SRI RAMAKRISHNA KATHAMRITA

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

“To realize Atman and for Welfare of the world”

Originally recorded by Sri M

(Mahendranath Gupta)

Original Bengali text in this ebook extracted from
www.ramakrishnavivekananda.info

Courtesy : www.belurmath.org

Address : Ramakrishna Math, Belurmath,
Howrah-711202. West Bengal, India

Dedicated at His Holy feet Sri Ramakrishna Paramahamsadev

“SRI RAMAKRISHNARPANAMASTU”

This ebook for Non Commercial use only

This ebook for Free distribution only

Following compatible ebook formats of Sri Ramakrishna Kathamrita (Language : Bengali) prepared with chapters and subchapters numbered, arranged, dates romanised and released in March 2020.

by

Swami Sevayogananda,
Ramakrishna Math, Belurmath,
Howrah-711202. West Bengal-India.

Compatible ebook formats :

Epub ebook format for Apple ipad/Mac/iphone prepared in January 2020 and published on Apple book store for free in March 2020.
(Bengali words and English date search, copy, highlight etc., made available)

Word docx ebook for Android phone 12 x 6.5 cm prepared and published in March 2020 for free,
{Table of contents linked (on document outline option) search, copy, highlight etc., options are available}.

Word docx ebook for Android Tablet 18 x 12 cm prepared and published in March 2020 for free,
{Table of contents linked (on document outline option) search, copy, highlight etc., options are available}.

Kindle format azw3 ebook published in March 2020 for free,
(Table of contents linked, copy Bengali word and paste in search to search from this book or type romanised dates, English words or alphabets).

Epub ebook for Android phone/Tablet prepared and published in March 2020 for free,
(Tested on ebookdroid app available on play store, search, copy, highlight etc., options are available).

Odt format A4 size for Linux prepared and published in March 2020 for free,
(search, copy, highlight etc., options are available).

PDF ebook A4 size for pc prepared and published in March 2020 for free,

(Table of contents linked, **Bengali word search not possible in PDF,** Search available only for romanised dates and numbers, English words/alphabets).

PDF ebook 12 x 6.5 cm size for phone prepared in March 2020 for free,
(Table of contents linked, **Bengali word search not possible in PDF,** Search available only for romanised dates and numbers, English words/alphabets).

PDF ebook 18 x 12 cm size for Android tablet prepared in March 2020,
(Table of contents linked, **Bengali word search not possible in PDF**, Search available only for romanised dates and numbers, English words/alphabets).

made available on **www.archive.org, www.scribd.com, search for Sri ramakrishna Kathamrita or sevayogananda** on archive.org or scribd.com to find easily this ebook.

Examples to search from this ebook :

Chapter search Eg: c1

Subchapter search Eg: 02.1

Bangla date search Eg: ১৮৮৫, ২৮শে জুলাই
(Highly case sensitive (type bangla numbers including comma, space & prepositions as in the ebook otherwise search error occurs, Bengali font not made searchable in pdf)

(or)

Simple romanised date search Eg: 1883/06/18/ii

(pattern in this ebook year/month/date/session)

Any word search Eg: ঠাকুর
(Case sensitive must be same as in this book, Bengali font not made searchable in PDF)

Search can be made by using exact word or sentence (except in PDF).

Chapters including subchapters :

c1 ১ উপক্রমণিকা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

c2 ২ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

02.1 কালীবাড়ী ও উদ্যান

02.2 প্রথম দর্শন

02.3 দ্বিতীয় দর্শন -- গুরুশিষ্য সংবাদ

02.4 মাস্টারকে তিরস্কার ও তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণকরণ

02.5 ভক্তির উপায়

02.6 তৃতীয় দর্শন

02.7 উপায় -- বিশ্বাস

02.8 সমাধি মন্দিরে

02.9 চতুর্থ দর্শন

02.10 অন্তরঙ্গ সঙ্গে -- আমি কে

c3 ৩ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে

03.1 শ্রীরামকৃষ্ণের বলরাম-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে নৃত্য

03.2 শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরে -- প্রাণকৃষ্ণের বাটীতে

03.3 কমলকুটিরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত কেশব সেন

c4 ৪ কলিকাতায় শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মিলন c4

04.1 বিদ্যাসাগরের বাটী

04.2 বিদ্যাসাগর

04.3 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ -- জ্ঞানযোগ বা বেদান্ত বিচার

04.4 জ্ঞান ও বিজ্ঞান, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ -- এই তিনের সমন্বয় -- Reconciliation of Non-Dualism, Qualified Non-Dualism and Dualism

04.5 ভক্তিযোগের রহস্য -- The secret of Dualism

04.6 ঈশ্বরকে ভালবাসা জীবনের উদ্দেশ্য -- The end of life

04.7 ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধু

c5 ৫ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রাদি অন্তরঙ্গ ও অন্যান্য ভক্তসঙ্গে

05.1 দক্ষিণেশ্বরে কেদারের উৎসব

05.2 কামিনী-কাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত -- সাধনা ও যোগতত্ত্ব

05.3 গুরুশিষ্য-সংবাদ -- গুহ্যকথা

05.4 পূর্বকথা -- শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম প্রেমোন্মাদ কথা -- ১৮৫৮

05.5 কীর্তনানন্দে নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে -- নরেন্দ্রকে প্রেমালিঙ্গন

05.6 শ্রীরামকৃষ্ণ ৺বিজয়াদিবসে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

05.7 ঠাকুর অনন্ত ও অনন্ত ঈশ্বর -- সকলই পন্থা -- শ্রীবৃন্দাবন-দর্শন

05.8 দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে বলরামাদি সঙ্গে -- বলরামকে শিক্ষা

c6 ৬ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নৌকাবিহার, আনন্দ ও কথোপকথন

06.1 শ্রীরামকৃষ্ণ - 'সমাধিমন্দিরে'

06.2 সমাধিমন্দিরে -- আত্মা অবিনশ্বর -- পওহারী বাবা

06.3 জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের সমন্বয়

06.4 বেদ ও তন্ত্রের সমন্বয় -- আদ্যাশক্তির ঐশ্বর্য

06.5 এ সংসার কেন

06.6 ব্রাহ্মদিগকে উপদেশ -- খ্রীষ্টধর্ম, ব্রাহ্মসমাজ ও পাপবাদ

06.7 শ্রীযুক্ত কেশব সেনের সহিত নৌকাবিহার -- সর্বভূতহিতে রতাঃ

06.8 কেশবকে শিক্ষা -- গুরুগিরি ও ব্রাহ্মসমাজে -- গুরু এক সচ্চিদানন্দ

06.9 কেশবাদি ব্রাহ্মদিগকে কর্মযোগ সম্বন্ধে উপদেশ

06.10 সুরেন্দ্রের বাড়ি নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে

c7 ৭ সিঁথি ব্রাহ্মসমাজ-দর্শন ও শ্রীযুক্ত শিবনাথ প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তদিগের সহিত কথোপকথন ও আনন্দ

07.1 উৎসব মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ

07.2 ভক্ত-সম্ভাষণে

07.3 তিন প্রকার আচার্য

07.4 ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না

07.5 ঈশ্বরদর্শন -- সাকার না নিরাকার?

07.6 ঈশ্বরলাভের লক্ষণ -- সপ্তভূমি ও ব্রহ্মজ্ঞান

07.7 ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনাপদ্ধতি ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য-বর্ণনা

c8 ৮ সার্কাস রঙ্গালয়ে -- গৃহস্থের ও অন্যান্য কর্মীদের কঠিন সমস্যা ও শ্রীরামকৃষ্ণ

08.1 সার্কাস ও বলরাম মন্দিরে

08.2 ষড়ভুজদর্শন ও শ্রীরাজমোহনের বাড়িতে শুভাগমন -- নরেন্দ্র

08.3 শ্রীযুক্ত মনোমোহন ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ

08.4 মণি মল্লিকের ব্রাহ্মোৎসবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

c9 ৯ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামি ও অন্যান্য ভক্তের প্রতি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ

09.1 মুক্তপুরুষের শরীরত্যাগ কি আত্মহত্যা?

09.2 জীব চার থাক -- বদ্ধজীবের লক্ষণ কামিনী-কাঞ্চন

09.3 তীব্র বৈরাগ্য ও বদ্ধজীব

09.4 কামিনী-কাঞ্চন জন্য দাসত্ব

09.5 ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত হলে তবে ঠিক আচার্য

09.6 মায়া বা অহং-আবরণ গেলেই মুক্তি

09.7 ভক্তিযোগ যুগধর্ম -- জ্ঞানযোগ বড় কঠিন -- "দাস আমি" -- "ভক্তের আমি" -- "বালকের আমি"

09.8 বাবুরাম প্রভৃতির সঙ্গে, ফ্রি উইল সম্বন্ধে কথা -- তোতাপুরীর আত্মহত্যার সঙ্কল্প

09.9 দক্ষিণেশ্বরে মারোয়াড়ী ভক্তগণসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

c10 ১০ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে শ্রীযুক্ত রাখাল, প্রাণকৃষ্ণ, কেদার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

10.1 দক্ষিণেশ্বরে প্রাণকৃষ্ণ, মাস্টার প্রভৃতি সঙ্গে

10.2 ভাবরাজ্য ও রূপদর্শন

10.3 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যশোদার ভাব ও সমাধি

10.4 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীরাধার ভাব

10.5 অভ্যাসযোগ -- দুই পথ -- বিচার ও ভক্তি

c11 ১১ বেলঘরে গ্রামে

11.1 গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে

c12 ১২ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ও বলরাম-মন্দিরে

12.1 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে, রাখাল, রাম, নিত্যগোপাল, চৌধুরী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

12.2 ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অমাবস্যায় ভক্তসঙ্গে -- রাখালের প্রতি গোপালভাব

12.3 দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব

12.4 জন্মোৎসবে ভক্তসঙ্গে -- সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম

12.5 সাকার-নিরাকার -- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের রামনামে সমাধি

12.6 কীর্তনানন্দে ও সমাধিমন্দিরে

12.7 গোস্বামী সঙ্গে সর্বধর্ম-সমন্বয়প্রসঙ্গে

12.8 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, নিত্যসিদ্ধ ও কৌমার বৈরাগ্য

12.9 পঞ্চবটীমূলে কীর্তনানন্দে

12.10 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গৃহস্থধর্ম

12.11 দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়িতে শ্রীযুক্ত অমৃত, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তের সঙ্গে কথোপকথন

12.12 গেরুয়াবসন ও সন্ন্যাসী -- অভিনয়েও মিথ্যা ভাল নয়

12.13 নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বলরাম-মন্দিরে

12.14 শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে -- মণিলাল ও কাশীদর্শন

12.15 গৃহস্থ ও কর্মযোগ

12.16 দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মগণ

12.17 শ্রীরামলাল প্রভৃতির গান ও শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি

12.18 শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরাবেশ, তাঁহার মুখে ঈশ্বরের বাণী

12.19 অধরের প্রতি উপদেশ -- সম্মুখে কাল

c13 ১৩ ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

13.1 শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা উপলক্ষে ভক্তসঙ্গে সুরেন্দ্রভবনে

13.2 ভক্তসঙ্গে সংকীর্তনানন্দে -- সমাধিমন্দিরে

13.3 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সাকার-নিরাকার

13.4 শ্রীরামকৃষ্ণ সিঁথির ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে

13.5 শ্রীরামকৃষ্ণ ও আচার্য শ্রীবেচারাম -- বেদান্ত ও ব্রহ্মতত্ত্ব প্রসঙ্গে

13.6 নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজে রাখাল, মাস্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

13.7 শ্রীরামকৃষ্ণ হরিকীর্তনানন্দে -- হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভায় ও রামচন্দ্রের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ

13.8 দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

13.9 কলিকাতায় বলরাম ও অধরের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ

13.10 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় ভক্তমন্দিরে -- শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ি কীর্তনানন্দে

c14 ১৪ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িমধ্যে

14.1 দক্ষিণেশ্বরে ফলহারিণী-পূজাদিবসে ভক্তসঙ্গে

14.2 পূর্বকথা -- শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমোন্মাদ ও রূপদর্শন

14.3 মণিলাল প্রভৃতি সঙ্গে -- ঠাকুর "অহেতুক কৃপাসিন্ধু"

14.4 মণিলাল প্রভৃতি সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও নিরাকারবাদ

14.5 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম প্রেমোন্মাদ কথা

14.6 হাজরার সঙ্গে কথা -- গুরুশিষ্য-সংবাদ

14.7 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে -- শ্রীযুক্ত রাখাল, রাম, কেদার, তারক, মাস্টার প্রভৃতির ভক্তসঙ্গে

14.8 দক্ষিণেশ্বরে মণিরামপুর ও বেলঘরের ভক্তসঙ্গে

14.9 শ্রীরামকৃষ্ণ মণিরামপুর ভক্তসঙ্গে

14.10 বেলঘরের ভক্তসঙ্গে

14.11 বেলঘরের ভক্তকে শিক্ষা -- ব্যাকুল হয়ে আর্জি কর -- ঠিক ভক্তের লক্ষণ

14.12 দক্ষিণেশ্বরে দশহরাদিবসে গৃহস্থাশ্রমকথা-প্রসঙ্গে

14.13 সাধনার প্রয়োজন -- গুরুবাক্যে বিশ্বাস -- ব্যাসের বিশ্বাস

14.14 শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে

c15 ১৫ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পেনেটীর মহোৎসবক্ষেত্রে রাখাল, রাম, মাস্টার, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

15.1 ঠাকুর সংকীর্তনানন্দে -- ঠাকুর কি শ্রীগৌরাঙ্গ?

15.2 শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ গোস্বামীর প্রতি উপদেশ

c16 ১৬ শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ও ভক্তগৃহে

16.1 শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের মন্দিরে রাখাল মাস্টার প্রভৃতির সঙ্গে

16.2 নানাভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ও ভক্তমন্দিরে

16.3 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতা রাজপথে ভক্তসঙ্গে

16.4 শ্রীযুক্ত অধর সেনের বাটীতে কীর্তনানন্দে

16.5 যদু মল্লিকের বাড়ি -- সিংহবাহিনী সম্মুখে -- 'সমাধিমন্দিরে'

16.6 ৺খেলাৎ ঘোষের বাটীতে সুভাগমন -- বৈষ্ণবকে শিক্ষা

16.7 দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটীতে ভক্তসঙ্গে ব্রহ্মতত্ত্ব ও আদ্যাশক্তির বিষয়ে কথোপকথন -- বিদ্যাসাগর ও কেশব সেনের কথা

16.8 ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত

16.9 সমাধিমন্দিরে

16.10 বলরাম-মন্দিরে ঈশ্বরদর্শন কথা

16.11 আদ্যাশক্তি ও অবতারতত্ত্ব

16.12 দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

16.13 মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী -- বিষ্ণুপুরে মৃন্ময়ীদর্শন

16.14 'সমাধিমন্দিরে' -- কাপ্তেন ও নরেন্দ্রের আগমন

16.15 সচ্চিদানন্দলাভের উপায় -- জ্ঞানী ও ভক্তের প্রভেদ

16.16 নরেন্দ্রসঙ্গে -- জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয়

16.17 সন্ধ্যাসমাগমে হরিধ্বনি -- নরেন্দ্রের কত গুণ

16.18 দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

16.19 গুরুশিষ্য-সংবাদ -- গুহ্যকথা

16.20 দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে রতন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

16.21 তান্ত্রিক সাধন ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানভাব

16.22 নিজের উপর শ্রদ্ধার মূল ঈশ্বরে বিশ্বাস

16.23 চিন্ময় রূপ কি -- ব্রহ্মজ্ঞানের পর বিজ্ঞান -- ঈশ্বরই বস্তু

16.24 শ্রীযুক্ত অধরের বাড়ি -- রাখাল, ঈশান প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

16.25 আদ্যাশক্তির উপাসনাতেই ব্রহ্ম-উপাসনা-- ব্রহ্ম ও শক্তিঅভেদ

16.26 দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে -- ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩

16.27 পণ্ডিত ও সাধুর প্রভেদ -- কলিযুগে নারদীয় ভক্তি

16.28 দক্ষিণেশ্বরে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ -- পরমহংস অবস্থা প্রদর্শন

16.29 দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

16.30 শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের বাড়ি দুর্গাপূজা মহোৎসবে

16.31 শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্ম-সমন্বয়ে -- বলরামের পিতার সঙ্গে কথা

16.32 দক্ষিণেশ্বরে কোজাগর লক্ষ্মীপূর্ণিমা -- ১৮৮৩

16.33 ভক্তসঙ্গে

16.34 কলিতে আগমের পথ

c17 ১৭ শ্রীরামকৃষ্ণের সিঁদুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজে, কমলকুটিরে ও শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেনের বাড়িতে আগমন

17.1 শ্রীরামকৃষ্ণের সিঁদুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজে আগমন ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির সহিত কথোপকথন

17.2 গৃহস্থের প্রতি উপদেশ

17.3 শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামীর নির্জনে সাধন

17.4 ভাব ও কুম্ভক -- মহাবায়ু উঠিলে ভগবানদর্শন

17.5 কেশবের বাটির সম্মুখে -- "পশ্যতি তব পন্থানম্"

17.6 শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ -- ঈশ্বরাবেশে মার সঙ্গে কথা

17.7 ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ -- মানুষলীলা

17.8 ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বর্ণনা -- পূর্বকথা

17.9 কেশব সঙ্গে কথা -- ঈশ্বরের হাসপাতালে আত্মার চিকিৎসা

17.10 ব্রাহ্মসমাজ ও বেদোল্লিখিত দেবতা -- গুরুগিরি নীচবুদ্ধি

17.11 শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেনের বাড়িতে শুভাগমন

17.12 গৃহস্থাশ্রমে ঈশ্বরলাভ -- উপায়

c18 ১৮ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে এবং ঠনঠনে সিদ্ধেশ্বরী-মন্দিরে

18.1 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-কালীমন্দিরে ভক্তসঙ্গে

18.2 ঠাকুরের তপস্যা -- ঠাকুরের আত্মীয়গণ ও ভবিষ্যৎ মহাতীর্থ

18.3 হরিকথাপ্রসঙ্গে

18.4 সেবক-হৃদয়ে

18.5 মণি, রামলাল, শ্যাম ডাক্তার, কাঁসারিপাড়ার ভক্তেরা

18.6 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও প্রতিমাপূজা -- ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরলাভ

18.7 'প্রয়োজন' (END OF LIFE) ঈশ্বরকে ভালবাসা

18.8 দক্ষিণেশ্বরে গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরঙ্গসঙ্গে

18.9 শ্রীরাখাল, লাটু, জনাইয়ের মুখুজ্জে প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

18.10 শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন ও বেদান্ত সম্বন্ধে গুহ্য ব্যাখ্যা -- অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ -- জগৎ কি মিথ্যা?

18.11 জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন -- উপায় প্রেম

18.12 দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে

18.13 ঠনঠনিয়া কালীমন্দিরেতে

18.14 বিল্বমূলে ও পঞ্চবটীতলায় শ্রীরামকৃষ্ণ

18.15 শ্রীরামকৃষ্ণ মণি প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

18.16 দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে -- বলরামের পিতা প্রভৃতি

18.17 শ্রীরামকৃষ্ণ, ভবনাথ, রাখাল, মণি, লাটু প্রভৃতি সঙ্গে

c19 ১৯ গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে

19.1 সমাধিমন্দিরে -- ঈশ্বরদর্শন ও ঠাকুরের পরমহংস অবস্থা

19.2 গুহ্যকথা

19.3 রাখাল, রাম, সুরেন্দ্র, লাটু প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

19.4 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগশিক্ষা -- শিবসংহিতা

19.5 শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রের বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে

19.6 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কলিকাতায় নিমন্ত্রণ -- শ্রীযুক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে শুভাগমন

19.7 ঈশানের গৃহে

19.8 শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয় -- ঈশ্বরকোটীর অপরাধ হয় না

19.9 দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে রাখাল, রাম, কেদার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে -- বেদান্তবাদী সাধুসঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা

c20 ২০ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

20.1 তান্ত্রিক ও মণি সঙ্গে

20.2 জ্ঞানপথ ও বিচারপথ -- ভক্তিযোগ ও ব্রহ্মজ্ঞান

20.3 মণিকে উপদেশ

20.4 সাধনকালে বেলতলায় ধ্যান ১৮৫৯-৬১ -- কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ

20.5 গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ -- ভক্তজন্য ক্রন্দন ও প্রার্থনা

20.6 দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে রাখাল, মাস্টার, মহিমা প্রভৃতি সঙ্গে

20.7 কি করে ঈশ্বরকে ডাকতে হয় -- "ব্যাকুল হও"

20.8 শিবপুর ভক্তগণ ও আমমোক্তারি (বকলমা) -- শ্রীমধু ডাক্তার

20.9 মহিমাচরণের প্রতি উপদেশ

20.10 মহিমাচরণের শাস্ত্রপাঠ শ্রবণ ও ঠাকুরের সমাধি

20.11 সরলতা ও সত্যকথা

20.12 দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে মাস্টার, মণিলাল প্রভৃতি সঙ্গে

20.13 শ্রীযুক্ত মণিলাল প্রভৃতির প্রতি উপদেশ -- নরলীলা

20.14 দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে

20.15 নরেন্দ্রাদি সঙ্গে -- নরেন্দ্রের সুখ-দুঃখ -- দেহের সুখ-দুঃখ

20.16 দক্ষিণেশ্বরে মণিলাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

20.17 ভক্তদিগকে ওঁকারের ব্যাখ্যা

20.18 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে রাখাল, রাম, নিত্য, অধর, মাস্টার, মহিমা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

20.19 ঠাকুরদাদা ও মহিমাচরণের প্রতি উপদেশ

20.20 মহিমার পাণ্ডিত্য -- মণি সেন, অধর ও মিটিং (Meeting)

20.21 শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে প্রাণকৃষ্ণ, মাস্টার, রাম, গিরীন্দ্র, গোপাল

20.22 শ্রীরামকৃষ্ণ ও সত্যকথা -- নরলীলায় বিশ্বাস করো

20.23 শ্রীকেশবচন্দ্র সেন ও নববিধান -- নববিধানে সার আছে

20.24 পিতা ধর্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমন্তপঃ

20.25 দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ -- ফলহারিণীপূজা ও বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা

20.26 যাত্রাওয়ালা ও সংসারে সাধনা -- ঈশ্বরদর্শনের (আত্মদর্শনের) উপায়

20.27 হরি (তুরিয়ানন্দ) নারাণ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

20.28 ভক্তসঙ্গে গুহ্যকথা -- শ্রীযুক্ত কেশব সেন

20.29 বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিক্ষা

20.30 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে, জন্মোৎসব্দিবসে বিজয়, কেদার, রাখাল, সুরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

20.31 বিজয়, কেদার প্রভৃতির প্রতি কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধে উপদেশ

20.32 বিজয়াদি ভক্তসঙ্গে সংকীর্তনানন্দে -- সহচরীর গৌরাঙ্গসন্ন্যাস গান

20.33 সন্ন্যাসীর কঠিন ব্রত -- সন্ন্যাসী ও লোকশিক্ষা

c21 ২১ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব

21.1 সুরেন্দ্রের বাগানে

21.2 সরলতা ও ঈশ্বরলাভ -- ঈশ্বরের সেবা আর সংসারের সেবা

21.3 শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও গোপীপ্রেম

21.4 ভবনাথ, মহিমা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে হরিকথাপ্রসঙ্গে

21.5 ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে

21.6 বিলাতে কাঞ্চনের পূজা -- জীবনের উদ্দেশ্য কর্ম না ঈশ্বরলাভ?

21.7 ব্রাহ্মসমাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণ -- প্রতাপকে শিক্ষা

21.8 প্রতাপকে শিক্ষা -- ব্রাহ্মসমাজ ও কামিনী-কাঞ্চন

c22 ২২ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে সুরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, লাটু, মাস্টার, অধর প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

22.1 শ্রীযুক্ত বাবুরাম, রাখাল, লাটু, নিরঞ্জন, নরেন্দ্র প্রভৃতির চরিত্র

c23 ২৩ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পণ্ডিতদর্শন

23.1 ঈশানের গৃহে

23.2 কলিতে ভক্তিযোগ -- কর্মযোগ নহে

23.3 শুধু পাণ্ডিত্য মিথ্যা -- সাধনা ও বিবেক-বৈরাগ্য

23.4 ঈশ্বরলাভের অনন্ত পথ -- ভক্তিযোগই যুগধর্ম

23.5 তীর্থযাত্রা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ -- আচার্যের তিন শ্রেণী

23.6 বিদায়

23.7 ঈশানের গৃহে

c24 ২৪ শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে পণ্ডিত শশধরাদি ভক্তসঙ্গে

24.1 কালীব্রহ্ম -- ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ

24.2 শাস্ত্রপাঠ ও পাণ্ডিত্য মিথ্যা -- তপস্যা চাই -- বিজ্ঞানী

24.3 জ্ঞান ও বিজ্ঞান -- ঠাকুর ও বেদোক্ত ঋষিগণ

24.4 ঈশ্বরদর্শন জীবনের উদ্দেশ্য -- তাহার উপায়

24.5 কালীব্রহ্ম, ব্রহ্মশক্তি অভেদ -- সর্বধর্ম-সমন্বয়

24.6 পণ্ডিত

c25 ২৫ বলরাম-মন্দিরে রথের পুনর্যাত্রায় ভক্তসঙ্গে

25.1 বলরাম-মন্দিরে

25.2 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমহংস অবস্থা -- বালকবৎ -- উন্মাদবৎ

25.3 পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তপস্যার প্রয়োজন -- সাধ্য-সাধনা

25.4 বলরামের বাড়ি, শশধর প্রভৃতি ভক্তগণ -- ঠাকুরের সমাধি

25.5 পুনুরযাত্রা -- রথের সম্মুখে ভক্তসঙ্গে ঠাকুরের নৃত্য ও সংকীর্তন

c26 ২৬ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে মাস্টার, রাখাল, লাটু, বলরাম, অধর, শিবপুরভক্তগণ প্রভৃতি সঙ্গে

26.1 শিবপুর ভক্তসঙ্গে যোগতত্ত্ব কথা -- কুণ্ডলিনী ও ষট্‌চক্রভেদ

26.2 ঠাকুরের সমাধি ও জগন্মাতার সহিত কথা -- প্রেমতত্ত্ব

26.3 নবাই চৈতন্য, নরেন্দ্র, বাবুরাম, লাটু, মণি, রাখাল, নিরঞ্জন, অধর

c27 ২৭ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত অধরের বাড়িতে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে

27.1 নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে। সমাধিমন্দিরে

27.2 ভাবাবস্থায় অন্তর্দৃষ্টি -- নরেন্দ্রাদির নিমন্ত্রণ

c28 ২৮ শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

28.1 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে রাম, বাবুরাম, মাস্টার, চুনি, অধর, ভবনাথ, নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

28.2 শ্রীরামকৃষ্ণ ও সর্বধর্ম-সমন্বয়

28.3 ভক্তসঙ্গে সংকীর্তনানন্দে -- ভক্তসঙ্গে নৃত্য

28.4 প্রবৃত্তি না নিবৃত্তি -- অধরের কর্ম -- বিষয়ীর উপাসনা ও চাকরি

28.5 চৈতন্যদেব, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও লোকমান্য

28.6 ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

28.7 নারাণের জন্য ঠাকুরের ভাবনা -- কোন্নগরের ভক্তগণ -- শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি ও নরেন্দ্রের গান

28.8 নরেন্দ্রাদির শিক্ষা -- বেদ-বেদান্তে কেবল আভাস

28.9 নরেন্দ্রের ভক্তি -- যদু মল্লিকের বাগানে ভক্তসঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব

28.10 শ্রীযুক্ত রাখালের জন্য চিন্তা -- যদু মল্লিক -- ভোলানাথের এজাহার

28.11 দক্ষিণেশ্বরে মহেন্দ্র, রাখাল, রাধিকা গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

28.12 শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত -- ঠাকুরের নানা সাধ

28.13 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত রাধিকা গোস্বামী

28.14 ছোকরা ভক্তদের সঙ্গে আনন্দ -- মা-কালীর আরতিদর্শন ও চামর ব্যজন -- মায়ে-পোয়ে কথা -- "কেন বিচার করাও"

28.15 হাজরা মহাশয়

28.16 পূর্বকথা -- শ্রীরামকৃষ্ণের পুরাণ, তন্ত্র ও বেদ মতের সাধনা

28.17 পূর্বকথা -- শম্ভু মল্লিকের অনাসক্তি -- মহাপুরুষের আশ্রয়

c29 ২৯ শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে ও কলিকাতায় চৈতন্যলীলা-দর্শন

29.1 রাখাল, নারাণ, নিত্যগোপাল ও ছোটগোপালের সংবাদ

29.2 ন্যাংটাবাবার শিক্ষা -- ঈশ্বরলাভের বিঘ্ন অষ্টসিদ্ধি

29.3 শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানোন্মাদ ও জাতি বিচার

29.4 হাতিবাগানে ভক্তমন্দিরে -- শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখুজ্জের সেবা

29.5 নাট্যালয়ে চৈতন্যলীলা -- শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ

29.6 চৈতন্যলীলাদর্শন -- গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণ

29.7 নাট্যালয়ে নিত্যানন্দবংশ ও শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দীপন

29.8 গৌরাঙ্গপ্রেমে মাতোয়ারা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

c30 ৩০ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে শ্রীরামুকৃষ্ণ -- দুর্গাপূজা দিবসে

30.1 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে

30.2 বিজয় গোস্বামীর প্রতি উপদেশ

c31 ৩১ রামের বাটীতে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

31.1 মহাষ্টমীদিবসে রামের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ

31.2 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে

c32 ৩২ দক্ষিণেশ্বরে নবমীপূজা দিবসে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

32.1 দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রকৃতি সঙ্গে

32.2 নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি মধ্যে সমাধিস্থ

32.3 ভবনাথ নরেন্দ্র প্রভৃতি মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি ও নৃত্য

32.4 নরেন্দ্র প্রভৃতিকে স্ত্রীলোক লইয়া সাধন নিষেধ, বামাচার নিন্দা

32.5 ঈশ্বর অভিভাবক -- শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভক্তি -- সংকীর্তনানন্দে

c33 ৩৩ শ্রীরামকৃষ্ণের অধরের বাড়ি আগমন ও ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দ

33.1 কেদার, বিজয়, বাবুরাম, নারাণ, মাস্টার, বৈষ্ণবচরণ

33.2 ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে

33.3 বিজয় প্রভৃতির সঙ্গে সাকার-নিরাকার কথা -- চিনির পাহাড়

c34 ৩৪ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে লাটু, মাস্টার, মণিলাল, মুখুজ্জে প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ও কলুটোলায় কীর্তনানন্দে

34.1 ব্রাহ্ম মণিলালকে উপদেশ (Dogmatism) ত্যাগ কর

34.2 আচার্যের কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ, তবে লোকশিক্ষার অধিকার -- সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম -- ব্রাহ্ম মণিলালকে শিক্ষা

34.3 শ্রীরামকৃষ্ণের বালকের অবস্থা

34.4 পূর্বকথা -- লক্ষ্মীনারায়ণের দশ হাজার টাকা দিবার কথায় শ্রীরামকৃষ্ণের অচৈতন্য হওয়া -- সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম

34.5 কর্মত্যাগ কখন? ভক্তের নিকট ঠাকুরের অঙ্গীকার

34.6 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলুটোলায় শ্রীযুক্ত নবীন সেনের বাটীতে ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে

c35 ৩৫ শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে -- বাবুরাম, মাস্টার, নীলকণ্ঠ, মনোমোহন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

35.1 হাজরা মহাশয় -- অহেতুকী ভক্তি

35.2 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধুদ্বয় সঙ্গে -- ঠাকুরের পরমহংস অবস্থা

35.3 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও 'কামিনী' -- সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম

35.4 শ্রীরামকৃষ্ণ, কেশব ও ব্রাহ্মসমাজ -- সমন্বয় উপদেশ

35.5 নীলকণ্ঠ প্রভৃতি ভক্তগণসঙ্গে সংকীর্তনানন্দে

35.6 দক্ষিণেশ্বরে বেদান্তবাগীশ -- ঈশান প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

35.7 স্ত্রীলোক লইয়া সাধন -- শ্রীরামকৃষ্ণের পুনঃ পুনঃ নিষেধ

35.8 পুরুষপ্রকৃতিবিবেক যোগ -- রাধাকৃষ্ণ, তাঁরা কে? আদ্যাশক্তি

35.9 ঈশানকে উপদেশ -- ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ -- জ্ঞানের লক্ষণ

35.10 নিবৃত্তিমার্গ -- ঈশ্বরলাভের পর কর্মত্যাগ

35.11 শ্রীরামকৃষ্ণের সব কামনা ত্যাগ -- কেবল ভক্তিকামনা

35.12 শ্রীরামকৃষ্ণ ও কর্মকাণ্ড -- কর্মকাণ্ড কঠিন তাই ভক্তিযোগ

35.13 শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কালীপূজা মহানিশায় ভক্তসঙ্গে

35.14 দক্ষিণেশ্বরে ৺কালীপূজা মহানিশায় শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনানন্দে

35.15 কালীপূজা রাত্রে সমাধিস্থ -- সাঙ্গোপাঙ্গ সম্বন্ধে দৈববাণী

c36 ৩৬ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সিঁথির ব্রাহ্মসমাজে ও বড়বাজারের মারোয়াড়ী ভক্তমন্দিরে গমন

36.1 সিঁথির ব্রাহ্মসমাজ পুনর্বার দর্শন ও বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি ব্রাহ্মভিক্তদিগকে উপদেশ ও তাঁহাদের সহিত আনন্দ

36.2 হরিকথা প্রসঙ্গে -- ব্রাহ্মসমাজে নিরাকারবাদ

36.3 ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে -- ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বর্ণনা

36.4 ব্রাহ্মসমাজ -- কেশব ও নির্লিপ্ত সংসার -- সংসারত্যাগ

36.5 আমমোক্তারী দাও -- গৃহস্থের কর্তব্য কতদিন

36.6 অহংকার ও সদরওয়ালা

36.7 শ্রীরামকৃষ্ণ সংকীর্তনানন্দে

36.8 বিজয়ের প্রতি উপদেশ

36.9 মা -- কালী ব্রহ্ম -- পূর্ণজ্ঞানের পর অভেদ

36.10 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বড়বাজারে মারোয়াড়ী ভক্তমন্দিরে

36.11 অবতার কি এখন নাই?

36.12 বড়বাজারে অন্নকূট-মহোৎসব মধ্যে -- ৺ময়ূরমুকুটধারীর পূজা

c37 ৩৭ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

37.1 দক্ষিণেশ্বরে মনোমোহন, মহিমা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

37.2 সেবক সন্নিকটে -- হৃদয় দণ্ডায়মান

37.3 ভক্তসঙ্গে -- নানাপ্রসঙ্গে -- ভাব মহাভাবের গূঢ়তত্ত্ব

37.4 সন্ন্যাস ও গৃহস্থাশ্রম -- ঈশ্বরলাভ ও ত্যাগ -- ঠিক সন্ন্যাসী কে?

37.5 গৃহস্থাশ্রমকথা-প্রসঙ্গে -- নির্লিপ্ত সংসারী

37.6 বেদান্তবিচারে -- মায়াবাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

37.7 মাতৃসেবা ও শ্রীরামকৃষ্ণ -- হাজরা মহাশয়

37.8 সন্ধ্যাসঙ্গীত ও ঈশান সংবাদ

37.9 সেবক-হৃদয়ে

37.10 সন্ন্যাসী সঞ্চয় করিবে না -- ঠাকুর 'মদগত-অন্তরাত্মা'

37.11 স্ব-স্বরূপে থাকা কিরূপ -- জ্ঞানযোগ কেন কঠিন

37.12 সংকীর্তনানন্দে

37.13 ভক্তসঙ্গে সংকীর্তনানন্দে

37.14 সেবকসঙ্গে

c38 ৩৮ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রহ্লাদচরিত্রাভিনয় দর্শনে স্টার থিয়েটারে

38.1 শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিমন্দিরে

38.2 ভক্তসঙ্গে ঈশ্বরকথাপ্রসঙ্গে

38.3 ঈশ্বরদর্শনের উপায় -- ব্যাকুলতা

38.4 সত্ত্বগুণ এলে ঈশ্বরলাভ -- "সচ্চিদানন্দ না কারণানন্দ"

c39 ৩৯ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও 'দেবী চৌধুরাণী' পাঠ

39.1 মাস্টার, প্রসন্ন, কেদার, রাম, নিত্যগোপাল, তারক, সুরেশ প্রভৃতি

39.2 নিষ্কামকর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ -- ফল সমর্পণ ও ভক্তি

39.3 ঈশ্বরদর্শনের উপায় -- শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত

39.4 পঞ্চবটীমূলে শ্রীরামকৃষ্ণ -- অবতারের 'অপরাধ' নাই

c40 ৪০ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মমহোৎসব ১৮৮৫ খ্রীঃ

40.1 নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে

40.2 জন্মোৎসবে ভক্তসম্ভাষণে

40.3 শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে -- সুরেন্দ্রের প্রতি উপদেশ -- গৃহস্থ ও দানধর্ম -- মনোযোগ ও কর্মযোগ

40.4 জন্মোৎসব রাত্রে গিরিশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে

c41 ৪১ গিরিশ-মন্দিরে ও স্টার থিয়েটারে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

41.1 গিরিশ-মন্দিরে জ্ঞানভক্তি-সমন্বয় কথাপ্রসঙ্গে

41.2 গিরিশের শান্তভাব, কলিতে শূদ্রের ভক্তি ও মুক্তি

41.3 শ্রীরামকৃষ্ণ স্টার থিয়েটারে -- বৃষকেতু অভিনয়দর্শনে, নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে

c42 ৪২ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

42.1 দোলযাত্রাদিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে

42.2 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার নরেন্দ্রকে সন্ন্যাসের উপদেশ

42.3 শ্রীশ্রীদোলযাত্রা ও শ্রীরামকৃষ্ণের ৺রাধাকান্ত ও মা-কালীকে ও ভক্তদিগের গায়ে আবির প্রদান

42.4 ৺দোলযাত্রাদিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ -- গুহ্যকথা

42.5 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ভক্তসঙ্গে (রাখাল, ভবনাথ, নরেন্দ্র, বাবুরাম)

42.6 সমাধিমন্দিরে ভক্তদের সম্বন্ধে মহাবাক্য

42.7 'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে' -- গুহ্যকথা'

42.8 শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত সন্ন্যাসের অবস্থা -- তারকসংবাদ

c43 ৪৩ বসু বলরাম-মন্দিরে, গিরিশ-মন্দিরে ও দেবেন্দ্র-ভবনে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

43.1 শ্রীরামকৃষ্ণের বলরামের গৃহে আগমন ও তাঁহার সহিত নরেন্দ্র, গিরিশ, বলরাম, চুনিলাল, লাটু, মাস্টার, নারায়ণ প্রভৃতি ভক্তের কথোপকথন ও আনন্দ

43.2 অপরাহ্নে ভক্তসঙ্গে -- অবতারবাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

43.3 ভক্তসঙ্গে ভজনানন্দে

43.4 সন্ধ্যাসমাগমে

43.5 রাজপথে শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত ঈশ্বরাবেশ

43.6 ঠাকুর ভক্তমন্দিরে -- সংবাদপত্র -- নিত্যগোপাল

43.7 পার্ষদসঙ্গে -- অবতার সম্বন্ধে বিচার

43.8 ঈশ্বরদর্শন (God Vision) -- অবতার প্রত্যক্ষসিদ্ধ

43.9 সমাধিমন্দিরে -- গরগরমাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণ

43.10 সেবকহৃদয়ে

43.11 অন্তরঙ্গসঙ্গে বসু বলরাম-মন্দিরে

43.12 দেবেন্দ্রের বাড়িতে ভক্তসঙ্গে

43.13 দেবেন্দ্র-ভবনে ঠাকুর কীর্তনানন্দে ও সমাধিমন্দিরে

43.14 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রের বাটীতে ভক্তসঙ্গে

c44 ৪৪ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

44.1 ঠাকুরের নিজ মুখে কথিত সাধনা বিবরণ

44.2 পূর্বকথা -- শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাব -- ব্রাহ্মণীর সেবা

44.3 সত্যকথা কলির তপস্যা -- ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি

44.4 কামিনী-কাঞ্চন ও তীব্র বৈরাগ্য

44.5 সংকীর্তনানন্দে ভক্তসঙ্গে

44.6 শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যার সংসার -- ঈশ্বরলাভের পর সংসার

44.7 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও অবতারতত্ত্ব

c45 ৪৫ শ্রীরামকৃষ্ণের কলিকাতায় ভক্তমন্দিরে আগমন -- শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষের বাটীতে উৎসব

45.1 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাটীতে অন্তরঙ্গসঙ্গে

45.2 শ্রীযুক্ত বলরামের বাটীতে অন্তরঙ্গসঙ্গে

45.3 অবতার ও সিদ্ধ-পুরুষের প্রভেদ -- মহিমা ও গিরিশের বিচার

45.4 ঠাকুর কীর্তনানন্দে

45.5 শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্র -- হাজরার কথা -- ছলরূপী নারায়ণ

45.6 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গোপীপ্রেম

45.7 সমাধিস্থ কি ফেরে? শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত -- কুয়ার সিং

c46 ৪৬ শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় বসু বলরাম-মন্দিরে

46.1 নরেন্দ্র ও হাজরা মহাশয়

46.2 অবতার সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে নরেন্দ্রাদির বিচার

46.3 শ্রীরামকৃষ্ণ ও কর্ম -- তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা

46.4 শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদিগকে আশ্বাস প্রদান ও অঙ্গীকার

c47 ৪৭ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ভক্তমন্দিরে -- রামের বাড়িতে

47.1 রামের বাড়িতে

c48 ৪৮ শ্রীরামকৃষ্ণ কাপ্তেন, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে

48.1 ঠাকুরের গলায় অসুখের সূত্রপাত

48.2 শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকাতত্ত্ব -- জন্মমৃত্যুতত্ত্ব

48.3 কাপ্তেন

48.4 অহংকারই বিনাশের কারণ ও ঈশ্বরলাভের বিঘ্ন

c49 ৪৯ শ্রীশ্রীরথযাত্রা বলরাম-মন্দিরে

49.1 পূর্ণ, ছোট নরেন, গোপালের মা

49.2 কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ ও পূর্ণাদি

49.3 শ্রীশ্রীরথযাত্রা দিবসে বলরাম-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

49.4 পূর্বকথা -- ৺কাশীধামে শিব ও সোনার অন্নপূর্ণাদর্শন -- অদ্য ব্রহ্মাণ্ডকে শালগ্রাম রূপে দর্শন

49.5 বলরামের রথযাত্রা -- নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে সংকীর্তনানন্দে

49.6 নরেন্দ্রের গান -- ঠাকুরের ভাবাবেশে নৃত্য

49.7 সুপ্রভাত ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ -- মধুর নৃত্য ও নামকীর্তন

49.8 ভক্তিযোগের গূঢ় রহস্য -- জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়

49.9 শ্রীরামকৃষ্ণের কুষ্ঠি -- পূর্বকথা -- ঠাকুরের ঈশ্বরদর্শন

c50 ৫০ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতানগরে ভক্তমন্দিরে

50.1 বলরাম বাটীতে

50.2 শ্রীযুক্ত নন্দ বসুর বাটীতে শুভাগমন

50.3 শ্রীরামকৃষ্ণ ও গৃহস্থের মঙ্গলকামনা -- রজোগুণের চিহ্ন

50.4 শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর বাটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

50.5 গণুর মার বাড়িতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

50.6 গুহ্যকথা -- "তিনজনই এক"

c51 ৫১ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

51.1 দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, মাস্টার, মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

51.2 ঠাকুর মুক্তকণ্ঠ -- শ্রীরামকৃষ্ণ কি সিদ্ধপুরুষ না অবতার?

51.3 পূর্বকথা -- ঠাকুর মুক্তকণ্ঠ -- ঠাকুর সিদ্ধপুরুষ না অবতার?

51.4 মহিমাচরণের ব্রহ্মচক্র -- পুর্বকথা -- তোতাপুরীর উপদেশ

51.5 মৌনাবলম্বী শ্রীরামকৃষ্ণ ও মায়াদর্শন

51.6 শ্রীরামকৃষ্ণ, গিরিশ, শশধর পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

51.7 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে রাখাল, মাস্টার, পণ্ডিত শ্যামাপদ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে সমাধিমন্দিরে -- পণ্ডিত শ্যামাপদের প্রতি কৃপা

51.8 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও যীশুখ্রীষ্ট (Jesus Christ)

51.9 দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে জন্মাষ্টমীদিবসে ভক্তসঙ্গে সুবোধের আগমন -- পূর্ণ, মাস্টার, গঙ্গাধর, ক্ষীরোদ, নিতাই

51.10 জন্মাষ্টামীদিবসে নরেন্দ্র, রাম, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

51.11 শ্রীযুক্ত ডাক্তার ভগবান রুদ্র ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

51.12 অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ ও ডাক্তার রাখাল -- ভক্তসঙ্গে নৃত্য

c52 ৫২ শ্যামপুকুর বাটীতে ভক্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

52.1 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরের বাটীতে ভক্তসঙ্গে

52.2 শ্রীরামকৃষ্ণ -- Sir Humphrey Davy ও অবতারবাদ

52.3 নিত্যলীলা যোগ

52.4 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও অবতারবাদ

52.5 পুরুষ-প্রকৃতি -- অধিকারী

52.6 শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশান, ডাক্তার সরকার, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে শ্যাম্পুকুরের বাটীতে আনন্দ ও কথোপকথন

52.7 যুগধর্ম কথাপ্রসঙ্গে -- জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ

52.8 অবতারকথাপ্রসঙ্গে -- অবতার ও জীব

52.9 শ্যামপুকুর বাটীতে ডাক্তার সরকার, নরেন্দ্র, শশী, শরৎ, মাস্টার, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

52.10 ঠাকুরের পরমহংস অবস্থা -- চতুর্দিকে আনন্দের কোয়াসাদর্শন -- ভগবতীর রূপদর্শন -- যেন বলছে, 'লাগ্ ভেলকি'

52.11 পূর্ণজ্ঞান -- দেহ ও আত্মা আলাদা -- শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত

52.12 ছোট নরেন প্রভৃতির ভাবাবস্থা -- সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের কর্তব্য

52.13 ডাক্তার সরকারকে উপদেশ -- অহংকার ভাল নয়। বিদ্যার আমি ভাল -- তবে লোকশিক্ষা (Lecture) হয়

52.14 শ্যামপুকুর বাটীতে নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

52.15 শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত বিজয়কৃষ্ণ, নরেন্দ্র, মাস্টার, ডাক্তার সরকার, মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তের কথোপকথন ও আনন্দ

52.16 শ্রীরামকৃষ্ণ সেবকসঙ্গে

52.17 বিজয়াদি ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে

52.18 ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে

52.19 ভক্তসঙ্গে -- শ্রীরামকৃষ্ণ ও ক্রোধজয়

52.20 শ্রীরামকৃষ্ণ -- গিরিশ, মাস্টার, ছোট নরেন্দ্র, কালী, শরৎ, রাখাল, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

52.21 মাস্টার ও ডাক্তার সংবাদ

52.22 ভক্তসঙ্গে -- শুধু পাণ্ডিত্যে কি আছে?

52.23 'যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া'

52.24 অহৈতুকি ভক্তি -- পূর্বকথা -- শ্রীরামকৃষ্ণের দাসভাব

52.25 শ্যামপুকুর বাটীতে নরেন্দ্র, মণি প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে অসুখ কেন? নরেন্দ্রের প্রতি সন্ন্যাসের উপদেশ

52.26 শ্রীরামকৃষ্ণ -- নরেন্দ্র, গিরিশ, সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ভজনানন্দে -- সমাধিমন্দিরে

52.27 জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিচারে -- ব্রহ্মদর্শন

52.28 পণ্ডিতের অহংকার -- পাপ ও পুণ্য

52.29 স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণ

52.30 গৃহস্থ ও নিষ্কাম কর্ম --Theosophy

52.31 গিরিশ ও ডাক্তার

52.32 ডাক্তার ও মাস্টার -- সার কি?

52.33 শ্রীরামকৃষ্ণ, ডাক্তার সরকার, ভাদুড়ী প্রভৃতি সঙ্গে

52.34 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় শ্যামপুকুর বাটীতে ভক্তসঙ্গে

52.35 ডাক্তার ও মাস্টার

52.36 ডাক্তার সরকারের প্রতি উপদেশ -- জ্ঞানীর ধ্যান

52.37 ঐহিক জ্ঞান বা Science

52.38 অবতীর্ণ শক্তি বা সদানন্দ

52.39 শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্বপ্রসঙ্গে -- 'সব সম্ভবে' নিত্যলীলা

52.40 শ্যামপুকুর বাটীতে হরিবল্লভ, নরেন্দ্র, মিশ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে শ্রীযুক্ত বলরামের জন্য চিন্তা -- শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ বসু

52.41 শ্রীরামকৃষ্ণ ও Jesus Christ -- তাঁহাতে খ্রীষ্টের আবির্ভাব

52.42 ৺কালীপূজার দিবসে শ্যামপুকুর বাটীতে ভক্তসঙ্গে

52.43 কালীপূজার দিবসে ভক্তসঙ্গে

52.44 জগন্মাতা ৺কালীপূজা

c53 ৫৩ কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

53.1 কাশীপুর উদ্যানে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে কৃপাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ -- মাস্টার, নিরঞ্জন, ভবনাথ

53.2 শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত -- শ্রীরামকৃষ্ণ কে? মুক্তকণ্ঠ

53.3 কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে; ঈশ্বরের জন্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের ব্যাকুলতা

53.4 ঈশ্বরের জন্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের ব্যাকুলতা ও তীব্র বৈরাগ্য

53.5 ভক্তদের তীব্র বৈরাগ্য -- সংসার ও নরক যন্ত্রণা

53.6 কাশীপুর উদ্যানে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে; নরেন্দ্রকে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয় উপদেশ

53.7 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে সাঙ্গোপাঙ্গসঙ্গে; ভক্তের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের দেহধারণ

53.8 সমাধিমন্দিরে

53.9 গুহ্যকথা -- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ

53.10 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে; বুদ্ধদেব ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

53.11 কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে

53.12 ঈশ্বরকোটির কি কর্মফল, প্রারব্ধ আছে? যোগবাশিষ্ঠ

53.13 শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর উদ্যানে -- গিরিশ ও মাস্টার

53.14 ঠাকুর গিরিশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে -- ভক্তের প্রতি ঠাকুরের স্নেহ

53.15 অবতার বেদবিধির পার -- বৈধীভক্তি ও ভক্তির উন্মাদ

53.16 কাশীপুর উদ্যানে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

53.17 বুদ্ধদেব কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিতেন? নরেন্দ্রকে শিক্ষা

53.18 নরেন্দ্র ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব -- ভবনাথ, পূর্ণ, সুরেন্দ্র

53.19 রাখাল, শশী, মাস্টার, নরেন্দ্র, ভবনাথ, সরেন্দ্র, রাজেন্দ্র, ডাক্তার

53.20 শ্রীরামকৃষ্ণ কেন কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করেছেন?

53.21 শ্রীরামকৃষ্ণ হীরানন্দ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে কাশীপুরের বাগানে

53.22 ঠাকুরের আত্মপূজা -- গুহ্যকথা -- মাস্টার, হীরানন্দ প্রভৃতি সঙ্গে

53.23 প্রবৃত্তি না নিবৃত্তি? হীরানন্দকে উপদেশ -- নিবৃত্তিই ভাল

53.24 মাস্টার, নরেন্দ্র, শরৎ প্রভৃতি

53.25 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রাদি ভক্তের মজলিস

53.26 পরিশিষ্ট

----

c54 ৫৪ শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্র

54.1 নরেন্দ্র

54.2 নরেন্দ্র কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচারকার্য

54.3 শ্রীরামকৃষ্ণ, নরেন্দ্র ও সর্বধর্ম-সমন্বয়

54.4 শ্রীরামকৃষ্ণ, নরেন্দ্র, কর্মযোগ ও স্বদেশহিতৈষণা

54.5 শ্রীরামকৃষ্ণ, নরেন্দ্র, কেশব সেন ও সাকারপূজা

54.6 শ্রীরামকৃষ্ণ, ব্রাহ্মসমাজ, নরেন্দ্র ও পাপবাদ

54.7 শ্রীরামকৃষ্ণ, বিজয়, কেশব, নরেন্দ্র ও 'কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ' -- সন্ন্যাস (Renunciation)

54.8 শ্রীরামকৃষ্ণ, কর্মযোগ, নরেন্দ্র ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা (নিষ্কাম কর্ম)

54.9 স্ত্রীলোক লইয়া সাধনা বা বামাচার সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর উপদেশ

54.10 শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও অবতারবাদ

c55 ৫৫ কেশবের সহিত দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে

55.1 প্রথম পরিচ্ছেদ

55.2 দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

c56 ৫৬ সুরেন্দ্রের বাড়িতে, মনোমোহন-মন্দিরে ও রাজেন্দ্রের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন

56.1 সুরেন্দ্রের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন; রাম, মনোমোহন, ত্রৈলোক্য ও মহেন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি সঙ্গে

56.2 শ্রীরামকৃষ্ণ মনোমোহন-মন্দিরে; কেশব সেন, রাম, সুরেন্দ্র, রাজেন্দ্র মিত্র, ত্রৈলোক্য প্রভৃতি সঙ্গে

56.3 মনোমোহন মন্দিরে

56.4 শ্রীরামকৃষ্ণ রাজেন্দ্রের বাড়িতে; রাম, মনোমোহন, কেষব সেন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে; ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ

56.5 রাজেন্দ্রের বাড়ি

c57 ৫৭ সিমুলিয়া ব্রাহ্মসমাজের মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ

57.1 রাম, কেশব, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

c58 ৫৮ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিম

58.1 শ্রীযুক্ত অধরলাল সেনের বাড়িতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দ ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদির সঙ্গে কথোপকথন

58.2 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও প্রচারকার্য

58.3 শ্রীরামকৃষ্ণ ও পরোপকার

58.4 আগে বিদ্যা (Science) না আগে ঈশ্বর

58.5 শ্রীরামকৃষ্ণ কীর্তনানন্দে

58.6 শ্রীযুক্ত বঙ্কিম ও ভক্তিযোগ -- ঈশ্বরপ্রেম

c59 ৫৯ বরাহনগর মঠ

59.1 নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি মঠের ভাইদের ৺শিবরাত্রি ব্রত

59.2 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ -- নরেন্দ্রাদি ভক্তের বৈরাগ্য ও সাধন

59.3 নরেন্দ্রের পূর্বকথা

59.4 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তহৃদয়ে; শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্রাদির সাধনা ও তীব্র বৈরাগ্য

59.5 ভাই সঙ্গে নরেন্দ্র -- নরেন্দ্রের অন্তরের কথা

59.6 নরেন্দ্র

c60 ৬০ শ্রীরামকৃষ্ণ অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

60.1 শ্রীযুক্ত কেশব সেন (১৮৮১), ৺দেবেন্দ্র ঠাকুর, অচলানন্দ, শিবনাথ, হৃদয়, নরেন্দ্র, গিরিশ

c61 ৬১ মাস্টার মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত

c62 ৬২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের শব্দার্থ

c63 ৬৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে উল্লিখিত ব্যক্তিবৃন্দের পরিচয়

c64 ৬৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে উল্লিখিত স্থানসমূহের পরিচয়

----

c1 ১ উপক্রমণিকা

INTRODUCTION

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম — পিতা ক্ষুদিরাম ও মাতা চন্দ্রমণি — পাঠশালা — ৺রঘুবীর সেবা — সাধুসঙ্গ ও পুরাণ শ্রবণ — অদ্ভুত জ্যোতিঃদর্শন — কলিকাতায় আগমন ও দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে অদ্ভুত ‘ঈশ্বরীয়’ রূপদর্শন — ঠাকুর উন্মাদবৎ — কালীবাড়িতে সাধুসঙ্গ — তোতাপুরী ও ঠাকুরের বেদান্ত শ্রবণ — তন্ত্রোক্ত ও পুরাণোক্ত সাধন — ঠাকুরের জগন্মাতার সহিত কথাবার্তা — তীর্থদর্শন — ঠাকুরের অন্তরঙ্গ — ঠাকুর ও ভক্তগণ — ঠাকুর

ও ব্রাহ্মসমাজ — হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান ইত্যাদি সর্বধর্ম-সমন্বয় — ঠাকুরের স্ত্রীলোক ভক্ত — ভক্ত-পরিবার।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হুগলী জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রামে এক সদ্ব্রাহ্মণের ঘরে ফাল্‌গুনের শুক্লা দ্বিতীয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। কামারপুকুর গ্রাম জাহানাবাদ (আরামবাগ) হইতে চার ক্রোশ পশ্চিমে, আর বর্ধমান হইতে ১২।১৩ ক্রোশ দক্ষিণে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মদিন সম্বন্ধে মতভেদ আছে:

অম্বিকা আচার্যের কোষ্ঠী। এই কোষ্ঠী ঠাকুরের অসুখের সময় প্রস্তুত করা হয়, ৩রা কার্তিক ১২৮৬, ইংরেজী ১৮৭৯। উহাতে জন্মদিন লেখা আছে ১৭৫৬ শক, ১০ই ফাল্গুন, বুধবার, শুক্লা দ্বিতীয়া, পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র। তাঁহার গণনা ১৭৫৬। ১০।৯।৫৯।১২।

ক্ষেত্রনাথ ভট্টের ১৩০০ সালে গণনা, ১৭৫৪।১০।৯।০।১২। এই মতে ১৭৫৪ শক, ১০ই ফাল্গুন, বুধবার, শুক্লা দ্বিতীয়া, পূর্বভাদ্রপদ — সব মিলে। ১২৩৯ সাল, ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩। লগ্নে রবি চন্দ্র বুধের যোগ।১ কুম্ভরাশি। বৃহস্পতি শুক্রের যোগহেতু, “সম্প্রদায়ের প্রভু হইবেন।”

নারায়ণ জ্যোর্তিভূষণের নূতন কোষ্ঠী (মঠে প্রস্তুত)। এ-গণনা অনুসারে ১২৪২ সালে, ৬ই ফাল্গুন বুধবার; ১৮৩৬, ১৭ই ফেব্রুয়ারি ভোর রাত্রি ৪টা ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া, ত্রিগ্রহের যোগ, নক্ষত্র — সব মিলে। কেবল অম্বিকা আচার্যের লিখিত ১০ই ফাল্গুন হয় না। ১৭৫৭।১০।৫।৫৯।২৮।২১।

ঠাকুর মানব-শরীরে ৫১/৫২ বৎসর কাল ছিলেন।

ঠাকুরের পিতা ৺ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় অতি নিষ্ঠাবান ও পরম ভক্ত ছিলেন। মা ৺চন্দ্রমণি দেবী সরলতা ও দয়ার প্রতিমূর্তি ছিলেন। পূর্বে তাঁহাদের দেরে নামক গ্রামে বাস ছিল। কামারপুকুর হইতে দেড় ক্রোশ দূরে। সেই গ্রামস্থ জমিদারের হইয়া মোকদ্দমায় ক্ষুদিরাম সাক্ষ্য দেন নাই। পরে স্বজন লইয়া কামারপুকুরে আসিয়া বাস করেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ছেলেবেলার নাম গদাধর। পাঠশালে সামান্য লেখাপড়া শিখিবার পর বাড়িতে থাকিয়া ৺রঘুবীরের বিগ্রহ সেবা করিতেন। নিজে ফুল তুলিয়া আনিয়া নিত্যপূজা করিতেন। পাঠশালে। "শুভঙ্করী ধাঁধাঁ লাগত"।

নিজে গান গাহিতে পারিতেন — অতিশয় সুকণ্ঠ। যাত্রা শুনিয়া প্রায় অধিকাংশ গান গাহিয়া দিতে পারিতেন। বাল্যকালাবধি সদানন্দ। পাড়ায় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন।

বাড়ির পাসে লাহাদের বাড়ি, সেখানে অতিথিশালা — সর্বদা সাধুদের যাতায়াত ছিল। গদাধর সেখানে সাধুদের সঙ্গ ও তাঁহাদের সেবা করিতেন। কথকেরা যখন পুরাণ পাঠ করিতেন, তখন নিবিষ্ট মনে সমস্ত শুনিতেন। এইরূপে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত-কথা — সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

একদিন মাঠ দিয়া বাড়ির নিকটবর্তী গ্রাম আনুড়ে যাইতেছিলেন। তখন ১১ বৎসর বয়স। ঠাকুর নিজ মুখে বলিয়াছেন, হঠাৎ তিনি অদ্ভুত জ্যোতিঃ দর্শন

করিয়া বাহ্যশূন্য হয়েন। লোকেরা বলিল, মূর্ছা — ঠাকুরের ভাবসমাধি হইয়াছিল।

 ক্ষুদিরামের মৃত্যুর পর ঠাকুর জ্যেষ্ঠভ্রাতার সঙ্গে কলিকাতায় আসিলেন। তখন তাঁহার বয়স ১৭/১৮ হইবে। কলিকাতায় কিছুদিন নাথের বাগানে, কিছুদিন ঝামাপুকুরে গোবিন্দ চাটুজ্যের বাড়িতে থাকিয়া, পূজা করিয়া বেড়াইতেন। এই সূত্রে ঝামাপুকুরের মিত্রদের বাড়িতে কিছুদিন পূজা করিয়াছিলেন।

রাণী রাসমণি কলিকাতা হইতে আড়াই ক্রোশ দূরে, দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি স্থাপন করিলেন। ১২৬২ সাল ১৮ই জৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, স্নানযাত্রার দিন। (ইংরেজী ৩১শে মে, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ)২। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা পণ্ডিত রামকুমার কালীবাড়িতে প্রথম পূজারী নিযুক্ত হইলেন। ঠাকুরও মাঝে মাঝে কলিকাতা হইতে আসিতেন ও কিছুদিন পরে নিজে পূজাকার্যে নিযুক্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স ২১/২২ হইবে। মধ্যমভ্রাতা রামেশ্বরও মাঝে মাঝে কালীবাড়ির পূজা করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র — শ্রীযুক্ত রামলাল ও শ্রীযুক্ত শিবরাম ও এক কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী।

কয়েকদিন পূজা করিতে করিতে শ্রীরামকৃষ্ণের মনের অবস্থা আর একরকম হইল। সর্বদাই বিমনা ও ঠাকুর প্রতিমার কাছে বসিয়া থাকিতেন।৩

আত্মীয়েরা এই সময় তাঁহার বিবাহ দিলেন — ভাবিলেন, বিবাহ হইলে হয়তো অবস্থান্তর হইতে পারে। কামারপুকুর হইতে দুই ক্রোশ দূরে জয়রামবাটী গ্রামস্থ

৺রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীর সঙ্গে বিবাহ হইল, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুরের বয়স ২২/২৩, শ্রীশ্রীমার ৬ বৎসর।

বিবাহের পর দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পরে তাঁহার একেবারে অবস্থান্তর হইল। কালী-বিগ্রহ পূজো করিতে করিতে কী অদ্ভুত ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। আরতি করেন, আরতি আর শেষ হয় না। পূজা করিতে বসেন, পূজা শেষ হয় না; হয়তো অপনার মাথায় ফুল দিতে থাকেন।

পূজা আর করিতে পারিলেন না —— উন্মাদের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। রানী রাসমণির জামাতা মথুর তাঁহাকে মহাপুরুষবোধে সেবা করিতে লাগিলেন ও অন্য ব্রাহ্মণ দ্বারা মা-কালীর পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ঠাকুরের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের উপর মথুরবাবুর এই পূজার ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার ভার দিলেন।

ঠাকুর আর পূজাও করিলেন না, সংসারও করিলেন না —— বিবাহ নামমাত্র হইল। নিশিদিন মা! মা! কখন জড়বৎ —— কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায়, কখনও উন্মাদবৎ বিচরণ করেন। কখনও বালকের ন্যায় —— কখনও কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত বিষয়ীদের দেখিয়া লুকাইতেন। ঈশ্বরীয় লোক ও ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছু ভালবাসেন না। সর্বদাই মা! মা!

কালীবাড়িতে সদাব্রত ছিল (এখনও আছে) — সাধু-সন্ন্যাসীরা সর্বদা আসিতেন। তোতাপুরী এগার মাস থাকিয়া ঠাকুরকে বেদান্ত শুনাইলেন; একটু

শুনাইতে শুনাইতে তোতা দেখিলেন, ঠাকুরের নির্বিকল্পসমাধি হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ।

ব্রাহ্মণী পূর্বেই (১৮৫৯) আসিয়াছেন, তিনি তন্ত্রোক্ত অনেক সাধন করাইলেন ও ঠাকুরকে শ্রীগৌরাঙ্গজ্ঞানে শ্রীচরিতামৃতাদি বৈষ্ণবগ্রন্থ শুনাইলেন। তোতার কাছে ঠাকুর বেদান্ত শ্রবণ করিতেছেন দেখিয়া, ব্রাহ্মণী তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতেন ও বলিতেন, “বাবা, বেদান্ত শুন না — ওতে ভাব-ভক্তি সব কমে যাবে।”

বৈষ্ণব পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণও সর্বদা আসিতেন। তিনিই ঠাকুরকে কলুটোলায় চৈতন্যসভায় লইয়া যান। এই সভাতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের আসনে গিয়া উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবচরণ চৈতন্যসভার সভাপতি ছিলেন

বৈষ্ণবচরণ মথুরকে বলিয়াছিলেন, এ-উন্মাদ সামান্য নহে — প্রেমোন্মাদ। ইনি ঈশ্বরের জন্য পাগল। ব্রাহ্মণী ও বৈষ্ণবচরণ দেখিলেন, ঠাকুরের মহাভাবের অবস্থা। শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় কখনও অন্তর্দশা (তখন জড়বৎ সমাধিস্থ), কখন অর্ধবাহ্য, কখনও বা বাহ্যদশা।

ঠাকুর ‘মা’ ‘মা’ করিয়া কাঁদিতেন, মার কাছে উপদেশ লইতেন। বলিতেন, “মা তোর কথা কেবল শুনব; আমি শাস্ত্রও জানি না, পন্ডিতও জানি না। তুই বুঝাবি তবে বিশ্বাস করব।” ঠাকুর জানিতেন ও বলিতেন, যিনি পরব্রহ্ম, অখন্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই মা।

ঠাকুরকে জগন্মাতা বলিয়াছিলেন, “তুই আর আমি এক। তুই ভক্তি নিয়ে থাক — জীবের মঙ্গলের জন্য। ভক্তেরা সকলে আসবে। তোর তখন কেবল বিষয়ীদের দেখতে হবে না; অনেক শুদ্ধ কামনাশূন্য ভক্ত আছে, তারা আসবে।” ঠাকুরবাড়িতে আরতির সময় যখন কাঁসরঘন্টা বাজিত, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ কুঠিতে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেন, “ওরে ভক্তেরা, তোরা কে কোথায় আছিস, শীঘ্র আয়।”

মাতা চন্দ্রমণি দেবীকে ঠাকুর জগজ্জননীর রূপান্তরজ্ঞান করিতেন ও সেইভাবে পূজা করিতেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের স্বর্গলাভের পর মাতা পুত্রশোকে কাতরা হইয়াছিলেন; তিন-চারি বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে কালীবাড়িতে আনাইয়া নিজের কাছে রাখিয়া দিয়াছিলেন ও প্রত্যহ দর্শন, পদধূলি গ্রহণ ও “মা কেমন আছ” জিজ্ঞাসা করিতেন।

ঠাকুর দুইবার তীর্থে গমন করেন। প্রথমবার মাকে সঙ্গে লইয়া যান, সঙ্গে শ্রীযুক্ত রাম চাটুজ্যে ও মথুরবাবুর কয়েকট পুত্র। তখন সবে কাশির রেল খুলিয়াছে। তাঁহার অবস্থান্তরের ৫/৬ বৎসরের মধ্যে। তখন অহর্নিশ প্রায়ই সমাধিস্থ বা ভাবে গরগর মাতোয়ারা। এবার বৈদ্যনাথ দর্শনান্তর ৺কাশীধাম ও প্রয়াগ দর্শন হইয়াছিল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ।

দ্বিতীয়বার তীর্থগমন ইহার ৫ বৎসর পরে, ইংরেজী জানুয়ারি, ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। মথুরবাবু ও তাঁহার স্ত্রী জগদম্বা দাসীর সঙ্গে। ভাগিনেয় হৃদয় এবার সঙ্গে ছিলেন। এ-যাত্রায় ৺কাশীধাম, প্রয়াগ, শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করেন। কাশীতে মণিকর্ণিকায় সমাধিস্থ হইয়া বিশ্বনাথের গম্ভীর চিন্ময় রূপ দর্শন করেন — মুমূর্ষুদিগের কর্ণে

তারকব্রহ্ম নাম দিতেছেন। আর মৌন ব্রতধারী ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সহিত আলাপ করেন। মথুরায় ধ্রুবঘাটে বসুদেবের কোলে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবৃন্দাবনে সন্ধ্যা সময়ে ফিরতিগোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ ধেনু লইয়া যমুনা পার হইয়া আসিতেছেন ইত্যাদি লীলা ভাবচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, নিধুবনে রাধাপ্রেমে বিভোরা গঙ্গামাতার সহিত আলাপ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত কেশব সেন যখন বেলঘরের বাগানে ভক্তসঙ্গে ঈশ্বরের ধ্যান চিন্তা করেন, তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগিনেয় হৃদয়ের সঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে যান; ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, নেপালের ‘কাপ্তেন’এই সময়ে আসিতে থাকেন। সিঁথির গোপাল (‘বুড়ো গোপাল’) ও মহেন্দ্র কবিরাজ, কৃষ্ণনগরের কিশোরী ও মহিমাচরণ এই সময়ে ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তেরা ইং ১৮৭৯, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ঠাকুরের কাছে আসিতে থাকেন। তাঁহারা যখন ঠাকুরকে দেখেন, তখন উন্মাদ অবস্থা প্রায় চলিয়া গিয়াছে। তখন শান্ত সদানন্দ বালকের অবস্থা। কিন্তু প্রায় সর্বদা সমাধিস্থ — কখন জড়সমাধি — কখন ভাবসমাধি — সমাধি ভঙ্গের পর ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। যেন পাঁচ বৎসরের ছেলে। সর্বদাই মা! মা!

রাম ও মনোমোহন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে আসিয়া মিলিত হইলেন; কেদার, সুরেন্দ্র তার পরে আসিলেন। চুনী, লাটু, নিত্যগোপাল, তারকও পরে আসিলেন। ১৮৮১-র শেষ ভাগে ও ১৮৮২-র প্রারম্ভ, এই সময়ের মধ্যে নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, বাবুরাম, নিরনঞ্জন, মাস্টার, যোগীন আসিয়া পড়িলেন। ১৮৮৩/৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কিশোরী, অধর, নিতাই, ছোটগোপাল, বেলঘরের

তারক, শরৎ, শশী; ১৮৮৪-র মধ্যে সান্যাল, গঙ্গাধর, কালী, গিরিশ, দেবেন্দ্র, সারদা, কালীপদ, উপেন্দ্র, দ্বিজ ও হরি; ১৮৮৫-র মধ্যে সুবোধ, ছোট নরেন্দ্র, পল্টু, পূর্ণ, নারায়ণ, তেজচন্দ্র, হরিপদ আসিলেন। এইরূপে হরমোহন, যজ্ঞেশ্বর, হাজরা, ক্ষীরোদ, কৃষ্ণনগরের যোগীন, মণীন্দ্র, ভূপতি, অক্ষয়, নবগোপাল, বেলঘরের গোবিন্দ, আশু, গিরীন্দ্র, অতুল, দুর্গাচরণ, সুরেশ, প্রাণকৃষ্ণ, নবাইচৈতন্য, হরিপ্রসন্ন, মহেন্দ্র (মুখো), প্রিয় (মুখুজ্জে), সাধু প্রিয়নাথ (মন্মথ), বিনোদ, তুলসী, হরিশ মুস্তাফী, বসাক, কথকঠাকুর, বালির শশী (ব্রহ্মচারী), নিত্যগোপাল (গোস্বামী), কোন্নগরের বিপিন, বিহারী, ধীরেন, রাখাল (হালদার) ক্রমে আসিয়া পড়িলেন

ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, শশধর পণ্ডিত, ডাক্তার রাজেন্দ্র, ডাক্তার সরকার, বঙ্কিম (চাটুজ্যে), আমেরিকার কুক্‌সাহেব, ভক্ত উইলিয়ামস্‌, মিসির সাহেব, মাইকেল মধুসূদন, কৃষ্ণদাস (পাল), পণ্ডিত দীনবন্ধু, পণ্ডিত শ্যামাপদ, রামনারায়ণ ডাক্তার, দুর্গাচরণ ডাক্তার, রাধিকা গোস্বামী, শিশির (ঘোষ), নবীন (মুন্সী), নীলকন্ঠ ইহারাও দর্শন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কাশীধামে ও গঙ্গামাতার শ্রীবৃন্দাবনে সাক্ষাৎ হয়। গঙ্গামাতা ঠাকুরকে শ্রীমতী রাধাজ্ঞানে বৃন্দাবন হইতে ছাড়িতে চান নাই।

অন্তরঙ্গ ভক্তেরা আসিবার আগে কৃষ্ণকিশোর, মথুর, শম্ভু মল্লিক, নারায়ণ শাস্ত্রী, ইঁদেশের গৌরী পণ্ডিত, চন্দ্র, অচলানন্দ সর্বদা ঠাকুরকে দর্শন করিতেন। বর্ধমানের রাজার সভাপন্ডিত পদ্মলোচন, আর্যসমাজের দয়ানন্দও দর্শন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুর এবং সিওড় শ্যামবাজার ইত্যাদি স্থানের অনেক ভক্তেরা তাঁহাকে দেখিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের অনেকে ঠাকুরের কাছে সর্বদা যাইতেন। কেশব, বিজয়, কালী (বসু), প্রতাপ, শিবনাথ, অমৃত ত্রৈলক্য, কৃষ্ণবিহারী, মণিলাল, উমেশ, হীরানন্দ, ভবানী, নন্দলাল ও অন্যান্য অনেক ব্রাহ্মভক্ত সর্বদা যাইতেন; ঠাকুরও ব্রাহ্মদের দেখিতে আসিতেন। মথুরের জীবদ্দশায় ঠাকুর তাঁহার সহিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁহার বাটীতে ও উপাসনাকালে আদি ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে গিয়াছিলেন। পরে কেশবের ব্রাহ্মমন্দির ও সাধারণসমাজ — উপাসনাকালে — দেখিতে গিয়াছিলেন। কেশবের বাড়িতে সর্বদা যাইতেন ও ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে কত আনন্দ করিতেন। কেশবও সর্বদা, কখন ভক্তসঙ্গে, কখন বা একাকী আসিতেন।

কালনাতে ভগবান দাস বাবাজীর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল ঠাকুরের সমাধি আবস্থা দেখিয়া বলিয়াছিলেন — আপনি মহাপুরুষ, চৈতন্যদেবের আসনে বসিবার আপনিই উপযুক্ত।

ঠাকুর সর্বধর্ম-সমন্বয়ার্থ বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ইত্যাদি ভাব সাধন করিয়া অপরদিকে আল্লা মন্ত্রজপ ও যীশুখ্রীষ্টের চিন্তা করিয়াছিলেন। যে-ঘরে ঠাকুর থাকিতেন সেখানে ঠাকুরদের ছবি ও বুদ্ধদেবের মূর্তি ছিল। যীশু জলমগ্ন পিতরকে উদ্ধার করিতেছেন, এ-ছবিও ছিল। এখনও সে-ঘরে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়। আজ ওই ঘরে ইংরেজ ও আমেরিকান ভক্তেরা আসিয়া ঠাকুরের ধ্যান চিন্তা করেন, দেখা যায়।

একদিন মাকে ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, “মা তোর খ্রীষ্টান ভক্তেরা তোকে কিরূপে ডাকে দেখব, আমায় নিয়ে চ।” কিছুদিন পরে কলিকাতায় গিয়া এক গির্জার

দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া উপাসনা দেখিয়াছিলেন। ঠাকুর ফিরিয়া আসিয়া ভক্তদের বলিলেন, “আমি খাজাঞ্চীর ভয়ে ভিতরে গিয়া বসি নাই — ভাবলাম, কি জানি যদি কালীঘরে যেতে না দেয়।”

ঠাকুরের অনেক স্ত্রীলোক ভক্ত আছেন। গোপালের মাকে ঠাকুর মা বলিয়াছিলেন ও “গোপালের মা” বলিয়া ডাকিতেন। সকল স্ত্রীলোককেই তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী দেখিতেন ও মা-জ্ঞানে পূজা করিতেন। কেবল যত দিন না স্ত্রীলোককে সাক্ষাৎ মা-বোধ হয়, যত দিন না ঈশ্বরে শুদ্ধাভক্তি হয়, ততদিন স্ত্রীলোক সম্বন্ধে পুরুষদের সাবধান থাকিতে বলিতেন। এমন কি পরম ভক্তিমতী হইলেও তাঁহাদের সম্পর্কে যাইতে বারণ করিতেন। মাকে নিজে বলিয়াছিলেন, “মা, আমার ভিতরে যদি কাম হয়, তাহলে কিন্তু মা গলায় ছুরি দিব।”

ঠাকুরের ভক্তেরা অসংখ্য — তাঁহারা কেহ প্রকাশিত আছেন, কেহ বা গুপ্ত আছেন — সকলের নাম করা অসম্ভব। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে অনেকের নাম পাওয়া যাইবে। বাল্যকালে অনেকে — রামকৃষ্ণ, পতু, তুলসী, শান্তি, শশী, বিপিন, হীরালাল, নগেন্দ্র মিত্র, উপেন্দ্র, সুরেন্দ্র, সুরেন ইত্যাদি; ও ছোট ছোট অনেক মেয়েরা ঠাকুরকে দেখিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারাও ঠাকুরের সেবক।

লীলা সংবরণের পর তাঁহার কত ভক্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন। মাদ্রাজ, লঙ্কাদ্বীপ, উত্তর-পশ্চিম, রাজপুতনা, কুমাউন, নেপাল, বোম্বাই, পাঞ্জাব, জাপান; আবার আমেরিকা, ইংলণ্ড — সর্বস্থানে ভক্ত-পরিবার ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও উত্তরোত্তর বাড়িতেছে।

(জন্মাষ্টমী ১৩১০)

১ লগ্নে রবি চন্দ্র বুধের যোগ — শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১৫ই জুলাই ১৮৮৫ দ্রষ্টব্য।

২ এ-সমস্ত রানী রাসমণির কালীবাড়ির বিক্রি কবালা হইতে লওয়া হইয়াছে:

Deed of Conveyance, Date of purchase of the temple grounds, 6th September, 1847. Date of Registration, 27th August, 1861; price of the Dinajpur Zamindari which supports the Temple, Rs. 2,26,000.

৩ রানী রাসমণির বরাদ্দ — ১২৬৫ (১৮৫৮ খ্রীঃ)

শ্রীশ্রীকালী

কাপড় —

শ্রীরামতারক ভট্টাচার্য ৫৲ রামতারক

৩ জোড়া ৪।।০

শ্রীশ্রীরাধাকান্তজী — রামকৃষ্ণ

৩ জোড়া ৪।।০

শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ৫৲ রাম চাটুজ্যে

ঐ ঐ

পরিচারক — হৃদয় মুখুজ্জে

ঐ ঐ

শ্রীহৃদয় মুখোপাধ্যায় ৩।।০

(ফুল তুলিতে হইবে।) খোরাকী

সিদ্ধচাউল ৴।।০ সের,

ডাল ৴৯০ পো,

পাতা ২ খান, তামাক ১

ছটাক, কাষ্ঠ ৴২।।০

বরাদ্দ হইতে দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৫৮ খ্রী: শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে ও রামতারক (হলধারী) কালীমন্দিরে পূজা করিতেছেন। হৃদয় পরিচারক ফুল তুলিতে হয়। [বলিদান হয় বলিয়া হলধারী পরে ১৮৫৯।৬০-এ ৺রাধাকান্তের সেবায় আসেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ কালীঘরে পূজা করিতে যান।]

এই সময়ে পঞ্চবটীতে তুলসীকানন ও পুরাণমতে সাধন, রামাৎ সাধুসঙ্গ, রামলালা সেবা। ১৮৫৯-এ বিবাহ। ১৮৬০-এ কালীঘরে ছয় মাস পূজা ও প্রেমোন্মাদ পূজাত্যাগ ও পরে ব্রাহ্মণীর সাহায্যে বেলতলায় তন্ত্রের সাধন।

— From Deed of Endowment executed by Rashmoni on 18th February, 1861.

----

c2 ২ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

02.1 কালীবাড়ী ও উদ্যান

[শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি মধ্যে — চাঁদনি ও দ্বাদশ শিবমন্দির — পাকা উঠান ও বিষ্ণুঘর — শ্রী শ্রীভবতারিণী মা-কালী — নাটমন্দির — ভাঁড়ার, ভোগঘর, অতিথিশালা ও বলিদানের স্থান — দপ্তরখানা — ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর — নহবত, বকুলতলা ও পঞ্চবটী — ঝাউতলা, বেলতলা ও কুঠি — বাসনমাজার ঘাট, গাজীতলা, সদর ফটক ও খিড়কি ফটক — হাঁসপুকুর, আস্তাবল, গোশালা ও পুষ্পোদ্যান — শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের বারান্দা — আনন্দনিকেতন।]

আজ রবিবার। ভক্তদের অবসর হইয়াছে, তাই তাঁহারা দলে দলে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে আসিতেছেন। সকলেরই অবারিত দ্বার। যিনি আসিতেছেন, ঠাকুর তাঁহারই সহিত কথা কহিতেছেন। সাধু, পরমহংস, হিন্দু, খ্রীষ্টান, ব্রহ্মজ্ঞানী; শাক্ত, বৈষ্ণব; পুরুষ, স্ত্রীলোক — সকলেই আসিতেছেন। ধন্য রানী রাসমণি! তোমারই সুকৃতিবলে এই সুন্দর দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আবার এই সচল প্রতিমা — এই মহাপুরুষকে লোকে আসিয়া দর্শন ও পূজা করিতে পাইতেছে।

[চাঁদনি ও দ্বাদশ শিবমন্দির]

কালীবাড়িটি কলিকাতা হইতে আড়াই ক্রোশ উত্তরে হইবে। ঠিক গঙ্গার উপরে। নৌকা হইতে নামিয়া সুবিস্তীর্ণ সোপানাবলী দিয়া পূর্বাস্য হইয়া উঠিয়া কালীবাড়িতে প্রবেশ করিতে হয়। এই ঘাটে পরমহংসদেব স্নান করিতেন। সোপানের পরেই চাঁদনি। সেখানে ঠাকুরবাড়ির চৌকিদারেরা থাকে। তাহাদের খাটিয়া, আমকাঠের সিন্দুক, দুই-একটা লোটা সেই চাঁদনিতে মাঝে মাঝে পড়িয়া আছে। পাড়ার বাবুরা যখন গঙ্গাস্নান করিতে আসেন, কেহ-কেহ সেই চাঁদনিতে বসিয়া খোসগল্প করিতে করিতে তেল মাখেন। যে-সকল সাধু-ফকির, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী অতিথিশালার প্রসাদ পাইবেন বলিয়া আসেন, তাঁহারাও কেহ-কেহ ভোগের ঘন্টা পর্যন্ত এই চাঁদনিতে অপেক্ষা করেন। কখন কখন দেখা যায়, গৈরিকবস্ত্রধারিণী ভৈরবী ত্রিশূলহস্তে এই স্থানে বসিয়া আছেন। তিনিও সময় হলে অতিথিশালায় যাইবেন। চাঁদনিটি দ্বাদশ শিবমন্দিরের ঠিক মধ্যবর্তী। তন্মধ্যে ছয়টি মন্দির চাঁদনির ঠিক উত্তরে, আর ছয়টি চাঁদনির ঠিক দক্ষিণে। নৌকাযাত্রীরা এই দ্বাদশ মন্দির দূর হইতে দেখিয়া বলিয়া থাকে, “ওই রাসমণির ঠাকুরবাড়ি”।

[পাকা উঠান ও বিষ্ণুঘর]

চাঁদনি ও দ্বাদশ মন্দিরের পূর্ববর্তী ইষ্টকনির্মিত পাকা উঠান। উঠানের মাঝখানে সারি সারি দুইটি মন্দির। উত্তরদিকে রাধাকান্তের মন্দির। তাহার ঠিক দক্ষিণে মা-কালীর মন্দির। ৺রাধাকান্তের মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ — পশ্চিমাস্য। সিঁড়ি দিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। মন্দিরতল মর্মর প্রস্তরাবৃত। মন্দিরের সম্মুখস্থ

দালানে ঝাড় টাঙানো আছে — এখন ব্যবহার নাই, তাই রক্তবস্ত্রের আবরণী দ্বারা রক্ষিত। একটি দ্বারবান পাহারা দিতেছে। অপরাহ্নে পশ্চিমের রৌদ্রে পাছে ঠাকুরের কষ্ট হয়, তাই ক্যামবিসের পর্দার বন্দোবস্ত আছে। দালানের সারি সারি খিলানের ফুকর উহাদের দ্বারা আবৃত হয়। দালানের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি গঙ্গাজলের জালা। মন্দিরের চৌকাঠের নিকট একটি পাত্রে শ্রীচরণামৃত। ভক্তেরা আসিয়া ঠাকুর প্রণাম করিয়া ওই চরণামৃত লইবেন। মন্দিরমধ্যে সিংহাসনারূঢ় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ। শ্রীরামকৃষ্ণ এই মন্দিরে পূজারীর কার্যে প্রথম ব্রতী হন — ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দ।

[শ্রীশ্রীভবতারিণী মা-কালী]

দক্ষিণের মন্দিরে সুন্দর পাষাণময়ী কালী-প্রতিমা! মার নাম ভবতারিণী। শ্বেতকৃষ্ণমর্মরপ্রস্তরাবৃত মন্দিরতল ও সোপানযুক্ত উচ্চবেদী। বেদীর উপরে রৌপ্যময় সহস্রদল পদ্ম, তাহার উপর শিব, শব হইয়া দক্ষিণদিকে মস্তক — উত্তরদিকে পা করিয়া পড়িয়া আছেন। শিবের প্রতিকৃতি শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত। তাঁহার হৃদয়োপরি বারাণসী-চেলিপরিহিতা নানাভরণালঙ্কৃতা এই সুন্দর ত্রিনয়নী শ্যামাকালীর প্রস্তরময়ী মূর্তী। শ্রীপাদপদ্মে নূপুর, গুজরিপঞ্চম, পাঁজেব, চুটকি আর জবা বিল্বপত্র। পাঁজেব পশ্চিমের মেয়েরা পরে। পরমহংসদেবের ভারী সাধ, তাই মথুরবাবু পরাইয়াছেন। মার হাতে সোনার বাউটি, তাবিজ ইত্যাদি। অগ্রহাতে — বালা, নারিকেল-ফুল, পঁইচে, বাউটি; মধ্যহাতে — তাড়, তাবিজ ও বাজু; তাবিজের ঝাঁপা দোদুল্যমান। গলদেশে — চিক, মুক্তার সাতনর মালা, সোনার বত্রিশ নর, তারাহার ও সুবর্ণনির্মিত মুণ্ডমালা; মাথায় — মুকুট; কানে — কানবালা, কানপাশ, ফুলঝুমকো, চৌঁদানি ও মাছ। নাসিকায় — নৎ নোলক

দেওয়া। ত্রিনয়নীর বাম হস্তদ্বয়ে নৃমুণ্ড ও অসি, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরাভয়। কটিদেশে নরকার-মালা, নিমফল ও কোমরপাটা। মন্দির মধ্যে উত্তর-পূর্ব কোণে বিচিত্র শয্যা — মা বিশ্রাম করেন। দেওয়ালের একপার্শ্বে চামর ঝুলিতেছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ওই চামর লইয়া কতবার মাকে ব্যজন করিয়াছেন। বেদীর উপর পদ্মাসনে রূপার গেলাসে জল। তলায় সারি সারি ঘটি, তন্মধ্যে শ্যামার পান করিবার জল। পদ্মাসনের উপর পশ্চিমে অষ্টধাতুনির্মিত সিংহ, পূর্বে গোধিকা ও ত্রিশূল। বেদীর অগ্নিকোণে শিবা, দক্ষিণে কালো প্রস্তরের বৃষ ও ঈশান কোণে হংস। বেদী উঠিবার সোপানে রৌপ্যময় ক্ষুদ্র সিংহাসনোপরি নারায়ণশিলা; একপার্শ্বে পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত অষ্টধাতুনির্মিত রামলালা নামধারী শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ মূর্তি ও বাণেশ্বর শিব। আরও অন্যান্য দেবতা আছেন। দেবী প্রতিমা দক্ষিণাস্য। ভবতারিণীর ঠিক সম্মুখে, অর্থাৎ বেদীর ঠিক দক্ষিণে ঘটস্থাপনা হইয়াছে। সিন্দুররঞ্জিত, পূজান্তে নানাকুসুমবিভূষিত, পুষ্পমালাশোভিত মঙ্গলঘট। দেওয়ালের একপার্শ্বে জলপূর্ণ তামার ঝারি — মা মুখ ধুইবেন। ঊর্ধ্বে মন্দিরে চাঁদোয়া, বিগ্রহের পশ্চাদ্দিকে সুন্দর বারাণসী বস্ত্রখণ্ড লম্বমান। বেদীর চারিকোণে রৌপ্যময় স্তম্ভ। তদুপরি বহুমূল্য চন্দ্রাতপ — উহাতে প্রতিমার শোভা বর্ধন হইয়াছে। মন্দির দোহারা। দালানটির কয়েকটি ফুকর সুদৃঢ় কপাট দ্বারা সুরক্ষিত। একটি কপাটের কাছে চৌকিদার বসিয়া আছে। মন্দিরের দ্বারে পঞ্চপাত্রে শ্রীচরণামৃত। মন্দিরশীর্ষ নবরত্ন মণ্ডিত। নিচের থাকে চারিটি চূড়া, মধ্যের থাকে চারিটি ও সর্বোপরি একটি। একটি চূড়া এখন ভাঙিয়া রহিয়াছে। এই মন্দিরে এবং ৺রাধাকান্তের ঘরে পরমহংসদেব পূজা করিয়াছিলেন।

[নাটমন্দির]

কালীমন্দিরের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে সুন্দর সুবিস্তৃত নাটমন্দির। নাটমন্দিরের উপর শ্রীশ্রীমহাদেব এবং নন্দী ও ভৃঙ্গী। মার মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহাদেবকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতেন — যেন তাঁহার আজ্ঞা লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন। নাটমন্দিরের উত্তর-দক্ষিণে স্থাপিত দুই সারি অতি উচ্চস্তম্ভ। তদুপরি ছাদ। স্তম্ভশ্রেণীর পূর্বদিকে ও পশ্চিমদিকে নাটমন্দিরের দুই পক্ষ। পূজার সময়, মহোৎসবকালে, বিশেষতঃ কালীপূজার দিন নাটমন্দিরে যাত্রা হয়। এই নাটমন্দিরে রাসমণির জামাতা মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশে ধান্যমেরু করিয়াছিলেন। এই নাটমন্দিরেই সর্বসমক্ষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবীপূজা করিয়াছিলেন।

[ভাঁড়ার, ভোগঘর, অতিথিশালা, বলিস্থান]

চক্‌মিলান উঠানের পশ্চিমপার্শ্বে দ্বাদশ মন্দির, আর তিনপার্শ্বে একতলা ঘর। পূর্বপার্শ্বের ঘরগুলির মধ্যে ভাঁড়ার, লুচিঘর, বিষ্ণুর ভোগঘর, নৈবেদ্যঘর, মায়ের ভোগঘর, ঠাকুরদের রান্নাঘর ও অতিথিশালা। অতিথি, সাধু যদি অতিথিশালায় না খান, তাহা হইলে দপ্তরখানায় খাজাঞ্চীর কাছে যাইতে হয়। খাজাঞ্চী ভাণ্ডারীকে হুকুম দিলে সাধু ভাঁড়ার হইতে সিধা লন। নাটমন্দিরের দক্ষিণে বলিদানের স্থান।

বিষ্ণুঘরের রান্না নিরামিষ। কালীঘরের ভোগের ভিন্ন রন্ধনশালা। রন্ধনশালার সম্মুখে দাসীরা বড় বড় বঁটি লইয়া মাছ কুটিতেছে। অমাবস্যায় একটি ছাগ বলি হয়। ভোগ দুই প্রহর মধ্যে হইয়া যায়। ইতিমধ্যে অতিথিশালায় এক-একখানা শালপাতা লইয়া সারি সারি কাঙাল, বৈষ্ণব, সাধু অতিথি বসিয়া পড়ে।

ব্রাহ্মণদের পৃথক স্থান করিয়া দেওয়া হয়। কর্মচারী ব্রাহ্মণদের পৃথক স্থান হয়। খাজাঞ্চীর প্রসাদ তাঁহার ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। জানবাজারের বাবুরা আসিলে কুঠিতে থাকেন। সেইখানে প্রসাদ পাঠানো হয়।

[দপ্তরখানা]

উঠানের দক্ষিণে সারি সারি ঘরগুলিতে দপ্তরখানা ও কর্মচারীদিগের থাকিবার স্থান। এখানে খাজাঞ্চী, মুহুরী সর্বদা থাকেন; আর ভাণ্ডারী, দাস-দাসী, পূজারী, রাঁধুনী, ব্রাহ্মণঠাকুর ইত্যাদির ও দ্বারবানদের সর্বদা যাতায়াত। কোন কোন ঘর চাবি দেওয়া; তন্মধ্যে ঠাকুরবাড়ির আসবাব সতরঞ্চি, শামিয়ানা ইত্যাদি থাকে। এই সারির কয়েকটা ঘর পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভাঁড়ার ঘর করা হইত। তাহার দক্ষিণদিকের ভূমিতে মহামহোৎসবের রান্না হইত।

উঠানের উত্তরে একতলা ঘরের শ্রেণী। তাহার ঠিক মাঝখানে দেউড়ি। চাঁদনির ন্যায় সেখানেও দ্বারবানেরা পাহাড়া দিতেছে। উভয় স্থানে প্রবেশ করিবার পূর্বে বাহিরে জুতা রাখিয়া যাইতে হইবে।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর]

উঠানের ঠিক উত্তর-পশ্চিম কোণে অর্থাৎ দ্বাদশ মন্দিরের ঠিক উত্তরে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ঘর। ঘরের ঠিক পশ্চিমদিকে অর্ধমণ্ডলাকার একটি বারান্দা। সেই বারান্দায় শ্রীরামকৃষ্ণ পশ্চিমাস্য হইয়া গঙ্গা দর্শন করিতেন। এই বারান্দার পরেই পথ। তাহার পশ্চিমে পুষ্পোদ্যান, তৎপরে পোস্তা। তাহার পরেই পূতসলিলা সর্বতীর্থময়ী কলকলনাদিনী গঙ্গা।

[নহবত, বকুলতলা ও পঞ্চবটী]

পরমহংসদেবের ঘরের ঠিক উত্তরে একটি চতুষ্কোণ বারান্দা, তাহার উত্তরে উদ্যানপথ। তাহার উত্তরে আবার পুষ্পোদ্যান। তাহার পরেই নহবতখানা। নহবতের নিচের ঘরে তাঁহার স্বর্গীয়া পরমারাধ্যা বৃদ্ধা মাতাঠাকুরানী ও পরে শ্রীশ্রীমা থাকিতেন। নহবতের পরেই বকুলতলা ও বকুলতলার ঘাট। এখানে পাড়ার মেয়েরা স্নান করেন। এই ঘাটে পরমহংসদেবের বৃদ্ধা মাতাঠাকুরানীর ৺গঙ্গালাভ হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ।

বকুলতলার আরও কিছু উত্তরে পঞ্চবটী। এই পঞ্চবটীর পাদমূলে বসিয়া পরমহংসদেব অনেক সাধনা করিয়াছিলেন, আর ইদানীং ভক্তসঙ্গে এখানে সর্বদা পাদচারণ করিতেন। গভীর রাত্রে সেখানে কখন কখন উঠিয়া যাইতেন। পঞ্চবটীর বৃক্ষগুলি — বট, অশ্বত্থ, নিম্ব,১ আমলকী ও বিল্ব — ঠাকুর নিজের তত্ত্বাবধানে রোপণ করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া এখানে রজঃ ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই পঞ্চবটীর ঠিক পূর্বগায়ে একখানি কুটির নির্মাণ করাইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাতে অনেক ঈশ্বরচিন্তা, অনেক তপস্যা করিয়াছিলেন। এই কুটির এক্ষণে পাকা হইয়াছে।

পঞ্চবটী মধ্যে সাবেক একটি বটগাছ আছে। তৎসঙ্গে একটি অশ্বত্থগাছ। দুইটি মিলিয়া যেন একটি হইয়াছে। বৃদ্ধ গাছটি বয়সাধিক্যবশতঃ বহুকোটরবিশিষ্ট ও নানা পক্ষীসমাকুল ও অন্যান্য জীবেরও আবাসস্থান হইয়াছে। পাদমূলে ইষ্টকনির্মিত, সোপানযুক্ত, মণ্ডলাকারবেদীসুশোভিত। এই বেদীর উত্তর-

পশ্চিমাংশে আসীন হইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সাধনা করিয়াছিলেন; আর বৎসের জন্য যেমন গাভী ব্যাকুল হয়, সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে কত ডাকিতেন। আজ সেই পবিত্র আসনোপরি বটবৃক্ষের সখীবৃক্ষ অশ্বত্থের একটি ডাল ভাঙিয়া পড়িয়া আছে। ডালটি একেবারে ভাঙিয়া যায় নাই। মূলতরুর সঙ্গে অর্ধসংলগ্ন হইয়া আছে। বুঝি সে-আসনে বসিবার এখনও কোন মহাপুরুষ জন্মেন নাই।

[ঝাউতলা, বেলতলা ও কুঠি]

পঞ্চবটীর আরও উত্তরে খানিকটা গিয়া লোহার তারের রেল আছে। সেই রেলের ওপারে ঝাউতলা। সারি সারি চারিটি ঝাউগাছ। ঝাউতলা দিয়া পূর্বদিকে খানিকটা গিয়া বেলতলা। এখানেও পরমহংসদেব অনেক কঠিন সাধনা করিয়াছিলেন। ঝাউতলা ও বেলতলার পরেই উন্নত প্রাচীর। তাহারই উত্তরে গভর্ণমেন্টের বারুদঘর।

উঠানের দেউড়ি হইতে উত্তরমুখে বহির্গত হইয়া দেখা যায়, সম্মুখে দ্বিতল কুঠি। ঠাকুরবাড়িতে আসিলে রানী রাসমণি, তাঁহার জামাই মথুরবাবু প্রভৃতি এই কুঠিতে থাকিতেন। তাঁহাদের জীবদ্দশায় পরমহংসদেব এই কুঠির বাড়ির নিচের পশ্চিমের ঘরে থাকিতেন। এই ঘর হইতে বকুলতলার ঘাটে যাওয়া যায় ও বেশ গঙ্গাদর্শন হয়।

[বাসনমাজার ঘাট, গাজীতলা ও দুই ফটক]

উঠানের দেউড়ি ও কুঠির মধ্যবর্তী যে-পথ সেই পথ ধরিয়া পূর্বদিকে যাইতে যাইতে ডানদিকে একটি বাঁধাঘাটবিশিষ্ট সুন্দর পুষ্করিণী। মা-কালীর মন্দিরে ঠিক পূর্বদিকে এই পুকুরের একটি বাসনমাজার ঘাট ও উল্লিখিত পথের অনতিদূরে আর একটি ঘাট। পথপার্শ্বস্থিত ওই ঘাটের নিকট একটি গাছ আছে, তাহাকে গাজীতলা বলে। ওই পথ ধরিয়া আর একটু পূর্বমুখে যাইলে আবার একটি দেউড়ি — বাগান হইতে বাহিরে আসিবার সদর ফটক। এই ফটক দিয়া আলমবাজার বা কলিকাতার লোক যাতায়াত করেন। দক্ষিণেশ্বরের লোক খিড়কি ফটক দিয়া আসেন। কলিকাতার লোক প্রায়ই এই সদর ফটক দিয়া কালীবাড়িতে প্রবেশ করেন। সেখানেও দ্বারবান বসিয়া পাহাড়া দিতেছে। কলিকাতা হইতে পরমহংসদেব যখন গভীর রাত্রে কালীবাড়িতে ফিরিয়া আসিতেন, তখন এই দেউড়ির দ্বারবান চাবি খুলিয়া দিত। পরমহংসদেব দ্বারবানকে ডাকিয়া ঘরে লইয়া যাইতেন ও লুচিমিষ্টান্নাদি ঠাকুরের প্রসাদ তাহাকে দিতেন।

[হাঁসপুকুর, আস্তাবল, গোশালা, পুষ্পোদ্যান]

পঞ্চবটির পূর্বদিকে আর একটি পুষ্করিণী — নাম হাঁসপুকুর। ওই পুষ্করিণীর উত্তর-পূর্ব কোণে আস্তাবল ও গোশালা। গোশালার পূর্বদিকে খিড়কি ফটক। এই ফটক দিয়া দক্ষিণেশ্বরের গ্রামে যাওয়া যায়। যে-সকল পূজারী বা অন্য কর্মচারী পরিবার আনিয়া দক্ষিণেশ্বরে রাখিয়াছেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা এই পথ দিয়া যাতায়াত করেন।

উদ্যানের দক্ষিণপ্রান্ত হইতে উত্তরে বকুলতলা ও পঞ্চবটী পর্যন্ত গঙ্গার ধার দিয়া পথ গিয়াছে। সেই পথের দুইপার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ। আবার কুঠির দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া পূর্ব-পশ্চিমে যে-পথ গিয়াছে তাহারও দুইপার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ। গাজীতলা হইতে গোশালা পর্যন্ত কুঠি ও হাঁসপুকুরের পূর্বদিকে যে-ভূমিখণ্ড, তাহার মধ্যেও নানাজাতীয় পুষ্পবৃক্ষ, ফলের বৃক্ষ ও একটি পুষ্করিণী আছে।

অতি প্রত্যূষে পূর্বদিক রক্তিমবর্ণ হইতে না হইতে যখন মঙ্গলারতির সুমধুর শব্দ হইতে থাকে ও সানাইয়ে প্রভাতী রাগরাগিণী বাজিতে থাকে, তখন হইতেই মা-কালীর বাগানে পুষ্পচয়ন আরম্ভ হয়। গঙ্গাতীরে পঞ্চবটীর সম্মুখে বিল্ববৃক্ষ ও সৌরভপূর্ণ গুল্‌চী ফুলের গাছ। মল্লিকা, মাধবী ও গুল্‌চী ফুল শ্রীরামকৃষ্ণ বড় ভালবাসেন। মাধবীলতা শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে আনিয়া তিনি পুঁতিয়া দিয়াছেন। হাঁসপুকুর ও কুঠির পূর্বদিকে যে-ভূমিখণ্ড তন্মধ্যে পুকুরের ধারে চম্পক বৃক্ষ। কিয়দ্দূরে ঝুমকাজবা, গোলাপ ও কাঞ্চনপুষ্প। বেড়ার উপরে অপরাজিতা — নিকটে জুঁই, কোথাও বা শেফালিকা। দ্বাদশ মন্দিরের পশ্চিমগায়ে বরাবর শ্বেতকরবী, রক্তকরবী, গোলাপ, জুঁই, বেল। ক্বচিৎ বা ধুস্তুরপুষ্প — মহাদেবের পূজা হইবে। মাঝে মাঝে তুলসী — উচ্চ ইষ্টকনির্মিত মঞ্চের উপর রোপণ করা হইয়াছে। নহবতের দক্ষিণদিকে বেল, জুঁই, গন্ধরাজ, গোলাপ। বাঁধাঘাটের অনতিদূরে পদ্মকরবী ও কোকিলাক্ষ। পরমহংসদেবের ঘরের পাশে দুই-একটি কৃষ্ণচূড়ার বৃক্ষ ও আশেপাশে বেল, জুঁই, গন্ধরাজ, গোলাপ, মল্লিকা, জবা, শ্বেতকরবী, রক্তকরবী আবার পঞ্চমুখী জবা, চীন জাতীয় জবা।

শ্রীরামকৃষ্ণও এককালে পুষ্পচয়ন করিতেন। একদিন পঞ্চবটীর সম্মুখস্থ একটি বিল্ববৃক্ষ হইতে বিল্বপত্র চয়ন করিতেছিলেন। বিল্বপত্র তুলিতে গিয়া গাছের

খানিকটা ছাল উঠিয়া আসিল। তখন তাঁহার এইরূপ অনিভূতি হইল যে, যিনি সর্বভূতে আছেন তাঁর না জানি কত কষ্ট হইল! অমনি আর বিল্বপত্র তুলিতে পারিলেন না। আর একদিন পুষ্পচয়ন করিবার জন্য বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় কে যেন দপ্‌ করিয়া দেখাইয়া দিল যে, কুসুমিত বৃক্ষগুলি যেন এক-একটি ফুলের তোড়া, এই বিরাট শিবমূর্তির উপর শোভা পাইতেছে — যেন তাঁহারই অহর্নিশ পূজা হইতেছে। সেইদিন হইতে আর ফুল তোলা হইল না।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের বারান্দা]

পরমহংসদেবের ঘরের পূর্বদিকে বরাবর বারান্দা। বারান্দার একভাগ উঠানের দিকে, অর্থাৎ দক্ষিণমুখো। এ-বারান্দায় পরমহংসদেব প্রায় ভক্তসঙ্গে বসিতেন ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা কহিতেন বা সংকীর্তন করিতেন। এই পূর্ব বারান্দার অপরার্ধ উত্তরমুখো। এ-বারান্দায় ভক্তেরা তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহার জন্মোৎসব করিতেন, তাঁহার সঙ্গে বসিয়া সংকীর্তন করিতেন; আবার তিনি তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে বসিয়া কতবার প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। এই বারান্দায় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র শিষ্যসমভিব্যাহারে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে কত আলাপ করিয়াছেন; আমোদ করিতে করিতে মুড়ি, নারিকেল, লুচি, মিষ্টান্নাদি একসঙ্গে বসিয়া খাইয়া গিয়াছেন। এই বারান্দায় নরেন্দ্রকে দর্শন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়াছিলেন।

[আনন্দনিকেতন]

কালিবাড়ি আনন্দনিকেতন হইয়াছে। রাধাকান্ত, ভবতারিণী ও মহাদেবের নিত্যপূজা, ভোগরাগাদি ও অতিথিসেবা। একদিকে ভাগীরথীর বহুদূর পর্যন্ত

পবিত্র দর্শন। আবার সৌরভাকুল সুন্দর নানাবর্ণরঞ্জিত কুসুমবিশিষ্ট মনোহার পুষ্পোদ্যান। তাহাতে আবার একজন চেতনমানুষ অহর্নিশ ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আছেন। আনন্দময়ীর নিত্য উৎসব। নহবত হইতে রাগরাগিণী সর্বদা বাজিতেছে। একবার প্রভাতে বাজিতে থাকে মঙ্গলারতির সময়। তারপর বেলা নয়টার সময় — যখন পূজা আরম্ভ হয়। তারপর বেলা দ্বিপ্রহরের সময় — তখন ভোগারতির পর ঠাকুর-ঠাকুরানীরা বিশ্রাম করিতে যান। আবার বেলা চারিটার সময় নহবত বাজিতে থাকে — তখন তাঁহারা বিশ্রামলাভের পর গাত্রোত্থান করিতেছেন ও মুখ ধুইতেছেন। তারপর আবার সন্ধ্যারতির সময়। অবশেষে রাত নয়টার সময় — যখন শীতলের পর ঠাকুর-শয়ন হয়, তখন আবার নহবত বাজিতে থাকে।

১ কোন কোন মতে — অশোক

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮২ মার্চ 1882/03/00/i

02.2 প্রথম দর্শন

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্ ।

শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ।।

[শ্রীমদ্ভাগবত, গোপীগীতা,

রাসপঞ্চাধ্যায়]

গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি। মা-কালীর মন্দির। বসন্তকাল, ইংরেজী ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস। ঠাকুরের জন্মোৎসবের কয়েক দিন পরে। শ্রীযুক্ত কেশব সেন ও শ্রীযুক্ত জোসেফ্ কুক সঙ্গে ২৩শে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার (১২ই ফাল্গুন, ১২৮৮, শুক্লা ষষ্ঠী) ঠাকুর স্টীমারে বেড়াইয়াছিলেন — তাহারই কয়েকদিন পরে। সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে মাস্টার আসিয়া উপস্থিত। এই প্রথম দর্শন। দেখিলেন১ একঘর লোক নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন। ঠাকুর তক্তপোশে বসিয়া পূর্বাস্য হইয়া সহাস্যবদনে হরি কথা কহিতেছেন। ভক্তেরা মেঝেয় বসিয়া আছেন।

[কর্মত্যাগ কখন]

মাস্টার দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। তাঁহার বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎ-কথা কহিতেছেন, আর সর্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে। অথবা যেন শ্রীচৈতন্য পুরীক্ষেত্রে রামানন্দ স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন ও ভগবানের নামগুণকীর্তন করিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, “যখন একবার হরি বা একবার রামনাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয় জেনো যে সন্ধ্যাদি কর্ম — আর করতে হবে না। তখন কর্মত্যাগের অধিকার হয়েছে — কর্ম আপনা আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। তখন কেবল রামনাম, কি হরিনাম, কি শুদ্ধ ওঁকার

জপলেই হল।” আবার বলিলেন, “সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী আবার ওঁকারে লয় হয়।”

মাস্টার সিধুর২ সঙ্গে বরাহনগরের এ-বাগানে ও-বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছেন। আজ রবিবার, অবসর আছে, তাই বেড়াইতে আসিয়াছেন; শ্রীযুক্ত প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যের বাগানে কিয়ৎক্ষণ পুর্বে বেড়াইতেছিলেন। তখন সিধু বলিয়াছিলেন, “গঙ্গার ধারে একটি চমৎকার বাগান আছে, সে-বাগানটি কি দেখতে যাবেন? সেখানে একজন পরমহংস আছেন।”

বাগানে সদর ফটক দিয়া ঢুকিয়াই মাস্টার ও সিধু বরাবর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে আসিলেন। মাস্টার অবাক্ হইয়া দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছেন, “আহা কি সুন্দর স্থান! কি সুন্দর মানুষ! কি সুন্দর কথা! এখান থেকে নড়তে ইচ্ছা করছে না।” কিয়ৎক্ষণ পরে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “একবার দেখি কোথায় এসেছি। তারপর এখানে এসে বসব।”

সিধুর সঙ্গে ঘরের বাহিরে আসিতে না আসিতে আরতির মধুর শব্দ হইতে লাগিল। এককালে কাঁসর, ঘন্টা, খোল, করতালি বাজিয়া উঠিল। বাগানের দক্ষিণসীমান্ত হইতে নহবতের মধুর শব্দ আসিতে লাগিল। সেই শব্দ ভাগীরথীবক্ষে যেন ভ্রমণ করিতে করিতে অতিদূরে গিয়া কোথায় মিশিয়া যাইতে লাগিল। মন্দ মন্দ কুসুমগন্ধবাহী বসন্তানিল! সবে জোৎস্না উঠিতেছে। ঠাকুরদের আরতির যেন চতুর্দিকে আয়োজন হইতেছে! মাস্টার দ্বাদশ শিবমন্দিরে, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে ও শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরে আরতি দর্শন করিয়া পরম

প্রীতিলাভ করিলেন। সিধু বলিলেন, “এটি রাসমণির দেবালয়। এখানে নিত্যসেবা। অনেক অতিথি, কাঙাল আসে।”

কথা কহিতে কহিতে ভবতারিণীর মন্দির হইতে বৃহৎ পাকা উঠানের মধ্য দিয়া পাদচারণ করিতে করিতে দুইজনে আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। এবার দেখিলেন, ঘরের দ্বার দেওয়া।

এইমাত্র ধুনা দেওয়া হইয়াছে। মাস্টার ইংরেজী পড়িয়াছেন, ঘরে হঠাৎ প্রবেশ করিতে পারিলেন না। দ্বারদেশে বৃন্দে (ঝি) দাঁড়াইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, “হ্যাঁ গা, সাধুটি কি এখন এর ভিতর আছেন?”

বৃন্দে — হ্যাঁ, এই ঘরের ভিতর আছেন।

মাস্টার — ইনি এখানে কতদিন আছেন?

বৃন্দে — তা অনেকদিন আছেন —

মাস্টার — আচ্ছা, ইনি কি খুব বই-টই পড়েন?

বৃন্দে — আর বাবা বই-টই! সব ওঁর মুখে!

মাস্টার সবে পড়াশুনা করে এসেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বই পড়েন না শুনে আরও অবাক্ হলেন।

মাস্টার — আচ্ছা, ইনি বুঝি এখন সন্ধ্যা করবেন? — আমরা কি এ-ঘরের ভিতর যেতে পারি? — তুমি একবার খবর দিবে?

বৃন্দে — তোমরা যাও না বাবা। গিয়ে ঘরে বস।

তখন তাঁহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, ঘরে আর অন্য কেহ নাই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে একাকী তক্তপোশের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে ধুনা দেওয়া হইয়াছে ও সমস্ত দরজা বন্ধ। মাস্টার প্রবেশ করিয়াই বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিতে অনুজ্ঞা করিলে তিনি ও সিধু মেঝেতে বসিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় থাক, কি কর, বরাহনগরে কি করতে এসেছ" ইত্যাদি। মাস্টার সমস্ত পরিচয় দিলেন। কিন্তু দেখিতে লাগিলেন যে, ঠাকুর মাঝে মাঝে যেন অন্যমনস্ক হইতেছেন। পরে শুনিলেন, এরই নাম ভাব। যেমন কেহ ছিপ হাতে করিয়া মাছ ধরিতে বসিয়াছে। মাছ আসিয়া টোপ খাইতে থাকিলে ফাতনা যখন নড়ে, সে ব্যক্তি যেমন শশব্যস্ত হইয়া ছিপ হাতে করিয়া ফাতনার দিকে একদৃষ্টে একমনে চাহিয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা কয় না; এ-ঠিক সেইরূপ ভাব। পরে শুনিলেন ও দেখিলেন, ঠাকুরের সন্ধ্যার পর এইরূপ ভাবান্তর হয়, কখন কখন তিনি একেবারে বাহ্যশূন্য হন!

মাস্টার — আপনি এখন সন্ধ্যা করবেন, তবে এখন আমরা আসি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ) — না — সন্ধ্যা — তা এমন কিছু নয়।

আর কিছু কথাবার্তার পর মাস্টার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "আবার এস"।

মাস্টার ফিরিবার সময় ভাবিতে লাগিলেন, “এ সৌম্য কে? — যাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে — বই না পড়িলে কি মানুষ মহৎ হয়? — কি আশ্চর্য, আবার আসিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইনিও বলিয়াছেন, ‘আবার এস’! কাল কি পরশু সকালে আসিব।”

১ প্রথম দর্শনের তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। — প্র:

২ শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মজুমদার, উত্তর বরাহনগরে বাড়ি।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮২ মার্চ 1882/03/00/ii

02.3 দ্বিতীয় দর্শন

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।।

গুরুশিষ্য-সংবাদ

দ্বিতীয় দর্শন সকাল বেলা, আটটার সময়। ঠাকুর তখন কামাতে যাচ্ছেন। এখনও একটু শীত আছে। তাই তাঁহার গায়ে মোলেস্কিনের র‍্যাপার। র‍্যাপারের

কিনারা শালু দিয়ে মোড়া। মাস্টারকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি এসেছ? আচ্ছা, এখানে বস।

এ-কথা দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় হইতেছিল। নাপিত উপস্থিত। সেই বারান্দায় ঠাকুর কামাইতে বসিলেন ও মাঝে মাঝে মাস্টারের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। গায়ে ওইরূপ র‌্যাপার, পায়ে চটি জুতা, সহাস্যবদন। কথা কহিবার সময় কেবল একটু তোতলা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — হ্যাঁগা, তোমার বাড়ি কোথায়?

মাস্টার — আজ্ঞা, কলিকাতায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এখানে কোথায় এসেছ?

মাস্টার — এখানে বরাহনগরে বড়দিদির বাড়ি আসিয়াছি। ঈশান কবিরাজের বাটী।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ওহ্ ঈশানের বাড়ি!

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন ও মার কাছে ঠাকুরের ক্রন্দন

শ্রীরামকৃষ্ণ — হ্যাঁগা, কেশব কেমন আছে? বড় অসুখ হয়েছিল।

মাস্টার — আমিও শুনেছিলাম বটে, এখন বোধ হয় ভাল আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি আবার কেশবের জন্য মার কাছে ডাব-চিনি মেনেছিলুম। শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে যেত, আর মার কাছে কাঁদতুম, বলতুম, মা, কেশবের অসুখ ভাল করে দাও; কেশব না থাকলে আমি কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কব? তাই ডাব-চিনি মেনেছিলুম।

“হ্যাঁগা, কুক্ সাহেব নাকি একজন এসেছে? সে নাকি লেকচার দিচ্ছে? আমাকে কেশব জাহাজে তুলে নিয়ে গিছিল। কুক্ সাহেবও ছিল।”

মাস্টার — আজ্ঞা, এইরকম শুনেছিলুম বটে, কিন্তু আমি তাঁর লেকচার শুনি নাই। আমি তাঁর বিষয় বিশেষ জানি না।

[গৃহস্থ ও পিতার কর্তব্য]

শ্রীরামকৃষ্ণ — প্রতাপের ভাই এসেছিল। এখানে কয়দিন ছিল। কাজকর্ম নাই। বলে, আমি এখানে থাকব। শুনলাম, মাগছেলে সব শ্বশুরবাড়িতে রেখেছে। অনেকগুলি ছেলেপিলে। আমি বকলুম, দেখ দেখি ছেলেপিলে হয়েছে; তাদের কি আবার ও-পাড়ার লোক এসে খাওয়াবে-দাওয়াবে, মানুষ করবে? লজ্জা করে না যে, মাগছেলেদের আর একজন খাওয়াচ্ছে, আর তাদের শ্বশুরবাড়ি ফেলে রেখেছে। অনেক বকলুম, আর কর্মকাজ খুঁজে নিতে বললুম। তবে এখান থেকে যেতে চায়।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮২ মার্চ 1882/03/00/iii

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।।

02.4 মাস্টারকে তিরস্কার ও তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণকরণ

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — তোমার কি বিবাহ হয়েছে?

মাস্টার —– আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিহরিয়া) — ওরে রামলাল১ যাঃ, বিয়ে করে ফেলেছে!

মাস্টার ঘোরতর অপরাধীর ন্যায় অবাক্‌ হইয়া অবনতমস্তকে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, বিয়ে করা কি এত দোষ!

ঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি ছেলে হয়েছে?

মাস্টারের বুক টিপটিপ করিতেছে। ভয়ে ভয়ে বলিলেন, আজ্ঞে, ছেলে হয়েছে। ঠাকুর আবার আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, যাঃ, ছেলে হয়ে গেছে! তিরস্কৃত হইয়া তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কৃপাদৃষ্টি করিয়া সস্নেহে বলিতে লাগিলেন, “দেখ, তোমার লক্ষণ ভাল ছিল, আমি কপাল, চোখ — এ-সব দেখলে বুঝতে পারি। আচ্ছা, তোমার পরিবার কেমন? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি?”

[জ্ঞান কাহাকে বলে? প্রতিমাপূজা]

মাস্টার — আজ্ঞা ভাল, কিন্তু অজ্ঞান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া) — আর তুমি জ্ঞানী?

তিনি জ্ঞান কাহাকে বলে, অজ্ঞান কাহাকে বলে, এখনও জানেন না। এখনও পর্যন্ত জানিতেন যে, লেখাপড়া শিখিলে ও বই পড়িতে পারিলে জ্ঞান হয়। এই ভ্রম পরে দূর হইয়াছিল। তখন শুনিলেন যে, ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান। ঠাকুর বলিলেন, “তুমি কি জ্ঞানী!” মাস্টারের অহঙ্কারে আবার বিশেষ আঘাত লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, তোমার ‘সাকারে’ বিশ্বাস, না ‘নিরাকারে’?

মাস্টার (অবাক্ হইয়া স্বগত) — সাকারে বিশ্বাস থাকলে কি নিরাকারে বিশ্বাস হয়? ঈশ্বর নিরাকার, এ-বিশ্বাস থাকিলে ঈশ্বর সাকার এ-বিশ্বাস কি হইতে পারে? বিরুদ্ধ অবস্থা দুটাই কি সত্য হইতে পারে? সাদা জিনিস — দুধ, কি আবার কালো হতে পারে?

মাস্টার — আজ্ঞা, নিরাকার — আমার এইটি ভাল লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা বেশ। একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হল। নিরাকারে বিশ্বাস, তাতো ভালই। তবে এ-বুদ্ধি করো না যে, এইটি কেবল সত্য আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে, নিরাকারও সত্য আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটিই ধরে থাকবে।

মাস্টার দুইই সত্য এই কথা বারবার শুনিয়া অবাক্‌ হইয়া রহিলেন। এ-কথা তো তাঁহার পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে নাই।

তাঁহার অহঙ্কার তৃতীয়বার চূর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। তাই আবার একটু তর্ক করিতে অগ্রসর হইলেন।

মাস্টার — আজ্ঞা, তিনি সাকার, এ-বিশ্বাস যেন হল! কিন্তু মাটির প্রতিমা তিনি তো নন —

শ্রীরামকৃষ্ণ — মাটি কেন গো! চিন্ময়ী প্রতিমা।

মাস্টার ‘চিন্ময়ী প্রতিমা’ বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, আচ্ছা, যারা মাটির প্রতিমা পূজা করে, তাদের তো বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়, আর প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে পূজা করা উচিত।

[লেকচার (Lecture) ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া) — তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক! কেবল লেকচার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া! আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নাই।!

তুমি বুঝাবার কে? যাঁর জগৎ, তিনি বুঝাবেন। যিনি এই জগৎ করেছেন, চন্দ্র, সূর্য, মানুষ, জীবজন্তু করেছেন; জীবজন্তুদের খাবার উপায়, পালন করবার জন্য মা-বাপ করেছেন, মা-বাপের স্নেহ করেছেন তিনিই বুঝাবেন। তিনি এত উপায় করেছেন, আর এ-উপায় করবেন না? যদি বুঝাবার দরকার হয় তিনিই বুঝাবেন। তিনি তো অন্তর্যামী। যদি ওই মাটির প্রতিমাপূজা করাতে কিছু ভুল হয়ে থাকে, তিনি কি জানেন না — তাঁকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি ওই পূজাতেই সন্তুষ্ট হন। তোমার ওর জন্য মাথা ব্যথা কেন? তুমি নিজের যাতে জ্ঞান হয়, ভক্তি হয়, তার চেষ্টা কর।

এইবার তাঁহার অহঙ্কার বোধ হয় একেবারে চূর্ণ হইল।

তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ইনি যা বলেছেন তাতো ঠিক! আমার বুঝাতে যাবার কি দরকার! আমি কি ঈশ্বরকে জেনেছি — না আমার তাঁর উপর ভক্তি হয়েছে! "আপনি শুতে স্থান পায় না, শঙ্করাকে ডাকে!" জানি না, শুনি না, পরকে বুঝাতে যাওয়া বড়ই লজ্জার কথা ও হীনবুদ্ধির কাজ! একি অঙ্কশাস্ত্র, না ইতিহাস, না সাহিত্য যে পরকে বুঝাব! এ-যে ঈশ্বরতত্ত্ব। ইনি যা বলছেন, মনে বেশ লাগছে।

ঠাকুরের সহিত তাঁহার এই প্রথম ও শেষ তর্ক।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি মাটির প্রতিমাপূজা বলছিলে। যদি মাটিরই হয়, সে-পূজাতে প্রয়োজন আছে। নানারকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন। যার

জগৎ তিনিই এ-সব করেছেন — অধিকারী ভেদে। যার যা পেটে সয়, বা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন।

“এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়িতে মাছ এসেছে। মা মাছের নানারকম ব্যঞ্জন করেছেন — যার যা পেটে সয়! কারও জন্য মাছের পোলোয়া, কারও জন্যে মাছের অম্বল, মাছের চড়চড়ি, মাছ ভাজা — এই সব করেছেন। যেটি যার ভাল লাগে। যেটি যার পেটে সয় — বুঝলে?”

মাস্টার — আজ্ঞে হাঁ।

১ শ্রীযুক্ত রামলাল, ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কালীবাড়ির পূজারী

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮২ মার্চ 1882/03/00/iv

সংসারার্ণবঘোরে যঃ কর্ণধারস্বরূপকঃ ।
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।।

02.5 ভক্তির উপায়

মাস্টার (বিনীতভাবে) — ঈশ্বরে কি করে মন হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বরের নামগুণগান সর্বদা করতে হয়। আর সৎসঙ্গ — ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এঁদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয়কাজের ভিতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না। মাঝেমাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন।

“যখন চারাগাছ থাকে, তখন তার চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলে।

“ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে। আর সর্বদা সদসৎ বিচার করবে। ঈশ্বরই সৎ — কিনা নিত্যবস্তু, আর সব অসৎ — কিনা অনিত্য। এই বিচার করতে করতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ করবে।”

মাস্টার (বিনীতভাবে) — সংসারে কিরকম করে থাকতে হবে?

[গৃহস্থ সন্ন্যাস — উপায় — নির্জনে সাধন]

শ্রীরামকৃষ্ণ — সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা — সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জানবে যে, তারা তোমার কেউ নয়।

“বড় মানুষের বাড়ির দাসী সব কাজ কচ্ছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ির দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মতো মানুষ করে।

বলে ‘আমার রাম’ ‘আমার হরি’, কিন্তু মনে বেশ জানে — এরা আমার কেউ নয়।

“কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জানো? — আড়ায় পড়ে আছে। যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সংসারের সব কর্ম করবে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে।

“ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না করে যদি সংসার করতে যাও তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক, তাপ — এ-সবে অধৈর্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয়-চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়বে।

“তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়! তা না হলে হাতে আঠা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।

“কিন্তু এই ভক্তিলাভ করতে হলে নির্জন হওয়া চাই। মাখন তুলতে গেলে নির্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তারপর নির্জনে বসে, সব কাজ ফেলে দই মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা যায়।

“আবার দেখ, এই মনে নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা করলে জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু সংসারে ফেলে রাখলে ওই মন নীচ হয়ে যায়। সংসারে কেবল কামিনী-কাঞ্চন চিন্তা।

“সংসার জল, আর মনটি যেন দুধ। যদি জলে ফেলে রাখ, তাহলে দুধে-জলে মিশে এক হয়ে যায়, খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন

তুলে যদি জলে রাখা যায়, তাহলে ভাসে। তাই নির্জনে সাধনা দ্বারা আগে জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে। সেই মাখন সংসার-জলে ফেলে রাখলেও মিশবে না, ভেসে থাকবে।

“সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, থাকবার জায়গা হয় — এই পর্যন্ত। ভগবানলাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না — এর নাম বিচার, বুঝেছ?

মাস্টার — আজ্ঞে হাঁ; প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক আমি সম্প্রতি পড়েছি, তাতে আছে ‘বস্তুবিচার’ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, বস্তুবিচার! এই দেখ, টাকাতেই বা কি আছে, আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে! বিচার কর, সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড়, মাংস, চর্বি, মল, মূত্র — এই সব আছে। এই সব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়?

[ঈশ্বরদর্শনের উপায়]

মাস্টার — ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, অবশ্য করা যায়। মাঝে মাঝে নির্জনে বাস; তাঁর নামগুণগান, বস্তুবিচার — এই সব উপায় অবলম্বন করতে হয়।

মাস্টার — কী অবস্থাতে তাঁকে দর্শন হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। মাগছেলের জন্য লোকে একঘটি কাঁদে, টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে? ডাকার মতো ডাকতে হয়।

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন:

“ডাক দেখি মন ডাকার মতো কেমন শ্যামা থাকতে পারে।
কেমন শ্যামা থাকতে পারে, কেমন কালী থাকতে পারে।।
মন যদি একান্ত হও, জবা বিল্বদল লও,
ভক্তি-চন্দন মিশাইয়ে (মার) পদে পুষ্পাঞ্জলি দাও।।

“ব্যাকুলতা হলেই অরুণ উদয় হল। তারপর সূর্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বরদর্শন।

“তিন টান একত্র হলে তবে তিনি দেখা দেন — বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর, আর সতীর পতির উপর টান। এই তিন টান যদি কারও একসঙ্গে হয়, সেই টানের জোরে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে।

“কথাটা এই, ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে। মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালবাসে, বিষয়ী যেমন বিষয় ভালবাসে। এই তিনজনের ভালবাসা, এই তিন টান একত্র করলে যতখানি হয়, ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর দর্শন লাভ হয়।

“ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা চাই। বিড়ালের ছানা কেবল ‘মিউ মিউ’ করে মাকে ডাকতে জানে। মা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানেই থাকে — কখনো হেঁশেলে, কখন মাটির উপর, কখন বা বিছানার উপর রেখে দেয়। তার কষ্ট হলে সে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে, আর কিছু জানে না। মা যেখানেই থাকুক, এই মিউ মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮২ মার্চ 1882/03/00/v

02.6 তৃতীয় দর্শন

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ।।

[গীতা — ৬।২৯]

[নরেন্দ্র, ভবনাথ, মাস্টার]

মাস্টার তখন বরাহনগরে ভগিনীর বাড়িতে ছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করা অবধি সর্বক্ষণ তাঁহারই চিন্তা। সর্বদাই যেন সেই আনন্দময় মূর্তি দেখিতেছেন ও তাঁহার সেই অমৃতময়ী কথা শুনিতেছেন। ভাবিতে লাগিলেন, এই দরিদ্র

ব্রাহ্মণ কিরূপে এই সব গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেন ও জানিলেন? আর এত সহজে এই সকল কথা বুঝাইতে তিনি এ-পর্যন্ত কাহাকেও কখনও দেখেন নাই। কখন তাঁহার কাছে যাইবেন ও আবার তাঁহাকে দর্শন করিবেন এই কথা রাত্রদিন ভাবিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে রবিবার আসিয়া পড়িল। বরাহনগরের নেপালবাবুর সঙ্গে বেলা ৩টা-৪টার সময় তিনি দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আসিয়া পোঁছিলেন। দেখিলেন, সেই পূর্বপরিচিত ঘরের মধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট তক্তপোশের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে একঘর লোক। রবিবারে অবসর হইয়াছে, তাই ভক্তেরা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। এখনও মাস্টারের সঙ্গে কাহারও আলাপ হয় নাই, তিনি সভামধ্যে একপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। দেখিলেন, ভক্তসঙ্গে সহাস্যবদনে ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

একটি ঊনবিংশতিবর্ষ বয়স্ক ছোকরাকে উদ্দেশ করিয়া ও তাঁহার দিকে তাকাইয়া ঠাকুর যেন কত আনন্দিত হইয়া অনেক কথা বলিতেছিলেন। ছেলেটির নাম নরেন্দ্র। কলেজে পড়েন ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন। কথাগুলি তেজঃপরিপূর্ণ। চক্ষু দুটি উজ্জ্বল। ভক্তের চেহারা।

মাস্টার অনুমানে বুঝিলেন যে, কথাটি বিষয়াসক্ত সংসারী ব্যক্তির সম্বন্ধে হইতেছিল। যরা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করে, ধর্ম ধর্ম করে তাদের ওই সকল ব্যক্তিরা নিন্দা করে। আর সংসারে কত দুষ্ট লোক আছে, তাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত — এ-সব কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) — নরেন্দ্র তুই কি বলিস? সংসারী লোকেরা কত কি বলে! কিন্তু দেখ, হাতি যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চিৎকার করে। কিন্তু হাতি ফিরেও চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তুই কি মনে করবি?

নরেন্দ্র —— আমি মনে করব, কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — না রে, অত দূর নয়। (সকলের হাস্য) ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে; মন্দ লোকের কাছ থেকে তফাত থাকতে হয়। বাঘের ভিতরেও নারায়ণ আছেন; তা বলে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না। (সকলের হাস্য) যদি বল বাঘ তো নারায়ণ, তবে কেন পালাব। তার উত্তর —— যারা বলছে "পালিয়ে এস" তারাও নারায়ণ, তাদের কথা কেন না শুনি?

"একটা গল্প শোন্। কোন এক বনে একটি সাধু থাকেন। তাঁর অনেকগুলি শিষ্য। তিনি একদিন শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে, সর্বভূতে নারায়ণ আছেন, এইটি জেনে সকলকে নমস্কার করবে। একদিন একটি শিষ্য হোমের জন্য কাঠ আনতে বনে গিছল। এমন সময়ে একটা রব উঠল, 'কে কোথায় আছ পালাও —— একটা পাগলা হাতি যাচ্ছে।' সবাই পালিয়ে গেল, কিন্তু শিষ্যটি পালাল না! সে জানে যে, হাতিও যে নারায়ণ তবে কেন পালাব? এই বলিয়া দাঁড়িয়ে রইল। নমস্কার করে স্তবস্তুতি করতে লাগল। এদিকে মাহুত চেঁচিয়ে বলছে 'পালাও, পালাও'; শিষ্যটি তবুও নড়ল না। শেষে হাতিটা শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে তাকে

একধারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। শিষ্য ক্ষতবিক্ষত হয়ে ও অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল।

“এই সংবাদ পেয়ে গুরু ও অন্যান্য শিষ্যেরা তাকে আশ্রমে ধরাধরি করে নিয়ে গেল। আর ঔষধ দিতে লাগল। খানিক্ষণ পরে চেতনা হলে ওকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে, ‘তুমি হাতি আসছে শুনেও কেন চলে গেলে না?’ সে বললে, ‘গুরুদেব আমায় বলে দিয়েছিলেন যে, নারায়ণই মানুষ, জীবজন্তু সব হয়েছেন। তাই আমি হাতি নারায়ণ আসছে দেখে সেখান থেকে সরে যাই নাই।’ গুরু তখন বললেন, ‘বাবা, হাতি নারায়ণ আসছিলেন বটে, তা সত্য; কিন্তু বাবা, মাহুত নারায়ণ তো তোমায় বারণ করেছিলেন। যদি সবই নারায়ণ তবে তার কথা বিশ্বাস করলে না কেন? মাহুত নারায়ণের কথাও শুনতে হয়।’ (সকলের হাস্য)

“শাস্ত্রে আছে ‘অপো নারায়ণঃ’ জল নারায়ণ। কিন্তু কোন জল ঠাকুর সেবায় চলে; আবার কোন জলে আঁচানো, বাসনমাজা, কাপড়কাচা কেবল চলে; কিন্তু খাওয়া বা ঠাকুরসেবা চলে না। তেমনি সাধু, অসাধু, ভক্ত, অভক্ত — সকলেরই হৃদয়ে নারায়ণ আছেন। কিন্তু অসাধু, অভক্ত, দুষ্ট লোকের সঙ্গে ব্যবহার চলে না। মাখামাখি চলে না। কারও সঙ্গে কেবল মুখের আলাপ পর্যন্ত চলে, আবার কারও সঙ্গে তাও চলে না। ওইরূপ লোকের কাছ থেকে তফাতে থাকতে হয়।”

একজন ভক্ত — মহাশয়, যদি দুষ্ট লোকে অনিষ্ট করতে আসে বা অনিষ্ট করে, তাহলে কি চুপ করে থাকা উচিত?

[গৃহস্থ ও তমোগুণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ — লোকের সঙ্গে বাস করতে গেলেই দুষ্ট লোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্য একটু তমোগুণ দেখানো দরকার! কিন্তু সে অনিষ্ট করবে বলে উলটে তার অনিষ্ট করা উচিত নয়।

“এক মাঠে এক রাখাল গরু চরাত। সেই মাঠে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ ছিল। সকলেই সেই সাপের ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে থাকত। একদিন একটি ব্রহ্মচারী সেই মাঠের পথ দিয়ে আসছিল। রাখালেরা দৌড়ে এসে বললে, ‘ঠাকুর মহাশয়! ওদিক দিয়ে যাবেন না। ওদিকে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ আছে।’ ব্রহ্মচারী বললে, ‘বাবা, তা হোক; আমার তাতে ভয় নাই, আমি মন্ত্র জানি!’ এই কথা বলে ব্রহ্মচারী সেইদিকে চলে গেল। রাখালেরা ভয়ে কেউ সঙ্গে গেল না। এদিকে সাপটা ফণা তুলে দৌড়ে আসছে, কিন্তু কাছে না আসতে আসতে ব্রহ্মচারী যেই একটি মন্ত্র পড়লে, আমনি সাপটা কেঁচোর মতন পায়ের কাছে পড়ে রইল। ব্রহ্মচারী বললে, ‘ওরে, তুই কেন পরের হিংসা করে বেড়াস; আয় তোকে মন্ত্র দিব। এই মন্ত্র জপলে তোর ভগবানে ভক্তি হবে, ভগবানলাভ হবে, আর হিংসা প্রবৃত্তি থাকবে না।’ এই বলে সে সাপকে মন্ত্র দিল। সাপটা মন্ত্র পেয়ে গুরুকে প্রণাম করলে আর জিজ্ঞাসা করলে, ‘ঠাকুর! কি করে সাধনা করব, বলুন?’ গুরু বললেন, ‘এই মন্ত্র জপ কর, আর কারও হিংসা করো না।’ ব্রহ্মচারী যাবার সময়ে বললে, ‘আমি আবার আসব।’

“এইরকম কিছুদিন যায়। রাখালেরা দেখে যে, সাপটা আর কামড়াতে আসে না! ঢ্যালা মারে তবুও রাগ হয় না, যেন কেঁচোর মতন হয়ে গেছে। একদিন একজন

রাখাল কাছে গিয়ে ল্যাজ ধরে খুব ঘুরপাক দিয়ে তাকে আছড়ে ফেলে দিলে। সাপটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল, আর সে অচেতন হয়ে পড়ল। নড়ে না, চড়ে না। রাখালেরা মনে করলে যে, সাপটা মরে গেছে। এই মনে করে তারা সব চলে গেল।

"অনেক রাত্রে সাপের চেতনা হল। সে আস্তে আস্তে অতি কষ্টে তার গর্তের ভিতর চলে গেল। শরীর চূর্ণ — নড়বার শক্তি নাই। অনেকদিন পরে যখন অস্থিচর্মসার তখন বাহিরে আহারের চেষ্টায় রাত্রে এক-একবার চরতে আসত; ভয়ে দিনের বেলা আসত না, মন্ত্র লওয়া অবধি আর হিংসা করে না। মাটি, পাতা, গাছ থেকে পড়ে গেছে এমন ফল খেয়ে প্রাণধারণ করত।

"প্রায় এক বৎসর পরে ব্রহ্মচারী সেইপথে আবার এল। এসেই সাপের সন্ধান করলে। রাখালেরা বললে, 'সে সাপটা মরে গেছে।' ব্রহ্মচারীর কিন্তু ও-কথা বিশ্বাস হল না! সে জানে, যে মন্ত্র ও নিয়েছে তা সাধন না হলে দেহত্যাগ হবে না। খুঁজে খুঁজে সেইদিকে তার নাম ধরে ডাকতে লাগল। সে গুরুদেবের আওয়াজ শুনে গর্ত থেকে বেড়িয়ে এল ও খুব ভক্তিভাবে প্রণাম করলে। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করলে, 'তুই কেমন আছিস?' সে বললে, 'আজ্ঞে ভাল আছি।' ব্রহ্মচারী বললে, 'তবে তুই এত রোগা হয়ে গিছিস কেন?' সাপ বললে, 'ঠাকুর আপনি আদেশ করেছেন — কারও হিংসা করো না, তাই পাতাটা ফলটা খাই বলে বোধ হয় রোগা হয়ে গিছি!' ওর সত্ত্বগুণ হয়েছে কি না, তাই কারু উপর ক্রোধ নাই। সে ভুলেই গিয়েছিল যে, রাখালেরা মেরে ফেলবার যোগাড় করেছিল। ব্রহ্মচারী বললে, 'শুধু না খাওয়ার দরুন এরূপ অবস্থা হয় না, অবশ্য আরও কারণ আছে, ভেবে দেখ।' সাপটার মনে পড়ল যে, রাখালেরা আছাড়

মেরেছিল। তখন সে বললে, ‘ঠাকুর মনে পড়েছে বটে, রাখালেরা একদিন আছাড় মেরেছিল। তারা অজ্ঞান, জানে না যে আমার মনের কি অবস্থা; আমি যে কাহাকেও কামড়াব না বা কোনরূপ অনিষ্ট করব না, কেমন করে জানবে?’ ব্রহ্মচারী বললে, ‘ছি! তুই এত বোকা, আপনাকে রক্ষা করতে জানিস না; আমি কামড়াতে বারণ করেছি, ফোঁস করতে নয়! ফোঁস করে তাদের ভয় দেখাস নাই কেন?’

“দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস করতে হয়, ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে। তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নাই, অনিষ্ট করতে নাই।”

[ভিন্ন প্রকৃতি — Are all men equal?]

“ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নানারকম জীবজন্তু, গাছপালা আছে। জানোয়ারের মধ্যে ভাল আছে মন্দ আছে। বাঘের মতো হিংস্র জন্তু আছে। গাছের মধ্যে অমৃতের ন্যায় ফল হয় এমন আছে; আবার বিষফলও আছে। তেমনি মানুষের মধ্যে ভাল আছে, মন্দও আছে; সাধু আছে, অসাধুও আছে; সংসারী জীব আছে আবার ভক্ত আছে।

“জীব চারপ্রকার: — বদ্ধজীব, মুমুক্ষজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব।

“নিত্যজীব: — যেমন নারদাদি। এরা সংসারে থাকে জীবের মঙ্গলের জন্য — জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য।

“বদ্ধজীব: — বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে, আর ভগবানকে ভুলে থাকে — ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না।

“মুমুক্ষজীব: — যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হতে পারে, কেউ বা পারে না।

“মুক্তজীব: — যারা সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে আবদ্ধ নয় — যেমন সাধু-মহাত্মারা; যাদের মনে বিষয়বুদ্ধি নাই, আর যারা সর্বদা হরিপাদপদ্ম চিন্তা করে।

“যেমন জাল ফেলা হয়েছে পুকুরে। দু-চারটা মাছ এমন সেয়ানা যে, কখনও জালে পড়ে না — এরা নিত্যজীবের উপমাস্থল। কিন্তু অনেক মাছই জালে পড়ে। এদের মধ্যে কতকগুলি পালাবার চেষ্টা করে। এরা মুমুক্ষুজীবের উপমাস্থল। কিন্তু সব মাছই পালাতে পারে না। দু-চারটে ধপাঙ ধপাঙ করে জাল থেকে পালিয়ে যায়, তখন জেলেরা বলে, ওই একটা মস্ত মাছ পালিয়ে গেল! কিন্তু যারা জালে পড়েছে, অধিকাংশই পালাতেও পারে না; আর পালাবার চেষ্টাও করে না। বরং জাল মুখে করে, পুকুরের পাঁকের ভিতরে গিয়ে চুপ করে মুখ গুঁজরে শুয়ে থাকে — মনে করে, আর কোন ভয় নাই, আমরা বেশ আছি। কিন্তু জানে না যে, জেলে হড় হড় করে টেনে আড়ায় তুলবে। এরাই বদ্ধজীবের উপমাস্থল।”

[সংসারী লোক – বদ্ধজীব]

“বদ্ধজীবেরা সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ হয়েছে, হাত-পা বাঁধা। আবার মনে করে যে, সংসারের ওই কামিনী ও কাঞ্চনেতেই সুখ হবে, আর নির্ভয়ে থাকবে।

জানে না যে, ওতেই মৃত্যু হবে। বদ্ধজীব যখন মরে তার পরিবার বলে, ‘তুমি তো চললে, আমার কি করে গেলে?’ আবার এমনি মায়া যে, প্রদীপটাতে বেশি সলতে জ্বললে বদ্ধজীব বলে, ‘তেল পুড়ে যাবে সলতে কমিয়ে দাও।’ এদিকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে রয়েছে!

“বদ্ধজীবেরা ঈশ্বরচিন্তা করে না। যদি অবসর হয় তাহলে হয় আবোল-তাবোল ফালতো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, আমি চুপ করে থাকতে পারি না, তাই বেড়া বাঁধছি। হয়তো সময় কাটে না দেখে তাস খেলতে আরম্ভ করে।” (সকলে স্তব্ধ)

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮২ মার্চ 1882/03/00/vi

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।

অসংমূঢ়ঃ স মর্তেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।।

[গীতা — ১০।৩]

02.7 উপায় — বিশ্বাস

একজন ভক্ত — মহাশয়, এরূপ সংসারী জীবের কি উপায় নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ — অবশ্য উপায় আছে। মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ আর মাঝে মাঝে নির্জনে থেকে ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়। আর বিচার করতে হয়। তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, আমাকে ভক্তি বিশ্বাস দাও।

“বিশ্বাস হয়ে গেলেই হল। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই।

(কেদারের প্রতি) — “বিশ্বাসের কত জোর তা তো শুনেছ? পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হল। কিন্তু হনুমান রামনামে বিশ্বাস করে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে পড়ল। তার সেতুর দরকার হয় নাই। (সকলের হাস্য)

“বিভীষণ একটি পাতায় রামনাম লিখে ওই পাতাটি একটি লোকের কাপড়ের খোঁটে বেঁধে দিছল। সে লোকটি সমুদ্রের পারে যাবে। বিভীষণ তাকে বললে, ‘তোমার ভয় নাই, তুমি বিশ্বাস করে জলের উপর দিয়ে চলে যাও, কিন্তু দেখ যাই অবিশ্বাস করবে, অমনি জলে ডুবে যাবে।’ লোকটি বেশ সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল; এমন সময়ে তার ভারী ইচ্ছা হল যে, কাপড়ের খোঁটে কি বাঁধা আছে একবার দেখে! খুলে দেখে যে, কেবল ‘রামনাম’ লেখা রয়েছে! তখন সে ভাবলে, ‘এ কি! শুধু রামনাম একটি লেখা রয়েছে!’ যাই অবিশ্বাস, অমনি ডুবে গেল।

“যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাপাতক করে — গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী হত্যা করে, তবুও ভগবানে এই বিশ্বাসের বলে ভারী ভারী পাপ থেকে উদ্ধার হতে

পারে। সে যদি বলে আর আমি এমন কাজ করব না, তার কিছুতেই ভয় হয় না।”

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন:

[মহাপাতক ও নামমাহাত্ম্য]

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ-দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী ।।
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী ।
এ-সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ নিতে পারি ।।

[নরেন্দ্র — হোমাপাখি]

“এই ছেলেটিকে দেখছ, এখানে একরকম। দুরন্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে, যেমন জুজুটি, আবার চাঁদনিতে যখন খেলে, তখন আর এক মূর্তি। এরা নিত্যসিদ্ধের থাক। এরা সংসারে কখনও বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। এরা সংসারে আসে জীবশিক্ষার জন্য। এদের সংসারের বস্তু কিছু ভাল লাগে না — এরা কামিনীকাঞ্চনে কখনও আসক্ত হয় না।

“বেদে আছে হোমাপাখির কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখি থাকে। সেই আকাশেতেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লে ডিমটা পড়তে থাকে — কিন্তু এত উঁচু যে, অনেকদিন থেকে ডিমটা পড়তে থাকে। ডিম পড়তে পড়তে ফুটে যায়।

তখন ছানাটা পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে তার চোখ ফোটে ও ডানা বেরোয়। চোখ ফুটলেই দেখতে পায় যে, সে পড়ে যাচ্ছে, মাটিতে লাগলে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে পাখি মার দিকে একেবারে চোঁচা দৌড় দেয়, আর উঁচুতে উঠে যায়।"

নরেন্দ্র উঠিয়া গেলেন।

সভামধ্যে কেদার, প্রাণকৃষ্ণ, মাস্টার ইত্যাদি অনেকে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখ নরেন্দ্র গাইতে, বাজাতে, পড়াশুনায় — সব তাতেই ভাল। সেদিন কেদারের সঙ্গে তর্ক করছিল। কেদারের কথাগুলো কচকচ করে কেটে দিতে লাগল। (ঠাকুর ও সকলের হাস্য) (মাস্টারের প্রতি) — ইংরাজীতে কি কোন তর্কের বই আছে গা?

মাস্টার — আজ্ঞে হাঁ, ইংরেজীতে ন্যায়শাস্ত্র (Logic) আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, কিরকম একটু বল দেখি।

মাস্টার এইবার মুশকিলে পড়িলেন। বলিলেন, একরকম আছে সাধারণ সিদ্ধান্ত থেকে বিশেষ সিদ্ধান্তে পোঁছানো। যেমন:

সব মানুষ মরে যাবে,
পণ্ডিতেরা মানুষ,
অতএব পণ্ডিতেরা মরে যাবে।

“আর একরকম আছে, বিশেষ দৃষ্টান্ত বা ঘটনা দেখে সাধারণ সিদ্ধান্তে পোঁছানো। যেমন:

এ কাকটা কালো,

ও কাকটা কালো

(আবার) যত কাক দেখছি সবই কালো,

অতএব সব কাকই কালো।

“কিন্তু এরকম সিদ্ধান্ত করলে ভুল হতে পারে, কেননা হয়তো খুঁজতে খুঁজতে আর এক দেশে সাদা কাক দেখা গেল। আর এক দৃষ্টান্ত —— যেখানে বৃষ্টি সেইখানে মেঘ ছিল বা আছে; অতএব এই সাধারণ সিদ্ধান্ত হল যে, মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। আরও এক দৃষ্টান্ত —— এ-মানুষটির বত্রিশ দাঁত আছে, ও-মানুষটির বত্রিশ দাঁত, আবার যে-কোন মানুষ দেখছি তারই বত্রিশ দাঁত আছে। অতএব সব মানুষেরই বত্রিশ দাঁত আছে।

“এরূপ সাধারণ সিদ্ধান্তের কথা ইংরেজী ন্যায়শাস্ত্রে আছে।”

শ্রীরামকৃষ্ণ কথাগুলি শুনিলেন মাত্র। শুনিতে শুনিতেই অন্যমনস্ক হইলেন। কাজে কাজেই আর এ-বিষয়ে বেশি প্রসঙ্গ হইল না।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১৮৮২ মার্চ 1882/03/00/vii

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।

সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ।।

[গীতা — ২।৫৩]

02.8 সমাধিমন্দিরে

সভা ভঙ্গ হইল। ভক্তেরা এদিক ওদিক পায়চারি করিতেছেন। মাস্টারও পঞ্চবটী ইত্যাদি স্থানে বেড়াইতেছেন, বেলা আন্দাজ পাঁচটা। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দিকে আসিয়া দেখিলেন, ঘরের উত্তরদিকের ছোট বারান্দার মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার হইতেছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। নরেন্দ্র গান করিতেছেন, দুই-চারিজন ভক্ত দাঁড়াইয়া আছেন। মাস্টার আসিয়া গান শুনিতেছেন। গান শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়া রহিলেন। ঠাকুরের গান ছাড়া এমন মধুর গান তিনি কখনও কোথাও শুনেন নাই। হঠাৎ ঠাকুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। ঠাকুর দাঁড়াইয়া নিস্পন্দ, চক্ষুর পাতা পড়িতেছে না; নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বহিছে কিনা বহিছে! জিজ্ঞাসা করাতে একজন ভক্ত বলিলেন, এর নাম সমাধি! মাস্টার এরূপ কখনও দেখেন নাই, শুনেন নাই। অবাক্ হইয়া তিনি ভাবিতেছেন, ভগবানকে চিন্তা করিয়া মানুষ কি এত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়? না জানি কতদূর বিশ্বাস-ভক্তি থাকলে এরূপ হয়। গানটি এই:

চিন্তয় মম মানস হরি চিদঘন নিরঞ্জন।

কিবা, অনুপমভাতি, মোহনমূরতি, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন।

নবরাগে রঞ্জিত, কোটি শশী-বিনিন্দিত;

(কিবা) বিজলি চমকে, সেরূপ আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন।

গানের এই চরণটি গাহিবার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শিহরিতে লাগিলেন। দেহ রোমাঞ্চিত! চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতেছে। মাঝে মাঝে যেন কি দেখিয়া হাসিতেছেন। না জানি 'কোটি শশী-বিনিন্দিত' কী অনুপম রূপদর্শন করিতেছেন! এরই নাম কি ভগবানের চিন্ময়-রূপ-দর্শন? কত সাধন করিলে, কত তপস্যার ফলে, কতখানি ভক্তি-বিশ্বাসের বলে, এরূপ ঈশ্বর-দর্শন হয়? আবার গান চলিতেছে:

হৃদি-কমলাসনে, ভজ তাঁর চরণ,

দেখ শান্ত মনে, প্রেম নয়নে, অপরূপ প্রিয়দর্শন!

আবার সেই ভুবনমোহন হাস্য! শরীর সেইরূপ নিস্পন্দ! স্তিমিত লোচন! কিন্তু কি যেন অপরূপ রূপদর্শন করিতেছেন! আর সেই অপরূপ রূপদর্শন করিয়া যেন মহানন্দে ভাসিতেছেন!

এইবার গানের শেষ হইল। নরেন্দ্র গাইলেন:

চিদানন্দরসে, ভক্তিযোগাবেশে, হও রে চিরগমন।

(চিদানন্দরসে, হায় রে) (প্রেমানন্দরসে)।।

সমাধির ও প্রেমানন্দের এই অদ্ভুত ছবি হৃদয়মধ্যে গ্রহণ করিয়া মাস্টার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে হৃদয়মধ্যে সেই হৃদয়োন্মত্তকারী মধুর সঙ্গীতের ফুট উঠিতে লাগিল:

“প্রেমানন্দরসে হও রে চিরমগন।” (হরিপ্রেমে মত্ত হয়ে)।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

১৮৮২ মার্চ 1882/03/00/viii

02.9 চতুর্থ দর্শন

যং লবধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ।।

[গীতা — ৬।২২]

[নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতির সঙ্গে আনন্দ]

তাহার পরদিনও ছুটি ছিল। বেলা তিনটার সময় মাস্টার আবার আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পূর্বপরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। মেঝেতে মাদুর পাতা। সেখানে নরেন্দ্র, ভবনাথ, আরও দুই-একজন বসিয়া আছেন।

কয়টিই ছোকরা, উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়স। ঠাকুর সহাস্যবদন, ছোট তক্তপোশের উপর বসিয়া আছেন, আর ছোকরাদের সহিত আনন্দে কথাবার্তা কহিতেছেন।

মাস্টার ঘরে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়াই ঠাকুর উচ্চহাস্য করিয়া ছোকরাদের বলিয়া উঠিলেন, "ওই রে আবার এসেছে!" — বলিয়াই হাস্য। সকলে হাসিতে লাগিল। মাস্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। — আগে হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতেন — ইংরেজী পড়া লোকেরা যেমন করে। কিন্তু আজ তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে শিখিয়াছেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে, শ্রীরামকৃষ্ণ কেন হাসিতেছিলেন, তাহাই নরেন্দ্রাদি ভক্তদের বুঝাইয়া দিতেছেন।

"দেখ, একটা ময়ূরকে বেলা চারটার সময় আফিম খাইয়ে দিচ্ছিল। তার পরদিন ঠিক চারটার সময় ময়ূরটা উপস্থিত — আফিমের মৌতাত ধরেছিল — ঠিক সময়ে আফিম খেতে এসেছে!" (সকলের হাস্য)

মাস্টার মনে মনে ভাবিতেছেন, "ইনি ঠিক কথাই বলিতেছেন। বাড়িতে যাই কিন্তু দিবানিশি ইঁহার দিকে মন পড়িয়া থাকে — কখন দেখিব, কখন দেখিব। এখানে কে যেন টেনে আনলে! মনে করলে অন্য জায়গায় যাবার জো নাই, এখানে আসতেই হবে!" এইরূপ ভাবিতেছেন, ঠাকুর এদিকে ছোকরাগুলির সহিত অনেক ফষ্টিনাষ্টি করিতে লাগিলেন যেন তারা সমবয়স্ক। হাসীর লহরী উঠিতে লাগিল। যেন আনন্দের হাট বসিয়াছে।

মাস্টার অবাক্ হইয়া এই অদ্ভুত চরিত্র দেখিতেছেন। ভাবিতেছেন, ইঁহারই কি পূর্বদিনে সমাধি ও অদৃষ্টপূর্ব প্রেমানন্দ দেখিয়াছিলাম? সেই ব্যক্তি কি আজ প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন? ইনিই কি আমায় প্রথম দিনে উপদেশ দিবার সময় তিরস্কার করিয়াছিলেন? ইনিই কি আমায় "তুমি কি জ্ঞানী" বলেছিলেন? ইনিই কি সাকার-নিরাকার দুই সত্য বলেছিলেন? ইনিই কি আমায় বলেছিলেন যে, ঈশ্বরই সত্য আর সংসারের সমস্তই অনিত্য? ইনিই কি আমায় সংসারে দাসীর মতো থাকতে বলেছিলেন?

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ করিতেছেন ও মাস্টারকে এক-একবার দেখিতেছেন। দেখিলেন, তিনি অবাক্ হইয়া বসিয়া আছেন। তখন রামলালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ্, এর একটু উমের বেশি কিনা, তাই একটু গম্ভীর। এরা এত হাসিখুশি করছে, কিন্তু এ চুপ করে বসে আছে।" মাস্টারের বয়স তখন সাতাশ বৎসর হইবে।

কথা কহিতে কহিতে পরম ভক্ত হনুমানের কথা উঠিল। হনুমানের পট একখানি ঠাকুরের ঘরের দেওয়ালে ছিল। ঠাকুর বলিলেন, "দেখ, হনুমানের কি ভাব! ধন, মান, দেহসুখ কিছুই চায় না; কেবল ভগবানকে চায়! যখন স্ফটিকস্তম্ভ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে পালাচ্ছে তখন মন্দোদরী অনেকরকম ফল নিয়ে লোভ দেখাতে লাগল। ভাবলে ফলের লোভে নেমে এসে অস্ত্রটা যদি ফেলে দেয়; কিন্তু হনুমান ভুলবার ছেলে নয়; সে বললে:

[গীত — 'শ্রীরামকল্পতরু']

আমার কি ফলের অভাব।
পেয়েছি যে ফল, জনম সফল,
মোক্ষ-ফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে ।।
শ্রীরামকল্পতরুমূলে বসে রই —
যখন যে ফল বাঞ্ছা সেই ফল প্রাপ্ত হই ।
ফলের কথা কই, (ধনি গো), ও ফল গ্রাহক নই;
যাব তোদের প্রতিফল যে দিয়ে ।।

[সমাধিমন্দিরে]

ঠাকুর এই গান গাহিতেছেন। আবার সেই 'সমাধি'! আবার নিস্পন্দ দেহ, স্তিমিত লোচন, দেহ স্থির! বসিয়া আছেন — ফটোগ্রাফে যেরূপ ছবি দেখা যায়। ভক্তেরা এইমাত্র এত হাসিখুশি করিতেছিলেন, এখন সকলেই একদৃষ্টি হইয়া ঠাকুরের সেই অদ্ভুত অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছেন। সমাধি অবস্থা মাস্টার এই দ্বিতীয়বার দর্শন করিলেন। অনেকক্ষণ পরে ওই অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে। দেহ শিথিল হইল। মুখ সহাস্য হইল। ইন্দ্রিয়গণ আবার নিজের নিজের কার্য করিতেছে। চক্ষের কোণ দিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে ঠাকুর 'রাম রাম', এই নাম উচ্চারণ করিতেছেন।

মাস্টার ভাবিতে লাগিলেন, এই মহাপুরুষই কি ছেলেদের সঙ্গে ফচকিমি করিতেছিলেন? তখন যেন পাঁচ বছরের বালক!

ঠাকুর পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন। মাস্টারকে ও নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তোমরা দুজনে ইংরেজীতে কথা কও ও বিচার কর আমি শুনব।”

মাস্টার ও নরেন্দ্র উভয়ে এই কথা শুনিয়া হাসিতেছেন। দুজনে কিছু কিছু আলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাংলাতে। ঠাকুরের সামনে মাস্টারের বিচার আর সম্ভব নয়। তাঁহার তর্কের ঘর ঠাকুরের কৃপায় একরকম বন্ধ। আর কিরূপে তর্ক-বিচার করিবেন? ঠাকুর আর একবার জিদ করিলেন, কিন্তু ইংরেজিতে তর্ক করা হইল না।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

১৮৮২ মার্চ 1882/03/00/ix

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং, ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।

ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা, সনাতনস্ত্বং, পুরুষো মতো মে ।।

[গীতা — ১১।১৮]

02.10 অন্তরঙ্গ সঙ্গে — ‘আমি কে’?

পাঁচটা বাজিয়াছে। ভক্ত কয়টি যে যার বাড়িতে চলিয়া গেলেন। কেবল মাস্টার ও নরেন্দ্র রহিলেন। নরেন্দ্র গাড়ু লইয়া হাঁসপুকুরের ও ঝাউতলার দিকে মুখ ধুইতে গেলেন। মাস্টার ঠাকুরবাড়ির এদিক-ওদিক পায়চারি করিতেছেন: কিয়ৎক্ষণ পরে কুঠির কাছ দিয়া হাঁসপুকুরের দিকে আসিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পুকুরের দক্ষিণদিকের সিঁড়ির চাতালের উপর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া, নরেন্দ্র গাড়ু হাতে করিয়া মুখ ধুইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, "দেখ্, আর একটু বেশি বেশি আসবি। সবে নূতন আসছিস কিনা! প্রথম আলাপের পর নূতন সকলেই ঘন ঘন আসে, যেমন — নূতন পতি (নরেন্দ্র ও মাস্টারের হাস্য)। কেমন আসবি তো?" নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের ছেলে, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁ, চেষ্টা করব।"

সকলে কুঠির পথ দিয়া ঠাকুরের ঘরে আসিতেছেন। কুঠির কাছে মাস্টারকে ঠাকুর বলিলেন, "দেখ্, চাষারা হাটে গরু কিনতে যায়; তারা ভাল গরু, মন্দ গরু বেশ চেনে। ল্যাজের নিচে হাত দিয়ে দেখে। কোনও গরু ল্যাজে হাত দিলে শুয়ে পড়ে, সে গরু কেনে না। যে গরু ল্যাজে হাত দিলে তিড়িং-মিড়িং করে লাফিয়ে উঠে সেই গরুকেই পছন্দ করে। নরেন্দ্র সেই গরুর জাত; ভিতরে খুব তেজ!" এই বলিয়া ঠাকুর হাসিতেছেন। "আবার কেউ কেউ লোক আছে, যেন চিঁড়ের ফলার, আঁট নাই, জোর নাই, ভ্যাৎ ভ্যাৎ করছে।"

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন; মাস্টারকে বলিলেন, "তুমি নরেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করগে, আমায় বলবে কিরকম ছেলে।"

আরতি হইয়া গেল। মাস্টার অনেকক্ষণ পরে চাঁদনির পশ্চিম ধারে নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। পরস্পর আলাপ হইতে লাগিল। নরেন্দ্র বলিলেন, আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের। কলেজে পড়িতেছি ইত্যাদি।

রাত হইয়াছে — মাস্টার এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন। কিন্তু যাইতে আর পারিতেছেন না। তাই নরেন্দ্রের নিকট হইতে আসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার গান শুনিয়া হৃদয়, মন মুগ্ধ হইয়াছে; বড় সাধ যে, আবার তাঁর শ্রীমুখে গান শুনিতে পান। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, মা-কালীর মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দিরের মধ্যে একাকী ঠাকুর পাদচারণ করিতেছেন। মার মন্দিরে মার দুইপার্শ্বে আলো জ্বলিতেছিল। বৃহৎ নাটমন্দিরে একটি আলো জ্বলিতেছে, ক্ষীণ আলোক। আলো ও অন্ধকার মিশ্রিত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ নাটমন্দিরে দেখাইতেছিল।

মাস্টার ঠাকুরের গান শুনিয়া আত্মহারা হইয়াছেন। যেন মন্ত্রমুগ্ধ সর্প। এক্ষণে সঙ্কুচিতভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ আর কি গান হবে?” ঠাকুর চিন্তা করিয়া বলিলেন, “না, আজ আর গান হবে না” এই বলিয়া কি যেন মনে পড়িল, অমনি বলিলেন, “তবে এক কর্ম করো। আমি বলরামের বাড়ি কলিকাতায় যাব, তুমি যেও, সেখানে গান হবে।”

মাস্টার — যে আজ্ঞা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি জান? বলরাম বসু?

মাস্টার — আজ্ঞা না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বলরাম বসু। বোসপাড়ায় বাড়ি।

মাস্টার — যে আজ্ঞা, আমি জিজ্ঞাসা করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের সঙ্গে নাটমন্দিরে বেড়াইতে বেড়াইতে) — আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাকে তোমার কি বোধ হয়?

মাস্টার চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার বলিতেছেন,

"তোমার কি বোধ হয়? আমার কয় আনা জ্ঞান হয়েছে?"

মাস্টার – 'আনা' এ-কথা বুঝতে পারছি না; তবে এরূপ জ্ঞান বা প্রেমভক্তি বা বিশ্বাস বা বৈরাগ্য বা উদার ভাব কখন কোথাও দেখি নাই।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতে লাগিলেন।

এরূপ কথাবার্তার পর মাস্টার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সদর ফটক পর্যন্ত আসিয়া আবার কি মনে পড়িল, অমনি ফিরিলেন। আবার নাটমন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিয়া উপস্থিত।

ঠাকুর সেই ক্ষীনালোকমধ্যে একাকী পাদচারণ করিতেছেন। একাকী — নিঃসঙ্গ। পশুরাজ যেন অরণ্যমধ্যে আপন মনে একাকী বিচরণ করিতেছেন! আত্মারাম; সিংহ একলা থাকতে, একলা বেড়াতে ভালবাসে! অনপেক্ষ!

অবাক্‌ হইয়া মাস্টার আবার সেই মহাপুরুষদর্শন করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — আবার যে ফিরে এলে?

মাস্টার —– আজ্ঞা, বোধ হয় বড়-মানুষের বাড়ি —– যেতে দিবে কি না; তাই যাব না ভাবছি। এইখানে এসেই আপনার সঙ্গে দেখা করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ —– না গো, তা কেন? তুমি আমার নাম করবে। বলবে তাঁর কাছে যাব, তাহলেই কেউ আমার কাছে নিয়ে আসবে।

মাস্টার “যে আজ্ঞা” বলিয়া আবার প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ End of Chapter

----

c3 ৩ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ১১ই মার্চ 1882/03/11

03.1 শ্রীরামকৃষ্ণের বলরাম-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে নৃত্য

রাত্রি ৮টা-৯টা হইবে। ৺দোলযাত্রা।১ রাম, মনোমোহন, রাখাল, নিত্যগোপাল প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছেন। সকলেই হরিনাম সংকীর্তন করিতে করিতে মত্ত হইয়াছেন। কয়েকটি ভক্তের ভাবাবস্থা হইয়াছে। নিত্যগোপালের ভাবাবস্থায় বক্ষঃস্থল রক্তিমবর্ণ হইয়াছে। সকলে উপবেশন করিলে মাস্টার ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। দেখিলেন, রাখাল শুইয়া আছেন, ভাবাবিষ্ট ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ঠাকুর তাঁহার বুকে হাত দিয়া "শান্ত হও" "শান্ত হও" বলিতেছেন। রাখালের এই প্রথম ভাবাবস্থা।২ তিনি কলিকাতার বাসাতে পিত্রালয়ে থাকেন, মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে যান। এই সময়ে শ্যামপুকুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলে কয়েক দিন পড়িয়াছিলেন।

ঠাকুর মাস্টারকে দক্ষিণেশ্বরে বলিয়াছিলেন, "আমি কলিকাতায় বলরামের বাড়িতে যাব, তুমি আসিও।" তাই তিনি তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। (২৮শে ফাল্গুন, ১২৮৮, কৃষ্ণা ষষ্ঠী); ১১ই মার্চ, শনিবার ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ, শ্রীযুক্ত বলরাম ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন।

এইবার ভক্তেরা বারান্দায় বসিয়া প্রসাদ পাইতেছেন। দাসের ন্যায় বলরাম দাঁড়াইয়া আছেন, দেখিলে বোধ হয় না, তিনি এই বাড়ির কর্তা।

মাস্টার এই নূতন আসিতেছেন। এখনও ভক্তদের সঙ্গে আলাপ হয় নাই। কেবল দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল।

[সর্বধর্ম-সমন্বয়]

কয়েকদিন পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে শিবমন্দিরে সিঁড়ির উপর ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। বেলা ৪টা-৫টা হইবে। মাস্টার কাছে বসিয়া আছেন।

কিয়ৎক্ষণ পূর্বে ঠাকুর নিজের ঘরে মেঝের উপর বিছানা পাতা — তাহাতে বিশ্রাম করিতেছিলেন। এখনও ঠাকুরের সেবার জন্য কাছে কেহ থাকেন না। হৃদয় যাওয়ার পর ঠাকুরের কষ্ট হইতেছে। কলিকাতা হইতে মাস্টার আসিলে তিনি তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরের সম্মুখস্থ শিবমন্দিরের সিঁড়িতে আসিয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু মন্দির দৃষ্টে হঠাৎ ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন।

ঠাকুর জগন্মাতার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, “মা, সব্বাই বলছে, আমার ঘড়ি ঠিক চলছে। খ্রীষ্টান, ব্রহ্মজ্ঞানী, হিন্দু, মুসলমান — সকলেই বলে, আমার ধর্ম ঠিক, কিন্তু মা, কারুর ঘড়ি তো ঠিক চলছে না। তোমাকে ঠিক কে বুঝতে পারবে। তবে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তোমার কৃপা হলে সব পথ দিয়ে তোমার কাছে পোঁছানো যায়। মা, খ্রীষ্টানরা গির্জাতে তোমাকে কি করে ডাকে, একবার দেখিও! কিন্তু মা, ভিতরে গেলে লোকে কি বলবে? যদি কিছু হাঙ্গামা হয়? আবার কালীঘরে যদি ঢুকতে না দেয়? তবে গির্জার দোরগোড়া থেকে দেখিও।”

[ভক্তসঙ্গে ভজনানন্দে — রাখালপ্রেম — “প্রেমের সুরা”]

আর এক দিন ঠাকুর নিজের ঘরে ছোট খাটটির উপর বসিয়া আছেন, আনন্দময় মূর্তি — হাস্যবদন। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণেরও সঙ্গে মাস্টার আসিয়া উপস্থিত।

কালীকৃষ্ণ জানিতেন না, তাঁহাকে তাঁহার বন্ধু কোথায় লইয়া আসিতেছেন। বন্ধু বলিয়াছিলেন, “শুঁড়ির দোকানে যাবে তো আমার সঙ্গে এস; সেখানে এক জালা মদ আছে।” মাস্টার আসিয়া বন্ধুকে যাহা বলিয়াছিলেন, প্রনামান্তর ঠাকুরকে সমস্ত নিবেগন করিলেন। ঠাকুরও হাসিতে লাগিলেন।

ঠাকুর বলিলেন, “ভজানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, এই আনন্দই সুরা; প্রেমের সুরা। মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরে প্রেম, ঈশ্বরকে ভালবাসা। ভক্তিই সার, জ্ঞানবিচার করে ঈশ্বরকে জানা বড়ই কঠিন।”

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাহিতে লাগিলেন:

কে জানে কালী কেমন, ষড় দর্শনে না পায় দরশন।
আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন,
সে যে ঘটে ঘটে বিরাজ করে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।
কালীর উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা বুঝ কেমন,
যেমন শিব বুঝেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন।
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন,
কালী পদ্মবনে হংস-সনে, হংসীরূপে করে রমণ।

প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু-তরণ,
আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না; ধরবে শশী হয়ে বামন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলিতেছেন, ঈশ্বরকে ভালবাসা — এইটি জীবনের উদ্দেশ্য; যেমন বৃন্দাবনে গোপ-গোপীরা, রাখালরা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসত। যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলেন, রাখালেরা তাঁর বিরহে কেঁদে কেঁদে বেড়াত।

এই বলিয়া ঠাকুর ঊর্ধ্বদৃষ্টি হইয়া গান গাহিতেছেন:

দেখে এলাম এক নবীন রাখাল,
নবীন তরুর ডাল ধরে,
নবীন বৎস কোলে করে,
বলে, কোথা রে ভাই কানাই।
আবার, কা বই কানাই বেরোয় না রে,
বলে কোথা রে ভাই,
আর নয়ন-জলে ভেসে যায়।

ঠাকুরের প্রেমমাখা গান শুনিয়া মাস্টারের চক্ষুতে জল আসিয়াছে।

১ দোলযাত্রার ৭ দিন পরে হইবে। কারণ গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকা মতে ওই বৎসর দোলযাত্রা 4ঠা মার্চ ছিল। শ্রীমও এই পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন, ১১ই মার্চ, ১৮৮২, শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম-মন্দিরে আসিয়াছিলেন। — প্র:

২ দ্বিতীয় ভাবাবস্থা হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয়। মাস্টার মহাশয় নিজেই ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৮4-তে উল্লেখ করিয়াছেন ‘রাখালের প্রথম ভাব ১৮৮১’। — প্র:

৩ কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য পরে বিদ্যাসাগর কলেজে Senior Professor of Sanskrit (সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক) হইয়াছিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ২রা এপ্রিল 1882/04/02/i

03.2 শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরে —— প্রাণকৃষ্ণের বাটীতে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় আজ শুভাগমন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের শ্যামপুকুর বাটীর দ্বিতলায় বৈঠকখানাঘরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। এইমাত্র ভক্তসঙ্গে বসিয়া প্রসাদ পাইয়াছেন। আজ ২রা এপ্রিল, রবিবার, ১৮৮২ খ্রী:, ২১শে চৈত্র, ১২৮৮, শুক্লা চর্তুদশী; এখন বেলা ১/২টা হইবে। কাপ্তেন ওই পাড়াতেই থাকেন; ঠাকুরের ইচ্ছা এ-বাড়িতে বিশ্রামের পর কাপ্তেনের বাড়ি হইয়া, তাঁহাকে দর্শন করিয়া ‘কমলকুটির’ নামক বাড়িতে শ্রীযুক্ত কেশব সেনকে দর্শন করিতে যাইবেন। প্রাণকৃষ্ণের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন; রাম, মনোমহন, কেদার, সুরেন্দ্র, গিরীন্দ্র, (সুরেন্দ্রের ভ্রাতা), রাখাল, বলরাম, মাস্টার প্রভৃতি ভক্তেরা উপস্থিত।

পাড়ার বাবুরা ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরাও আছেন, ঠাকুর কি বলেন — শুনিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইয়া আছেন।

ঠাকুর বলিতেছেন, ঈশ্বর ও তাঁহার ঐশ্বর্য। এই জগৎ তাঁর ঐশ্বর্য।

“কিন্তু ঐশ্বর্য দেখেই সকলে ভুলে যায়, যাঁর ঐশ্বর্য তাঁকে খোঁজে না। কামিনী-কাঞ্চন ভোগ করতে সকলে যায়; কিন্তু দুঃখ, অশান্তিই বেশি। সংসার যেন বিশালাক্ষীর দ, নৌকা দহে একবার পড়লে আর রক্ষা নাই। সেঁকুল কাঁটার মতো এক ছাড়ে তো আর একটি জড়ায়। গোলকধান্দায় একবার ঢুকলে বেরুনো মুশকিল। মানুষ যেন ঝলসা পোড়া হয়ে যায়।”

একজন ভক্ত — এখন উপায়?

[উপায় — সাধুসঙ্গ আর প্রার্থনা]

শ্রীরামকৃষ্ণ — উপায়: সাধুসঙ্গ আর প্রার্থনা।

“বৈদ্যের কাছে না গেলে রোগ ভাল হয় না। সাধুসঙ্গ একদিন করলে হয় না, সর্বদাই দরকার; রোগ লেগেই আছে। আবার বৈদ্যের কাছে না থাকলে নাড়ীজ্ঞান হয় না, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হয়। তবে কোন্‌টি কফের নাড়ী, কোন্‌টি পিত্তের নাড়ী বোঝা যায়।”

ভক্ত — সাধুসঙ্গে কি উপকার হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বরে অনুরাগ হয়। তাঁর উপর ভালবাসা হয়। ব্যাকুলতা না এলে কিছুই হয় না। সাধুসঙ্গ করতে করতে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। যেমন বাড়িতে কারুর অসুখ হলে সর্বদাই মন ব্যাকুল হয়ে থাকে, কিসে রোগী ভাল হয়। আবার কারুর যদি কর্ম যায়, সে ব্যক্তি যেমন আফিসে আফিসে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, ব্যাকুল হতে হয়, সেইরূপ। যদি কোন আফিসে বলে কর্ম খালি নেই, আবার তার পরদিন এসে জিজ্ঞাসা করে, আজ কি কোন কর্ম খালি হয়েছে?

“আর একটি উপায় আছে — ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা। তিনি যে আপনার লোক, তাঁকে বলতে হয়, তুমি কেমন, দেখা দাও — দেখা দিতেই হবে — তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ কেন? শিখরা বলেছিল, ‘ঈশ্বর দয়াময়’; আমি তাঁদের বলেছিলাম, দয়াময় কেন বলব? তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে আমাদের মঙ্গল হয়, তা যদি করেন সে কি আর আশ্চর্য! মা-বাপ ছেলেকে পালন করবে, সে আবার দয়া কি? সে তো করতেই হবে, তাই তাঁকে জোর করে প্রার্থনা করতে হয়। তিনি যে আপনার মা, আপনার বাপ! ছেলে যদি খাওয়া ত্যাগ করে, বাপ-মা তিন বৎসর আগেই হিস্যা ফেলে দেয়। আবার যখন ছেলে পয়সা চায়, আর পুনঃপুনঃ বলে, ‘মা, তোর দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে দুটি পয়সা দে’, তখন মা ব্যাজার হয়ে তার ব্যাকুলতা দেখে পয়সা ফেলে দেয়।

“সাধুসঙ্গ করলে আর একটি উপকার হয়। সদসৎ বিচার। সৎ — নিত্য পদার্থ অর্থাৎ ঈশ্বর। অসৎ অর্থাৎ অনিত্য। অসৎপথে মন গেলেই বিচার করতে হয়। হাতি পরের কলাগাছ খেতে শুঁড় বাড়ালে সেই সময় মাহুত ডাঙস মারে।”

প্রতিবেশী — মহাশয়, পাপবুদ্ধি কেন হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁর জগতে সকলরকম আছে। সাধু লোকও তিনি করেছেন, দুষ্ট লোকও তিনি করেছেন, সদ্‌বুদ্ধি তিনিই দেন, অসদ্‌বুদ্ধিও তিনিই দেন।

[পাপীর দায়িত্ব ও কর্মফল]

প্রতিবেশী — তবে পাপ করলে আমাদের কোন দায়িত্ব নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বরের নিয়ম যে, পাপ করলে তার ফল পেতে হবে। লঙ্কা খেলে, তার ঝাল লাগবে না? সেজোবাবু বয়সকালে অনেকরকম করেছিল, তাই মৃত্যুর সময় নানারকম অসুখ হল। কম বয়সে এত টের পাওয়া যায় না। কালীবাড়িতে ভোগ রাঁধবার অনেক সুঁদরী কাঠ থাকে। ভিজে কাঠ প্রথমটা বেশ জ্বলে যায়, তখন ভিতরে যে জল আছে, টের পাওয়া যায় না। কাঠটা পোড়া শেষ হলে যত জল পেছনে ঠেলে আসে ও ফ্যাঁচফোঁচ করে উনুন নিভিয়ে দেয়। তাই কাম, ক্রোধ, লোভ — এ-সব থেকে সাবধান হতে হয়। দেখ না, হনুমান ক্রোধ করে লঙ্কা দগ্ধ করেছিল, শেষে মনে পড়ল, অশোকবনে সীতা আছেন, তখন ছটফট করতে লাগল, পাছে সীতার কিছু হয়।

প্রতিবেশী — তবে ঈশ্বর দুষ্ট লোক করলেন কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁর ইচ্ছা, তাঁর লীলা। তাঁর মায়াতে বিদ্যাও আছে, অবিদ্যাও আছে। অন্ধকারেরও প্রয়োজন আছে, অন্ধকার থাকলে আলোর আরও মহিমা প্রকাশ হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ খারাপ জিনিস বটে, তবে তিনি দিয়েছেন কেন? মহৎ লোক তয়ের করবেন বলে। ইন্দ্রিয় জয় করলে মহৎ হয়। জিতেন্দ্রিয় কি না

করতে পারে? ঈশ্বরলাভ পর্যন্ত তাঁর কৃপায় করতে পারে। আবার অন্যদিকে দেখ, কাম থেকে তাঁর সৃষ্টি-লীলা চলছে।

“দুষ্ট লোকেরও দরকার আছে। একটি তালুকের প্রজারা বড়ই দুর্দান্ত হয়েছিল। তখন গোলক চৌধুরিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তার নামে প্রজারা কাঁপতে লাগল — এত কঠোর শাসন। সবই দরকার। সীতা বললেন, রাম! অযোধ্যায় সব অট্টালিকা হত তো বেশ হত, অনেক বাড়ি দেখছি ভাঙা, পুরানো। রাম বললেন, সীতা! সব বাড়ি সুন্দর থাকলে মিস্ত্রীরা কি করবে? (সকলের হাস্য) ঈশ্বর সবরকম করেছেন — ভাল গাছ, বিষ গাছ, আবার আগাছাও করেছেন। জানোয়ারদের ভিতর ভাল-মন্দ সব আছে — বাঘ, সিংহ, সাপ সব আছে।”

[সংসারেও ঈশ্বরলাভ হয় — সকলেরই মুক্তি হবে]

প্রতিবেশী — মহাশয়, সংসারে থেকে কি ভগবানকে পাওয়া যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — অবশ্য পাওয়া যায়। তবে যা বললুম, সাধুসঙ্গ আর সর্বদা প্রার্থনা করতে হয়। তাঁর কাছে কাঁদতে হয়। মনের ময়লাগুলো ধুয়ে গেলে তাঁর দর্শন হয়। মনটি যেন মাটি-মাখানো লোহার ছুঁচ — ঈশ্বর চুম্বক পাথর, মাটি না গেলে চুম্বক পাথরের সঙ্গে যোগ হয় না। কাঁদতে কাঁদতে ছুঁচের মাটি ধুয়ে যায়; ছুঁচের মাটি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, পাপবুদ্ধি, বিষয়বুদ্ধি। মাটি ধুয়ে গেলেই ছুঁচকে চুম্বক পাথরে টেনে লবে — অর্থাৎ ঈশ্বরদর্শন হবে। চিত্তশুদ্ধি হলে তবে তাঁকে লাভ হয়। জ্বর হয়েছে, দেহেতে রস অনেক রয়েছে তাতে কুইনাইনে কি কাজ হবে। সংসারে হবে না কেন? ওই সাধুসঙ্গ, কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা, মাঝে মাঝে

নির্জনে বাস; একটু বেড়া না দিলে ফুটপাথের চারাগাছ, ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে।

প্রতিবেশী — যারা সংসারে আছে, তাহলে তাদেরও হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — সকলেরই মুক্তি হবে। তবে গুরুর উপদেশ অনুসারে চলতে হয়। বাঁকাপথে গেলে ফিরে আসতে কষ্ট হবে। মুক্তি অনেক দেরিতে হয়। হয়তো এ-জন্মেও হল না, আবার হয়তো অনেক জন্মের পর হল। জনকাদি সংসারেও কর্ম করেছিলেন। ঈশ্বরকে মাথায় রেখে কাজ করতেন। নৃত্যকী যেমন মাথায় বাসন করে নাচে। আর পশ্চিমের মেয়েদের দেখ নাই? মাথায় জলের ঘড়া, হাসতে হাসতে কথা কইতে কইতে যাচ্ছে।

প্রতিবেশী — গুরুর উপদেশ বললেন। গুরু কেমন করে পাব?

শ্রীরামকৃষ্ণ — যে-সে লোক গুরু হতে পারে না। বাহাদুরী কাঠ নিজেও ভেসে চলে যায়, অনেক জীবজন্তুও চড়ে যেতে পারে। হাবাতে কাঠের উপর চড়লে, কাঠও ডুবে যায়, যে চড়ে সেও ডুবে যায়। তাই ঈশ্বর যুগে যুগে লোকশিক্ষার জন্য নিজে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। সচ্চিদানন্দই গুরু।

“জ্ঞান কাকে বলে; আর আমি কে? ঈশ্বরই কর্তা আর সব অকর্তা — এর নাম জ্ঞান। আমি অকর্তা। তাঁর হাতের যন্ত্র। তাই আমি বলি, মা, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; তুমি ঘরণী, আমি ঘর; তুমি ইঞ্জিনিয়ার; যেমন চালাও, তেমনি চলি; যেমন করাও, তেমনি করি; যেমন বলাও, তেমনি বলি; নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ২রা এপ্রিল 1882/04/02/ii

03.3 কমলকুটিরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত কেশব সেন

শ্রীরামকৃষ্ণ কাপ্তেনের বাটী হইয়া শ্রীযুক্ত কেশব সেনের ‘কমলকুটির’ নামক বাটীতে আসিয়াছেন। সঙ্গে রাম, মনোমোহন, সুরেন্দ্র, মাস্টার প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত। সকলে দ্বিতল হলঘরে উপবেশন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রতাপ মজুমদার, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তগণও উপস্থিত আছেন।

ঠাকুর শ্রীযুক্ত কেশবকে বড় ভালবাসেন। যখন বেলঘরের বাগানে সশিষ্য তিনি সাধন-ভজন করিতেছিলেন, অর্থাৎ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মাঘোৎসবের পর — কিছুদিনের মধ্যে ঠাকুর একদিন বাগানে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। সঙ্গে ভাগিনেয় হৃদয়রাম। বেলঘরের এই বাগানে তাঁহাকে বলেছিলেন, তোমারই ল্যাজ খসেছে, অর্থাৎ তুমি সব ত্যাগ করে সংসারের বাহিরেও থাকতে পার আবার সংসারেও থাকতে পার; যেমন বেঙাচির ল্যাজ খসলে জলেও থাকতে পারে, আবার ডাঙাতেও থাকতে পারে। পরে দক্ষিণেশ্বরে, কমলকুটিরে, ব্রাহ্মসমাজ ইত্যাদি স্থানে অনেকবার ঠাকুর কথাচ্ছলে তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, “নানা পথ দিয়া, নানা ধর্মের ভিতর দিয়া ঈশ্বরলাভ হতে পারে।

মাঝে মাঝে নির্জনে সাধন-ভজন করে ভক্তিলাভ করে সংসারে থাকা যায়; জনকাদি ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করে সংসারে ছিলেন; ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়, তবে দেখা দেন; তোমরা যা কর, নিরাকার সাধন, সে খুব ভাল। ব্রহ্মজ্ঞান হলে ঠিক বোধ করবে — ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। সনাতন হিন্দুধর্মে সাকার নিরাকার দুই মানে; নানাভাবে ঈশ্বরের পূজা করে — শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। রোশনচৌকিওয়ালারা একজন শুধু পোঁ ধরে বাজায় অথচ তার বাঁশীর সাত ফোকর আছে; কিন্তু আর একজন তারও সাত ফোকর আছে, সে নানা রাগরাগিণী বাজায়।

“তোমরা সাকার মানো না, তাতে কিছু ক্ষতি নাই; নিরাকারের নিষ্ঠা থাকলেই হল। তবে সাকারবাদীদের টানটুকু নেবে। মা বলে তাঁকে ডাকলে ভক্তি-প্রেম আরও বাড়বে। কখন দাস্য, কখন বাৎসল্য, কখন মধুর ভাব। কোন কামনা নাই তাঁকে ভালবাসি, এটি বেশ। এর নাম অহেতুকী ভক্তি। বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে এক ঈশ্বরেরই কথা আছে ও তাঁহার লীলার কথা; জ্ঞান ভক্তি দুইই আছে। সংসারে দাসীর মতো থাকবে; দাসী সব কাজ করে, কিন্তু দেশে মন পড়ে আছে। মনিবের ছেলেদের মানুষ করে; বলে, ‘আমার হরি’ ‘আমার রাম’ কিন্তু জানে, ছেলে আমার নয়। তোমরা যে নির্জনে সাধন করছ, এ খুব ভাল, তাঁর কৃপা হবে। জনক রাজা নির্জনে কত সাধন করেছিলেন, সাধন করলে তবে তো সংসারে নির্লিপ্ত হওয়া যায়।

“তোমরা বক্তৃতা দাও সকলের উপকারের জন্য, কিন্তু ঈশ্বরদর্শন করে বক্তৃতা দিলে উপকার হয়। তাঁর আদেশ না পেয়ে লোকশিক্ষা দিলে উপকার হয় না। ঈশ্বরলাভ না করলে তাঁর আদেশ পাওয়া যায় না। ঈশ্বরলাভ যে হয়েছে, তার

লক্ষণ আছে। বালকবৎ, জড়বৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ হয়ে যায়; যেমন শুকদেবাদি। চৈতন্যদেব কখন বালকবৎ, কখন উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করিতেন। হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়। পুরীধামে যখন ছিলেন, তখন অনেক সময় জড় সমাধিতে থাকতেন।”

[শ্রীযুক্ত কেশবের হিন্দুধর্মের উপর উত্তরোত্তর শ্রদ্ধা]

এইরূপ নানাস্থানে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনকে শ্রীরামকৃষ্ণ কথাচ্ছলে নানা উপদেশ দিয়াছিলেন। বেলঘরের বাগানে প্রথম দর্শনের পর কেশব ২৮শে মার্চ, ১৮৭৫ রবিবার ‘মিরার’ সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন,১ “আমরা অল্প দিন হইল, দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস রামকৃষ্ণকে বেলঘরের বাগানে দর্শন করিয়াছি। তাঁহার গভীরতা, অর্ন্তদৃষ্টি, বালকস্বভাব দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি শান্তস্বভাব, কোমল প্রকৃতি, আর দেখিলে বোধ হয়, সর্বদা যোগেতে আছেন। এখন আমাদের বোধ হইতেছে যে, হিন্দুধর্মের গভীরতম প্রদেশ অনুসন্ধান করিলে কত সৌন্দর্য, সত্য ও সাধুতা দেখিতে পাওয়া যায়। তা না হইলে পরমহংসের ন্যায় ঈশ্বরীয়ভাবে ভাবিত যোগীপুরুষ কিরূপে দেখা যাইতেছে?” ১৮৭৬ জানুয়ারি আবার মাঘোৎসব আসিল, তিনি টাউন হলে বক্তৃতা দিলেন; বিষয় —– ব্রাহ্মধর্ম ও আমরা কি শিখিয়াছি —– (‘Our Faith and Experiences’) — তাহাতেও হিন্দুধর্মের সৌন্দর্যের কথা অনেক বলিয়াছেন।২

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে যেমন ভালবাসিয়াছিলেন, কেশবও তাঁহাকে তদ্রূপ ভক্তি করিতেন। প্রায় প্রতি বৎসর ব্রাহ্মোৎসবের সময়েও কেশব দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন ও তাঁহাকে কমলকুটিরে লইয়া আসিতেন। কখন কখন একাকী কমলকুটিরের

দ্বিতলস্থ উপাসনাকক্ষে পরম অন্তরঙ্গজ্ঞানে ভক্তিভরে লইয়া যাইতেন ও একান্তে ঈশ্বরের পূজা ও আনন্দ করিতেন।

১৮৭৯ ভাদ্রোৎসবের সময় আবার কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বেলঘরের তপোবনে লইয়া যান। ১৫ই সেপ্টেম্বর সোমবার (৩১শে ভাদ্র, ১২৮৬, কৃষ্ণা চর্তুদশী)। আবার ২১শে সেপ্টেম্বর কমলকুটিরে উৎসবে যোগদান করিতে লইয়া যান। এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইলে ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে তাঁহার ফোটো লওয়া হয়। ঠাকুর দণ্ডায়মান, সমাধিস্থ। হৃদয় ধরিয়া আছেন। ২২শে অক্টোবর (৬ই কার্তিক, ১২৮৬, বুধবার), মহাষ্টমী — নবমীর দিন কেশব দক্ষিণেশ্বরে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন।

১৮৭৯, ২৯শে অক্টোবর বুধবার (১৩ই কার্তিক, ১২৮৬), কোজাগর পূর্ণিমায় বেলা ১টার সময় কেশব আবার ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করিতে যান। স্টীমারের সঙ্গে একখানি বজরা, ছয়খানি নৌকা, দুইখানি ডিঙ্গি, প্রায় ৮০ জন ভক্ত। সঙ্গে পতাকা পুষ্পপল্লব খোল করতাল ভেরী। হৃদয় অভ্যর্থনা করিয়া কেশবকে স্টীমার হইতে আনেন — গান গাইতে গাইতে "সুরধুনীর তীরে হরি বলে কে, বুঝি প্রেমাদতা নিতাই এসেছে!" ব্রাহ্মভক্তগণও পঞ্চবটী হইতে কীর্তন করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে আসিতে লাগিলেন: "সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রূপানন্দ ঘন!" তাহাদের মধ্যে ঠাকুর মাঝে মাঝে সমাধিস্থ। এই দিনে সন্ধ্যার পর বাঁধাঘাটে পূর্ণচন্দ্রের আলোকে কেশব উপাসনা করিয়াছিলেন।

উপাসনার পর ঠাকুর বলিতেছেন, তোমরা বল "ব্রহ্ম আত্মা ভগবান" "ব্রহ্ম মায়া জীব জগৎ" "ভগবত ভক্ত ভগবান"। কেশবাদি ব্রাহ্মভক্তগণ সেই চন্দ্রালোকে ভাগীরথীতীরে সমস্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে ওই সকল মন্ত্র ভক্তিভরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার যখন বলিলেন, বল "গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব"। তখন কেশব আনন্দে হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, মহাশয়, এখন অতদূর নয়; "গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব" আমরা যদি বলি লোকে বলিবে 'গোঁড়া'! শ্রীরামকৃষ্ণও হাসিতে লাগিলেন ও বলিলেন, বেশ তোমরা (ব্রাহ্মরা) যতদূর পার তাহাই বল।

কিছুদিন পরে ১৩ই নভেম্বর (২৮শে কার্তিক), ১৮৭৯ ২কালীপূজার পরে রাম, মনোমোহন, গোপাল মিত্র দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে একদিন গ্রীষ্মকালে রাম ও মনোমোহন কমলকুটিরে কেশবের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভারী জানিতে ইচ্ছা, কেশববাবু ঠাকুরকে কিরূপ মনে করেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, কেশববাবুকে জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, "দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস সামান্য নহেন, এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে এত বড় লোক কেহ নাই। ইনি এত সুন্দর, এত সাধারণ ব্যক্তি, ইঁহাকে অতি সাবধানে সন্তর্পণে রাখতে হয়; অযত্ন করলে এঁর দেহ থাকবে না; যেমন সুন্দর মূল্যবান জিনিস গ্লাসকেসে রাখতে হয়।"৩

ইহার কিছুদিন পরে ১৮৮১ মাঘোৎসবের সময় জানুয়ারি মাসে কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে যান। তখন রাম, মনোমহন, জয়গোপাল সেন প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

১৮০৩ শক, ১লা শ্রাবণ (কৃষ্ণা চতুর্থী, ১২৮৮), শুক্রবার, ১৫ই জুলাই, ১৮৮১, কেশব আবার শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর হইতে স্টীমারে তুলিয়া লন।

১৮৮১ নভেম্বর মাসে মনোমোহনের বাটীতে যখন ঠাকুর শুভাগমন করেন ও উৎসব হয়, তখনও কেশব নিমন্ত্রিত হইয়া উৎসবে জোগদান করেন। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য প্রভৃতি গান করিয়াছিলেন।

১৮৮১ ডিসেম্বর মাসে রাজেন্দ্র মিত্রের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ নিমন্ত্রিত হইয়া যান। শ্রীযুক্ত কেশবও গিয়াছিলেন। বাটীটি ঠন্‌ঠনে বেচু চাটুজ্যের স্ট্রীটে। রাজেন্দ্র রাম ও মনোমোহনের মেসোমহাশয়। রাম, মনোমোহন, ব্রাহ্মভক্ত রাজমোহন, রাজেন্দ্র, কেশবকেও সংবাদ দেন ও নিমন্ত্রণ করেন।

কেশবকে যখন সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তিনি ভাই অঘোরনাথের শোকে অশৌচ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রচারক ভাই অঘোর ২৪শে অগ্রহায়ণ, ৮ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারে লক্ষ্ণৌ নগরে দেহত্যাগ করেন। সকলে মনে করিলেন, কেশব বুঝি আসিতে পারিবেন না। কেশব সংবাদ পাইয়া বলিলেন, “সে কি! পরমহংস মহাশয় আসিবেন আর আমি যাইব না। অবশ্য যাইব। অশৌচ তাই আমি আলাদা জায়গায় খাব।”

মনোমোহনের মাতাঠাকুরানী পরম ভক্তিমতী ৺শ্যামাসুন্দরী দেবী ঠাকুরকে পরিবেশন করিয়াছিলেন। রাম খাবার সময় দাঁড়াইয়াছিলেন। যেদিন রাজেন্দ্রের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ শুভাগমন করেন, সেইদিন অপরাহ্নে সুরেন্দ্র তাঁহাকে লইয়া চীনাবাজারে তাঁহার ফোটোগ্রাফ লইয়াছিলেন। ঠাকুর দণ্ডায়মান সমাধিস্থ।

উৎসবের দিবসে মহেন্দ্র গোস্বামী ভাগবত পাঠ করিলেন।

১৮৮২ জানুয়ারি মাঘোৎসবের সময় সিমুলিয়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসব হয়। জ্ঞান চৌধুরির বাটীতে, দালানে ও উঠানে উপাসনা ও কীর্তন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশব নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। এই স্থানে নরেন্দ্রের গান ঠাকুর প্রথমে শুনেন ও তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে বলেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১২ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে আবার দর্শন করিতে আসেন। সঙ্গে জোসেফ কুক্, আমেরিকান পাদরী মিস পিগট। ব্রাহ্মভক্তগণসহ কেশব ঠাকুরকে স্টীমারে তুলিয়া লইলেন। কুক্ সাহেব শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি অবস্থা দেখিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র এই জাহাজে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মুখে সমস্ত শুনিয়া মাস্টার দশ-পনেরো দিনের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন।

তিন মাস পরে এপ্রিল মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ কমলকুটিরে কেশবকে দেখিতে আসেন। তাহারই একটু বিবরণ এই পরিচ্ছেদে দেওয়া হইল।

[শ্রীরামকৃষ্ণের কেশবের প্রতি স্নেহ — জগন্মাতার কাছে ডাব-চিনি মানা]

আজ কমলকুটিরে সেই বৈঠকখানাঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে উপবিষ্ট। ২রা এপ্রিল, ১৮৮২, বেলা ৫টা। কেশব ভিতরের ঘরে ছিলেন, তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি জামা-চাদর পরিয়া আসিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার ভক্তবন্ধু কালীনাথ বসু পীড়িত, তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছেন। ঠাকুর আসিয়াছেন,

কেশবের আর যাওয়া হইল না। ঠাকুর বলিতেছেন, তোমার অনেক কাজ, আবার খপরের কাগজে লিখতে হয়; সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যাবার অবসর নাই; তাই আমিই তোমায় দেখতে এসেছি। তোমার অসুখ শুনে ডাব-চিনি মেনেছিলুম; মাকে বললুম, "মা! কেশবের যদি কিছু হয়, তাহলে কলিকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কইব।"

শ্রীযুক্ত প্রতাপাদি ব্রাহ্মভক্তদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক কথা কহিতেছেন। কাছে মাস্টার বসিয়া আছেন দেখিয়া তিনি কেশবকে বলিতেছেন, "ইনি কেন ওখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যান না; জিজ্ঞাসা করত গা; এত ইনি বলেন, 'মাগছেলেদের উপর মন নাই'!" মাস্টার সবে এক মাস ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করিতেছেন। শেষে যাইতে কয়দিন বিলম্ব হইয়াছে তাই ঠাকুর এইরূপ কথা বলিতেছেন। ঠাকুর বলিয়া দিয়াছিলেন, আসতে দেরি হলে আমায় পত্র দেবে।

ব্রাহ্মভক্তেরা শ্রীযুক্ত সামাধ্যায়ীকে দেখাইয়া ঠাকুরকে বলিতেছেন, ইনি পণ্ডিত, বেদাদি শাস্ত্র বেশ পড়িয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, হাঁ, এঁর চক্ষু দিয়া এঁর ভিতরটি দেখা যাচ্ছে, যেমন সার্সীর দরজার ভিতর দিয়া ঘরের ভিতরকার জিনিস দেখা যায়।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য গান গাইতেছেন। গান গাইতে গাইতে সন্ধ্যার বাতি জ্বালা হইল, গান চলিতে লাগিল। গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর হঠাৎ দণ্ডায়মান — আর মার নাম করিতে করিতে সমাধিস্থ। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া নিজেই নৃত্য করিতে করিতে গান ধরিলেন:

সুরা পান করি না আমি সুধা খাই জয় কালী বলে,

মন-মাতালে মাতাল করে মদ-মাতালে মাতাল বলে।

গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে;

জ্ঞান শুঁড়িতে চোঁয়ায় ভাঁটী পান করে মোর মন-মাতালে।

মূল মন্ত্র যন্ত্রভরা, শোধন করি বলে তারা;

প্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্বর্গ মেলে।

শ্রীযুক্ত কেশবকে ঠাকুর স্নেহপূর্ণ নয়নে দেখিতেছেন। যেন কত আপনার লোক; আর যেন ভয় করিতেছেন, কেশব পাছে অন্য কারু, অর্থাৎ সংসারে হয়েন! তাঁহার দিকে তাকাইয়া আবার গান ধরিলেন:

কথা বলতে ডরাই; না বললেও ডরাই।

মনের সন্দ হয়; পাছে তোমা ধনে হারাই হারাই।।

আমরা জানি যে মন-তোর; দিলাম তোরে সেই মন্তোর।

এমন মন তোর; যে মন্ত্রে বিপদেতে তরী তরাই।।

"আমরা জানি যে মন-তোর; দিলাম তোরে সেই মন্তোর; এখন মন তোর।" অর্থাৎ সব ত্যাগ করে ভগবানকে ডাক, — তিনিই সত্য, আর সব অনিত্য; তাঁকে না লাভ করলে কিছুই হল না! এই মহামন্ত্র।

আবার উপবেশন করিয়া ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

তাঁহাকে জল খাওয়াইবার জন্য উদ্‌যোগ হইতেছে। হলঘরের একপাশে একটি ব্রাহ্মভক্ত পিয়ানো বাজাইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ হাস্যবদন, বালকের ন্যায় পিয়ানোর

কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। একটু পরেই অন্তঃপুরে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল। জল খাইবেন। আর মেয়েরাও প্রণাম করিবেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জলসেবা হইল। এইবারে তিনি গাড়িতে উঠিলেন। ব্রাহ্মভক্তেরা সকলেই গাড়ির কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। কমলকুটির হইতে গাড়ি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিল।

১ We met not long ago Paramhansa of Dakshineswar, and were charmed by the depth, penetration and simplicity of his spirit. The never-ceasing metaphors and analogies in which he indulged, and most of them as apt as they are beautiful. The characteristics of his mind are the very opposite to those of Pandit Dayananda Saraswati, the former being so gentle, tender and comtemplative, as the latter is sturdy, masculine and polemical.
— Indian Mirror, 28th March, 1875.
Hinduism must have in it a deep source of beauty, truth and goodness to inspire such men as these.
— Sunday Mirror, 28th March, 1875.

২ "If the ancient Vedic Aryan is gratefully honoured today for having taught us the deep truth of the Nirakar or the bodiless Spirit, the same loyal homage is due to the later Puranic Hindu for having taught us religious feelings in all their breadth and depth.

"In the days of the Vedas and the Vedanta, India was all Communion (Joga). In the days of the Puranas, India was all emotion (Bhakti). The highest and best feelings of religion have been cultivated under the guardianship of specific divinities."
— 'Our Faith & Experiences' — lecture delivered in January, 1876.

৩ ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৪ই মে, ১৮৭৫, শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বেলঘরের বাগানে আসেন। Bharat Asram Libel Suit শেষ হয় ৩০শে এপ্রিল, ১৮৭৫, ১৮ই বৈশাখ, (১২৮২)। কেশব ঐ বাগানে তখনও ছিলেন।

১৮৮০, শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে ৮ মাস ছিলেন, ৩রা মার্চ, বুধবার (২১শে ফাল্গুন) হইতে ১০ই অক্টোবর, ১৮৮০, (২৫শে আশ্বিন) পর্যন্ত। ইতিমধ্যে সিওড়, শ্যামবাজার, কয়াপাঠে কীর্তনান্দ। ফিরবার সময় কোতলপুরে ভদ্রদের বাড়ি সপ্তমী পূজায় আরতি দেখেছিলেন। রাস্তায় কেশবের প্রেরিত ব্রাহ্মভক্তের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কেশব চিন্তিত, ঠাকুরকে কয় মাস দেখেন নাই। কামারপুকুরে থাকিবার সময় ৺রঘুবীরের জমি ক্রয়।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c4 ৪ কলিকাতায় শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মিলন

কলিকাতায় শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মিলন

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ৫ই অগস্ট 1882/08/05/i

04.1 বিদ্যাসাগরের বাটী

আজ শনিবার, (২১শে) শ্রাবণের কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথি, ৫ই অগস্ট, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। বেলা ৪টা বাজিবে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতার রাজপথ দিয়া ঠিকা গাড়ি করিয়া বাদুড়বাগানের দিকে আসিতেছেন। সঙ্গে ভবনাথ, হাজরা ও মাস্টার। বিদ্যাসাগরের বাড়ি যাইবেন।

ঠাকুরের জন্মভূমি, হুগলী জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রাম। এই গ্রামটি বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরসিংহ নামক গ্রামের নিকটবর্তী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতে বিদ্যাসাগরের দয়ার কথা শুনিয়া আসিতেছেন। দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে থাকিতে থাকিতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও দয়ার কথা প্রায় শুনিয়া থাকেন। মাস্টার বিদ্যাসাগরের স্কুলে অধ্যাপনা করেন শুনিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আমাকে বিদ্যাসাগরের কাছে কি লইয়া যাইবে? আমার দেখিবার বড় সাধ হয়। মাস্টার বিদ্যাসাগরকে সেই কথা বলিলেন। বিদ্যাসাগর আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে একদিন শনিবার ৪টার সময় সঙ্গে করিয়া আনিতে বলিলেন। একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরকম ‘পরমহংস’? তিনি কি গেরুয়া কাপড় পরে থাকেন? মাস্টার বলিয়াছিলেন, আজ্ঞা না, তিনি এক অদ্ভুত পুরুষ, লালপেড়ে কাপড় পরেন, জামা পরেন, বার্নিশ করা জুতা পরেন, রাসমণির কালীবাড়িতে একটি ঘরের ভিতর বাস করেন, সেই ঘরে তক্তপোশ পাতা আছে

— তাহার উপর বিছানা, মশারি আছে, সেই বিছানায় শয়ন করেন। কোন বাহ্যিক চিহ্ন নাই — তবে ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না। অহর্নিশ তাঁহারই চিন্তা করেন।

গাড়ি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি হইতে ছাড়িয়াছে। পোল পার হইয়া শ্যামবাজার হইয়া ক্রমে আমহার্স্ট স্ট্রীটে আসিয়াছে। ভক্তেরা বলিতেছেন, এইবার বাদুড়বাগানের কাছে আসিয়াছে। ঠাকুর বালকের ন্যায় আনন্দে গল্প করিতে করিতে আসিতেছেন। আমহার্স্ট স্ট্রীটে আসিয়া হঠাৎ তাঁহার ভাবান্তর হইল, যেন ঈশ্বরাবেশ হইবার উপক্রম।

গাড়ি রামমোহন রায়ের বাগানবাটীর কাছ দিয়া আসিতেছে। মাস্টার ঠাকুরের ভাবান্তর দেখেন নাই, তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, এইটি রামমোহন রায়ের বাটী। ঠাকুর বিরক্ত হইলেন; বলিলেন, এখন ও-সব কথা ভাল লাগছে না। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন।

বিদ্যাসাগরের বাটীর সম্মুখে গাড়ি দাঁড়াল। গৃহটি দ্বিতল, ইংরেজ পছন্দ। জায়গার মাঝখানে বাটী ও জায়গার চতুর্দিকে প্রাচীর। বাড়ির পশ্চিমধারে সদর দরজা ও ফটক। ফটকটি দ্বারের দক্ষিণদিকে। পশ্চিমের প্রাচির ও দ্বিতল গৃহের মধ্যবর্তী স্থানে মাঝে মাঝে পুষ্পবৃক্ষ। পশ্চিমদিকের নিচের ঘর হইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। উপরে বিদ্যাসাগর থাকেন। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই উত্তরে একটি কামরা, তাহার পূর্বদিকে হলঘর। হলের দক্ষিণ-পূর্ব ঘরে বিদ্যাসাগর শয়ন করেন। ঠিক দক্ষিণে আর একটি কামরা আছে — এই কয়টি কামরা বহুমূল্য পুস্তক পরিপূর্ণ। দেওয়ালের কাছে সারি সারি অনেকগুলি পুস্তকাধারে অতি

সুন্দররূপে বাঁধানো বইগুলি সাজানো আছে। হলঘরের পূর্বসীমান্তে টেবিল ও চেয়ার আছে। বিদ্যাসাগর যখন বসিয়া কাজ করেন, তখন সেইখানে তিনি পশ্চিমাস্য হইয়া বসেন। যাঁহারা দেখাশুনা করিতে আসেন, তাঁহারাও টেবিলের চতুর্দিকে চেয়ারে উপবিষ্ট হন। টেবিলের উপর লিখিবার সামগ্রী — কাগজ, কলম। দোয়াত, ব্লটিং, অনেকগুলি চিঠিপত্র, বাঁধানো হিসাব-পত্রের খাতা, দু-চারখানি বিদ্যাসাগরের পাঠ্যপুস্তক রহিয়াছে — দেখিতে পাওয়া যায়। ওই কাষ্ঠাসনের ঠিক দক্ষিণের কামরাতে খাট-বিছানা আছে — সেইখানেই ইনি শয়ন করেন।

টেবিলের উপর যে-পত্রগুলি চাপা রহিয়াছে — তাহাতে কি লেখা রহিয়াছে? কোন বিধবা হয়তো লিখিয়াছে, আমার অপোগণ্ড শিশু অনাথ, দেখিবার কেহ নাই, অপনাকে দেখিতে হইবে। কেহ লিখিয়াছেন, আপনি খরমাতার চলিয়া গিয়াছিলেন, তাই আমরা মাসোহারা ঠিক সময় পাই নাই, বড় কষ্ট হইয়াছে। কোন গরিব লিখিয়াছে, আপনার স্কুলে ফ্রি ভর্তি হইয়াছি, কিন্তু আমার বই কিনিবার ক্ষমতা নাই। কেহ লিখিয়াছেন, আমার পরিবারবর্গ খেতে পাচ্ছে না — আমাকে একটি চাকরি করিয়া দিতে হইবে। তাঁর স্কুলের কোন শিক্ষক লিখিয়াছেন, আমার ভগিনী বিধবা হইয়াছে, তাহার সমস্ত ভার আমাকে লইতে হইয়াছে। এ বেতনে আমার চলে না। হয়তো কেহ বিলাত হইতে লিখিয়াছেন, আমি এখানে বিপদগ্রস্ত, আপনি দীনের বন্ধু, কিছু টাকা পাঠাইয়া আসন্ন বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। কেহ বা লিখিয়াছেন, অমুক তারিখে সালিসির দিন নির্ধারিত, আপনি সেদিন আসিয়া আমাদের বিবাদ মিটাইয়া দিবেন।

ঠাকুর গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন। মাস্টার পথ দেখাইয়া বাটির মধ্যে লইয়া যাইতেছেন। উঠানে ফুলগাছ, তাহার মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে ঠাকুর বালকের ন্যায় বোতামে হাত দিয়া মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "জামার বোতাম খোলা রয়েছে, — এতে কিছু দোষ হবে না?" গায়ে একটি লংক্লথের জামা, পরনে লালপেরে কাপড়, তাহার আঁচলটি কাঁধে ফেলা। পায়ে বার্নিশ করা চটি জুতা। মাস্টার বলিলেন, "আপনি ওর জন্য ভাববেন না, আপনার কিছুতে দোষ হবে না; আপনার বোতাম দেবার দরকার নাই।" বালককে বুঝাইলে যেমন নিশ্চিন্ত হয়, ঠাকুরও তেমনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ৫ই অগস্ট 1882/08/05/ii

04.2 বিদ্যাসাগর

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া একেবারে প্রথম কামরাটিতে (উঠিবার পর ঠিক উত্তরের কামরাটিতে) ঠাকুর ভক্তগণসঙ্গে প্রবেশ করিতেছেন। বিদ্যাসাগর কামরার উত্তরপার্শ্বে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া আছেন; সম্মুখে একটি চারকোণা লম্বা পালিশ করা টেবিল। টেবিলের পূর্বধারে একখানি পেছন দিকে হেলান-দেওয়া বেঞ্চ। টেবিলের দক্ষিণপার্শ্বে ও পশ্চিমপার্শ্বে কয়েকখানি চেয়ার। বিদ্যাসাগর দু-একটি বন্ধুর সহিত কথা কহিতেছিলেন।

ঠাকুর প্রবেশ করিলে পর বিদ্যাসাগর দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ঠাকুর পশ্চিমাস্য, টেবিলের পূর্বপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। বামহস্ত টেবিলের উপর। পশ্চাতে বেঞ্চখানি। বিদ্যাসাগরকে পূর্বপরিচিতের ন্যায় একদৃষ্টে দেখিতেছেন ও ভাবে হাসিতেছেন।

বিদ্যাসাগরের বয়স আন্দাজ ৬২/৬৩। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা ১৬/১৭ বৎসর বড় হইবেন। পরনে থান কাপড়, পায়ে চটি জুতা, গায়ে একটি হাত-কাটা ফ্লানেলের জামা। মাথার চতুষ্পার্শ্ব উড়িষ্যাবাসীদের মতো কামানো। কথা কহিবার সময় দাঁতগুলি উজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া যায়, — দাঁতগুলি সমস্ত বাঁধানো। মাথাটি খুব বড়। উন্নত ললাট ও একটু খর্বাকৃতি। ব্রাহ্মণ — তাই গলায় উপবীত।

বিদ্যাসাগরের অনেক গুণ। প্রথম — বিদ্যানুরাগ। একদিন মাস্টারের কাছে এই বলতে বলতে সত্য সত্য কেঁদেছিলেন, "আমার তো খুব ইচ্ছা ছিল যে, পড়াশুনা করি, কিন্তু কই তা হল! সংসারে পড়ে কিছুই সময় পেলাম না।" দ্বিতীয় — দয়া সর্বজীবে, বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর। বাছুরেরা মায়ের দুধ পায় না দেখিয়া নিজে কয়েক বৎসর ধরিয়া দুধ খাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন, শেষে শরীর অতিশয় অসুস্থ হওয়াতে অনেকদিন পরে আবার ধরিয়াছিলেন। গাড়িতে চড়িতেন না — ঘোড়া নিজের কষ্ট বলিতে পারে না। একদিন দেখলেন, একটি মুটে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া আছে, কাছে ঝাঁকাটা পড়িয়া অছে। দেখিয়া নিজে কোলে করিয়া তাহাকে বাড়িতে আনিলেন ও সেবা করিতে লাগিলেন। তৃতীয় — স্বাধীনতাপ্রিয়তা। কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে একমত না

হওয়াতে, সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষের (প্রিন্সিপালের) কাজ ছাড়িয়া দিলেন। চতুর্থ — লোকাপেক্ষা করিতেন না। একটি শিক্ষককে ভালবাসিতেন; তাঁহার কন্যার বিবাহের সময়ে নিজে আইবুড়ো ভাতের কাপড় বগলে করে এসে উপস্থিত। পঞ্চম — মাতৃভক্তি ও মনের বল। মা বলিয়াছেন, ঈশ্বর তুমি যদি এই বিবাহে (ভ্রাতার বিবাহে) না আস তাহলে আমার ভারী মন খারাপ হবে, তাই কলিকাতা হইতে হাঁটিয়া গেলেন। পথে দামোদর নদী, নৌকা নাই, সাঁতার দিয়া পার হইয়া গেলেন। সেই ভিজা কাপড়ে বিবাহ রাত্রেই বীরসিংহায় মার কাছে গিয়া উপস্থিত! বলিলেন, মা, এসেছি!

[শ্রীরামকৃষ্ণকে বিদ্যাসাগরের পূজা ও সম্ভাষণ]

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন ও কিয়ৎক্ষণ ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। ভাব সংবরণ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন, জল খাব। দেখিতে দেখিতে বাড়ির ছেলেরা ও আত্মীয় বন্ধুরা আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বেঞ্চের উপর বসিতেছেন। একটি ১৭/১৮ বছরের ছেলে সেই বেঞ্চে বসিয়া আছে — বিদ্যাসাগরের কাছে পড়াশুনার সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট, ঋষির অর্ন্তদৃষ্টি; ছেলের অন্তরের ভাব সব বুঝিয়াছেন। একটু সরিয়া বসিলেন ও ভাবে বলিতেছেন, "মা! এ-ছেলের বড় সংসারাসক্তি! তোমার অবিদ্যার সংসার! এ অবিদ্যার ছেলে!"

যে-ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যার জন্য ব্যাকুল নয়, শুধু অর্থকরী বিদ্যা উপার্জন তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র, এই কথা কি ঠাকুর বলিতেছেন?

বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হইয়া একজনকে জল আনিতে বলিলেন ও মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিছু খাবার আনিলে ইনি খাবেন কি? তিনি বলিলেন, আজ্ঞা, আনুন না। বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হইয়া ভিতরে গিয়া কতকগুলি মিঠাই আনিলেন ও বলিলেন, এগুলি বর্ধমান থেকে এসেছে। ঠাকুরকে কিছু খাইতে দেওয়া হইল, হাজরা ও ভবনাথও কিছু পাইলেন। মাস্টারকে দিতে আসিলে পর বিদ্যাসাগর বলিলেন, "ও ঘরের ছেলে, ওর জন্য আটকাচ্ছে না।" ঠাকুর একটি ভক্তছেলের কথা বিদ্যাসাগরকে বলিতেছেন। সে ছোকরাটি এখানে ঠাকুরের সম্মুখে বসে ছিল। ঠাকুর বলিলেন, "এ-ছেলেটি বেশ সৎ, আর অন্তঃসার যেমন ফল্গুনদী, উপরে বালি, একটু খুঁড়লেই ভিতরে জল বইছে দেখা যায়!"

মিষ্টিমুখের পর ঠাকুর সহাস্যে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। দেখিতে দেখিতে একঘর লোক হইয়াছে, কেহ উপবিষ্ট, কেহ দাঁড়াইয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হদ্দ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি। (সকলের হাস্য)

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে) — তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান! (হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ — না গো! নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর! (সকলের হাস্য) তুমি ক্ষীরসমুদ্র! (সকলের হাস্য)

বিদ্যাসাগর — তা বলতে পারেন বটে।

বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন —

[বিদ্যাসাগরের সাত্ত্বিক কর্ম — “তুমিও সিদ্ধপুরুষ”]

“তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ার জন্য যে কর্ম করা যায়, সে রাজসিক কর্ম বটে — কিন্তু এ রজোগুণ — সত্ত্বের রজোগুণ, এতে দোষ নাই। শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্য দয়া রেখেছিলেন — ঈশ্বর-বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য। তুমি বিদ্যাদান অন্নদান করছ, এও ভাল। নিষ্কাম করতে পারলেই এতে ভগবান-লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্য, পুণ্যের জন্য, তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর সিদ্ধ তো তুমি আছই।”

বিদ্যাসাগর — মহাশয়, কেমন করে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্য) — আলু পটল সিদ্ধ হলে তো নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া! (হাস্য)

বিদ্যাসাগর (সহাস্য) — কলাই বাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয়! (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি তা নও গো; শুধু পণ্ডিতগুলো দরকচা পড়া! না এদিক, না ওদিক। শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, তার নজর ভাগাড়ে। যারা শুধু পণ্ডিত শুনতেই পণ্ডিত, কিন্তু তাদের কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি — শকুনির মতো পচা মড়া খুঁজছে। আসক্তি অবিদ্যার সংসারে। দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য।

বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া শুনিতেছেন। সকলেই একদৃষ্টে এই আনন্দময় পুরুষকে দর্শন ও তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ৫ই অগস্ট 1882/08/05/iii

04.3 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ —– জ্ঞানযোগ বা বেদান্ত বিচার

বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত। যখন সংস্কৃত কলেজে পড়িতেন, তখন নিজের শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। প্রতি পরীক্ষায় প্রথম হইতেন ও স্বর্ণপদকাদি (Medal) বা ছাত্রবৃত্তি পাইতেন। ক্রমে সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যাপক হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ব্যাকারণ ও সংস্কৃত কাব্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যবসায় গুণে নিজে চেষ্টা করিয়া ইংরেজী শিখিয়াছিলেন।

ধর্ম-বিষয়ে বিদ্যাসাগর কাহাকেও শিক্ষা দিতেন না। তিনি দর্শনাদি গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন। মাস্টার একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “আপনার হিন্দুদর্শন কিরূপ লাগে?” তিনি বলিয়াছিলেন, “আমার তো বোধ হয়, ওরা যা বুঝতে গেছে, বুঝাতে পারে নাই।” হিন্দুদের ন্যায় শ্রাদ্ধাদি ধর্মকর্ম সমস্ত করিতেন, গলায় উপবীত ধারণ করিতেন, বাঙলায় যে-সকল পত্র লিখিতেন, তাহাতে ‘শ্রীশ্রীহরিশরনম্’ ভগবানের এই বন্দনা আগে করিতেন।

মাস্টার আর একদিন তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলেন, তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে কিরূপ ভাবেন। বিদ্যাসাগর বলিয়াছিলেন, “তাঁকে তো জানবার জো নাই! এখন কর্তব্য

কি? আমার মতে কর্তব্য, আমাদের নিজের এরূপ হওয়া উচিত যে, সকলে যদি সেরূপ হয়, পৃথিবী স্বর্গ হয়ে পড়বে। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়।”

বিদ্যা ও অবিদ্যার কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কহিতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত। ষড় দর্শন পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন, বুঝি ঈশ্বরের বিষয় কিছুই জানা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ব্রহ্ম — বিদ্যা ও অবিদ্যার পার। তিনি মায়াতীত।

[Problem of Evil — ব্রহ্ম নির্লিপ্ত — জীবেরই সম্বন্ধে দুঃখাদি]

“এই জগতে বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া দুই-ই আছে; জ্ঞান-ভক্তি আছে আবার কামিনী-কাঞ্চনও আছে, সৎও আছে, অসৎও আছে। ভালও আছে আবার মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভাল-মন্দ জীবের পক্ষে, সৎ-অসৎ জীবের পক্ষে, তাঁর ওতে কিছু হয় না।

“যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউ বা ভাগবত পড়ছে, আর কেউ বা জাল করছে। প্রদীপ নির্লিপ্ত।

“সূর্য শিষ্টের উপর আলো দিচ্ছে, আবার দুষ্টের উপরও দিচ্ছে।

“যদি বল দুঃখ, পাপ, অশান্তি — এ-সকল তবে কি? তার উত্তর এই যে, ও-সব জীবের পক্ষে। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে মরে যায়। সাপের কিন্তু কিছু হয় না।

[ব্রহ্ম অনির্বচনীয় অব্যপদেশ্যম্ — The Unknown and Unknowable]

“ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা জায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড় দর্শন — সব এঁটো হয়ে গেছে! মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে — তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্যন্ত কেহ মুখে বলতে পারে নাই।”

বিদ্যাসাগর (বন্ধুদের প্রতি) — বা! এটি তো বেশ কথা! আজ একটি নূতন কথা শিখলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এক বাপের দুটি ছেলে। ব্রহ্মবিদ্যা শিখবার জন্য ছেলে দুটিকে, বাপ আচার্যের হাতে দিলেন। কয়েক বৎসর পরে তারা গুরুগৃহ থেকে ফিরে এল, এসে বাপকে প্রণাম করলে। বাপের ইচ্ছা দেখেন, এদের ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ হয়েছে। বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, “বাপ! তুমি তো সব পড়েছ, ব্রহ্ম কিরূপ বল দেখি?” বড় ছেলেটি বেদ থেকে নানা শ্লোক বলে বলে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাতে লাগল! বাপ চুপ করে রইলেন। যখন ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে হেঁটমুখে চুপ করে রইল। মুখে কোন কথা নাই। বাপ তখন প্রসন্ন হয়ে ছোট ছেলেকে বললেন, “বাপু! তুমি একটু বুঝেছ। ব্রহ্ম যে কি। মুখে বলা যায় না।”

“মানুষ মনে করে, আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিছল। এক দানা খেয়ে পেট ভরে গেল, আর এক দানা মুখে করে বাসায় যেতে লাগল, যাবার সময় ভাবছে — এবার এসে সব পাহাড়টি লয়ে যাব। ক্ষুদ্র জীবেরা এই সব মনে করে। জানে না ব্রহ্ম বাক্যমনের অতীত।

"যে যতই বড় হউক না কেন, তাঁকে কি জানবে? শুকদেবাদি না হয় ডেও-পিঁপড়ে — চিনির আট-দশটা দানা না হয় মুখে করুক।"

[ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ — নির্বিকল্পসমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞান]

"তবে বেদে, পুরাণে যা বলছে — সে কিরকম বলা জান? একজন সাগর দেখে এলে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, কেমন দেখলে, সে লোক মুখ হাঁ করে বলে, — 'ও! কি দেখলুম! কি হিল্লোল কল্লোল!' ব্রহ্মের কথাও সেইরকম। বেদে আছে — তিনি আনন্দস্বরূপ — সচ্চিদানন্দ। শুকদেবাদি এই ব্রহ্মসাগর তটে দাঁড়িয়া দর্শন স্পর্শন করেছিলেন। এক মতে আছে — তাঁরা এ-সাগরে নামেন নাই। এ-সাগরে নামলে আর ফিরবার জো নাই।

"সমাধিস্থ হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়; ব্রহ্মদর্শন হয় — সে অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, মানুষ চুপ হয়ে যায়। ব্রহ্ম কি বস্তু মুখে বলবার শক্তি থাকে না।

"লুনের ছবি (লবণ পুত্তলিকা) সমুদ্র মাপতে গিছল। (সকলের হাস্য) কত গভীর জল তাই খপর দেবে। খপর দেওয়া আর হল না। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া। কে আর খপর দিবেক?"

একজন প্রশ্ন করিলেন, "সমাধিস্থ ব্যক্তি, যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তিনি কি আর কথা কন না?"

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগরাদির প্রতি) — শঙ্করাচার্য লোকশিক্ষার জন্য বিদ্যার 'আমি' রেখেছিলেন। ব্রহ্মদর্শন হলে মানুষ চুপ করে যায়। যতক্ষণ দর্শন না হয়,

ততক্ষণই বিচার। ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘির কোন শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন পাকা ঘিয়ে আবার কাঁচা লুচি পড়ে, তখন আর একবার ছ্যাঁক কলকল করে। যখন কাঁচা লুচিকে পাকা করে, তখন আবার চুপ হয়ে যায়। তেমনি সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দিবার জন্য আবার নেমে আসে, আবার কথা কয়।

“যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভনভন করে। ফুলে বসে মধু পান করতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধুপান করবার পর মাতাল হয়ে আবার কখন কখন গুনগুন করে।

“পুকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় ভকভক শব্দ হয়। পূর্ণ হয়ে গেলে আর শব্দ হয় না। (সকলের হাস্য) তবে আর এক কলসীতে যদি ঢালাঢালি হয় তাহলে আবার শব্দ হয়।” (হাস্য)

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ৫ই অগস্ট 1882/08/05/iv

04.4 জ্ঞান ও বিজ্ঞান, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ — এই তিনের সমন্বয় — Reconciliation of Non-Dualism, Qualified Non-Dualism and Dualism.

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল। বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে এই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ঋষিরা কত খাটত। সকাল বেলা আশ্রম থেকে চলে যেত। একলা সমস্ত দিন ধ্যান চিন্তা করত, রাত্রে আশ্রমে ফিরে এসে কিছু ফলমূল খেত। দেখা, শুনা, ছোঁয়া — এ-সবের বিষয় থেকে মনকে আলাদা রাখত, তবে ব্রহ্মকে বোধে বোধ করত।

"কলিতে অন্নগত প্রাণ, দেহবুদ্ধি যায় না। এ-অবস্থায় 'সোঽহং' বলা ভাল নয়। সবই করা যাচ্ছে, আবার 'আমিই ব্রহ্ম' বলা ঠিক নয়। যারা বিষয় ত্যাগ করতে পারে না, যাদের 'আমি' কোন মতে যাচ্ছে না, তাদের 'আমি দাস' 'আমি ভক্ত' এ-অভিমান ভাল। ভক্তিপথে থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়।

"জ্ঞানী 'নেতি' 'নেতি' করে বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ করে, তবে ব্রহ্মকে জানতে পারে। যেমন সিঁড়ির ধাপ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ছাদে পৌঁছানো যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী যিনি বিশেষরূপে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন তিনি আরও কিছু দর্শন করেন। তিনি দেখেন, ছাদ যে জিনিসে তৈয়ারি — সেই ইঁট, চুন, সুরকিতেই, সিঁড়িও তৈয়ারি। 'নেতি' 'নেতি' করে যাঁকে ব্রহ্ম বলে বোধ হয়েছে তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। বিজ্ঞানী দেখে, যিনি নির্গুণ, তিনিই সগুণ।

"ছাদে অনেকক্ষণ লোক থাকতে পারে না, আবার নেমে আসে। যাঁরা সমাধিস্থ হয়ে ব্রহ্মদর্শন করেছেন, তাঁরাও নেমে এসে দেখেন যে, জীবজগৎ তিনিই হয়েছেন। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। নি-তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না। 'আমি' যায় না; তখন দেখে, তিনিই আমি, তিনিই জীবজগৎ সব। এরই নাম বিজ্ঞান।

“জ্ঞানীর পথও পথ। জ্ঞান-ভক্তির পথও পথ। আবার ভক্তির পথও পথ। জ্ঞানযোগও সত্য, ভক্তিপথও সত্য — সব পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া যায়। তিনি যতক্ষণ ‘আমি’ রেখে দেন, ততক্ষণ ভক্তিপথই সোজা।

“বিজ্ঞানী দেখে ব্রহ্ম অটল, নিষ্ক্রিয়, সুমেরুবৎ। এই জগৎসংসার তাঁর সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণে রয়েছে। তিনি নির্লিপ্ত।

“বিজ্ঞানী দেখে যিনিই ব্রহ্ম তিনিই ভগবান, যিনিই গুণাতীত, তিনিই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান। এই জীবজগৎ, মন-বুদ্ধি, ভক্তি-বৈরাগ্য-জ্ঞান — এ-সব তাঁর ঐশ্বর্য। (সহাস্য) যে বাবুর ঘর-দ্বার নাই, হয়তো বিকিয়ে গেল সে বাবু কিসের বাবু। (সকলের হাস্য) ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। সে ব্যক্তির যদি ঐশ্বর্য না থাকত তাহলে কে মানত!” (সকলের হাস্য)

[বিভুরূপে এক — কিন্তু শক্তিবিশেষ]

“দেখ না, এই জগৎ কি চমৎকার। কতরকম জিনিস — চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র। কতরকম জীব। বড়, ছোট, ভাল, মন্দ, কারু বেশি শক্তি, কারু কম শক্তি।”

বিদ্যাসাগর — তিনি কি কারুকে বেশি শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তিনি বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন। পিঁপড়েতে পর্যন্ত। কিন্তু শক্তিবিশেষ। তা না হলে একজন লোকে দশজনকে হারিয়ে দেয়, আবার কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়, আর তা না হলে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো? (হাস্য) তোমার দয়া, তোমার বিদ্যা আছে —

অন্যের চেয়ে, তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে। তুমি এ-কথা মানো কি না? [বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।]

[শুধু পাণ্ডিত্য, পুঁথিগত বিদ্যা অসার — ভক্তিই সার]

শ্রীরামকৃষ্ণ — শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু নাই। তাঁকে পাবার উপায়, তাঁকে জানবার জন্যই বই পড়া। একটি সাধুর পুঁথিতে কি আছে, একজন জিজ্ঞাসা করলে, সাধু খুলে দেখালে। পাতায় পাতায় "ওঁ রামঃ" লেখা রয়েছে, আর কিছুই লেখা নাই!

"গীতার অর্থ কি? দশবার বললে যা হয়। 'গীতা' 'গীতা', দশবার বলতে গেলে, 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' হয়ে যায়। গীতায় এই শিক্ষা — হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা কর। সাধুই হোক, সংসারীই হোক, মন থেকে সব আসক্তি ত্যাগ করতে হয়।

"চৈতন্যদেব যখন দক্ষিণে তীর্থভ্রমণ করছিলেন — দেখলেন, একজন গীতা পড়ছে। আর-একজন একটু দূরে বসে শুনছে, আর কাঁদছে — কেঁদে চোখ ভেসে যাচ্ছে। চৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ-সব বুঝতে পারছ? সে বললে, ঠাকুর! আমি শ্লোক এ-সব কিছু বুঝতে পারছিনা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তবে কেন কাঁদছো? ভক্তটি বললে, আমি দেখছি অর্জুনের রথ, আর তার সামনে ঠাকুর আর অর্জুন কথা কচ্চেন। তাই দেখে আমি কাঁদছি।"

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ৫ই অগস্ট 1882/08/05/v

04.5 ভক্তিযোগের রহস্য — The Secret of Dualism

শ্রীরামকৃষ্ণ — বিজ্ঞানী কেন ভক্তি লয়ে থাকে? এর উত্তর এই যে, ‘আমি’ যায় না। সমাধি অবস্থায় যায় বটে, কিন্তু আবার এসে পড়ে। আর সাধারণ জীবের ‘অহং’ যায় না। অশ্বত্থগাছ কেটে দাও, আবার তার পরদিন ফেঁক্‌ড়ি বেরিয়েছে। (সকলের হাস্য)

“জ্ঞানলাভের পরও আবার কোথা থেকে ‘আমি’ এসে পড়ে! স্বপনে বাঘ দেখেছিলে, তারপর জাগলে, তবুও তোমার বুক দুড়্‌দুড়্‌ করছে। জীবের আমি লয়েই তো যত যন্ত্রণা। গরু ‘হাম্বা’ (আমি) ‘হাম্বা’ করে, তাই তো অত যন্ত্রণা। লাঙলে জোড়ে, রোদবৃষ্টি গায়ের উপর দিয়ে যায়, আবার কসাইয়ে কাটে, চামড়ায় জুতো হয়, ঢোল হয় — তখন খুব পেটে। (হাস্য)

“তবুও নিস্তার নাই। শেষে নাড়ীভুঁড়ি থেকে তাঁত তৈয়ার হয়। সেই তাঁতে ধুনুরীর যন্ত্র হয়। তখন আর ‘আমি’ বলে না, তখন বলে ‘তুঁহু’ ‘তুঁহু’ (অর্থাৎ ‘তুমি’, ‘তুমি’)। যখন ‘তুমি’, ‘তুমি’ বলে তখন নিস্তার। হে ঈশ্বর, আমি দাস, তুমি প্রভু, আমি ছেলে, তুমি মা।

“রাম জিজ্ঞাসা করলেন, হনুমান, তুমি আমায় কিভাবে দেখ? হনুমান বললে, রাম! যখন ‘আমি’ বলে আমার বোধ থাকে, তখন দেখি, তুমি পুর্ণ, আমি

অংশ; তুমি প্রভু, আমি দাস। আর রাম! যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি, তুমিই আমি, আমিই তুমি।

“সেব্য-সেবক ভাবই ভাল। ‘আমি’ তো যাবার নয়। তবে থাক শালা ‘দাস আমি’ হয়ে।”

[বিদ্যাসাগরকে শিক্ষা — “আমি ও আমার” অজ্ঞান]

“আমি ও আমার এই দুটি অজ্ঞান। ‘আমার বাড়ি’, ‘আমার টাকা’, ‘আমার বিদ্যা’, ‘আমার এই সব ঐশ্বর্য’ — এই যে-ভাব এটি অজ্ঞান থেকে হয়। ‘হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর এ-সব তোমার জিনিস — বাড়ি, পরিবার, ছেলেপুলে, লোকজন, বন্ধু-বান্ধব — এ-সব তোমার জিনিস’ — এ-ভাব থেকে জ্ঞান হয়।

মৃত্যুকে সর্বদা মনে রাখা উচিত। মরবার পর কিছুই থাকবে না। এখানে কতকগুলি কর্ম করতে আসা। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ি — কলকাতায় কর্ম করতে আসা। বড় মানুষের বাগানের সরকার, বাগান যদি কেউ দেখতে আসে, তা বলে ‘এ-বাগানটি আমাদের’, ‘এ-পুকুর আমাদের পুকুর’। কিন্তু কোন দোষ দেখে বাবু যদি ছাড়িয়ে দেয়, আর আমের সিন্দুকটা লয়ে যাবার যোগ্যতা থাকে না; দারোয়ানকে দিয়ে সিন্দুকটা পাঠিয়ে দেয়। (হাস্য)

“ভগবান দুই কথায় হাসেন। কবিরাজ যখন রোগীর মাকে বলে, ‘মা! ভয় কি? আমি তোমার ছেলেকে ভাল করে দিব’ — তখন একবার হাসেন; এই বলে হাসেন, আমি মারছি, আর এ কিনা বলে আমি বাঁচাব! কবিরাজ ভাবছে, আমি কর্তা, ঈশ্বর যে কর্তা — এ-কথা ভুলে গেছে। তারপর যখন দুই ভাই দড়ি

ফেলে জায়গা ভাগ করে, আর বলে 'এদিকটা আমার, ওদিকটা তোমার', তখন ঈশ্বর আর-একবার হাসেন, এই মনে করে হাসেন; আমার জগদ্ব্রহ্মাণ্ড, কিন্তু ওরা বলছে, 'এ-জায়গা আমার আর তোমার'।"

[উপায় — বিশ্বাস ও ভক্তি]

"তাঁকে কি বিচার করে জানা যায়? তাঁর দাস হয়ে, তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁকে ডাক।

(বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে) — "আচ্ছা, তোমার কি ভাব?"

বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। বলিতেছেন, "আচ্ছা সে কথা আপনাকে একলা-একলা একদিন বলব।" (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্য) — তাঁকে পাণ্ডিত্য দ্বারা বিচার করে জানা যায় না।

এই বলিয়া ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া গান ধরিলেন:

[ঈশ্বর অগম্য ও অপার]

কে জানে কালী কেমন?
ষড় দর্শনে না পায় দরশন ।।
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন ।
কালী পদ্মবনে হংস-সনে, হংসীরূপে করে রমণ ।।
আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন ।

তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ।।
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জানো কেমন ।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন ।।
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু-তরণ ।
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না ধরবে শশী হয়ে বামন ।।

"দেখলে, কালীর 'উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জানো কেমন'! আর বলছে, 'ষড় দর্শনে না পায় দরশন' — পাণ্ডিত্যে তাঁকে পাওয়া যায় না।"

[বিশ্বাসের জোর — ঈশ্বরে বিশ্বাস ও মহাপাতক]

"বিশ্বাস আর ভক্তি চাই — বিশ্বাসের কত জোর শুনঃ একজন লঙ্কা থেকে সমুদ্র পার হবে, বিভীষণ বললে, এই জিনিসটি কাপড়ের খুঁটে বেঁধে লও। তাহলে নির্বিঘ্নে চলে যাবে; জলের উপর দিয়ে চলে যেতে পারবে। কিন্তু খুলে দেখো না; খুলে দেখতে গেলেই ডুবে যাবে। সে লোকটা সমুদ্রের উপর দিয়ে বেশ চলে যাচ্ছিল। বিশ্বাসের এমন জোর। খানিক পথ গিয়ে ভাবছে, বিভীষণ এমন কি জিজিস বেঁধে দিলেন যে, জলের উপর দিয়ে চলে যেতে পাচ্ছি? এই বলে কাপড়ের খুঁটটি খুলে দেখে, যে শুধু 'রাম' নাম লেখা একটি পাতা রয়েছে। তখন সে ভাবলে, এঃ, এই জিনিস! ভাবাও যা, অমনি ডুবে যাওয়া।

"কথায় বলে হনুমানের রামনামে এত বিশ্বাস যে, বিশ্বাসের গুণে 'সাগর লঙ্ঘন' করলে! কিন্তু স্বয়ং রামের সাগর বাঁধতে হল!

“যদি তাঁতে বিশ্বাস থাকে, তাহলে পাপই করুক, আর মহাপাতকই করুক, কিছুতেই ভয় নাই।”

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তের ভাব আরোপ করিয়া ভাবে মাতোয়ারা হইয়া বিশ্বাসের মাহাত্ম্য গাহিতেছেন:

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ-দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ৫ই অগস্ট 1882/08/05/vi

04.6 ঈশ্বরকে ভালবাসা জীবনের উদ্দেশ্য —— The End of life

শ্রীরামকৃষ্ণ —— বিশ্বাস আর ভক্তি। তাঁকে ভক্তিতে সহজে পাওয়া যায়। তিনি ভাবের বিষয়।

এ-কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার গান ধরিলেন:

মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে ।

সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধরতে পারে ।।

অগ্রে শশী বশীভূত কর তব শক্তি-সারে ।

ওরে কোঠার ভিতর চোর-কুঠরি, ভোর হলে সে লুকাবে রে ।।

ষড় দর্শনে না পায় দরশন, আগম-নিগম তন্ত্রসারে ।

সে যে ভক্তিরসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ।।

সে ভাব লাগি পরম যোগী, যোগ করে যুগ-যুগান্তরে ।

হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে ।।

প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে ।

সেটা চাতরে কি ভাঙব হাঁড়ি, বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে ।।

[ঠাকুর সমাধি মন্দিরে]

গান গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন! হাত অঞ্জলিবদ্ধ! দেহ উন্নত ও স্থির! নেত্রদ্বয় স্পন্দহীন! সেই বেঞ্চের উপর পশ্চিমাস্য হইয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। সকলে উদগ্রীব হইয়া এই অদ্ভুত অবস্থা দেখিতেছেন। পণ্ডিত বিদ্যাসাগরও নিস্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার সহাস্যে কথা কহিতেছেন। — “ভাব ভক্তি, এর মানে — তাঁকে ভালবাসা। যিনিই ব্রহ্ম তাঁকেই ‘মা’ বলে ডাকছে।

“প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে ।

সেটা চাতরে কি ভাঙব হাঁড়ি, বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে ।।

“রামপ্রসাদ মনকে বলছে — ‘ঠারে ঠোরে’ বুঝতে। এই বুঝতে বলছে যে, বেদে যাঁকে ব্রহ্ম বলেছে — তাঁকেই আমি মা বলে ডাকছি। যিনিই নির্গুণ, তিনিই সগুণ; যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় বলে বোধ হয়, তখন তাঁকে ‘ব্রহ্ম’ বলি। যখন ভাবি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন, তখন তাঁকে আদ্যাশক্তি বলি, কালী বলি।

“ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর দাহিকাশক্তি, অগ্নি বললেই দাহিকাশক্তি বুঝা যায়; দাহিকাশক্তি বললেই অগ্নি বুঝা যায়; একটিকে মানলেই আর একটিকে মানা হয়ে যায়।

তাঁকেই ‘মা’ বলে ডাকা হচ্ছে। ‘মা’ বড় ভালবাসার জিনিস কিনা। ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায়। ভাব, ভক্তি, ভালবাসা আর বিশ্বাস। আর একটা গান শোনঃ

[উপায় — আগে বিশ্বাস — তারপর ভক্তি]

“ভাবিলে ভাবের উদয় হয় ।
(ও সে) যেমন ভাব, তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয় ।।
কালীপদ-সুধাহ্রদে, চিত্ত যদি রয় (যদি চিত্ত ডুবে রয়) ।
তবে পূজা, হোম, যাগযজ্ঞ, কিছুই কিছু নয় ।।

“চিত্ত তদগত হওয়া, তাঁকে খুব ভালবাসা। ‘সুধাহ্রদ’ কিনা অমৃতের হ্রদ। ওতে ডুবলে মানুষ মরে না। অমর হয়। কেউ কেউ মনে করে, বেশি ঈশ্বর ঈশ্বর করলে

মাথা খারাপ হয়ে যায়। তা নয়। এ-যে সুধার হ্রদ! অমৃতের সাগর। বেদে তাঁকে ‘অমৃত’ বলেছে, এতে ডুবে গেলে মরে না — অমর হয়।”

[নিষ্কামকর্ম বা কর্মযোগ ও জগতের উপকার — Sri Ramakrishna and the European ideal of work]

“পূজা, হোম, যাগ” কিছুই কিছু নয়। যদি তাঁর উপর ভালবাসা আসে, তাহলে আর এ-সব কর্মের বেশি দরকার নাই। যতক্ষণ হাওয়া পাওয়া না যায়, ততক্ষণই পাখার দরকার; যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি আসে, পাখা রেখে দেওয়া যায়। আর পাখার কি দরকার?

“তুমি যে-সব কর্ম করছ, এ-সব সৎকর্ম। যদি ‘আমি কর্তা’ এই অহংকার ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে করতে পার, তাহলে খুব ভাল। এই নিষ্কামকর্ম করতে করতে ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালবাসা আসে। এইরূপ নিষ্কামকর্ম করতে করতে ঈশ্বরলাভ হয়।

“কিন্তু যত তাঁর উপর ভক্তি ভালবাসা আসবে, ততই তোমার কর্ম কমে যাবে। গৃহস্থের বউ, পেটে যখন ছেলে হয় — শাশুড়ী তার কর্ম কমিয়ে দেয়। যতই মাস বাড়ে, শাশুড়ী কর্ম কমায়। দশমাস হলে আদপে কর্ম করতে দেয় না, পাছে ছেলের কোন হানি হয়, প্রসবের কোন ব্যাঘাত হয়। (হাস্য) তুমি যে-সব কর্ম করছ এতে তোমার নিজের উপকার। নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে। জগতের উপকার মানুষ করে না, তিনিই করছেন, যিনি চন্দ্র-সূর্য করেছেন, যিনি মা-বাপের স্নেহ, যিনি মহতের ভিতর দয়া, যিনি সাধু-ভক্তের

ভিতর ভক্তি দিয়েছেন। যে-লোক কামনাশূন্য হয়ে কর্ম করবে সে নিজেরই মঙ্গল করবে।”

[নিষ্কামকর্মের উদ্দেশ্য — ঈশ্বরদর্শন]

“অন্তরে সোনা আছে, এখনও খবর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে। গৃহস্থের বউ-এর ছেলে হলে ছেলেটিকেই নিয়ে থাকে; ওইটিকে নিয়েই নাড়াচাড়া; আর সংসারের কাজ শাশুড়ী করতে দেয় না। (সকলের হাস্য)

“আরও এগিয়ে যাও। কাঠুরে কাঠ কাটতে গিছিল; — ব্রহ্মচারী বললে, এগিয়ে যাও। এগিয়ে গিয়ে দেখে চন্দনগাছ। আবার কিছুদিন পরে ভাবলে, তিনি এগিয়ে যেতে বলেছিলেন, চন্দনগাছ পর্যন্ত তো যেতে বলেন নাই। এগিয়ে গিয়ে দেখে রূপার খনি। আবার কিছুদিন পরে এগিয়ে গিয়ে দেখে, সোনার খনি। তারপা কেবল হীরা, মাণিক। এই সব লয়ে একেবারে আণ্ডিল হয়ে গেল।

“নিষ্কামকর্ম করতে পারলে ঈশ্বরে ভালবাসা হয়; ক্রমে তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি!” (সকলে নিঃশব্দ)

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ৫ই অগস্ট 1882/08/05/vii

04.7 ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধু

সকলে অবাক ও নিস্তব্ধ হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছেন। যেমন সাক্ষাৎ বাগ্বাদিনী শ্রীরামকৃষ্ণের জিহ্বাতে অবতীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগরকে উপলক্ষ করিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য কথা বলিতেছেন। রাত্রি হইতেছে; নয়টা বাজে। ঠাকুর এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে) — এ-যা বললুম, বলা বাহুল্য আপনি সব জানেন —– তবে খপর নাই। (সকলের হাস্য) বরুণের ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে! বরুণ রাজার খপর নাই!

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে) — তা আপনি বলতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — হাঁ গো, অনেক বাবু জানে না চাকর-বাকরের নাম (সকলের হাস্য) — বা বাড়ির কোথায় কি দামী জিনিস আছে।

কথাবার্তা শুনিয়া সকলে আনন্দিত। সকলে একটু চুপ করিয়াছেন। ঠাকুর আবার বিদ্যাসাগরকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — একবার বাগান দেখতে যাবেন, রাসমণির বাগান। ভারী চমৎকার জায়গা।

বিদ্যাসাগর — যাব বই কি। আপনি এলেন আর আমি যাব না!

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমার কাছে? ছি! ছি!

বিদ্যাসাগর — সে কি! এমন কথা বললেন কেন? আমায় বুঝিয়ে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — আমরা জেলেডিঙি। (সকলের হাস্য) খাল বিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ, কি জানি যেতে গিয়ে চড়ায় পাছে লেগে যায়। (সকলের হাস্য)

বিদ্যাসাগর সহাস্যবদন, চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তার মধ্যে এ-সময় জাহাজও যেতে পারে।

বিদ্যাসাগর (সহাস্য) — হাঁ, এটি বর্ষাকাল বটে! (সকলের হাস্য)

মাস্টার (স্বগতঃ) — নবানুরাগের বর্ষা নবানুরাগের সময় মান-অপমান বোধ থাকে না বটে!

ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন, ভক্তসঙ্গে। বিদ্যাসাগর আত্মীয়গণসঙ্গে দাঁড়াইয়াছেন। ঠাকুরকে গাড়িতে তুলিয়া দিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন কেন? মূলমন্ত্র করে জপিতেছেন; জপিতে জপিতে ভাববিষ্ট হইয়াছেন। অহেতুক কৃপাসিন্ধু! বুঝি যাইবার সময় মহাত্মা বিদ্যাসাগরের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য মার কাছে প্রার্থনা করিতেছেন।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন। একজন ভক্তের হাত ধরিয়া আছেন। বিদ্যাসাগর স্বজনসঙ্গে আগে আগে যাইতেছেন — হাতে বাতি, পথ দেখাইয়া আগে আগে যাইতেছেন। শ্রাবণ কৃষ্ণাষষ্ঠী, এখনও চাঁদ উঠে নাই। তমসাবৃত উদ্যানভূমির মধ্য দিয়া সকলে বাতির ক্ষীনালোক লক্ষ্য করিয়া ফটকের দিকে আসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ফটকের কাছে যাই পোঁছিলেন, সকলে একটি সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া দাঁড়িয়া পড়িল। সম্মুখে বাঙালীর পরিচ্ছদধারী একটি গৌরবর্ণ শ্মশ্রুধারী পুরুষ, বয়স আন্দাজ ৩৬/৩৭, মাথায় শিখদিগের ন্যায় শুভ্র পাগড়ি, পরনে কাপড়, মোজা, জামা। চাদর নাই। তাঁহারা দেখিলেন, পুরুষটি শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিবামাত্র মাটিতে উষ্ণীষসমেত মস্তক অবলুণ্ঠিত করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া রহিছেন। তিনি দাঁড়াইলে ঠাকুর বলিলেন, “বলরাম! তুমি? এত রাত্রে?”

বলরাম (সহাস্যে) — আমি অনেক্ষণ এসেছি, এখানে দাঁড়িয়েছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ভিতরে কেন যাও নাই?

বলরাম — আজ্ঞা, সকলে আপনার কথাবার্তা শুনছেন, মাঝে গিয়ে বিরক্ত করা।

[এই বলিয়া বলরাম হাসিতে লাগিলেন।]

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে গাড়িতে উঠিতেছেন।

বিদ্যাসাগর (মাস্টারের প্রতি মৃদুস্বরে) — ভাড়া কি দেব?

মাস্টার — আজ্ঞা না, ও হয়ে গেছে।

বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

গাড়ি উত্তরাভিমুখে হাঁকাইয়া দিল। গাড়ি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে যাইবে। এখনও সকলে গাড়ির দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বুঝি ভাবিতেছেন, এ মহাপুরুষ কে? যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন, আর যিনি জীবের ঘরে ঘরে ফিরছেন, আর বলছেন, ঈশ্বরকে ভালবাসাই জীবনের উদ্দেশ্য।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c5 ৫ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রাদি অন্তরঙ্গ ও অন্যান্য ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ১৩ই অগস্ট 1882/08/13

05.1 দক্ষিণেশ্বরে কেদারের উৎসব

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কেদারাদি ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন। আজ রবিবার, অমাবস্যা, (২৯ শে শ্রাবণ ১২৮৯) ১৩ই অগস্ট ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। বেলা ৫টা হইবে।

শ্রীযুক্ত কেদার চাটুজ্যে, হালিসহরে বাটী। সরকারী অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাজ করিতেন। অনেকদিন ঢাকায় ছিলেন; সে-সময়ে শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামী তাঁহার সহিত সর্বদা শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় আলাপ করিতেন। ঈশ্বরের কথা শুনিলেই তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইত। তিনি পূর্বে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন।

ঠাকুর নিজের ঘরের দক্ষিণের বারান্দায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। রাম, মনোমহন, সুরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, মাস্টার প্রভৃতি অনেক ভক্তেরা উপস্থিত আছেন। কেদার আজ উৎসব করিয়াছেন। সমস্ত দিন আনন্দে অতিবাহিত হইতেছে। রাম একটি ওস্তাদ আনিয়াছিলেন, তিনি গান গাহিয়াছেন। গানের সময় ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া ঘরের ছোট খাটটিতে বসিয়াছিলেন। মাস্টার ও অন্যান্য ভক্তেরা তাঁহার পাদমূলে বসিয়াছিলেন।

[সমাধিতত্ত্ব ও সর্বধর্ম-সমন্বয় — হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান]

ঠাকুর কথা কহিতে কহিতে সমাধিতত্ত্ব বুঝাইতেছেন। বলিতেছেন, “সচ্চিদানন্দলাভ হলে সমাধি হয়। তখন কর্মত্যাগ হয়ে যায়। আমি ওস্তাদের নাম কচ্ছি এমন সময় ওস্তাদ এসে উপস্থিত, তখন আর তার নাম করবার কি প্রয়োজন। মৌমাছি ভনভন করে কতক্ষণ? যতক্ষণ না ফুলে বসে। কিন্তু সাধকের পক্ষে কর্মত্যাগ করলে হবে না। পূজা, জপ, ধ্যান, সন্ধ্যা, কবচাদি, তীর্থ — সবই করতে হয়।

“লাভের পর যদি কেউ বিচার করে, সে যেমন মৌমাছি মধুপান করতে করতে আধ আধ গুনগুন করে।”

ওস্তাদটি বেশ গান গাহিয়াছিলেন। ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন। তাঁহাকে বলিতেছেন, “যে মানুষে একটি বড় গুণ আছে, যেমন সঙ্গীতবিদ্যা, তাতে ঈশ্বরের শক্তি আছে বিশেষরূপে!”

ওস্তাদ — মহাশয়, কি উপায়ে তাঁকে পাওয়া যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ভক্তিই সার, ঈশ্বর তো সর্বভূতে আছেন; তবে ভক্ত কাকে বলি? যার মন সর্বদা ঈশ্বরেতে আছে। আর অহংকার অভিমান থাকলে হয় না। ‘আমি’রূপ ঢিপিতে ঈশ্বরের কৃপারূপ জল জমে না, গড়িয়ে যায়। আমি যন্ত্র।

(কেদারাদি ভক্তদের প্রতি) — “সব পথ দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। সব ধর্মই সত্য। ছাদে উঠা নিয়ে বিষয়। তা তুমি পাকা সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার; কাঠের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার; বাঁশের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার; আর দড়ি দিয়েও উঠতে পার। আবার একটি আছোলা বাঁশ দিয়েও উঠতে পার।

“যদি বল, ওদের ধর্মে অনেক ভুল, কুসংস্কার আছে; আমি বলি, তা থাকলেই বা, সকল ধর্মেই ভুল আছে। সব্বাই মনে করে আমার ঘড়িই ঠিক যাচ্ছে। ব্যাকুলতা থাকলেই হল; তাঁর উপর ভালবাসা, টান থাকলেই হল। তিনি যে অন্তর্যামী, অন্তরের টান ব্যাকুলতা দেখতে পান। মনে কর, এক বাপের অনেকগুলি ছেলে, বড় ছেলেরা কেউ বাবা, কেউ পাপা — এই সব স্পষ্ট বলে তাঁকে ডাকে। যারা ‘বা’ কি ‘পা’ পর্যন্ত বলতে পারে — বাবা কি তাদের উপর রাগ করবেন? বাবা জানেন যে, ওরা আমাকেই ডাকছে তবে ভাল উচ্চারণ করতে পারে না। বাপের কাছে সব ছেলেই সমান।

“আবার ভক্তেরা তাঁকেই নানা নামে ডাকছে; এক ব্যক্তিকেই ডাকছে। এক পুকুরের চারটি ঘাট। হিন্দুরা জল খাচ্ছে একঘাটে বলছে জল; মুসলমানরা আর-এক ঘাটে খাচ্ছে বলছে পানি; ইংরেজরা আর-একঘাটে খাচ্ছে বলছে ওয়াটার; আবার অন্য লোক একঘাটে বলছে aqua।

“এক ঈশ্বর তাঁর নানা নাম।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ২৪শে অগস্ট 1882/08/24/i

05.2 কামিনী-কাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত — সাধনা ও যোগতত্ত্ব

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে বিরাজ করিতেছেন। বৃহস্পতিবার (৯ই ভাদ্র ১২৮৯), শ্রাবণ-শুক্লা দশমী তিথি, ২৪শে অগস্ট ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ।

আজকাল ঠাকুরের কাছে হাজরা মহাশয়, রামলাল, রাখাল প্রভৃতি থাকেন। শ্রীযুক্ত রামলাল ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র, — কালীবাড়িতে পূজা করেন। মাস্টার আসিয়া দেখিলেন উত্তর-পূর্বের লম্বা বারান্দায় ঠাকুর হাজরার নিকট দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন। তিনি আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিলেন।

ঠাকুর সহাস্যবদন। মাস্টারকে বলিতেছেন, "আর দু-একবার ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখবার প্রয়োজন। চালচিত্র একবার মোটামুটি এঁকে নিয়ে তারপর বসে বসে রঙ ফলায়। প্রতিমা প্রথমে একমেটে, তারপর দোমেটে, তারপর খড়ি, তারপর রঙ — পরে পরে করতে হয়। ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের সব প্রস্তুত কেবল চাপা রয়েছে। কতকগুলি সৎকাজ করছে, কিন্তু অন্তরে কি আছে তা জানে না, অন্তরে সোনা চাপা রয়েছে। অন্তরে ঈশ্বর আছেন, — জানতে পারলে সব কাজ ছেড়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে ইচ্ছা হয়।"

ঠাকুর মাস্টারের সঙ্গে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন — আবার কখন কখন বারান্দায় বেড়াইতেছেন।

[সাধনা — কামিনী-কাঞ্চনের ঝড়তুফান কাটাইবার জন্য]

শ্রীরামকৃষ্ণ — অন্তরে কি আছে জানবার জন্য একটু সাধন চাই।

মাস্টার — সাধন কি বরাবর করতে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — না, প্রথমটা একটু উঠে পড়ে লাগতে হয়। তারপর আর বেশি পরিশ্রম করতে হবে না। যতক্ষণ ঢেউ, ঝড়, তুফান আর বাঁকের কাছ দিয়ে যেতে হয়, ততক্ষণ মাঝির দাঁড়িয়ে হাল ধরতে হয়, — সেইটুকু পার হয়ে গেলে আর না। যদি বাঁক পার হল আর অনুকূল হাওয়া বইল, তখন মাঝি আরাম করে বসে, হালে হাতটা ঠেকিয়ে রাখে, — তারপর পাল টাঙাবার বন্দোবস্ত করে তামাক সাজতে বসে। কামিনী-কাঞ্চনের ঝড় তুফানগুলো কাটিয়ে গেলে তখন শান্তি।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগতত্ত্ব — যোগভ্রষ্ট — যোগাবস্থা — "নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্" — যোগের ব্যাঘাত]

"কারু কারু যোগীর লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু তাদেরও সাবধান হওয়া উচিত। কামিনী—কাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত। যোগভ্রষ্ট হয়ে সংসারে এসে পড়ে, — হয়তো ভোগের বাসনা কিছু ছিল। সেইগুলো হয়ে গেলে আবার ঈশ্বরের দিকে যাবে, — আবার সেই যোগের অবস্থা। সট্‌কা কল জানো?"

মাস্টার — আজ্ঞে না — দেখি নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ও-দেশে আছে। বাঁশ নুইয়ে রাখে, তাতে বঁড়শি লাগানো দড়ি বাঁধা থাকে। বঁড়শিতে টোপ দেওয়া হয়। মাছ যেই টোপ খায় অমনি সড়াৎ করে বাঁশটা উঠে পড়ে। যেমন উপরে উঁচুদিকে বাঁশের মুখ ছিল সেইরূপই হয়ে যায়।

“নিক্তি, একদিকে ভার পড়লে নিচের কাঁটা উপরের কাঁটার সঙ্গে এক হয় না। নিচের কাঁটাটি মন — উপরের কাঁটাটি ঈশ্বর। নিচের কাঁটাটি উপরের কাঁটার সহিত এক হওয়ার নাম যোগ।

“মন স্থির না হলে যোগ হয় না। সংসার-হাওয়া মনরূপ দীপকে সর্বদা চঞ্চল করছে। ওই দীপটা যদি আদপে না নড়ে তাহলে ঠিক যোগের অবস্থা হয়ে যায়।

“কামিনী—কাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত। বস্তু বিচার করবে। মেয়েমানুষের শরীরে কি আছে — রক্ত, মাংস, চর্বি, নাড়ীভুঁড়ি, কৃমি, মুত, বিষ্ঠা এইসব। সেই শরীরের উপর ভালবাসা কেন?

“আমি রাজসিক ভাবের আরোপ করতাম — ত্যাগ করবার জন্য। সাধ হয়েছিল সাচ্চা জরির পোশাক পরব, আংটি আঙুলে দেব, নল দিয়ে গুড়গুড়িতে তামাক খাব। সাচ্চা জরির পোশাক পরলাম — এরা (মথুরবাবু) আনিয়ে দিলে। খানিকক্ষণ পরে মনকে বললাম, মন এর নাম সাচ্চা জরির পোশাক! তখন সেগুলোকে খুলে ফেলে দিলাম। আর ভাল লাগল না। বললাম, মন, এরই নাম শাল — এরই নাম আঙটি! এরই নাম নল দিয়ে গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়া! সেই যে সব ফেলে দিলাম আর মনে উঠে নাই।”

সন্ধ্যা আগত প্রায়। ঘরের দক্ষিণ-পূর্বের বারান্দায়, ঘরের দ্বারের কাছে ঠাকুর মণির সহিত নিভৃতে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে, সর্বদাই আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যালফ্যালে, দেখলেই বুঝা যায়। যেমন পাখি ডিমে তা দিচ্ছে — সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে! আচ্ছা আমায় সেই ছবি দেখাতে পার?

মণি — যে আজ্ঞা। আমি চেষ্টা করব যদি কোথাও পাই।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ২৪শে অগস্ট 1882/08/24/ii

05.3 গুরুশিষ্য-সংবাদ — গুহ্যকথা

সন্ধ্যা হইল। ফরাশ ৺কালীমন্দিরে ও ৺রাধামন্দিরে ও অন্যান্য ঘরে আলো জ্বালিয়া দিল। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া জগন্মাতার চিন্তা ও তৎপরে ঈশ্বরের নাম করিতেছেন। ঘরে ধুনো দেওয়া হইয়াছে। একপার্শ্বে একটি পিলসুজে প্রদীপ জ্বলিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে শাঁখঘন্টা বাজিয়া উঠিল। ৺কালীবাড়িতে আরতি হইতেছে। শুক্লা দশমী তিথি, চর্তুদিকে চাঁদের আলো।

আরতির কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে বসিয়া মণির সহিত একাকী নানা বিষয়ে কথা কহিতেছেন। মণি মেঝেতে বসিয়া।

[“কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন”]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — নিষ্কামকর্ম করবে। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর যে-কর্ম করে সে ভাল কাজ — নিষ্কামকর্ম করবার চেষ্টা করে।

মণি — আজ্ঞা হাঁ। আচ্ছা, যেখানে কর্ম সেখানে কি ঈশ্বর পাওয়া যায়? রাম আর কাম কি এক সঙ্গে হয়? হিন্দীতে একটা কথা সেদিন পড়লাম।

“যাহাঁ রাম তাহাঁ নাহি কাম, যাহাঁ কাম তাঁহা নাহি রাম।”

শ্রীরামকৃষ্ণ — কর্ম সকলেই করে — তাঁর নামগুণ করা এও কর্ম — সোঽহংবাদীদের ‘আমিই সেই’ এই চিন্তাও কর্ম — নিঃশ্বাস ফেলা, এও কর্ম। কর্মত্যাগ করবার জো নাই। তাই কর্ম করবে, কিন্তু ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করবে।

মণি — আজ্ঞা, যাতে অর্থ বেশি হয় এ-চেষ্টা কি করতে পারি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — বিদ্যার সংসারের জন্য পারা যায়। বেশি উপায়ের চেষ্টা করবে। কিন্তু সদুপায়ে। উপার্জন করা উদ্দেশ্য নয়। ঈশ্বরের সেবা করাই উদ্দেশ্য। টাকাতে যদি ঈশ্বরের সেবা হয় তো সে টাকায় দোষ নাই।

মণি — আজ্ঞা, পরিবারদের উপর কর্তব্য কতদিন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাদের খাওয়া পরার কষ্ট না থাকে। কিন্তু সন্তান নিজে সমর্থ হলে তাদের ভার লবার দরকার নাই, পাখির ছানা খুঁটে খেতে শিখলে, আবার মার কাছে খেতে এলে, মা ঠোক্কর মারে।

মণি — কর্ম কতদিন করতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ফললাভ হলে আর ফুল থাকে না। ঈশ্বরলাভ হলে কর্ম আর করতে হয় না। মনও লাগে না।

“মাতাল বেশি মদ খেয়ে হুঁশ রাখতে পারে না। — দু-আনা খেলে কাজকর্ম চলতে পারে! ঈশ্বরের দিকে যতই এগুবে ততই তিনি কর্ম কমিয়ে দেবেন। ভয় নাই। গৃহস্থের বউ অন্তঃসত্ত্বা হলে শাশুড়ি ক্রমে ক্রমে কর্ম কমিয়ে দেয়। দশমাস হলে আদপে কর্ম করতে দেয় না। ছেলেটি হলে ওইটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

“যে-কটা কর্ম আছে, সে-কটা শেষ হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত। গৃহিণী বাড়ির রাঁধাবাড়া আর কাজকর্ম সেরে যখন নাইতে গেল, তখন আর ফেরে না — তখন ডাকাডাকি করলেও আর আসবে না।

[ঈশ্বরলাভ ও ঈশ্বরদর্শন কি? উপায় কি?]

মণি — আজ্ঞা, ঈশ্বরলাভ-এর মানে কি? আর ঈশ্বরদর্শন কাকে বলে? আর কেমন করে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — বৈষ্ণবরা বলে যে, ঈশ্বরের পথে যারা যাচ্ছে আর যারা তাঁকে লাভ করেছে তাদের থাক থাক আছে — প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ আর সিদ্ধের

সিদ্দ। যিনি সবে পথে উঠছেন তাকে প্রবর্তক বলে। যে সাধন-ভজন করছে — পূজা, জপ, ধ্যান, নামগুণকীর্তণ করছে — সে ব্যক্তি সাধক। যে-ব্যক্তি ঈশ্বর আছেন বোধে বোধ করেছে, তাকেই সিদ্ধ বলে। যেমন বেদান্তের উপমা আছে — অন্ধকার ঘর, বাবু শুয়ে আছে। বাবুকে একজন হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছে। একটা কৌচে হাত দিয়ে বলছে, এ নয়, জানালায় হাত দিয়ে বলছে, এ নয়, দরজায় হাত দিয়ে বলছে, এ নয়। নেতি, নেতি, নেটি। শেষে বাবুর গায়ে হাত পড়েছে, তখন বলছে, 'ইহ' এই বাবু — অর্থাৎ 'অস্তি' বোধ হয়েছে। বাবুকে লাভ হয়েছে, কিন্তু বিশেষরূপে জানা হয় নাই।

"আর-এক থাক আছে, তাকে বলে সিদ্ধের সিদ্ধ। বাবুর সঙ্গে যদি বিশেষ আলাপ হয় তাহলে আর একরকম অবস্থা — যদি ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমভক্তির দ্বারা বিশেষ আলাপ হয়। যে সিদ্ধ সে ঈশ্বরকে পেয়েছে বটে, যিনি সিদ্ধের সিদ্ধ তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে বিশেষরূপে আলাপ করেছেন।

"কিন্তু তাঁকে লাভ করতে হলে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর।

"শান্ত — ঋষিদের ছিল। তাদের অন্য কিছু ভোগ করবার বাসনা ছিল না। যেমন স্ত্রীর স্বামীতে নিষ্ঠা, — সে জানে আমার পতি কন্দর্প।

"দাস্য — যেমন হনুমানের। রামের কাজ করবার সময় সিংহতুল্য। স্ত্রীরও দাস্যভাব থাকে, — স্বামীকে প্রাণপণে সেবা করে। মার কিছু কিছু থাকে — যশোদারও ছিল।

“সখ্য — বন্ধুর ভাব; এস, এস কাছে এসে বস। শ্রীদামাদি কৃষ্ণকে কখন এঁটো ফল খাওয়াচ্ছে, কখন ঘাড়ে চড়ছে।

“বাৎসল্য — যেমন যশোদার। স্ত্রীরও কতকটা থাকে, — স্বামীকে প্রাণ চিরে খাওয়ায়। ছেলেটি পেট ভরে খেলে তবেই মা সন্তুষ্ট। যশোদা কৃষ্ণ খাবে বলে ননী হাতে করে বেড়াতেন।

“মধুর — যেমন শ্রীমতীর। স্ত্রীরও মধুরভাব। এ-ভাবের ভিতরে সকল ভাবই আছে — শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য।”

মণি — ঈশ্বরকে দর্শন কি এই চক্ষে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না। সাধনা করতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয় — তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ। সেই চক্ষে তাঁকে দেখে, — সেই কর্ণে তাঁর বাণী শুনা যায়। আবার প্রেমের লিঙ্গ যোনি হয়।

এই কথা শুনিয়া মণি হো-হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর বিরক্ত না হইয়া আবার বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এই প্রেমের শরীরে আত্মার সহিত রমণ হয়।

মণি আবার গম্ভীর হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালবাসা না এলে হয় না। খুব ভালবাসা হলে তবেই তো চারিদিক ঈশ্বরময় দেখা যায়। খুব ন্যাবা হলে তবেই চারিদিক হলদে দেখা যায়।

“তখন আবার ‘তিনিই আমি’ এইটি বোধ হয়। মাতালের নেশা বেশি হলে বলে, ‘আমিই কালী’।

“গোপীরা প্রেমোন্মত্ত হয়ে বলতে লাগল, ‘আমিই কৃষ্ণ।’

“তাঁকে রাতদিন চিন্তা করলে তাঁকে চারিদিকে দেখা যায়, যেমন — প্রদীপের শিখার দিকে যদি একদৃষ্টে চেয়ে থাক, তবে খানিকক্ষণ পরে চারিদিক শিখাময় দেখা যায়।”

[ঈশ্বরদর্শন কি মস্তিষ্কের ভুল? “সংশয়াত্মা বিনশ্যতি”]

মণি ভাবিতেছেন যে, সে শিখা তো সত্যকার শিখা নয়।

ঠাকুর অন্তর্যামী, বলিতেছেন, চৈতন্যকে চিন্তা করলে অচৈতন্য হয় না। শিবনাথ বলেছিল, ঈশ্বরকে একশোবার ভাবলে বেহেড হয়ে যায়। আমি তাকে বললাম, চৈতন্যকে চিন্তা করলে কি অচৈতন্য হয়?

মণি — আজ্ঞা, বুঝেছি। এ-তো অনিত্য কোন বিষয় চিন্তা করা নয়? —যিনি নিত্যচৈতন্যস্বরূপ তাঁতে মন লাগিয়ে দিলে মানুষ কেন অচৈতন্য হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রসন্ন হইয়া) — এইটি তাঁর কৃপা — তাঁর কৃপা না হলে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না।

“আত্মার সাক্ষাৎকার না হলে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না।

“তাঁর কৃপা হলে আর ভয় নাই। বাপের হাত ধরে গেলেও বরং ছেলে পড়তে পারে? কিন্তু ছেলের হাত যদি বাপ ধরে, আর ভয় নাই। তিনি কৃপা করে যদি সন্দেহ ভঞ্জন করেন, আর দেখা দেন আর কষ্ট নাই। — তবে তাঁকে পাবার জন্য খুব ব্যাকুল হয়ে ডাকতে ডাকতে — সাধনা করতে করতে তবে কৃপা হয়। ছেলে অনেক দৌড়াদৌড়ি কচ্ছে, দেখে মার দয়া হয়। মা লুকিয়া ছিল, এসে দেখা দেয়।”

মণি ভাবিতেছেন, তিনি দৌড়াদৌড়ি কেন করান। — ঠাকুর অমনি বলিতেছেন, “তাঁর ইচ্ছা যে খানি দৌড়াদৌড়ি হয়; তবে আমোদ হয়। তিনি লীলায় এই সংসার রচনা করেছেন। এরি নাম মহামায়া। তাই সেই শক্তিরূপিণী মার শরণাগত হতে হয়। মায়াপাশে বেঁধে ফেলেছে, এই পাশ ছেদন করতে পারলে তবেই ঈশ্বরদর্শন হতে পারে।”

[আদ্যাশক্তি মহামায়া ও শক্তিসাধনা]

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁর কৃপা পেতে গেলে আদ্যাশক্তিরূপিণী তাঁকে প্রসন্ন করতে হয়। তিনি মহামায়া। জগৎকে মুগ্ধ করে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। তিনি অজ্ঞান করে রেখে দিয়েছেন। সেই মহামায়া দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে যাওয়া যায়। বাহিরে পড়ে থাকলে বাহিরের জিনিস কেবল দেখা যায় — সেই নিত্য

সচ্চিদানন্দ পুরুষকে জানতে পারা যায় না। তাই পুরাণে কথা আছে — চন্ডীতে — মধুকৈটভ১ বধের সময় ব্রহ্মাদি দেবতারা মহামায়ার স্তব করছেন।

“শক্তিই জগতের মূলাধার। সেই আদ্যাশক্তির ভিতরে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই আছে, — অবিদ্যা — মুগ্ধ করে। অবিদ্যা — যা থেকে কামিনী-কাঞ্চন — মুগ্ধ করে। বিদ্যা — যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম — ঈশ্বরের পথে লয়ে যায়।

“সেই অবিদ্যাকে প্রসন্ন করতে হবে। তাই শক্তির পূজা পদ্ধতি।

“তাঁকে প্রসন্ন করবার জন্য নানাভাবে পূজা — দাসীভাব, বীরভাব, সন্তানভাব। বীরভাব — অর্থাৎ রমণ দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করা।

“শক্তিসাধনা — সব ভারী উৎকট সাধনা ছিল, চালাকি নয়।

“আমি মার দাসীভাবে, সখীভাবে দুই বৎসর ছিলাম। আমার কিন্তু সন্তানভাব, স্ত্রীলোকের স্তন মাতৃস্তন মনে করি।

“মেয়েরা এক-একটি শক্তির রূপ। পশ্চিমে বিবাহের সময় বরের হাতে ছুরি থাকে, বাংলা দেশে জাঁতি থাকে; — অর্থাৎ ওই শক্তিরূপা কন্যার সাহায্যে বর মায়াপাশ ছেদন করবে। এটি বীরভাব। আমি বীরভাবে পূজা করি নাই। আমার সন্তানভাব।

“কন্যা শক্তিরূপা। বিবাহের সময় দেখ নাই — বর-বোকাটি পিছনে বসে থাকে? কন্যা কিন্তু নিঃশঙ্ক।”

[দর্শনের পর ঐশ্বর্য ভুল হয় — নানা জ্ঞান, অপরা-বিদ্যা — ‘Religion and Science’ —
সাত্ত্বিক ও রাজসিক জ্ঞান]

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বরলাভ করলে তাঁর বাহিরের ঐশ্বর্য, তাঁর জগতের ঐশ্বর্য ভুল হয়ে যায়; তাঁকে দেখলে তাঁর ঐশ্বর্য মনে থাকে না। ঈশ্বরের আনন্দে মগ্ন হলে ভক্তের আর হিসাব থাকে না। নরেন্দ্রকে দেখলে “তোর নাম কি; তোর বাড়ি কোথা” — এ-সব জিজ্ঞাসা করার দরকার হয় না। জিজ্ঞাসা করবার অবসর কই? হনুমানকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ কি তিথি? হনুমান বললে, “ভাই, আমি বার তিথি নক্ষত্র — এ-সব কিছুই জানি না, আমি এক ‘রাম’ চিন্তা করি।”

১ ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারঃ স্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্য ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা।। [চন্ডী — মধুকৈটভবধ]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ১৬ই অক্টোবর 1882/10/16/i

05.4 পূর্বকথা —— শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম প্রেমোন্মাদ কথা —— ১৮৫৮

[কৃষ্ণকিশোর, এঁড়েদার সাধু, হলধারী, যতীন্দ্র, জয় মুখুজ্জে, রাসমণি]

আজ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহানন্দে আছেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে নরেন্দ্র আসিয়াছেন। আরও কয়েকটি অন্তরঙ্গ আছেন। নরেন্দ্র ঠাকুরবাড়িতে আসিয়া স্নান করিয়া প্রসাদ পাইয়াছেন।

আজ (৩১ শে) আশ্বিন, শুক্লা চতুর্থী তিথি; ১৬ই অক্টোবর ১৮৮২, সোমবার। আগামী বৃহস্পতিবার সপ্তমী তিথিতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে রাখাল, রামলাল ও হাজরা আছেন। নরেন্দ্রের সঙ্গে আর দু-একটি ব্রহ্মজ্ঞানী ছোকরা আসিয়াছেন। আজ মাস্টারও আসিয়াছেন।

নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছেই আহার করিলেন। আহারান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ঘরের মেঝেতে বিছানা করিয়া দিতে বলিলেন, নরেন্দ্র আদি ভক্তেরা বিশেষতঃ নরেন্দ্র বিশ্রাম করিবেন। মাদুরের উপর লেপ ও বালিশ পাতা হইয়াছে। ঠাকুরও বালকের ন্যায় নরেন্দ্রের কাছে বিছানায় বসিলেন। ভক্তদের সহিত, বিশেষতঃ নরেন্দ্রের দিকে মুখ করিয়া হাসিমুখে মহা আনন্দে কথা কহিতেছেন। নিজের অবস্থা, নিজের চরিত্র, গল্পচ্ছলে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি) — আমার এই অবস্থার পর কেবল ঈশ্বরের কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুলতা হত। কোথায় ভাগবত, কোথায় অধ্যাত্ম, কোথায়

মহাভারত খুঁজে বেড়াতাম। এঁড়েদার কৃষ্ণকিশোরের কাছে অধ্যাত্ম শুনতে যেতাম।

“কৃষ্ণকিশোরের কি বিশ্বাস! বৃন্দাবনে গিছিল, সেখানে একদিন জলতৃষ্ণা পেয়েছিল। কুয়ার কাছে গিয়ে দেখে, একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে, ‘আমি নীচ জাতি, আপনি ব্রাহ্মণ; কেমন করে আপনার জল তুলে দেব?’ কৃষ্ণকিশোর বললে, ‘তুই বল শিব। শিব শিব বললেই তুই শুদ্ধ হয়ে যাবি।’ সে ‘শিব’ ‘শিব’ বলে জল তুলে দিলে। অমন আচারী ব্রাহ্মণ সেই জল খেলে! কি বিশ্বাস!

“এঁড়েদার ঘাটে একটি সাধু এসেছিল। আমরা একদিন দেখতে যাব ভাবলুম। আমি কালীবাড়িতে হলধারীকে বললাম, কৃষ্ণকিশোর আর আমি সাধু দেখতে যাব। তুমি যাবে? হলধারী বললে, ‘একটা মাটির খাঁচা দেখতে গিয়ে কি হবে?’ হলধারী গীতা-বেদান্ত পড়ে কি না! তাই সাধুকে বললে ‘মাটির খাঁচা। কৃষ্ণকিশোরকে গিয়ে আমি ওই-কথা বললাম। সে মহা রেগে গেল। আর বললে, ‘কি! হলধারী এমন কথা বলেছে? যে ঈশ্বর চিন্তা করে, যে রাম চিন্তা করে, আর সেইজন্য সর্বত্যাগ করেছে, তার দেহ মাটির খাঁচা। সে জানে না যে, ভক্তের দেহ চিন্ময়।’ এত রাগ — কালীবাড়িতে ফুল তুলতে আসত, হলধারীর সঙ্গে দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নিত! কথা কইবে না!

“আমায় বলেছিল, ‘পৈতেটা ফেললে কেন?’ যখন আমার এই অবস্থা হল, তখন আশ্বিনের ঝড়ের মতো একটা কি এসে কোথায় কি উড়িয়ে লয়ে গেল!

আগেকার চিহ্ন কিছুই রইল না। হুঁশ নাই! কাপড় পড়ে যাচ্ছে, তা পৈতে থাকবে কেমন করে! আমি বললাম, 'তোমার একবার উন্মাদ হয়, তাহলে তুমি বোঝ!'

তাই হল! তার নিজেরই উন্মাদ হল। তখন সে কেবল 'ওঁ ওঁ' বলত আর একঘরে চুপ করে বসে থাকত। সকলে মাথা গরম হয়েছে বলে কবিরাজ ডাকলে। নাটাগড়ের রাম কবিরাজ এল। কৃষ্ণকিশোর তাকে বললে, 'ওগো, আমার রোগ আরাম কর, কিন্তু দেখো, যেন আমার ওঁকারটি আরাম করো না।' (সকলের হাস্য)

"একদিন গিয়ে দেখি, বসে ভাবছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েছে?' বললে 'টেক্সোয়ালা এসেছিল — তাই ভাবছি। বলেছে টাকা না দিলে ঘটি-বাটি বেচে লবে।' আমি বললাম, কি হবে ভেবে? না হয় ঘটি-বাটি লয়ে যাবে। যদি বেঁধে লয়ে যায় তোমাকে তো লয়ে যেতে পারবে না। তুমি তো 'খ' গো! (নরেন্দ্রাদির হাস্য) কৃষ্ণকিশোর বলত, আমি আকাশবৎ। অধ্যাত্ম পড়ত কিনা। মাঝে মাঝে 'তুমি খ' বলে, ঠাট্টা করতাম। হেসে বললাম, 'তুমি খ'; টেক্স তোমাকে তো টানতে পারবে না।

"উন্মাদ অবস্থায় লোককে ঠিক ঠিক কথা, হক কথা, বলতুম! কারুকে মানতাম না। বড়লোক দেখলে ভয় হত না।

"যদু মল্লিকের বাগানে যতীন্দ্র এসেছিল। আমিও সেখানে ছিলাম। অমি তাকে বললাম, কর্তব্য কি? ঈশ্বরচিন্তা করাই আমাদের কর্তব্য কি না? যতীন্দ্র বললে, 'আমরা সংসারী লোক। আমাদের কি আর মুক্তি আছে! রাজা যুধিষ্ঠিরই নরক

দর্শন করেছিলেন!’ তখন আমার বড় রাগ হল। বললাম, ‘তুমি কিরকম লোক গা! যুধিষ্ঠিরের কেবল নরকদর্শনই মনে করে রেখেছ? যুধিষ্ঠিরের সত্যকথা, ক্ষমা, ধৈর্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরের ভক্তি — এ-সব কিছু মনে হয় না। আরও কত কি বলতে যাচ্ছিলাম। হৃদে আমার মুখ চেপে ধরলে। যতীন্দ্র একটু পরেই ‘আমার একটু কাজ আছে’ বলে চলে গেল।

“অনেকদিন পরে কাপ্তেনের সঙ্গে সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি গিছলাম। তাকে দেখে বললাম, ‘তোমাকে রাজা-টাজা বলতে পারব না, কেননা, সেটা মিথ্যাকথা হবে।’ আমার সঙ্গে খানিকটা কথা কইলে। তারপর দেখলাম, সাহেব-টাহেব আনাগোনা করতে লাগল। রজোগুণী লোক, নানা কাজ লয়ে আছে। যতীন্দ্রকে খবর পাঠানো হল। সে বলে পাঠালে, ‘আমার গলায় বেদনা হয়েছে।

“সেই উন্মাদ অবস্থায় একদিন বরানগরের ঘাটে দেখলাম, জয় মুখুজ্জে জপ করছে, কিন্তু অন্যমনস্ক! তখন কাছে গিয়ে দুই চাপড় দিলাম!

“একদিন রাসমণি ঠাকুরবাড়িতে এসেছে। কালীঘরে এল। পূজার সময় আসত আর দুই-একটা গান গাইতে বলত। গান গাচ্ছি, দেখি যে অন্যমনস্ক হয়ে ফুল বাচ্ছে। অমনি দুই চাপড়। তখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাতজোড় করে রইল।

“হলধারীকে বললাম, দাদা এ কি স্বভাব হল! কি উপায় করি, তখন মাকে ডাকতে ডাকতে ও-স্বভাব গেল।”

[মথুরের সঙ্গে তীর্থ ১৮৬৮ — কাশীতে বিষয় কথা শ্রবণে ঠাকুরের রোদন]

“ওই অবস্থায় ঈশ্বরকথা বই আর কিছু ভাল লাগে না। বিষয়ের কথা হচ্ছে শুনলে বসে বসে কাঁদতাম। মথুরবাবু যখন সঙ্গে করে তীর্থ লয়ে গেল, তখন কাশীতে রাজাবাবুর বাড়িতে কয়দিন আমরা ছিলাম। মথুরবাবুর সঙ্গে বৈঠকখানায় বসে আছি, রাজাবাবুরাও বসে আছে। দেখি তারা বিষয়ের কথা কইছে। এত টাকা লোকসান হয়েছে — এই সব কথা। আমি কাঁদতে লাগলাম, বললাম, ‘মা, কোথায় আনলে! আমি যে রাসমণির মন্দিরে খুব ভাল ছিলাম, তীর্থ করতে এসেও সেই কামিনী-কাঞ্চনের কথা। কিন্তু সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) তো বিষয়ের কথা শুনতে হয় নাই।”

ঠাকুর ভক্তদের, বিশেষতঃ নরেন্দ্রকে, একটু বিশ্রাম করিতে বলিলেন। নিজেও ছোট খাটটিতে একটু বিশ্রাম করিতে গেলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ১৬ই - ১৭ই অক্টোবর 1882/10/17 & 1882/10/16/ii

05.5 কীর্তনানন্দে নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে — নরেন্দ্রকে প্রেমালিঙ্গন

বৈকাল হইয়াছে — নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন — রাখাল, লাটু, মাস্টার, নরেন্দ্রের ব্রাহ্মবন্ধু প্রিয়, হাজরা — সকলে আছেন।

নরেন্দ্র কীর্তন গাহিলেন, খোল বাজিতে লাগিল:

চিন্তয় মম মানস হরি চিদঘন নিরঞ্জন;

কিবা অনুপম ভাতি, মোহন মূরতি, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন।

নবরাগে রঞ্জিত, কোটি শশী-বিনিন্দিত,

(কিবা) বিজলি চমকে, সেরূপ আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন।

হৃদি-কমলাসনে ভাব তাঁর চরণ,

দেখ শান্ত মনে, প্রেমনয়নে, অপরূপ প্রিয়দর্শন।

চিদানন্দরসে, ভক্তিযোগাবেশে, হও রে চিরমগন।

নরেন্দ্র আবার গাহিলেন:

(১) সত্যং শিব সুন্দর ভাতি হৃদি মন্দিরে।

নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে।

(সেদিন কবে হবে) (দীনজনের ভাগ্যে নাথ)।

জ্ঞান-অনন্তরূপে পশিবে নাম মম হৃদে,

অবাক্ হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে।

আনন্দ-অমৃতরূপে উদিবে হৃদয়-আকাশে,

চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে,

আমরাও নাথ, তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে।

শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজ-রাজ-চরণে,

বিকাইব ওহে প্রাণসখা, সফল করিব জীবনে।

এমন অধিকার, কোথা পাব আর, স্বর্গভোগ জীবনে (সশরীরে)।

শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপ, হেরিয়ে নাথ তোমার,

আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর;

তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ-আঁধার।

ওহে ধ্রুবতারা-সম হৃদে জ্বলন্ত বিশ্বাস হে,

জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পুরাও মনের আশ;

আমি নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে;

আপনার ভুলে যাব, তোমারে পাইয়ে হে।

(সেদিন কবে হবে হে।)

(২) আনন্দবনে মল মধুর ব্রহ্মনাম।

নামে উথলিবে সুধাসিন্ধু পিয় অবিরাম। (পান কর আর দান কর হে)।

যদি হয় কখন শুষ্ক হৃদয়, কর নামগান।

(বিষয়-মরীচিকায় পড়ে হে) (প্রেমে হৃদয়, সরস হবে হে)

(দেখ যেন ভুল না রে সেই মহামন্ত্র)।

সবে হুঙ্কারিয়ে ছিন্ন কর পাপের বন্ধন। (জয় ব্রহ্ম জয় বল হে)।

এস ব্রহ্মানন্দে বাতি সবে হই পূর্ণকাম। (প্রেমযোগে যোগী হয়ে হে)।

খোল করতাল লইয়া কীর্তন হইতেছে। নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা ঠাকুরকে বেড়িয়া বেড়িয়া কীর্তন করিতেছেন। কখন গাহিতেছেন, “প্রেমানন্দ রসে হও রে চিরগমন!” আবার কখন গাহিতেছেন, “সত্যং শিব সুন্দররূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে।”

অবশেষে নরেন্দ্র নিজে খোল ধরিয়াছেন ও মত্ত হইয়া ঠাকুরের সঙ্গে গাহিতেছেন, “আনন্দবদনে বল মধুর হরিনাম।”

কীর্তনান্তে নরেন্দ্রকে ঠাকুর অনেকক্ষণ করিয়া বারবার আলিঙ্গন করিলেন! বলিতেছেন, “তুমি আজ আমায় আনন্দ দিলে!!!”

আজ ঠাকুরের হৃদয়মধ্যস্থ প্রেমের উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। রাত প্রায় আটটা। তথাপি প্রেমোন্মত্ত হইয়া একাকী বারান্দায় বিচরণ করিতেছেন। উত্তরের লম্বা বারান্দায় আসিয়াছেন ও দ্রুতপদে বারান্দার এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্যন্ত পাদচারণ করিতেছেন। মাঝে মাঝে মার সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন। হঠাৎ উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, “তুই আমার কি করবি?”

মা যার সহায় তার মায়া কি করিতে পারে। এই কথা কি বলিতেছেন?

নরেন্দ্র, মাস্টার, প্রিয় রাত্রে থাকিবেন। নরেন্দ্র থাকিবেন; ঠাকুরের আনন্দের সীমা নাই। রাত্রিকালীন আহার প্রস্তুত। শ্রীশ্রীমা নহবতে আছেন। রুটি ছোলার ডাল ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া ভক্তেরা খাইবেন বলিয়া পাঠাইয়াছেন। ভক্তেরা মাঝে মাঝে থাকেন; সুরেন্দ্র মাসে মাসে কিছু খরচ দেন।

আহার প্রস্তুত। ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় জায়গা হইতেছে।

[নরেন্দ্র প্রভৃতিকে স্কুল ও অন্যান্য বিষয়কথা কহিতে নিষেধ]

ঘরের পুর্বদিকের দরজার কাছে নরেন্দ্রাদি গল্প করিতেছেন।

নরেন্দ্র — আজকাল ছোকরারা কিরকম দেখছেন?

মাস্টার — মন্দ নয়, তবে ধর্মোপদেশ কিছু হয় না।

নরেন্দ্র — নিজে যা দেখেছি, তাতে বোধ হয় সব অধঃপাতে যাচ্ছে। বার্ডসাই, ইয়ার্কি, বাবুয়ানা, স্কুল পালানো — এ-সব সর্বদা দেখা যায়। এমন কি দেখেছি যে, কুস্থানেও যায়।

মাস্টার — যখন পড়াশুনা করতাম, আমরা তো এরূপ দেখি নাই, শুনি নাই।

নরেন্দ্র — আপনি বোধ হয় তত মিশতেন না। এমন দেখেছি যে, খারাপ লোকে নাম ধরে ডাকে; কখন আলাপ করেছে কে জানে!

মাস্টার — কি আশ্চর্য!

নরেন্দ্র — আমি জানি, অনেকের চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে। স্কুলের কর্তৃপক্ষীয়েরা ও ছেলেদের অভিভাবকেরা এ-সব বিষয় দেখেন তো ভাল হয়।

[ঈশ্বরকথাই কথা — "আত্মানং বা বিজানীথ অন্যাং বাচং বিমুঞ্চথ"]

এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের ভিতর হইতে তাঁহাদের কাছে আসিলেন ও হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "কি গো, তোমাদের কি কথা হচ্ছে?" নরেন্দ্র বলিলেন, "এঁর সঙ্গে স্কুলের কথাবার্তা হচ্ছিল। ছেলেদের চরিত্র ভাল থাকে না।" ঠাকুর একটু ওই সকল কথা শুনিয়া মাস্টারকে গম্ভীরভাবে বলিতেছেন, "এ-সব কথাবার্তা ভাল নয়। ঈশ্বরের কথা বই অন্য কথা ভাল নয়।

তুমি এদের চেয়ে বয়সে বড়, বুদ্ধি হয়েছে, তোমার এ-সব কথা তুলতে দেওয়া উচিত ছিল না।” (নরেন্দ্রের বয়স তখন ১৯/২০; মাস্টারের ২৭/২৮)

মাস্টার অপ্রস্তুত। নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ চুপ করিয়া রহিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে নরেন্দ্রাদি ভক্তগণকে খাওয়াইতেছেন। ঠাকুরের আজ মহা আনন্দ।

নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা আহার করিয়া ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন ও ঠাকুরের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। আনন্দের হাট বসিয়াছে। কথা কহিতে কহিতে নরেন্দ্রকে ঠাকুর বলিতেছেন, “চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে এই গানটি একবার গা না।”

নরেন্দ্র গাহিতে আরম্ভ করিলেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে খোল করতাল অন্য ভক্তগণ বাজাইতে লাগিলেন:

চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে।
উথলিল প্রেমসিন্ধু কি আনন্দময় হে।
(জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়)
চারিদিকে ঝলমল করে ভক্ত গ্রহদল,
ভক্তসঙ্গে ভক্তসখা লীলারসময় হে।
(জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়)
স্বর্গের দুয়ার খুলি, আনন্দ-লহরী তুলি;
নববিধান-বসন্ত-সমীরণ বয়,

ছুটে তাহে মন্দ মন্দ লীলারস প্রেমগন্ধ,
ঘ্রাণে যোগিবৃন্দ যোগানন্দে মত্ত হয় হে।
(জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়)
ভবসিন্ধুজলে, বিধান-কমলে, আনন্দময়ী বিরাজে,
আবেশে আকুল, ভক্ত অলিকুল, পিয়ে সুধা তার মাঝে।
দেখ দেখ মায়ের প্রসন্নবদন চিত্ত-বিনোদন ভুবন-মোহন,
পদতলে দলে দলে সাধুগণ, নাচে গায় প্রেমে হইয়ে মগন;
কিবা অপরূপ আহা মরি মরি, জুড়াইল প্রাণ দরশন করি
প্রেমদাসে বলে সবে পায়ে ধরি, গাও ভাই মায়ের জয় ।।

কীর্তন করিতে করিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নৃত্য করিতেছেন। ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া নৃত্য করিতেছেন।

কীর্তনান্তে ঠাকুর উত্তর-পূর্ব বারান্দায় বেড়াইতেছেন। হাজরা মহাশয় বারান্দার উত্তরাংশে বসিয়া আছেন। ঠাকুর সেখানে গিয়া বসিলেন; মাস্টার সেইখানে বসিয়াছেন ও হাজরার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ঠাকুর একটি ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি স্বপ্ন-টপ্ন দেখ?"

ভক্ত — একটি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি; এই জগৎ জলে জল। অনন্ত জলরাশি! কয়েকখানা নৌকা ভাসিতেছিল; হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসে ডুবে গেল। আমি আর কয়টি লোক জাহাজে উঠেছি; এমন সময়ে সেই অকূল সমুদ্রের উপর দিয়ে এক ব্রাহ্মণ চলে যাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কেমন করে যাচ্ছেন?" ব্রাহ্মণটি একটু হেসে বললেন, "এখানে কোন কষ্ট নাই; জলের নিচে বরাবর

সাঁকো আছে।” জিজ্ঞাসা করলাম, “আপনি কোথায় যাচ্ছেন?” তিনি বললেন, “ভবানীপুর যাচ্ছি।” আমি বললাম, “একটু দাঁড়ান; আমিও আপনার সঙ্গে যাব।”

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমার এ-কথা শুনে রোমাঞ্চ হচ্ছে!

ভক্ত — ব্রাহ্মণটি বললেন, “আমার এখন তাড়াতাড়ি; তোমার নামতে দেরি! এখন আসি। এই পথ দেখে রাখ, তুমি তারপর এস।”

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে! তুমি শীঘ্র মন্ত্র লও।

রাত এগারটা হইয়াছে। নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে বিছানা করিয়া শয়ন করিলেন।

নিদ্রাভঙ্গের পর ভক্তেরা কেউ কেউ দেখিতেছেন যে, প্রভাত হইয়াছে (১৭ই অক্টোবর, ১৮৮২; মঙ্গলবার, ১লা কার্তিক, শুক্লা পঞ্চমী)। শ্রীরামকৃষ্ণ বালকের ন্যায় দিগম্বর, ঠাকুরদের নাম করিতে করিতে ঘরে বেড়াইতেছেন। কখন গঙ্গাদর্শন, কখন ঠাকুরদের ছবির কাছে গিয়া প্রণাম, কখন বা মধুর স্বরে নামকীর্তন। কখন বলিতেছেন, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা, গায়ত্রী, ভাগবত-ভক্ত-ভগবান। গীতা উদ্দেশ করিয়া অনেকবার বলিতেছেন, ত্যাগী ত্যাগী ত্যাগী ত্যাগী। কখন বা — তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই শক্তি; তুমিই পুরুষ, তুমিই প্রকৃতি; তুমিই বিরাট, তুমিই স্বরাট; তুমিই নিত্য, তুমিই লীলাময়ী; তুমিই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব।

এদিকে ৺কালীমন্দিরে ও ৺রাধাকান্তের মন্দিরে মঙ্গল আরতি হইতেছে ও শাঁখঘন্টা বাজিতেছে। ভক্তেরা উঠিয়া দেখিতেছেন কালীবাড়ির পুষ্পোদ্যানে ঠাকুরদের পূজার্থ পুষ্পচয়ন আরম্ভ হইয়াছে ও প্রভাতী রাগের লহরী উঠাইয়া নহবত বাজিতেছে।

নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ঠাকুরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর হাস্যমুখ, উত্তর-পূর্ব বারান্দার পশ্চিমাংশে দাঁড়াইয়া আছেন।

নরেন্দ্র — পঞ্চবটীতে কয়েকজন নানাকপন্থী সাধু বসে আছে দেখলুম।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, তারা কাল এসেছিল! (নরেন্দ্রকে) তোমরা সকলে একসঙ্গে মাদুরে বস, আমি দেখি।

ভক্তেরা সকলে মাদুরে বসিলে ঠাকুর আনন্দে দেখিতে লাগিলেন ও তাঁহাদের সহিত গল্প করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র সাধনের কথা তুলিলেন।

[নরেন্দ্রাদিকে স্ত্রীলোক নিয়ে সাধন নিষেধ — সন্তানভাব অতি শুদ্ধ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদির প্রতি) — ভক্তিই সার। তাঁকে ভালবাসলে বিবেক বৈরাগ্য আপনি আসে।

নরেন্দ্র — আচ্ছা, স্ত্রীলোক নিয়ে সাধন তন্ত্রে আছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ও-সব ভাল পথ নয়, বড় কঠিন, আর পতন প্রায়ই হয়। বীরভাবে সাধন, দাসীভাবে সাধন, আর মাতৃভাবে সাধন! আমার মাতৃভাব। দাসীভাবও ভাল। বীরভাবে সাধন বড় কঠিন। সন্তানভাব বড় শুদ্ধভাব।

নানাকপন্থী সাধুরা ঠাকুরকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "নমো নারায়ণায়।" ঠাকুর তাঁহাদের আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন।

[ঈশ্বরে সব সম্ভব — Miracles]

ঠাকুর বলিতেছেন, ঈশ্বরের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তাঁর স্বরূপ কেউ মুখে বলতে পারে না। সকলই সম্ভব। দুজন যোগী ছিল, ঈশ্বরের সাধনা করে। নারদ ঋষি যাচ্ছিলেন। একজন পরিচয় পেয়ে বললেন, "তুমি নারায়ণের কাছ থেকে আসছ, তিনি কি করছেন?" নারদ বললেন, "দেখে এলাম, তিনি ছুচের ভিতর দিয়ে উট হাতি প্রবেশ করাচ্ছেন, আবার বার করছেন।" একজন বললে, "তার আর আশ্চর্য কি! তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব।" কিন্তু অপরটি বললে, "তাও কি হতে পারে! তুমি কখনও সেখানে যাও নাই।"

বেলা প্রায় নয়টা। ঠাকুর নিজের ঘরে বসিয়া আছেন। মনোমহন কোন্নগর হইতে সপরিবারে আসিয়াছেন। মনোমোহন প্রণাম করিয়া বলিলেন, "এদের কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছি।" ঠাকুর কুশল প্রশ্ন করিয়া বলিলেন, "আজ ১লা, অগস্ত্য, কলকাতায় যাচ্ছ; কে জানে বাপু!" এই বলিয়া একটু হাসিয়া অন্য কথা কহিতে লাগিলেন।

[নরেন্দ্রকে মগ্ন হইয়া ধ্যানের উপদেশ]

নরেন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুরা স্নান করিয়া আসিলেন। ঠাকুর ব্যগ্র হইয়া নরেন্দ্রকে বলিলেন, “যাও বটতলায় ধ্যান কর গে, আসন দেব?”

নরেন্দ্র ও তাঁহার কয়টি ব্রাহ্মবন্ধু পঞ্চবটীমূলে ধ্যান করিতেছিলেন। বেলা প্রায় সাড়ে দশটা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিয়ৎক্ষণ পরে সেইখানে উপস্থিত; মাস্টারও আসিয়াছেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন —

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি) — ধ্যান করবার সময় তাঁতে মগ্ন হতে হয়। উপর উপর ভাসলে কি জলের নিচে রত্ন পাওয়া যায়?

এই বলিয়া ঠাকুর মধুর স্বরে গান গাহিতে লাগিলেন:

ডুব দে মন কালী বলে। হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু-চার ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম-সামর্থ্যে একডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে।
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শান্তিরূপা মুক্তা ফলে,
তুমি ভক্তি করে কুড়ায়ে পাবে, শিবযুক্তি মতো চাইলে।
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার-লোভে সদাই চলে,
তুমি বিবেক-হলদি গায়ে মেখে যাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।
রতন-মাণিক্য কতপড়ে আছে সেই জলে,
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে, মিলবে রতন ফলে ফলে।

[ব্রাহ্মসমাজ, বক্তৃতা ও সমাজসংস্কার (Social Reforms) — আগে ঈশ্বরলাভ, পরে লোকশিক্ষা প্রদান]

নরেন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণ পঞ্চবটীর চাতাল হইতে অবতরণ করিলেন ও ঠাকুরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুর দক্ষিণাস্য হইয়া নিজের ঘরের দিকে তাঁহাদের সহিত কথা কহিতে কহিতে আসিতেছেন।

ঠাকুর বলিতেছেন, "ডুব দিলে কুমির ধরতে পারে, কিন্তু হলুদ মাখলে কুমির ছোঁয় না। 'হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে' কামাদি ছয়টি কুমির আছে। কিন্তু বিবেক, বৈরাগ্যরূপ হলুদ মাখলে তারা আর তোমাকে ছোঁবে না।

"পাণ্ডিত্য কি লেকচার কি হবে যদি বিবেক-বৈরাগ্য না আসে। ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য; তিনিই বস্তু আর সব অবস্তু; এর নাম বিবেক।

"তাঁকে হৃদয়মন্দিরে আগে প্রতিষ্ঠা কর। বক্তৃতা, লেকচার, তারপর ইচ্ছা হয়তো করো। শুধু ব্রহ্ম ব্রহ্ম বললে কি হবে, যদি বিবেক-বৈরাগ্য না থাকে? ও তো ফাঁকা শঙ্খধ্বনি?

"এক গ্রামে পদ্মলোচন বলে একটি ছোকরা ছিল। লোকে তাকে পোদো পোদো বলে ডাকত। গ্রামে একটি পোড়ো মন্দির ছিল, ভিতরে ঠাকুর-বিগ্রহ নাই — মন্দিরের গায়ে অশ্বত্থগাছ, অন্যান্য গাছপালা হয়েছে। মন্দিরের ভিতরে চামচিকা বাসা করেছে। মেঝেতে ধুলা ও চামচিকার বিষ্ঠা। মন্দিরে লোকজনের আর যাতায়াত নাই।

“একদিন সন্ধ্যার কিছু পরে গ্রামের লোকেরা শঙ্খধ্বনি শুনতে পেলে। মন্দিরের দিক থেকে শাঁখ বাজছে ভোঁ ভোঁ করে। গ্রামের লোকেরা মনে করলে, হয়তো ঠাকুর প্রতিষ্ঠা কেউ করেছে, সন্ধ্যার পর আরতি হচ্ছে। ছেলে, বুড়ো, পুরুষ, মেয়ে — সকলে দৌড়ে দৌড়ে মন্দিরের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত। ঠাকুরদর্শন করবে আর আরতি দেখবে। তাদের মধ্যে একজন মন্দিরের দ্বার আস্তে আস্তে খুলে দেখে, পদ্মলোচন একপাশে দাঁড়িয়ে ভোঁ ভোঁ শাঁখ বাজাচ্ছে। ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হয় নাই — মন্দির মার্জনা হয় নাই — চামচিকার বিষ্ঠা রয়েছে। তখন সে চেঁচিয়া বলছে:

“মন্দিরে তোর নাহিক মাধব!
 পোদো, শাঁখ ফুঁকে তুই করলি গোল!

তায় চামচিকে এগার জনা, দিবানিশি দিচ্ছে থানা —

“যদি হৃদয়মন্দিরে মাধব প্রতিষ্ঠা করতে চাও, যদি ভগবানলাভ করতে চাও, শুধু ভোঁ ভোঁ করে শাঁখ ফুঁকলে কি হবে! আগে চিত্তশুদ্ধি। মন শুদ্ধ হলে ভগবান পবিত্র আসনে এসে বসবেন। চামচিকার বিষ্ঠা থাকলে মাধবকে আনা যায় না। এগার জন চামচিকে একাদশ ইন্দ্রিয় — পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় আর মন। আগে মাধব প্রতিষ্ঠা, তারপর ইচ্ছা হয় বক্তৃতা লেকচার দিও!

“আগে ডুব দাও। ডুব দিয়ে রত্ন তোল, তারপর অন্য কাজ।

“কেউ ডুব দিতে চায় না। সাধন নাই, ভজন নাই, বিবেক-বৈরাগ্য নাই, দু-চারটে কথা শিখেই অমনি লেকচার!

"লোকশিক্ষা দেওয়া কঠিন। ....ভগবানকে দর্শনের পর যদি কেউ তাঁর আদেশ পায়, তাহলে লোকশিক্ষা দিতে পারে।"

[অবিদ্যা স্ত্রী — আন্তরিক ভক্তি হলে সকলে বশে আসে]

কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর উত্তরের বারান্দার পশ্চিমাংশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মণি কাছে দাঁড়াইয়া। ঠাকুর বারবার বলিতেছেন, "বিবেক-বৈরাগ্য না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।" মণি বিবাহ করিয়াছেন, তাই ব্যাকুল হইয়া ভাবিতেছেন, কি হইবে! বয়স ২৮, কলেজে পড়িয়া ইংরেজী লেখাপড়া কিছু শিখিয়াছেন। ভাবিতেছেন, বিবেক-বৈরাগ্য মানে কি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ?

মণি (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — স্ত্রী যদি বলে, আমায় দেখছ না, আমি আত্মহত্যা করব; তাহলে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (গম্ভীরস্বরে) — অমন স্ত্রী ত্যাগ করবে, যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন করে। আত্মহত্যাই করুক, আর যাই করুক।

"যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন দেয়, সে অবিদ্যা স্ত্রী।"

গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া মণি দেওয়ালে ঠেসান দিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। নরেন্দ্রাদি ভক্তগণও ক্ষণকাল অবাক্‌ হইয়া রহিলেন।

ঠাকুর তাঁহাদের সহিত একটু কথা কহিতেছেন, হঠাৎ মণির কাছে আসিয়া একান্তে আস্তে আস্তে বলিতেছেন, "কিন্তু যার ঈশ্বরে আন্তরিক ভক্তি আছে, তার

সকলেই বশে আসে — রাজা, দুষ্ট লোক, স্ত্রী। নিজের আন্তরিক ভক্তি থাকলে স্ত্রীও ক্রমে ঈশ্বরের পথে যেতে পারে। নিজে ভাল হলে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সেও ভাল হতে পারে।”

মণির চিন্তাগ্নিতে জল পড়িল। তিনি এতক্ষণ ভাবিতেছিলেন, আত্মহত্যা করে করুক, আমি কি করব?

মণি (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — সংসারে বড় ভয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি ও নরেন্দ্রাদির প্রতি) — তাই চৈতন্যদেব বলেছিলেন, “শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই সংসারী জীবের কভু গতি নাই।”

(মণির প্রতি একান্তে একদিন বলিয়াছিলেন) — “ঈশ্বরেতে শুদ্ধাভক্তি যদি না হয়, তাহলে কোন গতি নাই। কেউ যদি ঈশ্বরলাভ করে সংসারে থাকে, তার কোন ভয় নাই। নির্জনে মাঝে মাঝে সাধন করে যদি শুদ্ধাভক্তিলাভ করতে পারে, সংসারে থাকলে তার কোন ভয় নাই! চৈতন্যদেবের সংসারী ভক্তও ছিল। তারা সংসারে নামমাত্র থাকত। অনাসক্ত হয়ে থাকত।”

ঠাকুরদের ভোগারতি হইয়া গেল। অমনি নহবত বাজিতে লাগিল। এইবার তাঁহারা বিশ্রাম করিবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আহারে বসিলেন। নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ আজও ঠাকুরের কাছে প্রসাদ পাইবেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ২২শে অক্টোবর 1882/10/22/i

05.6 শ্রীরামকৃষ্ণ ‘বিজয়াদিবসে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। বেলা ৯টা হইবে — ছোট খাটটিতে বিশ্রাম করিতেছেন, মেঝেতে মণি বসিয়া আছেন। তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

আজ বিজয়া, রবিবার, ২২শে অক্টোবর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ, আশ্বিন শুক্লা দশমী তিথি (৬ই কার্তিক, ১২৮৯)। আজকাল রাখাল ঠাকুরের কাছে আছেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ মাঝে মাঝে যাতায়াত করেন। ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল ও হাজরা মহাশয় বাস করিতেছেন। রাম, মনোমহন, সুরেশ, মাস্টার, বলরাম ইঁহারাও প্রায় প্রতি সপ্তাহে — ঠাকুরকে দর্শন করিয়া যান। বাবুরাম সবে দু-একবার দর্শন করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমার পূজার ছুটি হয়েছে?

মণি — আজ্ঞা হাঁ। আমি সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজার দিনে কেশব সেনের বাড়িতে প্রত্যহ গিছলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বল কি গো!

মণি — দুর্গাপূজার বেশ ব্যাখ্যা শুনেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি বল দেখি।

মণি — কেশব সেনের বাড়িতে রোজ সকালে উপাসনা হয়, — দশটা-এগারটা পর্যন্ত। সেই উপাসনার সময় তিনি দুর্গাপূজার ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বললেন, যদি মাকে পাওয়া যায় — যদি মা-দুর্গাকে কেউ হৃদয়মন্দিরে আনতে পারে — তাহলে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, আপনি আসেন। লক্ষ্মী অর্থাৎ ঐশ্বর্য, সরস্বতী অর্থাৎ জ্ঞান, কার্তিক অর্থাৎ বিক্রম, গণেশ অর্থাৎ সিদ্ধি — এ-সব আপনি হয়ে যায় — মা যদি আসেন।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নরেন্দ্রাদি অন্তরঙ্গ]

শ্রীযুক্ত ঠাকুর সকল বিবরণ শুনিলেন ও মাঝে মাঝে কেশবের উপাসনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিতেছেন, তুমি এখানে ওখানে যেও না — এইখানেই আসবে।

“যারা অন্তরঙ্গ তারা কেবল এখানেই আসবে। নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল — এরা আমার অন্তরঙ্গ। এরা সামান্য নয়। তুমি এদের একদিন খাইও! নরেন্দ্রকে তোমার কিরূপ বোধ হয়?”

মণি — আজ্ঞা, খুব ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখ, নরেন্দ্রের কত গুণ — গাইতে, বাজাতে, বিদ্যায়, আবার জিতেন্দ্রিয়, বলেছে বিয়ে করবে না — ছেলেবেলা থেকে ঈশ্বরেতে মন।

ঠাকুর মণির সহিত আবার কথা কহিতেছেন।

[সাকার না নিরাকার — চিন্ময়ী মূর্তি ধ্যান — মাতৃধ্যান]

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমার আজকাল ঈশ্বরচিন্তা কিরূপ হচ্ছে? তোমার সাকার ভাল লাগে — না নিরাকার?

মণি — আজ্ঞা, সাকারে এখন মন যায়ে না। আবার নিরাকারে কিন্তু মন স্থির করতে পারি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখলে? নিরাকারে একেবারে মন স্থির হয় না। প্রথম প্রথম সাকার তো বেশ।

মণি — মাটির এই সব মূর্তি চিন্তা করা?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেন? চিন্ময়ী মূর্তি।

মণি — আজ্ঞা, তাহলেও তো হাত-পা ভাবতে হবে? কিন্তু এও ভাবছি যে, প্রথমাবস্থায় রূপ চিন্তা না করলে মন স্থির হবে না — আপনি বলে দিয়েছেন। আচ্ছা, তিনি তো নানারূপ ধরতে পারেন। নিজের মার রূপ কি ধ্যান করতে পারা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ তিনি (মা) গুরু — আর ব্রহ্মময়ী স্বরূপা।

মণি চুপ করিয়া আছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন —

মণি — আজ্ঞা, নিরাকারে কিরকম দেখা যায়? — ও কি বর্ণনা করা যায় না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (একটু চিন্তা করিয়া) — ও কিরূপ জানো? —

এই কথা বলিয়া ঠাকুর একটু চুপ করিলেন। তৎপরে সাকার-নিরাকার দর্শন কিরূপ অনুভূতি হয়, একটি কথা বলিয়া দিলেন। আবার ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি জানো, এটি ঠিক বুঝতে সাধন চাই। ঘরের ভিতরের রত্ন যদি দেখতে চাও, আর নিতে চাও, তাহলে পরিশ্রম করে চাবি এনে দরজার তালা খুলতে হয়। তারপর রত্ন বার করে আনতে হয়। তা না হলে তালা দেওয়া ঘর — দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ভাবছি, "ওই আমি দরজা খুললুম, সিন্দুকের তালা ভাঙলুম — ওই রত্ন বার করলুম।" শুধু দাঁড়িয়ে ভাবলে তো হয় না। সাধন করা চাই।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ২২শে অক্টোবর 1882/10/22/ii

05.7 ঠাকুর অনন্ত ও অনন্ত ঈশ্বর — সকলই পন্থা — শ্রীবৃন্দাবন-দর্শন

[জ্ঞানীর মতে অসংখ্য অবতার — কুটীচক — তীর্থ কেন]

শ্রীরামকৃষ্ণ — জ্ঞানীরা নিরাকার চিন্তা করে। তারা অবতার মানে না। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করছেন, তুমি পূর্ণব্রহ্ম; কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, আমি পূর্ণব্রহ্ম কি না দেখবে এস। এই বলে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে বললেন, তুমি কি দেখছ? অর্জুন বললে, আমি এক বৃহৎ গাছ দেখছি, — তাতে থোলো থোলো কালো জামের মতো ফল ফলে রয়েছে। কৃষ্ণ বললেন, আরও কাছে এস দেখ দেখি ও থোলো থোলো ফল নয় — থোলো থোলো কৃষ্ণ অসংখ্য ফলে রয়েছে — আমার মতো। অর্থাৎ সেই পূর্ণব্রহ্মরূপ থেকে অসংখ্য অবতার হচ্ছে যাচ্ছে।

“কবীর দাসের নিরাকারের উপর খুব ঝোঁক ছিল। কৃষ্ণের কথায় কবীর দাস বলত, ওঁকে কি ভজব? — গোপীরা হাততালি দিত আর উনি বানর নাচ নাচতেন! (সহাস্যে) আমি সাকারবাদীর কাছে সাকার, আবার নিরাকারবাদীর কাছে নিরাকার।”

মণি (সহাস্যে) — যাঁর কথা হচ্ছে তিনিও (ঈশ্বর) যেমন অনন্ত, আপনিও তেমনি অনন্ত! — আপনার অন্ত পাওয়া যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তুমি বুঝে ফেলেছ! — কি জানো — সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়। — সব পথ দিয়ে চলে আসতে হয়। খেলার ঘুঁটি সব ঘর না

পার হলে কি চিকে উঠে? — ঘুঁটি যখন চিকে উঠে কেউ তাকে ধরতে পারে না।

মণি — আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — যোগী দুই প্রকার, — বহূদক আর কুটীচক। যে সাধু অনেক তীর্থ করে বেড়াচ্ছে — যার মনে এখনও শান্তি হয় নাই, তাকে বহূদক বলে। যে-যোগী সব ঘুরে মন স্থির করেছে, যার শান্তি হয়ে গেছে — সে এক জায়গায় আসন করে বসে — আর নড়ে না। সেই এক স্থানে বসেই তার আনন্দ। তার তীর্থে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন করে না যদি সে তীর্থে যায়, সে কেবল উদ্দীপনের জন্য।

“আমায় সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়েছিল — হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত এ-সব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে। দেখলাম, সেই এক ঈশ্বর — তাঁর কাছেই সকলি আসছে — ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।

“তীর্থে গেলাম তা এক-একবার ভারী কষ্ট হত। কাশীতে সেজোবাবুদের বৈঠকখানায় গিয়েছিলাম। সেখানে দেখি তারা বিষয়ের কথা কচ্ছে! — টাকা, জমি, এই সব কথা। কথা শুনে আমি কাঁদতে লাগলাম। বললাম, মা, কোথায় আনলি! দক্ষিণেশ্বরে যে আমি বেশ ছিলাম। পইরাগে দেখলাম, সেই পুকুর, সেই দুর্বা, সেই গাছ, সেই তেতুঁল পাতা! কেবল তফাত পশ্চিমে লোকের ভুষির মতো বাহ্য। (ঠাকুর ও মণির হাস্য)

“তবে তীর্থে উদ্দীপন হয়ে বটে। মথুরবাবুর সঙ্গে বৃন্দাবনে গেলাম। মথুরবাবুর বাড়ির মেয়েরাও ছিল — হৃদেও ছিল। কালীয়দমন ঘাট দেখবামাত্রই উদ্দীপন হত — আমি বিহ্বল হয়ে যেতাম! — হৃদে আমায় যমুনার সেই ঘাটে ছেলেটির মতন নাওয়াত।

“যমুনার তীরে সন্ধ্যার সময়ে বেড়াতে যেতাম। যমুনার চড়া দিয়ে সেই সময় গোষ্ঠ হতে গরু সব ফিরে আসত। দেখবামাত্র আমার কৃষ্ণের উদ্দীপন হল, উন্মত্তের ন্যায় আমি দৌড়তে লাগলাম — ‘কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই’ এই বলতে বলতে!

“পালকি করে শ্যামকুণ্ড রা ধাকুণ্ডের পথে যাচ্ছি, গোবর্ধন দেখতে নামলাম, গোবর্ধন দেখবামাত্রই একেবারে বিহ্বল, দৌড়ে গিয়ে গোবর্ধনের উপরে দাঁড়িয়ে পড়লুম। — আর বাহ্যশূন্য হয়ে গেলাম। তখন ব্রজবাসীরা গিয়ে আমায় নামিয়া আনে। শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড পথে সেই মাঠ, আর গাছপালা, পাখি, হরিণ — এই সব দেখে বিহ্বল হয়ে গেলাম। চক্ষের জলে কাপড় ভিজে যেতে লাগল। মনে হতে লাগল, কৃষ্ণ রে, সবই রয়েছে, কেবল তোকে দেখতে পাচ্ছি না। পালকির ভিতরে বসে, কিন্তু একবার একটি কইবার শক্তি নাই — চুপ করে বসে! হৃদে পালকির পিছনে আসছিল। বেয়ারাদের বলে দিল ‘খুব হুঁশিয়ার।’

“গঙ্গামায়ী বড় যত্ন করত। অনেক বয়স। নিধুবনের কাছে কুটিরে একলা থাকত। আমার অবস্থা আর ভাব দেখে, বলত — ইনি সাক্ষাৎ রাধা দেহধারণ করে এসেছেন। আমায় ‘দুলালী’ বলে ডাকত! তাকে পেলে আমার খাওয়া-দাওয়া,

বাসায় ফিরে যাওয়া সব ভুল হয়ে যেত। হৃদে এক-একদিন বাসা থেকে খাবার এনে খাইয়ে যেত — সেও খাবার জিনিস তয়ের করে খাওয়াত।

“গঙ্গামায়ীর ভাব হত। তার ভাব দেখবার জন্য লোকের মেলা হত। ভাবেতে একদিন হৃদের কাঁধে চড়েছিল।

“গঙ্গামায়ীর কাছ থেকে দেশে চলে আসবার আমার ইচ্ছা ছিল না। সব ঠিক-ঠাক, আমি সিদ্ধ চালের ভাত খাব; — গঙ্গামায়ীর বিছানা ঘরের এদিকে হবে, আমার বিছানা ওদিকে হবে। সব ঠিক-ঠাক। হৃদে তখন বললে, তোমার এত পেটের অসুখ — কে দেখবে? গঙ্গামায়ী বললে, কেন, আমি দেখব, আমি সেবা করব। হৃদে একহাত ধরে টানে আর গঙ্গামায়ী একহাত ধরে টানে — এমন সময় মাকে মনে পড়ল! — মা সেই একলা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ির নবতে। আর থাকা হল না। তখন বললাম, না, আমায় যেতে হবে!

“বৃন্দাবনের বেশ ভাবটি। নতুন যাত্রী গেলে ব্রজ বালকেরা বলতে থাকে, ‘হরি বোলো, গাঁঠরী খোলো!’

বেলা এগারটার পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মা-কালীর প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। মধ্যাহ্নে একটু বিশ্রাম করিয়া বৈকালে আবার ভক্তদের সঙ্গে কথাবার্তায় কাটাইতেছেন — কেবল মধ্যে মধ্যে এক-একবার প্রণবধ্বনি বা “হা চৈতন্য” এই নাম উচ্চারণ করিতেছেন।

ঠাকুরবাড়িতে সন্ধ্যার আরতি হইল। আজ বিজয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ কালীঘরে আসিয়াছেন, মাকে প্রণামের পর ভক্তেরা তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

রামলাল মা-কালীর আরতি করিয়াছেন। ঠাকুর রামলালকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “ও রামনেলো! কই রে!”

মা-কালীর কাছে সিদ্ধি নিবেদন করা হইয়াছে। ঠাকুর সেই প্রসাদ স্পর্শ করিবেন — সেইজন্য রামলালকে ডাকিতেছেন। আর আর ভক্তদের সকলকে একটু দিতে বলিতেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ২৪শে অক্টোবর 1882/10/24

05.8 দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে বলরামাদি সঙ্গে — বলরামকে শিক্ষা

[লক্ষণ — সত্যকথা — সর্বধর্মসমন্বয় — “কামিনী-কাঞ্চনই মায়া”]

মঙ্গলবার অপরাহ্ন, ২৪শে অক্টোবর (৮ই কার্তিক, ১২৮৯, শুক্লা ত্রয়োদশী)। বেলা ৩টা-৪টা হইবে। ঠাকুর খাবারের তাকের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। বলরাম ও মাস্টার কলিকাতা হইতে একগাড়িতে আসিয়াছেন ও প্রণাম করিতেছেন। প্রণাম করিয়া বসিলে ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, তাকের উপরে খাবার নিতে গিছিলাম, খাবারে হাত দিয়েছি, এমন সময় টিকটিকি পড়েছে, আর অমনি ছেড়ে দিইছি। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ গো, ও-সব মানতে হয়। এই দেখ না রাখালের অসুখ, আমারও হাত-পা কামড়াচ্ছে। হল কি জানো? আমি সকালে বিছানা থেকে উঠবার সময় রাখাল আসছে মনে করে অমুকের মুখ দেখে ফেলেছি! (সকলের হাস্য) হাঁ গো, লক্ষণ দেখতে হয়। সেদিন নরেন্দ্র এক কানা ছেলে এনেছিল, তার বন্ধু, চক্ষুটা সব কানা নয়; যা হোক, আমি ভাবলুম এ-আবার কি ঘটালে!

"আর একজন আসে, আমি তার জিনিস খেতে পারি না। সে আফিসে কর্ম করে, তার ২০্ টাকা মাহিনা। আর ২০্ টাকা কি মিথ্যা (bill) লিখিয়ে পায়। মিথ্যাকথা কয় বলে সে এলে বড় কথা কই না। হয়তো দু-চারদিন আফিসে গেল না, এইখানে পড়ে রইল। কি জানো, মতলব যে, যদি কারুকে বলে কয়ে দেয় তাহলে অন্য জায়গায় কর্ম কাজ হয়।"

বলরামের বংশ পরম বৈষ্ণববংশ। বলরামের পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন — পরম বৈষ্ণব। মাথায় শিখা, গলায় তুলসীর মালা, আর হস্তে সর্বদাই হরিনামের মালা, জপ করিতেছেন। ইহাদের উড়িষ্যায় অনেক জমিদারি আছে। আর কোঠরে, শ্রীবৃন্দাবনে ও অন্যান্য অনেক স্থানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহের সেবা আছে ও অতিথিশালা আছে। বলরাম নূতন আসিতেছেন, ঠাকুর গল্পচ্ছলে তাঁহাকে নানা উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সেদিন অমুক এসেছিল; শুনেছি নাকি ওই কালো মাগ্‌টার গোলাম! — ঈশ্বরকে কেন দর্শন হয় না? কামিনী-কাঞ্চন মাঝে আড়াল হয়ে রয়েছে বলে। আর তোমার সম্মুখে কি করে সেদিন ও-কথাটা বললে যে, আমার

বাবার কাছে একজন পরমহংস এসেছিলেন, বাবা তাঁকে কুঁকড়ো রেঁধে খাওয়ালেন! (বলরামের হাস্য) “আমার অবস্থা” এখন মাছের ঝোল মার প্রসাদ হলে একটু খেতে পারি। মার প্রসাদ মাংস এখন পারি না, — তবে আঙুলে করে একটু চাখি, পাছে মা রাগ করেন। (সকলের হাস্য)

[পূর্বকথা — বর্ধমানপথে — দেশযাত্রা — নকুড় আচার্যের গান — শ্রবণ]

“আচ্ছা আমার একি অবস্থা বল দেখি। ও-দেশে যাচ্ছি বর্ধমান থেকে নেমে, আমি গরুর গাড়িতে বসে — এমন সময়ে ঝড়বৃষ্টি। আবার কোত্থেকে লোক এসে জুটল। আমার সঙ্গের লোকেরা বললে, এরা ডাকাত! — আমি তখন ঈশ্বরের নাম করতে লাগলাম। কিন্তু কখন রাম রাম বলছি, কখন কালী কালী, কখন হনুমান হনুমান — সবরকমই বলছি, এ কিরকম বল দেখি।”

ঠাকুর এই কথা কি বলিতেছেন যে, এক ঈশ্বর তাঁর অসংখ্য নাম, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বা সম্প্রদায়ের লোক মিথ্যা বিবাদ করিয়া মরে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের প্রতি) — কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। ওর ভিতর অনেকদিন থাকলে হুঁশ চলে যায় — মনে হয় বেশ আছি। মেথর গুয়ের ভাঁড় বয় — বইতে বইতে আর ঘেন্না থাকে না। ঈশ্বরের নামগুণকীর্তন করা অভ্যাস করলেই ক্রমে ভক্তি হয়।

(মাস্টারের প্রতি) — “ওতে লজ্জা করতে নাই। ‘লজ্জা, ঘৃণা, ভয় — তিন থাকতে নয়।’

“ও-দেশে বেশ কীর্তন গান হয় — খোল নিয়ে কীর্তন। নকুড় আচার্যের গান চমৎকার! তোমাদের বৃন্দাবনে সেবা আছে?”

বলরাম — আজ্ঞে হাঁ। একটি কুঞ্জ আছে — শ্যামসুন্দরের সেবা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি বৃন্দাবনে গেছলাম। নিধুবন বেশ স্থানটি।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c6 ৬ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নৌকাবিহার, আনন্দ ও কথোপকথন

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ২৭শে অক্টোবর 1882/10/27/i

06.1 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ — ‘সমাধিমন্দিরে’

আজ কোজাগর লক্ষ্মীপূজা। শুক্রবার ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির সেই পূর্বপরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। বিজয় (গোস্বামী) ও হরলালের সহিত কথাবার্তা কহিতেছেন। একজন আসিয়া বলিলেন, কেশব সেন জাহাজে করিয়া ঘাটে উপস্থিত। কেশবের শিষ্যেরা প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, জাহাজ এসেছে, আপনাকে যেতে হবে, চলুন একটু বেড়িয়ে আসবেন; কেশববাবু জাহাজে আছেন, আমাদের পাঠালেন।"

বেলা ৪টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর নৌকা করিয়া জাহাজে উঠিয়াছেন। সঙ্গে বিজয়। নৌকায় উঠিয়াই বাহ্যশূন্য! সমাধিস্থ!

মাস্টার জাহাজে দাঁড়াইয়া সেই সমাধি-চিত্র দেখিতেছেন! তিনি বেলা তিনটার সময় কেশবের জাহাজে চড়িয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। বড় সাধ, দেখিবেন ঠাকুর ও কেশবের মিলন ও তাঁহাদের আনন্দ, শুনিবেন তাঁহাদের কথাবার্তা। কেশব তাঁহার সাধুচরিত্র ও বক্তৃতাবলে মাস্টারের ন্যায় অনেক বঙ্গীয় যুবকের মন হরণ করিয়াছেন। অনেকেই তাঁহাকে পরম আত্মীয়বোধে হৃদয়ের ভালবাসা দিয়াছেন। কেশব ইংরেজী পড়া লোক, ইংরেজী দর্শন সাহিত্য পড়িয়াছেন। তিনি আবার দেবদেবীপূজাকে অনেকবার পৌত্তলিকতা বলিয়াছেন। এইরূপ লোক শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন, আবার মাঝে দর্শন করিতে আসেন; এটি বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। তাঁহাদের মনের মিল কোন্‌খানে বা কেমন করিয়া হইল — এ-রহস্য ভেদ করিতে মাস্টারাদি অনেকেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন। ঠাকুর নিরাকারবাদী বটেন, কিন্তু আবার সাকারবাদী। ব্রহ্মের চিন্তা করেন, আবার দেবদেবী-প্রতিমার সম্মুখে ফুল-চন্দন দিয়া পূজা ও প্রেমে

মাতোয়ারা হইয়া নৃত্যগীত করেন। খাট-বিছানায় বসেন, লালপেড়ে কাপড়, জামা, মোজা, জুতা পরেন। কিন্তু সংসার করেন না। ভাব সমস্ত সন্ন্যাসীর; তাই লোকে পরমহংস বলে। এদিকে কেশব নিরাকারবাদী, স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসার করেন, ইংরেজীতে লেকচার দেন, সংবাদপত্রে লেখেন, বিষয়কর্ম করেন।

সমবেত কেশব-প্রমুখ ব্রাহ্মভক্তগণ জাহাজ হইতে ঠাকুরবাড়ির শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। জাহাজের পূর্বদিকে অনতিদূরে বাঁধা ঘাট ও ঠাকুরবাড়ির চাঁদনি। আরোহীদের বামপার্শ্বে চাঁদনির উত্তরে দ্বাদশ শিবমন্দিরের ক্রমান্বয়ে ছয় মন্দির, দক্ষিণপার্শ্বেও ছয় শিবমন্দির। শরতের নীল আকাশ চিত্রপটে ভবতারিণীর মন্দিরের চূড়া ও উত্তরদিকে পঞ্চবটী ও ঝাউগাছের মাথাগুলি দেখা যাইতেছে। বকুলতলার নিকট একটি ও কালীবাড়ির দক্ষিণ-প্রান্তভাগে আর একটি নহবতখানা। দুই নহবতখানার মধ্যবর্তী উদ্যানপথ, ধারে ধারে সারি সারি পুষ্পবৃক্ষ। শরতের নীলাকাশের নীলিমা জাহ্নবীজলে প্রতিভাসিত হইতেছে। বহির্জগতে কোমলভাব, ব্রাহ্মভক্তদের হৃদয়মধ্যে কোমলভাব। ঊর্ধ্বে সুন্দর সুনীল অনন্ত আকাশ, সম্মুখে সুন্দর ঠাকুরবাড়ি, নিম্নে পবিত্রসলিলা গঙ্গা, যাঁহার তীরে আর্য ঋষিগণ ভগবানের চিন্তা করিয়াছেন। আবার আসিতেছেন একটি মহাপুরুষ, সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম। এরূপ দর্শন মানুষের কপালে সর্বদা ঘটে না। এরূপ স্থলে, সমাধিস্থ মহাপুরুষে কাহার ভক্তির না উদ্রেক হয়, কোন্ পাষাণহৃদয় না বিগলিত হয়!

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ২৭শে অক্টোবর 1882/10/27/ii

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি ।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যান্যানি সংযাতি নবানি দেহী ।।

[গীতা — ২/২২]

06.2 সমাধিমন্দিরে — আত্মা অবিনশ্বর — পওহারী বাবা

নৌকা আসিয়া লাগিল। সকলেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত। ভিড় হইয়াছে। ঠাকুরকে নিরাপদে নামাইবার জন্য কেশব শশব্যস্ত হইলেন। অনেক কষ্টে হুঁশ করাইয়া ঘরের ভিতর লইয়া যাওয়া হইতেছে। এখনও ভাবস্থ — একজন ভক্তের উপর ভর দিয়া আসিতেছেন। পা নড়িতেছে মাত্র। ক্যাবিনঘরে প্রবেশ করিলেন। কেশবাদি ভক্তেরা প্রণাম করিলেন, কিন্তু কোন হুঁশ নাই। ঘরের মধ্যে একটি টেবিল, খানকতক চেয়ার। একখানি চেয়ারে ঠাকুরকে বসানো হইল, কেশব একখানিতে বসিলেন। বিজয় বসিলেন। অন্যান্য ভক্তেরা যে যেমন পাইলেন, মেঝেতে বসিলেন। অনেক লোকের স্থান হইল না। তাঁহারা বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন। ঠাকুর বসিয়া আবার সমাধিস্থ। সম্পূর্ণ বাহ্যশূন্য! সকলে একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

কেশব দেখিলেন, ঘরের মধ্যে অনেক লোক, ঠাকুরের কষ্ট হইতেছে। বিজয় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়াছেন ও কন্যার বিবাহ ইত্যাদি কার্যের বিরুদ্ধে অনেক বক্তৃতা দিয়াছেন, তাই বিজয়কে দেখিয়া কেশব একটু অপ্রস্তুত। কেশব আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, ঘরের জানালা খুলিয়া দিবেন।

ব্রাহ্মভক্তেরা একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। এখনও ভাব পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। ঠাকুর আপনা-আপনি অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন, "মা, আমায় এখানে আনলি কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা করতে পারব?"

ঠাকুর কি দেখিতেছেন যে, সংসারী ব্যক্তিরা বেড়ার ভিতরে বদ্ধ, বাহিরে আসিতে পারিতেছে না, বাহিরের আলোকও দেখিতে পাইতেছে না — সকলের বিষয়কর্মে হাত-পা বাঁধা। কেবল বাড়ির ভিতরের জিনিসগুলি দেখিতে পাইতেছে আর মনে করিতেছে যে, জীবনের উদ্দেশ্য কেবল দেহ-সুখ ও বিষয়কর্ম, কামিনী ও কাঞ্চন? তাই কি ঠাকুর এমন কথা বলিলেন, "মা আমায় এখানে আনলি কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা করতে পারব?"

ঠাকুরের ক্রমে বাহ্যজ্ঞান হইতেছে। গাজীপুরের নীলমাধববাবু ও একজন ব্রাহ্মভক্ত পওহারী বাবার কথা পাড়িলেন।

একজন ব্রাহ্মভক্ত (ঠাকুরের প্রতি) — মহাশয়, এঁরা সব পওহারী বাবাকে দেখেছেন। তিনি গাজীপুরে থাকেন। আপনার মতো আর-একজন।

ঠাকুর এখনও কথা কহিতে পারিতেছেন না। ঈশৎ হাস্য করিলেন।

ব্রাহ্মভক্ত (ঠাকুরের প্রতি) — মহাশয়, পওহারী বাবা নিজের ঘরে আপনার ফটোগ্রাফ রেখে দিয়েছেন।

ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া, নিজের দেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, ‘খোলটা’!

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ২৭শে অক্টোবর 1882/10/27/iii

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে ।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ।।

[গীতা — ৫/৫]

06.3 জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের সমন্বয়

“বালিশ ও তার খোলটা” — দেহী ও দেহ। ঠাকুর কি বলিতেছেন যে, দেহ বিনশ্বর, থাকিবে না? দেহের ভিতর যিনি দেহী তিনিই অবিনাশী, অতএব দেহের ফটোগ্রাফ লইয়া কি হইবে? দেহ অনিত্য জিনিস, এর আদর করে কি হবে? বরং

যে ভগবান অন্তর্যামী মানুষের হৃদয় মধ্যে বিরাজ করিতেছেন তাঁহারই পূজা করা উচিত?

ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন —

“তবে একটি কথা আছে। ভক্তের হৃদয় তাঁর অবস্থান। তিনি সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্তহৃদয়ে বিশেষরূপে আছেন। যেমন কোন জমিদার তার জমিদারির সকল স্থানেই থাকিতে পারে। কিন্তু তিনি তাঁর অমুক বৈঠকখানায় প্রায়ই থাকেন, এই লোকে বলে। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।” (সকলের আনন্দ)

[এক ঈশ্বর — তাঁর ভিন্ন নাম — জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত]

“জ্ঞানীরা যাকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে, আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান বলে।

“একই ব্রাহ্মণ। যখন পূজা করে, তার নাম পূজারী; যখন রাঁধে তখন রাঁধুনী বামুন। যে জ্ঞানী, জ্ঞানযোগ ধরে আছে, সে নেতি নেতি — এই বিচার করে। ব্রহ্ম এ নয়, ও নয়; জীব নয়, জগৎ নয়। বিচার করতে করতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; নামরূপ এ-সব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্ম কি যে, তা মুখে বলা যায় না; তিনি যে ব্যক্তি (Personal God) তাও বলবার জো নাই।

“জ্ঞানীরা ওইরূপ বলে — যেমন বেদান্তবাদীরা। ভক্তেরা কিন্তু সব অবস্থাই লয়। জাগ্রত অবস্থাও সত্য বলে — জগৎকে স্বপ্নবৎ বলে না। ভক্তেরা বলে, এই

জগৎ ভগবানের ঐশ্বর্য। আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, পর্বত, সমুদ্র, জীবজন্তু — এ-সব ঈশ্বর করেছেন। তাঁরই ঐশ্বর্য। তিনি অন্তরে হৃদয়মধ্যে আবার বাহিরে। উত্তম ভক্ত বলে, তিনি নিজে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব — জীবজগৎ হয়েছেন। ভক্তের সাধ যে চিনি খায়, চিনি হতে ভালবাসে না। (সকলের হাস্য)

“ভক্তের ভাব কিরূপ জানো? হে ভগবান, তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস’, ‘তুমি মা, আমি তোমার সন্তান’ , আবার ‘তুমি আমার পিতা বা মাতা’। ‘তুমি পূর্ণ, আমি তোমার অংশ।’ ভক্ত এমন কথা বলতে ইচ্ছা করে না যে ‘আমি ব্রহ্ম।”

“যোগীও পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করতে চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য — জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ। যোগী বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে লয় ও পরমাত্মাতে মন স্থির করতে চেষ্টা করে। তাই প্রথম অবস্থায় নির্জনে স্থির আসনে অনন্যমন হয়ে ধ্যানচিন্তা করে।

“কিন্তু একই বস্তু। নাম-ভেদমাত্র। যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, ভক্তের ভগবান।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ২৭শে অক্টোবর 1882/10/27/iv

ত্বমেব সূক্ষ্মা ত্বং স্থূলা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ।

নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি ।।

[মহানির্বাণতন্ত্র, চতুর্থোল্লাস, ১৫]

06.4 বেদ ও তন্ত্রের সমন্বয় — আদ্যাশক্তির ঐশ্বর্য

এদিকে আগ্নেয়পোত কলিকাতার অভিমুখে চলিতেছে। ঘরের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে যাঁহারা দর্শন ও তাঁহার অমৃতময়ী কথা শ্রবণ করিতেছেন তাঁহারা জাহাজ চলিতেছে কিনা, এ-কথা জানিতেও পারিলেন না। ভ্রমর পুষ্পে বসিলে আর কি ভনভন করে!

ক্রমে পোত দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইল। সুন্দর দেবালয়ের ছবি দৃশ্যপটের বহির্ভূত হইল। পোতচক্রবিক্ষুব্ধ নীলাভ গঙ্গাবারি তরঙ্গায়িত ফেনিল কল্লোলপূর্ণ হইতে লাগিল। ভক্তদের কর্ণে সে কল্লোল আর পোঁছিল না। তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন, — সহাস্যবদন, আনন্দময়, প্রেমানুরঞ্জিত নয়ন, প্রিয়দর্শন অদ্ভুত এক যোগী! তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন, সর্বত্যাগী একজন প্রেমিক বৈরাগী! ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না। ঠাকুরের এদিকে কথা চলিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, জীব, জগৎ — এ-সব শক্তির খেলা। বিচার করতে গেলে, এ-সব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু; শক্তিও স্বপ্নবৎ, অবস্তু।

“কিন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হলে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে জাবার জো নাই। ‘আমি ধ্যান করছি’, ‘আমি চিন্তা করছি’ — এ-সব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্যের মধ্যে।

“তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, একে মানলেই আর-একটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি; — অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না; আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না; সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না।

“দুধ কেমন? না, ধোবো ধোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না। আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না।

“তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে১ ছেড়ে লীলা, লীলাকে২ ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না!

“আদ্যাশক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী! একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয় — সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোন কাজ করছেন না — এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি নাম-রূপভেদ।

“যেমন ‘জল’ ‘ওয়াটার’ ‘পানি’। এক পুকুরে তিন-চার ঘাট; একঘাটে হিন্দুরা জল খায়, তারা বলে ‘জল’। একঘাটে মুসলমানেরা জল খায়, তারা বলে

পানি'। আর-এক ঘাটে ইংরাজেরা জল খায়, তারা 'ওয়াটার'। তিন-ই এক, কেবল নামে তফাত। তাঁকে কেউ বলছে 'আল্লা'; কেউ 'গড্'; কেউ বলছে 'ব্রহ্ম'; কেউ 'কালী'; কেউ বলছে রাম, হরি, যীশু, দুর্গা।"

কেশব (সহাস্যে) — কালী কতভাবে লীলা করছেন, সেই কথাগুলি একবার বলুন।

[কেশবের সহিত কথা — মহাকালী ও সৃষ্টি প্রকরণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই; চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না; নিবিড় আঁধার; তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী — মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন।

"শ্যামাকালীর অনেকটা কোমল ভাব — বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থবাড়িতে তাঁরই পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভুমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয় — রক্ষাকালীর পূজা করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহারমূর্তি। শব, শিবা, ডাকিনী, যোগিনী মধ্যে শ্মশানের উপর থাকেন। রুধিরদারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নীর কছে যেমন একটা ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নী পাঁচরকম জিনিস তুলে রাখে। (কেশবের ও সকলের হাস্য)

(সহাস্যে) — “হ্যাঁ গো! গিন্নীদের ওইরকম একটা হাঁড়ি থাকে। ভিতরে সমুদ্রের ফেনা, নীল বড়ি, ছোট-ছোট পুঁটলি বাঁধা শশাবিচি, কুমড়াবিচি, লাউবিচি — এই সব রাখে, দরকার হলে বার করে। মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টি-নাশের পর ওইরকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন। সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন! জগৎপ্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে ‘ঊর্ণনাভির’ কথা; মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা ভিতর থেকে জাল বার করে, আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর জগতের আধার আধেয় দুই।

[কালীব্রহ্ম — কালী নির্গুণা ও সগুণা]

“কালী কি কালো? দূরে তাই কালো, জানতে পারলে কালো নয়।

“আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে দেখ, কোন রঙ নাই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখ, কোন রঙ নাই।”

এই কথা বলিয়ে প্রেমোন্মত্ত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ গান ধরিলেন:

মা কি আমার কালো রে ।
কালোরূপ দিগম্বরী, হৃদ্‌পদ্ম করে আলো রে ।।

১ The Absolute.

২ The Relative Phenomenal World.

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ২৭শে অক্টোবর 1882/10/27/v

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌ ।।

[গীতা — ৭।১৩]

06.5 এ সংসার কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবাদির প্রতি) — বন্ধন আর মুক্তি — দুয়ের কর্তাই তিনি। তাঁর মায়াতে সংসারী জীব কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ, আবার তাঁর দয়া হলেই মুক্ত। তিনি "ভববন্ধনের বন্ধনহারিণী তারিণী"।

এই বলিয়া গন্ধর্বনিন্দিতকন্ঠে রামপ্রসাদের গান গাহিতেছেন:

শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ি (ভবসংসার বাজার মাঝে)।

(ওই যে) আশা-বায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি ।।

কাক গণ্ডি মণ্ডি গাঁথা, পঞ্জরাদি নানা নাড়ী ।

ঘুড়ি স্বগুণে নির্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি ।।

বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি ।

ঘুড়ি লক্ষের দুটা-একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত-চাপড়ি ।।

প্রসাদ বলে, দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি ।

ভবসংসার সমুদ্রপারে পড়বে গিয়ে তাড়াতাড়ি ।।

“তিনি লীলাময়ী! এ-সংসার তাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী। লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন।”

ব্রাহ্মভক্ত — মহাশয়, তিনি তো মনে করলে সকলকে মুক্ত করতে পারেন। কেন তবে আমাদের সংসারে বদ্ধ করে রেখেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা যে, তিনি এইসব নিয়ে খেলা করেন। বুড়ীকে আগে থাকতে ছুঁলে দৌড়াদৌড়ি করতে হয় না। সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে, খেলা কেমন করে হয়? সকলেই ছুঁয়ে ফেললে বুড়ি অসন্তুষ্ট হয়। খেলা চললে বুড়ীর আহ্লাদ। তাই “লক্ষের দুটো-একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত-চাপড়ি।” (সকলের আনন্দ)

“তিনি মনকে আঁখি ঠেরে ইশারা করে বলে দিয়েছেন, ‘যা, এখন সংসার করগে যা।’ মনের কি দোষ? তিনি যদি আবার দয়া করে মনকে ফিরিয়া দেন, তাহলে বিষয়বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি হয়। তখন আবার তাঁর পাদপদ্মে মন হয়।”

ঠাকুর সংসারীর ভাবে মার কাছে অভিমান করে গাইতেছেন:

আমি ওই খেদ খেদ করি ।
তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি ।।
মনে করি তোমার নাম করি, কিন্তু সময়ে পাসরি ।
আমি বুঝেছি জেনেছি, আশয় পেয়েছি এ-সব তোমারি চাতুরী ।।

কিছু দিলে না, পেলে না, নিলে না, খেলে না, সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াতাম তোমারি।।
যশ, অপযশ, সুরস, কুরস সকল রস তোমারি।
(ওগো) রসে থেকে রসভঙ্গ, কেন কর রসেশ্বরী।।
প্রসাদ বলে, মন দিয়েছ, মনেরি আঁখি ঠারি।
(ওমা) তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি-পোড়া, মিষ্টি বলে ঘুরি।।

"তাঁরই মায়াতে ভুলে মানুষ সংসারী হয়েছে। 'প্রসাদ বলে মন দিয়েছে, মনেরি আঁখি ঠারি'।"

[কর্মযোগ সম্বন্ধে শিক্ষা — সংসার ও নিষ্কামকর্ম]

ব্রাহ্মভক্ত — মহাশয়, সব ত্যাগ না করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — নাগো! তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন? তোমরা রসে-বসে বেশ আছ। সা-রে-মা-তে! (সকলের হাস্য) তোমরা বেশ আছ। নক্স খেলা জানো? আমি বেশি কাটিয়ে জ্বলে গেছি। তোমরা খুব সেয়ানা। কেউ দশে আছো; কেউ ছয়ে আছো; কেউ পাঁচে আছো। বেশি কাটাও নাই; তাই আমার মতো জ্বলে যাও নাই। খেলা চলছে — এ তো বেশ। (সকলের হাস্য)

"সত্য বলছি, তোমরা সংসার করছ এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হলে হবে না। একহাতে কর্ম কর, আর-একহাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক। কর্ম শেষ হলে দুইহাতে ঈশ্বরকে ধরবে।

“মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যে-রঙে ছোপাবে সেই রঙে ছুপবে। যেমন ধোপাঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজ রঙে ছোপাও সবুজ। যে-রঙে ছোপাও সেই রঙেই ছুপবে। দেখ না, যদি একটু ইংরেজী পড়, তো অমনি মুখে ইংরেজী কথা এসে পড়ে। ফুট-ফাট, ইট-মিট্। (সকলের হাস্য) আবার পায়ে বুটজুতা, শিস দিয়ে গান করা; এই সব এসে জুটবে। আবার যদি পণ্ডিত সংস্কৃত পড়ে অমনি শোলোক ঝাড়বে। মনকে যদি কুসঙ্গে রাখ তো সেরকম কথাবার্তা, চিন্তা হয়ে যাবে। যদি ভক্তের সঙ্গে রাখ, ঈশ্বরচিন্তা, হরি কথা — এই সব হবে।

“মন নিয়েই সব। একপাশে পরিবার, একপাশে সন্তান। একজনকে একভাবে, সন্তানকে আর-একভাবে আদর করে। কিন্তু একই মন।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ২৭শে অক্টোবর 1882/10/27/vi

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ।।

[গীতা — ১৮। ৬৬]

06.6 ব্রাহ্মদিগকে উপদেশ — খ্রীষ্টধর্ম, ব্রাহ্মসমাজ ও পাপবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি) — মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। আমি মুক্ত পুরুষ; সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান; রাজাধিরাজের ছেলে; আমায় আবার বাঁধে কে? যদি সাপে কামড়ায়, "বিষ নাই" জোর করে বললে বিষ ছেড়ে যায়! তেমনি "আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত" এই কথাটি রোখ করে বলতে বলতে তাই হয়ে যায়। মুক্তই হয়ে যায়।

[পূর্বকথা — শ্রীরামকৃষ্ণের বাইবেল শ্রবণ — কৃষ্ণকিশোরের বিশ্বাস]

"খ্রীষ্টানদের একখানা বই একজন দিলে, আমি পড়ে শুনাতে বললুম। তাতে কেবল 'পাপ আর পাপ'। (কেশবের প্রতি) তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেও কেবল 'পাপ'। যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ' 'আমি বদ্ধ' বার বার বলে, সে শালা বদ্ধই হয়ে যায়! যে রাতদিন 'আমি পাপী', 'আমি পাপী' এই করে, সে তাই হয়ে যায়।

"ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই — কি, আমি তাঁর নাম করেছি, আমার এখনও পাপ থাকবে! আমার আবার পাপ কি?' কৃষ্ণকিশোর পরম হিন্দু, সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সে বৃন্দাবনে গিছল। একদিন ভ্রমণ করতে করতে তার জলতৃষ্ণা পেয়েছিল। একটা কুয়ার কাছে গিয়ে দেখলে, একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বললে, ওরে তুই একঘটি জল আমায় দিতে পারিস? তুই কি জাত? সে বললে, ঠাকুর মহাশয়, আমি হীন জাত — মুচি। কৃষ্ণকিশোর বললে, তুই বল, শিব। নে, এখন জল তুলে দে।

“ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ-মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়।

“কেবল ‘পাপ’ আর ‘নরক’ এই সব কথা কেন? একবার বল যে, অন্যায় কর্ম যা করেছি আর করব না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর।”

ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নামমাহাত্ম্য গাইতেছেন:

“আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ-দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী ।।

“আমি মার কাছে কেবল ভক্তি চেয়েছিলাম। ফুল হাতে করে মার পাদপদ্মে দিয়েছিলাম; বলেছিলাম, ‘মা, এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও’।”

(ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি) — একটি রামপ্রসাদের গান শোন:

“আয় মন, বেড়াতে যাবি।
কালী-কল্পতরুমূলে রে (মন) চারি ফল কুড়ায়ে পাবি ।।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, (তার) নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে তার বেটা, তত্ত্ব-কথা তায় সুধাবি ।।
শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।

যখন দুই সতীনে পিরিত হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি ।।
অহংকার অবিদ্যা তোর, পিতামাতায় তাড়িয়ে দিবি ।
যদি মোহগর্তে টেনে লয়, ধৈর্যখোঁটা ধরে রবি ।।
ধর্মাধর্ম দুটো অজা, তুচ্ছখোঁটায় বেঁধে থুবি ।
যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞানখড়্গে বলি দিবি ।।
প্রথম ভার্যার সন্তানের দূর হতে বুঝাইবি ।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান-সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি ।।
প্রসাদ বলে, এমন হলে কালের কাছে জবাব দিবি ।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মতো মন হবি ।।

“সংসারে ঈশ্বরলাভ হবে না কেন? জনকের হয়েছিল। এ-সংসার ‘ধোঁকার টাটি’ প্রসাদ বলেছিল। তাঁর পাদপদ্মে ভক্তিলাভ করলে —

এই সংসারই মজার কুটি, আমি খাই-দাই আর মজা লুটি।
জনক রাজা মহাতেজা, তার কিসের ছিল ত্রুটি।
সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে, খেয়েছিল দুধের বাটি।” (সকলের হাস্য)

[ব্রাহ্মসমাজ ও জনক রাজা — গৃহস্থের উপায় — নির্জনে বাস ও বিবেক]

“কিন্তু ফস করে জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা নির্জনে অনেক তপস্যা করেছিলেন। সংসারে থেকেও এক-একবার নির্জনে বাস করতে হয়। সংসারের বাহিরে একলা গিয়ে যদি ভগবানের জন্য তিনদিনও কাঁদা যায় সেও

ভাল। এমনকি অবসর পেয়ে একদিনও নির্জনে তাঁর চিন্তা যদি করা যায়, সেও ভাল। লোক মাগছেলের জন্য একঘটি কাঁদে, ঈশ্বরের জন্যে কে কাঁদছে বল? নির্জনে থেকে মাঝে মাঝে ভগবানের জন্যে সাধন করতে হয়! সংসারের ভিতর কর্মের মধ্যে থেকে, প্রথমাবস্থায় মন স্থির করতে অনেক ব্যাঘাত হয়। ফুটপাতের গাছ; যখন চারা থাকে, বেড়া না দিলে ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলে। প্রথমাবস্থায় বেড়া, গুঁড়ি হলে আর বেড়ার দরকার থাকে না। গুঁড়িতে হাতি বেঁধে দিলেও কিছু হয় না।

“রোগটি হচ্ছে বিকার। আবার যে-ঘরে বিকারের রোগী, সেই ঘরে জলের জালা আর আচার তেঁতুল। যদি বিকারের রোগী আরাম করতে চাও, ঘর থেকে ঠাঁই নাড়া করতে হবে। সংসারী জীব বিকারের রোগী; বিষয় — জলের জালা; বিষয়ভোগতৃষ্ণা — জলতৃষ্ণা। আচার তেঁতুল মনে করলেই মুখে জল সরে, কাছে আনতে হয় না; এরূপ জিনিসও ঘরে রয়েছে; যোষিৎসঙ্গ। তাই নির্জনে চিকিৎসা দরকার।

“বিবেক-বৈরাগ্য লাভ করে সংসার করতে হয়। সংসার-সমুদ্রে কামক্রোধাদি কুমির আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে কুমিরের ভয় থাকে না। বিবেক-বৈরাগ্য — হলুদ। সদসৎ বিচারের নাম বিবেক। ঈশ্বরই সৎ, নিত্যবস্তু। আর সব অসৎ, অনিত্য; দুদিনের জন্য। এইটি বোধ আর ঈশ্বরে অনুরাগ। তাঁর উপর টান — ভালবাসা। গোপীদের কৃষ্ণের উপর যেরূপ টান ছিল। একটা গান শোন:

[আর উপায় — ঈশ্বরে অনুরাগ — গোপীদের মতো টান বা স্নেহ]

বংশী বাজিল ওই বিপিনে।

(আমার তো না গেলে নয়) (শ্যাম পথে দাঁড়ায়ে আছে)

তোরা যাবি কি না যাবি বল গো।।

তোদের শ্যাম কথার কথা।

আমার শ্যাম অন্তরের ব্যথা (সই)।।

তোদের বাজে বাঁশী কানের কাছে।

বাঁশী আমার বাজে হৃদয়মাঝে।।

শ্যামের বাঁশী বাজে, বেরাও রাই।

তোমা বিনা কুঞ্জের শোভা নাই।।”

ঠাকুর অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই গান গাইতে গাইতে কেশবাদি ভক্তদের বললেন, “রাধাকৃষ্ণ মানো আর নাই মানো, এই টানটুকু নাও, ভগবানের জন্য কিসে এইরূপ ব্যাকুলতা হয়, চেষ্টা কর। ব্যাকুলতা থাকলেই তাঁকে লাভ করা যায়।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ২৭শে অক্টোবর 1882/10/27/vii

সংনিয়ম্যেন্দ্রিনিদ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।

তে প্রাপনুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ।।

[গীতা — ১২।৪]

06.7 শ্রীযুক্ত কেশব সেনের সহিত নৌকাবিহার — সর্বভূতহিতে রতাঃ

ভাটা পড়িয়াছে। আগ্নেয়পোত কলিকাতাভিমুখে দ্রুতগতিতে চলিতেছে। তাই পোল পার হইয়া কোম্পানির বাগানের দিকে আরও খানিকটা বেড়াইয়া আসিতে কাপ্তেনকে হুকুম হইয়াছে। কতদূর জাহাজ গিয়াছিল, অনেকেরই জ্ঞান নাই — তাঁহারা মগ্ন হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনিতেছেন। কোন্ দিক দিয়া সময় যাইতেছে, হুঁশ নাই।

এইবার মুড়ি নারিকেল খাওয়া হইতেছে। সকলেই কিছু কিছু কোঁচড়ে লইলেন ও খাইতেছেন। আনন্দের হাট। কেশব মুড়ির আয়োজন করে এনেছেন। এই অবসরে ঠাকুর দেখিলেন বিজয় ও কেশব দুইজনেই সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া অছেন। তখন ঠাকুর যেন দুইজন অবোধ ছেলেকে ভাব করিয়া দিবেন।
'সর্বভূতহিতে রতাঃ'

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি) — ওগো! এই বিজয় এসেছেন। তোমাদের ঝগড়া-বিবাদ — যেন শিব ও রামের যুদ্ধ। (হাস্য) রামের গুরু শিব। যুদ্ধও হল, দুজনে ভাবও হল। কিন্তু শিবের ভূতপ্রেতগুলো আর রামের বানরগুলো ওদের ঝগড়া কিচকিচি আর মেটে না! (উচ্চহাস্য)

"আপনার লোক তা এরূপ হয়ে থাকে। লব কুশ যে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। আবার জানো মায়ে-ঝিয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে। মার মঙ্গল, আর মেয়ের মঙ্গল যেন দুটো আলাদা। কিন্তু এর মঙ্গলে ওর মঙ্গল হয়, ওর মঙ্গলে এর

মঙ্গল হয়। তেমনি তোমাদের এর একটি সমাজ আছে; আবার ওর একটি দরাকার। (সকলের হাস্য) তবে এ-সব চাই। যদি বল ভগবান নিজে লীলা করেছেন, সেখানে জটিলে-কুটিলের কি দরকার? জটিলে-কুটিলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না! (সকলের হাস্য) জটিলে-কুটিলে না থাকলে রগড় হয় না। (উচ্চহাস্য)

“রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈত্যবাদী। তাঁর গুরু ছিলেন অদ্বৈত্যবাদী। শেষে দুজনে অমিল। গুরুশিষ্য পরস্পর মত খণ্ডন করতে লাগল। এরূপ হয়েই থাকে। যাই হোক, তবু আপনার লোক।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ২৭শে অক্টোবর 1882/10/27/viii

পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য, ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুগরীয়ান্ ।

ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো, লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ।।

[গীতা — ১১।৪৩]

06.8 কেশবকে শিক্ষা — গুরুগিরি ও ব্রাহ্মসমাজে — গুরু এক সচ্চিদানন্দ

সকলে আনন্দ করিতেছেন। ঠাকুর কেশবকে বলিতেছেন, “তুমি প্রকৃতি দেখে শিষ্য কর না, তাই এইরূপ ভেঙে ভেঙে যায়।

“মানুষগুলি দেখতে সব একরকম, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কারু ভিতর সত্ত্বগুণ বেশি, কারু রজোগুণ বেশি, কারু তমোগুণ। পুলিগুলি দেখতে সব একরকম। কিন্তু কারু ভিতর ক্ষীরের পোর, কারু ভিতর নারিকেলের ছাঁই, কারু ভিতর কলায়ের পোর। (সকলের হাস্য)

“আমার কি ভাব জানো? আমি খাই-দাই থাকি, আর মা সব জানে। আমার তিন কথাতে গায়ে কাঁটা বেঁধে। গুরু, কর্তা আর বাবা।

“গুরু এক সচ্চিদানন্দ। তিনিই শিক্ষা দিবেন। আমার সন্তানভাব। মানুষ গুরু মেলে লাখ লাখ। সকলেই গুরু হতে চায়। শিষ্য কে হতে চায়?

“লোকশিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন আর আদেশ দেন, তাহলে হতে পারে। নারদ শুকদেবাদির আদেশ হয়েছিল। শঙ্করের আদেশ হয়েছিল। আদেশ না হলে কে তোমার কথা শুনবে? কলকাতার হুজুগ তো জানো! যতক্ষণ কাঠে জ্বাল, দুধ ফোঁস করে ফোলে। কাঠ টেনে নিলে কোথাও কিছু নাই। কলকাতার লোক হুজুগে। এই এখানটায় কুয়া খুঁড়ছে। — বলে জল চাই। সেখানে পাথর হল তো ছেড়ে দিলে! আবার এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ করলে। সেখানে বালি মিলে গেল; ছেড়ে দিলে! আর-এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ হল! এইরকম!

“আবার মনে-মনে আদেশ হলে হয় না। তিনি সত্য-সত্যই সাক্ষাৎকার হন, আর কথা কন। তখন আদেশ হতে পারে। সে-কথার জোর কত? পর্বত টলে যায়। শুধু লেকচার? দিন কতক লোকে শুনবে, তারপর ভুলে যাবে। কথা অনুসারে সে কাজ করবে না।”

[পূর্বকথা — ভাবচক্ষে হালদার-পুকুর দর্শন]

“ও-দেশে হালদার-পুকুর বলে একটা পুকুর আছে। পাড়ে রোজ সকালবেলা বাহ্যে করে রাখত। যারা সকালবেলা আসে, খুব গালাগাল দেয়। আবার তার পরদিন সেইরূপ। বাহ্যে আর থামে না (সকলের হাস্য) লোকে কোম্পানিকে জানালে। তারা একটা চাপরাসী পাঠিয়ে দিলে। সে যখন একটা কাগজ মেরে দিলে, ‘বাহ্যে করিও না’ তখন সব বন্ধ! (সকলের হাস্য)

“লোকশিক্ষা দেবে তার চাপরাস চাই। না হলে হাসির কথা হয়ে পড়ে। আপনারই হয় না, আবার অন্যলোক। কানা কানাকে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে। (হাস্য) হিতে-বিপরীত। ভগবানলাভ হলে অন্তর্দৃষ্টি হয়, কার কি রোগ বোঝা যায়। উপদেশ দেওয়া যায়।”

[“অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহম্ ইতি মন্যতে”]

“আদেশ না থাকলে ‘আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি’ এই অহংকার হয়। অহংকার হয় অজ্ঞানে। অজ্ঞানে বোধ হয়, আমি কর্তা। ঈশ্বর কর্তা, ঈশ্বরই সব করছেন, আমি কিছু করছি না — এ-বোধ হলে তো সে জীবন্মুক্ত। ‘আমি কর্তা’, ‘আমি কর্তা’ — এই বোধ থেকেই যত দুঃখ, অশান্তি।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ২৭শে অক্টোবর 1882/10/27/ix

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর ।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ।।

[গীতা — ৩।১৯]

06.9 কেশবাদি ব্রাহ্মদিগকে কর্মযোগ সম্বন্ধে উপদেশ

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবাদি ভক্তের প্রতি) — তোমরা বল “জগতের উপকার করা।” জগৎ কি এতটুকু গা! আর তুমি কে, যে জগতের উপকার করবে? তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার কর। তাঁকে লাভ কর। তিনি শক্তি দিলে তবে সকলের হিত করতে পার। নচেৎ নয়।

একজন ভক্ত — যতদিন না লাভ হয়, ততদিন সব কর্ম ত্যাগ করব?

শ্রীরামকৃষ্ণ — না; কর্ম ত্যাগ করবে কেন? ঈশ্বরের চিন্তা, তাঁর নামগুণগান, নিত্যকর্ম — এ-সব করতে হবে।

ব্রাহ্মভক্ত — সংসারের কর্ম? বিষয়কর্ম?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, তাও করবে, সংসারযাত্রার জন্য যেটুকু দরকার। কিন্তু কেঁদে নির্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে, যাতে ওই কর্মগুলি নিষ্কামভাবে করা যায়। আর বলবে, হে ঈশ্বর, আমার বিষয়কর্ম কমিয়ে দাও, কেন না ঠাকুর দেখছি যে, বেশি কর্ম জুটলে তোমায় ভুলে যাই। মনে করছি, নিষ্কামকর্ম করছি, কিন্তু সকাম হয়ে পড়ে। হয়তো দান সদাব্রত বেশি করতে গিয়ে লোকমান্য হতে ইচ্ছা হয়ে পড়ে।

[পূর্বকথা — শম্ভু মল্লিকের সহিত দানাদি কর্মকাণ্ডের কথা]

“শম্ভু মল্লিক হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্কুল, রাস্তা, পুষ্করিণীর কথা বলেছিল। আমি বললাম, সম্মুখে যেটা পড়ল, না করলে নয়, সেটাই নিষ্কাম হয়ে করতে হয়। ইচ্ছা করে বেশি কাজ জড়ানো ভালো নয় — ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়। কালীঘাটে দানই করতে লাগল; কালীদর্শন আর হলো না। (হাস্য) আগে জো-সো করে, ধাক্কাধুক্কি খেয়েও কালীদর্শন করতে হয়, তারপর দান যত কর আর না কর। ইচ্ছা হয় খুব কর। ঈশ্বরলাভের জন্যই কর্ম। শম্ভুকে তাই বললুম, যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন, তাঁকে কি বলবে কতকগুলো হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারি করে দাও? (হাস্য) ভক্ত কখনও তা বলে না বরং বলবে, ‘ঠাকুর! আমায় পাদপদ্মে স্থান দাও, নিজের সঙ্গে সর্বদা রাখ, পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও।’

“কর্মযোগ বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে-কর্ম করতে বলেছে, কলিকালে করা বড় কঠিন। অন্নগত প্রাণ। বেশি কর্ম চলে না। জ্বর হলে কবিরাজী চিকিৎসা করতে গেলে

এদিকে রোগীর হয়ে যায়। বেশি দেরি সয় না। এখন ডি গুপ্ত! কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নামগুণগান আর প্রার্থনা। ভক্তিযোগই যুগধর্ম। (ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি) তোমাদেরও ভক্তিযোগ, তোমরা হরিনাম কর, মায়ের নামগুণগাণ কর, তোমরা ধন্য! তোমাদের ভাবটি বেশ। বেদান্তবাদীদের মতো তোমরা জগৎকে স্বপ্নবৎ বল না। ওরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা নও, তোমরা ভক্ত। তোমরা ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Person) বল, এও বেশ। তোমরা ভক্ত। ব্যকুল হয়ে ডাকলে তাঁকে অবশ্য পাবে।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ২৭শে অক্টোবর 1882/10/27/x

06.10 সুরেন্দ্রের বাড়ি নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে

জাহাজ কয়লাঘাটে এইবার ফিরিয়া আসিল। সকলে নামিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখেন, কোজাগরের পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে, ভাগীরথী-বক্ষ কৌমুদীর লীলাভূমি হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য গাড়ি আনিতে দেওয়া হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে মাস্টার ও দু-একটি ভক্তের সহিত ঠাকুর গাড়িতে উঠিলেন। কেশবের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলালও গাড়িতে উঠিলেন, ঠাকুরের সঙ্গে খানিকটা যাবেন।

গাড়িতে সকলে বসিলে পর ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, কই তিনি কই — অর্থাৎ কেশব কই? দেখিতে দেখিতে কেশব একাকী আসিয়া উপস্থিত। মুখে হাসি! আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে কে এঁর সঙ্গে যাবে? সকলে গাড়িতে বসিলে পর, কেশব ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরও সস্নেহে সম্ভাষণ করিয়া বিদায় দিলেন।

গাড়ি চলিতে লাগিল। ইংরেজটোলা। সুন্দর রাজপথ। পথের দুইদিকে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা। পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে, অট্টালিকাগুলি যেন বিমল শীতল চন্দ্রকিরণে বিশ্রাম করিতেছে। দ্বারদেশে বাষ্পীয় দীপ, কক্ষমধ্যে দীপমালা, স্থানে স্থানে হার্মোনিয়াম, পিয়ানো সংযোগে ইংরেজ মহিলারা গান করিতেছে। ঠাকুর অনন্দে হাস্য করিতে করিতে যাইতেছেন। হঠাৎ বলিলেন, “আমার জলতৃষ্ণা পাচ্ছে; কি হবে?” কি করা যায়! নন্দলাল “ইন্ডিয়া ক্লাবের” নিকট গাড়ি থামাইয়া উপরে জল আনিতে গেলেন, কাচের গ্লাসে করিয়া জল আনিলেন। ঠাকুর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, “গ্লাসটি ধোয়া তো?” নন্দলাল বললেন, ‘হাঁ’। ঠাকুর সেই গ্লাসে জলপান করিলেন।

বালকের স্বভাব। গাড়ি চালাইয়া দিলে ঠাকুর মুখ বাড়াইয়া লোকজন গাড়ি-ঘোড়া চাঁদের আলো দেখিতেছেন। সকল তাতেই আনন্দ।

নন্দলাল কলুটোলায় নামিলেন। ঠাকুরের গাড়ি সিমুলিয়া স্ট্রীটে শ্রীযুক্ত সুরেশ মিত্রের বাড়িতে আসিয়া লাগিল। ঠাকুর তাঁহাকে সুরেন্দ্র বলিতেন। সুরেন্দ্র ঠাকুরের পরম ভক্ত।

কিন্তু সুরেন্দ্র বাড়িতে নাই। তাঁহাদের নূতন বাগানে গিয়াছেন। বাড়ির লোকরা বসিতে নিচের ঘর খুলিয়া দিলেন। গাড়িভাড়া দিতে হবে। কে দিবে? সুরেন্দ্র থাকিলে সেই দিত। ঠাকুর একজন ভক্তকে বলিলেন, “ভাড়াটা মেয়েদের কাছ থেকে চেয়ে নে না। ওরা কি জানে না, ওদের ভাতাররা যায় আসে।” (সকলের হাস্য)

নরেন্দ্র পাড়াতেই থাকেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন। এদিকে বাড়ির লোকেরা দোতলার ঘরে ঠাকুরকে বসাইলেন। ঘরের মেঝেতে চাদর পাতা, দু-চারটে তাকিয়া তার উপর; কক্ষ-প্রাচীরে সুরেন্দ্রের বিশেষ যত্নে প্রস্তুত ছবি (Oil painting) যাহাতে কেশবকে ঠাকুর দেখাইতেছেন হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ সকল ধর্মের সমন্বয়। আর বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয়।

ঠাকুর বসিয়া সহাস্যে গল্প করিতেছেন, এমন সময় নরেন্দ্র আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন ঠাকুরের আনন্দ যেন দ্বিগুণ হইল। তিনি বলিলেন, “আজ কেশব সেনের সঙ্গে কেমন জাহাজে করে বেড়াতে গিছিলাম। বিজয় ছিল, এরা সব ছিল।” মাস্টারকে নির্দেশ করিয়া বলিলেন, “একে জিজ্ঞাসা কর, কেমন বিজয় আর কেশবকে বললুম, মায়ে-ঝিয়ে মঙ্গলবার, আর জটিলে-কুটিলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না — এই সব কথা। (মাস্টারের প্রতি) কেমন গা?”

মাস্টার — আজ্ঞা হাঁ।

রাত্রি হইল, তবু সুরেন্দ্র ফিরিলেন না। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন, আর দেরি করা যায় না, রাত সাড়ে দশটা। রাস্তায় চাঁদের আলো।

গাড়ি আসিল। ঠাকুর উঠিলেন। নরেন্দ্র ও মাস্টার প্রণাম করিয়া কলিকাতাস্থিত স্ব স্ব বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c7 ৭ সিঁথি ব্রাহ্মসমাজ-দর্শন ও শ্রীযুক্ত শিবনাথ প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তদিগের সহিত কথোপকথন ও আনন্দ

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ২৮শে অক্টোবর 1882/10/28/i

07.1 উৎসবমন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশ্রীপরমহংসদেব সিঁথির ব্রাহ্মসমাজ-দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ২৮শে অক্টোবর ইং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ, শনিবার। (১২ই কার্তিক) কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথি।

আজ এখানে মহোৎসব। ব্রাহ্মসমাজের ষাণ্মাসিক। তাই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এখানে নিমন্ত্রণ। বেলা ৩টা-৪টার সময় তিনি কয়েকজন ভক্তসঙ্গে গাড়ি করিয়া দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটী হইতে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের মনোহর উদ্যানবাটীতে উপস্থিত হইলেন। এই উদ্যানবাটীতে ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মসমাজকে তিনি বড় ভালবাসেন। ব্রাহ্মভক্তগণও তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন। ইহার পূর্বদিন অর্থাৎ শুক্রবার বৈকালে কত আনন্দ করিতে করিতে সশিষ্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ভাগীরথী-বক্ষে কালীবাড়ি হইতে কলিকাতা পর্যন্ত ভক্তসঙ্গে স্টীমার করিয়া বেড়াইতে আসিয়াছিলেন।

সিঁথি পাইকপাড়ার নিকট। কলিকাতা হইতে দেড় ক্রোশ উত্তরে। উদ্যানবাটীটি মনোহর বলিয়াছি। স্থানটি অতি নিভৃত, ভগবানের উপাসনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। উদ্যানস্বামী বৎসরে দুইবার মহোৎসব করিয়া থাকেন। একবার শরৎকালে আর একবার বসন্তে। এই মহোৎসব উপলক্ষে তিনি কলিকাতার ও সিঁথির নিকটবর্তী গ্রামের অনেক ভক্তদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। তাই আজ কলিকাতা হইতে শিবনাথ প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রাতঃকালে উপাসনায় যোগদান করিয়াছেন, আবার সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হইবে, তাই প্রতীক্ষা করিতেছেন। বিশেষতঃ তাঁহারা শুনিয়াছেন যে অপরাহ্ণে মহাপুরুষের আগমন হইবে ও তাঁহারা তাঁহার আনন্দমূর্তি দেখিতে পাইবেন, তাঁহার হৃদয়মুগ্ধকারী কথামৃত পান করিতে পাইবেন, তাঁহার সেই মধুর সংকীর্তন শুনিতে ও দেবদুর্লভ হরিপ্রেমময় নৃত্য দেখিতে পাইবেন।

অপরাহ্নে বাগানটি বহুলোক সমাকীর্ণ হইয়াছে। কেহ লতামণ্ডপচ্ছায়ায় কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট। কেহ বা সুন্দর বাপীতটে বন্ধু সমভিব্যাহারে বিচরণ করিতেছেন। অনেকেই সমাজগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় পূর্ব হইতেই উত্তম আসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। উদ্যানের প্রবেশদ্বারে পানের দোকান। প্রবেশ করিয়া বোধ হয় যেন পূজাবাড়ি — রাত্রিকালে যাত্রা হইবে। চতুর্দিক আনন্দে পরিপূর্ণ। শরতের নীল আকাশে আনন্দ প্রতিভাসিত হইতেছে। উদ্যানের বৃক্ষলতাগুল্মমধ্যে প্রভাত হইতে আনন্দের সমীরণ বহিতেছে। আকাশ, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, যেন একতানে গান করিতেছে:

“আজি কি হরষ সমীর বহে প্রাণে — ভগবৎ মঙ্গল কিরণে!”

সকলেই যেন ভগবদ্দর্শন-পিপাসু। এমন সময়ে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের গাড়ি আসিয়া সমাজগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া মহাপুরুষের অভ্যর্থনা করিতেছেন। তিনি আসিয়াছেন। চারিদিকের লোক তাঁহাকে মণ্ডলাকারে ঘেরিতেছে।

সমাজগৃহের প্রধান প্রকোষ্ঠমধ্যে বেদী রচনা হইয়াছে। সে-স্থান লোকে পরিপূর্ণ। সম্মুখে দালান, সেখানে পরমহংসদেব সমাসীন, সেখানেও লোক। আর দালানের দুই পার্শ্বস্থিত দুই ঘর — সে-ঘরেও লোক — ঘরের দ্বারদেশে উদ্‌গ্রীব হইয়া লোকে দণ্ডায়মান। দালানে উঠিবার সোপানপরম্পরা একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই সোপানও লোকে লোকাকীর্ণ; সোপানের অনতিদূরে ২/৩টি বৃক্ষ পার্শ্বে লতামণ্ডপ — সেখানে কয়েকখানি কাষ্ঠাসন।

তথা হইতেও লোক উদগ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া মহাপুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। সারিসারি ফল ও পুষ্পের বৃক্ষ, মধ্যে পথ। বৃক্ষসকল সমীরণে ঈষৎ হেলিতেছে দুলিতেছে, যেন আনন্দভরে মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে।

ঠাকুর পরমহংসদেব হাসিতে হাসিতে আসন গ্রহণ করিলেন। এখন সব চক্ষু এককালে তাঁহার আনন্দমূর্তির উপর পতিত হইল। যেমন, যতক্ষণ নাট্যশালার অভিনয় আরম্ভ না হয়, ততক্ষণ দর্শকবৃন্দের মধ্যে কেহ হাসিতেছে, কেহ বিষয়কর্মের কথা কহিতেছে, কেহ একাকী অথবা বন্ধুসঙ্গে পাদচারণ করিতেছে, কেহ পান খাইতেছে, কেহ বা তামাক খাইতেছে; কিন্তু যাই ড্রপসিন উঠিয়া গেল, অমনি সকলে সব কথাবার্তা বন্ধ করিয়া অনন্যমন হইয়া একদৃষ্টে নাট্যরঙ্গ দেখিতে থাকে! অথবা যেমন, নানা পুষ্প-পরিভ্রমণকারী ষট্‌পদবৃন্দ পদ্মের সন্ধান পাইলে অন্য কুসুম ত্যাগ করিয়া পদ্মমধু পান করিতে ছুটিয়া আসে!

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ২৮শে অক্টোবর 1882/10/28/ii

মাঞ্চ যোঽথব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ।।

[গীতা — ১৪।২৬]

07.2 ভক্ত-সম্ভাষণে

সহাস্যবদনে ঠাকুর শ্রীযুক্ত শিবনাথ আদি ভক্তগণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "এই যে শিবনাথ! দেখ, তোমরা ভক্ত, তোমাদের দেখে বড় আনন্দ হয়। গাঁজাখোরের স্বভাব, আর-একজন গাঁজাখোরকে দেখলে ভারী খুশি হয়। হয়তো তার সঙ্গে কোলাকুলিই করে।" (শিবনাথ ও সকলের হাস্য)

[সংসারী লোকের স্বভাব — নামমাহাত্ম্য]

"যাদের দেখি ঈশ্বরে মন নাই, তাদের আমি বলি, 'তোমরা একটু ওইখানে গিয়ে বস। অথবা বলি, যাও বেশ বিল্ডিং (রাসমণির কালীবাটির মন্দির সকল) দেখ গে।' (সকলের হাস্য)

"আবার দেখেছি যে, ভক্তদের সঙ্গে হাবাতে লোক এসেছে। তাদের ভারী বিষয়বুদ্ধি। ঈশ্বরীয় কথা ভাল লাগে না। ওরা হয়তো আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ঈশ্বরীয় কথা বলছে। এদিকে এরা আর বসে থাকতে পারে না, ছটফট করছে। বারবার কানে কানে ফিসফিস করে বলছে, 'কখন যাবে — কখন যাবে।' তারা হয়তো বললে, 'দাঁড়াও না হে, আর-একটু পরে যাব।' তখন এরা বিরক্ত হয়ে বলে, 'তবে তোমরা কথা কও, আমরা নৌকায় গিয়ে বসি।' (সকলের হাস্য)

“সংসারী লোকদের যদি বল যে সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও, তা তারা কখনও শুনবে না। তাই বিষয়ী লোকদের টানবার জন্য গৌরনিতাই দুই ভাই মিলে পরামর্শ করে এই ব্যবস্থা করেছিলেন — ‘মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরি বোল।’ প্রথম দুইটির লোভে অনেকে হরিবোল বলতে যেত। হরিনাম-সুধার একটি আস্বাদ পেলে বুঝতে পারত যে, ‘মাগুর মাছের ঝোল’ আর কিছুই নয়, হরিপ্রেমে যে অশ্রু পড়ে তাই; ‘যুবতী মেয়ে’ কিনা — পৃথিবী। ‘যুবতী মেয়ের কোল’ কিনা — ধুলায় হরিপ্রেমে গড়াগড়ি।

“নিতাই কোনরকমে হরিনাম করিয়ে নিতেন। চৈতন্যদেব বলেছিলেন, ঈশ্বরের নামের ভারী মাহাত্ম্য। শীঘ্র ফল না হতে পারে, কিন্তু কখন না কখন এর ফল হবেই হবে। যেমন কেউ বাড়ির কার্নিসের উপর বীজ রেখে গিয়েছিল; অনেকদিন পরে বাড়ি ভূমিসাৎ হয়ে গেল, তখনও সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হল ও তার ফলও হল।”

[মনুষ্যপ্রকৃতি ও গুণত্রয় — ভক্তির সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ]

“যেমন সংসারীদের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ আছে; তেমনি ভক্তিরও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ আছে।”

“সংসারীর সত্ত্বগুণ কিরকম জানো? বাড়িটি এখানে ভাঙা, ওখানে ভাঙা — মেরামত করে না। ঠাকুরদালানে পায়রাগুলো হাগছে, উঠানে শেওলা পড়েছে হুঁশ নাই। আসবাবগুলো পুরানো, ফিটফাট করবার চেষ্টা নাই। কাপড় যা তাই

একখানা হলেই হল। লোকটি খুব শান্ত, শিষ্ট, দয়ালু, অমায়িক; কারু কোনও অনিষ্ট করে না।

“সংসারীর রজোগুণের লক্ষণ আবার আছে। ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হাতে দুই-তিনটা আঙটি। বাড়ির আসবাব খুব ফিটফাট। দেওয়ালে কুইনের ছবি, রাজপুত্রের ছবি, কোন বড় মানুষের ছবি। বাড়িটি চুনকাম করা, যেন কোনখানে একটু দাগ নাই। নানারকমের ভাল পোষাক। চাকরদেরও পোশাক। এমনি এমনি সব।

“সংসারীর তমোগুণের লক্ষণ — নিদ্রা, কাম, ক্রোধ, অহংকার এই সব।

“আর ভক্তির সত্ত্ব আছে। যে ভক্তের সত্ত্বগুণ আছে, সে ধ্যান করে অতি গোপনে। সে হয়তো মশারির ভিতর ধ্যান করে — সবাই জানছে, ইনি শুয়ে আছেন, বুঝি রাত্রে ঘুম হয় নাই, তাই উঠতে দেরি হচ্ছে। এদিকে শরীরের উপর আদর কেবল পেটচলা পর্যন্ত; শাকান্ন পেলেই হল। খাবার ঘটা নাই। পোশাকের আড়ম্বর নাই। বাড়ির আসবাবের জাঁকজমক নাই। আর সত্ত্বগুণী ভক্ত কখনও তোষামোদ করে ধন লয় না।

“ভক্তির রজঃ থাকলে সে ভক্তের হয়তো তিলক আছে, রুদ্রাক্ষের মালা আছে। সেই মালার মধ্যে মধ্যে আবার একটি সোনার দানা। (সকলের হাস্য) যখন পূজা করে, গরদের কাপড় পরে পূজা করে।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ২৮শে অক্টোবর 1882/10/28/iii

07.3 তিন প্রকার আচার্য

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ।।

[গীতা — ২।৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ — ভক্তির তমঃ যার হয়, তার বিশ্বাস জ্বলন্ত। ঈশ্বরের কাছে সেরূপ ভক্ত জোর করে। যেন ডাকাতি করে ধন কেড়ে লওয়া। "মারো কাটো বাঁধো!" এইরূপ ডাকাত-পড়া ভাব।

ঠাকুর ঊর্ধ্বদৃষ্টি, তাঁহার প্রেমরসাভিসিক্ত কন্ঠে গাহিতেছেন:

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।

কালী কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায় ।।

ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।

সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, কভু সন্ধি নাহি পায় ।।

দয়া ব্রত দান আদি, আর কিছু না মনে লয়।

মদনের যাগযজ্ঞ, ব্রহ্মময়ীর রাঙা পায় ।।

কালীনামের এত গুণ, কেবা জানতে পারে তায়।

দেবাদিদেব মহাদেব, যাঁর পঞ্চমুখে গুণ গায় ৷৷

ঠাকুর ভাবোন্মত্ত, যেন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গাহিতেছেন:

[নামমাহাত্ম্য ও পাপ — তিন প্রকার আচার্য]

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ-দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী।

“কি! আমি তাঁর নাম করেছি — আমার আবার পাপ! আমি তাঁর ছেলে। তাঁর ঐশ্বর্যের অধিকারী! এমন রোখ হওয়া চাই!

“তমোগুণকে মোড় ফিরিয়ে দিলে ঈশ্বরলাভ হয়। তাঁর কাছে জোর কর, তিনি তো পর নন, তিনি আপনার লোক। আবার দেখ, এই তমোগুণকে পরের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা যায়। বৈদ্য তিনপ্রকার — উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে ‘ঔষধ খেও হে’ এই কথা বলে চলে যায়, সে-অধম বৈদ্য — রোগী খেলে কিনা এ-খবর সে লয় না। যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক করে বুঝায় — যে মিষ্ট কথাতে বলে, ‘ওহে ঔষধ না খেলে কেমন করে ভাল হবে! লক্ষ্মীটি খাও, আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি খাও’ — সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য, রোগী কোনও মতে খেলে না দেখে বুকে হাঁটু দিয়ে, জোর করে ঔষধ খাইয়ে দেয় — সে উত্তম বৈদ্য। এই বৈদ্যের তমোগুণ, এ-গুণে রোগীর মঙ্গল হয়, অপকার হয় না।

“বৈদ্যের মতো আচার্যও তিনপ্রকার। ধর্মোপদেশ দিয়ে শিষ্যেদের আর কোন খবর লয় না — সে আচার্য অধম। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বরাবর বুঝান, যাতে তারা উপদেশগুলি ধারণা করতে পারে, অনেক অনুনয়-বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান — তিনি মধ্যম থাকের আচার্য। আর যখন শিষ্যেরা কোনও মতে শুনছে না দেখে কোন আচার্য জোর পর্যন্ত করেন, তাঁরে বলি উত্তম আচার্য।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ২৮শে অক্টোবর 1882/10/28/iv

“যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।”

[তৈত্তিরীয় উপনিষদ্

— ২।৪]

07.4 ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার আবার সাকার। ভক্তের জন্য তিনি সাকার। যারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হয়েছে,

তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার। ভক্ত জানে আমি একটি জিনিস, জগৎ একটি জিনিস। তাই ভক্তের কাছে ঈশ্বর ‘ব্যক্তি’ (Personal God) হয়ে দেখা দেন। জ্ঞানী — যেমন বেদান্তবাদী — কেবল নেতি নেতি বিচার করে। বিচার করে জ্ঞানীর বোধে বোধ হয় যে, “আমি মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা — স্বপ্নবৎ।” জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে। তিনি যে কি, মুখে বলতে পারে না।

“কিরকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ-সমুদ্র — কূল-কিনারা নাই — ভক্তিহিমে স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায় — বরফ আকারে জমাট বাঁধে। অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তভাবে, কখন কখন সাকার রূপ ধরে থাকেন। জ্ঞান-সূর্য উঠলে সে বরফ গলে যায়, তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ হয় না। — তাঁর রূপও দর্শন হয় না। কি তিনি মুখে বলা যায় না। কে বলবে? যিনি বলবেন, তিনিই নাই। তাঁর ‘আমি’ আর খুঁজে পান না।

“বিচার করতে করতে আমি-টামি আর কিছুই থাকে না। পেঁয়াজের প্রথমে লাল খোসা তুমি ছাড়ালে, তারপর সাদা পুরু খোসা। এইরূপ বরাবর ছাড়াতে ছাড়াতে ভিতরে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না।

“যেখানে নিজের আমি খুঁজে পাওয়া যায় না — আর খুঁজেই বা কে? — সেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ বোধে বোধ কিরূপ হয়, কে বলবে!

“একটা লুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছিল। সমুদ্রে যাই নেমেছে অমনি গলে মিশে গেল। তখন খবর কে দিবেক?

“পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ — পূর্ণ জ্ঞান হলে মানুষ চুপ হয়ে যায়। তখন ‘আমি’রূপ লুনের পুতুল সচ্চিদানন্দরূপ সাগরে গলে এক হয়ে যায়, আর একটুও ভেদবুদ্ধি থাকে না।

“বিচার করা যতক্ষণ না শেষ হয়, লোকে ফড়ফড় করে তর্ক করে। শেষ হলে চুপ হয়ে যায়। কলসী পূর্ণ হলে, কলসীর জল পুকুরের জল এক হলে আর শব্দ থাকে না। যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয় ততক্ষণ শব্দ।

“আগেকার লোকে বলত, কালাপানিতে জাহাজ গেলে ফেরে না।”

[‘আমি’ কিন্তু যায় না]

“আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল (হাস্য)। হাজার বিচার কর, ‘আমি’ যায় না। তোমার আমার পক্ষে ‘ভক্ত আমি’ এ-অভিমান ভাল।

“ভক্তের পক্ষে সগুণ ব্রহ্ম। অর্থাৎ তিনি সগুণ — একজন ব্যক্তি হয়ে, রূপ হয়ে দেখা দেন। তিনি প্রার্থনা শুনেন। তোমরা যে প্রার্থনা কর, তাঁকেই কর। তোমরা বেদান্তবাদী নও, জ্ঞানী নও — তোমরা ভক্ত। সাকাররূপ মানো আর না মানো এসে যায় না। ঈশ্বর একজন ব্যক্তি বলে বোধ থাকলেই হল — যে ব্যক্তি প্রার্থনা শুনেন, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন, যে ব্যক্তি অনন্তশক্তি।

“ভক্তিপথেই তাঁকে সহজে পাওয়া যায়।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ২৮শে অক্টোবর 1882/10/28/v

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ।।

[গীতা — ১১।৫৪]

07.5 ঈশ্বরদর্শন — সাকার না নিরাকার?

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় ঈশ্বরকে কি দেখা যায়? যদি দেখা যায়, দেখতে পাই না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, অবশ্য দেখা যায় — সাকাররূপ দেখা যায়, আবার অরূপও দেখা যায়। তা তোমায় বুঝাব কেমন করে?

ব্রাহ্মভক্ত — কি উপায়ে দেখা যেতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ব্যাকুল হয়ে তাঁর জন্য কাঁদতে পার?

“লোকে ছেলের জন্য, স্ত্রীর জন্য, টাকার জন্য, একঘটি কাঁদে। কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে? যতক্ষণ ছেলে চুষি নিয়ে ভুলে থাকে, মা রান্নাবান্না বাড়ির কাজ সব

করে। ছেলের যখন চুষি আর ভাল লাগে না — চুষি ফেলে চিৎকার করে কাঁদে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে দুড়্‌দুড়্ করে এসে ছেলেকে কোলে লয়।”

“ব্রাহ্মভক্ত — মহাশয়! ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে এত মত কেন? কেউ বলে সাকার — কেউ বলে নিরাকার — আবার সাকারবাদীদের নিকট নানারূপের কথা শুনতে পাই। এত গণ্ডগোল কেন?

“শ্রীরামকৃষ্ণ — যে ভক্ত যেরূপ দেখে, সে সেইরূপ মনে করে। বাস্তবিক কোনও গণ্ডগোল নাই। তাঁকে কোনরকমে যদি একবার লাভ করতে পারা যায়, তাহলে তিনি সব বুঝিয়ে দেন। সে পাড়াতেই গেলে না — সব খবর পাবে কেমন করে?

“একটা গল্প শোন:

“একজন বাহ্যে গিছিল। সে দেখলে যে গাছের উপর একটি জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আর একজনকে বললে, ‘দেখ, অমুক গাছে একটি সুন্দর লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলাম।’ লোকটি উত্তর করলে, ‘আমি যখন বাহ্যে গিছিলাম আমিও দেখেছি — তা সে লাল রঙ হতে যাবে কেন? সে যে সবুজ রঙ!’ আর-একজন বললে, ‘না না — আমি দেখেছি, হলদে!’ এইরূপে আরও কেউ কেউ বললে, ‘না জরদা, বেগুনী, নীল’ ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে, ‘আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি — তোমরা যা যা বলছ, সব সত্য — সে কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হলদে,

কখন নীল আরও সব কত কি হয়! বহুরূপী। আবার কখন দেখি, কোন রঙই নাই। কখন সগুণ, কখন নির্গুণ।’

“অর্থাৎ যে ব্যক্তি সদা-সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করে সেই জানতে পারে তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে, তিনি নানারূপে দেখা দেন, নানাভাবে দেখা দেন — তিনি সগুণ, আবার তিনি নির্গুণ। যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে যে, বহুরূপীর নানা রঙ — আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্য লোক কেবল তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায়।

“কবীর বলত, ‘নিরাকার আমার বাপ, সাকার আমার মা।’

“ভক্ত যে রূপটি ভালবাসে, সেইরূপে তিনি দেখা দেন — তিনি যে ভক্তবৎসল।

“পুরাণে আছে, বীরভক্ত হনুমানের জন্য তিনি রামরূপ ধরেছিলেন।”

[কালীরূপ ও শ্যামরূপের ব্যাখ্যা — ‘অনন্ত’কে জানা যায় না]

“বেদান্ত-বিচারের কাছে রূপ-টুপ উড়ে যায়। সে-বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই — ব্রহ্ম সত্য, আর নামরূপযুক্ত জগৎ মিথ্যা। যতক্ষণ ‘আমি ভক্ত’ এই অভিমান থাকে, ততক্ষণই ঈশ্বরের রূপদর্শন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Person) বলে বোধ সম্ভব হয়। বিচারের চক্ষে দেখলে, ভক্তের ‘আমি’ অভিমান, ভক্তকে একটু দূরে রেখেছে।

“কালীরূপ কি শ্যামরূপ চৌদ্দ পোয়া কেন? দূরে বলে। দূরে বলে সূর্য ছোট দেখায়। কাছে যাও তখন এত বৃহৎ দেখাবে যে, ধারণা করতে পারবে না। আবার কালীরূপ কি শ্যামরূপ শ্যামবর্ণ কেন? সেও দূর বলে। যেমন দীঘির জল দূরে থেকে সবুজ, নীল বা কালোবর্ণ দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে করে জল তুলে দেখ, কোন রঙই নাই। আকাশ দূরে দেখলে নীলবর্ণ, কাছে দেখ, কোন রঙ নাই।

“তাই বলছি, বেদান্ত-দর্শনের বিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ। তাঁর কি স্বরূপ, তা মুখে বলা যায় না। কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজে সত্য, ততক্ষণ জগৎও সত্য। ঈশ্বরের নানারূপও সত্য, ঈশ্বরকে ব্যক্তিবোধও সত্য।

“ভক্তিপথ তোমাদের পথ। এ খুব ভাল — এ সহজ পথ। অনন্ত ঈশ্বরকে কি জানা যায়? আর তাঁকে জানবারই বা কি দরকার? এই দুর্লভ মানুষ জনম পেয়ে আমার দরকার তাঁর পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়।

“যদি আমার একঘটি জলে তৃষ্ণা যায়, পুকুরে কত জল আছে, এ মাপবার আমার কি দরকার? আমি আধ বোতল মদে মাতাল হয়ে যাই — শুঁড়ির দোকানে কত মন মদ আছে, এ হিসাবে আমার কি দরকার? অনন্তকে জানার দরকারই বা কি?”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ২৮শে অক্টোবর 1882/10/28/vi

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।

আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ।।

[গীতা — ৩।১৭]

07.6 ঈশ্বরলাভের লক্ষণ — সপ্তভূমি ও ব্রহ্মজ্ঞান

শ্রীরামকৃষ্ণ — বেদে ব্রহ্মজ্ঞানীর নানারকম অবস্থা বর্ণনা আছে। জ্ঞানপথ — বড় কঠিন পথ। বিষয়বুদ্ধির — কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তির লেশমাত্র থাকলে জ্ঞান হয় না। এ-পথ কলিযুগের পক্ষে নয়।

"এই সম্বন্ধে বেদে সপ্তভুমির (Seven Planes) কথা আছে। এই সাতভূমি মনের স্থান। যখন সংসারে মন থাকে, তখন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি মনের বাসস্থান। মনের তখন ঊর্ধ্বদৃষ্টি থাকে না — কেবল কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে। মনের চতুর্থভূমি — হৃদয়। তখন প্রথম চৈতন্য হয়েছে। আর চারিদিকে জ্যোতিঃ দর্শন হয়। তখন সে ব্যক্তি ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ দেখে অবাক্ হয়ে বকে, 'একি'! 'একি!' তখন আর নিচের দিকে (সংসারের দিকে) মন যায় না।

"মনের পঞ্চভূমি — কণ্ঠ। মন যার কণ্ঠে উঠেছে, তার অবিদ্যা অজ্ঞান সব গিয়ে, ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোন কথা শুনতে বা বলতে ভাল লাগে না। যদি কেউ অন্য কথা বলে, সেখান থেকে উঠে যায়।

“মনের ষষ্ঠভূমি — কপাল। মন সেখানে গেলে অহর্নিশ ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। তখনও একটু ‘আমি’ থাকে। সে ব্যক্তি সেই নিরুপম রূপদর্শন করে, উন্মত্ত হয়ে সেই রূপকে স্পর্শ আর আলিঙ্গন করতে যায়, কিন্তু পারে না। যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো আছে, মনে হয়, এই আলো ছুঁলাম ছুঁলাম; কিন্তু কাচ ব্যবধান আছে বলে ছুঁতে পারা যায় না।

“শিরোদেশ — সপ্তমভূমি — সেখানে মন গেলে সমাধি হয় ও ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। কিন্তু সে-অবস্থায় শরীর অধিক দিন থাকে না। সর্বদা বেহুঁশ, কিছু খেতে পারে না, মুখে দুধ দিলে গড়িয়ে যায়। এই ভূমিতে একুশ দিনে মৃত্যু। এই ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা। তোমাদের ভক্তিপথ। ভক্তিপথ খুব ভাল আর সহজ।”

[সমাধি হলে কর্মত্যাগ — পূর্বকথা — ঠাকুরের তর্পণাদি কর্মত্যাগ]

“আমায় একজন বলেছিল, ‘মহাশয়! আমাকে সমাধিটা শিখিয়ে দিতে পারেন?’ (সকলের হাস্য)

“সমাধি হলে সব কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। পূজা-জপাদি কর্ম, বিষয়কর্ম সব ত্যাগ হয়। প্রথমে কর্মের বড় হৈ-চৈ থাকে। যত ঈশ্বরের দিকে এগুবে ততই কর্মের আড়ম্বর কমে। এমন কি তাঁর নামগুণগান পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। (শিবনাথের প্রতি) যতক্ষণ তুমি সভায় আসনি তোমার নাম, গুণকথা অনেক হয়েছে। যাই তুমি এসে পড়েছ, অমনি সে-সব কথা বন্ধ হয়ে গেল। তখন তোমার দর্শনেতেই

আনন্দ। তখন লোকে বলে, ‘এই যে শিবনাথ বাবু এসেছেন।’ তোমার বিষয়ে অন্য সব কথা বন্ধ হয়ে যায়।

“আমার এই অবস্থার পর গঙ্গাজলে তর্পণ করতে গিয়ে দেখি যে, হাতের আঙুলের ভিতর দিয়ে জল গলে পড়ে যাচ্ছে। তখন হলধারীকে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করলাম, দাদা, একি হল! হলধারী বললে একে গলিতহস্ত বলে। ঈশ্বরদর্শনের পর তর্পণাদি কর্ম থাকে না।

“সংকীর্তনে প্রথমে বলে ‘নিতাই আমার মাতা হাতি!’ ‘নিতাই আমার মাতা হাতি!’ ভাব গাঢ় হলে শুধু বলে ‘হাতি! হাতি!’ তারপর কেবল ‘হাতি’ এই কথাটি মুখে থাকে। শেষে ‘হা’ বলতে বলতে ভাবসমাধি হয়। তখন সে ব্যক্তি, এতক্ষণ কীর্তন করছিল, চুপ হয়ে যায়।

“যেমন ব্রাহ্মণভোজনে — প্রথমে খুব হৈ-চৈ। যখন সকলে পাতা সম্মুখে করে বসলে, তখন অনেক হৈ-চৈ কমে গেল, কেবল ‘লুচি আন’ ‘লুচি আন’ শব্দ হতে থাকে। তারপর যখন লুচি তরকারি খেতে আরম্ভ করে, তখন বার আনা শব্দ কমে গেছে। যখন দই এল তখন সুপসুপ (সকলের হাস্য) — শব্দ নাই বললেও হয়। খাবার পর নিদ্রা। তখন সব চুপ।

“তাই বলছি, প্রথম প্রথম কর্মের খুব হৈ-চৈ থাকে। ঈশ্বরের পথে যত এগুবে ততই কর্ম কমবে। শেষে কর্মত্যাগ আর সমাধি।

“গৃহস্থের বউ অন্তঃসত্ত্বা হলে শাশুড়ী কর্ম কমিয়ে দেয়, দশমাসে কর্ম প্রায় করতে হয় না। ছেলে হলে একেবারে কর্মত্যাগ। মা ছেলেটি নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে। ঘরকন্নার কাজ শাশুড়ী, ননদ, জা — এরা সব করে।”

[অবতারাদির শরীর সমাধির পর — লোকশিক্ষার জন্য]

“সমাধিস্থ হবার পর প্রায় শরীর থাকে না। কারু কারু লোকশিক্ষার জন্য শরীর থাকে — যেমন নারদাদির। আর চৈতন্যদেবের মতো অবতারদের। কূপ খোঁড়া হয়ে গেলে, কেহ কেহ ঝুড়ি-কোদাল বিদায় করে দেয়। কেউ কেউ রেখে দেয় — ভাবে, যদি পাড়ার কারুর দরকার হয়। এরূপ মহাপুরুষ জীবের দুঃখে কাতর। এরা স্বার্থপর নয় যে, আপনাদের জ্ঞান হলেই হল। স্বার্থপর লোকের কথা তো জানো। এখানে মোত্‌ বললে মুত্‌বে না, পাছে তোমার উপকার হয়। (সকলের হাস্য) এক পয়সার সন্দেশ দোকান থেকে আনতে দিলে চুষে চুষে এনে দেয়। (সকলের হাস্য)

“কিন্তু শক্তিবিশেষ। সামান্য আধার লোকশিক্ষা দিতে ভয় করে। হাবাতে কাঠ নিজে একরকম করে ভেসে যায়, কিন্তু একটা পাখি এসে বসলে ডুবে যায়। কিন্তু নারদাদি বাহাদুরী কাঠ। এ-কাঠ নিজেও ভেসে যায়, আবার উপরে কত মানুষ, গরু, হাতি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ২৮শে অক্টোবর 1882/10/28/vii

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা, ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং, প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ।।

[গীতা — ১১।৪৫]

07.7 ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনাপদ্ধতি ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য-বর্ণনা

[পূর্বকথা — দক্ষিণেশ্বরে রাধাকান্তের ঘরে গয়না চুরি — ১৮৬৯]

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিবনাথের প্রতি) — হ্যাঁগা, তোমরা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য অত বর্ণনা কর কেন? অমি কেশব সেনকে ওই কথা বলেছিলাম। একদিন তারা সব ওখানে (কালীবাড়িতে) গিছিল। আমি বললুম, তোমরা কিরকম লেকচার দাও, আমি শুনব। তা গঙ্গার ঘাটের চাঁদনিতে সভা হল, আর কেশব বলতে লাগল। বেশ বললে, আমার ভাব হয়ে গিছিল। পরে কেশবকে আমি বললুম, তুমি এগুলো এত বল কেন? — "হে ইশ্বর, তুমি কি সুন্দর ফুল করিয়াছ, তুমি আকাশ করিয়াছ, তুমি সমুদ্র করিয়াছ — এই সব?" যারা নিজে ঐশ্বর্য ভালবাসে তারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বর্ণনা করতে ভালবাসে। যখন রাধাকান্তের গয়না চুরি গেল, সেজোবাবু (রাসমণির জামাই) রাধাকান্তের মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে বলতে লাগল, "ছি ঠাকুর! তুমি তোমার গয়না রক্ষা করতে পারলে না!" আমি সেজোবাবুকে বললাম, "ও তোমার কি বুদ্ধি! স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁর দাসী, পদসেবা করেন, তাঁর কি ঐশ্বর্যের অভাব! এ গয়না তোমার পক্ষেই ভারী একটা জিনিস, কিন্তু ঈশ্বরের

পক্ষে কতকগুলো মাটির ড্যালা! ছি! অমন হীনবুদ্ধির কথা বলতে নাই; কি ঐশ্বর্য তুমি তাঁকে দিতে পার?” তাই বলি, যাঁকে নিয়ে আনন্দ হয়, তাঁকেই লোকে চায়; তার বাড়ি কোথায়, ক’খানা বাড়ি, ক’টা বাগান, কত ধন-জন, দাস-দাসী এ খবরে কাজ কি? নরেন্দ্রকে যখন দেখি, তখন আমি সব ভুলে যাই। তার কোথা বাড়ি, তার বাবা কি করে, তার ক’টি ভাই এ-সব কথা একদিন ভুলেও জিজ্ঞাসা করি নাই। ঈশ্বরের মাধুর্যরসে ডুবে যাও! তাঁর অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত ঐশ্বর্য! অত খবরে আমাদের কাজ কি।

আবার সেই গন্ধর্বনিন্দিতকণ্ঠে সেই মধুরিমাপূর্ণ গান:

“ডুব্‌ ডুব্‌ ডুব্‌ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন।।
খুঁজ্‌ খুঁজ্‌ খুঁজ্‌ খুঁজলে পাবি হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্‌ দীপ্‌ দীপ্‌ জ্ঞানের বাতি, জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ।।
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙায় ডিঙে, চালায় আবার সে কোন্‌ জন।
****কুবীর বলে শোন্‌ শোন্‌ শোন্‌ ভাব গুরুর শ্রীচরণ।।

“তবে দর্শনের পর ভক্তের সাধ হয় তাঁর লীলা কি, দেখি। রামচন্দ্র রাবণবধের পর রাক্ষসপুরী প্রবেশ করলেন; বুড়ী নিকষা দৌড়ে পালাতে লাগল। লক্ষ্মণ বললেন, ‘রাম! একি বলুন দেখি, এই নিকষা এত বুড়ী, কত পুত্রশোক পেয়েছে, তার এত প্রাণের ভয়, পালাচ্ছে!’ রামচন্দ্র নিকষাকে অভয় দান করে সম্মুখে আনিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে নিকষা বললে, ‘রাম, এতদিন বেঁচে আছি বলে তোমার এত

লীলা দেখলাম, তাই আরও বাঁচবার সাধ আছে। তোমার আরো কত লীলা দেখব।' (সকলের হাস্য)

(শিবনাথের প্রতি) — "তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করে। শুদ্ধাত্মাদের না দেখলে কি নিয়ে থাকব? শুদ্ধাত্মাদের পূর্বজন্মের বন্ধু বলে বোধ হয়।"

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, মহাশয়! আপনি জন্মান্তর মানেন?

[জন্মান্তর —— "বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন"]

শ্রীরামকৃষ্ণ —— হ্যাঁ, আমি শুনেছি জন্মান্তর আছে। ঈশ্বরের কার্য আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি বুঝব? অনেকে বলে গেছে, তাই অবিশ্বাস করতে পারি না। ভীষ্মদেব দেহত্যাগ করবেন, শরশয্যায় শুয়ে আছেন, পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সব দাঁড়িয়ে। তাঁরা দেখলেন যে, ভীষ্মদেবের চক্ষু দিয়ে জল পড়ছে। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'ভাই, কি অশ্চর্য! পিতামহ, যিনি স্বয়ং ভীষ্মদেব, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানী, অষ্টবসুর এক বসু, তিনিও দেহত্যাগের সময় মায়াতে কাঁদছেন।' শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেবকে এ-কথা বলাতে তিনি বললেন, 'কৃষ্ণ, তুমি বেশ জানো, আমি সেজন্য কাঁদছি না! যখন ভাবছি যে, যে পাণ্ডবদের স্বয়ং ভগবান নিজে সারথি, তাদেরও দুঃখ-বিপদের শেষ নাই, তখন এই মনে করে কাঁদছি যে, ভগবানের কার্য কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

[কীর্তনানন্দে —— ভক্তসঙ্গে]

সমাজগৃহে এইবার সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হইল। রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা। সন্ধ্যার চার-পাঁচ দণ্ডের পর রাত্রী জ্যোৎস্নাময়ী হইল। উদ্যানের বৃক্ষরাজি লতাপল্লব শরচ্চন্দ্রের বিমলকিরণে যেন ভাসিতে লাগিল। এদিকে সমাজগৃহে সংকীর্তন আরম্ভ হইয়াছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতেছেন, ব্রাহ্মভক্তেরা খোল-করতাল লইয়া তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতেছেন। সকলেই ভাবে মত্ত, যেন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন! হরিনামের রোল উত্তরোত্তর উঠিতেছে। চারিদিকে গ্রামবাসীরা হরিনাম শুনিতেছেন, আর মনে মনে উদ্যানস্বামী ভক্ত বেণীমাধবকে কতই ধন্যবাদ দিতেছেন।

কীর্তনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হইয়া জগন্মাতাকে প্রণাম করিতেছেন। প্রণাম করিতে করিতে বলিতেছেন, "ভাগবত-ভক্ত-ভগবান, জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাকারবাদী ভক্তের চরণে, নিরাকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম; আগেকার ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে, ব্রাহ্মসমাজের ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম।"

বেণীমাধব নানাবিধ উপায়ের খাদ্য আয়োজন করিয়াছিলেন ও সমবেত সকল ভক্তকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও ভক্তসঙ্গে বসিয়া আনন্দ করিতে করিতে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c8 ৮ সার্কাস রঙ্গালয়ে -- গৃহস্থের ও অন্যান্য কর্মীদের কঠিন সমস্যা ও শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ১৫ই নভেম্বর 1882/11/15

08.1 সার্কাস ও বলরাম মন্দিরে

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুর বিদ্যাসাগর স্কুলের দ্বারে গাড়ি করিয়া আসিয়া উপস্থিত। বেলা তিনটা হইবে। গাড়িতে মাস্টারকে তুলিয়া লইলেন। রাখাল ও আরও দু-একটি ভক্ত গাড়িতে আছেন। আজ বুধবার ১৫ই নভেম্বর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ, কার্তিক শুক্লা পঞ্চমী। গাড়ি ক্রমে চিৎপুর রাস্তা দিয়া গড়ের মাঠের দিকে যাইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দময় — মাতালের ন্যায় — গাড়ির একবার এধার একবার ওধার মুখ বাড়াইয়া বালকের ন্যায় দেখিতেছেন। মাস্টারকে বলিতেছেন, দেখ, সব লোক দেখছি নিম্নদৃষ্টি। পেটের জন্য সব যাচ্ছে, ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি নাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ আজ গড়ের মাঠে উইলসনের সার্কাস দেখিতে যাইতেছেন। মাঠে পৌঁছিয়া টিকিট কেনা হইল। আট আনার অর্থাৎ শেষশ্রেণীর টিকিট। ভক্তেরা ঠাকুরকে লইয়া উচ্চস্থানে উঠিয়া এক বেঞ্চির উপরে বসিলেন। ঠাকুর আনন্দে বলিতেছেন, "বাঃ, এখান থেকে বেশ দেখা যায়।"

রঙ্গস্থলে নানারূপ খেলা অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখা হইল। গোলাকার রাস্তায় ঘোড়া দৌড়িতেছে। ঘোড়ার পৃষ্ঠে একপায়ে বিবি দাঁড়াইয়া। আবার মাঝে মাঝে সামনে বড় বড় লোহার রিং (চক্র)। রিং-এর কাছে আসিয়া ঘোড়া যখন রিং-এর নিচে দৌড়িতেছে, বিবি ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে লম্ফ দিয়া রিং-এর মধ্য দিয়া পুনরায় ঘোড়ার পৃষ্ঠে আবার একপায়ে দাঁড়াইয়া! ঘোড়া পুনঃ পুনঃ বনবন করিয়া ওই গোলাকার পথে দৌড়াইতে লাগিল, বিবিও আবার ওইরূপ পৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া!

সার্কাস সমাপ্ত হইল। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নামিয়া আসিয়া ময়দানে গাড়ির কাছে আসিলেন। শীত পড়িয়াছে। গায়ে সবুজ বনাত দিয়া মাঠে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন, কাছে ভক্তেরা দাঁড়াইয়া আছেন। একজন ভক্তের হাতে বেটুয়াটি (মশলার ছোট থলেটি) রহিয়াছে। তাহাতে মশলা বিশেষতঃ কাবাব চিনি আছে।

[আগে সাধন, তারপর সংসার; অভ্যাসযোগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারকে বলিতেছেন, “দেখলে, বিবি কেমন একপায়ে ঘোড়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে, আর বনবন করে দৌড়ুচ্ছে! কত কঠিন, অনেকদিন ধরে অভ্যাস করেছে, তবে তো হয়েছে! একটু অসাবধান হলেই হাত-পা ভেঙে যাবে, আবার মৃত্যুও হতে পারে। সংসার করা ওইরূপ কঠিন। অনেক সাধন-ভজন করলে ঈশ্বরের কৃপায় কেউ কেউ পেরেছে। অধিকাংশ লোক পারে না। সংসার করতে গিয়ে আরও বদ্ধ হয়ে যায়, আরও ডুবে যায়, মৃত্যুযন্ত্রণা হয়! কেউ কেউ, যেমন জনকাদি অনেক তপস্যার বলে সংসার করেছিলেন। তাই সাধন-ভজন খুব দরকার, তা না হলে সংসারে ঠিক থাকা যায় না।”

[বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ গাড়িতে উঠিলেন। গাড়ি বাগবাজারে বসুপাড়ায় বলরামের বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইল, ঠাকুর ভক্তসঙ্গে দোতলার বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। সন্ধ্যার বাতি জ্বালা হইয়াছে। ঠাকুর সার্কাসের গল্প করিতেছেন। অনেকগুলি ভক্ত সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত ঈশ্বরীয় অনেক কথা হইতেছে। মুখে অন্য কথা কিছুই নাই, কেবল ঈশ্বরীয় কথা।

[Sri Ramakrishna, the Caste-system and the problem of the Untouchables solved]

জাতিভেদ সম্বন্ধে কথা পড়িল। ঠাকুর বলিলেন, “এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। সে উপায় — ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই। ভক্তি হলেই দেহ, মন, আত্মা — সব শুদ্ধ হয়। গৌর, নিতাই হরিনাম দিতে লাগলেন, আর আচণ্ডালে

কোল দিলেন। ভক্তি থাকলে চণ্ডাল, চণ্ডাল নয়। অস্পৃশ্য জাতি ভক্তি থাকলে শুদ্ধ, পবিত্র হয়।”

[সংসারী বদ্ধজীব]

শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারী বদ্ধজীবের কথা বলিতেছেন। তারা যেন গুটিপোকা, মনে করলে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে; কিন্তু অনেক যত্ন করে গুটি তৈয়ার করেছে, ছেড়ে আসতে পারে না; তাতেই মৃত্যু হয়। আবার যেন ঘুনির মধ্যে মাছ; যে-পথে ঢুকেছে, সেই পথ দিয়ে বেরিয়া আসতে পারে, কিন্তু জলের মিষ্ট শব্দ আর অন্য অন্য মাছের সঙ্গে ক্রীড়া, তাই ভুলে থাকে, বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করে না। ছেলেমেয়ের আধ-আধ কথাবার্তা যেন জলকল্লোলের মধুর শব্দ। মাছ অর্থাৎ জীব, পরিবারবর্গ। তবে দু-একটা দৌড়ে পালায়, তাদের বলে মুক্তজীব।

ঠাকুর গান গাহিতেছেন:

এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছ কি কুহক করে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি জানিতে পারে ।।
বিল করে ঘুনি পাতে মীন প্রবেশ করে তাতে।
গতায়াতের পথ আছে তবু মীন পালাতে নারে ।।

ঠাকুর আবার বলিতেছেন, “জীব যেন ডাল, জাঁতার ভিতর পড়েছে; পিষে যাবে। তবে যে কটি ডাল খুঁটি ধরে থাকে, তারা পিষে যায় না। তাই খুঁটি অর্থাৎ ঈশ্বরের শরণাগত হতে হয়। তাঁকে ডাক, তাঁর নাম কর তবে মুক্তি। তা না হলে কালরূপ জাঁতায় পিষে যাবে।”

ঠাকুর আবার গান গাহিতেছেন:

পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরী।
মায়া-ঝড় মোহ-তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী ।।
একে মন-মাঝি আনাড়ি, তাহে ছজন গোঁয়াড় দাঁড়ি;
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবুডুবু খেয়ে মরি।
ভেঙে গেল ভক্তির হাল; ছিঁড়ে পড়ল শ্রদ্ধার পাল,
তরী হল বানচাল, উপায় কি করি; —
উপায় না দেখি আর, অকিঞ্চন ভেবে সার;
তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার, শ্রীদুর্গানামের ভেলা ধরি ।।

[Duty to wife and children]

বিশ্বাসবাবু অনেকক্ষণ বসিয়াছিলেন, এখন উঠিয়া গেলেন। তাঁহার অনেক টাকা ছিল, কিন্তু চরিত্র মলিন হওয়াতে সমস্ত উড়িয়া গিয়াছে। এখন পরিবার, কন্যা প্রভৃতি কাহাকেও দেখেন না। বলরাম তাঁহার কথা পাড়াতে ঠাকুর বলিলেন, “ওটা লক্ষ্মীছাড়া দারিদ্দির। গৃহস্থের কর্তব্য আছে, ঋণ আছে, দেব-ঋণ, পিতৃ-ঋণ, ঋষি-ঋণ আবার পরিবারদের সম্বন্ধে ঋণ আছে। সতী স্ত্রী হলে তাকে প্রতিপালন; সন্তানদিগকে প্রতিপালন যতদিন না লায়েক হয়।

“সাধুই কেবল সঞ্চয় করবে না। ‘পঞ্ছি আউর দরবেশ’ সঞ্চয় করে না। কিন্তু পাখির ছানা হলে সঞ্চয় করে। ছানার জন্যে মুখে করে খাবার নিয়ে যায়।”

বলরাম — এখন বিশ্বাসের সাধুসঙ্গ করবার ইচ্ছা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — সাধুর কমণ্ডলু চারধামে ঘুরে আসে, কিন্তু যেমন তেতো, তেমনি তেতো থাকে। মলয়ের হাওয়া যে গাছে লাগে, সে-সব চন্দন হয়ে যায়! কিন্তু শিমুল, অশ্বত্থ, আমড়া এরা চন্দন হয় না। কেউ কেউ সাধুসঙ্গ করে, গাঁজা খাবার জন্য। (হাস্য) সাধুরা গাঁজা খায় কিনা, তাই তাদের কাছে এসে বসে গাঁজা সেজে দেয় আর প্রসাদ পায়। (সকলের হাস্য)

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ১৬ই নভেম্বর 1882/11/16

08.2 ষড়ভুজদর্শন ও শ্রীরাজমোহনের বাড়িতে শুভাগমন — নরেন্দ্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গড়ের মাঠে যেদিন সার্কাস দর্শন করিলেন তাহার পরদিনেই আবার কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছেন; বৃহস্পতিবার ১৬ই নভেম্বর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ, কার্তিক শুক্লা ষষ্ঠী, (১লা অগ্রহায়ণ)। আসিয়াই প্রথমে গরাণহাটায়১ ষড়ভুজ মহাপ্রভু দর্শন করিলেন। বৈষ্ণব সাধুদের আখড়া; মহন্ত শ্রীগিরিধারী দাস। ষড়ভুজ মহাপ্রভুর সেবা অনেকদিন হইতে চলিতেছে। ঠাকুর বৈকালে দর্শন করিলেন।

সন্ধ্যার কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর সিমুলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজমোহনের বাড়িতে গাড়ি করিয়া আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর শুনিয়াছেন যে, এখানে নরেন্দ্র প্রভৃতি ছোকরারা মিলিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা করেন। তাই দেখিতে আসিয়াছেন। মাস্টার ও আরও দু-একজন ভক্ত সঙ্গে আছেন। শ্রীযুক্ত রাজমোহন পুরাতন ব্রাহ্মভক্ত।

[ব্রাহ্মভক্ত ও সর্বত্যাগ বা সন্ন্যাস]

ঠাকুর নরেন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। আর বলিলেন, "তোমাদের উপাসনা দেখব!" নরেন্দ্র গান গাহিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত প্রিয় প্রভৃতি ছোকরারা কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন।

এইবার উপাসনা হইতেছে। ছোকরাদের মধ্যে একজন উপাসনা করিতেছেন। তিনি প্রার্থনা করিতেছেন, ঠাকুর যেন সব ছেড়ে তোমাতে মগ্ন হই! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়া বোধ হয় তাঁহার উদ্দীপন হইয়াছে। তাই সর্বত্যাগের কথা বলিতেছেন। মাস্টার ঠাকুরের খুব কাছে বসিয়াছিলেন, তিনিই কেবল শুনিতে পাইলেন, ঠাকুর অতি মৃদুস্বরে বলিতেছেন, "তা আর হয়েছে!"

শ্রীযুক্ত রাজমোহন ঠাকুরকে জল খাওয়াইবার জন্য বাড়ির ভিতরে লইয়া যাইতেছেন।

১ বর্তমান নিমতলা স্ট্রীট।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ১৯ই নভেম্বর 1882/11/19

08.3 শ্রীযুক্ত মনোমোহন ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ

পরের রবিবারে (১৯শে মভেম্বর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ) ৺জগদ্ধাত্রীপূজা, সুরেন্দ্র নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনি ঘর বাহির করিতেছেন —— কখন ঠাকুর আসেন। মাস্টারকে দেখিয়া তিনি বলিতেছেন, "তুমি এসেছ, আর তিনি কোথায়?" এমন সকয় ঠাকুরের গাড়ি আসিয়া উপস্থিত। কাছে শ্রীযুক্ত মনোমোহনের বাড়ি, ঠাকুর প্রথমে সেখানে নামিলেন, সেখানে একটু বিশ্রাম করিয়া সুরেন্দ্রের বাড়িতে আসিবেন।

মনোমোহনের বৈঠকখানায় ঠাকুর বলিতেছিলেন, "যে অকিঞ্চন, যে দীন, তার ভক্তি ঈশ্বরের প্রিয় জিনিস। খোল মাখানো জাব যেমন গরুর প্রিয়! দুর্যোধন অত টাকা অত ঐশ্বর্য দেখাতে লাগল; কিন্তু তার বাটীতে ঠাকুর গেলেন না। তিনি বিদুরের বাটী গেলেন। তিনি ভক্তবৎসল, বৎসের পাছে যেমন গাভী ধায় সেইরূপ তিনি ভক্তের পাছে পাছে যান।"

ঠাকুর গান গাহিতেছেন:

যে ভাব লাগি পরম যোগী, যোগ করে যুগ-যুগান্তরে।

হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বক ধরে।

“চৈতন্যদেবের কৃষ্ণনামে অশ্রু পড়ত। ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। মানুষ মনে করলে ঈশ্বরলাভ করতে পারে। কিন্তু কামিনী-কাঞ্চন ভোগ করতেও মত্ত। মাথায় মাণিক রয়েছে তবু সাপ ব্যাঙ খেয়ে মরে!

“ভক্তিই সার। ঈশ্বরকে বিচার করে কে জানতে পারবে। আমার দরকার ভক্তি। তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য অত জানবার কি দরকার? এক বোতল মদে যতি মাতাল হই শুঁড়ির দোকানে কত মন মদ আছে, সে খবরে আমার কি দরকার? একঘটি জলে আমার তৃষ্ণার শান্তি হতে পারে; পৃথিবীতে কত জল আছে, সে খবরে আমার প্রয়োজন নাই।”

[সুরেন্দ্রের দাদা ও সদরওয়ালার পদ — জাতিভেদ — caste system and problem of the Untouchables solved — Theosophy]

শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার সুরেন্দ্রের বাড়িতে আসিয়াছেন। আসিয়া দোতলার বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। সুরেন্দ্রের মোজোভাই সদরওয়ালা, তিনিও উপস্থিত ছিলেন। অনেক ভক্ত ঘরে সমবেত হইয়াছেন। ঠাকুর সুরেন্দ্রের দাদাকে বলিতেছেন, “আপনি জজ, তা বেশ; এটি জানবেন সবই ঈশ্বরের শক্তি। বড় পদ তিনিই দিয়েছেন, তাই হয়েছে। লোকে মনে করে আমরা বড়লোক; ছাদের জল সিংহের মুখওয়ালা নল দিয়ে পড়ে, মনে হয় সিংহটা মুখ দিয়ে জল বার কচ্ছে। কিন্তু দেখ কোথাকার জল। কোথা আকাশে মেঘ হয়, সেই জল ছাদে পড়েছে, তারপর গড়িয়ে নলে যাচ্ছ; তারপর সিংহের মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে।”

সুরেন্দ্রের ভ্রাতা — মহাশয়, ব্রাহ্মসমাজে বলে স্ত্রী-স্বাধীনতা; জাতিভেদ উঠিয়ে দাও; এ-সব আপনার কি বোধ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বরের উপর নূতন অনুরাগ হলে ওইরকম হয়। ঝড় এলে ধুলো ওড়ে, কোন্‌টা আমড়া, আর কোন্‌টা তেঁতুলগাছ, কোন্‌টা আমগাছ বোঝা যায় না। ঝড় থেমে গেলে, তখন বোঝা যায়। নবানুরাগের ঝড় থেকে গেলে ক্রমে বোঝা যায় যে, ঈশ্বরই শ্রেয়ঃ নিত্যপদার্থ আর সব অনিত্য। সাধুসঙ্গ তপস্যা না করলে এ-সব ধারণা হয় না! পাখোয়াজের বোল মুখে বললে কি হবে; হাতে আনা বড় কঠিন। শুধু লেকচার দিলে কি হবে; তপস্যা চাই, তবে ধারণা হবে।

“জাতিভেদ? কেবল এক উপায় জাতিভেদ উঠিতে পারে। সেটি ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই। অস্পৃশ্য জাত শুদ্ধ হয় — চণ্ডাল ভক্ত হলে আর চণ্ডাল থাকে না! চৈতন্যদেব আচণ্ডালে কোল দিয়েছিলেন।

“ব্রহ্মজ্ঞানীরা হরিনাম করে, খুব ভাল। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তাঁর কৃপা হবে, ঈশ্বরলাভ হবে।

“সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। এক ঈশ্বরকে নানা নামে ডাকে। যেমন একঘাটের জল হিন্দুরা খায়; বলে জল; আর-একঘাটে খ্রীষ্টানরা খায়, বলে ওয়াটার; আর-একঘাটে মুসলমানেরা খায়, বলে পানি।”

সুরেন্দ্রের ভ্রাতা — মহাশয়, থিওজফি কিরূপ বোধ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — শুনেছি নাকি ওতে অলৌকিক শক্তি (Miracles) হয়। দেব মোড়লের বাড়িতে দেখেছিলাম একজন পিশাচসিদ্ধ। পিশাচ কত কি জিনিস এনে দিত। অলৌকিক শক্তি নিয়ে কি করব? ওর দ্বারা কি ঈশ্বরলাভ হয়? ঈশ্বর যদি না লাভ হল তাহলে সকলই মিথ্যা!

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ২৬শে নভেম্বর 1882/11/26

08.4 মণি মল্লিকের ব্রাহ্মোৎসবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিকের সিন্দুরিয়াপটীর বাটীতে ভক্তসঙ্গে শুভাগমন করিয়াছিলেন। সেখানে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বৎসর উৎসব হয়। বৈকাল, বেলা ৪টা হইবে। এখানে আজ ব্রাহ্মসমাজের সাংবাৎসরিক উৎসব। (২৬শে) নভেম্বর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অনেকগুলি ব্রাহ্মভক্ত আর শ্রীপ্রেমচাঁদ বড়াল ও গৃহস্বামীর অন্যান্য বন্ধুগণ আসিয়াছেন। মাস্টার প্রভৃতি সঙ্গে আছেন।

শ্রীযুক্ত মণিলাল ভক্তদের সেবার জন্য অনেক আয়োজন করিয়াছেন। তিনি অদ্যকার উপাসনা করিবেন। তিনি এখনও গৈরিকবস্ত্র ধারণ করেন নাই।

কথক মহাশয় প্রহ্লাদচরিত্র-কথা বলিতেছেন। পিতা হিরণ্যকশিপু হরির নিন্দা ও পুত্র প্রহ্লাদকে বারবার নির্যাতন করিতেছেন। প্রহ্লাদ করজোড়ে হরির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন আর বলিতেছেন, “হে হরি, পিতাকে সুমতি দাও।” ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া কাঁদিতেছেন। শ্রীযুক্ত বিজয় প্রভৃতি ভক্তেরা ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুরের ভাবাবস্থা হইয়াছে।

[শ্রীবিজয় গোস্বামী প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তদিগকে উপদেশ — ঈশ্বর দর্শন ও আদেশপ্রাপ্তি, তবে লোকশিক্ষা]

কিয়ৎক্ষণ পরে বিজয়াদি ভক্তদিগকে বলিতেছেন, “ভক্তিই সার। তাঁর নামগুণকীর্তন সর্বদা করতে করতে ভক্তিলাভ হয়। আহা! শিবনাথের কি ভক্তি! যেন রসে ফেলা ছানাবড়া।

“এরকম মনে করা ভাল নয় যে, আমার ধর্মই ঠিক, আর অন্য সকলের ধর্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকলেই হল। অনন্ত পথ — অনন্ত মত।”

“দেখ! ঈশ্বরকে দেখা যায়। ‘অবাঙ্মনসোগোচর’ বেদে বলেছে: এর মানে বিষয়াসক্ত মনের অগোচর। বৈষ্ণবচরণ বলত, তিনি শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। ১ তাই সাধুসঙ্গ, প্রার্থনা, গুরুর উপদেশ এই সব প্রয়োজন। তবে চিত্তশুদ্ধি হয়। তবে তাঁর দর্শন হয়। ঘোলা জলে নির্মলি ফেললে পরিষ্কার হয়। তখন মুখ দেখা যায়। ময়লা আরশিতে ও মুখ দেখা যায় না।

“চিত্তশুদ্ধির পর ভক্তিলাভ করলে, তবে তাঁর কৃপায় তাঁকে দর্শন হয়। দর্শনের পর আদেশ পেলে তবে লোকশিক্ষা দেওয়া যায়। আগে থাকতে লেকচার দেওয়া ভাল নয়। একটা গানে আছে:

ভাবছো কি মন একলা বসে,
অনুরাগ বিনে কি চাঁদ গৌর মিলে।
মন্দিরে তোর নাইকে মাধব,
পোদো শাঁক ফুঁকে তুই করলি গোল।
তায় চামচিকে এগারজনা,
দিবানিশি দিচ্ছে থানা।

“হৃদয়মন্দিরে আগে পরিষ্কার রাখতে হয়; ঠাকুর প্রতিমা আনতে হয়; পূজার আয়োজন করতে হয়। কোন আয়োজন নাই, ভোঁ ভোঁ করে শাঁক বাজানো, তাতে কি হবে?”

এইবার শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামী বেদীতে বসিয়া ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করিতেছেন; উপাসনান্তে তিনি ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি) — আচ্ছা, তোমরা অত পাপ পাপ বললে কেন? একশোবার “আমি পাপী” “আমি পাপী” বললে তাই হয়ে যায়। এমন বিশ্বাস করা চাই যে, তাঁর নাম করেছি — আমার আবার পাপ কি? তিনি আমাদের বাপ-মা; তাঁকে বল যে, পাপ করেছি, আর কখনও করব না। আর তাঁর নাম কর, তাঁর নামে সকলে দেহ-মন পবিত্র কর — জিহ্বাকে পবিত্র কর।

১ মন এব মনুষ্যাণাং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসঙ্গি মোক্ষে নির্বিষয়ং স্মৃতমিতি।। — (মৈত্রায়ণী উপনিষদ্ — ৬।৩৪)

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c9 ৯ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামি ও অন্যান্য ভক্তের প্রতি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ১৪ই ডিসেম্বর 1882/12/14/i

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বাঽভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।

[গীতা — ২।২০]

09.1 মুক্তপুরুষের শরীরত্যাগ কি আত্মহত্যা?

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে তিন-চারটি ব্রাহ্মভক্ত। ২৯শে অগ্রহায়ণ, শুক্লা চতুর্থী তিথি। বৃহস্পতিবার, ইংরেজী ১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। পরমহংসদেবের পরমভক্ত শ্রীযুক্ত বলরামের সহিত ইঁহারা নৌকা করিয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্নকালে সবে মাত্র একটু বিশ্রাম করিতেছেন। রবিবারেই বেশি লোক সমাগম হয়। যে-সকল ভক্তেরা একান্তে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে চান, তাঁহারা প্রায় অন্য দিনেই আসেন।

পরমহংসদেব তক্তপোশের উপর উপবিষ্ট। বিজয়, বলরাম, মাস্টার ও অন্যান্য ভক্তেরা পশ্চিমাস্য হইয়া, তাঁহার দিকে মুখ করিয়া কেহ মাদুরের উপর। কেহ শুধু মেঝের উপর বসিয়া আছেন। ঘরের পশ্চিমদিকের দ্বারমধ্য দিয়া ভাগীরথী দেখা যাইতেছিল। শীতকালের স্থিরা স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথী। দ্বারের পরই পশ্চিমের অর্ধমণ্ডলাকার বারান্দা, তৎপরেই পুষ্পোদ্যান, তারপর পোস্তা। পোস্তার পশ্চিমগায়ে পুণ্যসলিলা কলুষহারিণী গঙ্গা, যেন ঈশ্বর মন্দিরের পাদমূল আনন্দে ধৌত করিতে করিতে যাইতেছিলেন।

শীতকাল, তাই সকলের গায়ে গরম কাপড়। বিজয় শূলবেদনায় দারুণ যন্ত্রণা পান; তাই সঙ্গে শিশি করিয়া ঔষধ আনিয়াছেন — ঔষধ সেবনের সময় হইলে খাইবেন। বিজয় এখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন বেতনভোগী আচার্য।

সমাজের বেদীর উপর বসিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিতে হয়। তবে এখন সমাজের সহিত নানা বিষয়ে মতভেদ হইতেছে। কর্ম স্বীকার করিয়াছেন, কি করেন, স্বাধীনভাবে কথাবার্তা বা কার্য করিতে পারেন না। বিজয় অতি পবিত্র বংশে — অদ্বৈত গোস্বামীর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বৈত গোস্বামী জ্ঞানী ছিলেন — নিরাকার পরব্রহ্মের চিন্তা করিতেন, আবার ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন! তিনি ভগবান চৈতন্যদেবের একজন প্রধান পার্ষদ — হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতে করিতে পরিধানবস্ত্র খসিয়া যাইত। বিজয়ও ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন — নিরাকার পরব্রহ্মের চিন্তা করেন; কিন্তু মহাভক্ত পূর্বপুরুষ শ্রীঅদ্বৈতের শোণিত ধমনী মধ্যে প্রবাহিত হইতেছিল, শরীর মধ্যস্থিত হরিপ্রেমের বীজ এখন প্রকাশোন্মুখ — কেবল কাল প্রতীক্ষা করিতেছে! তাই তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দেবদুর্লভ হরিপ্রেমে "গরগর মতোয়ারা" অবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। মন্ত্রমুগ্ধ সর্প যেমন ফণা ধরিয়া সাপুড়ের কাছে বসিয়া থাকে, বিজয়ও পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত ভাগবত শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকটে বসিয়া থাকেন। আবার যখন তিনি হরিপ্রেমে বালকের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকেন, বিজয়ও তাঁহার সঙ্গে নৃত্য করিতে থাকেন।

বিষ্ণুর এঁড়েদয়ে বাড়ি, তিনি গলায় ক্ষুর দিয়া শরীরত্যাগ করিয়াছেন। আজ প্রথমে তাঁহারই কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়, মাস্টার ও ভক্তদের প্রতি) — দেখ, এই ছেলেটি শরীরত্যাগ করেছে শুনলুম, মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে। এখানে আসত, স্কুলে পড়ত, কিন্তু বলত — সংসার ভাল লাগে না। পশ্চিমে গিয়ে কোন আত্মীয়ের কাছে

কিছুদিন ছিল — সেখানে নির্জনে মাঠে, বনে, পাহাড়ে সর্বদা বসে ধ্যান করত। বলেছিল যে, কত কি ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করি।

“বোধ হয় — শেষ জন্ম। পূর্বজন্মে অনেক কাজ করা ছিল। একটু বাকী ছিল, সেইটুকু বুঝি এবার হয়ে গেল।

“পূর্বজন্মের সংস্কার মানতে হয়। শুনেছি, একজন শবসাধন করছিল, গভীর বনে ভগবতীর আরাধনা করছিল। কিন্তু সে অনেক বিভীষিকা দেখতে লাগল; শেষে তাকে বাঘে নিয়ে গেল। আর-একজন বাঘের ভয়ে নিকটে একটা গাছের উপরে উঠেছিল। শব আর অন্যান্য পূজার উপকরণ তৈয়ার দেখে সে নেমে এসে আচমন করে শবের উপরে বসে গেল। একটু জপ করতে করতে মা সাক্ষাৎকার হলেন ও বললেন — আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি, তুমি বর নাও। মার পাদপদ্মে প্রণত হয়ে সে বললে — মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার কাণ্ড দেখে অবাক হয়েছি! সে ব্যক্তি এত খেটে, এত আয়োজন করে, এতদিন ধরে তোমার সাধনা করছিল, তাকে তোমার দয়া হল না! আর আমি কিছু জানি না, শুনি না, ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, আমার উপর এত কৃপা হল! ভগবতী হাসতে হাসতে বললেন, ‘বাছা! তোমার জন্মান্তরের কথা স্মরণ নাই, তুমি জন্ম জন্ম আমার তপস্যা করেছিলে, সেই সাধনবলে তোমার এরূপ জোটপাট হয়েছে, তাই আমার দর্শন পেলে। এখন বল কি বর চাও’?”

একজন ভক্ত বলিলেন, আত্মহত্যা করেছে শুনে ভয় হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আত্মহত্যা করা মহাপাপ, ফিরে ফিরে সংসারে আসতে হবে, আর এই সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

“তবে যদি ঈশ্বরের দর্শন হয়ে কেউ শরীরত্যাগ করে, তাকে আত্মহত্যা বলে না। সে শরীরত্যাগে দোষ নাই। জ্ঞানলাভের পর কেউ কেউ শরীর ত্যাগ করে। যখন সোনার প্রতিমা একবার মাটির ছাঁচে ঢালাই হয়, তখন মাটির ছাঁচ রাখতেও পারে, ভেঙে ফেলতেও পারে।

“অনেক বছর আগে বরাহনগর থেকে একটি ছোকরা আসত, উমের কুড়ি বছর হবে। গোপাল সেন যখন এখানে আসত তখন এত ভাব হত যে, হৃদয় কে ধরতে হত — পাছে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙে যায়! সে ছোকরা একদিন হঠাৎ আমার পায়ে হাত দিয়ে বললে, আর আমি আসতে পারব না — তবে আমি চললুম। কিছুদিন পরে শুনলাম যে, সে শরীরত্যাগ করেছে।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ১৪ই ডিসেম্বর 1882/12/14/ii

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্‌।

[গীতা — ৯।৩৩]

09.2 জীব চার থাক — বদ্ধজীবের লক্ষণ কামিনী-কাঞ্চন

শ্রীরামকৃষ্ণ — জীব চার থাক বলেছে — বদ্ধ, মুমুক্ষু, মুক্ত, নিত্য। সংসার জালের স্বরূপ, জীব যেন মাছ, ঈশ্বর (যাঁর মায়া এই সংসার) তিনি জেলে। জেলের জালে যখন মাছ পড়ে, কতকগুলো মাছ জাল ছিঁড়ে পালাবার অর্থাৎ মুক্ত হবার চেষ্টা করে। এদের মুমুক্ষু জীব বলা যায়। যারা পালাবা চেষ্টা করছে, সকলেই পালাতে পারে না। দু-চারটা মাছ ধপাঙ্‌ শব্দ করে পালায়; তখন লোকেরা বলে, “ওই মাছটা বড়, পালিয়ে গেল!” এই দু-চারটা লোক মুক্তজীব। কতকগুলি মাছ স্বভাবত এত সাবধান যে, কখনও জালে পড়ে না। নারদাদি নিত্যজীব কখনও সংসারজালে পড়ে না। কিন্তু অধিকাংশ মাছ জালে পড়ে; অথচ এ-বোধ নাই যে, জালে পড়েছে মরতে হবে। জালে পড়েই জাল-শুদ্ধ চোঁ-চা দৌড় মারে ও একেবারে পাঁকে গিয়ে শরীর লোকোবার চেষ্টা করে। পালাবার কোন চেষ্টা নাই বরং আরও পাঁকে গিয়ে পড়ে। এরাই বদ্ধজীব। জালে এরা রয়েছে, কিন্তু মনে করে, হেথায় বেশ আছি। বদ্ধজীব, সংসারে — অর্থাৎ কামিনী-কাঞ্চনে — আসক্ত হয়ে আছে; কলঙ্ক-সাগরে মগ্ন, কিন্তু মনে করে বেশ আছি! যারা মুমুক্ষু বা মুক্ত সংসার তাদের পাতকুয়া বোধ হয়; ভাল লাগে না। তাই কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর, ভগবানলাভের পর শরীরত্যাগ করে। কিন্তু সে-রকম শরীরত্যাগ অনেক দূরের কথা।

“বদ্ধজীবের — সংসারী জীবের — কোন মতে হুঁশ আর হয় না। এত দুঃখ, এত দাগা পায়, এত বিপদে পড়ে, তবুও চৈতন্য হয় না।

"উট কাঁটা ঘাস বড় ভালবাসে। কিন্তু যত খায়ে মুখ দিয়ে রক্ত দরদর করে পড়ে; তবুও সেই কাঁটা ঘাসই খাবে, ছাড়বে না। সংসারী লোক এত শোক-তাপ পায়, তবু কিছুদিনের পর যেমন তেমনি। স্ত্রী মরে গেল, কি অসতী হল, তবু আবার বিয়ে করবে। ছেলে মরে গেল কত শোক পেলে, কিছুদিন পরেই সব ভুলে গেল। সেই ছেলের মা, যে শোকে অধীর হয়েছিল, আবার কিছুদিন পরে চুল বাঁধল, গয়না পরল! এরকম লোক মেয়ের বিয়েতে সর্বস্বান্ত হয়, আবার বছরে বছরে তাদের মেয়ে ছেলেও হয়! মোকদ্দমা করে সর্বস্বান্ত হয়, আবার মোকদ্দমা করে! যা ছেলে হয়েছে তাদেরই খাওয়াতে পারে না, পরাতে পারে না, ভাল ঘরে রাখতে পারে না, আবার বছরে বছরে ছেলে হয়!

"আবার কখনও কখনও যেন সাপে ছুঁচো গেলা হয়। গিলতেও পারে না, আবার উগরাতেও পারে না। বদ্ধজীব হয়তো বুঝেছে যে, সংসারে কিছুই সার নাই; আমড়ার কেবল আঁটি আর চামড়া। তবু ছাড়তে পারে না। তবুও ঈশ্বরের দিকে মন দিতে পারে না!

"কেশব সেনের একজন আত্মীয় পঞ্চাশ বছর বয়স, দেখি, তাস খেলছে। যেন ঈশ্বরের নাম করবার সময় হয় নাই!

"বদ্ধজীবের আর-একটি লক্ষণ: তাকে যদি সংসার থেকে সরিয়ে ভাল জায়গায় রাখা যায়, তাহলে হেদিয়ে হেদিয়ে মারা যাবে। বিষ্ঠার পোকা বিষ্ঠাতেই বেশ আনন্দ। ওইতেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়। যদি সেই পোকাকে ভাতের হাঁড়িতে রাখ, মরে যাবে।" (সকলে স্তব্ধ)

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ১৪ই ডিসেম্বর 1882/12/14/iii

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্‌ ।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ।।

[গীতা — ৬।৩৫]

09.3 তীব্র বৈরাগ্য ও বদ্ধজীব

বিজয় — বদ্ধজীবের মনের কি অবস্থা হলে মুক্তি হতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বরের কৃপায় তীব্র বৈরাগ্য হলে, এই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে নিস্তার হতে পারে। তীব্র বৈরাগ্য কাকে বলে? হচ্ছে হবে, ঈশ্বরের নাম করা যাক — এ-সব মন্দ বৈরাগ্য। যার তীব্র বৈরাগ্য, তার প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল; মার প্রাণ যেমন পেটের ছেলের জন্য ব্যাকুল। যার তীব্র বৈরাগ্য, সে ভগবান ভিন্ন আর কিছু চায় না। সংসারকে পাতকুয়া দেখে: তার মনে হয়, বুঝি ডুবে গেলুম। আত্মীয়দের কাল সাপ দেখে, তাদের কাছ থেকে পালাতে ইচ্ছা হয়; আর পালায়ও। বাড়ির বন্দোবস্ত করি, তারপর ঈশ্বরচিন্তা করব — এ-কথা ভাবেই না। ভিতরে খুব রোখ।

“তীব্র বৈরাগ্য কাকে বলে, একটি গল্প শোন। এক দেশে অনাবৃষ্টি হয়েছে। চাষীরা সব খানা কেটে দূর থেকে জল আনছে। একজন চাষার খুব রোখ আছে; সে একদিন প্রতিজ্ঞা করলে যতক্ষণ না জল আসে, খানার সঙ্গে আর নদীর সঙ্গে এক হয়, ততক্ষণ খানা খুঁড়ে যাবে। এদিকে স্নান করবার বেলা হল। গৃহিণী মেয়ের হাতে তেল পাঠিয়ে দিল। মেয়ে বললে, ‘বাবা! বেলা হয়েছে, তেল মেখে নেয়ে ফেল।’ সে বললে, ‘তুই যা আমার এখন কাজ আছে।’ বেলা দুই প্রহর একটা হল, তখনও চাষা মাঠে কাজ করছে। স্নান করার নামটি নাই। তার স্ত্রী তখন মাঠে এসে বললে, ‘এখনও নাও নাই কেন? ভাত জুড়িয়ে গেল, তোমার যে সবই বাড়াবাড়ি! না হয় কাল করবে, কি খেয়ে-দেয়েই করবে।’ গালাগালি দিয়ে চাষা কোদাল হাতে করে তাড়া করলে; আর বললে, ‘তোর আক্কেল নেই? বৃষ্টি হয় নাই। চাষবাস কিছুই হল না, এবার ছেলেপুলে কি খাবে? না খেয়ে সব মারা যাবি! আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, মাঠে আজ জল আনব তবে আজ নাওয়া-খাওয়ার কথা কবো।’ স্ত্রী গতিক দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেল। চাষা সমস্ত দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে, সন্ধ্যার সময় খানার সঙ্গে নদীর যোগ করে দিলে। তখন একধারে বসে দেখতে লাগল যে, নদীর জল মাঠে কুলকুল করে আসছে। তার মন তখন শান্ত আর আনন্দে পূর্ণ হল। বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে বললে, ‘নে এখন তেল দে আর একটু তামাক সাজ।’ তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে নেয়ে খেয়ে সুখে ভোঁসভোঁস করে নিদ্রা যেতে লাগল! এই রোখ তীব্র বৈরাগ্যের উপমা।

“আর একজন চাষা — সেও মাঠে জল আনছিল। তার স্ত্রী যখন গেল আর বললে, ‘অনেক বেলা হয়েছে এখন এস, এত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই।’ তখন সে বেশি উচ্চবাচ্য না করে কোদাল রেখে স্ত্রীকে বললে, ‘তুই যখন বলছিস তো

চল!’ (সকলের হাস্য) সে চাষার আর মাঠে জল আনা হল না। এটি মন্দ বৈরাগ্যের উপমা।

“খুব রোখ না হলে, চাষার যেমন মাঠে জল আসে না, সেইরূপ মানুষের ঈশ্বরলাভ হয় না।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ১৪ই ডিসেম্বর 1882/12/14/iv

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং, সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে, স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ।।

[গীতা — ২।৭০]

09.4 কামিনী-কাঞ্চন জন্য দাসত্ব

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি) — আগে অত আসতে; এখন আস না কেন?

বিজয় — এখানে আসবার খুব ইচ্ছা, কিন্তু আমি স্বাধীন নই। ব্রাহ্মসমাজের কাজ স্বীকার করেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কামিনী-কাঞ্চনে জীবকে বদ্ধ করে। জীবের স্বাধীনতা যায়। কামিনী থেকেই কাঞ্চনের দরকার। তার জন্য পরের দাসত্ব। স্বাধীনতা চলে যায়। তোমার মনের মতো কাজ করতে পার না।

"জয়পুরে গোবিন্দজীর পূজারীরা প্রথম প্রথম বিবাহ করে নাই। তখন খুব তেজস্বী ছিল। রাজা একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তা তারা যায় নাই। বলেছিল, 'রাজাকে আসতে বল'। তারপর রাজা ও পাঁচজনে তাদের বিয়ে দিয়ে দিলেন। তখন রাজার সঙ্গে দেখা করবার জন্য, আর কাহারও ডাকতে হল না। নিজে নিজেই গিয়ে উপস্থিত। 'মহারাজ, আশীর্বাদ করতে এসেছি, এই নির্মাল্য এনেছি, ধারণ করুন।' কাজে কাজেই আসতে হয়; আজ ঘর তুলতে হবে, আজ ছেলের অন্নপ্রাসন, আজ হাতেখড়ি — এই সব।

"বারশো ন্যাড়া আর তেরশো নেড়ী তার সাক্ষী উদম সাড়ী — এ গল্প তো জান। নিত্যানন্দ গোস্বামীর ছেলে বীরভদ্রের তেরশো ন্যাড়া শিষ্য ছিল। তারা যখন সিদ্ধ হয়ে গেল, তখন বীরভদ্রের ভয় হল। তিনি ভাবতে লাগলেন, 'এরা সিদ্ধ হল, লোককে যা বলবে তাই ফলবে; যেদিক দিয়ে যাবে সেইদিকেই ভয়; কেননা, লোক না জেনে যদি অপরাধ করে, তাদের অনিষ্ট হবে।' এই ভেবে বীরভদ্র তাদের বললেন, তোমরা গঙ্গায় গিয়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক করে এস। ন্যাড়াদের এত তেজ যে, ধ্যান করতে করতে সমাধি হল। কখন জোয়ার মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে হুঁশ নাই। আবার ভাঁটা পড়েছে তবু ধ্যান ভাঙে না। তেরশোর মধ্যে একশো বুঝেছিল — বীরভদ্র কি বলবেন। গুরুর বাক্য লঙ্ঘন করতে নাই, তাই তারা সরে পড়ল, আর বীরভদ্রের সঙ্গে দেখা করলে না। বাকী বারশো দেখা করলে। বীরভদ্র বললেন, 'এই তেরশো নেড়ী তোমাদের সেবা করবে। তোমরা

এদের বিয়ে কর।’ ওরা বললে, ‘যে আজ্ঞা, কিন্তু আমাদের মধ্যে একশোজন কোথায় চলে গেছে।’ ওই বারশোর এখন প্রত্যেকের সেবাদাসীর সঙ্গে থাকতে লাগল। তখন আর সে তেজ নাই, সে তপস্যার বল নাই। মেয়েমানুষ সঙ্গে থাকাতে আর সে বল রইল না; কেননা সে সঙ্গে স্বাধীনতা লোপ হয়ে যায়। (বিজয়ের প্রতি) তোমরা নিজে নিজে তো দেখছ, পরের কর্ম স্বীকার করে কি হয়ে রয়েছ। আর দেখ, অত পাশ করা, কত ইংরাজী পড়া পণ্ডিত, মনিবের চাকরি স্বীকার করে তাদের বুট জুতার গোঁজা দুবেলা খায়। এর কারণ কেবল ‘কামিনী’। বিয়ে করে নদের হাট বসিয়ে আর হাট তোলবার জো নাই। তাই এত অপমানবোধ, অত দাসত্বের যন্ত্রণা।”

[ঈশ্বরলাভের পর কামিনীকে মাতৃভাবে পূজা]

“যদি একবার এইরূপ তীব্র বৈরাগ্য হয়ে ঈশ্বরলাভ হয়, তাহলে আর মেয়েমানুষে আসক্তি থাকে না। ঘরে থাকলেও, মেয়েমানুষে আসক্তি থাকে না, তাদের ভয় থাকে না। যদি একটা চুম্বক পাথর খুব বড় হয়, আর-একটা সামান্য হয়, তাহলে লোহাটাকে কোন্‌টা টেনে লবে? বড়টাই টেনে লবে। ঈশ্বর বড় চুম্বক পাথর, তাঁর কাছে কামিনী ছোট চুম্বক পাথর! কামিনী কি করবে?”

একজন ভক্ত — মহাশয়! মেয়েমানুষকে কি ঘৃণা করব?

শ্রীরামকৃষ্ণ — যিনি ঈশ্বরলাভ করেছেন, তিনি কামিনীকে আর অন্য চক্ষে দেখেন না যে ভয় হবে। তিনি ঠিক দেখেন যে, মেয়েরা মা ব্রহ্মময়ীর অংশ, আর

মা বলে তাই সকলকে পূজা করেন। (বিজয়ের প্রতি) — তুমি মাঝে মাঝে আসবে, তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছা করে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ১৪ই ডিসেম্বর 1882/12/14/v

09.5 ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত হলে তবে ঠিক আচার্য

বিজয় —— ব্রাহ্মসমাজের কাজ করতে হয়, তাই সদা-সর্বদা আসতে পারি না; সুবিধা হলে আসব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি) — দেখ, আচার্যের কাজ বড় কঠিন, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ ব্যতিরেকে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না।

“যদি আদেশ না পেয়ে উপদেশ দাও, লোকে শুনবে না। সে উপদেশের কোন শক্তি নাই। আগে সাধন করে, বা যে কোনরূপে হোক ঈশ্বরলাভ করতে হয়। তাঁর আদেশ পেয়ে লেকচার দিতে হয়। ও-দেশে একটি পুকুর আছে, নাম হালদার-পুকুর। তার পাড়ে রোজ লোকে বাহ্যে করে রাখত। সকালে যারা ঘাটে আসত তারা তাদের গালাগালি দিয়ে খুব গোলমাল করত। গালাগালে কোন কাজ হত না —— আবার তার পরদিন পাড়েতেই বাহ্যে। শেষে কোম্পানীর চাপরাসী এসে

নোটিশ টাঙিয়ে দিল যে, ‘এখানে কেউ ওরূপ কাজ করতে পারবে না। যদি করে, শাস্তি হবে।’ এই নোটিশের পর আর কেউ পাড়ে বাহ্য করত না।

“তাঁর আদেশের পর যেখানে সেখানে আচার্য হওয়া যায় ও লেকচার দেওয়া যায়। যে তাঁর আদেশ পায়, সে তাঁর কাছ থেকে শক্তি পায়। তখন এই কঠিন আচার্যের কর্ম করতে পারে।

“এক বড় জমিদারের সঙ্গে একজন সামান্য প্রজা বড় আদালতে মোকদ্দমা করেছিল। তখন লোকে বুঝেছিল যে, ওই প্রজার পেছনে একজন বলবান লোক আছে। হয়তো আর-একজন বড় জমিদার তার পেছনে থেকে মোকদ্দমা চালাচ্ছে। মানুষ সামান্য জীব, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ শক্তি না পেলে আচার্যের এমন কঠিন কাজ করতে পারে না।”

বিজয় — মহাশয়! ব্রাহ্মসমাজে যে উপদেশাদি হয়, তাতে কি লোকের পরিত্রাণ হয় না?

[সচ্চিদানন্দই গুরু — মুক্তি তিনিই দেন]

শ্রীরামকৃষ্ণ — মানুষের কি সাধ্য অপরকে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত করে। যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া, তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন। সচ্চিদানন্দগুরু বই আর গতি নাই। যারা ঈশ্বরলাভ করে নাই, তাঁর আদেশ পায় নাই, যারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হয় নাই, তাদের কি সাধ্য জীবের ভববন্ধন মোচন করে।

“আমি একদিন পঞ্চবটীর কাছ দিয়ে ঝাউতলায় বাহ্যে যাচ্ছিলাম। শুনতে পেলুম যে, একটা কোলা ব্যাঙ খুব ডাকছে। বোধ হল সাপে ধরেছে। অনেকক্ষণ পরে যখন ফিরে আসছি, তখনও দেখি, ব্যাঙটা খুব ডাকছে। একবার উঁকি মেরে দেখলুম কি হয়েছে। দেখি, একটা ঢোঁড়ায় ব্যাঙটাকে ধরেছে — ছাড়তেও পাচ্ছে না — গিলতেও পাচ্ছে না — ব্যাঙটার যন্ত্রণা ঘুচছে না। তখন ভাবলাম, ওরে! যদি জাতসাপে ধরত, তিন ডাকের পর ব্যাঙটা চুপ হয়ে যেত। এ-একটা ঢোঁড়ায় ধরেছে কি না, তাই সাপটারও যন্ত্রণা, ব্যাঙটারও যন্ত্রণা!

“যদি সদ্‌গুরু হয়, জীবের অহংকার তিন ডাকে ঘুচে। গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা! শিষ্যেরও অহংকার আর ঘুচে না, সংসারবন্ধন আর কাটে না। কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়লে শিষ্য মুক্ত হয় না।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ১৪ই ডিসেম্বর 1882/12/14/vi

09.6 অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।

[গীতা — ৩।২৭]

মায়া বা অহং-আবরণ গেলেই মুক্তি বা ঈশ্বরলাভ

বিজয় — মহাশয়! কেন আমরা এরূপ বদ্ধ হয়ে আছি? কেন ঈশ্বরকে দেখতে পাই না?

শ্রীরামকৃষ্ণ — জীবের অহংকারই মায়া। এই অহংকার সব আবরণ করে রেখেছে। “আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।” যদি ঈশ্বরের কৃপায় “আমি অকর্তা” এই বোধ হয়ে গেল, তাহলে সে ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই।

“এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য সূর্যকে দেখা যায় না — মেঘ সরে গেলেই সূর্যকে দেখা যায়। যদি গুরুর কৃপায় একবার অহংবুদ্ধি যায়, তাহলে ঈশ্বরদর্শন হয়।

“আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র, যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর; মধ্যে সীতারূপিণী মায়া ব্যবধান আছে বলে লক্ষ্মণরূপ জীব সেই ঈশ্বরকে দেখতে পান নাই। এই দেখ, আমি এই গামছাখানা দিয়ে মুখের সামনে আড়াল করছি আর আমায় দেখতে পাচ্ছ না। তবু আমি এত কাছে। সেইরূপ ভগবান সকলের চেয়ে কাছে, তবু এই মায়া-আবরণের দরুন তাঁকে দেখতে পারছ না।

“জীব তো সচ্চিদানন্দস্বরূপ। কিন্তু এই মায়া বা অহংকারে তাদের সব নানা উপাধি হয়ে পড়েছে, আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে।

“এক-একটি উপাধি হয়, আর জীবের স্বভাব বদলে যায়। যে কালোপেড়ে কাপড় পরে আছে, অমনি দেখবে, তার নিধুর টপ্পার তান এসে জোটে; আর তাস খেলা, বেড়াতে যাবার সময় হাতে ছড়ি (stick) এইসব এসে জোটে। রোগা

লোকও যদি বুট জুতা পরে সে অমনি শিস দিতে আরম্ভ করে, সিঁড়ি উঠবার সময় সাহেবদের মতো লাফিয়ে উঠতে থাকে। মানুষের হাতে যদি কলম থাকে, এমনি কলমের গুণ যে, সে অমনি একটা কাগজ-টাগজ পেলেই তার উপর ফ্যাসফ্যাস করে টান দিতে থাকবে।

“টাকাও একটি বিলক্ষণ উপাধি। টাকা হলেই মানুষ আর-একরকম হয়ে যায়, সে মানুষ থাকে না।

“এখানে একজন ব্রাহ্মণ আসা-যাওয়া করত। সে বাহিরে বেশ বিনয়ী ছিল। কিছুদিন পরে আমরা কোন্নগরে গেছলুম। হৃদে সঙ্গে ছিল। নৌকা থেকে যাই নামছি, দেখি সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে বসে আছে। বোধ হয়, হাওয়া খাচ্ছিল। আমাদের দেখে বলছে, ‘কি ঠাকুর! বলি — আছ কেমন?’ তার কথার স্বর শুনে আমি হৃদেকে বললাম, ‘ওরে হৃদে! এ লোকটার টাকা হয়েছে, তাই এইরকম কথা।’ হৃদে হাসতে লাগল।

“একটা ব্যাঙের একটা টাকা ছিল। গর্তে তার টাকাটা ছিল। একটা হাতি সেই গর্ত ডিঙিয়ে গিছিল। তখন ব্যাঙটা বেরিয়ে এসে খুব রাগ করে হাতিকে লাথি দেখাতে লাগল। আর বললে, তোর এত বড় সাধ্য যে, আমায় ডিঙিয়ে যাস! টাকার এত অহংকার।”

[সপ্তভূমি — অহংকার কখন যায় — ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা]

“জ্ঞানলাভ হলে অহংকার যেতে পারে। জ্ঞানলাভ হলে সমাধিস্থ হয়। সমাধিস্থ হলে তবে অহং যায়। সে জ্ঞানলাভ বড় কঠিন।

“বেদে আছে যে, সপ্তমভূমিতে মন গেলে তবে সমাধি হয়। সমাধি হলেই তবে অহং চলে যেতে পারে। মনের সচরাচর বাস কোথায়? প্রথম তিনভূমিতে। লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি — সেই তিনভূমি, তখন মনের আসক্তি কেবল সংসারে — কামিনী-কাঞ্চনে। হৃদয়ে যখন মনের বাস হয়, তখন ঈশ্বরীয় জ্যোতিঃদর্শন হয়। সে ব্যক্তি জ্যোতিঃদর্শন করে বলে ‘একি!’ ‘একি!’ তারপর কণ্ঠ। সেখানে যখন মনের বাস হয়, তখন কেবল ঈশ্বরীয় কথা কহিতে ও শুনিতে ইচ্ছা হয়। কপালে — ভ্রূমধ্যে — মন গেলে তখন সচ্চিদানন্দরূপে দর্শন হয়, সেই রূপের সঙ্গে আলিঙ্গন স্পর্শন করতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু পারে না। লণ্ঠনের ভিতর আলো দর্শন হয় কিন্তু স্পর্শ হয় না; ছুঁই ছুঁই বোধ হয়, কিন্তু ছোঁয়া যায় না। সপ্তমভূমিতে মন যখন যায়, তখন অহং আর থাকে না — সমাধি হয়।”

বিজয় — সেখানে পৌঁছিবার পর যখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়, মানুষ কি দেখে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — সপ্তমভূমিতে মন পৌঁছিলে কি হয় মুখে বলা যায় না।

“জাহাজ একবার কালাপানিতে গেলে আর ফিরে না। জাহাজের খপর পাওয়া যায় না। সমুদ্রের খপরও জাহাজের কাছে পাওয়া যায় না।

“নুনের ছবি সমুদ্র মাপতে গিছিল। কিন্তু যাই নেমেছে, অমনি গলে গেছে! সমুদ্র কত গভীর কে খপর দিবেক? যে দিবে, সে মিশে গেছে। সপ্তমভূমিতে মনের নাশ হয়, সমাধি হয়। কি বোধ হয়, মুখে বলা যায় না।”

[অহং কিন্তু যায় না — “বজ্জাৎ আমি” — “দাস আমি”]

“যে ‘আমি’তে সংসারী করে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত করে, সেই ‘আমি’ খারাপ। জীব ও আত্মার প্রভেদ হয়েছে, এই ‘আমি’ মাঝখানে আছে বলে। জলের উপর যদি একটা লাঠি ফেলে দেওয়া যায়, তাহলে দুটো ভাগ দেখায়। বস্তুত, এক জল; লাঠিটার দরুন দুটো দেখাচ্ছে।

“অহং-ই এই লাঠি। লাঠি তুলে লও, সেই এক জলই থাকবে।

“বজ্জাৎ ‘আমি’ কে? যে ‘আমি’ বলে, ‘আমায়’ জানে না? আমার এত টাকা, আমার চেয়ে কে বড়লোক আছে? যদি চোরে দশ টাকা চুরি করে থাকে, প্রথমে টাকা কেড়ে লয়, তারপর চোরকে খুব মারে; তাতেও ছাড়ে না, পাহারাওয়ালাকে ডেকে পুলিসে দেয় ও ম্যাদ খাটায়, ‘বজ্জাৎ আমি’ বলে, জানে না — আমার দশ টাকা নিয়েছে! এত বড় আস্পর্ধা!”

বিজয় — যদি অহং না গেলে সংসারে আসক্তি যাবে না, সমাধি হবে না, তাহলে ব্রহ্মজ্ঞানের পথ অবলম্বন করাই ভাল, যাতে সমাধি হয়। আর ভক্তিযোগে যদি অহং থাকে তবে জ্ঞানযোগই ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দুই-একটি লোকের সমাধি হয়ে ‘অহং’ যায় বটে, কিন্তু প্রায় যায় না। হাজার বিচার কর, ‘অহং’ ফিরে ঘুরে এসে উপস্থিত। আজ অশ্বত্থগাছ কেটে দাও, কাল আবার সকালে দেখ ফেঁকড়ি বেরিয়েছে। একান্ত যদি ‘আমি’ যাবে না, থাক শালা ‘দাস আমি’ হয়ে। ‘হে ঈশ্বর! তুমি প্রভু, আমি দাস’ এইভাবে থাক। ‘আমি দাস’, ‘আমি ভক্ত’ এরূপ ‘আমিতে’ দোষ নাই; মিষ্ট খেলে অম্বল হয়, কিন্তু মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়।

“জ্ঞানযোগ ভারী কঠিন। দেহাত্মবুদ্ধি না গেলে জ্ঞান হয় না। কলিযুগে অন্নগতপ্রাণ — দেহাত্মবুদ্ধি, অহংবুদ্ধি যায় না। তাই কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। ভক্তিপথ সহজ পথ। আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁর নামগুনগান কর, প্রার্থনা কর, ভগবানকে লাভ করবে, কোন সন্দেহ নাই।

“যেমন জলরাশির উপর বাঁশ না রেখে একটি রেখা কাটা হয়েছে। যেন দুই ভাগ জল। আর রেখা অনেকক্ষণ থাকে না। ‘দাস আমি’, কি ‘ভক্তের আমি’, কি ‘বালকের আমি’ — এরা যেন ‘আমির রেখা মাত্র’।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ১৪ই ডিসেম্বর 1882/12/14/vii

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গর্তির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ।।

[গীতা — ১২।৫]

09.7 ভক্তিযোগ যুগধর্ম — জ্ঞানযোগ বড় কঠিন — “দাস আমি” — “ভক্তের আমি” — “বালকের আমি”

বিজয় (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — মহাশয়! আপনি “বজ্জাৎ আমি” ত্যাগ করতে বলছেন। “দাস আমি”তে দোষ নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, “দাস আমি” অর্থাৎ আমি ঈশ্বরের দাস, আমি তাঁর ভক্ত — এই অভিমান। এতে দোষ নাই বরং এতে ঈশ্বরলাভ হয়।

বিজয় — আচ্ছা, যার “দাস আমি” তার কাম-ক্রোধাদি কিরূপ?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঠিক ভাব যদি হয়, তাহলে কাম-ক্রোধের কেবল আকার মাত্র থাকে। যদি ঈশ্বরলাভের পর “দাস আমি” বা “ভক্তের আমি” থাকে, সে ব্যক্তি কারু অনিষ্ট করতে পারে না। পরশমণি ছোঁয়ার পর তরবার সোনা হয়ে যায়, তরবারের আকার থাকে, কিন্তু কারু হিংসা করে না।

“নারিকেল গাছের বেল্লো শুকিয়ে ঝরে পড়ে গেলে কেবল দাগমাত্র থাকে। সেই দাগে এইটি টের পাওয়া যায় যে, এককালে ওইখানে নারিকেলের বেল্লো ছিল। সেইরকম যার ঈশ্বরলাভ হয়েছে, তার অহংকারের দাগমাত্র থাকে, কাম-ক্রোধের আকারমাত্র থাকে; বালকের অবস্থা হয়। বালকের যেমন সত্ত্ব, রজঃ, তমো গুণের মধ্যে কোন গুণের আঁট নাই। বালকের কোন জিনিসের উপর টান করতেও যতক্ষণ — তাকে ছাড়তেও ততক্ষণ। একখানা পাঁচ টাকার কাপড় তুমি আধ পয়সার পুতুল দিয়ে ভুলিয়ে নিতে পার। কিন্তু প্রথমে খুব আঁট করে বলবে এখন — ‘না আমি দেব না। আমার বাবা কিনে দিয়েছে।’ বালকের আবার সব্বাই সমান — ইনি বড়, উনি ছোট, এরূপ বোধ নাই। তাই জাতি বিচার নাই। মা

বলে দিয়েছে, ‘ও তোর দাদা হয়’, সে ছুতোর হলেও একপাতে বসে ভাত খাবে। বালকের ঘৃণা নাই, শুচি-অশুচি বোধ নাই। পায়খানায় গিয়ে হাতে মাটি দেয় না।

“কেউ কেউ সমাধির পরও ‘ভক্তের আমি’, ‘দাস আমি’ নিয়ে থাকে। ‘আমি দাস, তুমি প্রভু’, ‘আমি ভক্ত, তুমি ভগবান’ — এই অভিমান ভক্তের থাকে। ঈশ্বরলাভের পরও থাকে, সব ‘আমি’ যায় না। আবার এই অভিমান অভ্যাস করতে করতে ঈশ্বরলাভ হয়। এরই নাম ভক্তিযোগ।

“ভক্তির পথ ধরে গেলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ভগবান সর্বশক্তিমান, মনে করলে ব্রহ্মজ্ঞানও দিতে পারেন। ভক্তেরা প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। ‘আমি দাস, তুমি প্রভু’, ‘আমি ছেলে, তুমি মা’ — এই অভিমান রাখতে চায়।”

বিজয় — যাঁরা বেদান্ত বিচার করেন, তাঁরাও তো তাঁকে পান?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, বিচারপথেও তাঁকে পাওয়া যায়। একেই জ্ঞানযোগ বলে। বিচারপথ বড় কঠিন। তোমায় তো সপ্তভূমির কথা বলেছি। সপ্তভূমিতে মন পৌঁছিলে সমাধি হয়। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা — এই বোধ ঠিক হলে মনের লয় হয়, সমাধি হয়। কিন্তু কলিতে জীব অন্নগত প্রাণ, “ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা” কেমন করে বোধ হবে? সে-বোধ দেহবুদ্ধি না গেলে হয় না। “আমি দেহ নই, আমি মন নই, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নই, আমি সুখ-দুঃখের অতীত, আমার রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু কই?” — এ-সব বোধ কলিতে হওয়া কঠিন। যতই বিচার কর, কোন্‌খান থেকে দেহাত্মবুদ্ধি এসে দেখা দেয়। অশ্বত্থগাছ এই কেটে দাও, মনে করলে মূলসুদ্ধ উঠে গেল। কিন্তু তার পরদিন সকালে দেখ, গাছের একটি

ফেঁকড়ি দেখা দিয়েছে! দেহাভিমান যায় না। তাই ভক্তিযোগ কলির পক্ষে ভাল, সহজ।

“ ‘আর চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে ভালবাসি।’ আমার এক কখন ইচ্ছা হয় না, যে বলি ‘আমি ব্রহ্ম’। আমি বলি ‘তুমি ভগবান, আমি তোমার দাস’। পঞ্চমভূমি আর ষষ্ঠভুমির মাঝখানে বাচ খেলানো ভাল। ষষ্ঠভূমি পের হয়ে সপ্তমভূমিতে অনেকক্ষণ থাকতে আমার সাধ হয় না। আমি তাঁর নামগুণগান করব — এই আমার সাধ। সেব্য-সেবক ভাব খুব ভাল। আর দেখ গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউয়ের গঙ্গা কেউ বলে না। ‘আমিই সেই’ এ অভিমান ভাল নয়। দেহাত্মবুদ্ধি থাকতে যে এ অভিমান করে, তার বিশেষ হানি হয়; এগুতে পারে না, ক্রমে অধঃপতন হয়। পরকে ঠকায় আবার নিজেকে ঠকায়, নিজের অবস্থা বুঝতে পারে না।”

[দ্বিবিধা ভক্তি — উত্তম অধিকারী — ঈশ্বরদর্শনের উপায়]

কিন্তু ভক্তি অমনি করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রেমাভক্তি না হলে ঈশ্বরলাভ হয় না। প্রেমাভক্তির আর একটি নাম রাগভক্তি। প্রেম, অনুরাগ না হলে ভগবানলাভ হয় না ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না এলে তাঁকে লাভ করা যায় না।

“আর-একরকম ভক্তি আছে। তার নাম বৈধী ভক্তি। এত জপ করতে হবে, উপোস করতে হবে, তীর্থে যেতে হবে, এত উপচারে পূজা করতে হবে, এতগুলি বলিদান দিতে হবে — এ-সব বৈধী ভক্তি। এ-সব অনেক করতে করতে ক্রমে

রাগভক্তি আসে। কিন্তু রাগভক্তি যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ ঈশ্বরলাভ হবে না। তাঁর উপর ভালবাসা চাই। সংসারবুদ্ধি একেবারে চলে যাবে, আর তাঁর উপর ষোল আনা মন হবে, তবে তাঁকে পাবে।

“কিন্তু কারু কারু রাগভক্তি আপনা-আপনি হয়। স্বতঃসিদ্ধ। ছেলেবেলা থেকেই আছে। ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরের জন্য কাঁদে। যেমন প্রহ্লাদ। ‘বিধিবাদীয়’ ভক্তি — যেমন, হাওয়া পাবে বলে পাখা করা। হাওয়ার জন্য পাখার দরকার হয়। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা আসবে বলে জপ, তপ, উপবাস। কিন্তু যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি বয়, পাখাখানা লোকে ফেলে দেয়। ঈশ্বরের উপর অনুরাগ, প্রেম, আপনি এলে, জপাদি কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হলে বৈধী কর্ম কে করবে?

“যতক্ষণ না তাঁর উপর ভালবাসা জন্মায় ততক্ষণ ভক্তি কাঁচা ভক্তি। তাঁর উপর ভালবাসা এলে, তখন সেই ভক্তির নাম পাকা ভক্তি।

“যাঁর কাঁচা ভক্তি, সে ঈশ্বরের কথা, উপদেশ, ধারণা করতে পারে না। পাকা ভক্তি হলে ধারণা করতে পারে। ফটোগ্রাফের কাচে যদি কালি (Silver Nitrate) মাখানো থাকে, তাহলে যা ছবি পড়ে তা রয়ে যায়। কিন্তু শুধু কাচের উপর হাজার ছবি পড়ুক একটাও থাকেনা — একটু সরে গেলেই, যেমন কাচ তেমনি কাচ। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না থাকলে উপদেশ ধারণা হয় না।”

বিজয় — মহাশয়, ঈশ্বরকে লাভ করতে গেলে, তাঁকে দর্শন করতে গেলে ভক্তি হলেই হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, ভক্তি দ্বারাই তাঁকে দর্শন হয়, কিন্তু পাকা ভক্তি, প্রেমাভক্তি, রাগভক্তি চাই। সেই ভক্তি এলেই তাঁর উপর ভালবাসা আসে। যেমন ছেলের মার উপর ভালবাসা, মার ছেলের উপর ভালবাসা, স্ত্রীর স্বামীর উপর ভালবাসা।

“এ-ভালবাসা, এ-রাগভক্তি এলে স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-কুটুম্বের উপর সে মায়ার টান থাকে না। দয়া থাকে। সংসার বিদেশ বোধ হয়, একটি কর্মভূমি মাত্র বোধ হয়। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ি কিন্তু কলকাতা কর্মভূমি; কলকাতায় বাসা করে থাকতে হয়, কর্ম করবার জন্য। ঈশ্বরে ভালবাসা এলে সংসারাসক্তি — বিষয়বুদ্ধি — একেবারে যাবে।

“বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে তাঁকে দর্শন হয় না। দেশলাইয়ের কাঠি যদি ভিজে থাকে হাজার ঘষো, কোনরকমেই জ্বলবে না — কেবল একরাশ কাঠি লোকসান হয়। বিষয়াসক্ত মন ভিজে দেশলাই।

“শ্রীমতী (রাধিকা) যখন বললেন, আমি কৃষ্ণময় দেখছি, সখীরা বললে, কই আমরা তো তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি কি প্রলাপ বোকচো? শ্রীমতী বললেন, সখি! অনুরাগ-অঞ্জন চক্ষে মাখো, তাঁকে দেখতে পাবে। (বিজয়ের প্রতি) তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেরই গানে আছে:

“প্রভু বিনে অনুরাগ, করে যজ্ঞযাগ, তোমারে কি যায় জানা।

“এই অনুরাগ, এই প্রেম, এই পাকা ভক্তি, এই ভালবাসা যদি একবার হয়, তাহলে সাকার-নিরাকার দুই সাক্ষাৎকার হয়।”

[ঈশ্বরদর্শন — তাঁর কৃপা না হলে হয় না]

বিজয় — ঈশ্বরদর্শন কেমন করে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — চিত্তশুদ্ধি না হলে হয় না। কামিনী-কাঞ্চনে মন মলিন হয়ে আছে, মনে ময়লা পড়ে আছে। ছুঁচ কাদা দিয়ে ঢাকা থাকলে আর চুম্বক টানে না। মাটি কাদা ধুয়ে ফেললে তখন চুম্বক টানে। মনের ময়লা তেমনি চোখের জলে ধুয়ে ফেলা যায়। "হে ঈশ্বর, আর অমন কাজ করব না" বলে যদি কেউ অনুতাপে কাঁদে, তাহলে ময়লাটা ধুয়ে যায়। তখন ঈশ্বররূপ চুম্বক পাথর মনরূপ ছুঁচকে টেনে লন। তখন সমাধি হয়, ঈশ্বরদর্শন হয়।

"কিন্তু হাজার চেষ্টা কর, তাঁর কৃপা না হলে কিছু হয় না। তাঁর কৃপা না হলে তাঁর দর্শন হয় না। কৃপা কি সহজে হয়? অহংকার একেবারে ত্যাগ করতে হবে। 'আমি কর্তা' এ-বোধ থাকলে ঈশ্বরদর্শন হয় না। ভাঁড়ারে একজন আছে, তখন বাড়ির কর্তাকে যদি কেউ বলে, মহাশয় আপনি এসে জিনিস বার করে দিন। তখন কর্তাটি বলে, ভাঁড়ারে একজন রয়েছে, আমি আর গিয়ে কি করব! যে নিজে কর্তা হয়ে বসেছে তার হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর সহজে আসেন না।

"কৃপা হলেই দর্শন হয়। তিনি জ্ঞানসূর্য। তাঁর একটি কিরণে এই জগতে জ্ঞানের আলো পড়েছে, তবেই আমরা পরস্পরকে জানতে পারছি, আর জগতে কতরকম বিদ্যা উপার্জন করছি। তাঁর আলো যদি একবার তিনি নিজে তাঁর মুখের উপর ধরেন, তাহলে দর্শনলাভ হয়। সার্জন সাহেব রাত্রে আঁধারে লণ্ঠন

হাতে করে বেড়ায়; তার মুখ কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু ওই আলোতে সে সকলের মুখ দেখতে পায়; আর সকলে পরস্পরের মুখ দেখতে পায়।

“যদি কেউ সার্জনকে দেখতে চায়, তাহলে তাকে প্রার্থনা করতে হয়। বলতে হয়, সাহেব, কৃপা করে একবার আলোটি নিজের মুখের উপর ফিরাও, তোমাকে একবার দেখি।

“ঈশ্বরকে প্রার্থনা করতে হয়, ঠাকুর কৃপা করে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন করি।

“ঘরে যদি আলো না জ্বলে, সেটি দারিদ্রের চিহ্ন। হৃদয় মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালতে হয়। জ্ঞানদীপ জ্বেলে ঘরে, ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না।”

বিজয় সঙ্গে ঔষধ আনিয়াছেন। ঠাকুরের সম্মুখে সেবন করিবেন। ঔষধ জল দিয়া খাইতে হয়। ঠাকুর জল আনাইয়া দিলেন। ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধু, বিজয় গাড়িভাড়া, নৌকাভাড়া দিয়ে আসিতে পারেন না। ঠাকুর মাঝে মাঝে লোক পাঠাইয়া দেন, আসতে বলেন। এবার বলরামকে পাঠাইয়াছিলেন। বলরাম ভাড়া দিবেন। বলরামের সঙ্গে বিজয় আসিয়াছেন। সন্ধ্যার সময় বিজয়, নবকুমার ও বিজয়ের অন্যান্য সঙ্গিগণ বলরামের নৌকাতে আবার উঠিলেন। বলরাম তাঁহাদিগকে বাগবাজারের ঘাটে পৌঁছাইয়া দিবেন। মাস্টারও ওই নৌকায় উঠিলেন।

নৌকা বাগবাজারের অন্নপূর্ণা ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল। যখন বলরামের বাগবাজারের বাড়ির কাছে তাঁহারা পৌঁছিলেন, তখন জ্যোৎস্না একটু উঠিয়াছে।

আজ শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথি, শীতকাল, অল্প শীত করিতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতোপম উপদেশ সমরণ করিতে করিতে ও তাঁহার আনন্দমূর্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিজয়, বলরাম, মাস্টার প্রভৃতি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ১৪ই ডিসেম্বর 1882/12/14/viii

09.8 বাবুরাম প্রভৃতির সঙ্গে, ফ্রি উইল সম্বন্ধ কথা —— তোতাপুরীর আত্মহত্যার সঙ্কল্প

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে বৈকাল বেলা নিজের ঘরে পশ্চিমের বারান্দায় কথা কহিতেছেন। সঙ্গে বাবুরাম, মাস্টার, রামদয়াল প্রভৃতি। ডিসেম্বর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। বাবুরাম, রামদয়াল ও মাস্টার আজ রাত্রে থাকিবেন। শীতের (বড়দিনের) ছুটি হইয়াছে। মাস্টার আগামী কল্যও থাকিবেন। বাবুরাম নূতন নূতন আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — ঈশ্বর সব করছেন এ-জ্ঞান হলে তো জীবন্মুক্ত। কেশব সেন শম্ভু মল্লিকের সঙ্গে এসেছিল, আমি তাকে বললাম, গাছের পাতাটি পর্যন্ত ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন নড়ে না। স্বাধীন ইচ্ছা (Free will) কোথায়? সকলই

ঈশ্বরাধীন। ন্যাংটা অত বড় জ্ঞানী গো, সে-ই জলে ডুবতে গিছল। এখানে এগার মাস ছিল; পেটের ব্যারাম হল, রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে গঙ্গাতে ডুবতে গিছল! ঘাটের কাছে অনেকটা চড়া, যত যায় হাঁটু জলের চেয়ে আর বেশি হয় না; তখন আবার বুঝলে, বুঝে ফিরে এল। আমার একবার খুব বাতিক বৃদ্ধি হয়েছিল, তাই গলায় ছুরি দিতে গিছলুম। তাই বলি, "মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি রথ, তুমি রথী; যেমন চালাও তেমনি চলি — যেমন করাও তেমনি করি।"

ঠাকুরের ঘরের মধ্যে গান হইতেছে। ভক্তেরা গান গাহিতেছেন:

১। হৃদি-বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি।
ওহে ভক্তিপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধাসতী ।।
মুক্তি কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী ।।
আমায় ধর ধর জনার্দন, পাপভার গোবর্ধন,
কামাদি ছয় কংসচরে ধ্বংস কর সম্প্রতি ।।
বাজায়ে কৃপা বাঁশরি, মন ধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ হৃদিগোষ্ঠে পুরাও ইষ্ট এই মিনতি ।।
আমার প্রেমরূপ যমুনাকূলে, আশা বংশী বটমূলে,
স্বদাসভেবে সদয়ভাবে সতত কর বসতি —
যদি বল রাখাল-প্রেমে বন্দী থাকি ব্রজধামে,
তবে জ্ঞানহীন রাখাল তোমার দাস হবে হে দাশরথি ।।

২।   আমার প্রাণ-পিঞ্জরের পাখি গাওনারে।

ব্রহ্ম-কল্পতরুমূলে বসেরে পাখি, বিভুগুণ গাও দেখি (গাও গাও)

আর ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সুপক্ক ফল খাওনা রে ।।

নন্দন বাগানের শ্রীনাথ মিত্র বন্ধুগণ সঙ্গে আসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া বলিতেছেন, "এই যে এঁর চক্ষু দিয়া ভিতরটা সব দেখা যাচ্ছে। সার্সীর দরজার ভিতর দিয়ে যেমন ঘরের ভিতরকার জিনিস সব দেখা যায়।" শ্রীনাথ, যজ্ঞনাথ এঁরা নন্দন বাগানের ব্রাহ্মপরিবারভুক্ত। ইঁহাদের বাটীতে প্রতি বৎসর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব হইত। উৎসবদর্শন করিতে ঠাকুর পরে গিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়িতে আরতি হইতে লাগিল। ঘরে ছোট খাটটিতে বসিয়া ঠাকুর ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন। ক্রমে ভাবাবিষ্ট হইলেন। ভাব উপশমের পর বলিতেছেন, "মা ওকেও টেনে নাও। ও অত দীনভাবে থাকে। তোমার কাছে আসা যাওয়া করছে।"

ঠাকুর ভাবে বাবুরামের কথা কি বলিতেছেন? বাবুরাম, মাস্টার, রামদয়াল প্রভৃতি বসিয়া আছেন। রাত্রি ৮টা-৯টা হইবে। ঠাকুর সমাধিতত্ত্ব বলিতেছেন। জড়সমাধি, চেতনসমাধি, স্থিতসমাধি, উন্মনাসমাধি।

[বিদ্যাসাগর ও চেঙ্গিস খাঁ — ঈশ্বর কি নিষ্ঠুর? শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর]

সুখ-দুঃখের কথা হইতেছে। ঈশ্বর এত দুঃখ কেন করেছেন?

মাস্টার — বিদ্যাসাগর অভিমান করে বলেন, “ঈশ্বরকে ডাকবার আর কি দরকার! দেখ চেঙ্গিস খাঁ যখন লুটপাট আরম্ভ করলে তখন অনেক লোককে বন্দী করলে; ক্রমে প্রায় এক লক্ষ বন্দী জমে গেল। তখন সেনাপতিরা এসে বললে মহাশয়, এদের খাওয়াবে কে? সঙ্গে এদের রাখলে আমাদের বিপদ। কি করা যায়? ছেড়ে দিলেও বিপদ। তখন চেঙ্গিস খাঁ বললেন, তাহলে কি করা যায়। ওদের সব বধ কর। তাই কচাকচ করে কাটবার হুকুম হয়ে গেল। এই হত্যাকাণ্ড তো ঈশ্বর দেখলেন? কই একটু নিবারণ তো করলেন না। তা তিনি থাকেন থাকুন, আমার দরকার বোধ হচ্ছে না। আমার তো কোন উপকার হল না!”

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বরের কার্য কি বুঝা যায়, তিনি কি উদ্দেশ্যে কি করেন? তিনি সৃষ্টি, পালন, সংহার সবই করছেন। তিনি কেন সংহার করছেন আমরা কি বুঝতে পারি? আমি বলি, মা, আমার বোঝবারও দরাকার নাই, তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দিও। মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য এই ভক্তিলাভ। আর সব মা জানেন। বাগানে আম খেতে এসেছি; কত গাছ, কত ডাল, কত কোটি পাতা — এ-সব বসে বসে হিসাব করবার আমার কি দরকার! আমি আম খাই, গাছপাতার হিসাবে আমার দরকার নাই।

ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে আজ রাত্রে বাবুরাম, মাস্টার ও রামদয়াল শয়ন করিলেন।

গভির রাত্রি, ২টা-৩টা হইবে। ঠাকুরের ঘরে আলো নিভিয়া গিয়াছে। তিনি নিজে বিছানায় বসিয়া ভক্তদের সহিত মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাবুরাম, মাস্টার প্রভৃতি — দয়া ও মায়া — কঠিন সাধন ও ঈশ্বরদর্শন]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টার প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি) — দেখ, দয়া আর মায়া এ-দুটি আলাদা জিনিস। মায়া মানে আত্মীয়ে মমতা; যেমন বাপ-মা, ভাই-ভগ্নী, স্ত্রী-পুত্র, এদের উপর ভালবাসা। দয়া সর্বভূতে ভালবাসা; সমদৃষ্টি। কারু ভিতর যদি দয়া দেখ যেমন বিদ্যাসাগরের, সে জানবে ঈশ্বরের দয়া। দয়া থেকে সর্বভূতের সেবা হয়। মায়াও ঈশ্বরের। মায়া দ্বারা তিনি আত্মীয়দের সেবা করিয়ে লন। তবে একটি কথা আছে; মায়াতে অজ্ঞান করে রাখে, আর বদ্ধ করে। কিন্তু দয়াতে চিত্তশুদ্ধি হয়। ক্রমে বন্ধন মুক্তি হয়।

“চিত্তশুদ্ধি না হলে ভগবান দর্শন হয় না। কাম, ক্রোধ, লোভ — এ-সব হয় করলে তবে তাঁর কৃপা হয়; তখন দর্শন হয়। তোমাদের অতি গুহ্যকথা বলছি, কাম জয় করবার জন্য আমি অনেক কাণ্ড করেছিলাম। এমন কি আনন্দ আসনের চারিদকে ‘জয় কালী’ ‘জয় কালী’ বলে অনেকবার প্রদক্ষিণ করেছিলাম। আমার দশ-এগার বৎসর বয়সে যখন ও-দেশে ছিলুম, সেই সময়ে ওই অবস্থাটি (সমাধি অবস্থা) হয়েছিল; মাঠ দিয়ে যেতে যেতে যা দর্শন করলাম তাতে বিহ্বল হয়েছিলাম। ঈশ্বরদর্শনের কতরগুলি লক্ষণ আছে। জ্যোতি দেখা যায়, আনন্দ হয়। বুকের ভিতর তুবড়ির মতো গুরগুর করে মহাবায়ু ওঠে।”

পরদিন বাবুরাম, রামদয়াল বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। মাস্টার সেইদিনও রাত্রি ঠাকুরের সঙ্গে অতিবাহিত করলেন। সেদিন তিনি ঠাকুরবাড়িতেই প্রসাদ পাইলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ১৪ই ডিসেম্বর 1882/12/14/ix

09.9 দক্ষিণেশ্বরে মারোয়াড়ী ভক্তগণসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

বৈকাল হইয়াছে। মাস্টার ও দু-একটি ভক্ত বসিয়া আছেন। কতকগুলি মারোয়াড়ী ভক্ত আসিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহারা কলিকাতায় ব্যাবসা করেন। তাঁহারা ঠাকুরকে বলিতেছেন, আপনি আমাদের কিছু উপদেশ করুন। ঠাকুর হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মারোয়াড়ী ভক্তদের প্রতি) — দেখ, "আমি আর আমার" এ-দুটি অজ্ঞান। হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর তোমার এই সব এর নাম জ্ঞান। আর 'আমার' কেমন করে বলবে? বাগানের সরকার বলে, আমার বাগান, কিন্তু যদি কোন দোষ করে তখন মনিব তাড়িয়া দেয়, তখন এমন সাহস হয় না যে, নিজের আমের সিন্দুকটা বাগান থেকে বের করে আনে। কাম, ক্রোধ আদি যাবার নয়; ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। কামনা, লোভ করতে হয় তো ঈশ্বরকে পাবার কামনা, লোভ কর। বিচার করে তাদের তাড়িয়ে দাও। হাতি পরের কলাগাছ খেতে গেলে মাহুত অঙ্কুশ মারে।

“তোমরা তো ব্যবসা কর, ক্রমে ক্রমে উন্নতি করতে হয় জানো। কেউ আগে রেড়ির কল করে, আবার বেশি টাকা হলে কাপড়ের দোকান করে। তেমনি ঈশ্বরের পথে এগিয়ে যেতে হয়। হল, মাঝে মাঝে দিন কতক নির্জনে থেকে বেশি করে তাঁকে ডাকলে।

“তবে কি জানো? সময় নাহলে কিছু হয় না। কারু কারু ভোগকর্ম অনেক বাকি থাকে। তাই জন্য দেরিতে হয়। ফোঁড়া কাঁচা অবস্থায় অস্ত্র করলে হিতে বিপরীত হয়। পেকে মুখ হলে তবে ডাক্তার অস্ত্র করে। ছেলে বলেছিল, মা, এখন আমি ঘুমুই আমার বাহ্যে পেলে তখন তুমি তুল। মা বললে, বাবা, বাহ্যেতেই তোমায় তুলবে, আমায় তুলতে হবে না।” (সকলের হাস্য)

[মারোয়াড়ী ভক্ত ও ব্যবসায়ে মিথ্যাকথা — রামনাম কীর্তন]

মারোয়াড়ী ভক্তেরা মাঝে মাঝে ঠাকুরের সেবার জন্য মিষ্টান্নাদি দ্রব্য আনেন, ফলাদি থাল মিছরি ইত্যাদি। থাল মিছরিতে গোলাপ জলের গন্ধ। ঠাকুর কিন্তু সেই সব জিনিস প্রায় সেবা করেন না। বলেন, ওদের আনেক মিথ্যাকথা কয়ে টাকা রোজগার করতে হয়। তাই উপস্থিত মারোয়াড়ীদের কথাচ্ছলে উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখ, ব্যবসা করতে গেলে সত্যকথার আঁট থাকে না। ব্যবসায় তেজী মন্দি আছে। নানকের গল্পে আছে যে তিনি বললেন, অসাধুর দ্রব্য ভোজন করতে গিয়ে দেখলুম যে, সে-সব রক্ত মাখা হয়ে গেছে। সাধুদের শুদ্ধ জিনিস

দিতে হয়। মিথ্যা উপায়ে রোজগার করা জিনিস দিতে নাই। সত্যপথে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।১

সর্বদা তাঁর নাম করতে হয়। কাজের সময় মনটা তাঁর কাছে ফেলে রাখতে হয়। যেমন আমার পিঠে ফোঁড়া হয়েছে, সব কাজ করছি, কিন্তু মন ফোঁড়ার দিকে রয়েছে। রামনাম করা বেশ। যে রাম দশরথের ছেলে; আবার জগৎ সৃষ্টি করেছেন; আর সর্বভূতে আছেন। আর অতি নিকটে আছেন। অন্তরে বাহিরে।

“ওহি রাম দশরথকী বেটা,

ওহি রাম ঘট ঘটমে লেটা,

ওহি রাম জগৎ পশেরা,

ওহি রাম সব সে নিয়ারা।”

১ সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা, সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্‌।

[মুণ্ডকোপনিষদ্‌ — ৩/১/৫]

সত্যমেব জয়তে নানৃতম্‌।

[মুণ্ডকোপনিষদ্‌ — ৩/১/৬]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c10 ১০ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে শ্রীযুক্ত রাখাল, প্রাণকৃষ্ণ, কেদার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১লা জানুয়ারি 1883/01/01/i

10.1 দক্ষিণেশ্বরে প্রাণকৃষ্ণ, মাস্টার প্রভৃতি সঙ্গে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালীবাড়ির সেই পূর্বপরিচিত ঘরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। নিশিদিন হরিপ্রেমে — মার প্রেমে — মাতোয়ারা!

মেঝেতে মাদুর পাতা; তিনি সেই মাদুরে আসিয়া বসিয়াছেন। সম্মুখে প্রাণকৃষ্ণ ও মাস্টার। শ্রীযুক্ত রাখালও ঘরে আছেন। হাজরা মহাশয় ঘরের বাহিরে দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় বসিয়া আছেন।

শীতকাল — পৌষ মাস; ঠাকুরের গায়ে মোলস্কিনের র‍্যাপার। সোমবার, বেলা ৮টা। ১৮ই পৌষ, কৃষ্ণা অষ্টমী। ১লা জানুয়ারি, ১৮৮৩।

এখন অন্তরঙ্গ ভক্তগণ অনেকেই আসিয়া ঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়াছেন। ন্যূনাধিক এক বৎসর কাল নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, বলরাম, মাস্টার, বাবুরাম, লাটু প্রভৃতি সর্বদা আসা-যাওয়া করিতেছেন। তাঁহাদের বৎসরাধিক পূর্ব হইতে রাম, মনোমোহন, সুরেন্দ্র, কেদার আসিতেছেন।

প্রায় পাঁচ মাস হইল, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের বাদুড়বাগানের বাটীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। দুই মাস হইল শ্রীযুক্ত কেশব সেনের সহিত বিজয়াদি ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে নৌযানে (স্টীমার-এ) আনন্দ করিতে করিতে কলিকাতায় গিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কলিকাতার শ্যামপুকুর পল্লীতে বাস করেন। তাঁহার আদি নিবাস জনাই গ্রামে। Exchange-এর বড়বাবু। নিলামের কাজ তদারক করেন। প্রথম পরিবারের সন্তান না হওয়াতে, তাঁহার মত লইয়া দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহারই একমাত্র পুত্রসন্তান হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রাণকৃষ্ণ বড় ভক্তি করেন। একটু স্থূলকায়, তাই ঠাকুর মাঝে মাঝে 'মোটা বামুন' বলিতেন। অতি সজ্জন ব্যক্তি। প্রায় নয় মাস হইল ঠাকুর তাঁহার বাটীতে ভক্তসঙ্গে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাণকৃষ্ণ নানা ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি করিয়া অন্নভোগ দিয়াছিলেন।

ঠাকুর মেঝেতে বসিয়া আছেন। কাছে এক চ্যাঙড়া জিলিপি — কোন ভক্ত আনিয়াছেন। তিনি একটু জিলিপি ভাঙিয়া খাইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণের প্রতি সহাস্যে) — দেখছ আমি মায়ের নাম করি বলে — এই সব জিনিস খেতে পাচ্ছি! (হাস্য)

“কিন্তু তিনি লাউ কুমড়ো ফল দেন না — তিনি অমৃত ফল দেন — জ্ঞান, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য।”

ঘরে একটি ছয়-সাত বছরের ছেলে প্রবেশ করিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বালকাবস্থা। একজন ছেলে যেমন আর একজন ছেলের কাছ থেকে খাবার লুকিয়ে রাখে — পাছে সে খাইয়া ফেলে, ঠাকুরেরও ঠিক সেই অপূর্ব বালকবৎ অবস্থা হইতেছে। তিনি জিলিপির চ্যাংড়াটি হাত ঢাকা দিয়া লুকাইতেছেন। ক্রমে তিনি চ্যাংড়াটি একপার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া দিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ গৃহস্থ বটেন, কিন্তু তিনি বেদান্তচর্চা করেন — বলেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; তিনিই আমি — সোঽহম্‌। ঠাকুর তাঁহাকে বলেন, কলিতে অন্নগত প্রাণ — কলিতে নারদীয় ভক্তি।

“সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কে ধরতে পারে!” —

বালকের ন্যায় হাত ঢাকিয়া মিষ্টান্ন লুকাইতে লুকাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১লা জানুয়ারি 1883/01/01/ii

10.2 ভাবরাজ্য ও রূপদর্শন

ঠাকুর সমাধিস্থ — অনেকক্ষণ ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। দেহ নড়িতেছে না — চক্ষু স্পন্দহীন — নিঃশ্বাস পড়িতেছে কিনা — বুঝা যায় না।

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন — যেন ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে আবার ফিরিয়া আসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) — তিনি শুধু নিরাকার নন, তিনি আবার সাকার। তাঁর রূপ দর্শন করা যায়। ভাব-ভক্তির দ্বারা তাঁর সেই অতুলনীয় রূপ দর্শন করা যায়। মা নানারূপে দর্শন দেন।

[গৌরাঙ্গদর্শন — রতির মা বেশে মা]

“কাল মাকে দেখলাম। গেরুয়া জামা পরা, মুড়ি সেলাই নাই। আমার সঙ্গে কথা কচ্ছেন।

“আর-একদিন মুসলমানের মেয়েরূপে আমার কাছে এসেছিলেন। মাথায় তিলক কিন্তু দিগম্বরী। ছয় সাত বছরের মেয়ে — আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াতে লাগল ও ফচকিমি করতে লাগল।

“হৃদের বাড়িতে যখন ছিলাম — গৌরাঙ্গদর্শন হয়েছিল — কালোপেড়ে কাপড় পরা।

“হলধারী বলত তিনি ভাব-অভাবের অতীত। আমি মাকে গিয়ে বললাম, মা, হলধারী এ-কথা বলছে, তাহলে রূপ-টুপ কি সব মিথ্যা? মা রতির মার বেশে আমার কাছে এসে বললে, ‘তুই ভাবেই থাক।’ আমিও হলধারীকে তাই বললাম।

“এক-একবার ও-কথা ভুলে যাই বলে কষ্ট হয়। ভাবে না থেকে দাঁত ভেঙে গেল। তাই দৈববাণী বা প্রতক্ষ্য না হলে ভাবেই থাকব — ভক্তি নিয়ে থাকব। কি বল?”

প্রাণকৃষ্ণ — আজ্ঞা

[ভক্তির অবতার কেন? রামের ইচ্ছা]

শ্রীরামকৃষ্ণ — আর তোমাকেই বা কেন জিজ্ঞাসা করি। এর ভিতরে কে একটা আছে। সেই আমাকে নিয়ে এইরূপ কচ্ছে। মাঝে মাঝে দেবভাব প্রায় হত, — আমি পুজো না করলে শান্ত হতুম না।

“আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনি যেমন করান, তেমনি করি। যেমন বলান, তেমনি বলি।

“প্রসাদ বলে ভবসাগরে, বসে আছি ভাসিয়ে ভেলা।
জোয়ার এলে উজিয়ে যাব, ভাটিয়ে যাব ভাটার বেলা ।।

“ঝড়ের এঁটো পাতা কখনও উড়ে ভাল জায়গায় গিয়ে পড়ল, কখন বা ঝড়ে নর্দমায় গিয়ে পড়ল — ঝড় যেদিকে লয়ে যায়।

“তাঁতী বললে, রামের ইচ্ছায় ডাকাতি হল, রামের ইচ্ছায় আমাকে পুলিসে ধরলে — আবার রামের ইচ্ছায় ছেড়ে দিলে।

“হনুমান বলেছিল, হে রাম, শরণাগত, শরণাগত; — এই আশীর্বাদ কর যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়। আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।

“কোলা ব্যাঙ মুমূর্ষ অবস্থায় বললে, রাম, যখন সাপে ধরে তখন ‘রাম রক্ষা কর’ বলে চিৎকার করি। কিন্তু এখন রামের ধনুক বিঁধে মরে যাচ্ছি, তাই চুপ করে আছি।

“আগে প্রত্যক্ষ দর্শন হতো — এই চক্ষু দিয়ে — যেমন তোমায় দেখছি। এখন ভাবাস্থায় দর্শন হয়।

“ঈশ্বরলাভ হলে বালকের স্বভাব হয়। যে যাকে চিন্তা করে তার সত্তা পায়। ঈশ্বরের স্বভাব বালকের ন্যায়। বালক যেমন খেলাঘর করে, ভাঙে গড়ে — তিনিও সেইরূপ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কচ্ছেন। বালক যেমন কোনও গুণের বশ নয় — তিনিও তেমনি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণের অতীত।

“তাই পরমহংসেরা দশ-পাঁচজন বালক সঙ্গে রাখে, স্বভাব আরোপের জন্য।”

আগরপাড়া হইতে একটি বিশ-বাইশ বছরের ছোকরা আসিয়াছেন। ছেলেটি যখন আসেন ঠাকুরকে ইশারা করিয়া নির্জনে লইয়া যান ও চুপি চুপি মনের কথা কন। তিনি নূতন যাতায়াত করিতেছেন। আজ ছেলেটি কাছে আসিয়া মেঝেতে বসিয়াছেন।

[প্রকৃতিভাব ও কামজয় — সরলতা ও ঈশ্বরলাভ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ছেলেটির প্রতি) — আরোপ করলে ভাব বদলে যায়। প্রকৃতিভাব আরোপ করলে ক্রমে কামাদি রিপু নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক মেয়েদের মতন ব্যবহার হয়ে দাঁড়ায়। যাত্রাতে যারা মেয়ে সাজে তাদের নাইবার সময় দেখেছি — মেয়েদের মতো দাঁত মাজে, কথা কয়।

“তুমি একদিন শনি-মঙ্গলবারে এস।”

(প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) — ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। শক্তি না মানলে জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়, আমি-তুমি, ঘরবাড়ি, পরিবার — সব মিথ্যা। ওই আদ্যাশক্তি আছেন বলে জগৎ দাঁড়িয়ে আছে। কাঠামোর খুঁটি না থাকলে কাঠামোই হয় না — সুন্দর দুর্গা ঠাকুর-প্রতিমা হয় না।

“বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ না করলে চৈতন্যই হয় না — ভগবানলাভ হয় না — বিষয়বুদ্ধি থাকলেই কপটতা হয়। সরল না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না —

“এইসি ভক্তি কর ঘট ভিতর ছোড় কপট চতুরাই।
সেবা বন্দি আউর অধীনতা সহজে মিলি রঘুরাই ।।

“যারা বিষয়কর্ম করে — অফিসের কাজ কি ব্যবসা — তাদেরও সত্যেতে থাকা উচিত। সত্যকথা কলির তপস্যা।”

প্রাণকৃষ্ণ — অস্মিন্ ধর্মে মহেশি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।

পরোপকারনিরতো নির্বিকারঃ সদাশয়ঃ ।।

“মহানির্বাণতন্ত্রে এরূপ আছে।”

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, ওইগুলি ধারণা করতে হয়।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১লা জানুয়ারি 1883/01/01/iii

10.3 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যশোদার ভাব ও সমাধি

ঠাকুর ছোট খাটটির উপর গিয়া নিজের আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। সর্বদাই ভাবে পূর্ণ। ভাবচক্ষে রাখালকে দর্শন করিতেছেন। রাখালকে দেখিতে দেখিতে বাৎসল্য রসে আপ্লুত হইলেন; অঙ্গে পুলক হইতেছে। এই চক্ষে কি যশোদা গোপালকে দেখিতেন?

দেখিতে দেখিতে আবার ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ঘরের মধ্যস্থ ভক্তেরা অবাক ও নিস্তব্ধ হইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভুত ভাবাবস্থা দর্শন করিতেছেন।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন, রাখালকে দেখে উদ্দীপন কেন হয়? যত এগিয়ে যাবে ততই ঐশ্বর্যের ভাগ কম পড়ে যাবে। সাধকের প্রথম দর্শন হয় দশভুজা ঈশ্বরী মূর্তি। সে-মূর্তিতে ঐশ্বর্যের বেশি প্রকাশ। তারপর দর্শন দ্বিভুজা — তখন দশ হাত নাই — অত অস্ত্রশস্ত্র নাই। তারপর গোপাল-মূর্তি দর্শন — কোন ঐশ্বর্য নাই — কেবল কচি ছেলের মূর্তি। এরও পারে আছে — কেবল জ্যোতিঃ দর্শন।

[সমাধির পর ঠিক ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা — বিচার ও আসক্তি ত্যাগ]

“তাঁকে লাভ হলে, তাঁতে সমাধিস্থ হলে — জ্ঞানবিচার আর থাকে না।

“জ্ঞানবিচার আর কতক্ষণ? যতক্ষণ অনেক বলে বোধ হয় —

“যতক্ষণ জীব, জগৎ, আমি, তুমি — এ-সব বোধ থাকে। যখন ঠিক ঠিক এক জ্ঞান হয় তখন চুপ হয়ে যায়। যেমন ত্রৈলঙ্গ স্বামী।

“ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় দেখ নাই? প্রথমটা খুব হইচই। পেট যত ভরে আসছে ততই হইচই কমে যাচ্ছে। যখন দধি মুণ্ডি পড়ল তখন কেবল সুপ-সাপ! আর কোনও শব্দ নাই। তারপরই নিদ্রা — সমাধি। তখন হইচই আর আদৌ নাই।

(মাস্টার ও প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) — “অনেকে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কয়, কিন্তু নিচের জিনিস লয়ে থাকে। ঘরবাড়ি, টাকা, মান, ইন্দ্রিয়সুখ। মনুমেন্টের নিচে যতক্ষণ

থাক ততক্ষণ গাড়ি, ঘোড়া, সাহেব, মেম — এইসব দেখা যায়। উপরে উঠলে কেবল আকাশ, সমুদ্র, ধু-ধু কচ্ছে! তখন বাড়ি, ঘোড়া, গাড়ি, মানুষ এ-সব আর ভাল লাগে না; এ-সব পিঁপড়ের মতো দেখায়!

“ব্রহ্মজ্ঞান হলে সংসারাসক্তি, কামিনী-কাঞ্চনে উৎসাহ — সব চলে যায়। সব শান্তি হয়ে যায়। কাঠ পোড়বার সময় অনেক পড়পড় শব্দ আর আগুনের ঝাঁঝ। সব শেষ হয়ে গেলে, ছাই পড়ল — তখন আর শব্দ থাকে না। আসক্তি গেলেই উৎসাহ যায় — শেষে শান্তি।

“ঈশ্বরের যত নিকটে এগিয়ে যাবে ততই শান্তি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ প্রশান্তিঃ। গঙ্গার যত নিকটে যাবে ততই শীতল বোধ হবে। স্নান করলে আরও শান্তি।

“তবে জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, এ-সব, তিনি আছেন বলে সব আছে। তাঁকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না। ১-এর পিঠে অনেক শূন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায়। ১-কে পুঁছে ফেললে শূন্যের কোনও পদার্থ থাকে না।”

প্রাণকৃষ্ণকে কৃপা করিবার জন্য ঠাকুর কি এইবার নিজের অবস্থা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিতেছেন?

ঠাকুর বলিতেছেন —

[ঠাকুরের অবস্থা — ব্রহ্মজ্ঞানের পর “ভক্তির আমি”]

“ব্রহ্মজ্ঞানের পর — সমাধির পর — কেহ কেহ নেমে এসে ‘বিদ্যার আমি’, ‘ভক্তির আমি’ লয়ে থাকে। বাজার চুকে গেলে কেউ কেউ আপনার খুশি

বাজারে থাকে। যেমন নারদাদি। তাঁরা লোকশিক্ষার জন্য ‘ভক্তির আমি’ লয়ে থাকেন। শঙ্করাচার্য লোকশিক্ষার জন্য ‘বিদ্যার আমি’ রেখেছিলেন।

“একটুও আসক্তি থাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না। সূতার ভিতর একটু আঁশ থাকলে ছুঁচের ভিতর যাবে না।

“যিনি ঈশ্বরলাভ করেছেন, তাঁর কাম-ক্রোধাদি নামমাত্র। যেমন পোড়া দড়ি। দড়ির আকার। কিন্তু ফুঁ দিলে উড়ে যায়।

“মন আসক্তিশূন্য হলেই তাঁকে দর্শন হয়। শুদ্ধ মনে যা উঠবে সে তাঁরই বাণী। শুদ্ধ মনও যা শুদ্ধ বুদ্ধিও তা — শুদ্ধ আত্মাও তা। কেননা তিনি বই আর কেউ শুদ্ধ নাই।

“তাঁকে কিন্তু লাভ করলে ধর্মাধর্মের পার হওয়া যায়।”

এই বলিয়া ঠাকুর সেই দেবদুর্লভকন্ঠে রামপ্রসাদের গান ধরিলেন:

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী-কল্পতরুমূলে রে, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি ।।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
বিবেক নামে তার বেটারে তত্ত্বকথা তায় শুধাবি ।।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১লা জানুয়ারি 1883/01/01/iv

10.4 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীরাধার ভাব

ঠাকুর দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছেন। প্রাণকৃষ্ণাদি ভক্তগণও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন। হাজরা মহাশয় বারান্দায় বসিয়া আছেন। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে প্রাণকৃষ্ণকে বলিতেছেন —

"হাজরা একটি কম নয়। যদি এখানে বড় দরগা হয়, তবে হাজরা ছোট দরগা।" (সকলের হাস্য)

বারান্দার দরজায় নবকুমার আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ভক্তদের দেখিয়াই চলিয়া গেলেন। ঠাকুর বলিতেছেন, "অহংকারের মূর্তি"।

বেলা সাড়ে নয়টা হইয়াছে। প্রাণকৃষ্ণ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন — কলিকাতার বাটীতে ফিরিয়া যাইবেন।

একজন বৈরাগী গোপীযন্ত্রে ঠাকুরের ঘরে গান করিতেছেন:

নিত্যানন্দের জাহাজ এসেছে।
তোরা পারে যাবি তো ধর এসে ।।
ছয় মানোয়ারি গোরা, তারা দেয় সদা পারা,

বুক পিঠে তার ঢাল খাঁড়া ঘেরা।
তারা সদর দুয়ার আলগা করে রত্নমাণিক বিলাচ্ছে।

গান —— এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।
এবারে বর্ষা ভারি, হও হুঁশিয়ারি, লাগো আদা জল খেয়ে।
যখন আসবে শ্রবণা, দেখতে দেবে না।
বাঁশ বাখারি পচে যাবে, ঘর ছাওয়া হবে না।
যেমন আসবে ঝটকা, উড়বে মটকা, মটকা জাবে ফাঁক হয়ে।
(তুমিও যাবে হাঁ হয়ে)।

গান —— কার ভাবে নদে এসে, কাঙাল বেশে, হরি হয়ে বলছি হরি।
কার ভাবে ধরেছ ভাব, এমন স্বভাব, তাও তো কিছু বুঝতে নারি।

ঠাকুর গান শুনিতেছেন, এমন সময় শ্রীযুক্ত কেদার চাটুজ্যে আসিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি আফিসের বেশ পরিয়া আসিয়াছেন, চাপকান, ঘড়ি, ঘড়ির চেন। কিন্তু ঈশ্বরের কথা হইলেই তিনি চক্ষের জলে ভাসিয়া যান। অতি প্রেমিক লোক। অন্তরে গোপীর ভাব।

কেদারকে দেখিয়া ঠাকুরের একেবারে শ্রীবৃন্দাবনলীলা উদ্দীপন হইয়া গেল। প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ও কেদারকে সম্বোধন করিয়া গান গাহিতেছেন:

সখি, সে বন কতদূর।
(যথা আমার শ্যামসুন্দর) (আর চলিতে যে নারি)

শ্রীরাধার ভাবে গান গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ। চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান। কেবল চক্ষের দুই কোণ দিয়া আনন্দাশ্রু পড়িতেছে।

কেদার ভূমিষ্ঠ। ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া স্তব করিতেছেন:

হৃদয়কমলমধ্যে নির্বিশেষং নিরীহম্।
হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্ ।।
জননমরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎ স্বরূপম্।
সকল ভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে ।।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইতেছেন। কেদার নিজ বাটী হালিসহর হইতে কলিকাতায় কর্মস্থলে যাইবেন। পথে দক্ষিণেশ্বর কালী-মন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া যাইতেছেন। একটু বিশ্রাম করিয়া কেদার বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে ভক্তসঙ্গে কথা কহিতে কহিতে বেলা প্রায় দু-প্রহর হইল। শ্রীযুক্ত রামলাল ঠাকুরের জন্য থালা করিয়া মা-কালীর প্রসাদ আনিয়া দিলেন। ঘরের মধ্যে ঠাকুর দক্ষিণাস্য হইয়া আসনে বসিলেন ও প্রসাদ পাইলেন। আহার বালকের ন্যায় — একটু একটু সব মুখে দিলেন।

আহারান্তে ঠাকুর ছোট খাটটিতে একটু বিশ্রাম করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মারোয়াড়ী ভক্তেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১লা জানুয়ারি 1883/01/01/v

10.5 অভ্যাসযোগ — দুই পথ — বিচার ও ভক্তি

বেলা ৩টা। মারোয়াড়ী ভক্তেরা মেঝেতে বসিয়া ঠাকুরকে প্রশ্ন করিতেছেন। মাস্টার, রাখাল ও অন্যান্য ভক্তেরা ঘরে আছেন।

মারোয়াড়ী ভক্ত — মহারাজ, উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — দুইরকম আছে। বিচারপথ — আর অনুরাগ বা ভক্তির পথ।

“সৎ-অসৎ বিচার। একমাত্র সৎ বা নিত্যবস্তু ঈশ্বর, আর সমস্ত অসৎ বা অনিত্য। বাজিকরই সত্য, ভেলকি মিথ্যা। এইটি বিচার।

“বিবেক আর বৈরাগ্য। এই সৎ-অসৎ বিচারের নাম বিবেক। বৈরাগ্য অর্থাৎ সংসারের দ্রব্যের উপর বিরক্তি। এটি একবারে হয় না। — রোজ অভ্যাস করতে হয়। — তারপর তাঁর ইচ্ছায় মনের ত্যাগও করতে হয়, বাহিরের ত্যাগও করতে হয়। কলকাতার লোকদের বলবার জো নাই ‘ঈশ্বরের জন্য সব ত্যাগ কর’ — বলতে হয় ‘মনে ত্যাগ কর।’

“অভ্যাসযোগের দ্বারা কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ করা যায়। গীতায় এ-কথা আছে। অভ্যাস দ্বারা মনে অসাধারণ শক্তি এসে পড়ে, তখন ইন্দ্রিয় সংযম করতে — কাম, ক্রোধ বশ করতে — কষ্ট হয় না। যেমন কচ্ছপ হাত-পা টেনে নিলে আর বাহির করে না; কুড়ুল দিয়ে চারখানা করে কাটলেও আর বাহির করে না।”

মারোয়াড়ী ভক্ত — মহারাজ, দুই পথ বললেন; আর-এক পথ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — অনুরাগের বা ভক্তির পথ। ব্যাকুল হয়ে একবার কাঁদ — নির্জনে, গোপনে — দেখা দাও বলে।

“ডাক দেখি মন ডাকার মতো কেমন শ্যামা থাকতে পারে!”

মারোয়াড়ী ভক্ত — মহারাজ, সাকারপূজার মানে কি? আর নিরাকার, নির্গুণ — এর মানেই বা কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — যেমন বাপের ফটোগ্রাফ দেখলে বাপকে মনে পড়ে, তেমনি প্রতিমায় পূজা করতে করতে সত্যের রূপ উদ্দীপন হয়।

“সাকাররূপ কিরকম জান? যেমন জলরাশির মাঝ থেকে ভুড়ভুড়ি উঠে সেইরূপ। মহাকাশ চিদাকাশ থেকে এক-একটি রূপ উঠছে দেখা যায়। অবতারও একটি রূপ। অবতারলীলা সে আদ্যাশক্তিরই খেলা।”

[পাণ্ডিত্য — আমি কে? আমিই তুমি]

“পাণ্ডিত্যে কি আছে? ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তাঁকে পাওয়া যায়। নানা বিষয় জানবার দরকার নাই।

“যিনি আচার্য তাঁরই পাঁচটা জানা দরকার। অপরকে বধ করবার জন্য ঢাল-তরোয়াল চাই; আপনাকে বধ করবার জন্য একটি ছুঁচ বা নরুন হলেই হয়।

”আমি কে, এইটি খুঁজতে গেলে তাঁকেই পাওয়া যায়। আমি কি মাংস, না হাড়, না রক্ত, না মজ্জা — না মন, না বুদ্ধি? শেষে বিচারে দেখা যায় যে, আমি এ-সব কিছুই নয়। ‘নেতি’ ‘নেতি’। আত্মা ধরবার ছোঁবার জো নাই। তিনি নির্গুণ — নিরুপাধি।

“কিন্তু ভক্তি মতে তিনি সগুণ। চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম — সব চিন্ময়।”

মারোয়াড়ী ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

[দক্ষিণেশ্বরে সন্ধ্যা ও আরতি]

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর গঙ্গাদর্শন করিতেছেন। ঘরে প্রদীপ জ্বালা হইল, শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার নাম করিতেছেন ও খাটটিতে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার চিন্তা করিতেছেন।

ঠাকুরবাড়িতে এইবার আরতি হইতেছে। যাঁহারা এখনও পোস্তার উপর বা পঞ্চবটী মধ্যে পাদচারণ করিতেছেন তাঁহারা দূর হইতে আরতির মধুর ঘন্টা-নিনাদ শুনিতেছেন। জোয়ার আসিয়াছে — ভাগীরথী কুলকুল শব্দ করিয়া উত্তরবাহিনী হইতেছেন। আরতির মধুর শব্দ কুলকুল শব্দের সহিত মিশ্রিত হইয়া

আরও মধুর হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে প্রেমোন্মত্ত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। সকলই মধুর! হৃদয় মধুময়! মধু, মধু, মধু!

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c11 ১১ বেলঘরে গ্রামে

11.1 গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৮ই ফেব্রুয়ারি 1883/02/18

শ্রীরামকৃষ্ণ বেলঘরে শ্রীযুক্ত গোবিন্দ মুখুজ্জের বাটীতে শুভাগমন করিয়াছেন। আজ রবিবার, (৭ই ফাল্গুন) ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, মাঘ শুক্লা দ্বাদশী, পুষ্যানক্ষত্র। নরেন্দ্র, রাম প্রভৃতি ভক্তরা আসিয়াছেন, প্রতিবেশিগণ

আসিয়াছেন। ৭/৮টার সময় প্রথমেই ঠাকুর নরেন্দ্রাদিসঙ্গে সংকীর্তনে নৃত্য করিয়াছিলেন।

[বেলঘরেবাসিকে উপদেশ — কেন প্রণাম — কেন ভক্তিযোগ]

কীর্তনান্তে সকলেই উপবেশন করিলেন। অনেকেই ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন। ঠাকুর মাঝে মাঝে বলিতেছেন, "ঈশ্বরকে প্রণাম কর।" আবার বলিতেছেন, "তিনিই সব হয়ে রয়েছেন, তবে এক-এক জায়গায় বেশি প্রকাশ, যেমন সাধুতে। যদি বল, দুষ্ট লোক তো আছে, বাঘ সিংহও আছে; তা বাঘনারায়ণকে আলিঙ্গন করার দরকার নাই, দূর থেকে প্রণাম করে চলে যেতে হয়। আবার দেখ জল, কোন জল খাওয়া যায়, কোন জলে পূজা করা যায়, কোন জলে নাওয়া যায়। আবার কোন জলে কেবল আচান-শোচান হয়।"

প্রতিবেশী — আজ্ঞা, বেদান্তমত কিরূপ?

শ্রীরামকৃষ্ণ — বেদান্তবাদীরা বলে 'সোঽহম্' ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; আমিও মিথ্যা। কেবল সেই পরব্রহ্মই আছেন।

"কিন্তু আমি তো যায় না; তাই আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর সন্তান, আমি তাঁর ভক্ত — এ-অভিমান খুব ভাল।

"কলিযুগে ভক্তিযোগই ভাল। ভক্তি দ্বারাও তাঁকে পাওয়া যায়। দেহবুদ্ধি থাকলেই বিষয়বুদ্ধি। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ — এই সকল বিষয়। বিষয়বুদ্ধি যাওয়া বড় কঠিন। বিষয়বুদ্ধি থাকতে 'সোঽহম্' হয় না।১

"ত্যাগীদের বিষয়বুদ্ধি কম, সংসারীরা সর্বদাই বিষয়চিন্তা নিয়ে থাকে, তাই সংসারীর পক্ষে 'দাসোঽহম্'।"

[বেলঘরেবাসী ও পাপবাদ]

প্রতিবেশী — আমরা পাপী, আমাদের কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁর নামগুণকীর্তন করলে দেহের সব পাপ পালিয়ে যায়। দেহবৃক্ষে পাপপাখি; তাঁর নামকীর্তন যেন হাততালি দেওয়া। হাততালি দিলে যেমন বৃক্ষের উপরের পাখি সব পালায়, তেমনি সব পাপ তাঁর নামগুণকীর্তনে চলে যায়।২

"আবার দেখ, মেঠো পুকুরের জল সূর্যের তাপে আপনা-আপনি শুকিয়ে যায়। তেমনি তাঁর নামগুণকীর্তনে পাপ-পুষ্করিণীর জল আপনা-আপনি শুকিয়ে যায়।

"রোজ অভ্যাস করতে হয়। সার্কাসে দেখে এলাম ঘোড়া দৌড়ুচ্ছে তার উপর বিবি একপায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কত অভ্যাসে ওইটি হয়েছে।

"আর তাঁকে দেখবার জন্য অন্ততঃ একবার করে কাঁদ।

"এই দুটি উপায় — অভ্যাস আর অনুরাগ, অর্থাৎ তাঁকে দেখবার জন্য ব্যাকুলতা।"

[বেলঘরেবাসীর ষট্‌চক্রের গান ও শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি]

বৈঠকখানাবাড়ির দোতলা ঘরের বারান্দায় ঠাকুর ভক্তসঙ্গে প্রসাদ পাইতেছেন; বেলা ১টা হইয়াছে। সেবা সমাপ্ত হইতে না হইতে নিচের প্রাঙ্গণে একটি ভক্ত গান ধরিলেন:

জাগ জাগ জননি,
মূলাধারে নিদ্রাগত কতদিন গত হল কুলকুণ্ডলিনী।

ঠাকুর গান শুনিয়া সমাধিস্থ। শরীর সমস্ত স্থির, হাতটি প্রসাদপাত্রের উপর যেরূপ ছিল, চিত্রার্পিতের ন্যায় রহিল। খাওয়া আর হইল না। অনেকক্ষণ পরে ভাবের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে বলিতেছেন, “আমি নিচে যাব, আমি নিচে যাব।”

একজন ভক্ত তাঁহাকে অতি সন্তর্পনে নিচে লইয়া যাইতেছেন।

প্রাঙ্গণেই সকালে নামসংকীর্তন ও প্রেমানন্দে ঠাকুরের নৃত্য হইয়াছিল। এখনও সতরঞ্চি ও আসন পাতা রহিয়াছে। ঠাকুর এখনও ভাবাবিষ্ট; গায়কের কাছে আসিয়া বসিলেন। গায়ক এতক্ষণে গান থামাইয়াছিলেন। ঠাকুর অতি দীনভাবে বলিতেছেন, “বাবু, আর-একবার মায়ের নাম শুনব।”

গায়ক আবার গান গাহিতেছেন:

জাগ জাগ জননি,
মূলাধারে নিদ্রাগত কতদিন গত হল কুলকুণ্ডলিনী।
স্বকার্যসাধনে চল মা শিরোমধ্যে, পরম শিব যথা সহস্রদলপদ্মে,
করি ষট্‌চক্র ভেদ (মাগো) ঘুচাও মনের খেদ, চৈতন্যরূপিণি।

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট।

১ অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।

[গীতা, ১২/৫]

২ ...মামেকং শরণং ব্রজ, অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি।

[গীতা, ১৮/৬৬]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c12 ১২ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ও বলরাম-মন্দিরে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৫শে ফেব্রুয়ারি 1883/02/25

12.1 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে রাখাল, রাম, নিত্যগোপাল, চৌধুরী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

[নির্জনে সাধন — ফিলজফি — ঈশ্বরদর্শন]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পূর্ব পরিচিত ঘরে মধ্যাহ্নে সেবার পর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। আজ ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ (রবিবার, ১৪ই ফাল্গুন, কৃষ্ণা তৃতীয়া)।

রাখাল, হরিশ, লাটু, হাজরা আজকাল ঠাকুরের পদছায়ায় সর্বদা বাস করিতেছেন। কলিকাতা হইতে রাম, কেদার, নিত্যগোপাল, মাস্টার প্রভৃতি ভক্তেরা আসিয়াছেন। আর চৌধুরী আসিয়াছেন।

চৌধুরীর সম্প্রতি পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। মনের শান্তির জন্য তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিতে কয়বার আসিয়াছেন। তিনি চারটা পাশ করিয়াছেন — রাজ সরকারের কাজ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাম প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি) — রাখাল, নরেন্দ্র, ভবনাথ এরা নিত্য সিদ্ধ — জন্ম থেকেই চৈতন্য আছে। লোকশিক্ষার জন্যই শরীরধারণ।

“আর-একথাক আছে কৃপাসিদ্ধ। হঠাৎ তাঁর কৃপা হল — অমনি দর্শন আর জ্ঞানলাভ। যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর — আলো নিয়ে গেলে একক্ষণে আলো হয়ে যায়! — একটু একটু করে হয় না

“যাঁরা সংসারে আছে তাদের সাধন করতে হয়। নির্জনে গিয়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়।

(চৌধুরীর প্রতি) — “পাণ্ডিত্য দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না।

“আর তাঁর বিষয় কে বিচার করে বুঝবে? তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি যাতে হয়, তাই সকলের করা উচিত।”

[ভীষ্মদেবের ক্রন্দন — হার-জিত — দিব্যচক্ষু ও গীতা]

“তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য — কি বুঝবে? তাঁর কার্যই বা কি বুঝতে পারবে?

“ভীষ্মদেব যিনি সাক্ষাৎ অষ্টবসুর একজন বসু — তিনিই শরশয্যায় শুয়ে কাঁদতে লাগলেন। বললেন — কি আশ্চর্য! পাণ্ডবদের সঙ্গে স্বয়ং ভগবান সর্বদাই আছেন, তবু তাদের দুঃখ-বিপদের শেষ নাই! ভগবানের কার্য কে বুঝবে!

“কেউ মনে করে আমি একটু সাধন-ভজন করেছি, আমি জিতেছি। কিন্তু হার-জিত তাঁর হাতে। এখানে একজন মাগী (বেশ্যা) মরবার সময় সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করলে।”

চৌধুরী — তাঁকে কিরূপে দর্শন করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — এ-চক্ষে দেখা যায় না। তিনি দিব্যচক্ষু দেন, তবে দেখা যায়। অর্জুনকে বিশ্বরূপ-দর্শনের সময় ঠাকুর দিব্যচক্ষু দিছলেন।

"তোমার ফিলজফিতে (Philosophy) কেবল হিসাব কিতাব করে! কেবল বিচার করে! ওতে তাঁকে পাওয়া যায় না।"

[অহেতুকী ভক্তি — মূলকথা — রাগানুগাভক্তি]

"যদি রাগভক্তি হয় — অনুরাগের সহিত ভক্তি — তাহলে তিনি স্থির থাকতে পারেন না।

"ভক্তি তাঁর কিরূপ প্রিয় — খোল দিয়ে জাব যেমন গরুর প্রিয় — গবগব করে খায়।

"রাগভক্তি — শুদ্ধাভক্তি — অহেতুকী ভক্তি। যেমন প্রহ্লাদের।

"তুমি বড়লোকের কাছে কিছু চাও না — কিন্তু রোজ আস — তাকে দেখতে ভালবাস। জিজ্ঞাসা করলে বল, 'আজ্ঞা, দরকার কিছু নাই — আপনাকে দেখতে এসেছি।' এর নাম অহেতুকী ভক্তি। তুমি ঈশ্বরের কাছে কিছু চাও না — কেবল ভালবাস।"

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাহিতেছেন:

আমি মুক্তি দিতে কাতর নই
শুদ্ধাভক্তি দিতে কাতর হই।
আমার ভক্তি যেবা পায়, তারে কেবা পায়,
সে যে সেবা পায়, হয়ে ত্রিলোকজয়ী ।।
শুন চন্দ্রাবলী ভক্তির কথা কই।

ভক্তির কারণে পাতাল ভবনে,
বলির দ্বারে আমি দ্বারী হয়ে রই ।।
শুদ্ধাভক্তি এক আছে বৃন্দাবনে,
গোপ-গোপী বিনে অন্যে নাহি জানে।
ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে,
পিতাজ্ঞানে নন্দের বাধা মাথায় বই ।।

“মূলকথা ঈশ্বরে রাগানুগা ভক্তি। আর বিবেক বৈরাগ্য।”

চৌধুরী — মহাশয়, গুরু না হলে কি হবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ — সচ্চিদানন্দই গুরু।

“শবসাধন করে ইষ্টদর্শনের সময় গুরু সামনে এসে পড়েন — আর বলেন, ‘ওই দেখ্ তোর ইষ্ট।’ — তারপর গুরু ইষ্টে লীন হয়ে যান। যিনি গুরু তিনিই ইষ্ট। গুরু খেই ধরে দেন।

“অনন্তব্রত করে। কিন্তু পূজা করে — বিষ্ণুকে। তাঁরই মধ্যে ঈশ্বরের অনন্তরূপ!”

[শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম-সমন্বয়]

(রামাদি ভক্তদের প্রতি) — “যদি বল কোন্ মূর্তির চিন্তা করব; যে-মূর্তি ভাল লাগে তারই ধ্যান করবে। কিন্তু জানবে যে, সবই এক।

“কারু উপর বিদ্বেষ করতে নাই। শিব, কালী, হরি — সবই একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যে এক করেছে সেই ধন্য।

“বহিঃ শৈব, হৃদে কালী, মুখে হরিবোল।

“একটু কাম-ক্রোধাদি না থাকলে শরীর থাকে না। তাই তোমরা কেবল কমাবার চেষ্টা করবে।”

ঠাকুর কেদারকে দেখিয়া বলিতেছেন —

“ইনি বেশ। নিত্যও মানেন, লীলাও মানেন। একদিকে ব্রহ্ম, আবার দেবলীলা-মানুষলীলা পর্যন্ত।”

কেদার বলেন যে, ঠাকুর মানুষদেহ লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন।

[সন্ন্যাসী ও কামিনী — ভক্তা স্ত্রীলোক]

নিত্যগোপালকে দেখিয়া ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন —

“এর বেশ অবস্থা!

(নিত্যগোপালের প্রতি) — “তুই সেখানে বেশি যাসনি। — কখনও একবার গেলি। ভক্ত হলেই বা — মেয়েমানুষ কিনা। তাই সাবধান।

“সন্ন্যাসীর বড় কঠিন নিয়ম। স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না। এটি সংসারী লোকেদের পক্ষে নয়।

স্ত্রীলোক যদি খুব ভক্তও হয় — তবুও মেশামেশি করা উচিত নয়। জিতেন্দ্রিয় হলেও — লোকশিক্ষার জন্য ত্যাগীর এ-সব করতে হয়।

“সাধুর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে অন্য লোকে ত্যাগ করতে শিখবে। তা না হলে তারাও পড়ে যাবে। সন্ন্যাসী জগদ্‌গুরু।”

এইবার ঠাকুর ও ভক্তেরা উঠিয়া বেড়াইতেছেন। মাস্টার প্রহ্লাদের ছবির সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছবি দেখিতেছেন। প্রহ্লাদের অহেতুকী ভক্তি — ঠাকুর বলিয়াছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ৯ই মার্চ 1883/03/09

12.2 ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অমাবস্যায় ভক্তসঙ্গে — রাখালের প্রতি গোপালভাব

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে নিজের ঘরে রাখাল, মাস্টার প্রভৃতি দুই-একটি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। আজ শুক্রবার (২৬শে ফাল্গুন), ৯ই মার্চ, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, মাঘের অমাবস্যা, সকাল, বেলা ৮টা-৯টা হইবে।

অমাবস্যার দিন, ঠাকুরের সর্বদাই জগন্মাতার উদ্দীপন হইতেছে। তিনি বলিতেছেন, ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। মা তাঁর মহামায়ায় মুগ্ধ করে রেখেছেন। মানুষের ভিতরে দেখ, বদ্ধজীবই বেশি। এত কষ্ট-দুঃখ পায়, তবু সেই 'কামিনী-কাঞ্চনে' আসক্তি। কাঁটা ঘাস খেয়ে উটের মুখে দরদর করে রক্ত পড়ে, তবু আবার কাঁটা ঘাস খায়। প্রসববেদনার সময় মেয়েরা বলে, ওগো, আর স্বামীর কাছে যাব না; আবার ভুলে যায়।

"দেখ, তাঁকে কেউ খোঁজে না। আনারসগাছের ফল ছেড়ে লোকে তার পাতা খায়।"

ভক্ত — আজ্ঞা, সংসারে তিনি কেন রেখে দেন?

[সংসার কেন? নিষ্কামকর্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধির জন্য]

শ্রীরামকৃষ্ণ — সংসার কর্মক্ষেত্র, কর্ম করতে করতে তবে জ্ঞান হয়। গুরু বলেছেন, এই সব কর্ম করো, আর এই সব কর্ম করো না। আবার তিনি নিষ্কামকর্মের উপদেশ দেন।১ কর্ম করতে করতে মনের ময়লা কেটে যায়। ভাল ডাক্তারের হাতে পড়লে ঔষধ খেতে খেতে যেমন রোগ সেরে যায়।

"কেন তিনি সংসার থেকে ছাড়েন না? রোগ সারবে, তবে ছাড়বেন। কামিনী-কাঞ্চন ভোগ করতে ইচ্ছা যখন চলে যাবে, তখন ছাড়বেন। হাসপাতালে নাম লেখালে পালিয়ে আসবার জো নাই। রোগের কসুর থাকলে ডাক্তার সাহেব ছাড়বে না।"

ঠাকুর আজকাল যশোদার ন্যায় বাৎসল্যরসে সর্বদা আপ্লুত হইয়া থাকেন, তাই রাখালকে কাছে সঙ্গে রাখিয়াছেন। ঠাকুরের রাখালের সম্বন্ধে গোপালভাব। যেমন মার কোলের কাছে ছোট ছেলে গিয়া বসে, রাখালও ঠাকুরের কোলের উপর ভর দিয়া বসিতেন। যেন মাই খাচ্ছেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তসঙ্গে গঙ্গায় বানদর্শন]

ঠাকুর এইভাবে বসিয়া আছেন, এমন সময় একজন আসিয়া সংবাদ দিল যে, বান আসিতেছে। ঠাকুর, রাখাল, মাস্টার প্রভৃতি সকলে বান দেখিবার জন্য পঞ্চবটী অভিমুখে দৌড়াইতে লাগিলেন। পঞ্চবটীমূলে আসিয়া সকলে বান দেখিতেছেন। বেলা প্রায় ১০।।টা হইবে। একখানা নৌকার অবস্থা দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন, "দেখ, দেখ, ওই নৌকাখানার অবস্থা বা কি হয়।"

এইবার ঠাকুর পঞ্চবটীর রাস্তার উপরে মাস্টার, রাখাল প্রভৃতির সহিত বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — আচ্ছা, বান কি রকম করে হয়?

মাস্টার মাটিতে আঁক কাটিয়া পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, মাধ্যাকর্ষণ, জোয়ার, ভাটা; পূর্ণিমা, অমাবস্যা, গ্রহণ ইত্যাদি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকালে ও পাঠশালায় —— The Yogi is beyond all finite relations of number, quantity, cause, effect.]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — ওই যা! বুঝতে পারছি না; মাথা ঘুরে আসছে! টনটন করছে! আচ্ছা, এত দূরের কথা কেমন করে জানলে?

“দেখ, আমি ছেলেবেলায় চিত্র আঁকতে বেশ পারতুম, কিন্তু শুভঙ্করী আঁক ধাঁধা লাগত! গণনা অঙ্ক পারলাম না।”

এইবার ঠাকুর নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। দেওয়ালে টাঙানো যশোদার ছবি দেখিয়া বলিতেছেন, ”ছবি ভাল হয় নাই, ঠিক যেন মেলেনীমাসী করেছে।“

[শ্রীঅধর সেনের প্রথম দর্শন ও বলির কথা]

মধ্যাহ্ন-সেবার পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। অধর ও অন্যান্য ভক্তরা ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিলেন। অধর সেন এই প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করিতেছেন। অধরের বাড়ি কলিকাতা বেনেটোলায়। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বয়স ২৯।৩০।

[অবস্থা ও অহিংসা]

অধর (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — মহাশয়, আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে; বলিদান করা কি ভাল? এতে তো জীবহিংসা করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— বিশেষ বিশেষ অবস্থায় শাস্ত্রে আছে, বলি দেওয়া যেতে পারে। ‘বিধিবাদীয়’ বলিতে দোষ নাই। যেমন অষ্টমীতে একটি পাঁঠা। কিন্তু সকল অবস্থাতে হয় না। আমার এখন এমন অবস্থা, দাঁড়িয়ে বলি দেখতে পারি না। মার প্রসাদী মাংস, এ-অবস্থায় খেতে পারি না। তাই আঙুলে করে একটু ছুঁয়ে মাথায় ফোঁটা কাটি; পাছে মা রাগ করেন।

“আবার এমন অবস্থা হয় যে, দেখি সর্বভূতে ঈশ্বর, পিঁপড়েতেও তিনি। এ-অবস্থায় হঠাৎ কোন প্রাণী মরলে এই সান্ত্বনা হয় যে, তার দেহমাত্র বিনাশ হল। আত্মার জন্ম মৃত্যু নাই।”২

[অধরকে উপদেশ — “বেশি বিচার করো না”]

“বেশি বিচার করা ভাল নয়, মার পাদপদ্মে ভক্তি থাকলেই হল। বেশি বিচার করতে গেলে সব গুলিয়ে যায়। এ-দেশে পুকুরের জল উপর উপর খাও, বেশ পরিষ্কার জল পাবে। বেশি নিচে হাত দিয়ে নাড়লে জল ঘুলিয়ে যায়। তাই তাঁর কাছে ভক্তি প্রার্থনা কর। ধ্রুবর ভক্তি সকাম। রাজ্যলাভের জন্য তপস্যা করেছিলেন। প্রহ্লাদের কিন্তু নিষ্কাম অহেতুকী ভক্তি।”

ভক্ত — ঈশ্বরকে কিরূপে লাভ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ওই ভক্তির দ্বারা। তবে তাঁর কাছে জোর করতে হয়। দেখা দিবিনি, গলায় ছুরি দেব — এর নাম ভক্তির তমঃ।

ভক্ত — ঈশ্বরকে কি দেখা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, অবশ্য দেখা যায়। নিরাকার, সাকার — দুই দেখা যায়। সাকার চিন্ময়রূপ দর্শন হয়। আবার সাকার মানুষ তাতেও তিনি প্রতক্ষ্য। অবতারকে দেখাও যা ঈশ্বরকে দেখাও তা। ঈশ্বরই যুগে যুগে মানুষরূপে অবতীর্ণ হন!৩

১ কর্মণ্যেবাধিকারাস্তে মা ফলেষু কদাচন ।। [গীতা, ২।৪৭]

২ ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। [গীতা, ২।২০]

৩ ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে [গীতা, ৪।৮]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১১ই মার্চ 1883/03/11/i

12.3 দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব

[প্রভাতে ভক্তসঙ্গে]

কালীবাড়িতে আজ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মমহোৎসব — ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া, রবিবার, ১১ই মার্চ, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। আজ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সাক্ষাৎ তাঁহাকে লইয়া জন্মোৎসব করিবেন।

প্রভাত হইতে ভক্তেরা একে একে আসিয়া জুটিতেছেন। সম্মুখে মা ভবতারিণীর মন্দির। মঙ্গলারতির পরই প্রভাতী রাগে নহবতখানায় মধুর তানে রোশনচৌকি বাজিতেছে। একে বসন্তকাল, বৃক্ষলতা সকলই নূতন বেশ পরিধান করিয়াছে; তাহাতে ভক্তহৃদয় ঠাকুরের জন্মদিন স্মরণ করিয়া নৃত্য করিতেছে। চতুর্দিকে আনন্দের সমীরণ বহিতেছে। মাস্টার গিয়া দেখিতেছেন; ভবনাথ, রাখাল,

ভবনাথের বন্ধু কালীকৃষ্ণ বসিয়া সহাস্যে আলাপ করিতেছেন। মাস্টার পৌঁছিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — তুমি এসেছ। (ভক্তদিগকে) লজ্জা, ঘৃণা, ভয় —— তিন থাকতে নয়। আজ কত আনন্দ হবে। কিন্তু যে শালারা হরিনামে মত্ত হয়ে নৃত্য-গীত করতে পারবে না, তাদের কোন কালে হবে না। ঈশ্বরের কথায় লজ্জা কি, ভয় কি? নে, এখন তোরা গা।

ভবনাথ ও কালীকৃষ্ণ গান গাহিতেছেন:

ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী,
সব মিলে তব সত্যধর্ম ভারতে প্রচারি।
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম, দিশি দিশি তব পুণ্য নাম;
ভক্তজনসমাজ আজি স্তুতি করে তোমারি।
নাহি চাহি প্রভু ধন জন মান, নাহি প্রভু অন্য কাম;
প্রার্থনা করে তোমারে আকুল নরনারী।
তব পদে প্রভু লইনু শরণ, কি ভয় বিপদে কি ভয় মরণ,
অমৃতের খনি পাইনু যখন জয় জয় তোমারি।

ঠাকুর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বসিয়া একমনে গান শুনিতেছেন। গান শুনিতে শুনিতে মন একেবারে ভাবরাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। ঠাকুরের মন শুষ্ক দিয়াশলাই —— একবার ঘষিলেই উদ্দীপন। প্রাকৃত লোকের মন ভিজে দিয়াশলাইয়ের ন্যায়, যত

ঘষো জ্বলে না — কেন না মন বিষয়াসক্ত। ঠাকুর অনেকক্ষণ ধ্যানে নিমগ্ন। কিয়ৎক্ষণ পরে কালীকৃষ্ণ ভবনাথের কানে কানে কি বলিতেছেন।

[আগে হরিনাম না শ্রমজীবীদের শিক্ষা?]

কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ঠাকুর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় যাবে?”

ভবনাথ — আজ্ঞা, একটু প্রয়োজন আছে, তাই যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি দরকার?

ভবনাথ — আজ্ঞা, শ্রমজীবীদের শিক্ষালয়ে (Baranagore Workingmen's Institute) যাবে। [কালীকৃষ্ণের প্রস্থান]

শ্রীরামকৃষ্ণ — ওর কপালে নাই। আজ হরিনামে কত আনন্দ হবে দেখত? ওর কপালে নাই!

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১১ই মার্চ 1883/03/11/ii

12.4 জন্মোৎসবে ভক্তসঙ্গে — সন্ন্যাসীদের কঠিন নিয়ম

বেলা প্রায় সাড়ে আটটা বা নয়টা। ঠাকুর আজ অবগাহন করিয়া গঙ্গায় স্নান করিলেন না; শরীর তত ভাল নয়। তাঁহার স্নান করিবার জল ওই পূর্বোক্ত বারান্দায় কলসী করিয়া আনা হইল। ঠাকুর স্নান করিতেছেন, ভক্তেরা স্নান করাইয়া দিল। ঠাকুর স্নান করিতে করিতে বলিলেন, “এক ঘটি জল আলাদা করে রেখে দে।” শেষে ওই ঘটির জল মাথায় দিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ বড় সাবধান, এক ঘটি জলের বেশি মাথায় দিলেন না।

স্নানান্তে মধুর কণ্ঠে ভগবানের নাম করিতেছেন। শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া দুই-একটি ভক্তসঙ্গে দক্ষিণাস্য হইয়া কালীবাড়ির পাকা উঠানের মধ্য দিয়া মা-কালীর মন্দিরের অভিমুখে যাইতেছেন। মুখে অবিরত নাম উচ্চারণ করিতেছেন। দৃষ্টি ফ্যালফেলে — ডিমে যখন তা দেয়, পাখির দৃষ্টি যেরূপ হয়।

মা-কালীর মন্দিরে গিয়া প্রণাম ও পূজা করিলেন। পূজার নিয়ম নাই — গন্ধ-পুষ্প কখনও মায়ের চরণে দিতেছেন, কখনও বা নিজের মস্তকে ধারণ করিতেছেন। অবশেষে মায়ের নির্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া ভবনাথকে বলিতেছেন, “ডাব নে রে।” মার প্রসাদী ডাব।

আবার পাকা উঠানের পথ দিয়া নিজের ঘরের দিকে আসিতেছেন। সঙ্গে মাস্টার ও ভবনাথ। ভবনাথের হাতে ডাব। রাস্তার ডানদিকে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দির; ঠাকুর বলিতেন, ‘বিষ্ণুঘর’। এই যুগলরূপ দর্শন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

করিলেন। আবার বামপার্শ্বে দ্বাদশ শিবমন্দির। সদাশিবকে উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর এইবার ঘরে আসিয়া পোঁছিলেন। দেখিলেন, আরও ভক্তের সমাগম হইয়াছে। রাম, নিত্যগোপাল, কেদার চাটুজ্যে ইত্যাদি অনেকে আসিয়াছেন। তাঁহারা সকলে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুরও তাঁহাদের কুশল প্রশ্ন করিলেন।

ঠাকুর নিত্যগোপালকে দেখিয়া বলিতেছেন, "তুই কিছু খাবি?" ভক্তটির তখন বালকভাব। তিনি বিবাহ করেন নাই, বয়স ২৩।২৪ হবে। সর্বদাই ভাবরাজ্যে বাস করেন। ঠাকুরের কাছে কখনও একাকী, কখনও রামের সঙ্গে প্রায় আসেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ভাবাবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে স্নেহ করেন। তাঁহার পরমহংস অবস্থা — এ-কথা ঠাকুর মাঝে মাঝে বলেন। তাই তাঁহাকে গোপালের ন্যায় দেখিতেছেন।

ভক্তটি বলিলেন, 'খাব'। কথাগুলি ঠিক বালকের ন্যায়।

[নিত্যগোপালকে উপদেশ — ত্যাগীর নারীসঙ্গ একেবারে নিষেধ]

খাওয়ার পর ঠাকুর গঙ্গার উপর ঘরের পশ্চিম ধারে গোল বারান্দাটিতে তাঁকে লইয়া চলিলেন ও তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন।

একটি স্ত্রীলোক পরম ভক্ত, বয়স ৩১।৩২ হইবে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রায় আসেন ও তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি করেন। সেই স্ত্রীলোকটিও ওই ভক্তটির

অদ্ভুত ভাবাবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন ও তাঁহাকে প্রায় নিজের আলয়ে লইয়া যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তটির প্রতি) — সেখানে কি তুই যাস?

নিত্যগোপাল (বালকের ন্যায়) — হাঁ যাই। নিয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ওরে সাধু সাবধান! এক-আধবার যাবি। বেশি যাসনে — পড়ে যাবি! কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। সাধুর মেয়েমানুষ থেকে অনেক দূর থাকতে হয়। ওখানে সকলে ডুবে যায়। ওখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু পড়ে খাচ্ছে খাবি।

ভক্তটি সমস্ত শুনিলেন।

মাস্টার (স্বগত) — কি আশ্চর্য! ওই ভক্তটির পরমহংস অবস্থা — ঠাকুর মাঝে মাঝে বলেন। এমন উচ্চ অবস্থা সত্ত্বেও কি ইঁহার বিপদ সম্ভাবনা! সাধুর পক্ষে ঠাকুর কি কঠিন নিয়মই করিলেন। মেয়েদের সঙ্গে মাখামাখি করিলে সাধুর পতন হইবার সম্ভাবনা। এই উচ্চ আদর্শ না থাকিলে জীবের উদ্ধারই বা কিরূপে হইবে? স্ত্রীলোকটি তো ভক্তিমতী। তবুও ভয়! এখন বুঝিলাম, শ্রীচৈতন্য ছোট হরিদাসের উপর কেন অত কঠিন শাসন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর বারণ সত্ত্বেও হরিদাস একজন ভক্ত বিধবার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। কিন্তু হরিদাস যে সন্ন্যাসী। তাই মহাপ্রভু তাঁকে ত্যাগ করিলেন। কি শাসন! সন্ন্যাসীর কি কঠিন নিয়ম! আর এ-ভক্তটির উপর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কি ভালবাসা! পাছে উত্তরকালে তাঁহার কোন বিপদ হয় — তাড়াতাড়ি পূর্ব হইতে সাবধান

করিতেছেন। ভক্তেরা অবাক্‌। “সাধু সাবধান” — ভক্তেরা এই মেঘগম্ভীরধ্বনি শুনিতেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১১ই মার্চ 1883/03/11/iii

12.5 সাকার-নিরাকার — ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের রামনামে সমাধি

এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ঘরের উত্তর-পূর্ব বারান্দায় আসিয়াছেন। ভক্তদের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরবাসী একজন গৃহস্থও বসিয়া আছেন। তিনি গৃহে বেদান্ত-চর্চা করেন। ঠাকুরের সম্মুখে শ্রীযুক্ত কেদার চাটুজ্যের সঙ্গে তিনি শব্দব্রহ্ম সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও অবতারবাদ — ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সর্বধর্ম-সমন্বয়]

দক্ষিণেশ্বরবাসী — এই অনাহত শব্দ সর্বদা অন্তরে-বাহিরে হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — শুধু শব্দ হলে তো হবে না, শব্দের প্রতিপাত্য একটি আছে। তোমার নামে কি শুধু আমার আনন্দ হয়? তোমায় না দেখলে ষোল আনা আনন্দ হয় না।

দ: নিবাসী — ওই শব্দই ব্রহ্ম। ওই অনাহত শব্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারের প্রতি) — ওঃ বুঝেছ? এঁর ঋষিদের মত। ঋষিরা রামচন্দ্রকে বললেন, “হে রাম, আমরা জানি তুমি দশরথের ব্যাটা। ভরদ্বাজাদি ঋষিরা তোমায় অবতার জেনে পূজা করুন। আমরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চাই!” রাম এই কথা শুনে হেসে চলে গেলেন।

কেদার — ঋষিরা রামকে অবতার জানেন নাই। ঋষিরা বোকা ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গম্ভীরভাবে) — আপনি এমন কথা বলো না। যার যেমন রুচি। আবার যার যা পেটে সয়। একটা মাছ এনে মা ছেলেদের নানারকম করে খাওয়ান। কারুকে পোলাও করে দেন; কিন্তু সকলের পেটে পোলাও সয় না। তাই তাদের মাছের ঝোল করে দেন। যার যা পেটে সয়। আবার কেউ মাছ ভাজা, মাছের অম্বল ভালবাসে। (সকলের হাস্য) যার যেমন রুচি।

“ঋষিরা জ্ঞানী ছিলেন, তাই তাঁরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চাইতেন। আবার ভক্তেরা অবতারকে চান — ভক্তি আস্বাদন করবার জন্য। তাঁকে দর্শন করলে মনের অন্ধকার দূরে যায়। পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যখন সভাতে এলেন, তখন সভায় শত সূর্য যেন উদয় হল। তবে সভাসদ্‌ লোকেরা পুড়ে গেল না কেন? তার উত্তর — তাঁর জ্যোতিঃ জড় জ্যোতিঃ নয়। সভাস্থ সকলের হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হল। সূর্য উঠলে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়।”

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া ভক্তদের কাছে এই কথা বলিতেছেন। বলিতে বলিতেই একেবারে বাহ্যরাজ্য ছাড়িয়া মন অন্তর্মুখ হইল! “হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হইল।” — এই কথাটি উচ্চারণ করিতে না করিতে ঠাকুর একেবারে সমাধিস্থ।

ঠাকুর সমাধিমন্দিরে। ভগবানদর্শন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের হৃৎপদ্ম কি প্রস্ফুটিত হইল! সেই একভাবে দণ্ডায়মান। কিন্তু বাহ্যশূন্য। চিত্রার্পিতের ন্যায়। শ্রীমুখ উজ্জ্বল ও সহাস্য। ভক্তেরা কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া; অবাক্; একদৃষ্টে এই অদ্ভুত প্রেম রাজ্যের ছবি। এই অদৃষ্টপূর্ব সমাধি-চিত্র সন্দর্শন করিতেছেন।

অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইল।

ঠাকুর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ‘রাম’ এই নাম বারবার উচ্চারণ করিতেছেন। নামের বর্ণে বর্ণে যেন অমৃত ঝরিতেছে। ঠাকুর উপবিষ্ট হইলেন। ভক্তেরা চর্তুদিকে বসিয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদিগের প্রতি) — অবতার যখন আসে, সাধারণ লোকে জানতে পারে না — গোপনে আসে। দুই-চারিজন অন্তরঙ্গ ভক্ত জানতে পারে। রাম পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণ অবতার — এ-কথা বারজন ঋষি কেবল জানত। অন্যান্য ঋষিরা বলেছিল, “হে রাম, আমরা তোমাকে দশরথের ব্যাটা বলে জানি।”

“অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে কি সকলে ধরতে পারে? কিন্তু নিত্যে উঠে যে বিলাসের জন্য লীলায় থাকে, তারই পাকা ভক্তি। বিলাতে কুইন (রানী)-কে দেখে এলে পর, তখন কুইন-এর কথা, কুইন-এর কার্য — এ সকল বর্ণনা করা চলতে পারে। কুইন-এর কথা তখন বলা ঠিক ঠিক হয়। ভরদ্বাজাদি ঋষি রামকে স্তব

করেছিলেন, আর বলেছিলেন, ‘হে রাম, তুমিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। তুমি আমাদের কাছে মানুষরূপে অবতীর্ণ হয়েছ। বস্তুত তুমি তোমার মায়া আশ্রয় করেছ বলে, তোমাকে মানুষের মতো দেখাচ্ছে!’ ভরদ্বাজাদি ঋষি রামের পরম ভক্ত। তাঁদের ভক্তি পাকাভক্তি।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১১ই মার্চ 1883/03/11/iv

12.6 কীর্তনানন্দে ও সমাধিমন্দিরে

ভক্তেরা এই আবতারতত্ত্ব অবাক্‌ হইয়া শুনিতেছেন। কেহ কেহ ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য! বেদোক্ত অখণ্ড সচ্চিদানন্দ — যাহাকে বেদে বাক্য-মনের অতীত বলিয়াছে — সেই পুরুষ আমাদের সামনে চোদ্দ পোয়া মানুষ হইয়া আসেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যেকালে বলিতেছেন, সেকালে অবশ্য হইবে। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে “রাম রামন” করিয়া এই মহাপুরুষের কেন সমাধি হইবে? নিশ্চয় ইনি হৃৎপদ্মে রামরূপ দর্শন করিতেছিলেন।

দেখিতে দেখিতে কোন্নগর হইতে ভক্তেরা খোল-করতাল লইয়া সংকীর্তন করিতে করিতে বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মনোমোহন, নবাই ও অন্যান্য

অনেকে নামসংকীর্তন করিতে করিতে ঠাকুরের কাছে সেই উত্তর-পূর্ব বারান্দায় উপস্থিত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ত হইয়া তাঁহাদের সহিত সংকীর্তন করিতেছেন।

নৃত্য করিতে করিতে মাঝে মাঝে সমাধি। তখন আবার সংকীর্তনের মধ্যে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। সেই অবস্থায় ভক্তেরা তাঁহাকে পুষ্পমালা দিয়া সাজাইলেন। বড় বড় গোড়েমালা। ভক্তেরা দেখিতেছেন, যেন শ্রীগৌরাঙ্গ সম্মুখে দাঁড়াইয়া। গভীর ভাবসমাধিনিমগ্ন! প্রভুর কখন অন্তর্দশা — তখন জড়বৎ চিত্রার্পিতের ন্যায় বাহ্যশূন্য হইয়া পড়েন। কখন বা অর্ধবাহ্যদশা — তখন প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। আবার কখন বা শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় বাহ্যদশা — তখন ভক্তসঙ্গে সংকীর্তন করেন।

ঠাকুর সমাধিস্থ, দাঁড়াইয়া। গলায় মালা। পাছে পড়িয়া যান ভাবিয়া একজন ভক্ত তাঁহাকে ধরিয়া আছেন; চর্তুদিকের ভক্তেরা দাঁড়াইয়া খোল-করতাল লইয়া কীর্তন করিতেছেন। ঠাকুরের দৃষ্টি স্থির। চন্দ্রবদন প্রেমানুরঞ্জিত। ঠাকুর পশ্চিমাস্য।

এই আনন্দমূর্তি ভক্তেরা অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। সমাধি ভঙ্গ হইল। বেলা হইয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে কীর্তনও থামিল। ভক্তেরা ঠাকুরকে আহার করাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন।

ঠাকুর কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া, নববস্ত্র পীতাম্বর পরিধান করিয়া ছোট খাটটিতে বসিলেন। পীতাম্বরধারী সেই আনন্দময় মহাপুরুষের জ্যোতির্ময় ভক্তচিত্তবিনোদন, অপরূপ রূপ ভক্তেরা দর্শন করিতেছিলেন। সেই দেবদুর্লভ,

পবিত্র, মোহনমূর্তি দর্শন করিয়া নয়নের তৃপ্তি হইল না। ইচ্ছা, আরও দেখি, আরও দেখি; সেই রূপসাগরে মগ্ন হই।

ঠাকুর আহারে বসিলেন। ভক্তেরাও আনন্দে প্রসাদ পাইলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১১ই মার্চ 1883/03/11/v

12.7 গোস্বামী সঙ্গে সর্বধর্ম-সমন্বয়প্রসঙ্গে

আহারের পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে বিশ্রাম করিতেছেন। ঘরে লোকের ভিড় বাড়িতেছে। বাহিরের বারান্দাগুলিও লোকে পরিপূর্ণ। ঘরের মধ্যে ভক্তেরা মেঝেতে বসিয়া আছেন ও ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। কেদার, সুরেশ, রাম, মনোমোহন, গিরীন্দ্র, রাখাল ভবনাথ, মাস্টার ইত্যাদি অনেকে ঘরে উপস্থিত। রাখালের বাপ আসিয়াছেন; তিনিও ওই ঘরে বসিয়া আছেন।

একটি বৈষ্ণব গোস্বামীও এই ঘরে উপবিষ্ট। ঠাকুর তাহাকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন। গোস্বামীদের দেখিলেই ঠাকুর মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিতেন — কখন কখন সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হইতেন।

[নাম-মাহাত্ম্য না অনুরাগ — অজামিল]

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, তুমি কি বল? উপায় কি?

গোস্বামী — আজ্ঞা, নামেতেই হবে। কলিতে নাম-মাহাত্ম্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, নামের খুব মাহাত্ম্য আছে বটে। তবে অনুরাগ না থাকলে কি হয়? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়া দরকার। শুধু নাম করে যাচ্ছি কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনে মন রয়েছে, তাতে কি হয়?

“বিছে বা ডাকুর কামড় অমনি মন্ত্রে সারে না — ঘুঁটের ভাবরা দিতে হয়।”

গোস্বামী — তাহলে অজামিল? অজামিল মহাপাতকী, এমন পাপ নাই যা সে করে নাই। কিন্তু মরবার সময় ‘নারায়ণ’ বলে ছেলেকে ডাকাতে উদ্ধার হয়ে গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হয়তো অজামিলের পূর্বজন্মে অনেক কর্ম করা ছিল। আর আছে যে, সে পরে তপস্যা করেছিল।

“এরকমও বলা যায় যে, তার তখন অন্তিমকাল। হাতিকে নাইয়ে দিলে কি হবে, আবার ধূলা-কাদা মেখে যে কে সেই! তবে হাতিশালায় ঢোকবার আগে যদি কেউ ঝুল ঝেড়ে দেয় ও স্নান করিয়ে দেয়, তাহলে গা পরিস্কার থাকে

“নামেতে একবার শুদ্ধ হল, কিন্তু তারপরেই হয়তো নানা পাপে লিপ্ত হয়। মনে বল নাই; প্রতিজ্ঞা করে না যে, আর পাপ করব না। গঙ্গাস্নানে পাপ সব যায়।

গেলে কি হবে? লোকে বলে থাকে, পাপগুলো গাছের উপর থাকে। গঙ্গা নেয়ে যখন মানুষটা ফেরে, তখন ওই পুরানো পাপগুলো গাছ থেকে ঝাঁপ দিয়ে ওর ঘাড়ের উপর পড়ে। (সকলের হাস্য) সেই পুরানো পাপগুলো আবার ঘাড়ে চড়েছে। স্নান করে দু-পা না আসতে আসতে আবার ঘাড়ে চড়েছে!

"তাই নাম কর, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা কর, যাতে ঈশ্বরেতে অনুরাগ হয়, আর যে-সব জিনিস দুদিনের জন্য, যেমন টাকা, মান, দেহের সুখ; তাদের উপর যাতে ভালবাসা কমে যায়, প্রার্থনা কর।"

[বৈষ্ণবধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা —— সর্বধর্ম-সমন্বয়]

শ্রীরামকৃষ্ণ (গোস্বামীর প্রতি) — আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেরাও ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তরাও পাবে, বেদান্তবাদীরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে; আবার মুসলমান, খ্রীষ্টান, এরাও পাবে। আন্তরিক হলে সবাই পাবে। কেউ কেউ ঝগড়া করে বসে। তারা বলে, "আমাদের শ্রীকৃষ্ণকে না ভজলে কিছুই হবে না"; কি, "আমাদের মা-কালীকে না ভজলে কিছুই হবে না।"

"এ-সব বুদ্ধির নাম মাতুয়ার বুদ্ধি; অর্থাৎ আমার ধর্মই ঠিক, আর সকলের মিথ্যা। এ-বুদ্ধি খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌঁছানো যায়।

"আবার কেউ কেউ বলে, ঈশ্বর সাকার, তিনি নিরাকার নন। এই বলে আবার ঝগড়া। যে বৈষ্ণব, সে বেদান্তবাদীর সঙ্গে ঝগড়া করে।

“যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তাহলে ঠিক বলা যায়। যে দর্শন করেছে, সে ঠিক জানে ঈশ্বর সাকার, আবার নিরাকার। আরও তিনি কত কি আছেন তা বলা যায় না।

“কতকগুলো কানা একটা হাতির কাছে এসে পড়েছিল। একজন লোক বলে দিলে, এ-জানোয়ারটির নাম হাতি। তখন কানাদের জিজ্ঞাসা করা হল হাতিটা কিরকম? তারা হাতির গা স্পর্শ করতে লাগল। একজন বললে, ‘হাতি একটা থামের মতো!’ সে কানাটি কেবল হাতির পা স্পর্শ করেছিল। আর-একজন বললে, ‘হাতিটা একটা কুলোর মতো!’ সে কেবল একটা কানে হাত দিয়ে দেখেছিল। এইরকম যারা শুঁড়ে কি পেটে হাত দিয়ে দেখেছিল তারা নানা প্রকার বলতে লাগল। তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখেছে সে মনে করেছে, ইশ্বর এমনি, আর কিছু নয়।

“একজন লোক বাহ্যে থেকে ফিরে এসে বললে গাছতলায় একটি সুন্দর লাল গিরগিটি দেখে এলুম। আর-একজন বললে, আমি তোমার আগে সেই গাছতলায় গিছলুম — লাল কেন হবে? সে সবুজ, আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আর-একজন বললে, ও আমি বেশ জানি, তোমাদের আগে গিছলাম, সে গিরগিটি আমিও দেখেছি। সে লালও নয়, সবুজও নয়, স্বচক্ষে দেখেছি নীল। আর দুইজন ছিল তারা বললে, হলদে, পাঁশটে — নানা রঙ। শেষে সব ঝগড়া বেধে গেল। সকলে জানে, আমি যা দেখেছি, তাই ঠিক। তাদের ঝগড়া দেখে একজন লোক জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কি? যখন সব বিবরণ শুনলে, তখন বললে, আমি ওই গাছতলাতেই থাকি; আর ওই জানোয়ার কি আমি চিনি। তোমরা প্রত্যেকে যা বলছ, তা সব সত্য; ও গিরগিটি, — কখন সবুজ, কখন

নীল, এইরূপ নানা রঙ হয়। আবার কখন দেখি, একেবারে কোন রঙ নাই। নির্গুণ।”

[সাকার না নিরাকার]

(গোস্বামীর প্রতি) — “তা ঈশ্বর শুধু সাকার বললে কি হবে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মানুষের মতো দেহধারণ করে আসেন, এও সত্য, নানারূপ ধরে ভক্তকে দেখা দেন, এও সত্য। আবার তিনি নিরাকার, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, এও সত্য। বেদে তাঁকে সাকার নিরাকার দুই বলেছে, সগুণও বলেছে, নির্গুণও বলেছে।

“কিরকম জান? সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত সাগর। ঠাণ্ডার গুণে যেমন সাগরের জল বরফ হয়ে ভাসে, নানা রূপ ধরে বরফের চাঁই সাগরের জলে ভাসে; তেমনি ভক্তিহিম লেগে সচ্চিদানন্দ-সাগরে সাকারমূর্তি দর্শন হয়। ভক্তের জন্য সাকার। আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে বরফ গলে আগেকার যেমন জল, তেমনি জল। অধঃ ঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ। জলে জল। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে সব স্তব করেছে — ঠাকুর, তুমিই সাকার তুমিই নিরাকার; আমাদের সামনে তুমি মানুষ হয়ে বেড়াচ্ছ, কিন্তু বেদে তোমাকেই বাক্য-মনের অতীত বলেছে।

“তবে বলতে পার, কোন কোন ভক্তের পক্ষে তিনি নিত্য সাকার। এমন জায়গা আছে, যেখানে বরফ গলে না, স্ফটইকের আকার ধারণ করে।”

কেদার — আজ্ঞে, শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাস১ তিনটি দোষের জন্য ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এক জায়গায় বলেছেন, হে ভগবন্ তুমি বাক্য মনের

অতীত, কিন্তু আমি কেবল তোমার লীলা — তোমার সাকাররূপ — বর্ণনা করেছি, অতএব অপরাধ মার্জনা করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার, আবার সাকার-নিরাকারেরও পার। তাঁর ইতি করা যায় না।

১ রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং,
  স্তুত্যানির্বাচনীয়তাঽখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
  ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা,
  ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্‌বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্‌।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১১ই মার্চ 1883/03/11/vi

12.8 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, নিত্যসিদ্ধ ও কৌমার বৈরাগ্য

রাখালের বাপ বসিয়া আছেন। রাখাল আজকাল ঠাকুরের কাছে রহিয়াছেন। রাখালের মাতাঠাকুরানীর পরলোকপ্রাপ্তির পর পিতা দ্বিতীয় সংসার করিয়াছেন। রাখাল এখানে আছেন, তাই পিতা মাঝে মাঝে আসেন। তিনি ওখানে থাকাতে বিশেষ আপত্তি করেন না। ইনি সম্পন্ন ও বিষয়ী লোক, মামলা মোকদ্দমা সর্বদা

করিতে হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অনেক উকিল, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি আসেন। রাখালের পিতা তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে মাঝে মাঝে আসেন। তাঁহাদের নিকট বিষয়কর্ম সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ পাইবেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে রাখালের বাপকে দেখিতেছেন। ঠাকুরের ইচ্ছা — রাখাল তাঁর কাছে দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের বাপ ও ভক্তদের প্রতি) — আহা, আজকাল রাখালের স্বভাবটি কেমন হয়েছে! ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ — দেখতে পাবে, মাঝে মাঝে ঠোঁট নড়ছে। অন্তরে ঈশ্বরের নাম জপ করে কিনা, তাই ঠোঁট নড়ে।

"এ-সব ছোকরারা নিত্যসিদ্ধের থাক। ঈশ্বরের জ্ঞান নিয়ে জন্মেছে। একটু বয়স হলেই বুঝতে পারে, সংসার গায়ে লাগলে আর রক্ষা নাই। বেদেতে হোমাপাখির কথা আছে, সে পাখি আকাশেই থাকে, মাটির উপর কখন আসে না। আকাশেই ডিম পাড়ে। ডিম পড়তে থাকে; কিন্তু এত উঁচুতে পাখি থাকে যে, পড়তে পড়তে ডিম ফুটে যায়। তখন পাখির ছানা বেরিয়ে পড়ে, সেও পড়তে থাকে। তখনও এত উঁচু যে পড়তে পড়তে ওর পাখা উঠে ও চোখ ফোটে। তখন সে দেখতে পায় যে, আমি মাটির উপর পড়ে যাব! মাটিতে পড়লেই মৃত্যু! মাটি দেখাও যা, অমনি মার দিকে চোঁচা দৌড়। একবারে উড়তে আরম্ভ করে দিল। যাতে মার কাছে পৌঁছতে পারে। এক লক্ষ্য মার কাছে যাওয়া।

"এ-সব ছোকরারা ঠিক সেইরকম। ছেলেবেলাই সংসার দেখে ভয়। এক চিন্তা — কিসে মার কাছে যাব, কিসে ঈশ্বরলাভ হয়।

”যদি বল, বিষয়ীদের মধ্যে থাকা, বিষয়ীদের ঔরসে জন্ম, তবে এমন ভক্তি —— এমন জ্ঞান হয় কেমন করে? তার মানে আছে। বিষ্ঠাকুড়ে যদি ছোলা পড়ে, তাহলে তাতে ছোলাগাছই হয়। সে ছোলাতে কত ভাল কাজ হয়। বিষ্ঠাকুড়ে পড়েছে বলে কি অন্য গাছ হবে?

“আহা, রাখালের স্বভাব আজকাল কেমন হয়েছে। তা হবে নাই বা কেন? ওল যদি ভাল হয়, তার মুখিটিও ভাল হয়। (সকলের হাস্য) যেমন বাপ, তার তেমনি ছেলে!”

“মাস্টার (একান্ত গিরীন্দ্রের প্রতি) — সাকার-নিরাকারের কথাটি ইনি কেমন বুঝিয়ে দিলেন। বৈষ্ণবেরা বুঝি কেবল সাকার বলে?

গিরীন্দ্র —— তা হবে। ওরা একঘেয়ে।

মাস্টার —— “নিত্য সাকার”, আপনি বুঝেছেন? স্ফটিকের কথা? আমি ওটা ভাল বুঝতে পারছি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — হ্যাঁগা, তোমরা কি বলাবলি কচ্ছ?

মাস্টার ও গিরীন্দ্র একটু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

বৃন্দে ঝি (রামলালের প্রতি) — ও রামলাল, এ-লোকটিকে এখন খাবার দেও, আমার খাবার তার পরে দিও।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— বৃন্দেকে খাবার এখনও দেয় নাই?

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১১ই মার্চ 1883/03/11/vii

12.9 পঞ্চবটীমূলে কীর্তনানন্দে

অপরাহ্নে ভক্তেরা পঞ্চবটীমূলে কীর্তন করিতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। আজ ভক্তসঙ্গে মার নামকীর্তন করিতে করিতে আনন্দে ভাসিলেন:

শ্যামাপদ-আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়তেছিল।
কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল।।
মায়াকান্নি হল ভারী, আর আমি উঠাতে নারি।
দারাসুত কলের দড়ি, ফাঁস লেগে সে ফেঁসে গেল।।
জ্ঞান-মুণ্ড গেছে ছিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে।
মাথা নেই সে আর কি উড়ে, সঙ্গের ছজন জয়ী হল।।
ভক্তি ডোরে ছিল বাঁধা, খেলতে এসে লাগল ধাঁধা।
নরেশচন্দ্রের হাসা-কাঁদা, না আসা এক ছিল ভাল।।

আবার গান হইল। গানের সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতাল বাজিতে লাগিল। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নাচিতেছেন:

মজলো আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।
(শ্যামাপদ নীলকমলে, কালীপদ নীলকমলে!)
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হল কামাদি কুসুম সকলে।।
চরণ কালো, ভ্রমর কালো, কালোয় কালো মিশে গেল।
পঞ্চতত্ত্ব, প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে।।
কমলাকান্তেরই মনে, আশাপূর্ণ এতদিনে।
তায় সুখ-দুঃখ সমান হলে আনন্দ সাগর উথলে।।

কীর্তন চলিতেছে। ভক্তেরা গাহিতেছেন:

(১) — শ্যামা মা কি এক কল করেছে।
(কালী মা কি এক কল করেছে)
চোদ্দপোয়া কলের ভিতরি, কল ঘুরায় ধরে কলডুরি,
কল বলে আপনি ঘুরি, জানে না কে ঘুরাতেছে।
যে কলে জেনেছে তারে, কল হতে হবে না তারে,
কোন কলের ভক্তিডোরে আপনি শ্যামা বাঁধা আছে।

(২) — ভবে আসা খেলতে পাশা কত আশা করেছিলাম।
আশার আশা ভাঙা দশা প্রথমে পঞ্জুড়ি পেলাম।।
পঞ্চবার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলাম ভাল।

শেষে কচে বারো পড়ে মাগো, পঞ্জা-ছক্কায় বন্দী হলাম ।।

ভক্তেরা আনন্দ করিতে লাগিলেন। তাহারা একটু থামিলে ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। ঘরে ও আশেপাশে এখনও অনেকগুলি ভক্ত আছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটী হইতে দক্ষিণাস্য হইয়া নিজের ঘরের দিকে যাইতেছেন। সঙ্গে মাস্টার। বকুলতলায় আসিলে পর শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যের সহিত দেখা হইল। তিনি প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্যের প্রতি) — পঞ্চবটীতে ওরা গান গাচ্চে। চল না একবার —

ত্রৈলোক্য — আমি গিয়ে কি করব?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেন, বেশ একবার দেখতে।

ত্রৈলোক্য — একবার দেখে এসেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, আচ্ছা বেশ।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১১ই মার্চ 1883/03/11/viii

12.10 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গৃহস্থধর্ম

প্রায় সাড়ে পাঁচটা-ছয়টা হইল। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নিজের ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় বসিয়া আছেন। ভক্তদের দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারাদি ভক্তদের প্রতি) — সংসারত্যাগী সাধু — সে তো হরিনাম করবেই। তার তো আর কোন কাজ নাই। সে যদি ঈশ্বরচিন্তা করে তো, আশ্চর্যের বিষয় নয়। সে যদি ঈশ্বরচিন্তা না করে, সে যদি হরিনাম না করে তাহলে বরং সকলে নিন্দা করবে।

“সংসারী লোক যদি হরিনাম করে, তাহলে বাহাদুরি আছে। দেখ, জনক রাজা খুব বাহাদুর। সে দুখানি তরবার ঘুরাত। একখানা জ্ঞান ও একখানা কর্ম। এক দিকে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান, আর-একদিকে সংসারে কর্ম করছে। নষ্ট মেয়ে সংসারের সব কাজ খুঁটিয়ে করে, কিন্তু সর্বদাই উপপতিকে চিন্তা করে।

“সাধুসঙ্গ সর্বদা দরকার, সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করে দেন।”

কেদার — আজ্ঞে হাঁ! মহাপুরুষ জীবের উদ্ধারের জন্য আসেন। যেমন রেলের এঞ্জিন, পেছনে কত গাড়ি বাঁধা থাকে, টেনে নিয়ে যায়। অথবা যেমন নদী বা তড়াগ, কত জীবের পিপাসা শান্তি করে।

ক্রমে ভক্তেরা গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। একে একে সকলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

ভবনাথকে দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন, “তুই আজ আর যাস নাই। তোদের দেখেই উদ্দীপন!”

ভবনাথ এখনও সংসারে প্রবেশ করেন নাই। বয়স উনিশ-কুড়ি, গৌরবর্ণ, সুন্দর দেহ। ঈশ্বরের নামে তাঁহার চক্ষে জল আসে। ঠাকুর তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৯শে মার্চ 1883/03/29/i

12.11 দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়িতে শ্রীযুক্ত অমৃত, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তের সঙ্গে কথোপকথন

[সমাধিমন্দিরে]

ফাল্গুনের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি, বৃসস্পতিবার, ১৬ই চৈত্র; ইংরেজী ২৯শে মার্চ, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছেন। দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ির সেই পূর্বপরিচিত ঘর। সম্মুখে পশ্চিমদিকে গঙ্গা। চৈত্র মাসের গঙ্গা। বেলা দুইটার সময় জোয়ার আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। ভক্তেরা কেহ কেহ আসিয়াছেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মভক্ত শ্রীযুক্ত অমৃত ও মধুরকণ্ঠ

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য, যিনি কেশবের ব্রাহ্মসমাজে ভগবল্লীলাগুণগান করিয়া আবালবৃদ্ধের কতবার মন হরণ করিয়াছেন।

রাখালের অসুখ। এই কথা শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এই দেখ, রাখালের অসুখ। সোডা খেলে কি ভাল হয় গা? কি হবে বাপু! রাখাল তুই জগন্নাথের প্রসাদ খা।

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর অদ্ভুতভাবে ভাবিত হইলেন। বুঝি দেখিতে লাগিলেন, সাক্ষাৎ নারায়ণ সম্মুখে রাখালরূপে বালকের দেহধারণ করে এসেছেন! একদিকে কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী শুদ্ধাত্মা বালকভক্ত রাখাল, অপরদিকে ঈশ্বরপ্রেমে অহরহঃ মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রেমের চক্ষু — সহজেই বাৎসল্যভাবের উদয় হইল। তিনি সেই বালক রাখালকে বাৎসল্যভাবে দেখিতে লাগিলেন ও 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' এই নাম প্রেমভরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া যশোদার যে-ভাবের উদয় হইত এ বুঝি সেই ভাব! ভক্তেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে সব স্থির! 'গোবিন্দ' নাম করিতে করিতে ভক্তাবতার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি হইয়াছে। শরীর চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির! ইন্দ্রিয়গণ কাজে জবাব দিয়া যেন চলিয়া গিয়াছে! নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির। নিঃশ্বাস বহিছে, কি না বহিছে। শরীরমাত্র ইহলোকে পড়িয়া আছে! আত্মাপক্ষী বুঝি চিদাকাশে বিচরণ করিতেছে। এতক্ষণ যিনি সাক্ষাৎ মায়ের ন্যায় সন্তানের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তিনি এখন কোথায়? এই অদ্ভুত ভাবান্তরের নাম কি সমাধি?

এই সময়ে গেরুয়া কাপড়-পরা অপরিচিত একটি বাঙালী আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৯শে মার্চ 1883/03/29/ii

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্‌ ।

ইন্দ্রিয়ার্থান বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ।।

[গীতা, ৩।৬]

12.12 গেরুয়াবসন ও সন্ন্যাসী — অভিনয়েও মিথ্যা ভাল নয়

পরমহংসদেবের সমাধী ক্রমে ভঙ্গ হইতে লাগিল। ভাবস্থ হইয়াই কথা কহিতেছেন। আপনা-আপনি বলিতেছেন —

শ্রীরামকৃষ্ণ (গেরুয়াদৃষ্টে) — আবার গেরুয়া কেন? একটা কি পরলেই হল? (হাস্য) একজন বলেছিল, “চন্ডী ছেড়ে হলুম ঢাকী।” — আগে চণ্ডির গান গাইত, এখন ঢাক বাজায়! (সকলের হাস্য)

“বৈরাগ্য তিন-চার প্রকার। সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়াবসন পরেছে — সে বৈরাগ্য বেশিদিন থাকে না। হয়তো কর্ম নাই, গেরুয়া পরে কাশী চলে গেল। তিনমাস পরে ঘরে পত্র এল, ‘আমার একটি কর্ম হইয়াছে, কিছুদিন পরে বাড়ি যাইব, তোমরা ভাবিত হইও না।’ আবার সব আছে, কোন অভাব নাই, কিন্তু কিছুভাল লাগে না। ভগবানের জন্য একলা একলা কাঁদে। সে বৈরাগ্য যথার্থ বৈরাগ্য।

“মিথ্যা কিছুই ভাল নয়। মিথ্যা ভেক ভাল নয়। ভেকের মতো যদি মনটা না হয়, ক্রমে সর্বনাশ হয়। মিথ্যা বলতে বা করতে ক্রমে ভয় ভেঙে যায়। তার চেয়ে সাদা কাপড় ভাল। মনে আসক্তি, মাঝে মাঝে পতন হচ্ছে, আর বাহিরে গেরুয়া! বড় ভয়ঙ্কর!”

[কেশবের বাড়ি গমন ও নববৃন্দাবন-দর্শন]

”এমনকি, যারা সৎ, অভিনয়েও তাদের মিথ্যা কথা বা কাজ ভাল নয়। কেশব সেনের ওখানে নববৃন্দাবন নাটক দেখতে গিছলাম। কি একটা আনলে ক্রস (cross); আবার জল ছড়াতে লাগল, বলে শান্তিজল। একজন দেখি মাতাল সেজে মাতলামি করছে!”

ব্রাহ্মভক্ত — কু — বাবু।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ভক্তের পক্ষে ওরূপ সাজাও ভাল নয়। ও-সব বিষয়ে মন অনেকক্ষণ ফেলে রাখায় দোষ হয়। মন ধোপা ঘরের কাপড়, যে-রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যায়। মিথ্যাতে অনেকক্ষণ ফেলে রাখলে মিথ্যার রঙ ধরে যাবে।

“আর-একদিন নিমাই-সন্ন্যাস, কেশবের বাড়িতে দেখতে গিছিলাম। যাত্রাটি কেশবের কতকগুলো খোশামুদে শিষ্য জুটে খারাপ করেছিল। একজন কেশবকে বললে, ‘কলির চৈতন্য হচ্ছেন আপনি!’ কেশব আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে, ‘তাহলে ইনি কি হলেন?’ আমি বললুম, ‘আমি তোমাদের দাসের দাস। রেণুর রেণু।’ কেশবের লোকমান্য হবার ইচ্ছা ছিল।”

[নরেন্দ্র প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ — তাদের ভক্তি আজন্ম]

(অমৃত ও ত্রৈলোক্যের প্রতি) — “নরেন্দ্র, রাখাল-টাখাল এই সব ছোকরা, এরা নিত্যসিদ্ধ, এরা জন্মে ঈশ্বরের ভক্ত। অনেকের সাধ্যসাধনা করে একটু ভক্তি হয়, এদের কিন্তু আজন্ম ঈশ্বরে ভালবাসা। যেন পাতাল ফোঁড়া শিব — বসানো শিব নয়।

“নিত্যসিদ্ধ একটি থাক আলাদা। সব পাখির ঠোঁট বাঁকা নয়। এরা কখনও সংসারে আসক্ত হয় না। যেমন প্রহ্লাদ।

“সাধারণ লোক সাধন করে, ঈশ্বরে ভক্তিও করে। আবার সংসারেও আসক্ত হয়, কামিনী-কাঞ্চনে মুগ্ধ হয়। মাছি যেমন ফুলে বসে, সন্দেশে বসে, আবার বিষ্ঠাতেও বসে। (সকলে স্তব্ধ)

“নিত্যসিদ্ধ যেমন মৌমাছি, কেবল ফুলের উপর বসে মধুপান করে। নিত্যসিদ্ধ হরিরস পান করে, বিষয়রসের দিকে যায় না।

“সাধ্য-সাধনা করে যে ভক্তি, এদের সে ভক্তি নয়। এত জপ, এত ধ্যান করতে হবে, এইরূপ পূজা করতে হবে — এ-সব ‘বিধিবাদীয়’ ভক্তি। যেমন ধান হলে মাঠ পার হতে গেলে আল দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে। আবার যেমন সম্মুখের গাঁয়ে যাবে, কিন্তু বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে।

“রাগভক্তি প্রেমাভক্তি ঈশ্বরে আত্মীয়ের ন্যায় ভালবাসা, এলে আর কোন বিধিনিয়ম থাকে না। তখন ধানকাটা মাঠ যেমন পার হওয়া। আল দিয়ে যেতে হয় না। সোজা একদিক দিয়ে গেলেই হল।

“বন্যে এলে আর বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয় না। তখন মাঠের উপর এক বাঁশ জল! সোজা নৌকা চালিয়ে দিলেই হল।

“এই রাগভক্তি, অনুরাগ, ভালবাসা না এলে ঈশ্বরলাভ হয় না।”

[সমাধিতত্ত্ব — সবিকল্প ও নির্বিকল্প]

অমৃত — মহাশয়! আপনার এই সমাধি অবস্থায় কি বোধ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — শুনেছ, কুমুরে পোকা চিন্তা করে আরশুলা কুমুরে পোকা হয়ে যায়, কিরকম জানো? যেমন হাঁড়ির মাছ গঙ্গায় ছেড়ে দিলে হয়।

অমৃত — একটুও কি অহং থাকে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, আমার প্রায় একটু অহং থাকে। সোনার একটু কণা, সোনার চাপে যত ঘষ না কেন, তবু একটু কণা থেকে যায়। আর যেমন বড় আগুন আর

তার একটি ফিনকি। বাহ্যজ্ঞান চলে যায়, কিন্তু প্রায় তিনি একটু ‘অহং’ রেখে দেন — বিলাসের জন্য! আমি তুমি থাকলে তবে আস্বাদন হয়। কখন কখন সে আমিটুকুও তিনি পুঁছে ফেলেন। এর নাম ‘জড়সমাধি’ — নির্বিকল্পসমাধি। তখন কি অবস্থা হয় মুখে বলা যায় না। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছিল, একটু নেমেই গলে গেল। ‘তদাকারকারিত’। তখন কে আর উপরে এসে সংবাদ দেবে, সমুদ্র কত গভীর!

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ৭ই এপ্রিল 1883/04/07

12.13 নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বলরাম-মন্দিরে

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাড়িতে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন — বৈঠকখানার উত্তর-পূর্বের ঘরে। বেলা একটা হইবে। নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, বলরাম, মাস্টার ঘরে তাঁহার সঙ্গে বসিয়া আছেন।

আজ অমাবস্যা। শনিবার, ৭ই এপ্রিল, ১৮৮৩, ২৫শে চৈত্র। ঠাকুর সকালে বলরামের বাড়ি আসিয়া মধ্যাহ্নে সেবা করিয়াছেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল ও

আরও দু-একটি ভক্তকে নিমন্ত্রণ করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহারাও এখানে আহার করিয়াছেন। ঠাকুর বলরামকে বলিতেন — এদের খাইও, তাহলে অনেক সাধুদের খাওয়ানো হবে।

কয়েকদিন হইল ঠাকুর শ্রীযুক্ত কেশবের বাটীতে নববৃন্দাবন নাটক দেখিতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে নরেন্দ্র ও রাখাল ছিলেন। নরেন্দ্র অভিনয়ে যোগ দিয়াছিলেন। কেশব পওহারী বাবা সাজিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি) — কেশব (সেন) সাধু সেজে শান্তিজল ছড়াতে লাগল। আমার কিন্তু ভাল লাগল না। অভিনয় করে শান্তি জল!

“আর-একজন (কু-বাবু) পাপ পুরুষ সেজেছিল। ওরকম সাজাও ভাল না। নিজে পাপ করাও ভাল না — পাপের অভিনয় করাও ভাল না।”

নরেন্দ্রের শরীর তত সুস্থ নয়, কিন্তু তাঁহার গান শুনিতে ঠাকুরের ভারী ইচ্ছা। তিনি বলিতেছেন, “নরেন্দ্র, এরা বলছে একটু গা না।”

নরেন্দ্র তানপুরা লইয়া গাইতেছেন:

আমার প্রাণপিঞ্জরের পাখি, গাও না রে।
ব্রহ্মকল্পতরুপরে বসে রে পাখি, বিভুগুণ গাও দেখি,
(গাও, গাও) ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ,
সুপক্ক ফল খাও না রে।
বল বল আত্মারাম, পড় প্রাণারাম,

হৃদয়-মাঝে প্রাণ-বিহঙ্গ ডাক অবিরাম,

ডাক তৃষিত চাতকের মতো,

পাখি অলস থেক না রে।

গান — বিশ্বভুবনরঞ্জন ব্রহ্ম পরম জ্যোতিঃ।

অনাদিদেব জগৎপতি প্রাণের প্রাণ ।।

গান — ওহে রাজরাজেশ্বর, দেখা দাও।

চরণে উৎসর্গ দান, করিতেছি এই প্রাণ,

সংসার-অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও।

কলুষ-কলঙ্কে তাহে আবরিত এ-হৃদয়;

মোহে মুগ্ধ মৃতপায়, হয়ে আছি আমি দয়াময়,

মৃতসঞ্জীবনী দৃষ্টে, শোধন করিয়ে লও।

গান — গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে।

তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে।

ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,

সকল বনরাজি ফুটন্ত জ্যোতিঃ রে।

কেমন আরতি হে ভবখণ্ডন তব আরতি,

অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে।

গান — চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে।

নরেন্দ্রের গান সমাপ্ত হইল। ঠাকুর ভবনাথকে গান গাহিতে বলিতেছেন। ভবনাথ গাহিতেছেন:

দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী!

সুখে-দুঃখে সব, বন্ধু এমন কে, পাপ-তাপ-ভয়হারী।

নরেন্দ্র (সহাস্যে) — এ (ভবনাথ) পান-মাছ ত্যাগ করেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভবনাথের প্রতি, সহাস্যে) — সে কি রে! পান-মাছে কি হয়েছে? ওতে কিছু দোষ হয় না! কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ। রাখাল কোথায়?

একজন ভক্ত — আজ্ঞা, রাখাল ঘুমুচ্ছেন।

ঠাকুর (সহাস্যে) — একজন মাদুর বগলে করে যাত্রা শুনতে এসেছিল। যাত্রার দেরি দেখে মাদুরটি পেতে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন উঠল তখন সব শেষ হয়ে গেছে! (সকলের হাস্য)

“তখন মাদুর বগলে করে বাড়ি ফিরে গেল।” (হাস্য)

রামদয়াল বড় পীড়িত। আর এক ঘরে শয্যাগত। ঠাকুর সেই ঘরের সম্মুখে গিয়া, কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন।

[পঞ্চদশী, বেদান্ত শাস্ত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ — সংসারী ও শাস্ত্রার্থ]

বেলা ৪টা হইবে। বৈঠকখানাঘরে নরেন্দ্র, রাখাল, মাস্টার, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ঠাকুর বসিয়া আছেন। কয়েকজন ব্রাহ্মভক্ত আসিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে কথা হইতেছে।

ব্রাহ্মভক্ত — মহাশয়ের পঞ্চদশী দেখা আছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ও-সব একবার প্রথম প্রথম শুনতে হয়, — প্রথম প্রথম একবার বিচার করে নিতে হয়। তারপর —

“যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে,
মন তুই দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।

“সাধনাবস্থায় ও-সব শুনতে হয়। তাঁকে লাভের পর জ্ঞানের অভাব থাকে না। মা রাশ ঠেলে দেন।

“সোনা গলাবার সময় খুব উঠে পড়ে লাগতে হয়। একহাতে হাপর — একহাতে পাখা — মুখে চোঙ্গ — যতক্ষণ না সোনা গলে। গলার পর, যাই গড়নেতে ঢালা হল — অমনি নিশ্চিন্ত।

”শাস্ত্র শুধু পড়লে হয় না। কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে থাকলে শাস্ত্রের মর্ম বুঝতে দেয় না। সংসারের আসক্তিতে জ্ঞান লোপ হয়ে যায়।

‘সাধ করে শিখেছিলাম কাব্যরস যত।
কালার পিরীতে পড়ে সব হইল হতঞ্চ’ ।।” (সকলের হাস্য)

ঠাকুর ব্রাহ্মভক্তদের সহিত শ্রীযুক্ত কেশবের কথা বলিতেছেন:

“কেশবের যোগ ভোগ। সংসারে থেকে ঈশ্বরের দিকে মন আছে।”

একজন ভক্ত কন্‌ভোকেসন্ (বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের বাৎসরিক সভা) সম্বন্ধে বলিতেছেন — দেখলাম লোকে লোকারণ্য!

শ্রীরামকৃষ্ণ — অনেক লোক একসঙ্গে দেখলে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়। আমি দেখলে বিহ্বল হয়ে যেতাম।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ৮ই এপ্রিল 1883/04/08/i

12.14 শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে — মণিলাল ও কাশীদর্শন

আইস ভাই, আজ আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে দর্শন করিতে যাই। তিনি ভক্তসঙ্গে কিরূপ বিলাস করিতেছেন, ঈশ্বরের ভাবে সর্বদা কিরূপ সমাধিস্থ আছেন দেখিব। কখন সমাধিস্থ, কখন কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা আবার কখন বা প্রাকৃত লোকের ন্যায় ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন, দেখিব। শ্রীমুখে ঈশ্বরকথা বই আর কিছুই নাই; মন সর্বদা অন্তর্মুখ, ব্যবহার পঞ্চমবর্ষীয় বালকের

ন্যায়। প্রতি নিঃশ্বাসের সহিত মায়ের নাম করিতেছেন। একেবারে অভিমানশূন্য পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় ব্যবহার। পঞ্চমবর্ষীয় বালক বিষয়ে আসক্তিশূন্য, সদানন্দ, সরল ও উদার প্রকৃতি। এক কথা — "ঈশ্বর সত্য, আর সমস্ত অনিত্য", দুইদিনের জন্য। চল, সেই প্রেমোন্মত্ত বালককে দিখিতে যাই। মহাযোগী! অনন্ত সাগরের তীরে একাকী বিচরণ করিতেছেন। সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দ-সাগরমধ্যে কি যেন দেখিতেছেন! দেখিয়া প্রেমে উন্মত্ত হইয়া বেড়াইতেছেন।

আজ রবিবার, ৮ই এপ্রিল, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, ২৬শে চৈত্র, প্রাতঃকাল। এই যে ঠাকুর বালকের ন্যায় বসিয়া আছেন। কাছে বসিয়া একটি ছোকরা ভক্ত — রাখাল।

মাস্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল আছেন, কিশোরী ও আরও কয়েকটি ভক্ত আসিয়া জুটিলেন। পুরাতন ব্রাহ্মভক্ত শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন।

মণি মল্লিক কাশীধামে গিয়াছিলেন। তিনি ব্যবসায়ী লোক, কাশিতে তাঁহাদের কুঠি আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হ্যাঁগা, কাশীতে গেলে, কিছু সাধু-টাধু দেখলে?

মণিলাল — আজ্ঞে হাঁ, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ — এঁদের সব দেখতে গিছলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিরকম সব দেখলে বল?

মণিলাল — ত্রৈলঙ্গ স্বামী সেই ঠাকুরবাড়িতেই আছেন, মণিকর্ণিকার ঘাটে বেণীমাধবের কাছে। লোকে বলে, আগে তাঁর উচ্চ অবস্থা ছিল। কত আশ্চর্য আশ্চর্য কার্য করতে পারতেন। এখন অনেকটা কমে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ও-সব বিষয়ী লোকের নিন্দা।

মণিলাল — ভাস্করানন্দ সকলের সঙ্গে মেশেন, ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মতো নয় — একেবারে কথা বন্ধ।

[সিদ্ধের পক্ষে "ঈশ্বর কর্তা" — অন্যের পক্ষে পাপপূণ্য — ফ্রি উইল]

শ্রীরামকৃষ্ণ — ভাস্করানন্দের সঙ্গে তোমার কথা হল?

মণিলাল — আজ্ঞে হাঁ, অনেক কথা হল। তার মধ্যে পাপপুণ্যের কথা হল! তিনি বললেন, পাপ পথে যেও না, পাপচিন্তা ত্যাগ করবে, ঈশ্বর এই সব চান। যে-সব কাজ কল্লে পুণ্য হয়, এমন সব কর্ম কর।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ ও একরকম আছে, ঐহিকদের জন্য। যাদের চৈতন্য হয়েছে, যাদের ঈশ্বর সৎ আর-সব অসৎ অনিত্য বলে বোধ হয়ে গেছে, তাদের আর-একরকম ভাব। তারা জানে যে, ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা, আর সব অকর্তা। যাদের চৈতন্য হয়েছে তাদের বেতালে পা পড়ে না, হিসাব করে পাপ ত্যাগ করতে হয় না, ঈশ্বরের উপর এত ভালবাসা যে, যে-কর্ম তারা করে সেই কর্মই সৎকর্ম! কিন্তু

তারা জানে, এ-কর্মের কর্তা আমি নই, আমি ঈশ্বরের দাস। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনি যেমন করান, তেমনি করি, যেমন বলান তেমনি বলি, তিনি যেমন চালান, তেমনি চলি।

“যাদের চৈতন্য হয়েছে, তারা পাপপুণ্যের পার। তারা দেখে ঈশ্বরই সব করছেন। এক জায়গায় একটি মঠ ছিল। মঠের সাধুরা রোজ মাধুকরী (ভিক্ষা) করতে যায়। একদিন একটি সাধু ভিক্ষা করতে করতে দেখে যে, একটি জমিদার একটি লোককে ভারী মারছে, সাধুটি বড় দয়ালু; সে মাঝে পড়ে জমিদারকে মারতে বারণ করলে। জমিদার তখন ভারী রেগে রয়েছে, সে সমস্ত কোপটি সাধুটির গায়ে ঝাড়লে। এমন প্রহার করলে যে, সাধুটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। কেউ গিয়ে মঠে খপর দিলে, তোমাদের একজন সাধুকে জমিদার ভারী মেরেছে। মঠের সাধুরা দৌড়ে এসে দেখে, সাধুটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছে! তখন তারা পাঁচজনে ধরাধরি করে তাকে মঠের ভিতর নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে শোয়ালে। সাধু অজ্ঞান, চারিদিকে মঠের লোকে ঘিরে বিমর্ষ হয়ে বসে আছে, কেউ কেউ বাতাস কচ্ছে। একজন বললে, মুখে একটু দুধ দিয়ে দেখা যাক। মুখে দুধ দিতে দিতে সাধুর চৈতন্য হল। চোখ মেলে দেখতে লাগল। একজন বললে, ‘ওহে দেখি, জ্ঞান হয়েছে কি না? লোক চিনতে পারছে কিনা?’ তখন সে সাধুকে খুব চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ‘মহারাজ! তোমাকে কে দুধ খাওয়াচ্ছে?’ সাধু আস্তে আস্তে বলছে, ‘ভাই! যিনি আমাকে মেরেছিলেন, তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন।’

“ঈশ্বরকে জানতে না পারলে এরূপ অবস্থা হয় না।”

মণিলাল — আজ্ঞে আপনি যে-কথা বললেন, সে বড় উচ্চ অবস্থা! ভাস্করানন্দের সঙ্গে এই সব পাঁচরকম কথা হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কোনও বাড়িতে থাকেন?

মণিলাল — একজনের বাড়িতে থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কত বয়স?

মণিলাল — পঞ্চান্ন হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আর কিছু কথা হল?

মণিলাল — আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ভক্তি কিসে হয়? তিনি বললেন, "নাম কর, রাম রাম বোলো!"

শ্রীরামকৃষ্ণ — এ বেশ কথা।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ৮ই এপ্রিল 1883/04/08/ii

12.15 গৃহস্থ ও কর্মযোগ

ঠাকুরবাড়িতে শ্রীশ্রীভবতারিণী, শ্রীশ্রীরাধাকান্ত ও দ্বাদশ শিবের পূজা শেষ হইল। ক্রমে ভোগারতির বাজনা বাজিতেছে। চৈত্রমাস দ্বিপ্রহর বেলা। ভারী রৌদ্র। এই মাত্র জোয়ার আরম্ভ হইয়াছে। দক্ষিণদিক হইতে হাওয়া উঠিয়াছে। পূতসলিলা ভাগীরথী এইমাত্র উত্তরবাহিনী হইয়াছেন। ঠাকুর আহারান্তে কক্ষমধ্যে একটু বিশ্রাম করিতেছেন। রাখালের দেশ বসিরহাটের কাছে। দেশে গ্রীষ্মকালে বড় জলকষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি মল্লিকের প্রতি) — দেখ রাখাল বলছিল, ওদের দেশে বড় জলকষ্ট। তুমি সেখানে একটা পুষ্করিণী কাটাও না কেন। তাহলে কত লোকের উপকার হয়। (সহাস্যে) তোমার তো অনেক টাকা আছে, অত টাকা নিয়ে কি করবে? তা শুনেছি, তেলিরা নাকি বড় হিসাবী। (ঠাকুরের ও ভক্তগণের হাস্য)

মণিলাল মল্লিকের বাড়ি কলিকাতা সিন্দুরিয়াপটি। সিন্দুরিয়াপটির ব্রাহ্মসমাজের সাংবাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তিনি অনেককে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। মণিলালের বরাহনগরে একখানি বাগান আছে। সেখানে তিনি প্রায় একাকী আসিয়া থাকেন ও সেই সঙ্গে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া যান। মণিলাল যথার্থ হিসাবী লোক বটে! সমস্ত গাড়িভাড়া করিয়া বরাহনগরে প্রায় আসেন না; ট্রামে চাপিয়া প্রথমে শোভাবাজারে আসেন, সেখানে শেয়ারের গাড়িতে চাপিয়া বরাহনগরে আসেন। অর্থের অভাব নাই; কয়েক বৎসর পরে গরিব ছাত্রদের ভরণপোষণের জন্য এককালে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

মণিলাল চুপ করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এ-কথা ও-কথার পর, কথার পিঠে বলিলেন, “মহাশয় পুষ্করিণীর কথা বলছিলেন। তা বললেই হয়, তা আবার তেলি-ফেলি বলা কেন?”

ভক্তেরা কেহ কেহ মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন। ঠাকুরও হাসিতেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ৮ই এপ্রিল 1883/04/08/iii

12.16 দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মগণ — প্রেমতত্ত্ব

কিয়ৎক্ষণ পরে কলিকাতা হইতে কয়েকটি পুরাতন ব্রাহ্মভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে একজন — শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস সেন। ঘরে অনেকগুলি ভক্তের সমাগম হইয়াছে। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। সহাস্যবদন, বালকমূর্তি। উত্তরাস্য হইয়া বসিয়াছেন। ব্রাহ্মভক্তদের সঙ্গে আনন্দে আলাপ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্ম ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি) — তোমরা ‘প্যাম’ ‘প্যাম’ কর; কিন্তু প্রেম কি সামান্য জিনিস গা? চৈতন্যদেবের ‘প্রেম’ হয়েছিল। প্রেমের দুটি

লক্ষণ। প্রথম — জগৎ ভুল হয়ে যাবে। এত ঈশ্বরেতে ভালবাসা যে বাহ্যশূন্য! চৈতন্যদেব "বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে।"

"দ্বিতীয় লক্ষণ — নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, এর উপরও মমতা থাকবে না, দেহাত্মবোধ একেবারে চলে যাবে।

"ঈশ্বরলাভের কতকগুলি লক্ষণ আছে। যার ভিতর অনুরাগের ঐশ্বর্য প্রকাশ হচ্ছে তার ঈশ্বরলাভের আর দেরি নাই।

"অনুরাগের ঐশ্বর্য কি কি? বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরের নামগুণকীর্তন, সত্যকথা — এই সব।

"এই সকল অনুরাগের লক্ষণ দেখলে ঠিক বলতে পারা যায়, ঈশ্বর দর্শনের আর দেরি নাই। বাবু কোন খানসামার বাড়ি যাবেন, এরূপ যদি ঠিক হয়ে থাকে, খানসামার বাড়ির অবস্থা দেখে ঠিক বুঝতে পারা যায়! প্রথমে বন-জঙ্গল কাটা হয়, ঝুলঝাড়া হয়; ঝাঁটপাট দেওয়া হয়। বাবু নিজেই সতরঞ্চি, গুড়গুড়ি এই সব পাঁচরকম জিনিস পাঠিয়ে দেন। এই সব আসতে দেখলেই লোকের বুঝতে বাকি থাকে না, বাবু এসে পড়লেন বলে।"

একজন ভক্ত — আজ্ঞে, আগে বিচার করে কি ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করতে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ও এক পথ আছে। বিচারপথ। ভক্তিপথেও অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ আপনি হয়। আর সহজে হয়। ঈশ্বরের উপর যত ভালবাসা আসবে, ততই ইন্দ্রিয়সুখ আলুনী লাগবে।

“যেদিন সন্তান মারা গেছে, সেই শোকের উপর স্ত্রী-পুরুষের দেহ-সুখের দিকে কি মন থাকতে পারে?”

একজন ভক্ত — তাঁকে ভালবাসতে পারছি কি?

[নাম-মাহাত্ম্য — উপায় — মায়ের নাম]

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁর নাম কল্লে সব পাপ কেটে যায়! কাম, ক্রোধ, শরীরে সুখ-ইচ্ছা — এ-সব পালিয়ে যায়।

একজন ভক্ত — তাঁর নাম করতে ভাল কই লাগে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, যাতে তাঁর নামে রুচি হয়। তিনিই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন —

এই বলিয়া ঠাকুর দেবদুর্লভ কণ্ঠে গাহিতেছেন। জীবের দুঃখে কাতর হইয়া মার কাছে হৃদয়ের বেদনা জানাইতেছেন। প্রাকৃত জীবের অবস্থা নিজে আরোপ করিয়া মার কাছে জীবের দুঃখ জানাইতেছেন:

দোষ কারু নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।
ষড়রিপু হল কোদণ্ডস্বরূপ, পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে কূপে বেড়িল কালরূপ জল, কাল-মনোরমা।।
আমার কি হবে তারিণী, ত্রিগুণধারিণী — বিগুণ করেছে স্বগুণে,
কিসে এ-বারি নিবারি, ভেবে দাশরথির অনিবার বারি নয়নে।
ছিল বারি কক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে, জীবনে জীবন কেমনে হয় মা রক্ষে,

আছি তোর অপিক্ষে, দে মা মুক্তিভিক্ষে, কটাক্ষেতে করে পার ।।

আবার গান গাহিতেছেন। জীবের বিকাররোগ! তাঁর নামে রুচি হলে বিকার কাটবে:

এ কি বিকার শঙ্করী, কৃপা-চরণতরী পেলে ধন্বন্তরি!
অনিত্য গৌরব হল অঙ্গদাহ, আমার আমার একি হল পাপ মোহ;
(তায়) ধনজনতৃষ্ণা না হয় বিরহ, কিসে জীবন ধরি ।।
অনিত্য আলাপ, কি পাপ প্রলাপ, সতত সর্বমঙ্গলে;
মায়া-কাকনিদ্রা তাহে দাশরথির নয়নযুগলে;
হিংসারূপ তাহে সে উদরে কৃমি, মিছে কাজে ভ্রমি, সেই হয় ভ্রমি,
রোগে বাঁচি কি না বাঁচি ত্বন্নামে অরুচি দিবা শর্বরী ।।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ত্বন্নামে অরুচি! বিকারে যদি অরুচি হল, তাহলে আর বাঁচবার পথ থাকে না। যদি একটু রুচি থাকে, তবে বাঁচবার খুব আশা। তাই নামে রুচি। ঈশ্বরের নাম করতে হয়; দুর্গানাম, কৃষ্ণনাম, শিবনাম, যে নাম বলে ঈশ্বরকে ডাক না কেন? যদি নাম করতে অনুরাগ দিন দিন বাড়ে, যদি আনন্দ হয় তাহলে আর কোন ভয় নাই, বিকার কাটবেই কাটবে। তাঁর কৃপা হবেই হবে।

[আন্তরিক ভক্তি ও দেখানো ভক্তি — ঈশ্বর মন দেখেন]

“যেমন ভাব তেমনি লাভ। দুজন বন্ধু পথে যাচ্ছে। এক যায়গায় ভাগবত পাঠ হচ্ছিল। একজন বন্ধু বললে, ‘এস ভাই, একটু ভাগবত শুনি।’ আর-একজন একটু উঁকি মেরে দেখল। তারপর সে সেখান থেকে চলে গিয়ে বেশ্যালয়ে গেল।

সেখানে খানিকক্ষণ পরে তার মনে বড় বিরক্তি এল। সে আপনা-আপনি বলতে লাগল, ‘ধিক্ আমাকে! বন্ধু আমার হরি কথা শুনছে, আর আমি কোথায় পড়ে আছি!’ এদিকে যে ভাগবত শুনছে, তারও ধিক্কার হয়েছে। সে ভাবছে, ‘আমি কি বোকা! কি ব্যাড় ব্যাড় করে বকছে, আর আমি এখানে বসে আছি! বন্ধু আমার কেমন আমোদ-আহ্লাদ করছে।’ এরা যখন মরে গেল, যে ভাগবত শুনেছিল, তাকে যমদূত নিয়ে গেল; যে বেশ্যালয়ে গিছিল, তাকে বিষ্ণুদূত বৈকুণ্ঠে নিয়ে গেল।

“ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে তা দেখেন না। ‘ভাবগ্রাহী জনার্দন।’

“কর্তাভজারা মন্ত্র দিবার সময় বলে এখন ‘মন তোর’। অর্থাৎ এখন সব তোর মনের উপর নির্ভর করছে।

“তারা বলে, ‘যার ঠিক মন, তার ঠিক করণ, তার ঠিক লাভ।’

“মনের গুণে হনুমান সমুদ্র পার হয়ে গেল। ‘আমি রামের দাস, আমি রামনাম করেছি, আমি কি না পারি!’ এই বিশ্বাস।”

[কেন ঈশ্বরদর্শন হয় না? অহংবুদ্ধির জন্য]

“যতক্ষণ অহংকার ততক্ষণ অজ্ঞান। অহংকার থাকতে মুক্তি নাই।

“গরুগুলো হাম্মা হাম্মা করে, আর ছাগলগুলো ম্যা ম্যা করে। তাই ওদের কত যন্ত্রণা। কসায়ে কাটে; জুতো, ঢোলের চামড়া তৈয়ার করে। যন্ত্রণার শেষ নাই।

হিন্দিতে ‘হাম্’ মানে আমি, আর ‘ম্যায়’ মানেও আমি। ‘আমি’ ‘আমি’ করে বলে কত কর্মভোগ। শেষে নাড়ীভুঁড়ি থেকে ধুনুরীর তাঁত তৈয়ার করে। তখন ধুনুরীর হাতে ‘তুঁহু তুঁহু’ বলে, অর্থাৎ ‘তুমি তুমি’। তুমি তুমি বলার পর তবে নিস্তার! আর ভুগতে হয় না।

“হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর আমি অকর্তা, এরই নাম জ্ঞান।

“নিচু হলে তবে উঁচু হওয়া যায়। চাতক পাখির বাসা নিচে, কিন্তু ওঠে খুব উঁচুতে। উঁচু জমিতে চাষ হয় না। খাল জমি চাই, তবে জল জমে! তবে চাষ হয়!”

[গৃহস্থলোকের সাধুসঙ্গ প্রয়োজন — যথার্থ দরিদ্র কে?]

“একটু কষ্ট করে সৎসঙ্গ করতে হয়। বাড়িতে কেবল বিষয়ের কথা। রোগ লেগেই আছে। পাখি দাঁড়ে বসে তবে রাম রাম বলে। বনে ডড়ে গেলে আবার ক্যাঁ ক্যাঁ করবে।

“টাকা থাকলেই বড় মানুষ হয় না। বড় মানুষের বাড়ির একটি লক্ষণ যে, সব ঘরে আলো থাকে। গরিবেরা তেল খরচ করতে পারে না, তাই তত আলো বন্দোবস্ত করে না। এই দেহমন্দির অন্ধকারে রাখতে নাই, জ্ঞানদীপ জ্বেলে দিতে হয়।

“জ্ঞানদীপ জ্বেলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না।”

[প্রার্থনাতত্ত্ব — চৈতন্যের লক্ষণ]

“সকলেরই জ্ঞান হতে পারে। জীবাত্মা আর পরমাত্মা। প্রার্থনা কর — সেই পরমাত্মার সঙ্গে সব জীবেরই যোগ হতে পারে। গ্যাসের নল সব বাড়িতেই খাটানো আছে। গ্যাস কোম্পানির কাছে গ্যাস পাওয়া যায়। আরজি কর, করলেই গ্যাস বন্দোবস্ত করে দেবে — ঘরেতে আলো জ্বলবে। শিয়ালদহে আপিস আছে। (সকলের হাস্য)

“কারুর চৈতন্য হয়েছে। তার কিন্তু লক্ষণ আছে। ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছু শুনতে ভাল লাগে না। আর ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছু বলতে ভাল লাগে না। যেমন সাত সমুদ্র, গঙ্গা, যমুনা, নদী — সব তাতে জল রয়েছে, কিন্তু চাতক বৃষ্টির জল চাচ্ছে। তৃষ্ণাতে ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তবু অন্য জল খাবে না।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ৮ই এপ্রিল 1883/04/08/iv

12.17 শ্রীরামলাল প্রভৃতির গান ও শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গান গাহিতে বলিলেন। রামলাল ও কালীবাড়ির একটি ব্রাহ্মণ কর্মচারী গাহিতেছেন। সঙ্গতের মধ্যে একটি বাঁয়ার ঠেকা —

(১) — হৃদি-বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি।
ওহে ভক্তিপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধাসতী।।
মুক্তি কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী।।
আমার ধর ধর জনার্দন, পাপভার গোবর্ধন,
কামাদি ছয় কংসচরে ধ্বংস কর সম্প্রতি।।
বাজায়ে কৃপা বাঁশরি, মনধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ হৃদিগোষ্ঠে পুরাও ইষ্ট এই মিনতি।।
আমার প্রেমরূপ যমুনাকুলে, আশাবংশীবটমূলে,
স্বদাস ভেবে সদয়ভাবে, সতত কর বসতি।
যদি বল রাখাল-প্রেমে, বন্দী থাকি ব্রজধামে,
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার, দাস হবে হে দাশরথি।।

(২) — নবনীরদবরণ কিসে গণ্য শ্যামচাঁদ রূপ হেরে,
করেতে বাঁশি অধরে হাসি, রূপে ভুবন আলো রে।।
জড়িত পীতবসন, তড়িত জিনি ঝলমল,
আন্দোলিত চরণাবধি হৃদিসরোজে বনমাল,
নিতে যুবতী-জাতিকুল, আলো করে যমুনাকুল,
নন্দকুল চন্দ্র যত চন্দ্র জিনি বিহরে।।
শ্যামগুণধাম পশি, হাম হদিমন্দিরে,
প্রাণ মন জ্ঞান সখি হরে নিল বাঁশির স্বরে,
গঙ্গানারায়ণের যে দুঃখ সে-কথা বলিব কারে,

জানতে যদি যেতে গো সখী যমুনায় জল আনিবারে ।।

(৩) — শ্যামাপদ-আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়তেছিল;

কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল।

[ঈশ্বরলাভের উপায় অনুরাগ — গোপীপ্রেম — “অনুরাগ বাঘ”]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — বাঘ যেমন কপকপ করে জানোয়ার খেয়ে ফেলে, তেমনি “অনুরাগ বাঘ” কাম ক্রোধ এই সব রিপুদের খেয়ে ফেলে। ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হলে কামক্রোধাদি থাকে না। গোপীদের ওই অবস্থা হয়েছিল। কৃষ্ণে অনুরাগ।

“আবার আছে ‘অনুরাগ অঞ্জন’। শ্রীমতী বলছেন, ‘সখি, চতুর্দিক কৃষ্ণময় দেখছি!’ তারা বললে, ‘সখি, অনুরাগ-অঞ্জন চোখে দিয়েছ তাই ওইরূপ দেখছ।’ এরূপ আছে যে, ব্যাঙের মুণ্ডু পুড়িয়ে কাজল তৈয়ার করে, সেই কাজল চোখে দিলে চারিদিক সর্পময় দেখে!

“যারা কেবল কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে আছে — ঈশ্বরকে একবারও ভাবে না, তারা বদ্ধজীব। তাদের নিয়ে কি মহৎ কাজ হবে? যেমন কাকে ঠোকরানো আম, ঠাকুর সেবায় লাগে না, নিজের খেতেও সন্দেহ।

“বদ্ধজীব — সংসারী জীব, এরা যেমন গুটিপোকা। মনে করলে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে; কিন্তু নিজে ঘর বানিয়েছে, ছেড়ে আসতে মায়া হয়। শেষে মৃত্যু।

“যারা মুক্তজীব, তারা কামিনী-কাঞ্চনের বশ নয়। কোন কোন গুটিপোকা অত যত্নের গুটি কেটে বেরিয়ে আসে। সে কিন্তু দু-একটা।

“মায়াতে ভুলিয়ে রাখে। দু-একজনের জ্ঞান হয়; তারা মায়ার ভেলকিতে ভোলে না; কামিনী-কাঞ্চনের বশ হয় না। আঁতুড়ঘরের ধূলহাঁড়ির খোলা যে পায়ে পরে, তার বাজিকরের ড্যাম্‌ ড্যাম্‌ শব্দের ভেলকি লাগে না। বাজিকর কি করছে সে ঠিক দেখতে পায়।

“সাধনসিদ্ধ আর কৃপাসিদ্ধ। কেউ কেউ অনেক কষ্টে ক্ষেত্রে জল ছেঁচে আনে; আনতে পারলে ফসল হয়। কারু জল ছেঁচতে হল না, বৃষ্টির জলর ভেসে গেল। কষ্ট করে জল আনতে হল না। এই মায়ার হাত থেকে এড়াতে গেলে কষ্ট করে সাধন করতে হয়। কৃপাসিদ্ধের কষ্ট করতে হয় না। সে কিন্তু দু-এক জনা।

“আর নিত্যসিদ্ধ, এদের জন্মে জন্মে জ্ঞানচৈতন্য হয়ে আছে। যেমন ফোয়ারা বুজে আছে। মিস্ত্রী এটা খুলতে ফোয়ারাটাও খুলে দিলে, আর ফরফর করে জল বেরুতে লাগল! নিত্যসিদ্ধের প্রথম অনুরাগ যখন লোকে দেখে, তখন অবাক্‌ হয়। বলে এত ভক্তি-বৈরাগ্য-প্রেম কোথায় ছিল?”

ঠাকুর অনুরাগের কথা বলিতেছেন। গোপীদের অনুরাগের কথা। আবার গান হইতে লাগিল। রামলাল গাহিতেছেন:

নাথ! তিমি সর্বস্ব আমার। প্রাণাধার সারাৎসার;
নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে, বলিবার আপনার ।।
তুমি সুখ শান্তি, সহায় সম্বল, সম্পদ ঐশ্বর্য, জ্ঞান বুদ্ধি বল,

তুমি বাসগৃহ, আরামের স্থল, আত্মীয় বন্ধু পরিবার ।।

তুমি ইহকাল, তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল, তুমি স্বর্গধাম,

তুমি শাস্ত্রবিধি গুরুকল্পতরু, অনন্ত সুখের আধার ।।

তুমি হে উপায়, তুমি হে উদ্দেশ্য, তুমি স্রষ্টা পাতা তুমি হে উপাস্য,

দণ্ডদাতা পিতা, স্নেহময়ী মাতা, ভবার্ণবে কর্ণধার (তুমি) ।।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — আহা কি গান! "তুমি সর্বস্ব আমার!" গোপীরা অক্রুর আসবার পর শ্রীমতীকে বললে, রাধে! তোর সর্বস্ব ধন হরে নিতে এসেছে! এই ভালবাসা। ভগবানের জন্য এই ব্যাকুলতা।

আবার গান চলিতে লাগিল:

(১) — ধোরো না ধোরো না রথচক্র রথ কি চক্রে চলে,

যে চক্রের চক্রের চক্রী হরি যার চক্রে জগৎ চলে।

(২) — প্যারী! কার তরে আর, গাঁথ হার যতনে।

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিসিন্ধুমধ্যে মগ্ন হইলেন! ভক্তেরা একদৃষ্টে ঠাকুরের দিকে অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। আর সাড়াশব্দ নাই। ঠাকুর সমাধিস্থ! হাতজোড় করিয়া বসিয়া আছেন, যেমন ফটোগ্রাফে দেখা যায়। কেবল চক্ষের বাহিরের কোণ দিয়া আনন্দধারা পড়িতেছে।

[ঈশ্বরের সহিত কথা — শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন — কৃষ্ণ সর্বময়]

অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর একটু প্রকৃতস্থ হইলেন। কিন্তু সমাধির মধ্যে যাঁকে দর্শন করিতেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন। একটি-আধটি কেবল ভক্তদের কানে পোঁছিতেছে। ঠাকুর আপনা-আপনি বলিতেছেন, "তুমিই আমি আমিই তুমি। তুমি খাও, তুমি আমি খাও!... বেশ কিন্তু কচ্ছ।

"এ কি ন্যাবা লেগেছে। চারিদিকেই তোমাকে দেখছি!

"কৃষ্ণ হে দীনবন্ধু প্রাণবল্লভ! গোবিন্দ!"

প্রাণবল্লভ! গোবিন্দ! বলিতে বলিতে আবার সমাধিস্থ হইলেন। ঘর নিস্তব্ধ। ভক্তগণ মহাভাবময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে — অতৃপ্ত-নয়নে বারবার দেখিতেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ৮ই এপ্রিল 1883/04/08/v

12.18 শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরাবেশ, তাঁহার মুখে ঈশ্বরের বাণী

[শ্রীযুক্ত অধর সেনের দ্বিতীয় দর্শন — গৃহস্থের প্রতি উপদেশ]

শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ। ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে উপবিষ্ট। শ্রীযুক্ত অধর সেন কয়টি বন্ধুসঙ্গে আসিয়াছেন। অধর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ঠাকুরকে এই দ্বিতীয় দর্শন করিতেছেন। অধরের বয়স ২৯/৩০। অধরের বন্ধু সারদাচরণ পুত্রশোকে সন্তপ্ত। তিনি স্কুলের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন; পেনশন লইয়া, এবং আগেও তিনি সাধন-ভজন করিতেন। বড় ছেলেটি মারা যাওয়াতে কোনরূপে সান্ত্বনালাভ করিতে পারিতেছেন না। তাই অধর ঠাকুরের নাম শুনাইয়া তাঁহার কাছে লইয়া আসিয়াছেন। অধরের নিজেরও ঠাকুরকে দেখিবার অনেকদিন হইতে ইচ্ছা ছিল।

সমাধি ভঙ্গ হইল। ঠাকুর দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, একঘর লোক তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তখন তিনি আপনা-আপনি কি বলিতেছেন।

ঈশ্বর কি তাঁর মুখ দিয়া কথা কহিতেছেন ও উপদেশ দিতেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — বিষয়ী লোকের জ্ঞান কখনও দেখা দেয়। এক-একবার দীপ শিখার ন্যায়। না, না, সূর্যের একটি কিরণের ন্যায়। ফুটো দিয়ে যেন কিরণটি আসছে। বিষয়ী লোকের ঈশ্বরের নাম করা — অনুরাগ নাই। বালক যেমন বলে, তোর পরমেশ্বরের দিব্যি। খুড়ী-জেঠীর কোঁদল শুনে "পরমেশ্বরের দিব্যি" শিখেছে!

"বিষয়ী লোকদের রোখ নাই। হল হল; না হল না হল। জলের দরকার হয়েছে কূপ খুঁড়ছে। খুঁড়তে, খুঁড়তে যেমন পাথর বেরুল, অমনি সেখানটা ছেড়ে দিলে। আর-এক জায়গা খুঁড়তে বালি পেয়ে গেল; কেবল বালি বেরোয়। সেখানটাও

ছেড়ে দিলে। যেখানে খুঁড়তে আরম্ভ করেছে, সেইখানেই খুঁড়বে তবে তো জল পাবে।

“জীব যেমন কর্ম করে, তেমনি ফল পায়। তাই গানে আছে:

দোষ কারু নয় গো মা।
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।

“আমি আর আমার অজ্ঞান। বিচার করতে গেলে যাকে আমি আমি করছ, দেখবে তিনি আত্মা বই আর কেউ নয়। বিচার কর — তুমি শরীর না মাংস, না আর কিছু? তখন দেখবে, তুমি কিছুও নও। তোমার কোন উপাধি নাই। তখন আবার ‘আমি কিছু করি নাই, আমার দোষও নাই, গুণও নাই। পাপও নাই, পুণ্যও নাই।’

“এটা সোনা, এটা পেতল — এর নাম অজ্ঞান। সব সোনা — এর নাম জ্ঞান।”

[ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ — শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার?]

“ঈশ্বরদর্শন হলে বিচার বন্ধ হয়ে যায়। ঈশ্বরলাভ করেছে, অথছ বিচার করছে, তাও আছে। কি কেউ ভক্তি নিয়ে তাঁর নামগুণগান করছে।

“ছেলে কাঁদে কতক্ষণ? যতক্ষণ না স্তন পান করতে পায়। তারপরই কান্না বন্ধ হয়ে যায়। কেবল আনন্দ। আনন্দে মার দুধ খায়। তবে একটি কথা আছে। খেতে খেতে মাঝে মাঝে খেলা করে, আবার হাসে।

“তিনিই সব হয়েছেন। তবে মানুষে তিনি বেশি প্রকাশ। যেখানে শুদ্ধসত্ত্ব বালকের স্বভাব — হাসে, কাঁদে, নাচে, গায় — সেখানে তিনি সাক্ষাৎ বর্তমান।”

[পুত্রশোক — “জীব সাজ সমরে”]

ঠাকুর অধরের কুশল পরিচয় লইলেন। অধর তাঁহার বন্ধুর পুত্রশোকের কথা নিবেদন করিলেন। ঠাকুর অপনার মনে গান গাহিতেছেন:

জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশ তোর ঘরে।
ভক্তিরথে চড়ি, লয়ে জ্ঞানতূণ, রসনাধনুকে দিয়ে প্রেমগুণ,
ব্রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম-অস্ত্র তাহে সন্ধান করে ।।
আর এক যুক্তি রণে, চাই না রথরথী, শত্রুনাশে জীব হবে সুসঙ্গতি,
রণভূমি যদি করে দাশরথি ভাগীরথীর তীরে ।।

“কি করবে? এই কালের জন্য প্রস্তুত হও। কাল ঘরে প্রবেশ করেছে, তাঁর নামরূপ অস্ত্র লয়ে যুদ্ধ করতে হবে, তিনিই কর্তা। আমি বলি, যেমন করাও, তেমনি করি; যেমন বলাও তেমনি বলি; আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর, তুমি ঘরণী; আমি গাড়ি, তুমি ইঞ্জিনিয়ার।

“তাঁকে আম্‌মোক্তারি দাও! ভাল লোকের উপর ভার দিলে অমঙ্গল হয় না। তিনি যা হয় করুন।

“তা শোক হবে না গা? আত্মজ! রাবণ বধ হল; লক্ষ্মণ দৌড়িয়ে গিয়ে দেখলেন। দেখেন যে, হাড়ের ভিতর এমন জায়গা নাই — যেখানে ছিদ্র নাই। তখন

বললেন, রাম! তোমার বাণের কি মহিমা! রাবণের শরীরে এমন স্থান নাই, যেখানে ছিদ্র না হয়েছে! তখন রাম বললেন, ভাই হাড়ের ভিতর যে-সব ছিদ্র দেখছ, ও বাণের জন্য নয়। শোকে তার হাড় জরজর হয়েছে। ওই ছিদ্রগুলি সেই শোকের চিহ্ন। হাড় বিদীর্ণ করেছে।

“তবে এ-সব অনিত্য। গৃহ, পরিবার, সন্তান দুদিনের জন্য। তালগাছই সত্য। দু-একটা তাল খসে পড়েছে। তার আর দুঃখ কি?

“ঈশ্বর তিনটি কাজ করেছেন — সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। মৃত্যু আছেই। প্রলয়ের সময় সব ধ্বংস হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না। মা কেবল সৃষ্টির বীজগুলি কুড়িয়ে রেখে দেবেন। আবার নূতন সৃষ্টির সময় সেই বীজগুলি বার করবেন। গিন্নীদের যেমন ন্যাতা-কাঁতার হাঁড়ি থাকে। (সকলের হাস্য) তাতে শশাবিচি, সমুদ্রের ফেনা নীলবড়ি ছোট ছোট পুটলিতে বাঁধা থাকে।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ৮ই এপ্রিল 1883/04/08/vi

12.19 অধরের প্রতি উপদেশ — সম্মুখে কাল

ঠাকুর অধরের সঙ্গে তাঁর ঘরে উত্তরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অধরের প্রতি) — তুমি ডিপুটি। এ-পদও ঈশ্বরের অনুগ্রহে হয়েছে। তাঁকে ভূলো না। কিন্তু জেনো, সকলের একপথে যেতে হবে।১ এখানে দুদিনের জন্য।

“সংসার কর্মভূমি। এখানে কর্ম করতে আসা। যেমন দেশে বাড়ি কলকাতায় গিয়ে কর্ম করে।

“কিছু কর্ম করা দরকার। সাধন। তাড়াতাড়ি কর্মগুলি শেষ করে নিতে হয়। স্যাকরারা সোনা গলাবার সময় হাপর, পাখা চোঙ দিয়ে হাওয়া করে যাতে আগুনটা খুব হয়ে সোনাটা গলে। সোনা গলার পর তখন বলে, তামাক সাজ্। এতক্ষণ কপাল দিয়ে ঘাম পড়ছিল। তারপর তামাক খাবে।

“খুব রোখ চাই। তবে সাধন হয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

“তাঁর নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়।

“কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর থাকলে মন বড় টেনে লয়। সাবধানে থাকতে হয়। ত্যাগীদের অত ভয় নাই। ঠিক ঠিক তাগী কামিনী-কাঞ্চন থেকে তফাতে থাকে। তাই সাধন থাকলে ঈশ্বরে সর্বদা মন রাখতে পারবে।

“ঠিক ঠিক ত্যাগী। যারা সর্বদা ঈশ্বরে মন দিতে পারে, তারা মৌমাছির মতো কেবল ফুলে বসে মধু পান করে। সংসারে কামিনী-কাঞ্চনের ভিতরে যে আছে,

তার ঈশ্বরে মন হতে পারে, আবার কখন কখন কামিনী-কাঞ্চনেও মন হয়। যেমন সাধারণ মাছি, সন্দেশেও বসে আর পচা ঘায়েও বসে, বিষ্ঠাতেও বসে।

“ঈশ্বরেতে সর্বদা মন রাখবে। প্রথমে একটু খেটে নিতে হয়। তারপর পেনশন ভোগ করবে।”

১ শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র সেন দেড় বৎসর পরে দেহত্যাগ করেন। ঠাকুর ওই সংবাদ শুনিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া মার কাছে কাঁদিয়াছিলেন। অধর ঠাকুরের পরম ভক্ত। ঠাকুর বলেছিলেন, “তুমি আমার আত্মীয়।” অধরের বাড়ি কলিকাতা, শোভাবাজার, বেণেটোলা। তাঁহার কয়েকটি কন্যাসন্তান এখন বর্তমান। কলিকাতার বাটীতে শ্রীযুক্ত শ্যামলাল, শ্রীযুক্ত হীরালাল প্রভৃতি ভ্রাতারা কেহ কেহ এখনও আছেন। তাঁহাদের বাটীর বৈঠকখানা ও ঠাকুরদালান তীর্থ হইয়া আছে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c13 ১৩ ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৫ই এপ্রিল 1883/04/15/i

13.1 শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা উপলক্ষে ভক্তসঙ্গে সুরেন্দ্রভবনে

সুরেন্দ্রের বাড়ির উঠানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সভা আলো করিয়া বসিয়া আছেন, অপরাহ্ন বেলা ছয়টা হইল।

উঠান হইতে পূর্বাস্য হইয়া ঠাকুরদালানে উঠিতে হয়। দালানের ভিতর সুন্দর ঠাকুর-প্রতিমা। মার পাদপদ্মে জবা, বিল্ব, গলায় পুষ্পমালা। মাও ঠাকুরদালান আলো করিয়া বসিয়া আছেন।

আজ শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা। চৈত্র শুক্লাষ্টমী, ১৫ই এপ্রিল, ১৮৮২ রবিবার, ৩রা বৈশাখ, ১২৯০। সুরেন্দ্র মায়ের পূজা আনিয়াছেন তাই ঠাকুরের নিমন্ত্রণ। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আসিয়াছেন, আসিয়া ঠাকুরদালানে উঠিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রতিমা দর্শন করিলেন, প্রণাম ও দর্শনানন্তর দাঁড়াইয়া মার দিকে তাকাইয়া শ্রীকরে মূলমন্ত্র জপ করিতেছেন, ভক্তেরা ঠাকুর-প্রতিমাদর্শন ও প্রণামানন্তর প্রভুর কছে দাঁড়াইয়া আছেন।

উঠানে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আসিয়াছেন। উঠানে সতরঞ্চি পাতা হইয়াছে, তাহার উপর চাদর, তাহার উপর কয়েকটি তাকিয়া। এক ধারে খোল-করতাল লইয়া কয়েকটি বৈষ্ণব বসিয়া আছেন — সংকীর্তন হইবে। ঠাকুরকে ঘেরিয়া ভক্তেরা সব বসিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে একটি তাকিয়া লইয়া বসিতে বলা হইল। তিনি তাকিয়ার কাছে বসিলেন না। তাকিয়া সরাইয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসা! কি জানো, অভিমান ত্যাগ করা বড় কঠিন। এই বিচার কচ্ছ, অভিমান কিছু নয়। আবার কোথা থেকে এসে পড়ে!

“ছাগলকে কেটে ফেলা গেছে, তবু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়ছে।

“স্বপ্নে ভয় দেখেছ; ঘুম ভেঙে গেল, বেশ জেগে উঠলে তবু বুক দুড়দুড় করে। অভিমান ঠিক সেইরকম। তাড়িয়ে দিলেও আবার কোথা থেকে এসে পড়ে! অমনি মুখ ভার করে বলে, আমায় খাতির কল্লে না।”

কেদার — তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি ভক্তের রেণুর রেণু।

[বৈদ্যনাথের প্রবেশ]

বৈদ্যনাথ কৃতবিদ্য। কলিকাতার বড় আদালতের উকিল, ঠাকুরকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিলেন ও একপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন।

সুরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — ইনি আমার আত্মীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, এঁর স্বভাবটি বেশ দেখছি।

সুরেন্দ্র — ইনি আপনাকে কি জিজ্ঞাসা করবেন, তাই এসেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বৈদ্যনাথের প্রতি) — যা কিছু দেখছ, সবই তাঁর শক্তি। তাঁর শক্তি ব্যতিরেকে কারু কিছু করবার জো নাই। তবে একটি কথা আছে, তাঁর শক্তি সব স্থানে সমান নয়। বিদ্যাসাগর বলেছিল, "ঈশ্বর কি কারুকে বেশি শক্তি দিয়েছেন?" আমি বললুম, শক্তি কমবেশি যদি না দিয়ে থাকেন, তোমায় আমরা দেখতে এসেছি কেন? তোমার কি দুটো শিঙ বেরিয়েছে? তবে দাঁড়ালো যে, ঈশ্বর বিভূরূপে সর্বভূতে আছেন, কেবল শক্তিবিশেষ।

[স্বাধীন ইচ্ছা না ঈশ্বরের ইচ্ছা? Free will or God's Will]

বৈদ্যনাথ — মহাশয়! একটি সন্দেহ আমার আছে। এই যে বলে Free Will অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছা — মনে কল্লে ভাল কাজও কত্তে পারি, মন্দ কাজও কত্তে পারি, এটি কি সত্য? সত্য সত্যই কি আমরা স্বাধীন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — সকলই ঈশ্বরাধীন। তাঁরই লীলা। তিনি নানা জিনিস করেছেন। ছোট, বড়, বলবান, দুর্বল, ভাল, মন্দ। ভাললোক; মন্দলোক। এ-সব তাঁর মায়া, খেলা। এই দেখ না, বাগানের সব গাছ কিছু সমান হয় না।

"যতক্ষণ ঈশ্বরকে লাভ না হয়, ততক্ষণ মনে হয় আমরা স্বাধীন। এ-ভ্রম তিনিই রেখে দেন, তা না হলে পাপের বৃদ্ধি হত। পাপকে ভয় হত না। পাপের শাস্তি হত না।

“যিনি ঈশ্বরলাভ করেছেন, তাঁর ভাব কি জানো? আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর, তুমি ঘরণী; আমি রথ, তুমি রথী; যেমন চালাও, তেমনি চলি। যেমন বলাও, তেমনি বলি।”

[ঈশ্বরদর্শন কি একদিনে হয়? সাধুসঙ্গ প্রয়োজন]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বৈদ্যনাথের প্রতি) — তর্ক করা ভাল নয়; আপনি কি বল?

বৈদ্যনাথ —– আজ্ঞে হাঁ, তর্ক করা ভাবটি জ্ঞান হলে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ —– Thank you (সকলের হাস্য)। তোমার হবে! ঈশ্বরের কথা যদি কেউ বলে, লোকে বিশ্বাস করে না। যদি কোন মহাপুরুষ বলেন, আমি ঈশ্বরকে দেখেছি তবুও সাধারণ লোকে সেই মহাপুরুষের কথা লয় না। লোকে মনে করে, ও যদি ঈশ্বর দেখেছে, আমাদের দেখিয়ে দিগ্। কিন্তু একদিনে কি নাড়ী দেখতে শেখা যায়? বৈদ্যের সঙ্গে অনেকদিন ধরে ঘুরতে হয়; তখন কোন্‌টা কফের কোন্‌টা বায়ূর কোন্‌টা পিত্তের নাড়ী বলা যেতে পারে। যাদের নাড়ী দেখা ব্যবসা, তাদের সঙ্গ করতে হয়। (সকলের হাস্য)

“অমুক নম্বরের সুতা, যে-সে কি চিনতে পারে? সুতোর ব্যবসা করো, যারা ব্যবসা করে, তাদের দোকানে কিছুদিন থাক, তবে কোন্‌টা চল্লিশ নম্বর, কোন্‌টা একচল্লিশ নম্বরের সুতা ঝাঁ করে বলতে পারবে।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৫ই এপ্রিল 1883/04/15/ii

13.2 ভক্তসঙ্গে সংকীর্তনানন্দে — সমাধিমন্দিরে

এইবার সংকীর্তন আরম্ভ হইবে। খোল বাজিতেছে। গোষ্ঠ খোল বাজাইতেছে। এখনও গান আরম্ভ হয় নাই। খোলের মধুর বাজনা, গৌরাঙ্গমণ্ডল ও তাঁহাদের নামসংকীর্তন কথা উদ্দীপন করে। ঠাকুর ভাবে মগ্ন হইতেছেন। মাঝেমাঝে খুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, "আ মরি! আ মরি! আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে।"

গায়কেরা জিজ্ঞাসা কল্লেন, কিরূপ পদ গাহিবেন? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিনীতভাবে বলিলেন "একটু গৌরাঙ্গের কথা গাও।"

কীর্তন আরম্ভ হইল। প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা। তৎপরে অন্য গীত:

লাখবান কাঞ্চন জিনি। রসে ঢর ঢর গোরা মুঁজাঙ নিছনি ।।
কি কাজ শরদ কোটি শশী। জগৎ করিলে আলো গোরা মুখের হাসি ।।

কীর্তনে গৌরাঙ্গের রূপবর্ণনা হইতেছে। কীর্তনিয়া আখর দিতেছে।

(সখি! দেখিলাম পূর্ণশশী।) (হ্রাস নাই মৃগাঙ্ক নাই)
(হৃদয় আলো করে।)

কীর্তনিয়া আবার বলছে, কোটি শশীর অমৃতে মুখ মাজা।

এইকথা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন।

গান চলিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি ভঙ্গ হিল। তিনি ভাবে বিভোর হইয়া হঠাৎ দণ্ডায়মান হইলেন ও প্রেমোন্মত্ত গোপিকার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের রূপের বর্ণনা করিতে করিতে কীর্তনিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আখর দিতেছেন:

(সখি! রূপের দোষ, না মনের দোষ?)
(আন্ হেরিতে শ্যামময় হেরি ত্রিভুবন!)

ঠাকুর নৃত্য করিতে করিতে আখর দিতেছেন। ভক্তেরা অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। কীর্তনীয়া আবার বলছেন। গোপীকার উক্তি — বাঁশি বাজিস না! তোর কি নিদ্রা নাই কো?

আখর দিয়া বলছেন:

(আর নিদ্রা হবেই বা কেমন করে!) (শয্যা তো করপল্লব!)
(আহার তো শ্রীমুখের অমৃত।) (তাতে অঙ্গুলির সেবা!)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আসন পুনর্বার গ্রহণ করিয়াছেন। কীর্তন চলিতে লাগিল। শ্রীমতী বলছেন, চক্ষু গেল, শ্রবণ গেল, ঘ্রাণ গেল, ইন্দ্রিয় সকলে চলে গেল, — (আমি একেলা কেন বা রলাম গো)।

শেষে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন গান হইল:

ধনি মালা গাঁথে, শ্যামগলে দোলাইতে,

এমন সময়ে আইল সম্মুখে শ্যাম গুণমনি।

[গান —— যুগলমিলন]

নিধুবনে শ্যামবিনোদিনী ভোর।

দুঁহার রূপের নাহিক উপমা প্রেমের নাহির ওর ।।

হিরণ কিরণ আধ বরণ আধ নীল মণি-জ্যোতিঃ।

আধ গলে বন-মালা বিরাজিত আধ গলে গজমতি ।।

আধ শ্রবণে মকর-কুণ্ডল আধ রতন ছবি।

আধ কপালে চাঁদের উদয় আধ কপালে রবি ।।

আধ শিরে শোভে ময়ূর শিখণ্ড আধ শিরে দোলে বেণী।

করকমল করে ঝলমল, ফণী উগারবে মণি ।।

কীর্তন থামিল। ঠাকুর, ‘ভগবত-ভক্ত-ভগবান’ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বারবার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। চতুর্দিকে ভক্তদের উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিতেছেন ও সংকীর্তনভূমির ধূলি গ্রহণ করিয়া মস্তকে দিতেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৫ই এপ্রিল 1883/04/15/iii

13.3 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সাকার-নিরাকার

রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা। শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা ঠাকুরদালান আলো করিয়া আছেন। সম্মুখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে দাঁড়াইয়া। সুরেন্দ্র, রাখাল, কেদার, মাস্টার, রাম, মনোমোহন ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা রহিয়াছেন। তাঁহারা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে প্রসাদ পাইয়াছেন। সুরেন্দ্র সকলকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইয়াছেন। এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-বাগানে প্রত্যাবর্তন করিবেন। ভক্তেরাও স্ব স্ব ধামে চলিয়া যাইবেন। সকলেই ঠাকুরদালানে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন।

সুরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — আজ কিন্তু মায়ের নাম একটিও হল না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঠাকুরের প্রতিমা দেখাইয়া) — আহা, কেমন দালানের শোভা হয়েছে। মা যেন আলো করে বসে আছেন। এরূপ দর্শন কল্লে কত আনন্দ হয়। ভোগের ইচ্ছা, শোক —— এ-সব পালিয়ে যায়। তবে নিরাকার কি দর্শন হয় না —— তা নয়। বিষয়বুদ্ধি একটুও থাকলে হবে না; ঋষিরা সর্বত্যাগ করে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের চিন্তা করেছিলেন।

“ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীরা ‘অচল ঘন’ বলে গান গায়, — আমার আলুনী লাগে। যারা গান গায়, যেন মিষ্টরস পায় না। চিটেগুড়ের পানা দিয়ে ভুলে থাকলে, মিছরীর পানার সন্ধান কত্তে ইচ্ছা হয় না।

“তোমরা দেখ, কেমন বাহিরে দর্শন কচ্ছ আর আনন্দ পাচ্ছ। যারা নিরাকার নিরাকার করে কিছু পায় না, তাদের না আছে বাহিরে না আছে ভিতরে।”

ঠাকুর মার নাম করিয়া গান গাহিতেছেন:

গো আনন্দময়ী হয়ে আমায় নিরানন্দ কর না।
ও দুটি চরণ বিনা আমার মন, অন্য কিছু আর জানে না ।।
তপন-তনয়, আমায় মন্দ কয়, কি দোষে তাতো জানি না।
ভবানী বলিয়ে, ভবে যাব চলে, মনে ছিল এই বাসনা,
অকূলপাথরে ডুবাবে আমারে, স্বপনেও তা জানি না ।।
অহরহর্নিশি শ্রীদুর্গানামে ভাসি, তবু দুখরাশি গেল না।
এবার যদি মরি, ও হরসুন্দরী, (তোর) দুর্গানাম কেউ আর লবে না ।।

আবার গাহিতেছেন:

বল রে বল শ্রীদুর্গানাম। (ওরে আমার আমার মন রে) ।।
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে পথ চলে যায়।
শূলহস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তায় ।।
তুমি দিবা, তুমি সন্ধ্যা, তুমি সে যামিনী।
কখন পুরুষ হও মা, কখন কামিনী ।।
তুমি বল ছাড় ছাড় আমি না ছাড়িব।
বাজন নূপুর হয়ে মা চরণে বাজিব ।।
(জয় দুর্গা শ্রীদুর্গা বলে)।

শঙ্করী হইয়ে মাগো গগনে উড়িবে।

মীন হয়ে রব জলে নখে তুলে লবে ।।

নখাঘাতে ব্রহ্মময়ী যখন যাবে মোর পরাণী,

কৃপা করে দিও রাঙা চরণ দুখানি।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার প্রতিমার সম্মুখে প্রণাম করিলেন। এইবার সিঁড়িতে নামিবার সময় ডাকিয়া বলিতেছেন, “ও রা-জু-আ”? (ও রাখাল, জুতো সব আছে, না হারিয়ে গেছে?)

ঠাকুর গাড়িতে উঠিলেন। সুরেন্দ্র প্রণাম করিলেন। অন্যান্য ভক্তেরাও প্রণাম করিলেন। রাস্তায় চাঁদের আলো এখনও আছে। ঠাকুরের গাড়ি দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিল।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২২শে এপ্রিল 1883/04/22/i

13.4 শ্রীরামকৃষ্ণ সিঁথির ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত বেণী পালের সিঁথির বাগানে শুভাগমন করিয়াছেন। আজ সিঁথির ব্রাহ্মসমাজের ষান্মাসিক মহোৎসব। চৈত্র পূর্ণিমা (১০ই বৈশাখ,

রবিবার), ২২শে এপ্রিল, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ; বৈকাল বেলা। অনেক ব্রাহ্মভক্ত উপস্থিত; ভক্তেরা ঠাকুরকে ঘিরিয়া দক্ষিণের দালানে বসিলেন। সন্ধ্যার পর আদি সমাজের আচার্য শ্রীযুক্ত বেচারাম উপাসনা করিবেন।

ব্রাহ্মভক্তেরা ঠাকুরকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিতেছেন।

ব্রাহ্মভক্ত — মহাশয়, উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — উপায় অনুরাগ, অর্থাৎ তাঁকে ভালবাসা। আর প্রার্থনা।

ব্রাহ্মভক্ত — অনুরাগ না প্রার্থনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — অনুরাগ আগে, পরে প্রার্থনা।

"ডাক দেখি মন ডাকার মতো, কেমন শ্যামা থাকতে পারে" —

শ্রীরামকৃষ্ণ সুর করিয়া এই গানটি গাইলেন।

"আর সর্বদাই তাঁর নামগুণগান-কীর্তন, প্রার্থনা করতে হয়। পুরাতন ঘটি রোজ মাজতে হবে, একবার মাজলে কি হবে? আর বিবেক, বৈরাগ্য, সংসার অনিত্য, এই বোধ।"

[ব্রাহ্মভক্ত ও সংসারত্যাগ — সংসারে নিষ্কামকর্ম]

ব্রাহ্মভক্ত — সংসারত্যাগ কি ভাল?

শ্রীরামকৃষ্ণ — সকলের পক্ষে সংসারত্যাগ নয়। যাদের ভোগান্ত হয় নাই তাদের পক্ষে সংসারত্যাগ নয়। দুআনা মদে কি মাতাল হয়?

ব্রাহ্মভক্ত — তারা তবে সংসার করবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, তারা নিষ্কামকর্ম করবার চেষ্টা করবে। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙবে। বড় মানুষের বাড়ির দাসী সব কর্ম করে, কিন্তু দেশে মন পড়ে থাকে; এরই নাম নিষ্কামকর্ম।১ এরই নাম মনে ত্যাগ। তোমরা মনে ত্যাগ করবে। সন্ন্যাসী বাহিরের ত্যাগ আবার মনে ত্যাগ দুইই করবে।

[ব্রাহ্মভক্ত ও ভোগান্ত — বিদ্যারূপিণী স্ত্রীর লক্ষণ — বৈরাগ্য কখন হয়]

ব্রাহ্মভক্ত — ভোগান্ত কিরূপ?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কামিনী-কাঞ্চন ভোগ। যে ঘরে আচার তেঁতুল আর জলের জালা, সে ঘরে বিকারের রোগী থাকলে মুশকিল! টাকা-কড়ি, মান-সম্ভ্রম, দেহসুখ এই সব ভোগ একবার না হয়ে গেলে — ভোগান্ত না হলে — সকলের ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা আসে না।

ব্রাহ্মভক্ত — স্ত্রীজাতি খারাপ, না আমরা খারাপ?

শ্রীরামকৃষ্ণ — বিদ্যারূপিণী স্ত্রীও আছে, আবার অবিদ্যারূপিণী স্ত্রীও আছে। বিদ্যারূপিণী স্ত্রী ভগবানের দিকে লয়ে যায়, আর অবিদ্যারূপিণী ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, সংসারে ডুবিয়ে দেয়।

“তাঁর মহামায়াতে এই জগৎসংসার। এই মায়ার ভিতর বিদ্যা-মায়া অবিদ্যা-মায়া দুই-ই আছে। বিদ্যা-মায়া আশ্রয় করলে সাধুসঙ্গ, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য — এই সব হয়। অবিদ্যা-মায়া — পঞ্চভূত আর ইন্দ্রিয়ের বিষয় — রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ; যত ইন্দ্রিয়ের ভোগের জিনিস; এরা ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।”

ব্রাহ্মভক্ত — অবিদ্যাতে যদি অজ্ঞান করে, তবে তিনি অবিদ্যা করেছেন কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁর লীলা, অন্ধকার না থাকলে আলোর মহিমা বোঝা ঝায় না। দুঃখ না থাকলে সুখ বোঝা যায় না। ‘মন্দ’ জ্ঞান থাকলে তবে ‘ভাল’ জ্ঞান হয়।

“আবার আছে খোসাটি আছে বলে তবে আমটি বাড়ে ও পাকে। আমটি তয়ের হয়ে গেলে তবে খোসা ফেলে দিতে হয়! মায়ারূপ ছালটি থাকলে তবেই ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। বিদ্যা-মায়া, অবিদ্যা-মায়া আমের খোসার ন্যায়; দুই-ই দরকার।”

ব্রাহ্মভক্ত — আচ্ছা, সাকারপূজা, মাটিতে গড়া ঠাকুরপূজা — এ-সব কি ভাল?২

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমরা সাকার মান না, তা বেশ; তোমাদের পক্ষে মূর্তি নয়, ভাব। তোমরা টানটুকু নেবে, যেমন কৃষ্ণের উপর রাধার টান, ভালবাসা। সাকারবাদীরা যেমন মা-কালী, মা-দুর্গার পূজা করে, ‘মা’ ‘মা’ বলে কত ডাকে কত ভালবাসে — সেই ভাবটিকে তোমরা লবে, মূর্তি না-ই বা মানলে।

ব্রাহ্মভক্ত — বৈরাগ্য কি করে হয়? আর সকলের হয় না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ভোগের শান্তি না হলে বৈরাগ্য হয় না। ছোট ছেলেকে খাবার আর পুতুল দিয়ে বেশ ভুলানো যায়। কিন্তু যখন খাওয়া হয়ে গেল, আর পুতুল নিয়ে খেলা হয়ে গেল, তখন "মা যাব" বলে। মার কাছে নিয়ে না গেলে পুতুল ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আর চিৎকার করে কাঁদে।

[সচ্চিদানন্দই গুরু — ঈশ্বরলাভের পর সন্ধ্যাদি কর্মত্যাগ]

ব্রাহ্মভক্তেরা গুরুবাদের বিরোধী। তাই ব্রাহ্মভক্তটি এ-সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন।

ব্রাহ্মভক্ত — মহাশয়, গুরু না হলে কি জ্ঞান হবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ — সচ্চিদানন্দই গুরু; যদি মানুষ গুরুরূপে চৈতন্য করে তো জানবে যে, সচ্চিদানন্দই ওই রূপ ধারণ করেছেন। গুরু যেমন সেথো; হাত ধরে নিয়ে যান। ভগবানদর্শন হলে আর গুরুশিষ্য বোধ থাকে না। 'সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরুশিষ্যে দেখা নাই!' তাই জনক শুকদেবকে বললেন, 'যদি ব্রহ্মজ্ঞান চাও আগে দক্ষিণা দাও।' কেননা, ব্রহ্মজ্ঞান হলে আর শিষ্য ভেদবুদ্ধি থাকবে না। যতক্ষণ ঈশ্বরদর্শন না হয়, ততদিনই গুরুশিষ্য সম্বন্ধ।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। ব্রাহ্মভক্তেরা কেহ কেহ ঠাকুরকে বলিতেছেন, "আপনার বোধহয় এখন সন্ধ্যা করতে হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ — না, সেরকম নয়। ও-সব প্রথম প্রথম এক-একবার করে নিতে হয়। তারপর আর কোশাকুশি বা নিয়মাদি দরকার হয় না।

১ কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। [গীতা, ২/৪৭]

যৎ করোষি যদশ্নাসি ... কুরুষ্ব মদর্পণম্।   [গীতা, ৯/২৭]

২ “মৃণ্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী” — কেশবের উপদেশ।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২২শে এপ্রিল 1883/04/22/ii

13.5 শ্রীরামকৃষ্ণ ও আচার্য শ্রীবেচারাম — বেদান্ত ও ব্রহ্মতত্ত্ব প্রসঙ্গে

সন্ধ্যার পর আদিসমাজের আচার্য শ্রীযুক্ত বেচারাম বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিলেন। মাঝেমাঝে ব্রহ্মসঙ্গীত ও উপনিষদ্ হইতে পাঠ হইতে লাগিল। উপাসনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বসিয়া আচার্য অনেক আলাপ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, নিরাকারও সত্য আর সাকারও সত্য; আপনি কি বল?

[সাকার-নিরাকার চিন্ময়রূপ ও ভক্ত]

আচার্য — আজ্ঞা, নিরাকার যেমন Electric Current (তড়িৎ-প্রবাহ) চক্ষে দেখা যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, দুই সত্য। শুধু নিরাকার বলা কিরূপ জানো? যেমন রোশনচৌকির একজন পোঁ ধরে থাকে — তার বাঁশির সাত ফোকর সত্ত্বেও। কিন্তু আর-একজন দেখ কত রাগ-রাগিণী বাজায়! সেরূপ সাকারবাদীরা দেখ ঈশ্বরকে কতভাবে সম্ভোগ করে! শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর — নানাভাবে।

“কি জানো, অমৃতকুণ্ডে কোনও রকমে পড়া। তা স্তব করেই হোক অথবা কেউ ধাক্কা মেরেছে আর তুমি কুণ্ডে পড়ে গেছ, একই ফল। দুই জনেই অমর হবে!১

“ব্রাহ্মদের পক্ষে জল বরফ উপমা ঠিক। সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত জলরাশি। মহাসাগরের জল, ঠান্ডা দেশে স্থানে স্থানে যেমন বরফের আকার ধারণ করে, সেইরূপ ভক্তি হিমে সেই সচ্চিদানন্দ (সগুণ ব্রহ্ম) ভক্তের জন্য সাকার রূপ ধারণ করেন। ঋষিরা সেই অতীন্দ্রিয় চিন্ময় রূপ দর্শন করেছিলেন, আবার তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছিলেন। ভক্তের প্রেমের শরীর,২ ‘ভাগবতীতনু’ দ্বারা সেই চিন্ময় রূপ দর্শন হয়।

“আবার আছে, ব্রহ্ম অবাঙ্মনসোগোচর। জ্ঞানসূর্যের তাপে সাকার বরফ গলে যায়। ব্রহ্মজ্ঞানের পর, নির্বিকল্পসমাধির পর, আবার সেই অনন্ত, বাক্যমনের অতীত, অরূপ নিরাকার ব্রহ্ম!

“ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না, চুপ হয়ে যায়। অনন্তকে কে মুখে বোঝাবে! পাখি যত উপরে উঠে, তার উপর আরও আছে, আপনি কি বল?”

আচার্য — আজ্ঞা হাঁ, বেদান্তে ওইরূপ কথাই আছে।

[নির্গুণ ব্রহ্ম ‘অবাঙ্মনসোগোচরম্’ — ত্রিগুণাতীতম্]

শ্রীরামকৃষ্ণ — লবণপুত্তলিকা সাগর মাপতে গিছিল, ফিরে এসে আর খবর দিলে না। এক মতে আছে শুকদেবাদি দর্শন-স্পর্শন করেছিল, ডুব দেয় নাই।

“আমি বিদ্যাসগরকে বলেছিলাম, সব জিনিস এঁটো হয়ে গেছে, কিন্তু ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয় নাই।৩ অর্থাৎ ব্রহ্ম কি, কেউ মুখে বলতে পারে নাই। মুখে বললেই জিনিসটা এঁটো হয়। বিদ্যাসাগর পণ্ডিত, শুনে ভারী খুশি।

“কেদারের ওদিকে শুনেছি বরফে ঢাকা পাহাড় আছে। বেশি উচ্চে উঠলে আর ফিরতে হয় না। যারা বেশি উচ্চেতে কি আছে, গেলে কিরূপ অবস্থা হয় — এ-সব জানতে গিয়েছে, তারা ফিরে এসে, আর খবর দেয় নাই।

“তাঁকে দর্শন হলে মানুষ আনন্দে বিহ্বল হয়ে যায়, চুপ৪ হয়ে যায়। খবর কে দেবে? বুঝাবে কে?

“সাত দেউড়ির পর রাজা। প্রত্যেক দেউড়িতে এক-একজন মহা ঐশ্বর্যবান পুরুষ বসে আছেন। প্রত্যেক দেউড়িতেই শিষ্য জিজ্ঞাসা করছে, এই কি রাজা? গুরুও বলছেন, না; নেতি নেতি। সপ্তম দেউড়িতে গিয়ে যা দেখলে, একেবারে অবাক!৫ আনন্দে বিহ্বল। আর জিজ্ঞাসা করতে হল না ‘এই কি রাজা?’ দেখেই সব সংশয় চলে গেল।”

আচার্য — আজ্ঞে হাঁ, বেদান্তে এইরূপই সব আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — যখন তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন তখন তাঁকে সগুণ ব্রহ্ম, আদ্যাশক্তি বলি। যখন তিনি তিন গুণের অতীত তখন তাঁকে নির্গুণ ব্রহ্ম, বাক্য-মনের অতীত বলা যায়; পরব্রহ্ম।

“মানুষ তাঁর মায়াতে পড়ে স্ব-স্বরূপকে ভুলে যায়। সে যে বাপের অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী তা ভুলে যায়। তাঁর মায়া ত্রিগুণময়ী। এই তিনগুণই ডাকাত, সর্বস্ব হরণ করে; স্ব-স্বরূপকে ভুলিয়ে দেয়। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ — তিন গুণ। এদের মধ্যে সত্ত্বগুণই ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে দেয়। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সত্ত্বগুণও নিয়ে যেতে পারে না।

“একজন ধনী বনপথ দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় তিনজন ডাকাত এসে তাকে ঘিরে ফেলল ও তার সর্বস্ব হরণ করলে। সব কেড়ে-কুড়ে নিয়ে একজন ডাকাত বললে, ‘আর একে রেখে কি হবে? একে মেরে ফেল’ — এই বলে তাকে কাটতে এল। দ্বিতীয় ডাকাত বললে, ‘মেরে ফেলে কাজ নেই, একে আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে এইখানেই ফেলে রেখে যাওয়া যাক। তাহলে পুলিসকে খবর দিতে পারবে না।’ এই বলে ওকে বেঁধে রেখে ডাকাতরা চলে গেল। খানিকক্ষণ পরে তৃতীয় ডাকাতটি ফিরে এল। এসে বললে, ‘আহা তোমার বড় লেগেছে, না? আমি তোমার বন্ধন খুলে দিচ্ছি।’ বন্ধন খুলবার পর লোকটিকে সঙ্গে করে নিয়ে ডাকাত পথ দেখিয়ে দেখিয়ে চলতে লাগল। সরকারী রাস্তার কাছে এসে বললে, ‘এই পথ ধরে যাও, এখন তুমি অনায়াসে নিজের বাড়িতে যেতে পারবে।’ লোকটি বললে, ‘সে কি মহাশয়, আপনিও চলুন; আপনি আমার কত উপকার করলেন। আমাদের বাড়িতে গেলে আমরা কত আনন্দিত হব।’

ডাকাতটি বললে, ‘না, আমার ওখানে যাবার জো নাই, পুলিশে ধরবে।’ এই বলে সে পথ দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল।

“প্রথম ডাকাতটি তমোগুণ, যে বলেছিল, ‘একে রেখে আর কি হবে, মেরে ফেল।’ তমোগুণে বিনাশ হয়। দ্বিতীয় ডাকাতটি রজোগুণ; রজোগুণে মানুষ সংসারে বদ্ধ হয়, নানা কাজ জড়ায়। রজোগুণ ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। সত্ত্বগুণ যেন সিঁড়ির শেষ ধাপ। তারপরেই ছাদ। মানুষের স্বধাম হচ্ছে পরব্রহ্ম। ত্রিগুনাতীত না হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।”

আচার্য — বেশ সব কথা হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — (সহাস্যে) — ভক্তের স্বভাব কি জানো? আমি বলি তুমি শুন, তুমি বল আমি শুনি! তোমরা আচার্য, কত লোককে শিক্ষা দিচ্ছ। তোমরা জাহাজ, আমরা জেলেডিঙি। (সকলের হাস্য)

১ অমৃত কুণ্ড — ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।

অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ।।

[মুন্ডকোপনিষদ, ২।২।১১]

২ নারদ বলিলেন — আমি শুদ্ধা সর্বময়ী ভাগবতীতনু প্রাপ্ত হলাম।

প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীতনুম্।

আরব্ধকর্মনির্বাণো নাপতং পাঞ্চভৌতিকঃ।

[শ্রীমদ্ভাগবত, ১।৬।২৯]

৩ উচ্ছিষ্ট হয় নাই — অচিন্ত্যমব্যপদেশ্যম্ ... অদ্বৈতম্ [মাণ্ডুক্যোপনিষদ, ৭]

৪ যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। [তৈত্তরীয়োপনিষদ, ২।৪]

৫ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ .. তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে। [মুণ্ডকোপিনিষদ, ২।২।৮]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২রা মে 1883/05/02

13.6 নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজে রাখাল, মাস্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

[শ্রীমন্দিরদর্শন ও উদ্দীপন — শ্রীরাধার প্রেমোন্মাদ]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। ব্রাহ্মভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। সঙ্গে রাখাল, মাস্টার প্রভৃতি আছেন। বেলা পাঁচটা হইবে।

৺কাশীশ্বর মিত্রের বাগান বড়ি নন্দনবাগানে। তিনি পূর্বে সদরওয়ালা ছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী। তিনি নিজের বাড়িতেই দ্বিতলায় বৃহৎ

প্রকোষ্ঠমধ্যে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, আর ভক্তদের নিমন্ত্রণ করিয়া মাঝে মাঝে উৎসব করিতেন। তাঁহার স্বর্গরোহণের পর শ্রীনাথ, যজ্ঞনাথ প্রভৃতি তাঁহার পুত্রগণ কিছুদিন ওইরূপ উৎসব করিয়াছিলেন। তাঁহারাই ঠাকুরকে অতি যত্ন করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন।

ঠাকুর প্রথমে আসিয়া নিচে একটি বৈঠকখানাঘরে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে ঘরে ব্রাহ্মভক্তগণ ক্রমে ক্রমে আসিয়া একত্রিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র (ঠাকুর) প্রভৃতি ঠাকুরবংশের ভক্তগণ এই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।

আহূত হইয়া ঠাকুর ভক্তসঙ্গে দ্বিতলায় উপাসনামন্দিরে গিয়া উপবেশন করিলেন। উপাসনার গৃহের পূর্বধারে বেদী রচনা হইয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি ইংরেজী বাদ্যযন্ত্র (Piano) রহিয়াছে। ঘরের উত্তরাংশে কয়েকখানি চেয়ার পাতা আছে। তাহারই পূর্বধারে দ্বার আছে — অন্তঃপুরে যাওয়া যায়।

সন্ধ্যার সময় উৎসবের উপাসনা আরম্ভ হইবে। আদি ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায় দু-একটি ভক্তসঙ্গে বেদীতে বসিয়া উপাসনাকার্য সম্পন্ন করিবেন।

গ্রীষ্মকাল — আজ বুধবার (২০শে বৈশাখ), চৈত্র কৃষ্ণা দশমী তিথি। ২রা মে, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। ব্রাহ্মভক্তেরা অনেকে নিচের বৃহৎ প্রাঙ্গণে বা বারান্দায় বেড়াইতেছেন। শ্রীযুক্ত জানকী ঘোষাল প্রভৃতি কেহ কেহ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপাসনাগৃহে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মুখে ঈশ্বরীয় কথা

শুনিবেন। ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র বেদীর সম্মুখে ঠাকুর প্রণাম করিলেন। আসন গ্রহণ করিয়া রাখাল, মাস্টার প্রভৃতিকে কহিতেছেন —

নরেন্দ্র আমায় বলেছিল, ‘সমাজমন্দির প্রণাম করে কি হয়?’

“মন্দির দেখলে তাঁকেই মনে পড়ে — উদ্দীপন হয়। যেখানে তাঁর কথা হয় সেইখানে তাঁর আবির্ভাব হয়, — আর সকল তীর্থ উপস্থিত হয়। এ-সব জায়গা দেখলে ভগবানকেই মনে পড়ে।

“একজন ভক্ত বাবলাগাছ দেখে ভাবাবিষ্ট হয়েছিল! — এই মনে করে যে, এই কাঠে ঠাকুর রাধাকান্তের বাগানের জন্য কুড়ুলের বাঁট হয়।

“একজন ভক্তের এরূপ গুরুভক্তি যে, গুরুর পাড়ার লোককে দেখে ভাবে বিভোর হয়ে গেল!

“মেঘ দেখে — নীলবসন দেখে — চিত্রপট দেখে — শ্রীমতীর কৃষ্ণের উদ্দীপন হত। তিনি এই সব দেখে উন্মত্তের ন্যায় ‘কোথায় কৃষ্ণ!’ বলে ব্যাকুল হতেন।”

ঘোষাল — উন্মাদ তো ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সে কি গো? একি বিষয়চিন্তা করে উন্মাদ, যে অচৈতন্য হবে? এ অবস্থা যে ভগবানচিন্তা করে হয়! প্রেমোন্মাদ, জ্ঞানোন্মাদ — কি শুন নাই?

[উপায় — ঈশ্বরকে ভালবাসা ও ছয় রিপুকে মোড় ফিরানো]

একজন ব্রাহ্মভক্ত — কি উপায়ে তাঁকে পাওয়া যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁর উপর ভালবাসা। — আর এই সদাসর্বদা বিচার — ঈশ্বরই সত্য, জগৎ অনিত্য।

“অশ্বত্থই সত্য — ফল দুদিনের জন্য।”

ব্রাহ্মভক্ত — কাম, ক্রোধ, রিপু রয়েছে, কি করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ছয় রিপুকে ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও।

“আত্মার সহিত রমণ করা, এই কামনা।

“যারা ঈশ্বরের পথে বাধা দেয় তাদের উপর ক্রোধ। তাঁকে পাবার লোভ। ‘আমার আমার’ যদি করতে হয়, তবে তাঁক লয়ে। যেমন — আমার কৃষ্ণ, আমার রাম। যদি অহংকার করতে হয় তো বিভীষণের মতো! — আমি রামকে প্রণাম করেছি — এ-মাথা আর কারু কাছে অবনত করব না।”

ব্রাহ্মভক্ত — তিনিই যদি সব করাচ্ছেন, তাহলে আমি পাপের জন্য দায়ী নই?

[Free Will, Responsibility (পাপের দায়িত্ব)]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — দুর্যোধন ওই কথা বলেছিল,

“ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

“যার ঠিক বিশ্বাস — ‘ঈশ্বরই কর্তা আর আমি অকর্তা’ — তার পাপ কার্য হয় না। যে নাচতে ঠিক শিখেছে তার বেতালে পা পড়ে না।

“অন্তর শুদ্ধ না হলে ঈশ্বর আছেন বলে বিশ্বাসই হয় না!”

ঠাকুর উপাসনাগৃহে সমবেত লোকগুলিকে দেখিতেছেন ও বলিতেছেন — “মাঝে মাঝে এরূপ একসঙ্গে ঈশ্বরচিন্তা ও তাঁর নামগুণকীর্তন করা খুব ভাল।

“তবে সংসারী লোকদের ঈশ্বরে অনুরাগ ক্ষণিক — যেমন তপ্ত লৌহে জলের ছিটে দিলে, জল তাতে যতক্ষণ থাকে!”

[ব্রাহ্মোপাসনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ]

এইবার উপাসনা আরম্ভ হবে। উপাসনার বৃহৎ প্রকোষ্ঠ ব্রাহ্মভক্তে পরিপূর্ণ হইল। কয়েকটি ব্রাহ্মিকা ঘরের উত্তরদিকে চেয়ারে আসিয়া বসিলেন — হাতে সঙ্গীতপুস্তক।

পিয়ানো ও হারমোনিয়াম সংযোগে ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইতে জাগিল। সঙ্গীত শুনিয়া ঠাকুরের আনন্দের সীমা রহিল না। ক্রমে উদ্বোধন — প্রার্থনা — উপাসনা। বেদীতে উপবিষ্ট আচার্যগণ বেদ হইতে মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন:

‘ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নোবোধি। নমস্তেস্তু মা মা হিংসীঃ।

‘তুমি আমাদের পিতা, আমাদের সদ্বুদ্ধি দাও — তোমাকে নমস্কার। আমাদিগকে বিনাশ করিও না।’

ব্রাহ্মভক্তেরা সমস্বরে আচার্যের সহিত বলিতেছেন:

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতংযদ্বিভাতি।
শান্তং শিবমদ্বৈতম্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

এইবার আচার্যগণ স্তব করিতেছেন:

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়
নমস্তে চিতে সর্বলোকাশ্রয়ায়। ইত্যাদি।

স্তোত্রপাঠের পর আচার্যেরা প্রার্থনা করিতেছেন:

অসতো মা সদ্‌গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়। ...আবিরাবীর্ম এধি।
...রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

স্তোত্রাদি পাঠ শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। এইবার আচার্য প্রবন্ধ পাঠ করিতেছেন।

[অক্রোধ পরমানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ — অহেতুক কৃপাসিন্ধু]

উপাসনা হইয়া গেল। ভক্তদের লুচি, মিষ্টান্ন আদি খাওয়াইবার উদ্যোগ হইতেছে। ব্রাহ্মভক্তেরা অধিকাংশই নিচের প্রাঙ্গণে ও বারান্দায় বায়ুসেবন করিতেছেন।

রাত নয়টা হইল। ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। গৃহস্বামীরা আহূত সংসারীভক্তদের লইয়া খাতির করিতে করিতে এত ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন যে, ঠাকুরের আর কোন সংবাদ লইতে পারিতেছেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখাল প্রভৃতির প্রতি) — কিরে কেউ ডাকে না যে রে!

রাখাল (সক্রোধে) — মহাশয়, চলে আসুন —— দক্ষিণেশ্বরে যাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্য) — আরে রোস্ —— গাড়িভাড়া তিন টাকা দুআনা কে দেবে! — রোখ করলেই হয় না। পয়সা নাই আবার ফাঁকা রোখ! আর এত রাত্রে খাই কোথা!

অনেকক্ষণ পরে শোনা গেল, পাতা হইয়াছে। সব ভক্তদের এককালে আহ্বান করা হইল। সেই ভিড়ে ঠাকুর রাখাল প্রভৃতির সঙ্গে দ্বিতলায় জলযোগ করিতে চলিলেন। ভিড়েতে বসিবার জায়গা পাওয়া যাইতেছে না। অনেক কষ্টে ঠাকুরকে একধারে বসানো হইল।

স্থানটি অপরিষ্কার। একজন রন্ধনী-ব্রাহ্মণী তরকারি পরিবেশন করিল —— ঠাকুরের তরকারি খাইতে প্রবৃত্তি হইল না। তিনি নুন টাক্‌না দিয়া লুচি খাইলেন ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুর দয়াসিন্ধু। গৃহস্বামীদের ছোকরা বয়স। তাহারা তাঁহার পূজা করিতে জানে না বলিয়া তিনি কেন বিরক্ত হইবেন? তিনি না খাইয়া চলিয়া গেলে যে, তাহাদের অমঙ্গল হইবে। আর তাহারা ঈশ্বরকে উদ্দেশ করিয়াই এই সমস্ত আয়োজন করিয়াছে।

আহারান্তে ঠাকুর গাড়িতে উঠিলেন। গাড়িভাড়া কে দিবে? গৃহস্বামীদের দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে না। ঠাকুর গাড়িভাড়া সম্বন্ধে ভক্তদের কাছে আনন্দ করিতে করিতে গল্প করিয়াছিলেন —

"গাড়িভাড়া চাইতে গেল। তা প্রথমে হাঁকিয়া দিলে! — তারপর অনেক কষ্টে তিন টাকা পাওয়া গেল, দুআনা আর দিলে না! বলে, ওইতেই হবে।"

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৩ই মে 1883/05/13

13.7 শ্রীরামকৃষ্ণ হরিকীর্তনানন্দে — হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভায় ও রামচন্দ্রের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় কাঁসারীপাড়া হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভায় শুভাগমন করিয়াছেন; রবিবার (৩১শে) বৈশাখ, শুক্লা সপ্তমী, ১৩ই মে, ১৮৮৩

খ্রীষ্টাব্দ। আজ সভার বার্ষিক উৎসব হইতেছে। মনোহরসাঁই-এর কীর্তন হইতেছে।

‘মান’ এই পালা গান হইতেছে। সখীরা শ্রীমতীকে বলছেন, “মান কেন করলি, তবে তুই বুঝি কৃষ্ণের সুখ চাস না।” শ্রীমতী বলছেন, “চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে, যাবার জন্য নয়। সেখানে যাওয়া কেন? সে যে সেবা জানে না!”

পরের রবিবার (২০-৫-৮৩) রামচন্দ্রের বাটীতে আবার কীর্তন হইতেছে, মাথুর গান। ঠাকুর আসিয়াছেন। বৈশাখ, শুক্লা চতুর্দশী; ৭ই জ্যৈষ্ঠ। মাথুর গান হইতেছে, শ্রীমতী কৃষ্ণের বিরহে অনেক কথা বলিতেছেন, ”বালিকা অবস্থা থেকেই শ্যামকে দেখতে ভালবাসতাম। সখি, নখের ছনদ দিন গুণিতে ক্ষয় হয়ে গেছে। দেখ, তিনি যে মালা দিয়েছেন, সে মালা শুকায়ে গিয়েছে, তবু ফেলি নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের উদয় কোথা হল? সে চন্দ্র, মান রাহুর ভয়ে বুঝি চলে গেল! হায়, সেই কৃষ্ণ মেঘকে আবার কবে দর্শন হবে; আর কি দেখা হবে! বঁধু, প্রাণ ভরে তোমায় কখনও দেখিতে পাই নাই; একে দুটি চোখ তাতে নিমিখ, তাতে বারিধারা। তাঁর শিরে ময়ূর পাখা যেন স্থির বিজলী। ময়ূরগণ সেই মেঘ দেখে পাখা তুলে নৃত্য করত।

“সখি, এ প্রাণ তো থাকিবে না — রেখো দেহ তমালের ডালে, আর আবার গায়ে কৃষ্ণনাম লিখে দিও!”

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, “তিনি আর তাঁর নাম অভেদ; তাই শ্রীমতী এইরূপ বলছেন। যেই রাম সেই নাম।” ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া এই মাথুর কীর্তন গান

শুনিতেছেন। গোস্বামী কীর্তনিয়া এই সকল গান গাইতেছেন। আগামী রবিবারে আবার দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ওই গান হইবে। তাহার পরের শনিবারে আবার অধরের বাড়িতে ওই কীর্তন হইবে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৭শে মে 1883/05/27

13.8 দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে নিজের ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন ও ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন। আজ রবিবার, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, কৃষ্ণা পঞ্চমী; ২৭শে মে, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। বেলা ৯টা হইবে। ভক্তেরা ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টার প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি) — বিদ্বেষভাব ভাল নয়, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক এরা ঝগড়া করে, সেটা ভাল নয়। পদ্মলোচন বর্ধমানের সভাপণ্ডিত ছিল; সভায় বিচার হচ্ছিল, — শিব বড় না ব্রহ্মা বড়। পদ্মলোচন বেশ বলেছিল — আমি জানি না, আমার সঙ্গে শিবেরও আলাপ নেই, ব্রহ্মারও আলাপ নেই। (সকলের হাস্য)

“ব্যাকুলতা থাকলে সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। তবে নিষ্ঠা থাকা ভাল। নিষ্ঠাভক্তির আর-একটি নাম অব্যভিচারিণী ভক্তি। যেমন এক ডেলে গাছ, সোজা উঠেছে। ব্যভিচারিণী ভক্তি যেমন পাঁচ ডেলে গাছ। গোপীদের এমনি নিষ্ঠা যে, বৃন্দাবনের মোহনচূড়া, পীতধড়াপরা রাখালকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু ভালবাসবে না। মথুরায় যখন রাজবেশ, পাগড়ি মাথায় কৃষ্ণকে দর্শন করলে তখন তারা ঘোমটা দিলে। আর বললে, ইনি আবার কে? এঁর সঙ্গে আলাপ করে আমরা কি দ্বিচারিণী হব?

“স্ত্রী যে স্বামীর সেবা করে সেও নিষ্ঠাভক্তি, দেবর ভাসুরকে খাওয়ায়, পা ধোয়ার জল দেয়, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে অন্য সম্বন্ধ। সেইরূপ নিজের ধর্মতেও নিষ্ঠা হতে পারে। তা বলে অন্য ধর্মকে ঘৃণা করবে না। বরং তাদের সঙ্গে মিষ্ট ব্যবহার করবে।”

[জগন্মাতার পূজা ও আত্মপূজা — ‘বিপদনাশিনী’ মন্ত্র ও নৃত্য]

ঠাকুর গঙ্গাস্নান করিয়া কালীঘরে গিয়াছেন। সঙ্গে মাস্টার। ঠাকুর পূজার আসনে উপবিষ্ট হইয়া, মার পাদপদ্মে ফুল দিতেছেন, মাঝে মাঝে নিজের মাথায়ও দিতেছেন ও ধ্যান করিতেছেন।

অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর আসন হইতে উঠিলেন। ভাবে বিভোর, নৃত্য করিতেছেন। আর মুখে মার নাম করিতেছেন। বলিতেছেন, “মা বিপদনাশিনী গো, বিপদনাশিনী!” দেহধারণ করলেই দুঃখ বিপদ, তাই বুঝি জীবকে

শিখাইতেছেন তাঁহাকে ‘বিপদনাশিনী’ এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কাতর হইয়া ডাকিতে।

[পূর্বকথা — শ্রীরামকৃষ্ণ ও ঝামাপুকুরের নকুড় বাবাজী]

এইবার ঠাকুর নিজের ঘরের পশ্চিম বারান্দায় আসিয়া উপবিষ্ট হইয়াছেন। এখনও ভাবাবেশ রহিয়াছে। কাছে রাখাল, মাস্টার, নকুড়, বৈষ্ণব প্রভৃতি। নকুড় বৈষ্ণবকে ঠাকুর ২৮/২৯ বৎসর ধরিয়া জানেন। যখন তিনি প্রথম কলিকাতায় আসিয়া ঝামাপুকুরে ছিলেন ও বাড়ি বাড়ি পূজা করিয়া বেড়াইতেন, তখন নকুড় বৈষ্ণবের দোকানে আসিয়া মাঝে মাঝে বসিতেন ও আনন্দ করিতেন। পেনেটীতে রাঘব পণ্ডিতের মহোৎসবে উপলক্ষে নকুড় বাবাজী ইদানীং ঠাকুরকে প্রায় বর্ষে বর্ষে দর্শন করিতেন। নকুড় ভক্ত বৈষ্ণব, মাঝে মাঝে তিনিও মহোৎসব দিতেন। নকুড় মাস্টারের প্রতিবেশী। ঠাকুর ঝামাপুকুরে যখন ছিলেন, গোবিন্দ চাটুজ্যের বাড়িতে থাকিতেন। সেই পুরাতন বাটী নকুড় মাস্টারকে দেখাইয়াছিলেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার নামকীর্তনানন্দে]

ঠাকুর ভাবাবেশে গান গাইতেছেন:

কীর্তন

১। সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী।
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ, আপনি দাও মা করতালি ।।

আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা শশিভালি।
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন (তুই) মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ।।
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার তন্ত্রে চলি।
যেমন করাও তেমনি করি মা, যেমন বলাও তেমনি বলি ।।
নির্গুণে কমলাকান্ত দিয়ে বলে মা গালাগালি।
সর্বনাশী ধরে অসি ধর্মাধর্ম দুটো খেলি ।।

২। আমার মা ত্বং হি তারা
তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
আমি জানি মা ও দীন-দয়াময়ী, তুমি দুর্গমেতে দুখহরা।
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি জগধাত্রী, গো মা
তুমি অকুলের ত্রাণকর্ত্রী, সদাশিবের মনোরমা।
তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমি আদ্যমূলে গো মা
আছ সর্বঘটে অর্ঘ্যপুটে সাকার আকার নিরাকারা।

৩। গোলমালে মাল রয়েছে, গোল ছেড়ে মাল বেছে নাও।

৪। মন চল যাই, আর কাজ নাই, তারাও ও তালুকে রে!

৫। পড়িয়ে ভবসাগরে, ডোবে মা তনুর তরী;
মায়া-ঝড় মোহ-তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী।

৬। মায়ে পোয়ে দুটো দুখের কথা কি।
কারুর হাতির উপর ছি, কারু চিঁড়ের উপর খাসা দই।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলিতেছেন, সংসারীদের সম্মুখে কেবল দুঃখের কথা ভাল নয়। আনন্দ চাই। যাদের অন্নাভাব, তারা দুদিন বরং উপোস করতে পারে; আর যাদের খেতে একটু বেলা হলে অসুখ হয়, তাদের কাছে কেবল কান্নার কথা, দুঃখের কথা ভাল নয়।

“বৈষ্ণবচরণ বলত, কেবল পাপ পাপ — এ-সব কি? আনন্দ কর।”

ঠাকুর আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিতে না করিতে মনোহরসাঁই গোস্বামী আসিয়া উপস্থিত।

[শ্রীরাধার ভাবে মহাভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণ — ঠাকুর কি গৌরাঙ্গ!]

গোস্বামী পূর্বরাগ কীর্তন গান করিতেছেন। একটু শুনিতে শুনিতেই ঠাকুর রাধার ভাবে ভাববিষ্ট।

প্রথমেই গৌরচন্দ্রিকা কীর্তন। “করতলে হাত — চিন্তিত গোরা — আজ কেন চিন্তিত? — বুঝি রাধার ভাবে হয়েছে ভাবিত।”

গোস্বামী আবার গান গাইতেছেন:

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আসে যায়
কিবা মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্ব কাননে চায়।
(রাই, এমন কেন বা হল গো!)

গানের এই লাইনটি শুনিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাবের অবস্থা হইয়াছে। গায়ের জামা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

কীর্তনিয়া যখন গাইতেছেন:

শীতল তছু অঙ্গ।

তনু পরশে, অমনি অবশ অঙ্গ!

মহাভাবে ঠাকুরের কম্প হইতেছে!

(কেদার দৃষ্টে) ঠাকুর কীর্তনের সুরে বলিতেছেন, "প্রাণনাথ, হৃদয়বল্লভ তোরা কৃষ্ণ এনে দে; সুহৃদের তো কাজ বটে; হয় এনে দে, না হয় আমায় নিয়ে চল; তোদের চিরদাসী হব।"

গোস্বামী কীর্তনিয়া ঠাকুরের মহাভাবের অবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি করজোড়ে বলিতেছেন, "আমার বিষয়বুদ্ধি ঘুচিয়ে দিন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — "সাধু বাসা পাকড় লিয়া।" তুমি এত বড় রসিক; তোমার ভিতের থেকে এত মিষ্ট রস বেরুচ্ছে!

গোস্বামী — প্রভু, আমি চিনির বলদ, চিনির আস্বাদন করতে কই পেলাম?

আবার কীর্তন চলিতে লাগিল। কীর্তনিয়া শ্রীমতীর দশা বর্ণনা করিতেছেন —

"কোকিল-কুলকুবতি কলনাদম্"

কোকিলের কলনাদ শুনে শ্রীমতির বজ্রধ্বনি বলে মনে হচ্ছে। তাই জৈমিনির নাম কচ্ছেন। আর বলছেন, “সখি, কৃষ্ণ বিরহে এ প্রাণ থাকিবে না —— রেখো দেহ তমালের ডালে।”

গোস্বামী রাধাশ্যামের মিলন গান গাহিয়া কীর্তন সমাপ্ত করিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২রা জুন 1883/06/02/i

13.9 কলিকাতায় বলরাম ও অধরের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দির হইতে কলিকাতায় আসিতেছেন। বলরামের বাড়ি হইয়া অধরের বাড়ি যাইবেন। তারপর রামের বাড়ি যাইবেন। অধরের বাড়িতে মনোহরসাঁই কীর্তন হইবে। রামের বাড়িতে কথাকতা হইবে। আজ শনিবার, ২০শে জৈষ্ঠ (১২৯০), কৃষ্ণা দ্বাদশী, ২রা জুন, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ।

ঠাকুর গাড়ি করিয়া আসিতে আসিতে রাখাল ও মাস্টার প্রভৃতি ভক্তদের বলিতেছেন, “দেখ, তাঁর উপর ভালবাসা এলে পাপ-টাপ সব পালিয়ে যায়, সূর্যের তাপে যেমন মেঠো পুকুরে জল শুকিয়ে যায়।”

[সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের বিষয়াসক্তি]

“বিষয়ের উপর, কামিনী-কাঞ্চনের উপর, ভালবাসা থাকলে হয় না। সন্ন্যাস করলেও হয় না যদি বিষয়াসক্তি থাকে। যেমন থুথু ফেলে আবার থুথু খাওয়া!”

কিয়ৎক্ষণ পরে গাড়িতে ঠাকুর আবার বলিতেছেন, “ব্রহ্মজ্ঞানীরা সাকার মানে না। (সহাস্যে) নরেন্দ্র বলে ‘পুত্তলিকা’! আবার বলে, ‘উনি এখনও কালীঘরে যান’!”

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরলীলা দর্শন ও আস্বাদন]

ঠাকুর বলরামের বাড়ি আসিয়াছেন।

ঠাকুর হঠাৎ ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। বুঝি দেখিতেছেন, ঈশ্বরই জীবজগৎ হইয়া রহিয়াছেন, ঈশ্বরই মানুষ হইয়া বেড়াইতেছেন। জগন্মাতাকে বলিতেছেন, “মা, একি দেখাচ্ছ! থাম; আবার কত কি! রাখাল-টাখালকে দিয়ে কি দেখাচ্ছ! রূপ-টুপ সব উড়ে গেল। তা মা, মানুষ তো কেবল খোলটা বই তো নয়। চৈতন্য তোমারই।

“মা, ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীরা মিষ্টরস পায় নাই। চোখ শুকনো, মুখ শুকনো! প্রেমভক্তি না হলে কিছুই হল না।

“মা, তোমাকে বলেছিলাম, একজনকে সঙ্গী করে দাও আমার মতো। তাই বুঝি রাখালকে দিয়েছ।”

[অধরের বাটীতে হরিকীর্তনানন্দে]

ঠাকুর অধরের বাড়ি আসিয়াছেন। মনোহরসাঁই কীর্তনের আয়োজন হইতেছে।

অধরের বৈঠকখানায় অনেকগুলি ভক্ত ও প্রতিবেশী ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সকলের ইচ্ছা ঠাকুর কিছু বলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — সংসার আর মুক্তি দুই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তিনিই সংসারে অজ্ঞান করে রেখেছেন; আবার তিনিই ইচ্ছা করে যখন ডাকবেন তখন মুক্তি হবে। ছেলে খেলতে গেছে, খাবার সময় মা ডাকে।

“যখন তিনি মুক্তি দেবেন তখন তিনি সাধুসঙ্গ করিয়ে নেন। আবার তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুলতা করে দেন।”

প্রতিবেশী — মহাশয়, কিরকম ব্যাকুলতা?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কর্ম গেলে কেরানির যেমন ব্যাকুলতা হয়! সে যেমন রোজ আফিসে আফিসে ঘোরে, আর জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁগা কোনও কর্মখালি হয়েছে? ব্যাকুলতা হলে ছটফট করে — কিসে ঈশ্বরকে পাব!

“গোঁপে চাড়া, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আছেন, পান চিবুচ্ছেন, কোন ভাবনা নেই এরূপ অবস্থা হলে ঈশ্বরলাভ হয় না!”

প্রতিবেশী — সাধুসঙ্গ হলে এই ব্যাকুলতা হতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, হতে পারে, তবে পাষণ্ডের হয় না। সাধুর কমণ্ডলু চার-ধাম করে এল, তবু যেমন তেতো তেমনি তেতো!

এইবার কীর্তন আরম্ভ হইয়াছে। গোস্বামী কলহান্তরিতা গাইতেছেন:

শ্রীমতী বলছেন, সখি, প্রাণ যায়, কৃষ্ণ এনে দে!

সখী — রাধে, কৃষ্ণমেঘে বরিষণ হত, কিন্তু তুই মান-ঝঞ্ঝাবাতে মেঘ উড়াইলি। তুই কৃষ্ণসুখে সুখী নস্, তাহলে মান করবি কেন?

শ্রীমতী — সখি, মান তো আমার নয়। যার মান তার সঙ্গে গেছে।

ললিতা শ্রীমতীর হয়ে দুটো কথা বলছেন —

সবহুঁ মিলি কয়লি প্রীত...
কোই দেখাইলি ঘাটে মাঠে, বিশাখা দেখালি চিত্রপটে!

এইবার কীর্তনে গোস্বামী বলছেন যে, সখীরা রাধাকুণ্ডের নিকট শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। তারপর যমুনাপুলিনে শ্রীকৃষ্ণদর্শন, শ্রীদাম-সুদাম মধুমঙ্গল সঙ্গে, বৃন্দার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথা, শ্রীকৃষ্ণের যোগিবেশ, জটিলা সংবাদ, রাধার ভিক্ষা দেন, রাধার হাত দেখে যোগীর গণনা ও ফাঁড়া কথন। কাত্যায়নীপূজায় যাওয়ার আয়োজন কথা।

[The Humanity of Avatars]

কীর্তন সমাপ্ত হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে আলাপ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — গোপীরা কাত্যায়নীপূজা করেছিলেন। সকলেই সেই মহামায়া আদ্যাশক্তির অধীনে। অবতার আদি পর্যন্ত মায়া আশ্রয় করে তবে লীলা করেন। তাই তাঁরা আদ্যাশক্তির পূজা করেন। দেখ না, রাম সীতার জন্য কত কেঁদেছেন। "পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।"

"হিরণ্যাক্ষকে বধ করে বরাহ অবতার ছানা-পোনা নিয়ে ছিলেন। আত্মবিস্মৃত হয়ে তাদের মাই দিচ্ছিলেন! দেবতারা পরামর্শ করে শিবকে পাঠিয়ে দিলেন। শিব শূলের আঘাতে বরাহের দেহ ভেঙে দিলেন; তবে তিনি স্বধামে চলে গেলেন। শিব জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি আত্মবিস্মৃত হয়ে আছ কেন? তাতে তিনি বলেছিলেন, আমি বেশ আছি!"

অধরের বাটী হইয়া এইবার ঠাকুর রামের বাটীতে গমন করিতেছেন। সেখানে কথকঠাকুরের মুখে উদ্ধব-সংবাদ শুনিলেন। রামের বাটীতে কেদারাদি ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২রা জুন 1883.06/02/ii

13.10 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় ভক্তমন্দিরে — শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ি কীর্তনানন্দে

ঠাকুর অধরের বাড়ি হইতে কলহান্তরিতা কীর্তন শ্রবণ করিয়া রামের বাড়ি আসিয়াছেন। সিমুলিয়া মধু রায়ের গলি।

রামচন্দ্র ডাক্তারী শিক্ষা করিয়া ক্রমে মেডিক্যাল কলেজে সহকারী কেমিক্যাল এক্‌জামিনার হইয়াছিলেন ও Science Association-এ রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি স্বোপার্জিত অর্থে বাড়িটি নির্মাণ করিয়াছেন। এ-স্থানে ঠাকুর কয়েকবার শুভাগমন করিয়াছিলেন, তাই ভক্তদের কাছে এটি আজ মহাতীর্থস্থান। রামচন্দ্র শ্রীগুরুর করুণাবলে বিদ্যার সংসার করিতে চেষ্টা করিতেন। ঠাকুর দশমুখে রামের সুখ্যাতি করিতেন — বলিতেন, রাম বাড়িতে ভক্তদের স্থান দেয়, কত সেবা করে, তাদের বাড়ি ভক্তদের একটি আড্ডা। নিত্যগোপাল, লাটু, তারক (শিবানন্দ), রামচন্দ্রের একরকম বাড়ির লোক হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত অনেকদিন একসঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। আর বাড়িতে ৺নারায়ণের নিত্য সেবা।

রাম ঠাকুরকে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন — ফুলদোলের দিন — এই ভদ্রাসন বাটীতে পূজার্থে প্রথম লইয়া আসিবেন। প্রায় প্রতিবর্ষে ওই দিনে ঠাকুরকে লইয়া গিয়া ভক্তদের লইয়া মহোৎসব করিতেন। রামচন্দ্রের সন্তানপ্রতিম শিষ্যেরা এখনও অনেকে ওই দিনে উৎসব করেন।

আজ রামের বাড়ি উৎসব! প্রভু আসিবেন। রাম শ্রীমদ্‌ভাগবত-কথামৃত তাঁহাকে শুনাইবার আয়োজন করিয়াছেন। ছোট উঠান কিন্তু তাহার ভিতরই কত পরিপাটি। বেদী রচনা হইয়াছে, তাহার উপর কথকঠাকুর উপবিষ্ট। রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা হইতেছে, এমন সময় বলরাম ও অধরের বাড়ি হইয়া ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত। রামচন্দ্র আগুয়ান হইয়া ঠাকুরের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বেদীর সম্মুখে তাঁহার পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট আসনে বসাইলেন। চতুর্দিকে ভক্তেরা। কাছে মাস্টার।

[রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ]

রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা চলিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র বলিলেন, "মহারাজ! আমাকে সসাগরা পৃথিবী দান করিয়াছ, অতএব ইহার ভিতর তোমার স্থান নাই। তবে ৺কাশীধামে তুমি থাকিতে পার। সে মহাদেবের স্থান। চল, তোমাকে, তোমার সহধর্মিণী শৈব্যা ও তোমার পুত্র সহিত সেখানে পৌঁছাইয়া দিই। সেইখানে গিয়া তুমি দক্ষিণা যোগাড় করিয়া দিবে।" এই বলিয়া রাজাকে লইয়া ভগবান বিশ্বামিত্র ৺কাশীধাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাশীতে পৌঁছিয়া সকলে ৺বিশ্বেশ্বর-দর্শন করিলেন।

৺বিশ্বেশ্বর-দর্শন কথা হইবামাত্র, ঠাকুর একেবারে ভাবাবিষ্ট; 'শিব' 'শিব' এই কথা অস্পষ্ট উচ্চারণ করিতেছেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র দক্ষিণা দিতে পারিলেন না — কাজে কাজেই শৈব্যাকে বিক্রয় করিলেন। পুত্র রোহিতাশ্ব শৈব্যার সঙ্গে রহিলেন। কথকঠাকুর শৈব্যার প্রভু

ব্রাহ্মণের বাড়ি রোহিতাশ্বের পুষ্পচয়ন কথা ও সর্পদংশন কথাও বলিলেন। সেই তমসাচ্ছন্ন কালরাত্রে সন্তানের মৃত্যু হইল। সংকার করিবার কেহ নাই। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রভু শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন না — শৈব্যা একাকী পুত্রের শবদেহ ক্রোড়ে করিয়া শ্মশানাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে মেঘগর্জন ও অশনিপাত — নিবিড় অন্ধকার যেন বিদীর্ণ করিয়া এক-একবার বিদ্যুৎ খেলেতেছিল। শৈব্যা ভয়াকুলা শোকাকুলা, — রোদন করিতে করিতে আসিতেছেন।

হরিশ্চন্দ্র দক্ষিণার টাকা সমস্ত হয় নাই বলিয়া চণ্ডালের কাছে নিজেকে বিক্রয় করিয়াছেন। তিনি শ্মশানে চণ্ডাল হইয়া বসিয়া আছেন। কড়ি লইয়া সংকার কার্য সম্পাদন করিবেন। কত শবদেহ জ্বলিতেছে, কত ভস্মাবশেষ হইয়াছে। সেই অন্ধকার রজনীতে শ্মশান কি ভয়ঙ্কর হইয়াছে। শৈব্যা সেই স্থানে আসিয়া রোদন করিতেছেন — সে ক্রন্দন-বর্ণনা শুনিলে কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কোন্ দেহধারী জীবের হৃদয় বিগলিত না হয়? সমবেত শ্রোতাগণ হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছেন।

ঠাকুর কি করিতেছেন? স্থির হইয়া শুনিতেছেন — একেবারে স্থির — একবার মাত্র চক্ষের কোণে একটি বারিবিন্দু উদ্গত হইল, সেইটি মুছিয়া ফেলিলেন। অস্থির হইয়া হাহাকার করিলেন না কেন?

শেষে বিশ্বামিত্রের আগমন, রোহিতাশ্বের জীবনদান, সকলে 'বিশ্বেশ্বর-দর্শন ও হরিশ্চন্দ্রের পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্তি বর্ণনা করিয়া, কথকঠাকুর কথা সাঙ্গ করিলেন। ঠাকুর বেদীর সম্মুখে বসিয়া অনেকক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিলেন। কথা সাঙ্গ

হইলে তিনি বাহিরের ঘরে গিয়া বসিলেন। চতুর্দিকে ভক্তমণ্ডলী, কথকঠাকুরও কাছে আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর কথককে বলিতেছেন, "কিছু উদ্ধব-সংবাদ বল।"

[মুক্তি ও ভক্তি — গোপীপ্রেম — গোপীরা মুক্তি চান নাই]

কথক বলিলেন, যখন উদ্ধব শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলেন, রাখালগণ ও ব্রজগোপিগণ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। সকলেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ কেমন আছেন। তিনি কি আমাদের ভুলে গেছেন? তিনি কি আমাদের নাম করেন?" এই বলিয়া কেহ কাঁদিতে লাগিলেন, কেহ কেহ তাঁহাকে লইয়া বৃন্দাবনের নানা স্থান দেখাইতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন, "এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ করিয়াছিলেন, এখানে ধেনুকাসুর বধ, এখানে শকটাসুর বধ করিয়াছিলেন। এই মাঠে গরু চড়াইতেন, এই যমুনাপুলিনে তিনি বিহার করিতেন। এখানে রাখালদের লইয়া ক্রীড়া করিতেন; এইসকল কুঞ্জে গোপীদের সহিত আলাপ করিতেন।" উদ্ধব বলিলেন, "আপনারা কৃষ্ণের জন্য অত কাতর হইতেছেন কেন? তিনি সর্বভূতে আছেন। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান। তিনি ছাড়া কিছুই নাই।" গোপীরা বলিলেন, "আমরা ও-সব বুঝিতে পারি না। আমরা লেখাপড়া কিছুই জানি না। কেবল আমাদের বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে জানি, ইনি এখানে নানা ক্রীড়া করিয়া গিয়াছেন।" উদ্ধব বলিলেন, "তিনি সাক্ষাৎ ভগবান, তাঁকে চিন্তা করিলে আর এ-সংসারে আসিতে হয় না, জীব মুক্ত হয়ে যায়।" গোপীরা বলিলেন, "আমরা মুক্তি — এ-সব কথা বুঝি না। আমরা আমাদের প্রাণের কৃষ্ণকে দেখিতে চাই।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই সকল কথা এক মনে শুনিতে লাগিলেন ও ভাবে বিভোর হইলেন। বলিলেন, "গোপীরা ঠিক বলেছেন।" এই বলিয়া তাঁহার সেই মধুরকণ্ঠে গান গাহিতে লাগিলেন:

আমি মুক্তি দিতে কাতর নই,
    শুদ্ধাভক্তি দিতে কাতর হই (গো)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কথকের প্রতি) — গোপীদের ভক্তি প্রেমাভক্তি; অব্যভিচারিণী ভক্তি, নিষ্ঠাভক্তি। ব্যভিচারিণী ভক্তি কাকে বলে জানো? জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। যেমন, কৃষ্ণই সব হয়েছেন। তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই রাম, তিনিই শিব, তিনিই শক্তি। কিন্তু ও জ্ঞানটুকু প্রেমাভক্তির সঙ্গে মিশ্রিত নাই। দ্বারকায় হনুমান এসে বললে, "সীতা-রাম দেখব।" ঠাকুর রুক্মিণীকে বললেন, "তুমি সীতা হয়ে বস, তা না হলে হনুমানের কাছে রক্ষা নাই।" পাণ্ডবেরা যখন রাজসূয় যজ্ঞ করেন, তখন যত রাজা সব যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসিয়া প্রণাম করতে লাগল। বিভীষণ বললেন, "আমি এক নারায়ণকে প্রণাম করব, আর কারুকে করব না।" তখন ঠাকুর নিজে যুধিষ্ঠিরকে ভুমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে লাগলেন। তবে বিভীষণ রাজমুকুটসুদ্ধ সাষ্টাঙ্গ হয়ে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে।

"কিরকম জানো? যেমন বাড়ির বউ! দেওর, ভাশুর, শ্বশুর, স্বামী — সকলকে সেবা করে, পা ধোবার জল দেয়, গামছা দেয়, পিঁড়ে পেতে দেয়, কিন্তু এক স্বামীর সঙ্গেই অন্যরকম সম্বন্ধ।

“এই প্রেমাভক্তিতে দুটি জিনিস আছে। ‘অহংতা’ আর ‘মমতা’। যশোদা ভাবতেন, আমি না দেখলে গোপালকে কে দেখবে, তাহলে গোপালের অসুখ করবে। কৃষ্ণকে ভগবান বলে যশোদার বোধ ছিল না। আর ‘মমতা’ — আমার জ্ঞান, আমার গোপাল। উদ্ধব বললেন, ‘মা! তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি জগৎ চিন্তামণি। তিনি সামান্য নন।’ যশোদা বললেন, ‘ওরে, তোদের চিন্তামণি নয়, আমার গোপাল কেমন আছে জিজ্ঞাসা করছি। — চিন্তামণি না, আমার গোপাল।’

“গোপীদের কি নিষ্ঠা! মথুরায় দ্বারীকে অনেক কাকুতি-মিনতি করে সভায় ঢুকল। দ্বারী কৃষ্ণের কাছে তাদের লয়ে গেল। কিন্তু পাগড়ি-বাঁধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখে তারা হেঁটমুখ হয়ে রইল। পরস্পর বলতে লাগল, ‘এ পাগড়ি-বাঁধা আবার কে! এঁর সঙ্গে আলাপ কল্লে আমরা কি শেষে দ্বিচারিণী হব! আমাদের পীতধড়া, মোহনচূড়া-পরা সেই প্রাণবল্লভ কোথায়!’

“দেখেছ, এদের কি নিষ্ঠা! বৃন্দাবনের ভাবই আলাদা। শুনেছি, দ্বারকার কাছে লোকেরা অর্জুনের কৃষ্ণকে পূজা করে। তারা রাধা চায় না।”

[গোপীদের নিষ্ঠা — জ্ঞানভক্তি ও প্রেমাভক্তি]

ভক্ত — কোন্‌টি ভাল, জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তি, না প্রেমাভক্তি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বরে খুব ভালবাসা না হলে প্রেমাভক্তি হয় না। আর ‘আমার’ জ্ঞান। তিন বন্ধু বন দিয়ে যাচ্ছে, বাঘ এসে উপস্থিত। একজন বললে, “ভাই! আমরা সব মারা গেলুম!” একজন বললে, “কেন? মারা যাব কেন? এর ঈশ্বরকে

ডাকি।" আর-একজন বললে, "না, তাঁকে আর কষ্ট দিয়ে কি হবে? এস, এই গাছে উঠে পড়ি।"

"যে লোকটি বললে, 'আমরা মারা গেলুম', সে জানে না যে ঈশ্বর রক্ষাকর্তা আছেন। যে বললে, 'এস, আমার ঈশ্বরকে ডাকি', সে জ্ঞানী; তার বোধ আছে যে, ইশ্বর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সব করেছেন। আর যে বললে, 'তাঁকে কষ্ট দিয়ে কি হবে, এস, গাছে উঠি,' তার ভিতরে প্রেম জন্মেছে, ভালবাসা জন্মেছে। তা প্রেমের স্বভাবই এই — আপনাকে বড় মনে করে, আর প্রেমের পাত্রকে ছোট মনে করে। পাছে তার কষ্ট হয়। কেবল এই ইচ্ছা যে, যাকে সে ভালবাসে তার পায়ে কাঁটাটি পর্যন্ত না ফোটে।"

ঠাকুর ও ভক্তদিগকে রাম উপরে লইয়া গিয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন দিয়া সেবা করিলেন। ভক্তেরাও মহানন্দে প্রসাদ পাইলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c14 ১৪ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িমধ্যে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ৪ঠা জুন 1883/06/04/i

14.1 দক্ষিণেশ্বরে ফলহারিণী — পূজাদিবসে ভক্তসঙ্গে

[মণিলাল, ত্রৈলোক্য বিশ্বাস, রাম চাটুজ্যে, বলরাম, রাখাল]

আজ জৈষ্ঠ কৃষ্ণা চতুর্দশী। সাবিত্রী চতুর্দশী। আবার অমাবস্যা ও ফলহারিণী-পূজা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়িতে নিজ মন্দিরে বসিয়া আছেন। ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেছেন। সোমবার, ইংরেজী ৪ঠা জুন, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ।

মাস্টার পূর্বদিন রবিবারে আসিয়াছেন। ওই রাত্রে কাত্যায়নীপূজা। ঠাকুর প্রেমাবিষ্ট হইয়া নাটমন্দিরে মার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, বলিতেছেন, “মা, তুমিই ব্রজের কাত্যায়নী:

তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত মা, তুমি সে পাতাল।
তোমা হতে হরি ব্রহ্মা, দ্বাদশ গোপাল।
দশ মহাবিদ্যা মাতা দশ অবতার।

এবার কোনরূপে আমায় করিতে হবে পার।”

ঠাকুর গান করিতেছেন ও মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। প্রেমে একেবারে মাতোয়ারা! নিজের ঘরে আসিয়া চৌকির উপর বসিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত ওই রাত্রে মার নাম হইতে লাগিল।

সোমবার সকালে বলরাম এবং আরও কয়েকটি ভক্ত আসিলেন। ফলহারিনী-পূজা উপলক্ষে ত্রৈলোক্য প্রভৃতি বাগানের বাবুরা সপরিবারে আসিয়াছেন।

বেলা নয়টা। ঠাকুর সহাস্যবদন — গঙ্গার উপর গোল বারান্দাটিতে বসিয়া আছেন। কাছে মাস্টার। ক্রীড়াচ্ছলে ঠাকুর রাখালের মাথাটি কোলে লইয়াছেন! রাখাল শুইয়া। ঠাকুর কয়েকদিন রাখালকে সাক্ষাৎ গোপাল দেখিতেছেন।

ত্রৈলোক্য সম্মুখ দিয়া মা-কালীকে দর্শন করিতে যাইতেছেন। সঙ্গে অনুচর ছাতি ধরিয়া যাইতেছে। ঠাকুর রাখালকে বললেন, “ওরে, ওঠ্ ওঠ্।”

ঠাকুর বসিয়া আছেন। ত্রৈলোক্য নমস্কার করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্যের প্রতি) - হ্যাঁগা, কাল যাত্রা হয় নাই?

ত্রৈলোক্য — হাঁ, যাত্রার তেমন সুবিধা হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা এইবার যা হয়েছে। দেখো যেন অন্যবার এরূপ না হয়! যেমন নিয়ম আছে, সেইরকমই বরাবর হওয়া ভাল।

ত্রৈলোক্য যথোচিত উত্তর দিয়া চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বিষ্ণুঘরের পুরোহিত শ্রীযুক্ত রাম চাটুজ্যে আসিলেন।

ঠাকুর — রাম! ত্রৈলোক্যকে বললুম, যাত্রা হয় নাই, দেখো যেন এরূপ আর না হয় তা এ-কথাটা বলা কি ভাল হয়েছে?

রাম চাটুজ্যে — মহাশয়, তা আর কি হয়েছে! বেশই বলেছেন। যেমন নিয়ম আছে, সেইরকমই তো বরাবর হওয়া উচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের প্রতি) — ওগো, আজ তুমি এখানে খেও।

আহারের কিঞ্চিৎ পূর্বে ঠাকুর নিজের অবস্থার বিষয় ভক্তদের অনেক বলিতে লাগিলেন। রাখাল, বলরাম, মাস্টার, রামলাল, এবং আরও দু-একটি ভক্ত বসিয়াছিলেন।

[হাজরার উপর রাগ — ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও মানুষে ইশ্বরদর্শন]

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাজরা আবার শিক্ষা দেয়, তুমি কেন ছোকরাদের জন্য অত ভাব? গাড়ি করে বলরামের বাড়ি যাচ্ছি, এমন সময় পথে মহা ভাবনা হল। বললুম "মা, হাজরা বলে, নরেন্দ্র আর সব ছোকরাদের জন্য আমি অত ভাবি কেন; সে বলে, ঈশ্বরচিন্তা ছেড়ে এ-সব ছোকরাদের জন্য চিন্তা করছ কেন?" এই কথা বলতে বলতে একেবারে দেখালে যে, তিনিই মানুষ হয়েছেন। শুদ্ধ আধারে স্পষ্ট প্রকাশ হন। সেইরূপ দর্শন করে যখন সমাধি একটু ভাঙল, হাজরার উপর

রাগ করতে লাগলুম। বললুম, শালা আমার মন খারাপ করে দিছল। আবার ভাবলুম, সে বেচারীরই বা দোষ কি, সে জানবে কেমন করে?

[নরেন্দ্রের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দেখা]

“আমি এদের জানি, সাক্ষাৎ নারায়ণ। নরেন্দ্রের সঙ্গে প্রথম দেখা হল। দেখলুম, দেহবুদ্ধি নাই। একটু বুকে হাত দিতেই বাহ্যশূন্য হয়ে গেল। হুঁশ হয়ে বলে উঠল, ‘ওগো, তুমি আমার কি করলে? আমার যে মা-বাপ আছে!’ যদু মল্লিকের বাড়িতেও ঠিক ওইরকম হয়েছিল। ক্রমে তাকে দেখবার জন্য ব্যাকুলতা বাড়তে লাগল, প্রাণ আটু-পাটু করতে লাগল। তখন ভোলানাথকে১ বললুম, হ্যাঁগা, আমার মন এমন হচ্ছে কেন? নরেন্দ্র বলে একটি কায়েতের ছেলে, তার জন্য এমন হচ্ছে কেন? ভোলানাথ বললে, ‘এর মানে ভারতে আছে। সমাধিস্থ লোকের মন যখন নিচে আসে, সত্ত্বগুণী লোকের সঙ্গে বিলাস করে। সত্ত্বগুণী লোক দেখলে তবে তার মন ঠাণ্ডা হয়।’ এই কথা শুনে তবে আমার মনের শান্তি হল। মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে দেখব বলে বসে বসে কাঁদতুম।”

১ ৴ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরবাড়ির মুহুরী, পরে খাজাঞ্চী হইয়াছিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ৪ঠা জুন 1883/06/04/ii

14.2 পূর্বকথা — শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমোন্মাদ ও রূপদর্শন

শ্রীরামকৃষ্ণ — উঃ, কি অবস্থাই গেছে! প্রথম যখন এই অবস্থা হল দিনরাত কোথা দিয়ে যেত, বলতে পারিনা। সকলে বললে, পাগল হল। তাই তো এরা বিবাহ দিলে। উন্মাদ অবস্থা; — প্রথম চিন্তা হল, পরিবারও এইরূপ থাকবে, খাবে-দাবে। শ্বশুরবাড়ি গেলুম, সেখানে খুব সংকীর্তন। নফর, দিগম্বর বাঁড়ুজ্যের বাপ এরা এল! খুব সংকীর্তন। এক-একবার ভাবতুম, কি হবে। আবার বলতুম, মা, দেশের জমিদার যদি আদর করে, তাহলে বুঝব সত্য। তারাও সেধে এসে কথা কইত।

[পূর্বকথা — সুন্দরীপূজা ও কুমারীপূজা — রামলীলা-দর্শন — গড়ের মাঠে বেলুনদর্শন — সিওড়ে রাখাল-ভোজন — জানবাজারে মথুরের সঙ্গে বাস]

“কি অবস্থাই গেছে। একটু সামান্যতেই একেবারে উদ্দীপন হয়ে যেত। সুন্দরীপূজা কল্লুম! চৌদ্দ বছরের মেয়ে। দেখলুম, সাক্ষাৎ মা। টাকা দিয়ে প্রণাম কল্লুম।

“রামলীলা দেখতে গেলুম। একেবারে দেখলুম, সাক্ষাৎ সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, বিভীষণ। তখন যারা সেজেছিল, তাদের সব পূজা করতে লাগলুম।

““কুমারীদের এনে তখন পূজা করতুম। দেখতুম, সাক্ষাৎ মা।

“একদিন বকুলতলায় দেখলুম, নীল বসন পরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে, বেশ্যা। দপ্‌ করে একেবারে সীতার উদ্দীপন। ও মেয়েকে ভুলে গেলুম; কিন্তু দেখলুম, সাক্ষাৎ সীতা লঙ্কা থেকে উদ্ধার হয়ে রামের কাছে যাচ্ছেন। অনেকক্ষণ বাহ্যশূন্য হয়ে সমাধি অবস্থা হয়ে রইল।

“আর-একদিন গড়ের মাঠে বেড়াতে গিছলুম। বেলুন উঠবে — অনেক লোকের ভিড়। হঠাৎ নজরে পড়ল, একটি সাহেবের ছেলে গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ত্রিভঙ্গ হয়ে। যাই দেখা, অমনি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন। সমাধি হয়ে গেল।

“সিওড়ে রাখাল-ভোজন করালুম। তাদের হাতে হাতে সব জলপান দিলুম! দেখলুম, সাক্ষাৎ ব্রজের রাখাল। তাদের জলপান থেকে আবার খেতে লাগলুম!

“প্রায় হুঁশ থাকত না। সেজোবাবু জানবাজারের বাড়িতে নিয়ে দিন কতক রাখলে। দেখতে লাগলুম, সাক্ষাৎ মার দাসী হয়েছি। বাড়ির মেয়েরা আদবেই লজ্জা করত না, যেমন ছোট ছেলেকে বা মেয়েকে দেখলে কেউ লজ্জা করে না। আন্দির সঙ্গে — বাবুর মেয়েকে জামাই-এর কাছে শোয়াতে যেতুম।

“এখনও একটু তাতেই উদ্দীপন হয়ে যায়। রাখাল জপ করতে করতে বিড় বিড় করত। আমি দেখে স্থির থাকতে পারতুম না। একেবারে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়ে, বিহ্বল হয়ে যেতুম।”

ঠাকুর প্রকৃতিভাবের কথা আরও বলিতে লাগিলেন। আর বললেন, “আমি একজন কীর্তনীয়াকে মেয়ে-কীর্তনীর ঢঙ সব দেখিয়েছিলুম। সে বললে ‘আপনার এ-সব ঠিক ঠিক। আপনি এ-সব জানলেন কেমন করে’।”

এই বলিয়া ঠাকুর ভক্তদের মেয়ে-কীর্তনীয়ার ঢঙ দেখাইতেছেন। কেহই হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ৪ঠা জুন 1883/06/04/iii

14.3 মণিলাল প্রভৃতি সঙ্গে — ঠাকুর “অহেতুক কৃপাসিন্ধু”

আহারের পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। গাঢ় নিদ্রা নয়, তন্দ্রার ন্যায়। শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক (পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানী) আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর তখনও শুইয়া আছেন। মণিলাল এক-একটি কথা কহিতেছেন। ঠাকুরের অর্ধনিদ্রা অর্ধজাগরণ অবস্থা। এক-একবার উত্তর দিতেছেন।

মণিলাল — শিবনাথ নিত্যগোপালকে সুখ্যাতি করেন। বলেন, বেশ অবস্থা।

ঠাকুর তখনও শুইয়া — চক্ষে যেন নিদ্রা আছে। জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হাজরাকে ওরা কি বলে?" ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন। মণিলালকে ভবনাথের ভক্তির কথা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আহা, তার কি ভাব! গান না করতে করতে চক্ষে জল আসে। হরিশকে দেখে একেবারে ভাব। বলে, এরা বেশ আছে। হরিশ বাড়ি ছেড়ে এখানে মাঝে মাঝে থাকে কিনা।

মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আচ্ছা ভক্তির কারণ কি? ভবনাথ এ-সব ছোকরার কেন উদ্দীপন হয়?"

মাস্টার চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি জানো? মানুষ সব দেখতে একরকম, কিন্তু কারুর ভিতর ক্ষীরের পোর! যেমন পুলির ভিতর কলাইয়ের ডালের পোরও থাকতে পারে, ক্ষীরের পোরও থাকতে পারে, কিন্তু দেখতে একরকম। ঈশ্বর জানবার ইচ্ছা, তাঁর উপর প্রেমভক্তি — এরই নাম ক্ষীরের পোর।

[গুরুকৃপায় মুক্তি ও স্বরূপদর্শন — ঠাকুরের অভয়দান]

এইবার ঠাকুর ভক্তদের অভয় দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — কেউ কেউ মনে করে, আমার বুঝি জ্ঞানভক্তি হবে না, আমি বুঝি বদ্ধজীব। গুরুর কৃপা হলে কিছুই ভয় নাই। একটা ছাগলের পালে বাঘ পড়েছিল। লাফ দিতে গিয়ে, বাঘের প্রসব হয়ে ছানা হয়ে গেল। বাঘটা

মরে গেল, ছানাটি ছাগলের সঙ্গে মানুষ হতে লাগল। তারাও ঘাস খায়, বাঘের ছানাও ঘাস খায়। তারাও "ভ্যা ভ্যা" করে, সেও "ভ্যা ভ্যা" করে। ক্রমে ছানাটা খুব বড় হল। একদিন ওই ছাগলের পালে আর-একটা বাঘ এসে পড়ল। সে ঘাসখেকো বাঘটাকে দেখে অবাক্! তখন দৌড়ে এসে তাকে ধরলে। সেটাও "ভ্যা ভ্যা" করতে লাগলে। তাকে টেনে হিঁচড়ে জলের কাছে নিয়ে গেল। বললে, "দেখ, জলের ভিতর তোর মুখ দেখ — ঠিক আমার মতো দেখ। আর এই নে খানিকটা মাংস — এইটে খা।" এই বলে তাকে জোর করে খাওয়াতে লাগল। সে কোন মতে খাবে না — "ভ্যা ভ্যা" করছিল। রক্তের আস্বাদ পেয়ে খেতে আরম্ভ করলে। নূতন বাঘটা বললে, "এখন বুঝিছিস, আমিও যা তুইও তা; এখন আয় আমার সঙ্গে বনে চলে আয়।"

"তাই গুরুর কৃপা হলে আর কোন ভয় নাই! তিনি জানিয়ে দেবেন, তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি।

"একটু সাধন করলেই গুরু বুঝিয়ে দেন, এই এই। তখন সে নিজেই বুঝতে পারবে, কোন্‌টা সৎ, কোন্‌টা অসৎ। ঈশ্বরই সত্য, এ-সংসার অনিত্য।"

[কপট সাধনাও ভাল — জীবন্মুক্ত সংসারে থাকতে পারে]

"এক জেলে রাত্রে এক বাগানে জাল ফেলে মাছ চুরি করছিল। গৃহস্থ জানতে পেরে, তাকে লোকজন দিয়ে ঘিরে ফেললে। মশাল-টশাল নিয়ে চোরকে খুঁজতে এল। এদিকে জেলেটা খানিকটা ছাই মেখে, একটা গাছতলায় সাধু হয়ে বসে আছে। ওরা অনেক খুঁজে দেখে, জেলে-টেলে কেউ নেই, কেবল গাছতলায়

একটি সাধু ভস্মমাখা ধ্যানস্থ। পরদিন পাড়ায় খবর হল, একজন ভারী সাধু ওদের বাগানে এসেছে। এই যত লোক ফল ফুল সন্দেশ মিষ্টান্ন দিয়ে সাধুকে প্রণাম করতে এল। অনেক টাকা-পয়সাও সাধুর সামনে পড়তে লাগল। জেলেটা ভাবল কি অশ্চর্য! আমি সত্যকার সাধু নই, তবু আমার উপর লোকের এত ভক্তি। তবে সত্যকার সাধু হলে নিশ্চয়ই ভগবানকে পাব, সন্দেহ নাই।

“কপট সাধনাতেই এতদূর চৈতন্য হল। সত্য সাধন হলে তো কথাই নাই। কোন্‌টা সৎ কোন্‌টা অসৎ বুঝতে পারবে। ঈশ্বরই সত্য, সংসার অনিত্য।”

একজন ভক্ত ভাবিতেছেন, সংসার অনিত্য? জেলেটো তো সংসারত্যাগ করে গেল। তবে যারা সংসারে আছে, তাদের কি হবে? তাদের কি ত্যাগ করতে হবে? শ্রীরামকৃষ্ণ অহেতুক কৃপাসিন্ধু — অমনি বলিতেছেন, “যদি কেরানিকে জেলে দেয়, সে জেল খাটে বটে, কিন্তু যখন জেল থেকে তাকে ছেড়ে দেয়, তখন সে কি রাস্তায় এসে ধেই ধেই করে নেচে বেড়াবে? সে আবার কেরানিগিরি জুটিয়ে লেয়, সেই আগেকার কাজই করে। গুরুর কৃপায় জ্ঞানলাভের পরেও সংসারে জীবন্মুক্ত হয়ে থাকা যায়।”

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারী লোকদের অভয় দিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ৪ঠা জুন 1883/06/04/iv

14.4 মণিলাল প্রভৃতি সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও নিরাকারবাদ

মণিলাল (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — আহ্নিক করবার সময় তাঁকে কোন্‌খানে ধ্যান করব?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হৃদয় তো বেশ ডঙ্কামারা জায়গা, সেইখানে ধ্যান করো।

[বিশ্বাসেই সব — হলধারীর নিরাকারে বিশ্বাস — শম্ভুর বিশ্বাস]

মণিলাল ব্রহ্মজ্ঞানী, নিরাকারবাদী। ঠাকুর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, “কুবীর বলত, সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ। কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী!

“হলধারী দিনে সাকারে, আর রাতে নিরাকারে থাকত। তা যে ভাবই আশ্রয় কর, ঠিক বিশ্বাস হলেই হল। সাকারেতেই বিশ্বাস কর, আর নিরাকারেই বিশ্বাস কর, কিন্তু ঠিক ঠিক হওয়া চাই।”

[পূর্বকথা — প্রথম উন্মাদ — ঈশ্বর কর্তা না কাকতালীয়]

“শম্ভু মল্লিক বাগবাজার থেকে হেঁটে নিজের বাগানে আসত। কেউ বলেছিল, ‘অত রাস্তা, কেন গাড়ি করে আস না, বিপদ হতে পারে।’ তখন শম্ভু মুখ লাল করে বলে উঠেছিল, ‘কি, তাঁর নাম করে বেরিয়েছি আবার বিপদ!’ বিশ্বাসেতেই

সব হয়! আমি বলতুম, অমুককে যদি দেখি, তবে বলি সত্য। অমুক খাজাঞ্চী যদি আমার সঙ্গে কথা কয়! তা যেটা মনে করতুম, সেইটেই মিলে যেত!”

মাস্টার ইংরেজী ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। সকাল বেলার স্বপন মিলিয়া যায় (coincidence of dreams with actual events) এটি কুসংস্কার হইতে উৎপন্ন, এ-কথা পড়িয়াছিলেন (Chapter on Fallacies) তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন —

মাস্টার — আচ্ছা, কোন কোন ঘটনা মেলে নাই, এমন কি হয়েছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — না, সে-সময় সব মিলত। সে-সময় তাঁর নাম করে যা বিশ্বাস করতুম, তাই মিলে যেত! (মণিলালকে) তবে কি জানো, সরল উদার না হলে এ বিশ্বাস হয় না।

“হাড়পেকে, কোটরচোখ, ট্যারা — এরকম অনেক লক্ষণ আছে, তাদের বিশ্বাস সহজে হয় না। ‘দক্ষিণে কলাগাছ উত্তরে পুঁই, একলা কালো বিড়াল কি করব মুই’।” (সকলের হাস্য)।

[ভগবতী দাসীর প্রতি দয়া — শ্রীরামকৃষ্ণ ও সতীত্বধর্ম]

সন্ধ্যা হইল। দাসী আসিয়া ঘরে ধুনা দিয়া গেল। মণিলাল প্রভৃতি চলিয়া যাবার পর দু-একজন ভক্ত এখনও আছেন। ঘর নিস্তব্ধ। ধুনার গন্ধ, ঠাকুর ছোট খাটটিতে উপবিষ্ট। মার চিন্তা করিতেছেন! মাস্টার মেঝেতে বসিয়া আছেন। রাখালও আছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বাবুদের দাসী ভগবতী আসিয়া দূর হইতে প্রণাম করিল। ঠাকুর বসিতে বলিলেন। ভগবতী খুব পুরাতন দাসী। অনেক বৎসর বাবুদের বাড়িতে আছে। ঠাকুর তাহাকে অনেকদিন ধরিয়া জানেন। প্রথম বয়সে স্বভাব ভাল ছিল না। কিন্তু ঠাকুর দয়ার সাগর পতিতপাবন, তাহার সহিত অনেক পুরানো কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এখন তো বয়স হয়েছে। টাকা যা রোজগার করলি, সাধু বৈষ্ণবদের খাওয়াচ্ছিস তো?

ভগবতী (ঈষৎ হাসিয়া) — তা আর কি করে বলব?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কাশী, বৃন্দাবন, এ-সব হয়েছে?

ভগবতী (ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া) — তা আর কি করে বলব? একটা ঘাট বাঁধিয়ে দিইছি। তাতে পাথরে আমার নাম লেখা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বলিস কি রে?

ভগবতী — হাঁ, নাম লেখা আছে, “শ্রীমতী ভগবতী দাসী।”

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈষৎ হাসিয়া) — বেশ বেশ।

এই সময়ে ভগবতী সাহস পাইয়া ঠাকুরকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল।

বৃশ্চিক দংশন করিলে যেমন লোক চমকিয়া উঠে ও অস্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণ সেইরূপ অস্থির হইয়া ‘গোবিন্দ’ ‘গোবিন্দ’ এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ঘরের কোণে গঙ্গাজলের একটি জালা ছিল — এখনও আছে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে যেন ত্রস্ত হইয়া সেই জালার কাছে গেলেন। পায়ের যেখানে দাসী স্পর্শ করিয়াছিল গঙ্গাজল লইয়া সে-স্থান ধুইতে লাগিলেন।

দু-একটি ভক্ত যাঁহারা ঘরে ছিলেন তাঁহারা অবাক্ ও স্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে এই ব্যাপার দেখিতেছেন। দাসী জীবন্মৃতা হইয়া বসিয়া আছে। দয়াসিন্ধু পতিতপাবন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাসীকে সম্বোধন করিয়া করুণামাখা স্বরে বলিতেছেন, “তোরা অমনি প্রণাম করবি।” এই বলিয়া আবার আসন গ্রহণ করিয়া দাসীকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বলিলেন, “একটু গান শোন।”

তাহাকে গান শুনাইতেছেন:

(১) — মজলো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ-নীলকমলে।
(শ্যামাপদ-নীলকমলে, — কালীপদ-নীলকমলে।)

(২) — শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়তেছিল।
কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল।

(৩) — আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে।
যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে ।।
পরমধন এই পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে ।

কত মণি পড়ে আছে আমার চিন্তামণির নাচ দুয়ারে ।।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ৫ই জুন 1883/06/05/i

14.5 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম প্রেমোন্মাদ কথা

[পূর্বকথা — দেবেন্দ্র ঠাকুর, দীন মুখুজ্জে ও কোয়ার সিং]

আজও অমাবস্যা, মঙ্গলবার, ইং ৫ই জুন, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ কালীবাড়িতে আছেন। রবিবারেই ভক্ত-সমাগম বেশি হয়, আজ মঙ্গলবার বলিয়া বেশি লোক নাই। রাখাল ঠাকুরের কাছে আছেন। হাজরাও আছেন, ঠাকুরের ঘরের সামনে বারান্দায় আসন করিয়াছেন। মাস্টার গত রবিবারে আসিয়াছেন ও কয়দিন আছেন।

সোমবার রাত্রে মা-কালীর নাটমন্দিরে কৃষ্ণযাত্রা হইয়াছিল। ঠাকুর খানিকক্ষণ শুনিয়াছিলেন। এই যাত্রা রবিবার রাত্রে হইবার কথা ছিল, কিন্তু হয় নাই বলিয়া সোমবারে হইয়াছে।

মধ্যাহ্নে খাওয়া-দাওয়ার পর ঠাকুর নিজের প্রেমোন্মাদ অবস্থা আবার বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — কি অবস্থাই গিয়েছে। এখানে খেতুম না। বরাহনগরে, কি দক্ষিণেশ্বরে, কি এঁড়েদয়ে, কোন বামুনের বাড়ি গিয়ে পড়তুম। আবার পড়তুম অবেলায়। গিয়ে বসতুম, মুখে কোন কথা নাই। বাড়ির লোক কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে কেবল বলতুম, আমি এখানে খাব। আর কোন কথা নাই। আলমবাজারে রাম চাটুজ্যের বাড়ি যেতুম। কখনও দক্ষিণেশ্বরে সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়িতে। তাদের বাড়ি খেতুম বটে, কিন্তু ভাল লাগত না — কেমন আঁষ্টে গন্ধ!

“একদিন ধরে বসলুম, ‘দেবেন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি যাব।’ সেজোবাবুকে বললুম, দেবেন্দ্র ঈশ্বরের নাম করে, তাকে দেখব, আমায় লয়ে যাবে? সেজোবাবু — তার আবার ভারী অভিমান, সে সেধে লোকের বাড়ি যাবে? এগু-পেছু করতে লাগল। তারপর বললে, ‘হাঁ, দেবেন্দ্র আর আমি একসঙ্গে পড়েছিলুম, তা চল বাবা, নিয়ে যাব।’

“একদিন শুনলুম বাগবাজারের পোলের কাছে দীন মুখুজ্জে বলে একটি ভাল লোক আছে — ভক্ত। সেজোবাবুকে ধরলুম দীন মুখুজ্জের বাড়ি যাব। সেজোবাবু কি করে, গাড়ি করে নিয়ে গেল। বাড়িটি ছোট, আবার মস্ত গাড়ি করে এক বড় মানুষ এসেছে। তারাও অপ্রস্তুত, আমরাও অপ্রস্তুত। তার আবার ছেলের পৈতে। কোথায় বসায়? আমরা পাশের ঘরে যাচ্ছিলুম, তা বলে উঠল ও

ঘরে মেয়েরা, যাবেন না। মহা অপ্রস্তুত। সেজোবাবু ফেরবার সময় বললে, ‘বাবা! তোমার কথা আর শুনব না।’ আমি হাসতে লাগলুম।

“কি অবস্থাই গেছে। কুমার সিং সাধু-ভোজন করাবে, আমায় নিমন্ত্রণ কল্লে। গিয়ে দেখলুম, অনেক সাধু এসেছে। আমি বসলে পরে সাধুরা কেউ কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা কল্লে; যাই জিজ্ঞাসা করা, আমি আলাদা বসতে গেলুম। ভাবলুম, অত খবরে কাজ কি। তারপর যেই সকলকে পাতা পেতে খেতে বসালে, কেউ কিছু না বলতে বলতে আমি আগে খেতে লাগলুম। সাধুরা কেউ কেউ বলতে লাগল শুনতে পেলুম, ‘আরে এ কেয়া রে’।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ৫ই জুন 1883/06/05/ii

14.6 হাজরার সঙ্গে কথা — গুরুশিষ্য-সংবাদ

বেলা পাঁচটা হইয়াছে। ঠাকুর বারান্দার কোলে যে সিঁড়ি, তাহার উপর বসিয়া আছেন। রাখাল, হাজরা ও মাস্টার কাছে বসিয়া আছেন। হাজরার ভাব ‘সোঽহম্’।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি) — হাঁ, সব গোল মেটে; তিনিই আস্তিক, তিনিই নাস্তিক; তিনিই ভাল, তিনিই মন্দ; তিনিই সৎ, তিনিই অসৎ; জাগা, ঘুম এ-সব অবস্থা তাঁরই; আবার তিনি এ-সব অবস্থার পার।

“একজন চাষার বেশি বয়সে একটি ছেলে হয়েছিল। ছেলেটিকে খুব যত্ন করে। ছেলেটি ক্রমে বড় হল। একদিন চাষা ক্ষেতে কাজ করছে, এমন সময় একজন এসে খবর দিলে যে, ছেলেটির ভারী অসুখ। ছেলে যায় যায়। বাড়িতে এসে দেখে, ছেলে মারা গেছে। পরিবার খুব কাঁদছে, কিন্তু চাষার চক্ষে একটুও জল নাই। পরিবার প্রতিবেশীদের কাছে তাই আরও দুঃখ করতে লাগল যে, এমন ছেলেটি গেল এঁর চক্ষে একটু জল পর্যন্ত নাই। অনেকক্ষণ পরে চাষা পরিবারকে সম্বোধন করে বললে, ‘কেন কাঁদছি না জানো? আমি কাল স্বপন দেখেছিলুম যে, রাজা হয়েছি, আর সাত ছেলের বাপ হয়েছি। স্বপনে দেখলুম যে, ছেলেগুলি রূপে গুণে সুন্দর। ক্রমে বড় হল বিদ্যা ধর্ম উপার্জন কল্লে। এমন সময় আমার ঘুম ভেঙে গেল; এখন ভাবছি যে, তোমার ওই এক ছেলের জন্য কাঁদব, কি আমার সাত ছেলের জন্য কাঁদব।’ জ্ঞানীদের মতে স্বপন অবস্থাও যেমন সত্য, জাগা অবস্থাও তেমনি সত্য।

“ঈশ্বরই কর্তা, তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে।”

হাজরা — কিন্তু বোঝা বড় শক্ত। ভূকৈলাসের সাধুকে কত কষ্ট দিয়ে এক রকম মেরে ফেলা হল। সাধুটিকে সমাধিস্থ পেয়েছিল। কখন মাটির ভিতরে পোঁতে, কখন জলের ভিতর রাখে, কখন গায়ে ছেঁকা দেয়! এইরকম করে চৈতন্য

করালে। এই সব যন্ত্রণায় দেহত্যাগ হল। লোকে যন্ত্রণাও দিলে, আর ঈশ্বরের ইচ্ছাতে মারাও গেল!

[Problem of Evil and the Immortality of the Soul]

শ্রীরামকৃষ্ণ — যার যা কর্ম, তার ফল সে পাবে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে সাধুর দেহত্যাগ হল। কবিরাজেরা বোতলের ভিতর মকরধ্বজ তৈয়ার করে। চারিদিকে মাটি দিয়ে আগুনে ফেলে রাখে। বোতলের ভিতর যে-সোনা আছে, সেই সোনা আগুনের তাতে আরও অন্য জিনিসের সঙ্গে মিশে মকরধ্বজ হয়। তখন কবিরাজ বোতলটি লয়ে আস্তে আস্তে ভেঙে, ভিতরের মকরধ্বজ রেখে দেয়। তখন বোতল থাকলেই বা কি, আর গেলেই বা কি? তেমনি লোকে ভাবে সাধুকে মেরে ফেললে, কিন্তু হয়তো তার জিনিস তৈয়ার হয়ে গিছল। ভগবানলাভের পর শরীর থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি?

[সাধু ও অবতারের প্রভেদ]

“ভূকৈলাসের সাধু সমাধিস্থ ছিল। সমাধি অনেক প্রকার। হৃষীকেশের সাধুর কথার সঙ্গে আমার অবস্থা মিলে গিছল। কখন দেখি শরীরের ভিতর বায়ু চলছে যেন পিঁপড়ের মতো, কখনও বা সড়াৎ সড়াৎ করে, বানর যেমন এক ডাল থেকে আর-এক ডালে লাফায়। কখন মাছের মতো গতি। যার হয়, সেই জানে। জগৎ ভুল হয়ে যায়। মনটা একটু নামলে বলি, মা! আমায় ভাল কর, আমি কথা কব।

“ঈশ্বরকোটি (অবতারাদি) না হলে সমাধির পর ফেরে না। জীব কেউ কেউ সাধনার জোরে সমাধিস্থ হয়, কিন্তু আর ফেরে না। তিনি যখন নিজে মানুষ হয়ে আসেন, অবতার হন, জীবের মুক্তির চাবি তাঁর হাতে থাকে, তখন সমাধির পর ফেরেন। লোকের মঙ্গলের জন্য।”

মাস্টার (স্বগতঃ) — ঠাকুরের হাতে কি জীবের মুক্তির চাবি?

হাজরা —— ঈশ্বরকে তুষ্ট করতে পারলেই হল। অবতার থাকুন আর না থাকুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া) — হাঁ, হাঁ। বিষ্ণুপুরে রেজিস্টারির বড় অফিস, সেখানে রেজেস্টারি করতে পাল্লে, আর গোঘাটে গোল থাকে না।

[গুরুশিষ্য-সংবাদ —— শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত]

আজ মঙ্গলবার অমাবস্যা। সন্ধ্যা হইল। ঠাকুরবাড়িতে আরতি হইতেছে। দ্বাদশ শিবমন্দিরে, ৺রাধাকান্তের মন্দিরে ও ৺ভবতারিণীর মন্দিরে শঙ্খ-ঘন্টাদির মঙ্গল বাজনা হইতেছে। আরতি সমাপ্ত হইলে কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘর হইতে দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। চতুর্দিকে নিবিড় আঁধার, কেবল ঠাকুরবাড়িতে স্থানে স্থানে দীপ জ্বলিতেছে। ভাগীরথীবক্ষে আকাশের কালো ছায়া পড়িয়াছে। অমাবস্যা, ঠাকুর সহজেই ভাবময়; আজ ভাব ঘনীভূত হইয়াছে। শ্রীমুখে মাঝে মাঝে প্রণব উচ্চারণ ও মার নাম করিতেছেন। গ্রীষ্মকাল ঘরের ভিতর বড় গরম। তাই বারান্দায় আসিয়াছেন। একজন ভক্ত একটি মছলন্দের মাদুর দিয়াছেন। সেইটি বারান্দায় পাতা হইল। ঠাকুরের অহর্নিশ মার চিন্তা; শুইয়া শুইয়া মণির সঙ্গে ফিসফিস করিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখ, ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়! অমুকের দর্শন হয়েছে, কিন্তু কারুকে বলো না। আচ্ছা, তোমার রূপ না নিরাকার ভাল লাগে?

মণি — আজ্ঞা, এখন একটু নিরাকার ভাল লাগে। তবে একটু একটু বুঝছি যে, তিনিই এ-সব সাকার হয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখ, আমায় বেলঘরে মতি শীলের ঝিলে গাড়ি করে নিয়ে যাবে? সেখানে মুড়ি ফেলে দাও, মাছ সব এসে মুড়ি খাবে। আহা! মাছগুলি ক্রীড়া করে বেড়াচ্ছে, দেখলে খুব আনন্দ হয়। তোমার উদ্দীপন হবে, যেন সচ্চিদানন্দ-সাগরে আত্মারূপ মীন ক্রীড়া করছে! তেমনি খুব বড় মাঠে দাঁড়ালে ঈশ্বরীয় ভাব হয়। যেন হাঁড়ির মাছ পুকুরে এসেছে।

“তাঁকে দর্শন করতে হলে সাধনের দরকার। আমাকে কঠোর সাধন করতে হয়েছে। বেলতলায় কতরকম সাধন করেছি। গাছতলায় পড়ে থাকতুম, মা দেখা দাও বলে, চক্ষের জলে গা ভেসে যেত!”

মণি — আপনি কত সাধন করেছেন, আর লোকের কি একক্ষণে হয়ে যাবে? বাড়ির চারিদেকে আঙুল ঘুরিয়ে দিলেই কি দেয়াল হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — অমৃত বলে, একজন আগুন করলে দশজন পোয়ায়! আর-একটি কথা, নিত্যে পোঁছে লীলায় থাকা ভাল।

মণি — আপনি বলেছেন, লীলা বিলাসের জন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ — না। লীলাও সত্য। আর দেখ, যখন আসবে, তখন হাতে করে একটু কিছু আনবে। নিজে বলতে নাই, অভিমান হয়। অধর সেনকেও বলি, এক পয়সার কিছু নিয়ে এস। ভবনাথকে বলি, এক পয়সার পান আনিস। ভবনাথের কেমন ভক্তি দেখেছ? নরেন্দ্র, ভবনাথ — যেমন নরনারী। ভবনাথ নরেন্দ্রের অনুগত। নরেন্দ্রকে গাড়ি করে এনো। কিছু খাবার আনবে। এতে খুব ভাল হয়।

[জ্ঞানপথ ও নাস্তিকতা — Philosphy and Scepticism]

"জ্ঞান ও ভক্তি দুই-ই পথ। ভক্তিপথে একটু আচার বেশি করতে হয়। জ্ঞানপথে যদি অনাচার কেউ করে, সে নষ্ট হয়ে যায়। বেশি আগুন জ্বাললে কলাগাছটাও ভিতরে ফেলে দিলে পুড়ে যায়।

"জ্ঞানীর পথ বিচারপথ। বিচার করতে করতে নাস্তিকভাব হয়তো কখন কখন এসে পড়ে। ভক্তের আন্তরিক তাঁকে জানবার ইচ্ছা থাকলে, নাস্তিকভাব এলেও সে ঈশ্বরচিন্তা ছেড়ে দেয় না। যার বাপ পিতামহ চাষাগিরি করে এসেছে, হাজাশুখা বৎসরে ফসল না হলেও সে চাষ করে!"

ঠাকুর তাকিয়ার উপর মস্তক রাখিয়া শুইয়া শুইয়া কথা কহিতেছেন। মাঝে মণিকে বলিতেছেন, "আমার পাটা একটু কামড়াচ্চে, একটু হাত বুলিয়ে দাও তো গা।"

তিনি সেই অহেতুক কৃপাসিন্ধু গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম সেবা করিতে করিতে শ্রীমুখ হইতে বেদধ্বনি শুনিতেছিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ৮ই জুন 1883/06/08

14.7 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে — শ্রীযুক্ত রাখাল, রাম, কেদার, তারক
মাস্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

[দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে — ঠাকুরের শ্রীচরণপূজা]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ সন্ধ্যারতির পর দক্ষিণেশ্বর-কালীমন্দিরে দেবী-প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন ও চামর লইয়া কিয়ৎক্ষণ ব্যজন করিতেছেন।

গ্রীষ্মকাল। আজ (শুক্রবার) জ্যৈষ্ঠ শুক্লা তৃতীয়া তিথি, ৮ই জুন, ১৮৮৩। আজ কলিকাতা হইতে সন্ধ্যার পর রাম, কেদার (চাটুজ্যে), তারক ঠাকুরের জন্য ফুল মিষ্টান্ন লইয়া একখানি গাড়ি করিয়া আসিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কেদারের বয়ঃক্রম পঞ্চাশ হইবে। পরমভক্ত। ঈশ্বরের কথা হইলেই চক্ষু জলে ভাসিয়া যায়! প্রথমে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন — তৎপরে কর্তাভজা, নবরসিক প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের সহিত মিলিয়া অবশেষে ঠাকুর

শ্রীরামকৃষ্ণের পদাশ্রয় লইয়াছেন। রাজ-সরকারের অ্যাকাউন্ট্যান্টের কর্ম করেন। তাঁহার বাটী কাঁচড়াপাড়ার নিকট হালিসহর গ্রামে।

শ্রীযুক্ত তারকের বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর হইবে। বিবাহ করিয়াছিলেন — কিছুদিন পরে পত্নীবিয়োগ হইল। তাঁহার বাটী বারাসাত গ্রামে। তাঁহার পিতা একজন উচ্চদরের সাধক — ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে অনেকবার দর্শন করিয়াছিলেন। তারকের মাতৃবিয়োগের পর তাঁহার পিতা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন।

তারক রামের বাটীতে সর্বদা যাতায়াত করেন। তাঁহার ও নিত্যগোপালের সঙ্গে তিনি প্রায় ঠাকুরকে দর্শন করিতে আইসেন। এখনও একটি আফিসে কর্ম করিতেছেন। কিন্তু সর্বদাই উদাস ভাব।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালীঘর হইতে বহির্গত হইয়া চাতালে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাকে প্রণাম করিলেন। দেখিলেন, রাম, মাস্টার, কেদার, তারক প্রভৃতি ভক্তেরা সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন।

[শ্রীযুক্ত তারকের প্রতি স্নেহ — কেদার ও কামিনী কাঞ্চন]

ঠাকুর তারকের চিবুক ধরিয়া আদর করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন।

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া নিজের ঘরে মেঝেতে বসিয়া আছেন। পা দুখানি বাড়াইয়া দিয়াছেন, — রাম ও কেদার নানা কুসুম ও পুষ্পমালা দিয়া শ্রীপাদপদ্ম বিভূষিত করিয়াছেন। ঠাকুর সমাধিস্থ!

কেদারের নবরসিকের ভাব। শ্রীচরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিয়া আছেন। তাহা হইলে শক্তি সঞ্চার হইবে — এই ধারণা। ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন, “মা, আঙুল ধরে আমার কি করতে পারবে!” কেদার বিনীতভাবে হাতজোড় করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারের প্রতি, ভাবাবেশে) — কামিনী-কাঞ্চনে মন টানে (তোমার) — মুখে বললে কি হবে যে আমার ওতে মন নাই।

“এগিয়ে পড়। চন্দন কাঠের পর আরও আছে — রূপার খনি — সোনার খনি — হীরে-মাণিক। একটু উদ্দীপন হয়েছে বলে মনে করো না যে, সব হয়ে গেছে!”

ঠাকুর আবার মার সহিত কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, ”মা, একে সরিয়ে দাও।“

কেদার শুষ্ককণ্ঠ। রামকে সভয়ে বলিতেছেন, “ঠাকুর একি বলছেন?”

[অবতার ও পার্ষদ]

শ্রীযুক্ত রাখালকে দেখিয়া ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। ভাবে রাখালকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন —

“আমি অনেকদিন এখানে এসেছি! — তুই কবে এলি?”

ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন যে, তিনি ঈশ্বরের অবতার, আর রাখাল তাঁহার একজন পার্ষদ — অন্তরঙ্গ?

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১০ই জুন 1883/06/10/i

14.8 দক্ষিণেশ্বরে মণিরামপুর ও বেলঘরের ভক্তসঙ্গে

[শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত নিজ চরিত]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে নিজের ঘরে কখনও দাঁড়াইয়া, কখনও বসিয়া ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন। আজ রবিবার, ১০ই জুন, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, জ্যৈষ্ঠ, শুক্লা পঞ্চমী, বেলা ১০টা হইবে। রাখাল, মাস্টার, লাটু, কিশোরী, রামলাল, হাজরা প্রভৃতি অনেকেই আছেন।

ঠাকুর নিজের চরিত্র, পূর্বকাহিনী বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — ও-দেশে ছেলেবেলায় আমায় পুরুষ মেয়ে সকলে ভালবাসত। আমার গান শুনত। আবার লোকদের নকল করতে পারতুম, সেই সব দেখত ও শুনত। তাদের বাড়ির বউরা আমার জন্য খাবার জিনিস রেখে দিত। কিন্তু কেউ অবিশ্বাস করত না। সকলে দেখত যেন বাড়ির ছেলে।

“কিন্তু সুখের পায়রা ছিলুম। বেশ ভাল সংসার দেখলে আনাগোনা করতুম। যে-বাড়িতে দুঃখ বিপদ দেখতুম সেখান থেকে পালাতুম।

“ছোকরাদের ভিতর দু-একজন ভাল লোক দেখলে খুব ভাব করতুম। কারুর সঙ্গে সেঙাত পাতাতুম। কিন্তু এখন তারা ঘোর বিষয়ী। এখন তারা কেউ কেউ এখানে আসে, এসে বলে, ও মা! পাঠশালেও যেমন দেখেছি এখানেও ঠিক তাই দেখছি।

“পাঠশালে শুভঙ্করী আঁক ধাঁধা লাগত! কিন্তু চিত্র বেশ আঁকতে পারতুম; আর ছোট ছোট ঠাকুর বেশ গড়তে পারতুম।”

[Fond of charitable houses; and of Ramayana and Mahabharata]

“সদাব্রত, অতিথিশালা —– যেখানে দেখতুম সেখানে যেতুম, গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতুম।

“কোনখানে রামায়ণ কি ভাগবত পাঠ হচ্ছে, তা বসে বসে শুনতুম, তবে যদি ঢঙ করে পড়ত, তাহলে তার নকল করতুম, আর অন্য লোকেদের শুনাতুম।

“মেয়েদের ঢঙ বেশ বুঝতে পারতুম। তাদের কথা, সুর নকল করতুম। কড়েঁরাড়ী বাপকে উত্তর দিচ্ছে ‘যা-ই’। বারান্দায় মাগীরা ডাকছে, ‘ও তপ্‌সে-মাছোলা!’ নষ্ট মেয়ে বুঝতে পারতুম। বিধবা সোজা সিঁথে কেটেছে, আর খুব অনুরাগের সহিত গায়ে তেল মাখছে! লজ্জা কম, বসবার রকমই আলাদা।

“থাক বিষয়ীদের কথা।”

রামলালকে গান গাহিতে বলিতেছেন। শ্রীযুক্ত রামলাল গান গাহিতেছেন:

১। কে রণে নাচিছে বামা নীরদবরণী,
শোণিত সায়রে যেন ভাসিছে নবনলিনী।

এইবার রামলাল রাবণবধের পর মন্দোদরীর বিলাপ গান গাহিতেছেন:

২। কি করলে হে কান্ত! অবলারি প্রাণ কান্ত,
হয় না শান্ত এ প্রাণান্ত বিনে।

[রামনামে শ্রীরামকৃষ্ণ বিহ্বল — গোপীপ্রেম]

শেষ গানটি শুনিতে শুনিতে ঠাকুর অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন, আর বলিতেছেন, “আমি ঝাউতলায় বাহ্যে করতে গিয়ে শুনেছিলাম, নৌকার মাঝি নৌকাতে ওই গান গাচ্ছে; ঝাউতলায় যতক্ষণ বসেছিলাম খালি কেঁদেছি; আমাকে ধরে ধরে ঘরে নিয়ে এল।”

৩। শুনেছি রাম তারক ব্রহ্ম, মানুষ নয় রাম জটাধারী।
পিতে কি নাশিতে বংশ, সীতে তার করেছ চুরি ।।

অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে রথে বসাইয়া মথুরায় লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া গোপীরা রথচক্র আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন ও কেহ রথচক্রের সামনে শুইয়া পড়িয়াছেন। তাঁরা অক্রূরকে দোষ দিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ যে নিজের ইচ্ছায় যাইতেছেন তাহা জানেন না।

৪।   ধোরো না ধোরা না রথচক্র, রথ কি চক্রে চলে,

যে চক্রের চক্রী হরি, যাঁর চক্রে জগৎ চলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — গোপীদের কি ভালবাসা, কি প্রেম। শ্রীমতী স্বহস্তে শ্রীকৃষ্ণের চিত্র এঁকেছেন, কিন্তু পা আঁকেন নাই; পাছে তিনি মথুরায় চলে যান।

“আমি এ-সব গান ছেলেবেলায় খুব গাইতাম। এক-এক যাত্রার সমস্ত পালা গেয়ে দিতে পারতাম। কেউ কেউ বলত, আমি কালীয়দমন-যাত্রার দলে ছিলাম।”

একজন ভক্ত নূতন উড়ানি গায়ে দিয়া আসিয়াছেন। রাখালের বালক স্বভাব, কাঁচি এনে তাঁর চাদরের ছিলা কাটিতে আসিয়াছেন। ঠাকুর বলিলেন, “কেন কাটছিস? থাক না, শালের মতো বেশ দেখাচ্ছে। হাঁগা, এর কত দাম?” তখন বিলাতী চাদরের দাম কম ছিল। ভক্তটি বলিলেন, এক টাকা ছয় আনা জোড়া। ঠাকুর বলিলেন, “বল কি গো। জোড়া! এক টাকা ছয় আনা জোড়া!”

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর ভক্তকে বলিতেছেন, “যাও, গঙ্গা নাওগে; এঁকে তেল দে রে।”

স্নানান্তে তিনি ফিরিয়া আসিলে, ঠাকুর তাক হইতে একটি আম্র লইয়া তাঁহাকে দিলেন। বলিতেছেন, এই আমটি একে দিই; তিনটা পাশ করা। আচ্ছা, তোমার ভাই এখন কেমন?

ভক্ত — হাঁ, তাঁর ঔষধ ঠিক পড়েছে, এখন খাটলে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তার একটি কর্মের যোগাড় করে দিতে পার? বেশ তো তুমি মুরুব্বি হবে।

ভক্ত — ভাল হলে সব সুবিধা হয়ে যাবে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১০ই জুন 1883/06/10/ii

14.9 শ্রীরামকৃষ্ণ মণিরামপুর ভক্তসঙ্গে

ঠাকুর আহারান্তে ছোট খাটটিতে একটু বসিয়াছেন, এখনও বিশ্রাম করিতে অবসর পান নাই। ভক্তদের সমাগম হইতে লাগিল। প্রথমে মণিরামপুর হইতে একদল ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন পি. ডব্লিউ. ডি. তে কাজ করিতেন, এখন পেনশন পান। একটি ভক্ত তাঁহাদিগকে লইয়া আসিয়াছেন। ক্রমে বেলঘরে হইতে একদল ভক্ত আসিলেন। শ্রীযুক্ত মণি মল্লিক প্রভৃতি ভক্তেরাও ক্রমে আসিলেন।

মণিরামপুরের ভক্তগণ বলিতেছেন, আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, ““না, না, ও-সব রজোগুণের কথা — উনি এখন ঘুমুবেন!”

চাণক মণিরামপুর — এই কথা শুনিয়া ঠাকুরের বাল্যসখা শ্রীরামের উদ্দীপন হইয়াছে। ঠাকুর বলিতেছেন, “শ্রীরামের দোকান তোমাদের ওখানে। ও-দেশে শ্রীরাম আমার সঙ্গে পাঠশালায় পড়ত। সেদিন এখানে এসেছিল।”

মণিরামপুরের ভক্তেরা বলিতেছেন, কি উপায়ে ভগবানকে পাওয়া যায়, একটু আমাদের দয়া করে বলুন।

[মণিরামপুরের ভক্তকে শিক্ষা — সাধন-ভজন কর ও ব্যাকুল হও]

শ্রীরামকৃষ্ণ — একটু সাধন-ভজন করতে হয়।

“দুধে মাখন আছে বললেই হয় না, দুধকে দই পেতে, মন্থন করে মাখন তুলতে হয়। তবে মাঝে মাঝে একটু নির্জন চাই।১ দিন কতক নির্জনে থেকে ভক্তিলাভ করে, তারপর যেখানে থাক। জুতো পায় দিয়ে কাঁটাবনেও অনায়াসে যাওয়া যায়।

“প্রধান কথা বিশ্বাস। ‘যেমন ভাব তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়।’ বিশ্বাস হয়ে গেলে আর ভয় নাই।”

মণিরামপুর ভক্ত — আজ্ঞা, গুরু কি প্রয়োজন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — অনেকের প্রয়োজন আছে।২ তবে গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতে হয়। গুরুকে ঈশ্বরজ্ঞান করলে তবে হয়। তাই বৈষ্ণবেরা বলে, গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব।

“তাঁর নাম সর্বদাই করতে হয়। কলিতে নাম-মাহাত্ম্য। অন্নগত প্রাণ, তাই যোগ হয় না। তাঁর নাম করে, হাততালি দিলে পাপপাখি পালিয়ে যায়।

“সৎসঙ্গ সর্বদাই দরকার। গঙ্গার যত কাছে যাবে ততই শীতল হাওয়া পাব; অগ্নির যত কাছে যাবে ততই উত্তাপ পাবে।

“ঢিমে তেতলা হলে হয় না। যাদের সংসারে ভোগের ইচ্ছা আছে তারা বলে, ‘হবে, কখন না কখন ঈশ্বরকে পাবে!’

“আমি কেশব সেনকে বলেছিলাম, ছেলেকে ব্যাকুল দেখলে বাপ তিন বৎসর আগেই তার হিস্যে ফেলে দেয়।

“মা রাঁধছে, কোলের ছেলে শুয়ে আছে। মা মুখে চুষি দিয়ে গেছে; যখন চুষি ফেলে চিৎকার করে ছেলে কাঁদে, তখন মা হাঁড়ি নামিয়ে ছেলেকে কোলে করে মাই দেয়। এই সব কথা কেশব সেনকে বলেছিলাম।

“কলিতে বলে, একদিন একরাত কাঁদলে ইশ্বর দর্শন হয়।

“মনে অভিমান করবে, আর বলবে, ‘তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ; দেখা দিতে হবে।’

“সংসারেই থাক, আর যেখানেই থাক — ঈশ্বর মনটি দেখেন। বিষয়াসক্ত মন যেমন ভিজে দেশলাই, যত ঘষো জ্বলে না। একলব্য মাটির দ্রোণ অর্থাৎ নিজের গুরুর মূর্তি সামনে রেখে বাণ শিক্ষা করেছিল।

“এগিয়ে পড়; — কাঠুরে এগিয়ে গিয়ে দেখেছিল, চন্দন কাঠ, রূপার খনি, সোনার খনি, আরও এগিয়ে গিয়ে দেখলে হীরে, মাণিক।

“যারা অজ্ঞান, তারা যেন মাটির দেওয়ালের ঘরের ভিতর রয়েছে। ভিতরে তেমন আলো নাই, আবার বাহিরের কোন জিনিস দেখতে পাচ্ছে না। জ্ঞান লাভ করে যে সংসারে থাকে সে যেন কাচের ঘরের ভিতর আছে। ভিতরে আলো বাহিরেও আলো। ভিতরের জিনিসও দেখতে পায়, আর বাহিরের জিনিসও দেখতে পায়।”

[ব্রহ্ম ও জগন্মাতা এক]

“এক বই আর কিছু নাই। সেই পরব্রহ্ম ‘আমি’ যতক্ষণ রেখে দেন, ততক্ষণ দেখান যে, আদ্যাশক্তিরূপে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন।

“যিনিই ব্রহ্ম তিনিই আদ্যাশক্তি। একজন রাজা বলেছিল যে, আমায় এককথায় জ্ঞান দিতে হবে। যোগী বললে, আচ্ছা তুমি এককথাতেই জ্ঞান পাবে। খানিকক্ষণ পরে রাজার কাছে হঠাৎ একজন যাদুকর এসে উপস্থিত। রাজা দেখলে, সে এসে কেবল দুটো আঙুল ঘুরাচ্ছে, আর বলছে, ‘রাজা, এই দেখ, এই দেখ।’ রাজা অবাক্ হয়ে দেখছে। খানিকক্ষণ পরে দেখে দুটো আঙুল একটা আঙুল হয়ে গেছে। যাদুকর একটা আঙুল ঘোরাতে ঘোরাতে বলছে, ‘রাজা, এই দেখ, এই দেখ।’ অর্থাৎ ব্রহ্ম আর আদ্যাশক্তি প্রথম দুটা বোধ হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে আর দুটা থাকে না! অভেদ! এক! যে একের দুই নাই। অদ্বৈতম্।”

১ যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ। [গীতা, ৬।১০]

২ গুরুর প্রয়োজন — ...আচার্যবান্ পুরুষো বেদ...। [ছান্দোগ্যোপনিষদ, ৬।১৪।২]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১০ই জুন 1883/06/10/iii

14.10 বেলঘরের ভক্তসঙ্গে

বেলঘরে হইতে গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ভক্তেরা আসিয়াছেন। ঠাকুর যেদিন তাঁহার বাটীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন, সেদিন গায়কের "জাগ জাগ জননি" এই গান শুনিয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। গোবিন্দ সেই গায়কটিকেও আনিয়াছেন। ঠাকুর গায়ককে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন ও বলিতেছেন, তুমি কিছু গান কর। গায়ক গাইতেছেন:

১। দোষ কারু নয় গো মা,
আমি স্বখাত-সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।

২। ছুঁসনা রে শমন আমার জাত গিয়েছে।

যদি বলিস ওরে শমন জাত গেল কিসে,

কেলে সর্বনাশী আমায় সন্ন্যাসী করেছে।

[রাগিণী-মূলতান]

৩। জাগ জাগ জননী

মূলাধারে নিদ্রাগত কতদিন গত হল কুলকুণ্ডলিনী।

স্বকার্য সাধনে চল মা শির মধ্যে,

পরম শিব যথা সহস্রদল পদ্মে,

করি ষড়চক্র ভেদ ঘুচাও মনের খেদ, চৈতন্যরূপিণি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এই গানে ষড় চক্র ভেদের কথা আছে। ঈশ্বর বাহিরেও আছেন, অন্তরেও আছেন। তিনি ভিতরে থেকে মনের নানা অবস্থা করছেন। ষড় চক্র ভেদ হলে মায়ার রাজ্য ছাড়িয়ে জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায়। এরই নাম ঈশ্বরদর্শন।

“মায়া দ্বার ছেড়ে না দিলে ঈশ্বরদর্শন হয় না। রাম, লক্ষ্মণ আর সীতা একসঙ্গে যাচ্ছেন; সকলের আগে রাম, মধ্যে সীতা, পশ্চাতে লক্ষ্মণ। যেমন সীতা মাঝে মাঝে থাকাতে — লক্ষ্মণ রামকে দেখতে পাচ্ছেন না, তেমনি মাঝে মায়া থাকাতে জীব ঈশ্বরকে দর্শন করতে পাচ্ছে না। (মণি মল্লিকের প্রতি) তবে ঈশ্বরের কৃপা হলে মায়া দ্বার ছেড়ে দেন। যেমন দ্বারওয়ানরা বলে, বাবু হুকুম করে দিন — ওকে দ্বার ছেড়ে দিচ্ছি।১

“বেদান্ত মত আর পুরাণ মত। বেদান্তমতে বলে, ‘এই সংসার ধোঁকার টাটি’ অর্থাৎ জগৎ সব ভুল, স্বপ্নবৎ। কিন্তু পুরাণমত বা ভক্তিশাস্ত্রে বলে যে, ঈশ্বরই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন। তাঁকে অন্তরে বাহিরে পূজা কর।

“যতক্ষণ ‘আমি’ বোধ তিনি রেখেছেন ততক্ষণ সবই আছে। আর স্বপ্নবৎ বলবার জো নাই। নিচে আগুন জ্বালা আছে, তাই হাঁড়ির ভিতরে ডাল, ভাত, আলু, পটোল সব টগ্‌বগ্‌ করছে। লাফাচ্ছে, আর যেন বলছে, ‘আমি আছি, আমি লাফাচ্ছি।’ শরীরটা যেন হাঁড়ি; মন বুদ্ধি — জল ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি যেন — ডাল, ভাত, আলু পটোল। অহং যেন তাদের অভিমান, আমি টগ্‌বগ্‌ করছি! আর সচ্চিদানন্দ অগ্নি।

“তাই ভক্তিশাস্ত্রে, এই সংসারকেই ‘মজার কুটি’ বলেছে। রামপ্রসাদের গানে আছে ‘এই সংসার ধোঁকার টাটি’। তারই একজন জবাব দিয়েছিল, ‘এই সংসার মজার কুটি’। ‘কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময়।’ ভক্ত দেখে, যিনিই ঈশ্বর তিনিই মায়া হয়েছেন। তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। ইশ্বর-মায়া-জীব-জগৎ এক দেখে। কোন কোন ভক্ত সমস্ত রামময় দেখে। রামই সব রয়েছেন। কেউ রাধাকৃষ্ণময় দেখে। কৃষ্ণই এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন। সবুজ চশমা পরলে যেমন সব সবুজ দেখে।

“তবে ভক্তিমতে শক্তিবিশেষ। রামই সব হয়ে রয়েছেন, কিন্তু কোনখানে বেশি শক্তি, আর কোনখানে কম শক্তি। অবতারেতে তিনি একরকম প্রকাশ, আবার জীবেতে একরকম। অবতারেরও দেহবুদ্ধি আছে। শরীরধারণে মায়া। সীতার জন্য রাম কেঁদেছিলেন। তবে অবতার ইচ্ছা করে নিজের চোখে কাপড় বাঁধে।

যেমন ছেলেরা কানামাছি খেলে। কিন্তু মা ডাকলেই খেলা থামায়। জীবের আলাদা কথা। যে-কাপড়ে চোখ বাঁধা সেই কাপড়ের পিঠে আটটা ইস্কুরূপ দিয়ে বাঁধা। অষ্টপাশ।২ লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি, কুল, শীল, শোক, জুগুপ্সা (নিন্দা) — ওই অষ্টপাশ। গুরু না খুলে দিলে হয় না।"

১ মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। [গীতা, ৭/১৪]

২ ঘৃণা, লজ্জা, ভয়ং, শঙ্কা (শো?) জুগুপ্সা, চেতী পঞ্চমী।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্তিতাঃ। কুলার্ণবতন্ত্র

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১০ই জুন 1883/06/10/iv

14.11 বেলঘরের ভক্তকে শিক্ষা — ব্যাকুল হয়ে আর্জি কর — ঠিক ভক্তের লক্ষণ

বেলঘরের ভক্ত — আপনি আমাদের কৃপা করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সকলের ভিতরই তিনি রয়েছেন। তবে গ্যাস কোম্পানিকে আর্জি কর। তোমার ঘরের সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে।

“তবে ব্যাকুল হয়ে আর্জি (Prayer) করতে হয়। এমনি আছে, তিন টান একসঙ্গে হলে ঈশ্বরদর্শন হয়। ‘সন্তানের উপর মায়ের টান, সতী স্ত্রীর স্বামীর উপর টান, আর বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান।’

“ঠিক ভক্তের লক্ষণ আছে। গুরুর উপদেশ শুনে স্থির হয়ে থাকে। বেহুলার কাছে জাতসাপ স্থির হয়ে শুনে, কিন্তু কেউটে নয়। আর-একটি লক্ষণ — ঠিক ভক্তের ধারণা শক্তি হয়। শুধু কাচের উপর ছবির দাগ পড়ে না, কিন্তু কালি মাখানো কাচের উপর ছবি উঠে, যেমন ফটোগ্রাফ; ভক্তিরূপ কালি।

“আর-একটি লক্ষণ। ঠিক ভক্ত জিতেন্দ্রিয় হয়, কামজয়ী হয়। গোপীদের কাম হত না।

“তা তোমরা সংসারে আছ তাহলেই বা; এতে সাধনের আরও সুবিধা, যেমন কেল্লা থেকে যুদ্ধ করা। যখন শবসাধন করে, মাঝে মাঝে শবটা হাঁ করে ভয় দেখায়। তাই চাল, ছোলাভাজা রাখতে হয়। তার মুখে মাঝে মাঝে দিতে হয়। শবটা ঠাণ্ডা হলে, তবে নিশ্চিন্ত হয়ে জপ করতে পারবে। তাই পরিবারদের ঠাণ্ডা রাখতে হয়। তাদের খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করে দিতে হয়, তবে সাধন-ভজনের সুবিধা হয়।

“যাদের ভোগ একটু বাকী আছে, তারা সংসারে থেকেই তাঁকে ডাকবে। নিতাই-এর ব্যবস্থা ছিল, মাগুর মাছের ঝোল, ঘোর যুবতীর কোল, বোল হরি বোল।

“ঠিক ঠিক ত্যাগীর আলাদা কথা; মৌমাছি ফুল বই আর কিছুতেই বসবে না। চাতকের কাছে ‘সব জল ধুর’; কোন জল খাবে না কেবল স্বাতী-নক্ষত্রের বৃষ্টির

জন্য হাঁ করে আছে। ঠিক ঠিক ত্যাগী অন্য কোন আনন্দ নেবে না, কেবল ঈশ্বরের আনন্দ। মৌমাছি কেবল ফুলে বসে। ঠিক ঠিক ত্যাগী সাধু যেন মৌমাছি। গৃহীভক্ত যেন এই সব মাছি — সন্দেশেও বসে, আবার পচা ঘায়েও বসে।

"তোমরা এত কষ্ট করে এখানে এসেছ, তোমরা ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়াচ্ছ। সব লোক বাগান দেখেই সন্তুষ্ট, বাগানের কর্তার অনুসন্ধান করে দু-একজন। জগতের সৌন্দর্যই দেখে, কর্তাকে খোঁজে না।"

[হঠযোগ, রাজযোগ ও বেলঘরের ভক্ত — ষড়চক্র ভেদ ও সমাধি]

(গায়ককে দেখাইয়া) — ইনি ষড়চক্রের গান গাইলেন। সে-সব যোগের কথা। হঠযোগ আর রাজযোগ। হঠযোগী শরীরের কতকগুলো কসরৎ করে; উদ্দেশ্য — সিদ্ধাই, দীর্ঘ আয়ু হবে, অষ্টসিদ্ধি হবে; এই সব উদ্দেশ্য। রাজযোগের উদ্দেশ্য — ভক্তি, প্রেম, জ্ঞান, বৈরাগ্য। রাজযোগই ভাল।

"বেদান্তের সপ্তভূমি, আর যোগশাস্ত্রের ষড়চক্র অনেক মেলে। বেদের প্রথম তিনভূমি, আর ওদের মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর। এই তিন ভূমিতে গুহ্য, লিঙ্গ, নাভির মনের বাস। মন যখন চতুর্থভূমিতে উঠে অর্থাৎ অনাহত পদ্মে, জীবাত্মাকে তখন শিখার ন্যায় দর্শন হয়, আর জ্যোতিঃদর্শন হয়। সাধক বলে, 'এ কি! এ কি!'

"পঞ্চভূমিতে মন উঠলে, কেবল ঈশ্বরের কথাই শুনতে ইচ্ছা হয়। এখানে বিশুদ্ধচক্র। ষষ্ঠভূমি আর আজ্ঞাচক্র এক। সেখানে মন গেলে ঈশ্বরদর্শন হয়।

কিন্তু যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো — ছুঁতে পারে না, মাঝে কাচ ব্যবধান আছে বলে।

“জনক রাজা পঞ্চভূমি থেকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিতেন। তিনি কখনও পঞ্চমভূমি, কখনও ষষ্ঠভূমিতে থাকতেন।

“ষড়চক্র ভেদের পর সপ্তমভূমি। মন সেখানে গেলে মনের লয় হয়। জীবাত্মা পরমাত্মা এক হয়ে যায় — সমাধি হয়। দেহবুদ্ধি চলে যায়, বাহ্যশূন্য হয়; নানা জ্ঞান চলে যায়; বিচার বন্ধ হয়ে যায়।

“ত্রৈলঙ্গ স্বামী বলেছিল, বিচারে অনেক বোধ হচ্ছে; নানা বোধ হচ্ছে। সমাধির পর শেষে একুশদিনে মৃত্যু হয়।

“কিন্তু কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ না হলে চৈতন্য হয় না!”

[ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ]

“যে ঈশ্বরলাভ করেছে, তার লক্ষণ আছে। সে হয়ে যায় — বালকবৎ, উন্মাদবৎ, জড়বৎ, পিশাচবৎ। আর তার ঠিক বোধ হয় ‘আমি যন্ত্র আর তিনি যন্ত্রী; তিনিই কর্তা, আর সকলেই অকর্তা।’ শিখরা যেমন বলেছিল, পাতাটি নড়ছে সেও ঈশ্বরের ইচ্ছা। রামের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে — এই বোধ। তাঁতী যেমন বলেছিল, রামের ইচ্ছাতেই কাপড়ের দাম এক টাকা ছয় আনা, রামের ইচ্ছাতেই ডাকাতি হল; রামের ইচ্ছাতেই ডাকাত ধরা পড়ল। রামের ইচ্ছাতেই আমাকে পুলিশে নিয়ে গেল, আবার রামের ইচ্ছাতেই আমাকে ছেড়ে দিল।”

সন্ধ্যা আগত প্রায়। ঠাকুর একবারও বিশ্রাম করেন নাই। ভক্তসঙ্গে অবিশ্রান্ত হরিকথা হইতেছে। এইবার মণিরামপুর ও বেলঘরের ভক্তেরা ও অন্যান্য ভক্তেরা তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া, ঠাকুরবাড়িতে ঠাকুরদের দর্শন করিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৫ই জুন 1883/06/15/i

14.12 দক্ষিণেশ্বরে দশহরাদিবসে গৃহস্থাশ্রমকথা-প্রসঙ্গে

[রাখাল, অধর, মাস্টার, রাখালের বাপ, বাপের শ্বশুর প্রভৃতি]

আজ দশহরা (২রা আষাঢ়), জৈষ্ঠ শুক্লা দশমী, শুক্রবার, ১৫ই জুন, ১৮৮৩। ভক্তেরা শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়িতে আসিয়াছেন। অধর, মাস্টার দশহরা উপলক্ষে ছুটি পাইয়াছেন।

রাখালের বাপ ও তাঁহার শ্বশুর আসিয়াছেন। বাপ দ্বিতীয় সংসার করিয়াছিলেন। ঠাকুরের নাম শ্বশুর অনেকদিন হইতে শুনিয়াছেন। তিনি সাধক লোক, শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ঠাকুর আহারান্তে ছোট খাটটিতে

বসিয়া আছেন। রাখালের বাপের শ্বশুরকে এক-একবার দেখিতেছেন। ভক্তেরা মেঝেতে বসিয়া আছেন।

শ্বশুর — মহাশয়, গৃহস্থাশ্রমে কি ভগবান লাভ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — কেন হবে না? পাঁকাল মাছের মতো থাক। সে পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে পাঁক নাই। আর ঘুষকীর মতো থাক। সে ঘরে-কন্নার সব কাজ করে কিন্তু মন উপপতির উপর পড়ে থাকে। ঈশ্বরের উপর মন ফেলে রেখে সংসারের কাজ সব কর। কিন্তু বড় কঠিন। আমি ব্রহ্মজ্ঞানীদের বলেছিলুম, যে-ঘরে আচার তেঁতুল আর জলের জালা সেই ঘরেই বিকারের রোগী! কেমন করে রোগ সারবে? আচার তেঁতুল মনে করলে মুখে জল সরে। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোক আচার তেঁতুলের মতো। আর বিষয় তৃষ্ণা সর্বদাই লেগে আছে; ওইটি জলের জালা। এ তৃষ্ণার শেষ নাই। বিকারের রোগী বলে, এক জালা জল খাব! বড় কঠিন। সংসারে নানা গোল। এদিকে যাবি, কোঁস্তা ফেলে মারব; ওদিকে যাবি, ঝাঁটা ফেলে মারব; এদিকে যাবি জুতো ফেলে মারব। আর নির্জন না হলে ভগবানচিন্তা হয় না। সোনা গলিয়ে গয়না গড়ব তা যদি গলাবার সময় পাঁচবার ডাকে, তাহলে সোনা গলানো কেমন করে হয়? চাল কাঁড়ছ একলা বসে কাঁড়তে হয়। এক-একবার চাল হাত করে তুলে দেখতে হয়, কেমন সাফ হল। কাঁড়তে কাঁড়তে যদি পাঁচবার ডাকবে, ভাল কাঁড়া কেমন করে হয়?

[উপায় — তীব্র বৈরাগ্য; পূর্বকথা — গঙ্গাপ্রসাদের সহিত দেখা]

একজন ভক্ত — মহাশয়, এখন উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — আছে। যদি তীব্র বৈরাগ্য হয়, তাহলে হয়। যা মিথ্যা বলে জানছি, রোখ করে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ কর। যখন আমার ভারী ব্যামো, গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে লয়ে গেল। গঙ্গাপ্রসাদ বললে, স্বর্ণপটপটি খেতে হবে, কিন্তু জল খেতে পাবে না; বেদানার রস খেতে পার। সকলে মনে করলে, জল না খেয়ে কেমন করে আমি থাকব। আমি রোখ কল্লুম আর জল খাব না। 'পরমহংস'! আমি তো পাতিহাঁস নই — রাজহাঁস! দুধ খাব।

"কিছুদিন নির্জনে থাকতে হয়। বুড়ী ছুঁয়ে ফেললে আর ভয় নাই। সোনা হলে তারপরে যেখানেই থাক। নির্জনে থেকে যদি ভক্তিলাভ হয়, যদি ভগবানলাভ হয়, তাহলে সংসারেও থাকা যায়। (রাখালের বাপের প্রতি) তাই তো ছোকরাদের থাকতে বলি। কেননা, এখানে দিন কতক থাকলে ভগবানে ভক্তি হবে। তখন বেশ সংসারে গিয়ে থাকতে পারবে।"

[পাপ-পুণ্য — সংসারব্যাধির মহৌষধি সন্ন্যাস]

একজন ভক্ত — ঈশ্বর যদি সবই করছেন, তবে ভালমন্দ, পাপ-পুণ্য — এ-সব বলে কেন? পাপও তাহলে তাঁর ইচ্ছা?

রাখালের বাপের শ্বশুর — তাঁর ইচ্ছা আমরা কি করে বুঝব?

"Thou Great First Cause least understood" — Pope.

শ্রীরামকৃষ্ণ — পাপ-পুণ্য আছে, কিন্তু তিনি নিজে নির্লিপ্ত। বায়ুতে সুগন্ধ দুর্গন্ধ সবরকমই থাকে, কিন্তু বায়ু নিজে নির্লিপ্ত। তাঁর সৃষ্টিই এইরকম; ভালমন্দ, সদসৎ; যেমন গাছের মধ্যে কোনটা আমগাছ, কোনটা কাঁঠালগাছ, কোনটা

আমরাগাছ। দেখ না দুষ্ট লোকেরও প্রয়োজন আছে। যে-তালুকের প্রজারা দুর্দান্ত, সে-তালুকে একটা দুষ্ট লোককে পাঠাতে হয়, তবে তালুকের শাসন হয়।

আবার গৃহস্থাশ্রমের কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — কি জানো, সংসার করলে মনের বাজে খরচ হয়ে পড়ে। এই বাজে খরচ হওয়ার দরুন মনের যা ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি আবার পূরণ হয়, যদি কেউ সন্ন্যাস করে। বাপ প্রথম জন্ম দেন, তারপরে দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নের সময়। আর-একবার জন্ম হয় সন্ন্যাসের সময়।১ কামিনী ও কাঞ্চন এই দুটি বিঘ্ন। মেয়েমানুষে আসক্তি ঈশ্বরের পথ থেকে বিমুখ করে দেয়। কিসে পতন হয়, পুরুষ জানতে পারে না। যখন কেল্লায় যাচ্ছি, একটুও বুঝতে পারি নাই যে, গড়ানে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। কেল্লার ভিতর গাড়ি পোঁছুলে দেখতে পেলুম, কত নিচে এসেছি। আহা, পুরুষদের বুঝতে দেয় না! কাপ্তেন বলে, আমার স্ত্রী জ্ঞানী! ভূতে যাকে পায়, সে জানে না যে, ভূতে পেয়েছে! সে বলে, বেশ আছি! (সকলে নিস্তব্ধ)

"সংসারে শুধু যে কামের ভয়, তা নয়। আবার ক্রোধ আছে। কামনার পথে কাঁটা পড়লেই ক্রোধ।"

"মাস্টার — আমার পাতের কাছে বেড়াল নুলো বাড়িয়ে মাছ নিতে আসে, আমি কিছু বলতে পারি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেন! একবার মারলেই বা, তাতে দোষ কি? সংসারী ফোঁস করবে! বিষ ঢালা উচিত নয়। কাজে কারু অনিষ্ট যেন না করে। কিন্তু শত্রুদের

হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ক্রোধের আকার দেখাতে হয়। না হলে শত্রুরা এসে অনিষ্ট করবে। ত্যাগির ফোঁসের দরকার নাই।

একজন ভক্ত — মহাশয়, সংসারে তাঁকে পাওয়া বড়ই কঠিন দেখছি। কটা লোক এরকম হতে পারে? কি! দেখতে তো পাই না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেন হবে না? ও-দেশে শুনেছি, একজন ডেপুটি, খুব লোক — প্রতাপ সিং; দান-ধ্যান, ঈশ্বরে ভক্তি, অনেক গুণ আছে। আমাকে লতে পাঠিয়েছিল। এইরকম লোক আছে বইকি।

১ Except ye be born again ye cannot enter into the kingdom of Heaven: Christ.

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৫ই জুন 1883/06/15/ii

14.13 সাধনার প্রয়োজন — গুরুবাক্যে বিশ্বাস — ব্যাসের বিশ্বাস

শ্রীরামকৃষ্ণ — সাধন বড় দরকার। তবে হবে না কেন? ঠিক বিশ্বাস যদি হয়, তাহলে আর বেশি খাটতে হয় না। গুরুবাক্যে বিশ্বাস!

“ব্যাসদেব যমুনা পার হবেন, গোপীরা এসে উপস্থিত। গোপীরাও পার হবে কিন্তু খেয়া মিলছে না। গোপীরা বললে, ঠাকুর! এখন কি হবে? ব্যাসদেব বললেন, আচ্ছা তোদের পার করে দিচ্ছি, কিন্তু আমার বড় খিদে পেয়েছে, কিছু আছে? গোপীদের কাছে দুধ, ক্ষীর, নবনী অনেক ছিল, সমস্ত ভক্ষণ করলেন। গোপীরা বললে, ঠাকুর পারের কি হল। ব্যাসদেব তখন তীরে গিয়ে দাঁড়ালেন; বললেন, হে যমুনে, যদি আজ কিছু খেয়ে না থাকি, তোমার জল দুভাগ হয়ে যাবে, আর আমরা সব সেই পথ দিয়ে পার হয়ে যাব। বলতে বলতে জল দুধারে সরে গেল। গোপীরা অবাক্; ভাবতে লাগল — উনি এইমাত্র এত খেলেন, আবার বলছেন, ‘যদি আমি কিছু খেয়ে না থাকি?’

“এই দৃঢ় বিশ্বাস। আমি না, হৃদয় মধ্যে নারায়ণ — তিনি খেয়েছেন।

“শঙ্করাচার্য এদিকে ব্রহ্মজ্ঞানী; আবার প্রথম প্রথম ভেদবুদ্ধিও ছিল। তেমন বিশ্বাস ছিল না। চণ্ডাল মাংসের ভার লয়ে আসছে, উনি গঙ্গাস্নান করে উঠেছেন। চণ্ডালের গায়ে গা লেগে গেছে। বলে উঠলেন, ‘এই তুই আমায় ছুঁলি!’ চণ্ডাল বললে, ‘ঠাকুর, তুমিও আমায় ছোঁও নাই, আমিও তোমায় ছুঁই নাই।’ যিনি শুদ্ধ আত্মা, তিনি শরীর নন, পঞ্চভূত নন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নন। তখন শঙ্করের জ্ঞান হয়ে গেল।

“জড়ভরত রাজা রহুগণের পালকি বহিতে বহিতে যখন আত্মজ্ঞানের কথা বলতে লাগল, রাজা পালকি থেকে নিচে এসে বললে, তুমি কে গো! জড়ভরত বললেন, আমি নেতি, নেতি, শুদ্ধ আত্মা। একেবারে ঠিক বিশ্বাস, আমি শুদ্ধ আত্মা।”

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগতত্ত্ব — জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ]

" 'আমিই সেই' 'আমি শুদ্ধ আত্মা' — এটি জ্ঞানীদের মত। ভক্তেরা বলে, এ-সব ভগবানের ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য না থাকলে ধনীকে কে জানতে পারত? তবে সাধকের ভক্তি দেখে তিনি যখন বলবেন, 'আমিও যা, তুইও তা' তখন এক কথা। রাজা বসে আছেন, খানসামা যদি রাজার আসনে গিয়ে বসে, আর বলে, 'রাজা তুমিও যা, আমিও তা' লোকে পাগল বলবে। তবে খানসামার সেবাতে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা একদিন বলেন, 'ওরে, তুই আমার কাছে বোস, ওতে দোষ নাই; তুইও যা, আমিও তা!' তখন যদি সে গিয়ে বসে, তাতে দোষ হয় না। সামান্য জীবেরা যদি বলে, 'আমি সেই' সেটা ভাল না। জলেরই তরঙ্গ; তরঙ্গের কি জল হয়?

"কথাটা এই — মন স্থির না হলে যোগ হয় না, যে পথেই যাও। মন যোগীর বশ! যোগী মনের বশ নয়।

"মন স্থির হলে বায়ু স্থির হয় — কুম্ভক হয়। এই কুম্ভক ভক্তিযোগেতেও হয়; ভক্তিতে বায়ু স্থির হয়ে যায়। 'নিতাই আমার মাতা হাতি', 'নিতাই আমার মাতা হাতি!' এই বলতে বলতে যখন ভাব হয়ে যায়, সব কথাগুলো বলতে পারে না, কেবল 'হাতি'! 'হাতি'! তারপর শুধু 'হা'। ভাবে বায়ু স্থির হয় — কুম্ভক হয়।

"একজন ঝাঁট দিচ্ছে, একজন লোক এসে বললে, 'ওগো, অমুক নেই, মারা গেছে!' যে ঝাঁট দিচ্ছে তার যদি আপনার লোক না হয়, সে ঝাঁট দিতে থাকে, আর মাঝে মাঝে বলে, 'আহা, তাই তো গা, লোকটা মারা গেল! বেশ ছিল!'

এদিকে ঝাঁটাও চলছে। আর যদি আপনার লোক হয়, তাহলে ঝাঁটা হাত থেকে পড়ে যায়, আর 'এ্যাঁ'! বলে বসে পড়ে। তখন বায়ু স্থির হয়ে গেছে; কোন কাজ বা চিন্তা করতে পারে না। মেয়েদের ভিতর দেখ নাই! যদি কেউ অবাক্‌ হয়ে একটা জিনিস দেখে বা একটা কথা শুনে, তখন অন্য মেয়েরা বলে, তোর ভাব লেগেছে নাকি লো! এখানেও বায়ু স্থির হয়েছে, তাই অবাক্‌, হাঁ করে থাকে।"

[জ্ঞানীর লক্ষণ — সাধনসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ]

"সোঽহংসোঽহম্‌ কল্লেই হয় না। জ্ঞানীর লক্ষণ আছে। নরেন্দ্রের চোখ সুমুখঠেলা। এঁরও কপাল ও চোখের লক্ষণ ভাল।

"আর, সব্বায়ের এক অবস্থা নয়। জীব চার প্রকার বলেছে, — বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব, নিত্যজীব। সকলকেই যে সাধন করতে হয়, তাও নয়। নিত্যসিদ্ধ আর সাধনসিদ্ধ। কেউ অনেক সাধন করে ঈশ্বরকে পায়, কেউ জন্ম অবধি সিদ্ধ, যেমন প্রহ্লাদ। হোমাপাখি আকাশে থাকে। ডিম পাড়লে ডিম পড়তে থাকে। পড়তে পড়তেই ডিম ফুটে। ছানাটা বেরিয়ে আবার পড়তে থাকে। এখনও এত উঁচু যে, পড়তে পড়তে পাখা ওঠে। যখন পৃথিবীর কাছে এসে পড়ে, পাখিটা দেখতে পায়, তখন বুঝতে পারে যে, মাটিতে লাগলে চুরমার হয়ে যাবে। তখন একেবারে মার দিকে চোঁচা দৌড় দিয়ে উড়ে যায়। কোথায় মা! কোথায় মা!

"প্রহ্লাদাদি নিত্যসিদ্ধের সাধন-ভজন পরে। সাধনের আগে ঈশ্বরলাভ। যেমন লাউ কুমড়োর আগে ফল, তারপরে ফুল। (রাখালের বাপের দিকে চাহিয়া) নীচ

বংশেও যদি নিত্যসিদ্ধ জন্মায়, সে তাই হয়, আর কিছু হয় না। ছোলা বিষ্ঠাকুড়ে পড়লে ছোলাগাছই হয়!”

[শক্তিবিশেষ ও বিদ্যাসাগর — শুধু পাণ্ডিত্য]

“তিনি কারুকে বেশি শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন। কোনখানে একটা প্রদীপ জ্বলছে, কোনখানে একটা মশাল জ্বলছে। বিদ্যাসাগরের এক কথায় তাকে চিনেছি, কতদুর বুদ্ধির দৌড়! যখন বললুম শক্তিবিশেষ, তখন বিদ্যাসাগর বললে, মহাশয়, তবে কি তিনি কারুকে বেশি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন? আমি অমনি বললুম, তা দিয়েছেন বইকি। শক্তি কম বেশি না হলে তোমার নাম এত কম হবে কেন? তোমার বিদ্যা, তোমার দয়া — এই সব শুনে তো আমরা এসেছি। তোমার তো দুটো শিং বেরোয় নাই! বিদ্যাসাগরের এত বিদ্যা, এত নাম, কিন্তু এত কাঁচা কথা বলে ফেললে, ‘তিনি কি কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?’ কি জান, জালে প্রথম প্রথম বড় বড় মাছ পড়ে — রুই, কাতলা। তারপর জেলেরা পাঁকটা পা দিয়ে ঘেঁটে দেয়, তখন চুনোপুঁটি, পাঁকাল এই সব মাছ বেরোয় — একটু দেখতে দেখতে ধরা পড়ে। ঈশ্বরকে না জানলে ক্রমশঃ ভিতরের চুনোপুঁটি বেরিয়ে পড়ে। শুধু পণ্ডিত হলে কি হবে?”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৭ই জুন 1883/06/17

14.14 শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে

[তান্ত্রিকভক্ত ও সংসার —— নির্লিপ্তেরও ভয়]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে নিজের ঘরে আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়াছেন। অধর ও মাস্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। একটি তান্ত্রিক ভক্তও আসিয়াছেন। রাখাল, হাজরা, রামলাল প্রভৃতি ঠাকুরের কাছে আজকাল থাকেন। আজ রবিবার, ১৭ই জুন, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। (৪ঠা আষাঢ়) জৈষ্ঠ শুক্লা দ্বাদশী।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — সংসারে হবে না কেন? তবে বড় কঠিন। জনকাদি জ্ঞানলাভ করে সংসারে এসেছিলেন। তবুও ভয়! নিষ্কাম সংসারীরও ভয়। ভৈরবীকে দেখে জনক মুখ হেঁট করেছিল; স্ত্রীদর্শনে সঙ্কোচ হয়েছে! ভৈরবী বললে, জনক! তোমার দেখছি এখনও জ্ঞান হয় নাই; তোমার স্ত্রী-পুরুষ বোধ রয়েছে। কাজলের ঘরে যতই সেয়ানা হও না কেন, একটু না একটু কালো দাগ গায়ে লাগবে।

“দেখেছি, সংসারীভক্ত যখন পূজা করছে গরদ পরে তখন বেশ ভাবটি। এমন কি জলযোগ পর্যন্ত এক ভাব। তারপর নিজ মূর্তি; আবার রজঃ তমঃ।

“সত্ত্বগুণে ভক্তি হয়। কিন্তু ভক্তির সত্ত্ব, ভক্তির রজঃ, ভক্তির তমঃ আছে। ভক্তির সত্ত্ব, বিশুদ্ধ সত্ত্ব — এ-হলে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুতেই মন থাকে না; কেবল দেহটা যাতে রক্ষা হয় ওইটুকু শরীরের উপর মন থাকে।”

[পরমহংস ত্রিগুণাতীত ও কর্মফলের অতীত — পাপ-পুণ্যের অতীত — কেশব সেন ও দল]

“পরমহংস তিনগুণের অতীত।১ তার ভিতর তিনগুণ আছে আবার নাই। ঠিক বালক, কোন গুণের বশ নয়। তাই ছোট ছোট ছেলেদের পরমহংসরা কাছে আসতে দেয়, তাদের স্বভাব আরোপ করবে বলে।

“পরমহংস সঞ্চয় করতে পারে না। এটা সংসারীদের পক্ষে নয়, তাদের পরিবারদের জন্য সঞ্চয় করতে হয়।”

তান্ত্রিকভক্ত — পরমহংসের কি পাপ-পুণ্য বোধ থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেশব সেন ওই কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি বললাম, আরও বললে তোমার দল টল থাকবে না। কেশব বললে, তবে থাক মহাশয়।

“পাপ-পুণ্য কি জানো? পরমহংস অবস্থায় দেখে, তিনিই সুমতি দেন, তিনিই কুমতি দেন। তিতো মিঠে ফল কি নেই? কোন গাছে মিষ্ট ফল, কোন গাছে তিতো বা টক ফল। তিনি মিষ্ট আমগাছও করেছেন, আবার টক আমড়াগাছও করেছেন।”

তান্ত্রিকভক্ত — আজ্ঞা হাঁ, পাহাড়ের উপর দেখা যায় গোলাপের ক্ষেত। যতদূর চক্ষু যায় কেবল গোলাপের ক্ষেত।

শ্রীরামকৃষ্ণ — পরমহংস দেখে, এ-সব তাঁর মায়ার ঐশ্বর্য। সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য। সব বড় দূরের কথা। সে অবস্থায় দল টল থাকে না।

[তান্ত্রিকভক্ত ও কর্মফল, পাপ-পুণ্য — Sin and Responsibility]

তান্ত্রিকভক্ত — তবে কর্মফল আছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাও আছে। ভাল কর্ম করলে সুফল, মন্দ কর্ম করলে কুফল; লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে না? এ-সব তাঁর লীলা-খেলা।

তান্ত্রিকভক্ত — আমাদের উপায় কি? কর্মের ফল তো আছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — থাকলেই বা। তাঁর ভক্তের আলাদা কথা।

এই বলিয়া গান গাইতেছেন:

মন রে কৃষি কাজ জানো না।
এমন মানব-জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা।
কালীনামে দাওরে বেড়া, ফললে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না ।।
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে, ভক্তিবারি সেঁচে দেনা ।
একা যদি না পারিস মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা ।।

আবার গান গাইতেছেন:

শমন আসবার পথ ঘুচেছে, আমার মনের সন্দ ঘুচে গেছে।
ওরে আমার ঘরের নবদ্বারে চারি শিব চৌকি রয়েছে ।।
এক খুঁটিতে ঘর রয়েছে, তিন রজ্জুতে বাঁধা আছে।
সহস্রদল কমলে শ্রীনাথ অভয় দিয়ে বসে আছে ।।

"কাশীতে ব্রাহ্মণই মরুক আর বেশ্যাই মরুক শিব হবে।

"যখন হরিনামে, কালীনামে, রামনামে, চক্ষে জল আসে তখনই সন্ধ্যা-কবচাদির কিছুই প্রয়োজন নাই। কর্মত্যাগ হয়ে যায়। কর্মের ফল তার কাছে যায় না।"

ঠাকুর আবার গান গাইতেছেন:

ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
যেমন ভাব, তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়।
কালীপদ সুধাহ্রদে চিত্ত যদি রয় (যদি চিত্ত ডুবে রয়)।
তবে পূজা-হোম যাগযজ্ঞ কিছু নয়।

ঠাকুর আবার গান গাহিতেছেন:

ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায় ।
সন্ধ্যা তার সন্ধ্যানে ফিরে, কভু সন্ধি নাহি পায় ।।
গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায় ।

কালী কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায় ।।

“তাঁতে মগ্ন হলে আর অসদ্বুদ্ধি, পাপবুদ্ধি থাকে না।”

তান্ত্রিকভক্ত — আপনি যা বলেছেন “বিদ্যার আমি” থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বিদ্যার আমি, ভক্তের আমি। দাস আমি, ভাল আমি থাকে। বজ্জাত আমি চলে যায়। (হাস্য)

তান্ত্রিকভক্ত — আজ্ঞা, আমাদের অনেক সংশয় চলে গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আত্মার সাক্ষাৎকার হলে সব সন্দেহ ভঞ্জন হয়।

[তান্ত্রিকভক্ত ও ভক্তির তমঃ — হাবাতের সংশয় — অষ্টসিদ্ধি]

“ভক্তির তমঃ আন। বল, কি! রাম বলেছি, কালী বলেছি, আমার আবার বন্ধন; আমার আবার কর্মফল।”

ঠাকুর আবার গান গাহিতেছেন:

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি
আখেরে এ-দীনে না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শংকরী।
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশী নারী;
এ-সব পাতক না ভাবি তিলেক (ও মা) ব্রহ্মপদ নিতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলিতেছেন — বিশ্বাস! বিশ্বাস! বিশ্বাস! গুরু বলে দিয়েছেন, রামই সব হয়ে রয়েছেন; ‘ওহি রাম ঘট্ ঘট্‌মে লেটা!’ কুকুর রুটি খেয়ে যাচ্ছে। ভক্ত বলছে, ‘রাম! দাঁড়াও, দাঁড়াও রুটিতে ঘি মেখে দিই’ এমনি গুরুবাক্যে বিশ্বাস।

“হাবাতেগুলোর বিশ্বাস হয় না! সর্বদাই সংশয়! আত্মার সাক্ষাৎকার না হলে সব সংশয় যায় না।২

“শুদ্ধাভক্তি — কোন কামনা থাকবে না, সেই ভক্তি দ্বারা তাঁকে শীঘ্র পাওয়া যায়।

“অণিমাদি সিদ্ধি — এ-সব কামনা। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, ভাই, অণিমাদি সিদ্ধাই, একটিও থাকলে ঈশ্বরলাভ হয় না; একটু শক্তি বাড়তে পারে।”

“তান্ত্রিকভক্ত — আজ্ঞে, তান্ত্রিক ক্রিয়া আজকাল কেন ফলে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ — সর্বাঙ্গীণ হয় না, আর ভক্তিপূর্বক হয় না — তাই ফলে না।

এইবার ঠাকুর কথা সাঙ্গ করিতেছেন। বলিতেছেন, ভক্তিই সার; ঠিক ভক্তের কোন ভয় ভাবনা নাই। মা সব জানে। বিড়াল ইঁদুরকে ধরে একরকম করে, কিন্তু নিজের ছানাকে আর-একরকম করে ধরে।

১ মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।। [গীতা ১৪।২৬]

২ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়া ... তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে। [মুণ্ডকোপনিষদ, ২।২।৮]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c15 ১৫ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পেনেটীর মহোৎসবক্ষেত্রে রাখাল, রাম, মাস্টার, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৮ই জুন 1883/06/18/i

15.1 ঠাকুর সংকীর্তনানন্দে —— ঠাকুর কি শ্রীগৌরাঙ্গ?

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পেনেটীর মহোৎসবক্ষেত্রে বহুলোকসমাকীর্ণ রাজপথে সংকীর্তনের দলের মধ্যে নৃত্য করিতেছেন। বেলা একটা হইয়াছে। আজ সোমবার, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথী, ১৮ই জুন, ১৮৮৩।

সংকীর্তনমধ্যে ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য চতুর্দিকে লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইতেছে। ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতেছেন, কেহ কেহ ভাবিতেছে, শ্রীগৌরাঙ্গ কি আবার প্রকট হইলেন! চতুর্দিকে হরিধ্বনি সমুদ্রকল্লোলের ন্যায় বাড়িতেছে। চতুর্দিকে হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও হরির লুট পড়িতেছে।

নবদ্বীপ গোস্বামী প্রভু সংকীর্তন করিতে করিতে রাঘবমন্দিরাভিমুখে যাইতেছিলেন। এমন সময়ে ঠাকুর কোথা হইতে তীর বেগে আসিয়া সংকীর্তন দলের মধ্যে নৃত্য করিতেছেন।

এটি রাঘব পণ্ডিতের চিঁড়ার মহোৎসব। শুক্লাপক্ষের ত্রয়োদশী তিথীতে প্রতিবর্ষে হইয়া থাকে। দাস রঘুনাথ প্রথমে এই মহোৎসব করেন। রাঘব পণ্ডিত তাহার পরে বর্ষে বর্ষে করিয়াছিলেন। দাস রঘুনাথকে নিত্যানন্দ বলিয়াছিলেন, ‘ওরে চোরা, তুই বাড়ি থেকে কেবল পালিয়ে পালিয়ে আসিস, আর চুরি করে প্রেম আস্বাদন করিস — আমরা কেউ জানতে পারি না! আজ তোকে দণ্ড দিব, তুই চিঁড়ার মহোৎসব করে ভক্তদের সেবা কর।’

ঠাকুর প্রতি বৎসরই প্রায় আসেন, আজও এখানে রাম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে আসিবার কথা ছিল। রাম সকালে কলিকাতা হইতে মাস্টারের সহিত দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। সেইখানে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন ও প্রণামান্তর উত্তরের

বারান্দায় আসিয়া প্রসাদ পাইলেন। রাম কলিকাতা হইতে যে গাড়িতে আসিয়াছিলেন, সেই গাড়ি করিয়া ঠাকুরকে পেনেটীতে আনা হইল। সেই গাড়িতে রাখাল, মাস্টার, রাম, ভবনাথ, আরো দু-একটি ভক্ত — তাহার মধ্যে একজন ছাদে বসিয়াছিলেন।

গাড়ি ম্যাগাজিন রোড দিয়া চানকের বড় রাস্তায় (ট্রাঙ্ক রোড) গিয়া পড়িল। যাইতে যাইতে ঠাকুর ছোকরা ভক্তদের সঙ্গে অনেক ফষ্টিনাষ্টি করিতে লাগিলেন।

[পেনেটীর মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাব]

পেনেটীর মহোৎসবক্ষেত্রে গাড়ি পৌঁছিবামাত্র রাম প্রভৃতি ভক্তেরা দেখিয়া অবাক্ হইলেন — ঠাকুর গাড়িতে এই আনন্দ করিতেছিলেন, হঠাৎ একাকী নামিয়া তীরের ন্যায় ছুটিতেছেন! তাঁহারা অনেক খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন যে, নবদ্বীপ গোস্বামীর সংকীর্তনের দলের মধ্যে ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন ও মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতেছেন। পাছে পড়িয়া যান শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ গোস্বামী সমাধিস্থ দেখিয়া তাঁহাকে অতি যত্নে ধারণ করিতেছেন। আর চতুর্দিকে ভক্তেরা হরিধ্বনি করিয়া তাঁহার চরণে পুষ্প ও বাতাসা নিক্ষেপ করিতেছেন ও একবার দর্শন করিবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছেন!

ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশায় নৃত্য করিতেছেন। বাহ্যদশায় নাম ধরিলেন:

গান — যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, ওই তারা তারা দুভাই এসেছে রে।
যারা আপনি নেচে জগৎ নাচায়, তারা তারা দুভাই এসেছে রে!
(যারা আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়) (যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে)

ঠাকুরের সঙ্গে সকলে উন্মত্ত হইয়া নাচিতেছেন, আর বোধ করিতেছেন, গৌর-নিতাই আমাদের সাক্ষাতে নাচিতেছেন।

ঠাকুর আবার নাম ধরিলেন:

গান — নদে টলমল টলমল করে — গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে।

সংকীর্তনরঙ্গ রাঘবমন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সেখানে পরিক্রমণ ও নৃত্য করিয়া, গঙ্গাকুলের বাবুদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বাড়ির দিকে এই তরঙ্গায়িত জনসঙ্ঘ অগ্রসর হইতেছে।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বাড়িতে সংকীর্তন দলের কিয়দংশ প্রবেশ করিতেছে — অধিকাংশ লোকই প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। কেবল দ্বারদেশে ঠেলাঠেলি করিয়া উঁকি মারিতেছে।

[শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের আঙিনা মধ্যে নৃত্য]

ঠাকুর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের আঙিনায় আবার নৃত্য করিতেছেন। কীর্তনানন্দে গরগর মাতোয়ারা। মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতেছেন। আর চতুর্দিক হইতে পুষ্প ও বাতাসা চরণতলে পড়িতেছে। হরিনামের রোল আঙিনার ভিতর মুহুর্মুহুঃ হইতেছে। সেই ধ্বনি রাজপথে পৌঁছিয়া সহস্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। ভাগীরথীবক্ষে যে-সকল নৌকা যাতায়াত করিতেছিল তাহাদের আরোহিগণ অবাক্ হইয়া এই সমুদ্রকল্লোলের ন্যায় হরিধ্বনি শুনিতে লাগিল ও নিজেরাও ‘হরিবোল’ ‘হরিবোল’ বলিতে লাগিল।

পেনেটীর মহোৎসবে সমবেত সহস্র সহস্র নরনারী ভাবিতেছে, এই মহাপুরুষের ভিতর নিশ্চই শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছে। দুই-একজন ভাবিতেছে ইনিই বা সাক্ষাৎ সেই শ্রীগৌরাঙ্গ।

ক্ষুদ্র আঙিনায় বহুলোক একত্রিত হইয়াছে। ভক্তেরা অতি সন্তর্পণে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বাহিরে আনিলেন।

[শ্রীমণি সেনের বৈঠকখানায় শ্রীরামকৃষ্ণ]

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে শ্রীযুক্ত মণি সেনের বৈঠকখানায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। এই সেন পরিবারদেরই পেনেটীতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা। তাঁহারাই এখন বর্ষে বর্ষে মহোৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন ও ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করেন।

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিলে পর মণি সেন ও তাঁহাদের গুরুদেব নবদ্বীপ গোস্বামী ঠাকুরকে কক্ষান্তরে লইয়া গিয়া প্রসাদ আনিয়া সেবা করাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাম, রাখাল, মাস্টার, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তদেরও আর-একঘরে বসান হইল। ঠাকুর ভক্তবৎসল — নিজে দাঁড়াইয়া আনন্দ করিতে করিতে তাঁহাদিগকে খাওয়াইতেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৮ই জুন 1883/06/18/ii

15.2 শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ গোস্বামীর প্রতি উপদেশ

[শ্রীগৌরাঙ্গের মহাভাব, প্রেম ও তিন দশা]

অপরাহ্ন। রাখাল, রাম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ঠাকুর মণি সেনের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। নবদ্বীপ গোস্বামী প্রসাদ পাওয়ার পর ঠাণ্ডা হইয়া বৈঠকখানায় আসিয়া ঠাকুরের কাছে বসিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মণি সেন ঠাকুরের গাড়িভাড়া দিতে চাহিলেন। ঠাকুর তখন বৈঠকখানায় একটি কৌচে বসিয়া আছেন আর বলিতেছেন, “গাড়িভাড়া ওরা (রাম প্রভৃতিরা) নেবে কেন? ওরা রোজগার করে।”

এইবার ঠাকুর নবদ্বীপ গোস্বামীর সহিত ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নবদ্বীপের প্রতি) — ভক্তি পাকলে ভাব —– তারপর মহাভাব —– তারপর প্রেম —–তারপর বস্তুলাভ (ঈশ্বরলাভ)।

“গৌরাঙ্গের —– মহাভাব, প্রেম।

“এই প্রেম হলে জগৎ তো ভুল হয়ে যাবেই। আবার নিজের দেহ যে এত প্রিয় তাও ভুল হয়ে যায়! গৌরাঙ্গের এই প্রেম হয়েছিল। সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

“জীবের মহাভাব বা প্রেম হয় না —— তাদের ভাব পর্যন্ত। আর গৌরাঙ্গের তিনটি অবস্থা হত। কেমন?”

নবদ্বীপ —— আজ্ঞা হাঁ। অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা আর বাহ্যদশা।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— অন্তর্দশায় তিনি সমাধিস্থ থাকতেন। অর্ধবাহ্যদশায় কেবল নৃত্য করতে পারতেন। বাহ্যদশায় নামসংকীর্তন করতেন।

নবদ্বীপ তাঁহার ছেলেটিকে আনিয়া ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন। ছেলেটি যুবা পুরুষ —— শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

নবদ্বীপ —— ঘরে শাস্ত্র পড়ে। এ-দেশে বেদ একরকম পাওয়াই যেত না। মোক্ষমূলর ছাপালেন, তাই তবু লোকে পড়ছে।

[পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্র —— শাস্ত্রের সার জেনে নিতে হয়]

শ্রীরামকৃষ্ণ —— বেশি শাস্ত্র পড়াতে আরও হানি হয়।

“শাস্ত্রের সার জেনে নিতে হয়। তারপর আর গ্রন্থের কি দরকার!

“সারটুকু জেনে ডুব মারতে হয় —— ঈশ্বরলাভের জন্য।

“আমায় মা জানিয়ে দিয়েছেন, বেদান্তের সার —— ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। গীতার সার —— দশবার গীতা বললে যা হয়, অর্থাৎ ‘ত্যাগী, ত্যাগী’।”

নবদ্বীপ — ‘ত্যাগী’ ঠিক হয় না, ‘তাগী’ হয়। তাহলেও সেই মানে। তগ্ ধাতু ঘঞ্ = তাগ; তার উত্তর ইন্ প্রত্যয় — তাগী। ‘ত্যাগী’ মানেও যা ‘তাগী’ মানেও তাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — গীতার সার মানে — হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে পাবার জন্য সাধন কর।

নবদ্বীপ — ত্যাগ করবার মন কই হচ্ছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমরা গোস্বামী, তোমাদের ঠাকুর সেবা আছে, — তোমাদের সংসার ত্যাগ করলে চলবে না। তাহলে ঠাকুর সেবা কে করবে? তোমরা মনে ত্যাগ করবে।

“তিনিই লোকশিক্ষার জন্য তোমাদের সংসারে রেখেছেন — তুমি হাজার মনে কর, ত্যাগ করতে পারবে না — তিনি এমন প্রকৃতি তোমায় দিয়েছেন যে, তোমায় সংসারে কাজই করতে হবে।

“কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন — তুমি যুদ্ধ করবে না, কি বলছ? — তুমি ইচ্ছা করলেই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতে পারবে না, তোমার প্রকৃতিতে তোমায় যুদ্ধ করাবে।”

[সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ — গোস্বামীর যোগ ও ভোগ]

“কৃষ্ণ অর্জুনের সহিত কথা কহিতেছেন — এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর আবার সমাধিস্থ হইতেছেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত স্থির — চক্ষু পলকশূন্য।

নিঃশ্বাস বহিতেছে কি না বহিতেছে বুঝা ঝায় না। নবদ্বীপ গোস্বামী, তাঁহার পুত্র ও ভক্তগণ অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ঠাকুর নবদ্বীপকে বলিতেছেন:

“যোগ ভোগ। তোমরা গোস্বামীবংশ তোমাদের দুই-ই আছে।

“এখন কেবল তাঁকে প্রার্থনা কর, আন্তরিক প্রার্থনা — ‘হে ঈশ্বর, তোমার এই ভুবনমোহিনী মায়ার ঐশ্বর্য — আমি চাই না — আমি তোমায় চাই।’

“তিনি তো সর্বভূতেই আছেন — তবে ভক্ত কাকে বলে? যে তাঁতে থাকে — যার মন-প্রাণ-অন্তরাত্মা সব, তাঁতে গত হয়েছে।”

“ঠাকুর এইবার সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। নবদ্বীপকে বলিতেছেন:

“আমার এই যে অবস্থাটা হয় (সমাধি অবস্থা) কেউ কেউ বলে রোগ। আমি বলি যাঁর চৈতন্যে জগৎ চৈতন্য হয়ে রয়েছে, — তাঁর চিন্তা করে কেউ কি অচৈতন্য হয়?”

শ্রীযুক্ত মণি সেন অভ্যাগত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের বিদায় করিতেছেন — কাহাকে এক টাকা, কাহাকে দুই টাকা — যে যেমন ব্যক্তি।

ঠাকুরকে পাঁচ টাকা দিতে আসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন:

“আমার টাকা নিতে নাই।”

মণি সেন তথাপি ছাড়েন না।

ঠাকুর তখন বলিলেন, যদি দাও তোমার গুরুর দিব্য। মণি সেন আবার দিতে আসিলেন। তখন ঠাকুর যেন অধৈর্য হইয়া মাস্টারকে বলিতেছেন, “কেমন গো নেব?” মাস্টার ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিলেন, “আজ্ঞা না — কোন মতেই নেবেন না।”

শ্রীযুক্ত মণি সেনের লোকেরা তখন আম সন্দেশ কিনিবার নাম করিয়া রাখালের হস্তে টাকা দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — আমি গুরুর দিব্য দিয়েছি। — আমি এখন খালাস। রাখাল নিয়েছে সে এখন বুঝুগগে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে গাড়িতে আরোহণ করিলেন — দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ফিরিয়া যাইবেন।

[নিরাকার ধ্যান ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ]

পথে মতিশীলের ঠাকুরবাড়ি। ঠাকুর মাস্টারকে অনেকদিন হইল বলিতেছেন — একসঙ্গে আসিয়া এই ঠাকুরবাড়ির ঝিল দর্শন করিবেন — নিরাকার ধ্যান কিরূপ আরোপ করিতে হয়, শিখাইবার জন্য।

ঠাকুরের খুব সর্দি হইয়াছে। তথাপি ভক্তসঙ্গে ঠাকুরবাড়ি দেখিবার জন্য গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন।

ঠাকুরবাড়িতে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা আছে। সন্ধ্যার এখনও একটু দেরি আছে। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

এইবার ঠাকুরবাড়ির পূর্বাংশে যে ঝিল আছে তাহার ঘাটে আসিয়া ঝিল ও মৎস্য দর্শন করিতেছেন। কেহ মাছগুলির হিংসা করে না, মুড়িইত্যাদি খাবার জিনিস, কিছু দিলেই বড় বড় মাছ দলে দলে সম্মুখে আসিয়া ভক্ষণ করে — তারপর নির্ভয়ে আনন্দে লীলা করিতে করিতে জলমধ্যে বিচরণ করে।

ঠাকুর মাস্টারকে বলিতেছেন, “এই দেখ, কেমন মাছগুলি। এইরূপ চিদানন্দ-সাগরে এই মাছের ন্যায় আনন্দে বিচরণ করা।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c16 ১৬ শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ও ভক্তগৃহে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৫শে জুন 1883/06/25

16.1 শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের মন্দিরে রাখাল মাস্টার প্রভৃতির সঙ্গে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ কলিকাতায় বলরামের বাটীতে শুভাগমন করিয়াছেন। মাস্টার কাছে বসিয়া আছেন, রাখালও আছেন। ঠাকুরের ভাবাবেশ হইয়াছে। আজ জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা পঞ্চমী; সোমবার (১২ই আষাঢ়), ২৫শে জুন, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ; বেলা প্রায় ৫টা হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবাবিষ্ট) — দেখ, আন্তরিক ডাকলে স্ব-স্বরূপকে দেখা যায়। কিন্তু যতটুকু বিষয়ভোগের বাসনা থাকে, ততটুকু কম পড়ে যায়।

মাস্টার — আজ্ঞা, আপনি যেমন বলেন ঝাঁপ দিতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (আনন্দিত হইয়া) — ইয়া!

সকলে চুপ করিয়া আছেন, ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — দেখ, সকলেরই আত্মদর্শন হতে পারে।

মাস্টার — আজ্ঞা, তবে ঈশ্বর কর্তা, তিনি যে ঘরে যেমন করাচ্ছেন। কারুকে চৈতন্য করছেন, কারুকে অজ্ঞান করে রেখেছেন।

[স্ব-স্বরূপ দর্শন, ঈশ্বরদর্শন বা আত্মদর্শনের উপায় — আন্তরিক প্রার্থনা — নিত্যলীলা যোগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ — না। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতে হয়। আন্তরিক হলে তিনি প্রার্থনা শুনবেই শুনবেন।

একজন ভক্ত — আজ্ঞা হাঁ — ‘আমি’ যে রয়েছে, তাই প্রার্থনা করতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — লীলা ধরে ধরে নিত্যে যেতে হয়; যেমন সিঁড়ি ধরে ধরে ছাদে উঠা। নিত্যদর্শনের পর নিত্য থেকে লীলায় এসে থাকতে হয়। ভক্তি-ভক্ত নিয়ে। এইটি পাকা মত।

“তাঁর নানারূপ, নানালীলা — ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা; তিনি মানুষ হয়ে অবতার হয়ে যুগে যুগে আসেন, প্রেমভক্তি শিখাবার জন্য। দেখ না চৈতন্যদেব। অবতারের ভিতরেই তাঁর প্রেম-ভক্তি আস্বাদন করা যায়। তাঁর অনন্ত লীলা — কিন্তু আমার দরকার প্রেম, ভক্তি। আমার ক্ষীরটুকু দরকার। গাভীর বাঁট দিয়েই ক্ষীর আসে। অবতার গাভীর বাঁট।”

ঠাকুর কি বলিতেছেন যে, আমি অবতীর্ণ হইয়াছি, আমাকে দর্শন করিলেই ঈশ্বরদর্শন করা হয়? চৈতন্যদেবের কথা বলিয়া ঠাকুর কি নিজের কথা ইঙ্গিত করিতেছেন?

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, জুন 1883/06/00

16.2 নানাভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ও ভক্তমন্দিরে

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-দেবালয়ে, শিবমন্দিরে সিঁড়িতে বসিয়া আছেন। জৈষ্ঠ মাস, ১৮৮৩, খুব গরম পড়িয়াছে। একটু পরে সন্ধ্যা হইবে। বরফ ইত্যাদি লইয়া মাস্টার আসিয়াছেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পাদমূলে শিবমন্দিরের সিঁড়িতে বসিলেন।

[J. S. Mill and Sri Ramakrishna: Limitations of man — a conditioned being]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — মণি মল্লিকের নাতজামাই এসেছিল। সে কি বই-এ১ পড়েছে, ঈশ্বরকে তেমন জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ বলে বোধ হয় না। তাহলে এত দুঃখ কেন? আর এই যে জীবের মৃত্যু হয়, একেবারে মেরে ফেললেই হয়, ক্রমে ক্রমে অনেক কষ্ট দিয়ে মারা কেন? যে বই লিখেছে সে নাকি বলেছে যে, আমি হলে এর চেয়ে ভাল সৃষ্টি করতে পারতাম।

মাস্টার হাঁ করিয়া ঠাকুরের কথা শুনিতেছেন ও চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — তাঁকে কি বুঝা যায় গা! আমিও কখন তাঁকে ভাবি ভাল, কখন ভাবি মন্দ। তাঁর মহামায়ার ভিতের আমাদের রেখেছেন। কখন তিনি হুঁশ করেন, কখন তিনি অজ্ঞান করেন। একবার অজ্ঞানটা চলে যায়, আবার ঘিরে ফেলে। পুকুর পানা ঢাকা, ঢিল মারলে খানিকটা জল দেখা যায়, আবার খানিকক্ষণ পরে পানা নাচতে নাচতে এসে সে জলটুকুও ঢেকে ফেলে।

“যতক্ষণ দেহবুদ্ধি ততক্ষণই সুখ-দুঃখ, জন্মমৃত্যু, রোগশোক। দেহেরই এই সব, আত্মার নয়। দেহের মৃত্যুর পর তিনি হয়তো ভাল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন — যেমন প্রসববেদনার পর সন্তানলাভ। আত্মজ্ঞান হলে সুখ-দুঃখ, জন্মমৃত্যু — স্বপ্নবৎ বোধ হয়।

“আমরা কি বুঝব! এক সের ঘটিতে কি দশ সের দুধ ধরে? নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে আর খবর দেয় না। গলে মিশে যায়।”

[“ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে”]

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুরদের আরতি হইতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে ছোট খাটটিতে বসিয়া জগন্মাতার চিন্তা করিতেছেন। রাখাল, লাটু, রামলাল, কিশোরী গুপ্ত প্রভৃতি ভক্তেরা আছেন। মাস্টার আজ রাত্রে থাকিবেন। ঘরের উত্তরে ছোট বারান্দায় ঠাকুর একটি ভক্তের সহিত নিভৃতে কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, “প্রত্যূষে ও শেষ রাত্রে ধ্যান করা ভাল ও প্রত্যহ সন্ধ্যার পর।” কিরূপ ধ্যান করিতে হয় — সাকার ধ্যান, অরূপ ধ্যান, সে-সব বলিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারান্দাটিতে বসিয়া আছেন। রাত্রি ৯টা হইবে। মাস্টার কাছে বসিয়া আছেন, রাখাল প্রভৃতি এক-একবার ঘরের ভিতর যাতায়াত করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — দেখ, এখানে যারা যারা আসবে সকলের সংশয় মিটে যাবে, কি বল?

মাস্টার — আজ্ঞে হাঁ।

এমন সময় গঙ্গাবক্ষে অনেক দূরে মাঝি নৌকা লইয়া যাইতেছে ও গান ধরিয়াছে। সেই গীতধ্বনি, মধুর অনাহতধ্বনির ন্যায় অনন্ত আকাশের ভিতর দিয়া গঙ্গার প্রশস্ত বক্ষ যেন স্পর্শ করিয়া ঠাকুরের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। ঠাকুর অমনি ভাবাবিষ্ট। সমস্ত শরীর কণ্টকিত। মাস্টারের হাত ধরিয়া বলিতেছেন, "দেখ দেখ আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখ!" তিনি সেই প্রেমাবিষ্ট কণ্টকিত দেহ স্পর্শ করিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। "পুলকে পূরিত অঙ্গ"! উপনিষদে কথা আছে যে, তিনি বিশ্বে আকাশে 'ওতপ্রোত' হয়ে আছেন। তিনিই কি শব্দরূপে শ্রীরামকৃষ্ণকে স্পর্শ করিতেছেন? এই কি শব্দ ব্রহ্ম?২

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — যারা যারা এখানে আসে তাদের সংস্কার আছে; কি বল?

মাস্টার — আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — অধরের সংস্কার ছিল।

মাস্টার — তা আর বলতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সরল হলে ঈশ্বরকে শীঘ্র পাওয়া যায়। আর দুটো পথ আছে — সৎ, অসৎ। সৎপথ দিয়ে চলে যেতে হয়।

মাস্টার — আজ্ঞে হাঁ, সুতোর একটু আঁশ থাকলে ছুঁচের ভিতর যাবে না।

[সর্বত্যাগ কেন?]

শ্রীরামকৃষ্ণ — খাবারের সঙ্গে চুল জিবে পড়লে, মুখ থেকে সবসুদ্ধ ফেলে দিতে হয়।

মাস্টার — তবে আপনি যেমন বলেন, যিনি ভগবানদর্শন করেছেন, তাঁকে অসৎসঙ্গে কিছু করতে পারে না। খুব জ্ঞানাগ্নিতে কলাগাছটা পর্যন্ত জ্বলে যায়।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীকবিকঙ্কণ — অধরের বাটীতে চণ্ডীর গান]

আর-একদিন ঠাকুর কলিকাতায় বেনেটোলায় অধরের বাড়িতে আসিয়াছেন। ৩১শে আষাঢ়, শুক্লা দশমী, ১৪ই জুলাই ১৮৮৩, শনিবার। অধর ঠাকুরকে রাজনারাণের চণ্ডীর গান শুনাইবেন। রাখাল, মাস্টার প্রভৃতি সঙ্গে আছেন। ঠাকুরদালানে গান হইতেছে। রাজনারাণ গান ধরিলেন:

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি ।।

কালীনাম মহামন্ত্র আত্মশির শিখায় বেঁধেছি।
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে, দুর্গানাম কিনে এনেছি।।
কালীনাম-কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি।
এবার শমন এলে হৃদয় খুলে দেখাব তাই বসে আছি।।
দেহের মধ্যে ছজন কুজন, তাদের ঘরে দূর করেছি।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে যাত্রা করে বসে আছি।।

ঠাকুর খানিক শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট, দাঁড়াইয়া পড়িয়াছেন ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দিয়া গান গাইতেছেন।

ঠাকুর আখর দিতেছেন, "ওমা, রাখ মা।" আখর দিতে দিতে একেবারে সমাধিস্থ। বাহ্যশূন্য, নিস্পন্দ! দাঁড়াইয়া আছেন। আবার গায়ক গাহিতেছেন:

রণে এসেছ কার কামিনী
সজল-জলদ জিনিয়া কায় দশনে দোলে দামিনী!

ঠাকুর আবার সমাধিস্থ!

গান সমাপ্ত হইলে দালান হইতে গিয়া ঠাকুর অধরের দ্বিতল বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিলেন। নানা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হইতেছে। কোন কোন ভক্ত অন্তঃসার ফল্গুনদী, উপরে ভাবের কোন প্রকাশ নাই — এ-সব কথাও হইতেছে।

১ John Stuart Mill's Autobiography. Mill, 1806-1873.

২ ...এতস্মিন্নুখল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি।।

[বৃহদারণ্যকোপনিষদ, ৩।৮।১১]

...শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু। [গীতা, ৭।৮]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২১শে জুলাই 1883/07/21/i

16.3 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতা রাজপথে ভক্তসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ গাড়ি করিয়া দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ি হইতে বাহির হইয়া কলিকাতা অভিমুখে আসিতেছেন। সঙ্গে রামলাল ও দু-একটি ভক্ত। ফটক হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন চারিটি ফজলি আম হাতে করিয়া মণি পদব্রজে আসিতেছেন। মণিকে দেখিয়া গাড়ি থামাইতে বলিলেন। মণি গাড়ির উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলেন।

শনিবার, ২১শে জুলাই, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, (৬ই শ্রাবণ), আষাঢ় কৃষ্ণা প্রতিপদ, বেলা চারিটা। ঠাকুর অধরের বাড়ি যাইবেন, তৎপরে শ্রীযুক্ত যদু মল্লিকের বাটী, সর্বশেষে [১]খেলাৎ ঘোষের বাটী যাইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি, সহাস্যে) — তুমিও এস না — আমরা অধরের বাড়ি যাচ্ছি।

মণি যে আজ্ঞা বলিয়া গাড়িতে উঠিলেন।

মণি ইংরেজী পড়িয়াছেন, তাই সংস্কার মানিতেন না, কিন্তু কয়েকদিন হইল ঠাকুরের নিকটে স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন যে, অধরের সংস্কার ছিল তাই তিনি অত তাঁহাকে ভক্তি করেন। বাটীতে ফিরিয়া গিয়া ভাবিয়া দেখিলেন যে, সংস্কার সম্বন্ধে এখনও তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই। তাই ওই কথা বলিবার জন্যই আজ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, অধরকে তোমার কিরূপ মনে হয়?

মণি — আজ্ঞে, তাঁর খুব অনুরাগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — অধরও তোমার খুব সুখ্যাতি করে।

মণি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া আছেন; এইবার পূর্বজন্মের কথা উত্থাপন করিতেছেন।

[কিছু বুঝা যায় না — অতি গুহ্যকথা]

মণি — আমার ‘পূর্বজন্ম’ ও ‘সংস্কার’ এ-সব তাতে তেমন বিশ্বাস নাই; এতে কি আমার ভক্তির কিছু হানি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁর সৃষ্টিতে সবই হতে পারে এই বিশ্বাস থাকলেই হল; আমি যা ভাবছি — তাই সত্য; আর সকলের মত মিথ্যা; এরূপ ভাব আসতে দিও না। তারপর তিনিই বুঝিয়ে দিবেন।

“তাঁর কাণ্ড মানুষে কি বুঝবে? অনন্ত কাণ্ড! তাই আমি ও-সব বুঝতে আদপে চেষ্টা করি না। শুনে রেখেছি তাঁর সৃষ্টিতে সবই হতে পারে। তাই ও-সব চিন্তা না করে কেবল তাঁরই চিন্তা করি। হনুমানকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ কি তিথি, হনুমান বলেছিল, ‘আমি তিথি নক্ষত্র জানি না, কেবল এক রাম চিন্তা করি।’

“তাঁর কাণ্ড কি কিছু বুঝা যায় গা! কাছে তিনি — অথচ বোঝবার জো নাই, বলরাম কৃষ্ণকে ভগবান বলে জানতেন না।”

মণি — আজ্ঞা হাঁ! আপনি ভীষ্মদেবের কথা যেমন বলেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, হাঁ, কি বলেছিলাম বল দেখি।

মণি — ভীষ্মদেব শরশয্যায় কাঁদছিলেন, পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, ভাই, একি আশ্চর্য! পিতামহ এত জ্ঞানী, অথচ মৃত্যু ভেবে কাঁদছেন! শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা কর না, কেন কাঁদছেন! ভীষ্মদেব বললেন, এই ভেবে কাঁদছি যে, ভগবানের কার্য কিছুই বুঝতে পারলাম না! হে কৃষ্ণ, তুমি এই পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছ, পদে পদে রক্ষা করছ, তবু এদের বিপদের শেষ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁর মায়াতে সব ঢেকে রেখেছেন — কিছু জানতে দেন না। কামিনী-কাঞ্চন মায়া। এই মায়াকে সরিয়ে যে তাঁকে দর্শন করে সেই তাঁকে

দেখতে পায়। একজনকে বোঝাতে বোঝাতে (ঈশ্বর একটি আশ্চর্য ব্যাপার) দেখালেন, হঠাৎ সামনে দেখলাম, দেশের (কামারপুকুরের) একটি পুকুর, আর-একজন লোক পানা সরিয়ে যেন জলপান করলে। জলটি স্ফটিকের মতো। দেখালে যে, সেই সচ্চিদানন্দ মায়ারূপ পানাতে ঢাকা, — যে সরিয়ে জল খায় সেই পায়।

"শুন, তোমায় অতি গুহ্য কথা বলছি! ঝাউতলার দিকে বাহ্যে করতে করতে দেখলাম — চোর কুঠরির দরজার মতো একটা সামনে, কুঠরির ভিতর কি আছে দেখতে পাচ্ছি না। আমি নরুন দিয়ে ছেঁদা করতে লাগলাম, কিন্তু পারলুম না। ছেঁদা করি কিন্তু আবার পুরে আসে! তারপর একবার এতখানি ছেঁদা হল!"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। এইবার আবার কথা কহিতেছেন, "এ-সব বড় উঁচু কথা — ওই দেখ আমার মুখ কে যেন চেপে চেপে ধরছে!

"যোনিতে বাস স্বচক্ষে দেখলাম! — কুকুর-কুক্কুরীর মৈথুন সময়ে দেখেছিলাম।

"তাঁর চৈতন্যে জগতের চৈতন্য। এক-একবার দেখি, ছোট ছোট মাছের ভিতর সেই চৈতন্য কিলবিল করছে!"

গাড়ি শোভাবাজারের চৌমাথায় দরমাহাটার নিকট উপস্থিত হইল। ঠাকুর আবার বলিতেছেন:

“এক-একবার দেখি বরষায় যেরূপ পৃথিবী জরে থাকে, — সেইরূপ এই চৈতন্যতে জগৎ জরে রয়েছে।

“কিন্তু এত তো দেখা হচ্ছে, আমার কিন্তু অভিমান হয় না।”

মণি (সহাস্যে) — আপনার আবার অভিমান!

শ্রীরামকৃষ্ণ —— মাইরি বলছি, আমার যদি একটুও অভিমান হয়।

মণি —— গ্রীস দেশে একটি লোক ছিলেন, তাঁহার নাম সক্রেটিস। দৈববাণী হয়েছিল যে, সকল লোকের মধ্যে তিনি জ্ঞানী। সে ব্যক্তি অবাক্ হয়ে গেল। তখন নির্জনে অনেকক্ষণ চিন্তা করে বুঝতে পারলে। তখন সে বন্ধুদের বললে, আমিই কেবল বুঝেছি যে, আমি কিছুই জানি না। কিন্তু অন্যান্য সকল লোকে বলছে, “আমাদের বেশ জ্ঞান হয়েছে।” কিন্তু বস্তুতঃ সকলেই অজ্ঞান।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— আমি এক-একবার ভাবি যে, আমি কি জানি যে এত লোকে আসে! বৈষ্ণবচরণ খুব পণ্ডিত ছিল। সে বলত, তুমি যে-সব কথা বল সব শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তবে তোমার কাছে কেন আসি জানো? তোমার মুখে সেইগুলি শুনতে আসি।

মণি —— সব কথা শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে। নবদ্বীপ গোস্বামীও সেদিন পেনেটীতে সেই কথা বলছিলেন। আপনি বললেন যে, “গীতা গীতা” বলতে বলতে “ত্যাগী ত্যাগী” হয়ে যায়। বস্তুতঃ তাগী হয়, কিন্তু নবদ্বীপ গোস্বামী বললেন,

‘তাগী’ মানেও যা ‘ত্যাগী’ মানেও তা, তগ্‌ ধাতু একটা আছে তাই থেকে ‘তাগী’ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— আমার সঙ্গে কি আর কারু মেলে? কোন পণ্ডিত, কি সাধুর সঙ্গে?

মণি —— আপনাকে ঈশ্বর স্বয়ং হাতে গড়েছেন। অন্য লোকদের কলে ফেলে তয়ের করেছেন —— যেমন আইন অনুসারে সব সৃষ্টি হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— (সহাস্যে রামলালাদিকে) — ওরে, বলে কিরে!

ঠাকুরের হাস্য আর থামে না। অবশেষে বলিতেছেন, মাইরি বলছি, আমার যদি একটুও অভিমান হয়।

মণি —— বিদ্যাতে একটা উপকার হয়, এইটি বোধ হয় যে, আমি কিছু জানি না, আর আমি কিছুই নই।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— ঠিক ঠিক। আমি কিছুই নই! — আমি কিছুই নই! — আচ্ছা, তোমার ইংরেজী জ্যোতিষে বিশ্বাস আছে?

মণি —— ওদের নিয়ম অনুসারে নূতন আবিষ্ক্রিয়া (Discovery) হতে পারে, ইউরেনাস (Uranus) গ্রহের এলোমেলো চলন দেখে দূরবীন দিয়ে সন্ধান করে দেখলে যে, নূতন একটি গ্রহ (Neptune) জ্বলজ্বল করছে। আবার গ্রহণ গণনা হতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা হয়ে বটে।

গাড়ি চলিতেছে, — প্রায় অধরের বাড়ির নিকট আসিল। ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন:

“সত্যেতে থাকবে, তাহলেই ইশ্বরলাভ হবে।”

মণি — আর-একটি কথা আপনি নবদ্বীপ গোস্বামীকে বলেছিলেন, “হে ঈশ্বর! আমি তোমায় চাই। দেখো, যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ার ঐশ্বর্যে মুগ্ধ করো না! — আমি তোমায় চাই।”

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, ওইটি আন্তরিক বলতে হবে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২১শে জুলাই 1883/07/21/ii

16.4 শ্রীযুক্ত অধর সেনের বাটীতে কীর্তনানন্দে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের বাড়ি আসিয়াছেন। রামলাল, মাস্টার, অধর আর অন্য অন্য ভক্ত তাঁহার কাছে অধরের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। পাড়ার দু-

চারিটি লোক ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন। রাখালের পিতা কলিকাতায় আছেন — রাখাল সেইখানেই আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অধরের প্রতি) — কই রাখালকে খবর দাও নাই?

অধর — আজ্ঞে হাঁ, তাঁকে খবর দিয়াছি।

রাখালের জন্য ঠাকুরকে ব্যস্ত দেখিয়া অধর দ্বিরুক্তি না করিয়া রাখালকে আনিতে একটি লোক সঙ্গে নিজের গাড়ি পাঠাইয়া দিলেন।

অধর ঠাকুরের কাছে বসিলেন। আজ ঠাকুরকে দর্শনজন্য অধর ব্যাকুল হইয়াছেন। ঠাকুরের এখানে আসিবার কথা পূর্বে কিছু ঠিক ছিল না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তিনি আসিয়া পড়িয়াছেন।

অধর — আপনি অনেকদিন আসেন নাই। আমি আজ ডেকেছিলাম, — এমন কি চোখ দিয়ে জল পড়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রসন্ন হইয়া, সহাস্যে) — বল কি গো!

সন্ধ্যা হইয়াছে। বৈঠকখানায় আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর জোড় হস্তে জগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া নিঃশব্দে বুঝি মূলমন্ত্র করিলেন। তৎপরে মধুর স্বরে নাম করিতেছেন। বলিতেছেন, গোবিন্দ, গোবিন্দ, সচ্চিদানন্দ, হরিবোল! হরিবোল! নাম করিতেছেন, আর যেন মধু বর্ষণ হইতেছে। ভক্তেরা অবাক্‌ হইয়া সেই নাম-সুধা পান করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রামলাল এইবার গান গাইতেছেন:

ভুবন ভুলাইলি মা, হরমোহিনী।

মূলাধারে মহোৎপলে, বীণাবাদ্য-বিনোদিনী।

শরীর শারীর যন্ত্রে সুষুম্নাদি ত্রয় তন্ত্রে,

গুণভেদ মহামন্ত্রে গুণত্রয়বিভাগিনী ।।

আধারে ভৈরবাকার ষড়দলে শ্রীরাগ আর,

মণিপুরেতে মহ্লার, বসন্তে হৃৎপ্রকাশিনী

বিশুদ্ধ হিল্লোল সুরে, কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে,

তান লয় মান সুরে, তিন গ্রাম-সঞ্চারিণী।

মহামায়া মোহপাশে, বদ্ধ কর অনায়াসে,

তত্ত্ব লয়ে তত্ত্বাকাশে স্থির আছে সৌদামিনী।

শ্রীনন্দকুমারে কয়, তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়,

তব তত্ত্ব গুণত্রয়, কাকীমুখ-আচ্ছাদিনী।

রামালাল আবার গাইলেন:

ভবদারা ভয়হরা নাম শুনেছি তোমার,

তাইতে এবার দিয়েছি ভার তারো তারো না তারো মা।

তুমি মা ব্রহ্মাণ্ডধারী ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিকে,

কে জানে তোমারে তুমি কালী কি রাধিকে,

ঘটে ঘটে তুমি ঘটে আছ গো জননী,

মূলাধার কমলে থাক মা কুলকুণ্ডলিনী।

তদূর্ধ্বেতে আছে মাগো নামে স্বাধিষ্ঠান,

চতুর্দল পদ্মে তথায় আছ অধিষ্ঠান,

চর্তুদলে থাক তুমি কুলকুণ্ডলিনী,
ষড়্‌দল বজ্রাসনে বস মা আপনি।
তদূর্ধ্বেতে নাভিস্থান মা মণিপুর কয়,
নীলবর্ণের দশদল পদ্ম যে তথায়,
সুষুম্নার পথ দিয়ে এস গো জননী,
কমলে কমলে থাক কমলে কামিনী।
তদূর্ধ্বেতে আছে মাগো সুধা সরোবর,
রক্তবর্ণের দ্বাদশদল পদ্ম মনোহর,
পাদপদ্মে দিয়ে যদি এ পদ্ম প্রকাশ।
(মা), হৃদে আছে বিভাবরী তিমির বিনাশ।
তদূর্ধ্বেতে আছে মাগো নাম কণ্ঠস্থল,
ধূম্রবর্ণের পদ্ম আছে হয়ে ষোড়শদল।
সেই পদ্ম মধ্যে আছে অম্বুজে আকাশ,
সে আকাশ রুদ্ধ হলে সকলি আকাশ।
তদূর্ধ্বে ললাটে স্থান মা আছে দ্বিদল পদ্ম,
সদায় আছয়ে মন হইয়ে আবদ্ধ।
মন যে মানে না আমার মন ভাল নয়,
দ্বিদলে বসিয়া রঙ্গ দেখয়ে সদায়।
তদূর্ধ্বে মস্তকে স্থান মা অতি মনোহর,
সহস্রদল পদ্ম আছে তাহার ভিতর।
তথায় পরম শিব আছেন আপনি,
সেই শিবের কাছে বস শিবে মা আপনি।

তুমি আদ্যাশক্তি মা জিতেন্দ্রিয় নারী,

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ভাবে নগেন্দ্র কুমারী।

হর শক্তি হর শক্তি সুদনের এবার,

যেন না আসিতে হয় মা ভব পারাবার।

তুমি আদ্যাশক্তি মাগো তুমি পঞ্চতত্ত্ব,

কে জানে তোমারে তুমি তুমিই তত্ত্বাতীত।

ওমা ভক্ত জন্য চরাচরে তুমি সে সাকার,

পঞ্চে পঞ্চ লয় হলে তুমি নিরাকার।

[নিরাকার সচ্চিদানন্দ দর্শন — ষট্‌চক্রভেদ — নাদভেদ ও সমাধি]

শ্রীযুক্ত রামলাল যখন গাহিতেছেন:

“তদূর্ধ্বেতে আছে মাগো নাম কণ্ঠস্থল,

ধূম্রবর্ণের পদ্ম আছে হয়ে ষোড়শদল।

সেই পদ্ম মধ্যে আছে অম্বুজে আকাশ,

সে আকাশ রুদ্ধ হলে সকলি আকাশ।”

তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারকে বলিতেছেন —

“এই শুন, এরই নাম নিরাকার সচ্চিদানন্দ-দর্শন। বিশুদ্ধচক্র ভেদ হলে সকলি আকাশ।”

মাস্টার — আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এই মায়া-জীব-জগৎ পার হয়ে গেলে তবে নিত্যতে পোঁছানো যায়। নাদ ভেদ হলে তবে সমাধি হয়। ওঁকার সাধন করতে করতে নাদ ভেদ হয়, আর সমাধি হয়।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২১শে জুলাই 1883/07/21/iii

16.5 যদু মল্লিকের বাড়ি — সিংহবাহিনী সম্মুখে — ‘সমাধিমন্দিরে’

অধরের বাটিতে অধর ঠাকুরকে ফলমূল মিষ্টান্নাদি দিয়া সেবা করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, আজ যদু মল্লিকের বাড়ি যাইতে হইবে।

ঠাকুর যদু মল্লিকের বাটী আসিয়াছেন। আজ আষাঢ় কৃষ্ণ প্রতিপদ, রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। যে-ঘরে ৺সিংহবাহিনীর নিত্যসেবা হইতেছে ঠাকুর সেই ঘরে ভক্তসঙ্গে উপস্থিত হইলেন। মা সচন্দন পুষ্প ও পুষ্প-মালা দ্বারা অর্চিত হইয়া অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছেন। সম্মুখে পুরোহিত উপবিষ্ট। প্রতিমার সম্মুখে ঘরে আলো জ্বলিতেছে। সাঙ্গোপাঙ্গের মধ্যে একজনকে ঠাকুর টাকা দিয়া প্রণাম করিতে বলিলেন; কেননা ঠাকুরের কাছে আসিলে কিছু প্রণামী দিতে হয়।

ঠাকুর সিংহবাহিনীর সম্মুখে হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পশ্চাতে ভক্তগণ হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া দর্শন করিতেছেন।

কি আশ্চর্য, দর্শন করিতে করিতে একেবারে সমাধিস্থ। প্রস্তরমূর্তির ন্যায় নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান। নয়ন পলকশূন্য!

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। সমাধি ভঙ্গ হইল। যেন নেশায় মাতোয়ারা হইয়া বলিতেছেন, মা, আসি গো!

কিন্তু চলিতে পারিতেছেন না — সেই একভাবে দাঁড়াইয়া আছেন।

তখন রামলালকে বলিতেছেন — "তুমি ওইটি গাও — তবে আমি ভাল হব।"

রামলাল গাহিতেছেন, ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী।

গান সমাপ্ত হইল।

এইবার ঠাকুর বৈঠকখানার দিকে আসিতেছেন — ভক্তসঙ্গে। আসিবার সময় মাঝে একবার বলিতেছেন, মা, আমার হৃদয়ে থাক মা।

শ্রীযুক্ত যদু মল্লিক স্বজনসঙ্গে বৈঠকখানায় বসিয়া। ঠাকুর ভাবেই আছেন, আসিয়া গাহিতেছেন:

গো আনন্দময়ী হয়ে আমায় নিরানন্দ করো না।

গান সমাপ্ত হইলে আবার ভাবোন্মত্ত হইয়া যদুকে বলিতেছেন, “কি বাবু, কি গাইব? ‘মা আমি কি আটাশে ছেলে’ — এই গানটি কি গাইব?” এই বলিয়া ঠাকুর গাহিতেছেন:

মা আমি কি আটাশে ছেলে।
আমি ভয় করিনে চোখ রাঙালে ।।
সম্পদ আমার ও রাঙাপদ শিব ধরেন যা হৃৎকমলে।
আমার বিষয় চাইতে গেলে বিড়ম্বনা কতই ছলে ।।
শিবের দলিল সই রেখেছি হৃদয়েতে তুলে।
এবার করব নালিশ নাথের আগে, ডিক্রি লব এক সওয়ালে ।।
জানাইব কেমন ছেলে মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরুদত্ত দস্তাবিজ, গুজরাইব মিছিল চালে ।।
মায়ে-পোয়ে মোকদ্দমা, ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায় শান্ত করে লবে কোলে ।।

ভাব একটু উপশম হইলে বলিতেছেন, “আমি মার প্রসাদ খাব।”

৺সিংহবাহিনীর প্রসাদ আনিয়া ঠাকুরকে দেওয়া হইল।

শ্রীযুক্ত যদু মল্লিক বসিয়া আছেন। কাছে কেদারায় কতকগুলি বন্ধুবান্ধব বসিয়াছেন; তন্মধ্যে কতকগুলি মোসাহেবও আছেন।

যদু মল্লিকের দিকে সম্মুখ করিয়া ঠাকুর চেয়ারে বসিয়াছেন ও সহাস্যে কথা কহিতেছেন। ঠাকুরের সঙ্গী ভক্ত কেউ কেউ পাশের ঘরে, মাস্টার ও দুই একটি ভক্ত ঠাকুরের কাছে বসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — আচ্ছা, তুমি ভাঁড় রাখ কেন?

যদু (সহাস্যে) — ভাঁড় হলেই বা, তুমি উদ্ধার করবে না!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্য) — গঙ্গা মদের কুপোকে পারে না!

[সত্যকথা ও শ্রীরামকৃষ্ণ —– "পুরুষের এককথা"]

যদু ঠাকুরের কাছে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, বাটীতে চন্ডীর গান দিবেন। অনেকদিন হইয়া গেল চন্ডীর গান কিন্তু হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ —– কই গো, চন্ডীর গান?

যদু —– নানা কাজ ছিল তাই এতদিন হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ —– সে কি! পুরুষ মানুষের এককথা!

"পুরুষ কি বাত, হাতি কি দাঁত।

"কেমন, পুরুষের এককথা, কি বল?"

যদু (সহাস্যে) — তা বটে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি হিসাবী লোক। অনেক হিসাব করে কাজ কর, — বামুনের গড্ডী খাবে কম, নাদবে বেশি, আর হুড়হুড় করে দুধ দেবে! (সকলের হাস্য)

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ পরে যদুকে বলিতেছেন, বুঝেছি, তুমি রামজীবনপুরের শীলের মতো — আধখানা গরম, আধখানা ঠাণ্ডা। তোমার ঈশ্বরেতেও মন আছে, আবার সংসারেও মন আছে।

ঠাকুর দু-একটি ভক্তসঙ্গে যদুর বাটীতে ক্ষীর প্রসাদ, ফলমূল, মিষ্টান্নাদি খাইলেন। এইবারে ৺খেলাৎ ঘোষের বাড়ি যাইবেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২১শে জুলাই 1883/07/21/iv

16.6 ৺খেলাৎ ঘোষের বাটীতে শুভাগমন — বৈষ্ণবকে শিক্ষা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ৺খেলাৎ ঘোষের বাড়িতে প্রবেশ করিতেছেন। রাত্রি ১০টা হইবে। বাটী ও বাটীর বৃহৎ প্রাঙ্গণ চাঁদের আলোতে আলোকময় হইয়াছে। বাটীতে প্রবেশ করিতে করিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। সঙ্গে রামলাল, মাস্টার, আর দু-একটি ভক্ত। বৃহৎ চকমিলান বৈঠকখানাবাড়ি, দ্বিতলায় উঠিয়া বারান্দা দিয়া

একবার দক্ষিণে অনেকটা গিয়া, তারপর পূর্বদিকে আবার উত্তরাস্য হইয়া অনেকটা আসিয়া অন্তঃপুরের দিকে যাইতে হয়।

ওইদিকে আসিতে বোধ হইল যেন বাটীতে কেহ নাই, কেবল কতকগুলি বড় বড় ঘর ও সম্মুখে দীর্ঘ বারান্দা পড়িয়া আছে।

ঠাকুরকে উত্তর-পূর্বের একটি ঘরে বসানো হইল, এখনও ভাবস্থ। বাটীর যে ভক্তটি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন, তিনি আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি বৈষ্ণব, অঙ্গে তিলকাদি ছাপ ও হাতে হরিনামের ঝুলি। লোকটি প্রাচীণ। তিনি খেলাৎ ঘোষের সম্বন্ধী। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে মাঝে মাঝে গিয়া দর্শন করিতেন। কিন্তু কোন কোন বৈষ্ণবের ভাব অতি সঙ্কীর্ণ। তাঁহারা শাক্ত বা জ্ঞানীদিগের বড় নিন্দা করিয়া থাকেন। ঠাকুর এবার কথা কহিতেছেন।

[ঠাকুরের সর্বধর্ম-সমন্বয় —— The Religion of Love]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বৈষ্ণবভক্ত ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি) — আমার ধর্ম ঠিক, আর অপরের ধর্ম ভুল —— এ মত ভাল না। ঈশ্বর এক বই দুই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। কেউ বলে গড, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে শিব, কেউ বলে ব্রহ্ম। যেমন পুকুরে জল আছে —— একঘাটের লোক বলছে জল, আর-একঘাটের লোক বলছে ওয়াটার, আর-একঘাটের লোক বলছে পানি —— হিন্দু বলছে জল, খ্রীষ্টান বলছে ওয়াটার, মুসলমান বলছে পানি, — কিন্তু বস্তু এক। মত —— পথ। এক-একটি ধর্মের মত এক-

একটি পথ, — ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়। যেমন নদী নানাদিক থেকে এসে সাগরসঙ্গমে মিলিত হয়।

“বেদ-পুরাণ-তন্ত্রে, প্রতিপাদ্য একই সচ্চিদানন্দ। বেদে সচ্চিদানন্দ (ব্রহ্ম)। পুরাণেও সচ্চিদানন্দ (কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি)। তন্ত্রেও সচ্চিদানন্দ (শিব)। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ শিব।”

সকলে চুপ করিয়া আছেন।

বৈষ্ণবভক্ত — মহাশয়, ঈশ্বরকে ভাববই বা কেন?

[বৈষ্ণবকে শিক্ষা — জীবন্মুক্ত কে? উত্তম ভক্ত কে? ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ — এ-বোধ যদি থাকে, তাহলে তো জীবন্মুক্ত। কিন্তু সকলের এটি বিশ্বাস নাই, কেবল মুখে বলে। ঈশ্বর আছেন, তাঁর ইচ্ছায় এ-সমস্ত হচ্ছে, বিষয়ীরা শুনে রাখে — বিশ্বাস করে না।

“বিষয়ীর ঈশ্বর কেমন জান? খুড়ী-জেঠীর কোঁদল শুনে ছেলেরা যেমন যেমন ঝগড়া করতে করতে বলে, আমার ঈশ্বর আছেন।

“সব্বাই কি তাঁকে ধরতে পারে? তিনি ভাল লোক করেছেন, মন্দ লোক করেছেন, ভক্ত করেছেন, অভক্ত করেছেন — বিশ্বাসী করেছেন, অবিশ্বাসী করেছেন। তাঁর লীলার ভিতর সব বিচিত্রতা, তাঁর শক্তি কোনখানে বেশি প্রকাশ, কোনখানে কম প্রকাশ। সূর্যের আলো মৃত্তিকার চেয়ে জলে বেশি প্রকাশ, আবার জল অপেক্ষা দর্পণে বেশি প্রকাশ।

“আবার ভক্তদের ভিতর থাক থাক আছে, উত্তম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত, অধম ভক্ত। গীতাতে এ-সব আছে।”

বৈষ্ণবভক্ত — আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — অধম ভক্ত বলে, ঈশ্বর আছেন — ওই আকাশের ভিতর অনেক দূরে। মধ্যম ভক্ত বলে, ঈশ্বর সর্বভূতে চৈতন্যরূপে — প্রাণরূপে আছেন। উত্তম ভক্ত বলে, ঈশ্বরই নিজে সব হয়েছেন, যা কিছু দেখি ঈশ্বরের এক-একটি রূপ। তিনিই মায়া, জীব, জগৎ এই সব হয়েছেন — তিনি ছাড়া আর কিছু নাই।

বৈষ্ণবভক্ত — এরূপ অবস্থা কি কারু হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁকে দর্শন না করলে এরূপ অবস্থা হয় না, কিন্তু দর্শন করেছে কিনা তার লক্ষণ আছে। কখনও সে উন্মাদবৎ — হাঁসে কাঁদে নাচে গায়। কখনও বা বালকবৎ — পাঁচ বৎসরের বালকের অবস্থা। সরল, উদার, অহংকার নাই, কোন জিনিসে আসক্তি নাই, কোন গুণের বশ নয়, সদা আনন্দময়। কখনও পিশাচবৎ — শুচি-অশুচি ভেদবুদ্ধি থাকে না, আচার-অনাচার এক হয়ে যায়! কখনও বা জড়বৎ, কি জেন দেখেছে! তাই কোনরূপ কর্ম করতে পারে না — কোনরূপ চেষ্টা করতে পারে না।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি নিজের অবস্থা সমস্ত ইঙ্গিত করিতেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বৈষ্ণবভক্তের প্রতি) — “তুমি আর তোমার” —— এইটি জ্ঞান। “আমি আর আমার” —— এইটি অজ্ঞান।

“হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা, আর আমি অকর্তা —— এইটি জ্ঞান। হে ইশ্বর, তোমার সমস্ত —— দেহ, মন, গৃহ, পরিবার, জীব, জগৎ —— এ-সব তোমার, আমার কিছু নয় —— এইটির নাম জ্ঞান।

“যে অজ্ঞান সেই বলে, ঈশ্বর ‘সেথায় সেথায়’, — অনেক দূরে। যে জ্ঞানী, সে জানে ঈশ্বর ‘হেথায় হেথায় — অতি নিকটে, হৃদয়মধ্যে অন্তর্যামীরূপে, আবার নিজে এক-একটি রূপ ধরে রয়েছেন।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২২শে জুলাই 1883/07/22/i

16.7 দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটীতে ভক্তসঙ্গে ব্রহ্মতত্ত্ব ও আদ্যাশক্তির বিষয়ে কথোপকথন —— বিদ্যাসাগর ও কেশব সেনের কথা

[জ্ঞানযোগ ও নির্বাণমত]

আষাঢ়ের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি। ইংরেজী ২২শে জুলাই, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। আজ রবিবার, ভক্তেরা শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আবার আসিয়াছেন। অন্য অন্য বারে তাঁহারা প্রায় আসিতে পারেন না। রবিবারে তাঁহারা অবসর পান। অধর, রাখাল, মাস্টার কলিকাতা হইতে একখানি গাড়ি করিয়া বেলা একটা-দুইটার সময় কালীবাটীতে পৌঁছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। ঘরে মণি মল্লিকাদি আরও কয়েকজন ভক্ত বসিয়া আছেন।

রাসমণির কালীবাড়ির বৃহৎ প্রাঙ্গণের পূর্বাংশে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দির ও শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দির। পশ্চিমাংশে দ্বাদশ শিবমন্দির। সারি সারি শিবমন্দিরের ঠিক উত্তরে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ঘর। ঘরের পশ্চিমে অর্ধমণ্ডলাকার বারান্দা। সেখানে তিনি দাঁড়াইয়া পশ্চিমাস্য হইয়া গঙ্গা-দর্শন করিতেন। গঙ্গার পোস্তা ও বারান্দার মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ডে ঠাকুরবাড়ির পুষ্পোদ্যান। এই পুষ্পোদ্যান বহুদুরব্যাপী। দক্ষিণে বাগানের সীমা পর্যন্ত। উত্তরে পঞ্চবটী পর্যন্ত — যেখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তপস্যা করিয়াছিলেন — ও পূর্বে উদ্যানের দুই প্রবেশদ্বার পর্যন্ত। পরমহংসদেবের ঘরের কোলে দুই-একটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ। নিকটেই গন্ধরাজ, কোকিলাক্ষ, শ্বেত ও রক্তকরবী। ঘরের দেওয়ালে ঠাকুরদের ছবি, তন্মধ্যে “পিটার জলমধ্যে ডুবিতেছেন ও যীশু তাঁর হাত ধরিয়া তুলিতেছেন” সে ছবিখানিও আছে। আর-একটি বুদ্ধদেবের প্রস্তরময় মূর্তিও আছে। তক্তপোশের উপর তিনি উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। ভক্তেরা মেঝের উপর কেহ মাদুরে, কেহ আসনে উপবিষ্ট। সকলেই মহাপুরুষের আনন্দমূর্তি একদৃষ্টে দেখিতেছেন। ঘরের অনতিদূরে পোস্তার পশ্চিম-গা দিয়া পূতসলিলা গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী হইয়া প্রবাহিত হইতেছিলেন। বর্ষাকালে খরস্রোতা, যেন সাগরসঙ্গমে

পৌঁছিবার জন্য কত ব্যস্ত! পথে কেবল একবার মহাপুরুষের ধ্যানমন্দির দর্শন-স্পর্শন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন।

শ্রীযুক্ত মণি মল্লিক পুরাতন ব্রাহ্মভক্ত। বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি। তিনি কিছুদিন পূর্বে কাশীধাম দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। আজ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন ও তাঁহাকে কাশী পর্যটন বৃত্তান্ত বলিতেছেন।

মণি মল্লিক — আর-একটি সাধুকে দেখলাম। তিনি বলেন, ইন্দ্রিয়সংযম না হলে কিছু হবে না। শুধু ঈশ্বর ঈশ্বর করলে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — এদের মত কি জানো? আগে সাধন চাই। শম, দম, তিতিক্ষা চাই। এরা নির্বাণের চেষ্টা করছে। এরা বেদান্তবাদী, কেবল বিচার করে "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" — বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হলে তুমিও মিথ্যা, যিনি বলছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা।

"কিরকম জানো? যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না। কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকী থাকে। শেষ বিচারের পর সমাধি হয়। তখন 'আমি' 'তুমি' 'জগৎ' — এসবের খবর থাকে না।"

[পণ্ডিত পদ্মলোচন ও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা]

"পদ্মলোচন ভারী জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু আমি মা, মা, করতুম, তবু আমায় খুব মানত। পদ্মলোচন বর্ধমানের রাজার সভা-পণ্ডিত ছিল। কলকাতায় এসেছিল, এসে কামারহাটির কাছে একটি বাগানে ছিল। আমার পণ্ডিত দেখবার ইচ্ছা হল।

হৃদেকে পাঠিয়ে দিলুম জানতে, অভিমান আছে কি না? শুনলাম, পণ্ডিতের অভিমান নাই। আমার সঙ্গে দেখা হল। এত জ্ঞানী আর পণ্ডিত, তবু আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কান্না! কথা কয়ে এমন সুখ কোথাও পাই নাই। আমায় বললে, 'ভক্তের সঙ্গ করব এ-কামনা ত্যাগ করো, নচেৎ নানারকমের লোক তোমায় পতিত করবে।' বৈষ্ণবচরণের গুরু উৎসবানন্দের সঙ্গে লিখে বিচার করেছিল, আমায় আবার বললে, আপনি একটু শুনুন। একটা সভায় বিচার হয়েছিল — শিব বড়, না, ব্রহ্মা বড়। শেষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পদ্মলোচনকে জিজ্ঞাসা করলে। পদ্মলোচন এমনি সরল, সে বললে, 'আমার চৌদ্দপুরুষ শিবও দেখে নাই, ব্রহ্মাও দেখে নাই।' কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ শুনে আমায় একদিন বললে, 'ও-সব ত্যাগ করেছ কেন? এটা টাকা, এটা মাটি — এ ভেদবুদ্ধি তো অজ্ঞান থেকে হয়।' আমি কি বলব — বললাম, কে জানে বাপু, আমার টাকা-কড়ি ও-সব ভাল লাগে না।"

[বিদ্যাসাগরের দয়া — কিন্তু অন্তরে সোনা চাপা]

"একজন পণ্ডিতের ভারী অভিমান ছিল। ঈশ্বরের রূপ মানত না। কিন্তু ঈশ্বরের কার্য কে বুঝবে? তিনি আদ্যাশক্তিরূপে দেখা দিলেন। পণ্ডিত অনেকক্ষণ বেহুঁশ হয়ে রইল। একটু হুঁশ হবার পর, কা! কা! কা! (অর্থাৎ কালী) এই শব্দ কেবল করতে লাগল।"

ভক্ত — মহাশয়, বিদ্যাসাগরকে দেখেছেন, কিরকম বোধ হল?

শ্রীরামকৃষ্ণ — বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নাই। অন্তরে সোনা চাপা আছে, যদি সেই সোনার সন্ধান পেত, এত বাহিরের কাজ যা কচ্ছে সে-সব কম পড়ে যেত; শেষে একেবারে ত্যাগ হয়ে যেত। অন্তরে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর আছেন — এ-কথা জানতে পারলে তাঁরই ধ্যান চিন্তায় মন যেত। কারু কারু নিষ্কামকর্ম অনেকদিন করতে করতে শেষে বৈরাগ্য হয়, আর ওইদিকে মন যায়; ঈশ্বরে মন লিপ্ত হয়।

"ঈশ্বর বিদ্যাসাগর যেরূপ কাজ করছে সে খুব ভাল। দয়া খুব ভাল। দয়া আর মায়া অনেক তফাত। দয়া ভাল, মায়া ভাল নয়। মায়া আত্মীয়ের উপর ভালবাসা — স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগিনী, ভাইপো, ভাগনে, বাপ, মা এদেরই উপর। দয়া সর্বভূতে সমান ভালবাসা।"

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২২শে জুলাই 1883/07/22/ii

16.8 ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত

"গুণত্রয়ব্যতিরিক্তং সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ"
"ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত — মুখে বলা যায় না"

মাস্টার — দয়াও কি একটা বন্ধন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — সে অনেক দূরের কথা। দয়া সত্ত্বগুণ থেকে হয়। সত্ত্বগুণে পালন, রজোগুণে সৃষ্টি, তমোগুণে সংহার। কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্বরজস্তমঃ তিনগুণের পার। প্রকৃতির পার।

“যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে গুণ পৌঁছিতে পারে না। চোর যেমন ঠিক জায়গায় যেতে পারে না, ভয় হয় পাছে ধরা পড়ে। সত্ত্বরজস্তমঃ তিনগুনই চোর। একটা গল্প বলি শুন —

“একটি লোক বনের পথ দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময়ে তাকে তিনজন ডাকাত এসে ধরলে। তারা তার সর্বস্ব কেড়ে নিলে। একজন চোর বললে, আর এ লোকটাকে রেখে কি হবে? এই কথা বলে খাঁড়া দিয়ে কাটতে এল। তখন আর-একজন চোর বললে, না হে কেটে কি হবে? একে হাত-পা বেঁধে এখানে ফেলে যাও। তখন তাকে হাত-পা বেঁধে ওইখানেরেখে চোরেরা চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে বললে, ‘আহা, তোমার কি লেগেছে? এস, আমি তোমার বন্ধন খুলে দিই।’ তার বন্ধন খুলে দিয়ে চোরটি বললে, ‘আমার সঙ্গে সঙ্গে এস, তোমায় সদর রাস্তায় তুলে দিচ্ছি।’ অনেকক্ষণ পরে সদর রাস্তায় এসে বললে, ‘এই রাস্তা ধরে যাও, ওই তোমার বাড়ি দেখা যাচ্ছে।’ তখন লোকটি চোরকে বললে, ‘মশাই, আমার অনেক উপকার করলেন, এখন আপনিও আসুন, আমার বাড়ি পর্যন্ত যাবেন।’ চোর বললে, ‘না, আমার ওখানে যাবার জো নাই, পুলিসে টের পাবে।’

“সংসারই অরণ্য। এই বনে সত্ত্বরজস্তমঃ তিনগুণ ডাকাত, জীবের তত্ত্বজ্ঞান কেড়ে লয়। তমোগুণ জীবের বিনাশ করতে যায়। রজোগুণ সংসারে বদ্ধ করে। কিন্তু সত্ত্বগুণ, রজস্তমঃ থেকে বাঁচায়। সত্ত্বগুণের আশ্রয় পেলে কাম-ক্রোধ এই সব তমোগুণ থেকে রক্ষা হয়। সত্ত্বগুণও আবার জীবের সংসারবন্ধন মোচন করে। কিন্তু সত্ত্বগুণও চোর, তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারে না। কিন্তু সেই পরম ধামে যাবার পথে তুলে দেয়। দিয়ে বলে, ওই দেখ, তোমার বাড়ি ওই দেখা যায়! যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান সেখান থেকে সত্ত্বগুণও অনেক দূরে।

“ব্রহ্ম কি, তা মুখে যায় না। যার হয় সে খবর দিতে পারে না। একটা কথা আছে, কালাপানিতে জাহাজ গেলে আর ফিরে না।

“চার বন্ধু ভ্রমণ করতে করতে পাঁচিলে ঘেরা একটা জায়গা দেখতে পেলে। খুব উঁচু পাঁচিল। ভিতরে কি আছে দেখবার জন্য সকলে বড় উৎসুক হল। পাঁচিল বেয়ে একজন উঠল। উঁকি মেরে যা দেখলে, তাতে অবাক হয়ে ‘হা হা হা হা’ বলে ভিতরে পড়ে গেল। আর কোন খবর দিল না। যে-ই উঠে সে-ই ‘হা হা হা হা’ করে পড়ে যায়। তখন খবর আর কে দেবে?”

[জড়ভরত, দত্তাত্রেয়, শুকদেব — এঁদের ব্রহ্মজ্ঞান]

“জড়ভরত, দত্তাত্রেয় এঁরা ব্রহ্মদর্শন করে আর খবর দিতে পারেন নাই, ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে সমাধি হলে আর ‘আমি’ থাকে না। তাই রামপ্রসাদ বলেছে, ‘আপনি যদি না পারিস মন তবে রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না।’ মনের লয় হওয়া চাই, আবার ‘রামপ্রসাদের’ অর্থাৎ অহংতত্ত্বের লয় হওয়া চাই। তবে সেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়।”

একজন ভক্ত — মহাশয়, শুকদেবের কি জ্ঞান হয় নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেউ কেউ বলে, শুকদেব ব্রহ্মসমুদ্রের দর্শন-স্পর্শন মাত্র করেছিলেন, নেমে ডুব দেন নাই। তাই ফিরে এসে অত উপদেশ দিয়েছিলেন। কেউ বলে, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের পর ফিরে এসেছিলেন — লোকশিক্ষার জন্যে। পরীক্ষিৎকে ভাগবত বলবেন আরও কত লোকশিক্ষা দিবেন, তাই ঈশ্বর তাঁর সব 'আমি'র লয় করেন নাই। বিদ্যার 'আমি' এক রেখে দিয়েছিলেন।

[কেশবকে শিক্ষা — দল (সাম্প্রদায়িকতা) ভাল নয়]

একজন ভক্ত — ব্রহ্মজ্ঞান হলে কি দলটল থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেশব সেনের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা হচ্ছিল। কেশব বললে, আরও বলুন। আমি বললুম, আর বললে দলটল থাকে না। তখন কেশব বললে, তবে আর থাক, মশাই। (সকলের হাস্য) তবু কেশবকে বললুম, 'আমি' 'আমার' এটি অজ্ঞান। 'আমি কর্তা' আর আমার এই সব স্ত্রী, পুত্র, বিষয়, মান, সম্ভ্রম — এ-ভাব অজ্ঞান না হলে হয় না। তখন কেশব বললে, মহাশয়, 'আমি' ত্যাগ করলে যে আর কিছুই থাকে না। আমি বললুম, কেশব তোমাকে সব 'আমি' ত্যাগ করতে বলছি না, তুমি 'কাঁচা আমি' ত্যাগ কর। "আমি কর্তা" "আমার স্ত্রী-পুত্র" "আমি গুরু" — এ-সব অভিমান, "কাঁচা আমি"। এইটি ত্যাগ করে "পাকা আমি" হয়ে থাক — "আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর ভক্ত, আমি অকর্তা, তিনি কর্তা।"

[ঈশ্বরের আদেশ পেয়ে তবে ধর্মপ্রচার করা উচিত]

একজন ভক্ত — "পাকা আমি" কি দল করতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেশব সেনকে বললুম, আমি দলপতি দল করেছি, আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি — এ 'আমি' "কাঁচা আমি"। মত প্রচার বড় কঠিন। ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতিরেকে হয় না। তাঁর আদেশ চাই। যেমন শুকদেব ভাগবতকথা বলতে আদেশ পেয়েছিলেন। যদি ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করে কেউ আদেশ পায় — সে যদি প্রচার করে, লোকশিক্ষা দেয় দোষ নাই। তার 'আমি' "কাঁচা আমি" নয় — "পাকা আমি"।

"কেশবকে বলেছিলাম, 'কাঁচা আমি' ত্যাগ কর। 'দাস আমি' 'ভক্তের আমি' এতে কোন দোষ নাই।

"তুমি দল দল করছ। তোমার দল থেকে লোক ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। কেশব বললে, মহাশয়, তিন বৎসর এ-দলে থেকে আবার ও-দলে গেল। যাবার সময় আবার গালাগালি দিয়ে গেল। আমি বললাম, তুমি লক্ষণ দেখ না কেন, যাকে তাকে চেলা করলে কি হয়?"

[কেশবকে শিক্ষা — আদ্যাশক্তিকে মানো]

"আর কেশবকে বলেছিলাম, আদ্যাশক্তিকে মানো। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ — যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যতক্ষণ দেহবুদ্ধি, ততক্ষণ দুটো বলে বোধ হয়। বলতে গেলেই দুটো। কেশব কালী (শক্তি) মেনেছিল।

“একদিন কেশব শিষ্যদের সঙ্গে এখানে এসেছিল। আমি বললাম, তোমার লেকচার শুনব। চাঁদনিতে বসে লেকচার দিলে। তারপর ঘাটে এসে বসে অনেক কথাবার্তা হল। আমি বললাম, যিনিই ভগবান তিনিই একরূপে ভক্ত। তিনিই একরূপে ভাগবত। তোমরা বল ভাগবত-ভক্ত-ভগবান। কেশব বললে, আর শিষ্যেরাও একসঙ্গে বললে, ভাগবত-ভক্ত-ভগবান। যখন বললাম, ‘বল গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব’, তখন কেশব বললে, মহাশয়, এখন অত দূর নয়, তাহলে লোকে গোঁড়া বলবে।”

[পূর্বকথা — শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্ছা — মায়ার কাণ্ড দেখে]

“ত্রিগুনাতীত হওয়া বড় কঠিন। ঈশ্বরলাভ না করলে হয় না। জীব মায়ার রাজ্যে বাস করে। এই মায়া ইশ্বরকে জানতে দেয় না। এই মায়া মানুষকে অজ্ঞান করে রেখেছে। হৃদে একটা এঁড়ে বাছুর এনেছিল। একদিন দেখি, সেটিকে বাগানে বেঁধে দিয়েছে ঘাস খাওয়াবার জন্য। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হৃদে, ওটাকে রোজ ওখানে বেধে রাখিস কেন? হৃদে বললে, ‘মামা, এঁড়েটিকে দেশে পাঠিয়ে দিব। বড় হলে লাঙল টানবে।’ যাই এ-কথা বলেছে আমি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলাম! মনে হয়েছিল কি মায়ার খেলা! কোথায় কামারপুকুর, সিওড় — কোথায় কলকাতা! এই বাছুড়টি যাবে, ওই পথ! সেখানে বড় হবে। তারপর কতদিন পরে লাঙল টানবে — এরই নাম সংসার, — এরই নাম মায়া!

“অনেকক্ষণ পরে মূর্ছা ভেঙেছিল।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২২শে জুলাই 1883/07/22/iii

16.9 সমাধিমন্দিরে

শ্রীরামকৃষ্ণ অহর্নিশ সমাধিস্থ! দিনরাত কোথা দিয়া যাইতেছে। কেবল ভক্তদের সঙ্গে এক-একবার ঈশ্বরীয় কথা কীর্তন করেন। তিনটা-চারিটার সময় মাস্টার দেখিলেন, ঠাকুর ছোট তক্তপোশে বসিয়া আছেন, ভাবাবিষ্ট। কিয়ৎক্ষণ পরে মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

মার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে একবার বলিলেন, "মা, ওকে এক কলা দিলি কেন?" ঠাকুর খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আবার বলিতেছেন, "মা, বুঝেছি, এক কলাতেই যথেষ্ট হবে। এক কলাতেই তোর কাজ হবে, জীবশিক্ষা হবে।"

ঠাকুর কি সাঙ্গোপাঙ্গদের ভিতর এইরূপে শক্তিসঞ্চার করিতেছেন? এসব কি আয়োজন হইতেছে যে, পরে তাঁহারা জীবশিক্ষা দিবেন? মাস্টার ছাড়া ঘরে রাখালও বসিয়া আছেন। ঠাকুর এখনও আবিষ্ট। রাখালকে বলিতেছেন, "তুই রাগ করেছিলি? তোকে রাগালুম কেন, এর মানে আছে। ঔষধ ঠিক পড়বে বলে। পিলে মুখ তুললে পর মনসার পাতা-টাতে দিতে হয়।"

কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতেছেন, “হাজরাকে দেখলাম শুষ্ক কাঠ! তবে এখানে থাকে কেন? তার মানে আছে, জটিলে-কুটিলে থাকলে লীলা পোষ্টাই হয়।”

(মাস্টারের প্রতি) — ঈশ্বরীয় রূপ মানতে হয়। জগদ্ধাত্রীরূপের মানে জানো? যিনি জগৎকে ধারন করে আছেন। তিনি না ধরলে, তিনি না পালন করলে জগৎ পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। মনকরীকে যে বশ করতে পারে, তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন।

রাখাল —— “মন-মত্ত-করী!”

শ্রীরামকৃষ্ণ —— সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতিকে জব্দ করে রয়েছে।

সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়িতে আরতি হইতেছে। সন্ধ্যা সমাগমে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে ঠাকুরদের নাম করিতেছেন। ঘরে ধূনা দেওয়া হইল। ঠাকুর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ছোট তক্তপোশটির উপর বসিয়া আছেন। মার চিন্তা করিতেছেন। বেলঘরের শ্রীযুক্ত গোবিন্দ মুখুজ্জে ও তাহার বন্ধুগণ আসিয়া প্রণাম করিয়া মেঝেতে বসিলেন। মাস্টারও বসিয়া আছেন। রাখালও বসিয়া আছেন।

বাহিরে চাঁদ উঠিয়াছে। জগৎ নিঃশব্দে হাসিতেছে। ঘরের ভিতর সকলে নিঃশব্দে বসিয়া ঠাকুরের শান্তমূর্তি দেখিতেছেন। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। কিয়ৎক্ষণ পরে কথা কহিলেন। এখনও ভাবাবস্থা।

[শ্যামারূপ —— পুরুষ-প্রকৃতি —— যোগমায়া —— শিবকালী ও রাধাকৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যা —— উত্তম ভক্ত —— বিচারপথ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ) — বল, তোমাদের যা সংশয়। আমি সব বলছি।

গোবিন্দ ও অন্যান্য ভক্তেরা ভাবিতে লাগিলেন।

গোবিন্দ —— আজ্ঞা, শ্যামা এরূপটি হল কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ —— সে দূর বলে। কাছে গেলে কোন রঙই নাই। দীঘির জল দূর থেকে কালো দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে করে তোল, কোন রঙ নাই। আকাশ দূর থেকে যেন নীলবর্ণ। কাছের আকাশ দেখ, কোন রঙ নাই। ঈশ্বরের যত কাছে যাবে ততই ধারণা হবে, তাঁর নাম, রূপ নাই। পেছিয়ে একটু দূরে এলে আবার "আমার শ্যামা মা!" যেন ঘাসফুলের রঙ। শ্যামা পুরুষ না প্রকৃতি? একজন ভক্ত পূজা করেছিল। একজন দর্শন করতে এসে দেখে ঠাকুরের গলায় পৈতে! সে বললে, তুমি মার গলায় পৈতে পরিয়েছ! ভক্তটি বললে, "ভাই, তুমিই মাকে চিনেছ। আমি এখনও চিনতে পারি নাই তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি। তাই পৈতে পরিয়েছি!"

"যিনি শ্যামা, তিনিই ব্রহ্ম। যাঁরই রূপ, তিনিই অরূপ। যিনি সগুণ, তিনিই নির্গুণ। ব্রহ্ম শক্তি —— শক্তি ব্রহ্ম। অভেদ। সচ্চিদানন্দময় আর সচ্চিদানন্দময়ী।"

গোবিন্দ —— যোগমায়া কেন বলে?

শ্রীরামকৃষ্ণ —— যোগমায়া অর্থাৎ পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। যা কিছু দেখছ সবই পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। শিবকালীর মূর্তি, শিবের উপর কালী দাঁড়িয়া আছেন। শিব শব হয়ে পড়ে আছেন। কালী শিবের দিকে চেয়ে আছেন। এই সমস্তই

পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তাই শিব শব হয়ে আছেন। পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছেন। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন!

“রাধাকৃষ্ণ-যুগলমূর্তিরও মানে ওই। ওই যোগের জন্য বঙ্কিমভাব। সেই যোগ দেখাবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের নাকে মুক্তা, শ্রীমতীর নাকে নীল পাথর। শ্রীমতীর গৌর বরণ মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল। শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ, তাই শ্রীমতীর নীল পাথর। আবার শ্রীকৃষ্ণ পীতবসন ও শ্রীমতী নীলবসন পরেছেন।

“উত্তম ভক্ত কে? যে ব্রহ্মজ্ঞানের পর দেখে, তিনিই জীবজগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। প্রথমে ‘নেতি’ ‘নেতি’ বিচার করে ছাদে পৌঁছিতে হয়। তারপর সে দেখে, ছাদও যে জিনিসে তৈয়ারি — ইট, চুন, সুড়কি — সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈয়ারি। তখন দেখে, ব্রহ্মই জীবজগৎ সমস্ত হয়েছেন।

“শুধু বিচার! থু! থু! — কাজ নাই।

(ঠাকুর মুখামৃত ফেলিলেন।)

“কেন বিচার করে শুষ্ক হয়ে থাকব? যতক্ষণ ‘আমি তুমি’ আছে, ততক্ষণ যেন তাঁর পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি থাকে।”

(গোবিন্দের প্রতি) — কখনও বলি — তুমিই আমি, আমিই তুমি। আবার কখনও ‘তুমিই তুমি’ হয়ে যায়। তখন ‘আমি’ খুঁজে পাই না।

“শক্তিরই অবতার। এক মতে রাম ও কৃষ্ণ চিদানন্দসাগরের দুটি ঢেউ।

“অদ্বৈতজ্ঞানের পর চৈতন্যলাভ হয়। তখন দেখে, সর্বভূতে চৈতন্যরূপে তিনি আছেন। চৈতন্যলাভের পর আনন্দ। অদ্বৈত, চৈতন্য, নিত্যানন্দ।”

[ঈশ্বরের রূপ আছে — ভোগবাসনা গেলে ব্যাকুলতা]

(মাস্টারের প্রতি) — আর তোমায় বলছি, রূপ, ঈশ্বরীয় রূপ অবিশ্বাস করো না। রূপ আছে বিশ্বাস কর! তারপর যে রূপটি ভালবাস সেই রূপ ধ্যান করো।

(গোবিন্দের প্রতি) — কি জানো, যতক্ষণ ভোগবাসনা, ততক্ষণ ঈশ্বরকে জানতে বা দর্শন করতে প্রাণ ব্যাকুল হয় না। ছেলে খেলা নিয়ে ভুলে থাকে। সন্দেশ দিয়ে ভুলোও খানিক সন্দেশ খাবে। যখন খেলাও ভাল লাগে না, সন্দেশও ভাল লাগে না, তখন বলে, ‘মা যাব!’ আর সন্দেশ চায় না। যাকে চেনে না, কোনও কালে দেখে নাই, সে যদি বলে, আয় মার কাছে নিয়ে যাই — তারই সঙ্গে যাবে। যে কোলে করে নিয়ে যায় তারই সঙ্গে যাবে।

“সংসারের ভোগ হয়ে গেলে ইশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। কি করে তাঁকে পাব — কেবল এই চিন্তা হয়। যে যা বলে তাই শুনে।”

মাস্টার (স্বগত) — ভোগবাসনা গেলে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৮ই অগস্ট 1883/08/18/i

16.10 বলরাম-মন্দিরে ঈশ্বরদর্শন কথা

[জীবনের উদ্দেশ্য — The End of Life]

আর-একদিন ১৮ই অগস্ট, ১৮৮৩ (২রা ভাদ্র, শনিবার), বৈকালে বলরামের বাড়ি আসিয়াছেন। ঠাকুর অবতারতত্ত্ব বুঝাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — অবতার লোকশিক্ষার জন্য ভক্তি-ভক্ত নিয়ে থাকে। যেমন ছাদে উঠে সিঁড়িতে আনাগোনা করা। অন্য মানুষ ছাদে উঠবার জন্য ভক্তিপথে থাকবে; যতক্ষণ না জ্ঞানলাভ হয়, যতক্ষণ না সব বাসনা যায়। সব বাসনা গেলেই ছাদে উঠা যায়। দোকানদার যতক্ষণ না হিসাব মেটে ততক্ষণ ঘুমায় না। খাতায় হিসাব ঠিক করে তবে ঘুমায়!

(মাস্টারের প্রতি) — ঝাঁপ দিলে হবেই হবে! ঝাঁপ দিলে হবেই হবে।

“আচ্ছা, কেশব সেন, শিবনাথ এরা যে উপাসনা করে, তোমার কিরূপ বোধ হয়?”

মাস্টার — আজ্ঞা, আপনি যেমন বলেন, তাঁরা বাগান বর্ণনাই করেন, কিন্তু বাগানের মালিককে দর্শন করার কথা খুব কমই বলেন। প্রায় বাগান বর্ণনায় আরম্ভ আর উহাতেই শেষ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঠিক! বাগানের মালিককে খোঁজা আর তাঁর সঙ্গে আলাপ করা এইটেই কাজ। ঈশ্বরদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য।১

বলরামের বাড়ি হইতে এইবার অধরের বাড়ি আসিয়াছেন। সন্ধ্যার পর অধরের বৈঠকখানায় নামসংকীর্তন ও নৃত্য করিতেছেন। বৈষ্ণবচরণ কীর্তনিয়া গান গাইতেছেন। অধর, মাস্টার, রাখাল প্রভৃতি উপস্থিত আছেন।

[অধরের বাড়িতে কীর্তনানন্দ ও অধরের প্রতি উপদেশ]

কীর্তনান্তে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়াছেন, রাখালকে বলিতেছেন, "এখানকার শ্রাবণ মাসের জল নয়। শ্রাবণ মাসের জল খুব হুড়হুড় করে আসে আবার বেরিয়ে যায়। এখানে পাতাল ফোঁড়া শিব, বসানো শিব নয়। তুই রাগ করে দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে এলি, আমি মাকে বললুম, মা এর অপরাধ নিসনি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার? পাতাল ফোঁড়া শিব?

আবার অধরকে ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, "বাপু! তুমি যে নাম করেছিলে তাই ধ্যান করো।"

এই বলিয়া অধরের জিহ্বা অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলেন ও জিহ্বাতে কি লিখিয়া দিলেন। এই কি অধরের দীক্ষা হইল?

১ ...আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো...।।

[বৃহদারণ্যকোপনিষদ, ২/৪/৫]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৮ই অগস্ট 1883/08/18/ii

16.11 আদ্যাশক্তি ও অবতারতত্ত্ব

আর-একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় সিঁড়িতে বসিয়া আছেন। সঙ্গে রাখাল, মাস্টার হাজরা। ঠাকুর রহস্য করিতে করিতে বাল্যকালের অনেক কথা বলিতেছেন।

[দক্ষিণেশ্বরে-সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ ও জগন্মাতার সঙ্গে তাঁহার কথা]

ঠাকুর সমাধিস্থ। সন্ধ্যা হইয়াছে। নিজের ঘরে ছোট খাটটিতে বসে আছেন ও জগন্মাতার সহিত কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, “মা, এত হাঙ্গাম করিস কেন? মা, ওখানে কি যাব? আমায় নিয়ে যাস তো যাব!”

ঠাকুরের কোন ভক্তের বাড়িতে যাবার কথা হইয়াছিল! তাই কি জগন্মাতার আজ্ঞার জন্য এইরুপ বলিতেছেন?

জগন্মাতার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কহিতেছেন। এবার কোন অন্তরঙ্গ ভক্তের জন্য বুঝি প্রার্থনা করিতেছেন। বলিতেছেন, “মা, একে নিখাদ কর। আচ্ছা মা, ওকে এককলা দিলি কেন?”

ঠাকুর একটু চুপ করিয়াছেন। আবার বলিতেছেন, “ও! বুঝেছি, এতেই তোর কাজ হবে!”

ষোলকলার এককলা শক্তিতে তোর কাজ অর্থাৎ লোকশিক্ষা হবে, এই কথা কি ঠাকুর বলিতেছেন?

এইবার ভাবাবিষ্ট অবস্থায় মাস্টার প্রভৃতিকে আদ্যাশক্তি ও অবতারতত্ত্ব বলিতেছেন।

“যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। তাঁকেই মা বলে ডাকি। যখন নিষ্ক্রিয় তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি, আবার যখন সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কার্য করেন, তখন তাঁকে শক্তি বলি। যেমন স্থির জল, আর জলে ঢেউ হয়েছে। শক্তিলীলাতেই অবতার। অবতার প্রেমভক্তি শিখাতে আসেন। অবতার যেন গাভীর বাঁট। দুগ্ধ বাঁটের থেকেই পাওয়া যায়!

“মানুষে তিনি অবতীর্ণ হন। যেমন ঘুটির ভিতর মাছ এসে জমে।”

ভক্তেরা কেহ কেহ ভাবিতেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার পুরুষ? যেমন শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব, Christ?

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৯শে অগস্ট 1883/08/19/i

16.12 দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে। শ্রাবণ কৃষ্ণা প্রতিপদ (৩রা ভাদ্র), ১৯শে অগস্ট, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। আজ রবিবার। এইমাত্র ভোগারতির সময় সানাই বাজিতেছিল। ঠাকুরঘর বন্ধ হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসাদপ্রাপ্তির পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছেন। বিশ্রামের পর — এখনও মধ্যাহ্নকাল — তিনি তাঁহার ঘরে ছোট তক্তপোশের উপর বসিয়া আছেন। এমন সময় মাস্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার সঙ্গে বেদান্ত সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল।

[বেদান্তবাদীদিগের মত — কৃষ্ণকিশোরের কথা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — দেখ, অষ্টাবক্রসংহিতায় আত্মজ্ঞানের কথা আছে। আত্মজ্ঞানীরা বলে, ‘সোঽহম্’ অর্থাৎ “আমিই সেই পরমাত্মা।” এ-সব বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীর মত, সংসারীর পক্ষে এ-মত ঠিক নয়। সবই করা যাচ্ছে, অথচ “আমিই সেই নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা” — এ কিরূপে হতে পারে? বেদান্তবাদীরা বলে, আত্মা নির্লিপ্ত। সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য — এ-সব আত্মার কোনও অপকার করতে পারে না; তবে দেহাভিমানী লোকদের কষ্ট দিতে পারে। ধোঁয়া দেওয়াল ময়লা করে, আকাশের কিছু করতে পারে না। কৃষ্ণকিশোর জ্ঞানীদের মতো

বলত, আমি ‘খ’ — অর্থাৎ আকাশবৎ। তা সে পরমভক্ত; তার মুখে ওকথা বরং সাজে, কিন্তু সকলের মুখে নয়।

[পাপ ও পুণ্য — মায়া না দয়া?]

“কিন্তু ‘আমি মুক্ত’ এ-অভিমান খুব ভাল। ‘আমি মুক্ত’ এ-কথা বলতে বলতে সে মুক্ত হয়ে যায়। আবার ‘আমি বদ্ধ’ ‘আমি বদ্ধ’ এ-কথা বলতে বলতে সে ব্যক্তি বদ্ধই হয়ে যায়। যে কেবল বলে ‘আমি পাপী’ ‘আমি পাপী’ সেই সালাই পড়ে যায়! বরং বলতে হয়, আমি তাঁর নাম করেছি, আমার পাপ কি, বন্ধন কি!”

(মাস্টারের প্রতি) — দেখ, আমার মনটা বড় খারাপ হয়েছে। হৃদে১ চিঠি লিখেছে, তার বড় অসুখ। একি মায়া, না দয়া?

মাস্টার কি বলিবেন? চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — মায়া কাকে বলে জানো? বাপ-মা, ভাই-ভগ্নী, স্ত্রী-পুত্র, ভাগিনা-ভাগিনী, ভাইপো-ভাইঝি — এই সব আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসা। দয়া মানে — সর্বভূতে ভালবাসা। আমার এটা কি হল, মায়া না দয়া? হৃদে কিন্তু আমার অনেক করেছিল — অনেক সেবা করেছিল — হাতে করে গু পরিষ্কার করত। তেমনি শেষে শাস্তিও দিয়েছিল। এত শাস্তি যে, পোস্তার উপর গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ করতে গিছিলাম। কিন্তু আমার অনেক করেছিল — এখন সে কিছু (টাকা) পেলে মনটা স্থির হয়। কিন্তু কোন্ বাবুকে আবার বলতে যাব! কে বলে বেড়ায়?

১ হৃদয় ইং ১৮৮১ স্নানযাত্রার দিন পর্যন্ত কালীবাড়িতে প্রায় তেইশ বৎসর পরমহংসদেবের সেবা করিয়াছিলেন। সম্পর্কে হৃদয় তাঁহার ভাগিনেয়। তাঁহার জন্মভূমি হুগলী জেলার অন্তঃপাতী সিওড় গ্রাম। ওই গ্রাম ঠাকুরের জন্মভূমি ৺কামারপুকুর হইতে দুই ক্রোশ। ১৩০৬ সালের বৈশাখ মাসে দ্বিষষ্ঠি বৎসর বয়ঃক্রমে জন্মভূমিতে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৯শে অগস্ট 1883/08/19/ii

16.13 মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী —— বিষ্ণুপুরে মৃন্ময়ীদর্শন

বেলা দুটো-তিনটার সময় ভক্তবীর শ্রীযুক্ত অধর সেন ও শ্রীযুক্ত বলরাম বসু আসিয়া উপনীত হইলেন ও পরমহংসদেবকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কেমন আছেন? ঠাকুর বলিলেন, “হাঁ, শরীর ভাল আছে, তবে আমার মনে একটু কষ্ট হয়ে আছে।”

হৃদয়ের পীড়া সম্বন্ধে কোন কথারই উত্থাপন করিলেন না।

বড়বাজারের মল্লিকদের সিংহবাহিনী দেবী-বিগ্রহের কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সিংহবাহিনী আমি দেখতে গিছিলুম। চাষাধোপাপাড়ার একজন মল্লিকদের বাড়িতে ঠাকুরকে দেখলুম। পোড়ো বাড়ি, তারা গরিব হয়ে গেছে। এখানে পায়রার গু, ওখানে শেওলা, এখানে ঝুরঝুর করে বালি-সুরকি পড়ছে। অন্য মল্লিকদের বাড়ির যেমন দেখেছি, এ-বাড়ির সে শ্রী নাই। (মাস্টারের প্রতি) — আচ্ছা, এর মানে কি বল দেখি।

(মাস্টার চুপ করিয়া আছেন)

“কি জানো। যার যা কর্মের ভোগ আছে, তা তার করতে হয়। সংস্কার, প্রারব্ধ এ-সব মানতে হয়।

“আর পোড়ো বাড়িতে দেখলুম যে, সেখানেও সিংহ-বাহিনীর মুখের ভাব জ্বলজ্বল করছে। আবির্ভাব মানতে হয়।

“আমি একবার বিষ্ণুপুরে গিছিলুম। রাজার বেশ সব ঠাকুরবাড়ি আছে। সেখানে ভগবতীর মূর্তি আছে, নাম মৃন্ময়ী। ঠাকুরবাড়ির কাছে বড় দীঘি। কৃষ্ণবাঁধ। লালবাঁধ। আচ্ছা, দীঘিতে আবাঠার (মাথাঘষার) গন্ধ পেলুম কেন বল দেখি? আমি তো জানতুম না যে, মেয়েরা মৃন্ময়ীদর্শনের সময় আবাঠা তাঁকে দেয়। আর দীঘির কাছে আমার ভাবসমাধি হল, তখন বিগ্রহ দেখি নাই। আবেশে সেই দীঘির কাছে মৃন্ময়ীদর্শন হল — কোমর পর্যন্ত।”

[ভক্তের সুখ-দুঃখ — ভাগবত ও মহাভারতের কথা]

এতক্ষণে আর সব ভক্ত আসিয়া জুটিতেছেন। কাবুলের রাজবিপ্লব ও যুদ্ধের কথা উঠিল। একজন বলিলেন যে, ইয়াকুব খাঁ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন। তিনি পরমহংসদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়, ইয়াকুব খাঁ কিন্তু একজন বড় ভক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি জানো, সুখ-দুঃখ দেহধারণের ধর্ম। কবিকঙ্কণ চন্ডীতে আছে যে, কালুবীর জেলে গিছিল; তার বুকে পাষাণ দিয়ে রেখেছিল। — কিন্তু কালুবীর ভগবতীর বরপুত্র। দেহধারণ করলেই সুখ-দুঃখ ভোগ আছে।

"শ্রীমন্ত বড় ভক্ত। আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাসতেন। সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ। মশানে কাটতে নিয়ে গিছিল।

"একজন কাঠুরে পরম ভক্ত, ভগবতীর দর্শন পেলে; তিনি কত ভালবাসলেন, কত কৃপা করলেন। কিন্তু তার কাঠুরের কাজ আর ঘুচল না! সেই কাঠ কেটে আবার খেতে হবে। কারাগারে চর্তুভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবান দেবকীর দর্শন হল। কিন্তু কারাগার ঘুচল না।"

মাস্টার — শুধু কারাগার ঘোচা কেন? দেহই তো যত জঞ্জালের গোড়া। দেহটা ঘুচে যাওয়া উচিত ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি জানো, প্রারব্ধ কর্মের ভোগ। যে কদিন ভোগ আছে, দেহ ধারণ করতে হয়। একজন কানা গঙ্গাস্নান করলে। পাপ সব ঘুচে গেল। কিন্তু কানাচোখ আর ঘুচল না। (সকলের হাস্য) পূর্বজন্মের কর্ম ছিল তাই ভোগ।

মণি — যে বাণটা ছোড়া গেল, তার উপর কোনও আয়ত্ত থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেহের সুখ-দুঃখ যাই হোক, ভক্তের জ্ঞান, ভক্তির ঐশ্বর্য থাকে, সে ঐশ্বর্য কখনও যাবার নয়। দেখ না, পাণ্ডবের অত বিপদ! কিন্তু এ-বিপদে তারা চৈতন্য একবারও হারায় নাই। তাদের মতো জ্ঞানী, তাদের মতো ভক্ত কোথায়?

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চর্তুদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৯শে অগস্ট 1883/08/19/iii

16.14 'সমাধিমন্দিরে' — কাপ্তেন ও নরেন্দ্রের আগমন

এমন সময়ে নরেন্দ্র ও বিশ্বনাথ উপাধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বনাথ নেপালের রাজার উকিল — রাজপ্রতিনিধি। ঠাকুর তাঁহাকে কাপ্তেন বলিতেন। নরেন্দ্রের বয়স বছর বাইশ, বি.এ. পড়িতেছেন। মাঝে মাঝে, বিশেষতঃ রবিবারে দর্শন করিতে আসেন।

তাঁহারা প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে, পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে গান গাহিতে অনুরোধ করিলেন। ঘরের পশ্চিম ধারে তানপুরাটি ঝুলানো ছিল। সকলে একদৃষ্টে গায়কের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বাঁয়া ও তবলার সুর বাঁধা হইতে লাগিল — কখন গান হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) — দেখ, এ আর তেমন বাজে না।

কাপ্তেন —— পূর্ণ হয়ে বসে আছে, তাই শব্দ নাই। (সকলের হাস্য) পূর্ণকুম্ভ।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— (কাপ্তেনের প্রতি) — কিন্তু নারদাদি?

কাপ্তেন —— তাঁরা পরের দুঃখে কথা কয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— হাঁ, নারদ, শুকদেব —— এঁরা সমাধির পর নেমে এসেছিলেন, — দয়ার জন্য, পরের হিতের জন্য, তাঁরা কথা কয়েছিলেন।

নরেন্দ্র গান আরম্ভ করিলেন —— গাইলেন:

সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে।

(সেদিন কবে বা হবে)।

নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে ।।

জ্ঞান-অনন্তরূপে পশিবে নাথ মম হৃদে,

অবাক্ হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে।

আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদয়-আকাশে,

চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে,

আমরাও নাথ তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে ।।

শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজ-রাজ চরণে,

বিকাইব ওহে প্রাণসখা আফল করিব জীবনে।

এমন অধিকার, কোথা পাব তার, স্বর্গভোগ জীবনে (সশরীরে) ।।

শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপ হেরিয়া নাথ তোমার,
আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর,
তেমনি নাথ তোমার প্রকাশ পলাইবে পাপ-আঁধার।
ওহে ধ্রুবতারাসম হৃদে জ্বলন্ত বিশ্বাস হে,
জ্বালি দিয়ে দিনবন্ধু পুরাও মনের আশ,
আমি নিশিদিন প্রেমানন্দ মগন হইয়ে হে।
আপনারে ভুলে যাব তোমারে পাইয়ে হে ।।
(সেদিন কবে হবে) ।।

“আনন্দ অমৃতরূপে” এই কথা বলিতে না বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন! আসীন হইয়া করজোড়ে বসিয়া আছেন। পূর্বাস্য। দেহ উন্নত। আনন্দময়ীর রূপসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন! লোকবাহ্য একেবারেই নাই। শ্বাস বহিছে কি না বহিছে! স্পন্দনহীন! নিমেষশূন্য। চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। যেন এ-রাজ্য ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৯শে অগস্ট 1883/08/19/iv

16.15 সচ্চিদানন্দলাভের উপায় — জ্ঞানী ও ভক্তদের প্রভেদ

সমাধি ভঙ্গ হইল। ইতিপূর্বে নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি দৃষ্টে কক্ষ ত্যাগ করিয়া পূর্বদিকের বারান্দায় চলিয়া গিয়াছেন। সেখানে হাজরা মহাশয় কম্বলাসনে হরিনামের মালা হাতে করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে নরেন্দ্র আলাপ করিতেছেন। এদিকে ঘরে একঘর লোক। শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিভঙ্গের পর ভক্তদের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখেন যে, নরেন্দ্র নাই। শূন্য তানপুরা পড়িয়া রহিয়াছে। আর ভক্তগণ সকলে তাঁর দিকে ঔৎসুক্যের সহিত চাহিয়া রহিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আগুন জ্বেলে গেছে, এখন থাকল আর গেল! (কাপ্তেন প্রভৃতির প্রতি) — চিদানন্দ আরোপ কর, তোমাদেরও আনন্দ হবে। চিদানন্দ আছেই; — কেবল আবরণ ও বিক্ষেপ; বিষয়াসক্তি যত কমবে, ইশ্বরের প্রতি মতি তত বাড়বে।

কাপ্তেন — কলিকাতার বাড়ির দিকে যত আসবে, কাশী থেকে তত তফাত হবে। কাশীর দিকে যত যাবে, বাড়ি থেকে তত তফাত হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — শ্রীমতী যত কৃষ্ণের দিকে এগুচ্ছেন, ততই কৃষ্ণের দেহগন্ধ পাচ্ছিলেন। ইশ্বরের নিকট যত যাওয়া যায়, ততই তাতে ভাবভক্তি হয়। সাগরের নিকট নদী যতই যায়, ততই জোয়ার-ভাটা দেখা যায়।

“জ্ঞানীর ভিতর একটানা গঙ্গা বহিতে থাকে। তার পক্ষে সব স্বপ্নবৎ। সে সর্বদা স্ব-স্বরূপে থাকে। ভক্তের ভিতর একটানা নয়, জোয়ার-ভাটা হয়। হাসে-কাঁদে, নাচে গায়। ভক্ত তাঁর সঙ্গে বিলাস করতে ভালবাসে — কখন সাঁতার দেয়,

কখন ডুবে, কখন উঠে — যেমন জলের ভিতর বরফ ‘টাপুর-টুপুর’ ‘টাপুর-টুপুর’ করে।” (হাস্য)

[সচ্চিদানন্দ ও সচ্চিদানন্দময়ী — ব্রহ্ম ও আদ্যা শক্তি অভেদ]

“জ্ঞানী ব্রহ্মকে জানতে চায়। ভক্তের ভগবান, — ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ সর্বশক্তিমান ভগবান। কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ — যিনি সচ্চিদানন্দ, তিনিই সচ্চিদানন্দময়ী। যেমন মণির জ্যোতিঃ ও মণি; মণির জ্যোতিঃ বললেই মণি বুঝায়, মণি বললেই জ্যোতিঃ বুঝায়। মণি না ভাবলে মণির জ্যোতিঃ ভাবতে পারা যায় না — মণির জ্যোতিঃ না ভাবলে মণি ভাবতে পারা যায় না।

“এক সচ্চিদানন্দ শক্তিভেদে উপাধি ভেদ — তাই নানারূপ — ‘সে তো তুমিই গো তারা!’ যেখানে কার্য (সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়) সেইখানেই শক্তি। কিন্তু জল স্থির থাকলেও জল, তরঙ্গ, ভুড়ভুড়ি হলেও জল। সেই সচ্চিদানন্দই আদ্যাশক্তি — যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন। যেমন কাপ্তেন যখন কোন কাজ করেন না তখনও যিনি, আর কাপ্তেন পূজা করছেন, তখনও তিনি; আর কাপ্তেন লাট সাহেবের কাছে যাচ্ছেন, তখনও তিনি; কেবল উপাধি বিশেষ।”

কাপ্তেন — আজ্ঞা হাঁ, মহাশয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি এই কথা কেশব সেনকে বলেছিলাম।

কাপ্তেন — কেশব সেন ভ্রষ্টাচার, স্বেচ্ছাচার, তিনি বাবু, সাধু নন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — (ভক্তদের প্রতি) — কাপ্তেন আমায় বারণ করে, কেশব সেনের ওখানে যেতে।

কাপ্তেন — মহাশয়, আপনি যাবেন, তা আর কি করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্তভাবে) — তুমি লাট সাহেবের কাছে যেতে পার টাকার জন্য, আর আমি কেশব সেনের কাছে যেতে পারি না? সে ঈশ্বরচিন্তা করে, হরিনাম করে। তবে না তুমি বল 'ঈশ্বর-মায়া-জীব-জগৎ' — যিনি ঈশ্বর, তিনিই এই সব জীবজগৎ হয়েছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৯শে অগস্ট 1883/08/19/v

16.16 নরেন্দ্রসঙ্গে — জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয়

এই বলিয়া ঠাকুর হঠাৎ ঘর হইতে উত্তর-পূর্বের বারান্দায় চলিয়া গেলেন। কাপ্তেন ও অন্যান্য ভক্তেরা ঘরেই বসিয়া তাঁর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। মাস্টার তাঁহার সঙ্গে ওই বারান্দায় আসিলেন। উত্তর-পূর্বের বারান্দায় নরেন্দ্র হাজরার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জানেন, হাজরা বড় শুষ্ক

জ্ঞানবিচার করেন — বলেন, “জগৎ স্বপ্নবৎ — পূজা নৈবেদ্য এ-সব মনের ভুল — কেবল স্ব-স্বরূপকে চিন্তা করাই উদ্দেশ্য, আর ‘আমিই সেই’।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — কি গো! তোমাদের কি সব কথা হচ্ছে?

নরেন্দ্র (সহাস্যে) — কত কি কথা হচ্ছে — ‘লম্বা’ ‘লম্বা’ কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — কিন্তু শুদ্ধাজ্ঞান আর শুদ্ধাভক্তি এক। শুদ্ধাজ্ঞান যেখানে শুদ্ধাভক্তিও সেইখানে নিয়ে যায়। ভক্তিপথ বেশ সহজ পথ।

নরেন্দ্র — “আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে, দে মা পাগল করে।” (মাস্টারের প্রতি) দেখুন, হ্যামিলটন্‌এ পড়লুম — লিখছেন, “A learned ignorance is the end of Philosophy and the beginning of Religion.”

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — এর মানে কি গা?

নরেন্দ্র — ফিলসফি (দর্শনশাস্ত্র) পড়া শেষ হলে মানুষটা পণ্ডিতমূর্খ হয়ে দাঁড়ায়, তখন ধর্ম ধর্ম করে। তখন ধর্মের আরম্ভ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — Thank you! Thank you! (হাস্য)

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৯শে অগস্ট 1883/08/19/vi

16.17 সন্ধ্যাসমাগমে হরিধ্বনি — নরেন্দ্রের কত গুণ

কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া অধিকাংশ লোক বাটী গমন করিলেন। নরেন্দ্রও বিদায় লইলেন।

বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল। সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুরবাড়ির ফরাশ চারিদিকে আলোর আয়োজন করিতেছে। কালীঘরের ও বিষ্ণুঘরের দুইজন পূজারী গঙ্গায় অর্ধ নিমগ্ন হইয়া বাহ্য ও অন্তর শুচি করিতেছেন; শীঘ্র গিয়া আরতি ও ঠাকুরদের রাত্রিকালীন শীতল দিতে হইবে। দক্ষিণেশ্বর গ্রামবাসী যুবকবৃন্দ — কাহারও হাতে ছড়ি, কেহ বন্ধুসঙ্গে — বাগানে বেড়াইতে আসিয়াছে। তাহারা পোস্তার উপর বিচরণ করিতেছে ও কুসুমগন্ধবাহী নির্মল সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতে করিতে শ্রাবণ মাসের খরস্রোতা ইষৎ বীচিবিকম্পিত গঙ্গাপ্রবাহ দেখিতেছে। তন্মধ্যে হয়তো কেহ অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল পঞ্চবটির বিজনভূমিতে পাদচারণ করিতেছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও পশ্চিমের বারান্দা হইতে কিয়ৎকাল গঙ্গাদর্শন করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা হইল। ফরাশ আলোগুলি জ্বালিয়া দিয়া গেল। পরমহংসদেবের ঘরে আসিয়া দাসী প্রদীপ জ্বালিয়া ধুনা দিল। এদিকে দ্বাদশ মন্দিরে শিবের আরতি, তৎপরেই বিষ্ণুঘরের ও কালীঘরের আরতি আরম্ভ হইল। কাঁসর, ঘড়ি ও ঘন্টা

মধুর ও গম্ভীর নিনাদ করিতে লাগিল — মধুর ও গম্ভীর — কেননা, মন্দিরের পার্শ্বেই কলকলনিনাদিনী গঙ্গা।

শ্রাবণের কৃষ্ণা প্রতিপদ, কিয়ৎক্ষণ পরেই চাঁদ উঠিল। বৃহৎ উঠান ও উদ্যানস্থিত বৃক্ষশীর্ষ ক্রমে চন্দ্রকিরণে প্লাবিত হইল। এদিকে জ্যোৎস্নাস্পর্শে ভাগীরথীসলিল কত আনন্দ করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে।

সন্ধ্যার পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতাকে নমস্কার করিয়া হাততালি দিয়া হরিধ্বনি করিতেছেন। কক্ষমধ্যে অনেকগুলি ঠাকুরদের ছবি — ধ্রুব-প্রহ্লাদের ছবি, রাম রাজার ছবি, মা-কালীর ছবি, রাধাকৃষ্ণের ছবি। তিনি সকল ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া ও তাঁহাদের নাম করিয়া প্রণাম করিতেছেন। আবার বলিতেছেন, ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান; ভাগবত-ভক্ত-ভগবান; ব্রহ্ম-শক্তি, শক্তি-ব্রহ্ম; বেদ-পুরাণ-তন্ত্র; গীতা-গায়ত্রী। শরণাগত, শরণাগত; নাহং, নাহং; তুঁহু, তুঁহু; আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; ইত্যাদি।

নামের পর শ্রীরামকৃষ্ণ করজোড়ে জগন্মাতার চিন্তা করিতেছেন। দুই-চারিজন ভক্ত সন্ধ্যা সমাগমে উদ্যানমধ্যে গঙ্গাতীরে বেড়াইতেছিলেন। তাঁহারা ঠাকুরদের আরতির কিয়ৎক্ষণ পরে পরমহংসদেবের ঘরে ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিতেছেন। পরমহংসদেব খাটে উপবিষ্ট। মাস্টার, অধর, কিশোরী ইত্যাদি নিচে সম্মুখে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল — এরা সব নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ। দেখ না, নরেন্দ্র কাহাকেও কেয়ার

(গ্রাহ্য) করে না। আমার সঙ্গে কাপ্তেনের গাড়িতে যাচ্ছিল — কাপ্তেন ভাল জায়গায় বসতে বললে — তা চেয়েও দেখলে না। আমারই অপেক্ষা রাখে না! আবার যা জানে, তাও বলে না — পাছে আমি লোকের কাছে বলে বেড়াই যে, নরেন্দ্র এত বিদ্বান। মায়ামোহ নাই। — যেন কোন বন্ধন নাই! খুব ভাল আধার। একাধারে অনেক গুণ — গাইতে-বাজাতে, লিখতে-পড়তে! এদিকে জিতেন্দ্রিয়, — বলেছে বিয়ে করবে না। নরেন্দ্র আর ভবনাথ দুজনে ভারী মিল — যেন স্ত্রী-পুরুষ। নরেন্দ্র বেশি আসে না। সে ভাল। বেশি এলে আমি বিহ্বল হই।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২০শে অগস্ট 1883/08/20

16.18 দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

[মণিমোহনকে শিক্ষা — ব্রহ্মদর্শনের লক্ষণ — ধ্যানযোগ]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে বসিয়া মশারির ভিতর ধ্যান করিতেছেন। রাত ৭টা-৮টা হইবে। মাস্টার মেঝেতে বসিয়া আছেন — ও তাঁহার একটি বন্ধু হরিবাবু। আজ সোমবার, ২০শে অগস্ট, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, শ্রাবণের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথি।

আজকাল এখানে হাজরা থাকেন, রাখাল প্রায়ই থাকেন — কখনও অধরের বাড়ি গিয়া থাকেন। নরেন্দ্র ভবনাথ, অধর, বলরাম, রাম, মনোমোহন, মাস্টার প্রভৃতি প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আসিয়া থাকেন।

হৃদয় ঠাকুরের অনেক সেবা করিয়াছিলেন। দেশে তাঁহার অসুখ শুনিয়া ঠাকুর বড়ই চিন্তিত। তাই একজন ভক্ত শ্রীযুক্ত রাম চাটুজ্যের হাতে আজ দশটি টাকা দিয়াছেন হৃদয়কে পাঠাইতে। দিবার সময় ঠাকুর সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। ভক্তটি একটি চুমকি ঘটি আনিয়াছেন — ঠাকুর বলিয়া দিয়াছিলেন, "এখানকার জন্য একটি চুমকি ঘটি আনবে, ভক্তেরা জল খাবে।"

মাস্টারের বন্ধু হরিবাবুর প্রায় এগার বৎসর হইল পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। আর বিবাহ করেন নাই। মা-বাপ, ভাই-ভগ্নী সকলেই আছেন। তাঁহাদের উপর স্নেহ-মমতা খুব করেন ও তাঁহাদের সেবা করেন। বয়ঃক্রম ২৮।২৯। ভক্তেরা আসিয়া বসিলেই ঠাকুর মশারি হইতে বাহির হইলেন। মাস্টার প্রভৃতি সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের মশারি তুলিয়া দেওয়া হইল। তিনি ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন ও কথা কহিতেছেন —

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — মশারির ভিতর ধ্যান করছিলাম। ভাবলাম, কেবল একটা রূপ কল্পনা বই তো না, তাই ভাল লাগল না। তিনি দপ্‌ করে দেখিয়ে দেন তো হয়। আবার মনে করলাম, কেবা ধ্যান করে, কারই বা ধ্যান করি।

মাস্টার — আজ্ঞা হাঁ। আপনি বলেছেন যে, তিনিই জীব, জগৎ এই সব হয়েছেন — যে ধ্যান করছে সেও তিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আর তিনি না করালে তো আর হবে না। তিনি ধ্যান করালে তবেই ধ্যান হবে। তুমি কি বল?

মাস্টার — আজ্ঞে, আপনার ভিতর 'আমি' নাই তাই এইরূপ হচ্ছে। যেখানে 'আমি' নাই সেখানে এরূপই অবস্থা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিন্তু "আমি দাস, সেবক" এটুকু থাকা ভাল। যেখানে "আমি সব কাজ করছি" বোধ, সেখানে "আমি দাস, তুমি প্রভু" এ-ভাব খুব ভাল। সবই করা যাচ্ছে, সেব্য-সেবক ভাবে থাকাই ভাল।

মণিমোহন পরব্রহ্ম কি তাই সর্বদা চিন্তা করেন। ঠাকুর তাহাকে লক্ষ্য করিয়া আবার কহিতেছেন —

শ্রীরামকৃষ্ণ — ব্রহ্ম আকাশবৎ। ব্রহ্মের ভিতর বিকার নাই। যেমন অগ্নির কোন রঙই নাই। তবে শক্তিতে তিনি নানা হয়েছেন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ — এই তিনগুণ শক্তিরই গুণ। আগুনে যদি সাদা রঙ ফেলে দাও সাদা দেখাবে। যদি লাল রঙ ফেলে দাও লাল দেখাবে। যদি কালো রঙ ফেলে দাও তবে আগুন কালো দেখাবে। ব্রহ্ম — সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনগুণের অতীত। তিনি যে কি, মুখে বলা যায় না। তিনি বাক্যের অতীত। নেতি নেতি করে করে যা বাকি থাকে, আর যেখানে আনন্দ সেই ব্রহ্ম।

“একটি মেয়ের স্বামী এসেছে; অন্য অন্য সমবয়স্ক ছোকরাদের সহিত বাহিরের ঘরে বসেছে। এদিকে ওই মেয়েটি ও তার সমবয়স্কা মেয়েরা জানালা দিয়ে দেখছে। তারা বরটিকে চেনে না — ওই মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করছে, ওইটি কি তোর বর? তখন সে একটু হেসে বলছে, না। আর একজনকে দেখিয়ে বলছে, ওইটি কি তোর বর? সে আবার বলছে, না। আবার একজনকে দেখিয়ে বলছে, ওইটি কি তোর বর? সে আবার বলছে, না। শেষে তার স্বামীকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলে, ওইটি তোর বর? তখন সে হাঁও বললে না, নাও বললে না — কেবল একটু ফিক্‌ করে হেসে চুপ করে রইল। তখন সমবয়স্কারা বুঝলে যে, ওইটিই তার স্বামী। যেখানে ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান সেখানে চুপ।”

[সৎসঙ্গ — গৃহীর কর্তব্য]

(মণির প্রতি) — “আচ্ছা, আমি বকি কেন?”

মণি — আপনি যেমন বলেছেন, পাকা ঘিয়ে যদি আবার কাঁচা লুচি পড়ে তবে আবার ছ্যাঁক কলকল করে। ভক্তদের চৈতন্য হবার জন্য আপনি কথা কন।

ঠাকুর মাস্টারের সহিত হাজরা মহাশয়ের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সতের কি স্বভাব জানো? সে কাহাকেও কষ্ট দেয় না — ব্যতিব্যস্ত করে না। নিমন্ত্রণ গিয়েছে, কারু কারু এমন স্বভাব — হয়তো বললে, আমি আলাদা বসব। ঠিক ঈশ্বরে ভক্তি থাকলে বেতালে পা পড়ে না — কারুকে মিথ্যা কষ্ট দেয় না।

“আর অসতের সঙ্গ ভাল না। তাদের কাছ থেকে তফাত থাকতে হয়। গা বাঁচিয়ে চলতে হয়। (মণির প্রতি) তুমি কি বল?”

মণি — আজ্ঞে, অসৎসঙ্গে মনটা অনেক নেমে যায়। তবে আপনি বলেছেন, বীরের কথা আলাদা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিরূপ?

মণি — কম আগুনে একটু কাঠ ঠেলে দিলে নিবে যায়। আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলে তখন কলাগাছটাও ফেলে দিলে কিছু হয় না। কলাগাছ পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়।

ঠাকুর মাস্টারের বন্ধু হরিবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

মাস্টার — ইনি আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন। এঁর অনেকদিন পত্নীবিয়োগ হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি কি কর গা?

মাস্টার — একরকম কিছুই করেন না। তবে বাড়ির ভাই-ভগিনী, বাপ-মা এদের খুব সেবা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — সে কি? তুমি যে “কুমড়োকাটা বঠ্‌ঠাকুর” হলে। তুমি না সংসারী, না হরিভক্ত। এ ভাল নয়। এক-একজন বাড়িতে পুরুষ থাকে, — মেয়েছেলেদের নিয়ে রাতদিন থাকে, আর বাহিরের ঘরে বসে ভুড়ুর ভুড়ুর করে

তামাক খায়, নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকে। তবে বাড়ির ভিতরে কখনও গিয়ে কুমড়ো কেটে দেয়। মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নাই, তাই ছেলেদের দিয়ে তারা বলে পাঠায়, বঠ্ঠাকুরকে ডেকে আন। তিনি কুমড়োটা দুখানা করে দিবেন। তখন সে কুমড়োটা দুখানা করে দেয়, এই পর্যন্ত পুরুষের ব্যবহার। তাই নাম হয়েছে "কুমড়োকাটা বঠ্ঠাকুর"।

"তুমি এ-ও কর — ও-ও কর। ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে সংসারের কাজ কর। আর যখন একলা থাকবে তখন পড়বে ভক্তিশাস্ত্র — শ্রীমদ্ভাগবত বা চৈতন্যচরিতামৃত — এই সমস্ত পড়বে।"

রাত প্রায় দশটা হয় এখনও ৺কালীঘর বন্ধ হয় নাই। মাস্টার বৃহৎ উঠানের মধ্যে দিয়া রাম চাটুজ্যে মহাশয়ের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে প্রথমে ৺রাধাকান্তের মন্দিরে, পরে মা-কালীর মন্দিরে গিয়া প্রণাম করিলেন। চাঁদ উঠিয়াছে, শ্রাবণের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া — প্রাঙ্গণ, মন্দিরশীর্ষ, অতি সুন্দর দেখাইতেছে।

ঠাকুর ঘরে ফিরিয়া আসিয়া মাস্টার দেখিলেন ঠাকুর খাইতে বসিতেছেন। দক্ষিণাস্যে বসিলেন। খাদ্যের মধ্যে একটু সুজির পায়েস আর দুই-একখানি লুচি। কিয়ৎক্ষণ পরে মাস্টার ও তাঁহার বন্ধু ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। আজই কলিকাতায় ফিরিবেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ৭ই সেপ্টেম্বর 1883/09/07

16.19 গুরুশিষ্য-সংবাদ — গুহ্যকথা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সেই পূর্বপরিচিত ঘরে ছোট খাটটিতে বসিয়া মণির সহিত নিভৃতে কথা কহিতেছেন। মণি মেঝেতে বসিয়া আছেন। আজ শুক্রবার, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, ২২ শে ভাদ্র, শুক্লা ষষ্ঠী তিথি, রাত আন্দাজ সাড়ে সাতটা বাজিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সেদিন কলকাতায় গেলাম। গাড়িতে যেতে যেতে দেখলাম, জীব সব নিম্নদৃষ্টি — সব্বাইয়ের পেটের চিন্তা। সব পেটের জন্য দৌড়ুচ্ছে! সকলেরই মন কামিনী-কাঞ্চনে। তবে দুই-একটি দেখলাম, ঊর্ধ্বদৃষ্টি — ঈশ্বরের দিকে মন আছে।

মণি — আজকাল আরও পেটের চিন্তা বাড়িয়া দিয়েছে। ইংরেজদের অনুকরণ করতে গিয়ে লোকদের বিলাসের আরও মন হয়েছে, তাই অভাব বেড়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ওদের ঈশ্বর সম্বন্ধে কি মত?

মণি — ওরা নিরাকারবাদী।

[পূর্বকথা — শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থায় অভেদদর্শন — ইংরেজ হিন্দু, অন্ত্যজ জাতি (Depressed classes), পশু, কীট,

বিষ্ঠা, মূত্র — সর্বভূতে এক চৈতন্যদর্শন]

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমাদের এখানেও ওই মত আছে।

কিয়ৎকাল দুইজনেই চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর এইবার নিজের ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি একদিন দেখলাম, এক চৈতন্য — অভেদ। প্রথমে দেখালে, অনেক মানুষ, জীবজন্তু রয়েছে — তার ভিতর বাবুরা আছে, ইংরেজ, মুসলমান, আমি নিজে, মুদ্দোফরাস, কুকুর, আবার একজন দেড়ে মুসলমান হাতে এক সানকি, তাতে ভাত রয়েছে। সেই সানকির ভাত সব্বাইয়ের মুখে একটু একটু দিয়ে গেল, আমিও একটু আস্বাদ করলুম!

"আর-একদিন দেখালে, বিষ্ঠা, মূত্র, অন্ন ব্যঞ্জন সবরকম খাবার জিনিস, — সব পড়ে রয়েছে। হঠাৎ ভিতর থেকে জীবাত্মা বেরিয়ে গিয়ে একটি আগুনের শিখার মতো সব আস্বাদ করলে। যেন জিহ্বা লকলক করতে করতে সব জিনিস একবার আস্বাদ করলে! বিষ্ঠা, মূত্র — সব আস্বাদ করলে! দেখালে যে, সব এক — অভেদ!"

[পূর্বকথা — পার্ষদদর্শন — ঠাকুর কি অবতার?]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — আবার একবার দেখালে যে, এখানকার সব ভক্ত আছে — পার্ষদ — আপনার লোক। যাই আরতির শাঁখঘন্টা বেজে উঠত,

অমনি কুঠির ছাদের উপর উঠে ব্যকুল হয়ে চিৎকার করে বলতাম, “ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়! তোদের দেখবার জন্য আমার প্রাণ যায়।”

“আচ্ছা, আমার এই দর্শন বিষয়ে তোমার কিরূপ বোধ হয়?”

মণি — আপনি তাঁর বিলাসের স্থান! — এই বুঝেছি, আপনি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী; জীবদের যেন তিনি কলে ফেলে তৈয়ার করেছেন, কিন্তু আপনাকে তিনি নিজের হাতে গড়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, হাজরা বলে, দর্শনের পরে ষড়ৈশ্বর্য হয়।

মণি — যারা শুদ্ধাভক্তি চায় তারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য দেখতে চায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বোধ হয়, হাজরা আর-জন্মে দরিদ্র ছিল, তাই অত ঐশ্বর্য দেখতে চায়। হাজরা এখন আবার বলেছে, রাঁধুনি-বামুনের সঙ্গে আমি কি কথা কই! আবার বলে, খাজাঞ্চীকে বলে তোমাকে ওই সব জিনিস দেওয়াব! (মণির উচ্চহাস্য)

(সহাস্যে) — ও ওই সব কথা বলতে থাকে, আর আমি চুপ করে থাকি।

[মানুষ-অবতার ভক্তের সহজে ধারণা হয় — ঐশ্বর্য ও মাধুর্য]

মণি — আপনি তো অনেকবার বলে দিয়েছেন, যে শুদ্ধভক্ত সে ঐশ্বর্য দেখতে চায় না। যে শুদ্ধভক্ত সে ঈশ্বরকে গোপালভাবে দেখতে চায়। — প্রথমে ঈশ্বর

চুম্বক পাথর হন আর ভক্ত ছুঁচ হন — শেষে ভক্তই চুম্বক পাথর হন আর ঈশ্বর ছুঁচ হন — অর্থাৎ ভক্তের কাছে ঈশ্বর ছোট হয়ে যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ — যেমন ঠিক সূর্যোদয়ের সময়ে সূর্য। সে সূর্যকে অনায়াসে দেখতে পারা যায় — চক্ষু ঝলসে যায় না — বরং চক্ষের তৃপ্তি হয়। ভক্তের জন্য ভগবানের নরম ভাব হয়ে যায় — তিনি ঐশ্বর্য ত্যাগ করে ভক্তের কাছে আসেন।

দুইজনে আবার চুপ করিয়া আছেন।

মণি — এ-সব দর্শন ভাবি, কেন সত্য হবে না — যদি এ-সব অসত্য হয় এ-সংসার আরও অসত্য — কেননা যন্ত্র মন একই। ও-সব দর্শন শুদ্ধমনে হচ্ছে আর সংসারের বস্তু এই মনে দেখা হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এবার দেখছি, তোমার খুব অনিত্য বোধ হয়েছে! আচ্ছা, হাজরা কেমন বল।

মণি — ও একরকমের লোক! (ঠাকুরের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, আমার সঙ্গে আর কারু মেলে?

মণি — আজ্ঞে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কোন পরমহংসের সঙ্গে?

মণি — আজ্ঞে না। আপনার তুলনা নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — অচিনে গাছ শুনেছ?

মণি — আজ্ঞে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সে একরকম গাছ আছে — তাকে কেউ দেখে চিনতে পারে না।

মণি — আজ্ঞে, আপনাকেও চিনবার জো নাই। আপনাকে যে যত বুঝবে সে ততই উন্নত হবে!

মণি চুপ করিয়া ভাবিতেছেন, ঠাকুর "সূর্যোদয়ের সূর্য" আর "অচিনে গাছ" এই সব কথা যা বললেন, এরই নাম কি অবতার? এরই নাম কি নরলীলা? ঠাকুর কি অবতার? তাই পার্ষদদের দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে কুঠির ছাদে দাঁড়িয়ে ডাকতেন, "ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়?"

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

বিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ৯ই সেপ্টেম্বর 1883/09/09/i

16.20 দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে রতন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

[শ্রীরামকৃষ্ণের একচিন্তা ও এককথা, ঈশ্বর — “সা চাতুরী চাতুরী”]

শ্রীরামকৃষ্ণ ১কালীবাড়ির সেই পূর্বপরিচিত ঘরে ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন, সহাস্যবদন। ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। তাঁহার আহার হইয়া গিয়াছে। বেলা ১টা-২টা হইবে।

আজ রবিবার। ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। ভাদ্র শুক্লা সপ্তমী। ঘরের মেঝেতে রাখাল, মাস্টার, রতন বসিয়া আছেন। শ্রীযুক্ত রামলাল, শ্রীযুক্ত রাম চাটুজ্যে, শ্রীযুক্ত হাজরা মাঝে মাঝে আসিতেছেন ও বসিতেছেন। রতন শ্রীযুক্ত যদু মল্লিকের বাগানের তত্ত্বাবধান করেন। ঠাকুরকে ভক্তি করেন ও মাঝে মাঝে আসিয়া দর্শন করেন। ঠাকুর তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন। রতন বলিতেছেন, যদু মল্লিকের কলিকাতার বাড়িতে নীলকণ্ঠের যাত্রা হবে।

রতন — আপনার যেতে হবে। তাঁরা বলে পাঠিয়েছেন, অমুক দিনে যাত্রা হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা বেশ, আমার যাবার ইচ্ছা আছে। আহা! নীলকণ্ঠের কি ভক্তির সহিত গান!

একজন ভক্ত — আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — গান গাইতে গাইতে সে চক্ষের জলে ভেসে যায়। (রতনের প্রতি) — মনে কচ্ছি রাত্রে রয়ে যাব।

রতন — তা বেশ তো।

রাম চাটুজ্যে প্রভৃতি অনেকে খড়ম চুরির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

রতন — যদুবাবুর বাড়ির ঠাকুরের সোনার খড়ম চুরি হয়েছে। তার জন্য বাড়িতে হুলস্থূল পড়ে গেছে। থালা চালা হবে, সব্বাই বসে থাকবে, যে নিয়েছে তারদিকে থালা চলে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — কিরকম থালা চলে? আপনি চলে?

রতন — না, হাত চাপা থাকে।

ভক্ত — কি একটা হাতের কৌশল আছে — হাতের চাতুরী আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — যে চাতুরীতে ভগবানকে পাওয়া যায়, সেই চাতুরীই চাতুরী। "সা চাতুরী চাতুরী!"

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

একবিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ৯ই সেপ্টেম্বর 1883/09/09/ii

16.21 তান্ত্রিক সাধন ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানভাব

কথাবার্তা চলিতেছে, এমন সময় কতকগুলি বাঙালী ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন ঠাকুরের পূর্বপরিচিত। ইঁহারা তন্ত্রমতে সাধন করেন। পঞ্চ-মকার সাধন। ঠাকুর অন্তর্যামী, তাহাদের সমস্ত ভাব বুঝিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একজন ধর্মের নাম করিয়া পাপাচারণ করেন, তাহাও শুনিয়াছেন। সে ব্যক্তি একজন বড়মানুষের ভ্রাতার বিধবার সহিত অবৈধ প্রণয় করিয়াছে ও ধর্মের নাম করিয়া তাহার সহিত পঞ্চ-মকার সাধন করে, ইহাও শুনিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানভাব। প্রত্যেক স্ত্রীলোককে মা বলিয়া জানেন — বেশ্যা পর্যন্ত! — আর ভগবতীর এক-একটি রূপ বলিয়া জানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — অচলানন্দ কোথায়? কালীকিঙ্কর সেদিন এসেছিল, আর একজন কি সিঙ্গি, — (মাস্টার প্রভৃতির প্রতি) অচলানন্দ ও তার শিষ্যদের ভাব আলাদা। আমার সন্তানভাব।

আগন্তুক বাবুরা চুপ করিয়া আছেন, মুখে কোন কথা নাই।

[পূর্বকথা — অচলানন্দের তান্ত্রিক সাধনা]

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমার সন্তানভাব। অচলানন্দ এখানে এসে মাঝে মাঝে থাকত। খুব কারণ করত। আমার সন্তানভাব শুনে শেষে জিদ্-জিদ্ করে বলতে লাগল, — ‘স্ত্রীলোক লয়ে বীরভাবে তুমি কেন মানবে না? শিবের কলম মানবে না? শিব

তন্ত্র লিখে গেছেন, তাতে সব ভাবের সাধন আছে — বীরভাবেরও সাধন আছে।’

“আমি বললাম, কে জানে বাপু আমার ও-সব কিছুই ভাল লাগে না — আমার সন্তানভাব।”

[পিতার কর্তব্য — সিদ্ধাই ও পঞ্চ-মকারের নিন্দা]

“অচলানন্দ ছেলেপিলের খবর নিত না। আমায় বলত, ‘ছেলে ঈশ্বর দেখবেন, — এ-সব ঈশ্বরেচ্ছা!’ আমি শুনে চুপ করে থাকতুম। বলি ছেলেদের দেখে কে? ছেলেপুলে, পরিবার ত্যাগ করেছি বলে, টাকা রোজগারের একটা ছুতা না করা হয়। লোকে ভাববে উনি সব ত্যাগ করেছেন, আর অনেক টাকা এসে পড়বে।

“মোকদ্দমা জিতব, খুব টাকা হবে, মোকদ্দমা জিতিয়ে দেব, বিষয় পাইয়ে দেব, — এইজন্য সাধন? এ-ভারী হীনবুদ্ধির কথা।

“টাকায় খাওয়া-দাওয়া হয়, একটা থাকবার জায়গা হয়, ঠাকুরের সেবা হয়, সাধু-ভক্তের সেবা হয়, সম্মুখে কেউ গরিব পড়লে তার উপকার হয়। এই সব টাকার সদ্ব্যবহার। ঐশ্বর্য ভোগের জন্য টাকা নয়। দেহের সুখের জন্য টাকা নয়। লোকমান্যের জন্য টাকা নয়।

“সিদ্ধাইয়ের জন্য লোক পঞ্চ-মকার তন্ত্রমতে সাধন করে। কিন্তু কি হীনবুদ্ধি! কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, ‘ভাই! অষ্টসিদ্ধির মধ্যে কটি সিদ্ধি থাকলে তোমার একটু শক্তি বাড়তে পারে, কিন্তু আমায় পাবে না। ’ সিদ্ধাই থাকলে মায়া যায় না —

মায়া থেকে আবার অহংকার। কি হীনবুদ্ধি! ঘৃণার স্থান থেকে তিন টোসা কারণ বারি খেয়ে লাভ কি হল? — না মোকদ্দমা জেতা!”

[দীর্ঘায়ু হবার জন্য হঠযোগ কি প্রয়োজন?]

“শরীর, টাকা, — এ-সব অনিত্য। এর জন্য —— এত কেন? দেখ না, হঠযোগীদের দশা। শরীর কিসে দীর্ঘায়ু হবে এই দিকেই নজর! ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য নাই! নেতি, ধৌতি —— কেবল পেট সাফ করছেন! নল দিয়ে দুধ গ্রহণ করছেন!

“একজন স্যাকরা তার তালুতে জিব উলটে গিছল, তখন তার জড় সমাধির মতো হয়ে গেল। —— আর নড়ে-চড়ে না। অনেকদিন ওই ভাবে ছিল, সকলে এসে পূজা করত। কয়েক বৎসর পরে তার জিব হঠাৎ সোজা হয়ে গেল। তখন আগেকার মতো চৈতন্য হল, আবার স্যাকরার কাজ করতে লাগল! (সকলের হাস্য)

“ও-সব শরীরের কার্য, ওতে প্রায় ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না। শালগ্রামের ভাই (তার ছেলের বংশলোচনের কারবার ছিল) — বিরাশিরকম আসন জানত, আর নিজে যোগসমাধির কথা কত বলত! কিন্তু ভিতরে ভিতরে কামিনী-কাঞ্চনে মন। দাওয়ান মদন ভট্টের কত হাজার টাকার একখানা নোট পড়ে ছিল। টাকার লোভে সে টপ করে খেয়ে ফেলেছে —— গিলে ফেলেছে —— পরে কোনও রূপে বার করবে। কিন্তু নোট আদায় হল। শেষে তিন বৎসর মেয়াদ। আমি সরল বুদ্ধিতে ভাবতুম, বুঝি বেশি এগিয়ে পড়েছে, — মাইরি বলছি!”

[পূর্বকথা — মহেন্দ্র পালের টাকা ফিরানো — ভগবতী তেলী, কর্তাভজা মেয়েমানুষ নিয়ে সাধনের নিন্দা]

“এখানে সিঁথির মহিন্দোর পাল পাঁচটি টাকা দিয়ে গিছল — রামলালের কাছে। সে চলে গেলে পর রামলাল আমায় বললে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন দিয়েছে? রামলাল বললে, এখানের জন্যে দিয়েছে। তখন মনে উঠতে লাগল যে — দুধের দেনা রয়েছে, না হয় কতক শোধ দেওয়া যাবে। ওমা, রাত্রে শুয়ে আছি হঠাৎ উঠে পড়লাম। একবার বুকের ভিতর বিল্লী আঁচড়াতে লাগল! তখন রামলালকে গিয়ে বললাম, কাকে দিয়েছে? তোর খুড়ীকে কি দিয়েছে? রামলাল বললে, না আপনার জন্য দিয়েছে। তখন বললাম, না; এক্ষুণি টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আয়, তা না হলে আমার শান্তি হবে না।

“রামলাল ভোরে উঠে টাকা ফিরিয়া দিয়ে আসে, তবে হয়।

“ও-দেশে ভগি তেলী কর্তাভজার দলের। ওই মেয়েমানুষ নিয়ে সাধন। একটি পুরুষ না হলে মেয়েমানুষের সাধন-ভজন হবে না। সেই পুরুষটিকে বলে ‘রাগকৃষ্ণ’। তিনবার জিজ্ঞাসা করে, কৃষ্ণ পেয়েছিস? সে মেয়েমানুষটা তিনবার বলে, পেয়েছি।

“ভগী (ভগবতী) শূদ্র, তেলী। সকলে গিয়ে তার পায়ের ধুলো নিয়ে নমস্কার করত, তখন জমিদারের বড় রাগ হল। আমি তাকে দেখেছি। জমিদার একটা দুষ্ট লোক পাঠিয়ে দেয় — তার পাল্লায় পড়ে তার আবার পেটে ছেলে হয়।

“একদিন একজন বড়মানুষ এসেছিল। আমায় বলে, মহাশয় এই মোকদ্দমাটি কিসে জিত হয় আপনার করে দিতে হবে। আপনার নাম শুনে এসেছি। আমি বললাম, বাপু, সে আমি নই — তোমার ভুল হয়েছে। সে অচলানন্দ।

“যার ঠিক ঠিক ঈশ্বরে ভক্তি আছে, সে শরীর, টাকা — এ-সব গ্রাহ্য করে না। সে ভাবে, দেহসুখের জন্য, কি লোকমান্যের জন্য, কি টাকার জন্য, আবার তপ-জপ কি! এ-সব অনিত্য, দিন দুই-তিনের জন্য।”

আগন্তুক বাবুরা এইবার গাত্রোত্থান করিলেন ও নমস্কার করিয়া বলিলেন, তবে আমারা আসি। তাঁহারা চলিয়া গেলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিতেছেন ও মাস্টারকে বলিতেছেন, “চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।” (সকলের হাস্য)

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ৯ই সেপ্টম্বর 1883/09/09/iii

16.22 নিজের উপর শ্রদ্ধার মূল ঈশ্বরে বিশ্বাস

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি, সহাস্যে) — আচ্ছা, নরেন্দ্র কেমন!

মণি — আজ্ঞা, খুব ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখ, তার যেমন বিদ্যে তেমনি বুদ্ধি! আবার গাইতে বাজাতে। এদিকে জিতেন্দ্রিয়, বলেছে বিয়ে করবে না!

মণি — আপনি বলেছেন, যে পাপ পাপ মনে করে সেই পাপী হয়ে যায়। আর উঠতে পারে না। আমি ঈশ্বরের ছেলে — এ-বিশ্বাস থাকলে শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি হয়।

[পূর্বকথা — কৃষ্ণকিশোরের বিশ্বাস — হলধারীর পিতার বিশ্বাস।]

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, বিশ্বাস!

“কৃষ্ণকিশোরের কি বিশ্বাস! বলত, একবার তাঁর নাম করেছি আমার আবার পাপ কি? আমি শুদ্ধ নির্মল হয়ে গেছি। হলধারী বলেছিল, ‘অজামিল আবার নারায়ণের তপস্যায় গিছিল, তপস্যা না করলে কি তাঁর কৃপা পাওয়া যায়! শুধু একবার নারায়ণ বললে কি হবে!’ ওই কথা শুনে কৃষ্ণকিশোরের যে রাগ! এই বাগানে ফুল তুলতে এসেছিল, হলধারীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে না!

“হলধারীর বাপ ভারী ভক্ত ছিল। স্নানের সময় কোমর জলে গিয়ে যখন মন্ত্র উচ্চারণ করত, — ‘রক্তবর্ণং চতুর্মুখম্’ এই সব ধ্যান যখন করত, — তখন চক্ষু দিয়ে প্রেমাশ্রু পড়ত।

“একদিন এঁড়েদার ঘাটে একটি সাধু এসেছে। আমরা দেখতে যাব কথা হল। হলধারী বললে, সেই পঞ্চভূতের খোলটা দেখতে গিয়ে কি হবে? তারপরে সেই

কথা কৃষ্ণকিশোর শুনে কি বলেছিল, কি! সাধুকে দর্শন করে কি হবে, এই কথা বললে! — যে কৃষ্ণনাম করে, বা রামনাম করে, তার চিন্ময় দেহ হয়। আর সে সব চিন্ময় দেখে — ‘চিন্ময় শ্যাম’, ‘চিন্ময় ধাম’। বলেছিল, একবার কৃষ্ণনাম কি একবার রামনাম করলে শতবার সন্ধ্যার ফল পাওয়া যায়। তার একটি ছেলে যখন মারা গেল, প্রাণ যাবার সময় রামনাম বলেছিল। কৃষ্ণকিশোর বলেছিল, ও রাম বলেছে, ওর আর ভাবনা কি! তবে মাঝে মাঝে এক-একবার কাঁদত। পুত্রশোক!

“বৃন্দাবনে জলতৃষ্ণা পেয়েছে, মুচিকে বললে, তুই বল শিব। সে শিবনাম করে জল তুলে দিলে — অমন আচারী ব্রাহ্মণ সেই জল খেলে! কি বিশ্বাস!

“বিশ্বাস নাই, অথচ পূজা, জপ, সন্ধ্যাদি কর্ম করছে — তাতে কিছুই হয় না! কি বল?”

মণি — আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — গঙ্গার ঘাটে নাইতে এসেছে দেখেছি। যত রাজ্যের কথা! বিধবা পিসি বলছে, মা, দুর্গাপূজা আমি না হলে হয় না — শ্রীটি গড়া পর্যন্ত! বাটীতে বিয়ে-থাওয়া হলে সব আমায় করতে হবে মা — তবে হবে। এই ফুলশয্যের যোগাড়, খয়েরের বাগানটি পর্যন্ত!

মণি — আজ্ঞে, এদেরই বা দোষ কি, কি নিয়ে থাকে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — ছাদের উপর ঠাকুরঘর, নারায়ণপূজা হচ্ছে। পূজার নৈবেদ্য, চন্দন ঘষা — এই সব হচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরের কথা একটি নাই। কি রাঁধতে হবে, — আজ বাজারে কিছু ভাল পেলে না, — কাল অমুক ব্যঞ্জনটি বেশ হয়েছিল! ও ছেলেটি আমার খুড়তুত ভাই হয়, — হাঁরে তোর সে কর্মটি আছে? — আর আমি কেমন আছি! — আমার হরি নাই! এই সব কথা।

“দেখ দেখি, ঠাকুরঘরে পূজার সময় এই সব রাজ্যের কথাবার্তা!”

মণি — আজ্ঞে, বেশির ভাগই এইরূপ। আপনি যেমন বলেন, ঈশ্বরে যার অনুরাগ তার অধিক দিন কি পূজা-সন্ধ্যা করতে হয়!

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ৯ই সেপ্টেম্বর 1883/09/09/iv

16.23 চিন্ময় রূপ কি — ব্রহ্মজ্ঞানের পর বিজ্ঞান — ঈশ্বরই বস্তু

ঠাকুর মণির সহিত নিভৃতে কথা কহিতেছেন।

মণি — আজ্ঞে, তিনিই যদি সব হয়েছেন, এরূপ নানাভাব কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — বিভুরূপে তিনি সর্বভূতে আছেন, কিন্তু শক্তিবিশেষ, কোনখানে বিদ্যাশক্তি, কোনখানে অবিদ্যাশক্তি, কোনখানে বেশি শক্তি, কোনখানে কম শক্তি। দেখ না, মানুষের ভিতর ঠগ, জুয়াচোর আছে, আবার বাঘের মতো ভয়ানক লোকও আছে। আমি বলি, ঠগ নারায়ণ, বাঘ নারায়ণ।

মণি (সহাস্যে) — আজ্ঞা, তাদের দূর থেকে নমস্কার করতে হয়। বাঘ নারায়ণকে কাছে গিয়ে আলিঙ্গন করলে খেয়ে ফেলবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তিনি আর তাঁর শক্তি, ব্রহ্ম আর শক্তি — বই আর কিছুই নাই। নারদ রামচন্দ্রকে স্তব করতে বললেন, হে রাম তুমিই শিব, সীতা ভগবতী; তুমি ব্রহ্মা, সীতা ব্রহ্মাণী; তুমি ইন্দ্র, সীতা ইন্দ্রাণী; তুমিই নারায়ণ, সীতা লক্ষ্মী; পুরুষ-বাচক যা কিছু আছে সব তুমি, স্ত্রী-বাচক সব সীতা।

মণি — আর চিন্ময় রূপ?

শ্রীরামকৃষ্ণ একটু চিন্তা করিতেছেন। আস্তে আস্তে বলিতেছেন, "কিরকম জানো — যেমন জলের — এ-সব সাধন করলে জানা যায়।

"তুমি 'রূপে' বিশ্বাস করো। ব্রহ্মজ্ঞান হলে তবে অভেদ — ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি। অগ্নি ভাবলেই দাহিকাশক্তি ভাবতে হয়, আর দাহিকাশক্তি ভাবলেই অগ্নি ভাবতে হয়। দুগ্ধ আর দুগ্ধের ধবলত্ব। জল আর হিম শক্তি।

“কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের পরও আছে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। যার জ্ঞান আছে, বোধ হয়েছে, তার অজ্ঞানও আছে। বশিষ্ঠ শত পুত্রশোকে কাতর হলেন। লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করাতে রাম বললেন, ভাই, জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও, যার আছে জ্ঞান, তার আছে অজ্ঞান। পায়ে যদি কাঁটা ফোটে, আর-একটি আহরণ করে সেই কাঁটাটি তুলে দিতে হয়। তারপর দ্বিতীয় কাঁটাটিও ফেলে দেয়।”

মণি — অজ্ঞান, জ্ঞান দুই-ই ফেলে দিতে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, তাই বিজ্ঞানের প্রয়োজন!

“দেখ না, যার আলো জ্ঞান আছে, তার অন্ধকার জ্ঞান আছে; যার সুখ বোধ আছে, তার দুঃখ বোধ আছে; যার পুণ্য বোধ আছে, তার পাপ বোধ আছে; যার ভাল বোধ আছে, তার মন্দ বোধও আছে; যার শুচি বোধ আছে, তার অশুচি বোধ আছে; যার আমি বোধ আছে, তার তুমি বোধও আছে।

“বিজ্ঞান — কিনা তাঁকে বিশেষরূপে জানা। কাষ্ঠে আছে অগ্নি, এই বোধ — এই বিশ্বাসের নাম জ্ঞান। সেই আগুনে ভাত রাঁধা, খাওয়া, খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান। ঈশ্বর আছেন এইটি বোধে বোধ, তার নাম জ্ঞান; তাঁর সঙ্গে আলাপ, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা — বাৎসল্যভাবে, সখ্যভাবে, দাসভাবে, মধুরভাবে — এরই নাম বিজ্ঞান। জীবজগৎ তিনি হয়েছেন, এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান।

“এক মতে দর্শন হয় না — কে কাকে দর্শন করে। আপনিই আপনাকে দেখে। কালাপানিতে জাহাজ গেলে ফেরে না — আর ফিরে খবর দেয় না।”

মণি — যেমন আপনি বলেন, মনুমেন্টের উপরে উঠলে আর নিচের খবর থাকে না — গাড়ি, ঘোড়া, মেম, সাহেব, বাড়ি, ঘর, দ্বার, দোকান, অফিস ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, আজকাল কালীঘরে যাই না, কিছু অপরাধ হবে কি? নরেন্দ্র বলত, ইনি এখনও কালীঘরে যান।

মণি — আজ্ঞা, আপনার নূতন নূতন অবস্থা — আপনার আবার অপরাধ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, হৃদের জন্য সেনকে ওরা বলেছিল, "হৃদয়ের বড় অসুখ, আপনি তার জন্য দুইখান কাপড়, দুইটি জামা আনবেন, আমরা তাকে দেশে (সিওড়ে) পাঠিয়ে দিব।" সেন এনেছিল দুটি টাকা! এ কি বল দেখি, — এত টাকা! কিন্তু এই দেওয়া! বল না।

মণি — আজ্ঞে, যারা ঈশ্বরকে জানবার জন্য বেড়াচ্ছে, তারা এরূপ করতে পারে না; — যাদের জ্ঞানলাভই উদ্দেশ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বরই বস্তু, আর সবই অবস্তু।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২২শে সেপ্টম্বর 1883/09/22/i

16.24 শ্রীযুক্ত অধরের বাড়ি — রাখাল, ঈশান প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

[বালকের বিশ্বাস, অস্পৃশ্য জাতি (The Untouchables) ও শঙ্করাচার্য, সাধুর হৃদয়]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় অধরের বাড়ি শুভাগমন করিয়াছেন। ঠাকুর অধরের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। বৈকালবেলা। রাখাল, অধর, মাস্টার, ঈশান১ প্রভৃতি ও অনেকগুলি পাড়ার লোক উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভালবাসিতেন। তিনি Accountant General's Office-এ একজন সুপারিনটেণ্ডেন্ট ছিলেন। পেনশন লইবার পরে তিনি দান-ধ্যান, ধর্মকর্ম লইয়া থাকিতেন ও ঠাকুরকে মাঝে মাঝে দর্শন করিতেন। মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে তাঁহার বাড়িতে ঠাকুর একদিন আসিয়া নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে আহারাদি করিয়াছিলেন ও প্রায় সমস্ত দিন ছিলেন। সেই উপলক্ষে ঈশান অনেকগুলি লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের আসিবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি আসিতে পারেন নাই। ঈশান পেনশন লইবার পর ঠাকুরের নিকট দক্ষিণেশ্বরে প্রায় যাতায়াত করেন ও ভাটপাড়াতে গঙ্গাতীরে নির্জনে মাঝে মাঝে ঈশ্বরচিন্তা করেন। সম্প্রতি ভাটপাড়ায় গায়ত্রীর পুরশ্চরণ করিবার ইচ্ছা ছিল।

আজ শনিবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ (৬ই আশ্বিন, কৃষ্ণা ষষ্ঠী)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি) — তোমার সেই গল্পটি বলতো; ছেলে চিঠি পাঠিয়েছিল।

ঈশান (সহাস্যে) — একটি ছেলে শুনলে যে ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তাই সে প্রার্থনা জানাবার জন্য ইশ্বরকে একখানি চিঠি লিকে ডাকবাক্সে ফেলে দিছিল। ঠিকান দিছিল, স্বর্গ। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — দেখলে! এই বালকের মতো বিশ্বাস২। তবে হয়, (ঈশানের প্রতি) — আর সেই কর্মত্যাগের কথা?

ঈশান —– ভগবানলাভ হলে সন্ধ্যাদি কর্ম ত্যগ হয়ে যায়। গঙ্গাতীরে সকলে সন্ধ্যা করছে, একজন করছে না। তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, আমার অশৌচ হয়েছে, সন্ধ্যা৩ করতে নাই। মরণাশৌচ, আর জন্মাশৌচ দুই-ই হয়েছে। অবিদ্যা মার মৃত্যু হয়েছে, আত্মারামের জন্ম হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ —– আর আত্মজ্ঞান হলে জাতিভেদ থাকে না, সেই কথাটি?

ঈশান —– কাশীতে গঙ্গাস্নান করে শঙ্করাচার্য সিঁড়িতে উঠছেন —– এমন সময় কুক্কুরপালক চণ্ডালকে সামনে দেখে বললেন, এই তুই আমায় ছুঁলি। চন্ডাল বললে, ঠাকুর, তুমিও আমায় ছোঁও নাই —– আমিও তোমায় ছুঁই নাই; আত্মা সকলেরই অন্তর্যামী আর নির্লিপ্ত। সুরাতে সূর্যের প্রতিবিম্ব আর গঙ্গাজলে সূর্যের প্রতিবিম্ব এ-দুয়ে কি ভেদ আছে?৪

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — আর সেই সমন্বয়ের কথা, সব মত দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়?৫

ঈশান (সহাস্য) — হরি-হরের এক ধাতু, কেবল প্রত্যয়ের ভেদ, যিনিই হরি তিনিই হর। বিশ্বাস থাকলেই হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — আর সেই কথাটি — সাধুর হৃদয় সকলের চেয়ে বড়।

ঈশান (সহাস্যে) — সকলের চেয়ে বড় পৃথিবী, তার চেয়ে বড় সাগর, তার চেয়ে বড় আকাশ। কিন্তু ভগবান বিষ্ণু এক পদে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবন অধিকার করেছিলেন। সেই বিষ্ণুপদ সাধুর হৃদয়ের মধ্যে! তাই সাধুর হৃদয় সকলের চেয়ে বড়।

এই সকল কথা শুনিয়া ভক্তেরা আনন্দ করিতেছেন।

১ ঈশানের পুত্রগণ সকলেই কৃতবিদ্য। জ্যেষ্ঠ — গোপাল ডিস্‌ট্রিক্‌ট্‌ ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিলেন। মধ্যম — শ্রীশচন্দ্র ডিসট্রিক্‌ট্‌ জজ হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সতীশ নরেন্দ্রের সহপাঠী সুন্দর পাখোয়াজ বাজাইতে পারিতেন। তিনি গাজীপুরে সরকারী কর্ম করিতেন, তাঁহারই বাসায় নরেন্দ্র প্রব্রজ্যা অবস্থায় কিছুদিন ছিলেন ও সেইখানে থাকিয়া পওহারী বাবাকে দর্শন করিয়াছিলেন। ভ্রাতাদের মধ্যে অন্যতম শ্রীযুক্ত গিরিশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসিস্টান্ট রেজিষ্ট্রারের কার্য অনেকদিন করিয়াছিলেন।

ঈশান এত দান করিতেন যে, শেষে দেনাগ্রস্ত হইয়া অতি কষ্টে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর অনেক বৎসর পূর্বেই তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল।

ঈশান ভাটপাড়ায় প্রায় মধ্যে মধ্যে গিয়া নির্জনে সাধন-ভজন করিতেন।

২ The kingdom of heaven is revealed unto babes but is hidden from the wise and the prudent — Bible.

৩ মৃতা মোহময়ী মাতা জাতো বোধময়ঃ সূতঃ।

সূতকদ্বয়সংপ্রাপ্তৌ কথং সন্ধ্যামুপাসমহে ।।

হৃদাকাশে চিদাদিত্যঃ সদা ভাসতি ভাসতি।

নাস্তমেতি ন চোদেতি কথং সন্ধ্যামুপাসমহে ।। [মৈত্রেয়্যুপনিষদ্ ২য় অধ্যায়]

৪ সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।

ইক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ।। [গীতা, ৬।২৯]

৫ যে তথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। [গীতা, ৪।১১]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২২শে সেপ্টেম্বর 1883/09/22/ii

16.25 আদ্যাশক্তির উপাসনাতেই ব্রহ্ম-উপাসনা — ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ

[Identity of God the Absolute and God the Creator.
Preserver and Destroyer]

ঈশান ভাটপাড়ায় গায়ত্রীর পুরশ্চরণ করিবেন। গায়ত্রী ব্রহ্মমন্ত্র। একেবারে বিষয়বুদ্ধি না গেলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। কিন্তু কলিতে অন্নগত প্রাণ — বিষয়বুদ্ধি যায় না! রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ — মন এই সব বিষয়১ লয়ে সর্বদাই থাকে তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, কলিতে বেদমত চলে না। যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। শক্তির উপাসনা করিলেই ব্রহ্মের উপাসনা হয়। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন তখন তাঁকে শক্তি বলে। দুটা আলাদা জিনিস নয়। একই জিনিস।

[The quest of the Absolute and Ishan. The Vedantic position.
“I am He” — সোঽহম্]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি) — কেন নেতি নেতি করে বেড়াচ্ছ? ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না, কেবল বলা যায় “অস্তি মাত্রম্”।২ কেবলঃ রামঃ।

“আমরা যা কিছু দেখছি, চিন্তা করছি, সবই সেই আদ্যাশক্তির, সেই চিচ্ছক্তির ঐশ্বর্য — সৃষ্টি, পালন, সংহার; জীবজগৎ; আবার ধ্যান, ধ্যাতা, ভক্তি, প্রেম — সব তাঁর ঐশ্বর্য।

“কিন্তু ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। লঙ্কা থেকে ফিরে আসবার পর হনুমান রামকে স্তব করছেন; বলছেন, হে রাম, তুমিই পরব্রহ্ম, আর সীতা তোমার শক্তি। কিন্তু তোমরা দুজনে অভেদ। যেমন সর্প ও তার তির্যগ্গতি — সাপের মতো গতি ভাবতে গেলেই সাপকে ভাবতে হবে; আর সাপকে ভাবলেই সাপের গতি ভাবতে হয়। দুগ্ধ ভাবলেই দুধের বর্ণ ভাবতে হয়, ধবলত্ব। দুধের মতো সাদা অর্থাৎ ধবলত্ব ভাবতে গেলেই দুধকে ভাবতে হয়। জলের হিমশক্তি ভাবলেই জলকে ভাবতে হয়, আবার জলকে ভাবলেই জলের হিমশক্তিকে ভাবতে হয়।

“এই আদ্যাশক্তি বা মহামায়া ব্রহ্মকে আবরণ করে রেখেছে। আবরণ গেলেই ‘যা ছিলুম’, ‘তাই হলুম’। ‘আমিই তুমি’ ‘তুমিই আমি’!

“যতক্ষণ আবরণ রয়েছে, ততক্ষণ বেদান্তবাদীদের সোঽহম্‌ অর্থাৎ ‘আমিই সেই পরব্রহ্ম’ এ-কথা ঠিক খাটে না। জলেরই তরঙ্গ, তরঙ্গের কিছু জল নয়। যতক্ষণ আবরণ রয়েছে ততক্ষণ মা — মা বলে ডাকা ভাল। তুমি মা, আমি তোমার সন্তান; তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস। সেব্য-সেবক ভাবই ভাল। এই দাসভাব থেকে আবার সব ভাব আসে — শান্ত, সখ্য প্রভৃতি। মনিব যদি দাসকে ভালবাসে, তাহলে আবার তাকে বলে, আয়, আমার কাছে বস; তুইও যা, আমিও তা। কিন্তু দাস যদি মনিবের কাছে সেধে বসতে যায়, মনিব রাগ করবে না?”

[আদ্যাশক্তি ও অবতারলীলা ও ঈশান — What is Maya?
বেদ, পুরাণ, তন্ত্রের সমন্বয়]

“অবতারলীলা — এ-সব চিচ্ছক্তির ঐশ্বর্য। যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আবার রাম, কৃষ্ণ, শিব।”

ঈশান — হরি, হর এক ধাতু কেবল প্রত্যয়ের ভেদ। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, এক বই দুই কিছু নাই। বেদেতে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ ব্রহ্ম, পুরাণে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ, আবার তন্ত্রে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ।

“সেই চিচ্ছক্তি, মহামায়ারূপে সব অজ্ঞান করে রেখেছে। অধ্যাত্মরামায়ণে আছে, রামকে দর্শন করে যত ঋষিরা কেবল এই কথাই বলছে, হে রাম, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না!”৩

ঈশান — এ মায়াটা কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — যা কিছু দেখছ, শুনছ, চিন্তা করছ — সবই মায়া। এককথায় বলতে গেলে, কামিনী-কাঞ্চনই মায়ার আবরণ।

“পান খাওয়া, মাছ খাওয়া, তামাক খাওয়া, তেল মাখা — এ-সব তাতে দোষ নাই। এ-সব শুধু ত্যাগ করলে কি হবে? কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই দরকার। সেই ত্যাগই ত্যাগ! গৃহীরা মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে সাধন-ভজন করে, ভক্তিলাভ করে মনে ত্যাগ করবে। সন্ন্যাসীরা বাহিরে ত্যাগ, মনে ত্যাগ — দুই-ই করবে।”

[Keshab Chandra Sen and Renunciation — নববিধান ও নিরাকারবাদ — Dogmatism]

“কেশব সেনকে বলেছিলাম, যে-ঘরে জলের জালা আর আচার, তেঁতুল, সেই ঘরে বিকারী রোগী থাকলে কেমন করে হয়? মাঝে মাঝে নির্জনে থাকতে হয়।”

একজন ভক্ত — মহাশয়, নববিধান কিরকম, যেন ডাল-খিচুড়ির মতো।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেউ কেউ বলে আধুনিক। আমি ভাবি, ব্রহ্মজ্ঞানীর ঈশ্বর কি আর-একটা ঈশ্বর? বলে নববিধান, নূতন বিধান; তা হবে! যেমন ছটা দর্শন আছে, ষড়্‌ দর্শন, তেমনি আর-একটা কিছু হবে।

“তবে নিরাকারবাদীদের ভুল কি জানো? ভুল এই — তারা বলে, তিনি নিরাকার আর সব মত ভুল।

“আমি জানি, তিনি সাকার, নিরাকার দুই-ই, আরো কত কি হতে পারেন। তিনি সবই হতে পারেন।৪”

[God in the 'Untouchables']

(ঈশানের প্রতি) — সেই চিচ্ছক্তি, সেই মহামায়া চতুর্বিংশতি তত্ত্ব৫ হয়ে রয়েছেন। আমি ধ্যান করছিলাম; ধ্যান করতে করতে মন চলে গেল রস্‌কের বাড়ি! রস্‌কে ম্যাথর। মনকে বললুম, থাক শালা ওইখানে থাক। মা দেখিয়া দিলেন, ওর বাড়ির লোকজন সব বেড়াচ্ছে খোল মাত্র, ভিতরে সেই এক কুলকুণ্ডলিনী, এক ষট্‌চক্র!

“সেই আদ্যাশক্তি মেয়ে না পুরুষ? আমি ও-দেশে দেখলাম, লাহাদের বাড়িতে কালীপূজা হচ্ছে। মার গলায় পৈতে দিয়েছে। একজন জিজ্ঞাসা করলে, মার গলায় পৈতে কেন? যার বাড়ির ঠাকুর, তাকে সে বললে, ভাই! তুই মাকে ঠিক চিনেছিস, কিন্তু আমি কিছু জানি না, মা পুরুষ কি মেয়ে।৬

"এইরকম আছে যে, সেই মহামায়া শিবকে টপ্ করে খেয়ে ফেলেন। মার ভিতরে ষট্‌চক্রের জ্ঞান হলে শিব মার ঊরু দিয়ে বেরিয়া এলেন। তখন শিব তন্ত্রের সৃষ্টি করলেন।

"সেই চিচ্ছক্তির, সেই মহামায়ার শরণাগত হতে হয়।"

ঈশান — আপনি কৃপা করুন।

[ঈশানকে শিক্ষা, "ডুব দাও" — গুরুর কি প্রয়োজন? ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, শাস্ত্র ও ঈশান — Mere Book-Learning]

শ্রীরামকৃষ্ণ — সরলভাবে বল, হে ঈশ্বর, দেখা দাও, আর কাঁদ; আর বল, হে ঈশ্বর, কামিনী-কাঞ্চন থেকে মন তফাত কর!

"আর ডুব দাও। উপর উপর ভাসলে বা সাঁতার দিলে কি রত্ন পাওয়া যায়? ডুব দিতে হয়।

"গুরুর কাছে সন্ধান নিতে হয়। একজন বাণলিঙ্গ শিব খুঁজতে ছিল। কেউ আবার বলে দেয়, অমুক নদীর ধারে যাও, সেখানে একটি গাছ দেখবে, সেই গাছের কাছে একটি ঘূর্ণি জল আছে, সেইখানে ডুব মারতে হবে, তবে বাণলিঙ্গ শিব পাওয়া যাবে। তাই গুরুর কাছে সন্ধান জেনে নিতে হয়।"

ঈশান — আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সচ্চিদানন্দই৭ গুরুরূপে আসেন। মানুষ গুরুর কাছে যদি কেউ দীক্ষা লয়, তাঁকে মানুষ ভাবলে কিছু হবে না। তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবতে হয়, তবে তো মন্ত্রে বিশ্বাস হবে? বিশ্বাস হলেই সব হয়ে গেল! শূদ্র (একলব্য) মাটির দ্রোণ তৈয়ার করে বনেতে বাণশিক্ষা করেছিল। মাটির দ্রোণকে পূজা করত, সাক্ষাৎ দ্রোণাচার্য জ্ঞানে; তাইতেই বাণশিক্ষায় সিদ্ধ হল।

“আর তুমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিয়ে বেশি মাখামাখি করো না। ওদের চিন্তা দুপয়সা পাবার জন্য!

“আমি দেখেছি, ব্রাহ্মণ স্বস্ত্যয়ন করতে এসেছে, চন্ডীপাঠ কি আর কিছু পাঠ করেছে। তা দেখেছি অর্ধেক পাতা উল্টে যাবে। (সকলের হাস্য)

“নিজের বধের জন্য একটি নরুনেই হয়। পরকে মারতেই ঢাল-তরোয়াল — শাস্ত্রাদি।

“নানা শাস্ত্রেরও কিছু প্রয়োজন নাই৮। যদি বিবেক না থাকে, শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু হয় না। ষট্‌শাস্ত্র পড়লেও কিছু হয় না। নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাক, তিনিই সব করে দেবেন।”

[গোপনে সাধন — শুচিবাই ও ঈশান]

ঈশান ভাটপাড়ায় পুরশ্চরণ করিবার জন্য গঙ্গাকূলে আটচালা বাঁধিতেছিলেন, এই কথা ঠাকুর শুনিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যস্ত হইয়া ঈশানের প্রতি) — হ্যাঁগা, ঘর কি তৈয়ার হয়েছে? কি জানো, ও-সব কাজ লোকের খপরে যত না আসে ততই ভাল। যারা সত্ত্বগুণী, তারা ধ্যান করে মনে, কোণে, বনে, কখনও মশারির ভিতর ধ্যান করে!

হাজরা মহাশয়কে ঈশান মাঝে মাঝে ভাটপাড়ায় লইয়া যান। হাজরা মহাশয় শুচিবায়ের ন্যায় আচার করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে ওরূপ করিতে বারণ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি) — আর দেখ, বেশি আচার করো না। একজন সাধুর বড় জলতৃষ্ণা পেয়েছে, ভিস্তি জল নিয়ে যাচ্ছিল, সাধুকে জল দিতে চাইলে। সাধু বললে, তোমার ডোল৯ (চামড়ার মোশক) কি পরিষ্কার? ভিস্তি বললে। মহারাজ, আমার ডোল খুব পরিষ্কার, কিন্তু তোমার ডোলের ভিতর মলমূত্র অনেকরকম ময়লা আছে। তাই বলছি, আমার ডোল থেকে খাও, এতে দোষ হবে না। তোমার ডোল অর্থাৎ তোমার দেহ, তোমার পেট!

“আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর। তাহলে আর তীর্থাদিরও প্রয়োজন হবে না।”

এই বলিয়া ঠাকুর ভাবে বিভোর হইয়া গান গাইতেছেন:

[সিদ্ধাবস্থায় কর্মত্যাগ]

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায় ।।
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।

সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, কভু সন্ধি নাহি পায় ।।

দয়া ব্রত দান আদি, আর কিছু নাহি মনে লয়।

মদনেরি যাগযজ্ঞ — ব্রহ্মময়ীর রাঙা পায় ।।

কালীনামের এত গুণ কেবা জানতে পারে তায়।

দেবাদিদেব মহাদেব, যাঁর পঞ্চমুখে গুণ গায় ।।

ঈশান সব শুনিয়া চুপ করিয়া আছেন।

[ঈশানকে শিক্ষা; বালকের ন্যায় বিশ্বাস — জনকের ন্যায় আগে সাধন, তবে সংসারে ঈশ্বরলাভ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি) — আর কিছু খোঁচ মোচ (সন্দেহ) থাকে জিজ্ঞাসা কর!

ঈশান — আজ্ঞা, যা বলছিলেন, বিশ্বাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঠিক বিশ্বাসের দ্বারাই তাঁকে লাভ করা যায়। আর, সব বিশ্বাস করলে আরও শীঘ্র হয়। গাভী যদি বেছে বেছে খায়, তাহলে দুধ কম দেয়; সবরকম গাছ খেলে সে হুড়হুড় করে দুধ দেয়।

“রাজকৃষ্ণ বাঁড়ুজ্জের ছেলে গল্প করেছিল যে একজনের প্রতি আদেশ হল, দেখ্, এই ভেড়াতেই তোর ইষ্ট দেখিস। সে তাই বিশ্বাস করলে। সর্বভূতে যে তিনিই আছেন।

“গুরু ভক্তকে বলে দিছিলেন যে, ‘রামই ঘট্ ঘটমে লেটা।’ ভক্তের অমনি বিশ্বাস। যখন একটা কুকুর রুটি মুখে করে পালাচ্ছে, তখন ভক্ত ঘিয়ের ভাঁড় হাতে করে পিছু পিছু দৌড়াচ্ছে আর বলছে, ‘রাম একটু দাঁড়াও, রুটিতে ঘি মাখানো হয় নাই।’

“আচ্ছা, কৃষ্ণকিশোরের কি বিশ্বাস! বলত ‘ওঁ কৃষ্ণ! ওঁ রাম! এই মন্ত্র উচ্চারণ করলে কোটি সন্ধ্যার ফল হয়!’

“আবার আমাকে কৃষ্ণকিশোর চুপিচুপি বলত, ‘বলো না কারুকে, আমার সন্ধ্যা-টন্ধ্যা ভাল লাগে না!’

“আমারও ওইরকম হয়! মা দেখিয়ে দেন যে, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। বাহ্যের পর ঝাউতলা থেকে আসছি, পঞ্চবটীর দিকে, দেখি, সঙ্গে একটি কুকুর আসছে, তখন পঞ্চবটীর কাছে একবার দাঁড়াই, মনে করি, মা যদি একে দিয়ে কিছু বলান!

“তাই তুমি যা বললে; বিশ্বাসে১০ সব মিলে।”

[The difficult Problem of the Householder and the Lord's Grace]

ঈশান —— আমরা কিন্তু গৃহে রয়েছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— তা হলেই বা, তাঁর কৃপা১১ হলে অসম্ভব সম্ভব হয়। রামপ্রসাদ গান গেয়েছিল, “এই সংসার ধোঁকার টাটি।” তাঁকে একজন উত্তর দিছিল আর-একটি গানের ছলে:

এই সংসার মজার কুটি, আমি খাই দাই আর মজা লুটি

জনক মহাতেজা তার বা কিসে ছিল ত্রুটি।

সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে, খেয়েছিল দুধের বাটি।

“কিন্তু আগে নির্জনে গোপনে সাধন-ভজন করে, ঈশ্বলাভ করে সংসারে থাকলে, ‘জনক রাজা’ হওয়া যায়। তা না হলে কেমন করে হবে?

“দেখ না, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী সবই রয়েছে, কিন্তু শিব কখনও সমাধিস্থ, কখনও রাম রাম করে নৃত্য করছেন!”

১ ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।

অব্যক্তা হি গর্তির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ।। [গীতা, ১২।৫]

২ নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।

অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ।। [কঠোপনিষদ্ ২।৩ — ১২, ১৩]

৩ অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। [গীতা, ৫।১৫]

দৈবী হ্যেষা গুণময়ি মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ।। [গীতা, ৭।১৪]

৪ নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ। [গীতা, ১০।৮০]

৫ মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।

ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ।। [গীতা, ১৩।৬]

৬ তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং

বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি

মন্ত্র নান্যদতোঽস্তি বিঞ্চাতৃ....।। [বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩।৮।১১]

৭ “পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য, ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুগরীয়ান্।”

[গীতা, ১১।৪৩]

৮ উত্তমা তত্ত্বচিন্তৈব মধ্যমং শাস্ত্রচিন্তনম্।

অধমা মন্ত্রচিন্তা চ তীর্থভ্রান্ত্যধমাধমা। [মৈত্রেয়্যুপনিষদ, ২।১২]

৯ নবদ্বারমলস্রাবং সদাকালে স্বভাবজম্।

দুর্গন্ধিং দুর্মলোপেতং স্পৃষ্ট্বা স্নানংবিধীয়তে। [মৈত্রেয়্যুপনিষদ, ২।৬]

১০ সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ।। [গীতা, ১৮।৬৬]

১১ With man it is impossible, but nothing is impossible with the Lord — Christ.

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৩শে সেপ্টম্বর 1883/09/23

16.26 দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে — ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। রাখাল, মাস্টার, রাম, হাজরা প্রভৃতি ভক্তগণ উপস্থিত আছেন। হাজরা মহাশয় বাহিরের বারান্দায় বসিয়া আছেন। আজ রবিবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৩, ভাদ্র কৃষ্ণা সপ্তমী।

নিত্যগোপাল, তারক প্রভৃতি ভক্তগণ রামের বাড়িতে থকেন। তিনি তাহাদের যত্ন করিয়া রাখিয়াছেন।

রাখাল মাঝে মাঝে শ্রীযুক্ত অধর সেনের বাড়িতে গিয়া থাকেন। নিত্যগোপাল সর্বদাই ভাবে বিভোর। তারকেরও অবস্থা অন্তর্মুখ; তিনি লোকর সঙ্গে আজকাল বেশি কথা কন না।

[শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনা — নরেন্দ্রের জন্য]

ঠাকুর এইবার নরেন্দ্রের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (একজন ভক্তের প্রতি) — নরেন্দ্র তোমাকেও লাইক্ করে না। (মাস্টারের প্রতি) কই, অধরের বাড়ি নরেন্দ্র এল না কেন?

“একাধারে নরেন্দ্রের কত গুণ! গাইতে, বাজাতে, লেখাপড়ায়! সেদিন কাপ্তেনের গাড়িতে এখান থেকে যাচ্ছিল; কাপ্তেন অনেক করে বললে, তার কাছে বসতে। নরেন্দ্র ওধারে গিয়ে বসল; কাপ্তেনের দিকে ফিরে চেয়েও দেখলে না।”

[শাক্ত গৌরী পণ্ডিত ও শ্রীরামকৃষ্ণ]

“শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? সাধন-ভজন চাই। ইঁদেশের গৌরী — পণ্ডিতও ছিল, সাধকও ছিল। শাক্ত-সাধক; মার ভাবে মাঝে মাঝে উন্মত্ত হয়ে যেত! মাঝে মাঝে বলত, ‘হা রে রে, রে নিরালম্ব লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্?’ তখন পণ্ডিতেরা কেঁচো হয়ে যেত। আমিও আবিষ্ট হয়ে যেতুম। আমার খাওয়া দেখে বলত, তুমি ভৈরবী নিয়ে সাধন করেছ?

“একজন কর্তাভজা নিরাকারের ব্যাখ্যা করলে। নিরাকার অর্থাৎ নীরের আকার! গৌরী তাই শুনে মহা রেগে গেল।

“প্রথম প্রথম একটু গোঁড়া সাক্ত ছিল; তুলসীপাতা দুটো কাঠি করে তুলত — ছুঁত না (সকলের হাস্য) — তারপর বাড়ি গেল; বাড়ি থেকে ফিরে এসে আর অমন করে নাই।

“আমি একটি তুলসীগাছ কালীঘরের সম্মুখে পুঁতেছিলাম; মরে গেল। পাঁঠা বলি যেখানে হয়, সেখানে নাকি হয় না!

“গৌরী বেশ সব ব্যাখ্যা করত। ‘এ-ওই!’ ব্যাখ্যা করত — এ শিষ্য! ওই তোমার ইষ্ট! আবার রাবণের দশমুণ্ড বলত, দশ ইন্দ্রিয়। তমোগুণে কুম্ভকর্ণ, রজোগুণে রাবণ, সত্ত্বগুণে বিভীষণ। তাই বিভীষণ রামকে লাভ করেছিল।”

[রাম, তারক ও নিত্যগোপাল]

ঠাকুর মধ্যাহ্নে সেবার পর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। কলিকাতা হইতে রাম, তারক (শিবানন্দ) প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরকে প্রণাম

করিয়া তাঁহারা মেঝেতে বসিলেন। মাস্টারও মেঝেতে বসিয়া আছেন। রাম বলিতেছেন, “আমরা খোল বাজনা শিখিতেছি।”

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি) — নিত্যগোপাল বাজাতে শিখেছে?

রাম —— না, সে অমনি একটু সামান্য বাজাতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— তারক?

রাম —— সে অনেকটা পারবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— তাহলে আর অত মুখ নিচু করে থাকবে না; একটা দিকে খুব মন দিলে ঈশ্বরের দিকে তত থাকে না।

রাম —— আমি মনে করি, আমি যে শিখছি, কেবল সংকীর্তনের জন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — তুমি নাকি গান শিখেছ?

মাস্টার (সহাস্যে) — আজ্ঞে না; আমি উঁ আঁ করি!

[আমার ঠিক ভাব —— “আর কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে, দে মা পাগল করে”]

শ্রীরামকৃষ্ণ —— তোমার ওটা অভ্যাস আছে? থাকে তো বল না। “আর কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে, দে মা পাগল করে।”

“দেখ, ওইটে আমার ঠিক ভাব।”

[হাজরাকে উপদেশ — সর্বভূতে ভালবাসা — ঘৃণা ও নিন্দা ত্যাগ কর]

হাজরা মহাশয় কারু কারু সম্বন্ধে ঘৃণা প্রকাশ করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাম প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি) — ও-দেশে একজনের বাড়ি প্রায় সর্বদাই গিয়ে থাকতাম; তারা সমবয়সী; তারা সেদিন এসেছিল; এখানে দু-তিনদিন ছিল। তাদের মা ওইরূপ সকলকে ঘৃণা করত। শেষে সেই মার পায়ের খিল কিরকম করে খুলে গেল আর পা পচতে লাগল। ঘরে এত পচা গন্ধ হল যে, লোকে ঢুকতে পারত না।

“হাজরাকে তাই ওই কথা বলি, আর বলি, কারুকে নিন্দা করো না।”

বেলা প্রায় ৪টা হইল, ঠাকুর ক্রমে মুখপ্রক্ষালনাদি করিবার জন্য ঝাউতলায় গেলেন। ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় সতরঞ্চি পাতা হইল। সেখানে ঠাকুর ঝাউতলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া উপবেশন করিলেন। রাম প্রভৃতি উপস্থিত আছেন। শ্রীযুক্ত অধর সেন সুবর্ণবণিক, তাঁর বাড়িতে রাখাল অন্নগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া রামবাবু কি বলিয়াছেন। অধর পরমভক্ত। সেই সব কথা হইতেছে।

সুবর্ণবণিকদের মধ্যে কারু কারু স্বভাব একজন ভক্ত রহস্যভাবে বর্ণনা করিতেছেন। আর ঠাকুর হাসিতেছেন। তাঁহারা ‘রুটিঘন্ট’ ভালবাসেন, ব্যঞ্জন হউক আর না হউক। তাঁরা খুব সরেস চাল খান, আর জলযোগের মধ্যে ফল একটু খাওয়া চাই। তাঁরা বিলাতী আমড়া ভালবাসেন, ইত্যাদি। যদি বাড়িতে

তত্ত্ব আসে, ইলিস মাছ, সন্দেশ — সেই তত্ত্ব আবার ওদের কুটুম্ব বাড়িতে যাবে। সে কুটুম্ব আবার সেই তত্ত্ব তাদের কুটুম্ব বাড়িতে পাঠাবে। কাজে কাজেই একটা ইলিশ মাছ ১৫। ২০ ঘর ঘুরতে থাকে। মেয়েরা সব কাজ করে, তবে রান্নাটি উড়ে বামুনে রাঁধে, কারু বাড়ি ১ ঘন্টা, কারু বাড়ি ২ ঘন্টা, এইরকম। একটি উড়ে বামুন কখনও কখনও ৪। ৫ জায়গায় রাঁধে।

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতেছেন, নিজে কোন মত প্রকাশ করিতেছেন না।

[ঠাকুর সমাধিস্থ — তাঁহার জগন্মাতার সহিত কথা]

সন্ধ্যা হইল। উঠানে উত্তর-পশ্চিম কোণে শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান ও সমাধিস্থ।

অনেকক্ষণ পরে বাহ্য জগতে মন আসিল। ঠাকুরের কি আশ্চর্য অবস্থা! আজকাল প্রায়ই সমাধিস্থ। সামান্য উদ্দীপনে বাহ্যশূন্য হন; ভক্তেরা যখন আসেন, তখন একটু কথাবার্তা কন; নচেৎ সর্বদাই অন্তর্মুখ। পূজাজপাদি কর্ম আর করিতে পারেন না।

[শ্রীরামকৃষ্ণের কর্মত্যাগের অবস্থা]

সমাধি ভঙ্গের পর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই জগন্মাতার সহিত কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, “মা! পূজা গেল, জপ গেল,১ দেখো মা, যেন জড় করো না! সেব্য-সেবকভাবে রেখো। মা, যেন কথা কইতে পারি। যেন তোমার নাম করতে পারি, আর তোমার নামগুণকীর্তন করব, গান করব মা! আর শরীরে একটু বল দাও

মা! যেন আপনি একটু চলতে পারি; যেখানে তোমার কথা হচ্ছে, যেখানে তোমার ভক্তরা আছে, সেই সব জায়গায় যেতে পারি।”

শ্রীরামকৃষ্ণ আজ সকালে কালীঘরে গিয়া জগন্মাতার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন। তিনি আবার জগন্মাতার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন। মা আজ সকালে তোমার চরণে দুটো ফুল দিলাম; ভাবলাম; বেশ হল, আবার (বাহ্য) পূজার দিকে মন যাচ্ছে; তবে মা, আবার এমন হল কেন? আবার জড়ের মতো কেন করে ফেলছ!

ভাদ্র কৃষ্ণা সপ্তমী। এখনও চন্দ্র উদয় হয় নাই। রজনী তমসাচ্ছন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভাবাবিষ্ট; সেই অবস্থাতেই নিজের ঘরের ভিতর ছোট খাটটিতে বসিলেন। আবার জগন্মাতার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

[ঈশানকে শিক্ষা — কলিতে বেদমত চলে না — মাতৃভাবে সাধন কর]

এইবার বুঝি ভক্তদের বিষয়ে মাকে কি বলিতেছেন। ঈশান মুখোপাধ্যায়ের কথা বলিতেছেন। ঈশান বলিয়াছিলেন, আমি ভাটপাড়ায় গিয়া গায়ত্রীর পুরশ্চরণ করিব। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলিয়াছিলেন যে, কলিকালে বেদমত চলে না। জীবের অন্নগত প্রাণ, আয়ু কম, দেহবুদ্ধি, বিষয়বুদ্ধি একেবারে যায় না। তাই ঈশানকে মাতৃভাবে তন্ত্রমতে সাধন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আর ঈশানকে বলেছিলেন, যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই মা, তিনিই আদ্যাশক্তি।

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, “আবার গায়ত্রীর পুরশ্চরণ! এ-চাল থেকে ও-চালে লাফ! কে ওকে ও-কথা বলে দিলে? আপনার মনে করছে!... আচ্ছা, একটু পুরশ্চরণ করবে।

(মাস্টারের প্রতি) — “আচ্ছা আমার এ-সব কি বাইয়ে, না ভাবে?”

মাস্টার অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার সঙ্গে এইরূপ কথা কহিতেছেন। তিনি অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন! ঈশ্বর আমাদের অতি নিকটে, বাহিরে আবার অন্তরে। অতি নিকটে না হলে শ্রীরামকৃষ্ণ চুপি চুপি তাঁর সঙ্গে কেমন করে কথা কচ্ছেন।২

১ যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ .. সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ।। [গীতা, ৩।১৭]

২ তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ ।।

[ঋগ্বেদ, ১।২২।২০]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৬শে সেপ্টেম্বর 1883/09/26/i

16.27 পণ্ডিত ও সাধুর প্রভেদ — কলিযুগে নারদীয় ভক্তি

আজ বুধবার, (১০ই আশ্বিন) ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা দশমী তিথি, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। বুধবারে ভক্তসমাগম কম, কেন না সকলেরই কাজকর্ম আছে। ভক্তেরা প্রায় রবিবারে অবসর হইলে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন। মাস্টার বেলা দেড়টার সময় ছুটি পাইয়াছেন, তিনটার সময় দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে ঠাকুরের কাছে আসিয়া উপস্থিত। এ-সময় রাখাল, লাটু ঠাকুরের কাছে প্রায় থাকেন। আজ দুই ঘন্টা পূর্বে কিশোরী আসিয়াছেন। ঘরের ভিতর ঠাকুর ছোট খাটটির উপর বসিয়া আছেন। মাস্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া নরেন্দ্রের কথা পাড়িলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — হ্যাঁগা, নরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয়েছিল? (সহাস্যে) নরে ন্দ্র বলেছে, উনি এখনও কালীঘরে যান; ঠিক হয়ে যাবে, তখন আর কালীঘরে যাবেন না।

“এখানে মাঝে মাঝে আসে বলে বাড়ির লোকেরা বড় ব্যাজার। সেদিন এখানে এসেছিল, গাড়ি করে। সুরেন্দ্র গাড়িভাড়া দিছল। তাই নরেন্দ্রের পিসী সুরেন্দ্রের বাড়ি গিয়ে ঝগড়া করতে গিছল।”

ঠাকুর নরেন্দ্রের কথা কহিতে কহিতে গাত্রোত্থান করিলেন। কথা কহিতে কহিতে উত্তর-পূর্ব বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানে হাজরা, কিশোরী, রাখালাদি ভক্তেরা আছেন। অপরাহ্ন হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হ্যাঁগা, তুমি আজ যে বড় এলে? স্কুল নাই?

মাস্টার — আজ দেড়টার সময় ছুটি হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেন এত সকাল?

মাস্টার — বিদ্যাসাগর স্কুল দেখতে এসেছিলেন। স্কুল বিদ্যাসাগরের, তাই তিনি এলে ছেলেদের আনন্দ করবার জন্য ছুটি দেওয়া হয়।

[বিদ্যাসাগর ও সত্যকথা — শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত]

শ্রীরামকৃষ্ণ — বিদ্যাসাগর সত্যকথা কয় না কেন?

“সত্যবচন, পরস্ত্রী মাতৃসমান। এই সে হরি না মিলে তুলসী ঝুটজবান।” সত্যতে থাকলে তবে ভগবানকে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর সেদিন বললে, এখানে আসবে, কিন্তু এল না।

“পণ্ডিত আর সাধু অনেক তফাত। শুধু পণ্ডিত যে, তার কামিনী-কাঞ্চনে মন আছে। সাধুর মন হরিপাদপদ্মে। পণ্ডিত বলে এক, আর করে এক। সাধুর কথা ছেড়ে দাও। যাদের হরিপাদপদ্মে মন তাদের কাজ, কথা সব আলাদা। কাশীতে নানকপন্থী ছোকরা সাধু দেখেছিলাম। তার উমের তোমার মতো। আমায় বলত ‘প্রেমী সাধু’ কাশীতে তাদের মঠ আছে; একদিন আমায় সেখানে নিমন্ত্রণ করে লয়ে গেল। মোহন্তকে দেখলুম, যেন একটি গিন্নী। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, ‘উপায় কি?’ সে বললে, কলিযুগে নারদীয় ভক্তি। পাঠ কচ্ছিল। পাঠ শেষ হলে বলতে লাগল — ‘জলে বিষ্ণুঃ স্থলে বিষ্ণুঃ বিষ্ণুঃ পর্বতমস্তকে। সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ।’ সব শেষে বললে, শান্তিঃ শান্তিঃ প্রশান্তিঃ।”

[কলিযুগে বেদমত চলে না — জ্ঞানমার্গ]

“একদিন গীতা পাঠ করলে। তা এমনি আঁট, বিষয়ী লোকের দিকে চেয়ে পড়বে না! আমার দিকে চেয়ে পড়লে। সেজোবাবু ছিল। সেজোবাবুর দিকে পেছন ফিরে পড়তে লাগল। সেই নানকপন্থী সাধুটি বলেছিল, উপায়, ‘নারদীয় ভক্তি’।”

মাস্টার — ও-সাধুরা কি বেদান্তবাদী নয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হ্যাঁ, ওরা বেদান্তবাদী কিন্তু ভক্তিমার্গও মানে। কি জানো, এখন কলিযুগে বেদমত চলে না। একজন বলেছিল, গায়ত্রীর পুরশ্চরণ করব। আমি বললুম, কেন? কলিতে তন্ত্রোক্ত মত। তন্ত্রমতে কি পুরশ্চরণ হয় না?

“বৈদিক কর্ম বড় কঠিন। তাতে আবার দাসত্ব। এমনি আছে যে, বার বছর না কত ওইরকম দাসত্ব করলে তাই হয়ে যায়। যাদের অতদিন দাসত্ব করলে, তাদের সত্তা পেয়ে যায়! তাদের রজঃ, তমোগুণ, জীব-হিংসা, বিলাস — এই সব এসে পড়ে, তাদের সেবা করতে করতে। শুধু দাসত্ব নয়, আবার পেনশন খায়।

“একটি বেদান্তবাদী সাধু এসেছিল। মেঘ দেখে নাচত, ঝড়বৃষ্টিতে খুব আনন্দ। ধ্যানের সময় কেউ কাছে গেলে বড় চটে যেত। আমি একদিন গিছলুম। যাওয়াতে ভারী বিরক্ত। সর্বদাই বিচার করত, ‘ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।’ মায়াতে নানারূপ দেখাচ্ছে, তাই ঝাড়ের কলম লয়ে বেড়াত। ঝাড়ের কলম দিয়ে দেখলে নানা রঙ দেখা যায়; — বস্তুতঃ কোন রঙ নাই। তেমনি বস্তুতঃ ব্রহ্ম বই আর কিছু নাই, কিন্তু মায়াতে, অহংকারেতে নানা বস্তু দেখাচ্ছে। পাছে মায়া হয়, আসক্তি হয়, তাই কোন জিনিস একবার বই আর দেখবে না। স্নানের সময় পাখি উড়ছে দেখে বিচার করত। দুজনে বাহ্যে যেতুম। মুসলমানের পুকুর শুনে আর জল

নিলে না। হলধারী আবার ব্যাকরণ জিজ্ঞাসা কল্লে, ব্যকরণ জানে। ব্যঞ্জনবর্ণের কথা হল। তিনদিন এখানে ছিল। একদিন পোস্তার ধারে সানায়ের শব্দ শুনে বললে, যার ব্রহ্মদর্শন হয়, তার ওই শব্দ শুনে সমাধি হয়।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৬শে সেপ্টম্বর 1883/09/26/ii

16.28 দক্ষিণেশ্বরে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ —— পরমহংস অবস্থা প্রদর্শন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধুদিগের কথা কহিতে কহিতে পরমহংসের অবস্থা দেখাইতে লাগিলেন। সেই বালকের ন্যায় চলন! মুখে এক-একবার হাসি যেন ফাটিয়া পড়িতেছে! কোমরে কাপড় নাই, দিগম্বর, চক্ষু আনন্দে ভাসিতেছে! ঠাকুর ছোট খাটটিতে আবার বসিলেন। আবার সেই মনোমুগ্ধকারী কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — ন্যাংটার কাছে বেদান্ত শুনেছিলাম। “ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।” বাজিকর এসে কত কত বাজি করে; আমের চারা, আম পর্যন্ত হল। কিন্তু এ-সব বাজি। বাজিকরই সত্য।

মণি — জীবনটা যেন একটা লম্বা ঘুম! এইটি বোঝা যাচ্ছে সব ঠিক দেখছি না। যে মনে আকাশ বুঝতে পারি না, সেই মন নিয়েই তো জগৎ দেখছি; অতএব কেমন করে ঠিক দেখা হবে?

ঠাকুর — আর একরকম আছে। আকাশকে আমরা ঠিক দেখছি না; বোধ হয়, যেন মাটিতে লোটাচ্ছে। তেমনি কেমন করে মানুষ ঠিক দেখবে? ভিতরে বিকার।

ঠাকুর মধুর কণ্ঠে গাহিতেছেন, বিকার ও তাহার ধন্বন্তরি —

এ কি বিকার শঙ্করী! কৃপা চরণতলী পেলে ধন্বন্তরি।

“বিকার বইকি। দেখ না, সংসারীরা কোঁদল করে। কি লয়ে যে কোঁদল করে তার ঠিক নাই। কোঁদল কেমন! তোর অমুক হোক, তোর অমুক করি। কত চেঁচামেচি, কত গালাগাল!”

মণি — কিশোরীকে বলেছিলাম, খালি বাক্সের ভিতর কিছু নাই — অথচ দুইজনে টানাটানি করছে — টাকা আছে বলে!

[দেহধারণ-ব্যাধি — “To be or not to be” — সংসার মজার কুটি]

“আচ্ছা, দেহটাই তো যত অনর্থের কারণ। ওই সব দেখে জ্ঞানীরা ভাবে খোলস ছাড়লে বাঁচি।” [ঠাকুর কালীঘরে যাইতেছেন।]

ঠাকুর — কেন? “এই সংসার ধোঁকার টাটি,” আবার “মজার কুটি”ও বলেছে। দেহ থাকলেই বা। “সংসার মজার কুটি” তো হতে পারে।

মণি — নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ কোথায়?

ঠাকুর — হাঁ, তা বটে।

ঠাকুর কালীঘরের সম্মুখে আসিয়াছেন। মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মণিও প্রণাম করিলেন। ঠাকুর কালীঘরের সম্মুখে নিচের চাতালের উপর নিরাসনে মা-কালীকে সম্মুখ করিয়া বসিয়াছেন। পরনে কেবল লাল-পেড়ে কাপড়খানি, তার খানিকটা পিঠে ও কাঁধে। পশ্চাদ্দেশে নাটমন্দিরের একটি স্তম্ভ। কাছে মণি বসিয়া আছেন।

মণি — তাই যদি হল, তাহলে দেহধারণের কি দরকার? এ তো দেখছি কতকগুলো কর্মভোগ করবার জন্য দেহ। কি করছে কে জানে! মাঝে আমরা মারা যাই।

ঠাকুর — ছোলা বিষ্ঠকুড়ে পড়লেও ছোলাগাছই হয়।

মণি — তাহলেও অষ্টবন্ধন তো আছে?

[সচ্চিদানন্দ গুরু — গুরুর কৃপায় মুক্তি]

ঠাকুর — অষ্টবন্ধন নয়, অষ্টপাশ। তা থাকলেই বা। তাঁর কৃপা হলে এক মুহূর্তে অষ্টপাশ চলে যেতে পারে। কিরকম জানো, যেমন হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘর, আলো লয়ে এলে একক্ষণে অন্ধকার পালিয়ে যায়! একটু একটু করে যায় না! ভেলকিবাজি করে, দেখেছ? অনেক গেরো দেওয়া দড়ি একধার একটা জায়গায়

বাঁধে, আর-একধার নিজের হাতে ধরে; ধরে দড়িটাকে দুই-একবার নাড়া দেয়। নাড়াও দেওয়া, আর সব গেরো খুলেও যাওয়া। কিন্তু অন্য লোকে সেই গেরো প্রাণপণ চেষ্টা করেও খুলতে পারে নাই। গুরুর কৃপা হলে সব গেরো এক মুহূর্তে খুলে যায়।

[কেশব সেনের পরিবর্তনের কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ]

"আচ্ছা, কেশব সেন এত বদলাল কেন, বল দেখি? এখানে কিন্তু খুব আসত। এখান থেকে নমস্কার করতে শিখলে। একদিন বললুম, সাধুদের ওরকম করে নমস্কার করতে নাই। একদিন ঈশানের সঙ্গে কলকাতায় গাড়ি করে যাচ্ছিলুম। সে কেশব সেনের সব কথা শুনলে। হরিশ বেশ বলে, এখান থেকে সব চেক পাশ করে নিতে হবে; তবে ব্যাঙ্কে টাকা পাওয়া যাবে।" (ঠাকুরের হাস্য)

মণি অবাক্ হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছেন। বুঝিলেন, গুরুরূপে সচ্চিদানন্দ চেক পাশ করেন।

[পূর্বকথা, ন্যাংটাবাবার উপদেশ — তাঁকে জানা যায় না]

ঠাকুর — বিচার করো না। তাঁকে জানতে কে পারবে? ন্যাংটা বলত শুনে রেখেছি, তাঁরই এক অংশে এই ব্রহ্মাণ্ড।

"হাজরার বড় বিচারবুদ্ধি। সে হিসাব করে, এতখানিতে জগৎ হল, এতখানি বাকি রইল। তার হিসাব শুনে আমার মাথা টনটন করে। আমি জানি, আমি

কিছুই জানি না। কখনও তাঁকে ভাবি ভাল, আবার কখনও ভাবি মন্দ। তাঁর আমি কি বুঝব?”

মণি — আজ্ঞা হাঁ, তাঁকে কি বুঝা যায়? যার যেমন বুদ্ধি সেইটুকু নিয়ে মনে করে, আমি সবটা বুঝে ফেলেছি। আপনি যেমন বলেন, একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ের কাছে গিছল, তার একদানায় পেট ভরল বলে মনে করে — এইবারে পাহাড়টা বাসায় নিয়ে যাব।

[ঈশ্বরকে কি জানা যায়? উপায় শরণাগতি]

ঠাকুর — তাঁকে কে জানবে? আমি জানবার চেষ্টাও করি না! আমি কেবল মা বলে ডাকি! মা যা করেন। তাঁর ইচ্ছা হয় জানাবেন, না ইচ্ছা হয়, নাই বা জানাবেন। আমার বিড়ালছাঁর স্বভাব। বিড়ালছাঁ কেবল মিউ মিউ করে ডাকে। তারপর মা যেখানে রাখে — কখনও হেঁসেলে রাখছে, কখনও বাবুদের বিছানায়। ছোটছেলে মাকে চায়। মার কত ঐশ্বর্য সে জানে না! জানতে চায়ও না। সে জানে, আমার মা আছে, আমার ভাবনা কি? চাকরানীর ছেলেও জানে, আমার মা আছে। বাবুর ছেলের সঙ্গে যদি ঝগড়া হয়, তা বলে, “আমি মাকে বলে দেব! আমার মা আছে!” আমারও সন্তানভাব।

হঠাৎ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আপনাকে দেখাইয়া নিজের বুকে হাত দিয়া মণিকে বলিতেছেন, “আচ্ছা এতে কিছু আছে; তুমি কি বল।”

তিনি অবাক্ হইয়া ঠাকুরকে দেখিতেছেন। বুঝি ভাবিতেছেন, ঠাকুরের হৃদয়মধ্যে কি সাক্ষাৎ মা আছেন! মা কি দেহধারণ করে এসেছেন? জীবের মঙ্গলের জন্য।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৬শে সেপ্টম্বর 1883/09/26/iii

16.29 দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরের সম্মুখে চাতালের উপর উপবিষ্ট। জগন্মাতাকে কালী-প্রতিমামধ্যে দর্শন করিতেছেন। কাছে মাস্টার প্রভৃতি ভক্তেরা বসিয়া আছেন। আজ ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ; ভাদ্র কৃষ্ণা দশমী; বৈকালবেলা।

কিয়ৎক্ষণ পূর্বে ঠাকুর বলিতেছেন, "ঈশ্বরের সম্বন্ধে কিছু হিসাব করবার জো নাই! তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য! মানুষ মুখে কি বলবে। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ের কাছে গিয়ে, একদানা চিনি খেলে। তার পেট ভরে গেল; তখন সে ভাবছে, এইবার এসে সব পাহাড়টা গর্তের ভিতর নিয়ে যাব।

"তাঁকে কি বোঝা যায়। তাই আমার বিড়ালের ছানার ভাব, মা যেখানে রেখে দেয়। আমি কিছু জানি না। ছোট ছেলে মার কত ঐশ্বর্য তা জানে না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ [১]কালীমন্দিরের চাতালে বসিয়া স্তব করিতেছেন, “ওমা! ওমা! ওঁকার-রূপিণী! মা! এরা কত কি বলে মা — কিছু বুঝিতে পারি না! কিছু জানি না মা! — শরণাগত! শরণাগত! কেবল এই করো যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয় মা! আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না, মা! শরণাগত! শরণাগত!”

ঠাকুরবাড়ির আরতি হইয়া গেল, শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। মহেন্দ্র মেঝেতে বসিয়া আছেন।

মহেন্দ্র পূর্বে পূর্বে শ্রীযুক্ত কেশব সেনের ব্রাহ্মসমাজে সর্বদা যাইতেন। ঠাকুরকে দর্শনাবধি আর তিনি সেখানে যান না। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদা জগন্মাতার সহিত কথা কন; তাহা দেখিয়া তিনি অবাক্ হইয়াছেন। আর তাঁহার সর্বধর্ম-সমন্বয় কথা শুনিয়া ও ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন।

মহেন্দ্র ঠাকুরের কাছে প্রায় দুই বৎসর যাতায়াত করিতেছেন ও তাঁহার দর্শন ও কৃপালাভ করিতেছেন। ঠাকুর তাঁহাকে ও অন্যান্য ভক্তদের সর্বদাই বলেন, ঈশ্বর নিরাকার আবার সাকার; ভক্তের জন্য রূপধারণ করেন। যারা নিরাকারবাদী তাদের তিনি বলেন, তোমাদের যা বিশ্বাস তাই রাখবে, কিন্তু এটি জানবে যে, তাঁর সবই সম্ভব; সাকার নিরাকার; আর কত কি তিনি হতে পারেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও মহেন্দ্র — সাকার-নিরাকার — ডিউটি — কর্তব্যবোধ — ভক্তের পক্ষে অবিদ্যার সংসার মৃত্যুযন্ত্রণা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেন্দ্রের প্রতি) — তুমি একটা তো ধরেছ — নিরাকার?

মহেন্দ্র —আজ্ঞে হাঁ, তবে আপনি যেমন বলেন, সবই সম্ভব; সাকারও সম্ভব।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বেশ; আর জেনো তিনি চৈতন্যরূপর চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন।

মহেন্দ্র — আমি ভাবি, তিনি চেতনেরও চেতয়িতা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এখন ওইভাবেই থাক; টেনে-টুনে ভাব বদলে দরকার নাই। ক্রমে জানতে পারবে যে, ওই চৈতন্য তাঁরই চৈতন্য। তিনি চৈতন্যস্বরূপ।

“আচ্ছা, তোমার টাকা ঐশ্বর্য এতে টান আছে?”

মহেন্দ্র — না, তবে নিশ্চিন্ত হবার জন্য — নিশ্চিন্ত হয়ে ভগবানচিন্তা করবার জন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা হবে বইকি।

মহেন্দ্র — লোভ, না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, তা বটে, তাহলে তোমার ছেলেদের কে দেখবে?

“তোমার যদি অকর্তা জ্ঞান হয়, তাহলে ছেলেদের উপায় কি হবে?”

মহেন্দ্র — শুনেছি, কর্তব্য থাকতে জ্ঞান হয় না। কর্তব্য মার্তণ্ড।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এখন ওইভাবে থাক; তারপর যখন আপনি সেই কর্তব্যবোধ যাবে তখন আলাদা কথা।

সকলেই কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিলেন।

মহেন্দ্র — কতক জ্ঞানের পর সংসার! সে সজ্ঞানে মৃত্যু — ওলাউঠা!

শ্রীরামকৃষ্ণ — রাম! রাম!

মৃত্যু সময় জ্ঞান থাকলে খুব যন্ত্রণাবোধ হয়; যেমন কলেরাতে হয়। এই কথা বুঝি মহেন্দ্র বলছেন। অবিদ্যার সংসার দাবানল তুল্য — তাই বুঝি ঠাকুর "রাম! রাম!" বলিতেছেন।

মহেন্দ্র — অন্যলোক তবু বিকারের রোগী, অজ্ঞান হয়ে যায়; মৃত্যুযন্ত্রণা বোধ থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখ না, টাকা থাকলেই বা কি হবে! জয়গোপাল সেন, অত টাকা আছে কিন্তু দুঃখ করে, ছেলেরা তেমন মানে না।

মহেন্দ্র — সংসারে কি শুধু দারিদ্রই দুঃখ? এদিকে ছয় রিপু, তারপর রোগ-শোক।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আবার মান-সম্ভ্রম। লোকমান্য হবার ইচ্ছা।

"আচ্ছা, আমার কি ভাব?"

মহেন্দ্র —— ঘুম ভাঙলে মানুষের যা, যা —— হবার তাই। ঈশ্বরের সঙ্গে সদা যোগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— তুমি আমায় স্বপ্নে দেখ?

মহেন্দ্র —— হাঁ, — অনেকবার।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— কিরূপ? কিছু উপদেশ দিতে দেখ?

মহেন্দ্র চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— যদি দেখ আমাকে শিক্ষা দিতে, তবে জানবে সে সচ্চিদানন্দ।

মহেন্দ্র অতঃপর স্বপ্নে যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত বর্ণনা করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মনোযোগ দিয়া সমস্ত শুনিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেন্দ্রের প্রতি) — এ খুব ভাল! তুমি আর বিচার এনো না। তোমরা শাক্ত।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১০ই অক্টোবর 1883/10/10/i

16.30 শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের বাড়ি দুর্গাপূজা মহোৎসবে

শ্রীযুক্ত অধরের বাড়িতে ৺নবমীপূজার দিনে ঠাকুরদালানে শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান। সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীদুর্গার আরতি দর্শন করিতেছেন। অধরের বাড়ি দুর্গাপূজা মহোৎসব, তাই তিনি ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন।

আজ বুধবার, ১০ই অক্টোবর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, ২৪শে আশ্বিন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে আসিয়াছেন, তন্মধ্যে বলরামের পিতা ও অধরের বন্ধু অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ইনস্পেক্টর সারদাবাবু আসিয়াছেন। অধর প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের ৺পূজা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাঁহারাও অনেকে আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ধ্যার আরতি দর্শন করিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুরদালানে দাঁড়াইয়া আছেন। ভাবাবিষ্ট হইয়া মাকে গান শুনাইতেছেন।

অধর গৃহীভক্ত, আবার অনেক গৃহীভক্ত উপস্থিত, ত্রিতাপে তাপিত। তাই বুঝি শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের মঙ্গলের জন্য জগন্মাতাকে স্তব করিতেছেন:

তার তারিণী। এবার তারো ত্বরিত করিয়ে,
তপন-তনয়-ত্রাসে ত্রাসিত, যায় মা প্রাণী ।।
জগত অম্বে জন-পালিনী, জন-মোহিনী জগত-জননী।
যশোদা জঠরে জনম লইয়ে সহায় হরিলীলায় ।।
বৃন্দাবনে রাধাবিনোদিনী, ব্রজবল্লভবিহারকারিণী।
রাসরঙ্গিনী রসময়ী হয়ে রাস করিলে লীলাপ্রকাশ ।।
গিরিজা গোপজা গোবিন্দ মোহিনী তুমি মা গঙ্গে গতিদায়িনী;

গান্ধার্বিকে গৌরবরণী গাওয়ে গোলকে গুণ তোমার।

শিবে সনাতনী সর্বাণী ঈশানী সদানন্দময়ী সর্বস্বরূপিণী,

সগুণা নির্গুণা সদাশিবপ্রিয়ে কে জানে মহিমা তোমার!

[শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাবেশে জগন্মাতার সঙ্গে কথা]

শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের বাড়ির দ্বিতল বৈঠকখানায় গিয়া বসিয়াছেন। ঘরে অনেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আসিয়াছেন।

বলরামের পিতা ও সারদাবাবু প্রভৃতি কাছে বসিয়া আছেন।

ঠাকুর এখনও ভাবাবিষ্ট। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ও বাবুরা, আমি খেয়েছি, এখন তোমরা নিমন্ত্রণ খাও।"

অধরের নৈবেদ্য পূজা মা গ্রহণ করিয়াছেন, তাই কি শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার আবেশে বলিতেছেন, "আমি খেয়েছি, এখন তোমরা প্রসাদ পাও?"

ঠাকুর জগন্মাতাকে ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, "মা আমি খাব? না, তুমি খাবে? মা কারণানন্দরূপিণী।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কি জগন্মাতাকে ও আপনাকে এক দেখিতেছেন? যিনি মা তিনিই কি সন্তানরূপে লোকশিক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন? তাই কি ঠাকুর "আমি খেয়েছি" বলছেন?

এইবার ভাবাবেশে দেহের মধ্যে ষট্‌চক্র, তার মধ্যে মাকে দেখিতেছেন! তাই আবার ভাবে বিভোর হইয়া গান গাইতেছেন:

ভুবন ভুলাইলি মা, হরমোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে, বীণাবাদ্য-বিনোদিনী ।।
শরীর শারীর যন্ত্রে সুষুম্নাদি ত্রয় তন্ত্রে,
গুণভেদ মহামন্ত্রে গুণত্রয়বিভাগিনী ।।
আধার ভৈরবাকার, ষড়্ দলে শ্রীরাগ আর।
মণিপুরেতে মহ্লার বসন্তে হৃৎপ্রকাশিনী ।।
বিশুদ্ধ হিল্লোল সুরে, কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে।
তান-লয়-মান-সুরে ত্রিসপ্ত-সুরভেদিনী ।।
মহামায়া মোহপাশে বদ্ধ কর আনায়াসে।
তত্ত্ব লয়ে তত্ত্বাকাশে স্থির আছে সৌদামিনী ।।
শ্রীনন্দকুমারে কয়, তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়।
তব তত্ত্ব গুণত্রয় কাকীমুখ-আচ্ছাদিনী ।।

গান — ভাব কি ভেবে পরাণ গেল।
যাঁর নামে হরে কাল, পদে মহাকাল, তাঁর কেন কালরূপ হল ।।
কালরূপ অনেক আছে, এ-বড় আশ্চর্য কালো,
যাঁরে হৃদিমাঝে রাখলে পরে হৃদপদ্ম করে আলো ।।
রূপে কালী, নামে কালী কাল হতে অধিক কালো।
ও-রূপ যে দেখেছে, সে মজেছে অন্যরূপ লাগে না ভাল ।।
প্রসাদ বলে কুতুহলে এমন মেয়ে কোথায় ছিল।

না দেখে নাম শুনে কানে মন গিয়ে তায় লিপ্ত হল ।।

অভয়ার শরণাগত হলে সকল ভয় যায়, তাই বুঝি ভক্তদের অভয় দিতেছেন ও গান গাইতেছেন:

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি ।।

শ্রীযুক্ত সারদাবাবু পুত্রশোকে অভিভূত, তাই তাঁর বন্ধু অধর তাঁহাকে ঠাকুরের কাছে লইয়া আসিয়াছেন। তিনি গৌরাঙ্গ ভক্ত। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্দীপন হইয়াছে। ঠাকুর গাহিতেছেন:

আমার অঙ্গ কেন গৌর হল।
কি করলে রে ধনী, অকালে সকাল কৈলে, অকালেতে বরণ ধরালে ।।
এখন তো গৌর হতে দিন, বাকি আছে!
এখন তো দ্বাপর লীলা, শেষ হয় নাই!
একি হল রে! কোকিল ময়ূর, সকলই গৌর।
যেদিকে ফিরাই আঁখি (একি হল রে)।
একি, একি, গৌরময় সকল দেখি ।।
রাই বুঝি মথুরায় এল, তাইতো অঙ্গ বুঝি গৌর হল!
ধনী কুমুরিয়ে পোকা ছিল, তাইতে আপনার বরণ ধরাইল।
এখনি যে অঙ্গ কালো ছিল, দেখতে দেখতে গৌর হল!
রাই ভেবে কি রাই হলাম। (একি রে)

যে রাধামন্ত্র জপ না করে, রাই ধনী কি আপনার বরণ ধরায় তারে।

মথুরায় আমি, কি নবদ্বীপে আমি, কিছু ঠাওরাতে নারি রে!

এখনও তো, মহাদেব অদ্বৈত হয় নাই (আমার অঙ্গ কেন গৌর)।

এখনও তো বলাই দাদা নিতাই হয় নাই, বিশাখা রামানন্দ হয় নাই।

এখনও তো ব্রহ্মা হরিদাস হয় নাই, এখনও তো নারদ শ্রীবাস হয় নাই।

এখনও তো মা যশোদা শচী হয় নাই।

একাই কেন আমি গৌর (যখন বলাইদাদা নিতাই হয় নাই তখন)

তবে রাই বুঝি মথুরায় এল, তাইতে কি অঙ্গ আমার গৌর হল।

(অতএব বুঝি আমি গৌর) এখনও তো, পিতা নন্দ জগন্নাথ হয় নাই।

এখনও তো শ্রীরাধিকা গদাধর হয় নাই। আমার অঙ্গ কেন গৌর হল ।।

এইবার শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবে আবিষ্ট হইয়া গান গাহিতেছেন। বলিতেছেন, সারদাবাবু এই গান বড় ভালবাসেন:

ভাব হবে বই কি রে (ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের)

ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়।

বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে। সুরধনী দেখে শ্রীযমুনা ভাবে।

গোরা ফুকরি ফুকরি কান্দে! (যার অন্তঃ কৃষ্ণ বহির্গৌর)

গোরা আপনার পা আপনি ধরে ।।

গান — পাড়ার লোকে গোল করে মা,

আমায় বলে গৌর কলঙ্কিনী।

একি কইবার কথা কইবো কোথা;

লাজে মলাম ওগো প্রাণ সজনী।

একদিন শ্রীবাসের বাড়ি, কীর্তনের ধুম হুড়াহুড়ি;

গৌরচাঁদ দেন গড়াগড়ি শ্রীবাস আঙিনায়;

আমি একপাশে দাঁড়িয়া ছিলাম, (একপাশে নুকায়ে),

আমি পড়লাম অচেতন হয়ে, চেতন করায় শ্রীবাসের রমণী।

একদিন কাজীর দলন, গৌর করেন নগর কীর্তন,

চণ্ডালাদি যতেক যবন, গৌর সঙ্গেতে;

হরিবোল হরিবোল বলে, চলে যান নদের বাজার দিয়ে,

আমি তাদের সঙ্গে গিয়ে,

দেখেছিলাম রাঙা চরণ দুখানি।

একদিন জাহ্নবীর তটে; গৌরচাঁদ দাঁড়ায়ে ঘাটে,

চন্দ্রসূর্য উভয়েতে, গৌর অঙ্গেতে;

দেখে গৌর রূপের ছবি, ভুলে গেল শাক্ত শৈবী,

আমার কলসী পড়ে গেল দৈবী, দেখেছিল পাপ ননদিনী ।।

বলরামের পিতা বৈষ্ণব। তাই বুঝি এবার শ্রীরামকৃষ্ণ গোপীদের উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের গান গাহিতেছেন:

শ্যামের নাগাল পেলাম না গো সই।

আমি কি সুখে আর ঘরে রই।

শ্যাম যদি মোর হত মাথার চুল।

যতন করে বাঁধতুম বেণী সই, দিয়ে বকুল ফুল ।।

শ্যাম যদি মোর কঙ্কন হত বাহু মাঝে সতত রহিত।

(কঙ্কন নাড়া দিয়ে চলে যেতুম সই) (বাহু নাড়া দিয়ে)

(শ্যাম-কঙ্কন হাতে দিয়ে) (চলে যেতুম সই) (রাজপথে)

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১০ই অক্টোবর 1883/10/10/ii

16.31 শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্ম-সমন্বয়ে — বলরামের পিতার সঙ্গে কথা

বলরামের পিতার ভদ্রক প্রভৃতি উড়িষ্যার নানাস্থানে জমিদারী আছে ও তাঁহাদের বৃন্দাবন, পুরী, ভদ্রক প্রভৃতি নানাস্থানে দেবসেবা অতিথিশালা আছে। তিনি শেষ জীবনে শ্রীবৃন্দাবনে [১]শ্যামসুন্দরের কুঞ্জে তাঁহার সেবা লইয়া থাকিতেন।

বলরামের পিতা মহাশয় পুরাতন বৈষ্ণব। অনেক বৈষ্ণবভক্তেরা শাক্ত, শৈব ও বেদান্তবাদীদের সঙ্গে সহানুভূতি করেন না; কেহ কেহ তাঁদের বিদ্বেশ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু এরূপ সঙ্কীর্ণ মত ভালবাসেন না। তিনি বলেন যে, ব্যকুলতা থাকিলে সব পথ, সব মত দিয়া ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। অনেক বৈষ্ণবভক্ত বাহিরে মালা, গ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি করেন কিন্তু ভগবানলাভের জন্য ব্যাকুলতা নাই। তাই বুঝি ঠাকুর বলরামের পিতা মহাশয়কে উপদেশ দিতেছেন।

[পূর্বকথা — শ্রীরামকৃষ্ণের বৈষ্ণব-বৈরাগীর ভেক গ্রহণ ও রামমন্ত্র গ্রহণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — ভাবলাম কেন একঘেয়ে হব। আমিও বৃন্দবনে বৈষ্ণব-বৈরাগীর ভেক লয়েছিলাম; তিনদিন ওই ভাবে ছিলাম। আবার দক্ষিণেশ্বরে রামমন্ত্র লয়েছিলাম; দীর্ঘ ফোঁটা, গলায় হীরা; আবার কদিন পরে সব দূর করে দিলাম।

[বলরামের পিতাকে শিক্ষা — "ঈশ্বর সগুণ নির্গুণ, সাকার আবার নিরাকার"]

"একজনের একটি গামলা ছিল। লোকে তার কাছে কাপড় ছোপাতে আসত। গামলায় রঙ গোলা আছে; কিন্তু যার যে রঙ দরকার ওই গামলাতে কাপড় ডোবালেই সেই রঙ হয়ে যেত। একজন তাই দেখে অবাক্ হয়ে রঙওয়ালাকে বলছে, এখন তুমি যে রঙে রঙেছ সেই রঙটি আমাকে দাও।"

ঠাকুর কি বলিতেছেন, সকল ধর্মের লোকই তাঁর কাছে আসিবে ও চৈতন্যলাভ করিবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলিতেছেন, "একটি গাছের উপর একটি বহুরূপী ছিল। একজন লোক দেখে গেল সবুজ, দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখল কালো, তৃতীয় ব্যক্তি হলদে; এইরূপ অনেক লোক ভিন্ন ভিন্ন রঙ দেখে গেল। তারা পরস্পরকে বলছে, না জানোয়ারটি সবুজ। কেউ বলছে লাল, কেউ বলছে হলদে আর ঝগড়া করছে। তখন গাছতলায় একটি লোক বসেছিল তার কাছে সকলে গেল। সে বললে, আমি এই গাছতলায় রাতদিন থাকি, আমি জানি এইটু বহুরূপী। ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলায়। আবার কখন কখন কোন রঙ থাকে না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলিতেছেন যে, ঈশ্বর সগুণ, নানারূপ ধরেন? আবার নির্গুণ কোন রঙ নাই, বাক্যমনের অতীত? আর তিনি ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ সব পথ দিয়াই ঈশ্বরের মাধুর্য রস পান করেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের পিতার প্রতি) — বই আর পড়ো না, তবে ভক্তিশাস্ত্র পড়ো যেমন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

[রাধাকৃষ্ণলীলার অর্থ — রস ও রসিক — The one thing needful]

“কথাটা এই, তাঁকে ভালবাসা, তাঁর মাধুর্য আস্বাদন করা। তিনি রস, ভক্ত রসিক সেই রস পান করে। তিনি পদ্ম, ভক্ত অলি। ভক্ত পদ্মের মধু পান করে।

“ভক্ত যেমন ভগবান না হলে থাকতে পারে না, ভগবানও ভক্ত না হলে থাকতে পারেন না। তখন ভক্ত হন রস, ভগবান হন রসিক, ভক্ত হন পদ্ম, ভগবান হন অলি। তিনি নিজের মাধুর্য আস্বাদন করবার জন্য দুটি হয়েছেন, তাই রাধাকৃষ্ণলীলা।”

[বলরামের পিতাকে শিক্ষা — তীর্থাদি কর্ম, গলায় মালা, ভেক আচার কতদিন?]

“তীর্থ, গলায় মালা, আচার — এ-সব প্রথম প্রথম করতে হয়। বস্তুলাভ হলে ভগবানদর্শন হলে, বাহিরের আড়ম্বর ক্রমে কমে যায়। তখন তাঁর নামটি নিয়েথাকা আর স্মরণ-মনন।১

“ষোল টাকার পয়সা এক কাঁড়ি, কিন্তু ষোলটি টাকা যখন করলে, তখন আর অত কাঁড়ি দেখায় না। তাদের বদলে যখন একটি মোহর করলে, তখন কত কম হয়ে গেল। আবার সেটি বদলে যদি একটু হীরা কর, তাহলে লোকে টেরই পায় না।২

গলায় মালা আচার প্রভৃতি না থাকলে বৈষ্ণবেরা নিন্দা করেন। তাই কি ঠাকুর বলিতেছেন যে, ঈশ্বরদর্শনের পর মালা ভেক এ-সবের আঁট তত থাকে না? বস্তুলাভ হলে বাহিরের কর্ম কমে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের পিতার প্রতি) — কর্তাভজারা বলে, প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ, সিদ্ধের সিদ্ধ। প্রবর্তক ফোঁটা কাটে, গলায় মালা রাখে; আর আচারী। সাধক — তাদের অত বাহিরে আড়ম্বর থাকে না, যেমন বাউল। সিদ্ধ — যার ঠিক বিশ্বাস যে ঈশ্বর আছেন। সিদ্ধের সিদ্ধ — যেমন চৈতন্যদেব। ঈশ্বরকে দর্শন করেছেন, আর সর্বদা কতাবার্তা আলাপ। সিদ্ধের সিদ্ধকেই ওরা সাঁই বলে। “সাঁইয়ের পর আর নাই”।

[বলরামের পিতাকে শিক্ষা — সাত্ত্বিক সাধনা, সব ধর্মের সমন্বয় ও গোঁরামী ত্যাগ করা]

“সাধক নানারকম। সাত্ত্বিক সাধনা গোপনে, সাধক সাধন-ভজন গোপনে করে, দেখলে প্রাকৃত লোকের মতো বোধ হয়, মশারির ভিতর ধ্যান করে।

“রাজসিক সাধক বাহিরের আড়ম্বর রাখে, গলায় মালা, ভেক, গেরুয়া, গরদের কাপড়, সোনার দানা দেওয়া জপের মালা। যেমন সাইন বোর্ড মেরে বসা।”

বৈষ্ণবভক্তদের বেদান্তমতের অথবা শাক্তমতের উপর তত শ্রদ্ধা নাই। বলরামের পিতা মহাশয়কে ওইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাব পরিত্যাগ করিতে ঠাকুর উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের পিতা প্রভৃতির প্রতি) — যে ধর্মই হোক, যে মতই হোক, সকলেই এক ঈশ্বরকে ডাকছে; তাই কোন ধর্ম, কোন মতকে অশ্রদ্ধা বা ঘৃণা করতে নাই। বেদে তাঁকেই বলছে, সচ্চিদানন্দঃ ব্রহ্ম; ভাগবতাদি পুরাণে তাঁকেই বলছে, সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ, তন্ত্রে বলেছে, সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ। সেই এক সচ্চিদানন্দ।

বৈষ্ণবদের নানা থাক থাক আছে। বেদে তাঁকে ব্রহ্ম বলে, একদল বৈষ্ণবেরা তাঁকে বলে, আলেক নিরঞ্জন। আলেক অর্থাৎ যাঁকে লক্ষ্য করা যায় না, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখা যায় না। তারা বলে, রাধা আর কৃষ্ণ আলেকের দুটি ফুট।

“বেদান্তমতে অবতার নাই, বেদান্তবাদীরা বলে রাম, কৃষ্ণ, এরা সচ্চিদানন্দ সাগরের দুটি ঢেউ।

“এক বই তো দুই নাই; যে যা বলে, যদি আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকে, তাঁর কাছে নিশ্চয় পঁহুছিবে। ব্যাকুলতা থাকলেই হল।”

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর হইয়া ভক্তদের এই সকল কথা বলিতেছিলেন। এইবার একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন ও বলিতেছেন, “তুমি বলরামের বাপ?”

[বলরামের পিতাকে শিক্ষা — “ব্যকুল হও”]

সকলে একটু চুপ করিয়া আছেন, বলরামের বৃদ্ধ পিতা নিঃশব্দে হরিনামের মালা জপ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টার প্রভৃতির প্রতি) — আচ্ছা, এরা এত জপ করে, এত তীর্থ করেছে, তবু এরকম কেন? যেন আঠার মাসে এক বৎসর!

“হরিশকে বললুম, কাশী যাওয়া কি দরকার যদি ব্যাকুলতা না থাকে। ব্যাকুলতা থাকলে, এইখানেই কাশী।

“এত তীর্থ, এত জপ করে, হয় না কেন? ব্যাকুলতা নাই। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকলে তিনি দেখা দেন!

“যাত্রার গোড়ায় অনেক খচমচ খচমচ করে; তখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায় না। তারপর নারদ ঋষি যখন ব্যাকুল হয়ে বৃন্দাবনে এসে বীণা বাজাতে বাজাতে ডাকে আর বলে, প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন! তখন কৃষ্ণ আর থাকতে পারেন না। রাখালদের সঙ্গে সামনে আসেন, আর বলেন, ধবলী রও! ধবলী রও!”

১ যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ ... কার্যং ন বিদ্যতে ।। [গীতা, ৩।১৭]

পরে ব্রহ্মণি বিঞ্চাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলম্‌।

তালবৃন্তেন কিং প্রয়োজনং প্রাপ্তে মলয়মারুতে ।।

২ A merhchantman sold all, woundup his business, and bought a pearl of great price. — Bible.

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৬ই অক্টোবর 1883/10/16/i

16.32 দক্ষিণেশ্বরে কোজাগর লক্ষ্মীপূর্ণিমা —— ১৮৮৩

[রাখাল, বলরামের পিতা, বেণী পাল, মাস্টার, মণি মল্লিক, ঈশান, কিশোরী (গুপ্ত) প্রভৃতি সঙ্গে]

আজ মঙ্গলবার, ১৬ই অক্টোবর ১৮৮৩, (৩০শে আশ্বিন)। বলরামের পিতা মহাশয় ও অন্যান্য ভক্ত উপস্থিত আছেন। বলরামের পিতা পরমবৈষ্ণব, হাতে হরিনামের মালা সর্বদা জপ করেন।

গোঁড়া বৈষ্ণবেরা অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের তত পছন্দ করেন না। বলরামের পিতা শ্রীরামকৃষ্ণকে মাঝে মাঝে দর্শন করিতেছেন, তাঁহার ওই সকল বৈষ্ণবের ন্যায় ভাব নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— যাদের উদার ভাব তারা সব দেবতাকে মানে —— কৃষ্ণ, কালী, শিব, রাম ইত্যাদি।

বলরামের পিতা —— হাঁ, যেমন এক স্বামী ভিন্ন পোশাক।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিন্তু নিষ্ঠাভক্তি একটি আছে। গোপীরা যখন মথুরায় গিয়েছিল তখন পাগড়ি-বাঁধা কৃষ্ণকে দেখে ঘোমটা দিল, আর বললে, ইনি আবার কে, আমাদের পীতধড়া মোহনচূড়া-পরা কৃষ্ণ কোথায়? হনুমানেরও নিষ্ঠাভক্তি। দ্বাপর যুগে দ্বারকায় যখন আসেন কৃষ্ণ রুক্মিণীকে বললেন, হনুমান রামরূপ না দেখলে সন্তুষ্ট হবে না। তাই রামরূপ ধরে বসলেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত অবস্থা — নিত্য-লীলাযোগ]

"কে জানে বাপু, আমার এই একরকম অবস্থা। আমি কেবল নিত্য থেকে লীলায় নেমে আসি, আবার লীলা থেকে নিত্যে যাই।

"নিত্যে পঁহুছানোর নাম ব্রহ্মজ্ঞান। বড় কঠিন। একেবারে বিষয়বুদ্ধি না গেলে হয় না। হিমালয়ের ঘরে যখন ভগবতী জন্মগ্রহণ করলেন, তখন পিতাকে নানারূপে দর্শন দিলেন।১ হিমালয় বললেন, মা, আমি ব্রহ্মদর্শন করতে ইচ্ছা করি। তখন ভগবতী বলছেন, পিতা, যদি তা ইচ্ছা করেন তাহলে আপনার সাধুসঙ্গ করতে হবে। সংসার থেকে তফাত হয়ে নির্জনে মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ করবেন।

"সেই এক থেকেই অনেক হয়েছে — নিত্য থেকেই লীলা। এক অবস্থায় 'অনেক' চলে যায়, আবার 'এক'ও চলে যায় — কেননা এক থাকলেই দুই। তিনি যে উপমারহিত — উপমা দিয়ে বুঝাবার জো নাই। অন্ধকার ও আলোর মধ্যে। আমরা যে আলো দেখি সে আলো নয় — এ জড় আলো নয়।"২

"আবার যখন তিনি অবস্থা বদলে দেন — যখন লীলাতে মন নামিয়ে আনেন — তখন দেখি ঈশ্বর-মায়া-জীব-জগৎ — তিনি সব হয়ে রয়েছেন।"৩

[ঈশ্বর কর্তা — "তুমি ও তোমার"]

"আবার কখনও তিনি দেখান তিনি এই সমস্ত জীবজগৎ করেছেন — যেমন বাবু আর তার বাগান। তিনি কর্তা আর তাঁরই এই সমস্ত জীবজগৎ — এইটির নাম জ্ঞান। আর 'আমি কর্তা', 'আমি গুরু', 'আমি বাবা' — এরই নাম অজ্ঞান। আর আমার এই সমস্ত গৃহপরিবার, ধন, জন — এরই নাম অজ্ঞান।"

বলরামের পিতা — আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — যতদিন না "তুমি কর্তা" এইটি বোধ হয় ততদিন ফিরে ফিরে আসতে হবে — আবার জন্ম হবে। "তুমি কর্তা" বোধ হলে আর পূর্নজন্ম হবে না।

"যতক্ষণ না তুঁহু তুঁহু করবে ততক্ষণ ছাড়বে না। গতায়াত পুর্নজন্ম হবেই — মুক্তি হবে না। আর 'আমার' 'আমার' বললেই বা কি হবে। বাবুর সরকার বলে 'এটা আমাদের বাগান, আমাদের খাট, কেদারা।' কিন্তু বাবু যখন তাড়িয়া দেন, তার নিজের আম কাঠের সিন্দুকটা নিয়ে যাবার ক্ষমতা থাকে না!

'আমি আর আমার' সত্যকে আবরণ করে রেখেছে — জানতে দেয় না।"

[অদ্বৈতজ্ঞান ও চৈতন্যদর্শন]

"অদ্বৈতজ্ঞান না হলে চৈতন্যদর্শন হয় না। চৈতন্যদর্শন হলে তবে নিত্যানন্দ। পরমহংস অবস্থায় এই নিত্যানন্দ।

“বেদান্তমতে অবতার নাই। সে-মতে চৈতন্যদেব অদ্বৈতের একটি ফুট।

“চৈতন্যদর্শন কিরূপ? এক-একবার চিনে দেশলাই জ্বেলে অন্ধকার ঘরে যেমন হঠাৎ আলো।”

[অবতার বা মানুষ রতন]

“ভক্তিমতে অবতার। কর্তাভজা মেয়ে আমার অবস্থা দেখে বলে গেল, ‘বাবা, ভিতরে বস্তুলাভ হয়েছে, অত নেচো-টেচো না, আঙুর ফল তুলোর উপর যতন করে রাখতে হয়। পেটে ছেলে হলে শাশুড়ী ক্রমে ক্রমে খাটতে দেয় না। ভগবান দর্শনের লক্ষণ, ক্রমে কর্মত্যাগ হয়। এই মানুষের ভিতর মানুষ রতন আছে।

“আমার খাওয়ার সময় সে বলত, বাবা তুমি খাচ্ছো, না কারুকে খাওয়াচ্ছো?

“এই ‘আমি’ জ্ঞানই আবরণ করে রেখেছে। নরেন্দ্র বলেছিল ‘এ আমি যত যাবে, তাঁর আমি তত আসবে।’ কেদার বলে কুম্ভের ভিতরের মাটি যতখানি থাকবে, ততখানি এদিকে জল কমবে।

“কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, ভাই! অষ্টসিদ্ধির একটা সিদ্ধি থাকলে আমায় পাবে না। একটু শক্তি হতে পারে! গুটিকা সিদ্ধি; ঝাড়ানো, ফোঁকানো; ঔষধ-দেওয়া ব্রহ্মচারী; তবে লোকের একটু উপকার হয়। কেমন?

“তাই মার কাছে আমি কেবল শুদ্ধাভক্তি চেয়েছিলাম; সিদ্ধাই চাই নাই।”

বলরামের পিতা, বেণী পাল, মাস্টার, মণি মল্লিক প্রভৃতিকে এইকথা বলিতে বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইলেন। বাহ্যশূন্য, চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। সমাধিভঙ্গের পর শ্রীরামকৃষ্ণ গান গাহিতেছেন:

হলাম যার জন্য পাগল তারে কই পেলাম সই

এইবার শ্রীযুক্ত রামলালকে গান গাহিতে বলিতেছেন। তিনি গাইতেছেন। প্রথমেই গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস —

কি দেখিলাম রে কেশব ভারতীর কুটিরে,
অপরূপ জ্যোতিঃ, শ্রীগৌরাঙ্গ মূরতি,
দুনয়নে প্রেম বহে শতধারে।
গৌর মত্তমাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়,
কভু ধরাতে লুটায়, নয়নজলে ভাসে রে,
কাঁদে আর বলে হরি, স্বর্গ-মর্ত্য ভেদ করি, সিংহরবে রে;
আবার দন্তে তৃণ লয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে,
দাস্য মুক্তি যাচেন দ্বারে দ্বারে ।।

চৈতন্যদেবের এই ‘পাগল’ প্রেমোন্মাদ অবস্থা বর্ণনার ওর, ঠাকুরের ইঙ্গিতে রামলাল আবার গোপীদের উন্মাদ অবস্থা গাহিতেছেন:

ধোরো না ধোরো না রথচক্র, রথ কি চক্রে চলে।
যে চক্রের চক্রী হরি, যাঁর চক্রে জগৎ চলে।

গান — নবনীরদবরণ কিসে গণ্য শ্যামচাঁদ রূপ হেরে।
করেতে বাঁশি অধরে হাসি, রূপে ভুবন আলো করে।

১ দেবীভাগবত, সপ্তম স্কন্ধ — ৩১, ৩৪-৩৬ অধ্যায়

২ “এ জড় আলো নয়” — “তৎ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ”

... তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ।

[মুণ্ডকোপনিষদ, ২।২।৯]

৩ ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।

[শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৪।৩]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৬ই অক্টোবর 1883/10/16/ii

16.33 ভক্তসঙ্গে

হরিভক্তি হইলে আর জাতবিচার থাকে না। শ্রীযুক্ত মণি মল্লিককে বলিতেছেন, তুমি তুলসীদাসের সেই কথাটি বল তো।

মণি মল্লিক — চাতক, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায় — গঙ্গা, যমুনা, সরযূ আর কত নদী ও তড়াগ রয়েছে, কিন্তু কোন জল খাবে না। কেবল স্বাতিনক্ষত্রের বৃষ্টির জলের জন্য হাঁ করে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — অর্থাৎ তাঁর পাদপদ্মে ভক্তিই সার আর সব মিথ্যা।

[Problem of the untouchables — অস্পৃশ্য জাতি হরিণামে শুদ্ধ]

মণি মল্লিক — আর একটি তুলসীদাসের কথা — অষ্টধাতু পরশমনী ছোঁয়ালে সোনা হয়ে যায়। তেমনি সব জাতি — চামার, চণ্ডাল পর্যন্ত হরিনাম করলে শুদ্ধ হয়। "বিনা হর্‌নাম চার জাত চামার।"

শ্রীরামকৃষ্ণ — যে চামড়া ছুঁতে নাই, সেই চামড়া পাট করার পর ঠাকুরঘরে লয়ে যাওয়া যায়।

"ঈশ্বরের নামে মানুষ পবিত্র হয়। তাই নামকীর্তন অভ্যাস করতে হয়। আমি যদু মল্লিকের মাকে বলেছিলাম, যখন মৃত্যু আসবে তখন সেই সংসার চিন্তাই আসবে। পরিবার, ছেলেমেয়েদের চিন্তা — উইল করবার চিন্তা — এই সব আসবে; ভগবানের চিন্তা আসবে না। উপায় তাঁর নামজপ, নামকীর্তন অভ্যাস করা। এই অভ্যাস যদি থাকে মৃত্যু সময় তাঁরই নাম মুখে আসবে। বিড়াল ধরলে পাখির ক্যাঁ ক্যাঁ বুলিই আসবে, তখন আর 'রাম রাম' 'হরে কৃষ্ণ' বলবে না।

“মৃত্যু সময়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া ভাল। শেষ বয়সে নির্জনে গিয়া কেবল ঈশ্বরচিন্তা ও তাঁহার নাম করা। হাতি নেয়ে যদি আস্তাবলে যায় তাহলে আর ধুলো কাদা মাখতে পারে না।”

বলরামের বাবা, মণি মল্লিক, বেণী পাল, এদের বয়স হয়েছে; তাই কি ঠাকুর, বিশেষ তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য, এই সকল উপদেশ দিতেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ভক্তদের সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — নির্জনে তাঁর চিন্তা ও নাম করতে বলেছি কেন? সংসারে রাতদিন থাকলে অশান্তি। দেখ না একহাত জমির জন্য ভায়ে ভায়ে খুনোখুনি। শিখরা (Sikhs) বলে, জমি, জরু আর টাকা এই তিনটির জন্য যত গোলমাল অশান্তি।

[রামচন্দ্র, সংসার ও যোগবাশিষ্ঠ — “মজার কুটি”]

“তোমরা সংসারে আছ তা ভয় কি? রাম যখন সংসারত্যাগ করবার কথা বললেন, দশরথ চিন্তিত হয়ে বশিষ্ঠের শরণাগত হলেন। বশিষ্ঠ রামকে বললেন, রাম তুমি কেন সংসার ত্যাগ করবে? আমার সঙ্গে বিচার কর, ঈশ্বর ছাড়া কি সংসার? কি ত্যাগ করবে, কি বা গ্রহণ করবে? তিনি ছাড়া কিছুই নাই। তিনি ‘ঈশ্বর-মায়া-জীব-জগৎ’ রূপে প্রতীয়মান হচ্ছেন।”

বলরামের পিতা — বড় কঠিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সাধনের সময় এই সংসার “ধোঁকার টাটি”; আবার জ্ঞানলাভ হবার পর, তাঁকে দর্শনের পর, এই সংসার “মজার কুটি”।

[অবতার পুরুষে ঈশ্বরদর্শন — অবতার চৈতন্যদেব]

“বৈষ্ণবগ্রন্থে আছে, বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।

“কেবল বিশ্বাস!

“কৃষ্ণকিশোরের কি বিশ্বাস! বৃন্দাবনে কূপ থেকে নীচ জাতি জল তুলে দিলে, তাকে বললে, তুই বল শিব। সে শিবনাম করার পর অমনি জল খেলে। সে বলত ঈশ্বরের নাম করেছে আবার কড়ি দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত! এ কি!

“রোগাদি জন্য তুলসী দিচ্ছে, কৃষ্ণকিশোর দেখে অবাক্!

“সাধুদর্শনের কথায় হলধারী বলেছিল, ‘কি আর দেখতে যাবো — পঞ্চভূতের খোল।’ কৃষ্ণকিশোর রাগ করে বললে, এমন কথা হলধারী বলেছে। সাধুর চিন্ময় দেহ জানে না।

“কালীবাড়ির ঘাটে আমাদের বলেছিল, তোমরা বলো — রাম! রাম! বলতে বলতে যেন আমার দিন কাটে।

“আমি কৃষ্ণকিশোরের বাড়ি যাই যেতাম, আমাকে দেখে নৃত্য।

“রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলেছিলেন, ভাই, যেখানে দেখবে ঊর্জিতাভক্তি সেইখানে জানবে আমি আছি।

“যেমন চৈতন্যদেব। প্রেমে হাসে কাঁদে নাচে গায়। চৈতন্যদেব অবতার — ঈশ্বর অবতীর্ণ।”

শ্রীরামকৃষ্ণ গান গাইতেছেন:

ভাব হবে বইকি রে ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের।

ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়! (ফুকুরি ফুকুরি কান্দে)।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৬ই অক্টোবর 1883/10/16/iii

16.34 কলিতে আগমের পথ

বলরামের পিতা, মণি মল্লিক, বেণী পাল প্রভৃতি বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। সন্ধ্যার পর কাঁসারীপাড়ার হরিসভার ভক্তেরা আসিয়াছেন।

তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন।

নৃত্যের পর ভাবাবিষ্ট। বলছেন, আমি খানিকটা আপনি যাবো।

কিশোরী ভাবাবস্থায় পদসেবা করিতে যাইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কারুকে স্পর্শ করিতে দিলেন না।

সন্ধ্যার পর ঈশান আসিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন — ভাবাবিষ্ট। কিছুক্ষণ পরে ঈশানের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ঈশানের ইচ্ছা, গায়ত্রীর পুরশ্চরণ করা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি) — তোমার যা মনোগত তাই করো। মনে আর সংশয় নাই তো?

[কলিতে নিগমের পথ নয় — আগমের পথ]

ঈশান — আমি একরকম প্রায়শ্চিত্তের মতো সঙ্কল্প করেছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এ-পথে (আগমের পথে) কি তা হয় না? যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি, কালী। 'আমি কালীব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।'

ঈশান — চন্ডীর স্তবে আছে, ব্রহ্মই আদ্যাশক্তি। ব্রহ্ম-শক্তি অভেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এইটি মুখে বললে হয় না, ধারণা যখন হবে তখন ঠিক হবে।

"সাধনার পর চিত্তশুদ্ধি হলে ঠিক বোধ হবে তিনিই কর্তা, তিনিই মন-প্রাণ-বুদ্ধিরূপা। আমারা কেবল যন্ত্রস্বরূপ। 'পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি।'

“চিত্তশুদ্ধি হলে বোধ হবে, পুরশ্চরণাদি কর্ম তিনিই করান। ‘যাঁর কর্ম সেই করে লোকে বলে করি আমি।’

“তাঁকে দর্শন হলে সব সংশয় মিটে যায়। তখন অনুকূল হাওয়া বয়। অনুকূল হাওয়া বইলে মাঝি যেমন পাল তুলে দিয়ে হালটি ধরে বসে থাকে, আর তামাক খায়, সেইরূপ ভক্ত নিশ্চিন্ত হয়।”

ঈশান চলিয়া গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারের সহিত একান্তে কথা কহিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিতেছেন, নরেন্দ্র, রাখাল, অধর, হাজরা এদের তোমার কিরূপ বোধ হয়, সরল কি না। আর আমাকে তোমার কিরূপ বোধ হয়। মাস্টার বলিতেছেন, “আপনি সরল আবার গভীর — আপনাকে বুঝা বড় কঠিন।”

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c17 ১৭ শ্রীরামকৃষ্ণের সিঁদুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজে, কমলকুটিরে ও শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেনের বাড়িতে আগমন

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৬শে নভেম্বর 1883/11/26/i

17.1 শ্রীরামকৃষ্ণের সিঁদুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজে আগমন ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
প্রভৃতির সহিত কথোপকথন

কার্তিক মাসের কৃষ্ণা একাদশী। ২৬শে নভেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ (সোমবার)। শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিকের বাটীতে সিঁদুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হয়। বাড়িটি চিৎপুর রোডের উপর; পূর্ব ধারে হ্যারিসন রোডের চৌমাথা —— যেখানে বেদানা, পোস্তা, আপেল এবং অন্যান্য মেওয়ার দোকান —— সেখান হইতে কয়েকখানি দোকানবাড়ির উত্তরে। সমাজের অধিবেশন রাজপথের পার্শ্ববর্তী দুতলার হলঘরে হয়। আজ সমাজের সাংবৎসরিক, তাই মণিলাল মহোৎসব করিয়াছেন।

উপাসনাগৃহ আজ আনন্দপূর্ণ, বাহিরে ও ভিতরে হরিৎ বৃক্ষপল্লবে নানা পুষ্প ও পুষ্পমালায় সুশোভিত। গৃহমধ্যে ভক্তগণ আসন গ্রহণ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন, কখন উপাসনা হইবে। গৃহমধ্যে সকলের স্থান হয় নাই, অনেকেই

পশ্চিমদিকের ছাদে বিচরণ করিতেছেন, বা যথাস্থানে স্থাপিত সুন্দর বিচিত্র কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। মাঝে মাঝে গৃহস্বামী ও তাঁহার আত্মীয়গণ আসিয়া মিষ্ট সম্ভাষণে অভ্যাগত ভক্তবৃন্দকে আপ্যায়িত করিতেছেন। সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই ব্রাহ্মভক্তগণ আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা আজ একটি বিশেষ উৎসাহে উৎসাহান্বিত — আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভাগমন হইবে। ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণ কেশব, বিজয়, শিবনাথ প্রভৃতি ভক্তগণকে পরমহংসদেব বড় ভালবাসেন, তাই তিনি ব্রাহ্মভক্তদের এত প্রিয়। তিনি হরিপ্রেমে মাতোয়ারা। তাঁহার প্রেম, তাঁহার জ্বলন্ত বিশ্বাস, তাঁহার বালকের ন্যায় ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন, ভগবানের জন্য ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন, তাঁহার মাতৃজ্ঞানে স্ত্রীজাতির পূজা, তাঁহার বিষয়কথা-বর্জন ও তৈলধারাতুল্য নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরকথা প্রসঙ্গ, তাঁহার সর্বধর্ম-সমন্বয় ও অপর ধর্মে বিদ্বেষ-ভাবলেশশূন্যতা, তাঁহার ঈশ্বরভক্তের জন্য রোদন — এই সকল ব্যাপারে ব্রাহ্মভক্তদের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে। তাই আজ অনেকে বহুদূর হইতে তাঁহার দর্শনলাভার্থে আসিয়াছেন।

[শিবনাথ ও সত্যকথা — ঠাকুর ‘সমাধিমন্দিরে’]

উপাসনার পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তদের সহিত সহাস্যবদনে আলাপ করিতেছেন। সমাজগৃহে আলো জ্বালা হইল, অনতিবিলম্বে উপাসনা আরম্ভ হইবে।

পরমহংসদেব বলিতেছেন, “হ্যাগা, শিবনাথ আসবে না?” একজন ব্রাহ্মভক্ত বলিতেছেন, “না, আজ তাঁর অনেক কাজ আছে, আসতে পারবেন না।” পরমহংসদেব বলিলেন, “শিবনাথকে দেখলে আমার আনন্দ হয়, যেন ভক্তিরসে

ডুবে আছে; আর যাকে অনেকে গণে-মানে, তাতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কিছু শক্তি আছে। তবে শিবনাথের একটা ভারী দোষ আছে — কথার ঠিক নাই। আমাকে বলেছিল যে, একবার ওখানে (দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে) যাবে, কিন্তু যায় নাই, আর কোন খবরও পাঠায় নাই, ওটা ভাল নয়। এইরকম আছে যে, সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট করে ধরে থাকলে ভগবানলাভ হয়। সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়। আমি এই ভেবে যদিও কখন বলে ফেলি যে বাহ্যে যাব, যদি বাহ্যে নাও পায় তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে করে ঝাউতলার দিকে যাই। ভয় এই — পাছে সত্যের আঁট যায়। আমার এই অবস্থার পর মাকে ফুল হাতে করে বলেছিলাম, 'মা! এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।' যখন এই সব বলেছিলুম, তখন এ-কথা বলিতে পারি নাই, 'মা! এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য।' সব মাকে দিতে পারলুম, 'সত্য' মাকে দিতে পারলুম না।"

ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা আরম্ভ হইল। বেদীর উপর আচার্য, সম্মুখে সেজ। উদ্বোধনের পর আচার্য পরব্রহ্মের উদ্দেশে বেদোক্ত মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মভক্তগণ সমস্বরে সেই পুরাতন আর্য ঋষির শ্রীমুখ-নিঃসৃত, তাঁহাদের সেই পবিত্র রসনার দ্বারা উচ্চারিত নামগান করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, "সত্যং জ্ঞানংমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দস্বরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, শান্তং শিবমদ্বৈতম্, শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।" প্রণবসংযুক্ত এই ধ্বনি ভক্তদের

হৃদয়াকাশে প্রতিধ্বনিত হইল। অনেকের অন্তরে বাসনা নির্বাপিতপ্রায় হইল। চিত্ত অনেকটা স্থির ও ধ্যানপ্রবণ হইতে লাগিল। সকলেরই চক্ষু মুদ্রিত! — ক্ষণকালের জন্য বেদোক্ত সগুণ ব্রহ্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেব ভাবে নিমগ্ন। স্পন্দহীন, স্থিরদৃষ্টি, অবাক্‌ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া আছেন। আত্মাপক্ষী কোথায় আনন্দে বিচরণ করিতেছেন, আর দেহটি মাত্র শূন্যমন্দিরে পড়িয়া রহিয়াছে।

সমাধির অব্যবহিত পরেই চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিতেছেন। দেখিলেন, সভাস্থ সকলেই নিমীলিত নেত্র। তখন ‘ব্রহ্ম’ ‘ব্রহ্ম’ বলিয়া হঠাৎ দণ্ডায়মান হইলেন। উপাসনান্তে ব্রাহ্মভক্তেরা খোল-করতাল লইয়া সংকীর্তন করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন আর নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে মুগ্ধ হইয়া সেই নৃত্য দেখিতেছেন। বিজয় ও অন্যান্য ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতেছেন। অনেকে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া ও কীর্তনানন্দ সম্ভোগ করিয়া এককালে সংসার ভুলিয়া গেলেন — ক্ষণকালের জন্য হরি-রস-মদিরা পান করিয়া বিষয়ানন্দ ভুলিয়া গেলেন। বিষয়সুখের রস তিক্তবোধ হইতে লাগিল।

কীর্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর কি বলেন, শুনিবার জন্য সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৬শে নভেম্বর 1883/11/26/ii

17.2 গৃহস্থের প্রতি উপদেশ

সমবেত ব্রাহ্মভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন, “নির্লিপ্ত হয়ে সংসার করা কঠিন। প্রতাপ বলেছিল, মহাশয়, আমাদের জনক রাজার মত। জনক নির্লিপ্ত হয়ে সংসার করেছিলেন, আমরাও তাই করব। আমি বললুম, মনে করলেই কি জনক রাজা হওয়া যায়! জনক রাজা কত তপস্যা করে জ্ঞানলাভ করেছিলেন, হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ হয়ে অনেক বৎসর ঘোরতর তপস্যা করে তবে সংসারে ফিরে গিছলেন।

“তবে সংসারীর কি উপায় নাই? — হাঁ অবশ্য আছে। দিন কতক নির্জনে সাধন করতে হয়। তবে ভক্তিলাভ হয়, জ্ঞানলাভ হয়; তারপর গিয়ে সংসার কর, দোষ নাই। যখন নির্জনে সাধন করবে, সংসার থেকে একেবারে তফাতে যাবে। তখন যেন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী, আত্মীয়-কুটুম্ব কেহ কাছে না থাকে। নির্জনে সাধনের সময় ভাববে, আমার কেউ নাই; ঈশ্বরই আমার সর্বস্ব। আর কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে জ্ঞান-ভক্তির জন্য প্রার্থনা করবে।

“যদি বল কতদিন সংসার ছেড়ে নির্জনে থাকবো? তা একদিন যদি এইরকম করে থাক, সেও ভাল; তিনদিন থাকলে আরও ভাল; বা বারোদিন, একমাস,

তিনমাস, একবৎসর — যে যেমন পারে। জ্ঞান-ভক্তিলাভ করে সংসার করলে আর বেশি ভয় নাই।

“হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙলে হাতে আঠা লাগে না। চোর চোর যদি খেল বুড়ি ছুঁয়ে ফেললে আর ভয় নাই। একবার পরশমণিকে ছুঁয়ে সোনা হও, সোনা হবার পর হাজার বৎসর যদি মাটিতে পোঁতা থাক, মাটি থেকে তোলবার সময় সেই সোনাই থাকবে।

“মনটি দুধের মতো। সেই মনকে যদি সংসার-জলে রাখ, তাহলে দুধেজলে মিশে যাবে। তাই দুধকে নির্জনে দই পেতে মাখন তুলতে হয়। যখন নির্জনে সাধন করে মনরূপ দুধ থেকে জ্ঞান-ভক্তিরূপ মাখন তোলা হল, তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার-জলে রাখা যায়। সে মাখন কখনও সংসার-জলের সঙ্গে মিশে যাবে না — সংসার-জলের উপর নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৬শে নভেম্বর 1883/11/26/iii

17.3 শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামীর নির্জনে সাধন

শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামী সবে গয়া হইতে ফিরিয়াছেন। সেখানে অনেকদিন নির্জনে বাস ও সাধুসঙ্গ হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি গৈরিকবসন পরিধান করিয়াছেন। অবস্থা ভারী সুন্দর, যেন সর্বদা অন্তর্মুখ। পরমহংসদেবের নিকট হেঁটমুখ হইয়া রহিয়াছেন, যেন মগ্ন হইয়া কি ভাবিতেছেন।

বিজয়কে দেখিতে দেখিতে পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিলেন, “বিজয়! তুমি কি বাসা পাকড়েছ?

“দেখ, দুজন সাধু ভ্রমণ করতে করতে একটি শহরে এসে পড়েছিল। একজন হাঁ করে শহরের বাজার, দোকান, বাড়ি দেখছিল; এমন সময় অপরটির সঙ্গে দেখা হল। তখন সে সাধুটি বললে, তুমি হাঁ করে শহর দেখছ — তল্পি-তল্পা কোথায়? প্রথম সাধুটি বললে, আমি আগে বাসা পাকড়ে, তল্পি-তল্পা রেখে, ঘরে চাবি দিয়ে, নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়েছি। এখন শহরে রঙ দেখে বেড়াচ্ছি। তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি বাসা পাকড়েছ? (মাস্টার ইত্যদির প্রতি), দেখ, বিজয়ের এতদিন ফোয়ারা চাপা ছিল, এইবার খুলে গেছে।”

[বিজয় ও শিবনাথ — নিষ্কামকর্ম — সন্ন্যাসীর বাসনাত্যাগ]

(বিজয়ের প্রতি) — দেখ, শিবনাথের ভারী ঝঞ্কাট। খবরের কাগজ লিখতে হয়, আর অনেক কর্ম করতে হয়। বিষয়কর্ম করলেই অশান্তি হয়, অনেক ভাবনা-চিন্তা জোটে।

“শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে, অবধূত চব্বিশ গুরুর মধ্যে চিলকে একটি গুরু করেছিলেন। এক জায়গায় জেলেরা মাছ ধরছিল, একটি চিল এসে মাছ ছোঁ

মেরে নিয়ে গেল। কিন্তু মাছ দেখে পেছনে পেছনে প্রায় এক হাজার কাক চিলকে তাড়া করে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে কা কা করে বড় গোলমাল করতে লাগল। মাছ নিয়ে চিল যেদিকে যায়, কাকগুলোও তাড়া করে সেইদিকে যেতে লাগল। দক্ষিণদিকে চিলটা গেল, কাকগুলোও সেইদিকে গেল; আবার উত্তরদিকে যখন সে গেল, ওরাও সেইদিকে গেল। এইরূপে পূর্বদিকে ও পশ্চিমদিকে চিল ঘুরতে লাগল। শেষে ব্যতি ব্যস্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে মাছটা তার কাছ থেকে পড়ে গেল। তখন কাকগুলো চিলকে ছেড়ে মাছের দিকে গেল। চিল তখন নিশ্চিন্ত হয়ে একটা গাছের ডালের উপর গিয়ে বসল। বসে ভাবতে লাগল — ওই মাছটা যত গোল করেছিল। এখন মাছ কাছে নাই, আমি নিশ্চিন্ত হলুম।

“অবধূত চিলের কাছে এই শিক্ষা করলেন যে, যতক্ষণ সঙ্গে মাছ থাকে অর্থাৎ বাসনা থাকে ততক্ষণ কর্ম থাকে আর কর্মের দরুন ভাবনা, চিন্তা, অশান্তি। বাসনাত্যাগ হলেই কর্মক্ষয় হয় আর শান্তি হয়।

“তবে নিষ্কামকর্ম ভাল। তাতে অশান্তি হয় না। কিন্তু নিষ্কামকর্ম করা বড় কঠিন। মনে করছি, নিষ্কামকর্ম করছি, কিন্তু কোথা থেকে কামনা এসে পড়ে, জানতে দেয় না। আগে যদি অনেক সাধন থাকে, সাধনের বলে কেউ কেউ নিষ্কামকর্ম করতে পারে। ঈশ্বরদর্শনের পর নিষ্কামকর্ম অনায়াসে করা যায়। ঈশ্বরদর্শনের পর প্রায় কর্মত্যাগ হয়; দুই-একজন (নারদাদি) লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করে।”

[সন্ন্যাসী সঞ্চয় করিবে না — প্রেম হলে কর্মত্যাগ হয়]

“অবধূতের আর-একটি গুরু ছিল — মৌমাছি! মৌমাছি অনেক কষ্টে অনেকদিন ধরে মধু সঞ্চয় করে। কিন্তু সে মধু নিজের ভোগ হয় না। আর-একজন এসে চাক ভেঙে নিয়ে যায়। মৌমাছির কাছে অবধূত এই শিখলেন যে, সঞ্চয় করতে নাই। সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোল আনা নির্ভর করবে। তাদের সঞ্চয় করতে নাই।

“এটি সংসারীর পক্ষে নয়। সংসারীর সংসার পরতিপালন করতে হয়। তাই সঞ্চয়ের দরকার হয়! পন্‌ছী (পাখি) আউর দরবেশ (সাধু) সঞ্চয় করে না। কিন্তু পাখির ছানা হলে সঞ্চয় করে — ছানার জন্য মুখে করে খাবার আনে।

“দেখ বিজয়, সাধুর সঙ্গে যদি পুঁটলি-পাটলা থাকে, পনেরটা গাঁটোয়ালা যদি কাপড়-বুচকি থাকে তাহলে তাদের বিশ্বাস করো না। আমি বটতলায় ওইরকম সাধু দেখেছিলাম। দু-তিনজন বসে আছে, কেউ ডাল বাছছে, কেউ কেউ কাপড় সেলাই করছে, আর বড় মানুষের বাড়ির ভাণ্ডারার গল্প করছে। বলছে, ‘আরে ও বাবুনে লাখো রুপেয়া খরচ কিয়া, সাধু লোককো বহুৎ খিলায়া — পুরি, জিলেবী, পেড়া, বরফী, মালপুয়া, বহুৎ চিজ তৈয়ার কিয়া।” (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি) — ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আসলে কর্মত্যাগ আপনি হয়ে যায়। যাদের ঈশ্বর কর্ম করাচ্ছেন, তারা করুক। তোমার এখন সময় হয়েছে। — সব ছেড়ে তুমি বলো, “মন, তুই দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।”

এই বলিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মাধুর্য বর্ষণ করিতে করিতে গান গাহিলেন:

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে,
মন তুই দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,
রসনার সঙ্গে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে।
(মাঝে মাঝে সে যেন মা বলে ডাকে) ।।
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হতে দিও নাকো
জ্ঞাননয়নকে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে।
(খুব যেন সাবধানে থাকে) ।।

(বিজয়ের প্রতি) — “ভগবানের শরণাগত হয়ে এখন লজ্জা, ভয় — এ-সব ত্যাগ কর। ‘আমি হরিনামে যদি নাচি, লোকে আমায় কি বলবে’ — এ-সব ভাব ত্যাগ কর।”

[লজ্জা — ঘৃণা — ভয়]

“লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তিন থাকতে নয়। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি অভিমান, গোপন ইচ্ছা — এ-সব পাশ। এ-সব গেলে জীবের মুক্তি হয়।

“পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব। ভগবানের প্রেম — দুর্লভ জিনিস। প্রথমে স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা, সেইরূপ নিষ্ঠা যদি ঈশ্বরেতে হয় তবেই ভক্তি হয়। শুদ্ধাভক্তি হওয়া বড় কঠিন। ভক্তিতে প্রাণ মন ঈশ্বরেতে লীন হয়।

"তারপর ভাব। ভাবেতে মানুষ অবাক্ হয়। বায়ু স্থির হয়ে যায়। আপনি কুম্ভক হয়। যেমন বন্দুকে গুলি ছোড়বার সময়, যে ব্যক্তি গুলি ছোড়ে সে বাক্যশূন্য হয় ও তার বায়ু স্থির হয়ে যায়।

"প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা। চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল। ঈশ্বরে প্রেম হলে বাহিরের জিনিস ভুল হয়ে যায়। জগৎ ভুল হয়ে যায়। নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস — তাও ভুল হয়ে যায়।"

এই বলিয়া পরমহংসদেব আবার গান গাহিতেছেন:

সেদিন কবে বা হবে?
হরি বলিতে ধারা বেয়ে পড়বে (সেদিন কবে বা হবে?)
সংসার বাসনা যাবে (সেদিন কবে বা হবে?)
অঙ্গে পুলক হবে (সেদিন কবে বা হবে?)।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৬শে নভেম্বর 1883/11/26/iv

17.4 ভাব ও কুম্ভক — মহাবায়ু উঠিলে ভগবানদর্শন

এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছে, এমন সময় নিমন্ত্রিত আর কয়েকটি ব্রাহ্মভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে কয়েকটি পণ্ডিত ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রীরজনীনাথ রায়।

ঠাকুর বলিতেছেন, ভাব হইলে বায়ু স্থির হয়; আর বলিতেছেন, অর্জুন যখন লক্ষ্য বিঁধেছিল, কেবল মাছের চোখের দিকে দৃষ্টি ছিল — আর কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না। এমন কি চোখ ছাড়া আর কোন অঙ্গ দেখতে পায় নাই। এরূপ অবস্থায় বায়ু স্থির হয়, কুম্ভক হয়।

"ঈশ্বরদর্শনের একটি লক্ষণ, — ভিতর থেকে মহাবায়ু গর্‌গর্‌ করে উঠে দিকে যায়! তখন সমাধি হয়, ভগবানের দর্শন হয়।"

[শুধু পাণ্ডিত্য মিথ্যা — ঐশ্বর্য, বিভব, মান, পদ, সব মিথ্যা]

(অভ্যাগত ব্রাহ্মভক্ত দৃষ্টে) — "যাঁরা শুধু পণ্ডিত, কিন্তু যাদের ভগবানে ভক্তি নাই, তাদের কথা গোলমেলে। সামাধ্যায়ী বলে এক পণ্ডিত বলেছিল, 'ঈশ্বর নীরস, তোমরা নিজের প্রেমভক্তি দিয়ে সরস করো।' বেদে যাঁকে 'রসস্বরূপ' বলেছে তাঁকে কি না নীরস বলে! আর এত বোধ হচ্ছে, সে ব্যক্তি ঈশ্বর কি বস্তু কখনও জানে নাই। তাই এরূপ গোলমেলে কথা।

"একজন বলেছিল, 'আমার মামার বাড়িতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে।' এ-কথায় বুঝতে হবে, ঘোড়া আদবেই নাই, কেননা গোয়ালে ঘোড়া থাকে না। (সকলের হাস্য)

“কেউ ঐশ্বর্যের — বিভব, মান, পদ — এই সবের অহংকার করে। এ-সব দুই দিনের জন্য, কিছুই সঙ্গে যাবে না। একটা গানে আছে:

ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুল না দক্ষিণাকালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে ।।
যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে।
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে ।।
দিন দুই-তিনের জন্য ভবে কর্তা বলে সবাই মানে।
সেই কর্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্তা এলে ।।’

[অহংকারে মহৌষধ — তারে বাড়া আছে]

আর টাকার অহংকার করতে নাই। যদি বল আমি ধনী, — তো ধনীর আবার তারে বাড়া তারে বাড়া আছে। সন্ধ্যার পর যখন জোনাকি পোকা উঠে, সে মনে করে, আমি এই জগৎকে আলো দিচ্ছি! কিন্তু নক্ষত্র যাই উঠল অমনি তার অভিমান চলে গেল। তখন নক্ষত্রেরা ভাবতে লাগল আমরা জগৎকে আলো দিচ্ছি! কিছু পরে চন্দ্র উঠল, তখন নক্ষত্রেরা লজ্জায় মলিন হয়ে গেল। চন্দ্র মনে করলেন আমার আলোতে জগৎ হাসছে, আমি জগৎকে আলো দিচ্ছি। দেখতে দেখতে অরুণ উদয় হল, সূর্য উঠছেন। চাঁদ মলিন হয়ে গেল, — খানিকক্ষণ পরে আর দেখাই গেল না।

“ধনীরা যদি এইগুলি ভাবে, তাহলে ধনের অহংকার হয় না।”

উৎসব উপলক্ষে মণিলাল অনেক উপাদেয় খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়াছেন। তিনি অনেক যত্ন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ও সমবেত ভক্তগণকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন। যখন সকলে বাড়ি প্রত্যাগমন করিলেন, তখন রাত্রি অনেক, কিন্তু কাহারও কোন কষ্ট হয় নাই।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৮শে নভেম্বর 1883/11/28/i

17.5 কেশবের বাটীর সম্মুখে — "পশ্যতি তব পন্থানম্"

[কেশব, প্রসন্ন, অমৃত, উমানাথ, কেশবের মা, রাখাল, মাস্টার]

কার্তিক কৃষ্ণা চর্তুদশী; ২৮শে নভেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, বুধবার। আজ একটি ভক্ত কমলকুটিরের (Lily Cottage) ফটকের পূর্বধারের ফুটপাথে পায়চারি করিতেছেন। কাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া যেন অপেক্ষা করিতেছেন।

কমলকুটিরের উত্তরে মঙ্গলবাড়ি, ব্রাহ্মভক্তেরা অনেকে বাস করেন। কমলকুটিরে কেশব থাকেন। তাঁহার পীড়া বাড়িয়াছে। অনেকে বলিতেছেন, এহার বোধ হয় বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে বড় ভালবাসেন! আজ তাঁহাকে দেখিতে আসিবেন। তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি হইতে আসিতেছেন। তাই ভক্তটি চাহিয়া আছেন, কখন আসেন।

কমলকুটির সার্কুলার রোডের পশ্চিমধারে। তাই রাস্তাতেই ভক্তটি বেড়াইতেছিলেন। বেলা ২টা হইতে তিনি অপেক্ষা করিতেছেন। কত লোকজন যাইতেছে, তিনি দেখিতেছেন।

রাস্তার পূর্বধারে ভিক্টোরিয়া কলেজ। এখানে কেশবের সমাজের ব্রাহ্মিকাগণ ও তাঁহাদের মেয়েরা অনেকে পড়েন। রাস্তা হইতে স্কুলের ভিতর অনেকটা দেখা যায়। উহার উত্তরে একটি বড় বাগানবাড়িতে কোন ইংরেজ ভদ্রলোক থাকেন। ভক্তটি অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতেছেন যে, তাঁহাদের বাড়িতে কোন বিপদ হইয়াছে। ক্রমে কালোপরিচ্ছদধারী কোচম্যান ও সহিস মৃতদেহের গাড়ি লইয়া উপস্থিত হইল। দেড় দুই ঘন্টা ধরিয়া ওই সকল আয়োজন হইতেছে।

এই মর্ত্যধাম ছাড়িয়া কে চলিয়া গিয়াছে — তাই আয়োজন।

ভক্তটি ভাবিতেছেন, কোথায়? দেহত্যাগ করিয়া কোথায় যায়?

উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে কত গাড়ি আসিতেছে। ভক্তটি এক-একবার লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছেন, তিনি আসিতেছেন কি না।

বেলা প্রায় পাঁচটা বাজিল। ঠাকুরের গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল, সঙ্গে লাটু ও আর দু-একটি ভক্ত। আর মাস্টার ও রাখাল আসিয়াছেন।

কেশবের বাড়ির লোকেরা আসিয়া ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া গেলেন। বৈঠকখানার দক্ষিণদিকে বারান্দায় একখানি তক্তপোষ পাতা ছিল। তাহার উপর ঠাকুরকে বসানো হইল।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৮শে নভেম্বর 1883/11/28/ii

17.6 শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ — ঈশ্বরাবেশে মার সঙ্গে কথা

ঠাকুর অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন। কেশবকে দেখিবার জন্য অধৈর্য হইয়াছেন। কেশবের শিষ্যেরা বিনীতভাবে বলিতেছেন, তিনি একটু এই বিশ্রাম করছেন, এইবার একটু পরে আসছেন।

কেশবের সঙ্কটাপন্ন পীড়া। তাই শিষ্যেরা ও বাড়ির লোকেরা এত সাবধান। ঠাকুর কিন্তু কেশবকে দেখিতে উত্তরোত্তর ব্যস্ত হইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের শিষ্যদের প্রতি) — হ্যাঁগা! তাঁর আসবার কি দরকার? আমিই ভেতরে যাই না কেন?

প্রসন্ন (বিনীতভাবে) — আজ্ঞে, আর একটু পরে তিনি আসছেন।

ঠাকুর — যাও; তোমরাই অমন করছ! আমিই ভিতরে যাই।

প্রসন্ন ঠাকুরকে ভুলাইয়া কেশবের গল্প করিতেছেন।

প্রসন্ন — তাঁর অবস্থা আর-একরকম হয়ে গেছে। আপনারই মতো মার সঙ্গে কথা কন। মা কি বলেন, শুনে হাসেন-কাঁদেন।

কেশব জগতের মার সঙ্গে কথা কন, হাসেন-কাঁদেন — এই কথা শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। দেখিতে দেখিতে সমাধিস্থ!

ঠাকুর সমাধিস্থ! শীতকাল, গায়ে সবুজ রঙের বনাতের গরম জামা; জামার উপর একখানি বনাত। উন্নত দেহ, দৃষ্টি স্থির। একেবারে মগ্ন! অনেকক্ষণ এই অবস্থায়। সমাধিভঙ্গ আর হইতেছে না।

সন্ধ্যা হইয়াছে! ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ। পার্শ্বের বৈঠকখানায় আলো জ্বালা হইয়াছে। ঠাকুরকে সেই ঘরে বসাইবার চেষ্টা হইতেছে।

অনেক কষ্টে তাঁহাকে বৈঠকখানার ঘরে লইয়া যাওয়া হইল।

ঘরে অনেকগুলি আসবাব — কৌচ, কেদারা, আলনা, গ্যাসের আলো। ঠাকুরকে একখানা কৌচের উপর বসানো হইল।

কৌচের উপর বসিয়াই আবার বাহ্যশূন্য, ভাবাবিষ্ট।

কৌচের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া যেন নেশার ঘোরে কি বলিতেছেন, “আগে এ-সব দরকার ছিল। এখন আর কি দরকার?

(রাখাল দৃষ্টে) — “রাখাল, তুই এসেছিস?”

[জগন্মাতাদর্শন ও তাঁহার সহিত কথা — Immortality of the Soul]

বলিতে বলিতে ঠাকুর আবার কি দেখিতেছেন। বলছেন,

“এই যে মা এসেছো! আবার বারাণসী কাপড় পরে কি দেখাও। মা হ্যাঙ্গাম করো না! বসো গো বসো!”

ঠাকুরের মহাভাবের নেশা চলিতেছে। ঘর আলোকময়। ব্রাহ্মভক্তেরা চর্তুদিকে আছেন। লাটু, রাখাল, মাস্টার ইত্যাদি কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর ভাবাবস্থায় আপনা-আপনি বলিতেছেন,

“দেহ আর আত্মা। দেহ হয়েছে আবার যাবে! আত্মার মৃত্যু নাই। যেমন সুপারি; পাকা সুপারি ছাল থেকে আলাদা হয়ে থাকে, কাঁচা বেলায় ফল আলাদা আর ছাল আলাদা করা বড় শক্ত। তাঁকে দর্শন করলে, তাঁকে লাভ করলে দেহবুদ্ধি যায়! তখন দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা বোধ হয়।”

[কেশবের প্রবেশ]

কেশব ঘরে প্রবেশ করিতেছেন। পূর্বদিকে দ্বার দিয়া আসিতেছেন। যাঁহারা তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে বা টাউনহলে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার অস্থিচর্মসার

মূর্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। কেশব দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, দেয়াল ধরিয়া ধরিয়া অগ্রসর হইতেছেন। অনেক কষ্টের পর কৌচের সম্মুখে আসিয়া বসিলেন।

ঠাকুর ইতিমমধ্যে কৌচ হইতে নামিয়া নিচে বসিয়াছেন। কেশব ঠাকুরকে দর্শনলাভ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিতেছেন। প্রণামান্তর উঠিয়া বসিলেন। ঠাকুর এখনও ভাবাবস্থায়। আপনা-আপনি কি বলিতেছেন। ঠাকুর মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৮শে নভেম্বর 1883/11/28/iii

17.7 ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ — মানুষলীলা

এইবার কেশব উচ্চৈঃস্বরে বলছেন, “আমি এসেছি”, “আমি এসেছি!” এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাম হাত ধারণ করিলেন ও সেই হাতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ঠাকুর ভাবে গরগর মাতোয়ারা। আপনা-আপনি কত কথা বলিতেছেন। ভক্তেরা সকলে হাঁ করিয়া শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণ নানা বোধ। যেমন কেশব, প্রসন্ন, অমৃত — এই সব। পূর্ণজ্ঞান হলে এক চৈতন্য-বোধ হয়।

“আবার পূর্ণজ্ঞানে দেখে যে, সেই এক চৈতন্য এই জীবজগৎ, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন।

“তবে শক্তিবিশেষ। তিনিই সব হয়েছেন বটে, কিন্তু কোনখানে বেশি শক্তির প্রকাশ, কোনখানে কম শক্তির প্রকাশ।

“বিদ্যাসাগর বলেছিল, ‘তা ঈশ্বর কি কারুকে বেশি শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?’ আমি বললুম, ‘তা যদি না হতো, তাহলে একজন লোক পঞ্চাশজন লোককে হারিয়ে দেয় কেমন করে, আর তোমাকেই বা আমরা দেখতে এসেছি কেন?’

“তাঁর লীলা যে আধারে প্রকাশ করেন, সেখানে বিশেষ শক্তি।

“জমিদার সব জায়গায় থাকেন। কিন্তু অমুক বৈঠকখানায় তিনি প্রায় বসেন। ভক্ত তাঁর বৈঠকখানা। ভক্তের হৃদয়ে তিনি লীলা করতে ভালবাসেন। ভক্তের হৃদয়ে তাঁর বিশেষ শক্তি অবতীর্ণ হয়।

“তাঁর লক্ষণ কি? যেখানে কার্য বেশি, সেখানে বিশেষ শক্তির প্রকাশ।

“এই আদ্যাশক্তি আর পরব্রহ্ম অভেদ। একটিকে ছেড়ে আর-একটিকে চিন্তা করবার জো নাই। যেমন জ্যোতিঃ আর মণি! মণিকে ছেড়ে মণির জ্যোতিঃকে ভাববার জো নাই, আবার জ্যোতিঃকে ছেড়ে মণিকে ভাববার জো নাই। সাপ

আর তির্যগ্গতি। সাপকে ছেড়ে তির্যগ্গতি ভাববার জো নাই, আবার সাপের তির্যগ্গতি ছেড়ে সাপকে ভাববার জো নাই।”

[ব্রাহ্মসমাজ ও মানুষে ঈশ্বরদর্শন — সিদ্ধ ও সাধকের প্রভেদ]

“আদ্যাশক্তিই এই জীবজগৎ, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। অনুলোম, বিলোম। রাখাল, নরেন্দ্র আর আর ছোকরাদের জন্য ব্যস্ত হই কেন? হাজরা বললে, তুমি ওদের জন্য ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছ; তা ঈশ্বরকে ভাববে কখন? (কেশব ও সকলের ঈষৎ হাস্য)

তখন মহা চিন্তিত হলুম। বললুম, মা একি হল। হাজরা বলে, ওদের জন্য ভাব কেন? তারপর ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করলুম। ভোলানাথ বললে, ভারতে১ ওই কথা আছে। সমাধিস্থ লোক সমাধি থেকে নেমে কোথায় দাঁড়াবে? তাই সত্ত্বগুণী ভক্ত নিয়ে থাকে। ভারতের এই নজির পেয়ে তবে বাঁচলুম! (সকলের হাস্য)

“হাজরার দোষ নাই। সাধক অবস্থায় সব মনটা ‘নেতি’ ‘নেতি’ করে তাঁর দিকে দিতে হয়। সিদ্ধ অবস্থায় আলাদা কথা, তাঁকে লাভ করবার পর অনুলোম বিলোম। ঘোল ছেড়ে মাখন পেয়ে, তখন বোধ হয়, ‘ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল।’ তখন ঠিক বোধ হয়, তিনিই সব হয়েছেন। কোনখানে বেশি প্রকাশ, কোনখানে কম প্রকাশ।

“ভাবসমুদ্র উথলালে ডাঙায় একবাঁশ জল। আগে নদী দিয়ে সমুদ্রে আসতে হলে এঁকেবেঁকে ঘুরে আসতে হত। বন্যে এলে ডাঙায় একবাঁশ জল। তখন

সোজা নৌকা চালিয়ে দিলেই হল। আর ঘুরে যেতে হয় না। ধানকাটা হলে, আর আলের উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে আসতে হয় না! সোজা একদিক দিয়ে গেলেই হয়।

“লাভের পর তাঁকে সবতাতেই দেখা যায়। মানুষে তাঁর বেশি প্রকাশ। মানুষের মধ্যে সত্ত্বগুণী ভক্তের ভিতের আরও বেশি প্রকাশ — যাদের কামিনী-কাঞ্চন ভোগ করবার একেবারে ইচ্ছা নাই। (সকলে নিস্তব্ধ) সমাধিস্থ ব্যক্তি যদি নেমে আসে, তাহলে সে কিসে মন দাঁড় করাবে? তাই কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী সত্ত্বগুণী শুদ্ধভক্তের সঙ্গ দরকার হয়। না হলে সমাধিস্থ লোক কি নিয়ে থাকে?”

[ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের মাতৃভাব — জগতের মা]

“যিনি ব্রহ্ম, তিনিই আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি। পুরুষ বলি। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব করেন তাঁকে শক্তি বলি। প্রকৃতি বলি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যিনিই পুরুষ তিনিই প্রকৃতি। আনন্দময় আর আনন্দময়ী।

“যার পুরুষ জ্ঞান আছে, তার মেয়ে জ্ঞানও আছে। যার বাপ জ্ঞান আছে, তার মা জ্ঞানও আছে। (কেশবের হাস্য)

“যার অন্ধকার জ্ঞান আছে, তার আলো জ্ঞানও আছে। যার রাত জ্ঞান আছে, তার দিন জ্ঞানও আছে। যার সুখ জ্ঞান আছে, তার দুঃখ জ্ঞানও আছে। তুমি ওটা বুঝেছ?”

“কেশব (সহাস্যে) — হাঁ বুঝেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — মা — কি মা? জগতের মা। যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, পালন করছেন। যিনি তাঁর ছেলেদের সর্বদা রক্ষা করছেন। আর ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ — যে যা চায়, তাই দেন। ঠিক ছেলে মা ছাড়া থাকতে পারে না। তার মা সব জানে। ছেলে খায়, দায়, বেড়ায়; অত শত জানে না।

কেশব — আজ্ঞে হাঁ।

১ 'ভারত' অর্থাৎ মহাভারত। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ তখন কালীবাড়ির মুহুরী, ঠাকুরকে ভক্তি করিতেন ও মাঝে মাঝে গিয়া মহাভারত শুনাইতেন। ৺দীননাথ খাজাঞ্চীর পরলোকের পর ভোলানাথ কালীবাড়ির খাজাঞ্চী হইয়াছিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৮শে নভেম্বর 1883/11/28/iv

17.8 ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বর্ণনা — পূর্বকথা

শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহিতে কহিতে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। কেশবের সহিত সহাস্যে কথা কহিতেছেন। একঘর লোক উৎকর্ণ হইয়া সমস্ত শুনিতেছেন ও দেখিতেছেন। সকলে অবাক্ যে, "তুমি কেমন আছ" ইত্যাদি কথা আদৌ হইতেছে না। কেবল ঈশ্বরের কথা!

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি) — ব্রহ্মজ্ঞানীরা অত মহিমা-বর্ণন করে কেন? “হে ঈশ্বর তুমি চন্দ্র করিয়াছ, সূর্য করিয়াছ, নক্ষত্র করিয়াছ!” এ-সব কথা এত কি দরকার? অনেকে বাগান দেখেই তারিফ করে। বাবুকে দেখতে চায় কজন। বাগান বড় না বাবু বড়?

“মদ খাওয়া হলে শুঁড়ির দোকানে কত মন মদ আছে, তার হিসাবে আমার কি দরকার? আমার এক বোতলেই কাজ হয়ে যায়।”

[পূর্বকথা —– বিষ্ণুঘরের গয়না চুরি ও সেজোবাবু]

নরেন্দ্রকে যখন দেখি, কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই, ‘তোর বাপের নাম কি? তোর বাপের কখানা বাড়ি?’

“কি জান? মানুষ নিজে ঐশ্বর্যের আদর করে বলে, ভাবে ঈশ্বরও আদর করেন। ভাবে, তাঁর ঐশ্বর্যের প্রশংসা করলে তিনি খুশি হবেন। শম্ভু বলেছিল, আর এখন এই আশীর্বাদ কর, যাতে এই ঐশ্বর্য তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে মরতে পারি। আমি বললুম, এ তোমার পক্ষেই ঐশ্বর্য, তাঁকে তুমি কি দিবে? তাঁর পক্ষে এগুলো কাঠ মাটি!

“যখন বিষ্ণুঘরের গয়না সব চুরি গেল, তখন সেজোবাবু আর আমি ঠাকুরকে দেখতে গেলাম। সেজোবাবু বললে, ‘দূর ঠাকুর! তোমার কোন যোগ্যতা নাই। তোমার গা থেকে সব গয়না নিয়ে গেল, আর তুমি কিছু করতে পারলে না!’ আমি তাঁকে বললাম, ‘এ তোমার কি কথা! তুমি যাঁর গয়না গয়না করছো, তাঁর

পক্ষে এগুলো মাটির ডেলা! লক্ষ্মী যাঁর শক্তি, তিনি তোমার গুটিকতক চুরি গেল কি না, এই নিয়ে কি হাঁ করে আছেন? এরকম কথা বলতে নাই।’

“ঈশ্বর কি ঐশ্বর্যের বশ? তিনি ভক্তির বশ। তিনি কি চান? টাকা নয়। ভাব, প্রেম, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য — এই সব চান।”

[ঈশ্বরের স্বরূপ ও উপাসক ভেদ — ত্রিগুণাতীত ভক্ত]

“যার যেমন ভাব ঈশ্বরকে সে তেমনই দেখে। তমোগুণী ভক্ত, সে দেখে মা পাঁঠা খায় আর বলিদান দেয়। রজোগুণী ভক্ত নানা ব্যঞ্জন ভাত করে দেয়। সত্ত্বগুণী ভক্তের পূজার আড়ম্বর নাই। তার পূজা লোকে জানতে পারে না। ফুল নাই, তো বিল্বপত্র, গঙ্গাজল দিয়ে পূজা করে। দুটি মুড়কি দিয়ে কি বাতাসা দিয়ে শীতল দেয়। কখনও বা ঠাকুরকে একটু পায়েস রেঁধে দেয়।

“আর আছে, ত্রিগুনাতীত ভক্ত। তাঁর বালকের স্বভাব। ঈশ্বরের নাম করাই তাঁর পূজা। শুদ্ধ তাঁর নাম।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৮শে নভেম্বর 1883/11/28/v

17.9 কেশবের সঙ্গে কথা —— ঈশ্বরের হাসপাতালে আত্মার চিকিৎসা

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি, সহাস্যে) — তোমার অসুখ হয়েছে কেন তার মানে আছে। শরীরের ভিতর দিয়ে অনেক ভাব চলে গেছে, তাই ওইরকম হয়েছে। যখন ভাব হয় তখন কিছু বোঝা যায় না, অনেকদিন পরে শরীরে আঘাত লাগে। আমি দেখেছি, বড় জাহাজ গঙ্গা দিয়ে চলে গেল, তখন কিছু টের পাওয়া গেল না; ও মা! খানিকক্ষণ পরে দেখি, কিনারার উপরে জল ধপাস ধপাস করছে; আর তোলপাড় করে দিচ্ছে। হয় তো কিনারার খানিকটা ভেঙে জলে পড়ল!

“কুঁড়েঘরে হাতি প্রবেশ করলে ঘর তোলপাড় করে ভেঙে চুরে দেয়। ভাবহস্তী দেহঘরে প্রবেশ করে, আর তোলপাড় করে।

“হয় কি জান? আগুন লাগলে কতক গুলো জিনিস পুড়িয়ে-টুড়িয়ে ফেলে, আর একটা হইহই কাণ্ড আরম্ভ করে দেয়। জ্ঞানাগ্নি প্রথমে কামক্রোধ এই সব রিপু নাশ করে, তারপর অহংবুদ্ধি নাশ করে। তারপর একটা তোলপাড় আরম্ভ করে!

“তুমি মনে কচ্ছো সব ফুরিয়ে গেল! কিন্তু যতক্ষণ রোগের কিছু বাকী থাকে, ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন না। হাসপাতালে যদি তুমি নাম লেখাও, আর চলে আসবার জো নাই। যতক্ষণ রোগের একটু কসুর থাকে, ততক্ষণ ডাক্তার সাহেব চলে আসতে দেবে না। তুমি নাম লিখালে কেন!” (সকলের হাস্য)

কেশব হাসপাতালের কথা শুনিয়া বারবার হাসিতেছেন। হাসি সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। থাকেন থাকেন, আবার হাসিতেছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

[পূর্বকথা — ঠাকুরের পীড়া, রাম কবিরাজের চিকিৎসা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি) — হৃদু বলত, এমন ভাবও দেখি নাই! এমন রোগও দেখি নাই। তখন আমার খুব অসুখ। সরা সরা বাহ্যে যাচ্ছি। মাথায় যেন দুলাখ পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরীয় কথা রাতদিন চলছে। নাটগড়ের রাম কবিরাজ দেখতে এল। সে দেখে, আমি বসে বিচার করছি। তখন সে বললে, "একি পাগল। দুখানা হাড় নিয়ে, বিচার করছে!"

(কেশবের প্রতি) — "তাঁর ইচ্ছা। সকলই তোমার ইচ্ছা।

"সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।

"শিশির পাবে বলে মালী বসরাই গোলাপের গাছ শিকরসুদ্ধ তুলে দেয়। শিশির পেলে গাছ ভাল করে গজাবে। তাই বুঝি তোমার শিকড়সুদ্ধ তুলে দিচ্ছে। (ঠাকুরের ও কেশবের হাস্য) ফিরে ফিরতি বুঝি একটা বড় কাণ্ড হবে।"

[কেশবের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ক্রন্দন ও সিদ্ধেশ্বরীকে ডাব-চিনি মানন]

"তোমার অসুখ হলেই আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়। আগের বারে তোমার যখন অসুখ হয়, রাত্রি শেষ প্রহরে আমি কাঁদতুম। বলতুম, মা! কেশবের যদি কিছু হয়, তবে কার সঙ্গে কথা কবো। তখন কলকাতায় এলে ডাব-চিনি সিদ্ধেশ্বরীকে দিয়েছিলুম। মার কাছে মেনেছিলুম যাতে অসুখ ভাল হয়।"

কেশবের উপর ঠাকুরের এই অকৃত্রিম ভালবাসা ও তাঁহার জন্য ব্যাকুলতা কথা সকলে অবাক্ হইয়া শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এবার কিন্তু অত হয় নাই। ঠিক কথা বলব।

“কিন্তু দু-তিনদিন একটু হয়েছে।”

পূর্বদিকে যে দ্বার দিয়া কেশব বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই দ্বারের কাছে কেশবের পূজনীয়া জননী আসিয়াছেন।

সেই দ্বারদেশ হইতে উমানাথ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, “মা আপনাকে প্রণাম করিতেছেন।”

ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন। উমানাথ বলিতেছেন, “মা বলছেন, কেশবের অসুখটি যাতে সারে।” ঠাকুর বলিতেছেন, “মা সুবচনী আনন্দময়ীকে ডাকো, তিনি দুঃখ দূর করবেন।”

কেশবকে বলিতেছেন —

“বাড়ির ভিতরে অত থেকো না। মেয়েছেলেদের মধ্যে থাকলে আরও ডুববে, ঈশ্বরীয় কথা হলে আরও ভাল থাকবে।”

গম্ভীরভাবে কথাগুলি বলিয়া আবার বালকের ন্যায় হাসিতেছেন। কেশবকে বলছেন, “দেখি, তোমার হাত দেখি।” ছেলেমানুষের মতো হাত লইয়া যেন

ওজন করিতেছেন। অবশেষে বলিতেছেন, “না, তোমার হাতহালকা আছে, খলদের হাত ভারী হয়।” (সকলের হাস্য)

উমানাথ দ্বারদেশ হইতে আবার বলিতেছেন, “মা বলছেন, কেশবকে আর্শীবাদ করুন।”

শ্রীরামকৃষ্ণ (গম্ভীর স্বরে) — আমার কি সাধ্য! তিনিই আশীর্বাদ করবেন।
‘তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।’

“ঈশ্বর দুইবার হাসেন। একবার হাসেন যখন দুই ভাই জমি বখরা করে; আর দড়ি মেপে বলে, ‘এ-দিক্‌টা আমার, ও-দিক্‌টা তোমার’! ঈশ্বর এই ভেবে হাসেন, আমার জগৎ, তার খানিকটা মাটি নিয়ে করছে এ-দিক্‌টা আমার ও-দিক্‌টা তোমার!

“ঈশ্বর আর-একবার হাসেন। ছেলের অসুখ সঙ্কটাপন্ন। মা কাঁদছে। বৈদ্য এসে বলছে, ‘ভয় কি মা, আমি ভাল করব। ’বৈদ্য জানে না ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে।” (সকলেই নিস্তব্ধ)

ঠিক এই সময় কেশব অনেকক্ষণ ধরিয়া কাশিতে লাগিলেন। সে কাশি আর থামিতেছে না। সে কাশির শব্দ শুনিয়া সকলেরই কষ্ট হইতেছে। অনেক্ষণ পরে ও অনেক কষ্টের পর কাশি একটু বন্ধ হইল। কেশব আর থাকিতে পারিতেছেন না। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। কেশব প্রণাম করিয়া অনেক কষ্টে দেয়াল ধরিয়া সেই দ্বার দিয়া নিজের কামরায় পুনরায় গমন করিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৮শে নভেম্বর 1883/11/28/vi

17.10 ব্রাহ্মসমাজ ও বেদোল্লিখিত দেবতা — গুরুগিরি নীচবুদ্ধি

[অমৃত — কেশবের বড় ছেলে — দয়ানন্দ সরস্বতী]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু মিষ্টমুখ করিয়া যাইবেন। কেশবের বড় ছেলেটি কাছে আসিয়া বসিয়াছেন।

অমৃত বলিলেন, এইটি বড় ছেলে। আপনি অশির্বাদ করুন। ও কি! মাথায় হাত দিয়া আশির্বাদ করুন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, “আমার আশীর্বাদ করতে নাই।”

এই বলিয়া সহাস্যে ছেলেটির গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

অমৃত (সহাস্যে) — আচ্ছা, তবে গায়ে হাত বুলান। (সকলের হাস্য)

ঠাকুর অমৃতাদি ব্রাহ্মভক্ত সঙ্গে কেশবের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অমৃত প্রভৃতির প্রতি) — “অসুখ ভাল হোক” —— এ-সব কথা আমি বলতে পারি না। ও-ক্ষমতা আমি মার কাছে চাইও না। আমি মাকে শুধু বলি, মা আমাকে শুদ্ধাভক্তি দাও।

“ইনি কি কম লোক গা। যারা টাকা চায়, তারাও মানে, আবার সাধুতেও মানে। দয়ানন্দকে দেখেছিলাম। তখন বাগানে ছিল। কেশব সেন, কেশব সেন, করে ঘর-বাহির করছে, — কখন কেশব আসবে! সেদিন বুঝি কেশবের যাবার কথা ছিল।

“দয়ানন্দ বাঙলা ভাষাকে বলত —— ‘গৌড়াণ্ড ভাষা’।

“ইনি বুঝি হোম আর দেবতা মানতেন না। তাই বলেছিল ঈশ্বর এত জিনিস করেছেন আর দেবতা করতে পারেন না?”

ঠাকুর কেশবের শিষ্যদের কাছে কেশবের সুখ্যাতি করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— কেশব হীনবুদ্ধি নয়। ইনি অনেককে বলেছেন, “যা যা সন্দেহ সেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করবে।” আমারও স্বভাব এই। আমি বলি, ইনি আরও কোটিগুনে বাড়ুন। আমি মান নিয়ে কি করব?

“ইনি বড়লোক। টাকা চায়, তারাও মানে, আবার সাধুরাও মানে।”

ঠাকুর কিছু মিষ্টমুখ করিয়া এইবার গাড়িতে উঠিবেন। ব্রাহ্মভক্তেরা সঙ্গে আসিয়া তুলিয়া দিতেছেন।

সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় ঠাকুর দেখিলেন, নিচে আলো নাই। তখন অমৃতাদি ভক্তদের বলিলেন, এ-সব জায়গায় ভাল করে আলো দিতে হয়। আলো না দিলে দারিদ্র হয়। এরকম যেন আর না হয়।

ঠাকুর দু-একটি ভক্তসঙ্গে সেই রাত্রে কালীবাড়ি যাত্রা করিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৮শে নভেম্বর 1883/11/28/vii

17.11 শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেনের বাড়িতে শুভাগমন

ইংরেজী ২৮শে নভেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। আজ বেলা ৪টা-৫টার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের কমলকুটির নামক বাটীতে গিয়াছিলেন। কেশব পীড়িত, শীঘ্রই মর্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া যাইবেন। কেশবকে দেখিয়া রাত্রি ৭টার পর মাথাঘষা গলিতে শ্রীযুক্ত জয়গোপালের বাটীতে কয়েকটি ভক্তসঙ্গে ঠাকুর আগমন করিয়াছেন।

ভক্তেরা কত কি ভাবিতেছেন। ঠাকুর দেখিতেছি, নিশিদিন হরিপ্রেমে বিহ্বল। বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু ধর্মপত্নীর সহিত এইরূপ সংসার করেন নাই। ধর্মপত্নীকে ভক্তি করেন, পূজা করেন, তাঁহার সহিত কেবল ঈশ্বরীয় কথা কহেন, ঈশ্বরের

গান করেন, ঈশ্বরের পূজা করেন, ধ্যান করেন — মায়িক কোন সম্বন্ধই নাই। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, ঠাকুর দেখিতেছেন। টাকা, ধাতুদ্রব্য, ঘটি-বাটি স্পর্শ করিতে পারেন না। স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিতে পারেন না। স্পর্শ করিলে সিঙি মাছের কাঁটা ফোটার মতো সেইস্থানে ঝনঝন কনকন করে! টাকা, সোনা হাতে দিলে হাত তেউড়ে যায়, বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, নিশ্বাস রুদ্ধ হয়। অবশেষে ফেলিয়া দিলে আবার পূর্বের ন্যায় নিশ্বাস বহিতে থাকে!

ভক্তেরা কত কি ভাবিতেছেন। সংসার কি ত্যাগ করিতে হইবে? পড়াশুনা আর করিবার প্রয়োজন কি? যদি বিবাহ না করি, চাকরি তো করিতে হইবে না। মা-বাপকে কি ত্যাগ করিতে হইবে? আর আমি বিবাহ করিয়াছি, সন্তান হইয়াছে, পরিবার প্রতিপালন করিতে হইবে, — আমার কি হইবে? আমারও ইচ্ছা করে, নিশিদিন হরিপ্রেমে মগ্ন হইয়া থাকি! শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখি আর ভাবি, কি করিতেছি! ইনি রাতদিন তৈলধারার ন্যায় নিরবছিন্ন ঈশ্বর-চিন্তা করিতেছেন, আর আমি রাতদিন বিষয়চিন্তা করিতে ছুটিতেছি। একমাত্র ইঁহারই দর্শন যেন মেঘাছন্ন আকাশের একস্থানে একটু জ্যোতিঃ এখন জীবনসমস্যা কিরূপে পূরণ করিতে হইবে?

“ইনি তো নিজে করে দেখালেন। তবে এখনও সন্দেহ?

“ভেঙে বালির বাঁধ পূরাই মনের সাধ! সত্য কি ‘বালির বাঁধ’? যদি তাঁর উপর সেরূপ ভালবাসা আসে, আর হিসাব আসবে না। যদি জোয়ার গাঙে জল ছুটে কে রোধ করবে? সে প্রেমোদয় হওয়াতে শ্রীগৌরাঙ্গ কৌপীন ধারণ করেছিলেন, যে প্রেমে ঈশা অনন্যচিন্ত হয়ে বনবাসী হয়েছিলেন আর প্রেমময় পিতার মুখ চেয়ে

শরীরত্যাগ করেছিলেন, যে প্রেমে বুদ্ধ রাজভোগ ত্যাগ করে বৈরাগী হয়েছিলেন, সেই প্রেমের একবিন্দু যদি উদয় হয়, এই অনিত্য সংসার কোথায় পড়ে থাকে!

“আচ্ছা, যারা দুর্বল, যাদের সে প্রেমোদয় হয় না, যারা সংসারী জীব, যাদের পায়ে মায়ার বেড়ি, তাদের কি উপায়? দেখি, এই প্রেমিক বৈরাগী কি বলেন।”

ভক্তেরা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। ঠাকুর জয়গোপালের বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে উপবিষ্ট — সম্মুখে জয়গোপাল, তাঁহার আত্মীয়েরা ও প্রতিবেশীগণ। একজন প্রতিবেশী বিচার করিবেন বলিয়া প্রস্তুত ছিলেন। তিনিই অগ্রণী কথারম্ভ করিলেন। জয়গোপালের ভ্রাতা বৈকুণ্ঠও আছেন।

[গৃহস্থাশ্রম ও শ্রীরামকৃষ্ণ]

বৈকুণ্ঠ — আমরা সংসারী লোক, আমাদের কিছু বলুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁকে জেনে — একহাত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে আর-একহাতে সংসারের কার্য কর।

বৈকুণ্ঠ — মহাশয়, সংসার কি মিথ্যা?

শ্রীরামকৃষ্ণ — যতক্ষন তাঁকে না জানা যায়, ততক্ষণ মিথ্যা। তখন তাঁকে ভুলে মানুষ ‘আমার আমার’ করে, মায়ার বদ্ধ হয়ে কামিনী-কাঞ্চনে মুগ্ধ হয়ে আরও ডোবে! মায়াতে এমনই মানুষ অজ্ঞান হয় যে, পালাবার পথ থাকলেও পালাতে পারে না! একটি গান আছে:

এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছ কি কুহক করে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি জানিতে পারে ।।
বিল করে ঘুনি পাতে মীন প্রবেশ করে তাতে।
গতায়াতের পথ আছে তবু মীন পালাতে নারে ।।
গুটিপোকায় গুটি করে পালালেও পালাতে পারে।
মহামায়ায় বদ্ধ গুটি, আপনার নালে আপনি মরে ।।

“তোমরা তো নিজে নিজে দেখছ সংসার অনিত্য। এই দেখ না কেন? কত লোক এল গেল! কত জন্মালো কত দেহত্যাগ করলে! সংসার এই আছে এই নাই। অনিত্য! যাদের এত ‘আমার আমার’ করছ চোখ বুজলেই নাই। কেউ নাই, তবু নাতির জন্য কাশী যাওয়া হয় না। ‘আমার হারুর কি হবে?’ ‘গতায়াতের পথ আছে তবু মীন পালাতে নারে!’ ‘গুটিপোকা আপন নালে আপনি মরে।’ এরূপ সংসার মিথ্যা, অনিত্য।”

প্রতিবেশী — মহাশয়, একহাত ঈশ্বরে আর-একহাত সংসারে রাখব কেন? যদি সংসার অনিত্য, একহাতই বা সংসারে দিব কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁকে জেনে সংসার করলে অনিত্য নয়। গান শোন:

মন রে কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা ।।
কালীনামে দাওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না ।।

অদ্য কিম্বা শতাব্দান্তে, বাজাপ্ত হবে জান না।
এখন আপন একতারে (মনরে) চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা।।
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে, ভক্তিবারি সেঁচে দেনা।
একা যদি না পারিস মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা।।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৮শে নভেম্বর 1883/11/28/viii

17.12 গৃহস্থাশ্রমে ঈশ্বরলাভ — উপায়

শ্রীরামকৃষ্ণ — গান শুনলে? "কালীনামে দাওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।" ঈশ্বরের শরণাগত হও, সব পাবে। "সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না।" শক্ত বেড়া। তাঁকে যদি লাভ করতে পার, সংসার অসার বলে বোধ হবে না। যে তাঁকে জেনেছে, সে দেখে যে জীবজগৎ সে তিনিই হয়েছেন। ছেলেদের খাওয়াবে, যেন গোপালকে খাওয়াচ্ছে। পিতা মাতাকে ঈশ্বর-ঈশ্বরী দেখবে ও সেবা করবে। তাঁকে জেনে সংসার করলে বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ঐহিক সম্বন্ধ থাকে না। দুজনেই ভক্ত, কেবল ঈশ্বরের কথা কয়, ঈশ্বরের প্রসঙ্গ লয়ে থাকে। ভক্তের সেবা করে। সর্বভূতে তিনি আছেন, তাঁর সেবা দুজনে করে।

প্রতিবেশী — মহাশয়, এরূপ স্ত্রী-পুরুষ তো দেখা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আছে, অতি বিরল। বিষয়ী লোকেরা তাদের চিনতে পারে না। তবে এরূপটি হতে গেলে দুজনেরই ভাল হওয়া চাই। দুজনেই যদি সেই ঈশ্বরানন্দ পেয়ে থাকে, তাহলেই এটি সম্ভব হয়। ভগবানের বিশেষ কৃপা চাই। না হলে সর্বদা অমিল হয়। একজনকে তফাতে যেতে হয়। যদি না মিল হয়, তাহলে বড় যন্ত্রণা। স্ত্রী হয়তো রাতদিন বলে, 'বাবা কেন এখানে বিয়ে দিলে! না খেতে পেলুম, না বাছাদের খাওয়াতে পারলুম; না পরতে পেলুম, না বাছাদের পরাতে পেলুম, না একখানা গয়না! তুমি আমায় কি সুখে রেখেছো! চক্ষু বুজে ঈশ্বর ঈশ্বর করছেন! ও-সব পাগলামি ছাড়ো!'

ভক্ত — এ-সব প্রতিবন্ধক আছে, আবার হয়তো ছেলেরা অবাধ্য। তারপর কত আপদ আছে। তবে, মহাশয় উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — সংসারে থেকে সাধন করা বড় কঠিন। অনেক ব্যাঘাত। তা আর তোমাদের বলতে হবে না। — রোগ-শোক, দারিদ্র, আবার স্ত্রীর সঙ্গে মিল নাই, ছেলে অবাধ্য, মূর্খ, গোঁয়ার।

"তবে উপায় আছে। মাঝে মাজে নির্জনে গিয়ে তাঁকে প্রার্থনা করতে হয়, তাঁকে লাভ করবার জন্য চেষ্টা করতে হয়।"

প্রতিবেশী — বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — একেবারে নয়। যখন অবসর পাবে, কোন নির্জন স্থানে গিয়ে একদিন-দুদিন থাকবে — যেন কোন সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকে, যেন কোন বিষয়ী লোকদের সঙ্গে সাংসারিক বিষয় লয়ে আলাপ না করতে হয়। হয় নির্জনে বাস, নয় সাধুসঙ্গ।

প্রতিবেশী — সাধু চিনব কেমন করে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — যাঁর মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে, তিনিই সাধু। যিনি কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী, তিনিই সাধু। যিনি সাধু স্ত্রীলোককে ঐহিক চক্ষে দেখেন না, সর্বদাই তাদের অন্তরে থাকেন, — যদি স্ত্রীলোকের কাছে আসেন, তাঁকে মাতৃবৎ দেখেন ও পূজা করেন। সাধু সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করেন, ঈশ্বরীয় কথা বই কথা কন না। আর সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে তাদের সেবা করেন। মোটামুটি এইগুলি সাধুর লক্ষণ।

প্রতিবেশী — নির্জনে বরাবর থাকতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ফুটপাতের গাছ দেখেছ? যতদিন চারা, ততদিন চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। না হলে ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলবে। গাছের গুঁড়ি মোটা হলে আর বেড়ার দরকার নাই। তখন হাতি বেঁধে দিলেও গাছ ভাঙবে না। গুঁড়ি যদি করে নিতে পার আর ভাবনা কি, ভয় কি? বিবেক লাভ করবার চেষ্টা আগে কর। তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ, হাতে আঠা জড়াবে না।

প্রতিবেশী — বিবেক কাহাকে বলে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বর সৎ আর সব অসৎ — এই বিচার। সৎ মানে নিত্য। অসৎ — অনিত্য। যার বিবেক হয়েছে, সে জানে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। বিবেক উদয় হলে ঈশ্বরকে জানবার ইচ্ছা হয়। অসৎকে ভালবাসলে — যেমন দেহসুখ, লোকমান্য, টাকা — এই সব ভালবাসলে — ঈশ্বর, যিনি সৎস্বরূপ, তাঁকে জানতে ইচ্ছা হয় না। সদসৎ বিচার এলে তবে ঈশ্বরকে খুঁজতে ইচ্ছা করে।

"শোন, একটা গান শোন:

আয় মন, বেড়াতে যাবি।
কালী-কল্পতরুমূলে রে মন, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি ।।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, (তার) নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে তার বেটা, তত্ত্ব-কথা তায় সুধাবি ।।
শুচি অশুচিরে লয় দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে পিরিত হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি ।।
অহংকার অবিদ্যা তোর, পিতামাতায় তাড়িয়ে দিবি।
যদি মোহ-গর্তে টেনে লয়, ধৈর্য-খোঁটা ধরে রবি ।।
ধর্মাধর্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি ।।
প্রথম ভার্যার সন্তানেরে দূর হতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান-সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি ।।
প্রসাদ বলে, এমন হলে কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর মনের মতো মন হবি ।।

“মনে নিবৃত্তি এলে তবে বিবেক হয়, বিবেক হলে তত্ত্ব-কথা মনে উঠে। তখন মনের বেড়াতে যেতে সাধ হয়, কালী-কল্পতরুমূলে। সেই গাছতলায় গেলে। ঈশ্বরের কাছে গেলে, চার ফল কুড়িয়ে পাবে — অনায়াসে পাবে, কুড়িয়ে পাবে — ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। তাঁকে পেলে ধর্ম, অর্থ, কাম বা সংসারীর দরকার তাও হয় — যদি কেউ চায়।”

প্রতিবেশী — তবে সংসার মায়া বলে কেন?

[বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ — যতক্ষণ ইশ্বরকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ “নেতি নেতি” করে ত্যাগ করতে হয়। তাঁকে যারা পেয়েছে, তারা জানে যে তিনিই সব হয়েছেন। তখন বোধ হয় — ঈশ্বর-মায়া-জীব-জগৎ। জীবজগৎসুদ্ধ তিনি। যদি একটা বেলের খোলা, শাঁস, বিচি আলাদা করা যায়, আর একজন বলে, বেলটা কত ওজনে ছিল দেখ তো, তুমি কি খোলা বিচি ফেলে শাঁসটা কেবল ওজন করবে? না; ওজন করতে হলে খোলা বিচি সমস্ত ধরতে হবে। ধরলে তবে বলতে পারবে, বেলটা এত ওজনে ছিল। খোলাটা যেন জগৎ। জীবগুলি যেন বিচি। বিচারের সময় জীব আর জগৎকে অনাত্মা বলেছিলে, অবস্তু বলেছিলে। বিচার করবার সময় শাঁসকেই সার, খোলা আর বিচিকে অসার বলে বোধ হয়। বিচার হয়ে গেলে, সমস্ত জড়িয়ে এক বলে বোধ হয়। আর বোধ হয়, যে সত্ত্বাতে শাঁস সেই সত্ত্বা দিয়েই বেলের খোলা আর বিচি হয়েছে। বেল বুঝতে গেলে সব বুঝিয়ে যাবে।

“অনুলোম বিলোম। ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। যদি ঘোল হয়ে থাকে তো মাখনও হয়েছে। যদি মাখন হয়ে থাকে, তাহলে ঘোলও হয়েছে। আত্মা যদি থাকেন, তো অনাত্মাও আছে।

“যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা (Phenomenal world)। যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য (Absolute)। যিনি ঈশ্বর বলে গোচর হন, তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। যে জেনেছে সে দেখে যে তিনিই সব হয়েছেন — বাপ, মা, ছেলে প্রতিবেশী, জীবজন্তু, ভাল-মন্দ, শুচি, অশুচি সমস্ত।”

[পাপবোধ — Sense of Sin and Responsibility]

প্রতিবেশী — তবে পাপ পূণ্য নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ — আছে, আবার নাই। তিনি যদি অহংতত্ত্ব, (Ego) রেখে দেন, তাহলে ভেদবুদ্ধিও রেখে দেন। তিনি দু-একজনেতে অহংকার একেবারে পুঁছে ফেলেন — তারা পাপ-পুণ্য ভাল-মন্দের পার হয়ে যায়। ঈশ্বরদর্শন যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি ভাল-মন্দ জ্ঞান থাকবেই থাকবে। তুমি মুখে বলতে পার, আমার পাপ-পুণ্য সমান হয়ে গেছে; তিনি যেমন করাচ্ছেন, তেমনি করছি। কিন্তু অন্তরে জান যে, ও-সব কথা মাত্র; মন্দ কাজটি করলেই মন ধুকধুক করবে। ঈশ্বরদর্শনের পরও তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তিনি “দাস আমি” রেখে দেন। সে অবস্থায় ভক্ত বলে — আমি দাস, তুমি প্রভু। সে ভক্তের ঈশ্বরীয় কথা, ঈশ্বরীয় কাজ ভাল লাগে; ঈশ্বরবিমুখ লোককে ভাল লাগে না; ইশ্বর ছাড়া কাজ ভাল লাগে না। তবেই হল, এরূপ ভক্তেতেও তিনি ভেদবুদ্ধি রাখেন।

প্রতিবেশী — মহাশয় বলছেন, ঈশ্বরকে জেনে সংসার কর। তাঁকে কি জানা যায়?

[The “Unknown and Unknowable”]

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁকে ইন্দ্রিয় দ্বারা বা এ-মনের দ্বারা জানা যায় না। যে-মনে বিষয়বাসনা নাই সেই শুদ্ধমনের দ্বারা তাঁকে জানা যায়।

প্রতিবেশী — ঈশ্বরকে কে জানতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঠিক কে জানবে? আমাদের যতটুকু দরকার, ততটুকু হলেই হল। আমার এক পাতকুয়া জলের কি দরকার? একঘটি হলেই খুব হল। চিনির পাহারের কাছে একটা পিঁপড়ে গিছল। তার সব পাহাড়টার কি দরকার? একটা-দুটো দানা হলেই হেউ-ঢেউ হয়।

প্রতিবেশী — আমাদের যে বিকার, একঘটি জলে হয় কি? ইচ্ছা করে ঈশ্বকে সব বুঝে ফেলি!

[সংসার — বিকারযোগ ও ঔষধ — “মামেকং শরণং ব্রজ”]

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা বটে। কিন্তু বিকারের ঔষধও আছে।

প্রতিবেশী — মহাশয়, কি ঔষধ?

শ্রীরামকৃষ্ণ — সাধুসঙ্গ, তাঁর নামগুণগান, তাঁকে সর্বদা প্রার্থনা। আমি বলেছিলাম, মা, আমি জ্ঞান চাই না; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার

অজ্ঞান, — মা আমায় তোমার পাদপদ্মে কেবল শুদ্ধাভক্তি দাও। আর আমি কিছুই চাই নাই।

“যেমন রোগ, তার তেমনি ঔষধ। গীতায় তিনি বলেছেন, ‘হে অর্জুন, তুমি আমার শরণ লও, তোমাকে সবরকম পাপ থেকে আমি মুক্ত করব।’ তাঁর শরণাগত হও, তিনি সদ্বুদ্ধি দেবেন। তিনি সব ভার লবেন। তখন সবরকম বিকার দূরে যাবে। এ-বুদ্ধি দিয়ে কি তাঁকে বুঝা যায়? একসের ঘটিতে কি চারসের দুধ ধরে? আর তিনি না বুঝালে কি বুঝা যায়? তাই বলছি —— তাঁর শরণাগত হও —— তাঁর যা ইচ্ছা তিনি করুন। তিনি ইচ্ছাময়। মানুষের কি শক্তি আছে?”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c18 ১৮ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে এবং ঠনঠনে সিদ্ধেশ্বরী-মন্দিরে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ৯ই ডিসেম্বর 1883/12/09/i

18.1 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-কালীমন্দিরে ভক্তসঙ্গে

রবিবার, ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ; (২৪শে) অগ্রহায়ণ, শুক্লা দশমী তিথি, বেলা প্রায় একটা-দুইটা হইবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে সেই ছোট খাটটিতে বসিয়া ভক্তদের সঙ্গে হরিকথা কহিতেছেন। অধর, মনোমোহন, ঠনঠনের শিবচ ন্দ্র, রাখাল, মাস্টার, হরিশ ইত্যাদি অনেকে বসিয়া আছেন, হাজরাও তখন ওইখানে থাকেন। ঠাকুর মহাপ্রভুর অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

[ভক্তিযোগ — সমাধিতত্ত্ব ও মহাপ্রভুর অবস্থা — হঠযোগ ও রাজযোগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — চৈতন্যদেবের তিনটি অবস্থা হত —

১. বাহ্যদশা — তখন স্থূল আর সূক্ষ্ম তাঁর মন থাকত।

২. অর্ধবাহ্যদশা — তখন কারণ শরীরে, কারণানন্দে মন গিয়েছে।

৩. অন্তর্দশা — তখন মহাকারণে মন লয় হত।

“বেদান্তের পঞ্চকোষের সঙ্গে, এর বেশ মিল আছে। স্থূলশরীর, অর্থাৎ অন্নময় ও প্রাণময় কোষ। সূক্ষ্মশরীর, অর্থাৎ মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ। কারণ শরীর, অর্থাৎ আনন্দময় কোষ। মহাকারণে যখন মন লীন হত তখন সমাধিস্থ। — এরই নাম নির্বিকল্প বা জড়সমাধি।

“চৈতন্যদেবের যখন বাহ্যদশা হত তখন নামসংকীর্তন করতেন। অর্ধ-বাহ্যদশায় ভক্তসঙ্গে নৃত্য করতেন। অর্ন্তদশায় সমাধিস্থ হতেন।”

মাস্টার (স্বগত) — ঠাকুর কি নিজের সমস্ত অবস্থা এইরূপে ইঙ্গিত করছেন? চৈতন্যদেবেরও এইরূপ হত!

শ্রীরামকৃষ্ণ — চৈতন্য ভক্তির অবতার, জীবকে ভক্তি শিখাতে এসেছিলেন। তাঁর উপর ভক্তি হল তো সবই হল। হঠযোগের কিছু দরকার নাই।

একজন ভক্ত — আজ্ঞা, হঠযোগ কিরূপ?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হঠযোগে শরীরের উপর বেশি মনোযোগ দিতে হয়। ভিতর প্রক্ষালন করবে বলে বাঁশের নলে গুহ্যদ্বার রক্ষা করে। লিঙ্গ দিয়ে দুধ ঘি টানে। জিহ্বাসিদ্ধি অভ্যাস করে। আসন করে শূন্যে কখন কখন উঠে! ও-সব বায়ুর কার্য। একজন বাজি দেখাতে দেখাতে তালুর ভিতর জিহ্বা প্রবেশ করে দিয়েছিল। অমনি তার শরীর স্থির হয়ে গেল। লোকে মনে করলে, মরে গেছে। অনেক বৎসর সে গোর দেওয়া রহিল। বহুকালের পরে সেই গোর কোন সূত্রে ভেঙে গিয়েছিল! সেই লোকটার তখন হঠাৎ চৈতন্য হল। চৈতন্য হবার পরই, সে চেঁচাতে লাগল, লাগ্ ভেলকি, লাগ্ ভেলকি! (সকলের হাস্য) এ-সব বায়ুর কার্য।

“হঠযোগ বেদান্তবাদীরা মানে না।

“হঠযোগ আর রাজযোগ। রাজযোগে মনের দ্বারা যোগ হয় — ভক্তির দ্বারা বিচারের দ্বারা যোগ হয়। ওই যোগই ভাল। হঠযোগ ভাল নয়, কলিতে অন্নগত প্রাণ!”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ৯ই ডিসেম্বর 1883/12/09/ii

18.2 ঠাকুরের তপস্যা — ঠাকুরের আত্মিয়গণ ও ভবিষ্যৎ মহাতীর্থ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নহবতের পার্শ্বে রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিতেছেন নহবতের বারান্দার একপার্শ্বে বসিয়া, বেড়ার আড়ালে মণি গভীর চিন্তামগ্ন। তিনি কি ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন? ঠাকুর ঝাউতলায় গিয়াছিলেন, মুখ ধুইয়া ওইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিগো, এইখানে বসে! তোমার শীঘ্র হবে। একটু করলেই কেউ বলবে, এই এই!

চকিত হইয়া তিনি ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া আছেন। এখনও আসন ত্যাগ করেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমার সময় হয়েছে। পাখি ডিম ফুটোবার সময় না হলে ডিম ফুটোয় না। যে ঘর বলেছি, তোমার সেই ঘরই বটে।

এই বলিয়া ঠাকুর মণির ‘ঘর’ আবার বলিয়া দিলেন।

“সকলেরই যে বেশি তপস্যা করতে হয়, তা নয়। আমার কিন্তু বড় কষ্ট করতে হয়েছিল। মাটির ঢিপি মাথায় দিয়ে পড়ে থাকতাম। কোথা দিয়ে দিন চলে যেত। কেবল মা মা বলে ডাকতাম, কাঁদতাম।”

মণি ঠাকুরের কাছে প্রায় দুই বৎসর আসিতেছেন। তিনি ইংরেজী পড়েছেন। ঠাকুর তাঁহাকে কখন কখন ইংলিশম্যান বলতেন। কলেজে পড়াশুনা করেছেন। বিবাহ করেছেন।

তিনি কেশব ও অন্যান্য পণ্ডিতদের লেকচার শুনিতে, ইংরেজী দর্শন ও বিজ্ঞান পড়িতে ভালবাসেন। কিন্তু ঠাকুরের কাছে আসা অবধি, ইওরোপীয় পণ্ডিতদের গ্রন্থ ও ইংরেজী বা অন্য ভাষার লেকচার তাঁহার আলুনী বোধ হইয়াছে। এখন কেবল ঠাকুরকে রাতদিন দেখিতে ও তাঁহার শ্রীমুখের কথা শুনিতে ভালবাসেন।

আজকাল তিনি ঠাকুরের একটি কথা সর্বদা ভাবেন। ঠাকুর বলেছেন, “সাধন করলেই ঈশ্বরকে দেখা যায়,” আরও বলেছেন, “ঈশ্বরদর্শনই মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য।”

শ্রীরামকৃষ্ণ — একটু কল্লেই কেউ বলবে, এই এই। তুমি একাদশী করো। তোমরা আপনার লোক, আত্মীয়। তা না হলে এত আসবে কেন? কীর্তন শুনতে শুনতে রাখালকে দেখেছিলাম ব্রজমণ্ডলের ভিতর রয়েছে। নরেন্দ্রের খুব উঁচুঘর। আর হীরানন্দ। তার কেমন বালকের ভাব। তার ভাবটি কেমন মধুর। তাকেও দেখবার ইচ্ছা করে।

[পূর্বকথা — গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ — তুলসী কানন — সেজোবাবুর সেবা]

“গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ দেখেছিলাম। ভাবে নয়, এই চোখে! আগে এমন অবস্থা ছিল যে, সাদাচোখে সব দর্শন হত! এখন তো ভাবে হয়।

“সাদাচোখে গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ সব দেখেছিলাম। তারমধ্যে তোমায়ও যেন দেখেছিলাম। বলরামকেও যেন দেখেছিলাম।

“কারুকে দেখলে তড়াক করে উঠে দাঁড়াই কেন জান; আত্মীয়দের অনেক কাল পরে দেখলে ওইরূপ হয়।

“মাকে কেঁদে কেঁদে বলতাম, মা! ভক্তদের জন্যে আমার প্রাণ যায়, তাদের শীঘ্র আমায় এনে দে। যা যা মনে করতাম, তাই হত।

পঞ্চবটীতে তুলসী কানন করেছিলাম, জপ-ধ্যান করব বলে। ব্যাঁকারির বেড়া দেবার জন্য বড় ইচ্ছা হল। তারপরেই দেখি জোয়ারে কতকগুলি ব্যাঁকারির আঁটি, খানিকটা দড়ি, ঠিক পঞ্চবটীর সামনে এসে পড়েছে! ঠাকুরবাড়ির একজন ভারী ছিল, সে নাচতে নাচতে এসে খবর দিলে।

“যখন এই অবস্থা হল, পূজা আর করতে পারলাম না। বললাম, মা, আমায় কে দেখবে? মা! আমার এমন শক্তি নাই যে, নিজের ভার নিজে লই। আর তোমার কথা শুনতে ইচ্ছা করে; ভক্তদের খাওয়াতে ইচ্ছা করে; কারুকে সামনে পড়লে কিছু দিতে ইচ্ছা করে। এ-সব মা, কেমন করে হয়। মা, তুমি একজন বড়মানুষ পেছনে দাও! তাইতো সেজোবাবু এত সেবা করলে।

“আবার বলেছিলাম, মা! আমার তো আর সন্তান হবে না, কিন্তু ইচ্ছা করে, একটি শুদ্ধ-ভক্ত ছেলে, আমার সঙ্গে সর্বদা থাকে। সেইরূপ একটি ছেলে আমায় দাও। তাই তো রাখাল হল। যারা যারা আত্মীয়, তারা কেউ অংশ, কেউ কলা।”

ঠাকুর আবার পঞ্চবটীর দিকে যাইতেছেন। মাস্টার সঙ্গে আছেন, আর কেহ নাই। ঠাকুর সহাস্যে তাঁহার সহিত নানা কথা কহিতেছেন।

[পূর্বকথা —— অদ্ভুত মূর্তি দর্শন —— বটগাছের ডাল]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — দেখ, একদিন দেখি —— কালীঘর থেকে পঞ্চবটী পর্যন্ত এক অদ্ভুত মূর্তি। এ তোমার বিশ্বাস হয়?

মাস্টার অবাক্ হইয়া রহিলেন।

তিনি পঞ্চবটীর শাখা হইতে ২/১টি পাতা পকেটে রাখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— এই ডাল পড়ে গেছে, দেখেছ; এর নিচে বসতাম।

মাস্টার —— আমি এর একটি কচি ডাল ভেঙে নিয়ে গেছি —— বাড়িতে রেখে দিয়েছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — কেন?

মাস্টার —— দেখলে আহ্লাদ হয়। সব চুকে গেলে এই স্থান মহাতীর্থ হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — কিরকম তীর্থ? কি, পেনেটীর মতো?

পেনেটীতে মহাসমারোহ করিয়া রাঘব পণ্ডিতের মহোৎসব হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় প্রতি বৎসর এই মহোৎসব দেখিতে গিয়া থাকেন ও সংকীর্তন মধ্যে প্রেমানন্দে নৃত্য করেন, যেন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তের কাছে ডাক শুনিয়া স্থির থাকিতে না পারিয়া, নিজে আসিয়া সংকীর্তন মধ্যে প্রেমমূর্তি দেখাইতেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ৯ই ডিসেম্বর 1883/12/09/iii

18.3 হরিকথাপ্রসঙ্গে

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের ছোট খাটটিতে বসিয়া মার চিন্তা করিতেছেন। ক্রমে ঠাকুরবাড়িতে ঠাকুরদের আরতি আরম্ভ হইল। শাঁকঘন্টা বাজিতে লাগিল। মাস্টার আজ রাত্রে থাকিবেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর মাস্টারকে "ভক্তমাল" পাঠ করিয়া শুনাইতে বলিলেন। মাস্টার পড়িতেছেন —

চরিত্র শ্রীমহারাজ শ্রীজয়মল

জয়মল নামে এক রাজা শুদ্ধমতি। অনির্বচনীয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ পিরীত ।।
ভক্তি-অঙ্গ-যাজনে যে সুদৃঢ় নিয়ম। পাসাণের রেখা যেন নাহি বেশি কম ।।
শ্যামল সুন্দর নাম শ্রীবিগ্রহসেবা। তাহাতে প্রপন্ন, নাহি জানে দেবী দেবা ।।
দশদণ্ড-বেলা-বধি তাঁহার সেবায়। নিযুক্ত থাকয়ে সদা দৃঢ় নিয়ম হয় ।।
রাজ্যধন যায় কিবা বজ্রাঘাত হয়। তথাপিহ সেবা সমে ফিরি না তাকায় ।।
প্রতিযোগী রাজা ইহা সন্ধান জানিয়া। সেই অবকাশকালে আইল হানা দিয়া ।।
রাজার হুকুম বিনে সৈন্য-আদি-গণ। যুদ্ধ না করিতে পারে করে নিরীক্ষণ ।।
ক্রমে ক্রমে আসি গড় ঘেরে রিপুগণ। তথাপিহ তাহাতে কিঞ্চিৎ নাহি মন ।।
মাতা তাঁর আসি করে কত উচ্চধ্বনি। উদ্বিগ্ন হইয়া যে মাথায় কর হানি ।।
সর্বস্ব লইল আর সর্বনাশ হৈল। তথাপি তোমার কিছু ভ্রুক্ষেপ নৈল ।।
জয়মল কহে মাতা কেন দুঃখভাব। যেই দিল সেই লবে তাহে কি করিব ।।
সেই যদি রাখে তবে কে লইতে পারে। অতএব আমা সবার উদ্যমে কি করে ।।
শ্যামলসুন্দর হেথা ঘোড়ায় চড়িয়া। যুদ্ধ করিবারে গেলা অস্তর ধরিয়া ।।
একাই ভক্তের রিপু সৈন্যগণ মারি। আসিয়া বান্ধিল ঘোড়া আপন তেওয়ারি ।।
সেবা সমাপনে রাজা নিকশিয়া দেখে। ঘোরার সর্বাঙ্গে ঘর্ম শ্বাস বহে নাকে ॥
জিজ্ঞাসয়ে মোর অশ্বে সওয়ার কে হৈল। ঠাকুর মন্দিরে বা কে আনি বান্ধিল ।।
সবে কহে কে চড়িল কে আনি বান্ধিল। আমরা যে নাহি জানি কখন আনিল ।।
সংশয় হইয়া রাজা ভাবিতে ভাবিতে। সৈন্যসামন্ত সহ চলিল যুদ্ধেতে ।।
যুদ্ধস্থানে গিয়া দেখে শত্তুরে সৈন্য। রণশয্যায় শুইয়াছে মাত্র এক ভিন্ন ।।
প্রধান যে রাজা এবে সেই মাত্র আছে। বিস্ময় হইয়া ঞিহ কারণ কি পুছে ।।
হেনকালে অই প্রতিযোগী যে রাজা। গলবস্ত্র হইয়া করিল বহু পূজা ।।
আসিয়া জয়মল মহারাজার অগ্রেতে। নিবেদন করে কিছু করি জোড়হাতে ।।

কি করিব যুদ্ধ তব এক যে সেপাই। পরম আশ্চর্য সে ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ।।

অর্থ নাহি মাগোঁ মুঞিঃ রাজ্য নাহি চাহোঁ। বরঞ্চ আমার রাজ্য চল দিব লহো ।।

শ্যামল সেপাই সেই লড়িতে আইল। তোমাসনে প্রীতি কি তার বিবরিয়া বল ।।

সৈন্য যে মারিল মোর তারে মুই পারি। দরশনমাত্রে মোর চিত্ত নিল হরি ।।

জয়মল বুঝিল এই শ্যামলজীর কর্ম। প্রতিযোগী রাজা যে বুঝিল ইহা মর্ম ।।

জয়মলের চরণ ধরিয়া স্তব করে। যাহার প্রসাদে কৃষ্ণকৃপা হৈল তারে ।।

তাঁহা-সবার শ্রীচরণে শরণ আমার। শ্যামল সেপাই যেন করে অঙ্গীকার ।।

পাঠান্তে ঠাকুর মাস্টারের সহিত কথা কহিতেছেন।

[ভক্তমাল একঘেয়ে — অন্তরঙ্গ কে? জনক ও শুকদেব]

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমার এ-সব বিশ্বাস হয়? তিনি সওয়ার হয়ে সেনা বিনাশ করেছিলেন — এ-সব বিশ্বাস হয়?

মাস্টার — ভক্ত, ব্যাকুল হয়ে ডেকেছিল — এ-অবস্থা বিশ্বাস হয়। ঠাকুরকে সওয়ার ঠিক দেখেছিল কিনা — এ-সব বুঝতে পারি না। তিনি সওয়ার হয়ে আসতে পারেন, তবে ওরা তাঁকে ঠিক দেখেছিল কিনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্য) — বইখানিতে বেশ ভক্তদের কথা আছে। তবে একঘেয়ে। যাদের অন্য মত, তাদের নিন্দা আছে।

পরদিন সকালে উদ্যানপথে দাঁড়াইয়া ঠাকুর কথা কহিতেছেন। মণি বলিতেছেন, আমি তাহলে এখানে এসে থাকব।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, এত যে তোমরা আস, এর মানে কি! সাধুকে লোকে একবার হৃদ্দ দেখে যায়। এত আস — এর মানে কি?

মণি অবাক্‌। ঠাকুর নিজেই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — অন্তরঙ্গ না হলে কি আস। অন্তরঙ্গ মানে আত্মীয়, আপনার লোক — যেমন, বাপ, ছেলে, ভাই, ভগ্নী।

“সব কথা বলি না। তাহলে আর আসবে কেন?

“শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য জনকের কাছে গিয়েছিল। জনক বললে, আগে দক্ষিণা দাও। শুকদেব বললে, আগে উপদেশ না পেলে কেমন করে দক্ষিণা হয়! জনক হাসতে হাসতে বললে, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হলে আর কি গুরু-শিষ্য বোধ থাকবে? তাই আগে দক্ষিণার কথা বললাম।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ৯ই ডিসেম্বর 1883/12/09/iv

18.4 সেবক হৃদয়ে

শুক্লপক্ষ। চাঁদ উঠিয়াছে। মণি কালীবাড়ির উদ্যানপথে পাদচারণ করিতেছেন। পথের একধারে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর, নহবতখানা, বকুলতলা ও পঞ্চবটী; অপরধারে ভাগীরথী জ্যোৎস্নাময়ী।

আপনা-আপনি কি বলিতেছেন। — "সত্য সত্যই কি ঈশ্বরদর্শন করা যায়? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তো বলিতেছেন। বললেন, একটু কিছু করলে কেউ এসে বলে দেবে, 'এই এই'। অর্থাৎ একটু সাধনের কথা বললেন। আচ্ছা; বিবাহ, ছেলেপুলে হয়েছে, এতেও কি তাঁতে লাভ করা যায়? (একটু চিন্তার পর) অবশ্য করা যায়, তা নাহলে ঠাকুর বলছেন কেন? তাঁর কৃপা হলে কেন না হবে?

"এই জগৎ সামনে — সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, জীব, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। এ-সব কিরূপে হল, এর কর্তাই বা কে, আর আমিই বা তাঁর কে — এ না জানলে বৃথাই জীবন!

"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পুরুষের শ্রেষ্ঠ। এরূপ মহাপুরুষ এ-পর্যন্ত এ-জীবনে দেখি নাই। ইনি অবশ্যই সেই ঈশ্বরকে দেখেছেন। তা না হলে, মা মা করে কার সঙ্গে রাতদিন কথা কন! আর তা না হলে, ঈশ্বরের ওপর ওঁর এত ভালবাসা কেমন করে হল। এত ভালবাসা যে ভাবশূন্য হয়ে যান! সমাধিস্থ, জড়ের ন্যায় হয়ে যান। আবার কখন বা প্রেমে উন্মত্ত হয়ে হাসেন, কাঁদেন, নাচেন, গান!"

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৪ই ডিসেম্বর 1883/12/14/i

18.5 মণি, রামলাল, শ্যাম ডাক্তার, কাঁসারিপাড়ার ভক্তেরা

অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি — শুক্রবার ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। বেলা প্রায় নয়টা হইবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ঘরের দ্বারের কাছে দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। রামলাল কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। রাখাল, লাটু নিকটে এদিক-ওদিকে ছিলেন। মণি আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর বলিলেন, "এসেছো? তা আজ বেশ দিন।" তিনি ঠাকুরের কাছে কিছুদিন থাকিবেন, 'সাধন' করিবেন। ঠাকুর বলিয়াছেন, কিছু করিলেই কেউ বলে দেবে, "এই এই"।

ঠাকুর বলিয়া দিয়াছেন, এখানে অতিথিশালার অন্ন তোমার রোজ খাওয়া উচিত নয়। সাধু কাঙালের জন্য ও হয়েছে। তুমি তোমার রাঁধবার জন্য একটি লোক আনবে। তাই সঙ্গে একটি লোক এসেছে।

তাঁহার কোথায় রান্না হইবে? তিনি দুধ খাইবেন, ঠাকুর রামলালকে গোয়ালার কাছে বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বলিলেন।

শ্রীযুক্ত রামলাল অধ্যাত্ম রামায়ণ পড়িতেছেন ও ঠাকুর শুনিতেছেন। মণিও বসিয়া শুনিতেছেন। রামচন্দ্র সীতাকে বিবাহ করিয়া অযোধ্যায় আসিতেছেন। পথে পরশুরামের সহিত দেখা হইল। রাম হরধনু ভঙ্গ করিয়াছেন শুনিয়া

পরশুরাম রাস্তায় বড় গোলমাল করিতে লাগিলেন। দশরথ ভয়ে আকুল। পরশুরাম আর একটা ধনু রামকে ছুঁড়িয়া মারিলেন। আর ওই ধনুতে জ্যা রোপণ করিতে বলিলান। রাম ঈষৎ হাস্য করিয়া বামহস্তে ধনু গ্রহণ করিলেন ও জ্যা রোপন করিয়া টঙ্কার করিলেন! ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া পরশুরামকে বলিলেন, এখন এ-বাণ কোথায় ত্যাগ করব বল। পরশুরামের দর্প চূর্ণ হইল। তিনি শ্রীরামকে পরমব্রহ্ম বলে স্তব করিতে লাগিলেন।

পরশুরামের স্তব শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট! মাঝে মাঝে "রাম রাম" এই নাম মধুরকণ্ঠে উচ্চারণ করিতেছেন।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামলালকে) — একটু গুহক চণ্ডালের কথা বল দেখি!

রামচন্দ্র যখন "পিতৃসত্যের কারণ" বনে গিয়াছিলেন, গুহকরাজ চমকিত হইয়াছিলেন। রামলাল ভক্তমাল পড়িতেছেন —

নয়নে গলয়ে ধারা মনে উতরোল। চমকি চাহিয়া রহে নাহি আইসে বোল ।।
নিমিখ নাহিক পড়ে চাহিয়া রহিল। কাষ্ঠের পুতুলি প্রায় অস্পন্দ হইল ।।

তারপর ধীরে ধীরে রামের কাছে গিয়া বলিলেন, আমার ঘরে এস। রামচন্দ্র তাঁকে মিতা বলে আলিঙ্গন করিলেন। গুহ তখন তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতেছেন —

গুহ বলে ভাল ভাল তুমি মোর মিতে। তোমাতে সঁপিনু দেহ পরাণ সহিতে ।।
তুমি মোর সরবস প্রাণ ধন রাজ্য। তুমি মোর ভক্তি, মুক্তি, তুমি শুভকার্য ।।

আমি মর্‍্যা যাই তব বালায়ের সনে। দেহ সমর্পিণু মিতা তোমার চরণে ।।

রামচন্দ্র চৌদ্দবৎসর বনে থাকিবেন ও জটাবল্কল ধারণ করিবেন শুনিয়া গুহও জটা বল্কল ধারণ করিয়া রহিলেন ও ফলমূল ছাড়া অন্য কিছু আহার করিলেন না। চৌদ্দবৎসরান্তে রাম আসিতেছেন না দেখিয়া, গুহ অগ্নি প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় হনুমান আসিয়া সংবাদ দিলেন। সংবাদ পাইয়া গুহ মহানন্দে ভাসিতেছেন। রামচন্দ্র ও সীতা পুষ্পক রথে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দয়াল পরমানন্দ, প্রেমাধীন রামচন্দ্র, ভক্তবৎসল গুণধাম।
প্রিয় ভক্তরাজ গুহ, হেরিয়া পুলক দেহ, হৃদয়ে লইয়া প্রিয়তম ।।
গাঢ় আলিঙ্গন দোঁহে, প্রভু ভৃত্যে লাগি রহে,
অশ্রুজলে দোঁহা অঙ্গ ভিজে ।। ধন্য গুহ মহাশয়,
চারিদিকে জয় জয়,
কোলাহল হল ক্ষিতি মাঝে ।।

[কেশব সেনের যদৃচ্ছালাভ — উপায় — তীব্র বৈরাগ্য ও সংসারত্যাগ]

আহারান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একটু বিশ্রাম করিতেছেন। মাস্টার কাছে বসিয়া আছেন। এমন সময় শ্যাম ডাক্তার ও আরও কয়েকটি লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উঠিয়া বসিলেন ও কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কর্ম যে বরাবরই করতে হয়, তা নয়। ঈশ্বরলাভ হলে আর কর্ম থাকে না। ফল হলে ফুল আপনিই ঝরে যায়।

“যার লাভ হয়, তার সন্ধ্যাদি কর্ম থাকে না। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লীন হয়। তখন গায়ত্রী জপলেই হয়। আর গায়ত্রী ওঁকারে লয় হয়। তখন গায়ত্রীও বলতে হয় না। তখন শুধু ‘ওঁ’ বললেই হয়। সন্ধ্যাদি কর্ম কতদিন? যতদিন হরিনামে কি রামনামে পুলক না হয়, আর ধারা না পড়ে। টাকা-কড়ির জন্য, কি মোকদ্দমা জিত হবে বলে, পূজাদি কর্ম — ও-সব ভাল না।”

একজন ভক্ত — টাকা-কড়ির চেষ্টা তো সকলেই করছে দেখছি। কেশব সেন কেমন রাজার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেশবের আলাদা কথা। যে ঠিক ভক্ত সে চেষ্টা না করলেও ঈশ্বর তার সব জুটিয়ে দেন। যে ঠিক রাজার বেটা, সে মুসোহারা পায়। উকিল-ফুকিলের কথা বলছি না, — যারা কষ্ট করে, লোকের দাসত্ব করে টাকা আনে। আমি বলছি, ঠিক রাজার বেটা। যার কোন কামনা নাই সে টাকা-কড়ি চায় না, টাকা আপনি আসে। গীতায় আছে — যদৃচ্ছালাভ।

“সদ্ব্রাহ্মণ, যার কোন কামনা নাই, সে হাড়ির বাড়ির সিধে নিতে পারে। ‘যদৃচ্ছালাভ’। সে চায় না, কিন্তু আপনি আসে।”

একজন ভক্ত — আজ্ঞা, সংসারে কিরকম করে থাকতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — পাঁকাল মাছের মতো থাকবে। সংসার থেকে তফাতে গিয়ে, নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা মাঝে মাঝে করলে, তাঁতে ভক্তি জন্মে। তখন নির্লিপ্ত হয়ে থাকতে পারবে। পাঁক আছে, পাঁকের ভিতর থাকতে হয়, তবু গায়ে পাঁক লাগে না। সে লোক অনাসক্ত হয়ে সংসারে থাকে।

ঠাকুর দেখিতেছেন, মণি বসিয়া একমনে সমস্ত শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণিদৃষ্টে) — তীব্র বৈরাগ্য হলে তবে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। যার তীব্র বৈরাগ্য হয়, তার বোধ হয়, সংসার দাবানল! জ্বলছে! মাগছেলেকে দেখে যেন পাতকুয়া! সেরকম বৈরাগ্য যদি ঠিক ঠিক হয়, তাহলে বাড়ি ত্যাগ হয়ে পড়ে। শুধু অনাসক্ত হয়ে থাকা নয়। কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। মায়াকে যদি চিনতে পার, আপনি লজ্জায় পালাবে। একজন বাঘের ছাল পরে ভয় দেখাচ্ছে। যাকে ভয় দেখাচ্ছে সে বললে, আমি তোকে চিনেছি — তুই আমাদের ‘হরে’। তখন সে হেসে চলে গেল — আর-একজনকে ভয় দেখাতে গেল।

“যত স্ত্রীলোক, সকলে শক্তিরূপা। সেই আদ্যাশক্তিই স্ত্রী হয়ে, স্ত্রীরূপ ধরে রয়েছেন। অধ্যাত্মে আছে রামকে নারদাদি স্তব করছেন, হে রাম, যত পুরুষ সব তুমি; আর প্রকৃতির যত রূপ সীতা ধারণ করেছেন। তুমি ইন্দ্র, সীতা ঈন্দ্রাণী; তুমি শিব, সীতা শিবানী; তুমি নর, সীতা নারী! বেশ আর কি বলব — যেখানে পুরুষ, সেখানে তুমি; যেখানে স্ত্রী, সেখানে সীতা।”

[ত্যাগ ও প্রারব্ধ — বামাচার সাধন ঠাকুরের নিষেধ]

(ভক্তদের প্রতি) — “মনে করলেই ত্যাগ করা যায় না। প্রারব্ধ, সংস্কার —— এ-সব আবার আছে। একজন রাজাকে একজন যোগী বললে, তুমি আমার কাছে বসে থেকে ভগবানের চিন্তা কর। রাজা বললে, সে বড় হবে না; আমি থাকতে পারি; কিন্তু আমার এখনও ভোগ আছে।

“নটবর পাঁজা যখন ছেলেমানুষ, এই বাগানে গরু চরাত। তার কিন্তু অনেক ভোগ ছিল। তাই এখন রেড়ির কল করে অনেক টাকা করেছে। আলমবাজারে রেড়ির কলের ব্যাবসা খুব ফেঁদেছে।

“এক মতে আছে, মেয়েমানুষ নিয়ে সাধন করা। কর্তাভজা মাগীদের ভিতর আমায় একবার নিয়ে গিছিল। সব আমার কাছে এসে বসল। আমি তাদের মা, মা বলাতে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, ইনি প্রবর্তক, এখনও ঘাট চিনেন নাই! ওদের মতে কাঁচা অবস্থাকে বলে প্রবর্তক, তারপরে সাধক, তারপর সিদ্ধের সিদ্ধ।

“একজন মেয়ে বৈষ্ণবচরণের কাছে গিয়ে বসলে। বৈষ্ণবচরণকে জিজ্ঞাসা করাতে বললে, এর বালিকাভাব!

“স্ত্রীভাবে শীঘ্র পতন হয়। মাতৃভাব শুদ্ধভাব।”

“কাঁসারিপাড়ার ভক্তেরা গাত্রোত্থান করিলেন; ও বলিলেন, তবে আমরা আসি; মা-কালীকে, আর আর ঠাকুরকে দর্শন করব।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৪ই ডিসেম্বর 1883/12/14/ii

18.6 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও প্রতিমাপূজা —— ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরলাভ

মণি পঞ্চবটী ও কালীবাড়ির অন্যান্য স্থানে একাকী বিচরণ করিতেছেন। ঠাকুর বলিয়াছেন, একটু সাধন করিলে ঈশ্বরদর্শন করা যায়। মণি কি তাই ভাবিতেছেন?

আর তীব্র বৈরাগ্যের কথা। আর "মায়াকে চিনলে আপনি পালিয়ে যায়?" বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে মণি আবার বসিয়া আছেন। ব্রাউটন্ ইন্স্টিটিউশন হইতে একটি শিক্ষক কয়েকটি ছাত্র লইয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। শিক্ষকটি মাঝে মাঝে এক-একটি প্রশ্ন করিতেছেন। প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিক্ষকের প্রতি) — প্রতিমাপূজাতে দোষ কি? বেদান্তে বলে, যেখানে "অস্তি, ভাতি আর প্রিয়", সেইখানেই তাঁর প্রকাশ। তাই তিনি ছাড়া কোন জিনিসই নাই।

“আবার দেখ, ছোট মেয়েরা পুতুল খেলা কতদিন করে? যতদিন না বিবাহ হয়, আর যতদিন না স্বামী সহবাস করে। বিবাহ হলে পুতুলগুলি পেটরায় তুলে ফেলে। ঈশ্বরলাভ হলে আর প্রতিমাপূজার কি দরকার?”

মণির দিকে চাহিয়া বলিতেছেন —

“অনুরাগ হলে ঈশ্বরলাভ হয়। খুব ব্যাকুলতা চাই। খুব ব্যাকুলতা হলে সমস্ত মন তাঁতে গত হয়।”

[বালকের বিশ্বাস ও ঈশ্বরলাভ — গোবিন্দস্বামী — জটিলবালক]

“একজনের একটি মেয়ে ছিল। খুব অল্পবয়সে মেয়েটি বিধবা হয়ে গিছিল। স্বামীর মুখ কখনও দেখে নাই। অন্য মেয়ের স্বামী আসে দেখে। সে একদিন বললে, বাবা, আমার স্বামী কই? তার বাবা বললে, গোবিন্দ তোমার স্বামী, তাঁকে ডাকলে তিনি দেখা দেন। মেয়েটি ওই কথা শুনে ঘরে দ্বার দিয়ে গোবিন্দকে ডাকে আর কাঁদে; — বলে, গোবিন্দ! তুমি এস, আমাকে দেখা দাও, তুমি কেন আসছো না। ছোট মেয়েটির সেই কান্না শুনে ঠাকুর থাকতে পারলেন না, তাকে দেখা দিলেন।

“বালকের মতো বিশ্বাস! বালক মাকে দেখবার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা হল তো অরুণ উদয় হল। তারপর সূর্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বরদর্শন।

“জটিল বালকের কথা আছে। সে পাঠশালে যেত। একটু বনের পথ দিয়ে পাঠশালে যেতে হত, তাই সে ভয় পেত। মাকে বলাতে মা বললে, তোর ভয় কি? তুই মধুসূদনকে ডাকবি। ছেলেটি জিজ্ঞাসা করলে, মধুসূদন কে? মা বললে, মধুসূদন তোর দাদা হয়। তখন একলা যেতে যেতে যাই ভয় পেয়েছে, অমনি ডেকেছে, ‘দাদা মধুসূদন’। কেউ কোথাও নাই। তখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগল, ‘কোথায় দাদা মধুসূদন, তুমি এসো, আমার বড় ভয় পেয়েছে।’ ঠাকুর তখন থাকতে পারলেন না। এসে বললেন, ‘এই যে আমি, তোর ভয় কি?’ এই বলে সঙ্গে করে পাঠশালার রাস্তা পর্যন্ত পোঁছিয়া দিলেন, আর বললেন, ‘তুই যখন ডাকবি, আমি আসব। ভয় কি?’ এই বালকের বিশ্বাস! এই ব্যাকুলতা!

“একটি ব্রাহ্মণের বাড়িতে ঠাকুরের সেবা ছিল। একদিন কোন কাজ উপলক্ষে তার অন্যস্থানে যেতে হয়েছিল। ছোট ছেলেটিকে বলে গেল তুই আজ ঠাকুরের ভোগ দিস, ঠাকুরকে খাওয়াবি। ছেলেটি ঠাকুরকে ভোগ দিল। ঠাকুর কিন্তু চুপ করে বসে আছেন। কথাও কন না, খানও না। ছেলেটি অনেকক্ষণ বসে বসে দেখলে যে, ঠাকুর উঠেছন না! সে ঠিক জানে যে, ঠাকুর এসে আসনে বসে খাবেন। তখন সে বারবার বলতে লাগল, ঠাকুর, এসে খাও, অনেক দেরি হল; আর আমি বসতে পারি না। ঠাকুর কথা কন না। ছেলেটি কান্না আরম্ভ করলে। বলতে লাগল, ঠাকুর, বাবা তোমাকে খাওয়াতে বলে গেছেন; তুমি কেন আসবে না, কেন আমার কাছে খাবে না? ব্যাকুল হয়ে যাই খানিকক্ষণ কেঁদেছে, ঠাকুর হাসতে হাসতে এসে আসনে বসে খেতে লাগলেন! ঠাকুরকে খাইয়ে যখন ঠাকুরঘর থেকে সে গেল, বাড়ির লোকেরা বললে, ভোগ হয়ে গেছে; সে-সব নামিয়া আন। ছেলেটি বললে, হাঁ হয়ে গেছে; ঠাকুর সব খেয়ে গেছেন। তারা

বললে, সে কি রে! ছেলেটি সরল বুদ্ধিতে বললে, কেন, ঠাকুর তো খেয়ে গেছেন। তখন ঠাকুরঘরে গিয়ে দেখে সকলে অবাক্!”

সন্ধ্যা হইতে দেরী আছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নহবতখানার দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মণির সহিত কথা কহিতেছেন। সম্মুখে গঙ্গা। শীতকাল, ঠাকুরের গায়ে গরম কাপড়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — পঞ্চবটীর ঘরে শোবে?

মণি — নহবতখানার উপরের ঘরটি কি দেবে না?

ঠাকুর খাজাঞ্চীকে মণির কথা বলিবেন। থাকবার ঘর একটি নির্দিষ্ট করে দিবেন। তার নহবতের উপরের ঘর পছন্দ হয়েছে। তিনি কবিত্বপ্রিয়। নহবত থেকে আকাশ, গঙ্গা, চাঁদের আলো, ফুলগাছ — এ-সব দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেবে না কেন? তবে পঞ্চবটীর ঘর বলছি এই জন্য ওখানে অনেক হরিনাম, ঈশ্বরচিন্তা হয়েছে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৪ই ডিসেম্বর 1883/12/14/iii

18.7 ‘প্রয়োজন’ (END OF LIFE) ঈশ্বরকে ভালবাসা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে ধুন দেওয়া হইল। ছোট খাটটিতে বসিয়া ঠাকুর ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন। মণি মেঝেতে বসিয়া আছেন। রাখাল, লাটু, রামলাল ইঁহারাও ঘরে আছেন।

ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন, কথাটা এই — তাঁকে ভক্তি করা, তাঁকে ভালবাসা। রামলালকে গাইতে বলিলেন। তিনি মধুর কণ্ঠে গাইতেছেন। ঠাকুর এক-একটি গান ধরাইয়া দিতেছেন।

ঠাকুর বলাতে রামলাল প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গাইতেছেন:

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটিরে,

অপরূপ জ্যোতিঃ, শ্রীগৌরাঙ্গ মূরতি, দুনয়নে প্রেম বহে শতধারে।

গৌর মত্তমাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়,

কভু ধরাতে লুটায়, নয়নজলে ভাসে রে,

কাঁদে আর বলে হরি, স্বর্গমর্ত্য ভেদ করি, সিংহরবে রে,

আবার দন্তে তৃণ লয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে,

দাস্য মুক্তি যাচেন বারে বারে ।।

মুড়ায়ে চাঁচর কেশ, ধরেছেন যোগীর বেশ,

দেখে ভক্তি প্রেমাবেশ, প্রান কেঁদে উঠে রে।

জীবের দুঃখে কাতর হয়ে,

এলেন সর্বস্ব ত্যজিয়ে, প্রেম বিলাতে রে;

প্রেমদাসের বাঞ্ছা মনে, শ্রীচৈতন্যচরণে,

দাস হয়ে বেড়াই দ্বারে দ্বারে ।।

রামলাল পরে গাইলেন, শচী কেঁদে বলছেন, ‘নিমাই! কেমন করে তোকে ছেড়ে থাকব?’ ঠাকুর বলিলেন, সেই গানটি গা তো।

(১) — আমি মুক্তি দিতে কাতর নই

(২) — রাধার দেখা কি পায় সকলে,

রাধার প্রেম কি পায় সকলে।

অতি সুদুর্লভ ধন, না করলে আরাধন,

সাধন বিনে সে-ধন, এ-ধনে কি মেলে

তুলারাশিমাসে তিথি অমাবস্যা,

স্বাতী নক্ষত্রে যে বারি বরিষে,

সে বারি কি বরিষে বরিষার জলে।

যুবতী সকলে শিশু লয়ে কোলে,

আয় চাঁদ বলে ডাকে বাহু তুলে।

শিশু তাহে ভুলে, চন্দ্র কি তায় ভুলে,

গগন ছেড়ে চাঁদ কি উদয় হয় ভূতলে।

(৩) — নবনীরদবরণ কিসে গন্য শ্যামচাঁদ রূপ হেরে।

ঠাকুর রামলালকে আবার বলিতেছেন, সেই গানটি গা — গৌর নিতাই তোমরা দুভাই। রামলালের সঙ্গে ঠাকুরও যোগ দিতেছেন —

গৌর নিতাই তোমরা দুভাই, পরম দয়াল হে প্রভু

(আমি তাই শুনে এসেছি হে নাথ)

আমি গিয়েছিলাম কাশীপুরে, আমায় কয়ে দিলেন কাশী বিশ্বেশ্বরে,

ও সে পরব্রহ্ম শচীর ঘরে, (অমি চিনেছি হে, পরব্রহ্ম)।

আমি গিয়েছিলাম অনেক ঠাঁই, কিন্তু এমন দয়াল দেখে নাই। (তোমাদের মতো)।

তোমরা ব্রজে ছিলে কানাই, বলাই, এখন নদে এসে হলে গৌর নিতাই। (সেরূপ লুকায়ে)

ব্রজের খেলা ছিল দৌড়াদৌড়ি, এখন নদের খেলা ধূলায় গড়াগড়ি।

(হরিবোল বলে হে) (প্রেমে মত্ত হয়ে)।

ছিল ব্রজের খেলা উচ্চরোল, আজ নদের খেলা কেবল হরিবোল

(ওহে প্রাণ গৌর)।

তোমার সকল অঙ্গ গেছে ঢাকা, কেবল আছে দুটি নয়ন বাঁকা।

(ওহে দয়াল গৌর)।

তোমার পতিতপাবন নাম শুনে, বড় ভরসা পেয়েছি মনে।

(ওহে পতিতপাবন)।

বড় আশা করে এলাম ধেয়ে, আমায় রাখ চরণ ছায়া দিয়ে।

(ওহে দয়াল গৌর)।

জগাই মাধাই তরে গেছে, প্রভু সেই ভরসা আমার আছে।

(ওহে অধমতারণ)।

তোমরা নাকি আচণ্ডালে দাও কোল, কোল দিয়ে বল হরিবোল!

(ওহে পরম করুণ) (ও কাঙালের ঠাকুর)।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদের গোপনে সাধন]

নহবতখানার উপরের ঘরে মণি একাকী বসিয়া আছেন। অনেক রাত্রি হইয়াছে। আজ অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা। আকাশ, গঙ্গা, কালীবাড়ি, মন্দিরশীর্ষ, উদ্যানপথ, পঞ্চবটী চাঁদের আলোতে ভাসিয়াছে! মণি একাকী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে চিন্তা করিতেছেন।

রাত প্রায় তিনটা হইল, তিনি উঠিলেন। উত্তরাস্য হইয়া পঞ্চবটীর অভিমুখে যাইতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীর কথা বলিয়াছেন। আর নহবতখানা ভাল লাগিতেছে না। তিনি পঞ্চবটীর ঘরে থাকিবেন, স্থির করিলেন।

চতুর্দিক নীরব। রাত এগারটার সময় জোয়ার আসিয়াছে। এক-একবার জলের শব্দ শুনা যাইতেছে। তিনি পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন! — দূর হইতে একটি শব্দ শুনিতে পাইলেন। কে যেন পঞ্চবটীর বৃক্ষমণ্ডপের ভিতর হইতে আর্তনাদ করিয়া ডাকিতেছেন, কোথায় দাদা মধুসূদন!

আজ পূর্ণিমা। চতুর্দিকে বটবৃক্ষের শাখাপ্রশাখার মধ্য দিয়া চাঁদের আলো পাটিয়ে পড়িতেছে।

আরও অগ্রসর হইলেন। একটু দূর হইতে দেখিলেন পঞ্চবটীরমধ্যে ঠাকুরের একটি ভক্ত বসিয়া আছেন! তিনিই নির্জনে একাকী ডাকিতেছেন, কোথায় দাদা মধুসূদন! মণি নিঃশব্দে দেখিতেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৫ই ডিসেম্বর 1883/12/15

18.8 দক্ষিণেশ্বরে গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরঙ্গসঙ্গে

[প্রহ্লাদচরিত্র শ্রবণ ও ভাবাবেশ — যোষিৎসঙ্গ নিন্দা]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে সেই পূর্বপরিচিত ঘরে মেঝেতে বসিয়া প্রহ্লাদ চরিত্র শুনিতেছেন। বেলা ৮ টা হইবে। শ্রীযুক্ত রামলাল ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে প্রহ্লাদিচরিত্র পড়িতেছেন।

আজ শনিবার, (১লা পৌষ) অগ্রাহায়ণ কৃষ্ণা প্রতিপদ; ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। মণি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার পদছায়ায় বাস করিতেছেন; — তিনি ঠাকুরের কাছে বসিয়া প্রহ্লাদচরিত্র শুনিতেছেন। ঘরে শ্রীযুক্ত রাখাল, লাটু, হরিশ; কেহ বসিয়া শুনিতেছেন, — কেহ যাতায়াত করিতেছেন। হাজরা বারান্দায় আছেন।

ঠাকুর প্রহ্লাদচরিত্র কথা শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। যখন হিরণ্যকশিপু বধ হইল, নৃসিংহের রুদ্রমূর্তি দেখিয়া ও সিংহনাদ শুনিয়া ব্রহ্মাদি দেবতারা প্রলয়াশঙ্কায় প্রহ্লাদকেই নৃসিংহের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। প্রহ্লাদ বালকের ন্যায় স্তব করিতেছেন। ভক্তবৎসল স্নেহে প্রহ্লাদের গা চাটিতেছেন। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট

হইয়া বলিতেছেন, “আহা! আহা! ভক্তের উপর কি ভালবাসা!” বলিতে বলিতে ঠাকুরের ভাবসমাধি হইল! স্পন্দহীন, — চক্ষের কোণে প্রেমাশ্রু!

ভাব উপশমের পর ঠাকুর ছোট খাটখানিতে গিয়া বসিয়াছেন। মণি মেঝের উপর তাঁহার পাদমূলে বসিলেন। ঠাকুর তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ঈশ্বরের পথে থাকিয়া যাহারা স্ত্রীসঙ্গ করে তাহাদের প্রতি ঠাকুর ক্রোধ ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— লজ্জা হয় না। ছেলে হয়ে গেছে আবার স্ত্রীসঙ্গ! ঘৃণা করে না! — পশুদের মতো ব্যবহার! নাল, রক্ত, মল, মূত্র —— এ-সব ঘৃণা করে না! যে ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা করে, তার পরমাসুন্দরী রমণি চিতার ভস্ম বলে বোধ হয়। যে শরীর থাকবে না —— যার ভিতর কৃমি, ক্লেদ, শ্লেষ্মা, যতপ্রকার অপবিত্র জিনিস —— সেই শরীর নিয়ে আনন্দ। লজ্জা হয় না!

[ঠাকুরের প্রেমানন্দ ও মা-কালীর পূজা]

মণি চুপ করিয়া হেঁটমুখ হইয়া আছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলিতেছেন —— তাঁর প্রেমের এ কবিন্দু যদি কেউ পায় কামিনী-কাঞ্চন অতি তুচ্ছ বলে বোধ হয়। মিছরির পানা পেলে চিটেগুড়ের পানা তুচ্ছ হয়ে যায়। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করলে, তাঁর নামগুণ সর্বদা কীর্তন করলে —— তাঁর উপর ভালবাসা ক্রমে হয়।

এই বলিয়া ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া ঘরের মধ্যে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ও গান গাইতে লাগিলেন:

সুরধনীর তীরে হরি বলে কে, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
(নিতাই নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে)।

প্রায় ১০টা বাজে। শ্রীযুক্ত রামলাল কালীঘরে মা-কালীর নিত্যপূজা সাঙ্গ করিয়াছেন। ঠাকুর মাকে দর্শন করিবার জন্য কালীঘরে যাইতেছেন। মণি সঙ্গে আছেন। মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া ঠাকুর আসনে উপবিষ্ট হইলেন। দুই-একটি ফুল মার চরণে দিলেন। নিজের মাথায় ফুল দিয়া ধ্যান করিতেছেন। এইবার গীতচ্ছলে মার স্তব করিতেছেন:

ভবহারা ভয়হারা নাম শুনেছি তোমার।
তাইতে এবার দিয়েছি ভার, তারো তারো না তারো মা।

ঠাকুর কালীঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁর ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় বসিয়াছেন। বেলা ১০টা হইবে। এখনও ঠাকুরদের ভোগ ও ভোগারতি হয় নাই। মা-কালী ও রাধাকান্তের প্রসাদি মাখন ও ফলমূল হইতে কিছু লইয়া ঠাকুর জলযোগ করিয়াছেন। রাখাল প্রভৃতি ভক্তেরাও কিছু কিছু পাইয়াছেন।

ঠাকুরের কাছে বসিয়া রাখাল Smiles' Self-Help পড়িতেছেন, — Lord Erskine-এর বিষয়।

[নিষ্কামকর্ম — পূর্ণজ্ঞানী গ্রন্থ পড়ে না]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — ওতে কি বলছে?

মাস্টার — সাহেব ফলাকাঙ্ক্ষা না করে কর্তব্য কর্ম করতেন, — এই কথা বলছে। নিষ্কামকর্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তবে তো বেশ! কিন্তু পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ — একখানাও পুস্তক সঙ্গে থাকবে না। যেমন শুকদেব — তাঁর সব মুখে।

“বইয়ে — শাস্ত্রে — বালিতে চিনিতে মিশেল আছে। সাধু চিনিটুকু লয়ে বালি ত্যাগ করে। সাধু সার গ্রহণ করে।”

শুকদেবাদির নাম করিয়া ঠাকুর কি নিজের অবস্থা ইঙ্গিত করিয়া বুঝাইতেছেন?

বৈষ্ণবচরণ কীর্তনিয়া আসিয়াছেন। তিনি সুবোলমিলন কীর্তন শুনাইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীযুত রামলাল থালায় করিয়া ঠাকুরের জন্য প্রসাদ আনিয়া দিলেন। সেবার পর — ঠাকুর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন।

রাত্রে মণি নবতে শয়ন করিলেন। শ্রীশ্রীমা যখন দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ঠাকুরের সেবার জন্য আসিতেন তখন এই নবতেই বাস করিতেন। কয়েকমাস হইল তিনি কামারপুকুর শুভাগমন করিয়াছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৬ই ডিসেম্বর 1883/12/16/i

18.9 শ্রীরাখাল, লাটু, জনাইয়ের মুখুজ্জে প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মণির সঙ্গে পশ্চিমের গোল বারান্দায় বসিয়া আছেন। সম্মুখে দক্ষিণবাহিনী ভাগীরথী। কাছেই করবী, বেল, জুঁই, গোলাপ, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি নানা কুসুমবিভূষিত পুষ্পবৃক্ষ। বেলা ১০টা হইবে।

আজ রবিবার, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর মণিকে দেখিতেছেন ও গান গাইতেছেন:

তারিতে হবে মা তারা হয়েছি শরণাগত।
হইয়া রয়েছি যেন পিঞ্জরের পাখির মতো ।।
অসংখ্য অপরাধী আমি, জ্ঞানশূন্য মিছে ভ্রমি।
মায়াতে মোহিত হয়ে বৎসহারা গাভীর মতো ।।

[রামচিন্তা — সীতার ন্যায় ব্যাকুলতা]

“কেন? পিঞ্জরের পাখির মতো হতে যাব কেন? হ্যাক্! থু!”

কথা কহিতে কহিতে ভাবাবিষ্ট — শরীর, মন সব স্থির ও চক্ষে ধারা। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতেছেন, মা সীতার মতো করে দাও — একেবারে সব ভুল — দেহ ভুল, যোনি, হাত, পা, স্তন — কোনদিকে হুঁশ নাই। কেবল এক চিন্তা — ‘কোথায় রাম!’

কিরূপ ব্যাকুল হলে ঈশ্বরলাভ হয় — মণিকে এইটি শিখাইবার জন্যই কি ঠাকুরের সীতার উদ্দীপন হইল? সীতা রামময়জীবিতা, — রামচিন্তা করে উন্মাদিনী — দেহ যে এমন প্রিয় তাহাও ভুলে গেছেন!

বেলা ৪টা বাজিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে সেই ঘরে বসিয়া আছেন। জনাইয়ের মুখুজ্জেবাবু একজন আসিয়াছেন — তিনি শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণের জ্ঞাতি। তাঁহার সঙ্গে একটি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বন্ধু। মণি, রাখাল, লাটু, হরিশ, যোগীন প্রভৃতি ভক্তেরাও আছেন।

যোগীন দক্ষিণেশ্বরের সাবর্ণ চৌধুরীদের ছেলে। তিনি আজকাল প্রায় প্রত্যহ বৈকালে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন ও রাত্রে চলিয়া যান। যোগীন এখনও বিবাহ করেন নাই।

মুখুজ্জে (প্রণামনন্তর) — আপনাকে দর্শন করে বড় আনন্দ হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তিনি সকলের ভিতরই আছেন। সকলের ভিতর সেই সোনা, কোনখানে বেশি প্রকাশ। সংসারে অনেক মাটি চাপা।

মুখুজ্জে (সহাস্য) — মহাশয়, ঐহিক পারত্রিক কি তফাত?

শ্রীরামকৃষ্ণ — সাধনের সময় ‘নেতি’ ‘নেতি’ করে ত্যাগ করতে হয়। তাঁকে লাভের পর বুঝা যায় তিনিই সব হয়েছেন।

“যখন রামচন্দ্রের বৈরাগ্য হল দশরথ বড় ভাবিত হয়ে বশিষ্ঠদেবের শরণাগত হলেন — যাতে রাম সংসারত্যাগ না করেন। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে দেখেন, তিনি বিমনা হয়ে বসে আছেন — অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য। বশিষ্ঠ বললেন, রাম, তুমি সংসারত্যাগ করবে কেন? সংসার কি তিনি ছাড়া? আমার সঙ্গে বিচার কর। রাম দেখিলেন, সংসার সেই পরব্রহ্ম থেকেই হয়েছে, — তাই চুপ করে রহিলেন।

“যেমন যে জিনিস থেকে ঘোল, সেই জিনিস থেকে মাখম। তখন ঘোলেরই মাখম, মাখমেরই ঘোল। অনেক কষ্টে মাখম তুললে (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হল); — তখন দেখছ যে মাখম থাকলেই ঘোলও আছে, — যেখানে মাখম সেইখানেই ঘোল। ব্রহ্ম আছেন বোধ থাকলেই — জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্বও আছে।”

[ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র উপায়]

“ব্রহ্ম যে কি বস্তু মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়েছে (অর্থাৎ মুখে বলা হয়েছে), কিন্তু ব্রহ্ম কি, — কেউ মুখে বলতে পারে নাই। তাই উচ্ছিষ্ট হয় নাই। এ-কথাটি বিদ্যাসাগরকে বলেছিলাম — বিদ্যাসাগর শুনে ভারী খুশী।

“বিষয়বুদ্ধির লেশ থাকলে এই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। কামিনী-কাঞ্চন মনে আদৌ থাকবে না, তবে হবে। গিরিরাজকে পার্বতী বললেন, ‘বাবা, ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও তাহলে সাধুসঙ্গ কর’।”

ঠাকুর কি বলছেন, সংসারী লোক বা সন্ন্যাসী যদি কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে থাকে তাহলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না?

[যোগভ্রষ্ট — ব্রহ্মজ্ঞানের পর সংসার]

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার মুখুজ্জেকে সম্বোধন করে বলছেন, "তোমাদের ধন ঐশ্বর্য আছে অথচ ঈশ্বরকে ডাকছ — এ খুব ভাল। গীতায় আছে যারা যোগভ্রষ্ট তারাই ভক্ত হয়ে ধনীর ঘরে জন্মায়।"

মুখুজ্জে (বন্ধুর প্রতি, সহাস্যে) — শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তিনি মনে করলে জ্ঞানীকেও সংসারে রাখতে পারেন। তাঁর ইচ্ছাতে জীবজগৎ হয়েছে। তিনি ইচ্ছাময় —

মুখুজ্জে (সহাস্যে) — তাঁর আবার ইচ্ছা কি? তাঁর কি কিছু অভাব আছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তাতেই বা দোষ কি? জল স্থির থাকলেও জল, — তরঙ্গ হলেও জল।

[জীবজগৎ কি মিথ্যা?]

"সাপ চুপ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ, — আবার তির্যগ্গতি হয়ে এঁকেবেঁকে চললেও সাপ।

“বাবু যখন চুপ করে আছে তখনও যে ব্যক্তি, — যখন কাজ করছে তখনও সেই ব্যক্তি।

“জীবজগৎকে বাদ দেবে কেমন করে — তাহলে যে ওজনে কম পড়ে। বেলের বিচি, খোলা বাদ দিলে সমস্ত বেলের ওজন পাওয়া যায় না।

“ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। বায়ুতে সুগন্ধ দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। সেই আদ্যাশক্তিতেই জীবজগৎ হয়েছে।”

[সমাধিযোগের উপায় — ক্রন্দন। ভক্তিযোগ ও ধ্যানযোগ]

মুখুজ্জে — কেন যোগভ্রষ্ট হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ‘গর্ভে ছিলাম যোগে ছিলাম, ভূমে পড়ে খেলাম মাটি। ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ি কিসে কাটি।’

“কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। মন থেকে ওই দুটি গেলেই যোগ। আত্মা — পরমাত্মা চুম্বক পাথর, জীবাত্মা যেন একটি ছুঁচ — তিনি টেনে নিলেই যোগ। কিন্তু ছুঁচে যদি মাটি মাখা থাকে চুম্বকে টানে না, মাটি সাফ করে দিলে আবার টানে। কামিনী-কাঞ্চন মাটি পরিষ্কার করতে হয়।”

মুখুজ্জে — কিরূপে পরিষ্কার হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁর জন্য ব্যকুল হয়ে কাঁদ — সেই জল মাটিতে লাগলে ধুয়ে ধুয়ে যাবে। যখন খুব পরিষ্কার হবে তখন চুম্বকে টেনে লবে। — যোগ তবেই হবে।

মুখুজ্জে — আহা কি কথা!

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁর জন্য কাঁদতে পারলে দর্শন হয়। যোগ সিদ্ধ হলেই সমাধি। কাঁদলে কুম্ভক আপনি হয়, তারপর সমাধি।

“আর-এক আছে ধ্যান। সহস্রারে শিব বিশেষরূপে আছেন। তাঁর ধ্যান। শরীর সরা, মন-বুদ্ধি জল। এই জলে সেই সচ্চিদানন্দ সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে। সেই প্রতিবিম্ব সূর্যের ধ্যান করতে করতে সত্য সূর্য তাঁর কৃপায় দর্শন হয়।

[সাধুসঙ্গ কর ও আমমোক্তারি (বকলমা) দাও]

কিন্তু সংসারী লোকের সর্বদাই সাধুসঙ্গ দরকার। সকলেরই দরকার। সন্ন্যাসীরও দরকার। তবে সংসারীদের বিশেষতঃ, রোগ লেগেই আছে — কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে সর্বদা থাকতে হয়।”

মুখুজ্জে — আজ্ঞা, রোগ লেগেই আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁকে আমমোক্তারি (বকলমা) দাও — যা হয় তিনি করুন। তুমি বিড়ালছানার মতো কেবল তাঁকে ডাকো — ব্যাকুল হয়ে। তার মা যেখানে তাকে রাখে — সে কিছু জানে না; কখনও বিছানার উপর রাখছে, কখনও হেঁশালে।

[প্রবর্তক শাস্ত্র পড়ে — সাধনার পর তবে দর্শন]

মুখুজ্জে — গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র পড়া ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — শুধু পড়লে শুনলে কি হবে? কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ খেয়েছে। ঈশ্বরকে দর্শন করা যায় — আবার তাঁর সঙ্গে আলাপ করা যায়।

“প্রথমে প্রবর্তক। সে পড়ে, শুনে। তারপর সাধক, — তাঁকে ডাকছে, ধ্যান চিন্তা করছে, নামগুণকীর্তন করছে। তারপর সিদ্ধ — তাঁকে বোধ বোধ করেছে, দর্শন করেছে। তারপর সিদ্ধের সিদ্ধ; যেমন চৈতন্যদেবের অবস্থা — কখনও বাৎসল্য, কখনও মধুরভাব।”

মণি, রাখাল, যোগীন লাটু প্রভৃতি ভক্তেরা এই সকল দেবদুর্লভ তত্ত্বকথা অবাক্ হইয়া শুনিতেছেন।

এইবার মুখুজ্জেরা বিদায় লইবেন। তাঁহারা প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুরও যেন তাঁদের সম্মানার্থ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মুখুজ্জে (সহাস্যে) — আপনার আবার উঠা বসা। —

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — আবার উঠা বসাতেই বা ক্ষতি কি? জল স্থির হলেও জল, — আর হেললে দুললেও জল। ঝড়ের এঁটো পাতা — হাওয়াতে যেদিকে লয়ে যায়। আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৬ই ডিসেম্বর 1883/12/16/ii

18.10 শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন ও বেদান্ত সম্বন্ধে গুহ্য ব্যাখ্যা — অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ — জগৎ কি মিথ্যা?

Identity of the Undifferentiated and Differentiated

জনাইয়ের মুখুজ্জেরা চলিয়া গেলেন। মণি ভাবিতেছেন, বেদান্তদর্শন মতে "সব স্বপ্নবৎ"। তবে জীবজগৎ, আমি — এ-সব কি মিথ্যা?

মণি একটু একটু বেদান্ত দেখিয়াছেন। আবার বেদান্তের অস্ফুট প্রতিধ্বনি কান্ট্‌, হেগেল প্রভৃতি জার্মান পণ্ডিতদের বিচার একটু পড়েছেন। কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দুর্বল মানুষের ন্যায় বিচার করেন নাই, জগন্মাতা তাঁহাকে সমস্ত দর্শন১ করাইয়াছেন। মণি তাই ভাবছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মণির সহিত একাকী পশ্চিমের গোল বারান্দায় কথা কহিতেছেন। সম্মুখে গঙ্গা — কুলকুল রবে দক্ষিণে প্রবাহিত হইতেছেন। শীতকাল — সূর্যদেব এখনও দেখা যাইতেছেন দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। যাঁহার জীবন বেদময় — যাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্য বেদান্তবাক্য — যাঁহার শ্রীমুখ দিয়া শ্রীভগবান কথা কন — যাঁহার কথামৃত লইয়া বেদ, বেদান্ত,

শ্রীভাগবত গ্রন্থাকার ধারণ করে, সেই অহেতুককৃপাসিন্ধু পুরুষ গুরুরূপ করিয়া কথা কহিতেছেন।

মণি — জগৎ কি মিথ্যা?

শ্রীরামকৃষ্ণ — মিথ্যা কেন? ও-সব বিচারের কথা।

“প্রথমটা, ‘নেতি’ ‘নেতি’ বিচার করবার সময়, তিনি জীব নন, জগৎ নন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নন, হয়ে যায়; — ‘এ-সব স্বপ্নবৎ’ হয়ে যায়। তারপর অনুলোম বিলোম। তখন তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন বোধ হয়।

“তুমি সিঁড়ি ধরে ধরে ছাদে উঠলে। কিন্তু যতক্ষণ ছাদবোধ ততক্ষণ সিঁড়িও আছে। যার উঁচুবোধ আছে, তার নিচুবোধও আছে।

“আবার ছাদে উঠে দেখলে — যে জিনিসে ছাদ তৈয়ের হয়েছে — ইট, চুন, সুড়কি — সেই জিনিসেই সিঁড়ি তৈয়ের হয়েছে।

“আর যেমন বেলের কথা বলেছি।

“যার অটল আছে তার টলও আছে।

“আমি যাবার নয়। ‘আমি ঘট’ যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ জীবজগৎও রয়েছে। তাঁকে লাভ করলে দেখা যায় তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। — শুধু বিচারে হয় না।

“শিবের দুই অবস্থা। যখন সমাধিস্থ — মহাযোগে বসে আছেন — তখন আত্মারাম। আবার যখন সে অবস্থা থেকে নেবে আসেন — একটু ‘আমি’ থাকে তখন ‘রাম’ ‘রাম’ করে নৃত্য করেন!”

ঠাকুর শিবের অবস্থা বর্ণনা করিয়া কি নিজের অবস্থা ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন?

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর জগন্মাতার নাম ও তাঁহার চিন্তা করিতেছেন। ভক্তেরাও নির্জনে গিয়া যে যার ধ্যানাদি করিতে লাগিলেন। এদিকে ঠাকুরবাড়িতে মা-কালীর মন্দিরে, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে ও দ্বাদশ শিবমন্দিরে আরতি হইতে লাগিল।

আজ কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতিয়া তিথি। সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রোদয় হইল। সে আলো মন্দির শীর্ষ, চতুর্দিকের তরুলতা ও মন্দিরের পশ্চিমে ভাগীরথীবক্ষে পড়িয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। এই সময় সেই পূর্বপরিচিত ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। মণি মেঝেতে বসিয়া আছেন। মণি বৈকালে বেদান্ত সম্বন্ধে যে-কথার অবতারণা করিয়াছিলেন ঠাকুর আবার সেই কথাই কহিতেছেন।

[সব চিন্ময়দর্শন — মথুরকে খাজাঞ্চীর পত্র লেখা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — জগৎ মিথ্যা কেন হবে? ও-সব বিচারের কথা। তাঁকে দর্শন হলে তখন বোঝা যায় যে তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন।

“আমায় মা কালীঘরে দেখিয়া দিলেন যে মা-ই সব হয়েছেন। দেখিয়া দিলেন সব চিন্ময়! — প্রতিমা চিন্ময়! — বেদী চিন্ময়! — কোশাকুশি চিন্ময়! — চৌকাট চিন্ময়! — মার্বেলের পাথর —— সব চিন্ময়!

“ঘরের ভিতর দেখি —— সব যেন রসে রয়েছে! সচ্চিদানন্দ রসে।

“কালীঘরের সম্মুখে একজন দুষ্ট লোককে দেখলাম, — কিন্তু তারও ভিতরে তাঁর শক্তি জ্বলজ্বল করছে দেখলাম!

“তাইতো বিড়ালকে ভোগের লুচি খাইয়েছিলাম। দেখলাম মা-ই সব হয়েছেন —— বিড়াল পর্যন্ত। তখন খাজাঞ্চী সেজোবাবুকে চিঠি লিখলে যে ভটচার্জি মহাশয় ভোগের লুচি বিড়ালদের খাওয়াচ্ছেন। সেজোবাবু আমার অবস্থা বুঝতো। পত্রের উত্তরে লিখলে, ‘উনি যা করেন তাতে কোন কথা বলো না।’

“তাঁকে লাভ করলে এইগুলি ঠিক দেখা যায়। তিনিই জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন।

“তবে যদি তিনি ‘আমি’ একেবারে পুঁছে দেন তখন যে কি হয় মুখে বলা যায় না। রামপ্রসাদ যেমন বলেছেন ——

‘তখন তুমি ভাল কি আমি ভাল সে তুমিই বুঝবে।’

“সে অবস্থাও আমার এক-একবার হয়।

“বিচার করে একরকম দেখা যায়, — আর তিনি যখন দেখিয়ে দেন তখন আর একরকম দেখা যায়।”

১ Revelation: Transcendental Perception: God-vision.

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৭ই ডিসেম্বর 1883/12/17

18.11 জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন —— উপায় প্রেম

পরদিন (১৭ই ডিসেম্বর) সোমবার, বেলা আটটা হইল। ঠাকুর সেই ঘরে বসিয়া আছেন। রাখাল, লাটু প্রভৃতি ভক্তেরাও আছেন। মণি মেঝেতে বসিয়া আছেন। শ্রীযুক্ত মধু ডাক্তারও আসিয়াছেন। তিনি ঠাকুরের কাছে সেই ছোট খাটটির উপরেই বসিয়া আছেন। মধু ডাক্তার প্রবীণ —— ঠাকুরের অসুখ হইলে প্রায় তিনি আসিয়া দেখেন। বড় রসিক লোক।

মণি ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রণামনন্তর উপবেশন করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — কথাটা এই —— সচ্চিদানন্দ প্রেম।

[ঠাকুরের সীতামূর্তি-দর্শন —— গৌরী পণ্ডিতের কথা]

“কিরূপ প্রেম? ঈশ্বরকে কিরূপ ভালবাসতে হবে? গৌরী বলত রামকে জানতে গেলে সীতার মতো হতে হয়; ভগবানকে জানতে ভগবতীর মতো হতে হয়, — ভগবতী যেমন শিবের জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন সেইরূপ তপস্যা করতে হয়; পুরুষকে জানতে গেলে প্রকৃতভাবে আশ্রয় করতে হয় — সখীভাব, দাসীভাব, মাতৃভাব।

“আমি সীতামূর্তি দর্শন করেছিলাম। দেখলাম সব মনটা রামেতেই রয়েছে। যোনি, হাত, পা, বসন-ভূষণ কিছুতেই দৃষ্টি নাই। যেন জীবনটা রামময় — রাম না থাকলে, রামকে না পেলে, প্রাণে বাঁচবে না!”

মণি — আজ্ঞা হাঁ, — যেন পাগলিনী।

শ্রীরামকৃষ্ণ — উন্মাদিনী! — ইয়া। ঈশ্বরকে লাভ করতে গেলে পাগল হতে হয়।

“কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকলে হয় না। কামিনীর সঙ্গে রমণ, — তাতে কি সুখ! ঈশ্বরদর্শন হলে রমণসুখের কোটিগুণ আনন্দ হয়। গৌরী বলত, মহাভাব হলে শরীরের সব ছিদ্র — লোমকূপ পর্যন্ত — মহাযোনি হয়ে যায়। এক-একটি ছিদ্রে আত্মার সহিত রমণসুখ বোধ হয়।”

[গুরু পূর্ণজ্ঞানী হবেন]

শ্রীরামকৃষ্ণ — ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। গুরুর মুখে শুনে নিতে হয় — কি করলে তাঁকে পাওয়া যায়।

“গুরু নিজে পূর্ণজ্ঞানী হলে তবে পথ দেখিয়ে দিতে পারে।

“পূর্ণজ্ঞান হলে বাসনা যায়, — পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়। দত্তাত্রেয় আর জড়ভরত — এদের বালকের স্বভাব হয়েছিল।”

মণি — আজ্ঞে, এদের খপর আছে; — আরও এদের মতো কত জ্ঞানী লোক হয়ে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ! জ্ঞানীর সব বাসনা যায়, — যা থাকে তাতে কোন হানি হয় না। পরশমণিকে ছুঁলে তরবার সোনা হয়ে যায়, — তখন আর সে তরবারে হিংসার কাজ হয় না। সেইরূপ জ্ঞানীর কাম-ক্রোধের কেবল ভঙ্গীটুকু থাকে। নামমাত্র। তাতে কোন অনিষ্ট হয় না।

মণি — আপনি যেমন বলেন, জ্ঞানী তিনগুণের অতীত হয়। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ — কোন গুণেরই বশ নন। এরা তিনজনেই ডাকাত।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ওইগুলি ধারণা করা চাই।

মণি — পূর্ণজ্ঞানী পৃথিবীতে বোধ হয় তিন-চারজনের বেশি নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেন, পশ্চিমের মঠে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী দেখা যায়।

মণি — আজ্ঞা, সে সন্ন্যাসী আমিও হতে পারি!

শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথায় কিয়ৎক্ষণ মণিকে এক দৃষ্টে দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — কি, সব ছেড়ে?

মণি — মায়া না গেলে কি হবে? মায়াকে যদি জয় না করতে পারে শুধু সন্ন্যাসী হয়ে কি হবে?

সকলেই কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া আছেন।

[ত্রিগুণাতীত ভক্ত যেমন বালক]

মণি — আজ্ঞা, ত্রিগুণাতীত ভক্তি কাকে বলে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — সে ভক্তি হলে সব চিন্ময় দেখে। চিন্ময় শ্যাম। চিন্ময় ধাম। ভক্তও চিন্ময়। সব চিন্ময়। এ-ভক্তি কম লোকের হয়।

ডাক্তার মধু (সহাস্যে) — ত্রিগুণাতীত ভক্তি — অর্থাৎ ভক্ত কোন গুণের বশীভূত নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — হাঁ! যেমন পাঁচ বছরের বালক — কোন গুণের বশ নয়।

মধ্যাহ্নে সেবার পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একটু বিশ্রাম করিতেছেন। শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক আসিয়া প্রণাম করিলেন ও মেঝেতে আসন গ্রহণ করিলেন।

মণিও মেঝেতে বসিয়া আছেন। ঠাকুর শুইয়া শুইয়া মণি মল্লিকের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটি একটি কথা কহিতেছেন।

মণি মল্লিক — আপনি কেশব সেনকে দেখতে গিছলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ — এখন কেমন আছেন?

মণি মল্লিক — কিছু সারেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখলাম বড় রাজসিক, — অনেকক্ষণ বসিয়েছিল, — তারপর দেখা হল।

ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন ও ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

[শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত — ঠাকুর “রাম রাম” করিয়া পাগল]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — আমি ‘রাম’ ‘রাম’ করে পাগল হয়েছিলাম। সন্ন্যাসীর ঠাকুর রামলালকে লয়ে লয়ে বেড়াতাম। তাকে নাওয়াতাম, খাওয়াতাম, শোয়াতাম। যেখানে যাব, — সঙ্গে করে লয়ে যেতাম। “রামলালা রামলালা” করে পাগল হয়ে গেলাম।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৮ই ডিসেম্বর 1883/12/18/i

18.12 দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদাই সমাধিস্থ; কেবল রাখালাদি ভক্তদের শিক্ষার জন্য তাঁহাদের লইয়া ব্যস্ত — কিসে চৈতন্য হয়।

তাঁহার ঘরের পশ্চিমের বারান্দায় সকাল বেলা বসিয়া আছেন। আজ মঙ্গলবার, অগ্রহায়ণ চতুর্থী; ১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভক্তি ও বৈরাগ্যের কথায় তিনি তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন। রাখালাদি ছোকরা ভক্তদের দেখিয়া বলিতেছেন, তিনি ভাল লোক; কিন্তু যারা সংসারে না ঢুকিয়া ছেলেবেলা থেকে শুকদেবাদির মতো অহর্নিশ ঈশ্বরের চিন্তা করে, কৌমারবৈরাগ্যবান, তারা ধন্য!

“সংসারী লোকদের একটা না একটা কামনা বাসনা থাকে। এদিকে ভক্তিও বেশ দেখা যায়। সেজোবাবু কি একটা মোকদ্দমায় পড়েছিল — মা-কালীর কাছে, আমায় বলছে, বাবা, এই অর্ঘ্যটি মাকে দাও তো — আমি উদার মনে দিলাম।

“কিন্তু কেমন বিশ্বাস যে আমি দিলেই হবে।

“রতির মার এদিকে কত ভক্তি! প্রায় এসে কত সেবা। রতির মা বৈষ্ণবী। কিছুদিন পরে যাই দেখলে আমি মা-কালীর প্রসাদ খাই — অমনি আর এলো না! একঘেয়ে! লোককে দেখলে প্রথম প্রথম চেনা যায় না।”

শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের ভিতর পূর্বদিকের দরজার নিকট বসিয়া আছেন। শীতকাল, গায়ে মোলস্কিনের র্যাপার। হঠাৎ সূর্যদর্শন ও সমাধিস্থ। নিমেষশূন্য! বাহ্যশূন্য!

এই কি গায়ত্রী মন্ত্রের সার্থকতা — "তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি"?

অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইল। রাখাল, হাজরা, মাস্টার প্রভৃতি কাছে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি) — সমাধি, ভাব, প্রেমের বটে। ও-দেশে (শ্যামবাজারে) নটবর গোস্বামীর বাড়িতে কীর্তন হচ্ছিল — শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ দর্শন করে সমাধিস্থ হলাম! বোধ হল আমার লিঙ্গ শরীর (সূক্ষ্ম শরীর) শ্রীকৃষ্ণের পায় পায় বেড়াচ্ছে!

"জোড়াসাঁকো হরিসভায় ওইরূপ কীর্তনের সময় সমাধি হয়ে বাহ্যশূন্য! সেদিন দেহত্যাগের সম্ভাবনা ছিল।"

শ্রীরামকৃষ্ণ স্নান করিতে গেলেন। স্নানান্তর ওই গোপী প্রেমের কথা বলিতেছেন।

(মণি প্রভৃতির প্রতি) — "গোপীদের ওই টানটুকু নিতে হয়!

"এই সব গান গাইবে:

সখি, সে বন কতদূর!
(যেখানে আমার শ্যামসুন্দর)
(আর চলিতে যে নারি!)

গান — ঘরে যাবই যে না গো!

যে ঘরে কৃষ্ণ নামটি করা দায়। (সঙ্গিনীয়া)”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৮ই ডিসেম্বর 1883/12/18/ii

18.13 ঠনঠনিয়া কালীমন্দিরেতে

শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালের জন্য ৺সিদ্ধেশ্বরীকে ডাব-চিনি মানিয়াছেন। মণিকে বলিতেছেন, “তুমি ডাব, চিনির দাম দিবে।”

বৈকালে শ্রীরামকৃষ্ণ রাখাল, মণি প্রভৃতির সঙ্গে ঠনঠনের ৺সিদ্ধেশ্বরী-মন্দির অভিমুখে গাড়ি করিয়া আসিতেছেন। পথে সিমুলিয়ার বাজার, সেখানে ডাব, চিনি কেনা হইল।

মন্দিরে আসিয়া ভক্তদের বলিতেছেন, একটা ডাব কেটে চিনি দিয়ে মার কাছে দাও।

যখন মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন পূজারীরা বন্ধু লইয়া মা-কালীর সম্মুখে তাস খেলিতেছিলেন। ঠাকুর দেখিয়া ভক্তদের বলিতেছেন, দেখেছ, এ-সব স্থানে তাস খেলা! এখানে ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়।

এইবার শ্রীরামকৃষ্ণ যদু মল্লিকের বাটীতে আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে অনেকগুলি বাবু বসিয়া আছেন।

যদু বলিতেছেন, ‘এস’ ‘এস’। পরস্পর কুশল প্রশ্নের পর, শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তুমি অত ভাঁড়, মোসাহেব রাখ কেন?

যদু (সহাস্যে) — তুমি উদ্ধার করবে বলে। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ —– মোসাহেবরা মনে করে বাবু তাদের টাকা ঢেলে দেবে। কিন্তু বাবুর কাছে আদায় করা বড় কঠিন। একটা শৃগাল একটা বলদকে দেখে তার সঙ্গ আর ছাড়ে না। সে চরে বেড়ায়, ওটাও সঙ্গে সঙ্গে। শৃগালটা মনে করেছে ওর অণ্ডের কোষ ঝুলছে সেইটে কখন না কখন পড়ে যাবে আর আমি খাব। বলদটা কখন ঘুমোয়, সেও কাছে ঘুমোয়; আর যখন উঠে চড়ে বেড়ায়, সেও সঙ্গে সঙ্গে থাকে। কতদিন এইরূপে যায়, কিন্তু কোষটা পড়ল না; তখন সে নিরাশ হয়ে চলে গেল। (সকলের হাস্য) মোসাহেবের এইরূপই অবস্থা।

যদু ও তাঁহার মাতাঠাকুরানী শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তদের জলসেবা করাইলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৯শে ডিসেম্বর 1883/12/19/i

18.14 বিল্বমূলে ও পঞ্চবটীতলায় শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিল্ববৃক্ষের নিকট মণির সহিত কথা কহিতেছেন। বেলা প্রায় নয়টা হইবে।

আজ বুধবার, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩ (৫ই পৌষ, ১২৯০)। কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি।

বিল্বতল ঠাকুরের সাধনভূমি। অতি নির্জন স্থান। উত্তরে বারুদখানা ও প্রাচীর। পশ্চিমে ঝাউগাছগুলি সর্বদাই প্রাণ-উদাসকারী সোঁ-সোঁ শব্দ করিতেছে, পরেই ভাগীরথী। দক্ষিণে পঞ্চবটী দেখা যাইতেছে। চতুর্দিকে এত গাছপালা, দেবালয়গুলি দেখা যাইতেছে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করলে কিন্তু হবে না।

মণি —— কেন? বশিষ্ঠদেব তো রামচন্দ্রকে বলেছিলেন, রাম, সংসার যদি ঈশ্বরছাড়া হয়, তাহলে সংসারত্যাগ করো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈষৎ হাসিয়া) — সে রাবণবধের জন্য! তাই রাম সংসারে রইলেন —— বিবাহ করলেন।

মণি নির্বাক্ হইয়া কাষ্ঠের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া যাইবার জন্য পঞ্চবটী অভিমুখে গমন করিলেন। বেলা ৯টা হইয়া গিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মণির কথা চলিতেছে পঞ্চবটীমূলে।

মণি (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — জ্ঞান ভক্তি দুই-ই কি হয় না?

শ্রীরামকৃষ্ণ — খুব উঁচু ঘরের হয়। ঈশ্বরকোটির হয় — যেমন চৈতন্যদেবের। জীবকোটিদের আলাদা কথা।

“আলো (জ্যোতিঃ) পাঁচপ্রকার। দীপ আলোক, অন্যান্য অগ্নির আলো, চান্দ্র আলো, সৌর আলো ও চান্দ্র সৌর একাধারে। ভক্তি চন্দ্র; জ্ঞান সূর্য।

“কখনও কখনও আকাশে সূর্য অস্ত না যেতে যেতে চন্দ্রোদয় দেখা যায়। অবতারাদির ভক্তিচন্দ্র জ্ঞানসূর্য একাধারে দেখা যায়।

“মনে করলেই কি সকলের জ্ঞান ভক্তি একাধারে দুই হয়? আধার বিশেষ। কোন বাঁশের ফুটো বেশি, কোন বাঁশের খুব সরু ফুটো। ঈশ্বর বস্তু ধারণা কি সকল আধারে হয়। একসের ঘটিতে কি দুসের দুধ ধরে!”

মণি — কেন, তাঁর কৃপায়? তিনি কৃপা করলে তো ছুঁচের ভিতর উট যেতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিন্তু কৃপা কি অমনি হয়? ভিখারি যদি পয়সা চায়, দেওয়া যায়। কিন্তু একেবারে যদি রেলভাড়া চেয়ে বসে?

মণি নিঃশব্দে দণ্ডায়মান। শ্রীরামকৃষ্ণও চুপ করিয়া আছেন। হঠাৎ বলিতেছেন, হাঁ বটে, কারু কারু আধারে তাঁর কৃপা হলে হতে পারে; দুই-ই হতে পারে।

[‘নিরাকার সাধনা বড় কঠিন’]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীতলায় মণির সহিত কথা কহিতেছেন বেলা প্রায় ১০টা হইল।

মণি — আজ্ঞা, নিরাকার সাধন কি হয় না?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হবে না কেন? ও-পথ বড় কঠিন১। আগেকার ঋষিরা অনেক তপস্যার দ্বারা বোধে বোধ করত, — ব্রহ্ম কি বস্তু অনুভব করত। ঋষিদের খাটুনি কত ছিল। — নিজেদের কুটির থেকে সকালবেলা বেরিয়া যেত, — সমস্ত দিন তপস্যা করে সন্ধ্যার পর আবার ফিরত। তারপর এসে একটু ফলমূল খেত।

“এ-সাধনে একেবারে বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে হবে না। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ — এসব বিষয় মনে আদপে থাকবে না। তবে শুদ্ধমন হবে। সেই শুদ্ধমনও যা শুদ্ধ আত্মাও তা। মনেতে কামিনী-কাঞ্চন একেবারে থাকবে না —

“তখন আর-একটি অবস্থা হয়। ‘ঈশ্বরই কর্তা আমি অকর্তা’। আমি না হলে চলবে না এরূপ জ্ঞান থাকবে না — সুখে দুঃখে।

“একটি মঠের সাধুকে দুষ্টলোকে মেরেছিল, — সে অজ্ঞান হয়ে গিছল। চৈতন্য হলে যখন জিজ্ঞাসা করলে কে তোমায় দুধ খাওয়াচ্ছে। সে বলেছিল, যিনি আমায় মেরেছেন তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন।”

মণি — আজ্ঞা হাঁ, জানি।

[স্থিতসমাধি ও উন্মনাসমাধি]

শ্রীরামকৃষ্ণ — না, শুধু জানলে হবে না; ধারণা করা চাই।

“বিষয়চিন্তা মনকে সমাধিস্থ হতে দেয় না।

”একেবারে বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ হলে স্থিতসমাধি হয়। স্থিতসমাধিতে দেহত্যাগ হতে পারে, কিন্তু ভক্তি-ভক্ত নিয়ে একটু থাকবার বাসনা আছে। তাই দেহের উপরেও মন আছে।

“আর এক আছে উন্মনাসমাধি। ছড়ানো মন হঠাৎ কুড়িয়ে আনা। ওটা তুমি বুঝেছ?”

মণি — আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ছড়ানো মন হঠাৎ কুড়িয়ে আনা। বেশিক্ষণ এ-সমাধি থাকে না, বিষয়চিন্তা এসে ভঙ্গ হয় — যোগীর যোগ ভঙ্গ হয়।

“ও-দেশে দেয়ালের ভিতর গর্তে নেউল থাকে। গর্তে যখন থাকে বেশ আরামে থাকে। কেউ কেউ ন্যাজে ইট বেঁধে দেয় — তখন ইটের জোরে গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়ে। যতবার গর্তের ভিতর গিয়ে আরামে বসবার চেষ্টা করে — ততবারই ইটের জোরে বাইরে এসে পড়ে। বিষয়চিন্তা এমনি — যোগীকে যোগভ্রষ্ট করে।

“বিষয়ী লোকদের এক-একবার সমাধির অবস্থা হতে পারে। সূর্যোদয়ে পদ্ম ফোটে, কিন্তু সূর্য মেঘেতে ঢাকা পড়লে আবার পদ্ম মুদিত হয়ে যায়। বিষয় মেঘ।”

মণি — সাধন করলে জ্ঞান আর ভক্তি দুই কি হয় না?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ভক্তি নিয়ে থাকলে দুই-ই হয়। দরকার হয়, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান দেন। খুব উঁচু ঘর হলে একাধারে দুই-ই হতে পারে।

প্রণামপূর্বক মণি বেলতলার দিকে যাইতেছেন।

বেলতলা হইতে ফিরিতে দুপ্রহর হইয়া গিয়াছে। দেরি দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বেলতলার দিকে আসিতেছেন। মণি, সতরঞ্চি, আসন, জলের ঘটি লইয়া ফিরিতেছেন, পঞ্চবটীর কাছে ঠাকুরের সহিত দেখা হইল। তিনি অমনি ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — আমি যাচ্ছিলাম তোমায় খুঁজতে। ভাবলাম এত বেলা, বুঝি পাঁচিল ডিঙিয়ে পালালো! তোমার চোখ তখন যা দেখেছিলাম —

ভাবলাম বুঝি নারাণ শাস্ত্রীর মতো পালালো। তারপর আবার ভাবলাম, না সে পালাবে না; সে অনেক ভেবে-চিন্তে কাজ করে।

১ ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌।
  অব্যক্তা হি গর্তির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।। [গীতা, ১২।৫]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ১৯শে ডিসেম্বর 1883/12/19/ii

18.15 শ্রীরামকৃষ্ণ মণি প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

আবার রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ মণির সহিত কথা কহিতেছেন। রাখাল, লাটু, হরিশ প্রভৃতি আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — আচ্ছা, কেহ কেহ কৃষ্ণলীলার অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা করে; তুমি কি বল?

মণি —— নানা মত, তা হলেই বা। ভীষ্মদেবের কথা আপনি বলেছেন —— শরশয্যায় দেহত্যাগের সময় বলেছিলেন, ‘কেন কাঁদছি? যন্ত্রণার জন্য নয়। যখন ভাবছি যে, সাক্ষাৎ নারায়ণ অর্জুনের সারথি হয়েছিলেন অথচ পাণ্ডবদের এত বিপদ, তখন তাঁর লীলা কিছুই বুঝতে পারলাম না —— তাই কাঁদছি।’

“আবার হনুমানের কথা আপনি বলেছিলেন — হনুমান বলতেন, ‘আমি বার, তিথি, নক্ষত্র — এ-সব জানি না, আমি কেবল এক রামচিন্তা করি।’

“আপনি তো বলেছেন, দুটি জিনিস বই তো আর কিছু নাই — ব্রহ্ম আর শক্তি। আর বলেছেন, জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) হলে ওই দুইটি এক বোধ হয়; যে একের দুই নাই।”

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ বটে; চীজ নেবে তা কাঁটাবন দিয়েই হউক আর ভাল রাস্তা দিয়ে চলে গিয়েই হউক।

“নানা মত বটে। ন্যাংটা বলত, মতের জন্য সাধুসেবা হল না। এক জায়গায় ভাণ্ডারা হচ্ছিল। অনেক সাধু সম্প্রদায়; সবাই বলে আমাদের সেবা আগে, তারপর অন্য সম্প্রদায়। কিছুই মিমাংসা হল না; শেষে সকলে চলে গেল! আর বেশ্যাদের খাওয়ানো হল!”

মণি — তোতাপুরী খুব লোক।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাজরা বলে অমনি (সামান্য)। না বাবু, কথায় কাজ নাই — সবাই বলে আমার ঘড়ি ঠিক চলছে।

“দেখ, নারাণ শাস্ত্রীর খুব বৈরাগ্য হয়েছিল। অত বড় পণ্ডিত — স্ত্রী ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। মন থেকে একেবারে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করলে তবে যোগ হয়। কারু কারু যোগীর লক্ষণ দেখা যায়।

“তোমায় ষট্‌চক্রের বিষয় কিছু বলে দিতে হবে। যোগীরা ষট্‌চক্র ভেদ করে তাঁর কৃপায় তাকে দর্শন করে। ষট্‌চক্র শুনেছ?”

“মণি — বেদান্তমতে সপ্তভূমি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বেদান্ত নয়, বেদ মত। ষট্‌চক্র কিরকম জান? সূক্ষ্মদেহের ভিতর সব পদ্ম আছে — যোগীরা দেখতে পায়। যেমন মোমের গাছের ফলপাতা।

মণি — আজ্ঞা হাঁ, যোগীরা দেখতে পায়। একটা বইয়ে আছে, একরকম কাচ (Magnifier) আছে, তার ভিতর দিয়ে দেখলে খুব ছোট জিনিস বড় দেখায়। সেইরূপ যোগের দ্বারা ওই সব সূক্ষ্মপদ্ম দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীর ঘরে থাকিতে বলিয়াছেন। মণি ওই ঘরে রাত্রিবাস করিতেছেন।

প্রত্যূষে ওই ঘরে একাকী গান গাহিতেছেন:

গৌর হে আমি সাধন-ভজনহীন
পরশে পবিত্র করো আমি দীনহীন ।।
চরণ পাবো পাবো বলে হে,
(চরণ তো আর পেলাম না, গৌর!)
আমার আশায় আশায় গেল দিন!

হঠাৎ জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান। “পরশে পবিত্র করো আমি দীনহীন!” — এই কথা শুনিয়া তাঁহার চক্ষু, কি আশ্চর্য, অশ্রুপূর্ণ হইয়াছে।

আবার একটি গান হইতেছে:

আমি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব
    শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
আমি যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে,
    যেখানে নিঠুর হরি ।।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে রাখাল বেড়াইতেছেন।

পরদিন শুক্রবার, ২১শে ডিসেম্বর (৭ই পৌষ, কৃষ্ণা অষ্টমী)। সকালবেলা শ্রীরামকৃষ্ণ একাকী বেলতলায় মণির সঙ্গে অনেক কথা কহিতেছেন। সাধনের নানা গুহ্যকথা, কামিনী-কাঞ্চনত্যাগের কথা। আর কখনও কখনও মনই গুরু হয় — এ-সব কথা বলিতেছেন।

আহারের পর পঞ্চবটীতে আসিয়াছেন — মনোহর পীতাম্বরধারী! পঞ্চবটীতে দু-তিনজন বাবাজী বৈষ্ণব আসিয়াছেন — একজন বাউল। তিনি বৈষ্ণবকে বলছেন, তোর ডোরকৌপীনের স্বরূপ বল দেখি!

অপরাহ্নে নানকপন্থী সাধু আসিয়াছেন। হরিশ, রাখালও আছেন। সাধু নিরাকারবাদী। ঠাকুর তাঁহাকে সাকারও চিন্তা করিতে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সাধুকে বলিতেছেন, ডুব দাও; উপর উপর ভাসলে রত্ন পাওয়া যায় না। আর ঈশ্বর নিরাকারও বটেন আবার সাকার। সাকার চিন্তা করলে শীঘ্র ভক্তি হয়। তখন আবার নিরাকার চিন্তা। যেমন পত্র পড়ে নিয়ে সে পত্র ফেলে দেয়। তারপর লেখা অনুসারে কাজ করে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২২শে ডিসেম্বর 1883/12/22/i

18.16 দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে — বলরামের পিতা প্রভৃতি

আজ শনিবার, ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। এখন বেলা নয়টা হইবে। বলরামের পিতা আসিয়াছেন। রাখাল, হরিশ, মাস্টার, লাটু এখানে বাস করিতেছেন। শ্যামপুকুরের দেবেন্দ্র ঘোষ আসিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন।

একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিতেছেন — ভক্তি কিসে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের পিতা প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি) — এগিয়ে পড়। সাত দেউড়ির পর রাজা আছেন। সব দেউড়ি পার হয়ে গেলে তবে তো রাজাকে দেখবে।

“আমি চানকে অন্নপূর্ণা প্রতিষ্ঠার সময় দ্বারিকবাবুকে বলেছিলাম, (১৮৭৪-৭৫) বড় দীঘিতে বড় মাছ আছে গভীর জলে। চার ফেলে, সেই চারের গন্ধে ওই বড় মাছ আসবে। এক-একবার ঘাই দেবে। প্রেম-ভক্তিরূপ চার।”

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও অবতারতত্ত্ব]

“ঈশ্বর নরলীলা করেন। মানুষে তিনি অবতীর্ণ হন, যেমন শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, চৈতন্যদেব।

“আমি কেশব সেনকে বলেছিলাম যে, মানুষের ভিতর তিনি বেশি প্রকাশ। মাঠের আলোর ভিতে ছোট ছোট গর্ত থাকে; তাহাদের বলে ঘুটী। ঘুটীর ভিতর মাছ, কাঁকড়া জমে থাকে। মাছ, কাঁকড়া খুঁজতে গেলে ওই ঘুটীর ভিতর খুঁজতে হয়; ঈশ্বরকে খুঁজতে হলে অবতারের ভিতর খুঁজতে হয়।

“ওই চৌদ্দপোয়া মানুষের ভিতরে জগন্মাতা প্রকাশ হন। গানে আছে —

শ্যামা মা কি কল করেছে!
চৌদ্দপোয়া কলের ভিতরি কত রঙ্গ দেখাতেছে!
আপনি থাকি কলের ভিতরি কল ঘুরায় ধরে কলডুরি,
কল বলে আপনি ঘুরি জানে না কে ঘোরাতেছে।

“কিন্তু ঈশ্বরকে জানতে হলে, অবতারকে চিনতে গেলে, সাধনের প্রয়োজন। দীঘিতে বড় বড় মাছ আছে, চার ফেলতে হয়। দুধেতে মাখন আছে, মন্থন করতে

হয়। সরিষার ভিতর তেল আছে, সরিষাকে পিষতে হয়। মেথিতে হাত রাঙা হয়, মেথি বাটতে হয়।”

[নিরাকার সাধনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ]

ভক্ত (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — আচ্ছা, তিনি সাকার না নিরাকার?

শ্রীরামকৃষ্ণ —— দাঁড়াও, আগে কলকাতায় যাও তবে তো জানবে, কোথায় গড়ের মাঠ, কোথায় এসিয়াটিক সোসাইটি, কোথায় বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক!

“খড়দা বামুনপাড়া যেতে হলে আগে তো খড়দায় পোঁছুতে হবে।

“নিরাকার সাধনা হবে না কেন; তবে বড় কঠিন। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না হলে হয় না! বাহিরে ত্যাগ আবার ভিতরে ত্যাগ। বিষয়বুদ্ধির লেশ থাকলে হবে না।

“সাকার সাধনা সোজা। তবে তেমন সোজা নয়।

“নিরাকার সাধনা, জ্ঞানযোগের সাধনা, ভক্তদের কাছে বলতে নাই। অনেক কষ্টে একটু ভক্তি হচ্ছে, সব স্বপ্নবৎ বললে ভক্তির হানি হয়।

“কবীর দাস নিরাকারবাদী। শিব, কালী, কৃষ্ণ এদের মানত না। কবীর বলত, কালী চাল কলা খান; কৃষ্ণ গোপীদের হাততালিতে বানর নাচ নাচতেন। (সকলের হাস্য)

“নিরাকার সাধক হয়তো আগে দশভুজা দর্শন করলে; তারপর চতুর্ভুজ, তারপর দ্বিভুজ গোপাল; শেষে অখণ্ড জ্যোতিঃ দর্শন করে তাইতে লীন।

“দত্তাত্রেয়, জড়ভরত ব্রহ্মদর্শনের পর আর ফের নাই — এরূপ আছে।

“একমতে আছে শুকদেব সেই ব্রহ্ম-সমুদ্রের একটি বিন্দুমাত্র আস্বাদ করেছিলেন। সমুদ্রের হিল্লোল-কল্লোল দর্শন, শ্রবণ করেছিলেন; কিন্তু সমুদ্রে ডুব দেন নাই।

“একজন ব্রহ্মচারী বলেছিল, কেদারের ওদিকে গেলে শরীর থাকে না। সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের পর আর শরীর থাকে না। একুশ দিনে মৃত্যু।

“প্রাচীরের ওপারে অনন্ত মাঠ। চারজন বন্ধু প্রাচীরের ওপারে কি আছে দেখতে চেষ্টা করলে। এক-একজন প্রাচিরের উপর উঠে, ওই মাঠ দর্শন করে হা হা করে হেসে অপরপারে পড়ে যেতে লাগল। তিনজন কোন খপর দিলে না। একজন শুধু খপর দিলে। তার ব্রহ্মজ্ঞানের পরও শরীর রইল, লোকশিক্ষার জন্য। যেমন অবতার আদির।

“হিমালয়ের ঘরে পার্বতী জন্মগ্রহণ করলেন; আর পিতাকে তাঁর নানান রূপ দেখাতে লাগলেন। হিমালয় বললেন, মা, এ-সব রূপ তো দেখলাম। কিন্তু তোমার একটি ব্রহ্মস্বরূপ আছে — সেইটি একবার দেখাও। পার্বতী বললেন, বাবা, তুমি যদি ব্রহ্মজ্ঞান চাও, তাহলে সংসারত্যাগ করে সাদুসঙ্গ করতে হবে।

“হিমালয় কোনমতে ছাড়েন না। তখন পার্বতী একবার দেখালেন। দেখতেই গিরিরাজ একেবারে মূর্ছিত।”

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তিযোগ]

“এ যা বললুম সব বিচারের কথা। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা — এই বিচার। সব স্বপ্নবৎ! বড় কঠিন পথ। এ-পথে তাঁর লীলা স্বপ্নবৎ, মিথ্যা হয়ে যায়। আবার ‘আমি’টাও উড়ে যায়। এ-পথে অবতারও মানে না। বড় কঠিন। এ-সব বিচারের কথা ভক্তদের বেশি শুনতে নাই।

“তাই ঈশ্বর অবতীর্ণ হয়ে ভক্তির উপদেশ দেন। শরণাগত হতে বলেন। ভক্তি থেকে তাঁর কৃপায় সব হয় — জ্ঞান, বিজ্ঞান সব হয়।

“তিনি লীলা করছেন — তিনি ভক্তের অধীন।

“কোন কলের ভক্তিডোরে আপনি শ্যামা বাঁধা আছে!

“কখনও ঈশ্বর চুম্বক হন, ভক্ত ছুঁচ হয়। আবার কখনও ভক্ত চুম্বক হয়, তিনি ছুঁচ হন। ভক্ত তাঁকে টেনে লয় — তিনি ভক্তবৎসল, ভক্তাধীন।

“এক মতে আছে যশোদাদি গোপীগণ পূর্বজন্মে নিরাকারবাদী ছিলেন। তাঁদের তাতে তৃপ্তি হয় নাই। বৃন্দাবনলীলায় তাই শ্রীকৃষ্ণকে লয়ে আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণ একদিন বললেন, তোমাদের নিত্যধাম দর্শন করাবো, এসো যমুনায় স্নান করতে যাই। তাঁরা যাই ডুব দিয়েছেন — একেবারে গোলকদর্শন। আবার তারপর অখণ্ড জ্যোতিঃ দর্শন। যশোদা তখন বললেন, কৃষ্ণ রে ও-সব আর দেখতে চাই না — এখন তোর সেই মানুষরূপ দেখবো! তোকে কোলে করবো, খাওয়াবো।

“তাই অবতারে তিনি বেশি প্রকাশ। অবতারের শরীর থাকতে থাকতে তাঁর পূজা সেবা করতে হয়।

‘সে যে কোঠার ভিতর চোরকুঠরি
    ভোর হলে সে লুকাবে রে।’

“অবতারকে সকলে চিনতে পারে না। দেহধারণ করলে রোগ, শোক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা সবই আছে, মনে হয়, আমাদেরই মতো। রাম সীতার শোকে কেঁদেছিলেন —

‘পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।’

“পুরাণে আছে, হিরণ্যাক্ষ বধের পর বরাহ অবতার নাকি ছানা-পোনা নিয়ে ছিলেন — তাদের মাই দিচ্ছিলেন। (সকলের হাস্য) স্বধামে যাবার নামটি নাই। শেষে শিব এসে ত্রিশূল দিয়ে শরীর নাশ করলে, তিনি হি-হি করে হেসে স্বধামে গেলেন।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২২শে ডিসেম্বর 1883/12/22/ii

18.17 শ্রীরামকৃষ্ণ, ভবনাথ, রাখাল, মণি লাটু প্রভৃতি সঙ্গে

বৈকালে ভবনাথ আসিয়াছেন। ঘরে রাখাল, মাস্টার, হরিশ প্রভৃতি আছেন। শনিবার, ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভবনাথের প্রতি) — অবতারের উপর ভালবাসা এলেই হল। আহা গোপীদের কি ভালবাসা!

এই বলিয়া গান গাহিতেছেন গোপীদের ভাবে:

গান —— শ্যাম তুমি পরাণের পরাণ।

গান —— ঘরে যাবই যে না গো (সঙ্গিনীয়া)

গান —— সেদিন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে।

(বঁধু যখন বিপিন যাও, বিপিন যাও)

(বঁধু ইচ্ছা হয়, ইচ্ছা হয় রাখাল হয়ে তোমার বাধা মাথায় বই!)

“রাসমধ্যে যখন শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হলেন, গোপীরা একেবারে উন্মাদিনী। বৃক্ষ দেখে বলে, তুমি বুঝি তপস্বী, শ্রীকৃষ্ণকে নিশ্চয় দেখেছ! তা না হলে নিশ্চল, সমাধিস্থ হয়ে রয়েছ কেন? তৃণাচ্ছাদিত পৃথিবী দেখে বলে, হে পৃথিবী, তুমি নিশ্চিত তাঁকে দর্শন করেছ, না হলে তুমি রোমাঞ্চিত হয়ে রয়েছ কেন? অবশ্য তুমি তাঁর স্পর্শসুখ সম্ভোগ করেছ! আবার মাধবীকে দেখে বলে, ‘ও মাধবী, আমায় মাধব দে!’ গোপীদের প্রেমোন্মাদ!

“যখন অক্রূর এলেন, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম মথুরা যাবার জন্য তাঁর রথে উঠলেন, তখন গোপীরা রথের চাকা ধরে রইলেন, যেতে দেবেন না।”

এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আবার গান গাহিতেছেন:

ধরো না ধরো না রথচক্র, রথ কি চক্রে চলে!

যে চক্রের চক্রী হরি, যাঁর চক্রে জগৎ চলে!

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, “রথ কি চক্রে চলে” — এ-কথাগুলি আমার বড় লাগে। “যে চক্রে ব্রহ্মাণ্ড ঘোরে!” “রথীর আজ্ঞা লয়ে সারথি চালায়!”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c19 ১৯ গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৩শে ডিসেম্বর 1883/12/23

19.1 সমাধিমন্দিরে — ঈশ্বরদর্শন ও ঠাকুরের পরমহংস অবস্থা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ঘরের দক্ষিণ-পূর্বের বারান্দায় রাখাল, লাটু, মণি, হরিশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা নয়টা হবে। রবিবার, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা নবমী, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩।

মণির গুরুগৃহে বাসের আজ দশম দিবস।

শ্রীযুত মনোমোহন কোন্নগর হইতে সকাল বেলা আসিয়াছেন। ঠাকুরকে দর্শন করিয়া ও কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার কলিকাতায় যাইবেন। হাজরাও ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। নীলকণ্ঠের দেশের একজন বৈষ্ণব ঠাকুরকে গান শুনাইতেছেন। বৈষ্ণব প্রথমে নীলকণ্ঠের গান গাইলেন:

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নব-নটবর তপতকাঞ্চন কায়।
করে স্বরূপ বিভিন্ন, লুকাইয়ে চিহ্ন, অবতীর্ণ নদীয়ায়।
কলিঘোর অন্ধকার বিনাশিতে, উন্নত উজ্জ্বল রস প্রকাশিতে,
তিন বাঞ্ছা তিন বস্তু আস্বাদিতে, এসেছ তিনেরি দায়; —
সে তিন পরশে, বিরস-হরষে, দরশে জগৎ মাতায় ।।
নীলাব্জ হেমাব্জে করিয়ে আবৃত, হ্লাদিনীর পূরাও দেহভেদগত; —
অধিরূঢ় মহাভাবে বিভাবিত, সাত্ত্বিকাদি মিলে যায়;
সে ভাব আস্বাদনের জন্য, কান্দেন অরণ্যে,
প্রেমের বন্যে ভেসে যায় ।।
নবীন সন্ন্যাসী, সুতীর্থ অন্বেষী, কভু নীলাচলে কভু যান কাশী;

অযাচক দেন প্রেম রাশি রাশি, নাহি জাতিভেদ তায়;
দ্বিজ নীলকণ্ঠে ভণে, এই বাঞ্ছা মনে, কবে বিকাব গৌরের পায়।

পরের গানটি মানসপূজা সম্বন্ধে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি) — এ-গান (মানসপূজা) কি একরকম লাগল।

হাজরা — এ সাধকের নয়, — জ্ঞান দীপ, জ্ঞান প্রতিমা!

[পঞ্চবটীতে তোতাপুরীর ক্রন্দন — পদ্মলোচনের ক্রন্দন]

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমার কেমন কেমন বোধ হল!

“আগেকার সব গান ঠিক ঠিক। পঞ্চবটীতে, ন্যাংটার কাছে আমি গান গেয়েছিলাম, — ‘জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।’ আর-একটা গান — ‘দোষ কারু নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।’

“ন্যাংটা অত জ্ঞানী, — মানে না বুঝেই কাঁদতে লাগল।

“এ-সব গানে কেমন ঠিক ঠিক কথা —

“ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবি!

“পদ্মলোচন আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কাঁদতে লাগল। দেখ, অত বড় পণ্ডিত!”

[God-vision — One and Many: Unity in Diversity —
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ]

আহারের পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। মেঝেতে মণি বসিয়া আছেন। নহবতের রোশনচৌকি বাজনা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আনন্দ করিতেছেন।

শ্রবণের পর মণিকে বুঝাইতেছেন, ব্রহ্মই জীবজগৎ হয়ে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — কেউ বললে, অমুক স্থানে হরিনাম নাই। বলবামাত্রই দেখলাম, তিনিই সব জীব১ হয়ে আছেন। যেন অসংখ্য জলের ভুড়ভুড়ি — জলের বিম্ব! আবার দেখছি যেন অসংখ্য বড়ি বড়ি!

“ও-দেশ থেকে বর্ধমানে আসতে আসতে দৌড়ে একবার মাঠের পানে গেলাম, — বলি, দেখি, এখানে জীবরা কেমন করে খায়, থাকে! গিয়ে দেখি মাঠে পিঁপড়ে চলেছে! সব স্থানই চৈতন্যময়!”

হাজরা ঘরে প্রবেশ করিয়া মেঝেতে বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — নানা ফুল — পাপড়ি থাক থাক২ তাও দেখেছি! — ছোট বিম্ব, বড় বিম্ব!

এই সকল ঈশ্বরীয়রূপদর্শন-কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইতেছেন। বলিতেছেন, আমি হয়েছি! আমি এসেছি!

এই কথা বলিয়াই একেবারে সমাধিস্থ হইলেন। সমস্ত স্থির! অনেকক্ষণ সম্ভোগের পর বাহিরের একটু হুঁশ আসিতেছে।

এইবার বালকের ন্যায় হাসিতেছেন। হেসে হেসে ঘরের মধ্যে পাদচারণ করিতেছেন।

[ক্ষোভ, বাসনা গেলেই পরমহংস অবস্থা — সাধনকালে বটতলায় পরমহংসদর্শন-কথা]

অদ্ভুতদর্শনের পর চক্ষু হইতে যেরূপ আনন্দ-জ্যোতিঃ বাহির হয়, সেইরূপ ঠাকুরের চক্ষের ভাব হইল। মুখে হাস্য। শূন্যদৃষ্টি।

ঠাকুর পায়চারি করিতে করিতে বলিতেছেন —

"বটতলায় পরমহংস দেখলম — এইরকম হেসে চলছিল! — সেই স্বরূপ কি আমার হল!"

এইরূপ পাদচারণের পর ঠাকুর ছোট খাটটিতে গিয়া বসিয়াছেন ও জগন্মাতার সহিত কথা কহিতেছেন।

ঠাকুর বলিতেছেন, "যাক আমি জানতেও চাই না! — মা, তোমার পাদপদ্মে যেন শুদ্ধাভক্তি থাকে।"

(মণির প্রতি) — ক্ষোভ বাসনা গেলেই এই অবস্থা!

আবার মাকে বলিতেছেন, “মা! পূজা উঠিয়েছ; — সব বাসনা যেন যায় না! পরমহংস তো বালক — বালকের মা চাই না? তাই তুমি মা, আমি ছেলে। মার ছেলে মাকে ছেড়ে কেমন করে থাকে!”

ঠাকুর এরূপ স্বরে মার সঙ্গে কথা বলিতেছেন যে, পাষাণ পর্যন্ত বিগলিত হইয়া যায়। আবার মাকে বলিতেছেন, “শুধু অদ্বৈতজ্ঞান! হ্যাক্ থু!! যতক্ষণ ‘আমি’ রেখেছ ততক্ষণ তুমি! পরমহংস তো বালক, বালকের মা চাই না?”

মণি অবাক্ হইয়া ঠাকুরের এই দেবদুর্লভ অবস্থা দেখিতেছেন। ভাবিতেছেন ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধু। তাঁহারই বিশ্বাসের জন্য — তাঁহারই চৈতন্যের জন্য — আর জীবশিক্ষার জন্য গুরুরূপী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই পরমহংস অবস্থা।

মণি আরও ভাবিতেছেন — “ঠাকুর বলেন, অদ্বৈত — চৈতন্য — নিত্যানন্দ। অদ্বৈতজ্ঞান হলে চৈতন্য হয়, — তবেই নিত্যনন্দ হয়। ঠাকুরের শুধু অদ্বৈতজ্ঞান নয়, — নিত্যানন্দের অবস্থা। জগন্মাতার প্রেমানন্দে সর্বদাই বিভোর, — মাতোয়ারা!”

হাজরা ঠাকুরের এই অবস্থা হঠাৎ দেখিয়া হাতজোড় করিয়া মাঝে মাঝে বলিতে লাগিলেন — “ধন্য! ধন্য!”

শ্রীরামকৃষ্ণ হাজরাকে বলিতেছেন, “তোমার বিশ্বাস কই? তবে তুমি এখানে আছ যেমন জটিলে-কুটিলে — লীলা পোষ্টাই জন্য।”

বৈকাল হইয়াছে। মণি একাকী দেবালয়ে নির্জনে বেড়াইতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভুত অবস্থা ভাবিতেছেন। আর ভাবিতেছেন, ঠাকুর কেন বলিলেন, "ক্ষোভ বাসনা গেলেই এই অবস্থা।" এই গুরুরূপী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কে? স্বয়ং ভগবান কি আমাদের জন্য দেহধারণ করে এসেছেন? ঠাকুর বলেন, ঈশ্বরকোটি — অবতারাদি — না হলে জড়সমাধি (নির্বিকল্পসমাধি) হতে নেমে আসতে পারে না।

১ সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মানি

২ ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ।। [গীতা, ৬।২৯]

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চহি। [বেদান্তসূত্র, ২।১।২৮]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৪শে ডিসেম্বর 1883/12/24/i

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।

অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে।।

[গীতা, ১০।১৩]

19.2 গুহ্যকথা

পরদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঝাউতলায় মণির সহিত একাকী কথা কহিতেছেন। বেলা আটটা হইবে। সোমবার, কৃষ্ণপক্ষের দশমী তিথি। ২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। আজ মণির প্রভুসঙ্গে একাদশ দিবস।

শীতকাল। সূর্যদেব পূর্বকোণে সবে উঠিয়াছেন। ঝাউতলার পশ্চিমদিকে গঙ্গা বহিয়া যাইতেছেন, এখন উত্তরবাহিনী — সবে জোয়ার আসিয়াছে। চর্তুদিকে বৃক্ষলতা। অনতিদূরে সাধনার স্থান সেই বিল্বতরুমূল দেখা যাইতেছে। ঠাকুর পূর্বাস্য হইয়া কথা কহিতেছেন। মণি উত্তরাস্য হইয়া বিনীতভাবে শুনিতেছেন। ঠাকুরের ডানদিকে পঞ্চবটী ও হাঁসপুকুর। শীতকাল, সূর্যোদয়ে জগৎ যেন হাসিতেছে। ঠাকুর ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলিতেছেন।

[তোতাপুরীর ঠাকুরের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ]

শ্রীরামকৃষ্ণ — নিরাকারও সত্য, সাকারও সত্য।

“ন্যাংটা উপদেশ দিত, — সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম কিরূপ। যেমন অনন্ত সাগর — ঊর্ধ্বে নিচে, ডাইনে বামে, জলে জল। কারণ — সলিল। জল স্থির। — কার্য হলে তরঙ্গ। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় — কার্য।

“আবার বলত, বিচার যেখানে গিয়ে থেমে যায় সেই ব্রহ্ম। যেমন কর্পূর জ্বালালে পুড়ে যায়, একটু ছাইও থাকে না।

“ব্রহ্ম বাক্য-মনের অতীত। লুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছল। এসে আর খবর দিলে না। সমুদ্রেতেই গলে গেল।

“ঋষিরা রামকে বলেছিলেন, ‘রাম, ভরদ্বাজাদি তোমাকে অবতার বলতে পারেন। কিন্তু আমরা তা বলি না। আমরা শব্দব্রহ্মের উপাসনা করি। আমরা মানুষরূপ চাই না।’ রাম একটু হেসে প্রসন্ন হয়ে, তাদের পূজা গ্রহণ করে চলে গেলেন।”

[নিত্য, লীলা — দুই-ই সত্য]

“কিন্তু যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। যেমন বলেছি, ছাদ আর সিঁড়ি। ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা। নরলীলায় অবতার। নরলীলা কিরূপ জান? যেমন বড় ছাদের জল নল দিয়ে হুড়হুড় করে পড়ছে। সেই সচ্চিদানন্দ, তাঁরই শক্তি একটি প্রণালী দিয়ে — নলের ভিতর দিয়ে আসছে। কেবল ভরদ্বাজাদি বারজন ঋষি রামচন্দ্রকে অবতার বলে চিনেছিলেন। অবতারকে সকলে চিনতে পারে না।”

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার? শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত — ক্ষুদিরামের গয়াধামে স্বপ্ন — ঠাকুরকে হৃদয়ের মার পূজা — ঠাকুরের মধ্যে মথুরের ঈশ্বরীদর্শন — ফুলুই শ্যামবাজারে শ্রীগৌরাঙ্গের আবেশ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — তিনি অবতার হয়ে জ্ঞান ভক্তি শিক্ষা দেন। আচ্ছা, আমাকে তোমার কিরূপ বোধ হয়?

“আমার বাবা গয়াতে গিছলেন। সেখানে রঘুবীর স্বপন দিলেন, আমি তোদের ছেলে হব। বাবা স্বপন দেখে বললেন, ঠাকুর, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কেমন করে তোমার সেবা করব! রঘুবীর বললেন — তা হয়ে যাবে।

“দিদি — হৃদের মা — আমার পা পূজা করত ফুল-চন্দন দিয়ে। একদিন তার মাথায় পা দিয়ে (মা) বললে, তোর কাশীতেই মৃত্যু হবে।

“সেজোবাবু বললে, বাবা, তোমার ভিতরে আর কিছু নাই, — সেই ঈশ্বরই আছেন। দেহটা কেবল খোল মাত্র, — যেমন বাহিরে কুমড়োর আকার কিন্তু ভিতরের শাঁস-বিচি কিছুই নাই। তোমায় দেখলাম, যেন ঘোমটা দিয়ে কেউ চলে যাচ্ছে।

“আগে থাকতে সব দেখিয়ে দেয়। বটতলায় (পঞ্চবটীতলায়) গৌরাঙ্গের সংকীর্তনের দল দেখেছিলাম। তার ভিতর যেন বলরামকে দেখেছিলাম, — আর যেন তোমায় দেখেছিলাম।

“গৌরাঙ্গের ভাব জানতে চেয়েছিলাম। ও-দেশে — শ্যামবাজারে — দেখালে। গাছে পাঁচিলে লোক, — রাতদিন সঙ্গে সঙ্গে লোক! সাতদিন হাগবার জো ছিল না। তখন বললাম, মা, আর কাজ নাই। তাই এখন শান্ত।

“আর একবার আসতে হবে। তাই পার্ষদদের সব জ্ঞান দিচ্ছি না। (সহাস্যে) তোমাদের যদি সব জ্ঞান দিই — তাহলে তোমরা আর সহজে আমার কাছে আসবে কেন?

“তোমায় চিনেছি — তোমার চৈতন্য-ভাগবত পড়া শুনে। তুমি আপনার জন — এক সত্তা — যেমন পিতা আর পুত্র। এখানে সব আসছে — যেন কলমির দল, — এক জায়গায় টানলে সবটা এসে পড়ে। পরস্পর সন আত্মীয়

— যেমন ভাই ভাই। জগন্নাথে রাখাল, হরিশ-টরিশ গিয়েছে, আর তুমিও গিয়েছ — তা কি আলাদা বাসা হবে?

“যতদিন এখানে আস নাই, ততদিন ভুলে ছিলে; এখন আপনাকে চিনতে পারবে। তিনি গুরুরূপে এসে জানিয়ে দেন।”

[তোতাপুরীর উপদেশ — গুরুরূপী শ্রীভগবান স্ব-স্বরূপকে জানিয়ে দেন]

“ন্যাংটা বাঘ আর ছাগলের পালের গল্প বলেছিল! একটা বাঘিনী ছাগলের পাল আক্রমণ করেছিল। একটা ব্যাধ দূর থেকে দেখে ওকে মেরে ফেললে। ওর পেটে ছানা ছিল, সেটা প্রসব হয়ে গেল। সেই ছানাটা ছাগলের সঙ্গে বড় হতে লাগল। প্রথমে ছাগলদের মায়ের দুধ খায়, — তারপর একটু বড় হলে ঘাস খেতে আরম্ভ করলে। আবার ছাগলদের মতো ভ্যা ভ্যা করে। ক্রমে খুব বড় হল — কিন্তু ঘাস খায় আর ভ্যা ভ্যা করে। কোন জানোয়ার আক্রমণ করলে ছাগলদের মতো দৌড়ে পালায়!

“একদিন একটা ভয়ংকর বাঘ ছাগলদের পাল আক্রমণ করলে। সে অবাক্ হয়ে দেখলে যে, ওদের ভিতর একটা বাঘ ঘাস খাচ্ছিল, — ছাগলদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পালাল! তখন ছাগলদের কিছু না বলে ওই ঘাসখেকো বাঘটাকে ধরলে। সেটা ভ্যা ভ্যা করতে লাগল! আর পালাবার চেষ্টা করতে লাগল। তখন সে তাকে একটা জলের ধারে টেনে নিয়ে গেল। আর বললে, ‘এই জলের ভিতর তোর মুখ দেখ। দেখ, আমারও যেমন হাঁড়ির মতো মুখ, তোরও তেমনি।’ তারপর তার মুখে একটু মাংস গুঁজে দিলে। প্রথমে, সে কোনমতে খেতে চায় না

—— তারপর একটু আস্বাদ পেয়ে খেতে লাগল। তখন বাঘটা বললে, ‘তুই ছাগলদের সঙ্গে ছিলি আর তুই ওদের মতো ঘাস খাচ্ছিলি! ধিক্ তোকে!’ তখন সে লজ্জিত হল।

“ঘাস খাওয়া কি না কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে থাকা। ছাগলের মতো ভ্যা ভ্যা করে ডাকা, আর পালানো —— সামান্য জীবের মতো আচরণ করা। বাঘের সঙ্গে চলে যাওয়া, — কি না, গুরু যিনি চৈতন্য করালেন; তাঁর শরণাগত হওয়া, তাঁকেই আত্মীয় বলে জানা; নিজের ঠিক মুখ দেখা কি না স্ব-স্বরূপকে চেনা।”

ঠাকুর দণ্ডায়মান হইলেন। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। কেবল ঝাউগাছের সোঁ-সোঁ শব্দ ও গঙ্গার কুলুকুলু ধ্বনি। তিনি রেল পার হইয়া পঞ্চবটীর মধ্য দিয়া নিজের ঘরের দিকে মণির সহিত কথা কইতে কইতে যাইতেছেন। মণি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বটমূলে প্রণাম]

পঞ্চবটীতে আসিয়া, যেখানে ডালটি পড়ে গেছে, সেইখানে দাঁড়াইয়া পূর্বাস্য হইয়া বটমূলে, চাতাল মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। এই স্থান সাধনের স্থান; — এখানে কত ব্যাকুল ক্রন্দন —— কত ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন। আর মার সঙ্গে কত কথা হইয়াছে! — তাই কি ঠাকুর এখানে যখন আসেন, তখন প্রণাম করেন?

বকুলতলা হইয়া নহবতের কাছে আসিয়াছেন। মণি সঙ্গে।

নহবতের কাছে আসিয়া হাজরাকে দেখিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন, “বেশি খেয়ো না। আর শুচিবাই ছেড়ে দাও। যাদের শুচিবাই, তাদের জ্ঞান হয় না! আচার যতটুকু দরকার, ততটুকে করবে। বেশি বাড়াবাড়ি করো না।” ঠাকুর নিজের ঘরে গিয়া উপবেশন করিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৪শে ডিসেম্বর 1883/12/24/ii

19.3 রাখাল, রাম, সুরেন্দ্র, লাটু প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

আহারান্তে ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। আজ ২৪শে ডিসেম্বর। বড়দিনের ছুটি আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা হইতে সুরেন্দ্র, রাম প্রভৃতি ভক্তেরা ক্রমে ক্রমে আসিতেছেন।

বেলা একটা হইবে। মণি একাকী ঝাউতলায় বেড়াইতেছেন, এমন সময় রেলের নিকট দাঁড়াইয়া হরিশ উচ্চৈঃস্বরে মণিকে বলিতেছেন — প্রভু ডাকছেন, — শিবসংহিতা পড়া হবে।

শিবসংহিতায় যোগের কথা আছে, — ষট্‌চক্রের কথা আছে।

মণি ঠাকুরের ঘরে আসিয়া প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। ঠাকুর খাটের উপর, ভক্তেরা মেঝের উপর বসিয়া আছেন। শিবসংহিতা এখন আর পড়া হইল না। ঠাকুর নিজেই কথা কহিতেছেন।

[প্রেমাভক্তি ও শ্রীবৃন্দাবনলীলা — অবতার ও নরলীলা]

শ্রীরামকৃষ্ণ — গোপীদের প্রেমাভক্তি। প্রেমাভক্তিতে দুটি জিনিস থাকে, — অহংতা আর মমতা। আমি কৃষ্ণকে সেবা না করলে কৃষ্ণের অসুখ হবে, — এর নাম অহংতা। এতে ঈশ্বরবোধ থাকে না।

“মমতা, — ‘আমার আমার’ করা। পাছে পায়ে কিছু আঘাত লাগে, গোপীদের এত মমতা, তাদের সূক্ষ্ম শরীর শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে থাকত।

“যশোদা বললেন, তোদের চিন্তামণি-কৃষ্ণ জানি না, আমার গোপাল! গোপীরাও বলছে, ‘কোথায় আমার প্রাণবল্লভ! আমার হৃদয়বল্লভ!’ ঈশ্বরবোধ নাই।

“যেমন ছোট ছেলেরা, দেখেছি, বলে, ‘আমার বাবা’। যদি কেউ বলে, ‘না, তোর বাবা নয়’; — তাহলে বলবে ‘না, আমার বাবা।’

“নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মতো আচরণ করতে হয়, — তাই চিনতে পারা কঠিন। মানুষ হয়েছেন তো ঠিক মানুষ। সেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোগশোক, কখন বা ভয় — ঠিক মানুষের মতো। রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হয়ছিলেন। গোপাল নন্দের জুতো মাথায় করে নিয়ে গিছলেন — পিঁড়ে বয়ে নিয়ে গিছলেন।

“থিয়েটারে সাধু সাজে, সাধুর মতই ব্যবহার করবে, — যে রাজা সেজেছে তার মতো ব্যবহার করবে না। যা সেজেছে তাই অভিনয় করবে।

“একজন বহুরূপী সেজেছে, ‘ত্যাগী সাধু’। সাজটি ঠিক হয়েছে দেখে বাবুরা একটি টাকা দিতে গেল। সে নিলে না, উঁহু করে চলে গেল। গা-হাত-পা ধুয়ে যখন সহজ বেশে এলো, বললে, ‘টাকা দাও’। বাবুরা বললে, ‘এই তুমি টাকা নেবো না বলে চলে গেলে, আবার টাকা চাইছ?’ সে বললে, ‘তখন সাধু সেজেছি, টাকা নিতে নাই।’

“তেমনি ঈশ্বর, যখন মানুষ হন, ঠিক মানুষের মতো ব্যবহার করেন।

“বৃন্দাবনে গেলে অনেক লীলার স্থান দেখা যায়।”

[সুরেন্দ্রের প্রতি উপদেশ — ভক্তসেবার্থ দান ও সত্যকথা]

সুরেন্দ্র — আমরা ছুটিতে গিছলাম; বড় “পয়সা দাও”, “পয়সা দাও” করে। ‘দাও’ ‘দাও’ করতে লাগল — পাণ্ডারা আর সব। তাদের বললুম, ‘আমরা কাল কলকাতা যাব’। বলে, সেই দিনই পলায়ন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ও কি! ছি! কাল যাব বলে আজ পালানো! ছি!

সুরেন্দ্র (লজ্জিত হইয়া) — বনের মধ্যে মাঝে মাঝে বাবাজীদের দেখেছিলাম, নির্জনে বসে সাধন-ভজন করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বাবাজীদের কিছু দিলে?

সুরেন্দ্র — আজ্ঞে, না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ও ভাল কর নাই। সাধুভক্তদের কিছু দিতে হয়। যাদের টাকা আছে, তাদের ওরূপ লোক সামনে পড়লে কিছু দিতে হয়।

[শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত — মথুর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন-দর্শন, ১৮৬৮]

“আমি বৃন্দাবনে গিছলাম — সেজোবাবুদের সঙ্গে।

“মথুরার ধ্রুবঘাট যাই দেখলাম অমনি দপ্ করে দর্শন হল, বসুদেব কৃষ্ণ কোলে যমুনা পার হচ্ছেন।

“আবার সন্ধ্যার সময় যমুনাপুলিনে বেড়াচ্ছি, বালির উপর ছোট ছোট খোড়োঘর। বড় কুলগাছ। গোধূলির সময় গাভীরা গোষ্ঠ থেকে ফিরে আসছে। দেখলাম হেঁটে যমুনা পার হচ্ছে। তারপরেই কতকগুলি রাখাল গাভীদের নিয়ে পার হচ্ছে।

“যেই দেখা, অমনি ‘কোথায় কৃষ্ণ!’ বলে — বেহুঁশ হয়ে গেলাম।

শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড দর্শন করতে ইচ্ছা হয়েছিল। পালকি করে আমায় পাঠিয়ে দিলে। অনেকটা পথ; লুচি, জিলিপি পালকির ভিতরে দিলে। মাঠ পার হবার সময় এই ভেবে কাঁদতে লাগলাম, ‘কৃষ্ণ রে! তুই নাই, কিন্তু সেই সব স্থান রয়েছে! সেই মাঠ, তুমি গোরু চরাতে!’

“হৃদে রাস্তায় সঙ্গে সঙ্গে পেছনে আসছিল। আমি চক্ষের জলে ভাসতে লাগলাম। বিয়ারাদের দাঁড়াতে বলতে পারলাম না!

শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ডতে গিয়ে দেখলাম, সাধুরা একটি একটি ঝুপড়ির মতো করেছে; — তার ভিতরে পিছনে ফিরে সাধন-ভজন করছে — পাছে লোকের উপর দৃষ্টিপাত হয়। দ্বাদশ বন দেখবার উপযুক্ত। বঙ্কুবিহারীকে দেখে ভাব হয়েছিল, আমি তাঁকে ধরতে গিছিলাম। গোবিনজীকে দুইবার দেখতে চাইলাম না। মথুরায় গিয়ে রাখাল-কৃষ্ণকে স্বপন দেখেছিলাম। হৃদে ও সেজোবাবুও দেখেছিল।”

[দেবীভক্ত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রের যোগ ও ভোগ]

“তোমাদের যোগও আছে, ভোগও আছে।

“ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষি। ব্রহ্মর্ষি, যেমন শুকদেব — একখানি বইও কাছে নাই। দেবর্ষি, যেমন নারদ। রাজর্ষি জনক, — নিষ্কামকর্ম করে।

“দেবীভক্ত ধর্ম, মোক্ষ দু-ই পায়। আবার অর্থ, কামও ভোগ করে।

“তোমাকে একদিন দেবীপুত্র দেখেছিলাম। তোমার দুই-ই আছে — যোগ আর ভোগ। না হলে তোমার চেহারা শুষ্ক হত।”

[ঘাটে ঠাকুরের দেবীভক্তদর্শন — নবীন নিয়োগীর যোগ ও ভোগ]

“সর্বত্যাগীর চেহারা শুষ্ক। একজন দেবীভক্তকে ঘাটে দেখেছিলাম। নিজে খাচ্ছে আর সেই সঙ্গে দেবীপূজা কচ্ছে। সন্তানভাব!

“তবে বেশি টাকা হওয়া ভাল নয়। যদু মল্লিককে এখন দেখলাম ডুবে গেছে! বেশি টাকা হয়েছে কি না।

“নবীন নিয়োগী, — তারও যোগ ও ভোগ দুই-ই আছে। দুর্গাপূজার সময় দেখি, বাপ-ব্যাটা দুজনেই চামর কচ্ছে।”

সুরেন্দ্র — আজ্ঞা, ধ্যান হয় না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — স্মরণ-মনন তো আছে?

সুরেন্দ্র — আজ্ঞা, মা মা বলে ঘুমিয়ে পড়ি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — খুব ভাল। স্মরণ-মনন থাকলেই হল।

ঠাকুর সুরেন্দ্রের ভার লইয়াছেন। আর তাঁহার ভাবনা কি?

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৪শে ডিসেম্বর 1883/12/24/iii

19.4 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগশিক্ষা — শিবসংহিতা

সন্ধ্যার পর ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। মণিও ভক্তদের সহিত মেঝেতে বসিয়া আছেন। যোগের বিষয় — ষট্‌চক্রের বিষয় — কথা কহিতেছেন। শিব সংহিতায় সেই সকল কথা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার ভিতর সব পদ্ম আছে — চিন্ময়। যেমন মোমের গাছ, — ডাল, পালা, ফল, — সব মোমের। মূলাধার পদ্মে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি আছেন। চর্তুদল পদ্ম। যিনি আদ্যাশক্তি তিনিই সকলের দেহে কুলকুণ্ডলিনীরূপে আছেন। যেন ঘুমন্ত সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে! "প্রসুপ্ত-ভুজগাকারা আধারপদ্মবাসিনী!"

(মণির প্রতি) — ভক্তিযোগে কুলকুণ্ডলিনী শীঘ্র জাগ্রত হয়। কিন্তু ইনি জাগ্রত না হলে ভগবানদর্শন হয় না। গান করে করে একাগ্রতার সহিত গাইবে — নির্জনে গোপনে —

'জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী! তুমি নিত্যানন্দ স্বরূপিণী,
প্রসুপ্ত-ভুজগাকারা আধারপদ্মবাসিনী।'

"গানে রামপ্রসাদ সিদ্ধ। ব্যাকুল হয়ে গান গাইলে ঈশ্বরদর্শন হয়!"

মণি — আজ্ঞা, এ-সব একবার করলে মনের খেদ মিটে যায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ — আহা! খেদ মেটেই বটে।

“যোগের বিষয় গোটাকতক মোটামুটি তোমায় বলে দিতে হবে।”

[গুরুই সব করেন — সাধনা ও সিদ্ধি — নরেন্দ্র স্বতঃসিদ্ধ]

“কি জান, ডিমের ভিতর ছানা বড় না হলে পাখি ঠোকরায় না। সময় হলেই পাখি ডিম ফুটোয়।

“তবে একটু সাধনা করা দরকার। গুরুই সব করেন, — তবে শেষটা একটু সাধনা করিয়ে লন। বড় গাছ কাটবার সময় প্রায় সবটা কাটা হলে পর একটু সরে দাঁড়াতে হয়। তারপর গাছটা মড়মড় করে আপনিই ভেঙে পড়ে।

“যখন খাল কেটে জল আনে, আর-একটু কাটলেই নদীর সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে, তখন যে কাটে সে সরে দাঁড়ায়, তখন মাটিটা ভিজে আপনিই পড়ে যায়, আর নদীর জল হুড়হুড় করে খালে আসে।

“অহংকার, উপাধি — এ-সব ত্যাগ হলেই ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়। ‘আমি পণ্ডিত’, ‘আমি অমুকের ছেলে’, ‘আমি ধনী’, ‘আমি মানী’ — এ-সব উপাধি ত্যাগ হলেই দর্শন।

“ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য, সংসার অনিত্য — এর নাম বিবেক। বিবেক না হলে উপদেশ গ্রাহ্য হয় না।

“সাধনা করতে করতে তাঁর কৃপায় সিদ্ধ হয়। একটু খাটা চাই। তারপরই দর্শন ও আনন্দলাভ।

“অমুক জায়গায় সোনার কলসী পোতা আছে শুনে লোক ছুটে যায়। আর খুঁড়তে আরম্ভ করে। খুঁড়তে খুঁড়তে মাথায় ঘাম পড়ে। অনেক খোঁড়ার পর এক জায়গায় কোদালে ঠন্ করে শব্দ হল; কোদাল ফেলে দেখে, কলসী বেরিয়েছে কি না। কলসী দেখে নাচতে থাকে।

“কলসী বার করে মোহর ঢেলে, হাতে করে গণে — আর খুব আনন্দ! দর্শন, — স্পর্শন, — সম্ভোগ! — কেমন?”

মণি — আজ্ঞা, হাঁ।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন —

[আমার আপনার লোক কে? একাদশী করার উপদেশ]

“আমার যারা আপনার লোক, তাদের বকলেও আবার আসবে।

“আহা, নরেন্দ্রের কি স্বভাব। মা-কালীকে আগে যা ইচ্ছা তাই বলত; আমি বিরক্ত হয়ে একদিন বলেছিলাম, ‘শ্যালা, তুই আর এখানে আসিস না।’ তখন সে আস্তে আস্তে গিয়ে তামাক সাজে। যে আপনার লোক, তাকে তিরস্কার করলেও রাগ করবে না। কি বল?”

মণি — আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — নরেন্দ্র স্বতঃসিদ্ধ, নিরাকারে নিষ্ঠা।

মণি (সহাস্যে) — যখন আসে একটা কাণ্ড সঙ্গে করে আনে।

ঠাকুর আনন্দে হাসিতেছেন, বলিতেছেন, “একটা কাণ্ডই বটে”।

পরদিন মঙ্গলবার, ২৫শে ডিসেম্বর, কৃষ্ণপক্ষের একাদশী। বেলা প্রায় এগারটা হইবে। ঠাকুরের এখনও সেবা হয় নাই। মণি রাখালাদি ভক্তেরা ঠাকুরের ঘরে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — একাদশী করা ভাল। ওতে মন বড় পবিত্র হয়, আর ঈশ্বরেতে ভক্তি হয়। কেমন?

মণি —— আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— খই-দুধ খাবে, — কেমন?

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৬শে ডিসেম্বর 1883/12/26

19.5 শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রের বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ আজ রামচন্দ্রের নূতন বাগান দেখিতে যাইতেছেন। ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, (বুধবার, ১২ই পৌষ, কৃষ্ণা দ্বাদশী)।

রাম ঠাকুরকে সাক্ষাৎ অবতারজ্ঞানে পূজা করেন। দক্ষিণেশ্বরে প্রায় মাঝে মাঝে আসেন ও ঠাকুরকে দর্শন ও পূজা করিয়া যান। সুরেন্দ্রের বাগানের কাছে নূতন বাগান করিয়াছেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিতে যাইতেছেন।

গাড়িতে মণিলাল মল্লিক, মাস্টার ও আরও দু-একটি ভক্ত আছেন। মণিলাল মল্লিক ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। ব্রাহ্মভক্তেরা অবতার মানেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণিলালের প্রতি) — তাঁকে ধ্যান করতে হলে, প্রথমে উপাধিশূন্য তাঁকে ধ্যান করবার চেষ্টা করা উচিত। তিনি নিরুপাধি, বাক্যমনের অতীত। কিন্তু এ ধ্যানে সিদ্ধ হওয়া বড় কঠিন।

“তিনি মানুষে অবতীর্ণ হন, তখন ধ্যানের খুব সুবিধা। মানুষের ভিতর নারায়ণ। দেহটি আবরণ, যেন লণ্ঠনের ভিতর আলো জ্বলছে। অথবা সার্সীর ভিতর বহুমূল্য জিনিস দেখছি।”

গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া বাগানে পৌঁছিয়া রাম ও ভক্তগণের সঙ্গে প্রথমে তুলসী-কানন দর্শন করিতে ঠাকুর যাইতেছেন।

তুলসী-কানন দেখিয়া ঠাকুর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, “বাঃ! বেশ জায়গা, এখানে বেশ ঈশ্বরচিন্তা হয়।”

ঠাকুর এইবার সরোবরের দক্ষিণের ঘরে আসিয়া বসিলেন। রামচন্দ্র থালায় করিয়া বেদানা, কমলালেবু ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন কাছে দিলেন। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আনন্দ করিতে করিতে ফলাদি খাইতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সমস্ত বাগান পরিক্রমা করিতেছেন।

এইবার নিকটবর্তী সুরেন্দ্রের বাগানে যাইতেছেন। পদব্রজে খানিকটা গিয়া গাড়িতে উঠিবেন। গাড়ি করিয়া সুরেন্দ্রের বাগানে যাইবেন।

পদব্রজে যখন ভক্তসঙ্গে যাইতেছেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন যে পার্শ্বের বাগানে গাছতলায় একটি সাধু একাকী খাটিয়ায় বসিয়া আছেন। দেখিয়াই তিনি সাধুর কাছে উপস্থিত হইয়া আনন্দে তাঁহার সহিত হিন্দীতে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সাধুর প্রতি) — আপনি কোন্ সম্প্রদায়ের — গিরি বা পুরী কোন উপাধি আছে?

সাধু — লোকে আমায় পরমহংস বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বেশ, বেশ। শিবোঽহম্ — এ বেশ। তবে একটি কথা আছে। এই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় রাতদিন হচ্ছে — তাঁর শক্তিতে। এই আদ্যাশক্তি আর ব্রহ্ম অভেদ। ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তি হয় না। যেমন জলকে ছেড়ে তরঙ্গ হয় না। বাদ্যকে ছেড়ে বাজনা হয় না।

"যতক্ষণ তিনি এই লীলার মধ্যে রেখেছেন, ততক্ষণ দুটো বলে বোধ হয়। শক্তি বললেই ব্রহ্ম আছেন। যেমন রাতবোধ থাকলেই দিনবোধ আছে। জ্ঞানবোধ থাকলেই অজ্ঞানবোধ আছে।

"আর-একটি অবস্থায় তিনি দেখান যে ব্রহ্ম জ্ঞান-অজ্ঞানের পার — মুখে কিছু বলা যায় না। যো হ্যায় সো হ্যায়।"

এরূপ কিছু সদালাপ হইবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ গাড়ির দিকে যাইতেছেন। সাধুটিও সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গাড়িতে তুলিয়া দিতে আসিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন অনেকদিনের পরিচিত বন্ধু, সাধুর বাহুর ভিতর বাহু দিয়া গাড়ির অভিমুখে যাইতেছেন।

সাধু তাঁহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া নিজস্থানে চলিয়া আসিলেন।

এইবার সুরেন্দ্রের বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়াছেন। ভক্তসঙ্গে আসন গ্রহণ করিয়া প্রথমেই সাধুর কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সাধুটি বেশ। (রামের প্রতি) — তুমি যখন যাবে সাধুটিকে দক্ষিণেশ্বরের বাগানে লয়ে যেও।

"সাধুটি বেশ। একটা গানে আছে — সহজ না হলে সহজকে চেনা যায় না।

"নিরাকারবাদী — তা বেশ। তিনি নিরাকার-সাকার হয়ে আছেন, আরও কত কি! যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। সেই বাক্যমনের অতীত যিনি, তিনি নানা রূপ ধরে অবতীর্ণ হয়ে কাজ করছেন। সেই ওঁ হইতে 'ওঁ শিব', 'ওঁ কালী', 'ওঁ

কৃষ্ণ’ হয়েছেন। নিমন্ত্রণে কর্তা একটি ছোট ছেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন — তার কত আদর, কেন না সে অমুকের দৌহিত্র কি পৌত্র।”

সুরেন্দ্রের বাগানেও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে ভক্তসঙ্গে যাইতেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৭শে ডিসেম্বর 1883/12/27/i

19.6 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কলিকাতায় নিমন্ত্রণ —
শ্রীযুক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে শুভাগমন

দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে মঙ্গলারতির মধুর শব্দ শুনা যাইতেছে। সেই সঙ্গে প্রভাতী রাগে রোশনচৌকি বাজিতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গাত্রোত্থান করিয়া মধুর স্বরে নাম করিতেছেন। ঘরে যে সকল দেবদেবীর মূর্তি পটে চিত্রিত ছিল, এক-এক করিয়া প্রণাম করিলেন। পশ্চিম ধারের গোল বারান্দায় গিয়া ভাগীরথী দর্শন করিলেন ও প্রণাম করিলেন। ভক্তেরা কেহ কেহ ওখানে আছেন। তাঁহারা প্রাতঃকৃত সমাপন করিয়া ক্রমে ক্রমে আসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন।

রাখাল ঠাকুরের সঙ্গে এখানে এখন আছেন। বাবুরাম গতরাত্রে আসিয়াছেন। মণি ঠাকুরের কাছে আজ চৌদ্দদিন আছেন।

আজ বৃহস্পতিবার, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি; ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। আজ সকাল সকাল ঠাকুর স্নানাদি করিয়া কলিকাতায় আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঈশানের ওখানে আজ যেতে বলে গেছে। বাবুরাম যাবে, তুমিও যাবে আমার সঙ্গে।"

মণি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

শীতকাল। বেলা ৮টা, নহবতের কাছে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল; ঠাকুরকে লইয়া যাইবে। চতুর্দিকে ফুলগাছ, সম্মুখে ভাগীরথী; দিক সকল প্রসন্ন; শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরদের পটের কাছে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিলেন ও মার নাম করিতে করিতে যাত্রা করিয়া গাড়িতে উঠিলেন। সঙ্গে বাবুরাম, মণি। তাঁহারা ঠাকুরের গায়ের বনাত, বনাতের কানঢাকা টুপি ও মসলার থলে সঙ্গে লইয়াছেন, কেন না শীতকাল, সন্ধ্যার সময় ঠাকুর গায়ে গরম কাপড় দিবেন।

ঠাকুর সহাস্যবদন, সমস্ত পথ আনন্দ করিতে করিতে আসিতেছেন। বেলা ৯টা। গাড়ি কলিকাতায় প্রবেশ করিয়া শ্যামবাজার দিয়া ক্রমে মেছুয়াবাজারের চৌমাথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মণি ঈশানের বাড়ি জানিতেন। চৌমাথায় গাড়ির মোড় ফিরাইয়া ঈশানের বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইতে বলিলেন।

ঈশান আত্মীয়দের সহিত সাদরে সহাস্যবদনে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া নিচের বৈঠকখানাঘরে লইয়া গেলেন। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আসন গ্রহণ করিলেন।

পরস্পর কুশল প্রশ্নের পর ঠাকুর ঈশানের পুত্র শ্রীশের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। শ্রীশ এম্‌এ, বি-এল পাশ করিয়া আলিপুরে ওকালতি করিতেছেন। এন্ট্রান্স ও এফ-এ পরীক্ষায় ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট হইয়াছিলেন, অর্থাৎ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এখন তাঁর বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর হইবে। যেমন পাণ্ডিত্য তেমনি বিনয়, লোকে দেখিলে বোধ করে ইনি কিছুই জানেন না। হাতজোড় করিয়া শ্রীশ ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। মণি ঠাকুরের কাছে শ্রীশের পরিচয় দিলেন ও বলিলেন, এমন শান্ত প্রকৃতির লোক দেখি নাই।

[কর্ম বন্ধনের মহৌষধ ও পাপকর্ম — কর্মযোগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্রীশের প্রতি) — তুমি কি কর গা?

শ্রীশ — আজ্ঞা, আমি আলিপুরে বেরুচ্ছি। ওকালতি করছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — এমন লোকেরও ওকালতি? (শ্রীশের প্রতি) — আচ্ছা, তোমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে?

“সংসারে অনাসক্ত হয়ে থাকা, কেমন?”

শ্রীশ — কিন্তু কাজের গতিকে সংসারে অন্যায় কত করতে হয়। কেউ পাপ কর্ম করছে, কেউ পুণ্যকর্ম। এ-সব কি আগেকার কর্মের ফল, তাই করতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কর্ম কতদিন। যতদিন না তাঁকে লাভ করা যায়। তাঁকে লাভ হলে সব যায়। তখন পাপ-পুণ্যের পার হয়ে যায়।

“ফল দেখা দিলে ফুল যায়। ফুল দেখা দেয় ফল হবার জন্য।

সন্ধ্যাদি কর্ম কতদিন? যতদিন ঈশ্বরের নাম করতে রোমাঞ্চ আর চক্ষে জল না আসে। এ-সকল অবস্থা ঈশ্বরলাভের লক্ষণ, ইশ্বরে শুদ্ধাভক্তিলাভের লক্ষণ।

“তাঁকে জানলে পাপ-পুণ্যের পার হয়।

“প্রসাদ বলে ভুক্তি মুক্তি উভয় মাথায় রেখেছি,
আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।

“তাঁর দিকে যত এগুবে ততই তিনি কর্ম কমিয়ে দিবেন। গৃহস্থের বউ অন্তঃসত্ত্বা হলে শাশুড়ী ক্রমে ক্রমে কাজ কমিয়ে দেন। যখন দশমাস হয়, তখন একেবারে কাজ কমিয়ে দেন। সন্তানলাভ হলে সেইটিকে নিয়েই নাড়াচাড়া, সেইটিকে নিয়েই আনন্দ।”

শ্রীশ — সংসারে থাকতে থাকতে তাঁর দিকে যাওয়া বড় কঠিন।

[গৃহস্থ সংসারীকে শিক্ষা — অভ্যাসযোগ ও নির্জনে সাধন]

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেন? অভ্যাসযোগ? ও-দেশে ছুতোরদের মেয়েরা চিঁড়ে বেচে। তারা কত দিক সামলে কাজ করে, শোন। ঢেঁকির পাট পড়ছে, হাতে ধানগুলি ঠেলে দিচ্ছে আর-একহাতে ছেলেকে কোলে করে মাই দিচ্ছে। আবার খদ্দের

এসেছে; ঢেঁকি এদিকে পড়ছে, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথাও চলছে। খদ্দেরকে বলছে, তাহলে তুমি যে ক’পয়সা ধার আছে, সে ক’পয়সা দিয়ে যেও, আর জিনিস লয়ে যেও।

“দেখ, — ছেলেকে মাই দেওয়া, ঢেঁকি পড়ছে, ধান ঠেলে দেওয়া ও কাঁড়া ধান তোলা, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলা, একসঙ্গে করছে। এরই নাম অভ্যাসযোগ। কিন্তু তার পনর আনা মন ঢেঁকির পাটের দিকে রয়েছে, পাছে হাতে পড়ে যায়। আর এক আনায় ছেলেকে মাই দেওয়া আর খদ্দেরের সঙ্গে কথা কওয়া। তেমনি যারা সংসারে আছে, তাদের পনর আনা মন ভগবানে দেওয়া উচিত। না দিলে সর্বনাশ — কালের হাতে পড়তে হবে। আর এক আনায় অন্যান্য কর্ম কর।

“জ্ঞানের পর সংসারে থাকা যায়। কিন্তু আগে তো জ্ঞানলাভ করতে হবে। সংসার-রূপ জলে মন-রূপ দুধ রাখলে মিশে যাবে, তাই মন-রূপ দুধকে দই পেতে নির্জনে মন্থন করে — মাখন তুলে — সংসার-রূপ জলে রাখতে হয়।

“তা হলেই হল, সাধনের দরকার। প্রথমাবস্থায় নির্জনে থাকা বড় দরকার। অশ্বত্থগাছ যখন চারা থাকে তখন বেড়া দিতে হয়, তা না হলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে, কিন্তু গুঁড়ি মোটা হলে বেড়া খুলে দেওয়া যায়। এমন কি হাতি বেঁধে দিলেও গাছের কিছু হয় না।

“তাই প্রথমাবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জনে যেতে হয়। সাধনের দরকার। ভাত খাবে; বসে বসে বলছ, কাঠে অগ্নি আছে, ওই আগুনে ভাত রাঁধা হয়; তা বললে কি

ভাত তৈয়ার হয়? আর-একখানা কাঠ এনে কাঠে কাঠে ঘষতে হয়, তবে আগুন বেরোয়।

“সিদ্ধি খেলে নেশা হয়, আনন্দ হয়। খেলে না, কিছুই করলে না, বসে বসে বলছ, ‘সিদ্ধি সিদ্ধি’! তাহলে কি নেশা হয়, আনন্দ হয়?”

[ঈশ্বরলাভ — জীবনের উদ্দেশ্য — পরা ও অপরা বিদ্যা — ‘দুধ খাওয়া’]

“হাজার লেখাপড়া শেখ, ঈশ্বরে ভক্তি না থাকলে, তাঁকে লাভ করবার ইচ্ছা না থাকলে — সব মিছে। শুধু পণ্ডিত, বিবেক-বৈরাগ্য নাই — তার কামিনী-কাঞ্চনে নজর থাকে। শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর। যে বিদ্যা লাভ করলে তাঁকে জানা যায়, সে-ই বিদ্যা; আর সব মিছে।

“আচ্ছা, তোমার ঈশ্বর বিষয়ে কি ধারণা?”

শ্রীশ — আজ্ঞা, এইটুকু বোধ হয়েছে — একজন জ্ঞানময় পুরুষ আছেন, তাঁর সৃষ্টি দেখলে তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই একটা কথা বলছি — শীতপ্রধান দেশে মাছ ও অন্যান্য জলজন্তু বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তাঁর কৌশল। যত ঠাণ্ডা পড়ে তত জলের আয়তনের সঙ্কোচ হয়। কিন্তু আশ্চর্য, বরফ হবার একটু আগে থেকে জল হালকা হয় ও জলের আয়তন বৃদ্ধি হয়! পুকুরের জলে অনায়াসে খুব শীতে মাছ থাকতে পারে। জলের উপরিভাগে সমস্ত বরফ হয়ে গেছে, কিন্তু নিচে যেমন জল তেমনি জল। যদি খুব ঠাণ্ডা হাওয়া বয়, সে হাওয়া বরফের উপর লাগে। নিচের জল গরম থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তিনি আছেন, জগৎ দেখলে বোঝা যায়। কিন্তু তাঁর বিষয় শোনা এক, তাঁকে দেখা এক, তাঁর সঙ্গে আলাপ করা আর এক। কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ বা দুধ খেয়েছে। দেখলে তবে তো আনন্দ হবে, খেলে তবে তো বল হবে, — লোক হৃষ্টপুষ্ট হবে। ভগবানকে দর্শন করলে তবে তো শান্তি হবে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করলে তবেই তো আনন্দলাভ হবে, শক্তি বাড়বে।

[মুমুক্ষত্ব বা ঈশ্বরের জন্য ব্যকুলতা সময়সাপেক্ষ]

শ্রীশ — তাঁকে ডাকবার অবসর পাওয়া যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তা বটে; সময় না হলে কিছু হয় না। একটি ছেলে শুতে যাবার সময় মাকে বলেছিল, মা আমার যখন হাগা পাবে আমাকে তুলিও। মা বললেন, বাবা, হাগাতেই তোমাকে তোলাবে, আমায় তুলতে হবে না।

“যাকে যা দেবার তাঁর সব ঠিক করা আছে। সরার মাপে শাশুড়ী বউদের ভাত দিত। তাতে কিছু ভাত কম হত। একদিন সরাখানি ভেঙে যাইয়াতে বউরা আহ্লাদ করছিল। তখন শাশুড়ী বললেন, ‘নাচ কোঁদ বউমা, আমার হাতের আটকেল (আন্দাজ) আছে’।”

[আমমোক্তারি বা বকলমা দাও]

(শ্রীশের প্রতি) — কি করবে? তাঁর পদে সব সমর্পণ কর; তাঁকে আমমোক্তারি দাও। তিনি যা ভাল হয় করুন। বড়লোকের উপর যদি ভার দেওয়া যায়, সে লোক কখনও মন্দ করবে না।

“সাধনার প্রয়োজন বটে; কিন্তু দুরকম সাধক আছে; — একরকম সাধকের বানরের ছার স্বভাব, আর-একরকম সাধকের বিড়ালের ছার স্বভাব। বানরের ছা নিজে জো-সো করে মাকে আঁকড়িয়ে ধরে। সেইরূপ কোন কোন সাধক মনে করে, এত জপ করতে হবে, এত ধ্যান করতে হবে, এত তপস্যা করতে হবে, তবে ভগবানকে পাওয়া যাবে। এ-সাধক নিজে চেষ্টা করে ভগবানকে ধরতে যায়।

“বিড়ালের ছা কিন্তু নিজে মাকে ধরতে পারে না। সে পড়ে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে! মা যা করে। মা কখনও বিছানার উপর, কখনও ছাদের উপর কাঠের আড়ালে রেখে দিচ্ছে; মা তাকে মুখে করে এখানে ওখানে লয়ে রাখে, সে নিজে মাকে ধরতে জানে না। সেইরূপ কোন কোন সাধক নিজে হিসাব করে কোন সাধন করতে পারে না, — এত জপ করব, এত ধ্যান করব ইত্যাদি। সে কেবল ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকে। তিনি তার কান্না শুনে আর থাকতে পারেন না, এসে দেখা দেন।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৭শে ডিসেম্বর 1883/12/27/ii

19.7 ঈশানের গৃহে

বেলা হইয়াছে, গৃহস্বামী অন্নব্যঞ্জন করাইয়া ঠাকুরকে খাওয়াইবেন। তাই বড় ব্যস্ত। তিনি ভিতর-বাড়িতে গিয়াছেন, খাবার উদ্যোগ ও তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

বেলা হইয়াছে, তাই ঠাকুর ব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি ঘরের ভিতর একটু পাদচারণ করিতেছেন। কিন্তু সহাস্যবদন। কেশব কীর্তনিয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন।

[ঈশ্বর কর্তা —— অথচ কর্মের জন্য জীবের দায়িত্ব —— Responsibility]

কেশব (কীর্তনীয়া) — তা তিনিই 'করণ', 'কারণ'। দুর্যোধন বলেছিলেন, "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — হাঁ, তিনিই সব করাচ্ছেন বটে; তিনিই কর্তা, মানুষ যন্ত্রের স্বরূপ।

"আবার এও ঠিক যে কর্মফল আছেই আছে। লঙ্কামরিচ খেলেই পেট জ্বালা করবে; তিনিই বলে দিয়েছেন যে, খেলে পেট জ্বালা করবে। পাপ করলেই তার ফলটি পেতে হবে।

“যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করেছে, যে ঈশ্বরদর্শন করেছে, সে কিন্তু পাপ করতে পারে না। সাধা-লোকের বেতালে পা পড়ে না। যার সাধা গলা, তার সুরেতে সা, রে, গা, মা’-ই এসে পড়ে।”

অন্ন প্রস্তুত। ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে ভিতর-বাড়িতে গেলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণের বাড়ি ব্যঞ্জনাদি অনেকরকম হইয়াছিল, আর নানবিধ উপাদেয় মিষ্টান্নাদি আয়োজন হইয়াছিল।

বেলা ৩টা বাজিয়াছে। আহারান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশানের বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়াছেন। কাছে শ্রীশ ও মাস্টার বসিয়া আছেন। ঠাকুর শ্রীশের সঙ্গে আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমার কি ভাব? সোঽহম্ না সেব্য-সেবক?

[গৃহস্থের জ্ঞানযোগ না ভক্তিযোগ?]

“সংসারীর পক্ষে সেব্য-সেবকভাব খুব ভাল। সব করা যাচ্ছে, সে অবস্থায় ‘আমিই সেই’ এ-ভাব কেমন করে আসে। যে বলে আমিই সেই, তার পক্ষে জগৎ স্বপ্নবৎ, তার নিজের দেহ-মনও স্বপ্নবৎ, তার আমিটা পর্যন্ত স্বপ্নবৎ, কাজে কাজেই সংসারের কাজ সে করতে পারে না। তাই সেবকভাব, দাসভাব খুব ভাল।

“হনুমানের দাসভাব ছিল। রামকে হনুমান বলেছিলেন, ‘রাম, কখন ভাবি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; তুমি প্রভু, আমি দাস; আর যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি।’

“তত্ত্বজ্ঞানের সময় সোঽহম্‌ হতে পারে, কিন্তু সে দূরের কথা।”

শ্রীশ — আজ্ঞে হাঁ, দাসভাবে মানুষ নিশ্চিন্ত। প্রভুর উপর সকলই নির্ভর। কুকুর ভারী প্রভুভক্ত, তাই প্রভুর উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত।

[যিনি সাকার তিনিই নিরাকার — নাম-মাহাত্ম্য]

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, তোমার সাকার না নিরাকার ভাল লাগে? কি জান যিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার। ভক্তের চক্ষে তিনি সাকাররূপে দর্শন দেন। যেমন অনন্ত জলরাশি। মহাসমুদ্র। কূল-কিনারা নাই, সেই জলের কোন কোন স্থানে বরফ হয়েছে; বেশি ঠাণ্ডাতে বরফ হয়। ঠিক সেইরূপ ভক্তি-হিমে সাকাররূপ দর্শন হয়। আবার যেমন সূর্য উঠলে বরফ গলে যায় — যেমন জল তেমনি জল, ঠিক সেইরূপ জ্ঞানপথ — বিচারপথ — দিয়ে গেলে সাকাররূপ আর দেখা যায় না; আবার সব নিরাকার। জ্ঞানসূর্য উদয় হওয়াতে সাকার বরফ গলে গেল।

“কিন্তু দেখ, যারই নিরাকার, তারই সাকার।”

সন্ধ্যা হয় হয়, ঠাকুর গাত্রোত্থান করিয়াছেন; এইবার দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিবেন। বৈঠকখানাঘরের দক্ষিণে যে রক আছে তাহারই উপর দাঁড়াইয়া ঠাকুর

ঈশানের সহিত কথা কহিতেছেন। সেইখানে একজন বলিতেছেন যে, ভগবানের নাম নিলেই যে সকল সময় ফল হবে, এমন তো দেখা যায় না।

ঈশান বলিলেন, সে কি! অশ্বত্থের বীজ অত ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু উহারই ভিতরে বড় বড় গাছ আছে। দেরিতে সে গাছ দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ হাঁ, দেরিতে ফল হয়।

[ঈশান নির্লিপ্ত সংসারী — পরমহংস অবস্থা]

ঈশানের বাড়ি, ঈশানের শ্বশুর ৺ক্ষেত্রনাথ চাটুজ্যের বাড়ির পূর্বগায়ে। দুই বাড়ির মধ্যে আনাগোনার পথ আছে। চাটুয্যে মহাশয়ের বাড়ির ফটকে ঠাকুর আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঈশান সবান্ধবে ঠাকুরকে গাড়িতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছেন।

ঠাকুর ঈশানকে বলিতেছেন, "তুমি যে সংসারে আছ, ঠিক পাঁকাল মাছের মতো। পুকুরের পাঁকে সে থাকে, কিন্তু গায়ে পাঁক লাগে না।

"এই মায়ার সংসারে বিদ্যা, অবিদ্যা দুই-ই আছে। পরমহংস কাকে বলি? যিনি হাঁসের মতো দুধে-জলে একসঙ্গে থাকলেও জলটি ছেড়ে দুধটি নিতে পারেন। পিঁপড়ের ন্যায় বালিতে চিনিতে একসঙ্গে থাকলেও বালি ছেড়ে চিনিটুকু গ্রহণ করতে পারেন।"

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৭শে ডিসেম্বর 1883/12/27/iii

19.8 শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয় — ঈশ্বরকোটির অপরাধ হয় না

সন্ধ্যা হইয়াছে। ভক্ত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে ঠাকুর আসিয়াছেন। এখান হইতে তবে দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন।

রামের বৈঠকখানা ঘরটি আলো করিয়া ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গোস্বামীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন। গোস্বামীর বাড়ি ওই পাড়াতেই। ঠাকুর তাঁহাকে ভালবাসেন। তিনি রামের বাড়িতে এলেই গোস্বামী আসিয়া প্রায়ই দেখা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বৈষ্ণব, শাক্ত সকলেরই পৌঁছিবার স্থান এক; তবে পথ আলাদা। ঠিক ঠিক বৈষ্ণবেরা শক্তির নিন্দা করে না।

গোস্বামী (সহাস্যে) — হর-পার্বতী আমাদের বাপ-মা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — Thank you; 'বাপ-মা'।

গোস্বামী — তা ছাড়া কারুকে নিন্দা করা, বিশেষতঃ বৈষ্ণবের নিন্দা করায়, অপরাধ হয়। বৈষ্ণবাপরাধ। সব অপরাধের মাফ আছে, বৈষ্ণবাপরাধের মাফ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — অপরাধ সকলের হয় না। ঈশ্বরকোটির অপরাধ হয় না। যেমন চৈতন্যদেবের ন্যায় অবতারের।

“ছেলে যদি বাপকে ধরে আলের উপর দিয়ে চলে, তাহলে বরং খানায় পড়তে পারে। কিন্তু বাপ যদি ছেলের হাত ধরে, সে ছেলে কখনও পড়ে না।

“শোন, আমি মার কাছে শুদ্ধাভক্তি চেয়েছিলাম। মাকে বলেছিলাম, এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম; আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি; আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। মা, এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য; আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।”

গোস্বামী — আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সব মতকে নমস্কার করবে, তবে একটি আছে নিষ্ঠাভক্তি। সবাইকে প্রণাম করবে বটে, কিন্তু একটির উপরে প্রাণ-ঢালা ভালবাসার নাম নিষ্ঠা।

“রাম রূপ বই আর কোনও রূপ হনুমানের ভাল লাগতো না।

“গোপীদের এত নিষ্ঠা যে, তারা দ্বারকায় পাগড়িবাঁধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে চাইলে না।

“পত্নী, দেওর-ভাশুর ইত্যাদিকে পা ধোয়ার জল আসনাদির দ্বারা সেবা করে, কিন্তু পতিকে যেরূপ সেবা করে, সেরূপ সেবা আর কাহাকেও করে না। পতির সঙ্গে সম্বন্ধ আলাদা।”

রাম ঠাকুরকে কিছু মিষ্টান্নাদি দিয়া পূজা করিলেন।

ঠাকুর এইবার দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিবেন। মণির কাছ থেকে গায়ের বনাত ও টুপি লইয়া পরিলেন। বনাতের কানঢাকা টুপি। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে গাড়িতে উঠিতেছেন। রামাদি ভক্তেরা তাঁহাকে তুলিয়া দিতেছেন। মণিও গাড়িতে উঠিলেন, দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া যাইবেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

১৮৮৩, ২৯শে ডিসেম্বর 1883/12/29

19.9 দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে রাখাল, রাম, কেদার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে — বেদান্তবাদী সাধুসঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গাড়িতে উঠিয়াছেন — ১ কালীঘাট দর্শনে যাইবেন। শ্রীযুক্ত অধর সেনের বাটী হইয়া যাইবেন — অধরও সেখান হইতে সঙ্গে যাইবেন। আজ শনিবার, অমাবস্যা; ২৯শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩। বেলা ১টা হইবে।

গাড়ি তাঁহার ঘরের উত্তরের বারন্দার কাছে দাঁড়াইয়া আছে।

মণি গাড়ির দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

মণি (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — আজ্ঞা, আমি কি যাব?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেন?

মণি — কলকাতার বাসা হয়ে একবার আসতাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (চিন্তিত হইয়া) — আবার যাবে? এখানে বেশ আছ।

মণি বাড়ি ফিরিবেন — কয়েক ঘন্টার জন্য, কিন্তু ঠাকুরের মত নাই।

রবিবার, ৩০শে ডিসেম্বর, পৌষ শুক্লা প্রতিপদ তিথি। বেলা তিনটা হইয়াছে। মণি গাছতলায় একাকী বেড়াইতেছেন, — একটি ভক্ত আসিয়া বলিলেন, প্রভু ডাকিতেছেন। ঘরে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। মণি গিয়া প্রণাম করিলেন ও মেঝেতে ভক্তদের সঙ্গে বসিলেন।

কলিকাতা হইতে রাম, কেদার প্রভৃতি ভক্তেরা আসিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে একটি বেদান্তবাদী সাধু আসিয়াছেন। ঠাকুর যেদিন রামের বাগান দর্শন করিতে যান, সেই দিন এই সাধুটির সহিত দেখা হয়। সাধু পার্শ্বের বাগানের একটি গাছের তলায় একাকী একটি খাটিয়ায় বসিয়াছিলেন। রাম আজ ঠাকুরের আদেশে সেই সাধুটিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। সাধুও ঠাকুরকে দর্শন করিবেন — ইচ্ছা করিয়াছেন।

ঠাকুর সাধুর সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন। নিজের কাছে ছোট তক্তাটির উপর সাধুকে বসাইয়াছেন। কথাবার্তা হিন্দীতে হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এ-সব তোমার কিরূপ বোধ হয়?

বেদান্তবাদী সাধু — এ-সব স্বপ্নবৎ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা? আচ্ছা জী, ব্রহ্ম কিরূপ?

সাধু — শব্দই ব্রহ্ম। অনাহত শব্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিন্তু জী, শব্দের প্রতিপাদ্য একটি আছেন। কেমন?

সাধু — বাচ্য১ ওই হ্যায়, বাচক ওই হ্যায়।

এই কথা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। স্থির, — চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। সাধু ও ভক্তেরা অবাক্ হইয়া ঠাকুরের এই সমাধি অবস্থা দেখিতেছেন। কেদার সাধুকে বলিতেছেন —

“এই দেখো জী! ইস্‌কো সমাধি বোলতা হ্যায়।”

সাধু গ্রন্থেই সমাধির কথা পড়িয়াছেন, সমাধি কখনও দেখেন নাই।

ঠাকুর একটু একটু প্রকৃতিস্থ হইতেছেন ও জগন্মাতার সহিত কথা কহিতেছেন, “মা, ভাল হব — বেহুঁশ করিস নে — সাধুর সঙ্গে সচ্চিদানন্দের কথা কব! — মা, সচ্চিদানন্দের কথা নিয়ে বিলাস করব!”

সাধু অবাক্‌ হইয়া দেখিতেছেন ও এই সকল কথা শুনিতেছেন। এইবার ঠাকুর সাধুর সহিত কথা কহিতেছেন — বলিতেছেন — আব্‌ সোঽহম্‌ উড়ায়ে দেও। আব্‌ হাম্‌ তোম্‌; — বিলাস! (অর্থাৎ এখন সোঽহম্‌ — “সেই আমি” উড়ায়ে দাও; — এখন “আমি তুমি”)।

যতক্ষণ আমি তুমি রয়েছে ততক্ষণ মাও আছেন — এস তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা যাক। এই কথা কি ঠাকুর বলিতেছেন?

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ঠাকুর পঞ্চবটীমধ্যে বেড়াইতেছেন, — সঙ্গে রাম, কেদার, মাস্টার প্রভৃতি।

[শ্রীরামকৃষ্ণের কেদারের প্রতি উপদেশ — সংসারত্যাগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — সাধুটিকে কিরকম দেখলে?

কেদার — শুষ্ক জ্ঞান! সবে হাঁড়ি চড়েছে, — এখনও চাল চড়ে নাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা বটে, কিন্তু ত্যাগী। সংসার যে ত্যাগ করেছে, সে অনেকটা এগিয়েছে।

“সাধুটি প্রবর্তকের ঘর। তাঁকে লাভ না করলে কিছুই হল না। যখন তাঁর প্রেমে মত্ত হওয়া যায়, আর কিছু ভাল লাগে না, তখন:

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে!

মন, তুই দেখ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে!

ঠাকুরের ভাবে কেদার একটি গান বলিতেছেন—

মনের কথা কইবো কি সই, কইতে মানা —

দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।

মনের মানুষ হয় যে জনা, ও তার নয়নেতে যায় গো চেনা,

ও সে দুই-এক জনা, ভাবে ভাসে রসে ডোবে,

ও সে উজান পথে করে আনাগোনা (ভাবের মানুষ)।

ঠাকুর নিজের ঘরে ফিরিয়াছেন। ৪টা বাজিয়াছে, — মা-কালীর ঘর খোলা হইয়াছে। ঠাকুর সাধুকে সঙ্গে করিয়া মা-কালীর ঘরে যাইতেছেন। মণি সঙ্গে আছেন।

কালীঘরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুর ভক্তিভরে মাকে প্রণাম করিতেছেন। সাধুও হাতজোড় করিয়া মাথা নোয়াইয়া মাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেমন জী, দর্শন!

সাধু (ভক্তিভরে) — কালী প্রধানা হ্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কালী ব্রহ্ম অভেদ। কেমন জী?

সাধু — যতক্ষণ বহির্মুখ, ততক্ষণ কালী মানতে হবে। যতক্ষণ বহির্মুখ ততক্ষণ ভাল মন্দ; ততক্ষণ এটি প্রিয়, এটি ত্যাজ্য।

“এই দেখুন, নামরূপ তো সব মিথ্যা, কিন্তু যতক্ষণ আমি বহির্মুখ ততক্ষণ স্ত্রীলোক ত্যাজ্য। আর উপদেশের জন্য এটা ভাল, ওটা মন্দ; — নচেৎ ভ্রষ্টাচার হবে।”

ঠাকুর সাধুর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে ঘরে ফিরিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — দেখলে, — সাধু কালীঘরে প্রণাম করলে!

মণি —– আজ্ঞা, হাঁ!

পরদিন সোমবার, ৩১শে ডিসেম্বর (১৭ই পৌষ, শুক্লা দ্বিতীয়া)। বেলা ৪টা হইবে। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে ঘরে বসিয়া আছেন। বলরাম, মণি, রাখাল, লাটু, হরিশ প্রভৃতি আছেন। ঠাকুর মণিকে ও বলরামকে বলিতেছেন —–

[মুখে জ্ঞানের কথা —– হলধারীকে ঠাকুরের তিরস্কার কথা]

“হলধারীর জ্ঞানীর ভাব ছিল। সে অধ্যাত্ম, উপনিষৎ, — এই সব রাতদিন পড়ত। এদিকে সাকার কথায় মুখ ব্যাঁকাত। আমি যখণ কাঙালীদের পাতে একটু একটু খেলাম, তখন বললে, ‘তোর ছেলেদের বিয়ে কেমন করে হবে!’ আমি বললাম, ‘তবে রে শ্যালা, আমার আবার ছেলেপিলে হবে! তোর গীতা, বেদান্ত পড়ার মুখে আগুন!’ দেখো না, এদিকে বলছে জগৎ মিথ্যা! — আবার বিষ্ণুঘরে নাক সিটকে ধ্যান!”

সন্ধ্যা হইল। বলরামাদি ভক্তেরা কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। ঘরে ঠাকুর মার চিন্তা করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরবাড়িতে আরতির সুমধুর শব্দ শোনা যাইতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় ৮টা হইয়াছে। ঠাকুর ভাবে সুমধুর স্বরে সুর করিয়া মার সহিত কথা কহিতেছেন। মণি মেঝেতে বসিয়া আছেন।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বেদান্ত]

ঠাকুর মধুর নাম উচ্চারণ করিতেছেন — হরি ওঁ! হরি ওঁ! ওঁ! মাকে বলিতেছেন — "ও মা! ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহুঁশ করে রাখিস নে! ব্রহ্মজ্ঞান চাই না মা! আমি আনন্দ করব! বিলাস করব!"

আবার বলিতেছেন — "বেদান্ত জানি না মা! জানতে চাই না মা! — মা, তোকে পেলে বেদবেদান্ত কত নিচে পড়ে থাকে!

কৃষ্ণ রে! তোরে বলব, খা রে — নে রে — বাপ! কৃষ্ণ রে! বলব, তুই আমার জন্য দেহধারণ করে এসেছিস বাপ।"

১ বাচ্যবাচকভেদেন ত্বমেব পরমেশ্বর [অধ্যাত্ম রামায়ণ]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c20 ২০ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২রা জানুয়ারি 1884/01/02/i

20.1 তান্ত্রিক ও মণি সঙ্গে

আজ পৌষ শুক্লা চতুর্থী, ২রা জানুয়ারি, ১৮৮৪ (১৯শে পৌষ, বুধবার, ১২৯০)।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর-কালীমন্দিরে বাস করিতেছেন। আজকাল রাখাল, লাটু, হরিশ, রামলাল, মাস্টার দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতেছেন।

বেলা ৩টা বাজিয়াছে, মণি বেলতলা হইতে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে তাঁর ঘরের অভিমুখে আসিতেছেন। তিনি একটি তান্ত্রিকভক্তসঙ্গে পশ্চিমের গোল বারান্দায় উপবিষ্ট আছেন।

মণি আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে কাছে বসিতে বলিলেন। বুঝি তান্ত্রিকভক্তের সহিত কথা কহিতে কহিতে তাঁহাকেও উপদেশ দিবেন। শ্রীযুক্ত মহিম চক্রবর্তী তান্ত্রিকভক্তটিকে দর্শন করিতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ভক্তটি গেরুয়া বসন পরিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (তান্ত্রিকভক্তের প্রতি) — এ-সব তান্ত্রিক সাধনার অঙ্গ, কপালি পাত্রে সুধা পান করা, ওই সুধাকে কারণবারি বলে, কেমন?

তান্ত্রিক — আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এগার পাত্র, না?

তান্ত্রিক — তিনতোলা প্রমাণ। শবসাধনের জন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমার সুরা ছুঁবার জো নাই।

তান্ত্রিক — আপনার সহজানন্দ। সে আনন্দ হলে কিছুই চাই না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আবার দেখ, আমার জপতপও ভাল লাগে না। তবে সর্বদা স্মরণ-মনন আছে। আচ্ছা। ষট্‌চক্র, ওটা কি?

তান্ত্রিক — আজ্ঞা, ও-সব নানা তীর্থের ন্যায়। এক-এক চক্রে শিবশক্তিঃ; চক্ষে দেখা যায় না; কাটলে বেরোয় না। পদ্মের মৃণাল শিবলিঙ্গ, পদ্ম কর্ণিকায় আদ্যাশক্তি যোনিরূপে।

মণি নিঃশব্দে সমস্ত শুনিতেছেন। তাঁর দিকে তাকাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তান্ত্রিকভক্তকে কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (তান্ত্রিকের প্রতি) — আচ্ছা, বীজমন্ত্র না পেলে কি সিদ্ধ হয়?

তান্ত্রিক — হয়; বিশ্বাসে — গুরুবাক্যে বিশ্বাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির দিকে ফিরিয়া ও তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া) —বিশ্বাস!

তান্ত্রিকভক্ত চলিয়া গেলে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন আসিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন। রাখাল, মণি প্রভৃতি ভক্তেরা আছেন। অপরাহ্ন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (জয়গোপালের প্রতি) — কারুকে, কোন মতকে বিদ্বেষ করতে নাই। নিরাকারাবাদী, সাকারবাদী সকলেই তাঁর দিকে যাচ্ছে, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত সকলেই তাঁকে খুঁজছে, জ্ঞানপথের লোক তাঁকে বলে ব্রহ্ম, যোগীরা বলে আত্মা, পরমাত্মা। ভক্তেরা বলে ভগবান, আবার আছে যে, নিত্য ঠাকুর, নিত্য দাস।

জয়গোপাল —— সব পথই সত্য কেমন করে জানব?

শ্রীরামকৃষ্ণ —— একটা পথ দিয়ে ঠিক যেতে পারলে তাঁর খাছে পোঁছানো যায়। তখন সব পথের খবর জানতে পারে। যেমন একবার কোন উপায়ে ছাদে উঠতে পারলে, কাঠের সিঁড়ি দিয়াও নামা যায়; পাকা সিঁড়ি দিয়াও নামা যায়; একটা বাঁশ দিয়াও নামা যায়; একটা দড়ি দিয়াও নামা যায়।

“তাঁর কৃপা হলে, ভক্ত সব জানতে পারে। তাঁকে একবার লাভ হলে সব জানতে পারবে। একবার জো-সো করে বড়বাবু সঙ্গে দেখা করতে হয়, আলাপ করতে হয় —— তখন বাবুই বলে দেবে তাঁর কখানা বাগান, পুকুর, কোম্পানির কাগজ।”

[ঈশ্বরদর্শনের উপায়]

জয়গোপাল — কি করে তাঁর কৃপা হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁর নামগুণকীর্তন সর্বদা করতে হয়, বিষয়চিন্তা যত পার ত্যাগ করতে হয় — তুমি চাষ করবার জন্য ক্ষেতে অনেক কষ্টে জল আনছো, কিন্তু যোগ (আলের গর্ত) দিয়ে সব বেরিয়া যাচ্ছে। নালা কেটে জল আনা সব বৃথা পণ্ডশ্রম হল।

“চিত্তশুদ্ধি হলে, বিষয়াসক্তি চলে গেলে, ব্যাকুলতা আসবে; তোমার প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে পোঁছিবে। টেলিগ্রাফের তারের ভিতর অন্য জিনিস মিশাল থাকলে বা ফুটো থাকলে তারের খবর পোঁছিবে না।

“আমি ব্যাকুল হয়ে একলা একলা কাঁদতাম; কোথায় নারায়ণ এই বলে কাঁদতাম। কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে যেতাম — মহাবায়ুতে লীন!

“যোগ কিসে হয়? টেলিগ্রাফের তারে অন্য জিনিস বা ফুটো না থাকলে হয়। একেবারে বিষয়াসক্তি ত্যাগ।

“কোন কামনা-বাসনা রাখতে নাই। কামনা-বাসনা থাকলে সকাম ভক্তি বলে! নিষ্কাম ভক্তিকে বলে অহেতুকী ভক্তি। তুমি ভালবাসো আর নাই বাসো, তবু তোমাকে ভালবাসি। এর নাম অহেতুকী।

“কথাটা এই, তাঁকে ভালবাসা। খুব ভালবাসা হলে দর্শন হয়। সতীর পতির উপর টান, মায়ের সন্তানের উপর টান, বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান — এই তিন টান যদি একত্র হয়, তাহলে ঈশ্বরদর্শন হয়।”

জয়গোপাল বিষয়ী লোক; তাই কি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহারই উপযোগী এ-সব উপদেশ দিতেছেন?

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২রা জানুয়ারি 1884/01/02/ii

20.2 জ্ঞানপথ ও বিচারপথ — ভক্তিযোগ ও ব্রহ্মজ্ঞান

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে বসিয়া আছেন। রাত্রি প্রায় ৮টা হইবে। আজ পৌষ শুক্লা পঞ্চমী, বুধবার, ২রা জানুয়ারি, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। ঘরে রাখাল ও মণি আছেন। মণির আজ প্রভুসঙ্গে একবিংশতি দিবস।

ঠাকুর মণিকে বিচার করিতে বারণ করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি) — বেশি বিচার করা ভাল না। আগে ঈশ্বর তারপর জগৎ — তাঁকে লাভ করলে তাঁর জগতের বিষয়ও জানা যায়।

(মণি ও রাখালের প্রতি) — “যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করলে তার কত বাড়ি, বাগান, কোম্পানির কাগজ, সব জানতে পারা যায়।

“তাই তো ঋষিরা বাল্মীকিকে ‘মরা’ ‘মরা’ জপ করতে বললেন।

“ওর একটু মানে আছে; ‘ম’ মানে ঈশ্বর, ‘রা’ মানে জগৎ — আগে ঈশ্বর, তারপরে জগৎ।”

[কৃষ্ণকিশোরের সহিত ‘মরা’ মন্ত্রকথা]

“কৃষ্ণকিশোর বলেছিল, ‘মরা’ ‘মরা’ শুদ্ধ মন্ত্র — ঋষি দিয়েছেন বলে। ‘ম’ মানে ঈশ্বর, ‘রা’ মানে জগৎ।

“তাই আগে বাল্মীকির মতো সব ত্যাগ করে নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়। আগে দরকার ঈশ্বরদর্শন! তারপর বিচার — শাস্ত্র, জগৎ।”

[ঠাকুরের রাস্তায় ক্রন্দন — “মা বিচার-বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও” — ১৮৬৮]

(মণির প্রতি) — “তাই তোমাকে বলছি, — আর বিচার করো না। আমি ঝাউতলা থেকে উঠে যাচ্ছিলাম ওই কথা বলতে। বেশি বিচার করলে শেষে হানি হয়। শেষে হাজরার মতো হয়ে যাবে। আমি রাত্রে একলা রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াতাম আর বলেছিলাম —

‘মা, বিচার-বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও।’

“বল, আর (বিচার) করবে না?”

মণি — আজ্ঞা, না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ভক্তিতেই সব পাওয়া যায়। যারা ব্রহ্মজ্ঞান চায়, যদি ভক্তির রাস্তা ধরে থাকে, তারা ব্রহ্মজ্ঞানও পাবে।

“তাঁর দয়া থাকলে কি জ্ঞানের অভাব থাকে? ও-দেশে ধান মাপে, যেই রাশ ফুরোয় অমনি একজন রাশ ঠেলে দেয়! মা জ্ঞানের রাশ ঠেলে দেন।”

[পদ্মলোচনের ঠাকুরের প্রতি ভক্তি — পঞ্চবটীতে সাধনকালে প্রার্থনা]

“তাঁকে লাভ করলে পণ্ডিতদের খড়কুটো বোধ হয়। পদ্মলোচন বলেছিল, ‘তোমার সঙ্গে কৈবর্তের বাড়িতে যাব, তার আর কি? — তোমার সঙ্গে হাড়ির বাড়ি গিয়ে থাকতে পারি!’

“ভক্তি দ্বারাই সব পাওয়া যায়। তাঁকে ভালবাসতে পারলে আর কিছুরই অভাব থাকে না। ভগবতির কাছে কার্তিক আর গণেশ বসেছিলেন। তাঁর গলায় মণিময় রত্নমালা। মা বললেন, ‘যে ব্রহ্মাণ্ড আগে প্রদক্ষিণ করে আসতে পারবে, তাকে এই মালা দিব।’ কার্তিক তৎক্ষণাৎ ক্ষণবিলম্ব না করে ময়ূরে চড়ে বেরিয়ে গেলেন। গণেশ আস্তে আস্তে মাকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করিলেন। গণেশ জানে মার ভিতরেই ব্রহ্মাণ্ড! মা প্রসন্না হয়ে গণেশের গলায় হার পরিয়ে দিলেন। অনেকক্ষণ পরে কার্তিক এসে দেখে যে, দাদা হার পরে বসে আছে।

“মাকে কেঁদে কেঁদে আমি বলেছিলাম, ‘মা, বেদ-বেদান্তে কি আছে, আমায় জানিয়ে দাও — পুরাণ তন্ত্রে কি আছে, আমায় জানিয়ে দাও।’ তিনি একে একে আমায় সব জানিয়ে দিয়েছেন।

“তিনি আমাকে সব জানিয়ে দিয়েছেন, — কত সব দেখিয়ে দিয়েছেন।”

[সাধনকালে ঠাকুরের দর্শন — শিব-শক্তি, নৃমুণ্ডস্তূপ, গুরুকর্ণধার, সচ্চিদানন্দ-সাগর]

“একদিন দেখালেন, চর্তুদিকে শিব আর শক্তি। শিব-শক্তির রমণ। মানুষ, জীবজন্তু, তরুলতা, সকলের ভিতরেই সেই শিব আর শক্তি — পুরুষ আর প্রকৃতি। এদের রমণ।

“আর-একদিন দেখালেন — নৃমুণ্ডস্তূপাকার! — পর্বতাকার! আর কিছুই নাই! — আমি তার মধ্যে একলা বসে!

“আর-একবার দেখালেন মহাসমুদ্র! আমি লবণ-পুত্তলিকা হয়ে মাপতে যাচ্ছি! মাপতে গিয়ে গুরুর কৃপায় পাথর হয়ে গেলুম! — দেখলাম জাহাজ একখানা; — অমনি উঠে পড়লাম! — গুরু কর্ণধার! (মণির প্রতি) সচ্চিদানন্দ গুরুকে রোজ তো সকালে ডাকো?”

মণি — আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — গুরু কর্ণধার। তখন দেখছি, আমি একটি, তুমি একটি। আবার লাফ দিয়ে পড়ে মীন হলাম। সচ্চিদানন্দ-সাগরে আনন্দে বেড়াচ্ছি দেখলাম।

“এ-সব অতি গুহ্যকথা! বিচার করে কি বুঝবে? তিনি যখন দেখিয়ে দেন, তখন সব পাওয়া যায় —— কিছুরই অভাব থাকে না।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৪ঠা জানুয়ারি 1884/01/04

20.3 মণিকে উপদেশ

আজ শুক্রবার, ৪ঠা জানুয়ারি, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, বেলা ৪টার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীতে বসিয়া আছেন। সহাস্যবদন। সঙ্গে মণি, হরিপদ প্রভৃতি। ৺আনন্দ চাটুজ্যের কথা হরিপদের সহিত হইতেছে ও ঘোষপাড়ার সাধন-ভজনের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ক্রমে নিজের ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। মণি, হরিপদ, রাখালাদি ভক্তগণও থাকেন, মণি বেলতলায় অনেক সময় থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — বিচার আর করো না। ওতে শেষে হানি হয়। তাঁকে ডাকবার সময় একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। সখীভাব, দাসীভাব, সন্তানভাব বা বীরভাব।

“আমার সন্তানভাব। এভাব দেখলে মায়াদেবী পথ ছেড়ে দেন — লজ্জায়।

“বীরভাব বড় কঠিন। শাক্ত ও বৈষ্ণব বাউলদের আছে। ওভাবে ঠিক থাকা বড় শক্ত। আবার আছে — শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাব। মধুরভাবে সব আছে — শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য।

(মণির প্রতি) — “তোমার কোন্‌টা ভাল লাগে?”

মণি — সব ভাবই ভাল লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সব ভাব সিদ্ধ অবস্থায় ভাল লাগে। সে অবস্থায় কামগন্ধ থাকবে না। বৈষ্ণব শাস্ত্রে আছে চণ্ডীদাস ও রজকিনীর কথা — তাদের ভালবাসা কামগন্ধ বিবর্জিত!

“এ-অবস্থায় প্রকৃতিভাব। আপনাকে পুরুষ বলে বোধ থাকে না। রূপ গোস্বামী মীরাবাঈ স্ত্রীলোক বলে তাঁর সহিত দেখা করতে চান নাই। মীরাবাঈ বলে পাঠালেন ‘শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ’, বৃন্দাবনে সকলেই সেই পুরুষের দাসী; গোস্বামীর পুরুষ অভিমান করা কি ঠিক হয়েছে?”

সন্ধ্যার পর মণি আবার শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে বসিয়া আছেন। সংবাদ আসিয়াছে শ্রীযুক্ত কেশব সেনের অসুখ বাড়িয়াছে। তাঁহারই কথা প্রসঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — হ্যাঁগা; ওদের ওখানে কি কেবল লেকচার দেওয়া? না ধ্যানও আছে? ওরা বুঝি বলে উপাসনা।

“কেশব আগে খ্রীষ্টান ধর্ম, খ্রীষ্টানী মত খুব চিন্তা করেছিলেন। — সেই সময় ও তার আগে দেবেন্দ্র ঠাকুরের ওখানে ছিলেন।”

মণি — কেশববাবু প্রথম প্রথম যদি এখানে আসতেন তাহলে সমাজ সংস্কার নিয়ে ব্যস্ত হতেন না। জাতিভেদ উঠানো, বিধবা বিবাহ, অন্য জাতে বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদি সামাজিক কর্ম লয়ে অত ব্যস্ত হতেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেশব এখন কালী মানেন — চিন্ময়ী কালী — আদ্যাশক্তি। আর মা মা বলে তাঁর নামগুণকীর্তন করেন।

“আচ্ছা, ব্রাহ্মসমাজ ওইরকম কি একটা পরে দাঁড়াবে?”

মণি — এ-দেশের মাটি তেমন নয়। ঠিক যা, তা একবার হবেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হ্যাঁ, সনাতন ধর্ম ঋষিরা যা বলেছেন, তাই থেকে যাবে। তবে ব্রাহ্মসমাজ ও ওইরকম সম্প্রদায়ও একটু একটু থাকবে। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে যাচ্ছে।

বৈকালে কলিকাতা হইতে কতকগুলি ভক্ত আসিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক গান ঠাকুরকে শুনাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি গানে আছে “মা, তুমি আমাদের লাল চুষি মুখে দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছ; আমরা চুষি ফেলে যখন তোমার জন্য চিৎকার করে কাঁদব তখন তুমি আমাদের কাছে নিশ্চয় দৌড়ে আসবে।”

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — তারা, কেমন লাল চুষির গান গাইলে —

মণি — আজ্ঞা, আপনি কেশব সেনকে এ লাল চুষির কথা বলেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হ্যাঁ; আর চিদাকাশের কথা — আরও সব অনেক কথা হত; আর আনন্দ হত। গান, নৃত্য হত।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৫ই জানুয়ারি 1884/01/05/i

20.4 সাধনকালে বেলতলায় ধ্যান ১৮৫৯-৬১ — কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ

[শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি গমন — রঘুবীরের জমি রেজিস্ট্রি — ১৮৭৮-৮০]

ঠাকুরের মধ্যাহ্ন সেবা হইয়াছে। বেলা প্রায় ১টা। শনিবার, ৫ই জানুয়ারি। মণির আজ প্রভুসঙ্গে ত্রয়োবিংশতি দিবস।

মণি আহারান্তে নবতে ছিলেন — হঠাৎ শুনিলেন, কে তাহার নাম ধরিয়া তিন-চারবার ডাকিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুরের ঘরের উত্তরের লম্বা বারান্দা হইতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে ডাকিতেছেন। মণি আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

দক্ষিণের বারান্দায় ঠাকুর মণির সহিত বসিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমরা কিরকম ধ্যান কর? আমি বেলতলায় স্পষ্ট নানা রূপ দর্শন করতাম। একদিন দেখলাম সামনে টাকা, শাল, একসরা সন্দেশ, দুজন মেয়েমানুস। মনকে জিজ্ঞাসা করলাম, মন! তুই এ-সব কিছু চাস? — সন্দেশ দেখলাম গু! মেয়েদের মধ্যে একজনের ফাঁদি নথ। তাদের ভিতর বাহির সব দেখতে পাচ্ছি — নাড়ীভুঁড়ি, মল-মূত্র, হাড়-মাংস, রক্ত। মন কিছুই চাইলে না।

"তাঁর পাদপদ্মেতেই মন রহিল। নিক্তির নিচের কাঁটা আর উপরের কাঁটা — মন সেই নিচের কাঁটা। পাছে উপরের কাঁটা (ঈশ্বর) থেকে মন বিমুখ হয় সদাই আতঙ্ক। একজন আবার শূল হাতে সদাই কাছে এসে বসে থাকত; ভয় দেখালে, নিচের কাঁটা উপরের কাঁটা থেকে তফাত হলেই এর বাড়ি মারব।

"কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ না হলে হবে না। আমি তিন ত্যাগ করেছিলাম — জমিন, জরু, টাকা।১ রঘুবীরের নামের জমি ও-দেশে রেজিস্ট্রি করতে গিছলাম। আমায় সই করতে বললে। আমি সই করলুম না। 'আমার জমি' বলে তো বোধ নাই। কেশব সেনের গুরু বলে খুব আদর করেছিল। আম এনে দিলে। তা বাড়ি নিয়ে যাবার জো নাই। সন্ন্যাসীর সঞ্চয় করতে নাই।

"ত্যাগ না হলে কেমন করে তাঁকে লাভ করা যাবে! যদি একটা জিনিসের পর আর একটা জিনিস থাকে, তাহলে প্রথম জিনিসটাকে না সরালে, কেমন করে একটা জিনিস পাবে?

“নিষ্কাম হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। তবে সকাম ভজন করতে করতে নিষ্কাম হয়। ধ্রুব রাজ্যের জন্য তপস্যা করেছিলেন, কিন্তু ভগবানকে পেয়েছিলেন। বলেছিলেন, ‘যদি কাচ কুড়ুতে এসে কেউ কাঞ্চন পায়, তা ছাড়বে কেন’?”

[দয়া, দানাদি ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ — চৈতন্যদেবের দান]

“সত্ত্বগুণ এলে তবে তাঁকে লাভ করা যায়।

“দানাদি কর্ম সংসারী লোকের প্রায় সকামই হয় — সে ভাল না। তবে নিষ্কাম করলে ভাল। কিন্তু নিষ্কাম করা বড় কঠিন।

“সাক্ষাৎকার হলে ঈশ্বরের কাছে কি প্রার্থনা করবে যে ‘আমি কতকগুলো পুকুর, রাস্তা, ঘাট, ডিস্পেনসারি, হাসপাতাল — এই সব করব, ঠাকুর আমায় বর দাও। তাঁর সাক্ষাৎকার হলে ও-সব বাসনা একপাশে পড়ে থাকে।

“তবে দয়ার কাজ — দানাদি কাজ — কি কিছু করবে না?

“তা নয়। সামনে দুঃখ কষ্ট দেখলে টাকা থাকলে দেওয়া উচিত। জ্ঞানী বলে, ‘দে রে দে রে, এরে কিছু দে।’ তা না হলে, ‘আমি কি করতে পারি, — ঈশ্বরই কর্তা আর সব অকর্তা’ এইরূপ বোধ হয়।

“মহাপুরুষেরা জীবের দুঃখে কাতর হয়ে ভগবানের পথ দেখিয়ে দেন। শঙ্করাচার্য জীবশিক্ষার জন্য ‘বিদ্যার আমি’ রেখেছিলেন।

“অন্নদানের চেয়ে জ্ঞানদান, ভক্তিদান আরও বড়। চৈতন্যদেব তাই আচণ্ডালে ভক্তি বিলিয়েছিলেন। দেহের সুখ-দুঃখ তো আছেই। এখানে আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও। জ্ঞান-ভক্তির প্রয়োজন। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।”

[স্বাধীন ইচ্ছা (Free will) কি আছে, ঠাকুরের সিদ্ধান্ত]

“তিনি সব কচ্ছেন। যদি বল তাহলে লোকে পাপ করতে পারে। তা নয় — যার ঠিক বোধ হয়েছে ‘ঈশ্বর কর্তা আমি অকর্তা’ তার আর বেতালে পা পড়ে না।

“ইংলিশম্যান-রা যাকে স্বাধীন ইচ্ছা (Free will) বলে, সেই স্বাধীন ইচ্ছাবোধ তিনিই দিয়ে রাখেন।

“যারা তাঁকে লাভ করে নাই, তাদের ভিতর ওই স্বাধীন ইচ্ছাবোধ না দিলে পাপের বৃদ্ধি হত। নিজের দোষে পাপ কচ্ছি, এ-বোধ যদি তিনি না দিতেন, তাহলে পাপের আরও বৃদ্ধি হত।

“যারা তাঁকে লাভ করেছে, তারা জানে দেখতেই ‘স্বাধীন ইচ্ছা’ — বস্তুতঃ তিনিই যন্ত্রী, আমি যন্ত্র। তিনি ইঞ্জিনিয়ার, আমি গাড়ি।”

১ ভিক্ষুঃ সৌবর্ণাদীনাং নৈব পরিগ্রহেৎ
যস্মাদভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন দৃষ্টং চ স ব্রহ্মহা ভবেৎ।
যস্মাদভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন স্পৃষ্টং চেৎ পৌল্কসো ভবেৎ।
যস্মদভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন গ্রাহ্যং চ স আত্মহা ভবেৎ।

তস্মাদভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন ন দৃষ্টঞ্চ স্পৃষ্টঞ্চ ন গ্রাহ্যঞ্চ।

[পরমহংসোপনিষদ]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৫ই জানুয়ারি 1884/01/05/ii

20.5 গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ — ভক্তজন্য ক্রন্দন ও প্রার্থনা

বেলা চারিটা বাজিয়াছে। পঞ্চবটীঘরে শ্রীযুক্ত রাখাল, আরও দু-একটি ভক্ত মণির কীর্তন গান শুনিতেছেন —

গান — ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে এসে যায়।

রাখাল গান শুনিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটিতে আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে বাবুরাম, হরিশ — ক্রমে রাখাল ও মণি।

রাখাল — ইনি আজ বেশ কীর্তন করে আনন্দ দিয়েছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া গান গাহিতেছেন:

বাঁচলাম সখি, শুনি কৃষ্ণনাম (ভাল কথার মন্দও ভাল)।

(মণির প্রতি) — এই সব গান গাইবে — ‘সব সখি মিলি বৈঠল, (এই তো রাই ভাল ছিল)। (বুঝি হাট ভাল!)’

আবার বলিতেছেন, “এই আর কি! — ভক্তি, ভক্ত নিয়ে থাকা।”

[শ্রীরাধা ও যশোদা সংবাদ — ঠাকুরের “আপনার লোক”]

“কৃষ্ণ মথুরায় গেলে যশোদা শ্রীমতীর কাছে এসেছিলেন। শ্রীমতী ধ্যানস্থ ছিলেন। তারপর যশোদাকে বললেন, ‘আমি অদ্যাশক্তি, তুমি আমার কাছে কিছু বর লও।’ যশোদা বললেন, ‘বর আর কি দিবে! — তবে এই বলো — যেন কায়মনোবাক্যে তারই সেবা করতে পারি, — যেন এই চক্ষে তার ভক্তের দর্শন হয়; — এই মনে তার ধ্যান চিন্তা যেন হয় — আর বাক্য দ্বারা তার নামগুনগান যেন হয়।’

“তবে যাদের খুব পাকা হয়ে গেছে, তাদের ভক্ত না হলেও চলে — কখন কখন ভক্ত ভাল লাগে না। পঙ্খের কাজের উপর চুনকাম ফেটে যায় অর্থাৎ যার তিনি অন্তরে বাহিরে তাদের এইরূপ অবস্থা।”

ঠাকুর ঝাউতলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পঞ্চবটীমূলে মণিকে আবার বলিতেছেন — “তোমার মেয়ে সুর — এইরকম গান অভ্যাস করতে পার? — ‘সখি সে বন কত দূর! — যে বনে আমার শ্যামসুন্দর।’

(বাবুরাম দৃষ্টে, মণির প্রতি) — “দেখ, যারা আপনার তারা হল পর — রামলাল আর সব যেন আর কেউ। যারা পর তারা হল আপনার, — দেখ না, বাবুরামকে বলছি — ‘বাহ্যে যা — মুখ ধো।’ এখন ভক্তরাই আত্মীয়।”

মণি — আজ্ঞা, হাঁ।

[উন্মাদের পূর্বে পঞ্চবটীতে সাধন ১৮৫৭-৫৮ — চিচ্ছক্তি ও চিদাত্মা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (পঞ্চবটী দৃষ্টে) — এই পঞ্চবটীতে বসতাম। কালে উন্মাদ হলাম। তাও গেল। কালই ব্রহ্ম। যিনি কালের সহিত রমণ করেন, তিনিই কালী — আদ্যাশক্তি। অটলকে টলিয়ে দেন।

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাহিতেছেন — ‘ভাব কি ভেবে পরাণ গেল। যার নামে হর কাল, পদে মহাকাল, তার কালোরূপ কেন হল!’

“আজ শনিবার, মা-কালীর ঘরে যেও।”

বকুলতলার নিকট আসিয়া ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন —

“চিদাত্মা আর চিচ্ছক্তি। চিদাত্মা পুরুষ, চিচ্ছক্তি প্রকৃতি। চিদাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, চিচ্ছক্তি শ্রীরাধা। ভক্ত ওই চিচ্ছক্তির এক-একটি রূপ।

“অন্যান্য ভক্তেরা সখীভাব বা দাসভাবে থাকবে। এই মূলকথা।”

সন্ধ্যার পর ঠাকুর কালীঘরে গিয়াছেন। মণি সেখানে মার চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন।

[ভক্তজন্য জগন্মাতার কাছে ক্রন্দন — ভক্তদের আশীর্বাদ]

সমস্ত দেবালয়ে আরতি হইয়া গেল। ঠাকুর ঘরে তক্তার উপর বসিয়া মার চিন্তা করিতেছেন। মেঝেতে কেবল মণি বসিয়া আছেন।

ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সমাধু ভঙ্গ হইতেছে। এখন ভাবের পূর্ণ মাত্রা — ঠাকুর মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ছোটছেলে যেমন মার কাছে আবদার করে কথা কয়। মাকে করুণস্বরে বলিতেছেন, "ওমা, কেন সে রূপ দেখালি নি! সেই ভুবনমোহন রূপ! এত করে তোকে বললাম! তা তোকে বললে তো তুই শুনবিনি! তুই ইচ্ছাময়ী।" সুর করে মাকে এই কথাগুলি বললেন, শুনলে পাষাণ বিগলিত হয়। ঠাকুর আবার মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন —

"মা বিশ্বাস চাই। যাক শালার বিচার। সাত চোনার বিচার এক চোনায় যায়। বিশ্বাস চাই (গুরুবাক্যে বিশ্বাস) — বালকের মতো বিশ্বাস। মা বলেছে, ওখানে ভূত আছে, তা ঠিক জেনে আছে, — যে ভূত আছে। মা বলেছে, ওখানে জুজু। তো তাই ঠিক জেনে আছে। মা বলেছে, ও তোর দাদা হয় — তো জেনে আছে পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দাদা। বিশ্বাস চাই!

“কিন্তু মা! ওদেরই বা দোষ কি! ওরা কি করবে! বিচার একবার তো করে নিতে হয়! দেখ না ওই সেদিন এত করে বললাম, তা কিছু হল না — আজ কেন একেবারে — * * * *”

ঠাকুর মার কাছে করুণ গদ্‌গদস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করিতেছেন। কি আশ্চর্য! ভক্তদের জন্য মার কাছে কাঁদছেন — “মা, যারা যারা তোমার কাছে আসছে, তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো! সব ত্যাগ করিও না মা! আচ্ছা, শেষে যা হয় করো!

“মা, সংসারে যদি রাখো, তো এক-একবার দেখা দিস! না হলে কেমন করে থাকবে। এক-একবার দেখা না দিলে উৎসাহ কেমন করে মা! তারপর শেষে যা হয় করো!”

ঠাকুর এখনও ভাবাবিষ্ট। সেই অবস্থায় হঠাৎ মণিকে বলিতেছেন, “দেখো, তুমি যা বিচার করেছো, অনেক হয়েছে। আর না। বল আর করবে না?”

মনী করজোড়ে বলিতেছেন, আজ্ঞা না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — অনেক হয়েছে। তুমি প্রথম আসতে মাত্র তোমায় তো আমি বলেছিলাম — তোমার ঘর — আমি তো সব জানি?

মণি — (কৃতাঞ্জলি) — আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমার ঘর, তুমি কে, তোমার অন্তর বাহির, তোমার আগেকার কথা, তোমার পরে কি হবে — এ-সব তো আমি জানি?

মণি (করজোড়ে) — আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ছেলে হয়েছে শুনে বকেছিলাম। এখন গিয়ে বাড়িতে থাকো — তাদের জানিও যেন তুমি তাদের আপনার। ভিতরে জানবে তুমিও তাদের আপনার নও, তারাও তোমার আপনার নয়।

মণি চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আর বাপের সঙ্গে প্রীত করো — এখন উড়তে শিখে — তুমি বাপকে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে পারবে না?

মণি (করজোড়ে) — আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমায় আর কি বলব, তুমি তো সব জানো? — সব তো বুঝেছো?

(মণি চুপ করিয়া আছেন।)

ঠাকুর — সব তো বুঝেছো?

মণি — আজ্ঞা, একটু একটু বুঝেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — অনেকটা তো বুঝেছো। রাখাল যে এখানে আছে, ওর বাপ সন্তুষ্ট আছে।

মণি হাতজোড় করিয়া চুপ করিয়া আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলিতেছেন, “তুমি যা ভাবছো তাও হয়ে যাবে।”

[ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে — মা ও জননী — কেন নরলীলা]

ঠাকর এইবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। ঘরে রাখাল, রামলাল। রামলালকে গান গাহিতে বলিতেছেন। রামলাল গান গাহিতেছেন:

গান — সমর আলো করে কার কামিনী।

গান — কে রণে নাচিছে বামা নীরদবরণী।
শোণিত সায়রে যেন ভাসিছে নব নলিনী ।।

শ্রীরামকৃষ্ণ — মা আর জননী। যিনি জগৎরূপে আছেন — সর্বব্যাপী হয়ে তিনিই মা। জননী যিনি জন্ম স্থান। আমি মা বলতে বলতে সমাধিস্থ হতুম; — মা বলতে বলতে যেন জগতের ঈশ্বরীকে টেনে আনতুম! যেমন জেলেরা জাল ফেলে, তারপর আনেকক্ষণ পরে জাল গুটোতে থাকে। বড় বড় মাছ সব পড়েছে।

[গৌরী পণ্ডিতের কথা — কালী ও শ্রীগৌরাঙ্গে এক]

“গৌরী বলেছিল, কালী গৌরাঙ্গ এক বোধ হলে, তবে ঠিক জ্ঞান হয়। যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি (কালী)। তিনি নররূপে শ্রীগৌরাঙ্গ।”

ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, যিনি আদ্যাশক্তি তিনিই নররূপী শ্রীরামকৃষ্ণ হইয়া আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামলাল ঠাকুরের আদেশে আবার গাহিতেছেন — এবারে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা।

গান — কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটিরে, অপরূপ জ্যোতিঃ, শ্রীগৌরাঙ্গমূরতি, দু’নয়নে প্রেম বহে শতধারে!

গান — গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। ভক্তের জন্য লীলা। তাঁকে নররূপে দেখতে পেলে তবে তো ভক্তেরা ভালবাসতে পারবে, তবেই ভাই-ভগিনী, বাপ-মা সন্তানের মতো স্নেহ করতে পারবে।

“তিনি ভক্তের ভালবাসার জন্য ছোটটি হয়ে লীলা করতে আসেন।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২রা ফেব্রুয়ারি 1884/02/02/i

20.6 দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে রাখাল, মাস্টার, মহিমা প্রভৃতি সঙ্গে

[শ্রীরামকৃষ্ণের হস্তে আঘাত — সমাধি ও জগন্মাতার সহিত কথা]

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে সেই ঘরে অবস্থিতি করিতেছেন। বেলা তিনটা। শনিবার, ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ; ২০শে মাঘ, ১২৯০ সাল, মাঘ শুক্লা ষষ্ঠী।

একদিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া ঝাউতলার দিকে যাইতেছেন; সঙ্গে কেহ না থাকাতে রেলের কাছে পড়িয়া যান। তাহাতে তাঁহার বাম হাতের হাড় সরিয়া যায় ও খুব আঘাত লাগে। মাস্টার কলিকাতা হইতে ভক্তদের নিকট হইতে বাড়্, প্যাড ও ব্যাণ্ডেজ আনিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাখাল, মহিমাচরণ, হাজরা প্রভৃতি ভক্তেরা ঘরে আছেন। মাস্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের চরণ বন্দনা করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিগো! তোমার কি ব্যারাম হয়েছিল? এখন সেরেছে তো?

মাস্টার — আজ্ঞে, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) — হ্যাঁগা, "আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী" — তবে এরকম হল কেন?

ঠাকুর তক্তার উপর বসিয়া আছেন। মহিমাচরণ নিজের তীর্থদর্শনের গল্প করিতেছেন। ঠাকুর শুনিতেছেন। দ্বাদশ বৎসর পূর্বে তীর্থদর্শন।

মহিমাচরণ — কাশী সিক্‌রোলের একটি বাগানে একটি ব্রহ্মচারী দেখলাম। বললে, "এ-বাগানে কুড়ি বছর আছি। কিন্তু কার বাগান জানি না।" আমায়

জিজ্ঞাসা করলে, “নৌকরী কর বাবু?” আমি বললাম, না। তখন বলে, “কেয়া, পরিব্রাজক হ্যায়?”

নর্মদাতীরে একটি সাধু দেখলাম, অন্তরে গায়ত্রী জপ কচ্ছেন — শরীরে পুলক হচ্ছে। আবার এমন প্রণব আর গায়ত্রী উচ্চারণ করেন যে যারা বসে থাকে তাদের রোমাঞ্চ আর পুলক হয়।

ঠাকুরের বালকস্বভাব, — ক্ষুধা পাইয়াছে; মাস্টারকে বলিতেছেন, “কি, কি এনেছ?” রাখালকে দেখিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন।

সমাধি ভঙ্গ হইতেছে। প্রকৃতস্থ হইবার জন্য ঠাকুর বলিতেছেন — “আমি জিলিপি খাব”, “আমি জল খাব!”

ঠাকুর বালকস্বভাব, — জগন্মাতাকে কেঁদে কেঁদে বলছেন — ব্রহ্মময়ী! আমার এমন কেন করলি? আমার হাতে বড় লাগছে। (রাখাল, মহিমা, হাজরা প্রভৃতির প্রতি) — আমার ভাল হবে? ভক্তেরা ছোট ছেলেটিকে যেমন বুঝায় — সেইরূপ বলছেন “ভাল হবে বইকি!”

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি) — যদিও শরীর রক্ষার জন্য তুই আছিস, তোর দোষ নাই। কেননা, তুই থাকলেও রেল পর্যন্ত তো যেতিস না।

[শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানভাব — “ব্রহ্মজ্ঞানকে আমার কোটি নমস্কার”]

ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইলেন। ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন —

“ওঁ ওঁ ওঁ — মা আমি কি বলছি! মা, আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহুঁশ করো না — মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিও না। আমি যে ছেলে! — ভয়তরাসে। — আমার মা চাই — ব্রহ্মজ্ঞানকে আমার কোটি নমস্কার। ও যাদের দিতে হয়, তাদের দাও গে। আনন্দময়ী! আনন্দময়ী!”

ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে আনন্দময়ী! আনন্দময়ী! বলিয়া কাঁদিতেছেন আর বলিতেছেন —

“আমি ওই খেদে খেদ করি (শ্যামা)।
তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি ৷৷”

ঠাকুর আবার মাকে বলিতেছেন — “আমি কি অন্যায় করেছি মা? আমি কি কিছু করি মা? — তুই যে সব করিস মা! আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী! (রাখালের প্রতি, সহাস্যে) দেখিস, তুই যেন পড়িস নে। মান করে যেন ঠকিস না।

ঠাকুর মাকে আবার বলিতেছেন — “মা, আমি লেগেছে বলে কি কাঁদছি? না। —

“আমি ওই খেদে খেদ করি (শ্যামা)।
তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি ৷৷”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২রা ফেব্রুয়ারি 1884/02/02/ii

20.7 কি করে ঈশ্বরকে ডাকতে হয় — “ব্যাকুল হও”

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বালকের ন্যায় আবার হাসিতেছেন ও কথা কহিতেছেন — বালক যেমন বেশি অসুখ হলেও এক-একবার হেসে খেলে বেড়ায়। মহিমাদি ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সচ্চিদানন্দ লাভ না হলে কিছুই হল না বাবু!

“বিবেক-বৈরাগ্যের ন্যায় আর জিনিস নাই।

“সংসারীদের অনুরাগ ক্ষণিক — তপ্ত খোলায় জল যতক্ষণ থাকে — একটি ফুল দেখে হয়তো বললে, আহা! কি চমৎকার ঈশ্বরের সৃষ্টি!

“ব্যাকুলতা চাই। যখন ছেলে বিষয়ের ভাগের জন্য ব্যতিব্যস্ত করে, তখন বাপ-মা দুজনে পরামর্শ করে, আর ছেলেকে আগেই হিস্যা ফেলে দেয়। ব্যাকুল হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। তিনি যে কালে জন্ম দিয়েছেন, সে কালে তাঁর ঘরে আমাদের হিস্যা আছে। তিনি আপনার বাপ, আপনার মা — তাঁর উপর জোর খাটে! ‘দাও পরিচয়। নয় গলায় ছুরি দিব!”

কিরূপে মাকে ডাকিতে হয়, ঠাকুর শিখাইতেছেন — “আমি মা বলে এইরূপে ডাকতাম — ‘মা আনন্দময়ী! — দেখা দিতে যে হবে!’ —

“আবার কখন বলতাম — ওহে দীননাথ — জগন্নাথ — আমি তো জগৎ ছাড়া নই নাথ! আমি জ্ঞানহীন — সাধনহীন — ভক্তিহীন — আমি কিছুই জানি না — দয়া করে দেখা দিতে হবে।”

ঠাকুর অতি করুণ স্বরে সুর করিয়া, কিরূপে তাঁহাকে ডাকিতে হয়, শিখাইতেছেন। সেই করুণ স্বর শুনিয়া ভক্তদের হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছে, — মহিমাচরণ চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেছেন।

মহিমাচরণকে দেখিয়া ঠাকুর আবার বলিতেছেন —

“ডাক দেখি মন ডাকার মতন কেমন শ্যামা থাকতে পারে!”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২রা ফেব্রুয়ারি 1884/02/02/iii

20.8 শিবপুর ভক্তগণ ও আমমোক্তারি (বকলমা) — শ্রীমধু ডাক্তার

শিবপুর হইতে ভক্তেরা আসিলেন। তাহারা অত দূর হইতে কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সার সার গুটিকতক কথা তাহাদিগকে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিবপুরের ভক্তদের প্রতি) — ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য। বাবু আর বাগান। ঈশ্বর ও তাঁর ঐশ্বর্য। লোকে বাগানই দেখে, বাবুকে চায় কয়জনে?

ভক্ত — আজ্ঞা, উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — সদসৎ বিচার। তিনি সত্য আর সব অনিত্য — এইটি সর্বদা বিচার। ব্যাকুল হয়ে ডাকা।

ভক্ত — আজ্ঞে, সময় কই?

শ্রীরামকৃষ্ণ — যাদের সময় আছে, তারা ধ্যান-ভজন করবে।

“যারা একান্ত পারবে না তারা দুবেলা খুব দুটো করে প্রণাম করবে। তিনি তো অন্তর্যামী, — বুঝছেন যে, এরা কি করে! অনেক কাজ করতে হয়। তোমাদের ডাকবার সময় নাই, — তাঁকে আমমোক্তারি (বকলমা) দাও। কিন্তু তাঁকে লাভ না করলে — তাঁকে দর্শন না করলে, কিছুই হল না।”

একজন ভক্ত — আজ্ঞা, আপনাকে দেখাও যা ঈশ্বরকে দেখাও তা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ও-কথা আর বলো না। গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউ-এর কিছু গঙ্গা নয়। আমি এত বড় লোক, আমি অমুক — এই সব অহংকার না গেলে তাঁকে পাওয়া যায় না। ‘আমি’ ঢিপিকে ভক্তির জলে ভিজিয়ে সমভূমি করে ফ্যালো।

[কেন সংসার? ভোগান্তে ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরলাভ]

ভক্ত — সংসারে কেন তিনি রেখেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — সৃষ্টির জন্য রেখেছেন। তাঁর ইচ্ছা। তাঁর মায়া। কামিনী-কাঞ্চন দিয়ে তিনি ভুলিয়ে রেখেছেন।

ভক্ত — কেন ভুলিয়ে রেখেছেন? কেন, তাঁর ইচ্ছা?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তিনি যদি ঈশ্বরের আনন্দ একবার দেন তাহলে আর কেউ সংসার করে না, সৃষ্টিও চলে না।

“চালের আড়তে বড় বড় ঠেকের ভিতরে চাল থাকে। পাছে ইঁদুরগুলো ওই চালের সন্ধান পায়, তাই দোকানদার একটা কুলোতে খই-মুড়কি রেখে দেয়। ওই খই-মুড়কি মিষ্টি লাগে, তাই ইঁদুরগুলো সমস্ত রাত কড়র মড়র করে খায়। চালের সন্ধান আর করে না।

“কিন্তু দেখো, একসের চালে চৌদ্দগুণ খই হয়। কামিনী-কাঞ্চনের আনন্দ অপেক্ষা ঈশ্বরের আনন্দ কত বেশি। তাঁর রূপ চিন্তা করলে রম্ভা তিলোত্তমার রূপ চিতার ভস্ম বলে বোধ হয়।”

ভক্ত — তাঁকে লাভ করবার জন্য ব্যাকুলতা কেন হয় না?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ভোগান্ত না হলে ব্যাকুলতা হয় না। কামিনী-কাঞ্চনের ভোগ যেটুকু আছে সেটুকু তৃপ্তি না হলে জগতের মাকে মনে পড়ে না। ছেলে যখন খেলায় মত্ত হয়, তখন মাকে চায় না। খেলা সাঙ্গ হয়ে গেলে তখন বলে, "মা যাব।" হৃদের ছেলে পায়রা লয়ে খেলা কচ্ছিল; পায়রাকে ডাকছে, "আয় তি তি!" করে! পায়রা লয়ে খেলা তৃপ্তি যাই হলো, অমনি কাঁদতে আরম্ভ করলে। তখন একজন অচেনা লোক এসে বললে, আমি তোকে মার কাছে লয়ে যাচ্ছি আয়। সে তারই কাঁধে চড়ে অনায়াসে গেল।

"যারা নিত্যসিদ্ধ, তাদের সংসারে ঢুকতে হয় না। তাদের ভোগের বাসনা জন্ম থেকেই মিটে গেছে।"

[শ্রীমধু ডাক্তারের আগমন — শ্রীমধুসূদন ও নাম মাহাত্ম্য]

পাঁচটা বাজিয়াছে। মধু ডাক্তার আসিয়াছেন। ঠাকুরের হাতটিতে বাড় ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতেছেন। ঠাকুর বালকের ন্যায় হাসিতেছেন। আর বলিতেছেন, ঐহিক ও পারত্রিকের মধুসূদন।

মধু (সহাস্যে) — কেবল নামের বোঝা বয়ে মরি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — কেন নাম কি কম? তিনি আর তার নাম তফাত নয়। সত্যভামা যখন তুলাযন্ত্রে স্বর্ন-মণি-মাণিক্য দিয়ে ঠাকুরকে ওজন কচ্ছিলেন,

তখন হল না! যখন রুক্মিণী তুলসী আর কৃষ্ণনাম একদিকে লিখে দিলেন, তখন ঠিক ওজন হল!

এইবার ডাক্তার বাড় বাঁধিয়া দিবেন। মেঝেতে বিছানা করা হইল, ঠাকুর হাসিতে হাসিতে মেঝেতে আসিয়া শয়ন করিতেছেন। সুর করিয়া করিয়া বলিতেছেন, “রাই-এর দশম দশা! বৃন্দে বলে, আর কত বা হবে!”

ভক্তেরা চতুর্দিকে বসিয়া আছেন। ঠাকুর আবার গাহিতেছেন — “সব সখি মিলি বৈঠল — সরোবর কূলে!” ঠাকুরও হাসিতেছেন, ভক্তেরাও হাসিতেছেন। বাড় বাঁধা হইয়া গেলে ঠাকুর বলিতেছেন —

“আমার কলকাতার ডাক্তারদের তত বিশ্বাস হয় না। শম্ভুর বিকার হয়েছে, ডাক্তার (সর্বাধিকারী) বলে, ও কিছু নয়, ও ঔষধের নেশা! তারপরই শম্ভুর দেহত্যাগ হল।১

১ শম্ভু মল্লিকের মৃত্যু — ১৮৭৭

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২রা ফেব্রুয়ারি 1884/02/02/iv

20.9 মহিমাচরণের প্রতি উপদেশ

সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়িতে আরতি হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে অধর কলিকাতা হইতে আসিলেন ও ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঘরে মহিমাচরণ, রাখাল, মাস্টার। হাজরাও এক-একবার আসিতেছেন।

অধর — আপনি কেমন আছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (স্নেহমাখা স্বরে) — এই দেখো! হাতে লেগে কি হয়েছে। (সহাস্যে) আছি আর কেমন!

অধর মেঝেতে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। ঠাকুর তাহাকে বলিতেছেন, "তুমি একবার এইটে হাত বুলিয়া দাও তো!"

অধর ছোট খাটটির উত্তর প্রান্তে বসিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণ সেবা করিতেছেন। ঠাকুর মহিমাচরণের সহিত আবার কথা কহিতেছেন।

[মূলকথা অহেতুকী ভক্তি — "স্ব-স্বরূপকে জানো"]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) — অহেতুকী ভক্তি, — তুমি এইটি যদি সাধতে পার, তাহলে বেশ হয়।

"মুক্তি, মান, টাকা, রোগ ভাল হওয়া, কিছুই চাই না; — কেবল তোমায় চাই। এর নাম অহেতুকী ভক্তি। বাবুর কাছে অনেকেই আসে — নানা কামনা করে; কিন্তু যদি কেউ কিছুই চায় না কেবল ভালবাসে বলে বাবুকে দেখতে আসে, তাহলে বাবুরও ভালবাসা তার উপর হয়।

“প্রহ্লাদের অহেতুকী ভক্তি — ঈশ্বরের প্রতি শুদ্ধ নিষ্কাম ভালবাসা।”

মহিমাচরণ চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার তাহাকে বলিতেছেন, “আচ্ছা, তোমার যেমন ভাব সেইরূপ বলি, শোন।

(মহিমার প্রতি) — “বেদান্তমতে স্ব-স্বরূপকে চিনতে হয়। কিন্তু অহং ত্যাগ না করলে হয় না। অহং একটি লাঠির স্বরুপ — যেন জলকে দুভাগ কচ্ছে। আমি আলাদা, তুমি আলাদা।

“সমাধিস্থ হয়ে এই অহং চলে গেলে ব্রহ্মকে বোধে বোধ হয়।”

ভক্তেরা হয়তো কেহ কেহ ভাবিতেছেন, ঠাকুরের কি ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে? তা যদি হয়ে থাকে তবে উনি ‘আমি’ ‘আমি’ করিতেছেন কেন?

ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন — ‘আমি’ মহিম চক্রবর্তী, — বিদ্বান, এই ‘আমি’ ত্যাগ করতে হবে। বিদ্যার ‘আমি’তে দোষ নাই। শঙ্করাচার্য লোকশিক্ষার জন্য “বিদ্যার আমি” রেখেছিলেন।

“স্ত্রীলোক সম্বন্ধে খুব সাবধান না থাকলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। তাই সংসারে কঠিন। যত সিয়ান হও না কেন, কাজলের ঘরে থাকলে গায়ে কালি লাগবে। যুবতীর সঙ্গে নিষ্কামেরও কাম হয়।

“তবে জ্ঞানীর পক্ষে স্বদারায় কখন কখন গমন দোষের নয়। যেমন মলমূত্রত্যাগ তেমনই রেতঃত্যাগ — পায়খানা আর মনে নাই।

“আধা-ছানার মণ্ডা কখন বা খেলে। (মহিমার হাস্য) সংসারীর পক্ষে তত দোষের নয়।”

[সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ]

“সন্নাসীর পক্ষে খুব দোষের। সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোক, — থুথু ফেলে থুথু খাওয়া।

“স্ত্রীলোকদের সঙ্গে সন্ন্যাসী বসে বসে কথা কবে না। — হাজার ভক্ত হলেও। জিতেন্দ্রিয় হলেও আলাপ করবে না।

“সন্ন্যাসী কামিনী-কাঞ্চন দুই-ই ত্যাগ করবে — যেমন মেয়ের পট পর্যন্ত দেখবে না, তেমনি কাঞ্চন — টাকা — স্পর্শ করবে না। টাকা কাছে থাকলেও খারাপ! হিসাব, দুশ্চিন্তা, টাকার অহংকার, লোকের উপর ক্রোধ, কাছে থাকলে এই সব এসে পড়ে। — সূর্য দেখা যাচ্ছিল মেঘ এসে সব ঢেকে দিলে।

“তাইতো মারোয়াড়ী যখন হৃদের কাছে টাকা জমা দিতে চাইলে, আমি বললাম, ‘তাও হবে না — কাছে থাকলেই মেঘ উঠবে।’

“সন্ন্যাসীর এ কঠিন নিয়ম কেন? তার নিজের মঙ্গলের জন্যেও বটে, আর লোকশিক্ষার জন্য। সন্ন্যাসী যদিও নির্লিপ্ত হয় — জিতেন্দ্রিয় হয় — তবু লোকশিক্ষার জন্য কামিনী-কাঞ্চন এইরূপে ত্যাগ করবে।

“সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে তবে তো লোকের সাহস হবে! তবেই তো তারা কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে চেষ্টা করবে!

“এ-ত্যাগশিক্ষা যদি সন্ন্যাসী না দেয়, তবে কে দিবে!”

[জনকাদির ঈশ্বরলাভের পর সংসার — ঋষি ও শূকরমাংস]

“তাঁকে লাভ করে তবে সংসারে থাকা যায়। যেমন মাখম তুলে জলে ফেলে রাখা। জনক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে তবে সংসারে ছিলেন।

“জনক দুখান তরবার ঘোরাতেন — জ্ঞানের আবার কর্মের। সন্ন্যাসী কর্মত্যাগ করে। তাই কেবল একখানা তরবার — জ্ঞানের। জনকের মতো জ্ঞানী সংসারী গাছের নিচের ফল উপরের ফল দুই-ই খেতে পারে। সাধুসেবা, অতিথি-সৎকার — এ-সব পারে। মাকে বলেছিলাম, ‘মা, আমি শুঁটকে সাধু হব না।’

“ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পর খাওয়ারও বিচার থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি ব্রহ্মানন্দের পর সব খেতে পারত — শূকরমাংস পর্যন্ত।”

[চার আশ্রম, যোগতত্ত্ব ও শ্রীরামকৃষ্ণ]

(মহিমার প্রতি) — “মোটামুটি দুই প্রকার যোগ — কর্মযোগ আর মনোযোগ, — কর্মের দ্বারা যোগ আর মনের দ্বারা যোগ।

“ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ আর সন্ন্যাস — এর মধ্যে প্রথম তিনটিতে কর্ম করতে হয়। সন্ন্যাসীর দণ্ডকমণ্ডলু, ভিক্ষা পাত্র ধারণ করতে হয়। সন্ন্যাসী নিত্যকর্ম করে।

কিন্তু হয়তো মনের যোগ নাই — জ্ঞান নাই, ঈশ্বরে মন নাই। কোন কোন সন্ন্যাসী নিত্যকর্ম কিছু কিছু রাখে, লোকশিক্ষার জন্য। গৃহস্থ বা অন্যান্য আশ্রমী যদি নিষ্কামকর্ম করতে পারে, তাহলে তাদের কর্মের দ্বারা যোগ হয়।

“পরমহংস অবস্থায় — যেমন শুকদেবাদির — কর্ম সব উঠে যায়। পূজা, জপ, তর্পণ, সন্ধ্যা — এই সব কর্ম। এ-অবস্থায় কেবল মনের যোগ। বাহিরের কর্ম কখন কখন সাধ করে — লোকশিক্ষার জন্য। কিন্তু সর্বদা স্মরণমনন থাকে।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২রা ফেব্রুয়ারি 1884/02/02/v

20.10 মহিমাচরণের শাস্ত্রপাঠ শ্রবণ ও ঠাকুরের সমাধি

কথা কহিতে কহিতে রাত আটটা হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমাচরণকে শাস্ত্র হইতে কিছু স্তবাদি শুনাইতে বলিলেন। মহিমাচরণ একখানি বই লইয়া উত্তর গীতার প্রথমেই পরব্রহ্মসম্বন্ধীয় যে শ্লোক তাহা শুনাইতেছেন —

“যদেকং নিষ্কলং ব্রহ্ম ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং বিনাশোৎপত্তিবর্জিতম্ ।।”

ক্রমে তৃতীয় অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক পড়িতেছেন —

“অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতম্‌।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং সর্বত্র সমদর্শিনাম্‌ ।।”

অর্থাৎ ব্রাহ্মদিগের দেবতা অগ্নি, মুনিদিগের দেবতা হৃদয়মধ্যে — স্বল্পবুদ্ধি মনুষ্যদের প্রতিমাই দেবতা, আর সমদর্শী মহাযোগীদিগের দেবতা সর্বত্রই আছেন।

“সর্বত্র সমদর্শিনাম” — এই কথা উচ্চারণ করিবামাত্র ঠাকুর হঠাৎ আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। হাতে সেই বাড় ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ভক্তেরা সকলেই অবাক্‌ — এই সমদর্শী মহাযোগীর অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছেন।

অনেকক্ষণ এইরূপে দাঁড়াইয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন ও আবার আসন গ্রহণ করিলেন। মহিমাচরণকে এইবার সেই হরিভক্তির শ্লোক আবৃত্তি করিতে বলিলেন। মহিমা নারদপঞ্চরাত্র হইতে আবৃত্তি করিতেছেন —

অন্তর্বহির্যদিহরিস্তপসা ততঃ কিম্‌।
নান্তর্বহির্যদিহরিস্তপসা ততঃ কিম্‌ ।।
আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌ ।।
বিরম বিরম ব্রহ্মন্‌ কিং তপস্যাসু বৎস।
ব্রজ ব্রজ দ্বিজ শীঘ্রং শঙ্করং জ্ঞানসিন্ধুম্‌ ।।

লভ লভ হরিভক্তিং বৈষ্ণবোক্তাং সুপক্কাম্।
ভবনিগড়নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্তরীঞ্চ ।।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আহা! আহা!

[ভাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড — তুমিই চিদানন্দ — নাহং নাহং]

শ্লোকগুলির আবৃত্তি শুনিয়া ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইতেছিলেন। কষ্টে ভাব সংবরণ করিলেন। এইবার যতিপঞ্চক পাঠ হইতেছে —

যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং, চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্।
সচ্চিৎসুখৈকং জগদাত্মরূপং, সা কাশিকাহং নিজবোধরূপম্ ।।

"সা কাশিকাহং নিজবোধরূপম্" — এই কথা শুনিয়া ঠাকুর সহাস্যে বলিতেছেন, "যা আছে ভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে।"

এইবার পাঠ হইতেছে নির্বাণষট্‌কম্ —

ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং
 ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ু —
 শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ।।

যতবার মহিমাচরণ বলিতেছেন — চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্, ততবারই ঠাকুর সহাস্যে বলিতেছেন —

“নাহং! নাহং —– তুমি তুমি চিদানন্দ।”

মহিমাচরণ জীবন্মুক্তি গীতা থেকে কিছু পড়িয়া ষট্‌চক্রবর্ণনা পড়িতেছেন। তিনি নিজে কাশীতে যোগীর যোগাবস্থায় মৃত্যু দেখিয়াছিলেন, বলিলেন।

এইবার ভূচরী ও খেচরী মুদ্রার বর্ণনা করিতেছেন, ও সাম্ভবী বিদ্যার।

সাম্ভবী; — যেখানে সেখানে যায়, কোন উদ্দেশ্য নাই।

[পূর্বকথা —– সাধুদের কাছে ঠাকুরের রামগীতাপাঠ শ্রবণ]

মহিমা —– রামগীতায় বেশ বেশ কথা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) —তুমি রামগীতা রামগীতা কচ্ছো, — তবে তুমি ঘোর বেদান্তী! সাধুরা কত পড়ত এখানে।

মহিমাচরণ প্রণব শব্দ কিরূপ তাই পড়িতেছেন —– “তৈলধারামবিচ্ছিন্নম্ দীর্ঘঘন্টানিনাদবৎ”! আবার সমাধির লক্ষণ বলিতেছেন —–

“ঊর্ধ্বপূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকম্।
সর্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্ ।।”

অধর, মহিমাচরণ ক্রমে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৩রা ফেব্রুয়ারি 1884/02/03

20.11 সরলতা ও সত্যকথা

পরদিন রবিবার, ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, ২১শে মাঘ, ১২৯০ সাল। মাঘ শুক্লা সপ্তমী। মধ্যাহ্নে সেবার পর ঠাকুর নিজাসনে বসিয়া আছেন। কলিকাতা হইতে রাম, সুরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহার অসুখ শুনিয়া চিন্তিত হইয়া আসিয়াছেন। মাস্টারও কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুরের হাতে বাড় বাঁধা, ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

[পূর্বকথা — উন্মাদ, জানবাজারে বাস — সরলতা ও সত্যকথা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — এমনি অবস্থায় মা রেখেছেন যে ঢাকাঢাকি করবার জো নাই। বালকের অবস্থা!

“রাখাল আমার অবস্থা বোঝে না। পাছে কেউ দেখতে পায়, নিন্দা করে, গায়ে কাপড় দিয়ে ভাঙা হাত ঢেকে দেয়। মধু ডাক্তারকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে সব কথা বলছিল। তখন চেঁচিয়ে বললাম — ‘কোথা গো মধুসূদন, দেখবে এস, আমার হাত ভেঙে গেছে!’

“সেজোবাবু আর সেজোগিন্নি যে ঘরে শুতো সেই ঘরে আমিও শুতাম! তারা ঠিক ছেলেটির মতন আমায় যত্ন করত। তখন আমার উন্মাদ অবস্থা। সেজোবাবু বলত, ‘বাবা, তুমি আমাদের কথাবার্তা শুনতে পাও?’ আমি বলতাম, ‘পাই’।

“সেজোগিন্নি সেজোবাবুকে সন্দেহ করে বলেছিল, যদি কোথাও যাও — ভট্‌চার্জি মশায় তোমার সঙ্গে যাবেন। এক জায়গায় গেল — আমায় নিচে বসালে। তারপর আধঘন্টা পরে এসে বললে, ‘চল বাবা, চল বাবা। গাড়িতে উঠবে চল।’ সেজোগিন্নি জিজ্ঞাসা কললে, আমি ঠিক ওই সব কথা বললুম। আমি বললুম, ‘দেখগা, একটা বাড়িতে আমরা গেলুম, — উনি নিচে বসালে — উপরে আপনি গেল, — আধঘন্টা পরে এসে বললে, ‘চল বাবা চল।’ সেজোগিন্নি যা হয় বুঝে নিলে।

“মাড়েদের এক শরিক এখানকার গাছের ফল, কপি গাড়ি করে বাড়িতে চালান করে দিত। অন্য শরিকরা জিজ্ঞাসা করাতে আমি ঠিক তাই বললুম।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৪শে ফেব্রুয়ারি 1884/02/24/i

20.12 দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে মাস্টার, মণিলাল প্রভৃতি সঙ্গে

[ঠাকুর অধৈর্য কেন? মণি মল্লিকের প্রতি উপদেশ]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্নে সেবার পর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। মেঝেতে মণি মল্লিক বসিয়া আছেন। আজ রবিবার, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী, ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪, ১৩ই ফাল্গুন, ১২৯০ সাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — কিসে করে এলে?

মাস্টার —– আজ্ঞা, আলমবাজার পর্যন্ত গাড়ি করে এসে ওখান থেকে হেঁটে এসেছি।

মণিলাল —– উঃ! খুব ঘেমেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তাই ভাবি, আমার এ-সব বাই নয়! তা না হলে ইংলিশম্যানরা এত কষ্ট করে আসে!

ঠাকুর কেমন আছেন —– হাত ভাঙার কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ —– আমি এইটার জন্য এক-একবার অধৈর্য হই —– একে দেখাই —– আবার ওকে দেখাই —– আর বলি, হ্যাঁগা, ভাল হবে কি? রাখাল চটে, —– আমার অবস্থা বোঝে না। এক-একবার মনে করি এখান থেকে যায় যাক —– আবার মাকে বলি, মা কোথায় যাবে —– কোথায় জ্বলতে পুড়তে যাবে!

“আমার বালকের মতো অধৈর্য অবস্থা আজ বলে নয়। সেজোবাবুকে হাত দেখাতাম, বলতাম, হ্যাঁগা আমার কি অসুখ করেছে?

“আচ্ছা তাহলে ঈশ্বরে নিষ্ঠা কই? ও-দেশে যাবার সময় গোরুর গাড়ির কাছে ডাকাতের মতো লাঠি হাতে কতকগুলো মানুষ এলো! আমি ঠাকুরদের নাম করতে লাগলাম। কিন্তু কখন বলি রাম, কখন দুর্গা, কখন ওঁ তৎসৎ — যেটা খাটে।

(মাস্টারের প্রতি) — “আচ্ছা কেন এত অধৈর্য আমার?”

মাস্টার — আপনি সর্বদাই সমাধিস্থ — ভক্তদের জন্য একটু মন শরীরের উপর রেখেছেন, তাই — শরীর রক্ষার জন্য এক-একবার অধৈর্য হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, একটু মন আছে কেবল শরীরে, — আর ভক্তি-ভক্ত নিয়ে থাকতে।

[Exhibition দর্শন প্রস্তাব — ঠাকুরের চিড়িয়াখানা Zoological Garden দর্শন কথা]

মণিলাল মল্লিক এগ্‌জিবিশনের গল্প করিতেছেন।

যশোদা কৃষ্ণকে কোলে করে আছেন — বড় সুন্দর মূর্তি — শুনে ঠাকুরের চক্ষে জল আসিয়াছে। সেই বাৎসল্যরসের প্রতিমা যশোদার কথা শুনিয়া ঠাকুরের উদ্দীপন হইয়াছে — তাই কাঁদিতেছেন।

মণিলাল — আপনার অসুখ, — তা না হলে আপনি একবার গিয়ে দেখে আসতেন — গড়ের মাঠের প্রদর্শনী।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — আমি গেলে সব দেখতে পাব না! একটা কিছু দেখেই বেহুঁশ হয়ে যাব — আর কিছু দেখা হবে না। চিড়িয়াখানা দেখাতে লয়ে গিছল। সিংহ দর্শন করেই আমি সমাধিস্থ হয়ে গেলাম! ঈশ্বরীয় বাহনকে দেখে ঈশ্বরীয় উদ্দীপন হল — তখন আর অন্য জানোয়ার কে দেখে! সিংহ দেখেই ফিরে এলাম! তাই যদু মল্লিকের মা একবার বলে, এগ্‌জিবিশনে এঁকে নিয়ে চল — আবার বলে, না।

মণি মল্লিক পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানী। বয়স প্রায় ৬৫ হইয়াছে। ঠাকুর তাঁহারই ভাবে কথাচ্ছলে, তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন।

[পূর্বকথা — জয়নারায়ণ পণ্ডিতদর্শন — গৌরীপণ্ডিত]

শ্রীরামকৃষ্ণ — জয়নারায়ণ পণ্ডিত খুব উদার ছিল। গিয়ে দেখলাম বেশ ভাবটি। ছেলেগুলি বুট্‌ পরা; নিজে বললে আমি কাশী যাব। যা বললে তাই শেষে কল্লে। কাশীতে বাস — আর কাশীতেই দেহত্যাগ হল।১

“বয়স হলে সংসার থেকে ওইরকম চলে গিয়ে ঈশ্বরচিন্তা করা ভাল। কি বল?”

মণিলাল — হাঁ, সংসারের ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — গৌরী স্ত্রীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করত। সকল স্ত্রীই ভগবতীর এক-একটি রূপ।

(মণিলালের প্রতি) — “তোমার সেই কথাটি এঁদের বলতো গা।”

মণিলাল (সহাস্যে) — নৌকা করে কয়জন গঙ্গা পার হচ্ছিল। একজন পণ্ডিত বিদ্যার পরিচয় খুব দিচ্ছিল। "আমি নানা শাস্ত্র পড়িছি — বেদ-বেদান্ত — ষড়দর্শন।" একজনকে জিজ্ঞাসা কল্লে — "বেদান্ত জান?" সে বললে — "আজ্ঞা না।" "তুমি সাংখ্য, পাতঞ্জল জান?" — "আজ্ঞা না।" "দর্শন-টর্শন কিছুই পড় নাই?" — "আজ্ঞা না।"

"পণ্ডিত সগর্বে কথা কহিতেছেন ও লোকটি চুপ করে বসে আছে। এমন সময়ে ভয়ঙ্কর ঝড় — নৌকা ডুবতে লাগল। সেই লোকটি বললে, 'পণ্ডিতজী, আপনি সাঁতার জানেন?' পণ্ডিত বললেন, 'না'। সে বললে, 'আমি সাংখ্য, পাতঞ্জল জানি না, কিন্তু সাঁতার জানি'।"

[ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু — লক্ষ্য বেঁধা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — নানা শাস্ত্র জানলে কি হবে। ভবনদী পার হতে জানাই দরকার। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।

"লক্ষ্য ভেদের সময় দ্রোণাচার্য অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি কি দেখতে পাচ্ছ? এই রাজাদের কি তুমি দেখতে পাচ্ছ?' অর্জুন বললেন, 'না'। 'আমাকে দেখতে পাচ্ছ?' — 'না'। 'গাছ দেখতে পাচ্ছ?' — 'না'। 'গাছের উপর পাখি দেখতে পাচ্ছ?' — 'না'। 'তবে কি দেখতে পাচ্ছ?' — 'শুধু পাখির চোখ।'

"যে শুধু পাখির চোখটি দেখতে পায় সেই লক্ষ্য বিঁধতে পারে।

“যে কেবল দেখে, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, সেই চতুর। অন্য খবরে আমাদের কাজ কি? হনুমান বলেছিল, আমি তিথি নক্ষত্র অত জানি না, কেবল রাম চিন্তা করি।

(মাস্টারের প্রতি) — “খানকতক পাখা এখানকার জন্য কিনে দিও।

(মণিলালের প্রতি) — “ওগো তুমি একবার এঁর (মাস্টারের) বাবার কাছে যেও। ভক্ত দেখলে উদ্দীপন হবে।”

১ শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৬৯-এর পূর্বে পণ্ডিতকে দেখিয়াছিলেন। পণ্ডিত জয়নারায়ণের কাশী গমন — ১৮৬৯। জন্ম — ১৮০৪। কাশীপ্রাপ্তি — ১৮৭৩ খ্রীঃ

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৪শে ফেব্রুয়ারি 1884/02/24/ii

20.13 শ্রীযুক্ত মণিলাল প্রভৃতির প্রতি উপদেশ — নরলীলা

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ আসনে বসিয়া আছেন। মণিলাল প্রভৃতি ভক্তেরা মেঝেতে বসিয়া ঠাকুরের মধুর কথামৃত পান করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — এই হাত ভাঙার পর একটা ভারী অবস্থা বদলে যাচ্ছে। নরলীলাটি কেবল ভাল লাগছে।

“নিত্য আর লীলা। নিত্য — সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ।

“লীলা — ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা।”

[তু সচ্চিদানন্দ — বৈষ্ণবচরণের শিক্ষা — ঠাকুরের রামলীলা দর্শন]

“বৈষ্ণবচরণ বলত নরলীলায় বিশ্বাস হলে তবে পূর্ণজ্ঞান হবে। তখন শুনতুম না। এখন দেখছি ঠিক। বৈষ্ণবচরণ মানুষের ছবি দেখে কোমলভাব — প্রেমের ভাব — পছন্দ করত।

(মণিলালের প্রতি) — “ঈশ্বরই মানুষ হয়ে লীলা কচ্ছেন — তিনিই মণি মল্লিক হয়েছেন। শিখরা শিক্ষা দেয়, — তু সচ্চিদানন্দ।

“এক-একবার নিজের স্বরূপ (সচ্চিদানন্দ)-কে দেখতে পেয়ে মানুষ অবাক্ হয়, আর আনন্দে ভাসে। হঠাৎ আত্মীয়দর্শন হলে যেমন হয়। (মাস্টারের প্রতি) সেদিন সেই গাড়িতে আসতে আসতে বাবুরামকে দেখে যেমন হয়েছিল!

“শিব যখন স্ব-স্বরূপকে দেখেন, তখন ‘আমি কি!’ ‘আমি কি!’ বলে নৃত্য করেন।

“অধ্যাত্মে (অধ্যাত্ম রামায়ণে) ওই কথাই আছে। নারদ বলছেন, হে রাম, যত পুরুষ সব তুমি, — সীতাই যত স্ত্রীলোক হয়েছেন।

“রামলীলায় যারা সেজেছিল, দেখে বোধ হল নারায়ণই এই সব মানুষের রূপ ধরে রয়েছেন! আসল-নকল সমান বোধ হল।

“কুমারীপূজা করে কেন? সব স্ত্রীলোক ভগবতীর এক-একটি রূপ। শুদ্ধাত্মা কুমারীতে ভগবতীর বেশী প্রকাশ।”

[কেন অসুখে ঠাকুর অধৈর্য — ঠাকুরের বালক ও ভক্তের অবস্থা]

(মাস্টারের প্রতি) — “কেন আমি অসুখ হলে অধৈর্য হই। আমায় বালকের স্বভাবে রেখেছে। বালকের সব নির্ভর মার উপর।

“দাসীর ছেলে বাবুর ছেলেদের সঙ্গে কোঁদল করতে করতে বলে, আমি মাকে বলে দিব।”

[রাধাবাজারে সুরেন্দ্র কর্তৃক ফটোছবি তুলানো ১৮৮১]

“রাধাবাজারে আমাকে ছবি তোলাতে নিয়ে গিছল। সেদিন রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ি যাবার কথা ছিল। কেশব সেন আর সব আসবে শুনেছিলুম। গোটাকতক কথা বলব বলে ঠিক করেছিলাম। রাধাবাজারে গিয়ে সব ভুলে গেলাম। তখন বললাম, ‘মা তুই বলবি! আমি আর কি বলব’!”

[পূর্বকথা — কোয়ার সিং — রামলালের মা — কুমারীপূজা]

“আমার জ্ঞানীর স্বভাব নয়। জ্ঞানী আপনাকে দেখে বড় — বলে, আমার আবার রোগ!

“কোয়ার সিং বললে, ‘তোমার এখনও দেহের জন্য ভাবনা আছে?’

“আমার স্বভাব এই — আমার মা সব জানে। রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ি তিনি কথা কবেন। সেই কথাই কথা। সরস্বতীর জ্ঞানের একটি কিরণে এক হাজার পণ্ডিত থ হয়ে যায়!

“ভক্তের অবস্থায় — বিজ্ঞানীর অবস্থায় — রেখেছ। তাই রাখাল প্রভৃতির সঙ্গে ফচকিমি করি। জ্ঞানীর অবস্থায় রাখলে উটি হত না।

“এ-অবস্থায় দেখি মা-ই সব হয়েছেন। সর্বত্র তাঁকে দেখতে পাই।

“কালীঘরে দেখলাম, মা-ই হয়েছেন — দুষ্টলোক পর্যন্ত — ভাগবত পণ্ডিতের ভাই পর্যন্ত।

“রামলালের মাকে বকতে গিয়ে আর পারলাম না। দেখলাম তাঁরই একটি রূপ! মাকে কুমারীর ভিতর দেখতে পাই বলে কুমারীপূজা করি।

“আমার মাগ (ভক্তদের শ্রীশ্রীমা) পায়ে হাত বুলায়ে দেয়। তারপর আমি আবার নমস্কার করি।

“তোমরা আমার পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার কর, — হৃদে থাকলে পায়ে হাত দেয় কে! — কারুকে পা ছুঁতে দিত না।

“এই অবস্থায় রেখেছে বলে নমস্কার ফিরুতে হয়।

“দেখ, দুষ্ট লোককে পর্যন্ত বাদ দিবার জো নাই। তুলসী শুকনো হোক, ছোট হোক — ঠাকুর সেবায় লাগবে।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২রা মার্চ 1884/03/02/i

20.14 দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালীমন্দিরে সেই পূর্বপরিচিত ঘরে ছোট খাটটিতে বসিয়া গান শুনিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য সান্যাল গান করিতেছেন।

আজ রবিবার, ২০শে ফাল্গুন; শুক্লা পঞ্চমী তিথী; ১২৯০ সাল। ২রা মার্চ, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। মেঝেতে ভক্তেরা বসিয়া আছেন ও গান শুনিতেছেন। নরেন্দ্র, সুরেন্দ্র (মিত্র), মাস্টার, ত্রৈলোক্য প্রভৃতি অনেকে বসিয়া আছেন।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের পিতা বড় আদালতে উকিল ছিলেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে, পরিবারবর্গ বড়ই কষ্টে পড়িয়াছেন। এমন কি মাঝে মাঝে খাইবার কিছু থাকে না। নরেন্দ্র এই সকল ভাবনায় অতি কষ্টে আছেন।

ঠাকুরের শরীর, হাত ভাঙা অবধি, এখনও ভাল হয় নাই। হাতে অনেক দিন বাড় (Bar) দিয়া রাখা হইয়াছিল।

ত্রৈলোক্য মার গান গাইতেছেন। গানে বলিতেছেন, মা তোমার কোলে নিয়ে অঞ্চল ডেকে আমায় বুকে করে রাখ:

তোর কোলে লুকায়ে থাকি (মা)।
চেয়ে চেয়ে মুখপানে মা মা মা বলে ডাকি।
ডুবে চিদানন্দরসে, মহাযোগ নিদ্রাবশে,
দেখি রূপ অনিমেষে, নয়নে নয়নে রাখি।
দেখে শুনে ভয় করে প্রাণ কেঁদে ওঠে ডরে,
রাখ আমায় বুকে ধরে, স্নেহের অঞ্চলে ঢাকি (মা)।

ঠাকুর শুনিতে শুনিতে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। আর বলিতেছেন, আহা! কি ভাব!

ত্রৈলোক্য আবার গাহিতেছেন:

(লোফা)

লজ্জা নিবারণ হরি আমার।

(দেখো দেখো হে — যেন — মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়)।

ভকতের মান, ওহে ভগবান, তুমি বিনা কে রাখিবে আর।

তুমি প্রাণপতি প্রাণাধার, আমি চিরক্রীত দাস তোমার!

(দেখো)।

(বড় দশকশী)

তুয়া পদ সার করি, জাতি কুল পরিহরি, লাজ ভয়ে দিনু জলাঞ্জলি

(এখন কোথা বা যাই হে পথের পথিক হয়ে);

আব হাম তোর লাগি, হইনু কলঙ্কভাগী,

গঞ্জে লোকে কত মন্দ বলি। (কত নিন্দা করে হে)

(তোমায় ভালবাসি বলে) (ঘরে পরে গঞ্জনা হে)

সরম ভরম মোর, অবহি সকল তোর, রাখ বা না রাখ তব দায়

(দাসের মানে তোমারি মান হরি),

তুমি হে হৃদয় স্বামী, তব মানে মানী আমি, কর নাথ যেঁউ তুহে ভায়।

(ছোট দশকশী)

ঘরের বাহির করি, মজাইলে যদি হরি, দেও তবে শ্রীচরণে স্থান,

(চির দিনের মতো) অনুদিন প্রেমবধু, পিয়াও পরাণ বঁধু,

প্রেমদাসে করে পরিত্রাণ।

ঠাকুর আবার প্রেমাশ্রু বির্সজন করিতে করিতে মেঝেতে আসিয়া বসিলেন।

আর রামপ্রসাদের ভাবে গাহিতেছেন —

'যশ অপযশ কুরস সুরস সকল রস তোমারি।
(ওমা) রসে থেকে রসভঙ্গ কেন রসেশ্বরী ।।

ঠাকুর ত্রৈলোক্যকে বলিতেছেন, আহা! তোমার কি গান! তোমার গান ঠিক ঠিক। যে সমুদ্রে গিয়েছিল সেই সমুদ্রের জল এনে দেখায়।

ত্রৈলোক্য আবার গান গাহিতেছেন:

(হরি) আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি বাজাও তালে তালে,
মানুষ তো সাক্ষীগোপাল মিছে আমার আমার বলে।
ছায়াবাজির পুতুল যেমন, জীবের জীবন তেমন,
দেবতা হতে পারে, যদি তোমার পথে চলে।
দেহ যন্ত্রে তুমি যন্ত্রী, আত্মরথে তুমি রথী,
জীব কেবল পাপের ভাগী, নিজ স্বাধীনতার ফলে।
সর্বমূলাধার তুমি, প্রাণের প্রাণ হৃদয় স্বামী,
অসাধুকে সাধু কর, তুমি নিজ পুণ্যবলে।

[The Absolute identical with the phenomenal world — নিত্যলীলা যোগ —— পূর্ণজ্ঞান বা বিজ্ঞান]

গান সমাপ্ত হইল। ঠাকুর এইবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্য ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি) — হরিই সেব্য, হরিই সেবক —— এই ভাবটি পুর্ণজ্ঞানের লক্ষণ। প্রথমে নেতি নেতি করে হরিই সত্য আর সব

মিথ্যা বলে বোধ হয়। তারপরে সেই দেখে যে, হরিই এই সব হয়েছেন। অনুলোম হয়ে তারপর বিলোম। এইটি পুরাণের মত। যেমন একটি বেলের ভিতর শাঁস, বীজ আর খোলা আছে। খোলা বীজ ফেলে দিলে শাঁসটুকু পাওয়া যায়, কিন্তু বেলটি কত ওজনে ছিল জানতে গেলে, খোলা বীজ বাদ দিলে চলবে না। তাই জীবজগৎকে ছেড়ে প্রথমে সচ্চিদানন্দে পৌঁছাতে হয়; তারপর সচ্চিদানন্দকে লাভ করে দেখে যে তিনিই এই সব জীব, জগৎ হয়েছেন। শাঁস যে বস্তুর, বীজ ও খোলা সেই বস্তু থেকেই হয়েছে — যেমন ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল।

“তবে কেউ বলতে পারে, সচ্চিদানন্দ এত শক্ত হল কেমন করে। এই জগৎ টিপলে খুব কঠিন বোধ হয়। তার উত্তর এই, যে শোণিত শুক্র এত তরল জিনিস, — কিন্তু তাই থেকে এত বড় জীব — মানুষ তৈয়ারী হচ্ছে! তাঁ হতে সবই হতে পারে।

“একবার অখণ্ড সচ্চিদানন্দে পৌঁছে তারপর নেমে এসে এই সব দেখা।”

[সংসার ঈশ্বর ছাড়া নয় — যোগী ও ভক্তদের প্রভেদ]

“তিনিই সব হয়েছেন। সংসার কিছু তিনি ছাড়া নয়। গুরুর কাছে বেদ পড়ে রামচন্দ্রের বৈরাগ্য হল। তিনি বললেন, সংসার যদি স্বপ্নবৎ তবে সংসার ত্যাগ করাই ভাল। দশরথের বড় ভয় হল। তিনি রামকে বুঝাতে গুরু বশিষ্ঠকে পাঠিয়ে দিলেন। বশিষ্ঠ বললেন, রাম, তুমি সংসার ত্যাগ করবে কেন বলছ? তুমি আমায় বুঝিয়ে দাও যে, সংসার ঈশ্বর ছাড়া। যদি তুমি বুঝিয়ে দিতে পার ঈশ্বর

থেকে সংসার হয় নাই তাহলে তুমি ত্যাগ করতে পার। রাম তখন চুপ করে রইলেন, — কোনও উত্তর দিতে পারলেন না।

“সব তত্ত্ব শেষে আকাশতত্ত্বে লয় হয়। আবার সৃষ্টির সময় আকাশতত্ত্ব থেকে মহৎতত্ত্ব, মহৎতত্ত্ব থেকে অহংকার, এই সব ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে। অনুলোম, বিলোম। ভক্ত সবই লয়। ভক্ত অখণ্ড সচ্চিদানন্দকেও লয়, আবার জীবজগৎকেও লয়।

“যোগীর পথ কিন্তু আলাদা। সে পরমাত্মাতে পোঁছে আর ফেরে না। সেই পরমাত্মার সঙ্গে যোগ হয়ে যায়।

“একটার ভিতরে যে ঈশ্বরকে দেখে তার নাম খণ্ডজ্ঞানী — সে মনে করে যে, তার ওদিকে আর তিনি নাই!

“ভক্ত তিন শ্রেণীর। অধম ভক্ত বলে ‘ওই ঈশ্বর’, অর্থাৎ আকাশের দিকে সে দেখিয়ে দেয়। মধ্যম ভক্ত বলে যে, তিনি হৃদয়ের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে আছেন। আর উত্তম ভক্ত বলে যে, তিনি এই সব হয়েছেন, — যা কিছু দেখছি সবই তাঁর এক-একটি রূপ। নরেন্দ্র আগে ঠাট্টা করত আর বলত, ‘তিনিই সব হয়েছেন, — তাহলে ঈশ্বর ঘটি, ঈশ্বর বাটি’।” (সকলের হাস্য)

[ঈশ্বরদর্শনে সংশয় যায় — কর্মত্যাগ হয় — বিরাট শিব]

“তাঁকে কিন্তু দর্শন করলে সব সংশয় চলে যায়। শুনা এক, দেখা এক। শুনলে ষোলা আনা বিশ্বাস হয় না। সাক্ষাৎকার হলে আর বিশ্বাসের কিছু বাকী থাকে না।

“ঈশ্বরদর্শন করলে কর্মত্যাগ হয়। আমার ওই রকমে পূজা উঠে গেল। কালীঘরে পূজা করতাম। হঠাৎ দেখিয়ে দিলে, সব চিন্ময়, কোশাকুশি, বেদী, ঘরের চৌকাঠ —— সব চিন্ময়! মানুষ, জীব, জন্তু, সব চিন্ময়। তখন উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দিকে পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলাম! — যা দেখি তাই পূজা করি!

“একদিন পূজার সময় শিবের মাথায় বজ্র দিচ্ছি এমন সময় দেখিয়ে দিলে, এই বিরাট মূর্তিই শিব। তখন শিব গড়ে পূজা বন্ধ হল। ফুল তুলছি হঠাৎ দেখিয়ে দিলে যে ফুলের গাছগুলি যেন এক-একটি ফুলের তোড়া।”

[কাব্যরস ও ঈশ্বরদর্শনের প্রভেদ —— “ন কবিতাং বা জগদীশ”]

ত্রৈলোক্য —— আহা, ঈশ্বরের রচনা কি সুন্দর!

শ্রীরামকৃষ্ণ —— না গো, ঠিক দপ্‌ করে দেখিয়ে দিলে! — হিসেব করে নয়। দেখিয়ে দিলে যেন এক-একটি ফুল গাছ এক-একটি তোড়া, — সেই বিরাট মূর্তির উপর শোভা করছে। সেই দিন থেকে ফুল তোলা বন্ধ হয়ে গেল। মানুষকেও আমি ঠিক সেইরূপ দেখি। তিনিই যেন মানুষ-শরীরটাকে লয়ে হেলে-দুলে বেড়াচ্ছেন, — যেমন ঢেউয়ের উপর একটা বালিশ ভাসছে, — বালিশটাকে এদিক ওদিক নড়তে নড়তে চলে যাচ্ছে, কিন্তু ঢেউ লেগে একবার উঁচু হচ্ছে আবার ঢেউয়ে সঙ্গে নিচে এসে পড়ছে।

[ঠাকুরের শরীরধারণ কেন — ঠাকুরের সাধ]

“শরীরটা দুদিনের জন্য, তিনিই সত্য, শরীর এই আছে, এই নাই। অনেকদিন হল যখন পেটের ব্যামোতে বড় ভুগছি, হৃদে বললে — মাকে একবার বল না, — যাতে আরাম হয়। আমার রোগের জন্য বলতে লজ্জা হল। বললুম, মা সুসাইটিতে (Asiatic Soceity) মানুষের হাড় (Skeleton) দেখেছিলাম, তার দিয়ে জুড়ে জুড়ে মানুষের আকৃতি, মা! এরকম করে শরীরটা একটু শক্ত করে দাও, তাহলে তোমার নামগুণকীর্তন করব।

“বাঁচবার ইচ্ছা কেন? রাবণ বধের পর রাম লক্ষ্মণ লঙ্কায় প্রবেশ করলেন, রাবণের বাটীতে গিয়ে দেখেন, রাবণের মা নিকষা পালিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্মণ আশ্চর্য হয়ে বললেন, রাম, নিকষার সবংশ নাশ হল তবু প্রাণের উপর এত টান। নিকষাকে কাছে ডাকিয়ে রাম বললেন, তোমার ভয় নাই, তুমি কেন পালাচ্ছিলে? নিকষা বললে, রাম! আমি সেজন্য পালাই নাই — বেঁচে ছিলাম বলে তোমার এত লীলা দেখতে পেলাম — যদি আরও বাঁচি তো আরও কত লীলা দেখতে পাব! তাই বাঁচবার সাধ।

“বাসনা না থাকলে শরীর ধারণ হয় না।

(সহাস্যে) “আমার একটি-আধটি সাধ ছিল। বলেছিলাম মা, কামিনীকাঞ্চনত্যাগীর সঙ্গ দাও; আর বলেছিলাম, তোর জ্ঞানী ও ভক্তদের সঙ্গ করব, তাই একটু শক্তি দে যাতে হাঁটতে পারি, — এখানে ওখানে যেতে পারি। তা হাঁটবার শক্তি দিলে না কিন্তু!”

ত্রৈলোক্য (সহাস্যে) — সাধ কি মিটেছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — একটু বাকী আছে। (সকলের হাস্য)

“শরীরটা দুদিনের জন্য। হাত যখন ভেঙে গেল, মাকে বললুম, ‘মা বড় লাগছে।’ তখন দেখিয়ে দিলে গাড়ি আর তার ইঞ্জিনিয়ার। গাড়ির একটা-আধটা ইস্ক্রু আলগা হয়ে গেছে। ইঞ্জিনিয়ার যেরূপ চালাচ্ছে গাড়ি সেইরূপ চলছে। নিজের কোন ক্ষমতা নাই।

“তবে দেহের যত্ন করি কেন? ঈশ্বরকে নিয়ে সম্ভোগ করব; তাঁর নাম গুণ গাইব, তাঁর জ্ঞানী, ভক্ত দেখে দেখে বেড়াব।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২রা মার্চ 1884/03/02/ii

20.15 নরেন্দ্রাদি সঙ্গে — নরেন্দ্রের সুখ-দুঃখ — দেহের সুখ-দুঃখ

নরেন্দ্র মেঝের উপর সম্মুখে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্য ও ভক্তদের প্রতি) — দেহের সুখ-দুঃখ আছেই। দেখ না, নরেন্দ্র — বাপ মারা গেছে, বাড়িতে বড় কষ্ট; কোন উপায় হচ্ছে না। তিনি কখনও সুখে রাখেন কখনও দুঃখে।

ত্রৈলোক্য — আজ্ঞে, ঈশ্বরের (নরেন্দ্রের উপর) দয়া হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — আর কখন হবে! কাশীতে অন্নপূর্ণার বাড়ি কেউ অভুক্ত থাকে না বটে; — কিন্তু কারু কারু সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকতে হয়।

“হৃদে শম্ভু মল্লিককে বলেছিল, আমায় কিছু টাকা দাও। শম্ভু মল্লিকের ইংরাজী মত, সে বললে। তোমায় কেন দিতে যাব? তুমি খেটে খেতে পার, তুমি যা হোক কিছু রোজগার করছ। তবে খুব গরিব হয় সে এক কথা, কি কানা, খোঁড়া, পঙ্গু; এদের দিলে কাজ হয়। তখন হৃদে বললে, মহাশয়! আপনি উটি বলবেন না। আমার টাকায় কাজ নাই। ঈশ্বর করুন যেন আমায় কানা, খোঁড়া, আতি দারিদ্রীর — এ-সব না হতে হয়, আপনারও দিয়ে কাজ নাই, আমারও নিয়ে কাজ নাই।”

[নরেন্দ্র ও নাস্তিক মত — ঈশ্বরের কার্য ও ভীষ্মদেব]

ঈশ্বর নরেন্দ্রকে কেন এখনও দয়া করছেন না ঠাকুর যেন অভিমান করে এই কথা বলছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রের দিকে এক-একবার সস্নেহ দৃষ্টি করিতেছেন।

নরেন্দ্র — আমি নাস্তিক মত পড়ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দুটো আছে, অস্তি আর নাস্তি, অস্তিটাই নাও না কেন?

সুরেন্দ্র — ঈশ্বর তো ন্যায়পরায়ণ, তিনি তো ভক্তকে দেখবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আইনে (শাস্ত্রে) আছে, পূর্বজন্মে যারা দান-টান করে তাদেরই ধন হয়! তবে কি জান? এ-সংসার তাঁর মায়া, মায়ার কাজের ভিতর অনেক গোলমাল, কিছু বোঝা যায় না!

“ঈশ্বরের কার্য কিছু বুঝা যায় না। ভীষ্মদেব শরশয্যায় শুয়ে; পাণ্ডবেরা দেখতে এসেছেন। সঙ্গে কৃষ্ণ। এসে খানিকক্ষণ পরে দেখেন, ভীষমদেব কাঁদছেন। পাণ্ডবেরা কৃষ্ণকে বললেন, কৃষ্ণ, কি আশ্চর্য! পিতামহ অষ্টবসুর একজন বসু; এঁর মতন জ্ঞানী দেখা যায় না; ইনিও মৃত্যুর সময় মায়াতে কাঁদছেন! কৃষ্ণ বললেন, ভীষ্ম সেজন্য কাঁদছেন না। ওঁকে জিজ্ঞাসা কর দেখি। জিজ্ঞাসা করাতে ভীষ্ম বললেন, কৃষ্ণ! ঈশ্বরের কার্য কিছু বুঝতে পারলাম না! আমি এইজন্য কাঁদছি যে সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎ নারায়ণ ফিরছেন কিন্তু পাণ্ডবদের বিপদের শেষ নাই! এই কথা যখন ভাবি, দেখি যে তাঁর কার্য কিছুই বোঝবার জো নাই!”

[শুদ্ধ আত্মা একমাত্র অটল — সুমেরুবৎ]

“আমায় তিনি দেখিয়েছিলেন, পরমাত্মা, যাঁকে বেদে শুদ্ধ আত্মা বলে, তিনিই কেবল একমাত্র অটল সুমেরুবৎ নির্লিপ্ত, আর সুখ-দুঃখের অতীত। তাঁর মায়ার কার্যে অনেক গোলমাল; এটির পর ওটি, এটি থেকে উটি হবে — ও-সব বলবার জো নাই।”

সুরেন্দ্র (সহাস্যে) — পূর্বজন্মে দান-টান করলে তবে ধন হয়, তাহলে তো আমাদের দান-টান করা উচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ — যার টাকা আছে তার দেওয়া উচিত। (ত্রৈলোক্যের প্রতি) জয়গোপাল সেনের টাকা আছে তার দান করা উচিত। এ যে করে না সেটা নিন্দার কথা। এক-একজন টাকা থাকলেও হিসেবী (কৃপণ) হয়; — টাকা যে কে ভোগ করবে তার ঠিক নাই!

“সেদিন জয়গোপাল এসেছিল। গাড়ি করে আসে। গাড়িতে ভাঙা লণ্ঠন; — ভাগাড়ের ফেরত ঘোড়া; মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল ফেরত দ্বারবান; — আর এখানের জন্য নিয়ে এলে দুই পচা ডালিম।” (সকলের হাস্য)

সুরেন্দ্র — জয়গোপালবাবু ব্রাহ্মসমাজের। এখন বুঝি কেশববাবুর ব্রাহ্মসমাজে সেরূপ লোক নাই। বিজয় গোস্বামী, শিবনাথ ও আর আর বাবুরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — গোবিন্দ অধিকারী যাত্রার দলে ভাল লোক রাখত না; — ভাগ দিতে হবে বলে। (সকলের হাস্য)

“কেশবের শিষ্য একজনকে সেদিন দেখলাম। কেশবের বাড়িতে থিয়েটার হচ্ছিল। দেখলাম, সে ছেলে কোলে করে নাচছে! আবার শুনলাম লেকচার দেয়। নিজেকে কে শিক্ষা দেয় তার ঠিক নাই!”

ত্রৈলোক্য গাহিতেছেন, — চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।

গান সমপ্ত হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রৈলোক্যকে বলিতেছেন, ওই গানটা গাও তো গা, — আমায় দে মা পাগল করে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৯ই মার্চ 1884/03/09/i

20.16 দক্ষিণেশ্বরে মণিলাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

আজ রবিবার, ৯ই মার্চ, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ (২৭শে ফাল্গুন, শুক্লা ত্রয়োদশী)। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে অনেকগুলি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন; মণিলাল মল্লিক, সিঁথির মহেন্দ্র কবিরাজ, বলরাম, মাস্টার, ভবনাথ, রাখাল, লাটু, হরিশ, কিশোরী (গুপ্ত), শিবচন্দ্র প্রভৃতি। এখনও গিরিশ, কালী, সুবোধ প্রভৃতি আসিয়া জুটেন নাই। শরৎ, শশী ইঁহারা সবে দু-একবার দেখিয়াছেন। পূর্ণ, ছোট নরেন প্রভৃতিও তাঁহাকে এখনও দেখেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে বাড় বাঁধা। রেলের ধারে পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙিয়াছে — তখন ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন। সবে হাত ভাঙিয়া গিয়াছে, সর্বদাই হাতে যন্ত্রণা।

কিন্তু এই অবস্থাতেই প্রায় সমাধিস্থ থাকেন ও ভক্তদের গভীর তত্ত্বকথা বলেন।

একদিন যন্ত্রণায় কাঁদিতেছেন, এমন সময় সমাধিস্থ হইলেন। সমাধির পর প্রকৃতিস্থ হইয়া মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তগণকে বলিতেছেন, বাবু, সচ্চিদানন্দ লাভ না হলে কিছুই হল না। ব্যাকুলতা না হলে হবে না। আমি কেঁদে কেঁদে ডাকতাম আর বলতাম, ওহে দীননাথ, আমি ভজন-সাধনহীন, আমায় দেখা দিতে হবে।

সেই দিন রাত্রে আবার মহিমাচরণ, অধর, মাস্টার প্রভৃতি বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি) — একরকম আছে অহেতুকী ভক্তি, এইটি যদি সাধতে পার।

আবার অধরকে বলিতেছেন — এই হাতটাতে একটু হাত বুলিয়ে দিতে পার?

আজ ৯ই মার্চ, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। মণিলাল মল্লিক ও ভবনাথ এগ্‌জিবিশনের কথা বলিতেছেন — ১৮৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, এশিয়াটিক মিউজিয়াম্‌-এর কাছে হইয়াছিল। তাঁহারা বলিতেছেন — কত রাজারা বহুমূল্য জিনিস সব পাঠাইয়াছেন! সোনার খাট ইত্যাদি — একটা দেখবার জিনিস।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও ধন, ঐশ্বর্য]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি সহাস্যে) — হ্যাঁ, গেলে একটা বেশ লাভ হয়। ওইসব সোনার জিনিস, রাজরাজড়ার জিনিস দেখে সব ছ্যা হয়ে যায়। সেটাও অনেক লাভ। হৃদে, কলকাতায় যখন আমি আসতাম, লাট সাহেবের বাড়ি আমাকে দেখাত — মামা, ওই দেখ, লাট সাহেবের বাড়ি, বড় বড় থাম। মা দেখিয়ে দিলেন, কতকগুলি মাটির ইট উঁচু করে সাজান।

“ভগবান ও তাঁর ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য দুদিনের জন্য, ভগবানই সত্য; বাজিকর আর তার বাজি! বাজি দেখে সব অবাক্, কিন্তু সব মিথ্যা; বাজিকরই সত্য। বাবু আর তাঁর বাগান। বাগান দেখে বাগানের মালিক বাবুকে সন্ধান করতে হয়।”

মণি মল্লিক (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — আবার কত বড় ইলেক্‌ট্রিক লাইট দিয়েছে। তখন আমাদের মনে হয় তিনি কত বড় যিনি ইলেকট্রিক লাইট করেছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণিলালের প্রতি) — আবার একমতে আছে, তিনি এইসব হয়ে রয়েছেন; আবার যে বলছে সেও তিনি। ঈশ্বর মায়া, জীব, জগৎ।

মিউজিয়ামের কথা পড়িল।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও সাধুসঙ্গ — যোগীর ছবি]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — আমি একবার মিয়জিয়ামে গিছলুম; তা দেখালে ইট, পাথর হয়ে গেছে, জানোয়ার পাথর হয়ে গিয়েছে। দেখলে, সঙ্গের গুণ কি! তেমনি সর্বদা সাধুসঙ্গ করলে তাই হয়ে যায়।

মণি মল্লিক (সহাস্যে) — আপনি ওখানে একবার গেলে আমাদের ১০/১৫ বৎসর উপদেশ চলত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — কি, উপমার জন্য?

বলরাম — না; এখানে ওখানে গেলে হাত সারবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমার ইচ্ছা যে দুখানি ছবি যদি পাই। একটি ছবি; যোগী ধুনি জ্বেলে বসে আছে; আর-একটি ছবি, যোগী গাঁজার কলকে মুখ দিয়ে টানছে আর সেটা দপ্ করে জ্বলে উঠছে।

“এ-সব ছবিতে বেশ উদ্দীপন হয়। যেমন সোলার আতা দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়।

“তবে যোগের বিঘ্ন — কামিনী-কাঞ্চন। এই মন শুদ্ধ হলে যোগ হয়। মনের বাস কপালে (আজ্ঞা চক্রে) কিন্তু দৃষ্টি লিঙ্গ, গুহ্য, নাভিতে — অর্থাৎ কামিনী-কাঞ্চনে! সাধন করলে ওই মনের ঊর্ধ্বদৃষ্টি হয়।

“কি সাধন করলে মনের ঊর্ধ্বদৃষ্টি হয়? সর্বদা সাধুসঙ্গ করলে সব জানতে পারা যায়।

“ঋষিরা সর্বদা হয় নির্জনে, নয় সাধুসঙ্গে থাকতেন — তাই তাঁরা অনায়াসে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করে ঈশ্বরেতে মন যোগ করেছিলেন — নিন্দা, ভয় কিছু নাই।

“ত্যাগ করতে হলে ঈশ্বরের কাছে পুরুষকারের জন্য প্রার্থনা করতে হয়। যা মিথ্যা বলে বোধ হবে তা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ।

“ঋষিদের এই পুরুষকার ছিল। এই পুরুষকারের দ্বারা ঋষিরা ইন্দ্রিয় জয় করেছিলেন।

“কচ্ছপ যদি হাত-পা ভিতরে সাঁধ করে দেয়, চারখানা করে কাটলেও হাত-পা বার করবে না!

“সংসারী লোক কপট হয় — সরল হয় না। মুখে বলে ঈশ্বরকে ভালবাসি, কিন্তু বিষয়ে যত টান, কামিনী-কাঞ্চনে যত ভালবাসা, তার অতি অল্প অংশও ঈশ্বরের দিকে দেয় না। অথচ মুখে বলে ঈশ্বরকে ভালবাসি।

(মণি মল্লিকের প্রতি) — “কপটতা ছাড়ো।”

মণিলাল — মানুষ সম্বন্ধে না ঈশ্বর সম্বন্ধে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — সবরকম। মানুষ সম্বন্ধেও বটে, আর ঈশ্বর সম্বন্দেও বটে; কপটতা করতে নাই।

“ভবনাথ কেমন সরল! বিবাহ করে এসে আমায় বলছে, স্ত্রীর উপর আমার এত স্নেহ হচ্ছে কেন? আহা! সে ভারী সরল!

“তা স্ত্রীর উপর ভালবাসা হবে না? এটি জগন্মাতার ভুবনমোহিনী মায়া। স্ত্রীকে বোধ হয় যে পৃথিবীতে অমন আপনার লোক আর হবে না — আপনার লোক, জীবনে মরণে, ইহকালে পরকালে।

“এই স্ত্রী নিয়ে মানুষ কি না দুঃখ ভোগ করছে, তবু মনে করে যে এমন আত্মীয় আর কেউ নাই। কি দুরবস্থা! কুড়ি টাকা মাইনে — তিনটে ছেলে হয়েছে — তাদের ভাল করে খাওয়াবার শক্তি নেই, বাড়ির ছাদ দিয়ে জল পড়ছে, মেরামত করবার পয়সা নাই — ছেলের নতুন বই কিনে দিতে পারে না। — ছেলের

পৈতে দিতে পারে না — এর কাছে আট আনা, ওর কাছে চার আনা ভিক্ষে করে।

“বিদ্যারূপিণী স্ত্রী যথার্থ সহধর্মিণী। স্বামীকে ঈশ্বরের পথে যেতে বিশেষ সহায়তা করে। দু-একটি ছেলের পর দুজনে ভাই-ভগিনীর মতো থাকে। দুজনেই ঈশ্বরের ভক্ত — দাস-দাসী। তাদের সংসার, বিদ্যার সংসার। ঈশ্বরকে ও ভক্তদের লয়ে সর্বদা আনন্দ। তারা জানে ঈশ্বরই একমাত্র আপনার লোক — অনন্তকালের আপনার। সুখে-দুঃখে তাঁকে ভুলে না — যেমন পাণ্ডবেরা।”

[সংসারীভক্ত ও ত্যাগীভক্ত]

“সংসারীদের ঈশ্বরানুরাগ ক্ষণিক — যেমন তপ্ত খোলায় জল পড়েছে, ছ্যাঁক করে উঠল — তারপরই শুকিয়ে গেল।

“সংসারী লোকদের ভোগের দিকে মন রয়েছে — তাই জন্য সে অনুরাগ, সে ব্যাকুলতা হয় না।

“একাদশী তিনপ্রকার। প্রথম — নির্জলা একাদশী, জল পর্যন্ত খাবে না। তেমনি ফকির পূর্ণত্যাগী, একেবারে সব ভোগ ত্যাগ। দ্বিতীয় — দুধ সন্দেশ খায় — ভক্ত যেমন গৃহে সামান্য ভোগ রেখে দিয়ে দিয়েছে। তৃতীয় — লুচি ছক্কা খেয়ে একাদশী — পেট ভরে খাচ্ছে; হল দুখানা রুটি দুধে ভিজছে, পরে খাবে।

“লোকে সাধন-ভজন করে, কিন্তু মন কামিনী-কাঞ্চনে, মন ভোগের দিকে থাকে তাই সাধন-ভজন ঠিক হয় না।

“হাজরা এখানে অনেক জপতপ করত, কিন্তু বাড়িতে স্ত্রী ছেলেপুলে জমি — এ-সব ছিল, কাজে কাজেই জপতপও করে; ভিতরে ভিতরে দালালিও করে। এ-সব লোকের কথার ঠিক থাকে না। এই বলে মাছ খাব না। আবার খায়।

“টাকার জন্য লোকে কি না করতে পারে! ব্রাহ্মণকে, সাধুকে মোট বহাতে পারে।

“সন্দেশ পচে যেত, তবু এ-সব লোককে দিতে পারতুম না। অন্য লোকের হেগো ঘটির জল নিতে পারতুম, এ-সব লোকের ঘটি ছুঁতুম না।

“হাজরা টাকাওয়ালা লোক দেখলে কাছে ডাকত — ডেকে লম্বা লম্বা কথা শোনাত; আবার তাদের বলত রাখাল-টাখাল যা সব দেখছ — ওরা জপতপ করতে পারে না — হো-হো করে বেড়ায়।

“আমি জানি যে যদি কেউ পর্বতের গুহায় বাস করে, গায়ে ছাই মাখে, উপবাস করে, নানা কঠোর করে কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিষয়ী মন — কামিনী-কাঞ্চনে মন — সে লোককে আমি বলি ধিক্ আর যার কামিনী-কাঞ্চনে মন নাই — খায় দায় বেড়ায় তাকে বলি ধন্য।

(মণি মল্লিককে দেখাইয়া) — “এঁর বাড়িতে সাধুর ছবি নাই। সাধুদের ছবি রাখলে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়।”

মণিলাল — আছে, নন্দিনীর১ ঘরে ভক্ত মেমের ছবি আছে। মেম ভজনা (Prayer) করছে। আর-একখানা ছবি আছে — বিশ্বাস পাহাড় ধরে একজন

আছে — নিচে অতলস্পর্শ সমুদ্র, বিশ্বাস ছেড়ে দিলে একেবারে অতল জলে পড়ে যাবে।

“আর-একটি ছবি আছে — কয়টি বালিকা বর আসবে বলে প্রদীপে তেল ভরে জেগে বসে আছে। যে ঘুমিয়ে পড়েছে, সে দেখতে পাবে না। ঈশ্বরকে বর বলে বর্ণনা করেছে।”২

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্য) — এটি বেশ।

মণিলাল — আরও ছবি আছে — বিশ্বাসের বৃক্ষ! আর পাপ-পুণ্যের ছবি।৩

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভবনাথের প্রতি) — বেশ সব ছবি; তুই দেখতে যাস।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর বলিতেছেন, “এক-একবার ভাবি — তখন ও-সব ভাল লাগে না। প্রথমে একবার পাপ পাপ করতে হয়, কিসে পাপ থেকে মুক্তি হয়, কিন্তু তাঁর কৃপায় একবার ভালবাসা যদি আসে, একবার রাগভক্তি যদি আসে, তাহলে পাপ-পুণ্য সব ভুলে যায়। তখন আইনের সঙ্গে, শাস্ত্রের সঙ্গে তফাত হয়ে যায়। অনুতাপ করতে হবে, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, এ-সব ভাবনা আর থাকে না।

“যেমন বাঁকা নদী দিয়ে অনেক কষ্টে এবং অনেকক্ষণ পরে গন্তব্য স্থানে যাচ্ছ। কিন্তু যদি বন্যে হয় তাহলে সোজা পথ দিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে গন্তব্যস্থানে পোঁছানো যায়। তখন ড্যাঙাতেই একবাঁশ জল।

“প্রথম অবস্থায় অনেক ঘুরতে হয়, অনেক কষ্ট করতে হয়।

“রাগভক্তি এলে খুব সোজা। যেমন মাঠের উপর ধান কাটার পর যেদিক দিয়ে যাও। আগে আলের উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হত এখন যেদিক দিয়ে যাও। যদি কিছু কিছু খড় থাকে — জুতা পায়ে দিয়ে চলে গেলে আর কোন কষ্ট নাই। বিবেক, বৈরাগ্য, গুরুবাক্যে বিশ্বাস — এ-সব থাকলে আর কোন কষ্ট নাই।”

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও ধ্যানযোগ, শিবযোগ, বিষ্ণুযোগ — নিরাকার ধ্যান ও সাকার ধ্যান]

মণিলাল (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — আচ্ছা, ধ্যানের কি নিয়ম? কোথায় ধ্যান করতে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হৃদয় ডঙ্কাপেটা জায়গা। হৃদয়ে ধ্যান হতে পারে, অথবা সহস্রধারে, এগুলি আইনের ধ্যান — শাস্ত্রে আছে। তবে তোমার যেখানে অভিরুচি ধ্যান করতে পার। সব স্থানই তো ব্রহ্মময়; কোথায় তিনি নাই?

“যখন বলির কাছে তিন পায়ে নারায়ণ স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ঢেকে ফেললেন, তখন কি কোন স্থান বাকী ছিল? গঙ্গাতীরও যেমন পবিত্র আবার যেখানে খারাপ মাটি আছে সে-ও তেমনি পবিত্র। আবার আছে এ-এমস্ত তাঁরই বিরাটমূর্তি।

“নিরাকার ধ্যান ও সাকার ধ্যান। নিরাকার ধ্যান বড় কঠিন। সে ধ্যানে যা কিছু দেখছ শুনছ — লীন হয়ে যাবে; কেবল স্ব-স্বরূপ চিন্তা। সেই স্বরূপ চিন্তা করে শিব নাচেন। ‘আমি কি’, ‘আমি কি’ এই বলে নাচেন।

“একে বলে শিবযোগ। ধ্যানের সময় কপালে দৃষ্টি রাখতে হয়। ‘নেতি’ ‘নেতি’ করে জগৎ ছেড়ে স্ব-স্বরূপ চিন্তা।

“আর এক আছে বিষ্ণুযোগ। নাসাগ্রে দৃষ্টি; অর্ধেক জগতে, অর্ধেক অন্তরে। সাকার ধ্যানে এইরূপ হয়।

“শিব কখন কখন সাকার চিন্তা করে নাচেন। ‘রাম’, ‘রাম’ বলে নাচেন।”

১ নন্দিনী —— মণি মল্লিকের বিধবা কন্যা, ঠাকুরের ভক্ত।

২ Parable of the Ten Virgins

৩ Sin and Virtue

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৯ই মার্চ 1884/03/09/ii

20.17 ভক্তদিগকে ওঁকারের ব্যাখ্যা

মণিলাল মল্লিক পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানী। ভবনাথ, রাখাল, মাস্টার মাঝে মাঝে ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ওঁকারের ব্যাখ্যা ও ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মদর্শনের পর অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — শব্দ ব্রহ্ম, ঋষি মুনিরা ওই শব্দ লাভের জন্য তপস্যা করতেন। সিদ্ধ হলে শুনতে পায়, নাভি থেকে ওই শব্দ আপনি উঠছে — অনাহত শব্দ।

“একমতে, শুধু শব্দ শুনলে কি হবে? দূর থেকে শব্দ-কল্লোল শোনা যায়। সেই শব্দ-কল্লোল ধরে গেলে সমুদ্রে পোঁছানো যায়। যে কালে কল্লোল আছে সে কালে সমুদ্রও আছে। অনাহত ধ্বনি ধরে ধরে গেলে তার প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম তাঁর কাছে পোঁছানো যায়। তাঁকেই পরমপদ১ বলেছে। ‘আমি’ থাকতে ওরূপ দর্শন হয় না। যেখানে ‘আমি’ও নাই, ‘তুমিও নাই, একও নাই, অনেকও নাই; সেইখানেই এই দর্শন।”

[জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ ও সমাধি]

“মনে কর সূর্য আর দশটি জলপূর্ণ ঘট রয়েছে, প্রত্যেক ঘটে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে। প্রথমে দেখা যাচ্ছে সূর্য ও দশটি প্রতিবিম্ব সূর্য। যদি ৯টা ঘট ভেঙে দেওয়া যায়, তাহলে বাকী থাকে একটি সূর্য ও একটি প্রতিবিম্ব সূর্য। এক-একটি ঘট যেন এক-একটি জীব। প্রতিবিম্ব সূর্য ধরে ধরে সত্য সূর্যের কাছে যাওয়া যায়। জীবাত্মা থেকে পরমাত্মায় পোঁছানো যায়। জীব (জীবাত্মা) যদি সাধন-ভজন করে তাহলে পরমাত্মা দর্শন করতে পারে। শেষের ঘটটি ভেঙে দিলে কি আছে মুখে বলা যায় না।

“জীব প্রথমে অজ্ঞান হয়ে থাকে। ঈশ্বর বোধ নাই, নানা জিনিস বোধ — অনেক জিনিস বোধ। যখন জ্ঞান হয় তখন তার বোধ হয় যে ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন।

যেমন পায়ে কাঁটা ফুটেছে, আর-একটি কাঁটা জোগাড় করে এনে ওই কাঁটাটি তোলা। অর্থাৎ জ্ঞান কাঁটা দ্বারা অজ্ঞান কাঁটা তুলে ফেলা।

“আবার বিজ্ঞান হলে দুই কাঁটাই ফেলে দেওয়া — অজ্ঞান কাঁটা এবং জ্ঞান কাঁটা। তখন ঈশ্বরের সঙ্গে নিশিদিন কথা, আলাপ হচ্ছে — শুধু দর্শন নয়।

“যে দুধের কথা কেবল শুনেছে সে অজ্ঞান; যে দুধ দেখেছে তার জ্ঞান হয়েছে। যে দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে তার বিজ্ঞান হয়েছে।”

এইবার ভক্তদের বুঝি নিজের অবস্থা বুঝাইয়া দিতেছেন। বিজ্ঞানীর অবস্থা বর্ণনা করিয়া বুঝি নিজের অবস্থা বলিতেছেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থা — শ্রীমুখ-কথিত — ঈশ্বরদর্শনের পর অবস্থা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — জ্ঞানী সাধু আর বিজ্ঞানী সাধু প্রভেদ আছে। জ্ঞানী সাধুর বসবার ভঙ্গী আলাদা। গোঁপে চাড়া দিয়ে বসে। কেউ এলে বলে, “কেমন বাবু, তোমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে?”

“যে ঈশ্বরকে সর্বদা দর্শন করছে, তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছে (বিজ্ঞানী) তার স্বভাব আলাদা — কখনও জড়বৎ, কখনও পিশচবৎ, কখনও বালকবৎ, কখনও উন্মাদবৎ।

“কখনও সমাধিস্থ হয়ে বাহ্যশূন্য হয় — জড়বৎ হয়ে যায়।

“ব্রহ্মময় দেখে তাই পিশাচবৎ; শুচি-অশুচি বোধ থাকে না। হয়তো বাহ্যে করতে করতে কুল খাচ্ছে, বালকের মতো। স্বপ্নদোষের পর অশুদ্ধি বোধ করে না — শুক্রে শরীর হয়েছে এই ভেবে।

“বিষ্ঠা মূত্র জ্ঞান নাই; সব ব্রহ্মময়। ভাত-ডালও অনেকদিন রাখলে বিষ্ঠার মতন হয়ে যায়।

“আবার উন্মাদবৎ; তার রকম সকম দেখে লোকে মনে করে পাগল।

“আবার কখনও বালকবৎ, কোন পাশ নাই, লজ্জা, ঘৃণা, সঙ্কোচ প্রভৃতি।

“ঈশ্বরদর্শনের পর এই অবস্থা। যেমন চুম্বকের পাহাড়ের কাছ দিয়ে জাহাজ যাচ্ছে, জাহাজের স্ক্রু, পেরেক আলগা হয়ে খুলে যায়। ঈশ্বর দর্শনের পর কাম-ক্রোধাদি আর থাকে না।

“মা-কালীর মন্দিরে যখন বাজ পড়েছিল, তখন দেখেছিলাম স্ক্রুর মূখ উড়ে গেছে।

“যিনি ঈশ্বরদর্শন করেছেন, তাঁর দ্বারা আর ছেলেমেয়ের জন্ম দেওয়া, সৃষ্টির কাজ হয় না। ধান পুঁতলে গাছ হয়, কিন্তু ধান সিদ্ধ করে পুঁতলে গাছ হয় না।

“যিনি ঈশ্বরদর্শন করেছেন, তাঁর ‘আমি’টা নামমাত্র থাকে, সে ‘আমি’র দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হয় না। নামমাত্র থাকে — যেমন নারকেলের বেল্লোর দাগ। বেল্লো ঝরে গেছে — এখন কেবল দাগ মাত্র।”

[ঈশ্বরদর্শনের পর ‘আমি’ — শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশব সেন]

(ভক্তদের প্রতি) — “আমি কেশব সেনকে বললাম, ‘আমি’ ত্যাগ কর — আমি কর্তা — আমি লোকে শিক্ষা দিচ্ছি। কেশব বললে, ‘মহাশয়, তাহলে দল-টল থাকে না।’ আমি বললাম, ‘বজ্জাত আমি’ ত্যাগ কর। ‘ঈশ্বরের দাস আমি’, ‘ঈশ্বরের ভক্ত আমি’ ত্যাগ করতে হবে না। ‘বজ্জাত আমি’ আছে বলে ‘ঈশ্বরের আমি’ থাকে না।

“ভাঁড়ারী একজন থাকলে বাড়ির কর্তা ভাঁড়ারের ভার লয় না।”

[শ্রীরামকৃষ্ণ — মানুষলীলা ও অবতারতত্ত্ব]

(ভক্তদের প্রতি) — “দেখ, এই হাতে লাগার দরুন আমার স্বভাব উলটে যাচ্ছে। এখন মানুষের ভিতর ঈশ্বরের বেশি প্রকাশ দেখিয়ে দিচ্ছে। যেন বলছে আমি মানুষের ভিতর রইচি, তুমি মানুষ নিয়ে আনন্দ কর।

“তিনি শুদ্ধভক্তের ভিতর বেশি প্রকাশ — তাই নরেন্দ্র, রাখাল এদের জন্য এত ব্যাকুল হই।

“জলাশয়ের কিনারায় ছোট ছোট গর্ত থাকে, সেইখানে মাছ, কাঁকড়া এসে জমে, তেমনি মানুষের ভিতর ঈশ্বরের প্রকাশ বেশি।

“এমন আছে যে শালগ্রাম হতেও বড় মানুষ। নরনারায়ণ।

“প্রতিমাতে তাঁর আবির্ভাব হয় আর মানুষে হবে না?

“তিনি নরলীলা করবার জন্য মানুষের ভিতর অবতীর্ণ হন, যেমন রামচন্দ, শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব। অবতারকে চিন্তা করলেই তাঁর চিন্তা করা হয়।”

ব্রাহ্মভক্ত ভগবান দাস আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভগবান দাসের প্রতি) — ঋষিদের ধর্ম সনাতন ধর্ম, অনন্তকাল আছে ও থাকবে। এই সনাতন ধর্মের ভিতর নিরাকার, সাকার সবরকম পূজা আছে; জ্ঞানপথ, ভক্তিপথ সব আছে। অন্যান্য যে-সব ধর্ম আধুনিক ধর্ম কিছুদিন থাকবে আবার যাবে।

১ ‘যত্র নাদো বিলীয়তে’। ‘তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ’।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৩শে মার্চ 1884/03/23/i

20.18 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে রাখাল, রাম, নিত্য, অধর, মাস্টার, মহিমা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

[শ্রীরামকৃষ্ণ অসুখে অধৈর্য কেন? বিজ্ঞানীর অবস্থা]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্নে সেবার পর রাখাল, রাম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ নহে — এখনও হাতে বাড় বাঁধা। (আজ রবিবার, ১১ই চৈত্র, ১২৯০; কৃষ্ণা একাদশী; ২৩শে মার্চ, ১৮৮৪)।

নিজের অসুখ, — কিন্তু ঠাকুর আনন্দের হাট বসাইতেছেন। দলে দলে ভক্ত আসিতেছেন। সর্বদাই ঈশ্বরকথা প্রসঙ্গে — আনন্দ। কখনও কীর্তনানন্দ, কখনও বা ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতেছেন। ভক্তেরা অবাক্ হইয়া দেখে। ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

[নরেন্দ্রের বিবাহ-সম্বন্ধ — “নরেন্দ্র দলপতি”]

রাম — আর মিত্রের (R. Mitra) কন্যার সঙ্গে নরেন্দ্রের সম্বন্ধ হচ্ছে। অনেক টাকা দেবে বলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — ওইরকম একটা দলপতি-টলপতি হয়ে যেতে পারে। ও যেদিকে যাবে সেইদিকেই একটা কিছু বড় হয়ে দাঁড়াবে।

ঠাকুর নরেন্দ্রের কথা আর বেশি তুলিতে দিলেন না।

(রামের প্রতি) — “আচ্ছা, অসুখ হলে আমি এত অধৈর্য হই কেন? একবার একে জিজ্ঞাসা করি কিসে ভাল হবে। একবার ওকে জিজ্ঞাসা করি।

“কি জানো, হয় সকলকেই বিশ্বাস করতে হয়, না হয় কারুকে নয়।

“তিনিই ডাক্তার-কবিরাজ হয়েছেন। তাই সকল চিকিৎসককেই বিশ্বাস করতে হয়। মানুষ মনে করলে বিশ্বাস হয় না।”

[পূর্বকথা — শম্ভু মল্লিক ও হলধারীর অসুখ]

“শম্ভুর ঘোর বিকার — সর্বাধিকারী দেখে বলে ঔষধের গরম।

“হলধারী হাত দেখালে, ডাক্তার বললে, ‘চোখ দেখি; — ও! পিলে হয়েছে।’ হলধারী বলে, ‘পিলে-টিলে কোথাও কিছু নাই।’

“মধু ডাক্তারের ঔষধটি বেশ।”

রাম — ঔষধে উপকার হয় না। তবে প্রকৃতিকে অনেকটা সাহায্য করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঔষধে উপকার না হলে, আফিমে বাহ্যে বন্ধ হয় কেন?

[কেশব সেনের কথা — সুলভ সমাচারে ঠাকুরের বিষয় ছাপানো]

রাম কেশবের শরীরত্যাগের কথা বলিতেছেন।

রাম — আপনি তো ঠিক বলেছিলেন, — ভাল গোলাপের — (বসরাই গোলাপের) গাছ হলে মালী গোড়াসুদ্ধ খুলে দেয়, — শিশির পেলে আরও তেজ হবে। সিদ্ধবচন তো ফলেছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ — কে জানে বাপু, অত হিসাব করি নাই; তোমরাই বলছ।

রাম — ওরা আপনার বিষয় (সুলভ সমাচারে) ছাপিয়ে দিয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ছাপিয়ে দেওয়া! এ কি! এখন ছাপানো কেন? — আমি খাই-দাই থাকি, আর কিছু জানি না।

“কেশব সেনকে আমি বললাম, কেন ছাপালে? তা বললে — তোমার কাছে লোক আসবে বলে।”

[লোকশিক্ষা ঈশ্বরের শক্তিদ্বারা — হনুমান সিং-এর কুস্তিদর্শন]

(রাম প্রভৃতির প্রতি) — ”মানুষের শক্তি দ্বারা লোকশিক্ষা হয় না। ঈশ্বরের শক্তি না হলে অবিদ্যা জয় করা যায় না।

“দুইজনে কুস্তি লড়েছিল — হনুমান সিং আর একজন পাঞ্জাবী মুসলমান। মুসলমানটি খুব হৃষ্টপুষ্ট। কুস্তির দিনে, আর আগের পনেরদিন ধরে, মাংস-ঘি খুব করে খেলে। সবাই ভাবলে, এ-ই জিতবে। হনুমান সিং — গায়ে ময়লা কাপড় — কদিন ধরে কম কম খেলে, আর মহাবীরের নাম জপতে লাগল। যেদিন কুস্তি হল, সেদিন একেবারে উপবাস। সকলে ভাবলে, এ নিশ্চয়ই হারবে। কিন্তু সেই জিতল। যে পনেরদিন ধরে খেলে, সেই হারল।

“ছাপাছাপি করলে কি হবে? — যে লোকশিক্ষা দেবে তার শক্তি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসবে। আর ত্যাগী না হলে লোকশিক্ষা হয় না।”

[বাল্য — কামারপুকুরে লাহাদের বাড়ি সাধুদের পাঠশ্রবণ]

“আমি মূর্খোত্তম।” (সকলের হাস্য)

একজন ভক্ত — তাহলে আপনার মুখ থেকে বেদ-বেদান্ত — তা ছাড়াও কত কি — বেরোয় কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — কিন্তু ছেলেবেলায় লাহাদের ওখানে (কামারপুকুরে) সাধুরা যা পড়ত, বুঝতে পারতাম। তবে একটু-আধটু ফাঁক যায়। কোন পণ্ডিত এসে যদি সংস্কৃতে কথা কয় তো বুঝতে পারি। কিন্তু নিজে সংস্কৃত কথা কইতে পারি না।

[পাণ্ডিত্য কি জীবনের উদ্দেশ্য? মূর্খ ও ঈশ্বরের কৃপা]

“তাঁকে লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। লক্ষ্য বিঁধবার সময় অর্জুন বললেন — আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, — কেবল পাখির চক্ষু দেখতে পাচ্ছি — রাজাদেরও দেখতে পাচ্ছি না, — গাছ দেখতে পাচ্ছি না — পাখি পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না।

“তাঁকে লাভ হলেই হল! সংস্কৃত নাই জানলাম।

তাঁর কৃপা পণ্ডিত মূর্খ সকল ছেলেরই উপর — যে তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়। বাপের সকলের উপরে সমান স্নেহ।

“বাপের পাঁচটি ছেলে, — দুই-একজন ‘বাবা’ বলে ডাকতে পারে। আবার কেউ বা ‘বা’ বলে ডাকে, — কেউ বা ‘পা’ বলে ডাকে, — সবটা উচ্চারণ করতে পারে না। যে ‘বাবা’ বলে, তার উপর কি বাপের বেশি ভালবাসা হবে? — যে

‘পা’ বলে তার চেয়ে? বাবা জানে — এরা কচি ছেলে, ‘বাবা’ ঠিক বলতে পাচ্ছে না।”১

[ঠাকুর শ্রীরাককৃষ্ণের নরলীলায় মন]

“এই হাত ভাঙার পর একটা অবস্থা বদলে যাচ্ছে — নরলীলার দিকে মনটা বড় যাচ্ছে। তিনি মানুষ হয়ে খেলা কচ্ছেন।

“মাটির প্রতিমায় তাঁর পূজা হয় — আর মানুষে হয় না?

“একজন সদাগর লঙ্কার কাছে জাহাজ ডুবে যাওয়াতে লঙ্কার কূলে ভেসে এসেছিল। বিভীষণের লোকেরা বিভীষণের আজ্ঞায় লোকটিকে তাঁর কাছে লয়ে গেল। ‘আহা! এটি আমার রামচন্দ্রের ন্যায় মূর্তি — সেই নবরূপ।’ এই বলে বিভীষণ আনন্দে বিভোর হলেন। আর ওই লোকটিকে বসন ভূষণ পরিয়ে পূজা আর আরতি করতে লাগলেন।

“এই কথাটি আমি যখন প্রথম শুনি, তখন আমার যে কি আনন্দ হয়েছিল, বলা যায় না।”

[পূর্বকথা — বৈষ্ণবচরণ — ফুলুই শ্যামবাজারের কর্তাভজাদের কথা]

“বৈষ্ণবচরণকে জিজ্ঞাসা করাতে বললে, যে যাকে ভালবাসে, তাকে ইষ্ট বলে জানলে, ভগবানে শীঘ্র মন হয়। ‘তুই কাকে ভালবাসিস?’ ‘অমুক পুরুষকে।’ ‘তবে ওকেই তোর ইষ্ট বলে জান্।’ ও-দেশে (কামারপুকুর, শ্যামবাজারে) আমি বললাম — ‘এরূপ মত আমার নয়। আমার মাতৃভাব।’ দেখলাম যে লম্বা লম্বা

কথা কয়, আবার ব্যাভিচার করে। মাগীরা জিজ্ঞাসা করলে — আমাদের কি মুক্তি হবে না? আমি বললাম — হবে যদি একজনেতে ভগবান বলে নিষ্ঠা থাকে। পাঁচটা পুরুষের সঙ্গে থাকলে হবে না।”

রাম — কেদারবাবু কর্তাভজাদের ওখানে বুঝি গিছলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ও পাঁচ ফুলের মধু আহরণ করে

[“হলধারীর বাবা” — “আমার বাবা” — বৃন্দাবনে ফিরতিগোষ্ঠদর্শনে ভাব]

(রাম, নিত্যগোপাল প্রভৃতি প্রতি) — “ইনিই আমার ইষ্ট” এইটি ষোল আনা বিশ্বাস হলে — তাঁকে লাভ হয় — দর্শন হয়।

“আগেকার লোকের খুব বিশ্বাস ছিল। হলধারীর বাপের কি বিশ্বাস!

“মেয়ের বাড়ি যাচ্ছিল। রাস্তায় বেলফুল আর বেলপাতা চমৎকার হয়ে রয়েছে দেখে, ঠাকুরের সেবার জন্য সেই সব নিয়ে দুই-তিনক্রোশ পথ ফিরে তার বাড়ি এল।

“রাম যাত্রা হচ্ছিল। কৈকেয়ী রামকে বনবাস যেতে বললেন। হলধারীর বাপ যাত্রা শুনতে গিছিল — একবারে দাঁড়িয়ে উঠল। — যে কৈকেয়ী সেজেছে, তার কাছে এসে ‘পামরী!’ — এই কথা বলে দেউটি (প্রদীপ) দিয়ে মুখ পোড়াতে গেল।

স্নান করবার পর যখন জলে দাঁড়িয়ে — রক্তবর্ণং চতুর্মুখম্ — এই সব বলে ধ্যান করত — তখন চক্ষু জলে ভেসে যেত!

“আমার বাবা যখন খড়ম পরে রাস্তায় চলতেন, গাঁয়ের দোকানীরা দাঁড়িয়ে উঠত। বলত, ওই তিনি আসছেন।

“যখন হালদার-পুকুরে স্নান করতেন, লোকেরা সাহস করে নাইতে যেত না। খপর নিত — ‘উনি কি স্নান করে গেছেন?’

“রঘুবীর! রঘুবীর! বলতেন, আর তাঁর বুক রক্তবর্ণ হয়ে যেত।

“আমারও ওইরকম হত। বৃন্দাবনে ফিরতিগোষ্ঠ দেখে, ভাবে শরীর ওইরূপ হয়ে গিছল।

“তখনকার লোকের খুব বিশ্বাস ছিল। হয়তো কালীরূপে তিনি নাচছেন, সাধক হাততালি দিচ্ছে! এরূপ কথাও শোনা যায়।”

[পঞ্চবটীর হঠযোগী]

পঞ্চবটীর ঘরে একটি হঠযোগী আসিয়াছেন। এঁড়েদের কৃষ্ণকিশোরের পুত্র রামপ্রসন্ন ও আরও কয়েকটি লোক ওই হঠযোগীকে বড় ভক্তি করেন। কিন্তু তাঁর আফিম আর দুধে মাসে পঁচিশ টাকা খরচা পড়ে। রামপ্রসন্ন ঠাকুরকে বলেছিলেন, “আপনার এখানে অনেক ভক্তরা আসে কিছু বলে কয়ে দিবেন, — হঠযোগীর জন্য তাহলে কিছু টাকা পাওয়া যায়।”

ঠাকুর কয়েকটি ভক্তকে বলিলেন — পঞ্চবটীতে হঠযোগীকে দেখে এসো, কেমন লোকটি।

১ See Max Müller's Hibbert Lectures

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৩শে মার্চ 1884/03/23/ii

20.19 ঠাকুরদাদা ও মহিমাচরণের প্রতি উপদেশ

‘ঠাকুরদাদা’ দু-একটি বন্ধুসঙ্গে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। বয়স ২৭/২৮ হইবে। বরাহনগরে বাস। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে, — কথকতা অভ্যাস করিতেছেন। সংসার ঘাড়ে পড়িয়াছে, — দিন কতক বৈরাগ্য হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। এখনও সাধন-ভজন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি কি হেঁটে আসছ? কোথায় বাড়ি?

ঠাকুরদাদা — আজ্ঞা হাঁ; বরাহনগরে বাড়ি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এখানে কি দরকার ছিল?

ঠাকুরদাদা — আজ্ঞা, আপনাকে দর্শন করতে আসা, তাঁকে ডাকি — মাঝে মাঝে অশান্তি হয় কেন? দুপাঁচদিন বেশ আনন্দে যায় — তারপর অশান্তি কেন?

[কারিকর; মন্ত্রে বিশ্বাস; হরিভক্তি; জ্ঞানের দুটি লক্ষণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ — বুঝেছি, — ঠিক পড়ছে না। কারিকর দাঁতে দাঁত বসিয়ে দেয় — তাহলে হয় — একটু কোথায় আটকে আছে।

ঠাকুরদাদা — আজ্ঞা, এইরূপ অবস্থাই হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — মন্ত্র নিয়েছ?

ঠাকুরদাদা — আজ্ঞা, হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — মন্ত্রে বিশ্বাস আছে?

ঠাকুরদাদার বন্ধু বলিতেছেন — ইনি বেশ গান গাইতে পারেন।

ঠাকুর বলিতেছেন — একটা গাওনা গো।

ঠাকুরদাদা গাইতেছেন —

প্রেম গিরি-কন্দরে, যোগী হয়ে রহিব।
আনন্দনির্ঝর পাশে যোগধ্যানে থাকিব ।।
তত্ত্বফল আহরিয়ে জ্ঞান-ক্ষুধা নিবারিয়ে,
বৈরাগ্য-কুসুম দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম পূজিব।

মিটাতে বিরহ-তৃষা কূপ জলে আর যাব না,
হৃদয়-করঙ্গ ভরে শান্তি-বারি তুলিব।
কভু ভাব শৃঙ্গ পরে, পদামৃত পান করে,
হাসিব কাঁদিব নাচিব গাইব।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আহা, বেশ গান! আনন্দনির্ঝর! তত্ত্বফল! হাসিব কাঁদিব নাচিব গাইব।

"তোমার ভিতর থেকে এমন গান ভাল লাগছে — আবার কি!

"সংসারেতে থাকতে গেলেই সুখ-দুঃখ আছে — একটু-আধটু অশান্তি আছে।

"কাজলের ঘরে থাকলে গায়ে একটু কালি লাগেই।"

"ঠাকুরদাদা — আজ্ঞা, — এখন কি করব — বলে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাততালি দিয়ে সকালে বিকালে হরিনাম করবে — 'হরিবোল' — 'হরিবোল' — 'হরিবোল' বলে।

"আর একবার এসো, — আমার হাতটা একটু সারুক।"

মহিমাচরণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

(মহিমার প্রতি) — "আহা ইনি একটি বেশ গান গেয়েছেন। — গাও তো গা সেই গানটি আর একবার।"

ঠাকুরদাদা আবার গাইলেন, “প্রেম গিরি-কন্দরে” ইত্যাদি।

গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিতেছেন — তুমি সেই শ্লোকটি একবার বলতো — হরিভক্তির কথা।

মহিমাচরণ নারদপঞ্চরাত্র হইতে সেই শ্লোকটি বলিতেছেন —

অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ওটাও বল — লভ লভ হরিভক্তিং।

মহিমাচরণ বলিতেছেন —

বিরম বিরম ব্রহ্মন্ কিং তপস্যাসু বৎস।
ব্রজ ব্রজ দ্বিজ শীঘ্রং শঙ্করং জ্ঞানসিন্ধুম্ ।।
লভ লভ হরিভক্তিং বৈষ্ণবোক্তাং সুপক্কাম্।
ভব-নিগড়-নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্তরীঞ্চ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — শঙ্কর হরিভক্তি দিবেন।

মহিমা — পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, সঙ্কোচ — এ-সব পাশ; কি বল?

মহিমা — আজ্ঞা হাঁ, গোপন করবার ইচ্ছা, প্রশংসায় কুণ্ঠিত হওয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দুটি জ্ঞানের লক্ষণ। প্রথম কূটস্থ বুদ্ধি। হাজার দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-বিঘ্ন হোক — নির্বিকার, যেমন কামারশালের লোহা, যার উপর হাতুড়ি দিয়ে পেটে। আর, দ্বিতীয়, পুরুষকার — খুব রোখ। কাম-ক্রোধে আমার অনিষ্ট কচ্ছে তো একেবারে ত্যাগ! কচ্ছপ যদি হাত-পা ভিতরে সাঁদ করে, চারখানা করে কাটলেও আর বার করবে না।

[তীব্র, মন্দা ও মর্কট বৈরাগ্য]

(ঠাকুরদাদা প্রভৃতির প্রতি) — "বৈরাগ্য দুইপ্রকার। তীব্র বৈরাগ্য আর মন্দা বৈরাগ্য। মন্দা বৈরাগ্য — হচ্ছে হবে — ঢিমে তেতালা। তীব্র বৈরাগ্য — শাণিত ক্ষুরের ধার — মায়াপাশ কচকচ করে কেটে দেয়।

"কোনও চাষা কতদিন ধরে খাটছে — পুষ্করিণীর জল ক্ষেতে আসছে না। মনে রোখ নাই। আবার কেউ দু-চারদিন পরেই — আজ জল আনব তো ছাড়ব, প্রতিজ্ঞা করে। নাওয়া খাওয়া সব বন্ধ। সমস্ত দিন খেটে সন্ধ্যার সময় যখন জল কুলকুল করে আসতে লাগল, তখন আনন্দ। তারপর বাড়িতে গিয়ে পরিবারকে বলে — 'দে এখন তেল দে নাইব।' নেয়ে খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা।

“একজনের পরিবার বললে, ‘অমুক লোকের ভারী বৈরাগ্য হয়েছে, তোমার কিছু হল না!’ যার বৈরাগ্য হয়েছে, সে লোকটির ষোলজন স্ত্রী, — এক-একজন করে তাদের ত্যাগ করছে।

“সোয়ামী নাইতে যাচ্ছিল, কাঁধে গামছা, — বললে, ‘ক্ষেপী! সে লোক ত্যাগ করতে পারবে না, — একটু একটু করে কি ত্যাগ হয়! আমি ত্যাগ করতে পারব। এই দেখ, — আমি চললুম!’

সে বাড়ির গোছগাছ না করে — সেই অবস্থায় — কাঁধে গামছা — বাড়ি ত্যাগ করে, চলে গেল। — এরই নাম তীব্র বৈরাগ্য।

আর-একরকম বৈরাগ্য তাকে বলে মর্কট বৈরাগ্য। সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়া বসন পরে কাশী গেল। অনেকদিন সংবাদ নাই। তারপর একখানা চিঠি এল — ‘তোমরা ভাবিবে না, আমার এখানে একটি কর্ম হইয়াছে।’

“সংসারের জ্বালা তো আছেই! মাগ অবাধ্য, কুড়ি টাকা মাইনে, ছেলের অন্নপ্রাশন দিতে পারছে না, ছেলেকে পড়াতে পারছে না — বাড়ি ভাঙা, ছাত দিয়ে জল পড়ছে; — মেরামতের টাকা নাই।

“তাই ছোকরারা এলে আমি জিজ্ঞাসা করি, তোর কে কে আছে?

(মহিমার প্রতি) — “তোমাদের সংসারত্যাগের কি দরকার? সাধুদের কত কষ্ট! একজনের পরিবার বললে, তুমি সংসারত্যাগ করবে — কেন? আট ঘরে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করতে হবে, তার চেয়ে এক ঘরে খাওয়া পাচ্ছ, বেশ তো।

"সদাব্রত খুঁজে খুঁজে সাধু তিনক্রোশ রাস্তা থেকে দূরে গিয়ে পড়ে। দেখেছি, জগন্নাথদর্শন করে — সোজা পথ দিয়ে সাধু আসছে; সদাব্রতর জন্য তার সোজা পথ ছেড়ে যেতে হয়।

"এতো বেশ — কেল্লা থেকে যুদ্ধ। মাঠে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলে অনেক অসুবিধা। বিপদ। গায়ের উপর গোলাগুলি এসে পড়ে!

"তবে দিন কতক নির্জনে গিয়ে, জ্ঞানলাভ করে, সংসারে এসে থাকতে হয়। জনক জ্ঞানলাভ করে সংসারে ছিল। জ্ঞানের পর যেখানেই থাক তাতে কি?"

মহিমাচরণ — মহাশয়, মানুষ কেন বিষয়ে মুগ্ধ হয়ে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁকে লাভ না করে বিষয়ের মধ্যে থাকে বলে। তাঁকে লাভ করলে আর মুগ্ধ হয় না। বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখতে পায়, — তাহলে আর তার অন্ধকার ভাল লাগে না।

[ঊর্ধ্বরেতা ধৈর্যরেতা ও ঈশ্বরলাভ — সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম]

"তাঁকে পেতে হলে বীর্যধারণ করতে হয়।

"শুকদেবাদি ঊর্ধ্বরেতা। এঁদের রেতঃপাত কখনও হয় নাই।

"আর এক আছে ধৈর্যরেতা। আগে রেতঃপাত হয়েছে, কিন্তু তারপর বীর্যধারণ। বার বছর ধৈর্যরেতা হলে বিশেষ শক্তি জন্মায়। ভিতরে একটি নূতন নাড়ী হয়, তার নাম মেধা নাড়ী। সে নাড়ী হলে সব স্মরণ থাকে, — সব জানতে পারে।

“বীর্যপাতে বলক্ষয় হয়। স্বপ্নদোষে যা বেরিয়ে যায়, তাতে দোষ নাই। ও ভাতের গুণে হয়। ও-সব বেরিয়ে গিয়েও যা থাকে, তাতেই কাজ হয়। তবু স্ত্রীসঙ্গ করা উচিত নয়।

“শেষে যা থাকে, তা খুব রিফাইন (Refine) হয়ে থাকে। লাহাদের ওখানে গুড়ের নাগরি সব রেখেছিল, — নাগরির নিচে একটি একটি ফুটো করে, তারপর একবৎসর পরে দেখলে; সব দানা বেঁধে রয়েছে —– মিছরির মতো। রস যা বেরিয়ে যাবার, ফুটো দিয়ে তা বেরিয়ে গেছে।

“স্ত্রীলোক একেবারে ত্যাগ —– সন্ন্যাসীর পক্ষে। তোমাদের হয়ে গেছে, তাতে দোষ নাই।

“সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না। সাধারণ লোকে তা পারে না। সা রে গা মা পা ধা নি। ‘নি’তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না।

“সন্ন্যাসীর পক্ষে বীর্যপাত বড়ই খারাপ। তাই তাদের সাবধানে থাকতে হয়। স্ত্রীরূপদর্শন যাতে না হয়। ভক্ত স্ত্রীলোক হলেও সেখান থেকে সরে যাবে। স্ত্রীরূপ দেখাও খারাপ। জাগ্রত অবস্থায় না হয়, স্বপ্নে বীর্যপাত হয়।

“সন্ন্যাসী জিতেন্দ্রিয় হলেও লোকশিক্ষার জন্য মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করবে না। ভক্ত স্ত্রীলোক হলেও বেশিক্ষণ আলাপ করবে না।

“সন্ন্যাসীর হচ্ছে নির্জলা একাদশী। আর দুরকম একাদশী আছে। ফলমূল খেয়ে, — আর লুচি ছক্কা খেয়ে। (সকলের হাস্য)

“লুচি ছক্কার সঙ্গে হলো দুখানা রুটি দুধে ভিজেছে। (সকলের হাস্য)

(সহাস্যে) “তোমরা নির্জলা একাদশী পারবে না।”

[পূর্বকথা — কৃষ্ণকিশোরের একাদশী — রাজেন্দ্র মিত্র]

“কৃষ্ণকিশোরকে দেখলাম, একাদশীতে লুচি ছক্কা খেলে। আমি হৃদুকে বললাম — হৃদু, আমার কৃষ্ণকিশোরের একাদশী করতে ইচ্ছা হচ্ছে। (সকলের হাস্য) তাই একদিন করলাম। খুব পেট ভরে খেলাম, তার পরদিন আর কিছু খেতে পারলাম না” (সকলের হাস্য)

যে কয়েকটি ভক্ত পঞ্চবটীতে হঠযোগীকে দেখিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা ফিরিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের বলিতেছেন — “কেমন গো — কিরূপ দেখলে? তোমাদের গজ দিয়ে তো মাপলে?”

ঠাকুর দেখিলেন, ভক্তরা প্রায় কেহই হঠযোগীকে টাকা দিতে রাজী নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সাধুকে টাকা দিতে হলেই তাকে আর ভাল লাগে না।

“রাজেন্দ্র মিত্র — আটশ টাকা মাইনে — প্রয়াগে কুম্ভমেলা দেখে এসেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম — ‘কেমন গো, মেলায় কেমন সব সাধু দেখলে?’ রাজেন্দ্র বললে — ‘কই তেমন সাধু দেখতে পেলাম না। একজনকে দেখলাম বটে কিন্তু তিনিও টাকা লন।’

“আমি ভাবি যে সাধুদের কেউ টাকাপয়সা দেবে না তো খাবে কি করে? এখানে প্যালা দিতে হয় না — তাই সকলে আসে। আমি ভাবি; আহা, ওরা টাকা বড় ভালবাসে। তাই নিয়েই থাকুক।”

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। একজন ভক্ত ছোট খাটটির উত্তরদিকে বসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। ঠাকুর ভক্তটিকে আস্তে আস্তে বলিতেছেন — “যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার। সাকাররূপও মানতে হয়। কালীরূপ চিন্তা করতে করতে সাধক কালীরূপেই দর্শন পায়। তারপর দেখতে পায় যে, সেই রূপ অখণ্ডে লীন হয়ে গেল। যিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই কালী।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

বিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৩শে মার্চ 1884/03/23/iii

20.20 মহিমার পাণ্ডিত্য — মণি সেন, অধর ও মিটিং (Meeting)

ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারান্দায় মহিমা প্রভৃতির সহিত হঠযোগীর কথা কহিতেছেন। রামপ্রসন্ন ভক্ত কৃষ্ণকিশোরের পুত্র, তাই ঠাকুর তাহাকে স্নেহ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — রামপ্রসন্ন কেবল ওইরকম করে হো-হো করে বেড়াচ্ছে। সেদিন এখানে এসে বললে — একটু কথা কবে না। প্রাণায়াম করে নাক টিপে বসে

রইল; খেতে দিলাম, তা খেলে না। আর-একদিন ডেকে বসালুম। তা পায়ের উপর পা দিয়ে বসল — কাপ্তেনের দিকে পা-টা দিয়ে। ওর মার দুঃখ দেখে কাঁদি।

(মহিমার প্রতি) — ওই হঠযোগীর কথা তোমায় বলতে বলেছে। সাড়ে ছ আনা দিন খরচ। এদিকে আবার নিজে বলবে না।”

মহিমা — বললে শোনে কে? (ঠাকুরের ও সকলের হাস্য)

ঠাকুর ঘরের মধ্যে আসিয়া নিজের আসনে বসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মণি সেন (যাঁদের পেনেটীতে ঠাকুরবাড়ি) দু-একটি বন্ধুসঙ্গে আসিয়াছেন ও ঠাকুরের হাত ভাঙা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা পড়া করিতেছেন। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে একজন ডাক্তার।

ঠাকুর ডাক্তার প্রতাপ মজুমদারের ঔষধ সেবন করিতেছেন। মণিবাবুর সঙ্গী ডাক্তার তাঁহার ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন না। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন, “সে (প্রতাপ) তো বোকা নয়, তুমি অমন কথা বলছ কেন?”

এমন সময় লাটু উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন শিশি পড়ে ভেঙে গেছে।

মণি (সেন) হঠযোগীর কথা শুনিয়া বলিতেছেন — হঠযোগী কাকে বলে? হট্‌ (Hot) মানে তো গরম।

মণি সেনের ডাক্তার সম্বন্ধে ঠাকুর ভক্তদের পরে বলিলেন — “ওকে জানি। যদু মল্লিককে বলেছিলাম, এ-ডাক্তার তোমার ওলম্বাকুল, — অমুক ডাক্তারের চেয়েও মোটা বুদ্ধি।”

[শ্রীযুক্ত মাস্টারের সহিত একান্তে কথা]

এখনও সন্ধ্যা হয় নাই। ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়া মাস্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। তিনি খাটের পাশে পাপোশ পশ্চিমাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। এদিকে মহিমাচরণ পশ্চিমের গোল বারান্দায় বসিয়া মণি সেনের ডাক্তারের সহিত উচ্চৈঃস্বরে শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। ঠাকুর নিজের আসন হইতে শুনিতে পাইতেছেন ও ঈষৎ হাস্য করিয়া মাস্টারকে বলিতেছেন — "ওই ঝাড়ছে! রজোগুণ! রজোগুণে একটু পাণ্ডিত্য দেখাতে, লেকচার দিতে ইচ্ছা হয়। সত্ত্বগুণে অন্তর্মুখ হয়, — আর গোপন। কিন্তু খুব লোক! ঈশ্বর কথায় এত উল্লাস!"

অধর আসিয়া প্রণাম করিলেন ও মাস্টারের পাশে বসিলেন।

শ্রীযুক্ত অধর সেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর হইবে। অনেক দিন ধরিয়া সমস্ত দিন আফিসের পরিশ্রমের পর ঠাকুরের কাছে প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পার আসেন। তাঁহার বাটী কলিকাতা শোভাবাজার বেনেটোলায়। অধর কয়েকদিন আসেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিগো, এতদিন আস নাই কেন?

অধর — আজ্ঞা, অনেকগুণো কাজে পড়ে গিছলাম। ইস্কুলের দরুন সভা এবং আর আর মিটিং-এ যেতে হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — মিটিং, ইস্কুল — এই সব লয়ে একেবারে ভুলে গিছলে।

অধর (বিনীত ভাবে) — আজ্ঞা সব চাপা পড়ে গিছল। আপনার হাতটা কেমন আছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — এই দেখ এখনো সারে নাই। প্রতাপের ঔষধ খাচ্ছিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর হঠাৎ অধরকে বলিতেছেন — "দেখো এ-সব অনিত্য — মিটিং, ইস্কুল, আফিস — এ-সব অনিত্য। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। সব মন দিয়ে তাঁকেই আরাধনা করা উচিত।"

অধর চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এ-সব অনিত্য। শরীর এই আছে এই নাই। তাড়াতাড়ি তাঁকে ডেকে নিতে হয়।১

"তোমাদের সব ত্যাগ করবার দরকার নাই। কচ্ছপের মতো সংসারে থাক। কচ্ছপ নিজে জলে চরে বেড়ায়; — কিন্তু ডিম আড়াতে রাখে — সব মনটা তার ডিম যেখানে, সেখানে পড়ে থাকে।

"কাপ্তেনের বেশ স্বভাব হয়েছে। যখন পূজা করতে বসে, ঠিক একটি ঋষির মতো! — এদিকে কর্পূরের আরতি; সুন্দর স্তব পাঠ করে। পূজা করে যখন ওঠে, চক্ষে যেন পিঁপড়ে কামড়েছে! আর সর্বদা গীতা, ভাগবত — এ-সব পাঠ করে। আমি দু-একটা ইংরেজী কথা কয়েছিলাম, — তা রাগ কল্লে। বলে — ইংরেজী পড়া লোক ভ্রষ্টাচারী!"

কিয়ৎক্ষণ পরে অধর অতি বিনীতভাবে বলিতেছেন —

“আপনার আমাদের বাড়িতে অনেকদিন যাওয়া হয় নাই। বৈঠকখানা ঘরে গন্ধ হয়েছিল — আর যেন সব অন্ধকার!”

ভক্তের এই কথা শুনিয়া ঠাকুরের স্নেহ-সাগর যেন উথলিয়া উঠিল। তিনি হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া ভাবে অধর ও মাস্টারের মস্তক ও হৃদয় স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। আর সস্নেহে বলিতেছেন — “আমি তোমাদের নারায়ণ দেখছি! তোমরাই আমার আপনার লোক!”

এইবার মহিমাচরণ ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) — ধৈর্যতার কথা তখন যা বলেছিলে তা ঠিক। বীর্যধারণ না করলে এ-সব (উপদেশ) ধারণ হয় না।

“একজন চৈতন্যদেবকে বললে, এদের (ভক্তদের) এত উপদেশ দেন, তেমন উন্নতি করতে পাচ্ছে না কেন? তিনি বললেন — এরা যোষিৎসঙ্গ করে সব অপব্যয় করে। তাই ধারণা করতে পারে না। ফুটো কলসীতে জল রাখলে জল ক্রমে ক্রমে বেরিয়ে যায়।”

মহিমা প্রভৃতি ভক্তেরা চুপ করিয়া আছেন! কিয়ৎক্ষণ পরে মহিমাচরণ বলিতেছেন — ঈশ্বরের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন — যাতে আমাদের সেই শক্তি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এখনও সাবধান হও! আষাঢ় মাসের জল, বটে, রোধ করা শক্ত। কিন্তু জল অনেক তো বেরিয়ে গেছে! — এখন বাঁধ দিলে থাকবে।

১ অধর কয়েক মাস পরেই দেহত্যাগ করিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

একবিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৫ই এপ্রিল 1884/04/05/i

20.21 শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে প্রাণকৃষ্ণ, মাস্টার, রাম, গিরীন্দ্র, গোপাল

শনিবার, ২৪শে চৈত্র (১২৯০, শুক্লা দশমী) ইং ৫ই এপ্রিল, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ; প্রাতঃকাল বেলা আটটা। মাস্টার দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যবদন, কক্ষমধ্যে ছোট খাটটির উপরে উপবিষ্ট। মেঝেতে কয়েকটি ভক্ত বসিয়া; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

প্রাণকৃষ্ণ জনাইয়ের মুখুজ্জেদের বংশসম্ভূত। কলিকাতায় শ্যামপুকুরে বাড়ি। ম্যাকেঞ্জি লায়ালের এক্‌স্‌চেঞ্জ নামক নিলাম ঘরের কার্যাধ্যক্ষ। তিনি গৃহস্থ, কিন্তু বেদান্তর্চচায় বড় প্রীতি। পরমহংসদেবকে বড় ভক্তি করেন ও মাঝে মাঝে আসিয়া দর্শন করেন। ইতিমধ্যে একদিন নিজের বাড়িতে ঠাকুরকে লইয়া গিয়া মহোৎসব করিয়াছিলেন। তিনি বাগবাজারের ঘাটে প্রত্যহ প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতেন ও নৌকা সুবিধা হইলেই একেবারে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতেন। আজ এইরূপ নৌকা ভাড়া করিয়াছিলেন। নৌকা কূল হইতে একটু

অগ্রসর হইলেই ঢেউ হইতে লাগিল। মাস্টার বলিলেন, আমায় নামাইয়া দিতে হইবে। প্রাণকৃষ্ণ ও তাঁহার বন্ধু অনেক বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কোন মতে শুনিলেন না; বলিলেন, “আমায় নামাইয়া দিতে হইবে, আমি হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে যাব।” অগত্যা প্রাণকৃষ্ণ তাঁহাকে নামাইয়া দিলেন।

মাস্টার পৌঁছিয়া দেখেন যে, তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ পূর্বে পোঁছিয়াছেন ও ঠাকুরের সঙ্গে সদালাপ করিতেছেন। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তিনি একপাশে বসিলেন।

[অবতারবাদ Humanity and Divinity of Incarnation]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) — কিন্তু মানুষে তিনি বেশি প্রকাশ। যদি বল অবতার কেমন করে হবে, যাঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা এই সব জীবের ধর্ম অনেক আছে, হয়তো রোগশোকও আছে; তার উত্তর এই যে, “পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।”

“দেখ না রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হয়ে কাঁদতে লাগলেন। আবার হিরণ্যাক্ষ বধ করবার জন্য বরাহ অবতার হলেন। হিরণ্যাক্ষ বধ হল, কিন্তু নারায়ণ স্বধামে যেতে চান না। বরাহ হয়ে আছেন। কতকগুলি ছানাপোনা হয়েছে। তাদের নিয়ে একরকম বেশ আনন্দে রয়েছেন। দেবতারা বললেন, এ কি হল, ঠাকুর যে আসতে চান না। তখন সকলে শিবের কাছে গেল ও ব্যাপারটি নিবেদন করলে। শিব গিয়া তাঁকে অনেক জেদাজেদি করলেন, তিনি ছানাপোনাদের মাই দিতে

লাগলেন। (সকলের হাস্য) তখন শিব ত্রিশূল এনে শরীরটা ভেঙে দিলেন। ঠাকুর হি-হি করে হেসে তখন স্বধামে চলে গেলেন।”

প্রাণকৃষ্ণ (ঠাকুরের প্রতি) — মহাশয়! অনাহত শব্দটি কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ —— অনাহত শব্দ সর্বদাই এমনি হচ্ছে। প্রণবের ধ্বনি। পরব্রহ্ম থেকে আসছে, যোগীরা শুনতে পায়। বিষয়াসক্ত জীব শুনতে পায় না। যোগী জানতে পারে যে, সেই ধ্বনি একদিকে নাভি থেকে উঠে ও আর-একদিকে সেই ক্ষীরোদশায়ী পরব্রহ্ম থেকে উঠে।

[পরলোক সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কেশব সেনের প্রশ্ন]

প্রাণকৃষ্ণ —— মহাশয়! পরলোক কিরকম?

শ্রীরামকৃষ্ণ —— কেশব সেনও ওই কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। যতক্ষণ মানুষ অজ্ঞান থাকে, অর্থাৎ যথক্ষণ ঈশ্বরলাভ হয় নাই, ততক্ষণ জন্মগ্রহণ করতে হবে। কিন্তু জ্ঞানলাভ হলে আর এ-সংসারে আসতে হয় না। পৃথিবীতে বা অন্য কোন লোকে যেতে হয় না।

“কুমোরেরা হাঁড়ি রৌদ্রে শুকুতে দেয়। দেখ নাই, তার ভিতর পাকা হাঁড়িও আছে, কাঁচা হাঁড়িও আছে? গরু-টরু চলে গেলে হাঁড়ি কতক কতক ভেঙে যায়। পাকা হাঁড়ি ভেঙে গেলে কুমোর সেগুলিকে ফেলে দেয়, তার দ্বারা আর কোন কাজ হয় না। কাঁচা হাঁড়ি ভাঙলে কুমোর তাদের আবার লয়; নিয়ে চাকেতে তাল পাকিয়ে

দেয়, নূতন হাঁড়ি তৈয়ার হয়। তাই যতক্ষণ ঈশ্বরদর্শন হয় নাই, ততক্ষণ কুমোরের হাতে যেতে হবে, অর্থাৎ এই সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হবে।

“সিদ্ধ ধান পুঁতলে কি হবে? গাছ আর হয় না। মানুষ জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ হলে তার দ্বারা আর নূতন সৃষ্টি হয় না, সে মুক্ত হয়ে যায়।”

[বেদান্ত ও অহংকার — বেদান্ত ও ‘অবস্থাত্রয়সাক্ষী’ — জ্ঞান ও বিজ্ঞান]

“পুরাণ মতে ভক্ত একটি, ভগবান একটি; আমি একটি, তুমি একটি; শরীর যেন সরা; এই শরীরমধ্যে মন, বুদ্ধি, অহংকাররূপ জল রয়েছে; ব্রহ্ম সূর্যস্বরূপ। তিনি এই জলে প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন। ভক্ত তাই ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে।

“বেদান্ত (বেদান্তদর্শন) মতে ব্রহ্মই বস্তু, আর সমস্ত মায়া, স্বপ্নবৎ অবস্তু। অহংরূপ একটি লাঠি সচ্চিদানন্দ-সাগরের মাঝখানে পড়ে আছে। (মাস্টারের প্রতি) — তুমি এইটে শুনে যাও — অহং লাঠিটি তুলে নিলে এক সচ্চিদানন্দ-সমুদ্র। অহং লাঠিটি থাকলে দুটো দেখায়, এ একভাগ জল ও একভাগ জল। ব্রহ্মজ্ঞান হলে সমাধিস্থ হয়। তখন এই অহং পুঁছে যায়।

“তবে লোকশিক্ষার জন্য শঙ্করাচার্য ‘বিদ্যার আমি’ রেখেছিলেন।

(প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) — “কিন্তু জ্ঞানীর লক্ষণ আছে। কেউ কেউ মনে করে, আমি জ্ঞানী হয়েছি। জ্ঞানীর লক্ষণ কি? জ্ঞানী কারু অনিষ্ট করতে পারে না। বালকের মতো হয়ে যায়। লোহার খড়্গে যদি পরশমণি ছোঁয়ানো হয়, খড়্গ সোনা হয়ে

যায়। সোনায় হিংসার কাজ হয় না। বাহিরে হয়তো দেখায় যে, রাগ আছে, কি অহংকার আছে, কিন্তু বস্তুতঃ জ্ঞানীর ও-সব কিছু থাকে না।

“দূর থেকে পোড়া দড়ি দেখলে বোধ হয়, ঠিক একগাছা দড়ি পড়ে আছে। কিন্তু কাছে এসে ফুঁ দিলে সব উড়ে যায়। ক্রোধের আকার, অহংকারের আকার কেবল। কিন্তু সত্যকার ক্রোধ নয়, অহংকার নয়।

“বালকের আঁট থাকে না। এই খেলাঘর করলে, কেউ হাত দেয় তো ধেই ধেই করে নেচে কাঁদতে আরম্ভ করবে। আবার নিজেই ভেঙে ফেলবে সব। এই কাপড়ে এত আঁট, বলছে ‘আমার বাবা দিয়েছে, আমি দেব না।’ আবার একটা পুতুল দিলে পরে ভুলে যায়, কাপড়খানা ফেলে দিয়ে চলে যায়।

“এইসব জ্ঞানীর লক্ষণ। হয়তো বাড়িতে খুব ঐশ্বর্য; কোচ, কেদারা, ছবি, গাড়ি-ঘোড়া; আবার সব ফেলে কাশী চলে যাবে।

“বেদান্তমতে জাগরণ অবস্থাও কিছু নয়। এক কাঠুরে স্বপন দেখেছিল। একজন লোক তার ঘুম ভাঙানোতে সে বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, ‘তুই কেন আমার ঘুম ভাঙালি? আমি রাজা হয়েছিলাম, সাত ছেলের বাপ হয়েছিলাম। ছেলেরা সব লেখাপড়া, অস্ত্রবিদ্যা সব শিখছিল। আমি সিংহাসনে বসে রাজত্ব করছিলাম। কেন তুই আমার সুখের সংসার ভেঙে দিলি?’ সে ব্যক্তি বললে, ‘ও তো স্বপন, ওতে আর কি হয়েছে।’ কাঠুরে বললে, ‘দূর! তুই বুঝিস না, আমার কাঠুরে হওয়া যেমন সত্য, স্বপনে রাজা হওয়াও তেমনি সত্য। কাঠুরে হওয়া যদি সত্য হয়, তাহলে স্বপনে রাজা হওয়াও সত্য’।”

প্রাণকৃষ্ণ জ্ঞান জ্ঞান করেন, তাই বুঝি ঠাকুর জ্ঞানীর অবস্থা বলিতেছিলেন। এইবার ঠাকুর বিজ্ঞানীর অবস্থা বলিতেছেন। ইহাতে কি তিনি নিজের অবস্থার ইঙ্গিত করিতেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — 'নেতি' 'নেতি' করে আত্মাকে ধরার নাম জ্ঞান। 'নেতি' 'নেতি' বিচার করে সমাধিস্থ হলে আত্মাকে ধরা যায়।

"বিজ্ঞান — কিনা বিশেষরূপে জানা। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। যে কেবল শুনেছে, সে অজ্ঞান। যে দেখেছে সে জ্ঞানী; যে খেয়েছে তারই বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষরূপে জানা হয়েছে। ঈশ্বরদর্শন করে তাঁর সহিত আলাপ, যেন তিনি পরমাত্মীয়; এরই নাম বিজ্ঞান।

"প্রথমে 'নেতি' 'নেতি' করতে হয়। তিনি পঞ্চভূত নন; ইন্দ্রিয় নন; মন, বুদ্ধি, অহংকার নন; তিনি সকল তত্ত্বের অতীত। ছাদে উঠতে হবে, সব সিঁড়ি একে একে ত্যাগ করে যেতে হবে। সিঁড়ি কিছু ছাদ নয়। কিন্তু ছাদের উপর পৌঁছে দেখা যায় যে, যে জিনিসে ছাদ তৈয়ারী, ইট, চুন, সুড়কি — সেই জিনিসেই সিঁড়িও তৈয়ারী। যিনি পরব্রহ্ম তিনিই এই জীবজগৎ হয়েছেন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। যিনি আত্মা, তিনিই পঞ্চভূত হয়েছেন। মাটি এত শক্ত কেন, যদি আত্মা থেকেই হয়েছে। তাঁর ইচ্ছাতে সব হতে পারে। শোণিত শুক্র থেকে যে হাড় মাংস হচ্ছে! সমুদ্রের ফেণা কত শক্ত হয়!"

[গৃহস্থের কি বিজ্ঞান হতে পারে — সাধন চাই]

“বিজ্ঞান হলে সংসারে থাকা যায়। তখন বেশ অনুভব হয় যে, তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন, তিনি সংসার ছাড়া নন। রামচন্দ্র যখন জ্ঞানলাভের পর ‘সংসারে থাকব না’ বললেন, দশরথ বশিষ্ঠকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন, বুঝাবার জন্য। বশিষ্ঠ বললেন, ‘রাম! যদি সংসার ঈশ্বর ছাড়া হয়, তুমি ত্যাগ করতে পারো।’ রামচন্দ্র চুপ করে রইলেন। তিনি বেশ জানেন যে ঈশ্বর ছাড়া কিছুই নাই। তাঁর আর সংসার ত্যাগ করা হল না। (প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) কথাটা এই, দিব্য চক্ষু চাই। মন শুদ্ধ হলেই সেই চক্ষু হয়। দেখ না কুমারীপূজা। হাগা-মোতা মেয়ে, তাকে ঠিক দেখলুম সাক্ষাৎ ভগবতী। একদিকে স্ত্রী, একদিকে ছেলে, দুজনকেই আদর কচ্ছে, কিন্তু ভিন্ন ভাবে। তবেই হলো, মন নিয়ে কথা। শুদ্ধমনেতে এক ভাব হয়। সেই মনটি পেলে সংসারে ঈশ্বরদর্শন হয়; তবেই সাধন চাই।

“সাধন চাই। ... এইটি জানা যে, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সহজেই আসক্তি হয়। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃই পুরুষকে ভালবাসে। পুরুষ স্বভাবতঃই স্ত্রীলোক ভালবাসে — তাই দুজনেই শিগগির পড়ে যায়।

“কিন্তু সংসারে তেমনি খুব সুবিধা। বিশেষ দরকার হলে, হলো স্বদারা সহবাস করলে। (সহাস্য) মাস্টার হাসচো কেন?”

মাস্টার (স্বগত) — সংসারী লোক একেবারে সমস্ত ত্যাগ পেরে উঠবে না বলে ঠাকুর এই পর্যন্ত অনুমতি দিচ্ছেন। ষোল আনা ব্রহ্মচর্য সংসারে থেকে কি একেবারে অসম্ভব?

(হঠযোগীর প্রবেশ)

পঞ্চবটীতে একটি হঠযোগী কয়দিন ধরিয়া আছেন। তিনি কেবল দুধ খান, আফিম খান, আর হঠযোগ করেন, ভাত-টাত খান না। আফিমের ও দুধের পয়সার অভাব। ঠাকুর যখন পঞ্চবটীর কাছে গিয়াছিলেন, হঠযোগীর সহিত আলাপ করিয়া আসিয়াছিলেন। হঠযোগী রাখালকে বলিলেন, "পরমহংসজীকে বলে যেন আমার কিছু ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।" ঠাকুর বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "কলকাতার বাবুরা এলে বলে দেখব।"

হঠযোগী (ঠাকুরের প্রতি) — আপ্ রাখালসে কেয়া বোলাথা?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হ্যাঁ বলেছিলাম, দেখব যদি কোন বাবু কিছু দেয়। তা কই (প্রাণকৃষ্ণাদির প্রতি) তোমরা বুঝি এদের like কর না?

প্রাণকৃষ্ণ চুপ করিয়া রহিলেন।

(হঠযোগীর প্রস্থান)

ঠাকুরের কথা চলিতে লাগিল।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৫ই এপ্রিল 1884/04/05/ii

20.22 শ্রীরামকৃষ্ণ ও সত্যকথা — নরলীলায় বিশ্বাস করো

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণাদি ভক্তের প্রতি) — আর সংসারে থাকতে গেলে সত্য কথার খুব আঁট চাই। সত্যতেই ভগবানকে লাভ করা যায়। আমার সত্য কথার আঁট এখন তবু একটু কমছে, আগে ভারী আঁট ছিল। যদি বলতুম 'নাইব', গঙ্গায় নামা হল, মন্ত্রোচ্চারণ হল, মাথায় একটু জলও দিলুম, তবু সন্দেহ হল, বুঝি পুরো নাওয়া হল না! অমুক জায়গাতে হাগতে যাব, তা সেইখানেই যেতে হবে। রামের বাড়ি গেলুম কলকাতায়। বলে ফেলেছি, লুচি খাব না। যখন খেতে দিলে, তখন আবার খিদে পেয়েছে। কিন্তু লুচি খাব না বলেছি, তখন মেঠাই দিয়ে পেট ভরাই। (সকলের হাস্য)

"এখন তবু একটু আঁট কমেছে। বাহ্যে পায় নি, যাব বলে ফেলেছি, কি হবে? রামকে১ জিজ্ঞাসা কল্লুম। সে বললে, গিয়ে কাজ নাই। তখন বিচার কল্লুম; সব তো নারায়ণ। রামও নারায়ণ। ওর কথাটাই বা না শুনি কেন? হাতি নারায়ণ বটে, কিন্তু মাহুতও নারায়ণ। মাহুত যে কালে বলছে, হাতির কাছে এসো না, সেকালে মাহুতের কথা না শুনি কেন? এই রকম বিচার করে আগেকার চেয়ে একটু আঁট কমেছে।"

[পূর্বকথা — বৈষ্ণবচরণের উপদেশ — নরলীলায় বিশ্বাস করো]

"এখন দেখছি, এখন আবার একটা অবস্থা বদলাচ্ছে। অনেকদিন হল, বৈষ্ণবচরণ বলেছিল, মানুষের ভিতর যখন ঈশ্বরদর্শন হবে, তখন পূর্ণজ্ঞান হবে। এখন দেখছি, তিনিই এক-একরূপে বেড়াচ্ছেন। কখন সাধুরূপে, কখন ছলরূপে

— কোথাও বা খলরূপে। তাই বলি, সাধুরূপ নারায়ণ, ছলরূপ নারায়ণ, খলরূপ নারায়ণ, লুচ্চরূপ নারায়ণ।

“এখন ভাবনা হয়, সব্বাইকে খাওয়ানো কেমন করে হয়। সব্বাইকে খাওয়াতে ইচ্ছা করে। তাই একজনকে এখানে রেখে খাওয়াই।”

প্রাণকৃষ্ণ (মাস্টার দৃষ্টে, সহাস্যে) — আচ্ছা লোক! (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) মহাশয়, নৌকা থেকে নেমে তবে ছাড়লেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) — কি হয়েছিল?

প্রাণকৃষ্ণ — নৌকায় উঠেছিলেন। একটু ঢেউ দেখে বলেন, নামিয়া দাও — (মাস্টারের প্রতি) কিসে করে এলেন?

মাস্টার (সহাস্যে) — হেঁটে।

(ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন)

[সংসারী লোকের বিষয়কর্মত্যাগ কঠিন — পণ্ডিত ও বিবেক]

প্রাণকৃষ্ণ (ঠাকুরের প্রতি) — মহাশয়! এইবার মনে করছি কর্ম ছেড়ে দিব। কর্ম করতে গেলে আর কিছু হয় না। (সঙ্গী বাবুকে দেখাইয়া) এঁকে কাজ শেখাচ্ছি, আমি ছেড়ে দিলে ইনি কাজ করবেন। আর পারা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, বড় ঝঞ্ঝাট। এখন দিন কতক নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা করে খুব ভাল। কিন্তু তুমি বলছো বটে ছাড়বে। কাপ্তেনও ওই কথা বলেছিল। সংসারী লোকেরা বলে, কিন্তু পেরে ওঠে না।

"অনেক পণ্ডিত আছে, কত জ্ঞানের কথা বলে। মুখেই বলে, কাজে কিছুই নয়। যেমন শকুনি খুব উঁচুতে উঠে; কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর; অর্থাৎ সেই কামিনী-কাঞ্চনের উপর — সংসারের উপর আসক্তি। যদি শুনি, পণ্ডিতের বিবেক-বৈরাগ্য আছে, তবে ভয় হয়; তা না হলে কুকুর-ছাগলজ্ঞান হয়।"

প্রাণকৃষ্ণ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন ও মাস্টারকে বলিলেন, আপনি যাবেন? মাস্টার বলিলেন, না, আপনারা আসুন। প্রাণকৃষ্ণ হাসিতেছেন ও বলিলেন, তুমি আর যাও! (সকলের হাস্য)

মাস্টার পঞ্চবটীর কাছে একটু বেড়াইয়া ঠাকুর যে ঘাটে স্নান করিতেন, সেই ঘাটে স্নান করিলেন। তৎপরে ৺ভবতারিণী ও ৺রাধাকান্ত দর্শন ও প্রণাম করিলেন। ভাবিতেছেন, শুনিয়াছিলাম ঈশ্বর নিরাকার তবে এই প্রতিমার সম্মুখে কেন প্রণাম? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাকার দেবদেবী মানেন, এই জন্য? আমি তো ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু জানি না, বুঝি না। ঠাকুর যেকালে মানেন আমি কোন্ ছার, মানিতেই হইবে।

মাস্টার ৺ভবতারিণীকে দর্শন করিতেছেন। দেখিলেন — বামহস্তদ্বয়ে নরমুণ্ড ও অসি, দক্ষিণহস্তদ্বয়ে বরাভয়। একদিকে ভয়ঙ্করা আর-একদিকে মা ভক্তবৎসলা। দুইটি ভাবের সমাবেশ। ভক্তের কাছে, তাঁর দীনহীন জীবের কাছে, মা দয়াময়ী!

স্নেহময়ী! আবার এও সত্য, মা ভয়ঙ্করী কালকামিনী! একাধারে কেন দুই ভাব, মা-ই জানেন।

ঠাকুরের এই ব্যাখ্যা, মাস্টার সমরণ করিতেছেন। আর ভাবিতেছেন, শুনেছি কেশব সেন ঠাকুরের কাছে কালী মানিয়াছেন। এই কি “মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী” কেশব এই কথা বলিতেন।

[সমাধিস্থ পুরুষের (শ্রীরামকৃষ্ণের) ঘটি-বাটির খপর]

এইবার তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিয়া বসিলেন। স্নান করিয়াছেন দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে ফলমূলাদি প্রসাদ খাইতে দিলেন। তিনি গোল বারান্দায় বসিয়া প্রসাদ পাইলেন। পান করিবার জলের ঘটি বারান্দাতে রহিল। ঠাকুরের কাছে তাড়াতাড়ি আসিয়া ঘরের মধ্যে বসিতে যাইতেছেন, ঠাকুর বলিলেন, “ঘটি আনলে না?”

মাস্টার — আজ্ঞা হাঁ, আনছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বাহ্!

মাস্টার অপ্রস্তুত। বারান্দায় গিয়া ঘটি ঘরের মধ্যে রাখিলেন।

মাস্টারের বাড়ি কলিকাতায়। তিনি গৃহে অশান্তি হওয়াতে শ্যামপুকুরে বাড়ি ভাড়া করিয়া আছেন। সেই বাড়ির কাছেই কর্মস্থল। তাঁহার ভদ্রাসন বাটীতে তাঁহার পিতা ও ভাইয়েরা থাকিতেন। ঠাকুরের ইচ্ছা যে, তিনি নিজ বাটীতে গিয়া থাকেন, কেননা, একান্নভুক্ত পরিবার মধ্যে ঈশ্বরচিন্তা করিবার অনেক সুবিধা।

কিন্তু ঠাকুর মাঝে মাঝে যদিও ওইরূপ বলিতেন, তাঁহার দুর্দৈবক্রমে তিনি বাটীতে ফিরিয়া যান নাই। আজ ঠাকুর সেই বাড়ির কথা আবার তুলিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেমন, এইবার তুমি বাড়ি যাবে?

মাস্টার — আমার সেখানে ঢুকতে কোন মতে মন উঠে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেন? তোমার বাপ বাড়ি ভেঙেচুরে নূতন করছে।

মাস্টার — বাড়িতে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি। আমার যেতে কোন মতে মন হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কাকে তোমার ভয়?

মাস্টার — সব্বাইকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গম্ভীরস্বরে) — সে তোমার যেমন নৌকাতে উঠতে ভয়!

ঠাকুরদের ভোগ হইয়া গেল। আরতি হইতেছে ও কাঁসর ঘন্টা বাজিতেছে। কালীবাড়ি আনন্দে পরিপূর্ণ। আরতির শব্দ শুনিয়া কাঙাল, সাধু, ফকির সকলে অতিথিশালায় ছুটিয়া আসিতেছেন। কারু হাতে শালপাতা, কারু হাতে বা তৈজসপত্র — থালা, ঘটি। সকলে প্রসাদ পাইলেন। আজ মাস্টারও ভবতারিণীর প্রসাদ পাইলেন।

১ রাম চাটুজ্জে ঠাকুরবাড়ির শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সেবক।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৫ই এপ্রিল 1884/04/05/iii

20.23 শ্রীকেশবচন্দ্র সেন ও নববিধান — নববিধানে সার আছে

ঠাকুর প্রসাদ গ্রহান্তর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছেন। এমন সময় রাম, গিরীন্দ্র ও আর কয়েকটি ভক্ত আসিয়া উপস্থিত। ভক্তেরা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ও তৎপরে আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের নববিধানের কথা পড়িল।

রাম (ঠাকুরের প্রতি) — মহাশয়, আমার তো নববিধানে কিছু উপকার হয়েছে বলে বোধ হয় না। কেশববাবু যদি খাঁটি হতেন, শিষ্যদের অবস্থা এরূপ কেন? আমার মতে, ওর ভিতেরে কিছুই নাই। যেমন খোলামকুচি নেড়ে, ঘরে তালা দেওয়া। লোক মনে কচ্ছে খুব টাকা ঝমঝম কচ্ছে, কিন্তু ভিতরে কেবল খোলামকুচি। বাহিরের লোক ভিতরের খবর কিছু জানে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিছু সার আছে বই কি। তা না হলে এত লোকে কেশবকে মানে কেন? শিবনাথকে কেন লোকে চেনে না? ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকলে এরকম একটা হয় না।

“তবে সংসার ত্যাগ না করলে আচার্যের কাজ হয় না, লোকে মানে না। লোকে বলে, এ সংসারী লোক, এ নিজে কামিনী-কাঞ্চন লুকিয়ে ভোগ করে; আমাদের বলে, ঈশ্বর সত্য, সংসার স্বপ্নবৎ অনিত্য! সর্বত্যাগী না হলে তার কথা সকলে লয় না। ঐহিক যারা কেউ কেউ নিতে পারে। কেশবের সংসার ছিল, কাজে কাজেই সংসারের উপর মনও ছিল। সংসারটিকে তো রক্ষা করতে হবে। তাই অত লেকচার দিয়েছে; কিন্তু সংসারটি বেশ পাকা করে রেখে গেছে। অমন জামাই! বাড়ির ভিতরে গেলুম, বড় বড় খাট। সংসার করতে গেলে ক্রমে সব এসে জোটে। ভোগের জায়গাই সংসার।”

রাম — ও খাট, বাড়ি বখরার সময় কেশব সেন পেয়েছিলেন; কেশব সেনের বখরা। মহাশয়, যাই বলুন, বিজয়বাবু বলেছেন, কেশব সেন এমন কথা বিজয়বাবুকে বলেছেন যে, আমি খ্রাইষ্ট আর গৌরাঙ্গের অংশ, তুমি বল যে তুমি অদ্বৈত। আবার কি বলে জানেন? আপনিও নববিধানী! (ঠাকুরের ও সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) — কে জানে বাপু, আমি কিন্তু নববিধান মানে জানি না। (সকলের হাস্য)

রাম — কেশবের শিষ্যেরা বলে, জ্ঞান আর ভক্তির প্রথম সামঞ্জস্য কেশববাবু করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অবাক্ হইয়া) — সে কি গো! অধ্যাত্ম (রামায়ণ) তবে কি? নারদ রামচন্দ্রকে স্তব করতে লাগলেন, “হে রাম! বেদে যে পরব্রহ্মের কথা আছে, সে

তুমিই। তুমিই মানুষরূপে আমাদের কাছে রয়েছো; তুমিই মানুষ বলে বোধ হচ্ছ বস্তুত তুমি মানুষ নই, সেই পরব্রহ্ম।” রামচন্দ্র বললেন, “নারদ! তোমার উপর বড় প্রসন্ন হয়েছি, তুমি বর নাও।” নারদ বললেন, “রাম! আর কি বর চাহিব? তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও। আর তোমার ভুবনমোহিনী মায়ার যেন মুগ্ধ করো না।” অধ্যাত্মে কেবল জ্ঞান-ভক্তিরই কথা।

কেশবের শিষ্য অমৃতের কথা পড়িল।

রাম —— অমৃতবাবু একরকম হয়ে গেছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ —— হাঁ, সেদিন বড় রোগা দেখলুম।

রাম —— মহাশয়! লেকচারের কথা শুনুন। যখন খোলের শব্দ হয়, সেই সময় বলে ‘কেশবের জয়।’ আপনি বলেন কিনা যে, গেড়ে ডোবায় দল হয়। তাই একদিন লেকচারে অমৃতবাবু বললেন, সাধু বলেছেন বটে, গেড়ে ডোবায় দল বাঁধে; কিন্তু ভাই, দল চাই, দল চাই। সত্য বলছি, সত্য বলছি দল চাই! (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ —— এ কি! ছ্যা! ছ্যা! ছ্যা! এ কি লেকচার!

কেহ কেহ একটু প্রশংসা ভালবাসেন, এই কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— নিমাইসন্ন্যাসের যাত্রা হচ্ছিল, কেশবের ওখানে আমায় নিয়ে গিছিল। সেই দিন দেখেছিলাম কেশব আর প্রতাপকে একজন কে বললে, এঁরা দুজনে গৌর নিতাই। প্রসন্ন তখন আমায় জিজ্ঞাসা করলে, তাহলে আপনি কি?

দেখলাম কেশব চেয়ে রহিল; আমি কি বলি দেখবার জন্য। আমি বললুম, “আমি তোমাদের দাসানুদাস, রেণুর রেণু।” কেশব হেসে বললে, “ইনি ধরা দেন না।”

রাম — কেশব কখনও বলতেন, আপনি জন্ দি ব্যাপটিস্ট।

একজন ভক্ত — আবার কিন্তু কখন কখন বলতেন Nineteenth Century-র (ঊনবিংশ শতাব্দীর) চৈতন্য আপনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ওর মানে কি?

ভক্ত — ইংরেজী এই শত্যব্দীতে চৈতন্যদেব আবার এসেছেন; সে আপনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অন্যমনস্ক হয়ে) — তাতো হল। এখন হাতটা১ আরাম কেমন করে হয় বল দেখি? এখন কেবল ভাবছি, কেমন করে হাতটি সারবে!

ত্রৈলোক্যের গানের কথা পড়িল। ত্রৈলোক্য কেশবের সমাজে ঈশ্বরের নামগুনকীর্তন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আহা! ত্রৈলোক্যের কি গান!

রাম — কি, ঠিক ঠিক সব?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, ঠিক ঠিক; তা না হলে মনে এত টানে কেন?

রাম —— সব আপনার ভাব নিয়ে গান বেঁধেছেন। কেশব সেন উপাসনার সময় সেই ভাবগুলি সব বর্ণনা করতেন, আর ত্রৈলোক্যবাবু সেইরূপ গান বাঁধতেন। এই দেখুন না, ওই গানটা ——

“প্রেমের বাজারে আনন্দের মালা।
হরিভক্তসঙ্গে রসরঙ্গে করিছেন কত খেলা ।।

“আপনি ভক্তসঙ্গে আনন্দ করেন, দেখে নিয়ে ওই সব গান বাঁধা।”

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তুমি আর জ্বালিও না * * আবার আমায় জড়াও কেন? (সকলের হাস্য)

গিরীন্দ্র —— ব্রাহ্মরা বলেন, পরমহংসদেবের faculty of organisation নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— এর মানে কি?

মাস্টার —— আপনি দল চালাতে জানেন না। আপনার বুদ্ধি কম, এই কথা বলে। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি) — এখন বল দেখি, আমার হাত কেন ভাঙল? তুমি এই নিয়ে দাঁড়িয়ে একটা লেকচার দাও। (সকলের হাস্য)

[ব্রাহ্মসমাজ ও বৈষ্ণব ও শাক্তকে সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে উপদেশ]

“ব্রহ্মজ্ঞানীরা নিরাকার নিরাকার বলছে, তা হলেই বা; আন্তরিক তাঁকে ডাকলেই হল। যদি আন্তরিক হয়, তিনি তো অন্তর্যামী, তিনি অবশ্য জানিয়ে দেবেন, তাঁর স্বরূপ কি।

“তবে এটা ভাল না — এই বলা যে আমরা যা বুঝেছি তাই ঠিক, আর যে যা বলছে সব ভুল। আমরা নিরাকার বলছি, অতএব তিনি নিরাকার, তিনি সাকার নন। আমরা সাকার বলছি, অতএব তিনি সাকার, তিনি নিরাকার নন। মানুষ কি তাঁর ইতি করতে পারে?

“এইরকম বৈষ্ণব শাক্তদের ভিতর রেষারেষি। বৈষ্ণব বলে, আমার কেশব, — শাক্ত বলে, আমার ভগবতী, একমাত্র উদ্ধারকর্তা।

“আমি বৈষ্ণবচরণকে সেজোবাবুর কাছে নিয়ে গিছলাম। বৈষ্ণবচরণ বৈরাগী খুব পণ্ডিত কিন্তু গোঁড়া বৈষ্ণব। এদিকে সেজোবাবু ভগবতীর ভক্ত। বেশ কথা হচ্ছিল, বৈষ্ণবচরণ বলে ফেললে, মুক্তি দেবার একমাত্র কর্তা কেশব। বলতেই সেজোবাবুর মুখ লাল হয়ে গেল। বলেছিল, ‘শালা আমার!’ (সকলের হাস্য) শাক্ত কিনা। বলবে না? আমি আবার বৈষ্ণবচরণের গা টিপি।

“যত লোক দেখি, ধর্ম ধর্ম করে — এ ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে, ও ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব — সব পরস্পর ঝগড়া। এ বুদ্ধি নাই যে, যাঁকে কৃষ্ণ বলছো, তাঁকেই শিব, তাঁকেই আদ্যাশক্তি বলা হয়; তাঁকেই যীশু, তাঁহাকেই আল্লা বলা হয়। এক রাম তাঁর হাজার নাম।

“বস্তু এক, নাম আলাদা। সকলেই এক জিনিসকে চাচ্ছে। তবে আলাদা জায়গা, আলাদা পাত্র, আলাদা নাম। একটা পুকুরে অনেকগুলি ঘাট আছে; হিন্দুরা একঘাট থেকে জল নিচ্ছে, কলসী করে — বলছে ‘জল’। মুসলমানরা আর একঘাটে জল নিচ্ছে, চামড়ার ডোলে করে — তারা বলছে ‘পানী।’ খ্রীষ্টানরা আর-একঘাটে জল নিচ্ছে — তারা বলছে ‘ওয়াটার।’ (সকলের হাস্য)

“যদি কেউ বলে, না এ জিনিসটা জল নয়, পানী; কি পানী নয়, ওয়াটার; কি ওয়াটার নয়, জল; তাহলে হাসির কথা হয়। তাই দলাদলি, মনান্তর, ঝগড়া, ধর্ম নিয়ে লাটালাটি, মারামারি, কাটাকাটি — এ-সব ভাল নয়। সকলেই তাঁর পথে যাচ্ছে, আন্তরিক হলেই ব্যাকুল হলেই তাঁকে লাভ করবে।

(মণির প্রতি) — “তুমি এইটে শুনে যাও —

“বেদ, পুরাণ, তন্ত্র — সব শাস্ত্রে তাঁকেই চায়, আর কারুকে চায় না — সেই এক সচ্চিদানন্দ। যাকে বেদে ‘সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম’ বলেছে, তন্ত্রে তাঁকেই ‘সচ্চিদানন্দ শিবঃ’ বলেছে, তাঁকেই আবার পুরাণে ‘সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণঃ’ বলেছে।”

শ্রীরামকৃষ্ণ শুনিলেন, রাম বাড়িতে মাঝে মাঝে নিজে রেঁধে খান।

শ্রীরামকৃষ্ণ — (মণির প্রতি) — তুমিও কি রেঁধে খাও?

মণি — আজ্ঞা না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখো না, একটু গাওয়া ঘি দিয়ে খাবে। বেশ শরীর মন শুদ্ধ বোধ হবে।

১ কিয়দ্দিন পূর্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙিয়া ফেলিয়াছেন। হাতে বাড় দিয়া অনেক দিন বাধিয়া রাখিতে হইয়াছিল। তখনও বাঁধা ছিল।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৫ই এপ্রিল 1884/04/05/iv

20.24 পিতা ধর্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমন্তপঃ

রামের ঘরকন্নার অনেক কথা হইতেছে। রামের বাবা পরম বৈষ্ণব। বাড়িতে শ্রীধরের সেবা। রামের বাবা দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছিলেন —— রামের তখন খুব অল্প বয়স। পিতা ও বিমাতা রামের বাড়িতেই ছিলেন; কিন্তু বিমাতার সঙ্গে ঘর করিয়া রাম সুখী হন নাই। এক্ষণে বিমাতার বয়স চল্লিশ বৎসর। বিমাতার জন্য রাম পিতার উপরও মাঝে মাঝে অভিমান করিতেন। আজ সেই সব কথা হইতেছে।

রাম —— বাবা গোল্লায় গেছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — শুনলে? বাবা গোল্লায় গেছেন! আর উনি ভাল আছেন।

রাম — তিনি (বিমাতা) বাড়িতে এলেই অশান্তি! একটা না একটা গণ্ডগোল হবেই। আমাদের সংসার ভেঙে যায়। তাই আমি বলি, তিনি বাপের বাড়ি গিয়ে থাকুন না কেন?

গিরীন্দ্র (রামের প্রতি) — তোমার স্ত্রীকেও ওইরকম বাপের বাড়িতে রাখ না! (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — একি হাঁড়ি কলসী গা? হাঁড়ি এক জায়গায় রহিল, সরা এক জায়গায় রহিল? শিব একদিকে, শক্তি একদিকে!

রাম! — মহাশয়! আমরা আনন্দে আছি, উনি এলে সংসার ভাঙবে, এরূপ স্থলে —

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, তবে আলাদা বাড়ি করে দিতে পার, সে এক। মাসে মাসে সব খরচ দেবে। বাপ-মা কত বড় গুরু! রাখাল আমায় জিজ্ঞাসা করে যে, বাবার পাতে কি খাব? আমি বলি, সে কি রে? তোর কি হয়েছে যে, তোর বাবার পাতে খাবি না?

“তবে একটা কথা আছে, যারা সৎ, তারা উচ্ছিষ্ট কাহাকেও দেয় না। এমন কি উচ্ছিষ্ট কুকুরকেও দেওয়া যায় না।”

[গুরুকে ইষ্টবোধে পূজা — অসচ্চরিত্র হলেও গুরুত্যাগ নিষেধ]

গিরীন্দ্র — মহাশয়! বাপ-মা যদি কোন গুরুতর অপরাধ করে থাকেন, কোন ভয়ানক পাপ করে থাকেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা হোক। মা দ্বিচারিণী হলেও ত্যাগ করবে না। অমুক বাবুদের গুরুপত্নীর চরিত্র নষ্ট হওয়াতে তারা বললে যে ওঁর ছেলেকে গুরু করা যাক। আমি বললুম, সে কি গো! ওলকে ছেড়ে ওলের মুখী নেবে? নষ্ট হল তো কি? তুমি তাঁকে ইষ্ট বলে জেনো। 'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ি যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।'

[চৈতন্যদেব ও মা — মানুষের ঋণ — Duties]

"মা-বাপ কি কমন জিনিস গা? তাঁরা প্রসন্ন না হলে ধর্মটর্ম কিছুই হয় না। চৈতন্যদেব তো প্রেমে উন্মত্ত; তবু সন্ন্যাসের আগে কতদিন ধরে মাকে বোঝান। বললেন, 'মা! আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখা দিব।'

(মাস্টারের প্রতি তিরস্কার করিতে করিতে) "আর তোমায় বলি, বাপ-মা মানুষ করলে, এখন কত ছেলেপুলেও হল, মাগ নিয়ে বেরিয়ে আসা! বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে ছেলে মাগ নিয়ে, বাউল বৈষ্ণবী সেজে বেরয়। তোমার বাপের অভাব নাই বলে; তা না হলে আমি বলতুম ধিক্! (সভাসুদ্ধ সকলেই স্তব্ধ)

"কতকগুলি ঋণ আছে। দেবঋণ, ঋষিঋণ, আবার মাতৃঋণ, পিতৃঋণ, স্ত্রীঋণ। মা-বাপের ঋণ পরিশোধ না করলে কোন কাজই হয় না।

"স্ত্রীর কাছেও ঋণ আছে। হরিশ স্ত্রীকে ত্যাগ করে এখানে এসে রয়েছে। যদি তার স্ত্রীর খাবার জোগাড় না থাকত, তাহলে বলতুম ঢ্যামনা শ্যালা!

“জ্ঞানের পর ওই স্ত্রীকে দেখবে সাক্ষাৎ ভগবতী। চন্ডীতে আছে ‘যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা!’ তিনিই মা হয়েছেন।

“যত স্ত্রী দেখ, সব তিনিই। আমি তাই বৃন্দেকে১ কিছু বলতে পারি না। কেউ কেউ শোলক ঝাড়ে, লম্বা লম্বা কথা কয়, কিন্তু ব্যবহার আর একরকম। রামপ্রসন্ন২ ওই হঠযোগীর কিসে আফিম আর দুধের যোগাড় হয়, এই করে করে বেড়াচ্ছে। আবার বলে, মনুতে সাধুসেবার কথা আছে। এদিকে বুড়ো মা খেতে পায় না, নিজে হাট বাজার করতে যায়। এমনি রাগ হয়।”

[সকল ঋণ হইতে কে মুক্ত? সন্ন্যাসী ও কর্তব্য]

তবে একটি কথা আছে। যদি প্রেমোন্মাদ হয় তাহলে কে বা বাপ, কে বা মা, কে বা স্ত্রী। ঈশ্বরকে এত ভালবাসা যে পাগলের মতো হয়ে গেছে! তার কিছুই কর্তব্য নাই, সব ঋণ থেকে মুক্ত। প্রেমোন্মাদ কিরকম? সে অবস্থা হলে জগৎ ভুল হয়ে যায়! নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, তাও ভুল হয়ে যায়। চৈতন্যদেবের হয়েছিল। সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, সাগর বলে বোধ নাই। মাটিতে বারবার আছাড় খেয়ে পড়ছেন — ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, নিদ্রা নাই; শরীর বলে বোধই নাই।”

[শ্রীযুক্ত বুড়ো গোপালের৩ তীর্থযাত্রা — ঠাকুর বিদ্যমান, তীর্থ কেন? অধরের নিমন্ত্রণ — রামের অভিমান — ঠাকুর মধ্যস্থ]

ঠাকুর “হা চৈতন্য!” বলিয়া উঠিলেন। (ভক্তদের প্রতি) চৈতন্য কিনা অখণ্ড চৈতন্য। বৈষ্ণবচরণ বলত, গৌরাঙ্গ এই অখণ্ড চৈতন্যের একটি ফুট।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমার কি এখন ইচ্ছা তীর্থে যাওয়া?

বুড়ো গোপাল — আজ্ঞে হাঁ। একটু ঘুরে-ঘারে আসি।

রাম (বুড়ো গোপালের প্রতি) — ইনি বলেন, বহূদকের পর কুটীচক। যে সাধু অনেক তীর্থ ভ্রমণ করেন, তাঁর নাম বহূদক। যার ভ্রমণ করার সাধ মিটে গেছে, আর এক জায়গায় স্থির হয়ে আসন করে যিনি বসেন, তাঁকে বলে কুটীচক!

“আর একটি কথা ইনি বলেন। একটা পাখি জাহাজের মাস্তুলের উপর বসেছিল। জাহাজ গঙ্গা থেকে কখন কালাপানিতে পড়েছে তার হুঁশ নাই। যখন হুঁশ হল তখন ডাঙা কোন্ দিকে জানবার জন্য উত্তরদিকে উড়ে গেল। কোথাও কূল-কিনারা নাই, তখন ফিরে এল। আবার একট বিশ্রাম করে দক্ষিণদিকে গেল। সে দিকেও কূল-কিনারা নাই। তখন হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল। আবার একটু জিরিয়ে এইরূপে পূর্বদিকে ও পশ্চিমদিকে গেল। যখন দেখলে কোন দিকেই কূল-কিনারা নাই, তখন মাস্তুলের উপর চুপ করে বসে রইল।”

শ্রীরামকৃষ্ণ (বুড়োগোপাল ও ভক্তদের প্রতি) — যতক্ষণ বোধ যে ঈশ্বর সেথা সেথা, ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন হেথা হেথা, তখনই জ্ঞান।

”একজন তামাক খাবে, তো প্রতিবেশীর বাড়ি টিকে ধরাতে গেছে। রাত অনেক হয়েছে। তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে ঠেলাঠেলি করবার পর, একজন দোর খুলতে নেমে এল। লোকটির সঙ্গে দেখা হলে সে জিজ্ঞাসা করলে, কিগো, কি মনে করে? সে বললে, আর কি মনে করে, তামাকের নেশা আছে, জান তো;

টিকে ধরাব মনে করে। তখন সেই লোকটি বললে, বাঃ তুমি তো বেশ লোক! এত কষ্ট করে আসা, আর দোর ঠেলাঠেলি। তোমার হাতে যে লণ্ঠ রয়েছে! (সকলের হাস্য)

“যা চায়, তাই কাছে। অথচ লোকে নানাস্থানে ঘুরে।”

ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিতেছেন, তিনি বিদ্যমান, তীর্থ কেন?

রাম — মহাশয়! এখন এর মানে বুঝেছি, গুরু কেন কোনও কোনও শিষ্যকে বলেন চারধাম করে এসো। যখন একবার ঘুরে দেখে যে, এখানেও যেমন সেখানেও তেমন তখন আবার গুরুর কাছে ফিরে আসে। এ-সব কেবল গুরুবাক্যে বিশ্বাস হবার জন্য।

কথা একটু থামিলে পর ঠাকুর রামের গুণ গাহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — আহা, রামের কত গুণ! কথ ভক্তদের সেবা, আর প্রতিপালন। (রামের প্রতি) অধর বলছিল, তুমি নাকি তার খুব খাতির করেছ!

অধরের শোভাবাজারে বাড়ি। ঠাকুরের পরমভক্ত। তাঁর বাড়িতে চন্ডীর গান হইয়াছিল। ঠাকুর ও ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। অধরের কিন্তু রামকে নিমন্ত্রণ করিতে ভুল হইয়াছিল। রাম বড় অভিমানী — তিনি লোকের কাছে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই অধর রামের বাড়িতে গিয়াছিলেন। তাঁর ভুল হইয়াছিল, এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে গিয়াছিলেন।

রাম — সে অধরের দোষ নয়, আমি জানতে পেরেছি, সে রাখালের দোষ। রাখালের উপর ভার ছিল —

শ্রীরামকৃষ্ণ — রাখালের দোষ ধরতে নাই; গলা টিপলে দুধ বেরোয়!

রাম — মহাশয়! বলেন কি, চন্ডীর গান হল —,

শ্রীরামকৃষ্ণ — অধর তা জানত না। ওই দেখ না, সেদিন যদু মল্লিকের বাড়ি আমার সঙ্গে গিছিল। আমি চলে আসবার সময় জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি সিংহবাহিনীর কাছে প্রণামী দিলে না? তা বললে, মহাশয়! আমি জানতাম না যে, প্রণামী দিতে হয়।

"তা যদি না বলেই তাকে, হরিনামে দোষ কি? যেখানে হরিনাম, সেখানে না বললেও যাওয়া যায়। নিমন্ত্রণ দরকার নাই।"

১ বৃন্দে ঝি, ঠাকুরের পরিচারিকা। ১২ই আষাঢ়, ১২৮৪ সাল (সোমবার, স্নানপূর্ণিমা), ইং ২৫শে জুন, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কর্মে নিযুক্ত হয়।

২ রামপ্রসন্ন এঁড়েদার ভক্ত ৺কৃষ্ণকিশোরের পুত্র।

৩ বুড়ো গোপাল — এঁর নিবাস সিঁথি। ঠাকুরের একজন সন্ন্যাসী ভক্ত। ঠাকুর "বুড়ো গোপাল" বলিয়া ডাকিতেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৪শে মে 1884/05/24/i

20.25 দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ — ফলহারিণীপূজা ও বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা

[দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ, রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), অধর, হরি (স্বামী তুরীয়ানন্দ) প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পূর্বপরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন; বেলা ১১টা হইয়াছে। রাখাল, মাস্টার প্রভৃতি ভক্তেরা সেই ঘরে উপস্থিত আছেন। গত রাত্রে ৺ফলহারিণী কালীপূজা হইয়া গিয়াছে; সেই উৎসব উপলক্ষে নাটমন্দিরে শেষ রাত্রি হইতে যাত্রা হইয়াছে — বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা। শ্রীরামকৃষ্ণ সকালে মন্দিরে মাকে দর্শন করিতে গিয়া একটু যাত্রাও শুনিয়াছেন। যাত্রাওয়ালা স্নানান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

আজ শনিবার, ১২ই জ্যৈষ্ঠ (১২৯১), ২৪শে মে, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, অমাবস্যা।

যে গৌরবর্ণ ছোকরাটি বিদ্যা সাজিয়াছিলেন তিনি সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সহিত আনন্দে অনেক ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন। ভক্তেরা আগ্রহের সহিত সমস্ত শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যা অভিনেতার প্রতি) — তোমার অভিনয়টি বেশ হয়েছে। যদি কেউ গাইতে, বাজাতে, নাচতে, কি একটা কোন বিদ্যাতে ভাল হয়, সে যদি চেষ্টা করে, শীঘ্রই ঈশ্বরলাভ করতে পারে।

[যাত্রাওয়ালাকে ও চানকের সিপাইদিগকে শিক্ষা — অভ্যাস যোগ; “মৃত্যু স্মরণ কর”]

“আর তোমারা যেমন অনেক অভ্যাস করে গাইতে, বাজাতে বা নাচতে শিখ, সেইরূপ ঈশ্বরেতে মনের যোগ অভ্যাস করতে হয়; পূজা, জপ, ধ্যান — এ-সব নিয়মিত অভ্যাস করতে হয়।১

“তোমার কি বিবাহ হয়েছে? ছেলেপুলে?”

বিদ্যা — আজ্ঞা একটি কন্যা গত; আরও একটি সন্তান হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এর মধ্যে হল, গেল! তোমার এই কম বয়স। বলে — ‘সাঁজ সকালে ভাতার ম’লো কাঁদব কত রাত’। (সকলের হাস্য)

“সংসারে সুখ তো দেখেছ! যেমন আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া। খেলে হয় অমলশূল।

“যাত্রাওয়ালার কাজ করছ তা বেশ। কিন্তু বড় যন্ত্রণা। এখন কম বয়স, তাই গোলগাল চেহারা। তারপর সব তুবড়ে যাবে। যাত্রাওয়ালারা প্রায় ওইরকমই হয়। গাল তোবড়া, পেট মোটা, হাতে তাগা। (সকলের হাস্য)

“আমি কেন বিদ্যাসুন্দর শুনলাম? দেখলাম — তাল, মান, গান বেশ। তারপর মা দেখিয়ে দিলেন যে নারায়ণই এই যাত্রাওয়ালাদের রূপ ধারণ করে যাত্রা করছেন।”

বিদ্যা — আজ্ঞা, কাম আর কামনা তফাত কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কাম যেন গাছের মূল, কামনা যেন ডালপালা।

“এই কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি ছয় রিপু একেবারে তো যাবে না; তাই ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি কামনা করতে হয়, লোভ করতে হয়, তবে ঈশ্বরে ভক্তি কামনা করতে হয়, আর তাঁকে পাবার লোভ করতে হয়। যদি মদ অর্থাৎ মত্ততা করতে হয়, অহংকার করতে হয়, তাহলে আমি ঈশ্বরের দাস, ঈশ্বরের সন্তান এই বলে মত্ততা, অহংকার করতে হয়।

“সব মন তাঁকে না দিলে তাঁকে দর্শন হয় না।”

[ভোগান্তে যোগ — ভ্রাতৃস্নেহ ও সংসার]

“কামিনী-কাঞ্চনে মনের বাজে খরচ হয়। এই দেখ না, ছেলেমেয়ে হয়েছে, যাত্রা করা হচ্ছে — এই সব নানা কাজে ঈশ্বরেতে মনের যোগ হয় না।

“ভোগ থাকলেই যোগ কমে যায়। ভোগ থাকলেই আবার জ্বালা। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে — অবধূত চিলকে চব্বিশ গুরুর মধ্যে একজন করেছিল। চিলের মুখে মাছ ছিল, তাই হাজার কাক তাকে ঘিরে ফেললে, যেদিকে চিল মাছ মুখে যায় সেই দিকে কাকগুলো পেছনে পেছনে কা কা করতে যায়। যখন চিলের মুখ থেকে মাছটা আপনি হঠাৎ পড়ে গেল তখন যত কাক মাছের দিকে গেল, চিলের দিকে আর গেল না।২

“মাছ অর্থাৎ ভোগের বস্তু। কাকগুলো ভাবনা চিন্তা। যেখানে ভোগ সেখানেই ভাবনা চিন্তা; ভোগ ত্যাগ হয়ে গেলেই শান্তি।

“আবার দেখ, অর্থ-ই আবার অনর্থ হয়। তোমরা ভাই ভাই বেশ আছ, কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে হিস্যে নিয়ে গোল হয়। কুকুররা গা চাটাচাটি করছে, পরস্পর বেশ ভাব। কিন্তু গৃহস্থ যদি ভাত দুটি ফেলে দেয় তাহলে পরস্পর কামড়াকামড়ি করবে।

“মাঝে মাঝে এখানে আসবে। (মাস্টার প্রভৃতিকে দেখাইয়া) এঁরা আসেন। রবিবার কিম্বা অন্য ছুটিতে আসেন।”

বিদ্যা — আমাদের রবিবার তিন মাস। শ্রাবণ, ভাদ্র আর পৌষ — বর্ষা আর ধান কাটার সময়। আজ্ঞা, আপনার কাছে আসব সে তো আমাদের ভাগ্য।

“দক্ষিণেশ্বরে আসবার সময় দুজনের কথা শুনেছিলাম — আপনার আর জ্ঞানার্ণবের।”

শ্রীরামকৃষ্ণ — ভাইদের সঙ্গে মিল হয়ে থাকবে। মিল থাকলেই দেখতে শুনতে সব ভাল। যাত্রাতে দেখ নাই? চারজন গান গাইতেছে কিন্তু প্রত্যেকে যদি ভিন্ন সুর ধরে, তাহলে যাত্রা ভেঙে যায়।

বিদ্যা — জালের নিচে অনেক পাখি পড়েছে, যদি একসঙ্গে চেষ্টা করে একদিকে জালটা নিয়ে যায় তাহলে অনেকটা রক্ষা হয়। কিন্তু নানাদিকে যদি নানান পাখি উড়বার চেষ্টা করে তাহলে হয় না।

“যাত্রাতেও দেখা যায় মাথায় কলসী রেখেছে অথচ নাচছে।”

শ্রীরামকৃষ্ণ — সংসার করবে, অথচ মাথার কলসী ঠিক রাখবে, অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকে মন ঠিক রাখবে।

“আমি চানকে পল্টনের সিপাইদিগকে বলেছিলাম, তোমরা সংসারের কাজ করবে, কিন্তু কালরূপ (মৃত্যুরূপ) ঢেঁকি হাতে পড়বে, এটি হুঁশ রেখো।

“ও-দেশে ছুতোরদের মেয়েরা ঢেঁকি দিয়ে চিঁড়ে কাঁড়ে। একজন পা দিয়ে ঢেঁকি টেপে, আর-একজন নেড়ে চেড়ে দেয়। সে হুঁশ রাখে যাতে ঢেঁকির মুষলটা হাতের উপর না পড়ে। এদিকে ছেলেকে মাই দেয়, আর-একহাতে ভিজে ধান খোলায় ভেজে লয়। আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা হচ্ছে, ‘তোমার কাছে এত বাকী পাওনা আছে দিয়ে যেও।’

“ঈশ্বরেতে মন রেখে তেমনি সংসারে নানা কাজ করতে পার। কিন্তু অভ্যাস চাই; আর হুঁশিয়ার হওয়া চাই; তবে দুদিকে রাখা হয়।”

[আত্মদর্শন বা ঈশ্বরদর্শনের উপায় — সাধুসঙ্গ — NOT SCIENCE]

বিদ্যা — আজ্ঞা, আত্মা যে দেহ থেকে পৃথক তার প্রমাণ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — প্রমাণ? ঈশ্বরকে দেখা যায়; তপস্যা করলে তাঁর কৃপায় ঈশ্বরদর্শন হয়। ঋষিরা আত্মার সাক্ষাৎকার করেছিলেন। সায়েন্স্‌এ ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না, তাতে কেবল এটার সঙ্গে ওটা মিশালে এই হয়; আর ওটার সঙ্গে এটা মিশালে এই হয় — এই সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসের খবর পাওয়া যায়।

“তাই এ-বুদ্ধির দ্বারা এ-সব বুঝা যায় না। সাধুসঙ্গ করতে হয়। বৈদ্যের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে নাড়ী টেপা শেখা যায়।”

বিদ্যা — আজ্ঞা, এইবার বুঝেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তপস্যা চাই, তবে বস্তুলাভ হবে। শাস্ত্রের শ্লোক মুখস্থ করলেও কিছু হবে না। “সিদ্ধি সিদ্ধি” মুখে বললে নেশা হয় না। সিদ্ধি খেতে হয়।

“ঈশ্বরদর্শনের কথা লোককে বোঝানো যায় না। পাঁচ বৎসরের বালককে স্বামী-স্ত্রীর মিলনের আনন্দের কথা বোঝানো যায় না।”

বিদ্যা (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — আজ্ঞে, আত্মদর্শন কি উপায়ে হতে পারে?

[রাখালের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের গোপালভাব]

এই সময়ে রাখাল ঘরের মধ্যে আহার করিতে বসিতেছেন। কিন্তু অনেকে ঘরে আছেন বলিয়া ইতস্তত করিতেছেন। ঠাকুর আজকাল রাখালকে গোপালের ভাবে পালন করিতেছেন; ঠিক যেমন যশোদার বাৎসল্যভাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি) — খা না রে! এরা না হয় উঠে দাঁড়াক্! (একজন ভক্তপ্রতি) রাখালের জন্য বরফ রাখো। (রাখালের প্রতি) বনহুগলি তুই আবার যাবি। রৌদ্রে যাসনি।

রাখাল আহার করিতে বসিলেন। ঠাকুর আবার বিদ্যা অভিনেতা যাত্রাওয়ালা ছোকরাটির সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যার প্রতি) — তোমরা সকলে ঠাকুরবাড়িতে প্রসাদ পেলে না কেন? এখানে খেলেই হত।

বিদ্যা —– আজ্ঞা, সবাইয়ের মত তো সমান নয়, তাই আলাদা রান্নাবাড়া হচ্ছে। সকলে অতিথিশালায় খেতে চায় না।

রাখাল খাইতে বসিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বারান্দায় বসিয়া আবার কথা কহিতেছেন।

১ অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়। [গীতা, ১২।৯]

২ সামিষং কুররং জঘ্নুর্বলিনোঽন্যে নিরামিষাঃ

তদামিষং পরিত্যজ্য স সুখং সমবিন্দত।। [শ্রীমদ্ভাগবত, ১১/৯/২]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৪শে মে 1884/05/24/ii

20.26 যাত্রাওয়ালা ও সংসারে সাধনা —– ঈশ্বরদর্শনের (আত্মদর্শনের) উপায়

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যা অভিনেতার প্রতি) — আত্মদর্শনের উপায় ব্যাকুলতা। কায়মনোবাক্যে তাঁকে পাবার চেষ্টা। যখন অনেক পিত্ত জমে তখন ন্যাবা লাগে; সকল জিনিস হলদে দেখায়। হলদে ছাড়া কোন রঙ দেখা যায় না।

“তোমাদের যাত্রাওয়ালাদের ভিতর যারা কেবল মেয়ে সাজে তাদের প্রকৃতি ভাব হয়ে যায়। মেয়েকে চিন্তা করে মেয়ের মতো হাবভাব সব হয়। সেইরূপ ঈশ্বরকে রাতদিন চিন্তা করলে তাঁরই সত্তা পেয়ে যায়।

“মনকে যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যায়। মন ধোপাঘরের কাপড়।”

বিদ্যা — তবে একবার ধোপাবাড়ি দিতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হ্যাঁ, আগে চিত্তশুদ্ধি; তারপর মনকে যদি ঈশ্বরচিন্তাতে পেলে রাখ তবে সেই রঙই হবে। আবার যদি সংসার করা, যাত্রাওয়ালার কাজ করা — এতে ফেলে রাখো, তাহলে সেই রকমই হয়ে যাবে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৪শে মে 1884/05/24/iii

20.27 হরি (তুরীয়ানন্দ) নারাণ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ একটু বিশ্রাম করিতে না করিতেই কলিকাতা হইতে হরি, নারাণ, নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আসিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "প্রেসিডেন্সী কলেজ"-এর সংস্কৃত অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। বাড়িতে বনিবনাও না হওয়াতে শ্যামপুকুরে আলাদা বাসা করিয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া আছেন। লোকটি ভারী সরল। এক্ষণে বয়স ২৯/৩০ হইবে। শেষজীবনে তিনি এলাহাবাদে বাস করিয়াছিলেন। ৫৮ বৎসর বয়সে তাঁর শরীরত্যাগ হইয়াছিল।

তিনি ধ্যানের সময় ঘন্টা-নিনাদ প্রভৃতি অনেকরকম শুনিতে ও দেখিতে পাইতেন। ভূটান, উত্তর-পশ্চিমে ও নানা স্থানে অনেক ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরকে মাঝে মাঝে দর্শন করিতে আসিতেন।

হরি (স্বামী তুরীয়ানন্দ) তখন তাঁর বাগবাজারের বাড়িতে ভাইদের সঙ্গে থাকিতেন। জেনারাল অ্যাসেমব্লি-তে প্রবেশিকা পর্যন্ত পড়িয়া আপাতত বাড়িতে ঈশ্বরচিন্তা, শাস্ত্রপাঠ ও যোগাভ্যাস করিতেন। মাঝে মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দর্শন করিতেন। ঠাকুর বাগবাজারে বলরামের বাটীতে গমন করিলে তাঁহাকে কখন কখন ডাকাইয়া পাঠাইতেন।

[বৌদ্ধধর্মের কথা — ব্রহ্ম বোধ-স্বরূপ — ঠাকুরকে তোতাপুরীর শিক্ষা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — বুদ্ধদেবের কথা অনেক শুনেছি, তিনি দশাবতারের ভিতর একজন অবতার। ব্রহ্ম অচল, অটল, নিষ্ক্রিয় বোধ স্বরূপ।

বুদ্ধি যখন এই বোধ-স্বরূপে লয় হয় তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়; তখন মানুষ বুদ্ধ হয়ে যায়।

“ন্যাংটা বলত মনের লয় বুদ্ধিতে, বুদ্ধির লয় বোধ-স্বরূপে।

“যতক্ষণ অহং থাকে ততক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান হলে, ঈশ্বরকে দর্শন হলে, তবে অহং নিজের বশে আসে; তা না হলে অহংকে বশ করা যায় না। নিজের ছায়াকে ধরা শক্ত; তবে সূর্য মাথার উপর এলে ছায়া আধহাতের মধ্যে থাকে।”

[বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিক্ষা — ঈশ্বরদর্শন — উপায় সাধুসঙ্গ]

ভক্ত — ঈশ্বরদর্শন কিরূপ?

শ্রীরামকৃষ্ণ — থিয়েটারে অভিনয় দেখ নাই? লোক সব পরস্পর কথা কচ্ছে, এমন সময় পর্দা উঠে গেল; তখন সকলের সমস্ত মনটা অভিনয়ে যায়; আর বাহ্যদৃষ্টি থাকে না — এরই নাম সমাধিস্থ হওয়া।

“আবার পর্দা পড়ে গেলে বাহিরে দৃষ্টি। মায়ারূপ যবনিকা পড়ে গেলে আবার মানুষ বহির্মুখ হয়।

(নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি) — “তুমি অনেক ভ্রমণ করেছ, সাধুদের কিছু গল্প কর।”

বন্দ্যোপাধ্যায় ভূটানে দুইজন যোগী দেখেছিলেন, তাঁহারা আধসের নিমের রস খান; এই সব গল্প করিতেছেন। আবার নর্মদাতীরে সাধুর আশ্রমে গিয়াছিলেন। সেই আশ্রমের সাধু পেন্টেলুন-পরা বাঙালী বাবুকে দেখে বলেছিলেন, “ইসকা পেটমে ছুরি হ্যায়।”

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখ, সাধুদের ছবি ঘরে রাখতে হয়; তাহলে সর্বদা ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়।

বন্দ্যোপাধ্যায় — আপনার ছবি ঘরে রেখেছি; আর পাহাড়ে সাধুর ছবি, হাতে গাঁজার কলকেতে আগুন দেওয়া হচ্চে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ; সাধুদের ছবি দেখলে উদ্দীপন হয়; শোলার আতা দেখলে যেমন সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়; যুবতী স্ত্রীলোক দেখলে লোকের যেমন ভোগের উদ্দীপন হয়।

“তাই তোমাদের বলি — সর্বদাই সাধুসঙ্গ দরকার।

(বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি) — “সংসারে জ্বালা তো দেখছ। ভোগ নিতে গেলেই জ্বালা। চিলের মুখে যতক্ষণ মাছ ছিল, ততক্ষণ ঝাঁকে ঝাঁকে কাক এসে তাকে জ্বালাতন করেছিল।

“সাধুসঙ্গে শান্তি হয়; জলে কুম্ভীর অনেকক্ষণ থাকে; এক-একবার জলে ভাসে, নিঃশ্বাস লবার জন্য। তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।”

[যাত্রাওয়ালা ও ঈশ্বর ‘কল্পতরু’ — সকাম প্রার্থনার বিপদ]

যাত্রাওয়ালা — আজ্ঞা, আপনি ভোগের কথা যে বললেন, তা ঠিক। ঈশ্বরের কাছে ভোগের কামনা করলে শেষকালে বিপদে পড়তে হয়। মনে কতরকম কামনা বাসনা উঠছে, সব কামনাতে তো মঙ্গল হয় না। ঈশ্বর কল্পতরু, তাঁর কাছে যা কামনা করে চাইবে তা এসে পড়বে। এখন মনে যদি উঠে, 'ইনি কল্পতরু, আচ্ছা দেখি বাঘ যদি আসে।' বাঘকে মনে করতে বাঘ এসে পড়ল; আর লোকটাকে খেয়ে ফেললে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, ওই বোধ, যে বাঘ আসে।

"আর কি বলব, ওইদিকে মন রেখো, ঈশ্বরকে ভুলো না — সরলভাবে তাঁকে ডাকলে তিনি দেখা দিবেন।

"আর একটি কথা, — যাত্রা শেষে কিছু হরিনাম করে উঠো। তাহলে জারা গায় এবং যারা শুনে সকলে ঈশ্বরচিন্তা করতে করতে নিজ নিজ স্থানে যাবে।"

যাত্রাওয়ালারা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও গৃহস্থাশ্রমের ভক্ত-বধূগণের প্রতি উপদেশ]

দুটি ভক্তদের পরিবারেরা আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, এই জন্য উপবাস করিয়া আছেন। দুই জা অবগুন্ঠনবতী, দুই ভায়ের বধূ। বয়স ২২/২৩-এর মধ্যে, দুই জনেই ছেলেদের মা।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— (বধূদিগের প্রতি) — দেখ তোমরা শিবপূজা করো। কি করে করতে হয় ‘নিত্যকর্ম’ বলে বই আছে, সেই বই পড়ে দেখে লবে। ঠাকুর পূজা করতে হলে ঠাকুরের কাজ অনেকক্ষণ ধরে করতে পারবে। ফুল তোলা, চন্দন ঘষা, ঠাকুরের বাসন মাজা, ঠাকুরের জলখাবার সাজানো —— এই সকল করতে হলে ওই দিকেই মন থাকবে। হীন বুদ্ধি, রাগ, হিংসা —— এ-সব চলে যাবে। দুই জায়ে যখন কথাবার্তা কইবে তখন ঠাকুরদেরই কথাবার্তা কইবে।

[Sree Ramakrishna and the value of Image Worship]

কোনরকম করে ঈশ্বরেতে মনের যোগ করা। একবারও যেন তাঁকে ভোলা না হয়; যেমন তেলের ধারা, তার ভিতর ফাঁক নাই। একটা ইটকে বা পাথরকে ঈশ্বর বলে যদি ভক্তিভাবে পূজা কর, তাতেও তাঁর কৃপায় ঈশ্বর দর্শন হতে পারে।

“আগে যা বললুম শিবপূজা —— এই সব পূজা করতে হয়; তারপর পাকা হয়ে গেলে বেশিদিন পূজা করতে হয় না। তখন সর্বদাই মনের যোগ হয়ে থাকে; সর্বদাই স্মরণ মনন থাকে।”

বড় বধূ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — আমাদের কি একটু কিছু বলে দিবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে) — আমি তো মন্ত্র দিই না। মন্ত্র দিলে শিষ্যের পাপতাপ নিতে হয়। মা আমায় বালকের অবস্থায় রেখেছেন। এখন তোমরা শিবপূজা যা বলে দিলাম তাই করো। মাঝে মাঝে আসবে —— পরে ঈশ্বরের ইচ্ছায় যা হয় হবে। স্নানযাত্রার দিন আবার আসবার চেষ্টা করবে।

“বাড়িতে হরিনাম করতে আমি যে বলেছিলাম, তা কি হচ্ছে?”

বধূ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমরা উপবাস করে এসেছ কেন? খেয়ে আসতে হয়।

“মেয়েরা আমার মার এক-একটি রূপ১ কি না; তাই তাদের কষ্ট আমি দেখতে পারি না; জগন্মাতার এক-একটি রূপ। খেয়ে আসবে, আনন্দে থাকবে।”

এই বলিয়া শ্রীযুক্ত রামলালকে বধূদের বসাইয়া জল খাওয়াইতে আদেশ করিলেন। ফলহারিণীপূজার প্রসাদ, লুচি, নানাবিধ ফল, গ্লাস ভরিয়া চিনির পানা ও মিষ্টান্নাদি তাঁহারা পাইলেন।

ঠাকুর বলিলেন, “তোমরা কিছু খেলে, এখন আমার মনটা শীতল হল; আমি মেয়েদের উপবাসী দেখতে পারি না।”

১ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু। [শ্রীদেবীমাহাত্ম্যম্‌, চণ্ডী ১১/৬]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৪শে মে 1884/05/24/iv

20.28 ভক্তসঙ্গে গুহ্যকথা — শ্রীযুক্ত কেশব সেন

শ্রীরামকৃষ্ণ শিবের সিঁড়িতে বসিয়া আছেন। বেলা অপরাহ্ন ৫টা হইয়াছে; কাছে অধর, ডাক্তার নিতাই, মাস্টার প্রভৃতি দু-একটি ভক্ত বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — দেখ, আমার স্বভাব বদলে যাচ্ছে।

এইবার কি গুহ্যকথা বলিবেন বলিয়া সিঁড়ির এক ধাপ নামিয়া ভক্তদের কাছে বসিলেন। আবার কি বলিতেছেন —

[God's highest Manifestation in Man — The Mystery of Divine Incarnation]

"ভক্ত তোমরা, তোমাদের বলতে কি; আজকাল ঈশ্বরের চিন্ময় রূপ দর্শন হয় না। এখন সাকার নররূপ এইটে বলে দিচ্ছে। আমার স্বভাব ঈশ্বরের রূপ দর্শন-স্পর্শন-আলিঙ্গন করা। এখন বলে দিচ্ছে, 'তুমি দেহধারণ করেছ, সাকার নররূপ লয়ে আনন্দ কর।'

"তিনি তো সকল ভূতেই আছেন, তবে মানুষের ভিতর বেশি প্রকাশ।

"মানুষ কি কম গা? ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে, অনন্তকে চিন্তা করতে পারে, অন্য জীবজন্তু পারে না।

"অন্য জীবজন্তুর ভিতরে; গাছপালার ভিতরে, আবার সর্বভূতে তিনি আছেন; কিন্তু মানুষে বেশি প্রকাশ।

"অগ্নিতত্ত্ব সর্বভূতে আছে, সব জিনিসে আছে; কিন্তু কাষ্ঠে বেশি প্রকাশ।

“রাম লক্ষ্মণকে বলেছিলেন, ভাই, দেখ হাতি এত বড় জানোয়ার; কিন্তু ঈশ্বরচিন্তা করতে পারে না।

“আবার অবতারে বেশি প্রকাশ। রাম লক্ষ্মণকে বলেছিলেন, ভাই, যে মানুষে দেখবে ঊর্জিতা ভক্তি; ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়, সেইখানেই আমি আছি।”

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কথা কহিতেছেন।

[Influence of Sree Ramakrishna on Sj. Keshab Chandra Sen]

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, কেশব সেন খুব আসত। এখানে এসে অনেক বদলে গেল। ইদানীং খুব লোক হয়েছিল। এখানে অনেকবার এসেছিল দলবল নিয়ে। আবার একলা একলা আসবার ইচ্ছা ছিল।

“কেশবের আগে তেমন সাধুসঙ্গ হয় নাই।

“কলুটোলার বাড়িতে দেখা হল; হৃদে সঙ্গে ছিল। কেশব সেন যে-ঘরে ছিল, সেই ঘরে আমাদের বসালে। টেবিলে কি লিখছিল, অনেকক্ষণ পরে কলম ছেড়ে কেদারা থেকে নেমে বসল; তা আমাদের নমস্কার-টমস্কার করা নাই।

“এখানে মাঝে মাঝে আসত। আমি একদিন ভাবাবস্থাতে বললাম সাধুর সম্মুখে পা তুলতে নাই। ওতে রজোগুণ বৃদ্ধি হয়। তারা এলেই আমি নমস্কার করতুম, তখন ওরা ক্রমে ভূমিষ্ঠ হয়ে নমস্কার করতে শিখলে।”

[ব্রাহ্মসমাজে হরিনাম ও মার নাম — ভক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরদর্শন]

“আর কেশবকে বললাম, ‘তোমরা হরিনাম করো, কলিতে তাঁর নামগুণকীর্তন করতে হয়। তখন ওরা খোল-করতাল নিয়ে হরিনাম ধরলে।১

“হরিনামে বিশ্বাস আমার আরও হলো কেন? এই ঠাকুরবাড়িতে সাধুরা মাঝে মাঝে আসে; একটি মুলতানের সাধু এসেছিল, গঙ্গাসাগরের লোকের জন্য অপেক্ষা করছিল। (মাস্টারকে দেখাইয়া) এদের বয়সের সাধু। সেই বলেছিল, ‘উপায় নারদীয় ভক্তি’।”

[কেশবকে উপদেশ — কামিনী-কাঞ্চন আঁষচুপড়ি — সাধুসঙ্গ ফুলের গন্ধ — মাঝে মাঝে নির্জনে সাধন]

“কেশব একদিন এসেছিল; রাত দশটা পর্যন্ত ছিল। প্রতাপ আর কেউ কেউ বললে, আজ থেকে যাব; সব বটতলায় (পঞ্চবটীতে) বসে; কেশব বললে, না কাজ আছে, যেতে হবে।

“তখন আমি হেসে বললাম, আঁষচুপড়ির গন্ধ না হলে কি ঘুম হবে না? একজন মেছুনী মালীর বাড়িতে অতিথি হয়েছিল; মাছ বিক্রি করে আসছে; চুপড়ি হাতে আছে। তাকে ফুলের ঘরে শুতে দেওয়া হল। অনেক রাত পর্যন্ত ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না; বাড়ির গিন্নী সেই অবস্থা দেখে বললে, কিগো, তুই ছটফট করছিস কেন? সে বললে, কে জানে বাবু, বুঝি এই ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না; আমার আঁষচুপড়িটা আনিয়ে দিতে পার? তা হলে বোধহয় ঘুম হতে পারে। শেষে আঁষচুপড়ি আনাতে জল ছিটে দিয়ে নাকের কাছে রেখে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমাতে লাগল।

“গল্প শুনে কেশবের দলের লোকেরা হো-হো করে হাসতে লাগল।

“কেশব সন্ধ্যার পর ঘাটে উপাসনা করলে। উপাসনার পর আমি কেশবকে বললুম, দেখ, ভগবানই একরূপে ভাগবত হয়েছেন, তাই বেদ, পুরাণ, তন্ত্র — এ-সব পূজা করতে হয়। আবার একরূপে তিনি ভক্ত হয়েছেন, ভক্তের হৃদয় তাঁর বৈঠকখানা; বৈঠকখানায় গেলে যেমন বাবুকে অনায়াসে দেখা যায়। তাই ভক্তের পূজাতে ভগবানের পূজা হয়।

“কেশব আর তার দলের লোকগুলি এই কথাগুলি খুব মন দিয়ে শুনলে। পূর্ণিমা, চারিদিকে চাঁদের আলোক। গঙ্গাকূলে সিঁড়ির চাতালে সকলে বসে আছে। আমি বললাম, সকলে বল, ‘ভাগবত-ভক্ত-ভগবান।’

তখন সকলে একসুরে বললে, ‘ভাগবত-ভক্ত-ভগবান’। আবার বললাম, বল, ‘ব্রহ্মই শক্তি, শক্তিই ব্রহ্ম।’ তারা আবার একসুরে বললে, ‘ব্রহ্মই শক্তি, শক্তিই ব্রহ্ম।’ তাদের বললাম, যাঁকে তোমরা ব্রহ্ম বল, তাঁকেই আমি মা বলি; মা বড় মধুর নাম।

“যখন আবার তাদের বললাম, আবার বল, ‘গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব’। তখন কেশব বললে, মহাশয় অতদূর নয়! তাহলে সকলে আমাদের গোঁড়া বৈষ্ণব মনে করবে।

“কেশবকে মাঝে মাঝে বলতাম, তোমরা যাঁকে ব্রহ্ম বল, তাঁকেই আমি শক্তি, আদ্যাশক্তি বলি। যখন বাক্য-মনের অতীত, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, তখন বেদে তাঁকে ব্রহ্ম বলেছে। যখন দেখি যে তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন তখন তাঁকে শক্তি, আদ্যাশক্তি — এই সব বলি।

“কেশবকে বললাম, সংসারে হওয়া বড় কঠিন — যে-ঘরে আচার আর তেঁতুল আর জলের জালা, সেই ঘরেই বিকারী রোগী কেমন করে ভাল হয়; তাই মাঝে মাঝে সাধন-ভজন করবার জন্য নির্জনে চলে যেতে হয়। গুঁড়ি মোটা হলে হাতি বেঁধে দেওয়া যায়, কিন্তু চারা গাছ ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলে। তাই কেশব লেকচারে বললে, তোমরা পাকা হয়ে সংসারে থাক।”

[অধর, মাস্টার, নিতাই প্রভৃতিকে উপদেশ — “এগিয়ে পড়”]

(ভক্তদের প্রতি) — “দেখ, কেশব এত পণ্ডিত ইংরাজীতে লেকচার দিত, কত লোকে মানত; স্বয়ং কুইন ভিক্টোরিয়া তার সঙ্গে বসে কথা কয়েছে। সে কিন্তু এখানে যখন আসত, শুধু গায়ে; সাধুদর্শন করতে হলে হাতে কিছু আনতে হয়, তাই ফল হাতে করে আসত। একেবারে অভিমানশূন্য।

(অধরের প্রতি) — “দেখ, তুমি এত বিদ্বান আবার ডেপুটি, তবু তুমি খাঁদী-ফাঁদির বশ। এগিয়ে পড়। চন্দন কাঠের পরেও আরও ভাল ভাল জিনিস আছে; রূপার খনি, তারপর সোনার খনি, তারপর হীরা মাণিক। কাঠুরে বনে কাঠ কাটছিল, তাই ব্রহ্মচারী তাকে বললে, ‘এগিয়ে পড়’।”

শিবের মন্দির হইতে অবতরণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া নিজের ঘরের দিকে আসিতেছেন। সঙ্গে অধর, মাস্টার প্রভৃতি ভক্তেরা। এমন সময় বিষ্ণুঘরের সেবক পূজারী শ্রীযুক্ত রাম চাটুজ্যে আসিয়া খবর দিলেন শ্রীশ্রীমার পরিচারিকার কলেরা হইয়াছে।

রাম চাটুজ্জে (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — আমি তো দশটার সময় বললুম, আপনারা শুনলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— আমি কি করব?

রাম চাটুজ্জে —— আপনি কি করবেন? রাখাল, রামলাল এরা সব ছিল, ওরা কেউ কিছু করলে না।

মাস্টার —— কিশোরী (গুপ্ত) ঔষধ আনতে গেছে আলমবাজারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— কি, একলা? কোথা থেকে আনবে?

মাস্টার —— আর কেহ সঙ্গে নাই। আলমবাজার থেকে আনবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — যারা রোগীকে দেখেছে তাদের বলে দাও বাড়লে কি করতে হবে; কমলেই বা কি খাবে।

মাস্টার —— যে আজ্ঞা।

ভক্তবধুগণ এইবারে আসিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের আবার বললেন, "শিবপূজা যেমন বললাম ওইরূপ করবে। আর খেয়ে দেয়ে এসো, তা না হলে আমার কষ্ট হয়। স্নানযাত্রার দিন আবার আসবার চেষ্টা করো।"

১ শ্রীযুক্ত কেশব সেন খোল-করতাল লয়ে কয়েক বৎসর ধরিয়া ব্রহ্মনাম করিতেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ১৮৭৫ সালে দেখা হইবার পর হইতে বিশেষভাবে হরিনাম ও মায়ের নাম খোল-করতাল লইয়া কীর্তন করিতে লাগিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৪শে মে 1884/05/24/v

20.29 বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিক্ষা

শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার পশ্চিমের গোল বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায়, হরি, মাস্টার প্রভৃতি কাছে বসিয়া আছেন। বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসারে কষ্ট ঠাকুর সব জানেন।

[বন্দ্যোকে শিক্ষা — ভার্যা সংসারের কারণ — শরণাগত হও]

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখ, "এক কপ্নিকে বাস্তে" যত কষ্ট। বিবাহ করে, ছেলেপুলে হয়েছে, তাই চাকরি করতে হয়; সাধু কপ্নি লয়ে ব্যস্ত, সংসারী ভার্যা লয়ে। আবার বাড়ির সঙ্গে বনিবনাও নাই, তাই — আলাদা বাসা করতে হয়েছে। (সহাস্য)

চৈতন্যদেব নিতাইকে বলেছিলেন, শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই সংসারী জীবের কভু গতি নাই।

মাস্টার (স্বগত) — ঠাকুর বুঝি অবিদ্যার, সংসারের কথা বলছেন। অবিদ্যার সংসারেই বুঝি "সংসারী জীব" থাকে।

(মাস্টারকে দেখাইয়া — সহাস্যে) "ইনিও আলাদা বাসা করে আছেন। তুমি কে, না 'আমি বিদেশিনী'; আর তুমি কে, না 'আমি বিরহিণী।' (সকলের হাস্য) বেশ মিল হবে।

"তবে তাঁর শরণাগত হলে আর ভয় নাই। তিনিই রক্ষা করবেন।"

হরি প্রভৃতি — আচ্ছা, অনেকের তাঁকে লাভ করতে অত দেরি হয় কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি জানো, ভোগ আর কর্ম শেষ না হলে ব্যাকুলতা আসে না। বৈদ্য বলে দিন কাটুক — তারপর সামান্য ঔষধে উপকার হবে।

"নারদ রামকে বললেন, 'রাম! তুমি অযোধ্যায় বসে রইলে রাবণবধ কেমন করে হবে? তুমি যে সেইজন্যে অবতীর্ণ হয়েছ!' রাম বললেন, 'নারদ! সময় হউক, রাবণের কর্ম-ক্ষয় হোক; তবে তার বধের উদ্যোগ হবে'।"১

[The problem of Evil and Hari (Turiyananda) — ঠাকুরের বিজ্ঞানীর অবস্থা]

হরি — আচ্ছা, সংসারে এত দুঃখ কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — এ সংসার তাঁর লীলা; খেলার মতো। এই লীলায় সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, জ্ঞান-অজ্ঞান, ভাল-মন্দ — সব আছে। দুঃখ, পাপ — এ-সব গেলে লীলা চলে না।

“চোর চোর খেলায় বুড়ীকে ছুঁতে হয়। খেলার গোড়াতেই বুড়ী ছুঁলে বুড়ী সন্তুষ্ট হয় না। ঈশ্বরের (বুড়ির) ইচ্ছা যে খেলাটা খানিকক্ষণ চলে। তারপর। —

ঘুড়ি লক্ষের দুটা-একটা কাটে,

হেসে দাও মা, হাত-চাপড়ী।

অর্থাৎ ঈশ্বরদর্শন করে দুই-একজন মুক্ত হয়ে যায়, অনেক তপস্যার পর, তাঁর কৃপায়। তখন মা আনন্দে হাততালি দেন, ‘ভো! কাটা!’ এই বলে।”

হরি — খেলায় যে আমাদের প্রাণ যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তুমি কে বল দেখি; ঈশ্বরই সব হয়ে রয়েছেন — মায়া, জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব।২

“সাপ হয়ে খাই, আবার রোজা হয়ে ঝাড়ি! তিনি বিদ্যা-অবিদ্যা দুই-ই হয়ে রয়েছেন। অবিদ্যা মায়ার অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন, বিদ্যা মায়ার ও গুরুরূপে রোজা হয়ে ঝাড়ছেন।

“অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান। জ্ঞানী দেখেন তিনিই আছেন, তিনিই কর্তা — সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার করছেন। বিজ্ঞানী দেখেন, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন।

“মহাভাব, প্রেম হলে দেখে তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই।

“ভাবের কাছে ভক্তি ফিকে, ভাব পাকলে মহাভাব, প্রেম।

(বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি) — “ধ্যানের সময় ঘন্টাশব্দ এখনও কি শোনা?”

বন্দ্যো — রোজ ওই শব্দ শোনা! আবার রূপদর্শন! একবার মন ধরলে কি আর বিরাম হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — হাঁ, কাঠে একবার আগুন ধরলে আর নেবে না। (ভক্তদের প্রতি) — ইনি বিশ্বাসের কথা অনেক জানেন।

বন্দ্যো — আমার বিশ্বাসটা বড় বেশি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিছু বল না।

বন্দ্যো — একজনকে গুরু গাড়োল মন্ত্র দিয়েছিলেন, আর বলেছিলেন, “গাড়োলই তোর ইষ্ট।” গাড়োল মন্ত্র জপ করে সে সিদ্ধ হল।

“ঘেসুড়ে রামনাম করে গঙ্গা পার হয়ে গিছল!”

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমার বাড়ির মেয়েদের বলরামের মেয়েদের সঙ্গে এনো।

বন্দ্যো —— বলরাম কে?

শ্রীরামকৃষ্ণ —— বলরাম কে জানো না? বোসপাড়ায় বাড়ি।

সরলকে দেখিলে শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে বিভোর হয়েন। বন্দ্যোপাধ্যায় খুব সরল; নিরঞ্জনকেও সরল বলে খুব ভালবাসেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — তোমায় নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে বলছি কেন? সে সরল, সত্য কি না। এইটি দেখবে বলে।

১ অধ্যাত্মরামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড।

২ ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী।

ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।।

[শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ, ৪।৩]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৫শে মে 1884/05/25/i

20.30 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে, জন্মোৎসবদিবসে বিজয়, কেদার, রাখাল, সুরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

[পঞ্চবটীমূলে জন্মোৎসবদিবসে বিজয় প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীতলায় পুরাতন বটবৃক্ষের চাতালের উপর বিজয়, কেদার, সুরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্তসঙ্গে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। কয়েকটি ভক্ত চাতালের উপর বসিয়া আছেন। অধিকাংশই চাতালের নিচে, চতুর্দিকে দাঁড়াইয়া আছেন। বেলা ১টা হইবে। রবিবার, ২৫শে মে, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। ১৩ই জৈষ্ঠ; শুক্লা প্রতিপদ।

ঠাকুরের জন্মদিন ফাল্গুন মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথি। কিন্তু তাঁহার হাতে অসুখ বলিয়া এতদিন জন্মোৎসব হয় নাই। এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। তাই আজ ভক্তেরা আনন্দ করিবেন। সহচরী গান গাইবে। সহচরী প্রবীণা হইয়াছেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ কীর্তনী।

মাস্টার ঠাকুরের ঘরে ঠাকুরকে দেখিতে না পাইয়া পঞ্চবটীতে আসিয়া দেখেন যে, ভক্তেরা সহাস্যবদন — আনন্দে অবস্থান করিতেছেন। ঠাকুর বৃক্ষমূলে চাতালের উপর যে বসিয়া আছেন, তিনি দেখেন নাই অথচ ঠাকুরের ঠিক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন — তিনি কিথায়? এই কথা শুনিয়া সকলে উচ্চ হাস্য করিলেন। হঠাৎ সম্মুখে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া, মাস্টার অপ্রস্তুত হইয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। দেখিলেন, ঠাকুরের বামদিকে কেদার (চাটুজ্যে) এবং বিজয় (গোস্বামী) চাতালের উপর বসিয়া আছেন। ঠাকুর দক্ষিণাস্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, মাস্টারের প্রতি) — দেখ, কেমন দুজনকে (কেদার ও বিজয়কে) মিলিয়ে দিয়েছি!

শ্রীবৃন্দাবন হইতে মাধবীলতা আনিয়া ঠাকুর পঞ্চবটীতে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রোপণ করিয়াছিলেন। আজ মাধবী বেশ বড় হইয়াছে। ছোট ছোট ছেলেরা উঠিয়া দুলিতেছে, নাচিতেছে — ঠাকুর আনন্দে দেখিতেছেন ও বলিতেছেন — "বাঁদুরে ছানার ভাব। পড়লে ছাড়ে না।" সুরেন্দ্র চাতালের নিচে দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর সস্নেহে বলিতেছেন, "তুমি উপরে এসো না। এমনটা (পা মেলা) বেশ হবে।"

সুরেন্দ্র উপরে গিয়া বসিলেন। ভবনাথ জামা পরিয়া বসিয়াছেন দেখিয়া সুরেন্দ্র বলিতেছেন, "কিহে বিলাতে যাবে নাকি?"

ঠাকুর হাসিতেছেন ও বলিতেছেন, "আমাদের বিলাত ঈশ্বরের কাছে।" ঠাকুর ভক্তদের সহিত নানা বিষয়ে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি মাঝে মাঝে কাপড় ফেলে, আনন্দময় হয়ে বেড়াতাম। শম্ভু একদিন বলছে, 'ওহে তুমি তাই ন্যাংটো হয়ে বেড়াও! — বেশ আরাম! — আমি একদিন দেখলাম।'

সুরেন্দ্র — আফিস থেকে এসে জামা চাপকান খোলবার সময় বলি — মা তুমি কত বাঁধাই বেঁধেছ।

[সুরেন্দ্র আফিস — সংসার, অষ্টপাশ ও তিনগুণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ — অষ্টপাশ দিয়ে বন্ধন। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি, অভিমান, সঙ্কোচ, গোপনের ইচ্ছা — এই সব।

ঠাকুর গান গাহিতেছেন:

আমি ওই খেদে খেদ করি শ্যামা।

গান - শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি (ভব সংসার বাজার মাঝে)
ঘুড়ি আশাবায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি।

“মায়া দড়ি কিনা মাঘছেলে। বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা কর্কশা হয়েছে দড়ি। বিষয় — কামিনী-কাঞ্চন।

গান - ভবে আসা খেলতে পাশা, বড় আশা করেছিলাম।
আশার আশা ভাঙা দশা, প্রথমে পঞ্জুড়ি পেলাম।
প’বার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলাম ভাল,
(শেষে) কচে বারো পেয়ে মাগো, পঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হলাম।
ছ-দুই-আট, ছ-চার-দশ, কেউ নয় মা আমার বশ;
খেলাতে না পেলাম যশ, এবার বাজী ভোর হইল।

“পঞ্জুড়ি অর্থাৎ পঞ্চভূত। পঞ্জা ছক্কায় বন্দী হওয়া অর্থাৎ পঞ্চভূত ও ছয় রিপুর বশ হওয়া। ‘ছ তিন নয়ে ফাঁকি দিব।’ ছয়কে ফাঁকি দেওয়া অর্থাৎ ছয় রিপুর বশ না হওয়া। ‘তিনকে ফাঁকি দেওয়া’ অর্থাৎ তিন গুণের অতীত হওয়া।

“সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ — এই তিন গুণেতেই মানুষকে বশ করেছে। তিন ভাই; সত্ত্ব থাকলে রজঃকে ডাকতে পারে, রজঃ থাকলে তমঃকে ডাকতে পারে। তিন গুণই চোর। তমোগুণে বিনাশ করে, রজোগুণে বদ্ধ করে, সত্ত্ব গুণে বন্ধন খোলে বটে; কিন্তু ঈশ্বরের কাছ পর্যন্ত যেতে পারে না।”

বিজয় (সহাস্যে) — সত্ত্বও চোর কি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে না, কিন্তু পথ দেখিয়ে দেয়।

ভবনাথ — বাঃ! কি চমৎকার কথা!

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ এ খুব উঁচু কথা।

ভক্তেরা এই সকল কথা শুনিয়া আনন্দ করিতেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৫শে মে 1884/05/25/ii

20.31 বিজয়, কেদার প্রভৃতির প্রতি কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধে উপদেশ

শ্রীরামকৃষ্ণ — বন্ধনের কারণ কামিনী-কাঞ্চন। কামিনী-কাঞ্চনই সংসার। কামিনী-কাঞ্চনই ঈশ্বরকে দেখতে দেয় না।

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের গামছা লইয়া সম্মুখ আবরণ করিলেন। আর বলিতেছেন, আর আমায় তোমরা দেখতে পাচ্চ? — এই আবরণ! এই কামিনী-কাঞ্চন আবরণ গেলেই চিদানন্দলাভ।

"দেখো না — যে মাগ সুখ ত্যাগ করেছে, সে তো জগৎ সুখ ত্যাগ করেছে! ঈশ্বর তার অতি নিকট।"

কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া নিশশব্দে এই কথা শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদার, বিজয় প্রভৃতির প্রতি) — "মাগ সুখ যে ত্যাগ করেছে, সে জগৎ সুখ ত্যাগ করেছে। — এই কামিনী-কাঞ্চনই আবরণ। তোমাদের তো এত বড় বড় গোঁফ, তবু তোমরা ওইতেই রয়েছ! বল! মনে মনে বিবেচনা করে দেখ!—"

বিজয় — আজ্ঞা, তা সত্য বটে।

কেদার অবাক্ হইয়া চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর বলিতেছেন,

"সকলকেই দেখি, মেয়েমানুষের বশ। কাপ্তেনের বাড়ি গিছলাম; — তার বাড়ি হয়ে রামের বাড়ি যাব। তাই কাপ্তেনকে বললাম, 'গাড়িভাড়া দাও'। কাপ্তেন তার মাগ্‌কে বললে! সে মাগও তেমনি — 'ক্যা হুয়া' 'ক্যা হুয়া' করতে লাগল।

শেষে কাপ্তেন বললে যে, ওরাই (রামেরা) দেবে। গীতা, ভাগবত, বেদান্ত সব ওর ভিতরে! (সকলের হাস্য)

"টাকা-কড়ি সর্বস্ব সব মাগের হাতে! আবার বলা হয়, 'আমি দুটো টাকাও আমার কাছে রাখতে পারি না — কেমন আমার স্বভাব!'

"বড়বাবুর হাতে অনেক কর্ম, কিন্তু করে দিচ্চে না। একজন বললে, 'গোলাপীকে ধর, তবে কর্ম হবে।' গোলাপী বড়বাবুর রাঁড়।"

[পূর্বকথা — ফোর্টদর্শন — স্ত্রীলোক ও "কলমবাড়া রাস্তা"]

"পুরুষগুলো বুঝতে পারে না, কত নেমে গেছে।

"কেল্লায় যখন গাড়ি করে গিয়ে পোঁছিলাম তখন বোধ হল যেন সাধারণ রাস্তা দিয়ে এলাম। তারপরে দেখি যে চারতলা নিচে এসেছি! কলমবাড়া (Sloping) রাস্তা! যাকে ভূতে পায়, সে জানতে পারে না যে আমায় ভূতে পেয়েছে। সে ভাবে আমি বেশ আছি।"

বিজয় (সহাস্যে) — রোজা মিলে গেলে রোজা ঝাড়িয়ে দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও-কথার বেশি উত্তর দিলেন না। কেবল বলিলেন —

"সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

তিনি আবার স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — যাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বলে আজ্ঞে হাঁ, আমার স্ত্রীটি ভাল। একজনেরও স্ত্রী মন্দ নয়। (সকলের হাস্য)

“যারা কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে থাকে, তারা নেশায় কিছু বুঝতে পারে না। যারা দাবাবোড়ে খেলে, তারা অনেক সময় জানে না, কি ঠিক চাল। কিন্তু যারা অন্তর থেকে দেখে, তারা অনেকটা বুঝতে পারে।

“স্ত্রী মায়ারূপিণী। নারদ রামকে স্তব করতে লাগলেন — ‘হে রাম। তোমার অংশে যত পুরুষ; তোমার মায়ারূপিণী সীতার অংশে যত স্ত্রী। আর কোন বর চাই না — এই করো, যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়, আর যেন তোমার জগৎমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই’!”

[গিরীন্দ্র, নগেন্দ্র প্রভৃতির প্রতি উপদেশ]

সুরেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরীন্দ্র ও তাঁহার নগেন্দ্র প্রভৃতি ভ্রাতুষ্পুত্রেরা আসিয়াছেন। গিরীন্দ্র আফিসের কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। নগেন্দ্র ওকালতির জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীন্দ্র প্রভৃতির প্রতি) — তোমাদের বলি — তোমরা সংসারে আসক্ত হইও না। দেখো, রাখালের জ্ঞান অজ্ঞান বোধ হয়েছে, — সৎ অসৎ বিচার হয়েছে! এখন তাকে বলি, ‘বাড়িতে যা; কখন এখানে এলি, দুই দিন থাকলি।’

"আর তোমরা পরস্পর প্রণয় করে থাকবে — তবেই মঙ্গল হবে। আর আনন্দে থাকবে। যাত্রাওয়ালারা যদি একসুরে গায়, তবেই যাত্রাটি ভাল হয়, আর যারা শুনে তাদেরও আহ্লাদ হয়।

"ঈশ্বরে বেশি মন রেখে খানিকটা মন দিয়ে সংসারে কাজ করবে।

"সাধুর মন ঈশ্বরে বার আনা, — আর কাজে চার আনা। সাধুর ঈশ্বরের কথাতেই বেশি হুঁশ। সাপের ন্যাজ মাড়ালে আর রক্ষা নাই! ন্যাজে যেন তার বেশি লাগে।"

[পঞ্চবটীতে সহচরীর কীর্তন — হঠাৎ মেঘ ও ঝড়]

ঠাকুর ঝাউতলায় যাইবার সময় সিঁথির গোপালকে ছাতির কথা বলিয়া গেলেন। গোপাল মাস্টারকে বলিতেছেন, "উনি বলে গেলেন, ছাতি ঘরে রেখে আসতে।" পঞ্চবটীতলায় কীর্তনের আয়োজন হইল। ঠাকুর আসিয়া বসিয়াছেন। সহচরী গান গাইতেচেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া আছেন।

গতকল্য শনিবার অমাবস্যা গিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাস। আজ মধ্যে মধ্যে মেঘ করিতেছিল। হঠাৎ ঝড় উপস্থিত হইল। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। কীর্তন ঘরেই হবে স্থির হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সিঁথির গোপালের প্রতি) — হ্যাঁগা ছাতিটা এনেছ?

গোপাল — আজ্ঞা, না। গান শুনতে শুনতে ভুলে গেছি!

ছাতিটি পঞ্চবটীতে পড়িয়া আছে; গোপাল তাড়াতাড়ি আনিতে গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি যে এতো এলোমেলো, তবু অত দূর নয়!

“রাখাল এক জায়গায় নিমন্ত্রণের কথায় ১৩ই-কে বলে ১১ই!

“আর গোপাল — গোরুর পাল! (সকলের হাস্য)

“সেই যে স্যাকরাদের গল্পে আছে — একজন বলছে, ‘কেশব’, একজন বলছে, ‘গোপাল’, একজন বলছে, ‘হরি’, একজন বলছে, ‘হর’। সে ‘গোপালের’ মানে গোরুর পাল!” (সকলের হাস্য)

সুরেন্দ্র গোপালের উদ্দেশ্য করিয়া আনন্দে বলিতেছেন — ‘কানু কোথায়?’

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৫শে মে 1884/05/25/iii

20.32 বিজয়াদি ভক্তসঙ্গে সংকীর্তনানন্দে — সহচরীর গৌরাঙ্গসন্ন্যাস গান

কীর্তনী গৌরসন্ন্যাস গাইতেছেন ও মাঝে মাঝে আখর দিতেছেন —

(নারী হেরবে না!) (সে যে সন্ন্যাসীর ধর্ম!)

(জীবের দুঃখ ঘুচাইতে,) (নারী হেরিবে না!)
(নইলে বৃথা গৌর অবতার!)

ঠাকুর গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস কথা শুনিতে শুনিতে দণ্ডায়মান হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। অমনি ভক্তেরা গলায় পুষ্পমালা পরাইয়া দিলেন। ভবনাথ, রাখাল, ঠাকুরকে ধারণ করিয়া আছেন — পাছে পড়িয়া যান। ঠাকুর উত্তরাস্য, বিজয়, কেদার, রাম, মাস্টার, মনোমোহন। লাটু প্রভৃতি ভক্তেরা মণ্ডলাকার করিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ কি আসিয়া ভক্তসঙ্গে হরিণাম-মহোৎসব করিতেছেন!

[শ্রীকৃষ্ণই অখন্ড সচ্চিদানন্দ — আবার জীব-জগৎ — স্বরাট্‌বিরাট্‌]

অল্পে অল্পে সমাধি ভঙ্গ হইতেছে। ঠাকুর সচিদানন্দ কৃষ্ণের সহিত কথা কহিতেছেন। 'কৃষ্ণ' এই কথা এক-একবার উচ্চারণ করিতেছেন, আবার এক-একবার পারিতেছেন না। বলিতেছেন — কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ, সচ্চিদাননদ! — কই তোমার রূপ আজকাল দেখি না! এখন তোমায় অন্তরে বাহিরে দেখছি — জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব — সবই তুমি! মন বুদ্ধি সবই তুমি! গুরুর প্রণামে আছে —

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্‌।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

"তুমিই অখণ্ড, তুমিই আবার চরাচর ব্যাপ্ত করে রয়েছ! তুমিই আধার। তুমিই আধেয়! প্রাণকৃষ্ণ! মনকৃষ্ণ! বুদ্ধিকৃষ্ণ! আত্মাকৃষ্ণ! প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন!"

বিজয়ও আবিষ্ট হইয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, “বাবু, তুমিও কি বেহুঁশ হয়েছ?”

বিজয় (বিনীতভাবে) — আজ্ঞা, না।

কীর্তনী আবার গাইতেছেন — “আঁধল প্রেম!” কীর্তনী যাই আখর দিলেন — “সদাই হিয়ার মাঝে রাখিতাম, ওহে প্রাণবঁধু হে!” ঠাকুর আবার সমাধিস্থ! — ভবনাথের কাঁধে ভাঙা হাতটি রহিয়াছে!

কিঞ্চিৎ বাহ্য হইলে, কীর্তনী আবার আখর দিতেছেন — “যে তোমার জন্য সব ত্যাগ করেছে তার কি এত দুঃখ?”

ঠাকুর কীর্তনীকে নমস্কার করিলেন। বসিয়া গান শুনিতেছেন — মাঝে মাঝে ভাবাবিষ্ট। কীর্তনী চুপ করিলেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

[প্রেমে দেহ ও জগৎ ভুল — ঠাকুরের ভক্তসঙ্গে নৃত্য ও সমাধি]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় প্রভৃতি ভক্তের প্রতি) — প্রেম কাকে বলে। ঈশ্বরে যার প্রেম হয় — যেমন চৈতন্যদেবের — তার জগৎ তো ভুল হয়ে যাবে, আবার দেহ যে এত প্রিয়, এ পর্যন্ত ভুল হয়ে যাবে!

প্রেম হলে কি হয়, ঠাকুর গান গাইয়া বুঝাইতেছেন।

হরি বলিতে ধারা বেয়ে পড়বে। (সে দিন কবে বা হবে)
(অঙ্গে পুলক হবে) (সংসার বাসনা যাবে)

(দুর্দিন ঘুচে সুদিন হবে) (কবে হরির দয়া হবে)

ঠাকুর দাঁড়াইয়াছেন ও নৃত্য করিতেছেন। ভক্তেরা সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছেন। ঠাকুর মাস্টারের বাহু আকর্ষণ করিয়া মণ্ডলের ভিতর তাঁহাকে লইয়াছেন।

নৃত্য করিতে করিতে আবার সমাধিস্থ! চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া। কেদার সমাধী ভঙ্গ করিবার জন্য স্তব করিতেছেন —

“হৃদয়কমলমধ্যে নির্বিশেষং নিরীহম্

হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্।

জননমরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎস্বরূপম্,

সকল ভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে।।”

ক্রমে সমাধি ভঙ্গ হইল। ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলেন ও নাম করিতেছেন — ওঁ সচ্চিদানন্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ! যোগমায়া! — ভাগবত-ভক্ত-ভগবান!

কীর্তন ও নৃত্যস্থলের ধূলি ঠাকুর লইতেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৫শে মে 1884/05/25/iv

20.33 সন্ন্যাসির কঠিন ব্রত — সন্ন্যাসী ও লোকশিক্ষা

ঠাকুর গঙ্গার ধারের গোল বারান্দায় আসিয়াছেন। কাছে বিজয়, ভবনাথ, মাস্টার, কেদার প্রভৃতি ভক্তগণ। ঠাকুর এক-একবার বলিতেছেন — "হা কৃষ্ণচৈতন্য!"

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি) — ঘরে নাকি অনেক হরিনাম হয়েছে — তাই খুব জমে গেল!

ভবনাথ — তাতে আবার সন্ন্যাসের কথা!

শ্রীরামকৃষ্ণ — 'আহা! কি ভাব!'

এই বলিয়া গান ধরিলেন:

প্রেমধন বিলায় গোরারায়।
প্রেমকলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়!
চাঁদ নিতাই ডাকে আয়! আয়! চাঁদ, গৌর ডাকে আয়!
(ওই) শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।

(বিজয় প্রভৃতির প্রতি) — "বেশ বলেছে কীর্তনে, —

"সন্ন্যাসী নারী হেরবে না। এই সন্ন্যাসীর ধর্ম। কি ভাব!"

বিজয় — আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সন্ন্যাসীকে দেখে তবে সবাই শিখবে — তাই অত কঠিন নিয়ম। — নারীর চিত্রপট পর্যন্ত সন্ন্যাসী দেখবে না! এমনি কঠিন নিয়ম!

“কালো পাঁঠা মার সেবার জন্য বলি দিতে হয় — কিন্তু একটু ঘা থাকলে হয় না। রমণীসঙ্গ তো করবে না — মেয়েদের সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত করবে না।”

বিজয় — ছোট হরিদাস ভক্তমেয়ের সঙ্গে আলাপ করেছিল। চৈতন্যদেব হরিদাসকে ত্যাগ করলেন।

[পূর্বকথা — শ্রীরামকৃষ্ণের নামে মারোয়াড়ীর টাকা ও মথুরের জমি লিখিয়া দিবার প্রস্তাব]

শ্রীরামকৃষ্ণ — সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী আর কাঞ্চন — যেমন সুন্দরীর পক্ষে তার গায়ের বোট্‌কা গন্ধ! ও-গন্ধ থাকলে বৃথা সৌন্দর্য।

“মারোয়াড়ী আমার নামে টাকা লিখে দিতে চাইলে; — মথুর জমি লিখে দিতে চাইলে; — তা লতে পারলাম না।

“সন্ন্যাসীর ভারী কঠিন নিয়ম। যখন সাধু-সন্ন্যাসী সেজেছে, তখন ঠিক সাধু-সন্ন্যাসীর মতো কাজ করতে হবে। থিয়েটারে দেখ নাই! — যে রাজা সাজে সে রাজাই সাজে, যে মন্ত্রী সাজে সে মন্ত্রীই সাজে।

“একজন বহুরূপী ত্যাগী সাধু সেজেছিল। বাবুরা তাকে একতোড়া টাকা দিতে গেল। সে ‘উঁহু’ করে চলে গেল, — টাকা ছুঁলেও না। কিন্তু খানিক পরে গা-

হাত-পা ধুয়ে নিজের কাপড় পরে এল। বললে, ‘কি দিচ্ছিলে এখন দাও।’ যখন সাধু সেজেছিল, তখন টাকা ছুঁতে পারে নাই। এখন চার আনা দিলেও হয়।

“কিন্তু পরমহংস অবস্থায় বালক হয়ে যায়। পাঁচ বছরের বালকের স্ত্রী-পুরুষ জ্ঞান নাই। তবু লোকশিক্ষার জন্য সাবধান হতে হয়।”

[শ্রীযুক্ত কেশব সেনের দ্বারা লোকশিক্ষা হল না কেন]

শ্রীযুক্ত কেশব সেন কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর ছিলেন। — তাই লোকশিক্ষার ব্যাঘাত হইল। ঠাকুর এই কথা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ইনি (কেশব) — বুঝেচো?

বিজয় — আজ্ঞা, হাঁ

শ্রীরামকৃষ্ণ — এদিক-ইদিক দুই রাখতে গিয়ে তেমন কিছু পারলেন না।

[শ্রীচৈতন্যদেব কেন সংসারত্যাগ করিলেন]

বিজয় — চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে বললেন, “নিতাই, আমি যদি সংসারত্যাগ না করি, তাহলে লোকের ভাল হবে না। সকলেই আমার দেখাদেখি সংসার করতে চাইবে। — কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করে হরিপাদপদ্মে সমস্ত মন দিতে কেহ চেষ্টা করবে না!”

শ্রীরামকৃষ্ণ — চৈতন্যদেব লোকশিক্ষার জন্য সংসারত্যাগ করলেন।

“সাধু-সন্ন্যাসী নিজের মঙ্গলের জন্য কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করবে। আবার নির্লিপ্ত হলেও, লোকশিক্ষার জন্য কাছে কামিনী-কাঞ্চন রাখবে না। ন্যাসী — সন্ন্যাসী — জগদ্‌গুরু! তাকে দেখে তবে তো লোকের চৈতন্য হবে!”

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। ভক্তেরা ক্রমে ক্রমে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। বিজয় কেদারকে বলিতেছেন, “আজ সকালে (ধ্যানের সময়) আপনাকে দেখেছিলাম; — গায়ে হাত দিতে যাই — কেউ নাই।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c21 ২১ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৫ই জুন 1884/06/15/i

21.1 সুরেন্দ্রের বাগানে

আজ ঠাকুর সুরেন্দ্রের বাগানে আসিয়াছেন। রবিবার (২রা আষাঢ়), জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথি, ১৫ই জুন, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর সকাল নয়টা হইতে ভক্তসঙ্গে আনন্দ করিতেছেন।

সুরেন্দ্রের বাগান কলিকাতার নিকটস্থ কাঁকুড়গাছি নামক পল্লীর অন্তর্গত। নিকটেই রামের বাগান — যে বাগানে ঠাকুর প্রায় ছয় মাস পূর্বে শুভাগমন করিয়াছিলেন। আজ সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব।

সকাল হইতেই সংকীর্তন আরম্ভ হইয়াছে। কীর্তনিয়াগণ মাথুর গাহিতেছে। গোপীদের প্রেম, শ্রীকৃষ্ণ বিরহে শ্রীমতীর শোচনীয় অবস্থা — সমস্ত বর্ণিত হইতেছিল। ঠাকুর মুহুর্মুহু ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। ভক্তগণ উদ্যানগৃহমধ্যে চতুর্দিকে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

উদ্যানগৃহমধ্যে প্রধান প্রকোষ্ঠে সংকীর্তন হইতেছে। ঘরের মেঝেতে সাদা চাদর পাতা ও মাঝে মাঝে তাকিয়া রহিয়াছে। এই প্রকোষ্ঠের পূর্বে ও পশ্চিমে একটি করিয়া কামরা এবং উত্তরে ও দক্ষিণে বারান্দা আছে। উদ্যান গৃহের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে একটি বাঁধাঘাটবিশিষ্ট সুন্দর পুষ্করিণী। গৃহ ও পুষ্করিণী ঘাটের মধ্যবর্তী পূর্ব-পশ্চিমে উদ্যান পথ। পথের দুই ধারে পুষ্পবৃক্ষ ও ক্রোটনাদি গাছ। উদ্যানগৃহের পূর্বধার হইতে উত্তরে ফটক পর্যন্ত আর-একটি রাস্তা গিয়াছে। লাল সুরকির রাস্তা। তাহারও দুই পার্শ্বে নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ ও ক্রোটনাদি গাছ। ফটকের নিকট ও রাস্তার ধারে আর-একটি বাঁধাঘাট পুষ্করিণী। পল্লীবাসী সাধারণ লোকে এখানে স্নানাদি করে এবং পানীয় জল লয়; উদ্যান গৃহের পশ্চিম

ধারেও উদ্যান পথ, সেই পথের দক্ষিণ-পশ্চিমে রন্ধনশালা। আজ এখানে খুব ধুমধাম, ঠাকুর ও ভক্তদের সেবা হইবে। সুরেশ ও রাম সর্বদা তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

উদ্যানগৃহের বারান্দাতেও ভক্তদের সমাবেশ হইয়াছে। কেহ কেহ একাকী বা বন্ধুসঙ্গে প্রথমোক্ত পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইতেছেন। কেহ কেহ বাঁধাঘাটে মাঝে মাঝে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন।

সংকীর্তন চলিতেছে। সংকীর্তন গৃহমধ্যে ভক্তের জনতা হইয়াছে। ভবনাথ, নিরঞ্জন, রাখাল, সুরেন্দ্র, রাম, মাস্টার, মহিমাচরণ ও মণি মল্লিক ইত্যাদি অনেকেই উপস্থিত। অনেকগুলি ব্রাহ্মভক্তও উপস্থিত।

মাথুর গান হইতেছে। কীর্তনিয়া প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা গাহিতেছেন। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস করিয়াছেন — কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হইয়াছেন। তাঁর অদর্শনে নবদ্বীপের ভক্তেরা কাতর হইয়া কাঁদিতেছেন। তাই কীর্তনিয়া গাহিতেছেন — গৌর একবার চল নদীয়ায়।

তৎপরে শ্রীমতীর বিরহ অবস্থা বর্ণনা করিয়া আবার গাহিতেছেন।

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া অতি করুণ স্বরে আখর দিতেছেন — "সখি! হয় প্রাণবল্লভকে আমার কাছে নিয়ে আয়, নয় আমাকে সেখানে রেখে আয়।" ঠাকুরের শ্রীরাধার ভাব হইয়াছে। কথাগুলি বলিতে বলিতেই নির্বাক্ হইলেন; দেহ স্পন্দহীন, অর্ধনিমীলিতনেত্র। সম্পূর্ণ বাহ্যশূন্য; ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন!

অনেক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইলেন। আবার সেই করুণ স্বর। বলিতেছেন, “সখি! তাঁর কাছে লয়ে গিয়ে তুই আমাকে কিনে নে। আমি তোদের দাসী হব! তুই তো কৃষ্ণপ্রেম শিখায়েছিলি! প্রাণবল্লভ!”

কীর্তনিয়াদিগের গান চলিতে লাগিল। শ্রীমতী বলিতেছেন, “সখি! যমুনার জল আনতে আমি যাব না। কদম্বতলে প্রিয় সখাকে দেখেছিলাম, সেখানে গেলেই আমি বিহ্বল হই!”

ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কাতর হইয়া বলিতেছেন, ‘আহা’ ‘আহা’!

কীর্তন চলিতেছে — শ্রীমতির উক্তি —

গান — শীতল তছু অঙ্গ হেরি সঙ্গসুখ লালসে (হে)।

মাঝে মাঝে আখর দিতেছেন (না হয় তোদের হবে, আমায় একবার দেখা গো)। (ভূষণের ভূষণ গেছে আর ভূষণে কাজ নাই)। (আমার সুদিন গিয়ে দুর্দিন হয়েছে) (দুর্দশার দিন কি দেরি হয় না)।

ঠাকুর আখর দিতেছেন — (সে কাল কি আজও হয় নাই)।

কীর্তনিয়া আখর দিতেছেন — (এতকাল গেল, সে কাল কি আজও হয় নাই)।

গান - মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব,

(আমার) কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।

না পোড়াইও রাধা অঙ্গ, না ভাসাইও জলে,

(দেখো যেন অঙ্গ পোড়াইও না গো)

(কৃষ্ণ বিলাসের অঙ্গ ভাসাইও না গো)

(কৃষ্ণ বিলাসের অঙ্গ জলে না ডারবি, অনলে না দিবি)

মরিলে তুলিয়ে রেখ তমালের ডালে।

(বেঁধে তমালে রাখবি) (তাতে পরশ হবে)

(কালোতে পরশ হবে) (কৃষ্ণ কালো তমাল কালো)

(কালো বড় ভালবাসি) (শিশুকাল হ'তে)

(আমার কানু অনুগত তনু)

(দেখ যেন কানু ছাড়া করো না গো)।

শ্রীমতীর দশম দশা — মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন।

গান — ধনি ভেল মূরছিত, হরল গেয়ান, (নাম করিতে করিতে) (হাট কি ভাঙলি রাই) তখনই তো প্রাণসখি মুদলি নয়ান। (ধনি কেন এমন হল) (এই যে কথা কইতেছিল) কেহ কেহ চন্দন দেয় ধনির অঙ্গে; কেহ কেহ রোউত বিষাদতরঙ্গে। (সাধের প্রাণ যাবে বলে) কেহ কেহ জল ঢালি দেয় রাইয়ের বদনে (যদি বাঁচে) (যে কৃষ্ণ অনুরাগে মরে, সে কি জলে বাঁচে)।

মূর্ছিতা দেখিয়া সখীরা কৃষ্ণনাম করিতেছেন। শ্যামনামে তাঁহার সংজ্ঞা হইল। তমাল দেখে ভাবছেন বুঝি সম্মুখে কৃষ্ণ এসেছেন।

গান — শ্যামনামে প্রাণ পেয়ে, ধনি ইতি উতি চায়, না দেখি সে চাঁদমুখ কাঁদে উভরায়। (বলে, কইরে শ্রীদাম) (তোরা যার নাম শুনাইলি কই) (একবার এনে দেখা গো) সম্মুখে তমাল তরু দেখিবারে পায়। (তখন) সেই তমালতরু করি নিরীক্ষণ (বলে ওই যে চূড়া) (আমার কৃষ্ণের ওই যে চূড়া দেখা যায়)।

সখীরা যুক্তি করিয়া মথুরায় দূতী পাঠাইয়াছেন। তিনি একজন মথুরাবাসিনীর সহিত পরিচয় করিলেন —

গান — এক রমণী সমবয়সিনী, নিজ পরিচয় পুছে।

শ্রীমতীর সখী দূতী বলছেন — আমায় ডাকতে হবে না, সে আপনি আসবে। দূতী মথুরাবাসিনীর সঙ্গে যেখানে আছেন সেইখানে যাইতেছেন। তৎপরে ব্যাকুল হয় কেঁদে কেঁদে ডাকছেন —

"কোথায় হরি হে, গোপীজনজীবন! প্রাণপল্লভ! রাধাবল্লভ! লজ্জানিবারণ হরি! একবার দেখা দাও। আমি অনেক গরব করে এদের বলেছি, তুমি আপনি দেখা দিবে।"

গান — মধুপুর নাগরী, হাঁসী কহত ফিরি, গোকুলে গোপ কোঁয়ারি (হায় গো) (কেমন করে বা যাবি গো) (এমন কাঙালিনী বেশ)। সপ্তম দ্বার পারে রাজা বৈঠত, তাঁহা কাঁহা যাওবি নারি। (কেমন করে বা যাবি) (তোর সাহস দেখে লাজে মরি বল কেমন যাবি)। হা হা নাগর গোপীজনজীবন (কাঁহা নাগর দেখা দিয়ে দাসীর প্রাণ রাখ!) (কোথায় গোপীজনজীবন প্রাণবল্লভ!) (হে মথুরনাথ, দেখা দিয়ে দাসীর মন প্রাণ রাখ হরি, হা হা রাধাবল্লভ!) (কোথায় আছ হে, হৃদয়নাথ

হৃদয়বল্লভ লজ্জানিবারণ হরি) (দেখা দিয়ে দাসীর মান রাখ হরি)। হা হা নাগর গোপীজনজীবনধন, দূতী ডাকত উভরায়।

কোথায় গোপীজনজীবন প্রাণবল্লভ! এই কথা শুনিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। কীর্তনান্তে কীর্তনিয়ারা উচ্চ সংকীর্তন করিতেছেন। প্রভু আবার দণ্ডায়মান! সমাধিস্থ! কতক সংজ্ঞা লাভ করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিতেছেন, "কিট্‌ন কিট্‌ন" (কৃষ্ণ কৃষ্ণ)। ভাবে নিমগ্ন। নাম সম্পূর্ণ উচ্চারণ হইতেছে না।

রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল। কীর্তনিয়ারা ওই ভাবের গান গাহিতেছেন।

ঠাকুর আখর দিতেছেন —

"ধনি দাঁড়ালো রে
অঙ্গ হেলাইয়ে ধনি দাঁড়ালো রে।
শ্যামের বামে ধনি দাঁড়ালো রে।
তমাল বেড়ি বেড়ি ধনি দাঁড়ালো রে।"

এইবার নামসংকীর্তন। তাহারা খোল-করতাল সঙ্গে গাহিতে লাগিল "রাধে গোবিন্দ জয়!" ভক্তেরা সকলেই উন্মত্ত!

ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন। ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া আনন্দে নাচিতেছেন। মুখে "রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে গোবিন্দ জয়।"

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৫ই জুন 1884/06/15/ii

21.2 সরলতা ও ঈশ্বরলাভ — ঈশ্বরের সেবা আর সংসারের সেবা

কীর্তনান্তে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে একটু উপবেশন করিয়াছেন। এমন সময়ে নিরঞ্জন আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়াই দাঁড়াইয়া উঠিলেন। আনন্দে বিস্ফারিত লোচনে সস্মিত মুখে বলিয়া উঠিলেন, "তুই এসেছিস!"

(মাস্টারের প্রতি) — "দেখ, এ-ছোকরাটি বড় সরল। সরলতা পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা না করলে হয় না। কপটতা, পাটোয়ারী — এ-সব থাকতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

"দেখছো না, ভগবান যেখানে অবতার হয়েছেন, সেখানেই সরলতা। দশরথ কত সরল। নন্দ — শ্রীকৃষ্ণের বাবা কত সরল। লোকে বলে, আহা কি স্বভাব, ঠিক যেন নন্দ ঘোষ!"

ভক্তরা সরল। ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিতেছেন যে, আবার ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (নিরঞ্জনের প্রতি) — দেখ, তোর মুখে যেন একটা কালো আবরণ পড়েছে। তুই আফিসের কাজ করিস কি না, তাই পড়েছে। আফিসের হিসাবপত্র করতে হয়, — আরও নানারকম কাজ আছে; সর্বদা ভাবতে হয়।

“সংসারী লোকেরা যেমন চাকরি করে তুইও চাকরি করছিস। তবে একটু তফাত আছে। তুই মার জন্য চাকরি স্বীকার করেছিস।

“মা গুরুজন ব্রহ্মময়ীস্বরূপা। যদি মাগছেলের জন্যে চাকরি করতিস, তাহলে আমি বলতুম, ধিক্! ধিক্! শত ধিক্! একশ ছি!

(মণি মল্লিকের প্রতি) — “দেখ, ছোকরাটি ভারী সরল। তবে আজকাল একটু-আধটু মিথ্যা কথা কয়, এই যা দোষ। সেদিন বলে গেল যে আসবে, কিন্তু আর এল না। (নিরঞ্জনের প্রতি) তাই রাখাল বলেছিল —— তুই এঁড়েদয়ে এসেও দেখা করিস নাই কেন?”

নিরঞ্জন —— আমি এঁড়েদয়ে সবে দুদিন এসেছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নিরঞ্জনের প্রতি) — ইনি হেডমাস্টার! তোর সঙ্গে দেখা করতে গিছিলেন। আমি পাঠিয়েছিলাম। (মাস্টারের প্রতি) তুমি সেদিন বাবুরামকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলে?

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৫ই জুন 1884/06/15/iii

21.3 শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও গোপীপ্রেম

ঠাকুর পশ্চিমের কামরায় দু-চারজন ভক্তের সহিত কথাবার্তা কহিতেছেন। সেই ঘরে টেবিল-চেয়ার কয়েকখানা জড় করা ছিল।

ঠাকুর টেবিলে ভর দিয়া অর্ধেক দাঁড়িয়েছেন, অর্ধেক বসেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — আহা, গোপীদের কি অনুরাগ! তমাল দেখে একেবারে প্রেমোন্মাদ! শ্রীমতীর এরূপ বিরহানল যে চক্ষের জল সে আগুনের ঝাঁযে শুকিয়ে যেত —— জল হতে হতে বাষ্প হয়ে উড়ে যেত। কখনও কখনও তাঁর ভাব কেউ টের পেত না। সায়ের দীঘিতে হাতি নামলে কেউ টের পায় না।

মাস্টার —— আজ্ঞে হাঁ, গৌরাঙ্গেরও ওইরকম হয়েছিল। বন দেখে বৃন্দাবন ভেবেছিলেন, সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবেছিলেন ——

শ্রীরামকৃষ্ণ —— আহা, সেই প্রেমের যদি একবিন্দু কারু হয়! কি অনুরাগ! কি ভালবাসা! শুধু ষোল আনা অনুরাগ নয়, পাঁচ সিকা পাঁচ আনা! এরই নাম প্রেমোন্মাদ। কথাটা এই তাঁকে ভালবাসতে হবে। তাঁর জন্য ব্যাকুল হতে হবে। তা তুমি যে পথেই থাক, সাকারেই বিশ্বাস কর বা নিরাকারেই বিশ্বাস কর, — ভগবান মানুষ হয়ে অবতার হন, এ-কথা বিশ্বাস কর আর না কর; — তাঁতে অনুরাগ থাকলেই হল। তখন তিনি যে কেমন, নিজেই জানিয়ে দেবেন।

“যদি পাগল হতে হয়, সংসারের জিনিস লয়ে কেন পাগল হবে? যদি পাগল হতে হয়, তবে ঈশ্বরের জন্য পাগল হও!”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৫ই জুন 1884/06/15/iv

21.4 ভবনাথ, মহিমা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে হরিকথাপ্রসঙ্গে

ঠাকুর হলঘরে আবার ফিরিলেন। তাঁহার বসিবার আসনের কাছে একটি তাকিয়া দেওয়া হইল। ঠাকুর বসিবার সময় “ওঁ তৎসৎ” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাকিয়া স্পর্শ করিলেন। বিষয়ী লোকেরা এই বাগানে আসা-যাওয়া করে ও এই সকল তাকিয়া ব্যবহার করে; এইজন্য বুঝি ঠাকুর ওই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উপাধানটি শুদ্ধ করিয়া লইলেন; ভবনাথ, মাস্টার প্রভৃতি কাছে বসিলেন। বেলা অনেক হইয়াছে, এখনও খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন হয় নাই। ঠাকুর বালক স্বভাব। বলিলেন, “কইগো, এখনও যে দেয় না। নরেন্দ্র কোথায়?”

একজন ভক্ত (ঠাকুরের প্রতি সহাস্যে) — মহাশয়! রামবাবু অধ্যক্ষ। তিনি সব দেখছেন। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) — রাম অধ্যক্ষ! তবেই হয়েছে!

একজন ভক্ত — আজ্ঞা, রামবাবু যেখানে অধ্যক্ষ, সেখানে এইরকমই হয়ে থাকে। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — সুরেন্দ্র কোথায়? আহা, সুরেন্দ্রের বেশ স্বভাবটি হয়েছে। বড় স্পষ্ট বক্তা, কারুকে ভয় করে কথা কয় না। আর দেখ খুব মুক্তহস্ত। কেউ তার কাছে সাহায্যের জন্য গেলে শুধুহাতে ফেরে না। (মাস্টরের প্রতি) তুমি ভগবানদাসের কাছে গিয়েছিলে, কিরকম দেখলে?

মাস্টার — আজ্ঞা, কালনায় গিয়েছিলাম। ভগবানদাস খুব বুড়ো হয়েছেন। রাত্রে দেখা হয়েছিল, কাঁথার উপর শুয়েছিলেন। প্রসাদ এনে একজন খাইয়ে দিতে লাগল। চেঁচিয়ে কথা কইলে শুনতে পান। আপনার নাম শুনে বলতে লাগলেন, তোমাদের আর ভাবনা কি?

“সেই বাড়িতে নাম-ব্রহ্মের পূজা হয়।”

ভবনাথ (মাস্টারের প্রতি) — আপনি অনেকদিন দক্ষিণেশ্বরে যান নাই। ইনি আমাকে দক্ষিণেশ্বরে আপনার বিষয় জিজ্ঞাসা করছিলেন, আর বলছিলেন যে, মাস্টারের কি অরুচি হয়ে গেল।

এই বলিয়া ভবনাথ হাসিতে লাগিলেন। ঠাকুর উভয়ের কথোপকথন সমস্ত শুনিতেছিলেন। মাস্টারের প্রতি সস্নেহে দৃষ্টি করিয়া বলিতেছেন, হ্যাঁ গো, তুমি অনেকদিন যাও নাই কেন বল দেখি?

মাস্টার তো তো করিতে লাগিলেন।

এমন সময় মহিমাচরণ আসিয়া উপস্থিত। মহিমাচরণ কাশীপুরবাসী, ঠাকুরকে ভারী শ্রদ্ধাভক্তি করেন ও সর্বদা দক্ষিণেশ্বরে যান। ব্রাহ্মণ সন্তান, কিছু পৈতৃকবিষয় আছে। স্বাধীন ভাবে থাকেন, কাহারও চাকরি করেন না। সর্বদা শাস্ত্রালোচনা ও ঈশ্বরচিন্তা করেন। কিছু পাণ্ডিত্যও আছে। ইংরেজী, সংস্কৃত অনেক গ্রন্থ পাড়িয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, মহিমার প্রতি) — একি! এখানে জাহাজ এসে উপস্থিত। (সকলের হাস্য) এমন জায়গায় ডিঙি-টিঙি আসতে পারে; এ যে একেবারে জাহাজ! (সকলের হাস্য) তবে একটা কথা আছে — এটা আষাঢ় মাস। (সকলের হাস্য)

মহিমাচরণের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) — আচ্ছা, লোককে খাওয়ানো একরকম তাঁরই সেবা করা, কি বল? সব জীবের ভিতরে তিনি অগ্নিরূপে রয়েছেন। খাওয়ানো কিনা, তাঁকে আহুতি দেওয়া।

“কিন্তু তা বলে অসৎ লোককে খাওয়াতে নাই। এমন লোক, যারা ব্যভিচারাদি মহাপাতক করেছে — ঘোর বিষয়াসক্ত লোক, এরা যেখানে বসে খায়, সে জায়গায় সাত হাত মাটি অপবিত্র হয়।

“হৃদে সিওড়ে একবার লোক খাইয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই খারাপ লোক। আমি বললুম, ‘দেখ হৃদে, ওদের যদি তুই খাওয়াস, তবে এই তোর বাড়ি থেকে

চললুম।’ (মহিমার প্রতি) — আচ্ছা, আমি শুনেছি, তুমি আগে লোকদের খুব খাওয়াতে, এখন বুঝি খরচা বেড়ে গেছে?” (সকলের হাস্য)

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৫ই জুন 1884/06/15/v

21.5 ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে

এইবার পাতা হইতেছে। দক্ষিণের বারান্দায়। ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিতেছেন, আপনি একবার যাও, দেখো ওরা সব কি করছে। আর আপনাকে আমি বলতে পারি না, না হয় একটু পরিবেশন করলে? মহিমাচরণ বলিতেছেন, “নিয়ে আসুক না তারপর দেখা যাবে,” এই বলিয়া ‘হুঁ হুঁ করিয়া একটু দালানের দিকে গেলেন, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিলেন।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে পরমানন্দে আহার করিতে বসিলেন। আহারান্তে ঘরে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। ভক্তেরাও দক্ষিণের পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে আচমন করিয়া পান খাইতে খাইতে আবার ঠাকুরের কাছে আসিয়া জুটিলেন। সকলেই আসন গ্রহণ করিলেন। বেলা দুইটার পর প্রতাপ আসিয়া উপস্থিত। তিনি একজন ব্রাহ্মভক্ত। আসিয়া ঠাকুরকে অভিবাদন করিলেন। ঠাকুরও মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিলেন। প্রতাপের সহিত অনেক কথাবার্তা হইতেছে।

প্রতাপ — মহাশয়! আমি পাহাড়ে গিয়েছিলাম। (দার্জিলিং-এ)

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিন্তু তোমার শরীর তো তত ভাল হয় নাই। তোমার কি অসুখ হয়েছে?

প্রতাপ — আজ্ঞা, তাঁর যে অসুখ ছিল, আমারও সেই অসুখ হয়েছে।

কেশবের ওই অসুখ ছিল। কেশবের অন্যান্য কথা হইতে লাগিল। প্রতাপ বলিতে লাগিলেন, কেশবের বৈরাগ্য বাল্যকাল থেকেই দেখা গিয়েছিল। তাঁকে আহ্লাদ আমোদ করতে প্রায় দেখা যেত না। হিন্দু কলেজে পড়তেন, সেই সময় সত্যেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব হয়। আর ওই সূত্রে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ হয়। কেশবের দুই-ই ছিল। যোগও ছিল, ভক্তিও ছিল। সময়ে সময়ে তাঁর ভক্তির এত উচ্ছ্বাস হত যে মাঝে মাঝে মূর্ছা হত। গৃহস্থদের ভিতর ধর্ম আনা তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

[লোকমান্য ও অহংকার — “আমি কর্তা” “আমি গুরু” — দর্শনের লক্ষণ]

একটি মহারাষ্ট্রদেশীয় স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

প্রতাপ — এ-দেশের মেয়েরাও কেউ কেউ বিলেতে গেছে। একটি মহারাষ্ট্র দেশের মেয়ে, খুব পণ্ডিত, বিলেতে গিছিল। তিনি কিন্তু খ্রীষ্টান হয়েছেন। মহাশয় কি তাঁর নাম শুনেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — না; তবে তোমার মুখে যা শুনলুম তাতে বোধ হচ্ছে যে, তার লোকমান্য হবার ইচ্ছা। এরূপ অহংকার ভাল নয়। 'আমি করছি', এটি অজ্ঞান থেকে হয়; হে ঈশ্বর, তুমি করছ — এইটি জ্ঞান। ঈশ্বরই কর্তা আর সব অকর্তা।

" 'আমি' 'আমি' করলে কত যে দুর্গতি হয় বাছুরের অবস্থা ভাবলে বুঝতে পারবে। বাছুর 'হাম্ মা' 'হাম্ মা' (আমি আমি) করে। তার দুর্গতি দেখ। হয়তো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লাঙ্গল টানতে হচ্ছে; রোদ নাই, বৃষ্টি নাই। হয়তো কসাই কেটে ফেললে। মাংসগুলো লোকে খাবে। ছালটা চামড়া হবে। সেই চামড়ায় জুতো এই সব তৈয়ার হবে। লোক তার উপর পা দিয়ে চলে যাবে। তাতেও দুর্গতির শেষ হয় না। চামড়ায় ঢাক তৈয়ার হয়। আর ঢাকের কাঠি দিয়ে অনবরত চামড়ার উপর আঘাত করে। অবশেষে কিনা নাড়ীভুঁড়িগুলো নিয়ে তাঁত তৈয়ার করে; যখন ধুনুরীর তাঁত তৈয়ার হয় তখন ধোনবার সময় 'তুঁহু তুঁহু' বলে। আর 'হাম্ মা, হাম্ মা' বলে না। তুঁহু তুঁহু বলে, তবেই নিস্তার, তবেই তার মুক্তি। কর্মক্ষেত্রে আর আসতে হয় না।

"জীবও যখন বলে, 'হে ঈশ্বর, আমি কর্তা নই, তুমিই কর্তা — আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী', তখনই জীবের সংসার-যন্ত্রণা শেষ হয়। তখনই জীবের মুক্তি হয়, আর এ কর্মক্ষেত্রে আসতে হয় না।"

একজন ভক্ত — জীবের অহংকার কেমন করে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বরকে দর্শন না করলে অহংকার যায় না। যদি কারু অহংকার গিয়ে থাকে, তার অবশ্য ঈশ্বরদর্শন হয়েছে।

একজন ভক্ত — মহাশয়! কেমন করে জানা যায় যে, ঈশ্বরদর্শন হয়েছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরদর্শন করেছে, তার চারিটি লক্ষণ হয়, (১) বালকবৎ, (২) পিশাচবৎ, (৩) জড়বৎ, (৪) উন্মাদবৎ।

“যার ঈশ্বরদর্শন হয়েছে, তার বালকের স্বভাব হয়। সে ত্রিগুণাতীত — কোন গুণের আঁট নাই। আবার শুচি অশুচি তার কাছে দুই সমান — তাই পিশাচবৎ। আবার পাগলের মতো ‘কভু হাসে, কভু কাঁদে’; এই বাবুর মতো সাজে-গোজে, আবার খানিক পরে ন্যাংটা; বগলের নিচে কাপড় রেখে বেড়াচ্ছে — তাই উন্মাদবৎ। আবার কখনও বা জড়ের ন্যায় চুপ করে বসে আছে — জড়বৎ।”

একজন ভক্ত — ঈশ্বরদর্শনের পর কি অহংকার একেবারে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কখন কখন তিনি অহংকার একেবারে পুঁছে ফেলেন — যেমন সমাধি অবস্থায়। আবার প্রায় অহংকার একটু রেখে দেন। কিন্তু সে অহংকারে দোষ নাই। যেমন বালকের অহংকার। পাঁচ বছরের বালক ‘আমি’ ‘আমি’ করে কিন্তু কারু অনিষ্ট করতে জানে না।

“পরশমণি ছুঁলে লোহা সোনা হয়ে যায়। লোহার তরোয়াল সোনার তরোয়াল হয়ে যায়। তরোয়ালের আকার থাকে, কারু অনিষ্ট করে না। সোনার তরোয়ালে মারা কাটা চলে না।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৫ই জুন 1884/06/15/vi

21.6 বিলাতে কাঞ্চনের পূজা — জীবনের উদ্দেশ্য কর্ম না ঈশ্বরলাভ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি) — তুমি বিলাতে গিয়েছিলে, কি দেখলে, সব বল।

প্রতাপ — বিলাতের লোকেরা আপনি যাকে কাঞ্চন বলেন, তারই পূজা করে — অবশ্য কেউ কেউ ভাল লোক — অনাসক্ত লোক আছে। কিন্তু সাধারণতঃ আগাগোড়া রজোগুণের কাণ্ড। আমেরিকাতেও তাই দেখে এলুম।

[বিলাত ও কর্মযোগ — কলিযুগে কর্মযোগ না ভক্তিযোগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপকে) — বিষয়কর্মে আসক্তি শুধু যে বিলাতে আছে, এমন নয়। সব জায়গায় আছে। তবে কি জান? কর্মকাণ্ড হচ্ছে আদিকাণ্ড। সত্ত্বগুণ (ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া এই সব) না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। রজোগুণে কাজের আড়ম্বর হয়। তাই রজোগুণ থেকে তমোগুণ এসে পড়ে। বেশি কাজ জড়ালেই ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। আর কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি বাড়ে।

“তবে কর্ম একেবারে ত্যাগ করবার জো নাই। তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম করাবে। তা তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর। তাই বলেছে অনাসক্ত হয়ে কর্ম কর।

অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা; — কিনা, কর্মের ফল আকাঙ্ক্ষা করবে না। যেমন পূজা জপতপ করছো, কিন্তু লোকমান্য হবার কিম্বা পুণ্য করবার জন্য নয়।

“এরূপ অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার নাম কর্মযোগ। ভারী কঠিন। একে কলিযুগ, সহজেই আসক্তি এসে যায়। মনে করছি অনাসক্ত হয়ে কাজ করছি কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে আসক্তি এসে যায়, জানতে দেয় না। হয়তো পূজা মহোৎসব করলুম, কি অনেক গরিব কাঙালদের সেবা করলুম — মনে করলুম যে, অনাসক্ত হয়ে করছি, কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে লোকমান্য হবার ইচ্ছা হয়েছে, জানতে দেয় না। তবে একেবারে অনাসক্ত হওয়া সম্ভব কেবল তাঁর, যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে।”

একজন ভক্ত — যাঁরা ঈশ্বরকে লাভ করেন নাই তাঁদের উপায় কি? তাঁরা কি বিষয়কর্ম সব ছেড়ে দেবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কলিতে ভক্তিযোগ। নারদীয় ভক্তি। ঈশ্বরের নামগুণগান ও ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করা; ‘হে ঈশ্বর, আমায় জ্ঞান দাও, আমায় দেখা দাও।’ কর্মযোগ বড় কঠিন। তাই প্রার্থনা করতে হয়, ‘হে ঈশ্বর, আমার কর্ম কমিয়ে দাও। আর যেটুকু কর্ম রেখেছো, সেটুকু যেন তোমার কৃপায় অনাসক্ত হয়ে করতে পারি। আর যেন বেশি কর্ম জড়াতে না ইচ্ছা হয়।’

“কর্ম ছাড়বার জো নাই। আমি চিন্তা করছি, আমি ধ্যান করছি, এও কর্ম। ভক্তিলাভ করলে বিষয়কর্ম আপনা-আপনি কমে যায়। আর ভাল লাগে না। ওলা মিছরির পানা পেলে চিটেগুড়ের পানা কে খেতে চায়?”

একজন ভক্ত — বিলেতের লোকেরা কেবল “কর্ম কর” করে। কর্ম তবে জীবনের উদ্দেশ্য নয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। কর্ম তো আদিকাণ্ড; জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তবে নিষ্কামকর্ম একটি উপায়, — উদ্দেশ্য নয়।

“শম্ভু বললে, এখন এই আশীর্বাদ করুন যে, টাকা আছে, সেগুলি সদ্ব্যয়ে যায়, — হাসপাতাল, ডিস্পেনসারি করা, রাস্তা-ঘাট করা, কুয়ো করা এই সবে। আমি বললাম, এ-সব কর্ম অনাসক্ত হয়ে করতে পারলে ভাল, কিন্তু তা বড় কঠিন। আর যাই হোক এটি যেন মনে থাকে যে, তোমার মানবজন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। হাসপাতাল, ডিস্পেনসারি করা নয়! মনে কর ঈশ্বর তোমার সামনে এলেন; এসে বললেন, তুমি বর লও। তাহলে তুমি কি বলবে, আমায় কতকগুলো হাসপাতাল, ডিস্পেনসারি করে দাও, না বলবে — হে ভগবান, তোমার পাদপদ্মে যেন শুদ্ধাভক্তি হয়, আর যেন তোমাকে আমি সর্বদা দেখতে পাই। হাসপাতাল, ডিস্পেনসারি — এ-সব অনিত্য বস্তু। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। তাঁকে লাভ হলে আবার বোধ হয়, তিনিই কর্তা আমরা অকর্তা। তবে কেন তাঁকে ছেড়ে নানা কাজ বাড়িয়ে মরি? তাঁকে লাভ হলে তাঁর ইচ্ছায় অনেক হাসপাতাল, ডিস্পেনসারি হতে পারে। তাই বলছি, কর্ম আদিকাণ্ড। কর্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয়। সাধন করে আরও এগিয়ে পড়। সাধন করতে করতে আরও এগিয়ে পড়লে শেষে জানতে পারবে যে ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু, ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য।

“একজন কাঠুরে বনে কাঠ কাটতে গিছিল। হঠাৎ এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হল। ব্রহ্মচারী বললেন, ‘ওহে, এগিয়ে পড়ো।’ কাঠুরে বাড়িতে ফিরে এসে ভাবতে লাগল ব্রহ্মচারী এগিয়ে যেতে বললেন কেন?

“এইরকমে কিছুদিন যায়। একদিন সে বসে আছে, এমন সময় এই ব্রহ্মচারীর কথাগুলি মনে পড়ল। তখন সে মনে মনে বললে, আজ আমি আরও এগিয়ে যাব। বনে গিয়ে আরও এগিয়ে দেখে যে, অসংখ্য চন্দনের গাছ। তখন আনন্দে গাড়ি গাড়ি চন্দনের কাঠ নিয়ে এল, আর বাজারে বেচে খুব বড়মানুষ হয়ে গেল।

“এইরকমে কিছুদিন যায়। আর-একদিন মনে পড়ল ব্রহ্মচারী বলেছেন, ‘এগিয়ে পড়।’ তখন আবার বনে গিয়ে এগিয়ে দেখে নদীর ধারে রূপোর খনি। এ-কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। তখন খনি থেকে কেবল রূপো নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতে লাগল। এত টাকা হল যে আণ্ডিল হয়ে গেল।

“আবার কিছুদিন যায়। একদিন বসে ভাবছে ব্রহ্মচারী তো আমাকে রূপোর খনি পর্যন্ত যেতে বলেন নাই — তিনি যে এগিয়ে যেতে বলেছেন। এবার নদীর পারে গিয়ে দেখে, সোনার খনি! তখন সে ভাবলে, ওহো! তাই ব্রহ্মচারী বলেছিলেন, এগিয়ে পড়।

“আবার কিছুদিন পরে এগিয়ে দেখে, হীরে মাণিক রাশিকৃত পড়ে আছে। তখন তার কুবেরের মতো ঐশ্বর্য হল।

“তাই বলছি যে, যা কিছু কর না কেন, এগিয়ে গেলে আরও ভাল জিনিস পাবে। একটু জপ করে উদ্দীপন হয়েছে বলে মনে করো না, যা হবার তা হয়ে

গেছে। কর্ম কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য নয়। আরও এগোও, কর্ম নিষ্কাম করতে পারবে। তবে, নিষ্কামকর্ম বড় কঠিন, তাই ভক্তি করে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, ‘হে ঈশ্বর, তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দাও, আর কর্ম কমিয়ে দাও; আর যেটুকু রাখবে, সেটুকু কর্ম যেন নিষ্কাম হয়ে করতে পারি’।

“আরও এগিয়ে গেলে ঈশ্বরকে লাভ হবে। তাঁকে দর্শন হবে। ক্রমে তাঁর সঙ্গে আলাপ কথাবার্তা হবে।”

কেশবের স্বর্গলাভের পর মন্দিরের বেদী লইয়া যে বিবাদ হয়, এইবার তাহার কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি) — শুনছি তোমার সঙ্গে বেদী নিয়ে নাকি ঝগড়া হয়েছে। যারা ঝগড়া করেছে, তারা তো সব হরে, প্যালা, পঞ্চা! (সকলের হাস্য)

(ভক্তদের প্রতি) — “দেখ, প্রতাপ, অমৃত —— এ-সব শাঁখ বাজে। আর যা সব শুন তাদের কোন আওয়াজ নাই।” (সকলের হাস্য)

প্রতাপ —— মহাশয়, বাজে যদি বললেন তো আঁবের কশিও বাজে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৫ই জুন 1884/06/15/vii

21.7 ব্রাহ্মসমাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণ — প্রতাপকে শিক্ষা

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি) — দেখো, তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের লেকচার শুনলে লোকটার ভাব বেশ বোঝা যায়। এক হরিসভায় আমায় নিয়ে গিছিল। আচার্য হয়েছিলেন একজন পণ্ডিত, তাঁর নাম সামাধ্যায়ী। বলে কি, ঈশ্বর নীরস, আমাদের প্রেমভক্তি দিয়ে তাঁকে সরস করে নিতে হবে। এই কথা শুনে অবাক্! তখন একটা গল্প মনে পড়ল। একটি ছেলে বলেছিল, আমার মামার বাড়িতে অনেক ঘোড়া আছে, একগোয়াল ঘোড়া! এখন গোয়াল যদি হয় তাহলে কখনও ঘোড়া থাকতে পারে না, গরু থাকাই সম্ভব। এরূপ অসম্বদ্ধ কথা শুনলে লোকে কি ভাবে? এই ভাবে যে, ঘোড়া-টোড়া কিছুই নাই (সকলের হাস্য)

একজন ভক্ত — ঘোড়া তো নাই-ই। গরুও নাই। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখ দেখিন্, যিনি রসস্বরূপ তাঁকে কিনা বলছে 'নীরস'। এতে এই বোঝা যায় যে, ঈশ্বর যে কি জিনিস, কখনও অনুভব করে নাই।

["আমি কর্তা" "আমার ঘর" অজ্ঞান — জীবনের উদ্দেশ্য "ডুব দাও"]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি) — দেখ, তোমায় বলি, তুমি লেখাপড়া জান, বুদ্ধিমান, গম্ভীরাত্মা। কেশব আর তুমি ছিলে, যেন গৌর-নিতাই দুভাই। লেকচার দেওয়া, তর্ক, ঝগড়া, বাদ-বিসম্বাদ — এসব অনেক তো হল। আর কি এ-সব তোমার ভাল লাগে? এখন সব মনটে কুড়িয়ে ঈশ্বরের দিকে দাও। ঈশ্বরেতে এখন ঝাঁপ দাও।

প্রতাপ — আজ্ঞা হাঁ, তার সন্দেহ নাই, তাই করা কর্তব্য। তবে এ-সব করা তাঁর নামটা যাতে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া) — তুমি বলছো বটে, তাঁর নাম রাখবার জন্য সব করছো; কিন্তু কিছুদিন পরে এ-ভাবও থাকবে না। একটা গল্প শোন —

“একজন লোকের পাহাড়ের উপর একখানা ঘর ছিল। কুঁড়েঘর। অনেক মেহনত করে ঘরখানি করেছিল। কিছুদিন পরে একদিন ভারী ঝড় এল। কুঁড়েঘর টলটল করতে লাগল। তখন ঘর রক্ষার জন্য সে ভারী চিন্তিত হল। বললে, হে পবনদেব, দেখো ঘরটি ভেঙো না বাবা! পবনদেব কিন্তু শুনছেন না। ঘর মড়মড় করতে লাগল; তখন লোকটা একটা ফিকির ঠাওরালে; — তার মনে পড়ল যে, হনুমান পবনের ছেলে। যাই মনে পড়া অমনি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল — বাবা! ঘর ভেঙো না, হনুমানের ঘর, দোহাই তোমার। ঘর তবুও মড়মড় করে। কেবা তার কথা শুনে। অনেকবার 'হনুমানের ঘর' 'হনুমানের ঘর' করার পরে দেখলে যে কিছুই হল না। তখন বলতে লাগল, বাবা 'লক্ষণের ঘর!''লক্ষণের ঘর!' তাতেও হল না। তখন বলে বাবা, 'রামের ঘর!' 'রামের ঘর!' দেখো বাবা ভেঙো না, দোহাই তোমার। তাতেও কিছু হল না, ঘর মড়মড় করে ভাঙতে আরম্ভ হল। তখন প্রাণ বাঁচাতে হবে, লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় বলছে — যা শালার ঘর!

(প্রতাপের প্রতি) — “কেশবের নাম তোমায় রক্ষা করতে হবে না। যা কিছু হয়েছে, জানবে — ঈশ্বরের ইচ্ছায়! তাঁর ইচ্ছাতে হল আবার তাঁর ইচ্ছাতে

যাচ্ছে; তুমি কি করবে? তোমার এখন কর্তব্য যে ঈশ্বরেতে সব মন দাও — তাঁর প্রেমের সাগরে ঝাঁপ দাও।

এই কথা বলিয়া ঠাকুর সেই অতুলনীয় মধুর গান গাহিতে লাগিলেন:

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন ।।

(প্রতাপের প্রতি) — "গান শুনলে? লেকচার, ঝগড়া ও-সব তো অনেক হল, এখন ডুব দাও। আর এ-সমুদ্রে ডুব দিলে মরবার ভয় নাই। এ যে অমৃতের সাগর! মনে করো না যে এতে মানুষ বেহেড হয়; মনে করো না যে বেশি ঈশ্বর ঈশ্বর করলে মানুষ পাগল হয়ে যায়। আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলাম —"

প্রতাপ — মহাশয়, নরেন্দ্র কে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ও আছে একটি ছোকরা। আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলুম, দেখ, ঈশ্বর রসের সাগর। তোর ইচ্ছা হয় না কি যে, এই রসের সাগরে ডুব দিই? আচ্ছা মনে কর, এক খুলি রস আছে, তুই মাছি হয়েছিস; তা কোন্‌খানে বসে রস খাবি? নরেন্দ্র বললে, 'আমি খুলির কিনারায় বসে মুখ বাড়িয়ে খাব।' আমি জিজ্ঞাসা কল্লুম, কেন? কিনারায় বসবি কেন? সে বললে, 'বেশি দূরে গেলে ডুবে যাব, আর প্রাণ হারাব!' তখন আমি বললুম, 'বাবা! সচ্চিদানন্দসাগরে ডুব দিলে মৃত্যু হয় না, মানুষ অমর হয়। ঈশ্বরেতে পাগল হলে মানুষ বেহেড হয় না।'

(ভক্তদের প্রতি) — ‘আমি’ আর ‘আমার’ এইটির নাম অজ্ঞান। রাসমণি কালীবাড়ি করেছেন, এই কথাই লোকে বলে। কেউ বলে না যে, ঈশ্বর করেছেন। ‘ব্রাহ্মসমাজ অমুক লোক করে গেছেন’ — এ-কথা আর কেউ বলে না যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এটি হয়েছে! আমি করছি এইটির নাম অজ্ঞান। হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর আমি অকর্তা; তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; এইটির নাম জ্ঞান। হে ঈশ্বর আমার কিছুই নয় — এ মন্দির আমার নয়, এ কালীবাড়ি আমার নয়, এ সমাজ আমার নয়, এ-সব তোমার জিনিস; এ স্ত্রী, পুত্র, পরিবার এ-সব কিছুই আমার নয়, সব তোমার জিনিস; এর নাম জ্ঞান।

“আমার জিনিস, আমার জিনিস, বলে — সেই সকল জিনিসকে ভালবাসার নাম মায়া। সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া। শুধু ব্রাহ্মসমাজের লোকগুলিকে ভালবাসি, কি শুধু পরিবারদের ভালবাসি, এর নাম মায়া। শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসি এর নাম মায়া; সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোকদের ভালবাসা, এটি দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়।

“মায়াতে মানুষ বদ্ধ হয়ে যায়, ভগবান থেকে বিমুখ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বরলাভ হয়। শুকদেব, নারদ এঁরা দয়া রেখেছিলেন।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৫ই জুন 1884/06/15/viii

21.8 প্রতাপকে শিক্ষা — ব্রাহ্মসমাজ ও কামিনী-কাঞ্চন

প্রতাপ — যাঁরা মহাশয়ের কাছে আসেন, তাঁদের ক্রমে ক্রমে উন্নতি হচ্ছে তো?

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি বলি যে, সংসার করতে দোষ কি? তবে সংসারে দাসীর মতো থাক।

[গৃহস্থের সাধন]

“দাসী মনিবের বাড়ির কথায় বলে, ‘আমাদের বাড়ি’। কিন্তু তার নিজের বাড়ি হয়তো কোন পাড়াগাঁয়ে। মনিবের বাড়িকে দেখিয়ে মুখে বলে, ‘আমাদের বাড়ি’। মনে জানে যে ও-বাড়ি আমাদের নয়, আমাদের বাড়ি সেই পাড়াগাঁয়ে। আবার মনিবের ছেলেকে মানুষ করে, আর বলে, ‘হরি আমার বড় দুষ্টু হয়েছে’; ‘আমার হরি মিষ্টি খেতে ভালবাসে না।’ ‘আমার হরি’ মুখে বলে বটে, কিন্তু জানে যে, হরি আমার নয়, মনিবের ছেলে।

“তাই যারা আসে, তাদের আমি বলি, সংসার কর না কেন, তাতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরেতে মন রেখে কর, জেনো যে বাড়িঘর পরিবার আমার নয়; এ-সব ঈশ্বরের। আমার ঘর ঈশ্বরের কাছে। আর বলি যে, তাঁর পাদপদ্মে ভক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে সর্বদা প্রার্থনা করবে।”

বিলাতের কথা আবার পড়িল। একজন ভক্ত বলিলেন, আজকাল বিলাতের পণ্ডিতেরা নাকি ঈশ্বর আছেন এ-কথা মানেন না।

প্রতাপ — মুখে যে যা বলুন, আন্তরিক তাঁরা যে কেউ নাস্তিক তা আমার বোধ হয় না। এই জগতের ব্যাপারের পেছনে যে একটা মহাশক্তি আছে, এ-কথা অনেককেই মানতে হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাহলেই হল; শক্তি তো মানছে? নাস্তিক কেন হবে?

প্রতাপ — তা ছাড়া ইওরোপের পণ্ডিতেরা moral government (সৎকার্যের পুরস্কার আর পাপের শাস্তি এই জগতে হয়) এ-কথাও মানেন।

অনেক কথাবার্তার পর প্রতাপ বিদায় লইতে গাত্রোত্থান করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রতি) — আর কি বলব তোমায়? তবে এই বলা যে, আর ঝগড়া-বিবাদের ভিতর থেকো না।

"আর-এককথা — কামিনী-কাঞ্চনই ঈশ্বর থেকে মানুষকে বিমুখ করে। সেদিকে যেতে দেয় না। এই দেখ না, সকলেই নিজের পরিবারকে সুখ্যাত করে। (সকলের হাস্য) তা ভালই হোক আর মন্দই হোক, — যদি জিজ্ঞাসা কর, তোমার পরিবারটি কেমন গা, অমনি বলে, 'আজ্ঞে খুব ভাল' — "

প্রতাপ — তবে আমি আসি।

প্রতাপ চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের অমৃতময়ী কথা, কামিনী-কাঞ্চনত্যাগের কথা সমাপ্ত হইল না। সুরেন্দ্রের বাগানের বৃক্ষস্থিত পত্রগুলি দক্ষিণাবায়ু সংঘাতে দুলিতেছিল ও মর্মর শব্দ করিতেছিল। কথাগুলি সেই শব্দের সঙ্গে মিশাইয়া

গেল। একবার মাত্র ভক্তদের হৃদয়ে আঘাত করিয়া অবশেষে অনন্ত আকাশে লয়প্রাপ্ত হইল।

কিন্তু প্রতাপের হৃদয়ে কি এ-কথা প্রতিধ্বনিত হয় নাই?

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক ঠাকুরকে বলিতেছেন —

মহাশয়, এই বেলা দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করুন। আজ সেখানে কেশব সেনের মা ও বাড়ির মেয়েরা আপনাকে দর্শন করতে যাবেন। তাঁরা আপনাকে না দেখতে পেলে হয়তো দুঃখিত হয়ে ফিরে আসবেন।

কয় মাস হইল কেশব স্বর্গারোহন করিয়াছেন। তাই তাঁহার বৃদ্ধা মাতাঠাকুরানী, পরিবার ও বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি মল্লিকের প্রতি) — রোসো বাপু, একে আমার ঘুম-টুম হয় নাই; — তাড়াতাড়ি করতে পারি না। তারা গেছে তা আর কি করব। আর সেখানে তারা বাগানে বেড়াবে, চ্যাড়াবে — বেশ আনন্দ হবে।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ঠাকুর যাত্রা করিতেছেন — দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন। খাইবার সময় সুরেন্দ্রের কল্যাণ চিন্তা করিতেছেন। সব ঘরে এক-একবার যাইতেছেন আর মৃদু মৃদু নামোচ্চারণ করিতেছেন। কিছু অসম্পূর্ণ রাখিবেন না, তাই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই বলিতেছেন, “আমি তখন নুচি খাই নাই, একটু নুচি এনে দাও।” কণিকামাত্র লইয়া খাইতেছেন আর বলিতেছেন, “এর অনেক মানে আছে। নুচি খাই নাই মনে হলে আবার আসবার ইচ্ছা হবে।” (সকলের হাস্য)

মণি মল্লিক (সহাস্যে) — বেশ তো আমরাও আসতাম।

ভক্তেরা সকলে হাসিতেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c22 ২২ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে সুরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, লাটু, মাস্টার, অধর প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২০শে জুন 1884/06/20

22.1 শ্রীযুক্ত বাবুরাম, রাখাল, লাটু, নিরঞ্জন, নরেন্দ্র প্রভৃতির চরিত্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে নিজের ঘরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে, তাই জগন্মাতার নাম ও চিন্তা করিতেছেন। ঘরে রাখাল, অধর, মাস্টার, আরও দু-একজন ভক্ত আছেন।

আজ শুক্রবার (৭ই আষাঢ়), জৈষ্ঠ কৃষ্ণা দ্বাদশী, ২০শে জুন, ১৮৮৪। পাঁচ দিন পরে রথযাত্রা হইবে।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরবাড়িতে আরতি আরম্ভ হইল। অধর আরতি দেখিতে গেলেন। ঠাকুর মণির সহিত কথা কহিতেছেন ও আনন্দে মণির শিক্ষার জন্য ভক্তদের গল্প করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, বাবুরামের কি পড়বার ইচ্ছা আছে?

“বাবুরামকে বললাম, তুই লোকশিক্ষার জন্য পড়। সীতার উদ্ধারের পর বিভীষণ রাজ্য করতে রাজী হল না। রাম বললেন, তুমি মূর্খদের শিক্ষার জন্য রাজ্য করো। না হলে তারা বলবে, বিভীষণ রামের সেবা করেছে তার কি লাভ হল? — রাজ্যলাভ দেখলে খুশি হবে।

“তোমায় বলি সেদিন দেখলাম — বাবুরাম, ভবনাথ আর হরিশ এদের প্রকৃতি ভাব।

“বাবুরামকে দেখলাম — দেবীমূর্তি। গলায় হার। সখী সঙ্গে। ও স্বপ্নে কি পেয়েছে, ওর দেহ শুদ্ধ। একটু কিছু করলেই ওর হয়ে যাবে।

“কি জানো, দেহরক্ষার অসুবিধা হচ্ছে। ও এসে থাকলে ভাল হয়। এদের স্বভাব সব একরকম হয়ে যাচ্ছে। নোটো (লাটু) চড়েই রয়েছে (সর্বদাই ভাবেতে রয়েছে)। ক্রমে লীন হবার জো!

“রাখালের এমনি স্বভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে, তাকে আমার জল দিতে হয়! (আমার) সেবা করতে বড় পারে না।

“বাবুরাম আর নিরঞ্জন —— এদের ছাড়া কই ছোকরা? — যদি আর কেউ আসে, বোধ হয়, ওই উপদেশ নেবে; চলে যাবে।

“তবে টানাটানি করে আসতে বলি না, বাড়িতে হাঙ্গাম হতে পারে। (সহাস্যে) আমি যখন বলি ‘চলে আয় না’ তখন বেশ বলে, — ‘আপনি করে নিন না!’ রাখালকে দেখে কাঁদে। বলে, ও বেশ আছে!

“রাখাল এখন ঘরের ছেলের মতো আছে; জানি, আর ও আসক্ত হবে না। বলে, ‘ও-সব আলুনী লাগে!’ ওর পরিবার এখানে এসেছিল। ১৪ বৎসর বয়স। এখান হয়ে কোন্নগরে গেল। তারা ওকে কোন্নগরে যেতে বললে। ও গেল না। বলে —— ‘আমোদ-আহ্লাদ ভাল লাগে না।’

“নিরঞ্জনকে তোমার কিরূপ বোধ হয়?”

মাস্টার —— আজ্ঞা, বেশ চেহারা!

শ্রীরামকৃষ্ণ — না, চেহারা শুধু নয়। সরল। সরল হলে ঈশ্বরকে সহজে পাওয়া যায়। সরল হলে উপদেশে শীঘ্র কাজ হয়। পাট করে জমি কাঁকর কিছু নাই, বীজ পড়লেই গাছ হয় আর শীঘ্র ফল হয়।

“নিরঞ্জন বিয়ে করবে না। তুমি কি বল, — কামিনী-কাঞ্চনই বদ্ধ করে?”

মাস্টার — আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — পান তামাক ছাড়লে কি হবে? কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ।

“ভাবে দেখলাম, যদিও চাকরি করছে, ওকে কোন দোষ স্পর্শ করে নাই। মার জন্য কর্ম করে, — ওতে দোষ নাই।

“তোমার কর্ম যা করো, — এতে দোষ নাই। এ ভাল কাজ।

“কেরানি জেলে গেল — বদ্ধ হল — বেড়ি পরলে — আবার মুক্ত হল। মুক্ত হওয়ার পর সে কি ধেই ধেই করে নাচবে? সে আবার কেরানিগিরিই করে। তোমার উপায়ের ইচ্ছা নাই। ওদের খাওয়ানো পরানো। তারা তা না হলে কোথায় যাবে?”

মণি — কেউ নেয় তো ছাড়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা বইকি! এখন এ-ও করো, ও-ও করো।

মণি — সব ত্যাগ করতে পারা ভাগ্য!

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা বইকি! তবে যেমন সংস্কার। তোমার একটু কর্ম বাকী আছে। সেটুকু হয়ে গেলেই শান্তি — তখন তোমায় ছেড়ে দেবে। হাসপাতালে নাম লেখালে সহজে ছাড়ে না। সম্পূর্ণ সারলে তবে ছাড়ে।

“ভক্ত এখানে যারা আসে — দুই থাক। একথাক বলছে, আমায় উদ্ধার করো! হে ঈশ্বর! আর-একথাক তারা অন্তরঙ্গ, তারা ও-কথা বলে না। তাদের দুটি জিনিস জানলেই হল; প্রথম, আমি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কে? তারপর, তারা কে — আমার সঙ্গে সম্বন্ধ কি?

“তুমি এই শেষ থাকের। তা না হলে এতো সব করে. . .”

[নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জনের পুরুষভাব; বাবুরাম, ভবনাথের প্রকৃতিভাব]

“ভবনাথ, বাবুরাম এদের প্রকৃতিভাব। হরিশ মেয়ের কাপড় পরে শোয়। বাবুরাম বলেছে, ওই ভাবটা ভাল লাগে। তবেই মিললো। ভবনাথেরও ওই ভাব। নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, এদের ব্যাটাছেলের ভাব।”

[হাত ভাঙার মানে — সিদ্ধাই (Miracles) ও শ্রীরামকৃষ্ণ]

“আচ্ছা হাত ভাঙার মানেটা কি? আগে একবার ভাবাবস্থায় দাঁত ভেঙে গিছল, এবার ভাবাবস্থায় হাত ভাঙল।”

মণি চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর নিজেই বলিতেছেন —

“হাত ভেঙেছে সব অহংকার নির্মূল করবার জন্য! এখন আর ভিতরে আমি খুঁজে পাচ্ছি না। খুঁজতে গিয়ে দেখি, তিনি রয়েছেন। অহংকার একেবারে না গেলে তাঁকে পাবার জো নাই।

“চাতকের দেখ মাটিতে বাসা, কিন্তু কত উপরে উঠে!

“আচ্ছা, কাপ্তেন বলে, মাছ খাও বলে তোমার সিদ্ধাই হয় নাই।

“এক-একবার গা কাঁপে পাছে ওই সব শক্তি এসে পড়ে। এখন যদি সিদ্ধাই হয়, এখানে ডাক্তারখানা, হাসপাতাল হয়ে পড়বে। লোক এসে বলবে, ‘আমার অসুখ ভাল করে দাও!’ সিদ্ধাই কি ভাল?”

মাস্টার — আজ্ঞে, না। আপনি তো বলেছেন, অষ্ট সিদ্ধির মধ্যে একটি থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঠিক বলেছ! যারা হীনবুদ্ধি, তারাই সিদ্ধাই চায়।

“যে লোক বড় মানুষের কাছে কিছু চেয়ে ফেলে, সে আর খাতির পায় না! সে লোককে এক গাড়িতে চড়তে দেয় না; — আর যদি চড়তে দেয় তো কাছে বসতে দেয় না। তাই নিষ্কাম ভক্তি, অহেতুকি ভক্তি — সর্বাপেক্ষা ভাল।

[সাকার-নিরাকার দুই-ই সত্য — ভক্তের বাটী ঠাকুরের আড্ডা]

“আচ্ছা, সাকার-নিরাকার দুই-ই সত্য। কি বল? — নিরাকারে মন অনেকক্ষণ রাখা যায় না — তাই ভক্তের জন্য সাকার।

"কাপ্তেন বেশ বলে। পাখি উপরে খুব উঠে যখন শ্রান্ত হয়, তখন আবার ডালে এসে বিশ্রাম করে। নিরাকারের পর সাকার।

"তোমার আড্ডাটায় একবার যেতে হবে। ভাবে দেখলাম — অধরের বাড়ি, সুরেন্দ্রের বাড়ি — এ-সব আমার আড্ডা।

"কিন্তু ওরা এখানে না এলে আমার ইষ্টাপত্তি নাই।"

[ভক্তসঙ্গে লীলা পর্যন্ত বাজিকরের খেলা — চণ্ডী — দয়া ঈশ্বরের]

মাস্টার — আজ্ঞা, তা কেন হবে? সুখবোধ হলেই দুঃখ। আপনি সুখ-দুঃখের অতীত।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, আর আমি দেখছি, বাজিকর আর বাজিকরের খেলা। বাজিকরই সত্য। তাঁর খেলা সব অনিত্য — স্বপ্নের মতো।

"যখন চণ্ডী শুনতাম, তখন ওইটি বোধ হয়েছিল। এই শুম্ভ নিশুম্ভের জন্ম হল। আবার কিছুক্ষণ পরে শুনলাম বিনাশ হয়ে গেল।"

মাস্টার — আজ্ঞা, আমি কালনায় গঙ্গাধরের সঙ্গে জাহাজে করে যাচ্ছিলাম। জাহাজের ধাক্কা লেগে একনৌকা লোক, কুড়ি-পঁচিশজন ডুবে গেল! স্টীমারের তরঙ্গের ফেনার মতো জলে মিশিয়ে গেল!

“আচ্ছা, যে বাজি দেখে, তার কি দয়া থাকে? — তার কি কর্তৃত্ববোধ থাকে? — কর্তৃত্ববোধ থাকলে তবে তো দয়া থাকবে?”

শ্রীরামকৃষ্ণ —– সে একেবারে সবটা দেখে, — ঈশ্বর, মায়া, জীব, জগৎ।

“সে দেখে যে মায়া (বিদ্যা-মায়া, অবিদ্যা-মায়া), জীব, জগৎ —– আছে অথচ নাই। যতক্ষণ নিজের ‘আমি’ আছে ততক্ষণ ওরাও আছে। জ্ঞান অসির দ্বারা কাটলে পর, আর কিছুই নাই। তখন নিজের ‘আমি’ পর্যন্ত বাজিকরের বাজি হয়ে পড়ে!

মণি চিন্তা করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, “কিরকম জানো? — যেমন পঁচিশ থাক পাপড়িওয়ালা ফুল। এক চোপে কাটা!

কর্তৃত্ব! রাম! রাম! — শুকদেব, শঙ্করাচার্য এঁরা 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন। দয়া মানুষের নয়, দয়া ঈশ্বরের। বিদ্যার আমির ভিতরেই দয়া, বিদ্যার 'আমি' তিনিই হয়েছেন।”

[অতি গুহ্যকথা —– কালীব্রহ্ম —– আদ্যাশক্তির এলাকা —– কল্কি অবতার]

“কিন্তু হাজার বাজি দেখো, তবু তাঁর অণ্ডরে (Under - অধীন)। পালাবার জো নাই। তুমি স্বাধীন নও। তিনি যেমন করান তেমনি করতে হবে। সেই আদ্যাশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হয় —– তবে বাজির খেলা দেখা যায়। নচেৎ নয়।

“যতক্ষণ একটু ‘আমি’ থাকে, ততক্ষণ সেই আদ্যাশক্তির এলাকা। তাঁর অণ্ডরে —– তাঁকে ছাড়িয়ে যাবার জো নাই।

“আদ্যাশক্তির সাহায্যে অবতারলীলা। তাঁর শক্তিতে অবতার। অবতার তবে কাজ করেন। সমস্তই মার শক্তি।

“কালীবাড়ির আগেকার খাজাঞ্চী কেউ কিছু বেশিরকম চাইলে বলত ‘দু-তিনদিন পরে এসো’। মালিককে জিজ্ঞাসা করবে।

“কলির শেষে কল্কি অবতার হবে। ব্রাহ্মণের ছেলে — সে কিছু জানে না — হঠাৎ ঘোড়া আর তরবার আসবে —”

[কেশব সেনের মাতা ও ভগিনী — ধাত্রী ভুবনমোহিনী]

অধর আরতি দেখিয়া আসিয়া বসিলেন। ধাত্রী ভুবনমোহিনী মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন। ঠাকুর সকলের জিনিস খাইতে পারেন না — বিশেষতঃ ডাক্তার, কবিরাজের, ধাত্রির। অনেক যন্ত্রণা দেখেও তাহারা টাকা লন, এইজন্য খাইতে পারেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অধর প্রভৃতি ভক্তের প্রতি) — ভুবন এসেছিল। পঁচিশটা বোম্বাই আম আর সন্দেশ, রসগোল্লা এনেছিল। আমায় বললে, আপনি একটা আঁব খাবে? আমি বললাম — আমার পেট ভার। আর সত্যই দেখ না, একটু কচুরি সন্দেশ খেয়েই পেট কিরকম হয়ে গেছে।

“কেশব সেনের মা বোন এরা এসেছিল। তাই আবার খানিকটা নাচলাম। কি করি! — ভারী শোক পেয়েছে।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c23 ২৩ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পণ্ডিতদর্শন

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৫শে জুন 1884/06/25/i

23.1 ঈশানের গৃহে

আজ রথযাত্রা। বুধবার, ২৫শে জুন, ১৮৮৪; আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া। সকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় ঈশানের বাড়ি নিমন্ত্রণে আসিয়াছেন। ঠনঠনিয়ায় ঈশানের ভদ্রাসনবাটী। সেখানে আসিয়া ঠাকুর শুনিলেন যে, পণ্ডিত শশধর অনতিদূরে কলেজ স্ট্রীটে, চাটুজ্যেদের বাড়ি রহিয়াছেন। পণ্ডিতকে দেখিবার তাঁহার ভারী ইচ্ছা। বৈকালে পণ্ডিতের বাড়ি যাইবেন, স্থির হইল।

বেলা প্রায় দশটা। শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশানের নিচের বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। ঈশানের পরিচিত ভাটপাড়ার দুই-একটি ব্রাহ্মণ, তাহাদের মধ্যে একজন ভাগবতের পণ্ডিত। ঠাকুরের সঙ্গে হাজরা ও আরও দুই-একটি ভক্ত আসিয়াছেন। শ্রীশ প্রভৃতি ঈশানের ছেলেরাও উপস্থিত। একজন ভক্ত, শক্তির উপাসক, আসিয়াছেন। কপালে সিন্দূরের ফোঁটা। ঠাকুর আনন্দময়, সিন্দূরের টিপ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "উনি তো মার্কামারা।"

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র ও মাস্টার তাঁহাদের কলিকাতার বাটী হইতে আসিলেন। তাঁহারা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কাছে উপবিষ্ট হইলেন। ঠাকুর মাস্টারকে বলিয়াছিলেন, "আমি অমুক দিন ঈশানের বাড়ি যাইতেছি, তুমিও যাইবে ও নরেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া আনিবে।"

ঠাকুর মাস্টারকে বলিতেছেন, "সেদিন তোমার বাড়ি যাচ্ছিলাম — আড্ডাটা কোন্ ঠিকানায়?"

মাস্টার — আজ্ঞা, এখন শ্যামপুকুর তেলিপাড়ায়, স্কুলের কাছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আজ স্কুলে যাও নাই?

মাস্টার — আজ্ঞা, আজ রথের ছুটি।

নরেন্দ্রের পিতৃবিয়োগের পর বাড়িতে অত্যন্ত কষ্ট। তিনি পিতার জেষ্ঠপুত্র — ছোট ছোট ভাই-ভগ্নী আছে। পিতা উকিল ছিলেন, কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সংসার প্রতিপালনের জন্য নরেন্দ্র কাজকর্ম চেষ্টা করিতেছেন। ঠাকুর

নরেন্দ্রের কর্মের জন্য ঈশান প্রভৃতি ভক্তদের বলিয়া রাখিয়াছেন। ঈশান কম্পট্রোলার জেনারাল্যালের আফিসে কর্মচারিদিগের একজন অধ্যক্ষ ছিলেন। নরেন্দ্রের বাটীর কষ্ট শুনিয়া সর্বদা চিন্তিত থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) — আমি ঈশানকে তোর কথা বলেছি। ঈশান ওখানে (দক্ষিণেশ্বর-কালীমন্দিরে) একদিন ছিল কি না — তাই বলেছিলাম। তার অনেকের সঙ্গে আলাপ আছে।

ঈশান ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। সেই উপলক্ষে কতকগুলি বন্ধুদেরও নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। গান হইবে। পাখোয়াজ, বাঁয়া তবলা ও তানপুরার আয়োজন হইয়াছে। বাড়ির একজন একটি পাত্র করিয়া পাখোয়াজের জন্য ময়দা আনিয়া দিল। বেলা ১১টা হইবে। ঈশানের ইচ্ছা নরেন্দ্র গান করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি) — এখনও ময়দা! তবে বুঝি (খাবার) অনেক দেরি!

ঈশান (সহাস্যে) — আজ্ঞে না, তত দেরি নাই।

ভক্তেরা কেহ কেহ হাসিতেছেন। ভাগবতের পণ্ডিতও হাসিয়া একটি উদ্ভট শ্লোক বলিতেছেন। শ্লোক আবৃত্তির পর পণ্ডিত ব্যাখ্যা করিতেছেন। "দর্শনাদি শাস্ত্র অপেক্ষা কাব্য মনোহর। যখন কাব্য পাঠ হয় বা লোকে শ্রবণ করে তখন বেদান্ত, সাংখ্য, ন্যায়, পাতঞ্জল — এই সব দর্শন শুষ্ক বোধ হয়। কাব্য অপেক্ষা গীত মনোহর। সঙ্গীতে পাষাণহৃদয় লোকও গলে যায়; কিন্তু যদিও গীতের এত আকর্ষণ, যদি সুন্দরী নারী কাছ দিয়ে চলে যায়, কাব্যও পড়ে থাকে, গীত পর্যন্ত

ভাল লাগে না। সব মন ওই নারীর দিকে চলে যায়। আবার যখণ বুভুক্ষা হয়, ক্ষুধা পায়, কাব্য, গীত, নারী কিছুই ভাল লাগে না। অন্নচিন্তা চমৎকারা!”

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্য) — ইনি রসিক।

পাখোয়াজ বাঁধা হইল। নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন।

গান একটু আরম্ভ হইতে না হইতে ঠাকুর উপরের বৈঠকখানাঘরে বিশ্রাম করিবার জন্য চলিয়া আসিলেন। সঙ্গে মাস্টার ও শ্রীশ। বৈঠকখানাঘর রাস্তার উপর। ঈশানের শ্বশুর ৺ক্ষেত্রনাথ চাটুজ্যে মহাশয় এই বৈঠকখানা ঘর করিয়াছেন।

মাস্টার শ্রীশের পরিচয় দিলেন। বলিলেন, “ইনি পণ্ডিত ও অতিশয় শান্ত প্রকৃতি। শিশুকাল হইতে ইনি আমার সঙ্গে বরাবর পড়িয়াছিলেন। ইনি ওকালতি করেন।”

শ্রীরামকৃষ্ণ — এরকম লোকের উকিল হওয়া!

মাস্টার — ভুলে ওঁর ও-পথে যাওয়া হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি গণেশ উকিলকে দেখেছি। ওখানে (দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটীতে) বাবুদের সঙ্গে মাঝে মাঝে যায়। পান্নাও যায় — সুন্দর নয়, তবে গান ভাল। আমায় কিন্তু বড় মানে; সরল।

(শ্রীশের প্রতি) — “আপনি কি সার মনে করেছো?”

শ্রীশ — ঈশ্বর আছেন আর তিনিই সব করেছেন। তবে তাঁর গুণ (Attributes) আমরা যা ধারণা করি তা ঠিক নয়। মানুষ তাঁর বিষয় কি ধারণা করবে; অনন্ত কাণ্ড!

শ্রীরামকৃষ্ণ — বাগানে কত গাছ, গাছে কত ডাল — এ-সব হিসাবে তোমার কাজ কি? তুমি বাগানে আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও। তাঁতে ভক্তি প্রেম হবার জন্যই মানুষ জন্ম। তুমি আম খেয়ে চলে যাও।

"তুমি মদ খেতে এসেছ, শুঁড়ির দোকানে কত মন মদ এ খপরে তোমার কাজ কি! এক গেলাস হলেই তোমার হয়ে যায়।

"তোমার অনন্ত কাণ্ড জানবার কি দরকার।

"তাঁর গুণ কোটি বৎসর বিচার করলেও কিছু জানতে পারবে না।"

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন। ভাটপাড়ার একটি ব্রাহ্মণও বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — (মাস্টারের প্রতি) — সংসারে কিছুই নাই। এঁর (ঈশানের) সংসার ভাল তাই, — তা না হলে যদি ছেলেরা রাঁড়খোর, গাঁজাখোর, মাতাল, অবাধ্য এই সব হত, কষ্টের একশেষ হত। সকলের ঈশ্বরের দিকে মন — বিদ্যার সংসার, এরূপ প্রায় দেখা যায় না। এরূপ দু-চারটে বাড়ি দেখলাম। কেবল ঝগড়া, কোঁদল, হিংসা, তারপর রোগ, শোক, দারিদ্র্য। দেখে বললাম — মা; এই বেলা মোড় ফিরিয়ে দাও। দেখ না, নরেন্দ্র কি মুশকিলেই পড়েছে। বাপ মারা

গেছে, বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না — কাজকর্মের এত চেষ্টা করছে জুটছে না — এখন কি করে বেড়াচ্ছে দেখো।

“মাস্টার, তুমি আগে অত যেতে, এখন তত যাও না কেন? বুঝি পরিবারের সঙ্গে বেশি ভাব হয়েছে?

“তা দোষই বা কি, চারিদিকে কামিনী-কাঞ্চন! তাই বলি, মা, যদি কখনও শরীরধারণ হয়, যেন সংসারী করো না।”

ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণ — কি! গৃহস্থধর্মের সুখ্যাতি আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, কিন্তু বড় কঠিন।

ঠাকুর অন্য কথা পাড়িতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — আমরা কি অন্যায় করলাম? ওরা গাচ্ছে — নরেন্দ্র গাচ্ছে — আর — আমরা সব পালিয়ে এলাম।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৫শে জুন 1884/06/25/ii

23.2 কলিতে ভক্তিযোগ — কর্মযোগ নহে

প্রায় বেলা চারিটার সময় ঠাকুর গাড়িতে উঠিলেন। অতি কোমলাঙ্গ, অতি সন্তর্পণে তাঁহার দেহরক্ষা হয়। তাই পথে যাইতে কষ্ট হয় — প্রায় গাড়ি না হলে অল্প দূরও যাইতে পারেন না। গাড়িতে উঠিয়া ভাবসমাধিতে মগ্ন হলেন! তখন টিপ-টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বর্ষাকাল — আকাশে মেঘ, পথে কাদা। ভক্তেরা গাড়ির পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে যাইতেছেন। তাঁহারা দেখিলেন, রথযাত্রা উপলক্ষে ছেলেরা তালপাতার ভেঁপু বাজাইতেছে।

গাড়ি বাটীর সম্মুখে উপনীত হইল। দ্বারদেশে গৃহস্বামী ও তাঁহার আত্মীয়গণ আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন।

উপরে যাইবার সিঁড়ি। তৎপরে বৈঠকখানা। উপরে উঠিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন যে শশধর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছেন। পণ্ডিতকে দেখিয়া বোধ হইল যে তিনি যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্ণ উজ্জ্বল, গৌর বলিলে বলা যায়। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। তিনি অতি বিনীতভাবে ভক্তিভরে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে সঙ্গে করিয়া ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভক্তগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

সকলেই উৎসুক যে, তাঁহার নিকটে বসেন ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত কথামৃত পান করেন। নরেন্দ্র, রাখাল, রাম, মাস্টার ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা উপস্থিত আছেন। হাজরাও শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি হইতে আসিয়াছেন।

ঠাকুর পণ্ডিতকে দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই অবস্থায় হাসিতে হাসিতে পণ্ডিতের দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন, "বেশ! বেশ!" পরে বলিতেছেন, "আচ্ছা, তুমি কিরকম লেকচার দাও?"

শশিধর — মহাশয়, আমি শাস্ত্রের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি। — শাস্ত্রে যে সকল কর্মের কথা আছে, তার সময় কি? আজকালকার জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রোগীর এদিকে হয়ে যায়। আজকাল ফিবার মিক্‌শ্চার। কর্ম করতে যদি বল, — তো নেজামুড়া বাদ দিয়ে বলবে। আমি লোকদের বলি, তোমাদের 'আপোধন্যন্যা' — ও-সব অত বলতে হবে না। তোমাদের গায়ত্রী জপলেই হবে। কর্মের কথা যদি একান্ত বল তবে ঈশানের মতো কর্মী দুই-একজনকে বলতে পার।"

[বিষয়ী লোক ও লেকচার]

"হাজার লেকচার দাও বিষয়ী লোকদের কিছু করতে পারবে না। পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায়? পেরেকের মাথা ভেঙে যাবে তো দেওয়ালের কিছু হবে না। তরোয়ালের চোট মারলে কুমীরের কি হবে? সাধুর কমণ্ডুল (তুম্বা) চারধাম করে আসে কিন্তু যেমন তেঁতো তেমনি তেঁতো। তোমার লেকচারে বিষয়ী লোকদের বড় কিছু হচ্ছে না। তবে তুমি ক্রমে ক্রমে জানতে পারবে। বাছুর একবারে দাঁড়াতে পারে না। মাঝে মাঝে পড়ে যায়, আবার দাঁড়ায়; তবেতো দাঁড়াতে ও চলতে শিখে।"

[নবানুরাগ ও বিচার — ঈশ্বরলাভ হলে কর্মত্যাগ — যোগ ও সমাধি]

“কে ভক্ত, কে বিষয়ী চিনতে পার না। তা সে তোমার দোষ নয়। প্রথম ঝড় উঠলে কোন্‌টা তেঁতুলগাছ, কোন্‌টা আমগাছ বুঝা যায় না।

“ঈশ্বরলাভ না হলে কেউ একবারে কর্মত্যাগ করতে পারে না। সন্ধ্যাদি কর্ম কতদিন? যতদিন না ইশ্বরের নামে অশ্রু আর পুলক হয়। একবার ‘ওঁ রাম’ বলতে যদি চোখে জল আসে, নিশ্চয় জেনো তোমার কর্ম শেষ হয়েছে। আর সন্ধ্যাদি কর্ম করতে হবে না।

“ফল হলেই ফুল পড়ে যায়। ভক্তি — ফল; কর্ম — ফুল। গৃহস্থের বউ পেটে ছেলে হলে বেশি কর্ম করতে পারে না। শাশুড়ী দিন দিন তার কর্ম কমিয়ে দেয়। দশমাস পড়লে শাশুড়ী প্রায় কর্ম করতে দেয় না। ছেলে হলে সে ওইটিকে নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে, আর কর্ম করতে হয় না। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়। প্রণব সমাধিতে লয় হয়। যেমন ঘন্টার শব্দ — টং — ট — অ-ম্‌। যোগী নাদ ভেদ করে পরব্রহ্মে লয় হন। সমাধি মধ্যে সন্ধ্যাদি কর্মের লয় হয়। এইরকমে জ্ঞানীদের কর্মত্যাগ হয়।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৫শে জুন 1884/06/25/iii

23.3 শুধু পাণ্ডিত্য মিথ্যা — সাধনা ও বিবেক-বৈরাগ্য

সমাধির কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের ভাবান্তর হইল। তাঁহার চন্দ্রমুখ হইতে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে। আর বাহ্যজ্ঞান নাই। মুখে একটি কথা নাই। নেত্র স্থির! নিশ্চয়ই জগতের নাথকে দর্শন করিতেছেন! অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বালকের ন্যায় বলিতেছেন, "আমি জল খাব।" সমাধির পর যখন জল খাইতে চাহিতেন তখন ভক্তেরা জানিতে পারিতেন যে, এবার ইনি ক্রমশঃ বাহ্যজ্ঞান লাভ করিবেন।

ঠাকুর ভাবে বলিতে লাগিলেন, "মা! সেদিন ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখালি!" তারপর আমি আবার বলেছিলাম, "মা! আমি আর-একজন পণ্ডিতকে দেখব, তাই তুই আমায় এখানে এনেছিস।"

পরে শশধরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বাবা! আর একটু বল বাড়াও, আর কিছুদিন সাধন-ভজন কর। গাছে না উঠতেই এককাঁদি; তবে তুমি লোকের ভালর জন্য এ-সব করছ।"

এই বলিয়া ঠাকুর শশধরকে মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করিতেছেন।

আরও বলিতেছেন, "যখন প্রথমে তোমার কথা শুনলুম, জিজ্ঞাসা করলুম যে, এই পণ্ডিত কি শুধু পণ্ডিত, না, বিবেক-বৈরাগ্য আছে?"

[আদেশ না পেলে আচার্য হওয়া যায় না]

"যে পণ্ডিতের বিবেক নাই, সে পণ্ডিতই নয়।

"যদি আদেশ হয়ে থাকে, তাহলে লোকশিক্ষায় দোষ নাই। আদেশ পেয়ে যদি কেউ লোকশিক্ষা দেয়, তাকে কেউ হারাতে পারে না।

"বাগ্বাদিনীর কাছ থেকে যদি একটি কিরণ আসে, তাহলে এমন শক্তি হয় যে, বড় বড় পণ্ডিতগুলো কেঁচোর মতো হয়ে যায়।

"প্রদীপ জ্বাললে বাদুলে পোকাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আপনি আসে — ডাকতে হয় না। তেমনি যে আদেশ পেয়েছে, তার লোক ডাকতে হয় না; অমুক সময়ে লেকচার হবে বলে, খবর পাঠাতে হয় না। তার নিজের এমনি টান যে লোক তার কাছে আপনি আসে। তখন রাজা, বাবু, সকলে দলে দলে আসে। আর বলতে থাকে আপনি কি লবেন? আম, সন্দেশ, টাকা-কড়ি, শাল — এই সব এনেছি; আপনি কি লবেন? আমি যে সকল লোককে বলি, 'দূর কর — আমার ও-সব ভাল লাগে না, আমি কিছু চাই না।'

"চুম্বক পাথর কি লোহাকে বলে, তুমি আমার কাছে এস? এস বলতে হয় না, — লোহা আপনি চুম্বক পাথরের টানে ছুটে আসে।

"এরূপ লোক, পণ্ডিত নয় বটে। তা বলে মনে করো না যে তার জ্ঞানের কিছু কম্‌তি হয়। বই পড়ে কি জ্ঞান হয়? যে আদেশ পেয়েছে তার জ্ঞানের শেষ নাই। সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, — ফুরায় না।

“ও-দেশে ধান মাপবার সময় একজন মাপে, আর-একজন রাশ ঠেলে দেয়; তেমনি যে আদেশ পায় সে যত লোকশিক্ষা দিতে থাকে, মা তাহার পেছন থেকে জ্ঞানের রাশ ঠেলে ঠেলে দেন। সে-জ্ঞান আর ফুরায় না।

“মার যদি একবার কটাক্ষ হয়, তাহলে কি আর জ্ঞানের অভাব থাকে? তাই জিজ্ঞাসা করছি কোন আদেশ পেয়েছ কি না?”

হাজরা — হাঁ, অবশ্য আদেশ পেয়েছেন। কেমন মহাশয়?

পণ্ডিত — না, আদেশ? তা এমন কিছু পাই নাই।

গৃহস্বামী — আদেশ পান নাই বটে, কর্তব্যবোধে লেকচার দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — যে আদেশ পায় নাই, তার লেকচার কি হবে?

“একজন (ব্রাহ্ম) লেকচার দিতে দিতে বলেছিল, ‘ভাইরে, আমি কত মদ খেতুম, হেন করতাম, তেন করতাম।’ এই কথা শুনে, লোকগুলি বলাবলি করতে লাগল, ‘শালা, বলে কিরে? মদ খেত!’ এই কথা বলাতে উলটো উৎপত্তি হল। তাই ভাল লোক না হলে লেকচারে কোন উপকার হয় না।

“বরিশালে বাড়ি একজন সদরওয়ালা বলেছিল, ‘মহাশয়, আপনি প্রচার করতে আরম্ভ করুন। তাহলে আমিও কোমর বাঁধি।’ আমি বললাম, ওগো একটা গল্প শোন — ও-দেশে হালদার-পুকুর বলে একটি পুকুর আছে। যত লোক তার পাড়ে বাহ্যে করত। সকাল বেলা যারা পুকুরে আসত গালাগালে তাদের ভূত ছাড়িয়ে দিত। কিন্তু গালাগালে কোন কাজ হত না; আবার তার পরদিন সকালে

পাড়ে বাহ্যে করেছে, লোকে দেখত। কিছু দিন পরে কোম্পানি থেকে একজন চাপরাসী পুকুরের কাছে একটা হুকুম মেরে দিল। কি আশ্চর্য! একেবারে বাহ্যে করা বন্ধ হয়ে গেল।

“তাই বলছি, হেঁজি-পেঁজি লোক লেকচার দিলে কিছু কাজ হয় না। চাপরাস থাকলে তবে লোকে মানবে। ঈশ্বরের আদেশ না থাকলে লোকশিক্ষা হয় না। যে লোকশিক্ষা দিবে, তার খুব শক্তি চাই। কলকাতায় অনেক হনুমান পুরী আছে — তাদের সঙ্গে তোমায় লড়তে হবে। এরা তো (যারা চারিদিকে সভায় বসে আছে) পাঠ্‌ঠা!

“চৈতন্যদেব অবতার। তিনি যা করে গেলেন তারই কি রয়েছে বল দেখি? আর যে আদেশ পায় নাই, তার লেকচারে কি উপকার হবে?”

[কিরূপে আদেশ পাওয়া যায়]

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাই বলছি, ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও।

এই কথা বলিয়া ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গান গাহিতেছেন:

ডুব্‌ ডুব্‌ ডুব্‌ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন।
“এ-সাগরে ডুবলে মরে না — এ যে অমৃতের সাগর।”

[নরেন্দ্রকে শিক্ষা — ঈশ্বর অমৃতের সাগর]

“আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলাম — ঈশ্বর রসের সমুদ্র, তুই এ-সমুদ্রে ডুব দিবি কি না বল। আচ্ছা, মনে কর খুলিতে একখুলি রস রয়েছে আর তুই মাছি হয়েছিস। কোথা বসে রস খাবি বল? নরেন্দ্র বললে, ‘আমি খুলির আড়ায় বসে মুখ বাড়িয়ে খাব! কেন না বেশি দূরে গেলে ডুবে যাব।’ তখন আমি বললাম, বাবা, এ সচ্চিদানন্দ-সাগর — এতে মরণের ভয় নাই, এ-সাগর অমৃতের সাগর। যারা অজ্ঞান তারাই বলে যে, ভক্তি প্রেমের বাড়াবাড়ি করতে নাই। ঈশ্বরপ্রেমের কি বাড়াবাড়ি আছে? তাই তোমায় বলি, সচ্চিদানন্দ-সাগরে মগ্ন হও।

“ঈশ্বরলাভ হলে ভাবনা কি? তখন আদেশও হবে, লোকশিক্ষাও হবে।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৫শে জুন 1884/06/25/iv

23.4 ঈশ্বরলাভের অনন্ত পথ — ভক্তিযোগই যুগধর্ম

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখ, অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ। যে কোন প্রকারে এ-সাগরে পড়তে পারলেই হল। মনে কর অমৃতের একটি কুণ্ড আছে। কোনরকমে এই অমৃত একটু মুখে পড়লেই অমর হবে; — তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়েই পড়, বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেমে একটু খাও, বা কেউ তোমায় ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক। একই ফল। একটু অমৃত আস্বাদন করলেই অমর হবে।

“অনন্ত পথ — তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি — যে পথ দিয়া যাও, আন্তরিক হলে ঈশ্বরকে পাবে।

“মোটামুটি যোগ তিনপ্রকার; জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, আর ভক্তিযোগ।

“জ্ঞানযোগ — জ্ঞানী, ব্রহ্মকে জানতে চায়; নেতি নেতি বিচার করে। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা — এই বিচার করে। সদসৎ বিচার করে। বিচারের শেষ যেখানে, সেখানে সমাধি হয়, আর ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয়।

“কর্মযোগ — কর্ম দ্বারা ঈশ্বরে মন রাখা। তুমি যা শিখাচ্ছ। অনাসক্ত হয়ে প্রাণায়াম, ধ্যানধারণাদি কর্মযোগ। সংসারী লোকেরা যদি অনাসক্ত হয়ে ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে, তাতে ভক্তি রেখে, সংসারের কর্ম করে, সেও কর্মযোগ। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে পূজা জপাদি করার নামও কর্মযোগ। ঈশ্বরলাভই কর্মযোগের উদ্দেশ্য।

“ভক্তিযোগ — ঈশ্বরের নামগুণকীর্তন এই সব করে তাঁতে মন রাখা। কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ সহজ পথ। ভক্তিযোগই যুগধর্ম।

“কর্মযোগ বড় কঠিন — প্রথমতঃ, আগেই বলেছি, সময় কই? শাস্ত্রে যে-সব কর্ম করতে বলেছে, তার সময় কি? কলিতে আয়ু কম। তারপর অনাসক্ত হয়ে, ফল কামনা না করে, কর্ম করা ভারী কঠিন। ঈশ্বরলাভ না করলে অনাসক্ত হওয়া যায় না। তুমি হয়তো জান না, কিন্তু কোথা থেকে আসক্তি এসে পড়ে।

“জ্ঞানযোগও — এ-যুগে ভারী কঠিন। জীবের একে অন্নগত প্রাণ; তাতে আয়ু কম। আবার দেহবুদ্ধি কোন মতে যায় না। এদিকে দেহবুদ্ধি না গেলে একেবারে জ্ঞানই হবে না। জ্ঞানী বলে, আমি সেই ব্রহ্ম; আমি শরীর নই, আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ — এ-সকলের পার। যদি রোগ, শোক, সুখ দুঃখ — এ-সব বোধ থাকে, তুমি জ্ঞানী কেমন করে হবে? এদিকে কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর করে রক্ত পড়ছে, খুব লাগছে — অথচ বলছে, কই হাত তো কাটে নাই। আমার কি হয়েছে?”

[জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ যুগধর্ম নহে]

“তাই এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ আর অন্যান্য পথ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এ-সব ভারী কঠিন।

“ভক্তিযোগ যুগধর্ম — তার এ-মানে নয় যে, ভক্ত এক জায়গায় যাবে, জ্ঞানী বা কর্মী আর এক জায়গায় যাবে। এর মানে যিনি ব্রহ্ম জ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তিপথ ধরেও যান, তা হলেও সেই জ্ঞানলাব করবেন। ভক্তবৎসল মনে করলেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন।”

[ভক্তের কি ব্রহ্মজ্ঞান হয়? ভক্ত কিরূপ কর্ম ও কি প্রার্থনা করে]

“ভক্ত ঈশ্বরের সাকাররূপ দেখতে চায় ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চায়; — প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাঁর যদি খুশি হয় তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী করেন। ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন। কলকাতায় যদি

কেউ একবার এসে পড়তে পারে তাহলে গড়ের মাঠ, সুসাইটি (Asiatic Society's Museum) সবই দেখতে পায়।

“কথাটা এই, এখন কলকাতায় কেমন করে আসি।

“জগতের মাকে পেলে, ভক্তিও পাবে, জ্ঞানও পাবে। জ্ঞানও পাবে, ভক্তিও পাবে। ভাবসমাধিতে রূপদর্শন, নির্বিকল্পসমাধিতে অখণ্ডসচ্চিদানন্দ-দর্শন হয়, তখন অহং, নাম, রূপ থাকে না।

“ভক্ত বলে, মা, সকাম কর্মে আমার বড় ভয় হয়। সে কর্মে কামনা আছে। সে কর্ম করলেই ফল পেতে হবে। আবার অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা কঠিন। সকাম কর্ম করতে গেলে, তোমায় ভুলে যাব। তবে এমন কর্মে কাজ নাই। যতদিন না তোমায় লাভ করতে পারি, ততদিন পর্যন্ত যেন কর্ম কমে যায়। যেটুকু কর্ম থাকবে, সেটুকু কর্ম যেন অনাসক্ত হয়ে করতে পারি, আর সঙ্গে সঙ্গে যেন খুব ভক্তি হয়। আর যতদিন না তোমায় লাভ করতে পারি, ততদিন কোন নূতন কর্ম জড়াতে মন না যায়। তবে তুমি যখন আদেশ করবে তখন তোমার কর্ম করব। নচেৎ নয়।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৫শে জুন 1884/06/25/v

23.5 তীর্থযাত্রা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ — আচার্যের তিন শ্রেণী

পণ্ডিত — মহাশয়ের তীর্থে কতদূর যাওয়া হয়েছিল?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, কতক জায়গা দেখেছি। (সহাস্যে) হাজরা অনেক দূর গিছিল; আর খুব উঁচুতে উঠেছিল। হৃষীকেশ গিছিল। (সকলের হাস্য) আমি অত দূর যাই নাই, অত উঁচুতেও উঠি নাই।

"চিল শকুনিও অনেক উচ্চে উঠে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে। (সকলের হাস্য) ভাগাড় কি যান? কামিনী ও কাঞ্চন।

"যদি এখানে বসে ভক্তিলাভ করতে পার, তাহলে তীর্থে যাবার কি দরকার? কাশী গিয়ে দেখলাম, সেই গাছ! সেই তেঁতুলপাতা!

"তীর্থে গিয়ে যদি ভক্তিলাভ না হল, তাহলে তীর্থ যাওয়ার আর ফল হল না। আর ভক্তিই সার, একমাত্র প্রয়োজন। চিল শকুনি কি যান? অনেক লোক আছে, তারা লম্বা লম্বা কথা কয়। আর বলে যে, শাস্ত্রে যে সকল কর্ম করতে বলেছে, আমারা অনেক করেছি। এদিকে তাদের মন ভারী বিষয়াসক্ত — টাকা-কড়ি, মান-সম্ভ্রম, দেহের সুখ, এই সব নিয়ে ব্যস্ত।"

পণ্ডিত — আজ্ঞে, হাঁ। মহাশয়, তীর্থে যাওয়া যা, আর কৌস্তুভ মণি ফেলে অন্য হীরা মাণিক খুঁজে বেড়ানও তা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আর তুমি এইটি জেনো, হাজার শিক্ষা দাও — সময় না হলে ফল হবে না। ছেলে বিছানায় শোবার সময় মাকে বললে, ‘মা, আমার যখন হাগা পাবে, তখন তুমি আমায় উঠিও।’ মা বললে, ‘বাবা, হাগাই তোমাকে উঠাবে, এজন্য তুমি কিছু ভেবো না।’ (হাস্য)

সেইরূপ ভগবানের জন্য ব্যাকুল হওয়া ঠিক সময় হলেই হয়।ম”

[পাত্রাপাত্র দেখে উপদেশ — ঈশ্বর কি দয়াময়?]

“তিনরকম বৈদ্য আছে।

“একরকম — তারা নাড়ী দেখে ঔষধ ব্যবস্থা করে চলে যায়। রোগীকে কেবল বলে যায়, ঔষধ খেয়ো হে। এরা অধম থাকের বৈদ্য।

“সেইরূপ কতকগুলি আচার্য উপদেশ দিয়ে যায়, কিন্তু উপদেশ লোকের ভাল হল কি মন্দ হল তা দেখে না। তার জন্য ভাবে না।

“কতকগুলি বৈদ্য আছে, তারা ঔষধ ব্যবস্থা করে রোগীকে ঔষধ খেতে বলে। রোগী যদি খেতে না চায়, তাকে অনেক বুঝায়। এরা মধ্যম থাকের বৈদ্য। সেইরূপ মধ্যম থাকের আচার্যও আছে। তাঁরা উপদেশ দেন, আবার অনেক করে লোকদের বুঝান যাতে তারা উপদেশ অনুসারে চলে। আবার উত্তম থাকের বৈদ্য আছে। মিষ্ট কথাতে রোগী যদি না বুঝে, তারা জোর পর্যন্ত করে। দরকার হয়, রোগীর বুকে হাঁটু দিয়ে রোগীকে ঔষধ গিলিয়ে দেয়। সেইরূপ উত্তম থাকের

আচার্য আছে। তাঁরা ঈশ্বরের পথে আনবার জন্য শিষ্যদের উপর জোর পর্যন্ত করেন।”

পণ্ডিত — মহাশয়, যদি উত্তম থাকের আচার্য থাকেন, তবে কেন আপনি সময় না হলে জ্ঞান হয় না, এ-কথা বললেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — সত্য বটে। কিন্তু মনে কর, ঔষধ যদি পেটে না যায় — যদি মুখ থেকে গড়িয়ে যায়, তাহলে বৈদ্য কি করবে? উত্তম বৈদ্যও কিছু করতে পারে না।

“পাত্র দেখে উপদেশ দিতে হয়। তোমরা পাত্র দেখে উপদেশ দাও না। আমার কাছে কেহ ছোকরা এলে আগে জিজ্ঞাসা করি, ‘তোর কে আছে?’ মনে কর, বাপ নাই; হয়তো বাপের ঋণ আছে, সে কেমন করে ঈশ্বরে মন দিবেক? শুনছো বাপু?”

পণ্ডিত — আজ্ঞা হাঁ, আমি সব শুনছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — একদিন ঠাকুরবাড়িতে কতকগুলি শিখ সিপাহি এসেছিল। মা-কালীর মন্দিরের সম্মুখে তাদের সঙ্গে দেখা হল। একজন বললে, ‘ঈশ্বর দয়াময়।’ আমি বললাম, ‘বটে? সত্য নাকি? কেমন করে জানলে?’ তারা বললে, ‘কেন মহারাজ, ঈশ্বর আমাদের খাওয়াচ্ছেন, — এত যত্ন করছেন।’ আমি বললাম, ‘সে কি আশ্চর্য? ঈশ্বর যে সকলের বাপ! বাপ ছেলেকে দেখবে না তো কে দেখবে? ও-পাড়ার লোক এসে দেখবে নাকি?’

নরেন্দ্র — তবে ঈশ্বরকে দয়াময় বলব না?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁকে কি দয়াময় বলতে বারণ করছি? আমার বলবার মানে এই যে ঈশ্বর আমাদের আপনার লোক, পর নন।

পণ্ডিত — কথা অমূল্য!

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোর গান শুনছিলুম — কিন্তু ভাল লাগল না। তাই উঠে গেলুম। বললুম, উমেদারী অবস্থা — গান আলুনী বোধ হল।

নরেন্দ্র লজ্জিত হইলেন, মুখ ঈষৎ আরক্তিম হইল। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৫শে জুন 1884/06/25/vi

23.6 বিদায়

ঠাকুর জল খাইতে চাহিলেন। তাঁহার কাছে একগ্লাস জল রাখা হইয়াছিল। সে জল খাইতে পারিলেন না, আর-একগ্লাস জল আনিতে বলিলেন। পরে শুনা গেল কোনও ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি ওই জল স্পর্শ করিয়াছিল।

পণ্ডিত (হাজরার প্রতি) — আপনারা ইঁহার সঙ্গে রাতদিন থাকেন — আপনারা মহানন্দে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) — আজ আমার খুব দিন। আমি দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখলাম। (সকলের হাস্য) দ্বিতীয়ার চাঁদ কেন বললুম জান? সীতা রাবণকে বলেছিলেন, রাবণ পূর্ণচন্দ্র, আর রামচন্দ্র আমার দ্বিতীয়ার চাঁদ। রাবণ মানে বুঝতে পারে নাই, তাই ভারী খুশি। সীতার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, রাবণের সম্পদ যতদূর হবার হয়েছে, এইবার দিন দিন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় হ্রাস পাবে। রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চাঁদ, তাঁর দিন দিন বৃদ্ধি হবে!

ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। বন্ধুবান্ধব সঙ্গে পণ্ডিত ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৫শে জুন 1884/06/25/vii

23.7 ঈশানের গৃহে

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে ঈশানের বাটীতে ফিরিলেন। সন্ধ্যা হয় নাই। ঈশানের নিচের বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। ভক্তেরা কেহ কেহ আছেন। ভাগবতের পণ্ডিত, ঈশান, ঈশানের ছেলেরা উপস্থিত আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — শশধরকে বললাম গাছে না উঠতে এককাঁদি — আরও কিছু সাধন-ভজন কর, তারপর লোকশিক্ষা দিও।

ঈশান — সকলেই মনে করে যে আমি লোকশিক্ষা দিই। জোনাকি পোকা মনে করে আমি জগৎকে আলোকিত করছি। তা একজন বলেছিল, ‘হে জোনাকি পোকা, তুমি আবার আলো কি দেবে! — ওহে তুমি অন্ধকার আরও প্রকাশ করছো!’

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈষৎ হাস্য করিয়া) — কিন্তু শুধু পণ্ডিত নয়, — একটু বিবেক-বৈরাগ্য আছে।

ভাটপাড়ার ভাগবতের পণ্ডিতটিও এখনও বসিয়া আছেন। বয়স ৭০। ৭৫ হইবে। তিনি ঠাকুরকে একদৃষ্টে দেখিতেছিলেন।

ভাগবত পণ্ডিত (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — আপনি মহাত্মা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সে নারদ, প্রহ্লাদ, শুকদেব — এদের বলতে পারেন; আমি আপনার সন্তানের ন্যায়।

“তবে এক হিসাবে বলতে পারেন। এমনি আছে যে ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড় — কেন না ভক্ত ভগবানকে হৃদয়ে বয়ে নিয়ে বেড়ায় (সকলের আনন্দ)। ভক্ত ‘মোরে দেখে হীন, আপনাকে দেখে বড়।’ যশোদা কৃষ্ণকে বাঁধতে গিছিলেন। যশোদার বিশ্বাস, আমি কৃষ্ণকে না দেখলে তাকে কে দেখবে! কখনও ভগবান চুম্বুক, ভক্ত ছুঁচ — ভগবান আকর্ষণ করে ভক্তকে টেনে লন। আবার কখনও

ভক্ত চুম্বুক পাথর হন, ভগবান ছুঁচ হন। ভক্তের এত আকর্ষণ যে তার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ভগবান তার কাছে গিয়ে পড়েন।”

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিবেন। নিচের বৈঠকখানায় দক্ষিণদিকের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ঈশান প্রভৃতি ভক্তেরাও দাঁড়াইয়া আছেন। ঈশানকে কথাচ্ছলে অনেক উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি) — সংসারে থেকে যে তাঁকে ডাকে সে বীর ভক্ত। ভগবান বলেন, যে সংসার ছেড়ে দিয়েছে সে তো আমায় ডাকবেই, আমার সেবা করবেই — তার আর বাহাদুরি কি? সে যদি আমায় না ডাকে সকলে ছি ছি করবে। আর যে সংসারে থেকে আমায় ডাকে — বিশ মন পাথর ঠেলে যে আমায় দেখে সেই-ই ধন্য, সেই-ই বাহাদুর, সেই-ই বীরপুরুষ।

“ভাগবত পণ্ডিত — শাস্ত্রে তো ওই কথাই আছে। ধর্মব্যাধের কথা আর পতিব্রতার কথা। তপস্বী মনে করেছিল যে আমি কাক আর বককে ভস্ম করেছি, অতএব আমি খুব উঁচু হয়েছি। সে পতিব্রতার বাড়ি গিছিল। তার স্বামীর উপর এত ভক্তি যে দিনরাত স্বামীর সেবা করত। স্বামী বাড়িতে এলে পা ধোবার জল দিত; এমন কি মাথার চুল দিয়ে তার পা পুঁছে দিত। তপস্বী অতিথি, ভিক্ষা পাওয়ার দেরি হচ্ছিল তাই চেঁচিয়ে বলেছিল যে, তোমাদের ভাল হবে না। পতিব্রতা অমনি দূর থেকে বললে, এ তো কাকীবকী ভস্ম করা নয়। একটু দাঁড়াও ঠাকুর, আমি স্বামীর সেবা করে তোমার পূজা করছি।

“ধর্মব্যাধের কাছে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য গিছিল। ব্যাধ পশুর মাংস বিক্রি করত কিন্তু রাতদিন ঈশ্বরজ্ঞানে বাপ-মার সেবা করত। ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য তার কাছে যে গিছিল সে দেখে অবাক্ — ভাবতে লাগল এ ব্যাধ মাংস বিক্রি করে, আর সংসারী লোক! এ আবার আমায় কি ব্রহ্মজ্ঞান দিবে। কিন্তু সেই ব্যাধ পূর্ণজ্ঞানী।”

ঠাকুর এইবার গাড়িতে উঠিবেন। পাশের বাড়ির (ঈশানের শ্বশুরবাড়ির) দরজায় দাঁড়াইয়াছেন। ঈশান ও ভক্তেরা কাছে দাঁড়াইয়া আছেন — তাঁহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিবেন। ঠাকুর আবার কথাচ্ছলে ঈশানকে উপদেশ দিতেছেন — “পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশানো — পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।

“জলে-দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দরস আর বিষয়রস। হংসের মতো দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে।

“আর পানকৌটির মতো। গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকে থাকে কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।

“গোলমালে মাল আছে — গোল ছেড়ে মালটি নেবে।”

ঠাকুর গাড়িতে উঠিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিতেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c24 ২৪ শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে পণ্ডিত শশধরাদি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৩০শে জুন 1884/06/30/i

24.1 কালীব্রহ্ম — ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে তাঁর সেই পূর্বপরিচিত ঘরে মেঝেতে বসিয়া আছেন, — কাছে পণ্ডিত শশধর। মেঝেতে মাদুর পাতা — তাহার উপর ঠাকুর, পণ্ডিত শশধর এবং কয়েকটি ভক্ত বসিয়াছেন। কতকগুলি ভক্ত মাটির উপরেই বসিয়া আছেন। সুরেন্দ্র, বাবুরাম, মাস্টার, হরিশ, লাটু, হাজরা, মণি মল্লিক প্রভৃতি ভক্তেরা উপস্থিত আছেন। ঠাকুর পণ্ডিত পদ্মলোচনের কথা কহিতেছেন। পদ্মলোচন বর্ধমানের রাজার সভাপন্ডিত ছিলেন। বেলা অপরাহ্ন — প্রায় ৪টা।

আজ সোমবার, ৩০শে জুন, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ (১৭ই আষাঢ়, শুক্লা অষ্টমী)। ছয়দিন হইল শ্রীশ্রীরথযাত্রার দিবসে পণ্ডিত শশধরের সহিত ঠাকুরের কলিকাতায় দেখা

ও আলাপ হইয়াছিল। আজ আবার পণ্ডিত আসিয়াছেন। সঙ্গে শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর। কলিকাতায় তাহাদের বাড়িতে পণ্ডিত শশধর আছেন।

পণ্ডিত জ্ঞানমার্গের পন্থী। ঠাকুর তাঁহাকে বুঝাইতেছেন — যাঁহারই নিত্য তাঁহারই লীলা — যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই লীলার জন্য নানা রূপ ধরিয়াছেন। ঈশ্বরের কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর বেহুঁশ হইতেছেন। ভাবে মাতোয়ারা হইয়া কথা কহিতেছেন। পণ্ডিতকে বলিতেছেন, "বাপু, ব্রহ্ম অটল, অচল, সুমেরুবৎ। কিন্তু 'অচল' যার আছে তার 'চল'ও আছে।"

ঠাকুর প্রেমানন্দে মত্ত আছেন। সেই গন্ধর্ব বিনিন্দিত কণ্ঠে গান গাহিতেছেন। গানের পর গান গাহিতেছেন:

কে জানে কালী কেমন, ষড়্ দর্শনে না পায় দরশন।

গান - মা কি এমনি মায়ের মেয়ে।

যার নাম জপিয়ে মহেশ বাঁচেন হলাহল খাইয়ে ।।

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যার কটাক্ষে হেরিয়ে।

সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পুরিয়ে ।।

যে চরণে শরণ লয়ে দেবতা বাঁচেন দায়ে।

দেবের দেব মহাদেব যাঁর চরণে লুটায়ে ।।

গান - মা কি শুধুই শিবের সতী।

যাঁরে কালের কাল করে প্রণতি ।।

ন্যাংটাবেশে শত্রু নাশে মহাকাল হৃদয়ে স্থিতি।

বল দেখি মন সে বা কেমন, নাথের বুকে মারি লাথি ।।

প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, সকলই জেনো ডাকাতি।

সাবধানে মন কর যতন, হবে তোমার শুদ্ধমতি ।।

গান - আমি সুরা পান করি না, সুধা খাই জয় কালী বলে,

মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে।

গুরুদত্ত বীজ লয়ে প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে,

জ্ঞান শুঁড়িতে চোয়ায় ভাঁটি, পান করে মোর মন-মাতালে।

মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা,

প্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্বর্গ মিলে।

গান - শ্যামাধন কি সবাই পায়,

অবোধ মন বোঝে না একি দায়।

শিবেরই অসাধ্য সাধন মনমজানো রাঙা পায় ।।

ঠাকুরের ভাবাবস্থা একটু কম পড়িয়াছে। তাঁহার গান থামিল। একটু চুপ করিয়া আছেন। ছোট খাটটিতে গিয়া বসিয়াছেন।

পণ্ডিত গান শুনিয়া মোহিত হইয়াছেন। তিনি অতি বিনীত ভাবে ঠাকুরকে বলিতেছেন, “আবার গান হবে কি?”

ঠাকুর একটু পরেই আবার গান গাহিতেছেন:

শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়তেছিল,

কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল।

গান - এবার আমি ভাল ভেবেছি।

ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।

যে দেশে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।

আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি ।।

গান - অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।

আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি ।।

কালী নাম মহামন্ত্র আত্মশিরশিখায় বেঁধেছি।

(আমি) দেহ বেচে ভবের হাটে, দুর্গানাম কিনে এনেছি ।।

“দুর্গানাম কিনে এনেছি” এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত অশ্রুবারি বিসর্জন করিতেছেন। ঠাকুর আবার গাহিতেছেন:

গান - কালীনাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি।

এবার শমন এলে হৃদয় খুলে দেখাব তাই বসে আছি ।।

দেহের মধ্যে ছজন কুজন, তাদের ঘরে দূর করেছি।

রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে যাত্রা করে বসে আছি ।।

গান - আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে।

যা চাবি তাই বসে পাবি (ওরে) খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে ।।

ঠাকুর গান গাহিয়া বলিতেছেন — মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি বড় —

গান - আমি মুক্তি দিতে কাতর নই,

শুদ্ধাভক্তি দিতে কাতর হই গো।

আমার ভক্তি যেবা পায় সে যে সেবা পায়,

তারে কেবা পায় সে যে ত্রিলোকজয়ী ।।

শুদ্ধাভক্তি এক আছে বৃন্দাবনে,

গোপ-গোপী ভিন্ন অন্যে নাহি জানে।

ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে

পিতাজ্ঞানে নন্দের বাধা মাথায় বই ।।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৩০শে জুন 1884/06/30/ii

24.2 শাস্ত্রপাঠ ও পাণ্ডিত্য মিথ্যা — তপস্যা চাই — বিজ্ঞানী

পণ্ডিত বেদাদি শাস্ত্র পড়িয়াছেন ও জ্ঞানচর্চা করেন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া তাঁহাকে দেখিতেছেন ও গল্পচ্ছলে নানা উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতের প্রতি) — বেদাদি অনেক শাস্ত্র আছে, কিন্তু সাধন না করলে, তপস্যা না করলে — ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

“ষড় দর্শনে দর্শন মেলে না, আগম নিগম তন্ত্রসারে।

“তবে শাস্ত্রে যা আছে, সেই সব জেনে নিয়ে সেই অনুসারে কাজ করতে হয়। একজন একখানা চিঠি হারিয়ে ফেলেছিল। কোথায় রেখেছে মনে নাই। তখন সে প্রদীপ লয়ে খুঁজতে লাগল। দু-তিনজন মিলে খুঁজে চিঠিখানা পেলে। তাতে লেখা ছিল, পাঁচ সের সন্দেশ আর একখানা কাপড় পাঠাইবে। সেইটুকু পড়ে লয়ে সে আবার চিঠিখানা ফেলে দিলে। তখন আর চিঠির কি দরকার। এখন পাঁচ সের সন্দেশ আর একখানা কাপড় কিনে পাঠালেই হবে।”

[The Art of Teaching : পঠন, শ্রবণ ও দর্শনের তারতম্য]

“পড়ার চেয়ে শুনা ভাল, — শুনার চেয়ে দেখা ভাল। গুরুমুখে বা সাধুমুখে শুনলে ধারণা বেশি হয়, — আর শাস্ত্রের অসার ভাগ চিন্তা করতে হয় না।

“হনুমান বলেছিল, ‘ভাই, আমি তিথি-নক্ষত্র অত সব জানি না — আমি কেবল রামচিন্তা করি।’

“শুনার চেয়ে দেখা আরও ভাল। দেখলে সব সন্দেহ চলে যায়। শাস্ত্রে অনেক কথা তো আছে; ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না হলে — তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি না হলে — চিত্তশুদ্ধি না হলে — সবই বৃথা। পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল — কিন্তু পাঁজি টিপ্‌লে এক ফোঁটাও পড়ে না! এক ফোঁটাই পড়, তাও না।”

[বিচার কতদিন — ঈশ্বরদর্শন পর্যন্ত — বিজ্ঞানী কে?]

“শাস্ত্রাদি নিয়ে বিচার কতদিন? যতদিন না ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হয়। ভ্রমর গুনগুন করে কতক্ষণ? যতক্ষণ ফুলে না বসে। ফুলে বসে মধুপান করতে আরম্ভ করলে আর শব্দ নাই।

"তবে একটি আছে, ঈশ্বরকে দর্শনের পরও কথা চলতে পারে। সে কথা কেবল ঈশ্বরেরই আনন্দের কথা, — যেমন মাতালের 'জয় কালী' বলা। আর ভ্রমর ফুলে ব'সে মধুপান করার পর আধ আধ স্বরে গুন গুন করে।

বিজ্ঞানীর নাম করিয়া ঠাকুর বুঝি নিজের অবস্থা ইঙ্গিতে বলিতেছেন।

"জ্ঞানী 'নেতি নেতি' বিচার করে। এই বিচার করতে করতে যেখানে আনন্দ পায় সেই ব্রহ্ম।

"জ্ঞানীর স্বভাব কিরূপ? — জ্ঞানী আইন অনুসারে চলে।

"আমায় চানকে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে কতকগুলি সাধু দেখলাম। তারা কেউ কেউ সেলাই করছিল। (সকলের হাস্য)। আমরা যাওয়াতে সে সব ফেললে। তারপর পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে আমাদের সঙ্গে কথা কইতে লাগল। (সকলের হাস্য)।

"কিন্তু ঈশ্বরীয় কথা জিজ্ঞাসা না করলে জ্ঞানীরা সে সব কথা কয় না। আগে জিজ্ঞাসা করবে এখন, তুমি কেমন আছ। ক্যায়সা হ্যায় — বাড়ির সব কেমন আছে।

"কিন্তু বিজ্ঞানীর স্বভাব আলাদা। তার এলান স্বভাব — হয়ত কাপড়-খানা আলগা — কি বগলের ভিতর — ছেলেদের মত!

"ঈশ্বর আছেন এইটি জেনেছে, এর নাম জ্ঞানী। কাঠে নিশ্চিত আগুন আছে যে জেনেছে সেই জ্ঞানী। কিন্তু কাঠ জ্বেলে রাঁধা, খাওয়া, হেউ-ঢেউ হ'য়ে যাওয়া, তার নাম বিজ্ঞানী।

"কিন্তু বিজ্ঞানীর অষ্টপাশ কনলে যায়, — কাম-ক্রোধাদির আকার মাত্র থাকে।"

পণ্ডিত — "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।"

[পূর্বকথা — কৃষ্ণকিশোরের বাড়ি গমন — ঠাকুরের বিজ্ঞানীর অবস্থা]

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, একখানা জাহাজ সমুদ্র দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার যত লহা-লক্কড়, পেরেক, ইস্ক্রু উপড়ে যেতে লাগল। কাছে চুম্বকের পাহাড় ছিল তাই সব লহা আল্‌গা হয়ে উপড়ে যেতে লাগল।

"আমি কৃষ্ণকিশোরের বাড়ি যেতাম। একদিন গিয়েছি, সে বললে, তুমি পান কাও কেন? আমি বললাম, খুশি পান খাব — আরশিতে মুখ দেখব, — হাজার মেয়ের ভিতর ন্যাংটো হয়ে নাচব! কৃষ্ণকিশোরের পারিবার তাকে বকতে লাগলো — বলল তুমি কারে কি বল? — রামকৃষ্ণকে কি বলছো?

"এ অবস্থা হ'লে কাম-ক্রোধাদি দগ্ধ হ'ইয়ে যায়। শরীরের কিচ্ছু হয় না; অন্য লোকের শরীরের মত দেখতে সব — কিন্তু ভিতর ফাঁক আর নির্মল।

ভক্ত — ঈশ্বরদর্শনের পরও শরীর থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কারু কারু কিছু কর্মের জন্য থাকে, — লোকশিক্ষার জন্য। গঙ্গাস্নানে পাপ যায় আর মুক্তি হয় — কিন্তু চক্ষু অন্ধ যায় না। তবে পাপের জন্য যে কয় জন্ম কর্মভোগ করতে হয় সে কয় জন্ম আর হয় না। যে পাক দিয়েছে সেই পাকটাই কেবল ঘুরে যাবে। বাকীগুলো আর হবে না। কামক্রোধাদি সব দগ্ধ হয়ে যায়, — তবে শরীরটা থাকে কিছু কর্মের জন্য।

পণ্ডিত — ওকেই সংস্কার বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বিজ্ঞানী সর্বদা ঈশ্বরদর্শন করে — তাই তো এরূপ এলানো ভাব। চক্ষু চেয়েও দর্শন করে। কখনও নিত্য হতে লীলাতে থাকে, কখনও লীলা হতে নিত্যেতে যায়।

পণ্ডিত — এটি বুঝলাম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — নেতি নেতি বিচার করে সেই নিত্য অখণ্ড সচ্চিদানন্দে পোঁছয়। তারা এই বিচার করে — তিনি জীব নন, জগৎ নন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নন। নিত্যে পোঁছে আবার দেখে — তিনি এই সব হয়েছেন — জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব।

“দুধকে দই পেতে মন্থন করে মাখন তুলতে হয়। কিন্তু মাখন তোলা হলে দেখে যে, ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। খোলেরই মাঝ, মাঝেরই খোল।”

পণ্ডিত (ভূধরের প্রতি, সহাস্যে) — বুঝলে? এ বুঝা বড় শক্ত!

শ্রীরামকৃষ্ণ —— মাখন হয়েছে তো ঘোলও হয়েছে। মাখনকে ভাবতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে ঘোলকেও ভাবতে হয়, — কেননা ঘোল না থাকলে মাখন হয় না। তাই নিত্যকে মানতে গেলেই লীলাকেও মানতে হয়। অনুলোম ও বিলোম। সাকার-নিরাকার সাক্ষাৎকারের পর এই অবস্থা! সাকার চিন্ময়রূপ, নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ।

“তিনিই সব হয়েছেন, — তাই বিজ্ঞানীর ‘এই সংসার মজার কুটি’। জ্ঞানীর পক্ষে ‘এ সংসার ধোঁকার টাটি।’ রামপ্রসাদ ধোঁকার টাটি বলেছিল। তাই একজন জবাব দিয়েছিল, —

এই সংসার মজার কুটি, আমি খাই দাই আর মজা লুটি।
ওরে বদ্যি নাহিক বুদ্ধি, বুঝিস কেবল মোটামুটি ।।
জনক রাজা মহাতেজা তার কিসের ছিল ক্রুটি।
সে এদিক-ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি ।।

(সকলের হাস্য)

“বিজ্ঞানী ঈশ্বরের আনন্দ বিশেষরূপে সম্ভোগ করেছে। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ খেয়েছে। বিজ্ঞানী দুধ খেয়েছে আর খেয়ে আনন্দলাভ করেছে ও হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে।”

“তবে একটি আছে, ঈশ্বরকে দর্শনের পরও কথা চলতে পারে। সে-কথা কেবল ঈশ্বরের আনন্দের কথা, — যেমন মাতালের ‘জয় কালী’ বলা। সর ভ্রমর ফুলে বসে মধুপান করার পর আধ আধ স্বরে গুনগুন করে।”

বিজ্ঞানীর নাম করিয়া ঠাকুর বুঝি নিজের অবস্থা ইঙ্গিতে বলিতেছেন।

“জ্ঞানী ‘নেতি নেতি’ বিচার করে। এই বিচার করতে করতে যেখানে আনন্দ পায় সেই ব্রহ্ম।

“জ্ঞানীর স্বভাব কিরূপ? — জ্ঞানী আইন অনুসারে চলে।

“আমায় চানকে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে কতকগুলি সাধু দেখলাম। তারা কেউ কেউ সেলাই করছিল। (সকলের হাস্য) আমরা যাওয়াতে সে-সব ফেললে। তারপর পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আমাদের সঙ্গে কথা কইতে লাগল। (সকলের হাস্য)

“কিন্তু ঈশ্বরীয় কথা জিজ্ঞাসা না করলে জ্ঞানীরা সে-সব কথা কয় না। আগে জিজ্ঞাসা করবে এখন, তুমি কেমন আছ। ক্যায়সা হ্যায় — বাড়ির সব কেমন আছে।

“কিন্তু বিজ্ঞানীর স্বভাব আলাদা। তার এলানো স্বভাব — হয়তো কাপড়খানা আলগা — কি বগলের ভিতর — ছেলেদের মতো।

“ঈশ্বর আছেন এইটি জেনেছে, এর নাম জ্ঞানী। কাঠে নিশ্চিত আগুন আছে যে জেনেছে সেই জ্ঞানী। কিন্তু কাঠ জ্বেলে রাঁধা, খাওয়া, হেউ-ঢেউ হয়ে যাওয়া, যার হয় তার নাম বিজ্ঞানী।

“কিন্তু বিজ্ঞানীর অষ্টপাশ খুলে যায়, কাম-ক্রোধাদির আকার মাত্র থাকে।”

পণ্ডিত — “ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।”১

[পূর্বকথা — কৃষ্ণকিশোরের বাড়ি গমন — ঠাকুরের বিজ্ঞানীর অবস্থা]

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, একখানা জাহাজ সমুদ্র দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ যত লোহা-লক্কড়, পেরেক, ইস্ক্রু উপড়ে যেতে লাগল। কাছে চুম্বকের পাহাড় ছিল তাই সব লোহা আলগা হয়ে উপড়ে যেতে লাগল।

“আমি কৃষ্ণকিশোরের বাড়ি যেতাম। একদিন গিয়েছি, সে বললে, তুমি পান খাও কেন? আমি বললাম, খুশি পান খাব — আরশিতে মুখ দেখব, — হাজার মেয়ের ভিতর ন্যাংটো হয়ে নাচব! কৃষ্ণকোশোরের পরিবার তাকে বকতে লাগল — বললে, তুমি কারে কি বল? — রামকৃষ্ণকে কি বলছ?

“এ-অবস্থা হলে কাম-ক্রোধাদি দগ্ধ হয়ে যায়। শরীরের কিছু হয় না; অন্য লোকের শরীরের মতো দেখতে সব — কিন্তু ভিতর ফাঁক আর নির্মল।”

ঠাকুর একটু চুপ করিলেন ও পণ্ডিতকে তামাক খাইতে বলিলেন। পণ্ডিত দক্ষিণ-পূর্বের লম্বা বারান্দায় তামাক খাইতে গেলেন।

১ মুণ্ডকোপনিষদ্   [২।২।৮]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৩০শে জুন 1884/06/30/iii

24.3 জ্ঞান ও বিজ্ঞান — ঠাকুর ও বেদোক্ত ঋষিগণ

পণ্ডিত ফিরিয়া আসিয়া আবার ভক্তদের সঙ্গে মেঝেতে বসিলেন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতের প্রতি) — তোমাকে এইটে বলি। আনন্দ তিন প্রকার — বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ। যা সর্বদাই নিয়ে আছে — কামিনী-কাঞ্চনের আনন্দ — তার নাম বিষয়ানন্দ। ঈশ্বরের নামগুণগান করে যে আনন্দ তার নাম ভজনান্দ। আর ভগবান দর্শনের যে আনন্দ তার নাম ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দলাভের পর ঋষিদের স্বেচ্ছাচার হয়ে যেত।

“চৈতন্যদেবের তিনরকম অবস্থা হত — অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা ও বাহ্যদশা। অন্তর্দশায় ভগবানদর্শন করে সমাধিস্থ হতেন, — জড়সমাধির অবস্থা হত। অর্ধবাহ্যে একটু বাহিরের হুঁশ থাকত। বাহ্যদশায় নামগুণকীর্তন করতে পারতেন।”

হাজরা (পণ্ডিতের প্রতি) — এইতো সব সন্দেহ ঘুচান হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতের প্রতি) — সমাধি কাকে বলে? — যেখানে মনের লয় হয়। জ্ঞানীর জড়সমাধি হয়, — ‘আমি’ থাকে না। ভক্তিযোগের সমাধিকে চেতনসমাধি বলে। এতে সেব্য-সেবকের ‘আমি’ থাকে — রস-রসিকের ‘আমি’ — আস্বাদ্য-আস্বাদকের ‘আমি’। ঈশ্বর সেব্য — ভক্ত সেবক; ঈশ্বর রসস্বরূপ — ভক্ত রসিক; ঈশ্বর আস্বাদ্য — ভক্ত আস্বাদক। চিনি হব না, চিনি খেতে ভালবাসি।

পণ্ডিত — তিনি যদি সব ‘আমি’ লয় করেন তাহলে কি হবে? চিনি যদি করে লন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তোমার মনের কথা খুলে বল। “মা কৌশল্যা, একবার প্রকাশ করে বল!” (সকলের হাস্য) তবে কি নারদ, সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার শাস্ত্রে নাই?

পণ্ডিত — আজ্ঞা হাঁ, শাস্ত্রে আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — প্রার্থনা কর। তিনি দয়াময়। তিনি কি ভক্তের কথা শুনেন না? তিনি কল্পতরু। তাঁর কাছে গিয়ে যে যা চাইবে তাই পাবে।

পণ্ডিত — আমি তত এ-সব চিন্তা করি নাই। এযন সব বুঝছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ব্রহ্মজ্ঞানের পরও ঈশ্বর একটু ‘আমি’ রেখে দেন। সেই ‘আমি’ — “ভক্তের আমি” “বিদ্যার আমি।” তা হতে এ অনন্ত লীলা আস্বাদন হয়।

মুষল সব ঘষে একটু তাতেই আবার উলুবনে পড়ে কুলনাশন — যদুবংশ ধ্বংস হল। বিজ্ঞানী তাই এই “ভক্তের আমি” “বিদ্যার আমি” রাখে আস্বাদনের জন্য, লোকশিক্ষার জন্য।

[ঋষিরা ভয়তরাসে — A new light on the Vedanta]

“ঋষিরা ভয়তরাসে। তাদের ভাব কি জান? আমি জো-সো করে যাচ্ছি আবার কে আসে? যদি কাঠ আপনি জো-সো করে ভেসে যায় — কিন্তু তার উপর একটি পাখি বসলে ডুবে যায়। নারদাদি বাহাদুরী কাঠ, আপনিও ভেসে যায়, আবার অনেক জীবজন্তুকেও নিয়ে যেতে পারে। স্টীমবোট (কলের জাহাজ) — আপনিও পার হয়ে যায় এবং অপরকে পার করে নিয়ে যায়।

“নারদাদি আচার্য বিজ্ঞানী, — অন্য ঋষিদের চেয়ে সাহসী। যেমন পাকা খেলোয়াড় ছকবাঁধা খেলা খেলতে পারে। কি চাও, ছয় না পাঁচ? ফি বারেই ঠিক পড়ছে! — এমনি খেলোয়াড়! — সে আবার মাঝে মাঝে গোঁপে তা দেয়।

“শুধু জ্ঞানী যারা, তারা ভয়তরাসে। যেমন সতরঞ্চ খেলায় কাঁচা লোকেরা ভাবে, জো-সো করে একবার ঘুঁটি উঠলে হয়। বিজ্ঞানীর কিছুতেই ভয় নাই। সে সাকার-নিরাকার সাক্ষাৎকার করেছে! — ঈশ্বরের আনন্দ সম্ভোগ করেছে!

“তাঁকে চিন্তা করে, অখণ্ডে মন লয়ে হলেও আনন্দ, — আবার মন লয় না হলেও লীলাতে মন রেখেও আনন্দ।

“শুধু জ্ঞানী একঘেয়ে, — কেবল বিচার কচ্চে ‘এ নয় এ নয়, — এ-সব স্বপ্নবৎ।’ আমি দুহাত ছেড়ে দিয়েছি, তাই সব লই।

“একজন ব্যানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। ব্যান তখন সুতা কাটছিল, নানারকমের রেশমের সুতা। ‘ব্যান’ তার ব্যানকে দেখে খুব আনন্দ করতে লাগল; — আর বললে — ‘ব্যান, তুমি এসেছ বলে আমার যে কি আনন্দ হয়েছে, তা বলতে পারি না, — যাই তোমার জন্য কিছু জলখাবার আনিগে।’ ব্যান জলখাবার আনতে গেছে, — এদিকে নানা রঙের রেশমের সুতা দেখে এ-ব্যানের লোভ হয়েছে। সে একতাড়া সুতা বগলে করে লুকিয়ে ফেললে। ব্যান জলখাবার নিয়ে এল; — আর অতি উৎসাহের সহিত — জল খাওয়াতে লাগল। কিন্তু সুতার দিকে দৃষ্টিপাত করে বুঝতে পারলে যে, একতাড়া সুতো ব্যান সরিয়েছেন। তখন সে সুতোটা আদায় করবার একটা ফন্দি ঠাওরালে।

“সে বলছে, ‘ব্যান, অনেকদিনের পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হল। আজ ভারী আনন্দের দিন। আমার ভারী ইচ্ছা কচ্ছে যে দুজনে নৃত্য করি।’ সে বললে — ‘ভাই, আমারও ভারী আনন্দ হয়েছে।’ তখন দুই ব্যানে নৃত্য করতে লাগল। ব্যান দেখলে যে, ইনি বাহু না তুলে নৃত্য করছেন। তখন তিনি বললেন, ‘এস ব্যান দুহাত তুলে আমরা নাচি, — আজ ভারী আনন্দের দিন।’ কিন্তু তিনি একহাতে বগল টিপে আর-একটি হাত তুলে নাচতে লাগলেন! তখন ব্যান বললেন, ‘ব্যান ওকি! একহাত তুলে নাচা কি, এস দুহাত তুলে নাচি। এই দেখ, আমি দুহাত তুলে নাচছি।’ কিন্তু তিনি বগল টিপে হেসে হেসে একহাত তুলেই নাচতে লাগলেন আর বললেন, ‘যে যেমন জানে ব্যান!’

“আমি বগলে হাত দিয়ে টিপি না, — আমি দুহাত ছেড়ে দিয়েছি — আমার ভয় নাই। তাই আমি নিত্য-লীলা দুই লই।”

ঠাকুর কি বলিতেছেন যে জ্ঞানীর লোকমান্য হবার কামনা জ্ঞানীর মুক্তি কামনা — এই সব থাকে বলে দুহাত তুলে নাচতে পারে না? নিত্য-লীলা দুই নিতে পারে না? আর জ্ঞানীর ভয় আছে, বদ্ধ হই, — বিজ্ঞানীর ভয় নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেশব সেনকে বললা যে, ‘আমি’ ত্যাগ না করলে হবে না। সে বললে, তাহলে মহাশয় দলটল থাকে না। তখন আমি বললাম, “কাঁচা আমি,” “বজ্জাত আমি” — ত্যাগ করতে বলছি, কিন্তু “পাকা আমি” — “বালকের আমি”, “ঈশ্বরের দাস আমি”, “বিদ্যার আমি” — এতে দোষ নাই। “সংসারীর আমি” — “অবিদ্যার আমি” — “কাঁচা আমি” — একটা মোটা লাঠির ন্যায়। সচ্চিদানন্দসাগরের জল ওই লাঠি যেন দুই ভাগ করেছে। কিন্তু “ঈশ্বরের দাস আমি,” “বালকের আমি,” “বিদ্যার আমি” জলের উপর রেখার ন্যায়। জল এক, বেশ দেখা যাচ্ছে — শুধু মাঝখানে একটি রেখা, যেন দুভাগ জল। বস্তুতঃ একজল, — দেখা যাচ্ছে।

“শঙ্করাচার্য ‘বিদ্যার আমি’ রেখেছিলেন — লোকশিক্ষার জন্য।”

[ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পর “ভক্তের আমি” — গোপীভাব]

“ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পরেও অনেকের ভিতর তিনি ‘বিদ্যার আমি’ — ‘ভক্তের আমি’ রেখে দেন। হনুমান সাকার-নিরাকার সাক্ষাৎকার করবার পর সেব্য-সেবকের ভাবে, ভক্তের ভাবে থাকতেন। রামচন্দ্রকে বলেছিলেন, ‘রাম, কখন

ভাবি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; কখন ভাবি তুমি সেব্য, আমি সেবক; আর রাম, যখন তত্ত্বজ্ঞান হয় তখন দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি!’

“যশোদা কৃষ্ণ বিরহে কাতর হয়ে শ্রীমতীর কাছে গেলেন। তাঁর কষ্ট দেখে শ্রীমতী তাঁকে স্বরূপে দেখা দিলেন — আর বললেন, ‘কৃষ্ণ চিদাত্মা আমি চিচ্ছক্তি। মা তুমি আমার কাছে বর লও।’ যশোদা বললেন, মা আমার ব্রহ্মজ্ঞান চাই না — কেবল এই বর দাও যেন ধ্যানে গোপালের রূপ সর্বদা দর্শন হয়, আর কৃষ্ণভক্তসঙ্গ যেন সর্বদা হয়, আর ভক্তদের যেন আমি সেবা করতে পারি, — আর তাঁর নামগুনকীর্তন যেন আমি সর্বদা করতে পারি।

“গোপীদের ইছা হয়েছিল, ভগবানের ঈশ্বরীয় রূপদর্শন করে। কৃষ্ণ তাদের যমুনায় ডুব দিতে বললেন। ডুব দেওয়ায় যা অমনি বৈকুণ্ঠে সব্বাই উপস্থিত; — ভগবানের সেই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ রূপ দর্শন হল; — কিন্তু ভাল লাগল না। তখন কৃষ্ণকে তারা বললে, আমাদের গোপালকে দর্শন, গোপালের সেবা এই যেন থাকে আর আমারা কিছুই চাই না।

“মথুরা যাবার আগে কৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞান দিবার উদ্যোগ করেছিলেন। বলেছিলেন, আমি সর্বভূতের অন্তরে বাহিরে আছি। তোমরা কি একটি রূপ কেবল দেখছ? গোপীরা বলে উঠল, ‘কৃষ্ণ, তবে কি আমাদের ত্যাগ করে যাবে তাই ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিচ্ছ?’

“গোপীদের ভাব কি জান? আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের।”

একজন ভক্ত — এই “ভক্তের আমি” কি একেবারে যায় না?

[Sri Ramakrishna and the Vedanta]

শ্রীরামকৃষ্ণ — ও ‘আমি’ এক-একবার যায়। তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে সমাধিস্থ হয়। আমারও যায়। কিন্তু বরাবর নয়। সা রে গা মা পা ধা নি, — কিন্তু ‘নি’তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না, — আবার নিচের গ্রামে নামতে হয়। আমি বলি “মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিও না।” আগে সাকারবাদীরা খুব আসত। তারপর ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীরা আসতে আরম্ভ করলে। তখন প্রায় ওইরূপ বেহুঁশ হয়ে সমাধিস্থ হতাম — আর হুঁশ হলেই বলতাম, মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিও না।

পণ্ডিত — আমরা বললে তিনি শুনবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বর কল্পতরু। যে যা চাইবে, তাই পাবে। কিন্তু কল্পতরুর কাছে থেকে চাইতে হয়, তবে কথা থাকে।

“তবে একটি কথা আছে — তিনি ভাবগ্রাহী। যে যা মনে করে সাধনা করে তার সেরূপই হয়। যেমন ভাব তেমনি লাভ। একজন বাজিকর খেলা দেখাচ্ছে রাজার সামনে। আর মাঝে মাঝে বলছে রাজা টাকা দেও, কাপড়া দেও। এমন সময়ে তার জিব তালুর মূলের কাছে উলটে গেল। অমনি কুম্ভক হয়ে গেল। আর কথা নাই, শব্দ নাই, স্পন্দন নাই। তখন সকলে তাকে ইটের কবর তৈয়ার করে সেই ভাবেই পুঁতে রাখলে। হাজার বৎসর পরে সেই কবর কে খুঁড়েছিল। তখন লোকে দেখে যে একজন সমাধিস্থ হয়ে বসে আছে! তারা তাকে সাধু মনে করে পূজা করতে লাগল। এমন সময় নাড়াচাড়া দিতে দিতে তার জিব তালু

থেকে সরে এল। তখন তার চৈতন্য হল, আর সে চিৎকার করে বলতে লাগল, লাগ ভেলকি লাগ! রাজা টাকা দেও, কাপড়া দেও!

"আমি কাঁদতাম আর বলতাম, মা বিচারবুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হোক!"

পণ্ডিত — তবে আপনারও (বিচারবুদ্ধি) ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, একবার ছিল।

পণ্ডিত — তবে বলে দিন, তাহলে আমাদেরও যাবে। আপনার কেমন করে গেল?

শ্রীরামকৃষ্ণ — অমনি একরকম করে গেল।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৩০শে জুন 1884/06/30/iv

24.4 ঈশ্বরদর্শন জীবনের উদ্দেশ্য — তাহার উপায়

[ঐশ্বর্য ও মাধুর্য — কেহ কেহ ঐশ্বর্যজ্ঞান চায় না]

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বর কল্পতরু। তাঁর কাছে থেকে চাইতে হয়। তখন যে যা চায় তাই পায়।

“ঈশ্বর কত কি করেছেন। তাঁর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড — তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্যের জ্ঞান আমার দরকার কি! আর যদি জানতে ইচ্ছা করে, আগে তাঁকে লাভ করতে হয়, তারপর তিনি বলে দেবেন। যদু মল্লিকের কখানা বাড়ি কত কোম্পানির কাগজ আছে এ-সব আমার কি দরকার! আমার দরকার, জো-সো করে বাবুর সঙ্গে আলাপ করা! তা পগার ডিঙিয়েই হোক! — প্রার্থনা করেই হোক! বা দ্বারবানের ধাক্কা খেয়েই হোক — আলাপের পর কত কি আছে একবার জিজ্ঞাসা করলে বাবুই বলে দেয়। আবার বাবুর সঙ্গে আলাপ হলে আমলারাও মানে। (সকলের হাস্য)

“কেউ কেউ ঐশ্বর্যের জ্ঞান চায় না। শুঁড়ির দোকানে কত মন মদ আছে আমার কি দরকার! আমার এক বোতলেতেই হয়ে যায়। ঐশ্বর্য জ্ঞান চাইবে কি। যেটুকু মদ খেয়েছে তাতেই মত্ত!”

[জ্ঞানযোগ বড় কঠিন — অবতারাদি নিত্যসিদ্ধ]

“ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ — এ-সবই পথ। যে-পথ দিয়েই যাও তাঁকে পাবে। ভক্তির পথ সহজ পথ। জ্ঞান বিচারের পথ কঠিন পথ।

“কোন্ পথটি ভাল অত বিচার করবার কি দরকার। বিজয়ের সঙ্গে অনেকদিন কথা হয়েছিল, বিজয়কে বললাম, একজন প্রার্থনা করত, ‘হে ঈশ্বর! তুমি যে কি, কেমন আছ, আমায় দেখা দাও।’

“জ্ঞানবিচারের পথ কঠিন। পার্বতী গিরিরাজকে নানা ঈশ্বরীয় রূপে দেখা দিয়ে বললেন, ‘পিতা, যদি ব্রহ্মজ্ঞান চাও সাধুসঙ্গ কর।

“ব্রহ্ম কি মুখে বলা যায় না। রামগীতায় আছে, কেবল তটস্থ লক্ষণে তাঁকে বলা যায়, যেমন গঙ্গার উপর ঘোষপল্লী। গঙ্গার তটের উপর আছে এই কথা বলে ঘোষপল্লীকে ব্যক্ত করা যায়।

“নিরাকার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হবে না কেন? তবে বড় কঠিন। বিষয় বুদ্ধির লেশ থাকলে হবে না। ইন্দ্রিয়ের বিষয় যত আছে — রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ সমস্ত ত্যাগ হলে — মনের লয় হলে — তবে অনুভবে বোধে বোধ হয় আর অস্তিমাত্র জানা যায়।”

পণ্ডিত — অস্তীত্যোপলব্ধব্য ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁকে পেতে গেলে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়, — বীরভাব, সখীভাব বা দাসীভাব আর সন্তানভাব।

মণি মল্লিক — তবে আঁট হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি সখীভাবে অনেকদিন ছিলাম। বলতাম, ‘আমি আনন্দময়ী ব্রহ্মময়ীর দাসী, — ওগো দাসীরা আমায় তোমরা দাসী কর, আমি গরব করে চলে যাব, বলতে বলতে যে, আমি সাধন ব্রহ্মময়ীর দাসী!’

“কারু কারু সাধন না করে ঈশ্বরলাভ হয়, — তাদের নিত্যসিদ্ধ বলে। যারা জপতপাদি সাধন করে ঈশ্বরলাভ করেছে তাদের বলে সাধনসিদ্ধ। আবার কেউ কৃপাসিদ্ধ, — যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর, প্রদীপ নিয়ে গেলে একক্ষণে আলো হয়ে যায়!

“আবার আছে হঠাৎসিদ্ধ, — যেমন গরিবের ছেলে বড়মানুষের নজরে পড়ে গেছে। বাবু তাকে মেয়ে বিয়ে দিলে, — সেই সঙ্গে বাড়িঘর, গাড়ি, দাস-দাসী সব হয়ে গেল।

“আর আছে স্বপ্নসিদ্ধ — স্বপ্নে দর্শন হল।”

সুরেন্দ্র (সহাস্যে) — আমরা এখন ঘুমুই, — পরে বাবু হয়ে যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে) — তুমি তো বাবু আছই। ‘ক’য়ে আকার দিলে ‘কা’ হয়; — আবার একটা আকার দেওয়া বৃথা; — দিলে সেই ‘কা’ই হবে! (সকলের হাস্য)

“নিত্যসিদ্ধ আলাদা থাক — যেমন অরণি কাষ্ঠ, একটু ঘষলেই আগুন, — আবার না ঘষলেও হয়। একটু সাধন করলেই নিত্যসিদ্ধ ভগবানকে লাভ করে, আবার সাধন না করলেও পায়।

“তবে নিত্যসিদ্ধ ভগবানলাভ করার পর সাধন করে। যেমন আলু-কুমড়ো গাছে আগে ফল হয় তারপর ফুল।”

পণ্ডিত লাউ-কুমড়োর ফল আগে হয় শুনিয়া হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আর নিত্যসিদ্ধ হোমাপাখির ন্যায়। তার মা উচ্চ আকাশে থাকে। প্রসবের পর ছানা পৃথিবির দিকে পড়ে থাকে। পড়তে পড়তে ডানা উঠে ও চোখ ফুটে। কিন্তু মাটি গায়ে আঘাত না লাগতে লাগতে মার দিকে চোঁচা দৌড় দেয়। কোথায় মা! কোথায় মা! দেখ না প্রহ্লাদের ‘ক’ লিখতে চক্ষে ধারা!

ঠাকুর নিত্যসিদ্ধের কথায় অরণি কাঠ ও হোমাপাখির দৃষ্টান্তের দ্বারা কি নিজের অবস্থা বুঝাইতেছেন?

ঠাকুর পণ্ডিতের বিনীতভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। পণ্ডিতের স্বভাবের বিষয় ভক্তদের বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — এঁর স্বভাবটি বেশ। মাটির দেওয়ালে পেরেক পুঁতলে কোন কষ্ট হয় না। পাথরে পেরেকের গোড়া ভেঙে যায় তবু পাথরের কিছু হয় না। এমন সব লোক আছে হাজার ঈশ্বরকথা শুনুক, কোন মতে চৈতন্য হয় না, — যেমন কুমির — গায়ে তরবারির চোপ লাগে না!

[পাণ্ডিত্য অপেক্ষা সাধনা ভাল — বিবেক]

পণ্ডিত — কুমিরের পেটে বর্শা মারলে হয়। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্য) — গুচ্ছির শাস্ত্র পড়লে কি হবে? ফ্যালাজফী (Philosophy)! (সকলের হাস্য)

পণ্ডিত (সহাস্য) — ফ্যালাজফী বটে!

শ্রীরামকৃষ্ণ —— লম্বা লম্বা কথা বললে কি হবে? বাণশিক্ষা করতে গেলে আগে কলাগাছ তাগ করতে হয়, — তারপর শরগাছ, — তারপর সলতে, — তারপর উড়ে যাচ্ছে যে পাখি।

“তাই আগে সাকারে মনস্থির করতে হয়।

“আবার ত্রিগুণাতীত ভক্ত আছে, — নিত্য ভক্ত যেমন নারদাদি। সে ভক্তিতে চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় সেবক, — নিত্য ঈশ্বর, নিত্য ভক্ত, নিত্য ধাম।

“যারা নেতি নেতি জ্ঞানবিচার করছে, তারা অবতার মানে না। হাজরা বেশ বলে —— ভক্তের জন্যই অবতার, — জ্ঞানীর জন্য অবতার নয়, তারা তো সোঽহম্ হয়ে বসে আছে।”

ঠাকুর ও ভক্তেরা সকলেই কিয়ৎকাল চুপ করিয়া আছেন। এইবার পণ্ডিত কথা কহিতেছেন।

পণ্ডিত —— আজ্ঞে, কিসে নিষ্ঠুর ভাবটা যায়? হাস্য দেখলে মাংসপেশী (muscles), স্নায়ু (nerves) মনে পড়ে। শোক দেখলে কিরকম nervous system মনে পড়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্য) — নারাণ শাস্ত্রী তাই বলত, ‘শাস্ত্র পড়ার দোষ, — তর্ক-বিচার এই সব এনে ফেলে!’

পণ্ডিত — আজ্ঞে, উপায় কি কিছু নাই? — একটু মার্দব —

শ্রীরামকৃষ্ণ — আছে — বিবেক। একটা গান আছে, —

‘বিবেক নামে তার বেটার তত্ত্বকথা তায় সুধাবি।’

“বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে অনুরাগ — এই উপায়। বিবেক না হলে কথা কখন ঠিক ঠিক হয় না। সামাধ্যয়ী অনেক ব্যাখ্যার পর বললে, ‘ঈশ্বর নীরস!’ একজন বলেছিল, ‘আমাদের মামাদের একগোয়াল ঘোড়া আছে।’ গোয়ালে কি ঘোড়া থাকে?

(সহাস্যে) “তুমি ছানাবড়া হয়ে আছ। এখন দু-পাঁচদিন রসে পড়ে থাকলে তোমার পক্ষেও ভাল, পরেরও ভাল। দু-পাঁচদিন।”

পণ্ডিত (ঈষৎ হাসিয়া) — ছানাবড়া পুড়ে অঙ্গার হয়ে গিয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — না, না; আরসুলার রঙ হয়েছে।

হাজরা — বেশ ভাজা হয়েছে, — এখন রস খাবে বেশ।

[পূর্বকথা — তোতাপুরীর উপদেশ — গীতার অর্থ — ব্যাকুল হও]

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি জান, — শাস্ত্র বেশি পড়বার দরকার নাই। বেশি পড়লে তর্ক বিচার এসে পড়ে। ন্যাংটা আমায় শেখাত — উপদেশ দিত — গীতা দশবার বললে যা হয় তাই গীতার সার! — অর্থাৎ ‘গীতা’ ‘গীতা’ দশবার বলতে বলতে ‘ত্যাগী’ ‘ত্যাগী’ হয়ে যায়।

“উপায় — বিবেক, বৈরাগ্য, আর ঈশ্বরে অনুরাগ। কিরূপ অনুরাগ? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল, — যেমন ব্যাকুল হয়ে ‘বৎসের পিছে গাভী ধায়’।”

পণ্ডিত — বেদে ঠিক অমনি আছে, গাভী যেমন বৎসের জন্য ডাকে, তোমাকে আমরা তেমনি ডাকছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ব্যাকুলতার সঙ্গে কাঁদো। আর বিবেক-বৈরাগ্য এনে যদি কেউ সর্বত্যাগ করতে পারে, — তাহলে সাক্ষাৎকার হবে।

“সে ব্যাকুলতা এলে উন্মাদের অবস্থা হয় — তা জ্ঞানপথেই থাক, আর ভক্তিপথেই থাক। দুর্বাসার জ্ঞানোন্মাদ হয়েছিল।

“সংসারীর জ্ঞান আর সর্বত্যাগীর জ্ঞান — অনেক তফাত। সংসারীর জ্ঞান — দীপের আলোর ন্যায় ঘরের ভিতরটি আলো হয়, — নিজের দেহ ঘরকন্না ছাড়া আর কিছু বুঝতে পারে না। সর্বত্যাগীর জ্ঞান, সূর্যের আলোর ন্যায়। সে আলোতে ঘরের ভিতর বা’র সব দেখা যায়। চৈতন্যদেবের জ্ঞান সৌরজ্ঞান — জ্ঞানসূর্যের আলো! আবার তাঁর ভিতর ভক্তিচন্দ্রের শীতল আলোও ছিল। ব্রহ্মজ্ঞান, ভক্তিপ্রেম, দুই-ই ছিল।”

ঠাকুর কি চৈতন্যদেবের অবস্থা বর্ণনা করিয়া নিজের অবস্থা বলিতেছেন?

[জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ — কলিতে নারদীয় ভক্তি]

“অভাবমুখ চৈতন্য আর ভাবমুখ চৈতন্য। ভাব ভক্তি একটি পথ আছে; আর অভাবের একটি আছে। তুমি অভাবের কথা বলছ। কিন্তু ‘সে বড় কঠিন ঠাঁই গুরুশিষ্য দেখা নাই!’ জনকের কাছে শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশের জন্য গেলেন। জনক বললেন, ‘আগে দক্ষিণা দিতে হবে, — তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হলে আর দক্ষিণা দেবে না — কেননা গুরুশিষ্যে ভেদ থাকে না।’

“ভাব অভাব সবই পথ। অনন্ত মত অনন্ত পথ। কিন্তু একটি কথা আছে। কলিতে নারদীয় ভক্তি — এই বিধান। এ-পথে প্রথমে ভক্তি, ভক্তি পাকলে ভাব, ভাবের চেয়ে উচ্চ মহাভাব আর প্রেম। মহাভাব আর প্রেম জীবের হয় না। যার তা হয়েছে তার বস্তুলাভ অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ হয়েছে।”

পণ্ডিত — আজ্ঞে, বলতে গেলে তো অনেক কথা দিয়ে বুঝাতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি নেজামুড়া বাদ দিয়ে বলবে হে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৩০শে জুন 1884/06/30/v

24.5 কালীব্রহ্ম, ব্রহ্মশক্তি অভেদ — সর্বধর্ম-সমন্বয়

শ্রীযুক্ত মণি মল্লিকের সঙ্গে পণ্ডিত কথা কহিতেছেন। মণি মল্লিক ব্রাহ্মসমাজের লোক। পণ্ডিত ব্রাহ্মসমাজের দোষগুন লইয়া ঘোর তর্ক করিতেছেন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া দেখিতেছেন ও হাস্য করিতেছেন। মাঝে মাঝে বলিতেছেন, "এই সত্ত্বের তমঃ — বীরের ভাব। এ-সব চাই। অন্যায় অসত্য দেখলে চুপ করে থাকতে নাই। মনে কর, নষ্ট স্ত্রী পরমার্থ হানি করতে আসছে, তখন এই বীরের ভাব ধরতে হয়। তখন বলবে, কি শ্যালি! আমার পরমার্থ হানি করবি! — এক্ষণি তোর শরীর চিরে দিব।"

আবার হাসিয়া বলিতেছেন, "মণি মল্লিকের ব্রাহ্মসমাজের মত অনেকদিনের — ওর ভিতর তোমার মত ঢোকাতে পারবে না। পুরানো সংস্কার কি এমনি যায়? একজন হিন্দু বড় ভক্ত ছিল, — সর্বদা জগদম্বার পূজা আর নাম করত। মুসলমানদের যখন রাজ্য হল তখন সেই ভক্তকে ধরে মুসলমান করে দিল, আর বললে, তুই এখন মুসলমান হয়েছিস, বল আল্লা! কেবল আল্লা নাম জপ কর। সে অনেক কষ্টে আল্লা, আল্লা বলতে লাগল। কিন্তু এক-একবার বলে ফেলতে লাগল 'জগদম্বা!' তখন মুসলমানেরা তাকে মারতে যায়। সে বলে, দোহাই শেখজী! আমায় মারবেন না, আমি তোমাদের আল্লা নাম করতে খুব চেষ্টা করছি, কিন্তু আমাদের জগদম্বা আমার কণ্ঠা পর্যন্ত রয়েছেন, তোমাদের আল্লাকে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছেন। (সকলের হাস্য)

(পণ্ডিতের প্রতি, সহাস্যে) — "মণি মল্লিককে কিছু বলো না।

“কি জানো, রুচিভেদ, আর যার যা পেটে সয়। তিনি নানা ধর্ম নানা মত করেছেন — অধীকারী বিশেষের জন্য। সকলে ব্রহ্মজ্ঞানের অধীকারী নয়, তাই আবার তিনি সাকারপূজার ব্যবস্থা করেছেন। মা ছেলেদের জন্য বাড়িতে মাছ এনেছে। সেই মাছে ঝোল, অম্বল, ভাজা আবার পোলাও করলেন। সকলের পেটে কিন্তু পোলাও সয় না; তাই কারু কারু জন্য মাছের ঝোল করেছেন, — তারা পেট রোগা। আবার কারু সাধ অম্বল খায়, বা মাছ ভাজা খায়। প্রকৃতি আলাদা — আবার অধিকারী ভেদ।”

সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর পণ্ডিতকে বলিতেছেন, “যাও একবার ঠাকুর দর্শন করে এসো, — আবার বাগানে একটু বেড়াও।”

বেলা সাড়ে পাঁচটা বাজিয়াছে। পণ্ডিত ও তাঁহার বন্ধুরা গাত্রোত্থান করিলেন; ঠাকুরবাড়ি দেখিবেন। ভক্তেরাও কেহ কেহ তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মাস্টার সমভিব্যাহারে বেড়াইতে বেড়াইতে ঠাকুরও গঙ্গাতীরে বাঁধাঘাটের দিকে যাইতেছেন। ঠাকুর মাস্টারকে বলিতেছেন, “বাবুরাম এখন বলে — পড়েশুনে কি হবে।“

গঙ্গাতীরে পণ্ডিতের সহিত ঠাকুরের আবার দেখা হইল। ঠাকুর বলিতেছেন, “কালীঘরে যাবে না? — তাই এলুম।” পণ্ডিত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “আজ্ঞে, চলুন দর্শন করি গিয়ে।”

ঠাকুর সহাস্যবদন। চাঁদনির ভিতর দিয়া কালীঘরের দিকে যাইতে যাইতে বলিতেছেন, “একটা গানে আছে।” এই বলিয়া মধুর সুর করিয়া গাহিতেছেন:

“মা কি আমার কালো রে!
কালোরূপ দিগম্বরী হৃদিপদ্ম করে আলো রে!”

চাঁদনি হইতে প্রাঙ্গণে আসিয়া আবার বলিতেছেন, একটা গানে আছে, —
‘জ্ঞানাগ্নি জ্বেলে ঘরে, ব্রহ্মময়ীর রূপ দেখ না’!

মন্দিরে আসিয়া ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মার শ্রীপাদপদ্মে জবা, বিল্ব; ত্রিনয়নী ভক্তদের কতই স্নেহ চক্ষে দেখিতেছেন। হস্তে বরাভয়। মা বারাণসী চেলী ও বিবিধ অলঙ্কার পরিয়াছেন।

শ্রীমূর্তি দর্শন করিয়া ভূধরের দাদা বলিতেছেন, “শুনেছি নবীন ভাস্করের নির্মাণ।” ঠাকুর বলিতেছেন, “তা জানি না — জানি ইনি চিন্ময়ী!”

ভক্তসঙ্গে ঠাকুর নাটমন্দিরে বেড়াইতে বেড়াইতে দক্ষিণাস্য হইয়া আসিতেছেন! বলিদানের স্থান দেখিয়া পণ্ডিত বলিতেছেন, “মা পাঁঠা কাটা দেখতে পান না।”
(সকলের হাস্য)
পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৩০শে জুন 1884/06/30/vi

24.6 পণ্ডিত

ঠাকুর এইবার ফিরিতেছেন। বাবুরামকে বলিলেন, আরে আয়! মাস্টারও সঙ্গে আসিলেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে। ঘরের পশ্চিমের গোল বারান্দায় আসিয়া ঠাকুর বসিয়াছেন। ভাবস্থ, — অর্ধবাহ্য। কাছে বাবুরাম ও মাস্টার।

আজকাল ঠাকুরের সেবার কষ্ট হইয়াছে। রাখাল আজকাল থাকেন না। কেহ কেহ আছেন, কিন্তু তাঁহারা ঠাকুরের সকল অবস্থাতে ছুঁতে পারেন না। ঠাকুর সঙ্কেত করে বাবুরামকে বলিতেছেন — "হ — ছু — না, রা — ছু" এ-অবস্থায় আর কাকেও ছুঁতে দিতে পারি না, তুই থাক তাহলে ভাল হয়।"

[ঈশ্বরলাভ ও কর্মত্যাগ — নূতন হাঁড়ি — গৃহীভক্ত ও নষ্টা স্ত্রী]

পণ্ডিত ঠাকুরবাড়ি দর্শন করিয়া ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়াছেন। ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারান্দা হইতে বলিতেছেন, তুমি একটু জল খাও। পণ্ডিত বললেন, আমি সন্ধ্যা করি নাই। অমনি ঠাকুর ভাবে মাতোয়ারা হইয়া গান গাহিতেছেন, — ও দাঁড়াইয়া পড়িলেন —

গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি, কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়।।
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধ্যানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়।।

পূজা হোম জপ যজ্ঞ আর কিছু না মনে লয়।
মদনেরই যাগযজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙা পায়।।

ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া আবার বলিতেছেন, কতদিন সন্ধ্যা? যতদিন ওঁ বলতে মন লীন না হয়।

পণ্ডিত — তবে জল খাই, তারপর সন্ধ্যা করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি তোমার স্রোতে বাধা দিব না। সময় না হলে ত্যাগ ভাল না। ফল পাকলে ফুল আপনি ঝরে। কাঁচা বেলায় নারিকেলের বেল্লো টানাটানি করতে নাই, — এরকম করে ভাঙলে গাছ খারাপ হয়।

সুরেন্দ্র বাড়ি যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। বন্ধুবর্গকে আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার গাড়িতে লইয়া যাইবেন।

সুরেন্দ্র — মহেন্দ্রবাবু যাবেন?

ঠাকুর এখনও ভাবস্থ, সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হন নাই। তিনি সেই অবস্থাতেই সুরেন্দ্রকে বলিতেছেন, তোমার ঘোড়া যত বইতে পারে, তার বেশি নিয়ো না। সুরেন্দ্র প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

পণ্ডিত সন্ধ্যা করিতে গেলেন। মাস্টার ও বাবুরাম কলিকাতায় যাইবেন, ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন। ঠাকুর এখনও ভাবস্থ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — কথা বেরুচ্ছে না, একটু থাকো।

মাস্টার বসিলেন — ঠাকুর কি আজ্ঞা করিবেন — অপেক্ষা করিতেছেন। ঠাকুর বাবুরামকে সঙ্কেত করিয়া বসিতে বলিলেন। বাবুরাম বলিলেন, আর একটু বসুন। ঠাকুর বলিতেছেন, একটু বাতাস কর। বাবুরাম বাতাস করিতেছেন, মাস্টারও করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারকে সস্নেহে) — এখন আর তত এস না কেন?

মাস্টার — আজ্ঞা, বিশেষ কিছু কারণ নাই, বাড়ীতে কাজ ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বাবুরাম কি ঘর, কাল টের পেয়েছি। তাই তো এখন ওকে রাখবার জন্য অত বলছি। পাখি সময় বুঝে ডিম ফুটোয়। কি জানো এরা শুদ্ধ আত্মা, এখনও কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর গিয়ে পড়ে নাই। কি বল?

মাস্টার — আজ্ঞা, হাঁ। এখনও কোন দাগ লাগে নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — নূতন হাঁড়ি, দুধ রাখলে খারাপ হবে না।

মাস্টার — আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বাবুরামের এখানে থাকবার দরকার পড়েছে। অবস্থা আছে কিনা, তাতে ওইসব লোকের থাকা প্রয়োজন। ও বলেছে, ক্রমে ক্রমে থাকব, না হলে হাঙ্গামা হবে — বাড়িতে গোল করবে। আমি বলছি শনিবার, রবিবার আসবে।

এদিকে পণ্ডিত সন্ধ্যা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে ভূধর ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভাই১ পণ্ডিত এইবার জল খাইবেন।

ভূধরের বড়ভাই বলিতেছেন, “আমাদের কি হবে; — একটু বলে দিন আমাদের উপায় কি?”

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমরা মুমুক্ষু, ব্যাকুলতা থাকলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধের অন্ন খেও না। সংসারে নষ্ট স্ত্রীর মতো থাকবে। নষ্ট স্ত্রী বাড়ির সব কাজ যেন খুব মন দিয়ে করে, কিন্তু তার মন উপপতির উপর রাতদিন পড়ে থাকে। সংসারের কাজ করো, কিন্তু মন সর্বদা ঈশ্বরের উপর রাখবে।

পণ্ডিত জল খাইতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, আসনে বসে খাও।

খাবার পর পণ্ডিতকে বলিতেছেন — “তুমি তো গীতা পড়েছ, — যাকে সকলে গণে মানে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে।”

পণ্ডিত — যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা —

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমার ভিতর অবশ্য তাঁর শক্তি আছে।

পণ্ডিত — আজ্ঞা, যে ব্রত নিয়েছি অধ্যবসায়ের সহিত করব কি?

ঠাকুর যেন উপরোধে পড়ে বলছেন, “হাঁ হবে।” তারপরেই অন্য কথার দ্বারা ও-কথা যেন চাপা দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — শক্তি মানতে হয়। বিদ্যাসাগর বললেন, তিনি কি কারুকে বেশি শক্তি দিয়েছেন? আমি বললাম, তবে একজন লোক একশ জনকে মারতে পারে কেন? কুইন ভিক্টোরিয়ার এত মান, নাম কেন — যদি শক্তি না থাকত? আমি বললাম, তুমি মানো কি না? তখন বলে, 'হাঁ মানি।'

পণ্ডিত বিদায় লইয়া গাত্রোত্থান করিলেন ও ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। সঙ্গের বন্ধুরাও প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর বলিতেছেন, "আবার আসবেন, গাঁজাখোর গাঁজাখোরকে দেখলে আহ্লাদ করে — হয়তো তার সঙ্গে কোলাকুলি করে — অন্য লোক দেখলে মুখ লুকোয়। গরু আপনার জনকে দেখলে গা চাটে, অপরকে গুঁতোয়।" (সকলের হাস্য)

পণ্ডিত চলিয়া গেলে ঠাকুর হাসিয়া বলিতেছেন — ডাইলিউট হয়ে গেছে একদিনেই! — দেখলে কেমন বিনয়ী — আর সব কথা লয়!

আষাঢ় শুক্লা সপ্তমী তিথি। পশ্চিমের বারান্দায় চাঁদের আলো পড়িয়াছে। ঠাকুর সেখানে এখনও বসিয়া আছেন। মাস্টার প্রণাম করিতেছেন। ঠাকুর সস্নেহে বলিতেছেন, "যাবে?"

মাস্টার — আজ্ঞা, তবে আসি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — একদিন মনে করেছি, সব্বায়ের বাড়ি এক-একবার করে যাব, — তোমার ওখানে একবার যাব, — কেমন?

মাস্টার — আজ্ঞা, বেশ তো।

১ ভূধরের বড়দাদা শেষজীবন একাকী অতি পবিত্রভাবে ৺কাশীধামে কাটাইয়াছিলেন। ঠাকুরকে সর্বদা চিন্তা করিতেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c25 ২৫ বলরাম-মন্দিরে রথের পুনর্যাত্রায় ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৩রা জুলাই 1884/07/03/i

25.1 বলরাম-মন্দিরে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বৈঠকখানায় ভক্তের মজলিস করিয়া বসিয়া আছেন। আনন্দময় মূর্তি! — ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

আজ পুনর্যাত্রা। বৃহস্পতিবার। আষাঢ় শুক্লা দশমী। ৩রা জুলাই, ১৮৮৪। শ্রীযুক্ত বলরামের বাটীতে, শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবা আছে, একখানি ছোট রথও আছে। তাই তিনি ঠাকুরকে, পুনর্যাত্রা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। এই ছোট রথখানি বারবাটীর দোতলার চকমিলান বারান্দায় টানা হইবে। গত ২৫শে জুন বুধবারে শ্রীশ্রীরথযাত্রার দিন, ঠাকুর শ্রীযুক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায়ের ঠনঠনিয়া বাটীতে আসিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই দিনেই বৈকালে কলেজ স্ট্রীটে ভূধরের বাটীতে পণ্ডিত শশধরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনদিন হইল, গত সোমবারে শশধর তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর-কালীমন্দিরে দ্বিতীয়বার দর্শন করিতে গিয়াছিলেন।

ঠাকুরের আদেশে বলরাম শশধরকে আজ নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। পণ্ডিত হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করিয়া লোকশিক্ষা দিতেছেন। তাই কি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ভিতর শক্তিসঞ্চার করিবার জন্য এত উৎসুক হইয়াছেন?

ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। কাছে রাম, মাস্টার, বলরাম, মনোমোহন, কয়েকটি ছোকরা ভক্ত, বলরামের পিতা প্রভৃতি বসিয়া আছেন। বলরামের পিতা অতি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। তিনি প্রায় শ্রীবৃন্দাবনধামে তাঁহাদেরই প্রতিষ্ঠিত কুঞ্জে একাকী বাস করেন ও শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর-বিগ্রহের সেবার তত্ত্বাবধান করেন। শ্রীবৃন্দাবনে তিনি সমস্ত দিন ঠাকুরের সেবা লইয়া থাকেন। কখনও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ভক্তিগ্রন্থ পড়েন। কখন কখন ভক্তিগ্রন্থ লইয়া তাহার প্রতিলিপি করেন। কখন বসিয়া বসিয়া নিজে ফুলের মালা গাঁথেন। কখন বৈষ্ণবদের নিমন্ত্রণ করিয়া সেবা করেন। ঠাকুরকে দর্শন করাইবার জন্য, বলরাম

তাঁহাকে পত্রের উপর পত্র লিখিয়া কলিকাতায় আনাইয়াছেন। “সব ধর্মেই সাম্প্রদায়িক ভাব; বিশেষতঃ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে; ভিন্ন মতের লোক পরস্পর বিরোধ করে, সমন্বয় করিতে জানে না” — এই কথা ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন।

[বলরামের পিতার প্রতি সর্বধর্ম-সমন্বয় উপদেশ। ভক্তমাল; শ্রীভাগবত — পূর্বকথা — মথুরের কাছে বৈষ্ণবচরণের গোঁড়ামি ও শাক্তদের নিন্দা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের পিতা প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি) — বৈষ্ণবদের একটি গ্রন্থ ভক্তমাল। বেশ বই, — ভক্তদের সব কথা আছে। তবে একঘেয়ে। এক জায়গায় ভগবতীকে বিষ্ণুমন্ত্র লইয়ে তবে ছেড়েছে!

“আমি বৈষ্ণবচরণের অনেক সুখ্যাত করে সেজোবাবুর কাছে আনলুম। সেজোবাবু খুব যত্ন খাতির করলে। রূপার বাসন বার করে জল খাওয়ানো পর্যন্ত। তারপর সেজোবাবুর সামনে বলে কি — ‘আমাদের কেশবমন্ত্র না নিলে কিছুই হবে না!’ সেজোবাবু শাক্ত, ভগবতীর উপাসক। মুখ রাঙা হয়ে উঠল। আমি আবার বৈষ্ণবচরণের গা টিপি!

“শ্রীমদ্ভাগবত — তাতেও নাকি ওইরকম কথা আছে, ‘কেশবমন্ত্র না নিয়ে ভবসাগর পার হওয়াও যা, আর কুকুরের ল্যাজ ধরে মহাসমুদ্র পার হওয়াও তা!’ সব মতের লোকেরা আপনার মতটাই বড় করে গেছে।

“শাক্তেরাও বৈষ্ণবদের খাটো করবার চেষ্টা করে। শ্রীকৃষ্ণ ভবনদীর কাণ্ডারী, পার করে দেন, শাক্তেরা বলে, ‘তা তো বটেই, মা রাজরাজেশ্বরী — তিনি কি আপনি

এসে পার করবেন? ওই কৃষ্ণকেই রেখে দিয়েছেন পার করবার জন্য’” (সকলের হাস্য)

[পূর্বকথা — ঠাকুরের জন্মভূমিদর্শন ১ ১৮৮০ — ফুলুই শ্যামবাজারের তাঁতী বৈষ্ণবদের অহংকার — সমন্বয় উপদেশ]

“নিজের নিজের মত লয়ে আবার অহংকার কত! ও-দেশে, শ্যামবাজার এই সব জায়গায়, তাঁতীরা আছে। অনেকে বৈষ্ণব, তাদের লম্বা লম্বা কথা। বলে, ‘ইনি কোন্ বিষ্ণু মানেন? পাতা বিষ্ণু! (অর্থাৎ যিনি পালন করেন!) — ও আমরা ছুঁই না! কোন্ শিব? আমরা আত্মারাম শিব, আত্মারামেশ্বর শিব, মানি।’ কেউ বলছে, ‘তোমরা বুঝিয়ে দেও না, কোন্ হরি মান?’ তাতে কেউ বলছে — ‘না, আমরা আর কেন, ওইখান থেকেই হোক।’ এদিকে তাঁত বোনে; আবার এইসব লম্বা লম্বা কথা!”

[লালাবাবুর রানী কাত্যায়নীর মো-সাহেব রতির মার গোঁড়ামি]

“রতির মা রানী কাত্যায়নীর মো-সাহেব; — বৈষ্ণবচরণের দলের লোক, গোঁড়া বৈষ্ণবী। এখানে খুব আসা যাওয়া করত। ভক্তি দেখে কে! যাই আমায় দেখলে মা-কালীর প্রসাদ খেতে, অমনি পালাল!

“যে সমন্বয় করেছে, সেই-ই লোক। অনেকেই একঘেয়ে। আমি কিন্তু দেখি — সব এক। শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত মত সবই সেই এককে লয়ে। যিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার, তাঁরই নানা রূপ।

‘নির্গুণ মেরা বাপ, সগুণ মাহ্‌তারি,

কারে নিন্দো কারে বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী।’

“বেদে যাঁর কথা আছে, তন্ত্রে তাঁরই কথা, পুরাণেও তাঁরই কথা। সেই এক সচ্চিদানন্দের কথা। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা।

“বেদে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ ব্রহ্ম। তন্ত্রে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ — শিবঃ কেবলঃ — কেবলঃ শিবঃ। পুরাণে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ। সেই এক সচ্চিদানন্দের কথাই বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে আছে। আর বৈষ্ণবশাস্ত্রেও আছে, — কৃষ্ণই কালী হয়েছিলেন।”

১ শ্রীরামকৃষ্ণ শেষবার জন্মভূমি দর্শন সময়ে ১৮৮০ খ্রী: ফুলুই শ্যামবাজারে হৃদয়ের সঙ্গে শুভাগমন করিয়া নটবর গোস্বামী, ঈশান মল্লিক, সদয় বাবাজী প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত সংকীর্তন করেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৩রা জুলাই 1884/07/03/ii

25.2 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমহংস অবস্থা — বালকবৎ — উন্মাদবৎ

ঠাকুর বারান্দার দিকে একটু গিয়া আবার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। বাহিরে যাইবার সময় শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরের কন্যা তাঁহাকে নমস্কার করিয়াছিল, তাহার বয়স ৬/৭ বৎসর হইবে। ঠাকুর ঘরে ফিরিয়া আসিলে পর মেয়েটি তাঁহার সহিত কথা কহিতেছে। তাহার সঙ্গে আরও দু-একটি সমবয়স্ক ছেলেমেয়ে আছে।

বিশ্বম্ভরের কন্যা (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — আমি তোমায় নমস্কার করলুম, দেখলে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — কই, দেখি নাই।

কন্যা — তবে দাঁড়াও, আবার নমস্কার করি; — দাঁড়াও, এ পা'টা করি!

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে উপবেশন করিলেন ও ভূমি পর্যন্ত মস্তক নত করিয়া কুমারীকে প্রতিনমস্কার করিলেন। ঠাকুর মেয়েটিকে গান গাহিতে বলিলেন। মেয়েটি বলিল — "মাইরি, গান জানি না!"

তাহাকে আবার অনুরোধ করাতে বলিতেছে, "মাইরি বললে আর বলা হয়?" ঠাকুর তাহাদের লইয়া আনন্দ করিতেছেন ও গান শুনাইতেছেন। প্রথমে কেলুয়ার গান, তারপর, "আয় লো তোর খোঁপা বেঁধে দি, তোর ভাতার এলে বলবে কি!" (ছেলেরা ও ভক্তেরা গান শুনিয়া হাসিতেছেন)

[পূর্বকথা — জন্মভূমিদর্শন১ — বালক শিবরামের চরিত্র — সিওড়ে হৃদয়ের বাড়ি দুর্গাপূজা — ঠাকুরের উন্মাদকালে লিঙ্গপূজা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — পরমহংসের স্বভাব ঠিক পাঁচ বছরের বালকের মতো। সব চৈতন্যময় দেখে।

“যখন আমি ও-দেশে (কামারপুকুরে), রামলালের ভাই (শিবরাম) তখন ৪/৫ বছর বয়স, — পুকুরের ধারে ফড়িং ধরতে যাচ্ছে। পাতা নড়ছে, আর পাতার শব্দ পাছে হয়, তাই পাতাকে বলছে ‘চোপ্! আমি ফড়িং ধরব!’ ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, আমার সঙ্গে ঘরের ভিতরে সে আছে; বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তবুও দ্বার খুলে খুলে বাহিরে যেতে চায়। বকার পর আর বাহিরে গেল না, উঁকি মেরে মেরে এক-একবার দেখছে, বিদ্যুৎ, — আর বলছে, ‘খুড়ো! আবার চকমকি ঠুকছে’।

“পরমহংস বালকের ন্যায় — আত্মপর নাই, ঐহিক সম্বন্ধের আঁট নাই। রামলালের ভাই একদিন বলছে, ‘তুমি খুড়ো না পিসে?’

“পরমহংসের বালকের ন্যায় গতিবিধির হিসাব নাই। সব ব্রহ্মময় দেখে — কোথায় যাচ্ছে — কোথায় চলছে — হিসাব নাই। রামলালের ভাই হৃদের বাড়ি দুর্গাপূজা দেখতে গিছিল। হৃদের বাড়ি থেকে ছটকে আপনা-আপনি কোন্ দিকে চলে গেছে! চার বছরের ছেলে দেখে পথের লোক জিজ্ঞাসা করছে, তুই কোথা থেকে এলি? তা কিছু বলতে পারে না। কেবল বললে — ‘চালা’ (অর্থাৎ যে আটচালায় পূজা হয়েছে)। যখন জিজ্ঞাসা করলে, ‘কার বাড়ি থেকে এসেছিস?’ তখন কেবল — ‘দাদা’।

“পরমহংসের আবার উন্মাদের অবস্থা হয়। যখন উন্মাদ হল, শিবলিঙ্গ বোধে নিজের লিঙ্গ পূজা করতাম। জীবন্ত লিঙ্গপূজা। একটা আবার মুক্তা পরানো হত! এখন আর পারি না।”

[প্রতিষ্ঠার পর (প্রতিষ্ঠা ১৮৫৫) পূর্ণজ্ঞানী পাগলের সঙ্গে দেখা]

“দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে একজন পাগল এসেছিল, — পূর্ণজ্ঞানী। ছেঁড়া জুতা, হাতে কঞ্চি — একহাতে একটি ভাঁড়, আঁবচারা; গঙ্গায় ডুব দিয়ে উঠে, কোন সন্ধ্যা আহ্নিক নাই, কোঁচড়ে কি ছিল তাই খেলে। তারপর কালীঘরে গিয়ে স্তব করতে লাগল। মন্দির কেঁপে গিয়েছিল! হলধারী তখন কালীঘরে ছিল। অতিথিশালায় এরা তাকে ভাত দেয় নাই — তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। পাত কুড়িয়ে খেতে লাগল — যেখানে কুকুরগুলো খাচ্ছে। মাঝে মাঝে কুকুরগুলিকে সরিয়ে নিজে খেতে লাগল, — তা কুকুরগুলো কিছু বলে নাই। হলধারী পেছু পেছু গিয়েছিল, আর জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘তুমি কে? তুমি কি পূর্ণজ্ঞানী?’ তখন সে বলেছিল, ‘আমি পূর্ণজ্ঞানী! চুপ!’

“আমি হলধারীর কাছে যখন এ-সব কথা শুনলাম আমার বুক গুর গুর করতে লাগল, আর হৃদেকে জড়িয়ে ধরলুম। মাকে বললাম, ‘মা, তবে আমারও কি এই অবস্থা হবে!’ আমরা দেখতে গেলাম — আমাদের কাছে খুব জ্ঞানের কথা — অন্য লোক এলে পাগলামি। যখন চলে গেল, হলধারী অনেকখানি সঙ্গে গিয়েছিল। ফটক পার হলে হলধারীকে বলেছিল ‘তোকে আর কি বলব। এই ডোবার জল আর গঙ্গাজলে যখন কোন ভেদবুদ্ধি থাকবে না, তখন জানবি পূর্ণজ্ঞান হয়েছে।’ তারপর বেশ হনহন করে চলে গেল।”

১ শ্রীযুক্ত শিবরামের জন্ম — ১৮ই চৈত্র, ১২৭২, দোলপূর্ণিমার দিনে (৩০শে মার্চ, ১৮৬৬ খ্রী:) ঠাকুরের এবার জন্মভূমিদর্শনের সময় তিন-চার বছর বয়স অর্থাৎ ১৮৬৯-৭০ খ্রী:।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৩রা জুলাই 1884/07/03/iii

25.3 পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তপস্যার প্রয়োজন — সাধ্য-সাধনা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। ভক্তেরাও কাছে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — শশধরকে তোমার কেমন বোধ হয়?

মাস্টার — আজ্ঞা, বেশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — খুব বুদ্ধিমান, না?

মাস্টার — আজ্ঞা, পাণ্ডিত্য বেশ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — গীতার মত — যাকে অনেকে গণে, মানে, তার ভিতর ঈশ্বরের শক্তি আছে। তবে ওর একটু কাজ বাকী আছে।

“শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে, কিছু তপস্যার দরকার — কিছু সাধ্য-সাধনার দরকার।”

[পূর্বকথা — গৌরী পণ্ডিত ও নারায়ণ শাস্ত্রীর সাধনা — বেলঘরের বাগানে কেশবের সহিত সাক্ষাৎ ১৮৭৫ — কাপ্তেনের আগমন ১৮৭৫-৭৬]

“গৌরী পণ্ডিত সাধন করেছিল। যখন স্তব করত, ‘হা রে রে নিরালম্ব লম্বোদর!’ — তখন পণ্ডিতেরা কেঁচো হয়ে যেত।

“নারায়ণ শাস্ত্রীও শুধু পণ্ডিত নয়, সাধ্য-সাধনা করেছিল।

“নারায়ণ শাস্ত্রী পঁচিশ বৎসর একটানে পড়েছিল। সাত বৎসর ন্যায় পড়েছিল — তবুও ‘হর, হর,’ বলতে বলতে ভাব হত। জয়পুরের রাজা সভাপণ্ডিত করতে চেয়েছিল। তা সে কাজ স্বীকার করলে না। দক্ষিণেশ্বরে প্রায় এসে থাকত। বশিষ্ঠাশ্রমে যাবার ভারী ইচ্ছা, — সেখানে তপস্যা করবে। যাবার কথা আমাকে প্রায় বলত। আমি তাকে সেখানে যেতে বারণ করলাম। — তখন বলে ‘কোন্ দিন মরে যাব, সাধন কবে করব — ডুব্‌কি কব্ ফাট্ যায়গা!’ অনেক জেদাজেদির পর আমি যেতে বললাম।

“শুনতে পাই, কেউ কেউ বলে, নারায়ণ শাস্ত্রী নাকি শরীরত্যাগ করেছে, তপস্যা করবার সময় ভৈরবে নাকি চড় মেরেছিল। আবার কেউ কেউ বলে, ‘বেঁচে আছে — এই আমরা তাকে রেলে তুলে দিয়ে এলাম।’

“কেশব সেনকে দেখবার আগে নারাণ শাস্ত্রীকে বললুম, তুমি একবার যাও, দেখে এস কেমন লোক। সে দেখে এসে বললে, লোকটা জপে সিদ্ধ। সে জ্যোতিষ জানত — বললে, ‘কেশব সেনের ভাগ্য ভাল। আমি সংস্কৃতে কথা কইলাম, সে ভাষায় (বাঙলায়) কথা কইল।’

“তখন আমি হৃদেকে সঙ্গে করে বেলঘরের বাগানে গিয়ে দেখলাম। দেখেই বলেছিলাম, ‘এঁরই ন্যাজ খসেছে, — ইনি জলেও থাকতে পারেন, ডাঙাতেও থাকতে পারেন।’

“আমাকে পরোখ করবার জন্য তিনজন ব্রহ্মজ্ঞানী ঠাকুরবাড়িতে পাঠিয়েছিল। তার ভিতরে প্রসন্নও ছিল। রাতদিন আমায় দেখবে, দেখে কেশবের কাছে খবর দিবে। আমার ঘরের ভিতর রাত্রে ছিল — কেবল ‘দয়াময়, দয়াময়’ করতে লাগল — আর আমাকে বলে, ‘তুমি কেশববাবুকে ধর তাহলে তোমার ভাল হবে।’ আমি বললাম, ‘আমি সাকার মানি।’ তবুও ‘দয়াময়, দয়াময়’ করে! তখন আমার একটা অবস্থা হল হয়ে বললাম, ‘এখান থেকে যা!’ ঘরের মধ্যে কোন মতে থাকতে দিলাম না! তারা বারন্দায় গিয়ে শুয়ে রইল।

“কাপ্তেনও যেদিন আমায় প্রথম দেখলে সেদিন রাত্রে রয়ে গেল।”

[মাইকেল মধুসূদন১ — নারাণ শাস্ত্রীর সহিত কথা]

“নারায়ণ শাস্ত্রী যখন ছিল, মাইকেল এসেছিল। মথুরবাবুর বড়ছেলে দ্বারিকবাবু সঙ্গে করে এনেছিল। ম্যাগাজিনের সাহেবদের সঙ্গে মোকদ্দমা হবার যোগাড় হয়েছিল। তাই মাইকেলকে এনে বাবুরা পরামর্শ করছিল।

“দপ্তরখানার সঙ্গে বড়ঘর। সেইখানে মাইকেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি নারায়ণ শাস্ত্রীকে কথা কইতে বললাম। সংস্কৃতে কথা ভাল বলতে পারলে না। ভুল হতে লাগল! তখন ভাষায় কথা হল।

“নারায়ণ শাস্ত্রী বললে, ‘তুমি নিজের ধর্ম কেন ছাড়লে।’ মাইকেল পেট দেখিয়ে বলে, ‘পেটের জন্য — ছাড়তে হয়েছে।’

“নারায়ণ শাস্ত্রী বললে, ‘যে পেটের জন্য ধর্ম ছাড়ে তার সঙ্গে কথা কি কইব!’ তখন মাইকেল আমায় বললে, ‘আপনি কিছু বলুন।’

“আমি বললাম, কে জানে কেন আমার কিছু বলতে ইচ্ছা করছে না। আমার মুখ কে যেন চেপে ধরছে।“

[কামিনী-কাঞ্চন পণ্ডিতকেও হীনবুদ্ধি করে — বিষয়ীর পূজাদি]

ঠাকুরকে দর্শন করিতে চৌধুরীবাবুর আসিবার কথা ছিল।

মনোমোহন — চৌধুরী আসবেন না। তিনি বললেন, ফরিদপুরের সেই বাঙাল (শশধর) আসবে — তবে যাব না!

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি হীনবুদ্ধি! — বিদ্যার অহংকার, তার উপর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বিবাহ করেছে, — ধরাকে সরা মনে করেছে!

চৌধুরী এম. এ. পাশ করিয়াছেন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর খুব বৈরাগ্য হইয়াছিল। ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে প্রায় যাইতেন। আবার তিনি বিবাহ করিয়াছেন। তিন-চার শত টাকা মাহিনা পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — এই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি মানুষকে হীনবুদ্ধি করেছে। হরমোহন যখন প্রথম গেল, তখন বেশ লক্ষণ ছিল। দেখবার জন্য আমি ব্যাকুল হতাম। তখন বয়স ১৭। ১৮ হবে। প্রায় ডেকে ডেকে পাঠাই, আর যায় না। এখন মাগকে এনে আলাদা বাসা করেছে। মামার বাড়িতে ছিল, বেশ ছিল। সংসারের কোনো ঝঞ্ঝাট ছিল না। এখন আলাদা বাসা করে পরিবারের রোজ বাজার করে। (সকলের হাস্য) সেদিন ওখানে গিয়েছিল। আমি বললাম, ‘যা এখান থেকে চলে যা — তোকে ছুঁতে আমার গা কেমন করছে।’

কর্তাভজা চন্দ্র (চাটুজ্যে) আসিয়াছেন। বয়ঃক্রম ষাট-পঁয়ষট্টি। মুখে কেবল কর্তাভজাদের শ্লোক। ঠাকুরের পদসেবা করিতে যাইতেছেন। ঠাকুর পা স্পর্শ করিতে দিলেন না। হাসিয়া বলিলেন, ‘এখন তো বেশ হিসাবি কথা বলছে।’ ভক্তেরা হাসিতে লাগিলেন।

এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের অন্তঃপুরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতেছেন। অন্তঃপুরে স্ত্রীলোক ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করুবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছেন।

ঠাকুর আবার বৈঠকখানায় আসিয়াছেন। সহাস্যবদন। বলিলেন, ”আমি পাইখানার কাপড় ছেড়ে জগন্নাথকে দর্শন করলাম। আর একটু ফুল-টুল দিলাম।

“বিষয়ীদের পূজা, জপ, তপ, যখনকার তখন। যারা ভগবান বই জানে না তারা নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাঁর নাম করে। কেউ মনে মনে সর্বদাই ‘রাম’, ‘ওঁ রাম’ জপ করে। জ্ঞানপথের লোকেরাও ‘সোঽহম্’ জপ করে। কারও কারও সর্বদাই জিহ্বা নড়ে।

“সর্বদাই স্মরণ-মনন থাকা উচিত।”

১ শ্রীমধুসূদন কবি — জন্ম সাগরদাঁড়ি ১৮২৪; ইংলন্ডে অবস্থিতি ১৮৬২-৬৭; দেহত্যাগ ১৮৭৩। ঠাকুরকে দর্শন ১৮৬৮-র পরে হইবে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৩রা জুলাই 1884/07/03/iv

25.4 বলরামের বাড়ি, শশধর প্রভৃতি ভক্তগণ — ঠাকুরের সমাধি

শ্রীযুক্ত শশধর দু-একটি বন্ধু সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — আমরা সকলে বাসকসজ্জা জেগে আছি — কখন বর আসবে!

পণ্ডিত হাসিতেছেন। ভক্তের মজলিস। বলরামের পিতাঠাকুর উপস্থিত আছেন। ডাক্তার প্রতাপও আসিয়াছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শশধরের প্রতি) — জ্ঞানের চিহ্ন, প্রথম — শান্ত স্বভাব; দ্বিতীয় — অভিমানশূন্য স্বভাব। তোমার দুই লক্ষণই আছে।

“জ্ঞানীর আর কতকগুলি লক্ষণ আছে। সাধুর কাছে ত্যাগী, কর্মস্থলে — যেমন লেকচার দিবার সময় — সিংহতুল্য, স্ত্রীর কাছে রসরাজ, রসপণ্ডিত। (পণ্ডিত ও অন্যান্য সকলের হাস্য)

“বিজ্ঞানীর স্বভাব আলাদা। যেমন চৈতন্যদেবের অবস্থা। বালকবৎ, উন্মাদবৎ, জড়বৎ, পিশাচবৎ।

“বালকের অবস্থার ভিতর আবার বাল্য, পৌগণ্ড, যৌবন! পৌগণ্ড অবস্থায় ফচকিমি। উপদেশ দিবার সময় যুবার ন্যায়।”

পণ্ডিত — কিরূপ ভক্তি দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায়?

[শশধর ও ভক্তিতত্ত্ব-কথা — জ্বলন্ত বিশ্বাস চাই — বৈষ্ণবদের দীনভাব]

শ্রীরামকৃষ্ণ — প্রকৃতি অনুসারে ভক্তি তিনরকম! ভক্তির সত্ত্ব, ভক্তির রজঃ, ভক্তির তমঃ।

“ভক্তির সত্ত্ব — ঈশ্বরই টের পান। সেরূপ ভক্ত গোপন ভালবাসে, — হয়তো মশারির ভিতর ধ্যান করে, কেউ টের পায় না। সত্ত্বের সত্ত্ব — বিশুদ্ধ সত্ত্ব — হলে ঈশ্বরদর্শনের আর দেরি নাই; — যেমন অরুণোদয় হলে বুঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের আর দেরি নাই।

“ভক্তির রজঃ যাদের হয়, তাদের একটু ইচ্ছা হয় — লোকে দেখুক আমি ভক্ত। সে ষোড়শোপচার দিয়ে পূজা করে, গরদ পরে ঠাকুরঘরে যায়, — গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, — মালায় মুক্তা, মাঝে মাঝে একটি সোনার রুদ্রাক্ষ।

“ভক্তির তমঃ — যেমন ডাকাতপড়া ভক্তি। ডাকাত ঢেঁকি নিয়ে ডাকাতি করে, আটটা দারোগার ভয় নাই, — মুখে ‘মারো! লোটো!’ উন্মাদের ন্যায় বলে — ‘হর, হর, হর; ব্যোম, ব্যোম! জয় কালী!’ মনে খুব জোর জ্বলন্ত বিশ্বাস!

“শাক্তদের ওইরূপ বিশ্বাস। — কি, একবার কালীনাম, দুর্গানাম করেছি — একবার রামনাম করেছি, আমার আবার পাপ!

“বৈষ্ণবদের বড় দীনহীনভাব। যারা কেবল মালা জপে, (বলরামের পিতাকে লক্ষ্য করিয়া) কেঁদে ককিয়ে বলে, ‘হে কৃষ্ণ দয়া কর, — আমি অধম, আমি পাপী!’

“এমন জ্বলন্ত বিশ্বাস চাই যে, তাঁর নাম করেছি আমার আবার পাপ! — রাতদিন হরিনাম করে, আমার বলে — আমার পাপ!’

কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া গান গাহিতেছেন:

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।

আখেরে এ দীনে না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শংকরী।।

নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপানাদি বিনাশী নারী।

এ-সব পাতক না ভাবি তিলেক, (ও মা) ব্রহ্মপদ নিতে পারি।।

গান - শিব সঙ্গে সদারঙ্গে আনন্দে মগনা।

সুধাপানে ঢল ঢল কিন্তু ঢলে পড়ে না মা!

গান শুনিয়া শশধর কাঁদিতেছেন।

দুর্গানাম জপ সদা রসনা আমার,

দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনে কে করে নিস্তার।

তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্য তুমি সে পাতাল,

তোমা হতে হরি ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল।

দশমহাবিদ্যা মাতা দশ অবতার,

এবার কোনরূপে আমায় করিতে হবে পার।

চল অচল তুমি মা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল,

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি তুমি বিশ্বমূল।

ত্রিলোকজননী তুমি ত্রিলোকতারিণী,

সকলের শক্তি তুমি (মা গো) তোমার শক্তি তুমি।

এই কয় চরণ গান শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন, গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুর নিজে গান ধরিলেন:

যশোদা নাচাতো শ্যামা বলে নীলমণি,
সেরূপ লুকালে কোথা করালবদনী।

বৈষ্ণবচরণ এইবার কীর্তন গাইতেছেন। সুবোল-মিলন। যখন গায়ক আখর দিতেছেন — ‘রা বি ধা বেরোয় না রে!’ — ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন।

শশধর প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৩রা জুলাই 1884/07/03/v

25.5 পুনর্যাত্রা — রথের সম্মুখে ভক্তসঙ্গে ঠাকুরের নৃত্য ও সংকীর্তন

ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। গানও সমাপ্ত হইল। শশধর, প্রতাপ, রামদয়াল, রাম, মনোমোহন, ছোকরা ভক্তেরা প্রভৃতি অনেকেই বসিয়া আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারকে বলিতেছেন, “তোমরা একটা কেউ খোঁচা দেও না” — অর্থাৎ শশধরকে কিছু জিজ্ঞাসা কর।

রামদয়াল (শশধরের প্রতি) — ব্রহ্মের রূপকল্পনা যে শাস্ত্রে আছে, সে কল্পনা কে করেন?

পণ্ডিত — ব্রহ্ম নিজে করেন, — মানুষের কল্পনা নয়।

ডাঃ প্রতাপ — কেন রূপ কল্পনা করেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেন? তিনি কারু সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করেন না। তাঁর খুশি, তিনি ইচ্ছাময়! কেন তিনি করেন, এ খপরে আমাদের কাজ কি? বাগানে আম খেতে এসেছ, আম খাও; কটা গাছ, ক-হাজার ডাল, কত লক্ষ পাতা, — এ-সব হিসাবে কাজ কি? বৃথা তর্ক-বিচার করলে বস্তুলাভ হয় না।

ডাঃ প্রতাপ — তাহলে আর বিচার করব না?

শ্রীরামকৃষ্ণ — বৃথা তর্ক-বিচার করবে না। তবে সদসৎ বিচার করবে, — কোন্‌টা নিত্য। কোন্‌টা অনিত্য। যেমন কাম-ক্রোধাদি বা শোকের সময়।

পণ্ডিত — ও আলাদা। ওকে বিবেকাত্মক বিচার বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, সদসৎ বিচার [সকলে চুপ করিয়া আছেন]

(পণ্ডিতের প্রতি) — "আগে বড় বড় লোক আসত।"

পণ্ডিত — কি, বড়মানুষ?

শ্রীরামকৃষ্ণ — না, বড় বড় পণ্ডিত।

ইতিমধ্যে ছোট রথখানি বাহিরের দুতলার বারান্দার উপর আনা হইয়াছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, সুভদ্রা ও বলরাম নানা বর্ণের কুসুম ও পুষ্পমালায় সুশোভিত হইয়াছেন এবং অলঙ্কার ও নববস্ত্র পীতাম্বর পরিধান করিয়াছেন। বলরামের সাত্ত্বিক পূজা, কোন আড়ম্বর নাই। বাহিরের লোকে জানেও না যে, বাড়িতে রথ হইতেছে।

এইবার ঠাকুর ভক্তসঙ্গে রথের সম্মুখে আসিয়াছেন। ওই বারান্দাতেই রথ টানা হইবে। ঠাকুর রথের দড়ি ধরিয়াছেন ও কিয়ৎক্ষণ টানিলেন। পরে গান ধরিলেন — নদে টলমল টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে।

গান — যাদের হরি বলিতে নয়ন ঝরে তারা তারা দুভাই এসেছে রে।

ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন। ভক্তেরাও সেই সঙ্গে নাচিতেছেন ও গাইতেছেন। কীর্তনীয়া বৈষ্ণবচরণ, সম্প্রদায়ের সহিত গানে ও নৃত্যে যোগদান করিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে সমস্ত বারান্দা পরিপূর্ণ হইল। মেয়েরাও নিকটস্থ ঘর হইতে এই প্রেমানন্দ দেখিতছেন! বোধ হইল, যেন শ্রীবাসমন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তসঙ্গে হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন। বন্ধুবর্গসঙ্গে পণ্ডিতও রথের সম্মুখে এই নৃত্য গীত দর্শন করিতেছেন।

এখনও সন্ধ্যা হয় নাই। ঠাকুর বৈঠকখানাঘরে আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন ও ভক্তসঙ্গে উপবেশন করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতের প্রতি) — এর নাম ভজনানন্দ। সংসারীরা বিষয়ানন্দ নিয়ে থাকে, — কামিনী-কাঞ্চনের আনন্দ। ভজন করতে করতে তাঁর যখন কৃপা হয়, তখন তিনি দর্শন দেন — তখন ব্রহ্মানন্দ।

শশধর ও ভক্তেরা অবাক্ হইয়া শুনিতেছেন।

পণ্ডিত (বিনীতভাবে) — আজ্ঞা, কিরূপ ব্যাকুল হলে মনের এই সরস অবস্থা হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বরকে দর্শন করবার জন্য যখন প্রাণ আটুপাটু হয় তখন এই ব্যাকুলতা আসে। গুরু শিষ্যকে বললে, এসো তোমায় দেখিয়ে দি কিরূপ ব্যাকুল হলে তাঁকে পাওয়া যায়। এই বলে একটি পুকুরের কাছে নিয়ে শিষ্যকে জলে চুবিয়ে ধরলে। তুললে পর শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার প্রাণ কিরকম হচ্ছিল? সে বললে, প্রাণ আটুপাটু কচ্ছিল।

পণ্ডিত — হাঁ হাঁ, তা বটে, এবার বুঝেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বরকে ভালবাসা, এই সার! ভক্তিই সার। নারদ রামকে বললেন, তোমার পাদপদ্মে যেন সদা শুদ্ধাভক্তি থাকে; আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। রামচন্দ্র বললেন, আর কিছু বর লও; নারদ বললেন, আর কিছু চাই না, — কেবল যেন পাদপদ্মে ভক্তি থাকে।

পণ্ডিত বিদায় লইবেন। ঠাকুর বললেন, এঁকে গাড়ি আনিয়া দাও।

পণ্ডিত — আজ্ঞা না, আমরা অমনি চলে যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্য) — তা কি হয়! ব্রহ্মা যাঁরে না পায়ে ধ্যানে —

পণ্ডিত — যাবার প্রয়োজন ছিল না, তবে সন্ধ্যাদি করতে হবে।

[শ্রীরামকৃষ্ণের পরমহংস অবস্থা ও কর্মত্যাগ — মধুর নাম কীর্তন]

শ্রীরামকৃষ্ণ — মা আমার সন্ধ্যাদি কর্ম উঠিয়ে দিয়েছেন, সন্ধ্যাদি দ্বারা দেহ-মন শুদ্ধ করা, সে অবস্থা এখন আর নাই।

এই বলিয়া ঠাকুর গানের ধুয়া ধরিলেন — 'শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্যঘরে কবে শুবি, তাদের দুই সতীনে পিরিত হলে তবে শ্যামা মারে পাবি!'

শশধর প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাম — আমি কাল শশধরের কাছে গিয়েছিলাম, আপনি বলেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কই, আমি তো বলি নাই, তা বেশ তো, তুমি গিছিলে।

রাম — একজন খবরের কাগজের (Indian Empire) সম্পাদক আপনার নিন্দা করছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা করলেই বা।

রাম — তারপর শুনুন! আমার কথা শুনে তখন আর আমায় ছাড়ে না, আপনার কথা আরও শুনতে চায়!

ডাক্তার প্রতাপ এখনও বসিয়া। ঠাকুর বলিতেছেন — সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) একবার যেও, — ভুবন (ধাত্রী) ভাড়া দেবে বলেছে।

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর জগন্মাতার নাম করিতেছেন — রামনাম, কৃষ্ণনাম, হরিনাম করিতেছেন। ভক্তেরা নিঃশব্দে শুনিতেছেন। এত সুমিষ্ট নামকীর্তন, যেন মধুবর্ষণ হইতেছে। আজ বলরামের বাড়ি যেন নবদ্বীপ হইয়াছে। বাহিরে নবদ্বীপ, ভিতরে বৃন্দাবন।

আজ রাত্রেই ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিবেন। বলরাম তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইতেছেন — জল খাওয়াইবেন। এই সুযোগে মেয়ে ভক্তেরাও তাঁহাকে আবার দর্শন করিবেন।

এদিকে ভক্তেরা বাহিরের বৈঠকখানায় তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন ও একসঙ্গে সংকীর্তন করিতেছেন। ঠাকুর বাহিরে আসিয়াই যোগ দিলেন। কীর্তন চলিতেছে —

আমার গৌর নাচে।
নাচে সংকীর্তনে, শ্রীবাস অঙ্গনে, ভক্তগণসঙ্গে।।
হরিবোল বলে বদনে গোরা, চায় গদাধর পানে,
গোরার অরুণ নয়নে, বহিছে সঘনে, প্রেমধারা হেম অঙ্গে।।

ঠাকুর আখর দিতেছেন —

নাচে সংকীর্তনে (শচীর দুলাল নাচে রে)।

(আমার গোরা নাচে রে) (প্রাণের গোরা নাচে রে)।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c26 ২৬ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে মাস্টার, রাখাল, লাটু, বলরাম, অধর, শিবপুরভক্তগণ প্রভৃতি সঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৩রা অগস্ট 1884/08/03/i

26.1 শিবপুর ভক্তসঙ্গে যোগতত্ত্ব কথা — কুণ্ডলিনী ও ষট্‌চক্রভেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে মধ্যাহ্ন সেবার পর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা দুইটা হইবে।

শিবপুর হইতে বাউলের দল ও ভবানীপুর হইতে ভক্তেরা আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখাল, লাটু, হরিশ, আজকাল সর্বদাই থাকেন। ঘরে বলরাম, মাস্টারও আছেন।

আজ রবিবার, ৩রা অগস্ট, ১৮৮৪, ২০শে শ্রাবণ। শুক্লা দ্বাদশী, ঝুলনযাত্রার দ্বিতীয় দিন। গতকল্য ঠাকুর সুরেন্দ্রের বাড়িতে গিয়াছিলেন, — যেখানে শশধর প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন।

ঠাকুর শিবপুরের ভক্তদের সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন —

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকলে যোগ হয় না। সাধারণ জীবের মন লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভিতে। সাধ্য-সাধনার পর কুলকুন্ডলিনী জাগ্রতা হন। ইড়া, পিঙ্গলা আর সুষুম্না নাড়ী; — সুষুম্নার মধ্যে ছটি পদ্ম আছে। সর্বনিচে মূলাধার, তারপর স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। এইগুলিকে ষট্‌চক্র বলে।

“কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হলে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর — এই সব পদ্ম ক্রমে পার হয়ে হৃদয়মধ্যে অনাহত পদ্ম — সেইখানে এসে অবস্থান করে। তখন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি থেকে মন সরে গিয়ে চৈতন্য হয় আর জ্যোতিঃদর্শন হয়। সাধক অবাক হয়ে জ্যোতিঃ দেখে আর বলে, ‘একি!’ ‘একি!’

“ষটচক্র ভেদ হলে কুণ্ডলিনী সহস্রার পদ্মে গিয়ে মিলিত হন। কুণ্ডলিনী সেখানে গেলে সমাধি হয়।

“বেদমতে এ-সব চক্রকে — ‘ভূমি’ বলে। সপ্তভূমি। হৃদয় — চতুর্থভূমি। অনাহত পদ্ম, দ্বাদশ দল।

“বিশুদ্ধ চক্র পঞ্চমভূমি। এখানে মন উঠলে কেবল ঈশ্বরকথা বলতে আর শুনতে প্রাণ ব্যাকুল হয়। এ-চক্রের স্থান কণ্ঠ। ষোড়শ দল পদ্ম। যার এই চক্রে মন এসেছে, তার সামনে বিষয়কথা — কামিনী-কাঞ্চনের কথা — হলে ভারী কষ্ট হয়! ওরূপ কথা শুনলে সে সেখান থেকে উঠে যায়।

“তারপর ষষ্ঠভূমি। আজ্ঞা চক্র — দ্বিদল পদ্ম। এখানে কুলকুণ্ডলিনী ঈশ্বরের রূপ দর্শন হয়। কিন্তু একটু আড়াল থাকে — যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো, মনে হয় আলো ছুঁলাম, কিন্তু কাচ ব্যবধান আছে বলে ছোঁয়া যায় না।

“তারপর সপ্তভূমি। সহস্রার পদ্ম। সেখানে কুণ্ডলিনী গেলে সমাধি হয়। সহস্রারে সচ্চিদানন্দ শিব আছেন — তিনি শক্তির সহিত মিলিত হন। শিব-শক্তির মিলন!

“সহস্রারে মন এসে সমাধিস্থ হয়ে আর বাহ্য থাকে না। সে আর দেহরক্ষা করতে পারে না। মুখে দুধ দিলে গড়িয়ে যায়। এ অবস্থায় থাকলে একুশদিনে মৃত্যু হয়। কালাপানিতে গেলে জাহাজ আর ফেরে না।

“ঈশ্বরকোটি — অবতারাদি — এই সমাধি অবস্থা থেকে নামতে পারে। তারা ভক্তি-ভক্ত নিয়ে থাকে, তাই নামতে পারে। তিনি তাদের ভিতর ‘বিদ্যার আমি’ — ‘ভক্তের আমি’ — লোকশিক্ষার জন্য — রেখে দেন। তাদের অবস্থা — যেমন ষষ্ঠভূমি আর সপ্তভূমির মাঝখানে বাচখেলা।

“সমাধির পর ‘বিদ্যার আমি’ কেউ কেউ ইচ্ছা করে রেখে দেন। সে আমির আঁট নাই। — রেখা মাত্র।

“হনুমান সাকার-নিরাকার সাক্ষাৎকারের পর ‘দাস আমি’ রেখেছিলেন। নারদাদি — সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, এঁরাও ব্রহ্মজ্ঞানের পর ‘দাস আমি’ ‘ভক্তের আমি’ রেখেছিলেন। এঁরা, জাহাজের মতো, নিজেও পারে যান, আবার অনেক লোককে পার করে নিয়ে যান।”

ঠাকুর এইরূপে কি নিজের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন? বলিতেছেন —

[পরমহংস — নিরাকারবাদী ও সাকারবাদী। ঠাকুরের ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তি — নিত্যলীলাযোগ]

“পরমহংস — নিরাকারবাদী আবার সাকারবাদী। নিরাকারবাদী যেমন ত্রৈলঙ্গ স্বামী। এঁরা আপ্তসারা — নিজের হলেই হল।

“ব্রহ্মজ্ঞানের পরও যারা সাকারবাদী তারা লোকশিক্ষার জন্য ভক্তি নিয়ে থাকে। যেমন কুম্ভ পরিপূর্ণ হল, অন্য পাত্রে জল ঢালাঢালি করছে।

“এরা যে-সব সাধনা করে ভগবানকে লাভ করেছে, সেই সকল কথা লোকশিক্ষার জন্য বলে — তাদের হিতের জন্য। জলপানের জন্য অনেক কষ্টে কূপ খনন করলে — ঝুড়ি-কোদাল লয়ে। কূপ হয়ে গেল, কেউ কেউ কোদাল, আর আর যন্ত্র কূপের ভিতরেই ফেলে দেয় — আর কি দরকার! কিন্তু কেউ কেউ কাঁধে ফেলে রাখে, পরের উপকার হবে বলে।

“কেউ আম লুকিয়ে খেয়ে মুখ পুঁছে! কেউ অন্য লোককে দিয়ে খায় — লোকশিক্ষার জন্য আর তাঁকে আস্বাদন করবার জন্য। ‘চিনি খেতে ভালবাসি’।

“গোপীদেরও ব্রহ্মজ্ঞান ছিল। কিন্তু তারা ব্রহ্মজ্ঞান চাইত না। তারা কেউ বাৎসল্যভাবে, কেউ সখ্যভাবে, কেউ মধুরভাবে, কেউ দাসীভাবে ঈশ্বরকে সম্ভোগ করতে চাইত।”

[কীর্তনানন্দে — শ্রীগৌরাঙ্গের নাম ও মায়ের নাম]

শিবপুরের ভক্তেরা গোপীযন্ত্র লইয়া গান করিতেছেন। প্রথম গানে বলিতেছেন, “আমরা পাপী, আমাদের উদ্ধার কর।”

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — ভয় দেখিয়ে — ভয় পেয়ে — ভজনা, প্রবর্তকের ভাব। তাঁকে লাভ করার গান গাও। আনন্দের গান। (রাখালের প্রতি) নবীন নিয়োগীর বাড়িতে সেদিন কেমন গান করছিল —

হরিনাম মদিরায় মত্ত হও —

“কেবল অশান্তির কথা ভাল নয়। তাঁকে লয়ে আনন্দ — তাঁকে লয়ে মাতোয়ারা হওয়া।”

শিবপুরের ভক্ত — আজ্ঞা, আপনার গান একটি হবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি কি গাইব? আচ্ছা, যখন হবে গাইব।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর গান গাহিতেছেন। গাইবার সময় ঊর্ধ্বদৃষ্টি।

গান - কৌপিন দাও কাঙালবেশে ব্রজে যাই হে ভারতী।

গান - গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।

গান - দেখসে আয় গৌরবরণ রূপখানি (গো সজানী)।

আলতোলা দুধের ছানা মাখা গোরার গায়,

(দেখে ভাবের উদয় হয়)।

কারিগর ভাঙ্গড়, মিস্ত্রী বৃষভানুনন্দিনী

গান - ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।

গৌরাঙ্গের নামের পর ঠাকুর মার নাম করিতেছেন:

(১) শ্যামা ধন কি সবাই পায়। অবোধ মন বোঝে না একি দায়।।

(২) মজলো আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।

(৩) শ্যামা মা কি কল করেছে, কালী মা কি কল করেছে,

চৌদ্দ পোয়া কলের ভিতরি, কত রঙ্গ দেখাতেছে।

আপনি থাকি কলের ভিতরি, কল ঘুরায় ধরে কলডুরি;

কল বলে আপনি ঘুরি, জানে না কে ঘুরাতেছে।।

যে কল জেনেছে তারে, কল হতে হবে না তারে,

কোনো কলের ভক্তি ডোরে আপনি শ্যামা বাঁধা আছে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৩রা অগস্ট 1884/08/03/ii

26.2 ঠাকুরের সমাধি ও জগন্মাতার সহিত কথা — প্রেমতত্ত্ব

এই গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ভক্তেরা সকলে নিস্তব্ধ হইয়া দর্শন করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

“মা, উপর থেকে (সহস্রার থেকে?) এইখানে নেমে এস! — কি জ্বালাও! — চুপ করে বস!

“মা, যার যা (সংস্কার) আছে, তাই তো হবে! — আমি আর এদের কি বলব! বিবেক-বৈরাগ্য না হলে কিছু হয় না।

“বৈরাগ্য অনেকপ্রকার। একরকম আছে মর্কটবৈরাগ্য! — সংসারের জ্বালায় জ্বলে বৈরাগ্য — সে বৈরাগ্য বেশিদিন থাকে না। আর ঠিক ঠিক বৈরাগ্য — সব আছে, কিছুর অভাব নাই, অথচ সব মিথ্যাবোধ।

“বৈরাগ্য একেবারে হয় না। সময় না হলে হয় না। তবে একটি কথা আছে — শুনে রাখা ভাল। সময় যখন হবে তখন মনে হবে — ও! সেই শুনেছিলাম!

“আর একটি কথা। এ-সব কথা শুনতে শুনতে বিষয়বাসনা একটু একটু করে কমে। মদের নেশা কমাবার জন্য একটু একটু চালুনির জল খেতে হয়। তাহলে ক্রমে ক্রমে নেশা ছুটতে থাকে।

“জ্ঞানলাভের অধিকারী বড়ই কম। গীতায় বলেছে — হাজার হাজার লোকের ভিতর একজন তাঁকে জানতে ইচ্ছা করে। আবার যারা জানতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ হাজার হাজার লোকের ভিতর একজন জানতে পারে।”

তান্ত্রিকভক্ত — ‘মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে’ ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সংসারে আসক্তি যত কমবে, ততই জ্ঞান বাড়বে। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি।

[সাধুসঙ্গ, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, ভক্তি, ভাব, মহাভাব, প্রেম]

“প্রেম সকলের হয় না। গৌরাঙ্গের হয়েছিল। জীবের ভাব হতে পারে — এই পর্যন্ত। ঈশ্বরকোটির — যেমন অবতার আদির — প্রেম হয়। প্রেম জলে জগৎ মিথ্যা তো বোধ হইবেই, আবার শরীর যে এত ভালবাসার জিনিস, তা ভুল হয়ে যায়!

“পার্শী বইয়ে (হাফেজে) আছে, চামড়ার ভিতর মাংস, মাংসের ভিতর হাড়, হাড়ের ভিতর মজ্জা, তারপরে আরও কত কি! সকলের ভিতর প্রেম।

“প্রেমে কোমল, নরম হয়ে যায়। প্রেমে, কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ হয়েছেন।

“প্রেম হলে সচ্চিদানন্দকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া যায়। যাই দেখতে চাইবে দড়ি ধরে টানলেই হয়। যখন ডাকবে তখন পাবে।

“ভক্তি পাকলে ভাব। ভাব হলে সচ্চিদানন্দকে ভেবে অবাক্ হয় যায়। জীবের এই পর্যন্ত। আবার ভাব পাকলে মহাভাব, — প্রেম। যেমন কাঁচা আম আর পাকা আম।

“শুদ্ধাভক্তিই সার, আর সব মিথ্যা!

“নারদ স্তব করাতে বললেন, তুমি বর লও। নারদ চাইলেন, শুদ্ধাভক্তি। আর বললেন — রাম, যেন তোমার জগৎমোহিনী মায়ার মুগ্ধ না হই! রাম বললেন, ও তো হল, আর কিছু বর লও।

“নারদ বললেন, আর কিছু চাই না, কেবল ভক্তি!

“এই ভক্তি কিরূপে হয়? প্রথমে সাধুসঙ্গ করতে হয়। সাধুসঙ্গ করলে ঈশ্বরীয় বিষয়ে শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধার পর নিষ্ঠা, ঈশ্বরকথা বই আর কিছু শুনতে ইচ্ছা করে না; তাঁরই কাজ করতে ইচ্ছা করে।

“নিষ্ঠার পর ভক্তি। তারপর ভাব, — মহাভাব, প্রেম — বস্তুলাভ।

“মহাভাব, প্রেম, অবতার আদির হয়। সংসারী জীবের জ্ঞান, ভক্তের জ্ঞান, আর অবতারের জ্ঞান সমান নয়। সংসারী জীবের জ্ঞান যেন প্রদীপের আলো, — শুধু ঘরের ভিতরটি দেখা যায়। সে জ্ঞানে খাওয়া-দাওয়া, ঘর করা, শরীররক্ষা, সন্তানপালন — এই সব হয়।

“ভক্তের জ্ঞান, যেন চাঁদের আলো। ভিতর বার দেখা যায়, কিন্তু অনেক দূরের জিনিস, কি খুব ছোট জিনিস, দেখা যায় না। অবতার আদির জ্ঞান যেন সূর্যের আলো। ভিতর বার, ছোট বড় — তাঁরা সব দেখতে পান।

“তবে সংসারী জীবের মন ঘোলা জল হয়ে আছে বটে, কিন্তু নির্মলি ফেললে আবার পরিষ্কার হতে পারে। বিবেক-বৈরাগ্য নির্মলি।”

এইবার ঠাকুর শিবপুরের ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

[ঈশ্বরকথা শ্রবণের প্রয়োজন। “সময়-সাপেক্ষ”। ঠাকুরের সহজাবস্থা]

শ্রীরামকৃষ্ণ — আপনাদের কিছু জিজ্ঞাসা থাকে বলো।

ভক্ত — আজ্ঞা, সব তো শুনলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ — শুনে রাখা ভাল, কিন্তু সময় না হলে হয় না।

“যখন খুব জ্বর, তখন কুনাইন দিলে কি হবে? ফিবার মিকশ্চার দিয়ে বাহ্যে-টাহ্যে হয়ে একটু কম পড়লে তখন কুনাইন দিতে হয়। আবার কারু কারু অমনি সেরে যায়, কুনাইন না দিলেও হয়।

“ছেলে ঘুমবার সময় বলেছিল, ‘মা আমার যখন হাগা পাবে তখন তুলো।’ মা বললে, ‘বাবা, আমায় তুলতে হবে না, হাগায় তোমায় তুলবে।’

“কেউ কেউ এখানে আসে দেখি, কোন ভক্তসঙ্গে নৌকা করে এসেছে। ঈশ্বরীয় কথা তাদের ভাল লাগে না। কেবল বন্ধুর গা টিপছে, ‘কখন যাবে, কখন যাবে?’ যখন বন্ধু কোনরকমর উঠলো না, তখন বলে, ‘তবে ততক্ষণ আমি নৌকায় গিয়ে বসে থাকি।’

“যাদের প্রথম মানুষ জন্ম, তাদের ভোগের দরকার। কতকগুলো কাজ করা না থাকলে চৈতন্য হয় না।”

ঠাকুর ঝাউতলায় যাইবেন। গোল বারান্দায় মাস্টারকে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — আচ্ছা, আমার কিরকম অবস্থা।?

মাস্টার (সহাস্যে) — আজ্ঞা, আপনার উপরে সহজাবস্থা — ভিতর গভীর। — আপনার অবস্থা বোঝা ভারী কঠিন!

শ্রীরাককৃষ্ণ (সহাস্যে) — হাঁ; যেমন floor করা মেঝে, লোকে উপরটাই দেখে, মেঝের নিচে কত কি আছে, জানে না!

চাঁদনির ঘাটে বলরাম প্রভৃতি কয়েকটি ভক্ত কলিকাতা যাইবার জন্য নৌকা আরোহন করিতেছেন। বেলা চারিটা বাজিয়াছে। ভাটা পড়িয়াছে, তাহাতে দক্ষিণে হাওয়া। গঙ্গাবক্ষ তরঙ্গমালায় বিভূষিত হইয়াছে।

বলরামের নৌকা বাগবাজার অভিমুখে চলিয়া যাইতেছে, মাস্টার অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতেছেন।

নৌকা অদৃশ্য হইলে তিনি আবার ঠাকুরের কাছে আসিলেন।

ঠাকুর পশ্চিম বারান্দা হইতে নামিতেছেন — ঝাউতলায় যাইবেন। উত্তর-পশ্চিমে সুন্দর মেঘ হইয়াছে। ঠাকুর বলিতেছেন, বৃষ্টি হবে কি, ছাতাটা আনো দেখি। মাস্টার ছাতা আনিলেন। লাটুও সঙ্গে আছেন।

ঠাকুর পঞ্চবটীতে আসিয়াছেন। লাটুকে বলিতেছেন — 'তুই রোগা হয়ে যাচ্ছিস কেন?'

লাটু — কিছু খেতে পারি না!

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেবল কি ওই — সময় খারাপ পড়েছে — আর বেশি ধ্যান করিস বুঝি?

ঠাকুর মাস্টারের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — তোমার ওইটে ভার রইল। বাবুরামকে বলবে, রাখাল গেলে দুই-একদিন মাঝে মাঝে এসে থাকবে। তা না হলে আমার মন ভারী খারাপ হবে।

মাস্টার — যে আজ্ঞা, আমি বলব।

সরল হইলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বাবুরাম সরল কি না!

[ঝাউতলা ও পঞ্চবটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের সুন্দর রূপ দর্শন]

ঠাকুর ঝাউতলা হইতে দক্ষিণাস্য হইয়া আসিতেছেন। মাস্টার ও লাটু পঞ্চবটীতলায় দাঁড়াইয়া উত্তরাস্য হইয়া দেখিতেছেন।

ঠাকুরের পশ্চাতে নবীন মেঘ গগনমণ্ডল সুশোভিত করিয়া জাহ্নবী-জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে — তাহাতে গঙ্গাজলে কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে।

ঠাকুর আসিতেছেন — যেন সাক্ষাৎ ভগবান দেহধারণ করিয়া মর্ত্যলোকে ভক্তের জন্য কলুষবিনাশিনী হরিপাদাম্বুজসম্ভূতা সুরধুনীর তীরে বিচরণ করিতেছেন। সাক্ষাৎ তিনি উপস্থিত। — তাই কি বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, উদ্যানপথ, দেবালয়, ঠাকুর-প্রতিমা, সেবকগণ, দৌবারিকগণ, প্রত্যেক ধূলিকণা, এত মধুর হইতেছে!

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৩রা অগস্ট 1884/08/03/iii

26.3 নবাই চৈতন্য, নরেন্দ্র, বাবুরাম, লাটু, মণি, রাখাল, নিরঞ্জন, অধর

ঠাকুর নিজের ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। বলরাম আম্র আনিয়াছিলেন! ঠাকুর শ্রীযুক্ত রাম চাটুজ্যেকে বলিতেছেন — তোমার ছেলের জন্য আমগুলি নিয়ে যেও। ঘরে শ্রীযুক্ত নবাই চৈতন্য বসিয়াছেন। তিনি লাল কাপড় পরিয়া আসিয়াছেন।

উত্তরের লম্বা বারান্দায় ঠাকুর হাজরার সহিত কথা কহিতেছেন। ব্রহ্মচারী হরিতাল ভস্ম ঠাকুরের জন্য দিয়াছেন। — সেই কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ব্রহ্মচারীর ঔষধ আমার বেশ খাটে — লোকটা ঠিক।

হাজরা — কিন্তু বেচারী সংসারে পড়েছে — কি করে! কোন্নগর থেকে নবাই চৈতন্য এসেছেন। কিন্তু সংসারী লাল কাপড় পরা!

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি বলব! আর আমি দেখি ঈশ্বর নিজেই এই-সব মানুষরূপ ধারণ করে রয়েছেন। তখন কারুকে কিছু বলতে পারি না।

ঠাকুর আবার ঘরের মধ্যে আসিয়াছেন। হাজরার সহিত নরেন্দ্রের কথা কহিতেছেন।

হাজরা — “নরেন্দ্র আবার মোকদ্দমায় পড়েছে।”

শ্রীরামকৃষ্ণ — শক্তি মানে না। দেহধারণ করলে শক্তি মানতে হয়।

হাজরা — বলে, আমি মানলে সকলেই মানবে, — তা কেমন করে মানি।

“অত দূর ভাল নয়। এখন শক্তিরই এলাকায় এসেছে। জজসাহেব পর্যন্ত যখন সাক্ষী দেয়, তাঁকে সাক্ষীর বাক্সে নেমে এসে দাঁড়াতে হয়।”

ঠাকুর মাস্টারকে বলিতেছেন — তোমার সঙ্গে নরেন্দ্রের দেখা হয় নাই?

মাস্টার — আজ্ঞা, আজকাল হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — একবার দেখা করো না — আর গাড়ি করে আনবে।

(হাজরার প্রতি) — “আচ্ছা, এখানকার সঙ্গে কি তার সম্বন্ধ?”

হাজরা — আপনার সাহায্য পাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ভবনাথ? সংস্কার না থাকলে এখানে এত আসে?

“আচ্ছা, হরিশ, লাটু — কেবল ধ্যান করে; — উগুনো কি?”

হাজরা — হাঁ, কেবল ধ্যান করা কি? আপনাকে সেবা করে, সে এক।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হবে! — ওরা উঠে গিয়ে আবার কেউ আসবে।

[মণির প্রতি নানা উপদেশ। শ্রীরামকৃষ্ণের সহজাবস্থা]

হাজরা ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। এখনও সন্ধ্যার দেরি আছে। ঠাকুর ঘরে বসিয়া একান্তে মণির সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — আচ্ছা, আমি যা ভাবাবস্থায় বলি, তাতে লোকের আকর্ষণ হয়?

মণি — আজ্ঞা, খুব হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — লোকে কি ভাবে? ভাবাবস্থায় দেখলে কিছু বোধ হয়?

মণি — বোধ হয়, একধারে জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য — তার উপর সহজাবস্থা। ভিতর দিয়ে কত জাহাজ চলে গেছে, তবু সহজ! ও অবস্থা অনেকে বুঝতে পারে না — দু-চারজন কিন্তু ওইতেই আকৃষ্ট হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঘোষপাড়ার মতে ঈশ্বরকে 'সহজ' বলে। আর বলে, সহজ না হলে সহজকে না যায় চেনা।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও অভিমান ও অহংকার। "আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী"]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — আচ্ছা, আমার অভিমান আছে?

মণি — আজ্ঞা, একটু আছে। শরীররক্ষা আর ভক্তির-ভক্তের জন্য, — জ্ঞান-উপদেশের জন্য। তাও আপনি প্রার্থনা করে রেখেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি রাখি নাই; — তিনিই রেখে দিয়েছেন। আচ্ছা, ভাবাবেশের সময় কি হয়?

মণি — আপনি তখন বললেন, ষষ্ঠভূমিতে মন উঠে ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। তারপর কথা যখন কন, তখন পঞ্চমভূমিতে মন নামে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তিনিই সব কচ্ছেন। আমি কিছুই জানি না।

মণি — আজ্ঞা, তাই জন্যই তো এত আকর্ষণ!

[Why all Scriptures — all Religions — are true —
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিরুদ্ধ শাস্ত্রের সমন্বয়]

মণি — আজ্ঞা, শাস্ত্রে দুরকম বলেছে। এক পুরাণের মতে কৃষ্ণকে চিদাত্মা, রাধাকে চিচ্ছক্তি বলেছে। আর এক পুরাণে কৃষ্ণই কালী — আদ্যাশক্তি বলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেবীপুরাণের মত। এ-মতে কালীই কৃষ্ণ হয়েছেন।

“তা হলেই বা! — তিনি অনন্ত, পথও অনন্ত।”

এই কথা শুনিয়া মণি অবাক্ হইয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

মণি — ও বুঝেছি। আপনি যেমন বলেন, ছাদে উঠা নিয়ে কথা। যে কোন উপায়ে উঠতে পারলেই হল — দড়ি, বাঁশ — যে কোন উপায়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এইটি যে বুঝেছে, এটুকু ঈশ্বরের দয়া। ঈশ্বরের কৃপা না হলে সংশয় আর যায় না।

“কথাটা এই — কোনরকমে তাঁর উপর যাতে ভক্তি হয় — ভালবাসা হয়। নানা খবরে কাজ কি? একটা পথ দিয়ে যেতে যেতে যদি তাঁর উপর ভালবাসা হয়, তাহলেই হল। ভালবাসা হলেই তাঁকে লাভ করা যাবে। তারপর যদি দরকার হয়, তিনি সব বুঝিয়ে দিবেন — সব পথের খবর বলে দিবেন। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলেই হল — নানা বিচারের দরকার নাই। আম খেতে এয়েছ, আম খাও; কত ডাল, কত পাতা — এ-সবের হিসাবের দরকার নাই। হনুমানের ভাব — ‘আমি বার তিথি নক্ষত্র জানি না — এক রামচিন্তা করি’।”

[সংসারত্যাগ ও ঈশ্বরলাভ। ভক্তের সঞ্চয় না যদৃচ্ছালাভ?]

মণি — এখন এরূপ ইচ্ছা হয় যে, কর্ম খুব কমে যায়, — আর ঈশ্বরের দিকে খুব মন দিই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আহা! তা হবে বইকি!

“কিন্তু জ্ঞানী নির্লিপ্ত হয়ে সংসারে থাকতে পারে।”

মণি — আজ্ঞা, কিন্তু নির্লিপ্ত হতে গেলে বিশেষ শক্তি চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, তা বটে। কিন্তু হয়তো তুমি (সংসার) চেয়েছিলে।

“কৃষ্ণ শ্রীমতীর হৃদয়েই ছিলেন, কিন্তু ইচ্ছা হল, তাই মানুষরূপে লীলা।

“এখন প্রার্থনা করো, যাতে এ-সব কমে যায়।

“আর মন থেকে ত্যাগ হলেই হল।”

মণি — সে যারা বাহিরে ত্যাগ করতে পারে না। উঁচু থাকের জন্য একেবারেই ত্যাগ — মনের ত্যাগ ও বাহিরের ত্যাগ।

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বৈরাগ্য মানে কি বল দেখি?

মণি — বৈরাগ্য মানে শুধু সংসারে বিরাগ নয়। ঈশ্বরে অনুরাগ আর সংসারে বিরাগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, ঠিক বলেছ।

“সংসারে টাকার দরকার বটে, কিন্তু উগুনোর জন্য অত ভেবো না। যদৃচ্ছালাভ — এই ভালো। সঞ্চয়ের জন্য অত ভেবো না। যারা তাঁকে মন প্রাণ সমর্পণ করে — যারা তাঁর ভক্ত, শরণাগত, — তারা ও-সব অত ভাবে না। যত্র আয় — তত্র ব্যয়। একদিক থেকে টাকা আসে, আর-একদিক থেকে খরচ হয়ে যায়। এর নাম যদৃচ্ছালাভ। গীতায় আছে।”

[শ্রীযুক্ত হরিপদ, রাখাল, বাবুরাম, অধর প্রভৃতির কথা]

ঠাকুর হরিপদর কথা কহিতেছেন। — “হরিপদ সেদিন এসেছিল।”

মণি (সহাস্য) — হরিপদ কথকতা জানে। প্রহ্লাদচরিত্র, শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা — এ-সব বেশ সুর করে বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বটে সেদিন তার চক্ষু দেখলাম, যেন চড়ে রয়েছে। বললাম, “তুই কি খুব ধ্যান করিস?” তা মাথা হেঁট করে থাকে। আমি তখন বললাম, অত নয় রে!

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর মার নাম করিতেছেন ও চিন্তা করিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরবাড়িতে আরতি আরম্ভ হইল। শ্রাবণ শুক্লা দ্বাদশী। ঝুলন-উৎসবের দ্বিতীয় দিন। চাঁদ উঠিয়াছে! মন্দির, মন্দির প্রাঙ্গণ, উদ্যান, — আনন্দময় হইয়াছে। রাত আটটা হইল। ঘরে ঠাকুর বসিয়া আছেন। রাখাল ও মাস্টারও আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — বাবুরাম বলে, ‘সংসার! — ওরে বাবা!’

মাস্টার — ও শোনা কথা। বাবুরাম সংসারের কি জানে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, তা বটে। নিরঞ্জন দেখেছ, — খুব সরল!

মাস্টার — আজ্ঞা, হাঁ। তার চেহারেতেই আকর্ষণ করে। চোখের ভাবটি কেমন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — শুধু চোখের ভাব নয় — সমস্ত। তার বিয়ে দেবে বলেছিল, — তা সে বলেছে, আমায় ডুবুবে কেন? (সহাস্য) হ্যাঁগা, লোকে বলে, খেটে-খুটে গিয়ে পরিবারের কাছে গিয়ে বসলে নাকি খুব আনন্দ হয়।

মাস্টার — আজ্ঞা, যারা ওইভাবে আছে, তাদের হয় বইকি!

(রাখালের প্রতি, সহাস্যে) — একজামিন হচ্ছে — leading question.

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — মায়ে বলে, ছেলের একটা গাছতলা করে দিলে বাঁচি! রোদে ঝলসা পোড়া হয়ে গাছতলায় বসবে।

মাস্টার — আজ্ঞা, রকমারি বাপ-মা আছে। মুক্ত বাপ ছেলেদের বিয়ে দেয় না। যদি দেয় সে খুব মুক্ত! (ঠাকুরের হাস্য)।

[অধরের ও মাস্টারের কালীদর্শন। অধরের চন্দ্রনাথতীর্থ ও সীতাকুণ্ডের গল্প]

শ্রীযুক্ত অধর সেন কলিকাতা হইতে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। একটু বসিয়া কালীদর্শন জন্য কালীঘরে গেলেন।

মাস্টারও কালীদর্শন করিলেন। তৎপরে চাঁদনির ঘাটে আসিয়া গঙ্গার কুলে বসিলেন। গঙ্গার জল জ্যোৎস্নায় ঝকঝক করিতেছে। সবে জোয়ার আসিল। মাস্টার নির্জনে বসিয়া ঠাকুরের অদ্ভুত চরিত্র চিন্তা করিতেছেন — তাঁহার অদ্ভুত সমাধি অবস্থা — মুহুর্মুহুঃ ভাব — প্রেমানন্দ — অবিশ্রান্ত ঈশ্বরকথাপ্রসঙ্গ — ভক্তের উপর অকৃত্রিম স্নেহ — বালকের চরিত্র — এই সব স্মরণ করিতেছেন। আর ভাবিতেছেন — ইনি কে — ঈশ্বর কি ভক্তের জন্য দেহ ধারণ করে এসেছেন?

অধর, মাস্টার, ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়া গিয়াছেন। অধর চট্টগ্রামে কর্ম উপলক্ষে ছিলেন। তিনি চন্দ্রনাথ তীর্থের ও সীতাকুণ্ডের গল্প করিতেছেন।

অধর — সীতাকুণ্ডের জলে আগুনের শিখা জিহ্বার ন্যায় লকলক করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এ কেমন করে হয়?

অধর — জলে ফসফরাস (phosphorus) আছে।

শ্রীযুক্ত রাম চাটুজ্যে ঘরে আসিয়াছেন। ঠাকুর অধরের কাছে তাঁর সুখ্যাতি করিতেছেন। আর বলিতেছেন, "রাম আছে, তাই আমাদের অত ভাবতে হয় না। হরিশ, লাটু, এদের ডেকে-ডুকে খাওয়ায়। ওরা হয়তো একলা কোথায় ধ্যান কচ্ছে। সেখান থেকে রাম ডেকে-ডুকে আনে।"

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c27 ২৭ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত অধরের বাড়িতে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৬ই সেপ্টেম্বর 1884/09/06/i

27.1 নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে। সমাধিমন্দিরে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের বাটীর বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বৈঠকখানা দ্বিতলের উপর। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, মুখুজ্জে ভ্রাতৃদ্বয়, ভবনাথ, মাস্টার, চুনিলাল, হাজরা প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁর কাছে বসিয়া আছেন। বেলা ৩টা হইবে। আজ শনিবার, ২২শে ভাদ্র, ১২৯১; ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪। কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথি।

ভক্তেরা প্রণাম করিতেছেন। মাস্টার প্রণাম করিলে পর, ঠাকুর অধরকে বলিতেছেন, 'নিতাই ডাক্তার আসবে না?'

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র গান গাইবেন, তাহার আয়োজন হইতেছে। তানপুরা বাঁধিতে গিয়া তার ছিঁড়িয়া গেল। ঠাকুর বলিতেছেন, ওরে কি করলি। নরেন্দ্র বাঁয়া তবলা বাঁধিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন। তোর বাঁয়া যেন গালে চড় মারছে!

কীর্তনাঙ্গের গান সম্বন্ধে কথা হইতেছে। নরেন্দ্র বলিতেছেন, "কীর্তনে তাল সম্ এ-সব নাই — তাই অত Popular — লোকে ভালবাসে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ — সে কি বললি! করুণ বলে তাই অত — লোকে ভালবাসে।

নরেন্দ্র গান গাইতেছেন:

গান - সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে।

গান - যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।

আছি নাথ দিবানিশি আশাপথে নিরখিয়ে।।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি, সহাস্যে) — প্রথম এই গান করে!

নরেন্দ্র আরও দুই-একটি গান করবার পর বৈষ্ণবচরণ গান গাইতেছেন:

চিনিব কেমনে হে তোমায় (হরি),

ওহে বঙ্কুরায়, ভুলে আছ মথুরায়।

হাতিচড়া জোড়াপরা, ভুলেছ কি ধেনুচরা,

ব্রজের মাখন চুরি করা, মনে কিছু হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — “হরি হরি বল রে বীণে” ওইটে একবার হোক না।

বৈষ্ণবচরণ গাইতেছেন:

হরি হরি বল রে বীণে!

শ্রীহরির চরণ বিনে পরম তত্ত্ব আর পাবিনে।।

হরিনামে তাপ হরে, মুখে বল হরে কৃষ্ণ হরে,

হরি যদি কৃপা করে, তবে ভবে আর ভাবিনে।

বীণে একবার হরি বল, হরি নাম বিনে নাহি সম্বল,

দাস গোবিন্দ কয় দিন গেল, অকুলে যেন ভাসিনে।।

[ঠাকুরের মুহুর্মুহুঃ সমাধি ও নৃত্য]

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন — আহা! আহা! হরি হরি বল!

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে বসিয়া আছেন ও দর্শন করিতেছেন। ঘর লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

কীর্তনিয়া ওই গান সমাপ্ত করিয়া নূতন গান ধরিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর নব নটবর, তপত কাঞ্চন কায়।

কীর্তনিয়া যখন আখর দিচ্ছেন, “হরিপ্রেমের বন্যে ভেসে যায়,” ঠাকুর দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। আবার বসিয়া বাহু প্রসারিত করিয়া আখর দিতেছেন। — (একবার হরি বল রে)

ঠাকুর আখর দিতে দিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন ও হেঁটমস্তক হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। তাকিয়াটি সম্মুখে। তাহার উপর শিরদেশ ঢলিয়া পড়িয়াছে। কীর্তনিয়া আবার গাইতেছেন:

‘হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে, বল মাধাই মধুর স্বরে।’

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

গান - হরি বলে আমার গৌর নাচে।

নাচে রে গৌরাঙ্গ আমার হেমগিরির মাঝে।

রাঙ্গাপায়ে সোনার নূপুর রুণু ঝুণু বাজে।।

থেকো রে বাপ নরহরি থেকো গৌরের পাশে।

রাধার প্রেমে গড়া তনু, ধূলায় পড়ে পাছে।।

বামেতে অদ্বৈত আর দক্ষিণে নিতাই।

তার মাঝে নাচে আমার চৈতন্য গোঁসাই।।

ঠাকুর আবার উঠিয়াছেন ও আখর দিয়া নাচিতেছেন।

(প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে রে)!

সেই অপূর্ব নৃত্য দেখিয়া নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সকলেই ঠাকুরের সঙ্গে নাচিতে লাগিলেন।

নাচিতে নাচিতে ঠাকুর এক-একবার সমাধিস্থ হইতেছেন। তখন অন্তর্দশা। মুখে একটি কথা নাই। শরীর সমস্ত স্থির। ভক্তেরা তখন তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই অর্ধবাহ্যদশা — চৈতন্যদেবের যেরূপ হইত, — অমনি ঠাকুর সিংহবিক্রমে নৃত্য করিতেছেন। তখনও মুখে কথা নাই — প্রেমে উন্মত্তপ্রায়!

যখন একটু প্রকৃতিস্থ হইতেছেন — অমনি একবার আখর দিতেছেন।

আজ অধরের বৈঠকখানার ঘর শ্রীবাসের আঙিনা হইয়াছে। হরিনামের রোল শুনিতে পাইয়া রাজপথে অসংখ্য লোক জমিয়া গিয়াছে।

ভক্তসঙ্গে অনেকক্ষণ নৃত্যের পর ঠাকুর আবার আসন গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও ভাবাবেশ। সেই অবস্থায় নরেন্দ্রকে বলিতেছেন — সেই গানটি — "আমায় দে মা পাগল করে।"

ঠাকুরের আজ্ঞা পাইয়া নরেন্দ্র গান গাইতেছেন:

আমায় দে মা পাগল করে (ব্রহ্মময়ী)
আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে।।
তোমার প্রেমের সুরা, পানে কর মাতোয়ারা।
ও মা ভক্ত চিত্তহরা ডুবাও প্রেমসাগরে।।
তোমার এ পাগলা গারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে,
কেহ নাচে আনন্দ ভরে।
ঈশা মুসা শ্রীচৈতন্য, ওমা প্রেমের ভরে অচৈতন্য,
হায় কবে হব মা ধন্য, (ওমা) মিশে তার ভিতরে।।
স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেলা,
প্রেমের খেলা কে বুঝতে পারে।
তুই প্রেমে উন্মাদিনী, ওমা পাগলের শিরোমণি,
প্রেমধনে কর মা ধনী, কাঙ্গাল প্রেমদাসেরে।।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আর ওইটি “চিদানন্দ সিন্ধুনীরে।”

নরেন্দ্র গাইতেছেন:

চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।
মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী মরি মরি।।
মহাযোগে সমুদায় একাকার হইল।
দেশ-কাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল।।
এখন আনন্দে মাতিয়া দুবাহু তুলিয়া,
বল রে মন হরি হরি।।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) — আর ‘চিদাকাশে’? — না, ওটা বড় লম্বা, না? আচ্ছা, একটু আস্তে আস্তে!

নরেন্দ্র গাইতেছেন:

চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে।
উথলিল প্রেমসিন্ধু কি আনন্দময় হে।।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আর ওইটে — ‘হরিরস মদিরা?’

নরেন্দ্র — হরিরস মদিরা পিয়ে মম মানস মাত রে।
লুটায়ে অবনীতল, হরি হরি বলি কাঁদ রে।।

ঠাকুর আখর দিতেছেন:

প্রেমে মত্ত হয়ে, হরি হরি বলি কাঁদ রে।

ভাবে মত্ত হয়ে, হরি হরি বলি কাঁদ রে!

ঠাকুর ও ভক্তেরা একটু বিশ্রাম করিতেছেন। নরেন্দ্র আস্তে আস্তে ঠাকুরকে বলিতেছেন — “আপনি সেই গানটি একবার গাইবেন? —”

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন — ‘আমার গলাটা একটু ধরে গেছে —’

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার নরেন্দ্রকে বলিতেছেন — ‘কোন্‌টি?’

নরেন্দ্র — ভুবনরঞ্জনরূপ।

ঠাকুর আস্তে আস্তে গাইতেছেন:

ভুবনরঞ্জনরূপ নদে গৌর কে আনিল রে (অলকা আবৃত মুখ)
(মেঘের গায়ে বিজলী) (আন হেরিতে শ্যাম হেরি)

ঠাকুর আর-একটি গান গাহিতেছেন:

শ্যামের নাগাল পেলাম না লো সই।
আমি কি সুখে আর ঘরে রই।।
শ্যাম যদি মোর হতো মাথার চুল।
যতন করে বাঁধতুম বেণী সই, দিয়ে বকুল ফুল।।

(কেশব-কেশ যতনে বাঁধতুম সই) (কেউ নক্‌তে পারত না সই)

(শ্যাম কালো আর কেশ কালো) (কালোয় কালোয় মিশে যেতো গো)।

শ্যাম যদি মোর বেশর হইত, নাসা মাঝে সতত রহিত, —

(অধর চাঁদ অধরে র’ত সই) (যা হবা নয়, তা মনে হয় গো)

(শ্যাম কেন বেশর হবে সই?)।

শ্যাম যদি মোর কঙ্কণ হতো বাহু মাঝে সতত রহিত

(কঙ্কণ নাড়া দিয়ে চলে যেতুম সই) (বাহু নাড়া দিয়ে)

(শ্যাম-কঙ্কণ হাতে দিয়ে, চলে যেতুম সই) (রাজপথে)

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৬ই সেপ্টেম্বর 1884/09/06/ii

27.2 ভাবাবস্থায় অন্তর্দৃষ্টি —— নরেন্দ্রাদির নিমন্ত্রণ

গান সমাপ্ত হইল। নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ঠাকুর কথা কহিতেছেন। সহাস্যে বলছেন, হাজরা নেচেছিল।

নরেন্দ্র (সহাস্যে) — আজ্ঞা, একটু একটু।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — একটু একটু?

নরেন্দ্র (সহাস্যে) — ভুড়ি আর একটি জিনিস নেচেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — সে আপনি হেলে দোলে — না দোলাতে আপনি দোলে। (সকলের হাস্য)

শশধর যে বাড়িতে আছেন, সেই বাড়িতে ঠাকুরের নিমন্ত্রণ হইবার কথা হইতেছে।

নরেন্দ্র — বাড়িওয়ালা খাওয়াবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তার শুনেছি স্বভাব ভাল না — লোচ্চা।

নরেন্দ্র — আপনি তাই — যেদিন শশধরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয় — তাদের ছোঁয়া জলের গেলাস থেকে জল খেলেন না। আপনি কেমন করে জানলেন যে লোকটার স্বভাব ভাল না?

[পূর্বকথা — সিওড়ে হৃদয়ের বাটীতে হাজরা ও বৈষ্ণব সঙ্গে]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — হাজরা আর একটা জানে, — ও-দেশে — সিওড়ে — হৃদের বাড়িতে।

হাজরা — সে একজন বৈষ্ণব — আমার সঙ্গে দর্শন করতে গিছল, যাই সে গিয়ে বসল, ইনি তার দিকে পেছন ফিরে বসলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — মাসীর সঙ্গে নাকি নষ্ট ছিল — তারপর শোনা গেল। (নরেন্দ্রের প্রতি) আগে বলতিস আমার অবস্থা সব মনের গতিক। (hallucination)

নরেন্দ্র — কে জানে! এখন তো অনেক দেখলাম — সব মিলেছে!

নরেন্দ্র বলিতেছেন, ঠাকুর ভাবাবস্থায় লোকের অন্তর বাহির সমস্ত দেখিতে পান — এটা তিনি অনেকবার মিলাইয়া দেখিলেন।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তের জাতি বিচার — Caste]

ঠাকুর ও ভক্তদের সেবার জন্য অধর অনেক আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি এইবার তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন।

মহেন্দ্র ও প্রিয়নাথ — মুখুজ্জে ভ্রাতৃদ্বয়কে — ঠাকুর বলিতেছেন, ‘কিগো, তোমরা খেতে যাবে না?’

তাঁহারা বিনীতভাবে বলিতেছেন — ‘আজ্ঞা, আমাদের থাক।’

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — এঁরা সবই কচ্ছেন, শুধু ওইটেতেই সঙ্কোচ।

“একজনের শ্বশুর ভাসুরের নাম হরি, কৃষ্ণ — এই সব। এখন হরিনাম তো করতে হবে? — কিন্তু হরে কৃষ্ণ, বলবার জো নাই। তাই সে জপ কচ্ছে —

ফরে ফৃষ্ট, ফরে ফৃষ্ট, ফৃষ্ট ফৃষ্ট ফরে ফরে!
ফরে রাম, ফরে রাম, রাম রাম ফরে ফরে!”

অধর জাতিতে সুবর্ণবণিক। তাই ব্রাহ্মণ ভক্তেরা কেহ কেহ প্রথম প্রথম তাঁহার বাটীতে আহার করিতে ইতস্ততঃ করিতেন। কিছুদিন পরে যখন তাঁহারা দেখিলেন, স্বয়ং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ওখানে খান, তখন তাঁহাদের চটকা ভাঙিল।

রাত্রি প্রায় নটা হইল। নরেন্দ্র ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ঠাকুর আনন্দে সেবা করিলেন।

এইবার বৈঠকখানায় আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন — দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিবার উদ্যোগ হইতেছে।

আগামীকল্য রবিবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের আনন্দের জন্য মুখুজ্জে ভ্রাতৃদ্বয় কীর্তনের আয়োজন করিয়াছেন। শ্যামদাস কীর্তনিয়া গান গাইবেন। শ্যামদাসের কাছে রাম নিজের বাটীতে কীর্তন শিখেন।

ঠাকুর নরেন্দ্রকে কাল দক্ষিণেশ্বরে যাইতে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) — কাল যাবি — কেমন?

নরেন্দ্র — আচ্ছা, চেষ্টা করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সেখানে নাইবি খাবি।

“ইনিও (মাস্টার) না হয় গিয়ে খাবেন। (মাস্টারের প্রতি) — তোমার অসুখ এখন সেরেছে? — এখন পত্তি (পথ্য) তো নয়?”

মাস্টার — আজ্ঞা না — আমিও খাব।

নিত্যগোপাল বৃন্দাবনে আছেন। চুনিলাল কয়েকদিন হইল বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহার কাছে নিত্যগোপালের সংবাদ লইতেছেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিবেন। মাস্টার ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম মস্তকের দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর সস্নেহে তাঁহাকে বলিতেছেন, 'তবে যেও।'

(নরেন্দ্রাদির প্রতি, সস্নেহে) — 'নরেন্দ্র ভবনাথ যেও।'

নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রনাম করিলেন। তাঁহার অপূর্ব কীর্তনানন্দ ও কীর্তনমধ্যে ভক্তসঙ্গে অপূর্ব নৃত্য স্মরণ করিতে করিতে সকলে নিজ নিজ গৃহে ফিরিতেছেন।

আজ ভাদ্র কৃষ্ণাপ্রতিপদ। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী — যেন হাসিতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, ভবনাথ, হাজরা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বরাভিমুখে যাইতেছেন।
পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c28 ২৮ শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৭ই সেপ্টেম্বর 1884/09/07/i

28.1 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে রাম, বাবুরাম, মাস্টার, চুনি, অধর, ভবনাথ, নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

[শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত — ঘোষপাড়া ও কর্তাভজাদের মত]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে সেই ঘরে নিজের আসনে ছোট খাটটিতে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা এগারটা হইবে, এখনও তাঁহার সেবা হয় নাই।

গতকল্য শনিবার ঠাকুর শ্রীযুক্ত অধর সেনের বাটীতে ভক্তসঙ্গে শুভাগমন করিয়াছিলেন। হরিনাম-কীর্তন মহোৎসব করিয়া সকলকে ধন্য করিয়াছিলেন। আজ এখানে শ্যামদাসের কীর্তন হইবে। ঠাকুরের কীর্তনানন্দ দেখিবার জন্য অনেক ভক্তের সমাগম হইতেছে।

প্রথমে বাবুরাম, মাস্টার, শ্রীরামপুরের ব্রাহ্মণ, মনোমোহন, ভবনাথ, কিশোরী। তৎপরে চুনিলাল, হরিপদ প্রভৃতি; ক্রমে মুখুজ্জে ভ্রাতৃদ্বয়, রাম, সুরেন্দ্র, তারক, অধর, নিরঞ্জন। লাটু, হরিশ ও হাজরা আজকাল দক্ষিণেশ্বরেই থাকেন। শ্রীযুক্ত

রাম চক্রবর্তী বিষ্ণুঘরে সেবা করেন। তিনিও মাঝে মাঝে আসিয়া ঠাকুরের তত্ত্বাবধান করেন। লাটু, হরিশ ঠাকুরের সেবা করেন। আজ রবিবার, ভাদ্র কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথি, ২৩শে ভাদ্র, ১২৯১। ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪।

মাস্টার আসিয়া প্রণাম করিলে পর ঠাকুর বলিতেছেন, “কই নরেন্দ্র এলো না?”

নরেন্দ্র সেদিন আসিতে পারেন নাই। শ্রীরামপুরের ব্রাহ্মণটি রামপ্রসাদের গানের বই আনিয়াছেন ও সেই পুস্তক হইতে মাঝে মাঝে গান পড়িয়া ঠাকুরকে শুনাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মণের প্রতি) — কই পড় না?

ব্রাহ্মণ — বসন পরো, মা বসন পরো, মা বসন পরো।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ও-সব রাখো, আকাট বিকাট! এমন পড় যাতে ভক্তি হয়।

ব্রাহ্মণ — কে জানে কালী কেমন ষড়্‌দর্শনে না পায় দর্শন।

[ঠাকুরের ‘দরদী’ — পরমহংস, বাউল ও সাঁই]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — কাল অধর সেনের ভাবাবস্থায় একপাশে থেকে পায়ে ব্যথা হয়েছিল। তাই তো বাবুরামকে নিয়ে যাই। দরদী!

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতেছেন:

মনের কথা কইবো কি সই কইতে মানা। দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না ।।

মনের মানুষ হয় যে-জনা, নয়নে তার যায় গো চেনা,
সে দু-এক জনা; সে যে রসে ভাসে প্রেমে ডোবে,
কচ্ছে রসের বেচাকেনা। (ভাবের মানুষ)
মনের মানুষ মিলবে কোথা, বগলে তার ছেঁড়া কাঁথা;
ও সে কয় না গো কথা; ভাবের মানুষ উজান পথে, করে আনাগোনা।
(মনের মানুষ, উজান পথে করে আনাগোনা)।

"বাউলের এই সব গান। আবার আছে —

দরবেশে দাঁড়ারে, সাধের করোয়া ধারী,
দাঁড়ারে, তোর রূপ নেহারি!

"শাক্তমতের সিদ্ধকে বলে কৌল। বেদান্তমতে বলে পরমহংস। বাউল বৈষ্ণবদের মতে বলে সাঁই। 'সাঁইয়ের পর আর নাই!'

"বাউল সিদ্ধ হলে সাঁই হয়। তখন সব অভেদ। অর্ধেক মালা গোহাড়, অর্ধেক মালা তুলসীর। 'হিন্দুর নীর — মুসলমানের পীর'।"

[আলেখ, হাওয়ার খপর, পইঠে, রসের কাজ, খোলা নামা]

"সাঁইয়েরা বলে — আলেখ! আলেখ! বেদমতে বলে ব্রহ্ম; ওরা বলে আলেখ। জীবদের বলে — 'আলেখে আসে আলেখে যায়'; অর্থাৎ জীবাত্মা অব্যক্ত থেকে এসে তাইতে লয় হয়!

"তারা বলে, হাওয়ার খবর জান?

“অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ হলে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না —— এদের ভিতর দিয়ে যে মহাবায়ু উঠে, তাহার খবর!

“জিজ্ঞাসা করে, কোন্ পইঠেতে আছ? — ছটা পইঠে —— ষট্‌চক্র।

“যদি বলে পঞ্চমে আছে, তার মানে যে, বিশুদ্ধ চক্রে মন উঠেছে।

(মাস্টারের প্রতি) — “তখন নিরাকার দর্শন। যেমন গানে আছে।”

এই বলিয়া ঠাকুর একটু সুর করিয়া বলিতেছেন —— ‘তদূর্ধ্বেতে আছে মাগো অম্বুজে আকাশ। সে আকাশ রুদ্ধ হলে সকলি আকাশ।’

[পূর্বকথা —— বাউল ও ঘোষপাড়ার কর্তাভজাদের আগমন]

“একজন বাউল এসেছিল। তা আমি বললাম, ‘তোমার রসের কাজ সব হয়ে গেছে? — খোলা নেমেছে?’ যত রস জ্বাল দেবে, তত রেফাইন (refine) হবে। প্রথম, আকের রস —— তারপর গুড় —— তারপর দোলো —— তারপর চিনি —— তারপর মিছরি, ওলা এই সব। ক্রমে ক্রমে আরও রেফাইন হচ্ছে।

“খোলা নামবে কখন? অর্থাৎ সাধন শেষ হবে কবে? — যখন ইন্দ্রিয় জয় হবে —— যেমন জোঁকের উপর চুন দিলে জোঁক আপনি খুলে পড়ে যাবে —— ইন্দ্রিয় তেমনি শিথিল হয়ে যাবে। রমনীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ।

“ওরা অনেকে রাধাতন্ত্রের মতে চলে। পঞ্চতত্ত্ব নিয়ে সাধন করে পৃথিবীতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব, — মল, মূত্র, রজ, বীজ —— এই সব তত্ত্ব! এ-সব সাধন বড় নোংরা সাধন; যেমন পায়খানার ভিতর দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢোকা!

“একদিন আমি দালানে খাচ্ছি। একজন ঘোষপাড়ার মতের লোক এলো। এসে বলছে, ‘তুমি খাচ্ছ, না কারুকে খাওয়াচ্ছ?’ অর্থাৎ যে সিদ্ধ হয় সে দেখে যে, অন্তরে ভগবান আছেন!

“যারা এ মতে সিদ্ধ হয়, তারা অন্য মতের লোকদের বলে ‘জীব’। বিজাতীয় লোক থাকলে কথা কবে না। বলে, এখানে ‘জীব’ আছে।

[পূর্বকথা —— জন্মভূমি দর্শন; সরী পাথরের বাড়ি হৃদুসঙ্গে]

“ও-দেশে এই মতের লোক একজন দেখেছি। সরী (সরস্বতী) পাথর —— মেয়েমানুষ। এ মতের লোকে পরস্পরের বাড়িতে খায়, কিন্তু অন্য মতের লোকের বাড়ি খাবে না। মল্লিকরা সরী পাথরের বাড়িতে গিয়ে খেলে তবু হৃদের বাড়িতে খেলে না। বলে ওরা ‘জীব’। (হাস্য)

“আমি একদিন তার বাড়িতে হৃদের সঙ্গে বেড়াতে গিছলাম। বেশ তুলসী বন করেছে। কড়াই মুড়ি দিলে, দুটি খেলুম। হৃদে অনেক খেয়ে ফেললে, — তারপর অসুখ!

“ওরা সিদ্ধাবস্থাকে বলে সহজ অবস্থা। একথাকের লোক আছে, তারা ‘সহজ’ ‘সহজ’ করে চ্যাঁচায়। সহজাবস্থার দুটি লক্ষণ বলে। প্রথম — কৃষ্ণগন্ধ গায়ে থাকবে না। দ্বিতীয় — পদ্মের উপর অলি বসবে, কিন্তু মধু পান করবে না। ‘কৃষ্ণগন্ধ’ নাই, — এর মানে ঈশ্বরের ভাব সমস্ত অন্তরে, — বাহিরে কোন চিহ্ন নাই, — হরিনাম পর্যন্ত মুখে নাই। আর একটির মানে, কামিনীতে আসক্তি নাই — জিতেন্দ্রিয়।

“ওরা ঠাকুরপূজা, প্রতিমাপূজা — এ-সব লাইক করে না, জীবন্ত মানুষ চায়। তাই তো ওদের একথাকের লোককে বলে কর্তাভজা, অর্থাৎ যারা কর্তাকে — গুরুকে — ঈশ্বরবোধে ভজনা করে — পূজা করে।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৭ই সেপ্টেম্বর 1884/09/07/ii

28.2 শ্রীরামকৃষ্ণ ও সর্বধর্ম-সমন্বয়

[Why all scriptures — all Religions — are true]

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখছো কত রকম মত! মত, পথ। অনন্ত মত অনন্ত পথ!

ভবনাথ — এখন উপায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ — একটা জোর করে ধরতে হয়। ছাদে গেলে পাকা সিঁড়িতে উঠা যায়, একখানা মইয়ে উঠা যায়, দড়ির সিঁড়িতে উঠা যায়; একগাছা দড়ি দিয়ে, একগাছা বাঁশ দিয়ে উঠা যায়। কিন্তু এতে খানিকটা পা, ওতে খানিকটা পা দিলে হয় না। একটা দৃঢ় করে ধরতে হয়। ঈশ্বরলাভ করতে হলে, একটা পথ জোর করে ধরে যেতে হয়।

"আর সব মতকে এক-একটি পথ বলে জানবে। আমার ঠিক পথ, আর সকলের মিথ্যা — এরূপ বোধ না হয়। বিদ্বেষভাব না হয়।"

["আমি কোন্ পথের?" কেশব, শশধর ও বিজয়ের মত]

"আচ্ছা, আমি কোন্ পথের? কেশব সেন বলত, আপনি আমাদেরই মতের, — নিরাকারে আসছেন। শশধর বলে, ইনি আমাদের। বিজয়ও (গোস্বামী) বলে, ইনি আমাদের মতের লোক।"

ঠাকুর কি বলিতেছেন যে, আমি সব পথ দিয়াই ভগবানের নিকট পৌঁছিয়াছি — তাই সব পথের খবর জানি? আর সকল ধর্মের লোক আমার কাছে এসে শান্তি পাবে?

ঠাকুর পঞ্চবটীর দিকে মাস্টার প্রভৃতি দু-একটি ভক্তের সঙ্গে যাইতেছেন — মুখ ধুইবেন। বেলা বারটা, এইবার বান আসিবে। তাই শুনিয়া ঠাকুর পঞ্চবটীর পথে একটু অপেক্ষা করিতেছেন।

[ভাব মহাভাবের গূঢ় তত্ত্ব — গঙ্গার জোয়ার-ভাটা দর্শন]

ভক্তদের বলিতেছেন — “জোয়ার-ভাটা কি আশ্চর্য!

“কিন্তু একটি দেখো, — সমুদ্রের কাছে নদীর ভিতর জোয়ার-ভাটা খেলে। সমুদ্র থেকে অনেক দূর হলে একটানা হয়ে যায়। এর মানে কি? — ওই ভাবটা আরোপ কর। যারা ঈশ্বরের খুব কাছে, তাদের ভিতরই ভক্তি, ভাব — এই সব হয়; আবার দু-একজনের (ঈশ্বরকোটির) মহাভাব, প্রেম — এ-সব হয়।

(মাস্টারের প্রতি) — “আচ্ছা, জোয়ার-ভাটা কেন হয়?”

মাস্টার — ইংরেজী জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলে যে, সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে ওইরূপ হয়।

এই বলিয়া মাস্টার মাটিতে অঙ্ক পাতিয়া পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্যের গতি দেখাইতেছেন। ঠাকুর একটু দেখিয়াই বলিতেছেন, “থাক, ওতে আমার মাথা ঝনঝন করে!”

কথা কহিতে কহিতে বান ডাকিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে জলোচ্ছ্বাস — শব্দ হইতে লাগিল। ঠাকুরবাড়ির তীরভূমি আঘাত করিতে করিতে উত্তর দিকে বান চলিয়া গেল।

ঠাকুর একদৃষ্টে দেখিতেছেন। দূরের নৌকা দেখিয়া বালকের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন — দেখো, দেখো, ওই নৌকাখানি বা কি হয়!

ঠাকুর পঞ্চবটীমূলে মাস্টারের সহিত কথা কহিতে কহিতে আসিয়া পড়িয়াছেন। একটি ছাতা সঙ্গে, সেইটি পঞ্চবটীর চাতালে রাখিয়া দিলেন। নারাণকে সাক্ষাৎ নারায়ণের মতো দেখেন, তাই বড় ভালবাসেন। নারাণ ইস্কুলে পড়ে, এবার তাহারই কথা কহিতেছেন।

[মাস্টারের শিক্ষা, টাকার সদ্ব্যবহার — নারাণের জন্য চিন্তা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — নারাণের কেমন স্বভাব দেখেছ? সকলের সঙ্গে মিশতে পারে — ছেলে-বুড়ো সকলের সঙ্গে! এটি বিশেষ শক্তি না হলে হয় না। আর সব্বাই তাকে ভালবাসে। আচ্ছা, সে ঠিক সরল কি?

মাস্টার — আজ্ঞা, খুব সরল বলে বোধ হয়

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমার ওখানে নাকি যায়?

মাস্টার — আজ্ঞা, দু-একবার গিছল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — একটি টাকা তুমি তাকে দেবে? না কালীকে বলব?

মাস্টার — আজ্ঞা, বেশ তো, আমি দিব।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বেশ তো — ঈশ্বরে যাদের অনুরাগ আছে, তাদের দেওয়া ভাল। টাকার সদ্ব্যবহার হয়। সব সংসারে দিলে কি হবে?

কিশোরীর ছেলেপুলে হয়েছে। কম মাহিনা — চলে না। ঠাকুর মাস্টারকে বলিতেছেন, “নারাণ বলেছিল, কিশোরীর একটা কর্ম করে দেব। নারাণকে একবার মনে করে দিও না।”

মাস্টার পঞ্চবটীতে দাঁড়াইয়া। ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ পরে ঝাউতলা হইতে ফিরিলেন। মাস্টারকে বলিতেছেন, “বাহিরে একটা মাদুর পাতে বল তো। আমি একটু পরে যাচ্ছি — একটু শোব।”

ঠাকুর ঘরে পৌঁছিয়া বলিতেছেন, “তোমাদের কারুরই ছাতাটা আনতে মনে নাই। (সকলের হাস্য) ব্যস্তবাগীশ লোক নিজের কাছের জিনিসও দেখতে পায় না! একজন আর-একটি লোকের বাড়িতে টিকে ধরাতে গিছল, কিন্তু হাতে লণ্ঠন জ্বলছে!

“একজন গামছা খুঁজে খুঁজে তারপর দেখে, কাঁধেতেই রয়েছে!”

[ঠাকুরের মধ্যাহ্ন-সেবা ও বাবুরামাদি সাঙ্গোপাঙ্গ]

ঠাকুরের জন্য মা-কালীর অন্নপ্রসাদ আনা হইল। ঠাকুর সেবা করিবেন। বেলা প্রায় একটা। আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিবেন। ভক্তরা তবুও ঘরে সব বসিয়া আছেন। বুঝাইয়া বলার পর বাহিরে গিয়া বসিলেন। হরিশ, নিরঞ্জন, হরিপদ রান্না-বাড়ি গিয়া প্রসাদ পাইবেন। ঠাকুর হরিশকে বলিতেছেন, তোদের জন্য আমসত্ত্ব নিয়ে যাস।

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। বাবুরামকে বলিতেছেন, বাবুরাম, কাছে একটু আয় না? বাবুরাম বলিলেন, আমি পান সাজছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন — রেখে দে পান সাজা।

ঠাকুর বিশ্রাম করিতেছেন। এদিকে বকুলতলায় ও পঞ্চবটীতলায় কয়েকটি ভক্ত বসিয়া আছেন, — মুখুজ্জেরা, চুনিলাল, হরিপদ, ভবনাথ, তারক। তারক শ্রীবৃন্দাবন হইতে সবে ফিরিয়াছেন। ভক্তরা তাঁর কাছে বৃন্দাবনের গল্প শুনিতেছেন। তারক নিত্যগোপালের সহিত বৃন্দাবনে এতদিন ছিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৭ই সেপ্টেম্বর 1884/09/07/iii

28.3 ভক্তসঙ্গে সংকীর্তনানন্দে — ভক্তসঙ্গে নৃত্য

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। সম্প্রদায় লইয়া শ্যামদাস মাথুর কীর্তন গাইতেছেন:

“নাথ দরশসুখে ইত্যাদি —

“সুখময় সায়র, মরুভূমি ভেল। জলদ নেহারই, চাতকী মরি গেল।”

শ্রীমতীর এই বিরহদশা বর্ণনা শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। তিনি ছোট খাটটির উপর নিজের আসনে, বাবুরাম, নিরঞ্জন, রাম, মনোমোহন, মাস্টার, সুরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তরা মেঝেতে বসিয়া আছেন। কিন্তু গান ভাল জমিতেছে না।

কোন্নগরের নবাই চৈতন্যকে ঠাকুর কীর্তন করিতে বলিলেন। নবাই মনোমোহনের পিতৃব্য। পেনশন লইয়া কোন্নগরে গঙ্গাতীরে ভজন-সাধন করেন। ঠাকুরকে প্রায় দর্শন করিতে আসেন।

নবাই উচ্চ সংকীর্তন করিতেছেন। ঠাকুর আসন ত্যাগ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অমনি নবাই ও ভক্তেরা তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নৃত্য ও কীর্তন করিতে লাগিলেন। কীর্তন বেশ জমিয়া গেল। মহিমাচরণ পর্যন্ত ঠাকুরের সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন।

কীর্তনান্তে ঠাকুর নিজের আসনে উপবেশন করিলেন। হরিনামের পর এবার আনন্দময়ী মায়ের নাম করিতেছেন। ঠাকুর ভাবে মত্ত হইয়া মার নাম করিতেছেন। নাম করিবার সময় ঊর্ধ্বদৃষ্টি।

গান - গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ করো না।

গান - ভাবিলে ভাবের উদয় হয়!
যেমন ভাব, তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়।
যে-জন কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময় ।।

কালীপদ সুদাহ্রদে চিত্ত যদি রয়।

পূজা হোম জপ বলি কিছুই কিছু নয় ।।

গান - তোদের খ্যাপার হাট বাজার মা (তারা)।

কব গুণের কথা কার মা তোদের ।।

গজ বিনে গো আরোহণে ফিরিস কদাচার।

মণি-মুক্তা ফেলে পরিস গলে নরশির হার ।।

শ্মশানে-মশানে ফিরিস কার বা ধারিস ধার।

রামপ্রসাদকে ভবঘোরে করতে হবে পার ।।

গান - গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।

কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায় ।।

গান - আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও নাকো কারু ঘরে।

যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে ।।

গান - মজলো আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।

গান - যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণি শ্যামা মাকে।

মন তুই দেখ, আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে ।।

ঠাকুর এই গানটি গাইতে গাইতে দণ্ডায়মান হইলেন। মার প্রেমে উন্মত্তপ্রায়! ‘আদরিণী শ্যামা মাকে হৃদয়ে রেখো।’ —— এ-কথাটি যেন ভক্তদের বারবার বলিতেছেন।

ঠাকুর এইবার যেন সুরাপানে মত্ত হইয়াছেন। নাচিতে নাচিতে আবার গান গাহিতেছেন:

মা কি আমার কালো রে।

কালোরূপ দিগম্বরী, হৃদিপদ্ম করে আলো রে!

ঠাকুর গাইতে গাইতে বড় টলিতেছেন দেখিয়া নিরঞ্জন তাঁহাকে ধারণ করিতে গেলেন। ঠাকুর মৃদুস্বরে "য়্যাই! শালা ছুঁসনে" বলিয়া বারণ করিতেছেন। ঠাকুর নাচিতেছেন দেখিয়া ভক্তেরা দাঁড়াইলেন। ঠাকুর মাস্টারের হস্ত ধারণ করিয়া বলিতেছেন, "য়্যাই শালা নাচ।"

[বেদান্তবাদী মহিমার প্রভুসঙ্গে সংকীর্তনে নৃত্য ও ঠাকুরের আনন্দ]

ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়া আছেন। ভাবে গরগর মাতোয়ারা!

ভাব কিঞ্চিৎ উপশম হইলে বলিতেছেন — ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ কালী। আবার বলিতেছেন, তামাক খাব। ভক্তেরা অনেকে দাঁড়াইয়া আছেন। মহিমাচরণ দাঁড়াইয়া ঠাকুরকে পাখা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) — আপনারা বোসো।

"আপনি বেদ থেকে একটু কিছু শুনাও।

মহিমাচরণ আবৃত্তি করিতেছেন — 'জয় জজ্ঝমান' ইত্যাদি।

আবার মহানির্বাণতন্ত্র হিতে স্তব আবৃত্তি করিতেছেন —

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়, নমস্তে চিতে সর্বলোকাশ্রয়ায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়, নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায় ।।
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং, ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশম্।
ত্বমেকং জগৎকর্তৃপাতৃপ্রহর্তৃ, ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্বিকল্পম্ ।।
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং, গতিঃ প্রাণিনাং পাবণং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃপদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং, পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাম্ ।।
বয়ন্ত্বাং সমরামো বয়ন্ত্বান্‌ভজামো, বয়ন্ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং, ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ।।

ঠাকুর হাতজোড় করিয়া স্তব শুনিলেন। পাঠান্তে ভক্তিভরে নমস্কার করিলেন। ভক্তেরাও নমস্কার করিলেন।

অধর কলিকাতা হইতে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — আজ খুব আনন্দ হল! মহিম চক্রবর্তী এদিকে আসছে। হরিনামে আনন্দ কেমন দেখলে! না?

মাস্টার — আজ্ঞা, হাঁ।

মহিমাচরণ জ্ঞানচর্চা করেন। তিনি আজ হরিনাম করেছেন, আর কীর্তনসময়ে নৃত্য করিয়াছেন — তাই ঠাকুর আহ্লাদ করিতেছেন।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। ভক্তেরা অনেকেই ক্রমে ক্রমে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৭ই সেপ্টেম্বর 1884/09/07/iv

28.4 প্রবৃত্তি না নিবৃত্তি — অধরের কর্ম — বিষয়ীর উপাসনা ও চাকরি

সন্ধ্যা হইল। ফরাশ দক্ষিণের লম্বা বারান্দায় ও পশ্চিমের গোল বারান্দায় আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। ঠাকুরের ঘরে প্রদীপ জ্বালা হইল ও ধুনা দেওয়া হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে চাঁদ উঠিলেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণ, উদ্যানপথ, গঙ্গাতীর, পঞ্চবটী, বৃক্ষশীর্ষ, জ্যোৎস্নায় হাসিতে লাগিল।

ঠাকুর নিজাসনে বসিয়া আবিষ্ট হইয়া মার নাম ও চিন্তা করিতেছেন।

অধর আসিয়া বসিয়াছেন। ঘরে মাস্টার ও নিরঞ্জনও আছেন। ঠাকুর অধরের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি গো তুমি এখন এলে! কত কীর্তন নাচ হয়ে গেল। শ্যামদাসের কীর্তন — রামের ওস্তাদ। কিন্তু আমার তত ভাল লাগল না, উঠতে ইচ্ছা হল না। ও লোকটার কথা তারপর শুনলাম। গোপীদাসের বদলী বলেছে

— আমার মাথায় যত চুল তত উপপত্নী করেছে। (সকলের হাস্য) তোমার কর্ম হল না?

অধর ডেপুটি, তিন শত টাকা বেতন পান। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান-এর কর্মের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন — মাহিনা হাজার টাকা। কর্মের জন্য অধর কলিকাতার অনেক বড় বড় লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

[নিবৃত্তিই ভাল — চাকরির জন্য হীনবুদ্ধি বিষয়ীর উপাসনা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টার ও নিরঞ্জনের প্রতি) — হাজরা বলেছিল — অধরের কর্ম হবে, তুমি একটু মাকে বল। অধরও বলেছিল। আমি মাকে একটু বলেছিলাম — 'মা, এ তোমার কাছে আনাগোনা কচ্ছে, যদি হয় তো হোক না।' কিন্তু সেই সঙ্গে মাকে বলেছিলাম — 'মা, কি হীনবুদ্ধি! জ্ঞান, ভক্তি না চেয়ে তোমার কাছে এই সব চাচ্ছে!'

(অধরের প্রতি) — "কেন হীনবুদ্ধি লোকগুনোর কাছে অত আনাগোনা করলে? এত দেখলে শুনলে! — সাতকাণ্ড রামায়ণ, সীতা কার ভার্যে! অমুক মল্লিক হীনবুদ্ধি। আমার মাহেশে যাবার কথায় চলতি নৌকা বন্দোবস্ত করেছিল, — আর বাড়িতে গেলেই হৃদুকে বলত — হৃদু, গাড়ি রেখেছ?"

অধর — সংসার করতে গেলে এ-সব না করলে চলে না। আপনি তো বারণ করেন নাই?

[উন্মাদের পর মাহিনা সই করণার্থ খাজাঞ্চীর আহ্বান-কথা]

শ্রীরামকৃষ্ণ — নিবৃত্তিই ভাল — প্রবৃত্তি ভাল নয়। এই অবস্থার পর আমার মাইনে সই করাতে ডেকেছিল — যেমন সবাই খাজাঞ্চীর কাছে সই করে। আমি বললাম — তা আমি পারব না। আমি তো চাচ্ছি না। তোমাদের ইচ্ছা হয় আর কারুকে দাও।

“এক ঈশ্বরের দাস। আবার কার দাস হব?

“ — মল্লিক, আমার খেতে বেলা হয় বলে, রাঁধবার বামুন ঠিক করে দিছল। একমাস একটাকা দিছল। তখন লজ্জা হল। ডেকে পাঠালেই ছুটতে হত। — আপনি যাই, সে এক।

“হীনবুদ্ধি লোকের উপাসনা। সংসারে এই সব — আরও কত কি?”

[পূর্বকথা — উন্মাদের পর ঠাকুরের প্রার্থনা — সন্তোষ — Contentment]

“এই অবস্থা যাই হলো, রকম-সকম দেখে অমনি মাকে বললাম — মা, ওইখানেই মোড় ফিরিয়ে দাও! — সুধামুখীর রান্না — আর না, আর না — খেয়ে পায় কান্না!” (সকলের হাস্য)

[বাল্য — কামারপুকুরে ঈশ্বর ঘোষাল ডিপুটি দর্শন কথা]

“যার কর্ম কচ্ছ, তারই করো। লোকে পঞ্চাশ টাকা একশ টাকা মাইনের জন্য লালায়িত! তুমি তিনশ টাকা পাচ্ছ। ও-দেশে ডিপুটি আমি দেখেছিলাম। ঈশ্বর

ঘোষাল। মাথায় তাজ — সব হাড়ে কাঁপে! ছেলেবেলায় দেখেছিলাম। ডিপুটি কি কম গা!

“যার কর্ম কচ্ছ, তারই করো। একজনের চাকরি কল্লেই মন খারাপ হয়ে যায়, আবার পাঁচজনের।”

[চাকরির নিন্দা, শম্ভু ও মথুরের আদর — নরেন্দ্র হেডমাস্টার]

“একজন স্ত্রীলোক একজন মুছলমানের উপর আসক্ত হয়ে, তার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ডেকেছিল। মুছলমানটি সাধুলোক ছিল, সে বললে — আমি প্রস্রাব করব, আমার বদনা আনতে যাই। স্ত্রীলোকটি বললে — তা এইখানেই হবে, আমি বদনা দিব এখন। সে বললে — তা হবে না। আমি যে বদনার কাছে একবার লজ্জা ত্যাগ করেছি, সেই বদনাই ব্যবহার করব, — আবার নূতন বদনার কাছে নির্লজ্জ হব না। এই বলে সে চলে গেল। মাগীটারও আক্কেল হল। সে বদনার মানে বুঝলে উপপতি।”

নরেন্দ্র পিতৃবিয়োগের পর বড়ই কষ্টে পড়িয়াছেন। মা ও ভাইদের ভরণপোষণের জন্য তিনি কাজকর্ম খুঁজিতেছেন। বিদ্যাসাগরের বউবাজার স্কুলে দিন কতক হেডমাস্টারের কর্ম করিয়াছিলেন।

অধর — আচ্ছা, নরেন্দ্র কর্ম করবে কি না?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ — সে করবে। মা ও ভাইরা আছে।

অধর — আচ্ছা, নরেন্দ্রের পঞ্চাশ টাকায়ও চলে, একশ টাকায়ও চলে। নরেন্দ্র একশ টাকার জন্য চেষ্টা করবে কি না?

শ্রীরামকৃষ্ণ — বিষয়ীরা ধনের আদর করে, মনে করে, এমন জিনিস আর হবে না।

শম্ভু বললে — ‘এই সমস্ত বিষয় তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে যাব, এইটি ইচ্ছা’ তিনি কি বিষয় চান? তিনি চান ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য।

“গয়না চুরির সময় সেজোবাবু বললে — ‘ও ঠাকুর! তুমি গয়না রক্ষা করতে পারলে না? হংসেশ্বরী কেমন রক্ষা করেছিল!”

[সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম — মথুরের তালুক লিখে দিবার পরামর্শ]

“একখানা তালুক আমার নামে লিখে দেবে (সেজোবাবু) বলেছিল। আমি কালীঘর থেকে শুনলাম। সেজোবাবু আর হৃদে একসঙ্গে পরামর্শ কচ্ছিল। আমি এসে সেজোবাবুকে বললাম, — দেখো, অমন বুদ্ধি করো না! — এতে আমার ভারী হানি হবে!”

অধর — যা বলেছেন, সৃষ্টির পর থেকে ছটি-সাতটি হদ্দ ওরূপ হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেন, ত্যাগী আছে বইকি? ঐশ্বর্য ত্যাগ করলেই লোকে জানতে পারে। এমনি আছে — লোকে জানে না। পশ্চিমে নাই?

অধর — কলকাতার মধ্যে একটি জানি — দেবেন্দ্র ঠাকুর।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি বল! ও যা ভোগ করেছে, অমন কে করেছে! — যখন সেজোবাবু সঙ্গে ওর বাড়িতে গেলাম, দেখলাম, ছোট ছোট ছেলে অনেক — ডাক্তার এসেছে, ঔষধ লিখে দিচ্ছে। যার আট ছেলে আবার মেয়ে, সে ঈশ্বরচিন্তা করবে না তো কে করবে, এত ঐশ্বর্য ভোগ করার পর যদি ঈশ্বরচিন্তা না করত, লোকে বলত ধিক্!

নিরঞ্জন — দ্বারকানাথ ঠাকুরের ধার উনি সব শোধ করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — রেখে দে ও-সব কথা! আর জ্বালাস নে! ক্ষমতা থেকেও যে বাপের ধার শোধ করে না, সে কি আর মানুষ?

“তবে সংসারীরা একেবারে ডুবে থাকে, তাদের তুলনায় খুব ভাল — তাদের শিক্ষা হবে।

“ঠিক ঠিক ত্যাগীভক্ত আর সংসারীভক্ত অনেক তফাত। ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী — ঠিক ঠিক ত্যাগীভক্ত — মৌমাছির মতো। মৌমাছি ফুল বই আর কিছুতে বসবে না। মধুপান বই আর কিছু পান করবে না। সংসারীভক্ত অন্য মাছির মতো, সন্দেশেও বসছে, আবার পচা ঘায়েও বসছে। বেশ ঈশ্বরের ভাবেতে রয়েছে, আবার কামিনী-কাঞ্চন লয়ে মত্ত হয়।

“ঠিক ঠিক ত্যাগীভক্ত চাতকের মতো। চাতক স্বাতী নক্ষত্রের মেঘের জল বই আর কিছু খাবে না! সাত সমুদ্র নদী ভরপুর! সে অন্য জল খাবে না! কামিনী-কাঞ্চন স্পর্শ করবে না! কামিনী-কাঞ্চন কাছে রাখবে না, পাছে আসক্তি হয়।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৭ই সেপ্টেম্বর 1884/09/07/v

28.5 চৈতন্যদেব, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও লোকমান্য

অধর — চৈতন্যও ভোগ করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (চমৎকৃত হইয়া) — কি ভোগ করেছিলেন?

অধর — অত পণ্ডিত! কত মান!

শ্রীরামকৃষ্ণ — অন্যের পক্ষে মান। তাঁর পক্ষে কিছু নয়!

“তুমি আমায় মানো আর নিরঞ্জন মানে, আমার পক্ষে এক — সত্য করে বলছি। একজন টাকাওয়ালা লোক হাতে থাকবে, এ মনে হয় না। মনোমোহন বললে, ‘সুরেন্দ্র বলেছে, রাখাল এঁর কাছে থাকে — নালিশ চলে।’ আমি বললাম, ‘কে রে সুরেন্দ্র? তার সতরঞ্চ আর বালিশ এখানে আছে। আর সে টাকা দেয়’?”

অধর — দশ টাকা করে মাসে বুঝি দেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — দশ টাকায় দু মাস হয়। ভক্তেরা এখানে থাকে — সে ভক্তসেবার জন্য দেয়। সে তার পুণ্য, আমার কি? আমি যে রাখাল, নরেন্দ্র এদের ভালবাসি, সে কি কোন নিজের লাভের জন্য?

মাস্টার — মার ভালবাসার মতো।

শ্রীরামকৃষ্ণ — মা তবু চাকরি করে খাওয়াবে বলে অনেকটা করে। আমি এদের যে ভালবাসি, সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখি! — কথায় নয়।

[ঠিক ঠিক ত্যাগীর ভার ঈশ্বর লন — 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তঃ']

শ্রীরামকৃষ্ণ (অধরের প্রতি) — শোনো! আলো জ্বাললে বাদুলে পোকার অভাব হয় না! তাঁকে লাভ কল্লে তিনি সব জোগাড় করে দেন — কোন অভাব রাখেন না। তিনি হৃদয়মধ্যে এলে সেবা করবার লোক অনেক এসে জোটে।

"একটি ছোকরা সন্ন্যাসী গৃহস্থবাড়ি ভিক্ষা করতে গিছিল। সে আজন্ম সন্ন্যাসী। সংসারের বিষয় কিছু জানে না। গৃহস্থের একটি যুবতী মেয়ে এসে ভিক্ষা দিলে। সন্ন্যাসী বললে, মা এর বুকে কি ফোঁড়া হয়েছে? মেয়েটির মা বললে, না বাবা! ওর পেটে ছেলে হবে বলে ঈশ্বর স্তন করে দিয়েছেন — ওই স্তনের দুধ ছেলে খাবে। সন্ন্যাসী তখন বললে, তবে আর ভাবনা কি? আমি আর কেন ভিক্ষা করব? যিনি আমায় সৃষ্টি করেছেন তিনি আমায় খেতে দেবেন।

"শোনো! যে উপপতির জন্য সব ত্যাগ করে এল, সে বলবে না; শ্যালা, তোর বুকে বসব আর খাব।"

[তোতাপুরীর গল্প — রাজার সাধুসেবা — ১কাশীর দুর্গাবাড়ির নিকট নানকপন্থীর মঠে
ঠাকুরের মোহন্তদর্শন ১৮৬৮ খ্রীঃ]

“ন্যাংটা বললে, কোন রাজা সোনার থালা, সোনার গেলাস দিয়ে সাধুদের খাওয়ালে। কাশীতে মঠে দেখলাম, মোহন্তর কত মান — বড় বড় খোট্টারা হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে, আর বলছে, কি আজ্ঞা!

“ঠিক ঠিক সাধু — ঠিক ঠিক ত্যাগী সোনার থালও চায় না, মানও চায় না। তবে ঈশ্বর তাদের কোন অভাব রাখেন না! তাঁকে পেতে গেলে যা যা দরকার, সব জোগাড় করে দেন। (সকলে নিঃশব্দ)

“আপনি হাকিম — কি বলবো! — যা ভালো বোঝ তাই করো। আমি মূর্খ।

অধর (সহাস্যে, ভক্তদিগকে) — উনি আমাকে এগজামিন কচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — নিবৃত্তিই ভাল। দেখ না আমি সই কল্লাম না। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু!

হাজরা আসিয়া ভক্তদের কাছে মেঝেতে বসিলেন। হাজরা কখন কখন সোঽহং সোঽহম্‌ করেন! লাটু প্রভৃতি ভক্তদের বলেন, তাঁকে পূজা করে কি হয়! — তাঁরই জিনিস তাঁকে দেওয়া। একদিন নরেন্দ্রকেও তিনি ওই কথা বলিয়াছিলেন। ঠাকুর হাজরাকে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি) — লাটুকে বলেছিলাম, কে কারে ভক্তি করে।

হাজরা — ভক্ত আপনি আপনাকেই ডাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এ তো খুব উঁচু কথা। বলি রাজাকে বৃন্দাবলী বলেছিলেন, তুমি ব্রহ্মণ্যদেবকে কি ধন দেবে?

“তুমি যা বলছ, ওইটুকুর জন্যই সাধন-ভজন — তাঁর নামগুণগান।

“আপনার ভিতর আপনাকে দেখতে পেলে তো সব হয়ে গেল! ওইটি দেখতে পাবার জন্যই সাধনা। আর ওই সাধনার জন্যই শরীর। যতক্ষণ না স্বর্ণপ্রতিমা ঢালাই হয়, ততক্ষণ মাটির ছাঁচের দরকার হয়। হয়ে গেলে মাটির ছাঁচটা ফেলে দেওয়া যায়। ঈশ্বরদর্শন হলে শরীরত্যাগ করা যায়।

“তিনি শুধু অন্তরে নয়। অন্তরে বাহিরে! কালীঘরে মা আমাকে দেখালেন সবই চিন্ময়! — মা-ই সব হয়েছেন! — প্রতিমা, আমি, কোশা, চুমকি, চৌকাট, মার্বেল পাথর, — সব চিন্ময়!

“এইটি সাক্ষাৎকার করবার জন্যই তাঁকে ডাকা — সাধন-ভজন — তাঁর নামগুন-কীর্তন। এইটির জন্যই তাঁকে ভক্তি করা। ওরা (লাটু প্রভৃতি) এমনি আছে — এখনও অত উচ্চ অবস্থা হয় নাই। ওরা ভক্তি নিয়ে আছে। আর ওদের (সোঽহম্‌ ইত্যাদি) কিছু বলো না।”

পাখি যেমন শাবকদের পক্ষাচ্ছাদন করিয়া রক্ষা করে, দয়াময় গুরুদেব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই রূপে ভক্তদের রক্ষা করিতেছেন!

অধর ও নিরঞ্জন জলযোগ করিতে বারান্দায় গেলেন। জল খাইয়া ঘরে ফিরিলেন। মাস্টার ঠাকুরের কাছে মেঝেতে বসিয়া আছেন।

[চারটে পাস ব্রাহ্ম ছোকরার কথা — "এঁর সঙ্গে আবার তর্ক-বিচার"]

অধর (সহাস্যে) — আমাদের এত কথা হল, ইনি (মাস্টার) একটিও কথা কন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেশবের দলের একটি চারটে পাস করা ছোকরা (বরদা?), সব্বাই আমার সঙ্গে তর্ক করছে, দেখে — কেবল হাসে। আর বলে, এঁর সঙ্গে আবার তর্ক! কেশব সেনের ওখানে আর-একবার তাকে দেখলাম — কিন্তু তেমন চেহারা নাই।

রাম চক্রবর্তী, বিষ্ণুঘরের পূজারী, ঠাকুরের ঘরে আসিলেন। ঠাকুর বলিতেছেন — "দেখো রাম! তুমি কি দয়ালকে বলেছ মিছরির কথা? না, না, ও আর বলে কাজ নাই। অনেক কথা হয়ে গেছে।

[ঠাকুরের রাত্রের আহার — "সকলের জিনিস খেতে পারি না"]

রাত্রে ঠাকুরের আহার একখানি-দুখানি মা-কালীর প্রসাদী লুচি ও একটু সুজির পায়েস। ঠাকুর মেঝেতে আসনে সেবা করিতে বসিয়াছেন। কাছে মাস্টার বসিয়া আছেন, লাটুও ঘরে আছেন। ভক্তেরা সন্দেশাদি মিষ্টান্ন আনিয়াছিলেন। সন্দেশ একটি স্পর্শ করিয়া ঠাকুর লাটুকে বলিতেছেন — 'এ কোন্ শালার সন্দেশ?' — বলিয়াই সুজির পায়েসের বাটি হইতে নিচে ফেলিয়া দিলেন। (মাস্টার ও

লাটুর প্রতি) ‘ও আমি সব জানি। ওই আনন্দ চাটুজ্যেদের ছোকরা এনেছে — যে ঘোষপাড়ার মাগীর কাছে যায়।’

লাটু — এ গজা দিব?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিশোরী এনেছে।

লাটু — এ আপনার চলবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — হাঁ।

মাস্টার ইংরেজী পড়া লোক। — ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন — “সকলের জিনিস খেতে পারি না! তুমি এ-সব মানো?”

মাস্টার — আজ্ঞা, ক্রমে সব মানতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ

ঠাকুর পশ্চিমদিকের গোল বারান্দাটিতে হাত ধুইতে গেলেন। মাস্টার হাতে জল ঢালিয়া দিতেছেন।

শরৎকাল। চন্দ্র উদয় হওয়াতে নির্মল আকাশ ও ভাগীরথীবক্ষ ঝকমক করিতেছে। ভাটা পড়িয়াছে — ভাগীরথী দক্ষিণবাহিনী। মুখ ধুইতে ধুইতে মাস্টারকে বলিতেছেন, তবে নারাণকে টাকাটি দেবে?

মাস্টার — যে আজ্ঞা, দেব বইকি?

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৪ই সেপ্টেম্বর 1884/09/14/i

28.6 ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

[“জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও” — শশধরের শুষ্ক জ্ঞান]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্ন সেবার পর দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। আজ নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তেরা কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। মুখুজ্জে ভ্রাতৃদ্বয়, জ্ঞানবাবু, ছোট গোপাল, বড় কালী প্রভৃতি এঁরাও আসিয়াছেন। কোন্নগর হইতে তিন-চারিটি ভক্ত আসিয়াছেন। রাখাল শ্রীবৃন্দাবনে বলরামের সহিত আছেন। তাঁহার জ্বর হইয়াছিল — সংবাদ আসিয়াছে। আজ রবিবার, কৃষ্ণা দশমী তিথি, ৩০শে ভাদ্র, ১২৯১। ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪।

নরেন্দ্র পিতৃবিয়োগের পর মা ও ভাইদের লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবেন।

জ্ঞানবাবু চারটে পাস করিয়াছেন ও সরকারের কর্ম করেন। তিনি ১০টা-১১টার সময় আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (জ্ঞানবাবু দৃষ্টে) — কিগো, হঠাৎ যে জ্ঞানোদয়!

জ্ঞান (সহাস্যে) — আজ্ঞা, অনেক ভাগ্যে জ্ঞানোদয় হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তুমি জ্ঞান হয়ে অজ্ঞান কেন? ও বুঝেছি, যেখানে জ্ঞান সেইখানেই অজ্ঞান! বশিষ্ঠদেব অত জ্ঞানী, পুত্রশোকে কেঁদেছিলেন! তাই তুমি জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও। অজ্ঞান কাঁটা পায়ে ফুটেছে, তুলবার জন্য জ্ঞান কাঁটার দরকার। তারপর তোলা হলে দুই কাঁটাই ফেলে দেয়।

[নির্লিপ্ত গৃহস্থ — ঠাকুরের জন্মভূমিতে ছুতোরদের মেয়েদের কাজদর্শন]

"এই সংসার ধোঁকার টাটি — জ্ঞানী বলছে। যিনি জ্ঞান অজ্ঞানের পার, তিনি বলছেন 'মজার কুঠি!' সে দেখে ঈশ্বরই জীব, জগৎ, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সব হয়েছেন।

"তাঁকে লাভ করার পর সংসার করা যেতে পারে। তখন নির্লিপ্ত হতে পারে। ও-দেশে ছুতোরদের মেয়েদের দেখেছি — ঢেঁকি নিয়ে চিড়ে কোটে। একহাতে ধান নাড়ে, একহাতে ছেলেকে মাই দেয় — আবার খরিদ্দারের সঙ্গে কথাও কচ্চে — 'তোমার কাছে দুআনা পাওনা আছে — দাম দিয়ে যেও।' কিন্তু তার বারো আনা মন হাতের উপর — পাছে হাতে ঢেঁকি পড়ে যায়।

"বারো আনা মন ঈশ্বরেতে রেখে চার আনা লয়ে কাজকর্ম করা।"

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধরের কথা ভক্তদের বলিতেছেন, “দেখলাম — একঘেয়ে, কেবল শুষ্ক জ্ঞানবিচার নিয়ে আছে।”

“যে নিত্যতে পোঁছে লীলা নিয়ে থাকে, আবার লীলা থেকে নিত্যে যেতে পারে, তারই পাকা জ্ঞান, পাকা ভক্তি।

“নারদাদি ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তি নিয়ে ছিলেন। এরই নাম বিজ্ঞান।

শুধু শুষ্ক জ্ঞান! ও যেন ভস্‌-করে-ওঠা তুবড়ি। খানিকটা ফুল কেটে ভস্‌ করে ভেঙে যায়। নারদ, শুকদেবাদির জ্ঞান যেন ভাল তুবড়ি। খানিকটা ফুল কেটে বন্ধ হয়, আবার নূতন ফুল কাটছে — আবার বন্ধ হয় — আবার নূতন ফুল কাটে! নারদ, শুকদেবাদির তাঁর উপর প্রেম হয়েছিল। প্রেম সচ্চিদানন্দকে ধরবার দড়ি।”

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বকুলতলায় — ঝাউতলা হতে ভাবাবিষ্ট]

মধ্যাহ্নে সেবার পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন।

বকুলতলায় বেঞ্চের মতো যে বসিবার স্থান আছে, সেখানে দুই-চারিজন ভক্ত উপবিষ্ট আছেন ও গল্প করিতেছেন — ভবনাথ, মুখুজ্জে ভ্রাতৃদ্বয়, মাস্টার, ছোট গোপাল, হাজরা প্রভৃতি। ঠাকুর ঝাউতলায় যাইতেছেন। ওখানে আসিয়া একবার বসিলেন।

হাজরা (ছোট গোপালকে) — এঁকে একটু তামাক খাওয়াও।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তুমি খাবে তাই বল। (সকলের হাস্য)

মুখুজ্জে (হাজরাকে) — আপনি এঁর কাছে থেকে অনেক শিখেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — না, এঁর বাল্যকাল থেকেই এই অবস্থা। (সকলের হাস্য)

ঠাকুর ঝাউতলা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন — ভক্তেরা দেখিলেন। ভাবাবিষ্ট। মাতালের ন্যায় চলিতেছেন। যখন ঘরে পোঁছিলেন, তখন আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৪ই সেপ্টেম্বর 1884/09/14/ii

28.7 নারাণের জন্য ঠাকুরের ভাবনা — কোন্নগরের ভক্তগণ — শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি ও নরেন্দ্রের গান

ঠাকুরের ঘরে অনেক ভক্ত সমাগত হইয়াছেন। কোন্নগরের ভক্তদের মধ্যে একজন সাধক নূতন আসিয়াছেন — বয়ঃক্রম পঞ্চাশের উপর। দেখিলে বোধ হয়, ভিতরে খুব পাণ্ডিত্যাভিমান আছে। কথা কহিতে কহিতে তিনি বলিতেছেন, “সমুদ্র মন্থনের আগে কি চন্দ্র ছিল না? এ-সব মীমাংসা কে করবে?”

মাস্টার (সহাস্যে) — ‘ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন মুণ্ডমালা কোথায় পেলি?’

সাধক (বিরক্ত হইয়া) — ও আলাদা কথা।

ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া ঠাকুর মাস্টারকে হঠাৎ বলিতেছেন, “সে এসেছিল — নারাণ।”

নরেন্দ্র বারান্দায় হাজরা প্রভৃতির সহিত কথা কহিতেছেন — বিচারের শব্দ ঠাকুরের ঘর হইতে শুনা যাইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — খুব বকতে পারে! এখন বাড়ির ভাবনায় বড় পড়েছে।

মাস্টার — আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বিপদকে সম্পদজ্ঞান করবে বলেছিল কিনা। কি?

মাস্টার — আজ্ঞা, মনের বলটা খুব আছে।

বড়কালী — কোন্‌টা কম? [ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়াছেন।]

কোন্নগরের একটি ভক্ত ঠাকুরকে বলিতেছেন — মহাশয়, ইনি (সাধক) আপনাকে দেখতে এসেছেন — এঁর কি কি জিজ্ঞাস্য আছে।

সাধক দেহ ও মস্তক উন্নত করিয়া বসিয়া আছেন।

সাধক — মহাশয়, উপায় কি?

[ঈশ্বরদর্শনের উপায়, গুরুবাক্যে বিশ্বাস — শাস্ত্রের ধারণা কখন]

শ্রীরামকৃষ্ণ — গুরুবাক্যে বিশ্বাস। তাঁর বাক্য ধরে ধরে গেলে ভগবানকে লাভ করা যায়। যেমন সুতোর খি ধরে ধরে গেলে বস্তুলাভ হয়।

সাধক — তাঁকে কি দর্শন করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তিনি বিষয়বুদ্ধির অগোচর। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তির লেশ থাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না। কিন্তু শুদ্ধমন, শুদ্ধবুদ্ধির গোচর — যে মনে, যে বুদ্ধিতে, আসক্তির লেশমাত্র নাই। শুদ্ধমন, শুদ্ধবুদ্ধি, আর শুদ্ধ আত্মা — একই জিনিস।

সাধক — কিন্তু শাস্ত্রে বলছে, 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।' — তিনি বাক্য-মনের অগোচর।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ও থাক্ থাক্। সাধন না করলে শাস্ত্রের মানে বোঝা যায় না। সিদ্ধি সিদ্ধি বললে কি হবে? পণ্ডিতেরা শ্লোক সব ফড়র ফড়র করে বলে। কিন্তু তাতে কি হবে? সিদ্ধি গায় মাখলেও নেশা হয় না, খেতে হয়।

"শুধু বললে কি হবে 'দুধে আছে মাখন', 'দুধে আছে মাখন'? দুধকে দই পেতে মন্থন কর, তবে তো হবে!"

সাধক — মাখন তোলা — ও-সব তো শাস্ত্রের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — শাস্ত্রের কথা বললে বা শুনলে কি হবে? ধারণা করা চাই। পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল। পাঁজি টিপলে একটুও পড়ে না।

সাধক — মাখন তোলা — আপনি তুলেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি কি করেছি আর না করেছি — সে কথা থাক। আর এ-সব কথা বোঝানো বড় শক্ত। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে — ঘি কিরকম খেতে। তার উত্তর — কেমন ঘি, না যেমন ঘি!

"এ-সব জানতে গেলে সাধুসঙ্গ দরকার। কোন্‌টা কফের নাড়ী, কোন্‌টা পিত্তের নাড়ী, কোন্‌টা বায়ুর নাড়ী — এটা জানতে গেলে বৈদ্যের সঙ্গে থাকা দরকার।"

সাধক — কেউ কেউ অন্যের সঙ্গে থাকতে বিরক্ত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সে জ্ঞানের পর — ভগবানলাভের পর — আগে সাধুসঙ্গ চাই না?

সাধক চুপ করিয়া আছেন।

সাধক (কিয়ৎক্ষণ পরে, গরম হইয়া) — আপনি তাঁকে যদি জানতে পেরেছেন বলুন — প্রত্যক্ষেই হোক আর অনুভবেই হোক। ইচ্ছা হয় পারেন বলুন, না হয় না বলুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈষৎ হাসিতে হাসিতে) — কি বলবো! কেবল আভাস বলা যায়।

সাধক — তাই বলুন।

নরেন্দ্র গান গাহিবেন। নরেন্দ্র বলিতেছেন, পাখোয়াজটা আনলে না।

ছোট গোপাল — মহিম (মহিমাচরণ) বাবুর আছে —

শ্রীরামকৃষ্ণ — না, ওর জিনিস এনে কাজ নাই।

আগে কোন্নগরের একটি ভক্ত কালোয়াতি গান গাহিতেছেন।

গানের সময় ঠাকুর সাধকের অবস্থা এক-একবার দেখিতেছেন। গায়ক নরেন্দ্রের সহিত গানবাজনা সম্বন্ধে ঘোরতর তর্ক করিতেছেন।

সাধক গায়ককে বলছেন, তুমিও তো বাপু কম নও। এ-সব তর্কে কি দরকার!

আর-একজন তর্কে যোগ দিয়াছিলেন — ঠাকুর সাধককে বলিতেছেন, “আপনি এঁকে কিছু বকলেন না?”

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন্নগরের ভক্তদের বলছেন, “কই আপনাদের সঙ্গেও এর ভাল বনে না দেখছি।”

নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন:

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে,
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে।

সাধক গান শুনিতে শুনিতে ধ্যানস্থ হইয়াছেন। ঠাকুরের তক্তপোশের উত্তরে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। বেলা ৩টা-৪টা হইবে। পশ্চিমের রোদ্র আসিয়া তাঁহার গায়ে পড়িয়াছে। ঠাকুর তাড়াতাড়ি একটি ছাতি লইয়া তাহার পশ্চিমদিকে রাখিলেন। যাহাতে রৌদ্র সাধকের গায়ে না লাগে।

নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন:

মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়।
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায় ।।
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনলসম।
আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পূজিব তোমায় ।।
শুনি তব নামের গুণে, তরে মহাপাপী জনে।
লইতে পবিত্র নাম কাঁপে হে মম হৃদয় ।।
অভ্যস্ত পাপের সেবায়, জীবন চলিয়া যায়।
কেমনে করিব আমি পবিত্র পথ আশ্রয় ।।
এ পাতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে।
বল করে কেশে ধরে, দাও চরণে আশ্রয় ।।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৪ই সেপ্টেম্বর 1884/09/14/iii

28.8 নরেন্দ্রাদির শিক্ষা — বেদ-বেদান্তে কেবল আভাস

নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন।

গান - সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে।

বহিছে অমৃতধার, জুড়ায় শ্রবণ ও প্রাণরমণ হে ।।

গভীর বিষাদরাশি নিমেষে বিনাশে যখনি তব নামসুধা শ্রবণে পরশে।

হৃদয় মধুময় তব নামগানে, হয় হে হৃদয়নাথ চিদানন্দ ঘন হে ।।

নরেন্দ্র যেই গাহিলেন — "হৃদয় মধুময় তব নামগানে", ঠাকুর অমনি সমাধিস্থ। সমাধির প্রারম্ভে হস্তের অঙ্গুলি, বিশেষতঃ বৃদ্ধাঙ্গুলি, স্পন্দিত হইতেছে। কোন্নগরের ভক্তেরা ঠাকুরের সমাধি কখন দেখেন নাই। ঠাকুর চুপ করিলেন দেখিয়া তাঁহারা গাত্রোত্থান করিতেছেন।

ভবনাথ — আপনারা বসুন না। এঁর সমাধি অবস্থা।

কোন্নগরের ভক্তেরা আবার আসন গ্রহণ করিলেন। নরেন্দ্র গাহিতেছেন:

দিবানিশি করিয়া যতন হৃদয়েতে র'চেছি আসন,

জগৎপতি হে কৃপা করি, সেথা কি করিবে আগমন।

ঠাকুর ভাবাবেশে নিচে নামিয়া মেঝেতে নরেন্দ্রের কাছে বসিলেন।

চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে।

উথলিল প্রেমসিন্ধু কি আনন্দময় হে ।।
জয় দয়াময়! জয় দয়াময়! জয় দয়াময়!

‘জয় দয়াময়’ এই নাম শুনিয়া ঠাকুর দণ্ডায়মান, আবার সমাধিস্থ!

অনেকক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার মেঝেতে মাদুরের উপর বসিলেন। নরেন্দ্র গান সমাপ্ত করিয়াছেন। তানপুরা যথাস্থানে রাখা হইয়াছে। ঠাকুরের এখনও ভাবাবেশ রহিয়াছে। ভাবাবস্থাতেই বলিতেছেন, “এ কি বল দেখি মা, মাখন তুলে কাছে ধরো! পুকুরে চার ফেলবে না — ছিপ নিয়ে বসে থাকবে না — মাছ ধরে ওঁর হাতে দাও! কি হাঙ্গাম! মা, বিচার আর শুনব না, শালারা ঢুকিয়ে দেয় — কি হাঙ্গাম! ঝেড়ে ফেলব!

“সে বেদ বিধির পার! — বেদ-বেদান্ত শাস্ত্র পড়ে কি তাঁকে পাওয়া যায়? (নরেন্দ্রের প্রতি) বুঝেছিস? বেদে কেবল আভাস!”

নরেন্দ্র আবার তানপুরা আনিতে বলিলেন। ঠাকুর বলিলেন, “আমি গাইব।” এখনও ভাবাবেশ রহিয়াছে — ঠাকুর গাহিতেছেন:

আমি ওই খেদে খেদ করি শ্যামা।
তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি গো মা।

“মা! বিচার কেন করাও?” আবার গাহিতেছেন:

এবার আমি ভাল ভেবেছি, ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।
ঘুম ভেঙেছে আর কি ঘুমাই যোগে যাগে জেগে আছি,

যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।

ঠাকুর বলিতেছেন — “আমি হুঁশে আছি।” এখনও ভাবাবস্থা।

সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে।
মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে ।।

ঠাকুর বলিয়াছেন, ‘মা, বিচার আর শুনব না।’

নরেন্দ্র গাহিতেছেন:

(আমায়) দে মা পাগল করে, আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে।
তোমার প্রেমের সুরা পানে কর মাতোয়ারা,
ও মা ভক্ত-চিত্তহরা ডুবাও প্রেম-সাগরে।

ঠাকুর ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন — “দে মা পাগল করে! তাকে জ্ঞানবিচার করে — শাস্ত্রের বিচার করে পাওয়া যায় না।”

কোন্নগরের গায়কের কালোয়াতি গান ও রাগিণী আলাপ শুনিয়া প্রসন্ন হইয়াছেন। বিনীতভাবে গায়ককে বলিতেছেন, “বাবু, একটি আনন্দময়ির নাম!”

গায়ক — মহাশয়! মাপ করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গায়ককে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতে করিতে বলছেন) — “না বাপু! একটি, জোর করতে পারি!”

এই বলিয়া গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায় বৃন্দার উক্তি কীর্তন গান গাইয়া বলিতেছেন:

রাই বলিলে বলিতে পারে! (কৃষ্ণের জন্য জেগে আছে।)
(সারা রাত জেগে আছে!) (মান করিলে করিতে পারে।)

“বাপু! তুমি ব্রহ্মময়ীর ছেলে! তিনি ঘটে ঘটে আছেন! অবশ্য বলব। চাষা গুরুকে বলেছিল —— ‘মেরে মন্ত্র লব!’

গায়ক (সহাস্য) — জুতো মেরে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্রীগুরুদেবকে উদ্দেশে প্রণাম করিতে করিতে সহাস্যে) — অত দূর নয়।

আবার ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন —— “প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ, সিদ্ধর সিদ্ধ; — তুমি কি সিদ্ধ, না সিদ্ধের সিদ্ধ? আচ্ছা গান কর।”

গায়ক রাগিণী আলাপ করিয়া গান গাহিতেছেন —— মন বারণ!

[শব্দব্রহ্মে আনন্দ —— ‘মা, আমি না তুমি?’]

শ্রীরামকৃষ্ণ (আলাপ শুনিয়া) — বাবু! এতেও আনন্দ হয়, বাবু!

গান সমাপ্ত হইল। কোন্নগরের ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। সাধক জোড়হাতে প্রণামকরিয়া বলছেন, “গোঁসাইজী! — তবে আসি।” ঠাকুর এখনও ভাবাবিষ্ট। মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন,

“মা! আমি না তুমি? আমি কি করি? — না, না, তুমি।

“তুমি বিচার শুনলে —— না এতক্ষণ আমি শুনলাম? — না; আমি না; — তুমিই! (শুনলে)।”

[পূর্বকথা —— সাধুর ঠাকুরকে শিক্ষা —— তমোগুণী সাধু]

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ, মুখুজ্জে ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। সাধকটির কথায় ——

ভবনাথ (সহাস্যে) — কিরকমের লোক!

শ্রীরামকৃষ্ণ —— তমোগুণী ভক্ত।

ভবনাথ —— খুব শ্লোক বলতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— আমি একজনকে বলেছিলাম —— ‘ও রজোগুণী সাধু —— ওকে সিধে-টিধে দেওয়া কেন?’ আর-একজন সাধু আমায় শিক্ষা দিলে —— ‘অমন কথা বলো না! সাধু তিনপ্রকার —— সত্ত্বগুণী, রজোগুণী, তমোগুণী।’ সেই দিন থেকে আমি সবরকম সাধুকে মানি।

নরেন্দ্র (সহাস্যে) — কি, হাতি নারায়ণ? সবই নারায়ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তিনিই বিদ্যা-অবিদ্যারূপে লীলা কচ্ছেন। দুই-ই আমি প্রণাম করি। চন্ডীতে আছে, তিনিই লক্ষ্মী। আবার হতভাগার ঘরে অলক্ষ্মী। (ভবনাথের প্রতি) এটা কি বিষ্ণুপুরাণে আছে?

ভবনাথ (সহাস্যে) — আজ্ঞা, তা জানি না। কোন্নগরের ভক্তেরা আপনার সমাধি অবস্থা আসছে বুঝতে না পেরে উঠে যাচ্ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— কে আবার বলছিল —— তোমরা বসো।

ভবনাথ (সহাস্য) — সে আমি!

শ্রীরামকৃষ্ণ —— তুমি বাছা ঘটাতেও যেমন, আবার তাড়াতেও তেমনি।

গায়কের সঙ্গে নরেন্দ্রের তর্ক হইয়াছিল, — সেই কথা হইতেছে।

[Doctrine of Non-resistance and Sri Ramakrishna — নরেন্দ্রের প্রতি উপদেশ ——
সত্ত্বের তমঃ —— হরিনাম-মাহাত্ম্য]

মুখুজ্জে —— নরেন্দ্রও ছাড়েন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— না, এরূপ রোখ চাই! একে বলে সত্ত্বের তমঃ। লোকে যা বলবে তাই কি শুনতে হবে? বেশ্যাকে কি বলবে, আচ্ছা যা হয় তুমি করো। তাহলে

বেশ্যার কথা শুনতে হবে? মান করাতে একজন সখী বলেছিল, ‘শ্রীমতীর অহংকার হয়েছে।’ বৃন্দে বললে, এ ‘অহং’ কার? — এ তাঁরই অহং। কৃষ্ণের গরবে গরবিনী।

এইবার হরিনাম-মাহাত্ম্যের কথা হইতেছে।

ভবনাথ — হরিনামে আমার গা যেন খালি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — যিনি পাপ হরণ করেন তিনিই হরি। হরি ত্রিতাপ হরণ করেন।

“আর চৈতন্যদেব হরিনাম প্রচার করেছিলেন — অতএব ভাল। দেখো চৈতন্যদেব কত বড় পণ্ডিত — আর তিনি অবতার — তিনি যেকালে এই নাম প্রচার করেছিলেন এ অবশ্য ভাল। (সহাস্যে) চাষারা নিমন্ত্রণ খাচ্ছে — তাদের জিজ্ঞাসা করা হল, তোমরা আমড়ার অম্বল খাবে? তারা বললে, ঝদি বাবুরা খেয়ে থাকেন তাহলে আমাদের দেবেন। তাঁরা যেকালে খেয়ে গেছেন সেকালে ভালই হয়েছে।” (সকলের হাস্য)

[শিবনাথকে দেখিবার ইচ্ছা — মহেন্দ্রের তীর্থযাত্রার প্রস্তাব]

ঠাকুর শিবনাথ (শাস্ত্রী)-কে দেখিতে যাইবেন ইচ্ছা হইয়াছে — তাই মুখুজ্জেকে বলিতেছেন, “একবার শিবনাথকে দেখতে যাবো — তোমাদের গাড়িতে গেলে আর ভাড়া লাগবে না!”

মুখুজ্জে — যে আজ্ঞা, তাই একদিন ঠিক করা যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — আচ্ছা, আমাদের কি লাইক করবে? অত ওরা (ব্রাহ্মভক্তেরা), সাকারবাদীদের নিন্দা করে।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখুজ্জে তীর্থযাত্রা করিবেন — ঠাকুরকে জানাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — সে কি গো! প্রেমের অঙ্কুর না হতে হতে যাচ্চো? অঙ্কুর হবে, তারপর গাছ হবে, তারপর ফল হবে। তোমার সঙ্গে বেশ কথাবার্তা চলছিল।

মহেন্দ্র — আজ্ঞা, একটু ইচ্ছা হয়েছে ঘুরে আসি। আবার শীঘ্র ফিরে আসব।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৪ই সেপ্টেম্বর 1884/09/14/iv

28.9 নরেন্দ্রের ভক্তি — যদু মল্লিকের বাগানে ভক্তসঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব

অপরাহ্ন হইয়াছে। বেলা ৫টা হইবে। ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। ভক্তেরা বাগানে বেড়াইতেছেন। অনেকে শীঘ্র বিদায় লইবেন।

ঠাকুর উত্তরের বারান্দায় হাজরার সহিত কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র আজকাল গুহদের বড়ছেলে অন্নদার কাছে প্রায় যান।

হাজরা — গুহদের ছেলে অন্নদা, শুনলাম বেশ কঠোর করছে। সামান্য সামান্য কিছু খেয়ে থাকে। চারদিন অন্তর অন্ন খায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বল কি? ‘কে জানে কোন্ ভেক্‌সে নারায়ণ মিল্ যায়।’

হাজরা — নরেন্দ্র আগমনী গাইলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যস্ত হইয়া) — কিরকম?

কিশোরী কাছে দাঁড়াইয়া। ঠাকুর বলছেন, তুই ভাল আছিস?

ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারান্দায়। শরৎকাল। গেরুয়া রঙে ছোপানো একটি ফ্লানেলের জামা পরিতেছেন ও নরেন্দ্রকে বলছেন, “তুই আগমনী গেয়েছিস?” গোল বারান্দা হইতে নামিয়া নরেন্দ্রের সঙ্গে গঙ্গার পোস্তার উপর আসিলেন। সঙ্গে মাস্টার। নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন:

কেমন করে পরের ঘরে, ছিলি উমা বল মা তাই।
কত লোকে কত বলে, শুনে প্রাণে মরে যাই ।।
চিতাভস্ম মেখে অঙ্গে, জামাই বেড়ায় মহারঙ্গে।
তুই নাকি মা তারই সঙ্গে, সোনার অঙ্গে মাখিস ছাই ।।
কেমন মা ধৈর্য ধরে, জামাই নাকি ভিক্ষা করে।
এবার নিতে এলে পরে, বলব উমা ঘরে নাই ।।

ঠাকুর দাঁড়াইয়া শুনিতেছেন। শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট।

এখনও একটু বেলা আছে। সূর্যদেব পশ্চিম গগনে দেখা যাইতেছেন। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। তাঁহার একদিকে উত্তরবাহিনী গঙ্গা — কিয়ৎক্ষণ হইল জোয়ার আসিয়াছে। পশ্চাতে পুষ্পোদ্যান। ডানদিকে নবত ও পঞ্চবটী দেখা যাইতেছে। কাছে নরেন্দ্র দাঁড়াইয়া গান গাহিতেছেন।

সন্ধ্যা হইল। নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ঘরে ঠাকুর আসিয়াছেন ও জগন্মাতার নাম ও চিন্তা করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত যদু মল্লিক পার্শ্বের বাগানে আজ আসিয়াছেন। বাগানে আসিলে প্রায় ঠাকুরকে লোক পাঠাইয়া লইয়া যান — আজ লোক পাঠাইয়াছেন — ঠাকুরের যাইতে হইবে। শ্রীযুক্ত অধর সেন কলিকাতা হইতে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

[ভক্তসঙ্গে শ্রীযুক্ত যদু মল্লিকের বাগানে — শ্রীগৌরাঙ্গ ভাব]

ঠাকুর শ্রীযুক্ত যদু মল্লিকের বাগানে যাইবেন। লাটুকে বলিতেছেন, লণ্ঠটা জ্বাল্, একবার চল্।

ঠাকুর লাটুর সঙ্গে একাকী যাইতেছেন। মাস্টার সঙ্গে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — তুমি নারাণকে আনলে না কেন?

মাস্টার বলিতেছেন — আমি কি সঙ্গে যাব?

শ্রীরামকৃষ্ণ — যাবে? অধর-টধর সব রয়েছে — আচ্ছা, এসো।

মুখুজ্জেরা পথে দাঁড়াইয়াছিলেন। ঠাকুর মাস্টারকে বলিতেছেন — ওঁরা কেউ যাবেন? (মুখুজ্জেদের প্রতি) — আচ্ছা, বেশ চলো। তাহলে শীঘ্র উঠে আসতে পারব।

[চৈতন্যলীলা ও অধরের কর্মের কথা যদু মল্লিকের সঙ্গে]

ঠাকুর যদু মল্লিকের বৈঠকখানায় আসিয়াছেন। সুসজ্জিত বৈঠকখানা। ঘর বারান্দায় দ্যালগিরি জ্বলিতেছে। শ্রীযুক্ত যদুলাল ছোট ছোট ছেলেদের লইয়া আনন্দে দু-একটি বন্ধুসঙ্গে বসিয়া আছেন। খানসামারা কেহ অপেক্ষা করিতেছে, কেহ হাতপাখা লইয়া পাখা করিতেছে। যদু হাসিতে হাসিতে বসিয়া বসিয়া ঠাকুরকে সম্ভাষণ করিলেন ও অনেকদিনের পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

যদু গৌরাঙ্গভক্ত। তিনি স্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দেখিয়া আসিয়াছেন। ঠাকুরের কাছে গল্প করিতেছেন। বলিলেন, চৈতন্যলীলা নূতন অভিনয় হইতেছে। বড় চমৎকার হইয়াছে।

ঠাকুর আনন্দের সহিত চৈতন্যলীলা-কথা শুনিতেছেন। মাঝে মাঝে যদুর একটি ছোট ছেলের হাত লইয়া খেলা করিতেছেন। মাস্টার ও মুখুজ্জে-ভ্রাতারা তাঁহার কাছে বসিয়া আছেন।

শ্রীযুক্ত অধর সেন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান-এর কর্মের জন্যে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে কর্মের মাহিনা হাজার টাকা। অধর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট — তিনশ টাকা মাইনে পান। অধরের বয়স ত্রিশ বৎসর।

শ্রীরামকৃষ্ণ (যদুর প্রতি) — কই অধরের কর্ম হল না?

যদু ও তাঁহার বন্ধুরা বলিলেন, অধরের কর্মের বয়স যায় নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে যদু বলিতেছেন — "তুমি একটু তাঁর নাম করো।"

ঠাকুর গৌরাঙ্গের ভাব গানের ছলে বলিতেছেন:

গান - আমার গৌর নাচে।
নাচে সংকীর্তনে, শ্রীবাস-অঙ্গনে, ভক্তগণসঙ্গে ।।

গান - আমার গৌর রতন।

গান - গৌর চাহে বৃন্দাবনপানে, আর ধারা বহে দুনয়নে।
(ভাব হবে বইকি রে) (ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের)
(ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়) (বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে)
(সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে) (গৌর আপনার পায় আপনি ধরে)
(যার অন্তঃ কৃষ্ণ বহিঃ গৌর)

গান - আমার অঙ্গ কেন গৌর, (ও গৌর হল রে!)

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৪ই সেপ্টেম্বর 1884/09/14/v

28.10 শ্রীযুক্ত রাখালের জন্য চিন্তা — যদু মল্লিক — ভোলানাথের এজাহার

গান সমাপ্ত হইলে মুখুজ্জেরা গাত্রোত্থান করিলেন। ঠাকুরও সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন। কিন্তু ভাবাবিষ্ট। ঘরের বারান্দায় আসিয়া একেবারে সমাধিস্থ হইয়া দণ্ডায়মান। বারান্দায় অনেকগুলি আলো জ্বলিতেছে। বাগানের দ্বারবান ভক্ত লোক। ঠাকুরকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া সেবা করান। ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দ্বারবানটি আসিয়া ঠাকুরকে পাখার হাওয়া করিতেছেন; বড় হাত পাখা।

বাগানের সরকার শ্রীযুক্ত রতন আসিয়া প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। নারায়ণ! নারায়ণ! — এই নাম উচ্চারণ করিয়া তাহাদের সম্ভাষণ করিলেন।

ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির সদর ফটকের কাছে আসিয়াছেন। ইতিমধ্যে মুখুজ্জেরা ফটকের কাছে অপেক্ষা করিতেছেন।

অধর ঠাকুরকে খুঁজিতেছিলেন।

মুখুজ্জে (সহাস্যে) — মহেন্দ্রবাবু পালিয়ে এসেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, মুখুজ্জের প্রতি) — এর সঙ্গে তোমরা সর্বদা দেখা করো, আর কথাবার্তা কয়ো।

প্রিয় মুখুজ্জে (সহাস্যে) — ইনি এখন আমাদের মাস্টারি করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — গাঁজাখোরের স্বভাব গাঁজাখোর দেখলে আনন্দ করে। আমির এলে কথা কয় না। কিন্তু যদি একজন লক্ষ্মীছাড়া গাঁজাখোর আসে, তবে হয়তো কোলাকুলি করবে। (সকলের হাস্য)

ঠাকুর উদ্যান-পথ দিয়া পশ্চিমাস্য হইয়া নিজের ঘরের অভিমুখে আসিতেছেন। পথে বলিতেছেন — "যদু খুব হিঁদু। ভাগবত থেকে অনেক কথা বলে।"

মণি কালীমন্দিরে আসিয়া প্রণামাদি করিয়া চরণামৃতপান করিতেছেন। ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত — মাকে দর্শন করিবেন।

রাত প্রায় নয়টা হইল। মুখুজ্জেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। অধর ও মাস্টার মেঝেতে বসিয়া আছেন। ঠাকুর অধরের সহিত শ্রীযুক্ত রাখালের কথা কহিতেছেন।

রাখাল বৃন্দাবনে আছেন — বলরামের সঙ্গে। পত্রে সংবাদ আসিয়াছিল তাঁহার অসুখ হইয়াছে। দুই-তিনদিন হইল ঠাকুর রাখালের অসুখ শুনিয়া এত চিন্তিত হইয়াছিলেন যে, মধ্যাহ্নের সেবায় সময় 'কি হবে!' বলিয়া হাজরার কাছে

বালকের ন্যায় কেঁদেছিলেন। অধর রাখালকে রেজিস্টারি করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্যন্ত চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার পান নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — নারাণ চিঠি পেলে আর তুমি চিঠির জবাব পেলে না?

অধর — আজ্ঞা, এখনও পাই নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আর মাস্টারকে লিখেছে।

ঠাকুরের চৈতন্যলীলা দেখিতে যাইবার কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে, ভক্তদের প্রতি) — যদু বলছিল, এক টাকার জায়গা হতে বেশ দেখা যায় — সস্তা।

“একবার আমাদের পেনেটী নিয়ে যাবার কথা হয়েছিল — যদু আমাদের চলতি নৌকায় চড়তে বলেছিল। (সকলের হাস্য)

“আগে ঈশ্বরের কথা একটু একটু শুনত। একটি ভক্ত ওর কাছে যাতায়াত করত — এখন আর তাকে দেখতে পাই না। কতকগুলি মোসাহেব ওর কাছে সর্বদা থাকে — তারাই আরও গোল করেছে।

“ভারী হিসাবী — জেতে মাত্রই বলে কত ভাড়া — আমি বলি তোমার আর শুনে কাজ নেই। তুমি আড়াই টাকা দিয়ো — তাইতে চুপ করে থাকে আড়াই টাকাই দেয়।” (সকলের হাস্য)

ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণপ্রান্তে পাইখানা প্রস্তুত হইয়াছে। তাই লইয়া যদু মল্লিকের সহিত বিবাদ চলিতেছে। পাইখানার পাশে যদুর বাগান।

বাগানের মুহুরী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বিচারপতির কাছে এজাহার দিয়াছেন। এজাহার দেওয়ার পর হইতে তাঁহার বড় ভয় হইয়াছে। তিনি ঠাকুরকে জানাইয়াছিলেন। ঠাকুর বলিয়াছেন — অধর ডেপুটি ম্যাহিস্ট্রেট, সে আসিলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করো। শ্রীযুক্ত রাম চক্রবর্তী ভোলানাথকে সঙ্গে করিয়া ঠাকুরের কাছে আনিয়াছেন ও সমস্ত বলিতেছেন — 'এর এজাহার দিয়ে ভয় হয়েছে' ইত্যাদি।

ঠাকুর চিন্তিতপ্রায় হইয়া উঠিয়া বসিলেন ও অধরকে সব কথা বলিতে বলিলেন। অধর সমস্ত শুনিয়া বলিতেছেন — ও কিছুই না, একটু কষ্ট হবে। ঠাকুরের যেন গুরুতর চিন্তা দূর হইল।

রাত হইয়াছে। অধর বিদায় গ্রহণ করিবেন, প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — নারাণকে এনো।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৯শে সেপ্টেম্বর 1884/09/19/i

28.11 দক্ষিণেশ্বরে মহেন্দ্র, রাখাল, রাধিকা গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

[মহেন্দ্রাদির প্রতি উপদেশ — কাপ্তেনের ভক্তি ও পিতামাতার সেবা]

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-কালীমন্দিরে সেই পূর্বপরিচিত ঘরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। শরৎকাল। শুক্রবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪; ৪ঠা আশ্বিন, ১২৯১; বেলা দুইটা। আজ ভাদ্র অমাবস্যা। মহালয়া। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রিয় মুখোপাধ্যায়, মাস্টার, বাবুরাম, হরিশ, কিশোরী, লাটু, মেঝেতে কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া আছেন, — কেহ বা ঘরে যাতায়াত করিতেছেন। শ্রীযুক্ত হাজরা বারান্দায় বসিয়া আছেন। রাখাল বলরামের সহিত বৃন্দাবনে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেন্দ্রাদি ভক্তদের প্রতি) — কলিকাতায় কাপ্তেনের বাড়িতে গিছলাম। ফিরে আসতে অনেক রাত হয়েছিল।

“কাপ্তেনের কি স্বভাব! কি ভক্তি! ছোট কাপড়খানি পরে আরতি করে। একবার তিন বাতিওয়ালা প্রদীপে আরতি করে, — তারপর আবার এক বাতিওলা প্রদীপে। আবার কর্পূরের আরতি।

“সে সময়ে কথা হয় না। আমায় ইশারা করে আসনে বসতে বললে।

“পূজা করবার সময় চোখের ভাব — ঠিক যেন বোলতা কামড়েছে!

“এদিকে গান গাইতে পারে না। কিন্তু সুন্দর স্তব পাঠ করে।

“তার মার কাছে নিচে বসে। মা — আসনের উপর বসবে।

“বাপ ইংরাজের হাওয়ালদার। যুদ্ধক্ষেত্রে একহাতে বন্দুক আর-এক হাতে শিবপূজা করে। খানসামা শিব গড়ে গড়ে দিচ্ছে। শিবপূজা না করে জল খাবে না। ছয় হাজার টাকা মাহিনা বছরে।

“মাকে কাশীতে মাঝে মাঝে পাঠায়। সেখানে বার-তেরো জন মার সেবায় থাকে। অনেক খরচা। বেদান্ত, গীতা, ভাগবত — কাপ্তেনের কণ্ঠস্থ!

“সে বলে, কলিকাতার বাবুরা ম্লেচ্ছাচার।

“আগে হঠযোগ করেছিল — তাই আমার সমাধি কি ভাবাবস্থা হলে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

“কাপ্তেনের পরিবার — তার আবার আলাদা ঠাকুর, গোপাল। এবার তত কৃপণ দেখলাম না। সেও গীতা-টীতা জানে। ওদের কি ভক্তি! — আমি যেখানে খাব সেইখানেই আঁচাব। খড়কে কাঠিটি পর্যন্ত।

“পাঁঠার চচ্চড়ি করে, — কাপ্তেন বলে পনর দিন থাকে, — কিন্তু কাপ্তেনের পরিবার বললে — ‘নাহি নাহি, সাত রোজ’। কিন্তু বেশ লাগল। ব্যঞ্জন সব একটু একটু। আমি বেশ খাই বলে, আজকাল আমায় বেশি দেয়।

“তারপর খাবার পর, হয় কাপ্তেন, নয় তার পরিবার বাতাস করবে।”

[Jung Bahadur-এর ছেলেদের কাপ্তেনের সঙ্গে আগমন ১৮৭৫-৭৬ —— নেপালী ব্রহ্মচারিণীর
গীতগোবিন্দ গান —— “আমি ঈশ্বরের দাসী”]

“ওদের কিন্তু ভারী ভক্তি, — সাধুদের বড় সম্মান। পশ্চিমে লোকেদের সাধুভক্তি বেশি। জাঙ্‌-বাহাদুরের ছেলেরা আর ভাইপো কর্ণেল এখানে এসেছিল। যখন এলো পেন্টুলুণ খুলে যেন কত ভয়ে।

“কাপ্তেনের সঙ্গে একটি ওদের দেশের মেয়ে এসেছিল। ভারী ভক্ত, — বিবাহ হয় নাই। গীতগোবিন্দ গান কণ্ঠস্থ। তার গান শুনতে দ্বারিকবাবুরা এসে বসেছিল। আমি বললাম, এরা শুনতে চাচ্ছে, লোক ভাল। যখন গীতগোবিন্দ গান গাইলে তখন দ্বারিকবাবু১ রুমালে চক্ষের জল পুছতে লাগল। বিয়ে কর নাই কেন, জিজ্ঞাসা করাতে বলে, ‘ঈশ্বরের দাসী, আবার কার দাসী হব?’ আর সব্বাই তাকে দেবী বলে খুব মানে —— যেমন পুঁথিতে (শাস্ত্রে) আছে।

(মহেন্দ্রাদির প্রতি) — “আপনারা যে আসছো, তাতে কিছু কি উপকার হচ্ছে? শুনলে মনটা বড় ভাল থাকে। (মাস্টারের প্রতি) এখানে লোক আসে কেন? তেমন লেখাপড়া জানি না ——”

মাস্টার —— আজ্ঞা, কৃষ্ণ যখন নিজে সব রাখাল গরুটরু হলেন (ব্রহ্মা হরণ করবার পর) তখন রাখালদের মা’রা নূতন রাখালদের পেয়ে যশোদার বাড়িতে আর আসেন না। গাভীরাও হাম্বা রবে ওই নূতন বাছুরদের পিছে পিছে গিয়ে পড়তে লাগল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাতে কি হলো?

মাস্টার — ঈশ্বর নিজেই সব হয়েছেন কি না, তাই এত আকর্ষণ। ঈশ্বর বস্তু থাকলেই মন টানে।

[কৃষ্ণলীলার ব্যাখ্যা — গোপীপ্রেম — বস্ত্রহরণের মানে]

শ্রীরামকৃষ্ণ — এ যোগমায়ার আকর্ষণ — ভেলকি লাগিয়ে দেয়। রাধিকা সুবোল বেশে বাছুর কোলে — জটিলার ভয়ে যাচ্ছে; যখন যোগমায়ার শরণাগত হলো তখন জটিলা আবার আশীর্বাদ করে।

“হরিলীলা সব যোগমায়ার সাহায্যে!

“গোপীদের ভালবাসা — পরকীয়া রতি। কৃষ্ণের জন্য গোপীদের প্রেমোন্মাদ হয়েছিল। নিজের সোয়ামীর জন্য অত হয় না। যদি কেউ বলে, ওরে তোর সোয়ামী এসেছে! তা বলে, ‘এসেছে, তা আসুকগে, — ওই খাবে এখন! কিন্তু যদি পর পুরুষের কথা শুনে, — রসিক, সুন্দর, রসপণ্ডিত, — ছুটে দেখতে যাবে, — আর আড়াল থেকে উঁকি মেরে — দেখবে।

“যদি খোঁচ ধর যে, তাঁকে দেখি নাই, তাঁর উপর কেমন করে গোপীদের মতো টান হবে? তা শুনলেও সে টান হয় —

“না জেনে নাম শুনে কানে মন গিয়ে তায় লিপ্ত হলো।”

একজন ভক্ত — আজ্ঞা, বস্ত্রহরণের মানে কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — অষ্টপাশ, — গোপীদের সব পাশই গিয়েছিল, কেবল লজ্জা বাকী ছিল। তাই তিনি ও পাশটাও ঘুচিয়ে দিলেন। ঈশ্বরলাভ হলে সব পাশ চলে যায়।

[যোগভ্রষ্টের ভোগান্তে ঈশ্বরলাভ]

(মহেন্দ্র মুখুজ্জে প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি) — “ঈশ্বরের উপর টান সকলের হয় না, আধার বিশেষ হয়। সংস্কার থাকলে হয়। তা না হলে বাগবাজারে এত লোক ছিল কেবল তোমরাই এখানে এলে কেন? আদাড়েগুলোর হয় না।

“মলয় পর্বতের হাওয়া লাগলে সব গাছ চন্দন হয়; কেবল শিমূল, অশ্বত্থ, বট আর কয়েকটা গাছ চন্দন হয় না।

“তোমাদের টাকা-কড়ির অভাব নাই। যোগভ্রষ্ট হলে ভাগ্যবানের ঘরে জন্ম হয়, — তারপর আবার ঈশ্বরের জন্য সাধনা করে।”

মহেন্দ্র মুখুজ্জে — কেন যোগভ্রষ্ট হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — পূর্বজন্মে ঈশ্বরচিন্তা করতে করতে হয়তো হঠাৎ ভোগ করবার লালসা হয়েছে। এরূপ হলে যোগভ্রষ্ট হয়। আর পরজন্মে ওইরূপ জন্ম হয়।

মহেন্দ্র — তারপর, উপায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কামনা থাকতে — ভোগ লালসা থাকতে — মুক্তি নাই। তাই খাওয়া-পরা, রমণ-ফমন সব করে নেবে। (সহাস্যে) তুমি কি বল? স্বদারায় না পরদারায়? (মাস্টার, মুখুজ্জে, এঁরা হাসিতেছেন)

১ দ্বারিকবাবু মথুরের জেষ্ঠপুত্র। ১৮৭৭ খ্রী: প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয় — পৌষ ১২৮৪। কাপ্তেন প্রথম আসেন ১৮৭৫-৭৬ খ্রী:। অতএব এই গীতগোবিন্দ গান ১৮৭৫ ও ১৮৭৭ খ্রী: মধ্যে হইবে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৯শে সেপ্টেম্বর 1884/09/19/ii

28.12 শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত — ঠাকুরের নানা সাধ

[পূর্বকথা — প্রথম কলিকাতায় নাথের বাগানে — গঙ্গাস্নান]

শ্রীরামকৃষ্ণ — ভোগ লালসা থাকা ভাল নয়। আমি তাই জন্য যা যা মনে উঠতো আমনি করে নিতাম।

“বড়বাজারের রঙকরা সন্দেশ দেখে খেতে ইচ্ছা হল। এরা আনিয়া দিলে। খুব খেলুম, — তারপর অসুখ।

“ছেলেবেলা গঙ্গা নাইবার সময়, তখন নাথের বাগানে, একটি ছেলের কোমরে সোনার গোট দেখেছিলাম। এই অবস্থার পর সেই গোট পরতে সাধ হল। তা বেশিক্ষণ রাখবার জো নাই, — গোট পরে ভিতর দিয়ে সিড়সিড় করে উপরে বায়ু উঠতে লাগল — সোনা গায়ে ঠেকেছে কি না? একটু রেখেই খুলে ফেলতে হল। তা না হলে ছিঁড়ে ফেলতে হবে।

“ধনেখালির খইচুর, খানাকুল কৃষ্ণনগরের সরভাজা, তাও খেতে সাধ হয়েছিল।” (সকলের হাস্য)

[পূর্বকথা — শম্ভুর ও রাজনারায়ণের চন্ডী শ্রবণ — ঠাকুরের সাধুসেবা]

“শম্ভুর চন্ডীর গান শুনতে ইচ্ছা হয়েছিল! সে গান শোনার পর আবার রাজনারায়ণের চন্ডী শুনতে ইচ্ছা হয়েছিল। তাও শোনা হল।

“অনেক সাধুরা সে সময়ে আসত। তা সাধ হল, তাদের সেবার জন্য আলাদা একটি ভাঁড়ার হয়। সেজোবাবু তাই করে দিলে। সেই ভাঁড়ার থেকে সাধুদের সিদে কাঠ, এ-সব দেওয়া হত।

“একবার মনে উঠল যে খুব ভাল জরির সাজ পরব। আর রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাব। সেজোবাবু নূতন সাজ, গুড়গুড়ি, সব পাঠিয়ে দিলে। সাজ পরা হল। গুড়গুড়ি নানারকম করে টানতে লাগলুম। একবার এপাশ থেকে, একবার ওপাশ থেকে, — উঁচু থেকে নিচু থেকে। তখন বললাম, মন এর নাম রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়া! এই বলে গুড়গুড়ি ত্যাগ হয়ে গেল। সাজগুলো খানিক পরে খুলে ফেললাম, — পা দিয়ে মাড়াতে লাগলাম — আর তার

উপর থু থু করতে লাগলাম — বললাম, এর নাম সাজ! এই সাজে রজোগুণ হয়!”

[বৃন্দাবনে রাখাল ও বলরাম — পূর্বকথা — রাখালের প্রথম ভাব ১৮৮১]

বলরামের সহিত রাখাল বৃন্দাবনে আছেন। প্রথম প্রথম বৃন্দাবনের খুব সুখ্যাত করিয়া আর বর্ণনা করিয়া পত্রাদি লিখিতেন। মাস্টারকে পত্র লিখিয়াছিলেন, ‘এ বড় উত্তম স্থান, আপনি আসবেন, — ময়ূর-ময়ূরী সব নৃত্য করছে — আর নৃত্যগীত, সর্বদাই আনন্দ!’ তারপর রাখালের অসুখ হইয়াছে — বৃন্দাবনের জ্বর। ঠাকুর শুনিয়া বড়ই চিন্তিত আছেন। তাঁর জন্য চন্ডীর কাছে মানসিক করেছেন। ঠাকুর রাখালের কথা কহিতেছেন — “এইখানে বসে পা টিপতে টিপতে রাখালের প্রথম ভাব হয়েছিল। একজন ভাগবতের পণ্ডিত এই ঘরে বসে ভাগবতের কথা বলছিল। সেই সকল কথা শুনতে শুনতে রাখাল মাঝে মাঝে শিউরে উঠতে লাগল; তারপর একেবারে স্থির!

“দ্বিতীয় বার ভাব বলরামের বাটীতে — ভাবেতে শুয়ে পড়েছিল।

“রাখালের সাকারের ঘর — নিরাকারের কথা শুনলে উঠে যাবে।

“তার জন্য চন্ডীকে মানলুম। সে যে আমার উপর সব নির্ভর করেছিল — বাড়িঘর সব ছেড়ে! তার পরিবারের কাছে তাকে আমিই পাঠিয়ে দিতাম — একটু ভোগের বাকী ছিল।

বৃন্দাবন থেকে এঁকে লিখেছে, এ বেশ জায়গা — ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য করছে — এখন ময়ূর-ময়ূরী বড়ই মুশকিলে ফেলেছে!

“সেখানে বলরামের সঙ্গে আছে! বলরামের কি স্বভাব! আমার জন্য ওদেশে (উড়িষ্যায় কোঠারে) যায় না। ভাই মাসহারা বন্ধ করেছিল আর বলে পাঠিয়েছিল, ‘তুমি এখানে এসে থাকো, মিছামিছি কেন অত টাকা খরচ কর।’ — তা সে শুনে নাই — আমাকে দেখবে বলে।

“কি স্বভাব! — রাতদিন কেবল ঠাকুর লয়ে; — মালীরা ফুলের মালাই গাঁথছে! টাকা বাঁচবে বলে বৃন্দাবনে চার মাস থাকবে। দুশ টাকা মাসহারা পায়।“

[পূর্বকথা — নরেন্দ্রের জন্য ক্রন্দন — নরেন্দ্রের প্রথম দর্শন ১৮৮১]

“ছোকরাদের ভালবাসি কেন? — ওদের ভিতর কামিনী-কাঞ্চন এখনও ঢুকে নাই। আমি ওদের নিত্যসিদ্ধ দেখি!

“নরেন্দ্র যখন প্রথম এলো — ময়লা একখানা চাদর গায়ে, — কিন্তু চোখ মুখ দেখে বোধ হল ভিতরে কিছু আছে। তখন বেশি গান জানতো না। দুই-একটা গাইলে,:

‘মন চল নিজ নিকেতনে’ আর ‘যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।’

“যখন আসত, — একঘর লোক — তবু ওর দিক পানে চেয়েই কথা কইতাম। ও বলত, ‘এঁদের সঙ্গে কথা কন’, — তবে কইতাম।

“যদু মল্লিকের বাগানে কাঁদতুম, — ওকে দেখবার জন্য পাগল হয়েছিলাম। এখানে ভোলানাথের হাত ধরে কান্না! — ভোলানাথ বললে, ‘একটা কায়েতের ছেলের জন্য মশায় আপনার এরূপ করা উচিত নয়।’ মোটা বামুন একদিন হাতজোড় করে বললে, ‘মশায়, ওর সামান্য পড়াশুনো, ওর জন্য আপনি এত অধীর কেন হন?’

“ভবনাথ নরেন্দ্রের জুড়ি — দুজনে যেন স্ত্রী-পুরুষ! তাই ভবনাথকে নরেন্দ্রের কাছে বাসা করতে বললুম। ওরা দুজনেই অরূপের ঘর।”

[সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম, লোকশিক্ষার্থ ত্যাগ — ঘোষপাড়ার সাধনের কথা]

“আমি ছোকরাদের মেয়েদের কাছে বেশি থাকতে বা আনাগোনা করতে বারণ করে দিই।

“হরিপদ এক ঘোষপাড়ার মাগীর পাল্লায় পড়েছে। সে বাৎসল্যভাব করে। হরিপদ ছেলেমানুষ, কিছু বোঝে না। ওরা ছোকরা দেখলে ওইরকম করে। শুমলাম হরিপদ নাকি ওর কোলে শোয়। আর সে হাতে করে তাকে খাবার খাইয়ে দেয়। আমি ওকে বলে দিব — ও-সব ভাল নয়। ওই বাৎসল্যভাব থেকেই আবার তাচ্ছল্যভাব হয়।

“ওদের বর্তমানের সাধন — মানুষ নিয়ে সাধন। মানুষকে মনে করে শ্রীকৃষ্ণ। ওরা বলে ‘রাগকৃষ্ণ’। গুরু জিজ্ঞাসা করে, ‘রাগকৃষ্ণ পেয়েছিস?’ সে বলে ‘হাঁ, পেয়েছি।’

“সেদিন সে মাগী এসেছিল। তার চাহুনির রকম দেখলাম, বড় ভাল নয়। তারি ভাবে বললাম, ‘হরিপদকে নিয়ে যেমন কচ্চো কর — কিন্তু অন্যায় ভাব এনো না।’

“ছোকরাদের সাধনার অবস্থা। এখন কেবল ত্যাগ। সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না। আমি ওদের বলি, মেয়েমানুষ ভক্ত হলেও তাদের সঙ্গে বসে কথা কবে না; দাঁড়িয়ে একটু কথা কবে। সিদ্ধ হলেও এইরূপ করতে হয় — নিজের সাবধানের জন্য, — আর লোকশিক্ষার জন্য। আমিও মেয়েরা এলে একটু পরে বলি, তোমরা ঠাকুর দেখগে। তাতে যদি না উঠে, নিজে উঠে পড়ি। আমার দেখে আবার সবাই শিখবে।”

[পূর্বকথা — ফুলুই শ্যামবাজার দর্শন ১৮৮০ — অবতারের আকর্ষণ]

“আচ্ছা, এই যে সব ছেলেরা আসছে, আর তোমরা সব আসছো, এর মানে কি? এর (অর্থাৎ আমার) ভিতরে অবশ্য কিছু আছে, তা না হলে টান হয় কেমন করে — কেন আকর্ষণ হয়?

“ও-দেশে যখন হৃদের বাড়িতে (কামারপুকুরের নিকট, সিওড়ে) ছিলাম। তখন শ্যামবাজারে নিয়ে গেল। বুঝলাম গৌরাঙ্গভক্ত। গাঁয়ে ঢোকবার আগে দেখিয়ে দিলে। দেখলাম গৌরাঙ্গ! এমনি আকর্ষণ — সাতদিন সাতরাত লোকের ভিড়! কেবল কীর্তন আর নৃত্য। পাঁচিলে লোক! গাছে লোক!

“নটবর গোস্বামির বাড়িতে ছিলাম। সেখানে রাতদিন ভিড়। আমি আবার পালিয়ে গিয়ে এক তাঁতীর ঘরে সকালে গিয়ে বসতাম। সেখানে আবার দেখি,

খানিক পরে সব গিয়েছে। সব খোল-করতাল নিয়ে গেছে! — আবার ‘তাকুটী! তাকুটী!’ করছে। খাওয়া দাওয়া বেলা তিনটার সময় হতো!

“রব উঠে গেল —— সাতবার মরে, সাতবার বাঁচে, এমন এক লোক এসেছে! পাছে আমার সর্দিগর্মি হয়, হৃদে মাঠে টেনে নিয়ে যেতো; — সেখানে আবার পিঁপড়ের সার! আবার খোল-করতাল। —— তাকুটী! তাকুটী! হৃদে বকলে, আর বললে, ‘আমরা কি কখনও কীর্তন শুনি নাই?’

“সেখানকার গোঁসাইরা ঝগড়া করতে এসেছিল। মনে করেছিল, আমরা বুঝি তাদের পাওনাগণ্ডা নিতে এসেছি। দেখলে, আমি একখানা কাপড় কি একগাছা সুতাও লই নাই। কে বলেছিল ‘ব্রহ্মজ্ঞানী’। তাই গোঁসাইরা বিড়তে এসেছিল। একজন জিজ্ঞাসা করলে, ‘এঁর মালা তিলক, নাই কেন?’ তারাই একজন বললে, ‘নারকেলের বেল্লো আপনা-আপনি খসে গেছে’। ‘নারকেলের বেল্লো’ ও কথাটি ওইখানেই শিখেছি। জ্ঞান হলে উপাধি আপনি খসে পড়ে যায়।

“দূর গাঁ থেকে লোক এসে জমা হতো। তারা রাত্রে থাকত। যে বাড়িতে ছিলাম, তার উঠানে রাত্রে মাগীরা অনেক সব শুয়ে আছে। হৃদে প্রস্রাব করতে রাতে বাহিরে যাচ্ছিল, তা বলে, ‘এইখানেই (উঠানে) করো।’

“আকর্ষণ কাকে বলে, ওইখানেই (শ্যামবাজারে) বুঝলাম। হরিলীলায় যোগমায়ার সাহায্যে আকর্ষণ হয়, যেন ভেলকি লেগে যায়!”
পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৯শে সেপ্টেম্বর 1884/09/19/iii

28.13 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত রাধিকা গোস্বামী

মুখুজ্জে ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত কথা কহিতে কহিতে বেলা প্রায় তিনটা বাজিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাধিকা গোস্বামী আসিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে এই প্রথম দর্শন করলেন। বয়স আন্দাজ ত্রিশের মধ্যে। গোস্বামী আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— আপনারা কি অদ্বৈতবংশ?

গোস্বামী —— আজ্ঞা, হাঁ।

ঠাকুর অদ্বৈতবংশ শুনিয়া গোস্বামীকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতেছেন।

[গোস্বামী বংশ ও ব্রাহ্মণ পূজনীয় —— মহাপুরুষের বংশে জন্ম]

শ্রীরামকৃষ্ণ —— অদ্বৈতগোস্বামী বংশ, — আকরের গুণ আছেই!

“নেকো আমের গাছে নেকো আমই হয়। (ভক্তদের হাস্য) খারাপ আম হয় না। তবে মাটির গুণে একটু ছোট বড় হয়। আপনি কি বলেন?”

গোস্বামী (বিনীতভাবে) — আজ্ঞে, আমি কি জানি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি যাই বল, — অন্য লোকে ছাড়বে কেন?

“ব্রাহ্মণ, হাজার দোষ থাকুক — তবু ভরদ্বাজ গোত্র, শাণ্ডিল্য গোত্র বলে সকলের পূজনীয়। (মাস্টারের প্রতি) শঙ্খচিলের কথাটি বল তো!”

মাস্টার চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন —

শ্রীরামকৃষ্ণ — বংশে মহাপুরুষ যদি জন্মে থাকেন তিনিই টেনে নেবেন — হাজার দোষ থাকুক। যখন গন্ধর্ব কৌরবদের বন্দী করলে যুধিষ্ঠির গিয়ে তাদের মুক্ত করলেন। যে দুর্যোধন এত শত্রুতা করেছে, যার জন্য যুধিষ্ঠিরের বনবাস হয়েছে তাকেই গিয়ে মুক্ত করলেন!

“তা ছাড়া ভেকের আদর করতে হয়। ভেক দেখলে সত্য বস্তুর উদ্দীপন হয়। চৈতন্যদেব গাধাকে ভেক পরিয়ে সাষ্টাঙ্গ হয়েছিলেন।

“শঙ্খচিলকে দেখলে প্রণাম করে কেন? কংস মারতে যাওয়াতে ভগবতী শঙ্খচিল হয়ে উড়ে গিয়েছিলেন। তা এখনও শঙ্খচিল দেখলে সকলে প্রণাম করে।”

[পূর্বকথা — চানকে কোয়ার সিং কর্তৃক ঠাকুরের পূজা — ঠাকুরের রাজভক্তি Loyality]

“চানকের পল্টনের ভিতর ইংরাজকে আসতে দেখে সেপাইরা সেলাম করলে। কোয়ার সিং আমাকে বুঝিয়ে দিলে, ‘ইংরাজের রাজ্য তাই ইংরাজকে সেলাম করতে হয়’।”

[গোস্বামীর কছে সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা — শাক্ত ও বৈষ্ণব]

“শাক্তের তন্ত্র মত বৈষ্ণবের পুরাণ মত। বৈষ্ণব যা সাধন করে তা প্রকাশে দোষ নাই। তান্ত্রিকের সব গোপন। তাই তান্ত্রিককে সব বোঝা যায় না।

(গোস্বামীর প্রতি) — “আপনারা বেশ — কত জপ করেন, কত হরিনাম করেন।”

গোস্বামী (বিনীতভাবে) — আজ্ঞা, আমরা আর কি করছি! আমি কত অধম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — দীনতা; আচ্ছা ও তো আছে। আর এক আছে, ‘আমি হরিনাম কচ্ছি, আমার আবার পাপ! যে রাতদিন ‘আমি পাপী’ ‘আমি পাপী’ ‘আমি অধম’ ‘আমি অধম’ করে, সে তাই হয়ে যায়। কি অবিশ্বাস! তাঁর নাম এত করেছে আবার বলে, ‘পাপ, পাপ!’

গোস্বামী এই কথা অবাক্ হইয়া শুনিতেছেন।

[পূর্বকথা — বৃন্দাবনে বৈষ্ণবের ভেক গ্রহণ ১৮৬৮ খ্রী:]

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমিও বৃন্দাবনে ভেক নিয়েছিলাম; — পনর দিন রেখেছিলাম। (ভক্তদের প্রতি) সব ভাবই কিছুদিন করতাম, তবে শান্তি হতো।

(সহাস্যে) “আমি সবরকম করেছি — সব পথই মানি। শাক্তদেরও মানি, বৈষ্ণবদেরও মানি, আবার বেদান্তবাদীদেরও মানি। এখানে তাই সব মতের লোক আসে। আর সকলেই মনে করে, ইনি আমাদেরই মতের লোক। আজকালকার ব্রহ্মজ্ঞানীদেরও মানি।

“একজনের একটি রঙের গামলা ছিল। গামলার আশ্চর্য গুণ যে, যে রঙে কাপড় ছোপাতে চাইবে তার কাপড় সেই রঙেই ছুপে যেত।

“কিন্তু একজন চালাক লোক বলেছিল, ‘তুমি যে-রঙে রঙেছো, আমায় সেই রঙটি দিতে হবে।’ (ঠাকুর ও সকলের হাস্য)

“কেন একঘেয়ে হব? ‘অমুক মতের লোক তাহলে আসবে না।’ এ ভয় আমার নাই। কেউ আসুক আর না আসুক তাতে আমার বয়ে গেছে; — লোক কিসে হাতে থাকবে, এমন কিছু আমার মনে নাই। অধর সেন বড় কর্মের জন্য মাকে বলতে বলেছিল — তা ওর সে কর্ম হল না। ও তাতে যদি কিছু মনে করে, আমার বয়ে গেছে!”

[পূর্বকথা — কেশব সেনের বাটীতে নিরাকারের ভাব — বিজয় গোস্বামীর সঙ্গে এঁড়েদর গদাধরের
পাঠবাড়িদর্শন — বিজয়ের চরিত্র]

“আবার কেশব সেনের বাড়ি গিয়ে আর এক ভাব হল। ওরা নিরাকার নিরাকার করে; — তাই ভাবে বললুম, ‘মা এখানে আনিসনি, এরা তোর রূপ-টুপ মানে না’।”

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এই সকল কথা শুনিয়া গোস্বামী চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — বিজয় এখন বেশ হয়েছে।

“হরি হরি বলতে বলতে মাটিতে পড়ে যায়!

“চারটে রাত পর্যন্ত কীর্তন, ধ্যান এই সব নিয়ে থাকে। এখন গেরুয়া পরে আছে। ঠাকুর-বিগ্রহ দেখলে একেবারে সাষ্টাঙ্গ!

“চৈতন্যদেবের পটের সম্মুখে আবার সাষ্টাঙ্গ!”

গোস্বামী — রাধাকৃষ্ণ মূর্তির সম্মুখে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — সাষ্টাঙ্গ! আর আচারী খুব।

গোস্বামী — এখন সমাজে নিতে পারা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সে লোকে কি বলবে, তা অত চায় না।

গোস্বামী — না, সমাজ তাহলে কৃতার্থ হয় — অমন লোককে পেলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমায় খুব মানে।

“তাকে পাওয়াই ভার। আজ ঢাকায় ডাক, কাল আর এক জায়গায় ডাক। সর্বদাই ব্যস্ত।

“তাদের সমাজে (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে) বড় গোল উঠেছে।”

গোস্বামী — আজ্ঞা, কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাকে বলছে, ‘তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো! — তুমি পৌত্তলিক।’

“আর অতি উদার সরল। সরল না কলে ঈশ্বরের কৃপা হয় না।”

[মুখুজ্জেদিগকে শিক্ষা — গৃহস্থ, “এগিয়ে পড়” — অভ্যাসযোগ]

এইবার ঠাকুর মুখুজ্জেদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। জ্যেষ্ঠ মহেন্দ্র ব্যবসা করেন কাহারও চাকরি করেন না। কনিষ্ঠ প্রিয়নাথ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। এখন কিছু সংস্থান করিয়াছেন। আর চাকরি করেন না। জ্যেষ্ঠের বয়স ৩৫/৩৬ হইবে। তাঁহাদের বাড়ি কেদেটি গ্রামে। কলিকাতা বাগবাজারের তাঁহাদের বসতবাটী আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — একটু উদ্দীপন হচ্চে বলে চুপ করে থেকো না। এগিয়ে পড়। চন্দন কাঠের পর আরও আছে — রূপার খনি, সোনার খনি!

প্রিয় (সহাস্যে) — আজ্ঞা, পায়ে বন্ধন — এগুতে দেয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — পায়ে বন্ধন থাকলে কি হবে? — মন নিয়ে কথা।

“মনেই বদ্ধ মুক্ত। দুই বন্ধু — একজন বেশ্যালয়ে গেল, একজন ভাগবত শুনছে। প্রথমটি ভাবছে — ধিক্ আমাকে — বন্ধু হরিকথা শুনছে আর আমি কোথা পড়ে রয়েছি। আর-একজন ভাবছে, ধিক্ আমাকে, বন্ধু কেমন আমোদ-আহ্লাদ করছে, আর আমি শালা কি বোকা! দেখো প্রথমটিকে বিষ্ণুদূতে নিয়ে গেল — বৈকুণ্ঠে। আর দ্বিতীয়টিকে যমদূতে নিয়ে গেল”।

প্রিয় — মন যে আমার বশ নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সে কি! অভ্যাস যোগ। অভ্যাস কর, দেখবে মনকে যেদিকে নিয়ে যাবে, সেইদিকেই যাবে।

“মন ধোপাঘরের কাপড়। তারপর লালে ছোপাও লাল — নীলে ছোপাও নীল। যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে।

(গোস্বামীর প্রতি) — “আপনাদের কিছু কথা আছে?”

গোস্বামী (অতি বিনীতভাবে) — আজ্ঞে না, — দর্শন হল। আর কথা তো সব শুনছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঠাকুরদের দর্শন করুন।

গোস্বামী (অতি বিনীতভাবে) — একটু মহাপ্রভুর গুণানুকীর্তন —

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গোস্বামীকে গান শুনাইতেছেন:

গান — আমার অঙ্গ কেন গৌর হলো!

গান — গোরা চাহে বৃন্দাবনপানে, আর ধারা বহে দুনয়নে ।।

ভাব হবে বইকি রে!) (ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের)

(যার অন্তঃ কৃষ্ণ বহিঃ গৌর) (ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়)

(বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে) (সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে)

(গোরা আপনার পা আপনি ধরে)

[শ্রীযুক্ত রাধিকা গোস্বামীকে সর্বধর্ম-সমন্বয় উপদেশ]

গান সমাপ্ত হইল — ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গোস্বামীর প্রতি) — এ তো আপনাদের (বৈষ্ণবদের) হল। আর যদি কেউ শাক্ত, কি ঘোষপাড়ার মত আসে, তখন কি বলব!

“তাই এখানে সব ভাবই আছে — এখানে সবরকম লোক আসবে বলে; বৈষ্ণব, শাক্ত, কর্তাভজা, বেদান্তবাদী; আবার ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী।

“তাঁরই ইচ্ছায় নানা ধর্ম নানা মত হয়েছে।

“তবে তিনি যার যা পেটে সয় তাকে সেইটি দিয়েছেন। মা সকলকে মাছের পোলোয়া দেয় না। সকলের পেটে সয় না। তাই কাউকে মাছের ঝোল করে দেন।

“যার যা প্রকৃতি, যার যা ভাব, সে সেই ভাবটি নিয়ে থাকে।

“বারোয়ারিতে নানা মূর্তি করে, — আর নানা মতের লোক যায়। রাধা-কৃষ্ণ, হর-পার্বতী, সীতা-রাম; ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি রয়েছে, আর প্রত্যেক মূর্তির কাছে লোকের ভিড় হয়েছে। যারা বৈষ্ণব তারা বেশি রাধা-কৃষ্ণের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে। যারা শাক্ত তারা হর-পার্বতীর কাছে। যারা রামভক্ত তারা সীতা-রাম মূর্তির কাছে।

“তবে যাদের কোন ঠাকুরের দিকে মন নাই তাদের আলাদা কথা। বেশ্যা উপপতিকে ঝাঁটা মারছে, — বারোয়ারিতে এমন মূর্তিও করে। ও-সব লোক সেইখানে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখে, আর চিৎকার করে বন্ধুদের বলে, ‘আরে ও-সব কি দেখছিস, এদিকে আয়! এদিকে আয়!”

সকলে হাসিতেছেন। গোস্বামী প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চর্তুদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৯শে সেপ্টেম্বর 1884/09/19/iv

28.14 ছোকরা ভক্তদের সঙ্গে আনন্দ — মা-কালীর আরতিদর্শন ও চামর ব্যজন —

মায়ে-পোয়ে কথা — “কেন বিচার করাও”

বেলা পাঁচটা। ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারান্দায়। বাবুরাম, লাটু। মুখুজ্জে ভ্রাতৃদ্বয়, মাস্টার প্রভৃতি সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টার প্রভৃতির প্রতি) — কেন একঘেয়ে হব? ওরা বৈষ্ণব আর গোঁড়া, মনে করে আমাদের মতই ঠিক, আর সব ভুল। যে কথা বলেছি, খুব লেগেছে। (সহাস্যে) হাতির মাথায় অঙ্কুশ মারতে হয়। মাথায় নাকি ওদের কোষ থাকে। (সকলের হাস্য)

ঠাকুর এইবার ছোকরাদের সঙ্গে ফষ্টিনাষ্টি করতে লাগলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — আমি এদের (ছোকরাদের) কেবল নিরামিষ দিই না। মাঝে মাঝে আঁশ ধোয়া জল একটু একটু দিই। তা না হলে আসবে কেন।

মুখুজ্জেরা বারান্দা হইতে চলিয়া গেলেন। বাগানে একটু বেড়াইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — আমি জপ ... করতাম। সমাধি হয়ে যেত, কেমন এর ভাব?

মাস্টার (গম্ভীরবাবে) — আজ্ঞা, বেশ!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) সাধু! সাধু! — কিন্তু ওরা (মুখুজ্জেরা) কি মনে করবে?

মাস্টার — কেন কাপ্তেন তো বলেছিলেন, আপনার বালকের অবস্থা। ঈশ্বর-দর্শন করলে বালকের অবস্থা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আর বাল্য, পৌগণ্ড, যুবা। পৌগণ্ড অবস্থায় ফচকিমি করে, হয়তো খেউর মুখ দে বেরোয়। আর যুবা অবস্থায় সিংহের ন্যায় লোকশিক্ষা দেয়।

“তুমি না হয় ওদের (মুখুজ্জেদের) বুঝিয়ে দিও।”

মাস্টার — আজ্ঞা, আমার বোঝাতে হবে না। ওরা কি আর জানে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ ছোকরাদের সঙ্গে একটু আমোদ-আহ্লাদ করিয়া একজন ভক্তকে বলিতেছেন, “আজ অমাবস্যা, মার ঘরে যেও!”

সন্ধ্যার পর আরতির শব্দ শুনা যাইতেছে। ঠাকুর বাবুরামকে বলিতেছেন, “চল রে চল। কালীঘরে!” ঠাকুর বাবুরামের সঙ্গে যাইতেছেন — মাস্টারও সঙ্গে আছেন। হরিশ বারান্দায় বসিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন, “এর আবার বুঝি ভাব লাগলো।ম”

উঠান দিয়া চলিতে চলিতে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের আরতি একটু দেখিলেন। তৎপরেই মা-কালীর মন্দিরের অভিমুখে যাইতেছেন। যাইতে যাইতে হাত তুলিয়া জগন্মাতাকে ডাকিতেছেন — “ও মা! ও মা! ব্রহ্মময়ী!” মন্দিরের সম্মুখের চাতালে উপস্থিত হইয়া মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। মার আরতি হইতেছে। ঠাকুর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ও চামর লইয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন।

আরতি সমাপ্ত হইল। যাহারা আরতি দেখিতেছিলেন এককালে সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও মন্দিরের বাহিরে আসিয়া প্রণাম করিলেন। মহেন্দ্র মুখুজ্জে প্রভৃতি ভক্তেরাও প্রণাম করিলেন।

আজ অমাবস্যা। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। গরগর মাতোয়ারা! বাবুরামের হাত ধরিয়া মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে নিজের ঘরে ফিরিলেন।

ঘরের পশ্চিমের গোল বারান্দায় ফরাশ একটি আলো জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে। ঠাকুর সেই বারান্দায় আসিয়া একটু বসিলেন, মুখে 'হরি ওঁ! হরি ওঁ! হরি ওঁ'! ও তন্ত্রোক্ত নানাবিধ বীজমন্ত্র।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর ঘরের মধ্যে নিজের আসনে পূর্বাস্য হইয়া বসিয়াছেন।

[Origin of Language — The Philosophy of Prayer]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া মার সহিত কথা কহিতেছেন — বলিতেছেন, "মা, আমি বলব তবে তুমি করবে — এ কথাই নয়।

"কথা কওয়া কি? — কেবল ঈশারা বই তো নয়! কেউ বলছে, 'আমি খাব', — আবার কেউ বলছে, 'যা! আমি শুনব না।'

"আচ্ছা, মা! যদি না বলতাম 'আমি খাব' তাহলে কি যেমন খিদে তেমনি খিদে থাকত না? তোমাকে বললেই তুমি শুনবে, আর ভিতরটা শুধু ব্যাকুল হলে তুমি শুনবে না, — তা কখন হতে পারে।

“তুমি যা আছ তাই আছ — তবে বলি কেন — প্রার্থনা করি কেন?

“ও! যেমন করাও তেমনি করি।

“যা! সব গোল হয়ে গেল! — কেন বিচার করাও!”

ঠাকুর ঈশ্বরের সহিত কথা কহিতেছেন। — ভক্তেরা অবাক্‌ হইয়া শুনিতেছেন।

[সংস্কার ও তপস্যার প্রয়োজন — ভক্তদিগকে শিক্ষা — সাধুসেবা]

এইবার ভক্তদের উপর ঠাকুরের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — তাঁকে লাভ করতে হলে সংস্কার দরকার। একটু কিছু করে থাকা চাই। তপস্যা। তা এ জন্মেই হোক আর পূর্বজন্মেই হোক।

“দ্রৌপদীর যখন বস্ত্রহরণ করছিল, তাঁর ব্যাকুল হয়ে ক্রন্দন শুনে ঠাকুর দেখা দিলেন। আর বললেন — ‘তুমি যদি কারুকে কখনও বস্ত্র দান করে থাক, তো মনে করে দেখ — তবে লজ্জা নিবারণ হবে।’ দ্রৌপদী বললেন, ‘হাঁ, মনে পড়েছে। একজন ঋষি স্নান কচ্ছিলেন, — তাঁর কপ্‌নি ভেসে গিছলো। আমি নিজের কাপড়ের আধখানা ছিঁড়ে তাকে দিছলাম। ঠাকুর বললেন — তবে আর তোমার ভয় নাই’।”

মাস্টার ঠাকুরের আসনের পূর্বদিকে পাপোশে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — “তুমি ওটা বুঝেছ।”

মাস্টার — আজ্ঞা, সংস্কারের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — একবার বল দেখি, কি বললাম।

মাস্টার — দ্রৌপদী নাইতে গিছলেন ইত্যাদি। (হাজরার প্রবেশ)

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৯শে সেপ্টেম্বর 1884/09/19/v

28.15 হাজরা মহাশয়

হাজরা মহাশয় এখানে দুই বৎসর আছেন। তিনি ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুরের নিকটবর্তী সিওড় গ্রামে প্রথম তাঁহাকে দর্শন করেন, ১৮৮০ খ্রী:। এই গ্রামে ঠাকুরের ভাগিনেয়, পিসতুতো ভগিনী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র, শ্রীযুক্ত হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের বাস। ঠাকুর তখন হৃদয়ের বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

সিওড়ের নিকটবর্তী মরাগোড় গ্রামে হাজরা মহাশয়ের নিবাস। তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি, জমি প্রভৃতি একরকম আছে। পরিবার, সন্তান-সন্ততি আছে। একরকম চলিয়া যায়। কিছু দেনাও আছে, আন্দাজ হাজার টাকা।

যৌবনকাল হইতে তাঁহার বৈরাগ্যের ভাব — কোথায় সাধু, কোথায় ভক্ত, খুঁজিয়া বেড়ান। যখন দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়িতে প্রথম আসেন ও সেখানে থাকিতে চান ঠাকুর তাঁহার ভক্তিভাব দেখিয়া ও দেশের পরিচিত বলিয়া, ওখানে যত্ন করিয়া নিজের কাছে রাখেন।

হাজরার জ্ঞানীর ভাব। ঠাকুরের ভক্তিভাব ও ছোকরাদের জন্য ব্যাকুলতা পছন্দ করেন না। মাঝে মাঝে তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া মনে করেন। আবার কখনও সামান্য বলিয়া জ্ঞান করেন।

তিনি ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণ-পূর্বের বারান্দায় আসন করিয়াছেন। সেইখানেই মালা লইয়া অনেক জপ করেন। রাখাল প্রভৃতি ভক্তেরা বেশি জপ করেন না বলিয়া লোকের কাছে নিন্দা করেন।

তিনি আচারের বড় পক্ষপাতী। আচার আচার করিয়া তাঁহার একপ্রকার শুচিবাই হইয়াছে। তাঁহার বয়স প্রায় ৩৮ হইবে।

হাজরা মহাশয় ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুর আবার ঈষৎ ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন ও কথা কহিতেছেন।

[ঈশ্বর প্রার্থনা কি শুনেন? ঈশ্বরের জন্য ক্রন্দন কর, শুনবেন]

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি) — তুমি যা করছ তা ঠিক, — কিন্তু ঠিক ঠিক বসছে না।

“কারু নিন্দা করো না — পোকাটিরও না। তুমি নিজেই তো বল, লোমস মুনির কথা। যেমন ভক্তি প্রার্থনা করবে তেমনি ওটাও বলবে — ‘যেন কারু নিন্দা না করি’।”

হাজরা — (ভক্তি) প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — এক — শো — বার! যদি ঠিক হয় — যদি আন্তরিক হয়। বিষয়ী লোক যেমন ছেলে কি স্ত্রীর জন্য কাঁদে সেরূপ ঈশ্বরের জন্য কই কাঁদে?

[পূর্বকথা — স্ত্রীর অসুখে কামারপুকুরবাসীর থর থর কম্প]

“ও-দেশে একজনের পরিবারে অসুখ হয়েছিল। সারবে না মনে করে লোকটা থর থর করে কাঁপতে লাগলো — অজ্ঞান হয় আর কি!

“এরূপ ঈশ্বরের জন্য কে হচ্ছে!”

হাজরা ঠাকুরের পায়ের ধুলা লইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সঙ্কুচিত হইয়া) — “উগুনো কি?”

হাজরা — যাঁর কাছে আমি রয়েছি তাঁর পায়ের ধুলা লব না?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বরকে তুষ্ট কর, সকলেই তুষ্ট হবে। তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্। ঠাকুর যখন দ্রৌপদীর হাঁড়ির শাক খেয়ে বললেন, আমি তৃপ্ত হয়েছি, তখন

জগৎসুদ্ধ জীব তৃপ্ত — হেউ-ঢেউ হয়েছিল! কই মুনিরা খেলে কি জগৎ তুষ্ট হয়েছিল — হেউ-ঢেউ হয়েছিল?

ঠাকুর লোকশিক্ষার্থ কিছু কর্ম করতে হয়, এই কথা বলিতেছেন।

[পূর্বকথা — বটতলার সাধুর গুরুপাদুকা ও শালগ্রামপূজা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি) — জ্ঞানলাভের পরও লোকশিক্ষার জন্যে পূজাদি কর্ম রাখে।

"আমি কালীঘরে যাই, আবার ঘরের এই সব পট নমস্কার করি; তাই সকলে করে। তারপর অভ্যাস হয়ে গেলে যদি না করে তাহলে মন হুস্‌ফুস্‌ করবে।

"বটতলায় সন্ন্যাসীকে দেখলাম। যে আসনে গুরুপাদুকা রেখেছে তারই উপরে শালগ্রামও রেখেছে! ও পূজা করছে! আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'যদি এতদূর জ্ঞান হয়ে থাকে তবে পূজা করা কেন? সন্ন্যাসী বললে, — সবই করা যাচ্ছে — এ ও একটা করলাম। কখনও ফুলটা এ-পায়ে দিলাম; আবার কখনও একটা ফুল ও-পায়ে দিলাম।'

"দেহ থাকতে কর্মত্যাগ করবার জো নাই — পাঁক থাকতে ভুড়ভুড়ি হবেই।"১

[The three stages — শাস্ত্র, গুরুমুখ, সাধনা; Goal প্রত্যক্ষ]

(হাজরাকে) — "এক জ্ঞান থাকলেই অনেক জ্ঞানও আছে। শুধু শাস্ত্র পড়ে কি হবে?

“শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে — চিনিটুকু লওয়া বড় কঠিন। তাই শাস্ত্রের মর্ম সাধুমুখে গুরুমুখে শুনে নিতে হয়। তখন আর গ্রন্থের কি দরকার?

“চিঠিতে খবর এসেছে, — ‘পাঁচ সের সন্দেশ পাঠাইবা — আর একখানা রেলপেড়ে কাপড় পাঠাইবা।’ এখন চিঠিখানি হারিয়ে গেল। তখন ব্যস্ত হয়ে চারদিকে খোঁজে। অনেক খোঁজবার পর চিঠিখানি পেলে, পড়ে দেখে, — লিখেছে — ‘পাঁচ সের সন্দেশ আর একখানা রেলপেড়ে কাপড় পাঠাইবা।’ তখন চিঠিখানি আবার ফেলে দেয়। আর কি দরকার? এখন সন্দেশ আর কাপড়ের যোগাড় করলেই হল।

(মুখুজ্জে, বাবুরাম, মাস্টার প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি) — “সব সন্ধান জেনে তারপর ডুব দাও। পুকুরের অমুক জায়গায় ঘটিটা পড়ে গেছে, জায়গাটি ঠিক করে দেখে নিয়ে সেইখানে ডুব দিতে হয়।

“শাস্ত্রের মর্ম গুরুমুখে শুনে নিয়ে, তারপর সাধন করতে হয়। এই সাধন ঠিক হলে তবে প্রত্যক্ষ দর্শন হয়।

“ডুব দিলে তবে তো ঠিক ঠিক সাধন হয়! বসে বসে শাস্ত্রের কথা নিয়ে কেবল বিচার করলে কি হবে? শ্যালারা পথে যাবারই কথা — ওই নিয়ে মরছে — মর শ্যালারা, ডুব দেয় না!

“যদি বল ডুব দিলেও হাঙ্গর-কুমিরের ভয় আছে —— কাম-ক্রোধাদির ভয় আছে। —— হলুদ মেখে ডুব দাও —— তারা কাছে আসতে পারবে না। বিবেক-বৈরাগ্য হলুদ।”

১ ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ। গীতা, ১৮।১১
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ।।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৯শে সেপ্টেম্বর 1884/09/19/vi

28.16 পূর্বকথা —— শ্রীরামকৃষ্ণের পুরাণ, তন্ত্র ও বেদ মতের সাধনা

[পঞ্চবটী, বেলতলা ও চাঁদনির সাধন —— তোতার কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ —— ১৮৬৬]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — তিনি আমায় নানারূপ সাধন করিয়েছেন। প্রথম, পুরাণ মতের —— তারপর তন্ত্র মতের, আবার বেদ মতের। প্রথমে পঞ্চবটীতে সাধনা করতাম। তুলসী কানন হল —— তার মধ্যে বসে ধ্যান করতাম। কখনও ব্যাকুল হয়ে ‘মা! মা!’ বলে ডাকতাম —— বা ‘রাম! রাম!’ করতাম।

“যখন ‘রাম রাম’ করতাম তখন হনুমানের ভাবে হয়তো একটা ল্যাজ পরে বসে আছি! উন্মাদের অবস্থা। সে সময়ে পূজা করতে করতে গরদের কাপড় পরে আনন্দ হত — পূজারই আনন্দ!

“তন্ত্র মতের সাধনা বেলতলায়। তখন তুলসী গাছ — সজনের খাড়া — এক মনে হত!

“সে অবস্থায় শিবানীর উচ্ছিষ্ট — সমস্ত রাত্রি পড়ে আছে — তা সাপে খেলে কি কিসে খেলে তার ঠিক নাই — ওই উচ্ছিষ্টই আহার।

“কুকুরের উপর চড়ে তার মুখে লুচি দিয়ে খাওয়াতাম, আর নিজেও খেতাম। সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ। — মাটিতে জল জমবে তাই আচমন, আমি সে মাটিতে পুকুর থেকে জল দিয়ে আচমন কল্লাম।

“অবিদ্যাকে নাশ না করলে হবে না। আমি তাই বাঘ হতাম — হয়ে অবিদ্যাকে খেয়ে ফেলতাম!

“বেদমতে সাধনের সময় সন্ন্যাস নিলাম। তখন চাঁদনিতে পড়ে থাকতাম — হৃদুকে বলতাম, ‘আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, চাঁদনীতে ভাত খাব’!”

[সাধনকালে নানা দর্শন ও জগন্মাতার বেদান্ত, গীতা সম্বন্ধে উপদেশ]

(ভক্তদের প্রতি) — “হত্যা দিয়ে পরেছিলাম! মাকে বললাম, আমি মুখ্যু — তুমি আমায় জানিয়ে দাও — বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে — নানা শাস্ত্রে — কি আছে।

“মা বললেন, বেদান্তের সার — ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের কথা বেদে আছে, তাঁকে তন্ত্রে বলে, সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ — আবার তাঁকেই পুরাণে বলে, সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ।

“গীতা দশবার বললে যা হয়, তাই গীতার সার। অর্থাৎ ত্যাগী ত্যাগী!

“তাঁকে যখন লাভ হয়, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র — কত নিচে পড়ে থাকে। (হাজরাকে) তখন ওঁ উচ্চারণ করবার জো নাই। — এটি কেন হয়? সমাধি থেকে অনেক নেমে না এলে ওঁ উচ্চারণ করতে পারি না।

“প্রত্যক্ষ দর্শনের পার যা যা অবস্থা হয় শাস্ত্রে আছে, সে সব হয়েছিল। বালকবৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ, জড়বৎ।

“আর শাস্ত্রে যেরূপ আছে, সেরূপ দর্শনও হত।

“কখন দেখতাম জগৎময় আগুনের স্ফুলিঙ্গ!

“কখন চারিদিকে পারার হ্রদ, — ঝক্‌ঝক্ করছে। আবার কখনও রূপা গলার মতো দেখতাম।

“কখন দেখতাম রঙমশালের আলো যেন জ্বলছে!

“তাহলেই হল, শাস্ত্রের সঙ্গে ঐক্য হচ্ছে।”

[শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থা — নিত্যলীলাযোগ]

“আবার দেখালে, তিনিই জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন! ছাদে উঠে আবার সিঁড়িতে নামা। অনুলোম বিলোম।

“উঃ! কি অবস্থাতেই রেখেছে! — একটা অবস্থা যায় তো আর একটা আসে। যেন ঢেঁকির পাট। একদিক নিচু হয় তো আর-একদিক উঁচু হয়।

“যখন অন্তর্মুখ — সমাধিস্থ — তখনও দেখছি তিনি! আবার যখন বাহিরের জগতে মন এল, তখনও দেখছি তিনি।

“যখন আরশির এ-পিঠ দেখছি তখনও তিনি! আবার যখন উলটো পিঠ দেখছি তখনও তিনি।”

মুখুজ্জে ভ্রাতৃদ্বয়, বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তেরা অবাক্‌ হইয়া শুনিতেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৯শে সেপ্টেম্বর 1884/09/19/vii

28.17 পূর্বকথা — শম্ভু মল্লিকের অনাশক্তি — মহাপুরুষের আশ্রয়

শ্রীরামকৃষ্ণ (মুখুজ্জে প্রভৃতিকে) — কাপ্তেনের ঠিক সাধকের অবস্থা।

“ঐশ্বর্য থাকলেই যে তাতে আসক্ত হতেই হবে, এমন কিছু নয়। শম্ভু (মল্লিক) বলত, ‘হৃদু, পোঁটলা বেঁধে বসে আছি!’ আমি বলতাম কি অলক্ষণে কথা কও! —

“তখন শম্ভু বলে, ‘না, — বলো, এ-এব ফেলে যেন তাঁর কাছে যাই!’

“তাঁর ভক্তের ভয় নাই। ভক্ত তাঁর আত্মীয়। তিনি তাদের টেনে নেবেন। দুর্যোধনেরা গন্ধর্বের কাছে বন্দী হলে যুধিষ্ঠিরই উদ্ধার করলেন। বললেন, আত্মীয়দের ওরূপ অবস্থা হলে আমাদেরই কলঙ্ক।”

[ঠাকুরবাড়ির ব্রাহ্মণ ও পরিচারকগণ মধ্যে ভক্তিদান]

প্রায় নয়টা রাত্রি হইল। মুখুজ্জে ভ্রাতৃদ্বয় কলিকাতা ফিরিবার জন্য প্রস্তত হইতেছেন। ঠাকুর একটু উঠিয়া ঘরে ও বারান্দায় পাদচারণ করিতে করিতে বিষ্ণুঘরে উচ্চ সংকীর্তন হইতেছে শুনিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করাতে একজন ভক্ত বলিলেন, তাহাদের সঙ্গে লাটু ও হরিশ জুটিয়াছে। ঠাকুর বলিলেন, ও তাই!

ঠাকুর বিষ্ণুঘরে আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরাও আসিলেন। তিনি শ্রীশ্রীরাধাকান্তকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর দেখিলেন যে, ঠাকুরবাড়ির ব্রাহ্মণেরা — যারা ভোগ রাঁধে, নৈবেদ্য করে দেয়, অতিথিদের পরিবেশন করে এবং পরিচারকেরা, অনেকে একত্র মিলিত হইয়া নাম সংকীর্তন করিতেছে। ঠাকুর একটু দাঁড়াইয়া তাহাদের উৎসাহ বর্ধন করিলেন।

উঠানের মধ্য দিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় ভক্তদের বলিতেছেন —

“দেখো, এরা সব কেউ বেশ্যার বাড়ি যায়, কেউ বাসন মাজে!”

ঘরে আসিয়া ঠাকুর নিজ আসনে আবার বসিয়াছেন। যাঁহারা সংকীর্তন করিতেছিলেন, তাঁহারা আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর তাঁহাদিগকে বলিতেছেন — “টাকার জন্য যেমন ঘাম বার কর, তেমনি হরিনাম করে নেচে গেয়ে ঘাম বার করতে হয়।

“আমি মনে করলাম, তোমাদের সঙ্গে নাচব। গিয়ে দেখি যে ফোড়ন-টোড়ন সব পড়েছে — মেথি পর্যন্ত। (সকলের হাস্য) আমি কি দিয়ে সম্বরা করব।

“তোমরা মাঝে মাঝে হরিনাম করতে অমন এসো।”

মুখুজ্জে প্রভৃতি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুরের ঘরের ঠিক উত্তরের ছোট বারান্দাটির পাশে মুখুজ্জেদের গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়িতে বাতি জ্বালা হইয়াছে।

[ভক্ত বিদায় ও ঠাকুরের স্নেহ]

ঠাকুর এই বারান্দার চাতালের ঠিক উত্তর-পূর্ব কোণে উত্তরাস্য হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। একজন ভক্ত পথ দেখাইয়া একটি আলো আনিয়াছেন — ভক্তদের তুলিয়া দিবেন।

আজ অমাবস্যা — অন্ধকার রাত্রি। — ঠাকুরের পশ্চিমদিকে গঙ্গা, সম্মুখে নহবত, পুষ্পোদ্যান ও কুঠি, ঠাকুরের ডানদিকে সদর ফটকে যাইবার রাস্তা।

ভক্তেরা তাঁহার চরণে অবলুণ্ঠিত হইয়া একে একে গাড়িতে উঠিতেছেন। ঠাকুর একজন ভক্তকে বলিতেছেন — "ঈশানকে একবার বলো না — ওর কর্মের জন্য।"

গাড়িতে বেশি লোক দেখিয়া পাছে ঘোড়ার কষ্ট হয় — ঠাকুর বলিতেছেন — "গাড়িতে অত লোক কি ধরবে?"

ঠাকুর দাঁড়াইয়া আছেন। সেই ভক্তবৎসলমূর্তি দেখিতে দেখিতে ভক্তেরা কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c29 ২৯ শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে ও কলিকাতায় চৈতন্যলীলা-দর্শন

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২১শে সেপ্টেম্বর 1884/09/21/i

29.1 রাখাল, নারাণ, নিত্যগোপাল ও ছোটগোপালের সংবাদ

আজ রবিবার, (শুক্লা দ্বিতীয়া) ৬ই আশ্বিন, ১২৯১, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে অনেকগুলি ভক্ত সমবেত হইয়াছেন। রাম, মহেন্দ্র মুখুজ্জে, চুনিলাল, মাস্টার ইত্যাদি অনেকে আছেন।

চুনিলাল সবে শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়াছেন। সেখানে তিনি ও রাখাল বলরামের সঙ্গে গিয়াছিলেন। রাখাল ও বলরাম এখনও ফেরেন নাই। নিত্যগোপালও বৃন্দাবনে আছেন। ঠাকুর চুনিলালের সহিত বৃন্দাবনের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — রাখাল কেমন আছে?

চুনি — আজ্ঞে, তিনি এখন আছেন ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — নিত্যগোপাল আসবে না?

চুনি — বলরামবাবু বলেছেন, ভাল উপযুক্ত লোকের সঙ্গে পাঠিয়ে দেব। নাম দেন নাই।

ঠাকুর মহেন্দ্র মুখুজ্জের সঙ্গে নারাণের কথা কহিতে লাগিলেন। নারাণ স্কুলে পড়ে। ১৬।১৭ বৎসর বয়স। ঠাকুরের কাছে মাঝে মাঝে আসে। ঠাকুর বড় ভালবাসেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — খুব সরল; না?

'সরল' এইকথা বলিতে বলিতে ঠাকুর যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন।

মহেন্দ্র — আজ্ঞে হাঁ, খুব সরল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তার মা সেদিন এসেছিল। অভিমানী দেখে ভয় হল। তারপর তোমরা এখানে আসো, কাপ্তেন আসে, — এ-সব সেদিন দেখতে পেলে। তখন অবশ্য ভাবলে যে, শুধু নারাণ আসে আর আমি আসি, তা নয়। (সকলের হাস্য) মিছরি এ-ঘরে ছিল তা দেখে বললে, বেশ মিছরি! তবেই জানলে, খাবার-দাবার কোন অসুবিধা নাই।

"তাদের সামনে বুঝি বাবুরামকে বললুম, নারাণের জন্য আর তোর জন্য এই সন্দেশগুলি রেখে দে। তারপর গণির মা ওরা সব বললে, মা গো, নৌকাভাড়ার জন্য যা করে! আমায় বললে যে আপনি নারাণকে বলুন যাতে বিয়ে করে। সে কথায় বললুম, ও-সব অদৃষ্টের কথা। ওতে কথা দেব কেন? (সকলের হাস্য)

"ভাল করে পড়াশুনা করে না; তাই বললে, আপনি বলুন, যাতে ভাল করে পড়ে। আমি বললুম, পড়িস রে। তখন আবার বলে, একটু ভাল করে বলুন। (সকলের হাস্য)

(চুনির প্রতি) “হ্যাঁ গা, গোপাল আসে না কেন?”

চুনি — রক্ত আমেশা হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ওষুধ খাচ্ছে?

[থিয়েটার ও বেশ্যার অভিনয় — পূর্বকথা — বেলুনদর্শন ও শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন]

ঠাকুর আজ কলিকাতায় স্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দেখিতে যাইবেন। স্টার থিয়েটারে তখন যেখানে অভিনয় হইত, আজকাল সেখানে কোহিনূর থিয়েটার। মহেন্দ্র মুখুজ্জের সঙ্গে তাঁহার গাড়ি করিয়া অভিনয় দেখিতে যাইবেন। কোন্‌খানে বসিলে ভাল দেখা যায়, সেই কথা হইতেছে। কেউ কেউ বললেন, একটাকার সিটে বসলে বেশ দেখা যায়। রাম বললেন, কেন, উনি বক্সে বসবেন।

ঠাকুর হাসিতেছেন। কেহ কেহ বলিলেন, বেশ্যারা অভিনয় করে। চৈতন্যদেব, নিতাই এ-সব অভিনয় তারা করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদিগকে) — আমি তাদের মা আনন্দময়ী দেখব।

“তারা চৈতন্যদেব সেজেছে, তা হলেই বা। শোলার আতা দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়।

“একজন ভক্ত রাস্তায় যেতে যেতে দেখে, কতকগুলি বাবলাগাছ রয়েছে। দেখে ভক্তটি একেবারে ভাবাবিষ্ট। তার মনে হয়েছিল যে, ওই কাঠে শ্যামসুন্দর বাগানের কোদালের বেশ বাঁট হয়! অমনি শ্যামসুন্দরকে মনে পড়েছে! যখন গড়ের মাঠে বেলুন দেখতে আমায় নিয়ে গিয়েছিল, তখন একটি সাহেবের ছেলে একটা গাছে ঠেসান দিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেখাও যা, অমনি কৃষ্ণের উদ্দীপন হল; অমনি সমাধিস্থ হয়ে গেলাম!

“চৈতন্যদেব মেড়গাঁ দিয়ে যাচ্ছিলেন! শুনলেন, গাঁয়ের মাটিতে খোল তৈয়ার হয়! যাই শোনা অমনি ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন।

“শ্রীমতী মেঘ কি ময়ূরের কণ্ঠ দেখলে আর স্থির থাকতে পারতেন না। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন হয়ে বাহ্যশূন্য হয়ে যেতেন।”

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কথা কহিতেছেন — “শ্রীমতীর মহাভাব। গোপীপ্রেমে কোন কামনা নাই। ঠিক ভক্ত যে, সে কোন কামনা করে না। কেবল শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনা করে; কোন শক্তি কি সিদ্ধাই কিছু চায় না।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২১শে সেপ্টেম্বর 1884/09/21/ii

29.2 ন্যাংটাবাবার শিক্ষা — ঈশ্বরলাভের বিঘ্ন অষ্টসিদ্ধি

শ্রীরামকৃষ্ণ — সিদ্ধাই থাকা এক মহাগোল। ন্যাংটা আমায় শিখালে — একজন সিদ্ধ সমুদ্রের ধারে বসে আছে, এমন সময় একটা ঝড় এল। ঝড়ে তার কষ্ট হল বলে সে বললে, ঝড় থেমে যা। তার বাক্য মিথ্যা হবার নয়। একখানা জাহাজ পালভরে যাচ্ছিল। ঝড় হঠাৎ থামাও যা আর জাহাজ টুপ করে ডুবে গেল। এক জাহাজ লোক সেই সঙ্গে ডুবে গেলো। এখন এতগুলি লোক যাওয়াতে যে পাপ হল, সব ওর হলো। সেই পাপে সিদ্ধাইও গেল, আবার নরকও হলো।

“একটি সাধুর খুব সিদ্ধাই হয়েছিল, আর সেই জন্য অহংকারও হয়েছিল। কিন্তু সাধুটি লোক ভাল ছিল, আর তার তপস্যাও ছিল। ভগবান ছদ্মবেশে সাধুর বেশ ধরে একদিন তার কাছে এলেন। এসে বললেন, ‘মহারাজ! শুনেছি আপনার খুব সিদ্ধাই হয়েছে’। সাধু খাতির করে তাঁকে বসালেন। এমন সময়ে একটা হাতি সেখান দিয়ে যাচ্ছে। তখন নূতন সাধুটি বললেন, ‘আচ্ছা মহারাজ, আপনি মনে করলে এই হাতিটাকে মেরে ফেলতে পারেন?’ সাধু বললেন, ‘য়্যাসা হোনে শক্তা’। এই বলে ধুলো পড়ে হাতিটার গায়ে দেওয়াতে সে ছটফট করে মরে গেল। তখন যে সাধুটি এসেছে, সে বললে, ‘আপনার কি শক্তি! হাতিটাকে মেরে ফেললেন।’ সে হাসতে লাগল। তখন ও সাধুটি বললে, ‘আচ্ছা, হাতিটাকে আবার বাঁচাতে পারেন?’ সে বললে, ‘ওভি হোনে শক্তা হ্যায়।’ এই বলে আবার যাই ধুলো পড়ে দিলে, অমনি হাতিটা ধড়মড় করে উঠে পড়ল। তখন এ-সাধুটি বললে, ‘আপনার কি শক্তি! কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এই যে হাতি

মারলেন, আর হাতি বাঁচালেন, আপনার কি হল? নিজের কি উন্নতি হল? এতে কি আপনি ভগবানকে পেলেন?’ এই বলিয়া সাধুটি অন্তর্ধান হলেন।

“ধর্মের সূক্ষ্মা গতি। একটু কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না । ছুঁচের ভিতর সুতো যাওয়া একটু রোঁ থাকলে হয় না।

“কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, ভাই আমাকে যদি লাভ করতে চাও তাহলে অষ্টসিদ্ধির একটা সিদ্ধি থাকলে হবে না।

“কি জান? সিদ্ধাই থাকলে অহংকার হয়, ঈশ্বরকে ভুলে যায়।

“একজন বাবু এসেছিল —– ট্যারা। বলে, আপনি পরমহংস, তা বেশ, একটু স্বস্ত্যয়ন করতে হবে। কি হীনবুদ্দি। ‘পরমহংস’; আবার স্বস্ত্যয়ন করতে হবে। স্বস্ত্যয়ন করে ভাল করা, — সিদ্ধাই। অহংকারে ঈশ্বরলাভ হয় না। অহংকার কিরূপ হান? যেন উঁচু ঢিপি, বৃষ্টির জল জমে না, গড়িয়ে যায়। নিচু জমিতে জল জমে আর অঙ্কুর হয়; তারপর গাছ হয়; তারপর ফল হয়।”

[Love to all — ভালবাসায় অহংকার যায় —– তবে ঈশ্বরলাভ]

“হাজরাকে তাই বলি, আমি বুঝেছি, আর সব বোকা —– এ-বুদ্ধি করো না। সকলকে ভালবাসতে হয়। কেউ পর নয়। সর্বভূতেই সেই হরিই আছেন। তিনি ছাড়া কিছুই নাই। প্রহ্লাদকে ঠাকুর বললেন, তুমি বর নাও। প্রহ্লাদ বললেন, আপনার দর্শন পেয়েছি, আমার আর কিছু দরকার নাই। ঠাকুর ছাড়লেন না।

তখন প্রহ্লাদ বললেন, যদি বর দেবে, তবে এই বর দেও, আমায় যারা কষ্ট দিয়েছে তাদের অপরাধ না হয়।

“এর মানে এই যে, হরি একরূপে কষ্ট দিলেন। সেই লোকদের কষ্ট দিলে হরির কষ্ট হয়।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২১শে সেপ্টেম্বর 1884/09/21/iii

29.3 শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানোন্মাদ ও জাতি বিচার

[পূর্বকথা ১৮৫৭ — কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার পর জ্ঞানীপাগলদর্শন — হলধারী]

শ্রীরামকৃষ্ণ — শ্রীমতীর প্রেমোন্মাদ। আবার ভক্তি-উন্মাদ আছে। যেমন হনুমানের। সীতা আগুনে প্রবেশ করেছে দেখে রামকে মারতে যায়। আবার আছে জ্ঞানোন্মআদ। একজন জ্ঞানী পাগলের মতো দেখে ছিলাম। কালীবাড়ির সবে প্রতিষ্ঠার পর। লোকে বললে, রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসভার একজন। একপায়ে ছেঁড়া জুতা, হাতে কঞ্চি আর একটি ভাঁড়, আঁবচারা। গঙ্গায় ডুব দিলে। তারপর কালীঘরে গেল। হলধারী তখন কালীঘরে বসে আছে। তারপর মত্ত হয়ে স্তব করতে লাগল —

স্ফ্রোং স্ফ্রোং খট্টাঙ্গধারিণীম্‌ ইত্যাদি

“কুকুরের কাছে গিয়ে কান ধরে তার উচ্ছিষ্ট খেলে — কুকুর কিছু বলে নাই। আমারও তখন এই অবস্থা আরম্ভ হয়েছে। আমি হৃদের গলা ধরে বললাম, ওরে হৃদে, আমারও কি ওই দশা হবে?

“আমার উন্মাদ অবস্থা! নারায়ণ শাস্ত্রী এসে দেখলে, একটা বাঁশ ঘাড়ে করে বেরাচ্ছি। তখন সে লোকদের কাছে বললে ওহ্‌, উন্মস্ত্‌ হ্যায়। সে অবস্থায় জাত বিচার কিছু থাকতো না। একজন নীচ জাতি, তার মাগ শাক রেঁধে পাঠাতো, আমি খেতুম।

“কালীবাড়িতে কাঙালীরা খেয়ে গেল, তাদের পাতা মাথায় আর মুখে ঠেকালুম। হলধারী তখন আমায় বললে, তুই করছিস কি? কাঙালীদের এঁটো খেলি, তোর ছেলেপিলের বিয়ে হবে কেমন করে? আমার তখন রাগ হল। হলধারী আমার দাদা হয়। তাহলে কি হয়? তাকে বললাম, তবে রে শ্যালা, তুমি না গীতা, বেদান্ত পড়? তুমি না শিখাও ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা? আমার আবার ছেলেপুলে হবে তুমি ঠাউরেছ! তোর গীতাপাঠের মুখে আগুন!

(মাস্টারের প্রতি) — “দেখ, শুধু পড়াশুনাতে কিছু হয় না। বাজনার বোল লোকে মুখস্থ বেশ বলতে পারে, হাতে আনা বড় শক্ত!”

ঠাকুর আবার নিজের জ্ঞানোন্মাদ অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

[পূর্বকথা — মথুর সঙ্গে নবদ্বীপ — ঠাকুর চিনে শ্যাঁকারীর পায়ে ধরেন]

“সেজোবাবুর সঙ্গে কদিন বজরা করে হাওয়া খেতে গেলাম। সেই যাত্রায় নবদ্বীপেও যাওয়া হয়েছিল। বজরাতে দেখলাম মাঝিরা রাঁধছে। তাদের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, সেজোবাবু বললে, বাবা ওখানে কি করছ? আমি হেসে বললাম, মাঝিরা বেশ রাঁধছে। সেজোবাবু বুঝেছে যে, ইনি এবারে চেয়ে খেতে পারেন! তাই বললে বাবা সরে এসো সরে এসো!

“এখন কিন্তু আর পারি না। সে অবস্থা এখন নাই। এখন ব্রাহ্মণ হবে, আচারী হবে, ঠাকুরের ভোগ হবে, তবে ভাত খাব।

“কি অবস্থা সব গেছে! দেশে চিনে শ্যাঁকারী আর আর সমবয়সীদের বললাম, ওরে তোদের পায়ে পড়ি একবার হরিবোল বল! সকলের পায়ে পড়তে যাই! তখন চিনে বললে, ওরে তোর এখন প্রথম অনুরাগ তাই সব সমান বোধ হয়েছে। প্রথম ঝড় উঠলে যখন ধুলা উড়ে তখন আমগাছ তেঁতুলগাছ সব এক বোধ হয়। এটা আমগাছ এটা তেঁতুলগাছ চেনা যায় না।”

[শ্রীরামকৃষ্ণের মত কি সংসার না সর্বত্যাগ? কেশব সেনের সন্দেহ]

একজন ভক্ত — এই ভক্তি উন্মাদ, কি প্রেম উন্মাদ, কি জ্ঞান উন্মাদ, সংসারী লোকের হলে কেমন করে চলবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সংসারীভক্ত দৃষ্টে) — যোগী দুরকম। ব্যক্ত যোগী আর গুপ্ত যোগী। সংসারে গুপ্ত যোগী। কেউ তাকে টের পায় না। সংসারীর পক্ষে মনে ত্যাগ, বাহিরে ত্যাগ নয়।

রাম — আপনার ছেলে ভুলানো কথা। সংসারে জ্ঞানী হতে পারে বিজ্ঞানী হতে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — শেষে বিজ্ঞানী হয় হবে। জোর করে সংসারত্যাগ ভাল নয়।

রাম — কেশব সেন বলতেন, ওঁর কাছে লোকে অত যায় কেন? একদিন কুটুস করে কামড়াবেন, তখন পালিয়ে আসতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কুটুস করে কেন কামড়াব? আমি তো লোকদের বলি, এও কর, ওও কর; সংসারও কর; ঈশ্বরকেও ডাক। সব ত্যাগ করতে বলি না। (সহাস্যে) কেশব সেন একদিন লেকচার দিলে; বললে, 'হে ঈশ্বর, এই কর, যেন আমরা ভক্তিনদীতে ডুব দিতে পারি, আর ডুব দিয়ে যেন সচ্চিদানন্দ-সাগরে গিয়ে পড়ি'। মেয়েরা সব চিকের ভিতরে ছিল। আমি কেশবকে বললাম, একেবারে সবাই ডুব দিলে কি হবে! তাহলে এদের (মেয়েদের) দশা কি হবে? এক-একবার আড়ায় উঠো; আবার ডুব দিও, আবার উঠো! কেশব আর সকলে হাসতে লাগল। হাজরা বলে, তুমি রজোগুণী লোক বড় ভালবাস। যাদের টাকা-কড়ি মান-সম্ভ্রম, খুব আছে। তা যদি হল তবে হরিশ, নোটো ওদের ভালবাসি কেন? নরেন্দ্রকে কেন ভালবাসি? তার তো কলাপোড়া খাবার নুন নাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের বাহিরে আসিলেন ও মাস্টারের সহিত কথা কহিতে কহিতে ঝাউতলার দিকে যাইতেছেন। একটি ভক্ত গাড়ু ও গামছা লইয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। কলিকাতায় আজ চৈতন্যলীলা দেখিতে যাইবেন সেই কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি, পঞ্চবটীর নিকট) — রাম সব রজোগুণের কথা বলছে। এত বেশিদাম দিয়ে বসবার কি দরকার।

বক্সের টিকিট লইবার দরকার নাই ঠাকুর বলিতেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২১শে সেপ্টেম্বর 1884/09/21/iv

29.4 হাতিবাগানে ভক্তমন্দিরে —— শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখুজ্জের সেবা

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখুজ্জের গাড়ি করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতায় আসিতেছেন। রবিবার, ৬ই আশ্বিন, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪; আশ্বিন শুক্লা দ্বিতীয়া। বেলা ৫টা। গাড়ির মধ্যে মহেন্দ্র মুখুজ্জে, মাস্টার ও আরও দু-একজন আছেন। একটু যাইতে যাইতে ঈশ্বরচিন্তা করিতে করিতে ঠাকুর ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন।

অনেকক্ষণ পরে সমাধিভঙ্গ হইল। ঠাকুর বলিতেছেন, “হাজরা আবার আমায় শেখায়! শ্যালা!” কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতেছেন, “আমি জল খাব।” বাহ্য জগতে মন নামাইবার জন্য ঠাকুর ওই কথা প্রায়ই সমাধির পর বলিতেন।

মহেন্দ্র মুখুজ্জে (মাস্টারের প্রতি) — তাহলে কিছু খাবার আনলে হয় না?

মাস্টার — ইনি এখন খাবেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ) — আমি খাব; — বাহ্যে যাব।

মহেন্দ্র মুখুজ্জের হাতিবাগানে ময়দার কল আছে। সেই কলেতে ঠাকুরকে লইয়া যাইতেছেন। সেখানে একটু বিশ্রাম করিয়া স্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দেখিতে যাইবেন। মহেন্দ্রের বাড়ি বাগবাজার ৺মদনমোহনজীর মন্দিরে কিছু উত্তরে। পরমহংসদেবকে তাঁহার পিতাঠাকুর জানেন না। তাই মহেন্দ্র ঠাকুরকে বাড়িতে লইয়া যান নাই। তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা প্রিয়নাথও একজন ভক্ত।

মহেন্দ্রের কলে তক্তপোশের উপর সতরঞ্চি পাতা। তাহারই উপরে ঠাকুর বসিয়া আছেন ও ঈশ্বরের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টার ও মহেন্দ্রের প্রতি) — শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শুনতে শুনতে হাজরা বলে, এ-সব শক্তির লীলা — বিভু এর ভিতর নাই। বিভু ছাড়া শক্তি কখন হয়? এখানকার মত উলটে দেবার চেষ্টা!

[ব্রহ্ম বিভুরূপে সর্বভূতে — শুদ্ধভক্ত ষড়ৈশ্বর্য চায় না]

“আমি জানি, ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন জল আর জলের হিমশক্তি। অগ্নি আর দাহিকা শক্তি। তিনি বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন; তবে কোনওখানে বেশি শক্তির, কোনখানে কম শক্তির প্রকাশ। হাজরা আবার বলে, ভগবানকে পেলে তাঁর মতো ষড়ৈশ্বর্যশালী হয়, ষড়ৈশ্বর্য থাকবে ব্যবহার করুক আর না করুক।

মাস্টার — ষড়ৈশ্বর্য হাতে থাকা চাই। (সকলের হাস্য) শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — হাঁ, হাতে থাকা চাই! কি হীনবুদ্ধি! যে ঐশ্বর্য কখন ভোগ করে নাই, সেই ঐশ্বর্য ঐশ্বর্য করে অধৈর্য হয়। যে শুদ্ধভক্ত সে কখনও ঐশ্বর্য প্রার্থনা করে না।

কলবাড়িতে পান সাজা ছিল না। ঠাকুর বলিতেছেন, পানটা আনিয়েলও। ঠাকুর বাহ্যে যাইবেন। মহেন্দ্র গাড়ু করিয়া জল আনাইলেন ও নিজে গাড়ু হাতে করিলেন। ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া মাঠের দিকে লইয়া যাইবেন। ঠাকুর মণিকে সম্মুখে দেখিয়া মহেন্দ্রকে বলিলেন, "তোমার নিতে হবে না — এঁকে দাও?" মণি গাড়ু লইয়া ঠাকুরের সঙ্গে কলবাড়ির ভিতরের মাঠের দিকে গেলেন। মুখ ধোয়ার পর ঠাকুরকে তামাক সেজে দেওয়া হইল। ঠাকুর মাস্টারকে বলিতেছেন, সন্ধ্যা কি হয়েছে? তাহলে আর তামাকটা খাই না, "সন্ধ্যা হলে সর্ব কর্ম ছেড়ে হরি স্ম রণ করবে।" এই বলিয়া ঠাকুর হাতের লোম দেখিতেছেন — গনা যায় কি না। লোম যদি গনা না যায়, তাহা হইলে — সন্ধ্যা হইয়াছে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২১শে সেপ্টেম্বর 1884/09/21/v

29.5 নাট্যালয়ে চৈতন্যলীলা — শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ

[মাস্টার, বাবুরাম, নিত্যানন্দবংশের ভক্ত, মহেন্দ্র মুখুজ্জে, গিরিশ]

ঠাকুরের গাড়ি বিডন স্ট্রীটে স্টার থিয়েটারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। রাত প্রায় সাড়ে আটটা। সঙ্গে মাস্টার, বাবুরাম, মহেন্দ্র মুখুজ্জে ও আরও দু-একটি ভক্ত। টিকিট কিনিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। নাট্যালয়ের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ কয়েকজন কর্মচারী সঙ্গে ঠাকুরের গাড়ির কাছে আসিয়াছেন অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে সাদরে উপরে লইয়া গেলেন। গিরিশ পরমহংসদেবের নাম শুনিয়াছেন। তিনি চৈতন্যলীলা অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়াছেন, শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছেন। ঠাকুরকে দক্ষিণ-পশ্চিমের বক্সে বসানো হইল। ঠাকুরের পার্শ্বে মাস্টার বসিলেন। পশ্চাতে বাবুরাম, আরও দু-একটি ভক্ত।

নাট্যালয় আলোকাকীর্ণ। নিচে অনেক লোক। ঠাকুরের বামদিকে ড্রপসিন দেখা যাইতেছে। অনেকগুলি বক্সে লোক হইয়াছে। এক-একজন বেহারা নিযুক্ত, বক্সের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া হাওয়া করিতেছে। ঠাকুরকে হাওয়া করিতে গিরিশ বেহারা নিযুক্ত করিয়া গেলেন।

ঠাকুর নাট্যালয় দেখিয়া বালকের ন্যায় আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি, সহাস্যে) — বাঃ, এখান বেশ! এসে বেশ হল। অনেক লোক একসঙ্গে হলে উদ্দীপন হয়। তখন ঠিক দেখতে পাই, তিনিই সব হয়েছেন।

মাস্টার — আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এখানে কত নেবে?

মাস্টার — আজ্ঞা, কিছু নেবে না। আপনি এসেছেন ওদের খুব আহ্লাদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সব মার মাহাত্ম্য!

ড্রপসিন উঠিয়া গেল। এককালে দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি রঙ্গমঞ্চের উপর পড়িল। প্রথমে, পাপ আর ছয় রিপুর সভা। তারপর বনপথে বিবেক, বৈরাগ্য ও ভক্তির কথাবার্তা।

ভক্তি বলিতেছেন, গৌরাঙ্গ নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাই বিদ্যাধরীগণ আর মুনিঋষিগণ ছদ্মবেশে দর্শন করিতে আসিতেছেন।

ধন্য ধরা নদীয়ায় এলো গোরা।

দেখ, দেখ না বিমানে বিদ্যাধরীগণে, আসিতেছে হরি দরশনে।

দেখ, প্রেমানন্দে হইয়া বিভোল, মুনি ঋষি আসিছে সকল।

বিদ্যাধরীগণ আর মুনিঋষিরা গৌরাঙ্গকে ভগবানে অবতারজ্ঞানে স্তব করিতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের দেখিয়া ভাবে বিভোর হইতেছেন। মাস্টারকে বলিতেছেন, আহা! কেমন দেখো!

বিদ্যাধরীগণ ও মুনিঋষিগণ গান করিয়া স্তব করিতেছেন:

পুরুষগণ — কেশব কুরু করুণা দীনে, কুঞ্জকাননচারী।

স্ত্রীগণ — মাধব মনোমোহন মুহন মুরলীধারী।

সকলে —— হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার ।

পুরুষগণ —— ব্রজকিশোর কালীয়হর কাতর-ভয়-ভঞ্জন।

স্ত্রীগণ —— নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকা হৃদিরঞ্জন।

পুরুষগণ —— গোবর্ধনধারণ, বনকুসুমভূষণ, দামোদের কংসদর্পহারী।

স্ত্রীগণ —— শ্যাম রাসরসবিহারী।

সকলে —— হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার।

বিদ্যাধরীগণ যখন গাইলেন ——

নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকা-হৃদিরঞ্জন’

তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর-সমাধি-মধ্যে মগ্ন হইলেন। কনসার্ট (ঐকতানবাদ্য) হইতেছে। ঠাকুরের কোন হুঁশ নাই।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২১শে সেপ্টেম্বর 1884/09/21/vi

29.6 চৈতন্যলীলাদর্শন — গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণ

জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে অতিথি আসিয়াছেন। বালক নিমাই সদানন্দে সমবয়স্যদের সহিত গান গাহিয়া বেড়াইতেছেন:

কাঁহা মেরা বৃন্দাবন, কাঁহা যশোদা মাই।
কাঁহা মেরা নন্দ পিতা, কাঁহা বলাই ভাই ।।
কাঁহা মেরি ধবলী শ্যামলী, কাঁহা মেরি মোহন মুরলী।
শ্রীদাম সুদাম রাখালগণ কাঁহা মে পাই ।।
কাঁহা মেরি যমুনাতট, কাঁহা মেরি বংশীবট।
কাঁহা গোপনারী মেরি, কাঁহা হামারা রাই ।।

অতিথি চক্ষু বুজিয়া ভগবানকে অন্ন নিবেদন করিতেছেন। নিমাই দৌড়িয়া গিয়া সেই অন্ন ভক্ষণ করিতেছেন। অতিথি ভগবান বলিয়া তাঁহাকে জানিতে পারিলেন ও দশাবতারের স্তব করিয়া প্রসন্ন করিতেছেন। মিশ্র ও শচীর কাছে বিদায় লইবার সময় তিনি আবার গান করিয়া স্তব করিতেছেন —

জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র জয় ভবতারণ।
অনাথত্রাণ জীবপ্রাণ ভীতভয়বারণ ।।
যুগে যুগে রঙ্গ, নব লীলা নব রঙ্গ,
নব তরঙ্গ নব প্রসঙ্গ ধরাভার ধারণ।
তাপহারী প্রেমবারি, বিতর রাসরসবিহারী,
দীনআশ-কলুষনাশ দুষ্ট-ত্রাসকারণ।

স্তব শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আবার ভাবে বিভোর হইতেছেন।

নবদ্বীপের গঙ্গাতীর — গঙ্গাস্নানের পর ব্রাহ্মণেরা, মেয়ে পুরুষ ঘাটে বসিয়া পূজা করিতেছেন। নিমাই নৈবেদ্য কাড়িয়া খাইতেছেন। একজন ব্রাহ্মণ ভারী রেগে গেলেন, আর বললেন, আরে বেল্লিক! বিষ্ণুপূজার নৈবিদ্যি কেড়ে নিচ্ছিস — সর্বনাশ হবে তোর! নিমাই তবুও কেড়ে নিলেন, আর পলায়ন করিতে উদ্যত হইলেন। অনেক মেয়েরা ছেলেটিকে বড় ভালবাসে। নিমাই চলে যাচ্ছে দেখে তাদের প্রাণে সইল না। তারা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল, নিমাই, ফিরে আয়; নিমাই ফিরে আয়। নিমাই শুনিলেন না।

একজন নিমাইকে ফিরাইবার মহামন্ত্র জানিতেন। তিনি "হরিবোল হরিবোল" বলিতে লাগিলেন। অমনি নিমাই 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতে বলিতে ফিরিলেন।

মণি ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। বলিতেছেন, আহা!

ঠাকুর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। 'আহা' বলিতে বলিতে মণির দিকে তাকাইয়া প্রেমাশ্রু বির্সজন করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বাবুরাম ও মাস্টারকে) — দেখ, যদি আমার ভাব কি সমাধি হয়, তোমরা গোলমাল করো না। ঐহিকেরা ঢঙ মনে করবে।

নিমাই-এর উপনয়ন। নিমাই সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন। শচী ও প্রতিবাসিনিগণ চতুর্দিকে দাঁড়াইয়া। নিমাই গান গাইয়া ভিক্ষা করিতেছেন:

দে গো ভিক্ষা দে।

আমি নূতন যোগী ফিরি কেঁদে কেঁদে।

ওগো ব্রজবাসী তোদের ভালবাসি,

ওগো তাইতো আসি, দেখ মা উপবাসী।

দেখ মা দ্বারে যোগী বলে 'রাধে রাধে'।

বেলা গেল যেতে হবে ফিরে,

একাকী থাকি মা যমুনাতীরে

আঁখিনীরে মিশে নীরে,

চলে ধীরে ধীরে ধারা মৃদু নাদে।

সকলে চলিয়া গেলেন। নিমাই একাকী আছেন। দেবগণ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বেশে তাঁহাকে স্তব করিতেছেন।

পুরুষগণ — চন্দ্রকিরণ অঙ্গে, নমো বামনরূপধারী।

স্ত্রীগণ — গোপীগণ মনোমোহন, মঞ্জুকুঞ্জচারী।

নিমাই — জয় রাধে শ্রীরাধে।

পুরুষগণ — ব্রজবালক সঙ্গ, মদন মান ভঙ্গ।

স্ত্রীগণ — উন্মাদিনী ব্রজকামিনী, উন্মাদ তরঙ্গ।

পুরুষগণ — দৈত্যছলন, নারায়ণ, সুরগণভয়হারী।

স্ত্রীগণ — ব্রজবিহারী গোপনারী-মান-ভিখারী।

নিমাই — জয় রাধে শ্রীরাধে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই গান শুনিতে শুনিতে সমাধিস্থ হইলেন। যবনিকা পতন হইল। কনসার্ট বাজিতেছে।

[“সংসারী লোক দুদিক রাখতে বলে” — গঙ্গাদাস ও শ্রীবাস]

অদ্বৈতের বাটীর সম্মুখে শ্রীবাসাদি কথা কহিতেছেন। মুকুন্দ মধুর কণ্ঠে গান গাইতেছেন:

আর ঘুমাইও না মন। মায়াঘোরে কতদিন রবে অচেতন।
কে তুমি কি হেতু এলে, আপনারে ভুলে গেলে
চাহরে নয়ন মেলে ত্যজ কুস্বপন ।।
রয়েছো অনিত্য ধ্যানে নিত্যানন্দ হের প্রাণে,
তম পরিহরি হের তরুণ তপন ।।

মুকুন্দ বড় সুকণ্ঠ। শ্রীরামকৃষ্ণ মণির নিকট প্রশংসা করিতেছেন।

নিমাই বাটীতে আছেন। শ্রীবাস দেখা করিতে আসিয়াছেন। আগে শচির সঙ্গে দেখা হইল। শচী কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন, পুত্র আমার গৃহধর্মে মন দেয় না।

‘যে অবধি গেছে বিশ্বরূপ,
প্রাণ মম কাঁপে নিরন্তর, পাছে হয় নিমাই সন্ন্যাসী।’

এমন সময় নিমাই আসিতেছেন। শচী শ্রীবাসকে বলিতেছেন —

‘আহা দেখ দেখ পাগলের প্রায়,

আঁখিনীরে বুক ভেসে যায়, বল বল এ ভাব কেমনে যাবে?’

নিমাই শ্রীবাসকে দেখিয়া তাঁহার পায়ে জড়াইয়া কাঁদিতেছেন — আর বলিতেছেন —

কই প্রভু কই মম কৃষ্ণভক্তি হলো,
অধম জনম বৃথা কেটে গেল।
বল প্রভু, কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কোথা পাব,
দেহ পদধূলি বনমালী যেন পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারের দিকে তাকাইয়া কথা কহিতে যাইতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। গদগদ স্বর! গণ্ডদেশ নয়নজলে ভাসিয়া গেল। একদৃষ্টে দেখিতেছেন, নিমাই শ্রীবাসের পা জড়াইয়া রহিয়াছেন। আর বলিতেছেন, ‘কই প্রভু কৃষ্ণভক্তি তো হল না।’

এদিকে নিমাই পড়ুয়াদের আর পড়াইতে পারিতেছেন না। গঙ্গাদাসের কাছে নিমাই পড়িয়াছিলেন। তিনি নিমাইকে বুঝাইতে আসিয়াছেন। শ্রীবাসকে বলিলেন — শ্রীবাস ঠাকুর, আমরাও ব্রাহ্মণ, বিষ্ণুপূজা করে থাকি, আপনারা মিলে দেখছি সংসারটা ছারখার করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারকে) — এ সংসারীর শিক্ষা — এও কর, ওও কর। সংসারী যখন শিক্ষা দেয়, তখন দুদিক রাখতে বলে।

মাস্টার — আজ্ঞা, হাঁ।

গঙ্গাদাস নিমাইকে আবার বুঝাইতেছেন — ‘ওহে নিমাই, তোমার তো শাস্ত্রজ্ঞান হয়েছে? তুমি আমার সঙ্গে তর্ক কর। সংসারধর্ম অপেক্ষা কোন্ ধর্ম প্রধান, আমায় বোঝাও। তুমি গৃহী, গৃহীর মতো আচার না করে অন্য আচার কেন কর?’

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারকে) — দেখলে? দুইদিক রাখতে বলছে!

মাস্টার — আজ্ঞা, হাঁ।

নিমাই বলিলেন, আমি ইচ্ছা করে সংসারধর্ম উপেক্ষা করি নাই; আমার বরং ইচ্ছা যাতে সব বজায় থাকে। কিন্তু —

প্রভু কোন্ হেতু কিছু নাহি জানি,
প্রাণ টানে কি করি কি করি,
ভাবি কুলে রই, কুলে আর রহিতে না পারি,
প্রাণ ধায় বুঝালে না ফেরে,
সদা চায় ঝাঁপ দিতে অকুল পাথারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আহা!
পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২১শে সেপ্টেম্বর 1884/09/21/vii

29.7 নাট্যালয়ে নিত্যানন্দবংশ ও শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দীপন

[মাস্টার, বাবুরাম, খড়দার নিত্যানন্দবংশের গোস্বামী]

নবদ্বীপে নিত্যানন্দ আসিয়াছেন, তিনি নিমাইকে খুঁজিতেছেন এমন সময় নিমাই-এর সহিত দেখা হইল। নিমাইও তাঁহাকে খুঁজিতেছিলেন। মিলনের পর নিমাই বলিতেছেন —

সার্থক জীবন; সত্য মম ফলেছে স্বপন;
লুকাইলে স্বপ্নে দেখা দিয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারকে গদ্‌গদ স্বরে) — নিমাই বলছে, স্বপ্নে দেখেছি!

শ্রীবাস ষড়্‌ভুজ দর্শন করছেন, আর স্তব করছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া ষড়্‌ভুজ দর্শন করিতেছেন।

গৌরাঙ্গের ঈশ্বর আবেশ হইয়াছে। তিনি অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরিদাস ইত্যাদির সহিত ভাবে কথা কহিতেছেন।

গৌরাঙ্গের ভাব বুঝিতে পারিয়া নিতাই গান গাইতেছেন:

কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণ সই!
দে রে কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণ এনে দে, রাধা জানে কি গো কৃষ্ণ বই।

শ্রীরামকৃষ্ণ গান শুনিতে শুনিতে সমাধিস্থ হইলেন। অনেকক্ষণ ওইভাবে রহিলেন। কনসার্ট চলিতে লাগিল। ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। ইতিমধ্যে খড়দার নিত্যানন্দ গোস্বামীর বংশের একটি বাবু আসিয়াছেন ও ঠাকুরের চেয়ারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন। বয়স ৩৪/৩৫ হইবে। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহার হাত ধরিয়া কত কথা কহিতেছেন। মাঝে মাঝে তাঁহাকে বলিতেছেন, "এখানে বসো না; তুমি এখানে থাকলে খুব উদ্দীপন হয়।" সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া যেন খেলা করিতেছেন। সস্নেহে মুখে হাত দিয়া আদর করিতেছেন।

গোস্বামী চলিয়া গেলে মাস্টারকে বলিতেছেন, "ও বড় পণ্ডিত, বাপ বড় ভক্ত। আমি খড়দার শ্যামসুন্দর দেখতে গেলে, যে ভোগ একশ টাকা দিলে পাওয়া যায় না সেই ভোগ এনে আমায় খাওয়ায়।

"এর লক্ষণ বড় ভাল; একটু নেড়েচেড়ে দিলে চৈতন্য হয়। ওকে দেখতে দেখতে বড় উদ্দীপন হয়। আর একটু হলে আমি দাঁড়িয়া পড়তুম।"

গোস্বামীকে দেখিতে দেখিতে আর একটু হলে ঠাকুরের ভাবসমাধি হইত; এই কথা বলিতেছেন।

যবনিকা উঠিয়া গেল। রাজপথে নিত্যানন্দ মাথায় হাত দিয়া রক্তস্রোত বন্ধ করিতেছেন। মাধাই কলসির কানা ছুঁড়িয়া মারিয়াছেন; নিতাইয়ের ভ্রূক্ষেপ নাই। গৌরপ্রেমে গরগর মাতোয়ারা! ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। দেখিতেছেন, নিতাই জগাই মাধাইকে কোল দিবেন। নিতাই বলিতেছেন:

প্রাণ ভরে আয় হরি বলি, নেচে আয় জগাই মাধাই।

মেরেছ বেশ করেছ, হরি বলে নাচ ভাই ।।

বলরে হরিবোল; প্রেমিক হরি প্রেমে দিবে কোল।

তোল রে তোল হরিনামের রোল ।।

পাওনি প্রেমের স্বাদ, ওরে হরি বলে কাঁদ, হেরবি হৃদয় চাঁদ।

ওরে প্রেমে তোদের নাম বিলাব, প্রেমে নিতাই ডাকে তাই ।।

এইবার নিমাই শচীকে সন্ন্যাসের কথা বলিতেছেন।

শচী মূর্ছিতা হইলেন। মূর্ছা দেখিয়া দর্শকবৃন্দ অনেকে হাহাকার করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন; কেবল নয়নের কোণে একবিন্দু জল দেখা দিয়াছে!

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২১শে সেপ্টেম্বর 1884/09/21/viii

29.8 গৌরাঙ্গপ্রেমে মাতোয়ারা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

অভিনয় সমাপ্ত হইল। ঠাকুর গাড়িতে উঠিতেছেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন দেখলেন? ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আসল নকল এক দেখলাম।”

গাড়ি মহেন্দ্র মুখুজ্জের কলে যাইতেছে। হঠাৎ ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রেমভরে আপনা-আপনি বলিতেছেন, —

“হা কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! জ্ঞান কৃষ্ণ! প্রাণ কৃষ্ণ! মন কৃষ্ণ! আত্মা কৃষ্ণ! দেহ কৃষ্ণ!” আবার বলিতেছেন, “প্রাণ হে গোবিন্দ, মম জীবন!”

গাড়ি মুখুজ্জেদের কলে পোঁছিল। অনেক যত্ন করিয়া মহেন্দ্র ঠাকুরকে খাওয়াইলেন। মণি কাছে বসিয়া। ঠাকুর সস্নেহে তাঁহাকে বলিতেছেন, তুমি কিছু খাও না। হাতে করিয়া মেঠাই প্রসাদ দিলেন।

এইবার শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়িতে যাইতেছেন। গাড়িতে মহেন্দ্র মুখুজ্জে আরও দু-তিনটি ভক্ত। মহেন্দ্র খানিকটা এগিয়ে দেবেন। ঠাকুর আনন্দে যাইতেছেনও গান আরম্ভ করিলেন।

গৌর নিতাই তোমরা দু ভাই।

মণি সঙ্গে সঙ্গে গাইতেছেন।

মহেন্দ্র তীর্থে যাইবেন। ঠাকুরের সহিত সেই সব কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেন্দ্রের প্রতি, সহাস্যে) — প্রেমের অঙ্কুর না হতে হতে সব শুকিয়ে যাবে।

“কিন্তু শীঘ্র এস। আহা অনেকদিন থেকে তোমার বাড়িতে যাব মনে করেছিলাম, তা একবার দেখা হল বেশ হল।”

মহেন্দ্র —— আজ্ঞা, জীবন সার্থক হল!

শ্রীরামকৃষ্ণ —— সার্থক তো আছেনই। আপনার বাপও বেশ! সেদিন দেখলাম; অধ্যাত্মে বিশ্বাস।

মহেন্দ্র —— আজ্ঞা, কৃপা রাখবেন যেন ভক্তি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— তুমি খুব উদার সরল। উদার সরল না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। কপটতা থেকে অনেক দূর।

মহেন্দ্র শ্যামবাজারের কাছে বিদায় লইলেন। গাড়ি চলিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — যদু মল্লিক কি করলে?

মাস্টার (স্বগত) — ঠাকুর সকলের মঙ্গলের জন্য ভাবিতেছেন। চৈতন্যদেবের ন্যায় ইনিও কি ভক্তি শিখাইতে দেহধারণ করিয়াছেন?

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c30 ৩০ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে শ্রীরামকৃষ্ণ -- দুর্গাপূজা দিবসে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৬শে সেপ্টেম্বর 1884/09/26/i

30.1 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে

[মাস্টার, হাজরা, বিজয়, শিবনাথ, কেদার]

শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতা নগরীতে আগমন করিয়াছেন। সপ্তমীপূজা, শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুরের অনেকগুলি কাজ। শারদীয় মহোৎসব — রাজধানীমধ্যে হিন্দুর প্রায় ঘরে ঘরে আজ মায়ের সপ্তমী পূজা আরম্ভ। ঠাকুর অধরের বাড়ি প্রতিমাদর্শন করিবেন ও আনন্দময়ীর আনন্দোৎসবে যোগদান করিবেন। আর একটি সাধ, শ্রীযুক্ত শিবনাথকে দর্শন করিবেন।

বেলা আন্দাজ দুই প্রহর হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ফুটপাথের উপর একটি ছাতি হাতে করিয়া মাস্টার পাদচারণ করিতেছেন। একটা বাজিল, দুইটা বাজিল,

ঠাকুর আসিলেন না। শ্রীযুক্ত মহলানবিশের ডিস্পেনসারির ধাপে মাঝে মাঝে বসিতেছেন; দুর্গাপূজা উপলক্ষে ছেলেদের আনন্দ ও আবালবৃদ্ধ সকলের ব্যস্তভাব দেখিতেছেন।

বেলা তিনটা বাজিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরের গাড়ি আসিয়া উপস্থিত। গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়াই সমাজমন্দির দৃষ্টে ঠাকুর করজোড়ে প্রণাম করিলেন। সঙ্গে হাজরা ও আর দুই-একটি ভক্ত। মাস্টার ঠাকুরের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "আমি শিবনাথের বাড়ি যাইব।" ঠাকুরের আগমনবার্তা শুনিয়া দেখিতে দেখিতে কয়েকটি ব্রাহ্মভক্ত আসিয়া জুটিলেন। তাঁহারা ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া ব্রাহ্মপাড়ার মধ্যে শিবনাথের বাড়ির দ্বারদেশে তাঁহাকে লইয়া গেলেন। শিবনাথ বাড়িতে নাই। কি হইবে? দেখিতে দেখিতে শ্রীযুক্ত বিজয় (গোস্বামী), শ্রীযুক্ত মহলানবিশ ইত্যাদি ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষেরা উপস্থিত হইলেন ও ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া সমাজমন্দিরমধ্যে লইয়া গেলেন। ঠাকুর একটু বসুন — ইতিমধ্যে শিবনাথ আসিয়া পড়িলেও পড়িতে পারেন।

ঠাকুর আনন্দময়, সহাস্যবদনে আসন গ্রহণ করিলেন। বেদীর নিচে যে স্থানে সংকীর্তন হয়ে সেই স্থানে বসিবার আসন করিয়া দেওয়া হইল। বিজয়াদি অনেকগুলি ব্রাহ্মভক্ত সম্মুখে বসিলেন।

[সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও সাইনবোর্ড সাকার-নিরাকার — সমন্বয়]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়কে, সহাস্যে) — শুনলাম, এখানে নাকি সাইনবোর্ড আছে। অন্য মতের লোক নাকি এখানে আসবার জো নাই! নরেন্দ্র বললে, সমাজে গিয়ে কাজ নাই, শিবনাথের বাড়িতে যেও।

“আমি বলি সকলেই তাঁকে ডাকছে। দ্বেষাদ্বেষীর দরকার নাই। কেউ বলছে সাকার, কেউ বলছে নিরাকার। আমি বলি, যার সাকারে বিশ্বাস, সে সাকারই চিন্তা করুক। যার নিরাকারে বিশ্বাস, সে নিরাকারেই চিন্তা করুক। তবে এই লা যে, মতুয়ার বুদ্ধি (Dogmatism) ভাল নয়, অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক আর সকলের ভুল। আমার ধর্ম ঠিক; আর ওদের ধর্ম ঠিক কি ভুল, সত্য কি মিথ্যা; এ আমি বুঝতে পাচ্ছিনে —— এ-সব ভাল। কেননা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না করলে তাঁর স্বরূপ বুঝা যায় না। কবীর বলত, ‘সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ। কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী।’

“হিন্দু, মুসলামান, খ্রীষ্টান, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা —— সকলেই এক বস্তুকে চাহিছো। তবে যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ ব্যবস্থা করেছেন। মা যদি বাড়িতে মাছ আনেন, আর পাঁচটি ছেলে থাকে, সকলকেই পোলাও কালিয়া করে দেন না। সকলের পেট সমান নয়। কারু জন্য মাছের ঝোলের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মা সকলকেই সমান ভালবাসেন।

“আমার ভাব কি জানো? আমি মাছ সবরকম খেতে ভালবাসি। আমার মেয়েলি স্বভাব! (সকলের হাস্য) আমি মাছ ভাজা, হলুদ দিয়ে মাছ, টকের মাছ,

বাটি-চচ্চড়ি — এ-সব তাতেই আছি। আবার মুড়িঘন্টোতেও আছে, কালিয়া পোলোয়াতেও আছি। (সকলের হাস্য)

“কি জানো? দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্তু সব মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি করে একটা মত আশ্রয় কল্লে তাঁর কাছে পোঁছানো যায়। যদি কোন মত আশ্রয় করে তাতে ভুল থাকে আন্তরিক হলে তিনি সে ভুল শুধরিয়ে দেন। যদি কেউ আন্তরিক জগন্নাথদর্শনে বেরোয়, আর ভুলে দক্ষিণদিকে না গিয়ে উত্তরদিকে যায়, তাহলে অবশ্য পথে কেউ বলে দেয় ওহে, ওদিকে যেও না — দক্ষিণদিকে যাও। সে ব্যক্তি কখনও না কখনও জগন্নাথদর্শন করবে।

“তবে অন্যের মত ভুল হয়েছে, এ-কথা আমাদের দরকার নাই। যাঁর জগৎ, তিনি ভাবছেন। আমাদের কর্তব্য, কিসে জো সো করে জগন্নাথদর্শন হয়। তা তোমাদের মতটি বেশ তো। তাঁকে নিরাকার বলছ, এ তো বেশ। মিছরির রুটি সিধে করে খাও, আর আড় করে খাই, মিষ্টি লাগবে।

“তবে মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়। তুমি বহুরূপির গল্প শুনেছ। একজন বাহ্যে কত্তে গিয়ে গাছের উপর বহুরূপী দেখেছিল, বন্ধুদের কাছে এসে বললে, আমি একটি লাল গিরগিটি দেখে এলুম। তার বিশ্বাস, একবারে পাকা লাল। আর-একজন সেই গাছতলা থেকে এসে বললে যে আমি একটি সবুজ গিরগিটি দেখে এলুম। তার বিশ্বাস একেবারে পাকা সবুজ। কিন্তু যে গাছতলায় বাস কত্তো, সে এসে বললে, তোমরা যা বলছো সব ঠিক তবে জানোয়ারটি কখন লাল কখন সবুজ, কখন হলদে, আবার কখন কোন রঙ থাকে না।

“বেদে তাঁকে সগুণ নির্গুণ দুই বলা হয়েছে। তোমরা নিরাকার বলছো। একঘেয়ে। তা হোক। একটা ঠিক জানলে, অন্যটাও জানা যায়। তিনিই জানিয়ে দেন। তোমাদের এখানে যে আসে, সে এঁকেও জানে ওঁকেও জানে। ” (দুই-একজন ব্রাহ্মভক্তের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ)

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৬শে সেপ্টেম্বর 1884/09/26/ii

30.2 বিজয় গোস্বামীর প্রতি উপদেশ

বিজয় তখনও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত, ওই ব্রাহ্মসমাজে একজন বেতনভোগী আচার্য। আজকাল তিনি ব্রাহ্মসমাজের সব নিয়ম মানিয়া চলিতে পারিতেছেন না। সাকারবাদীদের সঙ্গেও মিশিতেছেন। এই সকল লইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষীয়দের সঙ্গে তাঁহার মনান্তর হইতেছে। সমাজের ব্রাহ্মভক্তদের অনেকেই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। ঠাকুর হঠাৎ বিজয়কে লক্ষ্য করিয়া আবার বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি সহাস্যে) — তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো বলে তোমার নাকি বড় নিন্দা হয়েছে? যে ভগবানের ভক্ত তার কূটস্থ বুদ্ধি হওয়া চাই।

যেমন কামারশালের নাই। হাতুড়ির ঘা অনবরত পড়ছে, তবু নির্বিকার। অসৎ লোকে তোমাকে কত কি বলবে, নিন্দা করবে! তুমি যদি আন্তরিক ভগবানকে চাও, তুমি সব সহ্য করবে। দুষ্টলোকের মধ্যে থেকে কি আর ঈশ্বরচিন্তা হয় না? দেখ না, ঋষিরা বনের মধ্যে ঈশ্বরকে চিন্তা করতো। চারিদিকে বাঘ, ভাল্লুক, নানা হিংস্র জন্তু। অসৎ লোকের, বাঘ ভাল্লুকের স্বভাব; তেড়ে এসে অনিষ্ট করবে।

"এই কয়েকটির কাছ থেকে সাবধান হতে হয়! প্রথম, বড়মানুষ। টাকা লোকজন অনেক, মনে করলে তোমার অনিষ্ট করতে পারে; তাদের কাছে সাবধানে কথা কইতে হয়। হয়তো যা বলে, সায় দিয়ে যেতে হয়! তারপর কুকুর। যখন কুকুর তেড়ে আসে কি ঘেউ ঘেউ করে, তখন দাঁড়িয়ে মুখের আওয়াজ করে তাকে ঠাণ্ডা করতে হয়। তারপর ষাঁড়। গুঁতুতে এলে, তাকেও মুখের আওয়াজ করে ঠাণ্ডা করতে হয়। তারপর মাতাল। যদি রাগিয়ে দাও, তাহলে বলবে, তোর চৌদ্দপুরুষ, তোর হেন তেন, — বলে গালাগালি দিবে। তাকে বলতে হয়, কি খুড়ো কেমন আছ? তাহলে খুব খুশি হয়ে তোমার কাছে বসে তামাক খাবে।

"অসৎ লোক দেখলে আমি সাবধান হয়ে যাই। যদি কেউ এসে বলে, ওহে হুঁকোটুকো আছে? আমি বলি আছে।

"কেউ কেউ সাপের স্বভাব। তুমি জান না, তোমায় ছোবল দেবে। ছোবল সামলাতে অনেক বিচার আনতে হয়। তা না হলে হয়তো তোমার এমন রাগ হয়ে গেল যে, তার আবার উলটে অনিষ্ট করতে ইচ্ছা হয়। তবে মাঝে মাঝে সৎসঙ্গ বড় দরকার। সৎসঙ্গ কল্লে তবে সদসৎ বিচার আসে।"

বিজয় — অবসর নাই, এখানে কাজে আবদ্ধ থাকি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমরা আচার্য; অন্যের ছুটি হয়, কিন্তু আচার্যের ছুটি নাই। নায়েব একধার শাসিত কল্লে পর, কমিদার আর-একধার শাসন করতে তাকে পাঠান। তাই তোমার ছুটি নাই। (সকলের হাস্য)

বিজয় (কৃতাঞ্জলি হইয়া) — আপনি একটু আশীর্বাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ও-সব অজ্ঞানের কথা। আশীর্বাদ ঈশ্বর করবেন।

[গৃহস্থ ব্রহ্মজ্ঞানীকে উপদেশ — গৃহস্থাশ্রম ও সন্ন্যাস]

বিজয় — আজ্ঞা, আপনি কিছু উপদেশ দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সমাজগৃহের চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, সহাস্যে) — এ এরকম বেশ! সারে মাতে সারও আছে, মাতও আছে। (সকলের হাস্য) আমি বেশ কাটিয়ে জ্বলে গেছি। (সকলের হাস্য) নক্স খেলা জান? সতের ফোঁটার বেশি হলে জ্বলে যায়। একরকম তাস খেলা। যারা সতের ফোঁটার কমে থাকে, যারা পাঁচে থাকে, সাত থাকে, দশে থাকে, তারা সেয়ানা। আমি বেশি কাটিয়ে জ্বলে গেছি।

“কেশব সেন বাড়িতে লেকচার দিলে। আমি শুনেছিলুম। অনেক লোক বসে ছিল। চিকের ভিতরে মেয়েরা ছিল। কেশব বললে, ‘হে ঈশ্বর, তুমি আশীর্বাদ কর, যেন আমরা ভক্তি-নদীতে একেবারে ডুবে যাই।’ আমি হেসে কেশবকে বললুম, ভক্তি-নদীতে যদি একেবারে ডুবে যাবে তাহলে চিকের ভিতর যাঁরা

রয়েছেন, ওঁদের দশা কি হবে? তবে এক কর্ম করো, ডুব দেবে, আর মাঝে মাঝে আড়ায় উঠবে। একেবারে ডুবে তলিয়ে যেও না। এই কথা শুনে কেশব আর সকলে হো-হো করে হাসতে লাগল।

“তা হোক। আন্তরিক হলে সংসারেও ঈশ্বরলাভ করা যায়। ‘আমি ও আমার’ — এইটি অজ্ঞান। হে ঈশ্বর, তুমি ও তোমার — এইটি জ্ঞান।

“সংসারে থাকো, যেমন বড়মানুষের বাড়ির ঝি। সব কাজ করে, ছেলে মানুষ করে, বাবুর ছেলেকে বলে আমার হরি কিন্তু তার মন দেশে পড়ে থাকে। তেমনি সংসারে সব কর্ম কর কিন্তু ঈশ্বরের দিকে মন রেখো। আর জেনো যে, গৃহ, পরিবার পুত্র — এ-সব আমার নয়, এ-সব তাঁর। আমি কেবল তাঁর দাস।

“আমি মনে ত্যাগ করতে বলি। সংসারত্যাগ বলি না। অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে, আন্তরিক চাইলে, তাঁকে পাওয়া যায়।”

[ব্রাহ্মসমাজ ও ধ্যানযোগ — Subjective and Objective]

(বিজয়ের প্রতি) — “আমিও চক্ষু বুজে ধ্যান কত্তুম। তারপর ভাবলুম। এমন কল্‌লে (চক্ষু বুজলে) ঈশ্বর আছেন, আর এমন কল্‌ লে (চক্ষু খুললে) কি ঈশ্বর নাই, চক্ষু খুলেও দেখছি, ঈশ্বর সর্বভূতে রয়েছেন। মানুষ, জীবজন্তু, গা ছপালা, চন্দ্রসূর্যমধ্যে, জলে, স্থলে — সর্বভূতে তিনি আছেন।”

[শিবনাথ — শ্রীযুক্ত কেদার চাটুজ্যে]

“কেন শিবনাথকে চাই? যে অনেকদিন ঈশ্বরচিন্তা করে, তার ভিতর সার আছে। তার ভিতর ঈশ্বরের শক্তি আছে। আবার যে ভাল গায়, ভাল বাজায়, কোন একটা বিদ্যা খুব ভালরকম জানে, তার ভিতরেও সার আছে। ঈশ্বরের শক্তি আছে। এটি গীতার মত১। চন্ডীতে আছে, যে খুব সুন্দর, তার ভিতরও সার আছে, ঈশ্বরের শক্তি আছে। (বিজয়ের প্রতি) আহা! কেদারের কি স্বভাব হয়েছে! এসেই কাঁদে! চোখ দুটি সর্বদাই যেন ছানাবড়া হয়ে আছে।”

“বিজয় — সেখানে২ কেবল আপনার কথা, আর তিনি আপনার কাছে আসবার জন্য ব্যাকুল!

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। ব্রাহ্মভক্তেরা নমস্কার করিলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলেন। ঠাকুর গাড়িতে উঠিলেন। অধরের বাড়িতে প্রতিমাদর্শন করিতে যাইতেছেন।

১ যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্।। [গীতা ১০/৪১]

২ কেদারনাথ চাটুজ্জ্যে, পরমভক্ত; তখন সরকারী কাজ উপলক্ষে ঢাকায় ছিলেন। শ্রীবিজয় গিস্বামী যখন ঢাকায় মাঝে মাঝে যাইতেন, তখন তাঁহার সহিত দেখা হইত। দুজনেই ভক্ত, পরস্পর দর্শনে আনন্দ করিতেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c31 ৩১ রামের বাটীতে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৮শে সেপ্টেম্বর 1884/09/28/i

31.1 মহাষ্টমীদিবসে রামের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ

[বিজয়, কেদার, রাম, সুরেন্দ্র, চুনি, নরেন্দ্র, নিরঞ্জন, বাবুরাম, মাস্টার]

আজ রবিবার, মহাষ্টমী, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় প্রতিমাদর্শন করিতে আসিয়াছেন। অধরের বাড়ি শারদীয় দুর্গোৎসব হইতেছে। ঠাকুরের তিনদিন নিমন্ত্রণ। অধরের বাড়ি প্রতিমাদর্শন করিবার পূর্বে রামের বাড়ি হইয়া যাইতেছেন। বিজয়, কেদার, রাম, সুরেন্দ্র, চুনিলাল, নরেন্দ্র, নিরঞ্জন, নারাণ, হরিশ, বাবুরাম, মাস্টার ইত্যাদি অনেক উপস্থিত আছেন। বলরাম, রাখাল এখন বৃন্দাবনধামে বাস করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় ও কেদার দৃষ্টে, সহাস্যে) — আজ বেশ মিলেছে। দুজনেই একভাবের ভাবী। বিজয়ের প্রতি) হ্যাঁগা, শিবনাথ? আপনি —

বিজয় — আজ্ঞা হাঁ, তিনি শুনেছেন। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে আমি সংবাদ পাঠিয়েছিলুম, আর তিনি শুনেওছেন।

ঠাকুর শিবনাথের বাড়ি গিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য কিন্তু দেখা হয় না। পরে বিজয় সংবাদ দিয়াছিলেন, কিন্তু শিবনাথ কাজের ভিড়ে আজও দেখা করিতে পারেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়াদির প্রতি) — মনে চারিটি সাধ উঠেছে।

"বেগুন দিয়ে মাছের ঝোল খাব। শিবনাথের সঙ্গে দেখা করব। হরিনামের মালা এনে ভক্তেরা জপবে, দেখব। আর আটআনার কারণ অষ্টমীর দিনে তন্ত্রের সাধকেরা পান করবে, তাই দেখব আর প্রণাম করব।"

নরেন্দ্র সম্মুখে বসিয়া। এখন বয়স ২২/২৩। কথাগুলি বলিতে বলিতে ঠাকুরের দৃষ্টি নরেন্দ্রের উপর পড়িল। ঠাকুর দাঁড়াইয়া পড়িলেন ও সমাধিস্থ হইলেন। নরেন্দ্রের হাঁটুতে একটি পা বাড়াইয়া দিয়া ওইভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। সম্পূর্ণ বাহ্যশূন্য, চক্ষু স্পন্দহীন!

[God impersonal and personal — সচ্চিদানন্দ ও কারণানন্দময়ী — রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি! ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি — নিত্যসিদ্ধের থাক]

অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইল। এখনও আনন্দের নেশা ছুটিয়া যায় নাই। ঠাকুর আপনা-আপনি কথা কহিতেছেন, ভাবস্থ হইয়া নাম করিতেছেন। বলিতেছেন — সচ্চিদানন্দ! সচ্চিদানন্দ! সচ্চিদানন্দ! বলব? না, আজ কারণানন্দময়ী! কারণানন্দময়ী! সা রে গা মা পা ধা নি। নি-তে থাকা ভাল নয় — অনেকক্ষণ থাকা যায় না। এক গ্রাম নিচে থাকব।

“স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ! মহাকারণে গেলে চুপ। সেখানে কথা চলে না!

“ঈশ্বরকোটি মহাকারণে গিয়ে ফিরে আসতে পারে। অবতারাদি ঈশ্বরকোটি। তারা উপরে উঠে, আবার নিচেও আসতে পারে। ছাদের উপরে উঠে, আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচে আনাগোনা করতে পারে। অনুলোম, বিলোম। সাততোলা বাড়ি, কেউ বারবাড়ি পর্যন্ত যেতে পারে। রাজার ছেলে, আপনার বাড়ি সাততোলায় যাওয়া আসা করতে পারে।

“এক একরকম তুবড়ি আছে, একবার একরকম ফুল কেটে গেল, তারপর খানিকক্ষণ আর-একরকম ফুল কাটছে তারপর আবার আর-একরকম। তার নানারকম ফুলকাটা ফুরোয় না।

“আর একরকম তুবড়ি আছে, আগুন দেওয়ার একটু পরেই ভস্ করে উঠে ভেঙে যায়! যদি সাধ্য-সাধনা করে উপরে যায়, তো আর এসে খপর দেয় না। জীবকোটির সাধ্য-সাধনা করে সমাধি হতে পারে। কিন্তু সমাধির পর নিচে আসতে বা এসে খপর দিতে পারে না।

“একটি আছে, নিত্যসিদ্ধের থাক্। তারা জন্মাবধি ঈশ্বরকে চায়, সংসারে কোন জিনিস তাদের ভাল লাগে না। বেদে আছে, হোমাপাখির কথা। এই পাখি খুব উঁচু আকাশে থাকে। ওই আকাশেই ডিম পাড়ে। এত উঁচুতে থাকে যে ডিম অনেকদিন ধরে পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে ডিম ফুটে যায়। তখন ছানাটি পড়তে থাকে। অনেকদিন ধরে পড়ে। পড়তে পড়তে চোখ ফুটে যায়। যখন মাটির কাছে এসে পড়ে, তখন তার চৈতন্য হয়। তখন বুঝতে পারে যে, মাটি গায়ে ঠেকলেই মৃত্যু। পাখি চিৎকার করে মার দিকে চোঁচা দৌড়। মাটিতে মৃত্যু, মাটি দেখে ভয় হয়েছে! এখন মাকে চায়! মা সেই উঁচু আকাশে আছে। সেই দিকে চোঁচা দৌড়! আর কোন দিকে দৃষ্টি নাই।

“অবতারে সঙ্গে যারা আসে, তারা নিত্যসিদ্ধ, কারু বা শেষ জন্ম।

(বিজয়ের প্রতি) — “তোমাদের দুই-ই আছে। যোগ ও ভোগ। জনক রাজার যোগও ছিল, ভোগও ছিল। তাই জনক রাজর্ষি, রাজা ঋষি, দুই-ই। নারদ দেবর্ষি। শুকদেব ব্রহ্মর্ষি।

“শুকদেব ব্রহ্মর্ষি, শুকদেব জ্ঞানী নন, জ্ঞানের ঘনমূর্তি। জ্ঞানী কাকে বলে? জ্ঞান হয়েছে যার —— সাধ্য-সাধনা করে জ্ঞান হয়েছে। শুকদেব জ্ঞানের মূর্তি অর্থাৎ জ্ঞানের জমাটবাঁধা। এমনি হয়েছে সাধ্য-সাধনা করে নয়।”

কথাগুলি বলিতে বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেন। এখন ভক্তদের সহিত কথা কহিতে পারিবেন।

কেদারকে গান করিতে বলিলেন। কেদার গাইতেছেন:

(১) - মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা।

দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না ।।

মনের মানুষ হয় যে-জনা,

ও তার নয়নেতে যায় গো চেনা, সে দুই-এক জনা,

ভাবে ভাসে রসে ডোবে, ও সে উজান পথে করে আনাগোনা ।।

(ভাবের মানুষ উজান পথে করে আনাগোনা।)

(২) - গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।

তার হিল্লোলে পাষণ্ড-দলন এ-ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায় ।।

মনে করি ডুবে তলিয়ে রই,

গৌরচাঁদের প্রেম-কুমিরে গিলেছে গো সই।

এমন ব্যথার ব্যথী কে আর আছে

হাত ধরে টেনে তোলায় ।।

(৩) - যে-জন প্রেমের ঘাট চেনে না।

গানের পর আবার ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। শ্রীযুক্ত কেশব সেনের ভাইপো নন্দলাল উপস্থিত ছিলেন। তিনি ও তাঁর দুই-একটি ব্রাহ্মবন্ধু ঠাকুরের কাছেই বসিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়াদি ভক্তদের প্রতি) — কারণের বোতল একজন এনেছিল, আমি ছুঁতে গিয়ে আর পারলুম না।

বিজয় — আহা!

শ্রীরামকৃষ্ণ — সহজানন্দ হলে অমনি নেশা হয়ে যায়! মদ খেতে হয় না। মার চরণামৃত দেখে আমার নেশা হয়ে যায়। ঠিক যেন পাঁচ বোতল মদ খেলে হয়!

[জ্ঞানী ও ভক্তদের অবস্থা — জ্ঞানী ও ভক্তদের আহারের নিয়ম]

“এ অবস্থায় সব সময় সবরকম খাওয়া চলে না।”

নরেন্দ্র — খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে যদৃচ্ছালাভই ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — অবস্থা বিশেষে উটি হয়। জ্ঞানীর পক্ষে কিছুতেই দোষ নাই। গীতার মতে জ্ঞানী আপনি খায় না, কুণ্ডলিনীকে আহুতি দেয়।

“ভক্তের পক্ষে উটি নয়। আমার এখনকার অবস্থা, — বামুনের দেওয়া ভোগ না হলে খেতে পারি না! আগে এমন অবস্থা ছিল, দক্ষিণেশ্বরের ওপার থেকে মড়াপোড়ার যে গন্ধ আসতো, সেই গন্ধ নাক দিয়ে টেনে নিতাম এত মিষ্ট লাগতো। এখন সব্বাইয়ের খেতে পারি না।

“পারি না বটে, আবার এক-একবার হয়ও। কেশব সেনের ওখানে (নববৃন্দাবন) থিয়েটারে আমায় নিয়ে গিয়েছিল। লুচি, ছক্কা আনলে। তা ধোবা কি নাপিত আনলে, জানি না। (সকলের হাস্য) বেশ খেলুম। রাখাল বললে, একটু খাও।

(নরেন্দ্রের প্রতি) — “তোমার এখন হবে। তুমি এতেও আছ, আবার ওতেও আছ! তুমি এখন সব খেতে পারবে।

(ভক্তদের প্রতি) — “শূকর মাংস খেয়ে যদি ঈশ্বরে টান থাকে, সে লোক ধন্য! আর হবিষ্য করে যদি কামিনী-কাঞ্চনে মন তাকে তাহলে সে ধিক্‌।”

[পূর্বকথা — প্রথম উন্মাদে ব্রহ্মজ্ঞান ও জাতিভেদবুদ্ধি ত্যাগ — কামারপুকুর গমন; ধনী কামারিনী; রামলালের বাপ — গোবিন্দ রায়ের নিকট আল্লামন্ত্র]

“আমার কামারবাড়ির দাল খেতে ইচ্ছা ছিল; ছেলেবেলা থেকে কামাররা বলত বামুনরা কি রাঁধতে যানে? তাই খেলুম, কিন্তু, কামারে কামারে গন্ধ১। (সকলের হাস্য)

“গোবিন্দ রায়ের কাছে আল্লামন্ত্র নিলাম। কুঠিতে প্যাঁজ দিয়ে রান্না ভাত হল। খানিক খেলুম। মণি মল্লিকের (বরাহনগরের) বাগানে ব্যান্নুন রান্না খেলুম, কিন্তু কেমন একটা ঘেন্না হল।

“দেশে গেলুম; রামলালের বাপ ভয় পেলে। ভাবলে, যার তার বাড়িতে খাবে। ভয় পেলে, পাছে তাদের জাতে বার করে দেয়। আমি তাই বেশি দিন থাকতে পারলুম না; চলে এলুম।”

[বেদ, পুরাণ, তন্ত্রমতে শুদ্ধাচার কিরূপ]

“বেদ পুরাণে বলেছে শুদ্ধাচার। বেদ পুরাণে যা বলে গেছে — ‘করো না, অনাচার হবে’ — তন্ত্রে আবার তাই ভাল বলেছে।

“কি অবস্থাই গেছে! মুখ করতুম আকাশ-পাতাল জোড়া, আর ‘মা’ বলতুম। যেন, মাকে পাকড়ে আনছি। যেন জাল ফেলে মাছ হড়হড় করে টেনে আনা। গানে আছে:

এবার কালী তোমায় খাব। (খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)।
(তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার)
গণ্ডযোগে জনমিলে সে হয় মা-খোকা ছেলে।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটার একটা করে যাব ।।
হাতে কালী মুখে কালী, সর্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে, সেই কালী তার মুখে দিব ।।
খাব খাব বলি মা গো উদরস্থ করিব।
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব ।।
যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাব।
আমার ভয় কি তাতে, কালী ব’লে কালেরে কলা দেখাব ।।
ডাকিনী যোগিনী দিয়ে, তরকারী বানায়ে খাব।
মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে অম্বল সম্বরা চড়াব ।।
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভালমতে তাই জানাব।
তাতে মন্ত্রের সাধন, শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব ।।

“উন্মাদের মতন অবস্থা হয়েছিল। এই ব্যাকুলতা!”

নরেন্দ্র গান গাইতে লাগিলেন:

আমায় দে মা পাগল করে, আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে।

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আবার সমাধিস্থ।

সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর গিরিরানীর ভাব আরোপ করিয়া আগমনী গাইতেছেন। গিরিরানী বলছেন, পুরবাসীরে! আমার কি উমা এসেছে? ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া গান গাইতেছেন।

গানের পর ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন, "আজ মহাষ্টমী কিনা; মা এসেছেন! তাই এত উদ্দীপন হচ্ছে!"

কেদার — প্রভু! আপনিই এসেছেন। মা কি আপনি ছাড়া?

ঠাকুর অন্যদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আনমনে গান ধরিলেন:

তারে কই পেলুম সই, হলাম যার জন্য পাগল।
ব্রহ্মা পাগল, বিষ্ণু পাগল, আর পাগল শিব।
তিন পাগলে যুক্তি করে ভাঙল নবদ্বীপ ।।
আর এক পাগল দেখে এলাম বৃন্দাবন মাঝে।
রাইকে রাজা সাজায়ে আপনি কোটাল সাজে ।।
আর এক পাগল দেখে এলাম নবদ্বীপের পথে।
রাধাপ্রেম সুধা বলে, করোয়া কীস্তি হাতে।

আবার ভাবে মত্ত হইয়া ঠাকুর গাহিতেছেন:

কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধাতরঙ্গিণী!

ঠাকুর গান করিতেছেন। হঠাৎ “হরিবোল হরিবোল” বলিতে বলিতে বিজয় দণ্ডায়মান। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবোন্মত্ত হইয়া বিজয়াদি ভক্তসঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

১ ঠাকুর তাঁহার ভিক্ষামাতা ধনী কামারিনীর বাড়িতে গিয়াছিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৮শে সেপ্টেম্বর 1884/09/28/ii

31.2 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে

কীর্তনান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, বিজয় নরেন্দ্র ও অন্যান্য ভক্তেরা আসন গ্রহণ করিলেন। সকলের দৃষ্টি ঠাকুরের দিকে। সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব আছে। ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা কহিতেচেন। তাঁহাদের কুশল প্রশ্ন করিতেছেন। কেদার অতি বিনীতভাবে হাতজোড় করিয়া অতি মৃদু ও মিষ্ট কথায় ঠাকুরের কাছে কি নিবেদন করিতেছেন। কাছে নরেন্দ্র, চুনি, সুরেন্দ্র, রাম, মাস্টার ও হরিশ।

কেদার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি, বিনীতভাবে) — মাথাঘোরাটা কিসে সেরে যাবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে) — ও হয়; আমার হয়েছিল! একটু একটু বাদামের তেল দিবেন। শুনেছি, দিলে সারে।

কেদার —— যে আজ্ঞা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (চুনির প্রতি) — কিগো, তোমরা সব কেমন আছ?

চুনি —— আজ্ঞা, এখন সব মঙ্গল। বৃন্দাবনে বলরামবাবু, রাখাল এঁরা সব ভাল আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— তুমি অত সন্দেশ কেন পাঠিয়েছ?

চুনি —— আজ্ঞা, বৃন্দাবন থেকে এসেছি ——

চুনিলাল বলরামের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন ও কয়মাস ছিলেন। ছুটি শেষ হইয়াছে, তাই কলিকাতায় সম্প্রতি ফিরিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হরিশের প্রতি) — তুই দুই-একদিন পরে যাস। অসুখ করেছে, আবার সেখানে পড়বি।

(নারাণের প্রতি, সস্নেহে) — ‘বোস্ কাছে এসে বোস্! কাল যাস —— গিয়ে সেখানে খাবি। (মাস্টারকে দেখাইয়া) এর সঙ্গে যাবি? (মাস্টারের প্রতি) কিগো?

মাস্টারের সেই দিনই ঠাকুরের সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা। তাই চিন্তা করিতেছেন। সুরেন্দ্র অনেকক্ষণ ছিলেন, মাঝে একবার বাড়ি গিয়াছিলেন। বাড়ি হইতে আসিয়া ঠাকুরের কাছে দাঁড়াইলেন।

সুরেন্দ্র কারণ পান করেন। আগে বড় বাড়াবাড়ি ছিল। ঠাকুর সুরেন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইয়াছিলেন। একেবারে পানত্যাগ করিতে বলিলেন না। বলিলেন, সুরেন্দ্র! দেখ, যা খাবে, ঠাকুরকে নিবেদন করে দিবে। আর যেন মাথা টলে না ও পা টলে না। তাঁকে চিন্তা করতে করতে তোমার আর পান করতে ভাল লাগবে না। তিনি কারণানন্দদায়িনী। তাঁকে লাভ করলে সহজানন্দ হয়।

সুরেন্দ্র কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি কারণ খেয়েছ? বলিয়াই ভাবে আবিষ্ট।

সন্ধ্যা হইল। কিঞ্চিৎ বাহ্য লাভ করিয়া ঠাকুর মার নাম করিয়া আনন্দে গান ধরিলেন:

শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা,
সুধাপানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না (মা)।
বিপরীত রতাতুরা, পদভরে কাঁপে ধরা,
উভয়ে পাগলের পারা, লজ্জা ভয় আর মানে না।

সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হরিনাম করিতেছেন। মাঝে মাঝে হাততালি দিতেছেন। সুস্বরে বলিতেছেন — হরিবোল, হরিবোল, হরিময় হরিবোল; হরি হরি হরোবোল।

আবার রামনাম করিতেছেন, — রাম, রাম, রাম, রাম! রাম, রাম, রাম, রাম, রাম!

[ঠাকুরের প্রার্থনা — How to Pray]

ঠাকুর এইবার প্রার্থনা করিতেছেন — “ও রাম! ও রাম! আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন — আমি ক্রিয়াহীন! রাম শরণাগত! ও রাম শরণাগত! দেহসুখ চাইনে রাম! লোকমান্য চাইনে রাম! অষ্টসিদ্ধি চাইনে রাম! শতসিদ্ধি চাইনে রাম! শরণাগত, শরণাগত! কেবল এই করো — যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয় রাম! আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হই না, রাম! ও রাম, শরণাগত!”

ঠাকুর প্রার্থনা করিতেছেন, সকলে একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার করুণামাখা স্বর শুনিয়া অনেকে অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেছেন না।

রাম কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি) — রাম! তুমি কোথায় ছিলে?

রাম আজ্ঞা, উপরে ছিলাম।

ঠাকুর ও ভক্তদের সেবার জন্য রাম আয়োজন করিতেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি, সহাস্যে) — উপরে থাকার চাইতে নিচে থাকা কি ভাল নয়? নিচু জমিতে জল জমে, উঁচু জমি থেকে জল গড়িয়ে চলে আসে।

রাম (হাসিতে হাসিতে) — আজ্ঞা, হাঁ।

ছাদে পাতা হইয়াছে। রামচন্দ্র ঠাকুর ও ভক্তগণ লইয়া গেলেন ও পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন। উৎসবান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, নিরঞ্জন, মাস্টার প্রভৃতি সঙ্গে অধরের বাড়ি গমন করিলেন। সেখানে মা আসিয়াছেন। আজ মহাষ্টমী! অধরের বিশেষ প্রার্থনা, ঠাকুর থাকিবেন, তবে তাঁহার পূজা সার্থক হইবে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c32 ৩২ দক্ষিণেশ্বরে নবমীপূজা দিবসে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৯শে সেপ্টেম্বর 1884/09/29/i

32.1 দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি সঙ্গে

আজ নবমীপূজা, সোমবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। এইমাত্র রাত্রি প্রভাত হইল। মা-কালীর মঙ্গল আরতি হইয়া গেল। নহবত হইতে রোশনচৌকি প্রভাতী রাগরাগিণী আলাপ করিতেছে। চাঙ্গারি হস্তে মালীরা ও সাজি হস্তে ব্রাহ্মণেরা পুষ্পচয়ন করিতে আসিতেছেন। মার পূজা হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ অতি প্রত্যূষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে উঠিয়াছেন। ভবনাথ, বাবুরাম, নিরঞ্জন ও মাস্টার গত রাত্রি হইতে রহিয়াছেন। তাঁহারা ঠাকুরের ঘরের বারান্দায় শুইয়াছিলেন। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখেন ঠাকুর মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন। বলিতেছেন — জয় জয় দুর্গে! জয় জয় দুর্গে! —

ঠিক একটি বালক! কোমড়ে কাপড় নাই। মার নাম করিতে করিতে ঘরের মধ্যে নাচিয়া বেড়াইতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন — সহজানন্দ, সহজানন্দ! শেষ গোবিন্দের নাম বারবার বলিতেছেন —

প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন!

ভক্তেরা উঠিয়া বসিয়াছেন! একদৃষ্টে ঠাকুরের ভাব দেখিতেছেন। হাজরাও কালীবাড়িতে আছেন। ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় তাঁহার আসন। লাটুও আছেনও তাঁহার সেবা করেন! রাখাল এ সময় বৃন্দাবনে। নরেন্দ্র মঝে মাঝে আসিয়া দর্শন করেন। আজ নরেন্দ্র আসিবেন।

ঠাকুরের ঘরের উত্তরদিকে ছোট বারান্দাটিতে ভক্তেরা শুইয়াছিলেন। শীতকাল, তাই ঝাঁপ দেওয়া ছিল। সকলের মুখ ধোয়ার পরে এই উত্তর বারান্দাটিতে ঠাকুর আসিয়া একটি মাদুরে বসিলেন। ভবনাথ ও মাস্টার কাছে বসিয়া আছেন। অন্যান্য ভক্তেরাও মাঝে মাঝে আসিয়া বসিতেছেন।

[জীবকোটি সংশয়াত্মা (Sceptic) — ঈশ্বরকোটির স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভবনাথের প্রতি) — কি জানিস, যারা জীবকোটি, তাদের বিশ্বাস সহজে হয় না। ঈশ্বরকোটির বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ। প্রহ্লাদ ‘ক’ লিখতে একেবারে কান্না —— কৃষ্ণকে মনে পড়েছে! জীবের স্বভাব —— সংশয়াত্মক বুদ্ধি! তারা বলে, হাঁ, বটে, কিন্তু ——।

“হাজরা কোনরকমে বিশ্বাস করবে না যে, ব্রহ্ম ও শক্তি, শক্তি আর শক্তিমান অভেদ। যখন নিষ্ক্রিয় তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই; যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন, তখন শক্তি বলি। কিন্তু একই বস্তু; অভেদ। অগ্নি বললে, দাহিকাশক্তি অমনি বুঝায়; দাহিকাশক্তি বললে, অগ্নিকে মনে পড়ে। একটাকে ছেড়ে আর একটাকে চিন্তা করবার জো নাই।

“তখন প্রার্থনা করলুম, মা, হাজরা এখানকার মত উলটে দেবার চেষ্টা কচ্চে। হয় ওকে বুঝিয়ে দে, নয় এখান থেকে সরিয়ে দে। তার পরদিন, সে আবার এসে বললে, হাঁ মানি। তখন বলে যে, বিভু সব জায়গায় আছেন।”

ভবনাথ (সহাস্যে) — হাজরার এই কথাতে আপনার এত কষ্ট বোধ হয়েছিল?

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমার অবস্থা বদলে গেছে। এখন লোকের সঙ্গে হাঁকডাক করতে পারি না। হাজরার সঙ্গে তর্ক-ঝগড়া করব, এরকম অবস্থা আমার এখন নয়। যদু মল্লিকের বাগানে হৃদে১বললে, মামা, আমাকে রাখবার কি তোমার ইচ্ছা নাই? আমি বললুম, না, সে অবস্থা এখন আমার নাই, এখন তোর সঙ্গে হাঁকডাক করবার জো নাই।

[পূর্বকথা — কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ — জগৎ চৈতন্যময় — বালকের বিশ্বাস]

“জ্ঞান আর অজ্ঞান কাকে বলে? — যতক্ষণ ঈশ্বর দূরে এই বোধ ততক্ষণ অজ্ঞান; যতক্ষণ হেথা হেথা বোধ, ততক্ষণ জ্ঞান।

“যখন ঠিক জ্ঞান হয়, তখন সব জিনিস চৈতন্যময় বোধ হয়। আমি শিবুর সঙ্গে আলাপ করতুম। শিবু তখন খুব ছেলেমানুষ — চার-পাঁচ বছরের হবে। ও-দেশে তখন আছি। মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ হচ্ছে। শিবু বলছে, খুড়ো ওই চকমকি ঝাড়ছে! (সকলের হাস্য) একদিন দেখি, সে একলা ফড়িং ধরতে যাচ্ছে। কাছে গাছে পাতা নড়ছিল। তখন পাতাকে বলছে, চুপ, চুপ, আমি ফড়িং ধরব। বালক সব চৈতন্যময় দেখছে! সরল বিশ্বাস, বালকের বিশ্বাস না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। উঃ আমার কি অবস্থা ছিল! একদিন ঘাস বনেতে কি কামড়েছে। তা ভয় হল, যদি সাপে কামড়ে থাকে! তখন কি করি! শুনেছিলাম, আবার যদি কামড়ায়, তাহলে বিষ তুলে লয়। অমনি সেইখানে বসে গর্ত খুঁজতে লাগলুম, যাতে আবার কামড়ায়। ওইরকম কচ্চি, একজন বললে, কি কচ্ছেন?

সব শুনে সে বললে, ঠিক ওইখানে কামড়ানো চাই যেখানটিতে আগে কামড়েছে। তখন উঠে আসি। বোধ হয় বিছে-টিছে কামড়েছিল।

“আর-একদিন রামলালের কাছে শুনেছিলুম, শরতে হিম ভাল। কি একটা শ্লোক আছে, রামলাল বলেছিল। আমি কলকাতা থাকে গাড়ি করে আসবার সময় গলা বাড়িয়ে এলুম, যাতে সব হিমটুকু লাগে। তারপর অসুখ!” (সকলের হাস্য)

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ঔষধ]

এইবার ঠাকুর ঘরের ভিতর আসিয়া বসিলেন। তাঁর পা দুটি একটু ফুলো ফুলো হয়েছিল। ভক্তদের হাত দিয়ে দেখতে বলেন, আঙুল দিলে ডোব হয় কি না। একটু একটু ডোব হতে লাগল; কিন্তু সকলেই বলতে লাগলেন, ও কিছুই নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভবনাথকে) — তুই সিঁথির মহিন্দরকে ডেকে দিস। সে বললে তবে আমার মনটা ভাল হবে।

ভবনাথ (সহাস্যে) — আপনার ঔষধে খুব বিশ্বাস। আমাদের অত নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঔষধ তাঁরই। তিনিই একরূপে চিকিৎসক। গঙ্গাপ্রসাদ বললেন, আপনি রাত্রে জল খাবেন না। আমি ওই কথা বেদবাক্য ধরে রেখেছি। আমি জানি, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।

১ হৃদয়ের তখন বাগানে আসিবার হুকুম ছিল না। কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। হৃদয়ের ইচ্ছা যে, ঠাকুর বলিয়া কহিয়া আবার তাঁহাকে কর্মে

নিযুক্ত করাইয়া দেন। হৃদয় ঠাকুরের খুব সেবা করিতেন; কিন্তু কটুবাক্যও বলিতেন। ঠাকুর অনেক সহ্য করিতেন, মাঝে মাঝে খুব তিরস্কার করিতেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৯শে সেপ্টেম্বর 1884/09/29/ii

32.2 নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি মধ্যে সমাধিস্থ

হাজরা আসিয়া বসিলেন। এ-কথা ও-কথার পর ঠাকুর হাজরাকে বললেন, ‘দেখ, কাল রামের বাড়ি অতগুলি লোক বসেছিল, বিজয়, কেদার এরা, তবু নরেন্দ্রকে দেখে এত হল কেন? কেদার, আমি দেখেছি, কারণানন্দের ঘর।”

ঠাকুর পূর্বদিনে, মহাষ্টমীর দিনে কলিকাতায় প্রতিমাদর্শনে গিয়াছিলেন। অধরের বাড়ি প্রতিমাদর্শন করিতে যাওয়ার পূর্বে রামের বাড়ি হইয়া যান। সেখানে অনেকগুলি ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। নরেন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রের হাঁটুর উপর পা বাড়িয়া দিয়াছিলেন, ও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমাধি হইয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে নরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত — ঠাকুরের আনন্দের আর সীমা রহিল না। নরেন্দ্র ঠাকুরকে প্রণামের পর ভবনাথাদির সঙ্গে ওই ঘরে একটু গল্প

করিতেছেন। কাছে মাস্টার। ঘরের মধ্যে লম্বা মাদুর পাতা। নরেন্দ্র কথা কহিতে কহিতে উপুড় হইয়া মাদুরের উপর শুইয়া আছেন। হঠাৎ তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের সমাধি হইল — তাঁহার পিঠের উপর গিয়া বসিলেন; সমাধিস্থ!

ভবনাথ গান গাহিতেছেন:

গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ করো না।
ও দুটি চরণ, বিনা আমার মন, অন্য কিছু আর জানে না ।।

ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। ঠাকুর গাইতেছেন:

কখন কি রঙ্গে থাক মা।

ঠাকুর আবার গাইতেছেন:

বল রে শ্রীদুর্গা নাম।
(ওরে আমার আমার আমার রে)।
নমো নমো গৌরী, নমোনারায়ণী!
দুঃখী দাসে কর দয়া তবে গুণ জানি ।।
তুমি সন্ধ্যা, তুমি দিবা তুমি গো যামিনী।
কখন পুরুষ হও মা, কখন কামিনী ।।
রামরূপে ধর ধনু মা, কৃষ্ণরূপে বাঁশী।
ভুলালি শিবের মন মা হয়ে এলোকেশী।
দশ মহাবিদ্যা তুমি মা, দশ অবতার।

কোনরূপে এইবার আমারে কর মা পার ।।

যশোদা পূজিয়েছিল মা জবা বিল্বদলে ।

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কৈলি কৃষ্ণ দিয়ে কোলে ।।

যেখানে সেখানে থাকি মা, থাকি গো কাননে।

নিশিদিন মন থাকে যেন ও রাঙ্গাচরণে ।।

যেখানে সেখানে মরি মা, মরি গো বিপাকে।

অন্তকালে জিহ্বা যেন মা, শ্রীদুর্গা বলে ডাকে ।।

যদি বল যাও যাও মা, যাব কার কাছে।

সুধামাখা তারা নাম, মা আর কার আছে ।।

যদি বল ছাড় ছাড় মা, আমি না ছাড়িব।

বাজন নূপুর হয়ে মা, তোর চরণে বাজিব।

যখন বসিবে মাগো শিব সন্নিধানে। —

জয় শিব জয় শিব বলে বাজিব চরণে ।।

চরণে লিখিতে নাম আঁচড় যদি যায়।

ভূমিতে লিখিয়ে থুই নাম, পদ দে গো তায় ।।

শঙ্করী হইয়ে মাগো গগনে উড়িবে ।

মীন হয়ে রব জলে মা, নখে তুলে লবে ।।

নখাঘাতে ব্রহ্মময়ি যখন যাবে গো পরাণী।

কৃপা করে দিও মা গো রাঙ্গা চরণ দুখানি ।।

পার কর ও মা কালী, কালের কামিনী।

তরাবারে দুটু পদ করেছ তরণী ।।

তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্য, তুমি গো পাতাল।

তোমা হতে হরি ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল ৷৷

গোলকে সর্বমঙ্গলা, ব্রজে কাত্যায়নী।

কাশীতে মা অন্নপূর্ণা অনন্তরূপিণী ৷৷

দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে যেবা পথে চলে যায়।

শূলহস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তায় ৷৷

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৯শে সেপ্টেম্বর 1884/09/29/iii

32.3 ভবনাথ নরেন্দ্র প্রভৃতি মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি ও নৃত্য

হাজরা উত্তর-পূর্ব বারান্দায় বসিয়া হরিণামের মালা হাতে করিয়াজপ করিতেছেন। ঠাকুর সম্মুখে আসিয়া বসিলেন ও হাজরার মালা হাতে লইলেন। মাস্টার ও ভবনাথ সঙ্গে। বেলা প্রায় দশটা হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি) — দেখ, আমার জপ হয় না; — না, না, হয়েছে! — বাঁ হাতে পারি, কিন্তু উদিক (নামজপ) হয় না!

এই বলিয়া ঠাকুর একটু জপ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জপ আরম্ভ করিতে গিয়া একেবারে সমাধি!

ঠাকুর এই সমাধি অবস্থায় অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন। হাতে মালা-গাছটি এখনও রহিয়াছে। ভক্তেরা অবাক্‌ হইয়া দেখিতেছেন। হাজরা নিজের আসনে বসিয়া — তিনিও অবাক্‌ হইয়া দেখিতেছেন। অনেক্ষণ পরে হুঁশ হইল। ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, খিদে পেয়েছে। প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য এই কথাগুলি সমাধির পর প্রায় বলেন।

মাস্টার খাবার আনিতে যাইতেছেন। ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "না বাপু, আগে কালীঘরে যাব।"

[নবমীপূজা-দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণের ৺কালীপূজা]

ঠাকুর পাকা উঠান দিয়া দক্ষিণাস্য হইয়া কালীঘরের দিকে যাইতেছেন। যাইতে যাইতে দ্বাদশ মন্দিরের শিবকে উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিলেন। বামপার্শ্বে রাধাকান্তের মন্দির। তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। কালীঘরে গিয়া মাকে প্রণাম করিয়া আসনে বসিয়া মার পাদপদ্মে ফুল দিলেন, নিজের মাথায়ও ফুল দিলেন। চলিয়া আসিবার সময় ভবনাথকে বলিলেন এইগুলি নিয়ে চল্‌ — মার প্রসাদী ডাব আর শ্রীচরণামৃত। ঠাকুর ঘরে ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে ভবনাথ ও মাস্টার। আসিয়াই, হাজরার সম্মুখে আসিয়া প্রণাম। হাজরা চিৎকার করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, কি করেন, কি করেন!

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, তুমি বল, যে এ অন্যায়?

হাজরা তর্ক করিয়া প্রায় এই কথা বলিতেন, ঈশ্বর সকলের ভিতরেই আছেন, সাধনের দ্বারা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে।

বেলা হইয়াছে। ভোগ আরতির ঘন্টা বাজিয়া গেল। অতিথিশালায় ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, কাঙাল সকলে যাইতেছে। মার প্রসাদ, রাধাকান্তের প্রসাদ, সকলে পাইবে। ভক্তেরাও মার প্রসাদ পাইবেন। অতিথিশালায় ব্রাহ্মণ কর্মচারীরা যেখানে বসেন, সেইখানে ভক্তেরা বসিয়া প্রসাদ পাইবেন। ঠাকুর বলিলেন, সবাই গিয়ে ওখানে খা —— কেমন? (নরেন্দ্রের প্রতি), না তুই এখানে খাবি? —

“আচ্ছা নরেন্দ্র আর আমি এইখানে খাব।”

ভবনাথ, বাবুরাম, মাস্টার ইত্যাদি সকলে প্রসাদ পাইতে গেলেন।

প্রসাদ পাওয়ার পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিলেন, কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। ভক্তেরা বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতেছেন সেইখানে আসিয়া বসিলেন ও তাঁহাদের সঙ্গে আনন্দ করিতে লাগিলেন। বেলা দুইটা। সকলে উত্তর-পূর্ব বারান্দায় আছেন। হঠাৎ ভবনাথ দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দা হইতে ব্রহ্মচারী বেশে আসিয়া উপস্থিত। গায়ে গৈরিকবস্ত্র, হাতে কমণ্ডলু, মুখে হাসি। ঠাকুর ও ভক্তেরা সকলে হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — ওর মনের ভাব ওই কিনা, তাই ওই সেজেছে।

নরেন্দ্র —— ও ব্রহ্মচারী সেজেছে, আমি বামাচারী সাজি। (হাস্য)

হাজরা —— তাতে পঞ্চ মকার, চক্র —— এ-সব করতে হয়।

ঠাকুর বামাচারের কথায় চুপ করিয়া রহিলেন। ও কথায় সায় দিলেন না। কেবল রহস্য করিয়া উড়াইয়া দিলেন। হঠাৎ মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। গাহিতেছেন:

আর ভুলালে ভুলব না মা, দেখেছি তোমার রাঙা চরণ।

[পূর্বকথা — রাজনারায়ণের চণ্ডী — নকুড় আচার্যের গান]

ঠাকুর বলিতেছেন, আহা, রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান কি চমৎকার! ওই রকম করে নেচে নেচে তারা গায়। আর ও-দেশে নকুড় আচার্যের কি গান। আহা, কি নৃত্য, কি গান!

পঞ্চবটীতে একটি সাধু আসিয়াছেন। বড় রাগী সাধু। যাকে তাকে গালাগাল দেন, শাপ দেন! তিনি খড়ম পায়ে দিয়ে এসে উপস্থিত।

সাধু বলিলেন, হিঁয়া আগ মিলে গা? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হাতজোড় করিয়া সাধুকে নমস্কার করিতেছেন এবং যতক্ষণ সে সাধুটি রহিলেন, ততক্ষণ হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

সাধুটি চলিয়া গেলে ভবনাথ হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, আপনার সাধুর উপর কি ভক্তি!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — ওরে তমোমুখ নারায়ণ! যাদের তমোগুণ, তাদের এইরকম করে প্রসন্ন করতে হয়। এ যে সাধু!

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও গোলকধাম খেলা — “ঠিক লোকের সর্বত্র জয়”]

গোলকধাম খেলা হইতেছে। ভক্তেরা খেলিতেছেন, হাজরাও খেলিতেছেন। ঠাকুর আসিয়া দাঁড়াইলেন। মাস্টার ও কিশোরীর ঘুঁটি উঠিয়া গেল। ঠাকুর দুয়জনকে নমস্কার করিলেন! বলিলেন, ধন্য তোমরা দু-ভাই। (মাস্টারকে একান্তে) আর খেলো না। ঠাকুর খেলা দেখিতেছেন, হাজরার ঘুঁটি একবার নরকে পড়িয়াছিল। ঠাকুর বলিতেছেন, হাজরার কি হল! — আবার!

অর্থাৎ হাজরার ঘুঁটি আবার নরকে পড়িয়াছে! এই সকলে হো-হো করিয়া হাসিতেছেন।

লাটুর ঘুঁটি সংসারের ঘর থেকে একেবারে সাতচিৎ মুক্তি! লাটু ধেই ধেই করিয়া নাচিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, নেটোর যে আহ্লাদ — দেখ। ওর উটি না হলে মনে বড় কষ্ট হত। (ভক্তদের প্রতি একান্তে) — এর একটা মানে আছে। হাজরার বড় অহংকার যে, এতেও আমার জিত হবে। ঈশ্বরের এমনও আছে যে, ঠিক লোকের কখনও কোথাও তিনি অপমান করেন না। সকলের কাছেই জয়।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৯শে সেপ্টেম্বর 1884/09/29/iv

32.4 নরেন্দ্র প্রভৃতিকে স্ত্রীলোক লইয়া সাধন নিষেধ বামাচার নিন্দা

[পূর্বকথা — তীর্থদর্শন; কাশীতে ভৈরবী চক্র — ঠাকুরের সন্তানভাব]

ঘরে ছোট তক্তপোষটিতে ঠাকুর বসিয়াছেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ, বাবুরাম, মাস্টার মেঝেতে বসিয়া আছেন। ঘোষপাড়া ও পঞ্চনামী এই সব মতের কথা নরেন্দ্র তুলিলেন। ঠাকুর তাহাদের বর্ণনা করিয়া নিন্দা করিতেছেন। বলিতেছেন, "ঠিক ঠিক সাধন করিতে পারে না, ধর্মের নাম করিয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে।

(নরেন্দ্রের প্রতি) — "তোর আর এ-সব শুনে কাজ নাই।

"ভৈরব, ভৈরবী, এদেরও ওইরকম। কাশীতে যখন আমি গেলুম, তখন একদিন ভৈরবীচক্রে আমায় নিয়ে গেল। একজন করে ভৈরব, একজন করে ভৈরবী। আমায় কারণ পান করতে বললে। আমি বললাম, মা, আমি কারণ ছুঁতে পারি না। তখন তারা খেতে লাগল। আমি মনে করলাম, এইবার বুঝি জপ-ধ্যান করবে। তা নয়, নৃত্য করতে আরম্ভ করলে! আমার ভয় হতে লাগল, পাছে গঙ্গায় পড়ে যায়। চক্রটি গঙ্গার ধারে হয়েছিল।

"স্বামী-স্ত্রী যদি ভৈরব-ভৈরবী হয়, তবে তাদের বড় মান।

(নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি) — "কি জান? আমার ভাব মাতৃভাব, সন্তানভাব। মাতৃভাব অতি শুদ্ধভাব, এতে কোন বিপদ নাই। ভগ্নীভাব, এও মন্দ নয়। স্ত্রীভাব — বীরভাব বড় কঠিন। তারকের বাপ ওইভাবে সাধন করত। বড় কঠিন। ঠিক ভাব রাখা যায় না।

“নানা পথ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার। মত পথ। যেমন কালীঘরে যেতে নানা পথ দিয়ে যাওয়া যায়। তবে কোনও পথ শুদ্ধ, কোনও পথ নোংরা, শুদ্ধ পথ দিয়ে যাওয়াই ভাল।

“অনেক মত — অনেক পথ — দেখলাম। এ-সব আর ভাল লাগে না। পরস্পর সব বিবাদ করে। এখানে আর কেউ নাই; তোমরা আপনার লোক, তোমাদের বলছি, শেষ এই বুঝেছি, তিনি পূর্ণ আমি তাঁর অংশ; তিনি প্রভু ‘আমি’ তাঁর দাস; আবার এক-একবার ভাবি, তিনিই আমি আমিই তিনি!”

ভক্তেরা নিস্তব্ধ হইয়া এই কথাগুলি শুনিতেছেন।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও মানুষের উপর ভালবাসা — Love of Mankind]

ভবনাথ (বিনীতভাবে) — লোকের সঙ্গে মনান্তর থাকলে, মন কেমন করে। তাহলে সকলকে তো ভালবাসতে পারলুম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — প্রথমে একবার কথাবার্তা কইতে — তাদের সঙ্গে ভাব করতে — চেষ্টা করবে। চেষ্টা করেও যদি না হয়, তারপর আর ও-সব ভাববে না। তাঁর শরণাগত হও — তাঁর চিন্তা কর — তাঁকে ছেড়ে অন্য লোকের জন্য মন খারাপ করবার দরকার নাই।

ভবনাথ — ক্রাইস্ট, চৈতন্য, এঁরা সব বলে গেছেন যে, সকলকে ভালবাসবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ভাল তো বাসবে, সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন বলে। কিন্তু যেখানে দুষ্টলোক, সেখানে দূর থেকে প্রণাম করবে। কি, চৈতন্যদেব? তিনিও “বিজাতিয়

লোক দেখে প্রভু করেন ভাব সংবরণ।” শ্রীবাসের বাড়িতে তাঁর শাশুরীকে চুল ধরে বার করা হয়েছিল।

ভবনাথ — সে অন্য লোক বার করেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁর সম্মতি না থা কলে পারে?

“কি করা যায়? ধদি অন্যের মন পাওয়া না গেল। তো রাতদিন কি ওই ভাবতে হবে? যে মন তাঁকে দেব, সে মন এদিক-ওদিক বাজে খরচ করব? আমি বলি, মা, আমি নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল কিছুই চাই না, কেবল তোমায় চাই! মানুষ নিয়ে কি করব?

“ঘরে আসবেন চণ্ডী, শুনব কত চণ্ডী,
কত আসবেন দণ্ডী যোগী জটাধারী!

“তাঁকে পেলে সবাইকে পাব। টাকা মাটি, মাটিই টাকা — সোনা মাটি, মাটিই সোনা — এই বলে ত্যাগ কল্লুম; গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম। তখন ভয় হল যে, মা লক্ষ্মী যদি রাগ করেন। লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য অবজ্ঞা কল্লুম। যদি খ্যাঁট বন্ধ করেন। তখন বললুম, মা তোমায় চাই, আর কিছু চাই না; তাঁকে পেলে তবে সব পাব।”

ভবনাথ (হাসিতে হাসিতে) — এ পাটোয়ারী!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — হাঁ ওইটুকু পাটোয়ারী!

“ঠাকুর সাক্ষাৎকার হয়ে একজনকে বললেন, তোমার তপস্যা দেখে বড় প্রসন্ন হয়েছি। এখন একটি বর নাও। সাধক বললেন ঠাকুর যদি বর দেবেন তো এই বর দিন, যেন সোনার থালে নাতির সঙ্গে বসে খাই। এক বরেতে অনেকগুলি হল। ঐশ্বর্য হল, ছেলে হল, নাতি হল!” (সকলের হাস্য)

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৯শে সেপ্টেম্বর 1884/09/29/v

32.5 ঈশ্বর অভিভাবক — শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভক্তি — সংকীর্তনানন্দে

ভক্তেরা ঘরে বসিয়াছেন। হাজরা বারান্দাতেই বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাজরা কি চাইছে জান? কিছু টাকা চায়, বাড়িতে কষ্ট। দেনা কর্জ। তা, জপ-ধ্যান করে বলে, তিনি টাকা দেবেন!

একজন ভক্ত — তিনি কি বাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারেন না?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁর ইচ্ছা! তবে প্রেমোন্মাদ না হলে তিনি সমস্ত ভার লন না। ছোট ছেলেকেই হাত ধরে খেতে বসিয়ে দেয়। বুড়োদের কে দেয়? তাঁর চিন্তা ক’রে যখন নিজের ভার নিতে পারে না, তখনই ঈশ্বর ভার লন।১

"নিজে বাড়ির খবর লবে না! হাজরার ছেলে রামলালের কাছে বলেছে 'বাবাকে আসতে বলো; আমরা কিছু চাইবো না!'আমার কথাগুলি শুনে কান্না পেল।"

[শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত — শ্রীবৃন্দাবন-দর্শন]

"হাজরার মা বলেছে রামলালকে, 'প্রতাপকে একবার আসতে বলো, আর তোমার খুড়োমশায়কে আমার নাম করে বলো, যেন তিনি প্রতাপকে আসতে বলেন।' আমি বললুম — তা শুনলে না।

"মা কি কম জিনিস গা? চৈতন্যদেব কত বুঝিয়ে তবে মার কাছ থেকে চলে আসতে পাল্লেন। শচী বলেছিল, কেশব ভারতীকে কাটব। চৈতন্যদেব অনেক করে বোঝালেন। বললেন, 'মা, তুমি না অনুমতি দিললে আমি যাব না। তবে সংসারে যদি আমায় রাখ, আমার শরীর থাকবে না। আর মা, যখন তুমি মনে করবে, আমাকে দেখতে পাবে। আমি কাছেই থাকব, মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাব।' তবে শচী অনুমতি দিলেন।

"মা যতদিন ছিল, নারদ ততদিন তপস্যায় যেতে পারেননি। মার সেবা করতে হয়েছিল কিনা! মার দেহত্যাগ হলে তবে হরিসাধন করতে বেরুলেন।

"বৃন্দাবনে গিয়ে আর আমার ফিরে আসতে ইচ্ছা হল না। গঙ্গামার কাছে থাকবার কথা হল। সব ঠিকঠাক! এদিকে আমার বিছানা হবে, ওদিকে গঙ্গামার বিছানা হবে, আর কলকাতায় যাব না, কৈবর্তর ভাত আর কতদিন খাব? তখন হৃদে বললে, না তুমি কলকাতায় চল। সে একদিকে টানে, গঙ্গামা আর-একটিকে টানে। আমার খুব থাকবার ইচ্ছা। এমন সময়ে মাকে মনে পড়ল। অমনি সব

বদলে গেল। মা বুড়ো হয়েছেন। তা বলুম মার চিন্তা থাকলে ঈশ্বর-ফীশ্বর সব ঘুরে যাবে। তার চেয়ে তাঁর কাছে যাই। গিয়ে সেইখানে ঈশ্বরচিন্তা করব, নিশ্চিন্ত হয়ে।

(নরেন্দ্রের প্রতি) — “তুমি একটু তাকে বলো না। আমায় সেদিন বললে, হাঁ দেশে যাব, তিনদিন গিয়ে থাকব। তারপর যে সেই।

(ভক্তদের প্রতি) — “আজ ঘোষপাড়া-ফোষপাড়া কি কথা হল। গোবিন্দ, গোবিন্দ, গোবিন্দ! এখন হরিনাম একটু বল। কড়ার ডাল টড়ার ডালের পর পায়েস মুণ্ডি হয়ে যাক্‌।”

নরেন্দ্র গাহিতেছেন:

এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে, চিত্ত সমাধান কর রে,
আদি সত্য তিনি কারণ-কারণ, প্রাণরূপে ব্যাপ্ত চরাচরে,
জীবন্ত জ্যোতির্ময়, সকলের আশ্রয়, দেখে সেই যে জন বিশ্বাস করে।
অতীন্দ্রিয় নিত্য চৈতন্যস্বরূপ, বিরাজিত হৃদিকন্দরে;
জ্ঞানপ্রেম পুণ্যে, ভূষিত নানাগুনে, যাহার চিন্তনে সন্তাপ হরে।
অনন্ত গুণাধার প্রশান্ত-মূরতি, ধারণা করিতে কেহ নাহি পারে,
পদাশ্রিত জনে, দেখা দেন নিজ গুণে, দীন হীন ব’লে দয়া করে।
চির ক্ষমাশীল কল্যাণদাতা, নিকট সহায় দুঃখসাগরে;
পরম ন্যায়বান্‌ করেন ফলদান, পাপপুণ্য কর্ম অনুসারে।
প্রেমময় দয়াসিন্ধু, কৃপানিধি, শ্রবণে যাঁর গুণ আঁখি ঝরে,
তাঁর মুখ দেখি, সবে হও রে সুখী, তৃষিত মন প্রাণ যাঁর তরে।

বিচিত্র শোভাময় নির্মল প্রকৃতি, বর্ণিতে সে অপরূপ বচন হারে;

ভজন সাধন তাঁর, কর হে নিরন্তর, চির ভিখারী হয়ে তাঁর দ্বারে।

(২) - চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে।

ঠাকুর নাচিতেছেন। বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতেছেন, সকলে কীর্তন করিতেছেন আর নাচিতেছেন। খুব আনন্দ। গান হইয়া গেলে ঠাকুর নিজে আবার গান ধরিলেন:

শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা,

মাস্টার সঙ্গে গাহিয়াছিলেন দেখিয়া ঠাকুর বড় খুশি! গান হইয়া গেলে ঠাকুর মাস্টারকে সহাস্যে বলিতেছেন, বেশ খুলি হত, তাহলে আরও জমাট হত। তাক তাক তা ধিনা, দাক দাক দা ধিনা; এই সব বোল বাজবে!

কীর্তন হইতে হইতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

১ অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ।।

[গীতা ৯।২২]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c33 ৩৩ শ্রীরামকৃষ্ণের অধরের বাড়ি আগমন ও ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দ

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১লা অক্টোবর 1884/10/01/i

33.1 কেদার, বিজয়, বাবুরাম, নারাণ, মাস্টার, বৈষ্ণবচরণ

আজ (১৬ই) আশ্বিন, শুক্লা একাদশী, বুধবার, ১লা অক্টোবর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর হইতে অধরের বাড়ি আসিতেছেন। সঙ্গে নারাণ,গঙ্গাধর। পথিমধ্যে হঠাৎ ঠাকুরের ভাবাবস্থা হইল। ঠাকুর ভাবে বলিতেছেন, "আমি মালা জোপব? হ্যাক থু! এ শিব যে পাতাল ফোঁড়া শিব, স্বয়ম্ভূলিঙ্গ!"

অধরের বাড়িতে আসিয়াছেন। এখানে অনেক ভক্তের সমাবেশ হইয়াছে। কেদার বিজয়, বাবুরাম প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত। কীর্তনিয়া বৈষ্ণবচরণ আসিয়াছেন। ঠাকুরের আদেশক্রমে অধর প্রত্যহ আফিস হইতে আসিয়াই বৈষ্ণবচরনের সংকীর্তন শুনেন বৈষ্ণবচরণের সংকীর্তন অতি মিষ্ট। আজও সংকীর্তন হইবে।

ঠাকুর অধরের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। ভক্তেরা সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। ঠাকুর সহাস্যে আসন গ্রহণ করিলে পর তাঁহারাও উপবেশন করিলেন। কেদার ও বিজয় প্রণাম করিলে পর ঠাকুর নারাণ ও বাবুরামকে তাঁহাদের প্রণাম করিতে বলিলেন। আর বলিলেন, আপনারা আশীর্বাদ করো, যেন এদের ভক্তি হয়। নারাণকে দেখাইয়া বলিলেন, এ বড় সরল; ভক্তেরা বাবুরামও নারাণকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারাদি ভক্তের প্রতি) — তোমাদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হল — তা না হলে তোমরা কালীবাড়ি গিয়ে পড়তে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় দেখা হয়ে গেল।

কেদার (বিনীতভাবে, কৃতাঞ্জলি) — ঈশ্বরের ইচ্ছা — সে আপনার ইচ্ছা।

ঠাকুর হাসিতেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১লা অক্টোবর 1884/10/01/ii

33.2 ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে

এইবার কীর্তন আরম্ভ হইল। বৈষ্ণবচরণ অভিসার আরম্ব করিয়া রাসকীর্তন করিয়া পালা সমাপ্ত করিলেন। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন কীর্তন যাই আরম্ভ হইল,

ঠাকুর প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া নাচিতে লাগিলেন ও সংকীর্তন করিতে লাগিলেন। কীর্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি) — ইনি বেশ গান!

এই বলিয়া বৈষ্ণবচরণকে দেখাইয়া দিলেন ও তাঁহাকে ‘শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর’ এই গানটি গাহিতে বলিলেন। বৈষ্ণবচরণ গান ধরিলেন:

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নব নটবর, তপত কাঞ্চনকায় ইত্যাদি।

গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুর বিজয়কে বলিলেন, ‘কেমন?’ বিজয় বলিলেন, ‘আশ্চর্য।’ ঠাকুর গৌরাঙ্গের ভাবে নিজে গান ধরিলেন:

ভাব হবে বইকি রে!
ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব হবে বইকিরে ।।
ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়।
বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে; সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে।
যার অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর (ভাব হবে) ।
গোরা ফুকরি ফুকরি কান্দে; গোরা আপনার পায় আপনি ধরে।
বলে কোথা রাই প্রেমময়ী।

মণি সঙ্গে সঙ্গে গাইতেছেন।

ঠাকুরের গান সমাপ্ত হইলে বৈষ্ণবচরণ আবার গাইলেন:

হরি হরি বল রে বীণে!

হরির করুণা বিনে, পরম তত্ত্ব আর পাবিনে ।।

হরিনামে তাপ হরে, মুখে বল হরে কৃষ্ণ হরে,

হরি যদি কৃপা করে, তবে ভবে আর ভাবিনে!

বীণে একবার হরি বল, হরিনাম বিনে নাই সম্বল,

দাস গোবিন্দ কয়, দিন গেলে, অকূলে যেন ডুবিনে।

ঠাকুর কীর্তনিয়ার মতন গানের সঙ্গে সঙ্গে সুর করিতেছেন। বৈষ্ণবচরণকে বলিতেছেন, ওইরকম করে বলো — কীর্তনিয়া ঢঙে।

বৈষ্ণবচরণ আবার গাইলেন:

শ্রীদুর্গানাম জপ সদা রসনা আমার।

দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনে কে করে নিস্তার ।।

দুর্গানাম তরী ভবার্ণব তরিবারে,

ভাসিতেছে, সেই তরী শ্রদ্ধাসরোবরে।

শ্রীগুরু করুণা করি যেই ধন দিলে,

সাধনা করহ তরী মিলিবে গো কূলে ।।

যদি বল ছয় রিপু হইয়ে পবন,

ধরিতে না দিবে তরী করিবে তুফান।

তুফানেতে কি করিবে শ্রীদুর্গানাম যার তরী,

তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্য মা, তুমি সে পাতাল; তোমা হতে হরি ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল।

দশ মহাবিদ্যা মাতা দশ অবতার,

এবার কোনরূপে আমায় করিতে হবে পার ।।

চল অচল তুমি মা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল,

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি মা তুমি বিশ্বমূল।

ত্রিলোকজননী তুমি, ত্রিলোক তারিণী;

সকলের শক্তি তুমি মা তোমার শক্তি তুমি ।।

ঠাকুর গায়কের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ গাহিতে লাগিলেন:

চল অচল তুমি মা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল,

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি মা তুমি বিশ্বমূল,

ত্রিলোকজননী তুমি, ত্রিলোক তারিণী;

সকলের শক্তি তুমি মা তোমার শক্তি তুমি ।।

কীর্তনীয়া আবার আরম্ভ করিলেন:

বায়ু অন্ধকার আদি শূন্য আর আকাশ,

রূপ দিক্ দিগন্তর তোমা হ’তে প্রকাশ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু আদি করি যতেক অমরে,

তব শক্তি প্রকাশিছে সকল শরীরে ।।

ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না বজ্রা চিত্রিণীতে,

ক্রমযোগে আছে জেগে সহস্রা হইতে।

চিত্রিণীর মধ্যে ঊর্ধ্বে আছে পদ্ম সারি সারি,

শুক্লবর্ণ সুবর্ণবর্ণ বিদ্যুতাদি করি ।।
দুই পদ্ম প্রস্ফুটিত একপদ্ম কোঢ়া,
অধোমুখে ঊর্ধ্ব মুখে আছে দুই পদ্ম জোড়া।
হংসরূপে বিহার তথায় কর গো আপনি,
আধার কমলে হও মা কুলকুণ্ডলিনী ।।
তদূর্ধ্বে মণিপুর নাম নাভিস্থল,
রক্তবর্ণ পদ্ম তাহে আছে দশদল।
সেই পদ্মে তব শক্তি অনল আছয়,
সে অনল নিবৃত্তি হ'লে সকলই নিভায় ।।
হৃদিপদ্মে আছে মানস সরোবর,
অনাহত পদ্ম ভাসে তাহার উপর।
সুবর্ণবর্ণ দ্বাদশদল তথায় শিব বাণ,
যেই পদ্মে তব শক্তি জীব আর আণ ।।
তদূর্ধ্বে কণ্ঠদেশ ধুম্রবর্ণ পদ্ম,
ষোড়শদল নাম তাঁর পদ্ম বিশুদ্ধাখ্য।
সেই পদ্মে তব শক্তি আছয়ে আকাশ,
সে আকাশ রুদ্ধ হঞ্চলে সকলি আকাশ ।।
তদূর্ধে শিরসি মধ্যে পদ্ম সহস্রদল,
গুরুদেবের স্থান সেই অতি গুহ্য স্থল।
সেই পদ্মে বিম্বরূপে পরমশিব বিরাজে,
একা আছেন শুক্লবর্ণ সহস্রদল পঙ্কজে ।।
ব্রহ্মরন্ধ্র আছে যথা শিব বিম্বরূপ,

তুমি তথা গেলে, শিব হন স্বীয়রূপ।

তথাশিবসঙ্গে রঙ্গে কর গো বিহার,

বিহার সমাপনে শিব হন বিম্বাকার ।।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১লা অক্টোবর 1884/10/01/iii

33.3 বিজয় প্রভৃতির সঙ্গে সাকার-নিরাকার কথা — চিনির পাহাড়

কেদার ও কয়েকটি ভক্ত গাত্রোত্থান করিলেন — বাড়ি যাইবেন। কেদার ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন, আর বলিলেন, আজ্ঞা তবে আসি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি অধরকে না বলে যাবে? অভদ্রতা হয় না?

কেদার — তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্; আপনি যেকালে রইলেন, সকলেরই থাকা হল — আর কিছু অসুখ বোধ হয়েছে — আর বিয়ে থাওয়ার জন্য একটা ভয় হয় — সমাজ আছে — একবার তো গোল হয়েছে —

বিজয় — এঁকে রেখে যাওয়া —

সময় ঠাকুরকে লইয়া যাইতে অধর আসিলেন। ভিতরে পাতা হইয়াছে। ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন ও বিজয় ও কেদারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এসো গো আমার সঙ্গে। বিজয়, কেদার ও অন্যান্য ভক্তেরা ঠাকুরের সঙ্গে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুর আহারান্তে বৈঠকখানায় আসিয়া আবার বসিলেন। কেদার, বিজয় ও অন্যান্য ভক্তেরা চারিপার্শ্বে বসিলেন।

[কেদারের কাকুতি ও ক্ষমা প্রার্থনা — বিজয়ের দেবদর্শন]

কেদার কৃতাঞ্জলি হইয়া অতি নম্রভাবে ঠাকুরকে বলিতেছেন, মাপ করুন, যা ইতস্ততঃ করেছিলাম। কেদার ভাবিতেছেন, ঠাকুর যেখানে আহার করিয়াছেন, সেখানে আমি কোন্ ছার!

কেদারের কর্মস্থল ঢাকায়। সেখানে অনেক ভক্ত তাঁহার কাছে আসেন ও তাঁহাকে খাওয়াইতে সন্দেশাদি নানারূপ দ্রব্য আনয়ন করেন। কেদার সেই সকল কথা ঠাকুরকে নিবেদন করিতেছেন।

কেদার (বিনীতভাবে) — লোকে অনেকে খাওয়াতে আসে। কি করব প্রভু, হুকুম করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ভক্ত হলে চণ্ডালের অন্ন খাওয়া যায়। সাত বৎসর উন্মাদের পর ও-দেশে (কামারপুকুরে) গেলুম। তখন কি অবস্থাই গেছে। খানকী পর্যন্ত খাইয়ে দিলে! এখন কিন্তু পারি না।

কেদার (বিদায় গ্রহণের পূর্বে মৃদুস্বরে) — প্রভু, আপনি শক্তি সঞ্চার করুন। অনেক লোক আসে। আমি কি জানি।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— হয়ে যাবে গো! আন্তরিক ঈশ্বরে মতি থাকলে হয়ে যায়।

কেদার বিদায় লইবার পূর্বে বঙ্গবাসীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র প্রবেশ করিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

সাকার-নিরাকার সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— তিনি সাকার, নিরাকার, আবার কত কি; তা আমরা জানি না! শুধু নিরাকর বললে কেমন করে হবে?

যোগেন্দ্র —— ব্রাহ্মসমাজের এক আশ্চর্য! বারবছরের ছেলে, সেও নিরাকার দেখছে! আদিসমাজে সাকারে অত আপত্তি নাই। ওরা পূজাতে ভদ্রলোকের বাড়িতে আসতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — ইনি বেশ বলেছেন, সেও নিরাকার দেখছে।

অধর —— শিবনাথবাবু সাকার মানেন না।

বিজয় —— সেটা তাঁর বুঝবার ভুল। ইনি যেমন বলেন, বহুরূপী কখন এ রঙ কখন সে রঙ। যে গাছতলায় বসে থাকে, সেই ঠিক জানতে পারে। আমি ধ্যান করতে করতে দেখতে পেলাম চালচিত্র। কত দেবতা, তাঁরা কত কি বলেন। আমি বললুম, তাঁর কাছে যাব তবে বুঝব।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমার ঠিক দেখা হয়েছে।

কেদার — ভক্তের জন্য সাকার। প্রেমে ভক্ত সাকার দেখে। ধ্রুব যখন ঠাকুরকে দর্শন কল্লেন, বলেছিলেম, কুণ্ডল কেন দুলছে না? ঠাকুর বললেন, তুমি দোলালেই দোলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সব মানতে হয় গো — নিরাকার-সাকার সব মানতে হয়। কালীঘরে ধ্যান করতে করতে দেখলুম রমণী খানকী! বললুম, মা তুই এইরূপেও আছিস! তাই বলছি, সব মানতে হয়। তিনি কখন কিরূপে দেখা দেন, সামনে আসেন, বলা যায় না।

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন — এসেছেন এক ভাবের ফকির।

বিজয় — তিনি অনন্তশক্তি — আর-একরূপে দেখা দিতে পারেন না? কি আশ্চর্য! সব রেণুর রেণু এরা সব কি না এই সব ঠিক করতে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — একটু গীতা, একটু ভাগবত, একটু বেদান্ত পড়ে লোকে মনে করে, আমি সব বুঝে ফেলেছি। চিনির পাহাড়ে একটা পিঁপড়ে গিছল। একদানা চিনি খেয়ে তার পেটে ভরে গেল। আর-একদানা মুখে করে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় ভাবছে, এবারে এসে পাহাড়টা নিয়ে যাব! (সকলের হাস্য)
পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c34 ৩৪ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে লাটু, মাস্টার, মণিলাল, মুখুজ্জে প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ও কলুটোলায় কীর্তনানন্দে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২রা অক্টোবর 1884/10/02/i

34.1 ব্রাহ্ম মণিলালকে উপদেশ — বিদ্বেষভাব (Dogmatism) ত্যাগ কর

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন।

আজ বৃহস্পতিবার, ২রা অক্টোবর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। ১৭ই আশ্বিন ১২৯১। আশ্বিন শুক্লা দ্বাদশী-ত্রয়োদশী। শ্রীশ্রীবিজয়া দশমীর দুই দিন পরে। গতকল্য ঠাকুর কলিকাতায় অধরের বাড়িতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। সেখানে নারাণ, বাবুরাম,

মাস্টার, কেদার, বিজয় প্রভৃতি অনেকে ছিলেন। ঠাকুর সেখানে ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের কাছে আজকাল লাটু, রামলাল, হরিশ থাকেন। বাবুরামও মাঝে মাঝে আসিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত রামলাল শ্রীশ্রীভবতারিণীর সেবা করেন। হাজরা মহাশয়ও আছেন।

আজ শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক, প্রিয় মুখুজ্জে, তাঁহার আত্মীয় হরি, শিবপুরের একটি ব্রাহ্ম (দাড়ি আছে), বড় বাজার ১২নং মল্লিক স্ট্রীটের মারোয়াড়ী ভক্তেরা — উপস্থিত আছেন। ক্রমে দক্ষিণেশ্বরের কয়েকটি ছোকরা, সিঁথির মহেন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি ভক্তেরা আসিলেন। মণিলাল পুরাতন ব্রাহ্ম ভক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণিলাল প্রভৃতির প্রতি) — নমস্কার মানসেই ভাল। পায়ে হাত দিয়ে নমস্কারের কি দরকার। আর মানসে নমস্কার করলে কেউ কুণ্ঠিত হবে না।

"আমারই ধর্ম ঠিক, আর সকলের মিথ্যা — এ-ভাব ভাল নয়।

"আমি দেখি তিনিই সব হয়েছেন — মানুষ, প্রতিমা, শালগ্রাম সকলের ভিতরেই এক দেখি। এক ছাড়া দুই আমি দেখি না!

"অনেকে মনে করে আমাদের মত ঠিক, আর সব ভুল, — আমরা জিতেছি, আর সব হেরেছে। কিন্তু যে এগিয়ে এসেছে সে হয়তো, একটুর জন্য আটকে গেল। পেছনে যে পড়েছিল সে তখন এগিয়ে গেল। গোলোকধাম খেলায়, অনেক এগিয়ে এসে, পোয়া (ঘুঁটি) আর পড়ল না।

“হার-জিত তাঁর হাতে। তাঁর কার্য কিছু বোঝা যায় না। দেখ না, ডাব অত উঁচুতে থাকে, রোদ পায়, তবু ঠাণ্ডা শক্তি! — এ-দিকে পানিফল জলে থাকে — গরম গুণ।

“মানুষের শরীর দেখ। মাথা যেটা মূল (গোড়া), সেটা উপরে চলে গেল।”

[শ্রীরামকৃষ্ণ, চার আশ্রম ও যোগতত্ত্ব — ব্রাহ্মসমাজ ও ‘মনোযোগ’]

মণিলাল — আমাদের এখন কর্তব্য?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কোনরকম করে তাঁর সঙ্গে যোগ হয়ে থাকা। দুইপথ আছে, — কর্মযোগ আর মনোযোগ।

“যারা আশ্রমে আছে, তাদের যোগ কর্মের দ্বারা। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। সন্ন্যাসীরা১কাম্য কর্মের ত্যাগ করবে কিন্তু নিত্যকর্ম কামনাশূন্য হয়ে করবে। দণ্ডধারণ, ভিক্ষা করা, তীর্থযাত্রা, পূজা, জপ এ-সব কর্মের দ্বারা তাঁর সঙ্গে যোগ হয়।

“আর যে কর্মই কর, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কামনাশূন্য হয়ে করতে পারলে তাঁর সঙ্গে যোগ হয়।

“আর-একপথ মনোযোগ। এরূপ যোগীর বাহিরের কোন চিহ্ন নাই। অন্তরে যোগ। যেমন জড়ভরত, শুকদেব। আরও কত আছে — এরা নামজাদা। এদের শরীরে চুল, দাড়ি, যেমন তেমনই থাকে।

“পরমহংস অবস্থায় কর্ম উঠে যায়। স্ম রণ-মনন থাকে। সর্বদাই মনের যোগ। যদি কর্ম করে সে লোকশিক্ষার জন্য।

“কর্মের দ্বারাই যোগ হউক, আর মনের দ্বারাই যোগ হউক ভক্তি হলে সব জানতে পারা যায়।

“ভক্তিতে কুম্ভক আপনি হয় — একাগ্র মন হলেই বায়ু স্থির হয়ে যায়, আর বায়ু স্থির হলেই মন একাগ্র হয়, বুদ্ধি স্থির হয়। যার হয় সে নিজে টের পায় না।”

[পূর্বকথা — সাধনাবস্থায় জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা — ভক্তিযোগ]

“ভক্তিযোগে সব পাওয়া যায়। আমি মার কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম, ‘মা, যোগীরা যোগ করে যা জেনেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে — আমায় জানিয়ে দাও — আমায় দেখিয়ে দাও!’ মা আমায় সব দেখিয়ে দিয়েছেন। ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে কাঁদলে তিনি সব জানিয়ে দেন। বেদ-বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র — এ-সব শাস্ত্রে কি আছে; সব তিনি আমায় জানিয়ে দিয়েছেন।”

মণিলাল — হঠযোগ?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হঠযোগীরা দেহাভিমানী সাধু। কেবল নেতি ধৌতি করছে — কেবল দেহের যত্ন। ওদের উদ্দেশ্য আয়ু বৃদ্ধি করা। দেহ নিয়ে রাতদিন সেবা। ও ভাল নয়।

[মণি মল্লিক, সংসারী ও মনের ত্যাগ — কেশব সেনের কথা]

“তোমাদের কর্তব্য কি? তোমরা মনে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করবে। তোমরা সংসারকে কাকবিষ্ঠা বলতে পার না।

“গোস্বামীরা গৃহস্থ, তাই তাদের বললাম, তোমাদের ঠাকুর সেবা রয়েছে, তোমরা সংসারত্যাগ কি করবে? — তোমরা সংসারকে মায়া বলে উড়িয়ে দিতে পার না।

“সংসারীদের যা কর্তব্য চৈতন্যদেব বলেছিলেন — জীবে দয়া, বৈষ্ণবসেবা, নামসংকীর্তন।

“কেশব সেন বলেছিল, উনি এখন দুই-ই কর বলছেন। একদিন কুটুস করে কামড়াবেন। তা নয় — কামড়াব কেন?”

মণি মল্লিক — তাই কামড়ান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — কেন? তুমি তো, তাই আছ — তোমার ত্যাগ করবার কি দরকার?

১ কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ।।
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ।। [গীতা, ১৮।২, ৩]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২রা অক্টোবর 1884/10/02/ii

34.2 আচার্যের কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ, তবে লোকশিক্ষার অধিকার — সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম — ব্রাহ্ম মণিলালকে শিক্ষা

শ্রীরামকৃষ্ণ — যাদের দ্বারা তিনি লোকশিক্ষা দেবেন, তাদের সংসারত্যাগ দরকার। তা না হলে উপদেশ গ্রাহ্য হয় না। শুধু ভিতরে ত্যাগ হলে হবে না। বাহিরে ত্যাগও চাই, তবে লোকশিক্ষা হয়। তা না হলে লোকে মনে করে, ইনি যদিও কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে বলছেন, ইনি নিজে ভিতরে ভিতরে ওই সব ভোগ করেন।

“একজন কবিরাজ ঔষধ দিয়ে রোগীকে বললে, তুমি আর-একদিন এসো, খাওয়া-দাওয়ার কথা বলে দিব। সেদিন তাঁর ঘরে অনেকগুলি গুড়ের নাগরি ছিল। রোগীর বাড়ি অনেক দূরে। সে আর-একদিন এসে দেখা করলে। কবিরাজ বললে ‘খাওয়া দাওয়া সাবধানে করবি, গুড় খাওয়া ভাল নয়।’ রোগী চলে গেলে একজন বৈদ্যকে বললে, ‘ওকে অত কষ্ট দিয়ে আনা কেন? সেই দিন বললেই তো হত!’ বৈদ্য হেসে বললে, ‘ওর মানে আছে। সেদিন ঘরে অনেকগুলি গুড়ের নাগরি ছিল। সেদিন যদি বলি, রোগীর বিশ্বাস হত না। সে মনে করত ওঁর ঘরে যেকালে এত গুড়ের নাগরি, উনি নিশ্চয় কিছু খান। তাহলে গুড়

জিনিসটা এত খারাপ নয়।’ আজ আমি গুড়ের নাগরি লুকিয়ে ফেলেছি, এখন বিশ্বাস হবে।

“আদি সমাজের আচার্যকে দেখলাম। শুনলাম নাকি দ্বিতীয় না তৃতীয় পক্ষের বিয়ে করেছে! — বড় বড় ছেলে!

“এই সব আচার্য! এরা যদি বলে ‘ঈশ্বর সত্য, আর সব মিথ্যা’ কে বিশ্বাস করবে! — এদের শিষ্য যা হবে, বুঝতেই পারছ।

“হেগো গুরু তার পেদো শিষ্য! সন্ন্যাসীও যদি মনে তাগ করে, বাহিরে কামিনী-কাঞ্চন লয়ে থাকে — তার দ্বারা লোকশিক্ষা হয় না। লোকে বলবে লুকিয়ে গুড় খায়।”

[শ্রীরামকৃষ্ণের কাঞ্চনত্যাগ — কবিরাজের পাঁচটাকা প্রত্যর্পণ]

“সিঁথির মহেন্দ্র (কবিরাজ) রামলালের কাছে পাঁচটা টাকা দিয়ে গিছল — আমি জানতে পারি নাই।

“রামলাল বললে পর, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কাকে দিয়েছে? সে বললে, এখানকার জন্য। আমি প্রথমটা ভাবলুম, দুধের দেনা আছে না হয় সেইটে শোধ দেওয়া যাবে। ও মা! খানিক রাত্রে ধড়মড় করে উঠে পড়েছি। বুকে যেন বিল্লি আঁচড়াচ্ছে! রামলালকে তখন গিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলুম, — ‘তোর খুড়ীকে কি দিয়েছে?’ সে বললে, ‘না’। তখন তাকে বললাম, ‘তুই এক্ষণই ফিরিয়ে দিয়ে আয়!’ রামলাল তার পরদিন টাকা ফিরিয়ে দিলে।

“সন্ন্যাসীর পক্ষে টাকা লওয়া বা লোভে আসক্ত হওয়া কিরূপ জানো? যেমন ব্রাহ্মণের বিধবা অনেক কাল হবিষ্য খেয়ে, ব্রহ্মচর্য করে, বাগ্ দী উপপতি করেছিল! (সকলে স্তম্ভিত)

“ও-দেশে ভগী তেলীর অনেক শিষ্য সামন্ত হল। শূদ্রকে সব্বাই প্রণাম করে দেখে, জমিদার একটা দুষ্ট লোক লাগিয়ে দিলে। সে তার ধর্ম নষ্ট করে দিলে — সাধন-ভজন সব মাটি হয়ে গেল। পতিত সন্ন্যাসী সেইরূপ।”

[সাধুসঙ্গের পর শ্রদ্ধা — কেশব সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী]

“তোমারা সংসারে আছ, তোমাদের সৎসঙ্গ (সাধুসঙ্গ) দরকার।

“আগে সাধুসঙ্গ, তারপর শ্রদ্ধা। সাধুরা যদি তাঁর নামগুণানুকীর্তন না করে, তাহলে কেমন করে লোকের ঈশ্বরে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি হবে? তিন পুরুষে আমির জানলে তবে তো লোকে মানবে?

(মাস্টারের প্রতি) — “জ্ঞান হলেও সর্বদা অনুশীলন চাই। ন্যাংটা বলত, ঘটি একদিন মাজলে কি হবে — ফেলে রাখলে আবার কলঙ্ক পড়বে!

“তোমার বাড়িটায় একবার যেতে হবে। তোমার আড্ডাটা জানা থাকলে, সেখানে আরও ভক্তদের সঙ্গে দেখা হবে। ঈশানের কাছে একবার যাবে।

(মণিলালের প্রতি) — “কেশব সেনের মা এসেছিল। তাদের বাড়ির ছোকরারা হরিনাম করলে। সে তাদের প্রদক্ষিণ করে হাততালি দিতে লাগল। দেখলাম

শোকে কাতর হয় নাই। এখানে এসে একাদশী করলে, মালাটি লয়ে জপ করে! বেশ ভক্তি দেখলাম।”

মণিলাল — কেশববাবুর পিতামহ রামকমল সেন ভক্ত ছিলেন। তুলসীকাননের মধ্যে বসে নাম করতেন। কেশবের বাপ প্যারীমোহনও ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বাপ ওরূপ না হলে ছেলে অমন ভক্ত হয় না। দেখো না, বিজয়ের অবস্থা।

“বিজয়ের বাপ ভাগবত পড়তে পড়তে ভাবে অজ্ঞান হয়ে যেত। বিজয় মাঝে মাঝে ‘হরি! হরি!’ বলে উঠে পড়ে।

“আজকাল বিজয় যা সব (ঈশ্বরীয় রূপ) দর্শন করছে, সব ঠিক ঠিক!

“সাকার-নিরাকারের কথা বিজয় বললে — যেমন বহুরূপীর রঙ — লাল, নীল, সবুজও হচ্ছে — আবার কোনও রঙই নাই। কখন সগুণ কখন নির্গুণ।”

[বিজয় সরল — “সরল হলে ঈশ্বরলাভ হয়”]

“বিজয় বেশ সরল — খুব উদার সরল না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

“বিজয় কাল অধর সেনের বাড়িতে গিছল। তা যেন আপনার বাড়ি — সবাই যেন আপনার।

“বিষয়বুদ্ধি না গেলে উদার সরল হয় না।

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাহিতেছেন —

“অমূল্যধন পাবি রে মন হলে খাঁটি!

“মাটি পাট করা না হলে হাঁড়ি তৈয়ার হয় না। ভিতরে বালিঢিল থাকলে হাঁড়ি ফেটে যায়। তাই কুমোর আগে মাটি পাট করে।

“আরশিতে ময়লা পড়ে থাকলে মুখ দেখা যায় না। চিত্তশুদ্ধি না হলে স্ব-স্বরূপদর্শন হয় না।

“দেখো না, যেখানে অবতার, সেখানেই সরল। নন্দঘোষ, দশরথ, বসুদেব — এঁরা সব সরল।

“বেদান্তে বলে শুদ্ধবুদ্ধি না হলে ঈশ্বরকে জানতে ইচ্ছা হয় না। শেষ জন্ম বা অনেক তপস্যা না থাকলে উদার সরল হয় না।”
পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২রা অক্টোবর 1884/10/02/iii

34.3 শ্রীরামকৃষ্ণের বালকের অবস্থা।

ঠাকুরের পা একটু ফুলো ফুলো বোধ হওয়াতে তিনি বালকের ন্যায় চিন্তিত আছেন।

সিঁথির মহেন্দ্র কবিরাজ আসিয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রিয় মুখুজ্জে প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি) — কাল নারাণকে বললাম, তোর পা টিপে দেখ দেখি, ডোব হয় কি না। সে টিপে দেখলে —— ডোব হল; — তখন বাঁচলুম। (মুখুজ্জের প্রতি) — তুমি একবার তোমার পা টিপে দেখো তো; ডোব হয়েছে?

মুখুজ্জে —— আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— আঃ! বাঁচলুম।

মণি মল্লিক —— কেন? আপনি স্রোতের জলে নাইবেন। সোরা ফোরা কেন খাওয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— না গো, তোমাদের রক্তের জোর আছে, — তোমাদের আলাদা কথা!

“আমায় বালকের অবস্থায় রেখেছে।

“ঘাস বনে একদিন কি কামড়ালে। আমি শুনেছিলাম, সাপে যদি আবার কামড়ায়, তাহলে বিষ তুলে লয়। তাই গর্তে হাত দিয়ে রইলাম। একজন এসে বললে — ও কি কচ্ছেন? — সাপ যদি সেইখানটা আবার কামড়ায়, তাহলে হয়। অন্য জায়গায় কামড়ালে হয় না।

“শরতের হিম ভাল, শুনেছিলাম — কলকাতা থেকে গাড়ি করে আসবার সময় মাথা বার করে হিম লাগাতে লাগলাম। (সকলের হাস্য)

(সিঁথির মহেন্দ্রের প্রতি) — “তোমাদের সিঁথির সেই পণ্ডিতটি বেশ। বেদান্তবাগীশ। আমায় মানে। যখন বললাম, তুমি অনেক পড়েছ, কিন্তু ‘আমি অমুক পণ্ডিত’ এ-অভিমান ত্যাগ করো, তখন তার খুব আহ্লাদ।

“তার সঙ্গে বেদান্তের কথা হল।”

[মাস্টারকে শিক্ষা — শুদ্ধআত্মা, অবিদ্যা; ব্রহ্মমায়া — বেদান্তের বিচার]

(মাস্টারের প্রতি) — যিনি শুদ্ধ আত্মা, তিনি নির্লিপ্ত। তাঁতে মায়া বা অবিদ্যা আছে। এই মায়ার ভিতরে তিন গুণ আছে — সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। যিনি শুদ্ধ আত্মা তাঁতে এই তিনগুণ রয়েছে, অথচ তিনি নির্লিপ্ত। আগুনে যদি নীল বড়ি ফেলে দাও, নীল শিখা দেখা যায়; রাঙা বড়ি ফেলে দাও, লাল শিখা দেখা যায়। কিন্তু আগুনের আপনার কোন রঙ নাই।

“জলে নীল রঙ ফেলে দাও, নীল জল হবে। আবার ফটকিরি ফেলে দিলে সেই জলেরই রঙ।

“মাংসের ভার লয়ে যাচ্চে চণ্ডালে — সে শঙ্করকে ছুঁয়েছিল। শঙ্কর যেই বলেছেন, আমায় ছুঁলি! — চণ্ডাল বললে, ঠাকুর, আমিও তোমায় ছুঁই নাই, — তুমিও আমায় ছোঁও নাই! তুমি শুদ্ধ আত্মা — নির্লিপ্ত।

“জড়ভরতও ওই সকল কথা রাজা রহুগণকে বলেছিল।

“শুদ্ধ আত্মা নির্লিপ্ত। আর শুদ্ধ আত্মাকে দেখা যায় না। জলে লবণ মিশ্রিত থাকলে লবণকে চক্ষের দ্বারা দেখা যায় না।

“যিনি শুদ্ধ আত্মা তিনিই মহাকারণ — কারণের কারণ। স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ মহাকারণ। পঞ্চভূত স্থূল। মন বুদ্ধি অহংকার, সূক্ষ্ম। প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি সকলের কারণ। ব্রহ্ম বা শুদ্ধ আত্মা কারণের কারণ।

“এই শুদ্ধ আত্মাই আমাদের স্বরূপ।

“জ্ঞান কাকে বলে? এই স্ব-স্বরূপকে জানা আর তাঁতে মন রাখা! এই শুদ্ধ আত্মাকে জানা।”

[কর্ম কতদিন?]

“কর্ম কতদিন? — যতদিন দেহ অভিমান থাকে; অর্থাৎ দেহই আমি এই বুদ্ধি থাকে। গীতায় ওই কথা আছে।১

“দেহে আত্মবুদ্ধি করার নামই অজ্ঞান।

(শিবপুরের ব্রাহ্মভক্তের প্রতি) — “আপনি কি ব্রাহ্ম?”

ব্রাহ্মভক্ত — আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্য) — আমি নিরাকার সাধকের চোখ মুখ দেখে বুঝতে পারি। আপনি একটু ডুব দেবেন। উপরে ভাসলে রত্ন পাওয়া যায় না। আমি সাকার-নিরাকার সব মানি।

[মারোয়াড়ী ভক্ত ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ — জীবাত্মা — চিত্ত]

বড়বাজারের মারিয়াড়ী ভক্তেরা আসিয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর তাঁহাদের সুখ্যাতি করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — আহা! এরা যে ভক্ত। সকলে ঠাকুরের কাছে যাওয়া — স্তব করা — প্রসাদ পাওয়া! এবার যাঁকে পুরোহিত রেখেছেন, সেটি ভাগবতের পণ্ডিত।

মারোয়াড়ী ভক্ত — “আমি তোমার দাস” যে বলে সে আমিটা কে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — লিঙ্গশরীর বা জীবাত্মা। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার — এ চারিটি জড়িয়ে লিঙ্গশরীর।

মারোয়াড়ী ভক্ত — জীবাত্মাটি কে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — অষ্টপাশ জড়িত আত্মা। আর চিত্ত কাকে বলে? যে ওহো! করে উঠে।

[মাড়োয়াড়ী — মৃত্যুর পর কি হয়? মায়া কি? “গীতার মত”]

শ্রীরামকৃষ্ণ — গীতার মতে, মরবার সময় যা ভাবে, তাই হবে। ভরত রাজা হরিণ ভেবে হরিণ হয়েছিল। তাই ঈশ্বরকে লাভ করবার জন্য সাধন চাই। রাতদিন তাঁর চিন্তা করলে মরবার সময়ও সেই চিন্তা আসবে।

মারোয়াড়ী ভক্ত — আচ্ছা মহারাজ, বিষয় বৈরাগ্য হয় না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — এরই নাম মায়া। মায়াতে সৎকে অসৎ, অসৎকে সৎ বোধ হয়।

“সৎ অর্থাৎ যিনি নিত্য, — পরব্রহ্ম। অসৎ — সংসার অনিত্য।”

মারোয়াড়ী ভক্ত — শাস্ত্র পড়ি, কিন্তু ধারণা হয় না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — পড়লে কি হবে? সাধনা — তপস্যা চাই। তাঁকে ডাকো। “সিদ্ধি সিদ্ধি” বললে কি হবে, কিছু খেতে হয়।

“এই সংসার কাঁটাগাছের মতো। হাত দিলে রক্ত বেরোয়। যদি কাঁটাগাছ এনে, বসে বসে বল, ওই গাছ পুড়ে গেল, তা কি অমনি পুড়ে যাবে? জ্ঞানাগ্নি আহরণ কর। সেই আগুন লাগিয়ে দাও, তবে তো পুড়বে!

“সাধনের অবস্থায় একটুখাটতে হয় তারপর সোজা পথ। ব্যাঁক কাটিয়ে অনুকূল বায়ুতে নৌকা ছেড়ে দাও।”

[আগে মায়ার সংসার ত্যাগ, তারপর জ্ঞানলাভ — ঈশ্বরলাভ]

“যতক্ষণ মায়ার ঘরের ভিতরে আছ, যতক্ষণ মায়া-মেঘ রয়েছে, ততক্ষণ জ্ঞান-সূর্য কাজ করে না। মায়াঘর ছেড়ে বাহিরে এসে দাঁড়ালে (কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের পর) তবে জ্ঞানসূর্য অবিদ্যা নাশ করে। ঘরের ভিতর আনলে আতস কাচে কাগজ পুড়ে না। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালে, রোদটি কাচে পড়ে, — তখন কাগজ পুড়ে যায়।

“আবার মেঘ থাকলে আতস কাচে কাগজ পুড়ে না। মেঘটি সরে গেলে তবে হয়।

“কামিনী-কাঞ্চন ঘর থেকে একটু সরে দাঁড়ালে — সরে দাঁড়িয়ে একটু সাধনা-তপস্যা করলে — তবেই মনের অন্ধকার নাশ হয় — অবিদ্যা অহংকার মেঘ পুড়ে যায় — জ্ঞানলাভ হয়!

“আবার কামিনী-কাঞ্চনই মেঘ।”

১ ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ।। [গীতা, ১৮। ১১]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২রা অক্টোবর 1884/10/02/iv

34.4 পূর্বকথা —– লক্ষ্মীনারায়ণের দশ হাজার টাকা দিবার কথায় শ্রীরামকৃষ্ণের অচৈতন্য হওয়া —– সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম

শ্রীরামকৃষ্ণ (মারোয়াড়ীর প্রতি) — ত্যাগীর বড় কঠিন নিয়ম। কামিনী-কাঞ্চনের সংস্রব লেশমাত্রও থাকবে না। টাকা নিজের হাতে তো লবে না, — আবার কাছেও রাখতে দেবে না।

“লক্ষ্মীনারায়ণ মারোয়াড়ী, বেদান্তবাদী, এখানে প্রায় আসত। বিছানা ময়লা দেখে বললে, আমি দশ হাজার টাকা লিখে দোব, তার সুদে তোমার সেবা চলবে।

“যাই ও-কথা বললে অমনি যেন লাঠি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম!

“চৈতন্য হবার পর তাকে বললাম, তুমি অমন কথা যদি আর মুখে বলো, তা হলে এখানে আর এসো না। আমার টাকা ছোঁবার জো নাই, কাছেও রাখবার জো নাই।

“সে ভারী সূক্ষ্মবুদ্ধি, — বললে, ‘তাহলে এখনও আপনার ত্যাজ্য, গ্রাহ্য আছে। তবে আপনার জ্ঞান হয় নাই।”

“লক্ষ্মীনারায়ণ তখন হৃদের কাছে দিতে চাইলে, আমি বললাম, তাহলে আমায় বলতে হবে ‘একে দে, ওকে দে’; না দিলে রাগ হবে! টাকা কাছে থাকাই খারাপ! সে-সব হবে না!

“আরশির কাছে জিনিস থাকলে প্রতিবিম্ব হবে না?

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও মুক্তিতত্ত্ব — “কলিতে বেদমত নয় পুরাণমত”]

মারোয়াড়ী ভক্ত — মহারাজ, গঙ্গায় শরীরত্যাগ করলে তবে মুক্তি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — জ্ঞান হলেই মুক্তি। যেখানেই থাকো — ভাগাড়েই মৃত্যু হোক, আর গঙ্গাতীরেই মৃত্যু হোক জ্ঞানীর মুক্তি হবে।

“তবে অজ্ঞানের পক্ষে গঙ্গাতীর।”

মারোয়াড়ী ভক্ত — মহারাজ কাশীতে মুক্তি হয় কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কাশীতে মৃত্যু হলে শিব সাক্ষাৎকার হন। — হয়ে বলেন, আমার এই যে সাকার রূপ এ মায়িক রূপ — ভক্তের জন্য এই রূপ ধারণ করি, — এই দেখ্‌, অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মিলিয়ে যাই! এই বলে সে রূপ অন্তর্ধান হয়!

“পুরাণমতে চণ্ডালেরও যদি ভক্তি হয়, তার মুক্তি হবে। এ মতে নাম করলেই হয়। যাগযজ্ঞ, তন্ত্রমন্ত্র — এ-সব দরকার নাই।

“বেদমত আলাদা। ব্রাহ্মণ না হলে মুক্তি হয় না। আবার ঠিক মন্ত্র উচ্চারণ না হলে পূজা গ্রহণ হয় না। যাগযজ্ঞ, মন্ত্রতন্ত্র — সব বিধি অনুসারে করতে হবে।”

[কর্মযোগ বড় কঠিন — কলিতে ভক্তিযোগ]

“কলিকালে বেদোক্ত কর্ম করবার সময় কই?

“তাই কলিতে নারদীয় ভক্তি।

“কর্মযোগ বড় কঠিন। নিষ্কাম না করতে পারলে বন্ধনের কারণ হয়। তাতে আবার অন্নগত প্রাণ — সব কর্ম বিধি অনুসারে করবার সময় নাই। দশমূল পাঁচন খেতে গেলে রোগীর এদিকে হয়ে যায়। তাই ফিভার মিক্‌শ্চার।

“নারদীয় ভক্তি — তাঁর নামগুনকীর্তন করা।

“কলিতে কর্মযোগ ঠিক নয়, — ভক্তিই ঠিক।

“সংসারে কর্ম যতদিন ভোগ আছে করো। কিন্তু ভক্তি অনুরাগ চাই। তাঁর নামগুণকীর্তন করলে কর্মক্ষয় হবে।

“কর্ম চিরকাল করতে হয় না। তাঁতে যত শুদ্ধাভক্তি-ভালবাসা হবে, ততই কর্ম কমবে। তাঁকে লাভ করলে কর্মত্যাগ হয়। গৃহস্থের বউ-এর পেটে ছেলে হলে শাশুড়ী কর্ম কমিয়ে দেয়। সন্তান হলে আর কর্ম করতে হয় না।”

[সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম — সংস্কার থাকলে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা হয়]

দক্ষিণেশ্বর গ্রাম হইতে কতকগুলি ছোকরা আসিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহারা আসন গ্রহণ করিয়া ঠাকুরকে প্রশ্ন করিতেছেন। বেলা ৪টা হইবে।

দক্ষিণেশ্বরনিবাসী ছোকরা — মহাশয়, জ্ঞান কাকে বলে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বর সৎ, আর সমস্ত ব্রহ্ম অসৎ; এইটি জানার নাম জ্ঞান।

“যিনি সৎ তাঁর একটি নাম ব্রহ্ম, আর একটি নাম কাল (মহাকাল)। তাই বলে ‘কালে কত গেল — কত হলো রে ভাই!’

“ ‘কালী’ যিনি কালের সহিত রমণ করেন। আদ্যাশক্তি। কাল ও কালী, ব্রহ্ম — ব্রহ্ম ও শক্তি — অভেদ।

“সেই সৎরূপ ব্রহ্ম নিত্য — তিনকালেই আছেন — আদি অন্তরহিত। তাঁকে মুখে বর্ণনা করা যায় না। হদ্দ বলা যায়, — তিনি চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ।

“জগৎ অনিত্য, তিনিই নিত্য! জগৎ ভেলকিস্বরূপ। বাজিকরই সত্য। বাজিকরের ভেলকি অনিত্য।”

ছোকরা — জগৎ যদি মায়া — ভেলকি — এ মায়া যায় না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — সংস্কার-দোষে মায়া যায় না। অনেক জন্ম এই মায়ার সংসারে থেকে থেকে মায়াকে সত্য বলে বোধ হয়।

“সংস্কারের কত ক্ষমতা শোন। একজন রাজার ছেলে পূর্বজন্মে ধোপার ঘরে জন্মেছিল। রাজার ছেলে হয়ে যখন খেলা করছে, তখন সমবয়সীদের বলছে, ও-সব খেলা থাক! আমি উপুড় হয়ে শুই, আর তোরা আমার পিঠে হুস্ হুস্ করে কাপড় কাচ।

[সংস্কারবান গোবিন্দ পাল, গোপাল সেন, নিরঞ্জন, হীরানন্দ — পূর্বকথা — গোবিন্দ, গোপাল ও
ঠাকুরদের ছেলেদের আগমন — ১৮৬৩-৬৪]

“এখানে অনেক ছোকরা আসে, — কিন্তু কেউ কেউ ঈশ্বরের জন্য ব্যকুল। তারা সংস্কার নিয়ে এসেছে।

“সে-সব ছোকরা বিবাহের কথায় অ্যাঁ, অ্যাঁ করে! বিবাহের কথা মনেই করে না! নিরঞ্জন ছেলেবেলা থেকে বলে, বিয়ে করব না।

“অনেকদিন হল (কুড়ি বছরের অধিক) বরাহনগর থেকে দুটি ছোকরা আসত। একজনের নাম গোবিন্দ পাল আর-একজনের নাম গোপাল সেন। তাদের ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরেতে মন। বিবাহের কথায় ভয়ে আকুল হত। গোপালের ভাবসমাধি হত! বিষয়ী দেখলে কুণ্ঠিত হত; যেমন ইন্দুর বিড়াল দেখে কুণ্ঠিত হয়। যখন ঠাকুরদের (Tagore) ছেলেরা ওই বাগানে বেড়াতে এসেছিল, তখন কুঠির ঘরের দ্বার বন্ধ করলে, পাছে তাদের সঙ্গে কথা কইতে হয়।

“গোপালের পঞ্চবটীতলায় ভাব হয়েছিল। ভাবে আমার পায়ে হাত দিয়ে বলে, ‘আমি তবে যাই। আমি আর এ সংসারে থাকতে পারছি না — আপনার এখন

অনেক দেরি — আমি যাই।’ আমিও ভাবাবস্থায় বললাম — Change this in doc ‘আবার আসবে’। সে বললে — ‘আচ্ছা, আবার আসব।’

“কিছুদিন পরে গোবিন্দ এসে দেখা করলে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, গোপাল কই? সে বললে, গোপাল (শরীরত্যাগ করে) চলে গেছে।

“অন্য ছোকরারা কি করে বেড়াচ্ছে! — কিসে টাকা হয় — বাড়ি — গাড়ি — পোশাক, তারপর বিবাহ — এইজন্য ব্যস্ত হয়ে বেড়ায়। বিবাহ করবে, — আগে কেমন মেয়ে খোঁজ নেয়। আবার সুন্দর কি না, নিজে দেখতে যায়!

“একজন আমায় বড় নিন্দে করে। কেবল বলে, ছোকরাদের ভালবাসি। যাদের সংস্কার আছে — শুদ্ধ আত্মা, ঈশ্বরের জন্য ব্যকুল, — টাকা, শরীরের সুখ এ-সবের দিকে মন নাই — তাদেরই আমি ভালবাসি।

“যারা বিয়ে করেছে, যদি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে, তাহলে সংসারে আসক্ত হবে না। হীরানন্দ বিয়ে করেছে। তা হোক সে বেশি আসক্ত হবে না।”

হীরানন্দ সিন্ধুদেশবাসী, বি.এ.পাস, ব্রাহ্মভক্ত।

মণিলাল, শিবপুরের ব্রাহ্মভক্ত, মারোয়াড়ী ভক্তেরা ও ছোকরারা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২রা অক্টোবর 1884/10/02/v

34.5 কর্মত্যাগ কখন? ভক্তের নিকট ঠাকুরের অঙ্গীকার

সন্ধ্যা হইল। দক্ষিণের বারান্দা ও পশ্চিমের গোল বারান্দায় ফরাশ আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। ঠাকুরের ঘরে প্রদীপ জ্বালা হইল ও ধুনা দেওয়া হইল।

ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়া মার নাম করিতেছেন ও মার চিন্তা করিতেছেন। ঘরে মাস্টার, শ্রীযুক্ত প্রিয় মুখুজ্জে, তাঁহার আত্মীয় হরি মেঝেতে বসিয়া আছেন।

কিয়ৎক্ষণ ধ্যান চিন্তার পর ঠাকুর আবার ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। এখনও ঠাকুরবাড়ির আরতির দেরি আছে।

[বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ — ওঁকার ও সমাধি — "তত্ত্বমসি" — ওঁ তৎ সৎ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — যে নিশিদিন তাঁর চিন্তা করছে, তার সন্ধ্যার কি দরকার!

ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা-সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, কভু সন্ধি নাহি পায় ।।
দয়া ব্রত, দান আদি আর কিছু না মনে লয়।
মদনেরই যাগযজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙা পায় ।।

“সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী ওঁকারে লয়হয়।

“একবার ওঁ বললে যখন সমাধি হয় তখন পাকা।

“হৃষীকেশে একজন সাধু সকালবেলায় উঠে ভারী একটা ঝরনা তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত দিন সেই ঝরনা দেখে আর ঈশ্বরকে বলে — ‘বাঃ বেশ করেছ! বাঃ বেশ করেছ! কি আশ্চর্য!’ তার অন্য জপতপ নাই। আবার রাত্রি হলে কুটিরে ফিরে যায়।

“তিনি নিরাকার কি সাকার সে-সব কথা ভাববারই বা কি দরকার? নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে বললেই হয় — হে ঈশ্বর, তুমি যে কেমন, তাই আমায় দেখাদাও!

“তিনি অন্তরে বাহিরে আছেন।

“অন্তরে তিনিই আছেন। তাই বেদে বলে ‘তত্ত্বমসি’ (সেই তুমি)। আর বাহিরেও তিনি। মায়াতে দেখাচ্ছে, নানা রূপ; কিন্তু বস্তুত তিনিই রয়েছেন।

“তাই সব নাম রূপ বর্ণনা করবার আগে, বলতে হয় ওঁ তৎ সৎ।

“দর্শন করলে একরকম, শাস্ত্র পড়ে আর-একরকম। শাস্ত্রে আভাস মাত্র পাওয়া যায়। তাই কতকগুলো শাস্ত্র পড়বার কোন প্রয়োজন নাই। তার চেয়ে নির্জনে তাঁকে ডাকা ভাল।

“গীতা সমস্ত না পড়লেও হয়। দশবার গীতা গীতা বললে যা হয় তাই গীতার সার। অর্থাৎ ‘ত্যাগী’। হে জীব, সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের আরাধনা কর — এই গীতার সার কথা।”

[শ্রীরামকৃষ্ণের ’ভবতারিণীর আরতিদর্শন ও ভাবাবেশ]

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে মা-কালীর আরতি দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। আর ঠাকুর-প্রতিমা সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে পারিতেছেন না।

অতি সন্তর্পণে ভক্তসঙ্গে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। এখনও ভাবাবিষ্ট। ভাবাবস্থায় কথা কহিতেছেন।

মুখুজ্জের আত্মীয় হরির বয়ঃক্রম আঠার-কুড়ি হইবে। তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। আপাততঃ মুখুজ্জেদের বাড়িতেই থাকেন — কর্মকাজ করিবেন। ঠাকুরের উপর খুব ভক্তি।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও মন্ত্রগ্রহণ — ভক্তের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গীকার]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবাবেশে, হরির প্রতি) — তুমি তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে মন্ত্র নিও। (শ্রীযুক্ত প্রিয়কে) — এঁকে (হরিকে) বলেও দিতে পারলাম না, মন্ত্র তো দিই না।

“তুমি যা ধ্যান-জপ কর তাই করো।

প্রিয় — যে আজ্ঞা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আর আমি এই অবস্থায় বলছি — কথায় বিশ্বাস করো। দেখো, এখানে ঢঙ-ফঙ নাই।

“আমি ভাবে বলেছি, — মা, এখানে যারা আন্তরিক টানে আসবে; তারা যেন সিদ্ধ হয়।

সিঁথির মহেন্দ্র কবিরাজ বারান্দায় বসিয়া আছেন। শ্রীযুক্ত রামলাল হাজরা প্রভৃতির সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ঠাকুর নিজের আসন হইতে তাঁহাকে ডাকিতেছেন — “মহিন্দর!” “মহিন্দর!”

মাস্টার তাড়াতাড়ি গিয়া কবিরাজকে ডাকিয়া আনিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কবিরাজের প্রতি) — বোসো না — একটু শোনো।

কবিরাজ কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া উপবেশন করিলেন ও ঠাকুরের অমৃতোপম কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

[নানা ছাঁদে সেবা — বলরামের ভাব — গৌরাঙ্গের তিন অবস্থা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — তাঁকে নানা ছাঁদে সেবা করা যায়।

“প্রেমিক ভক্ত তাঁকে নানারূপে সম্ভোগ করে। কখনও মনে করে ‘তুমি পদ্ম, আমি অলি’। কখনও ‘তুমি সচ্চিদানন্দ, আমি মীন!’

"প্রেমিক ভক্ত আবার ভাবে 'আমি তোমার নৃত্যকী!' — আর তাঁর সম্মুখে নৃত্যগীত করে। কখনও বা দাসীভাব। কখনও তাঁর উপর বাৎসল্যভাব — যেমন যশোদার। কখনও বা পতিভাব — মধুরভাব — যেমন গোপীদের।

"বলরাম কখনও সখার ভাবে থাকতেন, কখনও বা মনে করতেন, আমি কৃষ্ণের ছাতা বা আসন হয়েছি। সবরকমে তাঁর সেবা করতেন।"

ঠাকুর প্রেমিক ভক্তের অবস্থা বর্ণনা করিয়া কি নিজের অবস্থা বলিতেছেন? আবার চৈতন্যদেবের তিনটি অবস্থা বর্ণনা করিয়া ইঙ্গিত করিয়া বুঝি নিজের অবস্থা বুঝাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — চৈতন্যদেবের তিনটি অবস্থা ছিল। অন্তর্দশায় সমাধিস্থ — বাহ্যশূন্য। অর্ধবাহ্যদশায় আবিষ্ট হইয়া নৃত্য করতে পারতেন, কিন্তু কথা কইতে পারতেন না। বাহ্যদশায় সংকীর্তন।

(ভক্তদের প্রতি) — তোমরা এই সব কথা শুনছো — ধারণার চেষ্টা করবে। বিষয়ীরা সাধুর কাছে যখন আসে তখন বিষয়কথা, বিষয়চিন্তা, একেবারে লুকিয়ে রেখে দেয়। তারপর চলে গেলে সেই গুলি বার করে। পায়রা মটর খেলে; মনে হল যে ওর হজম হয়ে গেল। কিন্তু গলার ভিতর সব রেখে দেয়। গলায় মটর গিড়গিড় করে।

[সন্ধ্যাকালীন উপাসনা — শ্রীরামকৃষ্ণ ও মুসলমানধর্ম — জপ ও ধ্যান]

"সব কাজ ফেলে সন্ধ্যার সময় তোমরা তাঁকে ডাকবে।

“অন্ধকারে ঈশ্বরকে মনে পড়ে; সব এই দেখা যাচ্ছিল! — কে এমন করলে! মোসলমানেরা দেখো সব কাজ ফেলে ঠিক সময়ে নমাজটি পড়বে।

মুখুজ্জে — আজ্ঞা, জপ করা ভাল?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, জপ থেকে ঈশ্বরলাভ হয়। নির্জনে গোপনে তাঁর নাম করতে করতে তাঁর কৃপা হয়। তারপর দর্শন।

“যেমন জলের ভিতর ডুবানো বাহাদুরী কাঠ আছে — তীরেতে শিকল দিয়ে বাঁধা; সেই শিকলের এক এক পাপ ধরে ধরে গেলে, শেষে বাহাদুরী কাঠকে স্পর্শ করা যায়।

“পূজার চেয়ে জপ বড়। জপের চেয়ে ধ্যান বড়। ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়। ভাবের চেয়ে মহাভাব প্রেম বড়। চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল। প্রেম হলে ঈশ্বরকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া গেল।

হাজরা আসিয়া বসিয়াছেন।

[রাগভক্তি, মালাজপা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ — নারাণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরাকে) — তাঁর উপর ভালবাসা যদি আসে তার নাম রাগভক্তি। বৈধী ভক্তি আসতেও যতক্ষণ, যেতেও ততক্ষণ। রাগভক্তি স্বয়ম্ভূ লিঙ্গের মতো। তার জড় খুঁজে পাওয়া যায় না। স্বয়ম্ভূ লিঙ্গের জড় কাশী পর্যন্ত। রাগভক্তি, অবতার আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গের হয়।

হাজরা — আহা!

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি যখন জপ একদিন কচ্ছিলে — বাহ্যে থেকে এসে বললাম মা, একি হীনবুদ্ধি, এখানে এসে মালা নিয়ে জপ কচ্ছে! — যে এখানে আসবে তার একেবারে চৈতন্য হবে। তার মালা জপা অত করতে হবে না। তুমি কলকাতায় যাও না — দেখবে হাজার হাজার মালা জপ করছে — খানকী পর্যন্ত।

ঠাকুর মাস্টারকে বলিতেছেন, "তুমি নারাণকে গাড়ি করে এনো। এঁকে (মুখুজ্জেকে) ও বলে রাখলুম — নারাণের কথা। সে এলে কিছু খাওয়াব। ওদের খাওয়ানোর অনেক মানে আছে।"

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৪ঠা অক্টোবর 1884/10/04

34.6 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলুটোলায় শ্রীযুক্ত নবীন সেনের বাটীতে ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে

আজ শনিবার কোজাগর পূর্ণিমা (চন্দ্রগ্রহণ)। শ্রীযুক্ত কেশব সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীন সেনের কলুটোলার বাটীতে ঠাকুর আসিয়াছেন। ৪ঠা অক্টোবর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ; ১৯শে আশ্বিন, ১২৯১ সাল।

গত বৃহস্পতিবারে কেশবের মা ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া অনেক করিয়া যাইতে বলিয়া গিয়াছিলেন।

বাহিরের উপরের ঘরে গিয়া ঠাকুর বসিলেন। নন্দলাল প্রভৃতি কেশবের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, কেশবের মাতা ও তাঁহাদের আত্মীয় বন্ধুগণ ঠাকুরকে খুব যত্ন করিতেছেন। উপরের ঘরেই সংকীর্তন হইল। কলুটোলার সেনেদের অনেক মেয়েরাও আসিয়াছেন।

ঠাকুরের সঙ্গে বাবুরাম, কিশোরী, আরও দু-একটি ভক্ত। মাস্টারও আসিয়াছেন।

তিনি নিচে বসিয়া ঠাকুরের মধুর সংকীর্তন শুনিতেছেন।

ঠাকুর ব্রাহ্মভক্তদের বলিতেছেন, — সংসার অনিত্য; আর সর্বদা মৃত্যু স্ম রণ করা উচিত। ঠাকুর গান গাইতেছেন:

ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুল না দক্ষিণাকালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে ।।
দিন দুই-তিনের জন্য ভবে কর্তা বলে সবাই মানে।
সেই কর্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্তা এলে ।।
যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে।

সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া অমঙ্গল হবে বলে ।।

ঠাকুর বলিতেছেন — ডুব দাও — উপরে ভাসলে কি হবে? দিন কতক নির্জনে সব ছেড়ে, ষোল আনা মন দিয়ে, তাঁকে ডাকো।

ঠাকুর গান গাইতেছেন:

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন ।।

ঠাকুর ব্রাহ্মভক্তদের, "তুমি সর্বস্ব আমার।" এই গানটি গাইতে বলিতেছেন।

তুমি সর্বস্ব আমার (হে নাথ) প্রাণাধার সারাৎসার।
নাহি তোমা বিনে, কেহ ত্রিভুবনে, আপনার বলিবার।

ঠাকুর নিজে গাইতেছেন:

যশোদা নাচাতো গো মা বলে নীলমণি।
সেরূপ লুকালে কোথা করালবদনী ।।
(একবার নাচ গো শ্যামা) (অসি ফেলে বাঁশী লয়ে)
(মুণ্ডমালা ফেলে বনমালা লয়ে) (তোর শিব বলরাম হোক)
(তেমনি তেমনি করে নাচ গো শ্যামা)
(যেরূপে ব্রজমাঝে নেচেছিলি)
(একবার বাজা গো মা, তোর মোহন বেণু)
(যে বেণুরবে গোপীর মন ভুলাতিস)

(যে বেণুরবে ধেনু ফিরাতিস্)

(যে বেণুরবে যমুনা উজান বয়)।

গগনে বেলা বাড়িত, রানীর মন ব্যাকুল হতো,

বলে ধর ধর ধর, ধর রে গোপাল, ক্ষীর সর নবনী;

এলায়ে চাঁচর কেশ রানী বেঁধে দিত বেণী।

শ্রীদামের সঙ্গে, নাচিতে ত্রিভঙ্গ,

আবার তাথৈয়া তাথৈয়া, তাতা থৈয়া থৈয়া, বাজত নূপুরধ্বনি;

শুনতে পেয়ে আসত ধেয়ে যত ব্রজের রমণী (গো মা!) — ।

এই গান শুনিয়া কেশব ওই সুরের একটি গান বাঁধাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মভক্তেরা খোল-করতাল সংযোগে সেই গান গাইতেছেন:

কত ভালবাস গো মা মানব সন্তানে,

মনে হলে প্রেমধারা বহে দুনয়নে।

তাঁহারা আবার মার নাম করিতেছেন:

(১) - অন্তরে জাগিছ গো মা অন্তরযামিনী,

কোলে করে আছ মোরে দিবস যামিনী।

(২) - কেন রে মন ভাবিস এত দীন হীন কাঙালের মতো,

আমার মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী সিদ্ধেশ্বরী ক্ষেমঙ্করী।

ঠাকুর এইবার হরিনাম ও শ্রীগৌরাঙ্গের নাম করিতেছেন ও ব্রাহ্মভক্তদের সহিত নাচিতেছেন।

(১) - মধুর হরিনাম নসে রে, জীব যদি সুখে থাকবি।

(২) - গৌরপ্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।

হুঙ্কারে পাষণ্ড-দলন এ-ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায় ।।

(৩) - ব্রজে যাই কাঙ্গালবেশে কৌপিন দাও হে ভারতী।

(৪) - গৌর নিতাই তোমরা দুভাই, পরম দয়াল হে প্রভু।

(৫) - হরি বলে আমার গৌর নাচে।

(৬) - কে হরিবোল হরিবোল বলিয়ে যায়। যারে মাধাই জেনে আয়।

(আমার গৌর যায় কি নিতাই যায় রে) (যাদের সোনার নূপুর রাঙা পায়)

(যাদের নেড়া মাথা ছেঁড়া কাঁথা রে,) (যেন দেখি পাগলের প্রায়)।

ব্রাহ্মভক্তেরা আবার গাইতেছেন:

কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।

হয়ে পূর্ণকাম বলব হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম-অশ্রুধার ।।

ঠাকুর উচ্চ সংকীর্তন করিয়া গাহিতেছেন ও নাচিতেছেন:

(১) - যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে,

তারা, দুভাই এসেছে রে!

(যারা মার খে য়ে প্রেম যাচে, তারা) (যারা আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়)।

(২) - নদে টলমল টলমল করে ওই গৌর প্রেমের হিল্লোলে রে!

ঠাকুর মার নাম করিতেছেন:

গো আনন্দময়ী হয়ে আমায় নিরানন্দ করো না।

ব্রাহ্মভক্তেরা তাঁহাদের দুইটি গান গাহিতেছেন:

(১) - আমায় দে মা পাগল করে।

(২) - চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেম চন্দ্রোদয় হে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c35 ৩৫ শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে -- বাবুরাম, মাস্টার, নীলকণ্ঠ, মনোমোহন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৫ই অক্টোবর 1884/10/05/i

35.1 হাজরা মহাশয় — অহেতুকী ভক্তি

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে, ভক্তসঙ্গে মধ্যাহ্নসেবার পর নিজের ঘরে বসিয়া আছেন (৫ই অক্টোবর, ১৮৮৪)। কাছে মেঝেতে মাস্টার, হাজরা, বড় কালী, বাবুরাম, রামলাল, মুখুজ্জেদের হরি প্রভৃতি — কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীযুক্ত কেশবের মাতাঠাকুরানীর নিমন্ত্রণে গতকল্য তাঁহাদের কলুটোলার বাড়িতে গিয়া ঠাকুর কীর্তনানন্দ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি) — আমি কাল কেশব সেনের এ বাটীতে (নবীন সেনের বাটীতে) বেশ খেলুম — বেশ ভক্তি করে দিলে।

[হাজরা মহাশয় ও তত্ত্বজ্ঞান — হাজরা ও তর্কবুদ্ধি]

হাজরা মহাশয় অনেকদিন ঠাকুরের কাছে রহিয়াছেন। "আমি জ্ঞানী"; এই বলিয়া তাঁহার একটু অভিমান আছে। লোকজনের কাছে ঠাকুরের একটু নিন্দাও করাও হয়। এদিকে বারান্দাতে নিজের আসনে বসিয়া একমন হইয়া মালা জপও

করেন। চৈতন্যদেবকে “হালের অবতার” বলিয়া সামান্য জ্ঞান করেন। বলেন, “ঈশ্বর যে শুদ্ধ ভক্তি দেন, তা নয়; তাঁহার ঐশ্বর্যের অভাব নাই, — তিনি ঐশ্বর্যও দেন। তাঁকে লাভ করলে অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি শক্তিও হয়।” বাড়ির দরুন কিছু দেনা আছে — প্রায় হাজার টাকা। সেগুলির জন্য তিনি ভাবিত আছেন।

বড় কালী অফিসে কর্ম করেন। সামান্য বেতন। ঘরে পরিবার ছেলেপুলে আছে। পরমহংসদেবের উপর খুব ভক্তি; মাঝে মাঝে আফিস কামাই করিয়াও তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন।

বড় কালী (হাজরার প্রতি) — তুমি যে কষ্টিপাথর হয়ে, কে ভালো সোনা, কে মন্দ সোনা, পরখ করে করে বেড়াও — পরের নিন্দা অত করো কেন?

হাজরা — যা বলতে হয়, ওঁর কাছেই বলছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা বটে।

হাজরা তত্ত্বজ্ঞান মানে ব্যাখ্যা করিতেছেন।

হাজরা — তত্ত্বজ্ঞান মানে কি — না চব্বিশ তত্ত্ব আছে, এইটি জানা।

একজন ভক্ত — চব্বিশ তত্ত্ব কি?

হাজরা — পঞ্চভূত, ছয় রিপু, পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটা কর্মেন্দ্রিয়, এই সব।

মাস্টার (ঠাকুরকে, সহাস্যে) — ইনি বলছেন, ছয় রিপু চব্বিশ তত্ত্বের ভিতরে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — ওই দেখ না। তত্ত্বজ্ঞানের মানে কি করছে আবার দেখ। তত্ত্বজ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান! তৎ মানে পরমাত্মা, ত্বং মানে জীবাত্মা। জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক জ্ঞান হলে তত্ত্বজ্ঞান হয়।

হাজরা কিয়ৎক্ষণ পরে ঘর হইতে বারান্দায় গিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টার প্রভৃতিকে) — ও কেবল তর্ক করে। এই একবার বেশ বুঝে গেল —— আবার খানিক পরে যেমন তেমনি।

“বড় মাছ জোর করছে দেখে আমি সুতো ছেড়ে দিই। তা নাহলে সুতো ছিঁড়ে ফেলবে, আর যে ধরেছে, সে শুদ্ধ জলে পড়বে। আমি তাই আর কিছু বলি না।

[হাজরা ও মুক্তি ও ষড়ৈশ্বর্য —— মলিন ও অহেতুকী ভক্তি]

(মাস্টারকে) — “হাজরা বলে, ‘ব্রাহ্মণ শরীর না হলে মুক্তি হয় না।’ আমি বললাম, সে কি! ভক্তি দ্বারাই মুক্তি হবে। শবরী ব্যাধের মেয়ে, রুহিদাস যার খাবার সময় ঘন্টা বাজত —— এরা সব শূদ্র। এদের ভক্তি দ্বারাই মুক্তি হয়েছে! হাজরা বলে তবু!

“ধ্রুবকে ল্যায়। প্রহ্লাদকে যত ল্যায়, ধ্রুবকে তত না। নটো বললে ‘ধ্রুবের ছেলেবেলা থেকে অত অনুরাগ’ —— তখন আবার চুপ করে।

“আমি বলি কামনাশূন্য ভক্তি, অহেতুকী ভক্তি —— এর বাড়া আর কিছুই নাই। ও-কথা সে কাটিয়ে দেয়। যারা কিছু চাইবে, তারা এলে, বড়মানুষ ব্যাজার হয়

— বিরক্ত হয়ে বলে, ওই আসছেন। এলে পরে একরকম স্বর করে বলে 'বসুন'! — যেন কত বিরক্ত। যারা কিছু চায়, তাদের এক গাড়িতে নিয়ে যায় না।

"হাজরা বলে, তিনি এ-সব ধনীদের মতো নয়। তাঁর কি ঐশ্বর্যের অভাব যে দিতে কষ্ট হবে?

"হাজরা তখন আরও বলে — 'আকাশের জল যখন পড়ে তখন গঙ্গা আর সব বড় বড় নদী, বড় বড় পুকুর — এসব বেড়ে যায়; আবার ডোবা টোবাগুলোও পরিপূর্ণ হয়। তাঁর কৃপা হলে জ্ঞান-ভক্তিও দেন, — আবার টাকা-কড়িও দেন।'

"কিন্তু একে মলিন ভক্তি বলে। শুদ্ধাভক্তিতে কোন কামনা থাকবে না। তুমি এখানে কিছু চাও না কিন্তু (আমাকে) দেখতে আর (আমার) কথা শুনতে ভালবাস; — তোমার দিকেও আমার মন পড়ে থাকে — কেমন আছে — কেন আসে না — এই সব ভাবি।

"কিছু চাও না অথচ ভালবাস — এর নাম অহেতুকী ভক্তি। প্রহ্লাদের এটি ছিল; রাজ্য চায় না, ঐশ্বর্য চায় না, কেবল হরিকে চায়।

মাস্টার — হাজরা মহাশয় কেবল ফড়র ফড়র করে বকে। চুপ না করলে কিছু হচ্ছে না।

[হাজরার অহংকার ও লোকনিন্দা]

শ্রীরামকৃষ্ণ — এক-একবার বেশ কাছে এসে নরম হয়! — কি গ্রহ, আবার তর্ক করে। অহংকার যাওয়া বড় শক্ত। অশ্বত্থগাছ, এই কেটে দিলে আবার তার পর দিন ফেঁ কড়ি বেরিয়েছে। যতক্ষণ তার শিকড় আছে ততক্ষণ আবার হবে।

“আমি হাজরাকে বলি, কারুকে নিন্দা করো না।

“নারায়ণই এই সব রূপ ধরে রয়েছেন। দুষ্ট খারাপ লোককেও পূজা করা যায়।

“দেখ না কুমারীপূজা। একটা হাগে মোতে, নাক দিয়ে কফ পড়ছে এমন মেয়েকে পূজা করা কেন? ভগবতীর একটি রূপ বলে।

“ভক্তের ভিতর তিনি বিশেষরূপে আছেন। ভক্ত ঈশ্বরের বৈঠকখানা।

“নাউ-এর খুব ডোল হলে তানপুরা ভাল হয়, — বেশ বাজে।

(সহাস্য, রামলালের প্রতি) — “হ্যারে রামলাল, হাজরা ওটা কি করে বলেছিস — অন্তস্ বহিস্ যদি হরিস্ (স-কার দিয়ে)? যেমন একজন বলেছিল মাতারং ভাতারং খাতারং অর্থাৎ মা ভাত খাচ্ছে।” (সকলের হাস্য)

রামলাল (সহাস্যে) — অনতর্বহির্যদিহরিস্তপসা ততঃ কিম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — এইটে তুমি অভ্যাস করো, আমায় মাঝে মাঝে বলবে।

ঠাকুরের ঘরের রেকাবি হারাইয়াছে। রামলাল ও বৃন্দে ঝি রেকাবির কথা বলিতেছেন — ‘সে রেকাবি কি আপনি জানেন?’

শ্রীরামকৃষ্ণ — কই, এখন আর দেখতে পাই না! আগে ছিল বটে — দেখেছিলাম।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৫ই অক্টোবর 1884/10/05/ii

35.2 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধুদ্বয় সঙ্গে — ঠাকুরের পরমহংস অবস্থা

আজ পঞ্চবটীতে দুইটি সাধু অতিথি আসিয়াছেন। তাঁহারা গীতা, বেদান্ত এ সব অধ্যয়ন করেন। মধ্যাহ্নে সেবার পর ঠাকুরকে আসিয়া দর্শন করিতেছেন। তিনি ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। সাধুরা প্রণাম করিয়া মেঝেতে মাদুরের উপর আসিয়া বসিলেন। মাস্টার প্রভৃতিও বসিয়া আছেন। ঠাকুর হিন্দিতে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আপনাদের সেবা হয়েছে?

সাধুরা — জী, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি খেলেন?

সাধুরা — ডাল-রুটি; আপনি খাবেন?

[সাধু ও নিষ্কামকর্ম — ভক্তি কামনা — বেদান্ত — সংসারী ও ‘সোঽহম্’]

শ্রীরামকৃষ্ণ — না, আমি দুটি ভাত খাই। আচ্ছা জী, আপনারা যা জপ ধ্যান করেন তা নিষ্কাম করেন; না?

সাধু — জী, মহারাজ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ওই আচ্ছা হ্যায়, আর ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করতে হয়; — না? গীতাতে ওইরূপ আছে।

সাধু (অন্য সাধুর প্রতি) —

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ।।১

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁকে একগুণ যা দেবে সহস্রগুণ তাই পাবে। তাই সব কাজ করে জলের গণ্ডুষ অর্পণ — কৃষ্ণে ফল সমর্পণ।

“যুধিষ্ঠির যখন সব পাপ কৃষ্ণকে অর্পণ করতে যাচ্ছিল, তখন একজন (ভীম) সাবধান করলে, ‘অমন কর্ম করো না — কৃষ্ণকে যা অর্পণ করবে, সহস্রগুণ তাই হবে!’ আচ্ছা জী, নিষ্কাম হতে হয় — সব কামনা ত্যাগ করতে হয়?”

সাধু — জী, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমার কিন্তু ভক্তিকামনা আছে। ও মন্দ নয়, বরং ভালই হয়। মিষ্ট খারাপ জিনিস — অমল হয়, কিন্তু মিছরিতে বরং উপকার হয়। কেমন?

সাধু — জী, মহারাজ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা জী, বেদান্ত কেমন?

সাধু — বেদান্তমে খট্ শাস্ত্র (ষড়্দর্শন) হ্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিন্তু বেদান্তের সার — ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। আমি আলাদা কিছু নই; আমি সেই ব্রহ্ম। কেমন?

সাধু — জী, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিন্তু যারা সংসারে আছে, আর যাদের দেহবুদ্ধি আছে, তাদের সোঽহম্ এ-ভাবটি ভাল নয়। সংসারীর পক্ষে যোগবাশিষ্ঠ, বেদান্ত — ভাল নয়। বড় খারাপ।

সংসারীরা সেব্য-সেবক ভাবে থাকবে। 'হে ঈশ্বর, তুমি সেব্য — প্রভু, আমি সেবক — আমি তোমার দাস।' "যাদের দেহবুদ্ধি আছে তাদের সোঽহম্ এ-ভাব ভাল না।"

সকলেই চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আপনা-আপনি একটু হাসিতেছেন। আত্মারাম। আপনার আনন্দে আনন্দিত।

একজন সাধু অপরকে ফিসফিস করিয়া বলিতেছেন — “আরে, দেখো দেখো! এস্ কো পরমহংস অবস্থা বোল্ তা হ্যায়।”

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারকে, তাহার দিকে তাকাইয়া) — হাসি পাচ্ছে।

ঠাকুর বালকের ন্যায় আপনা-আপনি ঈষৎ হাসিতেছেন।

১ গীতা [৯/২৭]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৫ই অক্টোবর 1884/10/05/iii

35.3 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ‘কামিনী’ — সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম

[পূর্বকথা — শ্বশুরঘর যাবার সাধ — উলোর বামনদাসের সঙ্গে দেখা]

সাধুরা দর্শন করিয়া চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর ও বাবুরাম, মাস্টার, মুখুজ্জেদের হরি প্রভৃতি ভক্তেরা ঘরে ও বারান্দায় বেড়াইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারকে) — নবীন সেনের ওখানে তুমি গিছলে?

মাস্টার — আজ্ঞা, গিছলাম। নিচে বসে সব গান শুনেছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা বেশ করেছ। তোমার ওরা গিছল। কেশব সেন ওদের খুড়তাতো ভাই?

মাস্টার — একটু তফাত আছে।

শ্রীযুক্ত নবীন সেনেরা একজন ভক্তের শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কীয় লোক।

মণির সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে ঠাকুর নিভৃতে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — লোকে শ্বশুরবাড়ি যায়। এত ভেবেছিলুম, বিয়ে করব, শ্বশুরঘর যাব — সাধ আহ্লাদ করব! কি হয়ে গেল!

মণি — আজ্ঞা, 'ছেলে যদি বাপকে ধরে, সে পড়তে পারে; বাপ যে ছেলেকে ধরেছেন সে আর পড়ে না।' — এই কথা আপনি বলেন। আপনারও ঠিক সেই অবস্থা। মা আপনাকে ধরে রয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — উলোর বামনদাসের সঙ্গে — বিশ্বাসদের বাড়িতে — দেখা হল। আমি বললাম, আমি তোমাকে দেখতে এসেছি। যখন চলে এলাম, শুনতে

পেলাম, সে বলছে, ‘বাবা, বাঘ যেমন মানুষকে ধরে, তেমনই ঈশ্বরী এঁকে ধরে রয়েছেন!’ তখন সমর্থ বয়স — খুব মোটা। সর্বদাই ভাবে!

“আমি মেয়ে বড় ভয় করি। দেখি যেন বাঘিনী খেতে আসছে! আর অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, ছিদ্র সব খুব বড় বড় দেখি। সব রাক্ষসীর মতো দেখি।

“আগে ভারী ভয় ছিল! কারুকে কাছে আসতে দিতাম না। এখন তবু অনেক করে মনকে বুঝিয়ে, মা আনন্দময়ীর এক-একটি রূপ বলে দেখি।

“ভগবতীর অংশ। কিন্তু পুরুষের পক্ষে — সাধুর পক্ষে — ভক্তের পক্ষে — ত্যাজ্য।

“হাজার ভক্ত হলেও মেয়েমানুষকে বেশিক্ষণ কাছে বসতে দিই না। একটু পরে, হয়ে বলি, ঠাকুর দেখো গে যাও; তাতেও যদি না উঠে, তামাক খাবার নাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি।

“দেখতে পাই, কারু কারু মেয়েমানুষের দিকে আদপে মন নাই। নিরঞ্জন বলে, ‘কই আমার মেয়েমানুষের দিকে মন নাই’।”

[হরিবাবু, নিরঞ্জন, পাঁড়ে খোট্টা, জয়নারায়ণ]

“হরি (উপেন ডাক্তারের ভাই)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, সে বলে, ‘না, মেয়েমানুষের দিকে মন নাই।’

“যে মন ভগবানকে দিতে হবে, সে মনের বারো আনা মেয়েমানুষ নিয়ে ফেলে। তারপর তার ছেলে হলে প্রায় সব মনটাই খরচ হয়ে যায়। তাহলে ভগবানকে আর কি দেবে?

“আবার কারু কারু তাকে আগলাতে আগলাতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। পাঁড়ে জমাদার খোট্টা বুড়ো — তার চৌদ্দ বছরের বউ! বুড়োর সঙ্গে তার থাকতে হয়! গোলপাতার ঘর। গোলপাতা খুলে খুলে লোক দেখে। এখন মেয়েটা বেরিয়ে এসেছে।

“একজনের বউ — কোথায় রাখে এখন ঠিক পাচ্ছে না। বাড়িতে বড় গোল কয়েছিল। মহা ভাবিত। সে কথা আর কাজ নাই।

“আর মেয়েমানুষের সঙ্গে থাকলেই তাদের বশ হয়ে যেতে হয়। সংসারীরা মেয়েদের কথায় উঠতে বললে উঠে, বসতে বললে বসে। সকলেই আপনার পরিবারদের সুখ্যাত করে।

“আমি একজায়গায় যেতে চেয়েছিলাম। রামলালের খুড়ীকে জিজ্ঞাসা করাতে বারণ করলে, আর যাওয়া হল না। খানিক পরে ভাবলুম — উঃ, আমি সংসার করি নাই, কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী, তাতেই এই! — সংসারীরা না জানি পরিবারদের আছে কিরকম বশ!”

মণি — কামিনী-কাঞ্চনের মাঝখানে থাকলেই একটু না একটু গায়ে আঁচ লাগবেই। আপনি বলেছিলেন, জয়নারায়ণ অতো পণ্ডিত — বুড়ো হয়েছিল — আপনি যখন গেলেন, বালিস-টালিস শুকুতে দিচ্ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিন্তু পণ্ডিত বলে অহংকার ছিল না। আর যা বলেছিল, শেষে আইন মাফিক্ কাশীতে গিয়ে বাস হল।

“ছেলেগুনো দেখলাম, বুট পায়ে দেওয়া ইংরাজী পড়া।”

[ঠাকুরের প্রেমোন্মাদ প্রভৃতি নানা অবস্থা]

ঠাকুর মণিকে প্রশ্নচ্ছলে নিজের অবস্থা বুঝাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আগে খুব উন্মাদ ছিল, এখন কমলো কেন? — কিন্তু মাঝে মাঝে হয়।

মণি — আপনার একরকম অবস্থা তো নয়। যেমন বলেছিলেন, কখনও বালকবৎ — কখনও উন্মাদবৎ — কখনও জড়বৎ — কখনও পিশাচবৎ — এই সব অবস্থা মাঝে মাঝে হয়। আবার মাঝে মাঝে সহজ অবস্থাও হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, বালকবৎ। আবার ওই সঙ্গে বাল্য, পৌগণ্ড, যুবা — এ-সব অবস্থা হয়। যখন জ্ঞান উপদেশ দেবে, তখন যুবার অবস্থা।

“আবার পৌগণ্ড অবস্থা! বারো-তেরো বছরের ছোকরার মতো ফচকিমি করতে ইচ্ছা হয়। তাই ছোকরাদের নিয়ে ফষ্টিনাষ্টি হয়।”

[নারাণের গুণ — কামিনী-কাঞ্চনত্যাগই সন্ন্যাসীর কঠিন সাধনা]

“আচ্ছা, নারাণ কেমন?”

মণি — আজ্ঞা, লক্ষণ সব ভাল আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — নাউ-এর ডোলটা ভাল — তানপুরা বেশ বাজবে।

“সে আমায় বলে, আপনি সবই (অর্থাৎ অবতার) । যার যা ধারণা, সে তাই বলে। কেউ বলে, এমনি শুধু সাধুভক্ত।

“যেটি বারণ করে দিয়েছি, সেটি বেশ ধারণা করে। পরদা গুটোতে বললাম। তা গুটোলে না।

“গেরো দেওয়া, সেলাই করা, পরদা গুটোনো, দোর বাস্ক চাবি দিয়ে বন্ধ করা — এসব বারণ করেছিলাম — তাই ঠিক ধারণা। যে ত্যাগ করবে, তার এই সব সাধন করতে হয়। সন্ন্যাসীর পক্ষে এই সব সাধন।

“সাধনের অবস্থায় ‘কামিনী’ দাবানল স্বরূপ — কালসাপের স্বরূপ। সিদ্ধ অবস্তায় ভগবানদর্শনের পর — তবে মা আনন্দময়ী! তবে মার এক-একটি রূপ বলে দেখবে।”

কয়েকদিন হইল, ঠাকুর নারাণকে কামিনী সম্বন্ধে অনেক সতর্ক করেছিলেন। বলেছিলেন — ‘মেয়েমানুষের গায়ের হাওয়া লাগাবে না; মোটা কাপড় গায়ে দিয়ে থাকবে, পাছে তাদের হাওয়া গায় লাগে; — আর মা ছাড়া সকলের সঙ্গে আটহাত, নয় দুহাত, নয় অন্ততঃ একহাত সর্বদা তফাত থাকবে।”

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — তার মা নারাণকে বলেছে, তাঁকে দেখে আমরাই মুগ্ধ হই, তুই তো ছেলেমানুষ! আর সরল না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। নিরঞ্জন কেমন সরল!

মণি — আজ্ঞা, হাঁ।

[নিরঞ্জন, নরেন্দ্র কি সরল?]

শ্রীরামকৃষ্ণ — সেদিন কলকাতা যাবার সময় গাড়িতে দেখলে না? সব সময়েই এক ভাব — সরল। লোক ঘরের ভিতর একরকম আবার বাড়ির বাহিরে গেলে আর-একরকম হয়! নরেন্দ্র এখন (বাপের মৃত্যুর পর) সংসারের ভাবনায় পড়েছে। ওর একটু হিসাব বুদ্ধি আছে। সব ছোকরা এদের মতো কি হয়?

[শ্রীরামকৃষ্ণ নবীন নিয়োগীর বাড়ি — নীলকণ্ঠের যাত্রা]

“নীলকণ্ঠের যাত্রা আজ শুনতে গিছলাম — দক্ষিণেশ্বরে। নবীন নিয়োগীর বাড়ি। সেখানকার ছোঁড়াগুলো বড় খারাপ। কেবল এর নিন্দা, ওর নিন্দা! ওরকম স্থলে ভাব সম্বরণ হয়ে যায়।

“সেবার যাত্রার সময় মধু ডাক্তারের চক্ষে ধারা দেখে, তার দিকে চেয়েছিলাম। আর কারু দিকে তাকাতে পারলাম না।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৫ই অক্টোবর 1884/10/05/iv

35.4 শ্রীরামকৃষ্ণ, কেশব ও ব্রাহ্মসমাজ — সমন্বয় উপদেশ

The Universal Catholic Church of Sree Ramkrishna

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — আচ্ছা, লোক যে এত আকর্ষণ হয়ে আসে এখানে, তার মানে কি?

মণি — আমার ব্রজের লীলা মনে পড়ে। কৃষ্ণ যখন রাখাল আর বৎস হলেন, তখন রাখালদের উপর গোপীদের, আর বৎসদের উপর গাভীদের, বেশি আকর্ষণ হতে লাগল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সে ঈশ্বরের আকর্ষণ। কি জানো, মা এইরূপ ভেলকি লাগিয়ে দেন আর আকর্ষণ হয়।

“আচ্ছা, কেশব সেনের কাছে যত লোক যেত, এখানে তো তত আসে না। আর কেশব সেনকে কত লোক গণে মানে, বিলাতে পর্যন্ত জানে — কুইন (রানী ভিক্টোরিয়া) কেশবের সঙ্গে কথা কয়েছে। গীতায় তো বলেছে, যাকে অনেকে গণে মানে, সেখানে ঈশ্বরের শক্তি। এখানে তো অত হয় না?”

মণি — কেশব সেনের কাছে সংসারী লোক গিয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, তা বটে। ঐহিক লোক।

মণি — কেশব সেন যা করে গেলেন, তা কি থাকবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেন, সংহিতা করে গেছে, — তাতে কত নিয়ম!

মণি — অবতার যখন নিজে কাজ করেন, তখন আলাদা কথা। যেমন চৈতন্যদেবের কাজ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, হাঁ, ঠিক।

মণি — আপনি তো বলেন, — চৈতন্যদেব বলেছিলেন, আমি যা বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গেলাম, কখন না কখন এর কাজ হবে। কার্ণিশের উপর বীজ রেখেছিল, বাড়ি পড়ে গেলে সেই বীজ আবার গাছ হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, শিবনাথরা যে সমাজ করেছে, তাতেও অনেক লোক যায়।

মণি — আজ্ঞা, তেমনি লোক যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্য) — হাঁ, হাঁ সংসারী লোক সব যায়। যারা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল — কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে চেষ্টা করছে — এমন সব লোক কম যায় বটে।

মণি — এখান থেকে একটা স্রোত যদি বয়, তাহলে বেশ হয়। সে স্রোতের টানেতে সব ভেসে যাবে। এখান থেকে যা হবে সে তো আর একঘেয়ে হবে না।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান — বৈষ্ণব ও ব্রহ্মজ্ঞানী]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্য) — আমি যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা করি। বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের ভাবটিই রাখতে বলি, শাক্তকে শাক্তের ভাব। তবে বলি, ‘এ কথা বলো না — আমারই পথ সত্য আর সব মিথ্যা, ভুল।’ হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান — নানা পথ দিয়ে এক জায়গায়ই যাচ্ছে। নিজের নিজের ভাব রক্ষা করে, আন্তরিক তাঁকে ডাকলে, ভগবান লাভ হবে!

“বিজয়ের শাশুড়ি বলে, তুমি বলরামদের বলে দাও না, সাকার পুজোর কি দরকার? নিরাকার সচ্চিদানন্দকে ডাকলেই হল।

“আমি বললাল, ‘অমন কথা আমিই বা বলতে যাব কেন — আর তারাই বা শুনবে কেন?’ মা মাছ রেঁধেছে — কোনও ছেলেকে পোলোয়া রেঁধে দেয়, যার পেট ভাল নয় তাকে মাছের ঝোল করে দেয়। রুচিভেদ, অধিকারীভেদে, একই জিনিস নানারূপ করে দিতে হয়।”

মণি — আজ্ঞা, হাঁ। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে সব আলাদা রাস্তা। তবে যে রাস্তা দিয়েই যাওয়া হোক না কেন, শুদ্ধমন দিয়ে আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তবে তাঁকে পাওয়া যায়। এই কথা আপনি বলেন।

[মুখুজ্জেদের হরি — শ্রীরামকৃষ্ণ ও দান-ধ্যান]

ঘরের ভিতর ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়া আছেন। মেঝেতে মুখুজ্জেদের হরি, মাস্টার প্রভৃতি বসিয়া আছেন। একটি অপরিচিত ব্যক্তি ঠাকুরকে প্রণাম

করিয়া বসিলেন। ঠাকুর পরে বলিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষুর লক্ষণ ভাল না — বিড়ালের ন্যায় কটাচক্ষু।

ঠাকুরকে হরি তামাক সাজিয়া আনিয়া দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হুঁকা হাতে করিয়া, হরির প্রতি) — দেখি তোর — হাতদেখি। এই যে যব রয়েছে — এ বেশ ভাল লক্ষণ।

"হাত আলগা কর দেখি। (নিজের হাতে হরির হাত লইয়া যেন ওজন করিতেছেন) — ছেলেমানষি বুদ্ধি এখনও আছে; — দোষ এখনও কিছু হয় নাই। (ভক্তদের প্রতি) — আমি হাত দেখলে খল কি সরল বলতে পারি। (হরির প্রতি) — কেন, শ্বশুরবাড়ি যাবি — বউর সঙ্গে কথাবার্তা কইবি — আর ইচ্ছে হয় একটু আমোদ-আহ্লাদ করবি।

(মাস্টারের প্রতি) — "কেমন গো?" (মাস্টার প্রভৃতির হাস্য)

মাস্টার — আজ্ঞা, নতুন হাঁড়ি যদি খারাপ হয়ে যায়, তাহলে আর দুধ রাখা যাবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — এখন যে হয় নাই তা কি করে জানলে?

মুখুজ্জেরা দুই ভাই — মহেন্দ্র ও প্রিয়নাথ। তাঁহারা চাকরি করেন না। তাঁহাদের ময়দার কল আছে। প্রিয়নাথ পূর্বে ইঞ্জিনিয়ারের কর্ম করিতেন। ঠাকুর হরির নিকট মুখুজ্জে ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হরির প্রতি) — বড় ভাইটি বেশ, না? বেশ সরল।

হরি — আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — ছোট নাকি বড় সন (কৃপণ)? — এখানে এসে নাকি অনেক ভাল হয়েছে। আমায় বললে আমি কিছু জানতুম না। (হরিকে) এরা কিছু দান-টান করে কি?

হরি — তেমন দেখতে পাই না। এদের বড়ভাই যিনি ছিলেন — তাঁর কাল হয়েছে — তিনি বড় ভাল ছিলেন — খুব দান-ধ্যান ছিল।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ওদেহের লক্ষণ — ৺ মহেশ ন্যায়রত্নের ছাত্র]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টার প্রভৃতিকে) — শরিরে লক্ষণ দেখে অনেকটা বুঝা ঝায়, তার হবে কি না। খল হলে হাত ভারী হয়।

“নাক টেপা হওয়া ভাল না। শম্ভুর নাকটি টেপা ছিল। তাই অত জ্ঞান থেকেও তত সরল ছিল না।

“উনপাঁজুরে লক্ষণ ভাল না। আর হাড় পেকে — কনুয়ের গাঁট মোটা, হাত ছিনে। আর বিড়াল চক্ষু — বিড়ালের মত কটাচোখ।

“ঠোঁট — ডোমের মতো হলে — নীচবুদ্ধি হয়। বিষ্ণুঘরের পুরুত কয়মাস একটিং কর্মে এসেছিল। তার হাতে খেতুম না — হঠাৎ মুখ দিয়ে বলে

ফেলেছিলুম, ‘ও ডোম’। তারপর সে একদিন বললে ‘হাঁ, আমাদের ঘর ডোম পাড়ায়। আমি ডোমের বাসন চাঙ্গারী বুনতে জানি’।

“আরও খারাপ লক্ষণ — এক চক্ষু আর ট্যারা। বরং এক চক্ষু কানা ভাল, তো ট্যারা ভাল নয়। ভারী দুষ্ট ও খল হয়।

”মহেশের (৺ মহেশ ন্যায়রত্নের) একজন ছাত্র এসেছিল। সে বলে, ‘আমি নাস্তিক’। সে হৃদেকে বললে, ‘আমি নাস্তিক, তুমি আস্তিক হয়ে আমার সঙ্গে বিচার কর’। তখন তাকে ভাল করে দেখলাম। দেখি, বিড়াল চক্ষু!

“আবার চলনেতে লক্ষণ ভাল মন্দ টের পাওয়া যায়।

পুরুষাঙ্গের উপর চামরাটি মুসলমানদের মতো যদি কাটা হয়, সে একটি খারাপ লক্ষণ। (মাস্টার প্রভৃতির হাস্য) (মাস্টারকে সহাস্যে) তুমি ওটা দেখো — ও খারাপ লক্ষণ।” (সকলের হাস্য)

ঘর হইতে ঠাকুর বারান্দায় বেড়াইতেছেন। সঙ্গে মাস্টার ও বাবুরাম। শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি) — একজন এসেছিল, — দেখলাম বিড়ালের মতো চক্ষু। সে বলে, ‘আপনি জ্যোতিষ জানেন? — আমার কিছু কষ্ট আছে।’ আমি বললাম, ‘না, বরাহনগরে যাও, সেখানে জ্যোতিষের পণ্ডিত আছে।’

বাবুরাম ও মাস্টার নীলকণ্ঠের যাত্রার কথা কহিতেছেন। বাবুরাম নবীন সেনের বাটী হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিয়া কাল রাত্রে এখানে ছিলেন। সকালে

ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে নবীন নিয়োগীর বাড়িতে নীলকণ্ঠের যাত্রা শুনিয়াছিলেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণ, মণি ও নিভৃত চিন্তা — "ঈশ্বরের ইচ্ছা" — নারাণের জন্য ভাবনা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টার ও বাবুরামের প্রতি) — তোমাদের কি কথা হচ্ছে?

মাস্টার ও বাবুরাম — আজ্ঞা নীলকণ্ঠের যাত্রার কথা হচ্ছে, — আর সেই গানটির কথা — 'শ্যামাপদে আশ, নদীর তীরে বাস।'

ঠাকুর বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ মণিকে নিভৃতে হইয়া বলিতেছেন — ঈশ্বরচিন্তা যত লোকে টের না পায় ততই ভাল। হঠাৎ এই কথা বলিয়াই ঠাকুর চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর হাজরার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

হাজরা — নীলকণ্ঠ তো আপনাকে বলেছে, সে আসবে। তা ডাকতে গেলে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — না, রাত্রি জেগেছে, — ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনি আসে, সে এক। বাবুরামকে নারাণের বাড়ি গিয়া দেখা করিতে বলিতেছেন। নারাণকে সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখেন। তাই তাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। বাবুরামকে বলিতেছেন — "তুই বরং একখান ইংরাজী বই নিয়ে তার কাছে যাস।"
পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৫ই অক্টোবর 1884/10/05/v

35.5 নীলকণ্ঠ প্রভৃতি ভক্তগণসঙ্গে সংকীর্তনানন্দে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে নিজের আসনে বসিয়া আছেন। বেলা প্রায় তিনটা হইবে। নীলকণ্ঠ পাঁচ-সাতজন সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া ঠাকুরের ঘরে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর পূর্বাস্য হইয়া তাহাকে যেন অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন। নীলকণ্ঠ ঘরের পূর্ব দ্বার দিয়া আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন।

ঠাকুর সমাধিস্ত! — তাঁহার পশ্চাতে বাবুরাম, সম্মুখে মাস্টার, নীলকণ্ঠ ও চমৎকৃত অন্যান্য যাত্রাওয়ালারা। খাটের উত্তর ধারে দীননাথ খাজাঞ্চী আসিয়া দর্শন করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে ঘর ঠাকুরবাড়ির লোকে পরিপূর্ণ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরের কিঞ্চিত ভাব উপশম হইতেছে। ঠাকুর মেঝেতে মাদুরে বসিয়াছেন —— সম্মুখে নীলকণ্ঠ ও চতুর্দিকে ভক্তগণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (আবিষ্ট হইয়া) — আমি ভাল আছি।

নীলকণ্ঠ (কৃতাঞ্জলি হইয়া) — আমায়ও ভাল করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তুমি তো ভাল আছ। ‘ক’য়ে আকার ‘কা’, আবার আকার দিয়ে কি হবে? ‘কা’-এর উপর আবার আকার দিলে সেই ‘কা’-ই থাকে। (সকলের হাস্য)

নীলকণ্ঠ — আজ্ঞা, এই সংসারে পড়ে রয়েছি!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তোমায় সংসারে রেখেছেন পাঁচজনের জন্য।

“অষ্টপাশ। তা সব যায় না। দু-একটা পাশ তিনি রেখে দেন — লোকশিক্ষার জন্য! তুমি যাত্রাটি করেছো, তোমার ভক্তি দেখে কত লোকের উপকার হচ্ছে। আর তুমি সব ছেড়ে দিলে এঁরা (যাত্রাওয়ালারা) কোথায় যাবেন।

“তিনি তোমার দ্বারা কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। কাজ শেষ হলে তুমি আর ফিরবে না। গৃহিণী সমস্ত সংসারের কাজ সেরে, — সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে, দাস-দাসীদের পর্যন্ত খাইয়ে-দাইয়ে — নাইতে যায়; — তখন আর ডাকাডাকি করলেও ফিরে আসে না।”

নীলকণ্ঠ — আমায় আশীর্বাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কৃষ্ণের বিরহে যশোদা উন্মাদিনী, — শ্রীমতীর কাছে গিয়েছেন। শ্রীমতী তখন ধ্যান কচ্ছিলেন। তিনি আবিষ্ট হয়ে যশোদাকে বললেন — ”আমি সেই মূল প্রকৃতি আদ্যাশক্তি! তুমি আমার কাছে বর নাও!” যশোদা বললেন, ‘আর কি বর দেবে! এই বলো যেন কায়মনোবাক্যে তাঁর চিন্তা, তাঁর সেবা করতে পারি। কর্ণেতে যেন তাঁর নামগুণগান শুনতে পাই, হাতে যেন তাঁর ও তাঁর

ভক্তের সেবা করতে পারি, — চক্ষে যেন তাঁর রূপ, তাঁর ভক্ত, দর্শন করতে পারি।

“তোমার যেকালে তাঁর নাম করতে চক্ষু জলে ভেসে যায়, সেকালে আর তোমার ভাবনা কি? — তাঁর উপর তোমার ভালবাসা এসেছে।

“অনেক জানার নাম অজ্ঞান, — এক জানার নাম জ্ঞান — অর্থাৎ এক ঈশ্বর সত্য সর্বভূতে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপের নাম বিজ্ঞান — তাঁকে লাভ করে নানাভাবে ভালবাসার নাম বিজ্ঞান।

“আবার আছে — তিনি এক-দুয়ের পার — বাক্য মনের অতীত। লীলা থেকে নিত্য, আবার নিত্য থেকে লীলায় আসা, — এর নাম পাকা ভক্তি।

“তাহলেই হল, — তাঁর কৃপার উপর সব নির্ভর করছে।

“কিন্তু তা বলে তাঁকে ডাকতে হবে — চুপ করে থাকলে হবে না। উকিল হাকিমকে সব বলে শেষে বলে — “আমি যা বলবার বললাম এখন হাকিমের হাত’।”

“কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর বলিতেছেন — তুমি সকালে অত গাইলে, আবার এখানে এসেছ কষ্ট করে। এখানে কিন্তু অনারারী (Honorary)।

নীলকণ্ঠ — কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — বুঝেছি, আপনি যা বলবেন।

নীলকণ্ঠ — অমূল্য রতন নিয়ে যাব!!!

শ্রীরামকৃষ্ণ — সে অমূল্য রতন আপনার কাছে। আবার ‘ক’য়ে আকার দিলে কি হবে? না হলে তোমার গান অত ভাল লাগে কেন? রামপ্রসাদ সিদ্ধ, তাই তার গান ভাল লাগে।

“সাধারণ জীবকে বলে মানুষ। যার চৈতন্য হয়েছে, সেই মানহুঁস। তুমি তাই মানহুঁস।

“তোমার গান হবে শুনে আমি আপনি যাচ্ছিলাম — তা নিয়োগীও বলতে এসেছিল।”

ঠাকুর ছোট তক্তপোশের উপর নিজের আসনে গিয়া বসিয়াছেন। নীলকণ্ঠকে বলিতেছেন, একটু মায়ের নাম শুনব।

নীলকণ্ঠ সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া গান গাইতেছেন:

গান - শ্যামাপদে আশ, নদীর তীরে বাস।

গান - মহিষমর্দিনী।

এই গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ!

নীলকণ্ঠ গানে বলিতেছেন, ‘যার জটায় গঙ্গা, তিনি রাজরাজেশ্বরীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন।’

ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। নীলকণ্ঠ ও ভক্তগণ তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া গান গাহিতেছেন ও নৃত্য করিতেছেন।

গান - শিব শিব।

এই গানের সঙ্গেও ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

গান সমাপ্ত হইল। ঠাকুর নীলকণ্ঠকে বলিতেছেন, — আমি আপনার সেই-গানটি শুনব, কলকাতায় যা শুনেছিলাম।

মাস্টার — শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নব নটবর, তপত কাঞ্চন কায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, হাঁ।

নীলকণ্ঠ গাইতেছেন:

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর, নব নটবর, তপত কাঞ্চন কায়।

'প্রেমের বন্যে ভেসে যায়' — এই ধুয়া ধরিয়া ঠাকুর নীলকণ্ঠাদি ভক্তসঙ্গে আবার নাচিতেছেন, সে অপূর্ব নৃত্য যাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাঁহারা কখনই ভুলিবেন না। ঘর লোকে পরিপূর্ণ সকলেই উন্মত্তপ্রায়। ঘরটি যেন শ্রীবাসের আঙ্গিনা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভাবাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার বাটীর কয়েকটি মেয়ে আসিয়াছেন; তাঁহারা উত্তরের বারান্দা হইতে এই অপূর্ব নৃত্য ও সংকীর্তন দর্শন করিতেছেন।

তাঁহাদের মধ্যেও একজনের ভাব হইয়াছিল। মনোমোহন ঠাকুরের ভক্ত ও শ্রীযুক্ত রাখালের সম্বন্ধী।

ঠাকুর আবার গান ধরিলেন:

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝুরে, তারা দুভাই এসেছে রে!

সংকীর্তন করিতে করিতে ঠাকুর নীলকণ্ঠাদি ভক্তসঙ্গে নৃত্য করিতেছেন। ও আখর দিতেছেন —

‘রাধার প্রেমে মাতোয়ারা, তারা দুভাই এসেছে রে।’

উচ্চ সংকীর্তন শুনিয়া চতুর্দিকে লোক আসিয়া জমিয়াছে। দক্ষিণের, উত্তরের ও পশ্চিমের গোল বারান্দায়, সব লোক দাঁড়াইয়া। যাঁহারা নৌকা করিয়া যাইতেছেন, তাঁহারাও এই মধুর সংকীর্তনের শব্দ শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়াছেন।

কীর্তন সমাপ্ত হইল। ঠাকুর জগন্মাতাকে প্রণাম করিতেছেন ও বলিতেছেন — ভাগবত-ভক্ত-ভগবান — জ্ঞানীদের নমস্কার, যোগীদের নমস্কার, ভক্তদের নমস্কার।

এইবার ঠাকুর নীলকণ্ঠাদি ভক্তসঙ্গে পশ্চিমের গোল বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছেন। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আজ কোজাগর পূর্ণিমার পরদিন। চতুর্দিকে চাঁদের আলো। ঠাকুর নীলকণ্ঠের সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন।

[ঠাকুর কে? ‘আমি’ খুঁজে পাই নাই — “ঘরে আনবো চণ্ডী”]

নীলকণ্ঠ — আপনিই সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ও গুনো কি! — আমি সকলের দাস।

“গঙ্গারই ঢেউ। ঢেউ-এর কখন গঙ্গা হয়?”

নীলকণ্ঠ — আপনি যা বলুন, আমরা আপনাকে তাই দেখছি!

শ্রীরামকৃষ্ণ (কিঞ্চিৎ ভাবাবিষ্ট হইয়া, করুণস্বরে) — বাপু, আমার ‘আমি’ খুঁজতে যাই, কিন্তু খুঁজে পাই না।

“হনুমান বলেছিলেন — হে রাম, কখন ভাবি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ — তুমি প্রভু আমি দাস, — আবার যখন তত্ত্বজ্ঞান হয় — তখন দেখি, তুমিই আমি, আমিই তুমি!”

নীলকণ্ঠ — আর কি বলব আমাদের কৃপা করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তুমি কত লোককে পার করছ — তোমার গান শুনে কত লোকের উদ্দীপন হচ্ছে।

নীলকণ্ঠ — পার করছি বলছেন। কিন্তু আশীর্বাদ করুন, যেন নিজে ডুবি না!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — যদি ডোবো তো ওই সুধাহ্রদে!

ঠাকুর নীলকণ্ঠকে পাইয়া আনন্দিত হইয়াছেন। তাঁহাকে আবার বলিতেছেন "তোমার এখানে আসা! — যাকে অনেক সাধ্য-সাধনা করে তবে পাওয়া যায়! তবে একটা গান শোন:

গিরি! গণেশ আমার শুভকারী। —
পূজে গণপতি, পেলাম হৈমবতী
যাও হে গিরিরাজ, আন গিয়ে গৌরী।।
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন।
ঘরে আনবো চণ্ডী, শুনবো কত চণ্ডী,
কত আসবেন দণ্ডী, যোগী জটাধারী।।

"চণ্ডী যেকালে এসেছেন — সেকালে কত যোগী জটাধারীও আসবে।"

ঠাকুর হাসিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মাস্টার, বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তদের বলিতেছেন — "আমার বড় হাসি পাচ্ছে। ভাবছি — এঁদের (যাত্রাওয়ালাদের) আবার আমি গান শোনাচ্ছি।"

নীলকণ্ঠ — আমরা যে গান গেয়ে বেড়াই, তার পুরস্কার আজ হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্য) — কোন জিনিস বেচলে এক খাঁমচা ফাউ দেয় — তোমরা ওখানে গাইলে, এখানে ফাউ দিলে। (সকলের হাস্য)

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১১ই অক্টোবর 1884/10/11/i

35.6 দক্ষিণেশ্বরে বেদান্তবাগীশ — ঈশান প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

আজ শনিবার, ১১ই অক্টোবর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ (২৬শে আশ্বিন, কৃষ্ণা সপ্তমী)। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে ছোট তক্তপোশে শুইয়া আছেন। বেলা আন্দাজ ২টা বাজিয়াছে। মেঝের উপর মাস্টার ও প্রিয় মুখুজ্জে বসিয়া আছেন।

মাস্টার স্কুল হইতে ১টার সময় ছাড়িয়া দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে প্রায় ২টার সময় পৌঁছিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — যদু মল্লিকের বাড়ি গিয়াছিলাম। একেবারে জিজ্ঞাসা করে গাড়িভাড়া কত! যখন এরা বললে তিন টাকা দুইআনা, তখন একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করে আবার শুক্কুল ঠাকুর আড়ালে গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করছে। সে বললে তিন টাকা চারিআনা (সকলের হাস্য) তখন আবার আমাদের কাছে দৌড়ে আসে; বলে, ভাড়া কত?

“কাছে দালাল এসেছে। সে যদুকে বললে, বড়বাজারে ৪ কাঠা জায়গা বিক্রী আছে নেবেন? যদু বলে, কত দাম? দামটা কিছু কমায় না? আমি বললুম, ‘তুমি নেবে না কেবল ঢঙ করছ। না?’ তখন আবার আমার দিকে ফিরে হাসে। বিষয়ী লোকদের দস্তুরই; ৫টা লোক আনাগোনা করবে বাজারে খুব নাম হবে।

“অধরের বাড়ি গিছল তা আমি আবার বললাম, তুমি অধরের বাড়ি গিছিলে, তা অধর বড় সন্তুষ্ট হয়েছে। তখন বলে, ‘এ্যাঁ, এ্যাঁ, সন্তুষ্ট হয়েছে?’

“যদুর বাড়িতে — মল্লিক এসেছিল! বড় চতুর আর শঠ, চক্ষু দেখে বুঝতে পাল্লাম। চক্ষুর দিকে তাকিয়ে বললুম, ‘চতুর হওয়া ভাল নয়, কাক বড় সেয়ানা, চতুর, কিন্তু পরের গু খেয়ে মরে!’ আর দেখলাম লক্ষ্মীছাড়া। যদুর মা অবাক্ হয়ে বললে, বাবা, তুমি কেমন করে জানলে ওর কিছু নাই। চেহারা দেখে বুঝতে পেরেছিলাম।”

নারাণ আসিয়াছেন, তিনিও মেঝেয় বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রিয়নাথের প্রতি) — হ্যাঁগা, তোমাদের হরিটি বেশ।

প্রিয়নাথ — আজ্ঞা, এমন বিশেষ ভাল কি? তবে ছেলেমানুষ —

নারাণ — পরিবারকে মা বলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সে কি! আমিই বলতে পারি না, আর সে মা বলেছে! (প্রিয়নাথের প্রতি) — কি জানো, ছেলেটি বেশ শান্ত, ঈশ্বরের দিকে মন আছে।

ঠাকুর অন্য কথা পাড়িলেন।

“হেম কি বলেছিল জানো? বাবুরামকে বললে, ঈশ্বরই এক সত্য আর সব মিথ্যা। (সকলের হাস্য) না গো, আন্তরিক বলেছে। আবার আমাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়া

কীর্তন শুনাবে বলেছিল। তা হয় নাই। তারপর নাকি বলেছিল, 'আমি খোল-করতাল নিলে লোকে কি বলবে'। ভয় পেয়ে গেল, পাছে লোকে বলে পাগল হয়েছে।"

[ঘোষপাড়ার স্ত্রীলোকের হরিপদকে গোপালভাব — কৌমারবৈরাগ্য ও স্ত্রীলোক]

"হরিপদ ঘোষপাড়ার এক মাগীর পাল্লায় পড়েছে। ছাড়ে না। বলে কোলে করে খাওয়ায়। বলে নাকি গোপালভাব! আমি অনেক সাবধান করে দিইছি। বলে বাৎসল্যভাব। ওই বাৎসল্য থেকে আবার তাচ্ছল্য হয়।

"কি জানো? মেয়ে-মানুষ থেকে অনেক দূরে থাকতে হয়, তবে যদি ভগবান-লাভ হয়। যাদের মতলব খারাপ, সে-সব মেয়ে-মানুষের কাছে আনাগোনা করা, কি তাদের হাতে কিছু খাওয়া বড় খারাপ। এরা সত্তা হরণ করে।

"অনেক সাবধানে থাকলে তবে ভক্তি বজায় থাকে। ভবনাথ, রাখাল এরা সব একদিন আপনারা রান্না কল্লে। ওরা খেতে বসেছে, এমন সময় একজন বাউল এসে ওদের পঙ্ ক্তিতে বসে বলে, খাব। আমি বললাম, আঁটবে না; আচ্ছা যদি থাকে, তোমার জন্য রাখবে। তা সে রেগে উঠে গেল। বিজয়ার দিনে যে সে মুখে খাইয়ে দেয়, সে ভাল নয়। শুদ্ধসত্ত্ব ভক্ত — এদের হাতে খাওয়া যায়।

"মেয়ে-মানুষের কাছে খুব সাবধান হতে হয়। গোপালভাব! এ-সব কথা শুনো না। মেয়ে ত্রিভুবন দিলে খেয়ে। অনেক মেয়ে-মানুষ জোয়ান ছোকরা, দেখতে ভালো, দেখে নূতন মায়া ফাঁদে। তাই গোপালভাব!

“যাদের কৌমারবৈরাগ্য; যারা ছেলেবেলা থেকে ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয়ে বেড়ায়, সংসারে ঢোকে না, তারা একটি থাক আলাদা। তারা নৈকষ্য কুলীন। ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হলে তারা মেয়ে-মানুষ থেকে ৫০ হাত তফাতে থাকে, পাছে তাদের ভাব ভঙ্গ হয়। তারা যদি মেয়ে-মানুষের পাল্লায় পড়ে, তাহলে তার নৈকষ্য কুলীন থাকে না, ভঙ্গ ভাব হয়ে যায়; তাদের ঘর নিচু হয়ে যায়। যাদের ঠিক কৌমারবৈরাগ্য তাদের উঁচু ঘর; অতি শুদ্ধভাব। গায়ে দাগটি পর্যন্ত লাগে না।”

[জিতেন্দ্রিয় হবার উপায় — প্রকৃতিভাব সাধন]

“জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় কিরকম ভাবে? আপনাতে মেয়ের ভাব আরোপ করতে হয়। আমি অনেকদিন সখীভাবে ছিলাম। মেয়েমানুষের কাপড়, গয়না পরতুম, ওড়না গায়ে দিতুম। ওড়না গায়ে দিয়ে আরতি করতুম! তা না হলে পরিবারকে আট মাস কাছে এনে রেখেছিলাম কেমন করে? দুজনেই মার সখী!

“আমি আপনাকে পু (পুরুষ) বলতে পারি না। একদিন ভাবে রয়েছি (পরিবার) জিজ্ঞাসা কললে — আমি তোমার কে? আমি বললুম, ‘আনন্দময়ী’।

“এক মতে আছে, যার মাইয়ে বোঁটা আছে সেই মেয়ে। অর্জুন আর কৃষ্ণের মাইয়ে বোঁটা ছিল না। শিবপূজার ভাব কি জান? শিবলিঙ্গের পূজা, মাতৃস্থানের ও পিতৃস্থানের পূজা। ভক্ত এই বলে পূজা করে, ঠাকুর দেখো যেন আর জন্ম না হয়। শোণিত-শুক্রের মধ্য দিয়া মাতৃস্থান দিয়া আর যেন আসতে না হয়।”
পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১১ই অক্টোবর 1884/10/11/ii

35.7 স্ত্রীলোক লইয়া সাধন — শ্রীরামকৃষ্ণের পুনঃ পুনঃ নিষেধ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিভাবের কথা বলিতেছেন। শ্রীযুক্ত প্রিয় মুখুজ্জে, মাস্টার, আরও কয়েকটি ভক্ত বসিয়া আছেন। এমন সময় ঠাকুরদের বাড়ির একটি শিক্ষক ঠাকুরদের কয়েকটি ছেলে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — শ্রীকৃষ্ণের শিরে ময়ূর পাখা, ময়ূর পাখাতে যোনি চিহ্ন আছে — অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিকে মাথায় রেখেছেন।

“কৃষ্ণ রাসমণ্ডলে গেলেন। কিন্তু সেখানে নিজে প্রকৃতি হলেন। তাই দেখ রাসমণ্ডলে তাঁর মেয়ের বেশ। নিজে প্রকৃতিভাব না হলে প্রকৃতির সঙ্গের অধিকারী হয় না। প্রকৃতিভাব হলে তবে রাস, তবে সম্ভোগ। কিন্তু সাধকের অবস্থায় খুব সাবধান হতে হয়! তখন মেয়ে মানুষ থেকে অনেক অন্তরে থাকতে হয়। এমন কি ভক্তিমতী হলেও বেশি কাছে যেতে নাই। ছাদে উঠবার সময় হেলতে দুলতে নাই। হেললে দুললে পড়বার খুব সম্ভাবনা। যারা দুর্বল, তাদের ধরে ধরে উঠতে হয়।

“সিদ্ধ অবস্থায় আলাদা কথা। ভগবানকে দর্শনের পর বেশি ভয় নাই; অনেকটা নির্ভয়। ছাদে একবার উঠতে পাল্লে হয়। উঠবার পর ছাদে নাচাও যায়। সিঁড়িতে

কিন্তু নাচা যায় না। আবার দেখ — যা ত্যাগ করে গিছি, ছাদে উঠবার পর তা আর ত্যাগ করতে হয় না। ছাদও ইট, চুন, সুড়কির তৈয়ারী, আবার সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈয়ারী। যে মেয়েমানুষের কাছে এত সাবধান হতে হয়, ভগবানদর্শনের পর বোধ হবে, সেই মেয়েমানুষ সাক্ষাৎ ভগবতী। তখন তাঁকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করবে। আর তত ভয় নাই।

"কথাটা এই, বুড়ী ছুঁয়ে যা ইচ্ছা কর।"

[ধ্যানযোগ ও শ্রীরামকৃষ্ণ — অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ]

"বহির্মুখ অবস্থায় স্থূল দেখে। অন্নময় কোষে মন থাকে। তারপর সূক্ষ্ম শরীর। লিঙ্গ শরীর। মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষে মন থাকে। তারপর কারণ শরীর; যখন মন কারণ শরীরে আসে, তখন আনন্দ, — আনন্দময় কোষে মন থাকে। এইটি চৈতন্যদেবের অর্ধবাহ্যদশা।

"তারপর মন লীন হয়ে যায়। মনের নাশ হয়। মহাকারণে নাশ হয়। মনের নাশ হলে আর খবর নাই। এইটি চৈতন্যদেবের অন্তর্দশা।

"অন্তর্মুখ অবস্থা কিরকম জানো? দয়ানন্দ বলেছিল, 'অন্দরে এসো, কপাট বন্ধ করে! অন্দর বাড়িতে যে সে যেতে পারে না।'

"আমি দীপশিখাকে নিয়ে আরোপ করতুম। লালচে রঙটাকে বলতুম স্থূল, তার ভিতর সাদা সাদা ভাগটাকে বলতুম সূক্ষ্ম, সব ভিতরে কালো খড়কের মতো ভাগটাকে বলতুম কারণশরীর।

“ধ্যান যে ঠিক হচ্ছে, তার লক্ষণ আছে। একটি লক্ষণ — মাথায় পাখি বসবে জড় মনে করে।”

[পূর্বকথা — কেশবকে প্রথম দর্শন ১৮৬৪, ধ্যানস্থ — চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয়]

“কেশব সেনকে প্রথম দেখি আদি সমাজে। তাকের (বেদীর) উপর কজন বসেছে, কেশব মাঝখানে বসেছে। দেখলাম যেন কাষ্ঠবৎ! সেজোবাবুকে বললুম দেখ ওর ফাতনায় মাছে খেয়েছে! ওই ধ্যানটুকু ছিল বলে ঈশ্বরের ইচ্ছায় যেগুনো মনে করেছিল (মান-টানগুলো) হয়ে গেল।

ঠাকুরদের শিক্ষক — আজ্ঞে, ওটি বেশ জানি। (হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — হ্যাঁগো, দাঁতের ব্যামো যদি থাকে, সব কর্ম করছে, কিন্তু দরদের দিকে মনটা আছে। তাহলে ধ্যান চোখ চেয়েও হয়, কথা কইতে কইতেও হয়।

শিক্ষক — পতিতপাবন নাম তাঁর আছে, তাই ভরসা। তিনি দয়াময়।

[পূর্বকথা — শিখরা ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাসের সহিত কথা]

শ্রীরামকৃষ্ণ — শিখরাও বলেছিল, তিনি দয়াময়। আমি বললুম, তিনি কেমন করে দয়াময়? তা তারা বললে, কেন মহারাজ! তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের জন্য এত জিনিস তৈয়ারী করেছেন, আমাদের পদে পদে বিপদ থেকে রক্ষা করছেন। তা আমি বললুম, তিনি আমাদের জন্ম দিয়ে দেখছেন,

খাওয়াচ্ছেন, তা কি এত বাহাদুরি? তোমার যদি ছেলে হয়, তাকে কি আবার বামুনপাড়ার লোক এসে মানুষ করবে?

শিক্ষক — আচ্ছা, কারু ফস্‌ করে হয়, কারু হয় না, এর মানে কি?

[লালাবাবু ও রানী ভবানীর বৈরাগ্য — সংস্কার থাকলে সত্ত্বগুণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি জান? অনেকটা পূর্বজন্মের সংস্কারেতে হয়। লোকে মনে করে হঠাৎ হচ্ছে।

“একজন সকালে একপাত্র মদ খেয়েছিল, তাতেই বেজায় মাতাল, ঢলাঢলি আরম্ভ করলে — লোকে অবাক্‌। একপাত্রে এত মাতাল কি করে হল? একজন বললে, ওরে, সমস্ত রাত্রি মদ খেয়েছে।

“হনুমান সোনার লঙ্কা দগ্ধ করলে। লোকে অবাক্‌ একটা বানর এসে সব পুড়িয়ে দিলে। কিন্তু আবার বলেছে, আদত কথা এই — সীতার নিঃশ্বাসে আর রামের কোপে পুড়েছিল।

“আর দেখ লালাবাবু১ — এত ঐশ্বর্য; পূর্বজন্মের সংস্কার না থাকলে ফস্‌ করে কি বৈরাগ্য হয়? আর রানী ভবানী — মেয়েমানুষ হয়ে এত জ্ঞান ভক্তি!”

[কৃষ্ণদাসের রজোগুণ — তাই জগতের উপকার]

“শেষ জন্মে সত্ত্বগুণ থাকে, ভগবানে মন হয়; তাঁর জন্য মন ব্যাকুল হয়, নানা বিষয়কর্ম থেকে মন সরে আসে।

“কৃষ্ণদাস পাল এসেছিল। দেখলাম রজোগুণ! তবে হিন্দু, জুতো বাইরে রাখলে। একটু কথা কয় দেখলুম, ভিতরে কিছুই নাই। জিজ্ঞাসা করলুম, মানুষের কি কর্তব্য? তা বলে, ‘জগতের উপকার করব।’ আমি বললুম, হ্যাঁগা তুমি কে? আর কি উপকার করবে? আর জগৎ কতটুকু গা, যে তুমি উপকার করবে?”

নারান আসিয়াছেন। ঠাকুরের ভারী আনন্দ। নারায়ণকে ছোট খাটটির উপর পাশে বসাইলেন। গায়ে হাত দিয়ে আদর করিতে লাগিলেন। মিষ্টান্ন খাইতে দিলেন। আর সস্নেহে বললেন, জল খাবি? নারাণ মাস্টারের স্কুলে পড়েন। ঠাকুরের কাছে আসেন বলিয়া বাড়িতে মার খান। ঠাকুর সস্নেহে একটু হাসিতে হাসিতে নারায়ণকে বলছেন, তুই একটা চামড়ার জামা কর, তাহলে মারলে লাগবে না।

ঠাকুর হরিশকে বললেন, তামাক খাব।

[স্ত্রীলোক লয়ে সাধন ঠাকুরের বারবার নিষেধ — ঘোষপাড়ার মত]

আবার নারায়ণকে সম্বোধন করে বলছেন, “হরিপদের সেই পাতানো মা এসেছিল। আমি হরিপদকে খুব সাবধান করে দিয়েছি। ওদের ঘোষপাড়ার মত। আমি তাকে জিজ্ঞাসা কল্লুম, তোমার কেউ আশ্রয় আছে? তা বলে, হাঁ — অমুক চক্রবর্তী।”

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — আহা নীলকণ্ঠ সেদিন এসেছিল। এমন ভাব! আর-একদিন আসবে বলে গেছে। গান শুনাবে। আজ ওদিকে নাচ হচ্ছে, দেখো গে যাও না। (রামলালকে) তেল নাই যে, (ভাঁড় দৃষ্টে) কই তেল ভাঁড়ে তো নাই।

১ লালাবাবু, বাঙালী জাতির গৌরব, পাইকপাড়ার কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ —– সাত লক্ষ বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি ত্যাগ। মথুরাবাস —– ত্রিশ বৎসর বয়সে। চল্লিশে মাধুকরী, ভিক্ষাজীবী। বিয়াল্লিশে ৺প্রাপ্তি। পত্নী "রানী কাত্যায়নী" নিঃসন্তান। গুরু কৃষ্ণদাস বাবাজী, ভক্তমালের (বাঙলা পদ্যে) অনুবাদক।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১১ই অক্টোবর 1884/10/11/iii

35.8 পুরুষপ্রকৃতিবিবেক যোগ —– রাধাকৃষ্ণ, তাঁরা কে? আদ্যাশক্তি

[বেদান্তবাগীশ, দয়ানন্দ সরস্বতী, কর্ণেল অল্‌কট্‌, সুরেন্দ্র, নারাণ]

এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাদচারণ করিতেছেন; কখনও ঘরের দক্ষিণদিকের বারান্দায়, কখনও বা ঘরের পশ্চিমদিকে গোল বারান্দাটিতে দাঁড়াইয়া, গঙ্গা দর্শন করিতেছেন।

[সঙ্গ (Environment) দোষ গুণ, ছবি, গাছ, বালক]

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার ছোট খাটটিতে বসিলেন। বেলা ৩টা বাজিয়া গিয়াছে। ভক্তেরা আবার মেঝেতে আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া চুপ করিয়া আছেন। এক-একবার ঘরের দেওয়ালের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। দেওয়ালে অনেকগুলি পট আছে। ঠাকুরের বামদিকে শ্রীশ্রীবীণাপাণির পট, তাহার কিছু দূরে নিতাই গৌর ভক্তসঙ্গে কীর্তন করিতেছেন। ঠাকুরের সম্মুখে ধ্রুব ও প্রহ্লাদের ছবি ও মা-কালীর মূর্তি। ঠাকুরের ডানদিকে দেওয়ালের উপর রাজরাজেশ্বরী মূর্তি, পিছনের দেওয়ালে যীশুর ছবি রহিয়াছে — পীটার ডুবিয়া যাইতেছেন, যীশু তুলিতেছেন। ঠাকুর হঠাৎ মাস্টারকে বলিতেছেন, দেখ, সাধু-সন্ন্যাসীর পট ঘরে রাখা ভাল। সকাল বেলা উঠে অন্য মুখ না দেখে সাধু-সন্ন্যাসীদের মুখ দেখে উঠা ভাল। ইংরাজী ছবি দেওয়ালে — ধনী, রাজা, কুইন-এর ছবি — কুইন-এর ছেলের ছবি, সাহেব-মেম বেড়াচ্ছে তার ছবি রাখা — এ-সব রজোগুণে হয়।

“যেরূপ সঙ্গের মধ্যে থাকবে, সেরূপ স্বভাব হয়ে যায়। তাই ছবিতেও দোষ। আবার নিজের যেরূপ স্বভাব, সেইরূপ সঙ্গ লোকে খোঁজে। পরমহংসেরা দু-পাঁচজন ছেলে কাছে রেখে দেয় — কাছে আসতে দেয় — পাঁচ-ছয় বছরের। ও অবস্থায় ছেলেদের ভিতর থাকতে ভাল লাগে। ছেলেরা সত্ত্ব রজঃ তমঃ কোন গুণের বশ নয়।

“গাছ দেখলে তপোবন, ঋষি তপস্যা করছে, উদ্দীপন হয়।”

সিঁথির একটি ব্রাহ্মণ ঘরের মদ্যে প্রবেশ করিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ইনি কাশীতে বেদান্ত পড়িয়াছিলেন। স্থূলকায়, সদা হাস্যমুখ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিগো, কেমন সব আছ? অনেকদিন আস নাই।

পণ্ডিত (সহাস্যে) — আজ্ঞা, সংসারের কাজ। আর জানেন তো সময় আর হয় না।

পণ্ডিত আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সহিত কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কাশীতে অনেকদিন ছিলে, কি সব দেখলে, কিছু বল। দয়ানন্দের১ কথা একটু বল।

পণ্ডিত — দয়ানন্দের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আপনি তো দেখেছিলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখতে গিছলুম, তখন ওধারে একটি বাগানে সে ছিল। কেশব সেনের আসবার কথা ছিল সেদিন। তা যেন চাতকের মতন কেশবের জন্য ব্যস্ত হতে লাগল। খুব পণ্ডিত। বাঙ্গালা ভাষাকে বলত, গৌরাণ্ড ভাষা। দেবতা মানত — কেশব মানত না! তা বলত, ঈশ্বর এত জিনিস করেছেন আর দেবতা করতে পারেন না! নিরাকারবাদী। কাপ্তেন “রাম রাম“ কচ্ছিল, তা বললে, তার চেয়ে “সন্দেশ সন্দেশ” বল।

পণ্ডিত — কাশীতে দয়ানন্দের সঙ্গে পণ্ডিতদের খুব বিচার হল। শেষে সকলে একদিকে, আর ও একদিকে। তারপর এমন করে তুললে যে পালাতে পাল্লে বাঁচে। সকলে একসঙ্গে উঁচ্চৈঃস্বরে লাগল — ‘দয়ানন্দেন যদুক্তং তদ্ধেয়ম্’।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও থিয়োসফি — ওরা কি ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খোঁজে]

“আবার কর্ণেল অল্‌কট্‌ কেও দেখেছিলাম। ওরা বলে সব ‘মহাত্মা’ আছে। আর চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, নক্ষত্রলোক — এই সব আছে। সূক্ষ্মশরীর সেই সব জায়গায় যায় — এই সব অনেক কথা। আচ্ছা মহাশয়, আপনার থিয়োসফি কি-রকম বোধ হয়?”

শ্রীরামকৃষ্ণ — ভক্তিই একমাত্র সার — ঈশ্বরে ভক্তি! তারা কি ভক্তি খোঁজে? তাহলে ভাল। ভগবানলাভ যদি উদ্দেশ্য হয় তা হলেই ভাল। চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, নক্ষত্রলোক, মহাত্মা এই নিয়ে কেবল থাকলে ঈশ্বরকে খোঁজা হয় না। তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হবার জন্য সাধন করা চাই, ব্যাকুল হয়ে ডাকা চাই। নানা জিনিস থেকে মন কুড়িয়ে এনে তাঁতে লাগাতে হয়।

বলিয়া ঠাকুর রামপ্রসাদের গান ধরিলেন:

মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে ।।
সে ভাব লাগি পরম যোগী যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বক ধরে ।।

“আর শাস্ত্র বল, দর্শন বল, বেদান্ত বল — কিছুতেই তিনি নাই। তাঁর জন্য প্রাণ ব্যাকুল না হলে কিছু হবে না।

“ষড় দর্শনে না পায় দরশন, আগম নিগম তন্ত্রসারে।

সে যে ভক্তিরসের রসিক সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ।।

“খুব ব্যাকুল হতে হয়। একটা গান শোন:

রাধার দেখা কি পায় সকলে,”

[অবতাররাও সাধন করেন — লোকশিক্ষার্থ — সাধন, তবে ঈশ্বরদর্শন]

“সাধনের খুব দরকার, ফস্ করে কি আর ঈশ্বরদর্শন হয়?

“একজন জিজ্ঞাসা করলে, কই ঈশ্বরকে দেখতে পাই না কেন? তা মনে উঠল, বললুম বড়মাছ ধরবে, তার আয়োজন কর। চারা (চার) কর। হাতসুতো, ছিপ যোগাড় কর। গন্ধ পেয়ে ‘গম্ভীর’ জল থেকে মাছ আসবে। জল নড়লে টের পাবে, বড় মাছ এসেছে।

“মাখন খেতে ইচ্ছা। তা দুধে আছে মাখন, দুধে আছে মাখন, — করলে কি হবে? খাটতে হয় তবে মাখন উঠে। ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন, বললে কি ঈশ্বরকে দেখা যায়? সাধন চাই!

“ভগবতী নিজে পঞ্চমুণ্ডীর উপর বসে কঠোর তপস্যা করেছিলেন — লোকশিক্ষার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম, তিনিও রাধাযন্ত্র কুড়িয়ে পেয়ে লোকশিক্ষার জন্য তপস্যা করেছিলেন।”

[রাধাই আদ্যাশক্তি বা প্রকৃতি — পুরুষ ও প্রকৃতি, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ]

“শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, রাধা প্রকৃতি, চিচ্ছক্তি — আদ্যাশক্তি। রাধা প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী! এঁর ভিতরে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনগুণ। যেমন পেঁয়াজ ছাড়িয়ে যাও, প্রথমে লাল-কালোর আমেজ, তারপর লাল, তারপর সাদা বেরুতে থাকে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে, কামরাধা, প্রেমরাধা, নিত্যরাধা। কামরাধা চন্দ্রাবলী; প্রেমরাধা শ্রীমতী; নিত্যরাধা নন্দ দেখেছিলেন — গোপাল কোলে!

“এই চিচ্ছক্তি আর বেদান্তের ব্রহ্ম (পুরুষ) অভেদ। যেমন জল আর তার হিমশক্তি। জলের হিমশক্তি ভাবলেই জলকে ভাবতে হয়; আবার জলকে ভাবলেই জলের হিমশক্তি ভাবনা এসে পড়ে। সাপ আর সাপের তির্যগ্‌গতি। তির্যগ্ গতি ভাবলেই সাপকে ভাবতে হবে। ব্রহ্ম বলি কখন? যখন নিষ্ক্রিয় বা কার্যে নির্লিপ্ত। পুরুষ যখন কাপড় পরে, তখন সেই পুরুষই থাকে। ছিলে দিগম্বর হলে সাম্বর — আবার হবে দিগম্বর। সাপের ভিতর বিষ আছে, সাপের কিছু হয় না। যাকে কামড়াবে, তার পক্ষে বিষ। ব্রহ্ম নিজে নির্লিপ্ত।

“নামরূপ যেখানে, সেইখানেই প্রকৃতির ঐশ্বর্য। সীতা হনুমানকে বলেছিলেন, ‘বৎসে! আমিই একরূপে রাম, একরূপে সীতা হয়ে আছি; একরূপে ইন্দ্র, একরূপে ইন্দ্রাণী — একরূপে ব্রহ্মা, একরূপে ব্রহ্মাণী — একরূপে রুদ্র, একরূপে রুদ্রাণী, — হয়ে আছি’! — নামরূপ যা আছে সব চিচ্ছক্তির ঐশ্বর্য। চিচ্ছক্তির ঐশ্বর্য সমস্তই; এমন কি ধ্যান ধ্যাতা পর্যন্ত। আমি ধ্যান কচ্চি, যতক্ষণ বোধ ততক্ষণ তাঁরই এলাকায় আছি। (মাস্টারের প্রতি) — এইগুলি ধারণা কর। বেদ পুরাণ শুনতে হয়, তিনি যা বলেছেন করতে হয়।

(পণ্ডিতের প্রতি) — “মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ ভাল। রোগ মানুষের লেগেই আছে। সাধুসঙ্গে অনেক উপশম হয়।”

[বেদান্তবাগীশকে শিক্ষা — সাধুসঙ্গ কর; আমার কেউ নয়; দাসভাব]

“আমি ও আমার। এর নামই ঠিক জ্ঞান — ‘হে ঈশ্বর! তুমিই সব করছ, আর তুমিই আমার আপনার লোক। আর তোমার এই সমস্ত ঘরবাড়ি, পরিবার, আত্মীয়, বন্ধু, সমস্ত জগৎ; সব তোমার!’ আর ‘আমি সব করছি, আমি কর্তা, আমার ঘরবাড়ি, পরিবার, ছেলেপুলে, বন্ধু, বিষয়’ — এ-সব অজ্ঞান।

“গুরু শিষ্যকে এ-কথা বুঝাচ্ছিলেন। ঈশ্বর তোমার আপনার, আর কেউ আপনার নয়। শিষ্য বললে, ‘আজ্ঞা, মা, পরিবার এরা তো খুব যত্ন করেন; না দেখলে অন্ধকার দেখেন, কত ভালবাসেন। গুরু বললেন, ও তোমার মনের ভুল। আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি, কেউ তোমার নয়। ওই ঔষধবড়ি কয়টি তোমার কাছে রেখে দাও। তুমি বাড়িতে গিয়ে খেয়ে শুয়ে থেকো। লোকে মনে করবে যে তোমার দেহত্যাগ হয় গেছে। কিন্তু তোমার সব বাহ্যজ্ঞান থাকবে, তুমি দেখতে শুনতে সব পাবে; — আমি সেই সময় গিয়ে পড়ব।’

“শিষ্যটি তাই করলে। বাটীতে গিয়ে বড়ি ক’টি খেলে; খেয়ে অচেতন হয়ে পড়ে রহিল। মা, পরিবার, বাড়ির সকলে, কান্নাকাটি আরম্ভ করলে। এমন সময় গুরু কবিরাজের বেশে উপস্থিত হলেন। সমস্ত শুনে বললেন, আচ্ছা, এর ঔষধ আছে — আবার বেঁচে উঠবে। তবে একটি কথা আছে। এই ঔষধটি আগে একজন আপনার লোকের খেতে হবে, তারপর ওকে দেওয়া যাবে! যে আপনার লোক

ওই বড়িটি খাবে, তার কিন্তু মৃত্যু হবে। তা এখানে ওঁর মা কি পরিবার এঁরা তো সব আছেন, একজন না একজন কেউ খাবেন, সন্দেহ নাই। তাহলেই ছেলেটি বেঁচে উঠবে।

“শিষ্য সমস্ত শুনছে! কবিরাজ আগে মাকে ডাকলেন। মা কাতর হয়ে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছেন। কবিরাজ বললেন, মা! আর কাঁদতে হবে না। তুমি এই ঔষধটি খাও, তাহলেই ছেলেটি বেঁচে উঠবে। তবে তোমার এতে মৃত্যু হবে। মা ঔষধ হাতে ভাবতে লাগলেন। অনেক ভেবে-চিন্তে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, বাবা, আমার আর কটি ছেলেমেয়ে আছে, আমি গেলে কি হবে, এও ভাবছি। কে তাদের দেখবে, খাওয়াবে, তাদের জন্য ভাবছি। পরিবারকে ডেকে তখন ঔষধ দেওয়া হল, — পরিবারও খুব কাঁদছিলেন। ঔষধ হাত করে তিনিও ভাবতে লাগলেন। শুনলেন যে ঔষধ খেলে মরতে হবে। তখন কেঁদে বলতে লাগলেন, ওগো, ওঁর যা হবার, তা তো হয়েছে গো; আমার অপগণ্ডগুলির এখন কি হবে বল? কে ওদের বাঁচাবে? আমি কেমন করে ও ঔষধ খাই? শিষ্যের তখন ঔষধের নেশা চলে গেছে। সে বুঝলে যে, কেউ কারু নয়। ধড়মড় করে উঠে গুরুর সঙ্গে চলে গেল। গুরু বললেন, তোমার আপনার কেবল একজন, — ঈশ্বর।

“তাই তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হয়, — যাতে তিনিই ‘আমার’ বলে ভালবাসা হয় — তাই করাই ভাল । সংসার দেখছো, দুদিনের জন্য। আর এতে কিছুই নাই।”

[গৃহস্থ সর্বত্যাগ পারে না — জ্ঞান অন্তঃপুরে যায় না — ভক্তি যেতে পারে]

পণ্ডিত (সহাস্যে) — আজ্ঞে, এখানে এলে সেদিন পূর্ণ বৈরাগ্য হয়। ইচ্ছা করে — সংসার ত্যাগ করে চলে যাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — না, ত্যাগ করতে হবে কেন? আপনারা মনে ত্যাগ কর। সংসারে অনাসক্ত হয়ে থাক।

“সুরেন্দ্র এখানে মাঝে মাঝে রাত্রে এসে থাকবে বলে একটা বিছানা এনে রেখেছিল। দু-একদিন এসেও ছিল, তারপর তার পরিবার বলেছে, দিনের বেলা যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও, রাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া হবে না। তখন সুরেন্দ্র আর কি করে? আর রাত্রে থাকবার জো নাই!

“আর দেখ শুধু বিচার কললে কি হবে? তাঁর জন্য ব্যাকুল হও, তাঁকে ভালবাসতে শেখ! জ্ঞান-বিচার — পুরুষমানুষ, বাড়ির বারবাড়ি পর্যন্ত যায়।

“ভক্তি — মেয়েমানুষ অন্তঃপুর পর্যন্ত যায়।

“একটা কোনরকম ভাব আশ্রয় করতে হয়। তবে ঈশ্বরলাভ হয়। সনকাদি ঋষিরা শান্ত রস নিয়ে ছিলেন। হনুমান দাসভাব নিয়ে ছিলেন। শ্রীদাম, সুদাম, ব্রজের রাখালদের — সখ্যভাব। যশোদার বাৎসল্যভাব ঈশ্বরেতে সন্তানবুদ্ধি! শ্রীমতীর মধুরভাব।

“হে ঈশ্বর! তুমি প্রভু, আমি দাস, — এ-ভাবটির নাম দাসভাব। সাধকের পক্ষে এ-ভাবটি খুব ভাল।”

পণ্ডিত — আজ্ঞা, হাঁ।

১ দয়ানন্দ সরস্বতী, ১৮২৪-১৮৮৩। কাশীর আনন্দবাগে বিচার ১৮৬৯। কলিকাতায় স্থিতি, ঠাকুরদের নৈনালের প্রমোদ কাননে, ডিসেম্বর ১৮৭২ - মার্চ ১৮৭৩। ওই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ও কেশবের ও কাপ্তেনের দর্শন। কাপ্তেন ঠাকুরকে ওই সময় সম্ভবতঃ দর্শন করেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১১ই অক্টোবর 1884/10/11/iv

35.9 ঈশানকে উপদেশ — ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ — জ্ঞানের লক্ষণ

সিঁথির পণ্ডিত চলিয়া গিয়াছেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। কালীবাড়িতে ঠাকুরদের আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরদের নমস্কার করিতেছেন। ছোট খাটটিতে বসিয়া উন্মনা। কয়েকটি ভক্ত মেঝেতে আসিয়া আবার বসিলেন। ঘর নিঃশব্দ।

রাত্রি একঘন্টা হইয়াছে। ঈশান মুখোপাধ্যায় ও কিশোরী আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ঈশানের পুরশ্চরণাদি শাস্ত্রোল্লিখিত কর্মে খুব অনুরাগ। ঈশান কর্মযোগী। এইবার ঠাকুর কথা কহিতেছেন —

শ্রীরামকৃষ্ণ — জ্ঞান জ্ঞান বললেই কি হয়? জ্ঞান হবার লক্ষণ আছে। দুটি লক্ষণ — প্রথম অনুরাগ অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা। শুধু জ্ঞানবিচার করছি, কিন্তু ঈশ্বরেতে অনুরাগ নাই, ভালবাসা নাই, সে মিছে। আর-একটি লক্ষণ কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ। কুলকুণ্ডলিনী যতক্ষণ নিদ্রিত থাকেন, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না। বসে বসে বই পড়ে যাচ্ছি, বিচার করছি, কিন্তু ভিতরে ব্যাকুলতা নাই, সেটি জ্ঞানের লক্ষণ নয়।

“কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হলে ভাব, ভক্তি, প্রেম — এই সব হয়। এরই নাম ভক্তিযোগ।

“কর্মযোগ বড় কঠিন। কর্মযোগে কতকগুলি শক্তি হয় — সিদ্ধাই হয়।”

ঈশান — আমি হাজরা মহাশয়ের কাছে যাই।

ঠাকুর চুপ করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঈশান আবার ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে হাজরা। ঠাকুর নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে হাজরা ঈশানকে বলিলেন, চলুন ইনি এখন ধ্যান করবেন। ঈশান ও হাজরা চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। ক্রমে সত্য সত্যই ধ্যান করিতেছেন। করে জপ করিতেছেন। সেই হাত একবার মাথার উপরে রাখিলেন, তারপর কপালে, তারপর কণ্ঠে, তারপর হৃদয়ে, তারপর নাভিদেশে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কি ষট্‌চক্রে আদ্যাশক্তির ধ্যান করিতেছেন? শিব সংহিতাদি শাস্ত্রে যে যোগের কথা আছে, এ কি তাই!

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১১ই অক্টোবর 1884/10/11/v

35.10 নিবৃত্তিমার্গ — ঈশ্বরলাভের পর কর্মত্যাগ

[ঈশানকে শিক্ষা — উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত — কর্মযোগ বড় কঠিন]

ঈশান হাজরার সহিত কালীঘরে গিয়াছেন। ঠাকুর ধ্যান করিতেছিলেন। রাত্রি প্রায় ৭।। টা। ইতিমধ্যে অধর আসিয়া পড়িয়াছেন ।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর মা-কালী দর্শন করিতে গিয়াছেন। দর্শন করিয়া পাদপদ্ম হইতে নির্মাল্য লইয়া মস্তকে ধারণ করিলেন — মাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন এবং চামর লইয়া মাকে ব্যজন করিলেন। ঠাকুর ভাবে মাতোয়ারা! বাহিরে আসিবার সময় দেখিলেন, ঈশান কোশাকুশি লইয়া সন্ধ্যা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি) — কি, আপনি সেই এসেছ? আহ্নিক করছ। একটা গান শুন।

ভাবে উন্মত্ত হইয়া ঈশানের কাছে বসিয়া মধুর কণ্ঠে গাইতেছেন:

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়!

কালী কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায় ।।

ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।

সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়।।

দয়া ব্রত দান আদি আর কিছু না মনে লয়,

মদনেরই যাগযজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়।

"সন্ধ্যাদি কতদিন? যতদিন না তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হয় — তাঁর নাম করতে করতে চক্ষের জল যতদিন না পড়ে, — আর শরীর রোমাঞ্চ যতদিন না হয়।

রামপ্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেখেছি,

আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।

"যখন ফল হয়, তখন ফুল ঝরে যায়; যখন ভক্তি হয়, যখন ঈশ্বরলাভ হয়, — তখন সন্ধ্যাদি কর্ম চলে যায়।

"গৃহস্থের বউর পেটে যখন সন্তান হয়, শাশুড়ী কাজ কমিয়ে দেয়। দশমাস হলে আর সংসারের কাজ করতে দেয় না। তারপর সন্তান প্রসব হলে সে কেবল ছেলেটিকে কোলে করে তার সেবা করে। কোন কাজই থাকে না। ঈশ্বরলাভ হলে সন্ধ্যাদি কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়।

“তুমি এরকম টিমে তেতালা বাজালে চলবে না। তীব্র বৈরাগ্য দরকার। ১৫ মাসে এক বৎসর করলে কি হয়? তোমার ভিতরে যেন জোর নাই। শক্তি নাই। চিড়ের ফলার। উঠে পড়ে লাগো। কোমর বাঁধো।

“তাই আমার ওই গানটা ভাল লাগে না! ‘হরিষে লাগি রহরে ভাই, তেরা বন্‌ত বন্‌ত বনি যাই।’ বন্‌ত বন্‌ত বনি যাই — আমার ভাল লাগে না। তীব্র বৈরাগ্য চাই। হাজরাকেও তাই আমি বলি।”

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগতত্ত্ব — কামিনী-কাঞ্চন যোগের বিঘ্ন]

“কেন তীব্র বৈরাগ্য হয় না জিজ্ঞাসা করছ? তার মানে আছে। ভিতরে বাসনা প্রবৃত্তি সব আছে। হাজরাকে তাই বলি। ও-দেশে মাঠে জল আনে, মাঠের চারিদিকে আল দেওয়া আছে, পাছে জল বেরিয়ে যায়। কাদার আল, কিন্তু আলের মাঝে মাঝে ঘোগ। গর্ত। প্রাণপণে তো জল আনছে, কিন্তু ঘোগ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। বাসনা ঘোগ। জপতপ করে বটে, কিন্তু পেছনে বাসনা - ঘোগ দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে।

“মাছ ধরে শট্‌কা কল দিয়ে। বাঁশ সোজা থাকবার কথা; তবে নোয়ানো রয়েছে কেন? মাছ ধরবে বলে। বাসনা মাছ তাই মন সংসারে নোয়ানো রয়েছে। বাসনা না থাকলে সহজে ঊর্ধ্বদৃষ্টি হয়। ঈশ্বরের দিকে।

“কিরকম জানো? নিক্তির কাঁটা যেমন। কামিনী - কাঞ্চনের ভার আছে বলে উপরের কাঁটা নিচের কাঁটা এক হয় না। তাই যোগভ্রষ্ট হয়। দীপশিখা দেখ নাই?

একটু হাওয়া লাগলেই চঞ্চল হয়। যোগাবস্থা দীপশিখার মতো — যেখানে হাওয়া নাই।

“মনটি পড়েছে ছড়িয়ে — কতক গেছে ঢাকা, কতক গেছে দিল্লী, কতক গেছে কুচবিহার। সেই মনকে কুড়ুতে হবে। কুড়িয়ে এক জায়গায় করতে হবে। তুমি যদি ষোল আনার কাপড় চাও, তাহলে কাপড়ওয়ালাকে ষোল আনা তো দিতে হবে। একটু বিঘ্ন থাকলে আর যোগ হবার জো নাই। টেলিগ্রাফের তারে যদি একটু ফুটো থাকে, তাহলে আর খবর যাবে না। ”

[ত্রৈলোক্য বিশ্বাসের জোর — নিষ্কামকর্ম কর — জোর করে বল “আমার মা”]

“তা সংসারে আছ, থাকলেই বা। কিন্তু কর্মফল সমস্ত ঈশ্বরকে সমর্পণ করতে হবে। নিজে কোন ফলকামনা করতে নাই।

“তবে একটা কথা আছে। ভক্তিকামনা কামনার মধ্যে নয়। ভক্তিকামনা, ভক্তিপ্রার্থনা — করতে পার।

“ভক্তির তমঃ আনবে। মার কাছে জোর কর। —

“মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে,
তখন শান্ত হবো ক্ষান্ত হয়ে আমায় যখন করবি কোলে।

“ত্রৈলোক্য বলেছিল, আমি যেকালে ওদের ঘরে জন্মেছি, তখন আমার হিস্যে আছে।

“তোমার যে আপনার মা, গো! এ কি পাতানো মা, এ কি ধর্ম মা! এতে জোর চলবে না তো কিসে জোর চলবে? বলো —

“আমি কি আটাশে ছেলে আমি ভয় করিনি চোখ রাঙ্গালে।
এবার করবো নালিস্ শ্রীনাথের আগে, ডিক্রি লব এক সওয়ালে।

“আপনার মা! জোর কর! যার যাতে সত্তা থাকে, তার তাতে টানও থাকে। মার সত্তা আমার ভিতর আছে বলে তাই তো মার দিকে অত টান হয়। যে ঠিক শৈব, সে শিবের সত্তা পায়। কিছু কণা তার ভিতর এসে পড়ে। যে ঠিক বৈষ্ণব তার নারায়ণের সত্তা ভিতরে আসে। আর এ সময় তো আর তোমার বিষয়কর্ম করতে হয় না। এখন দিন কতক তাঁর চিন্তা কর। দেখলে তো সংসারে কিছু নাই।”

ঠাকুর আবার সেই মধুর কণ্ঠে গাইতেছেন:

ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুলো না দক্ষিণাকালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে।।
দিন দুই-তিনের জন্য ভবে কর্তা বলে সবাই মানে,
সেই কর্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্তা এলে।।
যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে,
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে।।

[সালিসী, মোড়লী, হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারি করবার বাসনা — লোকমান্য, পাণ্ডিত্য, বাসনা — এ-সব আদিকাণ্ড — লালচুষি ত্যাগের পর তবে ঈশ্বরলাভ]

"আর তুমি সালিসী মোড়লী ও-সব কি কচ্ছো? লোকের ঝগড়া বিবাদ মিটাও — তোমাকে সালিসী ধরে, শুনতে পাই। ও তো অনেকদিন করে আসছো। যারা করবে তারা এখন করুক। তুমি এখন তাঁর পাদপদ্মে বেশি করে মন দেও । বলে 'লঙ্কায় রাবণ মলো বেহুলা কেঁদে আকুল হলো!'

"তা শম্ভুও বলেছিল। বলে হাসপাতাল ডিস্পেনসারি করব। লোকটা ভক্ত ছিল। তাই আমি বললুম, ভগবানের সাক্ষাৎকার হলে কি হাসপাতাল ডিস্পেনসারি চাইবে!

"কেশব সেন বললে, ঈশ্বরদর্শন কেন হয় না! তা বললুম যে, লোকমান্য, বিদ্যা, — এ-সব নিয়ে তুমি আছ কি না, তাই হয় না। ছেলে চুষি নিয়ে যতক্ষণ চোষে, ততক্ষণ মা আসে না। লালচুষি। খানিকক্ষণ পরে চুষি ফেলে যখন চিৎকার করে তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে আসে।

"তুমিও মোড়লী কোচ্চ। মা ভাবছে, ছেলে আমার মোড়ল হয়ে বেশ আছে। আছে তো থাক।"

ঈশান ইতিমধ্যে ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া বসিয়া আছেন। চরণ ধরিয়া বিনীতভাবে বলিতেছেন — আমি যে ইচ্ছা করে এ-সব করি তা নয়।

[বাসনার মূল মহামায়া — তাই কর্মকাণ্ড]

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা জানি। সে মায়েরই খেলা! এঁরই লীলা! সংসারে বদ্ধ করে রাখা সে মহামায়ার ইচ্ছা! কি জান? ‘ভবসাগরে উঠছে ডুবছে কতই তরী।’ আবার — ‘ঘুড়ি লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।’ লক্ষের মধ্যে দু-একজন মুক্ত হয়ে যায়। বাকী সবাই মার ইচ্ছায় বদ্ধ হয়ে আছে।

“চোর চোর খেলা দেখ নাই; বুড়ীর ইচ্ছা যে খেলাটা চলে। সবাই যদি বুড়ীকে ছুঁয়ে ফেলে, তাহলে আর খেলা চলে না। তাই বুড়ির ইচ্ছা নয় যে, সকলে ছোঁয়।

“আর দেখ, বড় বড় দোকানে চালের বড় বড় ঠেক থাকে। ঘরের চাল পর্যন্ত উঁচু। চাল থাকে — দালও থাকে। কিন্তু পাছে ইঁদুরে খায়, তাই দোকানদার কুলোয় করে খই মুড়কি রেখে দেয়। মিষ্ট লাগে আর সোঁধা গন্ধ — তাই যত ইঁদুর সেই কুলোতে গিয়ে পড়ে, বড় বড় ঠেকের সন্ধান পায় না! — জীব কামিনী-কাঞ্চনে মুগ্ধ হয়। ঈশ্বরের খবর পায় না।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১১ই অক্টোবর 1884/10/11/vi

35.11 শ্রীরামকৃষ্ণের সব কামনা ত্যাগ — কেবল ভক্তিকামনা

শ্রীরামকৃষ্ণ — নারদকে রাম বললেন, তুমি আমার কাছে কিছু বর নাও। নারদ বললেন, রাম! আমার আর কী বাকী আছে? কি বর লব? তবে যদি একান্ত বর দিবে, এই বর দাও যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি থাকে, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। রাম বললেন, নারদ! আর কিছু বর লও। নারদ আবার বললেন, রাম! আর কিছু আমি চাই না, যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধাভক্তি থাকে, এই করো!

“আমি মার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম; বলেছিলাম মা! আমি লোকমান্য চাই না মা, অষ্টসিদ্ধি চাই না মা, ও মা! শতসিদ্ধি চাই না মা, দেহসুখ চাই না মা, কেবল এই করো যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয় মা।

“অধ্যাত্মে আছে, লক্ষ্মণ রামকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাম! তুমি কত ভাবে কত রূপে থাক, কিরূপে তোমায় চিনতে পারব? রাম বললেন, ‘ভাই! একটা কথা জেনে রাখ, যেখানে উর্জ্জিতা (ঊর্জিতা) ভক্তি, সেখানে নিশ্চই আমি আছি।’ উর্জ্জিতা (ঊর্জিতা) ভক্তিতে হাসে কাঁদে নাচে গায়! যদি কারু এরূপ ভক্তি হয়, নিশ্চয় জেনো, ঈশ্বর সেখানে স্বয়ং বর্তমান। চৈতন্যদেবের ওইরূপ হয়েছিল।”

ভক্তেরা অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। দৈববাণীর ন্যায় এই সকল কথা শুনিতেছিলেন। কেহ ভাবিতেছেন, ঠাকুর বলিতেছেন, ‘প্রেমে হাসে কাঁদে নাচে গায়’; এ তো শুধু চৈতন্যদেবের অবস্থা নয়, ঠাকুরের তো এই অবস্থা। তবে কি এইখানে স্বয়ং ঈশ্বর সাক্ষাৎ বর্তমান?

ঠাকুরের অমৃতময়ী কথা চলিতেছে নিবৃত্তিমার্গের কথা। ঈশানকে যাহা মেঘগম্ভীরস্বরে বলিতেছেন — সেই কথা চলিতেছে।

[ঈশান খোসামুদে হতে সাবধান — শ্রীরামকৃষ্ণ ও জগতের উপকার]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি) — তুমি খোসামুদের কথায় ভুলো না। বিষয়ী লোক দেখলেই খোসামুদে এসে জুটে!

“মরা গরু একটা পেলে যত শকুনি এসে পড়ে।”

[সংসারীর শিক্ষা কর্মকাণ্ড — সর্বত্যাগীর শিক্ষা, কেবল ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা]

“বিষয়ী লোকগুলোর পদার্থ নাই। যেন গোবরের ঝোড়া! খোসামুদেরা এসে বলবে, আপনি দানী, জ্ঞানী, ধ্যানী। বলা তো নয় অমনি — বাঁশ! ও কি! কতকগুলো সংসারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিয়ে রাতদিন বসে থাকা, আর খোসামোদ শোনা!

“সংসারী লোকগুলো তিনজনের দাস, তাদের পদার্থ থাকে? মেগের দাস, টাকার দাস, মনিবের দাস। একজনের নাম করব না। আটশো টাকা মাইনে কিন্তু মেগের দাস, উঠতে বললে উঠে, বসতে বললে বসে!

“আর সালিসী, মোড়লী — এ-সব কাজ কি? দয়া, পরোপকার? — এ-সব তো অনেক হলো! ও-সব যারা করবে তাদের থাক্ আলাদা। তোমার ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন দিবার সময় হয়েছে। তাঁকে পেলে সব পাওয়া যায়। আগে তিনি,

তারপর দয়া, পরোপকার, জগতের উপকার, জীব উদ্ধার। তোমার ও ভাবনায় কাজ কি?

“লঙ্কায় রাবণ মলো বেহুলা কেঁদে আকুল হলো।

“তাই হয়েছে তোমার। একজন সর্বত্যাগী তোমায় বলে দেয়, এই এই করো তবে বেশ হয়। সংসারী লোকের পরামর্শে ঠিক হবে না। তা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতই হউন আর যিনিই হউন।

[ঈশান পাগল হও — “এ সমস্ত উপদেশ মা দিলেন”]

“পাগল হও, ঈশ্বরের প্রেমে পাগল হও। লোকে না হয় জানুক যে ঈশান এখন পাগল হয়েছে আর পারে না। তাহলে তারা সালসী মোড়লী করাতে আর তোমার কাছে আসবে না। কোশাকুশি ছুঁড়ে ফেলে দাও, ঈশান নাম সার্থক কর।

ঈশান — দে মা, পাগল করে। আর কাজ নাই মা জ্ঞানবিচারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — পাগল না ঠিক? শিবনাথ বলেছিল, বেশি ঈশ্বরচিন্তা কল্লে বেহেড হয়ে যায়। আমি বললুম, কি? — চৈতন্যকে চিন্তা করে কি কেউ অচৈতন্য হয়ে যায়? তিনি নিত্যশুদ্ধবোধরূপ। যাঁর বোধে সব বোধ কচ্ছে যাঁর চৈতন্যে সব চৈতন্যময়! বলে নাকি কে সাহেবদের হয়েছিল — বেশি চিন্তা করে বেহেড হয়ে গিয়েছিল। তা হতে পারে। তারা ঐহিক পদার্থ চিন্তা করে। ‘ভাবেতে ভরল তনু, হরল গেয়ান!’ এতে যে জ্ঞানের (গেয়ানের) কথা আছে, সে জ্ঞান মানে বাহ্যজ্ঞান।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করিয়া ঈশান বসিয়া আছেন ও সমস্ত কথা শুনিতেছেন। তিনি এক-একবার মন্দিরমধ্যবর্তী পাষাণময়ী কালীপ্রতিমার দিকে চাহিতেছিলেন। দীপালোকে মার মুখ হাসিতেছে, যেন দেবী আবির্ভূতা হইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বেদমন্ত্রতুল্য বাক্যগুলি শুনিয়া আনন্দ করিতেছেন।

ঈশান (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — যে-সব কথা আপনি শ্রীমুখে বললেন, ও সব কথা ওইখান থেকে এসেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— আমি যন্ত্র, উনি যন্ত্রী; — আমি ঘর, উনি ঘরণী; — আমি রথ, উনি রথী; উনি যেমন চালান, তেমনি চলি; যেমন বলান, তেমন বলি।

“কলিযুগে অন্যপ্রকার দৈববাণী হয় না। তবে আছে, বালক কি পাগল, এদের মুখ দিয়ে তিনি কথা কন।

“মানুষ গুরু হতে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে। মহাপাতক, অনেকদিনের পাতক, অনেকদিনের অজ্ঞান, তাঁর কৃপা হলে একক্ষণে পালিয়ে যায়।

“হাজার বছরের অন্ধকার ঘরের ভিতর যদি হঠাৎ আলো আসে, তাহলে সেই হাজার বছরের অন্ধকার কি একটু একটু করে যায়, না একক্ষণে যায়? অবশ্য আলো দেখালেই সমস্ত অন্ধকার পালিয়ে যায়।

“মানুষ কি করবে। মানুষ অনেক কথা বলে দিতে পারে, কিন্তু শেষে সব ঈশ্বরের হাত। উকিল বলে, আমি যা বলবার সব বলেছি, এখন হাকিমের হাত।

“ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। তিনি যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় — এই সকল কাজ করেন, তখন তাঁকে আদ্যাশক্তি বলে। সেই আদ্যাশক্তিকে প্রসন্ন করতে হয়। চণ্ডীতে আছে জান না? দেবতারা আগে আদ্যাশক্তির স্তব কল্লেন। তিনি প্রসন্ন হলে তবে হরির যোগনিদ্রা ভাঙবে।”

ঈশান — আজ্ঞা, মধুকৈটভ বধের সময় ব্রহ্মাদি দেবতারা স্তব করছেন —

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারঃ স্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা।।
অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবজননী পরা।।
ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা।।
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে।।১

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ ওইটি ধারণা।

১ তুমি হোম, শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞে প্রযুজ্য স্বাহা, স্বধা ও বষট্‌কাররূপে মন্ত্রস্বরূপা এবং দেবভক্ষ্য সুধাও তুমি। হে নিত্যে! তুমি অক্ষর সমুদায়ে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত এই তিন প্রকার মাত্রাস্বরূপ হইয়া অবস্থান করিতেছ এবং যাহা বিশেষরূপে অনুচার্য ও অর্দ্ধমাত্রারূপে অবস্থিত, তাহাও তুমি। তুমিই সেই (বেদ সারভূতা) সাবিত্রী; হে দেবি! তুমিই আদি জননী। তোমা কর্তৃকই সমস্ত জগৎ ধৃত এবং তোমা

কর্তৃকই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তোমা কর্তৃকই এই জগৎ পালিত হইতেছে এবং তুমিই অন্তে ইহা ভক্ষণ (ধ্বংস) করিয়া থাক। হে জগদ্রূপে! তুমিই এই জগতের নানাপ্রকার নির্মাণকার্যে সৃষ্টিরূপা ও পালনকার্যে স্থিতিরূপা এবং অন্তে ইহার সংহার কার্যে তদ্রূপ সংহাররূপা।

[মার্কণ্ডেয় চন্ডী, ১।৭২ — ৭৬]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১১ই অক্টোবর 1884/10/11/vii

35.12 শ্রীরামকৃষ্ণ ও কর্মকাণ্ড — কর্মকাণ্ড কঠিন তাই ভক্তিযোগ

কালীমন্দিরের সম্মুখে ভক্তেরা শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘেরিয়া চতুর্দিকে বসিয়া আছেন। এতক্ষণ অবাক্ হইয়া শ্রীমুখের বাণী শুনিতেছিলেন।

এইবার ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। মন্দিরের সম্মুখে চাতালে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া মাকে প্রণাম করিলেন। ভক্তেরা সকলে তাঁহার কাছে সত্বর আসিয়া তাঁহার পাদমূলে ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। সকলেই চরণধূলির ভিখারী। সকলে চরণবন্দনা করিলে পর, ঠাকুর চাতাল হইতে নামিতেছেন ও মাস্টারের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে নিজের ঘরের দিকে আসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গীত গাহিতে গাহিতে মাস্টারের প্রতি) —

“প্রসাদ বলে ভুক্তি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেখেছি।
আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম, ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি!

“ধর্মাধর্ম কি জানো? এখানে ‘ধর্ম’ মানে বৈধীধর্ম। যেমন দান করতে হবে, শ্রাদ্ধ, কাঙালীভোজন —— এই সব।

“এই ধর্মকেই বলে কর্মকাণ্ড। এ-পথ বড় কঠিন। নিষ্কামকর্ম করা বড় কঠিন! তাই ভক্তিপথ আশ্রয় করতে বলেছে।

“একজন বাড়িতে শ্রাদ্ধ করেছিল। অনেক লোকজন খাচ্ছিল। একটা কসাই গরু নিয়ে যাচ্ছে, কাটবে বলে। গরু বাগ মানছিল না —— কসাই হাঁপিয়ে পড়েছিল। তখন সে ভাবলে শ্রাদ্ধবাড়ি গিয়ে খাই। খেয়ে গায়ে জোর করি, তারপর গরুটাকে নিয়ে যাব। শেষে তাই কল্লে, কিন্তু যখন সে গরু কাটলে তখন যে শ্রাদ্ধ করেছিল, তারও গো-হত্যার পাপ হল।

“তাই বলছি, কর্মকাণ্ডের চেয়ে ভক্তিপথ ভাল।”

ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিতেছেন, সঙ্গে মাস্টার। ঠাকুর গুনগুন করিয়া গাহিতেছেন। নিবৃত্তিমার্গের বিষয় যা বললেন, তারই ফুট উঠছে। ঠাকুর গুনগুন করে বলছেন —— “অবশেষে রাখ গো মা, হাড়ের মালা সিদ্ধি ঘোটা।”

ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিলেন। অধর, কিশোরী ও অন্যান্য ভক্তেরা আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — ঈশানকে দেখলুম —— কই, কিছুই হয় নাই! বল কি? পুরশ্চরণ পাঁচমাস করেছে! অন্য লোকে এক কাণ্ড করত।

অধর —— আমাদের সম্মুখে ওঁকে অত কথা বলা ভাল হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— সে কি! ও জাপক লোক, ওর ওতে কি?

কিয়ৎক্ষণ কথার পর ঠাকুর অধরকে বলিতেছেন, ঈশান খুব দানী। আর দেখ, জপতপ খুব করে।

ঠাকুর কিছুকাল চুপ করিয়া আছেন। ভক্তেরা মেঝেতে বসিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন।

হঠাৎ ঠাকুর অধরকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন ——আপনাদের যোগ ও ভোগ দুই-ই আছে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৮ই অক্টোবর 1884/10/18/i

35.13 শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কালীপূজা মহানিশায় ভক্তসঙ্গে

[মাস্টার, বাবুরাম, গোপাল, হরিপদ, নিরঞ্জনের আত্মীয়, রামলাল, হাজরা]

আজ ৺কালীপূজা, ১৮ই অক্টোবর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, শনিবার (৩রা কার্তিক, অমাবস্যা)। রাত দশটা-এগারটার সময় ৺কালীপূজা আরম্ভ হইবে। কয়েকজন ভক্ত এই গভীর অমাবস্যা নিশিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিবেন, তাই ত্বরা করিয়া আসিতেছেন।

মাস্টার রাত্রি আন্দাজ আটটার সময় একাকী আসিয়া পোঁছিলেন। বাগানে আসিয়া দেখিলেন, কালীমন্দিরে মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। উদ্যানমধ্যে মাঝে মাঝে দীপ —— দেবমন্দির আলোকে সুশোভিত হইয়াছে। মাঝে মাঝে রোশনচৌকি বাজিতেছে, কর্মচারীরা দ্রুতপদে মন্দিরের এ-স্থান হইতে ও-স্থানে যাতায়াত করিতেছেন। আজ রাসমণির কালীবাড়িতে ঘটা হইবে, দক্ষিণেশ্বরের গ্রামবাসীরা শুনিয়াছেন, আবার শেষরাত্রে যাত্রা হইবে। গ্রাম হইতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বহুসংখ্যক লোক ঠাকুরদর্শন করিতে সর্বদা আসিতেছে।

বৈকালে চণ্ডীর গান হইতেছিল —— রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে গান শুনিয়াছেন। আজ আবার জগতের মার পূজা হইবে। ঠাকুর আনন্দে বিভোর হইয়াছেন।

রাত্রি আটটার সময় পোঁছিয়া মাস্টার দেখিতেছেন, ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন, তাঁহাকে সম্মুখে করিয়া মেঝের উপর কয়েকটি ভক্ত বসিয়া আছেন —— বাবুরাম, ছোট গোপাল, হরিপদ, কিশোরী, নিরঞ্জনের একটি আত্মীয় ছোকরা

ও এঁড়েদার আর একটি ছেলে। রামলাল ও হাজরা মাঝে মাঝে আসিতেছেন ও যাইতেছেন।

নিরঞ্জনের আত্মীয় ছোকরাটি ঠাকুরের সম্মুখে ধ্যান করিতেছেন, — ঠাকুর তাঁহাকে ধ্যান করিতে বলিয়াছেন —

মাস্টার প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নিরঞ্জনের আত্মীয় প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। এঁড়েদার দ্বিতীয় ছেলেটিও প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন — ওই সঙ্গে যাবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নিরঞ্জনের আত্মীয়ের প্রতি) — তুমি কবে আসবে?

ভক্ত — আজ্ঞা, সোমবার — বোধ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (আগ্রহের সহিত) — লণ্ঠন চাই, সঙ্গে নিয়ে যাবে?

ভক্ত — আজ্ঞা না, এই বাগানের পাশে; — আর দরকার নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (এঁড়েদার ছোকরাটির প্রতি) — তুইও চললি?

ছোকরা — আজ্ঞা, সর্দি —

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, বরং মাথায় কাপড় দিয়ে যেও।

ছেলে দুটি আবার প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চর্তুদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৮ই অক্টোবর 1884/10/18/ii

35.14 দক্ষিণেশ্বরে ৺কালীপূজা মহানিশায় শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনানন্দে

গভীর অমাবশ্যা নিশি। আবার জগতের মার পূজা। শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে বালিশে হেলান দিয়া আছেন। কিন্তু অন্তর্মুখ, মাঝে মাঝে ভক্তদের সঙ্গে একটি-দুইটি কথা কহিতেছেন।

হঠাৎ মাস্টার ও ভক্তদের প্রতি তাকাইয়া বলিতেছেন, আহা, ছেলেটির কি ধ্যান! (হরিপদের প্রতি) — কেমন রে? কি ধ্যান!

হরিপদ —— আজ্ঞা হাঁ, ঠিক কাষ্ঠের মতো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কিশোরীর প্রতি) — ও ছেলেটিকে জান? নিরঞ্জনের কিরকম ভাই হয়।

আবার সকলেই নিঃস্তব্ধ। হরিপদ ঠাকুরের পদসেবা করিতেছেন।

ঠাকুর বৈকালে চণ্ডীর গান শুনিয়াছেন। গানের ফুট উঠিতেছে। আস্তে আস্তে গাইতেছেন:

কে জানে কালী কেমন, ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন।।

মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।

কালী পদ্মবনে হংসসনে হংসীরূপে করে রমণ।।

আত্মারামের আত্মাকালী, প্রমাণ প্রণবের মতন।

তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।।

মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন।

মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম অন্য কেবা জানে তেমন।।

প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধু তরণ।

আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন।।

ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন। আজ মায়ের পূজা — মায়ের নাম করিবেন! আবার উৎসাহের সহিত গাইতেছেন:

এ সব ক্ষেপা মায়ের খেলা

(যার মায়ার ত্রিভুবন বিভোলা) (মাগীর আপ্তভাবে গুপ্তলীলা)

সে যে আপনি ক্ষেপা, কর্তা ক্ষেপা, ক্ষেপা দুটো চেলা।।

কি রূপ কি গুণ ভঙ্গী, কি ভাব কিছুই যায় না বলা।

যার নাম জপিয়ে কপাল পোড়ে কণ্ঠে বিষের জ্বালা।।

সগুণে নির্গুণে বাঁধিয়ে বিবাদ, ঢ্যালা দিয়ে ভাঙছে ঢ্যালা।

মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজী নারাজ কেবল কাজের বেলা।।

প্রসাদ বলে থাকো বসে ভবর্ণবে ভাসিয়ে ভেলা।

যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাবে, ভাঁটিয়ে যাবে ভাঁটার বেলা।।

ঠাকুর গান করিতে করিতে মাতোয়ারা হইয়াছেন। বলিলেন, এ-সব মাতালের ভাবে গান। বলিয়া গাইতেছেন:

(১) - এবার কালী তোমায় খাব।

(২) - তাই তোমাকে সুধাই কালী।

(৩) - সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী।

তুমি আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি দাও মা করতালি।।

আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা শশীভালী।

ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি।।

সবে রাত্রে তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার তন্ত্রে চলি।

যেমন রাখ তেমনি থাকি মা, যেমন বলাও তেমনি বলি।।

অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে গালাগালি।

এবার সর্বনাশী ধরে অসি, ধর্মাধর্ম দুটো খেলি।।

(৪) - জয় কালী জয় কালী বলে যদি আমার প্রাণ যায়।

শিবত্ব হইব প্রাপ্ত, কাজ কি বারাণসী তায়।।

অনন্তরূপিণী কালী, কালীর অন্ত কেবা পায়?

কিঞ্চিৎ মাহাত্ম জেনে শিব পড়েছেন রাঙা পায়।।

গান সমাপ্ত হইল এমন সময়ে রাজনারায়ণের ছেলে দুটি আসিয়া প্রণাম করিল। নাটমন্দিরে বৈকালে রাজনারায়ণ চন্ডীর গান গাইয়াছিলেন, ছেলে দুটিও সঙ্গে সঙ্গে গাইয়াছিল। ঠাকুর ছেলে দুটির আঙ্গে আবার গাইতেছেন: 'এ সব ক্ষেপা মেয়ের খেলা'।

ছোট ছেলেটি ঠাকুরকে বলিতেছেন, — ওই গানটি একবার যদি —

'পরম দয়াল হে প্রভু' —

ঠাকুর বলিলেন, "গৌর নিতাই তোমরা দুভাই?" — এই বলিয়া গানটি গাইতেছেন:

গৌর নিতাই তোমরা দুভাই পরম দয়াল হে প্রভু।

গান সমাপ্ত হইল। রামলালের ঘরে আসিয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, 'একটু গা, আজ পূজা।' রামলাল গাইতেছেন:

(১) - সমর আলো করে কার কামিনী!
সজল জলদ জিনিয়া কায়, দশনে প্রকাশে দামিনী।।
এলায়ে চাঁচর চিকুর পাশ, সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস
অট্টহাসে দানব নাশে, রণ প্রকাশে রঙ্গিণী।।
কিবা শোভা করে শ্রমজ বিন্দু, ঘনতনু ঘেরি কুমুদবন্ধু,
অমিয় সিন্ধু হেরিয়ে ইন্দু, মলিন এ কোন মোহিনী।।
এ কি অসম্ভব ভব পরাভব, পদতলে শবসদৃশ নীরব,

কমলাকান্ত কর অনুভব, কে বটে ও গজগামিনী।।

(২) - কে রণে নাচিছে বামা নীরদবরণী।

ঠাকুর প্রেমানন্দে নাচিতেছেন। নাচিতে নাচিতে গান ধরিলেন:

মজলো আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে!

গান ও নৃত্য সমাপ্ত হইল। ভক্তেরা আবার সকলে মেঝেতে বসিয়াছেন। ঠাকুরও ছোট খাটটিতে বসিলেন।

মাস্টারকে বলিতেছেন, তুমি এলে না, চণ্ডীর গান কেমন হলো।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৮ই অক্টোবর 1884/10/18/iii

35.15 কালীপূজা রাত্রে সমাধিস্থ — সাঙ্গোপাঙ্গ সম্বন্ধে দৈববাণী

ভক্তেরা কেহ কেহ কালীমন্দিরে ঠাকুর দর্শন করিতে গমন করিলেন। কেহ বা দর্শন করিয়া একাকী গঙ্গাতীরে বাঁধাঘাটের উপর বসিয়া নির্জনে নিঃশব্দে নামজপ করিতেছেন। রাত্রি প্রায় ১১টা। মহানিশা। জোয়ার সবে আসিয়াছে —

ভাগীরথী উত্তরবাহিনী। তীরস্থ দীপালোকে এক-একবার কালো জল দেখা যাইতেছে।

রামলাল পূজাপদ্ধতি নামক পুঁথি হস্তে মায়ের মন্দিরে একবার আসিলেন। পুঁথিখানি মন্দিরমধ্যে রাখিয়া দিবেন। মণি মাকে সতৃষ্ণ নয়নে দর্শন করিতেছেন দেখিয়া রামলাল বলিলেন, ভিতরে আসবেন কি? মণি অনুগৃহীত হইয়া প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, মা বেশ সাজিয়াছেন। ঘর আলোকাকীর্ণ। মার সম্মুখে দুই সেজ; উপরে ঝাড় ঝুলিতেছে। মন্দিরতল নৈবেদ্যে পরিপূর্ণ। মার পাদপদ্মে জবাবিল্ব। নানাবিধ পুষ্প মালায় বেশকারী মাকে সাজাইয়াছেন। মণি দেখিলেন, সম্মুখে চামর ঝুলিতেছে। হঠাৎ মনে পড়িল, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই চামর লইয়া ঠাকুরকে কত ব্যজন করেন। তখন তিনি সঙ্কুচিতভাবে রামলালকে বলিতেছেন, “এই চামরটি একবার নিতে পারি?”

রামলাল অনুমতি প্রদান করিলেন; তিনি মাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। তখনও পূজা আরম্ভ হয় নাই।

যে সকল ভক্তেরা বাহিরে গিয়াছিলেন, তাঁহারা আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে আসিয়া মিলিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বেণী পাল নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আগামীকল্য সিঁথি ব্রাহ্মসমাজে যাইতে হইবে। ঠাকুরের নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণ পত্রে কিন্তু তারিখ ভুল হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — বেণী পাল নিমন্ত্রণ করেছে। তবে এরকম লিখলে কেন বল দেখি?

মাস্টার — আজ্ঞে, লেখাটি ঠিক হয় নাই। তবে অত ভেবে-চিন্তে লেখেন নাই।

ঘরের মধ্যে ঠাকুর দাঁড়াইয়া, বাবুরাম কাছে দাঁড়াইয়া। ঠাকুর বেণী পালের চিঠির কথা কহিতেছেন। বাবুরামকে স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হঠাৎ সমাধিস্থ!

ভক্তেরা সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই সমাধিস্থ মহাপুরুষকে অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। ঠাকুর সমাধিস্থ; বাম পা বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছেন — গ্রীবাদেশ ঈষৎ আকুঞ্চিত। বাবুরামের গ্রীবার পশ্চাদ্দেশে কানের কাছে হাতটি রহিয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে সমাধিভঙ্গ হইল। তখনও দাঁড়াইয়া। এইবার গালে হাত দিয়া যেন কত চিন্তিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

ঈষৎ হাস্য করিয়া এইবার ভক্তদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন —

শ্রীরামকৃষ্ণ — সব দেখলুম — কার কত দূর এগিয়েছে। রাখাল, ইনি (মণি), সুরেন্দ্র, বাবুরাম, অনেককে দেখলুম।

হাজরা — এখানকার?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ।

হাজরা — বেশি কি বন্ধন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — না।

হাজরা — নরেন্দ্রকে দেখলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখি নাই, কিন্তু এখনও বলতে পারি — একটু জড়িয়ে পড়েছে; কিন্তু সব্বায়ের হয়ে যাবে দেখলুম।

(মণির দিকে তাকাইয়া) — সব দেখলুম ঘুপটি মেরে রয়েছে!

ভক্তেরা অবাক্, দৈববাণীর ন্যায় অদ্ভুত সংবাদ শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিন্তু একে (বাবুরামকে) ছুঁয়ে ওরূপ হল!

হাজরা — ফার্স্ট (First) কে?

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চুপ করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতেছেন, "নিত্যগোপালের মতো গোটাকতক হয়!"

আবার চিন্তা করিতেছেন। এখনও সেইভাবে দাঁড়াইয়া আছেন।

আবার বলিতেছেন — "অধর সেন — যদি কর্মকাজ কমে, — কিন্তু ভয় হয় — সাহেব আবার বকবে। যদি বলে, এ ক্যা হ্যায়!" (সকলের ঈষৎ হাস্য)

ঠাকুর আবার নিজাসনে গিয়া বসিলেন। ভক্তেরা মেঝেতে বসিলেন। বাবুরাম ও কিশোরী তাড়াতাড়ি করিয়া ছোট খাটটিতে ঠাকুরের পাদমূলে বসিয়া একে একে পদসেবা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কিশোরীর দিকে তাকাইয়া) — আজ যে খুব সেবা!

রামলাল আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন; ও আতিশয় ভক্তিভাবে পদধূলি গ্রহণ করিলেন। মায়ের পূজা করিতে যাইতেছেন।

রামলাল (ঠাকুরের প্রতি) — তবে আমি আসি।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— ওঁ কালী, ওঁ কালী। সাবধানে পূজা করো। আবার মেড়া বলি দিতে হবে।

মহানিশা। পূজা আরম্ভ হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা দেখিতে আসিয়াছেন। মার কাছে গিয়া দর্শন করিতেছেন। এইবার বলি হইবে —— লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে। বধ্য পশুর উৎসর্গ হইল। পশুকে বলিদানের জন্য লইয়া যাইবার উদ্যোগ হইতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির ত্যাগ করিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

ঠাকুরের সে অবস্থা নয়, পশুবধ দেখিতে পারিবেন না।

রাত দুইটা পর্যন্ত কোন কোন ভক্ত মা-কালীর মন্দিরে বসিয়াছিলেন। হরিপদ কালীঘরে আসিয়া বলিলেন, চলুন, তিনি ডাকছেন, খাবার সব প্রস্তুত। ভক্তেরা ঠাকুরের প্রসাদ পাইলেন ও যে যেখানে পাইলেন, একটু শুইয়া পড়িলেন।

ভোর হইল; মার মঙ্গল আরতি হইয়া গিয়াছে। মার সম্মুখে নাটমন্দির। নাটমন্দিরে যাত্রা হইতেছে, মা যাত্রা শুনিতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালীবাড়ির বৃহৎ পাকা

উঠান দিয়া যাত্রা শুনিতে আসিতেছেন। মণি সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন — ঠাকুরের কাছে বিদায় লইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেন তুমি এখন যাবে?

মণি — আজ আপনি সিঁথিতে বৈকালে যাবেন, আমারও ইচ্ছা আছে, তাই বাড়িতে একবার যাচ্ছি।

কথা কহিতে কহিতে মা-কালীর মন্দিরের কাছে আসিয়া উপস্থিত। অদূরে নাটমন্দির, যাত্রা হইতেছে। মণি সোপানমূলে ভূমিষ্ঠ হইয়া চরণ বন্দনা করিতেছেন।

ঠাকুর বলিলেন, "আচ্ছা এসো। আর দুখানা আটপৌরে নাইবার কাপড় আমার জন্য এনো।"

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c36 ৩৬ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সিঁথির ব্রাহ্মসমাজে ও বড়বাজারের মারোয়াড়ী ভক্তমন্দিরে গমন

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৯শে অক্টোবর 1884/10/19/i

36.1 সিঁথির ব্রাহ্মসমাজ পুনর্বার দর্শন ও বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তদিগকে উপদেশ ও তাঁহাদের সহিত আনন্দ

[শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিমন্দিরে]

আবার ব্রাহ্মভক্তেরা মিলিত হইলেন। কালীপূজার পর দিন, কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথি, ১৯শে অক্টোবর, ১৮৮৪ (৪ঠা কার্তিক রবিবার)। এবার শরতের মহোৎসব। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের মনোহর উদ্যানবাটীতে আবার ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইল। প্রাতঃকালের উপাসনাদি হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বেলা সাড়ে চারিটায় আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার গাড়ি বাগানের মধ্যে দাঁড়াইল। অমনি দলে দলে ভক্ত মণ্ডলাকারে তাঁহাকে ঘেরিতে লাগিলেন। প্রথম প্রকোষ্ঠ মধ্যে সমাজের বেদী রচনা হইয়াছে। সম্মুখে দালান। সেই দালানে ঠাকুর উপবেশন করিলেন। অমনি ভক্তগণ চারিধারে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। বিজয়, ত্রৈলোক্য ও অনেকগুলি ব্রাহ্মভাক্ত উপস্থিত। তন্মধ্যে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত একজন সদরওয়ালাও (সাব-জজ) আছেন।

সমাজগৃহ মহোৎসব উপলক্ষে বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে। কোথাও নানা বর্ণের পতাকা; মধ্যে মধ্যে হর্ম্যোপরি বা বাতায়নপথে ময়নরঞ্জন, সুন্দর পাদপ-বিভ্রমকারী বৃক্ষপল্লব। সম্মুখে পূর্বপরিচিত সেই সরোবরের স্বচ্ছসলিল মধ্যে শরতের সুনীল নভোমণ্ডল প্রতিভাসিত হইতেছে। উদ্যানস্থিত রাঙ্গা রাঙ্গা পথগুলির দুই পার্শ্বে সেই পূর্বপরিচিত ফল পুষ্পের বৃক্ষশ্রেণী। আজ ঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত সেই বেদধ্বনি ভক্তেরা আবার শুনিতে পাইবেন — যে ধ্বনি আর্যঋষিদের মুখ হইতে বেদাকারে এককালে বহির্গত হইয়াছিল — যে ধ্বনি আর-একবার নবরূপধারী পরমসন্ন্যাসী, ব্রহ্মগতপ্রাণ, জীবের দুঃখে কাতর, ভক্তবৎসল, ভক্তাবতার হরিপ্রেমবিহ্বল, ঈশার মুখে তাঁহার দ্বাদশ শিষ্য সেই নিরক্ষর মৎসজীবিগণ শুনিয়াছিলেন, যে ধ্বনি পুণ্যক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকারে এককালে বহির্গত হইয়াছিল — সারথিবিশেশধারী মানবাকার সচ্চিদানন্দগুরু প্রমুখাৎ যে মেঘগম্ভীরধ্বনিমধ্যে বিনয়নম্র ব্যাকুল "গুড়াকেশ কৌন্তেয়" এই কথামৃত পান করিয়াছিলেন যথা —

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুসমরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।।
প্রয়াণকালে মনসাচলেন, ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্, স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।।
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি, বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি, তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে।।১

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আসন গ্রহণ করিয়া সমাজের সুন্দররচিত বেদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই অমনি নতশির হইয়া প্রণাম করিলেন। বেদী হইতে শ্রীভগবানের কথা হয়

— তাই তিনি দেখিতেছেন যে, বেদীক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র। দেখিতেছেন এখানে অচ্যুতের কথা হয়, তাই সর্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে। আদালতগৃহ দেখিলে যেমন মোকদ্দমা মনে পড়ে ও জজ মনে পড়ে, সেইরূপ এই হরিকথার স্থান দেখিয়া তাঁহার ভগবানের উদ্দীপন হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য গান গাহিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, হ্যাঁগা, ওই গানটি তোমার বেশ "দে মা পাগল করে", ওইটি গাও না।

তিনি গাহিতেছেন:

আমায় দে মা পাগল করে (ব্রহ্মময়ী)।

গান শুনিতে শুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল। একেবারে সমাধিস্থ — 'উপেক্ষিয়া মহত্তত্ত্ব, ত্যজি চতুর্বিংশ তত্ত্ব, সর্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব দেখি আপনি আপনে।' কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি অহংকার সমস্তই যেন পুঁছিয়া গিয়াছে। দেহমাত্র চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বিদ্যমান। একদিন ভগবান পাণ্ডবনাথের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া যুধিষ্ঠির প্রমুখ শ্রীকৃষ্ণগতান্তরাত্মা পাণ্ডবগণ কাঁদিয়াছিলেন। তখন আর্যকুলগৌরব ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত থাকিয়া অন্তিমকালে ভগবানের ধ্যাননিরত ছিলেন। তখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সবে সমাপ্ত হইয়াছে। সহজেই কাঁদিবার দিন। শ্রীকৃষ্ণের এই সমাধিপ্রাপ্ত অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া পাণ্ডবেরা কাঁদিয়াছিলেন; ভাবিয়াছিলেন, তিনি বুঝি দেহত্যাগ করিলেন।

১ গীতা, ৮।৯, ১০, ১১

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৯শে অক্টোবর 1884/10/19/ii

36.2 হরিকথা প্রসঙ্গে — ব্রাহ্মসমাজে নিরাকারবাদ

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবাবস্থায় ব্রাহ্মভক্তদের উপদেশ দিতেছেন। এই ঈশ্বরীয় ভাব খুব ঘণীভূত; যেন বক্তা মাতাল হইয়া কি বলিতেছেন। ভাব ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছে, অবশেষে পূর্বের ঠিক সহজাবস্থা।

[“আমি সিদ্ধি খাব” — গীতা ও অষ্টসিদ্ধি — ঈশ্বরলাভ কি?]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ) — মা, কারণানন্দ চাই না। সিদ্ধি খাব।

“সিদ্ধি কিনা বস্তুলাভ। ‘অষ্টসিদ্ধি’র সিদ্ধি নয়। সে (অণিমা লঘিমাদি) সিদ্ধির কথা কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, ‘ভাই, দেখ যদি দেখ যে, অষ্টসিদ্ধির একটি সিদ্ধি কারও আছে, তাহলে জেনো যে, সে ব্যক্তি আমাকে পাবে না। কেননা, সিদ্ধি থাকলেই অহংকার থাকবে, আর অহংকারের লেশ থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

“আর-এক আছে প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ, সিদ্ধের সিদ্ধ। যে ব্যক্তি সবে ঈশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছে, সে প্রবর্তকের থাক। প্রবর্তক ফোঁটা কাটে, তিলক মালা পরে, বাহিরে খুব আচার করে। সাধক আরও এগিয়ে গেছে; তার লোক-দেখানো ভাব কমে যায়। সাধক ঈশ্বরকে পাবার জন্য ব্যকুল হয়, আন্তরিক তাঁকে ডাকে, তাঁর নাম করে, তাঁকে সরল অন্তঃকরণে প্রার্থনা করে। সিদ্ধ কে? যার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয়েছে যে ঈশ্বর আছেন, আর তিনিই সব করছেন; যিনি ঈশ্বরকে দর্শন করেছেন। ‘সিদ্ধের সিদ্ধ’ কে? যিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছেন! শুধু দর্শন নয়, কেউ পিতৃভাবে, কেউ বাৎসল্যভাবে, কেউ সখ্যভাবে, কেউ মধুরভাবে — তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছেন।

“কাঠে আগুন নিশ্চিত আছে, এই বিশ্বাস; আর কাঠ থেকে আগুন বার করে ভাত রেঁধে, খেয়ে শান্তি আর তৃপ্তি লাভ করা; দুটি ভিন্ন জিনিস।

“ঈশ্বরীয় অবস্থার ইতি করা যায় না। তারে বাড়া তারে বাড়া আছে।”

[বিষয়ীর ঈশ্বর — ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরলাভ — দৃঢ় হও]

(ভাবস্থ) — “এরা ব্রহ্মজ্ঞানী, নিরাকারবাদী। তা বেশ।

(ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি) — “একটাতে দৃঢ় হও, হয় সাকারে নয় নিরাকারে। তবে ঈশ্বরলাভ হয়, নচেৎ হয় না। দৃঢ় হলে সাকারবাদীও ঈশ্বরলাভ করবে, নিরাকারবাদীও করবে। মিছরির রুটি সিধে করে খাও, আর আড় করে খাও, মিষ্ট লাগবে। (সকলের হাস্য)

“কিন্তু দৃঢ় হতে হবে; ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হবে। বিষয়ীর ঈশ্বর কিরূপ জানো? যেমন খুড়ী-জেঠীর কোঁদল শুনে ছেলেরা খেলা করবার সময় পরস্পর বলে, ‘আমার ঈশ্বরের দিব্য।’ আর যেমন কোন ফিটবাবু, পান চিবুতে চিবুতে হাতে স্টিক ধরে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটি ফুল তুলে বন্ধুকে বলে, — ঈশ্বর কি বিউটিফুল ফুল করেছেন। কিন্তু এই বিষয়ীর ভাব ক্ষণিক, যেন তপ্ত লোহার উপর জলের ছিটে।

“একটার উপর দৃঢ় হতে হবে। ডুব দাও। না দিলে সমুদ্রের ভিতর রত্ন পাওয়া যায় না। জলের উপর কেবল বাসলে পাওয়া যায় না।”

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, যে-গানে কেশবাদি ভক্তদের মন মুগ্ধ করিতেন, সেই গান — সেই মধুর কণ্ঠে — গাইতেছেন; সকলের বোধ হইতেছে, যেন স্বর্গধামে বা বৈকুণ্ঠে বসিয়া আছেন:

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন ।।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৯শে অক্টোবর 1884/10/19/iii

36.3 ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে — ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বর্ণনা

শ্রীরামকৃষ্ণ — ডুব দাও। ঈশ্বরকে ভালবাসতে শেখ। তাঁর প্রেমে মগ্ন হও। দেখ, তোমাদের উপাসনা শুনেছি। কিন্তু তোমাদের ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য অত বর্ণনা কর কেন? "হে ঈশ্বর, তুমি আকাশ করিয়াছ; বড় বড় সমুদ্র করিয়াছ, চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, নক্ষত্রলোক, সব করিয়াছ" — এ-সব কথায় আমাদের অত কাজ কি?

"সব লোক বাবুর বাগান দেখে অবাক্ — কেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন ঝিল। কেমন বৈঠকখানা, কেমন তার ভিতর ছবি — এই সব দেখেই অবাক্। কিন্তু কই, বাগানের মালিক যে বাবু তাঁকে খোঁজে ক'জন? বাবুকে খোঁজে দু-একজনা। ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজলে তাঁকে দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়; যেমন, আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কচ্ছি। সত্য বলছি দর্শন হয়!

"এ-কথা কারেই বা বলছি — কে বা বিশ্বাস করে।"

[শাস্ত্র না প্রত্যক্ষ — The Law of Revelation]

"শাস্ত্রের ভিতর কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? শাস্ত্র পড়ে হদ্দ অস্তিমাত্র বোধ হয়। কিন্তু নিজে ডুব না দিলে ঈশ্বর দেখা দেন না। ডুব দেবার পর তিনি নিজে জানিয়ে দিলে তবে সন্দেহ দূর হয়। বই হাজার পড়, মুখে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হয়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ধরতে পারবে না। শুধু পাণ্ডিত্যে মানুষকে ভোলাতে পারবে, কিন্তু তাঁকে পারবে না।

“শাস্ত্র, বই শুধু এ-সব তাতে কি হবে? তাঁর কৃপা না হলে কিছু হবে না; যাতে তাঁর কৃপা হয়, ব্যাকুল হয়ে তার চেষ্টা করো; কৃপা হলে তাঁর দর্শন হবে। তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা কইবেন।”

[ব্রাহ্মসমাজ ও সাম্য — ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ]

সদরওয়ালা — মহাশয়, তাঁর কৃপা কি একজনের উপর বেশি আর-একজনের উপর কম? তাহলে যে ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সে কি! ঘোড়াটাও টা আর সরাটাও টা! তুমি যা বলছ ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ওই কথা বলেছিল। বলেছিল, মহাশয়, তিনি কি কারুকে বেশি শক্তি দিয়েছেন, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন? আমি বললাম, বিভুরূপে তিনি সকলের ভিতর আছেন — আমার ভিতরে যেমনি পিঁপড়েটির ভিতরেও তেমনি। কিন্তু শক্তিবিশেষ আছে। যদি সকলেই সমান হবে, তবে ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নাম শুনে তোমায় আমরা কেন দেখতে এসেছি। তোমার কি দুটো শিং বেরিয়েছে! তা নয়, তুমি দয়ালু, তুমি পণ্ডিত — এই সব গুণ তোমার অপরের চেয়ে বেশি আছে, তাই তোমার এত নাম। দেখ না এমন লোক আছে যে, একলা একশো লোককে হারাতে পারে; আবার এমন আছে, একজনের ভয় পালায়।

“যদি শক্তিবিশেষ না হয় লোকে কেশবকে এত মানতো কেন?

গীতায় আছে, যাকে অনেকে গণে-মানে — তা বিদ্যার জন্যই হউক, বা গান-বাজনার জন্যই হউক, বা লেকচার দেবার জন্যই হউক, বা আর কিছুর জন্যই হউক — নিশ্চিত জেনো যে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে।”

ব্রাহ্মভক্ত (সদরওয়ালার প্রতি) — যা বলছেন মেনে নেন না!

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মভক্তের প্রতি) —তুমি কিরকম লোক! কথায় বিশ্বাস না করে শুধু মেনে লওয়া! কপটতা! তুমি ঢঙ কাচ দেখছি!

ব্রাহ্মভক্তটি অতিশয় লজ্জিত হইলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৯শে অক্টোবর 1884/10/19/iv

36.4 ব্রাহ্মসমাজ — কেশব ও নির্লিপ্ত সংসার — সংসারত্যাগ

[পূর্বকথা — কেশবকে শিক্ষা — নির্জনে সাধন — জ্ঞানের লক্ষণ]

সদরওয়ালা — মহাশয়, সংসার কি ত্যাগ করতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — না, তোমাদের ত্যাগ কেন করতে হবে? সংসারে থেকেই হতে পারে। তবে আগে দিন কতক নির্জনে থাকতে হয়। নির্জনে থেকে ঈশ্বরের সাধনা করতে হয়। বাড়ির কাছে এমনি একটি আড্ডা করতে হয়, যেখান থেকে বাড়িতে এসে অমনি করে একবার ভাত খেয়ে যেতে পার। কেশব সেন, প্রতাপ, এরা সব

বলেছিল, মহাশয়, আমাদের জনক রাজার মত। আমি বললুম, জনক রাজা অমনি মুখে বললেই হওয়া যায় না। জনক রাজা হেঁটমুণ্ড হয়ে আগে নির্জনে বসে কত তপস্যা করেছিল! তোমরা কিছু কর, তবে তো 'জনক রাজা' হবে। অমুক খুব তর তর করে ইংরাজী লিখতে পারে, তা কি একেবারে লিখতে পেরেছিল? সে গরিবের ছেলে, আগে একজনের বাড়িতে থেকে তাদের রেঁধে দিত, আর দুটি দুটি খেত, অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখেছিল, তাই এখন তর তর করে লিখতে পারে।

"কেশব সেনকে আরও বলেছিলুম, নির্জনে না গেলে, শক্ত রোগ সারবে কেমন করে? রোগটি হচ্ছে বিকার। আবার যে-ঘরে বিকারী রোগী, সেই ঘরেই আচার, তেঁতুল আর জলের জালা! তা রোগ সারবে কেমন করে? আচার, তেঁতুল — এই দেখো, বলতে বলতে আমার মুখে জল এসেছে। (সকলের হাস্য) সম্মুখে থাকলে কি হয়, সকলেই তো জানো? মেয়েমানুষ পুরুষের পক্ষে এই আচার তেঁতুল। ভোগবাসনা — জলের জালা; বিষয়-তৃষ্ণার শেষ নাই, আর এই বিষয় রোগীর ঘরে! এতে কি বিকাররোগ সারে? দিন কতক ঠাইনাড়া হয়ে থাকতে হয়, যেখানে আচার-তেঁতুল নাই, জলের জালা নাই। তারপর নীরোগ হয়ে আবার সেই ঘরে এলে আর ভয় নাই। তাঁকে লাভ করে সংসারে এসে থাকলে, আর কামিনী-কাঞ্চনে কিছু করতে পারে না। তখন জনকের মতো নির্লিপ্ত হতে পারবে। কিন্তু প্রথমাবস্থায় সাবধান হওয়া চাই। খুব নির্জনে থেকে সাধন করা চাই। অশ্বত্থগাছ যখন চারা থাকে, তখন চারিদিকে বেড়া দেয়, পাছে ছাগল-গরুতে নষ্ট করে। কিন্তু গুঁড়ি মোটা হলে আর বেড়ার দরকার থাকে না। হাতি বেঁধে দিলেও গাছের কিছু করতে পারে না। যদি নির্জনে সাধন করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে

ভক্তিলাভ করে বল বাড়িয়ে, বাড়ি গিয়ে সংসার কর, তাহলে কামিনী-কাঞ্চনে তোমার কিছু করতে পারবে না।

“নির্জনে দই পেতে মাখন তুলতে হয়। জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন যদি একবার মনরূপ দুধ থেকে তোলা হয়, তাহলে সংসাররূপ জলের উপর রাখলে নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে। কিন্তু মনকে কাঁচা অবস্থায় — দুধের অবস্থায়, যদি সংসাররূপ জলের উপর রাখ, তাহলে দুধে জলে মিশে যাবে। তখন আর মন নির্লিপ্ত হয়ে ভাসতে পারবে না।

“ঈশ্বরলাভের জন্য সংসারে থেকে, একহাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে আর একহাতে কাজ করবে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন দুই হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে, তখন নির্জনে বাস করবে, কেবল তাঁর চিন্তা আর সেবা করবে।”

সদরওয়ালা (আনন্দিত হইয়া) — মহাশয়, এ অতি সুন্দর কথা! নির্জনে সাধন চাই বইকি! ওইটি আমরা ভুলে যাই। মনে করি একেবারে জনক রাজা হয়ে পড়েছি! (শ্রীরামকৃষ্ণ ও সকলের হাস্য) সংসারত্যাগের যে প্রয়োজন নাই, বাড়িতে থেকেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, এ-কথা শুনেও আমার শান্তি ও আনন্দ হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ত্যাগ তোমাদের কেন করতে হবে? যেকালে যুদ্ধ করতেই হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ ভাল। ‘ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ, খিদে-তৃষ্ণা এ-সবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এ-যুদ্ধ সংসার থেকেই ভাল। আবার কলিতে অন্নগত প্রাণ, হয়তো

খেতেই পেলে না। তখন ঈশ্বর-টীশ্বর সব ঘুরে যাবে’। একজন তার মাগকে বলেছিল, ‘আমি সংসারত্যাগ করে চললুম।’ মাগটি একটু জ্ঞানী ছিল। সে বললে, ‘কেন তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? যদি পেটের জন্য দশ ঘরে যেতে না হয় তবে যাও। তা যদি হয়, তাহলে এই একঘরই ভাল।’

“তোমারা ত্যাগ কেন করবে? বাড়িতে বরং সুবিধা। আহারের জন্য ভাবতে হবে না। সহবাস স্বদারার সঙ্গে, তাতে দোষ নাই। শরীরের যখন যেটি দরকার কাছেই পাবে। রোগ হলে সেবা করবার লোক কাছে পাবে।

“জনক, ব্যাস, বশিষ্ঠ জ্ঞানলাভের করে সংসারে ছিলেন। এঁরা দুখানা তরবার ঘুরাতেন। একখানা জ্ঞানের, একখানা কর্মের।”

সদরওয়ালা — মহাশয়! জ্ঞান হয়েছে তা কেমন করে জানব?

শ্রীরামকৃষ্ণ — জ্ঞান হলে তাঁকে (ঈশ্বরকে) আর দূরে দেখায় না। তিনি আর তিনি বোধ হয় না। তখন ইনি! হৃদয়মধ্যে তাঁকে দেখা যায়। তিনি সকলেরই ভিতর আছেন, যে খুঁজে সেই পায়।

সদরওয়ালা — মহাশয়! আমি পাপী, কেমন করে বলি যে, তিনি আমার ভিতর আছেন?

[ব্রাহ্মসমাজ, খ্রীষ্টধর্ম ও পাপবাদ]

শ্রীরামকৃষ্ণ — ওই তোমাদের পাপ আর পাপ! এ-সব বুঝি খ্রীষ্টানী মত? আমায় একজন একখানি বই দিলে (বাইবেল) দিলে। একটু পড়া শুনলাম; তা

তাতে কেবল ওই এককথা — পাপ আর পাপ! আমি তাঁর নাম করেছি; ঈশ্বর, কি রাম, কি হরি বলেছি — আমার আবার পাপ! এমন বিশ্বাস থাকা চাই। নাম-মাহাত্ম্যে বিশ্বাস থাকা চাই।

সদরওয়ালা — মহাশয়! কেমন করে ওই বিশ্বাস হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁতে অনুরাগ কর। তোমাদেরই গানে আছে, 'প্রভু! বিনে অনুরাগ করে যজ্ঞযাগ, তোমার কি যায় জানা।' যাতে এরূপ অনুরাগ, এরূপ ঈশ্বরে ভালবাসা হয়, তার জন্য তাঁর কাছে গোপনে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করো, আর কাঁদো। মাগের ব্যামো হলে, কি টাকা লোকসান হলে, কি কর্মের জন্য, লোকে একঘটি কাঁদে, ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে বল দেখি?

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৯শে অক্টোবর 1884/10/19/v

36.5 আমমোক্তারী দাও — গৃহস্থের কর্তব্য কতদিন?

ত্রৈলোক্য — মহাশয়, এঁদের সময় কই; ইংরেজের কর্ম করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সদরওয়ালার প্রতি) — আচ্ছা তাঁকে আমমোক্তারী দাও। ভাল লোকের উপর যদি কেউ ভার দেয়, সে লোক কি আর মন্দ করে? তাঁর উপর আন্তরিক সব ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক। তিনি যা কাজ করতে দিয়েছেন, তাই করো।

“বিড়ালছানা পাটোয়ারী বুদ্ধি নাই। মা মা করে। মা যদি হেঁসেলে রাখে সেইখানেই পড়ে আছে। কেবল মিউ মিউ করে ডাকে। মা যখন গৃহস্থের বিছানায় রাখে, তখনও সেই ভাব। মা মা করে।”

সদরওয়ালা —— আমরা গৃহস্থ, কতদিন এ-এব কর্তব্য করতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ —— তোমাদের কর্তব্য আছে বইকি? ছেলেদের মানুষ করা, স্ত্রীকে ভরণপোষণ করতে, তোমার অবর্তমানে স্ত্রীর ভরণপোষণের যোগাড় করে রাখতে হবে। তা যদি না কর, তুমি নির্দয়। শুকদেবাদি দয়া রেখেছিলেন। দয়া যার নাই সে মানুষই নয়।

সদরওয়ালা —— সন্তান প্রতিপালন কতদিন?

শ্রীরামকৃষ্ণ —— সাবালক হওয়া পর্যন্ত। পাখি বড় হলে যখন সে আপনার ভার নিতে পারে, তখন তাকে ধাড়ী ঠোকরায়, কাছে আসতে দেয় না। (সকলের হাস্য)

সদরওয়ালা —— স্ত্রীর প্রতি কি কর্তব্য?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি বেঁচে থাকতে থাকতে ধর্মোপদেশ দেবে, ভরণপোষণ করবে। যদি সতী হয়, তোমার অবর্তমানে তার খাবার যোগাড় করে রাখতে হবে।

“তবে জ্ঞানোন্মাদ হলে আর কর্তব্য থাকে না। তখন কালকার জন্য তুমি না ভাবলে ঈশ্বর ভাবেন। জ্ঞানোন্মআদ হলে তোমার পরিবারদের জন্য তিনি ভাববেন। যখন জমিদার নাবালক ছেলে রেখে মরে যায়, তখন অছি সেই নাবালকের ভার লয়। এ-সব আইনের ব্যাপার তুমি তো সব জান।”

সদরওয়ালা — আজ্ঞা হাঁ।

বিজয় গোস্বামী — আহা! আহা! কি কথা! যিনি অনন্যমন হয়ে তাঁর চিন্তা করেন, যিনি তাঁর প্রেমে পাগল, তাঁর ভার ভগবান নিজে বহন করেন! নাবালকের অমনি ‘অছি’ এসে জোটে। আহা! কবে সেই অবস্থা হবে। যাদের হয় তারা কি ভাগ্যবান!

ত্রৈলোক্য — মহাশয়, সংসারে যথার্থ কি জ্ঞান হয়? ঈশ্বরলাভ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) — কেন গো, তুমি তো সারে-মাতে আছো। (সকলের হাস্য) ঈশ্বরে মন রেখে সংসারে আছো তো। কেন সংসারে হবে না? অবশ্য হবে।

[সংসারে জ্ঞানীর লক্ষণ — ঈশ্বরলাভের লক্ষণ — জীবন্মুক্ত]

ত্রৈলোক্য — সংসারে জ্ঞানলাভ হয়েছে তার লক্ষণ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হরিনামে ধারা আর পুলক। তাঁর মধুর নাম শুনেই শরীর রোমাঞ্চ হবে আর চক্ষু দিয়ে ধারা বেয়ে পড়বে।

“যতক্ষণ বিষয়াসক্তি থাকে, কামিনী-কাঞ্চনে ভালবাসা থাকে, ততক্ষণ দেহবুদ্ধি যায় না। বিষয়াসক্তি যত কমে ততই আত্মজ্ঞানের দিকে চলে যেতে পারা যায়, আর দেহবুদ্ধি কমে। বিষয়াসক্তি একেবারে চলে গেলে আত্মজ্ঞান হয়, তখন আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা বোধ হয়। নারিকেলের জল না শুকুলে দা দিয়ে কেটে শাঁস আলাদা, মালা আলাদা করা কঠিন হয়। জল যদি শুকিয়ে যায়, তাহলে নড় নড় করে, শাঁস আলাদা হয়ে যায়। একে বলে খড়ো নারিকেল।

“ঈশ্বরলাভ হলে লক্ষণ এই যে, সে ব্যক্তি খড়ো-নারিকেলের মতো হয়ে যায় — দেহাত্মবুদ্ধি চলে যায়। দেহের সুখ-দুঃখে তার সুখ-দুঃখ বোধ হয় না। সে ব্যক্তি দেহের সুখ চায় না। জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়ায়।

‘কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময়।’

“যখন দেখবে ঈশ্বরের নাম করতেই অশ্রু আর পুলক হয়, তখন জানবে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি চলে গেছে, ঈশ্বরলাভ হয়েছে। দেশলাই যদি শুকনো হয়, একটা ঘষলেই দপ করে জ্বলে উঠে। আর যদি ভিজে হয়, পঞ্চাশটা ঘষলেও কিছু হয় না। কেবল কাঠিগুলো ফেলা যায়। বিষয়রসে রোসে থাকলে, কামিনী-কাঞ্চন-রসে মন ভিজে থাকলে, ঈশ্বরের উদ্দীপনা হয় না। হাজার চেষ্টা কর, কেবল পণ্ডশ্রম। বিষয়রস শুকুলে তৎক্ষণাৎ উদ্দীপন হয়।”

[উপায় ব্যাকুলতা — তিনি যে আপনার মা]

ত্রৈলোক্য — বিষয়রস শুকোবার এখন উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — মার কাছে ব্যাকুল হয়ে ডাকো। তাঁর দর্শন হলে বিষয়রস শুকিয়ে যাবে; কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি সব দূরে চলে যাবে। আপনার মা বোধ থাকলে এক্ষণেই হয়। তিনি তো ধর্ম-মা নন। আপনারই মা। ব্যাকুল হয়ে মার কাছে আব্দার কর। ছেলে ঘুড়ি কিনবার জন্য মার আঁচল ধরে পয়সা চায় — মা হয়তো আর মেয়েদের সঙ্গে গল্প পরছে। প্রথমে মা কোনমতে দিতে চায় না। বলে, 'না, তিনি বারণ করে গেছেন, তিনি এলে বলে দিব, এক্ষণই ঘুড়ি নিয়ে একটা কাণ্ড করবি।' যখন ছেলে কাঁদতে শুরু করে, কোন মতে ছাড়ে না, মা অন্য মেয়েদের বলে, 'রোস মা, এ-ছেলেটাকে একবার শান্ত করে আসি।' এই কথা বলে, চাবিটা নিয়ে কড়াৎ কড়াৎ করে বাক্স খুলে একটা পয়সা ফেলে দেয়। তোমারও মার কাছে আব্দার করো, তিনি অবশ্য দেখা দিবেন। আমি শিখদের ওই কথা বলেছিলাম। তারা দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়িতে এসেছিল; মা-কালীর মন্দিরের সম্মুখে বসে কথা হয়েছিল। তারা বলেছিল, 'ঈশ্বর দয়াময়'। জিজ্ঞাসা করলুম, 'কিসে দয়াময়?' তারা বললে, কেন মহারাজ! তিনি সর্বদা আমাদের দেখছেন, আমাদের ধর্ম অর্থ সব দিচ্ছেন, আহার যোগাচ্ছেন। আমি বললুম, যদি কারো ছেলেপুলে হয়, তাদের খবর তাদের খাওয়ার ভার, বাপ নেবে, না, তো কি বামুনপাড়ার লোকে এসে নেবে?

সদরওয়ালা — মহাশয়! তিনি কি তবে দয়াময় নন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা কেন গো? ও একটা বললুম; তিনি যে বড় আপনার লোক! তাঁর উপর আমাদের জোর চলে! আপনার লোককে এমন কথা পর্যন্ত বলা যায়, “দিবি না রে শালা।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৯শে অক্টোবর 1884/10/19/vi

36.6 অহংকার ও সদরওয়ালা

শ্রীরামকৃষ্ণ (সদরওয়ালার প্রতি) — আচ্ছা, অভিমান, অহংকার জ্ঞানে হয় — না, অজ্ঞানে হয়? অহংকার তমোগুণ, অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়। এই অহংকার আড়াল আছে বলে তাই ঈশ্বরকে দেখা যায় না। “আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।” অহংকার করা বৃথা। এ-শরীর, এ-ঐশ্বর্য কিছুই থাকবে না। একটা মাতাল দুর্গা প্রতিমা দেখছিল। প্রতিমার সাজগোজ দেখে বলছে, “মা, যতই সাজো-গোজো, দিন দুই-তিন পরে তোমায় টেনে গঙ্গায় ফেলে দিবে।” (সকলের হাস্য) তাই সকলকে বলছি, জজই হও আর যেই হও সব দুদিনের জন্য। তাই অভিমান, অহংকার ত্যাগ করতে হয়।

[ব্রাহ্মসমাজ ও সাম্য — লোক ভিন্ন প্রকৃতি]

“সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ভিন্ন স্বভাব। তমোগুণীদের লক্ষণ, অহংকার, নিদ্রা, বেশি ভোজন, কাম, ক্রোধ — এই সব রজোগুণিরা বেশি কাজ জড়ায়; কাপড়; পোশাক ফিট-ফাট, বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বৈঠকখানায় কুইনের ছবি, যখন ঈশ্বরচিন্তা করে তখন চেলী-গরদ পরেম গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তার মাঝে মাঝে একটি একটি সোনার রুদ্রাক্ষ; যদি কেউ ঠাকুরবাড়ি দেখতে আসে তবে সঙ্গে করে দেখায় আর বলে, এদিকে আসুন আরও আছে, শ্বেত পাথরের, মার্বেল পাথরের মেঝে আছে, ষোল-ফোকর নাটমন্দির আছে। আবার দান করে, লোককে দেখিয়ে। সত্ত্বগুণী লোক অতি শিষ্ট-শান্ত, কাপড় যা তা; রোজগার পেট চলা পর্যন্ত, কখনও লোকের তোষামোদ করে ধন লয় না, বাড়িতে মেরামত নাই, ছেলেদের পোশাকের জন্য ভাবে না; মান-সম্ভ্রমের জন্য ব্যস্ত হয় না, ঈশ্বরচিন্তা, দানধ্যান সমস্ত গোপনে — লোকে টের পায় না; মশারির ভিতর ধ্যান করে, লোকে ভাবে বাবুর রাতে ঘুম হয় নাই তাই বেলা পর্যন্ত ঘুমাচ্ছেন। সত্ত্বগুণ সিঁড়ির শেষ ধাপ, তারপরেই ছাদ। সত্ত্বগুণ এলেই ঈশ্বরলাভের আর দেরি হয় না — আর একটু গেলেই তাঁকে পাবে। (সদরওয়ালার প্রতি) — তুমি বলেছিলে সব লোক সমান। এই দেখ, কত ভিন্ন প্রকৃতি।

“আরও কত রকম থাক থাক আছে; — নিত্যজীব, মুক্তজীব, মুমুক্ষজীব, বদ্ধজীব, — নানারকম মানুষ। নারদ, শুকদেব নিত্যজীব, যেমন স্টীম বোট্ (কলের জাহাজ) পারে আপনিও যেতে পারে আবার বড় জীবজন্তু হাতি পর্যন্ত পারে নিয়ে যায়। নিত্যজীবেরা নায়েবের স্বরূপ; একটা তালুক শাসন করে আর-একটা তালুক শাসন করতে যায়। আবার মুমুক্ষ জীব আছে, যারা সংসার জাল থেকে মুক্ত হোয়ার জন্য ব্যকুল হয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করছে। এদের মধ্যে দুই-

একজন জাল থেকে পালাতে পারে, তারা মুক্ত জীব। নিত্যজীবেরা এক-একটা সিয়ানা মাছের মতো; কখনও জালে পড়ে না।

“কিন্তু বদ্ধজীব — সংসারী জীব — তাদের হুঁশ নাই। তারা জালে পড়েই আছে, অথচ জালে বদ্ধ হয়েছি, এরূপ জ্ঞানও নাই। এরা হরিকথা সম্মুখে হলে সেখান থেকে চলে যায়, — বলে হরিনাম মরবার সময় হবে; এখন কেন? আবার মৃত্যুশয্যায় শুয়ে, পরিবার কিম্বা ছেলেদের বলে, ‘প্রদীপে অত সলতে কেন, একটা সলতে দাও; তা না হলে তেল পুড়ে যাবে’; আর পরিবার ও ছেলেদের মনে করে কাঁদে আর বলে, ‘হায়! আমি ম’লে এদের কি হবে।’ আর বদ্ধজীব যাতে এত দুঃখ ভোগ করে, তাই আবার করে; যেমন উটের কাঁটা ঘাস খেতে খেতে মুখ দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ে, তবু কাঁটা ঘাস ছাড়ে না। এদিকে ছেলে মারা গেছে, শোকে কাতর, তবু আবার বছর বছর ছেলে হবে; মেয়ের বিয়েতে সর্বস্বান্ত হল, আবার বছর বছর মেয়ে হবে; বলে, কি করব অদৃষ্টে ছিল। যদি তীর্থ করতে যায়, নিজে ঈশ্বরচিন্তা করবার অবসর পায় না। — কেবল পরিবারদের পুঁটুলি বইতে বইতে প্রাণ যায়, ঠাকুরদের মন্দিরে গিয়ে ছেলেকে চরণামৃত খাওয়াতে, গড়াগড়ি দেওয়াতেই ব্যস্ত। বদ্ধজীব নিজের আর পরিবারদের পেটের জন্য দাসত্ব করে — আর মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, তোষামোদ করে ধন উপায় করে। যারা ঈশ্বরচিন্তা করে, ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হয়, বদ্ধজীব তাদের পাগল বলে উড়িয়ে দেয়। (সদরওয়ালার প্রতি) মানুষ কত রকম দেখ; তুমি সব এক বলছিলে। কত ভিন্ন প্রকৃতি। কারু বশি শক্তি, কারু কম।”

[বদ্ধজীব মৃত্যুকালে ঈশ্বরের নাম করে না]

“সংসারাক্ত বদ্ধজীব মৃত্যুকালে সংসারের কথাই বলে। বাহিরে মালা জপলে, গঙ্গাস্নান করলে, তীর্থে গেলে — কি হবে? সংসার আসক্তি ভিতরে থাকলে মৃত্যুকালে সেটি দেখা যায়। কত আবোল-তাবোল বলে; হয়তো বিকারের খেয়ালে ‘হলুদ, পাঁচফোড়ন, তেজপাতা’ বলে চেঁচিয়ে উঠল। শুকপাখি সহজ বেলা রাধাকৃষ্ণ বলে, বিল্লি ধরলে নিজের বুলি বেরোয়, ক্যাঁ ক্যাঁ করে। গীতায় আছে মৃত্যুকালে যা মনে করবে, পরলোকে তাই হবে। ভরত রাজা ‘হরিণ’, ‘হরিণ’ করে দেহত্যাগ করেছিল, তাই হরিণ-জন্ম হল। ঈশ্বরচিন্তা করে দেহত্যাগ করলে ঈশ্বরলাভ হয়, আর এ-সংসারে আসতে হয় না।”

ব্রাহ্মভক্ত — মহাশয়, অন্য সময় ঈশ্বরচিন্তা করেছে, কিন্তু মৃত্যু সময় করে নাই বলে কি আবার এই সুখ-দুঃখময় সংসারে আসতে হবে? কেন, আগে তো ঈশ্বরচিন্তা করেছিল?

শ্রীরামকৃষ্ণ — জীব ঈশ্বরচিন্তা করে, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, আবার, ভুলে যায়; সংসারে আসক্ত হয়। যেমন এই হাতিকে স্নান করিয়ে দিলে, আবার ধুলা-কাদা মাখে। মনমত্তকরী! তবে হাতিকে নাইয়েই যদি আস্তাবলে সাঁধ করিয়া দিতে পার, তাহলে আর ধুলা-কাদা মাখতে পারে না। যদি জীব মৃত্যুকালে ঈশ্বরচিন্তা করে, তাহলে শুদ্ধমন হয়, সে মন কামিনী-কাঞ্চনে আবার আসক্ত হবার অবসর পায় না।

“ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, তাই এত কর্মভোগ। লোকে বলে যে, গঙ্গা-স্নানের সময় তোমার পাপগুলো তোমায় ছেড়ে গঙ্গার তীরের গাছের উপর বসে থাকে। যাই তুমি গঙ্গাস্নান করে তীরে উঠছো অমনি পাপগুলো তোমার ঘাড়ে আবার চেপে

বসে। (সকলের হাস্য) দেহত্যাগের সময় যাতে ঈশ্বরচিন্তা হয়, তাই তার আগে থাকতে উপায় করতে হয়। উপায় — অভ্যাসযোগ। ঈশ্বরচিন্তা অভ্যাস করলে শেষের দিনেও তাঁকে মনে পড়বে।”

ব্রাহ্মভক্ত — বেশ কথা হল। অতি সুন্দর কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি এলোমেলো বকলুম! তবে আমার ভাব কি জান? আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী; আমি ঘর তিনি ঘরণী; আমি গাড়ি তিনি Engineer; আমি রথ তিনি রথী; যেমন চালান তেমনি চলি; যেমন করান তেমনি করি।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৯শে অক্টোবর 1884/10/19/vii

36.7 শ্রীরামকৃষ্ণ সংকীর্তনানন্দে

ত্রৈলোক্য আবার গান গাহিতেছেন। সঙ্গে খোল-করতাল বাজিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। নৃত্য করিতে করিতে কতবার সমাধিস্থ হইতেছেন। সমাধিস্থ অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছেন, স্পন্দহীন দেহ, স্থিরনেত্র, সহাস্যবদন; কোন প্রিয় ভক্তের স্কন্ধদেশে হাত দিয়ে আছেন। আবার ভাবান্তে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নৃত্য। বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া গানের আখর দিতেছেন:

“নাচ মা, ভক্তবৃন্দ বেড়ে বেড়ে;
আপনি নেচে নাচাও গো মা;
(আবার বলি) হৃদিপদ্মে একবার নাচ মা;
নাচ গো ব্রহ্মময়ী সেই ভুবনমোহনরূপে।”

সে অপূর্ব দৃশ্য! মাতৃগতপ্রাণ, প্রেমে মাতোয়ারা সেই স্বর্গীয় বালকের নৃত্য! ব্রাহ্মভক্তেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতেছেন — যেন লোহাকে চুম্বুকে ধরিয়াছে! সকলে উন্মত্ত হইয়া ব্রহ্মনাম করিতেছেন; আবার ব্রহ্মের সেই মধুর নাম, — মা নাম করিতেছেন। অনেকে বালকের মতো “মা, মা” বলিতে বলিতে কাঁদিতেছেন।

কীর্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণও আসীন। সম্মুখে বিজয়। বিজয়ের শাশুড়ী ঠাকুরানী ও অন্যানা মেয়েভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিবেন ও তাঁহার সঙ্গে কথা বলিবেন বলিয়া সংবাদ পাঠাইলে, তিনি একটি ঘরের ভিতর গিয়া তাহাদের সঙ্গে দেখা করিলেন।

কিয়ৎ পরে ফিরিয়া আসিয়া বিজয়কে বলিতেছেন, “দেখ, তোমার শাশুড়ীর কি ভক্তি! বলে, সংসারের কথা আর বলবেন না। এক ঢেউ যাচ্ছে, আর-এক ঢেউ আসছে! আমি বললুম, ওগো, তোমার আর তাতে কি! তোমার তো জ্ঞান হয়েছে। তোমার শাশুড়ী তাতে বললেন, আমার আবার কি জ্ঞান হয়েছে। এখনও বিদ্যা-মায়া আর অবিদ্যা-মায়ার পার হই নাই, শুধু অবিদ্যার পার হলে

তো হবে না, বিদ্যার পার হতে হবে, তবে তো জ্ঞান হবে; আপনিই তো ও-কথা বলেন।”

এ-কথা হইতেছে এমন সময় শ্রীযুক্ত বেণী পাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বেণী পাল (বিজয়ের প্রতি) — মহাশয়, তবে গাত্রোত্থান করুন, অনেক দেরি হয়ে গেছে উপাসনা আরম্ভ করুন।

বিজয় —— মহাশয়, আর উপাসনা কি দরকার। আপনাদের এখানে আগে পায়েসের ব্যবস্থা, তারপর কড়ার ডাল ও অন্যান্য ব্যবস্থা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া) — যে যেমন ভক্ত সে সেইরূপ আয়োজন করে। সত্ত্বগুণীভক্ত পায়স দেয়, রজোগুণীভক্ত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়ে ভোগ দেয়, তমোগুণীভক্ত ছাগ ও অন্যান্য বলি দেয়।

বিজয় উপাসনা করিতে বেদীতে বসিবেন কিনা ভাবিতেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৯শে অক্টোবর 1884/10/19/viii

36.8 বিজয়ের প্রতি উপদেশ

[ব্রাহ্মসমাজে লেকচার — আচার্যের কার্য — ঈশ্বরই গুরু]

বিজয় — আপনি অনুগ্রহ করুন, তবে আমি বেদী থেকে বলব।

শ্রীরামকৃষ্ণ — অভিমান গেলেই হল। ‘আমি লেকচার দিচ্ছি, তোমরা শুন’ — এ-অভিমান না থাকলেই হল। অহংকার জ্ঞানে হয়, না, অজ্ঞানে হয়? যে নিরহংকার তারই জ্ঞান হয়। নিচু জায়গায় বৃষ্টির জল দাঁড়ায়, উঁচু জায়গা থেকে গড়িয়ে যায়।

“যতক্ষণ অহংকার থাকে, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না; আবার মুক্তিও হয় না। এই সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হয়। বাছুর হাম্বা হাম্বা (আমি আমি) করে, তাই অত যন্ত্রণা। কসায়ে কাটে, চামড়ায় জুতো হয়। আবার ঢোল-ঢাকের চামড়া হয়; সে ঢাক কত পেটে, কষ্টের শেষ নাই। শেষে নাড়ী থেকে তাঁত হয়, সেই তাঁতে যখন ধুনুরীর যন্ত্র তৈয়ার হয়, আর ধুনুরীর তাঁতে তুঁহু তুঁহু (তুমি তুমি) বলতে থাকে, তখন নিস্তার হয়। তখন আর হাম্বা হাম্বা (আমি আমি) বলছে না; বলছে তুঁহু তুঁহু (তুমি তুমি) অর্থাৎ হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা, আমি অকর্তা; তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; তুমিই সব।

“গুরু, বাবা ও কর্তা — এই তিন কথায় আমার গায়ে কাঁটা বেঁধে। আমি তাঁর ছেলে, চিরকাল বালক, আমি আবার ‘বাবা’ কি? ঈশ্বর কর্তা আমি অকর্তা; তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র।

“যদি কেউ আমায় গুরু বলে, আমি বলি, ‘দূর শালা’। গুরু কিরে? এক সচ্চিদানন্দ বই আর গুরু নাই। তিনি বিনা কোন উপায় নাই। তিনিই একমাত্র ভবসাগরের কাণ্ডারী।

(বিজয়ের প্রতি) — “আচার্যগিরি করা বড় কঠিন। ওতে নিজের হানি হয়। অমনি দশজন মানছে দেখে, পায়ের উপর পা দিয়ে বলে, ‘আমি বলছি আর তোমরা শুন’। এই ভাবটা বড় খারাপ। তার ওই পর্যন্ত! ওই একটু মান; লোকে হদ্দ বলবে, ‘আহা বিজয়বাবু বেশ বললেন, লোকটা খুব জ্ঞানী’। ‘আমি বলছি’ এ-জ্ঞান করো না। আমি মাকে বলি, ‘মা তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; যেমন করাও তেমনি করি; যেমন বলাও তেমনি বলি।”

বিজয় (বিনীতভাবে) — আপনি বলুন, তবে আমি গিয়ে বসব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) — আমি কি বলব; চাঁদা মামা সকলের মামা। তুমিই তাঁকে বল। যদি আন্তরিক হয়, কোন ভয় নাই।

বিজয় আবার অনুনয় করাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, “যাও, যেমন পদ্ধতি আছে তেমনি করগে; আন্তরিক তাঁর উপর ভক্তি থাকলেই হল।”

বিজয় বেদীতে আসীন হইয়া ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করিতেছেন। বিজয় প্রার্থনার সময় মা মা করিয়া ডাকিতেছেন। সকলেরই মন দ্রবীভূত হইল।

উপাসনান্তে ভক্তদের সেবার জন্য ভোজনের আয়োজন হইতেছে। সতরঞ্চি, গালিচা সমস্ত উঠাইয়া পাতা হইতে লাগিল, ভক্তেরা সকলেই বসিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আসন হইল। তিনি বসিয়া শ্রীযুক্ত বেণী পাল প্রদত্ত উপাদেয় লুচি, কচুরি, পাঁপর, নানবিধ মিষ্টান্ন, দধি, ক্ষীর ইত্যাদি সমস্ত ভগবানকে নিবেদন করিয়া আনন্দে প্রসাদ লইলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৯শে অক্টোবর 1884/10/19/ix

36.9 মা — কালী ব্রহ্ম — পূর্ণজ্ঞানের পর অভেদ

আহারান্তে সকলে পান খাইতে বাড়ি প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতেছেন। যাইবার পূর্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়ের সহিত একান্তে বসিয়া কথা কহিতেছেন। সেখানে মাস্টার আছেন।

[ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের মাতৃভাব — Motherhood of God]

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি তাঁকে মা মা বলে প্রার্থনা করছিলে। এ-খুব ভাল। কথায় বলে, মায়ের টান বাপের চেয়ে বেশি। মায়ের উপর জোর চলে, বাপের উপর চলে না। ত্রৈলোক্যের মায়ের জমিদারী থেকে গাড়ি গাড়ি ধন আসছিল, সঙ্গে কত

লাল পাগড়িওয়ালা লাঠি হাতে দ্বারবান। ত্রৈলোক্য রাস্তায় লোকজন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, জোর করে সব ধন কেড়ে নিলে। মায়ের ধনের উপর খুব জোর চলে। বলে নাকি ছেলের নামে তেমন নালিশ চলে না।

ব্রহ্ম যদি মা, তাহলে তিনি সাকার না নিরাকার?

শ্রীরামকৃষ্ণ — যিনি ব্রহ্ম, তিনি কালী (মা আদ্যাশক্তি)। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় — এই সব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলচে দুলচে, শক্তি বা কালীর উপমা। কালী! কিনা — যিনি মহাকালের (ব্রহ্মের) সহিত রমণ করেন। কালী "সাকার আকার নিরাকারা।" তোমাদের যদি নিরাকার বলে বিশ্বাস, কালীকে সেইরূপ চিন্তা করবে। একটা দৃঢ় করে তাঁর চিন্তা করলে তিনিই জানিয়ে দেবেন, তিনি কেমন। শ্যামপুকুরে পৌঁছিলে তেলীপাড়াও জানতে পারবে। জানতে পারবে যে তিনি শুধু আছেন (অস্তিমাত্রম্) তা নয়। তিনি তোমার কাছে এসে কথা কবেন — আমি যেমন তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি। বিশ্বাস করো সব হয়ে যাবে। আর-একটি কথা — তোমার নিরাকার বলে যদি বিশ্বাস, তাই বিশ্বাস দৃঢ় করে করো। কিন্তু মতুয়ার বুদ্ধি (Dogmatism) করো না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর করে বলো না যে তিনি এই হতে পারেন, আর এই হতে পারেন না। বলো আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার, আর কত কি হতে পারেন তিনি জানেন। আমি জানি না। বুঝতে পারি না। মানুষের একছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বুঝা যায়? একসের ঘটিতে কি চারসের দুধ ধরে? তিনি যদি কৃপা করে কখনও দর্শন দেন, আর বুঝিয়ে দেন, তবে বুঝা যায়; নচেৎ নয়।

‘যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, তিনিই মা।’

“প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি, বোঝনা রে মন ঠারে ঠোরে ।।

“আমি তত্ত্ব করি যাঁরে। অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্মের তত্ত্ব করছি। তাঁরেই মা মা বলে ডাকছি। আবার রামপ্রসাদ ওই কথাই বলছে, —

আমি কালীব্রহ্ম জেনে মর্ম, ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।

“অধর্ম কিনা অসৎ কর্ম। ধর্ম কিনা বৈধী কর্ম — এত দান করতে হবে, এত ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে, এই সব ধর্ম।”

বিজয় — ধর্মাধর্ম ত্যাগ করলে কি বাকি থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — শুদ্ধাভক্তি। আমি মাকে বলেছিলাম, মা! এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই লও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই লও তোমার জ্ঞান, এই লও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও! দেখ, জ্ঞান পর্যন্ত আমি চাই নাই। আমি লোকমান্যও চাই নাই। ধর্মাধর্ম ছাড়লে শুদ্ধাভক্তি — অমলা, নিষ্কাম, অহেতুকী ভক্তি — বাকি থাকে।

[ব্রাহ্মসমাজ ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম — আদ্যাশক্তি]

ব্রাহ্মভক্ত — তিনি আর তাঁর শক্তি কি তফাত?

শ্রীরামকৃষ্ণ — পূর্ণজ্ঞানের পর অভেদ। যেমন মণির জ্যোতিঃ আর মণি, অভেদ। মণির জ্যোতিঃ ভাবলেই মণি ভাবতে হয়। দুধ আর দুধের ধবলত্ব যেমন অভেদ। একটাকে ভাবলেই আর-একটাকে ভাবতে হয়। কিন্তু এ অভেদ জ্ঞান — পূর্ণজ্ঞান না হলে হয় না। পূর্ণজ্ঞানে সমাধি হয়, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ছেড়ে চলে যায় — তাই অহংতত্ত্ব থাকে না। সমাধিতে কি বোধ হয় মুখে বলা যায় না। নেমে একটু আভাসের মতো বলা যায়। যখন সমাধি ভঙ্গের পর 'ওঁ ওঁ' বলি, তখন আমি একশো হাত নেমে এসেছি। ব্রহ্ম বেদবিধির পার, মুখে বলা যায় না। সেখানে 'আমি' 'তুমি' নাই।

"যতক্ষণ 'আমি' 'তুমি' আছে, যতক্ষণ 'আমি প্রার্থনা কি ধ্যান করছি' এ-জ্ঞান আছে, ততক্ষণ 'তুমি' (ঈশ্বর) প্রার্থনা শুনছো, এ-জ্ঞানও আছে; ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ আছে। তুমি প্রভু, আমি দাস; তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; তুমি মা, আমি ছেলে — এ-বোধ থাকবে। এই ভেদবোধ; আমি একটি, তুমি একটি। এ ভেদবোধ তিনিই করাচ্ছেন। তাই পুরুষ-মেয়ে, আলো-অন্ধকার — এই সব বোধ হচ্ছে। যতক্ষণ এই ভেদবোধ, ততক্ষণ শক্তি (Personal God) মানতে হবে। তিনিই আমাদের ভিতর 'আমি' রেখে দিয়েছেন। হাজার বিচার কর, 'আমি' আর যায় না। আর তিনি ব্যক্তি হয়ে দেখা দেন।

"তাই যতক্ষণ 'আমি' আছে — ভেদবুদ্ধি আছে — ততক্ষণ ব্রহ্ম নির্গুণ বলবার জো নাই। ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্ম মানতে হবে। এই সগুণ ব্রহ্মকে বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে কালী বা আদ্যাশক্তি বলে গেছে।"

বিজয় — এই আদ্যাশক্তি দর্শন আর ওই ব্রহ্মজ্ঞান, কি উপায়ে হতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁকে প্রার্থনা করো। আর কাঁদো! এইরূপে চিত্তশক্তি হয়ে যাবে। নির্মল জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে। ভক্তের আমিরূপ আরশিতে সেই সগুণ ব্রহ্ম আদ্যাশক্তি দর্শন করবে। কিন্তু আরশি খুব পোঁছা চাই। ময়লা থাকলে ঠিক প্রতিবিম্ব পড়বে না।

"যতক্ষণ 'আমি' জলে সূর্যকে দেখতে হয়, সূর্য্যকে দেখবার আর কোনরূপ উপায় হয় না। আর যতক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্যকে দেখবার উপায় নাই, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্যই ষোল আনা সত্য — যতক্ষণ আমি সত্য ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্যও সত্য — ষোল আনা সত্য। সেই প্রতিবিম্ব সূর্যই আদ্যাশক্তি।

"ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও — সেই প্রতিবিম্বকে ধরে সত্য সূর্যের দিকে যাও। সেই সগুণ ব্রহ্ম, যিনি প্রার্থনা শুনেন তাঁরেই বলো, তিনিই সেই ব্রহ্মজ্ঞান দিবেন। কেননা, ইনিই সগুণ ব্রহ্ম, তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম, যিনিই শক্তি, তিনিই ব্রহ্ম। পূর্ণজ্ঞানের পর অভেদ।

"মা ব্রহ্মজ্ঞানও দেন। কিন্তু শুদ্ধভক্ত প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না।

"আর-এক পথ — জ্ঞানযোগ, বড় কঠিন পথ। ব্রাহ্মসমাজের তোমরা জ্ঞানী নও, ভক্ত! যারা জ্ঞানী, তাদের বিশ্বাস যে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, স্বপ্নবৎ। আমি, তুমি, সব স্বপ্নবৎ!"

[ব্রাহ্মসমাজে বিদ্বেষভাব]

“তিনি অন্তর্যামী! তাঁকে সরল মনে, শুদ্ধমনে প্রার্থনা কর। তিনি সব বুঝিয়ে দিবেন। অহংকার ত্যাগ করে তাঁর শরণাগত হও; সব পাবে।

“আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে।
যা চাবি তাই ব’সে পাবি খোঁজ নিজ অন্তপুরে।
পরম ধন এই পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে
কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ দুয়ারে।।

“যখন বাহিরে লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলেকে ভালবাসবে, মিশে যেন এক হয়ে যাবে — বিদ্বেষভাব আর রাখবে না। ‘ও-ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে না; ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না; ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খ্রীষ্টান’ — এই বলে নাক সিটকে ঘৃণা করো না! তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন। সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জানবে, জেনে তাদের সঙ্গে মিশবে, — যত দূর পার। আর ভালবাসবে। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে শান্তি আনন্দভোগ করবে। ‘জ্ঞানদীপ জ্বেলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখো না।’ নিজের ঘরে স্ব-স্বরূপকে দেখতে পাবে।

“রাখাল যখন গরু চরাতে যায়, গরু সব মাঠে গিয়ে এক হয়ে যায়। এক পালের গরু। যখন সন্ধ্যার সময় নিজের ঘরে যায়, আবার পৃথক হয়ে যায়। নিজের ঘরে ‘আপনাতে আপনি থাকে’।”

[সন্ন্যাসে সঞ্চয় করিতে নাই — শ্রীযুক্ত বেণী পালের অর্থের সদ্ব্যবহার]

রাত্রি দশটার পর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে ফিরিবার জন্য গাড়িতে উঠিলেন। সঙ্গে দুই-একজন সেবক ভক্ত। গভীর অন্ধকার, গাছতলায় গাড়ি দাঁড়িয়ে। বেণী পাল রামলালের জন্য লুচি মিষ্টান্নাদি গাড়িতে তুলিয়া দিতে আসিলেন।

বেণী পাল — মহাশয়! রামলাল আসতে পারেন নাই, তার জন্য কিছু খাবার এঁদের হাতে দিতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুমতি করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যস্ত হইয়া) — ও বাবু বেণী পাল! তুমি আমার সঙ্গে ও-সব দিও না! ওতে আমার দোষ হয়। আমার সঙ্গে কোন জিনিস সঞ্চয় করে নিয়ে যেতে নাই। তুমি কিছু মনে করবে না।

বেণী পাল — যে আজ্ঞা, আপনি আশীর্বাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আজ খুব আনন্দ হল। দেখ, অর্থ যার দাস, সেই মানুষ। যারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা মানুষ হয়ে মানুষ নয়। আকৃতি মানুষের কিন্তু পশুর ব্যবহার! ধন্য তুমি! এতগুলি ভক্তকে আনন্দ দিলে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২০শে অক্টোবর 1884/10/20/i

36.10 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বড়বাজারে মারোয়াড়ী ভক্তমন্দিরে

আজ ঠাকুর ১২নং মল্লিক স্ট্রীট বড়বাজারে শুভাগমন করিতেছেন। মারোয়াড়ী ভক্তেরা অন্নকূট করিয়াছেন — ঠাকুরের নিমন্ত্রণ। দুইদিন হইল শ্যামাপূজা হইয়া গিয়াছে। সেই দিনে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে আনন্দ করিয়াছিলেন। তাহার পরদিন আবার ভক্তসঙ্গে সিঁথি ব্রাহ্মসমাজে উৎসবে গিয়াছিলেন। আজ সোমবার, ২০শে অক্টোবর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ কার্তিকের শুক্লা প্রতিপদ — দ্বিতীয়া তিথি, বড়বাজারে এখন দেওয়ালির আমোদ চলিতেছে।

আন্দাজ বেলা ৩টার সময় মাস্টার ছোট গোপালের সঙ্গে বড়বাজারে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর তেলধুতি কিনিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, — সেইগুলি কিনিয়াছেন। কাগজে মোড়া; একহাতে আছে। মল্লিক স্ট্রীটে দুইজনে পোঁছিয়া দেখেন, লোকে লোকারণ্য — গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি জমা হইয়া রহিয়াছে। ১২ নম্বরের নিকটবর্তী হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর গাড়িতে বসিয়া, গাড়ি আসিতে পারিতেছে না। ভিতরে বাবুরাম, রাম চাটুজ্যে। গোপাল ও মাস্টারকে দেখিয়া ঠাকুর হাসিতেছেন।

ঠাকুর গাড়ি থেকে নামিলেন। সঙ্গে বাবুরাম, আগে আগে মাস্টার পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন। মারোয়াড়ীদের বাড়িতে পোঁছিয়া দেখেন, নিচে কেবল কাপড়ের গাঁট উঠানে পড়িয়া আছে। মাঝে মাঝে গরুর গাড়িতে মাল বোঝাই হইতেছে। ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে উপর তলায় উঠিলেন। মারোয়াড়ীরাও আসিয়া তাঁহাকে একটি তেতলার ঘরে বসাইল। সে ঘরে মা-কালীর পট রহিয়াছে — ঠাকুর

দেখিয়া নমস্কার করিলেন, ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলেন ও সহাস্যে ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

একজন মারোয়াড়ী আসিয়া ঠাকুরের পদসেবা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর বলিলেন, থাক্ থাক্। আবার কি ভাবিয়া বলিলেন, আচ্ছা, একটু কর। প্রত্যেক কথাটি করুণামাখা।

মাস্টারকে বলিলেন, স্কুলের কি —

মাস্টার — আজ্ঞা, ছুটি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — কাল আবার অধরের ওখানে চণ্ডীর গান।

মারোয়াড়ী ভক্ত গৃহস্বামী, পণ্ডিতজীকে ঠাকুরের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। পণ্ডিতজী আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিতজীর সহিত অনেক ঈশ্বরীয় কথা হইতেছে।

[শ্রীরামকৃষ্ণের কামনা — ভক্তিকামনা — ভাব, ভক্তি, প্রেম — প্রেমের মানে]

অবতারবিষয়ক কথা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ভক্তের জন্য অবতার, জ্ঞানীর জন্য নয়।

পণ্ডিতজী — পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

“অবতার, প্রথম, ভক্তের আনন্দের জন্য হন; আর দ্বিতীয়, দুষ্টের দমনের জন্য। জ্ঞানী কিন্তু কামনাশূন্য।”

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — আমার কিন্তু সব কামনা যায় নাই। আমার ভক্তিকামনা আছে।

এই সময়ে পণ্ডিতজীর পুত্র আসিয়া ঠাকুরের পাদবন্দনা করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতজীর প্রতি) — আচ্ছা জী! ভাব কাকে বলে, আর ভক্তি কাকে বলে?

পণ্ডিতজী —— ঈশ্বরকে চিন্তা করে মনোবৃত্তি কোমল হয়ে যায়, তার নাম ভাব, যেমন সূর্য উঠলে বরফ গলে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— আচ্ছা জী! প্রেম কাকে বলে?

পণ্ডিতজী হিন্দীতে বরাবর কথা কহিতেছেন। ঠাকুরও তাঁহার সহিত অতি মধুর হিন্দিতে কথা কহিতেচেন। পণ্ডিতজী ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে প্রেমের অর্থ একরকম বুঝাইয়া দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতজীর প্রতি) — না, প্রেম মানে তা নয়। প্রেম মানে ঈশ্বরেতে এমন ভালবাসা যে জগৎ তো ভুল হয়ে যাবে। চৈতন্যদেবের হয়েছিল।

পণ্ডিতজী — আজ্ঞে হ্যাঁ, যেমন মাতাল হলে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা জী, কারু ভক্তি হয় কারু হয় না, এর মানে কি?

পণ্ডিতজী — ঈশ্বরের বৈষম্য নাই। তিনি কলপতরু, যে যা চায় সে তা পায়। তবে কল্পতরুর কাছে গিয়ে চাইতে হয়।

পণ্ডিতজী হিন্দীতে এ-সমস্ত বলিতেছেন। ঠাকুর মাস্টারের দিকে ফিরিয়া এই কথাগুলির অর্থ বলিয়া দিতেছেন।

[সমাধিতত্ত্ব]

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা জি, সমাধি কিরকম সব বল দেখি।

পণ্ডিতজী — সমাধি দুইপ্রকার — সবিকল্প আর নির্বিকল্প। নির্বিকল্প-সমাধিতে আর বিকল্প নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, ‘তদাকারকারিত’ ধ্যাতা, ধ্যেয় ভেদ থাকে না। আর চেতনসমাধি ও জড়সমাধি। নারদ শুকদেব এঁদের চেতনসমাধি। কেমন জী?

পন্ডিতজী — আজ্ঞা, হাঁ!

শ্রীরামকৃষ্ণ — আর জী, উন্মনাসমাধি আর স্থিতসমাধি; কেমন জী?

পণ্ডিতজী চুপ করিয়া রহিলেন; কোন কথা কহিলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা জী, জপতপ করলে তো সিদ্ধাই হতে পারে — যেমন গঙ্গার উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া?

পণ্ডিতজী — আজ্ঞে তা হয়, ভক্ত কিন্তু তা চায় না।

আর কিছু কথাবার্তার পর পণ্ডিতজী বলিলেন, একাদশীর দিন দক্ষিণেশ্বরে আপনাকে দর্শন করতে যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আহা, তোমার ছেলেটি বেশ।

পণ্ডিতজী — আর মহারাজ! নদীর এক ঢেউ যাচ্ছে, আর-এক ঢেউ আসছে। সবই অনিত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমার ভিতরে সার আছে।

পণ্ডিতজী কিয়ৎক্ষণ পরে প্রণাম করিলেন, বলিলেন, পূজা করতে তাহলে যাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আরে, বৈঠো, বৈঠো!

পন্ডিতজী আবার বসিলেন।

ঠাকুর হঠযোগের কথা পাড়িলেন। পণ্ডিতজী হিন্দিতে ঠাকুরের সহিত ওই সম্বন্ধে আলাপ করিতেছেন। ঠাকুর বলিলেন, হাঁ, ও-একরকম তপস্যা বটে, কিন্তু হঠযোগী দেহাভিমানী সাধু — কেবল দেহের দিকে মন।

পণ্ডিতজী আবার বিদায় গ্রহণ করিলেন। পূজা করিতে যাইবেন।

ঠাকুর পণ্ডিতজীর পুত্রের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিছু ন্যায়, বেদান্ত, আর দর্শন পড়লে শ্রীমদ্ভাগবত বেশ বোঝা যায়। কেমন?

পুত্র — হাঁ, মহারাজ! সাংখ্য দর্শন পড়া বড় দরকার।

এইরূপ কথা মাঝে মাঝে চলিতে লাগিল।

এইরূপ কথা মাঝে মাঝে চলিতে লাগিল।

হরিষে লাগি রহ রে ভাই,
তেরা বনত বনত বনি যাই,
তেরা বিগড়ী বাত বনি যাই।
অঙ্কা তারে বঙ্কা তারে, তারে সুজন কসাই
শুগা পড়ায়কে গণিকা তারে, তারে মীরাবাঈ।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২০শে অক্টোবর 1884/10/20/ii

36.11 অবতার কি এখন নাই?

গৃহস্বামী আসিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি মারোয়াড়ী ভক্ত, ঠাকুরকে বড় ভক্তি করেন। পণ্ডিতজীর ছেলেটি বসিয়া আছেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, “পাণিনি ব্যাকরণ কি এদেশে পড়া হয়?”

মাস্টার — আজ্ঞে, পাণিনি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হ্যাঁ, আর ন্যায়, বেদান্ত এ-সব পড়া হয়?

গৃহস্বামী ও-সব কথায় সায় না দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

গৃহস্বামী — মহারাজ, উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁর নামগুণকীর্তন। সাধুসঙ্গ। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা।

গৃহস্বামী — আজ্ঞে, এই আশীর্বাদ করুন, যাতে সংসারে মন কমে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — কত আছে? আট আনা? (হাস্য)

গৃহস্বামী — আজ্ঞে, তা আপনি জানেন। মহাত্মার দয়া না হলে কিছু হবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সেইখানে সন্তোষ করলে সকলেই সন্তুষ্ট হবে। মহাত্মার হৃদয়ে তিনিই আছেন তো।

গৃহস্বামী — তাঁকে পেলে তো কথাই থাকে না। তাঁকে যদি কেউ পায়, তবে সব ছাড়ে। টাকা পেলে পয়সার আনন্দ চেড়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিছু সাধন দরকার করে। সাধন করতে করতে ক্রমে আনন্দ লাভ হয়। মাটির অনেক নিচে যদি কলসী করা ধন থাকে, আর যদি কেউ সেই ধন চায়, তাহলে পরিশ্রম করে খুঁড়ে যেতে হয়। মাথা দিয়ে ঘাম পড়ে, কিন্তু অনেক খোঁড়ার পর কলসীর গায়ে যখন কোদাল লেগে ঠং করে উঠে, তখনই আনন্দ হয়। যত ঠং ঠং করবে ততই আনন্দ। রামকে ডেকে যাও; তাঁর চিন্তা কর। রামই সব যোগাড় করে দেবেন।

গৃহস্বামী — মহারাজ, আপনিই রাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সে কি, নদীরই হিল্লোল, হিল্লোলের কি নদী?

গৃহস্বামী — মহাত্মাদের ভিতরেই রাম আছেন। রামকে তো দেখা যায় না। আর এখন অবতার নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — কেমন করে জানলে, অবতার নাই?

গৃহস্বামী চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — অবতারকে সকলে চিনতে পারে না। নারদ যখন রামচন্দ্রকে দর্শন করতে গেলেন, রাম দাঁড়িয়া উঠে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কল্লেন আর বললেন, আমরা সংসারী জীব; আপনাদের মতো সাধুরা না এলে কি করে পবিত্র হব? আবার যখন সত্যপালনের জন্য বনে গেলেন, তখন দেখলেন, রামের বনবাস শুনে

অবধি ঋষিরা আহার ত্যাগ করে অনেকে পড়ে আছেন। রাম যে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, তা তাঁরা অনেকে জানেন নাই।

গৃহস্বামী — আপনিই সেই রাম!

শ্রীরামকৃষ্ণ — রাম! রাম! ও-কথা বলতে নাই।

এই বলিয়া ঠাকুর হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিলেন ও বলিলেন — "ওহি রাম ঘটঘটমে লেটা, ওহি রাম জগৎ পসেরা! আমি তোমাদের দাস। সেই রামই এই সব মানুষ, জীব, জন্তু হয়েছেন।"

গৃহস্বামী — মহারাজ, আমরা তো তা জানি না —

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি জান আর না জান, তুমি রাম!

গৃহস্বামী — আপনার রাগদ্বেষ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেন? যে গাড়োয়ানের কলকাতায় আসবার কথা ছিল। সে তিনআনা পয়সা নিয়ে গেল, আর এলো না, তার উপরে তো খুব চটে গিছলুম!

কিন্তু ভারী খারাপ লোক, দেখ না, কত কষ্ট দিলে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২০শে অক্টোবর 1884/10/20/iii

36.12 বড়বাজারে অন্নকূট-মহোৎসবের মধ্যে — ৺ময়ূরমুকুটধারীর পূজা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতেছেন। এদিকে মারোয়াড়ী ভক্তেরা বাহিরে ছাদের উপর ভজন আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীময়ূরমুকুটধারীর আজ মহোৎসব। ভোগের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে। ঠাকুরদর্শন করিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আহ্বান করিয়া তাঁহারা লইয়া গেলেন। ময়ূরমুকুটধারীকে দর্শন করিয়া ঠাকুর প্রণাম করিলেন ও নির্মাল্যধারণ করিলেন।

বিগ্রহদর্শন করিয়া ঠাকুর ভাবে মুগ্ধ। হাতজোড় করিয়া বলিতেছেন, "প্রাণ হে, গোবিন্দ মম জীবন! জয় গোবিন্দ, গোবিন্দ, বাসুদেব সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ! হা কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, জ্ঞান কৃষ্ণ, মন কৃষ্ণ, প্রাণ কৃষ্ণ, আত্মা কৃষ্ণ, দেহ কৃষ্ণ, জাত কৃষ্ণ, কুল কৃষ্ণ, প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন!"

এই কথাগুলি বলিতে বলিতে ঠাকুর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ হইলেন। শ্রীযুক্ত রাম চাটুজ্যে ঠাকুরকে ধরিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে সমাধিভঙ্গ হইল।

এদিকে মারোয়াড়ী ভক্তেরা সিংহাসনস্থ ময়ূরমুকুটধারী বিগ্রহকে বাহিরে লইয়া যাইতে আসিলেন। বাহিরে ভোগ আয়োজন হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিভঙ্গ হইয়াছে। মহানন্দে মারোয়াড়ী ভক্তেরা সিংহাসনস্থ বিগ্রহকে ঘরের বাহিরে লইয়া যাইতেছেন, ঠাকুরও সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন।

ভোগ হইল। ভোগের সময় মারোয়াড়ী ভক্তেরা কাপড়ের আড়াল করিলেন। ভোগান্তে আরতি ও গান হইতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহকে চামর ব্যজন করিতেছেন।

এইবার ব্রাহ্মণ ভোজন হইতেছে। ওই ছাদের উপরেই ঠাকুরের সম্মুখে এই সকল কার্য নিষ্পন্ন হইতে লাগিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে মারোয়াড়ীরা খাইতে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুর বসিলেন, ভক্তেরাও প্রসাদ পাইলেন।

[বড়বাজার হইতে রাজপথে — ‘দেওয়ালি’ দৃশ্যমধ্যে]

ঠাকুর বিদায় গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যা হইয়াছে। আবার রাস্তায় বড় ভিড়। ঠাকুর বলিলেন, “আমরা না হয় গাড়ি থেকে নামি; গাড়ি পেছন দিয়ে ঘুরে যাক।” রাস্তা দিয়া একটু যাইতে যাইতে দেখিলেন, পানওয়ালারা গর্তের ন্যায় একটি ঘরের সামনে দোকান খুলিয়া বসিয়া আছে। সে ঘরে প্রবেশ করিতে হইলে মাথা নিচু করিয়া প্রবেশ করিতে হয়। ঠাকুর বলিতেছেন, কি কষ্ট, এইটুকুর ভিতরে বদ্ধ হয়ে থাকে! সংসারীদের কি স্বভাব! ওইতেই আবার আনন্দময়!

গাড়ি ঘুরিয়া কাছে আসিল। ঠাকুর আবার গাড়িতে উঠিলেন। ভিতরে ঠাকুরের সঙ্গে বাবুরাম, মাস্টার, রাম চাটুজ্যে। ছোট গোপাল গাড়ির ছাদে বসিলেন।

একজন ভিখারিণী, ছেলে কোলে গাড়ির সম্মুখে আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। ঠাকুর দেখিয়া মাস্টারকে বলিলেন, কিগো পয়সা আছে? গোপাল পয়সা দিলেন।

বড়াবজার দিয়া গাড়ি চলিতেছে। দেওয়ালির ভারী ধুম। অন্ধকার রাত্রি কিন্তু আলোয় আলোকময়। বড়বাজারের গলি হইতে চিৎপুর রোডে পড়িল। সে স্থানেও আলোবৃষ্টি ও পিপীলিকার নামে লোকে লোকাকীর্ণ। লোক হাঁ করিয়া দুই পার্শ্বের সুসজ্জিত বিপণীশ্রেণী দর্শন করিতেছিল। কোথাও বা মিষ্টান্নের দোকান, পাত্রস্থিত নানাবিধ মিষ্টান্নে সুশোভিত। কোথাও বা আতর গোলাপের দোকান, নানাবিধ সুন্দর চিত্রে সুশোভিত। দোকানদারগণ মনোহর বেশ ধারণ করিয়া গোলাপপাশ হস্তে করিয়া দর্শকবৃন্দের গায়ে গোলাপজল বর্ষণ করিতেছিল। গাড়ি একটি আতরওয়ালার দোকানের সামনে আসিয়া পড়িল। ঠাকুর পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় ছবি ও রোশনাই দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন। চতুর্দিকে কোলাহল। ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছেন — আরও এগিয়ে দেখ, আরও এগিয়ে! ও বলিতে বলিতে হাসিতেছেন। বাবুরামকে উচ্চহাস্য করিয়া বলিতেছেন, ওরে এগিয়ে পড় না, কি করছিস?

[“এগিয়ে পড়” — শ্রীরামকৃষ্ণের সঞ্চয় করবার জো নাই]

ভক্তেরা হাসিতে লাগিলেন; বুঝিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন, ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে পড়, নিজের বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়ে থেকো না। ব্রহ্মচারী কাঠুরিয়াকে বলিয়াছিল, এগিয়ে পড়। কাঠুরিয়া এগিয়ে ক্রমে ক্রমে দেখে, চন্দনগাছের বন; আবার কিছুদিন পরে এগিয়ে দেখে, রূপার খনি; আবার এগিয়ে দেখে, সোনার খনি; শেষে দেখে হীরা মাণিক! তাই ঠাকুর বারবার বলিতেছেন, এগিয়ে পড়

এগিয়ে পড়। গাড়ি চলিতে লাগিল। মাস্টার কাপড় কিনিয়াছেন, ঠাকুর দেখিয়াছেন। দুইখানি তেলধুতি ও দুইখানি ধোয়া। ঠাকুর কিন্তু কেবল তেলধুতি কিনিতে বলিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, তেলধুতি দুখানি সঙ্গে দাও, বরং ও কাপড়গুলি এখন নিয়ে যাও, তোমার কাছে রেখে দেবে। একখানা বরং দিও।

মাস্টার — আজ্ঞা, একখানা ফিরিয়ে নিয়ে যাব?

শ্রীরামকৃষ্ণ — না হয় এখন থাক, দুইখানাই নিয়ে যাও।

মাস্টার — যে আজ্ঞা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আবার যখন দরকার হবে, তখন এনে দেবে। দেখ না, কাল বেণী পাল রামলালের জন্য গাড়িতে খাবার দিতে এসেছিল। আমি বললুম, আমার সঙ্গে জিনিস দিও না। সঞ্চয় করবার জো নাই।

মাস্টার — আজ্ঞা হাঁ, তার আর কি। এ সাদা দুখানা এখন ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে) — আমার মনে একটা কিছু হওয়া তোমাদের ভাল না। — এ তো আপনার কথা, যখন দরকার হবে, বলব।

মাস্টার (বিনীতভাবে) — যে আজ্ঞা।

গাড়ি একটি দোকানের সামনে আসিয়া পড়িল, সেখানে কলকে বিক্রী হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ রাম চাটুজ্যেকে বলিলেন, রাম, একপয়সার কলকে কিনে লও না!

ঠাকুর একটি ভক্তের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি তাকে বললুম কাল বড়বাজারে যাব, তুই যাস। তা বলে কি জান? “আবার ট্রামের চার পয়সা ভাড়া১ লাগবে; কে যায়।” বেণী পালের বাগানে কাল গিছল, সেখানে আবার আচার্যগিরি কল্লে। কেউ বলে নাই, আপনিই গায় — যেন লোকে জানুক, আমি ব্রহ্মজ্ঞানীদেরই একজন। (মাস্টারের প্রতি) — হ্যাঁগা, এ কি বল দেখি, বলে, একানা আবার খরচ লাগবে!

মারোয়াড়ী ভক্তদের অন্নকূটের কথা আবার পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — এ যা দেখলে, বৃন্দাবনেও তাই। রাখালরা২ বৃন্দাবনে এই সব দেখছে। তবে সেখানে অন্নকূট আরও উঁচু; লোকজনও অনেক, গোবর্ধন পর্বত আছে — এই সব প্রভেদ।

[হিন্দুধর্ম সনাতন ধর্ম]

“কিন্তু খোট্টাদের কি ভক্তি দেখেছ! যথার্থই হিন্দুভাব। এই সনাতন ধর্ম। — ঠাকুরকে নিয়ে যাবার সময় কত আনন্দ দেখলে। আনন্দ এই ভেবে যে, ভগবানের সিংহাসন আমরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

“হিন্দুধর্মই সনাতন ধর্ম! ইদানীং যে সকল ধর্ম দেখছ এ-সব তাঁর ইচ্ছাতে হবে যাবে — থাকবে না। তাই আমি বলি, ইদানীং যে সকল ভক্ত, তাদেরও চরণেভ্যো নমঃ। নিন্দুধর্ম বরাবর আছে আর বরাবর থাকবে।”

মাস্টার বাড়ি প্রত্যাগমন করিবেন। ঠাকুরের চরণ বন্দনা করিয়া শোভাবাজারের কাছে নামিলেন। ঠাকুর আনন্দ করিতে করিতে গাড়িতে যাইতেছেন।

১ তখন ট্রামের ভাড়া এক আনা।

২ শ্রীযুক্ত রাখাল তখনও (অক্টোবরে) বৃন্দাবনে ছিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c37 ৩৭ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৬শে অক্টোবর 1884/10/26/i

37.1 দক্ষিণেশ্বরে মনোমোহন, মহিমা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

চল ভাই, আবার তাঁকে দর্শন করিতে যাই। সেই মহাপুরুষকে, সেই বালককে দেখিব, যিনি মা বই আর কিছু জানেন না; যিনি আমাদের জন্য দেহধারণ করে এসেছেন — তিনি বলে দেবেন, কি করে এই কঠিন জীবন-সমস্যা পূরণ করতে হবে! সন্ন্যাসীকে বলে দেবেন, গৃহীকে বলে দেবেন! অদ্বারিত দ্বার! দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। চল, চল, তাঁকে দেখব।

"অনন্ত গুণাধার প্রসন্নমূরতি, শ্রবণে যাঁর কথা আঁখি ঝরে!"

চল ভাই, অহেতুক-কৃপাসিন্ধু, প্রিয়দর্শন, ঈশ্বরপ্রেমে নিশিদিন মাতোয়ারা, সহাস্যবদন শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করে মানব-জীবন সার্থক করি!

আজ রবিবার, ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৪; হেমন্তকাল। কার্তিকের শুক্লা সপ্তমী তিথি। দু'প্রহর বেলা। ঠাকুরের সেই পূর্বপরিচিত ঘরে ভক্তেরা সমবেত হইয়াছেন। সে ঘরের পশ্চিম গায়ে অর্ধচন্দ্রাকার বারান্দা। বারান্দার পশ্চিমে উদ্যানপথ; উত্তর-দক্ষিণে যাইতেছে। পথের পশ্চিমে মা-কালীর পুষ্পোদ্যান, তাহার পরই পোস্তা, তৎপরে পবিত্র-সলিলা দক্ষিণবাহিনী গঙ্গা।

ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত। আজ আনন্দের হাট। আনন্দময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরপ্রেম ভক্তমুখদর্পণে মুকুরিত হইতেছিল। কি আশ্চর্য! আনন্দ কেবল ভক্তমুখদর্পণে কেন? বাহিরের উদ্যানে, বৃক্ষপত্রে, নানাবিধ যে কুসুম ফুটিয়া রহিয়াছে তন্মধ্যে, বিশাল ভাগীরথী বক্ষে, রবিকর প্রদীপ্ত নীলনভোমণ্ডলে, মুরারিচরণচ্যুত গঙ্গা-বারিকণাবাহী শীতল সমীরণ মধ্যে, এই আনন্দ প্রতিভাসিত হইতেছিল। কি আশ্চর্য! সত্য সত্যই "মধুমৎ পার্থিবং

রজঃ” — উদ্যানের ধূলি পর্যন্ত মধুময়! — ইচ্ছা হয়, গোপনে বা ভক্তসঙ্গে এই ধূলির উপর গড়াগড়ি দিই! ইচ্ছা হয়, এই উদ্যানের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমস্ত দিন এই মনোহারী গঙ্গাবারি দর্শন করি। ইচ্ছা হয়, এই উদ্যানের তরুলতাগুল্ম ও পত্রপুষ্পশোভিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল বৃক্ষগুলিকে আত্মীয়জ্ঞানে সাদর সম্ভাষণ ও প্রেমালিঙ্গন দান করি। এই ধূলির উপর দিয়া কি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাদচারণ করেন! এই বৃক্ষলতাগুল্মমধ্যে দিয়া তিনি কি অহরহ যাতায়াত করেন! ইচ্ছা করে জ্যোতির্ময় গগনপানে অনন্যদৃষ্টি হইয়া তাকাইয়া থাকি! কেননা দেখিতেছি ভূলোক-দ্যুলোক সমস্তই প্রেমানন্দে ভাসিতেছে!

ঠাকুরবড়ির পূজারী, দৌবারিক, পরিচারকম সকলকে কেন পরমাত্মীয় বোধ হইতেছে — কেন এ-স্থান বহুদিনানন্তে দৃষ্ট জন্মভূমির ন্যায় মধুর লাগিতেছে? আকাশ, গঙ্গা, দেবমন্দির, উদ্যানপথ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, সেবকগণ, আসনে উপবিষ্ট ভক্তগণ, সকলে যেন এক জিনিসের তৈয়ারী বোধ হইতেছে। যে জিনিসে নির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ, এঁরাও বোধ হইতেছে সেই জিনিসের হইবেন। যেন একটি মোমের বাগান, গাছপালা, ফল, পাতা, সব মোমের; বাগানের পথ, বাগানের মালী, বাগানের নিবাসীগণ, বাগান মধ্যস্থিত গৃহ সমস্তই মোমের। এখানকার সব আনন্দ দিয়ে গড়া!

শ্রীমনোমোহন, শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ, মাস্টার উপস্থিত ছিলেন। ক্রমে ঈশান, হৃদয় ও হাজরা। এঁরা ছাড়া অনেক ভক্তেরা ছিলেন। বলরাম, রাখাল, এঁরা তখন শ্রীবৃন্দাবনধামে। এই সময়ে নূতন ভক্তেরা আসেন যান; নারাণ, পল্টু, ছোট নরেন, তেজচন্দ্র, বিনোদ, হরিপদ। বাবুরাম আসিয়া মাঝে মাঝে থাকেন। রাম, সুরেশ, কেদার ও দেবেন্দ্রাদি ভক্তগণ প্রায় আসেন — কেহ কেহ সপ্তাহান্তে, কেহ দুই

সপ্তাহের পার। লাটু থাকেন। যোগীনের বাড়ি নিকটে, তিনি প্রায় প্রত্যহ যাতায়াত করেন। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে আসেন, এলেই আনন্দের হাট। নরেন্দ্র তাঁহার সেই দেবদুর্লভ কণ্ঠে ভগবানের নামগুণগান করেন, অমনি ঠাকুরের নানাবিধ ভাব ও সমাধি হইতে থাকে। একটি যেন উৎসব পড়িয়া যায়। ঠাকুরের ভারী ইচ্ছা, ছেলেদের কেহ তাঁর কাছে রাত্রিদিন থাকেন, কেননা তারা শুদ্ধাত্মা, সংসারে বিবাহাদিসূত্রে বা বিষয়কর্মে আবদ্ধ হয় নাই। বাবুরামকে থাকিতে বলেন; তিনি মাঝে মাঝে থাকেন। শ্রীযুক্ত অধর সেন প্রায় আসেন।

ঘরের মধ্যে ভক্তেরা বসিয়া আছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বালকের ন্যায় দাঁড়াইয়া কি ভাবছেন। ভক্তেরা চেয়ে আছেন।

[অব্যক্ত ও ব্যক্ত — The Undifferentiated and the Diffrentiated]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মনোমোহনের প্রতি) — সব রাম দেখছি! তোমরা সব বসে আছ, দেখছি রামই সব এক-একটি হয়েছেন।

মনোমোহন — রামই সব হয়েছেন; তবে আপনি যেমন বলেন, “অপো নারায়ণ”, জলই নারায়ণ; কিন্তু কোন জল খাওয়া যায়, কোন জলে মুখ ধোয়া চলে, কোন জলে বাসন মাজা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, কিন্তু দেখছি তিনিই সব। জীবজগৎ তিনি হয়েছেন।

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিলেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যে আঁট ও সঞ্চয়ে বিঘ্ন]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি) — “হ্যাঁগা, সত্যকথা কহিতে হবে বলে কি আমার শুচিবাঙ্গ হল নাকি! যদি হঠাৎ বলে ফেলি, খাব না, তবে খিদে পেলেও আর খাবার জো নাই। যদি বলি ঝাউতলায় আমার গাড়ু নিয়ে অমুক লোকের যেতে হবে, — আর কেউ নিয়ে গেলে তাকে আবার ফিরে যেতে বলতে হবে। একি হল বাপু! এর কি কোন উপায় নাই।

“আবার সঙ্গে করে কিছু আনবার জো নাই। পান, খাবার —— কোন জিনিস সঙ্গে করে আনবার জো নাই। তাহলে সঞ্চয় হল কিনা। হাতে মাটি নিয়ে আসবার জো নাই।”

এই সময় একটি লোক আসিয়া বলিল, মহাশয়! হৃদয়১ যদু মল্লিকের বাগানে এসেছে, ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে; আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলিতেছেন, হৃদের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি, তোমরা বসো। এই বলিয়া কালো বার্নিশ করা চটি জুতাটি পরে পূর্বদিকের ফটক অভিমুখে চলিলেন। সঙ্গে কেবল মাস্টার। লাল সুরকির উদ্যান-পথ। সেই পথে ঠাকুর পূর্বাস্য হইয়া যাইতেছেন। পথে খাজাঞ্চী দাঁড়াইয়াছিলেন ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। দক্ষিণে উঠানের ফটক রহিল, সেখানে শ্মশ্রুবিশিষ্ট দৌবারিকগণ বসিয়াছিল। বামে কুঠি —— বাবুদের বৈঠকখানা; আগে এখানে নীলকুঠি ছিল তাই কুঠি বলে। তৎপরে পথের দুইদিকে কুসুম বৃক্ষ, — অদূরে পথের ঠিক দক্ষিণদিকে গাজীতলা ও মা-কালীর পুষ্করিণীর সোপানাবলিশোভিত ঘাট। ক্রমে পূর্বদ্বার, বামদিকে দ্বারবানদের ঘর ও দক্ষিণে তুলসীমঞ্চ। উদ্যানের বাহিরে আসিয়া দেখেন, যদু মল্লিকের বাগানে ফটকের কাছে হৃদয় দণ্ডায়মান।

১ হৃদয় মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে ঠাকুরের ভাগিনেয়। ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুরের নিকট সিওড়ে হৃদয়ের বাড়ি। প্রায় বিংশতি বর্ষ ঠাকুরের কাছে থাকিয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে মা-কালীর পূজা ও ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি বাগানের কর্তৃপক্ষীয়দের অসন্তোষভাজন হওয়াতে তাঁহার বাগানে প্রবেশ করিবার হুকুম ছিল না। হৃদয়ের মাতামহী ঠাকুরের পিসী।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৬শে অক্টোবর 1884/10/26/ii

37.2 সেবক সন্নিকটে — হৃদয় দণ্ডায়মান

হৃদয় কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান। দর্শনমাত্র রাজপথের উপর দণ্ডের ন্যায় নিপতিত হইলেন। ঠাকুর উঠিতে বলিলেন। হৃদয় আবার হাতজোড় করিয়া বালকের মতো কাঁদিতেছেন।

কি আশ্চর্য! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও কাঁদিতেছেন! চক্ষের কোণে কয়েক ফোঁটা জল দেখা দিল! তিনি অশ্রুবারি হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিলেন — যেন চক্ষে জল পড়ে নাই। একি! যে হৃদয় তাঁকে কত যন্ত্রণা দিয়াছিল তার জন্য ছুটে এসেছেন! আর কাঁদছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ — এখন যে এলি?

হৃদয় (কাঁদিতে কাঁদিতে) — তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। আমার দুঃখ আর কার কাছে বলব?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সান্ত্বনার্থ সহাস্যে) — সংসারে এইরূপ দুঃখ আছে। সংসার করতে গেলেই সুখ-দুঃখ আছে। (মাস্টারকে দেখাইয়া) এঁরা এক-একবার তাই আসে; এসে ঈশ্বরীয় কথা দুটো শুনলে মনে শান্তি হয়। তোর কিসের দুঃখ?

হৃদয় (কাঁদিতে কাঁদিতে) — আপনার সঙ্গ ছাড়া, তাই দুঃখ!

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুই তো বলেছিলি, 'তোমার ভাব তোমাতে থাক আমার ভাব আমাতে থাক।'

হৃদয় — হাঁ, তা তো বলেছিলাম — আমি কি জানি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — আজ এখন তবে আয়, আর-একদিন তখন বসে কথা কহিব। আজ রবিবার অনেক লোক এসেছে, তারা বসে রয়েছে। এবার দেশে ধান-টান কেমন হয়েছে?

হৃদয় — হাঁ, তা একরকম মন্দ হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আজ তবে আয়, আবার একদিন আসিস।

হৃদয় আবার সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিল। ঠাকুর সেই পথ দিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। সঙ্গে মাস্টার।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — আমার সেবাও যত করেছে, যন্ত্রণাও তেমনি দিয়েছে! আমি যখন পেটের ব্যারামে দুখানা হাড় হয়ে গেছি — কিছু খেতে পারতুম না তখন আমায় বললে, “এই দেখ আমি কেমন খাই, তোমার মনের গুণে খেতে পারো না।” আবার বলতো, “বোকা — আমি না থাকলে তোমার সাধুগিরি বেরিয়ে যেত।” একদিন এরকম করে যন্ত্রণা দিলে যে পোস্তার উপর দাঁড়িয়ে জোয়ারের জলে দেহত্যাগ করতে গিয়েছিলুম!

মাস্টার শুনিয়া অবাক্‌! বোধ হয় ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য! এমন লোকের জন্য ইনি অশ্রুবারি বিসর্জন করিতেছিলেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — আচ্ছা, অত সেবা করত, — তবে কেন ওর এমন হল? ছেলেকে যেমন মানুষ করে, সেইরকম করে আমাকে দেখেছে। আমি তো রাতদিন বেহুঁশ হয়ে থাকতুম, তার উপর আবার অনেকদিন ধরে ব্যামোয় ভুগেছি। ও যেরকম করে আমায় রাখত, সেইরকম আমি থাকতুম।

মাস্টার কি বলিবেন, চুপ করিয়া রহিলেন। হয়তো ভাবিতেছিলেন, হৃদয় বুঝি নিষ্কাম হইয়া ঠাকুরের সেবা করেন নাই!

কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর নিজের ঘরে পৌঁছিলেন। ভক্তেরা প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ঠাকুর আবার ছোট খাটটিতে বসিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৬শে অক্টোবর 1884/10/26/iii

37.3 ভক্তসঙ্গে — নানাপ্রসঙ্গে — ভাব মহাভাবের গূঢ়তত্ত্ব

শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ প্রভৃতি ছাড়া কয়েকটি কোন্নগরের ভক্ত আসিয়াছেন; একজন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কিয়ৎকাল বিচার করেছিলেন।

কোন্নগরের ভক্ত — মহাশয় শুনলাম যে, আপনার ভাব হয়, সমাধি হয়। কেন হয়, কিরূপে হয়, আমাদের বুঝিয়ে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — শ্রীমতীর মহাভাব হত, সখীরা কেহ ছুঁতে গেলে অন্য সখী বলত, 'কৃষ্ণবিলাসের অঙ্গ ছুঁসনি — এঁর দেহমধ্যে এখন কৃষ্ণ বিলাস করছেন।' ঈশ্বর অনুভব না হলে ভাব বা মহাভাব হয় না। গভীর জল থেকে মাছ এলে জলটা নড়ে, — তেমন মাছ হলে জল তোলপাড় করে। তাই 'ভাবে হাসে কাঁদে, নাচে গায়।'

"অনেকক্ষণ ভাবে থাকা যায় না। আয়নার কাছে বসে কেবল মুখ দেখলে লোকে পাগল মনে করবে।"

কোন্নগরের ভক্ত — শুনেছি, মহাশয় ঈশ্বরদর্শন করে থাকেন, তাহলে আমাদের দেখিয়ে দিন।

[কর্ম বা সাধনা না করলে ঈশ্বরদর্শন হয় না]

শ্রীরামকৃষ্ণ — সবই ঈশ্বরাধীন — মানুষে কি করবে? তাঁর নাম করতে করতে কখনও ধারা পড়ে; কখনও পড়ে না। তাঁর ধ্যান করতে এক-একদিন বেশ উদ্দীপন হয় — আবার একদিন কিছুই হল না।

“কর্ম চাই, তবে দর্শন হয়। একদিন ভাবে হালদার-পুকুর১ দেখলুম। দেখি, একজন ছোটলোক পানা ঠেলে জল নিচ্ছে, আর হাত তুলে এক-একবার দেখছে। যেন দেখালে, পানা না ঠেললে জল দেখা যায় না — কর্ম না করলে ভক্তিলাভ হয় না, ঈশ্বরদর্শন হয় না। ধ্যান, জপ, এই সব কর্ম, তাঁর নাম গুণকীর্তনও কর্ম — আবার দান, যজ্ঞ এ-সবও কর্ম।

“মাখন যদি চাও, তবে দুধকে দই পাততে হয়। তারপর নির্জনে রাখতে হয়। তারপর দই বসলে পরিশ্রম করে মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা হয়।”

মহিমাচরণ — আজ্ঞা হাঁ, কর্ম চাই বইকি! অনেক খাটতে হয়, তবে লাভ হয়। পড়তেই কত হয়! অনন্ত শাস্ত্র।

[আগে বিদ্যা (জ্ঞানবিচার) — না আগে ঈশ্বরলাভ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) — শাস্ত্র কত পড়বে? শুধু বিচার করলে কি হবে? আগে তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর, গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে কিছু কর্ম কর। গুরু

না থাকেন, তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, তিনি কেমন — তিনিই জানিয়ে দিবেন।

“বই পড়ে কি জানবে? যতক্ষণ না হাটে পোঁছানি যায় ততক্ষণ দূর হতে কেবল হো-হো শব্দ। হাটে পোঁছিলে আর-একরকম। তখন স্পষ্ট দেখতে পাবে, শুনতে পাবে। ‘আলু নাও’ ‘পয়সা দাও’ স্পষ্ট শুনতে পাবে।

“সমুদ্র দূর হতে হো-হো শব্দ করছে। কাছে গেলে কত জাহাজ যাচ্ছে, পাখি উড়ছে, ঢেউ হচ্ছে — দেখতে পাবে।

“বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাত। তাঁকে দর্শনের পর বই, শাস্ত্র, সায়েন্স সব খড়কুটো বোধ হয়।

“বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। তাঁর ক’খানা বাড়ি, ক’টা বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, এ আগে জানবার জন্য অত ব্যস্ত কেন? চাকরদের কাছে গেলে তারা দাঁড়াতেই দেয় না, — কোম্পানির কাগজের খবর কি দিবে! কিন্তু জো-সো করে বড়বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কর, তা ধাক্কা খেয়েই হোক, আর বেড়া ডিঙ্গিয়েই হোক, — তখন কত বাড়ি, কত বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, তিনিই বলে দিবেন। বাবুর সঙ্গে আলাপ হলে আবার চাকর, দ্বারবান সব সেলাম করবে।”২ (সকলের হাস্য)

ভক্ত — এখন বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ কিসে হয়? (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাই কর্ম চাই। ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাকলে হবে না।

“জো-সো করে তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা কর; ‘দেখা দাও’ বলে ব্যাকুল হয়ে কাঁদো। কামিনী-কাঞ্চনের জন্য পাগল হয়ে বেড়াতে পার; তবে তাঁর জন্য একটু পাগল হও। লোকে বলুক যে ঈশ্বরের জন্য অমুক পাগল হয়ে গেছে। দিন কতক না হয়ে সব ত্যাগ করে তাঁকে একলা ডাকো।

“শুধু ‘তিনি আছেন’ বলে বসে থাকলে কি হবে? হালদার-পুকুরে বড় মাছ আছে। পুকুরের পাড়ে শুধু বসে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায়? চার করো, চারা ফেলো, ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আসবে আর জল নড়বে। তখন আনন্দ হবে। হয়তো মাছটার খানিকটা একবার দেখা গেল — মাছটা ধপাঙ্‌ করে উঠল। যখন দেখা গেল, তখন আরও আনন্দ।

“দুধকে দই পেতে মন্থন করলে তবে তো মাখন পাবে।

(মহিমার প্রতি) — “এ তো ভাল বালাই হল! ঈশ্বরকে দেখিয়ে দাও, আর উনি চুপ করে বসে থাকবেন। মাখন তুলে মুখের কাছে ধরো। (সকলের হাস্য) ভাল বালাই — মাছ ধরে হাতে দাও।

“একজন রাজাকে দেখতে চায়। রাজা আছেন সাত দেউড়ির পরে। প্রথম দেউড়ি পার না হতে হতে বলে, ‘রাজা কই?’ যেমন আছে, এক-একটা দেউড়ি তো পার হতে হবে!”

[ঈশ্বরলাভের উপায় — ব্যাকুলতা]

মহিমাচরণ — কি কর্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যেতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — এই কর্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যাবে, আর এ-কর্মের দ্বারা পাওয়া যাবে না, তা নয়। তাঁর কৃপার উপর নির্ভর। তবে ব্যাকুল হয়ে কিছু কর্ম করে যেতে হয়। ব্যাকুলতা থাকলে তাঁর কৃপা হয়।

“একটা সুযোগ হওয়া চাই। সাধুসঙ্গ, বিবেক, সদ্‌গুরুলাভ, হয়তো একজন বড়ভাই সংসারে ভার নিলে; হয়তো স্ত্রীটি বিদ্যাশক্তি, বড় ধার্মিক; কি বিবাহ আদপেই হল না, সংসারে বদ্ধ হতে হল না; — এই সব যোগাযোগ হলে হয়ে যায়।

“একজনের বাড়িতে ভারী অসুখ — যায় যায়। কেউ বললে, স্বাতী নক্ষত্রে বৃষ্টি পড়বে, সেই বৃষ্টির জল মড়ার-মাথার খুলিতে থাকবে, আর একটা সাপ ব্যাঙকে তেড়ে যাবে, ব্যাঙকে ছোবল মারবার সময় ব্যাঙটা যেই লাফ দিয়ে পালাবে, অমনি সেই সাপের বিষ মড়ার মাথার খুলিতে পড়ে যাবে; সেই বিষের ঔষধ তৈয়ার করে যদি খাওয়াতে পার, তবে বাঁচে। তখন যার বাড়িতে অসুখ, সেই লোক দিন-ক্ষণ-নক্ষত্র দেখে বাড়ি থেকে বেরুল, আর ব্যাকুল হয়ে ওই সব খুঁজতে লাগল। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকছে, ‘ঠাকুর! তুমি যদি জোটপাট করে দাও, তবেই হয়!’ এইরূপে যেতে যেতে সত্য সত্যই দেখতে পেলে, একটা মড়ার মাথার খুলি পড়ে রয়েছে। দেখতে দেখতে একপশলা বৃষ্টিও হল। তখন সে ব্যক্তি বলছে, ‘হে গুরুদেব! মরার মাথার খুলিও পেলুম, স্বাতীনক্ষত্রে বৃষ্টিও হল, সেই বৃষ্টির জলও ওই খুলিতে পড়েছে; এখন কৃপা করে আর কয়টির যোগাযোগ করে দাও ঠাকুর।’ ব্যাকুল হয়ে ভাবছে। এমন সময় দেখে একটা বিষধর সাপ আসছে। তখন লোকটির ভারী আহ্লাদ; সে এন ব্যাকুল হল যে বুক দুরদুর করতে লাগল; আর সে বলতে লাগল, ‘হে গুরুদেব! এবার সাপও

এসেছে; অনেকগুলির যোগাযোগও হল। কৃপা করে এখন আর যেগুলি বাকী আছে, সেগুলি করিয়ে দাও!’ বলতে বলতে ব্যাঙও এল, সাপটা ব্যাঙ তাড়া করে যেতেও লাগল; মড়ার মাথার খুলির কাছে এসে যেই ছোবল দিতে যাবে, ব্যাঙটা লাফিয়ে ওদিকে গিয়ে পড়ল আর বিষ অমনি খুলির ভিতর পড়ে গেল। তখন লোকটি আনন্দে হাততালি দিয়ে নাচতে লাগল।

“তাই বলছি ব্যাকুলতা থাকলে সব হয়ে যায়।”

১ হুগলী জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রামে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাড়ি। সেই বাড়ির সম্মুখে হালদার-পুকুর, একটি দীঘি বিশেষ।

২ "Seek ye first the kingdom of Heaven and all other things shall be added unto you."

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৬শে অক্টোবর 1884/10/26/iv

37.4 সন্ন্যাস ও গৃহস্থাশ্রম — ঈশ্বরলাভ ও ত্যাগ — ঠিক সন্ন্যাসী কে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — মন থেকে সব ত্যাগ না হলে ঈশ্বরলাভ হয় না। সাধু সঞ্চয় করতে পারে না। সঞ্চয় না করে “পন্‌ছী আউর দরবেশ।” পাখি আর সাধু সঞ্চয় করে না। এখানকার ভাব, — হাতে মাটি দেবার জন্য মাটি নিয়ে যেতে

পারি না। বেটুয়াটা করে পান আনবার জো নাই। হৃদে যখন বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে, তখন এখান থেকে কাশী চলে যাব মতলব হল। ভাবলুম কাপড় লব — কিন্তু টাকা কেমন করে লব? আর কাশী যাওয়া হল না। (সকলের হাস্য)

(মহিমার প্রতি) — "তোমরা সংসারী লোক। এও রাখ, অও রাখ। সংসারও রাখ, ধর্মও রাখ।"

মহিমা — 'এ, ও' কি আর থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি পঞ্চবটীর কাছে গঙ্গার ধারে 'টাকা মাটি, মাটিই টাকা, টাকাই মাটি', এই বিচার করতে করতে যখন গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম, তখন একটু ভয় হল। ভাবলুম, আমি কি লক্ষ্মীছাড়া হলুম! মা-লক্ষ্মী যদি খ্যাঁট বন্ধ করে দেন, তাহলে কি হবে। তখন হাজরার মতো পাটোয়ারী করলুম। বললুম, মা! তুমি যেন হৃদয়ে থেকো! একজন তপস্যা করাতে ভগবতী সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তুমি বর লও। সে বললে, মা যদি বর দিবে, তবে এই কর যেন আমি নাতির সঙ্গে সোনার থালে ভাত খাই। এক বরেতে নাতি, ঐশ্বর্য, সোনার থাল সব হল! (সকলের হাস্য)

"মন থেকে কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ হলে ঈশ্বরে মন যায়, মন গিয়ে লিপ্ত হয়। যিনি বদ্ধ, তিনিই মুক্ত হতে পারেন। ঈশ্বর থেকে বিমুখ হলেই বদ্ধ — নিকতির নিচের কাঁটা উপরের কাঁটা থেকে তফাত হয় কখন, যখন নিকতির বাটিতে কামিনী-কাঞ্চনের ভার পড়ে।

“ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়ে কেন কাঁদে? গর্ভে ছিলাম, যোগে ছিলাম’। ভূমিষ্ঠ হয়ে এই বলে কাঁদে — কাঁহা এ, কাঁহা এ; এ কোথায় এলুম, ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা করছিলাম, এ আবার কোথায় এলাম।

“তোমাদের পক্ষে মনে ত্যাগ — সংসার অনাসক্ত হয়ে কর।”

[সংসারত্যাগ কি দরকার?]

মহিমা — তাঁর উপর মন গেলে আর কি সংসার থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — সে কি? সংসারে থাকবে না তো কোথায় যাবে? আমি দেখছি যেখানে থাকি, রামের অযোধ্যায় আছি। এই জগৎসংসার রামের অযোধ্যা। রামচন্দ্র গুরুর কাছে জ্ঞানলাভ করবার পর বললেন, আমি সংসারত্যাগ করব। দশরথ তাঁকে বুঝাবার জন্য বশিষ্ঠকে পাঠালেন। বশিষ্ঠ দেখলেন, রামের তীব্র বৈরাগ্য। তখন বললেন, “রাম, আগে আমার সঙ্গে বিচার কর, তারপর সংসারত্যাগ করো। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, সংসার কি ঈশ্বর ছাড়া? তা যদি হয় তুমি ত্যাগ কর।” রাম দেখলেন, ঈশ্বরই জীবজগৎ সব হয়েছেন। তাঁর সত্তাতে সমস্ত সত্য বলে বোধ হচ্ছে। তখন রামচন্দ্র চুপ করে রইলেন।

“সংসারে কাম, ক্রোধ এই সবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, নানা বাসনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, আসক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধ কেল্লা থেকে হলেই সুবিধা। গৃহ থেকে যুদ্ধই ভাল; — খাওয়া মেলে, ধর্মপত্নী অনেকরকম সাহায্য করে। কলিতে অন্নগত প্রাণ — অন্নের জন্য সাত জায়গায় ঘুরার চেয়ে এক জায়গাই ভাল। গৃহে, কেল্লার ভিতর থেকে যেন যুদ্ধ করা।

"আর সংসারে থাকো ঝড়ের এঁটো পাত হয়ে। ঝড়ের এঁটো পাতাকে কখনও ঘরের ভিতরে লয়ে যায়, কখনও আঁস্তাকুড়ে। হাওয়া যেদিকে যায়, পাতাও সেইদিকে যায়। কখনও ভাল জায়গায়, কখনও মন্দ জায়গায়! তোমাকে এখন সংসারে ফেলেছেন, ভাল, এখন সেই স্থানেই থাকো — আবার যখন সেখান থেকে তুলে ওর চেয়ে ভাল জায়গায় লয়ে ফেলবেন, তখন যা হয় হবে।"

[সংসারে আত্মসমর্পণ (Resignation) রামের ইচ্ছা]

"সংসারে রেখেছেন তা কি করবে? সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করো — তাঁকে আত্মসমর্পণ করো। তাহলে আর কোন গোল থাকবে না। তখন দেখবে, তিনিই সব করছেন। সবই রামের ইচ্ছা।"

একজন ভক্ত — 'রামের ইচ্ছা' গল্পটি কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কোন এক গ্রামে একটি তাঁতী থাকে। বড় ধার্মিক, সকলেই তাকে বিশ্বাস করে আর ভালবাসে। তাঁতী হাটে গিয়ে কাপড় বিক্রি করে। খরিদ্দার দাম জিজ্ঞাসা করলে বলে, রামের ইচ্ছা, সুতার দাম একটাকা, রামের ইচ্ছা মেহন্নতের দাম চারি আনা, রামের ইচ্ছা, মুনাফা দুই আনা। কাপড়ের দাম রামের ইচ্ছা একটাকা ছয় আনা। লোকের এত বিশ্বাস যে তৎক্ষণাৎ দাম ফেলে দিয়ে কাপড় নিত। লোকটি ভারী ভক্ত, রাত্রিতে খাওয়াদাওয়ার পরে অনেকক্ষণ চণ্ডীমণ্ডপে বসে ঈশ্বরচিন্তা করে, তাঁর নামগুণকীর্তন করে। একদিন অনেক রাত হয়েছে, লোকটির ঘুম হচ্ছে না, বসে আছে, এক-একবার তামাক খাচ্ছে; এমন সময় সেই পথ দিয়ে একদল ডাকাত ডাকাতি করতে যাচ্ছে। তাদের মুটের

অভাব হওয়াতে ওই তাঁতীকে এসে বললে, আয় আমাদের সঙ্গে — এই বলে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল। তারপর একজন গৃহস্থের বাড়ি গিয়ে ডাকাতি করলে। কতকগুলো জিনিস তাঁতীর মাথায় দিলে। এমন সময় পুলিশ এসে পড়ল। ডাকাতেরা পালাল, কেবল তাঁতীটি মাথায় মোট ধরা পড়ল। সে রাত্রি তাকে হাজতে রাখা হল। পরদিন ম্যাজিস্টার সাহেবের কাছে বিচার। গ্রামের লোক জানতে পেরে সব এসে উপস্থিত। তারা সকলে বললে, ‘হুজুর! এ-লোক কখনও ডাকাতি করতে পারে না’। সাহেব তখন তাঁতীকে জিজ্ঞাসা করলে, ‘কি গো, তোমার কি হয়েছে বল’। তাঁতী বললে, ‘হুজুর! রামের ইচ্ছা, আমি রাত্রিতে ভাত খেলুম। তারপরে রামের ইচ্ছা, আমি চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছি, রামের ইচ্ছা অনেক রাত হল। আমি, রামের ইচ্ছা, তাঁর চিন্তা করছিলাম আর তাঁর নাম গুনগাণ করছিলাম। এমন সময়ে রামের ইচ্ছা, একদল ডাকাত সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। রামের ইচ্ছা তারা আমায় ধরে টেনে লয়ে গেল। রামের ইচ্ছা, তারা এক গৃহস্থের বাড়ি ডাকাতি করলে। রামের ইচ্ছা, আমার মাথায় মোট দিল। এমন সময় রামের ইচ্ছা, পুলিস এসে পড়ল। রামের ইচ্ছা, আমি ধরা পড়লুম। তখন রামের ইচ্ছা, পুলিসের লোকেরা হাজতে দিল। আজ সকালে রামের ইচ্ছা, হুজুরের কাছে এনেছে’।

“অমন ধার্মিক লোক দেখে, সাহেব তাঁতীটিকে ছেড়ে দিবার হুকুম দিলেন। তাঁতী রাস্তায় বন্ধুদের বললে, রামের ইচ্ছা, আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। সংসার করা, সন্ন্যাস করা, সবই রামের ইচ্ছা। তাই তাঁর উপর সব ফেলে দিয়ে সংসারে কাজ কর।

“তা না হলে আর কিই বা করবে?

“একজন কেরানি জেলে গিছিল। জেল খাটা শেষ হলে, সে জেল থেকে বেরিয়ে এল। এখন জেল থেকে এসে, সে কি কেবল ধেই ধেই করে নাচবে? না, কেরানিগিরিই করবে?

“সংসারী যদি জীবন্মুক্ত হয়, সে মনে করলে অনায়াসে সংসারে থাকতে পারে। জার জ্ঞানলাভ হয়েছে, তার এখান সেখান নাই। তার সব সমান। যার সেখানে আছে, তার এখানেও আছে।

[পূর্বকথা — কেশব সেনের সঙ্গে কথা — সংসারে জীবন্মুক্ত]

“যখন কেশব সেনকে বাগানে প্রথম দেখলুম, বলেছিলাম — ‘এরই ল্যাজ খসেছে’। সভাসুদ্ধ লোক হেসে উঠল। কেশব বললে, তোমারা হেসো না, এর কিছু মানে আছে, এঁকে জিজ্ঞাসা করি। আমি বললাম, যতদিন বেঙাচির ল্যাজ না খসে, তার কেবল জলে থাকতে হয়, আড়ায় উঠে ডাঙায় বেড়াতে পারে না; যেই ল্যাজ খসে, আমনি লাফ দিয়ে ডাঙায় পড়ে। তখন জলেও থাকে, আবার ডাঙায়ও থাকে। তেমনি মানুষের যতদিন অবিদ্যার ল্যাজ না খসে, ততদিন সংসার-জলে পড়ে থাকে। অবিদ্যার ল্যাজ খসলে — জ্ঞান হলে, তবে মুক্ত হয়ে বেড়াতে পারে, আবার ইচ্ছা হলে সংসারে থাকতে পারে।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৬শে অক্টোবর 1884/10/26/v

37.5 গৃহস্থাশ্রমকথা-প্রসঙ্গে — নির্লিপ্ত সংসারী

শ্রীযুক্ত মহিমাচরণাদি ভক্তেরা বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের হরিকথামৃত পান করিতেছেন। কথাগুলি যেন বিবিধ বর্ণের মণিরত্ন, যে যত পারেন কুড়াইতেছেন — কিন্তু কোঁচড় পরিপূর্ণ হয়েছে, এত ভার বোধ হচ্ছে যে উঠা যায় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আধার, আর ধারণা হয় না। সৃষ্টি হইতে এ পর্যন্ত যত বিষয়ে মানুষের হৃদয়ে যতরকম সমস্যা উদয় হয়েছে, সব সমস্যা পূরণ হইতেছে। পদ্মলোচন, নারায়ণ শাস্ত্রী, গৌরী পণ্ডিত, দয়ানন্দ সরস্বতী ইত্যাদি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা অবাক্ হয়েছেন। দয়ানন্দ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে যখন দর্শন করেন ও তাঁহার সমাধি অবস্থা দেখিলেন, তখন আক্ষেপ করে বলেছিলেন, আমরা এত বেদ-বেদান্ত কেবল পড়েছি, কিন্তু এই মহাপুরুষে তাহার ফল দেখিতেছি; এঁকে দেখে প্রমাণ হল যে পণ্ডিতেরা কেবল শাস্ত্র মন্থন করে ঘোলটা খান, এরূপ মহাপুরুষেরা মাখনটা সমস্ত খান। আবার ইংরেজী পড়া কেশবচন্দ্র সেনাদি পণ্ডিতেরাও ঠাকুরকে দেখে অবাক্ হয়েছেন। ভাবেন, কি আশ্চর্য, নিরক্ষর ব্যক্তি এ-সব কথা কিরূপে বলছেন। এযে ঠিক যীশুখ্রীষ্টের মতো কথা! গ্রাম্য ভাষা। সেই গল্প করে বুঝান — যাতে পুরুষ, স্ত্রী, ছেলে সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারে। যীশু ফাদার (পিতা) ফাদার (পিতা) করে পাগল হয়েছিলেন, ইনি মা মা করে পাগল। শুধু জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার নহে, — ঈশ্বরপ্রেম ‘কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়’। ইনিও যীশুর মতো ত্যাগী, তাঁহারই মতো ইঁহারও জ্বলন্ত বিশ্বাস। তাই কথাগুলির এত জোর। সংসারী লোক বললে তো এত জোর হয় না; তারা ত্যাগী নয়,

তাদের জ্বলন্ত বিশ্বাস কই? কেশব সেনাদি পণ্ডিতেরা আরও ভাবেন, — এই নিরক্ষর লোকের এত উদারভাব কেমন করে হল! কি আশ্চর্য! কোনরূপ বিদ্বেষভাব নাই! সব ধর্মাবলম্বীদের আদর করেন — কাহারও সহিত ঝগড়া নাই।

আজ মহিমাচরণের সহিত ঠাকুরের কথাবার্তা শুনিয়া কোন ভক্ত ভাবছেন, ঠাকুর তো সংসারত্যাগ করতে বললেন না — বরং বলছেন সংসার কেল্লাস্বরূপ, এই কেল্লায় থেকে কাম, ক্রোধ ইত্যাদির সহিত যুদ্ধ করিতে পারা যায়। আবার বলছেন, সংসারে থাকবে না তো কোথায় থাকবে? কেরানি জেল থেকে বেরিয়ে এসে কেরানির কাজই করে। অতএব একরকম বলা হল জীবন্মুক্ত সংসারেও থাকতে পারে। আদর্শ — কেশব সেন? তাঁকে বলেছিলেন, "তোমারই ল্যাজ খসেছে — আর কারুর হয় নাই।" কিন্তু একটা কথা আছে, ঠাকুর কেবল বলছেন, মাঝে মাঝে নির্জনে থাকতে হবে। চারাগাছে বেড়া দিতে হবে — নচেৎ ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলবে। গাছের গুঁড়ি হয়ে গেলে চারিদিকের বেড়া ভেঙে দাও আর না দাও; এমন কি হাতি বেঁধে দিলেও গাছের কিছু হবে না। নির্জনে থেকে থেকে জ্ঞানলাভ করে — ঈশ্বরে ভক্তিলাভ করে সংসারে এসে থাকলে কিছু ভয় নাই। তাই নির্জনবাস কথাটি কেবল বলছেন।

ভক্তেরা এরূপ চিন্তা করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের কথার পর, আর দু-একটি সংসারী ভক্তের কথা বলিতেছেন।

[শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর — যোগ ও ভোগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণাদির প্রতি) — আবার সেজোবাবুর১ সঙ্গে দেবেন্দ্র ঠাকুরকে দেখতে গিছলাম। সেজোবাবুকে বললুম, “আমি শুনেছি দেবেন্দ্র ঠাকুর ঈশ্বরচিন্তা করে, আমার তাকে দেখবার ইচ্ছা হয়।” সেজোবাবু বললে, “আচ্ছা বাবা, আমি তোমায় নিয়ে যাব, আমরা হিন্দু কলেজে একক্লাসে পড়তুম, আমার সঙ্গে বেশ ভাব আছে।” সেজোবাবুর সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হল। দেখে দেবেন্দ্র বললে, তোমার একটু বদলেছে — তোমার ভুঁড়ি হয়েছে। সেজোবাবু আমার কথা বললে, ইনি তোমায় দেখতে এসেছেন — এনি ঈশ্বর ঈশ্বর করে পাগল। আমি লক্ষণ দেখবার জন্য দেবেন্দ্রকে বললুম, “দেখি গা, তোমার গা।” দেবেন্দ্র গায়ের জামা তুললে, দেখলাম — গৌরবর্ণ, তার উপর সিঁদুর ছড়ানো। তখন দেবেন্দ্রের চুল পাকে নাই।

“প্রথম যাবার পর একটু অভিমান দেখেছিলাম। তা হবে না গা? অত ঐশ্বর্য, বিদ্যা, মান-সম্ভ্রম? অভিমান দেকে সেজোবাবুকে বললুম, আচ্ছা অভিমান জ্ঞানে হয়, না অজ্ঞানে হয়? যার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তার কি ‘আমি পণ্ডিত’, ‘আমি জ্ঞানী’, ‘আমি ধনী’; বলে অভিমান থাকতে পারে?

“দেবেন্দ্রের সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমার হঠাৎ সেই অবস্থাটি হল। সেই অবস্থাটি হলে কে কিরূপ লোক দেখতে পাই। আমার ভিতর থেকে হি-হি করে একটা হাসি উঠল। যখন ওই অবস্থাটা হয়, তখন পণ্ডিত-ফণ্ডিত তৃণ-জ্ঞান হয়! যদি দেখি, পণ্ডিতের বিবেক-বৈরাগ্য নাই, তখন খড়কুটোর মতো বোধ হয়। তখন দেখি যেন শকুনি খুব উঁচুতে উঠেছে কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর।

“দেখলাম, যোগ ভোগ দুই-ই আছে; অনেক ছেলেপুলে, ছোট ছোট; ডাক্তার এসেছে; তবেই হল, অত জ্ঞানী হয়ে সংসার নিয়ে সর্বদা থাকতে হয়। বললুম, তুমি কলির জনক। ‘জনক এদিক উদিক দু’দিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি’। তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরে মন রেখেছো শুনে তোমায় দেখতে এসেছি; আমায় ঈশ্বরীয় কথা কিছু শুনাও।

“তখন বেদ থেকে কিছু কিছু শুনালে। বললে, এই জগৎ যেন একটি ঝাড়ের মতো, আর জীব হয়েছে — এক-একটি ঝাড়ের দীপ। আমি এখানে পঞ্চবটীতে যখন ধ্যান করতুম ঠিক ওইরকম দেখেছিলাম। দেবেন্দ্রের কথার সঙ্গে মিলল দেখে ভাবলুম, তবে তো খুব বড়লোক। ব্যাখ্যা করতে বললাম — তা বললে ‘এ জগৎ কে জানত? — ঈশ্বর মানুষ করেছেন, তাঁর মহিমা প্রকাশ করবার জন্য। ঝাড়ের আলো না থাকলে সব অন্ধকার, ঝাড় পর্যন্ত দেখা যায় না৪।”

[ব্রাহ্মসমাজে ‘অসভ্যতা’ — কাপ্তেন, ভক্ত গৃহস্থ]

“অনেক কথাবার্তার পর দেবেন্দ্র খুশি হয়ে বললে, ‘আপনাকে উৎসবে (ব্রহ্মোৎসবে) আসতে হবে!’ আমি বললাম, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা; আমার তো এই অবস্থা দেখছ! — কখন কি ভাবে রাখেন।’ দেবেন্দ্র বললে, ‘না আসতে হবে; তবে ধুতি আর উড়ানি পরে এসো, — তোমাকে এলোমেলো দেখে কেউ কিছু বললে, আমার কষ্ট হবে।’ আমি বললাম, ‘তা পারব না। আমি বাবু হতে পারব না।’ দেবেন্দ্র, সেজোবাবু সব হাসতে লাগল।

“তারপরদিনই সেজোবাবুর কাছে দেবেন্দ্রর চিঠি এল — আমাকে উৎসব দেখতে যেতে বারণ করেছে। বলে — অসভ্যতা হবে, গায়ে উড়ানি থাকবে না। (সকলের হাস্য)

(মহিমার প্রতি) — “আর-একটি আছে — কাপ্তেন।২ সংসারী বটে, কিন্তু ভারী ভক্ত। তুমি আলাপ করো।

“কাপ্তেনের বেদ, বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা অধ্যাত্ম — এ-সব কণ্ঠস্থ। তুমি আলাপ করে দেখো।

“খুব ভক্তি! আমি বরাহনগরে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, তা আমায় ছাতা ধরে! ওর বাড়িতে লয়ে গিয়ে কত যত্ন! বাতাস করে — পা টিপে দেয় — আর নানা তরকারি করে খাওয়ায়। আমি একদিন ওর বাড়িতে পাইখানায় বেহুঁশ হয়ে গেছি। ও তো আচারী, পাইখানার ভিতর আমার কাছে গিয়ে পা ফাঁক করে বসিয়ে দেয়। অত আচারী, ঘৃণা করলে না।

“কাপ্তেনের অনেক খরচা। কাশীতে ভায়েরা থাকে, তাদের দিতে হয়। মাগ আগে কৃপণ ছিল, এখন এত বিব্রত হয়েছে যে সবরকম খরচ করতে পারে না।

“কাপ্তেনের পরিবার আমায় বললে যে, সংসার ওঁর ভাল লাগে না। তাই মাঝে বলেছিল, সংসার ছেড়ে দেব। মাঝে মাঝে ছেড়ে দেব, ছেড়ে দেব করত।

“ওদের বংশই ভক্ত। বাপ লড়ায়ে যেত। শুনেছি লড়ায়ের সময় এক-হাতে শিবপূজা, একহাতে তরবার খোলা, যুদ্ধ করত।

“লোকটা ভারী আচারী। আমি কেশব সেনের কাছে যেতুম, তাই এখানে একমাস আসে নাই। বলে, কেশব সেন ভ্রষ্টাচার — ইংরাজের সঙ্গে খায়, ভিন্ন জাতে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, জাত নাই। আমি বললুম, আমার সে সবের দরকার কি? কেশব হরিনাম করে, দেখতে যাই, ঈশ্বরীয় কথা শুনতে যাই — আমি কুলটি খাই, কাঁটায় আমার কি কাজ? তবুও আমায় ছাড়ে না; বলে তুমি কেশব সেনের ওখানে কেন যাও? তখন আমি বললুম, একটু বিরক্ত হয়ে, আমি তো টাকার জন্য যাই না — আমি হরিনাম শুনতে যাই — আর তুমি লাট সাহেবের বাড়িতে যাও কেমন করে? তারা ম্লেচ্ছ, তাদের সঙ্গে থাকো কেমন করে? এই সব বলার পর তবে একটু থামে।

“কিন্তু খুব ভক্তি। যখন পূজা করে, কর্পূরের আরতি করে। আর পূজা করতে করতে আসনে স্তব করে। তখন আর-একটি মানুষ। যেন তন্ময় হয়ে যায়।”

১ সেজোবাবু — রাণী রাসমণির জামাতা, শ্রীযুক্ত মথুরানাথ বিশ্বাস। ঠাকুরকে প্রথমাবধি সাতিশয় ভক্তি ও শিষ্যের ন্যায় সেবা করিতেন।
২ শ্রীবিশ্বনাথ উপাধ্যায়, নেপাল নিবসী, নেপালের রাজার উকিল, রাজ প্রতিনিধি, কলিকাতায় থাকিতেন। অতি সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও পরমভক্ত।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৬শে অক্টোবর 1884/10/26/vi

37.6 বেদান্তবিচারে — মায়াবাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি) — বেদান্ত বিচারে, সংসার মায়াময়, — স্বপ্নের মতো, সব মিথ্যা। যিনি পরমাত্মা, তিনি সাক্ষিস্বরূপ — জাগ্রত, স্বপন, সুষুপ্তি তিন অবস্থারই সাক্ষিস্বরূপ। এ-সব তোমার ভাবের কথা। স্বপ্নও যত সত্য, জাগরণও সেইরূপ সত্য। একটা গল্প বলি শোন। তোমার ভাবের —

"এক দেশে একটি চাষা থাকে। ভারী জ্ঞানী। চাষবাস করে — পরিবার আছে, একটি ছেলে অনেকদিন পরে হয়েছে; নাম হারু। ছেলেটির উপর বাপ-মা দুজনেরই ভালবাসা; কেননা, সবে ধন নীলমণি। চাষাটি ধার্মিক, গাঁয়ের সব লোকেই ভালবাসে। একদিন মাঠে কাজ করছে, এমন সময় একজন এসে খপর দিলে, হারুর কলেরা হয়েছে। চাষাটি বাড়ি গিয়ে অনেক চিকিৎসা করালে কিন্তু ছেলেটি মারা গেল। বাড়ির সকলে শোকে কাতর কিন্তু চাষাটির যেন কিছুই হয় নাই। উলটে সকলকে বুঝায় যে, শোক করে কি হবে? তারপর আবার চাষ করতে গেল। বাড়ি ফিরে এসে দেখে, পরিবার আরও কাঁদছে। পরিবার বললে, 'তুমি নিষ্ঠুর — ছেলেটার জন্য একবার কাঁদলেও না?' চাষা তখন স্থির হয়ে বললে, 'কেন কাঁদছি না বলব? আমি কাল একটা ভারী স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম যে, রাজা হয়েছি আর আট ছেলের বাপ হয়েছি — খুব সুখে আছি। তারপর ঘুম ভেঙে গেল। এখন মহা ভাবনায় পড়েছি — আমার সেই আট ছেলের জন্য শোক করব, না, তোমার এই এক ছেলে হারুর জন্য শোক করব?'

“চাষা জ্ঞানী, তাই দেখছিল স্বপ্ন অবস্থাও যেমন মিথ্যা, জাগরণ অবস্থাও তেমনি মিথ্যা; এক নিত্যবস্তু সেই আত্মা।

“আমি সবই লই। তুরীয় আবার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। আমি তিন অবস্থাই লই। ব্রহ্ম আবার মায়া, জীব, জগৎ আমি সবই লই। সব না নিলে ওজনে কম পড়ে।”

একজন ভক্ত — ওজনে কেন কম পড়ে? (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ — ব্রহ্ম — জীবজগৎবিশিষ্ট। প্রথম নেতি নেতি করবার সময় জীবজগৎকে ছেড়ে দিতে হয়। অহংবুদ্ধি যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনিই সব হয়েছেন, এই বোধ হয়, তিনিই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন।

“বেলের সার বলতে গেলে শাঁসই বুঝায়। তখন বিচি আর খোলা ফেলে দিতে হয়। কিন্তু বেলটা কত ওজনে ছিল বলতে গেলে শুধু শাঁস ওজন করলে হবে না। ওজনের সময় শাঁস, বিচি, খোলা সব নিতে হবে। যারই শাঁস, তারই বিচি, তারই খোলা।

“যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা।

“তাই আমি নিত্য, লীলা সবই লই। মায়া বলে জগৎসংসার উড়িয়ে দিই না। তাহলে যে ওজনে কম পড়বে।”

[মায়াবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ — জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ]

মহিমাচরণ — এ বেশ সামঞ্জস্য, — নিত্য থেকেই লীলা, আবার লীলা থেকেই নিত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ — জ্ঞানীরা দেখে সব স্বপ্নবৎ। ভক্তেরা সব অবস্থা লয়। জ্ঞানী দুধ দেয় ছিড়িক ছিড়িক করে। (সকলের হাস্য) এক-একটা গরু আছে — বেছে বেছে খায়; তাই ছিড়িক ছিড়িক দুধ। যারা অত বাছে না আর সব খায়, তারা হুড়হুড় করে দুধ দেয়। উত্তম ভক্ত১ — নিত্য লীলা দুই লয়। তাই নিত্য থেকে মন নেমে এলেও তাঁকে সম্ভোগ করতে পারে। উত্তম ভক্ত হুড়হুড় করে দুধ দেয়। (সকলের হাস্য)

মহিমা — তবে দুধে একটু গন্ধ হয়। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — হয় বটে, তবে একটু আওটাতে হয়। আগুনে আউটে নিতে হয়। জ্ঞানাগ্নির উপর একটু দুধটা চড়িয়ে দিতে হয়, তাহলে আর গন্ধটা থাকবে না। (সকলের হাস্য)

[ওঁকার ও নিত্যলীলাযোগ]

(মহিমার প্রতি) — “ওঁকারের ব্যাখ্যা তোমরা কেবল বল ‘অকার উকার মকার’।”

মহিমাচরণ — অকার, উকার, মকার — কিনা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি উপমা দিই ঘন্টার টং শব্দ। ট-অ-অ-ম-ম-। লীলা থেকে নিত্যে হয়; স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ থেকে মহাকারণে লয়। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি থেকে

তুরীয়ে লয়। আবার ঘণ্টা বাজল, যেম মহাসমুদ্রে একটা গুরু জিনিস পড়ল আর ঢেউ আরম্ভ হল। নিত্য থেকে লীলা আরম্ভ হল, মহাকারণ থেকে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরির দেখা দিল — সেই তুরীয় থেকেই জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সব অবস্থা এসে পড়ল। আবার মহাসমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রেই লয় হল। নিত্য ধরে ধরে লীলা, আবার লীলা ধরে নিত্য।২ আমি টং শব্দ উপমা দিই। আমি ঠিক এই সব দেখেছি। আমায় দেখিয়ে দিয়েছে চিৎ সমুদ্র, অন্ত নাই। তাই থেকে এইসব লীলা উঠল, আর ওইতেই লয় হয়ে গেল। চিদাকাশে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আবার ওইতেই লয় হয়, তোমাদের বইয়ে কি আছে, অত আমি জানি না।

মহিমা — যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা তো শাস্ত্র লেখেন নাই। তাঁরা নিজের ভাবেই বিভোর, লিখবেন কখন! লিখতে গেলেই একটু হিসাবী বুদ্ধির দরকার। তাঁদের কাছে শুনে অন্য লোকে লিখেছে।

[সংসারাসক্তি কতদিন — ব্রহ্মানন্দ পর্যন্ত]

শ্রীরামকৃষ্ণ — সংসারীরা বলে, কেন কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি যায় না? তাঁকে লাভ করলে আসক্তি যায়।৩ যদি একবার ব্রহ্মানন্দ পায়, তাহলে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে বা অর্থ, মান-সম্ভ্রমের জন্য, আর মন দৌড়ায় না।

“বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখে, তাহলে আর অন্ধকারে যায় না।

“রাবণকে বলেছিল, তুমি সীতার জন্য মায়ার নানারূপ ধরছো, একবার রামরূপ ধরে সীতার কাছে যাও না কেন? রাবণ বললে, তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধূসঙ্গঃ

কুতঃ — যখন রামকে চিন্তা করি, তখন ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, পরস্ত্রী তো সামান্য কথা! তা রামরূপ কি ধরব!”

[যত ভক্তি বাড়ে, সংসারাসক্তি কমে — শ্রীচৈতন্যভক্ত নির্লিপ্ত]

“তাই জন্যই সাধন-ভজন। তাঁকে চিন্তা যত করবে, ততই সংসারের সামান্য ভোগের জিনিসে আসক্তি কমবে। তাঁর পাদপদ্মে যত ভক্তি হবে, ততই বিষয়বাসনা কম পড়ে আসবে, ততই দেহের সুখের দিকে নজর কমবে; পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ বোধ হবে, নিজের স্ত্রীকে ধর্মের সহায় বন্ধু বোধ হবে, পশুভাব চলে যাবে, দেবভাব আসবে, সংসারে একেবারে অনাসক্ত হয়ে যাবে। তখন সংসারে যদিও থাক জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়াবে। চৈতন্যদেবের ভক্তেরা অনাসক্ত হয়ে সংসারে ছিল।”

[জ্ঞানী ও ভক্তের গূঢ় রহস্য]

(মহিমার প্রতি) — “যে ঠিক ভক্ত, তার কাছে হাজার বেদান্ত বিচার কর, আর ‘স্বপ্নবৎ’ বল তার ভক্তি যাবার নয়। ফিরে-ঘুরে একটুখানি থাকবেই। একটা মুষল ব্যানা বনে পড়েছিল, তাতেই ‘মুষলং কুলনাশনম্’।

“শিব অংশে জন্মালে জ্ঞানী হয়; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা — এই বোধের দিকে মন সর্বদা যায়। বিষ্ণু অংশে জন্মালে প্রেমভক্তি হয়, সে প্রেমভক্তি যাবার নয়। জ্ঞানবিচারের পর এই প্রেমভক্তি যদি কমে যায়, আবার এক সময় হু হু করে বেড়ে যায়; যদুবংষ ধ্বংস করেছিল মুষল, তারই মতো।”

১ উত্তম ভক্ত — যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।

তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে নে প্রণশ্যতি।

[গীতা, ৬।৩০]

২ নিত্য ধরে লীলা — From the Absolute to the Relative — from the Infinite to the Finite — from the Undifferentiated to the Differentiated — from the Unconditioned to the Conditioned and again from the Relative to the Absolute.

৩ রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে। [গীতা, ২।৫৯]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৬শে অক্টোবর 1884/10/26/vii

37.7 মাতৃসেবা ও শ্রীরামকৃষ্ণ — হাজরা মহাশয়১

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের পূর্ব বারান্দায় হাজরা মহাশয় বসিয়া জপ করেন। বয়স ৪৬।৪৭ হইবে। ঠাকুরের দেশের লোক। অনেকদিন হইতে বৈরাগ্য হইয়াছে — বাহিরে বাহিরে বেড়ান, কখন কখন বাড়িতে গিয়া থাকেন। বাড়িতে কিছু জমি-টমি আছে, তাতেই স্ত্রী-পুত্রকন্যাদের ভরণপোষণ হয়। তবে প্রায় হাজার টাকা দেনা আছে, তজ্জন্য হাজরা মহাশয় সর্বদা চিন্তিত থাকেন ও কিসে শোধ যায়,

সর্বদা চেষ্টা করেন। কলিকাতায় সর্বদা যাতায়াত আছে, সেখানে ঠনঠনে নিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে সাতিশয় যত্ন করেন ও সাধুর ন্যায় সেবা করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে যত্ন করে রেখেছেন, কাপড় ছিঁড়ে গেলে কাপড় কিনে দেওয়ান, সর্বদা সংবাদ লন ও ঈশ্বরীয় কথা তাঁহার সঙ্গে সর্বদা হয়ে থাকে। হাজরা মহাশয় বড় তার্কিক। প্রায় কথা কহিতে কহিতে তর্কের তরঙ্গে ভেসে একদিকে চলে যেতেন। বারান্দায় আসন করে সর্বদা জপের মালা লয়ে জপ করতেন।

হাজরা মহাশয়ের মাতাঠাকুরানীর অসুখ সংবাদ আসিয়াছে। রামলালকে দেশ থেকে আসবার সময় তিনি হাতে ধরে অনেক করে বলেছিলেন, খুড়ো মহাশয়কে আমার কাকুতি জানিয়ে বলো তিনি যেন প্রতাপকে বলে-কয়ে দেশে পাঠিয়ে দেন; একবার যেন আমার সঙ্গে দেখা হয়। ঠাকুর তাই হাজরাকে বলেছিলেন, "একবার বাড়িতে গিয়ে মার সঙ্গে দেখা করে এসো; তিনি রামলালকে অনেক করে বলে দিয়েছেন। মাকে কষ্ট দিয়ে কখন ঈশ্বরকে ডাকা হয়? একবার দেখা দিয়ে বরং চলে এসো।"

ভক্তের মজলিস ভাঙিলে পর, মহিমাচরণ হাজরাকে সঙ্গে করিয়া ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হইলেন। মাস্টারও আছেন।

মহিমাচরণ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি, সহাস্যে) — মহাশয়! আপনার কাছে দরবার আছে। আপনি কেন হাজরাকে বাড়ি যেতে বলছেন? আবার সংসারে যেতে ওর ইচ্ছা নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ওর মা রামলালের কাছে অনেক দুঃখ করেছে; তাই বললুম, তিনদিনের জন্য না হয় যাও, একবার দেখা দিয়ে এসো; মাকে কষ্ট দিয়ে কি ঈশ্বরসাধনা হয়? আমি বৃন্দাবনে রয়ে যাচ্ছিলাম, তখন মাকে মনে পড়ল; ভাবলুম — মা যে কাঁদবে; তখন আবার সেজোবাবুর সঙ্গে এখানে চলে এলুম।

"আর সংসারে যেতে জ্ঞানীর ভয় কি?"

মহিমাচরণ (সহাস্যে) — মহাশয়! জ্ঞান হলে তো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — হাজরার সবই হয়েছে, একটু সংসারে মন আছে — ছেলেরা রয়েছে, কিছু টাকা ধার রয়েছে। মামীর সব অসুখ সেরে গেছে, একটু কসুর আছে! (মহিমাচরণ প্রভৃতি সকলের হাস্য)

মহিমা — কোথায় জ্ঞান হয়েছে, মহাশয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া) — না — গো তুমি জান না। সব্বাই বলে, হাজরা একটি লোক, রাসমণির ঠাকুরবাড়িতে আছে। হাজরারই নাম করে, এখানকার নাম কেউ করে? (সকলের হাস্য)

হাজরা — আপনি নিরুপম — আপনার উপমা নাই, তাই কেউ আপনাকে বুঝতে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তবেই নিরুপমের সঙ্গে কোন কাজ হয় না; তা এখানকার নাম কেউ করবে কেন?

মহিমা — মহাশয়! ও কি জানে? আপনি যেরূপ উপদেশ দেবেন ও তাই করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেন, তুমি ওকে বরং জিজ্ঞাসা কর; ও আমায় বলেছে, তোমার সঙ্গে আমার লেনা-দেনা নাই।

মহিমা — ভারী তর্ক করে!

শ্রীরামকৃষ্ণ — ও মাঝে মাঝে আমায় আবার শিক্ষা দেয়। (সকলের হাস্য) তর্ক যখন করে, হয়তো আমি গালাগালি দিয়ে বসলুম। তর্কের পর মশারির ভিতর হয়তো শুয়েছি; আবার কি বলেছি মনে করে বেরিয়ে এসে হাজরাকে প্রণাম করে যাই, তবে হয়!

[বেদান্ত ও শুদ্ধাত্মা]

(হাজরার প্রতি) — "তুমি শুদ্ধাত্মাকে ঈশ্বর বল কেন? শুদ্ধাত্মা নিষ্ক্রিয়, তিন অবস্থার সাক্ষিস্বরূপ। যখন সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় কার্য ভাবি তখন তাঁকে ঈশ্বর বলি। শুদ্ধাত্মা কিরূপ — যেমন চুম্বক পাথর অনেক দূরে আছে, কিন্তু ছুঁচ নড়ছে — চুম্বক পাথর চুপ করে আছে নিষ্ক্রিয়।"

১ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুরের সন্নিকট মড়াগোড় গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি। সম্প্রতি (১৩০৬ সালের চৈত্র মাসে) স্বদেশে থাকিয়া ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। মৃত্যুকালে ঠাকুরের প্রতি ইঁহার অদ্ভুত বিশ্বাস ও ভক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার বয়ঃক্রম ৬৩।৬৪ বৎসার হইয়াছিল।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৬শে অক্টোবর 1884/10/26/viii

37.8 সন্ধ্যাসঙ্গীত ও ঈশান সংবাদ

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। ঠাকুর পাদচারণ করিতেছেন। মণি একাকী বসিয়া আছেন ও চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া, ঠাকুর হঠাৎ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া সস্নেহে বলিতেছেন, "গোটা দু-এক মার্কিনের জামা দিও, সকলের জামা তো পরি না — কাপ্তেনকে বলব মনে করেছিলাম, তা তুমিই দিও।" মণি দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিলেন, বলিলেন, "যে আজ্ঞা।"

সন্ধ্যা হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে ধুনা দেওয়া হইল। তিনি ঠাকুরদের প্রণাম করিয়া, বীজমন্ত্র জপিয়া, নামগান করিতেছেন। ঘরের বাহিরে অপূর্ব শোভা! কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি। বিমল চন্দ্রকিরণে একদিকে ঠাকুরবাড়ি হাসিতেছে, আর-একদিকে ভাগীরথীবক্ষ সুপ্ত শিশুর বক্ষের ন্যায় ঈষৎ বিকম্পিত হইতেছে। জোয়ার পূর্ণ হইয়া আসিল। আরতির শব্দ গঙ্গার স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রবাহসমুদ্ভূত কলকলনাদ সঙ্গে মিলিত হইয়া বহুদূর পর্যন্ত গমন করিয়া লয়প্রাপ্ত হইতেছিল। ঠাকুরবাড়িতে এককালে তিন মন্দিরে আরতি — কালীমন্দিরে, বিষ্ণুমন্দিরে ও শিবমন্দিরে। দ্বাদশ শিবমন্দিরে এক-একটি করিয়া

শিবলিঙ্গের আরতি। পুরোহিত শিবের একঘর হইতে আর-একঘরে যাইতেছেন। বাম হস্তে ঘণ্টা, দক্ষিণ হস্তে পঞ্চপ্রদীপ, সঙ্গে পরিচারক — তাহার হস্তে কাঁসর। আরতি হইতেছে, তৎসঙ্গে ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে রোশনচৌকির সুমধুর নিনাদ শুনা যাইতেছে। সেখানে নহবতখানা, সন্ধ্যাকালীন রাগরাগিণী বাজিতেছে। আনন্দময়ীর নিত্য উৎসব — যেন জীবকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে — কেহ নিরানন্দ হইও না — ঐহিকের সুখ-দুঃখ আছেই; থাকে থাকুক — জগদম্বা আছেন। আমাদের মা আছেন! আনন্দ কর! দাসীপুত্র ভাল খেতে পায় না, ভাল পরতে পায় না, বাড়ি নাই ঘর নাই, — তবু বুকে জোর আছে; তার যে মা আছে। মার কোলে নির্ভর। পাতানো মা নয়, সত্যকার মা। আমি কে, কোথা থেকে এলাম, আমার কি হবে, আমি কোথায় জাব, সব মা জানেন। কে অত ভাবে! আমার মা জানেন — আমার মা, যিনি দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা দিয়ে আমায় গড়েছেন। আমি জানতেও চাই না। যদি জানবার দরকার হয় তিনি জানিয়ে দিবেন। অত কে ভাবে? মায়ের ছেলেরা সব আনন্দ কর!

বাহিরে কৌমুদীপ্লাবিত জগৎ হাসিতেছে; কক্ষমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ হরিপ্রেমানন্দে বসিয়া আছেন। ঈশান কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন, আবার ইশ্বরীয় কথা হইতেছে। ঈশানের ভারী বিশ্বাস। বলেন, একবার যিনি দুর্গানাম করে বাড়ি থেকে যাত্রা করেন, তাঁর সঙ্গে শূলপাণি শূলহস্তে যান। বিপদে ভয় কি? শিব নিজে রক্ষা করেন।

[বিশ্বাসে ঈশ্বরলাভ — ঈশানকে কর্মযোগ উপদেশ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি) — তোমার খুব বিশ্বাস — আমাদের কিন্তু অত নাই। (সকলের হাস্য) বিশ্বাসেই তাঁকে পাওয়া যায়।

ঈশান — আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি জপ, আহ্নিক, উপবাস, পুরশ্চরণ — এই সব কর্ম করছ তা বেশ। যার আন্তরিক ঈশ্বরের উপর টান থাকে, তাকে দিয়ে তিনি এই সব কর্ম করিয়ে লন। ফলকামনা না করে এই সব কর্ম করে জেতে পারলে নিশ্চিত তাঁকে লাভ হয়।

[বৈধীভক্তি ও রাগভক্তি — কর্মত্যাগ কখন?]

"শাস্ত্র অনেক কর্ম করতে বলে গেছে — তাই করছি; এরূপ ভক্তিকে বৈধীভক্তি বলে। আর-এক আছে, রাগভক্তি। সেটি অনুরাগ থেকে হয়, ঈশ্বরে ভালবাসা থেকে হয় — যেমন প্রহ্লাদের। সে ভক্তি যদি আসে, আর বৈধী কর্মের প্রয়োজন হয় না।"

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৬শে অক্টোবর 1884/10/26/ix

37.9 সেবক হৃদয়ে

সন্ধ্যার পূর্বে মণি বেড়াইতেছেন ও ভাবিতেছেন — “রামের ইচ্ছা” এটি তো বেশ কথা! এতে তো Predestination আর Free will, Liberty আর — Necessity এ-সব ঝগড়া মিটে যাচ্ছে। আমায় ডাকাতে ধরে নিলে “রামের ইচ্ছায়”; আবার আমি তামাক খাচ্ছি “রামের ইচ্ছায়”, আমি ডাকাতি করছি “রামের ইচ্ছায়। আমায় পুলিসে ধরলে “রামের ইচ্ছায়”, আমি সাধু হয়েছি “রামের ইচ্ছায়”, আমি প্রার্থনা করছি, “হে প্রভু আমায় অসদ্বুদ্ধি দিও না — আমাকে দিয়ে ডাকাতি করিয়ো না” — এও “রামের ইচ্ছা”। সৎ ইচ্ছা, অসৎ ইচ্ছা তিনি দিচ্ছেন। তবে একটা কথা আছে, অসৎ ইচ্ছা তিনি কেন দিবেন — ডাকাতি করবার ইচ্ছা তিনি কেন দিবেন? তার উত্তরে ঠাকুর বলেন এই, — তিনি জানোয়ারের ভিতর যেমন বাঘ, সিংহ, সাপ করেছেন; গাছের ভিতর যেমন বিষগাছও করেছেন, সেইরূপ মানুষের ভিতর চোর, ডাকাতও করেছেন। কেন করেছেন? কেন করেছেন, তা কে বলবে? ঈশ্বরকে কে বুঝবে?

“কিন্তু তিনি যদি সব করেছেন, Sense of responsibility তো যায়; তা কেন যাবে? ঈশ্বরকে না জানলে, তাঁর দর্শন হলে “রামের ইচ্ছা”, এটি ষোল আনা বোধই হবে না। তাঁকে লাভ না করলে এটি এক-একবার বোধ হয়; আবার ভূল হয়ে যাবে। যতক্ষণ না পূর্ণ বিশ্বাস হয়, ততক্ষণ পাপ-পুণ্য বোধ, responsibility বোধ, থাকবেই থাকবে। ঠাকুর বুঝালেন, “রামের ইচ্ছা”। তোতা পাখির মতো “রামের ইচ্ছা” মুখে বললে হয় না। যতক্ষণ ঈশ্বরকে জানা না হয়, তাঁর ইচ্ছায় আমার ইচ্ছায় এক না হয়, যতক্ষণ না “আমি যন্ত্র” ঠিক বোধ হয়, ততক্ষণ তিনি পাপ-পুণ্য বোধ, সুখ-দুঃখ বোধ, শুচি-অশুচি বোধ, ভাল-মন্দ বোধ রেখে দেন;

Sense of responsibility রেখে দেন; তা না হলে তাঁর মায়ার সংসার কেমন করে চলবে?

“ঠাকুরের ভক্তির কথা যত ভাবিতেছি, ততই অবাক্ হইতেছি। কেশব সেন হরিনাম করেন, ঈশ্বরচিন্তা করেন, অমনি তাঁকে দেখতে ছুটেছেন, — অমনি কেশব আপনার লোক হলেন। তখন কাপ্তেনের কথা আর শুনলেন না। তিনি বিলাতে গিয়াছিলেন, সাহেবদের সঙ্গে খেয়েছেন, কন্যাকে ভিন্ন জাতিতে বিবাহ দিয়াছেন —— এ-সব কথা ভেসে গেল! কুলটি খাই, কাঁটায় আমার কি কাজ? ভক্তিসূত্রে সাকারবাদী, নিরাকারবাদী এক হয়; হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান এক হয়; চারি বর্ণ এক হয়। ভক্তিরই জয়। ধন্য শ্রীরামকৃষ্ণ! তোমারই জয়। তুমি সনাতন ধর্মের এই বিশ্বজনীন ভাব আবার মূর্তিমান করিলে। তাই বুঝি তোমার এত আকর্ষণ! সকল ধর্মাবলম্বীদের তুমি পরমাত্মীয়-নির্বিশেষে আলিঙ্গন করিতেছ! তোমার এক কষ্টিপাথর ভক্তি। তুমি কেবল দেখ —— অন্তরে ঈশ্বরে ভালবাসা ও ভক্তি আছে কিনা। যদি তা থাকে অমনি সে তোমার পরম আত্মীয় —— হিন্দুর যদি ভক্তি দেখ, অমনি সে তোমার আত্মীয় —— মুসলমানের যদি আল্লার উপর ভক্তি থাকে, সেও তোমার আপনার লোক —— খ্রীষ্টানদের যদি যীশুর উপর ভক্তি থাকে, সেও তোমার পরম আত্মীয়। তুমি বল যে, সব নদীই ভিন্ন দিগ্‌দেশ হইতে আসিয়া এক সমুদ্রমধ্যে পড়িতেছে। সকলেরই উদ্দেশ্য এক সমুদ্র।

“ঠাকুর এই জগৎ স্বপ্নবৎ বলছেন না। বলেন, ‘তাহলে ওজনে কম পড়ে’। মায়াবাদ নয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। কেন না, জীবজগৎ অলীক বলছেন না, মনের ভুল বলছেন না। ঈশ্বর সত্য আবার মানুষ সত্য, জগৎ সত্য। জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। বিচি খোলা বাদ দিলে সব বেলটা পাওয়া যায় না।

"শুনিলাম, এই জগৎব্রহ্মাণ্ড মহাচিদাকাশে আবির্ভূত হইতেছে আবার কালে লয় হইতেছে — মহাসমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতেছে আবার কালে লয় হইতেছে! আনন্দসিন্ধুনীরে অনন্ত-লীলাহরী! এ লীলার আদি কোথায়? অন্ত কোথায়? তাহা মুখে বলিবার জো নাই — মনে চিন্তা করিবার জো নাই। মানুষ কতটুকু! তার বুদ্ধিই বা কতটুকু! শুনিলাম মহাপুরুষেরা সমাধিস্থ হয়ে সেই নিত্য পরমপুরুষকে দর্শন করেছেন — নিত্য লীলাময় হরিকে সাক্ষাৎকার করেছেন। অবশ্য করেছেন, কেননা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও বলিতেছেন। তবে এ-চর্মচক্ষে নয়, বোধ হয় দিব্যচক্ষু যাহাকে বলে তাহার দ্বারা; যে দিব্যচক্ষু পাইয়া অর্জুন বিশ্বরূপ-দর্শন করেছিলেন, যে চক্ষুর দ্বারা ঋষিরা আত্মার সাক্ষাৎকার করেছিলেন, যে দিব্যচক্ষুর দ্বারা ঈশা তাঁহার স্বর্গীয় পিতাকে অহরহ দর্শন করিতেন। সে চক্ষু কিসে হয়? ঠাকুরের মুখে শুনিলাম ব্যাকুলতার দ্বারা হয়। এখন সে ব্যাকুলতা হয় কেমন করে, সংসার কি ত্যাগ করতে হবে? কই, তাও তো আজ বললেন না।"

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৯ই নভেম্বর 1884/11/09/i

37.10 সন্ন্যাসী সঞ্চয় করিবে না — ঠাকুর 'মদগত-অন্তরাত্মা'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে আছেন। তিনি নিজের ঘরে ছোট খাটটিতে পূর্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। ভক্তগণ মেঝের উপর বসিয়া আছেন। আজ কার্তিক মাসের কৃষ্ণা সপ্তমী, ২৫শে কার্তিক, ইংরেজী ৯ই নভেম্বর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ (রবিবার)।

বেলা প্রায় দুই প্রহর। মাস্টার আসিয়া দেখিলেন, ভক্তেরা ক্রমে ক্রমে আসিতেছেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে কয়েকটি ব্রাহ্মভক্ত আসিয়াছেন। পূজারী রাম চক্রবর্তীও আছেন। ক্রমে মহিমাচরণ, নারায়ণ, কিশোরী আসিলেন। একটু পরে আরও কয়েকটি ভক্ত আসিলেন।

শীতের প্রারম্ভ। ঠাকুরের জামার প্রয়োজন হইয়াছিল, মাস্টারকে আনিতে বলিয়াছিলেন। তিনি লংক্লথের জামা ছাড়া একটি জিনের জামা আনিয়াছিলেন; কিন্তু ঠাকুর জিনের জামা আনিতে বলেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — তুমি বরং একটা নিয়ে যাও। তুমিই পরবে। তাতে দোষ নাই। আচ্ছা, তোমায় কিরকম জামার কথা বলেছিলাম।

মাস্টার — আজ্ঞা, আপনি সাদাসিদে জামার কথা বলেচিলেন, জিনের জামা আনিতে বলেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তবে জিনেরটা ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

(বিজয়াদির প্রতি) — “দেখ, দ্বারিক বাবু বনাত দিছল। আবার খোট্টারাও আনলে। নিলাম না। — [ঠাকুর আর কি বলিতে যাইতেছিলেন। এমন সময় বিজয় কথা কহিলেন।]

বিজয় — আজ্ঞা — তা বইকি! যা দরকার কাজেই নিতে হয়। একজনের তো দিতেই হবে। মানুষ ছাড়া আর কে দেবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেবার সেই ঈশ্বর! শাশুড়ী বললে, আহা বউমা, সকলেরই সেবা করবার লোক আছে, তোমার কেউ পা টিপে দিত বেশ হত। বউ বললে, ওগো! আমার পা হরি টিপবেন, আমার কারুকে দরকার নাই। সে ভক্তিভাবে ওই কথা বললে।

“একজন ফকির আকবর শার কাছে কিছু টাকা আনতে গিছল। বাদশা তখন নমাজ পড়ছে আর বলছে, হে খোদা! আমায় ধন দাও, দৌলত দাও। ফকির তখন চলে আসবার উপক্রম করলে। কিন্তু আকবর শা তাকে বসতে ইশারা করলেন। নমাজের পর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেন চলে যাচ্ছিলে। সে বললে, আপনিই বলছিলেন ধন দাও, দৌলত দাও। তাই ভাবলাম, যদি চাইতে হয়, ভিখারীর কাছে কেন? খোদার কাছে চাইব!”

বিজয় — গয়াতে সাধু দেখেছিলাম, নিজের চেষ্টা নাই। একদিন ভক্তদের খাওয়াবার ইচ্ছা হল। দেখি কোথা থেকে, মাথায় করে ময়দা ঘি এসে পড়ল। ফলটলও এল।

[সঞ্চয় ও তিন শ্রেণীর সাধু]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়াদির প্রতি) — সাধুর তিন শ্রেণী। উত্তম, মধ্যম অধম। উত্তম যারা খাবার জন্যে চেষ্টা করেন না। মধ্যম ও অধম যেমন দণ্ডী-ফণ্ডী। মধ্যম, তারা ‘নমো নারায়ণ’! বলে দাঁড়ায়। যারা অধম তারা না দিলে ঝগড়া করে। (সকলের হাস্য)

“উত্তম শ্রেণীর সাধুর অজগরবৃত্তি। বসে খাওয়া পাবে। অজগর নড়ে না। একটি ছোকরা সাধু — বাল-ব্রহ্মচারী — ভিক্ষা করতে গিছিল, একটি মেয়ে এসে ভিক্ষা দিলে। তার বক্ষে স্তন দেখে সাধু মনে করলে বুকে ফোঁড়া হয়েছে, তাই জিজ্ঞাসা করলে। পরে বাড়ির গিন্নীরা বুঝিয়ে দিলে যে, ওর গর্ভে ছেলে হবে বলে ঈশ্বর স্তনেতে দুগ্ধ দিবেন; তাই ঈশ্বর আগে থাকতে তার বন্দোবস্ত করছেন। এই কথা শুনে ছোকরা সাধুটি অবাক্। তখন সে বললে, তবে আমার ভিক্ষা করবার দরকার নেই; আমার জন্যও খাবার আছে।”

ভক্তেরা কেহ কেহ মনে করিতেছেন, তবে আমাদেরও তো চেষ্টা না করলে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — যার মনে আছে চেষ্টা দরকার, তার চেষ্টা করতেই হবে।

বিজয় — ভক্তমালে একটি বেশ গল্প আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি বলো না।

বিজয় — আপনিই বলুন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — না তুমিই বলো! আমার অত মনে নাই। প্রথম প্রথম শুনতে হয়। তাই আগে আগে ও-সব শুনতাম।

[ঠাকুরের অবস্থা — এক রামচিন্তা — পূর্ণজ্ঞান ও প্রেমের লক্ষণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমার এখন সে অবস্থা নয়। হনুমান বলেছিল, আমি তিথি-নক্ষত্র জানি না, এক রামচিন্তা করি।

“চাতক চায় কেবল ফটিক জল। পিপাসায় প্রাণ যায়, উঁচু হয়ে আকাশের জল পান করতে চায়। গঙ্গা-যমুনা সাত সমুদ্র জলে পূর্ণ। সে কিন্তু পৃথিবীর জল খাবে না।

“রাম-লক্ষ্মণ পম্পা সরোবরে গিয়েছেন। লক্ষ্মণ দেখিলেন, একটি কাক ব্যাকুল হয়ে বারবার জল খেতে যায়, কিন্তু খায় না। রামকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, ভাই, এ কাক পরমভক্ত। অহর্নিশি রামনাম জপ করছে! এদিকে জলতৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু খেতে পারছে না। ভাবছে খেতে গেলে পাছে রামনাম জপ ফাঁক যায়! হলধারীকে পূর্ণিমার দিন বললুম, দাদা! আজ কি অমাবস্যা? (সকলের হাস্য)

(সহাস্যে) — “হ্যাঁগো! শুনেছিলাম, যখন অমাবস্যা-পূর্ণিমা ভুল হবে তখন পূর্ণজ্ঞান হয়। হলধারী তা বিশ্বাস করবে কেন, হলধারী বললে, এ কলিকাল! একে আবার লোকে মানে! যার অমাবস্যা-পূর্ণিমাবোধ নাই”।

ঠাকুর এ-কথা বলিতেছিলেন, এমন সময় মহিমাচরণ আসিয়া উপস্থিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সসম্ভ্রমে) — আসুন, আসুন। বসুন!

(বিজয়াদি ভক্তের প্রতি) — “এ অবস্থায় ‘অমুক দিন’ মনে থাকে না। সেদিন বেণী পালের বাগানে উৎসব; দিন ভুল হয়ে গেল। ‘অমুক দিন সংক্রান্তি ভাল করে হরিনাম করব’ —— এ-সব আর ঠিক তাকে না। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর) তবে অমুক আসবে বললে মনে থাকে।”

[শ্রীরামকৃষ্ণের মন-প্রাণ কোথায় —— ঈশ্বরলাভ ও উদ্দীপন]

ঈশ্বরে ষোল আনা মন গেলে এই অবস্থা। রাম জিজ্ঞাসা করলেন, হনুমান, তুমি সীতার সংবাদ এনেছ; কিরূপ তাঁকে চেখে এলে আমায় বল। হনুমান বললে রাম, দেখলাম সীতার শুধু শরীর পড়ে আছে। তার ভিতরে মন প্রাণ নাই। সীতার মন-প্রাণ যে তিনি তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করেছেন! তাই শুধু শরীর পড়ে আছে। আর কাল (যম) আনাগোনা করছে! কিন্তু কি করবে, শুধু শরীর; মন-প্রাণ তাতে নাই।

“যাঁকে চিন্তা করবে তার সত্তা পাওয়া যায়। অহর্নিশ ঈশ্বরচিন্তা করলে ঈশ্বরের সত্তা লাভ হয়। লুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে তাই হয়ে গেল।

“বই বা শাস্ত্রের কি উদ্দেশ্য? ঈশ্বরলাভ। সাধুর পুঁথি একজন খুলে দেখলে, প্রত্যেক পাতাতে কেবল ‘রাম’ নাম লেখা আছে। আর কিছু নাই।

“ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলে একটুতেই উদ্দীপন হয়। তখন একবার রামনাম করলে কোটি সন্ধ্যার ফল হয়।

“মেঘ দেখলে ময়ূরের উদ্দীপন হয়, আনন্দে পেখম ধরে নৃত্য করে। শ্রীমতীরও সেইরূপ হত। মেঘ দেখলেই কৃষ্ণকে মনে পড়ত।

“চৈতন্যদেব মেড়গাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শুনলেন, এ-গাঁয়ের মাটিতে খোল তৈয়ার হয়। অমনি ভাবে বিহ্বল হলেন, — কেননা হরিনাম কীর্তনের সময় খোল বাজে।

“কার উদ্দীপন হয়? যার বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ হয়েছে। বিষয়রস যার শুকিয়ে যায় তারই একটুতেই উদ্দীপন হয়। দেশলাই ভিজে থাকলে হাজার ঘষো, জ্বলবে না। জলটা যদি শুকিয়ে যায়, তাহলে একটু ঘষলেই দপ্ করে জ্বলে উঠে।”

[ঈশ্বরলাভের পর দুঃখে-মরণে স্থিরবুদ্ধি ও আত্মসমর্পণ]

“দেহের সুখ-দুঃখ আছেই। যার ঈশ্বরলাভ হয়েছে সে মন, প্রাণ, দেহ, আত্মা সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করে। পম্পা সরোবরে স্নানের সময় রাম-লক্ষ্মণ সরোবরের নিকট মাটিতে ধনুক গুঁজে রাখলেন। স্নানের পর উঠে লক্ষণ তুলে দেখেন যে, ধনুক রক্তাক্ত হয়ে রয়েছে। রাম দেখে বললেন, ভাই দেখ দেখ, বোধ হয় কোন জীবহিংসা হল। লক্ষ্মণ মাটি খুঁড়ে দেখেন একটা বড় কোলা ব্যাঙ। মুমূর্ষ অবস্থা। রাম করুণস্বরে বলতে লাগলেন, ‘কেন তুমি শব্দ কর নাই, আমরা তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতাম! যখন সাপে ধরে, তখন তো খুব চিৎকার কর।’ ভেক বললে, ‘রাম! যখন সাপে ধরে তখন আমি এই বলে চিৎকার করি — রাম রক্ষা করো, রাম রক্ষা করো। এখন দেখছি রামই আমায় মারছেন! তাই চুপ করে আছি’।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৯ই নভেম্বর 1884/11/09/ii

37.11 স্ব-স্বরূপে থাকা কিরূপ — জ্ঞানযোগ বড় কঠিন

ঠাকুর একটু চুপ করিলেন ও মহিমাদি ভক্তদের দেখিতেছেন।

ঠাকুর শুনিয়াছিলেন যে, মহিমাচরণ গুরু মানেন না। এইবার ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — গুরুবাক্যে বিশ্বাস করা উচিত। গুরুর চরিত্র দিকে দেখবার দরকার নাই। ‘যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ি যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।’

“একজন চন্ডী ভাগবত শোনাতো। সে বললে, ঝাড়ু অস্পৃশ্য বটে কিন্তু স্থানকে শুদ্ধ করে।”

মহিমাচরণ বেদান্তচর্চা করেন। উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞান। জ্ঞানীর পথ অবলম্বন করিয়াছেন ও সর্বদা বিচার করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) — জ্ঞানীর উদ্দেশ্য স্ব-স্বরূপকে জানা; এরই নাম জ্ঞান, এরই নাম মুক্তি। পরমব্রহ্ম, ইনিই নিজের স্বরূপ। আমি আর পরমব্রহ্ম এক, মায়ার দরুন জানতে দেয় না।

"হরিশকে বললুম, আর কিছু নয়, সোনার উপর ঝোড়া কতক মাটি পড়েছে, সেই মাটি ফেলে দেওয়া।

"ভক্তেরা 'আমি' রাখে, জ্ঞানীরা রাখে না। কিরূপে স্ব-স্বরূপে থাকা যায় ন্যাংটা উপদেশ দিত, — মন বুদ্ধিতে লয় কর, বুদ্ধি আত্মাতে লয় কর, তবে স্ব-স্বরূপে থাকবে।

"কিন্তু 'আমি' থাকবেই থাকবে; যায় না। যেমন অনন্ত জলরাশি, উপরে নিচে, সম্মুখে পিছনে, ডাইনে বামে, জল পরিপূর্ণ! সেই জলের মধ্যে একটি জলপূর্ণ কুম্ভ আছে। ভিতরে বাহিরে জল, কিন্তু তবু ও কুম্ভটি আছে। 'আমি' রূপ কুম্ভ।"

[পূর্বকথা —— কালীবাড়িতে বজ্রপাত —— ব্রহ্মজ্ঞানীর শরির ও চরিত্র]

"জ্ঞানীর শরীর যেমন তেমনই থাকে; তবে জ্ঞানাগ্নিতে কামাদিরিপু দগ্ধ হয়ে যায়। কালীবাড়িতে অনেকদিন হল ঝড়-বৃষ্টি হয়ে কালীঘরে বজ্রপাত হয়েছিল। আমরা গিয়ে দেখলাম, কপাটগুলির কিছু হয় নাই; তবে ইস্ক্রুগুলির মাথা ভেঙে গিছিল। কপাটগুলি যেন শরীর, কামাদি আসক্তি যেন ইস্ক্রুগুলি।

“জ্ঞানী কেবল ঈশ্বরের কথা ভালবাসে। বিষয়ের কথা হলে তার বড় কষ্ট হয়। বিষয়ীরা আলাদা লোক। তাদের অবিদ্যা-পাগড়ি খসে না। তাই ফিরে-ঘুরে ওই বিষয়ের কথা এনে ফেলে।

“বেদেতে সপ্তভূমির কথা আছে। পঞ্চমভূমিতে যখন জ্ঞানী উঠে, তখন ঈশ্বরকথা বই শুনতেও পারে না, আর বলতেও পারে না। তখন তার মুখ থেকে কেবল জ্ঞান উপদেশ বেরোয়।”

এই সমস্ত কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ কি নিজের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন? ঠাকুর আবার বলিতেছেন — “বেদে আছে ‘সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম।’ ব্রহ্ম একও নয়, দুইও নয়। এক-দুয়ের মধ্যে। অস্তিও বলা যায় না, নাস্তিও বলা যায় না। তবে অস্তি-নাস্তির মধ্যে।”

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তিযোগ — রাগভক্তি হলে ঈশ্বরলাভ]

শ্রীরামকৃষ্ণ — রাগভক্তি এলে, অর্থাৎ ঈশ্বরে ভালবাসা এলে তবে তাঁকে পাওয়া যায়। বৈধীভক্তি হতেও যেমন যেতেও তেমন। এত জপ, এত ধ্যান করবে, এত যাগ-যজ্ঞ-হোম করবে, এই এই উপচারে পূজা করবে, পূজার সময় এই এই মন্ত্র পাঠ করবে — এই সকলের নাম বৈধীভক্তি। হতেও যেমন, যেতেও তেমন! কত লোকে বলে, আর ভাই, কত হবিষ্য করলুম, কতবার বাড়িতে পূজা আনলুম, কিন্তু কি হল?

“রাগভক্তির কিন্তু পতন নাই! কাদের রাগভক্তি হয়? যাদের পূর্বজন্মে অনেক কাজ করা আছে। অথবা যারা নিত্যসিদ্ধ। যেমন একটা পোড়ো বাড়ির বনজঙ্গল

কাটতে কাটতে নল-বসানো ফোয়ারা একটা পেয়ে গেল! মাটি-সুরকি ঢাকা ছিল; যাই সরিয়ে দিলে অমনি ফরফর করে জল উঠতে লাগল!

“যাদের রাগভক্তি তারা এমন কথা বলে না, ‘ভাই, কত হবিষ্য করলুম — কিন্তু কি হল!’ যারা নূতন চাষ করে তাদের যদি ফসল না হয়, জমি ছেড়ে দেয়। খানদানি চাষা ফসল হোক আর না হোক, আবার চাষ করবেই। তাদের বাপ-পিতামহ চাষাগিরি করে এসেছে, তারা জানে যে চাষ করেই খেতে হবে।

“যাদের রাগভক্তি, তাদেরই আন্তরিক। ঈশ্বর তাদের ভার লন। হাসপাতালে নাম লেখালে — আরাম না হলে ডাক্তার ছাড়ে না।

“ঈশ্বর যাদের ধরে আছেন তাদের কোন ভয় নাই। মাঠের আলের উপর চলতে চলতে যে ছেলে বাপকে ধরে থাকে সে পড়লেও পড়তে পারে — যদি অন্যমনস্ক হয়ে হাত ছেড়ে দেয়। কিন্তু বাপ যে ছেলেকে ধরে থাকে সে পড়ে না।”

[রাগভক্তি হলে কেবল ঈশ্বরকথা — সংসারত্যাগ ও গৃহস্থ]

“বিশ্বাসে কি না হতে পারে? যার ঠিক, তার সব তাতে বিশ্বাস হয়, — সাকার-নিরাকার, রাম, কৃষ্ণ, ভগবতী।

“ও-দেশে যাবার সময় রাস্তায় ঝড়-বৃষ্টি এলো। মাঠের মাঝখানে আবার ডাকাতের ভয়। তখন সবই বললুম — রাম, কৃষ্ণ, ভগবতী; আবার বললুম, হনুমান! আচ্ছা সব বললুম — এর মানে কি?

“কি জানো, যখন চাকর বা দাসী বাজারের পয়সা লয় তখন বলে বলে লয়, এটা আলুর পয়সা, এটা বেগুনের পয়সা, এগুলো মাছের পয়সা। সব আলাদা। সব হিসাব করে লয়ে তারপর দেয় মিশিয়ে।

“ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলে কেবল তাঁরই কথা কইতে ইচ্ছা করে। যে যাকে ভালবাসে তার কথা শুনতে ও বলতে ভাল লাগে।

“সংসারী লোকদের ছেলের কথা বলতে বলতে লাল পড়ে। যদি কেউ ছেলের সুখ্যাত করে তো অমনি বলবে, ওরে তোর খুড়োর জন্য পা ধোবার জল আন।

“যারা পায়রা ভালবাসে, তাদের কাছে পায়রার সুখ্যাত করলে বড় খুশি। যদি কেউ পায়রার নিন্দা করে, তাহলে বলে উঠবে, তোর বাপ-চৌদ্দ পুরুষ কখন কি পায়রার চাষ করেছে?”

ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিতেছেন। কেননা মহিমা সংসারী।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) — সংসার একেবারে ত্যাগ করবার কি দরকার? আসক্তি গেলেই হল। তবে সাধন চাই। ইন্দ্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়।

“কেল্লার ভিতর থেকে যুদ্ধ করাই আরও সুবিধা — কেল্লা থেকে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। সংসার ভোগের স্থান, এক-একটি জিনিস ভোগ করে অমনি ত্যাগ করতে হয়। আমার সাধ ছিল সোনার গোট পরি। তা শেষে পাওয়াও গেল, সোনার গোট পরলুম; পরবার পর কিন্তু তৎক্ষণাৎ খুলতে হবে।

“পেঁয়াজ খেলুম আর বিচার করতে লাগলুম, — মন, এর নাম পেঁয়াজ। তারপর মুখের ভিতর একবার এদিক-ওদিক, একবার সেদিক করে তারপর ফেলে দিলুম।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৯ই নভেম্বর 1884/11/09/iii

37.12 সংকীর্তনানন্দে

আজ একজন গায়ক আসবে, সম্প্রদায় লইয়া কীর্তন করিবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে ভক্তদের জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কই কীর্তন কই?

মহিমা বলিতেছেন — আমরা বেশ আছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — না গো, এতো আমাদের বারমাস আছে।

নেপথ্যে একজন বলিতেছেন, ‘কীর্তন এসেছে।’

শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে পূর্ণ হয়ে কেবল বললেন, “অ্যাঁ, এসেছে?”

ঘরের দক্ষিণ-পূর্বে লম্বা বারান্দায় মাদুর পাতা হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, “গঙ্গাজল একটু দে, যত বিষয়ীরা পা দিচ্ছে।”

বালীনিবাসী প্যারীবাবুর পরিবারেরা ও মেয়েরা কালীমন্দির দর্শন করিতে আসিয়াছে, কীর্তন হইবার উদ্যোগ দেখিয়া তাহাদের শুনিবার ইচ্ছা হইল। একজন ঠাকুরকে আসিয়া বলিতেছে, “তারা জিজ্ঞাসা করছে ঘরে কি জায়গা হবে, তারা কি বসতে পারে?” ঠাকুর কীর্তন শুনিতে শুনিতে বলিতেছেন, “না, না।” (অর্থাৎ ঘরে) জায়গা কোথায়?

এমন সময় নারায়ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর বলিতেছেন, “তুই কেন এসেছিস? অত মেরেছে — তোর বাড়ির লোক।” নারাণ ঠাকুরের ঘরের দিকে যাইতেছেন দেখিয়া ঠাকুর বাবুরামকে ইঙ্গিত করিলেন, “ওকে খেতে দিস।”

নারাণ ঘরের মধ্যে গেলেন। হঠাৎ ঠাকুর উঠিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। নারাণকে নিজের হাতে খাওয়াইবেন। খাওয়াইবার পর আবার কীর্তনের স্থানে আসিয়া বসিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৯ই নভেম্বর 1884/11/09/iv

37.13 ভক্তসঙ্গে সংকীর্তনানন্দে

অনেক ভক্তেরা আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামী, মহিমাচরণ, নারায়ণ, অধর, মাস্টার, ছোট গোপাল ইত্যাদি। রাখাল, বলরাম তখন শ্রীবৃন্দাবনধামে আছেন।

বেলা ৩-৪টা বাজিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বারান্দায় কীর্তন শুনিতেছেন। কাছে নারাণ আসিয়া বসিলেন। অন্যান্য ভক্তেরা চতুর্দিকে বসিয়া আছেন।

এমন সময় অধর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অধরকে দেখিয়া ঠাকুর যেন শশব্যস্ত হইলেন। অধর প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলে ঠাকুর তাঁহাকে আরও কাছে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

কীর্তনিয়া কীর্তন সমাপ্ত করিলেন। আসর ভঙ্গ হইল। উদ্যানমধ্যে ভক্তেরা এদিক-ওদিক বেড়াইতেছেন। কেহ কেহ মা কালীর ও রাধাকান্তের মন্দিরে আরতি দর্শন করিতে গেলেন।

সন্ধ্যার পর ঠাকুরের ঘরে আবার ভক্তেরা আসিলেন।

ঠাকুরের ঘরের মধ্যে আবার কীর্তন হইবার উদ্যোগ হইতেছে। ঠাকুরের খুব উৎসাহ, বলিতেছেন যে, “এদিকে একটা বাতি দাও।” ডবল বাতি জ্বালিয়া দেওয়াতে খুব আলো হইল।

ঠাকুর বিজয়কে বলিতেছেন, “তুমি অমন জায়গায় বসলে কেন? এদিকে সরে এস।”

এবার সংকীর্তন খুব মাতামাতি হইল। ঠাকুর মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন। ভক্তেরা তাঁহাকে খুব বেড়াইয়া বেড়াইয়া নাচিতেছেন। বিজয় নৃত্য করিতে করিতে দিগম্বর হইয়া পড়িয়াছেন। হুঁশ নাই।

কীর্তনান্তে বিজয় চাবি খুঁজিতেছেন, কোথায় পড়িয়া গিয়াছে। ঠাকুর বলিতেছেন, “এখানেও একটা হরিবোল খায়।” এই বলিয়া হাসিতেছেন। বিজয়কে আরও বলিতেছেন, “ও সব আর কেন” (অর্থাৎ তার চাবির সঙ্গে সম্পর্ক রাখা কেন)!

কিশোরী প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন। ঠাকুর যেন স্নেহে আর্দ্র হইয়া তাঁহার বক্ষে হাত দিলেন আর বলিলেন, “তবে এসো।” কথাগুলি যেন করুণামাখা। কিয়ৎক্ষণ পরে মণি ও গোপাল কাছে আসিয়া প্রণাম করিলেন — তাঁহারা বিদায় লইবেন। আবার সেই স্নেহমাখা কথা। কথাগুলি হইতে যেন মধু ঝরিতেছে। বলিতেছেন, “কাল সকালে উঠে যেও, আবার হিম লাগবে?”

[ভক্ত সঙ্গে – ভক্তকথাপ্রসঙ্গে]

মণি এবং গোপালের আর যাওয়া হইল না, তাঁহারা আজ রাত্রে থাকিবেন। তাঁহারা ও আরও ২/১ জন ভক্ত মেঝেতে বসিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীযুক্ত রাম চক্রবর্তীকে বলিতেছেন, “রাম, এখানে যে আর-একখানি পাপোশ ছিল। কোথায় গেল?”

ঠাকুর সমস্ত দিন অবসর পান নাই — একটু বিশ্রাম করিতে পান নাই। ভক্তদের ফেলিয়া কোথায় যাইবেন! এইবার একবার বর্হির্দেশে যাইতেছেন। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, মণি রামলালের নিকট গান লিখিয়া লইতেছেন —

“তার তারিণি!
এবার ত্বরিত করিয়ে তপন-তনয়-ত্রাসিত” — ইত্যাদি।

ঠাকুর মণিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “কি লিখছো?” গানের কথা শুনিয়া বলিলেন, “এ যে বড় গান।”

রাত্রে ঠাকুর একটু সুজির পায়েস ও একখানি কি দুখানি লুচি খান। ঠাকুর রামলালকে বলিতেছেন, “সুজি কি আছে?”

গান এক লাইন দু’লাইন লিখিয়া মণি লেখা বন্ধ করিলেন।

ঠাকুর মেঝেতে আসনে বসিয়া সুজি খাইতেছেন।

ঠাকুর আবার ছোট খাটটিতে বসিলেন। মাস্টার খাটের পার্শ্বস্থিত পাপোশের উপর বসিয়া ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছেন। ঠাকুর নারায়ণের কথা বলিতে বলিতে ভাবযুক্ত হইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আজ নারায়ণকে দেখলুম।

মাস্টার — আজ্ঞা হাঁ, চোখ ভেজা। মুখ দেখে কান্না পেল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ওকে দেখলে যেন বাৎসল্য হয়। এখানে আসে বলে ওকে বাড়িতে মারে। ওর হয়ে বলে এমন কেউ নাই। ‘কুব্জা তোমায় কু বোঝায়। রাইপক্ষে বুঝায় এমন কেউ নাই।’

মাস্টার (সহাস্যে) — হরিপদর বাড়িতে বই রেখে পলায়ন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ওটা ভাল করে নাই।

ঠাকুর চুপ করিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখ, ওর খুব সত্তা। তা না হলে কীর্তন শুনতে শুনতে আমায় টানে! ঘরের ভিতর আমার আসতে হল। কীর্তন ফেলে আসা — এ কখনও হয় নাই।

ঠাকুর চুপ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ওকে ভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তা এককথায় বললে — “আমি আনন্দে আছি।” (মাস্টারের প্রতি) তুমি ওকে কিছু কিনে মাঝে মাঝে খাইও — বাৎসল্যভাবে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তেজচন্দ্রের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — একবার ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখো, একেবার আমায় ও কি বলে, — জ্ঞানী, কি কি বলে? শুনলুম, তেজচন্দ্র নাকি বড় কথা

কয় না। (গোপালের প্রতি) — দেখ্, তেজচন্দ্রকে শনি-মঙ্গলবারে আসতে বলিস।

[দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে — গোস্বামী, মহিমাচরণ প্রভৃতি সঙ্গে]

মেঝেতে আসনের উপর ঠাকুর উপবিষ্ট। সুজি খাইতেছেন। পার্শ্বে একটি পিলসুজের উপর প্রদীপ জলিতেছে। ঠাকুরের কাছে মাস্টার বসিয়া আছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, “কিছু মিষ্টি কি আছে?” মাস্টার নূতন গুড়ের সন্দেশ আনিয়াছিলেন। রামলালকে বলিলেন, সন্দেশ তাকের উপর আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি, আন না।

মাস্টার ব্যস্ত হইয়া তাক খুঁজিতে গেলেন। দেখিলেন, সন্দেশ নাই, বোধহয় ভক্তদের সেবায় খরচ হইয়াছে। অপ্রস্তত হইয়া ঠাকুরের কাছে ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা একবার তোমার স্কুলে গিয়ে যদি দেখি —

মাস্টার ভাবিতেছেন, উনি নারায়ণকে স্কুলে দেখিতে যাইবার ইচ্ছা করিতেছেন।

মাস্টার — আমাদের বাসায় গিয়ে বসলে তো হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — না, একটা ভাব আছে। কি জানো, আর কেউ ছোকরা আছে কিনা একবার দেখতুম।

মাস্টার — অবশ্য আপনি যাবেন। অন্য লোক দেখতে যায়, সেইরূপ আপনিও যাবেন।

ঠাকুর আহারান্তে ছোট খাটটিতে গিয়া বসিলেন। একটি ভক্ত তামাক সাজিয়া দিলেন। ঠাকুর তামাক খাইতেছেন। ইতিমধ্যে মাস্টার ও গোপাল বারান্দায় বসিয়া রুটি ও ডাল ইত্যাদি জলখাবার খাইলেন। তাঁহারা নহবতে ঘরে শুইবেন ঠিক করিয়াছেন।

খাবার পর মাস্টার খাটের পার্শ্বস্থ পাপোশে আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — নহবতে যদি হাঁড়িকুড়ি থাকে? এখানে শোবে? এই ঘরে?

মাস্টার — যে আজ্ঞে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৯ই - ১০ই নভেম্বর 1884/11/09/v & 1884/11/10

37.14 সেবকসঙ্গে

রাত ১০টা-১১টা হইল। ঠাকুর ছোট খাটটিতে তাকিয়া ঠেসান দিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। মণি মেঝেতে বসিয়া আছেন। মণির সহিত ঠাকুর কথা কহিতেছেন। ঘরের দেওয়ালের কাছে সেই পিলসুজের উপর প্রদীপে আলো জ্বলিতেছে।

ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধু। মণির সেবা লইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখ, আমার পাঞ্চটা কামড়াচ্ছে। একটু হাত বুলিয়া দাও তো।

মণি ঠাকুরের পাদমূলে ছোট্ট খাটটির উপর বসিলেন ও কোলে তাঁহার পা দুখানি লইয়া আস্তে আস্তে হাত বুলাইতেছেন। ঠাকুর মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — আজ সব কেমন কথা হয়েছে?

মণি — আজ্ঞা খুব ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — আকবর বাদশাহের কেমন কথা হল?

মণি — আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি বলো দেখি?

মণি — ফকির আকবর বাদশাহের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আকবর শা তখন নমাজ পড়ছিল। নমাজ পড়তে পড়তে ঈশ্বরের কাছে ধন-দৌলত চাচ্ছিল, তখন ফকির আস্তে আস্তে ঘর থেকে চলে যাবার উপক্রম করলে। পরে

আকবর জিজ্ঞাসা করাতে বললে, যদি ভিক্ষা করতে হয় ভিখারীর কাছে কেন করব!

শ্রীরামকৃষ্ণ — আর কি কি কথা হয়েছিল?

মণি — সঞ্চয়ের কথা খুব হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — (সহাস্যে) — কি কি হল?

মণি — চেষ্টা যতক্ষণ করতে হবে বোধ থাকে, ততক্ষণ চেষ্টা করতে হয়। সঞ্চয়ের কথা সিঁথিতে কেমন বলেছিলেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি কথা?

মণি — যে তাঁর উপর সব নির্ভর করে, তার ভার তিনি লন। নাবালকের যেমন অছি সব ভার নয়। আর-একটি কথা শুনেছিলাম যে, নিমন্ত্রণ বাড়িতে ছোট ছেলে নিজে বসবার জায়গা নিতে পারে না। তাকে খেতে কেউ বসিয়া দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — না। ও হলো না, বাপে ছেলের হাত ধরে লয়ে গেলে সে ছেলে আর পড়ে না।

মণি — আর আজ আপনি তিনরকম সাধুর কথা বলেছিলেন। উত্তম সাধু সে বসে খেতে পায়। আপনি ছোকরা সাধুটির কথা বললেন, মেয়েটির স্তন দেখে বলেছিল, বুকে ফোঁড়া হয়েছে কেন? আরও সব চমৎকার চমৎকার কথা বললেন, সব শেষের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — কি কি কথা?

মণি — সেই পম্পার কাকের কথা। রামনাম অহর্নিশ জপ করছে, তাই জলের কাছে যাচ্ছে কিন্তু খেতে পারছে না। আর সেই সাধুর পুঁথির কথা, — তাতে কেবল “ওঁ রামঞ্চঞ্চ এইটি লেখা। আর হনুমান রামকে যা বললেন —

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি বললেন?

মণি — সীতাকে দেখে এলুম, শুধু দেহটি পড়ে রয়েছে, মন-প্রাণ তোমার পায়ে সব সমর্পণ করেছেন!

“আর চাতকের কথা, — ফটিক জল বই আর কিছু খাবে না।

“আর জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগের কথা।”

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি?

মণি — যতক্ষণ ‘কুম্ভ’ জ্ঞান, ততক্ষণ “আমি কুম্ভ” থাকবেই থাকবে। যতক্ষণ ‘আমি’ জ্ঞান, ততক্ষণ “আমি ভক্ত, তুমি ভগবান।”

শ্রীরামকৃষ্ণ — না, ‘কুম্ভ’ জ্ঞান থাকুক আর না থাকুক, ‘কুম্ভ’ যায় না। ‘আমি’ যাবার নয়। হাজার বিচার কর, ও যাবে না।

মণি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। আবার বলিতেছেন —

মণি — কালীঘরে ঈশান মুখুজ্জের সঙ্গে কথা হয়েছিল — বড় ভাগ্য তখন আমরা সেখানে ছিলাম আর শুনতে পেয়েছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — হাঁ, কি কি কথা বল দেখি?

মণি — সেই বলেছিলেন, কর্মকাণ্ড। আদিকাণ্ড। শম্ভু মল্লিককে বলেছিলেন, যদি ঈশ্বর তোমার সামনে আসেন, তাহলে কি কতকগুলো হাসপাতাল ডিস্পেনসারি চাইবে?

“আর-একটি কথা হয়েছিল, — যতক্ষণ কর্মে আসক্তি থাকে ততক্ষণ ঈশ্বর দেখা দেন না। কেশব সেনকে সেই কথা বলেছিলেন।”

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি?

মণি — যতক্ষণ ছেলে চুষি নিয়ে ভুলে থাকে ততক্ষণ মা রান্নাবান্না করেন। চুষি ফেলে যখন ছেলে চিৎকার করে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে ছেলের কাছে যান।

“আর-একটি কথা সেদিন হয়েছিল। লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন — ভগবানকে কোথা কোথা দর্শন হতে পারে। রাম অনেক কথা বলে তারপর বললেন — ভাই, যে মানুষে ঊর্জিতা ভক্তি দেখতে পাবে — হাঁসে কাঁদে নাচে গায়, — প্রেমে মাতোয়ারা — সেইখানে জানবে যে আমি (ভগবান আছি)।”

শ্রীরামকৃষ্ণ — আহা! আহা!

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

মণি — ঈশানকে কেবল নিবৃত্তির কথা বললেন। সেই দিন থেকে অনেকের আক্কেল হয়েছে। কর্তব্য কর্ম কমাবার দিকে ঝোঁক। বলেছিলেন — ‘লঙ্কায় রাবণ মলো, বেহুলা কেঁদে আকুল হলো!’

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া উচ্চহাস্য করিলেন।

মণি (অতি বিনীতভাবে) — আচ্ছা, কর্তব্য কর্ম — হাঙ্গাম — কমানো তো ভাল?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, তবে সম্মুখে কেউ পড়ল, সে এক। সাধু কি গরিব লোক সম্মুখে পড়লে তাদের সেবা করা উচিত।

মণি — আর সেদিন ঈশান মুখুজ্জেকে খোসামুদের কথা বেশ বললেন। মড়ার উপর যেমন শকুনি পড়ে। ও-কথা আপনি পণ্ডিত পদ্মলোচনকে বলেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — না, উলোর বামনদাসকে।

কিয়ৎপরে মণি ছোট খাটের পার্শ্বে পাপোশের নিকট বসিলেন।

ঠাকুরের তন্দ্রা আসিতেছে, — তিনি মণিকে বলিতেছেন, তুমি শোওগে। গোপাল কোথায় গেল? তুমি দোর ভেজিয়ে রাখ।

পরদিন (১০ই নভেম্বর) সোমবার। শ্রীরামকৃষ্ণ বিছানা হইতে অতি প্রত্যূষ্যে উঠিয়াছেন ও ঠাকুরদের নাম করিতেছেন, মাঝে মাঝে গঙ্গাদর্শন করিতেছেন। এদিকে মা-কালীর ও শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে মঙ্গলারতি হইতেছে। মণি ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে শুইয়াছিলেন। তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া সমস্ত দর্শন করিতেছেন ও শুনিতেছেন।

প্রাতঃকৃত্যের পর তিনি ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিলেন।

ঠাকুর আজ স্নান করিলেন। স্নানান্তে ১কালীঘরে যাইতেছেন। মণি সঙ্গে আছেন। ঠাকুর তাঁহাকে ঘরে তালা লাগাইতে বলিলেন।

কালীঘরে যাইয়া ঠাকুর আসনে উপবিষ্ট হইলেন ও ফুল লইয়া কখনও নিজের মস্তকে কখনও মা-কালীর পাদপদ্মে দিতেছেন। একবার চামর লইয়া ব্যজন করিলেন। আবার নিজের ঘরে ফিরিলেন। মণিকে আবার চাবি খুলিতে বলিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া ছোট খাটটিতে বসিলেন। এখন ভাবে বিভোর — ঠাকুর নাম করিতেছেন। মণি মেঝেতে একাকী উপবিষ্ট। এইবার ঠাকুর গান গাহিতেছেন। ভাবে মাতোয়ারা হইয়া গানের ছলে মণিকে কি শিখাইতেছেন যে, কালীই ব্রহ্ম, কালী নির্গুণা, আবার সগুণা, অরূপ আবার অনন্তরূপিণী।

গান - কে জানে কালী কেমন, ষড়দর্শনে।

গান - এ সব ক্ষেপা মেয়ের খেলা।

গান - কালী কে জানে তোমায় মা (তুমি অনন্তরূপিণী!)

তুমি মহাবিদ্যা, অনাদি অনাদ্যা, ভববন্ধের বন্ধনহারিণী তারিণী!

গিরিজা, গোপজা, গোবিন্দমোহিনী, সারদে বরদে নগেন্দ্রনন্দিনী,

জ্ঞানদে মোক্ষদে, কামাখ্যা কামদে, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণহৃদিবিলাসিনী।

গান - তার তারিণী! এবার ত্বরিত করিয়ে,

তপন-তনয়-ত্রাসে ত্রাসিত প্রাণ যায়।

জগত অম্বে জনপালিনী, জন-মিহিনী জগত জননী,

যশোদা জঠরে জনম লইয়ে, সহায় হরি লীলায়।।

বৃন্দাবনে রাধাবিনোদিনী, ব্রজবল্লভ বিহারকারিণী,

রাসরঙ্গিনী রসময়ী হ'য়ে, রাস করিলে লীলাপ্রকাশ।।

গিরিজা গোপজা গোবিন্দমোহিনী, তুমি মা গঙ্গে গতিদায়িনী,

গান্ধার্বিকে গৌরবরণী গাওয়ে গোলকে গুণ তোমার।।

শিবে সনাতনী সর্বাণী ঈশানী, সদানন্দময়ী, সর্বস্বরূপিণী,

সগুণা নির্গুণা সদাশিব প্রিয়া, কে জানে মহিমা তোমার।।

মণি মনে মনে করিতেছেন ঠাকুর যদি একবার এই গানটি গান —

“আর ভুলালে ভুলবো না মা, দেখেছি তোমার রাঙ্গা চরণ।”

কি আশ্চর্য! মনে করিতে না করিতে ওই গানটি গাহিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন — আচ্ছা, আমার এখন কিরকম অবস্থা তোমার বোধ হয়!

মণি (সহাস্যে) — আপনার সহজাবস্থা।

ঠাকুর আপন মনে গানের ধুয়া ধরিলেন, — “সহজ মানুষ না হলে সহজকে না যায় চেনা।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c38 ৩৮ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রহ্লাদচরিত্রাভিনয় দর্শনে স্টার থিয়েটারে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৪ই ডিসেম্বর 1884/12/14/i

38.1 শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিমন্দিরে

শ্রীরামকৃষ্ণ আজ স্টার থিয়েটারে প্রহ্লাদচরিত্রের অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে মাস্টার, বাবুরাম ও নারায়ণ প্রভৃতি। স্টার থিয়েটার তখন বিডন স্ট্রীটে, এই রঙ্গমঞ্চে পরে এমারল্ড থিয়েটার ও ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনয় সম্পন্ন হইত।

আাজ রবিবার। ৩০শে অগ্রহায়ণ, কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ একটি বক্সে উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। রঙ্গালয় আলোকাকীর্ণ। কাছে মাস্টার, বাবুরাম ও নারায়ণ বসিয়া আছেন। গিরিশ আসিয়াছেন। অভিনয় এখনও আরম্ভ হয় নাই। ঠাকুর গিরিশের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — বা! তুমি বেশ সব লিখছ!

গিরিশ —— মহাশয়, ধারণা কই, শুধু লিখে গেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— না তোমার ধারণা আছে। সেই দিন তো তোমায় বললাম ভিতরে ভক্ত না থাকলে চালচিত্র আঁকা যায় না ——

“ধারণা চাই। কেশবের বাড়িতে নববৃন্দাবন নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম, একজন ডিপুটি ৮০০ টাকা মাহিনা পায়, সকলে বললে, খুব পণ্ডিত, কিন্তু একটা ছেলে লয়ে ব্যতিব্যস্ত! ছেলেটি কিসে ভাল জায়গায় বসবে, কিসে অভিনয় দেখতে পাবে, এইজন্য ব্যাকুল! এদিকে ঈশ্বরীয় কথা হচ্ছে তা শুনবে না, ছেলে কেবল জিজ্ঞাসা করছে, বাবা এটা কি, বাবা ওটা কি? — তিনিও ছেলে লয়ে ব্যতিব্যস্ত। কেবল বই পড়েছে মাত্র কিন্তু ধারণা হয় নাই।”

গিরিশ — মনে হয়, থিয়েটারগুলো আর করা কেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — না না ও থাক, ওতে লোকশিক্ষা হবে।

অভিনয় আরম্ভ হয়েছে। প্রহ্লাদ পাঠশালে লেখাপড়া করিতে আসিয়াছেন। প্রহ্লাদকে দর্শন করিয়া ঠাকুর সস্নেহে 'প্রহ্লাদ' 'প্রহ্লাদ' এই কথা বলিতে বলিতে একেবারে সমাধিস্থ হইলেন।

প্রহ্লাদকে হস্তীপদতলে দেখিয়া ঠাকুর কাঁদিতেছেন। অগ্নিকুণ্ডে যখন ফেলিয়া দিল তখনও ঠাকুর কাঁদিতেছেন।

গোলোকে লক্ষ্মীনারায়ণ বসিয়া আছেন। নারায়ণ প্রহ্লাদের জন্য ভাবিতেছেন। সেই দৃশ্য দেখিয়া ঠাকুর আবার সমাধিস্থ হইলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৪ই ডিসেম্বর 1884/12/14/ii

38.2 ভক্তসঙ্গে ঈশ্বরকথাপ্রসঙ্গে

[ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ ও উপায় — তিনপ্রকার ভক্ত]

রঙ্গালয়ে গিরিশ যে ঘরে বসেন সেইখানে অভিনয়ান্তে ঠাকুরকে লইয়া গেলেন। গিরিশ বলিলেন, “বিবাহ বিভ্রাট” কি শুনবেন? ঠাকুর বলিলেন, “না, প্রহ্লাদ চরিত্রের পর ও-সব কি? আমি তাই গোপাল উড়ের দলকে বলেছিলাম, ‘তোমরা শেষে কিছু ঈশ্বরীয় কথা বলো।’ বেশ ঈশ্বরের কথা হচ্ছিল আবার বিবাহ বিভ্রাট — সংসারের কথা। ‘যা ছিলুম তাই হলুম।’ আবার সেই আগেকার ভাব এসে পড়ে।” ঠাকুর গিরিশাদির সহিত ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন। গিরিশ বলিতেছেন, মহাশয়, কিরকম দেখলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখলাম সাক্ষাৎ তিনিই সব হয়েছেন। যারা সেজেছে তাদের দেখলাম সাক্ষাৎ আনন্দময়ী মা! যারা গোলোকে রাখাল সেজেছে তাদের দেখলাম সাক্ষাৎ নারায়ণ। তিনিই সব হয়েছেন। তবে ঠিক ঈশ্বরদর্শন হচ্ছে কি না তার লক্ষণ আছে। একটি লক্ষণ আনন্দ। সঙ্কোচ থাকে না। যেমন সমুদ্র — উপরে হিল্লোল, কল্লোল — নিচে গভীর জল। যার ভগবানদর্শন হয়েছে সে কখনও পাগলের ন্যায়, কখনও পিশাচের ন্যায় — শুচি-অশুচি ভেদ জ্ঞান নেই। কখন বা জড়ের ন্যায়; কেননা অন্তরে-বাহিরে ঈশ্বরকে দর্শন করে অবাক্ হয়ে থাকে। কখন বালকের ন্যায়। আঁট নাই, বালক যেমন কাপড় বগলে করে বেড়ায়। এই অবস্থায় কখন বাল্যভাব, কখন পৌগণ্ডভাব — ফষ্টিনাষ্টি করে, কখন যুবার ভাব — যেমন কর্ম করে, লোকশিক্ষা দেয়, তখন সিংহতুল্য।

“জীবের অহংকার আছে বলে ঈশ্বরকে দেখতে পায় না। মেঘ উঠলে আর সূর্য দেখা যায় না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না বলে কি সূর্য নাই? সূর্য ঠিক আছে।

“তবে ‘বালকের আমি’ এতে দোষ নাই, বরং উপকার আছে। শাক খেলে অসুখ হয়। কিন্তু হিঞ্চে শাক খেলে উপকার হয়। হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়। মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়। অন্য মিষ্টিতে অসুখ করে, কিন্তু মিছরিতে কফ-দোষ করে না।

“তাই কেশব সেনকে বলেছিলাম, আর বেশি তোমায় বললে দলটল থাকবে না! কেশব ভয় পেয়ে গেল। আমি তখন বললাম, ‘বালকের আমি’ ‘দাস আমি’ এতে দোষ নাই।

“যিনি ঈশ্বরদর্শন করেছেন তিনি দেখেন যে ঈশ্বরই জীবজগৎ হয়ে আছেন। সবই তিনি। এরই নাম উত্তম ভক্ত।”

গিরিশ (সহাস্যে) — সবই তিনি, তবে একটু আমি থাকে — কফ-দোষ করে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্য) — হাঁ, ওতে হানি নাই। ও ‘আমি’টুকু সম্ভোগের জন্য। আমি একটি, তুমি একটি হলে আনন্দভোগ করা যায়। সেব্য-সেবকের ভাব।

“আবার মধ্যম থাকের ভক্ত আছে। সে দেখে যে, ঈশ্বর সর্বভূতে অন্তর্যামীরূপে আছেন। অধম থাকের ভক্ত বলে, — ঈশ্বর আছেন, ওই ঈশ্বর — অর্থাৎ আকাশের ওপারে। (সকলের হাস্য)

“গোলোকের রাখাল দেখে আমার কিন্তু বোধ হল, সেই (ঈশ্বরই) সব হয়েছে। যিনি ঈশ্বরদর্শন করেছেন, তাঁর বোধ হয় ঈশ্বরই কর্তা, তিনিই সব করছেন।”

গিরিশ — মহাশয়, আমি কিন্তু ঠিক বুঝেছি, তিনিই সব করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি বলি, “মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি জড়, তুমি চেতয়িতা; যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি।” যারা অজ্ঞান তারা বলে, “কতক আমি করছি, কতক তিনি করছেন।”

[কর্মযোগে চিত্তশুদ্ধি হয় — সর্বদা পাপ পাপ কি — অহেতুকী ভক্তি]

গিরিশ — মহাশয়, আমি আর কি করছি, আর কর্মই বা কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — না গো, কর্ম ভাল। জমি পাট করা হলে যা রুইবে, তাই জন্মাবে। তবে কর্ম নিষ্কামভাবে করতে হয়।

“পরমহংস দুই প্রকার। জ্ঞানী পরমহংস আর প্রেমী পরমহংস। যিনি জ্ঞানী তিনি আপ্তসার — ‘আমার হলেই হলঞ্চ। যিনি প্রেমী যেমন শুকদেবাদি, ঈশ্বরকে লাভ করে আবার লোকশিক্ষা দেন। কেউ আম খেয়ে মুখটি পুঁছে ফেলে, কেউ পাঁচজনকে দেয়। কেউ পাতকুয়া খুঁড়বার সময় — ঝুড়ি-কোদাল আনে, খোঁড়া হয়ে গেলে ঝুড়ি-কোদাল ওই পাতকোতেই ফেলে দেয়। কেউ ঝুড়ি-কোদাল রেখে দেয় যদি পাড়ার লোকের কারুর দরকার লাগে। শুকদেবাদি পরের জন্য ঝুড়ি-কোদাল তুলে রেখেছিলেন। (গিরিশের প্রতি) তুমি পরের জন্য রাখবে।”

গিরিশ — আপনি তবে আশীর্বদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি মার নামে বিশ্বাস করো, হয়ে যাবে!

গিরিশ — আমি যে পাপী!

শ্রীরামকৃষ্ণ — যে পাপ পাপ সর্বদা করে সে শালাই পাপী হয়ে যায়!

গিরিশ — মহাশয়, আমি যেখানে বসতাম সে মাটি অশুদ্ধ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সে কি! হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যদি আলো আসে, সে কি একটু একটু করে আলো হয়? না, একেবারে দপ্‌ করে আলো হয়?

গিরিশ — আপনি আশীর্বাদ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমার যদি আন্তরিক হয়, — আমি কি বলব! আমি খাই-দাই তাঁর নাম করি।

গিরিশ — আন্তরিক নাই, কিন্তু ওইটুকু দিয়ে যাবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি কি? নারদ, শুকদেব এঁরা হতেন তো —

গিরিশ — নারদাদি তো দেখতে পাচ্চি না। সাক্ষাৎ যা পাচ্চি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্য) — আচ্ছা, বিশ্বাস!

কিয়ৎক্ষণ সকলে চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা হইতেছে।

গিরিশ — একটি সাধ, অহেতুকী ভক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — অহেতুকী ভক্তি ঈশ্বরকোটীর হয়। জীবকোটীর হয় না।

সকলে চুপ করিয়াছেন, ঠাকুর আনমনে গান ধরিলেন, দৃষ্টি ঊর্ধ্বদিকে —

শ্যামাধন কি সবাই পায় (কালীধন কি সবাই পায়)
অবোধ মন বোঝে না একি দায়।
শিবেরই অসাধ্য সাধন মনমজানো রাঙা পায়।।
ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়।
সদানন্দ সুখে ভাসে, শ্যামা যদি ফিরে চায়।।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র যে চরণ ধ্যানে না পায়।
নির্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়।।

গিরিশ — নির্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়!

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৪ই ডিসেম্বর 1884/12/14/iii

38.3 ঈশ্বরদর্শনের উপায় — ব্যাকুলতা

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি) — তীব্র বৈরাগ্য হলে তাঁকে পাওয়া যায়। প্রাণ ব্যাকুল হওয়া চাই। শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমন করে ভগবানকে পাব। গুরু বললেন, আমার সঙ্গে এসো, — এই বলে একটা পুকুরে লয়ে গিয়ে তাকে চুবিয়ে ধরলেন। খানিক পরে জল থেকে উঠিয়ে আনলেন ও বললেন, তোমার জলের ভিতর কিরকম হয়েছিল? শিষ্য বললে, প্রাণ আটুবাটু করছিল — যেন প্রাণ যায়! গুরু বললেন দেখ, এইরূপ ভগবানের জন্য যদি তোমার প্রাণ আটুবাটু করে তবেই তাঁকে লাভ করবে।

“তাই বলি, তিন টান একসঙ্গে হলে তবে তাঁকে লাভ করা যায়। বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান, সতীর পতিতে টান, আর মায়ের সন্তানেতে টান — এই তিন ভালবাসা একসঙ্গে করে কেউ যদি ভগবানকে দিতে পারে তাহলে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎকার হয়।

“ডাক দেখি মন ডাকার মতো কেমন শ্যামা থাকতে পারে! তেমন ব্যাকুল হয়ে ডাকতে পারলে তাঁর দেখা দিতেই হবে।”

[জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয় — কলিকালে নারদীয় ভক্তি]

“সেদিন তোমায় যা বললুম ভক্তির মানে কি — না কায়মনোবাক্যে তাঁর ভজনা। কায়, — অর্থাৎ হাতের দ্বারা তাঁর পূজা ও সেবা, পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, কানে তাঁর ভাগবত শোনা, নামগুণকীর্তন শোনা, চক্ষে তাঁর বিগ্রহ দর্শন। মন — অর্থাৎ সর্বদা তাঁর ধ্যান-চিন্তা করা, তাঁর লীলা স্মরণ-মনন করা। বাক্য — অর্থাৎ তাঁর স্তব-স্তুতি, তাঁর নামগুণকীর্তন — এই সব করা।

“কলিতে নারদীয় ভক্তি — সর্বদা তাঁর নামগুণকীর্তন করা। যাদের সময় নাই, তারা যেন সন্ধ্যা-সকালে হাততালি দিয়ে একমনে হরিবোল হরিবোল বলে তাঁর ভজনা করে।

“ভক্তির আমিতে অহংকার হয় না। অজ্ঞান করে না, বরং ঈশ্বরলাভ করিয়ে দেয়। এ ‘আমি’ আমির মধ্যে নয়। যেমন হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়, অন্য শাকে অসুখ হয়, কিন্তু হিঞ্চে শাক খেলে পিত্তনাশ হয়, উলটে উপকার হয়, মিছরি মিষ্টের মধ্যে নয়, অন্য মিষ্ট খেলে অপকার হয়, মিছরি খেলে অম্বল নাশ হয়।

“নিষ্ঠার পর ভক্তি। ভক্তি পাকলে ভাব হয়। ভাব ঘনীভূত হলে মহাভাব হয়। সর্বশেষে প্রেম।

“প্রেম রজ্জুর স্বরূপ। প্রেম হলে ভক্তের কাছে ঈশ্বর বাঁধা পড়েন আর পালাতে পারেন না। সামান্য জীবের ভাব পর্যন্ত হয়। ঈশ্বরকোটি না হলে মহাভাব প্রেম হয় না। চৈতন্যদেবের হয়েছিল।

“জ্ঞানযোগ কি? যে পথে দিয়ে স্ব-স্বরূপকে জানা যায়। ব্রহ্মই আমার স্বরূপ, এই বোধ।

“প্রহ্লাদ কখনও স্ব-স্বরূপে থাকতেন। কখনও দেখতেন, আমি একটি, তুমি একটি; তখন ভক্তিভাবে থাকতেন।

“হনুমান বলেছিল, রাম! কখনও দেখি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; কখনও দেখি তুমি প্রভু, আমি দাস; আর রাম, যখন তত্ত্বজ্ঞান হয় — তখন দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি।”

গিরিশ — আহা!

[সংসারে কি ঈশ্বরলাভ হয়?]

শ্রীরামকৃষ্ণ — সংসারে হবে না কেন? তবে বিবেক-বৈরাগ্য চাই। ঈশ্বর বস্তু আর সব অনিত্য, দুদিনের জন্য, — এইটি পাকা বোধ চাই। উপর উপর ভাসলে হবে না, ডুব দিতে হবে!

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাহিতেছেন:

ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন।।

“আর-একটি কথা। কামাদি কুমিরের ভয় আছে।”

গিরিশ — যমের ভয় কিন্তু আমার নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — না, কামাদি কুমিরের ভয় আছে, তাই হলুদ মেখে ডুব দিতে হয়। বিবেক-বৈরাগ্যরূপ হলুদ!

“সংসারে জ্ঞান কারু কারু হয় তাই দুই যোগীর কথা আছে, গুপ্তযোগী ও ব্যাক্তযোগী। যারা সংসারত্যাগ করেছে তারা ব্যাক্তযোগী, তাদের সকলে চেনে। গুপ্তযোগীর প্রকাশ নাই। যেমন দাসী সব কর্ম করছে, কিন্তু দেশের ছেলেপুলেদের দিকে মন পড়ে আছে। আর যেমন তোমায় বলেছি, নষ্ট মেয়ে সংসারের সব কাজ উৎসাহের সহিত করে, কিন্তু সর্বদাই উপপতির দিকে মন পড়ে থাকে। বিবেক-বৈরাগ্য হওয়া বড় কঠিন। আমি কর্তা, আর এ-সব জিনিস আমার — এ বোধ সহজে যায় না। একজন ডিপুটিকে দেখলুম ৮০০৲ টাকা মাইনে, ঈশ্বরীয় কথা হচ্ছে, সেদিকে মন একটুও দিলে না। একটা ছেলে সঙ্গে করে এনেছে, তাকে একবার এখানে বসায়, একবার সেখানে বসায়। আর-একজনকে আমি জানি, নাম করব না; জপ করত খুব, কিন্তু দশ হাজার টাকার জন্য মিথ্যা সাক্ষি দিচ্ছিল। তাই বলছি, বিবেক-বৈরাগ্য হলে সংসারেতেও হয়।”

[পাপীতাপী ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ]

গিরিশ — এ পাপীর কি হবে?

ঠাকুর ঊর্ধ্বদৃষ্টি করিয়া করুণস্বরে গান ধরিলেন:

ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে। নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হরি।।
ভাবিলে ভব ভাবনা যায় রে —
তরে তরঙ্গে ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে।
এলি কি তত্ত্বে, এ মর্তে কুচিত্ত কুবৃত্ত করিলে কি হবে রে —
উচিত তো নয়, দাশরথিরে ডুবাবি রে —

কর এ চিত্ত প্রাচিত্ত, সে নিত্য পদ ভেবে।।

(গিরিশের প্রতি) — “তবে তরঙ্গে ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে।”

[আদ্যাশক্তি মহামায়ার পূজা ও আমমোক্তারি বা বকলমা]

মহামায়া দ্বার ছাড়লে তাঁর দর্শন হয়। মহামায়ার দয়া চাই। তাই শক্তির উপাসনা। দেখ না, কাছে ভগবান আছেন তবু তাঁকে জানবার জো নাই, মাঝে মহামায়া আছেন বলে। রাম-সীতা, লক্ষ্মণ যাচ্ছেন। আগে রাম, মাঝে সীতা — সকলের পিছনে লক্ষ্মণ। রাম আড়াই হাত অন্তরে রয়েছেন, তবু লক্ষ্মণ দেখতে পাচ্ছেন না।

“তাঁকে উপাসনা করতে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। আমার তিন ভাব, — সন্তান ভাব, দাসী ভাব আর সখীভাব। দাসী ভাব, সখীভাবে অনেক-দিন ছিলাম। তখন মেয়েদের মতো কাপড়, গয়না, ওড়না পরতুম। সন্তান ভাব খুব ভাল।

“বীরভাব ভাল না। নেড়া-নেড়ীদের, ভৈরব-ভৈরবীদের বীরভাব। অর্থাৎ প্রকৃতিকে স্ত্রীরূপে দেখা আর রমণের দ্বারা প্রসন্ন করা, এ-ভাবে প্রায়ই পতন আছে।”

গিরিশ — আমার এক সময়ে ওই ভাব এসেছিল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তিত হইয়া গিরিশকে দেখিতে লাগিলেন।

গিরিশ — ওই আড়টুকু আছে, এখন উপায় কি বলুন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর) — তাঁকে আমমোক্তারি দাও —— তিনি যা করবার করুন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ১৪ই ডিসেম্বর 1884/12/14/iv

38.4 সত্ত্বগুণ এলে ঈশ্বরলাভ —— “সচ্চিদানন্দ না কারণানন্দ”

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোকরা ভক্তদের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশাদির প্রতি) — ধ্যান করতে করতে ওদের সব লক্ষণ দেখি। “বাড়ি করব” এ-বুদ্ধি ওদের নাই। মাগ-সুখের ইচ্ছা নাই। যাদের মাগ আছে একসঙ্গে শোয় না। কি জানো —— রজোগুণ না গেলে শুদ্ধসত্ত্ব না এলে, ভগবানেতে মন স্থির হয় না। তাঁর উপর ভালবাসা আসে না, তাঁকে লাভ করা যায় না।

গিরিশ —— আপনি আমায় আর্শীবাদ করেছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ —— কই! তবে বলেছি আন্তরিক হলে হয়ে যাবে।

কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ‘আনন্দময়ী’! ‘আনন্দময়ী’! এই কথা উচ্চারণ করিয়া সমাধিস্থ হইতেছেন। সমাধিস্থ হইয়া অনেকক্ষণ রহিলেন। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন, “শালারা, সব কই?” মাস্টার বাবুরামকে ডাকিয়া আনিলেন।

ঠাকুর বাবুরাম ও অন্যান্য ভক্তদের দিকে চাহিয়া প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া বলিতেছেন, “সচ্চিদানন্দই ভাল! আর কারণানন্দ?” এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন:

এবার আমি ভাল ভেবেছি।
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।।
যে দেশে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি।।
ঘুম ভেঙেছে আর কি ঘুমাই যোগে যাগে জেগে আছি।
যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।।
সোহাগা গন্ধক দিয়ে খাসা রঙ চড়ায়েছি।
মণি মন্দির মেজে লব অক্ষ দু’টি করে কুঁচি।।
প্রসাদ বলে ভুক্তি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেখেছি।
(আমি) কালীব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।।

ঠাকুর আবার গান ধরিলেন:

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়।।

ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।

সন্ধ্যা তার সন্ধ্যানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়।।

কালী নামের কতগুণ কেবা জানতে পারে তায়।

দেবাদিদেব মহাদেব যার পঞ্চমুখে গুণ গায়।।

দান ব্রত যজ্ঞ আদি আর কিছু না মনে জয়।

মদনের যাগ যজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়।

"আমি মার কাছে প্রার্থনা করতে করতে বলেছিলুম, মা আর কিছু চাই না, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।"

গিরিশের শান্তভাব দেখিয়া ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন। আর বলিতেছেন, তোমার এই অবস্থাই ভাল, সহজ অবস্থাই উত্তম অবস্থা।

ঠাকুর নাট্যালয়ের ম্যানেজারের ঘরে বসে আছেন। একজন আসিয়া বলিলেন,

"আপনি বিবাহ বিভ্রাট দেখবেন? এখন অভিনয় হচ্ছে।"

ঠাকুর গিরিশকে বলিতেছেন, "একি করলে? প্রহ্লাদচরিত্রের পর বিবাহ বিভ্রাট? আগে পায়েস মুণ্ডি, তারপর সুক্তনি!"

[দয়াসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ ও বারবণিতা]

অভিনয়ান্তে গিরিশের উপদেশে নটীরা (Actresses) ঠাকুরকে নমস্কার করিতে আসিয়াছে। তাহারা সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া নমস্কার করিল। ভক্তেরা কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া দেখিতেছেন। তাহারা দেখিয়া অবাক্ যে, উহাদের মধ্যে কেহ কেহ

ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়া নমস্কার করিতেছে। পায়ে হাত দিবার সময় ঠাকুর বলিতেছেন, “মা, থাক্ থাক্; মা, থাক্ তাক্।” কথাগুলি করুণামাখা।

তাহারা নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলে ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন — “সবই তিনি, এক-একরূপে।”

এইবার ঠাকুর গাড়িতে উঠিলেন। গিরিশাদি ভক্তেরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া গাড়িতে তুলিয়া দিলেন।

গাড়িতে উঠিতে উঠিতেই ঠাকুর গভীর সমাধিমধ্যে মগ্ন হইলেন!

গাড়ির ভিতরে নারাণাদি ভক্তেরা উঠিলেন। গাড়ি দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে যাইতেছে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c39 ৩৯ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও 'দেবী চৌধুরাণী' পাঠ

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৭শে ডিসেম্বর 1884/12/27/i

39.1 মাস্টার, প্রসন্ন, কেদার, রাম, নিত্যগোপাল, তারক, সুরেশ প্রভৃতি

আজ শনিবার, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, (১৩ই পৌষ) শুক্লা সপ্তমী তিথি। যীশুখ্রীষ্টের জন্ম উপলক্ষে ভক্তদের অবসর হইয়াছে। অনেকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়াছেন। সকালেই অনেকে উপস্থিত হইয়াছেন। মাস্টার ও প্রসন্ন আসিয়া দেখিলেন ঠাকুর তাঁহার ঘরে দক্ষিণদিকে দালানে রহিয়াছেন। তাঁহারা আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন এই প্রথম দর্শন করেন।

ঠাকুর মাস্টারকে বললেন, “কই, বঙ্কিমকে আনলে না?”

বঙ্কিম একটি স্কুলের ছেলে। ঠাকুর বাগবাজারে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। দূর থেকে দেখিয়াই বলিয়াছিলেন, ছেলেটি ভাল।

ভক্তেরা অনেকেই আসিয়াছেন। কেদার, রাম, নিত্যগোপাল, তারক, সুরেন্দ্র (মিত্র) প্রভৃতি ও ছোকরা ভক্তেরা অনেকে উপস্থিত।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে পঞ্চবটীতে গিয়া বসিয়াছেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে ঘেরিয়া রহিয়াছেন, কেহ বসিয়া — কেহ দাঁড়াইয়া। ঠাকুর পঞ্চবটীমূলে ইষ্টকনির্মিত চাতালের উপর বসিয়া আছেন। দক্ষিণ-পশ্চমদিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন। সহাস্যে মাস্টারকে বলিলেন, "বইখানা কি এনেছ?"

মাস্টার — আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — পড়ে আমায় একটু একটু শোনাও দেখি।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও রাজার কর্তব্য]

ভক্তেরা আগ্রহের সহিত দেখিতেছেন কি পুস্তক। পুস্তকের নাম "দেবী চৌধুরানী"। ঠাকুর শুনিয়াছেন, দেবী চৌধুরানীতে নিষ্কামকর্মের কথা আছে। লেখক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমের সুখ্যাতিও শুনিয়াছিলেন। পুস্তকে তিনি কি লিখিয়াছেন, তাহা শুনিলে তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। মাস্টার বলিলেন, "মেয়েটি ডাকাতের হাতে পড়িয়াছিল। মেয়েটির নাম প্রফুল্ল, পরে হল দেবী চৌধুরানী। যে ডাকাতটির হাতে মেয়েটি পড়েছিল, তার নাম ভবানী পাঠক। ডাকাতটি বড় ভাল। সেই প্রফুল্লকে অনেক সাধন-ভজন করিয়েছিল। আর কিরকম করে নিষ্কামকর্ম করতে হয়, তাই শিখিয়েছিল। ডাকাতটি দুষ্ট লোকেদের কাছ থেকে টাকা-কড়ি কেড়ে এনে গরিব-দুঃখীদের খাওয়াত — তাদের দান করত। প্রফুল্লকে বলেছিল, আমি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ — ও তো রাজার কর্তব্য।

মাস্টার — আর-এক জায়গায় ভক্তির কথা আছে। ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লর কাছে থাকবার জন্য একটি মেয়েকে পাঠিয়ে দিছলেন। তার নাম নিশি। সে মেয়েটি বড় ভক্তিমতী। সে বলত, শ্রীকৃষ্ণ আমার স্বামী। প্রফুল্লর বিয়ে হয়েছিল। প্রফুল্লর বাপ ছিল না, মা ছিল। মিছে একটা বদনাম তুলে পাড়ার লোকে ওদের একঘরে করে দিছল। তাই শ্বশুর প্রফুল্লকে বাড়িতে নিয়ে যায় নাই। ছেলের আরও দুটি বিয়ে দিছল। প্রফুল্লর কিন্তু স্বামীর উপর বড় ভালবাসা ছিল। এইখানটা শুনলে বেশ বুঝতে পারা যাবে —

“নিশি — আমি তাঁহার (ভবানী ঠাকুরের) কন্যা, তিনি আমার পিতা। তিনিও আমাকে একপ্রকার সম্প্রদান করিয়াছেন।

প্রফুল্ল — একপ্রকার কি?

নিশি — সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে।

প্রফুল্ল — সে কিরকম?

নিশি — রূপ, যৌবন, প্রাণ।

প্রফুল্ল — তিনিই তোমার স্বামী?

নিশি — হাঁ — কেননা, যিনি সম্পূর্ণরূপে আমাতে অধিকারী, তিনিই আমার স্বামী।

প্রফুল্ল দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, ‘বলিতে পারি না। কখনও স্বামী দেখ নাই, তাই বলিতেছ — স্বামী দেখিলে কখনও শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না।’

মূর্খ ব্রজেশ্বর (প্রফুল্লের স্বামী) এত জানিত না!

বয়স্যা বলিল, ‘শ্রীকৃষ্ণে সকল মেয়েরই মন উঠিতে পারে; কেন না, তাঁর রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত, ঐশ্বর্য অনন্ত।’

এ-যুবতী ভবানী ঠাকুরের চেলা, কিন্তু প্রফুল্ল নিরক্ষর — এ-কথার উত্তর দিতে পারিল না। হিন্দুধর্ম প্রণেতারা উত্তর জানিতেন। ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয় পিঞ্জরে পুরিতে পারি না, কিন্তু সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ। স্বামী আরও পরিষ্কার রূপে সান্ত। এইজন্য প্রেম পবিত্র হইলে স্বামী ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দু-মেয়ের পতিই দেবতা। অন্য সব সমাজ, হিন্দু সমাজের কাছে এ-অংশে নিকৃষ্ট।

প্রফুল্ল মূর্খ মেয়ে, কিছু বুঝিতে পারিল না। বলিল, ‘আমি অত কথা ভাই বুঝিতে পারি না। তোমার নামটি কি, এখনও তো বলিলে না?’

বয়স্যা বলিল, ভবানী ঠাকুর নাম রাখিয়াছিলেন নিশি। আমি দিবার বহিন নিশি। দিবাকে একদিন আলাপ করিতে লইয়া আসিব। কিন্তু যা বলিতেছিলাম শোন। ঈশ্বরই পরম স্বামী। স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা। শ্রীকৃষ্ণ সকলের দেবতা। দুটো দেবতা কেন ভাই? দুই ঈশ্বর? এ ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র ভক্তিটুকুকে দুই ভাগ করিলে কতটুকু থাকে?

প্রফুল্ল — দূর! মেয়েমানুষের ভক্তির কি শেষ আছে?

নিশি — মেয়েমানুষের ভালবাসার শেষ নাই। ভক্তি এক, ভালবাসা আর।”

[আগে ঈশ্বরসাধন — না আগে লেখাপড়া]

মাস্টার — ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লকে সাধন আরম্ভ করালেন।

“প্রথম বৎসর ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লের বাড়িতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন না বা তাহাকে বাড়ির বাহিরে কোন পুরুষের সঙ্গে আলাপ করিতে দিতেন না। দ্বিতীয় বৎসর আলাপ পক্ষে নিষেধ রহিত করিলেন। কিন্তু তাহার বাড়িতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন না। পরে তৃতীয় বৎসরে যখন প্রফুল্ল মাথা মুড়াইল, তখন ভবানী ঠাকুর বাছা বাছা শিষ্য সঙ্গে লইয়া প্রফুল্লের নিকটে যাইতেন — প্রফুল্ল নেড়া মাথায় অবনত মুখে তাহাদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ করিত।

“তারপর প্রফুল্লের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ। ব্যাকরণ পড়া হল, রঘু, কুমার, নৈষধ, শকুন্তলা। একটু সাংখ্য, একটু বেদান্ত, একটু ন্যায়।”

শ্রীরামকৃষ্ণ — এর মানে কি জানো? না পড়লে শুনলে জ্ঞান হয় না। যে লিখেছে, এ-সব লোকের এই মত। এরা ভাবে, আগে লেখাপড়া, তারপর ঈশ্বর; ঈশ্বরকে জানতে হলে লেখাপড়া চাই। কিন্তু যদু মল্লিকের সঙ্গে যদি আলাপ করতে হয় তাহলে তার কখানা বাড়ি, কত টাকা, কত কোম্পানির কাগজ — এ-সব আগে আমার অত খবরে কাজ কি? জো-সো করে — স্তব করেই হোক, দ্বারবানদের ধাক্কা খেয়েই হোক, কোন মতে বাড়ির ভিতর ঢুকে যদু মল্লিকের সঙ্গে

আলাপ করতে হয়। আর যদি টাকা-কড়ি ঐশ্বর্যের খবর জানতে ইচ্ছা হয়, তখন যদু মল্লিককে জিজ্ঞাসা কল্লেই হয়ে যাবে! খুব সহজে হয়ে যাবে। আগে রাম, তারপরে রামের ঐশ্বর্য — জগৎ। তাই বাল্মীকি 'মরা' মন্ত্র জপ করেছিলেন। 'ম' অর্থাৎ ঈশ্বর, তারপর 'রা' অর্থাৎ জগৎ — তার ঐশ্বর্য!

ভক্তেরা অবাক হইয়া ঠাকুরের কথামৃত পান করিতেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৭শে ডিসেম্বর 1884/12/27/ii

39.2 নিষ্কামকর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ — ফল সমর্পণ ও ভক্তি

মাস্টার — অধ্যয়ণ শেষ হলে আর অনেকদিন সাধনের পর ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লের সঙ্গে আবার দেখা করতে এলেন। এইবার নিষ্কামকর্মের উপদেশ দিবেন। গীতা থেকে শ্লোক বললেন —

তস্মাদসক্তং সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।১

অনাসক্তির তিনটি লক্ষণ বললেন —

(১) ইন্দ্রিয়সংযম। (২) নিরহংকার। (৩) শ্রীকৃষ্ণে ফল সমর্পণ। নিরহংকার ব্যতীত ধর্মাচরণ হয় না। গীতা থেকে আবার বললেন —

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।।২

তারপর সর্বকর্মফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ। গীতা থেকে বললেন, —

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।।৩

নিষ্কামকর্মের এই তিনটি লক্ষণ বলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এ বেশ। গীতার কথা। কাটবার জো নাই। তবে আর-একটি কথা আছে। শ্রীকৃষ্ণে ফল সমর্পণ বলেছে; শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি বলে নাই।

মাস্টার — এখানে এ-কথাটি বিশেষ করে বলা নাই।

[হিসাব বুদ্ধিতে হয় না — একেবারে ঝাঁপ]

“তারপর ধনের কি ব্যবহার করতে হবে, এই কথা হল। প্রফুল্ল বললে, এ-সমস্ত ধন শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কল্লাম।

“প্রফুল্ল — যখন আমার সকল কর্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম, তখন আমার এ-ধনও শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম।

ভবানী — সব?

প্রফুল্ল — সব।

ভবানী — ঠিক তাহা হইলে কর্ম অনাসক্ত হইবে না। আপনার আহারের জন্য যদি তোমাকে চেষ্টা হইতে হয়, তাহা হইলে আসক্তি জন্মিবে। অতএব তোমাকে হয় ভিক্ষাবৃত্ত হইতে হইবে, নয় এই ধন হইতেই দেহরক্ষা করিতে হইবে। ভিক্ষাতেও আসক্তি আছে। অতএব সেই ধন হইতে আপনার দেহরক্ষা করিবে।”

মাস্টার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি সহাস্যে) — ওইটুকু পাটোয়ারী।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, ওইটুকু পাটোয়ারী, ওইটুকু হিসাববুদ্ধি। যে ভগবানকে চায়, সে একেবারে ঝাঁপ দেয়। দেহরক্ষার জন্য এইটুকু থাকলো — এ-সব হিসাব আসে না।

মাস্টার — তারপর আছে, ভবানী জিজ্ঞাসা কল্লে, ধন নিয়ে শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কেমন করে করবে? প্রফুল্ল বললে, শ্রীকৃষ্ণ সর্বভূতে আছেন। অতএব সর্বভূতে ধন বিতরণ করব। ভবানী বললে, ভাল ভাল। আর গীতা থেকে শ্লোক বলতে লাগল, —

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।।
সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।

সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে।।

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুনঃ।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।।৪

শ্রীরামকৃষ্ণ — এগুলি উত্তম ভক্তের লক্ষণ।

[বিষয়ী লোক ও তাহাদের ভাষা — আকরে টানে]

মাস্টার পড়িতে লাগিলেন।

“সর্বভূতে দানের জন্য অনেক শ্রমের প্রয়োজন। কিছু বেশবিন্যাস কিছু ভোগবিলাসের ঠাটের প্রয়োজন। ভবানী তাই বললেন, কখন কখন কিছু ‘দোকানদারী’ চাই।”

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্তভাবে) — “দোকানদারী চাই”। যেমন আকর তেমনি কথাও বেরোয়! রাতদিন বিষয়চিন্তা, লোকের সঙ্গে কপটতা এ-সব করে করে কথাগুলো এইরকম হয়ে যায়। মূলো খেলে মূলোর ঢেঁকুর বেরোয়। দোকানদারী কথাটা না বলে ওইটে ভাল করে বললেই হত, “আপনাকে অকর্তা জেনে কর্তার ন্যায় কাজ করা”। সেদিন একজন গান গাচ্ছিল। সে গানের ভিতরে ‘লাভ’ ‘লোকসান’ এই সব কথাগোলো অনেক ছিল। গান হচ্ছিল, আমি বারণ কল্লুম। যা ভাবে রাতদিন, সেই বুলিই উঠে!

১অতএব অনাসক্ত হইয়া সর্বদা কর্ম কর। কারণ অনাসক্ত হইয়া কার্য করিলে পুরুষ সেই শ্রেষ্ঠ ভগবৎ পদ লাভ করেন। [গীতা, ৩।১৯]

২সমুদয় কর্মই প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা কৃত হইতেছে। কিন্তু অহংকার-বিমুগ্ধ ব্যক্তি আপনাকে কর্তা বলিয়া মনে করে। [গীতা, ৩।২৭]

৩যাহা কিছু কর, যাহা খাও, যে হোম কর, যাহা দান কর, যে তপস্যা কর, তাহাই আমাতে সমর্পণ কর। [গীতা ৯।২৭]

৪যে ব্যক্তি সর্বত্র আমাকে দেখিয়া থাকে এবং সকল বস্তুকে আমাতে দেখিয়া থাকে, তাহার নিকট আমি কখন অদৃষ্ট থাকি না, সে কখনও আমার দৃষ্টির দূরে থাকে না। যে ব্যক্তি জীব ও ব্রহ্মে অভেদদর্শী হইয়া আর্বভূতস্থিত আমাকে ভজনা করে, যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না, সেও যোগী আমাতেই অবস্থান করে। হে অর্জুন, সুখই হউক, দুঃখই হউক, যিনি নিজের তুলনায় সকলের প্রতিই সমদর্শন করেন, সেই যোগীই আমার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ। [গীতা, ৬।৩০, ৩১, ৩২]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৭শে ডিসেম্বর 1884/12/27/iii

39.3 ঈশ্বরদর্শনের উপায় — শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত

পাঠ চলিতে লাগিল। এইবার ঈশ্বরদর্শনের কথা। প্রফুল্ল এবার দেবী চৌধুরাণী হইয়াছেন। বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী তিথী। দেবী বজরার উপর বসিয়া দিবার সহিত কথা কহিতেছেন। চাঁদ উঠিয়াছে। গঙ্গাবক্ষে বজরা নঙ্গর করিয়া আছে। বজরার

ছাদে দেবী ও সখীদ্বয়। ঈশ্বর কি প্রত্যক্ষ হন, এই কথা হইতেছে। দেবী বললেন, যেমন ফুলের গন্ধ ঘ্রাণের প্রত্যক্ষ সেইরূপ ঈশ্বর মনের প্রত্যক্ষ হন। "ঈশ্বর মানস প্রত্যক্ষের বিষয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ — মনের প্রত্যক্ষ। সে এ-মনের নয়। সে শুদ্ধমনের। এ-মন থাকে না। বিষয়াসক্তি একটুও থাকলে হয় না। মন যখন শুদ্ধ হয়, শুদ্ধমনও বলতে পার, শুদ্ধ আত্মাও বলতে পার।

[যোগ দূরবীন — পাতিব্রত্যধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ]

মাস্টার — মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ যে সহজে হয় না, এ-কথা একটু পরে আছে। বলেছে প্রত্যক্ষ করতে দূরবীন চাই। ওই দূরবীনের নাম যোগ। তারপর যেমন গীতায় আছে, বলেছে, যোগ তিনরকম — জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ। এই যোগ-দূরবীন দিয়ে ঈশ্বরকে দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এ খুব ভাল কথা। গীতার কথা।

মাস্টার — শেষে দেবী চৌধুরানীর স্বামীর সঙ্গে দেখা হল। স্বামীর উপর খুব ভক্তি। স্বামীকে বললে, "তুমি আমার দেবতা। আমি অন্য দেবতার অর্চনা করিতে শিখিতেছিলাম, শিখিতে পারি নাই। তুমি সব দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — "শিখিতে পারি নাই!" এর নাম পতিব্রতার ধর্ম। এও আছে।

পাঠ সমাপ্ত হইল। ঠাকুর হাসিতেছেন। ভক্তেরা চাহিয়া আছেন, ঠাকুর আবার কি বলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, কেদার ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি) — এ একরকম মন্দ নয়। পতিব্রতাধর্ম। প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয় আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না? তিনিই মানুষ হয়ে লীলা করছেন।

[পূর্বকথা —— ঠাকুরের ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা ও সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন]

“কি অবস্থা গেছে। হরগৌরীভাবে কতদিন ছিলুম। আবার কতদিন রাধাকৃষ্ণভাবে! কখন সীতারামের ভাবে! রাধার ভাবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করতুম, সীতার ভাবে রাম রাম করতুম!

“তবে লীলাই শেষ নয়। এই সব ভাবের পর বললুম, মা এ-সব বিচ্ছেদ আছে। যার বিচ্ছেদ নাই, এমন অবস্থা করে দাও। তাই কতদিন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ এই ভাবে রইলুম। ঠাকুরদের ছবি ঘর থেকে বার করে দিলুম।

“তাঁকে সর্বভূতে দর্শন করতে লাগলুম। পূজা উঠে গেল! এই বেলগাছ! বেলপাতা তুলতে আসতুম! একদিন পাতা ছিঁড়তে গিয়ে আঁশ খানিকটা উঠে এল। দেখলাম গাছ চৈতন্যময়! মনে কষ্ট হল। দূর্বা তুলতে গিয়ে দেখি, আর-সেরকম করে তুলতে পারিনি। তখন রোখ করে তুলতে গেলুম।

“আমি লেবু কাটতে পারি না। সেদিন অনেক কষ্টে, ‘জয় কালী’ বলে তাঁর সম্মুখে বলির মতো করে তবে কাটতে পেরেছিলুম। একদিন ফুল তুলতে গিয়ে

দেখিয়ে দিলে, — গাছে ফুল ফুটে আছে, যেন সম্মুখে বিরাট — পূজা হয়ে গেছে — বিরাটের মাথায় ফুলের তোড়া! আর ফুল তোলা হল না!

“তিনি মানুষ হয়েও লীলা করছেন। আমি দেখি, সাক্ষাৎ নারায়ণ। কাঠ ঘষতে ঘষতে আগুন বেরোয়, ভক্তির জোর থাকলে মানুষেতেই ঈশ্বর দর্শন হয়। তেমন টোপ হলে বড় রুই কাতলা কপ্ করে খায়।

প্রেমোন্মাদ হলে সর্বভূতে সাক্ষাৎকার হয়। গোপীরা সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেছিল। কৃষ্ণময় দেখেছিল। বলেছিল, আমি কৃষ্ণ! তখন উন্মাদ অবস্থা! গাছ দেখে বলে, এরা তপস্বী, শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করছে। তৃণ দেখে বলে, শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করে ওই দেখ পৃথিবীর রোমাঞ্চ হয়েছে।

“পতিব্রতাধর্ম; স্বামী দেবতা। তা হবে না কেন? প্রতিমায় পূজা হয়, আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না?”

[প্রতিমায় আবির্ভাব — মানুষে ঈশ্বরদর্শন কখন? নিত্যসিদ্ধি ও সংসার]

“প্রতিমায় আবির্ভাব হতে গেলে তিনটি জিনিসের দরকার, — প্রথম পূজারীর ভক্তি, দ্বিতীয় প্রতিমা সুন্দর হওয়া চাই, তৃতীয় গৃহস্বামীর ভক্তি। বৈষ্ণবচরণ বলেছিল, শেষে নরলীলাতেই মনটি কুড়িয়ে আসে।

“তবে একটি কথা একটি আছে, — তাঁকে সাক্ষাৎকার না করলে এরূপ লীলাদর্শন হয় না। সাক্ষাৎকারের লক্ষণ কি জান? বালকস্বভাব হয়। কেন

বালকস্বভাব হয়? ঈশ্বর নিজে বালকস্বভাব কি না! তাই যে তাঁকে দর্শন করে, তারও বালকস্বভাব হয়ে যায়।”

[ঈশ্বরদর্শনের উপায় — তীব্র বৈরাগ্য ও তিনি আপনার ‘বাপ’ এই বোধ]

“এই দর্শন হওয়া চাই। এখন তাঁর সাক্ষাৎকার কেমন করে হয়? তীব্র বৈরাগ্য। এমন হওয়া চাই যে, বলবে, জ্ঞকি! জগৎপিতা? আমি কি জগৎ ছাড়া? আমায় তুমি দয়া করবে না? শালা!’

“যে যাকে চিন্তা করে, সে তার সত্তা পায়। শিবপূজা করে শিবের সত্তা পায়। একজন রামের ভক্ত, রাতদিন হনুমানের চিন্তা করত! মনে করত, আমি হনুমান হয়েছি। শেষে তার ধ্রুব বিশ্বাস হল যে, তার একটু ল্যাজও হয়েছে!

“শিব অংশে জ্ঞান হয়, বিষ্ণু অংশে ভক্তি হয়। যাদের শিব অংশ তাদের জ্ঞানীর স্বভাব, যাদের বিষ্ণু অংশ, তাদের ভক্তের স্বভাব।”

[চৈতন্যদেব অবতার — সামান্য জীব দুর্বল]

মাস্টার — চৈতন্যদেব? তাঁর তো আপনি বলেছিলেন, জ্ঞান ও ভক্তি দুই ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া) — তাঁর আলাদা কথা। তিনি ঈশ্বরের অবতার। তাঁর সঙ্গে জীবের অনেক তফাত। তাঁর এমন বৈরাগ্য যে, সার্বভৌম যখন জিহ্বায় চিনি ঢেলে দিলে, চিনি হাওয়াতে ফরফর করে উড়ে গেল, ভিজলো না। সর্বদাই সমাধিস্থ! কত বড় কামজয়ী! জীবের সহিত তাঁর তুলনা! সিংহ বার বছরে একবার রমণ করে, কিন্তু মাংস খায়; চড়ুই কাঁকর খায়, কিন্তু রাতদিনই রমণ

করে। তেমনি অবতার আর জীব। জীব কাম ত্যাগ করে, আবার একদিন হয়তো রমণ হয়ে গেল; সামলাতে পারে না। (মাস্টারের প্রতি) লজ্জা কেন? যার হয় সে লোক পোক দেখে! ‘লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়।’ এ-সব পাশ। ‘অষ্ট পাশ’ আছে না?

“যে নিত্যসিদ্ধ তার আবার সংসারে ভয় কি? ছকবাঁধা খেলা; আবার ফেললে কি হয়, চকবাঁধা খেলাতে এ-ভয় থাকে না।

“যে নিত্যসিদ্ধ, সে মনে করলে সংসারেও থাকতে পারে। কেউ কেউ দুই তলোয়ার নিয়ে খেলতে পারে। এমন খেলোয়াড় যে, ঢিল পড়লে তলোয়ারে লেগে ঠিকরে যায়!”

[দর্শনের উপায় যোগ — যোগীর লক্ষণ]

ভক্ত — মহাশয়, কি অবস্থায় ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — মন সব কুড়িয়ে না আনলে কি হয়। ভগবতে শুকদেবের কথা আছে — পথে যাচ্ছে যেন সঙ্গীন চড়ান। কোনদিকে দৃষ্টি নাই। এক লক্ষ্য — কেবল ভগবানের দিকে দৃষ্টি। এর নাম যোগ।

“চাতক কেবল মেঘের জল খায়। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, আর সব নদী জলে পরিপূর্ণ, সাত সমুদ্র ভরপুর, তবু সে জল খাবে না। মেঘের জল পড়বে তবে খাবে।

“যার এরূপ যোগ হয়েছে, তার ঈশ্বরের দর্শন হতে পারে। থিয়েটারে গেলে যতক্ষণ না পর্দা ওঠে ততক্ষণ লোকে বসে বসে নানারকম গল্প করে — বাড়ির কথা, আফিসের কথা, ইস্কুলের কথা এই সব। যাই পর্দা উঠে, অমনি কথাবার্তা সব বন্ধ। যা নাটক হচ্ছে, একদৃষ্টে তাই দেখতে থাকে। অনেকক্ষণ পরে যদি এক-আধটা কথা কয় সে ওই নাটকেরই কথা।

“মাতাল মদ খাওয়ার পর কেবল আনন্দের কথাই কয়।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চর্তুথ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ২৭শে ডিসেম্বর 1884/12/27/iv

39.4 পঞ্চবটীমূলে শ্রীরামকৃষ্ণ — অবতারের ‘অপরাধ’ নাই

নিত্যগোপাল সামনে উপবিষ্ট। সর্বদা ভাবস্থ, মুখে কথা নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — গোপাল! তুই কেবল চুপ করে থাকিস!

নিত্য (বালকের ন্যায়) — আমি — জানি — না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বুঝেছি কিছু বলিস না কেন। অপরাধ?

“বটে বটে। জয় বিজয় নারায়ণের দ্বারী, সনক সনাতনাদি ঋষিদের, ভিতরে যেতে বারণ করেছিল। সেই অপরাধে তিনবার এই সংসারে জন্মাতে হয়েছিল।

“শ্রীদাম গোলোকে বিরজার দ্বারী ছিলেন। শ্রীমতী কৃষ্ণকে বিরজার মন্দিরে ধরবার জন্য তাঁর দ্বারে গিছলেন, আর ভিতরে ঢুকতে চেয়েছিলেন — শ্রীদাম ঢুকতে দেয় নাই। তাই শ্রীমতী শাপ দিলেন, তুই মর্ত্যে অসুর হয়ে জন্মাগে যা। শ্রীদামও শাপ দিছলো! (সকলের ঈষৎ হাস্য)

“কিন্তু একটি কথা আছে, ছেলে যদি বাপের হাত ধরে, তাহলে খানায় পড়লেও পড়তে পারে, কিন্তু বাপ যার হাত ধরে থাকে, তার ভয় কি!

“শ্রীদামের কথা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে।”

কেদার (চাটুজ্যে) এখন ঢাকায় থাকেন, তিনি সরকারি কর্ম করেন। আগে কর্মস্থল কলিকাতায় ছিল, এখন ঢাকায়। তিনি ঠাকুরের পরমভক্ত। ঢাকায় অনেকগুলি ভক্তের সঙ্গ হইয়াছে। সেই সকল ভক্তেরা তাঁর কাছে সর্বদা আসেন ও উপদেশ গ্রহণ করেন। শুধু হাতে ভক্তদর্শনে আসতে নাই। অনেকে মিষ্টান্নাদি আনেন ও কেদারকে নিবেদন করেন।

[সবরকম লোকের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের নানারকম “ভাব ও অবস্থা”]

কেদার (অতি বিনীতভাবে) — তাদের জিনিস কি খাব?

শ্রীরামকৃষ্ণ — যদি ঈশ্বরে ভক্তি করে দেয়, তাহলে দোষ নাই। কামনা করে দিলে সে জিনিস ভাল নয়।

কেদার — আমি তাদের বলেছি, আমি নিশ্চিন্ত। আমি বলেছি, যিনি আমায় কৃপা করেছেন, তিনি সব জানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তা তো সত্য। এখানে সবরকম লোক আসে, তাই সবরকম ভাব দেখতে পায়।

কেদার — আমার নানা বিষয় জানা দরকার নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — না গো, সব একটু একটু চাই। যদি মুদীর দোকান কেউ করে, সবরকম রাখতে হয় — কিছু মুসুর ডালও চাই, হলো খানিকটা তেঁতুল, — এ-সব রাখতে হয়।

“বাজনার যে ওস্তাদ, সব বাজনা সে কিছু কিছু বাজাতে পারে।”

ঠাকুর ঝাউতলায় বাহ্যে গেলেন — একটি ভক্ত গাড়ু লইয়া সেইখানে রাখিয়া আসিলেন।

ভক্তেরা এদিক-ওদিক বেড়াইতেছেন — কেহ বা ঠাকুরের ঘরের দিকে গমন করিলেন, কেহ কেহ পঞ্চবটীতে ফিরিয়া আসিতেছেন। ঠাকুর সেখানে আসিয়া বলিলেন — “দু-তিনবার বাহ্যে গেলুম। মল্লিকের বাড়ি খাওয়া; — ঘোর বিষয়ী। পেট গরম হয়েছে।”

[সমাধিস্থ পুরুষের (শ্রীরামকৃষ্ণের) পানের ডিবে স্মরণ]

ঠাকুরের পানের ডিবে পঞ্চবটীর চাতালে এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। আরও দু-একটি জিনিস।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারকে বললেন, “ওই ডিবে আর কি কি আছে, ঘরে আন।” এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরের দিকে দক্ষিণাস্য হইয়া আসিতে লাগিলেন। ভক্তেরা সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতে আসিতেছেন। কাহারও হাতে পানের ডিবে, কাহারও হাতে গাড়ু ইত্যাদি।

ঠাকুর মধ্যাহ্নের পর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। দুই-চারিটি ভক্ত আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে একটি ছোট তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন —

[জ্ঞানী ও ভক্তের ভাব একাধারে কি হয়? সাধনা চাই]

“মহাশয়, জ্ঞানে কি ঈশ্বরের Attributes — গুণ — জানা যায়?

ঠাকুর বলিলেন, “সে এ-জ্ঞানে নয়। অমনি কি তাঁকে জানা যায়? সাধন করতে হয়। আর, একটা কোন ভাব আশ্রয় করতে হয়। দাসভাব। ঋষীদের শান্তভাব ছিল! জ্ঞানীদের কি ভাব জানো? স্ব-স্বরূপকে চিন্তা করা। (একজন ভক্তের প্রতি, সহাস্যে) — তোমার কি?”

ভক্তটি চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তোমার দুইভাব — স্ব-স্বরূপকে চিন্তা করাও বটে, আবার সেব্য-সেবকেরও ভাব বটে। কেমন ঠিক কি না?

ভক্ত (সহাস্যে ও কুণ্ঠিতভাবে) — আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্য) — তাই হাজরা বলে, তুমি মনের কথা সব বুঝতে পার। ও-ভাব খুব এগিয়ে গেলে হয়। প্রহ্লাদের হয়েছিল।

“কিন্তু ও ভাব সাধন করতে গেলে কর্ম চাই।

“একজন কুলগাছের কাঁটা টিপে ধরে আছে —– হাত দিয়ে রক্ত দরদর করে পড়ছে, কিন্তু বলে, আমার কিছু হয় নাই, লাগে নাই! জিজ্ঞাসা করলে বলে, — ‘বেশ বেশ’। এ-কথা শুধু মুখে বললে কি হবে? ভাব সাধন করতে হয়।”

ভক্তেরা ঠাকুরের কথামৃত পান করিতেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c40 ৪০ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মমহোৎসব ১৮৮৫ খ্রীঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২২শে ফেব্রুয়ারি 1885/02/22/i

40.1 নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে উত্তর-পূর্ব লম্বা বারান্দায় গোপীগোষ্ঠ ও সুবল-মিলন কীর্তন শুনিতেছেন। নরোত্তম কীর্তন করিতেছেন। আজ রবিবার, ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, ১২ই ফাল্গুন, ১২৯১, শুক্লাষ্টমী। ভক্তেরা তাঁহার জন্মমহোৎসব করিতেছেন। গত সোমবার ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া তাঁহার জন্মতিথি গিয়াছে। নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, ভবনাথ, সুরেন্দ্র, গিরীন্দ্র, বিনোদ, হাজরা, রামলাল, রাম, নিত্যগোপাল, মণি মল্লিক, গিরিশ, সিঁথির মহেন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি অনেক ভক্তের সমাগম হইয়াছে। কীর্তন প্রাতঃকাল হইতেই হইতেছে, এখন বেলা ৮টা হইবে। মাস্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়া কাছে বসিতে বলিলেন।

কীর্তন শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের গোচারণে আসিতে দেরি হইতেছে। কোন রাখাল বলিতেছেন, মা যশোদা আসিতে দিতেছেন না।

বলাই রোখ করিয়া বলিতেছে, আমি শিঙ্গা বাজিয়ে কানাইকে আনিব। বলাই-এর অগাধ প্রেম।

কীর্তনিয়া আবার গাহিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিতেছেন। গোপীরা, রাখালেরা, বংশীরব শুনিতেছেন, তাহদের নানাভাব উদয় হইতেছে।

ঠাকুর বসিয়া ভক্তসঙ্গে কীর্তন শুনিতেছেন। হঠাৎ নরেন্দ্রের দিকে তাঁহার দৃষ্টিপাত হইল। নরেন্দ্র কাছেই বসিয়াছিলেন, ঠাকুর দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ। নরেন্দ্রের জানু এক পা দিয়া স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার বসিলেন। নরেন্দ্র সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। কীর্তন চলিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বাবুরামকে আস্তে আস্তে বলিলেন, ঘরে ক্ষীর আছে নরেন্দ্রকে দিগে যা।

ঠাকুর কি নরেন্দ্রের ভিতর সাক্ষাৎ নারায়ণদর্শন করিতেছিলেন!

কীর্তনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে আসিয়াছেন ও নরেন্দ্রকে আদর করিয়া মিঠাই খাওয়াইতেছেন।

গিরিশের বিশ্বাস যে, ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — আপনার সব কার্য শ্রীকৃষ্ণের মতো। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধনগিরি ধারণ করেছিলেন, আর নন্দের কাছে দেখাচ্ছেন, পিঁড়ে বয়ে নিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে!

গিরিশ — বুঝেছি, আপনাকে এখন বুঝেছি।

[জন্মোৎসবে নববস্ত্র পরিধান, ভক্তগণকর্তৃক সেবা ও সমাধি]

ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। বেলা ১১টা হইবে। রাম প্রভৃতি ভক্তেরা ঠাকুরকে নববস্ত্র পরাইবেন। ঠাকুর বলিতেছেন — "না, না।" একজন ইংরেজী পড়া লোককে দেখাইয়া বলিতেছেন, "উনি কি বলবেন!" ভক্তেরা অনেক জিদ করাতে ঠাকুর বলিলেন — "তোমরা বলছ পরি।"

ভক্তেরা ওই ঘরেতেই ঠাকুরের অন্নাদি আহারের আয়োজন করিতেছেন।

ঠাকুর নরেন্দ্রকে একটু গান গাইতে বলিতেছেন। নরেন্দ্র গাহিতেছেন:

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী।।
অনন্ত আঁধার কোলে, মহানির্বাণ হিল্লোলে।
চিরশান্তি পরিমল, অবিরল যায় ভাসি।।
মহাকাল রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি।
সমাধিমন্দিরে মা কে তুমি গো একা বসি।।
অভয়-পদ-কমলে প্রেমের বিজলী জ্বলে।

চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি ।।

নরেন্দ্র যাই গাইলেন, ‘সমাধিমন্দিরে মা কে তুমি গো একা বসি!’ অমনি ঠাকুর বাহ্যশূন্য, সমাধিস্থ। অনেকক্ষণ পরে সমাধিভঙ্গের পর ভক্তেরা ঠাকুরকে আহারের জন্য আসনে বসাইলেন। এখনও ভাবের আবেশ রহিয়াছে। ভাত খাইতেছেন কিন্তু দুই হাতে। ভবনাথকে বলিতেছেন, “তুই দে খাইয়ে।” ভাবের আবেশ রহিয়াছে তাই নিজে খাইতে পারিতেছেন না। ভবনাথ তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতেছেন।

ঠাকুর সামান্য আহার করিলেন। আহারান্তে রাম বলিতেছেন, ‘নিত্যগোপাল পাতে খাবে।’

শ্রীরামকৃষ্ণ — পাতে? পাতে কেন?

রাম — তা আর আপনি বলছেন! আপনার পাতে খাবে না?

নিত্যগোপালকে ভাবাবিষ্ট দেখিয়া ঠাকুর তাহাকে দু-একগ্রাস খাওয়াইয়া দিলেন।

কোন্নগরের ভক্তগণ নৌকা করিয়া এইবার আসিয়াছেন। তাঁহারা কীর্তন করিতে করিতে ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। কীর্তনান্তে তাঁহারা জলযোগ করিতে বাহিরে গেলেন। নরোত্তম কীর্তনিয়া ঠাকুরের ঘরে বসিয়া আছেন। ঠাকুর নরোত্তম প্রভৃতিকে বলিতেছেন, “এদের যেন ডোঙ্গা-ঠেলা গান। এমন গান হবে যে সকলে নাচবে!

“এই সব গান গাইতে হয়:

নদে টলমল টলমল করে,

গৌর প্রেমের হিল্লোলে রে।

(নরোত্তমের প্রতি) — “ওর সঙ্গে এইটা বলতে হয় —

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, তারা, দুভাই এসেছে রে।

যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে, তারা, দুভাই এসেছে রে।

যারা আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়, তারা, দুভাই এসেছে রে।।

যারা আপনি মেতে জগৎ মাতায়, তারা, দুভাই এসেছে রে।

যারা আচণ্ডালে কোল দেয়, তারা দুভাই এসেছে রে।।

“আর এটাও গাইতে হয়:

গৌর নিতাই তোমরা দুভাই, পরম দয়াল হে প্রভু!

আমি তাই শুনে এসেছি হে নাথ;

তোমরা নাকি আচণ্ডালে দাও কোল,

কোল দিয়ে বল হরিবোল।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২২শে ফেব্রুয়ারি 1885/02/22/ii

40.2 জন্মোৎসবে ভক্তসম্ভাষণে

এইবার ভক্তেরা প্রসাদ পাইতেছেন। চিঁড়ে মিষ্টান্নাদি অনেকপ্রকার প্রসাদ পাইয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন। ঠাকুর মাস্টারকে বলিতেছেন, “মুখুজ্জেদের বল নাই? সুরেন্দ্রকে বল, বাউলদের খেতে বলতে।”

শ্রীযুক্ত বিপিন সরকার আসিয়াছেন। ভক্তেরা বলিলেন, “এঁর নাম বিপিন সরকার।” ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন ও বিনীতভাবে বলিলেন, “এঁকে আসন দাও। আর পান দাও।” তাঁহাকে বলিতেছেন, “আপনার সঙ্গে কথা কইতে পেলাম না; অনেক ভিড়!”

গিরীন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুর বাবুরামকে বলিলেন, “এঁকে একখানা আসন দাও।” নিত্যগোপাল মাটিতে বসিয়াছিলেন দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, “ওকেও একখানা আসন দাও।”

সিঁথির মহেন্দ্র কবিরাজ আসিয়াছেন। ঠাকুর সহাস্যে রাখালকে ইঙ্গিত করিতেছেন, “হাতটা দেখিয়ে নে।”

শ্রীযুক্ত রামলালকে বলিতেছেন, “গিরিশ ঘোষের সঙ্গে ভাব কর, তাহলে থিয়েটার দেখতে পাবি।” (হাস্য)

নরেন্দ্র হাজরা মহাশয়ের সঙ্গে বাহিরের বারান্দায় অনেকক্ষণ গল্প করিতেছিলেন। নরেন্দ্রের পিতৃবিয়োগের পর বাড়িতে বড়ই কষ্ট হইয়াছে। এইবার নরেন্দ্র ঘরের ভিতর আসিয়া বসিলেন।

[নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের নানা উপদেশ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) — তুই কি হাজরার কাছে বসেছিলি? তুই বিদেশিনী সে বিরহিণী! হাজরারও দেড় হাজার টাকার দরকার। (হাস্য)

“হাজরা বলে, ‘নরেন্দ্রের ষোল আনা সত্ত্বগুণ হয়েছে, একটু লালচে রজোগুণ আছে! আমার বিশুদ্দ সত্ত্ব সতের আনা।’ (সকলের হাস্য)

“আমি যখন বলি, ‘তুমি কেবল বিচার কর, তাই শুষ্ক।’ সে বলে, আমি সৌর সুধা পান করি, তাই শুষ্ক।’

“আমি যখন শুদ্ধাভক্তির কথা বলি, যখন বলি শুদ্ধভক্ত টাকা-কড়ি ঐশ্বর্য কিছু চায় না; তখন সে বলে, ‘তাঁর কৃপাবন্যা এলে নদী তো উপচে যাবে, আবার খাল-ডোবাও জলে পূর্ণ হবে। শুদ্ধাভক্তিও হয়, আবার ষড়ৈশ্বর্যও হয়। টাকা-কড়িও হয়।”

ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে নরেন্দ্রাদি অনেক ভক্ত বসিয়া আছেন, গিরিশও আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি) — আমি নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করি; আর আমি ওর অনুগত।

গিরিশ — আপনি কারই বা অনুগত নন!

[নরেন্দ্রের অখণ্ডের ঘর]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — ওর মদ্দের ভাব (পুরুষভাব) আর আমার মেদীভাব (প্রকৃতিভাব)। নরেন্দ্রের উঁচুঘর, অখণ্ডের ঘর।

গিরিশ বাহিরে তামাক খাইতে গেলেন।

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — গিরিশ ঘোষের সঙ্গে আলাপ হল, খুব বড়লোক (মাস্টারের প্রতি) — আপনার কথা হচ্ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি কথা?

নরেন্দ্র — আপনি লেখাপড়া জানেন না, আমরা সব পণ্ডিত, এই সব কথা হচ্ছিল। (হাস্য)

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্র — পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্র]

মণি মল্লিক (ঠাকুরের প্রতি) — আপনি না পড়ে পণ্ডিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদির প্রতি) — সত্য বলছি, আমি বেদান্ত আদি শাস্ত্র পড়ি নাই বলে একটু দুঃখ হয় না। আমি জানি বেদান্তের সার, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। আবার গীতার সার কি? গীতা দশবার বললে যা হয়; ত্যাগী ত্যাগী।

“শাস্ত্রের সার গুরুমুখে জেনে নিতে হয়। তারপর সাধন-ভজন। একজন চিঠি লিখেছিল। চিঠিখানি পড়া হয় নাই, হারিয়ে গেল। তখন সকলে মিলে খুঁজতে লাগল। যখন চিঠিখানা পাওয়া গেল, পড়ে দেখলে পাঁচ সের সন্দেশ পাঠাবে আর একখানা কাপড় পাঠাবে। তখন চিঠিটা ফেলে দিলে, আর পাঁচ সের সন্দেশ আর একখানা কাপড়ের যোগাড় করতে লাগল। তেমনি শাস্ত্রের সার জেনে নিয়ে আর বই পড়বার কি দরকার? এখন সাধন-ভজন।”১

এইবার গিরিশ ঘরে আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি) — হাঁ গা, আমার কথা সব তোমরা কি কচ্ছিলে? আমি খাই দাই থাকি।

গিরিশ — আপনার কথা আর কি বলব। আপনি কি সাধু?

শ্রীরামকৃষ্ণ — সাধু-টাধু নয়। আমার সত্যই তো সাধুবোধ নাই।

গিরিশ — ফচকিমিতেও আপনাকে পারলুম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি লালপেড়ে কাপড় পরে জয়গোপাল সেনের বাগানে গিছলাম। কেশব সেন সেখানে ছিল। কেশব লালপেড়ে কাপড় দেখে বললে, ‘আজ বড় যে রঙ, লালপাড়ের বাহার।’ আমি বললুম, ‘কেশবের মন ভুলাতে হবে, তাই বাহার দিয়ে এসেছি।’

এইবার আবার নরেন্দ্রের গান হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারকে তানপুরাটি পাড়িয়া দিতে বলিলেন। নরেন্দ্র তানপুরাটি অনেকক্ষণ ধরিয়া বাঁধিতেছেন। ঠাকুর ও সকলে অধৈর্য হইয়াছেন।

বিনোদ বলিতেছেন, বাঁধা আজ হবে, গান আর-একদিন হবে। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতেছেন আর বলিতেছেন, "এমনি ইচ্ছে হচ্ছে যে তানপুরাটা ভেঙে ফেলি। কি টং টং — আবার তানা নানা নেরে নূম্‌ হবে।"

ভবনাথ — যাত্রার গোড়ায় অমনি বিরক্তি হয়।

নরেন্দ্র (বাঁধিতে বাঁধিতে) — সে না বুঝলেই হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — ওই আমাদের সব উড়িয়ে দিলে।

[নরেন্দ্রের গান ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাবেশ — অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ — স্থির জল ও তরঙ্গ]

নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া শুনিতেছেন। নিত্যগোপাল প্রভৃতি ভক্তেরা মেঝেতে বসিয়া শুনিতেছেন।

১। অন্তরে জাগিছ ও মা অন্তর যামিনী,
কোলে করে আছ মোরে দিবস যামিনী;

২। গাও রে আনন্দময়ীর নাম।

ওরে আমার একতন্ত্রী প্রাণের আরাম।

৩। নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।

তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী ।।

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া নিচে নামিয়া আসিয়াছেন ও নরেন্দ্রের কাছে বসিয়াছেন। ভাবাবিষ্ট হইয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — গান গাইব? থু থু! (নিত্যগোপালের প্রতি) — তুই কি বলিস উদ্দীপনের জন্য শুনতে হয়; তারপর কি হল আর কি গেল।

“আগুন জ্বেলে দিলে; সে তো বেশ! তারপর চুপ। বেশ তো, আমিও তো চুপ করে আছি, তুইও চুপ করে থাক।

“আনন্দ-রসে মগ্ন হওয়া নিয়ে কথা।

“গান গাইব? আচ্ছা, গাইলেও হয়। জল স্থির থাকলেও জল আর হেললে দুললেও জল।”

[নরেন্দ্রকে শিক্ষা — “জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হও”]

নরেন্দ্র কাছে বসিয়া আছেন। তাঁর বাড়িতে কষ্ট, সেই জন্য তিনি সর্বদা চিন্তিত হইয়া থাকেন। তাঁহার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত ছিল। এখনও সর্বদা জ্ঞানবিচার করেন, বেদান্তাদি গ্রন্থ পড়িবার খুব ইচ্ছা, এক্ষণে বয়স ২৩ বৎসর হইবে। ঠাকুর নরেন্দ্রকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, নরেন্দ্রের প্রতি) — তুই তো ‘খ’ (আকাশবৎ); তবে যদি টেক্‌সো (Tax অর্থাৎ বাড়ির ভাবনা) না থাকত। (সকলের হাস্য)

“কৃষ্ণকিশোর বলত ‘আমি খ’। একদিন তার বাড়িতে গিয়ে দেখি, সে চিন্তিত হয়ে বসে আছে; বেশি কথা কচ্ছে না। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ‘কি হয়েছে গা, এমন করে বসে রয়েছ কেন?’ সে বললে, ‘টেক্‌সোওয়ালা এসেছিল; সে বলে গেছে টাকা যদি না দাও তাহলে ঘটিবাটি সব নীলাম করে নিয়ে যাব; তাই আমার ভাবনা হয়েছে।’ আমি হাসতে হাসতে বললাম, ‘সে কি গো, তুমি তো ‘খ’, আকাশবৎ। যাক শালারা ঘটিবাটি নিয়ে যাক, তোমার কি?’

“তাই তোকে বলছি, তুই তো ‘খ’ —— এত ভাবছিস কেন? কি জানিস এমনি আছে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, অষ্টসিদ্ধের একটি থাকলে কিছু শক্তি হতে পারে, কিন্তু আমায় পাবে না। সিদ্ধাই-এর দ্বারা বেশ শক্তি, বল, টাকা, এই সব হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরকে লাভ হয় না।

“আর একটি কথা —— জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হও। অনেকে বলে অমুক বড় জ্ঞানী, বস্তুতঃ তা নয়। বশিষ্ঠ এত বড় জ্ঞানী, পুত্রশোকে অস্থির হয়েছিল; তখন লক্ষ্মণ বললেন, ‘রাম এ কি আশ্চর্য! ইনিও এত শোকার্ত!’ রাম বললেন —— ভাই, যার জ্ঞান আছে, তার অজ্ঞানও আছে; যার আলোবোধ আছে, তার অন্ধকারবোধও আছে; যার ভালবোধ আছে, তার মন্দবোধও আছে; যার সুখবোধ আছে, তার দুঃখবোধও আছে। ভাই, তুমি দুই-এর পারে যাও, সুখ-

দুঃখের পারে যাও, জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যাও। তাই তোকে বলছি, জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হও।”

১তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ।

নানুধ্যায়াদ্ বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ। [বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪।৪।২১]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২২শে ফেব্রুয়ারি 1885/02/22/iii

40.3 শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে — সুরেন্দ্রের প্রতি উপদেশ — গৃহস্থ ও দানধর্ম — মনোযোগ ও কর্মযোগ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ছোট খাটটিতে আসিয়া বসিয়াছেন। ভক্তেরা এখনও মেঝেতে বসিয়া আছেন। সুরেন্দ্র তাঁহার কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর তাঁহার দিকে সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিতেছেন ও কথাচ্ছলে তাঁহাকে নানা উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সুরেন্দ্রের প্রতি) — মাঝে মাঝে এসো। ন্যাংটা বলত, ঘটি রোজ মাজতে হয়; তা না হলে কলঙ্ক পড়বে। সাধুসঙ্গ সর্বদাই দরকার।

“সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ, তোমাদের পক্ষে তা নয়। তোমারা মাঝে মাঝে নির্জনে যাবে আর তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকবে। তোমরা মনে ত্যাগ করবে।

“বীরভক্ত না হলে দুদিক রাখতে পারে না; জনক রাজা সাধন-ভজনের পর সিদ্ধ হয়ে সংসারে ছিল। সে দুখানা তলোয়ার ঘুরাত; জ্ঞান আর কর্ম।”

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাহিতেছেন:

এই সংসার মজার কুটি।
আমি খাই দাই আর মজা লুটি।।
জনক রাজা মহাতেজা তার কিসে ছিল ত্রুটি।
সে যে এদিক-ওদিক দুদিক রেখে খেয়াছিল দুধের বাটি।।

“তোমাদের পক্ষে চৈতন্যদেব যা বলেছিলেন, জীবে দয়া, ভক্তসেবা আর নামসংকীর্তন।

“তোমায় বলছি কেন? তোমার হৌস-এর (House, সদাগরে বাড়ির) কাজ; আর অনেক কাজ করতে হয়। তাই বলছি।

“তুমি আফিসে মিথ্যা কথা কও তবে তোমার জিনিস খাই কেন? তোমার যে দান-ধ্যান আছে; তোমার যা আয় তার চেয়ে বেশি দান কর; বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি!

“কৃপণের জিনিস খাই না। তাদের ধন এই কয় রকমে উড়ে যায়: ১ম, মামলা মোকদ্দমায়; ২য়, চোর ডাকাতে; ৩য়, ডাক্তার খরচে; ৪র্থ, আবার বদ ছেলেরা সেই সব টাকা উড়িয়ে দেয় — এই সব।

“তুমি যে দান-ধ্যান কর, খুব ভাল। যাদের টাকা আছে তাদের দান করা উচিত। কৃপণের ধন উড়ে যায়, দাতার ধন রক্ষা হয়, সৎকাজে যায়। ও-দেশে চাষারা খানা কেটে ক্ষেতে জল আনে। কখনও কখনও জলের এত তোড় হয় যে ক্ষেতের আল ভেঙে যায়, আর জল বেরিয়ে যায় ও ফসল নষ্ট হয়। তাই চাষারা আলের মাঝে মাঝে ছেঁদা করে রাখে, তাকে ঘোগ বলে। জল ঘোগ দিয়ে একটু একটু বেরিয়ে যায়, তখন জলের তোড়ে আল ভাঙে না। আর ক্ষেতের উপর পলি পড়ে। সেই পলিতে ক্ষেত উর্বরা হয়, আর খুব ফসল হয়। যে দান-ধ্যান করে, সে অনেক ফললাভ করে; চতুর্বর্গ ফল।”

ভক্তেরা সকলে ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে এই দান-ধর্ম কথা একমনে শুনিতেছেন।

সুরেন্দ্র — আমার ধ্যান ভাল হয় না। মাঝে মাঝে মা মা বলি; আর শোবার সময় মা মা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা হলেই হল। স্মরণ-মনন তো আছে।

“মনোযোগ ও কর্মযোগ। পূজা, তীর্থ, জীবসেবা ইত্যাদি গুরুর উপদেশে কর্ম করার নাম কর্মযোগ। জনকাদি যা কর্ম করতেন তার নামও কর্মযোগ। যোগীরা যে স্মরণ-মনন করেন তার নাম মনোযোগ।

“আবার ভাবি কালীঘরে গিয়ে, মা মনও তো তুমি! তাই শুদ্ধমন, শুদ্ধবুদ্ধি শুদ্ধ আত্মা একই জিনিস।”

সন্ধ্যা আগত প্রায়, ভক্তেরা অনেকেই ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বাটি প্রত্যাগমন করিতেছেন। ঠাকুর পশ্চিমের বারান্দায় গিয়াছেন; ভবনাথ ও মাস্টার সঙ্গে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভবনাথের প্রতি) — তুই এত দেরিতে আসিস কেন?

ভবনাথ (সহাস্যে) — আজ্ঞে, পনেরদিন অন্তর দেখা করি; সেদিন আপনি নিজে রাস্তায় দেখা দিলেন, তাই আর আসি নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— সে কিরে? শুধু দর্শনে কি হয়? স্পর্শন, আলাপ —— এ-সবও চাই।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২২শে ফেব্রুয়ারি 1885/02/22/iv

40.4 জন্মোৎসব রাত্রে গিরিশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে

সন্ধ্যা হইল। ক্রমে ঠাকুরদের আরতির শব্দ শুনা যাইতেছে। আজ ফাল্গুনের শুক্লষ্টমী, ৬।৭ দিন পরে পূর্ণিমায় দোল মহোৎসব হইবে।

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুরবাড়ির মন্দিরশীর্ষ, প্রাঙ্গণ, উদ্যানভূমি, বৃক্ষশীর্ষ — চন্দ্রালোকে মনোহররূপ ধারণ করিয়াছে। গঙ্গা এক্ষণে উত্তরবাহিনী, জ্যোৎস্নাময়ী, মন্দিরের গা দিয়া যেন আনন্দে উত্তরমুখ হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরের ছোট খাটটিতে বসিয়া নিঃশব্দে জগন্মাতার চিন্তা করিতেছেন।

উৎসবান্তে এখনও দু-একটি ভক্ত রহিয়াছেন। নরেন্দ্র আগেই চলিয়া গিয়াছেন।

আরতি হইয়া গেল। ঠাকুর আবিষ্ট হইয়া দক্ষিণ-পূর্বের লম্বা বারান্দায় পাদচারণ করিতেছেন। মাস্টারও সেইখানে দণ্ডায়মান আছেন ও ঠাকুরকে দর্শন করিতেছেন। ঠাকুর হঠাৎ মাস্টারকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "আহা, নরেন্দ্রের কি গান!"

[তন্ত্রে মহাকালীর ধ্যান — গভীর মানে]

মাস্টার — আজ্ঞা, "নিবিড় আঁধারে" ওই গানটি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, ও গানের খুব গভীর মানে। আমার মনটা এখনও যেন টেনে রেখেছে।

মাস্টার — আজ্ঞা হাঁ

শ্রীরামকৃষ্ণ — আঁধারে ধ্যান, এইটি তন্ত্রের মত। তখন সূর্যের আলো কোথায়?

শ্রীযুত গিরিশ ঘোষ আসিয়া দাঁড়াইলেন; ঠাকুর গান গাহিতেছেন:

মা কি আমার কালো রে!

কালরূপ দিগম্বরী হৃদিপদ্ম করে আলো রে।

ঠাকুর মাতোয়ারা হইয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গিরিশের গায়ে হাত দিয়া গান গাহিতেছেন:

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায় —

কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়।

ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়,

সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায় ।।

দয়া ব্রত দান আদি, আর কিছু না মনে লয়।

মদনেরই যাগযজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায় ।।

গান - এবার আমি ভাল ভেবেছি

ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।

যে দেশে রজনী নাই মা সেই দেশের এক লোক পেয়েছি,

আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি।

নূপুরে মিশায়ে তাল সেই তালের এক গীত শিখেছি,

তাধ্রিম তাধ্রিম বাজছে সে তাল নিমিরে ওস্তাদ করেছি।

ঘুম ভেঙেছে আর কি ঘুমাই, যোগে যাগে জেগে আছি,

যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।

প্রসাদ বলে ভুক্তি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেখেছি,

আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।

গিরিশকে দেখিতে দেখিতে যেন ঠাকুরের ভাবোল্লাস আরও বাড়িতেছে। তিনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আবার গাহিতেছেন:

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি

আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি।

কালীনাম মহামন্ত্র আত্মশির শিখায় বেঁধেছি,

আমি দেহ বেচে ভবের হাটে শ্রীদুর্গানাম কিনে এনেছি।

কালীনাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি,

এবার শমন এলে হৃদয় খুলে দেখাব তাই বসে আছি।

ঠাকুর ভাবে মত্ত হইয়া আবার গাহিতেছেন:

আমি দেহ বেচে ভবের হাটে শ্রীদুর্গানাম কিনে এনেছি।

(গিরিশাদি ভক্তের প্রতি) — ‘ভাবেতে ভরল তনু হরল গেঞান।’

“সে জ্ঞান মানে বাহ্যজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান এ-সব চাই।”

[শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার — পরমহংস অবস্থা]

“ভক্তিই সার। সকাম ভক্তিও আছে, আবার নিষ্কাম ভক্তি, শুদ্ধাভক্তি, অহেতুকী ভক্তি এও আছে। কেশব সেন ওরা অহেতুকী ভক্তি জানত না; কোন কামনা নাই, কেবল ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি।

“আবার আছে, ঊর্জিতা ভক্তি। ভক্তি যেন উথলে পড়ছে। ‘ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়।’ যেমন চৈতন্যদেবের। রাম বললেন লক্ষ্মণকে, ভাই যেখানে দেখবে ঊর্জিতা ভক্তি, সেইখানে জানবে আমি স্বয়ং বর্তমান।”১

ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিতেছেন, নিজের অবস্থা? ঠাকুর কি চৈতন্যদেবের ন্যায় অবতার? জীবকে ভক্তি শিখাইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

গিরিশ — আপনার কৃপা হলেই সব হয়। আমি কি ছিলাম কি হয়েছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ওগো, তোমার সংস্কার ছিল তাই হচ্ছে। সময় না হলে হয় না। যখন রোগ ভাল হয়ে এল, তখন কবিরাজ বললে, এই পাতাটি মরিচ দিয়ে বেটে খেও। তারপর রোগ ভাল হল। তা মরিচ দিয়ে ঔষধ খেয়ে ভাল হল, না আপনি ভাল হল, কে বলবে?

“লক্ষ্মণ লবকুশকে বললেন, তোরা ছেলেমানুষ, তোরা রামচন্দ্রকে জানিস না। তাঁর পাদস্পর্শে অহল্যা-পাষাণী মানবী হয়ে গেল। লবকুশ বললে, ঠাকুর সব জানি, সব শুনেছি। পাষাণী যে মানব হল সে মুনিবাক্য ছিল। গৌতমমুনি বলেছিলেন যে ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র ওই আশ্রমের কাছ দিয়ে যাবেন; তাঁর পাদস্পর্শে তুমি আবার মানবী হবে। তা এখন রামের গুণে না মুনিবাক্যে, কে বলবে বল।

“সবি ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে। এখানে যদি তোমার চৈতন্য হয় আমাকে জানবে হেতুমাত্র। চাঁদমামা সকলের মামা। ঈশ্বর ইচ্ছায় সব হচ্ছে।”

গিরিশ (সহাস্য) — ঈশ্বরের ইচ্ছায় তো। আমিও তো তাই বলছি! (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি) — সরল হলে শীঘ্র ঈশ্বরলাভ হয়। কয়জনের জ্ঞান হয় না। ১ম —– যার বাঁকা মন, সরল নয়; ২য় —– যার শুচিবাই; ৩য় —– যারা সংশয়াত্মা।

ঠাকুর নিত্যগোপালের ভাবাবস্থার প্রসংসা করিতেছেন।

এখনও তিন-চারজন ভক্ত ওই দক্ষিণ-পূর্ব লম্বা বারান্দায় ঠাকুরের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন ও সমস্ত শুনিতেছেন। পরমহংসের অবস্থা ঠাকুর বর্ণনা করিতেছেন। বলিতেছেন, পরমহংসের সর্বদা এই বোধ —– ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য। হাঁসেরই শক্তি আছে, দুধকে জল থেকে তফাত করা। দুধে জলে যদি মিশিয়া থাকে, তাদের জিহ্বাতে একরকম টকরস আছে সেই রসের দ্বারা দুধ আলাদা জল আলাদা হয়ে যায়। পরমহংসের মুখেও সেই টকরস আছে, প্রেমাভক্তি। প্রেমাভক্তি থাকলেই নিত্য-অনিত্য বিবেক হয়। ঈশ্বরের অনুভূতি হয়, ঈশ্বরদর্শন হয়।

১শ্রদ্ধালুরত্যুর্জিতভক্তিলক্ষণো

যস্তস্য দৃশ্যোঽহমর্নির্শং হৃদি।। [অধ্যাত্মরামায়ণ, রামগীতা] Check Spelling

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c41 ৪১ গিরিশ-মন্দিরে ও স্টার থিয়েটারে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৫শে ফেব্রুয়ারি 1885/02/25/i

41.1 গিরিশ-মন্দিরে জ্ঞানভক্তি-সমন্বয় কথাপ্রসঙ্গ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশ ঘোষের বসুপাড়ার বাটীতে ভক্তসঙ্গে বসিয়া ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন। বেলা ৩টা বাজিয়াছে। মাস্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। আজ বুধবার, ১৫ই ফাল্গুন, শুক্লা একাদশী — ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। গত রবিবার দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মমহোৎসব হইয়া

গিয়াছে। আজ ঠাকুর গিরিশের বাড়ি হইয়া স্টার থিয়েটারে বৃষকেতুর অভিনয় দর্শন করিতে যাইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশ প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি) — জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, জীবের এই তিন অবস্থা।

“যারা জ্ঞানবিচার করে তারা তিন অবস্থাই উড়িয়ে দেয়। তারা বলে যে ব্রহ্ম তিন অবস্থারই পার, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ — তিনদেহের পার; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনগুণের পার: সমস্তই মায়া, যেমন আয়নাতে প্রতিবিম্ব পড়েছে; প্রতিবিম্ব কিছু বস্তু নয়; ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু।১

“ব্রহ্মজ্ঞানীরা আরও বলে, দেহাত্মবুদ্ধি থাকলেই দুটো দেখায়। প্রতিবিম্বটাও সত্য বলে বোধ হয়। ওই বুদ্ধি চলেগেলে, সোঽহম্ ‘আমিই সেই ব্রহ্ম’ এই অনুভূতি হয়।”

একজন ভক্ত — তাহলে কি আমরা সব বিচার করব?

[দুই পথ ও গিরিশ — বিচার ও ভক্তি — জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ — বিচারপথও আছে, বেদান্তবাদীদের পথ। আর-একটি পথা আছে ভক্তিপথ। ভক্ত যদি ব্যাকুল হয়ে কাঁদে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য, সে তাও পায়। জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ।

“দুই পথ দিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে। কেউ কেউ ব্রহ্মজ্ঞানের পরও ভক্তি নিয়ে থাকে লোকশিক্ষার জন্য; যেমন অবতারাদি।

“দেহাত্মবুদ্ধি, ‘আমি’ বুদ্ধি কিন্তু সহজে যায় না; তাঁর কৃপায় সমাধিস্থ হলে যায় — নির্বিকল্পসমাধি, জড়সমাধি।

“সমাধির পর অবতারাদির ‘আমি’ আবার ফিরে আসে — বিদ্যার আমি, ভক্তের আমি এই ‘বিদ্যার আমি’ দিয়ে লোকশিক্ষা হয়। শঙ্করাচার্য ‘বিদ্যার আমি’ রেখেছিল।

“চৈতন্যদেব এই ‘আমি’ দিয়ে ভক্তি আস্বাদন করতেন, ভক্তি-ভক্ত নিয়ে থাকতেন; ঈশ্বরীয় কথা কইতেন; নামসংকীর্তন করতেন।

“আমি তো সহজে যায় না, তাই ভক্ত জাগ্রত স্বপ্ন প্রভৃতি অবস্থা উড়িয়ে দেয় না। ভক্ত সব অবস্থাই লয়; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, তিনগুণও লয়; ভক্ত দেখে তিনিই চর্তুবিংশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন, জীবজগৎ হয়ে রয়েছেন; আবার দেকে সাকার চিন্ময়রূপে তিনি দর্শন দেন।

“ভক্ত বিদ্যামায়া আশ্রয় করে থাকে। সাধুসঙ্গ, তীর্থ, জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য — এই সব আশ্রয় করে থাকে। সে বলে যদি ‘আমি’ সহজে চলে না যায়, তবে থাক্‌ শালা ‘দাস’ হয়ে, ‘ভক্ত’ হয়ে।

“ভক্তেরও একাকার জ্ঞান হয়; সে দেখে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নাই। ‘স্বপ্নবৎ’ বলে না, তবে বলে তিনিই এই সব হয়েছেন; মোমের বাগানে সবই মোম, তবে নানা রূপ।

“তবে পাকা ভক্তি হলে এইরূপ বোধ হয়। অনেক পিত্ত জমলে ন্যাবা লাগে; তখন দেখে যে সবই হলদে। শ্রীমতী শ্যামকে ভেবে ভেবে সমস্ত শ্যামময় দেখলে; আর নিজেকেও শ্যাম বোধ হল। পারার হ্রদে সীসে অনেকদিন থাকলে সেটাও পারা হয়ে যায়। কুমুরেপোকা ভেবে ভেবে আরশুলা নিশ্চল হয়ে যায়। নড়ে না; শেষে কুমুরেপোকাই হয়ে যায়। ভক্তও তাঁকে ভেবে ভেবে অহংশূন্য হয়ে যায়। আবার দেখে ‘তিনিই আমি’, ‘আমিই তিনি’।

“আরশুলা যখন কুকুরেপোকা হয়ে যায়, তখন সব হয়ে গেল। তখনই মুক্তি।”

[নানা ভাবে পূজা ও গিরিশ — “আমার মাতৃভাব”]

“যতক্ষণ আমিটা তিনি রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ একটি ভাব আশ্রয় করে তাঁকে ডাকতে হয় — শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য — এই সব।

“আমি দাসীভাবে একবৎসর ছিলাম — ব্রহ্মময়ীর দাসী। মেয়েদের কাপড় ওড়না এই সব পরতাম। আবার নথ পরতাম! মেয়ের ভাব থাকলে কাম জয় হয়।

“সেই আদ্যাশক্তির পূজা করতে হয়, তাঁকে প্রসন্ন করতে হয়। তিনিই মেয়েদের রূপ ধারণ করে রয়েছেন। তাই আমার মাতৃভাব।

“মাতৃভাব অতি শুদ্ধভাব। তন্ত্রে বামাচারের কথাও আছে; কিন্তু সে ভাল নয়; পতন হয়। ভোগ রাখলেই ভয়।

“মাতৃভাব যেন নির্জলা একাদশী; কোন ভোগের গন্ধ নাই। আর আছে ফলমূল খেয়ে একাদশী; আর লুচি ছক্কা খেয়ে একাদশী। আমার নির্জলা একাদশী; আমি মাতৃভাবে ষোড়শীর পূজা করেছিলাম। দেখলাম স্তন মাতৃস্তন, যোনি মাতৃযোনি।

“এই মাতৃভাব — সাধনের শেষ কথা — ‘তুমি মা, আমি তোমার ছেলে’। এই শেষ কথা।”

[সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম — গৃহস্থদের নিয়ম ও গিরিশ]

“সন্ন্যাসীর নির্জলা একাদশী; সন্ন্যাসী যদি ভোগ রাখে, তা হলেই ভয়। কামিনী-কাঞ্চন ভোগ, যেমন থুথু ফেলে আবার থুথু খাওয়া। টাকা-কড়ি, মান-সম্ভ্রম, ইন্দ্রিয়সুখ — এই সব ভোগ। সন্ন্যাসীর ভক্ত স্ত্রীলোকের সঙ্গে বসা বা আলাপ করাও ভাল নয় — নিজের ক্ষতি আর অন্য লোকেরও ক্ষতি। অন্য লোকের শিক্ষা হয় না, লোকশিক্ষা হয় না। সন্ন্যাসীর দেহধারণ লোকশিক্ষার জন্য।

“মেয়েদের সঙ্গে বসা কি বেশিক্ষণ আলাপ, তাকেও রমণ বলেছে। রমণ আট প্রকার। মেয়েদের কথা শুনছি; শুনতে শুনতে আনন্দ হচ্ছে; ও একরকম রমণ। মেয়েদের কথা বলছি (কীর্তনম্) ও একরকম রমণ; মেয়েদের সঙ্গে নির্জনে চুপি চুপি কথা কচ্ছি, ও একরকম। মেয়েদের কোন জিনিস কাছে রেখে দিয়েছি, আনন্দ হচ্ছে, ও একরকম। স্পর্শ করা একরকম। তাই গুরুপত্নী যুবতী হলে পাদস্পর্শ করতে নাই; সন্ন্যাসীদের এই সব নিয়ম।

“সংসারীদের আলাদা কথা; দু-একটি ছেলে হলে ভাই-ভগ্নীর মতো থাকবে; তাদের অন্য সাতরকম রমণে দোষ নাই।

“গৃহস্থের ঋণ আছে। দেবঋণ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ; আবার মাগঋণও আছে, একটি-দুটি ছেলে হওয়া আর সতী হলে প্রতিপালন করা।

“সংসারীরা বুঝতে পারে না, কে ভাল স্ত্রী, কে মন্দ স্ত্রী; কে বিদ্যাশক্তি, কে অবিদ্যাশক্তি। যে ভাল স্ত্রী; বিদ্যাশক্তি, তার কাম ক্রোধ এ-সব কম, ঘুম কম; স্বামীর মাথা ঠেলে দেয়। যে বিদ্যাশক্তি তার স্নেহ, দয়া, ভক্তি, লজ্জা — এই সব থাকে। সে সকলেরই সেবা করে বাৎসল্যভাবে, আর স্বামীর যাতে ভগবানে ভক্তি হয় তার সাহায্য করে। বেশী খরচ করে না, পাছে স্বামীর বেশী খাটতে হয়, পাছে ঈশ্বরচিন্তার অবসর না হয়।

“আবার পুরুষ মেয়ের অন্য অন্য লক্ষণ আছে। খারাপ লক্ষণ — টেরা, চোখ কোটর, ঊনপাঁজর, বিড়াল-চোখ, বাছুরে গাল।”

[সমাধি-তত্ত্ব ও গিরিশ — ঈশ্বরলাভের উপায় — গিরিশের প্রশ্ন]

গিরিশ — আমাদের উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ভক্তিই সার। আবার ভক্তির সত্ত্ব, ভক্তির রজঃ, ভক্তির তমঃ আছে।

“ভক্তির সত্ত্ব দীনহীন ভাব; ভক্তির তমঃ যেন ডাকাত-পড়া ভাব। আমি তাঁর নাম করছি, আমার আবার পাপ কি? তুমি আমার আপনার মা, দেখা দিতেই হবে।”

গিরিশ (সহাস্যে) — ভক্তির তমঃ আপনিই তো শেখান —

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তাঁকে দর্শন করবার কিন্তু লক্ষণ আছে। সমাধি হয়। সমাধি পাঁচপ্রকার; ১ম: — পিঁপড়ের গতি, মহাবায়ু উঠে পিঁপড়ের মতো। ২য়: — মীনের গতি। ৩য়: তির্যক্ গতি। ৪র্থ: — পাখির গতি, পাখি যেমন এ-ডাল থেকে ও-ডালে যায়। ৫ম: — কপিবৎ, বানরের গতি; মহাবায়ু যেন লাফ দিয়ে মাথায় উঠে গেল আর সমাধি হল।

“আবার দুরকম আছে; ১ম: — স্থিতসমাধি; একেবারে বাহ্যশূন্য; অনেকক্ষণ হয়তো অনেকদিন, রহিল। ২য়: — উন্মনাসমাধি; হঠাৎ মনটা চারিদিক থেকে কুড়িয়ে এনে ঈশ্বরেতে যোগ করে দেওয়া।”

[উন্মনাসমাধি ও মাস্টার]

(মাস্টারের প্রতি) — “তুমি ওটা বুঝেছ?”

মাস্টার — আজ্ঞে হাঁ।

গিরিশ — তাঁকে কি সাধন করে পাওয়া যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — নানারকমে তাঁকে লোকে লাভ করেছে। কেউ অনেক তপস্যা সাধন-ভজন করে; সাধনসিদ্ধ। কেউ জন্মাবধি সিদ্ধ; যেমন নারদ, শুকদেবাদি, এদের বলে নিত্যসিদ্ধ। আবার আছে হঠাৎসিদ্ধ; হঠাৎ লাভ করেছে। যেমন হঠাৎ কোন আশা ছিল না, কেউ নন্দ বসুর মতো বিষয় পেয়ে গেছে।

১ মাণ্ডূক্যোপনিষদ্‌।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৫শে ফেব্রুয়ারি 1885/02/25/ii

41.2 গিরিশের শান্তভাব, কলিতে শূদ্রের ভক্তি ও মুক্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ — আর আছে স্বপ্নসিদ্ধ আর কৃপাসিদ্ধ।

এই বলিয়া ঠাকুর ভাবে বিভোর হইয়া গান গাহিতেছেন:

শ্যামাধন কি সবাই পায়,

অবোধ মন বোঝে না একি দায়।

শিবেরই অসাধ্য সাধন মনমজানো রাঙা পায়।।

ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়।

সদানন্দ সুখে ভাসে, শ্যামা যদি ফিরে চায়।।

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র যে চরণ ধ্যানে না পায়।

নির্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়।।

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ ভাবাবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। গিরিশ প্রভৃতি ভক্তেরা সম্মুখে আছেন। কিছুদিন পূর্বে স্টার থিয়েটারে গিরিশ অনেক কথা বলিয়াছিলেন; এখন শান্তভাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি) — তোমার এ ভাব বেশ ভাল; শান্তভাব, মাকে তাই বলেছিলাম, মা ওকে শান্ত করে দাও, যা তা আমায় না বলে।

গিরিশ (মাস্টারে প্রতি) — আমার জিব কে যেন চেপে ধরেছে। আমায় কথা কইতে দিচ্ছে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভাবস্থ অনতর্মুখ। বাহিরের ব্যক্তি, বস্তু ক্রমে ক্রমে সব ভুলে যাচ্ছেন। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া মনকে নাবাচ্ছেন। ভক্তদের আবার দেখিতেছেন। (মাস্টার দৃষ্টে) এরা সব সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যায়; — তা যায় তো যায়; মা সব জানে।

(প্রতিবেশী ছোকরার প্রতি) — "কিগো! তোমার কি বোধ হয়? মানুষের কি কর্তব্য?"

সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর কি বলিতেছেন যে ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য?

শ্রীরামকৃষ্ণ (নারায়ণের প্রতি) — তুই পাস করবিনি? ওরে পাশমুক্ত শিব, পাশবদ্ধ জীব।

ঠাকুর এখন ভাবাবস্থায় আছেন। কাছে গ্লাস করা জল ছিল, পান করিলেন। তিনি আপনা-আপনি বলিতেছেন, কই ভাবে তো জল খেয়ে ফেললুম!

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত অতুল — ব্যাকুলতা]

এখনও সন্ধ্যা হয় নাই। ঠাকুর গিরিশের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অতুলের সহিত কথা কহিতেছেন। অতুল ভক্তসঙ্গে সম্মুখেই বসিয়া আছেন। একজন ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীও বসিয়া আছেন। অতুল হাইকোর্ট-এর উকিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অতুলের প্রতি) — আপনাদের এই বলা, আপনারা দুই করবে, সংসারও করবে, ভক্তি যাতে হয় তাও করবে।

ব্রাহ্মণ প্রতিবেশী — ব্রাহ্মণ না হলে কি সিদ্ধ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেন? কলিতে শূদ্রের ভক্তির কথা আছে। শবরী, রুইদাস, গুহক চণ্ডাল — এ-সব আছে।

নারায়ণ (সহাস্যে) — ব্রাহ্মণ, শুদ্র, সব এক।

ব্রাহ্মণ — এক জন্মে কি হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁর দয়া হলে কি না হয়। হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘরে আলো আনলে কি একটু একটু করে অন্ধকার চলে যায়? একেবারে আলো হয়।

(অতুলের প্রতি) — “তীব্র বৈরাগ্য চাই — যেন খাপখোলা তরোয়াল। সে বৈরাগ্য হলে, আত্মীয় কালসাপ মনে হয়, গৃহ পাতকুয়া মনে হয়।

“আর আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। আন্তরিক ডাক তিনি শুনবেনই শুনবেন।”

সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর যাহা বলিলেন, একমনে শুনিয়া সেই সকল চিন্তা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অতুলের প্রতি) — কেন? অমন আঁট বুঝি হয় না — ব্যাকুলতা?

অতুল — মন কই থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — অভ্যাসযোগ! রোজ তাঁকে ডাকা অভ্যাস করতে হয়। একদিনে হয় না; রোজ ডাকতে ডাকতে ব্যাকুলতা আসে।

“কেবল রাতদিন বিষয়কর্ম করলে ব্যাকুলতা কেমন করে আসবে? যদু মল্লিক আগে আগে ঈশ্বরীয় কথা বেশ শুনত, নিজেও বেশ বলত; আজকাল আর তত বলে না, রাতদিন মোসাহেব নিয়ে বসে থাকে, কেবল বিষয়ের কথা!”

[সন্ধ্যা সমাগমে ঠাকুরের প্রার্থনা — তেজচন্দ্র]

সন্ধ্যা হইল; ঘরে বাতি জ্বালা হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরদের নাম করিতেছেন, গান গাহিতেছেন ও প্রার্থনা করিতেছেন।

বলিতেছেন, “হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল”; আবার “রাম রাম রাম”; আবার ‘নিত্যলীলাময়ী’। ওমা, উপায় বল মা! “শরণাগত, শরণাগত, শরণাগত”!

গিরিশকে ব্যস্ত দেখিয়া ঠাকুর একটু চুপ করিলেন। তেজচন্দ্রকে বলিতেছেন, তুই একটু কাছে এসে বোস।

তেজচন্দ্র কাছে বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মাস্টারকে ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিতেছেন, আমায় যেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি ওদের অত টানি কেন? ওরা নির্মল আধার — বিষয়বুদ্ধি ঢোকেনি। থাকলে উপদেশ ধারণা করতে পারে না। নূতন হাঁড়িতে দুধ রাখা যায়, দই পাতা হাঁড়িতে দুধ রাখলে দুধ নষ্ট হয়।

“যে বাটিতে রসুন গুলেছে, সে বাটি হাজার ধোও, রসুনের গন্ধ যায় না।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৫শে ফেব্রুয়ারি 1885/02/25/iii

41.3 শ্রীরামকৃষ্ণ স্টার থিয়েটারে — বৃষকেতু অভিনয়দর্শনে, নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বৃষকেতু অভিনয়দর্শন করিবেন। বিডন স্ট্রীটে যেখানে পরে মনোমোহন থিয়েটার হয়, পূর্বে সেই মঞ্চে স্টার-থিয়েটার আভিনয় হইত। থিয়েটারে আসিয়া বক্সে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়াছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — নরেন্দ্র এসেছে?

মাস্টার —— আজ্ঞে হাঁ।

অভিনয় হইতেছে। কর্ণ ও পদ্মাবতী করাত দুইদিকে দুইজন ধরিয়া বৃষকেতুকে বলিদান করিলেন। পদ্মাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে মাংস রন্ধন করিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অতিথি আনন্দ করিতে করিতে কর্ণকে বলিতেছেন, এইবার এস, আমরা একসঙ্গে বসে রান্না মাংস খাই। অভিনয়ে কর্ণ বলিতেছেন, তা আমি পারব না; পুত্রের মাংস খেতে পারব না।

একজন ভক্ত সহানুভূতি-ব্যঞ্জক অস্ফুট আর্তনাদ করিলেন। ঠাকুরও সেই সঙ্গে দুঃখপ্রকাশ করিলেন।

অভিনয় সমাপ্ত হইলে ঠাকুর রঙ্গমঞ্চের বিশ্রাম ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গিরিশ, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা বসিয়া আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে প্রবেশ করিয়া নরেন্দ্রের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন ও বলিলেন, আমি এসেছি।

[Concert বা সানাইয়ের শব্দে ভাবাবিষ্ট]

ঠাকুর উপবেশন করিয়াছেন। এখনও ঐকতান বাদ্যের (কনসার্ট) শব্দ শুনা যাইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — এই বাজনা শুনে আমার আনন্দ হচ্ছে। সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) সানাই বাজত, আমি ভাবিবিষ্ট হয়ে যেতাম; একজন সাধু আমার অবস্থা দেখে বলত, এ-সব ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ।

[গিরিশ ও "আমি আমার"]

কনসার্ট থামিয়া গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি) — এ কি তোমার থিয়েটার, না তোমাদের?

গিরিশ —— আজ্ঞা আমাদের।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— আমাদের কথাটিই ভাল; আমার বলা ভাল নয়! কেউ কেউ বলে আমি নিজেই এসেছি; এ-সব হীনবুদ্ধি অহংকারে লোকে বলে।

[শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে]

নরেন্দ্র —— সবই থিয়েটার।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— হাঁ হাঁ ঠিক। তবে কোথাও বিদ্যার খেলা, কোথাও অবিদ্যার খেলা।

নরেন্দ্র —— সবই বিদ্যার।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ হাঁ; তবে উটি ব্রহ্মজ্ঞানে হয়। ভক্তি-ভক্তের পক্ষে দুইই আছে; বিদ্যা মায়া, অবিদ্যা মায়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুই একটু গান গা।

নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন:

চিদানন্দ সিন্ধুনীর প্রেমানন্দের লহরী।
মহাভাব রাসলীলা কি মাধুরী মরি মরি।
বিবিধ বিলাস রঙ্গ প্রসঙ্গ, কত অভিনব ভাবতরঙ্গ,
ডুবিছে উঠিছে করিছে রঙ্গ নবীন রূপ ধরি।
(হরি হরি বলে)
মহাযোগে সমুদায় একাকার হইল,
দেশ-কাল, ব্যবধান, ভেদাভেদ ঘুচিল (আশা পুরিল রে, —
আমার সকল সাধ মিটে গেল)
এখন আনন্দে মাতিয়া দুবাহু তুলিয়া
বল রে মন হরি হরি।

নরেন্দ্র যখন গাহিতেছেন, ‘মহাযোগে সব একাকার হইল’ তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, এটি ব্রহ্মজ্ঞানে হয়; তুই যা বলছিলি, সবই বিদ্যা।

নরেন্দ্র যখন গাহিতেছেন, “আনন্দে মাতিয়া দুবাহু তুলিয়া বল রে মন হরি হরি,” তখন শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বলিতেছেন, ওইটি দুবার করে বল্‌।

গান হইয়া গেলে আবার ভক্তসঙ্গে কথা হইতেছে।

গিরিশ — দেবেন্দ্রবাবু আসেন নাই; তিনি অভিমান করে বললেন, আমাদের ভিতরে তো ক্ষীরের পোর নাই; কলায়ের পোর। আমরা এসে কি করব?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিস্মিত হইয়া) — কই, আগে তো উনি ওরকম করতেন না?

ঠাকুর জলসেবা করিতেছেন, নরেন্দ্রকেও খাইতে দিলেন।

যতীন দেব (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি — "নরেন্দ্র খাও" "নরেন্দ্র খাও" বলছেন, আমরা শালারা ভেসে এসেছি!

যতীনকে ঠাকুর খুব ভালবাসেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া মাঝে মাঝে দর্শন করেন; কখন কখন রাত্রেও সেখানে গিয়া থাকেন। তিনি শোভাবাজারের রাজাদের বাড়ির (রাধাকান্ত দেবের বাড়ির) ছেলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি, সহাস্যে) — ওরে (যতীন) তোর কথাই বলছে।

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে যতীনের থুঁতি ধরে আদর করিতে করিতে বলিলেন, "সেখানে যাস, গিয়ে খাস!" অর্থাৎ "দক্ষিণেশ্বরে যাস।" ঠাকুর আবার বিবাহ-বিভ্রাট অভিনয় শুনবেন; বক্সে গিয়ে বসিলেন। ঝির কথাবার্তা শুনে হাসিতে লাগিলেন।

[গিরিশের অবতারবাদ — শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার?]

খানিকক্ষণ শুনিয়া অন্যমনস্ক হইলেন। মাস্টারের সহিত আস্তে আস্তে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — আচ্ছা, গিরিশ ঘোষ যা বলছে (অর্থাৎ অবতার) তা কি সত্য?

মাস্টার — আজ্ঞা ঠিক কথা; তা না হলে সবার মনে লাগছে কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখ, এখন একটি অবস্থা আসছে; আগেকার অবস্থা উলটে গেছে। ধাতুর দ্রব্য ছুঁতে পারছি না।

মাস্টার অবাক্ হইয়া শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এই যে নূতন অবস্থা, এর একটি খুব গুহ্য মানে আছে।

ঠাকুর ধাতু স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না। অবতার বুঝি মায়ার ঐশ্বর্য কিছুই ভোগ করেন না, তাই কি ঠাকুর এই সব কথা বলিতেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — আচ্ছা, আমার অবস্থা কিছু বদলাচ্ছে দেখছ?

মাস্টার — আজ্ঞা, কই?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কার্যে?

মাস্টার — এখন কাজ বাড়ছে — যত লোক জানতে পারছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখছ! আগে যা বলতুম এখন ফলছে?

ঠাকুর কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলছেন, “আচ্ছা, পল্টুর ভাল ধ্যান হয় না কেন?”

[গিরিশ কি রসুন গোলা বাটি? The Lord's message of hope for so-called 'Sinners']

এইবার ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর যাইবার উদ্যোগ হইতেছে।

ঠাকুর কোন ভক্তের কাছে গিরিশের সম্বন্ধে বলেছিলেন, “রসুন গোলা বাটি হাজার ধোও রসুনের গন্ধ কি একেবারে যায়?” গিরিশও তাই মনে মনে অভিমান করিয়াছেন; যাইবার সময় গিরিশ ঠাকুরকে কিছু নিবেদন করিতেছেন।

গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — রসুনের গন্ধ কি যাবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — যাবে।

গিরিশ — তবে বললেন ‘যাবে’?

শ্রীরামকৃষ্ণ — অত আগুন জ্বললে গন্ধ-ফন্ধ পালিয়ে যায়। রসুনের বাটি পুড়িয়ে নিলে আর গন্ধ থাকে না, নূতন হাঁড়ি হয়ে যায়।

“যে বলে আমার হবে না, তার হয় না। মুক্ত-অভিমানী মুক্তই হয়, আর বদ্ধ-অভিমানী বদ্ধই হয়। যে জোর করে বলে আমি মুক্ত হয়েছি, সে মুক্তই হয়। যে রাতদিন ‘আমি বদ্ধ’ ‘আমি বদ্ধ’ বলে, সে বদ্ধই হয়ে যায়।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c42 ৪২ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১লা মার্চ 1885/03/01/i

42.1 দোলযাত্রাদিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে

দোলযাত্রাদিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তিযোগ

[মহিমাচরণ, রাম, মনোমোহন, নবাই, নরেন্দ্র, মাস্টার প্রভৃতি]

আজ ১দোলযাত্রা, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মদিন, ১৯শে ফাল্গুন, পূর্ণিমা, রবিবার, ১লা মার্চ, ১৮৮৫। শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের মধ্যে ছোট খাটটিতে বসিয়া সমাধিস্থ। ভক্তেরা

মেঝেতে বসিয়া আছেন — একদৃষ্টে তাঁহাকে দেখিতেছেন। মহিমাচরণ, রাম (দত্ত), মনোমোহন, নবাই চৈতন্য, মাস্টার প্রভৃতি অনেকে বসিয়া আছেন।

ভক্তেরা একদৃষ্টে দেখিতেছেন। সমাধি ভঙ্গ হইল। ভাবের পূর্ণমাত্রা। ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিতেছেন — ‘বাবু’, হরিভক্তির কথা —

মহিমা - আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।।
বিরম বিরম ব্রহ্মন্ কিং তপস্যাসু বৎস।
ব্রজ ব্রজ দ্বিজ শীঘ্রং শঙ্করং জ্ঞানসিন্ধুম্।।
লভ লভ হরিভক্তিং বৈষ্ণবোক্তাং সুপক্কাম্।
ভবনিগড়নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্তরীঞ্চ।।

“নারদপঞ্চরাত্রে আছে। নারদ তপস্যা করছিলেন দৈববানী হল —

“হরিকে যদি আরাধনা করা যায়, তাহলে তপস্যার কি প্রয়োজন? আর হরিকে যদি না আরাধনা করা হয়, তাহলেই বা তপস্যার কি প্রয়োজন? হরি যদি অন্তরে বাহিরে থাকেন, তাহলেই বা তপস্যার কি প্রয়োজন? আর যদি অন্তরে বাহিরে না থাকেন, তাহলেই বা তপস্যার কি প্রয়োজন? অতএব হে ব্রহ্মন, বিরত হও, বৎস, তপস্যার কি প্রয়োজন? জ্ঞান-সিন্ধু শঙ্করের কাছে গমন কর। বৈষ্ণবেরা যে

হরিভক্তির কথা বলে গেছেন, সেই সুপক্কা ভক্তি লাভ কর, লাভ কর। এই ভক্তি — এই ভক্তি-কাটারি — দ্বারা ভবনিগড় ছেদন হবে।”

[ঈশ্বরকোটি — শুকদেবের সমাধিভঙ্গ — হনুমান, প্রহ্লাদ]

শ্রীরামকৃষ্ণ — জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি। জীবকোটির ভক্তি, বৈধভক্তি। এত উপচারে পূজা করতে হবে, এত জপ করতে হবে, এত পুরশ্চরণ করতে হবে। এই বৈধীভক্তির পর জ্ঞান। তারপর লয়। এই লয়ের পর আর ফেরে না।

“ঈশ্বরকোটির আলাদা কথা, — যেমন অনুলোম বোলুম। ‘নেতি’ ‘নেতি’ করে ছাদে পোঁছে যখন দেখে, ছাদও যে জিনিসে তৈরী, — ইঁট, চুন, সুরকি, সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈরী। তখন কখন ছাদেও থাকতে পারে, আবার উঠা নামাও করতে পারে।

“শুকদেব সমাধিস্থ ছিলেন নির্বিকল্পসমাধি, — জড়সমাধি। ঠাকুর নারদকে পাঠিয়ে দিলেন, — পরীক্ষিৎকে ভাগবত শুনাতে হবে। নারদ দেখলেন জড়ের ন্যায় শুকদেব বাহ্যশূন্য — বসে আছেন। তখন বীণার সঙ্গে হরির রূপ চার শ্লোকে বর্ণনা করতে লাগলেন। প্রথম শ্লোক বলতে বলতে শুকদেবের রোমাঞ্চ হল। ক্রমে অশ্রু; অন্তরে হৃদয়মধ্যে, চিন্ময়রূপ দর্শন করতে লাগলেন। জড়সমাধির পর আবার রূপদর্শনও হল। শুকদেব ঈশ্বরকোটি।

“হনুমান সাকার-নিরাকার সাক্ষাৎকার করে রামমূর্তিতে নিষ্ঠা করে থাকল। চিদঘন আনন্দের মূর্তি — সেই রামমূর্তি।

“প্রহ্লাদ কখন দেখতেন সোঽহম্‌; আবার কখন দাসভাবে থাকতেন। ভক্তি না নিলে কি নিয়ে থাকে? তাই সে সেব্য-সেবকভাব আশ্রয় করতে হয়, — তুমি প্রভু, আমি দাস। হরিরস আস্বাদন করবার জন্য। রস-রসিকে ভাব, — হে ঈশ্বর, তুমি রস,১ আমি রসিক।

“ভক্তির আমি, বিদ্যার আমি, বালকের আমি, — এতে দোষ নাই। শঙ্করাচার্য ‘বিদ্যার আমি’ রেখেছিলেন; লোকশিক্ষা দিবার জন্য। বালকের আমির আঁট নাই। বালক গুণাতীত, — কোন গুণের বশ নয়। এই রাগ কল্লে, আবার কোথাও কিছু নাই। এই খেলাঘর কল্লে, আবার ভুলে গেল; এই খেলুড়েদের ভালবাসছে, আবার কিছুদিন তাদের না দেখলে তো সব ভুলে গেল। বালক সত্ত্ব রজঃ তমঃ কোন গুণের বশ নয়।

“তুমি ঠাকুর, আমি ভক্ত —— এটি ভক্তের ভাব, এ আমি ‘ভক্তির আমি’। কেন ভক্তির আমি রাখে? তার মানে আছে। আমি তো যাবার নয়, তবে থাক শালা ‘দাস আমি’ ‘ভক্তের আমি’ হয়ে।

“হাজার বিচার কর, আমি যায় না। আমিরূপ কুম্ভ। ব্রহ্ম যেন সমুদ্র —— জলে জল। কুম্ভের ভিতরে বাহিরে জল। জলে জল। তবু কুম্ভ তো আছে। ওইটি ভক্তের আমির স্বরূপ। যতক্ষণ কুম্ভ আছে, আমি তুমি আছে; তুমি ঠাকুর, আমি ভক্ত; তুমি প্রভু, আমি দাস; এও আছে। হাজার বিচার কর, এ ছাড়বার জো নাই। কুম্ভ না থাকলে তখন সে এক কথা।”

১ ...রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।

কো হ্যোবান্যাৎ কঃ প্রাণাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

[তৈত্তিরীয়োপনিষদ, ২।৭]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১লা মার্চ 1885/03/01/ii

42.2 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার নরেন্দ্রকে সন্ন্যাসের উপদেশ

নরেন্দ্র আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। কথা কহিতে কহিতে মেঝেতে আসিয়া বসিলেন। মেঝেতে মাদুর পাতা। এতক্ষণে ঘর লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ভক্তেরাও আছেন, বাহিরের লোকও আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) — ভাল আছিস? তুই নাকি গিরিশ ঘোষের ওখানে প্রায়ই যাস?

নরেন্দ্র — আজ্ঞে হাঁ, মাঝে মাঝে যাই।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গিরিশ কয়মাস হইল নূতন আসা যাওয়া করিতেছেন। ঠাকুর বলেন, গিরিশের বিশ্বাস আঁকড়ে পাওয়া যায় না। যেমন বিশ্বাস, তেমনি অনুরাগ। বাড়িতে ঠাকুরের চিন্তায় সর্বদা মাতোয়ারা হয়ে থাকেন।

নরেন্দ্র প্রায় যান, হরিপদ, দেবেন্দ্র ও অনেক ভক্ত তাঁর বাড়িতে প্রায় যান; গিরিশ তাঁহাদের সঙ্গে কেবল ঠাকুরের কথাই কন। গিরিশ সংসারে থাকেন, কিন্তু ঠাকুর দেখিতেছেন নরেন্দ্র সংসারে থাকিবেন না — কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করিবেন। ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত কথা কহিতেছেন —

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুই গিরিশ ঘোষের ওখানে বেশি যাস?

[সন্ন্যাসের অধিকারী — কৌমারবৈরাগ্য — গিরিশ কোন্ থাকের — রাবণ ও অসুরদের প্রকৃতিতে যোগ ও ভোগ]

“কিন্তু রসুনের বাটি যত ধোও না কেন, গন্ধ একটু থাকবেই। ছোকরারা শুদ্ধ আধার! কামিনী-কাঞ্চন স্পর্শ করে নাই; অনেকদিন ধরে কামিনী-কাঞ্চন ঘাঁটলে রসুনের গন্ধ হয়।

“যেমন কাকে ঠোকরান আম। ঠাকুরদের দেওয়া যায় না, নিজেরও সন্দেহ। নূতন হাঁড়ি আর দইপাতা হাঁড়ি। দইপাতা হাঁড়িতে দুধ রাখতে ভয় হয়। প্রায় দুধ নষ্ট হয়ে যায়।

“ওরা থাক আলাদা। যোগও আছে, ভোগও আছে। যেমন রাবণের ভাব — নাগকন্যা দেবকন্যাও নেবে, রামকেও লাভ করবে।

“অসুররা নানা ভোগও কচ্ছে, আবার নারায়ণকেও লাভ কচ্ছে।”

নরেন্দ্র — গিরিশ ঘোষ আগেকার সঙ্গ ছেড়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বড় বেলায় দামড়া হয়েছে, আমি বর্ধমানে দেখেছিলাম। একটা দামড়া, গাই গরুর কাছে যেতে দেখে আমি জিজ্ঞেস কল্লুম, এ কি হল? এ তো দামড়া! তখন গাড়োয়ান বললে, মশাই এ বেশি বয়সে দামড়া হয়েছিল। তাই আগেকার সংস্কার যায় নাই।

“এক জায়গায় সন্ন্যাসীরা বসে আছে — একটি স্ত্রীলোক সেইখান দিয়ে চলে যাচ্ছে। সকলেই ঈশ্বরচিন্তা করছে, একজন আড়চোখে চেয়ে দেখলে। সে তিনটি ছেলে হবার পর সন্ন্যাসী হয়েছিল।

“একটি বাটিতে যদি রসুন গোলা যায়, রসুনের গন্ধ কি যায়? বাবুই গাছে কি আম হয়? হতে পারে সিদ্ধাই তেমন থাকলে, বাবুই গাছেও আম হয়। সে সিদ্ধাই কি সকলের হয়?

“সংসারী লোকের অবসর কই? একজন একটি ভাগবতের পণ্ডিত চেয়েছিল। তার বন্ধু বললে, একটি উত্তম ভাগবতের পণ্ডিত আছে, কিন্তু তার একটু গোল আছে। তার নিজের অনেক চাষবাস দেখতে হয়। চারখানা লাঙল, আটটা হেলে গরু। সর্বদা তদারক করতে হয়; অবসর নাই। যার পণ্ডিতের দরকার সে বললে, আমার এমন ভাগবতের পণ্ডিতের দরকার নাই, যার অবসর নাই। লাঙল-হেলেগরু-ওয়ালা ভাগবত পণ্ডিত আমি খুঁজছি না। আমি এমন ভাগবত পণ্ডিত চাই যে আমাকে ভাগবত শুনাতে পারে।

“এক রাজা রোজ ভাগবত শুনত। পণ্ডিত পড়া শেষ হলে রাজাকে বলত, রাজা বুঝেছ? রাজাও রোজ বলে — আগে তুমি বোঝ! পণ্ডিত বাড়ি গিয়ে রোজ

ভাবে — রাজা এমন কথা বলে কেন যে তুমি আগে বোঝ। লোকটা সাধন-ভজন করত — ক্রমে চৈতন্য হল। তখন দেখলে যে হরিপাদপদ্মই সার, আর সব মিথ্যা। সংসারে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এল। কেবল একজনকে পাঠালে রাজাকে বলতে যে — রাজা, এইবার বুঝেছি।

“তবে কি এদের ঘৃণা করি? না, ব্রহ্মজ্ঞান তখন আনি। তিনি সব হয়েছেন, — সকলেই নারায়ণ। সব যোনিই মাতৃযোনি, তখন বেশ্যা ও সতীলক্ষ্মীতে কোন প্রভেদ দেখি না।”

[সব কলাইয়ের ডালের খদ্দের — রূপ ও ঐশ্বর্যের বশ]

“কি বলব সব দেখছি কলাইয়ের ডালের খদ্দের। কামিনী-কাঞ্চন ছাড়তে চায় না। লোকে মেয়েমানুষের রূপে ভুলে যায়, টাকা ঐশ্বর্য দেখলে ভুলে যায়, কিন্তু ঈশ্বরের রূপদর্শন করলে ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়।

“রাবণকে একজন বলেছিল, তুমি সব রূপ ধরে সীতার কাছে যাও, রামরূপ ধর না কেন? রাবণ বললে, রামরূপ হৃদয়ে একবার দেখলে রম্ভা তিলোত্তমা এদের চিতার ভস্ম বলে বোধ হয়। ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, পরস্ত্রীর কথা তো দূরে থাক।

“সব কলাইয়ের ডালের খদ্দের। শুদ্ধ আধার না হলে ঈশ্বরে শুদ্ধাভক্তি হয় না — একলক্ষ্য হয় না, নানাদিকে মন থাকে।”

[নেপালী মেয়ে, ঈশ্বরের দাসী — সংসারীর দাসত্ব]

(মনোমোহনের প্রতি) — “তুমি রাগই কর আর যাই কর —— রাখালকে বললাম ঈশ্বরের জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছিস এ-কথা বরং শুনব; তবু কারুর দাসত্ব করিস, এ-কথা যেন না শুনি।

“নেপালের একটি মেয়ে এসেছিল। বেশ এসরাজ বাজিয়ে গান করলে। হরিনাম গান। কেউ জিজ্ঞাসা করলে —— ‘তোমার বিবাহ হয়েছে?’ তা বললে, ‘আবার কার দাসী হব? এক ভগবানের দাসী আমি।’

“কামিনী-কাঞ্চনের ভিতের থেকে কি করে হবে? অনাসক্ত হওয়া বড় কঠিন। একদিকে মেগের দাস, একদিকে টাকার দাস, আর-একদিকে মনিবের দাস, তাদের চাকরি করতে হয়।

“একটি ফকির বনে কুটির করে থাকত। তখন আকবর শা দিল্লীর বাদশা। ফকিরটির কাছে অনেকে আসত। অতিথিসৎকার করতে তার বড় ইচ্ছা হয়। একদিন ভাবলে যে, টাকা-কড়ি না হলে কেমন করে অতিথিসৎকার হয়? তবে যাই একবার অকবর শার কাছে। সাধু-ফকিরের অবারিত দ্বার। আকবর শা তখন নমাজ পড়ছিলেন, ফকির নমাজ ঘরে গিয়ে বসল। দেখলে আকবর শা নমাজের শেষে বলছে, ‘হে আল্লা, ধন দাও দৌলত দাও’, আরও কত কি। এই সময়ে ফকিরটি উঠে নমাজের ঘর থেকে চলে যাবার উদ্যোগ করতে লাগল। আকবর শা ইশারা করে বসতে বললেন। নমাজ শেষ হলে বাদশা জিজ্ঞাসা কল্লেন —— আপনি এসে বসলেন আবার চলে যাচ্ছেন? ফকির বললে, — সে আর মহারাজের শুনে কাজ নাই, আমি চল্লুম। বাদশা অনেক জিদ করাতে ফকির বললে —— আমার ওখানে অনেকে আসে। তাই কিছু টাকা প্রার্থনা করতে

এসেছিলাম। আকবর বললে — তবে চলে যাচ্ছিলেন কেন? ফকির বললে, যখন দেখলুম, তুমিও ধন-দৌলতের ভিখারী — তখন মনে করলুম যে, ভিখারীর কাছে চেয়ে আর কি হবে? চাইতে হয় তো আল্লার কাছে চাইব।”

[পূর্বকথা — হৃদয় মুখুজ্জের হাঁকডাক — ঠাকুরের সত্ত্বগুণের অবস্থা]

নরেন্দ্র — গিরিশ ঘোষ এখন কেবল এই সব চিন্তাই করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সে খুব ভাল। তবে অত গালাগাল মুখখারাপ করে কেন? সে অবস্থা আমার নয়। বাজ পড়লে ঘরের মোটা জিনিস তত নড়ে না, কিন্তু সার্সী ঘটঘট করে। আমার সে অবস্থা নয়। সত্ত্বগুণের অবস্থায় হইচই হয় না। হৃদে তাই চলে গেল; — মা রাখলেন না। শেষাশেষি বড় বাড়িয়েছিল। আমায় গালাগালি দিত। হাঁকডাক করত।

[নরেন্দ্র কি অবতার বলেন? নরেন্দ্র ত্যাগীর থাক — নরেন্দ্রের পিতৃবিয়োগ]

“গিরিশ ঘোষ যা বলে তোর সঙ্গে কি মিললো?”

নরেন্দ্র — আমি কিছু বলি নাই, তিনিই বলেন, তাঁর অবতার বলে বিশ্বাস। আমি আর কিছু বললাম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিন্তু খুব বিশ্বাস! দেখেছিস?

ভক্তেরা একদৃষ্টে দেখিতেছেন। ঠাকুর নিচেই মাদুরের উপর বসিয়া আছেন। কাছে মাস্টার, সম্মুখে নরেন্দ্র, চতুর্দিকে ভক্তগণ।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া নরেন্দ্রকে সস্নেহে দেখিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্রকে বলিলেন, বাবা, কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ না হলে হবে না। বলিতে বলিতে ভাবপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। সেই করুণামাখা সস্নেহ দৃষ্টি, তাহার সঙ্গে ভাবোন্মোত্ত হইয়া গান ধরিলেন:

কথা বলতে ডরাই, না বললেও ডরাই।
মনে সন্দ হয় পাছে তোমাধনে হারাই হারাই ।।
আমরা জানি যে মন-তোর, দিলাম তোকে সেই মন্তোর,
এখন মন তোর; আমরা যে মন্ত্রে বিপদেতে তরি তরাই ।।

শ্রীরামকৃষ্ণের যেন ভয়, বুঝি নরেন্দ্র আর কাহারও হইল, আমার বুঝি হল না! নরেন্দ্র অশ্রুপূর্ণলোচনে চাহিয়া আছেন।

বাহিরের একটি ভক্ত ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনিও কাছে বসিয়া সমস্ত দেখিতেছিলেন ও শুনিতেছিলেন।

ভক্ত — মহাশয়, কামিনী-কাঞ্চন যদি ত্যাগ করতে হবে, তবে গৃহস্থ কি করবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা তুমি কর না! আমাদের অমনি একটা কথা হয়ে গেল।

[গৃহস্থ ভক্তের প্রতি অভয়দান ও উত্তেজনা]

মহিমাচরণ চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, মুখে কথাটি নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) — এগিয়ে পড়! আরও আগে যাও, চন্দনকাঠ পাবে, আরও আগে যাও, রূপার খনি পাবে; আরও এগিয়ে যাও সোনার খনি পাবে, আরও এগিয়ে যাও হীরে মাণিক পাবে। এগিয়ে পড়!

মহিমা —— আজ্ঞে, টেনে রাখে যে —— এগুতে দেয় না!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — কেন, লাগাম কাট, তাঁর নাম গুণে কাট। ‘কালী নামেতে কালপাশ কাটে।

নরেন্দ্র পিতৃবিয়োগের পর সংসারে বড় কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার উপর অনেক তাল যাইতেছে। ঠাকুর মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে দেখিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, তুই কি চিকিৎসক হয়েছিস?

‘শতমারী ভবৌদ্যঃ। সহস্রমারী চিকিৎসকঃ।’ (সকলের হাস্য)

ঠাকুর কি বলিতেছেন, নরেন্দ্রের এই বয়সে অনেক দেখাশুনা হইল —— সুখ-দুঃখের সঙ্গে অনেক পরিচয় হইল।

নরেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১লা মার্চ 1885/03/01/iii

42.3 শ্রীশ্রীদোলযাত্রা ও শ্রীরামকৃষ্ণের ৺রাধাকান্ত ও মা-কালীকে ও ভক্তদিগের গায়ে আবির প্রদান

নবাই চৈতন্য গান গাহিতেছেন। ভক্তেরা সকলেই বসিয়া আছেন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ উঠিলেন। ঘরের বাহিরে গেলেন। ভক্তেরা সকলে বসিয়া রহিলেন, গান চলিতে লাগিল।

মাস্টার ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। ঠাকুর পাকা উঠান দিয়া কালীঘরের দিকে যাইতেছেন। ৺রাধাকান্তের মন্দিরে আগে প্রবেশ করিলেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার প্রণাম দেখিয়া মাস্টারও প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের সম্মুখের থালায় আবির ছিল। আজ শ্রীশ্রীদোলযাত্রা — ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা ভুলেন নাই। থালার ফাগ লইয়া শ্রীশ্রীরাধাশ্যামকে দিলেন। আবার প্রণাম করিলেন।

এইবার কালীঘরে যাইতেছেন। প্রথম সাতটি ধাপ ছাড়াইয়া চাতালে দাঁড়াইলেন মাকে দর্শন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মাকে আবির দিলেন। প্রণাম করিয়া কালীঘর হইতে চলিয়া আসিতেছেন। কালীঘরের সম্মুখের চাতালে দাঁড়াইয়া মাস্টারকে বলিতেছেন, — বাবুরামকে আনলে না কেন?

ঠাকুর আবার পাকা উঠান দিয়া যাইতেছেন। সঙ্গে মাস্টার ও আর-একজন আবিরের থালা হাতে করিয়া আসিতেছেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া সব পটকে ফাগ দিলেন — দু-একটি পট ছাড়া — নিজের ফটোগ্রাফ ও যীশুখ্রীষ্টের ছবি।

এইবার বারান্দায় আসিলেন নরেন্দ্র ঘরে ঢুকিতে বারান্দায় বসিয়া আছেন। কোন কোন ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রের গায়ে ফাগ দিলেন। ঘরে ঢুকিতেছেন, মাস্টার সঙ্গে আসিতেছেন, তিনিও আবির প্রসাদ পাইলেন।

ঘরে প্রবেশ করিলেন। যত ভক্তদের গায়ে আবির দিলেন। সকলেই প্রণাম করিতে লাগিলেন।

অপরাহ্ন হইল। ভক্তেরা এদিক-ওদিক বেড়াইতে লাগিলেন। ঠাকুর মাস্টারের সঙ্গে চুপিচুপি কথা কহিতেছেন। কাছে কেহ নাই। ছোকরা ভক্তদের কথা কহিতেছেন। বলছেন, "আচ্ছা, সব্বাই বলে, বেশ ধ্যান হয়, পল্টুর ধ্যান হয় না কেন?"

"নরেন্দ্রকে তোমার কিরকম মনে হয়? বেশ সরল; তবে সংসারের অনেক তাল পড়েছে, তাই একটু চাপা; ও থাকবে না।"

ঠাকুর মাঝে মাঝে বারান্দায় উঠিয়া যাইতেছেন। নরেন্দ্র একজন বেদান্তবাদীর সঙ্গে বিচার করছেন।

ক্রমে ভক্তেরা আবার ঘরে আসিয়া জুটিতেছেন। মহিমাচরণকে স্তব পাঠ করিতে বলিলেন। তিনি মহানির্বাণ তন্ত্র, তৃতীয় উল্লাস হইতে স্তব বলিতেছেন —

হৃদয়কমল মধ্যে নির্বিশেষং নিরীহং,
হরিহর বিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্।
জননমরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎস্বরূপম্,

সকলভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে।

[গৃহস্থের প্রতি অভয়]

আরও দু-একটি স্তবের পর মহিমাচরণ শঙ্করাচার্যের স্তব বলিতেছেন, তাহাতে সংসারকূপের, সংসারগহনের কথা আছে। মহিমাচরণ সংসারী ভক্ত।

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে, স্থাণো গিরিশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো।
ভূতেশ ভীতভয়সূদনং মামনাথং, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ।।
হে পার্বতী-হৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে, ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরিশজাপ।
হে বামদেব ভব রুদ্র পিনাকপাণে, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ।। . . . .
ইত্যাদি

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) — সংসারকূপ, সংসারগহন, কেন বল? ও প্রথম প্রথম বলতে হয়। তাঁকে ধরলে আর ভয় কি? তখন —

এই সংসার মজার কুটি।
আমি খাই দাই আর মজা লুটি।
জনক রাজা মহাতেজা তার কিসে ছিল ত্রুটি!
সে যে এদিক-ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি!

“কি ভয়? তাঁকে ধর। কাঁটাবন হলেই বা। জুতো পায়ে দিয়ে কাঁটাবনে চলে যাও। কিসের ভয়? যে বুড়ি ছোঁয় সে কি আর চোর হয়?

“জনক রাজা দুখানা তলোয়ার ঘোরাত। একখানা জ্ঞানের, একখানা কর্মের। পাকা খেলোয়াড়ের কিছু ভয় নাই।”

এইরূপ ঈশ্বরীয় কথা চলিতেছে। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। খাটের পাশে মাস্টার বসিয়া আছেন।

ঠাকুর (মাস্টারকে) — ও যা বললে, তাইতে টেনে রেখেছে!

ঠাকুর মহিমাচরণের কথা বলিতেছেন ও তাঁহার কথিত ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক শ্লোকের কথা। নবাই চৈতন্য ও অন্যান্য ভক্তেরা আবার গাইতেছেন। এবার ঠাকুর যোগদান করিলেন, আর ভাবে মগ্ন হইয়া সংকীর্তন মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

কীর্তনান্তে ঠাকুর বলিতেছেন, “এই কাজ হল, আর সব মিথ্যা। প্রেম ভক্তি — বস্তু, আর সব — অবস্তু।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১লা মার্চ 1885/03/01/iv

42.4 ৺দোলযাত্রাদিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ — গুহ্যকথা

বৈকাল হইয়াছে। ঠাকুর পঞ্চবটীতে গিয়াছেন। মাস্টারকে বিনোদের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বিনোদ মাস্টারের স্কুলে পড়িতেন। বিনোদের ঈশ্বরচিন্তা করে মাঝে মাঝে ভাবাবস্থা হয়। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে ভালবাসেন।

এইবার ঠাকুর মাস্টারের সহিত কথা কহিতে কহিতে ঘরে ফিরিতেছেন। বকুলতলার ঘাটের কাছে আসিয়া বলিলেন — "আচ্ছা, এই যে কেউ কেউ অবতার বলছে, তোমার কি বোধ হয়?"

কথা কহিতে কহিতে ঘরে আসিয়া পড়িলেন। চটিজুতা খুলিয়া ছোট খাটটিতে বসিলেন। খাটের পূর্বদিকের পাশে একখানি পাপোশ আছে। মাস্টার তাহার উপর বসিয়া কথা কহিতেছেন। ঠাকুর ওই কথা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অন্যান্য ভক্তেরা একটু দূরে বসিয়া আছেন। তাঁহারা এ-সকল কথা কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি কি বল?

মাস্টার — আজ্ঞা, আমারও তাই মনে হয়। যেমন চৈতন্যদেব ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — পূর্ণ, না অংশ, না কলা? — ওজন বল না?

মাস্টার — আজ্ঞা, ওজন বুঝতে পারছি না। তবে তাঁর শক্তি অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি তো আছেনই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, চৈতন্যদেব শক্তি চেয়েছিলেন।

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরেই বলিতেছেন — কিন্তু ষড়ভুজ?

মাস্টার ভাবিতেছেন, চৈতন্যদেব ষড়্‌ভুজ হয়েছিলেন — ভক্তেরা দেখিয়াছিলেন। ঠাকুর একথা উল্লখ কেন করিলেন?

[পূর্বকথা — ঠাকুরের উন্মাদ ও মার কাছে ক্রন্দন — তর্ক-বিচার ভাল লাগে না]

ভক্তেরা অদূরে ঘরের ভিতর বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র বিচার করিতেছেন। রাম (দত্ত) সবে অসুখ থেকে সেরে এসেছেন, তিনিও নরেন্দ্রের সঙ্গে ঘোরতর তর্ক করছেন। ঠাকুর দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — আমার এ-সব বিচার ভাল লাগে না। (রামের প্রতি) — থামো! তোমার একে অসুখ! — আচ্ছা, আস্তে আস্তে। (মাস্টারের প্রতি) — আমার এ-সব ভাল লাগে না। আমি কাঁদতুম, আর বলতুম, “মা, এ বলছে এই এই; ও বলছে আর-একরকম। কোন্‌টা সত্য, তুই আমায় বলে দে!”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ৭ই মার্চ 1885/03/07/i

42.5 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ভক্তসঙ্গে

(রাখাল, ভবনাথ, নরেন্দ্র, বাবুরাম)

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে আনন্দে বসিয়া আছেন। বাবুরাম, ছোট নরেন, পল্টু, হরিপদ, মোহিনীমোহন ইত্যাদি ভক্তেরা মেঝেতে বসিয়া আছেন। একটি ব্রাহ্মণ যুবক দুই-তিনদিন ঠাকুরের কাছে আছেন। তিনিও বসিয়া আছেন। আজ শনিবার, ২৫শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ, ১৮৮৫, বেলা আন্দাজ তিনটা। চৈত্র কৃষ্ণা সপ্তমী।

শ্রীশ্রীমা নহবতে আজকাল আছেন। তিনি মাঝে মাঝে ঠাকুরবাড়িতে আসিয়া থাকেন — শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার জন্য। মোহিনীমোহনের সঙ্গে স্ত্রী, নবীনবাবুর মা, গাড়ি করিয়া আসিয়াছেন।

মেয়েরা নহবতে গিয়া শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া সেইখানেই আছেন। ভক্তেরা একটু সরিয়া গেলে ঠাকুরকে আসিয়া প্রণাম করিবেন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। ছোকরা ভক্তদের দেখিতেছেন ও আনন্দে বিভোর হইতেছেন।

রাখাল এখন দক্ষিণেশ্বরে থাকেন না। কয় মাস বলরামের সহিত বৃন্দাবনে ছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া এখন বাটীতে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — রাখাল এখন পেনশান খাচ্ছে। বৃন্দাবন থেকে এসে এখন বাড়িতে থাকে। বাড়িতে পরিবার আছে। কিন্তু আবার বলেছে, হাজার টাকা মাহিনা দিলেও চাকরি করবে না।

“এখানে শুয়ে শুয়ে বলত — তোমাকেও ভাল লাগে না, এমনি তার একটি অবস্থা হয়েছিল।

“ভবনাথ বিয়ে করেছে, কিন্তু সমস্ত রাত্রি স্ত্রীর সঙ্গে কেবল ধর্মকথা কয়! ঈশ্বরের কথা নিয়ে দুজনে থাকে। আমি বললুম, পরিবারের সঙ্গে একটু আমোদ-আহ্লাদ করবি, তখন রেগে রোখ করে বললে, কি! আমরাও আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে থাকব?”

ঠাকুর এইবার নরেন্দ্রের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — কিন্তু নরেন্দ্রের উপর যত ব্যাকুলতা হয়েছিল, এর উপর (ছোট নরেনের উপর) তত হয় নাই।

(হরিপদর প্রতি) “তুই গিরিশ ঘোষের বাড়ি যাস?”

হরিপদ — আমাদের বাড়ির কাছে বাড়ি, প্রায়ই যাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — নরেন্দ্র যায়?

হরিপদ — হাঁ, কখন কখন দেখতে পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — গিরিশ ঘোষ যা বলে (অর্থাৎ ‘অবতার’ বলে) তাতে ও কি বলে?

হরিপদ — তর্কে হেরে গেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — না, সে (নরেন্দ্র) বললে, গিরিশ ঘোষের এখন এত বিশ্বাস — আমি কেন কোন কথা বলব?

জজ অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের জামায়ের ভাই আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি নরেন্দ্রকে জান?

জামায়ের ভাই — আজ্ঞা, হাঁ। নরেন্দ্র বুদ্ধিমান ছোকরা!

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — ইনি ভাল লোক, যে কালে নরেন্দ্রের সুখ্যাতি করেছেন। সেদিন নরেন্দ্র এসেছিল। ত্রৈলোক্যের সঙ্গে সেদিন গান গাইলে। কিন্তু গানটি সেদিন আলুনী লাগল।

[বাবুরাম ও ‘দুদিক রাখা’ — জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হও]

ঠাকুর বাবুরামের দিকে চাহিয়া কথা কহিতেছেন। মাস্টার যে স্কুলে অধ্যাপনা করেন, বাবুরাম সে স্কুলে এন্ট্রান্স ক্লাসে পড়েন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বাবুরামের প্রতি) — তোর বই কই? পড়াশুনা করবি না? (মাস্টারের প্রতি) ও দুদিক রাখতে চায়।

“বড় কঠিন পথ, একটু তাঁকে জানলে কি হবে! বশিষ্ঠদেব, তাঁরই পুত্রশোক হল! লক্ষ্মণ দেখে অবাক্‌ হয়ে রামকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাম বললেন, ভাই, এ আর আশ্চর্য কি? যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞানও আছে। ভাই, তুমি জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হও! পায়ে কাঁটা ফুটলে, আর একটি কাঁটা খুঁজে আনতে হয়, সেই কাঁটা দিয়ে প্রথম কাঁটাটি তুলতে হয়, তারপর দুটি কাঁটাই ফেলে দিতে হয়। তাই অজ্ঞান কাঁটা তুলবার জন্য জ্ঞান কাঁটা যোগাড় করতে হয়। তারপর জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যেতে হয়!”

বাবুরাম (সহাস্যে) — আমি ওইটি চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — ওরে, দুদিক রাখলে কি তা হয়? তা যদি চাস তবে চলে আয়!

বাবুরাম (সহাস্যে) — আপনি নিয়ে আসুন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — রাখাল ছিল সে এক, তার বাপের মত ছিল। এরা থাকলে হাঙ্গাম হবে।

বাবুরামের প্রতি) — “তুই দুর্বল। তোর সাহস কম! দেখ দেখি ছোট নরেন কেমন বলে, ‘আমি একবারে এসে থাকব’!”

এতক্ষণে ঠাকুর ছোকরা ভক্তদের মধ্যে আসিয়া মেঝেতে মাদুরের উপর বসিয়াছেন। মাস্টার তাঁহার কাছে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারকে) — আমি কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী খুঁজছি। মনে করি, এ বুঝি থাকবে! সকলেই এক-একটা ওজর করে!

“একটা ভূত সঙ্গী খুঁজছিল। শনি-মঙ্গলবারে অপঘাতে মৃত্যু হলে ভূত হয়, তাই সে ভূতটা যেই দেখত কেউ ছাদ থেকে পড়ে গেছে, কি হোঁচট খেয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে, অমনি দৌড়ে যেত, — এই মনে করে যে, এটার অপঘাত মৃত্যু হয়েছে, এবার ভূত হবে, আর আমার সঙ্গী হবে। কিন্তু তার এমনি কপাল যে দেখে, সব শালারা বেঁচে উঠে! সঙ্গী আর জোটে না।

“দেখ না, রাখাল ‘পরিবার’ ‘পরিবার’ করে। বলে, আমার স্ত্রীর কি হবে? নরেন্দ্র বুকে হাত দেওয়াতে বেহুঁশ হয়ে গিছল, তখন বলে, ওগো তুমি আমার কি করলে গো! আমার যে বাপ-মা আছে গো!

“আমায় তিনি এ-অবস্থায় রেখেছেন কেন? চৈতন্যদেব সন্ন্যাস করলেন — সকলে প্রণাম করবে বলে, যারা একবার নমস্কার করবে তারা উদ্ধার হয়ে যাবে।”

ঠাকুরের জন্য মোহিনীমোহন চ্যাংড়া করিয়া সন্দেশ আনিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এ সন্দেশ কার?

বাবুরাম মোহিনীকে দেখাইয়া দিলেন।

ঠাকুর প্রণব উচ্চারণ করিয়া সন্দেশ স্পর্শ করিলেন ও কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া প্রসাদ করিয়া দিলেন। অতঃপর সেই সন্দেশ লইয়া ভক্তদের দিতেছেন। কি

আশ্চর্য, ছোট নরেনকে ও আরও দুই-একটি ছোকরা ভক্তকে নিজে খাওয়াইয়া দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — এর একটি মানে আছে। নারায়ণ শুদ্ধাত্মাদের ভিতর বেশি প্রকাশ। ও-দেশে যখন যেতুম ইওরূপ ছেলেদের কারু-কারু মুখে নিজে খাবার দিতাম। চিনে শাঁখারী বলত 'উনি আমাদের খাইয়ে দেন না কেন?' কেমন করে দেব, কেউ ভাজ-মেগো! কেউ অমুক-মেগো, কে খাইয়ে দেবে!

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ৭ই মার্চ 1885/03/07/ii

42.6 সমাধিমন্দিরে ভক্তদের সম্বন্ধে মহাবাক্য

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শুদ্ধাত্মা ভক্তদিগকে পাইয়া আনন্দে ভাসিতেছেন ও ছোট খাটটিতে বসিয়া বসিয়া তাহাদিগকে কীর্তনীয়া ঢঙ দেখাইয়া হাসিতেছেন। কীর্তনী সেজে-গুজে সম্প্রদায় সঙ্গে গান গাইতেছে। কীর্তনী দাঁড়াইয়া, হাতে রঙ্গিন রুমাল, মাঝে মাঝে ঢঙ করিয়া কাশিতেছে ও নথ তুলিয়া থুথু ফেলিতেছে। আবার যদি কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়া পড়ে, গান গাইতে গাইতেই তাহকে

অভ্যর্থনা করিতেছে ও বলিতেছে 'আসুন'! আবার মাঝে মাঝে হাতের কাপড় সরাইয়া তাবিজ অনন্ত ও বাউটি ইতাদি অলঙ্কার দেখাইতেছে।

অভিনয়দৃষ্টে ভক্তরা সকলেই হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। পল্টু হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেছেন। ঠাকুর পল্টুর দিকে তাকাইয়া মাস্টারকে বলিতেছেন, "ছেলেমানুষ কিনা, তাই হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (পল্টুর প্রতি সহাস্যে) — তোর বাবাকে এ-সব কথা বলিসনি। যাও একটু (আমার প্রতি) টান ছিল তাও যাবে। ওরা একে ইংলিশম্যান লোক।

[আহ্নিক জপ ও গঙ্গাস্নানের সময় কথা]

(ভক্তদের প্রতি) "অনেকে আহ্নিক করবার সময় যত রাজ্যের কথা কয়; কিন্তু কথা কইতে নাই, — তাই ঠোঁট বুজে যত প্রকার ইশারা করতে থাকে। এটা নিয়ে এস, ওটা নিয়ে এস, হুঁ উহুঁ — এই সব করে। (হাস্য)

"আবার কেউ মালাজপ করছে; তার ভিতর থেকেই মাছ দর করে! জপ করতে করতে হয় তো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় — ওই মাছটা! যত হিসাব সেই সময়ে! (সকলের হাস্য)

"কেউ হয়তো গঙ্গাস্নান করতে এসেছে। সে সময় কোথা ভগবানচিন্তা করবে, গল্প করতে বসে গেল! যত রাজ্যের গল্প! 'তোর ছেলের বিয়ে হল, কি গয়না দিলে?' 'অমুকের বড় ব্যামো', 'অমুক শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে কি না', 'অমুক কনে দেখতে গিছলো, তা দেওয়া-থোওয়া সাধ-আহ্লাদ খুব করবে', 'হরিশ আমার বড়

ন্যাওটা, আমায় ছেড়ে একদণ্ড থাকতে পারে না’, ‘এতো দিন আসতে পারিনি মা — অমুকের মেয়ের পাকা দেখা, বড় ব্যস্ত ছিলাম।’

“দেখ দেখি, কোথায় গঙ্গাস্নানে এসেছে! যত সংসারের কথা!”

ঠাকুর ছোট নরেনকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে সমাধিস্থ হইলেন! শুদ্ধাত্মা ভক্তের ভিতর ঠাকুর কি নারায়ণ দর্শন করিতেছেন?

ভক্তেরা একদৃষ্টে সেই সমাধিচিত্র দেখিতেছেন। এত হাসি খুশি হইতেছিল, এইবার সকলেই নিঃশব্দ, ঘরে যেন কোন লোক নাই। ঠাকুরের শরীর নিস্পন্দ, চক্ষু স্থির, হাতজোড় করিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন।

কিয়ৎপরে সমাধিভঙ্গ হইল। ঠাকুরের বায়ু স্থির হইয়া গিয়াছিল, এইবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ক্রমে বহির্জগতে মন আসিতেছে। ভক্তদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

এখনও ভাবস্থ হইয়া রহিয়াছেন। এইবার প্রত্যেক ভক্তকে সম্বোধন করিয়া কাহার কি হইবে, ও কাহার কিরূপ অবস্থা কিছু কিছু বলিতেছেন। (ছোট নরেনের প্রতি) “তোকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হচ্ছিলাম। তোর হবে। আসিস এক-একবার। — আচ্ছা তুই কি ভালবাসিস? — জ্ঞান না ভক্তি?”

ছোট নরেন — শুধু ভক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — না জানলে ভক্তি কাকে করবি? (মাস্টারকে দেখাইয়া সহাস্যে) এঁকে যদি না জানিস, কেমন করে এঁকে ভক্তি করবি? (মাস্টারের প্রতি) — তবে শুদ্ধাত্মা যে কালে বলেছে — 'শুধু ভক্তি চাই' এর অবশ্য মানে আছে।

"আপনা-আপনি ভক্তি আসা সংস্কার না থাকলে হয় না। এইটি প্রেমাভক্তির লক্ষণ। জ্ঞানভক্তি — বিচার করা ভক্তি।

(ছোট নরেনর প্রতি) — "দেখি, তোর শরীর দেখি, জামা খোল দেখি। বেশ বুকের আয়তন; — তবে হবে। মাঝে মাঝে আসিস।"

ঠাকুর এখনও ভাবস্থ। অন্য অন্য ভক্তদের সস্নেহে এক-একজনকে সম্বোধন করিয়া আবার বলিতেছেন।

(পল্টুর প্রতি) — "তোরও হবে। তবে একটু দেরিতে হবে।

(বাবুরামের প্রতি) — "তোকে টানছি না কেন? শেষে কি একটা হাঙ্গামা হবে!

(মোহিনীমোহনের প্রতি) — "তুমি তো আছই! — একটু বাকী আছে, সেটুকু গেলে কর্মকাজ সংসার কিছু থাকে না। — সব যাওয়া কি ভাল।"

এই বলিয়া তাঁহার দিকে একদৃষ্টে সস্নেহে তাকাইয়া রহিলেন, যেন তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশের সমস্ত ভাব দেখিতেছেন! মোহিনীমোহন কি ভাবিতেছিলেন, ঈশ্বরের জন্য সব যাওয়াই ভাল? কিয়ৎপরে ঠাকুর আবার বলিতেছেন — ভাগবত পণ্ডিতকে একটি পাশ দিয়ে ঈশ্বর রেখে দেন, তা না হলে ভাগবত কে শুনাবে। — রেখে দেন লোকশিক্ষার জন্য। মা সেইজন্য সংসারে রেখেছেন।

এইবার ব্রাহ্মণ যুবকটিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন।

[জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ — ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা ও ‘জীবন্মুক্ত’]

শ্রীরামকৃষ্ণ (যুবকের প্রতি) — তুমি জ্ঞানচর্চা ছাড়ো — ভক্তি নাও — ভক্তিই সার! — আজ তোমার কি তিনদিন হল?

ব্রাহ্মণ যুবক (হাতজোড় করিয়া) — আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বিশ্বাস করো — নির্ভর করো — তাহলে নিজের কিছু করতে হবে না! মা-কালী সব করবেন!

“জ্ঞান সদর মহল পর্যন্ত যেতে পারে। ভক্তি অন্দর মহলে যায়। শুদ্ধাত্মা নির্লিপ্ত; বিদ্যা, অবিদ্যা তাঁর ভিতর দুইই আছে, তিনি নির্লিপ্ত। বায়ুতে কখনও সুগন্ধ কখনও দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত। ব্যাসদেব যমুনা পার হচ্ছিলেন, গোপীরাও সেখানে উপস্থিত। তারাও পারে যাবে — দধি, দুধ, ননী বিক্রী করতে যাচ্ছে, কিন্তু নৌকা ছিল না কেমন করে পারে যাবেন — সকলে ভাবছেন।

“এমন সময়ে ব্যাসদেব বললেন, আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে। তখন গোপীরা তাঁকে ক্ষীর, সর, ননী সমস্ত খাওয়াতে লাগলেন। ব্যাসদেবের প্রায় সমস্ত খেয়ে ফেললেন!

“তখন ব্যাসদেব যমুনাকে সম্বোধন করে বললেন — ‘যমুনে! আমি যদি কিছু না খেয়ে থাকি, তাহলে তোমার জল দুইভাগ হবে আর মাঝে রাস্তা দিয়ে আমরা

চলে যাব।’ ঠিক তাই হল! যমুনা দুইভাগ হয়ে গেলেন, মাঝে ওপারে যাবার পথ। সেই পথ দিয়ে ব্যাসদেব ও গোপীরা সকলে পার হয়ে গেলেন!

“আমি ‘খাই নাই’ তার মানে এই যে আমি সেই শুদ্ধাত্মা, শুদ্ধাত্মা নির্লিপ্ত — প্রকৃতির পার। তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই। জন্মমৃত্যু নাই, — অজর অমর সুমেরুবৎ!

“যার এই ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে, সে জীবন্মুক্ত! সে ঠিক বুঝতে পারে যে, আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা। ভগবানকে দর্শন করলে দেহাত্মবুদ্ধি আর থাকে না! দুটি আলাদা। যেমন নারিকেলের জল শুকিয়ে গেলে শাঁস আলাদা আর খোল আলাদা হয়ে যায়। আত্মাটি যেন দেহের ভিতর নড়নড় করে। তেমনি বিষয়বুদ্ধিরূপ জল শুকিয়ে গেলে আত্মজ্ঞান হয়। আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা বোধ হয়। কাঁচা সুপারি বা কাঁচা বাদামের ভিতরের সুপারি বা বাদাম ছাল থেকে তফাত করা যায় না।

“কিন্তু পাকা অবস্থায় সুপারি বা বাদাম আলাদা — ও ছাল আলাদা হয়ে যায়। পাকা অবস্থায় রস শুকিয়ে যায়। ব্রহ্মজ্ঞান হলে বিষয়রস শুকিয়ে যায়।

“কিন্তু সে জ্ঞান বড় কঠিন। বললেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না! কেউ জ্ঞানের ভান করে। (সহাস্য) একজন বড় মিথ্যা কথা কইত, আবার এদিকে বলত — আমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। কোনও লোক তাকে তিরস্কার করাতে সে বললে, কেন জগৎ তো স্বপ্নবৎ, সবই যদি মিথ্যা হল সত্য কথাটাই কি ঠিক! মিথ্যাটাও মিথ্যা, সত্যটাও মিথ্যা!” (সকলের হাস্য)

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ৭ই মার্চ 1885/03/07/iii

42.7 ‘ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে’ — গুহ্যকথা

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে মেঝেতে মাদুরের উপর বসিয়া আছেন। সহাস্যবদন। ভক্তদের বলিতেছেন, আমার পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দে তো। ভক্তেরা পদসেবা করিতেছেন। (মাস্টারের প্রতি, সহাস্যে) “এর (পদসেবার) অনেক মানে আছে।”

আবার নিজের হৃদয়ে হাত রাখিয়া বলিতেছেন, “এর ভিতর যদি কিছু থাকে (পদসেবা করলে) অজ্ঞান অবিদ্যা একেবারে চলে যায়।”

হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ গম্ভীর হইলেন, যেন কি গুহ্যকথা বলিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — এখানে অপর লোক কেউ নাই। সেদিন — হরিশ কাছে ছিল — দেখলাম — খোলটি (দেহটি) ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এল, এসে বললে, আমি যুগে যুগে অবতার! তখন ভাবলাম, বুঝি মনের খেয়ালে ওই সব কথা বলছি। তারপর চুপ করে থেকে দেখলাম — তখন দেখি আপনি বলছে, শক্তির আরাধনা চৈতন্যও করেছিল।

ভক্তেরা সকলে অবাক্ হইয়া শুনিতেছেন। কেহ কেহ ভাবিতেছেন — সচ্চিদানন্দ ভগবান কি শ্রীরামকৃষ্ণের রূপ ধারণ করিয়া আমাদের কাছে বসিয়া আছেন? ভগবান কি আবার অবতীর্ণ হইয়াছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহিতেছেন। মাস্টারকে সম্বোধন করিয়া আবার বলিতেছেন — "দেখলাম, পূর্ণ আর্বির্ভাব। তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।"

ভক্তেরা সকলে অবাক্ হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছেন।

[যোগমায়া আদ্যাশক্তি ও অবতারলীলা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — এখন মাকে বলছিলাম, আর বকতে পারি না। আর বলছিলাম, 'মা যেন একবার ছুঁয়ে দিলে লোকের চৈতন্য হয়।' যোগমায়ার এমনি মহিমা — তিনি ভেলকি লাগিয়ে দিতে পারেন। বৃন্দাবনলীলায় যোগমায়া ভেলকি লাগিয়ে দিলেন। তাঁরই বলে সুবোল কৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীমতীর মিলন করে দিছলেন। যোগমায়া — যিনি আদ্যাশক্তি — তাঁর একটি আকর্ষণী শক্তি আছে। আমি ওই শক্তির আরোপ করেছিলাম।

"আচ্ছা, যারা আসে তাদের কিছু কিছু হচ্ছে?"

মাস্টার — আজ্ঞা হাঁ, হচ্ছে বইকি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেমন করে জানলে?

মাস্টার (সহাস্যে) সবাই বলে, তাঁর কাছে যারা যায় তারা ফেরে না!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — একটা কোলাব্যাঙ হেলেসাপের পাল্লায় পড়েছিল। সে ওটাকে গিলতেও পারছে না, ছাড়তেও পারছে না! আর কোলাব্যাঙটার যন্ত্রণা —– সেটা ক্রমাগত ডাকছে! ঢোঁড়াসাপটারও যন্ত্রণা। কিন্তু গোখরোসাপের পাল্লায় যদি পড়ত তাহলে দু-এক ডাকেই শান্তি হয়ে যেত। (সকলের হাস্য)

(ছোকরা ভক্তদের প্রতি) — "তোরা ত্রৈলোক্যের সেই বইখানা পড়িস —– ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা। তার কাছে একখানা চেয়ে নিস না। বেশ চৈতন্যদেবের কথা আছে।"

একজন ভক্ত —– তিনি দেবেন কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — কেন, কাঁকুড়ক্ষেত্রে যদি অনেক কাঁকুড় হয়ে থাকে তাহলে মালিক ২/৩টা বিলিয়ে দিতে পারে! (সকলের হাস্য) অমনি কি দেবে না —– কি বলিস?

শ্রীরামকৃষ্ণ (পল্টুর প্রতি) — আসিস এখানে এক-একবার।

পল্টু —– সুবিধা হলে আসব।

শ্রীরামকৃষ্ণ —– কলকাতায় যেখানে যাব, সেখানে যাবি?

পল্টু —– যাব, চেষ্টা করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ —– ওই পাটোয়ারী!

পল্টু — ‘চেষ্টা করব’ না বললে যে মিছে কথা হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — ওদের মিছে কথা ধরি না, ওরা স্বাধীন নয়।

ঠাকুর হরিপদর সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হরিপদর প্রতি) — মহেন্দ্র মুখুজ্জে কেন আসে না?

হরিপদ — ঠিক বলতে পারি না।

মাস্টার (সহাস্যে) — তিনি জ্ঞানযোগ করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — না, সেদিন প্রহ্লাদচরিত্র দেখাবে বলে গাড়ি পাঠিয়ে দেবে বলেছিল। কিন্তু দেয় নাই, বোধ হয় এইজন্য আসে না।

মাস্টার — একদিন মহিম চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা ও আলাপ হয়েছিল। সেইখানে যাওয়া আসা করেন বলে বোধ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেন মহিমা তো ভক্তির কথাও কয়। সে তো ওইটে খুব বলে, ‘আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।’

মাস্টার (সহাস্যে) — সে আপনি বলান তাই বলে!

শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ ঠাকুরের কাছে নূতন যাতায়াত করিতেছেন। আজকাল তিনি সর্বদা ঠাকুরের কথা লইয়া থাকেন।

হরি — গিরিশ ঘোষ আজলাল অনেকরকম দেখেন। এখান থেকে গিয়ে অবধি সর্বদা ঈশ্বরের ভাবে থাকেন — কত কি দেখেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা হতে পারে, গঙ্গার কাছে গেলে অনেক জিনিস দেখা যায়, নৌকা, জাহাজ — কত কি।

হরি — গিরিশ ঘোষ বলেন, ‘এবার কেবল কর্ম নিয়ে থাকব, সকালে ঘড়ি দেখে দোয়াত কলম নিয়ে বসব ও সমস্ত দিন ওই (বই লেখা) করব।’ এইরকম বলেন কিন্তু পারেন না। আমরা গেলেই কেবল এখানকার কথা। আপনি নরেন্দ্রকে পাঠাতে বলেছিলেন। গিরিশবাবু বললেন, ‘নরেন্দ্রকে গাড়ি করে দিব।’

৫টা বাজিয়াছে। ছোট নরেন বাড়ি যাইতেছেন। ঠাকুর উত্তর-পূর্ব লম্বা বারান্দায় দাঁড়াইয়া একান্তে তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশ দিতেছেন। কিয়ৎপরে তিনি প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। অন্যান্য ভক্তেরাও অনেকে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে বসিয়া মোহিনীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন। পরিবারটি পুত্রশোকের পর পাগলের মতো। কখন হাসেন, কখনও কাঁদেন, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে এসে কিছু শান্তভাব হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমার পরিবার এখন কিরকম?

মোহিনী — এখানে এলেই শান্ত হন, সেখানে মাঝে মাঝে বড় হাঙ্গাম করেন। সেদিন মরতে গিছলেন।

ঠাকুর শুনিয়া কিয়ৎকাল চিন্তিত হইয়া রহিলেন। মোহিনী বিনীতভাবে বলিতেছেন, “আপনার দু-একটা কথা বলে দিতে হবে।”

শ্রীরামকৃষ্ণ — রাঁধতে দিও না। ওতে মাথা আরও গরম হয়। আর লোকজনের সঙ্গে রাখবে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ৭ই মার্চ 1885/03/07/iv

42.8 শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত সন্ন্যাসের অবস্থা — তারকসংবাদ

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুরবাড়িতে অরতির উদ্যোগ হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে আলো জ্বালা ও ধুনা দেওয়া হইল। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসে জগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া সুস্বরে নাম করিতেছেন। ঘরে আর কেহ নাই। কেবল মাস্টার বসিয়া আছেন।

ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। মাস্টারও দাঁড়াইলেন। ঠাকুর ঘরের পশ্চিমের ও উত্তরের দরজা দেখাইয়া মাস্টারকে বলিতেছেন, “ওদিকগুলো (দরজাগুলি) বন্ধ করো।” মাস্টার দরজাগুলি বন্ধ করিয়া বারান্দায় ঠাকুরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ঠাকুর বলিতেছেন, “একবার কালীঘরে যাব।” এই বলিয়া মাস্টারের হাত ধরিয়া ও তাঁহার উপর ভর দিয়া কালীঘরের সম্মুখের চাতালে গিয়া উপস্থিত হইলেন আর সেই স্থানে বসিলেন। বসিবার পূর্বে বলিতেছেন, “তুমি বরং ওকে ডেকে দাও।” মাস্টার বাবুরামকে ডাকিয়া দিলেন।

ঠাকুর মা-কালী দর্শন করিয়া বৃহৎ উঠানের মধ্য দিয়া নিজের ঘরে ফিরিতেছেন। মুখে “মা! মা! রাজরাজেশ্বরী!”

ঘরে আসিয়া ছোট খাটটিতে বসিলেন।

ঠাকুরের একটি অদ্ভুত অবস্থা হইয়াছে। কোন ধাতুদ্রব্যে হাত দিতে পারিতেছেন না। বলিয়াছিলেন, “মা বুঝি ঐশ্বর্যের ব্যাপারটি মন থেকে একেবারে তুলে দিচ্ছেন!” এখন কলাপাতায় আহার করেন। মাটির ভাঁড়ে জল খান। গাড়ু ছুঁইতে পারেন না, তাই ভক্তদের মাটির ভাঁড় আনিতে বলিয়াছিলেন। গাড়ুতে বা থালায় হাত দিলে ঝন্‌ঝন করে, যেন শিঙ্গি মাছের কাঁটা বিঁধছে।

প্রসন্ন কয়টি ভাঁড় আনিয়াছিলেন, কিন্তু বড় ছোট। ঠাকুর হাসিয়া বলিতেছেন, “ভাঁড়গুলি বড় ছোট। কিন্তু ছেলেটি বেশ। আমি বলাতে আমার সামনে ন্যাংটো হয়ে দাঁড়ালো। কি ছেলেমানুষ!”

[‘ভক্ত ও কামিনী’ — ‘সাধু সাবধান’]

বেলঘরের তারক একজন বন্ধুসঙ্গে উপস্থিত হইলেন।

ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। মাস্টার ও দুই-একটি ভক্তও বসিয়া আছেন।

তারক বিবাহ করিয়াছেন। বাপ-মা ঠাকুরের কাছে আসিতে দেন না। কলিকাতায় বউবাজারের কাছে বাসা আছে, সেইখানেই আজকাল তারক প্রায় থাকেন। তারককে ঠাকুর বড় ভালবাসেন। সঙ্গী ছোকরাটি একটু তমোগুণী। ধর্মবিষয় ও ঠাকুরের সম্বন্ধে একটু ব্যঙ্গভাব। তারকের বয়স আন্দাজ বিংশতি বৎসর। তারক আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (তারকের বন্ধুর প্রতি) — একবার দেবালয় সব দেখে এস না।

বন্ধু — ও-সব দেখা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, তারক যে এখানে আসে, এটা কি খারাপ?

বন্ধু — তা আপনি জানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ইনি (মাস্টার) হেডমাস্টার।

বন্ধু — ওঃ।

ঠাকুর তারককে কুশল প্রশ্ন করিতেছেন। আর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া অনেক কথা কহিতেছেন। তারক অনেক কথাবার্তার পর বিদায় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। ঠাকুর তাহাকে নানা বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (তারকের প্রতি) — সাধু সাবধান! কামিনী-কাঞ্চন থেকে সাবধান! মেয়েমানুষের মায়াতে একবার ডুবলে আর উঠবার জো নাই। বিশালক্ষীর দ; যে একবার পড়েছে সে আর উঠতে পারে না! আর এখানে এক-একবার আসবি।

তারক —– বাড়িতে আসতে দেয় না।

একজন ভক্ত —– যদি কারু মা বলেন তুই দক্ষিণেশ্বরে যাস নাই। যদি দিব্য দেন আর বলেন, যদি যাস তো আমার রক্ত খাবি! —

[শুধু ঈশ্বরের জন্য গুরুবাক্য লঙ্ঘন]

শ্রীরামকৃষ্ণ —– যে মা ও কথা বলে সে মা নয়; — সে অবিদ্যারূপিণী। সে-মার কথা না শুনলে কোন দোষ নাই। সে-মা ঈশ্বরলাভের পথে বিঘ্ন দেয়। ঈশ্বরের জন্য গুরুজনের বাক্য লঙ্ঘনে দোষ নাই। ভরত রামের জন্য কৈকেয়ীর কথা শুনে নাই। গোপীরা কৃষ্ণদর্শনের জন্য পতিদের মানা শুনে নাই। প্রহ্লাদ ঈশ্বরের জন্য বাপের কথা শুনে নাই। বলি ভগবানের প্রীতির জন্য গুরু শুক্রাচার্যের কথা শুনে নাই। বিভীষণ রামকে পাবার জন্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাবণের কথা শুনে নাই।

“তবে ঈশ্বরের পথে যেও না, এ-কথা ছাড়া আর সব কথা শুনবি! দেখি, তোর হাত দেখি।”

এই বলিয়া ঠাকুর তারকের হাত কত ভারী যেন দেখিতেছেন। একটু পরে বলিতেছেন, “একটু (আড়) আছে —– কিন্তু ওটুকু যাবে। তাঁকে একটু প্রার্থনা

করিস, আর এখানে এক-একবার আসিস — ওটুকু যাবে! কলকাতার বউবাজারের বাসা তুই করেছিস?”

তারক — আজ্ঞা — না, তারা করেছে।

শ্রীরামৃষ্ণ (সহাস্যে) — তারা করেছে না তুই করেছিস? বাঘের ভয়ে?

ঠাকুর কামিনীকে কি বাঘ বলিতেছেন?

তারক প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুর ছোট খাটটিতে শুইয়া আছেন, যেন তারকের জন্য ভাবছেন। হঠাৎ মাস্টারকে বলিতেছেন, — এদের জন্য আমি এত ব্যাকুল কেন?

মাস্টার চুপ করিয়া আছেন — যেন কি উত্তর দিবেন, ভাবিতেছেন। ঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর বলিতেছেন, “বল না।”

এদিকে মোহিনীমোহনের পরিবার ঠাকুরের ঘরে আসিয়া প্রণাম করিয়া একপাশে বসিয়া আছেন। ঠাকুর তারকের সঙ্গীর কথা মাস্টারকে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তারক কেন ওটাকে সঙ্গে করে আনলে?

মাস্টার — বোধ হয় রাস্তার সঙ্গী। অনেকটা পথ, তাই একজনকে সঙ্গে করে এনেছে।

এই কথার মধ্যে ঠাকুর হঠাৎ মোহিনীর পরিবারকে সম্বোধন করে বলছেন, অপঘাত মৃত্যু হলে প্রেতনী হয়। সাবধান! মনকে বুঝাবে! এত শুনে-দেখে শেষকালে কি এই হল!

মোহিনী এইবার বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। পরিবারও ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন। ঠাকুর তাঁহার ঘরের মধ্যে উত্তর দিকের দরজার কাছে দাঁড়াইতেছেন। পরিবার মাথায় কাপড় দিয়া ঠাকুরকে আস্তে আস্তে কি বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এখানে থাকবে?

পরিবার — এসে কিছুদিন থাকব। নহবতে মা আছেন তাঁর কাছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা বেশ। তা তুমি যে বল — মরবার কথা — তাই ভয় হয়। আবার পাশে গঙ্গা!

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c43 ৪৩ বসু বলরাম-মন্দিরে, গিরিশ-মন্দিরে ও দেবেন্দ্র-ভবনে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১১ই মার্চ 1885/03/11/i

43.1 শ্রীরামকৃষ্ণের বলরামের গৃহে আগমন ও তাঁহার সহিত নরেন্দ্র, গিরিশ, বলরাম, চুনিলাল, লাটু, মাস্টার, নারায়ণ প্রভৃতি ভক্তের কথোপকথন ও আনন্দ

ফাল্গুন কৃষ্ণা দশমী তিথি, পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র, ২৯শে ফাল্গুন, বুধবার — ইংরেজী ১১ই মার্চ, ১৮৮৫। আজ আন্দাজ বেলা দশটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিয়া ভক্তগৃহে বসু বলরাম-মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথের প্রসাদ পাইয়াছেন। সঙ্গে লাটু প্রভৃতি ভক্ত।

ধন্য বলরাম! তোমারই আলয় আজ ঠাকুরের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়াছে। কত নূতন নূতন ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমডোরে বাঁধিলেন, ভক্তসঙ্গে কত নাচিলেন। গাইলেন। যেন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসমন্দিরে প্রেমের হাট বসাচ্ছেন!

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে বসে বসে কাঁদেন, নিজের অন্তরঙ্গ দেখিবেন বলে ব্যাকুল! রাত্রে ঘুম নাই। মাকে বলেন, “মা, ওর বড় ভক্তি, ওকে টেনে নাও; মা, একে এখানে এনে দাও; যদি সে না আসতে পারে, তাহলে মা আমায় সেখানে

লয়ে যাও, আমি দেখে আসি।” তাই বলরামের বাড়ি ছুটে ছুটে আসেন। লোকের কাছে কেবল বলেন, “বলরামের ৺জগন্নাথের সেবা আছে, খুব শুদ্ধ অন্ন।” যখন আসেন অমনি নিমন্ত্রণ করিতে বলরামকে পাঠান। বলেন, “যাও — নরেন্দ্রকে, ভবনাথকে, রাখালকে নিমন্ত্রণ করে এসো। এদের খাওয়ালে নারায়ণকে খাওয়ানো হয়। এরা সামান্য নয়, এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে, এদের খাওয়ালে তোমার খুব ভাল হবে।”

বলরামের আলয়েই শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষের সঙ্গে প্রথম বসে আলাপ। এইখানেই রথের সময় কীর্তনানন্দ। এইখানেই কতবার “প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা” হইয়াছে।

[“পশ্যতি তব পন্থানম্” — ছোট নরেন]

মাস্টার নিকটে একটি বিদ্যালয়ে পড়ান। শুনিয়াছেন আজ দশটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাটীতে আসিবেন। মাঝে অধ্যাপনার কিঞ্চিত অবসর পাইয়া বেলা দুই প্রহরের সময় ওইখানে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া দর্শন ও প্রণাম করিলেন। ঠাকুর আহারান্তে বৈঠকখানায় একটু বিশ্রাম করিতেছেন। মাঝে মাঝে থলি থেকে কিছু মসলা বা কাবাবচিনি খাচ্ছেন; অলপবয়স্ক ভক্তেরা চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে) — তুমি যে এখন এলে? স্কুল নাই?

মাস্টার — স্কুল থেকে আসছি — এখন সেখানে বিশেষ কাজ নাই।

ভক্ত — না, মহাশয়! উনি স্কুল পালিয়ে এসেছেন! (সকলের হাস্য)।

মাস্টার (স্বগতঃ) — হায়! কে যেন টেনে আনলে!

ঠাকুর যেন একটু চিন্তিত হইলেন। পরে মাস্টারকে কাছে বসাইয়া কত কথা কহিতে লাগিলেন। আর বলিলেন, “আমার গামছাটা নিংড়ে দাও তো গা, আর জামাটা শুকোতে দাও, আর পাটা একটু কামড়াচ্ছে, একটু হাত বুলিয়ে দিতে পার?” মাস্টার সেবা করিতে জানেন না, তাই ঠাকুর সেবা করিতে শিখাইতেছেন। মাস্টার শশব্যস্ত হইয়া একে একে ওই কাজগুলি করিতেছেন। তিনি পায়ে হাত বুলাইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কথাচ্ছলে কত উপদেশ দিতে লাগিলেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও ঐশ্বর্যত্যাগের পরাকাষ্ঠা — ঠিক সন্ন্যাসী]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — হ্যাঁগা, এটা আমার কদিন ধরে হচ্ছে, কেন বল দেখি? ধাতুর কোন জিনিসে হাত দেবার জো নাই। একবার একটা বাটিতে হাত দিছিলুম, — তা হাতে শিঙ্গিমাছের কাঁটা ফোটা মতো হল। ঝন্‌ঝন্ কন্‌কন্ করতে লাগল। গাড়ু না ছুঁলে নয়, তাই মনে করলুম, গামছাখানা ঢাকা দিয়ে দেখি, তুলতে পারি কিনা; যাই হাত দিয়েছি, অমনি হাতটা ঝন্‌ঝন্ কন্‌কন্ করতে লাগল, খুব বেদনা। শেষে মাকে প্রাথ্রনা করলুম, ‘মা আর অমন কর্ম করব না, মা এবার মাপ করো।’

“হ্যাঁগা, ছোট নরেন যাওয়া আসা কচ্ছে, বাড়িতে কিছু বলবে? খুব শুদ্ধ, মেয়ে সঙ্গ কখনও হয় নাই।”

মাস্টার — আর খোলটা বড়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, আবার বলে যে, ঈশ্বরীয় কথা একবার শুনলে আমার মনে থাকে। বলে, ছেলেবেলায় আমি কাঁদতুম — ঈশ্বর দেখা দিচ্ছেন না বলে।

মাস্টারের সঙ্গে ছোট নরেন সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কথা হইল। এমন সময় উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন, "মাস্টার মহাশয়! আপনি স্কুলে যাবেন না?"

শ্রীরামকৃষ্ণ — কটা বেজেছে?

একজন ভক্ত — একটা বাজতে দশ মিনিট।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — তুমি এস, তোমার দেরি হচ্ছে। একে কাজ ফেলে এসেছো। (লাটুর প্রতি) — রাখাল কোথায়?

লাটু — চলে গেছে; — বাড়ি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমার সঙ্গে দেখা না করে?

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১১ই মার্চ 1885/03/11/ii

43.2 অপরাহ্নে ভক্তসঙ্গে — অবতারবাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

স্কুলের ছুটির পর মাস্টার আসিয়া দেখিতেছেন — ঠাকুর বলরামের বৈঠকখানায় ভক্তের মজলিস করিয়া বসিয়া আছেন। ঠাকুরের মুখে মধুর হাসি, সেই হাসি ভক্তদের মুখে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। মাস্টারকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া ও তিনি প্রণাম করিলে, ঠাকুর তাহাকে তাঁহার কাছে আসিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ, সুরেশ মিত্র, বলরাম, লাটু, চুনিলাল ইত্যাদি ভক্ত উপস্থিত আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি) — তুমি একবার নরেন্দ্রের সঙ্গে বিচার করে দেখো, সে কি বলে।

গিরিশ (সহাস্যে) — নরেন্দ্র বলে, ঈশ্বর অনন্ত। যা কিছু আমরা দেখি, শুনি, — জিনিসটি, কি ব্যক্তিটি — সব তাঁর অংশ, এ পর্যন্ত আমাদের বলবার জো নাই। Infinity (অনন্ত আকাশ) — তার আবার অংশ কি? অংশ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বর অনন্ত হউন আর যত বড় হউন, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সার বস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে। তিনি অবতার হয়ে থাকেন, এটি উপমা দিয়ে বুঝান যায় না। অনুভব হওয়া চাই। প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। উপমার দ্বারা কতকটা আভাস পাওয়া যায়। গরুর মধ্যে শিংটা যদি ছোঁয়, গরুকেই ছোঁয়া হল; পাটা বা লেজটা ছুঁলেও গরুটাকে ছোঁয়া হল। কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর ভিতেরের সার পদার্থ হচ্ছে দুধ। সেই দুধ বাঁট দিয়ে আসে।

“সেইরূপ প্রেমভক্ত শিখাইবার জন্য ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতির্ণ হন।”

গিরিশ —— নরেন্দ্র বলে, তাঁর কি সব ধারণা করা যায়। তিনি অনন্ত।

[PERCEPTION OF THE INFINITE]১

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি) — ঈশ্বরের সব ধারণা কে করতে পারে? তা তাঁর বড় ভাবটাও পারে না, আবার ছোট ভাবটাও পারে না। আর সব ধারণা করা কি দরকার? তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেই হল। তাঁর অবতারকে দেখলেই তাঁকে দেখা হল। যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে, সে বলে —— গঙ্গা দর্শন-স্পর্শন করে এলুম। সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত, হাত দিয়ে ছুঁতে হয় না। (হাস্য)

“তোমার পাটা যদি ছুঁই, তোমায় ছোঁয়াই হল। (হাস্য)

“যদি সাগরের কাছে গিয়ে একটু জল স্পর্শ কর, তাহলে সাগর স্পর্শ করাই হল। অগ্নিতত্ত্ব সব জায়গায় আছে, তবে কাঠে বেশি।”

গিরিশ (হাসিতে হাসিতে) — যেখানে আগুন পাব, সেইখানেই আমার দরকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) — অগ্নিতত্ত্ব কাঠে বেশি। ঈশ্বরতত্ত্ব খোঁজ, মানুষে খুঁজবে। মানুষে তিনি বেশি প্রকাশ হন। যে মানুষে দেখবে উর্জিতা ভক্তি ——

প্রেমভক্তি উথলে পড়ছে —— ঈশ্বরের জন্য পাগল —— তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা —— সেই মানুষে নিশ্চিত জেনো, তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন।

(মাস্টার দৃষ্টে) — "তিনি তো আছেনই, তবে তাঁর শক্তি কোথাও বেশি প্রকাশ, কোথাও কম প্রকাশ। অবতারের ভিতর তাঁর শক্তি বেশি প্রকাশ; সেই শক্তি কখন কখন পূর্ণভাবে থাকে। শক্তিরই অবতার।"

গিরিশ —— নরেন্দ্র বলে, তিনি অবাঙ্মনসোগোচরম্‌।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— না; এ-মনের গোচর নয় বটে —— কিন্তু শুদ্ধমনের গোচর। এ বুদ্ধির গোচর নয় —— কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধির গোচর। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি গেলেই, শুদ্ধমন আর শুদ্ধবুদ্ধি হয়। তখন শুদ্ধমন শুদ্ধবুদ্ধি এক। শুদ্ধমনের গোচর। ঋষি-মুনিরা কি তাঁকে দেখেন নাই? তাঁরা চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎকার করেছিলেন।

গিরিশ (সহাস্যে) — নরেন্দ্র আমার কাছে তর্কে হেরেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— না; আমায় বলেছে, গিরিশ ঘোষের মানুষে অবতার বলে অত বিশ্বাস; এখন আমি আর কি বলব! অমন বিশ্বাসের উপর কিছু বলতে নাই।'

গিরিশ (সহাস্যে) — মহাশয়! আমরা সব হলহল করে কথা কচ্ছি, কিন্তু মাস্টার ঠোঁট চেপে বসে আছে। কি ভাবে? মহাশয়! কি বলেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) — “মুখহলসা, ভেতরবুঁদে, কানতুলসে, দীঘল ঘোমটা নারী, পানা পুকুরের সীতল জল বড় মন্দকারী। (সকলের হাস্য) (সহাস্যে) — কিন্তু ইনি তা নন — ইনি ‘গম্ভীরাত্মা’ (সকলের হাস্য)

গিরিশ — মহাশয়! শ্লোকটি কি বললেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — এই ক’টি লোকের কাছে সাবধান হবে: প্রথম, মুখহলসা — হলহল করে কথা কয়; তারপর ভেতরবুঁদে — মনের ভিতর ডুবুরি নামালেও অন্ত পাবে না; তারপর কানতুলসে — কানে তুলসী দেয়, ভক্তি জানাবার জন্য; দীঘল ঘোমটা নারী — লম্বা ঘোমটা, লোকে মনে করে ভারী সতী, তা নয়; আর পানাপুকুরের জল — নাইলে সান্নিপাতিক হয়। (হাস্য)

চুনিলাল — এঁর (মাস্টারের) নামে কথা উঠেছে। ছোট নরেন, বাবুরাম ওঁর পোড়ো; নারায়ণ, পল্টু, তেজচন্দ্র — এরা সব ওঁর পোড়ো। কথা উঠেছে যে, উনি তাদের এইখানে এনেছেন, আর তাদের পড়াশুনা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এঁর নামে দোষ দিচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাদের কথা কে বিশ্বাস করবে?

এই সকল কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় নারাণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিল। নারাণ গৌরবর্ণ, ১৭/১৮ বছর বয়স, স্কুলে পড়ে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বড় ভালবাসেন। তাকে দেখবার জন্য, তাকে খাওয়াবার জন্য ব্যাকুল। তার জন্য দক্ষিণেশ্বরে বসে বসে কাঁদেন। নারাণকে তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখেন।

গিরিশ (নারায়ণ দৃষ্টে) — কে খবর দিলে? মাস্টারই দেখছি সব সারলে। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) — রোসো! চুপচাপ করে থাকো! এর (মাস্টারের) নামে একে বদনাম উঠেছে।

[অন্নচিন্তা চমৎকারা — ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ করার ফল]

আবার নরেন্দ্রের কথা পড়িল।

একজন ভক্ত — এখন তত আসেন না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — 'অন্নচিন্তা চমৎকারা,
কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা।' (সকলের হাস্য)

বলরাম — শিব গুহর বাড়ির ছেলে অন্নদা গুহর কাছে খুব আনাগোনা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, একজন আফিসোয়ালার বাসায় নরেন্দ্র, অন্নদা এরা সব যায়। সেখানে তারা ব্রাহ্মসমাজ করে।

একজন ভক্ত — তাঁর (অফিসওয়ালার) নাম তারাপদ।

বলরাম (হাসিতে হাসিতে) — বামুনরা বলে, অন্নদা গুহ লোকটার বড় অহংকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বামুনদের ও-সব কথা শুনো না। তাদের তো জানো, না দিলেই খারাপ লোক, দিলেই ভাল! (সকলের হাস্য) অন্নদাকে আমি জানি ভালো লোক।

১ Compare discussion about the order of perception of the Infinite and of the Finite in Max-Muller's Hibbert Lectures and Gifford Lectures.

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১১ই মার্চ 1885/03/11/iii

43.3 ভক্তসঙ্গে ভজনানন্দে

ঠাকুর গান শুনিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বলরামের বৈঠকখানায় একঘর লোক। সকলেই তাঁহার পানে চাহিয়া আছেন — কি বলেন শুনিবেন, কি করেন দেখিবেন।

শ্রীযুক্ত তারাপদ গাহিতেছেন:

কেশব কুরু করুণা দীনে, কুঞ্জকাননচারী।

মাধব মনোমোহন, মোহন মুরলীধারী ।।

(হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার)।

ব্রজকিশোর কালীয়হর কাতরভয়ভঞ্জন,

নয়ন-বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা রাধিকা-হৃদয়রঞ্জন —

গোবর্ধনধারণ, বনকুসুমভূষণ, দামোদর কংসদর্পহারী।

শ্যামরাসরসবিহারী। (হরিবোল, ইত্যাদি) ।।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি) — আহা, বেশ গানটি! তুমিই কি সব গান বেঁধেছ?

একজন ভক্ত — হাঁ, উনিই চৈতন্যলীলার সব গান বেঁধেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি) — এ গানটি খুব উতরেছে।

(গায়কের প্রতি) — "নিতাই-এর গান গাইতে পারো?"

আবার গান হইল, নিতাই গেয়েছেন:

কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জুয়ার বয়ে যায়।

বইছে রে প্রেম শতধারে, যে যত চায় তত পায় ।।

প্রেমের কিশোরী, প্রেম বিলায় সাধ করি, রাধার প্রেমে বলরে হরি;

প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেম তরঙ্গে প্রাণ নাচায়।

রাধার প্রেমে হরি বলি, আয় আয় আয় ।।

শ্রীগৌরাঙ্গের গান হইল —

কার ভাবে গৌর বেশে জুড়ালে হে প্রাণ।

প্রেমসাগরে উঠলো তুফান, থাকবে না আর কুল মান ।।

(মন মজালে গৌর হে)

ব্রজ মাঝে, রাখাল সাজে, চরালে গোধন;

ধরলে করে মোহন বাঁশি, মজলো গোপীর মন;

ধরে গোবর্ধন, রাখলে বৃন্দাবন,

মানের দায়ে, ধরে গোপীর পায়, ভেসে গেল চাঁদ বয়ান ।।

(মন মজালে গৌর হে)।

সকলে মাস্টারকে অনুরোধ করিতেছেন, তুমি একটি গান গাও। মাস্টার একটু লাজুক, ফিস্‌ফিস্ করে মাপ চাহিতেছেন।

গিরিশ (ঠাকুরের প্রতি, সহাস্যে) — মহাশয়! মাস্টার কোন মতে গান গাইছে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া) — ও স্কুলে দাঁত বার করবে; গান গাইতে যত লজ্জা! মাস্টার মুখটি চুন করে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেশ মিত্র একটু দূরে বসেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষকে দেখাইয়া সহাস্যবদনে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তুমি তো কি? ইনি (গিরিশ) তোমার চেয়ে!

সুরেশ (হাসিতে হাসিতে) — আজ্ঞা হাঁ, আমার বড়দাদা। (সকলের হাস্য)

গিরিশ (ঠাকুরের প্রতি) — আচ্ছা, মহাশয়! আমি ছেলেবেলায় কিছু লেখাপড়া করি নাই, তবু লোকে বলে বিদ্বান!

শ্রীরামকৃষ্ণ — মহিমা চক্রবর্তী অনেক শাস্ত্র-টাস্ত্র দেখেছে শুনেছে — খুব আধার! (মাস্টারের প্রতি) — কেমন গা?

মাস্টার — আজ্ঞা হাঁ।

গিরিশ — কি? বিদ্যা! ও অনেক দেখেছি! ওতে আর ভুলি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) — এখানকার ভাব কি জান? বই শাস্ত্র এ-সব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ বলে দেয়। পথ, উপায়, জেনে লবার পর, আর বই শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ করতে হয়।

“একজন একখানা চিঠি পেয়েছিল, কুটুম বাড়ি তত্ত্ব করতে হবে, কি কি জিনিস লেখা ছিল। জিনিস কিনতে দেবার সময় চিঠিখানা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কর্তাটি তখন খুব ব্যস্ত হয়ে চিঠির খোঁজ আরম্ভ করলেন। অনেকক্ষণ ধরে অনেকজন মিলে খুঁজলে। শেষে পাওয়া গেল। তখন আর আনন্দের সীমা নাই। কর্তা ব্যস্ত হয়ে অতি যত্নে চিঠিখানা হাতে নিলেন আর দেখতে জাগলেন, কি লেখা আছে। লেখা এই, পাঁচ সের সন্দেশ পাঠাইবে, একখানা কাপড় পাঠাইবে; আরও কত কি। তখন আর চিঠির দরকার নাই, চিঠি ফেলে দিয়ে সন্দেশ ও কাপড়ের আর অন্যান্য জিনিসের চেষ্টায় বেরুলেন। চিঠির দরকার কতক্ষণ? যতক্ষণ সন্দেশ, কাপড় ইত্যাদির বিষয় না জানা জায়। তারপরই পাবার চেষ্টা।

“শাস্ত্রে তাঁকে পাবার উপায়ের কথা পাবে। কিন্তু খবর সব জেনে নিজে কর্ম আরম্ভ করতে হয়। তবে তো বস্তুলাভ!

“শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? অনেক শ্লোক, অনেক শাস্ত্র, পণ্ডিতের জানা থাকতে পারে; কিন্তু যার সংসারে আসক্তি আছে, যার কামিনী-কাঞ্চনে মনে মনে ভালবাসা আছে, তার শাস্ত্রে ধারণা হয় নাই— মিছে পড়া। পাঁজিতে লেখেছে, বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না।” (সকলের হাস্য)

গিরিশ (সহাস্যে) — মহাশয়! পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না? (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — পণ্ডিত খুব লম্বা লম্বা কথা বলে, কিন্তু নজর কোথায়? কামিনী আর কাঞ্চনে, দেহের সুখ আর টাকায়।

“শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে, কিন্তু নজর ভাগাড়, কোথায় মড়া।

(গিরিশের প্রতি) — “নরেন্দ্র খুব ভাল; গাইতে বাজাতে, পড়ায় শুনায় বিদ্যায়; এদিকে জিতেন্দ্রিয়, বিবেক-বৈরাগ্য আছে, সত্যবাদী। অনেক গুণ।

(মাস্টারের প্রতি) — কেমন রে? কেমন গা, খুব ভাল নয়?”

মাস্টার — আজ্ঞা হাঁ, খুব ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (জনান্তিকে, মাস্টারের প্রতি) — দেখ, ওর (গিরিশের) খুব অনুরাগ আর বিশ্বাস।

মাস্টার অবাক হইয়া গিরিশকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। গিরিশ ঠাকুরের কাছে কয়েকদিন আসিতেছেন মাত্র। মাস্টার কিন্তু দেখিলেন যেন পূর্বপরিচিত —

অনেকদিনের আলাপ — পরমাত্মীয় — যেন একসূত্রে গাঁথা মণিগণের একটি মণি।

নারাণ বলিলেন — মহাশয়! আপনার গান হবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই মধুর কণ্ঠে মায়ের নামগুণগান করিতেছেন:

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মাকে তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে ।।
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে (মাঝে মাঝে) ।।
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হতে দিও নাকো,
জ্ঞান-নয়নকে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে ।।

ঠাকুর ত্রিতাপে তাপিত সংসারী জীবের ভাব আরোপ করিয়া মার কাছে অভিমান করিয়া গাইতেছেন:

গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ করো না।
(ওমা) ও দুটি চরণ বিনে আমার মন, অন্য কিছু আর জানে না ।।
তপন-তনয় আমায় মন্দ কয়, কি বলিব তায় বল না।
ভবানী বলিয়ে, ভবে যাব চলে, মনে ছিল এই বাসনা ।।
অকুলপাথারে ডুবাবি আমারে (ওমা) স্বপনেও তাতো জানি না ।।
অহরহর্নিশি, শ্রীদুর্গানামে ভাসি, তবু দুখরাশি গেল না।
এবার যদি মরি ও হরসুন্দরী, তোর দুর্গানাম আর কেউ লবে না ।।

আর নিত্যানন্দময়ী ব্রহ্মানন্দের কথা গাইতেছেন:

শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা,
সুধাপানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না (মা)।
বিপরীত রতাতুরা, পদভরে কাঁপে ধরা,
উভয়ে পাগলের পারা, লজ্জা ভয় আর মানে না (মা)।

ভক্তেরা নিস্তব্ধ হইয়া গান শুনিতেছেন। তাঁহারা একদৃষ্টে ঠাকুরের অদ্ভুত আত্মহারা মাতোয়ারা ভাব দেখিতেছেন।

গান সমাপ্ত হইল। কিয়ৎকালে পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, “আমার আজ গান ভাল হল না — সর্দি হয়েছে।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১১ই মার্চ 1885/03/11/iv

43.4 সন্ধ্যাসমাগমে

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। সিন্ধুবক্ষে যথায় অনন্তের নীল ছায়া পড়িয়াছে, নিবিড় অরণ্যমধ্যে, অম্বরস্পর্শী পর্বত শিখরে, বায়ুবিকম্পিত নদীর তীরে, দিগন্তব্যাপী প্রান্তরমধ্যে, ক্ষুদ্র মানবের সহজেই ভাবান্তর হইল। এই সূর্য চরাচর বিশ্বকে আলোকিত করিতেছিলেন, কোথায় গেলেন? বালক ভাবিতেছে, আবার ভাবিতেছেন — বালকস্বভাবাপন্ন মহাপুরুষ। সন্ধ্যা হইল। কি আশ্চর্য! কে এরূপ করিল? — পাখিরা পাদপশাখা আশ্রয় করিয়া রব করিতেছে। মানুষের মধ্যে যাঁহাদের চৈতন্য হইয়াছে, তাঁহারাও সেই আদিকবি কারণের কারণ পুরুষোত্তমের নাম করিতেছেন।

কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইল। ভক্তেরা যে যে-আসনে বসিয়াছিলেন, তিনি সেই আসনেই বসিয়া রহিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মধুর নাম করিতেছেন, সকলে উদগ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন। আমন মিষ্ট নাম তাঁরা কখনও শুনেন নাই — যেন সুধাবর্ষণ হইতেছে। এমন প্রেমমাখা বালকের মা মা বলে ডাকা, তাঁরা কখনও শুনেন নাই, দেখেন নাই। আকাশ, পর্বত, মহাসাগর, প্রান্তর, বন আর দেখিবার কি প্রয়োজন? গরুর শৃঙ্গ, পদাদি ও শরীরের অন্যান্য অংশ আর দেখিবার কি প্রয়োজন? দয়াময় গুরুদেব যে গরুর বাঁটের কথা বলিলেন, এই গৃহমধ্যে কি তাই দেখিতেছি? সকলের অশান্ত মন কিসে শান্তিলাভ করিল? নিরানন্দ ধরা কিসে আনন্দে ভাসিল? কেন ভক্তদের দেখিতেছি শান্ত আর আনন্দময়? এই প্রেমিক সন্ন্যাসী কি সুন্দর রূপধারী অনন্ত ঈশ্বর? এইখানেই কি দুগ্ধপানপিপাসুর পিপাসা শান্তি হইবে? অবতার হউন, আর নাই হউন, ইঁহারই চরণপ্রান্তে মন বিকাইয়াছে, আর যাইবার জো নাই! ইঁহারেই করিয়াছি জীবনের

ধ্রুবতারা। দেখি, ইঁহার হৃদয়-সরোবরে সেই আদিপুরুষ কিরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন।

ভক্তেরা কেহ কেহ ওইরূপ চিন্তা করিতেছেন ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখবিগলিত হরিনাম, আর মায়ের নাম শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেছেন। নামগুণকীর্তনান্তে ঠাকুর প্রার্থনা করিতেছেন। যেন সাক্ষাৎ ভগবান প্রেমের দেহধারণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিতেছেন, কিরূপে প্রার্থনা করিতে হয়। বলিলেন, "মা আমি তোমার শরণাগত, শরণাগত! দেহসুখ চাই না মা! লোকমান্য চাই না, (অণিমাদি) অষ্টসিদ্ধি চাই না, কেবল এই করো যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয় — নিষ্কাম অমলা, অহৈতুকী ভক্তি হয়। আর যেন মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ার মুগ্ধ না হই — তোমার মায়ার সংসারে, কামিনী-কাঞ্চনের উপর ভালবাসা যেন কখন না হয়! মা! তোমা বই আমার আর কেউ নাই। আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন — কৃপা করে শ্রীপাদপদ্মে আমায় ভক্তি দাও।"

মণি ভাবিতেছেন — ত্রিসন্ধ্যা যিনি তাঁর নাম করিতেছেন — যাঁর শ্রীমুখবিনিঃসৃত নামগঙ্গা তৈলধারার ন্যায় নিরবছিন্না, তাঁর আবার সন্ধ্যা কি? মণি পরে বুঝিলেন, লোকশিক্ষার জন্য ঠাকুর মানবদেহ ধারণ করিয়াছেন —

"হরি আপনি এসে, যোগীবেশে, করিলে নামসংকীর্তন।"

গিরিশ ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই রাত্রেই যেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — রাত হবে না?

গিরিশ — না, যখন ইচ্ছা আপনি যাবেন, আমায় আজ থিয়েটারে যেতে হবে। তাদের ঝগড়া মেটাতে হবে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১১ই মার্চ 1885/03/11/v

43.5 রাজপথে শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত ঈশ্বরাবেশ

গিরিশের নিমন্ত্রণ! রাত্রেই যেতে হবে। এখন রাত ৯টা, ঠাকুর খাবেন বলে রাত্রের খাবার বলরামও প্রস্তুত করেছেন। পাছে বলরাম মনে কষ্ট পান, ঠাকুর গিরিশের বাড়ি যাইবার সময় তাই বুঝি বলিতেছেন, "বলরাম! তুমিও খাবার পাঠিয়ে দিও।"

দুতলা হইতে নিচে নামিতে নামিতেই ভগবদ্ভাবে বিভোর! যেন মাতাল। সঙ্গে নারাণ ও মাস্টার। পশ্চাতে রাম, চুনি ইত্যাদি অনেকে। একজন ভক্ত বলিতেছেন, "সঙ্গে কে যাবে?" ঠাকুর বলিলেন, "একজন হলেই হল।" নামিতে নামিতেই বিভোর। নারাণ হাত ধরিতে গেলেন, পাছে পড়িয়া যান। ঠাকুর বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নারাণকে সস্নেহে বলিলেন, "হাত ধরলে লোকে মাতাল মনে করবে, আমি আপনি চলে যাব।"

বোসপাড়ার তেমাথা পার হচ্ছেন — কিছুদূরেই শ্রীযুক্ত গিরিশের বাড়ি। এত শীঘ্র চলছেন কেন? ভক্তেরা পশ্চাতে পড়ে থাকছে। না জানি হৃদয়মধ্যে কি অদ্ভুত দেবভাব হইয়াছে! বেদে যাঁহাকে বাক্য-মনের অতীত বলিয়াছেন, তাঁহাকে চিন্তা করিয়া কি ঠাকুর পাগলের মতো পাদবিক্ষেপ করিতেছেন? এইমাত্র বলরামের বাড়িতে বলিলেন যে, সেই পুরুষ বাক্য-মনের অতীত নহেন; তিনি শুদ্ধমনের, শুদ্ধবুদ্ধির, শুদ্ধ আত্মার গোচর। তবে বুঝি সেই পুরুষকে সাক্ষাৎকার করছেন! এই কি দেখছেন — "যো কুছ হ্যায়, সো তুঁহি হ্যায়?"

এই যে নরেন্দ্র আসিতেছেন। 'নরেন্দ্র' 'নরেন্দ্র' বলিয়া পাগল। কই, নরেন্দ্র সম্মুখে আসিলেন, ঠাকুর তো কথা কহিতেছেন না। লোকে বলে, এর নাম ভাব, এইরূপ কি শ্রীগৌরাঙ্গের হইত?

কে এ-ভাব বুঝিবে? গিরিশের বাড়ি প্রবেশ করিবার গলির সম্মুখে ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে ভক্তগণ। এইবার নরেন্দ্রকে সম্ভাষণ করিতেছেন।

নরেন্দ্রকে বলছেন, "ভাল আছ, বাবা? আমি তখন কথা কইতে পারি নাই।" — কথার প্রতি অক্ষর করুণা মাখা। তখনও দ্বারদেশে উপস্থিত হন নাই। এইবার হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, একটা কথা — এই একটি (দেহী?) ও একটি (জগৎ?)।

জীব জগৎ! ভাবে এ-সব কি দেখিতেছিলেন? তিনিই জানেন, অবাক্‌ হয়ে কি দেখছিলেন! দু-একটি কথা উচ্চারিত হইল, যেন বেদবাক্য — যেন দৈববানী — অথবা, যেন অনন্ত সমুদ্রের তীরে গিয়াছি ও অবাক্‌ হয়ে দাঁড়াইয়াছি; আর যেন অনন্ততরঙ্গমালোত্থিত অনাহত শব্দের একটি-দুটি ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১১ই মার্চ 1885/03/11/vi

43.6 ঠাকুর ভক্তমন্দিরে — সংবাদপত্র — নিত্যগোপাল

দ্বারদেশে গিরিশ; ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে গৃহমধ্যে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে যেই নিকটে এলেন, অমনি গিরিশ দণ্ডের ন্যায় সম্মুখে পড়িলেন। আজ্ঞা পাইয়া উঠিলেন, ঠাকুরের পদধূলা গ্রহণ করিলেন ও সঙ্গে করিয়া দু-তলায় বৈঠকখানা ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভক্তেরা শশব্যস্ত হয়ে আসন গ্রহণ করিলেন — সকলের ইচ্ছা, তাঁহার কাছে বসেন ও তাঁহার মধুর কথামৃত পান করেন।

আসন গ্রহণ করিতে গিয়া ঠাকুর দেখিলেন, একখানা খবরের কাগজ রহিয়াছে। খবরের কাগজে বিষয়ীদের কথা। বিষয়কথা, পরচর্চা, পরনিন্দা তাই অপবিত্র — তাঁহার চক্ষে। তিনি ইশারা করলেন, ওখানা যাতে স্থানান্তরিত করা হয়।

কাগজখানা সরানো হবার পর আসন গ্রহণ করিলেন।

নিত্যগোপাল প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নিত্যগোপালের প্রতি) — ওখানে?

নিত্য — আজ্ঞা হাঁ, দক্ষিণেশ্বরে যাই নাই। শরীর খারাপ। ব্যাথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেমন আছিস?

নিত্য — ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দুই-এক গ্রাম নিচে থাকিস।

নিত্য — লোক ভাল লাগে না। কত কি বলে — ভয় হয়। এক-একবার খুব সাহস হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা হবে বইকি! তোর সঙ্গে কে থাকে?

নিত্য — তারক১। ও সর্বদা সঙ্গে থাকে, ওকেও সময়ে সময়ে ভাল লাগে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ন্যাংটা বলত, তাদের মঠে একজন সিদ্ধ ছিল। সে আকাশ তাকিয়ে চলে যেত; গণেশগর্জী — সঙ্গী যেতে বড় দুঃখ — অধৈর্য হয়ে গিছল।

বলিতে বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল। কি ভাবে অবাক হয়ে রহিলেন। কিয়ৎ পরে বলিতেছেন, "তুই এসেছিস? আমিও এসেছি।"

এ কথা কে বুঝিবে? এই কি দেব-ভাষা?

১ শ্রী তারকনাথ ঘোষাল — শ্রীশিবানন্দ

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১১ই মার্চ 1885/03/11/vii

43.7 পার্ষদসঙ্গে — অবতার সম্বন্ধে বিচার

ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত; — শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বসিয়া। নরেন্দ্র, গিরিশ, রাম, হরিপদ, চুনি, বলরাম, মাস্টার — অনেকে আছেন।

নরেন্দ্র মানেন না যে, মানুষদেহ লইয়া ঈশ্বর অবতার হন। এদিকে গিরিশের জ্বলন্ত বিশ্বাস যে, তিনি যুগে যুগে অবতার হন, আর মানবদেহ ধারণ করে মর্ত্যলোকে

আসেন। ঠাকুরের ভারী ইচ্ছা যে, এ সম্বন্ধে দুজনের বিচার হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশকে বলিতেছেন, “একটু ইংরাজীতে দুজনে বিচার করো, আমি দেখবো!”

বিচার আরম্ভ হইল। ইংরেজীতে হইল না, বাংলাতেই হইল — মাঝে মাঝে দু-একটা ইংরেজী কথা। নরেন্দ্র বলিলেন, “ঈশ্বর অনন্ত। তাঁকে ধারণা করা আমাদের সাধ্য কি? তিনি সকলের ভিতরেই আছেন — শুধু একজনের ভিতর এসেছেন, এমন নয়।”

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে) — ওরও যা মত আমারও তাই মত। তিনি সর্বত্র আছেন। তবে একটা কথা আছে — শক্তিবিশেষ। কোনখানে অবিদ্যাশক্তির প্রকাশ, কোনখানে বিদ্যাশক্তির। কোন আধারে শক্তি বেশি, কোন আধারে শক্তি কম। তাই সব মানুষ সমান নয়।

রাম — এ-সব মিছে তর্কে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্তভাবে) — না, না, ওর একটা মানে আছে।

গিরিশ (নরেন্দ্রের প্রতি) — তুমি কেমন করে জানলে, তিনি দেহধারণ করে আসেন না?

নরেন্দ্র — তিনি অবাঙ্মনোসোগোচরম্‌।

শ্রীরামকৃষ্ণ — না; তিনি শুদ্ধবুদ্ধির গোচর। শুদ্ধবুদ্ধি শুদ্ধ-আত্মা একই, ঋষিরা শুদ্ধবুদ্ধি শুদ্ধ-আত্মা দ্বারা শুদ্ধ-আত্মাকে সাক্ষাৎকার করেছিলেন।

গিরিশ (নরেন্দ্রের প্রতি) — মানুষে অবতার না হলে কে বুঝিয়ে দেবে? মানুষকে জ্ঞানভক্তি দিবার জন্য তিনি দেহধারণ করে আসেন। না হলে কে শিক্ষা দেবে?

নরেন্দ্র — কেন? তিনি অন্তরে থেকে বুঝিয়ে দেবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে) — হাঁ হাঁ, অন্তর্যামীরূপে তিনি বুঝাবেন।

তারপর ঘোরতর তর্ক। ইনফিনিটি — তার কি অংশ হয়? আবার হ্যামিলটন্ কি বলেন? হার্বার্ট স্পেন্সার কি বলেন? টিণ্ডেল, হাক্সলে বা কি বলে গেছেন, এই কথা হতে লাগল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — দেখ, ইগুণো আমার ভাল লাগছে না। আমি সব তাই দেখছি। বিচার আর কি করবো? দেখছি — তিনিই সব। তিনিই সব হয়েছেন। তাও বটে, আবার তাও বটে। এক অবস্থায়, অখণ্ডে মনবুদ্ধিহারা হয়ে যায়! নরেন্দ্রকে দেখে আমার মন অখণ্ডে লীন হয়।

(গিরিশের প্রতি) — "তার কি করলে বল দেখি।"

গিরিশ (হাসিতে হাসিতে) — ওইটে ছাড়া প্রায় সব বুঝেছি কিনা। (সকলের হাস্য)

[রামানুজ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ]

শ্রীরামকৃষ্ণ — আবার দু-থাক না নামলে কথা কইতে পারি না।

“বেদান্ত —– শঙ্কর যা বুঝিয়েছেন, তাও আছে; আবার রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আছে।

নরেন্দ্র —– বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রকে) — বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আছে —– রামানুজের মত। কিনা, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। সব জড়িয়ে একটি বেল। খোলা আলাদা, বীজ আলাদা, আর শাঁস আলাদা একজন করেছিল। বেলটি কত ওজনের জানবার দরকার হয়েছিল। এখন শুধু শাঁস ওজন করলে কি বেলের ওজন পাওয়া যায়? খোলা, বিচি, শাঁস সব একসঙ্গে ওজন করতে হবে। প্রথমে খোলা নয়, বিচি নয়, শাঁসটিই সার পদার্থ বলে বোধ হয়। তারপর বিচার করে দেখে, — যেই বস্তুর শাঁস সেই বস্তুরই খোলা আর বিচি। আগে নেতি নেতি করে যেতে হয়। জীব নেতি, জগৎ নেতি এইরূপ বিচার করতে হয়; ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু। তারপর অনুভব হয়, যার শাঁস তারই খোলা, বিচি। যা থেকে ব্রহ্ম বলছো তাই থেকে জীবজগৎ। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। তাই রামানুজ বলতেন, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। এরই নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১১ই মার্চ 1885/03/11/viii

43.8 ঈশ্বরদর্শন (God Vision) — অবতার প্রত্যক্ষসিদ্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — আমি তাই দেখছি সাক্ষাৎ —— আর কি বিচার করব? আমি দেখছি, তিনিই এইসব হয়েছেন। তিনিই জীব ও জগৎ হয়েছেন।

“তবে চৈতন্য না লাভ করলে চৈতন্যকে জানা যায় না। বিচার কতক্ষণ? যতক্ষণ না তাঁকে লাভ করা যায়; শুধু মুখে বললে হবে না, এই আমি দেখছি তিনিই সব হয়েছেন। তাঁর কৃপায় চৈতন্য লাভ করা চাই! চৈতন্য লাভ করলে সমাধি হয়, মাঝে মাঝে দেহ ভুল হয়ে যায়, কামিনী-কাঞ্চনের উপর আসক্তি থাকে না, ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কিছু ভাল লাগে না; বিষয়কথা শুনলে কষ্ট হয়।”

[প্রত্যক্ষ (Revelation) — নরেন্দ্রকে শিক্ষা ——কালীই ব্রহ্ম ১]

“চৈতন্য লাভ করলে তবে চৈতন্যকে জানতে পারা যায়।”

বিচারান্তে ঠাকুর মাস্টারকে বলিতেছেন ——

“দেখেছি, বিচার করে একরকম জানা যায়, তাঁকে ধ্যান করে একরকম জানা যায়। আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেব —— এর নাম অবতার —— তিনি যদি তাঁর মানুষলীলা দেখিয়ে দেন, তাহলে আর বিচার করতে হয় না, কারুকে বুঝিয়ে দিতে হয় না! কিরকম জানো? যেমন অন্ধকারের ভিতর দেশলাই ঘষতে ঘষতে দপ্ করে আলো হয়। সেইরকম দপ্ করে আলো যদি তিনি দেন, তাহলে সব সন্দেহ মিটে যায়। এরূপ বিচার করে কি তাঁকে জানা যায়?

ঠাকুর নরেন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন ও কুশল প্রশ্ন ও কত আদর করিতেছেন।

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — কই কালীর ধ্যান তিন-চারদিন করলুম, কিছুই তো হল না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ক্রমে হবে। কালী আর কেউ নয়, যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী। কালী আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন তখন শক্তি বলে কই। যাঁকে তুমি ব্রহ্ম বলছো, তাঁকেই কালী বলছি।

"ব্রহ্ম আর কালী অভেদ। যেমন অগ্নি আর দাহিকাশক্তি। অগ্নি ভাবলেই দাহিকাশক্তি ভাবতে হয়। কালী মানলেই ব্রহ্ম মানতে হয়, আবার ব্রহ্ম মানলেই কালী মানতে হয়।

"ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। ওকেই শক্তি, ওকেই কালী আমি বলি।"

এদিকে রাত হয়ে গেছে। গিরিশ হরিপদকে বলিতেছেন, ভাই একখানা গাড়ি যদি ডেকে দিস — থিয়েটারে যেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — দেখিস যেন আনিস! (সকলের হাস্য)

হরিপদ (সহাস্যে) — আমি আনতে যাচ্ছি — আর আনবো না?

[ঈশ্বরলাভ ও কর্ম — রাম ও কাম]

গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — আপনাকে ছেড়ে আবার থিয়েটারে যেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— না, ইদিক-উদিক দুদিক রাখতে হবে; ‘জনক রাজা ইদিক-উদিক দুদিক রেখে, খেয়েছিল দুধের বাটি।” (সকলের হাস্য)

গিরিশ —— থিয়েটারগুলো ছোঁড়াদেরই ছেড়ে দিই মনে করছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— না না, ও বেশ আছে; অনেকের উপকার হচ্ছে।

নরেন্দ্র (মৃদুস্বরে) — এই তো ঈশ্বর বলছে, অবতার বলছে! আবার থিয়েটার টানে।

১ কালী —— God in His relations to the conditioned.
ব্রহ্ম —— The Unconditioned, the Absolute.

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১১ই মার্চ 1885/03/11/ix

43.9 সমাধিমন্দিরে —— গরগরমাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে কাছে বসাইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার সন্নিকটে আরও সরিয়া গিয়া বসিলেন। নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই — তায় কি এসে যায়? ঠাকুরের ভালবাসা যেন আরও উথলিয়া পড়িল। গায়ে হাত দিয়া নরেন্দ্রের প্রতি কহিতেছেন, ‘মান কয়লি তো কয়লি, আমরাও তোর মানে আছি (রাই)!’

[বিচার ঈশ্বরলাভ পর্যন্ত]

(নরেন্দ্রের প্রতি) — “যতক্ষণ বিচার, ততক্ষণ তাঁকে পায় নাই। তোমরা বিচার করছিলে, আমার ভাল লাগে নাই।

“নিমন্ত্রণবাড়ির শব্দ কতক্ষণ শুনা যায়? যতক্ষণ লোকে খেতে না বসে। যাই লুচি তরকারী পড়ে, অমনি বার আনা শব্দ কমে যায়। (সকলের হাস্য) অন্য খাবার পড়লে আরও কমতে থাকে। দই পাতে পাতে পড়লে কেবল সুপ্‌ সাপ্‌। ক্রমে খাওয়া হয়ে গেলেই নিদ্রা।

“ঈশ্বরকে যত লাভ হবে, ততই বিচার কমবে। তাঁকে লাভ হলে আর শব্দ বিচার থাকে না। তখন নিদ্রা — সমাধি।”

এই বলিয়া নরেন্দ্রের গায় হাত বুলাইয়া, মুখে হাত দিয়া আদর করিতেছেন ও বলিতেছেন, “হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ।”

কেন এরূপ করিতেছেন ও বলিতেছেন? শ্রীরামকৃষ্ণ কি নরেন্দ্রের মধ্যে সাক্ষাৎ নারায়ণ দর্শন করিতেছেন? এরই নাম কি মানুষে ঈশ্বরদর্শন? কি আশ্চর্য! দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের সংজ্ঞা যাইতেছে। ওই দেখ বর্হিজগতের হুঁশ চলিয়া খাইতেছে।

এরই নাম বুঝি অর্ধবাহ্যদশা — যাহা শ্রীগৌরাঙ্গের হইয়াছিল। এখনও নরেন্দ্রের পায়ের উপর হাত — যেন ছল করিয়া নারায়ণের পা টিপিতেছেন —আবার গায়ে হাত বুলাইতেছেন। এত গা-টেপা, পা-টেপা কেন? একি নারায়ণের সেবা করছেন, না শক্তি সঞ্চার করছেন?

দেখিতে দেখিতে আরও ভাবান্তর হইতেছে। এই আবার নরেন্দ্রের কাছে হাতজোড় করে কি বলছেন! বলছেন — "একটা গান (গা) — তাহলে ভাল হবো; — উঠতে পারবো কেমন করে! গোরাপ্রেমে গরগরমাতোয়ারা (নিতাই আমার) —"

কিয়ৎক্ষণ আবার অবাক্, চিত্রপুত্তলিকার মতো চুপ করে রহিয়াছেন। আবার ভাবে মাতোয়ারা হয়ে বলছেন —

"দেখিস রাই — যমুনায় যে পড়ে যাবি — কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী"।

আবার ভাবে বিভোর! বলিতেছেন —

"সখি! সে বন কত দূর! (যে বনে আমার শ্যামসুন্দর)।

(ওই যে কৃষ্ণগন্ধ পাওয়া যায়)! (আমি চলতে যে নারি)!"

এখন জগৎ ভুল হয়েছে — কাহাকেও মনে নাই — নরেন্দ্র সম্মুখে, কিন্তু নরেন্দ্রকে আর মনে নাই — কোথায় বসে আছেন, কিছুই হুঁশ নাই। এখন যেন মন-প্রাণ ঈশ্বরে গত হয়েছে! 'মদ্‌গত-অন্তরাত্মা।'

“গোরা প্রেমে গরগরমাতোয়ারা!” এই কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ হুঙ্কার দিয়া দণ্ডায়মান! আবার বসিতেছেন, বসিয়া বলিতেছেন —

“ওই একটা আলো আসছে দেখতে পাচ্ছি, — কিন্তু কোন দিক্ দিয়ে আলোটা আসছে এখনও বুঝতে পারছি না।”

এইবার নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন:

সব দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে — মোহিলে প্রাণ।
সপ্তলোক ভুলে শোক, তোমারে পাইয়ে —
কোথায় আমি অতি দীন-হীন ।।

গান শুনিতে শুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণের বহির্জগত ভুল হইয়া আসিতেছে। আবার নিমীলিত নেত্র! স্পন্দহীন দেহ! সমাধিস্থ!

সমাধিভঙ্গের পর বলিতেছেন, “আমাকে কে লয়ে যাবে?” বালক যেমন সঙ্গী না দেখলে অন্ধকার দেখে সেইরূপ।

অনেক রাত হইয়াছে। ফাল্গুন কৃষ্ণা দশমী — অন্ধকার রাত্রি। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে যাইবেন। গাড়িতে উঠিবেন। ভক্তেরা গাড়ির কাছে দাঁড়াইয়া। তিনি উঠিতেছেন — অনেক সন্তর্পণে তাঁহাকে উঠান হইতেছে। এখনও ‘গরগরমাতোয়ারা!’

গাড়ি চলিয়া গেল। ভক্তেরা যে যার বাড়ি যাইতেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১১ই মার্চ 1885/03/11/x

43.10 সেবকহৃদয়ে

মস্তকের উপরে তারকামণ্ডিত নৈশগগন — হৃদয়পটে অদ্ভুত শ্রীরামকৃষ্ণ ছবি, স্মৃতিমধ্যে ভক্তের মজলিস — সুখস্বপ্নের ন্যায় নয়নপথে সেই প্রেমের হাট — কলিকাতার রাজপথে স্বগৃহাভিমুখে ভক্তেরা যাইতেছেন। কেহ সরস বসন্তানিল সেবন করিতে করিতে সেই গানটি আবার গাইতে গাইতে যাচ্ছেন —

“সব দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে — মোহিলে প্রাণ!”

মণি ভাবতে ভাবতে যাচ্ছেন, “সত্য সত্যই কি ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ করে আসেন? অনন্ত কি সান্ত হয়? বিচার তো অনেক হল। কি বুঝলাম বিচারের দ্বারা কিছুই বুঝলাম না।

“ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তো বেশ বললেন, ‘যতক্ষণ বিচার ততক্ষণ বস্তুলাভ হয় নাই, ততক্ষণ ঈশ্বরকে পাওয়া যায় নাই।’ তাও বটে! এই তো এক ছটাক বুদ্ধি; এর দ্বারা আর কি বুঝবো ঈশ্বরের কথা! একসের বাটিতে কি চার সের দুধ ধরে? তবে আবতার বিশ্বাস কিরূপে হয়? ঠাকুর বললেন, ঈশ্বর যদি দেখিয়ে দেন দপ্ করে,

তাহলে এক দণ্ডেই বুঝা যায়! Goethe মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন, Light! More Light! তিনি যদি দপ্ করে আলো জ্বেলে দেখিয়ে দেন তবে — ‘ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।’

“যেমন প্যালেস্টাইন-এর মূর্খ ধীবরেরা Jesus-কে অথবা যেমন শ্রীবাসাদি ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণাবতার দেখেছিলেন।

“যদি দপ্ করে তিনি না দেখান তাহলে উপায় কি? কেন, যেকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ও-কথা, সেকালে অবতার বিশ্বাস করব। তিনিই শিখিয়েছেন — বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস! গুরুবাক্যে বিশ্বাস! আর —

“তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা ৷৷”

“আমার তাঁর বাক্যে — ঈশ্বর কৃপায় বিশ্বাস হয়েছে; — আমি বিশ্বাস করব, অন্যে যা করে করুক; আমি এই দেবদুর্লভ বিশ্বাস কেন ছাড়ব? বিচার থাক। জ্ঞান চচ্চড়ি করে কি একটা Faust হতে হবে? গভীর রজনীমধ্যে বাতায়নপথে চন্দ্রকিরণ আসিতেছে, আর Faust নাকি একাকী ঘরের মধ্যে ‘হায় কিছু জানিতে পারিলাম না, সায়েন্স, ফিলসফি বৃথা অধ্যয়ন করিলাম, এই জীবনে ধিক্!’ এই বলিয়া বিষের শিশি লইয়া আত্মহত্যা করিতে বসিলেন! না, Alastor-এর মতো অজ্ঞানের বোঝা বইতে না পেরেও শিলাখণ্ডের উপর মাথা রেখে মৃত্যুর অপেক্ষা করিব! না, আমার এ-সব ভয়ানক পণ্ডিতদের মতো একছটাক জ্ঞানের দ্বারা রহস্য ভেদ করতে যাবার প্রয়োজন নাই! বেশ কথা — গুরুবাক্যে বিশ্বাস। হে

ভগবন্, আমায় ওই বিশ্বাস দাও; আর মিছামিছি ঘুরাইও না। যা হবার নয়, তা খুঁজতে যাওয়াইও না। আর ঠাকুর যা শিখিয়েছেন, ‘যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়, — অমলা অহৈতুকি ভক্তি; আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই!’ কৃপা করে এই আশীর্বাদ কর।

“শ্রীরামকৃষ্ণের অদৃষ্টপূর্ব প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে মণি সেই তমসাচ্ছন্ন রাত্রি মধ্যে রাজপথ দিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছেন ও ভাবিতেছেন, ‘কি ভালবাসা গিরিশকে! গিরিশ থিয়েটারে চলে যাবেন, তবু তাঁর বাড়িতে যেতে হবে। শুধু তা নয়! এমনও বলছেন না যে, সব ত্যাগ কর — আমার জন্য গৃহ-পরিজন, বিষয়কর্ম সব ত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন কর।’ বুঝেছি — এর মানে এই যে, সময় না হলে, তীব্র বৈরাগ্য না হলে, ছাড়লে কষ্ট হবে; ঠাকুর যেমন নিজে বলেন, ঘায়ের মাম্‌ড়ি ঘা শুকুতে না শুকুতে ছিঁড়লে, রক্ত পড়ে কষ্ট হয়, কিন্তু ঘা শুকিয়ে গেলে মাম্‌ড়ি আপনি খসে পড়ে যায়। সামান্য লোকে, যাদের অন্তর্দৃষ্টি নাই, তারা বলে, এখনি সংসারত্যাগ কর। ইনি সদ্‌গুরু, অহেতুক কৃপাসিন্ধু, প্রেমের সমুদ্র, জীবের কিসে মঙ্গল হয় এই চেষ্টা নিশিদিন করিতেছেন।

“আর গিরিশের কি বিশ্বাস! দুদিন দর্শনের পরই বলেছিলেন, ‘প্রভু, তুমিই ঈশ্বর — মানুষদেহ ধারণ করে এসেছ — আমার পরিত্রাণের জন্য।’ গিরিশ ঠিক তো বলেছেন, ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ না করলে ঘরের লোকের মতো কে শিক্ষা দেবে, কে জানিয়ে দেবে, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, কে ধরায় পতিত দুর্বল সন্তানকে হাত ধরে তুলবে? কে কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত পাশব-স্বভাবপ্রাপ্ত মানুষকে আবার পূর্ববৎ অমৃতের অধিকারী করবে? আর তিনি মানুষরূপে সঙ্গে সঙ্গে না

বেড়ালে যাঁরা তদ্‌গতান্তরাত্মা, যাঁদের ঈশ্বর বই আর কিছু ভাল লাগে না তাঁরা কি করে দিন কাটাবেন? তাই —

‘পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।।’১

“কি ভালবাসা! — নরেন্দ্রের জন্য পাগল, নারায়ণের কন্য ক্রন্দন। বলেন, ‘এরা ও অন্যান্য ছেলেরা — রাখাল, ভবনাথ, পূর্ণ, বাবুরাম ইত্যাদি — সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমার জন্য দেহধারণ করে এসেছে!” এ প্রেম তো মানুষ জ্ঞানে নয়, এ প্রেম দেখছি ঈশ্বরপ্রেম! ছেলেরা শুদ্ধ-আত্মা, স্ত্রীলোক অন্যভাবে স্পর্শ করে নাই; বিষয়কর্ম করে এদের লোভ, অহংকার, হিংসা ইত্যাদি স্ফূর্তি হয় নাই, তাই ছেলেদের ভিতর ঈশ্বরের বেশি প্রকাশ। কিন্তু এ-দৃষ্টি কার আছে? ঠাকুরের অন্তর্দৃষ্টি; সমস্ত দেখিতেছেন — কে বিষয়াসক্ত, কে সরল উদার, ঈশ্বরভক্ত! তাই এরূপ ভক্ত দেখলেই সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে সেবা করেন। তাদের নাওয়ান, শোয়ান, তাদের দেখিবার জন্য কাঁদেন; কলিকাতায় ছুটিয়া ছুটিয়া যান। লোকের খোশামোদ করে বেড়ান কলিকাতা থেকে তাদের গাড়ি করে আনতে; গৃহস্থ ভক্তদের সর্বদা বলেন, ‘ওদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াইয়ো; তাহলে তোমাদের ভাল হবে।’ একি মায়িক স্নেহ? না, বিশুদ্ধ ঈশ্বরপ্রেম? মাটির প্রতিমাতে এত ষোড়শোপচারে ঈশ্বরের পূজা ও সেবা হয়, আর শুদ্ধ নরদেহে কি হয় না? তা ছাড়া এরাই ভগবানের প্রত্যেক লীলার সহায়! জন্মে জন্মে সাঙ্গোপাঙ্গ!

“নরেন্দ্রকে দেখতে দেখতে বাহ্যজগৎ ভুলে গেলেন; ক্রমে দেহী নরেন্দ্রকে ভুলে গেলেন। বাহ্যিক মনুষ্যকে (Apparent man) ভুলে গেলেন; প্রকৃত মনুষ্যকে

(Real man) দর্শন করতে লাগিলেন; অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মন লীন হইল, যাঁকে দর্শন করে কখনও অবাক্ স্পন্দনহীন হয়ে চুপ করে থাকেন, কখনও বা ওঁ ওঁ বলেন; কখন বা মা মা করে বালকের মতো ডাকেন, নরেন্দ্রের ভিতর তাঁকে বেশি প্রকাশ দেখেন। নরেন্দ্র নরেন্দ্র করে পাগল!

“নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই, তার আর কি হয়েছে। ঠাকুরের দিব্যচক্ষু; তিনি দেখিলেন যে, এ অভিমান হতে পারে। তিনি যে বড় আপনার লোক, তিনি যে আপনার মা, পাতানো মা তো নন। তিনি কেন বুঝিয়ে দেন না, তিনি কেন দপ্ করে আলো জ্বেলে দেন না! তাই বুঝি ঠাকুর বললেন ——

‘মান কয়লি তো কয়লি, আমরাও তোর মানে আছি।’

“আত্মীয় হতে যিনি পরমাত্মীয় তাঁর উপর অভিমান করবে না তো কার উপর করবে? ধন্য নরেন্দ্রনাথ, তোমার উপর এই পুরুষোত্তমের এত ভালবাসা! তোমাকে দেখে এত সহজে ঈশ্বরের উদ্দীপন!”

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই গভীর রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ করিতে করিতে ভক্তেরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন।

১ গীতা, [৪।৮]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ৬ই এপ্রিল 1885/04/06/i

43.11 অন্তরঙ্গসঙ্গে বসু বলরাম-মন্দিরে

বেলা তিনটা অনেকক্ষণ বাজিয়াছে। চৈত্র মাস, প্রচণ্ড রৌদ্র। শ্রীরামকৃষ্ণ দুই-একটি ভক্তসঙ্গে বলরামের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। মাস্টারের সহিত কথা কহিতেছেন।

আজ ৬ই এপ্রিল (সোমবার), ১৮৮৫, ২৫শে চৈত্র, ১২৯১, কৃষ্ণা সপ্তমী। ঠাকুর কলিকাতায় ভক্তমন্দিরে আসিয়াছেন। সাঙ্গোপাঙ্গদিগকে দেখিবেন ও নিমু গোস্বামীর গলিতে দেবেন্দ্রের বাড়িতে যাইবেন।

[সত্যকথা ও শ্রীরামকৃষ্ণ — ছোট নরেন, বাবুরাম, পূর্ণ]

ঠাকুর ঈশ্বরপ্রেমে দিবানিশি মাতোয়ারা হইয়া আছেন। অনুক্ষণ ভাবাবিষ্ট বা সমাধিস্থ। বহির্জগতে মন আদৌ নাই। কেবল অন্তরঙ্গেরা যতদিন না আপনাদের জানিতে পারেন, ততদিন তাহাদের জন্য ব্যাকুল, — বাপ-মা যেমন অক্ষম ছেলেদের জন্য ব্যাকুল, আর ভাবেন কেমন করে এরা মানুষ হবে। অথবা পাখি যেমন শাবকদের লালন-পালন করিবার জন্য ব্যাকুল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — বলে ফেলেছি, তিনটের সময় যাব, তাই আসছি। কিন্তু ভারী ধুপ।

মাস্টার — আজ্ঞে হাঁ, আপনার বড় কষ্ট হয়েছে।

ভক্তেরা ঠাকুরকে হাওয়া করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ছোট নরেনের জন্য আর বাবুরামের জন্য এলাম। পূর্ণকে কেন আনলে না?

মাস্টার — সভায় আসতে চায় না, তার ভয় হয়, আপনি পাঁচজনের সাক্ষাতে সুখ্যাতি করেন, পাছে বাড়িতে জানতে পারে।

[পণ্ডিতদের ও সাধুদের শিক্ষা ভিন্ন – সাধুসঙ্গ]

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, তা বটে। যদি বলে ফেলি তো আর বলব না। আচ্ছা, পূর্ণকে তুমি ধর্মশিক্ষা দিচ্ছ, এ তো বেশ।

মাস্টার — তা ছাড়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বইয়েতে Selection-এ ওই কথাই১ আছে, ঈশ্বরকে দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে। এ-কথা শেখালে কর্তারা যদি রাগ করেন তো কি করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ওদের বইয়েতে অনেক কথা আছে বটে, কিন্তু যারা বই লিখেছে, তারা ধারণা করতে পারে না। সাধুসঙ্গ হলে তবে ধারণা হয়। ঠিক ঠিক ত্যাগী সাধু যদি উপদেশ দেয়, তবেই লোকে সে কথা শুনে। শুধু পণ্ডিত যদি বই লিখে বা মুখে উপদেশ দেয়, সে কথা তত ধারণা হয় না। যার কাছে গুড়ের নাগরি আছে, সে যদি রোগীকে বলে, গুড় খেয়ো না, রোগী তার কথা তত শুনে না।

“আচ্ছা, পূর্ণের অবস্থা কিরকম দেখছো? ভাব-টাব কি হয়?”

মাস্টার — কই ভাবের অবস্থা বাহিরে সেরকম দেখতে পাই না। একদিন আপনার সেই কথাটি তাকে বলেছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি কথাটি?

মাস্টার — সেই যে আপনি বলেছিলেন! — সামান্য আধার হলে ভাব সম্বরণ করতে পারে না। বড় আধার হলে ভিতরে খুব ভাব হয় কিন্তু বাহিরে প্রকাশ থাকে না। যেমন বলেছিলেন, সায়ের দীঘিতে হাতি নামলে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু ডোবাতে নামলে তোলপাড় হয়ে যায়, আর পাড়ের উপর জল উপছে পড়ে!

শ্রীরামকৃষ্ণ — বাহিরে ভাব তার তো হবে না। তার আকর আলাদা! আর আর সব লক্ষণ ভাল। কি বলো?

মাস্টার — চোখ দুটি বেশ উজ্জ্বল — যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — চোখ দুটো শুধু উজ্জ্বল হলে হয় না। তবে ঈশ্বরীয় চোখ আলাদা। আচ্ছা, তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে, তারপর (ঠাকুরের সহিত দেখার পর) কিরকম হয়েছে?

মাস্টার — আজ্ঞা হাঁ, কথা হয়েছিল। সে চার-পাঁচদিন ধরে বলছে, ঈশ্বর চিন্তা করতে গেলে, আর তাঁর নাম করতে গেলে চোখ দিয়ে জল, রোমাঞ্চ এই সব হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তবে আর কি!

ঠাকুর ও মাস্টার চুপ করিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মাস্টার কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, সে দাঁড়িয়ে আছে —

শ্রীরামকৃষ্ণ — কে?

মাস্টার — পূর্ণ, — তার বাড়ির দরজার কাছে বোধ হয় দাঁড়িয়ে আছে। আমরা কেউ গেলে দৌড়ে আসবে, এসে আমাদের নমস্কার করে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আহা! আহা!

ঠাকুর তাকিয়ায় হেলান দিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। মাস্টারের সঙ্গে একটি দ্বাদশবর্ষীয় বালক আসিয়াছে, মাস্টারের স্কুলে পড়ে, নাম ক্ষীরোদ।

মাস্টার বলিতেছেন, এই ছেলেটি বেশ! ঈশ্বরের কথায় খুব আনন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — চোখ দুটি যেন হরিণের মতো।

ছেলেটি ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল ও অতি ভক্তিভাবে ঠাকুরের পদসেবা করিতে লাগিল। ঠাকুর ভক্তদের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারকে) রাখাল বাড়িতে আছে। তারও শরীর ভাল নয়, ফোঁড়া হয়েছে। একটি ছেলে বুঝি তার হবে শুনলাম।

পল্টু ও বিনোদ সম্মুখে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পল্টুর প্রতি সহাস্যে) — তুই তোর বাবাকে কি বললি? (মাস্টারের প্রতি) — ওর বাবাকে ও নাকি জবাব করেছে, এখানে আসবার কথায়। (পল্টুর প্রতি) — তুই কি বললি?

পল্টু — বললুম, হাঁ আমি তাঁর কাছে যাই, এ কি অন্যায়? (ঠাকুর ও মাস্টারের হাস্য) যদি দরকার হয় আরো বেশি বলব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, মাস্টারের প্রতি) — না, কিগো অতদূর!

মাস্টার — আজ্ঞা না, অতদূর ভাল নয়! (ঠাকুরের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিনোদের প্রতি) — তুই কেমন আছিস? সেখানে গেলি না?

বিনোদ — আজ্ঞা, যাচ্ছিলাম — আবার ভয়ে গেলাম না! একটু অসুখ করেছে, শরীর ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — চ না সেইখানে, বেশ হাওয়া, সেরে যাবি।

ছোট নরেন আসিয়াছেন। ঠাকুর মুখ ধুইতে যাইতেছেন। ছোট নরেন গামছা লইয়া ঠাকুরকে জল দিতে গেলেন। মাস্টারও সঙ্গে সঙ্গে আছেন।

ছোট নরেন পশ্চিমের বরান্দার উত্তর কোণে ঠাকুরের পা ধুইয়া দিতেছেন, কাছে মাস্টার দাঁড়াইয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ভারী ধুপ।

মাস্টার — আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি কেমন করে ওইটুকুর ভিতর থাকো? উপরের ঘরে গরম হয়ে না?

মাস্টার — আজ্ঞা, হাঁ! খুব গরম হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাতে পরিবারের মাথার অসুখ, ঠাণ্ডায় রাখবে।

মাস্টার — আজ্ঞা, হাঁ। বলে দিয়েছি, নিচের ঘরে শুতে।

ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে আবার আসিয়া বসিয়াছেন ও মাস্টারকে বলিতেছেন, তুমি এ রবিবারেও যাও নাই কেন?

মাস্টার — আজ্ঞা, বাড়িতে তো আর কেউ নাই। তাতে আবার (পরিবারের মাথার) ব্যারাম। কেউ দেখবার নাই।

ঠাকুর গাড়ি করিয়া নিমু গোস্বামীর গলিতে দেবেন্দ্রের বাড়িতে যাইতেছেন। সঙ্গে ছোট নরেন, মাস্টার, আরও দুই-একটি ভক্ত। পূর্ণর কথা কহিতেছেন। পূর্ণর জন্য ব্যাকুল হইয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — খুব আধার! তা না হলে ওর জন্য জপ করিয়ে নিলে! ও তো এ-সব কথা জানে না।

মাস্টার ও ভক্তেরা অবাক্‌ হইয়া শুনিতেছেন যে, ঠাকুর পূর্ণর জন্য বীজমন্ত্র জপ করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আজ তাকে আনলেই হত। আনলে না কেন?

ছোট নরেনের হাসি দেখিয়া ঠাকুর ও ভক্তেরা সকলে হাসিতেছেন। ঠাকুর আনন্দে তাঁহাকে দেখাইয়া মাস্টারকে বলিতেছেন — দ্যাখো দ্যাখো, ন্যাকা ন্যাকা হাসে। যেন কিছু যানে না। কিন্তু মনের ভিতর কিছুই নাই, — তিনটেই মনে নাই — জমীন, জরু, রূপেয়া। কামিনী-কাঞ্চন মন থেকে একেবারে না গেলে ভগবানলাভ হয় না।

ঠাকুর দেবেন্দ্রের বাড়িতে যাইতেছেন। দক্ষিণেশ্বরে দেবেন্দ্রকে একদিন বলিতেছিলেন, একদিন মনে করেছি, তোমার বাড়িতে যাব। দেবেন্দ্র বলিয়াছিলেন, আমিও তাই বলবার জন্য আজ এসেছি, এই রবিবারে যেতে হবে। ঠাকুর বলিলেন, কিন্তু তোমার আয় কম, বেশি লোক বলো না। আর গাড়ি ভাড়া বড় বেশি! দেবেন্দ্র হাসিয়া বলিয়াছিলেন, তা আয় কম হলেই বা, ‘ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ’ (ধার করে ঘৃত খাবে, ঘি খাওয়া চাই)। ঠাকুর এই কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন, হাসি আর থামে না।

কিয়ৎ পরে বাড়িতে পোঁছিয়া বলিতেছেন, দেবেন্দ্র আমার জন্য খাবার কিছু করো না, অমনি সামান্য, — শরীর তত ভাল নয়।

১ "With all thy Soul love God above.
And as thyself thy neighbour love."

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ৬ই এপ্রিল 1885/04/06/ii

43.12 দেবেন্দ্রের বাড়িতে ভক্তসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রের বাড়ির বৈঠকখানায় ভক্তের মজলিশ করিয়া বসিয়া আছেন। বৈঠকখানার ঘরটি এক তলায়। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঘরে আলো জ্বলিতেছে। ছোট নরেন, রাম, মাস্টার, গিরিশ, দেবেন্দ্র, অক্ষয়, উপেন্দ্র, ইত্যাদি অনেক ভক্তেরা কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর একটি ছোকরা ভক্তকে দেখিতেছেন ও আনন্দে ভাসিতেছেন। তাহাকে উদ্দেশ করিয়া ভক্তদের বলিতেছেন, ‘তিনটে এর একেবারেই নাই! যাতে সংসারে বদ্ধ করে। জমি, টাকা আর স্ত্রী। ওই তিনটি জিনিসের উপর মন রাখতে গেলে ভগবানের উপর মনের যোগ হয় না। এ কি আবার দেখেছিল?’ (ভক্তটির প্রতি) বলত রে, কি দেখেছিলি?

[কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ ও ব্রহ্মানন্দ]

ভক্ত (সহাস্যে) — দেখলাম, কতকগুলো গুয়ের ভাঁড়, — কেউ ভাঁড়ের উপর বসে আছে, কেউ কিছু তফাতে বসে আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সংসারী লোক যারা ঈশ্বরকে ভুলে আছে, তাদের ওই দশা এ দেখেছে, তাই মন থেকে এর সব ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। কামিনী-কাঞ্চনের উপর থেকে যদি মন চলে যায়, আর ভাবনা কি!

“উঃ! কি আশ্চর্য! আমার তো কত জপ-ধ্যান করে তবে গিয়েছিল। এর একেবারে এত শীঘ্র কেমন করে মন থেকে ত্যাগ হলো! কাম চলে যাওয়া কি সহজ ব্যাপার! আমারই ছয়মাস পরে বুক কি করে এসেছিল! তখন গাছতলায় পড়ে কাঁদতে লাগলাম! বললাম, মা! যদি তা হয়, তাহলে গলায় ছুরি দিব!

(ভক্তদের প্রতি) — “কামিনী-কাঞ্চন যদি মন থেকে গেল, তবে আর বাকী কি রইল? তখন কেবল ব্রহ্মানন্দ।”

শশী তখন সবে ঠাকুরের কাছে যাওয়া-আসা করিতেছেন। তিনি তখন বিদ্যাসাগরের কলেজে বি. এ. প্রথম বৎসর পড়েন। ঠাকুর এইবার তাঁহার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — সেই যে ছেলেটি যায়, কিছুদিন তার টাকায় মন এক-একবার উঠবে দেখেছি। কিন্তু কয়েটির দেখেছি আদৌ উঠবে না। কয়েকটি ছোকরা বিয়ে করবে না।

ভক্তেরা নিঃশব্দে শুনিতেছেন।

[অবতারকে কে চিনতে পারে?]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — মন থেকে কামিনী-কাঞ্চন সব না গেলে অবতারকে চিনতে পারা কঠিন। বেগুনওলাকে হীরার দাম জিজ্ঞাসা করেছিল, সে বললে, আমি এর বদলে নয় সের বেগুন দিতে পারি, এর একটাও বেশি দিতে পারি না। (সকলের হাস্য ও ছোট নরেনের উচ্চহাস্য)

ঠাকুর দেখিলেন, ছোট নরেন কথার মর্ম ফস করিয়া বুঝিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এর কি সূক্ষ্মবুদ্ধি! ন্যাংটা এইরকম ফস্ করে বুঝে নিত — গীতা, ভাগবত, যেখানে যা, সে বুঝে নিত।

[কৌমারবৈরাগ্য আশ্চর্য — বেশ্যার উদ্ধার কিরূপে হয়]

শ্রীরামকৃষ্ণ — ছেলেবেলা থেকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ, এটি খুব আশ্চর্য। খুব কম লোকের হয়! তা না হলে যেমন শিল-খেকো আম — ঠাকুরের সেবায় লাগে না — নিজে খেতে ভয় হয়।

“আগে অনেক পাপ করেছে, তারপর বুড়ো বয়সে হরিনাম করছে এ মন্দের ভাল।

“অমুক মল্লিকের মা, খুব বড় মানুষের ঘরের মেয়ে! বেশ্যাদের কথায় জিজ্ঞাসা করলে, ওদের কি কোন মতে উদ্ধার হবে না? নিজে আগে আগে অনেকরকম করেছে কি না! তাই জিজ্ঞাসা করলে। আমি বললুম, হাঁ, হবে — যদি আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে কাঁদে, আর বলে আর করবো না। শুধু হরিনাম করলে কি হবে, আন্তরিক কাঁদতে হবে!”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ৬ই এপ্রিল 1885/04/06/iii

43.13 দেবেন্দ্র-ভবনে ঠাকুর কীর্তনানন্দে ও সমাধিমন্দিরে

এইবার খোল-করতাল লইয়া সংকীর্তন হইতেছে। কীর্তনিয়া গাহিতেছেন:

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটিরে,

অপরূপ জ্যোতিঃ, শ্রীগৌরাঙ্গ মূরতি,

দুনয়নে প্রেম বহে শতধারে।

গৌর মত্তমাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়,

কভু ধরাতে লুঠায়, নয়নজলে ভাসে রে,

কাঁদে আর বলে হরি, স্বর্গ-মর্ত্য ভেদ করি, সিংহরবে রে,

আবার দন্তে তৃণ লয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে,

দাস্য মুক্তি যাচেন দ্বারে দ্বারে ।।

কিবা মুড়ায়ে চাঁচর কেশ, ধরেছেন যোগীর বেশ,

দেখে ভক্তি প্রেমাবেশ, প্রাণ কেঁদে উঠে রে।

জীবের দুঃখে কাতর হয়ে, এলেন সর্বস্ব ত্যজিয়ে,

প্রেম বিলাতে রে,

প্রেমদাসের বাঞ্ছা মনে, শ্রীচৈতন্যচরণে,

দাস হয়ে বেড়াই দ্বারে দ্বারে ।।

ঠাকুর গান শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। কীর্তনীয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহবিধুরা ব্রজগোপীর অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

ব্রজগোপী মাধবীকুঞ্জে মাধবের অন্বেষণ করিতেছেন —

রে মাধবী! আমার মাধব দে!

(দে দে দে, মাধব দে!)

আমার মাধব আমায় দে, দিয়ে বিনামূল্যে কিনে নে।

মীনের জীবন, জীবন যেমন, আমার জীবন মাধব তেমন।

(তুই লুকাইয়ে রেখেছিস, ও মাধবী!)

(অবলা সরলা পেয়ে!) (আমি বাঁচি না, বাঁচি না)

(মাধবী, ও মাধবী, মাধব বিনে) (মাধব অদর্শনে)।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে আখর দিতেছেন, —

(সে মথুরা কতদূর! যেখানে আমার প্রাণবল্লভ!)

ঠাকুর সমাধিস্থ! স্পন্দহীন দেহ! অনেকক্ষণ স্থির রহিয়াছেন।

ঠাকুর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ; কিন্তু এখনও ভাবাবিষ্ট। এই অবস্থায় ভক্তদের কথা বলিতেছেন। মাঝে মাঝে মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ) — মা! তাকে টেনে নিও, আমি আর ভাবতে পারি না! (মাস্টারের প্রতি) তোমার সম্বন্ধী — তার দিকে একটু মন আছে।

(গিরিশের প্রতি) — "তুমি গালাগাল, খারাপ কথা, অনেক বল; তা হউক ওসব বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। বদরক্ত রোগ কারু কারুর আছে। যত বেরিয়ে যায় ততই ভাল।

"উপাধি নাশের সময়ই শব্দ হয়। কাঠ পোড়াবার সময় চড়চড় শব্দ করে। সব পুড়ে গেলে আর শব্দ থাকে না।

"তুমি দিন দিন শুদ্ধ হবে। তোমার দিন দিন খুব উন্নতি হবে। লোকে দেখে অবাক্ হবে। আমি বেশি আসতে পারবো না, — তা হউক, তোমার এমনিই হবে।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব আবার ঘনীভূত হইতেছে। আবার মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন, "মা! যে ভাল আছে তাকে ভাল করতে যাওয়া কি বাহাদুরি? মা! মরাকে মেরে কি হবে? যে খাড়া হয়ে রয়েছে তাকে মারলে তবে তো তোমার মহিমা!"

ঠাকুর কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া হঠাৎ একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন — "আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে এসেছি। যাচ্ছি গো মা!"

যেন একটি ছোট ছেলে দূর হইতে মার ডাক শুনিয়া উত্তর দিতেছে! ঠাকুর আবার নিস্পন্দ দেহ, সমাধিস্থ বসিয়া আছেন। ভক্তেরা অনিমেষলোচনে নিঃশব্দে দেখিতেছেন।

ঠাকুর ভাবে আবার বলছেন, “আমি লুচি আর খাব না।”

পাড়া হইতে দুই-একটি গোস্বামী আসিয়াছিলেন — তাঁহারা উঠিয়া গেলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ৬ই এপ্রিল 1885/04/06/iv

43.14 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রের বাটীতে ভক্তসঙ্গে

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আনন্দে কথাবার্তা কহিতেছেন। চৈত্র মাস, বড় গরম! দেবেন্দ্র কুলপি বরফ তৈয়ার করিয়াছেন। ঠাকুরকে ও ভক্তেদর খাওয়াইতেছেন। ভক্তরাও কুলপি খাইয়া আনন্দ করিতেছেন। মণি আস্তে আস্তে বলছেন, ‘এন্‌কোর! এন্‌কোর!’ (অর্থাৎ আরও কুলপি দাও) ও সকলে হাসিতেছেন। কুলপি দেখিয়া ঠাকুরের ঠিক বালকের ন্যায় আনন্দ হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বেশ কীর্তন হল! গোপীদের অবস্থা বেশ বললে — ‘রে মাধবী, আমার মাধব দে।’ গোপীদের প্রেমোন্মাদের অবস্থা। কি আশ্চর্য! কৃষ্ণের জন্য পাগল!

একজন ভক্ত আর একজনকে দেখাইয়া বলিতেছেন — এঁর সখীভাব — গোপীভাব।

রাম বলিতেছেন — এঁর ভিতর দুইই আছে। মধুরভাব আবার জ্ঞানের কঠোর ভাবও আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি গা?

ঠাকুর এইবার সুরেন্দ্রের কথা কহিতেছেন।

রাম — আমি খবর দিছলাম, কই এলো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কর্ম থেকে এসে আর পারে না।

একজন ভক্ত — রামবাবু আপনার কথা লিখছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্য) — কি লিখেছে?

ভক্ত — পরমহংসের ভক্তি — এই বলে একটি বিষয় লিখছেন — ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তবে আর কি, রামের খুব নাম হবে।

গিরিশ (সহাস্যে) — সে আপনার চেলা বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমার চেলা-টেলা নাই। আমি রামের দাসানুদাস।

পাড়ার লোকেরা কেহ কেহ আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের দেখিয়া ঠাকুরের আনন্দ হয় নাই। ঠাকুর একবার বলিলেন, “এ কি পাড়া! আখানে দেখছি কেউ নাই।”

দেবেন্দ্র এইবার ঠাকুরকে বাড়ির ভিতর লইয়া যাইতেছেন। সেখানে ঠাকুরকে জল খাওয়াইবার হইয়াছে। ঠাকুর ভিতরে গেলেন। ঠাকুর সহাস্যবদনে বাড়ির ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিলেন ও আবার বৈঠকখানায় উপবিষ্ট হইলেন। ভক্তেরা কাছে বসিয়া আছেন। উপেন্দ্র১ ও অক্ষয়২ ঠাকুরের দুই পার্শ্বে বসিয়া পদসেবা করিতেছেন। ঠাকুর দেবেন্দ্রের বাড়ির মেয়েদের কথা বলিতেছেন — “বেশ মেয়েরা, পাড়াগেঁয়ে মেয়ে কি না। খুব ভক্তি!”

ঠাকুর আত্মারাম? নিজের আনন্দে গান গাহিতেছেন! কি ভাবে গান গাহিতেছেন? নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহার কি ভাবোল্লাস হইল? তাই কি গান কয়টি গাহিতেছেন?

গান - সহজ মানুষ না হলে সজকে না যায় চেনা।

গান - দরবেশ দাঁড়ারে, সাধের করওয়া কিস্তিধারী।

দাঁড়ারে, ও তোর ভাব (রূপ) নেহারি ।।

গান - এসেছেন এক ভাবের ফকির।

(ও সে) হিঁদুর ঠাকুর, মুসলমানর পীর ।।

গিরিশ ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরও গিরিশকে নমস্কার করিলেন।

দেবেন্দ্রাদি ভক্তেরা ঠাকুরকে গাড়িতে তুলিয়া দিলেন।

দেবেন্দ্র বৈঠকখানার দক্ষিণ উঠানে আসিয়া দেখেন যে, তক্তপোশের উপর তাঁহার পাড়ার একটি লোক এখনও নিদ্রিত রহিয়াছেন। তিনি বলিলেন, “উঠ, উঠ”। লোকটি চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠে বলছেন, “পরমহংসদেব কি এসেছেন?” সকলে হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। লোকটি ঠাকুরের আসিবার আগে আসিয়াছিলেন, ঠাকুরকে দেখিবার জন্য। গরম বোধ হওয়াতে উঠানের তক্তপোশে মাদুর পাতিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছেন। গাড়িতে মাস্টারকে আনন্দে বলিতেছেন — “খুব কুলপি খেয়েছি! তুমি (আমার জন্য) নিয়ে যেও গোটা চার-পাঁচ।” ঠাকুর আবার বলছেন, “এখন এই কটি ছোকরার উপর মন টানছে, — ছোট নরেন, পূর্ণ আর তোমার সম্বন্ধী।”

মাস্টার — দ্বিজ?

শ্রীরামকৃষ্ণ — না, দ্বিজ তো আছে। তার বড়টির উপর মন যাচ্ছে।

মাস্টার — ওঃ।

ঠাকুর আনন্দে গাড়িতে যাইতেছেন।

১ শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরের ভক্ত ও “বসুমতীর” স্বত্বাধিকারী।

২ শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন, ঠাকুরের ভক্ত ও কবি। ইনিই “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি” লিখিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতী ময়নাপুর গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c44 ৪৪ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১২ই এপ্রিল 1885/04/12/i

44.1 ঠাকুরের নিজ মুখে কথিত সাধনা বিবরণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় শ্রীযুক্ত বলরামের বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। গিরিশ, মাস্টার, বলরাম — ক্রমে ছোট নরেন, পল্টু, দ্বিজ, পূর্ণ, মহেন্দ্র মুখুজ্জে ইত্যাদি — অনেক ভক্ত উপস্থিত আছেন। ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য সান্যাল, জয়গোপাল সেন প্রভৃতি অনেক ভক্ত আসিলেন। মেয়ে ভক্তেরা অনেকেই আসিয়াছেন। তাঁহারা চিকের আড়ালে বসিয়া ঠাকুরের দর্শন করিতেছেন। মোহিনীর পরিবারও আসিয়াছেন — পুত্রশোকে উন্মাদের ন্যায় — তিনি ও তাঁহার ন্যায় সন্তপ্ত অনেকেই আসিয়াছেন, এই বিশ্বাস যে ঠাকুরের কাছে নিশ্চই শান্তিলাভ হইবে।

আজ ১লা বৈশাখ, চৈত্র কৃষ্ণা ত্রয়োদশী, ১২ই এপ্রিল, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, বেলা ৩টা হইবে।

মাস্টার আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুর ভক্তের মজলিস করিয়া বসিয়া আছেন ও নিজের সাধনা বিবরণ ও নানাবিধ আধ্যাত্মিক অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। মাস্টার আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — সে সময় (সাধনার সময়ে) ধ্যানে দেখতে পেতাম, সত্য সত্য একজন কাছে শূল হাতে করে বসে আছে। ভয় দেখাচ্ছে — যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন না রাখি শূলের বাড়ি আমায় মারবে। ঠিক মন না হলে বুক যাবে।

[নিত্য-লীলাযোগ — পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেকযোগ]

“কখনও মা এমন অবস্থা করে দিতেন যে, নিত্য থেকে মন লীলায় নেমে আসত। আবার কখনও লীলা থেকে নিত্যে মন উঠে যেত।

“যখন লীলায় মন নেমে আসত কখনও সীতারামকে রাতদিন চিন্তা করতাম। আর সীতারামের রূপ সর্বদা দর্শন হত — রামলালকে (রামের অষ্টধাতু নির্মিত ছোট বিগ্রহ) নিয়ে সর্বদা বেড়াতাম, কখনও খাওয়াতাম। আবার কখনও রাধাকৃষ্ণের ভাবে থাকতাম। ওই রূপ সর্বদা দর্শন হত। আবার কখনও গৌরাঙ্গের ভাবে থাকতাম, দুই ভাবের মিলন — পুরুষ ও প্রকৃতি ভাবের মিলন। এ অবস্থায় সর্বদাই গৌরাঙ্গের রূপ দর্শন হত। আবার অবস্থা বদলে গেল! সজনে তুলসী সব এক বোধ হতে লাগল। ঈশ্বরীয় রূপ আর ভাল লাগল না। বললাম, ‘কিন্তু তোমাদের বিচ্ছেদ আছে।’ তখন তাদের তলায় রাখলাম। ঘরে যত ঈশ্বরীয় পট বা ছবি ছিল সব খুলে ফেললাম। কেবল সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সেই আদি পুরুষকে চিন্তা করতে লাগলাম। নিজে দাসীভাবে রইলুম — পুরুষের দাসী।

“আমি সবরকম সাধন করেছি। সাধনা তিন প্রকার — সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক। সাত্ত্বিক সাধনায় তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকে বা তাঁর নামটি শুদ্ধ নিয়ে থাকে। আর কোন ফলাকাঙ্খা নাই। রাজসিক সাধনে নানারকম প্রক্রিয়া — এতবার পুরশ্চরণ করতে হবে, এত তীর্থ করতে হবে, পঞ্চতপা করতে হবে; ষোড়শোপচারে পূজা করতে হবে ইত্যাদি। তামসিক সাধন — তমোগুণ আশ্রয় করে সাধন। জয় কালী! কি, তুই দেখা দিবিনি! এই গলায় ছুরি দেব যদি দেখা না দিস। এ সাধনায় শুদ্ধাচার নাই — যেমন তন্ত্রের সাধন।

“সে অবস্থায় (সাধনার অবস্থায়) অদ্ভুত সব দর্শন হত, আত্মার রমণ প্রত্যক্ষ দেখলাম। আমার মতো রূপ একজন আমার শরীরের ভিতর প্রবেশ করলে! আর ষট্‌পদ্মের প্রত্যেক পদ্মের সঙ্গে রমণ করতে লাগল। ষট্‌পদ্ম মুদিত হয়েছিল — টক টক করে রমণ করে আর একটি পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় — আর ঊর্ধ্বমুখ হয়ে যায়! এইরূপে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাপদ্ম, সহস্রার সকল পদ্মগুলি ফুটে উঠল। আর নিচে মুখ ছিল ঊর্ধ্বমুখ হল, প্রত্যক্ষ দেখলাম।”

[ধ্যানযোগ সাধনা — ‘নিবাত নিষ্কম্পমিবপ্রদীপম্‌’]

“সাধনার সময় আমি ধ্যান করতে করতে আরোপ করতাম প্রদীপের শিখা — যখন হাওয়া নাই, একটুও নড়ে না — তার আরোপ করতাম।

“গভীর ধ্যানে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়। একজন ব্যাধ পাখি মারবার জন্য তাগ করছে। কাছ দিয়ে বর চলে যাচ্ছে, সঙ্গে বরযাত্রীরা, কত রোশনাই, বাজনা, গাড়ি, ঘোড়া — কতক্ষণ ধরে কাছ দিয়ে চলে গেল। ব্যাধের কিন্তু হুঁশ নাই। সে জানতে পারলো না যে কাছ দিয়ে বর চলে গেল।

“একজন একলা একটি পুকুরের ধারে মাছ ধরছে। অনেকক্ষণ পরে ফাতনাটা নড়তে লাগল, মাঝে মাঝে কাত হতে লাগল। সে তখন ছিপ হাতে করে টান মারবার উদ্যোগ করছে। এমন সময় একজন পথিক কাছে এসে জিজ্ঞাসা করছে, মহাশয়, অমুক বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ি কোথায় বলতে পারেন? সে ব্যক্তির হুঁশ নাই। তার হাত কাঁপছে, কেবল ফাতনার দিকে দৃষ্টি। তখন পথিক বিরক্ত হয়ে চলে গেল। সে অনেক দূরে চলে গেছে, এমন সময় ফাতনাটা ডুবে গেল, আর

ও ব্যক্তি টান মেরে মাছটাকে আড়ায় তুললে। তখন গামছা দিয়ে মুখ পুঁছে, চিৎকার করে পথিককে ডাকছে — ওহে — শোনা — শোনো! পথিক ফিরতে চায় না, অনেক ডাকাডাকির পর ফিরল। এসে বলছে, কেন মহাশয়, আবার ডাকছ কেন? তখন সে বললে, তুমি আমায় কি বলছিলে? পথিক বললে, তখন অতবার করে জিজ্ঞাসা করলুম — আর এখন বলছো কি বললে! সে বললে, তখন যে ফাতনা ডুবছিল, তাই আমি কিছুই শুনতে পাই নাই।

“ধ্যানে এইরূপ একাগ্রতা হয়, অন্য কিছু দেখা যায় না শোনাও যায় না। স্পর্শবোধ পর্যন্ত হয় না। সাপ গায়ের উপর দিয়ে চলে যায়, জানতে পারে না। যে ধ্যান করে সেও বুঝতে পারে না — সাপটাও জানতে পারে না।

“গভীর ধ্যানে ইন্দ্রিয়ের সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মন বহির্মুখ থাকে না — যেন বার-বাড়িতে কপাট পড়লো। ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়! রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ — বাহিরে পড়ে থাকবে।

“ধ্যানের সময় প্রথম প্রথম ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল সামনে আসে — গভীর ধ্যানে সে সকল আর আসে না — বাহিরে পড়ে থাকে। ধ্যান করতে করতে আমার কত কি দর্শন হত। প্রতক্ষ দেখলাম — সামনে টাকার কাঁড়ি, শাল, একথালা সন্দেশ, দুটো মেয়ে, তাদের ফাঁদী নথ। মনকে জিজ্ঞাসা করলাম আবার — মন তুই কি চাস? মন বললে, ‘না, কিছুই চাই না। ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছুই চাই না।’ মেয়েদের ভিতর-বার সমস্ত দেখতে পেলাম — যেমন, কাচের ঘরে

সমস্ত জিনিস বার থেকে দেখা যায়! তাদের ভিতরে দেখলাম — নাড়ীভুঁড়ি, রক্ত, বিষ্ঠা, কৃমি, কফ, নাল, প্রস্রাব এই সব!”

[অষ্টসিদ্ধি ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ — গুরুগিরি ও বেশ্যাবৃত্তি]

শ্রীযুক্ত গিরিশ ঠাকুরের নাম করিয়া ব্যারাম ভাল করিব — এই কথা মাঝে মাঝে বলিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশ প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি) — যারা হীনবুদ্ধি তারা সিদ্ধাই চায়। ব্যারাম ভাল করা, মোকদ্দমা জিতানো, জলে হেঁটে চলে যাওয়া — এই সব। যারা শুদ্ধভক্ত তারা ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া কিছুই চায় না। হৃদে একদিন বললে ‘মামা! মার কাছে কিছু শক্তি চাও, কিছু সিদ্ধাই চাও।’ আমার বালকের স্বভাব — কালীঘরে জপ করবার সময় মাকে বললাম, মা হৃদে বলছে কিছু সিদ্ধাই চাইতে। অমনি দেখিয়ে দিলে সামনে এসে পেছন ফিরে উবু হয়ে বসলো — একজন বুড়ো বেশ্যা, চল্লিশ বছর বয়স — ধামা পোঁদ — কালাপেড়ে কাপড় পরা — পড় পড় করে হাগছে! মা দেখিয়ে দিলেন যে, সিদ্ধাই এই বুড়ো বেশ্যার বিষ্ঠা! তখন হৃদেকে গিয়ে বকলাম আর বললাম, তুই কেন আমায় এরূপ কথা শিখিয়ে দিলি। তোর জন্যই তো আমার এরূপ হল!

“যাদের একটু সিদ্ধাই থাকে তাদের প্রতিষ্ঠা, লোকমান্য এই সব হয়। অনেকের ইচ্ছা হয় গুরুগিরি করি — পাঁচজনে গণে মানে — শিষ্য-সেবক হয়; লোকে বলবে, গুরুচরণের ভাইয়ের আজকাল বেশ সময় — কত লোক আসছে যাচ্ছে — শিষ্য-সেবক অনেক হয়েছে — ঘরে জিনিসপত্র থইথই করছে! —

কত জিনিস কত লোক এনে দিচ্ছে — সে যদি মনে করে — তার এমন শক্তি হয়েছে যে, কত লোককে খাওয়াতে পারে।

“গুরুগিরি বেশ্যাগিরির মতো। — ছার টাকা-কড়ি, লোকমান্য হওয়া, শরীরের সেবা, এই সবের জন্য আপনাকে বিক্রি করা। যে শরীর মন আত্মার দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, সেই শরীর মন আত্মাকে সামান্য জিনিসের জন্য এরূপ করে রাখা ভাল নয়।১ একজন বলেছিল, সাবির এখন খুব সময় — এখন তার বেশ হয়েছে — একখানা ঘরভাড়া নিয়েছে — ঘুঁটে রে, গোবর রে, তক্তপোশ, দুখানা বাসন হয়েছে, বিছানা, মাদুর, তাকিয়া — কতলোক বশীভূত, যাচ্ছে আসছে! অর্থাৎ সাবি এখন বেশ্যা হয়েছে তাই সুখ ধরে না! আগে সে ভদ্রলোকের বাড়ির দাসী ছিল, এখন বেশ্যা হয়েছে! সামান্য জিনিসের জন্য নিজের সর্বনাশ!”

[শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় প্রলোভন (Temptation) — ব্রহ্মজ্ঞান ও অভেদবুদ্ধি]

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মুসলমান ধর্ম

“সাধনার সময় ধ্যান করতে করতে আমি আরও কত কি দেখতাম। বেলতলায় ধ্যান করছি, পাপপুরুষ এসে কতরকম লোভ দেখাতে লাগল। লড়ায়ে গোরার রূপ ধরে এসেছিল। টাকা, মান, রমণ সুখ নানারকম শক্তি, এই সব দিতে চাইলে। আমি মাকে ডাকতে লাগলাম। বড় গুহ্যকথা। মা দেখা দিলেন, তখন আমি বললাম, মা ওকে কেটে ফেলো। মার সেই রূপ — সেই ভুবনমোহন রূপ — মনে পড়ছে। কৃষ্ণময়ীর২ রূপ! — কিন্তু চাউনীতে যেন জগৎটা নড়ছে!”

ঠাকুর চুপ করিলেন। ঠাকুর আবার বলিতেছেন — "আরও কত কি বলতে দেয় না! — মুখ যেন কে আটকে দেয়!

"সজনে তুলসী এক বোধ হত! ভেদ-বুদ্ধি দূর করে দিলেন। বটতলায় ধ্যান করছি, দেখালে একজন দেড়ে মুসলমান (মোহম্মদ) সানকি করে ভাত নিয়ে সামনে এল। সানকি থেকে ম্লেচ্ছদের খাইয়ে আমাকে দুটি দিয়ে গেল। মা দেখালেন, এক বই দুই নাই। সচ্চিদানন্দই নানারূপ ধরে রয়েছেন। তিনিই জীবজগৎ সমস্তই হয়েছেন। তিনিই অন্ন হয়েছেন।"

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বালকভাব ও ভাবাবেশ]

(গিরিশ, মাস্টার প্রভৃতির প্রতি) — "আমার বালক স্বভাব। হৃদে বললে, মামা, মাকে কিছু শক্তির কথা বলো, — অমনি মাকে বলতে চললাম! এমনি অবস্থায় রেখেছে যে, যে ব্যক্তি কাছে থাকবে তার কথা শুনতে হয়। ছোট ছেলের যেমন কাছে লোক না থাকলে অন্ধকার দেখে — আমারও সেইরূপ হত! হৃদে কাছে না থাকলে প্রাণ যায় যায় হত! ওই দেখো ওই ভাবটা আসছে! — কথা কইতে কইতে উদ্দীপন হয়।"

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। দেশ কাল বোধ চলিয়া যাইতেছে। অতি কষ্টে ভাব সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ভাবে বলিতেছেন, "এখনও তোমাদের দেখছি, — কিন্তু বোধ হচ্ছে যেন চিরকাল তোমরা বসে আছ, কখন এসেছ, কোথায় এসেছ এ-সব কিছু মনে নাই।"

ঠাকুর কিয়ৎকাল প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন, “জল খাব।” সমাধিভঙ্গের পর মন নামাইবার জন্য ঠাকুর এই কথা প্রায় বলিয়া থাকেন। গিরিশ নূতন আসিতেছেন, জানেন না তাই জল আনিতে উদ্যত হইলেন। ঠাকুর বারণ করিতেছেন আর বলিতেছেন, “না বাপু, এখন খেতে পারব না।” ঠাকুর ও ভক্তগণ ক্ষণকাল চুপ করিয়া আছেন। এইবার ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — হ্যাঁগা, আমার কি অপরাধ হল? এ-সব (গুহ্য) কথা বলা?

মাস্টার কি বলিবেন চুপ করিয়া আছেন। তখন ঠাকুর আবার বলিতেছেন, “না, অপরাধ কেন হবে, আমি লোকের বিশ্বাসের জন্য বলেছি।” কিয়ৎ পরে যেন কত অনুনয় করিয়া বলিতেছেন, “ওদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে?” (অর্থাৎ পূর্ণের সঙ্গে)

মাস্টার (সঙ্কুচিতভাবে) — আজ্ঞে, এক্ষণই খবর পাঠাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সাগ্রহে) — ওইখানে খুঁটে মিলছে।

ঠাকুর কি বলিতেছেন যে অন্তরঙ্গ ভক্তদের ভিতর পূর্ণ শেষ ভক্ত, তাঁহার পর প্রায় কেহ নাই?

১ নাত্মানমবসাদয়েৎ।

২ কৃষ্ণময়ী — বলরামের বালিকা কন্যা

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১২ই এপ্রিল 1885/04/12/ii

44.2 পূর্বকথা — শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাব — ব্রাহ্মণীর সেবা

গিরিশ, মাস্টার প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া ঠাকুর নিজের মহাভাবের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — সে অবস্থার পরে আনন্দও যেমন, আগে যন্ত্রণাও তেমনি। মহাভাব ঈশ্বরের ভাব — এই দেহ-মনকে তোলপাড় করে দেয়! যেন একটা বড় হাতি কুঁড়ে ঘরে ঢুকেছে। ঘর তোলপাড়! হয়তো ভেঙেচুড়ে যায়!

"ঈশ্বরের বিরহ-অগ্নি সামান্য নয়। রূপসনাতন যে গাছের তলায় বসে থাকতেন ওই অবস্থা হলে এইরকম আছে যে, গাছের পাতা ঝলসা-পোড়া হয়ে যেত! আমি এই অবস্থায় তিনদিন অজ্ঞান হয়ে ছিলাম। নড়তে-চড়তে পারতাম না, এক জায়গায় পড়েছিলাম। হুঁশ হলে বামনী আমায় ঘরে স্নান করাতে নিয়ে গেল। কিন্তু হাত দিয়ে গা ছোঁবার জো ছিল না। গা মোটা চাদর দিয়ে ঢাকা। বামনী সেই চাদরের উপর হাত দিয়ে আমায় ধরে নিয়ে গিছল। গায়ে যে সব মাটি লেগেছিল, পুড়ে গিছল!

“যখন সেই অবস্থা আসত শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে যেন ফাল চালিয়ে যেত! ‘প্রাণ যায়, প্রাণ যায়’ এই করতাম। কিন্তু তারপরে খুব আনন্দ!”

ভক্তেরা এই মহাভাবের অবস্থা বর্ণনা অবাক্‌ হইয়া শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি) — এতদুর তোমাদের দরকার নাই। আমার ভাব কেবল নজিরের জন্য। তোমরা পাঁচটা নিয়ে আছ, আমি একটা নিয়ে আছি। আমার ঈশ্বর বই কিছু ভাল লাগে না। তাঁর ইচ্ছে। (সহাস্যে) একডেলে গাছও আছে আবার পাঁচডেলে গাছও আছে। (সহলের হাস্য)

“আমার অবস্থা নজিরের জন্য। তোমরা সংসার করো, অনাসক্ত হয়ে। গায়ে কাদা লাগবে কিন্তু ঝেড়ে ফেলবে, পাঁকাল মাছের মতো। কলঙ্কসাগরে সাঁতার দেবে — তবু গায়ে কলঙ্ক লাগবে না।”

গিরিশ (সহাস্যে) — আপনারও তো বিয়ে আছে। (হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্য) — সংস্কারের জন্য বিয়ে করতে হয়, কিন্তু সংসার আর কেমন করে হবে! গলায় পৈতে পরিয়ে দেয় আবার খুলে খুলে পড়ে যায় — সামলাতে পারি নাই। একমতে আছে, শুকদেবের বিয়ে হয়েছিল — সংস্কারের জন্য। একটি কন্যাও নাকি হয়েছিল। (সকলের হাস্য)

“কামিনী-কাঞ্চনই সংসার — ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।”

গিরিশ — কামিনী-কাঞ্চন ছাড়ে কই?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, বিবেকের জন্য প্রার্থনা কর। ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য — এরই নাম বিবেক! জল-ছাঁকা দিয়ে জল ছেঁকে নিতে হয়। ময়লাটা একদিকে পড়ে — ভাল জল একদিকে পড়ে, বিবেকরূপ জল-ছাঁকা আরোপ করো। তোমরা তাঁকে জেনে সংসার করো। এরই নাম বিদ্যার সংসার।

“দেখ না, মেয়ে-মানুষের কি মোহিনী শক্তি, অবিদ্যারূপিণী মেয়েদের। পুরুষগুলোকে যেন বোকা অপদার্থ করে রেখে দেয়। যখনই দেখি স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে বসে আছে, তখন বলি, আহা! এরা গেছে। (মাস্টারের দিকে তাকাইয়া) — হারু এমন সুন্দর ছেলে, তাকে পেতনীতে পেয়েছে! — ‘ওরে হারু কোথা গেল’, ‘ওরে হারু কোথা গেল’। সব্বাই গিয়ে দেখে হারু বটতলায় চুপ করে বসে আছে। সে রূপ নাই, সে তেজ নাই, সে আনন্দ নাই! বটগাছের পেতনীতে হারুকে পেয়েছে।

“স্ত্রী যদি বলে ‘যাও তো একবার’ — অমনি উঠে দাঁড়ায়, ‘বসো তো’ — আমনি বসে পড়ে।

“একজন উমেদার বড়বাবুর কাছে আনাগোনা করে হায়রান হয়েছে। কর্ম আর হয় না। আফিসের বড়বাবু। তিনি বলেন, এখন খালি নাই, মাঝে মাঝে এসে দেখা করো। এইরূপে কতকাল কেটে গেল — উমেদার হতাশ হয়ে গেল। সে একজন বন্ধুর কাছে দুঃখ করছে। বন্ধু বললে তোর যেমন বুদ্ধি। — ওটার কাছে আনাগোনা করে পায়ের বাঁধন ছেঁড়া কেন? তুই গোলাপকে ধর, কালই তোর কর্ম হবে। উমেদার বললে, বটে! — আমি এক্ষণি চললুম। গোলাপ বড়বাবুর রাঁড়।

উমেদার দেখা করে বললে, মা, তুমি এটি না করলে হবে না — আমি মহাবিপদে পড়েছি। ব্রাহ্মণের ছেলে আর কোথায় যাই! মা, অনেকদিন কাজকর্ম নাই, ছেলেপুলে না খেতে পেয়ে মারা যায়। তুমি একটি কথা বলে দিলেই আমার একটি কাজ হয়। গোলাপ ব্রাহ্মণের ছেলেকে বললে, বাছা, কাকে বললে হয়? আর ভাবতে লাগল, আহা, ব্রাহ্মণের ছেলে বড় কষ্ট পাচ্ছে! উমেদার বললে, বড়বাবুকে একটি কথা বললে আমার নিশ্চয় একটা কর্ম হয়। গোলাপ বললে, আমি আজই বড়বাবুকে বলে ঠিক করে রাখব। তার পরদিন সকালে উমেদারের কাছে একটি লোক গিয়ে উপস্থিত; সে বললে, তুমি আজ থেকেই বড়বাবুর আফিসে বেরুবে। বড়বাবু সাহেবকে বললে, ‘এ ব্যক্তি বড় উপযুক্ত লোক। একে নিযুক্ত করা হয়েছে, এর দ্বারা আফিসের বিশেষ উপকার হবে।’

“এই কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে সকলে ভুলে আছে। আমার কিন্তু ও-সব ভাল লাগে না — মাইরি বলছি, ঈশ্বর বই আর কিছুই জানি না।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১২ই এপ্রিল 1885/04/12/iii

44.3 সত্যকথা কলির তপস্যা — ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি

একজন ভক্ত — মহাশয়, নব-হুল্লোল বলে এক মত বেরিয়েছে। শ্রীযুক্ত ললিত চাটুজ্যে তার ভিতর আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — নানা মত আছে। মত পথ। কিন্তু সব্বাই মনে করে, আমার মতই ঠিক — আমার ঘড়ি ঠিক চলছে।

গিরিশ (মাস্টারের প্রতি) — পোপ কি বলেন? It is with our judgements ইত্যাদি১।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — এর মানে কি গা?

মাস্টার — সব্বাই মনে করে, আমার ঘড়ি ঠিক যাচ্ছে, কিন্তু ঘড়িগুলো পরস্পর মেলে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তবে অন্য ঘড়ি যত ভুল হউক না, সূর্য কিন্তু ঠিক যাচ্ছে। সেই সূর্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয়।

একজন ভক্ত — অমুকবাবু বড় মিথ্যা কথা কয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সত্যকথা কলির তপস্যা। কলিতে অন্য তপস্যা কঠিন। সত্যে থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায়। তুলসীদাস বলেছে, ‘সত্যকথা, অধীনতা, পরস্ত্রী মাতৃসমান — এইসে হরি না মিলে তুলসী ঝুট জবান্।’

“কেশব সেন বাপের ধার মেনেছিল, অন্য লোক হলে কখনও মানতো না, একে লেখাপড়া নাই। জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রের সমাজে গিয়ে দেখলাম, কেশব সেন

বেদীতে বসে ধ্যান করছে। তখন ছোকরা বয়েস। আমি সেজোবাবুকে বললাম, যতগুলি ধ্যান করছে এই ছোকরার ফতা (ফাত্‌না) ডুবেছে, — বড়শির কাছে মাছ এসে ঘুরছে।

"একজন —— তার নাম করবো না —— সে দশহাজার টাকার জন্য আদালতে মিথ্যা কথা কয়েছিল। জিতবে বলে আমাকে দিয়ে মা-কালীকে অর্ঘ্য দেওয়ালে। আমি বালকবুদ্ধিতে অর্ঘ্য দিলুম! বলে, বাবা এই অর্ঘটি মাকে দাও তো!"

ভক্ত —— আচ্ছা লোক!

শ্রীরামকৃষ্ণ —— কিন্তু এমনি বিশ্বাস আমি দিলেই মা শুনবেন!

ললিতবাবুর কথায় ঠাকুর বলিতেছেন ——

"অহংকার কি যায় গা! দুই-এক জনের দেখতে পাওয়া যায় না। বলরামের অহংকার নাই। আর এঁর নাই! — অন্য লোক হলে কত টেরী, তমো হত —— বিদ্যার অহংকার হতো। মোটা বামুনের এখনও একটু একটু আছে! (মাস্টারের প্রতি) মহিম চক্রবর্তী অনেক পড়েছে, না?"

মাস্টার —— আজ্ঞা হাঁ, অনেক বই পড়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তার সঙ্গে গিরিশ ঘোষের একবার আলাপ হয়। তাহলে একটু বিচার হয়।

গিরিশ (সহাস্যে) — তিনি বুঝি বলেন সাধনা করলে শ্রীকৃষ্ণের মতো সব্বাই হতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ —— ঠিক তা নয়, — তবে আভাসটা ওইরকম।

ভক্ত —— আজ্ঞা, শ্রীকৃষ্ণের মতো সব্বাই কি হতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ —— অবতার বা অবতারের অংশ, এদের বলে ঈশ্বরকোটি আর সাধারণ লোকদের বলে জীব বা জীবকোটি। যারা জীবকোটি তারা সাধনা করে ঈশ্বরলাভ করতে পারে; তারা সমাধিস্থ হয়ে আর ফেরে না।

"যারা ঈশ্বরকোটি —— তারা যেমন রাজার বেটা; সাততলার চাবি তাদের হাতে। তারা সাততলায় উঠে যায়, আবার ইচ্ছামতো নেমে আসতে পারে। জীবকোটি যেমন ছোট কর্মচারী, সাততলা বাড়ির খানিকটা যেতে পারে ওই পর্যন্ত।"

[জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়]

"জনক জ্ঞানী, সাধন করে জ্ঞানলাভ করেছিল; শুকদেব জ্ঞানের মূর্তি।"

গিরিশ —— আহা!

শ্রীরামকৃষ্ণ —— সাধন করে শুকদেবের জ্ঞানলাভ করতে হয় নাই। নারদেরও শুকদেবের মতো ব্রহ্মজ্ঞান ছিল, কিন্তু ভক্তি নিয়ে ছিলেন —— লোকশিক্ষার জন্য। প্রহ্লাদ কখনও সোঽহম্‌ ভাবে থাকতেন, কখনও দাসভাবে —— সন্তানভাবে। হনুমানেরও ওই অবস্থা।

“মনে করলে সকলেরই এই অবস্থা হয় না। কোনও বাঁশের বেশি খোল, কোনও বাঁশের ফুটো ছোট।”

১ It is with our judgements as with our watches,
None goes just alike, yet each believes his own.

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১২ই এপ্রিল 1885/04/12/iv

44.4 কামিনী-কাঞ্চন ও তীব্র বৈরাগ্য

একজন ভক্ত — আপনার এ-সব ভাব নজিরের জন্য, তাহলে আমাদের কি করতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ভগবানলাভ করতে হলে তীব্র বৈরাগ্য দরকার। যা ঈশ্বরের পথে বিরুদ্ধ বলে বোধ হবে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে হয়। পরে হবে বলে ফেলে রাখা উচিত নয়। কামিনী-কাঞ্চন ঈশ্বরের পথে বিরোধী; ও-থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে।

“টিমে তেতালা হলে হবে না। একজন গামছা কাঁধে স্নান করতে যাচ্ছে। পরিবার বললে, তুমি কোন কাজের নও, বয়স বাড়ছে, এখন এ-সব ত্যাগ করতে পারলে না। আমাকে ছেড়ে তুমি একদিনও থাকতে পার না। কিন্তু অমুক কেমন ত্যাগী!

স্বামী —— কেন, সে কি করেছে?

পরিবার —— তার ষোলজন মাগ, সে এক-একজন করে তাদের ত্যাগ করছে। তুমি কখনও ত্যাগ করতে পারবে না।

স্বামী —— এক-একজন করে ত্যাগ! ওরে খেপী, সে ত্যাগ করতে পারবে না। যে ত্যাগ করে সে কি একটু একটু করে ত্যাগ করে!

পরিবার —— (সহাস্যে) — তবু তোমার চেয়ে ভাল।

স্বামী —— খেপী, তুই বুঝিস না। তার কর্ম নয়, আমিই ত্যাগ করতে পারব, এই দ্যাখ্ আমি চললুম!

“এর নাম তীব্র বৈরাগ্য। যাই বিবেক এল তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করলে। গামছা কাঁধেই চলে গেল। সংসার গোছগাছ করতে এল না। বাড়ির দিকে একবার পেছন ফিরে চাইলেও না।

“যে ত্যাগ করবে তার খুব মনের বল চাই। ডাকাত পড়ার ভাব। অ্যায়!!! — ডাকাতি করবার আগে যেমন ডাকাতেরা বলে —— মারো! লোটো! কাটো!

“কি আর তোমরা করবে? তাঁতে ভক্তি, প্রেম লাভ করে দিন কাটানো। কৃষ্ণের অদর্শনে যশোদা পাগলের ন্যায় শ্রীমতীর কাছে গেলেন। শ্রীমতী তাঁর শোক দেখে আদ্যাশক্তিরূপে দেখা দিলেন। বললেন, মা, আমার কাছে বর নাও। যশোদা বললেন, মা, আর কি লব? তবে এই বল, যেন কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণেরই সেবা করতে পারি। এই চক্ষে তার ভক্তদর্শন, — যেখানে যেখানে তার লীলা, এই পা দিয়ে সেখানে যেতে পারি, — এই হাতে তার সেবা আর তার ভক্তসেবা, — সব ইন্দ্রিয়, যেন তারই কাজ করে।”

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আবার ভাবাবেশের উপক্রম হইতেছে। হঠাৎ আপনা-আপনি বলিতেছেন, “সংহারমূর্তি কালী! — না নিত্যকালী!”

ঠাকুর অতি কষ্টে ভাব সম্বরণ করিলেন। এইবার একটু জলপান করিলেন। যশোদার কথা আবার বলিতে যাইতেছেন, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখুজ্জে আসিয়া উপস্থিত। ইনি ও ইঁহার কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত প্রিয় মুখুজ্জে ঠাকুরের কাছে নূতন যাওয়া-আসা করিতেছেন। মহেন্দ্রের ময়দার কল ও অন্যান্য ব্যবসা আছে। তাঁহার ভ্রাতা ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করিতেন। ইঁহাদের কাজকর্ম লোকজনে দেখে, নিজেদের খুব অবসর আছে। মহেন্দ্রের বয়স ৩৬।৩৭ হইবে, ভ্রাতার বয়স আন্দাজ ৩৪।৩৫। ইঁহাদের বাটী কেদেটি গ্রামে। কলিকাতা বাগবাজারেও একটি বসতবাটী আছে। তাঁহাদের সঙ্গে একটি ছোকরা ভক্ত আসা-যাওয়া করেন, তাঁহার নাম হরি। তাঁহার বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু ঠাকুরের উপর বড় ভক্তি। মহেন্দ্র অনেকদিন দক্ষিণেশ্বরে যান নাই। হরিও যান নাই, আজ আসিয়াছেন। মহেন্দ্র গৌরবর্ণ ও

সদা হাস্যমুখ, শরীর দোহারা। মহেন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। হরিও প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেন এতদিন দক্ষিণেশ্বরে যাওনি গো?

মহেন্দ্র — আজ্ঞা, কেদেটিতে গিছলাম, কলকাতায় ছিলাম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিগো ছেলেপুলে নাই, — কারু চাকরি করতে হয় না, — তবুও অবসর নাই! ভাল জ্বালা!

ভক্তেরা সকলে চুপ করিয়া আছেন। মহেন্দ্র একটু অপ্রস্তুত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেন্দ্রের প্রতি) — তোমায় বলি কেন, — তুমি সরল, উদার — তোমার ঈশ্বরে ভক্তি আছে।

মহেন্দ্র — আজ্ঞে, আপনি আমার ভালোর জন্যই বলেছেন।

[বিষয়ী ও টাকাওয়ালা সাধু — সন্তানের মায়া]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — আর এখানকার যাত্রায় প্যালা দিতে হয় না। যদুর মা তাই বলে, ‘অন্য সাধু কেবল দাও দাও করে; বাবা, তোমার উটি নাই’। বিষয়ী লোকের টাকা খরচ হলে বিরক্ত হয়।

“এক জায়গায় যাত্রা হচ্ছিল। একজন লোকের বসে শোনবার ভারী ইচ্ছা। কিন্তু সে উঁকি মেরে দেখলে যে আসরে প্যালা পড়ছে, তখন সেখান থেকে আস্তে

আস্তে পালিয়ে গেল। আর-এক জায়গায় যাত্রা হচ্ছিল, সেই জায়গায় গেল। সন্ধান করে জানতে পারলে যে এখানে কেউ প্যালা দেবে না। ভারী ভিড় হয়েছে। সে দুই হাতে কুনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে ঠেলে আসরে গিয়ে উপস্থিত। আসরে ভাল করে বসে গোঁপে চাড়া দিয়ে শুনতে লাগল। (হাস্য)

“আর তোমার তো ছেলেপুলে নাই যে মন অন্যমনস্ক হবে। একজন ডেপুটি, আটশো টাকা মাইনে, কেশব সেনের বাড়িতে (নববৃন্দাবন) নাটক দেখতে গিছল। আমিও গিছলাম, আমার সঙ্গে রাখাল আরও কেউ কেউ গিছল। নাটক শুনবার জন্য আমি — যেখানে বসেছি তারা আমার পাশে বসেছে। রাখাল তখন একটু উঠে গিছল। ডেপুটি এসে ওইখানে বসল। আর তার ছোট ছেলেটিকে রাখালের জায়গায় বসালে। আমি বললুম, এখানে বসা হবে না, — আমার এমনি অবস্থা যে, কাছে যে বসবে সে যা বলবে তাই করতে হবে, তাই রাখালকে কাছে বসিয়েছিলাম। যতক্ষণ নাটক হল ডেপুটির কেবল ছেলের সঙ্গে কথা। শালা একবারও কি থিয়েটার দেখলে না! আবার শুনেছি নাকি মাগের দাস — ওঠ বললে ওঠে, বোস বললে বসে, — আবার একটা খাঁদা বানুরে ছেলের জন্য এই ... তুমি ধ্যান-ট্যান তো কর?”

মহেন্দ্র — আজ্ঞে, একটু একটু হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — যাবে এক-একবার?

মহেন্দ্র (সহাস্যে) — আজ্ঞে, কোথায় গাঁট-টাঁট আছে আপনি জানেন, — আপনি দেখবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — আগে যেও। —— তবে তো টিপে-টুপে দেখব, কোথায় কি গাঁটি আছে! যাও না কেন?

মহেন্দ্র —— কাজকর্মের ভিড়ে আসতে পারি না, — আবার কেদেটির বাড়ি মাঝে মাঝে দেখতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া, মহেন্দ্রের প্রতি) — এদের কি বাড়ি ঘর-দোর নাই? আর কাজকর্ম নাই? এরা আসে কেমন করে?

[পরিবারের বন্ধন]

শ্রীরামকৃষ্ণ (হরির প্রতি) — তুই কেন আসিস নাই? তোর পরিবার এসেছে বুঝি?

হরি —— আজ্ঞা, না।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— তবে কেন ভুলে গেলি?

হরি —— আজ্ঞা, অসুখ করেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের) — কাহিল হয়ে গেছে, — ওর ভক্তি তো কম নয়, ভক্তির চোট দেখে কে! উৎপেতে ভক্তি। (হাস্য)

ঠাকুর একটি ভক্তের পরিবারকে ‘হাবীর মা’ বলতেন। হাবীর মার ভাই আসিয়াছে, কলেজে পড়ে, বয়স আন্দাজ কুড়ি। তিনি ব্যাট খেলিতে যাইবেন,

— গাত্রোত্থান করিলেন। ছোট ভাইও ঠাকুরের ভক্ত, সেই সঙ্গে গমন করিলেন। কিয়ৎ পরে দ্বিজ ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর বলিলেন, “তুই গেলিনি?”

একজন ভক্ত বলিলেন, “উনি গান শুনিবেন তাই বুঝি ফিরে এলেন।”

আজ ব্রাহ্মভক্ত শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যের গান হইবে। পল্টু আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর বলিতেছেন, কে রে, — পল্টু যে রে!

আর একটি ছোকরা ভক্ত (পূর্ণ) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে অনেক কষ্টে ডাকাইয়া আনিয়াছেন, বাড়ির লোকেরা কোনও মতে আসিতে দিবেন না। মাস্টার যে বিদ্যালয়ে পড়ান সেই বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে এই ছেলেটি পড়েন। ছেলেটি আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রনাম করিলেন। ঠাকুর নিজের কাছে তাহাকে বসাইয়া আস্তে আস্তে কথা কহিতেছেন —— মাস্টার শুধু কাছে বসিয়া আছেন, অন্যান্য ভক্তেরা অন্যমনস্ক হইয়া আছেন। গিরিশ এক পাশে বসিয়া কেশবচরিত পড়িতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ছোকরা ভক্তটির প্রতি) — এখানে এস।

গিরিশ (মাস্টারের প্রতি) — কে এ ছেলেটি?

মাস্টার (বিরক্ত হইয়া) — ছেলে আর কে?

গিরিশ (সহাস্যে) — It needs no ghost to tell me that.

মাস্টারের ভয় হইয়াছে পাছে পাঁচজন জানিতে পারিলে ছেলের বাড়িতে গোলযোগ হয় আর তাঁহার নামে দোষ হয়। ছেলেটির সঙ্গে ঠাকুরও সেইজন্য আস্তে আস্তে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সে সব কর? — যা বলে দিছিলাম?

ছেলেটি — আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — স্বপনে কিছু দেখ? — আগুন-শিখা, মশালের আলো? সধবা মেয়ে? — শ্মশান-মশান? এ-সব দেখা বড় ভাল।

ছেলেটি — আপনাকে দেখেছি — বসে আছেন — কি বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি — উপদেশ? — কই, একটা বল দেখি।

ছেলেটি — মনে নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা হোক, — ও খুব ভাল! — তোমার উন্নতি হবে — আমার উপর তো টান আছে?

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর বলিতেছেন — "কই সেখানে যাবে না?" — অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বরে। ছেলেটি বলিতেছে, "তা বলতে পারি না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেন, সেখানে তোমার আত্মীয় কে আছে না?

ছেলেটি — আজ্ঞা হাঁ, কিন্তু সেখানে যাবার সুবিধা হবে না।

গিরিশ কেশবচরিত পড়িতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য শ্রীযুক্ত কেশব সেনের ওই জীবনচরিত লিখিয়াছেন। ওই পুস্তকে লেখা আছে যে পরমহংসদেব আগে সংসারের উপর বড় বিরক্ত ছিলেন, কিন্তু কেশবের সহিত দেখাশুনা হবার পরে তিনি মত বদলাইয়াছেন — এখন পরমহংসদেব বলেন যে, সংসারেও ধর্ম হয়। এই কথা পড়িয়া কোন কোন ভক্তরা ঠাকুরকে বলিয়াছেন। ভক্তদের ইচ্ছা যে, ত্রৈলোক্যের সঙ্গে আজ এই বিষয় লইয়া কথা হয়। ঠাকুরকে বই পড়িয়া ওই সকল কথা শোনান হইয়াছিল।

[ঠাকুরের অবস্থা — ভক্তসঙ্গ ত্যাগ]

গিরিশের হাতে বই দেখিয়া ঠাকুর গিরিশ, মাস্টার, রাম ও অন্যান্য ভক্তদের বলিতেছেন — "ওরা ওই নিয়ে আছে, তাই 'সংসার সংসার' করছে! — কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর রয়েছে। তাঁকে লাভ করলে ও কথা বলে না। ঈশ্বরের আনন্দ পেলে সংসার কাকবিষ্ঠা হয়ে যায়, — আবার মাঝে ভক্তসঙ্গ-ফঙ্গও ত্যাগ করেছিলাম! দেখলুম পট্‌ পট্‌ মরে যায়, আর শুনে ছট্‌ফট্‌ করি! এখন তবু একটু লোক নিয়ে থাকি।"

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১২ই এপ্রিল 1885/04/12/v

44.5 সংকীর্তনানন্দে ভক্তসঙ্গে

গিরিশ বাড়ি চলিয়া গেলেন। আবার আসিবেন।

শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেনের সহিত ত্রৈলোক্য আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা ঠাকুরকে প্রনাম করিলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর তাঁহাদের কুশল প্রশ্ন করিতেছেন। ছোট নরেন আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, — কই তুই শনিবারে এলিনি? এইবার ত্রৈলোক্য গান গাইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— আহা, তুমি আনন্দময়ীর গান সেদিন করলে, — কি গান! আর সব লোকের গান আলুনী লাগে! সেদিন নরেন্দ্রের গানও ভাল লাগল না। সেইটে অমনি অমনি হোক না।

ত্রৈলোক্য গাইতেছেন —— 'জয় শচীনন্দন'।

ঠাকুর মুখ ধুইতে যাইতেছেন। মেয়ে ভক্তেরা চিকের পার্শ্বে ব্যাকুল হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের কাছে গিয়া একবার দর্শন দিবেন। ত্রৈলোক্যের গান চলিতেছে।

ঠাকুর ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া ত্রৈলোক্যকে বলিতেছেন, — একটু আনন্দময়ীর গান, — ত্রৈলোক্য গাইতেছেন:

কত ভালবাস গো মা মানব সন্তানে,
মনে হলে প্রেমধারা বহে দুনয়নে (গো মা)।

তব পদে অপরাধী, আছি আমি জন্মাবধি,
তবু চেয়ে মুখপানে প্রেমনয়নে, ডাকিছ মধুর বচনে,
মনে হলে প্রেমধারা বহে দুনয়নে।
তোমার প্রেমের ভার, বহিতে পারি না গো আর,
প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া, হৃদয় ভেদিয়া, তব স্নেহ দরশনে,
লইনু শরণ মা গো তব শ্রীচরণে (গো মা) ।।

গান শুনিতে শুনিতে ছোট নরেন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছেন, যেন কাষ্ঠবৎ! ঠাকুর মাস্টারকে বলিতেছেন, "দেখ, দেখ, কি গভীর ধ্যান! একেবারে বাহ্যশূন্য!"

গান সমাপ্ত হইল। ঠাকুর ত্রৈলোক্যকে এই গানটি গাইতে বলিলেন — 'দে মা পাগল করে, আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।'

রাম বলিতেছেন, কিছু হরিনাম হোক! ত্রৈলোক্য গাইতেছেন:

মন একবার হরি বল হরি বল হরি বল।
হরি হরি হরি বলে, ভবসিন্ধু পারে চল।

মাস্টার আস্তে আস্তে বলিতেছেন, 'গৌর-নিতাই তোমরা দুভাই।'

ঠাকুরও ওই গানটি গাইতে বলিতেছেন। ত্রৈলোক্য ও ভক্তেরা সকলে মিলিয়া গাইতেছেন:

গৌর নিতাই তোমরা দুভাই পরম দয়াল হে প্রভু!

ঠাকুরও যোগদান করিলেন। সমাপ্ত হইলে আর একটি ধরিলেন:

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে তারা দুভাই এসেছে রে।

যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে তারা তারা দুভাই এসেছে রে।

যারা ব্রজের কানাই বলাই তারা তারা দুভাই এসেছে রে।

যারা আচণ্ডালে কোল দেয় তারা তারা দুভাই এসেছে রে।

ওই গানের সঙ্গে ঠাকুর আর একটা গান গাহিতেছেন:

নদে টলমল টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে।

ঠাকুর আবার ধরিলেন:

কে হরিবোল হরিবোল বলিয়ে যায়?

যা রে মাধাই জেনে আয়।

বুঝি গৌর যায় আর নিতাই যায় রে।

যাদের সোনার নূপুর রাঙা পায়।

যাদের নেড়া মাথা ছেঁড়া কাঁথা রে।

যেন দেখি পাগলেরই প্রায়।

ছোট নরেন বিদায় লইতেছেন —

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুই বাপ-মাকে খুব ভক্তি করবি। — কিন্তু ঈশ্বরের পথে বাধা দিলে মানবিনি। খুব রোখ আনবি — শালার বাপ!

ছোট নরেন — কে জানে, আমার কিছু ভয় হয় না।

গিরিশ বাড়ি হইতে আবার আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর ত্রৈলোক্যের সহিত আলাপ করিয়া দিতেছেন; আর বলিতেছেন, ‘একটু আলাপ তোমরা কর।’ একটু আলাপের পর ত্রৈলোক্যকে বলিতেছেন, ‘সেই গানটি আর একবার,’ — ত্রৈলোক্য গাইতেছেন:

[ঝিঁঝিট খাম্বাজ — ঠুংরী]

জয় শচীনন্দন, গৌর গুণাকার, প্রেম-পরশমণি, ভাব-রস-সাগর।
কিবা সুন্দর মুরতিমোহন আঁখিরঞ্জন কনকবরণ,
কিবা মৃণালনিন্দিত, আজানুলম্বিত, প্রেম প্রসারিত, কোমল যুগল কর
কিবা রুচির বদন-কমল, প্রেমরসে ঢল ঢল,
চিকুর কুন্তল, চারু গণ্ডস্থল, হরিপ্রেমে বিহ্বল, অপরূপ মনোহর।
মহাভাবে মণ্ডিত হরি রসে রঞ্জিত, আনন্দে পুলকিত অঙ্গ,
প্রমত্ত মাতঙ্গ, সোনার গৌরাঙ্গ,
আবেশে বিভোর অঙ্গ, অনুরাগে গরগর।
হরিগুণগায়ক, প্রেমরস নায়ক,
সাধু-হৃদিরঞ্জক, আলোকসামান্য, ভক্তিসিন্ধু শ্রীচৈতন্য,
আহা! ‘ভাই’ বলি চণ্ডালে, প্রেমভরে লন কোলে,
নাচেন দুবাহু তুলে, হরি বোল হরি বলে,
অবিরল ঝরে জলে নয়নে নিরন্তর!
‘কোথা হরি প্রাণধন’ — বলে করে রোদন,

মহাস্বেদ কম্পন, হুঙ্কার গর্জন,
পুলকে রোমাঞ্চিত, শরীর কদম্বিত,
ধুলায় বিলুণ্ঠিত সুন্দর কলেবর।
হরি-লীলা-রস-নিকেতন, ভক্তিরস-প্রস্রবণ;
দীনজনবান্ধব, বঙ্গের গৌরব, ধন্য ধন্য শ্রীচৈতন্য প্রেম শশধর।

‘গৌর হাসে কাঁদে নাচে গায়’ — এই কথা শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন, — একেবারে বাহ্যশূন্য!

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া — ত্রৈলোক্যকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতেছেন, “একবার সেই গানটি! — কি দেখিলাম রে।”

ত্রৈলোক্য গাইতেছেন:

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটিরে,
অপরূপ জ্যোতি; গৌরাঙ্গ মূরতি, দুনয়নে প্রেম বহে শত ধারে।

গান সমাপ্ত হইল। সন্ধ্যা হয়। ঠাকুর এখনও ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি) — বাজনা নাই! ভাল বাজনা থাকলে গান খুব জমে। (সহাস্যে) বলরামের আয়োজন কি জান, — বামুনের গোড্ডি (গরুটি) খাবে কম, দুধ দেবে হুড়হুড় করে! (সকলের হাস্য) বলরামের ভাব, — আপনারা গাও আপনারা বাজাও! (সকলের হাস্য)

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১২ই এপ্রিল 1885/04/12/vi

44.6 শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যার সংসার — ঈশ্বরলাভের পর সংসার

সন্ধ্যা হইল। বলরামের বৈঠকখানায় ও বারান্দায় আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের মাতাকে প্রণাম করিয়া, করে মূলমন্ত্র জপ করিয়া মধুর নাম করিতেছেন। ভক্তেরা চারিপার্শ্বে বসিয়া আছেন ও সেই মধুর নাম শুনিতেছেন। গিরিশ, মাস্টার, বলরাম, ত্রৈলোক্য ও অন্যান্য অনেক ভক্তরা এখনও আছেন। কেশবচরিত গ্রন্থে ঠাকুরের সংসার সম্বন্ধে মত পরিবর্তনের কথা যাহা লেখা আছে, ত্রৈলোক্যের সামনে সেই কথা উত্থাপন করিবেন, ভক্তেরা ঠিক করিয়াছেন। গিরিশ কথা আরম্ভ করিলেন।

তিনি ত্রৈলোক্যকে বলিতেছেন, "আপনি যা লিখেছেন — যে সংসার সম্বন্ধে এঁর মত পরিবর্তন হয়েছে, তা বস্তুতঃ হয় নাই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্য ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি) — এ-দিকের আনন্দ পেলে ওটা ভাল লাগে না, ভগবানের আনন্দলাভ করলে সংসার আলুনী বোধ হয়। শাল পেলে আর বনাত ভাল লাগে না!

ত্রৈলোক্য — সংসার যারা করবে তাদের কথা আমি বলছি, — যারা ত্যাগী তাদের কথা বলছি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ও-সব তোমাদের কি কথা! — যারা ‘সংসারে ধর্ম’ ‘সংসারে ধর্ম’ করছে, তারা একবার যদি ভগবানের আনন্দ পায় তাদের আর কিছু ভাল লাগে না, কাজের সব আঁট কমে যায়, ক্রমে যত আনন্দ বাড়ে কাজ আর করতে পারে না, — কেবল সেই আনন্দ খুঁজে খুঁজে বেড়ায়! ভগবানের আনন্দের কাছে বিষয়ানন্দ আর রমণানন্দ! একবার ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পেলে সেই আনন্দের জন্য ছুটোছুটি করে বেড়ায়, তখন সংসার থাকে আর যায়।

“চাতক তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, — সাত সমুদ্র যত নদী পুষ্করিণী সব ভরপুর! তবু সে জল খাবে না! ছাতি ফেটে যাচ্ছে তবু খাবে না! স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টির জলের জন্য হাঁ করে আছে! ‘বিনা স্বাতীকি জল সব ধূর!”

[দুআনা মদ ও দুদিক রাখা]

“বলে দুদিক রাখব। দুআনা মদ খেলে মানুষ দুদিক রাখতে চায়, আর খুব মদ খেলে কি আর দুদিক রাখা যায়!

“ঈশ্বরের আনন্দ পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। তখন কামিনী-কাঞ্চনের কথা যেন বুকে বাজে। (ঠাকুর কীর্তনের সুরে বলিতেছেন) ‘আন্ লোকের আন্ কথা, কিছু ভাল তো লাগে না!’ তখন ঈশ্বরের জন্য পাগল হয়, টাকা-ফাকা কিছুই ভাল লাগে না!”

ত্রৈলোক্য — সংসারে থাকতে গেলে টাকাও তো চাই, সঞ্চয়ও চাই। পাঁচটা দান-ধ্যান —

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি, আগে টাকা সঞ্চয় করে তবে ঈশ্বর! আর দান-ধ্যান-দয়া কত! নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার হাজার টাকা খরচ — আর পাশের বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না। তাদের দুটি চাল দিতে কষ্ট হয় — অনেক হিসেব করে দিতে হয়। খেতে পাচ্ছে না লোকে, — তা আর কি হবে, ও শালারা মরুক বাঁচুক, — আমি আর আমার বাড়ির সকলে ভাল থাকলেই হল। মুখে বলে সর্বজীবে দয়া!

ত্রৈলোক্য — সংসারে তো ভাল লোক আছে, — পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, চৈতন্যদেবের ভক্ত। তিনি তো সংসারে ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তার গলা পর্যন্ত মদ খাওয়া ছিল, যদি আর একটু খেত তা হলে আর সংসার করতে পারত না।

ত্রৈলোক্য চুপ করিয়া রইলেন। মাস্টার গিরিশকে জনান্তিকে বলিতেছেন, 'তাহলে উনি যা লিখেছেন ঠিক নয়।'

গিরিশ — তা হলে আপনি যা লিখেছেন ও-কথা ঠিক না?

ত্রৈলোক্য — কেন, সংসারে ধর্ম হয় উনি কি মানেন না?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হয়, — কিন্তু জ্ঞানলাভ করে থাকতে হয়, ভগবানকে লাভ করে থাকতে হয়। তখন 'কলঙ্ক সাগরে ভাসে, তবু কলঙ্ক না লাগে গায়।' তখন

পাঁকাল মাছের মতো থাকতে পারে। ঈশ্বরলাভের পর যে সংসার সে বিদ্যার সংসার। কামিনী-কাঞ্চন তাতে নাই, কেবল ভক্তি, ভক্ত আর ভগবান। আমারও মাগ আছে, — ঘরে ঘটিবাটিও আছে, — হরে প্যালাদের খাইয়ে দিই, আবার যখন হাবীর মা এরা আসে এদের জন্যও ভাবি।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১২ই এপ্রিল 1885/04/12/vii

44.7 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও অবতারতত্ত্ব

একজন ভক্ত (ত্রৈলোক্যের প্রতি) — আপনার বইয়েতে দেখলাম আপনি অবতার মানেন না। চৈতন্যদেবের কথায় দেখলাম।

ত্রৈললোক্য — তিনি নিজেই প্রতিবাদ করেছেন, — পুরীতে যখন অদ্বৈত ও অন্যান্য ভক্তেরা ‘তিনিই ভগবান’ এই বলে গান করেছিলেন, গান শুনে চৈতন্যদেব ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য। ইনি যেমন বলেন ভক্ত ঈশ্বরের বৈঠকখানা। তা বৈঠকখানা খুব সাজান বলে কি আর কিছু ঐশ্বর্য নাই?

গিরিশ — ইনি বলেন, প্রেমই ঈশ্বরের সারাংশ — যে মানুষ দিয়ে ঈশ্বরের প্রেম আসে তাকেই আমাদের দরকার। ইনি বলেন, গরুর দুধ বাঁট দিয়ে আসে, আমাদের বাঁটের দরকার। গরুর শরীরে অন্য কিছু দরকার নাই; হাত, পা কি শিং।

ত্রৈলোক্য — তাঁর প্রেমদুগ্ধ অনন্ত প্রণালী দিয়ে পড়ছে! তিনি যে অনন্তশক্তি!

গিরিশ — ওই প্রেমের কাছে আর কোন শক্তি দাঁড়ায়?

ত্রৈলোক্য — যাঁর শক্তি তিনি মনে করলে হয়! সবই ঈশ্বরের শক্তি।

গিরিশ — আর সব তাঁর শক্তি বটে, — কিন্তু অবিদ্যা শক্তি।

ত্রৈলোক্য — অবিদ্যা কি জিনিস! অবিদ্যা বলে একটা জিনিস আছে না কি? অবিদ্যা একটি অভাব। যেমন অন্ধকার আলোর অভাব। তাঁর প্রেম আমাদের পক্ষে খুব বটে। তাঁর বিন্দুতে আমাদের সিন্ধু! কিন্তু ওইটি যে শেষ, একথা বললে তাঁর সীমা করা হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্য ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি) — হাঁ হাঁ, তা বটে। কিন্তু একটু মদ খেলেই আমাদের নেশা হয়। শুঁড়ির দোকানে কত মদ আছে সে হিসাবে আমাদের কাজ কি! অনন্ত শক্তির খপরে আমাদের কাজ কি?

গিরিশ (ত্রৈলোক্যের প্রতি) — আপনি অবতার মানেন?

ত্রৈলোক্য — ভক্ততেই ভগবান অবতীর্ণ। অনন্ত শক্তির manifestation হয় না, — হতে পারে না! — কোন মানুষেই হতে পারে না।

গিরিশ — ছেলেদের 'ব্রহ্মগোপাল' বলে সেবা করতে পারেন, মহাপুরুষকে ঈশ্বর বলে কি পূজা করতে পারা যায় না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্যের প্রতি) — অনন্ত ঢুকুতে চাও কেন? তোমাকে ছুঁলে কি তোমার সব শরীরটা ছুঁতে হবে? যদি গঙ্গাস্নান করি তা হলে হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত কি ছুঁয়ে যেতে হবে? 'আমি গেলে ঘুচিবে জঞ্জাল'। যতক্ষণ 'আমি' টুকু থাকে ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি। 'আমি' গেলে কি রইল তা কেউ জানতে পারে না, — মুখে বলতে পারে না। যা আছে তাই আছে! তখন খানিকটা এঁতে প্রকাশ হয়েছে আর বাদবাকিটা ওখানে প্রকাশ হয়েছে, — এ-সব মুখে বলা যায় না। সচ্চিদানন্দ সাগর! — তার ভিতর 'আমি' ঘট। যতক্ষণ ঘট ততক্ষণ যেন দুভাগ জল, — ঘটের ভিতরে একভাগ, বাহিরে এক ভাগ। ঘট ভেঙে গেলে — এক জল — তাও বলবার জো নাই! — কে বলবে?

বিচারান্তে ঠাকুর ত্রৈলোক্যের সঙ্গে মিষ্টালাপ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি তো আনন্দে আছ?

ত্রৈলোক্য — কই এখান থেকে উঠলেই আবার যেমন তেমনি হয়ে যাবে। এখন বেশ ঈশ্বরের উদ্দীপনা হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — জুতো পরে থাকলে, কাঁটা বনে আর তার ভয় নাই। ‘ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য’ এই বোধ থাকলে কামিনী-কাঞ্চনে আর ভয় নাই।

ত্রৈলোক্যকে মিষ্টমুখ করাইতে বলরাম কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রৈলোক্যের ও তাঁহার মতালম্বী লোকদিগের ভক্তদের নিকট বর্ণনা করিতেছেন। রাত নয়টা হইল।

[অবতারকে কি সকলে চিনিতে পারে?]

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশ, মণি ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি) — এর আকি জানো! একটা পাতকুয়ার ব্যাঙ কখনও পৃথিবী দেখে নাই; পাতকুয়াটি জানে; তাই বিশ্বাস করবে না যে, একটা পৃথিবী আছে। ভগবানের আনন্দের সন্ধান পায় নাই, তাই ‘সংসার, সংসার’ করছে।

(গিরিশের প্রতি) — “ওদের সঙ্গে বকচো কেন? দুইই নিয়ে অছে। ভগবানের আনন্দের আস্বাদ না পেলে, সে আনন্দের কথা বুঝতে পারে না। পাঁচবছরের বালককে কি রমণসুখ বোঝানো যায়? বিষয়ীরা যে ঈশ্বর ঈশ্বর করে, সে শোনা কথা। যেমন খুড়ী জেঠিরা কোঁদল করে, তাদের কাছ থেকে বালকেরা শুনে শেখে আর বলে, ‘আমার ঈশ্বর আছেন’, ‘তোর ঈশ্বরের দিব্য।’

“তা হোক। ওদের দোষ নাই। সকলে কি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে ধরতে পারে? রামচন্দ্রকে বারজন ঋষি কেবল জানতে পেরেছিল। সকলে ধরতে পারে না। কেউ সাধারণ মানুষ ভাবে; — কেউ সাধু ভাবে; দু-চারজন অবতার বলে ধরতে পারে।

“যার যেমন পুঁজি —— জিনিসের সেইরকম দর দেয়। একজন বাবু তার চাকরকে বললে, তুই এই হীরেটি বাজারে নিয়ে যা। আমায় বলবি, কে কি-রকম দর দেয়। আগে বেগুনওয়ালার কাছে নিয়ে যা। চাকরটি প্রথমে বেগুনওয়ালার কাছে গেল। সে নেড়ে চেড়ে দেখে বললে —— ভাই, নয় সের বেগুন আমি দিতে পারি! চাকরটি বললে, ভাই আর একটু ওঠ, না হয় দশ শের দাও। সে বললে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি; এতে তোমায় পোষায় তো দিয়ে যাও। চাকর তখন হাসতে হাসতে হীরেটি ফিরিয়ে নিয়ে বাবুর কাছে বললে, মহাশয়, বেগুনওয়ালা নয় সের বেগুনের বেশি একটিও দেবে না। সে বললে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি।

বাবু হেসে বললে, আচ্ছা এবার কাপড়ওয়ালার কাছে নিয়ে যা। ও বেগুন নিয়ে থাকে, ও আর কতদূর বুঝবে! কাপড়ওয়ালার পুঁজি একটু বেশি, — দেখি ও কি বলে। চাকরটি কাপড়ওয়ালার কাছে বললে, ওহে এটি নেবে? কত দর দিতে পার? কাপড়ওয়ালা বললে, হাঁ জিনিসটা ভাল, এতে বেশ গয়না হতে পারে; — তা ভাই আমি নয়শো টাকা দিতে পারি। চাকরটি বললে, ভাই আর-একটু ওঠ, তাহলে ছেড়ে দিয়ে যাই; না হয় হাজার টাকাই দাও। কাপড়ওয়ালা বললে, ভাই, আর কিছু বলো না; আমি বাজার দরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি; নয়শো টাকার বেশি একটি টাকাও আমি দিতে পারব না। চাকর ফিরিয়ে নিয়ে মনিবের কাছে হাসতে হাসতে ফিরে গেল আর বললে যে, কাপড়ওয়ালা বলেছে যে নশো টাকার বেশি একটি টাকাও সে দিতে পারবে না! আরও সে বলেছে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি। তখন তার মনিব হাসতে হাসতে বললে,

এইবার জহুরীর কাছে যাও — সে কি বলে দেখা যাক। চাকরটি জহুরীর কাছে এল। জহুরী একটু দেখেই একবারে বললে, একলাখ টাকা দেব।”

[ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি]

“সংসারে ধর্ম ধর্ম এরা করছে। যেমন একজন ঘরে আছে, — সব বন্ধ, — ছাদের ফুটো দিয়ে একটু আলো আসছে। মাতার উপর ছাদ থাকলে কি সূর্যকে দেখা যায়? একটু আলো এলে কি হবে? কামিনী-কাঞ্চন ছাদ! ছাদ তুলে না ফেললে কি সূর্যকে দেখা যায়! সংসারী লোক যেন ঘরের ভিতর বন্দী হয়ে আছে!

“অবতারাদি ঈশ্বরকোটি। তারা ফাঁকা জায়গায় বেড়াচ্চে। তারা কখনও সংসারে বদ্ধ হয় না, — বন্দী হয় না। তাদের ‘আমি’ মোটা ‘আমি’ নয় — সংসারী লোকদের মতো। সংসারী লোকদের অহংকার, সংসারী লোকদের ‘আমি’ — যেন চতুর্দিকে পাঁচিল, মাথার উপর ছাদ; — বাহিরে কোন জিনিস দেখা যায় না। অবতারাদির ‘আমি’ পাতলা ‘আমি’। এ ‘আমি’র ভিতর দিয়ে ঈশ্বরকে সর্বদা দেখা যায়। যেমন একজন লোক পাঁচিলের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে, — পাঁচিলের দুদিকেই অনন্ত মাঠ। সেই পাঁচিলের গায়ে যদি ফোকর থাকে পাঁচিলের ওধারে সব দেখা যায়। বড় ফোকর জলে আনাগোনাও হয়। অবতারাদির ‘আমি’ ওই ফোকরওয়ালা পাঁচিল। পাঁচিলের এধারে থাকলেও অনন্ত মাঠ দেখা যায়; — এর মানে, দেহধারণ করলেও তারা সর্বদা যোগেতেই থাকে! আবার ইচ্ছে হলে বড় ফোকরের ওধারে গিয়ে সমাধিস্থ হয়। আবার বড় ফোকর হলে আনাগোনা করতে পারে; সমাধিস্থ হলেও আবার নেমে আসতে পারে।”

ভক্তেরা অবাক্‌ হইয়া অবতারতত্ত্ব শুনিতে লাগিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c45 ৪৫ শ্রীরামকৃষ্ণের কলিকাতায় ভক্তমন্দিরে আগমন -- শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষের বাটীতে উৎসব

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৪শে এপ্রিল 1885/04/24/i

45.1 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাটীতে অন্তরঙ্গসঙ্গে

[নরেন্দ্র, মাস্টার, যোগীন, বাবুরাম, রাম, ভবনাথ, বলরাম, চুনি]

শুক্রবার (১২ই বৈশাখ, ১২৯২) বৈশাখের শুক্লা দশমী, ২৪শে এপ্রিল, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ কলিকাতায় আসিয়াছেন। মাস্টার আন্দাজ বেলা একটার সময় বলরামের বৈঠকখানায় গিয়া দেখেন, ঠাকুর নিদ্রিত। দু-একটি ভক্ত কাছে বিশ্রাম করিতেছেন।

মাস্টার একপার্শ্বে বসিয়া সেই সুপ্ত বালক-মূর্তি দেখিতেছেন। ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য, এই মহাপুরুষ, ইনিও প্রাকৃত লোকের ন্যায় নিদ্রায় অভিভুত হইয়া শুইয়া আছেন। ইনিও জীবের ধর্ম স্বীকার করিয়াছেন।

মাস্টার আস্তে আস্তে একখানি পাখা লইয়া হাওয়া করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। এলোথেলো হইয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। মাস্টার ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম অসুখের সঞ্চার — এপ্রিল ১৮৮৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি সস্নেহে) — ভাল আছ? কে জানে বাপু! আমার গলায় বিচি হয়েছে। শেষ রাত্রে বড় কষ্ট হয়। কিসে ভাল হয় বাপু? (চিন্তিত হইয়া) — আমের অম্বল করেছিল, সব একটু একটু খেলুম। (মাস্টারের প্রতি) — তোমার পরিবার কেমন আছে? সেদিন কাহিল দেখলুম; ঠাণ্ডা একটু একটু দেবে।

মাস্টার — আজ্ঞা, ডাব-টাব?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, মিছরির সরবৎ খাওয়া ভাল।

মাস্টার — আমি রবিবার বাড়ি গিয়েছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বেশ করেছ। বাড়িতে থাকা তোমার সুবিধে। বাপ-টাপ সকলে আছে, তোমায় সংসার তত দেখতে হবে না।

কথা কহিতে কহিতে ঠাকুরের মুখ শুকাইতে লাগিল। তখন বালকের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, (মাস্টারের প্রতি) — আমার মুখ শুকুচ্চে। সবাই-এর কি মুখ শুকুচ্চে?

মাস্টার — যোগীনবাবু, তোমার কি মুখ শুকুচ্চে?

যোগীন্দ্র — না; বোধ হয়, ওঁর গরম হয়েছে।

এঁড়েদার যোগীন ঠাকুরের অন্তরঙ্গ; একজন ত্যাগী ভক্ত।

ঠাকুর এলোথেলো হয়ে বসে আছেন। ভক্তেরা কেহ কেহ হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — যেন মাই দিতে বসেছি। (সকরের হাস্য) আচ্ছা, মুখ শুকুচ্চে, তা ন্যাশপাতি খাব? কি জামরুল?

বাবুরাম — তাই বরং আনি গে — জামরুল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোর আর রৌদ্রে গিয়ে কাজ নাই।

মাস্টার পাখা করিতেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — থাক, তুমি অনেকক্ষণ —

মাস্টার — আজ্ঞা, কষ্ট হচ্চে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে) — হচ্চে না?

মাস্টার নিকটবর্তী একটি স্কুলে অধ্যাপনা কার্য করেন। তিনি একটার সময় পড়ান হইতে কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়া আসিয়াছিলেন। এইবার স্কুলে আবার যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন ও ঠাকুরের পাদবন্দনা করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — এক্ষণই যাবে?

একজন ভক্ত — স্কুলে এখনও ছুটি হয় নাই। উনি মাঝে একবার এসেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) — যেমন গিন্নি — সাত-আটটি ছেলে বিয়েন — সংসারে রাতদিন কাজ — আবার ওর মধ্যে এক-একবার এসে স্বামীর সেবা করে যায়। (সকলের হাস্য)

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৪শে এপ্রিল 1885/04/24/ii

45.2 শ্রীযুক্ত বলরামের বাটীতে অন্তরঙ্গসঙ্গে

চারটের ওর স্কুলের ছুটি হইল, মাস্টার বলরামবাবুর বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখেন, ঠাকুর সহাস্যবদন, বসিয়া আছেন। সংবাদ পাইয়া একে একে ভক্তগণ আসিয়া জুটিতেছেন। ছোট নরেন ও রাম আসিয়াছেন। নরেন্দ্র আসিয়াছেন। মাস্টার প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। বাটীর ভিতর হইতে বলরাম থালায় করিয়া ঠাকুরের জন্য মোহনভোগ পাঠাইয়াছেন, কেন না, ঠাকুরের গলায় বিচি হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মোহনভোগ দেখিয়া, নরেন্দ্রের প্রতি) — ওরে মাল এতেছে! মাল! মাল! খা! খা! (সকলের হাস্য)

ক্রমে বেলা পড়িতে লাগিল। ঠাকুর গিরিশের বাড়ি যাইবেন, সেখানে আজ উৎসব। ঠাকুরকে লইয়া গিরিশ উৎসব করিবেন। ঠাকুর বলরামের দ্বিতল ঘর হইতে নামিতেছেন। সঙ্গে মাস্টার পশ্চাতে আরও দু-একটি ভক্ত। দেউড়ির কাছে আসিয়া দেখেন, একটি হিন্দুস্থানী ভিখারী গান গাহিতেছে। রামনাম শুনিয়া ঠাকুর দাঁড়াইলেন। দক্ষিণাস্য। দেখিতে দেখিতে মন অন্তর্মুখ হইতেছে। এইরূপভাবে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন; মাস্টার বলিলেন, “বেশ সুর।” একজন ভক্ত ভিক্ষুককে চারিটি পয়সা দিলেন।

ঠাকুর বোসপাড়ার গলিতে প্রবেশ করিয়াছেন। হাসিতে হাসিতে মাস্টারকে বললেন, “হ্যাঁগা, কি বলে? ‘পরমহংসের ফৌজ আসছে’? শালারা বলে কি।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৪শে এপ্রিল 1885/04/24/iii

45.3 অবতার ও সিদ্ধ-পুরুষের প্রভেদ — মহিমা ও গিরিশের বিচার

ভক্তসঙ্গে ঠাকুর গিরিরশের বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। গিরিশ অনেকগুলি ভক্তকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেকেই সমবেত হইয়াছেন। ঠাকুর আসিয়াছেন শুনিয়া সকলে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। ঠাকুর সহাস্যবদনে আসন গ্রহণ করিলেন। ভক্তেরাও সকলে বসিলেন। গিরিশ, মহিমাচরণ, রাম, ভবনাথ ইত্যাদি অনেক ভক্ত বসিয়াছিলেন। এ ছাড়া ঠাকুরের সঙ্গে অনেকে আসিলেন, বাবুরাম, যোগীন, দুই নরেন্দ্র, চুনি, বলরাম ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি) — গিরিশ ঘোষকে বললুম, তোমার নাম করে, 'একজন লোক আছে — গভীর, তোমার এক হাঁটু জল।' তা এখন যা বলেছি মিলিয়ে দাও দেখি। তোমরা দুজনে বিচার করো, কিন্তু রফা করো না। (সকলের হাস্য)

মহিমাচরণ ও গিরিশের বিচার হইতে লাগিল। একটু আরম্ভ হইতে না হইতে রাম বলিলেন, "ও-সব থাক — কীর্তন হোক।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি) — না, না; এর অনেক মানে আছে। এরা ইংলিশম্যান, এরা কি বলে দেখি।

মহিমাচরণের মত — সকলেই শ্রীকৃষ্ণ হতে পারে, সাধন করিতে পারিলেই হইল। গিরিশের মত — শ্রীকৃষ্ণ অবতার, মানুষ হাজার সাধন করুক, অবতারের মতো হইতে পারিবে না।

মহিমাচরণ — কিরকম জানেন? যেমন বেলগাছটা আমগাছ হতে পারে প্রতিবন্ধক পথ থেকে গেলেই হল। যোগের প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিবন্ধক চলে যায়।

গিরিশ — তা মশাই যাই বলুন, যোগের প্রক্রিয়াই বলুন আর যাই বলুন, সেটি হতে পারে না। কৃষ্ণই কৃষ্ণ হতে পারেন। যদি সেই সব ভাব, মনে করুন রাধার ভাব কারু ভিতরে থাকে, তবে সে ব্যক্তি সেই-ই; অর্থাৎ সে ব্যক্তি রাধা স্বয়ং। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ভাব যদি কারু ভিতর দেখতে পাই, তখন বুঝতে হবে, শ্রীকৃষ্ণকেই দেখছি।

মহিমাচরণ বিচার বেশিদূর লইয়া যাইতে পারিলেন না। অবশেষে এক-রকম গিরিশের কথায় সায় দিলেন।

মহিমাচরণ (গিরিশের প্রতি) — হাঁ মহাশয়, দুই-ই সত্য। জ্ঞানপথ সেও তাঁর ইচ্ছা; আবার প্রেমভক্তি, তাঁর ইচ্ছা। ইনি যেমন বলেন, ভিন্ন পথ দিয়ে এক জায়গাতেই পৌঁছানো যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি একান্তে) — কেমন, ঠিক বলছি না?

মহিমা — আজ্ঞা, যা বলেছেন। দুই-ই সত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আপনি দেখলে, ওর (গিরিশের) কি বিশ্বাস! জল খেতে ভুলে গেল। আপনি যদি না মানতে, তাহলে টুঁটু ছিঁড়ে খেত, যেমন কুকুরে মাংস খায়। তা বেশ হল। দুজনের পরিচয় হল, আর আমারও অনেকটা জানা হল।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৪শে এপ্রিল 1885/04/24/iv

45.4 ঠাকুর কীর্তনানন্দে

কীর্তনিয়া দলবলের সহিত উপস্থিত। ঘরের মাঝখানে বসিয়া আছে। ঠাকুরের ইঙ্গিত হইলেই কীর্তন আরম্ভ হয়। ঠাকুর অনুমতি দিলেন।

রাম (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — আপনি বলুন এরা কি গাইবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি কি বলব? — (একটু চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, অনুরাগ।

কীর্তনিয়া পূর্বরাগ গাইতেছেন:

আরে মোর গোরা দ্বিজমণি।
রাধা রাধা বলি কান্দে, লোটায় ধরণী।।

রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে।
সুরধুনী ধারা বহে অরুণ নয়নে।।
ক্ষণে ক্ষণে গোরা অক্ষগ ভূমে গড়ি যায়।
রাধানাম বলি ক্ষণে ক্ষণে মুরছায়।।
পুলকে পুরল তনু গদ গদ বোল।
বাসু কহে গোরা কেন এত উতরোল।।

কীর্তন চলিতে লাগিল। যমুনাতটে প্রথম কৃষ্ণদর্শন অবধি শ্রীমতীর অবস্থা সখীগণ বলিতেছেন:

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিঃশ্বাস সঘন, কদম্ব কাননে চায়।।
(রাই এমন কেনে বা হৈল)।
গুরু দুরু জন, ভয় নাহি মন, কোথা বা কি দেব পাইল।।
সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল, সম্বরণ নাহি করে।
বসি বসি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসিয়া পড়ে।।
বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী, তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে, আছয়ে লালসে, না বুঝি তাহার ছলা।।
তাহার চরিতে, হেন বুঝি চিতে, হাত বাড়াইল চান্দে।
চণ্ডীদাস কয়, করি অনুনয়, ঠেকেছে কালিয়া ফান্দে।।

কীর্তন চলিতে লাগিল — শ্রীমতীকে সখীগণ বলিতেছেন:

কহ কহ সুবদনী রাধে! কি তোর হইল বিরোধে।।

কেন তোরে আনমন দেখি। কাহে নখে ক্ষিতি তলে লিখি।।

হেমকান্তি ঝামর হৈল। রাঙ্গাবাস খসিয়া পড়িল।।

আঁখিযুগ অরুণ হইল। মুখপদ্ম শুকাইয়া গেল।।

এমন হইল কি লাগিয়া। না কহিলে ফাটি যায় হিয়া।।

এত শুনি কহে ধনি রাই। শ্রীযদুনন্দন মুখ চাই।।

কীর্তনিয়া আবার গাইল — শ্রীমতী বংশীধ্বনি শুনিয়া পাগলের ন্যায় হইয়াছেন। সখীগণের প্রতি শ্রীমতীর উক্তি:

কদম্বের বনে, থাকে কোন্ জনে, কেমন শবদ্ আসি।

এক আচম্বিতে, শ্রবণের পথে, মরমে রহল পশি।।

সান্ধায়ে মরমে, ঘুচায়া ধরমে, করিল পাগলি পারা।

চিত স্থির নহে, শোয়াস বারহে, নয়নে বহয়ে ধারা।।

কি জানি কেমন, সেই কোন জন, এমন শবদ্ করে।

না দেখি তাহারে, হৃদয় বিদরে, রহিতে না পারি ঘরে।।

পরাণ না ধরে, কন কন করে, রহে দরশন আশে।

যবহুঁ দেখিবে, পরাণ পাইবে, কহয়ে উদ্ধব দাসে।।

গান চলিতে লাগিল। শ্রীমতীর কৃষ্ণদর্শন জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। শ্রীমতী বলিতেছেন:

পহিলে শুনিনু, অপরূপ ধ্বনি, কদম্ব কানন হৈতে।

তারপর দিনে, ভাটের বর্ণনে, শুনি চমকিত চিতে।।
আর একদিন, মোর প্রাণ-সখী কহিলে যাহার নাম,
(আহা সকল মাধুর্যময় কৃষ্ণ নাম)।
গুণিগণ গানে, শুনিনু শ্রবণে, তাহার এ গুণগ্রাম।।
সহজে অবলা, তাহে কুলবালা, গুরুজন জ্বালা ঘরে।
সে হেন নাগরে, আরতি বাঢ়য়ে, কেমনে পরাণ ধরে।
ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনে দঢ়াইনু, পরাণ বহিবার নয়।
কহত উপায় কৈছে মিলয়ে, দাস উদ্ধবে কয়।।

"আহা সকল মাধুর্যময় কৃষ্ণনাম!" এই কথা শুনিয়া ঠাকুর আর বসিতে পারিলেন না। একেবারে বাহ্যশূন্য, দণ্ডায়মান। সমাধিস্থ! ডানদিকে ছোট নরেন দাঁড়াইয়া। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া মধুর কণ্ঠে "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" এই কথা সাশ্রুনয়নে বলিতেছেন। ক্রমে পুনর্বার আসন গ্রহণ করিলেন।

কীর্তনিয়া আবার গাইতেছেন। বিশাখা দৌড়িয়া গিয়া একখানি চিত্রপট আনিয়া শ্রীমতীর সম্মুখে ধরিলেন। চিত্রপটে সেই ভুবনরঞ্জনরূপ। শ্রীমতী পটদর্শনে বলিলেন, এই পটে যাঁকে দেখছি, তাঁকে যমুনাতটে দেখা অবধি আমার এই দশা হয়েছে।

কীর্তন — শ্রীমতির উক্তি —

যে দেখেছি যমুনাতটে। সেই দেখি এই চিত্রপটে।।
যার নাম কহিল বিশাখা। সেই এই পটে আছে লেখা।।

যাহার মুরলী ধ্বনি। সেই বটে এই রসিকমণি।।

আধমুখে যার গুণ গাঁথা। দূতীমুখে শুনি যার কথা।।

এই মোর হইয়াছে প্রাণ। ইহা বিনে কেহ নহে আন।।

এত কহি মূরছি পড়য়ে। সখীগণ ধরিয়া তোলয়ে।।

পুনঃ কহে পাইয়া চেতনে। কি দেখিনু দেখায় সে জনে।।

সখীগণ করয়ে আশ্বাস। ভণে ঘনশ্যাম দাস।।

ঠাকুর আবার উঠিলেন, নরেন্দ্রাদি সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া উচ্চ সংকীর্তন করিতেছেন:

(১) — যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে তারা তারা দুভাই এসেছে রে।

(যারা আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়)   (যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে)

(যারা ব্রজের কানাই বলাই)   (যারা ব্রজের মাখন চোর)

(যারা জাতির বিচার নাহি করে)   (যারা আপামরে কোল দেয়)

(যারা আপনি মেতে জগৎ মাতায়)   (যারা হরি হয়ে হরি বলে)।

(যারা জগাই মাধাই উদ্ধারিল)   (যারা আপন পর নাহি বাচে)।

জীব তরাতে তারা দুভাই এসেছে রে।   (নিতাই গৌর)

(২) — নদে টলমল টলমল করে, গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে।

ঠাকুর আবার সমাধিস্থ!

ভাব উপষম হইলে আবার আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — কোন্‌ দিকে সুমুখ ফিরে বসেছিলাম, এখন মনে নাই।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৪শে এপ্রিল 1885/04/24/v

45.5 শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্র — হাজরার কথা — ছলরূপী নারায়ণ

ঠাকুর, ভাব উপশমের পর ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন।

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — হাজরা এখন ভাল হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুই জানিস নি, এমন লোক আছে, বগলে ইট, মুখে রাম রাম বলে।

নরেন্দ্র — আজ্ঞা না, সব জিজ্ঞাসা করলুম, তা সে বলে, ‘না’।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তার নিষ্ঠা আছে, একটু জপটপ করে। কিন্তু অমন! — গাড়োয়ানকে ভাড়া দেয় না!

নরেন্দ্র — আজ্ঞা না, সে বলে তো ‘দিয়েছি’ —

শ্রীরামকৃষ্ণ — কোথা থেকে দেবে?

নরেন্দ্র — রামলাল টামলালের কাছ থেকে দিয়েছে, বোধ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুই সব কথা জিজ্ঞাসা কি করেছিস?

“মাকে প্রার্থনা করেছিলাম, মা, হাজরা যদি ছল হয়, এখান থেকে সরিয়ে দাও। ওকে সেই কথা বলেছিলাম। ও কিছুদিন পরে এসে বলে, দেখলে আমি এখনও রয়েছি। (ঠাকুরের ও সকলের হাস্য) কিন্তু তারপরে চলে গেল।

“হাজরার মা রামলালকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিল, ‘হাজরাকে একবার রামলালের খুড়োমশায় যেন পাঠিয়ে দেন। আমি কেঁদে কেঁদে চোখে দেখতে পাই না।’ আমি হাজরাকে অনেক করে বললুম, বুড়ো মা, একবার দেখা দিয়ে এস; তা কোন মতে গেল না। তার মা শেষে কেঁদে কেঁদে মরে গেল।”

নরেন্দ্র — এবারে দেশে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এখন দেশে যাবে, ঢ্যামনা শালা! দূর দূর, তুই বুঝিস না। গোপাল বলেছে, সিঁথিতে হাজরা কদিন ছিল। তারা চাল ঘি সব জিনিস দিত। তা বলেছিল, এ ঘি এ চাল কি আমি খাই? ভাটপাড়ায় ঈশেনের সঙ্গে গিছল। ঈশেনকে নাকি বলেছে, বাহ্যে যাবার জল আনতে। এই বামুনরা সব রেগে গিছল।

নরেন্দ্র — জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তা সে বলে, ঈশানবাবু এগিয়ে দিতে গিছল। আর ভাটপাড়ায় অনেক বামুনের কাছে মানও হয়েছিল!

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) — ওইটুকু জপতপের ফল।

“আর কি জানো, অনেকটা লক্ষণে হয়। বেঁটে, ডোব কাটা কাটা গা, ভাল লক্ষণ নয়। অনেক দেরিতে জ্ঞান হয়।”

ভবনাথ — থাক্ থাক্ — ও-সব কথায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা নয়। (নরেন্দ্রের প্রতি) — তুই নাকি লোক চিনিস, তাই তোকে বলছি। আমি হাজরাকে ও সকলকে কিরকম জানি, জানিস? আমি জানি, যেমন সাধুরূপী নারায়ণ, তেমনি ছলরূপী নারায়ণ, লুচ্চরূপী নারায়ণ! (মহিমাচরণের প্রতি) — কি বল গো? সকলই নারায়ণ।

মহিমাচরণ — আজ্ঞা, সবই নারায়ণ।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৪শে এপ্রিল 1885/04/24/vi

45.6 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গোপীপ্রেম

গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — মহাশয়, একাঙ্গী প্রেম কাকে বলে?

শ্রীরামকৃষ্ণ —— একাঙ্গী, কিনা, ভালবাসা একদিক থেকে। যেমন জল হাঁসকে চাচ্চে না, কিন্তু হাঁস জলকে ভালবাসে। আবার আছে সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থা। সাধারণী প্রেম —— নিজের সুখ চায়, তুমি সুখী হও আর না হও, যেমন চন্দ্রাবলীর ভাব। আবার সমঞ্জসা, আমারও সুখ হোক, তোমারও হোক। এ খুব ভাল অবস্থা।

“সকলের উচ্চ অবস্থা, — সমর্থা। যেমন শ্রীমতীর। কৃষ্ণসুখে সুখী, তুমি সুখে থাক, আমার যাই হোক।

“গোপীদের এই ভাব বড় উচ্চ ভাব।

“গোপীরা কে জান? রামচন্দ্র বনে বনে ভ্রমণ করতে করতে —— ষষ্টি সহস্র ঋষি বসেছিলেন, তাদের দিকে একবার চেয়ে দেখেছিলেন, সস্নেহে! তাঁরা রামচন্দ্রকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। কোন কোন পুরাণে আছে, তারাই গোপী।”

একজন ভক্ত —— মহাশয়! অন্তরঙ্গ কাহাকে বলে?

শ্রীরামকৃষ্ণ —— কিরকম জানো? যেমন নাটমন্দিরের ভিতরে থাম, বাইরের থাম। যারা সর্বদা কাছে থাকে, তারাই অন্তরঙ্গ।

[জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয় —— ভরদ্বাজাদি ও রাম —— পূর্বকথা ——

অরূপদর্শন — সাকার ত্যাগ — শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি) — কিন্তু জ্ঞানী রূপও চায় না, অবতারও চায় না। রামচন্দ্র বনে যেতে যেতে কতকগুলি ঋষিদের দেখতে পেলেন। তাঁরা রামকে খুব আদর করে আশ্রমে বসালেন। সেই ঋষিরা বললেন, রাম তোমাকে আজ আমরা দেখলুম, আমাদের সকল সফল হল। কিন্তু আমরা তোমাকে জানি দশরথের বেটা। ভরদ্বাজাদি তোমাকে অবতার বলে; আমরা কিন্তু তা বলি না, আমরা সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের চিন্তা করি। রাম প্রসন্ন হয়ে হাসতে লাগলেন।

"উঃ, আমার কি অবস্থা গেছে! মন অখণ্ডে লয় হয়ে যেত! এমন কতদিন! সব ভক্তি-ভক্ত ত্যাগ করলুম! জড় হলুম! দেখলুম, মাথাটা নিরাকার, প্রাণ যায় যায়! রামলালের খুড়ীকে ডাকব মনে করলুম!

"ঘরে ছবি-টবি যা ছিল, সব সরিয়ে ফেলতে বললুম। আবার হুঁশ যখন আসে, তখন মন নেমে আসবার সময় প্রাণ আটুপাটু করতে থাকে! শেষে ভাবতে লাগলুম, তবে কি নিয়ে থাকব! তখন ভক্তি-ভক্তের উপর মন এল।

"তখন লোকদের জিজ্ঞাসা করে বেড়াতে লাগলুম যে, এ আমার কি হল! ভোলানাথ১ বললে, ভারতে২ আছে'। সমাধিস্থ লোক যখন সমাধি থেকে ফিরবে, তখন কি নিয়ে থাকবে? কাজেই ভক্তি-ভক্ত চাই। তা না হলে মন দাঁড়ায় কোথা?

১ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় তখন রাসমণির ঠাকুর বাড়ির মুহুরী ছিলেন, পরে খাজাঞ্চি হইয়াছিলেন।

২ মহাভারত।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৪শে এপ্রিল 1885/04/24/vii

45.7 সমাধিস্থ কি ফেরে? শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত — কুয়ার সিং১

মহিমাচরণ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — মহাশয়, সমাধিস্থ কি ফিরতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি একান্তে) — তোমায় একলা একলা বলব; তুমিই একথা শোনবার উপযুক্ত।

“কুয়ার সিং ওই কথা জিজ্ঞাসা করত। জীব আর ঈশ্বর অনেক তফাত। সাধন-ভজন করে সমাধি পর্যন্ত জীবের হতে পারে। ঈশ্বর যখন অবতীর্ণ হন, তিনি সমাধিস্থ হয়েও আবার ফিরতে পারেন। জীবের থাক — এরা যেন রাজার কর্মচারী। রাজার বারবাড়ি পর্যন্ত এদের গতায়াত। রাজার বাড়ি সাততলা, কিন্তু রাজার ছেলে সাততলায় আনাগোনা করতে পারে, আবার বাইরেও আসতে পারে। ফেরে না, ফেরে না, সব বলে। তবে শঙ্করাচার্য রামানুজ এরা সব কি? এরা ‘বিদ্যার আমি’ রেখেছিল।”

মহিমাচরণ — তাই তো; তা না হলে গ্রন্থ লিখলে কেমন করে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — আবার দেখ, প্রহ্লাদ, নারদ, হনুমান, এরাও সমাধির পর ভক্তি রেখেছিল।

মহিমাচরণ — আজ্ঞা হাঁ।

[শুধু জ্ঞান বা জ্ঞানচর্চা — আর সমাধির পর জ্ঞান — বিদ্যার আমি]

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেউ কেউ জ্ঞানচর্চা করে বলে মনে করে, আমি কি হইছি। হয়তো একটু বেদান্ত পড়েছে। কিন্তু ঠিক জ্ঞান হলে অহংকার হয় না, অর্থাৎ যদি সমাধি হয়, আর মানুষ তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যায়, তাহলে আর অহংকার থাকে না। সমাধি না হলে ঠিক জ্ঞান হয় না। সমাধি হলে তাঁর সঙ্গে এক হওয়া যায়। অহং থাকে না।

“কিরকম জানো? ঠিক দুপুর বেলা সূর্য ঠিক মাথার উপর উঠে। তখন মানুষটা চারিদিকে চেয়ে দেখে, আর ছায়া নাই। তাই ঠিক জ্ঞান হলে — সমাধিস্থ হলে — অহংরূপ ছায়া থাকে না।

“ঠিক জ্ঞান হবার পর যদি অহং থাকে, তবে জেনো, ‘বিদ্যার আমি’ ‘ভক্তির আমি’ ‘দাস আমি’। সে ‘অবিদ্যার আমি’ নয়।

“আবার জ্ঞান ভক্তি দুইটিই পথ — যে পথ দিয়ে যাও, তাঁকেই পাবে। জ্ঞানী একভাবে তাঁকে দেখে, ভক্ত আর-একভাবে তাঁকে দেখে। জ্ঞানীর ঈশ্বর তেজোময়, ভক্তের রসময়।”

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও মার্কণ্ডেয়চণ্ডীবর্ণিত অসুরবিনাশের অর্থ]

ভবনাথ কাছে বসিয়াছেন ও সমস্ত শুনিতেছেন। ভবনাথ নরেন্দ্রের ভারী অনুগত ও প্রথম প্রথম ব্রাহ্মসমাজে সর্বদা যাইতেন।

ভবনাথ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে। আমি চণ্ডী বুঝতে পারছি না। চণ্ডীতে লেখা আছে যে, তিনি সব টক টক মারছেন। এর মানে কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ —– ও-সব লীলা। আমিও ভাবতুম ওই কথা। তারপর দেখলুম সবই মায়া। তাঁর সৃষ্টিও মায়া, তাঁর সংহারও মায়া।

ঘরের পশ্চিমদিকের ছাদে পাতা হইয়াছে। এইবার গিরিশ ঠাকুরকে ও ভক্তদিগকে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন। বৈশাখ শুক্লা দশমী। জগৎ হাসিতেছে। ছাদ চন্দ্রকিরণে প্লাবিত। এ-দিকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে সম্মুখে রাখিয়া ভক্তেরা প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন। সকলেই আনন্দে পরিপূর্ণ।

ঠাকুর “নরেন্দ্র” “নরেন্দ্র” করিয়া পাগল। নরেন্দ্র সম্মুখে পঙ্‌ক্তিতে অন্যান্য ভক্তসঙ্গে বসিয়াছেন। মাঝে মাঝে ঠাকুর নরেন্দ্রের খবর লইতেছেন। অর্ধেক খাওয়া হইতে না হইতে ঠাকুর হঠাৎ নরেন্দ্রের কাছে নিজের পাত থেকে দই ও তরমুজের পানা লইয়া উপস্থিত। বলিলেন, “নরেন্দ্র তুই এইটুকু খা।” ঠাকুর বালকের ন্যায় আবার ভোজনের আসনে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

১ কুয়ার সিং সিপাহিদের হাভিলদার

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c46 ৪৬ শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় বসু বলরাম-মন্দিরে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ৯ই মে 1885/05/09/i

46.1 নরেন্দ্র ও হাজরা মহাশয়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের দ্বিতলের বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। সহাস্যবদন। ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র, মাস্টার, ভবনাথ, পূর্ণ, পল্টু, ছোট নরেন, গিরিশ, রামবাবু, দ্বিজ, বিনোদ ইত্যাদি অনেক ভক্ত চতুর্দিকে বসিয়া আছেন।

আজ শনিবার (২৭শে বৈশাখ, ১২৯২) — বেলা ৩টা — বৈশাখ কৃষ্ণাদশমী, ৯ই মে, ১৮৮৫।

বলরাম বাড়িতে নাই, শরীর অসুস্থ থাকাতে, মুঙ্গেরে জলবায়ু পরিবর্তন করিতে গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা (এযন স্বর্গগতা) ঠাকুর ও ভক্তদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মহোৎসব করিয়াছেন। ঠাকুর খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করিতেছেন।

ঠাকুর মাস্টারকে বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি বল, আমি কি উদার?" ভবনাথ সহাস্যে বলিতেছেন, "উনি আর কি বলবেন, চুপ করে থাকবেন!"

একজন হিন্দুস্থানী ভিখারী গান গাইতে আসিয়াছেন। ভক্তেরা দুই-একটি গান শুনিলেন। গান নরেন্দ্রের ভাল লাগিয়াছে। তিনি গায়ককে বলিলেন, 'আবার গাও।'

শ্রীরামকৃষ্ণ — থাক্ থাক্, আর কাজ নাই, পয়সা কোথায়? (নরেন্দ্রের প্রতি) তুই তো বললি!

ভক্ত (সহাস্যে) — মহাশয়, আপনাকে আমীর ঠাওরেছে; আপনি তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া আছেন — (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া) — ব্যারাম হয়েছে, ভাবতে পারে।

হাজরার অহংকারের কথা পড়িল। কোনও কারণে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটী ত্যাগ করিয়া হাজরার চলিয়া আসিতে হইয়াছিল।

নরেন্দ্র — হাজরা এখন মানছে, তার অহংকার হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ও-কথা বিশ্বাস করো না। দক্ষিণেশ্বরে আবার আসবার জন্য ওরূপ কথা বলছে। (ভক্তদিগকে) নরেন্দ্র কেবল বলে, ‘হাজরা খুব লোক।’

নরেন্দ্র — এখনও বলি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেন? এত সব শুনলি।

নরেন্দ্র — দোষ একটু, — কিন্তু গুণ অনেকটা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — নিষ্ঠা আছে বটে।

“সে আমায় বলে, এখন তোমার আমাকে ভাল লাগছে না, — কিন্তু পরে আমাকে তোমায় খুঁজতে হবে। শ্রীরামপুর থেকে একটি গোঁসাই এসেছিল, অদ্বৈত বংশ। ইচ্ছা, ওখানে একরাত্রি দুরাত্রি থাকে। আমি যত্ন করে তাকে থাকতে বললুম। হাজরা বলে কি, ‘খাজাঞ্চীর কাছে ওকে পাঠাও’। এ-কথার মানে এই যে, দুধটুধ পাছে চায়, তাহলে হাজরার ভাগ থেকে কিছু দিতে হয়। আমি বললুম, — তবে রে শালা! গোঁসাই বলে আমি ওর কাছে সাষ্টাঙ্গ হই, আর তুই সংসারে থেকে কামিনী-কাঞ্চন লয়ে নানা কাণ্ড করে — এখন একটু জপ করে এত অহংকার হয়েছে! লজ্জা করে না!

“সত্ত্বগুণে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়; রজঃ, তমোগুণে ঈশ্বর থেকে তফাত করে। সত্ত্বগুণকে সাদা রঙের সঙ্গে উপমা দিয়েছে, রজোগুণকে লাল রঙের সঙ্গে, আর

তমোগুণকে কালো রঙের সঙ্গে। আমি একদিন হাজরাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি বল কার কত সত্ত্বগুণ হয়েছে। সে বললে, ‘নরেন্দ্রের ষোল আনা; আর আমার একটাকা দুইআনা।’ জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কত হয়েছে? তা বললে, তোমার এখনও লালচে মারছে, — তোমার বার আনা। (সকলের হাস্য)

“দক্ষিণেশ্বরে বসে হাজরা জপ করত। আবার ওরই ভিতর থেকে দালালির চেষ্টা করত! বাড়িতে কয় হাজার টাকা দেনা আছে — সেই দেনা শুধতে হবে। রাঁধুনী বামুনদের কথায় বলেছিল, ও-সব লোকের সঙ্গে আমরা কি কথা কই!”

[কামনা ঈশ্বরলাভের বিঘ্ন — ঈশ্বর বালকস্বভাব]

“কি জানো, একটু কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ধর্মের সূক্ষ্ম গতি! ছুঁচে সুতা পরাচ্ছ — কিন্তু সুতার ভিতর একটু আঁস থাকলে ছুঁচে ভিতর প্রবেশ করবে না।

“ত্রিশ বছরর মালা জপে, তবু কেন কিছু হয় না? ডাকুর ঘা হলে ঘুঁটের ভাবরা দিতে হয় না। না হলে শুধু ঔষধে আরাম হয় না।

“কামনা থাকতে, যত সাধনা কর না কেন, সিদ্ধিলাভ হয় না। তবে একটি কথা আছে — ঈশ্বরের কৃপা হলে, ঈশ্বরের দয়া হলে একক্ষণে সিদ্ধিলাভ করতে পারে। যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর, হঠাৎ কেউ যদি প্রদীপ আনে, তাহলে একক্ষণে আলো হয়ে যায়!

“গরিবের ছেলে বড় মানুষের চোখে পড়ে গেছে। তার মেয়ের সঙ্গে তাকে বিয়ে দিলে। অমনি গাড়িঘোড়া, দাসদাসী, পোসাক, আসবাব, বাড়ি সব হয়ে গেল!”

একজন ভক্ত — মহাশয়, কৃপা কিরূপে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বর বালকস্বভাব। যেমন কোন ছেলে কোঁচড়ে রত্ন লয়ে বসে আছে! কত লোক রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে। অনেকে তার কাছে রত্ন চাচ্ছে। কিন্তু সে কাপড়ে হাত চেপে মুখ ফিরিয়ে বলে, না আমি দেব না। আবার হয়ত যে চায়নি, চলে যাচ্ছে, পেছনে পেছনে দৌড়ে গিয়ে সেধে তাকে দিয়ে ফেলে!

[ত্যাগ — তবে ঈশ্বরলাভ — পূর্বকথা — সেজোবাবুর ভাব]

শ্রীরামকৃষ্ণ — ত্যাগ না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

“আমার কথা লবে কে? আমি সঙ্গী খুঁজছি, — আমার ভাবের লোক। খুব ভক্ত দেখলে মনে হয়, এই বুঝি আমার ভাব নিতে পারবে। আবার দেখি, সে আর-একরকম হয়ে যায়!

“একটা ভূত সঙ্গী খুঁছিল। শনি মঙ্গলবারে অপঘাত-মৃত্যু হলে ভূত হয়। ভূতটা, যেই দেখে কেউ শনি মঙ্গলবারে ওইরকম করে মরছে, অমনি দৌড়ে যায়। মনে করে, এইবার বুঝি আমার সঙ্গী হল। কিন্তু কাছেও যাওয়া, আর সে লোকটা দাঁড়িয়ে উঠেছে। হয়তো ছাদ থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়েছে, আবার বেঁচে উঠেছে।

“সেজোবাবুর ভাব হল। সর্বদাই মাতালের মতো থাকে — কোনও কাজ করতে পারে না। তখন সবাই বলে, এরকম হলে বিষয় দেখবে কে? ছোট ভট্‌চার্জি নিশ্চয় কোনও তুক্‌ করেছে।”

[নরেন্দ্রের বেহুঁশ হওয়া — গুরুশিষ্যের দুটি গল্প]

“নরেন্দ্র যখন প্রথম প্রথম আসে, ওর বুকে হাত দিতে বেহুঁশ হয়ে গেল। তারপর চৈতন্য হলে কেঁদে বলতে লাগল, ওগো আমায় এমন করলে কেন? আমার যে বাবা আছে, আমার যে মা আছে গো! ‘আমার’, ‘আমার’ করা, এটি অজ্ঞান থেকে হয়।

“গুরু শিষ্যকে বললেন, সংসার মিথ্যা; তুই আমার সঙ্গে চলে আয়। শিষ্য বললে, ঠাকুর এরা আমায় এত ভালবাসে — আমার বাপ, আমার মা, আমার স্ত্রী — এদের ছেড়ে কেমন করে যাব। গুরু বললেন, তুই ‘আমার’ ‘আমার’ করছিস বটে, আর বলছিস ওরা ভালবাসে, কিন্তু ও-সব ভুল। আমি তোকে একটা ফন্দি শিখিয়ে দিচ্ছি, সেইটি করিস, তাহলে বুঝবি সত্য ভালবাসে কি না! এই বলে একটা ঔষধের বড়ি তার হাতে দিয়ে বললেন, এইটি খাস, মড়ার মতন হয়ে যাবি! তোর জ্ঞান যাবে না, সব দেখতে শুনতে পাবি। তারপর আমি গেলে তোর ক্রমে ক্রমে পূর্বাবস্থা হবে।

“শিষ্যটি ঠিক ওইরূপ করলে। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। মা, স্ত্রী, সকলে আছড়া-পিছড়ি করে কাঁদছে। এমন সময় একটি ব্রাহ্মণ এসে বললে, কি হয়েছে গা? তারা সকলে বললে, এ ছেলেটি মারা গেছে। ব্রাহ্মণ মরা মানুষের হাত দেখে

বললেন, সে কি, এ তো মরে নাই। আমি একটি ঔষধ দিচ্ছি, খেলেই সব সেরে যাবে! বাড়ির সকলে তখন যেন হাতে স্বর্গ পেল। তখন ব্রাহ্মণ বললেন, তবে একটি কথা আছে। ঔষধটি আগে একজনের খেতে হবে, তারপর ওর খেতে হবে। যিনি আগে খাবেন, তাঁর কিন্তু মৃত্যু হবে। এর তো অনেক আপনার লোক আছে দেখছি, কেউ না কেউ অবশ্য খেতে পারে। মা কি স্ত্রী এঁরা খুব কাঁদছেন, এঁরা অবশ্য পারেন।

"তখন তারা সব কান্না থামিয়ে, চুপ করে রহিল। মা বললেন, তাই তো এই বৃহৎ সংসার, আমি গেলে, কে এই সব দেখবে শুনবে, এই বলে ভাবতে লাগলেন। স্ত্রী এইমাত্র এই বলে কাঁদছিল — "দিদি গো আমার কি হল গো!' সে বললে, তাই তো, ওঁর যা হবার হয়ে গেছে। আমার দুটি-তিনটি নাবালক ছেলেমেয়ে — আমি যদি যাই এদের কে দেখবে।

"শিষ্য সব দেখছিল শুনছিল। সে তখন দাঁড়িয়ে উঠে পড়ল; আর বললে, গুরুদেব চলুন, আপনার সঙ্গে যাই। (সকলের হাস্য)

"আর-একজন শিষ্য গুরুকে বলেছিল, আমার স্ত্রী বড় যত্ন করে, ওর জন্য গুরুদেব যেতে পারছি না। শিষ্যটি হঠযোগ করত। গুরু তাকেও একটি ফন্দি শিখিয়ে দিলেন। একদিন তার বাড়িতে খুব কান্নাকাটি পড়েছে। পাড়ার লোকেরা এসে দেখে হঠযোগী ঘরে আসনে বসে আছে — এঁকে বেঁকে, আড়ষ্ট হয়ে। সব্বাই বুঝতে পারলে, তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। স্ত্রী আছড়ে কাঁদছে, 'ওগো আমাদের কি হল গো — ওগো তুমি আমাদের কি করে গেলে গো — ওগো

দিদি গো, এমন হবে তা জানতাম না গো!’ এদিকে আত্মীয় বন্ধুরা খাট এনেছে, ওকে ঘর থেকে বার করছে।

“এখন একটি গোল হল। এঁকে বেঁকে আড়ষ্ট হয়ে থাকাতে দ্বার দিয়ে বেরুচ্ছে না। তখন একজন প্রতিবেশী দৌড়ে একটি কাটারি লয়ে দ্বারের চৌকাঠ কাটতে লাগল। স্ত্রী অস্থির হয়ে কাঁদছিল, সে দুমদুম শব্দ শুনে দৌড়ে এল। এসে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করলে, ওগো কি হয়েছে গো! তারা বললে, ইনি বেরুচ্ছেন না, তাই চৌকাঠ কাটছি। তখন স্ত্রী বললে, ওগো, অমন কর্ম করো না গো। — আমি এখন রাঁড় বেওয়া হলুম। আমার আর দেখবার লোক কেউ নাই, কঠি নাবালক ছেলেকে মানুষ করতে হবে! এ দোয়ার গেলে আর তো হবে না। ওগো, ওঁর যা হবার তা তো হয়ে গেছে — হাত-পা ওঁর কেটে দাও! তখন হঠযোগী দাঁড়িয়া পড়ল। তার তখন ঔষধের ঝোঁক চলে গেছে। দাঁড়িয়ে বলছে, ‘তবে রে শালী, আমার হাত-পা কাটবে।’ এই বলে বাড়ি ত্যাগ করে গুরুর সঙ্গে চলে গেল। (সকলের হাস্য)

“অনেকে ঢং করে শোক করে। কাঁদতে হবে জেনে আগে নৎ খোলে আর আর গহনা খোলে; খুলে বাক্সর ভিতর চাবি দিয়ে রেখে দেয়। তারপর আছড়ে এসে পড়ে, আর কাঁদে, ‘ওগো দিদিগো, আমার কি হল গো’!”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ৯ই মে 1885/05/09/ii

46.2 অবতার সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে নরেন্দ্রাদির বিচার

নরেন্দ্র — Proof (প্রমাণ) না হলে কেমন করে বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসেন।

গিরিশ — বিশ্বাসই sufficient proof (যথেষ্ট প্রমাণ)। এই জিনিসটা এখানে আছে, এর প্রমাণ কি? বিশ্বাসই প্রমান।

একজন ভক্ত — External world (বহির্জগৎ) বাহিরে আছে ফিলসফার (দার্শনিকরা) কেউ Prove করতে পেরেছে? তবে বলেছে irresistible belief (বিশ্বাস)।

গিরিশ (নরেন্দ্রের প্রতি) — তোমার সম্মুখে এলেও তো বিশ্বাস করবে না! হয়তো বলবে, ও বলছে আমি ঈশ্বর, মানুষ হয়ে এসেছি, ও মিথ্যাবাদী ভণ্ড।

দেবতারা অমর এই কথা পড়িল।

নরেন্দ্র — তার প্রমাণ কই?

গিরিশ — তোমার সামনে এলেও তো বিশ্বাস করবে না!

নরেন্দ্র — অমর, past-ages-তে ছিল, প্রুফ চাই।

মণি পল্টুকে কি বলিতেছেন।

পল্টু (নরেন্দ্রের প্রতি, সহাস্যে) — অনাদি কি দরকার? অমর হতে গেলে অনন্ত হওয়া দরকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — নরেন্দ্র উকিলের ছেলে, পল্টু ডেপুটির ছেলে। (সকলের হাস্য)

সকলে একটু চুপ করিয়া আছেন।

যোগীন (গিরিশাদি ভক্তদের প্রতি সহাস্যে) — নরেন্দ্রের কথা ইনি (ঠাকুর) আর লন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — আমি একদিন বলছিলাম, চাতক আকাশের জল ছাড়া আর কিছু খায় না। নরেন্দ্র বললে, চাতক এ-জলও খায়। তখন মাকে বললুম, মা এ-সব কথা কি মিথ্যা হয়ে গেল! ভারী ভাবনা হল। একদিন আবার নরেন্দ্র এসেছে। ঘরের ভিতর কতকগুলি পাখি উড়ছিল দেখে বলে উঠল, ‘ওই! ওই!’ আমি বললাম, কি? ও বললে, ‘ওই চাতক! ওই চাতক!’ দেখি কতকগুলো চামচিকে। সেই থেকে ওর কথা আর লই না। (সকলের হাস্য)

[ঈশ্বর-রূপদর্শন কি মনের ভুল?]

শ্রীরামকৃষ্ণ — যদু মল্লিকের বাগানে নরেন্দ্র বললে, তুমি ঈশ্বরের রূপ-টুপ যা দেখ, ও মনের ভুল। তখন অবাক্ হয়ে ওকে বললাম, কথা কয় যে রে? নরেন্দ্র বললে, ও অমন হয়। তখন মার কাছে এসে কাঁদতে লাগলাম! বললাম, মা, এ

কি হল! এ-সব কি মিছে? নরেন্দ্র এমন কথা বললে! তখন দেখিয়ে দিলে — চৈতন্য — অখণ্ড চৈতন্য — চৈতন্যময় রূপ। আর বললে, ‘এ-সব কথা মেলে কেমন করে যদি মিথ্যা হবে!’ তখন বলেছিলাম, ‘শালা, তুই আমায় অবিশ্বাস করে দিছলি! তুই আর আসিস নি!’

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ — শাস্ত্র ও ঈশ্বরের বাণী — Revelation]

আবার বিচার হইতে লাগিল। নরেন্দ্র বিচার করিতেছেন! নরেন্দ্রের বয়স এখন ২২ বৎসর চার মাস হইবে।

নরেন্দ্র (গিরিশ, মাস্টার প্রভৃতিকে) — শাস্ত্রই বা বিশ্বাস কেমন করে করি! মহানির্বাণতন্ত্র একবার বলছেন, ব্রহ্মজ্ঞান না হলে নরক হবে। আবার বলে, পার্বতীর উপাসনা ব্যতীত আর উপায় নাই! মনুসংহিতায় লিখছেন মনুরই কথা। মোজেস লিখছেন পেন্ট্যাটিউক্, তাঁরই নিজের মৃত্যুর কথা বর্ণনা!

“সাংখ্য দর্শন বলছেন, ‘ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ’। ঈশ্বর আছেন, এ প্রমাণ করবার জো নাই। আবার বলে, বেদ মানতে হয়, বেদ নিত্য।

“তা বলে এ-সব নাই, বলছি না! বুঝতে পারছি না, বুঝিয়ে দাও! শাস্ত্রের অর্থ যার যা মনে এসেছে তাই করেছে। এখন কোন্‌টা লব? হোয়াইট লাইট (শ্বেত আলো) রেড মীডিয়ম-এর (লাল কাচের) মধ্য দিয়ে এলে লাল দেখায়। গ্রীন্ মীডিয়ম-এর মধ্য দিয়ে এলে গ্রীন দেখায়।”

একজন ভক্ত — গীতা ভগবান বলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — গীতা সব শাস্ত্রের সার। সন্ন্যাসীর কাছে আর কিছু না থাকে, গীতা একখানি ছোট থাকবে।

একজন ভক্ত — গীতা শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন!

নরেন্দ্র — শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, না ইয়ে বলেছেন! —

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অবাক্ হইয়া নরেন্দ্রের এই কথা শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এ-সব বেশ কথা হচ্ছে।

"শাস্ত্রের দুইরকম অর্থ — শব্দার্থ ও মর্মার্থ। মর্মার্থটুকু লতে হয়; যে ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে মিলে। চিঠির কথা, আর যে ব্যক্তি চিঠি লিখেছে তার মুখের কথা, অনেক তফাত। শাস্ত্র হচ্ছে চিঠির কথা; ঈশ্বরের বাণী মুখের কথা। আমি মার মুখের কথার সঙ্গে না মিললে কিছুই লই না।"

আবার অবতারের কথা পড়িল।

নরেন্দ্র — ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলেই হল। তারপর তিনি কোথায় ঝুলছেন বা কি করছেন এ আমার দরকার নাই। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড! অনন্ত অবতার!

'অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড', 'অনন্ত অবতার' শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিলেন ও বলিতেছেন, 'আহা!'

মণি ভবনাথকে কি বলিতেছেন।

ভবনাথ — ইনি বলেন, ‘হাতি যখন দেখি নাই, তখন সে ছুঁচের ভিতর যেতে পারে কিনা কেমন করে জানব? ঈশ্বরকে জানি না, অথচ তিনি মানুষ হয়ে অবতার হতে পারেন কিনা, কেমন করে বিচারে দ্বারা বুঝব!’

শ্রীরামকৃষ্ণ — সবই সম্ভব। তিনি ভেলকি লাগিয়ে দেন! বাজিকর গলার ভিতর ছুরি লাগিয়ে দেয়, আবার বার করে। ইট-পাটকেল খেয়ে ফেলে!

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ৯ই মে 1885/05/09/iii

46.3 শ্রীরামকৃষ্ণ ও কর্ম — তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা

ভক্ত — ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা বলেন, সংসারের কর্ম করা কর্তব্য। এ-কর্ম ত্যাগ করলে হবে না।

গিরিশ — সুলভ সমাচারে ওইরকম লিখেছে, দেখলাম। কিন্তু ঈশ্বরকে জানবার জন্য যে সব কর্ম — তাই করে উঠতে পারা যায় না, আবার অন্য কর্ম!

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া মাস্টারের দিকে তাকাইয়া নয়নের দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন, ‘ও যা বলছে তাই ঠিক’।

মাস্টার বুঝিলেন, কর্মকাণ্ড বড় কঠিন।

পূর্ণ আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কে তোমাকে খবর দিলে!

পূর্ণ — সারদা

শ্রীরামকৃষ্ণ (উপস্থিত মেয়ে ভক্তদের প্রতি) — ওগো একে (পূর্ণকে) একটু জলখাবার দাও তো।

এইবার নরেন্দ্র গান গাইবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তেরা শুনিবেন। নরেন্দ্র গাইতেছেন:

গান — পরবত পাথার।
ব্যোমে জাগো রুদ্র উদ্যত বাজ।
দেব দেব মহাদেব, কাল কাল মহাকাল,
ধর্মরাজ শঙ্কর শিব তার হর পাপ।

গান — সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে,
বহিছে অমৃতধার, জুড়ায় শ্রবণ, প্রাণরমণ হে।

গান — বিপদভয় বারণ, যে করে ওরে মন, তাঁরে কেন ডাক না;
মিছে ভ্রমে ভুলে সদা, রয়েছ, ভবঘোরে মজি, একি বিড়ম্বনা।

এ ধন জন, না রবে হেন তাঁরে যেন ভুল না,
ছাড়ি অসার, ভজহ সার, যাবে ভব যাতনা।
এখন হিত বচন শোন, যতনে করি ধারণা;
বদন ভরি, নাম হরি, সতত কর ঘোষণা।
যদি এ-ভবে পার হবে, ছাড় বিষয় বাসনা;
সঁপিয়ে তনু হৃদয় মন, তাঁর কর সাধনা।

পল্টু — এই গানটি গাইবেন?

নরেন্দ্র — কোন্‌টি?

পল্টু — দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে,
কি ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ শাসনে।

নরেন্দ্র সেই গানটি গাহিতেছেন:

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে,
কি ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ শাসনে।
অরুণ উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগৎ ছাড়িয়ে,
তেমনি দেব তোমার জ্যোতিঃ মঙ্গলময় বিরাজিলে,
ভকত হৃদয় বীতশোক তোমার মধুর সান্ত্বনে।
তোমার করুণা, তোমার প্রেম, হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে,
উথলে হৃদয় নয়ন বারি রাখে কে নিবারিয়ে?
জয় করুণাময়, জয় করুণাময় তোমার প্রেম গাইয়ে,

যায় যদি যাক্ প্রাণ তোমার কর্ম সাধনে।

মাস্টারের অনুরোধে আবার গাইতেছেন। মাস্টার ও ভক্তেরা অনেকে হাতজোড় করিয়া গান শুনিতেছেন।

গান — হরিরসমদিরা পিয়ে মম মানস মাতোরে।

একবার লুটহ অবনীতল, হরি হরি বলি কাঁদ রে।

(গতি কর কর বলে)।

গভীর নিনাদে হরিনামে গগন ছাও রে,

নাচো হরি বলে দুবাহু তুলে, হরিনাম বিলাও রে।

(লোকের দ্বারে দ্বারে)।

হরিপ্রেমানন্দরসে অনুদিন ভাস রে,

গাও হরিনাম, হও পূর্ণকাম, নীচ বাসনা নাশ রে।।

গান — চিন্তয় মম মানস হরি চিদঘন নিরঞ্জন।

গান — চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার।

গান — গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে।

গান — সেই এক পুরাতনে, পুরুষ নিরঞ্জনে, চিত্ত সমাধান কর রে।

নারাণের অনুরোধে আবার নরেন্দ্র গাইতেছেন:

এসো মা এসো মা, ও হৃদয়-রমা, পরাণ-পুতলী গো।

হৃদয়-আসনে, হও মা আসীন, নিরখি তোরে গো।।

আছি জন্মাবধি তোর মুখ চেয়ে,

জান মা জননী কি দুখ পেয়ে,

একবার হৃদয়কমল বিকাশ করিয়ে,

প্রকাশ তাহে আনন্দময়ী ।।

[শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিমন্দিরে — তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা]

নরেন্দ্র নিজের মনে গাইতেছেন:

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।

তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী ।।

সমাধির এই গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইতেছেন।

নরেন্দ্র আর একবার সেই গানটি গাইতেছেন —

হরিরসমদরিরা পিয়ে মম মানস মাতোরে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট। উত্তরাস্য হইয়া দেওয়ালে ঠেসান দিয়া পা ঝুলাইয়া তাকিয়ার উপর বসিয়া আছেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে উপবিষ্ট।

ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর মার সঙ্গে একাকী কথা কহিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন — "এই বেলা খেয়ে যাব। তুই এলি? তুই কি গাঁট্‌রি বেঁধে বাসা পাকড়ে সব ঠিক করে এলি?"

ঠাকুর কি বলিতেছেন, মা তুই কি এলি? ঠাকুর আর মা কি অভেদ?

“এখন আমার কারুকে ভাল লাগছে না।”

“মা, গান কেন শুনব? ওতে তো মন খানিকটা বাইরে চলে যাবে!”

ঠাকুর ক্রমে ক্রমে আরও বাহ্যজ্ঞান লাভ করিতেছেন। ভক্তদের দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন, ‘আগে কইমাছ জীইয়ে রাখা দেখে আশ্চর্য হতুম; মনে করতুম এরা কি নিষ্ঠুর, এদের শেষকালে হত্যা করবে! অবস্থা যখন বদলাতে লাগল তখন দেখি যে, শরীগুলো খোল মাত্র! থাকলেও এসে যায় না, গেলেও এসে যায় না!”

ভবনাথ — তবে মানুষ হিংসা করা যায়! — মেরে ফেলা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, এ-অবস্থায় হতে পারে১। সে অবস্থা সকলের হয় না। — ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা।

“দুই-এক গ্রাম নেমে এলে তবে ভক্তি, ভক্ত ভাল লাগে!

“ঈশ্বরেতে বিদ্যা-অবিদ্যা দুই আছে। এই বিদ্যা মায়া ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়, অবিদ্যা মায়া ঈশ্বর থেকে মানুষকে তফাত করে লয়ে যায়। বিদ্যার খেলা — জ্ঞান, ভক্তি, দয়া, বৈরাগ্য। এই সব আশ্রয় করলে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো যায়।

“আর-একধাপ উঠলেই ঈশ্বর — ব্রহ্মজ্ঞান! এ-অবস্থায় ঠিক বিধ হচ্চে — ঠিক দেখছি — তিনিই সব হয়েছেন। ত্যাজ্য-গ্রাহ্য থাকে না! কারু উপর রাগ করবার জো থাকে না।

“গাড়ি করে যাচ্ছি — বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম দুই বেশ্যা! দেখলাম সাক্ষাৎ ভগবতী — দেখে প্রণাম করলাম!

“যখন এই অবস্থা প্রথম হল, তখন মা-কালীকে পূজা করতে বা ভোগ দিতে আর পারলাম না। হলধারী আর হৃদে বললে, খাজাঞ্চী বলেছে, ভট্‌চাজ্জি ভোগ দিবেন না তো কি করবেন? আমি কুবাক্য বলেছে শুনে কেবল হাসতে লাগলাম, একটু রাগ হল না।

“এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে তারপর লীলা আস্বাদন করে বেড়াও। সাধু একটি শহরে এসে রঙ দেখে বেড়াচ্চে। এমন সময়ে তার এক আলাপী সাধুর সঙ্গে দেখা হল। সে বললে ‘তুমি যে ঘুরে ঘুরে আমোদ করে বেড়াচ্চো, তল্পিতল্পা কই? সেগুলি তো চুরি করে লয়ে যায় নাই?’ প্রথম সাধু বললে, ‘না মহারাজ, আগে বাসা পাকড়ে গাঁট্‌রি-ওঠরি ঠিকঠাক করে ঘরে রেখে, তালা লাগিয়ে তবে শহরের রঙ দেখে বেরাচ্চি’।” (সকলের হাস্য)

ভবনাথ — এ খুব উঁচু কথা।

মণি (স্বগত) — ব্রহ্মজ্ঞানের পর লীলা-আস্বাদন! সমাধির পর নিচে নামা!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারাদির প্রতি) — ব্রহ্মজ্ঞান কি সহজে হয় গা? মনের নাশ না হলে হয় না। গুরু শিষ্যকে বলেছিল, তুমি আমায় মন দাও, আমি তোমায় জ্ঞান দিচ্ছি। ন্যাংটা বলত, 'আরে মন বিলাতে নাহি'!

[Biology — 'Natural law' in the Spiritual world]

"এ অবস্থায় কেবল হরিকথা লাগে; আর ভক্তসঙ্গ।

(রামের প্রতি) — "তুমি তো ডাক্তার, — যখন রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে এক হয়ে যাবে তখনই তো কাজ হবে। তেমনি এ অবস্থায় অন্তরে-বাহিরে ঈশ্বর। সে দেখবে তিনিই দেহ মন প্রাণ আত্মা!"

মণি (স্বগত) — Assimilation!

শ্রীরামকৃষ্ণ —— ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা! মনের নাশ হলেই হয়। মনের নাশ হলেই 'অহং' নাশ, — যেটা 'আমি' 'আমি' করছে। এটি ভক্তি পথেও হয়, আবার জ্ঞানপথে অর্থাৎ বিচারপথেও হয়। 'নেতি নেতি' অর্থাৎ 'এ-সব মায়া, স্বপ্নবৎ' এই বিচার জ্ঞানীরা করে। এই জগৎ 'নেতি' 'নেতি' —— মায়া। জগৎ যখন উড়ে গেল, বাকী রইল কতকগুলি জীব —— 'আমি' ঘট মধ্যে রয়েছে!

"মনে কর দশটা জলপূর্ণ ঘট আছে, তার মধ্যে সূর্যের প্রতিবিম্ব হয়েছে। কটা সূর্য দেখা যাচ্ছে?"

ভক্ত —— দশটা প্রতিবিম্ব। আর একটা সত্য সূর্য তো আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — মনে কর, একটা ঘট ভেঙে দিলে, এখন কটা সূর্য দেখা যায়?

ভক্ত — নয়টা; একটা সত্য সূর্য তো আছেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, নয়টা ঘট ভেঙে দেওয়া গেল, কটা সূর্য দেখা যাবে?

ভক্ত — একটা প্রতিবিম্ব সূর্য। একটা সত্য সূর্য তো আছেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি) — শেষ ঘট ভাঙলে কি থাকে?

গিরিশ — আজ্ঞা, ওই সত্য সূর্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ — না। কি থাকে তা মুখে বলা যায় না। যা আছে তাই আছে। প্রতিবিম্ব সূর্য না থাকলে সত্য সূর্য আছে কি করে জানবে! সমাধিস্থ হলে অহং তত্ত্ব নাশ হয়। সমাধিস্থ ব্যক্তি নেমে এলে কি দেখেছে মুখে বলতে পারে না!

১ ... ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে [গীতা, ২।২০]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ৯ই মে 1885/05/09/iv

46.4 শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদিগকে আশ্বাস প্রদান ও অঙ্গীকার

অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বলরামের বৈঠকখানায় দীপালোক জ্বলিতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভাবস্থ, ভক্তজন পরিবৃত হইয়া আছেন। ভাবে বলিতেছেন —

“এখানে আর কেউ নাই, তাই তোমাদের বলছি, — আন্তরিক ঈশ্বরকে যে জানতে চাইবে তারই হবে, হবেই হবে! যে ব্যকুল, ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, তারই হবে।

“এখানকার যারা লোক (অন্তরঙ্গ ভক্তেরা) তারা সব জুটে গেছে। আর সব এখন যারা যাবে তারা বাহিরের লোক। তারাও এখন মাঝে মাঝে যাবে। (মা) তাদের বলে দেবে, ‘ই করো, এইরকম করে ঈশ্বরকে ডাকো’।”

[ঈশ্বরই গুরু — জীবের একমাত্র মুক্তির উপায়]

“কেন ঈশ্বরের দিকে (জীবের) মন যায় না? ঈশ্বরের চেয়ে তাঁর মহামায়ার আবার জোর বেশি। জজের চেয়ে প্যায়দার ক্ষমতা বেশি। (সকলের হাস্য)

“নারদকে রাম বললেন, নারদ, আমি তোমার স্তবে বড় প্রসন্ন হয়েছি; আমার কাছে কিছু বর লও! নারদ বললেন, রাম! তোমার পাদপদ্মে যেন আমার শুদ্ধাভক্তি হয়, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। রাম বললেন, তথাস্তু, আর কিছু বর লও! নারদ বললেন, রাম আর কিছু বর চাই না।

“এই ভুবনমোহিনী মায়ায় সকলে মুগ্ধ। ঈশ্বর দেহধারণ করেছেন — তিনিও মুগ্ধ হন। রাম সীতার জন্য কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছিলেন। ‘পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।’

“তবে একটি কথা আছে, — ঈশ্বর মনে করলেই মুক্ত হন!”

ভবনাথ — গার্ড (রেলের গাড়ির) নিজে ইচ্ছা করে রেলের গাড়ির ভিতর আপনাকে রুদ্ধ করে; আবার মনে করলেই নেমে পড়তে পারে!

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বরকোটি — যেমন অবতারাদি — মনে করলেই মুক্ত হতে পারে। যারা জীবকোটি তারা পারে না। জীবরা কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ। ঘরের দ্বার-জানলা, ইস্‌কুরু দিয়ে আঁটা, বেরুবে কেমন করে?

ভবনাথ (সহাস্যে) — যেমন রেলের থার্ডক্লাস্‌ প্যাসেঞ্জার-রা (তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীরা) চাবিবন্ধ, বেরুবার জো নাই!

গিরিশ — জীব যদি এইরূপ আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ, তার এখন উপায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তবে গুরুরূপ হয়ে ঈশ্বর স্বয়ং যদি মায়াপাশ ছেদন করেন তাহলে আর ভয় নাই।

ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিতেছেন যে, তিনি নিজে জীবের মায়াপাশ ছেদন করতে দেহধারণ করে, গুরুরূপ হয়ে এসেছেন?

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c47 ৪৭ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ভক্তমন্দিরে -- রামের বাড়িতে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৩শে মে 1885/05/23/i

47.1 রামের বাড়িতে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ রামের বাটীতে আসিয়াছেন। তাহার নিচের বৈঠকখানার ঘরে ঠাকুর ভক্ত পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। সহাস্যবদন। ঠাকুর ভক্তদের সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন।

আজ শনিবার (১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২), জ্যৈষ্ঠ শুক্লাদশমী তিথি। ২৩শে মে, ১৮৮৫, বেলা প্রায় ৫টা। ঠাকুরের সম্মুখে শ্রীযুক্ত মহিমা বসিয়া আছেন। বামপার্শ্বে

মাস্টার, চারিপার্শ্বে — পল্টু, ভবনাথ, নিত্যগোপাল, হরমোহন। শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়াই ভক্তগণের খবর লইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — ছোট নরেন আসে নাই?

ছোট নরেন কিয়ৎক্ষণ পরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সে আসে নাই?

মাস্টার — আজ্ঞা?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিশোরী? — গিরিশ ঘোষ আসবে না? নরেন্দ্র আসবে না?

নরেন্দ্র কিয়ৎ পরে আসিয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — কেদার (চাটুজ্যে) থাকলে বেশ হত! গিরিশ ঘোষের সঙ্গে খুব মিল। (মহিমার প্রতি, সহাস্যে) সেও ওই বলে (অবতার বলে)।

ঘরে কীর্তন গাহিবার আয়োজন হইয়াছে। কীর্তনিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ঠাকুরকে বলিতেছেন, আজ্ঞা করেন তো গান আরম্ভ হয়।

ঠাকুর বলিতেছেন, একটু জল খাব।

জলপান করিয়া মশলার বটুয়া হইতে কিছু মশলা লইলেন। মাস্টারকে বটুয়াটি বন্ধ করিতে বলিলেন।

কীর্তন হইতেছে। খোলের আওয়াজে ঠাকুরের ভাব হইতেছে। গৌরচন্দ্রিকা শুনিতে শুনিতে একেবারে সমাধিস্থ। কাছে নিত্যগোপাল ছিলেন, তাঁহার কোলে পা ছড়াইয়া দিলেন। নিত্যগোপালও ভাবে কাঁদিতেছেন। ভক্তেরা সকলে অবাক্ হইয়া সেই সমাধি-অবস্থা একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

[Yoga, Subjective and Objective, Identity of God (the Absolute) the soul and the
Cosmos (জগৎ)]

ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কথা কহিতেছেন — “নিত্য থেকে লীলা, লীলা থেকে নিত্য। (নিত্যগোপালের প্রতি) তোর কি?

নিত্য (বিনীত ভাবে) — দুই-ই ভালো।

শ্রীরামকৃষ্ণ চোখ বুজিয়া বলিতেছেন, — কেবল এমনটা কি? চোখ বুজলেই তিনি আছেন, আর চোখ চাইলেই নাই! যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা; যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) — তোমায় বাপু একবার বলি —

মহিমাচরণ — আজ্ঞা, দুই-ই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেউ সাততলার উপরে উঠে আর নামতে পারে না, আবার কেউ উঠে নিচে আনাগোনা করতে পারে।

“উদ্ধব গোপীদের বলেছিলেন, তোমরা যাকে কৃষ্ণ বলছ, তিনি সর্বভূতে আছেন, তিনিই জীবজগৎ হয়ে রয়েছেন।

“তাই বলি চোখ বুজলেই ধ্যান, চোখ খুললে আর কিছু নাই?”

মহিমা — একটা জিজ্ঞাস্য আছে। ভক্ত — এর এককালে তো নির্বাণ চাই?

[পূর্বকথা — তোতার ক্রন্দন — Is Nirvana the End of Life?]

শ্রীরামকৃষ্ণ — নির্বাণ যে চাই এমন কিছু না। এইরকম আছে যে, নিত্যকৃষ্ণ তাঁর নিত্যভক্ত! চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম!

“যেমন চন্দ্র যেখানে, তারাগণও সেখানে। নিত্যকৃষ্ণ, নিত্যভক্ত! তুমিই তো বল গো, অন্তর্বহির্যদিহরিস্তপসা ততঃ কিম্১ — আর তোমায় তো বলেছি যে বিষ্ণু অংশে ভক্তির বীজ যায় না। আমি এক জ্ঞানীর পাল্লায় পড়েছিলুম, এগার মাস বেদান্ত শুনালে। কিন্তু ভক্তীর বীজ আর যায় না। ফিরে ঘুরে সেই ‘মা মা’! যখন গান করতুম ন্যাংটা কাঁদত — বলত, ‘আরে কেয়া রে!’ দেখ, অত বড় জ্ঞানী কেঁদে ফেলত! (ছোট নরেন ইত্যাদির প্রতি) এইটে জেনে রেখো — আলেখ লতার জল পেটে গেলে গাছ হয়। ভক্তির বীজ একবার পড়লে অব্যর্থ হয়, ক্রমে গাছ, ফল, ফুল, দেখা দিবে।

“মুষলং কুলনাশনম্’। মুষল যত ঘষেছিল, ক্ষয় হয়ে হয়ে একটু সামান্য ছিল। সেই সামান্যতেই যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল। হাজার জ্ঞান বিচার কর, ভিতরে ভক্তির বীজ থাকলে, আবার ফিরে ঘুরে — হরি হরি হরিবোল।”

ভক্তেরা চুপ করিয়া শুনিতেছেন। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে মহিমাচরণকে বলিতেছেন, — আপনার কি ভাল লাগে?

মহিমা (সহাস্যে) — কিছুই না, আম ভাল লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — কি একলা একলা? না, আপনিও খাবে সব্বাইকেও একটু একটু দেবে?

মহিমা (সহাস্য) — এতো দেবার ইচ্ছা নাই, একলা হলেও হয়।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঠিক ভাব]

শ্রীরামকৃষ্ণ —— কিন্তু আমার ভাব কি জানো? চোখ চাইলেই কি তিনি আর নাই? আমি নিত্য লীলা দুইই লই।

"তাঁকে লাভ করলে জানতে পারা যায়; তিনিই স্বরাট, তিনিই বিরাট। তিনিই অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ, তিনিই আবার জীবজগৎ হয়েছেন।"

[শুধু শাস্ত্রজ্ঞান মিথ্যা —— সাধনা করিলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়]

"সাধনা চাই —— শুধু শাস্ত্র পড়লে হয় না। দেখলাম বিদ্যাসাগরকে —— অনেক পড়া আছে, কিন্তু অন্তরে কি আছে দেখে নাই। ছেলেদের পড়া শিখিয়ে আনন্দ। ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পায় নাই। শুধু পড়লে কি হবে? ধারণা কই? পাঁজিতে লিখেছে, বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না!"

মহিমা — সংসারে অনেক কাজ, সাধনার অবসর কই?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেন তুমি তো বল সব স্বপ্নবৎ?

“সম্মুখে সমুদ্র দেখে লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ হাতে করে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, আমি বরুণকে বধ করব, এই সমুদ্র আমাদের লঙ্কায় যেতে দিচ্ছে না; রাম বুঝালেন, লক্ষ্মণ, এ যা-কিছু দেখছো এসব তো স্বপ্নবৎ, অনিত্য — সমুদ্রও অনিত্য — তোমার রাগও অনিত্য। মিথ্যাকে মিথ্যা দ্বারা বধ করা সেটাও মিথ্যা।”

মহিমাচরণ চুপ করিয়া রহিলেন।

[কর্মযোগ না ভক্তিযোগ — সৎগুরু কে?]

মহিমাচরণের সংসারে অনেক কাজ। আর তিনি একটি নূতন স্কুল করিয়াছেন, — পরোপকারের জন্য।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কহিতেছেন —

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) — শম্ভু বললে — আমার ইচ্ছা যে এই টাকাগুলো সৎকর্মে ব্যয় করি, স্কুল ডিস্পেনসারি করে দি, রাস্তাঘাট করে দি। আমি বললাম, নিষ্কামভাবে করতে পার সে ভাল, কিন্তু নিষ্কামকর্ম করা বড় কঠিন, — কোন্ দিক দিয়া কামনা এসে পড়ে! আর একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন, তাহলে তাঁর কাছে তুমি কি কতকগুলি স্কুল, ডিস্পেনসারি, হাসপাতাল এই সব চাইবে?

একজন ভক্ত — মহাশয়! সংসারীদের উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — সাধুসঙ্গ; ঈশ্বরীয় কথা শোনা।

“সংসারীরা মাতাল হয়ে আছে, কামিনী-কাঞ্চনে মত্ত। মাতালকে চালিনির জল একটু একটু খাওয়াতে খাওয়াতে ক্রমে ক্রমে হুঁশ হয়।

“আর সৎগুরুর কাছে উপদেশ লতে হয়। সৎগুরুর লক্ষণ আছে। যে কাশী গিয়েছে আর দেখেছে, তার কাছেই কাশীর কথা শুনতে হয়। শুধু পণ্ডিত হলে হয় না। যার সংসার অনিত্য বলে বোধ নাই, সে পণ্ডিতের কাছে উপদেশ লওয়া উচিত নয়। পণ্ডিতের বিবেক-বৈরাগ্য থাকলে তবে উপদেশ দিতে পারে।

“সামাধ্যয়ী বলেছিল, ঈশ্বর নীরস। যিনি রসস্বরূপ, তাঁকে নীরস বলেছিল! যেমন একজন বলেছিল, আমার মামার বাটীতে একগোয়াল ঘোড়া আছে!” (সকলের হাস্য)

[অজ্ঞান — আমি ও আমার — জ্ঞান ও বিজ্ঞান]

“সংসারীরা মাতাল হয়ে আছে। সর্বদাই মনে করে, আমিই এই সব করছি। আর গৃহ, পরিবার এ-সব আমার। দাঁত ছরকুটে বলে। ‘এদের (মাগছেলেদের) কি হবে! আমি না থাকলে এদের কি করে চলবে? আমার স্ত্রী, পরিবার কে দেখবে?’ রাখাল বললে, আমার স্ত্রীর কি হবে!”

হরমোহন — রাখাল এই কথা বললে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা বলবে না তো কি করবে? যার আছে জ্ঞান তার আছে অজ্ঞান। লক্ষ্মণ রামকে বললেন, রাম একি আশ্চর্য? সাক্ষাৎ বশিষ্ঠদেব — তাঁর পুত্রশোক হল? রাম বললেন, ভাই, যার আছে জ্ঞান, তার আছে অজ্ঞান। ভাই! জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যাও।

“যেমন কারু পায়ে একটি কাঁটা ফুটেছে, সে ওই কাঁটাটি তোলবার জন্য আর একটি কাঁটা যোগাড় করে আনে। তারপর কাঁটা দিয়া কাঁটাটি তুলবার পর, দুটি কাঁটাই ফেলে দেয়! অজ্ঞান-কাঁটা তুলবার জন্য জ্ঞান-কাঁটা আহরণ করতে হয়। তারপর জ্ঞান-অজ্ঞান দুই কাঁটা ফেলে দিলে হয় বিজ্ঞান। ঈশ্বর আছেন এইটি বোধে বোধ করে তাঁকে বিশেষরূপে জানতে হয়, তাঁর সঙ্গে বিশেষরূপে আলাপ করতে হয়, — এরই নাম বিজ্ঞান। তাই ঠাকুর (শ্রীকৃষ্ণ) অর্জুনকে বলেছিলেন — তুমি ত্রিগুণাতীত হও।

“এই বিজ্ঞান লাভ করবার জন্য বিদ্যামায়া আশ্রয় করতে হয়। ঈশ্বর সত্য, জগৎ অনিত্য, এই বিচার, — অর্থাৎ বিবেক-বৈরাগ্য। আবার তাঁর নামগুণকীর্তন, ধ্যান, সাধুসঙ্গ, প্রার্থনা — এ-সব বিদ্যামায়ার ভিতর। বিদ্যামায়া যেন ছাদে উঠবার শেষ কয় পইঠা, আর-একধাপ উঠলেই ছাদ। ছাদে উঠা অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ।”

[সংসারী লোক ও কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী ছোকরা]

“বিষয়ীরা মাতাল হয়ে আছে, — কামিনী-কাঞ্চনে মত্ত, হুঁশ নাই, — তাইতো ছোকরাদের ভালবাসি। তাদের ভিতর কামিনী-কাঞ্চন এখনও ঢোকে নাই। আধার ভাল, ঈশ্বরের কাজে আসতে পারে।

“সংসারীদের ভিতর কাঁটা বাছতে বাছতে সব যায়, — মাছ পাওয়া যায় না!
“যেমন শিলে খেকো আম —— গঙ্গাজল দিয়ে লতে হয়। ঠাকুর সেবায় প্রায় দেওয়া হয় না; ব্রহ্মজ্ঞান করে তবে কাটতে হয়, — অর্থাৎ তিনি সব হয়েছেন এইরূপ মনকে বুঝিয়ে।”

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত বিহারী ভাদুড়ীর পুত্রের সঙ্গে একটি থিয়জফিস্ট্‌ আসিয়াছেন। মুখুজ্জেরা আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। উঠানে সংকীর্তনের আয়োজন হইয়াছে। যাই খোল বাজিল ঠাকুর ঘর ত্যাগ করিয়া উঠানে গিয়া বসিলেন।

ভবনাথ অশ্বিনীর পরিচয় দিতেছেন। ঠাকুর মাস্টারকে অশ্বিণীকে দেখাইয়া দিলেন। দুইজনে কথা কহিতেছেন, নরেন্দ্র উঠানে আসিলেন। ঠাকুর অশ্বিনীকে বলিতেছেন, “এরই নাম নরেন্দ্র।”

১ অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌, নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌ ।।
আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌, নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌ ।।
বিরম বিরম ব্রহ্মণ্‌ কিং তপস্যসু বৎস, ব্রজ ব্রজ দ্বিজ শীঘ্রং শঙ্করং ঞ্জানসিন্ধুম্‌ ।।

লভ লভ হরিভক্তিং বৈষ্ণবোক্তাং সুপক্কাম্‌, ভব নিগড়নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্ত্তরীঞ্চ ||

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c48 ৪৮ শ্রীরামকৃষ্ণ কাপ্তেন, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১৩ই জুন 1885/06/13/i

48.1 ঠাকুরের গলার অসুখের সূত্রপাত

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে সেই পূর্বপরিচিত ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। আজ শনিবার, ১৩ই জুন, ১৮৮৫, (৩২শে জৈষ্ঠ, ১২৯২) জৈষ্ঠ শুক্লা প্রতিপদ,

জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি। বেলা তিনটা। ঠাকুর খাওয়া-দাওয়ার পর ছোট খাটটিতে একটু বিশ্রাম করিতেছেন।

পণ্ডিতজী মেঝের উপর মাদুরে বসিয়া আছেন। একটি শোকাতুরা ব্রাহ্মণী ঘরের উত্তরের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। কিশোরীও আছেন। মাস্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। সঙ্গে দ্বিজ ইত্যাদি। অখিলবাবুর প্রতিবেশীও বসিয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে একটি আসামী ছোকরা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একটু অসুস্থ আছেন। গলায় বিচি হইয়া সর্দির ভাব। গলার অসুখের এই প্রথম সূত্রপাত।

বড় গরম পড়াতে মাস্টারেরও শরীর অসুস্থ। ঠাকুরকে সর্বদা দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিতে পারেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এই যে তুমি এসেছ। বেশ বেলটি। তুমি কেমন আছ?

মাস্টার — আজ্ঞা, আগেকার চেয়ে একটু ভাল আছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বড় গরম পড়েছে। একটু একটু বরফ খেও। আমারও বাপু বড় গরম পড়ে কষ্ট হয়েছে। গরমেতে কুলপি বরফ — এই সব বেশি খাওয়া হয়েছিল। তাই গলায় বিচি হয়েছে। গয়ারে এমন বিশ্রী গন্ধ দেখি নাই।

“মাকে বলেছি, মা! ভাল করে দাও, আর কুলপি খাব না।

“তারপর আবার বলেছি, বরফও খাব না।”

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও সত্যকথা — তাঁহার জ্ঞানী ও ভক্তের অবস্থা]

“মাকে যেকালে বলছি ‘খাব না’ আর খাওয়া হবে না। তবে এমন হঠাৎ ভুল হয়ে যায়। বলেছিলাম, রবিবারে মাছ খাব না। এখন একদিন ভুলে খেয়ে ফেলেছি।

“কিন্তু জেনে-শুনে হবার জো নাই। সেদিন গাড়ু নিয়ে একজনকে ঝাউতলার দিকে আসতে বললুম। এখন সে বাহ্যে গিছল, তাই আর-একজন নিয়ে এসেছিল। আমি বাহ্যে করে এসে দেখি যে, আর-একজন গাড়ু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে গাড়ুর জল নিতে পারলুম না। কি করি? মাটি দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম — যতক্ষণ না সে এসে জল দিলে।

“মার পাদপদ্মে ফুল দিয়ে যখন সব ত্যাগ করতে লাগলাম, তখন বলতে লাগলাম, ‘মা! এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি; এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম; এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য; এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ; আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।’ কিন্তু এই লও তোমার সত্য, এই লও তোমার মিথ্যা — এ-কথা বলতে পারলাম না।”

একজন ভক্ত বরফ আনিয়াছিলেন। ঠাকুর পুনঃপুনঃ মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “হাঁগা খাব কি?”

মাস্টার বিনীতভাবে বলিতেছেন, “আজ্ঞা, তবে মার সঙ্গে পরামর্শ না করে খাবেন না।”

ঠাকুর অবশেষে বরফ খাইলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — শুচি-অশুচি — এটি ভক্তি ভক্তের পক্ষে। জ্ঞানীর পক্ষে নয়। বিজয়ের শাশুড়ী বললে, ‘কই আমার কি হয়েছে? এখনও সকলের খেতে পারি না!’ আমি বললাম, ‘সকলের খেলেই কি জ্ঞান হয়? কুকুর যা তা খায়, তাই বলে কি কুকুর জ্ঞানী?’

(মাস্টারের প্রতি) — “আমি পাঁচ ব্যান্নন দিয়ে খাই কেন? পাছে একঘেয়ে হলে এদের (ভক্তদের) ছেড়ে দিতে হয়।

“কেশব সেনকে বললাম, আরও এগিয়ে কথা বললে তোমার দলটল থাকে না!

“জ্ঞানীর অবস্থায় দলটল মিথ্যা — স্বপ্নবৎ।...

“মাছ ছেড়ে দিলাম। প্রথম প্রথম কষ্ট হত, পরে তত কষ্ট হত না। পাখির বাসা যদি কেউ পুড়িয়ে দেয়, সে উড়ে উড়ে বেড়ায়; আকাশ আশ্রয় করে। দেহ, জগৎ — যদি ঠিক মিথ্যা বোধ হয়, তাহলে আত্মা সমাধিস্থ হয়।

“আগে ওই জ্ঞানীর অবস্থা ছিল। লোক ভাল লাগত না। হাটখোলায় অমুক একটি জ্ঞানী আছে, কি একটি ভক্ত আছে, এই শুনলাম; আবার কিছুদিন পরে শুনলাম, ওই সে মরে গেছে! তাই আর লোক ভাল লাগত না। তারপর তিনি (মা) মনকে নামালেন, ভক্তি-ভক্ততে মন রাখিয়ে দিলেন।”

মাস্টার অবাক্, ঠাকুরের অবস্থা পরিবর্তনের বিষয় শুনিতেছেন। এইবার ঈশ্বর মানুষ হয়ে কেন অবতার হন, তাই ঠাকুর বলিতেছেন।

[অবতার বা নরলীলার গুহ্য অর্থ — দ্বিজ ও পূর্বসংস্কার]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — মনুষ্যলীলা কেন জান? এর ভিতর তাঁর কথা শুনতে পাওয়া যায়। এর ভিতর তাঁর বিলাস, এর ভিতর তিনি রসাস্বাদন করেন।

“আর সব ভক্তদের ভিতর তাঁরই একটু একটু প্রকাশ! যেমন জিনিস অনেক চুষতে চুষতে একটু রস, ফুল চুষতে চুষতে একটু মধু। (মাস্টারের প্রতি) তুমি এটা বুঝেছ?”

মাস্টার — আজ্ঞা হাঁ, বেশ বুঝেছি।

ঠাকুর দ্বিজর সহিত কথা কহিতেছেন। দ্বিজর বয়স ১৫।১৬, বাপ দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছেন। দ্বিজ প্রায় মাস্টারের সঙ্গে আসেন। ঠাকুর তাঁহাকে স্নেহ করেন। দ্বিজ বলিতেছিলেন, বাবা তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে আসিতে দেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (দ্বিজর প্রতি) — তোর ভাইরাও? আমাকে কি অবজ্ঞা করে?

দ্বিজ চুপ করিয়া আছেন।

মাস্টার — সংসারের আর দু-চার ঠোক্কর খেলে যাদের একটু-আধটু যা অবজ্ঞা আছে, চলে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বিমাতা আছে, ঘা (blow) তো খাচ্ছে।

সকলে একটু চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — একে (দ্বিজকে) পূর্ণর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিও না।

মাস্টার — যে আজ্ঞা। (দ্বিজর প্রতি) — পেনেটিতে যেও।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, তাই সব্বাইকে বলছি — একে পাঠিয়ে দিও; ওকে পাঠিয়ে দিও। (মাস্টারের প্রতি) তুমি যাবে না?

ঠাকুর পেনেটির মহোৎসবে যাইবেন। তাই ভক্তদের সেখানে যাবার কথা বলিতেছেন।

মাস্টার — আজ্ঞা, ইচ্ছা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বড় নৌকা হবে, টলটল করবে না। গিরিশ ঘোষ যাবে না?

[‘হাঁ’ ‘না’ “Everlasting Yea — Everlasting Nay”]

ঠাকুর দ্বিজকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা এত ছোকরা আছে, এই বা আসে কেন? তুমি বল, অবশ্য আগেকার কিছু ছিল!

মাস্টার — আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সংস্কার। আগের জন্মে কর্ম করা আছে। সরল হয়ে শেষ জন্মে। শেষ জন্মে খ্যাপাটে ভাব থাকে।

“তবে কি জানো? — তাঁর ইচ্ছা। তঁর ‘হাঁ’তে জগতের সব হচ্চে; তঁর ‘না’তে হওয়া বন্ধ হচ্চে। মানুষের আশীর্বাদ করতে নাই কেন?

“মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না, তাঁরই ইচ্ছাতে হয় — যায়!

“সেদিন কাপ্তেনের ওখানে গেলাম। রাস্তা দিয়ে ছোকরারা যাচ্ছে দেখলাম। তারা একরকমের। একটা ছোকরাকে দেখলাম, উনিশ-কুড়ি বছর বয়স, বাঁকা সিঁতে কাটা, শিস দিতে দিতে যাচ্ছে! কেউ যাচ্ছে বলতে বলতে, ‘নগেন্দ্র! ক্ষীরোদ!’

“কেউ দেখি ঘোর তমো; — বাঁশী বাজাচ্ছে, — তাতেই একটু অহংকার হয়েছে। (দ্বিজর প্রতি) যার জ্ঞান হয়েছে, তার নিন্দার ভয় কি? তার কূটস্থ বুদ্ধি — কামারের নেয়াই, তার উপর কত হাতুড়ির ঘা পড়েছে, কিছুতেই কিছু হয় না।

“আমি (অমুকের) বাপকে দেখলাম রাস্তা দিয়ে যাচ্চে।”

মাস্টার — লোকটি বেশ সরল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিন্তু চোখ রাঙা।

[কাপ্তেনের চরিত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ — পুরুষ-প্রকৃতি যোগ]

ঠাকুর কাপ্তেনের বাড়ি গিয়াছিলেন — সেই গল্প করিতেছেন। যে-সব ছেলেরা ঠাকুরের কাছে আসে, কাপ্তেন তাহাদের নিন্দা করিয়াছিলেন। হাজরামহাশয়ের কাছে বোধ হয় তাহাদের নিন্দা শুনিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কাপ্তেনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আমি বললাম পুরুষ আর প্রকৃতি ছাড়া আর কিছুই নাই। নারদ বলেছিলেন, হে রাম, যত পুরুষ দেখতে পাও, সব তোমার অংশ; আর যত স্ত্রী দেখতে পাও, সব সীতার অংশ।

"কাপ্তেন খুব খুশি। বললে, 'আপনারই ঠিক বোধ হয়েছে, সব পুরুষ রামের অংশে রাম, সব স্ত্রী সীতার অংশে সীতা!'

"এই কথা এই বললে, আবার তারই পর ছোকরাদের নিন্দা আরম্ভ করলে! বলে, 'ওরা ইংরাজী পড়ে, — যা তা খায়, ওরা তোমার কাছে সর্বদা যায়, — সে ভাল নয়। ওতে তোমার খারাপ হতে পারে। হাজরা যা একটি লোক, খুব লোক। ওদের অত যেতে দেবেন না।' আমি প্রথমে বললাম, যায় তা কি করি?

"তারপর প্যাণ (প্রাণ) থেঁতলে দিলাম। ওর মেয়ে হাসতে লাগল। বললাম, যে লোকের বিষয়বুদ্ধি আছে, সে লোক থেকে ঈশ্বর অনেক দূর। বিষয়বুদ্ধি যদি না থাকে, সে ব্যক্তির তিনি হাতের ভিতর — অতি নিকটে।

“কাপ্তেন রাখালের কথায় বলে যে, ও সকলের বাড়িতে খায়। বুঝি হাজরার কাছে শুনেছে। তখন বললাম, লোকে হাজার তপজপ করুক, যদি বিষয়বুদ্ধি থাকে, তাহলে কিছুই হবে না; আর শূকর মাংস খেয়ে যদি ঈশ্বরে মন থাকে, সে ব্যক্তি ধন্য! তার ক্রমে ঈশ্বরলাভ হবেই। হাজরা এত তপজপ করে, কিন্তু ওর মধ্যে দালালি করবে — এই চেষ্টায় থাকে।

“তখন কাপ্তেন বলে, হাঁ, তা ও বাৎ ঠিক হ্যায়। তারপরে আমি বললাম, এই তুমি বললে, সব পুরুষ রামের অংশে রাম, সব স্ত্রী সীতার অংশে সীতা, আবার এখন এমন কথা বলছ!

“কাপ্তেন বললে, তা তো, কিন্তু তুমি সকলকে তো ভালবাস না!

“আমি বললাম, ‘আপো নারায়ণঃ’ সবই জল, কিন্তু কোনও জল খাওয়া যায়, কোনটিতে নাওয়া যায়, কোনও জলে শৌচ করে যায়। এই যে তোমার মাগ মেয়ে বসে আছে, আমি দেখছি সাক্ষাৎ আনন্দময়ী! কাপ্তেন তখন বলতে লাগল, ‘হাঁ, হাঁ, ও ঠিক হ্যায়’! তখন আবার আমার পায়ে ধরতে যায়।”

এই বলিয়া ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন। এইবার ঠাকুর কাপ্তেনের কত গুণ, তাহা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কাপ্তেনের অনেক গুণ। রোজ নিত্যকর্ম, — নিজে ঠাকুর পূজা, — স্নানের মন্ত্রই কত! কাপ্তেন খুব একজন কর্মী, — পূজা জপ, আরতি, পাঠ, স্তব এ-সব নিত্যকর্ম করে।

[কাপ্তেন ও পাণ্ডিত্য — কাপ্তেন ও ঠাকুরের অবস্থা]

“আমি কাপ্তেনকে বকতে লাগলাম; বললাম, তুমি পড়েই সব খারাপ করেছ। আর পোড়ো না!

“আমার অবস্থা কাপ্তেন বললে, উড্ডীয়মান ভাব। জীবাত্মা আর পরমাত্মা; জীবাত্মা যেন একটা পাখি, আর পরমাত্মা যেন আকাশ — চিদাকাশ। কাপ্তেন বললে, ‘তোমার জীবাত্মা চিদাকাশে উড়ে যায়, — তাই সমাধি’; (সহাস্যে) কাপ্তেন বাঙালীদের নিন্দা করলে। বললে, বাঙালীরা নির্বোধ! কাছে মাণিক রয়েছে চিনলে না!”

[গৃহস্থভক্ত ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ — কর্ম কত দিন]

“কাপ্তেনের বাপ খুব ভক্ত ছিল। ইংরেজের ফৌজে সুবাদারের কাজ করত। যুদ্ধক্ষেত্রে পূজার সময়ে পূজা করত, — একহাতে শিবপূজা, একহাতে তরবার-বন্দুক!

(মাস্টারের প্রতি) “তবে কি জানো, রাতদিন বিষয়কর্ম! মাগছেলে ঘিরে রয়েছে, যখনই যাই দেখি! আবার লোকজন হিসাবের খাতা মাঝে মাঝে আনে। এক-একবার ঈশ্বরেও মন যায়। যেমন বিকারের রোগী; বিকারের ঘোর লেগেই আছে, এক-একবার চটকা ভাঙে! তখন ‘জল খাব’ ‘জল খাব’ বলে চেঁচিয়ে উঠে; আবার জল দিতে দিতে অজ্ঞান হয়ে যায়, — কোন হুঁশ থাকে না! আমি তাই ওকে বললাম, — তুমি কর্মী। কাপ্তেন বললে, ‘আজ্ঞা, আমার পূজা এই সব করতে আনন্দ হয় — জীবের কর্ম বই আর উপায় নাই।

“আমি বললাম, কিন্তু কর্ম কি চিরকাল করতে হবে? মৌমাছি ভনভন কতক্ষণ করে? যতক্ষণ না ফুলে বসে। মধুপানের সময় ভনভনানি চলে যায়। কাপ্তেন বললে, ‘আপনার মতো আমরা কি পূজা আর আর কর্ম ত্যাগ করতে পারি?’ তার কিন্তু কথার ঠিক নাই, — কখনও বলে, ‘এ-সব জড়।’ কখনও বলে, ‘এ-সব চৈতন্য।’ আমি বলি, জড় আবার কি? সবই চৈতন্য!”

[পূর্ণ ও মাস্টার — জোর করে বিবাহ ও শ্রীরামকৃষ্ণ]

পূর্ণর কথা ঠাকুর মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — পূর্ণকে আর-একবার দেখলে আমার ব্যাকুলতা একটু কম পড়বে! — কি চতুর! — আমার উপর খুব টান; সে বলে, আমারও বুক কেমন করে আপনাকে দেখবার জন্য। (মাস্টারের প্রতি) তোমার স্কুল থেকে ওকে ছাড়িয়ে নিয়েছে, তাতে তোমার কি কিছু ক্ষতি হবে?

মাস্টার — যদি তাঁরা (বিদ্যাসাগর) — বলেন, তোমার জন্য ওকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিলে, — তাহলে আমার জবাব দিবার পথ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি বলবে?

মাস্টার — এই কথা বলব, সাধুসঙ্গে ঈশ্বরচিন্তা হয়, সে আর মন্দ কাজ নয়; আর আপনারা যে বই পড়াতে দিয়েছেন, তাতেই আছে — ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত ভালবাসবে।

ঠাকুর হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কাপ্তেনের বাড়িতে ছোট নরেনকে ডাকলুম। বললাম, তোর বাড়িটা কোথায়? চল যাই। — সে বললে, ‘আসুন’। কিন্তু ভয়ে ভয়ে চলতে লাগল সঙ্গে, — পাছে বাপ জানতে পারে! (সকলের হাস্য)

(অখিলবাবুর প্রতিবেশীকে) — “হ্যাঁগা, তুমি অনেক কাল আস নাই। সাত-আট মাস হবে।”

প্রতিবেশী — আজ্ঞা, একবৎসর হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমার সঙ্গে আর-একটি আসতেন।

প্রতিবেশী — আজ্ঞা হাঁ, নীলমণিবাবু।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তিনি কেন আসেন না? — একবার তাঁকে আসতে বলো, তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিও। (প্রতিবেশীর সঙ্গী বালক দৃষ্টে) — এ-ছেলেটি কে?

প্রতিবেশী — এ-ছেলেটির বাড়ি আসামে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আসাম কোথা? কোন্ দিকে?

দ্বিজ আশুর কথা বলিতেছেন। আশুর বাবা তার বিবাহ দিবেন। আশুর ইচ্ছা নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখ দেখ, তার ইচ্ছা নাই, জোর করে বিবাহ দিচ্ছে।

ঠাকুর একটি ভক্তকে জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে ভক্তি করিতে বলিতেছেন, — “জ্যেষ্ঠ-ভাই, পিতা সম, খুব মানবি।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১৩ই জুন 1885/06/13/ii

48.2 শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকাতত্ত্ব —— জন্মমৃত্যুতত্ত্ব

পণ্ডিতজী বসিয়া আছেন, তিনি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোক।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, মাস্টারের প্রতি) — খুব ভাগবতের পণ্ডিত।

মাস্টার ও ভক্তেরা পণ্ডিতজীকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতের প্রতি) — আচ্ছা জী! যোগমায়া কি?

পণ্ডিতজী যোগমায়ার একরকম ব্যাখ্যা করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— রাধিকাকে কেন যোগমায়া বলে না?

পণ্ডিতজী এই প্রশ্নের উত্তর একরকম দিলেন। তখন ঠাকুর নিজেই বলিতেছেন, রাধিকা বিশুদ্ধসত্ত্ব, প্রেমময়ী! যোগমায়ার ভিতরে তিনগুণই আছে — সত্ত্ব রজঃ তমঃ। শ্রীমতীর ভিতর বিশুদ্ধসত্ত্ব বই আর কিছুই নাই। (মাস্টারের প্রতি) নরেন্দ্র এখন শ্রীমতীকে খুব মানে, সে বলে, সচ্চিদানন্দকে যদি ভালবাসতে শিখতে হয় তো রাধিকার কাছে শেখা যায়।

“সচ্চিদানন্দ নিজে রসাস্বাদন করতে রাধিকার সৃষ্টি করেছেন। সচ্চিদানন্দকৃষ্ণের অঙ্গ থেকে রাধা বেরিয়েছেন। সচ্চিদানন্দকৃষ্ণই ‘আধার’ আর নিজেই শ্রীমতীরূপে ‘আধেয়’, — নিজের রস আস্বাদন করতে — অর্থাৎ সচ্চিদানন্দকে ভালবেসে আনন্দ সম্ভোগ করতে।

“তাই বৈষ্ণবদের গ্রন্থে আছে, রাধা জন্মগ্রহণ করে চোখ খুলেন নাই; অর্থাৎ এই ভাব যে — এ-চক্ষে আর কাকে দেখব? রাধিকাকে দেখতে যশোদা যখন কৃষ্ণকে কোলে করে গেলেন, তখন কৃষ্ণকে দেখবার জন্য রাধা চোখ খুললেন। কৃষ্ণ খেলার ছলে রাধার চক্ষে হাত দিছলেন। (আসামী বালকের প্রতি) একি দেখেছ, ছোট ছেলে চোখে হাত দেয়?”

[সংসারী ব্যক্তি ও শুদ্ধাত্মা ছোকরার প্রভেদ]

পণ্ডিতজী ঠাকুরের কাছে বিদায় লইতেছেন।

পণ্ডিত — আমি বাড়ি যাচ্ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে) — কিছু হাতে হয়েছে।

পণ্ডিত —— বাজার বড় মন্দা হ্যায়। রোজগার নেহি! —

পণ্ডিতজী কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — দেখো, — বিষয়ী আর ছোকরাদের কত তফাত। এই পণ্ডিত রাতদিন টাকা টাকা করছে! কলকাতায় এসেছে, পেটের জন্য, — তা না হলে বাড়ির সেগুলির পেট চলে না। তাই এর দ্বারে ওর দ্বারে যেতে হয়! মন একাগ্র করে ঈশ্বরচিন্তা করবে কখন? কিন্তু ছোকরাদের ভিতর কামিনী-কাঞ্চন নাই। ইচ্ছা করলেই ঈশ্বরেতে মন দিতে পারে।

“ছোকরারা বিষয়ীর সঙ্গ ভালবাসবে না। রাখাল মাঝে মাঝে বলত, বিষয়ী লোক আসতে দেখলে ভয় হয়।

“আমার যখন প্রথম এই অবস্থা হল, তখন বিষয়ী লোক আসতে দেখলে ঘরের দরজা বন্ধ করতাম।”

[পুত্র-কন্যা বিয়োগ জন্য শোক ও শ্রীরামকৃষ্ণ — পূর্বকথা]

“দেশে শ্রীরাম মল্লিককে অত ভালবাসতাম, কিন্তু এখানে যখন এলো তখন ছুঁতে পারলাম না।

“শ্রীরামের সঙ্গে ছেলেবেলায় খুব প্রণয় ছিল। রাতদিন একসঙ্গে থাকতাম। একসঙ্গে শুয়ে থাকতাম। তখন ষোল-সতের বৎসর বয়স। লোকে বলত, এদের ভিতর একজন মেয়েমানুষ হলে দুজনের বিয়ে হত। তাদের বাড়িতে দুজনে খেলা

করতাম, তখনকার সব কথা মনে পড়ছে। তাদের কুটুম্বেরা পালকি চড়ে আসত, বেয়ারগুলো ‘হিঞ্জোড়া হিঞ্জোড়া’ বলতে থাকত।

“শ্রীরামকে দেখব বলে কতবার লোক পাঠিয়েছি; এখন চানকে দোকান করেছে! সেদিন এসেছিল, দুদিন এখানে ছিল।

“শ্রীরাম বললে, ছেলেপিলে হয় নাই। ভাইপোটিকে মানুষ করেছিলাম। সেটি মরে গেছে। বলতে বলতে শ্রীরাম দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, চক্ষে জল এল, ভাইপোর জন্য খুব শোক হয়েছে।

“আবার বললে, ছেলে হয় নাই বলে স্ত্রীর যত স্নেহ ওই ভাইপোর উপর পড়েছিল; এখন সে শোকে অধীর হয়েছে। আমি তাকে বলি, ক্ষেপী! আর শোক করলে কি হবে? তুই কাশী যাবি?

“বলে ‘ক্ষেপী’ — একেবারে ডাইলিউট (dilute) হয়ে গেছে! তাকে ছুঁতে পারলাম না। দেখলাম তাতে আর কিছু নাই।”

ঠাকুর শোক সম্বন্ধে এই সকল কথা বলিতেছেন, এদিকে ঘরের উত্তরের দরজার কাছে সেই শোকাতুরা ব্রাহ্মণিটি দাঁড়াইয়া আছেন। ব্রাহ্মণী বিধবা। তার একমাত্র কন্যার খুব বড় ঘরে বিবাহ হইয়াছিল। মেয়েটির স্বামী রাজা উপাধিধারী, — কলিকাতানিবাসী, — জমিদার। মেয়েটি যখন বাপের বাড়ি আসিতেন, তখন সঙ্গে সেপাই-শান্ত্রী আসিত, — মায়ের বুক যেন দশ হাত হইত। সেই একমাত্র কন্যা কয়দিন হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছে!

ব্রাহ্মণী দাঁড়াইয়া ভাইপোর বিয়োগ জন্য শ্রীরাম মল্লিকের শোকের কথা শুনিলেন। তিনি কয়দিন ধরিয়া বাগবাজার হইতে পাগলের ন্যায় ছুটে ছুটে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিতেছেন, যদি কোনও উপায় হয়; যদি তিনি এই দুর্জয় শোক নিবারণের কোনও ব্যবস্থা করিতে পারেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন —

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মণী ও ভক্তদের প্রতি) — একজন এসেছিল। খানিকক্ষণ বসে বলছে, ‘যাই একবার ছেলের চাঁদমুখটি দেখিগে।’

“আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, তবে রে শালা! ওঠ্ এখান থেকে। ঈশ্বরের চাঁদমুখের চেয়ে ছেলের চাঁদমুখ?”

[জন্মমৃত্যুতত্ত্ব — বাজিকরের ভেলকি]

(মাস্টারের প্রতি) — “কি জানো, ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য! জীব, জগৎ, বাড়ি-ঘর-দ্বার, ছেলেপিলে, এ-সব বাজিকরের ভেলকি! বাজিকর কাঠি দিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে, আর বলছে, লাগ লাগ লাগ! ঢাকা খুলে দেখ, কতকগুলি পাখি আকাশে উড়ে গেল। কিন্তু বাজিকরই সত্য, আর সব অনিত্য! এই আছে, এই নাই!

“কৈলাসে শিব বসে আছেন, নন্দী কাছে আছেন। এমন সময় একটা ভারী শব্দ হল। নন্দী জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুর! এ কিসের শব্দ হল? শিব বললেন, ‘রাবণ জন্মগ্রহণ করলে, তাই শব্দ।’ খানিক পরে আবার একটি ভয়ানক শব্দ হল। নন্দী জিজ্ঞাসা করলে — ‘এবার কিসের শব্দ?’ শিব হেসে বললেন, ‘এবার রাবণ বধ

হল!’ জন্মমৃত্যু — এ-সব ভেলকির মতো! এই আছে এই নাই! ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য। জলই সত্য, জলের ভুড়ভুড়ি, এই আছে, এই নাই; ভুড়ভুড়ি জলে মিশে যায়, — যে জলে উৎপত্তি সেই জলেই লয়।

“ঈশ্বর যেন মহাসমুদ্র, জীবেরা যেন ভুড়ভুড়ি; তাঁতেই জন্ম, তাঁতেই লয়।

“ছেলেমেয়ে, — যেমন একটা বড় ভুড়ভুড়ির সঙ্গে পাঁচটা ছটা ছোট ভুড়ভুড়ি।

“ঈশ্বরই সত্য। তাঁর উপরে কিরূপে ভক্তি হয়, তাঁকে কেমন করে লাভ করা যায়, এখন এই চেষ্টা করো। শোক করে কি হবে?”

সকলে চুপ করিয়া আছেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন, ‘তবে আমি আসি।’

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মণীর প্রতি সস্নেহে) — তুমি এখন যাবে? বড় ধুপ! — কেন, এদের সঙ্গে গাড়ি করে যাবে।

আজ জৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি, বেলা প্রায় তিনটা-চারটা। ভারী গ্রীষ্ম। একটি ভক্ত ঠাকুরকে একখানি নূতন চন্দনের পাখা আনিয়া দিলেন। ঠাকুর পাখা পাইয়া আনন্দিত হইলেন ও বলিলেন, “বা! বা!” “ওঁ তৎসৎ! কালী!” এই বলিয়া প্রথমেই ঠাকুরদের হাওয়া করিতেছেন। তাহার পরে মাস্টারকে বলিতেছেন, “দেখ, দেখ, কেমন হাওয়া।” মাস্টারও আনন্দিত হইয়া দেখিতেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১৩ই জুন 1885/06/13/iii

48.3 কাপ্তেন

কাপ্তেন ছেলেদের সঙ্গে করিয়া আসিয়াছেন

ঠাকুর কিশোরীকে বলিলেন, “এদের সব দেখিয়ে এস তো, — ঠাকুরবাড়ি!”

ঠাকুর কাপ্তেনের সহিত কথা কহিতেছেন।

মাস্টার, দ্বিজ ইত্যাদি ভক্তেরা মেঝেতে বসিয়া আছেন। দমদমার মাস্টারও আসিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। তিনি কাপ্তেনকে ছোট খাটটির এক পার্শ্বে তাঁহার সম্মুখে বসিতে বলিলেন।

[পাকা-আমি বা দাস-আমি]

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমার কথা এদের বলছিলাম, — কত ভক্ত, কত পূজা, কত রকম আরতি!

কাপ্তেন (সলজ্জভাবে) — আমি কি পূজা আরতি করব? আমি কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — যে ‘আমি’ কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত, সেই আমিতেই দোষ। আমি ঈশ্বরের দাস, এ আমিতে দোষ নাই। আর বালকের আমি, — বালক

কোনও গুণের বশ নয়। এই ঝগড়া করছে, আবার ভাব! এই খেলাঘর করলে কত যত্ন করে, আবার তৎক্ষণাৎ ভেঙে ফেললে! দাস আমি — বালকের আমি, এতে কোনও দোষ নাই। এ আমি আমির মধ্যে নয়, যেমন মিছরি মিষ্টের মধ্যে নয়। অন্য মিষ্টিতে অসুখ করে, কিন্তু মিছরিতে বরং অমলনাশ হয়। আর যেমন ওঁকার শব্দের মধ্যে নয়।

“এই অহং দিয়ে সচ্চিদানন্দকে ভালবাসা যায়। অহং তো যাবে না — তাই ‘দাস আমি’, ‘ভক্তের আমি’। তা না হলে মানুষ কি লয়ে থাকে। গোপীদের কি ভালবাসা! (কাপ্তেনের প্রতি) তুমি গোপীদের কথা কিছু বল। তুমি অত ভাগবত পড়।”

কাপ্তেন — যখন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আছেন, কোন ঐশ্বর্য নাই, তখনও গোপীরা তাঁকে প্রাণাপেক্ষা ভালবেসেছিলেন। তাই কৃষ্ণ বলেছিলেন, আমি তাদের ঋণ কেমন করে শুধবো? যে গোপীরা আমার প্রতি সব সমর্পণ করেছে, — দেহ, — মন, — চিত্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর হইতেছেন। ‘গোবিন্দ!’ ‘গোবিন্দ!’ ‘গোবিন্দ!’ এই কথা বলিতে বলিতে আবিষ্ট হইতেছেন! প্রায় বাহ্যশূন্য। কাপ্তেন সবিসময়ে বলিতেছেন, ‘ধন্য!’ ‘ধন্য!’

কাপ্তেন ও সমবেত ভক্তগণ ঠাকুরের এই অদ্ভুত প্রেমাবস্থা দেখিতেছেন। যতক্ষণ না তিনি প্রকৃতিস্থ হন, ততক্ষণ তাঁহারা চুপ করিয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তারপর?

কাপ্তেন — তিনি যোগীদিগের অগম্য — ‘যোগিভিরগম্যম্’ — আপনার ন্যায় যোগীদের অগম্য; কিন্তু গোপীদিগের গম্য। যোগীরা কত বৎসর যোগ করে যাঁকে পায় নাই; কিন্তু গোপীরা অনায়াসে তাঁকে পেয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — গোপীদের কাছে খাওয়া, খেলা, কাঁদা, আব্দার করা, এ-সব হয়েছে।

[শ্রীযুক্ত বঙ্কিম ও শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র — অবতারবাদ]

একজন ভক্ত বলিলেন, ‘শ্রীযুক্ত বঙ্কিম কৃষ্ণ-চরিত্র লিখেছেন।’

শ্রীরামকৃষ্ণ — বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণ মানে, শ্রীমতী মানে না।

কাপ্তেন — বুঝি লীলা মানেন না?

শ্রীরামকৃষ্ণ — আবার বলে নাকি কামাদি — এ-সব দরকার।

দমদম মাস্টার — নবজীবনে বঙ্কিম লিখেছেন — ধর্মের প্রয়োজন এই যে, শারীরিক, মনাসিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সব বৃত্তির স্ফূর্তি হয়।

কাপ্তেন — ‘কামাদি দরকার’, তবে লীলা মানেন না। ঈশ্বর মানুষ হয়ে বৃন্দাবনে এসেছিলেন, রাধাকৃষ্ণলীলা, তা মানেন না?

[পূর্ণব্রহ্মের অবতার — শুধু পাণ্ডিত্য ও প্রত্যক্ষের প্রভেদ —

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — ও-সব কথা যে খবরের কাগজে নাই, কেমন করে মানা যায়!

“একজন তার বন্ধুকে এসে বললে, ‘ওহে! কাল ও-পাড়া দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় দেখলাম, সে-বাড়িটা হুড়মুড় করে পড়ে গেল।’ বন্ধু বললে, দাঁড়াও হে, একবার খবরের কাগজখানা দেখি। এখন বাড়ি হুড়মুড় করে পড়ার কথা খবরের কাগজে কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বললে, ‘কই খবরের কাগজে তো কিছুই নাই। — ও-সব কাজের কথা নয়।’ সে লোকটা বললে, ‘আমি যে দেখে এলাম।’ ও বললে, ‘তা হোক্ যেকালে খবরের কাগজে নাই, সেকালে ও-কথা বিশ্বাস করলুম না।’ ঈশ্বর মানুষ হয়ে লীলা করেন, এ-কথা কেমন করে বিশ্বাস করবে? এ-কথা যে ওদের ইংরাজী লেখাপড়ার ভিতর নাই! পূর্ণ অবতার বোঝানো বড় শক্ত, কি বল? চৌদ্দ পোয়ার ভিতর অনন্ত আসা!”

কাপ্তেন — ‘কৃষ্ণ ভগবান্ স্বয়ম্।’ বলবার সময় পূর্ণ ও অংশ বলতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — পূর্ণ ও অংশ, — যেমন অগ্নি ও তার স্ফুলিঙ্গ। অবতার ভক্তের জন্য, — জ্ঞানীর জন্য নয়। অধ্যাত্মরামায়ণে আছে — হে রাম! তুমিই ব্যাপ্য, তুমিই ব্যাপক, ‘বাচ্যবাচকভেদেন ত্বমেব পরমেশ্বর।’

কাপ্তেন — ‘বাচ্যবাচক’ অর্থাৎ ব্যাপ্য-ব্যাপক।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ‘ব্যাপক’ অর্থাৎ যেমন ছোট একটি রূপ, যেমন অবতার মানুষরূপ হয়েছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১৩ই জুন 1885/06/13/iv

48.4 অহংকারই বিনাশের কারণ ও ঈশ্বরলাভের বিঘ্ন

সকলে বসিয়া আছেন। কাপ্তেন ও ভক্তদের সহিত ঠাকুর কথা কহিতেছেন। এমন সময় ব্রাহ্মসমাজের জয়গোপাল সেন ও ত্রৈলোক্য আসিয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর সহাস্যে ত্রৈলোক্যের দিকে তাকাইয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — অহংকার আছে বলে ঈশ্বরদর্শন হয় না। ঈশ্বরের বাড়ির দরজার সামনে এই অহংকাররূপ গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে। এই গুঁড়ি উল্লঙ্ঘন না করলে তাঁর ঘরে প্রবেশ করা যায় না।

"একজন ভূতসিদ্ধ হয়েছিল। সিদ্ধ হয়ে যাই ডেকেছে, অমনি ভূতটি এসেছে। এসে বললে, 'কি কাজ করতে হবে বল। কাজ যাই দিতে পারবে না, অমনি তোমার ঘাড় ভাঙব।' সে ব্যক্তি যত কাজ দরকার ছিল, সব ক্রমে ক্রমে করিয়ে নিল। তারপর আর কাজ পায় না। ভূতটি বললে, 'এইবার তোমার ঘাড় ভাঙি?' সে বললে, 'একটু দাঁড়াও, আমি আসছি'। এই বলে গুরুদেবের কাছে গিয়ে

বললে, ‘মহাশয়! ভারী বিপদে পড়েছি, এই এই বিবরণ, এখন কি করি?’ গুরু তখন বললেন, তুই এক কর্ম কর, তাকে এই চুলগাছটি সোজা করতে বল। ভূতটি দিনরাত ওই করতে লাগল। চুল কি সোজা হয়? যেমন বাঁকা, তেমনি রহিল! অহংকারও এই যায়, আবার আসে।

“অহংকার ত্যাগ না করলে ঈশ্বরের কৃপা হয় না।

“কর্মের বাড়িতে যদি একজনকে ভাঁড়ারী করা যায়, যতক্ষণ ভাঁড়ারে সে থাকে ততক্ষণ কর্তা আসে না। যখন সে নিজে ইচ্ছা করে ভাঁড়ার ছেড়ে চলে যায়, তখনই কর্তা ঘরে চাবি দেয় ও নিজে ভাঁড়ারের বন্দোবস্ত করে।

“নাবালকেরই অছি। ছেলেমানুষ নিজে বিষয় রক্ষা করতে পারে না, রাজা ভার লন। অহংকার ত্যাগ না করলে ঈশ্বর ভার লন না।

বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণ বসে আছেন, হঠাৎ নারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ্মী পদসেবা করছিলেন; বললেন, ‘ঠাকুর কোথা যাও?’ নারায়ণ বললেন, ‘আমার একটি ভক্ত বড় বিপদে পড়েছে তাই তাকে রক্ষা করতে যাচ্ছি!’ এই বলে নারায়ণ বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ফিরলেন। লক্ষ্মী বললেন, ‘ঠাকুর এত শীঘ্র ফিরলে যে?’ নারায়ণ হেসে বললেন, ‘ভক্তটি প্রেমে বিহ্বল হয়ে পথে চলে যাচ্ছিল, ধোপারা কাপড় শুকাতে দিছল, ভক্তটি মাড়িয়ে যাচ্ছিল। দেখে ধোপারা লাঠি লয়ে তাকে মারতে যাচ্ছিল। তাই আমি তাকে রক্ষা করতে গিয়েছিলাম’। লক্ষ্মী আবার বললেন, ‘ফিরে এলেন কেন?’ নারায়ণ হাসতে হাসতে বললেন,

‘সে ভক্তটি নিজে ধোপাদের মারবার জন্য ইট তুলেছে দেখলাম। (সকলের হাস্য) তাই আর আমি গেলাম না’।”

[পূর্বকথা — কেশব ও গৌরী — সোঽহম্ অবস্থার পর দাসভাব]

“কেশব সেনকে বলেছিলাম, ‘অহং ত্যাগ করতে হবে।’ তাতে কেশব বললে, — তাহলে মহাশয় দল কেমন করে থাকে?

“আমি বললাম, ‘তোমার এ কি বুদ্ধি! — তুমি কাঁচা-আমি ত্যাগ কর, — যে আমিতে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত করে, কিন্তু পাকা-আমি, দাস-আমি, ভক্তের আমি, — ত্যাগ করতে বলছি না। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের সন্তান, — এর নাম পাকা-আমি। এতে কোনও দোষ নাই’।”

ত্রৈলোক্য — অহংকার যাওয়া বড় শক্ত। লোকে মনে করে, বুঝি গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — পাছে অহংকার হয় বলে গৌরী ‘আমি’ বলত না — বলত ‘ইনি’। আমিও তার দেখাদেখি বলতাম ‘ইনি’; ‘আমি খেয়েছি,’ না বলে, বলতাম ‘ইনি খেয়েছেন।’ সেজোবাবু তাই দেখে একদিন বললে, ‘সে কি বাবা, তুমি ও-সব কেন বলবে? ও-সব ওরা বলুক, ওদের অহংকার আছে। তোমার তো আর অহংকার নাই। তোমার ও-সব বলার কিছু দরকার নাই।’

“কেশবকে বললাম, ‘আমি’টা তো যাবে না, অতএব সে দাসভাবে থাক; — যেমন দাস। প্রহ্লাদ দুই ভাবে থাকতেন, কখনও বোধ করতেন ‘তুমিই আমি’ ‘আমিই তুমি’ — সোঽহম্। আবার যখন অহং বুদ্ধি আসত, তখন দেখতেন,

আমি দাস তুমি প্রভু! একবার পাকা ‘সোঽহম্’ হলে পরে, তারপর দাসভাবে থাকা। যেমন আমি দাস।”

[ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ — ভক্তের আমি — কর্মত্যাগ]

(কাপ্তেনের প্রতি) — “ব্রহ্মজ্ঞান হলে কতকগুলি লক্ষণে বুঝা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে জ্ঞানীর চারটি অবস্থার কথা আছে — (১) বালকবৎ, (২) জড়বৎ, (৩) উন্মাদবৎ, (৪) পিশাচবৎ। পাঁচ বছরের বালকের অবস্থা হয়। আবার কখনও পাগলের মতন ব্যবহার করে।

“কখনও জড়ের ন্যায় থাকে। এ অবস্থায় কর্ম করতে পারে না, কর্মত্যাগ হয়। তবে যদি বল জনকাদি কর্ম করেছিলেন; তা কি জানো, তখনকার লোক কর্মচারীদের উপর ভার দিয়ে নিশ্চিত হত। আর তখনকার লোকও খুব বিশ্বাসী ছিল।”

শ্রীরামকৃষ্ণ কর্মত্যাগের কথা বলিতেছেন, আবার যাহাদের কর্মে আসক্তি আছে, তাহাদের অনাসক্ত হয়ে কর্ম করতে বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — জ্ঞান হলে বেশি কর্ম করতে পারে না।

ত্রৈলোক্য — কেন? পওহারি বাবা এমন যোগী কিন্তু লোকের ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেন, — এমন কি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, হাঁ, — তা বটে। দুর্গাচরণ ডাক্তার এতো মাতাল, চব্বিশ ঘন্টা মদ খেয়ে থাকত, কিন্তু কাজের বেলা ঠিক, — চিকিৎসা করবার সময় কোনরূপ

ভুল হবে না। ভক্তিলাভ করে কর্ম করলে দোষ নাই। কিন্তু বড় কঠিন, খুব তপস্যা চাই!

“ঈশ্বরই সব করছেন, আমরা যন্ত্রস্বরূপ। কালীঘরের সামনে শিখরা বলেছিল, ‘ঈশ্বর দয়াময়’। আমি বললাম, দয়া কাদের উপর? শিখরা বললে, ‘কেন মহারাজ? আমাদের উপর।’ আমি বললাম, আমরা সকলে তাঁর ছেলে; ছেলের উপর আবার দয়া কি? তিনি ছেলেদের দেখছেন; তা তিনি দেখবেন না তো বামুনপাড়ার লোকে এসে দেখবে? আচ্ছা, যারা ‘দয়াময়’ বলে, তারা এটি ভাবে না যে, আমরা কি পরের ছেলে?”

কাপ্তেন — আজ্ঞা হাঁ, আপনার বলে বোধ থাকে না।

[ভক্ত ও পূজাদি — ঈশ্বর ভক্তবৎসল — পূর্ণজ্ঞানী]

শ্রীরামকৃষ্ণ — তবে কি দয়াময় বলবে না? যতক্ষণ সাধনার অবস্থা, ততক্ষণ বলবে। তাঁকে লাভ হলে তবে ঠিক আপনার বাপ কি আপনার মা বলে বোধ হয়। যতক্ষণ না ঈশ্বরলাভ হয় ততক্ষণ বোধ হয় — আমরা সব দূরের লোক, পরের ছেলে।

“সাধনাবস্থায় তাঁকে সবই বলতে হয়। হাজরা নরেন্দ্রকে একদিন বলেছিল, ‘ঈশ্বর অনন্ত তাঁর ঐশ্বর্য অনন্ত। তিনি কি আর সন্দেশ কলা খাবেন? না গান শুনবেন? ও-সব মনের ভুল।’

“নরেন্দ্র অমনি দশ হাত নেবে গেল। তখন হাজরাকে বললাম, তুমি কি পাজী! ওদের অমন কথা বললে ওরা দাঁড়ায় কোথা? ভক্তি গেলে মানুষ কি লয়ে থাকে? তাঁর আনন্ত ঐশ্বর্য, তবুও তিনি ভক্তাধীন! বড় মানুষের দ্বারবান এসে বাবুর সভায় একধারে দাঁড়িয়া আছে। হাতে কি একটি জিনিস আছে, কাপড়ে ঢাকা! অতি সঙ্কোচভাব! বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কি দ্বারবান, হাতে কি আছে? দ্বারবান সঙ্কোচভাবে একটি আতা বার করে বাবুর সম্মুখে রাখলে — ইচ্ছা বাবু ওটি খাবেন। বাবু দ্বারবানের ভক্তিভাব দেখে আতাটি খুব আদর করে নিলেন, আর বললেন, আহা বেশ আতা! তুমি এটি কোথা থেকে কষ্ট করে আনলে?

“তিনি ভক্তাধীন! দুর্যোধন অত যত্ন দেখালে, আর বললে, এখানে খাওয়া-দাওয়া করুন; ঠাকুর (শ্রীকৃষ্ণ) কিন্তু বিদুরের কুটিরে গেলেন। তিনি ভক্তবৎসল, বিদুরের শাকান্ন সুধার ন্যায় খেলেন!

“পূর্ণজ্ঞানীর আর-একটি লক্ষণ — ‘পিশাচবৎ’! খাওয়া-দাওয়ার বিচার নাই — শুচি-অশুচির বিচার নাই! পূর্ণজ্ঞানী ও পূর্ণমূর্খ, দুইজনেরই বাহিরের লক্ষণ একরকম। পূর্ণজ্ঞানী হয়তো গঙ্গাস্নানে মন্ত্রপাঠ করলে না, ঠাকুরপূজা করবার সময় ফুলগুলি হয়তো একসঙ্গে ঠাকুরের চরণে দিয়ে চলে এল, কোনও তন্ত্র-মন্ত্র নাই!”

[কর্মী ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ — কর্ম কতক্ষণ?]

“যতদিন সংসারে ভোগ করবার ইচ্ছা থাকে, ততদিন কর্মত্যাগ করতে পারে না। যতক্ষণ ভোগের আশা ততক্ষণ কর্ম।

“একটি পাখি জাহাজের মাস্তুলে অন্যমনস্ক হয়ে বসে ছিল। জাহাজ গঙ্গার ভিতর ছিল, ক্রমে মহাসমুদ্রে এসে পড়ল। তখন পাখির চটকা ভাঙলো, সে দেখলে চতুর্দিকে কূল কিনারা নাই। তখন ড্যাঙায় ফিরে যাবার জন্য উত্তরদিকে উড়ে গেল। অনেক দূর গিয়ে শ্রান্ত হয়ে গেল, তবু কূল-কিনারা দেখতে পেলে না। তখন কি করে, ফিরে এসে মাস্তুলে আবার বসল।

“অনেকক্ষণ পরে পাখিটা আবার উড়ে গেল — এবার পূর্বদিকে গেল। সেদিকে কিছুই দেখতে পেলে না, চারিদিকে কেবল অকূল পাথার! তখন ভারী পরিশ্রান্ত হয়ে আবার জাহাজে ফিরে এসে মাস্তুলের উপর বসল, আর উঠল না। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইল। তখন মনে আর কোনও ব্যস্তভাব বা অশান্তি রইল না। নিশ্চিন্ত হয়েছে আর কোনোও চেষ্টাও নাই।”

কাপ্তেন — আহা কেয়া দৃষ্টান্ত!

[ভোগান্তে ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরলাভ]

শ্রীরামকৃষ্ণ — সংসারী লোকেরা যখন সুখের জন্য চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আর পায় না, আর শেষে পরিশ্রান্ত হয়; যখন কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হয়ে কেবল দুঃখ পায়, তখনই বৈরাগ্য আসে, ত্যাগ আসে। ভোগ না করলে ত্যাগ অনেকের হয় না। কুটিচক আর বহুদক। সাধকের ভিতরও কেয় কেয় অনেক তীর্থে ঘোরে। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারে না; অনেক তীর্থের উদক — কিনা জল খায়! যখন ঘুরে ঘুরে ক্ষোভ মিটে জায়, তখন এক জায়গায় কুটির বেঁধে বসে। আর নিশ্চিন্ত ও চেষ্টাশূন্য হয়ে ভগবানকে চিন্তা করে।

“কিন্তু কি ভোগ সংসারে করবে? কামিনী-কাঞ্চন ভোগ? সে তো ক্ষণিক আনন্দ এই আছে, এই নাই!

“প্রায় মেঘ ও বর্ষা লেগেই আছে, সূর্য দেখা যায় না! দুঃখের ভাগই বেশি! আর কামিনী-কাঞ্চন-মেঘ সূর্যকে দেখতে দেয় না।

“কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, ‘মহাশয়, ঈশ্বর কেন এমন সংসার করলেন? আমাদের কি কোনও উপায় নাই’?”

[উপায় — ব্যাকুলতা — ত্যাগ]

“আমি বলি, উপায় থাকবে না কেন? তাঁর শরণাগত হও, আর ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, যাতে অনুকূল হাওয়া বয়, — যাতে শুভযোগ ঘটে। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।

“একজনের ছেলেটি যায় যায় হয়েছিল। সে ব্যক্তি ব্যাকুল হয়ে এর কাছে ওর কাছে উপায় জিজ্ঞাসা করে বেড়াচ্ছে। একজন বললে, তুমি যদি এইটি যোগাড় করতে পারো তো ভাল হয়, — স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়বে মড়ার মাথার খুলির উপর। সেই জল একটি ব্যাঙ খেতে যাবে। সেই ব্যাঙকে একটি সাপে তাড়া করবে। ব্যাঙকে কামরাতে গিয়ে সাপের বিষ ওই মড়ার মাথার খুলিতে পড়বে, আর সেই ব্যাঙটি পালিয়ে যাবে। সেই বিষজল একটু লয়ে রোগীকে খাওয়াতে হবে।

“লোকটি অমনি ব্যাকুল হয়ে সেই ঔষধ খুঁজতে স্বাতী নক্ষত্রে বেরুল! এমন সময়ে বৃষ্টি হচ্ছে। তখন ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরকে বলছে, ঠাকুর! এইবার মরার মাথা জুটিয়ে দাও। খুঁজতে খুঁজতে দেখে, একটি মরার খুলি, তাতে স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়েছে; তখন সে আবার প্রার্থনা করে বলতে লাগল, দোহাই ঠাকুর! এইবার আর কটি জুটিয়া দাও — ব্যাঙ ও সাপ! তার যেমন ব্যাকুলতা তেমনি সব জুটে গেল। দেখতে দেখতে একটি সাপ ব্যাঙকে তাড়া করে আসছে, আর কামড়াতে গিয়ে তার বিষ, ওই খুলির ভিতর পড়ে গেল।

“ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে, তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে, তিনি শুনবেনই শুনবেন — সব সুযোগ করে দেবেন।”

কাপ্তেন — কেয়া দৃষ্টান্ত!

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, তিনি সুযোগ করে দেন। হয়তো, — বিয়ে হল না, সব মন ঈশ্বরকে দিতে পারলে, হয়তো ভায়েরা রোজগার করতে লাগল বা একটি ছেলে মানুষ হয়ে গেল, তাহলে তোমায় আর সংসার দেখতে হল না। তখন তুমি অনায়াসে ষোল আনা মন ঈশ্বরকে দিতে পার। তবে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না হলে হবে না। ত্যাগ হলে তবে অজ্ঞান অবিদ্যা নাশ হয়। আতস কাঁচের উপর সূর্যের কিরণ পড়লে কত জিনিস পুড়ে যায়। কিন্তু ঘরের ভিতর ছায়া, সেখানে আতস কাঁচ লয়ে গেলে ওটি হয় না। ঘর ত্যাগ করে বাহিরে এসে দাঁড়াতে হয়।

[ঈশ্বরলাভের পর সংসার — জনকাদির]

“তবে জ্ঞানলাভের পর কেউ সংসারে থাকে। তারা ঘর-বার দুই-ই দেখতে পায়। জ্ঞানের আলো সংসারের ভিতর পড়ে, তাই তারা ভাল, মন্দ, নিত্য, অনিত্য, — এ-সব সে আলোতে দেখতে পায়।

“যারা অজ্ঞান, ঈশ্বরকে মানে না, অথচ সংসারে আছে, তারা যেন মাটির ঘরের ভিতর বাস করে। ক্ষীণ আলোতে শুধু ঘরের ভিতরটি দেখতে পায়! কিন্তু যারা জ্ঞানলাভ করেছে, ঈশ্বরকে জেনেছে, তারপর সংসারে আছে, তারা যেন সার্সীর ঘরের ভিতর বাস করে। ঘরের ভিতরও দেখতে পায়, ঘরের বাহিরের জিনিসও দেখতে পায়। জ্ঞান-সূর্যের আলো ঘরের ভিতরে খুব প্রবেশ করে। সে ব্যক্তি ঘরের ভিতরের জিনিস খুব স্পষ্টরূপে দেখতে পায়, — কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ, কোন্‌টি নিত্য, কোন্‌টি অনিত্য।

“ঈশ্বরই কর্তা আর সব তাঁর যন্ত্রস্বরূপ।

“তাই জ্ঞানীরও অহংকার করবার জো নাই। মহিম্নস্তব যে লিখেছিল, তার অহংকার হয়েছিল। শিবের ষাড় যখন দাঁত বার করে দেখালে, তখন তার অহংকার চূর্ণ হয়ে গেল। দেখলে, এক-একটি দাঁত এক-এক মন্ত্র। তার মানে কি জানো? এ-সব মন্ত্র অনাদিকাল ছিল। তুমি কেবল উদ্ধার করলে।

“গুরুগিরি করা ভাল নয়। ঈশ্বরের আদেশ না পেলে আচার্য হওয়া যায় না। যে নিজে বলে, ‘আমি গুরু’ সে হীনবুদ্ধি। দাঁড়িপাল্লা দেখ নাই? হালকা দিকটা উঁচু হয়, যে ব্যক্তি নিজে উঁচু হয়, সে হালকা। সকলেই গুরু হতে যায়! — শিষ্য পাওয়া যায় না!”

ত্রৈলোক্য ছোট খাটটির উত্তরে ধারে মেঝেতে বসিয়াছিলেন। ত্রৈলোক্য গান গাইবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, “আহা! তোমার কি গান!” ত্রৈলোক্য তানপুরা লইয়া গান করিতেছেন —

তুঝ্‌সে হাম্‌নে দিল্‌কো লাগায়া, যো কুছ্‌ হ্যায় সব্‌ তুঁহি হ্যায়।।

গান - তুমি সর্বস্ব আমার (হে নাথ!) প্রাণাধার সারাৎসার।
নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে আপনার বলিবার ।।

গান শুনিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর হইতেছেন। আর বলিতেছেন, “আহা! তুমিই সব! আহা! আহা!”

গান সমাপ্ত হইল। ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর মুখ ধুইতে ঝাউতালর দিকে যাইতেছেন। সঙ্গে মাস্টার।

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে গল্প করিতে করিতে যাইতেছেন। মাস্টারকে হঠাৎ বলিলেন, “কই তোমরা খেলে না? আর ওরা খেলে না?”

ঠাকুর ভক্তদের প্রসাদ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন।

[নরেন্দ্র ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ]

আজ সন্ধ্যার পর ঠাকুরের কলিকাতায় যাইবার কথা আছে। ঝাউতলা থেকে ফিরিবার সময় মাস্টারকে বলিতেছেন, — “তাই তো কার গাড়িতে যাই?”

সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুরের ঘরে প্রদীপ জ্বালা হইল ও ধুনা দেওয়া হইতেছে। ঠাকুরবাড়িতে সব স্থানে ফরাশ আলো জ্বালিয়া দিল! রোশনচৌকি বাজিতেছে। এবার দ্বাদশ শিব মন্দিরে, বিষ্ণুঘরে ও কালীঘরে আরতি হইবে।

ছোট খাটটিতে বসিয়া ঠাকুরদের নাম কীর্তনান্তর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মার ধ্যান করিতেছেন। আরতি হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর এদিক-ওদিক পায়চারি করিতেছেন ও ভক্তদের সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন। আর কলিকাতায় যাইবার জন্য মাস্টারের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছেন।

এমন সময়ে নরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে শরৎ ও আরও দুই-একটি ছোকরা। তাঁহারা আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

নরেন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুরের স্নেহ উথলিয়া পড়িল। যেমন কচি ছেলেকে আদর করে, ঠাকুর নরেন্দ্রের মুখে হাত দিয়া আদর করিতে লাগিলেন ও স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, “তুমি এসেছ!”

ঘরের মধ্যে পশ্চিমাস্য হইয়া ঠাকুর দাঁড়াইয়া আছেন। নরেন্দ্র ও আর কয়টি ছোকরা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া পূর্বাস্য হইয়া তাঁহার সম্মুখে কথা কহিতেছেন। ঠাকুর মাস্টারের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতেছেন, “নরেন্দ্র এসেছে, আর যাওয়া যায়? লোক দিয়ে নরেন্দ্রকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম; আর যাওয়া যায়? কি বল?”

মাস্টার — যে আজ্ঞা, আজ তবে থাক্‌।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা কাল যাব, হয় নৌকায় নয় গাড়িতে। (অন্যান্য ভক্তদের প্রতি) তোমরা তবে এস আজ, রাত হল।

ভক্তেরা সকলে একে এক প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c49 ৪৯ শ্রীশ্রীরথযাত্রা বলরাম-মন্দিরে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১৩ই জুলাই 1885/07/13/i

49.1 পূর্ণ, ছোট নরেন, গোপালের মা

শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাড়ির বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। (৩০শে আষাঢ়, ১২৯২) আষাঢ় শুক্লা প্রতিপদ, সোমবার, ১৩ই জুলাই, ১৮৮৫, বেলা ৯টা।

কল্য শ্রীশ্রীরথযাত্রা। রথে বলরাম ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। বাড়িতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহের নিত্য সেবা হয়। একখানি ছোট রথও আছে, — রথের দিন রথ বাহিরের বারান্দায় টানা হইবে।

ঠাকুর মাস্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। কাছে নারাণ, তেজচন্দ্র, বলরাম ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা। পূর্ণ সম্বন্ধে কথা হইতেছে। পূর্ণের বয়স পনর হইবে। ঠাকুর মাস্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। কাছে নারাণ, তেজচন্দ্র, বলরাম ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা। পূর্ণ সম্বন্ধে কথা হইতেছে। পূর্ণের বয়স পনর হইবে। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — আচ্ছা, সে (পূর্ণ) কোন পথ দিয়ে এসে দেখা করবে? — দ্বিজকে ও পূর্ণকে তুমিই মিলিয়ে দিও।

“এক সত্তার আর এক বয়সের লোক, আমি মিলিয়ে দিই। এর মানে আছে। দুজনেরই উন্নতি হয়। পূর্ণর কেমন অনুরাগ দেখেছ।”

মাস্টার — আজ্ঞা হাঁ, আমি ট্রামে করে যাচ্ছি, ছাদ থেকে আমাকে দেখে, রাস্তার দিকে দৌড়ে এল, — আর ব্যাকুল হয়ে সেইখান থেকেই নমস্কার করলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সাশ্রুনয়নে) — আহা! আহা! — কি না ইনি আমার পরমার্থের (পরমার্থলাভের জন্য) সংযোগ করে দিয়েছেন। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল না হলে এইরূপ হয় না।

[পূর্ণের পুরুষত্তা, দৈবস্বভাব, — তপস্যার জোরে নারায়ণ সন্তান]

“এ তিনজনের পুরুষসত্তা — নরেন্দ্র, ছোট নরেন আর পূর্ণ। ভবনাথের নয় — ওর মেদী ভাব (প্রকৃতিভাব)।

“পূর্ণর যে অবস্থা, এতে হয় শীঘ্র দেহনাশ হবে — ঈশ্বরলাভ হল, আর কেন; — বা কিছুদিনের মধ্যে তেড়েফুঁড়ে বেরুবে।

“দৈবস্বভাব — দেবতার প্রকৃতি। এতে লোকভয় কম থাকে। যদি গলায় মালা, গায়ে চন্দন, ধূপধুনার গন্ধ দেওয়া যায়; তাহলে সমাধি হয়ে যায়! — ঠিক বোধ হয়ে যায় যে, অন্তরে নারায়ণ আছেন — নারায়ণ দেহধারণ করে এসেছেন। আমি টের পেয়েছি।”

[পূর্বকথা — সুলক্ষণা ব্রাহ্মণির সমাধি — রণজিতের ভগবতী কন্যা]

“দক্ষিণেশ্বরে যখন আমার প্রথম এইরুপ অবস্থা হল, কিছুদিন পরে একটি ভদ্রঘরে বামুনের মেয়ে এসেছিল। বড় সুলক্ষণা। যাই গলায় মালা আর ধূপধুনা দেওয়া হল অমনি সমাধিস্থ। কিছুক্ষণ পরে আনন্দ, — আর ধারা পড়তে লাগল। আমি তখন প্রণাম করে বললুম, ‘মা, আমার হবে?’ তা বললে, ‘হাঁ!’ তবে পূর্ণকে আর একবার দেখা। তা দেখবার সুবিধা কই?

“কলা বলে বোধ হয়। কি আশ্চর্য অংশ শুধু নয়, কলা!

“কি চতুর! — পড়াতে নাকি খুব। — তবে তো ঠিক ঠাওরেছি!

“তপস্যার জোরে নারায়ণ সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ও-দেশে যাবার রাস্তায় রণজিত রায়ের দীঘি আছে। রণজিত রায়ের ঘরে ভগবতী কন্যা হয়ে জন্মেছিলেন। এখনও চৈত্রমাসে মেলা হয়। আমার বড় যাবার ইচ্ছা হয়! — আর এখন হয় না।

“রণজিত রায় ওখানকার জমিদার ছিল। তপস্যার জোরে তাঁকে কন্যারূপে পেয়েছিল। মেয়েটিকে বড়ই স্নেহ করে। সেই স্নেহের গুণে তিনি আটকে ছিলেন, বাপের কাছ ছাড়া প্রায় হতেন না। একদিন সে জমিদারির কাজ করছে, ভারী ব্যস্ত; মেয়েটি ছেলের স্বভাবে কেবল বলছে, ‘বাবা, এটা কি; ওটা কি।’ বাপ অনেক মিষ্টি করে বললে — ‘মা, এখন যাও, বড় কাজ পড়েছে।’ মেয়ে কোনমতে যায় না। শেষে বাপ অন্যমনস্ক হয়ে বললে, ‘তুই এখান থেকে দূর হ’। মা তখন এই ছুতো করে বাড়ি থেকে চলে গেলেন। সেই সময় একজন শাঁখারী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে ডেকে শাঁখা পরা হল। দাম দেবার কথায় বললেন, ঘরের অমুক কুলুঙ্গিতে টাকা আছে, লবে। এই বলে সেখান থেকে চলে গেলেন, আর দেখা গেল না। এদিকে শাঁখারী টাকার জন্য ডাকাডাকি করছে। তখন মেয়ে বাড়িতে নাই দেখে সকলে ছুটে এল। রণজিত রায় নানাস্থানে লোক পাঠালে সন্ধান করবার জন্য। শাঁখারীর টাকা সেই কুলুঙ্গিতে পাওয়া গেল। রণজিত রায় কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় লোকজন এসে বললে, যে, দীঘিতে কি দেখা যাচ্ছে। সকলে দীঘির ধারে গিয়ে দেখে যে শাঁখাপরা হাতটি

জলের উপর তুলেছেন। তারপর আর দেখা গেল না। এখনও ভগবতীর পূজা ওই মেলার সময় হয় — বারুণীর দিনে।

(মাস্টারকে) — “এ সব সত্য।”

মাস্টার — আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — নরেন্দ্র এখন এ-সব বিশ্বাস করে।

“পূর্ণর বিষ্ণুর অংশে জন্ম। মানসে বিল্বপত্র দিয়ে পূজা করলুম, তা হল না; — তুলসী-চন্দন দিলাম, তখন হল!

“তিনি নানারূপে দর্শন দেন। কখন নররূপে, কখন চিন্ময় ঈশ্বরীয় রূপে। রূপ মানতে হয়। কি বল?”

মাস্টার — আজ্ঞা, হাঁ!

[গোপালের মার প্রকৃতিভাব ও রূপদর্শন]

শ্রীরামকৃষ্ণ — কামারহাটির বামনী (গোপালের মা) কত কি দেখে! একলাটি গঙ্গার ধারে একটি বাগানে নির্জন ঘরে থাকে, আর জপ করে। গোপাল কাছে শোয়! (বলিতে বলিতে ঠাকুর চমকিত হইলেন)। কল্পনায় নয়, সাক্ষাৎ! দেখলে গোপালের হাত রাঙা! সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায়! — মাই খায়! — কথা কয়! নরেন্দ্র শুনে কাঁদলে!

“আমি আগে অনেক দেখতুম। এখন আর ভাবে তত দর্শন হয় না। এখন প্রকৃতিভাব কম পড়ছে। বেটাছেলের ভাব আসছে। তাই ভাব অন্তরে, বাহিরে তত প্রকাশ নাই।

“ছোট নরেনের পুরুষভাব, — তাই মন লীন হয়ে যায়। ভাবাদি নাই। নিত্যগোপালের প্রকৃতিভাব। তাই খ্যাঁচা ম্যাঁচা; — ভাবে তার শরীর লাল হয়ে যায়।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১৩ই জুলাই 1885/07/13/ii

49.2 কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ ও পূর্ণাদি

[বিনোদ, দ্বিজ, তারক, মোহিত, তেজচন্দ্র, নারাণ, বলরাম, অতুল]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — আচ্ছা, লোকের তিল তিল করে ত্যাগ হয়, এদের কি অবস্থা।

“বিনোদ বললে, ‘স্ত্রীর সঙ্গে শুতে হয়, বড়ই মন খারাপ হয়।’

“দেখো, সঙ্গ হউক আর নাই হউক, একসঙ্গে শোয়াও খারাপ। গায়ের ঘর্ষণ, গায়ের গরম!

“দ্বিজর কি অবস্থা! কেবল গা দোলায় আর আমার পানে তাকিয়ে থাকে, একি কম? সব মন কুড়িয়ে আমাতে এল, তাহলে তো সবই হল।”

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার?]

“আমি আর কি? — তিনি। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। এর (আমার) ভিতর ঈশ্বরের সত্তা রয়েছে! তাই এত লোকের আকর্ষণ বাড়ছে। ছুঁয়ে দিলেই হয়! সে টান সে আকর্ষণ ঈশ্বরেরই আকষর্ণ।

“তারক (বেলঘরের) ওখান থেকে (দক্ষিণেশ্বর থেকে) বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। দেখলাম, এর ভিতর থেকে শিখার ন্যায় জ্বল্‌ জ্বল্‌ করতে করতে কি বেরিয়ে গেল, — পেছু পেছু!

“কয়েকদিন পরে তারক আবার এল (দক্ষিণেশ্বরে)। তখন সমাধিস্থ হয়ে তার বুকে পা দিলে — এর ভিতর যিনি আছেন।

“আচ্ছা, এমন ছোকরাদের মতন আর কি ছোকরা আছে!”

মাস্টার — মোহিতটি বেশ। আপনার কাছে দু-একবার গিয়েছিল। দুটো পাশের পড়া আছে, আর ঈশ্বরে খুব অনুরাগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা হতে পারে, তবে অত উঁচু ঘর নয়। শরীরের লক্ষণ তত ভাল নয়। মুখ থ্যাবড়ানো।

“এদের উঁচুঘর। তবে শরীরধারণ করলেই বড় গোল। আবার শাপ হল তো সাতজন্ম আসতে হবে। বড় সাবধানে থাকতে হয়! বাসনা থাকলেই শরীরধারণ।”

একজন ভক্ত — যাঁরা অবতার দেহধারণ করে এসেছেন, তাঁদের কি বাসনা — ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — দেখেছি, আমার সব বাসনা যায় নাই। এক সাধুর আলোয়ান দেখে বাসনা হয়েছিল, ওইরকম পরি। এখনও আছে। জানি কিনা আর-একবার আসতে হবে।

বলরাম (সহাস্যে) — আপনার জন্ম কি আলোয়ানের জন্য? (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — একটা সৎ কামনা রাখতে হয়। ওই চিন্তা করতে করতে দেহত্যগ হবে বলে। সাধুরা চারধামের একধাম বাকী রাখে। অনেকে জগন্নাথক্ষেত্র বাকী রাখে। তাহলে জগন্নাথ চিন্তা করতে করতে শরীর যাবে।

গেরুয়া পরা একব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিলেন। তিনি ভিতরে ভিতরে ঠাকুরের নিন্দা করেন, তাই বলরাম হাসিতেছেন। ঠাকুর অন্তর্যামী, বলরামকে বলিতেছেন — “তা হোক, বলুকগে ভণ্ড।”

[তেজচন্দ্রের সংসারত্যাগের প্রস্তাব]

ঠাকুর তেজচন্দ্রের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (তেজচন্দ্রের প্রতি) — তোকে এত ডেকে পাঠাই, — আসিস না কেন? আচ্ছা, ধ্যান-ট্যান করিস, তা হলেই আমি সুখী হব। আমি তোকে আপনার বলে জানি, তাই ডাকি।

তেজচন্দ্র — আজ্ঞা, আপিস যেতে হয়, — কাজের ভিড়।

মাস্টার (সহাস্যে) — বাড়িতে বিয়ে, দশদিন আপিসের ছুটি নিয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তবে! — অবসর নাই, অবসর নাই! এই বললি সংসারত্যাগ করবি।

নারাণ — মাস্টার মহাশয় একদিনে বলেছিলেন — wilderness of this world — সংসার অরণ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — তুমি ওই গল্পটা বল তো, এদের উপকার হবে। শিষ্য ঔষধ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে আছে। গুরু এসে বললেন, এর প্রাণ বাঁচতে পারে, যদি এই বড়ি কেউ খায়। এ বাঁচবে কিন্তু বড়ি যে খাবে সে মরে যাবে।

“আর ওটাও বল — খ্যাঁচা ম্যাঁচা। সেই হঠযোগী যে মনে করেছিল যে পরিবারাদি — এরাই আমার আপনার লোক।”

মধ্যাহ্নে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ পাইলেন। বলরামের জগন্নাথদেবের সেবা আছে। তাই ঠাকুর বলেন, ‘বলরামের শুদ্ধ অন্ন।’ আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন।

বৈকাল হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে সেই ঘরে বসিয়া আছেন। কর্তাভজা চন্দ্রবাবু ও রসিক ব্রাহ্মণটিও আছেন। ব্রাহ্মণটির স্বভাব একরকম ভাঁড়ের ন্যায়, — এক-একটি কথা কন আর সকলে হাসে।

ঠাকুর কর্তাভজাদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন, — রূপ, স্বরূপ, রজঃ, বীজ, পাকপ্রণালী ইত্যাদি।

[ঠাকুরের ভাবাবস্থা — শ্রীযুক্ত অতুল ও তেজচন্দ্রের ভ্রাতা]

ছটা বাজে। গিরিশের ভ্রাতা অতুল, ও তেজচন্দ্রের ভ্রাতা আসিয়াছেন। ঠাকুর ভাবসমাধিস্থ হইয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভাবে বলিতেছেন, “চৈতন্যকে ভেবে কি অচৈতন্য হয়? — ঈশ্বরকে চিন্তা করে কেউ কি বেহেড হয়? — তিনি যে বোধস্বরূপ!”

আগন্তুকদের ভিতর কেউ কি মনে করিতেছিলেন যে, বেশি ঈশ্বরচিন্তা করিয়া ঠাকুরের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে?

[‘এগিয়ে পড়’ — কৃষ্ণধনের সামান্য রসিকতা]

ঠাকুর কৃষ্ণধন নামক ওই রসিক ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন — “কি সামান্য ঐহিক বিষয় নিয়ে তুমি রাতদিন ফষ্টিনাষ্টি করে সময় কাটাচ্ছ। ওইটি ঈশ্বরের দিকে মোড়

ফিরিয়ে দাও। যে নুনের হিসাব করতে পারে, সে মিছরির হিসাবও করতে পারে।”

কৃষ্ণধন (সহাস্যে) — আপনি টেনে নিন!

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি কি করব, তোমার চেষ্টার উপর সব নির্ভর করছে। ‘এ মন্ত্র নয় — এখন মন তোর!’

“ও সামান্য রসিকতা ছেড়ে ঈশ্বরের পথে এগিয়ে পড়, — তারে বাড়া, তারে বাড়া, — আছে! ব্রহ্মচারী কাঠুরিয়াকে এগিয়ে পড়তে বলেছিল। সে প্রথমে এগিয়ে দেখে চন্দনের কাঠ, — তারপর দেখে রূপার খনি, — তারপর সোনার খনি, — তারপর হীরা মাণিক!”

কৃষ্ণধন — এ-পথের শেষ নাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ — যেখানে শান্তি সেইখানে ‘তিষ্ঠ’।

ঠাকুর একজন আগন্তুক সম্বন্ধে বলিতেছেন —

“ওর ভিতর কিছু বস্তু দেখতে পেলেম না। যেন ওলম্বাকুল।”

সন্ধ্যা হইল। ঘরে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর জগন্মাতার চিন্তা ও মধুর স্বরে নাম করিতেছেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে বসিয়া আছেন।

কাল রথযাত্রা। ঠাকুর আজ এই বাটীতেই রাত্রিবাস করিবেন।

অন্তঃপুরে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আবার ঘরে ফিরিলেন। রাত প্রায় দশটা হইবে। ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন, 'ওই ঘর থেকে (অর্থাৎ পার্শ্বের পশ্চিমের ছোট ঘর থেকে) গামছাটা আন তো'।

ঠাকুরের সেই ছোট ঘরটিতেই শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে। রাত সাড়ে দশটা হইল। ঠাকুর শয়ন করিলেন।

গ্রীষ্মকাল। ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন, "বরং পাখাটা আনো।" তাঁহাকে পাখা করিতে বলিলেন। রত বারটার সময় ঠাকুরের একটু নিদ্রাভঙ্গ হইল। বলিলেন, "শীত করছে, আর কাজ নাই।"

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১৪ই জুলাই 1885/07/14/i

49.3 শ্রীশ্রীরথযাত্রা দিবসে বলরাম-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

আজ শ্রীশ্রীরথযাত্রা। মঙ্গলবার (৩১শে আষাঢ়, ১২৯২, শুক্লা দ্বিতীয়া, ১৪ই জুলাই, ১৮৮৫)। অতি প্রত্যূষে ঠাকুর উঠিয়া একাকী নৃত্য করিতেছেন ও মধুর কণ্ঠে নাম করিতেছেন।

মাস্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। ক্রমে ভক্তেরা আসিয়া প্রণাম করিয়া ঠাকুরের কাছে উপবিষ্ট হইলেন। ঠাকুর পূর্ণর জন্য বড় ব্যাকুল। মাস্টারকে দেখিয়া তাঁরই কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি পূর্ণকে দেখে কিছু উপদেশ দিতে?

মাস্টার — আজ্ঞা, চৈতন্যচরিত পড়তে বলেছিলাম, — তা সে সব কথা বেশ বলতে পারে। আর আপনি বলেছিলেন, সত্য ধরে রাখতে, সেই কথাও বলেছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা 'ইনি অবতার' এ-সব কথা জিজ্ঞাসা করলে কি বলত।

মাস্টার — আমি বলেছিলাম, চৈতন্যদেবের মতো একজনকে দেখবে তো চল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আর কিছু?

মাস্টার — আপনার সেই কথা। ডোবাতে হাতি নামলে জল তোলপাড় হয়ে যায়, — ক্ষুদ্র আধার হলেই ভাব উপছে পড়ে।

"মাছ ছাড়ার কথায় বলেছিলাম, কেন অমন করলে। হইচই হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাই ভাল। নিজের ভাব ভিতরে ভিতরে থাকাই ভাল।

[ভূমিকম্প ও শ্রীরামকৃষ্ণ — জ্ঞানীর দেহ ও দেহনাশ সমান]

প্রায় সাড়ে ছয়টা বাজে। বলরামের বাটী হইতে মাস্টার গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন। পথে হঠাৎ ভূমিকম্প। তিনি তৎক্ষণাৎ ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তেরাও দাঁড়াইয়া আছেন। ভূমিকম্পের কথা হইতেছে। কম্প কিছু বেশি হইয়াছিল। ভক্তেরা অনেকে ভয় পাইয়াছেন।

মাস্টার — আমাদের সব নিচে যাওয়া উচিত ছিল।

[পূর্বকথা — আশ্বিনের ঝড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ — ৫ই অক্টোবর, ১৮৬৪ খ্রী:]

শ্রীরামকৃষ্ণ — যে ঘরে বাস, তারই এই দশা! এতে আবার লোকে অহংকার। (মাস্টারকে) তোমার আশ্বিনের ঝড় মনে আছে?

মাস্টার — আজ্ঞা, হাঁ। তখন খুব কম বয়স — নয়-দশ বছর বয়স — একঘরে একলা ঠাকুরদের ডাকছিলাম!

মাস্টার বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন — ঠাকুর হঠাৎ আশ্বিনের ঝড়ের দিনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? আমি যে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে একাকী একঘরে বসে ঈশ্বরকে প্রার্থনা করেছিলাম, ঠাকুর কি সব জানেন ও আমাকে মনে করাইয়া দিতেছেন? উনি কি জন্মাবধি আমাকে গুরুরূপে রক্ষা করিতেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — দক্ষিণেশ্বরে অনেক বেলায় — তবে কি কি রান্না হল। গাছ সব উলটে পড়েছিল! দেখ যে ঘরে বাস, তারই এ-দশা!

“তবে পূর্ণজ্ঞান হলে মরা মারা একবোধ হয়। মলেও কিছু মরে না — মেরে ফেল্লেও কিছু মরে না১ যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য। সেই একরূপে নিত্য, একরূপে

লীলা। লীলারূপ ভেঙে গেলেও নিত্য আছেই। জল স্থির থাকলেও জল, — হেললে দুললেও জল। হেলা দোলা থেমে গেলেও সেই জল।”

ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে ভক্তসঙ্গে আবার বসিয়াছেন। মহেন্দ্র মুখুজ্জে, হরিবাবু, ছোট নরেন ও অন্যান্য অনেকগুলি ছোকরা ভক্ত বসিয়া আছেন। হরিবাবু একলা একলা থাকেন ও বেদান্তচর্চা করেন। বয়স ২৩।২৮ হবে। বিবাহ করেন নাই। ঠাকুর তাহাকে বড় ভালবাসেন। সর্বদা তাঁহার কাছে যাইতে বলেন। তিনি একলা একলা থাকতে চান বলিয়া হরিবাবু ঠাকুরের কাছে অধিক যাইতে পারেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হরিবাবুকে) — কি গো, তুমি অনেকদিন আস নাই।

[হরিবাবুকে উপদেশ — অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ — বিজ্ঞান]

“তিনি একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা। বেদান্তে কি আছে? — ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। কিন্তু যতক্ষণ ‘ভক্তের আমি’ রেখে দিয়েছে, ততক্ষণ লীলাও সত্য। ‘আমি’ যখন তিনি পুছে ফেলবেন, তখন যা আছে তাই আছে। মুখে বলা যায় না। যতক্ষণ ‘আমি’ রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ সবই নিতে হবে। কলাগাছের খোল ছাড়িয়া ছাড়িয়া মাজ পাওয়া যায়। কিন্তু খোল থাকলেই মাজ আছে। মাজ থাকলেই খোল আছে। খোলেরই মাজ, মাজেরই খোল। নিত্য বললেই লীলা আছে বুঝায়। লীলা বললেই নিত্য আছে বুঝায়।

“তিনি জীবজগৎ হয়েছেন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। যখন নিষ্ক্রিয় তখন তাঁহাকে ব্রহ্ম বলি। যখন সৃষ্টি করছেন, পালন করছেন, সংহার করছেন, —

তখন তাঁকে শক্তি বলি। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, জল স্থির থাকলেও জল, হেললে দুললেও জল।

“আমিবোধ যায় না। যতক্ষণ ‘আমি’বোধ থাকে, ততক্ষণ জীবজগৎ মিথ্যা বলবার জো নাই! বেলের খোলটা আর বিচিগুলো ফেলে দিলে সমস্ত বেলটার ওজন পাওয়া যায় না।

“যে ইট, চুন, সুরকি থেকে ছাদ, সেই ইট, চুন, সুরকি থেকেই সিঁড়ি। যিনি ব্রহ্ম, তাঁর সত্তাতেই জীবজগৎ।

“ভক্তেরা — বিজ্ঞানীরা — নিরাকার-সাকার দুই-ই লয়, অরূপ-রূপ দুই-ই গ্রহণ করে। ভক্তি হিমে ওই জলেরই খানিকটা বরফ হয়ে যায়। আবার জ্ঞান-সূর্য উদয় হলে ওই বরফ গলে আবার যেমন জল তেমনি হয়।”

[বিচারান্তে মনের নাশ ও ব্রহ্মজ্ঞান]

“যতক্ষণ মনের দ্বারা বিচার ততক্ষণ নিত্যেতে পৌঁছানো যায় না। মনের দ্বারা বিচার করতে গেলেই জগৎকে ছাড়বার জো নাই, — রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, — ইন্দ্রিয়ের এই সকল বিষয়কে ছাড়বার জো নাই। বিচার বন্ধ হলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান। এ মনের দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না। আত্মার দ্বারাই আত্মাকে জানা যায়। শুদ্ধমন, শুদ্ধবুদ্ধি, শুদ্ধ-আত্মা, একই।

“দেখ না, একটা জিনিস দেখতেই কতকগুলো দরকার — চক্ষু দরকার, আলো দরকার, আবার মনের দরকার। এই তিনটার মধ্যে একটা বাদ দিলে তার দর্শন হয়

না। এই মনের কাজ যতক্ষণ চলছে, ততক্ষণ কেমন করে বলবে যে, জগৎ নাই, কি আমি নাই?

“মনের নাশ হলে, সঙ্কল্প-বিকল্প চলে গেলে, সমাধি হয়, ব্রহ্মজ্ঞান হয়। কিন্তু সা রে গা মা পা ধা নি —— নি-তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না।”

[ছোট নরেনকে উপদেশ —— ঈশ্বরদর্শনের পর তাঁর সঙ্গে আলাপ]

ছোট নরেনের দিকে তাকাইয়া ঠাকুর বলিতেছেন, “শুধু ঈশ্বর আছেন, বোধে বোধ করলে কি হবে? ঈশ্বরদর্শন হলেই যে সব হয়ে গেল, তা নয়।

“তাঁকে ঘরে আনতে হয় —— আলাপ করতে হয়।

“কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে।

“রাজাকে কেউ কেউ দেখেছে। কিন্তু দু-একজন বাড়িতে আনতে পারে, আর খাওয়াতে-দাওয়াতে পারে।”

মাস্টার গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন।

১ ... ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। ... নায়ং হন্তি ন হন্যতে। [গীতা, ২।১৯, ২০]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১৪ই জুলাই 1885/07/14/ii

49.4 পূর্বকথা — ১কাশীধামে শিব ও সোনার অন্নপূর্ণাদর্শন — অদ্য ব্রহ্মাণ্ডকে শালগ্রাম রূপে দর্শন

বেলা দশটা বাজিয়াছে। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন। মাস্টার গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও কাছে বসিলেন।

ঠাকুর ভাবে পূর্ণ হইয়া কত কথাই বলিতেছেন। মাঝে মাঝে অতি গুহ্য দর্শনকথা একটু একটু বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সেজোবাবুর সঙ্গে যখন কাশী গিয়েছিলাম, মণিকর্ণিকার ঘাটের কাছ দিয়ে আমাদের নৌকা যাচ্ছিল। হঠাৎ শিবদর্শন। আমি নৌকার ধারে এসে দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ। মাঝিরা হৃদেকে বলতে লাগল — 'ধর! ধর!' পাছে পড়ে যাই। যেন জগতের যত গম্ভীর নিয়ে সেই ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথমে দেখলাম দূরে দাঁড়িয়ে তারপর কাছে আসতে দেখলাম, তারপর আমার ভিতরে মিলিয়ে গেলেন!

"ভাবে দেখলাম, সন্ন্যাসী হাতে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। একটি ঠাকুরবাড়িতে ঢুকলাম — সোনার অন্নপূর্ণাদর্শন হল!

"তিনিই এই সব হয়েছেন, — কোন কোন জিনিসে বেশি প্রকাশ।

(মাস্টারাদির প্রতি) — “শালগ্রাম তোমরা বুঝি মান না — ইংলিশম্যানরা মানে না। তা তোমরা মানো আর নাই মানো। সুলক্ষণ শালগ্রাম, — বেশ চক্র থাকবে, — গোমুখী। আর সব লক্ষণ থাকবে — তাহলে ভগবানের পূজা হয়।”

মাস্টার — আজ্ঞা, সুলক্ষণযুক্ত মানুষের ভিতর যেমন ঈশ্বরের বেশি প্রকাশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — নরেন্দ্র আগে মনের ভুল বলত, এখন সব মানছে।

ঈশ্বরদর্শনের কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের ভাবাবস্থা হইয়াছে। ভাব-সমাধিস্থ। ভক্তেরা একদৃষ্টে চুপ করিয়া দেখিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে ভাব সম্বরণ করিলেন ও কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — কি দেখছিলাম। ব্রহ্মাণ্ড একটি শালগ্রাম। — তার ভিতর তোমার দুটো চক্ষু দেখছিলাম!

মাস্টার ও ভক্তেরা এই অদ্ভুত, অশ্রুতপূর্ব দর্শনকথা অবাক্ হইয়া শুনিতেছেন। এই সময় আর-একটি ছোকরা ভক্ত, সারদা, প্রবেশ করিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সারদার প্রতি) — দক্ষিণেশ্বরে যাস না কেন? কলিকাতায় যখন আসি, তখন আসিস না কেন?

সারদা — আমি খবর পাই না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এইবার তোকে খবর দিব। (মাস্টারকে সহাস্যে) একখানা ফর্দ করো তো — ছোকরাদের। (মাস্টার ও ভক্তদের হাস্য)

[পূর্ণের সংবাদ — নরেন্দ্রদর্শনে ঠাকুরের আনন্দ]

সারদা — বাড়িতে বিয়ে দিতে চায়। ইনি (মাস্টার) বিয়ের কথায় আমাদের কতবার বকেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এখন বিয়ে কেন? (মাস্টারের প্রতি) সারদার বেশ অবস্থা হয়েছে। আগে সঙ্কোচ ভাব ছিল। যেন ছিপের ফাতা টেনে নিত। এখন মুখে আনন্দ এসেছে।

ঠাকুর একজন ভক্তকে বলিতেছেন, "তুমি একবার পূর্ণর জন্য যাবে?"

এইবার নরেন্দ্র আসিয়াছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে জল খাওয়াইতে বলিলেন। নরেন্দ্রকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন। নরেন্দ্রকে খাওয়াইয়া যেন সাক্ষাৎ নারায়ণের সেবা করিতেছেন। গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিতেছেন, যেন সূক্ষ্মভাবে হাত-পা টিপিতেছেন! গোপালের মা ('কামারহাটির বামনী') ঘরের মধ্যে আসিলেন। ঠাকুর বলরামকে কামারহাটিতে লোক পাঠাইয়া গোপালের মাকে আনিতে বলিয়াছিলেন। তাই তিনি আসিয়াছেন। গোপালের মা ঘরের মধ্যে আসিয়াই বলিতেছেন, "আমার আনন্দে চক্ষে জল পড়ছে।" এই বলিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া নমস্কার করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সে কি গো। এই তুমি আমাকে গোপাল বল — আবার নমস্কার!

“যাও, বাড়ির ভিতর গিয়ে একটি বেন্নন রাঁধ গে — খুব ফোড়ন দিও — যেন এখানে পর্যন্ত গন্ধ আসে।” (সকলের হাস্য)

গোপালের মা — এঁরা (বাড়ির লোকেরা) কি মনে করবে?

গোপালের মা কি ভাবিতেছেন যে, এখানে নূতন এসেছি, — যদি আলাদা রাঁধব বলে বাড়ির লোকেরা কিছু মনে করে!

বাড়ির ভিতর যাইবার আগে তিনি নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কাতরস্বরে বলিতেছেন, “বাবা! আমার কি হয়েছে; না বাকী আছে?”

আজ রথযাত্রা — শ্রীশ্রীজগন্নাথের ভোগরাগাদি হইতে একটু দেরি হইয়াছে। এইবার ঠাকুর সেবা হইবে। অন্তঃপুরে যাইতেছেন। মেয়ে ভক্তেরা ব্যাকুল হইয়া আছেন, — তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিবেন।

ঠাকুরের অনেক স্ত্রীলোক ভক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের কথা পুরুষ ভক্তদের কাছে বেশী বলিতেন না। কেহ মেয়ে ভক্তদের কাছে যাতায়াত করিলে, বলিতেন, ‘বেশী যাস নাই; পড়ে যাবি!’ কখন কখন বলিতেন, ‘যদি স্ত্রীলোক ভক্তিতে গড়াগড়ি যায়, তবুও তার কাছে যাতায়াত করবে না।’ মেয়েভক্তেরা আলাদা থাকবে — পুরুষ-ভক্তেরা আলাদা থাকবে। তবেই উভয়ের মঙ্গল। আবার

বলিতেন, “মেয়েভক্তদের গোপাল ভাব — ‘বাৎসল্য ভাব’ বেশি ভাল নয়। ওই ‘বাৎসল্য’ থেকেই আবার একদিন ‘তাচ্ছল্য’ হয়।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১৪ই জুলাই 1885/07/14/iii

49.5 বলরামের রথযাত্রা — নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে সংকীর্তনানন্দে

বেলা ১টা হইয়াছে। ঠাকুর আহারান্তে আবার বৈঠকখানা গরে আসিয়া ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। একটি ভক্ত পূর্ণকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। ঠাকুর মহানন্দে মাস্টারকে বলিতেছেন, “এই গো! পূর্ণ এসেছে।” নরেন্দ্র, ছোট নরেন, নারাণ, হরিপদ ও অন্যান্য ভক্তেরা কাছে বসিয়া আছেন ও ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছেন।

[স্বাধীন ইচ্ছা (ফ্রি উইল) ও ছোট নরেন — নরেন্দ্রের গান]

ছোট নরেন — আচ্ছা, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা (ফ্রি উইল) আছে কি না?

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি কে খোঁজ দেখি। আমি খুঁজতে খুঁজতে তিনি বেরিয়ে পড়েন! ‘আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী’। চীনের পুতুল দোকানে চিঠি হাতে করে যায় শুনেছ! ঈশ্বরই কর্তা! আপনাকে অকর্তা জেনে কর্তার ন্যায় কাজ করো।

“যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণ অজ্ঞান; আমি পণ্ডিত, আমি জ্ঞানী, আমি ধনী, আমি মানী; আমি কর্তা বাবা গুরু — এ-সব অজ্ঞান থেকে হয়। ‘আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী’ — এই জ্ঞান। অন্য সব উপাধি চলে গেল। কাঠ পোড়া শেষ হলে আর শব্দ থাকে না — উত্তাপও থাকে না। সব ঠাণ্ডা! — শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

(নরেন্দ্রকে) — “একটু গা না।”

নরেন্দ্র — ঘরে যাই — অনেক কাজ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা বাছা, আমাদের কথা শুনবে কেন? ‘যার আছে কানে সোনা, তার কথা আনা আনা। যার আছে পোঁদে ট্যানা তার কথা কেউ শোনে না!’ (সকলের হাস্য)

তুমি গুহদের বাগান যেতে পারো। প্রায় শুনি, আজ কোথায়, না গুহদের বাগানে! — এ কথা বলতুম না, তুই কেঁড়েলি করলি —”

নরেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া আছেন। বলছেন, “যন্ত্র নাই শুধু গান —”

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমাদের বাছা যেমন অবস্থা — এইতে পার তো গাও। তাতে বলরামের বন্দোবস্ত!

“বলরাম বলে, ‘আপনি নৌকা করে আসবেন, একান্ত না হয় গাড়ি করে আসবেন’, — (সকলের হাস্য) খ্যাঁট দিয়েছে। আজ তাই বৈকালে নাচিয়ে নেবে (হাস্য)। একান থেকে একদিন গাড়ি করে দিছলো — বারো আনা ভাড়া; — আমি বললাম, বার আনায় দক্ষিণেশ্বরে যাবে? তা বলে, ‘ও অমন হয়।’ গাড়ি রাস্তায় যেতে যেতে একধার ভেঙে পড়ে গেল — (সকলের উচ্চ হাস্য)। আবার ঘোড়া মাঝে মাঝে একেবারে থেমে যায়। কোন মতে চলে না; গাড়োয়ান এক-একবার খুব মারে, আর এক-একবার দৌড়ায়! (উচ্চ হাস্য) তারপর রাম খোল বাজাবে — আর আমরা নাচব — রামের তালবোধ নাই। (সকলের হাস্য) বলরামের ভাব, আপনারা গাও, নাচো, আনন্দ করো। (সকলের হাস্য)

ভক্তেরা বাটী হইতে আহারাদি করিয়া ক্রমে ক্রমে আসিতেছেন।

মহেন্দ্র মুখুজ্জেকে দূর হইতে প্রণাম করিতে দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন — আবার সেলাম করিতেছেন। কাছের রকটি ছোকরা ভক্তকে বলিতেছেন, ওকে বল্‌না ‘সেলাম করলে’, — ও বড় অলকট্ অলকট্ করে। (সকলের হাস্য) গৃহস্থ ভক্তেরা অনেকে নিজেদের বাটীর পরিবারদের আনিয়াছেন; — তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিবেন ও রথের সম্মুখে কীর্তনানন্দ দেখিবেন। রাম, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তেরা ক্রমে ক্রমে আসিয়াছেন। ছোকরা ভক্তেরা অনেকে আসিয়াছেন।

এইবার নরেন্দ্র গান গাইতেছেন:

(১) কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।

হয়ে পূর্ণকাম বলব হরিনাম,

নয়নে বহিবে প্রেম-অশ্রুধার ।।

(২) নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।

তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী ।।

বলরাম আজ কীর্তনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন, — বৈষ্ণবচরণ ও বেনোয়ারীর কীর্তন। এইবার বৈষ্ণবচরণ গাহিতেছেন —— শ্রীদুর্গানাম জপ সদা রসনা আমার। দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনে কে করে নিস্তার।

গান একটু শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ! দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ! — ছোট নরেন ধরিয়া আছেন। সহাস্যবদন। ক্রমে সব স্থির! একঘর ভক্তেরা অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। মেয়ে ভক্তেরা চিকের মধ্য হইতে দেখিতেছেন। সাক্ষাৎ নারায়ণ বুঝি দেহধারণ করিয়া ভক্তের জন্য আসিয়াছেন। কি করে ঈশ্বরকে ভালবাসতে হয়, তাই বুঝি শিখাতে এসেছেন!

নাম করিতে করিতে অনেকক্ষণ পরে সমাধিভঙ্গ হইল। ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলে বৈষ্ণবচরণ আবার গান ধরিলেন:

(১) হরি হরি বল রে বীণে!

(২) বিফলে দিন যায় রে বীণে, শ্রীহরির সাধন বিনে।

এইবার আর এক কীর্তনীয়া, বেনোয়ারী, রূপ গাহিতেছেন। কিন্তু সদাই গান গাহিতে ‘আহা! আহা!’ বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন। তাহাতে শ্রোতারা কেহ হাসে, কেহ বিরক্ত হয়।

অপরাহ্ন হইয়াছে। ইতিমধ্যে বারান্দায় শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেই ছোট রথখানি ধ্বজা পতাকা দিয়া সুসজ্জিত করিয়া আনা হইয়াছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম চন্দনচর্চিত ও বসন-ভূষণ ও পুষ্পমালা দ্বারা সুশোভিত হইয়াছেন। ঠাকুর বেনোয়ারীর কীর্তন ফেলিয়া বারান্দায় রথাগ্রে গমন করিলেন, — ভক্তেরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। রথের রজ্জু ধরিয়া একটু টানিলেন —— তৎপরে রথাগ্রে ভক্তসঙ্গে নৃত্য ও কীর্তন করিতেছেন। অন্যান্য গানের সঙ্গে ঠাকুর পদ ধরিলেন:

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, তারা তারা দুভাই এসেছে রে!
যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে, তারা তারা দুভাই এসেছে রে!
আবার —— নদে টলমল টলমল করে, গৌরপ্রেমে হিল্লোলে রে।

ছোট বারান্দাতে রথের সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন ও নৃত্য হইতেছে। উচ্চ সংকীর্তন ও খোলের শব্দ শুনিয়া বাহিরের লোক অনেকে বারান্দা মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। ঠাকুর হরিপ্রেমে মাতোয়ারা। ভক্তেরাও সঙ্গে সঙ্গে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নাচিতেছেন।
পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১৪ই জুলাই 1885/07/14/iv

49.6 নরেন্দ্রের গান — ঠাকুরের ভাবাবেশে নৃত্য

রথাগ্রে কীর্তন ও নৃত্যের পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। মণি প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহার পদসেবা করিতেছেন।

নরেন্দ্র ভাবে পূর্ণ হইয়া তানপুরা লইয়া আবার গান গাহিতেছেন:

(১) এসো মা এসো মা, ও হৃদয়-রমা, পরাণ-পুতলী গো,
হৃদয়-আসনে, হও মা আসীন, নিরখি তোমারে গো।

(২) মা ত্বং হি তারা, তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
আমি জানি গো ও দীন-দয়াময়ী, তুমি দুর্গমেতে দুখহারা ।।
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা।
তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী, সদাশিবের মনোরমা ।।
তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমি আদ্যমূলে গো মা।
তুমি সর্বঘটে অর্ঘপুটে, সাকার আকার নিরাকারা ।।

(৩) তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ-সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা ।।

একজন ভক্ত নরেন্দ্রকে বলিতেছেন, তুমি ওই গানটা গাইবে? —

অন্তরে জাগিছো গো মা অন্তরযামিনী!

শ্রীরামকৃষ্ণ — দূর! এখন ও-সব গান কি! এখন আনন্দের গান — ‘শ্যামা সুধা-তরঙ্গিণী।’

নরেন্দ্র গাইতেছেন:

কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা, সুধা-তরঙ্গিনী!
তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী ।।

ভাবোন্মত্ত হইয়া নরেন্দ্র বারবার গাইতে লাগিলেন:

কভু কমলে কমলে থাকো মা পূর্ণব্রহ্মসনাতনী।

ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন, — ও গাইতেছেন, ওমা পূর্ণব্রহ্মসনাতনী! অনেকক্ষণ নৃত্যের পর ঠাকুর আবার আসন গ্রহণ করিলেন। নরেন্দ্র ভাবাবিষ্ট হইয়া সাশ্রুনয়নে গান গাহিতেছেন দেখিয়া ঠাকুর অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

রাত্রি প্রায় নয়টা হইবে, এখনও ভক্তসঙ্গে ঠাকুর বসিয়া আছেন।

আবার বৈষ্ণবচরণের গান শুনিতেছেন।

(১) শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর নটবর তপত কাঞ্চন কায়।

(২) চিনিব কেমনে হে তোমায় (হরি)।

ওহে বঙ্কুরায়, ভুলে আছ মথুরায় ।।

হাতিচড়া জোড়াপরা, ভুলেছ কি ধেনুচরা

ব্রজের মাখন চুরি করা, মনে কিছু হয়।

রাত্রি দশটা-এগারটা। ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, আর সব্বাই বাড়ি যাও — (নরেন্দ্র ও ছোট নরেনকে দেখাইয়া) এরা দুইজন থাকলেই হল! (গিরিশের প্রতি) তুমি কি বাড়ি গিয়ে খাবে? থাকো তো খানিক থাক। তামাক্! — ওহ বলরামের চাকরও তেমনি। ডেকে দেখ না — দেবে না। (সকলের হাস্য) কিন্তু তুমি তামাক খেয়ে যেও।

শ্রীযুক্ত গিরিশের সঙ্গে একটি চশমাপরা বন্ধু আসিয়াছেন। তিনি সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া চলিয়া গেলেন। ঠাকুর গিরিশকে বলিতেছেন, — “তোমাকে আর হরে প্যালাকে বলি, জোর করে কারুকে নিয়ে এসো না, — সময় না হলে হয় না।”

একটি ভক্ত প্রণাম করিলেন। সঙ্গে একটি ছেলে। ঠাকুর সস্নেহে কহিতেছেন — “তবে তুমি এসো — আবার উটি সঙ্গে।” নরেন্দ্র, ছোট নরেন, আর দু-একটি ভক্ত, আর একটু থাকিয়া বাটী ফিরিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১৫ই জুলাই 1885/07/15/i

49.7 সুপ্রভাত ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ — মধুর নৃত্য ও নামকীর্তন

শ্রীরামকৃষ্ণ বৈঠকখানার পশ্চিমদিকের ছোট ঘরে শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। রাত ৪টা। ঘরের দক্ষিণে বারান্দা, তাহাতে একখানি টুল পাতা আছে। তাহার উপর মাস্টার বসিয়া আছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই ঠাকুর বারান্দায় আসিলেন। মাস্টার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। সংক্রান্তি, বুধবার, ৩২শে আষাঢ়; ১৫ই জুলাই, ১৮৮৫।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি আর-একবার উঠেছিলাম। আচ্ছা, সকালবেলা কি যাব?

মাস্টার — আজ্ঞা, সকালবেলায় ঢেউ একটু কম থাকে।

ভোর হইয়াছে — এখনও ভক্তেরা আসিয়া জুটেন নাই। ঠাকুর মুখ ধুইয়া মধুর স্বরে নাম করিতেছেন। পশ্চিমের ঘরটির উত্তর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া নাম করিতেছেন। কাছে মাস্টার। কিয়ৎক্ষণ পরে অনতিদূরে গোপালের মা আসিয়া দাঁড়াইলেন। অন্তঃপরে দ্বারের অন্তরালে ২/১টি স্ত্রীলোক ভক্ত আসিয়া ঠাকুরকে দেখিতেছেন। যেন শ্রীবৃন্দাবনের গোপীরা শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিতেছেন! অথবা নবদ্বীপের ভক্ত মহিলারা প্রেমোন্মত্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে আড়াল হইতে দেখিতেছেন।

রামনাম করিয়া ঠাকুর কৃষ্ণনাম করিতেচেন, কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! গোপীকৃষ্ণ! গোপী! গোপী! রাখালজীবন কৃষ্ণ! নন্দনন্দন কৃষ্ণ! গোবিন্দ! গোবিন্দ!

আবার গৌরাঙ্গের নাম করিতেছেন —

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। হরেকৃষ্ণ হরে রাম, রাধে গোবিন্দ!

আবার বলিতেছেন, আলেখ নিরঞ্জন! নিরঞ্জন বলিয়া কাঁদিতেছেন। তাঁহার কান্না দেখিয়া ও কাতর স্বর শুনিয়া, কাছে দণ্ডায়মান ভক্তেরা কাঁদিতেছেন। তিনি কাঁদিতেছেন, আর বলিতেছেন, 'নিরঞ্জন! আয় বাপ — খারে নেরে — কবে তোরে খাইয়ে জন্ম সফল করব! তুই আমার জন্য দেহধারণ করে নররূপে এসেছিস।'

জগন্নাথের কাছে আর্তি করিতেছেন — জগন্নাথ! জগবন্ধু! দীনবন্ধু! আমি তো জগৎছাড়া নই নাথ, আমায় দয়া কর!

প্রেমোন্মত্ত হইয়া গাহিতেছেন — "উড়িষ্যা জগন্নাথ ভজ বিরাজ জী!"

এইবার নারায়ণের নামকীর্তন করিতে করিতে নাচিতেছেন ও গাহিতেছেন — শ্রীমন্নারায়ণ! শ্রীমন্নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ!

নাচিতে নাচিতে আবার গান গাইতেছেন:

হলাম যার জন্য পাগল, তারে কই পেলাম সই।
ব্রহ্মা পাগল, বিষ্ণু পাগল, আর পাগল শিব,
তিন পাগলে যুক্তি করে ভাঙলে নবদ্বীপ
আর এক পাগল দেখে এলাম বৃন্দাবনের মাঠে,

রাইকে রাজা সাজায়ে আপনি কোটাল সাজে!

এইবার ঠাকুর ভক্তসঙ্গে ছোট ঘরটিতে বসিয়াছেন। দিগম্বর! যেন পাঁচ বৎসরের বালক! মাস্টার, বলরাম আরও দুই-একটি ভক্ত বসিয়া আছেন।

[রূপদর্শন কখন? গুহ্যকথা — শুদ্ধ-আত্মা ছোকরাতে নারায়ণদর্শন]

(রামলালা, নিরঞ্জন, পূর্ণ, নরেন্দ্র, বেলঘরের তারক, ছোট নরেন)

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করা যায়! যখন উপাধি সব চলে যায়, — বিচার বন্ধ হয়ে যায়, — তখন দর্শন। তখন মানুষ অবাক্ সমাধিস্থ হয়। থিয়েটারে গিয়ে বসে লোকে কত গল্প করে, — এ-গল্প সে গল্প। যাই পর্দা উঠে যায় সব গল্প-টল্প বন্ধ হয়ে যায়। যা দেখে তাইতেই মগ্ন হয়ে যায়।

"তোমাদের অতি গুহ্যকতা বলছি। কেন পূর্ণ, নরেন্দ্র, এদের সব এত ভালবাসি। জগন্নাথের সঙ্গে মধুরভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাত ভেঙে গেল। জানিয়ে দিলে, "তুমি শরীরধারণ করেছ — এখন নররূপের সঙ্গে সখ্য, বাৎসল্য এইসব ভাব লয়ে থাকো।"

"রামলালার উপর যা যা ভাব হত, তাই পূর্ণাদিকে দেখে হচ্ছে! রামলালাকে নাওয়াতাম, খাওয়াতাম, শোয়াতাম, —সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতাম, — রামলালার জন্য বসে বসে কাঁদতাম, ঠিক এই সব ছেলেদের নিয়ে তাই হয়েছে! দেখ না নিরঞ্জন। কিছুতেই লিপ্ত নয়। নিজের টাকা দিয়ে গরিবদের ডাক্তারখানায়

নিয়ে যায়। বিবাহের কথায় বলে, ‘বাপরে! ও বিশালাক্ষীর দ!’ ওকে দেখি যে, একটা জ্যোতিঃর উপর বসে রয়েছে।

“পূর্ণ উঁচু সাকার ঘর — বিষ্ণুর অংশে জন্ম। আহা কি অনুরাগ!

(মাস্টারের প্রতি) — “দেখলে না, — তোমার দিকে চাইতে লাগল — যেন গুরুভাই-এর উপর — যেন ইনি আমার আপনার লোক! আর-একবার দেখা করবে বলেছে। বলে কাপ্তেনের ওখানে দেখা হবে।”

[নরেন্দ্রের কত গুণ — ছোট নরেণের গুণ]

“নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর — নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা।

“এতো ভক্ত আসছে, ওর মতো একটি নাই।

“এক-একবার বসে বসে খতাই। তা দেখি, অন্য পদ্ম কারু দশদল, কারু ষোড়শদল, কারু শতদল কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল!

“অন্যেরা কলসী, ঘটি এ-সব হতে পারে, — নরেন্দ্র জালা।

“ডোবা পুষ্করিণী মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি! যেমন হালদার-পুকুর।

“মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙাচক্ষু বড় রুই, আর সব নানারকম মাছ — পোনা, কাঠি বাটা, এই সব।

“খুব আধার, — অনেক জিনিস ধরে। বড় ফুটোওলা বাঁশ!

“নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়। ও আসক্তি, ইন্দ্রিয়-সুখের বশ নয়। পুরুষ পায়রা। পুরুষ পায়রার ঠোঁট ধরলে ঠোঁট টেনে ছিনিয়ে লয়, — মাদী পায়রা চুপ করে থাকে।

“বেলঘরের তারককে মৃগেল বলা যায়।

“নরেন্দ্র পুরুষ, গাড়িতে তাই ডান দিকে বসে। ভবনাথের মেদী ভাব ওকে তাই অন্যদিকে বসতে দিই!

“নরেন্দ্র সভায় থাকলে আমার বল।”

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখুজ্জে আসিয়া প্রণাম করিলেন। বেলা আটটা হইবে। হরিপদ, তুলসীরাম, ক্রমে আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। বাবুরামের জ্বর হইয়াছে, — আসিতে পারেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারাদির প্রতি) — ছোট নরেন এলো না? মনে করেছে, আমি চলে গেছি। (মুখুজ্জের প্রতি) কি আশ্চর্য! সে (ছোট নরেন) ছেলেবেলায় স্কুল থেকে এসে ঈশ্বরের জন্য কাঁদত। (ঈশ্বরের জন্য) কান্না কি কমেতে হয়!

“আবার বুদ্ধি খুব। বাঁশের মধ্যে বড় ফুটোওলা বাঁশ!

“আর আমার উপর সব মনটা। গিরিশ ঘোষ বললে, নবগোপালের বাড়ি যেদিন কীর্তন হয়েছিল, সেদিন (ছোট নরেন) গিছিল, — কিন্তু ‘তিনি কই’ বলে আর হুঁশ নাই, — লোকের গায়ের উপর দিয়েই চলে যায়!

“আবার ভয় নাই — যে বাড়িতে বকবে। দক্ষিণেশ্বরে তিনরাত্রি সমানে থাকে।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১৫ই জুলাই 1885/07/15/ii

49.8 ভক্তিযোগের গূঢ় রহস্য — জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়

[মুখুজ্জে, হরিবাবু, পূর্ণ, নিরঞ্জন, মাস্টার, বলরাম]

মুখুজ্জে — হরি (বাগবাজারের হরিবাবু) আপনার কালকের কথা শুনে অবাক্! বলে, ‘সাংখ্যদর্শনে, পাতঞ্জলে, বেদান্তে — ও-সব কথা আছে। ইনি সামান্য নন।’

শ্রীরামকৃষ্ণ — কই, আমি সাংখ্য, বেদান্ত পড়ি নাই।

“পূর্ণজ্ঞান আর পূর্ণভক্তি একই। ‘নেতি’ ‘নেতি’ করে বিচারের শেষ হলে, ব্রহ্মজ্ঞান। — তারপর যা ত্যাগ করে গিছিল, তাই আবার গ্রহণ। ছাদে উঠবার সময় সাবধানে উঠতে হয়। তারপর দেখে যে, ছাদও যে জিনিসে — ইট-চুন-সুরকি — সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈয়ারী!

“যার উচ্চ বোধ আছে, তার নিচু বোধ আছে। জ্ঞানের পর, উপর নিচে এক বোধ হয়।

“প্রহ্লাদের যখন তত্ত্বজ্ঞান হত, ‘সোঽহম্’ হয়ে থাকতেন। যখন দেহবুদ্ধি আসত ‘দাসোঽহম্’, ‘আমি তোমার দাস’, এই ভাব আসত।

“হনুমানের কখনও ‘সোঽহম্’, কখন ‘দাস আমি’, কখন ‘আমি তোমার অংশ’, এই ভাব আসত।

“কেন ভক্তি নিয়ে থাকো? — তা না হলে মানুষ কি নিয়ে থাকে! কি নিয়ে দিন কাটায়।

“‘আমি’ তো যাবার নয়, ‘আমি’ ঘট থাকতে সোঽহম্ হয় না। সমাধিস্থ হলে ‘আমি’ পুছে যায়, — তখন যা আছে তাই। রামপ্রসাদ বলে, তারপর আমি ভাল কি তুমি ভাল, তা তুমিই জানবে।

“যতক্ষণ ‘আমি’ রয়েছে ততক্ষণ ভক্তের মতো থাকাই ভাল! ‘আমি ভগবান’ এটি ভাল না। হে জীব, ভক্তবৎ এটি ভাল না। হে জীব, ভক্তবৎ ন চ কৃষ্ণবৎ! — তবে যদি নিজে টেনে লন, তবে আলাদা কথা। যেমন মনিব চাকরকে ভালবেসে বলছে, আয় আয় কাছে বোস আমিও যা তুইও তা। গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউয়ের গঙ্গা হয় না!

“শিবের দুই অবস্থা। যখন আত্মারাম তখন সোঽহম্ অবস্থা, — যোগেতে সব স্থির। যখন ‘আমি’ একটি আলাদা বোধ থাকে তখন ‘রাম! রাম!’ করে নৃত্য।

“যাঁর অটল আছে, তাঁর টলও আছে।

“এই তুমি স্থির। আবার তুমিই কিছুক্ষণ পরে কাজ করবে।

“জ্ঞান আর ভক্তি একই জিনিস। — তবে একজন বলছে ‘জল’, আর-একজন ‘জলের খানিকটা চাপ’।”

[দুই সমাধি — সমাধি প্রতিবন্ধক — কামিনী-কাঞ্চন]

“সমাধি মোটামুটি দুইরকম। — জ্ঞানের পথে, বিচার করতে করতে অহং নাশের পর যে সমাধি, তাকে স্থিতসমাধি বা জড়সমাধি (নির্বিকল্পসমাধি) বলে। ভক্তিপথের সমাধিকে ভাবসমাধি বলে। এতে সম্ভোগের জন্য, আস্বাদনের জন্য, রেখার মতো একটু অহং থাকে। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থাকলে এ-সব ধারণা হয় না।

“কেদারকে বললুম, কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকলে হবে না। ইচ্ছা হল, একবার তার বুকে হাত বুলিয়ে দি, — কিন্তু পারলাম না। ভিতরে অঙ্কট-বঙ্কট। ঘরে বিষ্ঠার গন্ধ, ঢুকতে পারলাম না। যেমন স্বয়ম্ভু লিঙ্গ কাশী পর্যন্ত জড়। সংসারে আসক্তি, — কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি, — থাকলে হবে না।

“ছোকরাদের ভিতর এখনও কামিনী-কাঞ্চন ঢোকে নাই; তাইতো ওদের অত ভালবাসি। হাজরা বলে, ‘ধনীর ছেলে দেখে, সুন্দর ছেলে দেখে, — তুমি ভালবাস’। তা যদি হয়, হরিশ, নোটো, নরেন্দ্র — এদের ভালবাসি কেন? নরেন্দ্রের ভাত নুন দে খাবার পয়সা জোটে না।

“ছোকরাদের ভিতর বিষয়বুদ্ধি এখনও ঢোকে নাই। তাই অন্তর অত শুদ্ধ।

“আর অনেকেই নিত্যসিদ্ধ। জন্ম থেকেই ঈশ্বরের দিকে টান। যেমন বাগান একটা কিনেছ। পরিষ্কার করতে করতে এক জায়গায় বসানো জলের কল পাওয়া গেল। একবারে জল কলকল করে বেরুচ্ছে।”

[পূর্ণ ও নিরঞ্জন — মাতৃসেবা — বৈষ্ণবদের মহোৎসবের ভাব]

বলরাম — মহাশয়, সংসার মিথ্যা, একবারে জ্ঞান, পূর্ণের কেমন করে হল?

শ্রীরামকৃষ্ণ — জন্মান্তরীণ। পূর্ব পূর্ব জন্মে সব করা আছে। শরীরটাই ছোট হয়ে আবার বৃদ্ধ হয় — আত্মা সেইরূপ নয়।

“ওদের কেমন জান, — ফল আগে তারপর ফুল। আগে দর্শন, — তারপর গুণ-মহিমাশ্রবণ, তারপর মিলন!

“নিরঞ্জনকে দেখ — লেনাদেনা নাই। — যখন ডাক পড়বে যেতে পারবে। তবে যতক্ষণ মা আছে, মাকে দেখতে হবে। আমি মাকে ফুল চন্দন দিয়ে পূজা করতাম। সেই জগতের মা-ই মা হয়ে এসেছেন। তাই কারু শ্রাদ্ধ, — শেষে ঈষ্টের পূজা হয়ে পড়ে। কেউ মরে গেলে বৈষ্ণবদের মহোৎসব হয়, তারও এই ভাব।

“যতক্ষণ নিজের শরীরের খপর আছে ততক্ষণ মার খপর নিতে হবে। তাই হাজরাকে বলি, নিজের কাশি হলে মিছরি মরিচ করতে হয়, মরিচ-লবণের যোগাড় করতে হয়; যতক্ষণ এ-সব করতে হয়, ততক্ষণ মার খপরও নিতে হয়।

“তবে যখন নিজের শরীরের খপর নিতে পাচ্ছি না, — তখন অন্য কথা। তখন ঈশ্বরই সব ভার লন।

“নাবালক নিজের ভার নিতে পারে না। তাই তার অছি (Guardian) হয়। নাবালকের অবস্থা —— যেমন চৈতন্যদেবের অবস্থা।”

মাস্টার গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১৫ই জুলাই 1885/07/15/iii

49.9 শ্রীরামকৃষ্ণের কুষ্ঠি —— পূর্বকথা —— ঠাকুরের ঈশ্বরদর্শন

[রাম, লক্ষ্মণ ও পার্থসারথি-দর্শন —— ন্যাংটা পরমহংসমূর্তি]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে সেই ছোট ঘরে কথা কহিতেছেন। মহেন্দ্র মুখুজ্জে, বলরাম, তুলসী, হরিপদ, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তেরা বসিয়া আছেন। গিরিশ ঠাকুরের কৃপা পাইয়া সাত-আট মাস যাতায়াত করিতেছেন। মাস্টার ইতিমধ্যে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়াছেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কাছে বসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহার অদ্ভুত ঈশ্বর-দর্শনকথা একটু একটু বলিতেছেন।

“কালীঘরে একদিন ন্যাংটা আর হলধারী অধ্যাত্ম (রামায়ণ) পড়ছে। হঠাৎ দেখলাম নদী, তার পাশে বন, সবুজ রঙ গাছপালা, — রাম লক্ষ্মণ জাঙ্গিয়া পরা, চলে যাচ্ছেন। একদিন কুঠির সম্মুখে অর্জুনের রথ দেখলাম। — সারথির বেশে ঠাকুর বসে আছেন। সে এখনও মনে আছে।

“আর একদিন, দেশে কীর্তন হচ্ছে, — সম্মুখে গৌরাঙ্গমূর্তি।

“একজন ন্যাংটা সঙ্গে সঙ্গে থাকত — তার ধনে হাত দিয়ে ফচকিমি করতুম। তখন খুব হাসতুম। এ ন্যাংটোমূর্তি আমারই ভিতর থেকে বেরুত। পরমহংসমূর্তি, — বালকের ন্যায়।

“ঈশ্বরীয় রূপ কত যে দর্শন হয়েছে, তা বলা যায় না। সেই সময়ে বড় পেটের ব্যামো। ওই সকল অবস্থায় পেটের ব্যামো বড় বেড়ে যেত। তাই রূপ দেখলে শেষে থু-থু করতুম — কিন্তু পেছেনে গিয়ে ভূত পাওয়ার মতো আবার আমায় ধরত! ভাবে বিভোর হয়ে থাকতাম, দিনরাত কোথা দিয়ে যেত! তার পরদিন পেট ধুয়ে ভাব বেরুত!” (হাস্য)

গিরিশ (সহাস্যে) — আপনার কুষ্ঠি দেখছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — দ্বিতীয়ার চাঁদে জন্ম। আর রবি, চন্দ্র, বুধ — এছাড়া আর কিছু বড় একটা নাই।

গিরিশ — কুম্ভরাশি। কর্কট আর বৃষে রাম আর কৃষ্ণ; — সিংহে চৈতন্যদেব।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দুটি সাধ ছিল। প্রথম — ভক্তের রাজা হব, দ্বিতীয় শুঁটকে সাধু হবো না।

[শ্রীরামকৃষ্ণের কুষ্ঠি — ঠাকুরের সাধন কেন — ব্রহ্মযোনিদর্শন]

গিরিশ (সহাস্যে) — আপনার সাধন করা কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — ভগবতী শিবের জন্য অনেক কঠোর সাধন করেছিলেন, — পঞ্চতপা, শীতকালে জলে গা বুড়িয়ে থাকা, সূর্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকা!

"স্বয়ং কৃষ্ণ রাধাযন্ত্র নিয়ে অনেক সাধন করেছিলেন। যন্ত্র ব্রহ্মযোনি — তাঁরই পূজা ধ্যান! এই ব্রহ্মযোনি থেকে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হচ্ছে।

"অতি গুহ্যকথা! বেলতলায় দর্শন হত — লকলক করত!"

[পূর্বকথা — বেলতলায় তন্ত্রের সাধন — বামনীর যোগাড়]

"বেলতলায় অনেক তন্ত্রের সাধন হয়েছিল। মড়ার মাথা নিয়ে। আবার ... আসন। বামনী সব যোগাড় করত।

(হরিপদর দিকে অগ্রসর হইয়া) — "সেই অবস্থায় ছেলেদের ধন, ফুল-চন্দন দিয়ে পূজা না করলে থাকতে পারতাম না।

"আর-একটি অবস্থা হত। যেদিন অহংকার করতুম, তারপরদিনই অসুখ হত।"

মাস্টার শ্রীমুখনিঃসৃত অশ্রুতপূর্ব বেদান্তবাক্য শুনিয়া অবাক্ হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। ভক্তেরাও যেন সেই পূতসলিলা পতিতপাবনী শ্রীমুখনিঃসৃত ভাগবতগঙ্গায় স্নান করিয়া বসিয়া আছেন।

সকলে চুপ করিয়া আছেন।

তুলসী — ইনি হাসেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ভিতরে হাসি আছে। ফল্গুনদীর উপরে বালি, — খুঁড়লে জল পাওয়া যায়।

(মাস্টারের প্রতি) — "তুমি জিহ্বা ছোল না! রোজ জিহ্বা ছুলবে।"

বলরাম — আচ্ছা, এঁর (মাস্টারের) কাছে পূর্ণ আপনার কথা অনেক শুনেছেন —

শ্রীরামকৃষ্ণ — আগেকার কথা — ইনি জানেন — আমি জানি না।

বলরাম — পূর্ণ স্বভাবসিদ্ধ। তবে এঁরা?

শ্রীরামকৃষ্ণ — এঁরা হেতুমাত্র।

নয়টা বাজিয়াছে — ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিবেন তাহার উদ্যোগ হইতেছে। বাগবাজারের অন্নপূর্ণার ঘাটে নৌকা ঠিক করা আছে। ঠাকুরকে ভক্তেরা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন।

ঠাকুর দুই-একটি ভক্তের সহিত নৌকায় গিয়া বসিলেন, গোপালের মা ওই নৌকায় উঠিলেন, — দক্ষিণেশ্বরে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া বৈকালে হাঁটিয়া কামারহাটি যাইবেন।

ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরের ঘরের ক্যাম্পখাটটি সারাইতে দেইয়া হইয়াছিল। সেখানিও নৌকায় তুলিয়া দেওয়া হইল। এই খাটখানিতে শ্রীযুক্ত রাখাল প্রায় শয়ন করিতেন।

আজ কিন্তু মঘা নক্ষত্র। যাত্রা বদলাইতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আগত শনিবারে বলরামের বাটীতে আবার শুভাগমন করিবেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c50 ৫০ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতানগরে ভক্তমন্দিরে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৮শে জুলাই 1885/07/28/i

50.1 বলরাম বাটীতে

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে বলরামের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। সহাস্যবদন। এখন বেলা প্রায় তিনটা; বিনোদ, রাখাল, মাস্টার ইত্যাদি কাছে বসিয়া। ছোট নরেনও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আজ মঙ্গলবার, ২৮শে জুলাই, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, (১৩ই শ্রাবণ, ১২৯২) আষাঢ় কৃষ্ণা প্রতিপদ। ঠাকুর বলরামের বাড়িতে সকালে আসিয়াছেন ও ভক্তসঙ্গে আহারাদি করিয়াছেন। বলরামের বাড়িতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা আছে। তাই ঠাকুর বলেন, "বড় শুদ্ধ অন্ন।"

নারাণ প্রভৃতি ভক্তেরা বলিয়াছিলেন, নন্দ বসুর বাড়িতে অনেক ঈশ্বরীয় ছবি আছে। আজ তাই ঠাকুর তাদের বারি গিয়া অপরাহ্নে ছবি দেখিবেন। একটি ভক্ত ব্রাহ্মণীর বাড়ি নন্দ বসুর বাটীর নিকটে, সেখানেও যাইবেন। ব্রাহ্মণী কন্যা-শোকে সন্তপ্তা, প্রায় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে জান। তিনি অতিশয়

ব্যাকুলা হইয়া ঠাকুরকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাঁহার বাটীতে যাইতে হইবে ও আর-একটি স্ত্রী ভক্ত গণুর মার বাটীতেও যাইতে হইবে।

ঠাকুর বলরামের বাটীতে আসিয়াই ছোকরা ভক্তদের ডাকিয়া পাঠান। ছোট নরেন মাঝে বলিয়াছিলেন; "আমার কাজ আছে বলিয়া সর্বদা আসিতে পারি না, পরীক্ষার জন্য পড়া" — ইত্যাদি; ছোট নরেন আসিলে ঠাকুর তাহার সহিত কথা কহিতেছেন —

শ্রীরামকৃষ্ণ (ছোট নরেনকে) — তোকে ডাকতে পাঠাই নাই।

ছোট নরেন (হাসিতে হাসিতে) — তা আর কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা বাপু তোমার অনিষ্ট হবে, অবসর হলে আসবে!

ঠাকুর যেন অভিমান করিয়া এই কথাগুলি বলিলেন।

পালকি আসিয়াছে। ঠাকুর শ্রীযুক্ত নন্দ বসুর বাটীতে যাইবেন।

ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে ঠাকুর পালকিতে উঠিতেছেন। পায়ে কালো বার্ণিশ করা চটি জুতা, পরনে লাল ফিতাপাড় ধুতি, উত্তরীয় নাই। জুতা-জোড়াটি পালকির একপাশে মণি রাখলেন। পালকির সঙ্গে সঙ্গে মাস্টার যাইতেছেন। ক্রমে পরেশ আসিয়া জুটিলেন।

নন্দ বসুর গেটের ভিতর পালকি প্রবেশ করিল। ক্রমে বাটীর সম্মুখে প্রশস্ত ভূমি পার হইয়া পালকি বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গৃহস্বামীর আত্মীয়গণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম মরিলেন। ঠাকুর মাস্টারকে চটিজুতা-জোড়াটি দিতে বলিলেন। পালকি হইতে অবতরণ করিয়া উপরের হলঘরে উপস্থিত হইলেন। অতি দীর্ঘ ও প্রশস্ত হলঘর। দেবদেবীর ছবি ঘরের চতুর্দিকে।

গৃহস্বামী ও তাঁহার ভ্রাতা পশুপতি ঠাকুরকে সম্ভাষণ করিলেন। ক্রমে পালকির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া ভক্তেরা এই হলঘরে জুটিলেন। গিরিশের ভাই অতুল আসিয়াছেন। প্রসন্নের পিতা শ্রীযুক্ত নন্দ বসুর বাটীতে সর্বদা যাতায়াত করেন। তিনিও উপস্থিত আছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৮শে জুলাই 1885/07/28/ii

50.2 শ্রীযুক্ত নন্দ বসুর বাটীতে শুভাগমন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার ছবি দেখিতে গাত্রোত্থান করিলেন। সঙ্গে মাস্টার ও আরও কয়েকজন ভক্ত, গৃহস্বামীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পশুপতিও সঙ্গ সঙ্গে থাকিয়া ছবিগুলি দেখাইতেছেন।

ঠাকুর প্রথমেই চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি দর্শন করিতেছেন। দেখিয়াই ভাবে বিভোর হইলেন। দাঁড়াইয়াছিলেন, বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল ভাবে আবিষ্ট হইয়া রহিলেন।

হনুমানের মাথায় হাত দিয়া শ্রীরাম আশীর্বাদ করিতেছেন। হনুমানের দৃষ্টি শ্রীরামের পাদপদ্মে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অনেকক্ষণ ধরিয়া এই ছবি দেখিতেছেন। ভাবে বলিতেছেন, "আহা! আহা!"

তৃতীয় ছবি বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণ কদমতলায় দাঁড়াইয়া আছেন।

চতুর্থ — বামনাবতার। ছাতি মাতায় বলির যজ্ঞে যাইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "বামন!" এবং একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

এইবার নৃসিংহমূর্তি দর্শন করিয়া ঠাকুর গোষ্ঠের ছবি দর্শন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ রাখালদের সহিত বৎসগণ চরাইতেছেন। শ্রীবৃন্দাবন ও যমুনাপুলিন! মণি বলিয়া উঠিলেন — চমৎকার ছবি।

সপ্তম ছবি দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন — "ধূমাবতী"; অষ্টম — ষোড়শী; নবম — ভুবনেশ্বরী; দশম — তারা; একাদশ — কালী। এই সকল মূর্তি দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন — "এ-সব উগ্রমূর্তি! এ-সব মূর্তি বাড়িতে রাখতে নাই। এ-মূর্তি বাড়িতে রাখলে পূজা দিতে হয়। তবে আপনাদের অদৃষ্টের জোর আছে, আপনারা রেখেছেন।"

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া ঠাকুর ভাবে বলিতেছেন, "বা! বা!"

তারপরই রাই রাজা। নিকুঞ্জবনে সখীপরিবৃতা সিংহাসনে বসিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জের দ্বারে কোটাল সাজিয়া বসিয়া আছেন। তারপর দোলের ছবি। ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া এর পরের মূর্তি দেখিতেছেন। গ্লাসকেসের ভিতর বীণাপাণির মূর্তি; দেবী বীনাহস্তে মাতোয়ারা হইয়া রাগরাগিনী আলাপ করিতেছেন।

ছবি দেখা সমাপ্ত হইল। ঠাকুর আবার গৃহস্বামীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গৃহস্বামীকে বলিতেছেন, "আজ খুব আনন্দ হল। বা! আপনি তো খুব হিন্দু! ইংরাজী ছবি না রেখে যে এই ছবি রেখেছেন — খুব আশ্চর্য!"

শ্রীযুক্ত নন্দ বসু বসিয়া আছেন। তিনি ঠাকুরকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, "বসুন! দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণ (বসিয়া) — এ পটগুলো খুব বড় বড়। তুমি বেশ হিন্দু।

নন্দ বসু — ইংরাজী ছবিও আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — সে-সব অমন নয়। ইংরাজীর দিকে তোমার তেমন নজর নাই।

ঘরের দেওয়ালের উপর শ্রীযুক্ত কেশব সেনের নববিধানের ছবি টাঙ্গানো ছিল। শ্রীযুক্ত সুরেশ মিত্র ওই ছবি করাইয়াছিলেন! তিনি ঠাকুরের একজন প্রিয় ভক্ত। ওই ছবিতে পরমহংসদেব কেশবকে দেখাইয়া দিতেছেন, ভিন্ন পথ দিয়া সব ধর্মাবলম্বীরা ঈশ্বরের দিকে যাইতেছেন। গন্তব্য স্থান এক, শুধু পথ আলাদা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ও যে সুরেন্দ্রের পট!

প্রসন্নের পিতা (সহাস্যে) — আপনিও ওর ভিতরে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — ওই একরকম, ওর ভিতর সবই আছে। — ইদানিং ভাব!

এই কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ ঠাকুর ভাবে বিভোর হইতেছেন। ঠাকুর জগন্মাতার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মাতালের ন্যায় বলিতেছেন, "আমি বেহুঁশ হই নাই।" বাড়ির দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিতেছেন, "বড় বাড়ি! এতে কি আছে? ইট, কাঠ, মাটি!"

কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতেছেন, "ঈশ্বরীয় মূর্তিসকল দেখে বড় আনন্দ হল।" আবার বলিতেছেন, "উগ্রমূর্তি, কালী, তারা (শব শিবা মধ্যে শ্মশানবাসিনী) রাখা ভাল নয়, রাখলে পূজা দিতে হয়।"

পশুপতি (সহাস্যে) — তা তিনি যতদিন চালাবেন, ততদিন চলবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা বটে, কিন্তু ঈশ্বরেতে মন রাখা ভাল; তাঁকে ভুলে থাকা ভাল নয়।

নন্দ বসু — তাঁতে মতি কই হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁর কৃপা কই হয়? তাঁর কি কৃপা করবার শক্তি আছে?

[ঈশ্বর কর্তা — না কর্মই ঈশ্বর]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — বুঝেছি, তোমার পণ্ডিতের মত, ‘যে যেমন কর্ম করবে সেরূপ ফল পাবে’; ওগুলো ছেড়ে দাও! ঈশ্বরের শরণাগত হলে কর্ম ক্ষয় হয়। আমি মার কছে ফুল হাতে করে বলেছিলাম, ‘মা! এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য; আমি কিছুই চাই না, তুমি আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ; আমি ভালমন্দ কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম; আমি ধর্মাধর্ম কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার জ্ঞান, এই লও তোমার অজ্ঞান; আমি জ্ঞান-অজ্ঞান কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।’

নন্দ বসু — আইন তিনি ছাড়াতে পারেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — সে কি! তিনি ঈশ্বর, তিনি সব পারেন; যিনি আইন করেছেন, তিনি আইন বদলাতে পারেন।

[চৈতন্যলাভ ভোগান্তে — না তাঁর কৃপায়]

“তবে ওকথা বলতে পার তুমি। তোমার নাকি ভোগ করবার ইচ্ছা আছে, তাই তুমি অমন কথা বলছ। ও এক মত আছে বটে, ভোগ শান্তি না হলে চৈতন্য হয় না! তবে ভোগেই বা কি করবে? কামিনী-কাঞ্চনের সুখ — এই আছে, এই নাই, ক্ষণিক! কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর আছে কি? আমড়া, আঁটি আর চামড়া; খেলে অমলশূল হয়। সন্দেশ, যাই গিলে ফেললে আর নাই!”

[ঈশ্বর কি পক্ষপাতী — অবিদ্যা কেন — তাঁর খুশি]

নন্দ বসু একটু চুপ করিয়া আছেন, তারপর বলিতেছেন, — ও-সব তো বলে বটে! ঈশ্বর কি পক্ষপাতী? তাঁর কৃপাতে যদি হয়, তাহলে বলতে হবে ঈশ্বর পক্ষপাতী?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তিনি নিজেই সব, ঈশ্বর নিজেই জীব, জগৎ সব হয়েছেন। যখন পূর্ণ জ্ঞান হবে, তখন ওই বোধ। তিনি মন, দেহ বুদ্ধি, দেহ — চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সব হয়েছেন। তিনি আর পক্ষপাত কার উপর করবেন?

নন্দ বসু — তিনি নানারূপ কেন হয়েছেন? কোনখানে জ্ঞান, কোনখানে অজ্ঞান?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁর খুশি।

অতুল — কেদারবাবু (চাটুজ্যে) বেশ বলেছেন। একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, ঈশ্বর সৃষ্টি কেন করলেন, তাতে বলেছিলেন যে, যে মিটিং-এ তিনি সৃষ্টির মতলব করেছিলেন, সে মিটিং-এ আমি ছিলাম না। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁর খুশি।

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতেছেন:

সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।

পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,

কারে দাও মা! ব্রহ্মপদ, কারে কর অধোগামী।।

আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী।

আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি।।

“তিনি আনন্দময়ী! এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের লীলা করছেন। অসংখ্য জীব, তার মধ্যে দু-একটি মুক্ত হয়ে যাচ্ছে, — তাতেও আনন্দ। ‘ঘুড়ির লক্ষের দুটো-একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি’। কেউ সংসারে বদ্ধ হচ্ছে, কেউ মুক্ত হচ্ছে।

“ভবসিন্ধু মাঝে মন উঠছে ডুবছে কত তরী!”

নন্দ বসু — তাঁর খুশি! আমরা যে মরি!

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমরা কোথায়? তিনিই সব হয়েছেন। যতক্ষণ না তাঁকে জানতে পাচ্ছ, ততক্ষণ ‘আমি’ ‘আমি’ করছ!

“সকলে তাঁকে জানতে পারবে — সকলেই উদ্ধার হবে, তবে কেহ সকাল সকাল খেতে পায়, কেহ দুপুর বেলা কেউ বা সন্ধ্যার সময়; কিন্তু কেহ অভুক্ত থাকবে না! সকলেই আপনার স্বরূপকে জানতে পারবে।”

পশুপতি — আজ্ঞা হাঁ, তিনিই সব হয়েছেন বোধ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি কি, এটা খোঁজো দেখি। আমি কি হাড়, না মাংস, না রক্ত, না নাড়ীভুঁড়ি? আমি খুঁজতে খুঁজতে ‘তুমি’ এসে পড়ে, অর্থাৎ অন্তরে সেই

ঈশ্বরের শক্তি বই আর কিছুই নাই। ‘আমি’ নাই! — তিনি। তোমার অভিমান নাই! এত ঐশ্বর্য। ‘আমি’ একেবারে ত্যাগ হয় না; তাই যদি যাবে না তবে থাক শ্যালা ঈশ্বরের দাস হয়ে। (সকলের হাস্য) ঈশ্বরের ভক্ত, ঈশ্বরের ছেলে, ঈশ্বরের দাস, এ-অভিমান ভাল। যে ‘আমি’ কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হয়, সেই ‘আমি’ কাঁচা আমি, সে ‘আমি’ ত্যাগ করতে হয়।

অহংকারের এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া গৃহস্বামী ও অন্যান্য সকলে সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন।

[ঐশ্বর্যের অহংকার ও মত্ততা]

শ্রীরামকৃষ্ণ — জ্ঞানের দুটি লক্ষণ, প্রথম অভিমান থাকবে না; দ্বিতীয় শান্ত স্বভাব। তোমার দুই লক্ষণই আছে। অতএব তোমার উপর ঈশ্বরের অনুগ্রহ আছে।

“বেশি ঐশ্বর্য হলে, ঈশ্বরকে ভুল হয়ে যায়; ঐশ্বর্যের স্বভাবই ওই। যদু মল্লিকের বেশি ঐশ্বর্য হয়েছে, সে আজকাল ঈশ্বরীয় কথা কয় না। আগে আগে বেশ ঈশ্বরের কথা কইত।

“কামিনী-কাঞ্চন একপ্রকার মদ। অনেক মদ খেলে খুড়া-জ্যাঠা বোধ থাকে না, তাদেরই বলে ফেলে, তোর গুষ্টির; মাতালের গুরু-লঘু বোধ থাকে না।”

নন্দ বসু — তা বটে।

[Theosophy — ক্ষণকাল যোগে মুক্তি — শুদ্ধাভক্তিসাধন]

পশুপতি — মহাশয়! এগুলো কি সত্য — Spiritualism, Theosophy? সূর্যলোক, চন্দ্রলোক? নক্ষত্রলোক?

শ্রীরামকৃষ্ণ — জানি না বাপু! অত হিসাব কেন? আম খাও; কত আমগাছ, কত লক্ষ ডাল, কত কোটি পাতা, এ হিসাব করা আমার দরকার কি? আমি বাগানে আম খেতে এসেছি, খেয়ে যাই।

“চৈতন্য যদি একবার হয়, যদি একবার ঈশ্বরকে কেউ জানতে পারে তাহলে ও-সব হাবজা-গোবজা বিষয় জানতে ইচ্ছাও হয় না। বিকার থাকলে কত কি বলে, — ‘আমি পাঁচ সের চালের ভাত খাবো রে’ — ‘আমি একজালা জল খাবো রে।’ — বৈদ্য বলে, ‘খাবি? আচ্ছা খাবি!’ — এই বলে বৈদ্য তামাক খায়। বিকার সেরে, যা বলবে তাই শুনতে হয়।”

পশুপতি — আমাদের বিকার চিরকাল বুঝি থাকবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেন ঈশ্বরেতে মন রাখো, চৈতন্য হবে।

পশুপতি (সহাস্যে) — আমাদের ঈশ্বরে যোগ ক্ষণিক। তামাক খেতে যতক্ষণ লাগে। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা হোক; ক্ষণকাল তাঁর সঙ্গে যোগ হলেই মুক্তি।

“অহল্যা বললে, রাম! শূকরযোনিতেই জন্ম হউক আর যেখানেই হউক যেন তোমার পাদপদ্মে মন থাকে, যেন শুদ্ধাভক্তি হয়।

“নারদ বললে, রাম! তোমার কাছে আর কোনও বর চাই না, আমাকে শুদ্ধাভক্তি দাও, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই, এই আশীর্বাদ করো। আন্তরিক তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে, তাঁতে মন হয়, — ঈশ্বরের পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়।”

[পাপ ও পরলোক — মৃত্যুকালে ঈশ্বরচিন্তা — ভরত রাজা]

“আমাদের কি বিকার যাবে!’ — ‘আমাদের আর কি হবে’ – ‘আমরা পাপী’ — এ-সব বুদ্ধি ত্যাগ করো। (নন্দ বসুর প্রতি) আর এই চাই — একবার রাম বলেছি, আমার আবার পাপ!”

নন্দ বসু — পরলোকে কি আছে? পাপের শাস্তি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি আম খাও না! তোমার ও-সব হিসাবে দরকার কি? পরলোক আছে কি না — তাতে কি হয় — এ-সব খবর!

“আম খাও। ‘আম’ প্রয়োজন, — তাঁতে ভক্তি —”

নন্দ বসু — আমগাছ কোথা? আম পাই কোথা?

শ্রীরামকৃষ্ণ — গাছ? তিনি অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম! তিনি আছেনই, তিনি নিত্য! তবে একটি কথা আছে — তিনি ‘কল্পতরু —’

“কালী কল্পতরু মূলে রে মন, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি!

“কল্পতরুর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করতে হয়, তবে ফল পাওয়া যায়, — তবে ফল তরুর মূলে পড়ে, — তখন কুড়িয়ে লওয়া যায়। চারি ফল, — ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

“জ্ঞানীরা মুক্তি (মোক্ষফল) চায়, ভক্তেরা ভক্তি চায়, — অহেতুকী ভক্তি। তারা ধর্ম, অর্থ, কাম চায় না।

“পরলোকের কথা বলছ? গীতার মত, — মৃত্যুকালে যা ভাববে তাই হবে। ভরত রাজা ‘হরিণ’ ‘হরিণ’ করে শোকে প্রাণত্যাগ করেছিল। তাই তার হরিণ হয়ে জন্মাতে হল। তাই জপ, ধ্যান, পূজা এ-সব রাতদিন অভ্যাস করতে হয়, তাহলে মৃত্যুকালে ঈশ্বরচিন্তা আসে —— অভ্যাসের গুণে। এরূপে মৃত্যু হলে ঈশ্বরের স্বরূপ পায়।

“কেশব সেনও পরলোকের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি কেশবকেও বললুম, ‘এ-সব হিসাবে তোমার কি দরকার?’ তারপর আবার বললুম, যতক্ষণ না ঈশ্বরলাভ হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করতে হবে। কুমোরেরা হাঁড়ি-সরা রৌদ্র শুকুতে দেয়; ছাগল-গরুতে মাড়িয়ে যদি ভেঙে দেয় তাহলে তৈরি লাল হাঁড়িগুলো ফেলে দেয়। কাঁচাগুলো কিন্তু আবার নিয়ে কাদামাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে ও আবার চাকে দেয়!”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৮শে জুলাই 1885/07/28/iii

50.3 শ্রীরামকৃষ্ণ ও গৃহস্থের মঙ্গলকামনা — রজোগুণের চিহ্ন

এ পর্যন্ত গৃহস্বামী ঠাকুরের মিষ্ট মুখ করাইবার কোনও চেষ্টা করেন নাই। ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গৃহস্বামীকে বলিতেছেন —

“কিছু খেতে হয়। যদুর মাকে তাই সেদিন বললুম — ‘ওগো কিছু (খেতে) দাও’! তা না হলে পাছে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়!”

গৃহস্বামী কিছু মিষ্টান্ন আনাইয়া দিলেন। ঠাকুর খাইতেছেন। নন্দ বসু ও অন্যান্য সকলে ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। দেখিতেছেন তিনি কি কি করেন।

ঠাকুর হাত ধুইবেন, চাদরের উপর রেকাবি করিয়া মিষ্টান্ন দেওয়া হইয়াছিল, সেখানে হাত ধোয়া হইবে না। হাত ধুইবার জন্য একজন ভৃত্য পিকদানি আনিয়া উপস্থিত হইল।

পিকদানি রজোগুণের চিহ্ন। ঠাকুর দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, “নিয়ে যাও, নিয়ে যাও।” গৃহস্বামী বলিতেছেন, “হাত ধুন।”

ঠাকুর অন্যমনস্ক। বলিলেন, “কি? — হাত ধোবো?

ঠাকুর দক্ষিণে বারান্দার দিকে উঠিয়া গেলেন। মণিকে আজ্ঞা করিলেন, “আমার হাতে জল দাও।” মণি ভৃঙ্গার হইতে জল ঢালিয়া দিলেন। ঠাকুর নিজের কাপড়ে হাত পুঁছিয়া আবার বসিবার স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। ভদ্রলোকদের জন্য রেকাবি করিয়া পান আনা হইয়াছিল। সেই রেকাবির পান ঠাকুরের কাছে লইয়া যাওয়া হইল, তিনি সে পান গ্রহণ করিলেন না।

[ইষ্টদেবতাকে নিবেদন — জ্ঞানভক্তি ও শুদ্ধাভক্তি]

নন্দ বসু (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — একটা কথা বলব?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — কি?

নন্দ বসু — পান খেলেন না কেন? সব ঠিক হল, ওইটি অন্যায় হয়েছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ — ইষ্টকে দিয়ে খাই; — ওই একটা ভাব আছে।

নন্দ বসু — ও তো ইষ্টতেই পড়ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ — জ্ঞানপথ একটা আছে; আর ভক্তিপথ একটা আছে। জ্ঞানীর মতে সব জিনিসই ব্রহ্মজ্ঞান করে লওয়া যায়! ভক্তিপথে একটু ভেদবুদ্ধি হয়।

নন্দ — ওটা দোষ হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — ও আমার একটা ভাব আছে। তুমি যা বলছ ও ঠিক বটে — ও-ও আছে।

ঠাকুর গৃহস্বামীকে মোসাহেব হইতে সাবধান করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আর একটা সাবধান! মোসাহেবরা স্বার্থের জন্য বেড়ায়। (প্রসন্নের পিতাকে) আপনার কি এখানে থাকা হয়?

প্রসন্নের পিতা — আজ্ঞে না, এই পাড়াতেই থাকা হয়। তামাক ইচ্ছা করুন।

নন্দ বসুর বাড়িটি খুব বড় তাই ঠাকুর বলিতেছেন — যদুর বাড়ি এত বড় নয়; তাই তাকে সেদিন বললাম।

নন্দ — হাঁ, তিনি জোড়াসাঁকোতে নূতন বাড়ি করেছেন।

ঠাকুর নন্দ বসুকে উৎসাহ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নন্দ বসুর প্রতি) — তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরের প্রতি মন রেখেছ, এ কি কম কথা? যে সংসারত্যাগী সে তো ঈশ্বরকে ডাকবেই। তাতে বাহাদুরি কি? সংসারে থেকে যে ডাকে, সেই ধন্য! সে ব্যক্তি বিশ মন পাথর সরিয়ে তবে দেখে।

“একটা ভাব আশ্রয় করে তাঁকে ডাকতে হয়। হনুমানের জ্ঞানভক্তি, নারদের শুদ্ধাভক্তি।

“রাম জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হনুমান! তুমি আমাকে কি ভাবে অর্চনা কর?’ হনুমান বললেন, ‘কখনও দেখি, তুমি পূর্ণ আমি অংশ; কখনও দেখি তুমি প্রভু আমি

দাস; আর রাম যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি, তুমিই আমি — আমিই তুমি।’
—

“রাম নারদকে বললেন, ‘তুমি বর লও।’ নারদ বললেন, ‘রাম! এই বর দাও, যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই!”

এইবার ঠাকুর গাত্রোত্থান করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নন্দ বসুর প্রতি) — গীতার মত — অনেকে যাকে গণে মানে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি অছে। তোমাতে ঈশ্বরের শক্তি আছে।

নন্দ বসু — শক্তি সকল মানুষেরই সমান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া) — ওই এক তোমাদের কথা; — সকল লোকের শক্তি কি সমান হতে পারে? বিভুরূপে তিনি সর্বভূতে এক হয়ে আছেন বটে, কিন্তু শক্তিবিশেষ!

“বিদ্যাসাগরও ওই কথা বলছিল, — ‘তিনি কি কারুকে বেশি শক্তি কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?’ তখন আমি বললাম — যদি শক্তি ভিন্ন না হয়, তাহলে তোমাকে আমরা কেন দেখতে এসেছি? তোমার মাথায় কি দুটো শিং বেরিয়েছে?”

ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। ভক্তেরাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন। পশুপতি সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুদগমন করিয়া দ্বারদেশে পৌঁছাইয়া দিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৮শে জুলাই 1885/07/28/iv

50.4 শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর বাটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর বাগবাজারের একটি শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর বাড়ি আসিয়াছেন। বাড়িটি পুরাতন ইষ্টকনির্ম্মিত। বাড়ি প্রবেশ করিয়াই বাম দিকে গোয়ালঘর। ছাদের উপর বসিবার স্থান হইয়াছে। ছাদে লোক কাতার দিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া কেহ বসিয়া আছেন। সকলেই উৎসুক —– কখন ঠাকুরকে দেখিবেন।

ব্রাহ্মণীরা দুই ভগ্নী, দুই জনেই বিধবা। বাড়িতে এঁদের ভায়েরাও সপরিবারে থাকেন। ব্রাহ্মণীর একমাত্র কন্যা দেহত্যাগ করাতে তিনি যারপরনাই শোকাতুরা। আজ ঠাকুর গৃহে পদার্পণ করিবেন বলিয়া সমস্ত দিন উদ্যোগ করিতেছেন। যতক্ষণ ঠাকুর শ্রীযুক্ত নন্দ বসুর বাড়িতে ছিলেন, ততক্ষণ ব্রাহ্মণী ঘর-বাহির করিতেছিলেন, — কখন তিনি আসেন। ঠাকুর বলিয়া দিয়াছিলেন যে, নন্দ বসুর বাড়ি হইতে আসিয়া তাঁহার বাড়িতে আসিবেন। বিলম্ব হওয়াতে তিনি ভাবিতেছিলেন, তবে বুঝি ঠাকুর আসিবেন না।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আসিয়া ছাদের উপর বসিবার স্থানে আসন গ্রহণ করিলেন। কাছে মাদুরের উপর মাস্টার, নারাণ, যোগীন সেন, দেবেন্দ্র, যোগীন। কিয়ৎক্ষণ পরে ছোট নরেন প্রভৃতি অনেক ভক্তেরা আসিয়া জুটিলেন। ব্রাহ্মণীর ভগ্নী ছাদের উপর আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন — "দিদি এই গেলেন নন্দ বোসের বাড়ি খবর নিতে, কেন এত দেরি হচ্ছে; — এতক্ষণে ফিরবেন।"

নিচে একটি শব্দ হওয়াতে তিনি আবার বলিতেছেন — "ওই দিদি আসছেন।" এই বলিয়া তিনি দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি এখনও আসিয়া পোঁছেন নাই।

ঠাকুর সহাস্যবদন, ভক্তপরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন।

মাস্টার (দেবেন্দ্রের প্রতি) — কি চমৎকার দৃশ্য। ছেলে-বুড়ো, পুরুষ-মেয়ে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়া রয়েছে! সকলে কত উৎসুক — এঁকে দেখবার জন্য! আর এঁর কথা শোনবার জন্য!

দেবেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — মাস্টার মশাই বলছেন যে, এ জায়গাটি নন্দ বোসের চেয়ে ভাল জায়গা; — এদের কি ভক্তি!

ঠাকুর হাসিতেছেন।

এইবার ব্রাহ্মণীর ভগ্নী বলিতেছেন, "ওই দিদি আসছেন।"

ব্রাহ্মণী আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কি বলিবেন, কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না।

ব্রাহ্মণী অধীর হইয়া বলিতেছেন, “ওগো, আমি যে আহ্লাদে আর বাঁচি না, গো! তোমরা সব বল গো আমি কেমন করে বাঁচি! ওগো, আমার চণ্ডী যখন এসেছিল, — সেপাই শান্ত্রী, সঙ্গে করে — আর রাস্তায় তারা পাহারা দিচ্ছিল — তখন যে এত আহ্লাদ হয়নি গো! — ওগো চণ্ডীর শোক এখন একটুও আমার নাই! মনে করেছিলাম, তিনি যেকালে এলেন না, যা আয়োজন করলুম, সব গঙ্গার জলে ফেলে দেব; — আর ওঁর (ঠাকুরের) সঙ্গে আলাপ করব না, যেখানে আসবেন একবার যাব, অন্তর থেকে দেখব, — দেখে চলে আসব।

“যাই — সকলকে বলি, আয়রে আমার সুখ দেখে যা! — যাই, — যোগীনকে বলিগে, আমার ভাগ্যি দেখে যা!”

ব্রাহ্মণী আবার আনন্দে অধীর হইয়া বলিতেছেন, “ওগো খেলাতে (লটারী-তে) একটা টাকা দিয়ে মুটে এক লাখ টাকা পেয়েছিল, — সে যেই শুনলে এক লাখ টাকা পেয়েছি, অমনি আহ্লাদে মরে গিছল — সত্য সত্য মরে গিছল! — ওগো আমার যে তাই হল গো! তোমরা সকলে আশীর্বাদ কর, না হলে আমি সত্য সত্য মরে যাব।”

মণি ব্রাহ্মণীর আর্তি ও ভাবের অবস্থা দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার পায়ের ধুলা লইতে গেলেন। ব্রাহ্মণী বলিতেছেন, ‘সে কি গো!’ — তিনি মণিকে প্রতিপ্রণাম করিলেন।

ব্রাহ্মণী, ভক্তেরা আসিয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন আর বলিতেছেন, “তোমরা সব এসেছ, — ছোট নরেনকে এনেছি, — বলি তা না হলে হাসবে

কে!” ব্রাহ্মণী এইরূপ কথাবার্তা কহিতেছেন, উহার ভগ্নী আসিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিতেছেন, “দিদি এসো না! তুমি এখানে দাঁড়ায়ে থাকলে কি হয়? নিচে এসো! আমরা কি একলা পারি।”

ব্রাহ্মণী আনন্দে বিভোর! ঠাকুর ও ভক্তদের দেখিতেছেন। তাঁদের ছেড়ে যেতে আর পারেন না।

এইরূপ কথাবার্তার পর ব্রাহ্মণী অতিশয় ভক্তিসহকারে ঠাকুরকে অন্য ঘরে লইয়া গিয়া মিশটান্নাদি নিবেদন করিলেন। ভক্তেরাও ছাদে বসিয়া সকলে মিষ্টমুখ করিলেন।

রাত প্রায় ৮টা হইল, ঠাকুর বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। নিচের তলায় ঘরের কোলে বারান্দা, বারান্দা দিয়ে পশ্চিমাস্য হইয়া উঠানে আসিতে হয়। তাহার পর গোয়ালঘর ডান দিকে রাখিয়া সদর দরজায় আসিতে হয়। ঠাকুর যখন বারান্দা দিয়া ভক্তসঙ্গে সদর দরজার দিকে আসিতেছেন, তখন ব্রাহ্মণী উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছেন, “ও বউ, শীঘ্র পায়ের ধুলা নিবি আয়!” বউ ঠাকুরানী প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণীর একটি ভাইও আসিয়া প্রণাম করিলেন।

ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে বলিতেছেন, “এই আর একটি ভাই; মুখ্যু।”

শ্রীরামকৃষ্ণ — না, না, সব ভাল মানুষ।

একজন সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ ধরিয়া আসিতেছেন, আসিতে আসিতে এক যায়গায় তেমন আলো হইল না।

ছোট নরেন উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, “পিদ্দিম ধর, পিদ্দিম ধর! মনে করো না যে, পিদ্দিম ধরা ফুরিয়ে গেল!” (সকলের হাস্য)

এইবার গোয়ালঘর। ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে বলিতেছেন, এই আমার গোয়ালঘর। গোয়ালঘরের সামনে একবার দাঁড়াইলেন, চতুর্দিকে ভক্তগণ। মণি ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন ও পায়ের ধুলা লইতেছেন।

এইবার ঠাকুর গণুর মার বাড়ি যাইবেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৮শে জুলাই 1885/07/28/v

50.5 গণুর মার বাড়িতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

গণুর মার বাড়ির বৈঠকখানায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। ঘরটি একতলায়, ঠিক রাস্তার উপর। ঘরের ভিতর ঐকতান বাদ্যের (Concert) আখড়া আছে। ছোকরারা বাদ্যযন্ত্র লইয়া ঠাকুরের প্রীত্যর্থে মাঝে মাঝে বাজাইতেছিল।

রাত সাড়ে আটটা। আজ আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদ। চাঁদের আলোতে আকাশ, গৃহ, রাজপথ সব যেন প্লাবিত হইয়াছে। ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরা আসিয়া ওই ঘরে বসিয়াছেন।

ব্রাহ্মণীও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন। তিনি একবার বাড়ির ভিতর যাইতেছেন, একবার বাহিরে আসিয়া বৈঠকখানার দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেছেন। পাড়ার কতকগুলি ছোকরা বৈঠকখানার জানলার উপর উঠিয়া ঠাকুরকে দেখিতেছে। পাড়ার ছেলে-বুড়ো সকলেই ঠাকুরের আগমন সংবাদ শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া মহাপুরুষ দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

জানলার উপর ছেলেরা উঠিয়াছে দেখিয়া ছোট নরেন বলিতেছেন, “ওরে তোরা ওখানে কেন? যা, যা বাড়ি যা।” ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহে বলিতেছেন, “না, থাক না, থাক না।”

ঠাকুর মাঝে মাঝে বলিতেছেন, “হরি ওঁ! হরি ওঁ!”

শতরঞ্জির উপর একখানি আসন দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়াছেন। ঐকতান বাদ্যের ছোকরাদের গান গাহিতে বলা হইল। তাহাদের বসিবার সুবিধা হইতেছে না, ঠাকুর তাঁহার নিকটে শতরঞ্জিতে বসিবার জন্য তাহাদের আহ্বান করিলেন।

ঠাকুর বলিতেছেন, “এর উপরেই বস না। আই আমি লিচ্ছি।” এই বলিয়া আসন গুটাইয়া লইলেন। ছোকরারা গান গাহিতেছে:

কেশব কুরু করুণাদীনে কুঞ্জকাননচারী

মাধব মনোমোহন মোহন মুরলীধারী।

(হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার) ।।

ব্রজকিশোর, কালীয়হর কাতরভয়ভঞ্জন,

নয়ন-বাঁকা, বাঁকা-শিখিপাখা, রাধিকা-হৃদিরঞ্জন;

গোবর্ধনধারণ, বনকুসুমভূষণ, দামোদর কংসদর্পহারী।

শ্যাম রাসরসবিহারী।

(হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার) ।।

গান - এস মা জীবন উমা —— ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— আহা কি গান! — কেমন বেহালা! — কেমন বাজনা!

একটি ছোকরা ফ্লুট বাজাইতেছিলেন। তাঁহার দিকে ও অপর আর আকটি ছোকরার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিতেছেন। "ইনি ওঁর যেন জোড়।"

এইবার কেবল কনসার্ট বাজনা হইতে লাগিল। বাজনার পর ঠাকুর আনন্দিত হইয়া বলিতেছেন, "বা! কি চমৎকার!"

একটি ছোকরাকে নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "এঁর সব (সবরকম বাজনা) জানা আছে।"

মাস্টারকে বলিতেছেন, — এঁরা সব বেশ লোক।"

ছোকরাদের গান-বাজনার পর তাহারা ভক্তদের বলিতেছে — “আপনারা কিছু গান!” ব্রাহ্মণী দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি দ্বারের কাছ থেকে বলিলেন, গান এরা কেউ জানে না, এক মহিমবাবু বুঝি জানেন, তা ওঁর সামনে উনি গাইবেন না।

একজন ছোকরা — কেন? আমি বাবা সুমুখে গাইতে পারি।

ছোট নরেন (উচ্চহাস্য করিয়া) — অতদূর উনি এগোননি!

সকলে হাসিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রাহ্মণী আসিয়া বলিতেছেন, — “আপনি ভিতরে আসুন।” শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, “কেন গো!”

ব্রাহ্মণী — সেখানে জলখাবার দেওয়া হয়েছে; যাবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — এইখানেই এনে দাও না।

ব্রাহ্মণী — গণুর মা বলেছে, ঘরটায় একবার পায়ের ধুলা দিন, তাহলে ঘর কাশী হয়ে থাকবে, — ঘরে মরে গেলে আর কোন গোল থাকবে না।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, ব্রাহ্মণী ও বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে অন্তঃপুরে গমন করিলেন। ভক্তেরা চাঁদের আলোতে বেড়াইতে লাগিলেন। মাস্টার ও বিনোদ বাড়ির দক্ষিণদিকে সদর রাস্তার উপর গল্প করিতে করিতে পাদচারণ করিতেছেন!

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৮শে জুলাই 1885/07/28/vi

50.6 গুহ্যকথা — “তিনজনই এক”

বলরামের বাড়ির বৈঠকখানার পশ্চিমপার্শ্বের ঘরে ঠাকুর বিশ্রাম করিতেছেন, নিদ্রা জাইবেন। গণুর মার বাড়ি হইতে ফিরিতে অনেক রাত হইয়া গিয়াছে। রাত পৌনে এগারটা হইবে।

ঠাকুর বলিতেছেন, “যোগীন একটু পায়ে হাতটা বুলিয়ে দাও তো।”

কাছে মণি বসিয়া আছেন।

যোগীন পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন; এমন সময় ঠাকুর বলিতেছেন, আমার ক্ষিদে পেয়েছে, একটু সুজি খাব।

ব্রাহ্মণী সঙ্গ সঙ্গে এখানেও আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণীর ভাইটি বেশ বাঁয়া তবলা বাজাইতে পারেন। ঠাকুর ব্রাহ্মণিকে আবার দেখিয়া বলিতেছেন, “এবার নরেন্দ্র এলে, কি আর কোনও গাইয়ে লোক এলে ওঁর ভাইকে ডেকে আনলেই হবে।”

ঠাকুর একটু সুজি খাইলেন। ক্রমে যোগীন ইত্যাদি ভক্তেরা ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। মণি ঠাকুরের পায়ে হাত বুলাইতেছেন, ঠাকুর তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আহা, এদের (ব্রাহ্মণীদের) কি আহ্লাদ!

মণি — কি আশ্চর্য, যীশুকৃষ্টের সময় ঠিক এইরকম হয়েছিল! তারাও দুটি মেয়েমানুষ ভক্ত, দুই ভগ্নী। মার্থা আর মেরী।

শ্রীরামকৃষ্ণ (উৎসুক হইয়া) — তাদের গল্প কি বল তো।

মণি — যীশুকৃষ্ট তাঁদের বাড়িতে ভক্তসঙ্গে ঠিক এইরকম করে গিয়েছিলেন। একজন ভগ্নী তাঁকে দেখে ভাবোল্লাসে পরিপূর্ণ হয়েছিল। যেমন গৌরের গানে আছে, —

‘ডুবলো নয়ন ফিরে না এলো।
গৌর রূপসাগরে সাঁতার ভুলে, তলিয়ে গেল আমার মন।’

“আর-একটি বোন একলা খাবর-দাবার উদ্যোগ করছিল। সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে যীশুর কাছে নালিশ করলে, প্রভু, দেখুন দেখি — দিদির কি অন্যায়! উনি এখানে একলা চুপ করে বসে আছেন, আর আমি একলা এই সব উদ্যোগ করছি?

“তখন যীশু বললেন, তোমার দিদিই ধন্য, কেন না মানুষ জীবনের যা প্রয়োজন (অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা — প্রেম) তা ওঁর হয়েছে।”

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা তোমার এ-সব দেখে কি বোধ হয়?

মণি — আমার বোধ হয়, তিনজনেই এক বস্তু! — যীশুখ্রীষ্ট, চৈতন্যদেব আর আপনি — একব্যক্তি!

শ্রীরামকৃষ্ণ — এক এক! এক বইকি। তিনি (ঈশ্বর), — দেখছ না, — যেন এর উপর এমন করে রয়েছে!

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের শরীরের উপর অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন — যেন বলছেন, ঈশ্বর তাঁরই শরীরধারণ করে অবতীর্ণ হয়েই রয়েছেন।

মণি — সেদিন আপনি এই অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারটি বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি বল দেখি।

মণি — যেন দিগ্‌দিগন্তব্যাপী মাঠ পড়ে রয়েছে! ধু-ধু করছে! সম্মুখে পাঁচিল রয়েছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি না; — সেই পাঁচিলে কেবল একটি ফাঁক! — সেই ফাঁক দিয়ে অনন্ত মাঠের খানিকটা দেখা যায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ — বল দেখি সে ফাঁকটি কি?

মণি — সে ফাঁকটি আপনি! আপনার ভিতর দিয়ে সব দেখা যায়; — সেই দিগ্‌দিগন্তব্যাপী মাঠ দেখা যায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ অতিশয় সন্তুষ্ট, মণির গা চাপড়াতে লাগলেন। আর বললেন, “তুমি যে ওইটে বুঝে ফেলেছ। — বেশ হয়েছে।”

মণি — ওইটি শক্ত কি না; পূর্ণব্রহ্ম হয়ে ওইটুকুর ভিতর কেমন করে থাকেন, ওইটা বুঝা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ‘তারে কেউ চিনলি না রে! ও সে পাগলের বেশে (দীনহীন কাঙালের বেশে) ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে!’

মণি — আর আপনি বলেছিলেন যীশুর কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি, কি?

মণি — যদু মল্লিকের বাগানে যীশুর ছবি দেখে ভাবসমাধি হয়েছিল। আপনি দেখেছিলেন যে যীশুর মূর্তি ছবি থেকে এসে আপনার ভিতর মিশে গেল।

ঠাকুর কিয়ৎকাল চুপ করিয়া আছেন। তারপর আবার মণিকে বলিতেছেন, “এই যে গলায় এইটে হয়েছে, ওর হয়তো মানে আছে — সব লোকের কাছে পাছে হালকামি করি। — না হলে যেখানে সেখানে নাচা-গাওয়া তো হয়ে যেত।”

ঠাকুর দ্বিজর কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, “দ্বিজ এল না?”

মণি — বলেছিলাম আসতে। আজ আসবার কথা ছিল; কিন্তু কেন এল না, বলতে পারি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তার খুব অনুরাগ। আচ্ছা, ও এখানকার একটা কেউ হবে (অর্থাৎ সাঙ্গোপাঙ্গের মধ্যে একজন হবে), না?

মণি — আজ্ঞা হাঁ, তাই হবে, তা না হলে এত অনুরাগ।

মণি মশারির ভিতর গিয়া ঠাকুরকে বাতাস করিতেছেন।

ঠাকুর একটু পাশ ফেরার পর আবার কথা কহিতেছেন। মানুষের ভিতর তিনি অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন, এই কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমার ওই ঘর। আমার আগে রূপদর্শন হত না, এমন অবস্থা গিয়েছে। এখনও দেখছ না, আবার রূপ কম পড়ছে।

মণি — লীলার মধ্যে নরলীলা বেশ ভাল লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাহলেই হল; — আর আমাকে দেখছো!

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলিতেছেন যে, আমার ভিতর ঈশ্বর নররূপে অবতির্ণ হইয়া লীলা করিতেছেন?

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c51 ৫১ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ৯ই অগস্ট 1885/08/09/i

51.1 দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, মাস্টার, মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

[দ্বিজ, দ্বিজের পিতা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ — মাতৃঋণ ও পিতৃঋণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে সেই পূর্বপরিচিত ঘরে রাখাল, মাস্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা তিনটা-চারিটা।

ঠাকুরের গলার অসুখের সূত্রপাত হইয়াছে। তথাপি সমস্ত দিন কেবল ভক্তদের মঙ্গলচিন্তা করিতেছেন — কিসে তাহারা সংসারে বদ্ধ না হয়, — কিসে তাহাদের জ্ঞান-ভক্তিলাভ হয়; — ঈশ্বরলাভ হয়।

দশ-বারো দিন হইল, ২৮শে জুলাই মঙ্গলবার, তিনি কলিকাতায় শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর বাটীতে ঠাকুরদের ছবি দেখিতে আসিয়া বলরাম প্রভৃতি অন্যান্য ভক্তদের বাড়ি শুভাগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত রাখাল বৃন্দাবন হইতে আসিয়া কিছুদিন বাড়িতে ছিলেন। আজকাল তিনি, লাটু, হরিশ ও রামলাল ঠাকুরের কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীমা কয়েকমাস হইল, ঠাকুরের সেবার্থ দেশ হইতে শুভাগমন করিয়াছেন। তিনি নবতে আছেন। 'শোকাতুরা ব্রাহ্মণী' আসিয়া কয়েকদিন তাঁহার কাছে আছেন।

ঠাকুরের কাছে দ্বিজ, দ্বিজর পিতা ও ভাইরা, মাস্টার প্রভৃতি বসিয়া আছেন। আজ ৯ই অগস্ট, ১৮৮৫ খ্রী: (২৫শে শ্রাবণ, ১২৯২, রবিবার, কৃষ্ণা চতুর্দশী)।

দ্বিজর বয়স ষোল বছর হইবে। তাঁহার মাতার পরলোকপ্রাপ্তির পর পিতা দ্বিতীয় সংসার করিয়াছেন। দ্বিজ — মাস্টারের সহিত প্রায় ঠাকুরের কাছে আসেন, — কিন্তু তাঁহার পিতা তাহাতে বড় অসন্তুষ্ট।

দ্বিজর পিতা অনেকদিন ধরিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিবেন বলিয়াছিলেন। তাই আজ আসিয়াছেন। কলিকাতায় সওদাগরী অফিসের তিনি একজন কর্মচারী — ম্যানেজার। হিন্দু কলেজে ডি. এল. রিচার্ডসনের কাছে পড়িয়াছিলেন ও হাইকোর্টের ওকালতি পাস করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (দ্বিজর পিতার প্রতি) — আপনার ছেলেরা এখানে আসে, তাতে কিছু মনে করবে না।

“আমি বলি, চৈতন্যলাভের পর সংসারে গিয়ে থাক। অনেক পরিশ্রম করে যদি কেউ সোনা পায়, সে মাটির ভিতর রাখতে পারে — বাক্সের ভিতরও রাখতে পারে, জলের ভিতরও রাখতে পারে — সোনার কিছু হয় না।

“অমি বলি, অনাসক্ত হয়ে সংসার কর। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গ — তাহলে হাতে আঠা লাগবে না।

“কাঁচা মনকে সংসারে রাখতে গেলে মন মলিন হয়ে যায়। জ্ঞানলাভ কর তবে সংসারে থাকতে হয়।

“শুধু জলে দুধ রাখলে দুধ নষ্ট হয়ে যায়। মাখন তুলে জলের উপর রাখলে আর কোন গোল থাকে না।”

দ্বিজর পিতা — আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — আপনি যে এদের বকেন-টকেন, তার মানে বুঝেছি। অপনি ভয় দেখান। ব্রহ্মচারী সাপকে বললে, ‘তুই তো বড় বোকা! তোকে কামড়াতেই আমি বারণ করেছিলাম। তোকে ফোঁস করতে বারণ করি নাই! তুই যদি ফোঁস করতিস তাহলে তোর শত্রুরা তোকে মারতে পারত না।’ আপনি ছেলেদের বকেন-ঝকেন, — সে কেবল ফোঁস করেন।

[দ্বিজর পিতা হাসিতেছেন]।

“ভাল ছেলে হওয়া পিতার পুণ্যের চিহ্ন। যদি পুষ্করিণীতে ভাল জল হয় — সেটি পুষ্করিণীর মালিকের পুণ্যের চিহ্ন।

“ছেলেকে আত্মজ বলে। তুমি আর তোমার ছেলে কিছু তফাত নয়। তুমি একরূপে ছেলে হয়েছ। একরূপে তুমি বিষয়ী, আফিসের কাজ করছ, সংসারে ভোগ করছ; — আর একরূপে তুমিই ভক্ত হয়েছ — তোমার সন্তানরূপে। শুনেছিলাম, আপনি খুব ঘোর বিষয়ী। তা তো নয়! (সহাস্যে) এ-সব তো আপনি জানেন। তবে আপনি নাকি আটপিটে, এতেও হুঁ দিয়ে যাচ্ছেন।

[দ্বিজর পিতা ঈষৎ হাসিতেছেন।]

“এখানে এলে, আপনি কি বস্তু তা এরা জানতে পারবে। বাপ কত বড় বস্তু! বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে যে ধর্ম করবে, তার ছাই হবে!”

[পূর্বকথা — বৃন্দাবনে শ্রীরামকৃষ্ণের মার জন্য চিন্তা]

“মানুষের অনেকগুলি ঋণ আছে। পিতৃঋণ, দেবঋণ, ঋষিঋণ। এছাড়া আবার মাতৃঋণ আছে। আবার পরিবারের সম্বন্ধেও ঋণ আছে — প্রতিপালন করতে হবে। সতী হলে, মরবার পরও তার জন্য কিছু সংস্থান করে যেতে হয়।

“আমি মার জন্য বৃন্দাবনে থাকতে পারলাম না। যাই মনে পড়ল মা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে আছেন, অমনি আর বৃন্দাবনেও মন টিকল না।

“আমি এদের বলি, সংসারও কর, আবার ভগবানেতেও মন রাখ। — সংসার ছাড়তে বলি না; — এও কর, ও-ও কর।”

পিতা — আমি বলি, পড়াশুনা তো চাই, — আপনার এখানে আসতে বারণ করি না। তবে ছেলেদের সঙ্গে ইয়ারকি দিয়ে সময় না কাটে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এর (দ্বিজর) অবশ্য সংস্কার ছিল। এ দুই ভায়ের হল না কেন? আর এরই বা হল কেন?

“জোর করে আপনি কি বারণ করতে পারবেন? যার যা (সংস্কার) আছে তাই হবে।”

পিতা — হাঁ, তা বটে।

ঠাকুর মেঝেতে দ্বিজর পিতার কাছে আসিয়া মাদুরের উপর বসিয়াছেন। কথা কহিতে কহিতে এক-একবার তাঁহার গায়ে হাত দিতেছেন।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। ঠাকুর মাস্টার প্রভৃতিকে বলিতেছেন, “এদের সব ঠাকুর দেখিয়ে আনো — আমি ভাল থাকলে সঙ্গে যেতাম।”

ছেলেদের সন্দেশ দিতে বলিলেন। দ্বিজর পিতাকে বলিলেন, “এরা একটু খাবে; মিষ্টমুখ করতে হয়।”

দ্বিজর বাবা দেবালয় ও ঠাকুরদের দর্শন করিয়া বাগানে একটু বেড়াইতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় ভূপেন, দ্বিজ, মাস্টার প্রভৃতির সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন। ক্রীড়াচ্ছলে ভূপেন ও মাস্টারের পিঠে চাপড় মারিলেন। দ্বিজকে সহাস্যে বলিতেছেন, “তোর বাপকে কেমন বললাম।”

সন্ধ্যার পর দ্বিজর পিতা আবার ঠাকুরের ঘরে আসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই বিদায় লইবেন।

দ্বিজের পিতার গরম বোধ হইয়াছে — ঠাকুর নিজে হাতে করিয়া পাখা দিতেছেন।

পিতা বিদায় লইলেন — ঠাকুর নিজে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ৯ই অগস্ট 1885/08/09/ii

51.2 ঠাকুর মুক্তকণ্ঠ — শ্রীরামকৃষ্ণ কি সিদ্ধপুরুষ না অবতার?

রাত্রি আটটা হইয়াছে। ঠাকুর মহিমাচরণের সহিত কথা কহিতেছেন। ঘরে রাখাল, মাস্টার, মহিমাচরনের দু-একটি সঙ্গী, — আছেন।

মহিমাচরণ আজ রাত্রে থাকিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, কেদারকে কেমন দেখছো? — দুধ দেখেছে না খেয়েছে?

মহিমা — হাঁ, আনন্দ ভোগ করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — নিত্যগোপাল?

মহিমা — খুব! — বেশ অবস্থা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ। আচ্ছা, গিরিশ ঘোষ কেমন হয়েছে?

মহিমা — বেশ হয়েছে। কিন্তু ওদের থাক আলাদা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — নরেন্দ্র?

মহিমা — আমি পনর বৎসর আগে যা ছিলুম এ তাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ছোট নরেন? কেমন সরল?

মহিমা — হাঁ, খুব সরল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঠিক বলেছ। (চিন্তা করতে করতে) আর কে আছে?

"যে সব ছোকরা এখানে আসছে, তাদের — দুটি জিনিস জানলেই হল। তাহলে আর বেশি সাধন-ভজন করতে হবে না। প্রথম, আমি কে — তারপর, ওরা কে। ছোকরারা অনেকেই অন্তরঙ্গ।

"যারা অন্তরঙ্গ, তাদের মুক্তি হবে না। বায়ুকোণে আর-একবার (আমার) দেহ হবে।

“ছোকরাদের দেখে আমার প্রাণ শীতল হয়। আর যারা ছেলে করেছে, মামলা মোকদ্দমা করে বেড়াচ্ছে — কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে রয়েছে — তাদের দেখলে কেমন করে আনন্দ হবে? শুদ্ধ-আত্মা না দেখলে কেমন করে থাকি!”

মহিমাচরণ শাস্ত্র হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেছেন — আর তন্ত্রোক্ত ভূচরী খেচরী শাম্ভবী প্রভৃতি নানা মুদ্রার কথা বলিতেছেন।

[ঠাকুরের পাঁচপ্রকার সমাধি — ষট্‌চক্রভেদ — যোগতত্ত্ব — কুণ্ডলিনী]

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, আমার আত্মা সমাধির পর মহাকাশে পাখির মতো উড়ে বেড়ায়, এইরকম কেউ কেউ বলে।

“হৃষীকেশ সাধু এসেছিল। সে বললে যে, সমাধি পাঁচপ্রকার — তা তোমার সবই হয় দেখছি। পিপীলিকাবৎ, মীনবৎ, কপিবৎ, পক্ষীবৎ, তির্যগ্‌বৎ।

“কখনও বায়ু উঠে পিঁপড়ের মতো শিড়শিড় করে — কখনও সমাধি অবস্থায় ভাব-সমুদ্রের ভিতর আত্মা-মীন আনন্দে খেলা করে!

“কখনও পাশ ফিরে রয়েছি, মহাবায়ু, বানরের ন্যায় আমায় ঠেলে — আমোদ করে। আমি চুপ করে থাকি। সেই বায়ু হঠাৎ বানরের ন্যায় লাখ দিয়ে সহস্রারে উঠে যায়! তাই তো তিড়িং করে লাফিয়ে উঠি।

“আবার কখনও পাখির মতো এ-ডাল থেকে ও-ডাল, ও-ডাল থেকে এ-ডাল, — মহাবায়ু উঠতে থাকে! সে ডালে বসে, সে স্থান আগুনের মতো বোধ হয়।

হয়তো মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান, স্বাধিষ্ঠান থেকে হৃদয়, এইরূপ ক্রমে মাথায় উঠে।

“কখনও বা মহাবায়ু তির্যক গতিতে চলে — এঁকে বেঁকে! ওইরূপ চলে চলে শেষে মাথায় এলে সমাধি হয়।”

[পূর্বকথা — ২২/২৩ বছরে প্রথম উন্মাদ ১৮৫৮ খ্রী: — ষট্‌চক্র ভেদ]

“কুলকুণ্ডলিনী না জাগলে চৈতন্য হয় না।

“মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী। চৈতন্য হলে তিনি সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়ে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর এই সব চক্র ভেদ করে, শেষে শিরিমধ্যে গিয়ে পড়েন। এরই নাম মহাবায়ুর গতি — তবেই শেষে সমাধি হয়।

“শুধু পুঁথি পড়লে চৈতন্য হয় না — তাঁকে ডাকতে হয়। ব্যাকুল হলে তবে কুলকুণ্ডলিনী জাগেন। শুনে, বই পড়ে জ্ঞানের কথা! — তাতে কি হবে!

“এই অবস্থা যখন হল, তার ঠিক আগে আমায় দেখিয়ে দিলে — কিরূপ কুলকুণ্ডলিনীশক্তি জাগরণ হয়ে, ক্রমে ক্রমে সব পদ্মগুলি ফুটে যেতে লাগল, আর সমাধি হল। এ অতি গুহ্যকথা। দেখলাম, ঠিক আমার মতন বাইশ-তেইশ বছরের ছোকরা, সুষুম্না নাড়ির ভিতর দিয়ে যোনিরূপ পদ্মের সঙ্গে রমণ করছে! প্রথমে গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি। চতুর্দল, ষড়দল, দশদল পদ্ম সব অধোমুখ হয়েছিল — ঊর্ধ্বমুখ হল।

“হৃদয়ে যখন এল —— বেশ মনে পড়ছে —— জিহ্বা দিয়ে রমণ করবার পর দ্বাদশদল অধোমুখ পদ্ম ঊর্ধ্বমুখ হল, — আর প্রস্ফুটিত হল! তারপর কণ্ঠে ষোড়শদল, আর কপালে দ্বিদল। শেষে সহস্রদল পদ্ম প্রস্ফুটিত হল! সেই অবধি আমার এই অবস্থা।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ৯ই অগস্ট 1885/08/09/iii

51.3 পূর্বকথা —— ঠাকুর মুক্তকণ্ঠ —— ঠাকুর সিদ্ধপুরুষ না অবতার?

[ঈশ্বরের সঙ্গে কথা —— মায়াদর্শন —— ভক্ত আসিবার অগ্রে তাদের দর্শন —— কেশব সেনকে ভাবাবেশে দর্শন —— অখণ্ড সচ্চিদানন্দদর্শন ও নরেন্দ্র —— ও কেদার —— প্রথম উন্মাদে জ্যোতির্ময় দেহ —— বাবার স্বপ্ন —— ন্যাংটা ও তিনদিনে সমাধি —— মথুরের ১৪ বৎসর সেবা ১৮৫৮-৭১ —— কুঠির উপর ভক্তদের জন্য ব্যাকুলতা —— অবিরত সমাধি। সবরকম সাধন।]

ঠাকুর এই কথা বলিতে বলিতে নামিয়া আসিয়া মেঝেতে মহিমাচরণের নিকট বসিলেন। কাছে মাস্টার ও আরও দু-একটি ভক্ত। ঘরে রাখালও আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) — আপনাকে অনেকদিন বলবার ইচ্ছা ছিল পারি নাই — আজ বলতে ইচ্ছা হচ্ছে।

“আমার যা অবস্থা — আপনি বলেন, সাধন করলেই ওরকম হয়, তা নয়। এতে (আমাতে) কিছু বিশেষ আছে।”

মাস্টার, রাখাল প্রভৃতি ভক্তেরা অবাক্ হইয়া ঠাকুর কি বলিবেন উৎসুক হইয়া শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কথা কয়েছে! — শুধু দর্শন নয় — কথা কয়েছে। বটতলায় দেখলাম, গঙ্গার ভিতর থেকে উঠে এসে — তারপর কত হাসি! খেলার ছলে আঙ্গুল মটকান হল। তারপর কথা। — কথা কয়েছে!

“তিনদিন করে কেঁদেছি, আর বেদ পুরাণ তন্ত্র — এ-সব শাস্ত্রে কি আছে — (তিনি) সব দেখিয়ে দিয়েছেন।

“মহামায়ার মায়া যে কি, তা একদিন দেখালে। ঘরের ভিতর ছোট জ্যোতিঃ ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল! আর জগৎকে ঢেকে ফেলতে লাগল!

“আবার দেখালে, — যেন মস্ত দীঘি, পানায় ঢাকা! হাওয়াতে পানা একটু সরে গেল, — অমনি জল দেখা গেল। কিন্তু দেখতে দেখতে চার দিককার পানা নাচতে নাচতে এসে, আবার ঢেকে ফেললে! দেখালে, ওই জল, যেন সচ্চিদানন্দ, আর পানা যেন মায়া। মায়ার দরুন সচ্চিদানন্দকে দেখা যায় না, — যদিও এক-একবার চকিতের ন্যায় দেখা যায়, তো আবার মায়াতে ঢেকে ফেলে।

“কিরূপ লোক (ভক্ত) এখানে আসবে, আসবার আগে দেখিয়ে দেয়। বটতলা থেকে বকুলতলা পর্যন্ত চৈতন্যদেবের সংকীর্তনের দল দেখালে। তাতে বলরামকে দেখলাম — না হলে মিছরি এ-সব দেবে কে! আর এঁকে দেখেছিলাম।”

[শ্রীরামকৃষ্ণ, কেশব সেন ও তাঁহার সমাজে হরিণাম ও মায়ের নাম প্রবেশ]

“কেশব সেনের সঙ্গে দেখা হবার আগে, তাকে দেখলাম! সমাধি অবস্থায় দেখলাম, কেশব সেন আর তার দল। একঘর লোক আমার সামনে বসে রয়েছে! কেশবকে দেখাচ্ছে, যেন একটি ময়ূর তার পাখা বিস্তার করে বসে রয়েছে! পাখা অর্থাৎ দল বল। কেশবের মাথায় দেখলাম লালমণি। ওটি রজোগুণের চিহ্ন। কেশব শিষ্যদের বলছে — ‘ইনি কি বলছেন, তোমরা সব শোনো’। মাকে বললাম, মা এদের ইংরাজী মত, — এদের বলা কেন। তারপর মা বুঝিয়ে দিলে যে, কলিতে এরকম হবে। তখন এখান থেকে হরিণাম আর মায়ের নাম ওরা নিয়ে গেল। তাই মা কেশবের দল থেকে বিজয়কে নিলে। কিন্তু আদি সমাজে গেল না।

(নিজেকে দেখাইয়া) “এর (আমার) ভিতর একটা কিছু আছে। গোপাল সেন বলে একটি ছেলে আসত — অনেকদিন হল। এর ভিতর যিনি আছেন গোপালের বুকে পা দিলে। সে ভাবে বলতে লাগল, তোমার এখন দেরি আছে। আমি ঐহিকদের সঙ্গে থাকতে পারছি না, — তারপর ‘জাই’ বলে বাড়ি চলে গেল। তারপর শুনলাম দেহত্যাগ করেছে। সেই বোধ হয় নিত্যগোপাল।

“আশ্চর্য দর্শন সব হয়েছে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দদর্শন। তার ভিতর দেখছি, মাঝে বেড়া দেওয়া দুই তাক। একধারে কেদার চুনি, আর আর অনেক সাকারবাদী ভক্ত। বেড়ার আর-একধারে টকটকে লাল সুরকির কাঁড়ির মতো জ্যোতিঃ। তারমধ্যে বসে নরেন্দ্র। — সমাধিস্থ!

“ধ্যানস্থ দেখে বললুম, ‘ও নরেনদ্র!’ একটু চোখ চাইলে — বুঝলুম ওই একরূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে। — তখন বললাম, ‘মা। ওকে মায়ায় বদ্ধ কর। — তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।’ — কেদার সাকারবাদী, উঁকি মেরে দেখে শিউরে উঠে পালাল।

“তাই ভাবি এর (নিজের) ভিতর মা স্বয়ং ভক্ত হয়ে লীলা করছেন। যখন প্রথম এই অবস্থা হল, তখন জ্যোতিঃতে দেহ জ্বল জ্বল করত। বুক লাল হয়ে যেত! তখন বললুম, ‘মা, বাইরে প্রকাশ হয়ো না, ঢুকে যাও!’ তাই এখন এই হীন দেহ।

“তা না হলে লোকে জ্বালাতন করত। লোকের ভিড় লেগে যেত — সেরূপ জ্যোতির্ময় দেহ থাকলে। এখন বাহিরে প্রকাশ নাই। এতে আগাছা পালায় — যারা শুদ্ধভক্ত তারাই কেবল থাকবে। এই ব্যারাম হয়েছে কেন? — এর মানে ওই। যাদের সকাম ভক্তি, তারা ব্যারাম অবস্থা দেখলে চলে যাবে।

“সাধ ছিল — মাকে বলেছিলাম, মা, ভক্তের রাজা হব!

“আবার মনে উঠল, ‘যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে তার এখানে আসতেই হবে! আসতেই হবে! দেখো, তাই হচ্ছে — সেই সম লোকই আসছে।

“এর ভিতরে কে আছেন, আমার বাপেরা জানত। বাপ গয়াতে স্বপ্নে দেখেছিলেন, — রঘুবীর বলছেন, ‘আমি তোমার ছেলে হব।’

“এর ভিতরে তিনিই আছেন। কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ! একি আমার কর্ম। স্ত্রীসম্ভোগ স্বপনেও হলো না।

“ন্যাংটা বেদান্তের উপদেশ দিলে। তিনদিনেই সমাধি। মাধবীতলায় ওই সমাধি অবস্থা দেখে সে হতবুদ্ধি হয়ে বলছে, ‘আরে এ কেয়া রে!’ পরে সে বুঝতে পারলে —— এর ভিতরে কে আছে। তখন আমায় বলে, ‘তুমি আমায় ছেড়ে দাও!’ ও-কথা শুনে আমার ভাবাবস্থা হয়ে গেল; — আমি সেই অবস্থায় বললাম, ‘বেদান্ত বোধ না হলে তোমার যাবার জো নাই।’

“তখন রাতদিন তার কাছে! কেবল বেদান্ত! বামনী বলত, ‘বাবা, বেদান্ত শুনো না! — ওতে ভক্তির হানি হবে।’

“মাকে যাই বললাম, ‘মা, এ-দেহ রক্ষা কেমন করে হবে, আর সাধুভক্ত লয়ে কেমন করে থাকব! — একটা বড় মানুষ জুটিয়ে দাও!’ তাই সেজোবাবু চৌদ্দ বৎসর ধরে সেবা করলে!

“এর ভিতর যিনি আছে, আগে থাকতে জানিয়ে দেয়, কোন্‌ থাকের ভক্ত আসবে। যাই দেখি গৌরাঙ্গরূপ সামনে এসেছেন, অমনি বুঝতে পারি গৌরভক্ত আসছে। যদি শাক্ত আসে, তাহলে শক্তিরূপ, — কালীরূপ —— দর্শন হয়।

“কুঠির উপর থেকে আরতির সময় চেঁচাতাম, “ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস আয়।’ দেখো, এখন সব ক্রমে ক্রমে এসে জুটেছে!

“এর ভিতর তিনি নিজে রয়েছেন — যেন নিজে থেকে এই সব ভক্ত লয়ে কাজ করছেন।

“এক-একজনের ভক্তের অবস্থা কি আশ্চর্য! ছোট নরেন — এর কুম্ভক আপনি হয়। আবার সমাধি! এক-একবার কখন কখন আড়াই ঘন্টা! কখনও বেশি! কি আশ্চর্য!

“সবরকম সাধন এখানে হয় গেছে — জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ। হঠযোগ পর্যন্ত — আয়ু বাড়াবার জন্য! এর ভিতর একজন আছে। তা না হলে সমাধির পর ভক্তি-ভক্ত লয়ে কেমন করে আছি। কোয়ার সিং বলত, ‘সমাধির পর ফিরে আসা লোক দেখি নাই। — তুমিই নানক’।”

[পূর্বকথা — কেশব, প্রতাপ ও কুক্ সঙ্গে জাহাজে ১৮৮১]

“চারিদিকে ঐহিক লোক — চারদিকে কামিনী-কাঞ্চন — এতোর ভিতর থেকে এমন অবস্থা! — সমাধি, ভাব, লেগেই রয়েছে। তাই প্রতাপ (ব্রাহ্মসমাজের শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার) — কুক্ সাহেব যখন এসেছিল, জাহাজে আমার অবস্থা (সমাধি-অবস্থা) দেখে বললে, ‘বাবা! যেন ভূতে পেয়ে রয়েছে’।”

রাখাল, মাস্টার প্রভৃতি অবাক্ হইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে এই সকল আশ্চর্য কথা শুনিতেছেন।

মহিমাচরণ কি ঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝিলেন? এই সমস্ত কথা শুনিয়াও তিনি বলিতেছেন, “আজ্ঞা, আপনার প্রারব্ধবশতঃ এরূপ সব হয়েছে।” তাঁহার মনের ভাব, — ঠাকুর একটি সাধু বা ভক্ত। ঠাকুর তাঁহার কথায় সায় দিয়া বলিতেছেন, “হাঁ, প্রাক্তন! যেন বাবুর অনেক বাড়ি আছে — এখানে একটা বৈঠকখানা। ভক্ত তাঁর বৈঠকখানা।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ৯ই ও ১০ই অগস্ট 1885/08/09/iv & 1885/08/10/i

51.4 মহিমাচরণের ব্রহ্মচক্র — পূর্বকথা — তোতাপুরীর উপদেশ

[‘স্বপ্নে দর্শন কি কম?’ নরেন্দ্রের ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন]

রাত নয়টা হইল। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। মহিমাচরণের সাধ — ঘরে ঠাকুর থাকিবেন — ব্রহ্মচক্র রচনা করিবেন। তিনি রাখাল, মাস্টার, কিশোরী ও আর দু-একটি ভক্তকে লইয়া মেঝেতে চক্র করিলেন। সকলকে ধ্যান করিতে বলিলেন। রাখালের ভাবাবস্থা হয়েছে। ঠাকুর নামিয়া আসিয়া তাঁহার বুকে হাত দিয়া মার নাম করিতে লাগিলেন। রাখালের ভাব সম্বরণ হইল।

রাত একটা হইবে। আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথি, চতুর্দিকে নিবিড় অন্ধকার। দু-একটি ভক্ত গঙ্গার পোস্তার উপর একাকী বেড়াইতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একবার উঠিয়াছেন। তিনিও বাহিরে আসিলেন ও ভক্তদের বলিতেছেন, ন্যাংটা বলত, 'এই সময়ে — এই গভীর রাত্রে — অনাহত শব্দ শোনা যায়।'

শেষরাত্রে মহিমাচরণ ও মাস্টার ঠাকুরের ঘরেই মেঝেতে শুইয়া আছেন। রাখালও ক্যাম্প খাটে শুইয়াছেন।

ঠাকুর পাঁচ বছরের ছেলের ন্যায় দিগম্বর হইয়া মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে পাদচারণ করিতেছেন।

প্রত্যূষ (১০ই অগস্ট) হইল। ঠাকুর মার নাম করিতেছেন। পশ্চিমের বারান্দায় গিয়া গঙ্গাদর্শন করিলেন। ঘরের মধ্যস্থিত দেবদেবীর যত পট ছিল, কাছে গিয়া নমস্কার করিলেন। ভক্তেরা শয্যা হইতে উঠিয়া প্রণামাদি করিয়া প্রাতঃকৃত্য করিতে গেলেন।

ঠাকুর পঞ্চবটীতে একটি ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন। তিনি স্বপ্নে চৈতন্যদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবাবিষ্ট হইয়া) — আহা! আহা!

ভক্ত — আজ্ঞা, ও স্বপনে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — স্বপন কি কম!

ঠাকুরের চক্ষে হল। গদগদ স্বর!

একজন ভক্তের জাগরণ অবস্থায় দর্শন-কথা শুনিয়া বলিতেছেন — “তা আশ্চর্য কি! আজকাল নরেন্দ্রও ঈশ্বরীয় রূপ দেখে!”

মহিমাচরণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকের শিবের মন্দিরে গিয়া, নির্জনে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন।

বেলা আটটা হইয়াছে। মণি গঙ্গাস্নান করিয়া ঠাকুরের কাছে আসিলেন। শোকাতুরা ব্রাহ্মণীও দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মণীর প্রতি) — এঁকে কিছু প্রসাদ খেতে দাও তো গা, লুচি-টুচি। তাকের উপর আছে।

ব্রাহ্মণী — আপনি আগে খান। তারপর উনি প্রসাদ পাবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি আগে জগন্নাথের আটকে দাও, তারপর প্রসাদ।

প্রসাদ পাইয়া মণি শিবমন্দিরে শিবদর্শন করিয়া ঠাকুরের কাছে আবার আসিলেন ও প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে) — তুমি এসো। আবার কাজে যেতে হবে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১১ই অগস্ট 1885/08/11

51.5 মৌনাবলম্বী শ্রীরামকৃষ্ণ ও মায়াদর্শন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর — মন্দিরে সকাল ৮টা হইতে বেলা ৩টা পর্যন্ত মৌন অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। আজ মঙ্গলবার ১১ই অগস্ট, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ; (২৭শে শ্রাবণ, ১২৯২, শুক্লা প্রতিপদ)। গতকল্য সোমবার অমাবস্যা গিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখের সঞ্চার হইয়াছে। তিনি কি জানিতে পারিয়াছেন যে, শীঘ্র তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন? জগন্মাতার ক্রোড়ে আবার গিয়া বসিবেন? তাই কি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন? তিনি কথা কহিতেছেন না দেখিয়া শ্রীশ্রীমা কাঁদিতেছিলেন। রাখাল ও লাটু কাঁদিতেছেন। বাগবাজারের ব্রাহ্মণীও এই সময় আসিয়াছিলেন, তিনিও কাঁদিতেছেন। ভক্তেরা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আপনি কি বরাবর চুপ করিয়া থাকিবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, 'না'।

নারাণ আসিয়াছিলেন, বেলা ৩টার সময়, ঠাকুর নারায়ণকে বলিতেছেন, "মা তোর ভাল করবে।"

নারাণ আনন্দে ভক্তদের সংবাদ দিলেন, ‘ঠাকুর এইবার কথা কহিয়াছেন।’ রাখালাদি ভক্তদের বুক থেকে যেন একখানি পাথর নামিয়া গেল। তাঁহারা সকলে ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালাদি ভক্তদের প্রতি) — ‘মা’ দেখিয়ে দিচ্ছিলেন যে, সবই মায়া! তিনি সত্য, আর যা কিছু সব মায়ার ঐশ্বর্য।

“আর একটি দেখলুম, ভক্তদের কার কতটা হয়েছে।”

নারাণাদি ভক্ত —— আচ্ছা কার কতদূর হয়েছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ —— এদের সব দেখলাম —— নিত্যগোপাল, রাখাল, নারাণ, পূর্ণ, মহিমা চক্রবর্তী প্রভৃতি।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১৬ই অগস্ট 1885/08/16

51.6 শ্রীরামকৃষ্ণ, গিরিশ, শশধর পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

ঠাকুরের অসুখ সংবাদ কলিকাতার ভক্তেরা জানিতে পারিলেন। আলজিভে অসুখ হইয়াছে সকলে বলিতেছেন।

রবিবার, ১৬ই অগস্ট, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ; (১লা ভাদ্র, ১২৯২)। শুক্লা ষষ্ঠী। অনেক ভক্ত তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন — গিরিশ, রাম, নিত্যগোপাল, মহিমা চক্রবর্তী, কিশোরী (গুপ্ত), পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি।

ঠাকুর পূর্বের ন্যায় আনন্দময়, ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — রোগের কথা মাকে বলতে পারি না। বলতে লজ্জা হয়।

গিরিশ — আমার নারায়ণ ভাল করবেন।

রাম — ভাল হয়ে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — (সহাস্যে) — হাঁ, ওই আশীর্বাদ কর। (সকলের হাস্য)

গিরিশ নূতন নূতন আসিতেছেন, ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন, "তোমার অনেক গোলের ভিতর থাকতে হয়, অনেক কাজ; তুমি আর তিনবার এসো।" এইবার শশধরের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

[শশধর পণ্ডিতকে উপোদেশ — ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি অভেদ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (শশধরের প্রতি) — তুমি আদ্যাশক্তির কথা কিছু বল।

শশধর — আমি কি জানি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — একজনকে একটি লোক খুব ভক্তি করে। সেই ভক্তকে তামাক সাজার আগুন আনতে বললে; তা সে বললে, আমি কি আপনার আগুন আনবার যোগ্য? আর আগুন আনলেও না! (সকলের হাস্য)

শশধর — আজ্ঞা, তিনিই নিমিত্ত কারণ, তিনিই উপাদান কারণ। তিনিই জীব জগৎ সৃষ্টি করেছেন, আবার তিনিই জীবজগৎ হয়ে রয়েছেন; যেমন মাকড়সা, নিজে জাল তৈয়ার করলে (নিমিত্ত কারণ); আর সেই জাল নিজের ভিতর থেকে বার করলে (উপাদান কারণ)।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আর আছে যিনিই পুরুষ তিনিই প্রকৃতি, যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন না, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি, পুরুষ বলি; আর যখন ওই সব কাজ করেন তখন তাঁকে শক্তি বলি, প্রকৃতি বলি। কিন্তু যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি, যিনিই পুরুষ তিনিই প্রকৃতি হয়ে রয়েছেন। জল স্থির থাকলেও জল, আর হেললে দুললেও জল। সাপ এঁকে বেঁকে চললেও সাপ; আবার চুপ করে কুণ্ডলি পাকিয়ে থাকলেও সাপ।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের কথায় সমাধি — ভোগ ও কর্ম]

“ব্রহ্ম কি তা মুখে বলা যায় না, মুখ বন্ধ হয়ে যায়। নিতাই আমার মাতা হাতি! নিতাই আমার মাতা হাতি! এই কথা বলতে বলতে শেষে আর কিছুই বলতে পারে না; কেবল বলে হাতি! আবার হাতি হাতি বলতে বলতে ‘হা’। শেষে তাও বলতে পারে না! বাহ্যশূন্য।”

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সমাধিস্থ।

সমাধিভঙ্গের পর কিয়ৎকাল পরে বলিতেছেন, ‘ক্ষর’ ‘অক্ষরের’ পারে কি আছে মুখে বলা যায় না।

সকলে চুপ করিয়া আছেন, ঠাকুর আবার বলিতেছেন, “যতক্ষণ কিছু ভোগ বাকি থাকে কি কর্ম বাকি থাকে, ততক্ষণ সমাধি হয় না।১

(শশধরের প্রতি) — “এখন ঈশ্বর তোমায় কর্ম করাচ্ছেন, লেকচার দেওয়া ইত্যাদি; এখন তোমায় ওই সব করতে হবে।

“কর্মটুকু শেষ হয় গেলে আর না। গৃহিণী বাড়ির কাজকর্ম সব সেরে নাইতে গেলে ডাকাডাকি করলেও আর ফেরে না।”

১ ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ।।
[গীতা, ২।৪৪]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৭শে অগস্ট 1885/08/27

51.7 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে রাখাল, মাস্টার, পণ্ডিত শ্যামাপদ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

সমাধিমন্দিরে — পণ্ডিত শ্যামাপদের প্রতি কৃপা

শ্রীরামকৃষ্ণ দু-একটি ভক্তসঙ্গে ঘরে বসিয়া আছেন। অপরাহ্ন, পাঁচটা; বৃসস্পতিবার, ২৭শে অগস্ট ১৮৮৫; ১২ই ভাদ্র, শ্রাবণ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া।

ঠাকুরের অসুখের সূত্রপাত হইয়াছে। তথাপি ভক্তেরা কেহ আসিলে শরীরকে শরীর জ্ঞান করেন না। হয়তো সমস্ত দিন তাঁহাদের লইয়া কথা কহিতেছেন — কখনও বা গান করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত মধু ডাক্তার প্রায় নৌকা করিয়া আসেন — ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য ভক্তেরা বড়ই চিন্তিত হইয়াছেন। মধু ডাক্তার যাহাতে প্রত্যহ আসিয়া দেখেন, এই তাঁহাদের ইচ্ছা। মাস্টার ঠাকুরকে বলিতেছেন, 'উনি বহুদর্শী লোক, উনি রোজ দেখলে ভাল হয়।'

পণ্ডিত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিলেন। ইঁহার নিবাস আঁটপুর গ্রামে। সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া পণ্ডিত 'সন্ধ্যা করিতে যাই', বলিয়া গঙ্গাতীরে চাঁদনীর ঘাটে গমন করিলেন।

সন্ধ্যা করিতে করিতে পণ্ডিত কি আশ্চর্য দর্শন করিলেন। সন্ধ্যা সমাপ্ত হইলে ঠাকুরের ঘরে আসিয়া মেঝেতে বসিলেন। ঠাকুর মার নাম ও চিন্তার পর নিজের আসনেই বসিয়া আছেন। পাপোশের উপর মাস্টার। রাখাল, লাটু প্রভৃতি ঘরে যাতায়াত করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি, পণ্ডিতকে দেখাইয়া) — ইনি একজন বেশ লোক। (পণ্ডিতের প্রতি) ‘নেতি’ ‘নেতি’ করে যেখানে মনের শান্তি হয়, সেইখানেই তিনি।

[ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ ও পণ্ডিত শ্যামাপদ —— ‘সমাধিমন্দিরে’]

“সাত দেউড়ির পর রাজা আছেন। প্রথম দেউড়িতে গিয়ে দেখে যে একজন ঐশ্বর্যবান পুরুষ অনেক লোকজন নিয়ে বসে আছেন; খুব জাঁকজমক। রাজাকে যে দেখতে গিয়েছে, সে সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলে, ‘এই কি রাজা?’ সঙ্গী ঈষৎ হেসে বললে, ‘না’।

“দ্বিতীয় দেউড়ি আর অন্যান্য দেউড়িতেও ওইরূপ বললে। দেখে, যত এগিয়ে যায়, ততই ঐশ্বর্য! আর জাঁকজমক! সাত দেউড়ি পার হয়ে যখন দেখলে তখন আর সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলে না! রাজার অতুল ঐশ্বর্য দর্শন করে অবাক্‌ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। —— বুঝলে এই রাজা। —— এ-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।”

[ঈশ্বর, মায়া, জীবজগৎ —— অধ্যাত্ম রামায়ণ —— যমলার্জ্জুনের স্তব]

পণ্ডিত —— মায়ার রাজ্য ছাড়িয়ে গেলে তাঁকে দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— তাঁর সাক্ষাৎকারের পর আবার দেখে, এই মায়া-জীবজগৎ তিনিই হয়েছেন। এই সংসার ধোকার টাটি —— স্বপ্নবৎ, — এই বোধ হয়, যখন ‘নেতি’, ‘নেতি’ বিচার করে। তাঁর দর্শনের পর আবার ‘এই সংসার মজার কুটি।’

“শুধু শাস্ত্র পড়লে কি হবে? পণ্ডিতেরা কেবল বিচার করে।”

পণ্ডিত — আমায় কেউ পণ্ডিত বললে ঘৃণা করে।”

শ্রীরামকৃষ্ণ — ওইটি তাঁর কৃপা! পণ্ডিতেরা কেবল বিচার করে। কিন্তু কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে। সাক্ষাৎকারের পর সব নারায়ণ দেখবে — নারায়ণই সব হয়েছেন।

পণ্ডিত নারায়ণের স্তব শুনাইতেছেন। ঠাকুর আনন্দে বিভোর।

পণ্ডিত — সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ।।১

শ্রীরামকৃষ্ণ — আপনার অধ্যাত্ম (রামায়ণ) দেখা আছে?

পণ্ডিত — আজ্ঞে হাঁ, একটু দেখা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ওতে জ্ঞান-ভক্তি পরিপূর্ণ। শবরীর উপাখ্যান, অহল্যার স্তব, সব ভক্তিতে পরিপূর্ণ।

“তবে একটি কথা আছে। তিনি বিষয়বুদ্ধি থেকে অনেক দূর।”

পণ্ডিত — যেখানে বিষয়বুদ্ধি, তিনি ‘সুদূরম্’, — আর যেখানে তা নাই, সেখানে তিনি ‘অদূরম্’। উত্তরপাড়ার এক জমিদার মুখুজ্জেকে দেখে এলাম বয়স হয়েছে — কেবল নভেলের গল্প শুনছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ — অধ্যাত্মে আর একটি বলেছে যে, তিনিই জীবজগৎ!

পণ্ডিত আনন্দিত হইয়া যমলার্জ্জুনের এই ভাবের স্তব শ্রীমদ্‌ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে আবৃত্তি করিতেছেন —

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিংস্ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণা বিদুঃ ।।
ত্বমেকঃ সর্বভূতানাং দেহস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ।
ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ ।।
ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজঃসত্ত্বতমোময়ী।
ত্বমেব পুরুষোঽধ্যক্ষঃ সর্বক্ষেত্রবিকারবিৎ ।।

[শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ — ‘আন্তরিক ধ্যান-জপ করলে আসতেই হবে’]

ঠাকুর স্তব শুনিয়া সমাধিস্থ! দাঁড়াইয়াছেন। পণ্ডিত বসিয়া। পণ্ডিতের কোলে ও বক্ষে একটি চরণ রাখিয়া ঠাকুর হাসিতেছেন।

পণ্ডিত চরণ ধারণ করিয়া বলিতেছেন, ‘গুরো চৈতন্যং দেহি।’ ঠাকুর ছোট তক্তার কাছে পূর্বাস্য হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

পণ্ডিত ঘর হইতে চলিয়া গেলে ঠাকুর মাস্টারকে বলিতেছেন, আমি যা বলি মিলছে? যারা আন্তরিক ধ্যান-জপ করেছে তাদের এখানে আসতেই হবে।

রাত দশটা হইল। ঠাকুর একটু সামান্য সুজির পায়স খাইয়া শয়ন করিয়াছেন।

মণিকে বলিতেছেন, “পায়ে হাতটা বুলিয়ে দাও তো।”

কিয়ৎক্ষণ পরে গায়ে ও বক্ষঃস্থলে হাত বুলাইয়া দিতে বলিতেছেন।

সামান্য নিদ্রার পর মণিকে বলিতেছেন, “তুমি শোওগে; — দেখি একলা থাকলে যদি ঘুম হয়।” ঠাকুর রামলালকে বলিতেছেন, “ঘরের ভিতরে ইনি (মণি) আর রাখাল শুলে হয়।”

১ গীতা [৬।২৯]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৮শে অগস্ট 1885/08/28

51.8 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও যীশুখ্রীষ্ট (Jesus Christ)

প্রত্যূষ (২৮শে অগস্ট) হইল। ঠাকুর গাত্রোত্থান করিয়া মার চিন্তা করিতেছেন। অসুস্থ হওয়াতে ভক্তেরা শ্রীমুখ হইতে সেই মধুর নাম শুনিতে পাইলেন না। ঠাকুর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া নিজের আসনে আসিয়া বসিয়াছেন। মণিকে বলিতেছেন, আচ্ছা, রোগ কেন হল?

মণি — আজ্ঞা, মানুষের মতন সব না হলে জীবের সাহস হবে না। তারা দেখেছে যে, এই দেহের এত অসুখ, তবুও আপনি ঈশ্বর বই আর কিছুই জানেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — বলরামও বললে, ‘আপনারই এই, তাহলে আমাদের আর হবে না কেন?’

“সীতার শোকে রাম ধনুক তুলতে না পারাতে লক্ষ্মণ আশ্চর্য হয়ে গেল। কিন্তু পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পরে কাঁদে।

মণি — ভক্তের দুঃখ দেখে যীশুখ্রীষ্টও অন্য লোকের মতো কেঁদেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি হয়েছিল?

মণি — মার্থা, মেরী দুই ভগ্নী, আর ল্যাজেরাস ভাই — তিনজনই যীশুখ্রীষ্টের ভক্ত। ল্যাজেরাসের মৃত্যু হয়। যীশু তাদের বাড়িতে আসছিলেন। পথে একজন ভগ্নী (মেরী), দৌড়ে গিয়ে পদতলে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, ‘প্রভু, তুমি যদি আসতে, তাহলে সে মরতো না।’ যীশু তার কান্না দেখে কেঁদেছিলেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও সিদ্ধাই — Miracles]

“তারপর তিনি গোরের কাছে গিয়ে নাম ধরে ডাকতে লাগলেন, অমনি ল্যাজেরাস প্রাণ পেয়ে উঠে এল।”

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমার কিন্তু উগোনো হয় না।

মণি —— সে আপনি করেন না —— ইচ্ছা করে। ও-সব সিদ্ধাই, Miracle তাই আপনি করেন না। ও-সব করলে লোকদের দেহেতেই মন যাবে —— শুদ্ধাভক্তির দিকে মন যাবে না। তাই আপনি করেন না।

“আপনার সঙ্গে যীশুখ্রীষ্টের অনেক মেলে!”

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — আর কি কি মেলে?

মণি —— আপনি ভক্তদের উপবাস করতে কি অন্য কোন কঠোর করতে বলেন না —— খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধেও কোন কঠিন নাই। যীশুখ্রীষ্টের শিষ্যেরা রবিবারে নিয়ম না করে খেয়েছিল, তাই যারা শাস্ত্র মেনে চলত তারা তিরস্কার করেছিল। যীশু বললেন, ‘ওরা খাবে, খুব করবে; যতদিন বরের সঙ্গে আছে, বরযাত্রীরা আনন্দই করবে।’

শ্রীরামকৃষ্ণ —— এর মানে কি?

মণি —— অর্থাৎ যতদিন অবতারের সঙ্গে সঙ্গে আছে, সাঙ্গোপাঙ্গগণ কেবল আনন্দই করবে —— কেন নিরানন্দ হবে? তিনি যখন স্বধামে চলে যাবেন, তখন তাদের নিরানন্দের দিন আসবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — আর কিছু মেলে?

মণি — আজ্ঞা, আপনি যেমন বলেন — ‘ছোকরাদের ভিতর কামিনী-কাঞ্চন ঢুকে নাই; ওরা উপদেশ ধারণা করতে পারবে, — যেমন নূতন হাঁড়িতে দুধ রাখা যায়। দই পাতা হাঁড়িতে রাখলে নষ্ট হতে পারে’; তিনিও সেইরূপ বলতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি বলতেন?

মণি — ‘পুরানো বোতলে নূতন মদ রাখলে বোতল ফেটে যেতে পারে।’ আর ‘পুরানো কাপড়ে নূতন তালি দিলে শীঘ্র ছিঁড়ে যায়।’

“আপনি যেমন বলেন, ‘মা আর আপনি এক’ তিনিও তেমনি বলতেন, ‘বাবা আর আমি এক’।” (I and my father are one.)

মণি — আপনি যেমন বলেন, ‘ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।” তিনিও বলতেন, ‘ব্যাকুল হয়ে দোরে ঘা মারো দোর খোলা পাবে!’ (Knock and it shall be opened unto you.)

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, অবতার যদি হয়, তা পূর্ণ, না অংশ, না কলা? কেউ কেউ বলে পূর্ণ।

মণি — আজ্ঞা, পূর্ণ, অংশ, কলা, ও-সব ভাল বুঝতে পারি না। তবে যেমন বলেছিলেন ওইটে বেশ বুঝেছি। পাঁচিলের মধ্যে গোল ফাঁক।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি বল দেখি?

মণি — প্রাচীরের ভিতর একটি গোল ফাঁক — সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে প্রাচিরের ওধারের মাঠ খানিকটা দেখা যাচ্ছে। সেইরূপ আপনার ভিতর দিয়ে সেই অনন্ত ঈশ্বর খানিকটা দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, দুই-তিন ক্রোশ একেবারে দেখা যাচ্ছে।

মণি চাঁদনির ঘাটে গঙ্গাস্নান করিয়া ঠাকুরের কাছে ঘরে উপনীত হইলেন। বেলা আটটা হইয়াছে।

মণি লাটুর কাছে আটকে চাইছেন — শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আটকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কাছে আসিয়া মণিকে বলিতেছেন, "তুমি ওটা (প্রসাদ খাওয়া) করো — যারা ভক্ত হয়, প্রসাদ না হলে খেতে পারে না।"

মণি — আজ্ঞা, আমি কাল অবধি বলরামবাবুর বাড়ি থেকে জগন্নাথের আটকে এনেছি — তাই রোজ একটি দুটি খাই।

মণি ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন ও বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। ঠাকুর সস্নেহে বলিতেছেন, তবে তুমি সকাল সকাল এসো — আবার ভাদ্র মাসের রৌদ্র — বড় খারাপ।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ৩১শে অগস্ট 1885/08/31

51.9 দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে জন্মাষ্টমীদিবসে ভক্তসঙ্গে

সুবোধের আগমন — পূর্ণ মাস্টার, গঙ্গাধর, ক্ষীরোদ, নিতাই

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পূর্বপরিচিত ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। রাত আটটা। সোমবার ১৬ই ভাদ্র, শ্রাবণ-কৃষ্ণা-ষষ্ঠী, ৩১শে অগস্ট ১৮৮৫।

ঠাকুর অসুস্থ — গলায় অসুখের সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু নিশিদিন এক চিন্তা, কিসে ভক্তদের মঙ্গল হয়। এক-একবার বালকের ন্যায় অসুখের জন্য কাতর। পরক্ষণেই সব ভুলিয়া গিয়া ঈশ্বরের প্রেমে মাতোয়ারা। আর ভক্তদের প্রতি স্নেহ ও বাৎসল্যে উন্মত্তপ্রায়।

দুইদিন হইল — গত শনিবার রাত্রে — শ্রীযুক্ত পূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন — ‘আমার খুব আনন্দ হয়। মাঝে মাঝে রাত্রে আনন্দে ঘুম হয় না!’

ঠাকুর পত্রপাঠ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, “আমার গায়ে রোমাঞ্চ হচ্ছে! ওই আনন্দের অবস্থা ওর পরে থেকে যাবে; দেখি চিঠিখানা।”

পত্রখানি হাতে করে মুড়ে টিপে বলিতেছেন, “অন্যের চিঠি ছুঁতে পারি না; এর বেশ ভাল চিঠি।”

সেই রাত্রে একটু শুইয়াছেন। হঠাৎ গায়ে ঘাম — শয্যা হইতে উঠিয়া বলিতেছেন, “আমার বোধ হচ্ছে, এ-অসুখ সারবে না।”

এই কথা শুনিয়া ভক্তেরা সকলেই চিন্তিত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের সেবা করিবার জন্য আসিয়াছেন ও অতি নিভৃতে নবতে বাস করেন। নবতে তিনি যে আছেন, ভক্তেরা প্রায় কেহ জানিতেন না। একটি ভক্ত স্ত্রীলোক (গোলাপ মা)-ও কয়দিন নবতে আছেন। তিনি ঠাকুরের ঘরে প্রায় আসেন ও দর্শন করেন।

আজ সোমবার। ঠাকুর অসুস্থ রহিয়াছেন। রাত প্রায় আটটা হইয়াছে। ঠাকুর ছোট খাটটিতে পেছন ফিরিয়া দক্ষিণদিকে শিয়র করিয়া শুইয়া আছেন। গঙ্গাধর সন্ধ্যার পর কলিকাতা হইতে মাস্টারের সহিত আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া আছেন। ঠাকুর মাস্টারের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দুটি ছেলে এসেছিল। শঙ্কর ঘোষের নাতির ছেলে (সুবোধ) আর একটি তাদের পাড়ার ছেলে (ক্ষীরোদ)। বেশ ছেলে দুটি। তাদের বললাম, আমার এখন অসুখ, তোমার কাছে গিয়ে উপদেশ নিতে। তুমি একটু যত্ন করো।

মাস্টার — আজ্ঞা, হাঁ, আমাদের পাড়ায় তাদের বাড়ি।

[অসুখের সূত্রপাত — ভগবান ডাক্তার — নিতাই ডাক্তার]

শ্রীরামকৃষ্ণ — সেদিন আবার গায়ে দিয়ে ঘুম ভেঙে গিছল। এ অসুখটা কি হল!

মাস্টার — আজ্ঞা, আমরা একবার ভগবান রুদ্রকে দেখাব, ঠিক করেছি। এম. ডি. পাশ করা। খুব ভাল ডাক্তার।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কত নেবে? মাস্টার — অন্য জায়গা হলে কুড়ি-পঁচিশ টাকা নিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তবে থাক।

মাস্টার — আজ্ঞা, আমরা হদ্দ চার-পাঁচ টাকা দেব।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, এইরকম করে যদি একবার বলো, 'দয়া করে তাঁকে দেখবেন চলুন।' এখানকার কথা কিছু শুনে নাই?

মাস্টার — বোধ হয় শুনেছে। একরকম কিছু নেবে না বলেছে তবে আমরা দেব; কেন না, তাহলে আবার আসবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — নিতাইকে (ডাক্তার) আনো তো সে বরং ভাল। আর ডাক্তাররা এসেই বা কি করছে? কেবল টিপে বাড়িয়ে দেয়।

রাত নয়টা — ঠাকুর একটু সুজির পায়স খাইতে বসিলেন।

খাইতে কোন কষ্ট হইল না। তাই আনন্দ করিতে করিতে মাস্টারকে বলিতেছেন, "একটু খেতে পারলাম, মনটায় বেশ আনন্দ হল।"

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১লা সেপ্টেম্বর 1885/09/01

51.10 জন্মাষ্টমীদিবসে নরেন্দ্র, রাম, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

[বলরাম, মাস্টার, গোপালের মা, রাখাল, লাটু, ছোট নরেন, পাঞ্জাবী সাধু, নবগোপাল, কাটোয়ার বৈষ্ণব,
রাখাল ডাক্তার]

আজ জন্মাষ্টমী, মঙ্গলবার। ১৭ই ভাদ্র; ১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫। ঠাকুর স্নান করিবেন। একটি ভক্ত তেল মাখাইয়া দিতেছেন। ঠাকুর দক্ষিণের বারান্দায় বসিয়া তেল মাখিতেছেন। মাস্টার গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

স্নানান্তে ঠাকুর গামছা পরিয়া দক্ষিণাস্য হইয়া সেই বারান্দা হইতেই ঠাকুরদের উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিতেছেন। শরীর অসুস্থ বলিয়া কালীঘরে বা বিষ্ণুঘরে যাইতে পারিলেন না।

আজ জন্মাষ্টমী — রামাদি ভক্তেরা ঠাকুরের জন্য নববস্ত্র আনিয়াছেন। ঠাকুর নববস্ত্র পরিধান করিয়াছেন — বৃন্দাবনী কাপড় ও গায়ে লাল চেলী। তাঁহার শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ দেহ নববস্ত্রে শোভা পাইতে লাগিল। বস্ত্র পরিধান করিয়াই তিনি ঠাকুরদের প্রণাম করিলেন।

আজ জন্মাষ্টমী। গোপালের মা গোপালের জন্য কিছু খাবার করিয়া কামারহাটি হইতে আনিয়াছেন। তিনি আসিয়া ঠাকুরকে দুঃখ করিতে করিতে বলিতেছেন, “তুমি তো খাবে না।”

শ্রীরামকৃষ্ণ — এই দেখো, অসুখ হয়েছে।

গোপালের মা — আমার অদৃষ্ট! — একটু হাতে করো!

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি আশীর্বাদ করো।

গোপালের মা ঠাকুরকেই গোপাল বলিয়া সেবা করিতেন।

ভক্তেরা মিছরি আনিয়াছেন। গোপালের মা বলিতেছেন, “এ মিছরি নবতে নিয়ে যাই।” শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, “এখানে ভক্তদের দিতে হয়। কে একশ বার চাইবে, এখানেই থাক।”

বেলা এগারটা। কলিকাতা হইতে ভক্তেরা ক্রমে ক্রমে আসিতেছেন। শ্রীযুক্ত বলরাম, নরেন্দ্র, ছোট নরেন, নবগোপাল, কাটোয়া হইতে একটি বৈষ্ণব, ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিলেন। রাখাল, লাটু আজকাল থাকেন। একটি পাঞ্জাবী সাধু পঞ্চবটীতে কয়দিন রহিয়াছেন।

ছোট নরেনের কপালে একটি আব আছে। ঠাকুর পঞ্চবটীতে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতেছেন, ‘তুই আবটা কাট না, ও তো গলায় নয় — মাথায়। ওতে আর কি হবে — লোকে একশিরা-কাটাচ্ছে।” (হাস্য)

পাঞ্জাবী সাধুটি উদ্যানের পথ দিয়া যাইতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, “আমি ওকে টানি না। জ্ঞানীর ভাব। দেখি যেন শুকনো কাঠ!”

ঘরে ঠাকুর ফিরিয়াছেন। শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের কথা হইতেছে।

বলরাম — তিনি বলেছেন যে, নরেন্দ্রের যেমন বুকে পা দিলে (ভাবাবেশ) হয়েছিলো, কই আমার তো তা হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি জানো, কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকলে ছড়ান মন কুড়ান দায়। ওর সালিসী করতে হয়, বলছে। আবার বাড়ির ছেলেদের বিষয় ভাবতে হয়। নরেন্দ্রাদির মন তো ছড়ানো নয় — ওদের ভিতে এখনো কামিনী-কাঞ্চন ঢোকে নাই।

“কিন্তু (শ্যামাপদ) খুব লোক!”

কাটোয়ার বৈষ্ণব ঠাকুরকে প্রশ্ন করিতেছেন। বৈষ্ণবটি একটু ট্যারা।

[জন্মান্তরের খপর — ভক্তিলাভের জন্যই মানুষজন্ম]

বৈষ্ণব — মশায়, আবার জন্ম কি হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — গীতায় আছে, মৃত্যুসময় যে যা চিন্তা করে দেহত্যাগ করবে তার সেই ভাব লয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয়। হরিণকে চিন্তা করে ভরত রাজার হরিণ-জন্ম হয়েছিল।

বৈষ্ণব — এটি যে হয়, কেউ চোখে দেখে বলে তো বিশ্বাস হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা জানি না বাপু। আমি নিজের ব্যামো সারাতে পারছি না — আবার মলে কি হয়!

"তুমি যা বলছো এ-সব হীনবুদ্ধির কথা। ঈশ্বরে কিসে ভক্তি হয়, এই চেষ্টা করো। ভক্তিলাভের জন্যই মানুষ হয়ে জন্মেছ। বাগানে আম খেতে এসেছ, কত হাজার ডাল, কত লক্ষ পাতা, এ-সব খপরে কাজ কি? জন্ম-জন্মান্তরের খপর!"

[গিরিশ ঘোষ ও অবতারবাদ! কে পবিত্র? যার বিশ্বাস-ভক্তি]

শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ দুই-একটি বন্ধু সঙ্গে গাড়ি করিয়া আসিয়া উপস্থিত। কিছু পান করিয়াছেন। কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছেন ও ঠাকুরের চরণে মাথা দিয়া কাঁদিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহে তাঁহার গা চাপড়াইতে লাগিলেন। একজন ভক্তকে ডাকিয়া বলিতেছেন — "ওরে একে তামাক খাওয়া।"

গিরিশ মাথা তুলিয়া হাতজোড় করিয়া বলিতেছেন, তুমিই পূর্ণব্রহ্ম। তা যদি না হয়, সবই মিথ্যা!

"বড় খেদ রইল, তোমার সেবা করতে পেলুম না! (এই কথাগুলি এরূপ স্বরে বলিতেছেন যে, দু-একটি ভক্ত কাঁদিতেছেন!)

"দাও বর ভগবন্, এক বৎসর তোমার সেবা করব? মুক্তি ছড়াছড়ি, প্রস্রাব করে দি। বল, তোমার সেবা এক বৎসর করব?"

শ্রীরামকৃষ্ণ — এখানকার লোক ভাল নয় — কেউ কিছু বলবে।

গিরিশ — তা হবে না, বলো —

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, তোমার বাড়িতে যখন যাব —

গিরিশ — না, তা নয়। এইখানে করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (জিদ দেখিয়া) — আচ্ছা, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।

ঠাকুরের গলায় অসুখ। গিরিশ আবার কথা কহিতেছেন, "বল, আরাম হয়ে যাক! — আচ্ছা, আমি ঝাড়িয়ে দেব। কালী! কালী!"

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমার লাগবে!

গিরিশ — ভাল হয়ে যা! (ফুঁ)। ভাল যদি না হয়ে থাকে তো — যদি আমার ও-পায়ে কিছু ভক্তি থাকে, তবে অবশ্য ভাল হবে! বল, ভাল হয়ে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া) — যা বাপু, আমি ও-সব বলতে পারি না। রোগ ভাল হবার কথা মাকে বলতে পারি না। আচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছায় হবে।

গিরিশ — আমায় ভুলোনো! তোমার ইচ্ছায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ — ছি, ও-কথা বলতে নাই। ভক্তবৎ ন চ কৃষ্ণবৎ। তুমি যা ভাবো, তুমি ভাবতে পারো। আপনার গুরু তো ভগবান — তাবলে ও-সব কথা বলায় অপরাধ হয় — ও-কথা বলতে নাই।

গিরিশ — বল, ভাল হয়ে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, যা হয়েছে তা যাবে।

গিরিশ নিজের ভাবে মাঝে মাঝে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,

"হ্যাঁগা, এবার রূপ নিয়ে আস নাই কেন গা?"

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন, 'এবার বুঝি বাঙ্গালা উদ্ধার!'

কোন কোন ভক্ত ভাবিতেছেন, বাঙ্গালা উদ্ধার, সমস্ত জগৎ উদ্ধার!

গিরিশ আবার বলিতেছেন, "ইনি এখানে রয়েছেন কেন, কেউ বুঝেছো? জীবের দুঃখে কাতর হয়ে সেছেন; তাঁদের উদ্ধার করবার জন্যে!"

গাড়োয়ান ডাকিতেছিল। গিরিশ গাত্রোত্থান করিয়া তাহার কাছে যাইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারকে বলিতেছেন, "দেখো, কোথায় যায় — মারবে না তো।" মাস্টারও সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন।

গিরিশ আবার ফিরিয়াছেন ও ঠাকুরকে স্তব করিতেছেন — "ভগবন্, পবিত্রতা আমায় দাও। যাতে কখনও একটুও পাপ-চিন্তা না হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি পবিত্র তো আছ। — তোমার যে বিশ্বাস-ভক্তি! তুমি তো আনন্দে আছ।

গিরিশ — আজ্ঞা, না। মন খারাপ — অশান্তি — তাই খুব মদ খেলুম।

কিয়ৎক্ষণ পরে গিরিশ আবার বলিতেছেন, “ভগবন্‌, আশ্চর্য হচ্ছি যে, পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের সেবা করছি! এমন কি তপস্যা করিছি যে এই সেবার অধিকারী হয়েছি!”

ঠাকুর মধ্যাহ্নের সেবা করিলেন। অসুখ হওয়াতে অতি সামান্য একটু আহার করিলেন।

ঠাকুরের সর্বদাই ভাবাবস্থা — জোর করিয়া শরীরের দিকে মন আনিতেছেন। কিন্তু শরীর রক্ষা করিতে বালকের ন্যায় অক্ষম। বালকের ন্যায় ভক্তদের বলিতেছেন, “এখন একটু খেলুম — একটু শোব! তোমরা একটু বাহিরে গিয়ে বসো।”

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। ভক্তেরা আবার ঘরে বসিয়াছেন।

[গিরিশ ঘোষ — গুরুই ইষ্ট — দ্বিবিধ ভক্ত]

গিরিশ — হ্যাঁ গা, গুরু আর ইষ্ট; — গুরু-রূপটি বেশ লাগে — ভয় হয় না — কেন গা? ভাব দেখলে দশহাত তফাতে যাই। ভয় হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — যিনি ইষ্ট, তিনিই গুরুরূপ হয়ে আসেন। শবসাধনের পর যখন ইষ্টদর্শন হয়, গুরুই এসে শিষ্যকে বলেন — এ (শিষ্য) ওই (তোর ইষ্ট)। এই কথা বলেই ইষ্টরূপেতে লীন হয়ে যান। শিষ্য আর গুরুকে দেখতে পায় না। যখন পূর্ণজ্ঞান হয়, তখন কে বা গুরু, কে বা শিষ্য। ‘সে বড় কঠিন ঠাঁই। গুরুশিষ্যে দেখা নাই।’

একজন ভক্ত — গুরুর মাথা শিষ্যের পা।

গিরিশ — (আনন্দে) হাঁ।

নবগোপাল — শোনো মানে! শিষ্যের মাথাটা গুরুর জিনিস, আর গুরুর পা শিষ্যের জিনিস। শুনলে?

গিরিশ — না, ও মানে নয়। বাপের ঘাড়ে ছেলে কি চড়ে না? তাই শিষ্যের পা।

নবগোপাল — সে তেমনি কচি ছেলে থাকলে তো হয়।

[পূর্বকথা — শিখভক্ত — দুই থাক ভক্ত — বানরের ছা ও বিল্লির ছা]

শ্রীরামকৃষ্ণ — দুরকম ভক্ত আছে। একথাকের বিল্লির ছার স্বভাব। সব নির্ভর — মা যা করে। বিল্লির ছা কেবল মিউ মিউ করে। কোথায় যাবে, কি করবে — কিছুই জানে না। মা কখন হেঁশালে রাখছে — কখন বা বিছানার উপরে রাখছে। এরূপ ভক্ত ঈশ্বরকে আমমোক্তারি (বকলমা) দেয়। আমমোক্তারি দিয়ে নিশ্চিন্ত।

“শিখরা বলেছিল — ঈশ্বর দয়ালু। আমি বললাম, তিনি আমাদের মা-বাপ, তিনি আবার দয়ালু কি? ছেলেদের জন্ম দিয়ে বাপ-মা লালন-পালন করবে না, তো কি বামুনপাড়ার লোকেরা এসে করবে? এ-ভক্তদের ঠিক বিশ্বাস — তিনি আপনার মা, আপনার বাপ।

“আর-এক থাক ভক্ত আছে, তাদের বানরের ছার স্বভাব। বানরের ছা নিজে জো-সো করে মাকে আঁকড়ে ধরে। এদের একটু কর্তৃত্ব বোধ আছে। আমায় তীর্থ করতে হবে, জপতপ করতে হবে, ষোড়শোপচারে পূজা করতে হবে, তবে আমি ঈশ্বরকে ধরতে পারব, — এদের এই ভাব।

“দুজনেই ভক্ত (ভক্তদের প্রতি) — যত এগোবে, ততই দেখবে তিনিই সব হয়েছেন — তিনিই সব করছেন। তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট। তিনিই জ্ঞান, ভক্তি সব দিচ্ছেন।”

[পূর্বকথা — কেশব সেনকে উপদেশ ‘এগিয়ে পড়ো’]

“যত এগোবে, দেখবে, চন্দন কাঠের পরও আছে, — রূপার খনি, — সোনার খনি, — হীরে মাণিক! তাই এগিয়ে পড়।

“আর ‘এগিয়ে পড়’ এ-কথাই বা বলি কেমন করে! — সংসারী লোকদের বেশি এগোতে গেলে সংসার-টংসার ফক্কা হয়ে যায়! কেশব সেন উপাসনা কচ্ছিল, — বলে, ‘হে ঈশ্বর, তোমার ভক্তিনদীতে যেন ডুবে যাই।’ সব হয়ে গেলে আমি কেশবকে বললাম, ওগো, তুমি ভক্তিনদীতে ডুবে যাবে কি করে? ডুবে গেলে,

চিকের ভিতর যারা আছে তাদের কি হবে। তবে এককর্ম করো — মাঝে মাঝে ডুব দিও, আর এক-একবার আড়ায় উঠো।” (সকলের হাস্য)

[বৈষ্ণবের ‘কলকলানি’ — ‘ধারণা করো’! সত্যকথা তপস্যা]

কাটোয়ার বৈষ্ণব তর্ক করিতেছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন, “তুমি কলকলানি ছাড়। ঘি কাঁচা থাকলেই কলকল করে।

“একবার তাঁর আনন্দ পেলে বিচারবুদ্ধি পালিয়ে যায়। মধুপানের আনন্দ পেলে আর ভনভনানি থাকে না।

“বই পড়ে কতকগুলো কথা বলতে পারলে কি হবে? পণ্ডিতেরা কত শ্লোক বলে — ‘শীর্ণা গোকুলমণ্ডলী!’ — এই সব।

“সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে বললে কি হবে? কুলকুচো করলেও কিছু হবে না। পেটে ঢুকুতে হবে! তবে নেশা হবে। ঈশ্বরকে নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে না ডাকলে, এ-সব কথা ধারণা হয় না।”

ডাক্তার রাখাল ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিতেছেন — “এসো গো বসো।” বৈষ্ণবের সহিত কথা চলিতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — মানুষ আর মানহুঁশ। যার চৈতন্য হয়েছে, সেই মানহুঁশ। চৈতন্য না হলে বৃথা মানুষ জন্ম!

[পূর্বকথা — কামারপুকুরে ধার্মিক সত্যবাদী দ্বারা সালিসী]

“আমাদের দেশে পেটমোটা গোঁফওয়ালা অনেক লোক আছে। তবু দশ ক্রোশ দূর থেকে ভাল লোককে পালকি করে আনে কেন —— ধার্মিক সত্যবাদী দেখে। তারা বিবাদ মিটাবে। শুধু যারা পণ্ডিত, তাদের আনে না।

ঠাকুর বালকের মতো ডাক্তারকে বলিতেছেন —— “বাবু আমার এটা ভাল করে দাও।”

ডাক্তার —— আমি ভাল করব?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — ডাক্তার নারায়ণ। আমি সব মানি।

[Reconciliation of Free Will and God's Will — of Liberty and Necessity — ঈশ্বরই মাহুত নারায়ণ]

“যদি বলো সব নারায়ণ, তবে চুপ করে থাকলেই হয়, তা আমি মাহুত নারায়ণও মানি।

“শুদ্ধমন আর শুদ্ধ-আত্মা একই! শুদ্ধমনে যা উঠে, সে তাঁরই কথা। তিনিই ‘মাহুত নারায়ণ।’

“তাঁর কথা শুনব না কেন? তিনিই কর্তা। ‘আমি’ যতক্ষণ রেখেছেন, তাঁর আদেশ শুনে কাজ করব।”

ঠাকুরের গলার অসুখ এইবার ডাক্তার দেখিবেন। ঠাকুর বলিতেছেন —— “মহেন্দ্র সরকার জিব টিপেছিল, যেমন গরুর জিবকে টিপে।”

ঠাকুর আবার বালকের ন্যায় ডাক্তারের জামায় বারংবার হাত দিয়ে বলিতেছেন, “বাবু! বাবু! তুমি এইটে ভাল করে দাও!”

Laryngoscope দেখিয়া ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন — “বুঝেছি, এতে ছায়া পড়বে।”

নরেন্দ্র গান গাইলেন। ঠাকুরের অসুখ বলিয়া বেশি গান হইল না।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২রা সেপ্টেম্বর 1885/09/02

51.11 শ্রীযুক্ত ডাক্তার ভগবান রুদ্র ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্নে সেবা করিয়া নিজের আসনে বসিয়া আছেন। ডাক্তার ভগবান রুদ্র ও মাস্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। ঘরে লাটু প্রভৃতি ভক্তেরাও আছেন।

আজ বুধবার, নন্দোৎসব, ১৮ই ভাদ্র; শ্রাবণ অষ্টমী-নবমী তিথি; ২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুরের অসুখের বিষয় সমস্ত ডাক্তার শুনিলেন। ঠাকুর মেঝেতে আসিয়া ডাক্তারের কাছে বসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখো গা, ঔষধ সহ্য হয় না! ধাত আলাদা।

[টাকা স্পর্শন, গিরোবান্ধা, সঞ্চয় — এ-সব ঠাকুরের অসম্ভব]

“আচ্ছা, এটা তোমার কি মনে হয়? টাকা ছুঁলে হাত এঁকে বেঁকে যায়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়! আর যদি আমি গিরো (গ্রন্থি) বাঁধি যতক্ষণ না গিরো খোলা হয়, ততক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে থাকবে!”

এই বলিয়া একটি টাকা আনিতে বলিলেন। ডাক্তার দেখিয়া অবাক্ যে হাতের উপর টাকা দেওয়াতে হাত বাঁকিয়া গেল; আর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। টাকাটি স্থানান্তরিত করিবার পর, ক্রমে ক্রমে তিনবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িয়া, তবে হাত পুনর্বার শিথিল হইল।

ডাক্তার মাস্টারকে বলিতেছেন, Action on the nerves (স্নায়ুর উপর ক্রিয়া)।

[পূর্বকথা — শম্ভু মল্লিকের বাগানে আফিম সঞ্চয় — জন্মভূমি কামারপুকুরে আম পাড়া — সঞ্চয় অসম্ভব]

ঠাকুর আবার ডাক্তারকে বলিতেছেন, ‘আর একটি অবস্থা আছে। কিছু সঞ্চয় করবার জো নাই! শম্ভু মল্লিকের বাগানে একদিন গিছলাম। তখন বড় পেটের অসুখ। শম্ভু বললে — একটু একটু আফিম খেও তাহলে কম পড়বে। আমার

কাপড়ের খোঁটে একটু আফিম বেঁধে দিলে। যখন ফিরে আসছি, ফটকের কাছে, কে জানে ঘুরতে লাগলাম —— যেন পথ খুঁজে পাচ্ছি না। তারপর যখন আফিমটা খুলে ফেলে দিলে, তখন আবার সহজ অবস্থা হয়ে বাগানে ফিরে এলাম।

“দেশেও আম পেড়ে নিয়ে আসছি —— আর চলতে পারলাম না, দাঁড়িয়ে পড়লাম। তারপর সেগুলো একটা ডোবের মতন জায়গায় রাখতে হল —— তবে আসতে পারলাম! আচ্ছা, ওটা কি?”

ডাক্তার —— ওর পেছনে আর একটা (শক্তি) আছে, মনের শক্তি।

মণি —— ইনি বলেন, এটি ঈশ্বরের শক্তি (Godforce) আপনি বলছেন মনের শক্তি (Willforce)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) — আবার এমনি অবস্থা, যদি কেউ বললে, ‘কমে গেছে’ তো অমনি অনেকটা কমে যায়। সেদিন ব্রাহ্মণী বললে, ‘আট-আনা কমে গেছে’ —— অমনি নাচতে লাগলুম!

ঠাকুর ডাক্তারের স্বভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি ডাক্তারকে বলিতেছেন, ‘তোমার স্বভাবটি বেশ। জ্ঞানের দুটি লক্ষণ —— শান্ত ভাব, আর অভিমান থাকবে না।”

মণি —— এঁর (ডাক্তারের) স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) — আমি বলি, তিন টান হলে ভগবানকে পাওয়া যায়। মায়ের ছেলের উপর টান, সতীর পতির উপর টান, বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান।

“যা হোক, আমার বাবু এটা ভাল করো!”

ডাক্তার এইবার অসুখের স্থানটি দেখিবেন। গোল বারান্দায় একখানি কেদারাতে ঠাকুর বসিলেন। ঠাকুর প্রথমে ডাক্তার সরকারের কথা বলিতেছেন, “শ্যালা, যেন গরুর জিব টিপলে!”

ভগবান —— তিনি বোধ হয় ইচ্ছা করে ওরূপ করেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— না, তা নয় খুব ভাল করে দেখবে বলে টিপেছিল।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২০শে ও ২৪শে সেপ্টেম্বর 1885/09/20 1885/09/24

51.12 অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ ও ডাক্তার রাখাল —— ভক্তসঙ্গে নৃত্য

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে নিজের ঘরে বসিয়া আছেন। রবিবার, ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ; ৫ই আশ্বিন; শুক্লা একাদশী। নবগোপাল, হিন্দু স্কুলের শিক্ষক হরলাল, রাখাল, লাটু প্রভৃতি; কীর্তনীয়া গোস্বামী; অনেকেই উপস্থিত।

বহুবাজারের রাখাল ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া মাস্টার আসিয়া উপস্থিত; ডাক্তারকে ঠাকুরের অসুখ দেখাইবেন।

ডাক্তারটি ঠাকুরের গলায় কি অসুখ হইয়াছে দেখিতেছেন। তিনি দোহারা লোক; আঙুলগুলি মোটা মোটা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, ডাক্তারের প্রতি) — যারা এমন এমন করে (অর্থাৎ কুস্তি করে) তাদের মতো তোমার আঙুল। মহেন্দ্র সরকার দেখেছিল কিন্তু জিভ এমন জোরে চেপেছিল যে ভারী যন্ত্রণা হয়েছিল; যেমন গরুর জিভ চেপে ধরেছে।

রাখাল ডাক্তার —— আজ্ঞা, আমি দেখছি আপনার কিছু লাগবে না।

[শ্রীরামকৃষ্ণের রোগ কেন?]

ডাক্তার ব্যবস্থা করার পর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — আচ্ছা, লোকে বলে ইনি যদি এত —— (এত সাধু) তবে রোগ হয় কেন?

তারক —— ভগবানদাস বাবাজী অনেকদিন রোগে শয্যাগত হয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — মধু ডাক্তার, ষাট বছর বয়সে রাঁড়ের জন্য তার বাসায় ভাত নিয়ে যাবে; এদিকে নিজের কোন রোগ নাই।

গোস্বামী — আজ্ঞা, আপনার যে অসুখ সে পরের জন্য; যারা আপনার কাছে আসে তাদের অপরাধ আপনার নিতে হয়, সেই সকল অপরাধ, পাপ লওয়াতে আপনার অসুখ হয়!

একজন ভক্ত — আপনি যদি মাকে বলেন মা, এই রোগটা সারিয়ে দাও, তা হলে শীঘ্র সেরে যায়।

[সেব্য-সেবকভাব কম — 'আমি' খুঁজে পাচ্ছি না]

শ্রীরামকৃষ্ণ — রোগ সারাবার কথা বলতে পারি না; আবার ইদানীং সেব্য-সেবক ভাব কম পড়ে যাচ্ছে। এক-একবার বলি, 'মা, তরবারির খাপটা একটু মেরামত করে দাও'; কিন্তু ওরূপ প্রার্থনা কম পড়ে যাচ্ছে; আজকাল 'আমি'টা খুঁজে পাচ্ছি না। দেখছি তিনিই এই খোলটার ভিতরে রয়েছেন।

কীর্তনের জন্য গোস্বামীকে আনা হইয়াছে। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কীর্তন কি হবে?' শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ, কীর্তন হইলে মত্ততা আসিবে; এই ভয় সকলে করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "হোক একটু। আমার নাকি ভাব হয়, তাই ভয় হয়। ভাব হলে গলার ওইখানটা গিয়ে লাগে।"

কীর্তন শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাব সম্বরণ করিতে পারিলেন না; দাঁড়াইয়া পড়িলেন ও ভক্ত সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার রাখাল সমস্ত দেখিলেন; তাঁহার ভাড়াটিয়া গাড়ি দাঁড়িয়া আছে। তিনি ও মাস্টার গাত্রোত্থান করিলেন, কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে উভয়ে প্রণাম করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে মাস্টারের প্রতি) — তুমি কি খেয়েছ?

[মাস্টারের প্রতি আত্মজ্ঞানের উপদেশ — ‘দেহটা খোলমাত্র’]

বৃহস্পতিবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর পূর্ণিমার দিন রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ঘরের ছোট খাটটির উপর বসিয়া আছেন। গলার অসুখের জন্য কাতর হইয়াছেন। মাস্টার প্রভৃতি ভক্তেরা মেঝেতে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — এক-একবার ভাবি দেহটা খোল মাত্র; সেই অখণ্ড (সচ্চিদানন্দ) বই আর কিছু নাই।

“ভাবাবেশ হলে গলার অসুখটা একপাশে পড়ে থাকে। এখন ওই ভাবটা একটু একটু হচ্ছে, আর হাসি পাচ্ছে।”

দ্বিজর ভগিনী ও ছোট দিদিমা ঠাকুরের অসুখ শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন; তাঁহারা প্রণাম করিয়া ঘরের একপাশে বসিলেন। দ্বিজর দিদিমাকে দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন, “ইনি কে? — যিনি দ্বিজকে মানুষ করেছেন? আচ্ছা দ্বিজ এমন এমন (একতারা) কিনেছে কেন?”

মাস্টার — আজ্ঞা, তাতে দুইতার আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — একে ওর বাবা বিরুদ্ধ; সব্বাই কি বলবে? ওর পক্ষে গোপনে (ঈশ্বরকে) ডাকাই ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে দেয়ালে টাঙ্গানো গৌর নিতাইয়ের ছবি একখানা বেশি ছিল; গৌর নিতাই সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া নবদ্বীপে সংকীর্তন করছেন এই ছবি।

রামলাল (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — তাহলে, ছবিখানা এঁকেই (মাস্টারকে) দিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা; তা বেশ।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও হরিশের সেবা]

ঠাকুর কয়েকদিন প্রতাপের ঔষধ খাইতেছেন। গভীর রাত্রে উঠিয়া পড়িয়াছেন, প্রাণ আই-ঢাই করিতেছে। হরিশ সেবা করেন, ওই ঘরেই ছিলেন; রাখালও আছেন; শ্রীযুক্ত রামলাল বাহিরে বারান্দায় শুইয়া আছেন। ঠাকুর পরে বলিলেন, "প্রাণ আই-ঢাই করাতে হরিশকে জড়াতে ইচ্ছা হল; মধ্যম নারায়ণ তেল দেওয়াতে ভাল হলাম, তখন আবার নাচতে লাগলাম।"

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c52 ৫২ শ্যামপুকুর বাটীতে ভক্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১৮ই অক্টোবর 1885/10/18/i

52.1 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরের বাটীতে ভক্তসঙ্গে

শ্রীশ্রীবিজয়া দশমী। ১৮ই অক্টোবর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ (৩রা কার্তিক, ১২৯২, রবিবার)। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরের বাটীতে আছেন। শরীর অসুস্থ — কলিকাতায় চিকিৎসা করিতে আসিয়াছেন। ভক্তেরা সর্বদাই থাকেন, ঠাকুরের সেবা করেন। ভক্তদের মধ্যে এখন কেহ সংসারত্যাগ করেন নাই — তাঁহারা নিজেদের বাটী হইতে যাতায়াত করেন।

[সুরেন্দ্রের ভক্তি — 'মা হৃদয়ে থাকুন']

শীতকাল সকাল বেলা ৮টা। ঠাকুর অসুস্থ, বিছানায় বসিয়া আছেন। কিন্তু পঞ্চমবর্ষীয় বালকের মতো, মা বই কিছু জানেন না। সুরেন্দ্র আসিয়া বসিলেন।

নবগোপাল, মাস্টার ও আরও কেহ কেহ উপস্থিত আছেন। সুরেন্দ্রের বাটিতে ৺দুর্গাপূজা হইয়াছিল। ঠাকুর যাইতে পারেন নাই, ভক্তদের প্রতিমা দর্শন করিতে পাঠাইয়াছিলেন। আজ বিজয়া, তাই সুরেন্দ্রের মন খারাপ হইয়াছে।

সুরেন্দ্র — বাড়ি থেকে পালিয়ে এলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারকে) — তাহলেই বা। মা হৃদয়ে থাকুন!

সুরেন্দ্র মা মা করিয়া পরমেশ্বরীর উদ্দেশে কত কথা কহিতে লাগিলেন।

ঠাকুর সুরেন্দ্রকে দেখিতে দেখিতে অশ্রু বির্সজন করিতেছেন। মাস্টারের দিকে তাকাইয়া গদ্‌গদস্বরে বলিতেছেন, কি ভক্তি! আহা, এর যা ভক্তি আছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ — কাল ৭টা-৭৷৷টার সময় ভাবে দেখলাম, তোমাদের দালান। ঠাকুর প্রতিমা রহিয়াছেন, দেখলাম সব জ্যোতির্ময়। এখানে-ওখানে এক হয়ে আছে। যেন একটা আলোর স্রোত দু-জায়গার মাঝে বইছে! — এবাড়ি আর তোমাদের সেই বাড়ি!

সুরেন্দ্র — আমি তখন ঠাকুর দালানে মা মা বলে ডাকছি, দাদারা ত্যাগ করে উপরে চলে গেছে। মনে উঠলো মা বললেন, 'আমি আবার আসব'।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভগবদ্‌গীতা]

বেলা এগারটা বাজিবে। ঠাকুর পথ্য পাইলেন। মণি হাতে আঁচাবার জল দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — ছোলার ডাল খেয়ে রাখালের অসুখ হয়েছে। সাত্ত্বিক আহার করা ভাল। তুমি গীতা পড় না?

মণি — আজ্ঞা হাঁ, যুক্তাহারের কথা আছে। সাত্ত্বিক আহার, রাজসিক আহার, তামসিক আহার। আবার সাত্ত্বিক দয়া, রাজসিক দয়া, তামসিক দয়া। সাত্ত্বিক অহং ইত্যাদি সব আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — গীতা তোমার আছে?

মণি — আজ্ঞা, আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ওতে সর্বশাস্ত্রের সার আছে।

মণি — আজ্ঞা, ঈশ্বরকে নানারকমে দেখার কথা আছে; আপনি যেমন বলেন, নানা পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া — জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, ধ্যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কর্মযোগ মানে কি জান? সকল কর্মের ফল ভগবানে সমর্পণ করা।

মণি — আজ্ঞা, দেখছি, ওতে আছে। কর্ম আবার তিনরকমে করা যেতে পারে, আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি কি রকম?

মণি — প্রথম — জ্ঞানের জন্য। দ্বিতীয় — লোকশিক্ষার জন্য। তৃতীয় — স্বভাবে।

ঠাকুর আচমনান্তে পান খাইতেছেন। মণিকে মুখ হইতে পান প্রসাদ দিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১৮ই অক্টোবর 1885/10/18/ii

52.2 শ্রীরামকৃষ্ণ — Sir Humphrey Davy ও অবতারবাদ

ঠাকুর মাস্টারের সহিত ডাক্তার সরকারের কথা কহিতেছেন। পূর্বদিনে ঠাকুরের সংবাদ লইয়া মাস্টার ডাক্তারের কাছে গিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমার সঙ্গে কি কি কথা হল?

মাস্টার — ডাক্তারের ঘরে অনেক বই আছে। আমি একখানা বই সেখানে বসে বসে পড়ছিলাম। সেই সব পড়ে আবার ডাক্তারকে শোনাতে লাগলাম। Sir Humphrey Davy-র বই। তাতে অবতারের প্রয়োজন এ-কথা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বটে? তুমি কি কথা বলেছিলে?

মাস্টার — একটি কথা আছে, ঈশ্বরের বাণী মানুষের ভিতর দিয়ে না এলে মানুষ বুঝতে পারে না। (Divine Truth must be made human Truth to be appreciated by us)। তাই অবতারাদির প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বাঃ, এ-সব তো বেশ কথা!

মাস্টার — সাহেব উপমা দিয়েছে, যেমন সূর্যের দিকে চাওয়া যায় না, কিন্তু সূর্যের আলো যেখানে পড়ে, (Reflected rays) সেদিকে চাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বেশ কথা, আর কিছু আছে?

মাস্টার — আর এক যায়গায় ছিল, যথার্থ জ্ঞান হচ্ছে বিশ্বাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এ তো খুব ভাল কথা। বিশ্বাস হল তো সবই হয়ে গেল।

মাস্টার — সাহেব আবার স্বপ্ন দেখেছিলেন রোমানদের দেবদেবী।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এমন সব বই হয়েছে? তিনিই (ঈশ্বর) সেখানে কাজ করছেন। আর কিছু কথা হল?

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও ‘জগতের উপকার’ বা কর্মযোগ]

মাস্টার — ওরা বলে জগতের উপকার করব। তাই আমি আপনার কথা বললাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — কি কথা?

মাস্টার — শম্ভু মল্লিকের কথা। সে আপনাকে বলেছিল, ‘আমার ইচ্ছা যে টাকা দিয়ে কতকগুলি হাসপাতল, ডিস্পেন্সারি, স্কুল, এইসব করে দিই; হলে অনেকের উপকার হবে।’ আপনি তাকে যা বলেছিলেন, তাই বললুম, ‘যদি ঈশ্বর সম্মুখে আসেন, তবে তুমি কি বলবে, আমাকে কতকগুলি হাসপাতাল, ডিস্পেনসারি, স্কুল করে দাও!’ আর-একটি কথা বললাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, থাক আলাদা আছে, যারা কর্ম করতে আসে। আর কি কথা?

মাস্টার — বললাম, কালীদর্শন যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে রাস্তায় কেবল কাঙ্গালী বিদায় করলে কি হবে? বরং জো-সো করে একবার কালীদর্শন করে লও; — তারপর যত কাঙ্গালী বিদায় করতে ইচ্ছা হয় করো।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আর কিছু কথা হল?

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ও কামজয়]

মাস্টার — আপনার কাছে যারা আসে তাদের অনেকে কামজয় করেছেন, এই কথা হল। ডাক্তার তখন বললে, ‘আমারও কামটাম উঠে গেছে, জানো?’ আমি বললাম, আপনি তো বড় লোক। আপনি যে কাম জয় করেছেন বলছেন তাতো আশ্চর্য নয়। ক্ষুদ্র প্রাণীদের পর্যন্ত তাঁর কাছে ইন্দ্রিয় জয় হচ্ছে, এই আশ্চর্য! তারপর আমি বললাম, আপনি যা গিরিশ ঘোষকে বলেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — কি বলেছিলাম?

মাস্টার — আপনি গিরিশ ঘোষকে বলেছিলেন, ‘ডাক্তার তোমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নাই।’ সেই অবতারে কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি অবতারের কথা তাকে (ডাক্তারকে) বলবে। অবতার — যিনি তারণ করেন। তা দশ অবতার আছে, চব্বিশ অবতার আছে আবার অসংখ্য অবতার আছে।

[মদ্যপান ক্রমে ক্রমে একেবারে ত্যাগ]

মাস্টার — গিরিশ ঘোষের ভারী খবর নেয়। কেবল জিজ্ঞাসা করেন, গিরিশ ঘোষ কি সব মদ ছেড়েছে? তার উপর বড় চোখ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি গিরিশ ঘোষকে ও-কথা বলেছিলে?

মাস্টার — আজ্ঞা হাঁ, বলেছিলাম। আর সব মদ ছাড়বার কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সে কি বললে?

মাস্টার — তিনি বললেন, তোমরা যে কালে বলছো সেকালে ঠাকুরের কথা বলে মানি — কিন্তু আর জোর করে কোনও কথা বলব না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (আনন্দের সহিত) — কালীপদ বলেছে, সে একেবারে সব ছেড়েছে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১৮ই অক্টোবর 1885/10/18/iii

52.3 নিত্যলীলা যোগ

[Identity of the Absolute or the Universal Ego and the Phenomenal World]

বৈকাল হইয়াছে, ডাক্তার আসিয়াছেন। অমৃত (ডাক্তারের ছেলে) ও হেম, ডাক্তারের সঙ্গে আসিয়াছেন। নরেন্দ্রাদি ভক্তেরাও উপস্থিত আছেন। ঠাকুর নিভৃতে অমৃতের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তোমার কি ধ্যান হয়?" আর বলিতেছেন, "ধ্যানের অবস্থা কিরকম জানো? মনটি হয়ে যায় তৈলধারায় ন্যায়। এক চিন্তা, ঈশ্বরের; অন্য কোন চিন্তা আর ভিতর আসবে না।" এইবার ঠাকুর সকলের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) — তোমার ছেলে অবতার মানে না। তা বেশ। নাই বা মানলে।

"তোমার ছেলেটি বেশ। তা হবে না? বোম্বাই আমের গাছে কি টোকো আম হয়? তার ঈশ্বরে কেমন বিশ্বাস! যার ঈশ্বরে মন সেই তো মানুষ। মানুষ —— আর মানহুঁশ। যার হুঁশ আছে, চৈতন্য আছে, সে নিশ্চিত জানে, ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য —— সেই মানহুঁশ। তা অবতার মানে না, তাতে দোষ কি?

"ঈশ্বর; আর এ-সব জীবজগৎ, তাঁর ঐশ্বর্য। এ মানলেই হল। যেমন বড় মানুষ আর তার বাগান।

"এরকম আছে, দশ অবতার, — চব্বিশ অবতার, — আবার অসংখ্য অবতার। যেখানে তাঁর বিশেষ শক্তি প্রকাশ, সেখানেই অবতার! তাই তো আমার মত।

"আর-এক আছে, যা কিছু দেখছো এ-সব তিনি হয়েছেন। যেমন বেল, — বিচি, খোলা, শাঁস — তিন জড়িয়ে এক। যাঁর নিত্য তাঁরই লীলা; যাঁর লীলা তাঁরই নিত্য। নিত্যকে ছেড়ে শুধু লীলা বুঝা যায় না। লীলা আছে বলেই ছাড়িয়া ছাড়িয়ে নিত্যে পোঁছানো যায়।

"অহং বুদ্ধি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ লীলা ছাড়িয়ে যাবার জো নাই। নেতি নেতি করে ধ্যানযোগের ভিতর দিয়ে নিত্যে পোঁছানো যেতে পারে। কিন্তু কিছু ছাড়বার জো নাই। যেমন বললাম, — বেল।"

ডাক্তার — ঠিক কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কচ নির্বিকল্পসমাধিতে রয়েছেন। যখন সমাধিভঙ্গ হচ্ছে একজন জিজ্ঞাসা করলে, তুমি এখন কি দেখছো? কচ বললেন, দেখছি যে জগৎ যেত তাঁতে জরে রয়েছে! তিনিই পরিপূর্ণ! যা কিছু দেখছি সব তিনিই হয়েছেন। এর ভিতর কোন্‌টা ফেলব, কোন্‌টা লব, ঠিক করতে পাচ্ছি না।

“কি জানো — নিত্য আর লীলা দর্শন করে, দাসভাবে থাকা। হনুমান সাকার-নিরাকার সাক্ষাৎকার করেছিলেন। তারপরে, দাসভাবে — ভক্তের ভাবে — ছিলেন।”

মণি (স্বগতঃ) — নিত্য, লীলা দুই নিতে হবে। জার্মানিতে বেদান্ত যাওয়া অবধি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাহারও কাহারও এই মত। কিন্তু ঠাকুর বলেছেন, সব ত্যাগ — কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ — না হলে নিত্য-লীলার সাক্ষাৎকার হয় না। ঠিক ঠিক ত্যাগী। সম্পূর্ণ অনাসক্তি। এইটুকু হেগেল প্রভৃতি পণ্ডিতদের সঙ্গে বিশেষ তফাত দেখছি।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১৮ই অক্টোবর 1885/10/18/iv

52.4 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও অবতারবাদ

[Reconciliation of Free will and Predestination]

ডাক্তার বলছেন, ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আর আমাদের সকলের আত্মা (Soul) অনন্ত উন্নতি করবে। একজন আর একজনের চেয়ে বড়, একথা তিনি মানতে চাহিতেছেন না। তাই অবতার মানছেন না।

ডাক্তার — ‘Infinite Progress’ তা যদি না হল তাহলে পাঁচ বছর সাত বছর আর বেঁচেই বা কি হবে! গলায় দড়ি দেব!

“অবতার আবার কি! যে মানুষ হাগে মোতে তার পদানত হব! হাঁ, তবে Reflection of God's light (ঈশ্বরের জ্যোতি) মানুষে প্রকাশ হয়ে থাকে তা মানি।”

গিরিশ (সহাস্যে) — আপনি God's Light দেখেন নি —

ডাক্তার উত্তর দিবার পূর্বে একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন। কাছে একজন বন্ধু বসিয়াছেলেন — আস্তে আস্তে কি বলিলেন।

ডাক্তার — আপনিও তো প্রতিবিম্ব বই কিছু দেখেন নাই।

গিরিশ — I see it, I see the Light! শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার Prove (প্রমাণ) করব — তা নাহলে জিব কেটে ফেলব।

[বিকারী রোগীরই বিচার — পূর্ণজ্ঞানে বিচার বন্ধ হয়]

শ্রীরামকৃষ্ণ — এ-সব যা কথা হচ্ছে, এ কিছুই নয়।

“এ-সব বিকারের রোগীর খেয়াল। বিকারের রোগী বলেছিল, — এক জালা জল খাব। এক হাঁড়ি ভাত খাব! বদ্যি বললে, আচ্ছা আচ্ছা খাবি। পথ্য পেয়ে যা বলবি তখন করা যাবে।

“যতক্ষণ কাঁচা ঘি, ততক্ষণই কলকলানি শোনা যায়। পাকা হলে আর শব্দ থাকে না। যার যেমন মন, ঈশ্বরকে সেইরূপ দেখে। আমি দেখেছি, বড় মানুষের বাড়ির ছবি — কুইন-এর ছবি আছে। আবার ভক্তের বাড়ি — ঠাকুরদের ছবি!

“লক্ষণ বলেছিলেন, রাম, যিনি স্বয়ং বশিষ্ঠদেব, তাঁর আবার পুত্রশোক! রাম বললেন, ভাই যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞানও আছে। যার আলোবোধ আছে, তার অন্ধকারবোধও আছে। তাই জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হও। ঈশ্বরকে বিশেষরূপে জানলে সেই অবস্থা হয়। এরই নাম বিজ্ঞান।

“পায়ে কাঁটা ফুটলে আর-একটি কাঁটা যোগাড় করে আনতে হয়। এতে সেই কাঁটাটি তুলতে হয়। তোলার পর দুটি কাঁটাই ফেলে দেয়। জ্ঞান দিয়ে অজ্ঞান কাঁটা তুলে, জ্ঞান অজ্ঞান দুই কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।

“পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ আছে৷ বিচার বন্ধ হয়ে যায়। যা বললুম, কাঁচা থাকলেই ঘিয়ের কলকলানি।”

ডাক্তার — পূর্ণজ্ঞান থাকে কি? সব ঈশ্বর! তবে তুমি পরমহংসগিরি করছো কেন? আর এরাই বা এসে তোমার সেবা করছে কেন? চুপ করে থাক না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — জল স্থির থাকলেও জল, হেললে দুললেও জল, তরঙ্গ হলেও জল।

[Voice of God or Conscience — মাহুত নারায়ণ]

“আর একটি কথা। মাহুত নারায়ণের কথাই বা শুনি কেন? গুরু শিষ্যকে বলে দিছলেন সব নারায়ণ। পাগলা হাতি আসছিল। শিষ্য গুরুবাক্য বিশ্বাস করে সেখান থেকে সরে নাই। হাতিও নারায়ণ। মাহুত কিন্তু চেঁচিয়ে বলছিল, সব সরে যাও, সব সরে যাও; শিষ্যটি সরে নাই। হাতি তাকে আছাড় দিয়ে চলে গেল। প্রাণ যায় নাই। মুখে জল দিতে দিতে জ্ঞান হয়েছিল। যখন জিজ্ঞাসা করলে কেন তুমি সরে যাও নাই, সে বললে, ‘কেন, গুরুদেব যে বলেছেন — সব নারায়ণ!’ গুরু বললেন, বাবা, মাহুত নারায়ণের কথা তবে শুন নাই কেন? তিনিই শুদ্ধমন শুদ্ধবুদ্ধি হয়ে ভিতরে আছেন। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। আমি ঘর, তিনি ঘরণী। তিনিই মাহুত নারায়ণ।”

ডাক্তার আর একটা বলি; তবে কেন বল, এটা সারিয়ে দাও?

শ্রীরামকৃষ্ণ — যতক্ষণ আমি ঘট রয়েছে, ততক্ষণ এইরূপ হচ্ছে। মনে করো মহাসমুদ্র — অধঃ ঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ। তার ভিতর একটি ঘট রয়েছে। ঘটের অন্তরে-বাহিরে জল। কিন্তু না ভাঙ্গলে ঠিক একাকার হচ্ছে না। তিনিই এই আমি-ঘট রেখে দিয়েছেন।

[আমি কে?]

ডাক্তার — তবে এই ‘আমি’ যা বলছ, এগুলো কি? এর তো মানে বলতে হবে। তিনি কি আমাদের সঙ্গে চালাকি খেলছেন?

গিরিশ — মহাশয়, কেমন করে জানলেন, চালাকি নয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — এই ‘আমি’ তিনিই রেখে দিয়েছেন। তাঁর খেলা — তাঁর লীলা! এক রাজার চার বেটা। রাজার ছেলে। — কিন্তু খেলা করছে — কেউ মন্ত্রী, কেউ কোটাল হয়েছে, এই সব। রাজার বেটা হয়ে কোটাল কোটাল খেলছে!

(ডাক্তারের প্রতি) — “শোন! তোমার যদি আত্মার সাক্ষাৎকার হয়, তবে এই সব মানতে হবে। তাঁর দর্শন হলে সব সংশয় যায়।”

[Sonship and the Father — জ্ঞানযোগ ও শ্রীরামকৃষ্ণ]

ডাক্তার — সব সন্দেহ যায় কই?

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমার কাছে এই পর্যন্ত শুনে যাও। তারপর বেশি কিছু শুনতে চাও, তাঁর কাছে একলা একলা বলবে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে, কেন তিনি এমন করেছেন।

“ছেলে ভিখারীকে এক কুনকে চাল দিতে পারে। রেলভাড়া যদি দিতে হয় তো কর্তাকে জানাতে হয়। [ডাক্তার চুপ করিয়া আছেন।]

“আচ্ছা, তুমি বিচার ভালবাস। কিছু বিচার করি, শোন। জ্ঞানীর মতে অবতার নাই। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, — তুমি আমাকে অবতার অবতার বলছ, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই — দেখবে এস। অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। খানিক দূরে গিয়ে অর্জুনকে বললেন, ‘কি দেখতে পাচ্ছ?’ অর্জুন বললেন, ‘একটি বৃহৎ গাছ, কালো জাম থোলো থোলো হয়ে আছে।” শ্রীকৃষ্ণ বললেন,

‘ও কালো জাম নয়। আর একটু এগিয়ে দেখ।’ তখন অর্জুন দেখলেন, থোলো থোলো কৃষ্ণ ফলে আছে। কৃষ্ণ বললেন, ‘এখন দেখলে? আমার মতো কত কৃষ্ণ ফলে রয়েছে!’

“কবীর দাস শ্রীকৃষ্ণের কথায় বলেছিল, তুমি গোপীদের হাততালিতে বানর নাচ নেচেছিলে!

“যত এগিয়ে যাবে ততই ভগবানের উপাধি কম দেখতে পাবে। ভক্ত প্রথমে দর্শন করলে দশভূজা। আরও এগিয়ে দেখলে ষড়ভুজ। আরও এগিয়ে গিয়ে দেকছ দ্বিভুজ গোপাল! যত এগুচ্ছে ততই ঐশ্বর্য কমে যাচ্চে। আরও এগিয়ে গিয়ে দেখছে দ্বিভুজ গোপাল! যত এগুচ্ছে ততই ঐশ্বর্য কমে যাচ্ছে। আরও এগিয়ে গেল, তখন জ্যোতিঃদর্শন কল্লে — কোনও উপাধি নাই।

“একটু বেদান্তের বিচার শোন। এক রাজার সামনে একজন ভেলকি দেখাতে এসেছিল। একটু সরে যাওয়ার পর রাজা দেখলে, একজন সওয়ার আসছে। ঘোড়ার উপর চড়ে, খুব সাজগোজ — হাতে অস্ত্রশস্ত্র। সভাশুদ্ধ লোক আর রাজা বিচার কচ্ছে, এর ভিতর সত্য কি? ঘোড়া তো সত্য নয়, সাজগোজ, অস্ত্রশস্ত্রও সত্য নয়। শেষে সত্য সত্য দেখলে যে সোয়ার একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে! কিনা, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা — বিচার করতে গেলে কিছুই টেঁকে না।”

ডাক্তার — এতে আমার আপত্তি নাই।

[The World (সংসার) and the Scare-Crow]

শ্রীরামকৃষ্ণ — তবে এ-ভ্রম সহজে যায় না। জ্ঞানের পরও থাকে। স্বপনে বাঘকে দেখেছে, স্বপন ভেঙে গেল, তবু বুক দুড়্দুড় করছে!

“ক্ষেতে চুরি করতে চোর এসেছে। খড়ের ছবি মানুষের আকার করে রেখে দিয়েছে — ভয় দেখাবার জন্য। চোরেরা কোনও মতে ঢুকতে পারছে না। একজন কাছে গিয়ে দেখলে — খড়ের ছবি। এসে ওদের বললে, — ভয় নাই। তবু ওরা আসতে চায় না — বলে বুক দুড়্দুড় করছে। তখন ভূঁয়ে ছবিটাকে শুইয়ে দিলে, আর বলতে লাগল এ কিছু নয়, এ-কিছু নয়, ‘নেতি’ ‘নেতি’।”

ডাক্তার — এ-সব বেশ কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — হাঁ! কেমন কথা?

ডাক্তার — বেশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — একটা ‘Thank you’ দাও।

ডাক্তার — তুমি কি বুঝছো না, মনের ভাব? আর কত কষ্ট করে তোমায় এখানে দেখতে আসছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — না গো, মূর্খের জন্য কিছু বল। বিভীষণ লঙ্কার রাজা হতে চায় নাই — বলেছিল, রাম তোমাকে পেয়েছি আবার রাজা হয়ে কি হবে! রাম বললেন, বিভীষণ, তুমি মূর্খদের জন্য রাজা হও। যারা বলছে, তুমি এত রামের সেবা করলে, তোমার কি ঐশ্বর্য হল? তাদের শিক্ষার জন্য রাজা হও।

ডাক্তার — এখানে তেমন মূর্খ কই?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — না গো, শাঁকও আছে আবার গেঁড়ি-গুগলিও আছে। (সকলের হাস্য)

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১৮ই অক্টোবর 1885/10/18/v

52.5 পুরুষ-প্রকৃতি — অধিকারী

ডাক্তার ঠাকুরের জন্য ঔষধ দিলেন — দুটি Globule; বলিতেছেন, এই দুইটি গুলি দিলাম — পুরুষ আর প্রকৃতি। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — হাঁ, ওরা এক সঙ্গেই থাকে। পায়রাদের দেখ নাই, তফাতে থাকতে পারে না। যেখানে পুরুষ সেখানেই প্রকৃতি, যেখানে প্রকৃতি সেইখানেই পুরুষ।

আজ বিজয়া। ঠাকুর ডাক্তারকে মিষ্টমুখ করিতে বলিলেন। ভক্তেরা মিষ্টান্ন আনিয়া দিতেছেন।

ডাক্তার (খাইতে খাইতে) — খাবার জন্য ‘Thank you’ দিচ্ছি। তুমি যে অমন উপদেশ দিলে, তার জন্য নয়। সে ‘Thank you’ মুখে বলব কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তাঁতে মন রাখা। আর কি বলব? আর একটু একটু ধ্যান করা। (ছোট নরেনকে দেখাইয়া) দেখ দেখ এর মন ঈশ্বরে একেবারে লীন হয়ে যায়। যে-সব কথা তোমায় বলছিলাম। —

ডাক্তার — এদের সব বলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ — যার যা পেটে সয়। ওসব কথা কি সব্বাই লতে পারে? তোমাকে বললাম, সে এক। মা বাড়িতে মাছ এনেছে। সকলের পেট সমান নয়। কারুকে পোলোয়া করে দিলে, কারুকে আবার মাছের ঝোল। পেট ভাল নয়। (সকলের হাস্য)

ডাক্তার চলিয়া গেলে। আজ বিজয়া। ভক্তেরা সকলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তৎপরে পরস্পর কোলাকুলি করিতে লাগিলেন। আনন্দের সীমা নাই। ঠাকুরের অত অসুখ, সব ভুলাইয়া দিয়াছেন! প্রেমালিঙ্গন ও মিষ্টমুখ অনেকক্ষণ ধরিয়া হইতেছে। ঠাকুরের কাছে ছোট নরেন, মাস্টার ও আরও দু’চারিটি ভক্ত বসিয়া আছেন। ঠাকুর আনন্দে কথা কহিতেছেন। ডাক্তারের কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ডাক্তারকে আর বেশি কিছু বলতে হবে না।

“গাছটা কাটা শেষ হয়ে এলে, যে ব্যক্তি কাটে সে একটু সরে দাঁড়ায়। খানিকক্ষণ পরে গাছটা আপনিই পড়ে যায়।”

ছোট নরেন (সহাস্যে) — সবই Principle!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারকে) — ডাক্তার অনেক বদলে গেছে না?

মাস্টার — আজ্ঞা হাঁ। এখানে এলে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। কি ঔষধ দিতে হবে আদপেই সে কথা তোলেন না। আমরা মনে করে দিলে তবে বলেন, হাঁ হাঁ ঔষধ দিতে হবে।

বৈঠকখানা ঘরে ভক্তেরা কেহ কেহ গান গাহিতেছিলেন।

ঠাকুর যে ঘরে আছেন, সেই ঘরে তাঁহারা ফিরায়া আসিলে পর ঠাকুর বলিতেছেন, “তোমরা গান গাচ্ছিলে, — তাল হয় না কেন? কে একজন বেতালসিদ্ধ ছিল — এ তাই!” (সকলের হাস্য)

ছোট নরেনের আত্মীয় ছোকরা আসিয়াছেন। খুব সাজগোজ, আর চক্ষে চশমা। ঠাকুর ছোট নরেনের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখ, এই রাস্তা দিয়ে একজন ছোকরা যাচ্ছিল, প্লেটওলা জামা পরা। চলবার যে ঢঙ। প্লেটটা সামনে রেখে সেইখানটা চাদর খুলে দেয় — আবার এদিক-ওদিক চায়, — কেউ দেখছে কিনা। চলবার সময় কাঁকাল ভাঙা। (সকলের হাস্য) একবার দেখিস না।

"ময়ূর পাখা দেখায়। কিন্তু পাগুলো বড় নোংরা। (সকলের হাস্য) উট বড় কুৎসিত, — তার সব কুৎসিত।"

নরেনের আত্মীয় —— কিন্তু আচরণ ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— ভাল। তবে কাঁটা ঘাস খায় —— মুখ দে রক্ত পড়ে, তবুও খাবে! সংসারী, এই ছেলে মরে, আবার ছেলে ছেলে করে!

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২২শে অক্টোবর 1885/10/22/i

52.6 শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশান, ডাক্তার সরকার, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে শ্যামপুকুরের বাটীতে আনন্দ ও কথোপকথন

গৃহস্থাশ্রম কথাপ্রসঙ্গে

আশ্বিন শুক্লাচর্তুদশী। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিনদিন মহামায়ার পূজা মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। দশমীতে বিজয়া; তদুপলক্ষে পরস্পরের প্রেমালিঙ্গন ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে কলিকাতার অন্তর্বর্তী সেই শ্যামপুকুর নামক পল্লীতে বাস করিতেছেন। শরিরে কঠিন ব্যাধি, গলায় ক্যান্সার।

বলরামের বাড়িতে যখন ছিলেন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এ-রোগ সাধ্য না অসাধ্য। কবিরাজ এ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই, চুপ করিয়াছিলেন। ইংরেজ ডাক্তারেরাও রোগটি অসাধ্য, এ-কথা ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার, ২২শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ (৭ই কার্তিক, ১২৯২, শুক্লা চতুর্দশী)। শ্যামপুকুরস্থিত একটি দ্বিতল গৃহমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ — দুতলা ঘরের মধ্যে শয্যা রচনা হইয়াছে, তাহাতে উপবিষ্ট। ডাক্তার সরকার শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ভক্তেরা সম্মুখে এবং চারিদিকে সমাসীন। ঈশান বড় দানী, পেনশন লইয়াও দান করেন, ঋণ করিয়া দান করেন আর সর্বদাই ঈশ্বরচিন্তায় থাকেন। পীড়া শুনিয়া তিনি দেখিতে আসিয়াছেন। ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতে আসিয়া ছয়-সাত ঘণ্টা করিয়া থাকেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে সাতিশয় ভক্তিশ্রদ্ধা করেন ও ভক্তদের সহিত পরম আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করেন।

রাত্রি প্রায় ৭টা হইয়াছে। বাহিরে জ্যোৎস্না — পূর্ণাবয়ব নিশানাথ যেন চারিদিকে সুধা ঢালিয়াছেন। ভিতরে দীপালোক, ঘরে অনেক লোক। অনেকে মহাপুরুষ দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সকলেই একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। শুনিবেন তিনি কি বলেন ও দেখিবেন তিনি কি করেন। ঈশানকে দেখিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন —

[নির্লিপ্ত সংসারী — নির্লিপ্ত হবার উপায়]

“যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার করে, সে ধন্য, সে বীরপুরুষ! যেমন কারু মাথায় দুমন বোঝা আছে, আর বর যাচ্ছে, মাথায় বোঝা — তবু সে বর দেখছে। খুব শক্তি না থাকলে হয় না। যেমন পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে একটুকুও পাঁক নাই। পানকৌটি জলে সর্বদা ডুব মারে, কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলেই আর গায়ে জল থাকে না।

“কিন্তু সংসারে নির্লিপ্তভাবে থাকতে গেলে কিছু সাধন করা চাই। দিনকতক নির্জনে থাকা দরকার; তা একবছর হোক, ছয়মাস হোক তিনমাস হোক বা একমাস হোক। সেই নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়। সর্বদা তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ভক্তির জন্য প্রার্থনা করতে হয়। আর মনে মনে বলতে হয়, ‘আমার এ-সংসারে কেউ নাই, যাদের আপনার বলি, তারা দুদিনের জন্য। ভগবান আমার একমাত্র আপনার লোক, তিনিই আমার সর্বস্ব; হায়! কেমন করে তাঁকে পাব!’

“ভক্তিলাভের পর সংসার করা যায়। যেমন হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙলে হাতে আর আঠা লাগে না। সংসার জলের স্বরূপ আর মানুষের মনটি যেন দুধ। জলে যদি দুধ রাখতে যাও, দুধে-জলে এক হয়ে যাবে। তাই নির্জন স্থানে দই পাততে হয়। দই পেতে মাখন তুলতে হয়। মাখন তুলে যদি জলে রাখ, তাহলে জলে মিশবে না; নির্লিপ্ত হয়ে ভাসতে থাকবে।

“ব্রহ্মজ্ঞানীরা আমায় বলেছিল, মহাশয়! আমাদের জনক রাজার মত। তাঁর মতো নির্লিপ্তভাবে আমরা সংসার করব। আমি বললুম, ‘নির্লিপ্তভাবে সংসার করা বড় কঠিন। মুখে বললেই জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা হেঁটমুণ্ড হয়ে ঊর্ধ্বপদ করে কত তপস্যা করেছিলেন! তোমাদের হেঁটমুণ্ড বা ঊর্ধ্বপদ হতে

হবে না, কিন্তু সাধন চাই। নির্জনে বাস চাই! নির্জনে জ্ঞানলাভ, ভক্তিলাভ করে তবে গিয়ে সংসার করতে হয়। দই নির্জনে পাততে হয়। ঠেলাঠেলি নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না।'

"জনক নির্লিপ্ত বলে তাঁর একটি নাম বিদেহ; — কিনা, দেহে দেহবুদ্ধি নাই। সংসারে থেকেও জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়াতেন। কিন্তু দেহবুদ্ধি যাওয়া অনেক দূরের কথা! খুব সাধন চাই!

"জনক ভারী বীরপুরুষ। দুখানা তরবার ঘুরাতেন। একখানা জ্ঞান একখানা কর্ম।"

[সংসার আশ্রমের জ্ঞান ও সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞান]

"যদি বল, সংসার আশ্রমের জ্ঞানী আর সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞানী, এ-দুয়ের তফাত আছে কিনা? আর উত্তর এই যে দুই-ই এক জিনিস। এটিও জ্ঞানী উটিও জ্ঞানী — এক জিনিস। তবে সংসারে জ্ঞানীরও ভয় আছে। কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর থাকতে গেলেই একটু না একটু ভয় আছে। কাজলের ঘরে থাকতে গেলে যত সিয়ানাই হও না কেন কালো দাগ একটু না একটু গায়ে লাগবেই।

"মাখন তুলে যদি নূতন হাঁড়িতে রাখ, মাখন নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে না। যদি ঘোলের হাঁড়িতে রাখ, সন্দেহ হয়। (সকলের হাস্য)

“খই যখন ভাজা হয় দু চারটে খই খোলা থেকে টপ্ টপ্ করে লাফিয়ে পড়ে। সেগুলি যেন মল্লিকা ফুলের মতো, গায়ে একটু দাগ থাকে না। খোলার উপর যে-সব খই থাকে, সেও বেশ খই, তবে অত ফুলের মতো হয় না, একটু গায়ে দাগ থাকে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী যদি জ্ঞানলাভ করে, তবে ঠিক এই মল্লিকা ফুলের মতো দাগশূন্য হয়। আর জ্ঞানের পর সংসার খোলায় থাকলে একটু গায়ে লালচে দাগ হতে পারে। (সকলের হাস্য)

“জনক রাজার সভায় একটি ভৈরবী এসেছিল। স্ত্রীলোক ধেখে জনক রাজা হেঁটমুখ হয়ে চোখ নিচু করেছিলেন। ভৈরবী তাই দেখে বলেছিলেন, ‘হে জনক, তোমার এখনও স্ত্রীলোক দেখে ভয়!’ পূর্ণজ্ঞান হলে পাঁচ বছরের ছেলের স্বভাব হয় — তখন স্ত্রী-পুরুষ বলে ভেদবুদ্ধি থাকে না।

“যাই হোক যদিও সংসারের জ্ঞানীর গায়ে দাগ থাকতে পারে, সে দাগ কোন ক্ষতি হয় না। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বটে কিন্তু আলোর ব্যাঘাত হয় না।”

[জ্ঞানের পর কর্ম — লোকসংগ্রহার্থ]

“কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করে, যেমন জনক ও নারদাদি। লোকশিক্ষার জন্য শক্তি থাকা চাই। ঋষিরা নিজের নিজের জ্ঞানের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। নারদাদি আচার্য লোকের হিতের জন্য বিচরণ করে বেড়াতেন। তাঁরা বীরপুরুষ।

"হাবাতে কাঠ যখন ভেসে যায়, পাখি একটি বসলে ডুবে যায়, কিন্তু বাহাদুরী কাঠ যখন ভেসে যায়, তখন গরু, মানুষ, এমন কি হাতি পর্যন্ত তার উপর যেতে পারে। স্টীমবোট আপনিও পারে যায়, আবার কত মানুষকে পার করে দেয়।

"নারদাদি আচার্য বাহাদুরী কাঠের মতো, স্টীমবোট-এর মতো।

"কেউ খেয়ে গামছা দুএ মুখে মুছে বসে থাকে, পাছে কেউ টের পায়। (সকলের হাস্য) আবার কেউ কেউ একটি আম পেলে কেটে একটু একটু সকলকে দেয়, আর আপনিও খায়। "নারদাদি আচার্য সকলের মঙ্গলের জন্য জ্ঞানলাভের পরও ভক্তি লয়ে ছিলেন।"

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২২শে অক্টোবর 1885/10/22/ii

52.7 যুগধর্ম কথাপ্রসঙ্গে —— জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ

ডাক্তার —— জ্ঞানে মানুষ অবাক্‌ হয়, চক্ষু বুজে যায়, আর চক্ষে জল আসে। তখন ভক্তি দরকার হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ভক্তি মেয়েমানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান বারবাড়ি পর্যন্ত যায়। (সকলের হাস্য)

ডাক্তার — কিন্তু অন্তঃপুরে যাকে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। বেশ্যারা ঢুকতে পারে না। জ্ঞান চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঠিক পথ জানে না, কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি আছে, তাঁকে জানবার ইচ্ছা আছে — এরূপ লোক কেবল ভক্তির জোরে ঈশ্বরলাভ করে। একজন ভারী ভক্ত জগন্নাথদর্শন করতে বেরিয়েছিল। পুরীর কোন্‌পথ সে জানত না, দক্ষিণদিকে না গিয়ে পশ্চিমদিকে গিছিল। পথ ভুলেছিল বটে, কিন্তু ব্যাকুল হয়ে লোকদের জিজ্ঞাসা করত। তারা বলে দিলে, 'এ পথ নয়, ওই পথে যাও।' ভক্তটি শেষে পুরীতে গিয়ে জগন্নাথদর্শন করলে। দেখ, না জানলেও কেউ না কেউ বলে দেয়।

ডাক্তার — সে ভুলে তো গিছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, তা হয় বটে, কিন্তু শেষে পায়।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঈশ্বর সাকার না নিরাকার।'

শ্রীরামকৃষ্ণ — তিনি সাকার আবার নিরাকার। একজন সন্ন্যাসী জগন্নাথদর্শন করতে গিছিল। জগন্নাথদর্শন করে সন্দেহ হল ঈশ্বর সাকার না নিরাকার। হাতে দণ্ড ছিল, সেই দণ্ড দিয়ে দেখতে লাগল, জগন্নাথের গায়ে ঠেকে কিনা। একবার এ-ধার থেকে ও-ধারে দণ্ডটি নিয়ে যাবার সময় দেখলে যে, জগন্নাথের গায়ে

ঠেকল না — দেখে যে সেখানে ঠাকুরের মূর্তি নাই! আবার দণ্ড এ-ধার থেকে ও-ধারে লয়ে যাবার সময় বিগ্রহের গায়ে ঠেকল; তখন সন্ন্যাসী বুঝলে যে ঈশ্বর নিরাকার, আবার সাকার।

“কিন্তু এটি ধারণা করা বড় শক্ত। যিনি নিরকার, তিনি আবার সাকার কিরূপে হবেন? এ-সন্দহ মনে উঠে। আবার যদি সাকার হন, তো নানারূপ কেন?”

ডাক্তার — যিনি আকার করেছেন, তিনি সাকার। তিনি আবার মন করেছেন, তাই তিনি নিরাকার। তিনি সবই হতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বরকে লাভ না করতে পারলে, এ-সব বুঝা যায় না। সাধকের জন্য তিনি নানাভাবে নানারূপে দেখা দেন। একজনের এক গামলা রঙ ছিল। অনেকে তার কাছে কাপড় রঙ করাতে আসত। সে লোকটি জিজ্ঞাসা করত, তুমি কি রঙে ছোপাতে চাও। একজন হয়তো বললে, ‘আমি লাল রঙে ছোপাতে চাই।’ অমনি সেই লোকটি গামলার রঙে সেও কাপড়খানি ছুপিয়ে বলত, ‘এই লও, তোমার লাল রঙে ছোপানো কাপড়।’ আর-একজন হয়তো বললে, ‘আমার হলদে রঙে ছোপানো চাই।’ অমনি সেই লোকটি সেই গামলায় কাপড়খানি ডুবিয়ে বলত, ‘এই লও তোমার হলদে রঙ।’ নীল রঙে ছোপাতে চাইলে আবার সেই একই গামলায় ডুবিয়ে সেই কথা, ‘এই লও তোমার নীল রঙে ছোপানো কাপড়।’ এইরকমে যে যে রঙে ছোপাতে চাইত, তার কাপড় সেই রঙে সেই একই গামলা হতে ছোপানো হত। একজন লোক এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখছিল। যার গামলা, সে জিজ্ঞাসা করলে, ‘কেমন হে! তোমার কি রঙে

ছোপাতে হবে?’ তখন সে বললে, ‘ভাই! তুমি যে রঙে রঙেছ, আমায় সেই রঙ দাও!’ (সকলের হাস্য)

“একজন বাহ্যে গিছিল — দেখলে, গাছের উপর একটি সুন্দর জানোয়ার রয়েছে। সে ক্রমে আর একজনকে বললে, ‘ভাই! অমুক গাছে আমি একটি লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলুম।’ সে লোকটি বললে, ‘আমিও দেখেছি, তা সে লাল রঙ হতে যাবে কেন? সে যে সবুজ রঙ।’ আর একজন বললে, না, না; সে সবুজ হতে যাবে কেন, কালো ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে একজন লোক বসে। জিজ্ঞাসা করায়, সে বললে, ‘আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি। তোমারা যা যা বলছো সব সত্য, সে কখনও লাল, কখনও সবুজ, কখনও হলদে, কখনও নীল আরও সব কত কি হয়। আবার কখনও দেখি কোন রঙই নাই!’

“যে ব্যক্তি সদাসর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করে, সেই জানতে পারে, তাঁর স্বরূপ কি। সে ব্যক্তিই জানে যে ঈশ্বর নানারূপে দেখা দেন। নানাভাবে দেখা দেন। তিনি সগুণ আবার নির্গুণ। গাছতলায় যে থাকে সেই জানে যে, বহুরূপীর নানারঙ, আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায়।

“তিনি সাকার, তিনি নিরাকার। কিরকম জানো? যেন সচ্চিদানন্দ-সমুদ্র। কূল কিনারা নাই। ভক্তিহিমে সেই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়, যেন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে; অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে কখন কখন সাকাররূপ হয়ে দেখা দেন। আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে সে বরফ গলে যায়।”

ডাক্তার — সূর্য উঠলে বরফ গলে জল হয়; আবার জানেন, জল আবার নিরাকার বাষ্প হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা’ এই বিচারের পর সমাধি হলে রূপ-টুপ উড়ে যায়। তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Person) বলে বোধ হয় না। কি তিনি মুখে বলা যায় না। কে বলবে? যিনি বলবেন তিনিই নাই। তিনি তাঁর ‘আমি’ আর খুঁজে পান না। তখন ব্রহ্ম নির্গুণ (Absolute)। তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন। মন-বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না। (Unknown and Unknowable)

“তাই বলে, ভক্তি — চন্দ্র; জ্ঞান — সূর্য। শুনেছি, খুব উত্তরে আর দক্ষিণে সমুদ্র আছে। এত ঠাণ্ডা যে, জল জমে মাঝে মাঝে বরফের চাঁই হয়। জাহাজ চলে না। সেখানে গিয়ে আটকে যায়।”

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, তা যায় বটে, কিন্তু তাতে হানি হয় না, সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরের জলই জমাট বেঁধে বরফ হয়েছে। যদি আরও বিচার করতে চাও, যদি ‘ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা’ এই বিচার কর, তাতেও ক্ষতি নাই। জ্ঞানসূর্যেই বরফ গলে যাবে; তবে সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরই রইল।

[কাঁচা আমি ও পাকা আমি — ভক্তের আমি — ভক্তের আমি — বালকের আমি]

“জ্ঞানবিচারের শেষে সমাধি হলে, আমি-টামি কিছু থাকে না। কিন্তু সমাধি হওয়া বড় কঠিন। ‘আমি’ কোন মতে যেতে চায় না। আর যেতে চায় না বলে, ফিরে এই সংসারে আসতে হয়।

“গরু হাম্বা হাম্বা (আমি, আমি) করে তাই এত দুঃখ! সমস্ত দিন লাঙল দিতে হয় — গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই। কিম্বা তাকে কসাইয়ে কাটে। তাতেও নিস্তার নাই। চামারে চামড়া করে, জুতা তৈয়ারি করে। অবশেষে নাড়ীভুঁড়ি থেকে তাঁত হয়। ধুনুরীর হাতে পড়ে যখন তুঁহু তুঁহু (তুমি তুমি) করে, তখন নিস্তার হয়।

“যখন জীব বলে, ‘নাহং’ ‘নাহং’ ‘নাহং’ আমি কেহ নি, হে ঈশ্বর! তুমি কর্তা; আমি দাস তুমি প্রভু — তখন নিস্তার; তখনই মুক্তি।”

ডাক্তার — কিন্তু ধুনুরীর হাতে পড়া চাই। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ — যদি একান্ত ‘আমি’ না যাস, থাক শালা ‘দাস আমি’ হয়ে। (সকলের হাস্য)

“সমাধির পর কাহারও ‘আমি’ থাকে — ‘দাস আমি’, ‘ভক্তের আমি’। শঙ্করাচার্য ‘বিদ্যার আমি’ লোকশিক্ষার জন্য রেখে দিয়েছিলেন। ‘দাস আমি’, ‘বিদ্যার আমি’, ‘ভক্তের আমি’ — এরই নাম ‘পাকা আমি’। কাঁচা আমি কি জান? আমি কর্তা, আমি এত বড়লোকের ছেলে, বিদ্বান, আমি ধনবান আমাকে এমন কথা বলে! — এই সব ভাব। যদি কেউ বাড়িতে চুরি করে, তাকে যদি ধরতে পারে, প্রথমে সব জিনিসপত্র কেড়ে লয়; তারপর উত্তম-মধ্যম মারে, তারর পুলিসে দেয়! বলে, ‘কি! জানে না, কার চুরি করেছে!’

"ঈশ্বরলাভ হলে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়। 'বালকের আমি' আর 'পাকা আমি'। বালক কোন গুণের বশ নয়। ত্রিগুণাতীত। সত্ত্ব রজঃ তমঃ কোন গুণের বশ নয়। দেখ, ছেলে তমোগুণের বশ নয়। এইমাত্র ঝগড়া মারামারি করলে, আবার তৎক্ষণাৎ তারই গলা ধরে কত ভাব, কত খেলা! রজোগুণেরও বশ নয়। এই খেলাঘর পাতলে কত বন্দোবস্ত, কিছুক্ষণ পরেই সব পড়ে রইল; মার কাছে ছুটেছে। হয়তো এখখানি সুন্দর কাপড় পরে বেড়াচ্ছে। খানিকক্ষণ পরে কাপড় খুলে পড়ে গেছে। হয় কাপড়ের কথা একেবারে ভুলে গেল — নয় বগলদাবা করে বেড়াচ্ছে! (হাস্য)

"যদি ছেলেটিকে বল, 'বেশ কাপড়খানি, কার কাপড় রে?' সে বলে, 'আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েছে।' যদি বল, 'লক্ষ্মী ছেলে, আমায় কাপড়খানি দাও না।' সে বলে, 'না, আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েছে, না আমি দেবো না।' তারপর ভুলিয়ে একটি পুতুল কি আর একটি বাঁশি যদি দাও তাহলে পাঁচটাকা দামের কাপড়খানা তোমায় দিয়ে চলে যাবে। আবার পাঁচ বছরের ছেলের সত্ত্বগুণেরও আঁট নাই। এই পাড়ার খেলুড়েদের সঙ্গে কত ভালবাসা, একদণ্ড না দেখলে থাকতে পারে না। কিন্তু বাপ-মার সঙ্গে যখন অন্য জায়গায় চলে গেল, তখন নূতন খেলুড়ে হল। তাদের উপর তখন সব ভালবাসা পড়ল; পুরানো খেলুড়েদের একেবারে ভুলে গেল। তারপর জাত অভিমান নাই। মা বলে দিয়েছে, ও তোর দাদা হয়, তা সে ষোল আনা জানে যে, এ আমার ঠিক দাদা। তা একজন যদি বামুনের ছেলে হয় আর-একজন যদি কামারের ছেলে হয়, তো একপাতে বসে ভাত খাবে। আর শুচি-অশুচি নাই, হেগোপোঁদে খাবে! আবার

লোকলজ্জা নাই, ছোঁচাবার পর যাকে-তাকে পেছন ফিরে বলে — দেখ দেখি, আমার ছোঁচানো হয়েছে কি না?

“আবার, ‘বুড়োর আমি’ আছে। (ডাক্তারের হাস্য) বুড়োর অনেকগুলি পাশ। জাতি, অভিমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, বিষয়বুদ্ধি, পাটোয়ারী, কপটতা। যদি কারুর উপর আকোছ হয়, তো সহজে যায় না — হয়তো যতদিন বাঁচে ততদিন যায় না। তারপর পাণ্ডিত্যের অহংকার, ধনের অহংকার। ‘বুড়োর আমি’ কাঁচা আমি।”

[জ্ঞান কাহাদের হয় না]

(ডাক্তারের প্রতি) — “চার-পাঁচজনের জ্ঞান হয় না। যার বিদ্যার অহংকার, যার পাণ্ডিত্যের অহংকার, যার ধনের অহংকার, তার জ্ঞান হয় না। এ সব লোককে যদি বলা যায় যে অমুক জায়গায় বেশ একটি সাধু আছে, দেখতে যাবে? তারা অমনি নানা ওজর করে বলে, যাব না। আর মনে মনে বলে, আমি এতবড় লোক, আমি যাব?”

[তিনগুণ — সত্ত্বগুণে ঈশ্বরলাভ — ইন্দ্রিয় সংযমের উপায়]

“তমোগুণের স্বভাব অহংকার। অহংকার অজ্ঞান, তমোগুণ থেকে হয়।

“পুরাণে আছে রাবণের রজোগুণ, কুম্ভকর্ণের তমোগুণ, বিভীষণের সত্ত্বগুণ। তাই বিভীষণ রামচন্দ্রকে লাভ করেছিলেন। তমোগুণের আর একটি লক্ষণ —

ক্রোধ। ক্রোধে দিক-বিদিক জ্ঞান থাকে না, হনুমান লঙ্কা পুড়ালেন, এ-জ্ঞান নাই যে সীতার কুটির নষ্ট হবে।

“আবার তমোগুণের আর একটি লক্ষণ — কাম। পাথুরেঘাটার গিরীন্দ্র ঘোষ বলেছিল, কাম-ক্রোধাদি রিপু এরা তো যাবে বা, এদের মোড় ফিরিয়ে দাও। ঈশ্বরের কামনা কর। সচ্চিদানন্দর সহিত রমণ কর। ক্রোধ যদি না খায়, ভক্তির তমঃ আন। কি! আমি দুর্গানাম করেছি, উদ্ধার হব না? আমার আবার পাপ কি? বন্ধন কি? তারপর ঈশ্বরলাভ করবার লোভ কর। ঈশ্বরের রূপে মুগ্ধ হও। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের ছেলে, যদি অহংকার করতে হয়, তো এই অহংকার কর। এইরকমে ছয় রিপুর মন ফিরিয়ে দিতে হয়।”

ডাক্তার — ইন্দ্রিয়সংযম করা বড় শক্ত। ঘোড়ার চক্ষের দুদিকে ঠুলি দাও। কোন কোন ঘোড়ার চক্ষু একেবারে বন্ধ করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁর যদি একবার কৃপা হয়, ঈশ্বরের যদি একবার দর্শনলাভ হয়, আত্মার যদি একবার সাক্ষাৎকার হয়, তাহলে আর কোন ভয় নাই — তখন ছয় রিপু আর কিছু করতে পারবে না।

“নারদ, প্রহ্লাদ এই সব নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষদের অত করে চক্ষের দুদিকে ঠুলি দিতে হয় না। যে ছেলে নিজে বাপের হাত ধরে মাঠের আলপথে চলছে সে ছেলে বরং অসাবধান হয়ে বাপের হাত ছেড়ে দিয়ে খানায় পড়তে পারে। কিন্তু বাপ যে ছেলের হাত ধরে, সে কখনও খানায় পড়ে না।”

ডাক্তার — কিন্তু বাপ ছেলের হাত ধরা ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা নয়। মহাপুরুষদের বালক স্বভাব। ঈশ্বরের কাছে তারা সর্বদাই বালক, তাদের অহংকার থাকে না। তাদের সব শক্তি ঈশ্বরের শক্তি, বাপের শক্তি, নিজের কিছুই নয়। এইটি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

[বিচারপথ ও আনন্দপথ — জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ]

ডাক্তার — আগে ঘোড়ার চক্ষের দুইদিকে ঠুলি না দিলে, ঘোড়া কি এগুতে চায়? রিপু বশ না হলে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি যা বলছো, ওকে বিচারপথ বলে — জ্ঞানযোগ বলে। ও-পথেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। জ্ঞানীরা বলে, আগে চিত্তশুদ্ধি হওয়া দরকার। আগে সাধন চাই, তবে জ্ঞান হবে।

“ভক্তিপথেও তাঁকে পাওয়া যায়। যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়, যদি তাঁর নামগূনগান করতে ভাল লাগে, ইন্দ্রিয় সংযম আর চেষ্টা করে করতে হয় না। রিপুবশ আপনা-আপনি হয়ে যায়।

“যদি কারও পুত্রশোক হয়, সেদিন সে কি আর লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে, না, নিমন্ত্রণে গিয়ে খেতে পারে? সে কি লোকের সামনে অহংকার করে বেড়াতে পারে, না, সুখ সম্ভোগ করতে পারে?

“বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখতে পায়, তাহলে কি সে আর অন্ধকারে থাকে? ডাক্তার (সহাস্যে) — তা পুড়েই মরুক সেও স্বীকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ — না গো! ভক্ত কিন্তু বাদুলে পোকার মতো পুড়ে মরে না। ভক্ত যে আলো দেখে ছুটে যায়, সে যে মণির আলো! মণির আলো খুব উজ্জ্বল বটে, কিন্তু স্নিগ্ধ আর শীতল। এ-আলোতে গা পুড়ে না, এ-আলোতে শান্তি হয়, আনন্দ হয়।

[জ্ঞানযোগ বড় কঠিন]

"বিচারপথে জ্ঞানযোগের পথে, তাঁকে পাওয়া যায়। কিন্তু এ-পথ বড় কঠিন। আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই। আমার রোগ নাই, শোক নাই, অশান্তি নাই; আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আমি সুখ-দুঃখের অতীত, আমি ইন্দ্রিয়ের বশ নই, এ-সব কথা মুখে বলা খুব সোজা। কাজে করা, ধারণা হওয়া বড় কঠিন। কাঁটাতে হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর করে রক্ত পড়ছে, অথচ বলছি, কই কাঁটায় আমার হাত কাটে নাই, আমি বেশ আছি। এ-সব বলা সাজে না। আগে ওই কাঁটাকে জ্ঞানাগ্নিতে পোড়াতে হবে তো।"

[বইপড়া জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য — ঠাকুরের শিক্ষাপ্রণালী]

"অনেকে মনে করে, বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না, বিদ্যা হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শুনা ভাল, শুনার চেয়ে দেখা ভাল। কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয় শুনা, আর কাশীদর্শন অনেক তফাত।

"আবার যারা নিজে সতরঞ্চ খেলে, তারা চাল তত বুঝে না, কিন্তু যারা না খেলে, উপর চাল বলে দেয়, তাদের চাল ওদের চেয়ে অনেকটা ঠিক ঠিক হয়। সংসারী লোক মনে করে, আমরা বড় বুদ্ধিমান কিন্তু তারা বিষয়াসক্ত। নিজে খেলছে।

নিজেদের চাল ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু সংসারত্যাগী সাধুলোক বিষয়ে অনাসক্ত। তারা সংসারীদের চেয়ে বুদ্ধিমান। নিজে খেলে না, তাই উপর চাল ঠিক বলে দিতে পারে।”

ডাক্তার (ভক্তদিগের প্রতি) — বই পড়লে এ-ব্যক্তির (পরমহংসদেবের) এত জ্ঞান হত না। Faraday communed with Nature. প্রকৃতিকে ফ্যারাডে নিজে দর্শন করত, তাই অত Scientific truth discover করতে পেরেছিল। বই পড়ে বিদ্যা হলে অত হত না। Mathematical formulae only throw the brain into confusion — Original inquiry-র পথে বড় বিঘ্ন এনে দেয়।

[ঈশ্বর-প্রদত্ত জ্ঞান — Divine wisdom and Book learning]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) — যখন পঞ্চবটীতে মাটিতে পড়ে পড়ে মাকে ডাকতুম, আমি মাকে বলেছিলাম, মা, আমায় দেখিয়ে দাও কর্মীরা কর্ম করে যা পেয়েছে, যোগীরা যোগ করে যা দেখেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে। আরও কত কি তা কি বলব!

“আহা! কি অবস্থাই গেছে! ঘুম যায়!”

এই বলিয়া পরমহংসদেব গান করিয়া বলিতে লাগিলেন —

“ঘুম ভেঙেছে আর কি ঘুমাই, যোগে-যাগে জেগে আছি।
এখন যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি!

“আমি তো বই-টই কিছুই পড়িনি, কিন্তু দেখ মার নাম করি বলে আমায় সবাই মানে। শম্ভু মল্লিক আমায় বলেছিল, ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, শান্তিরাম সিং?” (সকলের হাস্য)

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের বুদ্ধদেবচরিত অভিনয় কথা হইতে লাগিল। তিনি ডাক্তারকে নিমন্ত্রণ করিয়া ওই অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। ডাক্তার উহা দেখিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছিলেন।

ডাক্তার (গিরিশের প্রতি) — তুমি বড় বদলোক! রোজ থিয়েটারে যেতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — কি বলছে, আমি বুঝতে পারছি না।

মাস্টার —– ওঁর থিয়েটার বড় ভাল লেগেছে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২২শে অক্টোবর 1885/10/22/iii

52.8 অবতারকথাপ্রসঙ্গে —– অবতার ও জীব

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি) — তুমি কিছু বল না; এ (ডাক্তার) অবতার মানছে না।

ঈশান —— আজ্ঞা, কি আর বিচার করব। বিচার আর ভাল লাগে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া) — কেন? সঙ্গত কথা বলবে না?

ঈশান (ডাক্তারের প্রতি) — অহংকারের দরুন আমাদের বিশ্বাস কম। কাকভূষণ্ডী রামচন্দ্রকে প্রথমে অবতার বলে মানে নাই। শেষে যখন চন্দ্রলোক, দেবলোক, কৈলাস ভ্রমণ করে দেখলে যে রামের হাত থেকে কোনরূপেই নিস্তার নাই, তখন নিজে ধরা দিল, রামের শরণাগত হল। রাম তখন তাকে ধরে মুখের ভিতর নিয়ে গিলে ফেললেন। ভূষণ্ডী তখন দেখে যে, সে তার গাছে বসে রয়েছে। অহংকার চূর্ণ হলে কাকভূষণ্ডী জানতে পারলে যে, রামচন্দ্র দেখতে আমাদের মতো মানুষ বটে, কিন্তু তাঁরই উদরে ব্রহ্মাণ্ড। তাঁরই উদরের ভিতর আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, সমুদ্র, পর্বত, জীব, জন্তু, গাছ ইত্যাদি।

[জীবের ক্ষুদ্র বুদ্ধি —— Limited Powers of the conditioned]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) — ওইটুকু বুঝা শক্ত, তিনিই স্বরাট তিনিই বিরাট। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। তিনি মানুষ হতে পারেন না, এ-কথা জোর করে আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি বলতে পারি? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ-সব কথা কি ধারণা হতে পারে? একসের ঘটিতে কি চারসের দুধ ধরে?

“তাই সাধু মহাত্মা যাঁরা ঈশ্বরলাভ করেছেন, তাঁদের কথা বিশ্বাস করতে হয়। সাধুরা ঈশ্বরচিন্তা লয়ে থাকেন, যেমন উকিলরা মোকদ্দমা লয়ে থাকে। তোমার কাকভূষণ্ডীর কথা কি বিশ্বাস হয়?”

ডাক্তার — যেটুকু ভাল, বিশ্বাস করলুম। ধরা দিলেই চুকে যায়, কোন গোল থাকে না। রামকে অবতার কেমন করে বলি? প্রথমে দেখ বালীবধ। লুকিয়ে চোরের মত বাণ মেরে তাকে মেরে ফেলা হল। এ তো মানুষের কাজ, ঈশ্বরের নয়।

গিরিশ ঘোষ — মহাশয়, এ-কাজ ঈশ্বরই পারেন।

ডাক্তার — তারপর দেখ সীতাবর্জন।

গিরিশ — মহাশয়, এ-কাজও ঈশ্বরই পারেন, মানুষ পারে না।

[সায়েন্স — না মহাপুরুষের বাক্য?]

ঈশান (ডাক্তারের প্রতি) — আপনি অবতার মানছেন না কেন? এই বললেন, যিনি আকার করেছেন তিনি সাকার, যিনি মন করেছেন তিনি নিরাকার। এই আপনি বললেন, ঈশ্বরের কাণ্ড হতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) — ঈশ্বর অবতার হতে পারেন, এ-কথা যে ওঁর সায়েন্স-এ (ইংরাজী বিজ্ঞানশাস্ত্রে) নাই! তবে কেমন করে বিশ্বাস হয়? (সকলের হাস্য)

“একটা গল্প শোন — একজন এসে বললে, ওহে! ও-পাড়ায় দেখে এলুম অমুকের বাড়ি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গেছে। যাকে ও-কথা বললে, সে ইংরাজী লেখা-পড়া জানে। সে বললে দাঁড়াও, একবার খপরের কাগজখানা দেখি। খপরের কাগজ পড়ে দেখে যে, বাড়ি ভাঙার কথা কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বললে, ওহে তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করি না। কই, বাড়ি ভাঙার কথা তো খপরের কাগজে লেখা নাই। ও-সব মিছে কথা।” (সকলের হাস্য)

গিরিশ (ডাক্তারের প্রতি) — আপনার শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর মানতে হবে। আপনাকে মানুষ মানতে দেব না। বলতে হবে Demon or God (হয় শয়তান, নয় ঈশ্বর)।

[সরলতা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস]

শ্রীরামকৃষ্ণ — সরল না হলে ঈশ্বরে চট করে বিশ্বাস হয় না। বিষয়বুদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দূর। বিষয়বুদ্ধি থাকলে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, আর নানারকম অহংকার এসে পড়ে — পাণ্ডিত্যের অহংকার, ধনের অহংকার — এই সব। ইনি (ডাক্তার) কিন্তু সরল।

গিরিশ (ডাক্তারের প্রতি) — মহাশয়! কি বলেন? কুরুটের কি জ্ঞান হয়?

ডাক্তার — রাম বলো! তাও কখন হয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেশব সেন কি সরল ছিল! একদিন ওখানে (রাসমণির কালীবাড়িতে) গিছিল। অতিথিশালা দেখে বেলা চারটের সময় বলে, হাঁগা অতিথি-কাঙালদের কখন খাওয়া হবে?

“বিশ্বাস যত বাড়বে, জ্ঞানও তত বাড়বে। যে গরু বেছে বেছে খায় সে ছিড়িক ছিড়িক করে দুধ দেয়। যে গরু শাকপাতা, খোসা, ভুষি, যা দাও, গবগব করে খায়, সে গরু হুড়হুড় করে দুধ দেয়। (সকলের হাস্য)

“বালকের মতো বিশ্বাস না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। মা বলেছেন, ‘ও তোর দাদা’ বালকের অমনি বিশ্বাস যে, ও আমার ষোল আনা দাদা। মা বলেছেন, ‘জুজু আছে।’ ষোল আনা বিশ্বাস যে, ও-ঘরে জুজু আছে। এইরূপ বালকের ন্যায় বিশ্বাস দেখলে ঈশ্বরের দয়া হয়। সংসার বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।”

ডাক্তার (ভক্তদের প্রতি) — গরুর কিন্তু যা তা খেয়ে দুধ হওয়া ভাল নয়। আমার একটা গরুকে ওইরকম যা তা খেতে দিত। শেষে আমার ভারী ব্যারাম। তখন ভাবলুম, এর কারণ কি? অনেক অনুসন্ধান করে টের পেলুম, গরু খুদ ও আরও কি কি খেয়েছিল। তখন মহা মুশকিল! লখনউ যেতে হল। শেষে বার হাজার টাকা খরচ! (সকলের হো-হো করিয়া হাস্য)

“কিসে কি হয় বলা যায় না। পাকপাড়ার বাবুদের বাড়িতে সাত মাসের মেয়ের অসুখ করেছিল — ঘুঙরী কাশি (Whooping Cough) — আমি দেখতে গিছিলাম। কিছুতেই অসুখের কারণ ঠিক করতে পারি নাই। শেষে জানতে পারলুম, গাধা ভিজেছিল, যে গাধার দুধ সে মেয়েটি খেত।” (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি বল গো! তেঁতুলতলায় আমার গাড়ি গিছিল, তাই আমার অম্বল হয়েছে! (ডাক্তার ও সকলের হাস্য)

ডাক্তার (হাসিতে হাসিতে) — জাহাজের ক্যাপ্তেনের বড় মাথা ধরেছিল। তা ডাক্তারেরা পরামর্শ করে জাহজের গায়ে বেলেস্তারা (blister) লাগিয়ে দিল। (সকলের হাস্য)

[সাধুসঙ্গ ও ভোগবিলাস ত্যাগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) — সাধুসঙ্গ সর্বদাই দরকার। রোগ লেগেই আছে। সাধুরা যা বলেন, সেইরূপ করতে হয়। শুধু শুনলে কি হবে? ঔষধ খেতে হবে, আবার আহারের কটকেনা করতে হবে। পথ্যের দরকার।

ডাক্তার —— পথ্যতেই সারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— বৈদ্য তিনপ্রকার —— উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে 'ঔষধ খেও হে' এই কথা বলে চলে যায়, সে অধম বৈদ্য —— রোগী খেলে কিনা, এ-খবর সে লয় না। আর যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক করে বুঝায়, মিষ্ট কথাতে বলে। 'ওহে ঔষধ না খেলে কেমন করে ভাল হবে? লক্ষ্মীটি খাও, আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি খাও', সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য রোগী কোন মতে খেলে না দেখে, বুকে হাঁটু দিয়ে জোর করে ঔষধ খাইয়ে দেয়, সে উত্তম বৈদ্য।

ডাক্তার —— আবার এমন ঔষধ আছে, যাতে বুকে হাঁটু দিতে হয় না। যেমন হোমিওপ্যাথিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— উত্তম বৈদ্য বুকে হাঁটু দিলে কোন ভয় নাই।

“বৈদ্যের মতো আচার্যও তিনপ্রকার। যিনি ধর্ম উপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর কোন খবর লন না, তিনি অধম আচার্য। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বারবার বুঝান, যাতে উপদেশগুলি ধারণা করতে পারে, অনেক অনুনয় বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান — তিনি মধ্যম আচার্য। আর যখন শিষ্যেরা কোনও মতে শুনছে না দেখে, কোনও আচার্য জোর পর্যন্ত করেন, তাঁকে বলি উত্তম আচার্য।”

[স্ত্রীলোক ও সন্ন্যাসী — সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম]

(ডাক্তারের প্রতি) — “সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ। স্ত্রীলোকের পট পর্যন্ত সন্ন্যাসী দেখবে না। স্ত্রীলোক কিরূপ জান? যেমন আচার তেঁতুল। মনে করলে, মুখে জল সরে। আচার তেঁতুল সম্মুখে আনতে হয় না।

“কিন্তু এ-কথা আপনাদের পক্ষে নয়, — এ সন্নাসীর পক্ষে। আপনারা যতদূর পার স্ত্রীলোকের সঙ্গে অনাসক্ত হয়ে থাকবে। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে ঈশ্বরচিন্তা করবে। সেখানে যেন ওরা কেউ না থাকে। ঈশ্বরেতে বিশ্বাস ভক্তি এলে, অনেকটা অনাসক্ত হয়ে থাকতে পারবে। দুই-একটি ছেলে হলে স্ত্রী-পুরুষ দুইজনে ভাই-বোনের মতো থাকবে, আর ঈশ্বরকে সর্বদা প্রার্থনা করবে, যাতে ইন্দ্রিয় সুখেতে মন না যায়, — ছেলেপুলে আর না হয়।”

গিরিশ (সহাস্যে, ডাক্তারের প্রতি) — আপনি এখানে তিন-চার ঘণ্টা রয়েছেন; কই, রোগীদের চিকিৎসা করতে যাবেন না?

ডাক্তার — আর ডাক্তারী আর রোগী! যে পরমহংস হয়েছে, আমার সব গেল! (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখ কর্মনাশা বলে একটি নদী আছে। সে নদীতে ডুব দেওয়া এক মহাবিপদ। কর্মনাশ হয়ে যায় — সে ব্যক্তি আর কোন কর্ম করতে পারে না। (ডাক্তার ও সকলের হাস্য)

ডাক্তার (মাস্টার, গিরিশ ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি) — দেখ, আমি তোমাদেরই রইলুম। ব্যারামের জন্য যদি মনে কর, তাহলে নয়। তবে আপনার লোক বলে যদি মনে কর, তাহলে আমি তোমাদের।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) — একটি আছে অহৈতুকী ভক্তি। এটি যদি হয়, তাহলে খুব ভাল। প্রহ্লাদের অহৈতুকী ভক্তি ছিল। সেরূপ ভক্ত বলে, হে ঈশ্বর! আমি ধন, মান, দেহসুখ, এ-সব কিছুই চাই না। এই কর যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধাভক্তি হয়।

ডাক্তার — হাঁ, কালীতলায় লোকে প্রণাম করে থাকে দেখেছি; ভিতরে কেবল কামনা — আমার চাকরি করে দাও, আমার রোগ ভাল করে দাও, — এই সব।

(শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — "যে অসুখ তোমার হয়েছে, লোকেদের সঙ্গে কথা কওয়া হবে না। তবে আমি যখন আসব, কেবল আমার সঙ্গে কথা কইবে।" (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ — এই অসুখটা ভাল করে দাও। তাঁর নামগুণ করতে পাই না।

ডাক্তার — ধ্যান করলেই হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সে কি কথা! আমি একঘেয়ে কেন হব? আমি পাঁচরকম করে মাছ খাই। কখন ঝোলে, কখন ঝালে অম্বলে, কখন বা ভাজায়। আমি কখন পূজা, কখন জপ, কখন বা ধ্যান, কখন বা তাঁর নামগুণগান করি, কখন তাঁর নাম করে নাচি।

ডাক্তার — আমিও একঘেয়ে নই।

[অবতার না মানিলে কি দোষ আছে?]

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমার ছেলে অমৃত — অবতার মানে না। তাতে দোষ কি? ঈশ্বরকে নিরাকার বলে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়। আবার সাকার বলে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়। তাঁতে বিশ্বাস থাকা আর শরণাগত হওয়া। এই দুটি দরকার। মানুষ তো অজ্ঞান, ভুল হতেই পারে। একসের ঘটিতে কি চারসের দুধ ধরে? তবে যে পথেই থাকো, ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা চাই। তিনি তো অন্তর্যামী — সে আন্তরিক ডাক শুনবেনই শুনবেন। ব্যাকুল হয়ে সাকারবাদীর পথেই যাও, আর নিরাকারবাদীর পথেই যাও, তাঁকেই (ঈশ্বরকেই) পাবে।

“মিছরির রুটি সিধে করেই খাও, আর আড় করেই খাও; মিষ্ট লাগবে। তোমার ছেলে অমৃতটি বেশ।”

ডাক্তার — সে তোমার চেলা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, ডাক্তারের প্রতি) — আমার কোন শালা চেলা নাই। আমিই সকলের চেলা! সকলেই ঈশ্বরের ছেলে, সকলেই ঈশ্বরের দাস — আমিও ঈশ্বরের ছেলে; আমিও ঈশ্বরের দাস।

“চাঁদা মামা সকলেরই মামা।” (সভাস্থ সকলের আনন্দ ও হাস্য।)

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৩শে অক্টোবর 1885/10/23/i

52.9 শ্যামপুকুর বাটীতে ডাক্তার সরকার, নরেন্দ্র, শশী, শরৎ, মাস্টার, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

[পূর্বকথা — উন্মাদাবস্থায় কুঠির পেছনে যেন গায়ে হোমাগ্নি জ্বলন। পণ্ডিত পদ্মলোচনের বিশ্বাস ও তাঁহার মৃত্যু]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুর বাটীতে চিকিৎসার্থ ভক্তসঙ্গে বাস করিতেছেন। আজ কোজাগর পূর্ণিমা, শুক্রবার (৮ই কার্তিক, ১২৯২)। ২৩শে অক্টোবর, ১৮৮৫, বেলা ১০টা। ঠাকুর মাস্টারের সহিত কথা কহিতেছেন।

মাস্টার তাঁহার পায়ে মোজা পরাইয়া দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — কম্‌ফর্টার্‌টা কেটে পায় পরলে হয় না? বেশ গরম।

[মাস্টার হাসিতেছেন।]

গতকল্য বৃহস্পতিবার রাত্রে ডাক্তার সরকারের সহিত অনেক কথা হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর সে সকল কথা উল্লেখ করিয়া মাস্টারকে হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন — “কাল কেমন তুঁহু তুহু বললুম!”

ঠাকুর কাল বলিয়াছিলেন, — “জীবেরা ত্রিতাপে জ্বলছে, তবু বলে বেশ আছি। বেঁকা কাঁটা দিয়ে হাত কেটে যাচ্ছে। দরদর করে রক্ত পড়ছে — তবু বলে, ‘আমার হাতে কিছু হয় নাই।’ জ্ঞানাগ্নি দিয়ে এই কাঁটা তো পোড়াতে হবে।”

ছোট নরেন ওই কথা স্মরণ করিয়া বলিতেছেন — ‘কালকের বাঁকা কাঁটার কথাটি বেশ! জ্ঞানাগ্নিতে জ্বালিয়ে দেওয়া।’

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমার সাক্ষাৎ ওই সব অবস্থা হত।

“কুঠির পেছন দিয়ে যেতে যেতে — গায়ে যেন হোমাগ্নি জ্বলে গেল!

“পদ্মলোচন বলেছিল, ‘তোমার অবস্থা সভা করে লোকদের বলব!’ তারপর কিন্তু তার মৃত্যু হল।”

বেলা এগারটার সময় ঠাকুরের সংবাদ লইয়া ডাক্তার সরকারের বাটীতে মণি আসিয়াছেন।

ডাক্তার ঠাকুরের সংবাদ লইয়া তাঁহারই বিষয় কথাবার্তা কহিতেছেন — তাঁহার কথা শুনিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন।

ডাক্তার (সহাস্যে) — আমি কাল যেমন বললাম, ‘তুঁহু তুঁহু’ বলতে গেলে তেমনি ধুনুরির হাতে পড়তে হয়!

মণি — আজ্ঞা হাঁ, তেমন গুরুর হাতে না পড়লে অহংকার যায় না।

“কাল ভক্তির কথা কেমন বললেন! — ভক্তি মেয়েমানুষ, অন্তঃপুর পর্যন্ত যেতে পারে।”

ডাক্তার — হাঁ ওটি বেশ কথা; কিন্তু তা বলে তো জ্ঞান তো আর ছেড়ে দেওয়া যায় না।

মণি — পরমহংসদেব তা তো বলেন না। তিনি জ্ঞান-ভক্তি দুই-ই লন — নিরাকার-সাকার। তিনি বলেন, ভক্তি হিমে জলের খানিকটা বরফ হল, আবার জ্ঞানসূর্য উদয় হলে বরফ গলে গেল। অর্থাৎ ভক্তিযোগে সাকার, জ্ঞানযোগে নিরাকার।

“আর দেখেছেন, ঈশ্বরকে এত কাছে দেখেছেন যে তাঁর সঙ্গে সর্বদা কথা কচ্ছেন। ছোট ছেলেটির মতো বলছেন, ‘মা, বড় লাগছে!’

“আর কি অব্‌জর্‌ভেশন (দর্শন)! মিউজিয়াম-এ (যাদুঘরে) ফসিল (জানোয়ার পাথর) হয়ে গেছে দেখেছিলেন। অমনি সাধুসঙ্গের উপমা হয়ে গেল! পাথরের

কাছে থেকে থেকে পাথর হয়ে গেছে, তেমনি সাধুর কাছে থাকতে থাকতে সাধু হয়ে যায়।”

ডাক্তার — ঈশানবাবু কাল অবতার অবতার করছিলেন। অবতার আবার কি! — মানুষকে ঈশ্বর বলা!

মণি — ওঁদের যা যা বিশ্বাস, তা আর ইন্টারফিয়ার (তাতে হস্তক্ষেপ) করে কি হবে?

ডাক্তার — হাঁ, কাজ কি!

মণি — আর ও-কথাটিতে কেমন হাসিয়াছেন! — ‘একজন দেখে গেল, একটা বাড়ি পড়ে গেছে কিন্তু খপরের কাগজে ওটি লিখা নাই। অতএব ও-বিশ্বাস করা যাবে না।’

ডাক্তার চুপ করিয়া আছেন — কেননা ঠাকুর বলিয়াছিলেন, ‘তোমার সাইয়েন্স-এ অবতারের কথা নাই, অতএব অবতার নাই!’

বেলা দ্বিপ্রহর হইল। ডাক্তার মণিকে লইয়া গাড়িতে উঠিলেন। অন্যান্য রোগী দেখিয়া অবশেষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে যাইবেন।

ডাক্তার সেদিন গিরিশের নিমন্ত্রণে ‘বুদ্ধলীলা’ অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি গাড়িতে বসিয়া মণিকে বলিতেছেন, “বুদ্ধকে দয়ার অবতার বললে ভাল হত — বিষ্ণুর অবতার কেন বললে?”

ডাক্তার মণিকে হেদুয়ার চৌমাথায় নামাইয়া দিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৩শে অক্টোবর 1885/10/23/ii

52.10 ঠাকুরের পরমহংস অবস্থা — চতুর্দিকে আনন্দের কোয়াসাদর্শন — ভগবতীর রূপদর্শন — যেন বলছে, ‘লাগ্‌ ভেলকি’

বেলা ৩টা। ঠাকুরের কাছে ২/১টি ভক্ত বসিয়া আছেন। তিনি ‘ডাক্তার কখন আসিবে’ আর ‘কটা বেজেছে’ বালকের ন্যায় অধৈর্য হইয়া বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ডাক্তার আজ সন্ধ্যার পরে আসিবেন।

হঠাৎ ঠাকুরের বালকের ন্যায় অবস্থা হইয়াছে। বালিশ কোলে করিয়া যেন বাৎসল্যরসে আপ্লুত হইয়া ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছেন! ভাবাবিষ্ট বালকের ন্যায় হাসিতেছেন — আর-একরকম করিয়া কাপড় পরিতেছেন!

মণি প্রভৃতি অবাক্‌ হইয়া দেখিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভাব উপশম হইল। ঠাকুরের খাবার সময় হইয়াছে, তিনি একটু সুজি খাইলেন।

মণির কাছে নিভৃতে অতি গুহ্যকথা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি একান্তে) — এতক্ষণ ভাবাবস্থায় কি দেখছিলাম জান? — তিন-চার ক্রোশ ব্যাপী সিওড়ে যাবার রাস্তার মাঠ। সেই মাঠে আমি একাকী! — সেই যে পনের-ষোল বছরের ছোকরার মতো পরমহংস বটতলায় দেখেছিলাম, আবার ঠিক সেইরকম দেখলাম!

“চতুর্দিকে আনন্দের কোয়াসা! — তারই ভিতর থেকে ১৩/১৪ বছরের একটি ছেলে উঠলো মুখটি দেখা যাচ্ছে! পূর্ণর রূপ। দুইজনেই দিগম্বর! — তারপর আনন্দে মাঠে দুইজনে দৌড়াদৌড়ি আর খেলা!

“দৌড়াদৌড়ি করে পূর্ণর জলতৃষ্ণা পেল। সে একটা পাত্রে করে জল খেলে। জল খেয়ে আমায় দিতে আসে। আমি বললাম, ‘ভাই, তোর এঁটো খেতে পারব না।’ তখন সে হাসতে হাসতে গিয়ে গ্লাসটি ধুয়ে আর-একগ্লাস জল এনে দিলে।”

[‘ভয়ঙ্করা কালকামিনী’ — দেখাচ্ছেন, সব ভেলকি]

ঠাকুর আবার সমাধিস্থ। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার মণির সহিত কথা কহিতেছেন —

“আবার অবস্থা বদলাচ্ছে! — প্রসাদ খাওয়া উঠে গেল! সত্য-মিথ্যা এক হয়ে যাচ্ছে! আবার কি দেখছিলাম জান? ঈশ্বরীয় রূপ! ভগবতী মূর্তি — পেটের

ভিতর ছেলে — তাকে বার করে আবার গিলে ফেলছে! — ভিতরে যতটা যাচ্ছে, ততটা শূন্য হয়! আমায় দেখাচ্ছে যে, সব শূন্য!

“যেন বলছে, লাগ্! লাগ্! লাগ্ ভেলকি! লাগ!”

মণি ঠাকুরের কথা ভাবিতেছেন! ‘বাজিকরই সত্য আর সব মিথ্যা।’

[সিদ্ধাই ভাল নয় — নিচু ঘরের সিদ্ধাই]

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, তখন পূর্ণকে আকর্ষণ কল্লাম, তা হল না কেন? এইতে একটু বিশ্বাস কমে যাচ্ছে!

মণি — ও-সব তো সিদ্ধাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঘোর সিদ্ধাই!

মণি — সেই অধর সেনের বাড়ি থেকে গাড়ি করে আপনার সঙ্গে আমরা যখন দক্ষিণেশ্বরে আসছিলাম — বোতল ভেঙে গেল। একজন বললে যে, এতে কি হানি হবে, আপনি একবার দেখুন। আপনি বললেন, দায় পড়েছে, দেখবার জন্য — ও-সব তো সিদ্ধাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ — ওইরকম হরির লুটের ছেলে — রোগ ভাল করা — এ-সব সিদ্ধাই। যারা অতি নিচু ঘর, তারাই ঈশ্বরকে ডাকে রোগ ভালর জন্য।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৩শে অক্টোবর 1885/10/23/iii

52.11 পূর্ণজ্ঞান — দেহ ও আত্মা আলাদা — শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত

সন্ধ্যা হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ শয্যায় বসিয়া মার চিন্তা ও নাম করিতেছেন। ভক্তেরা অনেকে তাঁহার কাছে নিঃশব্দে বসিয়া আছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার সরকার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরে লাটু, শশী, শরৎ, ছোট নরেন, পল্টু, ভূপতি, গিরিশ প্রভৃতি অনেক ভক্তেরা আসিয়াছেন। গিরিশের সঙ্গে স্টার থিয়েটারের শ্রীযুক্ত রামতারণ আসিয়াছেন — গান গাইবেন।

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — কাল রাত তিনটার সময় আমি তোমার জন্য বড় ভেবেছিলাম। বৃষ্টি হল, ভাবলুম দোর-টোর খুলে রেখেছে — না কি করেছে, কে জানে!

শ্রীরামকৃষ্ণ ডাক্তারের স্নেহ দেখিয়া প্রসন্ন হইয়াছেন। আর বলিতেছেন, বল কিগো!

“যতক্ষণ দেহটা আছে ততক্ষণ যত্ন করতে হয়।

“কিন্তু দেখছি যে এটা আলাদা। কামিনী-কাঞ্চনের উপর ভালবাসা যদি একেবারে চলে যায়, তাহলে ঠিক বুঝতে পারা যায় যে দেহ আলাদা আর আত্মা আলাদা। নারকেলের জল সব শুকিয়ে গেলে মালা আলাদা, আঁস আলাদা হয়ে যায়। তখন নারকেল টের পাওয়া যায় — ঢপর ঢপর করছে। যেমন খাপ আর তরবার — খাপ আলাদা, তরবার আলাদা।

“তাই দেহের অসুখের জন্য তাঁকে বেশি বলতে পারি না।”

গিরিশ — পণ্ডিত শশধর বলেছিলেন, ‘আপনি সমাধি অবস্থায় দেহের উপর মনটা আনবেন, — তাহলে অসুখ সেরে যাবে। ইনি ভাবে ভাবে দেখলেন যে শরীরটা যেন ধ্যাড় ধ্যাড় করছে।

[পূর্বকথা — মিয়জিয়াম দর্শন ও পীড়ার সময় প্রার্থনা]

শ্রীরামকৃষ্ণ — অনেকদিন হল, — আমার তখন খুব ব্যামো। কালীঘরে বসে আছি, — মার কাছে প্রার্থনা করতে ইচ্ছা হল! কিন্তু ঠিক আপনি বলতে পাল্লাম না। বললুম, — মা হৃদে বলে তোমার কাছে ব্যামোর কথা বলতে। আর বেশি বলতে পাল্লাম না — বলতে বলতে অমনি দপ্ করে মনে এলো সুসাইট্ (Asiatic Society's Museum) সেখানকার তারে বাঁধা মানুষের হাড়ের দেহ (Skeleton) অমনি বললুম, মা, তোমার নামগুণ করে বেড়াব — দেহটা একটু তার দিয়ে এঁটে দাও, সেখানকার মতো! সিদ্ধাই চাইবার জো নাই!

“প্রথম প্রথম হৃদে বলেছিল, — হৃদের অণ্ডার (under) ছিলাম কি না — ‘মার কাছে একটু ক্ষমতা চেও।’ কালীঘরে ক্ষমতা চাইতে গিয়ে দেখলাম — ত্রিশ-

পঁয়ত্রিশ বছরের রাঁড় — কাপড় তুলে ভড়ভড় করে হাগছে। তখন হৃদের উপর রাগ হল — কেন সে সিদ্ধাই চাইতে শিখিয়ে দিলে।”

[শ্রীযুক্ত রামতারণের গান — ঠাকুরের ভাবাবস্থা]

গান:

আমার এই সাধের বীণে, যত্নে গাঁথা তারের হার।
যে যত্ন জানে, বাজায় বীণে, উঠে সুধা অনিবার।।
তানে মানে বাঁধলে ডুরী, শত ধারে বয় মাধুরী।
বাজে না আলগা তারে, টানে ছিঁড়ে কোমল তার।।

ডাক্তার (গিরিশের প্রতি) — গান এ-সব কি অরিজিন্যাল (নূতন)?

গিরিশ — না, Edwin Arnold-এর thought (আর্নল্ড সাহেবের ভাব লয়ে গান)।

রামতারণ প্রথমে বুদ্ধচরিত হইতে গান গাহিতেছেন:

জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই,
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।।
কর হে চেতন, কে আছে চেতন,
কত দিনে আর ভাঙিবে স্বপন?

কে আছে চেতন, ঘুমায়ো না আর,
দারুণ এ-ঘোর নিবিড় আঁধার,
কর তম নাশ, হও হে প্রকাশ,
তোমা বিনা আর নাহিক উপায়,
তব পদে তাই শরণ চাই ।।

এই গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন।

গান — কোঁ কোঁ কোঁ বহরে ঝড়।

[সূর্যের অন্তর্যামী দেবতাদর্শন]

এই গানটি সমাপ্ত হইলে ঠাকুর বলিতেছেন, “এ কি করলে! পায়েসের পর নিম ঝোল! —

“যাই গাইলে — ‘কর তম নাশ’, অমনি দেখলাম সূর্য — উদয় হবা মাত্র চারদিকের অন্ধকার ঘুচে গেল! আর সেই সূর্যের পায়ে সব শরণাগত হয়ে পড়ছে!”

রামতারণ আবার গাইতেছেন:

(১) দীনতারিণী দুরিতবারিণী, সত্ত্বরজঃতমঃ ত্রিগুণধারিণী,
সৃজন পালন নিধনকারিণী, সগুণা নির্গুণা সর্বস্বরূপিণী।

(২) ধরম করম সকলি গেল, শ্যামাপূজা বুঝি হল না!

মন নিবারিত নারি কোন মতে, ছি, ছি, কি জ্বালা বল না ।।

এই গান শুনিয়া ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইলেন।

রাঙা জবা কে দিলে তোর পায়ে মুঠো মুঠো।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৩শে অক্টোবর 1885/10/23/iv

52.12 ছোট নরেন প্রভৃতির ভাবাবস্থা —– সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের কর্তব্য

গান সমাপ্ত হইল। ভক্তেরা অনেকে ভাবাবিষ্ট। নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। ছোট নরেন ধ্যানে মগ্ন। কাষ্ঠের ন্যায় বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ছোট নরেনকে দেখাইয়া, ডাক্তারকে) — এ অতি শুদ্ধ। বিষয়-বুদ্ধির লেশ এতে লাগে নাই।

ডাক্তার নরেনকে দেখিতেছেন। এখনও ধ্যানভঙ্গ হয় নাই।

মনোমোহন (ডাক্তারের প্রতি, সহাস্যে) — আপনার ছেলের কথায় বলেন, ‘ছেলেকে যদি পাই, বাপকে চাই না।’

ডাক্তার — অই তো! — তাইতো বলি, তোমরা ছেলে নিয়েই ভোলো! (অর্থাৎ ঈশ্বরকে ছেড়ে অবতার বা ভক্তকে নিয়ে ভোলো।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — বাপকে চাই না — তা বলছি না।

ডাক্তার — তা বুঝিছি! — এরকম দু-একটা না বললে হবে কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমার ছেলেটি বেশ সরল। শম্ভু রাঙামুখ করে বলেছিল। ‘সরলভাবে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।’ ছোকরাদের অত ভালবাসি কেন, জান? ওরা খাঁটি দুধ, একটু ফুটিয়ে নিলেই হয় — ঠাকুর সেবায় চলে।

“জোলো দুধ অনেক জ্বাল দিতে হয় — অনেক কাঠ পুড়ে যায়।

“ছোকরারা যেন নূতন হাঁড়ি — পাত্র ভাল — দুধ নিশ্চিন্ত হয়ে রাখা যায়। তাদের জ্ঞানোপদেশ দিলে শীঘ্র চৈতন্য হয়। বিষয়ী লোকদের শীঘ্র হয় না। দই পাতা হাঁড়িতে দুধ রাখতে ভয় হয়, পাছে নষ্ট হয়!

“তোমার ছেলের ভিতর বিষয়বুদ্ধি — কামিনী-কাঞ্চন — ঢোকে নাই।”

ডাক্তার — বাপের খাচ্চেন, তাই! —

“নিজের করতে হলে দেখতুম, বিষয়বুদ্ধি ঢোকে কি না!”

[সন্ন্যাসী ও নারীত্যাগ — সন্ন্যাসী ও কাঞ্চনত্যাগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা বটে, তা বটে। তবে কি জানো, তিনি বিষয়বুদ্ধি থেকে অনেক দূর, তা না হলে হাতের ভিতর। (সরকার ও ডাক্তার দোকড়ির প্রতি) কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ আপনাদের পক্ষে নয়। আপনারা মনে ত্যাগ করবে। গোস্বামীদের তাই বললাম — তোমরা ত্যাগের কথা কেন বলছো? — ত্যাগ করলে তোমাদের চলবে না — শ্যামসুন্দরের সেবা রয়েছে।

“সন্ন্যাসীর পক্ষে ত্যাগ। তারা স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না। মেয়েমানুষ তাদের পক্ষে বিষবৎ। অন্ততঃ দশহাত অন্তরে, একান্তপক্ষে একহাত অন্তরে থাকবে। হাজার ভক্ত স্ত্রীলোক হলেও তাদের সঙ্গে বেশি আলাপ করবে না।

“এমনকি সন্ন্যাসীর এরূপ স্থানে থাকা উচিত, যেখানে স্ত্রিলোকের মুখ দেখা যায় না; — বা অনেক কাল পরে দেখা যায়।

“টাকাও সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষ। টাকা কাছে থাকলেই ভাবনা, অহংকার, দেহের সুখের চেষ্টা, ক্রোধ, — এই সব এসে পড়ে। রজোগুণ বৃদ্ধি করে। আবার রজোগুণ থাকলেই তমোগুণ। তাই সন্ন্যাসী কাঞ্চন স্পর্শ করে না। কামিনী-কাঞ্চন ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।”

[ডাক্তারকে উপদেশ — টাকার ঠিক ব্যবহার — গৃহস্থের পক্ষে স্বদ্বারা]

“তোমরা জানবে যে, টাকাতে ডাল-ভাত হয়, পরবার কাপড়, — থাকবার একটি স্থান হয়, ঠাকুরের সেবা — সাধু-ভক্তের সেবা হয়।

“জমাবার চেষ্টা মিথ্যা। অনেক কষ্টে মৌমাছি চাক তৈয়ার করে — আর-একজন এসে ভেঙে নিয়ে যায়।”

ডাক্তার — জমাচ্ছেন কার জন্য? — না একটা বদ ছেলের জন্য!

শ্রীরামকৃষ্ণ — বদ ছেলে! — পরিবারটা হয়তোও নষ্ট — উপপতি করে। তোমারই ঘড়ি, তোমারই চেন তাকে দেবে!

“তোমাদের পক্ষে স্ত্রীলোক একেবারে ত্যাগ নয়। স্ব-দারায় গমন দোষের নয়। তবে ছেলেপুলে হয়ে গেলে, ভাই-ভগ্নীর মতো থাকতে হয়।

“কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থাকলেই বিদ্যার অহংকার, টাকার অহংকার, উচ্চপদের অহংকার — এই সব হয়।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৩শে অক্টোবর 1885/10/23/v

52.13 ডাক্তার সরকারকে উপদেশ — অহংকার ভাল নয়

বিদ্যার আমি ভাল — তবে লোকশিক্ষা (Lecture) হয়

শ্রীরামকৃষ্ণ — অহংকার না গেলে জ্ঞানলাভ করা যায় না। উঁচু ঢিপিতে জল জমে না। খাল জমিতে চারিদিককার জল হুড়হুড় করে আসে।

ডাক্তার — কিন্তু খাল জমিতে যে চারিদিকের জল আসে, তার ভিতর ভাল জলও আছে, খারাপ জলও আছে, — ঘোলো জল, হেগো জল, এ-সবও আছে। পাহাড়ের উপরও খাল জমি আছে। নৈনিতাল, মানস সরোবর — যেখানে কেবল আকাশের শুদ্ধ জল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেবল আকাশের জল, — বেশ।

ডাক্তার — আর উঁচু জায়গার জল চারিদিকে দিতে পারবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — একজন সিদ্ধমন্ত্র পেয়েছিল। সে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে দিলে — তোমরা এই মন্ত্র জপে ঈশ্বরকে লাভ করবে।

ডাক্তার — হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তবে একটি কথা আছে, যখন ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়, ভাল জল — হেগো জল — এ-সব হিসাব থাকে না। তাঁকে জানবার জন্য কখন ভাল লোকের কাছেও যায় কাঁচা লোকের কাছেও যায়। কিন্তু তাঁর কৃপা হলে ময়লা জলে কিছু হানি করে না। যখন তিনি জ্ঞান দেন, কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ, সব জানিয়ে দেন।

“পাহাড়ের উপর খাল জমি থাকতে পারে, কিন্তু বজ্জাৎ-আমি-রূপ পাহাড়ে থাকে না। বিদ্যার আমি, ভক্তের আমি, যদি হয়, তবেই আকাশের শুদ্ধ জল এসে জমে।

উঁচু জায়গার জল চারিদিকে দিতে পারা যায় বটে। সে বিদ্যার আমি রূপ পাহাড় থেকে হতে পারে।

“তাঁর আদেশ না হলে লোকশিক্ষা হয় না। শঙ্করাচার্য জ্ঞানের পর ‘বিদ্যার আমি’ রেখেছিলেন — লোকশিক্ষার জন্য। তাঁকে লাভ না করে লেকচার! তাতে লোকের কি উপকার হবে?”

[পূর্বকথা — সামাধ্যায়ীর লেকচার — নন্দনবাগান সমাজ দর্শন]

“নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজে গিছলাম। তাদের উপাসনার পর বেদীতে বসে লেকচার দিলে। — লিখে এনেছে। — পড়বার সময় আবার চারদিকে চায়। — ধ্যান কচ্ছে, তা এক-একবার আবার চায়!

“যে ঈশ্বরদর্শন করে নাই, তার উপদেশ ঠিক ঠিক হয় না। একটা কথা ঠিক হল, তো আর-একটা গোলমেলে হয় যায়।

“সামাধ্যায়ী লেকচার দিলে। বলে, — ঈশ্বর বাক্য মনের অতীত — তাঁতে কোন রস নাই — তোমরা প্রেমভক্তিরূপ রস দিয়ে তঁর ভজনা কর। দেখো যিনি রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, তাঁকে এইরূপ বলছে। এ-লেকচারে কি হবে? এতে কি লোকশিক্ষা হয়?

“একজন বলেছিল — আমার মামার বাড়িতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে। গোয়ালে আবার ঘোড়া! (সকলের হাস্য) তাতে বুঝতে হবে ঘোড়া নাই।”

ডাক্তার (সহাস্যে) — গরুও নাই। (সকলের হাস্য)

ভক্তদের মধ্যে যাহারা ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন, সকলে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। ভক্তদের দেখিয়া ডাক্তার আনন্দ করিতেছেন।

মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ‘ইনি কে’ ‘ইনি কে’। পল্টু, ছোট নরেন, ভূপতি, শরৎ, শশী প্রভৃতি ছোকরা ভক্তদিগকে মাস্টার এক-একটি করিয়া দেখাইয়া ডাক্তারের কাছে পরিচয় দিতেছেন।

শ্রীযুক্ত শশী১ সম্বন্ধে মাস্টার বলিতেছেন — “ইনি বি. এ. পরীক্ষা দিবেন।”

ডাক্তার একটু অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) — দেখো গো! ইনি কি বলছেন।

ডাক্তার শশীর পরিচয় শুনিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারকে দেখাইয়া, ডাক্তারের প্রতি) — ইনি সব ইস্কুলের ছেলেদের উপদেশ দেন।

ডাক্তার — তা শুনেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি আশ্চর্য, আমি মূর্খ! — তবু লেখাপড়াওয়ালারা এখানে আসে, এ কি আশ্চর্য! এতে তো বলতে হবে ঈশ্বরের খেলা!

আজ কোজাগর পূর্ণিমা। রাত প্রায় নয়টা হইবে। ডাক্তার ছয়টা হইতে বসিয়া আছেন ও এই সকল ব্যাপার দেখিতেছেন।

গিরিশ (ডাক্তারের প্রতি) — আচ্ছা, মশায় এরকম কি আপনার হয়? — এখানে আসব না আসব না করছি, — যেন কে টেনে আনে — আমার নাকি হয়েছে, তাই বলছি।

ডাক্তার — তা এমন বোধ হয় না। তবে হার্ট-এর (হৃদয়ের) কথা হার্টই (হৃদয়ই) জানে। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) আর এ-সব বলাও কিছু নয়।

১ শশী ১৮৮৪ খ্রী: শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৪শে অক্টোবর 1885/10/24

52.14 শ্যামপুকুর বাটীতে নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

[ডাক্তার সরকার ও সর্বধর্ম পরীক্ষা (Comparative Religion)]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র, মহিমাচরণ, মাস্টার, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে শ্যামপুকুর বাটীতে দ্বিতলার ঘরে বসিয়া আছেন। বেলা প্রায় একটা। ২৪শে অক্টোবর, ১৮৮৫, ৯ই কার্তিক (শনিবার, কৃষ্ণা প্রতিপদ)।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমার এ (হোমিওপ্যাথিক) চিকিৎসা বেশ।

ডাক্তার — এতে রোগীর অবস্থা বইয়ের সঙ্গে মেলাতে হয়। যেমন ইংরেজী বাজনা, — দেখে পড়া আর গাওয়া।

“গিরিশ ঘোষ কই? — থাক্ থাক্ কাল জেগেছে।”

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, সিদ্ধির নেশার মতো ভাবাবস্থায় হয়, ওটি কি?

ডাক্তার (মাস্টারকে) — Nervous centre — action বন্ধ হয়, তাই অসাড় — এ-দিকে পা টলে, যত energies brain-এর দিকে যায়। এই nervous system নিয়ে Life। ঘাড়ের কাছে আছে — Medulla Oblongata; তার হানি হলে Life extinct হতে পারে।

শ্রীযুক্ত মহিমা চক্রবর্তী সুষুম্না নাড়ীর ভিতরে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির কথা বলিতেছেন, — “স্পাইন্যাল্ কর্ড-এর ভিতর সুষুম্না নাড়ী সূক্ষ্মভাবে আছে — কেউ দেখতে পায় না। মহাদেবের বাক্য।”

ডাক্তার — মহাদেব man in the maturity-কে examine করেছে। European-রা Embryo থেকে maturity পর্যন্ত সমস্ত stage দেখেছে।

Comparative History সব জানা ভাল। সাঁওতালদের history পড়ে জানা গেছে যে, কালী একজন সাঁওতালী মাগী ছিল — খুব লড়াই করেছিল। (সকলের হাস্য)

“তোমরা হেসো না। আবার Comparative anatomy-তে কত উপকার হয়েছে, শোনো। প্রথমে pancreatic juice ও bile-(পিত্তের) action-(ক্রিয়ার) তফাত বোঝা যাচ্ছিল না। তারপর Claude Bernard খরগোশের stomach, liver প্রভৃতি examine করে দেখালে যে, bile-এর action আর ওই juice-এর action আলাদা।

“তাহলেই দাঁড়ালো যে, lower animal-দের আমাদের দেখা উচিত — শুধু মানুষকে দেখলে হবে না।

“সেইরূপ Comparative Religion-তে বিশেষ উপকার!

“এই যে ইনি (পরমহংসদেব) যা বলেন, তা অত অন্তরে লাগে কেন? এঁর সব ধর্ম দেখা আছে — হিঁদু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শাক্ত, বৈষ্ণব, — এ-সব ইনি নিজে করে দেখেছেন। মধুকর নানা ফুলে বসে মধু সঞ্চয় করলে তবেই চাকটি বেশ হয়।”

মাস্টার (ডাক্তারকে) — ইনি (মহিমা) খুব সাইয়েন্স্‌ পড়েছেন।

ডাক্তার (সহাস্যে) — কি Maxmuller's Science of Religion?

মহিমা (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — আপনার অসুখ, ডাক্তারেরা আর কি করবে? যখন শুনলাম যে আপনার অসুখ করেছে, তখন ভাবলাম যে ডাক্তারের অহংকার বাড়াচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— ইনি খুব ভাল ডাক্তার। আর খুব বিদ্যা।

মহিমাচরণ —— আজ্ঞা হাঁ, উনি জাহাজ, আর আমরা সব ডিঙ্গি।

ডাক্তার বিনীত হইয়া হাতজোড় করিতেছেন।

মহিমা —— তবে ওখানে (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে) সবাই সমান।

ঠাকুর নরেন্দ্রকে গান গাইতে বলিতেছেন।

নরেন্দ্রের গান:

(১) তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।

(২) অহংকারে মত্ত সদা, অপার বাসনা।

(৩) চমৎকার অপার, জগৎ রচনা তোমার!
শোভার আগার বিশ্ব সংসার!

(৪) মহা সিংহাসনে বসি শুনেছি হে বিশ্বপতিঃ
তোমারি রচিত ছন্দ মহান বিশ্বের গীত।
মর্ত্যের মৃত্তিকা হয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে,

আমিও দুয়ারে তব, হয়েছি হে উপনীত।
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে যথা রবি শশী, সেই সভা মাঝে বসি,
একান্তে গাইতে চাহে এই ভকতের চিত।

(৫) ওহে রাজরাজেশ্বর, দেখা দাও!
করুণাভিখারী আমি করুণা কটাক্ষে চাও ।।
চরণে উৎসর্গ দান, করিতেছি এই প্রাণ,
সংসার-অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও ।।
কলুষ-কলঙ্কে তাহে আবরিত এ-হৃদয়;
মোহে মুগ্ধ মৃতপ্রায়, হয়ে আছি দয়াময়,
মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে শোধ্ন করিয়ে লও ।।

(৬) হরি-রস-মদিরা পিয়ে মম মানস মাতোরে!
লুটায়ে অবনীতলে হরি হরি বলি কাঁদোরে ।।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আর 'যে কুছ্ হ্যায় তুঁহি হ্যায়।'

ডাক্তার — আহা!

গান সমাপ্ত হইল। ডাক্তার মুগ্ধপ্রায় হইয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার অতি ভক্তিভাবে হাতজোড় করিয়া ঠাকুরকে বলিতেছেন, 'তবে আজ যাই, — আবার কাল আসব।'

শ্রীরামকৃষ্ণ — একটু থাক না! গিরিশ ঘোষকে খপর দিয়েছে। (মহিমাকে দেখাইয়া) ইনি বিদ্বান হরিনামে নাচেন, অহংকার নাই। কোন্নগরে চলে গিছলেন — আমরা গিছলাম বলে; আবার স্বাধীন, ধনবান, কারু চাকরি করতে হয় না! (নরেন্দ্রকে দেখাইয়া) এ কেমন?

ডাক্তার — খুব ভাল!

শ্রীরামকৃষ্ণ — আর ইনি —

ডাক্তার — আহা!

মহিমাচরণ — হিন্দুদের দর্শন না পড়লে দর্শন পড়াই হয় না। সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ইওরোপ জানে না — বুঝতেও পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — কি তিন পথ তুমি বলো?

মহিমা — সৎপথ — জ্ঞানের পথ। চিৎপথ, যোগের। কর্মযোগ। তাই চার আশ্রমের ক্রিয়া, কি কি কর্তব্য, এর ভিতর আসছে। আনন্দপথ — ভক্তিপ্রেমের পথ। — আপনাতে তিন পথেরই ব্যাপার — আপনি তিন পথেরই খপর বাতলে দেন! (ঠাকুর হাসিতেছেন)

“আমি আর কি বলব? জনক বক্তা, শুকদেব শ্রোতা!”

ডাক্তার বিদায় গ্রহণ করিলেন।

[সন্ধ্যার পর সমাধিস্থ — নিত্যগোপাল ও নরেন্দ্র — 'জপাৎ সিদ্ধি']

সন্ধ্যার পর চাঁদ উঠিয়াছে। আজ কোজাগর পূর্ণিমার পরদিন, শনিবার, ৯ই কার্তিক। ঠাকুর সমাধিস্থ! দাঁড়াইয়া আছেন। নিত্যগোপালও তাঁহার কাছে ভক্তিভাবে দাঁড়াইয়া আছেন।

ঠাকুর উপবিষ্ট হইয়াছেন — নিত্যগোপাল পদসেবা করিতেছেন। দেবেন্দ্র কালীপদ প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত কাছে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (দেবেন্দ্র প্রভৃতির প্রতি) — এমনি মনে উঠছে, নিত্যগোপালের এ-অবস্থাগুলো এখন যাবে, — ওর সব মন কুড়িয়ে আমাতেই আসবে — যিনি এর ভিতর আছেন, তাঁতে।

"নরেন্দ্রকে দেখছো না? — সব মনটা ওর আমারই উপর আসছে!"

ভক্তেরা অনেকে বিদায় লইতেছেন। ঠাকুর দাঁড়াইয়া আছেন। একজন ভক্তকে জপের কথা বলিতেছেন — "জপ করা কি না নির্জনে নিঃশব্দে তাঁর নাম করা। একমনে নাম করতে করতে — জপ করতে করতে — তাঁর রূপদর্শন হয় — তাঁর সাক্ষাৎকার হয়। শিকলে বাঁধা কড়িকাঠ গঙ্গার গর্ভে ডুবান আছে — শিকলের আর-একদিক তীরে বাঁধা আছে। শিকলের এক-একটি পাপ (Link) ধরে ধরে গিয়ে ক্রমে ডুব মেরে শিকল ধরে যেতে ওই কড়ি-কাঠ স্পর্শ করা যায়! ঠিক সেইরূপ জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়।"

কালীপদ (সহাস্যে, ভক্তদের প্রতি) — আমাদের এ খুব ঠাকুর! — জপ-ধ্যান, তপস্যা করতে হয় না!

ঠাকুরের গলায় অসুখ করিতেছে। দেবেন্দ্র বলিতেছেন —— “এ-কথায় আর ভুলি না।” দেবেন্দ্রের এই মনের ভাব যে ঠাকুর কেবল ভক্তদের ভুলাইবার জন্য অসুখ দেখাইতেছেন।

ভক্তেরা বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাত্রে কয়েকটি ছোকরা ভক্ত পালা করিয়া থাকিবেন। আজ মাস্টারও রাত্রে থাকিবেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৫শে অক্টোবর 1885/10/25/i

52.15 শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত বিজয়কৃষ্ণ, নরেন্দ্র, মাস্টার, ডাক্তার সরকার, মহিমাচরণ
প্রভৃতি ভক্তের কথোপকথন ও আনন্দ

আজ রবিবার, ১০ই কার্তিক; কৃষ্ণাদ্বিতীয়া —— ২৫শে অক্টোবর, ১৮৮৫। শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতাস্থ শ্যামপুকুরের বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন। গলার

পিড়া (ক্যান্সার) চিকিৎসা করাইতে আসিয়াছেন। আজকাল ডাক্তার সরকার দেখিতেছেন।

ডাক্তারের কাছে পরমহংসদেবের অবস্থা জানাইবার জন্য মাস্টারকে প্রত্যহ পাঠানো হইয়া থাকে। আজ সকালে বেলা ৬।। টার সময় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মাস্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কেমন আছেন?” শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, “ডাক্তারকে বলবে, শেষ রাত্রে একমুখ জল হয়; কাশি আছে; ইত্যাদি। জিজ্ঞাসা করবে নাইব কিনা?”

মাস্টার ৭-টার পর ডাক্তার সরকারের সঙ্গে দেখা করিলেন ও সমস্ত অবস্থা বলিলেন। ডাক্তারের বৃদ্ধ শিক্ষক ও দুই-একজন বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার বৃদ্ধ শিক্ষককে বলিতেছেন, মহাশয়! রাত তিনটে থেকে পরমহংসের ভাবনা আরম্ভ হয়েছে —— ঘুম নাই। এখনও পরমহংস চলেছে। (সকলের হাস্য)

ডাক্তারের একজন বন্ধু ডাক্তারকে বলিতেছেন, মহাশয়, শুনতে পাই পরমহংসকে কেউ কেউ অবতার বলে। আপনি তো রোজ দেখছেন, আপনার কি বোধ হয়?

ডাক্তার —— As man I have the greatest regard for him.

মাস্টার (ডাক্তারের বন্ধুর প্রতি) — ডাক্তার মহাশয় তাঁকে অনুগ্রহ করে অনেক দেখছেন।

ডাক্তার —— অনুগ্রহ!

মাস্টার — আমাদের উপর, পরমহংসদেবের উপর বলছি না।

ডাক্তার — তা নয় হে। তোমরা জান না, আমার actual loss হচ্ছে, রোজ রোজ দুই-তিনটে call-এ যাওয়াই হচ্ছে না। তার পরদিন আপনিই রোগীদের বাড়ি যাই, আর ফি লই না; — আপনি গিয়ে ফি নেবো কেমন করে?

শ্রীযুক্ত মহিমা চক্রবর্তীর কথা হইল। শনিবারে যখন ডাক্তার পরমহংসদেবকে দেখিতে যান, তখন চক্তবর্তী উপস্থিত ছিলেন; ডাক্তারকে দেখিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, 'মহাশয়, আপনি ডাক্তারের অহংকার বাড়াবার জন্য রোগ করিয়াছেন।"

মাস্টার (ডাক্তারের প্রতি) — মহিমা চক্রবর্তী আপনার এখানে আগে আসতেন। আপনি বাড়িতে ডাক্তারী সায়েন্স-এর লেক্‌চার দিতেন, তিনি শুনতে আসতেন।

ডাক্তার — বটে? লোকটার কি তমো! দেখলে — আমি নমস্কার করলুম as God's Lower Third? আর ঈশ্বরের ভিতর তো (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) সব গুণই আছে। ও কথাটা mark করেছিলে, 'আপনি ডাক্তারের অহংকার বাড়াবার জন্য রোগ করে বসেছেন?'

মাস্টার — মহিমা চক্তবর্তীর বিশ্বাস যে, পরমহংসদেব মনে করলে নিজে ব্যারাম আরাম করতে পারেন।

ডাক্তার — ওঃ। তা কি হয়? আপনি ব্যারাম ভাল করা! আমরা ডাক্তার, আমরা তো জানি ও ক্যান্সার-এর ভিতর কি আছে! — আমরাই আরাম করতে

পারি না। উনি তো কিছু জানেন না, উনি কিরকম করে আরাম করবেন! (বন্ধুদের প্রতি) — দেখুন, রোগ দুঃসাধ্য বটে, কিন্তু এরা সকলে তেমনি devotee-র মতো সেবা করছে!

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৫শে অক্টোবর 1885/10/25/ii

52.16 শ্রীরামকৃষ্ণ সেবকসঙ্গে

মাস্টার ডাক্তারকে আসিতে বলিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর বেলা-তিনটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। বলিলেন, ডাক্তার আজ বড় অপ্রতিভ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি হয়েছে?

মাস্টার — 'আপনি হতভাগা ডাক্তারদের অহংকার বাড়াবার জন্য রোগ করে বসেছেন' — এ-কথা শুনে গিছলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কে বলেছিল?

মাস্টার — মহিমা চক্রবর্তী।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তারপর?

মাস্টার — তা মহিমা চক্রবর্তীকে বলে ‘তমোগুণী ঈশ্বর’ (God's Lower Third) এখন ডাক্তার বলছেন, ঈশ্বরের সব গুণ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) আছে! (পরমহংসদেবের হাস্য) আবার আমায় বললেন, রাত তিনটের সময় ঘুম ভেঙে গেছে আর পরমহংসের ভাবনা। বেলা আটটার সময় বলেন, ‘এখনও পরমহংস চলছে।’

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) — ও ইংরাজী পড়েছে, ওকে বলবার জো নাই আমাকে চিন্তা কর; তা আপনিই করছে।

মাস্টার — আবার বলেন, As man I have the greatest regard for him, এর মানে এই, আমি তাঁকে অবতার বলে মানি না। কিন্তু মানুষ বলে যতদূর সম্ভব ভক্তি আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আর কিছু কথা হল?

মাস্টার — আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আজ ব্যারামের কি বন্দোবস্ত হবে?’ ডাক্তার বললেন, ‘বন্দোবস্ত আর আমার মাথা আর মুণ্ডু; আবার আজ যেতে হবে, আর কি বন্দোবস্ত!’ (শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্য) আরও বললেন, ‘তোমরা জান না যে আমার কত টাকা রোজ লোকসান হচ্ছে — দুই-তিন জায়গায় রোজ যেতে সময় হয় না।’

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৫শে অক্টোবর 1885/10/25/iii

52.17 বিজয়াদি ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আসিলেন। সঙ্গে কয়েকটি ব্রাহ্মভক্ত। বিজয়কৃষ্ণ ঢাকায় অনেক দিবস ছিলেন। আপাততঃ পশ্চিমে অনেক তীর্থ ভ্রমণের পর সবে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। আসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অনেকে উপস্থিত ছিলেন, — নরেন্দ্র, মহিমা চক্রবর্তী, নবগোপাল, ভূপতি, লাটু, মাস্টার, ছোট নরেন্দ্র ইত্যাদি অনেকগুলো ভক্ত।

মহিমা চক্রবর্তী (বিজয়ের প্রতি) — মহাশয়, তীর্থ করে এলেন, অনেক দেশ দেখে এলেন, এখন কি দেখলেন বলুন।

বিজয় — কি বলব! দেখছি, যেখানে এখন বসে আছি, এইখানেই সব। কেবল মিছে ঘোরা! কোন কোন জায়গায় এঁরই এক আনা কি দুই আনা, কোথাও চারি আনা, এই পর্যন্ত। এইখানেই পূর্ণ ষোল আনা দেখছি!

মহিমা চক্রবর্তী — ঠিক বলছেন, আবার ইনিই ঘোরান, ইনিই বসান!

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) — দেখ, বিজয়ের অবস্থা কি হয়েছে। লক্ষণ সব বদলে গেছে, যেন সব আউটে গেছে। আমি পরমহংসের ঘাড় ও কপাল দেখে চিনতে পারি। বলতে পারি, পরমহংস কি না।

মহিমা চক্রবর্তী —— মহাশয়! আপনার আহার কমে গেছে?

বিজয় —— হাঁ, বোধ হয় গিয়েছে। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — আপনার পীড়ার কথা শুনে দেখতে এলাম। আবার ঢাকা থেকে ——

শ্রীরামকৃষ্ণ —— কি?

বিজয় কোন উত্তর দিলেন না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

বিজয় —— ধরা না দিলে ধরা শক্ত। এইখানেই ষোল আনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— কেদার১ বললে, অন্য জায়গায় খেতে পাই না —— এখানে এসে পেট ভরা পেলুম! মহিমা চক্রবর্তী —— পেট ভরা কি? উপচে পড়ছে!

বিজয় (হাতজোড় করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — বুঝেছি আপনি কে! আর বলতে হবে না!

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ) — যদি তা হয়ে থাকে, তো তাই।

বিজয় —— বুঝেছি।

এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে পতিত হইলেন ও নিজের বক্ষে তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ঈশ্বরাবেশে বাহ্যশূন্য চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন।

এই প্রেমাবেশ, এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া উপস্থিত ভক্তেরা কেহ কাঁদিতেছেন, কেহ স্তব করিতেছেন। যাঁহার যে মনের ভাব তিনি সেই ভাবে একদৃষ্টে শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া রহিলেন! কেহ তাঁহাকে পরমভক্ত, কেহ সাধু, কেহ বা সাক্ষাৎ দেহধারী ঈশ্বরাবতার দেখিতেছেন, যাঁহার যেমন ভাব।

মহিমাচরণ সাশ্রুনয়নে গাহিলেন — দেখ দেখ প্রেমমূর্তি — ও মাঝে মাঝে যেন ব্রহ্মদর্শন করিতেছেন, এই ভাবে বলিতেছেন —

"তুরীয়ং সচ্চিদানন্দম্ দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্।"

নবগোপাল কাঁদিতেছেন। আর একটি ভক্ত ভূপতি গাহিলেন:

জয় জয় পরব্রহ্ম অপার তুমি অগম্য
        পারাৎপর তুমি সারাৎসার।
সত্যের আলোক তুমি প্রেমের আকর ভূমি,
        মঙ্গলের তুমি মূলাধার।
নানা রসযুত ভব, গভীর রচনা তব,
        উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায়,
মহাকবি আদিকবি, ছন্দে উঠে শশী রবি,
        ছন্দে পুনঃ অস্তাচলে যায়।

তারকা কনক কুচি, জলদ অক্ষর রুচি,
গীত লেখা নীলাম্বর পাতে।
ছয় ঋতু সম্বৎসরে, মহিমা কীর্তন করে,
সুখপূর্ণ চরাচর সাথে।
কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি,
বজ্ররবে রুদ্র তুমি ভীম;
তব ভাব গূঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি,
ধ্যায় যুগযুগান্ত অসীম।
আনন্দে সবে আনন্দে, তোমার চরণ বন্দে,
কোটি চন্দ্র কোটি সূর্য তারা!
তোমারি এ রচনারি, ভাব লয়ে নরনারী,
হাহাকারে নেত্রে বহে ধারা।
মিলি সুর, নর, ঋভু, প্রণমে তোমায় বিভু
তুমি সর্ব মঙ্গল-আলয়;
দেও জ্ঞান, দেও প্রেম, দেও ভক্তি, দেও ক্ষেম,
দেও দেও ওপদে আশ্রয়।

ভূপতি আবার গাহিতেছেন:

[ঝিঁঝিট — (খয়রা) কীর্তন]

চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।
মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী মরি মরি

বিবিধ বিলাস রসপ্রসঙ্গ, কত অভিনব ভাবতরঙ্গ,

ডুবিছে উঠিছে করিছে রঙ্গ, নবীন নবীন রূপ ধরি,

(হরি হরি বলে)

মহাযোগে সমুদয় একাকার হইল,

দেশ-কাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল,

(আশা পুরিল রে, আমার সকল সাধ মিটে গেল!)

এখন আনন্দে মাতিয়া দুবাহু তুলিয়া, বলরে মন হরি হরি।

[ঝাঁপতাল]

টুটল ভরম ভীতি ধরম করম নীতি

দূর ভেল জাতি কুল মান;

কাঁহা হাম, কাঁহা হরি, প্রাণমন চুরি করি,

বঁধূয়া করিলা পয়ান;

(আমি কেনই বা এলাম গো, প্রেমসিন্ধুতটে),

ভাবেতে হল ভোর, অবহিঁ হৃদয় মোর

নাহি যাত আপনা পসান,

প্রেমদার কহে হাসি, শুন সাধু জগবাসী,

এয়সাহি নূতন বিধান।

(কিছু ভয় নাই! ভয় নাই!)

অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেন।

[ব্রহ্মজ্ঞান ও 'আশ্চর্য গণিত' — অবতারের প্রয়োজন]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — কি একটা হয় আবেশে; এখন লজ্জা হচ্ছে। যেন ভূতে পায়, আমি আর আমি থাকি না।

"এ-অবস্থার পর গণনা হয় না। গণতে গেলে ১-৭-৮ এইরকম গণনা হয়।"

নরেন্দ্র — সব এক কিনা!

শ্রীরামকৃষ্ণ — না, এক দুয়ের পার![২]

মহিমাচরণ — আজ্ঞা হাঁ, দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হিসাব পচে যায়! পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। তিনি শাস্ত্র, — বেদ, পুরাণ, তন্ত্রের — পার। হাতে একখানা বই যদি দেখি, জ্ঞানী হলেও তাঁকে রাজর্ষি বলে কই। ব্রহ্মর্ষির কোন চিহ্ন থাকে না। শাস্ত্রের কি ব্যবহার জানো? একজন চিঠি লিখেছিল, পাঁচ সের সন্দেশ ও একখানা কাপড় পাঠাইবে। যে চিঠি পেলে সে চিঠি পড়ে, পাঁচ সের সন্দেশ ও একখানা কাপড়, এই কথা মনে রেখে চিঠিখানা ফেলে দিলে! আর চিঠির কি দরকার?

বিজয় — সন্দেশ পাঠানো হয়েছে, বোঝা গেছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ — মানুষদেহ ধারণ করে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। তিনি সর্বস্থানে সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু অবতার না হলে জীবের আকাঙ্খা পুরে না, প্রয়োজন মেটে

না। কিরকম জানো? গরুর যেখানটা ছোঁবে, গরুকে ছোঁয়াই হয় বটে। শিঙটা ছুঁলেও গাইটাকে ছোঁয়া হল, কিন্তু গাইটার বাঁট থেকেই দুধ হয়। (সকলের হাস্য)

মহিমা — দুধ যদি দরকার হয়, গাইটার শিঙে মুখ দিলে কি হবে? বাঁটে মুখ দিতে হবে। (সকলের হাস্য)

বিজয় — কিন্তু বাছুর প্রথম প্রথম এদিক-ওদিক ঢুঁ মারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) — আবার কেউ হয়তো বাছুরকে ওইরকম করতে দেখে বাঁটটা ধরিয়ে দেয়। (সকলের হাস্য)

১ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চাটুজ্যে অনেকদিন ঢাকায় ছিলেন। ঈশ্বরের কথা পড়লেই তাঁহার চক্ষু আর্দ্র হইত। একজন পরমভক্ত। বাটী হালিসহর।

২ এক দুয়ের পার — The Absolute as distinguished from the Relative.

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৫শে অক্টোবর 1885/10/25/iv

52.18 ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে

এই সকল কথা হইতেছে, এমন সময়ে ডাক্তার তঁহাকে দেখিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিতেছেন, “কাল রাত তিনটে থেকে আমার ঘুম ভেঙেছে। কেবল তোমার জন্য ভাবছিলাম, পাছে ঠাণ্ডা লেগে থাকে। আরও কত কি ভাবছিলাম।”

শ্রীরামকৃষ্ণ — কাশি হয়েছে, টাটিয়েছে; শেষ রাত্রে একমুখ জল, আর যেন কাঁটা বিঁধছে।

ডাক্তার — সকালে সব খবর পেয়েছি।

মহিমাচরণ তাঁহার ভারতবর্ষ ভ্রমণের কথা বলিতেছেন। বলিলেন যে, লঙ্কাদ্বীপে ‘ল্যাফিং ম্যান্’ নাই। ডাক্তার সরকার বলিলেন, তা হবে, ওটা এন্‌কোয়ার করতে হবে। (সকলের হাস্য)

[ডাক্তারের ব্যবসা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ]

ডাক্তারী কর্মের কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) — ডাক্তারী কর্ম খুব উঁচু কর্ম বলে অনেকের বোধ আছে। যদি টাকা না লয়ে পরের দুঃখ দেখে দয়া করে কেউ চিকিৎসা করে তবে সে মহৎ, কাজটিও মহৎ। কিন্তু টাকা লয়ে এ-সব কাজ করতে করতে মানুষ নির্দয় হয়ে যায়। ব্যবসার ভাবে টাকার জন্য হাগা, বাহ্যের রঙ এই সব দেখা — নীচের কাজ।

ডাক্তার — তা যদি শুধু করে, কাজ খারাপ বটে। তোমার কাছে বলা গৌরব করা —

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, ডাক্তারী কাজে নিঃস্বার্থভাবে যদি পরের উপকার করা হয়, তাহলে খুব ভাল।

“তা যে কর্মই লোকে করুক না কেন, সংসারী ব্যক্তির মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ বড় দরকার। ঈশ্বরে ভক্তি থাকলে লোকে সাধুসঙ্গ আপনি খুঁজে লয়। আমি উপমা দিই — গাঁজাখোর গাঁজাখোরের সঙ্গে থাকে, অন্য লোক দেখলে মুখ নিচু করে চলে যায়, বা লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু আর-একজন গাঁজাখোর দেখলে মহা আনন্দ। হয়তো কোলাকুলি করে। (সকলের হাস্য) আবার শকুনি শকুনির সঙ্গে থাকে।”

[সাধুর সর্বজীবে দয়া]

ডাক্তার — আবার কাকের ভয়ে শকুনি পালায়। আমি বলি শুধু মানুষ কেন, সব জীবেরই সেবা করা উচিত। আমি প্রায়ই চড়ুই পাখিকে ময়দা দিই। ছোট ছোট ময়দার গুলি করে ছুঁড়ে ফেলি, আর ছাদে ঝাঁকে ঝাঁকে চড়ুই পাখি এসে খায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বাঃ, এটা খুব কথা। জীবকে খাওয়ানো সাধুর কাজ; সাধুরা পিঁপড়েদের চিনি দেয়।

ডাক্তার — আজ গান হবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) — একটু গান কর না।

নরেন্দ্র গাহিতেছেন, তানপুরা সঙ্গে। অন্য বাজনাও হইতে লাগিল —

সুন্দর তোমার নাম দীন-শরণ হে,

বরিষে অমৃতধার, জুড়ায় শ্রবণ ও প্রাণরমণ হে।

এক তব নাম ধন, অমৃত-ভবন হে,

অমর হয় সেইজন, যে করে কীর্তন হে।

গভীর বিষাদরাশি নিমেষে বিনাশে,

যখনি তব নামসুধা শ্রবণে পরশে;

হৃদয় মধুময় তব নাম গানে,

হয় হে হৃদয়নাথ, চিদানন্দ ঘন হে।

গান — আমায় দে মা পাগল করে।

আর কাজ নাই মা জ্ঞান বিচারে ।।

(ব্রহ্মময়ী দে মা পাগল ক’রে)

(ওমা) তোমার প্রেমের সুরা, পানে কর মাতোয়ারা,

ওমা ভক্তচিত্তহরা ডুবাও প্রেমসাগরে ।।

তোমার এ পাগলাগারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে,

কেহ নাচে আনন্দ ভরে;

ঈশা বুদ্ধ শ্রীচৈতন্য ওমা প্রেমের ভরে অচৈতন্য,

হায় কবে হব মা ধন্য, (ওমা) মিশে তার ভিতরে ।।

গানের পর আবার অদ্ভুত দৃশ্য। সকলেই ভাবে উন্মত্ত। পণ্ডিত পাণ্ডিত্যাভিমান ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বলছেন, “আমায় দে মা পাগল করে, আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।” বিজয় সর্বপ্রথমে আসনত্যাগ করিয়া ভাবোন্মত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাহার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুর দেহের কঠিন অসাধ্য ব্যাধি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার সম্মুখে। তিনিও দাঁড়াইয়েছেন। রোগীরও হুঁশ নাই, ডাক্তারেরও হুঁশ নাই। ছোট নরেনের ভাবসমাধি হইল। লাটুরও ভাবসমাধি হইল। ডাক্তার সায়েন্স্‌ পড়িয়াছেন, কিন্তু অবাক্‌ হইয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, যাঁহাদের ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের বাহ্য চৈতন্য কিছুই নাই, সকলেই স্থির, নিস্পন্দ; ভাব উপশম হইলে কেহ কাঁদিতেছেন, কেহ কেহ হাসিতেছেন। যেন কতকগুলি মাতাল একত্র হইয়াছে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৫শে অক্টোবর 1885/10/25/v

52.19 ভক্তসঙ্গে — শ্রীরামকৃষ্ণ ও ক্রোধজয়

এই কাণ্ডের পর সকলে আবার আসন গ্রহণ করিলেন। রাত আটটা হইয়া গিয়াছে। আবার কথাবার্তা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) — এই যা ভাব-টাব দেখলে তোমার সায়েন্স কি বলে? তোমার কি এ-সব ঢঙ বোধ হয়?

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — যেখানে এত লোকের হচ্ছে সেখানে natural (আন্তরিক) বোধ হয়, ঢঙ বোধ হয় না। (নরেন্দ্রের প্রতি) যখন তুমি গাচ্ছিলে 'দে মা পাগল করে, আর কাজ নাই মা জ্ঞান বিচারে' তখন আর থাকতে পারি নাই। দাঁড়াই আর কি! তারপর অনেক কষ্টে ভাব চাপলুম; ভাবলুম যে display করা হবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি, সহাস্যে) — তুমি যে অটল অচল সুমেরুবৎ। (সকলের হাস্য) তুমি গম্ভীরাত্মা, রূপসনাতনের ভাব কেউ টের পেতো না —— যদি ডোবাতে হাতি নামে, তাহলেই তোলপাড় হয়ে যায়। কিন্তু সায়ের দীঘিতে নামলে তোলপাড় হয় না। কেউ হয়তো টেরও পায় না। শ্রীমতী সখীকে বললেন, 'সখি, তোরা তো কৃষ্ণের বিরহে কত কাঁদছিস। কিন্তু দেখ, আমি যে কঠিন, আমার চক্ষে একবিন্দুও জল নাই।' তখন বৃন্দা বললেন, সখি, তোর চক্ষে জল নাই, তার অনেক মানে আছে। তোর হৃদয়ে বিরহ অগ্নি সদা জ্বলছে; চক্ষে জল উঠছে আর সেই অগ্নির তাপে শুকিয়ে যাচ্ছে!

ডাক্তার —— তোমার সঙ্গে তো কথায় পারবার জো নাই। (হাস্য)

ক্রমে অন্য কথা পড়িল। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের প্রথম ভাবাবস্থা বর্ণনা করিতেছিলেন। আর কাম-ক্রোধাদি কিরূপে বশ করিতে হয়।

ডাক্তার — তুমি ভাবে পড়েছিলে, আর-একজন দুষ্ট লোক তোমায় বুট জুতার গোঁজা মেরেছিল — সে-সব কথা শুনেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সে কালীঘাটের চন্দ্র হালদার। সেজোবাবুর কাছে প্রায় আসত। আমি ঈশ্বরের আবেশে মাটিতে অন্ধকারে পড়ে আছি। চন্দ্র হালদার ভাবত, আমি ঢঙ করে ওইরকম হয় থাকি, বাবুর প্রিয়পাত্র হব বলে। সে অন্ধকারে এসে বুট জুতার গোঁজা দিতে লাগল। গায়ে দাগ হয়েছিল। সবাই বলে, সেজোবাবুকে বলে দেওয়া যাক। আমি বারণ করলুম।

ডাক্তার — এও ঈশ্বরের খেলা; ওতেও লোক শিখবে, ক্রোধ কিরকম করে বশীভূত করতে হয়। ক্ষমা কাকে বলে, লোক শিখবে।

[বিজয় ও নরেন্দ্রের ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন]

ইতিমধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে বিজয়ের সঙ্গে ভক্তদের অনেক কথাবার্তা হইতেছে।

বিজয় — কে একজন আমার সঙ্গে সদা-সর্বদা থাকেন, আমি দূরে থাকলেও তিনি জানিয়ে দেন, কোথায় কি হচ্ছে।

নরেন্দ্র — Guardian angel-এর মতো।

বিজয় — ঢাকায় এঁকে (পরমহংসদেবকে) দেখেছি! গা ছুঁয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) — সে তবে আর-একজন!

নরেন্দ্র — আমিও এঁকে নিজে অনেকবার দেখেছি! (বিজয়ের প্রতি) তাই কি করে বলব — আপনার কথা বিশ্বাস করি না।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

বিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৬শে অক্টোবর 1885/10/26/i

52.20 শ্রীরামকৃষ্ণ — গিরিশ, মাস্টার, ছোট নরেন্দ্র, কালী, শরৎ রাখাল, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

পরদিন আশ্বিনের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি, সোমবার, ১১ই কার্তিক — ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৫। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব কলিকাতায় ওই শ্যামপুকুরের বাটীতে চিকিৎসার্থ রহিয়াছেন। ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতেছেন। প্রায় প্রত্যহ আসেন, আর তাঁহার নিকট পীড়ার সংবাদ লইয়া লোক সর্বদা যাতায়াত করে।

শরৎকাল। কয়েকদিন হইল শারদীয়া দুর্গাপূজা হইয়া গিয়াছে। এ মহোৎসব শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যমণ্ডলী হর্ষ-বিষাদে অতিবাহিত করিয়াছেন। তিন মাস ধরিয়া গুরুদেবের কঠিন পীড়া — কণ্ঠদেশে — ক্যান্সার। সরকার ইত্যাদি ডাক্তার ইঙ্গিত করিয়াছেন, পীড়া চিকিৎসার অসাধ্য। হতভাগ্য শিষ্যেরা এ-কথা শুনিয়া একান্তে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেন। এক্ষণে এই শ্যামপুকুরের বাটীতে আছেন।

শিষ্যরা প্রাণপণে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। নরেন্দ্রাদি কৌমারবৈরাগ্যযুক্ত শিষ্যগণ এই মহতী সেবা উপলক্ষে কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগপ্রদর্শী সোপান আরোহণ করিতে সবে শিখিতেছেন।

এত পীড়া কিন্তু দলে দলে লোক দর্শন করিতে আসিতেছেন — শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিলেই শান্তি ও আনন্দ হয়। অহেতুক-কৃপাসিন্ধু! দয়ার ইয়ত্তা নাই — সকলের সঙ্গেই কথা কহিতেছেন, কিসে তাহাদের মঙ্গল হয়। শেষে ডাক্তারেরা, বিশেষতঃ ডাক্তার সরকার, কথা কহিতে একেবারে নিষেধ করিলেন। কিন্তু ডাক্তার নিজে ৬।৭ ঘণ্টা করিয়া থাকেন। তিনি বলেন, "আর কাহারও সহিত কথা কওয়া হবে না, কেবল আমার সঙ্গে কথা কইবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পান করিয়া ডাক্তার একেবারে মুগ্ধ হইয়া যান। তাই এতক্ষণ ধরিয়া বসিয়া থাকেন।

বেলা দশটার সময় ডাক্তারকে সংবাদ দিবার জন্য মাস্টার যাইবেন, তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত কথাবার্তা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — অসুখটা খুব হাল্কা হয়েছে। খুব ভাল আছি। আচ্ছা, তবে ঔষধে কি এরূপ হয়েছে? তাহলে ওই ঔষধটা খাই না কেন?

মাস্টার — আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, তাঁকে সব বলব; তিনি যা ভাল হয় তাই বলবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখ, পূর্ণ[১] দুই-তিনদিন আসে নাই, বড় মন কেমন কচ্ছে।

মাস্টার — কালীবাবু, তুমি যাও না পূর্ণকে ডাকতে।

কালী — এই যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — ডাক্তারের ছেলেটি বেশ! একবার আসতে বলো।

১ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রের বয়স ১৪।১৫

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

একবিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৬শে অক্টোবর 1885/10/26/ii

52.21 মাস্টার ও ডাক্তার সংবাদ

মাস্টার ডাক্তারের বাড়ি উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ডাক্তার দুই-একজন বন্ধু সঙ্গে বসিয়া আছেন।

ডাক্তার (মাস্টারের প্রতি) — এই একমিনিট হল তোমার কথা কচ্ছিলাম। দশটায় আসবে বললে, দেড় ঘণ্টা বসে। ভাবলুম, কেমন আছেন, কি হল। (বন্ধুকে) ‘ওহে সেই গানটা গাও তো’।

বন্ধু গাহিতেছেন:

কর তাঁর নাম গান, যতদিন দেহে রহে প্রাণ।
যাঁর মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতিঃ, জগৎ করে হে আলো;
স্রোত বহে প্রেমপীযূষ-বারি, সকল জীব সুখকারী হে।
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত বাক্যে বলিতে কি পারি।
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্তে সকল শোক অপসারি হে।
উচ্চে নিচে দেশ দেশান্তে, জলগর্ভে, কি আকাশে;
অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর, এই সবে সদা জিজ্ঞাসে হে।
চেতন নিকেতন পরশ রতন সেই নয়ন অনিমেষ,
নিরঞ্জন সেই, যাঁর দরশনে, নাহি রহে দুঃখ লেশ হে।

ডাক্তার (মাস্টারকে) — গানটি খুব ভাল, — নয়? ওইখানটি কেমন?

‘অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর, এই সবে সদা জিজ্ঞাসে।’

মাস্টার — হাঁ, ও-খানটি বড় চমৎকার! খুব অনন্তের ভাব।

ডাক্তার (সস্নেহে) — অনেক বেলা হয়েছে, তুমি খেয়েছো তো? আমার দশটার মধ্যে খাওয়া হয়ে যায়, তারপর আমি ডাক্তারী করতে বেরুই। না খেয়ে বেরুলে অসুখ করে। ওহে, একদিন তোমাদের খাওয়াব মনে করেছি।

মাস্টার — তা বেশ তো, মহাশয়।

ডাক্তার — আচ্ছা, এখানে না সেখানে? তোমরা যা বল। —

মাস্টার — মহাশয়, এইখানেই হোক, আর সেইখানেই হোক, সকলে আহ্লাদ করে খাব।

এইবার মা কালীর কথা হইতেছে।

ডাক্তার — কালী তো একজন সাঁওতালী মাগী। (মাস্টারের উচ্চহাস্য)

মাস্টার — ও-কথা কোথায় আছে?

ডাক্তার — শুনেছি এইরকম। (মাস্টারের হাস্য)

পূর্বদিন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ও অন্যান্য ভক্তের ভাবসমাধি হইয়াছিল। ডাক্তারও উপস্থিত ছিলেন। সেই কথা হইতেছে।

ডাক্তার — ভাব তো দেখলুম। বেশি ভাব কি ভাল?

মাস্টার — পরমহংসদেব বলে যে, ঈশ্বরচিন্তা করে যে ভাব হয় তা বেশি হলে কোন ক্ষতি হয় না। তিনি বলেন যে মণির জ্যোতিতে আলো হয় আর শরীর স্নিগ্ধ হয়, কিন্তু গা পুড়ে যায় না!

ডাক্তার — মণির জ্যোতিঃ; ও যে Reflected light!

মাস্টার — তিনি আরও বলেন, অমৃতসরোবরে ডুবলে মানুষ মরে যায় না। ঈশ্বর অমৃতের সরোবর। তাঁতে ডুবলে মানুষের অনিষ্ট হয় না; বরং মানুষ অমর হয়। অবশ্য যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে।

ডাক্তার — হাঁ, তা বটে।

ডাক্তার গাড়িতে উঠিলেন, দু-চারিটি রোগী দেখিয়া পরমহংসদেবকে দেখিতে যাইবেন। পথে আবার মাস্টারের সঙ্গে কথা হইতে লাগিল। ‘চক্রবর্তীর অহংকার’ ডাক্তার এই কথা তুলিলেন।

মাস্টার — পরমহংসদেবের কাছে তাঁর যাওয়া-আসা আছে। অহংকার যদি থাকে, কিছুদিনের মধ্যে আর থাকবে না। তাঁর কাছে বসলে জীবের অহংকার পলায়ন করে অহংকার চূর্ণ হয়। ওখানে অহংকার নাই কি না, তাই। নিরহংকারের নিকট আসলে অহংকার পালিয়ে যায়। দেখুন, বিদ্যাসাগর মহাশয় অত বড়লোক, কত বিনয় আর নম্রতা দেখিয়েছেন। পরমহংসদেব তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন, বাদুড়বাগানের বাড়িতে। যখন বিদায় লন, রাত তখন ৯টা। বিদ্যাসাগর লাইব্রেরীঘর থেকে বরাবর সঙ্গে সঙ্গে, নিজে এক-একবার বাতি ধরে, এসে গাড়িতে তুলে দিলেন; আর বিদায়ের সময় হাতজোড় করে রহিলেন।

ডাক্তার — আচ্ছা, এঁর বিষয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কি মত?

মাস্টার — সেদিন খুব ভক্তি করেছিলেন। তবে কথা কয়ে দেখেছি, বৈষ্ণবেরা যাকে ভাব-টাব বলে, সে বড় ভালবাসেন না। আপনার মতের মতো।

ডাক্তার — হাতজোড় করা, পায়ে মাথা দেওয়া, আমি ও-সব ভালবাসি না। মাথাও যা, পাও তা। তবে যার পা অন্য জ্ঞান আছে, সে করুক।

মাস্টার — আপনি ভাব-টাব ভালবাসেন না। পরমহংসদেব আপনাকে ‘গম্ভীরাত্মা’ মাঝে মাঝে বলেন, বোধ হয় মনে আছে। তিই কাল আপনাকে বলেছিলেন যে, ডোবাতে হাতি নামলে জল তোলপাড় হয়, কিন্তু সায়ের দীঘি বড়, তাতে হাতি নামলে জল নড়েও না। গম্ভীরাত্মার ভিতর ভাবহস্তী নামলে তার কিছু করতে পারে না। তিনি বলেন, আপনি ‘গম্ভীরাত্মা’।

ডাক্তার — I don't deserve the Compliment, ভাব আর কি? feelings; ভক্তি, আর অন্যান্য feelings — বেশি হলে কেউ চাপতে পারে, কেউ পারে না।

মাস্টার — Explanation কেউ দিতে পারে একরকম করে — কেউ পারে না; কিন্তু মহাশয়, ভাবভক্তি জিনিসটা অপূর্ব সামগ্রী। Stebbing on Darwinism আপনার library-তেa দেখলাম। Stebbing বলেন, Human mind যার দ্বারাই হউক — evolution দ্বারাই হোক বা ঈশ্বর আলাদা বসে সৃষ্টিই করুন — equally wonderful. তিনি একটি বেশ উপমা দিয়েছেন — theory of light. Whether you know the undulatory theory of light or not, light in either case is equally wonderful.

ডাক্তার — হাঁ; আর দেখেছো, Stebbing Darwinism মানে, আবার God মানে।

আবার পরমহংসদেবের কথা পড়িল।

ডাক্তার — ইনি (পরমহংসদেব) দেখছি কালীর উপাসক।

মাস্টার — তাঁর ‘কালী’ মানে আলাদা। বেদ যাঁকে পরমব্রহ্ম বলে, তিনি তাঁকেই কালী বলেন। মুসলমান যাঁকে আল্লা বলে, খ্রীষ্টান যাঁকে গড্‌ বলে, তিনি তাঁকেই কালী বলেন। তিনি অনেক ঈশ্বর দেখেন না। এক দেখেন। পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে গেছেন। যোগীরা যাঁকে আত্মা বলেন, ভক্তেরা যাঁকে ভগবান বলেন, পরমহংসদেব তাঁকেই কালী বলেন।

“তাঁর কাছে শুনেছি, একজনের একটি গামলা ছিল, তাতে রঙ ছিল। কারু কাপড় ছোপাবার দরকার হলে তার কাছে যেত। সে জিজ্ঞাসা করত, তুমি কি রঙে ছোপাতে চাও। লোকটি যদি বলত সবুজ রঙ, তাহলে কাপড়খানি গামলার রঙে ডুবিয়ে ফিরিয়ে দিত; ও বলত, এই লও তোমার সবুজ রঙে ছোপানো কাপড়। যদি কেহ বলত লাল রঙ, সেই গামলায় কাপড়খানি ছুপিয়ে সে বলত, এই লও তোমার লালে ছোপানো কাপড়। এই এক গামলার রঙে সবুজ, নীল, হলদে, সব রঙের কাপড় ছোপানো হত। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে একজন লোক বললে, বাবু আমি কি রঙ চাই বলব? তুমি নিজে যে রঙে ছুপেছো আমায় সেই রঙ দাও। সেইরূপ পরমহংসদেবের ভিতরে সব ভাব আছে, — সব ধর্মের, সব সম্প্রদায়ের লোক তাঁর কাছে শান্তি পায় ও আনন্দ পায়। তাঁর যে কি ভাব, কি গভীর অবস্থা, তা কে বুঝবে?”

ডাক্তার — All things to all men! তাও ভাল নয় although St. Paul says it.

মাস্টার — পরমহংসদেবের অবস্থা কে বুঝবে? তাঁর মুখে শুনেছি, সুতার ব্যবসা না করলে ৪০ নং সুতা আর ৪১ নং সুতার প্রভেদ বুঝা যায় না। পেন্টার না হলে

পেন্টার-এর আর্ট বুঝা যায় না। মহাপুরুষের গভীর ভাব। ক্রাইস্ট-এর ন্যায় না হলে ক্রাইস্ট-এর ভাব বুঝা যায় না। পরমহংসদেবের এই গভীর ভাব হয়তো ক্রাইস্ট যা বলেছিলেন তাই — Be perfect as your Father in heaven is perfect.

ডাক্তার — আচ্ছা, তাঁর অসুখের তদারক তোমরা কিরূপ কর?

মাস্টার — আপাততঃ, প্রত্যহ একজন সুপার্‌ইন্‌টেণ্ড করেন, যাঁহাদের বয়স বেশি। কোনদিন গিরিশবাবু, কোনদিন রামবাবু, কোনদিন বলরামবাবু, কোনদিন সুরেশবাবু, কোনদিন নবগোপাল, কোনদিন কালীবাবু, এইরকম।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৬শে অক্টোবর 1885/10/26/iii

52.22 ভক্তসঙ্গে — শুধু পাণ্ডিত্যে কি আছে?

এই সকল কথা হইতে হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর পরমহংসদেব শ্যামপুকুরে যে বাড়িতে চিকিৎসার্থ অবস্থান করিতেছেন, সেই বাড়ির সম্মুখে ডাক্তারের গাড়ি আসিয়া লাগিল। তখন বেলা ১টা। ঠাকুর দোতলার ঘরে বসিয়া আছেন। অনকগুলি ভক্ত সম্মুখে উপবিষ্ট; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ, ছোট নরেন্দ্র, শরৎ ইত্যাদি।

সকলের দৃষ্টি সেই মহাযোগী সদানন্দ মহাপুরুষের দিকে। সকলে যেন মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় রোজার সম্মুখে বসিয়া আছেন। অথবা বরকে লইয়া বরযাত্রীরা যেন আনন্দ করিতেছেন। ডাক্তার ও মাস্টার আসিয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তারকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "আজ বেশ ভাল আছি।"

ক্রমে ভক্তসঙ্গে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অনেক কথাবার্তা চলিতে লাগিল।

[পূর্বকথা — রামনারায়ণ ডাক্তার — বঙ্কিম সংবাদ]

শ্রীরামকৃষ্ণ — শুধু পণ্ডিত কি হবে, যদি বিবেক-বৈরাগ্য না থাকে। ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা করলে আমার একটি অবস্থা হয়। পরনের কাপড় পড়ে যায়, শিড়্ শিড়্ করে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কি একটা উঠে। তখন সকলকে তৃণজ্ঞান হয়। পণ্ডিতের যদি দেখি বিবেক নাই, ঈশ্বরে ভালবাসা নাই, খড়কুটো মনে হয়।

"রামনারায়ণ ডাক্তার আমার সঙ্গে তর্ক করছিল; হঠাৎ সেই অবস্থাটা হল। তারপর তাঁকে বললুম, তুমি কি বলছো? তাঁকে তর্ক করে কি বুঝবে! তাঁর সৃষ্টিই বা কি বুঝবে। তোমার তো ভারী তেঁতে বুদ্ধি। আমার অবস্থা দেখে সে কাঁদতে লাগল — আর আমার পা টিপতে লাগল।"

ডাক্তার — রামনারায়ণ ডাক্তার হিন্দু কি না! আবার ফুল-চন্দন লয়! সত্য হিন্দু কি না।

মাস্টার (স্বগতঃ) — ডাক্তার বলেছিলেন, আমি শাঁকঘণ্টায় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— বঙ্কিম তোমাদের একজন পণ্ডিত। বঙ্কিমের১ সঙ্গে দেখা হয়েছিল —— আমি জিজ্ঞাসা করলুম, মানুষের কর্তব্য কি? তা বলে, 'আহার, নিদ্রা আর মৈথুন।' এই সকল কথাবার্তা শুনে আমার ঘৃণা হল। বললুম যে, তোমার এ কিরকম কথা! তুমি তো বড় ছ্যাঁচ্‌ড়া। যা সব রাতদিন চিন্তা করছো, কাজে করছো, তাই আবার মুখ দিয়ে বেরুচ্চে। মূলো খেলেই মূলোর ঢেঁকুর উঠে। তারপর অনেক ঈশ্বরীয় কথা হল। ঘরে সংকীর্তন হল। আমি আবার নাচলুম। তখন বলে, মহাশয়! আমাদের ওখানে একবার যাবেন। আমি বললুম, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। তখন বলে, আমাদের সেখানেও ভক্ত আছে, দেখবেন। আমি হাসতে হাসতে বললুম, কি রকম ভক্ত আছে গো? 'গোপাল!' 'গোপাল!' যারা বলেছিল, সেইরকম ভক্ত নাকি?

ডাক্তার —— 'গোপাল!' 'গোপাল।' সে ব্যাপারটা কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — একটি স্যাকরার দোকান ছিল। বড় ভক্ত, পরম বৈষ্ণব —— গলায় মালা, কপালে তিলক, হস্তে হরিনামের মালা। সকলে বিশ্বাস করে ওই দোকানেই আসে, ভাবে এরা পরমভক্ত, কখনও ঠকাতে যাবে না। একদল খদ্দের এলে দেখত কোনও কারিগর বলছে 'কেশব!' 'কেশব!' আর-একজন কারিগর খানিক পরে নাম করছে 'গোপাল!' 'গোপাল!' আবার খানিকক্ষণ পরে একজন কারিগর বলছে, 'হরি', 'হরি', তারপর কেউ বলছে 'হর; হর!' কাজে কাজেই এত ভগবানের নাম দেখে খরিদ্দারেরা সহজেই মনে করত, এ-স্যাকরা অতি উত্তম লোক। —— কিন্তু ব্যাপারটা কি জানো? যে বললে, 'কেশব, কেশব!'

তার মনের ভাব, এ-সব (খদ্দের) কে? যে বললে ‘গোপাল! গোপাল!’ তার অর্থ এই যে আমি এদের চেয়ে চেয়ে দেখলুম, এরা গরুর পাল। (হাস্য)

যে বললে ‘হরি হরি’ — তার অর্থ এই যে, যদি গরুর পাল, তবে হরি অর্থাৎ হরণ করি। (হাস্য) যে বললে, ‘হর হর!’ — তার মানে এই — তবে হরণ কর, হরণ কর; এরা তো গরুর পাল! (হাস্য)

“সেজোবাবুর সঙ্গে আর-একজায়গায় গিয়েছিলাম; অনেক পণ্ডিত আমার সঙ্গে বিচার করতে এসেছিল। আমি তো মুখ্যু! (সকলের হাস্য) তারা আমার সেই অবস্থা দেখলে, আর আমার সঙ্গে কথাবার্তা হলে বললে, মহাশয়! আগে যা পড়েছি, তোমার সঙ্গে কথা কয়ে সে সব পড়া বিদ্যা সব থু হয়ে গেল! এখন বুঝেছি, তাঁর কৃপা হলে জ্ঞানের অভাব থাকে না, মূর্খ বিদ্বান হয়, বোবার কথা ফুটে! তাই বলছি, বই পড়লেই পণ্ডিত হয় না।”

[পূর্বকথা — প্রথম সমাধি — আবির্ভাব ও মূর্খের কণ্ঠে সরস্বতী]

“হাঁ, তাঁর কৃপা হলে জ্ঞানের কি আর অভাব থাকে? দেখ না, আমি মুখ্যু, কিছুই জানি না, তবে এ-সব কথা বলে কে? আবার এ-জ্ঞানের ভাণ্ডার অক্ষয়। ও দেশে ধান মাপে, ‘রামে রাম, রামে রাম’, বলতে বলতে। একজন মাপে, আর যাই ফুরিয়ে আসে, আর-একজন রাশ ঠেলে দেয়। তার কর্মই ওই, ফুরালেই রাশ ঠেলে। আমিও যা কথা কয়ে যাই, ফুরিয়ে আসে আসে হয়, মা আমার অমনি তাঁর অক্ষয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের রাশ ঠেলে দেন!

“ছেলেবেলায় তাঁর আর্বিভাব হয়েছিল। এগারো বছরের সময় মাঠের উপর কি দেখলুম! সবাই বললে, বেহুঁশ হয়ে গিছলুম, কোন সাড় ছিল না। সেই দিন থেকে আর-একরকম হয়ে গেলুম। নিজের ভিতর আর-একজনকে দেখতে লাগলাম! যখন ঠাকুর পূজা করতে যেতুম, হাতটা অনেক সময় ঠাকুরের দিকে না গিয়ে নিজের মাথার উপর আসত, আর ফুল মাথায় দিতুম! যে ছোকরা আমার কাছে থাকত, সে আমার কাছে আসত না; বলত, তোমার মুখে কি এক জ্যোতিঃ দেখছি, তোমার বেশি কাছে যেতে ভয় হয়!”

১ কলিকাতা বেনেটোলা নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পরমভক্ত শ্রীঅধরলাল সেনের বাটীতে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চাটুজ্যের সহিত শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের দেখা হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে এই একবার মাত্র দর্শন করিয়াছিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৬শে অক্টোবর 1885/10/26/iv

FREE WILL OR GOD'S WILL

52.23 ‘যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া’

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি তো মুখ্যু, আমি কিছু জানি না, তবে এ-সব বলে কে? আমি বলি, ‘মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর, তুমি ঘরণী; আমি রথ, তুমি

রথী; যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি, যেমন চালাও তেমনি চলি; নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু।' তাঁরই জয়; আমি তো কেবল যন্ত্র মাত্র! শ্রীমতী যখন সহস্রধারা কলসী লয়ে যাচ্ছিলেন, জল একটুকুও পড়ে নাই, সকলে তাঁর প্রশংসা করতে লাহল; বলে এমন সতী হবে না। তখন শ্রীমতী বললেন, 'তোমরা আমার জয় কেন দাও; বল, কৃষ্ণের জয়, কৃষ্ণের জয়! আমি তাঁর দাসী মাত্র।' ওই অবস্থায় ভাবে বিজয়কে বুকে পা দিলুম; এদিকে তো বিজয়কে এত ভক্তি করি, সেই বিজয়ের গায়ে পা দিলুম, তার কি বল দেখি!

ডাক্তার —— তারপর সাবধান হওয়া উচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাতজোড় করে) — আমি কি করব? সেই অবস্থাটা এলে বেহুঁশ হয়ে যাই! কি করি, কিছুই জানতে পারি না।

ডাক্তার —— সাবধান হওয়া উচিত, হাতজোড় করলে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ —— তখন কি আমি কিছু করতে পারি? — তবে তুমি আমার অবস্থা কি মনে কর? যদি ঢঙ মনে কর তাহলে তোমার সায়েন্স-মায়েন্স সব ছাই পড়েছো।

ডাক্তার —— মহাশয়, যদি ঢঙ মনে করি তাহলে কি এত আসি? এই দেখ, সব কাজ ফেলে এখানে আসি; কত রোগীর বাড়ি যেতে পারি না, এখানে এসে ছয়-সাত ঘণ্টা ধরে থাকি।

['ন যোৎস্য' —— ভগবদ্‌গীতা —— ঈশ্বরই কর্তা, অর্জুন যন্ত্র]

শ্রীরামকৃষ্ণ — সেজোবাবুকে বলেছিলাম, তুমি মনে করো না, তুমি একটা বড়মানুষ, আমায় মানছো বলে আমি কৃতার্থ হয়ে গেলুম! তা তুমি মানো আর নাই মানো। তবে একটি কথা আছে — মানুষ কি করবে, তিনিই মানাবেন। ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ খড়কুটো!

ডাক্তার — তুমি কি মনে করেছো অমুক মাড় তোমায় মেনেছে বলে আমি তোমায় মানব? তবে তোমায় সম্মান করি বটে, তোমায় রিগার্ড করি, মানুষকে যেমন রিগার্ড করে —

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি কি মানতে বলছি গা?

গিরিশ ঘোষ — উনি কি আপনাকে মানতে বলছেন?

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — তুমি কি বলছো — ঈশ্বরের ইচ্ছা?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তবে আর কি বলছি! ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ কি করবে? অর্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বললেন, আমি যুদ্ধ করতে পারব না, জ্ঞাতি বধ করা আমার কর্ম নয়। শ্রীকৃষ্ণ বললেন — ‘অর্জুন! তোমায় যুদ্ধ করতেই হবে, তোমার স্বভাবে করাবে!’ শ্রীকৃষ্ণ সব দেখিয়ে দিলেন, এই এই লোক মরে রয়েছে।
১ শিখরা ঠাকুর বাড়িতে এসেছিল; তাঁদের মতে অশ্বত্থ গাছে যে পাতা নড়ছে, সেও ঈশ্বরের ইচ্ছায় — তাঁর ইচ্ছা বই একটি পাতাও নড়বার জো নাই!

[Liberty or Necessity? — Influence of Motives]

ডাক্তার — যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা, তবে তুমি বকো কেন? লোকদের জ্ঞান দেবার জন্য কথা কও কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — বলাচ্ছেন, তাই বলি। ‘আমি যন্ত্র — তুমি যন্ত্রী।’

ডাক্তার — যন্ত্র তো বলছো; হয় তাই বল, নয় চুপ করে থাকো। সবই ঈশ্বর।

গিরিশ — মসাই, যা মনে করুন। কিন্তু তিনি করান তাই করি। A single step against the Almighty will (তাঁর ইচ্ছার প্রতিকূলে এক পা) কেউ যেতে পারে?

ডাক্তার — Free Will তিনিই দিয়েছেন তো। আমি মনে করলে ঈশ্বর চিন্তা করতে পারি, আবার না করলে না করতে পারি।

গিরিশ — আপনার ঈশ্বরচিন্তা বা অন্য কোন সৎকাজ ভাল লাগে বলে করেন। আপনি করেন না, সেই ভাল লাগাটা করায়।

ডাক্তার — কেন, আমি কর্তব্য কর্ম বলে করি —

গিরিশ — সেও কর্তব্য কর্ম করতে ভাল লাগে বলে!

ডাক্তার — মনে কর একটি ছেলে পুড়ে যাচ্ছে; তাকে বাঁচাতে যাওয়া কর্তব্য বোধে —

গিরিশ — ছেলেটিকে বাঁচাতে আনন্দ হয়, তাই আগুনের ভিতর যান; আনন্দ আপনাকে নিয়ে যায়। চাটের লোভে গুলি খাওয়া! (সকলের হাস্য)

[“জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা”]২

শ্রীরামকৃষ্ণ — কর্ম করতে গেলে আগে একটি বিশ্বাস চাই, সেই সঙ্গে জিনিসটি মনে করে আনন্দ হয়, তবে সে ব্যক্তি কাজে প্রবৃত্ত হয়। মাটির নিচে একঘড়া মোহর আছে — এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস, প্রথমে চাই। ঘড়া মনে করে সেই সঙ্গে আনন্দ হয় — তারপর খোঁড়ে। খুঁড়তে খুঁড়তে ঠং শব্দ হলে আনন্দ বাড়ে। তারপর ঘরার কানা দেখা যায়। তখন আনন্দ আরও বাড়ে। এইরকম ক্রমে ক্রমে আনন্দ বাড়তে থাকে। আমি নিজে ঠাকুরবাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখেছি, — সাধু গাঁজা তয়ের করছে আর সাজতে সাজতে আনন্দ।

ডাক্তার — কিন্তু আগুন ‘হীট’ও (উত্তাপ) দেয়, আর ‘লাইট’ও (আলো) দেয়। আলোতে দেখা যায় বটে; কিন্তু উত্তাপে গা পুড়ে যায়। ডিউটি (কর্তব্য কর্ম) করতে গেলে কেবল আনন্দ হয় তা নয়, কষ্টও আছে!

মাস্টার (গিরিশের প্রতি) — পেটে খেলে পিঠে সয়। কষ্টতেও আনন্দ।

গিরিশ (ডাক্তারের প্রতি) — ডিউটি শুষ্ক।

ডাক্তার — কেন?

গিরিশ — তবে সরস। (সকলের হাস্য)

মাস্টার — বশ, এইবার লোভে গুলি খাওয়া এসে পড়ল।

গিরিশ (ডাক্তারের প্রতি) — সরস, নচেৎ ডিউটি কেন করেন?

ডাক্তার — এইরূপ মনের ইনক্লিনেসন (মনের ওইদিকে গতি)।

মাস্টার (গিরিশের প্রতি) — 'পোড়া স্বভাবে টানে!' (হাস্য) যদি একদিকে ঝোঁকই (ইনক্লিনেসন) হল Free Will কোথায়?

ডাক্তার — আমি Free (স্বাধীন) একেবারে বলছি না। গরু খুঁটিতে বাঁধা আছে, দড়ি যতদূর যায়, তার ভিতর ফ্রি। দড়ি টান পড়লে আবার —

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও Free Will]

শ্রীরামকৃষ্ণ — এই উপমা যদু মল্লিকও বলেছিল। (ছোট নরেন্দ্রের প্রতি) একি ইংরাজীতে আছে?

(ডাক্তারের প্রতি) — "দেখ, ঈশ্বর সব করছেন, তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র। এ-বিশ্বাস যদি কারু হয়, সে তো জীবন্মুক্ত — 'তোমার কর্ম তুমি কর, লোকে বলে করি আমি।' কিরকম জানো? বেদান্তের একটি উপমা আছে — একটা হাঁড়িতে ভাত চড়িয়েছ, আলু, বেগুন, চাল লাফাতে থাকে, যেন অভিমান করছে 'আমি নড়ছি', আমি লাফাচ্চি।' ছোট ছেলেরা ভাবে, আলু। পঠল, বেগুন ওরা বুঝি জীয়ন্ত, তাই লাফাচ্চে। যাদের জ্ঞান হয়েছে তারা কিন্তু বুঝিয়ে দেয় যে, এই সব আলু, বেগুন পটল এরা জীয়ন্ত নয়, নিজে লাফাচ্চে না। হাঁড়ির নিচে আগুন জ্বলছে, তাই ওরা লাফাচ্ছে। যদি কাঠ টেনে লওয়া যায়, তাহলে আর নড়ে না।

জীবের ‘আমি কর্তা’ এই অভিমান অজ্ঞান থেকে হয়। ঈশ্বরের শক্তিতে সব শক্তিমান। জ্বলন্ত কাঠ টেনে নিলে সব চুপ। — পুতুলনাচের পুতুল বাজিকরের হাতে বেশ নাচে, হাত থেকে পড়ে গেলে আর নড়ে না চড়ে না!

“যতক্ষণ না ঈশ্বরদর্শন হয়, যতক্ষণ সেই পরশমণি ছোঁয়া না হয়, ততক্ষণ আমি কর্তা এই ভুল থাকবে; আমি সৎ কাজ করেছি, অসৎ কাজ করেছি, এই সব ভেদ বোধ থাকবেই থাকবে। এ-ভেদবোধ তাঁরই মায়া — তাঁর মায়ার সংসার চালাবার জন্য বন্দোবস্ত। বিদ্যামায়া আশ্রয় করলে, সৎপথ ধরলে তাঁকে লাভ করা যায়। যে লাভ করে, যে ঈশ্বরকে দর্শন করে, সেই মায়া পার হয়ে যেতে পারে। তিনিই একমাত্র কর্তা, আমি অকর্তা, এ-বিশ্বাস যার, সেই জীবন্মুক্ত, এ-কথা কেশব সেনকে বলেছিলাম।”

গিরিশ — Free Will কেমন করে আপনি জানলেন?

ডাক্তার — Reason (বিচার)-এর দ্বারা নয় — I feel it!

গিরিশ — Then I and others feel it to be the reverse. (আমরা সকলে ঠিক উলটো বোধ করি যে, আমরা পরতন্ত্র)। (সকলের হাস্য)

ডাক্তার — ডিউটির ভিতর দুটো এলিমেন্ট — (১) ডিউটি বলে কর্তব্য কর্ম করতে যাই, (২) পরে আহ্লাদ হয়। কিন্তু initial stage-এ (গোড়াতে) আনন্দ হবে বলে যাই না। ছেলেবেলায় দেখতুম পুরুত সন্দেশে পিঁপড়ে হলে বড় ভাবিত হত। পুরুতের প্রথমেই সন্দেশ-চিন্তা করে আনন্দ হয় না। (হাস্য) প্রথমে বড় ভাবনা।

মাস্টার (স্বগত) — পরে আনন্দ, কি সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ হয়, বলা কঠিন। আনন্দের জোরে কার্য হলে, Free Will কোথায়?

১ ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্‌।

[গীতা, ১১।১৩]

২ গীতা, [১৮।১৮]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৬শে অক্টোবর 1885/10/26/v

52.24 অহৈতুকী ভক্তি — পূর্বকথা — শ্রীরামকৃষ্ণের দাসভাব

শ্রীরামকৃষ্ণ — ইনি (ডাক্তার) যা বলছেন, তার নাম অহৈতুকী ভক্তি। মহেন্দ্র সরকারের কাছে আমি কিছু চাই না — কোন প্রয়োজন নাই, মহেন্দ্র সরকারকে দেখতে ভাল লাগে, এরই নাম অহৈতুকী ভক্তি। একটু আনন্দ হয় তা কি করব?

“অহল্যা বলেছিল, হে রাম! যদি শূকরযোনিতে জন্ম হয় তাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি তাকে — আমি আর কিছু চাই না।

“রাবণ বধের কথা স্মরণ করাবার জন্য নারদ অযোধ্যায় রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি সীতারাম দর্শন করে স্তব করতে লাগলেন। রামচন্দ্র স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, ‘নারদ! আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি কিছু বর লও।’ নারদ বললেন, ‘রাম! যদি একান্ত আমায় বর দেবে, তো এই বর দাও যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধাভক্তি থাকে, আর এই করো যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই!’ রাম বললেন, ‘আরও কিছু বর লও।’ নারদ বললেন, ‘আর কিছুই আমি চাই না, কেবল চাই তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি।’

“এঁর তাই। যেমন ঈশ্বরকে শুধু দেখতে চায়, আর কিছু ধন মান দেহসুখ —— কিছুই চায় না। এরই নাম শুদ্ধাভক্তি।

“আনন্দ একটু হয় বটে, কিন্তু বিষয়ের আনন্দ নয়। ভক্তির, প্রেমের আনন্দ। শম্ভু (মল্লিক) বলেছিল —— যখন আমি তার বাড়িতে প্রায় যেতুম – ‘তুমি এখানে এস; অবশ্য আমার সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পাও তাই এস’ —— ওইটুকু আনন্দ আছে।

“তবে ওর উপর আর-একটি অবস্থা আছে! বালকের মতো যাচ্ছে —— কোনও ঠিক নাই; হয়তো একটা ফড়িং ধরছে।

(ভক্তদের প্রতি) — “এঁর (ডাক্তারের) মনের ভাব কি বুঝেছ? ঈশ্বরকে প্রার্থনা করা হয়, হে ঈশ্বর, আমায় সৎ ইচ্ছা দাও যেন অসৎ কাজে মতি না হয়।

“আমারও ওই অবস্থা ছিল। একে দাস্য বলে। আমি ‘মা, মা’ বলে এমন কাঁদতুম যে, লোক দাঁড়িয়ে যেত। আমার এই অবস্থার পর আমাকে বীড়বার

জন্য আর আমার পাগলামি সারাবার জন্য, তারা একজন রাঁড় এনে ঘরে বসিয়ে দিয়ে গেল — সুন্দর, চোখ ভাল। আমি মা! মা! বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম, আর হলধারীকে ডেকে দিয়ে বললুম, 'দাদা দেখবে এসো ঘরে কে এসেছে।' হলধারীকে, আর সব লোককে বলে দিলুম। এই অবস্থায় 'মা, মা' বলে কাঁদতুম, কেঁদে কেঁদে বলতুম, 'মা! রক্ষা কর। মা! আমায় নিখাদ কর, যেন সৎ থেকে অসতে মন না যায়।' (ডাক্তারের প্রতি) তোমার এ-ভাব বেশ — ঠিক ভক্তিভাব, দাসভাব।"

[জগতের উপকার ও সামান্য জীব — নিষ্কামকর্ম ও শুদ্ধসত্ত্ব]

"যদি কারো শুদ্ধসত্ত্ব (গুণ) আসে, সে কেবল ঈশ্বরচিন্তা করে, আর আর কিছুই ভাল লাগে না। কেউ কেউ প্রারব্ধের গুণে জন্ম থেকে শুদ্ধসত্ত্বগুণ পায়। কামনাশূন্য হয়ে কর্ম করতে চেষ্টা করলে, শেষে শুদ্ধসত্ত্বলাভ হয়। রজমিশানো সত্ত্বগুণ থাকলে ক্রমে নানাদিকে মন হয়, তখন জগতের উপকার করব এই সব অভিমান এসে জোটে। জগতের উপকার এই সামান্য জীবের পক্ষে করতে যাওয়া বড় কঠিন। তবে যদি কেউ জীবের সেবার জন্য কামনাশূণ্য হয়ে কর্ম করে, তাতে দোষ নাই; একে নিষ্কাম কর্ম বলে। এরূপ কর্ম করতে চেষ্টা করা খুব ভাল। কিন্তু সকলে পারে না। বড় কঠিন। সকলেরই কর্ম করতে হবে; দু-একটি লোক কর্ম ত্যাগ করতে পারে। দু-একজন লোকের শুদ্ধসত্ত্ব দেখতে পাওয়া যায়। এই নিষ্কাম কর্ম করতে করতে রজমিশানো সত্ত্বগুণ ক্রমে শুদ্ধসত্ত্ব হয়ে দাঁড়ায়।

"শুদ্ধসত্ত্ব হলেই ঈশ্বরলাভ তাঁর কৃপায় হয়।

“সাধারণ লোকে এই শুদ্ধসত্ত্বের অবস্থা বুঝতে পারে না; হেম আমায় বলেছিল, কেমন ভট্টাচার্য মহাশয়! জগতে মানলাভ করা মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য, কেমন?”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৭শে অক্টোবর 1885/10/27/i

52.25 শ্যামপুকুর বাটীতে নরেন্দ্র, মণি প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

অসুখ কেন? নরেন্দ্রের প্রতি সন্ন্যাসের উপদেশ

ঠাকুর শ্যামপুকুরের বাটীতে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা দশটা। আজ ২৭থে অক্টোবর, ১৮৮৫, মঙ্গলবার, আশ্বিন কৃষ্ণা চতুর্থী, ১২ই কার্তিক।

ঠাকুর নরেন্দ্র, মণি প্রভৃতির সহিত কথা কহিতেছেন।

নরেন্দ্র — ডাক্তার কাল কি করে গেল।

একজন ভক্ত — সুতোয় মাছ গিঁথেছিল, ছিঁড়ে গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — বঁড়শি বেঁধা আছে — মরে ভেসে উঠবে।

নরেন্দ্র একটু বাহিরে গেলেন, আবার আসিবেন। ঠাকুর মণির সহিত পূর্ণ সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন —

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমায় বলছি — এ-সব জীবের শুনতে নাই — প্রকৃতিভাবে পুরুষকে (ঈশ্বরকে) আলিঙ্গন, চুম্বন করতে ইচ্ছা হয়।

মণি — নানারকম খেলা — আপনার রোগ পর্যন্ত খেলার মধ্যে। এই রোগ হয়েছে বলে এখানে নূতন নূতন ভক্ত আসছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — ভূপতি বলে, রোগ না হলে শুধু বাড়িভাড়া করলে লোকে কি বলত — আচ্ছা, ডাক্তারের কি হল?

মণি — এদিকে দাস্য মানা আছে — 'আমি দাস, তুমি প্রভু।' আবার বলে — মানুষ-উপমা আনো কেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখলে! আজ কি আর তুমি তার কাছে যাবে?

মণি — খপর দিতে যদি হয়, তবে যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বঙ্কিম ছেলেটি কেমন? এখানে যদি আসতে না পারে, তুমি না হয় তারে সব বলবে। — চৈতন্য হবে।

[আগে সংসারের গোছগাছ, না ঈশ্বর? কেশব ও নরেন্দ্রকে ইঙ্গিত]

নরেন্দ্র আসিয়া কাছে বসিলেন। নরেন্দ্রের পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হওয়াতে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। মা ও ভাই এরা আছেন, তাহাদের ভরণপোষণ করিতে হইবে। নরেন্দ্র আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। মধ্যে বিদ্যাসাগরের বউবাজারের স্কুলে কয়েক মাস শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। বাটীর একটা ব্যবস্থা করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন — এই চেষ্টা কেবল করিতেছেন।

ঠাকুর সমস্তই অবগত আছেন — নরেন্দ্রকে একদৃষ্টে সস্নেহে দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারকে) — আচ্ছা, কেশব সেনকে বললাম, — যদৃচ্ছালাভ। যে বড় ঘরের ছেলে, তার খাবার জন্য ভাবনা হয় না — সে মাসে মাসে মুসোহারা পায়। তবে নরেন্দ্রের অত উঁচু ঘর, তবু হয় না কেন? ভগবানে মন সব সমর্পণ করলে তিনি তো সব জোগাড় করে দিবেন!

মাস্টার — আজ্ঞা হবে; এখনও তো সব সময় যায় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিন্তু তীব্র বৈরাগ্য হলে ও-সব হিসাব থাকে না। ‘বাড়ির সব বন্দোবস্ত করে দিব, তারপরে সাধনা করব’ — তীব্র বৈরাগ্য হলে এরূপ মনে হয় না। (সহাস্যে) গোঁসাই লেকচার দিয়েছিল। তা বলে, দশ হাজার টাকা হলে ওই থেকে খাওয়া-দাওয়া এই সব হয় — তখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঈশ্বরকে বেশ ডাকা যেতে পারে।

“কেশব সেনও ওই ইঙ্গিত করেছিল। বলেছিল, — ‘মহাশয়, যদি কেউ বিষয়-আশয় ঠিকঠাক করে, ঈশ্বরচিন্তা করে — তা পারে কিনা? তার তাতে কিছু দোষ হতে পারে কি?’

“আমি বললাম, তীব্র বৈরাগ্য হলে সংসার পাতকুয়া, আত্মীয় কাল সাপের মতো, বোধ হয়। তখন, ‘টাকা জমাব’, ‘বিষয় ঠিকঠাক করব’, এ-সব হিসাব আসে না। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু — ঈশ্বরকে ছেড়ে বিষয়চিন্তা!

“একটা মেয়ের ভারী শোক হয়েছিল। আগে নৎটা কাপড়ের আঁচলে বাঁধলে, — তারপর, ‘ওগো! আমার কি হল গো।’ বলে আছড়ে পড়লো কিন্তু খুব সাবধান, নৎটা না ভেঙে যায়।”

সকলে হাসিতেছেন।

নরেন্দ্র এই সকল কথা শুনিয়া বাণবিদ্ধের ন্যায় একটু কাত হইয়া শুইয়া পড়িলেন। তাঁর মনের অবস্থা বুঝিয়া —

মাস্টার (নরেন্দ্রের প্রতি, সহাস্যে) — শুয়ে পড়লে যে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি, সহাস্যে) — “আমি তো আপনার ভাশুরকে নিয়ে আছি তাইতেই লজ্জায় মরি, এরা সব (অন্য মাগীরা) পরপুরুষ নিয়ে কি করে থাকে?”

মাস্টার নিজে সংসারে আছেন, লজ্জিত হওয়া উচিত। নিজের দোষ, কেহ দেখে না — অপরের দেখে। ঠাকুর এই কথা বলিতেছেন। একজন স্ত্রীলোক ভাশুরের সঙ্গে নষ্ট হইয়াছিল। সে নিজের দোষ কম, অন্য নষ্ট স্ত্রী লোকদের দোষ বেশি, মনে করিতেছে। বলে, ‘ভাশুর তো আপনার লোক, তাইতেই লজ্জায় মরি।’

[মুক্তহস্ত কে? চাকরি ও খোশামোদের টাকায় বেশি মায়া]

নিচে একজন বৈষ্ণব গান গাইতেছিল। ঠাকুর শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। বৈষ্ণবকে কিছু পয়সা দিতে বলিলেন। একজন ভক্ত কিছু দিতে গেলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “কি দিলে?” একজন ভক্ত বলিলেন — “তিনি দুপয়সা দিয়েছেন।”

ঠাকুর — চাকরি করা টাকা কিনা। — অনেক কষ্টের টাকা — খোশামোদের টাকা! মনে করেছিলাম, চার আনা দিবে!

[Electricity — তাড়িতযন্ত্র ও বাগচী চিত্রিত ষড়্‌ভুজ ও রামচন্দ্রের আলেখ্য দর্শন — পূর্বকথা — দক্ষিণেশ্বরে দীর্ঘকেশ সন্ন্যাসী]

ছোট নরেন ঠাকুরকে যন্ত্র আনিয়া তাড়িতের প্রকৃতি দেখাইবেন বলিয়াছিলেন। আজ আনিয়া দেখাইলেন।

বেলা দুইটা — ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। অতুল একটি বন্ধু মুনসেফকে আনিয়াছেন। শিকদারপাড়ার প্রসিদ্ধ চিত্রকর বাগচী আসিয়াছেন। কয়েকখানি চিত্র ঠাকুরকে উপহার দিলেন।

ঠাকুর আনন্দের সহিত পট দেখিতেছেন। ষড়্‌ভুজ মূর্তি দর্শন করিয়া ভক্তদের বলিতেছেন — “দেখো, কেমন হয়েছে!”

ভক্তদের আবার দেখাইবার জন্য ‘অহল্যা পাষাণীর পট’ আনিতে বলিলেন। পটে শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত বাগচীর মেয়েদের মতো লম্বা চুল। ঠাকুর বলিতেছেন, “অনেককাল হল দক্ষিণেশ্বরে একটি সন্ন্যাসী দেখেছিলাম। ন হাত লম্বা চুল। সন্ন্যাসীটি ‘রাধে রাধে’ করত। ঢঙ নাই।”

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র গান গাইতেছেন। গানগুলি বৈরাগ্যপূর্ণ। ঠাকুরের মুখে তীব্র বৈরাগ্যের কথা ও সন্ন্যাসের উপদেশ শুনিয়া কি নরেন্দ্রের উদ্দীপন হইল?

নরেন্দ্রের গান:

(১) যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।

(২) অন্তরে জাগিছ ওমা অন্তরযামিনী।

(৩) কি সুখ জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে,

যদি চরণ-সরোজে পরাণ-মধুপ, চির মগন না রয় হে!

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৭শে অক্টোবর 1885/10/27/ii

52.26 শ্রীরামকৃষ্ণ — নরেন্দ্র, গিরিশ, সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ভজনানন্দে — সমাধিমন্দিরে

২৭শে অক্টোবর, ১৮৮৫, মঙ্গলবার, বেলা সাড়ে পাঁচটা। আজ নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার, শ্যাম বসু, গিরিশ, ডাক্তার দোকড়ি, ছোট নরেন্দ্র, রাখাল, মাস্টার ইত্যাদি অনেকে উপস্থিত। ডাক্তার আসিয়া হাত দেখিলেন ও ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন।

পীড়াসম্বন্ধীয় কথার পর শ্রীরামকৃষ্ণের ঔষধ সেবনের পর ডাক্তার বলিলেন, ‘তবে শ্যামবাবুর সঙ্গে তুমি কথা কও, আমি আসি।’

শ্রীরামকৃষ্ণ ও একজন ভক্ত বলিয়া উঠিলেন, ‘গান শুনবেন?”

ডাক্তার — তুমি যে তিড়িং মিড়িং করে ওঠো। ভাব চেপে রাখতে হবে।

ডাক্তার আবার বসিলেন। তখন নরেন্দ্র মধুরকণ্ঠে গান করিতেছেন। তৎসঙ্গে তানপুরা ও মৃদঙ্গ ঘন ঘন বাজিতেছে। গাহিতেছেন:

(১) চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার,
শোভার আগার বিশ্ব সংসার।
অযুত তারকা চমকে রতন-কাঞ্চন-হার
কত চন্দ্র কত সূর্য নাহি অন্ত তার।
শোভে বসুন্ধরা ধনধান্যময়, হায় পূর্ণ তোমার ভাণ্ডার
হে মহেশ, অগণনলোক গায় ধন্য ধন্য এ গীতি অনিবার।

(২) নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি-গুহাবাসী।
অনন্ত আঁধার কোলে, মহানির্বাণ হিল্লোলে,

চিরশান্তি পরিমল, অবিরল যায় ভাসি।
মহাকাল রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি,
সমাধিমন্দিরে ও মা কে তুমি গো একা বসি;
অভয়-পদ-কমলে, প্রেমের বিজলী জ্বলে
চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি।

ডাক্তার মাস্টারকে বলিলেন, “It is dangerous to him!”

এ-গান ঠাকুরের পক্ষে ভাল নয়, ভাব হইলে অনর্থ ঘটিতে পারে)।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বলছে?” তিনি উত্তর করিলেন, “ডাক্তার ভয় করছেন, পাছে আপনার ভাবসমাধি হয়।” বলিতে বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ একটু ভাবস্থ হইয়াছেন; ডাক্তারের মুখপানে তাকাইয়া করজোড়ে বলিতেছেন, “না, না, কেন ভাব হবে?” কিন্তু বলিতে বলিতে তিনি গভীর ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইলেন। শরীর স্পন্দহীন, নয়ন স্থির! অবাক্! কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় উপবিষ্ট! বাহ্যশূন্য! মন বুদ্ধি অহংকার চিত্ত সমস্তই অন্তর্মুখ। আর সে মানুষ নয়। নরেন্দ্রের মধুরকণ্ঠে মধুর গান চলিতেছে:

এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ!
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়নাথ, প্রেম উৎস উথলিল আজি —
বল হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী, কি ধন তোমারে দিব উপহার?
হৃদয় প্রাণ লহ লহ তুমি, কি বলিব;
যাহা কিছু আছে মম, সকলি লও হে নাথ।

গান - কি সুখ জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে

যদি চরণ-সরোজে পরাণ-মধুপ চিরমগন না রয় হে।

অগণন ধনরাশি তায় কিবা ফলোদয় হে

যদি লভিয়ে সে ধনে, পরম রতনে যতন না করয় হে।

সুকুমার কুমার মুখ দেখিতে না চাই হে

যদি সে চাঁদবয়ানে তব প্রেমমুখে দেখিতে না পাই হে।

কি ছার শশাঙ্কজ্যোতিঃ, দেখি আঁধারময় হে;

যদি সে চাঁদ প্রকাশে তব প্রেম চাঁদ নাহি হয় উদয় হে।

সতীর পবিত্র প্রেম তাও মলিনতাময় হে,

যদি সে প্রেমকনকে, তব প্রেমমণি নাহি জড়িত রয় হে।

তীক্ষ্ণ বিষা ব্যালী সম সতত দংশয় হে,

যদি মোহ পরমাদে নাথ তোমাতে ঘটায় সংশয় হে।

কি আর বলিব নাথ, বলিব তোমায় হে;

তুমি আমার হৃদয়রতন মণি, আনন্দনিলয় হে।

“সতির পবিত্র প্রেম” গানের এই অংশ শুনিতে শুনিতে ডাক্তার অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিয়া উঠিলেন, আহা! আহা!

নরেন্দ্র গাহিলেন:

কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।

হয়ে পূর্ণকাম বলব হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার।।

কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণমন, কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন,

সংসার বন্ধন হইবে মোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার।।

কবে পরশমণি করি পরশন লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন

হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন, লুটিব ভক্তিপথে অনিবার।।

(হায়) কবে যাবে আমার ধরম করম, কবে যাবে জাতি কুলের ভরম,

কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম, পরিহরি অভিমান লোকাচার।।

মাখি সর্ব অঙ্গে ভক্তপদধূলি, কাঁধে লয়ে চির বৈরাগ্যের ঝুলি,

পিব প্রেমবারি দুই হাতে তুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেমযমুনার।।

প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিব,

আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব, হরিপদে নিত্য করিব বিহার।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৭শে অক্টোবর 1885/10/27/iii

52.27 জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিচারে — ব্রহ্মদর্শন

ইতিমধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাহ্যসংজ্ঞালাভ করিয়াছেন। গান সমাপ্ত হইল। তখন পণ্ডিত ও মূর্খের — বালক ও বৃদ্ধের — পুরুষ ও স্ত্রীর — আপামর সাধারণের — সেই মনোমুগ্ধকরী কথা হইতে লাগিল। সভাসুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ। সকলেই সেই মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছেন। এখন সেই কঠিন পীড়া কোথায়? মুখ

এখনও যেন প্রফুল্ল অরবিন্দ, — যেন ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে। তখন তিনি ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “লজ্জা ত্যাগ কর, ঈশ্বরের নাম করবে, তাতে আবার লজ্জা কি? লজ্জা, ঘৃণা, ভয় — তিন থাকতে নয়। ‘আমি এত বড় লোক, আমি ‘হরি হরি’ বলে নাচব? বড় বড় লোক এ-কথা শুনলে আমায় কি বলবে? যদি বলে, ওহে ডাক্তারটা ‘হরি হরি’ বলে নেচেছে। লজ্জার কথা!’ এ-সব ভাব ত্যাগ কর।”

ডাক্তার — আমার ওদিক দিয়েই যাওয়া নাই; লোকে কি বলবে, আমি তার তোয়াক্কা রাখি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমার উটি খুব আছে। (সকলের হাস্য)

“দেখ, জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হও, তবে তাঁকে জানতে পারা যায়। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। পাণ্ডিত্যের অহংকারও অজ্ঞান। এক ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, এই নিশ্চয় বুদ্ধির নাম জ্ঞান। তাঁকে বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান। যেমন পায়ে কাঁটা বিঁধেছে, সে কাঁটাটা তোলবার জন্য আর-একটি কাঁটার প্রয়োজন। কাঁটাটা তোলবার পর দুটি কাঁটাই ফেলে দেয়। প্রথমে অজ্ঞান কাঁটা দূর করবার জন্য জ্ঞান কাঁটাটি আনতে হয়। তারপর জ্ঞান-অজ্ঞান দুইটিই ফেলে দিতে হয়। তিনি যে জ্ঞান-অজ্ঞানের পার। লক্ষ্মণ বলেছিলেন, ‘রাম! এ কি আশ্চর্য! এত বড় জ্ঞানী স্বয়ং বশিষ্ঠদেব পুত্রশোকে অধীর হয়ে কেঁদেছিলেন।’ রাম বললেন, ‘ভাই, যার জ্ঞান আছে, তার অজ্ঞানও আছে, যার এক জ্ঞান আছে, তার অনেক জ্ঞানও আছে। যার আলোবোধ আছে, তার অন্ধকারবোধও আছে। ব্রহ্ম — জ্ঞান-অজ্ঞানের পার, পাপ-পুণ্যের পার, ধর্মাধর্মের পার, শুচি-অশুচির পার।”

এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ রামপ্রসাদের গান আবৃত্তি করিয়া বলিতেছেন —

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরুমূলে রে চারিফল কুড়ায়ে পাবি।।

[অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌ — ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝান যায় না]

শ্যাম বসু — দুই কাঁটা ফেলে দেওয়ার পর কি থাকবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — নিত্যশুদ্ধবোধরূপম্‌। তা তোমায় কেমন করে বুঝাব? যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, ‘ঘি কেমন খেলে?’ তাকে এখন কি করে বুঝাবে? হদ্দ বলতে পার, ‘কেমন ঘি না যেমন ঘি।’ একটি মেয়েকে তার সঙ্গী জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘তোর স্বামী এসেছে, আচ্ছা ভাই, স্বামী এলে কিরূপ আনন্দ হয়?’ মেয়েটি বললে, ‘ভাই, তোর স্বামী হলে তুই জানবি; এখন তোরে কেমন করে বুঝাব।’ পুরাণে আছে ভগবতী যখন হিমালয়ের ঘরে জন্মালেন, তখন তাঁকে নানারূপে দর্শন দিলেন। গিরিরাজ সব রূপ দর্শন করে শেষে ভগবতীকে বললেন, মা, বেদে যে ব্রহ্মের কথা আছে, এইবার আমার যেন ব্রহ্মদর্শন হয়। তখন ভগবতী বললেন, বাবা, ব্রহ্মদর্শন যদি করতে চাও, তবে সাধুসঙ্গ কর।

“ব্রহ্ম কি জিনিস — মুখে বলা যায় না। একজন বলেছিল — সব উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কেবল ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই। এর মানে এই যে, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, আর সব শাস্ত্র, মুখে উচ্চারণ হওয়াতে উচ্ছিষ্ট হয়েছে বলা যেতে পারে; কিন্তু ব্রহ্ম কি বস্তু, কেউ এ-পর্যন্ত মুখে বলতে পারে নাই। তাই ব্রহ্ম এ পর্যন্ত উচ্ছিষ্ট হন নাই! আর

সচ্চিদানন্দের সঙ্গে ক্রীড়া, রমণ — যে কি আনন্দের তা মুখে বলা যায় না। যার হয়েছে সে জানে।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৭শে অক্টোবর 1885/10/27/iv

52.28 পণ্ডিতের অহংকার — পাপ ও পুণ্য

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “দেখ, অহংকার না গেলে জ্ঞান হয় না। ‘মুক্ত হব কবে, “আমি” যাবে যবে’। ‘আমি’ ও ‘আমার’ এই দুইটি অজ্ঞান। ‘তুমি’ ও ‘তোমার’ এই দুইটি জ্ঞান। যে ঠিক ভক্ত, সে বলে — হে ঈশ্বর! তুমিই কর্তা, তুমিই সব করছো, আমি কেবল যন্ত্র, আমাকে যেমন করাও তেমনি করি। আর এ-সব তোমার ধন, তোমার ঐশ্বর্য, তোমার জগৎ। তোমারই গৃহ পরিজন, আমার কিছু নয়। আমি দাস। তোমার যেমন হুকুম, সেইরূপ সেবা করবার আমার অধিকার।

“যারা একটু বই-টই পড়েছে, অমনি তাদের অহংকার এসে জোটে। কা-ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা হয়েছিল। সে বলে, ‘ও-সব আমি জানি।’ আমি বললুম, যে

দিল্লী গিছিল, সে কি বলে বেড়ায় আমি দিল্লী গেছি, আর জাঁক করে? যে বাবু, সে কি বলে আমি বাবু!”

শ্যাম বসু — তিনি (কা-ঠাকুর) আপনাকে খুব মানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ওগো বলব কি! দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে একটি মেথরাণীর যে অহংকার! তার গায়ে ২/১ খানা গহনা ছিল। সে যে পথ দিয়ে আসছিল, সেই পথে দু-একজন লোক তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। মেথরাণী তাদের বলে উঠল। ‘এই! সরে যা’ তা অন্য লোকের অহংকারের কথা আর কি বলব?

শ্যাম বসু — মহাশয়! পাপের শাস্তি আছে অথচ ঈশ্বর সব করছেন, এ কিরকম কথা?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি, তোমার সোনার বেনে বুদ্ধি!

নরেন্দ্র — সোনার বেনে বুদ্ধি অর্থাৎ calculating বুদ্ধি!

শ্রীরামকৃষ্ণ — ওরে পোদো, তুই আম খেয়ে নে! বাগানে কত শত গাছ আছে, কত হাজার ডাল আছে, কত কোটি পাতা আছে, এ-সব হিসাবে তোর কাজ কি? তুই আম খেতে এসেছিল, আম খেয়ে যা। (শ্যাম বসুর প্রতি) তুমি এ সংসারে ঈশ্বর সাধন জন্য মানব জন্ম পেয়েছ। ঈশ্বরের পাদপদ্মে কিরূপে ভক্তি হয়, তাই চেষ্টা কর। তোমার এত শত কাজ কি? ফিলজফী লয়ে বিচার করে তোমার কি হবে? দেখ, আধপো মদে তুমি মাতাল হতে পার। শুঁড়ির দোকানে কত মন মদ আছে, এ হিসাবে তোমার কি দরকার?

ডাক্তার — আর ঈশ্বরের মদ Infinite! সে মদের শেষ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্যাম বসুর প্রতি) — আর ঈশ্বরকে আমমোক্তারী দাও না। তাঁর উপর সব ভার দাও। সৎ লোককে যদি কেউ ভার দেয়, তিনি কি অন্যায় করেন? পাপের শাস্তি দিবেন, কি না দিবেন, সে তিনি বুঝবেন।

ডাক্তার — তাঁর মনে কি আছে, তিনিই জানেন। মানুষ হিসাব করে কি বলবে? তিনি হিসাবের পার!

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্যাম বসুর প্রতি) — তোমাদের ওই এক। কলকাতার লোকগুলো বলে, 'ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ।' কেননা, তিনি একজনকে সুখে রেখেছেন, আর-একজনকে দুঃখে রেখেছেন। শালাদের নিজের ভিতরও যেমন, ঈশ্বরের ভিতরও তেমনি দেখে।

['লোকমান্য' কি জীবনের উদ্দেশ্য?]

"হেম দক্ষিণেশ্বরে যেত। দেখা হলেই আমায় বলত, 'কেমন ভট্টাচার্য মশাই! জগতে এক বস্তু আছে; — মান? ঈশ্বরলাভ যে মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য, তা কম লোকই বলে।"

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৭শে অক্টোবর 1885/10/27/v

52.29 স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণ

শ্যাম বসু — সূক্ষ্মশরীর কেউ কি দেখিয়ে দিতে পারে? কেউ কি দেখাতে পারে যে সেই শরীর বাহিরে চলে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — যারা ঠিক ভক্ত, তাদের দায় পড়েছে তোমায় দেখাতে! কোন্ শালা মানবে আর না মনবে, তাদের দায় কি! একটা বড়লোক হাতে থাকবে, এ-সব ইচ্ছা তাদের থাকে না।

শ্যাম বসু — আচ্ছা, স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ, এ-সব প্রভেদ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — পঞ্চভূত লয়ে যে দেহ, সেইটি স্থূলদেহ। মন, বুদ্ধি, অহংকার আর চিত্ত, এই লয়ে সূক্ষ্মশরীর। যে শরীরে ভগবানের আনন্দলাভ হয়, আর সম্ভোগ হয়, সেইটি কারণ শরীর। তন্ত্রে বলে, 'ভগবতী তনু।' সকলের অতীত 'মহাকারণ' (তুরীয়) মুখে বলা যায় না।

[সাধনের প্রয়োজন — ঈশ্বরে একমাত্র ভক্তিই সার]

"কেবল শুনলে কি হবে? কিছু করো।

"সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে বললে কি হবে? তাতে কি নেশা হয়?

“সিদ্ধি বেটে গায়ে মাখলেও নেশা হয় না। কিছু খেতে হয়। কোন্‌টা একচল্লিশ নম্বরের সুতো, কোন্‌টা চল্লিশ নম্বরের — সুতার ব্যবসা না করলে এ-সব কি বলা যায়? যাদের সুতার ব্যবসা আছে, তাদের পক্ষে অমুক নম্বরের সুতা দেওয়া কিছু শক্ত নয়! তাই বলি, কিছু সাধন কর। তখন স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ মহাকারণ কাকে বলে সব বুঝতে পারবে। যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে, তাঁর পাদপদ্মে একমাত্র ভক্তি প্রার্থনা করবে।

“অহল্যার শাপ মোচনের পর শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে বললেন, তুমি আমার কাছে বর লও। অহল্যা বললেন, রাম যদি বর দিবে তবে এই বর দাও — আমার যদি শূকরযোনিতেও জন্ম হয় তাতেও ক্ষতি নাই; কিন্তু হে রাম! যেন তোমার পাদপদ্মে আমার মন থাকে।

“আমি মার কাছে একমাত্র ভক্তি চেয়েছিলাম। মার পাদপদ্মে ফুল দিয়ে হাতজোড় করে বলেছিলাম, ‘মা, এই লও তোমার অজ্ঞান, এই লও তোমার জ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।’

“ধর্ম কিনা দানাদি কর্ম। ধর্ম নিলেই অধর্ম লতে হবে। পুণ্য নিলেই পাপ লতে হবে। জ্ঞান নিলেই অজ্ঞান লতে হবে। শুচি নিলেই অশুচি লতে হবে। যেমন যার

আলোবোধ আছে, তার অন্ধকারবোধও আছে। যার একবোধ আছে, তার অনেকবোধও আছে। যার ভালবোধ আছে তার মন্দবোধও আছে।

“যদি কারও শূকর মাংস খেয়ে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি তাকে, সে পুরুষ ধন্য; আর হবিষ্য খেয়ে যদি সংসারে আসক্তি থাকে —”

ডাক্তার — তবে সে অধম! এখানে একটি কথা বলি — বুদ্ধ শূকর মাংস খেয়েছিল। শূকর মাংস খাওয়া আর কলিক্‌ (পেটে শূলবেদনা) হওয়া। এ ব্যারামের জন্য বুদ্ধ Opium (আফিং) খেত। নির্বাণ-টির্বাণ কি জান? আফিং খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকত, বাহ্যজ্ঞান থাকত না; — তাই নির্বাণ!

বুদ্ধদেবের নির্বাণ সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন; আবার কথাবার্তা চলিতে লাগিল।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৭শে অক্টোবর 1885/10/27/vi

52.30 গৃহস্থ ও নিষ্কাম কর্ম — Theosophy

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্যাম বসুর প্রতি) — সংসারধর্ম; তাতে দোষ নাই। কিন্তু ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে, কামনাশূন্য হয়ে কাজকর্ম করবে। এই দেখ না, যদি কারু পিঠে একটা ফোঁড়া হয়, সে যেমন সকলের সঙ্গে কথাবার্তা কয়, হয়তো কাজকর্মও করে, কিন্তু যেমন ফোঁড়ার দিকে তার মন পড়ে থাকে, সেইরূপ।

"সংসারে নষ্ট মেয়ের মতো থাকবে। মন উপপতির দিকে, কিন্তু সে সংসারের সব কাজ করে। (ডাক্তারের প্রতি) বুঝেছ?"

ডাক্তার — ও-ভাব যদি না থাকে, বুঝব কেমন করে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) — আর ওই ব্যাবসা অনেকদিন ধরে করছেন! কি বল? (সকলের হাস্য)

শ্যাম বসু — মহাশয়, থিয়সফি কিরকম বলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — মোট কথা এই, যারা শিষ্য করে বেড়ায়, তারা হালকা থাকের লোক। আর যারা সিদ্ধাই অর্থাৎ নানারকম শক্তি চায়, তারাও হালকা থাক। যেমন গঙ্গা হেঁটে পার হয় যাব, এই শক্তি। অন্য দেশে একজন কি কথা বলছে তাই বলতে পারা, এই এক শক্তি। ঈশ্বরে শুদ্ধাভক্তি হওয়া এই সব লোকের ভারী কঠিন।

শ্যাম বসু — কিন্তু তারা (থিয়সফিস্ট্‌রা) হিন্দুধর্ম পুনঃস্থাপিত করবার চেষ্টা করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি তাদের বিষয় ভাল জানি না।

শ্যাম বসু — মরবার পর জীবাত্মা কোথায় যায় — চন্দ্রলোকে, নক্ষত্রলোকে ইত্যাদি — এ-সব থিয়সফিতে জানা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা হবে আমার ভাব কিরকম জানো? হনুমানকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ কি তিথি? হনুমান বললে, 'আমি বার, তিথি, নক্ষত্র এ-সব কিছু জানি না; কেবল এক রামচিন্তা করি।' আমার ঠিক ওই ভাব।

শ্যাম বসু — তারা বলে, মহাত্মা সব আছেন। আপনার কি বিশ্বাস?

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমার কথা বিশ্বাস করেন তো আছে। এ-সব কথা এখন থাক। আমার অসুখটা কমলে তুমি আসবে। যাতে তোমার শান্তি হয়, যদি আমায় বিশ্বাস কর — উপায় হয়ে যাবে। দেখছো তো, আমি টাকা লই না, কাপড় লই না। এখানে প্যালা দিতে হয় না, তাই অনেকে আসে! (সকলের হাস্য)

(ডাক্তারের প্রতি) — "তোমাকে এই বলা, রাগ করো না; ও-সব তো অনেক করলে — টাকা, মান, লেকচার; — এখন মনটা দিনকতক ঈশ্বরেতে দাও; আর এখানে মাঝে মাঝে আসবে, ঈশ্বরের কথা শুনলে উদ্দীপন হবে!"

কিয়ৎকাল পরে ডাক্তার বিদায় লইতে গাত্রোত্থান করিলেন। এমন সময় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ আসিলেন ও ঠাকুরের চরণধূলি লইয়া উপবিষ্ট হইলেন। ডাক্তার তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ও আবার আসন গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তার — আমি থাকতে উনি (গিরিশবাবু) আসবেন না! যাই চলে যাব যাব হয়েছি অমনি এসে উপস্থিত। (সকলের হাস্য)

গিরিশের সঙ্গে ডাক্তারের বিজ্ঞানসভার (Science Association) কথা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমায় একদিন সেখানে লয়ে যাবে?

ডাক্তার — তুমি সেখানে গেলে অজ্ঞান হয়ে যাবে — ঈশ্বরের আশ্চর্য কাণ্ড সব দেখে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বটে?

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৭শে অক্টোবর 1885/10/27/vii

52.31 গিরিশ ও ডাক্তার

ডাক্তার (গিরিশের প্রতি) — আর সব কর — but do not worship him as God (ঈশ্বর বলে পূজা করো না।) এমন ভাল লোকটার মাথা খাচ্ছ?

গিরিশ — কি করি মহাশয়? যিনি এ সংসার-সমুদ্র ও সন্দেহ সাগর থেকে পার করলেন, তাঁকে আর কি করব বলুন। তাঁর গু কি গু বোধ হয়?

ডাক্তার — গুর জন্য হচ্ছে না। আমারও ঘৃণা নাই! একটা দোকানীর ছেলে এসেছিল, তা বাহ্যে করে ফেললে! সকলে নাকে কাপড় দিলে! আমি তার কাছে আধঘণ্টা বসে! নাকে কাপড় দিই নাই। আর মেথর যতক্ষণ মাথায় করে নিয়ে যায়, ততক্ষণ আমার নাকে কাপড় দেবার জো নাই। আমি জানি সেও যা, আমিও তা, কেন তাকে ঘৃণা করব? আমি কি এঁর পায়ের ধুলা নিতে পারি না? — এই দেখ নিচ্ছি। (শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলি গ্রহণ।)

গিরিশ — Angels (দেবগণ) এই মুহূর্তে ধন্য ধন্য করছেন।

ডাক্তার — তা পায়ের ধুলা লওয়া কি আশ্চর্য! আমি যে সকলেরই নিতে পারি! — এই দাও! এই দাও! (সকলের পায়ের ধুলা গ্রহণ।)

নরেন্দ্র (ডাক্তারের প্রতি) — এঁকে আমরা ঈশ্বরের মতো মনে করি। কিরকম জানেন? যেমন ভেজিটেবল্ ক্রিয়েসন্ (উদ্ভিদ) ও অ্যানিম্যাল ক্রিয়েসন্ (জীবজন্তুগণ)। এদের মাঝামাঝি এমন একটি পয়েন্ট্ স্থান আছে, যেখানে এটা উদ্ভিদ কি প্রাণী, স্থির করা ভারী কঠিন। সেইরূপ Man-world (নরলোক) ও God-world (দেবলোক) এই দুয়ের মধ্যে একটি স্থান আছে, যেখানে বলা কঠিন, এ ব্যক্তি মানুষ, না ঈশ্বর।

ডাক্তার — ওহে, ঈশ্বরের কথায় উপমা চলে না।

নরেন্দ্র — আমি God (ঈশ্বর) বলছি না, God like man (ঈশ্বর তুল্য ব্যক্তি) বলছি।

ডাক্তার — ও-সব নিজের নিজের ভাব চাপতে হয়। প্রকাশ করা ভাল নয়। আমার ভাব কেউ বুঝলে না। My best friends (যারা আমার পরম বন্ধু) আমায় কঠোর নির্দয় মনে করে। এই তোমরা হয়তো আমায় জুতো মেরে তাড়াবে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) — সেকি! — এরা তোমায় কত ভালবাসে! তুমি আসবে বলে বাসকসজ্জা করে জেগে থাকে।

গিরিশ — Every one has the greatest respect for you. (সকলেই আপনাকে যৎপরোনাস্তি শ্রদ্ধা করে।)

ডাক্তার — আমার ছেলে — আমার স্ত্রী পর্যন্ত — আমায় মনে করে hard-hearted (স্নেহমমতা শূন্য), — কেননা, আমার দোষ এই যে, আমি ভাব কারু কাছে প্রকাশ করি না।

গিরিশ — তবে মহাশয়! আপনার মনের কবাট খোলা তো ভাল — at least out of pity for your friends (বন্ধুদের প্রতি অন্ততঃ কৃপা করে) — এই মনে করে যে, তারা আপনাকে বুঝতে পারছে না।

ডাক্তার — বলব কি হে! তোমাদের চেয়েও আমার feelings worked-up হয় (অর্থাৎ আমার ভাব হয়)। (নরেন্দ্রের প্রতি) I shed tears in solitude (আমি একলা একলা বসে কাঁদি।)

[মহাপুরুষ ও জীবের পাপ গ্রহণ — অবতারাদি ও নরেন্দ্র]

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — ভাল, তুমি ভাব হলে লোকের গায়ে পা দাও, সেটা ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— আমি কি জানতে পারি গা, কারু গায়ে পা দিচ্ছি কিনা!

ডাক্তার —— ওটা ভাল নয় —— এটুকু তো বোধ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ —— আমার ভাবাবস্থায় আমার কি হয় তা তোমায় কি বলব? সে অবস্থার পর এমন ভাবি, বুঝি রোগ হচ্ছে ওই জন্য! ঈশ্বরের ভাবে আমার উন্মাদ হয়। উন্মাদে এরূপ হয়, কি করব?

ডাক্তার —— ইনি মেনেছেন। He expresses regret for what he does; কাজটা sinful (অন্যায়) এটি বোধ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) — তুই তো খুব শঠ (বুদ্ধিমান), তুই বল না; একে বুঝিয়ে দে না।

গিরিশ (ডাক্তারের প্রতি) — মহাশয়! আপনি ভুল বুঝেছেন। উনি সে জন্য দুঃখিত হননি। এঁর দেহ শুদ্ধ —— অপাপবিদ্ধ। ইনি জীবের মঙ্গলের জন্য তাদের স্পর্শ করেন। তাদের পাপ গ্রহণ করে এঁর রোগ হবার খুব সম্ভাবনা, তাই কখনও কখনও ভাবেন। আপনার যখন কলিক (শূলবেদনা) হয়েছিল তখন আপনার কি রিগ্রেট (দুঃখ) হয় নাই, কেন রাত জেগে এত পড়তুম? তা বলে রাত জেগে পড়াটা কি অন্যায় কাজ? রোগের জন্য রিগ্রেট (দুঃখ-কষ্ট) হতে পারে। তা বলে জীবের মঙ্গলসাধনের স্পর্শ করাকে অন্যায় কাজ মনে করবেন না।

ডাক্তার (অপ্রতিভ হইয়া, গিরিশের প্রতি) — (তোমার কাছে হেরে গেলুম, দাও পায়ের ধুলা দাও। (গিরিশের পদধূলি গ্রহণ)। (নরেন্দ্রের প্রতি) — আর কিছু নয় হে, his intellectual power (গিরিশের বুদ্ধিমত্তা) মানতে হবে।

নরেন্দ্র (ডাক্তারের প্রতি) — আর-এককথা দেখুন। একটা Scientific discovery (জড় বিজ্ঞানের সত্য বাহির) করবার জন্য আপনি life devote (জীবন উৎসর্গ) করতে পারেন —— শরীর, অসুখ ইত্যাদি কিছুই মানেন না। আর ঈশ্বরকে জানা grandest of all sciences (শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান)-এর জন্য ইনি health risk (শরীর নষ্ট হয় হউক, এরূপ মনের ভাব) করবেন না?

ডাক্তার —— যত religious reformer (ধর্মাচার্য) হয়েছে, Jesus (যীশু), চৈতন্য, বুদ্ধ, মহম্মদ শেষে সব অহংকারে পরিপূর্ণ —— বলে, ‘আমি যা বললুম, তাই ঠিক!’ এ কি কথা!

গিরিশ (ডাক্তারের প্রতি) — মহাশয়, সে দোষ আপনারও হচ্ছে! আপনি একলা তাদের সকলের অহংকার আছে, এ দোষ ধরাতে ঠিক সেই দোষ আপনারও হচ্ছে।

ডাক্তার নীরব হইলেন।

নরেন্দ্র (ডাক্তারের প্রতি) — We offer to him Worship bordering on Divine Worship (এঁকে আমরা পূজা করি —— সে পূজা ঈশ্বরের পূজার প্রায় কাছাকাছি) —

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে বালকের ন্যায় হাসিতেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৯শে অক্টোবর 1885/10/29/i

52.32 ডাক্তার ও মাস্টার — সার কি?

আজ বৃহস্পতিবার, আশ্বিন কৃষ্ণা ষষ্ঠী, ২৯শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। বেলা দশটা। ঠাকুর পীড়িত। কলিকাতার অন্তর্গত শ্যামপুকুরে রহিয়াছেন। ডাক্তার তাঁহাকে চিকিৎসা করিতেছেন, ডাক্তারের বাড়ি শাঁখারিটোলা। ডাক্তারের সঙ্গে এখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একটি সেবক কথা কহিতেছেন। ঠাকুর রোজ রোজ কেমন থাকেন, সেই সংবাদ লইয়া তাঁহাকে প্রত্যহ আসিতে হয়।

ডাক্তার — দেখ, বিহারীর (ভাদুরীর) এক কথা! বলে Goethe's spirit (সূক্ষ্মশরীর) বেরিয়ে গেল, আবার Goethe তাই দেখছে! কি আশ্চর্য কথা!

মাস্টার — পরমহংসদেব বলেন, ও-সব কথায় আমাদের কি দরকার? আমরা পৃথিবীতে এসেছি, যাতে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি হয়। তিনি বলেন, একজন একটা বাগানে আম খেতে গিছল। সে একটা কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে কত গাছ, কত ডাল, কত পাতা তাই গুণছি — এখানে আম খেতে এসেছি!

বাগানের লোকটি বললে, আম খেতে এসেছ তো আম খেয়ে যাও, তোমার অত শত, কত পাতা, কত ডাল এ-সব কাজ কি?

ডাক্তার — পরমহংস সারটা নিয়েছে দেখছি।

অতঃপর ডাক্তার তাঁহার হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল সম্বন্ধে অনেক গল্প করিতে লাগিলেন — কত রোগী রোজ আসে, তাদের ফর্দ দেখালেন; বললেন, ডাক্তার সাল্‌জার এবং অন্যান্য অনেকে তাঁহাকে প্রথমে নিরুৎসাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক মাসিক পত্রিকায় তাঁহার বিরুদ্ধে লিখিতেন ইত্যাদি।

ডাক্তার গাড়িতে উঠিলেন, মাস্টারও সঙ্গে উঠিলেন। ডাক্তার নানা রোগী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রথমে চোরবাগান, তারপর মাথাঘষার গলি, তারপর পাথুরিয়াঘাটা। সব রোগী দেখা হইলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে যাইবেন। ডাক্তার পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরদের একটি বাড়িতে গেলেন। সেখানে কিছু বিলম্ব হইল। গাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া আবার গল্প করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার — এই বাবুটির সঙ্গে পরমহংসের কথা হল। থিয়সফির কথা — কর্ণেল অল্‌কটের কথা হল। পরমহংস ওই বাবুটির উপর চটা! কেন জান? এ বলে, আমি সব জানি।

মাস্টার — না, চটা হবেন কেন? তবে শুনেছি, একবার দেখা হয়েছিল। তা পরমহংসদেব ঈশ্বরের কথা বলছিলেন। তখন ইনি বলেছিলেন বটে যে ‘হাঁ ও-সব জানি’।

ডাক্তার — এ বাবুটি সায়েন্স এসোসিয়েশনে ৩২,৫০০ টাকা দিয়াছেন।

গাড়ি চলিতে লাগিল। বড়বাজার হইয়া ফিরিতেছে। ডাক্তার ঠাকুরের সেবা সম্বন্ধে কথা কহিতে লাগিলেন।

ডাক্তার — তোমাদের কি ইচ্ছা এঁকে দক্ষিণেশ্বরে পাঠানো?

মাস্টার — না, তাতে ভক্তদের বড় অসুবিধা। কলকাতায় থাকলে সর্বদা যাওয়া আসা যায় — দেখতে পারা যায়।

ডাক্তার — এতে তো অনেক খরচ হচ্ছে।

মাস্টার — ভক্তদের সে জন্য কোন কষ্ট নাই। তাঁরা যাতে সেবা করতে পারেন, এই চেষ্টা করছেন। খরচ তো এখানেও আছে। সেখানে গেলে সর্বদা দেখতে পাবেন না, এই ভাবনা।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৯শে অক্টোবর 1885/10/29/ii

52.33 শ্রীরামকৃষ্ণ, ডাক্তার সরকার, ভাদুড়ী প্রভৃতি সঙ্গে

[ডাক্তার সরকার, ভাদুড়ী, দোকড়ি, ছোট নরেন, মাস্টার, শ্যাম বসু]

ডাক্তার ও মাস্টার শ্যামপুকুরে আসিয়া দ্বিতল গৃহে উপস্থিত হইলেন। সেই গৃহের বাহিরের উপরে বারান্দাওয়ালা দুটি ঘর আছে। একটি পূর্ব-পশ্চিমে ও অপরটি উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ। তাহার প্রথম ঘরটিতে গিয়া দেখেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। ঠাকুর সহাস্য। কাছে ডাক্তার ভাদুড়ী ও অনেকগুলি ভক্ত।

ডাক্তার হাত দেখিলেন ও পীড়ার অবস্থা সমস্ত অবগত হইলেন। ক্রমে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা হইতে লাগিল।

ভাদুড়ী — কথাটা কি জান? সব স্বপ্নবৎ।

ডাক্তার — সবই ডিলিউসন(ভ্রম)? তবে কার ডিলিউসন্‌আর কেন ডিলিউন্‌? আর সব্বাই কথাই বা কয় কেন, ডিলিউসন্‌ জেনেও? I cannot believe that God is real and creation is unreal. (ঈশ্বর সত্য, আর তাঁর সৃষ্টি মিথ্যা, এ বিশ্বাস করিতে পারি না।)

[সোঽহম্‌ ও দাসভাব — জ্ঞান ও ভক্তি]

শ্রীরামকৃষ্ণ — এ বেশ ভাব — তুমি প্রভু, আমি দাস। যতক্ষণ দেহ সত্য বলে বোধ আছে, আমি তুমি আছে, ততক্ষণ সেব্য সেবকভাবই ভাল; আমি সেই, এ-বুদ্ধি ভাল নয়।

“আর কি জান? একপাশ থেকে ঘরকে দেখছি, এও যা, আর ঘরের মধ্যে থেকে ঘরকে দেখছি, সেও তাই।”

ভাদুড়ী (ডাক্তারের প্রতি) — এ-সব কথা যা বললুম, বেদান্তে আছে। শাস্ত্র-টাস্ত্র দেখ, তবে তো।

ডাক্তার — কেন, ইনি কি শাস্ত্র দেখে বিদ্বান হয়েছেন? আর ইনিও তো ওই কথা বলেন। শাস্ত্র না পড়লে হবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ওগো, আমি শুনেছি কত?

ডাক্তার — শুধু শুনলে কত ভুল থাকতে পারে। তুমি শুধু শোন নাই।

আবার অন্য কথা চলিতে লাগিল।

[‘ইনি পাগল’ — ঠাকুরের পায়ের ধুলা দেওয়া]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) — আপনি নাকি বলেছো, ‘ইনি পাগল’? তাই এরা (মাস্টার ইত্যাদির দিকে দেখাইয়া) তোমার কাছে যেতে চায় না।

ডাক্তার (মাস্টারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) — কই? তবে অহংকার বলেছি। তুমি লোককে পায়ের ধুলা নিতে দাও কেন?

মাস্টার — তা না হলে লোকে কাঁদে।

ডাক্তার — তাদের ভুল — বুঝিয়ে দেওয়া উচিত।

মাস্টার — কেন, সর্বভূতে নারায়ণ?

ডাক্তার — তাতে আমার আপত্তি নাই। সব্বাইকে কর।

মাস্টার — কোন কোন মানুষে বেশি প্রকাশ! জল সব জায়গায় আছে, কিন্তু পুকুরে, নদীতে, সমুদ্রে, — প্রকাশ। আপনি Faraday-কেL যত মানবেন, নূতন Bachelor of Science-কেL কি তত মানবেন?

ডাক্তার — তাতে আমি রাজী আছি। তবে গড্ (God) বল কেন?

মাস্টার — আমরা পরস্পর নমস্কার করি কেন? সকলের হৃদয়মধ্যে নারায়ণ আছেন। আপনি ও-সব বিষয় বেশি দেখেন নাই, ভাবেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) — কোন কোন জিনিসে বেশি প্রকাশ। আপনাকে তো বলেছি, সূর্যের রশ্মি মাটিতে একরকম পড়ে, গাছে একরকম পড়ে, আবার আরশিতে আর একরকম। আরশিতে কিছু বেশি প্রকাশ। এই দেখ না, প্রহ্লাদাদি আর এরা কি সমান? প্রহ্লাদের মন প্রাণ সব তাঁতে সমর্পণ হয়েছিল!

ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন। সকলে চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) — দেখ, তোমার এখানের উপর টান আছে। তুমি আমাকে বলেছো, তোমায় ভালবাসি।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও সংসারী জীব — “তুমি লোভী, কামী, অহংকারী”]

ডাক্তার — তুমি Child of Nature, তাই অত বলি। লোক পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করে, এতে আমার কষ্ট হয়। মনে করি এমন ভাল লোকটাকে খারাপ করে দিচ্ছে। কেশব সেনকে তার চেলারা ওইরকম করেছিল। তোমায় বলি শোন —

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমার কথা কি শুনব? তুমি লোভী, কামী, অহংকারী।

ভাদুড়ী (ডাক্তারের প্রতি) — অর্থাৎ তোমার জীবত্ব আছে। জীবের ধর্মই ওই, টাকা-কড়ি, মান-সম্ভ্রমেতে লোভ, কাম, অহংকার। সকল জীবেরই এই ধর্ম।

ডাক্তার — তা বল তো তোমার গলার অসুখটি কেবল দেখে যাব। অন্য কোন কথায় কাজ নাই। তর্ক করতে তো সব ঠিকঠাক বলব।

সকলে চুপ করিয়া রহিলেন।

[অনুলোম ও বিলোম — Involution and Evolution — তিন ভক্ত]

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার ভাদুড়ীর সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি জানো? ইনি (ডাক্তার) এখন নেতি নেতি করে অনুলোমে যাচ্ছে। ঈশ্বর জীব নয়, জগৎ নয়, সৃষ্টির ছাড়া তিনি, এই সব বিচার ইনি কচ্ছে। যখন বিলোমে আসবে সব মানবে।

“কলাগাছের খোলা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে গেলে, মাঝ পাওয়া যায়।

“খোলা একটি আলাদা জিনিস, মাঝ একটি আলাদা জিনিস। মাঝ কিছু খোলা নয়, খোলাও মাঝ নয়। কিন্তু শেষে মানুষ দেখে যে খোলেরই মাঝ, মাঝেরই খোল। তিনি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন, তিনিই মানুষ হয়েছেন। (ডাক্তারের প্রতি) — ভক্ত তিনরকম। অধম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত, উত্তম ভক্ত। অধম ভক্ত বলে, ওই ঈশ্বর। তারা বলে সৃষ্টি আলাদা, ঈশ্বর আলাদা। মধ্যম ভক্ত বলে, ঈশ্বর অন্তর্যামী। তিনি হৃদয়মধ্যে আছেন। সে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে। উত্তম ভক্ত দেখে, তিনি এই সব হয়েছেন। তিনিই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। সে দেখে ঈশ্বর অধঃ ঊর্ধ্বে পরিপূর্ণ।

“তুমি গীতা, ভাগবত, বেদান্ত এ-সব পড়, — তবে এ-সব বুঝতে পারবে!

“ঈশ্বর কি সৃষ্টিমধ্যে নাই?”

ডাক্তার —– না, সব জায়গায় আছেন, আর আছেন বলেই খোঁজা যায় না।

কিয়ৎক্ষণ পরে অন্য কথা পড়িল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরীয় ভাব সর্বদা হয়, তাহাতে অসুখ বাড়িবার সম্ভাবনা।

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — ভাব চাপবে। আমার খুব ভাব হয়। তোমাদের চেয়ে নাচতে পারি।

ছোট নরেন (সহাস্যে) — ভাব যদি আর একটু বাড়ে, কি করবেন?

ডাক্তার —– Controlling Power-ও (চাপবার শক্তি) বাড়বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাস্টার — সে আপনি বলছো (বলছেন।)

মাস্টার — ভাব হলে কি হবে, আপনি বলতে পারেন?

কিয়ৎক্ষণ পরে টাকা-কড়ির কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) — আমার তাতে ইচ্ছা নাই, তা তো জান? — কি ঢঙ্‌ নয়!

ডাক্তার — আমারই তাতে ইচ্ছা নাই — তা আবার তুমি! বাক্স খোলা টাকা পড়ে থাকে —

শ্রীরামকৃষ্ণ — যদু মল্লিকও ওইরকম অন্যমনস্ক, — যখন খেতে বসে, এত অন্যমনস্ক যে, যা তা ব্যান্নুন, ভাল মন্দ খেয়ে যাচ্ছে। কেউ হয়তো বললে, 'ওটা খেও না, ওটা খারাপ হয়েছে'। তখন বলে, 'অ্যাঁ, এ ব্যান্নুনটা খারাপ? হাঁ, সত্যই তো!'

ঠাকুর কি ইঙ্গিতে বলিতেছেন, ঈশ্বরচিন্ত্য করে অন্যমনস্ক, আর বিষয় চিন্তা করে অ্যমনস্ক, অনেক প্রভেদ?

আবার ভক্তদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ডাক্তারকে দেখাইয়া সহাস্যে বলিতেছেন, "দেখ, সিদ্ধ হলে জিনিস নরম হয় — ইনি (ডাক্তার) খুব শক্ত ছিলেন, এখন ভিতর থেকে একটু নরম হচ্চেন।"

ডাক্তার — সিদ্ধ হলে উপর থেকেই নরম হয়, কিন্তু আমার এ যাত্রায় তা হল না। (সকলের হাস্য)

ডাক্তার বিদায় লইবেন, আবার ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছেন।

ডাক্তার — লোকে পায়ের ধুলা লয়, বারণ করতে পার না?

শ্রীরামকৃষ্ণ — সব্বাই কি অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে ধরতে পারে?

ডাক্তার — তা বলে যা ঠিক মত, তা বলবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ — রুচিভেদ আর অধিকারীভেদ আছে।

ডাক্তার — সে আবার কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — রুচিভেদ, কিরকম জানো? কেউ মাছটা ঝোলে খায়, কেউ ভাজা খায়, কেউ মাছের অম্বল খায়, কেউ মাছের পোলাও খায়। আর অধিকারীভেদ। আমি বলি আগে কলাগাছ বিঁধতে শেখ, তারপর শলতে, তারপর পাখি উড়ে যাচ্ছে, তাকে বেঁধ।

[অখণ্ডদর্শন — ডাক্তার সরকার ও হরিবল্লভকে দর্শন]

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হইলেন। এত অসুখ; কিন্তু অসুখ একধারে পড়িয়া রহিল। দুই-চারজন অন্তরঙ্গ ভক্ত কাছে বসিয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন। ঠাকুর অনেকক্ষণ এই অবস্থায় আছেন।

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। মণি কাছে বসিয়া আছেন, তাঁহাকে একান্তে বলিতেছেন — "দেখ, অখণ্ডে মন লীন হয়ে গিছিল! তারপর দেখলাম — সে অনেক কথা। ডাক্তারকে দেখলাম, ওর হবে — কিছুদিন পরে; — আর বেশি ওকে বলতে টলতে হবে না। আর-একজনকে দেখলাম। মন থেকে উঠল 'তাকেও নাও'। তার কথা পরে তোমাকে বলব।

[সংসারী জীবকে নানা উপদেশ]

শ্রীযুক্ত শ্যাম বসু ও দোকড়ি ডাক্তার ও আরও দু-একটি লোক আসিয়াছেন। এইবার তাঁহাদের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্যাম বসু — আহা, সেদিন সেই কথাটি যা বলেছিলেন, কি চমৎকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — কি কথাটি গা?

শ্যাম বসু — সেই যে বললেন, জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে গেলে কি থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — বিজ্ঞান। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন, এর নাম জ্ঞান। বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান। ঈশ্বরের সহিত আলাপ, তাতে আত্মীয়বোধ, এর নাম বিজ্ঞান।

"কাঠে আগুন আছে, অগ্নিতত্ত্ব আছে; এর নাম জ্ঞান। সেই কাঠ জ্বালিয়ে ভাত রেঁধে খাওয়া ও খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান।"

শ্যাম বসু (সহাস্যে) — আর সেই কাঁটার কথা!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — হাঁ, যেমন পায়ে কাঁটা ফুটলে আর-একটি কাঁটা আহরণ করতে হয়; তারপর পায়ের কাঁটাটি তুলে দুটি কাঁটা ফেলে দেয়। তেমনি অজ্ঞানকাঁটা তুলবার জন্য জ্ঞানকাঁটা জোগাড় করতে হয়। অজ্ঞান নাশের পর জ্ঞান-অজ্ঞান দুই-ই ফেলে দিতে হয়। তখন বিজ্ঞান।

ঠাকুর শ্যাম বসুর উপর প্রসন্ন হইয়াছেন। শ্যাম বসুর বয়স হইয়াছে, এখন ইচ্ছা — কিছুদিন ঈশ্বরচিন্তা করেন। পরমহংসদেবের নাম শুনিয়া এখানে আসিয়াছেন। ইতিপূর্বে আর একদিন আসিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্যাম বসুর প্রতি) — বিষয়ের কথা একবারে ছেড়ে দেবে। ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোনও কথা বলো না। বিষয়ী লোক দেখলে আসতে আসতে সরে যাবে। এতদিন সংসার করে তো দেখলে সব ফক্কিবাজি! ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। ঈশ্বরই সত্য, আর সব দুদিনের জন্য। সংসারে আছে কি? আমড়ার অম্বল; খেতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমড়াতে আছে কি? আঁটি আর চামড়া খেলে অম্লশূল হয়।

শ্যাম বসু — আজ্ঞা হাঁ; যা বলছেন সবই সত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ — অনেকদিন ধরে অনেক বিষয়কর্ম করেছ, এখন গোলমালে ধ্যান ঈশ্বরচিন্তা হবে না। একটু নির্জন দরকার। নির্জন না হলে মন স্থির হবে না। তাই বাড়ি থেকে আধপো অন্তরে ধ্যানের জায়গা করতে হয়।

শ্যামবাবু একটু চুপ করিয়া রহিলেন, যেন কি চিন্তা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — আর দেখ, দাঁতও সব পড়ে গেছে, আর দুর্গাপূজা কেন? (সকলের হাস্য) একজন বলেছিল, আর দুর্গাপূজা কর না কেন? সে ব্যক্তি উত্তর দিলে, আর দাঁত নাই ভাই। পাঁঠা খাবার শক্তি গেছে।

শ্যাম বসু — আহা, চিনিমাখা কথা!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — এই সংসারে বলি আর চিনি মিশেল আছে। পিঁপড়ের মতো বালি ত্যাগ করে করে চিনিটুকু নিতে হয়। যে চিনিটুকু নিতে পারে সেই চতুর। তাঁর চিন্তা করবার জন্য একটু নির্জন স্থান কর। ধ্যানের স্থান। তুমি একবার কর না। আমিও একবার যাব।

সকলে কিয়ৎকাল চুপ করিয়া আছেন।

শ্যাম বসু — মহাশয়, জন্মান্তর কি আছে? আবার জন্মাতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বরকে বল, আন্তরিক ডাক; তিনি জানিয়ে দেন, দেবেন। যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ কর, যদু মল্লিকই বলে দেবে, তার কখানা বাড়ি, কত টাকার কোম্পানির কাগজ। আগে সে-সব জানবার চেষ্টা করা ঠিক নয়। আগে ঈশ্বরকে লাভ কর, তারপর যা ইচ্ছা, তিনিই জানিয়ে দেবেন।

শ্যাম বসু — মহাশয়, মানুষ সংসারে থেকে কত অন্যায় করে, পাপকর্ম করে। সে মানুষ কি ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেহত্যাগের আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে, আর সাধন করতে করতে ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে, যদি দেহত্যাগ হয়, তাকে আর পাপ

কখন স্পর্শ করবে? হাতির স্বভাব বটে, নাইয়ে দেওয়ার পরেও আবার ধুলো-কাদা মাখে; কিন্তু মাহুত নাইয়ে দিয়ে যদি আস্তাবলে তাকে ঢুকিয়ে দিতে পারে, তাহলে আর ধুলো-কাদা মাখতে পায় না।

ঠাকুরের কঠিন পীড়া! ভক্তেরা অবাক্, অহেতুক-কৃপাসিন্ধু দয়াল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জীবের দুঃখে কাতর; অহর্নিশ জীবের মঙ্গলচিন্তা করিতেছেন। শ্যাম বসুকে সাহস দিতেছেন —— অভয় দিতেছেন; "ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যগ হয়, আর পাপ স্পর্শ করবে না।"

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ৩০শে অক্টোবর 1885/10/30/i

52.34 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় শ্যামপুকুর বাটীতে ভক্তসঙ্গে

শুক্রবার আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী; ১৫ই কার্তিক; ৩০শে অক্টোবর, ১৮৮৫। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরে চিকিৎসার্থ আসিয়াছেন। দোতলার ঘরে আছেন; বেলা ৯টা; মাস্টারের সহিত একাকী কথা কহিতেছেন; মাস্টার ডাক্তার সরকারের কাছে গিয়া পীড়ার খবর দিবেন ও তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিবেন। ঠাকুরের শরীর এত অসুস্থ; — কিন্তু কেবল ভক্তদের জন্য চিন্তা!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি, সহাস্যে) — আজ সকালে পূর্ণ এসেছিল। বেশ স্বভাব। মণীন্দ্রের প্রকৃতিভাব। কি আশ্চর্য! চৈতন্যচরিত পড়ে ওইটি মনে ধারণা হয়েছে — গোপীভাব, সখীভাব; ঈশ্বর পুরুষ আর আমি যেন প্রকৃতি।

মাস্টার — আজ্ঞা হাঁ।

পূর্ণচন্দ্র স্কুলের ছেলে, বয়স ১৫।১৬। পূর্ণকে দেখিবার জন্য ঠাকুর বড় ব্যাকুল হন, কিন্তু বাড়িতে তাহাকে আসিতে দেয় না। দেখিবার জন্য প্রথম প্রথম এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, একদিন রাত্রে তিনি দক্ষিণেশ্বর হইতে হঠাৎ মাস্টারের বাড়িতে উপস্থিত। মাস্টার পূর্ণকে বাড়ি হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়া দেখা করাইয়া দিয়াছিলেন। ঈশ্বরকে কিরূপে ডাকিতে হয়, — তাহার সহিত এইরূপ অনেক কথাবার্তার পর — ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া যান।

মণীন্দ্রের বয়সও ১৫।১৬ হইবে। ভক্তেরা তাঁহাকে খোকা বলিয়া ডাকিতেন, এখনও ডাকেন। ছেলেটি ভগবানের নামগুণগান শুনিলে ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিত।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ৩০শে অক্টোবর 1885/10/30/ii

52.35 ডাক্তার ও মাস্টার

বেলা ১০টা-১০।।টা। ডাক্তার সরকারের বাড়ি মাস্টার গিয়াছেন। রাস্তার উপর দোতলার বৈঠকখানার ঘরের বারান্দা, সেইখানে ডাক্তারের সঙ্গে কাষ্ঠাসনে বসিয়া কথা কহিতেছেন। ডাক্তারের সম্মুখে কাঁচের আধারে জল, তাহাতে লাল মাছ খেলা করিতেছে। ডাক্তার মাঝে মাঝে এলাচের খোসা জলে ফেলিয়া দিতেছেন। এক-একবার ময়দার গুলি পাকাইয়া খোলা ছাদের দিকে চড়ুই পাখিদের আহারের জন্য ফেলিয়া দিতেছেন। মাস্টার দেখিতেছেন।

ডাক্তার (মাস্টারের প্রতি সহাস্যে) — এই দেখ, এরা (লাল মাছ) আমার দিকে চেয়ে আছে, কিন্তু উদিকে যে এলাচের খোসা ফেলে দিইছি তা দেখে নাই, তাই বলি, শুধু ভক্তিতে কি হবে, জ্ঞান চাই। (মাস্টারের হাস্য)। ওই দেখ, চড়ুই পাখি উড়ে গেল; ময়দার গুলি ফেললুম, ওর দেখে ভয় হল। ওর ভক্তি হল না, জ্ঞান নাই বলে। জানে না যে খাবার জিনিস।

ডাক্তার বৈঠকখানার মধ্যে আসিয়া বসিলেন। চতুর্দিকে আলমারিতে স্তূপাকার বই। ডাক্তার একটু বিশ্রাম করিতেছেন। মাস্টার বই দেখিতেছেন ও একখানি লইয়া পড়িতেছেন। শেষে কিয়ৎক্ষণ পড়িতেছেন — Canon Farrar's Life of Jesus.

ডাক্তার মাঝে মাঝে গল্প করিতেছেন। কত কষ্টে হোমিওপ্যাথিক হস্পিট্যাল্ হইয়াছিল, সেই সকল ব্যাপার সম্বন্ধীয় চিঠিপত্র পড়িতে বলিলেন, আর বলিলেন যে, “ওই সকল চিঠিপত্র ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের “ক্যালকাটা জার্ণাল্ অব মেডিসিন’-এ পাওয়া যাইবে।” ডাক্তারের হোমিওপ্যাথির উপর খুব অনুরাগ।

মাস্টার আর একখানি বই বাহির করিয়াছেন, Munger's New Theology। ডাক্তার দেখিলেন।

ডাক্তার — Munger বেশ যুক্তি বিচারের উপর সিদ্ধান্ত করেছে। এ তোমার চৈতন্য অমুক কথা বলেছে, কি বুদ্ধ বলেছে, কি যীশুখ্রীষ্ট বলেছে, — তাই বিশ্বাস করতে হবে, — তা নয়।

মাস্টার (সহাস্যে) — চৈতন্য, বুদ্ধ, নয়; তবে ইনি (Munger)। ডাক্তার — তা তুমি যা বল।

মাস্টার — একজন তো কেউ বলছে। তাহলে দাঁড়ালো ইনি। (ডাক্তারের হাস্য)

ডাক্তার গাড়িতে উঠিয়াছেন, মাস্টার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়াছেন। গাড়ি শ্যামপুকুর অভিমুখে যাইতেছে, বেলা দুই প্রহর হইয়াছে। দুইজনে গল্প করিতে করিতে যাইতেছেন। ডাক্তার ভাদুড়ীও মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দেখিতে আসেন; তাঁহারই কথা পড়িল।

মাস্টার (সহাস্যে) — আপনাকে ভাদুড়ী বলেছেন, ইটপাটকেল থেকে আরম্ভ করতে হবে।

ডাক্তার — সে কিরকম?

মাস্টার — মহাত্মা, সূক্ষ্ম শরীর, এসব আপনি মানেন না। ভাদুড়ী মহাশয় বোধ হয় থিয়সফিস্ট্। তা ছাড়া, আপনি অবতারলীলা মানেন না। তাই তিনি বুঝি

ঠাট্টা করে বলেছেন, এবার মলে মানুষ জন্ম তো হবেই না; কোনও জীবজন্তু, গাছপালা কিছুই হতে পারবেন না! ইটপাটকেল থেকে আরম্ভ করতে হবে, তারপর অনেক জন্মের পর যদি কখনও মানুষ হন!

ডাক্তার — ও বাবা!

মাস্টার — আর বলছেন, আপনাদের যে Science নিয়ে জ্ঞান সে মিথ্যা জ্ঞান। এই আছে, এই নাই। তিনি উপমাও দিয়েছেন। যেমন দুটি পাতকুয়া আছে। একটি পাতকুয়ার জল নিচের Spring থেকে আসছে; দ্বিতীয় পাতকুয়ার Spring নাই, তবে বর্ষার জলে পরিপূর্ণ হয়েছে। সে জল কিন্তু বেশিদিন থাকবার নয়। আপনার Science-এর জ্ঞানও বর্ষার পাতকুয়ার জলের মতো শুকিয়ে যাবে।

ডাক্তার (ঈষৎ হাসিয়া) — বটে।

গাড়ি কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার সরকার শ্রীযুক্ত প্রতাপ ডাক্তারকে তুলিয়া লইলেন। তিনি গতকল্য ঠাকুরকে দেখিতে গিয়াছিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ৩০শে অক্টোবর 1885/10/30/iii

52.36 ডাক্তার সরকারের প্রতি উপদেশ —— জ্ঞানীর ধ্যান

ঠাকুর সেই দোতলার ঘরে বসিয়া আছেন, — কয়েকটি ভক্তসঙ্গে। ডাক্তার এবং প্রতাপের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — আবার কাশি হয়েছে? (সহাস্যে) তা কশীতে যাওয়া তো ভাল। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তাতে তো মুক্তি গো! আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই। (ডাক্তার ও ভক্তেরা হাসিতেছেন)

শ্রীযুক্ত প্রতাপ, ডাক্তার ভাদুড়ির জামাতা। ঠাকুর প্রতাপকে দেখিয়া ভাদুড়ীর গুণগান করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপকে) — আহা, তিনি কি লোক হয়েছেন! ঈশ্বরচিন্তা, শুদ্ধাচার, আর নিরাকার-সাকার সব ভাব নিয়েছেন।

মাস্টারের বড় ইচ্ছা যে ইটপাটকেলের কথাটি আর একবার হয়। তিনি ছোট নরেনকে আস্তে আস্তে —— অথচ ঠাকুর যাহাতে শুনিতে পান —— এমন ভাবে বলিতেছেন, “ইটপাটকেলের কথাটি ভাদুড়ী কি বলেছেন মনে আছে?”

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, ডাক্তারের প্রতি) — আর তোমায় কি বলেছেন জানো? তুমি এ-সব বিশ্বাস কর না, মন্বন্তরের পর তোমার ইটপাটকেল থেকে আরম্ভ করতে হবে। (সকলের হাস্য)

ডাক্তার (সহাস্যে) — ইটপাটকেল থেকে আরম্ভ করে অনেক জন্মের পর যদি মানুষ হই, আবার এখানে এলেই তো ইটপাটকেল থেকে আবার আরম্ভ। (ডাক্তারের ও সকলের হাস্য)

ঠাকুর একটু অসুস্থ, তবুও তাঁহার ঈশ্বরীয় ভাব হয় ও তিনি ঈশ্বরের কথা সর্বদা কন, এই কথা হইতেছে।

প্রতাপ — কাল দেখে গেলাম ভাবাবস্থা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সে আপনি আপনি হয়ে গিয়েছিল; বেশি নয়।

ডাক্তার — কথা আর ভাব এখন ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) — কাল যে ভাবাবস্থা হয়েছিল, তাতে তোমাকে দেখলাম। দেখলাম, জ্ঞানের আকার — কিন্তু মজক একেবারে শুষ্ক, আনন্দরস পায় নাই। (প্রতাপের প্রতি) ইনি (ডাক্তার) যদি একবার আনন্দ পান, অধঃ ঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ দেখেন। আর 'আমি যা বলছি তাই ঠিক, আর অন্যেরা যা বলে তা ঠিক নয়,' — এ-সব কথা তাহলে আর বলেন না — আর হ্যাঁক-ম্যাঁক লাঠিমারা কথাগোলো আর ওঁর মুখ দিয়ে বেরোয় না!

[জীবনের উদ্দেশ্য — পূর্বকথা — ন্যাংটার উপদেশ]

ভক্তেরা সকলে চুপ করিয়া আছেন, হঠাৎ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া ডাক্তার সরকারকে বলিতেছেন —

“মহীন্দ্রবাবু — কি টাকা টাকা করছো! মাগ, মাগ! — মান, মান! করছো! ও-সব এখন ছেড়ে দিয়ে, একচিত্ত হয়ে ঈশ্বরেতে মন দাও! — ওই আনন্দ ভোগ করো।”

ডাক্তার সরকার চুপ করিয়া আছেন। সকলেই চুপ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — জ্ঞানীর ধ্যানের কথা ন্যাংটা বলত। জলে জল, অধঃ ঊর্ধ্বে পরিপূর্ণ! জীব যেন মীন, জলে আনন্দে সে সাঁতার দিচ্ছে। ঠিক ধ্যান হলে এইটি সত্য সত্য দেখবে।

“অনন্ত সমুদ্র, জলেরও অবধি নাই। তার ভিতরে যেন একটি ঘট রয়েছে। বাহিরে ভিতরে জল। জ্ঞানী দেখে, — অন্তরে বাহিরে সেই পরমাত্মা। তবে ঘটটি কি? ঘট আছে বলে জল দুই ভাগ দেখাচ্ছে, অন্তরে বাহিরে বোধ হচ্ছে। ‘আমি’ ঘট থাকলে এই বোধ হয়। ওই ‘আমিটি’ যদি যায়, তাহলে যা আছে তাই, মুখে বলবার কিছু নাই।

“জ্ঞানীর ধ্যান আর কিরকম জানো? অনন্ত আকাশ, তাতে পাখি আনন্দে উড়ছে, পাখা বিস্তার করে। চিদাকাশ, আত্মা পাখি। পাখি খাঁচায় নাই, চিদাকাশে উড়ছে! আনন্দ ধরে না।”১

ভক্তেরা অবাক্ হইয়া এই ধ্যানযোগ কথা শুনিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রতাপ আবার কথা আরম্ভ করিলেন।

প্রতাপ (সরকারের প্রতি) — ভাবতে গেলে সব ছায়া।

ডাক্তার — ছায়া যদি বললে, তবে তিনটি চাই। সূর্য, বস্তু আর ছায়া। বস্তু না হলে ছায়া কি! এদিকে বলছো God real আবার Creation unreal! Creation-ও real।

প্রতাপ — আচ্ছা, আরশিতে যেমন প্রতিবিম্ব, তেমনি মনরূপ আরশিতে এই জগৎ দেখা যাচ্ছে।

ডাক্তার — একটা বস্তু না থাকলে কি প্রতিবিম্ব?

নরেন — কেন, ঈশ্বর বস্তু। [ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন]

[জগৎ-চৈতন্য ও Science — ঈশ্বরই কর্তা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) — একটা কথা তুমি বেশ বলেছো। ভাবাবস্থা যে মনের যোগে হয় এটি আর কেউ বলেনি। তুমিই বলেছো।

“শিবনাথ বলেছিল, বেশি ঈশ্বরচিন্তা করলে বেহেড হয়ে যায়। বলে জগৎ-চৈতন্যকে চিন্তা করে অচৈতন্য হয়। বোধস্বরূপ, যাঁর বোধে জগৎ বোধ করছে, তাঁকে চিন্তা করে অবোধ!

“আর তোমার Science — এটা মিশলে ওটা হয়; ওটা মিশলে এটা হয়; ওগুলো চিন্তা করলে বরং বোধশূন্য হতে পারে, কেবল জড়গুলো ঘেঁটে!”

ডাক্তার — ওতে ঈশ্বরকে দেখা যায়।

মণি — তবে মানুষে আরও স্পষ্ট দেখা যায়। আর মহাপুরুষে আরও বেশি দেখা যায়। মহাপুরুষে বেশি প্রকাশ।

ডাক্তার — হাঁ, মানুষেতে বটে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁকে চিন্তা করলে অচৈতন্য! যে চৈতন্য জড় পর্যন্ত চেতন হয়েছে, হাত-পা-শরীর নড়ছে! বলে শরীর নড়ছে, কিন্তু তিনি নড়ছেন, জানে না। বলে, জলে হাত পুড়ে গেল! জলে কিছু পোড়ে না। জলের ভিতর যে উত্তাপ, জলের ভিতর যে অগ্নি তাতেই হাত পুড়ে গেল!

“হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। আলু-বেগুন লাফাচ্ছে। ছোট ছেলে বলে আলু-বেগুনগুলো আপনি নাচছে। জানে না যে, নিচে আগুন আছে! মানুষ বলে, ইন্দ্রিয়েরা আপনা-আপনি কাজ করছে! ভিতরে যে সেই চৈতন্যস্বরূপ আছে তা ভাবে না!”

ডাক্তার সরকার গাত্রোত্থান করিলেন। এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও দাঁড়াইলেন।

ডাক্তার — বিপদে মধুসূদন। সাধে ‘তুঁহু তুঁহু’ বলায়। গলায় ওইটি হয়েছে তাই। তুমি নিজে যেমন বলো, এখন ধুনুরীর হাতে পড়েছো, ধুনুরীকে বলো। তোমারই কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি আর বলব।

ডাক্তার — কেন বলবে না? তাঁর কোলে রয়েছি, কোলে হাগছি আর ব্যায়রাম হলে তাঁকে বলব না তবে কাকে বলব?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঠিক ঠিক। এক-একবার বলি। তা — হয় না।

ডাক্তার — আর বলতেই বা হবে কেন, তিনি কি জানছেন না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — একজন মুসলমান নমাজ করতে করতে ‘হো আল্লা’ ‘হো আল্লা’ বলে চিৎকার করে ডাকছিল। তাকে একজন লোক বললে, তুই আল্লাকে ডাকছিস তা অতো চেঁচাচ্ছিস কেন? তিনি যে পিঁপড়ের পায়ের নূপুর শুনতে পান!

[যোগীর লক্ষণ — যোগী অন্তর্মুখ — বিল্বমঙ্গল ঠাকুর]

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁতে যখন মনের যোগ হয়, তখন ঈশ্বরকে খুব কাছে দেখে। হৃদয়ের মধ্যে দেখে।

“কিন্তু একটি কথা আছে, যত এই যোগ হবে ততই বাহিরের জিনিস থেকে মন সরে আসবে। ভক্তমালে এক ভক্তের (বিশ্বমঙ্গলের) কথা আছে। সে বেশ্যালয়ে

যেত। একদিন অনেক রাত্রে যাচ্ছে। বাড়িতে বাপ-মায়ের শ্রাদ্ধ হয়েছিল তাই দেরি হয়েছে। শ্রাদ্ধের খাবার বেশ্যাকে দেবে বলে হাতে করে লয়ে যাচ্ছে। তার বেশ্যার দিকে এত একাগ্র মন যে কিসের উপর দিয়ে যাচ্ছে, কোন্‌খান দিয়ে যাচ্ছে, এ-সব কিছু হুঁশ নাই। পথে এক যোগী চক্ষু বুজে ঈশ্বরচিন্তা কচ্ছিল, তাঁর গায়ে পা দিয়ে চলে যাচ্ছে। যোগী রাগ করে বলে উঠল, 'কি তুই দেখতে পাচ্ছিস না? আমি ঈশ্বরকে চিন্তা করছি, তুই গায়ের উপর পা দিয়ে চলে যাচ্ছিস?' তখন সে লোকটি বললে, আমায় মাপ করবেন, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বেশ্যাকে চিন্তা করে আমার হুঁশ নাই, আর আপনি ঈশ্বরচিন্তা কচ্ছেন, আপনার সব বাহিরের হুঁশ আছে! এ কিরকম ঈশ্বরচিন্তা! সে ভক্ত শেষে সংসারত্যাগ করে ঈশ্বরের আরাধনায় চলে গিয়েছিল। বেশ্যাকে বলেছিল, তুমি আমার গুরু, তুমিই শিখিয়েছ কিরকম ঈশ্বরে অনুরাগ করতে হয়। বেশ্যাকে মা বলে ত্যাগ করেছিল।"

ডাক্তার — এ তান্ত্রিক উপাসনা। জননী রমনী।

[লোকশিক্ষা দিবার সংসারীর অনধিকার]

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখ, একটা গল্প শোন। একজন রাজা ছিল। একটি পণ্ডিতের কাছে রাজা রোজ ভাগবত শুনত। প্রত্যহ ভাগবত পড়ার পর পণ্ডিত রাজাকে বলত, রাজা বুঝেছ? রাজাও রোজ বলত, তুমি আগে বোঝ! ভাগবতের পণ্ডিত বাড়ি গিয়ে রোজ ভাবে যে, রাজা রোজ এমন কথা বলে কেন! আমি রোজ এত করে বোঝাই আর রাজা উলটে বলে, তুমি আগে বোঝ! পণ্ডিতটি সাধন-ভজন করত। কিছুদিন পরে তাঁর হুঁশ হল যে ঈশ্বরই বস্তু, আর সব — গৃহ পরিবার,

ধন, জন, মানসম্ভ্রম সব অবস্তু। সংসারে সব মিথ্যা বোধ হওয়াতে সে সংসারত্যাগ করলে। যাবার সময় কেবল একজনকে বলে গেল যে, রাজাকে বলো যে এখন আমি বুঝেছি।

"আর একটি গল্প শোন। একজনের একটি ভাগবতের পণ্ডিত দরকার হয়েছিল, — পণ্ডিত এসে রোজ শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বলবে। এখন ভাগবতের পণ্ডিত পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক খোঁজার পর একটি লোক এসে বললে, মহাশয়, একটি উৎকৃষ্ট ভাগবতের পণ্ডিত পেয়েছি। সে বললে, তবে বেশ হয়েছে, — তাঁকে আন। লোকটি বললে, একটু কিন্তু গোল আছে। তার কয়খানা লাঙ্গল আর কয়টা হেলে গরু আছে — তাদের নিয়ে সমস্ত দিন থাকতে হয়, চাষ দেখতে হয়, একটুও অবসর নাই। তখন যার ভাগবতের পণ্ডিতের দরকার সে বললে ওহে, যার লাঙ্গল আর হেলে গরু আছে, এমন ভাগবতের পণ্ডিত আমি চাচ্ছি না, — আমি চাচ্ছি এমন লোক যার অবসর আছে, আর আমাকে হরিকথা শুনাতে পারেন। (ডাক্তারের প্রতি) বুঝলে?"

ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন।

[শুধু পাণ্ডিত্য ও ডাক্তার]

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি জানো, শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? পন্ডিতেরা অনেক জানে-শোনে — বেদ, পুরাণ, তন্ত্র। কিন্তু শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? বিবেক-বৈরাগ্য চাই। বিবেক-বৈরাগ্য যদি থাকে, তবে তার কথা শুনতে পারা যায়। যারা সংসারকে সার করেছে, তাদের কথা নিয়ে কি হবে!

“গীতা পড়লে কি হয়? দশবার ‘গীতা গীতা’ বললে যা হয়। ‘গীতা গীতা’ বলতে বলতে ‘ত্যাগী’ হয়ে যায়। সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি যা ত্যাগ হয়ে গেছে, যে ঈশ্বরেতে ষোল আনা ভক্তি দিতে পেরেছে, সেই গীতার মর্ম বুঝেছে। গীতা সব বইটা পড়বার দরকার নাই। ‘ত্যাগী’ বলতে পারলেই হল।”

ডাক্তার — ‘ত্যাগী’ বলতে গেলেই একটা য-ফলা আনতে হয়।

মণি — তা য-ফলা না আনলেও হয়, নবদ্বীপ গোস্বামী ঠাকুরকে বলেছিলেন। ঠাকুর পেনেটিতে মহোৎসব দেখতে গিয়েছিলেন, সেখানে নবদ্বীপ গোস্বামীকে এই গীতার কথা বলেছিলেন। তখন গোস্বামী বললেন, তগ্‌ ধাতু ঘঙ্‌ ‘তাগ’ হয়, তার উত্তর ইন্‌ প্রত্যয় করলে ত্যাগী হয়, ত্যাগী ও তাগী এক মানে।

ডাক্তার — আমায় একজন রাধা মানে বলেছিল। বললে, রাধা মানে কি জানো? কথাটা উল্‌টে নাও অর্থাৎ ‘ধারা, ধারা’। (সকলের হাস্য)

(সহাস্যে) – “আজ ‘ধারা’ পর্যন্তই রহিল।”

১ cf. Shelley's Skylark

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ৩০শে অক্টোবর 1885/10/30/iv

52.37 ঐহিক জ্ঞান বা Science

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে মাস্টার বসিয়া আছেন ও একান্তে কথা হইতেছে। মাস্টার ডাক্তারের বাড়িতে গিয়াছিলেন, সেই সব কথা হইতেছিল।

মাস্টার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — লাল মাছকে এলাচের খোসা দেওয়া হচ্ছিল, আর চড়ুই পাখীদের ময়দার গুলি। তা বলেন, 'দেখলে, ওরা এলাচের খোসা দেখেনি, তাই চলে গেল! আগে জ্ঞান তাই তবে ভক্তি। দুই-একটা চড়ুইও ময়দার ডেলা ছোড়া দেখে পালিয়ে গেল। ওদের জ্ঞান নাই, তাই ভক্তি হল না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — ও জ্ঞানের মানে ঐহিক জ্ঞান —— ওদের Science-এর জ্ঞান।

মাস্টার —— আবার বললেন, 'চৈতন্য বলে গেছে, কি বুদ্ধ বলে গেছে, কি যীশুখ্রীষ্ট বলে গেছে, তবে বিশ্বাস করব! তা নয়!'

"এক নাতি হয়েছে, — তা বউমার সুখ্যাতি করলেন। বললেন, একদিনও বাড়িতে দেখতে পাই না, এমনি শান্ত আর লজ্জাশীলা ——"

শ্রীরামকৃষ্ণ —— এখানকার কথা ভাবছে। ক্রমে শ্রদ্ধা হচ্ছে। একেবারে অহংকার কি যায় গা! অত বিদ্যা, মান! টাকা হয়েছে! কিন্তু এখানকার কথাতে অশ্রদ্ধা নেই।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ৩০শে অক্টোবর 1885/10/30/v

52.38 অবতীর্ণ শক্তি বা সদানন্দ

বেলা ৫টা। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই দোতলার ঘরে বসিয়া আছেন। চতুর্দিকে ভক্তেরা চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। তন্মধ্যে অনেকগুলি বাহিরের লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। কোন কথা নাই।

মাস্টার কাছে বসিয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে নিভৃতে এক-একটি কথা হইতেছে। ঠাকুর জামা পরিবেন — মাস্টার জামা পরাইয়া দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — দেখো, এখন আর বড় ধ্যান-ট্যান করতে হয় না। অখণ্ড একবারে বোধ হয়ে যায়। এখন কেবল দর্শন।

মাস্টার চুপ করিয়া আছেন। ঘরও নিস্তব্ধ।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর তাহাকে আবার একটি কথা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, এরা যে সব একাসনে চুপ করে বসে আছে, আর আমায় দেখে — কথা নাই, গান নাই; এতে কি দেখে?

ঠাকুর কি ইঙ্গিত বরিতেছেন যে, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের শক্তি অবতীর্ণ — তাই এত লোকের আকর্ষণ, তাই ভক্তেরা অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকে!

মাস্টার উত্তর করিলেন — আজ্ঞে, এরা সব আপনার কথা অনেক আগে শুনেছে, আর দেখে — যা কখনও ওরা দেখতে পায় না — সদানন্দ বালকস্বভাব, নিরহংকার, ঈশ্বরের পেমে মাতোয়ারা! সেদিন ঈশান মুখুজ্জের বাড়ি আপনি গিছিলেন; সেই বাহিরের ঘরে পায়চারি কচ্ছিলেন; আমরাও ছিলাম, একজন আপনাকে এসে বললে, এমন 'সদানন্দ পুরুষ' কোথাও দেখি নাই।

মাস্টার আবার চুপ করিয়া রহিলেন। ঘর আবার নিস্তব্ধ! কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর আবার মৃদুস্বরে মাস্টারকে কি বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, ডাক্তারের কিরকম হচ্ছে? এখানকার কথা সব কি বেশ নিচ্ছে?

মাস্টার — এ অমোঘ বীজ কোথায় যাবে, একবার না একবার একদিক দিয়ে বেরোবে। সেদিনকার একটা কথায় হাসি পাচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি কথা?

মাস্টার — সেদিন বলেছিলেন, যদু মল্লিকের খাবার সময় কোন্ ব্যঞ্জনে নুন হয়েছে, কোন্ ব্যঞ্জনে হয়নি এ বুঝতে পারে না; এত অন্যমনস্ক! কেউ যদি বলে দেয় এ ব্যঞ্জনে নুন হয় নাই, তখন এ্যাঁ এ্যাঁ করে বলে, 'নুন হয় নাই?' ডাক্তারকে

এই কথাটি শোনাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন কিনা যে, আমি এত অন্যমনস্ক, হয়ে যাই। আপনি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যে, সে বিষয়চিন্তা করে অন্যমনস্ক ঈশ্বরচিন্তা করে নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ওগুলো কি ভাববে না?

মাস্টার — ভাববেন বইকি। তবে নানা কাজ, অনেককথা ভুলে যায়।
আজকেও বেশ বললেন, তিনি যখন বললেন, ‘ও তান্ত্রিকের উপাসনা। — জননী রমণী।’

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি কি বললুম?

মাস্টার — আপনি বললেন, হেলে গরুওয়ালা ভাগবত পণ্ডিতের কথা। (শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্য) আর বললেন, সেই রাজার কথা যে বলেছিল, ‘তুমি আগে বোঝ!’ (শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্য)

“আর বললেন, গীতার কথা। গীতার সার কথা কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ, — কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ। ডাক্তারকে আপনি বললেন যে সংসারী হয় (ত্যাগী না হয়ে) ও আবার কি শিক্ষা দেবে? তাতে তিনি বুঝতে বোধ হয় পারেন নাই। শেষে ‘ধারা’ ‘ধারা’ বলে চাপা দিয়ে গেলেন।”

ঠাকুর ভক্তের জন্য চিন্তা করিতেছেন; — পূর্ণ বালক ভক্ত, তাঁহার জন্য। মণীন্দ্রও বালক ভক্ত; ঠাকুর তাঁহাকে পূর্ণের সঙ্গে আলাপ করিতে পাঠাইলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ৩০শে অক্টোবর 1885/10/30/vi

52.39 শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্বপ্রসঙ্গে — ‘সব সম্ভবে’ নিত্যলীলা

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। কয়েকটি ভক্ত ও যাঁহারা ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা সেই ঘরে একটু দূরে বসিয়া আছেন। ঠাকুর অন্তর্মুখ — কথা কহিতেছেন না। ঘরের মধ্যে যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও ঈশ্বরকে চিন্তা করিতে করিতে মৌনাবলম্বন করিয়া আছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র একটি বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। নরেন্দ্র বলিলেন, ইনি আমার বন্ধু, ইনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ইনি ‘কিরণ্ময়ী’ লিখেন। ‘কিরণ্ময়ী’ লেখক প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে কথা কহিবেন।

নরেন্দ্র — ইনি রাধাকৃষ্ণের বিষয় লিখেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (লেখকের প্রতি) — কি লিখেছো গো, বল দেখি।

লেখক — রাধাকৃষ্ণই পরব্রহ্ম, ওঁকারের বিন্দুস্বরূপ। সেই রাধাকৃষ্ণ পরব্রহ্ম থেকে মহাবিষ্ণু, মহাবিষ্ণু থেকে পুরুষ-প্রকৃতি, — শিব-দুর্গা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বেশ! নিত্যরাধা নন্দ ঘোষ দেখেছিলেন। প্রেমরাধা বৃন্দাবনে লীলা করেছিলেন, কামরাধা চন্দ্রাবলী।

“কামরাধা, প্রেমরাধা। আরও এগিয়ে গেলে নিত্যরাধা। প্যাঁজ ছাড়িয়ে গেলে প্রথমে লাল খোসা, তারপরে ঈসৎ লাল, তারপরে সাদা, তারপরে আর খোসা পাওয়া যায় না। ওইটি নিত্যরাধার স্বরূপ — যেখানে নেতি নেতি বিচার বন্ধ হয়ে যায়!

“নিত্য রাধাকৃষ্ণ, আর লীলা রাধাকৃষ্ণ। যেমন সূর্য আর রশ্মি। নিত্য সূর্যের স্বরূপ, লীলা রশ্মির স্বরূপ।

“শুদ্ধভক্ত কখনও নিত্যে থাকে, কখন লীলায়।

“যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। দুই কিংবা বহু নয়।”

লেখক — আজ্ঞে, ‘বৃন্দাবনের কৃষ্ণ’ আর ‘মথুরার কৃষ্ণ’ বলে কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ও গোস্বামীদের মত। পশ্চিমে পণ্ডিতেরা তা বলে না। তাদের কৃষ্ণ এক, রাধা নাই। দ্বারিকার কৃষ্ণ ওইরকম।

লেখক — আজ্ঞে, রাধাকৃষ্ণই পরব্রহ্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বেশ! কিন্তু তাঁতে সব সম্ভবে! সেই তিনিই নিরাকার সাকার। তিনিই স্বরাট বিরাট! তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি!

“তাঁর ইতি নাই, — শেষ নাই; তাঁতে সব সম্ভবে। চিল-শকুনি যত উপরে উঠুক না কেন, আকাশ গায়ে ঠেকে না। যদি জিজ্ঞাসা কর ব্রহ্ম কেমন — তা বলা যায় না। সাক্ষাৎকার হলেও মুখে বলা যায় না। যদি জিজ্ঞাসা কেউ করে, কেমন ঘি? তার উত্তর, — কেমন ঘি, না যেমন ঘি। ব্রহ্মের উপমা ব্রহ্ম। আর কিছুই নাই।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ৩১শে অক্টোবর 1885/10/31/i

52.40 শ্যামপুকুর বাটীতে হরিবল্লভ নরেন্দ্র, মিশ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

শ্রীযুক্ত বলরামের জন্য চিন্তা — শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ বসু

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরের বাটীতে ভক্তসঙ্গে চিকিৎসার্থ বাস করিতেছেন। আজ শনিবার। আশ্বিন, কৃষ্ণা অষ্টমী তিথি, ১৬ই কার্তিক। ৩১শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। বেলা নয়টা।

এখানে ভক্তেরা দিবারাত্রি থাকেন — ঠাকুরের সেবার্থ! এখনও কেহ সংসার ত্যাগ করেন নাই।

বলরাম সপরিবারে ঠাকুরের সেবক। তিনি যে বংশে জন্মিয়াছেন, সে অতি ভক্তবংশ। পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, বৃন্দাবনে একাকী বাস করেন — তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের কুঞ্জে। তাঁহার পিতৃব্যপুত্র শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ বসু ও বাটীর অন্যান্য সকলেই বৈষ্ণব।

হরিবল্লভ কটকের প্রধান উকিল। পরমহংসদেবের কাছে বলরাম যাতায়াত করেন — বিশেষতঃ মেয়েদের লইয়া যান — শুনিয়া বিরক্ত হইয়াছেন। দেখা হইলে, বলরাম বলিয়াছিলেন, তুমি তাঁহাকে একবার দর্শন কর — তারপর যা হয় বলো!

আজ হরিবল্লভ আসিয়াছেন, তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিয়া অতি ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি করে ভাল হবে! — আপনি কি দেখছো, শক্ত ব্যামো?

হরিবল্লভ — আজ্ঞা, ডাক্তারেরস বলতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — মেয়েরা পায়ের ধুলা লয়। তা ভাবি একরূপে তিনিই (ঈশ্বর) ভিতরে আছেন — হিসাব আনি।

হরিবল্লভ — আপনি সাধু! আপনাকে সকলে প্রণাম করবে, তাতে দোষ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — সে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, কপিল, এরা কেউ হলে হত। আমি কি! আপনি আবার আসবেন।

হরি — আজ্ঞা, আমাদের টানেই আসব — আপনি বলছেন কেন।

হরিবল্লভ বিদায় লইবেন — প্রণাম করিতেছেন। পায়ের ধুলা লইতে যাইতেছেন — ঠাকুর পা সরাইয়া লইতেছেন। কিন্তু হরিবল্লভ ছাড়িলেন না — জোর করিয়া পায়ের ধুলা লইলেন।

হরিবল্লভ গাত্রোত্থান করিলেন। ঠাকুর যেন তাঁহাকে খাতির করিবার জন্য দাঁড়াইলেন। বলিতেছেন, "বলরাম অনেক দুঃখ করে। আমি মনে কল্লাম, একদিন যাই — গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করি। তা আবার ভয় হয়! পাছে তোমরা বল, একে কে আনলে!"

হরি — ও-সব কথা কে বলেছে। আপনি কিছু ভাববেন না।

হরিবল্লভ চলিয়া গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — ভক্তি আছে — তা না হলে জোর করে পায়ের ধুলা নিলে কেন?

"সেই যে তোমায় বলেছিলাম, ভাবে দেখলাম ডাক্তার ও আর-একজনকে, — এই সেই আর-একজন। তাই দেখ, এসেছে।"

মাস্টার — আজ্ঞে, ভক্তিরই ঘর।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি সরল!

ডাক্তার সরকারের কাছে ঠাকুরের অসুখের সংবাদ দিবার জন্য মাস্টার শাঁখারিটোলায় আসিয়াছেন। ডাক্তার আজ আবার ঠাকুরকে দেখিতে যাইবেন।

ডাক্তার ঠাকুরের ও মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তদের কথা বলিতেছেন।

ডাক্তার — কই, তিনি (মহিমাচরণ) সে বইতো আনেন নাই — যে বই আমাকে দেখাবেন বলেছিলেন! বললে, ভুল হয়েছে। তা হতে পারে — আমারও হয়।

মাস্টার — তাঁর বেশ পড়াশুনা আছে।

ডাক্তার — তাহলে এই দশা!

ঠাকুরের সম্বন্ধে ডাক্তার বলিতেছেন, “শুধু ভক্তি নিয়ে কি হবে — জ্ঞান যদি না থাকে।”

মাস্টার — কেন, ঠাকুর তো বলেন — জ্ঞানের পর ভক্তি। তবে তাঁর ‘জ্ঞান, ভক্তি’ আর আপনাদের ‘জ্ঞান, ভক্তি’র মানে অনেক তফাত।

“তিনি যখন বলেন — ‘জ্ঞানের পর ভক্তি’ তার মানে — তত্ত্বজ্ঞানের পর ভক্তি, ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তি — ভগবানকে জানার পর ভক্তি। আপনাদের জ্ঞান মানে সেন্স্ নলেজ্ (ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে পাওয়া জ্ঞান।) প্রথমটি not verifiable by our standard; তত্ত্বজ্ঞান ইন্দ্রিয়লভ্য জ্ঞানের দ্বারা ঠিক করা যায় না। দ্বিতিয়টি — verifiable (জড়জ্ঞান)।”

ডাক্তার চুপ করিয়া, আবার অবতার সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন।

ডাক্তার — অবতার আবার কি? আর পায়ের ধুলো লওয়া কি!

মাস্টার — কেন, আপনি তো বলেন একস্‌পেরিমেন্ট্‌ সময় তাঁর সৃষ্টি দেখে ভাব হয়, মানুষ দেখলে ভাব হয়। তা যদি হয়, ঈশ্বরকে কেন না মাথা নোয়াব? মানুষের হৃদয় মধ্যে ঈশ্বর আছেন।

“হিন্দুধর্মে দেখে সর্বভূতে নারায়ণ! এটা তত আপনার জানা নাই। সর্বভূতে যদি থাকেন তাঁকে প্রণাম করতে কি?

“পরমহংসদেব বলেন, কোনও কোনও জিনিসে তিনি বেশি প্রকাশ। সূর্যের প্রকাশ জলে, আরশিতে। জল সব জায়গায় আছে — কিন্তু নদীতে, পুষ্করিণীতে, বেশি প্রকাশ। ঈশ্বরকেই নমস্কার করা হয় — মানুষকে নয়। God is God — not, man is God.

“তাঁকে তো রীজ্‌নিং (সামান্য বিচার) করে জানা যায় না — সমস্ত বিশ্বাসের উপর নির্ভর। এই সব কথা ঠাকুর বলেন।”

আজ মাস্টারকে ডাক্তার তাঁহার রচিত একখানি বই উপহার দিলেন —

Physiological Basis of Psychology — 'as a token of brotherly regards'.

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ৩১শে অক্টোবর 1885/10/31/ii

52.41 শ্রীরামকৃষ্ণ ও Jesus Christ — তাঁহাতে খ্রীষ্টের আবির্ভাব

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা এগারটা। মিশ্র নামক একটি খ্রীষ্টান ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন। মিশ্রের বয়ঃক্রম ৩৫ বৎসর হইবে। মিশ্র খ্রীষ্টানবংশে জন্মিয়াছেন। যদিও সাহেবের পোশাক, ভিতরে গেরুয়া আছে। এখন সংসারত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার জন্মস্থান পশ্চিমাঞ্চলে। একটি ভ্রাতার বিবাহের দিনে তাঁহার এবং আর একটি ভ্রাতার একদিনে মৃত্যু হয়। সেই দিন হইতে মিশ্র সংসারত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কোয়েকার্ সম্প্রদায়ভুক্ত।

মিশ্র — 'ওহি রাম ঘট্ ঘটমে লেটা।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট নরেনকে আস্তে আস্তে বলিতেছেন — যাহাতে মিশ্রও শুনিতে পান — 'এক রাম তাঁর হাজার নাম।'

"খ্রীষ্টানরা যাঁকে God বলে, হিন্দুরা তাঁকেই রাম, কৃষ্ণ, ঈশ্বর — এই সব বলে। পুকুরে অনেকগুলি ঘাট। একঘাটে হিন্দুরা জল খাচ্ছে, বলছে জল; ঈশ্বর। খ্রীষ্টানেরা আর-একঘাটে খাচ্ছে, — বলছে, ওয়াটার; গড্ যীশু। মুসলমানেরা আর-একঘাটে খাচ্ছে — বলছে, পানি; আল্লা।"

মিশ্র — মেরির ছেলে Jesus নয়। Jesus স্বয়ং ঈশ্বর।

(ভক্তদের প্রতি) — “ইনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) এখন এই আছেন —— আবার এক সময়ে সাক্ষাৎ ঈশ্বর।

“আপনারা (ভক্তেরা) এঁকে চিনতে পাচ্ছেন না। আমি আগে থেকে এঁকে দেখেছি —— এখন সাক্ষাৎ দেখছি। দেখেছিলাম —— একটি বাগান, উনি উপরে আসনে বসে আছেন; মেঝের উপর আর-একজন বসে আছেন, — তিনি তত advanced (উন্নত নন।)

“এই দেশে চারজন দ্বারবান্ আছেন। বোম্বাই অঞ্চলে তুকারাম ও কাশ্মীরে রবার্ট মাইকেল; — এখানে ইনি; — আর পূর্বদেশে আর-একজন আছেন।”

শ্রীরামকৃষ্ণ —— তুমি কিছু দেখতে-টেকতে পাও?

মিশ্র —— আজ্ঞা, বাটীতে যখন ছিলাম তখন থেকে জ্যোতিঃদর্শন হত। তারপর যীশুকে দর্শন করেছি। সে-রূপ আর কি বলব! — সে সৌন্দর্যের কাছে কি স্ত্রীর সৌন্দর্য!

কিয়ৎক্ষণ পরে ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে মিশ্র জামা পেন্টলুন খুলিয়া ভিতরের গেরুয়ার কৌপীন দেখাইলেন।

ঠাকুর বারান্দা হইতে আসিয়া বলিতেছেন —— “বাহ্যে হল না —— এঁকে (মিশ্রকে) দেখলাম, বীরের ভঙ্গী করে দাঁড়িয়ে আছে।”

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইতেছেন। পশ্চিমাস্য হইয়া দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া মিশ্রকে দেখিতে দেখিতে হাসিতেছেন।

এখনও দাঁড়াইয়া। ভাবাবেশে মিশ্রকে শেক্ হ্যাণ্ড (হস্তধারণ) করিতেছেন ও হাসিতেছেন। হাত ধরিয়া বলিতেছেন, "তুমি যা চাইছ তা হয়ে যাবে।"

ঠাকুরের বুঝি যীশুর ভাব হইল! তিনি আর যীশু কি এক?

মিশ্র (করজোড়ে) — আমি সেদিন থেকে মন, প্রাণ, শরীর, — সব আপনাকে দিয়েছি!

[ঠাকুর ভাবাবেশে হাসিতেছেন]

ঠাকুর উপবেশন করিলেন। মিশ্র ভক্তদের কাছে তাঁহার পূর্বকথা সব বর্ণনা করিতেছেন। তাঁহার দুই ভাই বরের সভায় সামিয়ানা চাপা পড়িয়া, মানবলীলা সম্বরণ করিলেন, — তাহাও বলিলেন।

ঠাকুর মিশ্রকে যত্ন করিবার কথা ভক্তদের বলিয়া দিলেন।

[নরেন্দ্র, ডা: সরকার প্রভৃতি সঙ্গে কীর্তনানন্দে]

ডাক্তার সরকার আসিয়াছেন। ডাক্তারকে দেখিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ। কিঞ্চিৎ ভাব উপশমের পর ঠাকুর ভাবাবেশে বলিতেছেন — "কারণানন্দের পর সচ্চিদানন্দ। — কারণের কারণ!"

ডাক্তার বলিতেছেন, হাঁ!

শ্রীরামকৃষ্ণ — বেহুঁশ হই নাই।

ডাক্তার বুঝিয়াছেন যে, ঠাকুরের ঈশ্বরের আবেশ হইয়াছে। তাই বলিতেছেন — “না তুমি খুব হুঁশে আছ!”

ঠাকুর সহাস্যে বলিতেছেন —

গান - সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয়কালী বলে,
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে (মা)
জ্ঞান শুঁড়িতে চুয়ায় ভাঁটি, পান করে মোর মন মাতালে।
মূলমন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা,
প্রসাদ বলে এমন সুরা, খেলে চতুর্বর্গ মেলে।

গান শুনিয়া ডাক্তার ভাবাবিষ্টপ্রায় হইলেন। ঠাকুরেরও আবার ভাবাবেশ হইল। ভাবে ডাক্তারের কোলে চরণ বাড়াইয়া দিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভাব সম্বরণ হইল, — তখন চরণ গুটাইয়া লইয়া ডাক্তারকে বলিতেছেন — “উহ্! তুমি কি কথাই বলেছ! তাঁরই কোলে বসে আছি, তাঁকে ব্যারামের কথা বলব না তো কাকে বলব। — ডাকতে হয় তাঁকেই ডাকব!”

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

আবার ভাবাবিষ্ট। — ভাবে ডাক্তারকে বলিতেছেন — "তুমি খুব শুদ্ধ! তা না হলে পা রাখতে পারি না!" আবার বলিতেছেন। "শান্ত ওহি হ্যায় যো রাম-রস চাখে!

"বিষয় কি? — ওতে আছে কি? — টাকা-কড়ি, মান, শরীরের সুখ — এতে আছে, কি? রামকো যো চিনা নাই দিল্ চিনা হ্যায় সো কেয়া রে।"

এত অসুখের পর ঠাকুরের ভাবাবেশ হইতেছে দেখিয়া ভক্তেরা চিন্তিত হইয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, "ওই গানটি হলে আমি থামব; — হরিরস মদিরা।"

নরেন্দ্র কক্ষান্তরে ছিলেন, তাঁকে ডাকানো হইল। তিনি তাঁহার দেবদুর্লভ কণ্ঠে গান শুনাইতেছেন:

হরিরসমদিরা পিয়ে মম মানস মাতো রে।
(একবার) লুটায়ে অবনীতল হরিহরি বলি কাঁদো রে।
গভীর নিনতদে হরিনামে গগন ছাও রে
নাচো হরি বলে, দুবাহু তুলে, হরিনাম বিলাও রে।
হরিপ্রেমানন্দরসে অনিদিন ভাসো রে,
গাও হরিনাম হও পূর্ণকাম, নীচ বাসনা নাশো রে!

শ্রীরামকৃষ্ণ — আর সেইটি? 'চিদানন্দসিন্ধুনীরে?'

নরেন্দ্র গাইতেছেন:

(১) - চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী,

মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী মরি মরি।

মহাযোগে সব একাকার হইল, দেশকাল ব্যবধান সব ঘুচিল রে,

এখন আনন্দে মাতিয়া, দু বাহু তুলিয়া বল রে মন হরি হরি।

(২) - চিন্তয় মন মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন।

ডাক্তার একাগ্রমনে শুনিতেছেন। গান সমাপ্ত হইলে বলিতেছেন, ‘চিদানন্দসিন্ধুনীরে, ওইটি বেশ!’ ডাক্তারের আনন্দ দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন — “ছেলে বলেছিল, ‘বাবা, একটু (মদ) চেখে দেখ তারপর আমায় ছাড়তে বল তো ছাড়া যাবে।’ বাবা খেয়ে বললে, ‘তুমি বাছা ছাড় আপত্তি নাই কিন্তু আমি ছাড়ছি না।’ (ডাক্তার ও সকলের হাস্য)

“সেদিন মা দেখালে দুটি লোককে। ইনি তার ভিতর একজন। খুব জ্ঞান হবে দেখলাম, — কিন্তু শুষ্ক। (ডাক্তারকে, সহাস্যে) কিন্তু রোসবে।”

ডাক্তার চুপ করিয়া আছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ৬ই নভেম্বর 1885/11/06/i

52.42 ৺কালীপূজার দিবসে শ্যামপুকুর বাটীতে ভক্তসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরে বাটীর উপরের দক্ষিণের ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন। বেলা ৯টা। ঠাকুরের পরিধানে শুদ্ধবস্ত্র এবং কপালে চন্দনের ফোঁটা।

মাস্টার ঠাকুরের আদেশে ৺সিদ্ধেশ্বরী কালীর প্রসাদ আনিয়াছেন; প্রসাদ হস্তে ঠাকুর অতি ভক্তিভাবে দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎ মস্তকে ধারণ করিতেছেন। গ্রহণ করিবার সময় পাদুকা খুলিয়াছেন। মাস্টারকে বলিতেছেন, “বেশ প্রসাদ।”

আজ শুক্রবার (২২শে কার্তিক, ১২৯২); আশ্বিন অমাবস্যা, ৬ই নভেম্বর, ১৮৮৫। আজ ৺কালীপূজা।

ঠাকুর মাস্টারকে আদেশ করিয়াছিলেন ঠনঠনের ৺সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতাকে পুষ্প, ডাব, চিনি, সন্দেশ দিয়ে আজ সকালে পূজা দিবে। মাস্টার স্নান করিয়া নগ্নপদে সকালে পূজা দিয়া আবার নগ্নপদে ঠাকুরের কাছে প্রসাদ আনিয়াছেন।

ঠাকুরের আর একটি আদেশ — ‘রামপ্রসাদের ও কমলাকান্তের গানের বই কিনিয়া আনিবে।’ ডাক্তার সরকারকে দিতে হইবে।

মাস্টার বলিতেছেন, “এই বই আনিয়াছি। রামপ্রসাদ আর কমলাকান্তের গানের বই।” শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, “এই গান সব (ডাক্তারের ভিতর) ঢুকিয়ে দেবে।”

গান - মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে ।।

গান - কে জানে কালী কেমন। ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন।

গান - মন রে কৃষি কাজ জান না।

এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা ।।

গান - আয় মন বেড়াতে যাবি।

কালী কল্পতরু মূলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে পাবি ।।

মাস্টার বলিলেন, আজ্ঞা হাঁ। ঠাকুর মাস্টারের সহিত ঘরে পায়চারি করিতেছেন —— চটিজুতা পায়ে। অত অসুখ —— সহাস্যবদন।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— আর ও গানটাও বেশ! — ‘এ সংসার ধোঁকার টাটি’। আর ‘এ সংসার মজার কুটি! ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি।’

মাস্টার —— আজ্ঞা হাঁ।

ঠাকুর হঠাৎ চমকিত হইতেছেন। অমনি পাদুকা ত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন। একেবারে সমাধিস্থ। আজ জগন্মাতার পূজা, তাই কি মুহুর্মুহুঃ চমকিত এবং সমাধিস্থ! অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া যেন অতি কষ্টে ভাব সম্বরণ করিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ত্রয়শ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ৬ই নভেম্বর 1885/11/06/ii

52.43 কালীপূজার দিবসে ভক্তসঙ্গে

ঠাকুর সেই উপরের ঘরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন; বেলা ১০টা। বিছানার উপর বালিশে ঠেসান দিয়া আছেন, ভক্তেরা চতুর্দিকে বসিয়া। রাম, রাখাল, নিরঞ্জন, কালীপদ, মাস্টার প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত আছেন। ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয় মুখুজ্জের কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাম প্রভৃতিকে) — হৃদে এখনও জমি জমি করছে। যখন দক্ষিণেশ্বরে তখন বলেছিল, শাল দাও, না হলে নালিশ করব।

“মা তাকে সরিয়ে দিলেন। লোকজন গেলে কেবল টাকা টাকা করত। সে যদি থাকত এ-সব লোক যেত না। মা সরিয়ে দিলেন।

“গো —— অমনি আরম্ভ করেছিল। খুঁতখুঁত করত। গাড়িতে আমার সঙ্গে যাবে তা দেরি করত। অন্য ছোকরারা আমার কাছে এলে বিরক্ত হত। তাদের যদি আমি কলকাতায় দেখতে যেতাম —— আমায় বলত, ওরা কি সংসার ছেড়ে আসবে তাই দেখতে যাবেন! জল-খাবার ছোকরাদের দেওয়া আগে ভয়ে বলতুম, তুই খা আর ওদের দে। জানতে পারলুম ও থাকবে না।

“তখন মাকে বললাম —— মা ওকে হৃদের মতো একেবারে সরাস নে। তারপর শুনলাম বৃন্দাবনে যাবে।

"গো —— যদি থাকত এই-সব ছোকরাদের হত না। ও বৃন্দাবনে চলে গেল তাই এই-সব ছোকরারা আসতে যেতে লাগল।"

গো (বিনীতভাবে) — আজ্ঞে, আমার তা মনে ছিল না।

রাম (দত্ত) — তোমার মন উনি যা বুঝবেন তা তুমি বুঝবে?

(গো) — চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গো প্রতি) তুই কেন অমন করছিস —— আমি তোকে সন্তান অপেক্ষা ভালবাসি!

"তুই চুপ কর না ...... এখন তোর সে ভাব নাই।"

ভক্তদের সহিত কথাবার্তার পর তাঁহারা কক্ষান্তরে চলিয়া গেলে ঠাকুর গো - কে ডাকাইলেন ও বলিলেন, তুই কি কিছু মনে করেছিস।

গো —— আজ্ঞে না।

ঠাকুর মাস্টারকে বলিলেন, আজ কালীপূজা, কিছু পূজার আয়োজন করা ভাল। ওদের একবার বলে এস। পাঁকাটি এনেছে কিনা জিজ্ঞাসা করো দেখি।

মাস্টার বৈঠকখানায় গিয়া ভক্তদের সমস্ত জানাইলেন। কালীপদ ও অন্যান্য ভক্তেরা পূজার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

বেলা আন্দাজ ২টার সময় ডাক্তার ঠাকুরকে দেখিতে আসিলেন। সঙ্গে অধ্যাপক নীলমণি। ঠাকুরের কাছে অনেকগুলি ভক্ত বসিয়া আছেন। গিরিশ, কালীপদ, নিরঞ্জন, রাখাল, খোকা (মণীন্দ্র), লাটু, মাস্টার অনেকে। ঠাকুর সহাস্যবদন, ডাক্তারের সঙ্গে অসুখের কথা ও ঔষধাদির কথা একটু হইলে পর বলিতেছেন, "তোমার জন্য এই বই এসেছে।" ডাক্তারের হাতে মাস্টার সেই দুখানি বই দিলেন।

ডাক্তার গান শুনিতে চাইলেন। ঠাকুরের আদেশক্রমে মাস্টার ও একটি ভক্ত রামপ্রসাদের গান গাইতেছেন:

গান - মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।

গান - কে জানে কালী কেমন ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন।

গান - মন রে কৃষি কাজ জান না।

গান - আয় মন বেড়াতে যাবি।

ডাক্তার গিরিশকে বলিতেছেন, "তোমার ওই গানটি বেশ — বীণের গান — বুদ্ধ চরিতের।" ঠাকুরের ইঙ্গিতে গিরিশ ও কালীপদ দুইজনে মিলিয়া গান শুনাইতেছেন:

আমার এই সাধের বীণে, যত্নে গাঁথা তারের হার।
যে যত্ন জানে বাজায় বিণে উঠে সুধা অনিবার ।।
তানে মানে বাঁধলে ডুরি, শত ধারে বয় মাধুরী।

বাজে না আলগা তারে, টানে ছিঁড়ে কোমল তার ।।

গান - জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই,

কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।

ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,

কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই ।।

কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন,

জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন।

এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর,

অধীর-অধীর যেমতি সমীর, অবিরাম গতি নিয়ত ধাই ।।

জানি না কেবা, এসেছি কোথায়,

কেন বা এসেছি, কোথা নিয়ে যায়,

যাই ভেসে ভেসে কত কত দেশে,

চারিদিকে গোল ওঠে নানা রোল।

কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়,

এই আছে আর তখনি নাই ।।

কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল,

কে জানে কেমন কি খেলা হল।

প্রবাহের বারি, রহিতে কি পারি,

যাই যাই কোথা কূল কি নাই?

কর হে চেতন, কে আছ চেতন,

কতদিনে আর ভাঙিবে স্বপন?

কে আছ চেতন ঘুমাইও না আর,

দারুণ এ-ঘোর নিবিড় আঁধার।

কর তমঃ নাশ, হও হে প্রকাশ,

তোমা বিনা আর নাহিক উপায়,

তব পদে তাই শরণ চাই ।।

গান - আমায় ধর নিতাই

আমার প্রাণ যেন আক করে রে কেমন ।।

নিতাই, জীবকে হরি নাম বিলাতে,

উঠল গো ঢেউ প্রেম-নদীতে,

(এখন) সেই তরঙ্গে এখন আমি ভাসিয়ে যাই।

নিতাই যে দুঃখ আমার অন্তরে, দুঃখের কথা কইব কারে,

জীবের দুঃখে এখন আমি ভাসিয়ে যাই।

গান - প্রাণভরে আয় হরি বলি, নেচে আয় জগাই মাধাই।

গান - কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জুয়ারে বয়ে যায়।

বহিছে রে প্রেম শতধারে, যে যত চায় তত পায় ।।

প্রেমের কিশোরী প্রেম বিলায় সাধ করি,

রাধার প্রেমে বল রে হরি।

প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেম তরঙ্গে প্রাণ নাচায়,

রাধার প্রেমে হরি বলে, আয় আয় আয় আয় ।।

গান শুনিতে শুনিতে দুই-তিনটি ভক্তের ভাব হইয়া গেল, — খোকার (মণীন্দ্রের), লাটুর! লাটু নিরঞ্জনের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। গান হইয়া গেলে ঠাকুরের সহিত ডাক্তার আবার কথা কহিতেছেন। গতকল্য প্রতাপ (মজুমদার) ঠাকুরকে ‘নাক্‌স্‌ ভমিকা’ ঔষধ দিয়াছিলেন। ডাক্তার সরকার শুনিয়া বিরক্ত হইয়াছেন।

ডাক্তার —— আমি তো মরি নাই, নাক্‌স্‌ ভমিকা দেওয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তোমার অবিদ্যা মরুক!

ডাক্তার —— আমার কোনকালে অবিদ্যা নাই।

ডাক্তার অবিদ্যা মানে নষ্টা স্ত্রীলোক বুঝিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — না গো! সন্ন্যাসীর অবিদ্যা মরে যায় আর বিবেক সন্তান হয়। অবিদ্যা মা মরে গেলে অশৌচ হয়, — তাই বলে সন্ন্যাসীকে ছুঁতে নাই।

হরিবল্লভ আসিয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, “তোমায় দেখলে আনন্দ হয়।” হরিবল্লভ অতি বিনীত। মাদুরের নিচে মাটির উপর বসিয়া ঠাকুরকে পাখা করিতেছেন। হরিবল্লভ কটকের বড় উকিল।

কাছে অধ্যাপক নীলমণি বসিয়া আছেন। ঠাকুর তাঁহার মান রাখিতেছেন ও বলিতেছেন, আজ আমার খুব দিন। কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার ও তাঁহার বন্ধু নীলমণি বিদায় গ্রহণ করিলেন। হরিবল্লভও আসিলেন। আসিবার সময় বলিলেন, আমি আবার আসব।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ৬ই নভেম্বর 1885/11/06/iii

52.44 জগন্মাতা ৺কালীপূজা

শরৎকাল, অমাবস্যা, রাত্রি ৭টা। সেই উপরের ঘরেই পূজার সমস্ত আয়োজন হইয়াছে। নানাবিধ পুষ্প, চন্দন, বিল্বপত্র, জবা; পায়স ও নানাবিধ মিষ্টান্ন ঠাকুরের সম্মুখে ভক্তেরা আনিয়াছেন। ঠাকুর বসিয়া আছেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন। শরৎ, শশী, রাম, গিরিশ, চুনিলাল, মাস্টার, রাখাল, নিরঞ্জন, ছোট নরেন, বিহারী প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত।

ঠাকুর বলিতেছেন, “ধুনা আন”। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর জগন্মাতাকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। মাস্টার কাছে বসিয়া আছেন। মাস্টারের দিকে তাকাইয়া ঠাকুর বলিতেছেন, “একটু সবাই ধ্যান করো”। ভক্তেরা সকলে একটু ধ্যান করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে গিরিশ ঠাকুরের পাদপদ্মে মালা দিলেন। মাস্টারও গন্ধপুষ্প দিলেন। তারপরেই রাখাল। তারপর রাম প্রভৃতি সকল ভক্তেরা চরণে ফুল দিতে লাগিলেন।

নিরঞ্জন পায়ে ফুল দিয়া ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মময়ী বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া, পায়ে মাথা দিয়া প্রণাম করিতেছেন। ভক্তেরা সকলে ‘জয় মা! জয় মা!’ ধ্বনি করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়াছেন। কি আশ্চর্য! ভক্তেরা অদ্ভুত রূপান্তর দেখিতেছেন। ঠাকুরের জ্যোতির্ময় বদনমণ্ডল! দুই হস্তে বরাভয়! ঠাকুর নিস্পন্দ বাহ্যশূন্য! উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। সাক্ষাৎ জগন্মাতা কি ঠাকুরের ভিতর আবির্ভূর্তা হইলেন!

সকলে অবাক্ হইয়া এই অদ্ভুত বরাভয়দায়িনী জগন্মাতার মূর্তি দর্শন করিতেছেন।

এইবারে ভক্তেরা স্তব করিতেছেন। আর একজন গান গাহিয়া স্তব করিতেছেন ও সকলে যোগদান করিয়া সমস্বরে গাইতেছেন।

গিরিশ স্তব করিতেছেন:

কে রে নিবিড় নীল কাদম্বিনী সুরসমাজে।
কে রে রক্তোৎপল চরণ যুগল হর উরসে বিরাজে ।।
কে রে রজনীকর নখরে বাস, দিনকর কত পদে প্রকাশ।
মৃদু মৃদু হাস ভাস, ঘন ঘন ঘন গরজে ॥

আবার গাইতেছেন:

দীনতারিণী, দূরিতহারিনী, সত্ত্বরজস্তম ত্রিগুণধারিণী,
সৃজন-পালন-নিধনকারিণী, সগুণা নির্গুণা সর্বস্বরূপিণী।

ত্বংহি কালী তারা পরমাপ্রকৃতি, ত্বংহি ব্যোম ব্যোমকেশ প্রসবিনী।

ত্বংহি স্থল জল অনিল অনল, ত্বংহি ব্যোম ব্যোমকেশ প্রসবিনী।

সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসক ন্যায়, তন্ন তন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধ্যায়,

বৈশেষিক বেদান্তে ভ্রমে হয়ে ভ্রান্ত, তথাপি অদ্যাপি জানিতে পারেনি ।।

নিরুপাধি আদি অন্তরহিত, করিতে সাধক জনার হিত,

গণেশাদি পঞ্চরূপে কালবঞ্চ ভবভয়হরা ত্রিকালবর্তিনী।

সাকার সাধকে তুমি সে সাকার, নিরাকার উপাসকে নিরাকার,

কেহ কেহ কয় ব্রহ্ম জ্যোতির্ময়, সেও তুমি নগতনয়া জননী।

যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়, সে অবধি সে পরব্রহ্ম কয়,

তৎপরে তুরীয় অনির্বচনীয়, সকলি মা তারা ত্রিলোকব্যাপিনী।

বিহারী স্তব করিতেছেন:

মনেরি বাসনা শ্যামা শবাসনা শোন মা বলি,

হৃদয় মাঝে উদয় হইও মা, যখন হবে অন্তর্জলি।

তখন আমি মনে মনে, তুলব জবা বনে বনে,

মিশাইয়ে ভক্তি চন্দন মা, পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি।

মণি গাহিতেছেন ভক্তসঙ্গে:

সকলি তোমারি ইচ্ছা মা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,

তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।

পঙ্কে বদ্ধ কর করী পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,

কারে দাও মা ইন্দ্রত্বপদ কারে কর অধোগামী।

আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী,

আমি রথ তুমি রথী যেমন চালাও তেমনি চলি।

গান - তোমারি করুণায় মা সকলি হইতে পারে।

অলঙ্ঘ্য পর্বত সম বিঘ্ন বাধা যায় দূরে ।।

তুমি মঙ্গল নিধান, করিছ মঙ্গল বিধান।

তবে কেন বৃথা মরি ফলাফল চিন্তা করে ।।

গান - গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ করো না।

গান - নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। আদেশ করিতেছেন, এই গানটি গাইতে —

গান - কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধাতরঙ্গিণী।

গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুর আবার আদেশ করিতেছেন —

গান - শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা।

ঠাকুর ভক্তবৃন্দের আনন্দের জন্য একটু পায়স মুখে দিতেছেন। কিন্তু একেবারে ভাবে বিভোর, বাহ্যশূন্য হইলেন!

কিয়ৎক্ষণ পরে ভক্তেরা সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া প্রসাদ লইয়া বৈঠকখানা ঘরে গেলেন ও সকলে মিলিয়া আনন্দ করিতে করিতে সেই প্রসাদ পাইলেন। রাত ৯টা। ঠাকুর বলিয়া পাঠাইলেন — রাত হইয়াছে, সুরেন্দ্রের বাড়িতে আজ ৺কালীপূজা হবে, তোমরা সকলে নিমন্ত্রণে যাও।

ভক্তেরা আনন্দ করিতে করিতে সিমলা স্ট্রীটে সুরেন্দ্রের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সুরেন্দ্র অতি যত্নসহকারে তাঁহাদিগকে উপরের বৈঠকখানা ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। বাটীতে উৎসব। সকলেই গীতবাদ্য ইত্যাদি লইয়া আনন্দ করিতেছেন।

সুরেন্দ্রের বাটীতে প্রসাদ পাইয়া বাড়িতে ফিরিতে ভক্তদের প্রায় দুই প্রহরের অধিক রাত্রি হইয়াছিল।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c53 ৫৩ কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৩শে ডিসেম্বর 1885/12/23/i

53.1 কাশীপুর উদ্যানে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে

কৃপাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ — মাস্টার, নিরঞ্জন, ভবনাথ

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে কাশীপুরে বাস করিতেছেন। এত অসুখ — কিন্তু এক চিন্তা — কিসে ভক্তদের মঙ্গল হয়। নিশিদিন কোন না কোন ভক্তের বিষয় চিন্তা করিতেছেন।

শুক্রবার, ১১ই ডিসেম্বর, ২৭শে অগ্রহায়ণ, শুক্লা পঞ্চমীতে শ্যামপুকুর হইতে ঠাকুর কাশীপুরের বাগানে আইসেন। আজ বারো দিন হইল। ছোকরা ভক্তেরা ক্রমে কাশীপুরে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন — ঠাকুরের সেবার জন্য। এখনও বাটী অনেকে যাতায়াত করেন। গৃহী ভক্তেরা প্রায় প্রত্যহ দেখিয়া যান — মধ্যে মধ্যে রাত্রেও থাকেন।

ভক্তেরা প্রায় সকলেই জুটিয়াছেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভক্ত সমাগম হইতেছে। শেষের ভক্তেরা সকলেই আসিয়া পড়িয়াছেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি শশী ও শরৎ ঠাকুরকে দর্শন করেন, কলেজের পরীক্ষাদির পর, ১৮৮৫-র মাঝামাঝি হইতে তাঁহারা সর্বদা যাতায়াত করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্টার থিয়েটারে শ্রীযুক্ত গিরিশ (ঘোষ) ঠাকুরকে দর্শন করেন। তিনমাস পরে অর্থাৎ ডিসেম্বরের প্রারম্ভ হইতে তিনি সর্বদা যাতায়াত করেন। ১৮৮৪, ডিসেম্বরের শেষে সারদা ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে দর্শন করেন। সুবোধ ও ক্ষীরোদ ১৮৮৫-র অগস্ট মাসে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন।

আজ সকালে প্রেমের ছড়াছড়ি। নিরঞ্জনকে বলছেন, “তুই আমার বাপ, তোর কোলে বসব।” কালীপদর বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন, “চৈতন্য হও!” আর চিবুক ধরিয়া তাহাকে আদর করিতেছেন; আর বলিতেছেন, “যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডেকেছে বা সন্ধ্যা-আহ্নিক করেছে, তার এখানে আসতেই হবে।” আজ সকালে দুইটি ভক্ত স্ত্রীলোকের উপরও কৃপা করিয়াছেন। সমাধিস্থ হইয়া তাহাদের বক্ষে চরণ দ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন। তাঁহারা অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন; একজন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “আপনার এত দয়া!” প্রেমের ছড়াছড়ি! সিঁথির গোপালকে কৃপা করিবেন বলিয়া বলিতেছেন, “গোপালকে ডেকে আন।”

আজ বুধবার, ৯ই পৌষ, অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৮৫। সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুর জগন্মাতার চিন্তা করিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর অতি মৃদুস্বরে দু-একটি ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন। ঘরে কালী, চুনিলাল, মাস্টার, নবগোপাল, শশী, নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তেরা আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — একটি টুল কিনে আনবে — এখানকার জন্য। কত নেবে?

মাস্টার — আজ্ঞা, দু-তিন টাকার মধ্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — জলপিড়ি যদি বার আনা, ওর দাম অত হবে কেন?

মাস্টার — বেশি হবে না, — ওরই মধ্যে হয়ে যাবে!

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, কাল আবার বৃহস্পতিবারের বারবেলা, — তুমি তিনটের আগে আসতে পারবে না?

মাস্টার — যে আজ্ঞা, আসব।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার? অসুখের গুহ্য উদ্দেশ্য]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — আচ্ছা, এ-অসুখটা কদ্দিনে সারবে?

মাস্টার — একটু বেশি হয়েছে — দিন নেবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কত দিন?

মাস্টার — পাঁচ-ছ’ মাস হতে পারে।

এই কথায় ঠাকুর বালকের ন্যায় অধৈর্য হইলেন। আর বলিতেছেন — “বল কি?”

মাস্টার — আজ্ঞা, সব সারতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাই বল। — আচ্ছা, এত ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন, ভাব, সমাধি! — তবে এমন ব্যামো কেন?

মাস্টার — আজ্ঞা, খুব কষ্ট হচ্ছে বটে; কিন্তু উদ্দেশ্য আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি উদ্দেশ্য?

মাস্টার — আপনার অবস্থা পরিবর্তন হবে — নিরাকারের দিকে ঝোঁক হচ্ছে। — 'বিদ্যার আমি' পর্যন্ত থাকছে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, লোকশিক্ষা বন্ধ হচ্ছে — আর বলতে পারি না। সব রামময় দেকছি। — এক-একবার মনে হয়, কাকে আর বলব! দেখো না, — এই বাড়ি-ভাড়া হয়েছে বলে কত রকম ভক্ত আসছে।

"কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বা শশধরের মতো সাইন্‌বোর্ড তো হবে না, — অমুক সময় লেকচার হইবে!" (ঠাকুরের ও মাস্টারের হাস্য)

মাস্টার — আর একটি উদ্দেশ্য, লোক বাছা। পাঁচ বছরের তপস্যা করে যা না হত, এই কয়দিনে ভক্তদের তা হয়েছে। সাধনা, প্রেম, ভক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, তা হল বটে! এই নিরঞ্জন বাড়ি গিছলো। (নিরঞ্জনের প্রতি) তুই বল দেখি, কিরকম বোধ হয়?

নিরঞ্জন — আজ্ঞে, আগে ভালবাসা ছিল বটে, — কিন্তু এখন ছেড়ে থাকতে পারবার জো নাই।

মাস্টার — আমি একদিন দেখেছিলাম, এরা কত বড়লোক!

শ্রীরামকৃষ্ণ — কোথায়?

মাস্টার — আজ্ঞা, একপাশে দাঁড়িয়ে শ্যামপুকুরের বাড়িতে দেখেছিলাম। বোধ হল, এরা এক-একজন কত বিঘ্ন-বাধা ঠেলে ওখানে এসে বসে রয়েছে — সেবার জন্য।

[সমাধিমন্দিরে — আশ্চর্য অবস্থা — নিরাকার — অন্তরঙ্গ নির্বাচন]

এই কথা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সমাধিস্থ!

ভাবের উপশম হইলে মাস্টারকে বলিতেছেন — "দেখলাম, সাকার থেকে সব নিরাকারে যাচ্ছে! আর কথা বলতে ইচ্ছা যাচ্ছে কিন্তু পারছি না।

"আচ্ছা, ওই নিরাকারে ঝোঁক, — ওটা কেবল লয় হবার জন্য; না?"

মাস্টার (অবাক্ হইয়া) — আজ্ঞা, তাই হবে!

শ্রীরামকৃষ্ণ — এখনও দেখছি নিরাকার অখণ্ডসচ্চিদানন্দ এইরকম করে রয়েছে। ...... কিন্তু চাপলাম খুব কষ্টে।

"লোক বাছা যা বলছ তা ঠিক। এই অসুখ হওয়াতে কে অন্তরঙ্গ, কে বহিরঙ্গ, বোঝা যাচ্ছে। যারা সংসার ছেড়ে এখানে আছে, তারা অন্তরঙ্গ। আর যারা একবার এসে 'কেমন আছেন মশাই', জিজ্ঞাসা করে, তারা বহিরঙ্গ।

“ভবনাথকে দেখলে না? শ্যামপুকুরে বরটি সেজে এলো। জিজ্ঞাসা করলে ‘কেমন আছেন?’ তারপর আর দেখা নাই। নরেন্দ্রের খাতিরে ওইরকম তাকে করি, কিন্তু মন নাই।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ২৩শে ডিসেম্বর 1885/12/23/ii

53.2 শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত —— শ্রীরামকৃষ্ণ কে? মুক্তকণ্ঠ

আহুস্ত্বাম্‌ ঋষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদাস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ।।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — তিনি ভক্তের জন্যে দেহধারণ করে যখন আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরাও আসে। কেউ অন্তরঙ্গ, কেউ বহিরঙ্গ। কেউ রসদ্দার।

“দশ-এগারো বছরের সময় দেশে বিশালাক্ষী দেখতে গিয়ে মাঠে অবস্থা হয়। কি দেখলাম! — একেবারে বাহ্যশূন্য!

“যখন বাইশ-তেইশ বছর বয়স১ কালীঘরে (দক্ষিণেশ্বরে) বললে, তুই কি অক্ষর হতে চাস?’ — অক্ষর মানে জানি না! জিজ্ঞাসা করলাম — হলধারী বললে, ‘ক্ষর মানে জীব, অক্ষর মানে পরমাত্মা’।

“যখন আরতি হত, কুঠির উপর থেকে চিৎকার করতাম, ‘ওরে কে কোথায় ভক্ত আছিস আয়! ঐহিক লোকদের সঙ্গে আমার প্রাণ যায়!’ ইংলিশম্যানকে (ইংরাজী পড়া লোককে) বললাম। তারা বলে, ‘ও-সব মনের ভুল!’ তখন ‘তাই হবে’ বলে শান্ত হলাম। কিন্তু এখন তো সেই সব মিলছে! — সব ভক্ত এসে জুটছে!

“আবার দেখালে পাঁচজন সেবায়েত। প্রথম, সেজোবাবু (মথুরবাবু) তারপর শম্ভু মল্লিক, — তাকে আগে কখন দেখি নাই। ভাবে দেখলাম, — গৌরবর্ণ পুরুষ, মাথায় তাজ। যখন অনেকদিন পরে শম্ভুকে দেখলাম, তখন মনে পড়ল, — একেই আগে ভাবাবস্থায় দেখেছি! আর তিনজন সেবায়েত এখনও ঠিক হয় নাই। কিন্তু সব গৌরবর্ণ। সুরেন্দ্র অনেকটা রসদ্দার বলে বোধ হয়।

“এই অবস্থা যখন হল ঠিক আমার মতো একজন এসে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ী সব ঝেড়ে দিয়ে গেল। ষড়চক্রের এক-একটি পদ্মে জিহ্বা দিয়ে রমণ করে, আর অধোমুখ পদ্ম ঊর্ধ্বমুখ হয়ে উঠে। শেষে সহস্রার পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে গেল।

“যখন যেরূপ লোক আসবে, আগে দেখিয়ে দিত! এই চক্ষে — ভাবে নয় — দেখলাম, চৈতন্যদেবের সংকীর্তন বটতলা থেকে বকুলতলার দিকে যাচ্ছে। তাতে বলরামকে দেখলাম, আর যেন তোমায় দেখলাম। চুনিকে আর তোমাকে

আনাগোনায় উদ্দীপন হয়েছে। শশী আর শরৎকে দেখেছিলাম, ঋষি কৃষ্ণের (ক্রাইস্ট্) দলে ছিল।

“বটতলায় একটি ছেলে দেখেছিলাম। হৃদে বললে, তবে তোমার একটি ছেলে হবে। আমি বললাম, ‘আমার যে মাতৃযোনী! আমার ছেলে কেমন করে হবে?’ সেই ছেলে রাখাল।

“বললাম, মা, এরকম অবস্থা যদি করলে, তাহলে একজন বড়মানুষ জুটিয়ে দাও। তাই সেজোবাবু চৌদ্দ বছর২ ধরে সেবা কল্লে। সে কত কি! — আলাদা ভাঁড়ার করে দিলে —— সাধুসেবার জন্য —— গাড়ি, পালকি —— যাকে যা দিতে বলেছি, তাকে তা দেওয়া। বামনী খতাতো —— প্রতাপ রুদ্র।

“বিজয় এই রূপ (অর্থাৎ ঠাকুরের মূর্তি) দর্শন করেছে। একি বলো দেখি? বলে, তোমায় যেমন ছোঁয়া, ওইরূপ ছুঁয়েছি।

“নোটো (লাটু) খতালে একত্রিশজন ভক্ত। কই তেমন বেশি কই! — তবে কেদার আর বিজয় কতকগুলো কচ্ছে!

“ভাবে দেখালে, শেষে পায়েস খেয়ে থাকতে হবে!

“এ অসুখে পরিবার (ভক্তদের শ্রীশ্রীমা) পায়েস খাইয়ে দিচ্ছিল, তখন কাঁদলাম এই বলে, — এই কি পায়েস খাওয়া! এই কষ্টে!”

১ যখন ২২/২৩ বয়স অর্থাৎ ১৮৫৮/৫৯ খ্রী:, তখন প্রথম এই অবস্থা

২ মথুরের চৌদ্দ বৎসর সেবা। ১৮৫৮ হইতে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ। মথুরের মৃত্যু — ১লা শ্রাবণ, ১২৭৮; ১৮ই জুলাই, ১৮৭১।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৬, ৪ঠা জানুয়ারি 1886/01/04/i

53.3 কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে

ঈশ্বরের জন্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের ব্যাকুলতা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে উপরের সেই পূর্বপরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। দক্ষিণেশ্বর-কালীমন্দির হইতে শ্রীযুক্ত রাম চাটুজ্যে তাঁহার কুশল সংবাদ লইতে আসিয়াছিলেন। ঠাকুর মণির সহিত সেই সকল কথা কহিতেছেন — বলিতেছেন — ওখানে (দক্ষিণেশ্বরে) কি এখন বড় ঠাণ্ডা?

আজ ২১শে পৌষ, কৃষ্ণা চতুর্দশী, সোমবার, ৪ঠা জানুয়ারি, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। অপরাহ্ন — বেলা ৪টা বাজিয়া গিয়াছে।

নরেন্দ্র আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে মাঝে মাঝে দেখিতেছেন ও তাঁহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিতেছেন, — যেন তাঁহার স্নেহ উথলিয়া পড়িতেছে। মণিকে

সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন, “কেঁদেছিল!” ঠাকুর কিঞ্চিৎ চুপ করিলেন। আবার মণিকে সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন, “কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি থেকে এসেছিল!”

সকলে চুপ করিয়া আছেন। এইবার নরেন্দ্র কথা কহিতেছেন —

নরেন্দ্র — ওখানে আজ যাব মনে করেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কোথায়?

নরেন্দ্র — দক্ষিণেশ্বরে — বেলতলায় — ওখানে রাত্রে ধুনি জ্বালাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ — না; ওরা (ম্যাগাজিনের কর্তৃপক্ষীয়েরা) দেবে না। পঞ্চবটী বেশ জায়গা, — অনেক সাধু ধ্যান-জপ করেছে!

“কিন্তু বড় শীত আর অন্ধকার।”

সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি, সহাস্যে) — পড়বি না?

নরেন্দ্র (ঠাকুর ও মণির দিকে চাহিয়া) — ঔষধ পেলে বাঁচি, যাতে পড়া-টড়া যা হয়েছে সব ভুলে যাই!

শ্রীযুক্ত (বুড়ো) গোপাল বসিয়া আছেন। তিনি বলিতেছেন — আমিও ওই সঙ্গে যাব। শ্রীযুক্ত কালীপদ (ঘোষ) ঠাকুরের জন্য আঙ্গুর আনিয়াছিলেন। আঙ্গুরের বাক্স ঠাকুরের পার্শ্বে ছিল। ঠাকুর ভক্তদের আঙ্গুর বিতরণ করিতেছেন।

প্রথমেই নরেন্দ্রকে দিলেন — তাহার পর হরিরলুঠের মতো ছড়াইয়া দিলেন, ভক্তেরা যে যেমন পাইলেন কুড়াইয়া লইলেন!

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৬, ৪ঠা জানুয়ারি 1886/01/04/ii

53.4 ঈশ্বরের জন্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের ব্যাকুলতা ও তীব্র বৈরাগ্য

সন্ধ্যা হইয়াছে, নরেন্দ্র নিচে বসিয়া তামাক খাইতেছেন ও নিভৃতে মণির কাছে নিজের প্রাণ কিরূপ ব্যাকুল গল্প করিতেছেন।

নরেন্দ্র (মণির প্রতি) — গত শনিবার এখানে ধ্যান করছিলাম। হঠাৎ বুকের ভিতর কিরকম করে এল!

মণি — কুণ্ডলিনী জাগরণ।

নরেন্দ্র — তাই হবে, বেশ বোধ হল — ইড়া-পিঙ্গলা। হাজরাকে বললাম, বুকে হাত দিয়ে দেখতে।

“কাল রবিবার, উপরে গিয়ে এঁর সঙ্গে দেখা কল্লাম, ওঁকে সব বললাম।

“আমি বললাম, ‘সব্বাই-এর হল, আমায় কিছু দিন। সব্বাই-এর হল, আমার হবে না’?”

মণি — তিনি তোমায় কি বললেন?

নরেন্দ্র — তিনি বললেন, ‘তুই বাড়ির একটা ঠিক করে আয় না, সব হবে। তুই কি চাস?’

[Sri Ramakrishna and the Vedanta — নিত্যলীলা দুই গ্রহণ]

“আমি বললাম, — আমার ইচ্ছা অমনি তিন-চারদিন সমাধিস্থ হয়ে থাকব! কখন কখন এক-একবার খেতে উঠব!

“তিনি বললেন, ‘তুই তো বড় হীনবুদ্ধি! ও অবস্থার উঁচু অবস্থা আছে। তুই তো গান গাস, ‘যো কুছ্ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়’।”

মণি — হাঁ, উনি সর্বদাই বলেন যে, সমাধি থেকে নেমে এসে দেখে — তিনিই জীবজগৎ, এই সমস্ত হয়েছেন। ঈশ্বরকোটির এই অবস্থা হতে পারে। উনি বলেন, জীবকোটি সমাধি অবস্থা যদিও লাভ করে আর নামতে পারে না।

নরেন্দ্র — উনি বললেন, — তুই বাড়ির একটা ঠিক করে আয়, সমাধিলাভের অবস্থার চেয়েও উঁচু অবস্থা হতে পারবে।

“আজ সকালে বাড়ি গেলাম। সকলে বকতে লাগল, — আর বললে, ‘কি হো-হো করে বেড়াচ্ছিস? আইন একজামিন (বি. এল.) এত নিকটে, পড়াশুনা নাই, হো-হো করে বেড়াচ্ছে’।”

মণি — তোমার মা কিছু বললেন?

নরেন্দ্র — না, তিনি খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত, হরিণের মাংস ছিল; খেলুম, — কিন্তু খেতে ইচ্ছা ছিল না।

মণি — তারপর?

নরেন্দ্র — দিদিমার বাড়িতে, সেই পড়বার ঘরে পড়তে গেলাম। পড়তে গিয়ে পড়াতে একটা ভয়ানক আতঙ্ক এল, — পড়াটা যেন কি ভয়ের জিনিস! বুক আটুপাটু করতে লাগল! — অমন কান্না কখনও কাঁদি নাই।

“তারপর বই-টই ফেলে দৌড়! রাস্তা দিয়ে ছুট! জুতো-টুতো রাস্তায় কোথায় একদিকে পড়ে রইল! খড়ের গাদার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম, — গায়েময়ে খড়, আমি দৌড়ুচ্ছি, — কাশীপুরের রাস্তায়।”

নরেন্দ্র একটু চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

নরেন্দ্র — বিবেক চূড়ামণি শুনে আরও মন খারাপ হয়েছে! শঙ্করাচার্য বলেন — যে, এই তিনটি জিনিস অনেক তপস্যায়, অনেক ভাগ্যে মেলে, — মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ।

“ভাবলাম আমার তো তিনটিই হয়েছে! — অনেক তপস্যার ফলে মানুষ জন্ম হয়েছে, অনেক তপস্যার ফলে মুক্তির ইচ্ছা হয়েছে, — আর অনেক তপস্যার ফলে এরূপ মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ হয়েছে।”

মণি — আহা!

নরেন্দ্র — সংসার আর ভাল লাগে না। সংসারে যারা আছে তাদেরও ভাল লাগে না। দুই-একজন ভক্ত ছাড়া।

নরেন্দ্র অমনি আবার চুপ করিয়া আছেন। নরেন্দ্রের ভিতর তীব্র বৈরাগ্য! এখনও প্রাণ আটুপাটু করিতেছে। নরেন্দ্র আবার কথা কহিতেছেন।

নরেন্দ্র (মণির প্রতি) — আপনাদের শান্তি হয়েছে, আমার প্রাণ অস্থির হচ্ছে! আপনারাই ধন্য!

মণি কিছু উত্তর করিলেন না, চুপ করিয়া আছেন। ভাবিতেছেন, ঠাকুর বলিয়াছিলেন, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হতে হয়, তবে ঈশ্বরদর্শন হয়। সন্ধ্যার পরেই মণি উপরের ঘরে গেলেন। দেখলেন, ঠাকুর নিদ্রিত।

রাত্রি প্রায় ৯টা। ঠাকুরের কাছে নিরঞ্জন, শশী। ঠাকুর জাগিয়াছেন। থাকিয়া থাকিয়া নরেন্দ্রের কথাই বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — নরেন্দ্রের অবস্থা কি আশ্চর্য! দেখো, এই নরেন্দ্র আগে সাকার মানত না! এর প্রাণ কিরূপ আটুপাটু হয়েছে দেখছিল। সেই যে আছে — একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, ঈশ্বরকে কেমন করে পাওয়া যায়। গুরু বললেন,

‘এস আমার সঙ্গে; তোমায় দেখিয়ে দিই কি হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।’ এই বলে একটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে তাকে জলে চুবিয়ে ধরলেন! খানিকক্ষণ পরে তাকে ছেড়ে দেওয়ার পর শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমার প্রাণটা কি-রকম হচ্ছিল?’ সে বললে, ‘প্রাণ যায় যায় হচ্ছিল!’

“ঈশ্বরের জন্য প্রাণ আটুবাটু করলে জানবে যে দর্শনের আর দেরি নাই। অরুণ উদয় হলে — পূর্বদিক লাল হলে — বুঝা যায় সূর্য উঠবে।”

ঠাকুরের আজ অসুখ বাড়িয়াছে। শরীরের এত কষ্ট। তবুও নরেন্দ্র সম্বন্ধে এই সকল কথা, — সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন।

নরেন্দ্র এই রাত্রেই দক্ষিণেশ্বর চলিয়া গিয়াছেন। গভীর অন্ধকার — অমাবস্যা পড়িয়াছে। নরেন্দ্রের সঙ্গে দু-একটি ভক্ত। মণি রাত্রে বাগানেই আছেন। স্বপ্নে দেখিতেছেন, সন্ন্যাসীমণ্ডলের ভিতর বসিয়া আছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৬, ৫ই জানুয়ারি 1886/01/05/i

53.5 ভক্তদের তীব্র বৈরাগ্য — সংসার ও নরক যন্ত্রণা

পরদিন মঙ্গলবার, ৫ই জানুয়ারি ২২শে পৌষ। অনেকক্ষণ অমাবস্যা আছে। বেলা ৪টা বাজিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শয্যায় বসিয়া আছেন, মণির সহিত নিভৃতে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ক্ষীরোদ যদি [১]গঙ্গাসাগর যায় তাহলে তুমি কম্বল একখানা কিনে দিও।

মণি — যে আজ্ঞা।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, ছোকরাদের একি হচ্ছে বল দেখি? কেউ শ্রীক্ষেত্রে পালাচ্ছে — কেউ গঙ্গাসাগরে!

“বাড়ি ত্যাগ করে করে সব আসছে। দেখ না নরেন্দ্র। তীব্র বৈরাগ্য হলে সংসার পাতকুয়ো বোধ হয়, আত্মীয়েরা কালসাপ বোধ হয়।”

মণি — আজ্ঞা, সংসারে ভারী যন্ত্রণা!

শ্রীরামকৃষ্ণ — নরকযন্ত্রণা! জন্ম থেকে। দেখছ না। — মাগছেলে নিয়ে কি যন্ত্রণা!

মণি — আজ্ঞা হাঁ। আর আপনি বলেছিলেন, ওদের (সংসারে ঢুকে নাই তাদের) লেনাদেনা নাই, লেনাদেনার জন্য আটকে থাকতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখছ না — নিরঞ্জনকে! ‘তোর এই নে আমার এই দে’ — বাস! আর কোনও সম্পর্ক নাই। পেছুটান নাই!

“কামিনী-কাঞ্চনই সংসার। দেখ না, টাকা থাকলেই বাঁধতে ইচ্ছা করে।” মণি হো-হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। ঠাকুরও হাসিলেন।

মণি — টাকা বার করতে অনেক হিসাব আসে। (উভয়ের হাস্য) তবে দক্ষিণেশ্বরে বলেছিলেন, ত্রিগুণাতীত হয়ে সংসারে থাকতে পারলে এক হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ বালকের মতো।

মণি — আজ্ঞা, কিন্তু বড় কঠিন, বড় শক্তি চাই।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন।

মণি — কাল ওরা দক্ষিণেশ্বরে ধ্যান করতে গেল। আমি স্বপ্ন দেখলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি দেখলে?

মণি — দেখলাম যেন নরেন্দ্র প্রভৃতি সন্ন্যাসী হয়েছেন — ধুনি জ্বেলে বসে আছেন। আমিও তাদের মধ্যে বসে আছি। ওরা তামাক খেয়ে ধোঁয়া মুখ দিয়ে বার ক’চ্চে, আমি বললাম, গাঁজার ধোঁয়ার গন্ধ।

[সন্ন্যাসী কে — ঠাকুরের পীড়া ও বালকের অবস্থা]

শ্রীরামকৃষ্ণ — মনে ত্যাগ হলেই হল, তাহলেও সন্ন্যাসী।

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিন্তু বাসনায় আগুন দিতে হয়, তবে তো!

মণি — বড়বাজারে মারোয়াড়ীদের পণ্ডিতজীকে বলেছিলেন, ‘ভক্তিকামনা আমার আছে।‘ — ভক্তিকামনা বুঝি কামনার মধ্যে নয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — যেমন হিঞ্চেশাক শাকের মধ্যে নয়। পিত্ত দমন হয়।

“আচ্ছা, এত আনন্দ, ভাব — এ-সব কোথায় গেল?”

মণি — বোধ হয় গীতায় যে ত্রিগুণাতীতের কথা বলা আছে সেই অবস্থা হয়েছে। সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ নিজে নিজে কাজ করছে, আপনি স্বয়ং নির্লিপ্ত — সত্ত্ব গুণেতেও নির্লিপ্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ; বালকের অবস্থায় রেখেছে।

“আচ্ছা, দেহ কি এবার থাকবে না?”

ঠাকুর ও মণি চুপ করিয়া আছেন। নরেন্দ্র নিচে হইতে আসিলেন। একবার বাড়ি যাইবেন। বন্দোবস্ত করিয়া আসিবেন।

পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর তাঁহার মা ও ভাইরা অতি কষ্টে আছেন, — মাঝে মাঝে অন্নকষ্ট। নরেন্দ্র একমাত্র তাঁহাদের ভরসা, — তিনি রোজগার করিয়া তাঁহাদের খাওয়াইবেন। কিন্তু নরেন্দ্রের আইন পরীক্ষা দেওয়া হইল না। এখন তীব্র

বৈরাগ্য! তাই আজ বাড়ির কিছু বন্দোবস্ত করিতে কলিকাতায় যাইতেছেন। একজন বন্ধু তাঁহাকে একশত টাকা ধার দিবেন। সেই টাকায় বাড়ির তিন মাসের খাওয়ার যোগাড় করিয়া দিয়া আসিবেন।

নরেন্দ্র — যাই বাড়ি একবার। (মণির প্রতি) মহিম চক্রবর্তীর বাড়ি হয়ে যাচ্ছি, আপনি কি যাবেন?

মণির যাইবার ইচ্ছা নাই; ঠাকুর তাঁহার দিকে তাকাইয়া নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “কেন”?

নরেন্দ্র — ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, তাঁর সঙ্গে বলসে একটু গল্পটল্প করব।

ঠাকুর একদৃষ্টে নরেন্দ্রকে দেখিতেছেন।

নরেন্দ্র — এখানকার একজন বন্ধু বলেছেন, আমায় একশ টাকা ধার দিবেন। সেই টাকাতে বাড়ির তিন মাসের বন্দোবস্ত করে আসব।

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। মণির দিকে তাকাইলেন।

মণি (নরেন্দ্রকে) — না, তোমরা এগোও, — আমি পরে যাব।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮৬, ১১ই মার্চ 1886/03/11

53.6 কাশীপুর উদ্যানে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

নরেন্দ্রকে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয় উপদেশ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে হলঘরে ভক্তসঙ্গে অবস্থান করিতেছেন। রাত্রি প্রায় আটটা। ঘরে নরেন্দ্র, শশী, মাস্টার, বুড়োগোপাল শরৎ। আজ বৃসস্পতিবার — ২৮শে ফাল্গুন, ১২৯২ সাল; ফাল্গুন মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথি; ১১ই মার্চ, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।

ঠাকুর অসুস্থ — একটু শুইয়া আছেন। ভক্তেরা কাছে বসিয়া। শরৎ দাঁড়াইয়া পাখা করিতেছেন। ঠাকুর অসুখের কথা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ভোলানাথের কাছে গেলে তেল দেবে। আর সে বলে দেবে, কি-রকম করে লাগাতে হবে।

বুড়োগোপাল — তাহলে কাল সকালে আমরা গিয়ে আনব।

মাস্টার — আজ কেউ গেলে বলে দিতে পারে।

শশী — আমি যেতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শরৎকে দেখাইয়া) — ও যেতে পারে।

শরৎ কিয়ৎক্ষণ পরে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে মুহুরী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে তেল আনিতে যাত্রা করিলেন।

ঠাকুর শুইয়া আছেন। ভক্তেরা নিঃসব্দে বসিয়া আছেন। ঠাকুর হঠাৎ উঠিয়া বসিলেন। নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) — ব্রহ্ম অলেপ। তিন গুণ তাঁতে আছে, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত।

“যেমন বায়ুতে সুগন্ধ-দুর্গন্ধ দুই-ই পাওয়া যায়, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত। কাশীতে শঙ্করাচার্য পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন! চণ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে যাচ্ছিল — হঠাৎ ছুঁয়ে ফেললে। শঙ্কর বললেন — ছুঁয়ে ফেললি! চণ্ডাল বললে, — ঠাকুর, তুমিও আমায় ছোঁও নাই! আমিও তোমায় ছুঁই নাই! আত্মা নির্লিপ্ত। তুমি সেই শুদ্ধ আত্মা।

“ব্রহ্ম আর মায়া। জ্ঞানী মায়া ফেলে দেয়।

“মায়া আবরণস্বরূপ। এই দেখ, এই গামছা আড়াল করলাম — আর প্রদীপের আলো দেখা যাচ্ছে না।

ঠাকুর গামছাটি আপনার ও ভক্তদের মাঝখানে ধরিলেন। বলিতেছেন, “এই দেখ, আমার মুখ আর দেখা যাচ্ছে না।

“রামপ্রসাদ যেমন বলেছে — ‘মশারি তুলিয়া দেখ —’

“ভক্ত কিন্তু মায়া ছেড়ে দেয় না। মহামায়ার পূজা করে। শরণাগত হয়ে বলে, ‘মা, পথ ছেড়ে দাও! তুমি পথ ছেড়ে দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হবে।’ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, — এই তিন অবস্থা জ্ঞানীরা উড়িয়ে দেয়! ভক্তেরা এ-সব অবস্থাই লয় — যতক্ষণ আমি আছে ততক্ষণ সবই আছে।

“যতক্ষণ আমি আছে, ততক্ষণ দেখে যে, তিনিই মায়া, জীবজগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, সব হয়েছেন!

[নরেন্দ্র প্রভৃতি চুপ করিয়া আছেন।]

“মায়াবাদ শুকনো। কি বললাম, বল দেখি।”

নরেন্দ্র — শুকনো।

ঠাকুর নরেন্দ্রের হাত-মুখ স্পর্শ করিতে লাগিলেন। আবার কথা কহিতেছেন — “এ-সব (নরেন্দ্রের সব) ভক্তের লক্ষণ। জ্ঞানীর সে আলাদা লক্ষণ, — মুখ, চেহারা শুকনো হয়।

“জ্ঞানী জ্ঞানলাভ করবার পরও বিদ্যামায়া নিয়ে থাকতে পারে — ভক্তি, দয়া, বৈরাগ্য — এই সব নিয়ে থাকতে পারে। এর দুটি উদ্দেশ্য। প্রথম, লোকশিক্ষা হয়, তারপর রসাস্বাদনের জন্য।

“জ্ঞানী যদি সমাধিস্থ হয়ে চুপ করে থাকে, তাহলে লোকশিক্ষা হয় না। তাই শঙ্করাচার্য ‘বিদ্যার আমি’ রেখেছিলেন।

“আর ঈশ্বরের আনন্দ ভোগ করবার জন্য — সম্ভোগ করবার জন্য — ভক্তি-ভক্ত নিয়ে থাকে!

“এই ‘বিদ্যার আমি’, ‘ভক্তের আমি’ — এতে দোষ নাই। ‘বজ্জাৎ আমি’তে দোষ হয়। তাঁকে দর্শন করবার পর বালকের স্বভাব হয়। ‘বালকের আমি’তে কোন দোষ নাই। যেমন আরশির মুখ — লোককে গালাগাল দেয় না। পোড়া দড়ি দেখতেই দড়ির আকার, ফুঁ দিলে উড়ে যায়। জ্ঞানাগ্নিতে অহংকার পুড়ে গেছে। এখন আর কারও অনিষ্ট করে না। নামমাত্র ‘আমি’।

“নিত্যতে পোঁছে আবার লীলায় থাকা। যেমন ওপারে গিয়ে আবার এপারে আসা। লোকশিক্ষা আর বিলাসের জন্য — আমোদের জন্য।”

ঠাকুর অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতেছেন। একটু চুপ করিলেন। আবার ভক্তদের বলিতেছেন — “শরীরের এই রোগ — কিন্তু অবিদ্যা মায়া রাখে না! এই দেখো, রামলাল, কি বাড়ি, কি পরিবার, আমার মনে নাই! — কে না পূর্ণ কায়েত তার জন্য ভাবছি। — ওদের জন্য তো ভাবনা হয় না!

“তিনিই বিদ্যামায়া রেখে দিয়েছেন — লোকের জন্য — ভক্তের জন্য।

“কিন্তু বিদ্যমায়া থাকলে আবার আসতে হবে। অবতারাদি বিদ্যামায়া রাখে! একটু বাসনা থাকলেই আসতে হয়, ফিরে ফিরে আসতে হয়। সব বাসনা গেলে মুক্তি। ভক্তরা কিন্তু মুক্তি চায় না।

“যদি কাশীতে কারু দেহত্যাগ হয় তাহলে মুক্তি হয় — আর আসতে হয় না। জ্ঞানীদের মুক্তি।”

নরেন্দ্র — সেদিন মহিম চক্রবর্তীর বাড়িতে আমরা গিছলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তারপর?

নরেন্দ্র — ওর মতো এমন শুষ্ক জ্ঞানী দেখি নাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — কি হয়েছিল?

নরেন্দ্র — আমাদের গান গাইতে বললে। গঙ্গাধর গাইলে —

শ্যামনামে প্রাণ পেয়ে ইতি উতি চায়,
সম্মুখে তমালবৃক্ষ দেখিবারে পায়।

“গান শুনে বললে — ও-সব গান কেন? প্রেম-ট্রেম ভাল লাগে না। তা ছাড়া, মাগছেলে নিয়ে থাকি, এ-সব গান এখানে কেন?”

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — ভয় দেখেছ!

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮৬, ১৪ই মার্চ 1886/03/14

53.7 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে সাঙ্গোপাঙ্গসঙ্গে

ভক্তের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের দেহধারণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে রহিয়াছেন। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর অসুস্থ। উপরের হলঘরে উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র ও রাখাল দুইজনে পদসেবা করিতেছেন, মণি কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে পদসেবা করিতে বলিলেন। মণি পদসেবা করিতেছেন।

আজ রবিবার, ১৪ই মার্চ, ১৮৮৬; ২রা চৈত্র, ফাল্গুন শুক্লা নবমী। গত রবিবারে ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে বাগানে পূজা হইয়া গিয়াছে। গত বর্ষে জন্মমহোৎসব দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়িতে খুব ঘটা করিয়া হইয়াছিল। এবার তিনি অসুস্থ। ভক্তেরা বিষাদসাগরে ডুবিয়া আছেন। পূজা হইল। নামমাত্র উৎসব হইল।

ভক্তেরা সর্বদাই বাগানে উপস্থিত আছেন ও ঠাকুরের সেবা করিতেছেন। শ্রীশ্রীমা ওই সেবায় নিশিদিন নিযুক্ত। ছোকরা ভক্তেরা অনেকেই সর্বদা থাকেন, নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, বাবুরাম, যোগীন, কালী, লাটু প্রভৃতি।

বয়স্ক ভক্তেরা মাঝে মাঝে থাকেন ও প্রায় প্রত্যহ আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করেন বা তাঁহাঁর সংবাদ লইয়া যান। তারক, সিঁথির গোপাল, ইঁহারা সর্বদা থাকেন। ছোট গোপালও থাকেন।

ঠাকুর আজও বিশেষ অসুস্থ। রাত্রি দুই প্রহর। আজ শুক্ল পক্ষের নবমী তিথি, চাঁদের আলোয় উদ্যানভূমি যেন আনন্দময় হইয়া রহিয়াছে। ঠাকুরের কঠিন পীড়া, — চন্দ্রের বিমলকিরণ দর্শনে ভক্তহৃদয়ে আনন্দ নাই। যেমন একটি নগরীর মধ্যে সকলই সুন্দর, কিন্তু শত্রুসৈন্য অবরোধ করিয়াছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ, কেবল বসন্তানিলস্পর্শে বৃক্ষপত্রের শব্দ হইতেছে। উপরের হলঘরে ঠাকুর শুইয়া আছেন। ভারী অসুস্থ, — নিদ্রা নাই। দু-একটি ভক্ত নিঃশব্দে কাছে বসিয়া আছেন — কখন কি প্রয়োজন হয়। এক-একবার তন্দ্রা আসিতেছে ও ঠাকুরকে নিদ্রাগতপ্রায় বোধ হইতেছে।

এ কি নিদ্রা না মহাযোগ? ‘যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে!’ এ কি সেই যোগাবস্থা?

মাস্টার কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়া আরও কাছে আসিতে বলিতেছেন। ঠাকুরের কষ্ট দেখিলে পাষাণ বিগলিত হয়! মাস্টারকে আস্তে আস্তে অতি কষ্টে বলিতেছেন — “তোমরা কাঁদবে বলে এত ভোগ করছি — সব্বাই যদি বল যে — ‘এত কষ্ট, তবে দেহ যাক’ — তাহলে দেহ যায়!”

কথা শুনিয়া ভক্তদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যিনি তাঁহাদের পিতা মাতা রক্ষাকর্তা তিনি এই কথা বলিতেছেন! — সকলে চুপ করিয়া আছেন। কেহ ভাবিতেছেন, এরই নাম কি Crucifixation! ভক্তের জন্য দেহ বিসর্জন!

গভীর রাত্রি। ঠাকুরের অসুখ আরও যেন বাড়িতেছে! কি উপায় করা যায়? কলিকাতায় লোক পাঠানো হইল। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র ডাক্তার আর শ্রীযুক্ত নবগোপাল কবিরাজকে সঙ্গে করিয়া গিরিশ সেই গভীর রাত্রে আসিলেন।

ভক্তেরা কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর একটু সুস্থ হইতেছেন। বলিতেছেন, "দেহের অসুখ, তা হবে, দেখছি পঞ্চভূতের দেহ!"

গিরিশের দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন, "অনেক ঈশ্বরীয় রূপ দেখেছি! তার মধ্যে এই রূপটিও (নিজের মূর্তি) দেখছি!"

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১৮৮৬, ১৫ই মার্চ 1886/03/15/i

53.8 সমাধিমন্দিরে

পরদিন সকাল বেলা। আজ সোমবার, ৩রা চৈত্র; ১৫ই মার্চ, (১৮৮৬)। বেলা ৭টা-৮টা হইবে। ঠাকুর একটু সামলাইয়াছেন ও ভক্তদের সহিত আস্তে আস্তে, কখনও ইশারা করিয়া কথা কহিতেছেন। কাছে নরেন্দ্র, রাখাল, মাস্টার, লাটু, সিঁথির গোপাল প্রভৃতি।

ভক্তদের মুখে কথা নাই, ঠাকুরের পূর্বরাত্রির দেহের অবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহারা বিষাদগম্ভীর মুখে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

[ঠাকুরের দর্শন, ঈশ্বর, জীব, জগৎ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের দিকে তাকাইয়া, ভক্তদের প্রতি) — কি দেখছি জানো? তিনি সব হয়েছেন! মানুষ আর যা জীব দেখছি, যেন চামড়ার সব তয়েরি — তার ভিতর থেকে তিনিই হাত পা মাথা নাড়ছেন! যেমন একবার দেখেছিলাম — মোমের বাড়ি, বাগান, রাস্তা, মানুষ গরু সব মোমের — সব এক জিনিসে তয়েরি।

“দেখছি — সে-ই কামার, সে-ই বলি, সে-ই হাড়িকাট হয়েছে!”

ঠাকুর কি বলিতেছেন, জীবের দুঃখে কাতর হইয়া তিনি নিজের শরীর জীবের মঙ্গলের জন্য বলিদান দিতেছেন?

ঈশ্বরই কামার, বলি, হাড়িকাট হইয়াছেন। এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ভাবে বিভোর হইয়া বলিতেছেন — “আহা! আহা!”

আবার সেই ভাববস্থা! ঠাকুর বাহ্যশূন্য হইতেছেন। ভক্তেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন — “এখন আমার কোনও কষ্ট নাই, ঠিক পূর্বাবস্থা।”

ঠাকুরের এই সুখ-দুঃখের অতীত অবস্থা দেখিয়া ভক্তেরা অবাক্‌ হইয়া রহিয়াছেন। লাটুর দিকে তাকাইয়া আবার বলিতেছেন —

“ওই লোটো — মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে, — তিনিই (ঈশ্বরই) মাথায় হাত দিয়ে যেন রয়েছেন!”

ঠাকুর ভক্তদের দেখিতেছেন ও স্নেহে যেন বিগলিত হইতেছেন। যেমন শিশুকে আদর করে, সেইরূপ রাখাল ও নরেন্দ্রকে আদর করিতেছেন! তাঁহাদের মুখে হাত বুলাইয়া আদর করিতেছেন!

[কেন লীলা সংবরণ]

কিয়ৎপরে মাস্টারকে বলিতেছেন, “শরীরটা কিছুদিন থাকত, লোকদের চৈতন্য হত।” ঠাকুর আবার চুপ করিয়া আছেন।

ঠাকুর আবার বলিতেছেন — “তা রাখবে না।”

ভক্তেরা ভাবিতেছেন, ঠাকুর আবার কি বলিবেন। ঠাকুর আবার বলিতেছেন, “তা রাখবে না, — সরল মূর্খ দেখে পাছে লোকে সব ধরে পড়ে। সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফেলে! একে কলিতে ধ্যান-জপ নাই।”

রাখাল (সস্নেহে) — আপনি বলুন — যাতে আপনার দেহ থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।

নরেন্দ্র — আপনার ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হয়ে গেছে।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন — যেন কি ভাবিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্র, রাখালাদি ভক্তের প্রতি) — আর বললে কই হয়?

“এখন দেখছি এক হয়ে গেছে। ননদিনীর ভয়ে কৃষ্ণকে শ্রীমতী বললেন, ‘তুমি হৃদয়ের ভিতর থাকো’। যখন আবার ব্যাকুল হয়ে কৃষ্ণকে দর্শন করিতে চাইলেন; — এমনি ব্যাকুলতা — খেমন বেড়াল আঁচড় পাঁচড় করে, — তখন কিন্তু আর বেরয় না!”

রাখাল (ভক্তদের প্রতি, মৃদুস্বরে) — গৌর অবতারের কথা বলছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

১৮৮৬, ১৫ই মার্চ 1886/03/15/ii

53.9 গুহ্যকথা — ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ

ভক্তেরা নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। ঠাকুর ভক্তদের সস্নেহে দেখিতেছেন, নিজের হৃদয়ে হাত রাখিলেন — কি বলিবেন —

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদিকে) — এর ভিতর দুটি আছেন। একটি তিনি।

ভক্তেরা অপেক্ষা করিতেছেন আবার কি বলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — একটি তিনি — আর একটি ভক্ত হয়ে আছে। তারই হাত ভেঙে ছিল — তারই এই অসুখ করেছে। বুঝেছ?

ভক্তেরা চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কারেই বা বলব কেই বা বুঝবে।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন —

“তিনি মানুষ হয়ে — অবতার হয়ে — ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তেরা তাঁরই সঙ্গে আবার চলে যায়।”

রাখাল — তাই আমাদের আপনি খেন ফেলে না যান।

ঠাকুর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। বলিতেছেন, “বাউলের দল হঠাৎ এল, — নাচলে, গান গাইলে; আবার হঠাৎ চলে গেল! এল — গেল, কেউ চিনলে না। (ঠাকুরের ও সকলের ঈষৎ হাস্য)

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া ঠাকুর আবার বলিতেছেন, —

“দেহধারণ করলে কষ্ট আছেই।

“এক-একবার বলি, আর যেন আসতে না হয়।

“তবে কি, — একটা কথা আছে। নিমন্ত্রণ খেয়ে খেয়ে আর বাড়ির কড়াই-এর ডাল-ভাত ভাল লাগে না।

“আর যে দেহধারণ করা, — এটি ভক্তের জন্য।”

ঠাকুর ভক্তের নৈবেদ্য —— ভক্তের নিমন্ত্রণ —— ভক্তসঙ্গে বিহার ভালবাসেন, এই কথা কি বলিতেছেন?

[নরেন্দ্রের জ্ঞান-ভক্তি —— নরেন্দ্র ও সংসারত্যাগ]

ঠাকুর নরেন্দ্রকে সস্নেহে দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) — চণ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে যাচ্ছিল। শঙ্করাচার্য গঙ্গা নেয়ে কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। চণ্ডাল হঠাৎ তাঁকে ছুঁয়ে ফেলেছিল। শঙ্কর বিরক্ত হয়ে বললেন, তুই আমায় ছুঁয়ে ফেললি! সে বললে, ‘ঠাকুর তুমিও আমায় ছোঁওনি, আমিও তোমায় ছুঁই নাই! তুমি বিচার-কর! তুমি কি দেহ, তুমি কি মন, তুমি কি বুদ্ধি; কি তুমি, বিচার কর! শুদ্ধ আত্মা নির্লিপ্ত —— সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ; তিনগুণ; — কোন গুণে লিপ্ত নয়।’

“ব্রহ্ম কিরূপ জানিস। যেমন বায়ু। দুর্গন্ধ, ভাল গন্ধ —— সব বায়ুতে আসছে, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত।”

নরেন্দ্র —— আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — গুণাতীত। মায়াতীত। অবিদ্যামায়া বিদ্যামায়া দুয়েরই আতীত। কামিনী-কাঞ্চন অবিদ্যা। জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি — এ-সব বিদ্যার ঐশ্বর্য। শঙ্করাচার্য বিদ্যামায়া রেখেছিলেন। তুমি আর এরা যে আমার জন্যে ভাবছ, এই ভাবনা বিদ্যামায়া!

“বিদ্যামায়া ধরে ধরে সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। যেমন সিঁড়ির উপরের পইটে — তারপরে ছাদ। কেউ কেউ ছাদে পোঁছানোর পরও সিঁড়িতে আনাগোনা করে — জ্ঞানলাভের পরও বিদ্যার আমি রাখে। লোকশিক্ষার জন্য। আবার ভক্তি আস্বাদ করবার জন্য — ভক্তের সঙ্গে বিলাস করবার জন্য।”

নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর কি এ-সমস্ত নিজের অবস্থা বলিতেছেন?

নরেন্দ্র — কেউ কেউ রাগে আমার উপর, ত্যাগ করবার কথায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মৃদুস্বরে) — ত্যাগ দরকার।

ঠাকুর নিজের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখাইয়া বলিতেছেন, “একটা জিনিসের পার যদি আর-একটা জিনিস থাকে, প্রথম জিনিসটা পেতে গেলে, ও জিনিসটা সরাতে হবে না? একটা না সরালে আর একটা কি পাওয়া যায়?”

নরেন্দ্র — আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রকে, মৃদুস্বরে) — সেই-ময় দেখলে আর কিছু কি দেখা যায়?

নরেন্দ্র — সংসারত্যাগ করতে হবেই?

শ্রীরামকৃষ্ণ — যা বললুম সেই-ময় দেখলে কি আর কিছু দেখা যায়? সংসার-ফংসার আর কিছু দেখা যায়?

“তবে মনে ত্যাগ। এখানে যারা আসে, কেউ সংসারী নয়। কারু কারু একটু ইচ্ছা ছিল — মেয়েমানুষের সঙ্গে থাকা। (রাখাল, মাস্টার প্রভৃতির ঈষৎ হাস্য) সেই ইচ্ছাটুকু হয়ে গেল।

[নরেন্দ্র ও বীরভাব]

ঠাকুর নরেন্দ্রকে সস্নেহে দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছেন। ভক্তদের দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন — ‘খুব’! নরেন্দ্র ঠাকুরকে সহাস্যে বলিতেছেন, ‘খুব’ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — খুব ত্যাগ আসছে।

নরেন্দ্র ও ভক্তেরা চুপ করিয়া আছেন ও ঠাকুরকে দেখিতেছেন। এইবার রাখাল কথা কহিতেছেন।

রাখাল (ঠাকুরকে, সহাস্যে) — নরেন্দ্র আপনাকে খুব বুঝছে।

ঠাকুর হাসিতেছেন ও বলিতেছেন, “হাঁ, আবার দেখছি অনেকে বুঝেছে! (মাস্টারের প্রতি) — না গা?”

মাস্টার — আজ্ঞা হাঁ।

ঠাকুর নরেন্দ্র ও মণিকে দেখিতেছেন ও হস্তের দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া রাখালাদি ভক্তদিগকে দেখাইতেছেন। প্রথন ইঙ্গিত করিয়া নরেন্দ্রকে দেখাইলেন — তারপর মণিকে দেখাইলেন! রাখাল ইঙ্গিত বুঝিয়াছেন ও কথা কহিতেছেন।

রাখাল (সহাস্যে, শ্রীরামকৃষ্ণর প্রতি) — আপনি বলছেন নরেন্দ্রের বীরভাব? আর এঁর সখীভাব? [ঠাকুর হাসিতেছেন]

নরেন্দ্র (সহাস্যে) — ইনি বেশি কথা কন না, আর লাজুক; তাই বুঝি বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে নরেন্দ্রকে) — আচ্ছা, আমার কি ভাব?

নরেন্দ্র — বীরভাব, সখীভাব, — সবভাব।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ — কে তিনি?]

ঠাকুর এই কথা শুনিয়া যেন ভাবে পূর্ণ হইলেন, হৃদয়ে হাত রাখিয়া কি বলিতেছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদি ভক্তদিগকে) — দেখছি এর ভিতর থেকেই যা কিছু।

নরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “কি বুঝলি?”

নরেন্দ্র — (“যা কিছু” অর্থাৎ) যত সৃষ্ট পদার্থ সব আপনার ভিতর থেকে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি, আনন্দে) — দেখছিস!

ঠাকুর নরেন্দ্রকে একটু গান গাইতে বলিতেছেন। নরেন্দ্র সুর করিয়া গাহিতেছেন। নরেন্দ্রের ত্যাগের ভাব, — গাহিতেছেন:

“নলিনীদলগতজলমতিতরলম্ তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।”

দুই-এক চরণ গানের পরই ঠাকুর নরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, “ও কি! ও-সব ভাব অতি সামান্য!”

নরেন্দ্র এইবার সখী ভাবের গান গাহিতেছেন:

কাহে সই, জিয়ত মরত কি বিধান!
ব্রজকি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই, ব্রজজন টুটায়ল পরাণ।।
মিলি সই নাগরী, ভুলিগেই মাধব, রূপবিহীন গোপকুঙারী।
কো জানে পিয় সই, রসময় প্রেমিক, হেন বঁধু রূপ কি ভিখারি।।
আগে নাহি বুঝনু, রূপ হেরি ভুলনু, হৃদি কৈনু চরণ যুগল।
যমুনা সলিলে সই, অব তনু ডারব, আন সখি ভখিব গরল।।
(কিবা) কানন বল্লরী, গল বেড়ি বাঁধই, নবীন তমালে দিব ফাঁস।
নহে শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম নাম-জপই, ছার তনু করিব বিনাশ।।

গান শুনিয়া ঠাকুর ও ভক্তেরা মুগ্ধ হইয়াছেন। ঠাকুর ও রাখালের নয়ন দিয়ে প্রেমাশ্রু পড়িতেছে। নরেন্দ্র আবার ব্রজগোপীর ভাবে মাতোয়ারা হইয়া কীর্তনের সুরে গাহিতেছেন:

তুমি আমার, আমার বঁধু, কি বলি (কি বলি তোমায় বলি নাথ)।

(কি জানি কি বলি আমি অভাগিনী নারীজাতি)।

তুমি হাতোকি দর্পণ, মাথোকি ফুল

(তোমায় ফুল করে কেশে পরব বঁধু)।

(তোমায় কবরীর সনে লুকায়ে লুকায়ে রাখব বঁধু)

(শ্যামফুল পরিলে কেউ নখতে নারবে)।

তুমি নয়নের অঞ্জন, বয়ানের তাম্বুল

(তোমায় শ্যাম অঞ্জন করে এঁখে পরবো বঁধু)

(শ্যাম অঞ্জন পরেছি বলে কেউ নখতে নারবে)

তুমি অঙ্গকি মৃগমদ গিমকি হার।

(শ্যামচন্দন মাখি শীতল হব বঁধু)

তোমার হার কণ্ঠে পরব বঁধু। তুমি দেহকি সর্বস্ব গেহকি সার।।

পাখিকো পাখ মীনকো পানি। তেয়সে হাম বঁধু তুয়া মানি।।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

১৮৮৬, ৯ই এপ্রিল 1886/04/09

53.10 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে

বুদ্ধদেব ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে কাশীপুরের বাগানে আছেন। আজ শুক্রবার বেলা ৫টা, চৈত্র শুক্লা পঞ্চমী। ৯ই এপ্রিল, ১৮৮৬।

নরেন্দ্র, কালী, নিরঞ্জন, মাস্টার নিচে বসিয়া কথা কহিতেছেন।

নিরঞ্জন (মাস্টারের প্রতি) — বিদ্যাসাগরের নূতন একটা স্কুল নাকি হবে? নরেনকে এর একটা কর্ম যোগাড় করে —

নরেন্দ্র — আর বিদ্যাসাগরের কাছে চাকরি করে কাজ নাই!

নরেন্দ্র বুদ্ধগয়া হইতে সবে ফিরিয়াছেন। সেখানে বুদ্ধমূর্তি দর্শন করিয়াছেন এবং সেই মূর্তির সম্মুখে গভির ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। যে বৃক্ষের নিচে বুদ্ধদেব তপস্যা করিয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই বৃক্ষের স্থানে একটি নূতন বৃক্ষ হইয়াছে, তাহাও দর্শন করিয়াছিলেন। কালী বলিলেন, “একদিন গয়ার উমেশ বাবুর বাড়িতে নরেন্দ্র গান গাইয়াছিলেন, — মৃদঙ্গ সঙ্গে খেয়াল, ধ্রুপদ ইত্যাদি।”

শ্রীরামকৃষ্ণ হলঘরে বিছানায় বসিয়া। রাত্রি কয়েক দণ্ড হইয়াছে। মণি একাকী পাখা করিতেছেন। — লাটু আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — একখানি গায়ের চাদর ও একজোড়া চটি জুতা আনবে।

মণি — যে আজ্ঞা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (লাটুকে) — চাদর দশ আনা ও জুতা, সর্বসুদ্ধ কত দাম?

লাটু — একটাকা দশ আনা।

ঠাকুর মণিকে দামের কথা শুনিতে ইঙ্গিত করিলেন।

নরেন্দ্র আসিয়া উপবিষ্ট হলেন। শশী, রাখাল ও আরও দু-একটি ভক্ত আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিত করিয়া নরেন্দ্রকে বলিতেছেন — "খেয়েছিস?"

[বুদ্ধদেব কি নাস্তিক? "অস্তি নাস্তির মধ্যের অবস্থা"]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি, সহাস্যে) — ওখানে (অর্থাৎ বুদ্ধগয়ায়) গিছল।

মাস্টার (নরেন্দ্রের প্রতি) — বুদ্ধদেবের কি মত?

নরেন্দ্র — তিনি তপস্যার পর কি পেলেন, তা মুখে বলতে পারেন নাই। তাই সকলে বলে, নাস্তিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ইঙ্গিত করিয়া) — নাস্তিক কেন? নাস্তিক নয়, মুখে বলতে পারে নাই। বুদ্ধ কি জানো? বোধ স্বরূপকে চিন্তা করে করে, — তাই হওয়া, — বোধ স্বরূপ হওয়া।

নরেন্দ্র —— আজ্ঞে হাঁ। এদের তিন শ্রেণী আছে, — বুদ্ধ, অর্হৎ আর বোধিসত্ত্ব।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— এ তাঁরই খেলা, — নূতন একটা লীলা।

“নাস্তিক কেন হতে যাবে! যেখানে স্বরূপকে বোধ হয়, সেখানে অস্তি-নাস্তির মধ্যের অবস্থা।”

নরেন্দ্র (মাস্টারের প্রতি) — যে অবস্থায় contradictions meet, যে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন-এ শীতল জল তৈয়ার হয়, সেই হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন দিয়ে Oxyhydrogen-blowpipe (জ্বলন্ত অত্যুষ্ণ অগ্নিশিখা) উৎপন্ন হয়।

“যে অবস্থায় কর্ম, কর্মত্যাগ দুইই সম্ভবে, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম।

“যারা সংসারী, ইন্দ্রিয়ের বিষয় নিয়ে রয়েছে, তারা বলেছে, সব ‘অস্তি’; আবার মায়াবাদীরা বলছে, — ‘নাস্তি’; বুদ্ধের অবস্থা এই ‘অস্তি’ ‘নাস্তির’ পরে।”

শ্রীরামকৃষ্ণ —— এ অস্তি নাস্তি প্রকৃতির গুণ। যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে অস্তি নাস্তি ছাড়া।

ভক্তেরা কিয়ৎক্ষণ সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

[বুদ্ধদেবের দয়া ও বৈরাগ্য ও নরেন্দ্র]

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) — ওদের (বুদ্ধদেবের) কি মত?

নরেন্দ্র — ঈশ্বর আছেন, কি, না আছেন, এ-সব কথা বুদ্ধ বলতেন না। তবে দয়া নিয়ে ছিলেন।

“একটা বাজ পক্ষী শিকারকে ধরে তাকে খেতে যাচ্ছিল, বুদ্ধ শিকারটির প্রাণ বাঁচাবার জন্য নিজের গায়ের মাংস তাকে দিয়েছিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চুপ করিয়া আছেন। নরেন্দ্র উৎসাহের সহিত বুদ্ধদেবের কথা আরও বলিতেছেন।

নরেন্দ্র — কি বৈরাগ্য! রাজার ছেলে হয়ে সব ত্যাগ করলে! যাদের কিছু নাই — কোনও ঐশ্বর্য নাই, তারা আর কি ত্যাগ করবে।

“যখন বুদ্ধ হয়ে নির্বাণলাভ করে বাড়িতে একবার এলেন, তখন স্ত্রীকে, ছেলেকে — রাজ বংশের অনেককে — বৈরাগ্য অবলম্বন করতে বললেন। কি বৈরাগ্য! কিন্তু এ-দিকে ব্যাসদেবের আচরণ দেখুন, — শুকদেবকে বারণ করে বললেন, পুত্র! সংসারে থেকে ধর্ম কর!”

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। এখনও কোন কথা বলিতেছেন না।

নরেন্দ্র — শক্তি-ফক্তি কিছু (বুদ্ধ) মানতেন না। — কেবল নির্বাণ। কি বৈরাগ্য! গাছতলায় তপস্যা করতে বসলেন, আর বললেন — ইহৈব শুষ্যতু মে শরীরম্!

অর্থাৎ যদি নির্বাণলাভ না করি, তাহলে আমার শরীর এইখানে শুকিয়ে যাক — এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা!

“শরীরই তো বদমাইস! — ওকে জব্দ না করলে কি কিছু! —”

শশী — তবে যে তুমি বল, মাংস খেলে সত্ত্বগুণ হয়। — মাংস খাওয়া উচিত, এ-কথা তো বল।

নরেন্দ্র — যেমন মাংস খাই, — তেমনি (মাংসত্যাগ করে) শুধু ভাতও খেতে পারি — লুন না দিয়েও শুধু ভাত খেতে পারি।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহিতেছেন। আবার বুদ্ধদেবের কথা ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — (বুদ্ধদেবের) কি, মাথায় ঝুঁটি?

নরেন্দ্র — আজ্ঞা না, রুদ্রাক্ষের মালা অনেক জড় করলে যা হয়, সেই রকম মাথায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — চক্ষু?

নরেন্দ্র — চক্ষু সমাধিস্থ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ দর্শন — “আমিই সেই”]

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। নরেন্দ্র ও অন্যান্য ভক্তেরা তাঁহাকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। হঠাৎ তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া আবার নরেন্দ্রের সঙ্গে কথা আরম্ভ করিলেন। মণি হাওয়া করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) — আচ্ছা, — এখানে সব আছে, না? — নাগাদ মুসুর ডাল, ছোলার ডাল, তেঁতুল পর্যন্ত।

নরেন্দ্র —— আপনি ও-সব অবস্থা ভোগ করে, নিচে রয়েছেন! —

মণি (স্বগত) — সব অবস্থা ভোগ করে, ভক্তের অবস্থায়! —

শ্রীরামকৃষ্ণ —— কে যেন নিচে টেনে রেখেছে!

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মণির হাত হইতে পাখাখানি লইলেন এবং আবার কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— এই পাখা যেমন দেখছি, সামনে —— প্রত্যক্ষ —— ঠিক অমনি আমি (ঈশ্বরকে দেখেছি! আর দেখলাম ——

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের হৃদয়ে হাত দিয়া ইঙ্গিত করিতেছেন, আর নরেন্দ্রকে বলিতেছেন, “কি বললুম বল দেখি?”

নরেন্দ্র —— বুঝেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— বল দেখি?

নরেন্দ্র ভাল শুনিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ইঙ্গিত করিতেছেন, — দেখলাম, তিনি (ঈশ্বর) আর হৃদয় মধ্যে যিনি আছেন এক ব্যক্তি।

নরেন্দ্র — হাঁ, হাঁ, সোঽহম্‌।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তবে একটি রেখামাত্র আছে — (‘ভক্তের আমি’ আছে) সম্ভোগের জন্য।

নরেন্দ্র (মাস্টারকে) — মহাপুরুষ নিজে উদ্ধার হয়ে গিয়ে জীবের উদ্ধারের জন্য থাকেন, — অহঙ্কার নিয়ে থাকেন — দেহের সুখ-দুঃখ নিয়ে থাকেন।

“যেমন মুটেগিরি, আমাদের মুটেগিরি on compulsion (কারে পড়ে)। মহাপুরুষ মুটেগিরি করেন সখ করে।”

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গুরুকৃপা]

আবার সকলে চুপ করিয়া আছেন। অহেতুক-কৃপাসিন্ধু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কহিতেছেন। আপনি কে, এই তত্ত্ব নরেন্দ্রাদি ভক্তগণকে আবার বুঝাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি) — ছাদ তো দেখা যায়! — কিন্তু ছাদে উঠা বড় শক্ত!

নরেন্দ্র — আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তবে যদি কেউ উঠে থাকে, দড়ি ফেলে দিলে আর-একজনকে তুলে নিতে পারে।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পাঁচপ্রকার সমাধি]

“হৃষীকেশের সাধু এসেছিল। সে (আমাকে) বললে, কি আশ্চর্য! তোমাতে পাঁচপ্রকার সমাধি দেখলাম!

“কখন কপিবৎ — দেহবৃক্ষে বানরের ন্যায় মহাবায়ু যেন এ-ডাল থেকে ও-ডালে একেবারে লাফ দিয়ে উঠে, আর সমাধি হয়।

“কখন মীনবৎ — মাছ যেমন জলের ভিতরে সড়াৎ সড়াৎ করে যায় আর সুখে বেড়ায়, তেমনি মহাবায়ু দেহের ভিতর চলতে থাকে আর সমাধি হয়।

“কখন বা পক্ষীবৎ — দেহবৃক্ষে পাখির ন্যায় কখনও এডালে কখনও ও-ডালে।

“কখন পিপীলিকাবৎ — মহাবায়ু পিঁপড়ের মতো একটু একটু করে ভিতরে উঠতে থাকে, তারপর সহস্রারে বায়ু উঠলে সমাধি হয়। কখন বা তির্যক্‌বৎ — অর্থাৎ মাহবায়ুর গতি সর্পের ন্যায় আঁকা-ব্যাঁকা; তারপর সহস্রারে গিয়ে সমাধি।”

রাখাল (ভক্তদের প্রতি) — থাক আর কথায়, — অনেক কথা হয়ে গেল; — অসুখ করবে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৬, ১২ই এপ্রিল 1886/04/12

53.11 কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে সেই উপরের ঘরে শয্যার উপর বসিয়া আছেন। ঘরে শশী ও মণি। ঠাকুর মণিকে ইশারা করিতেছেন — পাখা করিতে। তিনি পাখা করিতেছেন।

বৈকাল বেলা ৫টা-৬টা। সোমবার চড়কসংক্রান্তি, বাসন্তী মহাষ্টমী পূজা। চৈত্র শুক্লাষ্টমী, ৩১শে চৈত্র, ১২ই এপ্রিল, ১৮৮৬।

পাড়াতেই চড়ক হইতেছে। ঠাকুর একজন ভক্তকে চড়কের কিছু কিছু জিনিস কিনিতে পাঠাইয়াছিলেন। ভক্তটি ফিরিয়া আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি কি আনলি?

ভক্ত — বাতাসা একপয়সা, বঁটি — দুপয়সা, হাতা — দুপয়সা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ছুরি কই?

ভক্ত — দুপয়সায় দিলে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যাগ্র হইয়া) — যা যা, ছুরি আন। মাস্টার নিচে বেড়াইতেছেন। নরেন্দ্র ও তারক কলিকাতা হইতে ফিরিলেন। গিরিশ ঘোষের বাড়ি ও অন্যান্য স্থানে গিয়াছিলেন।

তারক — আজ আমরা মাংস-টাংস অনেক খেলুম।

নরেন্দ্র — আজ মন অনেকটা নেমে গেছে। তপস্যা লাগাও।

(মাস্টারের প্রতি) — "কি Slavery (দাসত্ব) of body, — of mind! (শরীরের দাসত্ব — মনের দাসত্ব!) ঠিক যেন মুটের অবস্থা! শরীর-মন যেন আমার নয়, আর কারু।"

সন্ধ্যা হইয়াছে; উপরের ঘরে ও অন্যান্য স্থানে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর বিছানায় উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন; জগন্মাতার চিন্তা করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ফকির ঠাকুরের সম্মুখে অপরাধভঞ্জন স্তব পাঠ করিতেছেন। ফকির বলরামের পুরোহিতবংশীয়।

প্রাগ্‌দেহস্থো যদাসং তব চরণযুগং নাশ্রিতো নার্চিতোঽহং,

তেনাদ্যেঽকীর্তিবর্গৈর্জঠরজদহনৈর্বধ্যমানো বলিষ্ঠৈঃ,

স্থিত্বা জন্মান্তরে নো পুনরিহ ভবিতা ক্বাশ্রয়ঃ ক্বাপি সেবা,

ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে! ইত্যদি।

ঘরে শশী, মণি, আরও দু-একটি ভক্ত আছেন।

স্তবপাঠ সমাপ্ত হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অতি ভক্তিভাবে হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিতেছেন। মণি পাখা করিতেছেন। ঠাকুর ঈশারা করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন “একটি পাথরবাটি আনবে। (এই বলিয়া পাথরবাটির গঠন অঙ্গুলি দিয়া আঁকিয়া দেখাইলেন।) একপো, অত দুধ ধরবে? সাদা পাথর।”

মণি — আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আর সব বাটিতে ঝোল খেতে আঁষটে লাগে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৬, ১৩ই এপ্রিল 1886/04/13

53.12 ঈশ্বরকোটির কি কর্মফল, প্রারব্ধ আছে? যোগবাশিষ্ঠ

পরদিন মঙ্গলবার, রামনবমী; ১লা বৈশাখ, ১৩ই এপ্রিল, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। প্রাতঃকাল, — ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উপরের ঘরে শয্যায় বসিয়া আছেন। বেলা ৮টা-৯টা হইবে। মণি রাত্রে ছিলেন, প্রাতে গঙ্গা স্নান করিয়া আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন। রাম (দত্ত) সকালে আসিয়াছেন ও প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। রাম ফুলের মালা আনিয়াছেন ও ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। ভক্তেরা অনেকেই নিচে বসিয়া আছেন। দুই-একজন ঠাকুরের ঘরে আছেন। রাম ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি) — কিরকম দেখছ?

রাম — আপনার সবই আছে। এখনই রোগের সব কথা উঠবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিলেন ও সঙ্কেত করিয়া রামকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন — "রোগের কথাও উঠবে?"

ঠাকুরের চটিজুতা আছে, পায়ে লাগে। ডাক্তার রাজেন্দ্র দত্ত মাপ দিতে বলিয়াছেন, — তিনি ফরমাশ দিয়া আনিবেন। ঠাকুরের পায়ের মাপ লওয়া হইল। এই পাদুকা এখন বেলুড় মঠে পূজা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে সঙ্কেত করিতেছেন, "কই, পাথরবাটি?" মণি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, — কলিকাতায় পাথরবাটি আনিতে যাইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "থাক্ থাক্ এখন।"

মণি — আজ্ঞা না, এঁরা সব যাচ্ছেন, এই সঙ্গেই যাই।

মণি নূতন বাজারের জোড়াসাঁকোর চৌমাথায় একটি দোকান হইতে একটি সাদা পাথরবাটি কিনিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে, এমন সময়ে কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন ও ঠাকুরের কাছে আসিয়া প্রণাম করিয়া বাটিটি রাখিলেন। ঠাকুর সাদা বাটিটি হাতে করিয়া দেখিতেছেন। ডাক্তার রাজেন্দ্র দত্ত, গীতাহস্তে শ্রীনাথ ডাক্তার, শ্রীযুক্ত রাখাল হালদার, আরও কয়েজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরে রাখাল, শশী, ছোট নরেন প্রভৃতি ভক্তেরা আছেন। ডাক্তারেরা ঠাকুরের পীড়া সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ লইলেন।

শ্রীনাথ ডাক্তার (বন্ধুদের প্রতি) — সকলেই প্রকৃতির অধীন। কর্মফল কেউ এড়াতে পারে না! প্রারব্ধ!

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেন, — তাঁর নাম করলে, তাঁকে চিন্তা করলে, তাঁর শরণাগত হলে —

শ্রীনাথ — আজ্ঞে, প্রারব্ধ কোথা যাবে? — পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণ — খানিকটা কর্ম ভোগ হয়। কিন্তু তাঁর নামের গুণে অনেক কর্মপাশ কেটে যায়। একজন পূর্বজন্মের কর্মের দরুন সাত জন্ম কানা হত; কিন্তু সে গঙ্গাস্নান করলে। গঙ্গাস্নানে মুক্তি হয়। সে ব্যক্তির চক্ষু যেমন কানা সেইরকমই রইল, কিন্তু আর যে ছজন্ম সেটা হল না।

শ্রীনাথ — আজ্ঞে, শাস্ত্রে তো আছে, কর্মফল কারুরই এড়াবার জো নাই। [শ্রীনাথ ডাক্তার তর্ক করিতে উদ্যত।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি) — বল না, ঈশ্বরকোটির আর জীবকোটির অনেক তফাত। ঈশ্বরকোটির অপরাধ হয় না; বল না।

মণি চুপ করিয়া আছেন; মণি রাখলাকে বলিতেছেন, “তুমি বল।”

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তারেরা চলিয়া গেলেন। ঠাকুর শ্রীযুক্ত রাখাল হালদারের সহিত কথা কহিতেছেন।

হালদার — শ্রীনাথ ডা: বেদান্ত চর্চা করেন — যোগবাশিষ্ঠ পড়েন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সংসারী হয়ে, ‘সব স্বপ্নবৎ’ — এ-সব মত ভাল নয়।

একজন ভক্ত — কালিদাস বলে সেই লোকটি — তিনিও বেদান্ত চর্চা করেন; কিন্তু মোকদ্দমা করে সর্বস্বান্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — সব মায়া — আবার মোকদ্দমা! (রাখালের প্রতি) জনাইয়ের মুখুজ্জে প্রথমে লম্বা লম্বা কথা বলছিল; তারপর শেষকালে বেশ বুঝে গেল! আমি যদি ভাল থাকতুম ওদের সঙ্গে আর খানিকটা কথা কইতাম। জ্ঞান জ্ঞান কি করলেই হয়?

[কামজয় দৃষ্টে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের রোমাঞ্চ]

হালদার — অনেক জ্ঞান দেখা গেছে। একটু ভক্তি হলে বাঁচি। সেদিন একটা কথা মনে করে এসেছিলাম। তা আপনি মীমাংসা করে দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যগ্র হইয়া) — কি কি?

হালদার —— আজ্ঞে, এই ছেলেটি এলে বললেন যে —— জিতেন্দ্রিয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— হাঁ গো, ওর (ছোট নরেনের) ভিতর বিষয়বুদ্ধি আদপে ঢোকে নাই! ও বলে কাম কাকে বলে তা জানি না।

(মণির প্রতি) “হাত দিয়ে দেখ আমার রোমাঞ্চ হচ্চে!”

কাম নাই, এই শুদ্ধ অবস্থা মনে করিয়া ঠাকুরের রোমাঞ্চ হইতেছে। যেখানে কাম নাই সেখানে ঈশ্বর বর্তমান। এই কথা মনে করিয়া কি ঠাকুরের ঈশ্বরের উদ্দিপন হইতেছে? * * *

রাখাল হালদার বিদায় লইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। পাগলী তাঁহাকে দেখিবার জন্য বড়ই উপদ্রব করে। পাগলীর মধুর ভাব। বাগানে প্রায় আসে ও দৌড়ে দৌড়ে ঠাকুরের ঘরে এসে পড়ে। ভক্তেরা প্রহারও করেন, — কিন্তু তাহাতেও নিবৃত্ত হয় না।

শশী —— পাগলী এবার এলে ধাক্কা মেরে তাড়াব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (করুণামাখা স্বরে) — না, না। আসবে চলে যাবে।

রাখাল — আগে আগে অপর পাঁচজন ওঁর কাছে এলে আমার হিংসে হত। তারপর উনি কৃপা করে আমায় জানিয়ে দিয়েছেন, — মদ্‌গুরু শ্রীজগৎ গুরু! — উনি কি কেবল আমাদের জন্য এসেছেন?

শশী — তা নয় বটে, কিন্তু অসুখের সময় কেন? আর ও-রকম উপদ্রব।

রাখাল — উপদ্রব সব্বাই করে। সকলেই কি খাঁটি হয়ে ওঁর কাছে এসেছে? ওঁকে আমরা কষ্ট দিই নাই? নরেন্দ্র-টরেন্দ্র আগে কিরকম ছিল, কত তর্ক করত?

শশী — নরেন্দ্র যা মুখে বলত, কাজেও তা করত।

রাখাল — ডাক্তার সরকার কত কি ওঁকে বলছে! ধরতে গেলে কেহই নির্দোষ নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি, সস্নেহে) — কিছু খাবি?

রাখাল — না; — খাবো এখন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে সঙ্কেত করিতেছেন, তুমি আজ এখানে খাবে?

রাখাল — খান না, উনি বলছেন।

ঠাকুর পঞ্চম বর্ষীয় বালকের ন্যায় দিগম্বর হইয়া ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। এমন সময়ে পাগলী সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছে।

মণি (শশীকে আস্তে আস্তে) — নমস্কার করে যেতে বল, কিছু বলে কাজ নাই।

শশী পাগলীকে নামাইয়া দিলেন।

আজ নব বর্ষারম্ভ, মেয়ে ভক্তেরা অনেকে আসিয়াছেন। ঠাকুরকে ও শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিলেন ও তাঁহাদের আশীর্বাদ লইলেন। শ্রীযুক্ত বলরামের পরিবার, মণিমোহনের পরিবার, বাগবাজারের ব্রাহ্মণী ও অন্যান্য অনেক স্ত্রীলোক ভক্তেরা আসিয়াছেন। কেহ কেহ সন্তানাদি লইয়া আসিয়াছেন।

তাঁহারা ঠাকুরকে প্রণাম করিতে উপরের ঘরে আসিলেন। কেহ কেহ ঠাকুরকে পাদপদ্মে পুষ্প ও আবির দিলেন। ভক্তদের দুইটি ৯।১০ বর্ষের মেয়ে ঠাকুরকে গান শুনাইতেছেন:

জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই,

কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।

ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,

কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।।

গান - হরি হরি বলরে বীণে।

গান - ওই আসছে কিশোরী, ওই দেখ এলো

তোর নয়ন বাঁকা বংশীধারী।

গান - দুর্গানাম জপ সদা রসনা আমার,

দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনে কে করে উদ্ধার?

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন, “বেশ মা মা বলছে!”

ব্রাহ্মণীর ছেলেমান্‌সের স্বভাব। ঠাকুর হাসিয়া রাখালকে ইঙ্গিত করিতেছেন, “ওকে গান গাইতে বল না।” ব্রাহ্মণী গান গাইতেছেন। ভক্তেরা হাসিতেছেন।

‘হরি খেলব আজ তোমার সনে,

একলা পেয়েছি তোমায় নিধুবনে।’

মেয়েরা উপরের ঘর হইতে নিচে চলিয়া গেলেন।

বৈকাল বেলা। ঠাকুরের কাছে মণি ও দু-একটি ভক্ত বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিকই বলেন, নরেন্দ্র যেন খাপখোলা তলোয়ার লইয়া বেড়াইতেছেন।

[সন্ন্যাসির কঠিন নিয়ম ও নরেন্দ্র]

নরেন্দ্র আসিয়া ঠাকুরের কাছে বসিলেন। ঠাকুরকে শুনাইয়া নরেন্দ্র মেয়েদের সম্বন্ধে যৎপরোনাস্তি বিরক্তিভাব প্রকাশ করিতেছেন। মেয়েদের সঙ্গ ঈশ্বরলাভের ভয়ানক বিঘ্ন, — বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন কথা কহিতেছেন না, সকলি শুনিতেছেন।

নরেন্দ্র আবার বলিতেছেন, আমি চাই শান্তি, আমি ইশ্বর পর্যন্ত চাই না। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। মুখে কোন কথা নাই। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে সুর করিয়া বলিতেছেন — সত্যং জ্ঞানমনন্তম্‌।

রাত্রি আটটা। ঠাকুর শয্যাতে বসিয়া আছেন, দু-একটি ভক্তও সম্মুখে বসিয়া। সুরেন্দ্র আফিসের কার্য সারিয়া ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন, হস্তে চারিটি কমলালেবু ও দুইছড়া ফুলের মালা। সুরেন্দ্র ভক্তদের দিকে এক-একবার ও ঠাকুরের দিকে এক-একবার তাকাইতেছেন; আর হৃদয়ের কথা সমস্ত বলিতেছেন।

সুরেন্দ্র (মণি প্রভৃতির দিকে তাকাইয়া) — আফিসের কাজ সব সেরে এলাম। ভাবলাম, দুই নৌকায় পা দিয়ে কি হবে, কাজ সেরে আসাই ভাল। আজ ১লা বৈশাখ, আবার মঙ্গলবার; কালীঘাটে যাওয়া হল না। ভাবলাম যিনি কালী — যিনি কালী ঠিক চিনেছেন, তাঁকে দর্শন করলেই হবে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিতেছেন।

সুরেন্দ্র — গুরুদর্শনে, সাধুদর্শনে শুনেছি ফুল-ফল নিয়ে আসতে হয়। তাই এগুলি আনলাম। আপনার জন্যে টাকা খরচ, তা ভগবান মন দেখেন। কেউ একটি পয়সা দিতে কাতর, আবার কেউ বা হাজার টাকা খরচ করতে কিছুই বোধ করে না। ভগবান মনের ভক্তি দেখেন তবে গ্রহণ করেন।

ঠাকুর মাথা নাড়িয়া সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন, “তুমি ঠিক বলছ।” সুরেন্দ্র আবার বলিতেছেন, “কাল আসতে পারি নাই, সংক্রান্তি। আপনার ছবিকে ফুল দিয়ে সাজালুম।”

শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন, “আহা কি ভক্তি!”

সুরেন্দ্র — আসছিলাম, এই দুগাছা মালা আনলাম, চার আনা দাম।

ভক্তেরা প্রায় সকলেই চলিয়া গেলেন। ঠাকুর মণিকে পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে বলিতেছেন ও হাওয়া করিতে বলিতেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৬, ১৬ই এপ্রিল 1886/04/16/i

53.13 শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর উদ্যানে — গিরিশ ও মাস্টার

কাশীপুর বাগানের পূর্বধারে পুষ্করিণীর ঘাট। চাঁদ উঠিয়াছে। উদ্যানপথ ও উদ্যানের বৃক্ষগুলি চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়াছে। পুষ্করিণীর পাশ্চিমদিকে দ্বিতল গৃহ। উপরের ঘরে আলো জ্বলিতেছে, পুষ্করিণীর ঘাট হইতে সেই আলো খড়খড়ির মধ্য দিয়া আসিতেছে, তাহা দেখা যাইতেছে। কক্ষমধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শয্যার উপর বসিয়া আছেন। একটি-দুটি ভক্ত নিঃশব্দে কাছে বসিয়া আছেন বা এ-ঘর হইতে ও-ঘর যাইতেছেন। ঠাকুর অসুস্থ, চিকিৎসার্থে বাগানে আসিয়াছেন। ভক্তেরা সেবার্থ সঙ্গে আছেন। পুষ্করিণীর ঘাট হইতে নিচের তিনটি আলো দেখা যাইতেছে। একটি ঘরে ভক্তেরা থাকেন, তাহার আলো দেখা যাইতেছে। মা ঠাকুরের সেবার্থ আসিয়াছেন। তৃতীয় আলোটি রান্নাঘরের। সেই ঘর গৃহের

উত্তরদিকে। উদ্যান মধ্যস্থিত ওই দুতলা বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব কোণ হইতে একটি পথ পুষ্করিণীর ঘাটের দিকে গিয়াছে। পূর্বাস্য হইয়া ওই পথ দিয়া ঘাটে যাইতে হয়। পথের দুই ধারে, বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে, অনেক ফল-ফুলের গাছ।

চাঁদ উঠিয়াছে। পুকুরঘাটে গিরিশ, মাস্টার, লাটু আরও দুই-একটি ভক্ত বসিয়া আছেন। ঠাকুরের কথা হইতেছে। আজ শুক্রবার, ১৬ই এপ্রিল, ১৮৮৬, ৪ঠা বৈশাখ, ১২৯৩। চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশী।

কিয়ৎক্ষণ পরে গিরিশ ও মাস্টার ওই পথে বেড়াইতেছেন ও মাঝে মাঝে কথাবার্তা কহিতেছেন।

মাস্টার — কি সুন্দর চাঁদের আলো! কতকাল ধরে এই নিয়ম চলছে!

গিরিশ — কি করে জানলে?

মাস্টার — প্রকৃতির নিয়ম বদলায় না (Uniformity of Nature) আর বিলাতের লোকেরা নূতন নূতন নক্ষত্র টেলিস্‌কোপ দিয়ে দেখেছে। চাঁদে পাহাড় আছে, দেখেছে।

গিরিশ — তা বলা শক্ত, বিশ্বাস হয় না।

মাস্টার — কেন, টেলিস্‌কোপ দিয়ে ঠিক দেখা যায়।

গিরিশ — কেমন করে বলব, ঠিক দেখেছে। পৃথিবী আর চাঁদের মাঝখানে যদি আর কোন জিনিস থাকে, তার মধ্যে দিয়ে আলো আসতে আসতে হয়তো অমন দেখায়।

বাগানে ছোকরা ভক্তেরা ঠাকুরের সেবার জন্য সর্বদা থাকেন। নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, বাবুরাম, কালী, যোগীন, লাটু ইত্যাদি; তাঁহারা থাকেন। যে ভক্তেরা সংসার করিয়াছেন, কেহ কেহ প্রত্যহ আসেন ও মাঝে মাঝে রাত্রেও থাকেন। কেহ বা মধ্যে মধ্যে আসেন। আজ নরেন্দ্র, কালী ও তারক দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ির বাগানে গিয়াছেন। নরেন্দ্র সেখানে পঞ্চবটী বৃক্ষমূলে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিবেন; সাধন করিবেন। তাই দুই-একটি গুরুভাই সঙ্গে গিয়াছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৬, ১৬ই এপ্রিল 1886/04/16/ii

53.14 ঠাকুর গিরিশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে — ভক্তের প্রতি ঠাকুরের স্নেহ

[গিরিশ, লাটু, মাস্টার, বাবুরাম, নিরঞ্জন, রাখাল]

গিরিশ, লাটু, মাস্টার উপরে গিয়া দেখেন, ঠাকুর শয্যায় বসিয়া আছেন। শশী ও আরও দু-একটি ভক্ত সেবার্থ ওই ঘরে ছিলেন, ক্রমে বাবুরাম, নিরঞ্জন, রাখাল, ইঁহারাও আসিলেন।

ঘরটি বড়। ঠাকুরের শয্যার নিকট ঔষাধি ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসাদি রহিয়াছে। ঘরের উত্তরে একটি দ্বার আছে, সিঁড়ি হইতে উঠিয়া সেই দ্বার দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে হয়। সেই দ্বারের সামনাসামনি ঘরের দক্ষিণ গায়ে আর-একটি দ্বার আছে। সেই দ্বার দিয়া দক্ষিণের ছোট ছাদটিতে যাইয়া যায়। সেই ছাদের উপর দাঁড়াইলে বাগানের গাছপালা, চাঁদের আলো, অদূরে রাজপথ ইত্যাদি দেখা যায়।

ভক্তদের রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, তাঁহারা পালা করিয়া জাগেন। মশারি টাঙ্গাইয়া ঠাকুরকে শয়ন করাইয়া যে ভক্তটি ঘরে থাকিবেন, তিনি ঘরের পূর্বধারে মাদুর পাতিয়া কখনও বসিয়া, কখনও শুইয়া থাকেন। অসুস্থতানিবন্ধন ঠাকুরের প্রায় নিদ্রা নাই! তাই যিনি থাকেন, তিনি কয়েক ঘণ্টা প্রায় বসিয়া কাটাইয়া দেন।

আজ ঠাকুরের অসুখ কিছু কম। ভক্তেরা আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং ঠাকুরের সম্মুখে মেঝের উপর বসিলেন।

ঠাকুর আলোটি কাছে আনিতে মাস্টারকে আদেশ করিলেন। ঠাকুর গিরিশকে সস্নেহ সম্ভাষণ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি) — ভাল আছ? (লাটুর প্রতি) এঁকে তামাক খাওয়া। আর পান এনে দে।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিলেন, “কিছু জলখাবার এনে দে।”

লাটু — পানটান দিয়েছি। দোকান থেকে জলখাবার আনতে যাচ্ছে।

ঠাকুর বসিয়া আছেন। একটি ভক্ত কয়গাছি ফুলের মালা আনিয়া দিলেন। ঠাকুর নিজের গলায় একে একে সেগুলি ধারণ করিলেন। ঠাকুরের হৃদয়মধ্যে হরি আছেন, তাঁকেই বুঝি পূজা করিলেন। ভক্তেরা অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। দুইগাছি মালা গলা হইতে লইয়া গিরিশকে দিলেন।

ঠাকুর মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “জলখাবার কি এলো?”

মণি ঠাকুরকে পাখা করিতেছেন। ঠাকুরের কাছে একটি ভক্তপ্রদত্ত চন্দনকাষ্ঠের পাখা ছিল। ঠাকুর সেই পাখাখানি মণির হাতে দিলেন। মণি সেই পাখা লইয়া বাতাস করিতেছেন। মণি পাখা করিতেছেন, ঠাকুর দুইগাছি মালা গলা হইতে লইয়া তাঁহাকেও দিলেন।

লাটু ঠাকুরকে একটি ভক্তের কথা বলিতেছেন। তাঁহার একটি সাত-আট বৎসরের সন্তান প্রায় দেড় বৎসর হইল দেহত্যাগ করিয়াছে। সে ছেলেটি ঠাকুরকে কখন ভক্তসঙ্গে কখন কীর্তনানন্দে অনেকবার দর্শন করিয়াছিল।

লাটু (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — ইনি এঁর ছেলেটির বই দেখে কাল রাত্রে বড় কেঁদেছিলেন। পরিবারও ছেলের শোকে পাগলের মতো হয়ে গেছে। নিজের ছেলেপুলেকে মারে, আছড়ায়। ইনি এখানে মাঝে মাঝে থাকেন তাই বলে ভারী হেঙ্গাম করে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই শোকের কথা শুনিয়া যেন চিন্তিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

গিরিশ — অর্জুন অত গীতা-টীতা পড়ে অভিমন্যুর শোকে একেবারে মূর্চ্ছিত। তা এঁর ছেলের জন্য শোক কিছু আশ্চর্য নয়।

[সংসারে কি হলে ঈশ্বরলাভ হয়?]

গিরিশের জন্য জলখাবার আসিয়াছে। ফাগুর দোকানের গরম কচুরি, লুচি ও অন্যান্য মিষ্টান্ন। বরাহনগরে ফাগুর দোকান। ঠাকুর নিজে সেই সমস্ত খাবার সম্মুখে রাখাইয়া প্রসাদ করিয়া দিলেন। তারপর নিজে হাতে করিয়া খাবার গিরিশের হাতে দিলেন। বলিলেন, বেশ কচুরি।

গিরিশ সম্মুখে বসিয়া খাইতেছেন। গিরিশকে খাইবার জল দিতে হইবে। ঠাকুরের শয্যার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কুঁজায় করিয়া জল আছে। গ্রীষ্মকাল, বৈশাখ মাস। ঠাকুর বলিলেন, "এখানে বেশ জল আছে।"

ঠাকুর অতি অসুস্থ। দাঁড়াইবার শক্তি নাই।

ভক্তেরা অবাক্ হইয়া কি দেখিতেছেন? দেখিতেছেন — ঠাকুরের কোমরে কাপড় নাই। দিগম্বর! বালকের ন্যায় শয্যা হইতে এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। নিজে জল গড়াইয়া দিবেন। ভক্তদের নিশ্বাসবায়ু স্থির হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জল গড়াইলেন। গেলাস হইতে একটু জল হাতে লইয়া দেখিতেছেন, ঠাণ্ডা

কিনা। দেখিতেছেন জল তত ঠাণ্ডা নয়। অবশেষে অন্য ভাল জল পাওয়া যাইবে না বুঝিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওই জলই দিলেন।

গিরিশ খাবার খাইতেছেন। ভক্তগুলি চতুর্দিকে বসিয়া আছেন। মণি ঠাকুরকে পাখা করিতেছেন।

গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — দেবেনবাবু সংসারত্যাগ করবেন।

ঠাকুর সর্বদা কথা কহিতে পারেন না, বড় কষ্ট হয়। নিজের ওষ্ঠাধর অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন, "পরিবারদের খাওয়া-দাওয়া কিরূপে হবে — তাদের কিসে চলবে?"

গিরিশ — তা কি করবেন জানি না।

সকলে চুপ করিয়া আছেন। গিরিশ খাবার খাইতে খাইতে কথা আরম্ভ করিলেন।

গিরিশ — আচ্ছা, মহাশয় — কোনটা ঠিক! কষ্টে সংসার ছাড়া না সংসারে থেকে তাঁকে ডাকা?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — গীতায় দেখনি? অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে কর্ম করলে, সব মিথ্যা জেনে জ্ঞানের পর সংসারে থাকলে, ঠিক ঈশ্বরলাভ হয়।

"যারা কষ্টে ছাড়ে, তারা হীন থাকের লোক।

“সংসারী জ্ঞানী কিরকম জানো? যেমন সার্সীর ঘরে কেউ আছে। ভিতর বার দুই দেখতে পায়।”

আবার সকলে চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — কচুরি গরম আর খুব ভাল।

মাস্টার (গিরিশের প্রতি) — ফাগুর দোকানের কচুরি! বিখ্যাত।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— বিখ্যাত!

গিরিশ (খাইতে খাইতে, সহাস্যে) — বেশ কচুরি।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— লুচি থাক, কচুরি খাও। (মাস্টারকে) কচুরি কিন্তু রজোগুণের।

গিরিশ খাইতে খাইতে আবার কথা তুলিলেন।

[সংসারীর মন ও ঠিক ঠিক ত্যাগীর মনের প্রভেদ]

গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — আচ্ছা মহাশয়, মনটা এত উঁচু আছে, আবার নিচু হয় কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ —— সংসারে থাকতে গেলেই ও-রকম হয়। কখনও উঁচু, কখনও নিচু। কখনও বেশ ভক্তি হচ্ছে, আবার কমে যায়। কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে থাকতে হয় কিনা, তাই হয়। সংসারে ভক্ত কখন ঈশ্বরচিন্তা, হরিনাম করে; কখন বা

কামিনী-কাঞ্চনে মন দিয়ে ফেলে। যেমন সাধারণ মাছি — কখন সন্দেশে বসছে, কখন বা পচা ঘা বা বিষ্ঠাতেও বসে।

“ত্যাগীদের আলাদা কথা। তারা কামিনী-কাঞ্চন থেকে মন সরিয়ে এনে কেবল ঈশ্বরকে দিতে পারে; কেবল হরিরস পান করতে পারে। ঠিক ঠিক ত্যাগী হলে ঈশ্বর বই তাদের আর কিছু ভাল লাগে না। বিষয়কথা হলে উঠে যায়; ঈশ্বরীয় কথা হলে শুনে। ঠিক ঠিক ত্যাগী হলে নিজেরা ঈশ্বরকথা বই আর অন্যবাক্য মুখে আনে না।

“মৌমাছি কেবল ফুলে বসে — মধু খাবে বলে। অন্য কোন জিনিস মৌমাছির ভাল লাগে না।”

গিরিশ দক্ষিণের ছোট ছাদটির উপর হাত ধুইতে গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — ঈশ্বরের অনুগ্রহ চাই, তবে তাঁতে সব মন হয়। অনেকগুলো কচুরি খেলে, ওকে বলে এসো আজ আর কিছু না খায়।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৬, ১৬ই এপ্রিল 1886/04/16/iii

53.15 অবতার বেদবিধির পার — বৈধীভক্তি ও ভক্তি উন্মাদ

গিরিশ পুনর্বার ঘরে আসিয়া ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়াছেন ও পান খাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি) — রাখাল-টাখাল এখন বুঝেছে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ; কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা। ওরা যে সংসারে গিয়ে থাকে, সে জেনেশুনে। পরিবার আছে, ছেলেও হয়েছে — কিন্তু বুঝেছে যে সব মিথ্যা। অনিত্য। রাখাল-টাখাল এরা সংসারে লিপ্ত হবে না।

“যেমন পাঁকাল মাছ। পাঁকের ভিতর বাস, কিন্তু গায়ে পাঁকের দাগটি পর্যন্ত নাই!”

গিরিশ — মহাশয়, ও-সব আমি বুঝি না। মনে করলে সব্বাইকে নির্লিপ্ত আর শুদ্ধ করে দিতে পারেন। কি সংসারী কি ত্যাগী সব্বাইকে ভাল করে দিতে পারেন! মলয়ের হাওয়া বইলে, আমি বলি, সব কাঠ চন্দন হয় —

শ্রীরামকৃষ্ণ — সার না থাকলে চন্দন হয় না। শিমূল আরও কয়টি গাছ, এরা চন্দন হয় না।

গিরিশ — তা শুনি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আইনে এরূপ আছে।

গিরিশ — আপনার সব বে-আইনি!

ভক্তেরা অবাক্ হইয়া শুনিতেছেন। মণির হাতের পাখা এক-একবার স্থির হইয়া যাইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, তা হতে পারে; ভক্তি-নদী ওথলালে ডাঙ্গায় একবাঁশ জল।

“যখন ভক্তি উন্মাদ হয়, তখন বেদবিধি মানে না। দূর্বা তোলে; তা বাছে না! যা হাতে আসে, তাই লয়। তুলসী তোলে, পড়পড় করে ডাল ভাঙে! আহা কি অবস্থাই গেছে!

(মাস্টারের প্রতি) — “ভক্তি হলে আর কিছুই চাই না!”

মাস্টার — আজ্ঞা হাঁ।

[সীতা ও শ্রীরাধা — রামাবতার ও কৃষ্ণাবতারের বিভিন্ন ভাব]

শ্রীরামকৃষ্ণ — একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। রামাবতারে শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ফখ্য। কৃষ্ণাবতারে ও-সবও ছিল, আবার মধুরভাব।

“শ্রীমতীর মধুরভাব — ছেনালি আছে। সীতার শুদ্ধ সতীত্ব — ছেনালি নাই।

“তাঁরই লীলা। যখন যে ভাব।”

বিজয়ের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে একটি পাগলের মতো স্ত্রীলোক ঠাকুরকে গান শুনাইতে যাইত। শ্যামাবিষয়ক গান ও ব্রহ্ম সঙ্গীত। সকলে পাগলী বলে।

সে কাশীপুরের বাগানেও সর্বদা আসে ও ঠাকুরের কাছে যাবার জন্য বড় উপদ্রব করে। ভক্তদের সেই জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশাদি ভক্তের প্রতি) — পাগলীর মধুরভাব। দক্ষিণেশ্বরে একদিন গিছল। হঠাৎ কান্না। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন কাঁদছিস? তা বলে, মাথাব্যথা করছে। (সকলের হাস্য)

“আর-একদিন গিছল। আমি খেতে বসেছি। হঠাৎ বলছে, ‘দয়া করলেন না?’ আমি উদারবুদ্ধিতে খাচ্চি। তারপর বলছে, ‘মনে ঠেল্লেন কেন?’ জিজ্ঞাসা করলুম, ‘তোর কি ভাব?’ তা বললে, ‘মধুরভাব!’ আমি বললাম, ‘আরে আমার যে মাতৃযোনি! আমার যে সব মেয়েরা মা হয়!’ তখন বলে, ‘তা আমি জানি না।’ তখন রামলালকে ডাকলাম। বললাম, ‘ওরে রামলাল, কি মনে ঠ্যালাঠেলি বলছে শোন দেখি।’ ওর এখনও সেই ভাব আছে।”

গিরিশ — সে পাগলী — ধন্য! পাগল হোক আর ভক্তদের কাছে মারই খাক আপনার তো অষ্টপ্রহর চিন্তা করছে! সে যে ভাবেই করুক, তার কখনও মন্দ হবে না!

“মহাশয়, কি বলব! আপনাকে চিন্তা করে আমি কি ছিলাম, কি হয়েছি! আগে আলস্য ছিল, এখন সে আলস্য ঈশ্বরে নির্ভর হয়ে দাঁড়িয়েছে! পাপ ছিল, তাই এখন নিরহংকার হয়েছি! আর কি বলব!”

ভক্তেরা চুপ করিয়া আছেন। রাখাল পাগলীর কথা উল্লেখ করিয়া দুঃখ করিতেছেন। বললেন, দুঃখ হয়, সে উপদ্রব করে আর তার জন্য অনেকে কষ্টও পায়।

নিরঞ্জন (রাখালের প্রতি) — তোর মাগ আছে তাই তোর মন কেমন করে। আমরা তাকে বলিদান দিতে পারি।

রাখাল (বিরক্ত হইয়া) — কি বাহাদুরি! ওঁর সামনে ওই সব কথা!

[গিরিশকে উপদেশ — টাকায় আসক্তি — সদ্ব্যবহার — ডাক্তার কবিরাজের দ্রব্য]

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি) — কামিনী-কাঞ্চনই সংসার। অনেকে টাকা গায়ের রক্ত মনে করে। কিন্তু টাকাকে বেশি যত্ন করলে একদিন হয়তো সব বেরিয়ে যায়।

“আমাদের দেশে মাঠা আল বাঁধে। আল জানো? যারা খুব যত্ন করে চারিদিকে আল দেয়, তাদের আল জলের তোড়ে ভেঙে যায়। যরা একদিকে খুলে ঘাসের চাপড়া দিয়ে রাখে, তাদের কেমন পলি পড়ে, কত ধান হয়।

“যারা টাকার সদ্ব্যবহার করে, ঠাকুরসেবা, সাধু ভক্তের সেবা করে, দান করে তাদেরই কাজ হয়। তাদেরই ফসল হয়।

“আমি ডাক্তার কবিরাজের জিনিস খেতে পারি না। যারা লোকের কষ্ট থেকে টাকা রোজগার করে! ওদের ধন যেন রক্ত-পুঁজ!”

এই বলিয়া ঠাকুর দুইজন চিকিৎসকের নাম করিলেন।

গিরিশ — রাজেন্দ্র দত্তের খুব দরাজ মন; কারু কাছে একটি পয়সা লয় না। তার দান-ধ্যান আছে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

১৮৮৬, ১৭ই - ১৮ই এপ্রিল 1886/04/17 1886/04/18/i

53.16 কাশীপুর উদ্যানে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে বাস করিতেছেন। শরীর খুব অসুস্থ — কিন্তু ভক্তদের মঙ্গলের জন্য সর্বদাই ব্যাকুল। আজ শনিবার, ৫ই বৈশাখ, চৈত্র শুক্লা চতুর্দশী (১৭ই এপ্রিল, ১৮৮৬)। পূর্ণিমাও পড়িয়াছে।

কয়দিন ধরিয়া প্রায় প্রত্যহ নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছেন — পঞ্চবটীতে ঈশ্বরচিন্তা করেন — সাধনা করেন। আজ সন্ধ্যার সময় ফিরিলেন। সঙ্গে শ্রীযুক্ত তারক ও কালী।

রাত আটটা হইয়াছে। জ্যোৎস্না ও দক্ষিণে হাওয়া বাগানটিকে সুন্দর করিয়াছে। ভক্তেরা অনেকে নিচের ঘরে ধ্যান করিতেছেন। নরেন্দ্র মণিকে বলিতেছেন — “এরা ছাড়াচ্ছে” (অর্থাৎ ধ্যান করিতে করিতে উপাধি বর্জন করিতেছে)।

কিয়ৎক্ষণ পরে মণি উপরের হলঘরে ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর তাঁহাকে ডাবর ও গামছা পরিষ্কার করিয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন। তিনি পশ্চিমের পুষ্করিণীর ঘাট হইতে চাঁদের আলোতে ওইগুলি ধুইয়া আনিলেন।

পরদিন সকালে (১৮ই এপ্রিল, ৬ই বৈশাখ, ১২৯৩, পূর্ণিমা) ঠাকুর মণিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি গঙ্গাস্নানের পর ঠাকুরকে দর্শন করিয়া হলঘরের ছাদে গিয়াছিলেন।

মণির পরিবার পুত্রশোকে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাকে বাগানে আসিবার কথা ও এখানে আসিয়া প্রসাদ পাইতে বলিলেন।

ঠাকুর ইশারা করিয়া বলিতেছেন — “এখানে আসতে বলবে — দুদিন থাকবে; — কোলের ছেলেটিকে যেন নিয়ে আসে; — আর এখানে এসে খাবে।”

মণি — যে আজ্ঞা। খুব ঈশ্বরে ভক্তি হয়, তাহলে বেশ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ইশারা করিয়া বলিতেছেন — “উহুঁ: — (শোক) ঠেলে দেয় (ভক্তিকে)। আর এত বড় ছেলে!

"কৃষ্ণকিশোরের ভবনাথের মতো দুই ছেলে। দুটো আড়াইটে পাস। মারা গেল। অত বড় জ্ঞানী! — প্রথম প্রথম সামলাতে পারলে না। আমায় ভাগ্যিস ঈশ্বর দেন নি!

"অর্জুন অত বড় জ্ঞানী। সঙ্গে কৃষ্ণ। তবু অভিমন্যুর শোকে একেবারে অধীর! কিশোরী আসে না কেন?"

একজন ভক্ত — সে রোজ গঙ্গাস্নানে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এখানে আসে না কেন?

ভক্ত — আজ্ঞে আসতে বলব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (লাটুর প্রতি) — হরিশ আসে না কেন?

[মেয়েদের লজ্জাই ভূষণ — পূর্বকথা — মাস্টারের বাড়িতে শুভাগমন]

মাস্টারের বাটীর নয়-দশ বছরের দুইটি মেয়ে ঠাকুরের কাছে কাশীপুর বাগানে আসিয়া 'দুর্গানাম জপ সদা', 'মজলো আমার মন ভ্রমরা' ইত্যাদি গান শুনিয়াছিল। ঠাকুর যখন মাস্টারের শ্যামপুকুরের তেলিপাড়ার বাটিতে শুভাগমন করেন (৩০শে অক্টোবর, ১৮৮৪; ১৫ই কার্তিক, বৃসস্পতিবার, উত্থান একাদশীর দিন) তখন এই দুটি মেয়ে ঠাকুরকে গান শুনাইয়াছিল। ঠাকুর গান শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। যখন ঠাকুরের কাছে কাশীপুর বাগানে আজ তাহারা উপরে গান গাহিতেছিল, ভক্তেরা নিচে হইতে শুনিয়াছিলেন। তাঁহারা আবার তাহাদের নিচে ডাকাইয়া গান শুনিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — তোমার মেয়েদের আর গান শিখিও না। আপনা-আপনি গায় সে এক। যার তার কাছে গাইলে লজ্জা ভেঙে যাবে, লজ্জা মেয়েদের বড় দরকার।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মপূজা —– ভক্তদের প্রসাদ প্রদান]

ঠাকুরের সম্মুখে পুষ্পপাত্রে ফুল-চন্দন আনিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঠাকুর শয্যায় বসিয়া আছেন। ফুল-চন্দন দিয়া আপনাকেই পূজা করিতেছেন। সচন্দন পুষ্প কখনও মস্তকে, কখনও কণ্ঠে, কখনও হৃদয়ে, কখনও নাভিদেশে, ধারণ করিতেছেন।

মনোমোহন কোন্নগর হইতে আসিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। ঠাকুর আপনাকে এখনও পূজা করিতেছেন। নিজের গলায় পুষ্পমালা দিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে যেন প্রসন্ন হইয়া মনোমোহনকে নির্মাল্য প্রদান করিলেন। মণিকে একটি চম্পক দিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৬, ১৮ই এপ্রিল 1886/04/18/ii

53.17 বুদ্ধদেব কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানতেন? নরেন্দ্রকে শিক্ষা

বেলা নয়টা হইয়াছে, ঠাকুর মাস্টারের সহিত কথা কহিতেছেন, ঘরে শশীও আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — নরেন্দ্র আর শশী কি বলছিল — কি বিচার করছিল?

মাস্টার (শশীর প্রতি) — কি কথা হচ্ছিল গা?

শশী — নিরঞ্জন বুঝি বলেছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — 'ঈশ্বর নাস্তি অস্তি', এই সব কি কথা হচ্ছিল?

শশী (সহাস্যে) — নরেন্দ্রকে ডাকব?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ডাক। [নরেন্দ্র আসিয়া উপবেশন করিলেন।]

(মাস্টারের প্রতি) — "তুমি কিছু জিজ্ঞাসা কর। কি কথা হচ্ছিল, বল।"

নরেন্দ্র — পেট গরম হয়েছে। ও আর কি বলবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সেরে যাবে।

মাস্টার (সহাস্যে) — বুদ্ধ অবস্থা কিরকম?

নরেন্দ্র — আমার কি হয়েছে, তাই বলবো।

মাস্টার — ঈশ্বর আছেন — তিনি কি বলেন?

নরেন্দ্র — ঈশ্বর আছেন কি করে বলছেন? তুমিই জগৎ সৃষ্টি করছো। Berkely কি বলেছেন, জানো তো?

মাস্টার — হাঁ, তিনি বলেছেন বটে — Their esse is percipii (The existence of external objects depends upon their perception.) — "যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ের কাজ চলেছে, ততক্ষণই জগৎ!'

[পূর্বকথা — তোতাপুরীর ঠাকুরকে উপদেশ — "মনেই জগৎ"]

শ্রীরামকৃষ্ণ — ন্যাংটা বলত, "মনেই জগৎ, আবার মনেতেই লয় হয়।'

"কিন্তু যতক্ষণ আমি আছে, ততক্ষণ সেব্য-সেবকই ভাল।"

নরেন্দ্র (মাস্টারের প্রতি) — বিচার যদি কর, তাহলে ঈশ্বর আছেন, কেমন করে বলবে? আর বিশ্বাসের উপর যদি যাও, তাহলে সেব্য-সেবক মানতেই হবে। তা যাদি মানো — আর মানতেই হবে — তাহলে দয়াময়ও বলতে হবে।

"তুমি কেবল দুঃখটাই মনে করে রেখেছো। তিনি যে এত সুখ দিয়েছেন — তা ভুলে যাও কেন? তাঁর কত কৃপা! তিনটি বড় বড় জিনিস আমাদের দিয়েছেন

— মানুষজন্ম, ঈশ্বরকে জানবার ব্যাকুলতা, আর মহাপুরুষের সঙ্গ দিয়েছেন। মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ।”

সকলে চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) — আমার কিন্তু বেশ বোধ হয়, ভিতরে একটি আছে।

রাজেন্দ্রলাল দত্ত আসিয়া বসিলেন। হোমিওপ্যাথিক মতে ঠাকুরের চিকিৎসা করিতেছেন। ঔষধাদির কথা হইয়া গেলে, ঠাকুর অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া মনোমোহনকে দেখাইতেছেন।

ডাক্তার রাজেন্দ্র — উনি আমার মামাতো ভাইয়ের ছেলে।

নরেন্দ্র নিচে আসিয়াছেন। আপনা-আপনি গান গাহিতেছেন:

সব দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে, মোহিলে প্রাণ।
সপ্তলোক ভুলে শোক, তোমারে পাইয়ে,
কোথা আমি অতি দীন-হীন।

নরেন্দ্রের একটু পেটের অসুখ করিয়াছে। মাস্টারকে বলিতেছেন — “প্রেম-ভক্তির পথে থাকলে দেহে মন আসে। তা না হলে আমি কে? মানুষও নই — দেবতাও নই — আমার সুখও নাই, দুঃখও নাই।”

[ঠাকুরের আত্মপূজা — সুরেন্দ্রকে প্রসাদ — সুরেন্দ্রের সেবা]

রাত্রি নয়টা হইল। সুরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা ঠাকুরের কাছে পুষ্পমালা আনিয়া নিবেদন করিয়াছেন! ঘরে বাবুরাম, সুরেন্দ্র, লাটু, মাস্টার প্রভৃতি আছেন।

ঠাকুর সুরেন্দ্রের মালা নিজে গলায় ধারণ করিয়াছেন, সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। যিনি অন্তরে আছেন, ঠাকুর তাঁহারই বুঝি পূজা করিতেছেন!

হঠাৎ সুরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিতেছেন। সুরেন্দ্র শয্যার কাছে আসিলে প্রসাদীমালা (যে মালা নিজে পরিয়াছিলেন) লইয়া নিজে তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলেন!

সুরেন্দ্র মালা পাইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর আবার তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে বলিতেছেন। সুরেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ ঠাকুরের পদসেবা করিলেন।

[কাশীপুর উদ্যানে ভক্তগণের সংকীর্তন]

ঠাকুর যে ঘরে আছেন, তাহার পশ্চিমদিকে একটি পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিনীর ঘাটের চাতালে কয়েকটি ভক্ত খোল-করতাল লইয়া গান গাইতেছেন। ঠাকুর লাটুকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন — “তোমরা একটু হরিনাম কর।”

মাস্টার, বাবুরাম প্রভৃতি এখনও ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। তাঁহারা শুনিতেছেন, ভক্তেরা গাইতেছেন:

হরি বোলে আমার গৌর নাচে।

ঠাকুর গান শুনিতে শুনিতে বাবুরাম, মাস্টার প্রভৃতিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন —— “তোমরা নিচে যাও। ওদের সঙ্গে গান কর, — আর নাচবে।”

তাঁহারা নিচে আসিয়া কীর্তনে যোগদান করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার লোক পাঠাইয়াছেন। বলেছেন, এই আখরগুলি দেবে —— “গৌর নাচতেও জানে রে! গৌরের ভাবের বালাই যাই রে! গৌর আমার নাচে দুই বাহু তুলে!”

কীর্তন সমাপ্ত হইল। সুরেন্দ্র ভাবাবিষ্টপ্রায় হইয়া গাইতেছেন ——

আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা।
আমি তাদের পাগল ছেলে, আমার মায়ের নাম শ্যামা।।
বাবা বব বম্‌ বলে, মদ খেয়ে মা গায়ে পড়ে ঢলে,
শ্যামার এলোকেশে দোলে;
রাঙা পায়ে ভ্রমর গাজে, ওই নূপুর বাজে শুন না।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৬, ২১শে এপ্রিল 1886/04/21

53.18 নরেন্দ্র ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব — ভবনাথ, পূর্ণ, সুরেন্দ্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া হীরানন্দ গাড়িতে উঠিতেছেন। গাড়ির কাছে নরেন্দ্র, রাখাল দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত মিষ্টালাপ করিতেছেন। বেলা দশটা। হীরানন্দ আবার কাল আসিবেন।

আজ বুধবার, ৯ই বৈশাখ, চৈত্র কৃষ্ণা তৃতীয়া। ২১শে এপ্রিল, ১৮৮৬। নরেন্দ্র উদ্যানপথে বেড়াইতে বেড়াইতে মণির সহিত কথা কহিতেছেন। বাটিতে মা ও ভাইদের বড় কষ্ট — এখনও সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন নাই। তজ্জন্য চিন্তিত আছেন।

নরেন্দ্র — বিদ্যাসাগরের ইস্কুলের কর্ম আর আমার দরকার নাই। গয়াতে যাব মনে করেছি। একটা জমিদারীর ম্যানেজারের কর্মের কথা একজন বলেছে। ঈশ্বর-টীশ্বর নাই।

মণি (সহাস্যে) — সে তুমি এখন বলছ; পরে বলবে না। Scepticism ঈশ্বরলাভের পথের একটা স্টেজ; এই সব স্টেজ পার হলে আরও এগিয়ে পড়লে তবে ভগবানকে পাওয়া যায়, — পরমহংসদেব বলেছেন।

নরেন্দ্র — যেমন গাছ দেখছি, অমনি করে কেউ ভগবানকে দেখেছে?

মণি — হাঁ, ঠাকুর দেখেছেন।

নরেন্দ্র — সে মনের ভুল হতে পারে।

মণি — জে যে অবস্থায় যা দেখে, সেই অবস্থায় তা তার পক্ষে রীয়্যালিটি (সত্য)। যতক্ষণ স্বপন দেখছ। একটা বাগানে গিয়েছ, ততক্ষণ বাগানটি তোমার পক্ষে রীয়্যালিটি; কিন্তু তোমার অবস্থা বদলালে — যেমন জাগরণ অবস্থায় — তোমার ওটা ভুল বলে বোধ হতে পারে! যে অবস্থায় ঈশ্বরদর্শন করা যায়, — সে অবস্থা হলে তখন রীয়্যালিটি (সত্য) বোধ হবে।

নরেন্দ্র — আমি ট্রুথ চাই। সেদিন পরমহংস মহাশয়ের সঙ্গেই খুব তর্ক করলাম।

মণি (সহাস্যে) — কি হয়েছিল?

নরেন্দ্র — উনি আমায় বলছিলেন, ‘আমাকে কেউ কেউ ঈশ্বর বলে।’ আমি বললাম, ‘হাজার লোকে ঈশ্বর বলুক, আমার যতক্ষণ সত্য বলে না বোধ হয়, ততক্ষণ বলব না।’

“তিনি বললেন — ‘অনেকে যা বলবে, তাই তো সত্য — তাই তো ধর্ম!’

“আমি বললাম, ‘নিজে ঠিক না বুঝলে অন্য লোকের কথা শুনব না’।”

মণি (সহাস্যে) — তোমার ভাব Copernicus, Berkeley — এদের মতো। জগতের লোক বললছে, — সূর্য চলছে, Copernicus তা শুনলে না; জগতের লোক বলছে External World (জগৎ) আছে, Berkeley তা শুনলে না। তাই Lewis বলেছেন, ‘Why was not Berkeley a philosophical Copernicus?’

নরেন্দ্র — একখানা History of philosophy দিতে পারেন?

মণি — কি, Lewis?

নরেন্দ্র — না, Ueberweg; — German পড়তে হবে।

মণি — তুমি বলছো, সামনে গাছের মতন কেউ কি দেখেছে? তা ঈশ্বর মানুষ হয়ে যদি এসে বলেন, ‘আমি ঈশ্বর!’ তাহলে তুমি কি বিশ্বাস করবে? তুমি ল্যাজারাস্-এর গল্প তো জান? যখন ল্যাজারাস্ পরলোকে গিয়ে এব্রাহাম-কে বললে যে, আমি আত্মীয়বন্ধুদের বলে আসি যে সত্যই পরলোক আর নরক আছে। এব্রাহাম বললেন, তুমি গিয়ে বললে কি তারা বিশ্বাস করবে? তারা বলবে, কে একটা জোচ্চোর এসে এই সব কথা বলছে।

“ঠাকুর বলছেন, তাঁকে বিচার করে জানা যায় না। বিশ্বাসেই সমস্ত হয়, — জ্ঞান, বিজ্ঞান। দর্শন, আলাপ, — সব।”

ভবনাথ বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার অন্নচিন্তা হইয়াছে। তিনি মাস্টারের কাছে আসিয়া বলিতেছেন, “বিদ্যাসাগরের নূতন ইস্কুল হবে, শুনলাম। আমারও তো খ্যাঁটের যোগাড় করতে হবে। ইস্কুলের একটা কাজ করলে হয় না?”

[রামলাল — পূর্ণের গাড়িভাড়া — সুরেন্দ্রের খসখসের পরদা]

বেলা তিনটে-চারটে। ঠাকুর শুইয়া আছেন। রামলাল পদসেবা করিতেছেন। ঘরে সিঁথির গোপাল ও মণি আছেন। রামলাল দক্ষিণেশ্বর হইতে আজ ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন।

ঠাকুর মণিকে জানালা বন্ধ করিয়া দিতে — ও পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে বলিতেছেন।

শ্রীযুক্ত পূর্ণকে গাড়িভাড়া করিয়া কাশীপুরের উদ্যানে আসিতে বলিয়াছিলেন। তিনি দর্শন করিয়া গিয়াছেন। গাড়িভাড়া মণি দিবেন। ঠাকুর গোপালকে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "এঁর কাছে (টাকা) পেয়েছ?"

গোপাল — আজ্ঞা, হাঁ।

রাত নয়টা হইল। সুরেন্দ্র, রাম প্রভৃতি কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন।

বৈশাখ মাসের রৌদ্র — দিনের বেলা ঠাকুরের ঘর বড়ই গরম হয়। সুরেন্দ্র তাই খসখস আনিয়া দিয়াছেন। পরদা করিয়া জানালায় টাঙ্গাইয়া দিলে ঘর বেশ ঠাণ্ডা হইবে।

সুরেন্দ্র — কই, খসখস কেউ পরদা করে টাঙ্গিয়ে দিলে না? — কেউ মনোযোগ করে না।

একজন ভক্ত (সহাস্যে) — ভক্তদের এখন ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা। এখন 'সোঽহম্' — জগৎ মিথ্যা। আবার 'তুমি প্রভু, আমি দাস' এই ভাব যখন আসবে তখন এই সব সেবা হবে! (সকলের হাস্য)

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৬, ২২শে এপ্রিল 1886/04/22/i

53.19 রাখাল, শশী, মাস্টার, নরেন্দ্র, ভবনাথ, সুরেন্দ্র, রাজেন্দ্র, ডাক্তার

কাশীপুরের বাগান। রাখাল, শশী ও মাস্টার সন্ধ্যার সময় উদ্যানপথে পাদচারণ করিতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পীড়িত — বাগানে চিকিৎসা করাইতে আসিয়াছেন। তিনি উপরে দ্বিতলের ঘরে আছেন, ভক্তেরা তাঁহার সেবা করিতেছেন। আজ বৃহস্পতিবার, ২২শে এপ্রিল ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ, গুড ফ্রাইডে-এর পূর্বদিন।

মাস্টার — তিনি তো গুণাতীত বালক।

শশী ও রাখাল — ঠাকুর বলেছেন, তাঁর ওই অবস্থা।

রাখাল — যেমন একটা টাওয়ার। সেখানে বসে সব খবর পাওয়া যায়, দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু কেউ যেতে পারে না, কেউ নাগাল পায় না।

মাস্টার — ইনি বলেছেন, এ-অবস্থায় সর্বদা ঈশ্বরদর্শন হতে পারে। বিষয়রস নাই, তাই শুষ্ক কাঠ শীঘ্র ধরে যায়।

শশী — বুদ্ধি কত রকম, চারুকে বলছিলেন। যে বুদ্ধিতে ভগবানলাভ হয়, সেই ঠিক বুদ্ধি। যে বুদ্ধিতে টাকা হয়, বাড়ি হয়, ডেপুটির কর্ম হয়, উকিল হয় সে বুদ্ধি চিঁড়েভেজা বুদ্ধি। সে বুদ্ধিতে জোলো দইয়ের মতো চিঁড়েটা ভেজে মাত্র। শুকো দইয়ের মতো উঁচুদরের দই নয়। যে বুদ্ধিতে ভগবানলাভ হয়, সেই বুদ্ধিই শুকো দইয়ের মতো উৎকৃষ্ট দই।

মাস্টার — আহা! কি কথা!

শশী — কালী তপস্বী ঠাকুরের কাছে বলেছিলেন, ‘কি হবে আনন্দ? ভীলদের তো আনন্দ আছে। অসভ্য হো-হো নাচছে-গাইছে।’

রাখাল — উনি বললেন, সে কি? ব্রহ্মানন্দ আর বিষয়ানন্দ এক? জীবেরা বিষয়ানন্দ নিয়ে আছে। বিষয়াসক্তি সব না গেলে ব্রহ্মানন্দ হয় না। একদিকে টাকার আনন্দ, ইন্দ্রিয়সুখের আনন্দ, আর-একদিকে ঈশ্বরকে পেয়ে আনন্দ। এই দুই কখন সমান হতে পারে? ঋষিরা এ ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেছিলেন।

মাস্টার — কালী এখন বুদ্ধদেবকে চিন্তা করেন কিনা তাই সব আনন্দের পারের কথা বলছেন।

রাখাল — তাঁর কাছেও বুদ্ধদেবের কথা তুলেছিল। পরমহংসদেব বললেন, “বুদ্ধদেব অবতার, তাঁর সঙ্গে কি ধরা? বড় ঘরের বড় কথা।” কালী বলেছিল, “তাঁর শক্তি তো সব। সেই শক্তিতেই ঈশ্বরের আনন্দ আর সেই শক্তিতেই তো বিষয়ানন্দ হয় —”

মাস্টার — ইনি কি বললেন?

রাখাল — ইনি বললেন, সে কি? সন্তান উৎপাদনের শক্তি আর ঈশ্বরলাভের শক্তি কি এক?

[শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে — “কামিনী-কাঞ্চন বড় জঞ্জাল”]

বাগানের সেই দোতলার ‘হল’ ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। শরীর উত্তরোত্তর অসুস্থ হইতেছে, আজ আবার ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার ও ডাক্তার রাজেন্দ্র দত্ত দেখিতে আসিয়াছেন — যদি চিকিৎসার দ্বারা কোন উপকার হয়। ঘরে নরেন্দ্র, রাখাল, শশী, সুরেন্দ্র, মাস্টার, ভবনাথ ও অন্যন্য অনেক ভক্তেরা আছেন।

বাগানটি পাকপারার বাবুদের। ভাড়া দিতে হয় — প্রায় ৬০ - ৬৫ টাকা। ছোকরা ভক্তেরা প্রায় বাগানেই থাকেন। তাঁহারাই নিশিদিন ঠাকুরের সেবা করেন। গৃহী ভক্তেরা সর্বদা আসেন ও মাঝে মাঝে রাত্রেও থাকেন। তাঁহাদেরও নিশিদিন ঠাকুরের সেবা করিবার ইচ্ছা। কিন্তু সকলে কর্মে বদ্ধ — কোন না কোন কর্ম করিতে হয়। সর্বদা ওখানে থাকিয়া সেবা করিতে পারেন না। বাগানের খরচ চালাইবার জন্য যাহার যাহা শক্তি ঠাকুরের সেবার্থ প্রদান করেন; অধিকাংশ খরচ সুরেন্দ্র দেন! তাঁহারই নামে বাগানভাড়ার লেখাপড়া হইয়াছে। একটি পাচক ব্রাহ্মণ ও একটি দাসী সর্বদা নিযুক্ত আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তার সরকার ইত্যদির প্রতি) — বড় খরচা হচ্ছে।

ডাক্তার (ভক্তদিগকে দেখাইয়া) — তা এরা সব প্রস্তুত। বাগানের খরচ সমস্ত দিতে এদের কোন কষ্ট নাই। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — এখন দেখ, কাঞ্চন চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) — বল্ না?

ঠাকুর নরেন্দ্রকে উত্তর দিতে আদেশ করিলেন। নরেন্দ্র চুপ করিয়া আছেন। ডাক্তার আবার কথা কহিতেছেন।

ডাক্তার — কাঞ্চন চাই। আবার কামিনীও চাই।

রাজেন্দ্র ডাক্তার — এঁর পরিবার রেঁধে বেড়ে দিচ্ছেন।

ডাক্তার সরকার (ঠাকুরের প্রতি) — দেখলে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈষৎ হাস্য করিয়া) — বড় জঞ্জাল!

ডাক্তার সরকার — জঞ্জাল না থাকলে তো সবাই পরমহংস।

শ্রীরামকৃষ্ণ — স্ত্রীলোক গায়ে ঠেকলে অসুখ হয়; যেখানে ঠেকে সেখানটা ঝনঝন করে, যেন শিঙি মাছের কাঁটা বিঁধলো।

ডাক্তার — তা বিশ্বাস হয়, — তবে না হলে চলে কই?

শ্রীরামকৃষ্ণ — টাকা হাতে করলে হাত বেঁকে যায়! নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। টাকাতে যদি কেউ বিদ্যার সংসার করে, — ঈশ্বরের সেবা — সাধু-ভক্তের সেবা করে — তাতে দোষ নাই।

“স্ত্রীলোক নিয়ে মায়ার সংসার করা! তাতে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। যিনি জগতের মা, তিনিই এই মায়ার রূপ — স্ত্রীলোকের রূপ ধরেছেন। এটি ঠিক জানলে আর মায়ার সংসার করতে ইচ্ছা হয় না। সব স্ত্রীলোককে ঠিক মা বোধ হলে তবে বিদ্যার সংসার করতে পারে। ঈশ্বর দর্শন না হলে স্ত্রীলোক কি বস্তু বোঝা যায় না।”

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাইয়া ঠাকুর কয়দিন একটু ভাল আছেন।

রাজেন্দ্র সেরে উঠে আপনার হোমিওপ্যাথি মতে ডাক্তারি করতে হবে। আর তা না হলে বেঁচে বা কি ফল? (সকলের হাস্য)

নরেন্দ্র — Nothing like leather (যে মুচির কাজ করে, সে বলে, চামড়ার মতো উৎকৃষ্ট জিনিস এ জগতে আর কিছু নাই।) (সকলের হাস্য)

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তারেরা চলিয়া গেলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

বিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৬, ২২শে এপ্রিল 1886/04/22/ii

53.20 শ্রীরামকৃষ্ণ কেন কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করেছেন?

ঠাকুর মাস্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। ‘কামিনী’ সম্বন্ধে আপনার অবস্থা বলিতেছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — এরা কামিনী-কাঞ্চন না হলে চলে না, বলছে। আমার যে কি অবস্থা তা জানে না।

“মেয়েদের গায়ে হাত লাগলে হাত আড়ষ্ট, ঝনঝন করে।

“যদি আত্মীয়তা করে কাছে গিয়ে কথা কইতে যাই, মাঝে যেন কি একটা আড়াল থাকে, সে আড়ালের ওদিকে যাবার জো নাই।

“ঘরে একলা বসে আছি, এমন সময় যদি কোন মেয়ে এসে পড়ে, তাহলে একেবারে বালকের অবস্থা হয়ে যাবে; আর সেই মেয়েকে মা বলে জ্ঞান হবে।”

মাস্টার অবাক্ হইয়া ঠাকুরের বিছানার কাছে বসিয়া এই সকল কথা শুনিতছেন। বিছানা হইতে একটু দূরে ভবনাথের সহিত নরেন্দ্র কথা কহিতেছেন। ভবনাথ বিবাহ করিয়াছেন; — কর্ম কাজের চেষ্টা করিতেছেন। কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরকে দেখিতে আসিতে বেশি পারেন না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভবনাথের জন্য বড় চিন্তিত থাকেন, কেন না ভবনাথ সংসারে পড়িয়াছেন। ভবনাথের বয়স ২৩। ২৪ হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) — ওকে খুব সাহস দে।

নরেন্দ্র ও ভবনাথ ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিতে লাগিলেন। ঠাকুর ইশারা করিয়া আবার ভবনাথকে বলিতেছেন — “খুব বীরপুরুষ হবি। ঘোমটা দিয়ে কান্নাতে ভুলোসনে। শিকনি ফেলতে ফেলতে কান্না! (নরেন্দ্র ও মাস্টারের হাস্য)

“ভগবানেতে মন ঠিক রাখবি; যে বীরপুরুষ সে রমণীর সঙ্গে থাকে, না করে রমণ! পরিবারের সঙ্গে কেবল ঈশ্বরীয় কথা কবি।”

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার ইশারা করিয়া ভবনাথকে বলিতেছেন, “আজ এখানে খাস।”

ভবনাথ — জে আজ্ঞা। আমি বেশ আছি।

সুরেন্দ্র আসিয়া বসিয়াছেন। বৈশাখ মাস। ভক্তেরা ঠাকুরকে সন্ধ্যার পর প্রত্যহ মালা আনিয়া দেন। সেই মালাগুলি ঠাকুর এক-একটি করিয়া গলায় ধারণ করেন। সুরেন্দ্র নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। ঠাকুর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দুইগাছি মালা দিলেন। সুরেন্দ্রও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সেই মালা মস্তকে ধারণ করিয়া গলায় পরিলেন।

সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া আছেন ও ঠাকুরকে দেখিতেছেন। এইবার সুরেন্দ্র ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; তিনি বিদায় গ্রহণ করিবেন। যাইবার সময় ভবনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, খসখসের পর্দা টাঙিয়ে দিও। বড় গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। ঠাকুরের উপরের হলঘর দিনের বেলায় বড় গরম হয়। তাই সুরেন্দ্র খসখসের পর্দা করিয়া আনিয়াছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

একবিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৬, ২২শে এপ্রিল 1886/04/22/iii

53.21 শ্রীরামকৃষ্ণ হীরানন্দ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে কাশীপুরের বাগানে

[ঠাকুরের উপদেশ — “যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়” — নরেন্দ্র ও হীরানন্দের চরিত্র]

কাশীপুরের বাগান। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উপরের হলঘরে বসিয়া আছেন। সম্মুখে হীরানন্দ, মাস্টার, আরও দু-একটি ভক্ত, আর হীরানন্দের সঙ্গে দুইজন বন্ধু আসিয়াছেন। হীরানন্দ সিন্ধুদেশনবাসী। কলিকাতার কলেজে পড়াশুনা করিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়া সেখানে এতদিন ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখ হইয়াছে শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। সিন্ধুদেশ কলিকাতা হইতে প্রায় এগার শত ক্রোশ হইবে। হীরানন্দকে দেখিবার জন্য ঠাকুর ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

ঠাকুর হীরানন্দের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া মাস্টারকে ইঙ্গিত করিলেন, — যেন বলিতেছেন, ছোকরাটি খুব ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আলাপ আছে?

মাস্টার — আজ্ঞে আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হীরানন্দ ও মাস্টারের প্রতি) — তোমরা একটু কথা কও, আমি শুনি।

মাস্টার চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “নরেন্দ্র আছে? তাকে ডেকে আন।”

নরেন্দ্র উপরে আসিলেন ও ঠাকুরের কাছে বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্র ও হীরানন্দকে) — একটু দুজনে কথা কও।

হীরানন্দ চুপ করিয়া আছেন। অনেক ইতস্তত করিয়া তিনি কথা আরম্ভ করিলেন।

হীরানন্দ (নরেন্দ্রের প্রতি) — আচ্ছা, ভক্তের দুঃখ কেন?

হীরানন্দর কথাগুলি যেন মধুর ন্যায় মিষ্ট। কথাগুলি যাঁহারা শুনিলেন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, এঁর হৃদয় প্রেমপূর্ণ।

নরেন্দ্র — The scheme of the universe is devilish! I could have created a beter world! (এ জগতের বন্দোবস্ত দেখে বোধ হয় যে, শয়তানে করেছে, আমি এর চেয়ে ভাল জগৎ সৃষ্টি করতে পারতাম।)

হীরানন্দ — দুঃখ না থাকলে কি সুখ বোধ হয়?

নরেন্দ্র — I am giving no scheme of the universe but simply my opinion of the present scheme. (জগৎ কি উপাদানে সৃষ্টি করতে হবে, আমি তা বলছি না। আমি বলছি — যে বন্দোবস্ত সামনে দেখছি, সে বন্দোবস্ত ভাল নয়।)

“তবে একটা বিশ্বাস করলে সব চুকে যায়। Our only refuge is in pantheism: সবই ঈশ্বর, — এই বিশ্বাস হলেই চুকে যায়! আমিই সব করছি।”

হীরানন্দ — ও-কথা বলা সোজা।

নরেন্দ্র নির্বাণষট্‌কম্‌ সুর করিয়া বলিতেছেন:

ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্‌।। ১
ন চ প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চবায়ুর্ন বা সপ্তধাতুর্ন বা পঞ্চকোষাঃ।
না বাক্‌পাণিপাদং ন চোপস্থপায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্‌।। ২
ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লাভমোহৌ মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্যভাবঃ।
ন ধর্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্‌।। ৩
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা চিদানন্দরূপং শিবোঽহং শিবোঽহম্‌।। ৪
ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্নমিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্‌।। ৫
অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো বিভুত্বা সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়াণাম্‌।

ন চাসঙ্গতং নৈব মুক্তির্নমেয়শ্চিদানন্দরূপং শিবোঽহং শিবোঽহম্।। ৬

হীরানন্দ — বেশ।

ঠাকুর হীরানন্দকে ইশারা করিলেন, ইহার জবাব দাও।

হীরানন্দ — এককোণ থেকে ঘর দেখাও যা, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘর দেখাও তা। হে ঈশ্বর! আমি তোমার দাস — তাতেও ঈশ্বরানুভব হয়, আর সেই আমি, সোঽহম্ — তাতেও ঈশ্বরানুভব। একটি দ্বার দিয়েও ঘরে যাওয়া যায়, আর নানা দ্বার দিয়েও ঘরে যাওয়া যায়।

সকলে চুপ করিয়া আছেন। হীরানন্দ নরেন্দ্রকে বলিলেন, একটু গান বলুন।

নরেন্দ্র সুর করিয়া কৌপীনপঞ্চকম্ গাইতেছেন:

বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো, ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ।। ১
মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ, পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমামন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ।। ২
স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ, সুশান্তসর্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মণি যে রমন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ।। ৩

ঠাকুর যেই শুনিলেন — অহর্নিশং ব্রহ্মণি যে রমন্তঃ — অমনি আস্তে আস্তে বলিতেছেন, আহা! আর ইশারা করিয়া দেখাইতেছেন, “এইটি যোগীর লক্ষণ।”

নরেন্দ্র কৌপীনপঞ্চকম্‌ শেষ করিতেছেন:

দেহাদিভাবং পরিবর্তয়ন্তঃ, স্বাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তঃ।

নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ সমরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ।। ৪

ব্রহ্মাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তো, ব্রহ্মাহমস্মীতি বিভাবয়ন্তঃ

ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ।। ৫

নরেন্দ্র আবার গাইতেছেন:

পরিপূর্ণমানন্দম্‌।

অঙ্গ বিহীনং স্মর জগন্নিধানম্‌।

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচোহবাচং।

বাগতীতং প্রাণস্য প্রাণং পরং বরেণ্যম্‌।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) — আর ওইটে "যো কুছ্‌ হ্যায় সব্‌ তুঁহি হ্যায়!"

নরেন্দ্র ওই গানটি গাইতেছেন:

তুঝ্‌সে হাম্‌নে দিলকো লাগায়া, যো কুছ্‌ হ্যায় সব্‌ তুঁহি হ্যায়!।

এক তুঝ্‌কো আপ্‌না পায়া, যো কুছ হ্যায় সব্‌ তুঁহি হ্যায়।

দিল্‌কা মকাঁ সব্‌কী মকী তু, কৌন্‌সা দিল্‌ হ্যায় জিস্‌মে নহি তুঁ,

হরিয়েক্‌ দিল্‌মে তুনে সমায়া, যো কুছ্‌ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।

কেয়া মলায়েক্‌ কেয়া ইন্‌সান্‌, কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান্‌,

জায়্‌সা চাহা তুনে বানায়া, যো কুছ্‌ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।

কাবা মে কেয়া অওর্ দায়ের্ মে কেয়া, তেরী পারাস্তিস্ হায়গী সাব জাঁ,
আগে তেরে সির সভোঁনে ঝুকায়া, যো কুছ্ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।
আর্স্ সে লে ফার্স জমী তাক্। আওর জমীন সে আর্স্ বারী তক্,
যাহাঁ মায় দেখা তুহি নজর মে আয়া, যো কুছ্ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।
সোচা সম্‌ঝা দেখা ভালা, তু জায়সা না কোই ঢুঁড়্ নিকালা,
আব ইয়ে সমঝ্ মে জাফার কী আয়া, যো কুছ্ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।

“হরিয়েক্ দিল্‌মে” এই কথাগুলি শুনিয়া ঠাকুর ইশারা করিয়া বলিতেছেন যে, তিনি প্রত্যেকের হৃদয়ে আছেন, তিনি অন্তর্যামী। “যাঁহা মায় দেখা তুহি নজর মে আয়া, যো কুছ্ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়!” হীরানন্দ এইটি শুনিয়া নরেন্দ্রকে বলিতেছেন, — সব্ তুঁহি হ্যায়; এখন তুঁহুঁ তুঁহুঁ। আমি নয়; তুমি!

নরেন্দ্র —– Give me one and I will give you a million (আমি যদি এক পাই, তাহলে নিযুত কোটি এ-সব আনায়াসে করতে পারি —– অর্থাৎ ১-এর পর শূন্য বসাইয়া।) তুমিও আমি, আমিও তুমি, আমি বই আর কিছু নাই।

এই বলিয়া নরেন্দ্র অষ্টাবক্রসংহিতা হইতে কতকগুলি শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। আবার সকলে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হীরানন্দের প্রতি, নরেন্দ্রকে দেখাইয়া) — যেন খাপখোলা তরোয়াল নিয়ে বেড়াচ্চে।

(মাস্টারের প্রতি, হীরানন্দকে দেখাইয়া) — “কি শান্ত! রোজার কাছে জাতসাপ যেমন ফণা ধরে চুপ করে থাকে!’

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৬, ২২শে এপ্রিল 1886/04/22/iv

53.22 ঠাকুরের আত্মপূজা — গুহ্যকথা — মাস্টার, হীরানন্দ প্রভৃতি সঙ্গে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তর্মুখ। কাছে হীরানন্দ ও মাস্টার বসিয়া আছেন। ঘর নিস্তব্ধ। ঠাকুরের শরীরে অশ্রুতপূর্ব যন্ত্রণা; ভক্তেরা যখন এক-একবার দেখেন, তখন তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ঠাকুর কিন্তু সকলকেই ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। বসিয়া আছেন সহাস্যবদন!

ভক্তেরা ফুল ও মালা আনিয়া দিয়াছেন। ঠাকুরের হৃদয়মধ্যে নারায়ণ, তাঁহারই বুঝি পূজা করিতেছেন। এই যে ফুল লইয়া মাথায় দিতেছেন। কণ্ঠে, হৃদয়ে, নাভিদেশে। একটি বালক ফুল লইয়া খেলা করিতেছে।

ঠাকুরের যখন ঈশ্বরীয়ভাব উপস্থিত হয়, তখন বলেন যে, শরীরের মধ্যে মহাবায়ু ঊর্ধ্বগামী হইয়াছে। মহাবায়ু উঠিলে ঈশ্বরের অনুভূতি হয়, — সর্বদা বলেন। এইবার মাস্টারের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — বায়ু কখন উঠেছে জানি না।

“এখন বালকভাব। তাই ফুল নিয়ে এই রকম কচ্ছি। কি দেখছি জানো? শরীরটা যেন বাঁখারিসাজানো কাপড়মোড়া, সেইটে নরছে। ভিতরে একজন আছে বলে তাই নড়ছে।

“যেন কুমড়ো-শাঁসবিচি ফেলা। ভিতরে কামাদি-আসক্তি কিছুই নাই। ভিতর সব পরিষ্কার। আর —”

ঠাকুরের বলিতে কষ্ট হইতেছে। বড় দুর্বল। মাস্টার তাড়াতাড়ি ঠাকুর কি বলিতে যাইতেছেন একটা আন্দাজ করিয়া বলিতেছেন, “আর অন্তরে ভগবান দেখছেন।”

শ্রীরামকৃষ্ণ — অন্তরে বাহিরে, দুই দেখছি। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ! সচ্চিদানন্দ কেবল একটা খোল আশ্রয় করে এই খোলের অন্তরে-বাহিরে রয়েছেন! এইটি দেখছি।

মাস্টার ও হীরানন্দ এই ব্রহ্মদর্শনকথা শুনিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর তাঁহাদের দিকে দৃষ্টি করিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টার ও হীরানন্দের প্রতি) — তোমাদের সব আত্মীয়বোধ হয়। কেউ পর বোধ হয় না।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগাবস্থা — অখণ্ডদর্শন]

“সব দেখছি একটা খোল নিয়ে মাথা নাড়ছে।

“দেখছি, যখন তাঁতে মনের যোগ হয়, তখন কষ্ট একধারে পড়ে থাকে।১

“এখন কেবল দেখছি একটা চামড়া ঢাকা অখণ্ড, আর-একপাশে গলার ঘা-টা পড়ে রয়েছে।”

ঠাকুর আবার চুপ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন, জড়ের সত্তা চৈতন্য লয়, আর চৈতন্যের সত্তা জড় লয়। শরীরের রোগ হলে বোধ হয় আমার রোগ হয়েছে।

হীরানন্দ ওই কথাটি বুঝিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাই মাস্টার বলিতেছেন — “গরম জলে হাত পুড়ে গেলে বলে, জলে হাত পুড়ে গেল। কিন্তু তা নয়, হীট (Heat)-এতে হাত পুড়ে গেছে।

হীরানন্দ (ঠাকুরের প্রতি) — আপনি বলুন, কেন ভক্ত কষ্ট পায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেহের কষ্ট।

ঠাকুর আবার কি বলিবেন। উভয়ে অপেক্ষা করিতেছেন।

ঠাকুর বলিতেছেন — “বুঝতে পারলে?”

মাস্টার আস্তে আস্তে হীরানন্দকে কি বলিতেছেন —

মাস্টার — লোকশিক্ষার জন্য। নজির। এত দেহের কষ্টমধ্যে ঈশ্বরে মনের ষোল আনা যোগ!

হীরানন্দ — হাঁ, যেমন Christ-এর Crucifixion। তবে এই Mystery, এঁকে কেন যন্ত্রণা?

মাস্টার — ঠাকুর যেমন বলেন, মার ইচ্ছা। এখানে তাঁর এইরূপই খেলা।

ইঁহারা দুজন আস্তে আস্তে কথা কহিতেছেন। ঠাকুর ইশারা করিয়া হীরানন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হীরানন্দ ইশারা বুঝিতে না পারাতে ঠাকুর আবার ইশারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ও কি বলছে?"

হীরানন্দ — ইনি লোকশিক্ষার কথা বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ও-কথা অনুমানের বই তো নয়। (মাস্টার ও হীরানন্দের প্রতি) — অবস্থা বদলাচ্ছে, মনে করিছি চৈতন্য হউক, সকলেকে বলব না। কলিতে পাপ বেশি, সেই সব পাপ এসে পড়ে।

মাস্টার (হীরানন্দের প্রতি) — সময় না দেখে বলবেন না। যার চৈতন্য হবার সময় হবে, তাকে বলবেন।

১ যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
   যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ।।
[গীতা, ৬।২২]

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৬, ২৩শে এপ্রিল 1886/04/23/i

53.23 প্রবৃত্তি না নিবৃত্তি? হীরানন্দকে উপদেশ — নিবৃত্তিই ভাল

হীরানন্দ ঠাকুরের পায়ে হাত বুলাইতেছেন। কাছে মাস্টার বসিয়া আছেন। লাটু ও আর দু-একটি ভক্ত ঘরে মাঝে মাঝে আসিতেছেন। শুক্রবার, ২৩শে এপ্রিল, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। আজ গুড্ ফ্রাইডে, বেলা প্রায় দুই প্রহর একটা হইয়াছে। হীরানন্দ আজ এখানেই অন্নপ্রসাদ পাইয়াছেন। ঠাকুরের একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল যে, হীরানন্দ এখানে থাকেন।

হীরানন্দ পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছেন। সেই মিষ্ট কথা আর মুখ হাসি হাসি। যেন বালককে বুঝাইতেছেন। ঠাকুর অসুস্থ। ডাক্তার সর্বদা দেখিতেছেন।

হীরানন্দ — তা অত ভাবেন কেন? ডাক্তারে বিশ্বাস করলেই নিশ্চিন্ত। আপনি তো বালক।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — ডাক্তারে বিশ্বাস কই? সরকার (ডাক্তার) বলেছিল, “সারবে না”।

হীরানন্দ — তা অত ভাবনা কেন? যা হবার হবে।

মাস্টার (হীরানন্দের প্রতি, জনান্তিকে) — উনি আপনার জন্য ভাবছেন না। ওঁর শরীররক্ষা ভক্তের জন্য।

বড় গ্রীষ্ম। আর মধ্যাহ্নকাল। খসখসের পর্দা টাঙ্গানো হইয়াছে। হীরানন্দ উঠিয়া পর্দাটি ভাল করিয়া টাঙ্গাইয়া দিতেছেন। ঠাকুর দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হীরানন্দের প্রতি) — তবে পাজামা পাঠিয়ে দিও।

হীরানন্দ বলিয়াছেন, তাদের দেশের পাজামা পরিলে ঠাকুর আরামে থাকিবেন। তাই ঠাকুর স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, যেন তিনি পাজামা পাঠাইয়া দেন।

হীরানন্দের খাওয়া ভাল হয় নাই। ভাত একটু চাল চাল ছিল। ঠাকুর শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলেন, আর বার বার তাঁহাকে বলিতেছেন, জলখাবার খাবে? এত অসুখ, কথা কহিতে পারিতেছেন না; তথাপি বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

আবার লাটুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোদেরও কি ওই ভাত খেতে হয়েছিল?

ঠাকুর কোমড়ে কাপড় রাখিতে পারিতেছেন না। প্রায় বালকের মতো দিগম্বর হইয়াই থাকেন। হীরানন্দের সঙ্গে দুইটি ব্রাহ্ম ভক্ত আসিয়াছেন। তাই কাপড়খানি এক-একবার কোমরের কাছে টানিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হীরানন্দের প্রতি) — কাপড় খুলে গেলে তোমরা কি অসভ্য বল?

হীরানন্দ —— আপনার তাতে কি? আপনি তো বালক।

শ্রীরামকৃষ্ণ (একটি ব্রাহ্ম ভক্ত প্রিয়নাথের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) — উনি বলেন।

হীরানন্দ এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন। তিনি দু-একদিন কলিকাতায় থাকিয়া আবার সিন্ধুদেশে গমন করিবেন। সেখানে তাঁহার কাজ আছে। দুইখানি সংবাদপত্রের তিনি সম্পাদক। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চার বৎসর ধরিয়া ওই কার্য করিয়াছিলেন। সংবাদপত্রের নাম, সিন্ধু টাইমস্ (Sind Times) এবং সিন্ধু সুধার (Sind Sudhar); হীরানন্দ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. উপাধি পাইয়াছিলেন। হীরানন্দ সিন্ধুবাসী। কলিকাতায় পড়াশুনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কেশব সেনকে সর্বদা দর্শন ও তাঁহার সহিত সর্বদা আলাপ করিতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কালীবাড়িতে মাঝে মাঝে আসিয়া থাকিতেন।

[হীরানন্দের পরীক্ষা —— প্রবৃত্তি না নিবৃত্তি]

শ্রীরামকৃষ্ণ (হীরানন্দের প্রতি) — সেখানে নাই বা গেলে?

হীরানন্দ (সহাস্যে) — বাঃ আর যে সেখানে কেউ নাই! আর সব যে চাকরি করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— কি মাহিনা পাও?

হীরানন্দ (সহাস্যে) — এ-সব কাজে কম মাহিনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— কত?

হীরানন্দ হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এখানে থাক না?

[হীরানন্দ চুপ করিয়া আছেন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি হবে কর্মে?

হীরানন্দ চুপ করিয়া আছেন।

হীরানন্দ আর একটু কথাবার্তার পর বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কবে আসবে?

হীরানন্দ — পরশু সোমবার দেশে যাব। সোমবার সকালে এসে দেখা করব।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৬, ২৩শে এপ্রিল 1886/04/23/ii

53.24 মাস্টার, নরেন্দ্র, শরৎ প্রভৃতি

মাস্টার ঠাকুরের কাছে বসিয়া। হীরানন্দ এইমাত্র চলিয়া গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — খুব ভাল; না?

মাস্টার — আজ্ঞা হাঁ; স্বভাবটি বড় মধুর।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বললে এগার শো ক্রোশ। অত দূর থেকে দেখতে এসেছে।

মাস্টার — আজ্ঞা হাঁ, খুব ভালবাসা না থাকলে এরূপ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বড় ইচ্ছা, আমায় সেই দেশে নিয়ে যায়।

মাস্টার — যেতে বড় কষ্ট হবে। রেলে ৪।৫ দিনের পথ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তিনটে পাস!

মাস্টার — আজ্ঞে, হাঁ।

ঠাকুর একটু শ্রান্ত হইয়াছেন। বিশ্রাম করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — পাখি খুলে দাও আর মাদুরটা পেতে দাও।

ঠাকুর খড়খড়ির পাখি খুলিয়া দিতে বলিতেছেন। আর বড় গরম, তাই বিছানার উপর মাদুর পাতিয়া দিতে বলিতেছেন।

মাস্টার হাওয়া করিতেছেন। ঠাকুরের একটু তন্দ্রা আসিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (একটু নিদ্রার পর, মাস্টারের প্রতি) — ঘুম কি হয়েছিল?

মাস্টার — আজ্ঞে, একটু হয়েছিল।

নরেন্দ্র, শরৎ ও মাস্টার নিচে হলঘরের পূর্বদিকে কথা কহিতেছেন।

নরেন্দ্র — কি আশ্চর্য! এত বৎসর পড়ে তবু বিদ্যা হয় না; কি করে লোকে বলে যে, দু-তিনদিন সাধন করেছি, ভগবানলাভ হবে! ভগবানলাভ কি এত সোজা! (শরতের প্রতি) তোর শান্তি হয়েছে; মাস্টার নহাশয়ের শান্তি হয়েছে, আমার কিন্তু হয় নাই।

মাস্টার — তাহলে তুমি বরং জাব দাও, আমরা রাজবাড়ি যাই; না হয় আমরা রাজবাড়ি যাই আর তুমি জাব দাও! (সকলের হাস্য)

নরেন্দ্র (সহাস্যে) — ওই গল্প উনি (পরমহংসদেব) শুনেছিলেন — আর শুনতে শুনতে হেসেছিলেন।১

১ কথাটি প্রহ্লাদ চরিত্রের। প্রহ্লাদের বাবা, ষণ্ড আর অমর্ক, দুই গুরু মহাশয়কে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। রাজা জিঞ্জাসা করিবেন, প্রহ্লাদকে তারা কেন হরিনাম শিখাইয়াছে? তাদের রাজার কাছে যেতে ভয় হয়েছিল। তাই ষণ্ড অমর্ককে ওই কথা বলছে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৮৬, ২৩শে - ২৪শে এপ্রিল 1886/04/23/iii & 1886/04/24

53.25 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রাদি ভক্তের মজলিশ

[সুরেন্দ্র, শরৎ, শশী, লাটু, নিত্যগোপাল, কেদার, গিরিশ, রাম, মাস্টার]

বৈকাল হইয়াছে। উপরের হলঘরে অনেকগুলি ভক্ত বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র, শরৎ, শশী, লাটু, নিত্যগোপাল, কেদার, গিরিশ, রাম, মাস্টার, সুরেশ অনেকেই আছেন।

সকলের অগ্রে নিত্যগোপাল আসিয়াছেন ও ঠাকুরকে দেখিবামাত্র তাঁহার চরণে মস্তক দিয়া বন্দনা করিয়াছেন। উপবেশনানন্তর নিত্যগোপাল বালকের ন্যায় বলিতেছেন কেদারবাবু এসেছে।

কেদার অনেকদিন পরে ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বিষয়কর্ম উপলক্ষে ঢাকায় ছিলেন। সেখানে ঠাকুরের অসুখের কথা শুনিয়া আসিয়াছেন। কেদার ঘরে প্রবেশ করিয়াই ঠাকুরের ভক্তসম্ভাষণ দেখিতেছেন।

কেদার ঠাকুরের পদধূলি নিকে মস্তকে গ্রহণ করিলেন ও আনন্দে সেই ধূলি লইয়া সকলেকে বিতরণ করিতেছেন। ভক্তেরা মস্তক অবনত করিয়া সেই ধূলি গ্রহণ করিতেছেন।

শরৎকে দিতে যাইতেছেন, এমন সময় তিনি নিজেই ঠাকুরের চরণধূলি লইলেন। মাস্টার হাসিলেন। ঠাকুরও মাস্টারের দিকে চাহিয়া হাসিলেন। ভক্তেরা নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। ঠাকুরের ভাব-লক্ষণ দেখা যাইতেছে। মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস ত্যাগ

করিতেছেন, যেন ভাব চাপিতেছেন। অবশেষে কেদারকে ইঙ্গিত করিতেছেন — গিরিশ ঘোষের সহিত তর্ক কর। গিরিশ কান-নাক মলিতেছেন আর বলিতেছেন, “মহাশয় নাক-কান মলছি! আগে জানতাম না, আপনি কে! তখন তর্ক করেছি; সে এক!” (ঠাকুরের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কেদারকে দেখাইতেছেন ও বলিতেছেন, “সব ত্যাগ করেছে! (ভক্তদের প্রতি) কেদার নরেন্দ্রকে বলেছিল, এখন তর্ক কর বিচার কর, কিন্তু শেষে হরিনামে গড়াগড়ি দিতে হবে। (নরেন্দ্রের প্রতি) — কেদারের পায়ের ধুলা নাও।”

কেদার (নরেন্দ্রকে) — ওঁর পায়ের ধুলা নাও; তাহলেই হবে।

সুরেন্দ্র ভক্তদের পশ্চাতে বসিয়া আছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইলেন। কেদারকে বলিতেছেন, আহা, কি স্বভাব! কেদার ঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝিয়া সুরেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইয়া বসিলেন।

সুরেন্দ্র একটু অভিমানী। ভক্তেরা কেহ কেহ বাগানের খরচের জন্য বাহিরের ভক্তদের কাছে অর্থ সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। তাই বড় অভিমান হইয়াছে। সুরেন্দ্র বাগানের অধিকাংশ খরচ দেন।

সুরেন্দ্র (কেদারের প্রতি) — অত সাধুদের কাছে কি আমি বসতে পারি! আবার কেউ কেউ (নরেন্দ্র) কয়দিন হইল, সন্ন্যাসীর বেশে বুদ্ধগয়া দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বড় বড় সাধু দেখতে!

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সুরেন্দ্রকে ঠাণ্ডা করিতেছেন। বলছেন, হাঁ, ওরা ছেলেমানুষ, ভাল বুঝতে পারে না।

সুরেন্দ্র (কেদারের প্রতি) — গুরুদেব কি জানেন না, কার কি ভাব। উনি টাকাতে তুষ্ট নন; উনি ভাব নিয়ে তুষ্ট!

ঠাকুর মাথা নাড়িয়া সুরেন্দ্রের কথায় সায় দিতেছেন। "ভাব নিয়ে তুষ্ট", এই কথা শুনিয়া কেদারও আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

ভক্তেরা খাবার আনিয়াছেন ও ঠাকুরের সামনে রাখিয়াছিলেন। ঠাকুর জিহ্বাতে কণিকামাত্র ঠেকাইলেন। সুরেন্দ্রের হাতে প্রসাদ দিতে বলিলেন ও অন্য সকলকে দিতে বলিলেন।

সুরেন্দ্র নিচে গেলেন। নিচে প্রসাদ বিতরণ হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারের প্রতি) — তুমি বুঝিয়ে দিও। যাও একবার — বকাবকি করতে মানা করো।

মণি হাওয়া করিতেছেন। ঠাকুর বলিলেন, "তুমি খাবে না?" মণিকেও নিচে প্রসাদ পাইতে পাঠাইলেন।

সন্ধ্যা হয় হয়! গিরিশ ও শ্রীম — পুকুরধারে বেড়াইতেছেন।

গিরিশ — ওহে তুমি ঠাকুরের বিষয় — কি নাকি লিখেছো?

শ্রীম — কে বললে?

গিরিশ — আমি শুনেছি। আমায় দেবে?

শ্রীম — না; আমি নিজে না বুঝে কারুকে দেব না — ও আমি নিজের জন্য লিখেছি।

অন্যের জন্য নয়!

গিরিশ — বল কি!

শ্রীম — আমার দেহ যাবার সময় পাবে।

[ঠাকুর অহেতুক-কৃপাসিন্ধু — ব্রাহ্মভক্ত শ্রীযুক্ত অমৃত]

সন্ধ্যার পর ঠাকুরের ঘরে আলো জ্বালা হইয়াছে। ব্রাহ্মভক্ত শ্রীযুক্ত অমৃত (বসু) দেখিতে আসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। মাস্টার ও দুই-চারিজন ভক্ত বসিয়া আছেন। ঠাকুরের সম্মুখে কলাপাতায় বেল ও জুঁই ফুলের মালা রহিয়াছে। ঘর নিস্তব্ধ। যেন একটি মহাযোগী নিঃশব্দে যোগে বসিয়া আছেন। ঠাকুর মালা লইয়া এক-একবার তুলিতেছেন। যেন গলায় পরিবেন।

অমৃত (স্নেহপূর্ণস্বরে) — মালা পরিয়ে দেব?

মালা পরা হইলে, ঠাকুর অমৃতের সহিত অনেক কথা কহিলেন। অমৃত বিদায় লইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি আবার এসো।

অমৃত — আজ্ঞে, আসবার খুব ইচ্ছা। অনেক দুর থেকে আসতে হয় — তাই সব সময় পারি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি এসো। এখান থেকে গাড়িভাড়া নিও।

অমৃতের প্রতি ঠাকুরের অহেতুক স্নেহ দেখিয়া সকলে অবাক্‌।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তের স্ত্রী পুত্র]

পরদিন শনিবার, ২৪শে এপ্রিল। একটি ভক্ত আসিয়াছেন। সঙ্গে পরিবার ও একটি সাত বছরের ছেলে। একবৎসর হইল একটি অষ্টমবর্ষীয় সন্তান দেহত্যাগ করিয়াছে। পরিবারটি সেই অবধি পাগলের মতো হইয়াছেন। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে মাঝে মাঝে আসিতে বলেন।

খাইতে খাইতে, ঠাকুর তাঁহাকে ঘরকন্নার কথা অনেক জিজ্ঞাসা করিলেন ও কিছুদিন ওই বাগানে আসিয়া শ্রীশ্রীমার কাছে থাকিতে বলিলেন। তাহা হইলে শোক অনেক কম পড়িবে। তাঁহার একটি কোলের মেয়ে ছিল। পরে শ্রীশ্রীমা তাহাকে মানময়ী বলিয়া ডাকিতেন। ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, তাকেও আনবে।

ঠাকুরের খাওয়ার পর ভক্তটির পরিবার স্থানটি পরিষ্কার করিয়া লইলেন। ঠাকুরের সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ কথাবার্তার পর, শ্রীশ্রীমা যখন নিচের ঘরে গেলেন, তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সেই সঙ্গে গমন করিলেন।

রাত্রি প্রায় নয়টা হইল। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে সেই ঘরে বসিয়া আছেন। ফুলের মালা পরিয়াছেন। মণি হাওয়া করিতেছেন।

ঠাকুর গলদেশ হইতে মালা লইয়া হাতে করিয়া আপন মনে কি বলিতেছেন। তারপর যেন প্রসন্ন হইয়া মণিকে মালা দিলেন।

শোকসন্তপ্তা ভক্তের পত্নীকে ঠাকুর শ্রীশ্রীমার কাছে ওই বাগানে আসিয়া কিছুদিন থাকিতে বলিয়াছেন, মণি সমস্ত শুনিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

53.26 পরিশিষ্ট

----

c54 ৫৪ শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্র

[VIVEKANANDA IN AMERICA AND EUROPE]

প্রথম পরিচ্ছেদ

54.1 নরেন্দ্র

৺রথযাত্রার পরদিন (১৫ই জুলাই) ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, আষাঢ় — সংক্রান্তি শ্রীশ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম-মন্দিরে সকালবেলা ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। নরেন্দ্রের (স্বামী বিবেকানন্দের) মহত্ত্ব-কথা বলিতেছেন —

[নরেন্দ্রের মহত্ত্ব — ‘A prince among men’]

“নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর — নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা। এত ভক্ত আসছে, ওর মতো একটিও নাই।

“এক-একবার বসে বসে আমি খতাই। তা দেখি, অন্য পদ্ম কারুর দশদল, কারুর ষোড়শদল, কারুর শতদল, কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল।

“অন্যেরা কলসী, ঘটি এ-সব হতে পারে; নরেন্দ্র জালা।

“ডোবা পুষ্করিণির মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি। যেমন হালদার-পুকুর।

“মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙ্গাচক্ষু বড় রুই, আর সব নানারকম মাছ — পোনা, কাঠি-বাটা এই সব।

“খুব আধার, — অনেক জিনিস ধরে। বড় ফুটোওলা বাঁশ।

“নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়। ও আসক্তি, ইন্দ্রিয়সুখের বশ নয়। পুরুষ পায়রা। পুরুষ পায়রা ঠোঁট ধরলে ঠোঁট ছিনিয়ে লয় — মাদী পায়রা চুপ করে থাকে।”

[আগে ঈশ্বরলাভ — আদেশ হলে লোকশিক্ষা]

তিন বৎসর পূর্বে (১৮৮২ খ্রী:) নরেন্দ্র দু-একটি ব্রাহ্মবন্ধু সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। রাত্রিতে ওইখানেই ছিলেন। প্রত্যূষ হইলে ঠাকুর বলিলেন, “যাও পঞ্চবটীতে ধ্যান কর গিয়ে।” কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর গিয়া দেখেন, তিনি বন্ধুসঙ্গে পঞ্চবটীমূলে ধ্যান করিতেছেন। ধ্যানান্তে ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন, “দেখ, ঈশ্বরদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য; ব্যাকুল হয়ে নির্জনে গোপনে তাঁর ধ্যান-চিন্তাকরতে হয় ও কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতে হয়, ‘ঠাকুর আমাকে দেখা দাও’।” ব্রাহ্মসমাজের ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের লোকহিতকর

কর্ম যথা স্ত্রীশিক্ষা, স্কুল স্থাপন, বক্তৃতা (lecture) দেওয়া সম্বন্ধে বলিলেন, “আগে ঈশ্বরদর্শন কর। নিরাকার-সাকার দুই দর্শন। বাক্যমনের অতীত যিনি, তিনিই আবার ভক্তের জন্য রূপধারণ করে দর্শন দেন আর কথা কন। দর্শনের পর তাঁর আদেশ লয়ে লোকহিতকর কর্ম করতে হয়। একটা গানে আছে — মন্দিরে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হয় নাই, পোদো কেবল শাঁখ বাজাচ্ছে, যেন আরতি হচ্ছে; একজন তাই তাকে ধিক্কার দিয়ে বলছে:

মন্দিরে তোর নাহিক মাধব।

(ওরে) পোদো, শাঁক ফুঁকে তুই করলি গোল।
তায় চামচিকে এগার জনা,
দিবানিশি দিচ্ছে থানা —

“যদি হৃদয়মন্দিরে মাধব প্রতিষ্ঠা করতে চাও, যদি ভগবানলাভ করতে চাও, তাহলে শুধু ভোঁ ভোঁ করে শাঁখ ফুঁকলে কি হবে। আগে চিত্তশুদ্ধি কর; মন শুদ্ধ হলে ভগবান পবিত্র আসনে এসে বসবেন। চামচিকার বিষ্ঠা থাকলে মাধবকে আনা যায় না। এগার জন চামচিকে অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয়।

“আগে ডুব দাও। ডুব দিয়ে রত্ন তোল, তারপর অন্য কাজ। আগে মাধব প্রতিষ্ঠা, তারপর ইচ্ছা হয় বক্তৃতা (lecture) দিও।

“কেউ ডুব দিতে চায় না। সাধন নাই, ভজন নাই, বিবেক-বৈরাগ্য নাই, দুই-চারটে কথা শিখেই অমনি লেকচার।

“লোকশিক্ষা দেওয়া কঠিন। ভগবানকে দর্শনের পর যদি কেউ তাঁর আদেশ পায়, তাহলে লোকশিক্ষা দিতে পারে।”

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের রথযাত্রার দিন কলিকাতায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত পণ্ডিত শশধরের দেখা হয়। নরেন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্ডিতকে বলিলেন, “তুমি লোকের মঙ্গলের জন্য বক্তৃতা করছ, তা বেশ। কিন্তু বাবা, ভগবানের আদেশ ব্যতিরেকে লোকশিক্ষা হয় না। ওই দুদিন লোক তোমার লেকচার শুনবে তারপর ভুলে যাবে। হালদার-পুকুরের পাড়ে লোক বাহ্যে করত; লোক গালাগাল দিন কিন্তু কিছুই ফল হয় নাই। অবশেষে সরকার যখন একটি নোটিস মেরে দিলে, তখন তা বন্ধ হল। তাই ঈশ্বরের আদেশ না হলে লোকশিক্ষা হয় না।”

তাই নরেন্দ্র গুরুদেবের কথা শিরিধার্য করিয়া সংসারত্যাগ করিয়া নির্জনে গোপনে অনেক তপস্যা করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া এই লোকশিক্ষাব্রত অবলম্বন করিয়া দুরূহ প্রচারকার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।

কাশীপুরে যখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পীড়িত হইয়া আছেন (১৮৮৬ খ্রী:) একদিন একটি কাগজে লিখিয়াছিলেন — “নরেন্দ্র শিক্ষে দিবে।”

স্বামী বিবেকানন্দ মাদ্রাজীদের নিকট আমেরিকা হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দাস; তাঁহারই দূত হইয়া তাঁহার মঙ্গলবার্তা তিনি সমগ্র জগৎকে বলিয়াছেন।

"It was your generous apreciation of Him whose message ti India and to the whole world, I, the most unworthy of His servants, had

the privilege to bear, it was your innate spiritual instinct which saw in Him and His message the first murmurs of that tidal wave of spirituality which is destined at no distant future to break upon India in all its irresistible powers." etc.
— Reply to Madras Address

মাদ্রাজে তৃতীয় বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, আমি সারগর্ভ যাহা কিছু বলিয়াছি, সমস্তই পরমহংসদেবের, অসার যদি কিছু বলিয়া থাকি, সে সব আমার —

"Let me conclude by saying that if in my life I have told one word of truth it was his and his alone; and if I have told you many things which were not true, correct and beneficial to the human race, it was all mine and on me is the responsibility."
— Third lecture, Madras.

কলিকাতায় ৺রাধাআকান্ত দেবের বাড়িতে যখন তাঁহার অভ্যর্থনা হয়, তখনও তিনি বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শক্তি আজ জগদ্ব্যাপী! হে ভারতবাসিগণ, তোমরা তাঁহাকে চিন্তা কর তাহা হইলে সকল বিষয়ে মহত্ত্ব লাভ করিবে। তিনি বলিলেন —

"If this nation wants to rise, it will have to come enthusiastically round his name. It does not matter who preaches Ramakrishna, whether I or you or anybody. But him I place before you and it is for you to judge, and for the good of our race, for the good of our nation, to judge now that you shall do with this great ideal of life. * *

* * * Within ten years of his passing away this power has encircled the globe. Judge him not through me. I am only a weak instrument. His character was so great that I or any of his disciples, if we spent hundreds of lives, could do no justice to a millionth part of what he really was."

গুরুদেবের কথা বলিতে বলিতে স্বামী বিবেকান্দ একেবারে পাগল হইয়া যাইতেন। ধন্য গুরুভক্তি!

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

54.2 নরেন্দ্র কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচারকার্য

আজ আমরা একটু আলচনা করিব, পরমহংসদেবের সেই বিশ্বজনীন সনাতন হিন্দুধর্ম স্বামীজী কিরূপ প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(REALISATION OF GOD)

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা — ঈশ্বরকে দর্শন করিতে হইবে। কতকগুলি মত মুখস্থ বা শ্লোক মুখস্থ করার নাম ধর্ম নহে। এই ঈশ্বরদর্শন হয়, যদি ভক্ত ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে ডাকে, এই জন্মেই হউক অথবা জন্মান্তরেই হউক। একদিনের তাঁহার কথাবার্তা আমাদের মনে পড়ে। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে কথা হইতেছিল।

পরমহংসদেব কাশীপুরের মহিমাচরণ চক্রবর্তীকে বলিতেছিলেন — (রবিবার, ২৬শে অক্টোবর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণ ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি) — শাস্ত্র কত পড়বে? শুধু বিচার করলে কি হবে? আগে তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর। বই পড়ে কি জানবে? যতক্ষণ না হাটে পৌঁছান যায়, ততঁন দূর হতে কেবল হো-হো শব্দ। হাটে পৌঁছিলে আর-একরকম, তখন স্পষ্ট স্পষ্ট দেখতে পাবে, শুনতে পাবে, 'আলু লও' 'পয়সা দাও'।

বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাত। তাঁহাকে দর্শনের পর শাস্ত্র, সায়েন্স সব খড়কুটো বোধ হয়।

"বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। তাঁর কখানা বাড়ি, কটা বাগান, কত কোম্পানির কাগজ; এ-সব আগে জানবার জন্য অত ব্যস্ত কেন? কিন্তু জো-সো করে বড়বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কর, তা ধাক্কা খেয়েই হউক আর বেড়া ডিঙ্গিয়েই হউক, তখন ইচ্ছা হয় তো তিনিই বলে দিবেন, তাঁর কখানা বাড়ি, কত বাগান, কত কোম্পানির কাগজ। বাবুর সঙ্গে আলাপ হলে আবার চাকর দ্বারবান সব সেলাম করবে।" (সকলের হাস্য)

একজন ভক্ত —— এখন বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ কিসে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ —— তাই কর্ম চাই। সাধন চাই। ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাকলে হবে না। তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা করো —— 'দেখা দাও' বলে। ব্যকুল হয়ে কাঁদো। কামিনী-কাঞ্চনের জন্য পাগল হয়ে বেড়াতে পার, তবে তাঁর জন্য একটু পাগল হও। লোক বলুক যে, ঈশ্বরের জন্য অমুক পাগল হয়ে গেছে। দিনকতক না হয় সব ত্যাগ করে তাঁকে একলা ডাকো। শুধু 'তিনি

আছেন’ বলে বসে থাকলে কি হবে? হালদার-পুকুরে বড় মাছ আছে, পুকুরের পাড়ে শুধু বসে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায়? চার কর, চার ফেল। ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আসবে আর জল নড়বে। তখন আনন্দ হবে। হয়তো মাছের খানিকটা একবার দেখা গেল, মাছটা ধপাং করে উঠলো। যখন দেখা গেল, আরও আনন্দ।১

ঠিক এই কথা স্বামীজীও চিকাগোর ধর্মসমিতি সমক্ষে বলিলেন —— অর্থাৎ ধর্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে লাভ করা, দর্শন করা ——

"The Hindu does not want to live upon words and theories. He must see God and that alone can destroy all doubts. So the best proof of a Hindu sage gives about the soul, about God, is 'I have seen the soul; I have seen God'. * * * The whole struggle in their system is a constant struggle to become perfect, to become divine, to reach God and see God; and their reaching God, seeing God, becoming perfect even 'as the Father in Heaven is perfect' constitutes the religion of the Hindus."
— Lecture on Hinduism (Chicago Parliament of Religions.)

আমেরিকার অনেক স্থানে স্বামী বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সকল স্থানেই এই কথা। Hartford নামক স্থানে বলিয়াছিলেন ——

"The next idea that I want to bring to you is that religion does not consist in doctrines or dogmas. * * * The end of all religions is the realisation of God in the soul. Ideals and methods may differ but that is the central point. That is the realisation of God, something behind this world of sense — this world of eternal eating and drinking and talking nonsense — this world of shadows and selfishness. There is that beyond all books, beyond all creeds, beyond the vanities of this world, and that is the realisation of God

within yourself. A man may believe in all the churches in the world, he may carry on his head all the sacred books ever written, he may baptise himself in all the rivers of the earth; still if he has no perception of God I would class him with the rankest atheist."

স্বামী তাঁহার ‘রাজযোগ’ নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, আজকাল লোক বিশ্বাস করে না যে, ঈশ্বরদর্শন হয়; লোকে বলে, হাঁ ঋষিরা অথবা খ্রীষ্ট প্রভৃতি মহাপুরুষগণ আত্মদর্শন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আজকাল আর তাহা হয় না। স্বামীজী বলেন, অবশ্য হয় — মনের যোগ (Concentration) অভ্যাস কর, অবশ্য হৃদয় মধ্যে তাঁহাকে পাইবে —

"The teachers all saw God; they all saw their own souls and what they saw preached. Only there is this difference that in most of these religions, especially in modern times, a peculiar claim is put before us and that claim is that these experiences are impossible at the present day; they were only possible with a few men, who were the first founders of the religions that subsequently bore their names. At the present time these experiences have become obsolete and therefore we have now to take religion on belief. This I entirely deny. Uniformity is the rigorous law of nature; what once happened can happen always."
— Raja-Yoga: Introductory.

স্বামী New York নামক নগরে ৯ই জানুয়ারি, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বজনীন ধর্ম কাহাকে বলে (Ideal of a Universal Religion) এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন — অর্থাৎ যে ধর্মে জ্ঞানী, ভক্ত, যোগী বা কর্মী সকলেই মিলিত হইতে পারে। বক্তৃতা সমাপ্ত হইবার সময় ঈশ্বরদর্শন যে সব ধর্মের উদ্দেশ্য, এই কথা বলিলেন — জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি এগুলি নানা পথ, নানা উপায় — কিন্তু গন্তব্যস্থান একই অর্থাৎ ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার। স্বামী বলিলেন —

"Then again all these various yogas (work or wo র ship, psychic control or philosophy) have to be carried out into practice, theories will not do. We have to meditate upon it, realise it until it becomes our whole life. Religion is realisation, nor talk nor doctrine nor theories, however beautiful they may be. It is being and beoming, not hearing or acknowledging. It is not an intellectual assent. By intellectual assent we can come to hundred sorts of foolish things and change them next day, but this being and becoming is what is Religion."

মাদ্রাজীদের নিকট তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও ওই কথা। —

হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব ঈশ্বরদর্শন — বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন —

"The one idea which distinguishes the Hindu religion from every other in the world, the one idea to express which the sages almost exhaust the vocabulary of the Sanskrit language, is that man must realise God. * * * Thus to realise God, the Brahman as the Dvaitas (dualists) say, or to become Brahman as the Advaitas say — is the aim and end of the whole teachings of the Vedas."
— Reply to Madras Address.

স্বামী ২৯শে অক্টোবর (১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) লণ্ডন নগরে বক্তৃতা করেন, বিষয়, ঈশ্বরদর্শন (Realisation) এই বক্তৃতায় কঠোপনিষৎ পাঠ করিয়া নচিকেতার কথা উল্লেখ করিলেন। নচিকেতা ঈশ্বরকে দেখিতে চান, ব্রহ্মজ্ঞান চান। ধর্মরাজ যম বলিলেন, বাপু, যদি ঈশ্বরকে জানিতে চাও, দেখিতে চাও, তাহা হইলে ভোগ আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে; ভোগ থাকিলে যোগ হয় না, অবস্তু ভালবাসিলে বস্তুলাভ হয় না। স্বামী বলিতে লাগিলেন, আমরা বলিতে গেলে সকলেই নাস্তিক,

কতকগুলি বাক্যের আড়ম্বর লইয়া ধর্ম ধর্ম বলিতেছি। যদি একবার ঈশ্বরদর্শন হয়, তাহা হইলেই প্রকৃত বিশ্বাস আসিবে।

"We are all atheists and yet we try to fight the man who tries to confess it. We are all in the dark; religion is to us a mere nothing, mere intellectual assent, mere talk — this man talks well and that man evil. Religion will begin when that actual realisation in our own souls begins. That will be the dawn of religion. * * * Then will real faith begin."

১ যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যদের বলিতেন —"Blessed are the pure in spirit, for they shall see God.'

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

54.3 শ্রীরামকৃষ্ণ, নরেন্দ্র ও সর্বধর্ম-সমন্বয়
(HARMONY OF ALL RELIGIONS)

নরেন্দ্র ও অন্যান্য কৃতবিদ্য যুবকগণ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সকল ধর্মের উপর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। সকল ধর্মে সত্য আছে, এ-কথা পরমহংসদেব মুক্তকণ্ঠে বলিতেন। কিন্তু তিনি আরও বলিতেন, সকল ধর্মই সত্য — অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্ম দিয়া ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো যাইতে পারে।

একদিন, ২৭শে অক্টোবর (১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে) কেশবচন্দ্র সেন কোজাগর লক্ষ্মীপূজার দিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে স্টীমারে করিয়া দেখিতে গিয়াছিলেন ও

তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। পথে জাহাজের উপরে অনেক বিষয়ে কথা হয়। ঠিক এই সকল কথা ১৩ই অগস্ট অর্থাৎ কয়েক মাস পূর্বে হইয়াছিল। এই সর্বধর্ম-সমন্বয় কথা আমাদের diary হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

“কেদারনাথ চাটুজ্যে দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়িতে মহোৎসব করিয়াছিলেন। উৎসবান্তে দক্ষিণের বারান্দায় বসিয়া বেলা ৩।৪ টার সময় কথাবার্তা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — মত পথ। সকল ধর্মই সত্য। যেমন কালীঘাটে নানা পথ দিয়া যাওয়া যায়। ধর্ম কিছু ঈশ্বর নয়। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম আশ্রয় করে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়।

“নদী সব নানাদিক দিয়ে আসে কিন্তু সব নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। সেখানে সব এক।

“ছাদে নানা উপায়ে উঠা যায়। পাকা সিঁড়ি, কাঠের সিঁড়ি, বাঁকা সিঁড়ি আর শুধু একটা দড়ি দিয়াও উঠা যায়! তবে উঠবার সময় একটা ধরে উঠতে হয় — দু-তিনরকম সিঁড়িতে পা দিলে উঠা যায় না। তবে ছাদে উঠবার পর সবরকম সিঁড়ি দিয়ে নামা যায়, উঠা যায়।

“তাই প্রথমে একটা ধর্ম আশ্রয় করতে হয়। ঈশ্বরলাভ হলে সেই ব্যক্তি সব ধর্মপথ দিয়ে আনাগোনা করতে পারে; যখন হিন্দুদের ভিতর থাকে, তখন সকলে মনে করে হিন্দু; যখন মুসলমানদের সঙ্গে মেশে, তখন সকলে মনে করে

মুসলমান; আবার যখন খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মেশে, তখন সকলে ভাবে ইনি বুঝি খ্রীষ্টান।

“সব ধর্মের লোকেরা একজনকেই ডাকছে। কেউ বলছে ঈশ্বর, কেউ রাম, কেউ হরি, কেউ আল্লা, কেউ ব্রহ্ম। নাম আলাদা, কিন্তু একই বস্তু।

“একটা পুকুরে চার ঘাট আছে। একঘাটে হিন্দুরা জল খাচ্ছে, তারা বলছে ‘জল’। আর-একঘাটে মুসলমান, তারা বলছে ‘পানি’। আর-একঘাটে খ্রীষ্টান, তারা বলছে ‘ওয়াটার’। আবার একঘাটে কতকগুলো ওক বলছে ‘aqua’ (সকলের হাস্য)। বস্তু এক — জল, নাম আলাদা। তবে ঝগড়া করবার কি দরকার? সকলেই এক ঈশ্বরকে ডাকছে ও সকলেই তাঁর কাছে যাবে।”

একজন ভক্ত (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — যদি অন্য ধর্মে ভ্রম থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা ভ্রম কোন ধর্মে নাই? সকলেই বলে, আমার ঘড়ি ঠিক যাচ্ছে। কিন্তু কোন ঘড়িই একেবারে ঠিক যায় না। সব ঘড়িকেই মাঝে মাঝে সূর্যের সঙ্গে মিলাতে হয়। “ভুল কোন্ ধর্মে নাই? আর যদি ভুল থাকে, যদি আন্তরিক হয়, যদি ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকে, তাহলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।

“মনে কর, এক বাপের অনেকগুলি ছেলে — ছোট বড়। সকলেই ‘বাবা’ বলতে পারে না। কেউ বলে ‘বাবা’, কেউ বলে ‘বা’, কেউ বা কেবল ‘পা’। যারা ‘বাবা’ বলতে পারলে না, তাদের উপর বাপ রাগ করবে নাকি? (সকলের হাস্য) না, বাপ সকলকেই সমান ভালবাসবে।১

“লোক মনে করে, আমার ধর্ম ঠিক; আমি ঈশ্বর কি বস্তু বুঝেছি, ওরা বুঝতে পারে নাই। আমি ঠিক তাঁকে ডাকছি, ওরা ঠিক ডাকতে পারে না; অতএব ঈশ্বর আমাকেই কৃপা করেন, ওদের করেন না। এ-সব লোক জানে না যে, ঈশ্বর সকলের বাপ-মা, আন্তরিক হলে তিনি সকলকেই দয়া করেন।”

কি প্রেমের ধর্ম! এ-কথা তিনি তো বারবার বলিলেন, কিন্তু কয়জন ধারণা করিতে পারিল? শ্রীযুক্ত কেশব সেন কতকটা পারিয়াছিলেন। আর স্বামী বিবেকানন্দ জগতের সম্মুখে এই প্রেমের ধর্ম অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া প্রচার করিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মতুয়ার বুদ্ধি (Dogmatism) করিতে বারবার নিষেধ করিয়াছিলেন। “আমার ধর্ম সত্য ও তোমার মিথ্যা” এটির নাম ‘মতুয়ার বুদ্ধি’ —— এইটি যত অনর্থের মূল। স্বামী এই অনর্থের কথা চিকাগো ধর্মসমিতিসমক্ষে বলিলেন। বলিলেন, খ্রীষ্টান, মুসলমান ইত্যাদি অনেকেই ধর্মের নামে রক্তারক্তি, কাটাকাটি, মারামারি করিয়াছেন।

"Sectarianism, bigotry and its horrible descendant fanaticism have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization and sent whole nations to despair."
— Lecture on Hinduism, (Chicago Parliament of Religions.)

স্বামী অপর এক বক্তৃতায় ‘সকল ধর্ম সত্য’, এ-কথা বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রমাণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, —

"If any one here hopes that this unity will come by the triumph of any one of these religions and the destruction of the others, to him I say, Brother, yours is an impossible hope. Do I wish that the

Christian would become Hindu? God forbid. Do I wish that the Hindu or Buddhist would become Christian? God forbid.

"The seed is put in the ground, and earth and air and water are placed around it. Does the seed become the earth or the air or the water? No, it becomes a plant, it assimilates the air, the earth and the water, converts them into plant substance and grows a plant.

"Similar is the case with religion. The Christian is not to become a Hindu or a Buddhist nor the Hindu or the Buddhist to become a Christian. But each must assimilate the others and yet preserve its own law of growth."

আমেরিকায় স্বামী Brooklyn Ethical Society নামক সভায় হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। অধ্যাপক Dr. Lewis James সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানেও প্রথম কথা, সর্বধর্ম-সমন্বয়। স্বামী বলিলেন, একজনের ধর্ম সত্য বলা একটি ব্যাধিবিশেষ বলিতে হইবে। সকলের পাঁচটি আঙুল, আর-একজনের যদি ছয়টি হয়, বলিতে হইবে যে ইহা তাহার একটি রোগবিশেষ।

"Truth has always been universal. If I alone were to have six fingers on my hand while all of you have only five, you would not think that my hand was the true intent of nature, but rather that it was abnormal and diseased. Just so with religion. If one creed alone were to be true and all the others untrue, you would have again to say that, that religion is diseased. If one religion is true all the others must be true. Thus the Hindu religion is your property as well as mine."
— Lecture at Brooklyn.

স্বামী চিকাগো ধর্ম-মহাসভা সম্মুখে যে দিন প্রথম বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হয়েন, যে বক্তৃতা শুনিয়া প্রায় ছয় সহস্র লোক মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে আসন ত্যাগ করিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন২ সেই বক্তৃতামধ্যে এই সমন্বয়বার্তা ছিল। স্বামী বলিয়াছিলেন, —

"I am proud to belong to a religion which taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all Religions as true. I belong to a religion into whose sacred language, the Sanskrit, the word 'exclusion' is untranslatable."

১ ঠিক এই কথা একখানি ইংরেজী গ্রন্থে আছে – Maxmuller’s Hibbert Lectures. মোক্ষ মূলরও এই উপমা দিয়া বুঝাইয়াছেন যে, যাঁহারা দেবদেবী পূজা করেন, তাঁহাদের ঘৃণা করা উচিত নহে।

২ "When Vivekananda addressed the audience as sisters and brothers of America, there arose a peal of applause that lasted for several minutes." (Dr. Barrow's Report) "But eloquent as were many of the brief speeches, no one expressed so well the spirit of the Parliament of Religions and its limitations as the Hindu monk. * * He is an Orator by divine right."
— New York Critique, 1893.

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

54.4 শ্রীরামকৃষ্ণ, নরেন্দ্র, কর্মযোগ ও স্বদেশহিতৈষণা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদা বলিতেন, “আমি ও আমার” এইটি অজ্ঞান, “তুমি ও তোমার” এইটি জ্ঞান। একদিন শ্রীসুরেশ মিত্রের বাগানে মহোৎসব হইতেছিল, রবিবার, ১৫ই জুন ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তেরা অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন ভক্তও আসিয়াছিলেন। ঠাকুর প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও অন্যান্য ভক্তদের বলিলেন, “দেখ, ‘আমি ও আমার’ এইটির নাম অজ্ঞান। কালীবাড়ি রাসমনী করেছেন, এই কথাই লোকে বলে। কেউ বলে না যে ঈশ্বর করেছেন। ব্রাহ্মসমাজ অমুক করে গেছেন, এই কথাই লোকে বলে। এ-কথা আর কেউ বলে না, ঈশ্বর ইচ্ছায় এটি হয়েছে। ‘আমি করেছি’ এটির নাম অজ্ঞান। হে ঈশ্বর আমার কিছুই নয়, এ মন্দির আমার নয়, এ কালীবাড়ি আমার নয়, এ সমাজ আমার নয়, এ-সব তোমার জিনিস, এ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার এ-সব কিছুই আমার নয়, সব তোমারই জিনিস, জ্ঞানীর এসব কথা।

“আমার জিনিস, আমার জিনিস বলে সেই সকল জিনিসকে ভালবাসার নাম মায়া। সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া। শুধু ব্রাহ্মসমাজের লোকগুলিকে ভালবাসি, এর নাম মায়া। শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসি, এর নাম মায়া। সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোককে ভালবাসা এট দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়। মায়াতে মানুষ বদ্ধ হয়ে যায়, ভগবান থেকে বিমুখ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বরলাভ হয়। শুকদেব, নারদ এঁরা দয়া রেখেছিলেন।”

ঠাকুরের কথা — শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসা, এর নাম মায়া। সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোকদের ভালবাসা, এট দয়া থেকে হয় — ভক্তি থেকে হয়। তবে স্বামী বিবেকানন্দ অত স্বদেশের জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন কেন?

স্বামী চিকাগো ধর্মমহাসভায় একদিন বলিয়াছিলেন, আমার গরিব স্বদেশবাসীদের জন্য এখানে অর্থ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম ভারী কঠিন, — খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের নিকট যাহারা খ্রীষ্টান নয় তাহাদের জন্য টাকা যোগাড় করা কঠিন।

"The crying evil in the East is not religion — they have religion enough, but it is the bread that the suffering millions of burning India cry out for with parched throats;" ...

"I came here to ask aid for my impoverished people and fully realised how difficult it was to get help for heathens from Christians in a Christian land."
— Speech before the Parliament of Religions. (Chicago Tribune)

স্বামীর একজন প্রধান শিষ্যা সিষ্টার নিবেদিতা (Miss Margaret Noble) বলেন যে, স্বামী যখন চিকাগো নগরে বাস করেন, তখন ভারতবাসীদের কাহারও সহিত দেখা হইলে তিনি অতিশয় যত্ন করিতেন, তা তিনি যে জাতিই হউন — হিন্দু হউন বা মুসলমান বা পার্শী বা যাহাই হউন। তিনি নিজে কোন ভাগ্যবানের বাটীতে অতিথিরূপে থাকিতেন। সেইখানেই নিজের দেশের লোককে লইয়া যাইতেন। গৃহস্বামীরাও তাঁহাদের খুব যত্ন করিতেন, আর তাঁহারা বেশ জানিতেন

যে, তাঁহাদের যত্ন যদি না করেন, তাহা হইলে স্বামীজী নিশ্চয়ই তাঁহাদের গৃহত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবেন; —

"At Chicago any Indian man attending the great world Bazar, rich or poor, high or low, Hindu, Mahomedan, Parsi, what not, might at any moment be brought by him to his hosts for hospitality and entertainment and they well knew that any failure of kindness on their part to the least of these would immediately have lost them his presence."

দেশের লোকের কিরূপে দারিদ্র-দুঃখ বিমোচন হয়, তাহাদের কিসে সংশিক্ষা হয়, কিসে তাহাদের ধর্মসঞ্চয় হয়, এই জন্য স্বামী সর্বদা ভাবিতেন। কিন্তু তিনি দেশের লোকের জন্য যেরূপ দুঃখিত ছিলেন, আফ্রিকাবাসী নিগ্রোর জন্যও সেইরূপ দঃখিত থাকিতেন। শ্রীমতী নিবেদিতা বলেন, স্বামী যখন দক্ষিণ United States মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, কেহ কেহ তাঁহাকে আফ্রিকাবাসী (coloured man) মনে করিয়া গৃহ হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা শুনিলেন, ইনি তাহা নহেন, ইনি হিন্দু সন্ন্যাসী ও বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ তখন তাঁহারাই অতি সমাদরে তাঁহাকে লইয়া গিয়া সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "স্বামী, যখন আমরা তোমাকে বলিলাম, 'তুমি কি আফ্রিকাবাসী?' তখন তুমি কিছু না বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলে কেন?"

স্বামী বলিলেন, "কেন, আফ্রিকাবাসী নিগ্রো কি আমার ভাই নয়?" অর্থাৎ স্বদেশবাসী কি জগৎছাড়া? নিগ্রোকেও যেমন ভালবাসা, স্বদেশবাসীকেও সেইরূপ ভালবাসা, তবে তাহাদের সঙ্গে সর্বদাই থাকা, তাই তাহাদের সেবা আগে। ইহারই নাম অনাসক্ত হইয়া সেবা। ইহারই নাম কর্মযোগ। সকলেই কর্ম

করে, কিন্তু কর্মযোগ বড় কঠিন। সব ত্যাগ করে অনেকদিন ধরিয়া নির্জনে ভগবানের ধ্যান-চিন্তা না করিলে এরূপ স্বদেশের উপকার করা যায় না। ‘আমার দেশ’ বলিয়া নয়, তাহা হইলে তো মায়া হইল; ‘তোমার (ঈশ্বরের) এরা’ তাই এদের সেবা করিব। তোমার আদেশ, তাই দেশের সেবা করিব; ‘তোমারই এ কাজ’ আমি তোমার দাস, তাই এই ব্রত পালন করিতেছি, সিদ্ধি হউক, অসিদ্ধি হউক; সে তুমি জান, আমার নামের জন্য নয়, এতে তোমার মহিমা প্রকাশ হইবে।

যথার্থ স্বদেশহিতৈষিতা (Ideal Patriotism) কাহাকে বলে, লোকশিক্ষার জন্য স্বামী তাই এই দুরূহ ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাহাদের গৃহপরিজন আছে, কখনও ভগবানের জন্য যাহারা ব্যাকুল হয় নাই, যাহারা ‘ত্যাগ’ এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করে, যাহাদের মন সর্বদা কামিনী-কাঞ্চন ও এই পৃথিবীর মানসম্ভ্রমের দিকে, যাহারা ঈশ্বরদর্শন জীবনের উদ্দেশ্য শুনিয়া অবাক্ হয়, তাহারা স্বদেশহিতৈষিতার এই মহান উচ্চ আদর্শ কিরূপে গ্রহণ করিবে? স্বামী স্বদেশের জন্য কাঁদিতেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা এটিও মনে রাখিতেন যে, এই অনিত্য সংসারে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। স্বামী বিলাত হইতে ফিরিবার পর হিমাচল দর্শন করিতে আলমোড়ায় গিয়াছিলেন। আলমোড়াবাসীরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণবোধে পূজা করিতে লাগিলেন। স্বামী নগাধিরাজ দেবতাত্মা হিমগিরির অত্যুচ্চ শৃঙ্গাবলী সন্দর্শন করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া রহিলেন। বলিলেন, আজ এই পবিত্র উত্তরাখণ্ডে সেই পবিত্র তপোভূমি দেখিতেছি, যেখানে ঋষিগণ সর্বত্যাগ করিয়া এই সংসারের কোলাহল হইতে প্রস্থান করিয়া নিশিদিন ঈশ্বরচিন্তা করিতেন। তাহাদেরই শ্রীমুখ হইতে বেদমন্ত্র বিনির্গত হইয়াচিল।

হায়! কবে আমার সে দিন হইবে? আমার কতকগুলি কাজ করিবার ইচ্ছা আছে বটে, কিন্তু এই পবিত্র ভূমিতে অনেকদিন পরে আবার আসিবার পর সকল বাসনা এককালে অন্তর্হিত হইতেছে। ইচ্ছা হয়, বিরলে বসিয়া শেষ কয়দিন হরিপাদপদ্ম চিন্তায় গভীর সমাধিমধ্যে নিমগ্ন হইয়া কাটাইয়া যাই।

"It is the hope of my life to end my days somewhere within this Father of Mountains, where Rishis lived — where Philosophy was born.
— Speech at Almora.

হিমালয় দেখিলে আর কর্ম করিতে ইচ্ছা হয় না —– মনে একচিন্তায় উদয় হয় —– কর্মসন্ন্যাস।

"As peak after peak of this Father of Mountains began to appear before my sight, all those propensities to work, that ferment that had been going on in my brain for years seemed to quiet down and mind reverted to that one eternal theme which the Himalayas always teach us, the one theme which is reverberating in the very atmosphere of the place, the one theme that I hear in the rushing whirlpools of its rivers — Renunciation."

এই কর্মসন্ন্যাস, এই ত্যাগ, করিতে পারিলে মানুষ অভয় হয় —– আর সকল বস্তুই ভয়াবহ।

‘সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।’

"Everything in this life is fraught with fear.
It is renunciation that makes one fearless."

“এখানে আসিলে আর সাম্প্রদায়িক ভাব থাকে না, ধর্ম লইয়া ঝগড়াবিবাদ কোথায় পলাইয়া যায়। কেবল একটি মহান সত্যের ধারণা হয় —— ঈশ্বরদর্শনই সত্য, আর যাহা কিছু জলের ফেনার ন্যায় —— ভগবানের পূজাই একমাত্র জীবনে প্রয়োজন, আর সকলই মিথ্যা।

“ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। অথবা মধুকর পদ্মের উপর বসিতে পাইলে আর ভনভন করে না!”

"Strong souls will be attracted to this Father of Mountains in time to come, when all this fight between sects and all those differences in dogmas will not be remembered any more, and quarrel between your religion and my religion will have vanished altogether, when mankind will understand that there is but one Eternal Religion and that is the perception of the Divine within an the rest is mere forth. Such ardent souls will come here, knowing that the world is but Vanity, knowing that everything is useless except the worship of the Lord and the Lord alone." —
— Speech at Almora.

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, “অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া যেখানে ইচ্ছা যাও”, স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীর গৃহ, ধন, পরিজন, আত্মীয়, কুটুম্ব, স্বদেশ, বিদেশ আবার কি? যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন, ঈশ্বরকে না জানলে এ-সব ধন, বিদ্যা কি হবে? হে মৈত্রেয়ী, আগে তাঁকে জান, তারপর অন্য কথা। স্বামী এইটি জগৎকে দেখাইলেন। তিনি যেন বলিলেন, হে জগদ্বাসিগণ, আগে বিষয়ত্যাগ করিয়া নির্জনে ভগবানের আরাধনা কর, তাহার পর যাহা ইচ্ছা কর, কিছুতেই দোষ নাই; স্বদেশের সেবা কর; ইচ্ছা হয় কুটুম্ব পালন কর, কিছুতেই দোষ নাই; কেননা, তুমি এখন বুঝিতেছ যে

সর্বভূতে তিনি আছেন — তিনি ছাড়া কিছুই নাই — সংসার, স্বদেশ তিনি ছাড়া নহে। ভগবানের সাক্ষাৎকারের পর দেখিবে তিনিই পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন। বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন, রাম, তুমি যে সংসারত্যাগ করিবে বলিতেছ, আমার সঙ্গে বিচার কর; যদি ঈশ্বর এ-সংসার ছাড়া হন তবে ত্যাগ করিও।১ রামচন্দ্র আত্মার সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন তাই চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "ছুরির ব্যবহার জানিয়া ছুরি হাতে কর!" স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থ কর্মযোগী কাহাকে বলে, দেখাইলেন। দেশের কি উপকার করিবে? স্বামী জানিতেন যে, দেশের দরিদ্রের ধন দিয়া সাহায্য করা অপেক্ষা অনেক মহৎ কার্য আছে। ঈশ্বরকে জানাইয়া দেওয়া প্রধান কার্য। তৎপরে বিদ্যাদান; তাহার পর জীবনদান; তাহারপরে অন্নবস্ত্রদান। সংসার দুঃখময়। এই দুঃখ তমি কয়দিনের ঘুচাইবে? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কৃষ্ণদাস পালকে২ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, জীবনের উদ্দেশ্য কি?" কৃষ্ণদাস বলিলেন, "আমার মতে জগতের উপকার করা, জগতের দুঃখ দূর করা।" ঠাকুর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমার ওরূপ রাঁড়ীপুতী বুদ্ধি৩ কেন? জগতের দুঃখনাশ তুমি করবে? জগৎ কি এতটুকু? বর্ষাকালে গঙ্গায় কাঁকড়া হয় জান? এইরূপ অসংখ্য জগৎ আছে। এই জগতের পতি যিনি তিনি সকলের খবর নিচ্ছেন। তাঁকে আগে জানা — এই জীবনের উদ্দেশ্য। তারপর যা "হয় করো।" স্বামীও একস্থানে বলিয়া গিয়াছেন —

"Spiritual knowledge is the only thing that can remove our miseries for ever, any other knowledge satisfies wants only for a time * * * He who gives spiritual knowledge is the greatest benefactor of mankind, * * * Next to spiritual help (ব্রহ্মজ্ঞান) comes intellectual

help (বিদ্যাদান) — the gift of secular knowledge. This is far higher than the giving of food and clothes; the next gift is the gift of life and the fourth, the gift of food."
— Karmayoga (New York); My plan of Campaign (Madras)

ঈশ্বরদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য। আর এ দেশের ওই এককথা। আগে ওই কথা তাহার পর অন্য কথা। ‘রাজনীতি’ (Politics) প্রথম হইতে বলিলে চলিবে না। আগে অনন্যমন হইয়া ভগবানের ধ্যানচিন্তা কর, হৃদয়মধ্যে তাঁহার অপরূপ রূপ দর্শন কর। তাঁহাকে লাভ করিয়া তখন ‘স্বদেশে’র মঙ্গলসাধন করিতে পারিবে; কেননা, তখন মন অনাসক্ত; ‘আমার দেশ’ বলিয়া সেবা নহে —— সর্বভূতে ভগবান আছেন বলিয়া তাঁহার সেবা। তখন স্বদেশ-বিদেশ ভেদবুদ্ধি থাকিবে না। তখন কিসে জীবের মঙ্গলসাধন হয়, ঠিক বুঝিতে পারা যাইবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, “দাবাবোড়ে যারা খেলে, তারা ঠিক চাল বুঝতে তত পারে না; যারা উদাসীন, কেবল বসে খেলা দেখে, তারা উপর চাল বেশ বলে দিতে পারে।” কেননা, উদাসীনের নিজের কোন দরকার নাই, রাগদ্বেষবিমুক্ত উদাসীন অনাসক্ত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ নির্জনে অনেকদিন সাধন করিয়া যাহা লাভ করিয়া বসিয়া আছেন, তাহার কাছে আর কিছুই ভাল লাগে না:-

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।।

হিন্দুর রাজনীতি, সমাজনীতি, তাই সমস্তই ধর্মশাস্ত্র। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ইত্যাদি মহাপুরুষ এই সকল ধর্মশাস্ত্রের প্রণেতা। তাঁহাদের কিছুরই প্রয়োজন নাই। তথাপি ভগবান কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া গৃহস্থের জন্য তাঁহারা শাস্ত্র প্রণয়ন

করিয়াছেন। তাঁহারা উদাসীন হইয়া দাবাবোড়ের চাল বলিয়া দিতেছেন, তাই দেশকালপাত্রবিশেষে তাঁহাদের কথায় একটি ভুল হবার সম্ভাবনা নাই।

স্বামী বিবেকানন্দও কর্মযোগী। অনাসক্ত হইয়া পরোপকার-ব্রতরূপ, জীবসেবারূপ কর্ম করিয়াছেন। তাই কর্মীদের সম্বন্ধে তাঁহার এত মূল্য। তিনি অনাসক্ত হইয়া এই দেশের মঙ্গলসাধন করিয়াছেন, যেমন পূর্বতন মহাপুরুষগণ জীবের মঙ্গলার্থে বরাবর করিয়া গিয়াছেন। এই নিষ্কাম ধর্ম পালনার্থ যেন আমরাও তাঁহার পদানুসরণ করিতে পারি। কিন্তু এটি কি কঠিন ব্যাপার! প্রথমে হরিপাদপদ্মলাভ করিতে হইবে। তজ্জন্য বিবেকানন্দের ন্যায় ত্যাগ ও তপস্যা করিতে হইবে। তবে এই অধিকার হইতে পারে।

ধন্য ত্যাগী মহাপুরুষ! তুমি যথার্থই গুরুদেবের পদানুসরণ করিয়াছ। গুরুদেবের মহামন্ত্র — আগে ঈশ্বরলাভ, তাহার পর অন্য কথা, তুমিই সাধন করিয়াছ! তুমিই বুঝিয়াছিলে, ভগবানকে ছাড়িয়া দিলে ‘অতিবাদী’ হইলে, এ-সংসার যথার্থই স্বপ্নবৎ, ভেলকিবাজি; তাই সর্বত্যাগ করিয়া তাঁহার সাধন আগে করিয়াছিলে। যখন দেখিলে সর্ববস্তুর প্রাণ তিনি, যখন দেখিলে, তিনি ছাড়া কিছুই নাই, তখন আবার এই সংসারে মনোনিবেশ করিলে, তখন হে মহাযোগিন! সর্বভূতস্থ সেই হরির সেবার জন্য আবার কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলে; তখন তোমার গভীর অপার প্রেমের অধিকারী সকলেই হইল — হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বিদেশী, স্বদেশবাসী, ধনী, দরিদ্র, নর-নারী সকলকেই তুমি প্রেমালিঙ্গন দান করিয়াছ! তখন তীব্র বৈরাগ্যবশতঃ যে গর্ভধারিণী মাতৃদেবীকেও ত্যাগ করিয়া, চক্ষুর জলে ভাসাইয়া, গৈরিকবস্ত্র ধারণ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলে, তখন সেই

মাকে আবার দর্শন দিলে ও বাৎসল্য স্বীকার করিয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলে! তুমি নারদাদি জনকাদির ন্যায় লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করিয়াছিলে!

১ যোগবাশিষ্ঠ।

২ শ্রীকৃষ্ণদাস পাল দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন।

৩ রাঁড়ীপুতী বুদ্ধি — বিধবার ছেলের বুদ্ধি; হীন বুদ্ধি; কেননা, সে ছেলে অনেক নীচ উপায়ে মানুষ হয়; পরের তোষামোদ করিয়া, ইত্যাদি।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

54.5 শ্রীরামকৃষ্ণ, নরেন্দ্র, কেশব সেন ও সাকারপূজা

[ঈশ্বর সাকার না নিরাকার]

একদিন কেশবচন্দ্র সেন শিষ্যবৃন্দ লইয়া দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়িতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কেশবের সঙ্গে নিরাকার সম্বন্ধে অনেক কথা হইত। পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিতেন, ‘আমি মাটির বা পাথরের কালী মনে করি না। চিন্ময়ী কালী। যিনি ব্রহ্ম তিনি কালী। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন ‘ব্রহ্ম’; যখন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন, তখন কালী, অর্থাৎ যিনি কালের সঙ্গে রমণ

করেন। কাল অর্থাৎ ব্রহ্ম। তাঁহাদের নিম্নলিখিত কথাবার্তা একদিন হইতেছিল —

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি) — কিরকম জানো? যেন সচ্চিদানন্দসমুদ্র — কূলকিনারা নাই। ভক্তিহিমে এই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়; স্থানে স্থানে যেন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে; অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে কখন কখন সাকাররূপ হয়ে দেখা দেন। আবার ব্রহ্ম-জ্ঞান-সূর্য উঠলে সে বরফ গলে যায় — অর্থাৎ 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এই বিচারের পর সমাধি হলে রূপ-টুপ সব উড়ে যায়। তখন কি তিনি, মুখে বলা যায় না — মন বুদ্ধি অহংতত্ত্ব দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না।

"যে লোক একটা ঠিক জানে, সে আর একটাও জানতে পারে। যে নিরাকার জানতে পারে, সে সাকারও জানতে পারে। সে পাড়াতেও গেলে না — কোন্‌টা শ্যামপুকুর, কোন্‌টা তেলিপাড়া, জানবে কেমন করে!"

সকলে নিরাকার পূজার অধিকারী নয়, তাই সাকার পূজার বিশেষ প্রয়োজন, এ-কথাও পরমহংসদেব বুঝাইতেছেন। তিনি বলিলেন —

"এক মার পাঁচ ছেলে। মা মাছের নানারকম আয়োজন করেছেন, যার যা পেটে সয়। কারু জন্য মাছের পোলাও করেছেন। যার পেটের অসুখ তার জন্য মাছের ঝোল করেছেন। যেটা যার পেটে সয়।"

এ দেশে সাকার পূজা হয়। খ্রীষ্টান মিশনারীরা আমেরিকা ও ইওরোপে এদেশবাসীকে অসভ্য জাতি বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহারা বলেন যে, ভারতবাসীরা পুতুল পূজা করেন — ও তাঁহাদের অবস্থা বড় শোচনীয়।

স্বামী বিবেকানন্দ এই সাকার পূজার অর্থ আমেরিকায় প্রথমেই বুঝাইলেন; বলিলেন, ভারতবর্ষে পুতুল পূজা হয় না।

"At the very outset I may tell you there is no polytheism in India. In every temple, if one stands by and listens, he will find the worshippers applying the attributes of God to these images."
— Lecture on Hinduism (Chicago).

ঈশ্বরকে ভাবিতে গেলেই সাকার চিন্তা বই আর কিছু আসিতে পারে না, এ-কথা মনোবিজ্ঞান (Psychology) সাহায্যে স্বামী বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন —

"Why does a Christian go to Church? Why is the Cross holy? Why is the face turned towards the sky in prayers? Why are there so many images in the Catholic Church? Why are there so many images in the minds of the Protestants when they pray? My brethren, we can no more think about anything without a material image than we can live without breathing. Omnipresence to almost the whole world means nothing. Has God superficial area? If not, then when we repeat the word we think of the extended earth; that is all."
— Lecture on Hinduism (Chicago).

স্বামীজী আরও বলিলেন, “অধিকারীভেদে সাকার পূজা ও নিরাকার পূজা। সাকার পূজা কুসংস্কার নহে — মিথ্যা নহে, নিম্ন স্থানীয় সত্য।

"If a man can realise his divine nature most easily with the help of an image, would it be right to call it a sin? Nor even when he has passed that stage, should he call it an error? To the Hindu, man is not travelling from error to truth but lower to higher truth."

স্বামীজী বলিলেন, সকলের পক্ষে এক নিয়ম হইতে পারে না। ঈশ্বর এক; কিন্তু তিনি নানা ভক্তের নিকট নানাভাবে প্রকাশ হইতেছেন। হিন্দু এইটি বুঝেন।

"Unity in variety is the plan of nature and the Hindu has recognised it. Other religions lay down certain fixed dogmas and try to force society to adopt them; they place before society one kind of coat which must fit Jack and John and Henry, all alike. If it does not fit John or Henry, he must go without a coat to cover his body. The Hindus have discovered that the Absolute can be realised, thought of or stated, only through the Relative."

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

54.6 শ্রীরামকৃষ্ণ, ব্রাহ্মসমাজ, নরেন্দ্র ও পাপবাদ
[THE DOCTRINE OF SIN]

স্বামীজীর গুরুদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "ঈশ্বরের নাম লইলে ও আন্তরিক তাঁহার চিন্তা করিলে পাপ পলাইয়া যায়। যেমন তুলার পাহাড়

অগ্নিস্পর্শে একক্ষণে পুড়িয়া যায়; অথবা যেমন বৃক্ষে পাখি অনেক বসিয়াছে, হাততালি দিলে সব উড়িয়া যায়।”

একদিন কেশববাবুর সহিত কথা হইতেছিল —

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি) — মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত! আমি মুক্ত পুরুষ — সংসারেই তাকি, আর অরণ্যেই থাকি — আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান, রাজাধিরাজের ছেলে, আমায় আবার বাঁধে কে? যদি সাপে কামড়ায়, — ‘বিষ নাই’, ‘বিষ নাই’; জোর করে বললে বিষ ছেড়ে যায়। তেমনিই ‘আমি বদ্ধ নই’ ‘আমি বদ্ধ নই’ ‘আমি মুক্ত’ এই কথাটি রোক করে বলতে বলতে তাই হয়ে যায়। মুক্তই হয়ে যায়।

“খ্রীষ্টানদের একখানা বই (বাইবেল) একজন দিলে। আমি পড়ে শুনাতে বললাম। তাতে কেবল ‘পাপ’ আর ‘পাপ’। তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেও কেবল ‘পাপ’ আর ‘পাপ’। যে ব্যক্তি আমি বদ্ধ বারবার বলে, সে শেষে বদ্ধই হয়ে যায়। যে রাতদিন ‘আমি পাপী’ ‘আমি পাপী’ এই করে, সে তাই হয়ে যায়।

“ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই — কি! আমি তাঁর নাম করেছি, আমার এখনও পাপ থাকবে? আমার আবার বন্ধন কি, পাপ কি? কৃষ্ণকিশোর পরম হিন্দু, সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। সে বৃন্দাবনে গিয়েছিল। একদিন ভ্রমণ করতে করতে তার জলতৃষ্ণা পেয়েছিল। একটা কুয়ার কাছে গিয়ে দেখলে, একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বললে, ‘ওরে, তুই আমায় একঘটি জল দিতে পারিস?

তুই কি জাত?’ সে বললে, ‘ঠাকুর মশাই, আমি হীন জাত — মুচি।’ কৃষ্ণকিশোর বললে, ‘তুই বল, শিব, আর জল তুলে দে।’

“ভগবানের নাম করলে দেহ-মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়। কেবল ‘পাপ’ আর ‘নরক’ এ-সব কথা কেন? একবার বল যে অন্যায় কর্ম যা করেছি, তা আর করবো না। আর তাঁহার নামে বিশ্বাস কর।”

স্বামীজীও খ্রীষ্টানদের এই পাপবাদ সম্বন্ধে বলিলেন, পাপ কি! তোমরা অমৃতের অধিকারী, Sons of Immortal Bliss. তোমাদের ধর্মযাজকেরা রাত্রদিন নরকাগ্নির কথা বলেন, সে-কথা শুনিও না।

"Ye are the children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings. Ye divinities on earth — Sinners! It is a sin to call a man so. Come up, O lions! and shake off the delusion that you are sheep! You are souls immortal spirits free and blest — and eternal, ye are not bodies; matter is your servant, not you the servant of matter."
— Lecture on Hinduism (Chicago)

আমেরিকার হার্টফোর্ড নামক স্থানে স্বামী বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এখানকার American Consul Patterson তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন ও সভাপতির কার্য করিয়াছিলেন। স্বামী আবার খ্রীষ্টানদের পাপবাদ সম্বন্ধে বলিলেন, যদি ঘর অন্ধকার হয়, তাহলে ‘অন্ধকার’ ‘অন্ধকার’ করিলে কি হইবে? আলো জ্বালো তবে ত হবে —

"Shall we advise men to kneel down and cry — Oh miserable sinner that I am! No, rather let us remind them of their divine nature.....If the room is dark, do you go about striking your breast and crying,

"It is dark!' No, the only way to get into light is to strike a light and then the darkness goes. — The only way to realise the Light above you, is to strike the spiritual light within you and the darkness of impurity and sin will flee away. Think of your higher Self, not of your lower."

স্বামী পরমহংসদেবের কাছে একটি গল্প১ শুনিয়াছিলেন, সেই গল্পটই বলিলেন — একটা বাঘিনী একটা ছাগলের পাল আক্রমণ করেছিল। পূর্ণগর্ভা, তাই লাফ দিতে গিয়ে ছানা হয়ে গেল। বাঘিনীর মৃত্যু হল। ছানাটি ছাগলের সঙ্গে মানুষ হতে লাগল, আর তাদের সঙ্গে ঘাস খেতে লাগল ও 'ভ্যা — অ্যা, ভ্যা — অ্যা', করতে লাগল। কিছুদিন পরে সে ছানাটি বেশ বড় হল। একদিন ছাগলের পালে আর একটি বাঘ পড়ল। সে দেখে অবাক্ যে, একটা বাঘ ঘাস খাচ্ছে, আর ভ্যা — ভ্যা করছে, আবার তাকে দেখে ছাগলের মতো পালাচ্ছে। তখন তাকে ধরে জলের কাছে নিয়ে গেল ও বললে, 'তুইও বাঘ, তুই ঘাস খাচ্ছিস কেন, আর ভ্যা — ভ্যা করছিল কেন — দেখ আমি কেমন মাংস খাচ্ছি। তুইও খা, ওই দেখ — জলে তোর মুখ দেখা যাচ্চে আমার মতো!' বাঘটা সব দেখলে, মাংসেরও আস্বাদ পেলে।"

১ এই আখ্যায়িকাটি সাংখ্যদর্শনে আছে। আখ্যায়িকা প্রকরণ।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

54.7 শ্রীরামকৃষ্ণ, বিজয়, কেশব, নরেন্দ্র ও ‘কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ’ —— সন্ন্যাস (Renunciation)

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে কথাবার্তা কহিতেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি) — কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ না করলে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না। দেখ না, কেশব সেন ওইটি পারলে না বলে, কি হল শেষটা! তুমি নিজে ঐশ্বর্যের ভিতর, কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর থেকে যদি বল ‘সংসার অনিত্য, ঈশ্বরই বস্তু’, অনেকে তোমার কথা শুনবে না। আপনার কাছে গুড়ের নাগরি রয়েছে, পরকে বলছো গুড় খেও না! তাই ভেবে-চিন্তে চৈতন্যদেব সংসারত্যাগ করলেন। তা না হলে জীবের উদ্ধার হয় না।

বিজয় —— আজ্ঞে হাঁ, চৈতন্যদেব বলেছিলেন, কফ যাবে বলে পিপ্পলখণ্ড তৈয়ের করলাম১ —— কিন্তু উলটো উৎপত্তি হল, কফ বেড়ে গেল; নবদ্বীপের অনেক লোক ব্যঙ্গ করতে লাগল ও বলল, নিমাই পণ্ডিত বেশ আছে হে; সুন্দরী স্ত্রী, প্রতিষ্ঠা, অর্থের অভাব নেই; বেশ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— কেশব যদি ত্যাগী হত অনেক কাজ হত। ছাগলের গায়ে ক্ষত থাকলে আর ঠাকুর সেবা হয় না। বলি দেওয়া হয় না। ত্যাগী না হলে লোকশিক্ষার অধিকারী হয় না। গৃহস্থ হলে কজন তার কথা শুনবে?

স্বামী বিবেকানন্দ কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী, তাই তাঁহার ঈশ্বরবিষয়ে লোকশিক্ষা দেবার অধিকার। বিবেকানন্দ বেদান্তে ও ইংরেজী ভাষা ও দর্শনাদিতে

পণ্ডিতাগ্রগণ্য, তিনি অসাধারণ বাগ্মী, সেই কি তাঁহার মাহাত্ম্য? ইহার উত্তর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দিবেন। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে ভক্তদের সম্বোধন করিয়া পরমহংসদেব ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলিতেছেন —

"এই ছেলেটিকে২ দেখছো এখানে একরকম। দুরন্ত ছেলে, বাবার কাছে যখন বসে, যেন জুজুটি। আবার চাঁদনিতে যখন খেলে, তখন আর এক মূর্তি। এরা নিত্যসিদ্ধের থাক। এরা সংসারে কখন বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। এরা সংসারে আসে জীবশিক্ষার জন্য। এদের সংসারে বস্তু কিছু ভাল লাগে না — এরা কামিনী-কাঞ্চনে কখনও আসক্ত হয় না।

"বেদে আছে হোমাপাখির কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখি থাকে। সেই আকাশেই সে ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লেই ডিমটা পড়তে থাকে। ডিম পড়তে পড়তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে তার চোখ ফুটে আর ডানা বেরোয়। চোখ ফুটলেই দেখতে পায় যে, সে পড়ে যাচ্ছে, আর শরীর মাটিতে লাগলে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে পাখি মার দিকে, ঊর্ধ্বদিকে চোঁচা দৌড় দেয়, আর উঁচুতে উঠে যায়।"

বিবেকানন্দ এই 'হোমাপাখি' — তাঁর জীবনের এক লক্ষ্য মার কাছে চোঁচা দৌড় দিয়ে উঠে যাওয়া — গায়ে মাটি না ঠেকতে ঠেকতে অর্থাৎ সংসার স্পর্শ না করতে করতে ভগবানের পতে অগ্রসর হওয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ ৺বিদ্যাসাগরকে বলিয়াছিলেন, “পাণ্ডিত্য! শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? শকুনিও অনেক উঁচুতে উঠে, কিন্তু নজর ভাগাড়ের দিকে — কোথায় পচা মড়া। পণ্ডিত অনেক শ্লোক ফড়্‌র ফড়্‌র করতে পারে, কিন্তু মন কোথায়? যদি হরিপাদপদ্মে থাকে, আমি তাকে মানি, যদি কামিনী-কাঞ্চনে থাকে, তাহলে আমার খড়কুটো বোধ হয়।”

স্বামী বিবেকানন্দ শুধু পণ্ডিত নহেন, তিনি সাধু, মহাপুরুষ! শুধু পাণ্ডিত্যের জন্য ইংরেজ ও আমেরিকাবাসিগণ ভৃত্যের ন্যায়, তাঁহার সেবা করেন নাই। তঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ইনি আর এক জাতীয় লোক। সম্মান, টাকা, ইন্দ্রিয়সুখ, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি লোকে রহিয়াছে; ইঁহার কিন্তু এক লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ। সন্ন্যাসীর গীতিতে তিনিই বলিয়াছেন, সন্ন্যাসী কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ করিবে।

"Truth never comes where lust
   and fame and greed
Of gain reside. No man who
   thinks of woman
As his wife can ever perfect be.
Nor he who owns however little,
   Nor he —
Whom anger chains — Can ever pass
   thro' Maya's gates.
So give these up, sannyasin bold, Say —
  "Om Tat Sat Om!"

— Song of the Sannyasin.

আমেরিকায় তাঁহার প্রলোভন কম হয় নাই। একে জগদ্‌ব্যাপী প্রতিষ্ঠা; তাহাতে সর্বদাই পরমাসুন্দরী উচ্চবংশীয়া সুশিক্ষিতা মহিলাগণ আসিয়া আলাপ ও সেবা

করিতেন। তাঁহার এত মোহিনীশক্তি যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিতেন। একজন অতি ধনাঢ্যের কন্যা (heiress) সত্য সত্য একদিন আসিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “স্বামী! আমার সর্বস্ব ও আমাকে আপনাকে সমর্পণ করিলাম।” স্বামী তদুত্তরে বলিলেন, “ভদ্রে! আমি সন্ন্যাসী, আমার বিবাহ করিতে নাই। সকল স্ত্রীলোক আমার মাতৃস্বরূপা!” ধন্য বীর! তুমি গুরুদেবের উপযুক্ত শিষ্য! তোমার গাত্র যথার্থই পৃথিবীর মৃত্তিকা স্পর্শ করে নাই। তোমার গাত্রে কামিনী-কাঞ্চনের দাগটি পর্যন্ত লাগে নাই। তুমি প্রলোভনের রাজ্য হইতে পলায়ন কর নাই। তাহার মধ্যে থাকিয়া, শ্রীনগরে বাস করিয়া, ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইয়াছ। তুমি সামান্য জীবের ন্যায় দিন কাটাইতে চাও নাই। তুমি দেবভাবের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া এ-মর্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছ।

১ পিপুলখণ্ড — অর্থাৎ নবদ্বীপে হরিনাম প্রচার।

২ স্বামী বিবেকানন্দ তখন জেনার‍্যাল্ অ্যাসেমব্লি কলেজে পড়েন। বয়স ১৯।২০। তাঁহার বাড়ি তখন কলেজের কাছে সিমুলিয়ায়। পিতার নাম ৺বিশ্বনাথ দত্ত হাইকোর্টের এটর্ণি। বালকের নাম নরেন্দ্র। কলেজে থাকিয়া বি. এ. পাশ করিয়াছিলেন। তখন Hastie সাহেব প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার ভাই ভগ্নীরা আছেন। স্বামীর জন্মদিন — সোমবার, পৌষ সংক্রান্তি, ১২৬৯ সাল, প্রাতে ৬-৩১।৩৩ সময়, সূর্যোদয়ের ৬ মিনিট পূর্বে; বয়স — ৩৯ বৎসর ৫ মাস ২৪ দিন হইয়াছিল।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

54.8 শ্রীরামকৃষ্ণ, কর্মযোগ, নরেন্দ্র ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা
(নিষ্কাম কর্ম)

পরমহংসদেব বলিতেন, কর্ম সকলেরই করিতে হয়। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম এই তিনটি ঈশ্বরের কাছে পোঁছবার পথ। গীতায় আছে, — সাধু, গৃহস্থ, প্রথমে চিত্তশুদ্ধির জন্য গুরুর উপদেশ অনুসারে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করিবে। 'আমি কর্তা' এটি অজ্ঞান, ধন-জন কার্যকলাপ আমার, এটিও অজ্ঞান। গীতায় আছে, আপনাকে অকর্তা জেনে ইশ্বরকে ফল সমর্পণ করে কাজ করতে হয়। গীতায় আরও আছে যে, সিদ্ধিলাভের পরও প্রত্যাদিষ্ট হইয়া কেহ কেহ, যেমন জনকাদি, কর্ম করেন। গীতায় যে আছে কর্মযোগ সে এই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও ওই কথা বলিতেন।

তাই কর্মযোগ বড় কঠিন। অনেকদিন নির্জনে ঈশ্বরের সাধনা না করলে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা যায় না। সাধনার অবস্থায় গুরুর উপদেশ সর্বদা প্রয়োজন। তখন কাঁচা অবস্থা, তাই কোন্‌ দিক থেকে আসক্তি এসে পড়ে জানতে পারা যায় না। মনে করছি, আমি অনাসক্ত হয়ে ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে, জীবসেবা দানাদি কার্য করছি; কিন্তু বাস্তবিক আমি হয় তো লোকমান্য হবার জন্য করছি, নিজেই বুঝতে পারছি না। যে ব্যক্তি গৃহস্থ, যার গৃহ, পরিজন, আত্মীয়-কুটুম্ব, আমার বলবার আছে, তাকে দেখে নিষ্কাম কর্ম ও অনাসক্তি, পরার্থে স্বার্থত্যাগ, এ-সকল শিক্ষা করা বড় কঠিন।

কিন্তু সর্বত্যাগী কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী সিদ্ধ মহাপুরুষ যদি নিষ্কাম কর্ম করে দেখান, তাহলে লোক সহজে উহা বুঝিতে পারে ও তাঁহার পদানুসরণ করে।

স্বামী বিবেকানন্দ কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী। তিনি নির্জনে গুরুর উপদেশে অনেকদিন সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি যথার্থে কর্মযোগের অধিকারী। তবে তিনি সন্ন্যাসী, মনে করিলেই ঋষিদের মতো অথবা তাঁহার গুরুদেব পরমহংসদেবের মতো কেবল জ্ঞান-কর্ম লইয়া থাকিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার জীবন কেবল ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য হয় নাই। সংসারীরা যে সকল বস্তু গ্রহণ করে, অনাসক্ত হইয়া তাহাদের কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, নারদ, শুকদেব ও জনকাদির ন্যায় স্বামীজী লোকসংগ্রহার্থ তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি অর্থ ও মান, এ-সকলকে সন্ন্যাসীর ন্যায় কাকবিষ্ঠা জ্ঞান করিতেন বটে, অর্থাৎ নিজে ভোগ করিতেন না; কিন্তু তাহাদিগকে জীবসেবার্থে কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়, তাহা উপদেশ দিয়া ও নিজে কাজ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। যে অর্থ বিলাত ও আমেরিকার বন্ধুবর্গের নিকট হইতে তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত অর্থ জীবের মঙ্গলকল্পে ব্যয় করিয়াছেন। স্থানে স্থানে, যথা কলিকাতার নিকটস্থ বেলুড়ে, আলমোরার নিকটস্থ মায়াবতীতে, কাশীধামে ও মাদ্রাজ ইত্যাদি স্থানে মঠ স্থাপন করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে নানা স্থানে — দিনাজপুর, বৈদ্যনাথ, কিষেণগড়, দক্ষিণেশ্বর ও অন্যান্য স্থানে — সেবা করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের সময় পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক-বালিকাগণকে অনাথাশ্রম করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। রাজপুতনার অন্তর্গত কিষেণগড় নামক স্থানে অনাথাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের নিকট (ভাবদা) সারগাছী গ্রামে এখনও অনাথাশ্রম চলিতেছে। হরিদ্বার-নিকটস্থ কনখলে পীড়িত

সাধুদিগের জন্য স্বামী সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। প্লেগের সময় প্লেগব্যাধি-আক্রান্ত রোগীদিগকে অনেক অর্থব্যয় করিয়া সেবা-শুশ্রূষা করাইয়াছেন। দরিদ্র কাঙালের কন্য একাকী বসিয়া কাঁদিতেন। আর বন্ধুদের সমক্ষে বলিতেন, “হায়! এদের এত কষ্ট, ঈশ্বরকে চিন্তা করিবার অবসর পর্যন্ত নাই।”

গুরূপদিষ্ট কর্ম, নিত্যকর্ম ছাড়া অন্য কর্মতো বন্ধনের কারণ। তিনি সন্ন্যাসী। তাঁহার কর্মের কি প্রয়োজন?

"Who sows must reap," they say
and "cause must bring
The sure effect. Good good;
bad bad; and none
Escape the law. But who so
wears a form Must wear the chain." Too true,
but far beyond
Both name and form is Atman,
ever free.
Know thou art That, sannyasin bold!
say "Om Tat Sat, Om."

— Song of the Sannaysin

কেবল লোকশিক্ষার জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে এই সকল কর্ম করাইলেন। এখন সাধু বা সংসারী সকলে শিখিবে যে, যদি তাহারাও কিছুদিন নির্জনে গুরুর উপদেশে ঈশ্বরের সাধনা করিয়া ভক্তিলাভ করে, তাহারাও স্বামীজীর ন্যায় নিষ্কাম কর্ম করিতে পারিবে, যথার্থা অনাসক্ত হইয়া দানাদি সৎকার্য করিতে পারিবে। স্বামীজীর গুরুদেব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, “হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙলে আঠা লাগবে না।” অর্থাৎ নির্জনে সাধনের পর ভক্তিলাভ করিয়া

প্রত্যাদিষ্ট হইয়া লোকশিক্ষার্থ পৃথিবীর কার্যে হাত দিলে ঈশ্বরের কৃপায় যথার্থ নির্লিপ্তভাবে কাজ করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন অনুধ্যান করিলে, নির্জনে সাধন কাহাকে বলে ও লোকশিক্ষার্থ কর্ম কাহাকে বলে, তাহার আভাস পাওয়া যায়।

বিবেকানন্দের এ-সকল কর্ম লোকশিক্ষার্থ।

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ।।

এই গীতোক্ত কর্মযোগ অতিশয় কঠিন। জনকাদি কর্মের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন যে, জনক তাহার পূর্বে নির্জনে বনে অনেক কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাই সাধুরা জ্ঞান ও ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়া সংসার-কোলাহল ত্যাগ করিয়া নির্জনে ঈশ্বরসাধন করেন। তবে স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় উত্তম অধিকারী বীরপুরুষ কেবল এই কর্মযোগের অধিকারী। ভগবানকে অনুভব করিতেছেন, অথচ লোকশিক্ষার জন্য প্রত্যাদিষ্ট হইয়া সংসারে কর্ম করিতেছেন, এরূপ মহাপুরুষ পৃথিবীতে কয়টি? ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা, কামিনী-কাঞ্চনের দাগ একটিও লাগে নাই, অথচ জীবের সেবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন, এরূপ আচার্য কয়টি দেখা যায়?

স্বামীজী লণ্ডনে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই নভেম্বর বেদান্তের কর্মযোগ ব্যাখ্যায় গীতার কথা বলিলেন —

"Curiously enough the scene is laid on the battlefield where Krishna teaches the philosophy to Arjuna; and the doctrine which stands out

luminously in every page of the Gita is intense activity, but in the midst of that, eternal calmness. And this idea is called the secret of work to attain which is the goal of the Vedanta." (London)

— Practical Vedanta

বক্তৃতায় স্বামীজী কর্মের মধ্যে সন্ন্যাসীর ভাবের (‘Calmness in the midst of activity’) কথা বলিয়াছেন। স্বামী ‘রাগদ্বেষ-বিবর্জিত’ হইয়া কর্ম করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি যে এরূপ কর্ম করিতে পারিতেন, সে কেবল তাঁর তপস্যার গুণে, তাঁর ঈশ্বরানুভূতির বলে। সিদ্ধ পুরুষ অথবা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় অবতারপুরুষ না হইলে এই স্থিরতা (‘Calmness’) হয় না।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

54.9 স্ত্রীলোক লইয়া সাধনা বা বামাচার সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীরামককৃষ্ণ ও স্বামীজীর উপদেশ

স্বামী বিবেকানন্দ একদিন দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ভবনাথ ও বাবুরাম প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, ২৯শে সেপ্টেম্বর। ঘোষপাড়া ও পঞ্চনামী সম্বন্ধে নরেন্দ্র কথা তুলিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, স্ত্রীলোক লইয়া তারা কিরূপ সাধনা করে?

ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলিলেন, "তোর আর এ-সব কথা শুনে কাজ নাই। কর্তাভজা, ঘোষপাড়া ও পঞ্চনামী আবার ভৈরব-ভৈরবী এরা ঠিক ঠিক সাধনা করতে পারে না, পতন হয়। ও-সব পথ নোংরা পথ, ভাল পথ নয়। শুদ্ধ পথ দিয়ে যাওয়াই ভাল। কাশীতে আমায় ভৈরবীচক্রে নিয়ে গেল। একজন করে ভৈরব, একজন করে ভৈরবী; আমায় আবার কারণ পান করতে বললে। আমি বললাম, 'মা, আমি কারণ ছুঁতে পারি না।' তারা খেতে লাগল। ভাবলাম এইবার বুঝি জপ ধ্যান করবে। তা নয়, মদ খেয়ে নাচতে আরম্ভ করলে।"

নরেন্দ্রকে আবার বলিলেন, "কি জান, আমার মাতৃভাব — সন্তানভাব। মাতৃভাব অতি শুদ্ধভাব, এতে কোন বিপদ নাই। স্ত্রীভাব, বীরভাব — বড় কঠিন, ঠিক রাখা যায় না, পতন হয়। তোমরা আপনার লোক, তোমাদের বলছি, — শেষ এই বুঝেছি — তিনি পূর্ণ, আমি তার অংশ। তিনি প্রভু, আমি তাঁর দাস। আবার এক-একবার ভাবি, তিনিই আমি, আমিই তিনি। আর ভক্তিই সার।"

আর-একদিন ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন, "আমার সন্তানভাব। অচলানন্দ এখানে এসে মাঝে মাঝে থাকত, খুব কারণ করত। আমি স্ত্রীলোক লয়ে সাধন ভাল বলতাম না, তাই আমাকে বলেছিল, 'তুমি বীরভাবের সাধন কেন মানবে না? তন্ত্রে আছে। — শিবের কলম মানবে না? তিনি (শিব) সন্তানভাবও বলেছেন — আবার বীরভাবও বলেছেন।'

“আমি বললাম, কে জানে বাপু আমার ও-সব ভাল লাগে না — আমার সন্তানভাব।

“ও-দেশে ভগী তেলীকে কর্তাভজার দলে দেখেছিলাম। — ওই মেয়েমানুষ নিয়ে সাধন। আবার একটি পুরুষ না হলে মেয়েমানুষের সাধন-ভজন হবে না। সেই পুরুষটিকে বলে রাগকৃষ্ণ। তিনবার জিজ্ঞাসা করে, তুই কৃষ্ণ পেয়েছিস। সেই মেয়েমানুষটিও তিনবার বলে কৃষ্ণ পেয়েছি।”

আর-একদিন ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, ২৩শে মার্চ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ রাখাল, রাম প্রভৃতি ভক্তদের বলিতেছেন — বৈষ্ণবচরণের কর্তাভজার মত ছিল। আমি যখন ও-দেশে শ্যামবাজারে যাই, তাদের বললাম এরূপ মত আমার নয়, আমার মাতৃভাব। দেখলাম যে লম্বা লম্বা কথা কয়, আবার ব্যভিচার করে। ওরা ঠাকুর পূজা, প্রতিমা পূজা like করে না। জীবন্ত মানুষ চায়। ওরা অনেকে রাধাতন্ত্রের মতে চলে। পৃথিবীতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব — মল, মূত্র, রজ, বীজ এই সব তত্ত্ব। এ সাধন বড় নোংরা সাধন, যেমন পাইখানার মধ্যে দিয়া বাড়ির ভিতর ঢোকা।”

ঠাকুরের উপদেশ অনুসারে স্বামী বিবেকানন্দও বামাচারের খুব নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলেন, “ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানে বিশেষত বাঙ্গালাদেশে গুপ্তভাবে অনেকে এরূপ সাধনা করেন, তাঁহারা বামাচারতন্ত্রের প্রমাণ দেখান। ও-সকল তন্ত্র ত্যাগ করিয়া উপনিষৎ, গীতাদি শাস্ত্র ছেলেদের পাঠ করিতে দেওয়া উচিত।”

শোভাবাজার ৺রাধাকান্তদেবের ঠাকুরবাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ বিলাত হইতে ফিরিবার পর বেদান্ত সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। তাহাতে স্ত্রীলোক লইয়া সাধনার নিন্দা করিয়া নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন —

"Give up this filthy Vamachara that is killing your country. You have not seen the other parts of India. When I see how much the Vamachara has entered our society, I find it a most disgraceful place with all its boast of culture. These Vamachara sects are honey-combing our society in Bengal. Those who came out in the day-time and preach most loudly about achara, it is they who carry on the most horrible debauchery at night, and are backed by the most dreadful books. They are ordered by the books to do these things. You who are of Bengal know it. The Bengali Shastras are the Vamachara Tantras. They are published by the cartload, and you poison the minds of your children with them instead of teaching them your Shrutis. Fathers of Calcutta, do you not feel ashamed that such horrible stuff as these Vamachara Tantras, with translation too, should be put into the hands of your boys and girls, and their minds poisoned, and that they should be brought up with the idea that these are the Shastras of the Hindus? If you are ashamed, take them away from your children, and let them read the true Shastras, the Vedas, the Gita, the Upanishads."

— Reply to Calcutta address at Shovabazar.

কাশীপুর বাগানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন পীড়িত হইয়া আছেন (১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে), নরেন্দ্রকে একদিন ডাকিয়া বলিলেন, “বাবা, এখানে যেন কেহ কারণ পান না করে। ধর্মের নাম করে মদ্য পান করা ভাল নয়; আমি দেখেছি, যেখানে ওরূপ করেছে, সেখানে ভাল হয় নাই।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

54.10 শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও অবতারবাদ

একদিন দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তদের সঙ্গে বসিয়া আছেন, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, ৭ই মার্চ, বেলা ৩টা-৪টা হইবে।

ভক্তেরা পদসেবা করিতেছেন, — শ্রীরামকৃষ্ণ একটু হাসিয়া ভক্তদের বলিতেছেন, "এর (অর্থাৎ পদসেবার) অনেক মানে আছে।" আবার নিজের হৃদয়ে হাত রাখিয়া বলিতেছেন, "এর ভিতর যদি কিছু থাকে (পদসেবা করলে) অজ্ঞান অবিদ্যা একেবারে চলে যাবে।"

হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ গম্ভীর হইলেন, যেন কি গুহ্যকথা বলিবেন। ভক্তদের বলিতেছেন, "এখানে বাহিরের লোক কেউ নাই, তোমাদের একটা গুহ্যকথা বলছি। সেদিন দেখলাম, আমার ভিতর থেকে সচ্চিদানন্দ বাইরে এসে রূপ ধারণ করে বললে, আমিই যুগে যুগে অবতার। দেখলাম পূর্ণ আর্বিভাব, তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।"

ভক্তেরা এই সকল কথা অবাক্ হইয়া শুনিতেছেন। কেহ কেহ গীতোক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহাবাক্য স্মরণ করিতেছেন —

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ।।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।।

আর-একদিন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, ১লা সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমী দিবসে নরেন্দ্রাদি ভক্তের সমাগম হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ ২।১টি বন্ধু সঙ্গে করিয়া দক্ষিণেশ্বরে গাড়ি করিয়া আসিয়া উপস্থিত। কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহে তাঁহার গা চাপড়াইতে লাগিলেন।

গিরিশ মাথা তুলিয়া হাতজোড় করিয়া বলিতেছেন — "তুমিই পূর্ণব্রহ্ম। তা যদি না হয়, সবই মিথ্যা। বড় খেদ রইলো তোমার সেবা করতে পেলুম না। দাও বর ভগবন, একবৎসর তোমার সেবা করব।" বারবার তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্তব করাতে ঠাকুর বলিতেছেন, — "ছি, ও-কথা বলতে নাই, ভক্তবৎ ন চ কৃষ্ণবৎ। তুমি যা ভাব, তুমি ভাবতে পার। আপনার গুরু তো ভগবান, তা বলে ও-সব কথা বলায় অপরাধ হয়।"

গিরিশ ঠাকুরকে আবার স্তব করিতেছেন, "ভগবন্, পবিত্রতা আমায় দাও; যাতে কখনও একটু পাপচিন্তা না হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি পবিত্র তো আছ — তোমার যে বিশ্বাস ভক্তি!

একদিন ১লা মার্চ, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, দোলযাত্রা দিবসে নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ আসিয়াছেন। ওইদিন ঠাকুর নরেন্দ্রকে সন্ন্যাসের উপদেশ দিতেছেন ও

বলিতেছেন, “বাবা, কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ না হলে হবে না। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, আর সব অনিত্য।” বলিতে বলিতে ভাবপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। সেই করুণামাখা সস্নেহদৃষ্টি।

ভাবোন্মত্ত হইয়া গান ধরিলেন:

কথা বলতে ডরাই, না বললেও ডরাই,
    মনে সন্দ হয়, পাছে তোমা ধনে হারাই — হারাই।
আমরা জানি যে মন্‌তোর দিলাম তোকে সেই মন্‌তোর,
        এখন মন তোর!
আমরা যে মন্ত্রে বিপদেতে তরি তরাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের যেন ভয়, বুঝি নরেন্দ্র আর কাহার হইল, আমার বুঝি হল না — ভয় পাছে নরেন্দ্র সংসারের হয়েন। “আমরা জানি যে মন্ত্র, দিলাম তোরে সেই মন্ত্র”, অর্থাৎ আমি তোকে জীবনের Highest Ideal সর্বত্যাগ করে ঈশ্বরের শরণাগত হওয়া এই মন্ত্র দিলাম। নরেন্দ্র অশ্রুপূর্ণ লোচনে চাহিয়া আছেন।

ওইদিনই ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলিতেছেন, “গিরিশ ঘোষ যা বলে, তোর সঙ্গে কি মিললো?”

নরেন্দ্র — আমি কিছু বলি নাই, তিনিই বলেন তাঁর অবতার বলে বিশ্বাস। আমি আর কিছু বললুম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিন্তু খুব বিশ্বাস! দেখেছিস?

কিছুদিন পরে নরেন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরের অবতার বিষয়ের কথা হইল। ঠাকুর বলিতেছেন, ‘আচ্ছা, কেউ কেউ যে আমাকে ঈশ্বরের অবতার বলে, তোর কি বোধ হয়?”

নরেন্দ্র বললেন, “অন্যের মত শুনে আমি কিছু করব না; আমি নিজে যখন বুঝব, নিজের যখন বিশ্বাস হবে, তখনই বলব।”

কাশীপুর উদ্যানে ঠাকুর যখন ক্যানসার রোগে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছেন, ভাতের তরল মণ্ড পর্যন্ত গলাধঃকরণ হইতেছে না, তখন একদিন নরেন্দ্র ঠাকুরের নিকট বসিয়া ভাবিতেছেন, এই যন্ত্রণামধ্যে যদি বলেন যে, আমি সেই ঈশ্বরের অবতার তাহলে বিশ্বাস হয়। চকিতের মধ্যে ঠাকুর বলিতেছেন — “যে রাম যে কৃষ্ণ, ইদানিং সে-ই রামকৃষ্ণরূপে ভক্তের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।” নরেন্দ্র এই কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। ঠাকুর স্বধামে গমন করিলে পর নরেন্দ্র সন্ন্যাসী হইয়া অনেক সাধন-ভজন-তপস্যা করিলেন। তযন তাঁহার হৃদয়মধ্যে অবতার সম্বন্ধে ঠাকুরের মহাবাক্য সকল যেন আরও প্রস্ফুটিত হইল। তিনি স্বদেশে-বিদেশে এই তত্ত্ব আরও পরিষ্কাররূপে বুঝাইতে লাগিলেন।

স্বামীজী যখন আমেরিকায় ছিলেন, তখন নারদসূত্রাদি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ভক্তিযোগ নামক গ্রন্থ ইংরেজীতে প্রণয়ন করেন। তাহাতেও বলিতেছেন যে, অবতারগণ স্পর্শ করিয়া লোকের চৈতন্য সম্পাদন করেন। তাঁহাদের স্পর্শে যাহারা দুরাচার, তাঁহারা পরম সাধু হইয়া যায়েন। “অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ।” ঈশ্বরই অবতাররূপে আমাদের কাছে আইসেন। যদি ঈশ্বরদর্শন করিতে আমরা চাই, তাহা হইলে

অবতারপুরুষের মধ্যেই তাঁহাকে দর্শন করিব। তাঁহাদিগকে আমরা পূজা না করিয়া থাকিতে পারিব না।

"Higher and nobler than all ordinary ones, is another set of teachers, the Avataras of Ishvara, in the world. They can transmit spirituality with a touch, even with a mere wish. The lowest and the most degraded characters become in one second saints at their command. They are the Teachers of all teachers, the highest manifestations of God through man. We cannot see God except through them. We cannot help worshipping them; and indeed they are the only ones whom we are bound to worship."
— Bhakti Yoga

আবার বলিতেছেন, — যতক্ষণ আমাদের মনুষ্যদেহ, ততক্ষণ আমরা ঈশ্বরের যদি পূজা করি, তবে একমাত্র অবতারপুরুষকেই করিতে হইবে। হাজার লম্বা লম্বা কথা কও, ঈশ্বরকে মনুষ্যরূপ ব্যতীত আর চিন্তাই হয় না। তোমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ আবোল-তাবোল কি বলিতে চাও? যাহা বলিবে, তাহার কিছুই মূল্য নাই। mere froth!

"As long as we are men, we must worship Him in man and as man. Talk as you may, you cannot think of God except as a man. You may deliver great intellectual discourses on God and on all things under the Sun, become great rationalists and prove to your satisfaction that all these accounts of the Avataras of God as man are nonsense. But let us come for a moment to practical commonsense. What is there behind this kind of remarkable intellect? Zero, nothing, simply so much forth. When next you hear a man delivering a great intellectual lecture against this worship of the Avataras of God, get hold of him and ask him what his idea of God is, what he inderstands by 'Omnipotence'. 'Omnipotence' and all similar terms beyond the spellingof the words. He really means

nothing by them; he cannot formulate as their meaning any idea unaffected by his own human nature; he is no better off in this matter than the man in the street who has not read a single book." — Bhakti-Yoga.

স্বামী দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। সেই সময়ে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে California প্রদেশে Los Angeles নামক নগরে Christ the Messenger বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই বক্তৃতায় আবার অবতারতত্ত্ব বিষদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বামী বলিলেন, অবতার পুরুষেতেই (in the Son) ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে। আমাদের ভিতরেও ঈশ্বর আছেন বটে, কিন্তু অবতারপুরুষেই তিনি বেশি প্রকাশ। আলোর স্পন্দন (Vibration of Light) সর্বস্থানে হইতেছে, কিন্তু বড় বড় দীপ জ্বালিলেই অন্ধকার দূর হয়।

"It has been said by the same Messenger (Christ) 'None hath seen God, but they have seen the Son.' And that is true. And where to see God but in the Son? It is true that you and I, the poorest of us, the meanest even, embody that God — even reflect that God. The vibration of light is everywhere, omnipresent; but we have to strike the light of the lamp there and then we human beings see that He is Omnipresent. The Omnipresent God of the Universe cannot be seen until He is reflected by these giant lamps of the earth; the Prophets, the Man-Gods, the Incarnations, the embodiments of God." — Christ the Messenger.

স্বামী আবার বলিতেছেন —— ঈশ্বরের স্বরূপ তুমি যতদূর পার কল্পনা করিতে পার; কিন্তু দেখিবে, তোমার কল্পিত ঈশ্বর, অবতারপুরুষ অপেক্ষা অনেক নিচু। তবে এই মানুষ দেবতাগুলিকে পূজা করা কি অন্যায়? তাঁহাদের পূজা করাতে

কোন দোষ নাই। শুধু তাহা নহে, ঈশ্বরকে পূজা করিতে হইলে অবতারকেই পূজা করিতে হইবে। তুমি যে মানুষ, তোমার মানুষরূপী ভগবানকে পূজা করিতে হইবে, অন্য উপায় নাই।

"Take one of these Messengers of light, compare his character with highest ideal of God you ever formed, and you find that your God falls low and that that character rises. You cannot even form of God a higher ideal than what he actually embodied have practically realised and laid before us as an example. Is it wrong, therefore, to worship these as God? Is it a sin to fall at the feet of these man-Gods and worship them as the only Divine beings in the world? If they are really, actually, higher than all my conceptions of God, what harm that they should be worshipped? Not only is there no harm, but it is the only possible and positive way of worship."
— Christ the Messenger.

[অবতারের লক্ষণ (Jesus Christ)]

অবতারপুরুষ কি বলিতে আইসেন? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, বাবা, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করলে হবে না, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। স্বামীজীও আমেরিকানদের বলিলেন —

"We see in the life of Christ the first watchword, 'Not this life, but something higher!' No faith in this world and all its belongings! It is evanescent; it goes!"

“যীশু কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী। তিনি জেনেছিলেন, আত্মা স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয়। টাকা-কড়ি, মান-সম্ভ্রম, দেহসুখ, ইন্দ্রিয়সুখ অবতারপুরুষ কিছুই চান না। তাঁহার

পক্ষে ‘আমি’ ‘আমার’ কিছুই নাই। আমি কর্তা, আমার গৃহ, পরিবার ইত্যাদি সব অজ্ঞান থেকে হয়।”

"We still have fondness for 'me' and 'mine'. We want property, money, wealth. Woe unto us! Let us confess! And do not put to shame that great Teacher of humanity! He (Jesus) had no family ties. Do you think that that man had any physical ideas in him? Do you think that this mass of Light, this God and Not-man, came down so low, as to be the brother of animals? ANd yet, they make him preach all sorts, even of low sexual things. He had none! He was a soul! Nothing but a soul, just working, as it were, a body for the good of humanity; and that was all his relation to the body. Oh, not that! In the soul there is neither man nor woman. No, no! The disembodied soul has no relationship to the animal, no relationship to the body. The ideal may be high; away beyond us. never mind; It is the Ideal. Let us confess it is so: — that we cannot approach it yet."

— Christ the Messenger.

আমেরিকানদের আবার বলিতেছেন — অবতারপুরুষ আর কি বলেন? আমাকে দেখিতেছ আর ঈশ্বরকে দেখিতে পাইতেছ না? তিনি আর আমি যে এক। তিনি যে হৃদয়মধ্যে শুদ্ধ মনের গোচর।

"Thou hast seen me and not seen the Father? I and my Father are one! The kingdom of Heaven is within you! If I am pure enough I will also find in the heart of my heart, I and my Father are one. That was what Jesus of Nazareth said."

— Christ the Messenger.

এই বক্তৃতামধ্যে স্বামী অন্যস্থলে বলিতেছেন, অবতারপুরুষ ধর্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে দেহধারণ করেন। যীসাস্ ক্রাইষ্টের ন্যায় দেশকালভেদে তাঁহারা অবতীর্ণ হয়েন। তাঁহারা মনে করিলে আমাদের পাপ মার্জনা ও মুক্তি দিতে (Vicarious atonement) পারেন। আমরা যেন তাঁহাদের সর্বদা পূজা করিতে পারি।

"Let us, therefore, find God not only in Jesus of Nazareth, but in all the great ones that have preceded him, in all that came after him, and all that are yet to come. Our worship is unbounded and free. They are all manifestations of the same Infinite God. They were all pure and unselfish; they struggled, and gave up their lives for us, poor human beings. They all and each of them bore Vicarious atonement for every one of us and also for all that are to come hereafter."

— Christ the Messenger.

[জ্ঞানযোগ ও স্বামী বিবেকানন্দ]

স্বামী বেদান্তচর্চা করিতে বলিতেন, কিন্তু সেই সঙ্গে ওই চর্চা যাহা বিপদ তাহাও দেখাইয়া দিয়াছেন। ঠাকুর যেদিন ঠনঠনিয়াতে শ্রীযুক্ত শশধর পণ্ডিতের সহিত আলাপ করেন, সেদিন নরেন্দ্রাদি অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন; ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে।

ঠাকুর বলিলেন, “জ্ঞানযোগও এযুগে ভারী কঠিন। জীবের একে অন্নগত প্রাণ, তাতে আয়ু কম। আবার দেহবুদ্ধি কোন মতে যায় না। এদিকে দেহবুদ্ধি না গেলে একেবারে ব্রহ্মজ্ঞান হবে না। জ্ঞানী বলেন, আমি সেই ব্রহ্ম; আমি শরীর নই, আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ এ সকলের পার। যদি রোগ, শোক, সুখ, দুঃখ, এ-সব বোধ থেকে তুমি জ্ঞানী কেমন করে হবে? এদিকে

কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে দরদর করে রক্ত পড়ছে খুব লাগছে — অথচ বলছে কই, হাত তো কাটে নাই। আমার কি হয়েছে?

“তাই এ-যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ আর অন্যান্য পথ দিয়াও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এ-সব পথ কঠিন।”

ঠাকুর আরও বলিয়াছেন, “কর্মীদের যেটুকু কর্ম বাকী আছে, সেটুকু নিষ্কামভাবে করিবে। নিষ্কাম কর্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হলে ভক্তি আসবে, ভক্তি দ্বারা ভগবানলাভ হয়।”

স্বামিও বলিলেন, “দেহবুদ্ধি থাকিতে সোঽহম্‌ হয় না — অর্থাৎ সব বাসনা গেলে, সব ত্যাগ হলে তবে সমাধি হয়। সমাধি হলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ভক্তিযোগ সহজ ও মধুর (natural and sweet).”

"Jnana-yoga is grand, it is high philosophy; and almost every human being thinks curiously enough that he cab surely do everything required of him by Philosophy; but it is really very difficult to live truly the life of a philosopher. We are often apt to run into great dangers in trying to guide our life by philosophy. This world may be said to be divided between persons of demoniacal nature, who think the care-taking of the body to be-all and end-all of existence, and persons of godly nature, who realise that the body is simply a means to an end, an instrument intended for the culture of the soul. The devil can and indeed does quote the scriptures for his own purpose, and thus the way of knowledge often appears to offer justification to what the bad man does as much as it offers inducements to what the good man does. This is the great danger in Jnana-yoga. But Bhakti-yoga is natural, sweet and gentle; the

Bhakta does not take such high flights as the Jnana-yogin, and therefore he is not apt to such big falls."
— Bhakti-Yoga.

[শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার — স্বামীজীর বিশ্বাস]

ভারতের মহাপুরুষগণ (The Sages of India) সম্বন্ধে স্বামীজী বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে অবতারপুরুষদিগের কথা অনেক বলিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, রামানুজ, শঙ্করাচার্য, চৈতন্যদেব সকলের কথাই বলিলেন। ধর্মের গ্লানি হইয়া অধর্মের অভ্যুত্থান হইলে সাধুদের পরিত্রাণের জন্য ও পাপাচার বিনাশের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ন হই — গীতোক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ওই কথা উদ্ধার করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন —

"Whenever virtue subsides and irreligion prevails, I create myself; for the protection of the good and for the destruction of all immorality I am coming from time to time."
— Sages of India.

আবার বলিলেন, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম-সমন্বয় করিয়াছেন,

"In the Gita we already hear the distant sound of the conflicts of sects, and the Lord comes in the middle to harmonise them all. He the great Preacher of harmony, the greatest Teacher of Harmony, Lord Krishna himself.

“শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিয়াছেন, স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র, সকলেই পরমগতি লাভ করিবেন; ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের তো কথাই নাই।

“বুদ্ধদেব দরিদ্রের ঠাকুর। সর্বভূতস্থমাত্মানম্। ভগবান সর্বভূতে আছেন এইটি তিনি কাজে দেখাইলেন। বুদ্ধদেবের শিষ্যরা আত্মা জীবাত্মা এ-সব মানেন নাই —— তাই শঙ্করাচার্য আবার বৈদিক ধর্মের উপদেশ দিলেন। তিনি বেদান্তের অদ্বৈত মত, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত মত বুঝাইতে লাগিলেন। তাহার পর চৈতন্যদেব প্রেমভক্তি শিখাইবার জন্য অবতীর্ণ হইলেন। শঙ্কর, রামানুজ জাতি বিচার করিয়াছিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব তাহা করিলেন না। তিনি বলিলেন, ভক্তদের আবার জাতি কি?”

এইবার স্বামীজী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলিতেছেন —— শঙ্করের বিচারশক্তি ও চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তি এইবার একাধারে মূর্তিমতী হইল, আবার শ্রীকৃষ্ণের সর্বধর্ম-সমন্বয় বার্তা শোনা গেল, আবার দীন দরিদ্র পাপী তাপীর জন্য বুদ্ধদেবের ন্যায় একজন ক্রন্দন করিতেছেন, শোনা গেল; অবতারপুরুষগণ যেন অসম্পূর্ণ ছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অবতির্ণ হইয়া তাঁহাদের পূর্ণ করিয়াছেন (fulfilment of all sages).

"The one (Sankara) had a great head, the other (Chaitanya) a large heart, and the time was ripe for one to be born, the embodiment of both his head and heart; the time was ripe for one to be born who in one body would have the brilliant intellect of Sankara and the wonderfully expansive, infinite heart of Chaitanya; one who would see in every sect the spirit working, the same God; one who would see God in every being, one whose heart would weep for the poor, for the weak, for the outcast, for the down-trodden, for every one in this world, inside India or outside India; and the same time whose grand brilliant intellect, would conceive of such noble thoughts as would harmonise all conflicting sects, not only in India but outside of India, and bring a marvellous harmony, the universal Religion of head and heart, into existence.

"Such a man was born, and I had the good fortune to sit at his feet for years. The time was ripe, it was necessary that such a man should be born, and he came; and the most wonderful part of it was that his life's work was just near a city which was full of western thought, a city which had run mad after these occidental ideas, a city which had become more Europeanised than any other city in India. There he lived, without any book-learning whatsoever; this great intellect never learnt even to write his own name, but the most brilliant graduates of our University found in him an intellectual giant. He was a strange man, this Ramakrishna Paramahamsa. It is a long, long story, and I have no time to tell anything about him to-night. Let me now only mention the great Sri Ramakrishna, the fulfilment of the Indian sages, the sage for the time, one whose teaching is just now at the present time most beneficial. And mark the Divine power working behind the man. Ths son of a poor priest, born in an out-of-the way village, unknown and unthought of, today is worshipped literally by thousands in Europe and America, and to-morrow will be worshipped by thousands more. Who knows the plans of the Lord! Now my brothers, if you do not see the hand, the finger of Providence, it is because you are blind, born blind indeed." — The Sages of India.

স্বামী আবার বলিতেছেন — যে বেদময় দেববাণী ঋষিরা সরস্বতী তীরে শুনিয়াছিলেন, যে বাণী গিরিরাজ হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে মহাযোগী তাপসদের কর্ণে একদা প্রতিধ্বনিত হইয়াছীল, যে বানী সর্বগ্রাহী মহাবেগমতী নদীর আকারে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য নাম ধারণ করিয়া মর্ত্যলোকে অবতরণ করিয়াছিল, আজ আবার সেই দেববাণী সকলে শুনিতেছি। এই ভগবদ্বাণীর মহাস্পন্দন অল্পদিনের মধ্যে সমগ্র ভারত হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বস্থানে পৌঁছিবে — যতদূর বিস্তৃত মেদিনী। এই বাণী প্রতিদিন নবশক্তিতে শক্তিমতী হইতেছে। এই দেববাণী

পূর্ব পূর্ব যুগে অনেকবার শুনা গিয়াছে, কিন্তু আজ যাহা আমরা শুনিতেছি তাহা ওই সমস্ত বাণীর সমষ্টি! (summation of them all).

"Once more the wheel is turning up, once more vibrations have been set in motion from India, which are destined at no distant day to reach the farthest limits of the earth. One voice has spoken, whose echoes are rolling on and gathering strength every day, a voice even mightier than those which have preceded it, for it is the summation of them all. Once more the voice, that spoke to the sages on the banks of the Sarswati, the voice whose echoes reverberated from peak to peak of the 'Father of Mountains' and descended upon the plains through Krishna, Buddha and Chaitanya, in all-carrying floods, has spoken again. Once more the doors have opened. Enter ye into the realms of light, the gates have been opened wide once more."
— Reply to Khetri address.

স্বামীজী আরও বলিলেন, আমি যদি একটিও ভাল কথা বলিয়া থাকি —— আপনারা জানিবেন যে সমস্তই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের। যদি কিছু কাঁচা কথা —— প্রমাদপূর্ণ কথা —— বলিয়া থাকি তাহা জানিবেন সে আমার।

"Only let me say now that if I have told you one word of Truth, it was his and his alone; and if I have told you many things which were not true, were not correct, which were not beneficial to the human race, they were all mine, and on me is the responsibility."

এইরূপে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে নানাস্থানে অবতারপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনবার্তা ঘোষণা করিলেন। যেখানে যেখানে মঠস্থাপনা হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার নিত্য সেবাপূজাদি হইতেছে। আরতির সময় স্বামীজীর রচিত স্তব সকল স্থানেই বাদ্য ও সুর-সংযোগে গীত হয়। এই স্তবমধ্যে স্বামী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে

নির্গুণ সগুণ নিরঞ্জন জগদীশ্বর বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। আর বলিয়াছেন, হে ভবসাগরের কাণ্ডারী! তুমি নররূপ ধারণ করে আমাদের ভব-বন্ধন খণ্ডন করিবার জন্য যোগের সহায় হইয়া আসিয়াছ! তোমার কৃপায় আমার সমাধি হইতেছে। তুমি কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ করাইয়াছ। হে ভক্তশরণ! তোমার পাদপদ্মে আমার অনুরাগ দাও। তোমার পাদপদ্ম আমার পরম সম্পদ। উহাকে পাইলে ভবসাগর গোষ্পদের ন্যায় বোধ হয়।

স্বামীজী রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক

[Italicised Heading]

খণ্ডন ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন নররূপ ধর নির্গুণ গুণময় ।।
মোচন অঘদূষণ জগভূষণ চিদ্‌ঘনকায়।
জ্ঞানাঞ্জন বিমল-নয়ন বীক্ষণে মোহ যায় ।।
ভাস্বর ভাবসাগর চির-উন্মদ প্রেমপাথার।
ভক্তার্জ্জন-যুগলচরণ তারণ ভাব-পার ।।
জৃম্ভিত যুগ-ঈশ্বর জগদীশ্বর যোগ সহায়।
নিরোধন সমাহিত-মন নিরখি তব কৃপায় ।।
ভঞ্জন দুঃখগঞ্জন করুণাঘন কর্ম-কঠোর।
প্রাণার্পণ জগত-তারণ কৃন্তন কলিডোর ।।
বঞ্চন-কামকাঞ্চন অতিনিন্দিত-ইন্দ্রিয়রাগ।
ত্যাগীশ্বর হে নরবর! দেহ পদে অনুরাগ ।।

নির্ভয় গত সংশয় দৃঢ়নিশ্চয়-মানসবান।
নিষ্কারণ-ভকত-শরণ ত্যজি জাতি-কুল-মান ।।
সম্পদ তব শ্রীপদ ভব-গোষ্পদ-বারি যথায়।
প্রেমার্পণ সম দরশন জগজন-দুঃখ যায় ।।

[“যেই রাম, যেই কৃষ্ণ, ইদানীং সেই রামকৃষ্ণ।”]

কাশীপুর উদ্যানে স্বামীজী এই মহাবাক্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছিলেন। এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া স্বামী বিলাত হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পর বেলুড় মঠে একটি স্তব রচনা করিয়াছিলেন। স্তবে বলিতেছেন, — যিনি আচণ্ডাল দীন-দরিদ্রের বন্ধু জানকীবল্লভ, জ্ঞান ভক্তির অবতার শ্রীরামচন্দ্র! যিনি আবার শ্রীকৃষ্ণ-রূপে কুরুক্ষেত্রে গীতারূপ গম্ভীর মধুর সিংহনাদ করিয়াছিলেন, তিনিই ইদানীং প্রথিত পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহো
লোকতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্।
ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধো
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ ।। ১

স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতম্বাহবোত্থং মাহান্তং
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।
গিতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ

সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্ ।। ২

আর একটি স্তোত্র বেলুড়মঠে ও কাশী, মদ্রাজ, ঢাকা প্রভৃতি সকল মঠে আরতির সময় গীত হয়।

এই স্তোত্রে স্বামীজী বলিতেছেন — হে দীনবন্ধো, তুমি সগুণ আবার ত্রিগুণাতীত, তোমার পাদপদ্ম দিন রাত্রি ভজনা করিতেছি না, তাই তোমার আমি শরণাগত। আমি মুখে ভজন করিতেছি, জ্ঞানানুশীলন করিতেছি, কিন্তু কিছুই ধারণা হইতেছে না তাই তোমার শরণাগত। হে দীনবন্ধো, তুমি জগতের একমাত্র প্রাপ্তব্য বস্তু, আমি তোমার শরণাগত। ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো!

ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেড্যো।
ন-ক্তন্দিবং সকরুণং তব পাদপদ্মম্।
মো-হঙ্কষং বহুকৃতং ন ভজে যতোঽহং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ! ১ ।।

ভ-ক্তির্ভগশ্চ ভজনং ভবভেদকারি
গ-চ্ছন্ত্যলং সুবিপুলং গমনায় তত্ত্বম্।
ব-ক্ত্রোদ্ধৃতন্তু হৃদি মে ন চ ভাতি কিঞ্চিৎ
তস্মাত্ত্বমেব শরনং মম দীনবন্ধো ! ২ ।।

তে-জস্তরন্তি তরসা ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণা
রা-গে কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে।
ম-র্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্মিনাশং

তস্মাত্ত্বমেব শরনং মম দীনবন্ধো ! ৩ ।।

কৃ-ত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারি

ষ্ণা-ন্তং শিবং সুবিলং তব নাম নাথ।

য-সমাদহং ত্বশরণো জগদেকগম্য

তস্মাত্ত্বমেব শরনং মম দীনবন্ধো ।। ৪ ।।

স্বামীজী আরতির পর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রণাম শিখাইয়াছেন। উহাতে ঠাকুরকে অবতার শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন!

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।

অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ।।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c55 ৫৫ কেশবের সহিত দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে

55.1 প্রথম পরিচ্ছেদ

১লা জানুয়ারি, ১৮৮১, শনিবার, ১৮ই পৌষ, ১২৮৭

1881/01/01

ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব সম্মুখে। প্রতাপ, ত্রৈলোক্য, জয়গোপাল সেন প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মভক্ত লইয়া কেশবচন্দ্র সেন শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে আসিয়াছেন। রাম, মনোমোহন প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত।

ব্রাহ্মভক্তেরা অনেকেই কেশবের আসিবার আগে কালীবাড়িতেই আসিয়াছেন ও ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। সকলেই ব্যস্ত, কেবল দক্ষিণদিকে তাকাইতেছেন, কখন কেশব আসিবেন, কখন কেশব জাহাজে করিয়া আসিয়া অবতরণ করিবেন। তাঁহার আসা পর্যন্ত ঘরে গোলমাল হইতে লাগিল।

এইবার কেশব আসিয়াছেন। হাতে দুইটি বেল ও ফুলের একটি তোড়া। কেশব শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করিয়া ওইগুলি কাছে রাখিয়া দিলেন এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুরও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রতিনমস্কার করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে হাসিতেছেন। আর কেশবের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি সহাস্যে) — কেশব তুমি আমায় চাও কিন্তু তোমার চেলারা আমায় চায় না। তোমার চেলাদের বলছিলুম, এখন আমরা খচমচ করি, তারপর গোবিন্দ আসবেন।

(কেশবের শিষ্যদের প্রতি) — "ওইগো, তোমাদের গোবিন্দ এসেছেন। আমি এতক্ষণ খচমচ করছিলুম, জমবে কেন। (সকলের হাস্য)

"গোবিন্দের দর্শন সহজে পাওয়া যায় না। কৃষ্ণযাত্রায় দেখ নাই, নারদ ব্যাকুল হয়ে যখন ব্রজে বলেন — 'প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন', তখন রাখাল সঙ্গে কৃষ্ণ আসেন। পশ্চাতে সখীগণ গোপীগণ। ব্যাকুল না হলে ভগবানের দর্শন হয় না।

(কেশবের প্রতি) — "কেশব তুমি কিছু বল; এরা সকলে তোমার কথা শুনতে চায়।"

কেশব (বিনীতভাবে, সহাস্যে) — এখানে কথা কওয়া কামারের নিকট ছুঁচ বিক্রি করতে আসা!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তবে কি জানো, ভক্তের স্বভাব গাঁজাখোরের স্বভাব। তুমি একবার গাঁজার কলকেটা নিয়ে টানলে আমিও একবার টানলাম। (সকলের হাস্য)

বেলা ৪টা বাজিয়াছে। কালীবাড়ির নহবতে বাজনা শুনা যাইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশব প্রভৃতির প্রতি) — দেখলে কেমন সুন্দর বাজনা। তবে একজন কেবল পোঁ করছে, আর-একজন নানা সুরের লহরী তুলে কত রাগ-

রাগিণীর আলাপ করছে। আমারও ওই ভাব। আমার সাত ফোকর থাকতে কেন শুধু পোঁ করব — কেন শুধি সোহং সোহং করব। আমি সাত ফোকরে নানা রাগ-রাগিণী বাজাব। শুধু ব্রহ্ম ব্রহ্ম কেন করব! শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর সবভাবে তাঁকে ডাকব — আনন্দ করব, বিলাস করব।

কেশব অবাক্ হইয়া এই কথাগুলি শুনিতেছেন। আর বলিতেছেন, জ্ঞান ও ভক্তির এরূপ আশ্চর্য, সুন্দর ব্যাখ্যা কখনও শুনি নাই।

কেশব (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — আপনি কতদিন এরূপ গোপনে থাকবেন — ক্রমে এখানে লোকে লোকারণ্য হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ও তোমার কি কথা। আমি খাই দাই থাকি, তাঁর নাম করি। লোক জড় করাকরি আমি জানি না। কে জানে তোর গাঁইগুঁই, বীরভূমের বামুন মুই। হনুমান বলেছিল — আমি বার, তিথি, নক্ষত্র ও-সব জানি না কেবল এক রামচিন্তা করি।

কেশব — আচ্ছা, আমি লোক জড় করব। কিন্তু আপনার এখানে সকলের আসতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমি সকলের রেণুর রেণু। যিনি দয়া করে আসবেন, আসবেন।

কেশব — আপনি যা বলুন, আপনার আসা বিফল হবে না।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

55.2 দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এদিকে সংকীর্তনের আয়োজন হইতেছে। অনেকগুলি ভক্ত যোগ দিয়াছেন। পঞ্চবটী হইতে সংকীর্তনের দল দক্ষিণদিকে আসিতেছে। হৃদয় শিঙা বাজাইতেছেন। গোপীদাস খোল বাজাইতেছেন আর দুইজন করতাল বাজাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ গান ধরিলেন:

হরিনাম নিসে রে জীব যদি সুখে থাকবি।
সুখে থাকবি বৈকুণ্ঠে যাবি, ওরে মোক্ষফল সদা পাবি ।।
    (হরিণাম গুণেরে)
যে নাম শিব জপেন পঞ্চমুখে
আজ সেই হরিনাম দিব তোকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সিংহবিক্রমে নৃত্য করিতেছেন।

এইবার সমাধিস্থ হইলেন।

সমাধিভঙ্গের পর ঘরে উপবিষ্ট হইয়াছেন। কেশব প্রভৃতির সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

[সর্বধর্ম-সমন্বয় কথা]

“সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। যেমন তোমরা কেউ গাড়ি, কেউ নৌকা, কেউ জাহাজে করে, কেউ পদব্রজে এসেছ, যার যাতে সুবিধা, আর যার যা প্রকৃতি সেই অনুসারে এসেছ। উদ্দেশ্য এক — কেউ আগে এসেছে, কেউ পরে এসেছে।

[ঈশ্বরদর্শনের উপায়, অহংকার ত্যাগ]

(কেশব প্রভৃতির প্রতি) — “উপাধি যতই যাবে, ততই তিনি কাছে হবেন। উঁচু ঢিপিতে বৃষ্টির জল জমে না। খাল জমিতে জমে; তেমনি তাঁর কৃপাবারি, যেখানে অহংকার, সেখানে জমে না। তাঁর কাছে দীনহীন ভাবই ভাল।

“খুব সাবধানে থাকতে হয়, এমন কি কাপড়চোপড়েও অহংকার হয়। পিলে রোগী দেখেছি কালাপেড়ে কাপড় পরেছে, অমনি নিধুবাবুর টপ্পা গাইছে!

“কেউ বুট পরেছে অমনি মুখে ইংরাজী কথা বেরুচ্ছে!

“সামান্য আধার হলে গেরুয়া পরলে অহংকার হয়; একটু ত্রুটি হলে ক্রোধ, অভিমান হয়।”

[ভোগান্ত, ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরলাভ]

“ব্যাকুল না হলে তাঁকে দেখা যায় না। এই ব্যাকুলতা ভোগান্ত না হলে হয় না। যারা কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে আছে ভোগান্ত হয় নাই, তাদের ব্যাকুলতা আসে না।

“ও-দেশে হৃদয়ের ছেলে সমস্ত দিন আমার কাছে থাকত, চার-পাঁচ বছরের চেলে। আমার সামনে এটা ওটা খেলা করত, একরকম ভুলে থাকত। যাই সন্ধ্যা হয় হয় অমনি বলে — মা যাব। অমি কত বলতুম — পায়রা দিব, এই সব কথা, সে ভুলত না; কেঁদে কেঁদে বলত — মা যাব। খেলা-টেলা কিছুই ভাল লাগছে না। আমি তার অবস্থা দেখে কাঁদতুম।

“এই বালকের মতো ঈশ্বরের জন্য কান্না। এই ব্যাকুলতা। আর খেলা, খাওয়া কিছুই ভাল লাগে না। ভোগান্তে এই ব্যাকুলতা ও তাঁর জন্য কান্না!”

সকলে অবাক্ হইয়া নিঃশব্দে এই সকল কথা শুনিতেছেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে, ফরাশ আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। কেশব প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তগণ সকলে জলযোগ করিয়া যাইবেন। খাবার আয়োজন হইতেছে।

কেশব (সহাস্যে) — আজও কি মুড়ি?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — হৃদু জানে।

পাতা পড়িল। প্রথমে মুড়ি, তারপর লুচি, তারপর তরকারি। (সকলের খুব আনন্দ ও হাসি) সব শেষ হইতে রাত দশটা বাজিয়া গেল।

ঠাকুর পঞ্চবটীমূলে ব্রাহ্মভক্তগণের সঙ্গে আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে কেশব প্রভৃতির প্রতি) — ঈশ্বরলাভের পর সংসারে বেশ থাকা যায়। বুড়ী ছুঁয়ে তারপর খেলা কর না।

“লাভের পর ভক্ত নির্লিপ্ত হয়, যেমন পাঁকাল মাছ। পাঁকের ভিতর থেকেও গায়ে পাঁক লেগে থাকে না।”

প্রায় ১১টা বাজে, সকলে যাইবার জন্য অধৈর্য। প্রতাপ বললেন, আজ রাত্রে এখানে থেকে গেলে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে বলিতেছেন, আজ এখানে থাক না।

কেশব (সহাস্যে) — কাজ-টাজ আছে; যেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ —— কেন গো, তোমার আঁষচুবড়ির গন্দ না হলে কি ঘুম হবে না। মেছুনী মালীর বাড়িতে রাত্রে অতিথি হয়েছিল। তাকে ফুলের ঘরে শুতে দেওয়াতে তার আর ঘুম হয় না। (সকলের হাস্য) উসখুস করছে, তাকে দেখে মালিনী এসে বললে —— কেন গো —— ঘুমুচ্ছিস নি কেন গো? মেছুনী বললে কি জানি মা কেমন ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না, তুমি একবার আঁষচুবড়িটা আনিয়ে দিতে পার? তখন মেছুনী আঁষচুবড়িতে জল ছিটিয়ে সেই গন্ধ আঘ্রাণ করতে করতে নিদ্রায় অভিভূত হল। (সকলের হাস্য)

বিদায়ের সময় কেশব ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করে একটি ফুলের তোড়া গ্রহণ করিলেন ও ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া ‘বিধানের জয় হউক’ এই কথা ভক্তসঙ্গে বলিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মভক্ত জয়গোপাল সেনের গাড়িতে কেশব উঠিলেন; কলিকাতায় যাইবেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c56 ৫৬ সুরেন্দ্রের বাড়িতে, মনোমোহন-মন্দিরে ও রাজেন্দ্রের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮১, আষাঢ় মাসের একদিন 1881/ashad

56.1 সুরেন্দ্রের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন

রাম, মনোমোহন, ত্রৈলোক্য ও মহেন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি সঙ্গে

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে সুরেন্দ্রের বাড়িতে আসিয়াছেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ, আষাঢ় মাসের একদিন। সন্ধ্যা হয় হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ কিয়ৎক্ষণ পূর্বে বৈকালে শ্রীযুক্ত মনোমোহনের বাড়িতে একটু বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রের দ্বিতলের বৈঠকখানার ঘরে ভক্তেরা আসিয়াছেন। মহেন্দ্র গোস্বামী, ভোলানাথ পাল ইত্যাদি প্রতিবেশীগণ উপস্থিত আছেন। শ্রীযুক্ত কেশব সেনের আসিবার কথা ছিল কিন্তু আসিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য সান্যাল ও আরও কতকগুলি ব্রাহ্মভক্ত আসিয়াছেন।

বৈঠকখানা ঘরে সতরঞ্চি ও চাদর পাতা হইয়াছে — তার উপর একখানি সুন্দর গালিচা ও তাকিয়া। ঠাকুরকে লইয়া সুরেন্দ্র ওই গালিচার উপর বসিতে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, একি তোমার কথা! এই বলিয়া মহেন্দ্র গোস্বামীর পার্শ্বে বসিলেন। যদু মল্লিকের বাগানে যখন পারায়ণ হয় শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদা যাইতেন। কয়মাস ধরিয়া পারায়ণ হইয়াছিল।

মহেন্দ্র গোস্বামী (ভক্তদের প্রতি) — আমি এঁর নিকট কয়েক মাস প্রায় সর্বদা থাকতাম। এমন মহৎ লোক আমি কখনও দেখি নাই। এঁর ভাব সকল সাধারণ ভাব নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গোস্বামীর প্রতি) — ও-সব তোমার কি কথা! আমি হীনের হীন, দীনের দীন; আমি তাঁর দাসানুদাস; কৃষ্ণই মহান।

“যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। দূর থেকে দেখলে সমুদ্র নীলবর্ণ দেখায়, কাছে যাও কোন রঙ নাই। যিনিই সগুণ, তিনিই নির্গুণ; যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা।

“শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ কেন? রাধার প্রেমে।

“যিনিই ব্রহ্ম তিনিই কালী, আদ্যাশক্তি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। যিনি কৃষ্ণ তিনিই কালী।

“মূল এক — তাঁর সমস্ত, লীলা।”

[ঈশ্বরদর্শনের উপায়]

তাঁকে দর্শন করা যায়। শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধিতে দর্শন করা যায়। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থাকলে মন মলিন হয়।

“মন নিয়ে কথা। মন ধোপা ঘরের কাপড়; যে রঙে ছোপাবে, সেই রঙ হবে! মনেতেই জ্ঞানী, মনেতেই অজ্ঞান। অমুক লোক খারাপ হয়ে গেছে অর্থাৎ অমুক লোকের মনে খারাপ রঙ ধরেছে।”

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য সান্যাল ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্ত এইবার আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

সুরেন্দ্র মালা লইয়া ঠাকুরকে পরাইতে আসিলেন। তিনি মালা হাতে করিয়া লইলেন — কিন্তু দূরে নিক্ষেপ করিয়া একপাশে রাখিয়া দিলেন।

সুরেন্দ্র অশ্রুপূর্ণ লোচনে পশ্চিমের বারান্দায় গিয়া বসিলেন; সঙ্গে রাম ও মনোমোহন প্রভৃতি। সুরেন্দ্র অভিমানে বলিতেছেন; — আমার রাগ হয়েছে; রাঢ় দেশের বামুন এ-সব জিনিসের মর্যাদা কি জানে! অনেক টাকা খরচ করে এই মালা; ক্রোধে বললাম সব মালা আর সকলের গলায় দাও। এখন বুঝতে পারছি আমার অপরাধ; ভগবান পয়সার কেউ নয়; অহংকারেরও কেউ নয়! আমি অহংকারী, আমার পূজা কেন লবেন। আমার বাঁচতে ইচ্ছা নাই।

বলিতে বলিতে অশ্রুধারা গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল ও বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

এদিকে ঘরের মধ্যে ত্রৈলোক্য গান গাহিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন। যে মালা ফেলিয়া দিয়াছিলেন, সেই মালা তুলিয়া গলায় পড়িলেন। এক হাতে মালা ধরিয়া, অপর হাতে দোলাতে দোলাতে গান ও নৃত্য করিতেছেন। —

হৃদয় পরশমনী আমার —

আখর দিতেছেন —

(ভূষণ বাকি কি আছে রে!)
(জগৎ-চন্দ্র-হার পরেছি!)

সুরেন্দ্র আনন্দে বিভোর — ঠাকুর গলায় সেই মালা পরিয়া নাচিতেছেন! মনে মনে বলিতেছেন, ভগবান দর্পহারী। কিন্তু কাঙালের অকিঞ্চনের ধন!

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে গান ধরিলেন:

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝুরে
তারা তারা দুভাই এসেছে রে।
(যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে)
(যারা আপনি মেতে জগৎ মাতায়)
(যারা আচণ্ডালে কোল দেয়)
(যারা ব্রজের কানাই বলাই)

অনেকগুলি ভক্ত ঠাকুরের সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন।

সকলে উপবিষ্ট হইলেন ও সদালাপ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সুরেন্দ্রকে বলিতেছেন, “আমায় কিছু খাওয়াবে না?”

এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন। মেয়েরা আসিয়া সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া অতি ভক্তভরে প্রণাম করিলেন।

আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রের বাড়িতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন শুভাগমন করেন ‘আষাঢ় মাসের একদিন’ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তখন শ্রীযুক্ত কেশবের আসিবার কথা ছিল — কিন্তু তিনি আসিতে পারেন নাই। তিনি প্রথম পুত্র ও দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন।

১লা শ্রাবণ, ১৫ই জুলাই, ১৮৮১ (শুক্রবার), কেশব তাঁহার জামাতা কুচবিহারের মহারাজার জাহাজে (Steam Yacht) করিয়া অনেক ব্রাহ্মভক্ত লইয়া কলিকাতা হইতে সোমড়া পর্যন্ত বেড়াইয়াছিলেন।১ পথে দক্ষিণেশ্বরে জাহাজ থামাইয়া পরমহংসদেবকে তুলিয়া লইলেন, সঙ্গে হৃদয়।

জাহাজে কেশব ত্রৈলোক্য প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তগণ, কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ, নগেন্দ্র প্রভৃতি।

নিরাকার ব্রহ্মের কথা কহিতে কহিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইলেন। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য সান্যাল গান গাহিতেছেন ও খোল, করতাল বাজিতেছে। সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর গাহিতেছেন:

শ্যামা মা কি কল করেছে।
চৌদ্দপুয়া কলের ভিতরি কত রঙ্গ দেখাতেছে।

জাহাজ ফিরিবার সময় ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে নামাইয়া দেওয়া হইল। কেশব আহিরীটোলা ঘাটে নামিলেন — মস্‌জিদবাড়ি স্ট্রীট দিয়া পদব্রজে শ্রীযুক্ত কালীচরণ ব্যানার্জীর বাড়িতে নিমন্ত্রণে যাইবেন।

১ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র এই বিবরণ মাস্টারকে দু-তিন মাস পরে বলিয়াছিলেন। বলিবার কয়েক মাস পরে মাস্টার ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন, ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮১, ৩রা ডিসেম্বর 1881/12/03/i

56.2 শ্রীরামকৃষ্ণ মনোমোহন-মন্দিরে

কেশব সেন, রাম, সুরেন্দ্র, রাজেন্দ্র মিত্র, ত্রৈলোক্য প্রভৃতি সঙ্গে

শ্রীযুক্ত মনোমোহনের বাটী; ২৩নং সিমুলিয়া স্ট্রীট; সুরেন্দ্রের বাটীর নিকট। আজ ৩রা ডিসেম্বর; শনিবার, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ (১৯শে অগ্রহায়ণ, ১২৮৮)।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেলা আন্দাজ ৪টা সময় শুভাগমন করিয়াছেন। বাটীটি ছোট — দ্বিতল — ছোট উঠান। ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে উপবিষ্ট। একতলা ঘর — গলির উপরেই ঘরটি।

ভবানীপুরের ঈশান মুখুয্যের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহিতেছেন।

ঈশান — আপনি সংসারত্যাগ করিয়াছেন কেন? শাস্ত্রে সংসার আশ্রমকে শ্রেষ্ঠ বলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি ভাল কি মন্দ অত জানি না; তিনি যা করান তাই করি, যা বলান তাই বলি।

ঈশান — সবাই যদি সংসারত্যাগ করে, তাহলে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কাজ করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সব্বাই ত্যাগ করবে কেন? আর তাঁর কি ইচ্ছা যে, সকলেই শিয়াল-কুকুরের মতো কামিনী-কাঞ্চনে মুখ জুবরে থাকে? আর কি কিছু ইচ্ছা তাঁর নয়? কোন্‌টা তাঁর ইচ্ছা, কোন্‌টা অনিচ্ছা কি সব জেনেছ?

“তাঁর ইচ্ছা সংসার করা তুমি বলছ। যখন স্ত্রী পুত্র মরে তখন ভগবানের ইচ্ছা দেখতে পাও না কেন? যখন খেতে পাওনা — দারিদ্র — তখন ভগবানের ইচ্ছা দেখতে পাও না কেন?

“তাঁর কি ইচ্ছা মায়াতে জানতে দেয় না। তাঁর মায়াতে অনিত্যকে নিত্য বোধ হয়, আবার নিত্যকে অনিত্য বোধ হয়। সংসার অনিত্য — এই আছে এই নাই কিন্তু তাঁর মায়াতে বোধ হয়, এই ঠিক। তাঁর মায়াতেই আমি কর্তা বোধ হয়; আর আমার এই সব স্ত্রী-পুত্র, ভাই-ভগিনী, বাপ-মা, বাড়ি-ঘর — এই সব আমার বোধ হয়।

“মায়াতে বিদ্যা অবিদ্যা দুই আছে। অবিদ্যার সংসার ভুলিয়ে দেয় আর বিদ্যামায়া — জ্ঞান, ভক্তি, সাধুসঙ্গ — ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়।

“তাঁর কৃপায় যিনি মায়ার অতীত, তাঁর পক্ষে সব সমান — বিদ্যা অবিদ্যা সব সমান।

“সংসার আশ্রম ভোগের আশ্রম। আর কামিনী-কাঞ্চন ভোগ কি আর করবে? সন্দেশ গলা থেকে নেমে গেলে টক কি মিষ্টি মনে থাকে না।

“তবে সকলে কেন ত্যাগ করবে? সময় না হলে কি ত্যাগ হয়? ভোগান্ত হয়ে গেলে তবে ত্যাগের সময় হয়। জোর করে কেউ ত্যাগ করতে পারে?

“একরকম বৈরাগ্য আছে, তাকে বলে মর্কট বৈরাগ্য, হীনবুদ্ধি লোকের ওই বৈরাগ্য হয়। রাঁড়ীপুতি (বিধবার ছেলে), মা সুতা কেটে খায় — ছেলের একটু কাজ ছিল, সে কাজ গেছে — তখন বৈরাগ্য হল, গেরুয়া পরলে, কাশী চলে গেল। আবার কিছুদিন পরে পত্র লিখছে — আমার একটি কর্ম হইয়াছে, দশ টাকা মাহিনা; ওরই ভিতর সোনার আংটি আর জামা-জোড়া কেনবার চেষ্টা করছে। ভোগের ইচ্ছা যাবে কোথায়?”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮১, ৩রা ডিসেম্বর 1881/12/03/ii

56.3 মনোমোহন মন্দিরে

ব্রাহ্মভক্তগণ সঙ্গে কেশব আসিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাঙ্গণে বসিয়া আছেন। কেশব আসিয়া অতি ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের বামদিকে কেশব বসিলেন আর দক্ষিণদিকে রাম উপবিষ্ট।

কিয়ৎকাল ভাগবত পাঠ হইতে লাগিল।

পাঠান্তে ঠাকুর কথা কহিতেছেন। প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে গৃহস্থ ভক্তগণ বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — সংসারের কর্ম বড় কঠিন; বনবন করে ঘুরলে মাথা ঘুরে যেমন অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তবে খুঁটি ধরে ঘুরলে আর ভয় নাই। কর্ম কর কিন্তু ঈশ্বরকে ভুল না।

“যদি বল, যেকালে এত কঠিন? উপায় কি?

“উপায় অভ্যাসযোগ। ও-দেশে ছুতোরদের মেয়েরা দেখছি, তারা একদিকে চিঁড়ে কুটছে, ঢেঁকি পড়বার ভয় আছে হাতে; আবার ছেলেকে মাই দিচ্ছে; আবার খরিদ্দারদের সঙ্গর কতা কইছে; বলছে —– তোমার যা পাওনা আছে দিয়ে যেও।

“নষ্ট মেয়ে সংসারের সব কাজ করে, কিন্তু সর্বদা উপপতির দিকে মন পড়ে থাকে।

“তবে এটুকু হবার জন্য একটু সাধন চাই। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁকর ডাকতে হয়। ভক্তিলাভ করে কর্ম করা যায়। শুধু হাতে কাঁঠাল ভাঙলে হাতে আঠা লাগবে —– হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙলে আর আঠা লাগবে না।”

এইবার প্রাঙ্গণে গান হইতেছে। ক্রমে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যও গান গাহিতেছেন:

জয় জয় আনন্দময়ী ব্রহ্মরূপিণী।

ঠাকুর আনন্দে নাচিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কেশবাদি ভক্তগণ নাচিতেছেন। শীতকাল, ঠাকুরের গায়ে ঘাম দেখা দিতেছে।

কীর্তনানন্দের পর সকলে উপবেশন করিলে শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু খাইতে চাহিলেন। ভিতর হইতে একটি থালা করিয়া মিষ্টান্নাদি আসিল। কেশব ওই থালাখানা ধরিয়া রহিলেন, ঠাকুর খাইতে লাগিলেন। কেশব জলপাত্রও ওইরূপ ধরিলেন; গামছা দিয়া মুখ মুছাইয়া দিলেন। তৎপরে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার সংসারে ধর্ম হয় কিনা আবার সেই কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবাদির প্রতি) — যারা সগসারে তাঁকে ডাকতে পারে, তারা বীরভক্ত। মাথায় বিশ মন বোঝা, তবু ঈশ্বরকে পাবার চেষ্টা করছে। এরই নাম বীরভক্ত।

“যদি বল এটি অতি কঠিন। কঠিন হলেও ভগবানের কৃপায় কিনা হয়। অসম্ভবও সম্ভব হয়। হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যদি আলো আসে, সে কি একটু একটু করে আসবে? একবারে ঘর আলোকিত হবে।”

এই সকল আশার কথা শুনিয়া কেশবাদি গৃহস্থ ভক্তগণ আনন্দ করিতেছেন।

কেশব (রাজেন্দ্র মিত্রের প্রতি, সহাস্যে) — আপনার বাড়িতে এরূপ একদিন হলে বেশ হয়।

রাজেন্দ্র —— আচ্ছা তাতো বেশ! রাম, তোমার উপর সব ভার।

রাজেন্দ্র, রাম ও মনোমোহনের মেসোমশাই।

এইবার ঠাকুরকে উপরে অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হইতেছে। সেখানে তিনি সেবা করিবেন। মনোমোহনের মাতাঠাকুরাণী শ্যামাসুন্দরী সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আসন গ্রহণ করিলেন। নানাবিধ মিষ্টান্নাদি উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন ও খাইতে খাইতে বলিতেছেন — আমার জন্য এত করেছো। এক গ্লাস বরফ জলও কাছে ছিল।

কেশবাদি ভক্তগণ প্রাঙ্গণে বসিয়া খাইতেছেন। ঠাকুর নিচে আসিয়া তাঁহাদিগকে খাওয়াইতে লাগিলেন। তাঁহাদের আনন্দের জন্য লুচিমণ্ডার গান গাহিতেছেন ও নাচিতেছেন।

এইবার দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিবেন। কেশবাদি ভক্তগণ তাঁহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিলেন ও পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮১, ১০ই ডিসেম্বর 1881/12/10/i

56.4 শ্রীরামকৃষ্ণ রাজেন্দ্রের বাড়িতে

রাম, মনোমোহন, কেশব সেন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে; ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ

রাজেন্দ্র মিত্রের বাটী ঠনঠনে বেচু চাটুজ্যের গলি। মনোমোহনের বাটীতে উৎসবের দিন শ্রীযুক্ত কেশব রাজেন্দ্রবাবুকে বলিয়াছিলেন, আপনার বাড়িতে এইরূপ একদিন উৎসব হয়, বেশ হয়। রাজেন্দ্র আনন্দিত হইয়া তাহার উদ্যোগ করিতেছেন।

আজ শনিবার, ১০ই ডিসেম্বর, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ, ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১২৮৮। আজ উৎসব হইবে স্থির হইয়াছে। খুব আনন্দ — অনেক ভক্ত আসিবেন — কেশব প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তগণও আসিবেন।

এমন সময় ব্রাহ্মভক্ত ভাই অঘোরনাথের মৃত্যুসংবাদ উমানাথ রাজেন্দ্রকে জানাইলে। অঘোরনাথ লক্ষ্ণৌ নগরে রাত দুটার সময় শরীরত্যাগ করিয়াছেন, সেই রাত্রেই তারযোগে এই সংবাদ আসিয়াছে। ৮ই ডিসেম্বর, ২৪শে অগ্রহায়ণ। উমানাথ পর দিনেই ওই সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন। কেশবাদি ব্রাহ্মভক্তগণ অশৌচ গ্রহণ করিয়াছেন — শনিবারে তাঁহারা কেমন করিয়া আসিবেন, রাজেন্দ্র চিন্তিত হইলেন।

রাম রাজেন্দ্রকে বলিতেছেন — আপনি কেন ভাবছেন? কেশববাবু নাই বা এলেন। ঠাকুর আসিতেছেন — আপনি কি জানেন না তিনি সর্বদা সমাধিস্থ, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, — যাঁর আনন্দে জগৎ আনন্দ আস্বাদন করছে।

রাম, রাজেন্দ্র, রাজমোহন, মনোমোহন কেশবের সঙ্গে দেখা করিলেন। কেশব বলিলেন, “কই, আমি এমন কথা বলি নাই যে আমি যাব না। পরমহংস মহাশয়

আসবেন আর আমি যাব না? অবশ্য যাব; অশৌচ হয়েছে, তা আলাদা জায়গায় বসে খাব।”

কেশব রাজেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিচিত্র টাঙ্গান ছিল।

রাজেন্দ্র (কেশবের প্রতি) — পরমহংস মহাশয়কে অনেকে বলে চৈতন্যের অবতার।

কেশব (সমাধিচিত্র দেখিয়া) — এরূপ সমাধি দেখা যায় না। যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য এঁদের হত।

বেলা ৩টার সময় মনোমোহনের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়াছেন। সেখানে বিশ্রাম করিয়া একটু জলযোগ করিলেন। সুরেন্দ্র বলিতেছেন — আপনি কল দেখবেন বলেছিলেন — চলুন! তাঁহাকে গাড়ি করিয়া সুরেন্দ্র বেঙ্গল ফটোগ্রাফারের ষ্টুডিওতে লইয়া গেলেন। ফটোগ্রাফার দেখাইলেন কিরূপে ছবি তোলা হয়। কাঁচের পিছনে কালী (Silver Nitrate) মাখান হয়; তারপর ছবি উঠে।

ঠাকুরের ছবি লওয়া হইতেছে — অমনি তিনি সমাধিস্থ হইলেন।

এইবার ঠাকুর রাজেন্দ্র মিত্রের বাটীতে আসিয়াছেন। রাজেন্দ্র পুরাতন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গোস্বামী বাটীর প্রাঙ্গণে ভাগবত পাঠ করিতেছেন। অনেক ভক্ত উপস্থিত — কেশব এখনও আসিয়া পোঁছান নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের পতি) — সংসারে হবে না কেন? তবে বড় কঠিন। আজ বাগবাজারের পুল হয়ে এলাম। কত বন্ধনেই বেঁধেছে। একটা বন্ধন ছিঁড়লে পুলের কিছু হবে না। আরও অনেক শিকল দিয়ে বাঁধা আছে — তারা টেনে রাখবে। তেমনি সংসারীদের অনেক বন্ধন। ভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে সে বন্ধন যাবার উপায় নাই।

"তাঁকে দর্শন করলে আর ভয় নাই; তাঁর মায়ার ভিতর বিদ্যা-অবিদ্যা দুই আছে; — দর্শনের পর নির্লিপ্ত হতে পারে। পরমহংস অবস্থায় ঠিক বোধ হয়। দুধে জলে আছে, হাঁসে যেমন দুধ নিয়ে জল ত্যাগ করে। হাঁস পারে কিন্তু শালিক পারে না।"

একজন ভক্ত — তবে সংসারীর উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — গুরুবাক্যে বিশ্বাস। তাঁর বাক্য অবলম্বন; তাঁর বাক্যরূপ খুঁটি ধরে ঘোরো, সংসারের কাজ করো।

"গুরুকে মানুষবুদ্ধি করতে নাই। সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন। গুরুর কৃপায় ইষ্টকে দর্শন হয়, তখন গুরু ইষ্টতে লীন হয়ে যান।

“সরল বিশ্বাসে কি না হয়। গুরুপুত্রের অন্নপ্রাশনে — শিষ্যেরা যে যেমন পারে, উৎসবের আয়োজন করছে। একটি গরীব বিধবা সেও শিষ্যা। তার একটি গরু আছে, সে একঘটি দুধ এনেছে। গুরু মনে করছিলেন যে দুধের ভার ওই মেয়েটি লবে। বিরক্ত হয়ে সে যা এনেছিল ফেলে দিলে আর বললে — তুই জলে ডুবে মরতে পারিস নি? মেয়েটি এই গুরুর আজ্ঞা মনে করে নদীর ধারে ডুবতে গেল। তখন নারায়ণ দর্শন দিলেন; আর প্রসন্ন হয়ে বললেন — এই পাত্রটিতে দধি আছে, যতই ঢালবে ততই বেরুবে, গুরু সন্তুষ্ট হবেন। এবং সেই পাত্রটি দেওয়া হলে গুরু অবাক্‌। আর সমস্ত বিবরণ শুনে নদীর ধারে এসে মেয়েটিকে বললেন — নারায়ণকে যদি আমাকে দর্শন না করাও তবে আমি এই জলেতে প্রাণত্যাগ করব। নারায়ণ দর্শন দিলেন, কিন্তু গুরু দেখতে পেলেন না। মেয়েটি তখন বললে, প্রভু গুরুদেবকে যদি দর্শন না দেন আর তাঁর শরীর যদি যায় তো আমিও শরীরত্যাগ করব; তখন নারায়ণ একবার গুরুকে দেখা দিলেন।

“দেখ গুরুভক্তি থাকলে নিজেরও দর্শন হল আবার গুরুদেবেরও হল।

“তাই বলি — যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ীবাড়ি যায়,
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।

“সকলেই গুরু হতে চায়, শিষ্য হতে বড় কেহ চায় না। কিন্তু দেখ উঁচু জমিতে বৃষ্টির জল জমে না। নিচু জমিতে — খাল জমিতে জমে।

“গুরু যে নামটি দেবেন বিশ্বাস করে সে নামটি লয়ে সাধন-ভজন করতে হয়।”

“যে শামুকের ভেতর মুক্তা তয়ের হয়, এমনি আছে, সেই শামুক স্বাতী-নক্ষত্রের বৃষ্টির জলের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। সেই জল পড়লে একেবারে অতল জলে ডুবে চলে যায়, যতদিন না মুক্তা হয়।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮১, ১০ই ডিসেম্বর 1881/12/10/ii

56.5 রাজেন্দ্রের বাড়ি

অনেকগুলি ব্রাহ্মভক্ত আসিয়াছেন দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন —

“ব্রাহ্মসভা না শোভা? ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত উপাসনা হয়, সে খুব ভাল; কিন্তু ডুব দিতে হয়। শুধু উপাসনা, লেকচারে হয় না। তাঁকে প্রার্থনা করতে হয়, যাতে ভোগাসক্তি চলে গিয়ে তাঁর পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়।

“হাতির বাহিরের দাঁত আছে আবার ভিতরের দাঁতও আছে। বাহিরের দাঁতে শোভা, কিন্তু ভিতরের দাঁতে খায়। তেমনি ভিতরে কামিনী-কাঞ্চন ভোগ করলে ভক্তির হানি হয়।

“বাহিরে লেকচার ইত্যাদি দিলে কি হবে? শকুনি উপরে উঠে কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর। হাওয়াই হুস করে প্রথমে আকাশে উঠে যায় কিন্তু পরক্ষণেই মাটিতে পড়ে যায়।

“ভোগাসক্তি ত্যাগ হলে শরীর যাবার সময় ঈশ্বরকেই মনে পড়বে। তা না হলে এই সংসারের জিনিসই মনে পড়বে — স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ধন, মানসম্ভ্রম ইত্যাদি। পাখি অভ্যাস করে রাধাকৃষ্ণ বোল বলে। কিন্তু বেড়ালে ধরলে ক্যাঁ ক্যাঁ করে।

“তাই সর্বদা অভ্যাস করা দরকার। তাঁর নামগুণকীর্তন, তাঁর ধ্যান, চিন্তা, আর প্রার্থনা — যেন ভোগাসক্তি যায় আর তোমার পাদপদ্মে মন হয়।

“এরূপ সংসারী লোক, সংসারে দাসীর মতো থাকে, সব কর্ম কাজ করে, কিন্তু দেশে মন পড়ে থাকে। অর্থাৎ ঈশ্বরের উপর মন রেখে কর্মগুলি করে। সংসার করতে গেলেই গায়ে পাঁক লাগে। ঠিক ভক্ত সংসারী পাঁকাল মাছের মতো, পাঁকে থেকেও গা পাঁকশূন্য।

“ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। তাঁকে মা বলে ডাকলে শীঘ্র ভক্তি হয়, ভালবাসা হয়।”

এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ গান ধরিলেন:

শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখানা উড়িতেছিল।
কলুষের কুবাতাস খেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল।।

গান — যশোদা নাচাতো গো মা বলে নীলমণি
সে বেশ লুকালি কোথা করালবদনি।।

ঠাকুর উঠিয়া নৃত্য করিতেছেন ও গান গাহিতেছেন। ভক্তেরাও উঠিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মুহুর্মুহু সমাধিস্থ হইতেছেন। সকলেই একদৃষ্টে দেখিতেছেন আর চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন।

ডাক্তার দুকড়ি সমাধি কিরূপ পরীক্ষা করিবার জন্য চক্ষে আঙুল দিতেছেন। তাহা দেখিয়া ভক্তেরা অতিশয় বিরক্ত হইলেন।

এ অদ্ভুত সংকীর্তন ও নৃত্যের পর সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। এমন সময় কেশব আরও কয়েকটি ব্রাহ্মভক্ত লইয়া আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

রাজেন্দ্র (কেশবের প্রতি) — চমৎকার নৃত্যগীত হল।

এই কথা বলিয়া শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যকে আবার গান গাহিতে অনুরোধ করিলেন।

কেশব (রাজেন্দ্রের প্রতি) — যখন পরমহংস মশায় বসেছেন, তখন কোনমতে কীর্তন জমবে না।

গান হইতে লাগিল। ত্রৈলোক্য ও ব্রাহ্মভক্তেরা গান গাহিতে লাগিলেন:

মন একবার হরি বল হরি বল হরি বল।
হরি হরি হরি বলে ভবসিন্ধু পারে চল।।
জলে হরি, স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি, সূর্যে হরি,

অনলে অনিলে হরি, হরিময় এ ভূমণ্ডল।।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তদের খাওয়ার জন্য দ্বিতলে উদ্যোগ হইতেছে। এখনও তিনি প্রাঙ্গনে বসিয়া কেশবের সহিত কথা বলিতেছেন। রাধাবাজারের ফটোগ্রাফারদের ওখানে গিয়াছিলেন — সেই সব কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি সহাস্যে) — আজ বেশ কলে ছবি তোলা দেখে এলুম। একটি দেখলুম যে শুধু কাচের উপর ছবি থাকে না। কাচের পিঠে একটা কালি মাখিয়ে দেয়, তবে ছবি থাকে। তেমনি ঈশ্বরীয় কথা শুধু শুনে যাচ্ছি; তাতে কিছু হয় না, আবার তৎক্ষণাৎ ভুলে খায়; যদি ভিতরে অনুরাগ ভক্তিরূপ কালি মাখান থাকে তবে সে কথাগুলি ধারণা হয়। নচেৎ শুনে আর ভুলে যায়।

এইবার ঠাকুর দ্বিতলায় আসিয়াছেন। সুন্দর কার্পেটের আসনে তাঁহাকে বসান হইল।

মনোমোহনের মাতাঠাকুরানী শ্যামাসুন্দরী দেবী পরিবেশন করিতেছেন। মনোমোহন বলিয়াছেন — "আমার স্নেহময়ী জননী সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন ও ঠাকুরকে খাওয়াইলেন।" রাম প্রভৃতি খাবার সময় উপস্থিত ছিলেন।

যে ঘরে ঠাকুর খাইতেছেন, সেই ঘরের সম্মুখের দালানে কেশব প্রভৃতি ভক্তরা খাইতে বসিয়াছেন।

ওই দিবসে বেচু চাটুজ্যের স্ট্রীটের ৺শ্যামসুন্দর বিগ্রহের সেবক শ্রীশৈলজাচরণ চাটুজ্যে উপস্থিত ছিলেন। ইনি কয়েকমাস হইল পরলোকগত হইয়াছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c57 ৫৭ সিমুলিয়া ব্রাহ্মসমাজের মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮২, ১লা জানুয়ারি 1882/01/01

57.1 রাম, কেশব, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ সিমুলিয়া ব্রাহ্মসমাজের সাংবাৎসরিক মহোৎসবে ভক্তসঙ্গে আসিয়াছেন। জ্ঞান চৌধুরীর বাড়িতে মহোৎসব হইতেছে। ১লা জানুয়ারি, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ, রবিবার, বেলা ৫টা হইবে। (১৮ই পৌষ, ১২৮৮)

শ্রীযুক্ত কেশব সেন, রাম, মনোমোহন, বলরাম, ব্রাহ্মভক্ত রাজমোহন, জ্ঞান চৌধুরী, কেদার, ব্রাহ্মভক্ত কান্তিবাবু, কালিদাস সরকার, কালিদাস মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি অনেক ভক্ত উপস্থিত।

নরেন্দ্র, রাম প্রভৃতির সঙ্গে গিয়া কেবল কয়দিন মাত্র হইল ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করিয়াছেন। আজও এই উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। তিনি সিমুলিয়া ব্রাহ্মসমাজে মধ্যে মধ্যে আসিতেন ও সেখানে গান ও উপাসনা করিতেন।

ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা হইবে।

প্রথমে কিছু পাঠ হইল। নরেন্দ্র গাইতে পারেন, তাঁহাকে গান গাইতে অনুরোধ করাতে তিনিও গান গাহিলেন।

সন্ধ্যা হইল। ইঁদেশের গৌরী পণ্ডিত গেরুয়াপরা ব্রহ্মচারীবেশে আসিয়া উপস্থিত।

গৌরী — কোথা গো পরমহংস বাবু?

কিয়ৎক্ষণ পরে কেশব ব্রাহ্মভক্তগণ সঙ্গে আসিয়া পোঁছিলেন ও ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। সকলেই দালানের উপর উপবিষ্ট; পরস্পর আনন্দ করিতেছেন। চর্তুদিকে সংসারী ভক্তগণকে উপবিষ্ট দেখিয়া ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তা সংসারে হবে না কেন? তবে কি জান, মন নিজের কাছে নাই। নিজের কাছে মন থাকলে তবে তো ভগবানকে দেবে। মন বন্ধক দিয়েছ; কামিনী-কাঞ্চনে বন্ধক! তাই সর্বদা সাধুসঙ্গ দরকার।

“মন নিজের কাছে এলে তবে সাধন-ভজন হবে। সর্বদাই গুরুর সঙ্গ, গুরুসেবা, সাধুসঙ্গ প্রয়োজন। হয় নির্জনে রাতদিন তাঁর চিন্তা, নয় সাধুসঙ্গ। মন একলা থাকলে ক্রমে শুষ্ক হয়ে যায়।

“এক ভাঁড় জল যদি আলাদা রেখে দাও, ক্রমে শুকিয়ে যাবে! কিন্তু গঙ্গাজলের ভিতর যদি ওই ভাঁড় ডুবিয়ে রাখো, তাহলে শুকবে না!

“কামারশালার লোহা আগুনে বেশ লাল হয়ে গেল। আবার আলাদা করে রাখো, যেমন কালো লোহা, তেমনি কালো। তাই লোহাকে মধ্যে মধ্যে হাপরে দিতে হয়।

“আমি কর্তা, আমি করছি তবে সংসার চলছে; আমার গৃহ পরিজন — এ সকল অজ্ঞান! আমি তাঁর দাস, তাঁর ভক্ত, তাঁর সন্তান — এ খুব ভাল।

“একেবারে আমি যায় না। এই বিচার করে উড়িয়ে দিচ্ছ, আবার কাটা ছাগল যেমন একটু ভ্যা ভ্যা করে হাত পা নাড়ে, সেই রকম কোথা থেকে আমি এসে পড়ে।

“তাঁকে দর্শন করবার পর, তিনি যে আমি রেখে দেন, তাকে বলে পাকা আমি।

“যেমন তরবার পরশমণি ছুঁয়েছে, সোনা হয়ে গিয়েছে। তার দ্বারা আর হিংসার কাজ হয় না!”

শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরদালানের উপর বসিয়া সকল কথা কহিতেছেন। কেশব প্রভৃতি ভক্তগণ নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতেছেন। রাত ৮টা হইয়াছে। তিনবার ঘন্টা (Warning bell) বাজিল, যাহাতে উপাসনা আরম্ভ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশব প্রভৃতির প্রতি) — এ কি! তোমাদের উপাসনা হচ্ছে না!

কেশব — আর উপাসনা কি হবে? এই তো সব হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — না গো, যেমন পদ্ধতি সেইরকম হক।

কেশব — কেন এই তো বেশ হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক বলাতে কেশব উঠিয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেন।

উপাসনা মধ্যে ঠাকুর হঠাৎ দণ্ডায়মান — সমাধিস্থ হইয়াছেন।

ব্রাহ্মভক্তগণ গান গাহিতেছেন:

মন একবার হরি বল হরি বল হরি বল।
হরি হরি হরি বলে ভবসিন্ধু পারে চল ।।
জলে হরি স্থলে হরি, অনলে অনিলে হরি।
চন্দ্রে হরি, সূর্যে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল।।

শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভাবস্থ হইয়া দণ্ডায়মন। কেশব অতি সন্তর্পণে তাঁহার হাত ধরিয়া দালান হইতে প্রাঙ্গণে নামিলেন।

গান চলিতেছে। এইবার ঠাকুর গানের সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন। চতুর্দিকে ভক্তগণও নাচিতেছেন।

জ্ঞানবাবুর দ্বিতলের ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ, কেশব প্রভৃতিকে জল খাওয়াবার আয়োজন হইতেছে।

তঁহারা জলযোগ করিয়া আবার নিচে নামিয়া বসিলেন। ঠাকুর কথা কহিতে কহিতে আবার গান গাহিতেছেন। কেশবও সেই সঙ্গে যোগ দিয়াছেন —

মজলো আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে।
যত বিষয় মধু তুচ্ছ হল কামাদি কুসুম সকলে ।।

গান — শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়ি খান উড়িতেছিল।
কলুষের কুবাতাস খেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল ।।

ঠাকুর কেশব দুজনেই মাতিয়া গেলেন। আবার সকলে মিলিয়া গান ও নৃত্য, রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত।

একটু বিশ্রাম করিয়া ঠাকুর কেশবকে বলিতেছেন — তোমার ছেলের বিবাহের বিদায় পাঠিয়েছিলে কেন? ফেরত এনো — আমি ও-সব নিয়ে কি করব?

কেশব ঈষৎ হাসিতেছেন। ঠাকুর আবার বলিতেছেন — আমার নাম কাগজে প্রকাশ কর কেন? বই লিখে, খবরের কাগজে লিখে, কারুকে বড়ো করা যায় না। ভগবান যাকে বড় করেন, বনে থাকলেও তাকে সকলে জানতে পারে। গভীরবনে ফুল ফুটেছে, মৌমাছি কিন্তু সন্ধান করে যায়। অন্য মাছি সন্ধান পায়

না। মানুষ কি করবে? মানুষের মুখ চেয়ো না —— লোক! পোক! যে মুখে ভাল বলছে, সেই মুখে আবার মন্দ বলবে। আমি মান্যগণ্য হতে চাই না। যেন দীনের দীন, হীনের হীন হয়ে থাকি।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c58 ৫৮ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিম

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৬ই ডিসেম্বর 1884/12/06/i

58.1 শ্রীযুক্ত অধরলাল সেনের বাড়িতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দ ও

শ্রীযুক্ত বঙ্কীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদির সঙ্গে কথোপকথন

আজ ঠাকুর অধরের বাড়িতে আসিয়াছেন; ২২শে অগ্রহায়ণ, কৃষ্ণা চতুর্থী তিথি, শনিবার, ইংরেজী ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর পুষ্যানক্ষত্রে আগমন করিয়াছেন।

অধর ভারী ভক্ত, তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বয়ঃক্রম ২৯/৩০ বৎসর হইবে। ঠাকুর তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসেন। অধরের কি ভক্তি! সমস্ত দিন অফিসের খাটুনির পর মুখে ও হাতে একটু জল দিয়াই প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে যাইতেন। তাঁহার বাড়ি শোভাবাজার বেনেটোলা। সেখান হইতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে ঠাকুরের কাছে গাড়ি করিয়া যাইতেন। এইরূপ প্রত্যহ প্রায় দুই টাকা গাড়িভাড়া দিতেন। কেবল ঠাকুরকে দর্শন করিবেন, এই আনন্দ। তাঁহার শ্রীমুখের কথা শুনিবেন, এমন সুবিধা প্রায় হইত না। পৌঁছিয়াই ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন; কুশল প্রশ্নাদির পর তিনি মা-কালীকে দর্শন করিতে যাইতেন। পরে মেঝেতে মাদুর পাতা থাকিত সেখানে বিশ্রাম করিতেন। অধরের শরীর পরিশ্রমের জন্য এত অবসন্ন থাকিত যে, তিনি অল্পক্ষণমধ্যে নিদ্রাভিভূত হইতেন। রাত্রে ৯/১০টা সময় তাঁহাকে উঠাইয়া দেওয়া হইত। তিনিও উঠিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আবার গাড়ীতে উঠিতেন। তৎপরে বাড়িতে ফিরিয়া যাইতেন।

অধর ঠাকুরকে প্রায়ই শোভাবাজারের বাড়িতে লইয়া যাইতেন। ঠাকুর আসিলে তথায় উৎসব পড়িয়া যাইত। ঠাকুর ও ভক্তদের লইয়া অধর খুব আনন্দ করিতেন ও নানারূপে তাঁহাদিগকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইতেন।

একদিন তাঁহার বাড়িতে গিয়াছেন। অধর বলিলেন, আপনি অনেকদিন এ-বাড়িতে আসেন নাই, ঘর মলিন হইয়াছিল; যেন কি একরকম গন্ধ হইয়াছিল; আজ দেখুন, ঘরের কেমন শোভা হইয়াছে! আর কেমন একটি সুগন্ধ হইয়াছে। আমি আজ ঈশ্বরকে ভারি ডেকেছিলাম। এমন কি চোখ দিয়ে জল পড়েছিল। ঠাকুর বলিলেন, "বল কি গো!" ও অধরের দিকে সস্নেহে তাকাইয়া হাসিতে লাগিলেন।

আজও উৎসব হইবে। ঠাকুরও আনন্দময় ও ভক্তেরা আনন্দে পরিপূর্ণ। কেননা যেখানে ঠাকুর উপস্থিত, সেখানে ঈশ্বরের কথা বৈ আর কোন কথাও হইবে না। ভক্তেরা আসিয়াছেন ও ঠাকুরকে দেখিবার জন্য অনেকগুলি নূতন নূতন লোক আসিয়াছে। অধর নিজে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি তাঁহার কয়েকটি বন্ধু ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারা নিজে ঠাকুরকে দেখিবেন ও বলিবেন, যথার্থ তিনি মহাপুরুষ কিনা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যবদনে ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। এমন সময় অধর কয়েকটি বন্ধু লইয়া ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিলেন।

অধর (বঙ্কিমকে দেখাইয়া ঠাকুরের প্রতি) — মহাশয়, ইনি ভারি পণ্ডিত, অনেক বই-টই লিখেছেন। আপনাকে দেখতে এসেছেন। ইঁহার নাম বঙ্কিমবাবু।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — বঙ্কিম! তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো!

বঙ্কিম (হাসিতে হাসিতে) — আর মহাশয়! জুতোর চোটে। (সকলের হাস্য) সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।

[বঙ্কিম ও রাধাকৃষ্ণ — যুগলরূপের ব্যাখ্যা]

শ্রীরামকৃষ্ণ — না গো, শ্রীকৃষ্ণ বঙ্কিম হয়েছিলেন। শ্রীমতীর প্রেমে ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন। কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যা কেউ কেউ করে, শ্রীরাধার প্রেমে ত্রিভঙ্গ। কালো কেন জানো? আর চৌদ্দপো, অত ছোট কেন? যতক্ষণ ঈশ্বরদূরে, ততক্ষণ কালো দেখায়, যেমন সমুদ্রের জল দূর থেকে নীলবর্ণ দেখায়। সমুদ্রের জলের কাছে গেলে ও হাতে করে তুললে আর কালো থাকে না, তখন খুব পরিষ্কার, সাদা। সূর্য দূরে বলে খুব ছোট দেখায়; কাছে গেলে আর ছোট থাকে না। সে অনেক দূরের কথা সমাধিস্থ না হলে হয় না। যতক্ষণ আমি তুমি আছে, ততক্ষণ নাম-রূপও আছে। তাঁরই সব লীলা। আমি তুমি যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তিনি নানারূপে প্রকাশ হন।

“শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, শ্রীমতী তাঁর শক্তি — আদ্যাশক্তি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যুগলমূর্তির মানে কি? পুরুষ আর প্রকৃতি অভেদ, তাঁদের ভেদ নাই। পুরুষ, প্রকৃতি না হলে থাকতে পারে না; প্রকৃতিও পুরুষ না হলে থাকতে পারে না। একটি বললেই আর একটি তার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে। যেমন অগ্নি আর দাহিকাশক্তি। দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নিকে ভাবা যায় না। আর অগ্নি ছাড়া দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। তাই যুগলমূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি শ্রীমতীর দিকে, ও শ্রীমতীর দৃষ্টি কৃষ্ণের দিকে। শ্রীমতীর গৌর বর্ণ বিদ্যুতের মতো, তাই কৃষ্ণ পীতাম্বর পরেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ নীল মেঘের মতো; তাই শ্রীমতী নীলাম্বর পরেছেন। আর শ্রীমতী নীলকান্ত মণি দিয়ে অঙ্গ সাজিয়েছেন। শ্রীমতীর পায়ে

নূপুর, তাই শ্রীকৃষ্ণ নূপুর পরেছেন; অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের অন্তরে-বাহিরে মিল।”

এই কথাগুলি সমস্ত সাঙ্গ হইল, এমন সময়ে অধরের বঙ্কিমাদি বন্ধুগণ পরস্পর ইংরেজীতে আস্তে আস্তে কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে বঙ্কিমাদির প্রতি) — কি গো। আপনারে ইংরাজীতে কি কথাবার্তা করছো? (সকলের হাস্য)

অধর —— আজ্ঞে, এই বিষয় একটুকথা হচ্ছিল, কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যার কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্য সকলের প্রতি) — একটা কথা মনে পড়ে আমার হাসি পাচ্ছে। শুন, একটা গল্প বলি। একজন নাপিত কামাতে গিয়েছিল। একজন ভদ্রলোককে কামাচ্ছিল। এখন কামাতে কামাতে তার একটু লেগেছিল। আর সে লোকটি ড্যাম (Damn) বলে উঠেছিল। নাপিত কিন্তু ড্যামের মানে জানে না। তখন সে ক্ষুর-টুর সব সেখানে রেখে, শীতকাল, জামার আস্তিন গুটিয়ে বলে, তুমি আমায় ড্যাম বললে, এর মানে কি, এখন বল। সে লোকটি বললে, আরে তুই কামা না; ওর মানে এমন কিছু নয়, তবে একটু সাবধানে কামাস। নাপিত, সে ছাড়বার নয়, সে বলতে লাগল, ড্যাম মানে যদি ভাল হয়, তাহলে আমি ড্যাম, আমার বাপ ড্যাম, আমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম। (সকলের হাস্য) আর ড্যাম মানে যদি খারাপ হয়, তাহলে তুমি ড্যাম, তোমার বাবা ড্যাম, তোমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম। (সকলের হাস্য) আর শুধু ড্যাম নয়। ড্যাম ড্যাম ড্যাম ড্যা ড্যাম ড্যাম। (সকলের উচ্চ হাস্য)

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৬ই ডিসেম্বর 1884/12/06/ii

58.2 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও প্রচারকার্য

সকলের হাস্য থামিলে পর, বঙ্কিম আবার কথা আরম্ভ করিলেন।

বঙ্কিম —— মহাশয়, আপনি প্রচার করেন না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) — প্রচার! ওগুলো অভিমানের কথা। মানুষ তো ক্ষুদ্র জীব। প্রচার তিনিই করবেন, যিনি চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করে এই জগৎ প্রকাশ করেছেন। প্রচার করা কি সামান্য কথা? তিনি সাক্ষাৎকার হয়ে আদেশ না দিলে প্রচার হয় না। তবে হবে না কেন? আদেশ হয়নি তুমি বকে যাচ্ছ; ওই দুদিন লোকে শুনবে তারপর ভুলে যাবে। যেমন একটা হুজুক আর কি! যতক্ষণ তুমি বলবে ততক্ষণ লোকে বলবে, আহা ইনি বেশ বলছেন। তুমি থামবে, তারপর কোথাও কিছুই নাই!

“যতক্ষণ দুধের নিচে আগুন জ্বাল রয়েছে, ততঁন দুধটা ফোঁস করে ফুলে উঠে। জ্বালও টেনে নিলে, আর দুধও যেমন তেমনি! কমে গেল।

“আর সাধন করে নিজের শক্তি বাড়াতে হয়। তা না হলে প্রচার হয় না। ‘আপনি শুতে স্থান পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।’ আপনারই শোবার জায়গা নাই, আবার ডাকে ওরে শঙ্করা আয়, আমার কাছে শুবি আয়। (হাস্য)

“ও-দেশে হালদার পুকুরের পাড়ে রোজ বাহ্যে করে যেত, লোকে সকালে এসে দেকে গালাগালি দিত। লোক গালাগালি দেয় তবু বাহ্যে আর বন্ধ হয় না। শেষে পাড়ার লোক দরখাস্ত করে কোম্পানিকে জানালে। তারা একটি নোটিশ মেরে দিলে —— ‘এখানে বাহ্যে, প্রস্রাব করিও না; তা করিলে শাস্তি পাইবে।’ তখন একেবারে সব বন্ধ। আর কোনও গোলযোগ নাই। কোম্পানির হুকুম —— সকলের মানতে হবে।

“তেমনি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়ে যদি আদেশ দেন, তবেই প্রচার হয়; লোকশিক্ষা হয়, তা না হলে কে তোমার কথা শুনবে?”

এই কথাগুলি সকলে গম্ভীরভাবে স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

[শ্রীযুক্ত বঙ্কিম ও পরকাল]
[Life after Death — argument from analogy]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি) — আচ্ছা, আপনি তো খুব পণ্ডিত, আর কত বই লিখেছ; আপনি কি বলো, মানুষের কর্তব্য কি? কি সঙ্গে যাবে? পরকাল তো আছে?

বঙ্কিম —— পরকাল! সে আবার কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, জ্ঞানের পর আর অন্যলোকে যেতে হয় না, — পুনর্জন্ম হয় না। কিন্তু যতক্ষণ না জ্ঞান হয়, ঈশ্বরলাভ হয়, ততক্ষণ সংসারে ফিরে আসতে হয়, কোনমতে নিস্তার নাই। ততক্ষণ পরকালও আছে। জ্ঞানলাভ হলে, ঈশ্বরদর্শন হলে মুক্তি হয়ে যায় — আর আসতে হয় না। সিধোনো-ধান পুঁতলে আর গাছ হয় না। জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ যদি কেহ হয় তাকে নিয়ে আর সৃষ্টির খেলা হয় না। সে সংসার করতে পারে না, তার তো কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি নাই। সিধোনো-ধান আর ক্ষেতে পুতলে কি হবে?

বঙ্কিম (হাসিতে হাসিতে) — মহাশয়, তা আগাছাতেও কোন গাছের কাজ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — জ্ঞানী তা বলে আগাছা নয়। যে ঈশ্বরদর্শন করেছে, সে অমৃত ফল লাভ করেছে — লাউ, কুমড়া ফল নয়! তার পুনর্জন্ম হয় না। পৃথিবী বল, সূর্যলোক বল, চন্দ্রলোক — কোনও জায়গায় তার আসতে হয় না।

“উপমা — একাদেশী। তুমি তো পণ্ডিত, ন্যায় পড় নাই? বাঘের মতো ভয়ানক বললে যে বাঘের মতো একটা ভয়ানক ন্যাজ কি হাঁড়ি মুখ থাকবে তা নয়। (সকলের হাস্য)

“আমি কেশব সেনকে ওই কথা বলেছিলাম। কেশব জিজ্ঞাসা করলে — মহাশয়, পরকাল কি আছে? আমি না এদিক না ওদিক বললাম! বললাম, কুমোররা হাঁড়ি শুকোতে দেয়, তার ভিতর পাকা হাঁড়িও আছে, আবার কাঁচা হাঁড়িও আছে। কখনও গরুটরু এলে হাঁড়ি মাড়িয়ে দেয়। পাকা হাঁড়ি ভেঙে

গেলে কুমোর সেগুলোকে ফেলে দেয়। কিন্তু কাঁচা হাঁড়ি ভেঙে গেলে সেগুলি কুমোর আবার ঘরে আনে; এনে জল দিয়ে মেখে আবার চাকে দিয়ে নূতন হাঁড়ি করে, ছাড়ে না। তাই কেশবকে বললুম, যতক্ষণ কাঁচা থাকবে কুমোর ছাড়বে না; যতক্ষণ না জ্ঞানলাভ হয়, যতক্ষণ না ঈশ্বর দর্শন হয়, ততক্ষণ কুমোর আবার চাকে দেবে; ছাড়বে না, অর্থাৎ ফিরে ফিরে এ সংসারে আসতে হবে, নিস্তার নাই। তাঁকে লাভ করলে তবে মুক্তি হয়, তবে কুমোর ছাড়ে, কেননা, তার দ্বারা মায়ার সৃষ্টির কোন কাজ আসে না। জ্ঞানী মায়াকে পার হয়ে গেছে। সে আর মায়ার সংসারে কি করবে।

“তবে কারুকে কারুকে তিনি রেখে দেন, মায়ার সংসারে লোকশিক্ষার জন্য। লোকশিক্ষা দিবার জন্য জ্ঞানী বিদ্যামায়া আশ্রয় করে থাকে। সে তাঁর কাজের জন্য তিনিই রেখে দেন; যেমন শুকদেব, শঙ্করাচার্য।

(বঙ্কিমের প্রতি) — “আচ্ছা, আপনি কি বল, মানুষের কর্তব্য কি?”

বঙ্কিম (হাসিতে হাসিতে) — আজ্ঞা, তা যদি বলেন, তাহলে আহার, নিদ্রা ও মৈথুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া) — এঃ! তুমি তো বড় ছ্যাঁচড়া! তুমি যা রাতদিন কর, তাই তোমার মুখে বেরুচ্ছে। লোকে যা খায়, তার ঢেকুর উঠে। মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর উঠে। ডাব খেলে ডাবের ঢেকুর উঠে। কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর রাতদিন রয়েছো আর ওই কথাই মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে! কেবল বিষয়চিন্তা করলে

পাটোয়ারি স্বভাব হয়, মানুষ কপট হয়। ঈশ্বরচিন্তা করলে সরল হয়, ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হলে ও-কথা কেউ বলবে না।

[শ্রীযুক্ত বঙ্কিম — শুধু পাণ্ডিত্য ও কামিনী-কাঞ্চন]

(বঙ্কিমের প্রতি) — "শুধু পাণ্ডিত্য হলে কি হবে, যদি ঈশ্বরচিন্তা না থাকে? যদি বিবেক-বৈরাগ্য না থাকে? পাণ্ডিত্য কি হবে, যদি কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে?

"চিল শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, কিন্তু ভাগাড়ের কদিকে কেবল নজর! পণ্ডিত অনেক বই শাস্ত্র পড়েছে, শোলোক ঝাড়তে পারে, কি বই লিখেছে, কিন্তু মেয়েমানুষে আসক্ত, টাকা, মান সার বস্তু মনে করেছে; সে আবার পণ্ডিত কি? ঈশ্বরে মন না থাকলে পণ্ডিত কি?

"কেউ কেউ মনে করে এরা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করছে, পাগলা। এরা বেহেড হয়েছে। আমরা কেমন স্যায়না, কেমন সুখভোগ করছি; টাকা, মান, ইন্দ্রিয়সুখ। কাকও মনে করে, আমি বড় স্যায়না, কিন্তু সকালবেলা উঠেই পরের গু খেয়ে মরে। কাক দেখো না কত উড়ুর পুড়ুর করে, ভারী স্যায়না! (সকলে স্তব্ধ)

"যারা কিন্তু ঈশ্বরচিন্তা করে, বিষয়ে আসক্তি, কামিনী-কাঞ্চনে ভালবাসা চলে যাবার জন্য রাতদিন প্রার্থনা করে, যাদের বিষয়রস তেঁতো লাগে, হরিপাদপদ্মের সুধা বই আর কিছু ভাল লাগে না, তাদের স্বভাব যেমন হাঁসের স্বভাব। হাঁসের সুমুখে দুধেজলে দাও, জল ত্যাগ করে দুধ খাবে। আর হাঁসের গতি দেখেছো? একদিকে সোজা চলে যাবে। শুদ্ধভক্তের গতিও কেবল ঈশ্বরের দিকে। সে আর কিছু চায় না; তার আর কিছু ভাল লাগে না।

(বঙ্কিমের প্রতি কোমলভাবে) — “আপনি কিছু মনে করো না।”

বঙ্কিম — আজ্ঞা, মিষ্টি শুনতে আসিনি।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৬ই ডিসেম্বর 1884/12/06/iii

58.3 শ্রীরামকৃষ্ণ ও পরোপকার

শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি) — কামিনী-কাঞ্চনই সংসার। এরই নাম মায়া। ঈশ্বরকে দেখতে, চিন্তা করতে দেয় না; দুই-একটি ছেলে হলে স্ত্রীর সঙ্গে ভাই-ভগ্নীর মতো থাকতে হয়, আর তার সঙ্গে সর্বদা ঈশ্বরের কথা কইতে হয়। তাহলে দুজনেরই মন তাঁর দিকে যাবে আর স্ত্রী ধর্মের সহায় হবে। পশুভাব না গেলে ঈশ্বরের আনন্দ আস্বাদন করতে পারে না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয় যাতে পশূভাব যায়। ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা। তিনি অন্তর্যামী, শুনবেনই শুনবেন। যদি আন্তরিক হয়।

“আর — ‘কাঞ্চন’। আমি পঞ্চবটীর১ তলায় গঙ্গার ধারে বসে ‘টাকা মাটি’ ‘টাকা মাটি’ ‘মাটিই টাকা’, ‘টাকাই মাটি’ বলে জলে ফেলে দিছলুম!”

বঙ্কিম — টাকা মাটি! মহাশয় চারটা পয়সা থাকলে গরিবকে দেওয়া যায়। টাকা যদি মাটি, তাহলে দয়া পরোপকার করা হবে না?

[শ্রীযুক্ত বঙ্কিম ‘জগতের উপকার’ ও কর্মযোগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি) — দয়া! পরোপকার! তোমার সাধ্য কি যে তুমি পরোপকার কর? মানুষের এতো নপর-চপর কিন্তু যখন ঘুমোয়, তখন যদি কেউ দাঁড়িয়ে মুখে মুতে দেয়, তো টের পায় না, মুখ ভেসে যায়। তখন অহংকার, অভিমান, দর্প কোথায় যায়?

“সন্ন্যাসীর কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে হয়! তা আর গ্রহণ করতে পারে না। থুথু ফেলে আবার থুথু খেতে নাই। সন্ন্যাসী যদি কারুকে কিছু দেয়, সে নিজে দেয়, মনে করে না। দয়া ঈশ্বরের; মানুষে আবার কি দয়া করবে? দানটান সবই রামের ইচ্ছা। ঠিক সন্ন্যাসী মনেও ত্যাগ করে, বাহিরেও ত্যাগ করে। যে গুড় খায় না, তার কাছে গুড় থাকাও ভাল নয়। কাছে গুড় থেকে যদি সে বলে খেয়ো না, তা লোকে শুনবে না।

“সংসারী লোকের টাকার দরকার আছে, কেননা মাগছেলে আছে। তাদের সঞ্চয় করা দরকার, মাগছেলেদের খাওয়াতে হবে। সঞ্চয় করবে না কেবল পঞ্ছী আউর দরবেশ, অর্থাৎ পাখি আর সন্ন্যাসী। কিন্তু পাখির ছানা হলে সে মুখে করে খাবার আনে। তারও তখন সঞ্চয় করতে হয়। তাই সংসারী লোকের টাকার দরকার। পরিবার ভরণপোষণ করতে হয়।

“সংসারী লোক শুদ্ধভক্ত হলে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করে। কর্মের ফল — লাভ, লোকশান, সুখ, দুঃখ ঈশ্বরকে সমর্পণ করে। আর তাঁর কাছে রাতদিন ভক্তি প্রার্থনা করে, আর কিছু চায় না। এরই নাম নিষ্কাম কর্ম — অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা। সন্ন্যাসীরও সব কর্ম নিষ্কাম করতে হয়। তবে সন্ন্যাসী সংসারীদের মতো বিষয়কর্ম করে না।

“সংসারী ব্যক্তি নিষ্কামভাবে যদি কাউকে দান করে সে নিজের উপকারের জন্য, ‘পরোপকারের’ জন্য নয়। সর্বভূতে হরি আছেন তাঁরই সেবা করা হয়। হরিসেবা হলে নিজেরই উপকার হলো, ‘পরোপকার’ নয়। এই সর্বভূতে হরির সেবা — শুধু মানুষের নয়, জীবজন্তুর মধ্যেও হরির সেবা, যদি কেউ করে, আর যদি সে মান চায় না, যশ চায় না, মরবার পর স্বর্গ চায় না, যাদের সেবা করছে, তাদের কাছ থেকে উলটে কোন উপকার চায় না, এরূপ ভাবে যদি সেবা করে, তাহলে তার যথার্থ নিষ্কাম কর্ম, অনাসক্ত কর্ম করা হয়। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম করলে তার নিজের কল্যাণ হয়, এরই নাম কর্মযোগ। এই কর্মযোগও ঈশ্বরলাভের একটি পথ। কিন্তু বড় কঠিন, কলিযুগের পক্ষে নয়।

তাই বলছি, যে অনাসক্ত হয়ে এরূপ কর্ম করে, দয়া দান করে, সে নিজেরই মঙ্গল করে। পরের উপকার পরের মঙ্গল সে ঈশ্বর করেন — যিনি চন্দ্র, সূর্য, বাপ মা, ফল, ফুল, শস্য জীবের জন্য করেছেন! বাপ-মার ভিতর যা স্নেহ দেখ, সে তাঁরই স্নেহ, জীবের রক্ষার জন্যই দিয়েছেন। দয়ালুর ভিতর যা দয়া দেখ, সে তাঁরই দয়া, নিঃসহায় জীবের রক্ষার জন্য দিয়েছেন। তুমি দয়া কর আর না কর, তিনি কোন না কোন সূত্রে তাঁর কাজ করবেন। তাঁর কাজ আটকে থাকে না।

“তাই জীবের কর্তব্য কি? আর কি, তাঁর শরণাগত হওয়া, আর তাঁকে যাতে লাভ হয়, দর্শন হয়, সেইজন্য ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা।”

[ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু]

“শম্ভু বলেছিল, আমার ইচ্ছা যে খুব কতকগুলো ডিস্পেনসারি, হাসপাতাল করে দিই, তাহলে গরিবদের অনেক উপকার হয়। আমি বললুম, হাঁ, অনাসক্ত হয়ে যদি এ-সব কর, তো মন্দ নয়। তবে ইশ্বরের উপর আন্তরিক ভক্তি না থাকলে অনাসক্ত হওয়া বড় কঠিন। আবার অনেক কাজ জড়ালে কোনদিক থেকে আসক্তি এসে পড়ে, জানতে দেয় না। মনে করছি নিষ্কামভাবে করছি, কিন্তু হয়তো যশের ইচ্ছা হয় গেছে, নাম বার করবার ইচ্ছা হয়ে গেছে। আবার বেশি কর্ম করতে গেলে, কর্মের ভিড়ে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। আরও বললুম, শম্ভু! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। যদি ঈশ্বর তোমার সম্মুখে এসে সাক্ষাৎকার হন, তাহলে তুমি তাঁকে চাইবে, না কতকগুলি ডিস্পেনসারি বা হাসপাতাল চাইবে? তাঁকে পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। মিছরির পানা পেলে আর চিটেগুড়ের পানা ভাল লাগে না।

“যারা হাসপাতাল, ডিস্পেনসারি করবে, আর এতেই আনন্দ করবে তারাও ভাল লোক, কিন্তু থাক্ আলাদা। যে শুদ্ধভক্ত, সে ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না; বেশি কর্মের ভিতর যদি সে পড়ে, সে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করে, হে ঈশ্বর, কৃপা করে আমার কর্ম কমিয়ে দাও; তা না হলে যে মন তোমাতেই নিশিদিন লেগে থাকবে, সেই মন বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে; সেই মনেতে বিষয়চিন্তা করা হচ্ছে। শুদ্ধভক্তির থাক্ একটি আলাদা থাক্। ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু, এ বোধ না হলে শুদ্ধভক্তি

হয় না। এ-সংসার অনিত্য, দুদিনের জন্য, আর এ-সংসারের যিনি কর্তা, তিনিই সত্য, নিত্য; এ-বোধ না হলে শুদ্ধভক্তি হয় না।

“জনকাদি প্রত্যাদিষ্ট হয়ে কর্ম করেছেন।”

১ পঞ্চবটী — রাসমণির কালীবাটীতে পঞ্চবটীতলায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সাধনা তপস্যা করিয়াছিলেন। অতি নির্জন স্থান। সহজেই ঈশ্বর উদ্দীপন হয়।
পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৬ই ডিসেম্বর 1884/12/06/iv

58.4 আগে বিদ্যা (Science) না আগে ঈশ্বর

শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি) — কেউ কেউ মনে করে শাস্ত্র না পড়লে, বই না পড়লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। তারা মনে করে, আগে জগতের বিষয়, জীবের বিষয় জানতে হয়, আগে সায়েন্স পড়তে হয়। (সকলের হাস্য) তারা বলে ঈশ্বরের সৃষ্টি এ-সব না বুঝলে ঈশ্বরকে জানা যায় না। তুমি কি বল? আগে সায়েন্স না আগে ঈশ্বর?

বঙ্কিম — হাঁ, আগে পাঁচটা জানতে হয়, জগতের বিষয়। একটু এ দিককার জ্ঞান না হলে, ঈশ্বর জানব কেমন করে? আগে পড়াশুনা করে জানতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ওই তোমাদের এক। আগে ঈশ্বর, তারপর সৃষ্টি। তাঁকে লাভ করলে, দরকার হয়তো সবই জানতে পারবে।

“যদি যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করতে পারো জো-সো করে, তাহলে যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, যদু মল্লিকের কখানা বাড়ি, কত কোম্পানির কাগজ, কখানা বাগান, এও জানতে পারবে। যদু মল্লিকই বলে দেবে। কিন্তু তার সঙ্গে যদি আলাপ না হয়, বাড়ি ঢুকতে গেলে দারোয়ানেরা যদি না ঢুকতে দেয়, তাহলে কখানা বাড়ি, কত কোম্পানির কাগজ, কখানা বাগান, এ-সব ঠিক খবর কেমন করে যানবে? তাঁকে জানলে সব জানা যায়,১ কিন্তু সামান্য বিষয় জানবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। বেদেও এ-কথা আছে। যতক্ষণ না লোকটিকে দেখা যায়, ততক্ষণ তার গুণের কথা কওয়া যায়; সে যেই সামনে আসে, তখন ও-সব কথা বন্ধ হয়ে খায়। লোকে তাকে নিয়েই মত্ত হয়, তার সঙ্গে আলাপ করে বিভোর হয়, তখন আর অন্য কথা থাকে না।

“আগে ঈশ্বরলাভ২, তারপর সৃষ্টি বা অন্য কথা। বাল্মীকিকে রামমন্ত্র জপ করতে দেওয়া হল, কিন্তু তাকে বলা হল, ‘মরা’ ‘মরা’ জপ করো। ‘ম’ মানে ঈশ্বর আর ‘রা’ মানে জগৎ। আগে ঈশ্বর তারপর জগৎ, এককে জানলে সব জানা যায়। ১-এর পর যদি পঞ্চাশটা শূন্য থাকে অনেক হয়ে যায়। ১কে পুছে ফেললে কিছুই থাকে না। ১কে নিয়েই অনেক। এক আগে, তারপর অনেক; আগে ঈশ্বর৩ তারপর জীবজগৎ।

“তোমার দরকার ঈশ্বরকে লাভ করা! তুমি অত জগৎ, সৃষ্টি, সায়েন্স, ফায়েন্স এ-সব করছো কেন? তোমার আম খাবার দরকার। বাগানে কত শ আমগাছ, কত হাজার ডাল, কত লক্ষ কোটি পাতা, এ-সব খবরে তোমার কাজ কি? তুই আম খেতে এসেছিস আম খেয়ে যা। এ-সংসারে মানুষ এসেছে ভগবানলাভের জন্য। সেটি ভুলে নানা বিষয়ে মন দেওয়া ভাল নয়। আম খেতে এসেছিস আম খেয়েই যা।”

বঙ্কিম — আম পাই কই?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর। আন্তরিক হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। হয়তো এমন কোনও সৎসঙ্গ জুটিয়ে দিলেন, যাতে সুবিধা হয়ে গেল। কেউ হয়তো বলে দেয়, এমনি এমনি কর তাহলে ঈশ্বরকে পাবে।

বঙ্কিম — কে? গুরু! তিনি আপনি ভাল আম খেয়ে, আমায় খারাপ আম দেন! (হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ — কেন গো! যার যা পেটে সয়। সকলে কি পলুয়া-কালিয়া খেলে হজম করতে পারে? বাড়িতে মাছ এলে মা সব ছেলেকে পমুয়া-কালিয়া দেন না। যে দুর্বল, যার পেটের অসুখ, তাকে মাছের ঝোল দেন; তা বলে কি মা সে ছেলেকে কম ভালবাসেন?

[ঈশ্বরলাভের উপায়, — ব্যাকুলতা, বালকের বিশ্বাস]

“গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতে হয়। গুরুই সচ্চিদানন্দ, সচ্চিদানন্দই গুরু, তাঁর কথা বিশ্বাস করলে, — বালকের মতো বিশ্বাস করলে — ঈশ্বরলাভ হয়। বালকের কি বিশ্বাস! মা বলেছে, ‘ও তোর দাদা হয়’, অমনি জেনেছে, ‘ও আমার দাদা।’ একেবারে পাঁচ সিকা পাঁচ আনা বিশ্বাস! তা সে ছেলে হয়তো বামুনের ছেলে, আর দাদা হয়তো ছুতোর কামারের ছেলে। মা বলেছে, ও ঘরে জুজু। তো পাকা জেনে আছে, ও ঘরে জুজু। এই বালকের বিশ্বাস; গুরুবাক্যে এমন বিশ্বাস ছাই। স্যায়না বুদ্ধি, পাটোয়ারী বুদ্ধি, বিচার বুদ্ধি করলে, ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। বিশ্বাস আর সরল হওয়া, কপট হলে চলবে না। সরলের কাছে তিনি খুব সহজ। কপট থেকে তিনি অনেক দূর।

“কিন্তু বালক যেমন মাকে না দেখলে দিশেহারা হয়, সন্দেশ মিঠাই হাতে দিয়ে ভোলাতে যাও কিছুই চায় না, কিছুতেই ভোলে না, আর বলে, ‘না, আমি মার কাছে যাব’, সেইরকম ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা চাই। আহা! কি অবস্থা! বালক যেমন মা মা করে পাগল হয়। কিছুতেই ভোলে না! যার সংসারে এ-সব সুখভোগ আলুনী লাগে, যার আর কিছু ভাল লাগে না — টাকা, মান, দেহের সুখ, ইন্দ্রিয়ের সুখ, যার কিছুই ভাল লাগে না, সেই আন্তরিক মা মা করে কাতর হয়। তারই জন্যে মার আবার সব কাজ ফেলে দৌড়ে আসতে হয়।

“এই ব্যাকুলতা। যে পথেই যাও, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শাক্ত, ব্রহ্মজ্ঞানী — যে পথেই যাও, ওই ব্যাকুলতা নিয়েই কথা। তিনি তো অন্তর্যামী, ভুলপথে গিয়ে পড়লেও দোষ নাই — যদি ব্যাকুলতা থাকে। তিনি আবার ভালপথে তুলে লন।

"আর সব পথেই ভুল আছে, — সব্বাই মনে করে আমার ঘড়ি ঠিক যাচ্ছে, কিন্তু কারও ঘড়ি ঠিক যায় না। তা বলে কারু কাজ আটকায় না। ব্যাকুলতা থাকলে সাধুসঙ্গ জুটে যায়, সাধুসঙ্গে নিজের ঘড়ি অনেকটা ঠিক করে লওয়া যায়।"

১ তস্মিন্‌ বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিঞ্জাতং ভবতি।

২ মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য (End of Life) ঈশ্বরলাভ।

৩ আগে ঈশ্বর Seek ye first the kingdom of Heaven and all other things shall be added unto you — Jesus.

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৬ই ডিসেম্বর 1884/12/06/v

58.5 শ্রীরামকৃষ্ণ কীর্তনানন্দে

ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য গান করিতেছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কীর্তন একটু শুনিতে শুনিতে হঠাৎ দণ্ডায়মান ও ঈশ্বরাবেশে বাহ্যশূন্য হইলেন। একেবারে অন্তর্মুখ, সমাধিস্থ। দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ। সকলেই বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। বঙ্কিম ব্যস্ত হইয়া ভিড় ঠেলিয়া ঠাকুরের কাছে গিয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন। তিনি সমাধি কখনও দেখেন নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে একটু বাহ্য হইবার পর ঠাকুর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, যেন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসমন্দিরে ভক্ত সঙ্গে নাচিতেছেন। সে অদ্ভুত নৃত্য! বঙ্কিমাদি ইংরেজী পড়া লোকেরা দেখিয়া অবাক্‌। কি আশ্চর্য! এরই নাম কি প্রেমানন্দ? ঈশ্বরকে ভালবেসে মানুষ কি এত মাতোয়ারা হয়? এইরূপ কাণ্ডই কি নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ করেছিলেন? এইরকম করেই কি তিনি নবদ্বীপে আর শ্রীক্ষেত্রে প্রেমের হাট বসিয়াছিলেন? এর ভিতর তো ঢঙ হতে পারে না। ইনি সর্বত্যাগী, এঁর টাকা, মান, নাম বেরুনো কিছুই দরকার নাই। তবে এই কি জীবনের উদ্দেশ্য? কোন দিকে মন না দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসাই কি জীবনের উদ্দেশ্য? এখন উপায় কি? ইনি বললেন, মার জন্য দিশেহারা হয়ে ব্যাকুল হওয়া, ব্যাকুলতা, ভালবাসাই উপায়, ভালবাসাই উদ্দেশ্য। ঠিক ভালবাসা এলেই দর্শন হয়।

ভক্তেরা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ও সেই অদ্ভুত দেবদুর্লভ নৃত্য ও কীর্তনানন্দ দেখিতে লাগিলেন। সকলেই দণ্ডায়মান — ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চারিদিকে — আর একদৃষ্টে তাঁকে দেখিতেছেন।

কীর্তনান্তে ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। “ভাগবত-ভক্ত-ভগবান” এই কথা উচ্চারণ করিয়া বলিতেছেন, জ্ঞানী-যোগী-ভক্ত সকলের চরণে প্রণাম।

আবার সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮৪, ৬ই ডিসেম্বর 1884/12/06/vi

58.6 শ্রীযুক্ত বঙ্কিম ও ভক্তিযোগ — ঈশ্বরপ্রেম

বঙ্কিম (ঠাকুরের প্রতি) — মহাশয়, ভক্তি কেমন করে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ব্যাকুলতা। ছেলে যেমন মার জন্য মাকে না দেখতে পেয়ে দিশেহারা হয়ে কাঁদে, সেই রকম ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরের জন্য কাঁদলে ঈশ্বরকে লাভ করা পর্যন্ত যায়।

“অরুণোদয় হলে পূর্বদিক লাল হয়, তখন বোঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের আর দেরি নাই। সেইরূপ যদি কারও ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে দেখা যায়, তখন বেশ বুঝতে পারা যায় যে, এ ব্যক্তির ঈশ্বরলাভের আর বেশি দেরি নাই।

“একজন গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, মহাশয়, বলে দিন ঈশ্বরকে কেমন করে পাব। গুরু বললে, এসো আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে তাকে সঙ্গে করে একটি পুকুরের কাছে নিয়ে গেল। দুই জনেই জলে নামল, এমন সময় হঠাৎ গুরু শিষ্যকে ধরে জলে চুবিয়ে ধরলে। খানিক পরে ছেড়ে দিবার পর শিষ্য মাথা তুলে দাঁড়াল। গুরু জিজ্ঞাসা করলে, তোমার কি রকম বোধ হচ্ছিল? শিষ্য বললে, প্রাণ যায় যায় বোধ হচ্ছিল, প্রাণ আটু-পাটু করছিল। তখন গুরু বললে, ঈশ্বরের জন্য যখন প্রাণ ওইরূপ আটু-পাটু করবে, তখন জানবে যে, তাঁর সাক্ষাৎকারের দেরি নাই।

“তোমায় বলি, উপরে ভাসলে কি হবে? একটু ডুব দাও। গভীর জলের নিচে রত্ন রয়েছে, জলের উপর হাত-পা ছুঁড়লে কি হবে? ঠিক মাণিক ভারী হয়, জলে ভাসে না; তলিয়ে গিয়ে জলের নিচে থাকে। ঠিক মাণিক লাভ করতে গেলে জলের ভিতর ডুব দিতে হয়।”

বঙ্কিম — মহাশয়, কি করি, পেছনে শোলা বাঁধা আছে। (সকলের হাস্য) ডুবতে দেয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁকে স্মরণ করলে সব পাপ পেটে যায়। তাঁর নামেতে কালপাথ কাটে। ডুব দিতে হবে, তা না হলে রত্ন পাওয়া যাবে না। একটা গান শোন:

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ-সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবে রে প্রেমরত্নধন ।।
খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ ।।
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাঙ্গায় ডিঙে চালায় আবার সে কোন্ জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ ।।

ঠাকুর তাঁহার সেই দেবদুর্লভ মধুর কণ্ঠে এই গানটি গাইলেন। সভাসুদ্ধ লোক আকৃষ্ট হইয়া একমনে এই গান শুনিতে লাগিলেন। গান সমাপ্ত হইলে আবার কথা আরম্ভ হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি) — কেউ কেউ ডুব দিতে চায় না। তারা বলে, ঈশ্বর ঈশ্বর করে বাড়াবাড়ি করে শেষকালে কি পাগল হয়ে যাব? যারা ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত, তাদের তারা বলে, বেহেড হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই সব লোক এটি বোঝে না যে সচ্চিদানন্দ অমৃতের সাগর।

আমি নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মনে কর যে, এক খুলি রস আছে, আর তুই মাছি হয়েছিস; তুই কোন্‌খানে বসে রস খাবি? নরেন্দ্র বললে, আড়ায় (কিনারায়) বসে মুখ বাড়িয়ে খাব। আমি বললুম, কেন? মাঝখানে গিয়ে ডুবে খেলে কি দোষ? নরেন্দ্র বললে, তাহলে যে রসে জড়িয়া মরে যাব। তখন আমি বললুম, বাবা সচ্চিদানন্দ-রস তা নয়, এ-রস অমৃত রস, এতে ডুবলে মানুষ মরে না; অমর হয়। "তাই বলছি ডুব দাও। কিছু ভয় নেই, ডুবলে অমর হয়।"

এইবার বঙ্কিম ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন — বিদায় গ্রহণ করিবেন।

বঙ্কিম — মহাশয়, যত আহাম্মক আমাকে ঠাওরেছেন তত নয়। একটি প্রার্থনা আছে — অনুগ্রহ করে কুটিরে একবার পায়ের ধুলা —

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা বেশ তো, ঈশ্বরের ইচ্ছা।

বঙ্কিম — সেখানেও দেখবেন, ভক্ত আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — কি গো! কি রকম সব ভক্ত সেখানে? যারা গোপাল গোপাল, কেশব কেশব বলেছিল, তাদের মতো কি? (সকলের হাস্য)

একজন ভক্ত — মহাশয়, গোপাল, গোপাল, ও গল্পটি কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) — তবে গল্পটি বলি শোন। এক জায়গায় একটি স্যাকরার দোকান আছে। তারা পরম বৈষ্ণব, গলায় মালা, তিলক সেবা, প্রায় হাতে হরিনামের ঝুলি আর মুখে সর্বদাই হরিনাম। সাধু বললেই হয়, তবে পেটের জন্য স্যাকরার কর্ম করা; মাগছেলেদের তো খাওয়াতে হবে। পরম বৈষ্ণব, এই কথা শুনে অনেক খরিদ্দার তাদেরই দোকানে আসে; কেননা, তারা জানে যে, এদের দোকানে সোনা-রূপা গোলমাল হবে না। খরিদ্দার দোকানে গিয়ে দেখে যে, মুখে হরিনাম, করছে, আর বসে বসে কাজকর্ম করছে। খরিদ্দার যাই গিয়ে বসল, একজন বলে উঠল, 'কেশব! কেশব! কেশব!' খানিকক্ষণ পরে আর-একজন বলে উঠল, 'গোপাল! গোপাল! গোপাল!' আবার একটু কতাবার্তা হতে না হতেই আর-একজন বলে উঠল — 'হরি! হরি! হরি!' গয়না গড়বার কথা যখন একরকম ফুরিয়ে এল, তখন আর-একজন বলে উঠলো — 'হর! হর! হর! হর!' কাজে কাজেই এত ভক্তি প্রেম দেখে তারা স্যাকরাদের কাছে টাকাকড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত হল; জানে যে এরা কখনও ঠকাবে না।

"কিন্তু কথা কি জানো? খরিদ্দার আসবার পর যে বলেছিল 'কেশব! কেশব!' তার মানে এই, এরা সব কে? অর্থাৎ যে খরিদ্দারেরা আসলো এরা সব কে? যে বললে, 'গোপাল! গোপাল!' তার মানে এই, এরা দেখছি গোরুর পাল, গোরুর পাল। যে বললে, 'হরি! হরি!' তার মানে এই, যেকালে দেখছি গোরুর পাল, সে স্থলে তবে 'হরি' অর্থাৎ হরণ করি। আর যে বললে, 'হর! হর!' তার মানে এই যেকালে গোরুর পাল দেখছো, সেকালে সর্বস্ব হরণ কর।' এই তারা পরমভক্ত সাধু।" (সকলের হাস্য)

বঙ্কিম বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু একাগ্র হয়ে কি ভাবিতেছিলেন। ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দেখেন, চাদর ফেলিয়া আসিয়াছেন। গায়ে শুধু জামা। একটি বাবু চাদরখানি কুড়াইয়া লইয়া ছুটিয়া আসিয়া চাদর তাঁহার হস্তে দিলেন। বঙ্কিম কি ভাবিতেছিলেন?

রাখাল আসিয়াছেন। তিনি বৃন্দাবনধামে বলরামের সঙ্গে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে কিছুদিন ফিরিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহার কথা শরৎ ও দেবেন্দ্রের কছে বলিয়াছিলেন ও তাঁহার সহিত আলপা করিতে তাঁহাদের বলিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা রাখালের সঙ্গে আলাপ পরিতে উৎসুক হইয়া আসিয়াছিলেন। শুনিলেন, এঁরই নাম রাখাল।

শরৎ ও সান্যাল এঁরা ব্রাহ্মণ, অধর সুবর্ণবণিক। পাছে গৃহস্বামী খাইতে ডাকেন, তাই তাড়াতাড়ি পলাইয়া গেলেন। তাঁহারা নূতন আসিতেছেন; এখনও জানেন না, ঠাকুর অধরকে কত ভালবাসেন। ঠাকুর বলেন, “ভক্ত একটি পৃথক জাতি। সকলেই এক জাতীয়।”

অধর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ও সমবেত ভক্তদের অতি যত্নপূর্বক আহ্বান করিয়া পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন। ভোজনানন্তে ভক্তগণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর কথাগুলি স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার অদ্ভুত প্রেমের ছবি হৃদয়ে গ্রহণপূর্বক গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

অধরের বাটীতে শুভাগমনের দিনে শ্রীযুক্ত বঙ্কিম শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁহার বাটীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করাতে তিনি কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত গিরিশ ও মাস্টারকে

তাঁহার সান্‌কীভাঙার বাসায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। ঠাকুরকে আবার দর্শন করিতে আসিবার ইচ্ছা বঙ্কিম প্রকাশ করেন, কিন্তু কার্যগতিকে আর আসা হয় নাই।

[দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে ‘দেবী চৌধুরানী’ পাঠ]

৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত অধরের বাটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শুভাগমন করিয়াছিলেন ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবাবুর সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। প্রথম হইতে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এই সব কথা বিবৃত হইল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে অর্থাৎ ২৭শে ডিসেম্বর, শনিবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীমূলে দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে বঙ্কিম প্রণীত দেবী চৌধুরাণীর কতক অংশ পাঠ শুনিয়াছিলেন ও গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের বিষয় অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীমূলে চাতালের উপর অনেক ভক্তসঙ্গে বসিয়াছিলেন। মাস্টারকে পাঠ করিয়া শুনাইতে বলিলেন। কেদার, রাম, নিত্যগোপাল, তারক (শিবানন্দ), প্রসন্ন (ত্রিগুণাতীত), সুরেন্দ্র প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c59 ৫৯ বরাহনগর মঠ

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৮৭, ২১ - ২২শে ফেব্রুয়ারি 1887/02/21 1887/02/22

59.1 নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি মঠের ভাইদের ৺শিবরাত্রি ব্রত

বরাহনগর মঠ। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি আজ ৺শিবরাত্রির উপবাস করিয়া আছেন। দুইদিন পরে ঠাকুরের জন্মতিথি পূজা হইবে।

বরাহনগর মঠ সবে পাঁচ মাস স্থাপিত হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্যধামে বেশিদিন যান নাই। নরেন্দ্র রাখাল প্রভৃতি ভক্তদের তীব্র বৈরাগ্য। একদিন রাখালের পিতা বাড়ি ফিরিয়া যাইবার জন্য রাখালকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছিলেন। রাখাল বলিলেন, "কেন আপনারা কষ্ট করে আসেন! আমি এখানে বেশ আছি। এখন আশীর্বাদ করুন, যেন আপনারা আমায় ভুলে যান, আর আমি আপনাদের ভুলে যাই।" সকলেরই তীব্র বৈরাগ্য! সর্বদা সাধনভজন লইয়া আছেন। এক উদ্দেশ্য — কিসে ভগবানদর্শন হয়।

নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা কখনও জপ-ধ্যান করেন, কখনও শাস্ত্রপাঠ করেন। নরেন্দ্র বলেন, “গীতায় ভগবান যে নিষ্কামকর্ম করতে বলেন — সে পূজা, জপ, ধ্যান এই সব কর্ম — অন্য কর্ম নহে।”

আজ সকালে নরেন্দ্র কলিকাতায় আসিয়াছেন। বাটীর মোকদ্দমায় তদ্বির করিতে হইতেছে। আদালতে সাক্ষি দিতে হয়।

মাস্টার বেলা নয়টার সময় মঠে উপনীত হইয়াছেন। দানাদের ঘরে প্রবেশ করিলে পর তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীযুক্ত তারক আনন্দে শিবের গান ধরিলেন —

‘তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা।

তাঁহার গানের সহিত রাখালও যোগ দিলেন। আর গান গাহিয়া দুইজনেই নৃত্য করিতেছেন। এই গান নরেন্দ্র সবে বাঁধিয়াছেন।

তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা, বববম্‌, বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে দুলিছে কপাল মাল।
গরজে গঙ্গা জটা মাঝে, উগরে অনল-ত্রিশূল রাজে।
ধক্‌ ধক্‌ ধক্‌ মৌলি বন্ধ, জ্বলে শশাঙ্ক ভাল ।।

মঠের ভাইয়েরা সকলে উপবাস করিয়া আছেন। ঘরে এখন নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, কালী, বাবুরাম, তারক, হরিশ, সিঁথির গোপাল, সারদা, মাস্টার আছেন। যোগীন, লাটু শ্রীবৃন্দাবনে আছেন। তাঁহারা এখনও মঠ দেখেন নাই।

আজ শোমবার [১]শিবরাত্রি, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৭। আগামী শনিবারে শরৎ, কালী, নিরঞ্জন, সারদা, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনার্থ [১]পুরীধামে যাত্রা করিবেন।

শ্রীযুক্ত শশী দিনরাত ঠাকুরের সেবা লইয়া আছেন।

পূজা হইয়া গেল। শরৎ তানপুরা লইয়া গান গাইতেছেন:

শিব শঙ্কর বম্‌ বম্‌ (ভোলা), কৈলাসপতি মহারাজরাজ!
উড়ে শৃঙ্গ কি খেয়াল, গলে ব্যাল মাল, লোচন বিশাল, লালে লাল;
ভালে চন্দ্র শোভে, সুন্দর বিরাজে।

নরেন্দ্র কলিকাতা হইতে এইমাত্র আসিয়াছেন। এখনও স্নান করেন নাই। কালী নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মোকদ্দমার কি খবর?

নরেন্দ্র (বিরক্ত হইয়া) — তোদের ও-সব কথায় কাজ কি?

নরেন্দ্র তামাক খাইতেছেন ও মাস্টার প্রভৃতির সহিত কথা কহিতেছেন। — "কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ না করলে হবে না। কামিনী নরকস্য দ্বারম্‌। যত লোক স্ত্রীলোকে বশ। শিব আর কৃষ্ণ এদের আলাদা কথা। শক্তিকে শিব দাসী করে রেখেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সংসার করেছিলেন বটে, কিন্তু কেমন নির্লিপ্ত! ফস করে বৃন্দাবন কেমন ত্যাগ করলেন!"

রাখাল — আবার দ্বারিকা কেমন ত্যাগ করলেন!

নরেন্দ্র গঙ্গাস্নান করিয়া মঠে ফিরিলেন। হাতে ভিজে কাপড় ও গামছা। সারদা এতক্ষণ সমস্ত গায়ে মাটি মাখা — আসিয়া নরেন্দ্রকে সাষ্টাঙ্গ হইয়া নমস্কার করিলেন। তিনিও শিবরাত্রির উপবাস করিয়াছেন — গঙ্গাস্নানে যাইবেন। নরেন্দ্র ঠাকুরঘরে গিয়া ঠাকুর প্রণাম করিলেন ও উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল ধ্যান করিলেন।

ভবনাথের কথা হইতেছে। ভবনাথ বিবাহ করিয়াছেন, কর্ম কাজ করিতে হইতেছে। নরেন্দ্র বলিতেছেন, "ওরা তো সংসারী কীট!"

অপরাহ্ন হইল। শিবরাত্রির পূজার আয়োজন হইতেছে। বেলকাঠ ও বিল্বপত্র আহরণ করা হইল। পূজান্তে হোম হইবে।

সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুরঘরে ধুনা দিয়া শশী অন্যান্য ঘরেও ধুনা লইয়া গেলেন। প্রত্যেক দেবদেবীর পটের কাছে প্রণাম করিয়া অতি ভক্তিভরে নাম উচ্চারণ করিতেছেন। "শ্রীশ্রীগুরুদেবায় নমঃ! শ্রীশ্রীকালিকায়ৈ নমঃ! শ্রীশ্রীজগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামেভ্যো নমঃ! শ্রীশ্রীষড়্‌ভুজায় নমঃ! শ্রীশ্রীরাধাবল্লভায় নমঃ! শ্রীশ্রীনিত্যানন্দায়, শ্রীঅদ্বৈতায়, শ্রীভক্তেভ্যো নমঃ! শ্রীগোপালায়, শ্রীশ্রীযশোদায়ৈ নমঃ! শ্রীরামায়, শ্রীলক্ষ্মণায়, শ্রীবিশ্বামিত্রায় নমঃ!"

মঠের বেলতলায় শিবপূজার আয়োজন। রাত্রি নয়টা। এইবার পূজা হইবেক। সাড়ে এগারটার সময় দ্বিতীয় পূজা। চারি প্রহরে চার পূজা। নরেন্দ্র, রাখাল, শরৎ, কালী, সিঁথির গোপাল প্রভৃতি মঠের ভাইরা সকলেই বেলতলায়

উপস্থিত। ভূপতি ও মাস্টারও আছেন। মঠের ভাইদের মধ্যে একজন পূজা করিতেছেন।

কালী গীতা পাঠ করিতেছেন। সৈন্যদর্শন, সাংখ্যযোগ — কর্মযোগ। পাঠের মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্রের সহিত কথা ও বিচার হইতেছে।

কালী — আমিই সব। আমি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছি।

নরেন্দ্র — আমি সৃষ্টি করছি কই? আর এক শক্তিতে আমায় করাচ্ছে। এই নানা কার্য, — চিন্তা পর্যন্ত, তিনি করাচ্ছেন।

মাস্টার (স্বগত) — ঠাকুর বলেন, যতক্ষণ আমি 'ধ্যান করছি' এই বোধ, ততক্ষণও আদ্যাশক্তির এলাকা! শক্তি মানতেই হবে।

কালী নিস্তব্ধ হইয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিতেছেন। তারপর বলিতেছেন — "কার্য যা বললে, ও-সব মিথ্যা! — চিন্তা আদপেই হয় নাই — ও-সব মনে করলে হাসি পায় —"

নরেন্দ্র — 'সোঽহম্ বললে যে 'আমি' বোঝায়, সে এ 'আমি' নয়। মন, দেহ এ-সব বাদ দিলে যা থাকে, সেই 'আমি'!'

গীতা পাঠান্তে কালী শান্তিবাদ করিতেছেন — শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

এইবার নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য গীত করিতে করিতে বিল্বমূল বারবার পরিক্রমণ করিতেছেন। মাঝে মাঝে সমস্বরে 'শিবগুরু'!

শিবগুরু’! এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। গভীর রাত্রি। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথি। চারিদিক অন্ধকার! জীবজন্তু সকলেই নিস্তব্ধ।

গৈরিক বস্ত্রধারী, এই কৌমারবৈরাগ্যবান ভক্তগণের কণ্ঠে উচ্চারিত ‘শিবগুরু! শিবগুরু।’ এই মহামন্ত্রধ্বনি মেঘগম্ভীররবে অনন্ত আকাশে উঠিয়া অখণ্ড সচ্চিদানন্দে লীন হইতে লাগিল!

পূজা সমাপ্ত হইল: অরুণোদয় হয় হয়। নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ ব্রাহ্মমুহূর্তে গঙ্গাস্নান করিলেন।

সকাল (২২শে ফেব্রুয়ারি) হইল। স্নানান্তে ভক্তগণ মঠে ঠাকুরঘরে গিয়া ঠাকুরকে প্রণামান্তর দানাদের ঘরে (অর্থাৎ বৈঠকখানার ঘরে) ক্রমে ক্রমে আসিয়া একত্রিত হইতেছেন। নরেন্দ্র সুন্দর নব গৈরিকবস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। বসনের সৌন্দর্যের সঙ্গে তাহার মুখের ও দেহের তপস্যাসম্ভূত অপূর্ব স্বর্গীয় পবিত্র জ্যোতিঃ মিশাইয়াছে! বদনমণ্ডল তেজঃপরিপূর্ণ, আবার প্রেমানুরঞ্জিত! যেন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-সাগরের একটি ফুট জ্ঞান-ভক্তি শিখাইবার জন্য দেবদেহ ধারণ করিয়াছেন — অবতার লীলায় সহায়তার জন্য। যে দেখিতেছে, সে আর চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছে না। নরেন্দ্রের বয়ঃক্রম ঠিক চতুর্বিংশতি বৎসর। ঠিক এই বয়সে শ্রীচৈতন্য সংসারত্যাগ করিয়াছিলেন।

ভক্তদের পারনের জন্য শ্রীযুক্ত বলরাম তাঁহার বাটী হইতে ফল মিষ্টান্নাদি পূর্বদিনেই (শিবরাত্রির দিনে) পাঠাইয়াছেন।

রাখাল প্রভৃতি দু-একটি ভক্তসঙ্গে নরেন্দ্র ঘরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতেছেন। একটি-দুটি খাইয়াই আনন্দ করিতে করিতে বলিতেছেন, ‘ধন্য বলরাম’ ‘ধন্য বলরাম!’ (সকলের হাস্য)

এইবার নরেন্দ্র বালকের ন্যায় রহস্য করিতেছেন। রসগোল্লা মুখে করিয়া একেবারে স্পন্দহীন! চক্ষু নিমেষশূন্য! নরেন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া একজন ভক্ত ভান করিয়া তাঁহাকে ধারণ করিলেন —— পাছে পড়িয়া যান!

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র —— (রসগোল্লা মুখে রহিয়াছে) — চোখ চাহিয়া বলিতেছেন, ‘আমি —— ভাল —— আছি!’ (সকলের হাস্য)

মাস্টার প্রভৃতিকে সিদ্ধি ও প্রসাদ মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইল।

মাস্টার আনন্দের হাট দেখিতেছেন। ভক্তেরা জয়ধ্বনি করিতেছেন।

— “জয় গুরু মহারাজ! জয় গুরু মহারাজ!” —

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৭, ২৫শে মার্চ 1887/03/25

59.2 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ — নরেন্দ্রাদি ভক্তের বৈরাগ্য ও সাধন

বরাহনগরের মঠ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পর নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা একত্র হইয়াছেন। সুরেন্দ্রের সাধু ইচ্ছায় বরাহনগরে তাঁহাদের থাকিবার একটি বাসস্থান হইয়াছে। সেই স্থান আজি মঠে পরিণত। ঠাকুরঘরে গুরুদেব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যসেবা। নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা বলিলেন, আর সংসারে ফিরিব না, তিনি যে কামিণী-কাঞ্চন ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, আমরা কি করে আর বাড়িতে ফিরিয়া যাই! শশী নিত্যপূজার ভার লইয়াছেন। নরেন্দ্র ভাইদের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। ভাইরাও তাঁহার মুখ চাহিয়া থাকেন। নরেন্দ্র বলিলেন সাধন করিতে হইবে, তাহা না হইলে ভগবানকে পাওয়া যাইবে না। তিনি নিজে ও ভাইরাও নানাবিধ সাধন আরম্ভ করিলেন। বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রমতে মনের খেদ মিটাইবার জন্য অনেক প্রকার সাধনের প্রবৃত্ত হইলেন। কখনও কখনও নির্জনে বৃক্ষতলে, কখনও একাকী শ্মশানমধ্যে, কখনও গঙ্গাতীরে সাধন করেন। মঠের মধ্যে কখনও বা ধ্যানের ঘরে একাকী জপ-ধ্যানে দিন যাপন করেন। আবার কখনও ভাইদের সঙ্গে একত্র মিলিত হইয়া সংকীর্তনানন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। সকলেই, বিশেষতঃ নরেন্দ্র, ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল। কখনও বলেন প্রায়োপবেশন কি করিব? কি উপায়ে তাঁহাকে লাভ করিব?

লাটু, তারক ও বুড়োগোপাল ইঁহাদের থাকিবার স্থান নাই, এঁদের নাম করিয়াই সুরেন্দ্র প্রথম মঠ করেন। সুরেন্দ্র বলিলেন, “ভাই! তোমরা এই স্থানে ঠাকুরের গদি লইয়া থাকিবে, আর আমরা সকলে মাঝে মাঝে এখানে জুড়াইতে আসিব।” দেখিতে দেখিতে কৌমারবৈরাগ্যবান ভক্তেরা যাতায়াত করিতে করিতে আর বাড়িতে ফিরিলেন না। নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, বাবুরাম, শরৎ, শশী, কালী রহিয়া

গেলেন। কিছুদিন পরে সুবোধ ও প্রসন্ন আসিলেন। যোগীন ও লাটু বৃন্দাবনে ছিলেন, একবৎসর পরে আসিয়া জুটিলেন। গঙ্গাধর সর্বদাই মঠে যাতায়াত করিতেন। নরেন্দ্রকে না দেখিলে তিনি থাকিতে পারিতেন না। তিনি "জয় শিব ওঙ্কারঃ" এই আরতির স্তব আনিয়া দেন। মঠের ভাইরা "বা গুরুজী কি ফতে" এই জয়জয়কার ধ্বনি যে মাঝে মাঝে করিতেন, তাহাও গঙ্গাধর শিখাইয়াছিলেন। তিব্বত হইতে ফিরিবার পর তিনি মঠে রহিয়া গিয়াছিলেন। ঠাকুরের আর দুটি ভক্ত হরি ও তুলসী, নরেন্দ্র ও তাঁহার মঠের ভাইদের সর্বদা দর্শন করিতে আসিতেন। কিছুদিন পরে অবশেষে তাঁহারা মঠে থাকিয়া যান।

[নরেন্দ্রের পূর্বকথা ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসা]

আজ শুক্রবার, ২৫শে মার্চ, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ (১২ই চৈত্র, ১২৯৩, শুক্লা প্রতিপদ) — মাস্টার মঠের ভাইদের দর্শন করিতে আসিয়াছেন। দেবেন্দ্রও আসিয়াছেন। মাস্টার প্রায় দর্শন করিতে আসেন ও কখন কখন থাকিয়া যান। গত শনিবারে আসিয়া শনি, রবি ও সোম — তিনদিন ছিলেন। মঠের ভাইদের, বিশেষতঃ নরেন্দ্রের, এখন তীব্র বৈরাগ্য। তাই তিনি উৎসুক হইয়া সর্বদা তাঁহাদের দেখিতে আসেন।

রাত্রি হইয়াছে। আজ রাত্রে মাস্টার থাকিবেন।

সন্ধ্যার পর শশী মধুর নাম করিতে করিতে ঠাকুরঘরে আলো জ্বালিলেন ও ধুনা দিলেন। সেই ধুনা লইয়া যত ঘরের পট আছে, প্রত্যেকের কাছে গিয়া প্রণাম করিতেছেন।

এইবার আরতি হইতেছে। শশী আরতি করিতেছেন। মঠের ভাইরা, মাস্টার ও দেবেন্দ্র সকলে হাতজোড় করিয়া আরতি দেখিতেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে আরতির স্তব গাইতেছেন — “জয় শিব ওঙ্কার। ভজ শিব ওঙ্কার। ব্রহ্মা বিষ্ণু সদাশিব! হর হর হর মহাদেব!!”

নরেন্দ্র ও মাস্টার দুইজনে কহিতেছেন। নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছে যাওয়া অবধি অনেক পূর্বকথা মাস্টারের কাছে বলিতেছেন। নরেন্দ্রের এখন বয়স ২৪ বৎসর ২ মাস হইবে।

নরেন্দ্র — প্রথম প্রথম যখন যাই, তখন একদিন ভাবে বললেন, ‘তুই এসেছিস!’

“আমি বাবলাম, ‘কি আশ্চর্য! ইনি যেন আমায় অনেকদিন থেকে চেনেন।’ তারপর বললেন, ‘তুই কি একটা জ্যোতি দেখতে পাস?’

“আমি বললাম, আজ্ঞে হাঁ। ঘুমাবার আগে কপালের কাছে কি যেন একটি জ্যোতি ঘুরতে থাকে।”

মাস্টার — এখনও কি দেখ?

নরেন্দ্র — আগে খুব দেখতাম। যদু মল্লিকের রান্নাবড়িতে একদিন আমায় স্পর্শ করে কি মনে মনে বললেন, আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম! সেই নেশায় অমন একমাস ছিলুম!

“আমার বিবাহ হবে শুনে মা-কালীর পা ধরে কেঁদেছিলেন। কেঁদে বলেছিলেন, ‘মা ও-সব ঘুরিয়ে দে মা। নরেন্দ্র যেন ডুবে না!’

“যখন বাবা মারা গেলেন, মা-ভাইরা খেতে পাচ্ছে না, তখন একদিন অন্নদা গুহর সঙ্গে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল।

“তিনি অন্নদা গুহকে বললেন, ‘নরেন্দ্রের বাবা মারা গেছে, ওদের বড় কষ্ট, এখন বন্ধুবান্ধবরা সাহাজ্য করে তো বেশ হয়।’

“অন্নদা গুহ চলে গেলে আমি তাঁকে বকতে লাগলাম। বললাম, কেন আপনি ওর কাছে ও-সব কথা বললেন? তিনি তিরস্কৃত হয়ে কাঁদতে লাগলেন ও বললেন, ‘ওরে তোর জন্য যে আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে পারি!’

“তিনি ভালবেসে আমাদের বশীভূত করেছিলেন। আপনি কি বলেন?”

মাস্টার — অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ওঁর অহেতুক ভালবাসা।

নরেন্দ্র — আমায় একদিন একলা একটি কথা বললেন। আর কেহ ছিল না। এ-কথা আপনি (আমাদের ভিতরে) আর কারুকে বলবেন না।

মাস্টার — না, কি বলেছিলেন?

নরেন্দ্র — তিনি বললেন, আমার তো সিদ্ধাই করবার জো নাই। তোর ভিতর দিয়ে করব, কি বলিস? আমি বললাম — ‘না, তা হবে না।’

“ওঁর কথা উড়িয়ে দিতাম, — ওঁর কাছে শুনেছেন। ঈশ্বরের রূপদর্শন করেন, এ বিষয়ে আমি বলেছিলাম, ‘ও-সব মনের ভুল।’

“তিনি বললেন, ওরে, আমি কুঠির উপর চেঁচিয়ে বলতাম, ওরে কোথায় কে ভক্ত আছিস আয়, — তোদের না দেখে আমার প্রাণ যায়! মা বলেছিলেন, ভক্তেরা সব আসবে, — তা দেখ, সব তো মিলছে!

“আমি তখন আর কি বলব, চুপ করে রইলাম।”

[নরেন্দ্রের অখণ্ডের ঘর — নরেন্দ্রের অহংকার]

“একদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবেন্দ্রবাবু ও গিরিশবাবুকে আমার বিষয় বলেছিলেন, ‘ওর ঘর বলে দিলে ও দেহ রাখবে না।’ ”

মাস্টার — হাঁ, শুনেছি। আর আমাদের কাছেও অনেকবার বলেছিলেন। কাশীপুরে থাকতে তোমার একবার সে অবস্থা হয়েছিল, না?

নরেন্দ্র — সেই অবস্থায় বোধ হল যে, আমার শরীর নাই, শুধু মুখটি দেখতে পাচ্ছি। ঠাকুর উপরের ঘরে ছিলেন। আমার নিচে ওই অবস্থাটি হল! আমি সেই অবস্থাতে কাঁদতে লাগলাম। বলতে লাগলাম আমার কি হল! বুড়োগোপাল উপরে গিয়ে ঠাকুরকে বললেন, ‘নরেন্দ্র কাঁদছে।’

“তাঁর সঙ্গে দেখা হলে, তিনি বললেন, ‘এখন টের পেলি, চাবি আমার কাছে রইল!’ — আমি বললাম, ‘আমার কি হল!’

“তিনি অন্য ভক্তদের দিকে চেয়ে বললেন, ‘ও আপনাকে জানতে পারলে, দেহ রাখবে না; আমি ভুলিয়ে রেখেছি।’

“একদিন বলেছিলেন, তুই যদি মনে করিস কৃষ্ণকে হৃদয়মধ্যে দেখতে পাস। আমি বললাম, আমি কিষ্টফিষ্ট মানি না। (মাস্টার ও নরেন্দ্রের হাস্য)

“আর একটা দেখেছি, এক-একটি জায়গা, জিনিস বা মানুষ দেখলে, বোধ হয় যেন আগে জন্মান্তরে দেখেছি। যেন চেনা চেনা! আমহার্স্ট্‌ স্ট্রীট-এ যখন শরতের বাড়িতে গেলাম, শরতকে একবার বললাম, ওই বাড়ি যেন আমার সব জানা! বাড়ির ভিতরের পথগুলি, ঘরগুলি, যেন অনেক দিনের চেনা চেনা।

“আমি নিজের মতো কাজ করতাম, তিনি (ঠাকুর) কিছু বলতেন না। আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মেম্বার হয়েছিলাম, জানেন তো?”

মাস্টার — হাঁ, তা জানি।

নরেন্দ্র — তিনি জানতেন, ওখানে মেয়েমানুষেরা যায়। মেয়েদের সামনে রেখে ধ্যান করা যায় না, তাই নিন্দা করতেন। আমায় কিন্তু কিছু বলতেন না! একদিন শুধু বললেন, রাখালকে ও-সব কথা কিছু বলিস নি — যে তুই সমাজের মেম্বার হয়েছিস। ওরও, তাহলে হতে ইচ্ছা যাবে।

মাস্টার — তোমার বেশি মনের জোর, তাই তোমায় বারণ করেন নাই।

নরেন্দ্র — অনেক দুঃখকষ্ট পেয়ে তবে এই অবস্থা হয়েছে। মাস্টার মশাই, আপনি দুঃখকষ্ট পান নাই তাই, — মানি দুঃখকষ্ট না পেলে Resignation (ঈশ্বরে সমস্ত সমর্পণ) হয় না — Absolute Dependence on God.

“আচ্ছা ... এত নম্র ও নিরহংকার; কত বিনয়! আমায় বলতে পারেন, আমার কিসে বিনয় হয়?”

মাস্টার — তিনি বলেছেন, তোমার অহংকার সম্বন্ধে, — এ ‘অহং’ কার?

নরেন্দ্র — এর মানে কি?

মাস্টার — অর্থাৎ রাধিকাকে একজন সখী বলছেন, তোর অহংকার হয়েছে — তাই কৃষ্ণকে অপমান করলি। আর এক সখী উত্তর দিছিল, হাঁ, অহংকার শ্রীমতীর হয়েছিল বটে, কিন্তু এ অহং কার? অর্থাৎ কৃষ্ণ আমার পতি — এই অহংকার, — কৃষ্ণই এ ‘অহং’ রেখে দিয়েছিলেন। ঠাকুরের কথার মানে এই, ঈশ্বরই এই অহংকার তোমার ভিতরে রেখে দিয়েছেন, অনেক কাজ করিয়ে নেবেন এই জন্য!

নরেন্দ্র — কিন্তু আমি হাঁকডেকে বোলে আমার দুঃখ নাই!

মাস্টার (সহাস্যে) — তবে সখ করে হাঁকডাক করো। (উভয়ের হাস্য)

এইবার অন্য অন্য ভক্তদের কথা পড়িল — বিজয় গোস্বামীর প্রভৃতির।

নরেন্দ্র — তিনি বিজয় গোস্বামীর কথা বলেছিলেন, ‘দ্বারে ঘা দিচ্ছে।’

মাস্টার — অর্থাৎ ঘরের ভিতর এখনও প্রবেশ করিতে পারেন নাই।

“কিন্তু শ্যামপুকুর বাটীতে বিজয় গোস্বামী ঠাকুরকে বলেছিলেন, ‘আমি আপনাকে ঢাকাতে এই আকারে দর্শন করেছি, এই শরীরে।’ তুমিও সেইখানে উপস্থিত ছিলে।

নরেন্দ্র — দেবেন্দ্রবাবু, রামবাবু এরা সব সংসারত্যাগ করবে — খুব চেষ্টা করছে। রামবাবু, Privately বলেছে, দুই বছর পরে ত্যাগ করবে।

মাস্টার — দুই বছর পরে? মেয়েছেলেদের বন্দোবস্ত হলে বুঝি?

নরেন্দ্র — আর ও বাড়িটা ভাড়া দেবে। আর একটা ছোট বাড়ি কিনবে। মেয়ের বিয়ে-টিয়ে ওরা বুঝবে।

মাস্টার — গোপালের বেশ অবস্থা, না?

নরেন্দ্র — কি অবস্থা!

মাস্টার — এত ভাব, হরিনামে অশ্রু, রোমাঞ্চ!

নরেন্দ্র — ভাব হলেই কি বড় লোক হয়ে গেল!

কালী, শরৎ, শশী সারদা এরা — গোপালের চেয়ে কত বড়লোক! এদের ত্যাগ কত! গোপাল তাঁকে (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে) মানে কই?”

মাস্টার — তিনি বলেছিলেন বটে, ও এখানকার লোক নয়। তবে ঠাকুরকে তো খুব ভক্তি করতেন দেখেছি।

নরেন্দ্র — কি দেখেছেন?

মাস্টার — যখন প্রথম প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যাই, ঠাকুরের ঘরে ভক্তদের দরবার ভেঙে গেলে পর, ঘরের বাহিরে এসে একদিন দেখলাম — গোপাল হাঁটু গেড়ে বাগানের লাল সুরকির পথে হাতজোড় করে আছেন — ঠাকুর সেইখানে দাঁড়িয়ে। খুব চাঁদের আলো। ঠাকুরের ঘরের ঠিক উত্তরে যে বারান্দাটি আছে তারই ঠিক উত্তর গায়ে লাল সুরকির রাস্তা। সেখানে আর কেউ ছিল না। বোধ হল যেন — গোপাল শরণাগত হয়েছেন ও ঠাকুর আশ্বাস দিচ্ছেন।

নরেন্দ্র — আমি দেখি নাই।

মাস্টার — আর মাঝে মাঝে বলতেন, 'ওর পরমহংস অবস্থা।' তবে এও বেশ মনে আছে, ঠাকুর তাঁকে মেয়ে মানুষ ভক্তদের কাছে আনাগোনা করতে বারণ করেছিলেন। অনেকবার সাবধান করে দিছলেন।

নরেন্দ্র — আর তিনি আমার কছে বলেছেন, — ওর যদি পরমহংস অবস্থা তবে টাকা কেন! আর বলেছেন, 'ও এখানকার লোক নয়। যারা আমার আপনার লোক তারা এখানে সর্বদা আসবে।'

"তাইত — বাবুর উপর তিনি রাগ করতেন। সে সর্বদা সঙ্গে থাকত বলে, আর ঠাকুরের কাছে বেশি আসত না।

“আমায় বলেছিলেন — ‘গোপাল সিদ্ধ — হঠাৎ সিদ্ধ; ও এখানকার লোক নয়। যদি আপনার হত, ওকে দেখবার জন্য আমি কাঁদি নাই কেন?’

“কেউ কেউ ওঁকে নিত্যানন্দ বলে খাড়া করেছেন। কিন্তু তিনি (ঠাকুর) কতবার বলেছেন, ‘আমিই অদ্বৈত-চৈতন্য-নিত্যানন্দ একাধারে তিন।’ ”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৭, ৮ই এপ্রিল 1887/04/08

59.3 নরেন্দ্রের পূর্বকথা

মঠে কালী তপস্বীর ঘরে দুইটি ভক্ত বসিয়া আছেন। একটি ত্যাগী ও একটি গৃহী। উভয়েরই বয়স ২৪।২৫। দুইজনে কথা কহিতেছেন। এমন সময়ে মাস্টার আসিলেন। তিনি মঠে তিন দিন থাকবেন।

আজ গুডফ্রাইডে, ৮ই এপ্রিল, (২৬শে চৈত্র, ১২৯৩, পূর্ণিমা) শুক্রবার। এখন বেলা ৮টা হইবে। মাস্টার আসিয়া ঠাকুরঘরে গিয়া ঠাকুর প্রণাম করিলেন। তৎপরে নরেন্দ্র, রাখাল ইত্যাদি ভক্তদের সহিত দেখা করিয়া ক্রমে এই ঘরে আসিয়া বসিলেন ও দুইটি ভক্তকে সম্ভাষণ করিয়া ক্রমে তাঁহাদের কথা শুনিতে

লাগিলেন। গৃহী ভক্তটির ইচ্ছা সংসারত্যাগ করেন। মঠের ভাইটি তাঁহাকে বুঝাচ্ছেন, যাতে সংসারত্যাগ না করে।

ত্যাগী ভক্ত — কিছু কর্ম যা আছে — করে ফেল না। একটু করলেই তারপর শেষ হয়ে যাবে।

“একজন শুনেছিল তার নরক হবে। সে একজন বন্ধুকে বললে, ‘নরক কি রকম গা?’ বন্ধুটি একটু খড়ি নিয়ে নরক আঁকতে লাগল। নরক যেই আঁকা হয়েছে অমনি ওই লোকটি তাতে গড়াগড়ি দিয়ে ফেললে। তার বললে, এইবার আমার নরক ভোগ হয়ে গেল।

গৃহী ভক্ত — আমার সংসার ভাল লাগে না, আহা, তোমরা কেমন আছ!

ত্যাগী ভক্ত — তুই অত বকিস কেন? বেরিয়ে যাবি যাস। — কেন, একবার সখ করে ভোগ করে নে না।

নয়টার পর ঠাকুরঘরে শশী পূজা করিলেন।

প্রায় এগারটা বাজিল। মঠের ভাইরা ক্রমে ক্রমে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলেন। স্নানের পর শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া প্রত্যেকে ঠাকুরঘরে গিয়া ঠাকুরকে প্রণাম ও তৎপরে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের ভোগের পর মঠের ভাইরা বসিয়া প্রসাদ পাইলেন; মাস্টারও সেই সঙ্গে প্রসাদ পাইলেন।

সন্ধ্যা হইল। ধুনা দিবার পর ক্রমে আরতি হইল। দানাদের ঘরে রাখাল, শশী, বুড়োগোপাল ও হরিশ বসিয়া আছেন। মাস্টারও আছেন। রাখাল ঠাকুরের খাবার খুব সাবধানে রাখিতে বলিতেছেন।

রাখাল (শশী প্রভৃতির প্রতি) — আমি একদিন তাঁর জলখাবার আগে খেয়েছিলাম। তিনি দেখে বললেন, "তোর দিকে চাইতে পারছি না। তুই কেন এ কর্ম করলি!" — আমি কাঁদতে লাগলুম।

বুড়োগোপাল — আমি কাশীপুরে তাঁর খাবারের উপর জোরে নিঃশ্বাস ফেলেছিলুম, তখন তিনি বললেন, "ও খাবার থাক।"

বারান্দার উপর মাস্টার নরেন্দ্রের সহিত বেড়াইতেছেন ও উভয়ে অনেক কথাবার্তা কহিতেছেন।

নরেন্দ্র বলিলেন, আমি তো কিছুই মানতুম না। — জানেন?

মাস্টার — কি, রূপ-টুপ?

নরেন্দ্র — তিনি যা যা বলতেন, প্রথম প্রথম অনেক কথাই মানতুম না। একদিন তিনি বলেছিলেন, 'তবে আসিস কেন?'

"আমি বললাম, আপনাকে দেখতে আসি, কথা শুনতে নয়।"

মাস্টার — তিনি কি বললেন?

নরেন্দ্র — তিনি খুব খুশি হলেন।

পরদিন — শনিবার। ৯ই এপ্রিল, ১৮৮৭। ঠাকুরের ভোগের পর মঠের ভাইরা আহার করিয়াছেন ও একটু বিশ্রামও করিয়াছেন। নরেন্দ্র ও মাস্টার মঠের পশ্চিমগায়ে যে বাগান আছে, তাহার একটি গাছতলায় বসিয়া নির্জনে কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পর যত পূর্বকথা বলিতেছেন। নরেন্দ্রের বয়স ২৮, মাস্টারের ৩২ বৎসর।

মাস্টার — প্রথম দেখার দিনটি তোমার বেশ স্মরণ পড়ে?

নরেন্দ্র — সে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে। তাঁহারই ঘরে। সেইদিনে এই দুটি গান গেয়েছিলাম:

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে।।
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেউ নয় আপন।
পর প্রেমে কেন হইয়ে মগন, ভুলিছ আপন জনে।।
সত্যপথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চল অণুক্ষণ।
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্য ধন, গোপনে অতি যতনে।।
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ, পথিকের করে সর্বস্ব মোষণ।
পরম যতনে রাখ রে প্রহরী শম দম দুই জনে।।
সাধুসঙ্গ নাম আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হলে তথা করিও বিশ্রাম।
পথভ্রান্ত হলে সুধাইও পথ সে পান্থ-নিবাসীহলে।।

যতি দেখ পথে ভয়েরি আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার।
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে।।

গান — যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে।।
তুমি ত্রিভুবন নাথ, আমি ভিখারি অনাথ।
কেমনে বলিব তোমায় এস হে মম হৃদয়ে।।
হৃদয়-কুটীর-দ্বার, খুলে রাখি আনিবার।
কৃপা করি একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে।।

মাস্টার — গান শুনে কি বললেন?

নরেন্দ্র — তাঁর ভাব হয়ে গিছল। রামবাবুদের জিজ্ঞাসা করলেন, “এ ছেলেটি কে? আহা কি গান!” আমায় আবার আসতে বললেন।

মাস্টার — তারপর কোথায় দেখা হল?

নরেন্দ্র — তারপর রাজমোহনের বাড়ি তারপর আবার দক্ষিণেশ্বরে। সেবারে আমায় দেখে ভাবে আমায় স্তব করতে লাগলেন। স্তব করে বলতে লাগলেন, ‘নারায়ণ, তুমি আমার জন্য দেহধারণ করে এসেছ!’

“কিন্তু এ কথাগুলি কাহাকেও বলবেন না।”

মাস্টার — আর কি বললেন?

নরেন্দ্র — তুমি আমার জন্য দেহধারণ করে এসেছ। মাকে বলেছিলাম, ‘মা, আমি কি যেতে পারি! গেলে কার সঙ্গে কথা কব? মা, কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী শুদ্ধভক্ত না পেলে কেমন করে পৃথিবীতে থাকব! বললেন, তুই রাত্রে এসে আমায় তুললি, আর আমায় বললি ‘আমি এসেছি।’ আমি কিন্তু কিছু জানি না, কলিকাতার বাড়িতে তোফা ঘুম মারছি।

মাস্টার — অর্থাৎ, তুমি এক সময় Present- বটে, Absent- বটে, যেমন ঈশ্বর সাকারও বটেন, নিরাকারও বটেন!

নরেন্দ্র — কিন্তু এ-কথা কারুকে বলবেন না।

[নরেন্দ্রের প্রতি লোকশিক্ষার আদেশ]

নরেন্দ্র — কাশীপুরে তিনি শক্তিসঞ্চার করে দিলেন।

মাস্টার — যে সময়ে কাশীপুরের বাগানে গাছতলায় ধুনি জ্বেলে বসতে, না?

নরেন্দ্র — হাঁ। কালীকে বললাম, আমার হাত ধর দেখি। কালী বললে, কি একটা Shock তোমার গা ধরাতে আমার গায়ে লাগল।

“এ-কথা (আমাদের মধ্যে) কারুকেও বলবেন না — Promise করুন।”

মাস্টার — তোমার উপর শক্তি সঞ্চার করলেন, বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, তোমার দ্বারা অনেক কাজ হবে। একদিন একখানা কাগজে লিখে বলেছিলেন, ‘নরেন শিক্ষে দিবে।’

নরেন্দ্র — আমি কিন্তু বলেছিলাম, ‘আমি ও-সব পারব না।’

“তিনি বললেন, ‘তোর হাড় করবে।’ শরতের ভার আমার উপর দিয়েছেন। ও এখন ব্যাকুল হয়েছে। ওর কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়েছে।”

মাস্টার — এখন পাতা না জমে। ঠাকুর বলতেন, বোধ হয়ে মনে আছে যে, পুকুরের ভিতর মাছের গাড়ি হয় অর্থাৎ গর্ত, যেখানে মাছ এসে বিশ্রাম করে। যে গাড়িতে পাতা এসে জমে যায়, সে গাড়িতে মাছ এসে থাকে না।

[নরেন্দ্রের অখণ্ডের ঘর]

নরেন্দ্র — নারায়ণ বলতেন।

মাস্টার — তোমায় — “নারায়ণ” বলতেন, — তা জানি।

নরেন্দ্র — তাঁর ব্যামোর সময় শোচাবার জল এগিয়ে দিতে দিতেন না।

“কাশীপুরে বললেন, ‘চাবি আমার কাছে রইল, ও আপনাকে জানতে পারলে দেহত্যাগ করবে’।”

মাস্টার — যখন তোমার একদিন সেই অবস্থা হয়েছিল, না?

নরেন্দ্র — সেই সময়ে বোধ হয়েছিল, যেন আমার শরীর নাই কেবল মুখটি আছে। বাড়িতে আইন পড়ছিলুম, একজামিন দেব বলে। তখন হঠাৎ মনে হল, কি করছি!

মাস্টার — যখন ঠাকুর কাশীপুরে আছেন?

নরেন্দ্র — হাঁ। পাগলের মতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কি চাস?' আমি বললাম, 'আমি সমাধিস্থ হয়ে থাকব।' তিনি বললেন, 'তুই তো বড় হীনবুদ্ধি! সমাধির পারে যা! সমাধি তো তুচ্ছ কথা।'

মাস্টার — হাঁ, তিনি বলতেন, জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। ছাদে উঠে আবার সিঁড়িতে আনাগোনা করা।

নরেন্দ্র — কালী জ্ঞান জ্ঞান করে। আমি বকি। জ্ঞান কততে হয়? আগে ভক্তি পাকুক।

"আবার তারকবাবুকে দক্ষিণেশ্বরে বলেছিলেন, 'ভাব-ভক্তি কিছু শেষ নয়'।"

মাস্টার — তোমার বিষয় আর কি কি বলেছেন বল!

নরেন্দ্র — আমার কথায় এতো বিশ্বাস যে যখন বললাম, আপনি রূপ-টুপ যা দেখেন ও সব মনের ভুল। তখন মার কাছে গয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা, নরেন্দ্র এই সব কথা বলেছে, তবে এ-সব কি ভুল? তারপর আমাকে বললেন, 'মা বললে, ও-সব সত্য!'

"বলতেন, বোধ হয় মনে আছে, 'তোর গান শুনলে (বুকে হাত দিয়া দেখাইয়া) এর ভিতর যিনি আছেন তিনি সাপের ন্যায়ে ফোঁস করে যেন ফণা ধরে স্থির হয়ে শুনতে থাকেন!'

“কিন্তু মাস্টার মহাশয়, এত তিনি বললেন, কই আমার কি হল!”

মাস্টার — এখন শিব সেজেছ, পয়সা নেবার জো নাই। ঠাকুরের গল্প তো মনে আছে?

নরেন্দ্র — কি, বলুন না একবার।

মাস্টার — বহুরূপী শিব সেজেছিল। যাদের বাড়ি গিছল, তারা একটা টাকা দিতে এসেছিল; সে নেয় নি! বাড়ি থেকে হাত-পা ধুয়ে এসে টাকা চাইলে। বাড়ির লোকেরা বললে, তখন যে নিলে না? সে বললে, ‘তখন শিব সেজেছিলাম — সন্ন্যাসী — টাকা ছোঁবার জো নাই।’

এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন।

মাস্টার — তুমি এখন রোজা সেজেছ। তোমার উপর সব ভার। তুমি মঠের ভাইদের মানুষ করবে।

নরেন্দ্র — সাধন-টাধন যা আমরা করছি, এ-সব তাঁর কথায়। কিন্তু Strange (আশ্চর্যের বিষয়) এই যে, রামবাবু এই সাধন নিয়ে খোঁটা দেন। রামবাবু বলেন, ‘তাঁকে দর্শন করেছি, আবার সাধন কি?’

মাস্টার — যার যেমন বিশ্বাস সে না হয় তাই করুক।

নরেন্দ্র — আমাদের যে তিনি সাধন করতে বলেছেন।

নরেন্দ্র ঠাকুরের ভালবাসার কথা আবার বলছেন।

নরেন্দ্র — আমার জন্য মার কাছে কত কথা বলেছেন। যখন খেতে পাচ্ছি না — বাবার কাল হয়েছে — বাড়িতে খুব কষ্ট — আখন আমার জন্য মার কাছে টাকা প্রার্থনা করেছিলেন।

মাস্টার — তা জানি; তোমার কাছে শুনেছিলাম।

নরেন্দ্র — টাকা হল না। তিনি বললেন, ‘মা বলেছেন, মোটা ভাত, মোটা কাপড় হতে পারে। ভাত-ডাল হতে পারে।’

“এতো আমাকে ভালবাসা, — কিন্তু যখন কোন অপবিত্র ভাব এসেছে অমনি টের পেয়েছেন! অন্নদার সঙ্গে যখন বেড়াতাম, অসৎ লোকের সঙ্গে কখন কখন গিয়ে পড়েছিলাম। তাঁর কাছে এলে আমার হাতে আর খেলেন না, খানিকটা হাত উঠে আর উঠলো না। তাঁর ব্যামোর সময় তাঁর মুখ পর্যন্ত উঠে আর উঠলো না। বললেন, ‘তোর এখনও হয় নাই।’

“এক-একবার খুব অবিশ্বাস আসে। বাবুরামদের বাড়িতে কিছু নাই বোধ হল। যেন ইশ্বর-টীশ্বর কিছুই নাই।”

মাস্টার — ঠাকুর তো বলতেন, তাঁরও এরূপ অবস্থা এক-একবার হত।

দুজনে চুপ করে আছেন। মাস্টার বলিতেছেন — “ধন্য তোমরা! রাতদিন তাঁকে চিন্তা করছো!” নরেন্দ্র বলিলেন, “কই? তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না বলে শরীরত্যাগ করতে ইচ্ছা হচ্ছে কই?”

রাত্রি হইয়াছে। নিরঞ্জন ৺পুরীধাম হইতে কিয়ৎক্ষণ ফিরিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মঠের ভাইরা ও মাস্টার সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি পুরী যাত্রার বিবরণ বলিতে লাগিলেন। নিরঞ্জনের বয়স এখন ২৫।২৬ হইবে, সন্ধ্যারতির পর কেহ কেহ ধ্যান করিতেছেন। নিরঞ্জন ফিরিয়াছেন বলিয়া অনেকে বড় ঘরে (দানাদের ঘরে) আসিয়া বসিলেন ও সদালাপ করিতে লাগিলেন। রাত ৯টার পর শশী ৺ঠাকুরের ভোগ দিলেন ও তাঁহাকে শয়ন করাইলেন।

মঠের ভাইরা নিরঞ্জনকে লইয়া রাত্রের আহার করিতে বসিলেন। খাদ্যের মধ্যে রুটি, একটা তরকারি ও একটু গুড়; আর ঠাকুরের যৎকিঞ্চিৎ সুজির পায়সাদি প্রসাদ।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৮৮৭, ৭ই মে 1887/05/07

59.4 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তহৃদয়ে

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ ও নরেন্দ্রাদির সাধনা ও তীব্র বৈরাগ্য

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা (২৫শে বৈশাখ, ১২৯৪)। ৭ই মে, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ। শনিবার অপরাহ্ন। নরেন্দ্র মাস্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। কলিকাতা গুরুপ্রসাদ

চৌধুরী লেনে, একটি বাড়ির নিচের ঘরে, তক্তপোশের উপর উভয়ে বসিয়া আছেন।

মণি সেই ঘরে পড়াশুনা করেন। Merchant of Venice, Comus, Blackie's self-culture এই সব বই পড়িতেছেন। পড়া তৈয়ার করিতেছেন। স্কুলে পড়াইতে হইবে।

কয়মাস হইল, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের অকূল পাথারে ভাসাইয়া স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। অবিবাহিত ও বিবাহিত ভক্তেরা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাকালে যে স্নেহসূত্রে বাঁধা হইয়াছেন তাহা আর ছিন্ন হইবার নহে। হঠাৎ কর্ণধারের অদর্শনে আরোহিগণ ভয় পাইয়াছেন বটে, কিন্তু সকলেই যে এক প্রাণ, পরস্পরের মুখ চাহিয়া রহিয়াছেন। এখন পরস্পরকে না দেখিলে আর তাঁহারা বাঁচেন না। অন্য লোকের সঙ্গে আলাপ আর ভাল লাগে না। তাঁহার কথা বই আর কিছু ভাল লাগে না। সকলে ভাবেন তাঁকে কি আর দেখতে পাব না? তিনি তো বলে গেছেন, ব্যাকুল হয়ে ডাকলে আন্তরিক ডাক শুনলে ঈশ্বর দেখা দেবেন। বলে গেছেন, আন্তরিক হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। যখন নির্জনে থাকেন, তখন সেই আনন্দময় মূর্তি মনে পড়ে। রাস্তায় চলেন, উদ্দেশ্যহীন, একাকী কেঁদে কেঁদে বেড়ান। ঠাকুর তাই বুঝি মণিকে বলেছিলেন, 'তোমরা রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াবে, তাই শরীরত্যাগ করতে একটু কষ্ট হচ্ছে!' কেউ ভাবছেন, কই তিনি চলে গেলেন, আমি এখনও বেঁচে রইছি। এই অনিত্য সংসারে এখনও থাকতে ইচ্ছা! নিজে মনে করলে তো শরীরত্যাগ করতে পারি, তা কই করছি!

ছোকরা ভক্তেরা কাশীপুরের বাগানে থাকিয়া রাত্রিদিন সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার অদর্শনের পর অনিচ্ছাসত্ত্বেও কলের পুত্তলিকার ন্যায় নিজের নিজের বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। ঠাকুর কাহাকেও সন্ন্যাসীর বাহ্য চিহ্ন (গেরুয়া বস্ত্র ইত্যাদি) ধারণ করিতে অথবা গৃহীর উপাধি ত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন নাই। তাঁহারা লোকের কাছে দত্ত, ঘোষ, চক্রবর্তী, ঘোষাল ইত্যাদি উপাধিযুক্ত হইয়া পরিচয়, ঠাকুরের অদর্শনের পরও কিছুদিন দিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুর তাঁহাদের অন্তরে ত্যাগী করিয়া গিয়াছিলেন।

দু-তিন জনের ফিরিয়া যাইবার বাড়ি ছিল না; সুরেন্দ্র তাঁহাদের বলিলেন, ভাই তোমরা আর কোথা যাবে; একটা বাসা করা যাক। তোমরাও থাকবে আর আমাদেরও জুড়াবার একটা স্থান চাই; তা না হলে সংসারে এরকম রাতদিন কেমন করে থাকব। সেইখানে তোমরা গিয়ে থাক। আমি কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের সেবার জন্য যৎকিঞ্চিৎ দিতাম। এক্ষণে তাহাতে বাসা খরচা চলিবে। সুরেন্দ্র প্রথম প্রথম দুই-একমাস টাকা ত্রিশ করিয়া দিতেন। ক্রমে যেমন মঠে অন্যান্য ভাইরা যোগ দিতে লাগিলেন, পঞ্চাশ-ষাট করিয়া দিতে লাগিলেন। শেষে ১০০ টাকা পর্যন্ত দিতেন। বরাহনগরে যে বাড়ি লওয়া হইল, তাহার ভাড়া ও ট্যাক্স ১১ টাকা। পাচক ব্রাহ্মণের মাহিয়ানা ৬্ টাকা, আর বাকী ডালভাতের খরচ। বুড়ো গোপাল, লাটু ও তারকের বাড়ি নাই। ছোট গোপাল প্রথমে কাশীপুরের বাগান হইতে ঠাকুরের গদি ও জিনিসপত্র লইয়া সেই বাসা বাড়িতে গেলেন। সঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ শশী। রাত্রে শরৎ আসিয়া থাকিলেন। তারক বৃন্দাবন গিয়াছিলেন। কালী একমাসের মধ্যে, রাখাল কয়েক মাস পরে, যোগীন একবৎসর পরে ফিরিলেন।

কিছুদিনের মধ্যে নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, বাবুরাম, যোগীন, কালী, লাটু রহিয়া গেলেন আর বাড়িতে ফিরিলেন না। ক্রমে প্রসন্ন ও সুবোধ আসিয়া রহিলেন। গঙ্গাধর ও হরিও পরে আসিয়া জুটিলেন।

ধন্য সুরেন্দ্র! এই প্রথম মঠ তোমারি হাতে গড়া! তোমার সাধু ইচ্ছায় এই আশ্রম হইল! তোমাকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মূলমন্ত্র কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ মূর্তিমান করিলেন। কৌমারবৈরাগ্যবান শুদ্ধাত্মা নরেন্দ্রাদি ভক্তের দ্বারা আবার সনাতন হিন্দু ধর্মকে জীবের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন। ভাই, তোমার ঋণ কে ভুলিবে? মঠের ভাইরা মাতৃহীন বালকের ন্যায় থাকিতেন — তোমার অপেক্ষা করিতেন, তুমি কখন আসিবে। আজ বাড়ি-ভাড়া দিতে সব টাকা গিয়াছে — আজ খাবার কিছু নাই — কখন তুমি আসিবে — আসিয়া ভাইদের খাবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে! তোমার অকৃত্রিম স্নেহ স্মরণ করিলে কে না অশ্রুবারি বিসর্জন করিবে।

[নরেন্দ্রাদির ঈশ্বর জন্য ব্যাকুলতা ও প্রায়োপবেশন-প্রসঙ্গ]

কলিকাতার সেই নিচের ঘরে নরেন্দ্র মণির সহিত কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র এখন ভক্তদের নেতা। মঠের সকলের অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য। ভগবান দর্শন জন্য সকলে ছটফট করিতেছেন।

নরেন্দ্র (মণির প্রতি) — আমার কিছু ভাল লাগছে না। এই আপনার সঙ্গে কথা কচ্ছি, ইচ্ছা হয় এখনি উঠে যাই।

নরেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন — প্রায়োপবেশন করব?

মণি — তা বেশ! ভগাবনের জন্য সবই তো করা যায়।

নরেন্দ্র — যদি খিদে সামলাতে না পারি?

মণি — তাহলে খেয়ো, আবার লাগতে হবে।

নরেন্দ্র আবার কিয়ৎক্ষণ চুপ করিলেন।

নরেন্দ্র — ভগবান নাই বোধ হচ্ছে! যত প্রার্থনা করছি, একবারও জবাব পাই নাই।

"কত দেখলাম মন্ত্র সোনার অক্ষরে জ্বল জ্বল করছে!

"কত কালীরূপ; আরও অন্যান্য রূপ দেখলুম! তবু শান্তি হচ্ছে না।

"ছয়টা পয়সা দেবেন?"

নরেন্দ্র শোভাবাজার হইতে শেয়ারের গাড়িতে বরাহনগরের মাঠে যাইতেছেন, তাই ছয়টা পয়সা।

দেখিতে দেখিতে সাতু (সাতকড়ি) গাড়ি করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাতু নরেন্দ্রের সমবয়স্ক। মঠের ছোকরাদের বড় ভালবাসেন ও সর্বদা মঠে যান। তাঁহার

বাড়ি বরাহনগরের মঠের কাছে। কলিকাতার আফিসে কর্ম করেন। তাঁদের ঘরের গাড়ি আছে। সেই গাড়ি করিয়া আফিস হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নরেন্দ্র মণিকে পয়সা ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন, আর কি, সাতুর সঙ্গে যাব। আপনি কিছু খাওয়ান। মণি কিছু জলখাবার খাওয়ালেন।

মণিও সেই গাড়িতে উঠিলেন, তাহাদের সঙ্গে মঠে যাইবেন। সন্ধ্যার সময় সকলে মঠে পোঁছিলেন। মঠের ভাইরা কিরূপে দিন কাটাইতেছেন ও সাধনা করিতেছেন, মণি দেখিবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের হৃদয়ে কিরূপ প্রতিবিম্বিত হইতেছেন, তাহা দেখিতে মণি মাঝে মাঝে মঠ দর্শন করিতে যান। মঠে নিরঞ্জন নাই। তাঁহার একমাত্র মা আছেন; তাঁহাকে দেখিতে বাড়ি গিয়াছেন। বাবুরাম, শরৎ, কালী, ৺পুরীক্ষেত্রে গিয়াছেন। সেখানে আরও কিছুদিন থাকিয়া শ্রীশ্রীরথযাত্রা দর্শন করিবেন।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যার সংসার ও নরেন্দ্রের তত্ত্বাবধান]

নরেন্দ্র মঠের ভাইদের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। প্রসন্ন কয়দিন সাধন করিতেছিলেন। নরেন্দ্র তাঁহার কাছেও প্রায়োপবেশনের কথা তুলিয়াছিলেন। নরেন্দ্র কলিকাতায় গিয়াছেন দেখিয়া সেই অবসরে তিনি কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। নরেন্দ্র আসিয়া সমস্ত শুনিলেন। রাজা কেন তাহাকে যাইতে দিয়াছেন? কিন্তু রাখাল ছিলেন না। তিনি মঠ হইতে দক্ষিণেশ্বরে বাগানে একটু বেড়াইতে গিয়াছিলেন। রাখালকে সকলে রাজা বলিয়া ডাকিতেন। অর্থাৎ ‘রাখালরাজ’ শ্রীকৃষ্ণের আর একটি নাম।

নরেন্দ্র — রাজা আসুক, একবার বকব! কেন তারে যেতে দিলে? (হরিশের প্রতি) — তুমি তো পা ফাঁক করে লেকচার দিচ্ছিলে; তাকে বারণ করতে পার নাই।

হরিশ (অতি মৃদুস্বরে) — তারকদা বলেছিলেন, তবু সে চলে গেল।

নরেন্দ্র (মাস্টারের প্রতি) — দেখুন আমার বিষম মুশকিল। এখানেও এক মায়ার সংসারে পড়েছি। আবার ছোঁড়াটা কোথায় গেল।

রাখাল দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভবনাথ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

রাখালকে নরেন্দ্র প্রসন্নের কথা বলিলেন। প্রসন্ন নরেন্দ্রকে একখানা পত্র লিখিয়াছেন; সেই পত্র পড়া হইতেছে। পত্র এই মর্মে লিখিয়াছেন, "আমি হাঁটিয়া বৃন্দাবনে চলিলাম। এখানে থাকা আমার পক্ষে বিপদ। এখানে ভাবের পরিবর্তন হচ্ছে; আগে বাপ, মা ও বাড়ির সকলের স্বপন দেখতাম। তারপর মায়ার মূর্তি দেখলাম। দুবার খুব কষ্ট পেয়েছি; বাড়িতে ফিরে যেতে হয়েছিল। তাই এবার দূরে যাচ্ছি। পরমহংসদেব আমায় বলেছিলেন, তোর বাড়ির ওরা সব করতে পারে; ওদের বিশ্বাস করিস না।"

রাখাল বলিতেছেন, সে চলে গেছে ওই সব নানা কারণে। আবার বলেছে, 'নরেন্দ্র প্রায় বাড়ি যায় — মা ও ভাই ভগিনীদের খবর নিতে; আর মোকদ্দমা করতে। ভয় হয়, পাছে তার দেখাদেখি আমার বাড়ি যেতে ইচ্ছা হয়।'

নরেন্দ্র এই কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

রাখাল তীর্থে যাইবার গল্প করিতেছেন। বলিতেছেন, “এখানে থাকিয়া তো কিছু হল না। তিনি যা বলেছিলেন, ভগবানদর্শন, কই হল” রাখাল শুইয়া আছেন। নিকটে ভক্তেরা কেহ শুইয়া কেহ বসিয়া আছেন।

রাখাল — চল নর্মদায় বেরিয়ে পড়ি।

নরেন্দ্র — বেরিয়ে কি হবে? জ্ঞান কি হয়? তাই জ্ঞান জ্ঞান করছিস?

একজন ভক্ত — তাহলে সংসারত্যাগ করলে কেন?

নরেন্দ্র — রামকে পেলাম না বলে শ্যামের সঙ্গে থাকব — আর ছেলেমেয়ের বাপ হব — এমন কি কথা!

এই বলিয়া নরেন্দ্র একটু উঠিয়া গেলেন। রাখাল শুইয়া আছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র আবার আসিয়া বসিলেন।

একজন ভাই শুইয়া শুইয়া রহস্যভাবে বলিতেছেন — যেন ঈশ্বরের অদর্শনে বড় কাতর হয়েছেন — “ওরে আমায় একখানা ছুরি এনে দে রে! আর কাজ নাই! আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না।”

নরেন্দ্র (গম্ভীরভাবে) — ওইখানেই আছে হাত বাড়িয়ে নে। (সকলের হাস্য)

প্রসন্নের কথা আবার হইতে লাগিল।

নরেন্দ্র — এখানেও মায়া! তবে আর সন্ন্যাস কেন?

রাখাল — ‘মুক্তি ও তাহার সাধন’ সেই বইখানিতে আছে, সন্ন্যাসীদের একসঙ্গে থাকা ভাল নয়। ‘সন্ন্যাসী নগরের’ কথা আছে।

শশী — আমি সন্ন্যাস-ফন্ন্যাস মানি না। আমার অগম্য স্থান নাই। এমন জায়গা নাই যেখানে আমি থাকতে না পারি।

ভবনাথের কথা পড়িল। ভবনাথের স্ত্রীর সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইয়াছিল।

নরেন্দ্র (রাখালের প্রতি) — ভবনাথের মাগটা বুঝি বেঁচেছে; তাই সে ফুর্তি করে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গিছিল।

কাঁকুড়গাছির বাগানের কথা হইল। রাম মন্দির করিবেন।

নরেন্দ্র (রাখালের প্রতি) — রামবাবু মাস্টার মহাশয়কে একজন ট্রাস্টি (Trustee) করছেন।

মাস্টার (রাখালের প্রতি) — কই, আমি কিছু জানি না।

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে শশী ধুনা দিলেন। অন্যান্য ঘরে যত ঠাকুরের পট ছিল, সেখানে ধুনা দিলেন ও মধুর স্বরে নাম করিতে করিতে প্রণাম করিলেন।

এইবার আরতি হইতেছে। মঠের ভায়েরা ও অন্যান্য ভক্তেরা সকলে করজোড়ে দাঁড়াইয়া আরতি দর্শন করিতেছেন। কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে। ভক্তেরা সমস্বরে আরতির গান সেই সঙ্গে সঙ্গে গাইতেছেন:

জয় শিব ওঁকার, ভজ শিব ওঁকার।
ব্রহ্মা বিষ্ণু সদা শিব হর হর হর মহাদেব।।

নরেন্দ্র এই গান ধরিয়াছেন। কাশীধামে ৺বিশ্বনাথের সম্মুখে এই গান হয়।

মণি মঠের ভক্তদের দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

মঠে খাওয়া দাওয়া শেষ হইতে ১১টা বাজিল। ভক্তেরা সকলে শয়ন করিলেন। তাঁহারা যত্ন করিয়া মণিকে শয়ন করাইলেন।

রাত্রি দুই প্রহর। মণির নিদ্রা নাই। ভাবিতেছেন, সকলেই রহিয়াছে; সেই অযোধ্যা কেবল রাম নাই। মণি নিঃশব্দে উঠিয়া গেলেন। আজ বৈশাখী পূর্ণিমা। মণি একাকী গঙ্গাপুলিনে বিচরণ করিতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ভাবিতেছেন!

[নরেন্দ্রাদি মঠের ভাইদের বৈরাগ্য ও যোগবাশিষ্ঠ পাঠ —
সংকীর্তনানন্দ ও নৃত্য]

মাস্টার শনিবারে আসিয়াছেন। বুধবার পর্যন্ত অর্থাৎ পাঁচ দিন মঠে থাকিবেন। আজ রবিবার (৮ই মে, ১৮৮৭)। গৃহস্থ ভক্তেরা প্রায় রবিবারে মঠে দর্শন করিতে আসেন। আজকাল যোগবাশিষ্ঠ প্রায় পড়া হয়। মাস্টার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যোগবাশিষ্ঠের কথা কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন। দেহবুদ্ধি থাকিতে

যোগবাশিষ্ঠের সোঽহম্ ভাব আশ্রয় করিতে ঠাকুর বারণ করিয়াছিলেন। আর বলিয়াছিলেন, সেব্য-সেবকভাবই ভাল। মাস্টার দেখিবেন মঠের ভাইদের সহিত মেলে কি না। যোগবাশিষ্ঠের সম্বন্ধেই কথা পাড়িলেন।

মাস্টার — আচ্ছা, যোগবাশিষ্ঠে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কিরূপ আছে?

রাখাল — ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সুখ, দুঃখ, এ সব মায়া! মনের নাশই উপায়!

মাস্টার — মনের নাশের পর যা থাকে, তাই ব্রহ্ম। কেমন?

রাখাল — হাঁ।

মাস্টার — ঠাকুরও ওই কথা বলতেন। ন্যাংটা তাঁকে ওই কথা বলেছিলেন। আচ্ছা রামকে কি বশিষ্ঠ সংসার করতে বলেছেন, এমন কিছু দেখলে?

রাখাল — কই, এ পর্যন্ত তো পাই নাই। রামকে অবতার বলেই মানছে না।

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময়ে নরেন্দ্র, তারক ও আর-একটি ভক্ত গঙ্গাতীর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাদের কোন্নগরে বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা ছিল — নৌকা পাইলেন না। তাঁহারা আসিয়া বসিলেন। যোগবাশিষ্ঠের কথা চলিতে লাগিল।

নরেন্দ্র (মাস্টারের প্রতি) — বেশ সব গল্প আছে। লীলার কথা জানেন?

মাস্টার — হাঁ, যোগবাশিষ্ঠে আছে, একটু একটু দেখেছি। লীলার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল।

নরেন্দ্র — হাঁ, আর ইন্দ্র-অহল্যা — সংবাদ? আর বিদূরথ রাজা চণ্ডাল হল?

মাস্টার — হাঁ, মনে পড়ছে।

নরেন্দ্র — বনের বর্ণনাটি কেমন চমৎকার!১

[মঠের ভাইদের প্রত্যহ গঙ্গাস্নান ও গুরুপূজা]

নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন। মাস্টারও স্নান করিবেন। রৌদ্র দেখিয়া মাস্টার ছাতি লইয়াছেন। বরাহনগরনিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্রও এই সঙ্গে স্নান করিতে যাইতেছেন। ইনি সদাচারনিষ্ঠ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ যুবক। মঠে সর্বদা আসেন। কিছুদিন পূর্বে ইনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছেন।

মাস্টার (শরতের প্রতি) — ভারী রৌদ্র!

নরেন্দ্র — তাই বল, ছাতিটা লই। (মাস্টারের হাস্য)

ভক্তেরা গামছা স্কন্ধে মঠ হইতে রাস্তা দিয়া পরামাণিক ঘাটের উত্তরের ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছেন। সকলে গেরুয়া পরা। আজ ২৬শে বৈশাখ। প্রচণ্ড রৌদ্র।

মাস্টার — (নরেন্দ্রের প্রতি) — সর্দিগর্মি হবার উদ্যোগ!

নরেন্দ্র — আপনাদের শরীরই বৈরাগ্যের প্রতিবন্ধক, না? আপনার, দেবেনবাবুর —

মাস্টার হাসিতে লাগিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন, “শুধু কি শরীর?” স্নানান্তে ভক্তেরা মঠে ফিরিলেন ও পা ধুইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রণামপূর্বক ঠাকুরের পাদপদ্মে এক এক জন পুষ্পাঞ্জলি দিলেন।

পূজার ঘরে আসিতে নরেন্দ্রের একটু বিলম্ব হইয়াছিল। গুরুমহারাজকে প্রণাম করিয়া ফুল লইতে যান, দেখেন যে পুষ্পপাত্রে ফুল নাই। তখন বলিয়া উঠিলেন, ফুল নাই। পুষ্পপাত্রে দু-একটি বিল্বপত্র ছিল, তাই চন্দনে ডুবাইয়া নিবেদন করিলেন। একবার ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। আবার প্রণাম করিয়া দানাদের ঘরে গিয়া বসিলেন।

[দানাদের ঘর, ঠাকুরঘর ও কালী তপস্বীর ঘর]

মঠের ভাইরা আপনাদের দানা দৈত্য বলিতেন; যে ঘরে সকলে একত্র বসিতেন, সেই ঘরকে ‘দানাদের ঘর’ বলিতেন। যাঁরা নির্জনে ধ্যান, ধারণা ও পাঠাদি করিতেন, সর্বদক্ষিণের ঘরটিতে তাঁহারাই থাকিতেন। দ্বার রুদ্ধ করিয়া কালী ওই ঘরে অধিকাংশ সময় থাকিতেন বলিয়া মঠের ভাইরা বলিতেন “কালী তপস্বীর ঘর!” কালী তপস্বীর ঘরের উত্তরেই ঠাকুরঘর। তাহার ইত্তরে ঠাকুরদের নৈবেদ্যের ঘর। ওই ঘরে দাঁড়াইয়া আরতি দেখা যাইত ও ভক্তেরা আসিয়া ঠাকুর প্রণাম করিতেন। নৈবেদ্যের ঘরের উত্তরে দানাদের ঘর। ঘরটি খুব লম্বা। বাহিরের ভক্তেরা আসিলে এই ঘরেই তাহাদের অভ্যর্থনা করা হইত। দানাদের ঘরের

উত্তরে একটি ছোট ঘর। ভাইরা পানের ঘর বলিতেন। এখানে ভক্তেরা আহার করিতেন।

দানাদের ঘরের পূর্বকোণে দালান। উৎসব হইলে এই দালানে খাওয়া দাওয়া হইত। দালানের ঠিক উত্তরে রান্নাঘর।

ঠাকুরঘরে ও কালী তপস্বীর ঘরের পূর্বে বারান্দা। বারান্দার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বরাহনগরের একটি সমিতির লাইব্রেরী ঘর। এ-সমস্ত ঘর দোতলার উপর। কালী তপস্বীর ঘর ও সমিতির লাইব্রেরী ঘরের মাঝখানে একতলা হইতে দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি। ভক্তদের আহারের ঘরের উত্তরদিকে দোতলার ছাদে উঠিবার সিঁড়ি; নরেন্দ্রাদি মঠের ভাইরা ওই সিঁড়ি দিয়া সন্ধ্যার সময় মাঝে মাঝে ছাদে উঠিতেন। সেখানে উপবেশন করিয়া তাঁহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা বিষয়ে কথা কহিতেন। কখনও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা; কখনও বা শঙ্করাচার্যের, রামানুজের বা যীশুখ্রীষ্টের কথা; কখনও হিন্দু দর্শনের কথা; কখনও বা ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের কথা; বেদ, পুরাণ, তন্ত্রের কথা।

দানাদের ঘরে বসিয়া নরেন্দ্র তাঁহার দেবদুর্লভ কণ্ঠে ভগবানের নাম গুণগান করেন। শরৎ ও অন্যান্য ভাইদের গান শিখাইতেন। কালী বাজনা শিখিতেন। এই ঘরে নরেন্দ্র ভাইদের সঙ্গে কতবার হরিনাম-সংকীর্তনে আনন্দ করিতেন ও আনন্দে একসঙ্গে নৃত্য করিতেন।

[নরেন্দ্র ও ধর্মপ্রচার — ধ্যানযোগ ও কর্মযোগ]

নরেন্দ্র দানাদের ঘরে বসিয়া আছেন। ভক্তেরা বসিয়া আছেন; চুনিলাল, মাস্টার ও মঠের ভাইরা। ধর্মপ্রচারের কথা পড়িল।

মাস্টার (নরেন্দ্রের প্রতি) — বিদ্যাসাগর বলেন, আমি বেত খাবার ভয়ে ঈশ্বরের কথা কারুকে বলি না।

নরেন্দ্র — বেত খাবার ভয়?

মাস্টার — বিদ্যাসাগর বলেন, মনে কর, মরবার পর আমরা সকলে ঈশ্বরের কাছে গেলুম। মনে কর, কেশব সেনকে, যমদূতেরা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে গেল। কেশব সেন অবশ্য সংসারে পাপ-টাপ করেছে। যখন প্রমাণ হল তখন ঈশ্বর হয়তো বলবেন, ওঁকে পঁচিশ বেত মার! তারপর মনে কর, আমাকে নিয়ে গেল। আমি হয়তো কেশব সেনের সমাজে যাই। অনেক অন্যায় করিছি। তার জন্য বেতের হুকুম হল। তখন আমি হয়তো বললাম, কেশব সেন আমাকে এইরূপ বুঝিয়েছিলেন, তাই এইরূপ কাজ করেছি। তখন ঈশ্বর আবার দূতদের হয়তো বলবেন, কেশব সেনকে আবার নিয়ে আয়। এলে পর হয়তো তাকে বলবেন, তুই একে উপদেশ দিছিলি? তুই নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু জানিস না, আবার পরকে উপদেশ দিছিলি? ওরে কে আছিস — একে আর পঁচিশ বেত দে। (সকলের হাস্য)

“তাই বিদ্যাসাগর বলেন নিজেই সামলাতে পারি না, আবার পরের জন্য বেত খাওয়া! (সকলের হাস্য) আমি নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু বুঝি না, আবার পরকে কি লেকচার দেব?”

নরেন্দ্র — যে এটা বোঝেনি, সে আর পাঁচটা বুঝলে কেমন করে?

মাস্টার — আর পাঁচটা কি?

নরেন্দ্র — যে এটা বোঝে নাই, সে দয়া, পরোপকার বুঝলে কেমন করে? স্কুল বুঝলে কেমন করে?

“যে একটা ঠিক বোঝে, সে সব বোঝে।”

মাস্টার (স্বগত) — ঠাকুর বলতেন বটে ‘যে ঈশ্বরকে জেনেছে, সে সব বোঝে।’ আর সংসার করা, স্কুল করা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন যে, ‘ও-সব রজোগুণে হয়।’ বিদ্যাসাগরের দয়া আছে বলে বলেছিলেন, ‘এ রজোগুণের সত্ত্ব। এ রজোগুণে দোষ নাই।’

খাওয়া-দাওয়ার পর মঠের ভাইরা বিশ্রাম করিতেছেন। মণি ও চুনিলাল নৈবেদ্যের ঘরের পূর্বদিকে যে অন্দরমহলের সিঁড়ি আছে, তাহার চাতালের উপর বসিয়া গল্প করিতেছেন। চুনিলাল বলিতেছেন, কি প্রকারে ঠাকুরের সহিত দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার প্রথম দর্শন হইল। সংসার ভাল লাগে নাই বলিয়া তিনি একবার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন ও তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সকল গল্প করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র আসিয়া বসিলেন। যোগবাশিষ্ঠের কথা হইতে লাগিল।

নরেন্দ্র (মণির প্রতি) — আর বিদুরথের চণ্ডাল হওয়া?২

মণি — কি লবণের কথা বলছো?

নরেন্দ্র — ও! আপনি পড়েছেন?

মণি — হাঁ, একটু পড়েছি।

নরেন্দ্র — কি, এখানকার বই পড়েছেন?

মণি — না, বাড়িতে একটু পড়েছিলাম।

নরেন্দ্র ছোট গোপালকে তামাক আনিতে বলিতেছেন। ছোট গোপাল একটু ধ্যান করিতেছিলেন।

নরেন্দ্র (গোপালের প্রতি) — ওরে আমাক সাজ্। ধ্যান কি রে! আগে ঠাকুর ও সাধুসেবা করে Preparation কর। তারপর ধ্যান। আগে কর্ম তারপর ধ্যান। (সকলের হাস্য)

মঠের বাড়ির পশ্চিমে সংলগ্ন অনেকটা জমি আছে। সেখানে অনেকগুলি গাছপালা আছে। সেখানে অনেকগুলি গাছপালা আছে। মাস্টার গাছতলায় একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময় প্রসন্ন আসিয়া উপস্থিত। বেলা ৩টা হইবে।

মাস্টার — এ কয়দিন কোথায় গিছিলে? তোমার জন্য সকলে ভাবিত হয়েছে।

ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছে? কখন এলে?

প্রসন্ন — এই এলাম, এসে দেখা করিছি।

মাস্টার — তুমি বৃন্দাবনে চললুম বলে চিঠি লিখেছ! আমরা মহা ভাবিত! কত দূর গিছিলে?

প্রসন্ন — কোন্নগর পর্যন্ত গিছিলাম। (উভয়ের হাস্য)

মাস্টার — বসো, একটু গল্প বল, শুনি। প্রথমে কোথায় গিছিলে?

প্রসন্ন — দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়িতে, সেখানে একরাত্রি ছিলাম।

মাস্টার (সহাস্যে) — হাজরা মহাশয়ের এখন কি ভাব?

প্রসন্ন — হাজরা বলে, আমাকে কি ঠাওরাও (উভয়ের হাস্য)

মাস্টার (সহাস্যে) — তুমি কি বললে?

প্রসন্ন — আমি চুপ করে রইলাম। মাস্টার — তারপর?

প্রসন্ন — আবার বলে, আমার জন্য তামাক এনেছ? (উভয়ের হাস্য) খাটিয়ে নিতে চায়! (হাস্য)

মাস্টার — তারপর কোথায় গেলে?

প্রসন্ন — ক্রমে কোন্নগরে গেলাম। একটা জায়গায় রাত্রে পড়েছিলাম। আরও চলে যাব ভাবলাম। পশ্চিমের রেলভাড়ার জন্য ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এখানে পাওয়া যেতে পারে কি না?

মাস্টার — তারা কি বললে?

প্রসন্ন — বলে টাকাটা সিকেটা পেতে পার। অত রেলভাড়া কে দিবে? (উভয়ের হাস্য)

মাস্টার সঙ্গে কি ছিল?

প্রসন্ন — এক আধখানা কাপড়। পরমহংসদেবের ছবি ছিল। ছবি কারুকে দেখাই নাই।

[পিতা-পুত্র সংবাদ — আগে মা-বাপ — না আগে ঈশ্বর?]

শ্রীযুক্ত শশীর বাবা আসিয়াছেন। বাবা মঠ থেকে ছেলেকে লইয়া যাইবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখের সময় প্রায় নয় মাস ধরিরা অনন্যচিত্ত হইয়া শশী তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। ইনি কলেজে বি. এ. পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন।

এন্ট্রান্সে জলপানি পাইয়াছিলেন। বাপ দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কিন্তু সাধক ও নিষ্ঠাবান। ইনি বাপ-মায়ের বড় ছেলে। তাঁহাদের বড় আশা যে, ইনি লেখাপড়া শিখিয়া রোজগার করিয়া তাঁদের দুঃখ দূর করিবেন। কিন্তু ভগবানকে পাইবার জন্য ইনি সব ত্যাগ করিয়াছেন। বন্ধুদের কেঁদে কেঁদে বলতেন, “কি করি, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। হায়! মা বাপের কিছু সেবা করতে পারলাম না! তাঁরা কত আশা করেছিলেন। মা আমার গয়না পরতে পান নাই; আমি কত সাধ করেছিলাম, আমি তাঁকে গয়না পরাব! কিছুই হল না! বাড়িতে ফিরে যাওয়া যেন

ভার বোধ হয়! গুরুমহারাজ কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে বলেছেন; আর যাবার জো নাই!”

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্বধামে গমন করিবার পর শশীর পিতা ভাবিলেন, এবারে বুঝি বাড়ি ফিরিবে। কিন্তু কিছুদিন বাড়ি থাকার পর, মঠ স্থাপিত হইবার কিছুদিনের মধ্যেই মঠে কিছুদিন যাতায়াতের পর, শশী আর মঠ হইতে ফিরিলেন না। তাই পিতা মাঝে মাঝে তাঁহাকে লইতে আসেন। তিনি কোন মতে যাবেন না। আজ বাবা আসিয়াছেন শুনিয়া আর একদিক দিয়া পলায়ন করিলেন, হাতে তাঁহার সঙ্গে দেখা না হয়।

পিতা মাস্টারকে চিনিতেন। তাঁর সঙ্গে উপরের বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে কথা কহিতে লাগিলেন।

পিতা — এখানে কর্তা কে? এই নরেন্দ্রই যত নষ্টের গোড়া! ওরা তো বেশ বাড়িতে ফিরে গিছিল। পড়াশুনা আবার কচ্ছিল।

মাস্টার — এখানে কর্তা নাই; সকলেই সমান। নরেন্দ্র কি করবেন? নিজের ইচ্ছা না থাকলে কি মানুষ চলে আসে? আমরা কি বাড়ি ছেড়ে আসতে পেরেছি?

পিতা — তোমরা তো বেশ করছো গো। দুদিক রাখছো। তোমরা যা কচ্ছ, এতে কি ধর্ম হয় না? তাই তো আমাদেরও ইচ্ছা। এখানেও থাকুক, সেখানেও যাক। দেখ দেখি, ওর গর্ভধারিণী কত কাঁদছে।

মাস্টার দুঃখিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

পিতা — আর সাধু খুঁজে খুঁজে এত বেড়ানো! আমি ভাল সাধুর কাছে নিয়ে যেতে পারি। ইন্দ্রনারায়ণের কাছে একটি সাধু এসেছে — চমৎকার লোক। সেই সাধুকে দেখুক না।

[রাখালের বৈরাগ্য, — সন্ন্যাসী ও নারী]

রাখাল ও মাস্টার কালী তপস্বীর ঘরের পূর্বদিকের বারান্দায় বেড়াইতেছেন। ঠাকুর ও ভক্তদের বিষয় গল্প করিতেছেন।

রাখাল (ব্যস্ত হইয়া) — মাস্টার মশায়, আসুন, সকলে সাধন করি।

"তাই তো আর বাড়িতে ফিরে গেলাম না। যদি কেউ বলে, ঈশ্বরকে পেলে না, তবে আর কেন। তা নরেন্দ্র বেশ বলে, রামকে পেলুম না বলে কি শ্যামের সঙ্গে ঘর করতেই হবে; আর ছেলেপুলের বাপ হতেই হবে! আহা! নরেন্দ্র এক-একটি বেশ কথা বলে! আপনি বরং জিজ্ঞাসা করবেন!"

মাস্টার — তা ঠিক কথা। রাখাল বাবু, তোমারও দেখছি মনটা খুব ব্যাকুল হয়েছে।

রাখাল — মাস্টার মশায়, কি বলব? দুপুর বেলায় নর্মদায় যাবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়েছিল! মাস্টার মশায়, সাধন করুন, তা না হলে কিছু হচ্ছে না; দেখুন না, শুকদেবেরও ভয়। জন্মগ্রহণ করেই পলায়ন! ব্যাসদেব দাঁড়াতে বললেন, তা দাঁড়ায় না!

মাস্টার — যোগোপনিষদের কথা। মায়ার রাজ্য থেকে শুকদেব পালাচ্ছিলেন। হাঁ, ব্যাস আর শুকদেবের বেশ কথাবার্তা আছে। ব্যাস সংসারে থেকে ধর্ম করতে বলছেন। শুকদেব বলছেন, হরিপাদপদ্মই সার! আর সংসারীদের বিবাহ করে মেয়েমানুষের সঙ্গে বাস, এতে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন।

রাখাল — অনেকে মনে করে, মেয়েমানুষ না দেখলেই হল। মেয়েমানুষ দেখে ঘাড় নিচু করলে কি হবে? নরেন্দ্র কাল রাত্রে বেশ বললে, 'যতক্ষণ আমার কাম, ততক্ষণই স্ত্রীলোক; তা না হলে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ বোধ থাকে না।'

মাস্টার — ঠিক কথা। ছেলেদের ছেলেমেয়ে বোধ নাই।

রাখাল — তাই বলছি, আমাদের সাধনা চাই। মায়াতীত না হলে কেমন করে জ্ঞান হবে। চলুন বড় ঘরে যাই; বরাহনগরে থেকে কতকগুলি ভদ্রলোক এসেছে। নরেন্দ্র তাদের কি বলছে, চলুন শুনি গিয়ে।

[নরেন্দ্র ও শরণাগতি (Resignation)]

নরেন্দ্র কথা কহিতেছেন। মাস্টার ভিতরে গেলেন না। বড় ঘরের পূর্বদিকের দালানে বেড়াইতে বেড়াইতে কিছু কিছু শুনিতে পাইলেন।

নরেন্দ্র বলিতেছেন — সন্ধ্যাদি কর্মের, স্থান সময় নাই।

একজন ভদ্রলোক — আচ্ছা মশায়, সাধন করলেই তাঁকে পাওয়া যাবে?

নরেন্দ্র — তাঁর কৃপা। গীতায় বলছেন, —

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।

ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপস্যসি শাশ্বতম্‌।।

"তাঁর কৃপা না হলে সাধন-ভজনে কিছু হয় না। তাই তাঁর শরণাগত হতে হয়।"

ভদ্রলোক — আমরা মাঝে মাঝে এসে বিরক্ত করব।

নরেন্দ্র — তা যখন হয় আসবেন।

"আপনাদের ওখানে গঙ্গার ঘাটে আমরা নাইতে যাই।"

ভদ্রলোক — তাতে আপত্তি নাই, তবে অন্য লোক না যায়।

নরেন্দ্র — তা বলেন তো আমরা নাই যাব।

ভদ্রলোক — না তা নয় — তবে যদি দেখেন পাঁচজন যাচ্ছে, তাহলে আর যাবেন না।

[আরতি ও নরেন্দ্রের গুরুগীতা পাঠ]

সন্ধ্যার পর আরতি হইল। ভক্তেরা আবার কৃতাঞ্জলি হয়ে "জয় শিব ওঁকার" সমস্বরে গান করিতে করিতে ঠাকুরের স্তব করিতে লাগিলেন। আরতি হইয়া গেলে ভক্তেরা দানাদের ঘরে গিয়া বসিলেন। মাস্টার বসিয়া আছেন। প্রসন্ন

গুরুগীতা পাঠ করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। নরেন্দ্র আসিয়া নিজে সুর করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র গাইতেছেন:

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীসাক্ষীভূতং।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি।।

আবার গাইলেন:

ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং। শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ।।
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্মগুরুং বদামি। শ্রীমৎ পরং ব্রহ্মগুরুং ভজামি।।
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্মগুরুং স্মরামি। শ্রীমৎ পরং ব্রহ্মগুরুং নমামি।।

নরেন্দ্র সুর করিয়া গুরুগীতা পাঠ করিতেছেন। আর ভক্তদের মন যেন নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির হইয়া গেল। সত্য সত্যই ঠাকুর বলিতেন, সুমধুর বংশীধ্বনি শুনে সাপ যেমন ফণা তুলে স্থির হয়ে থাকে, নরেন্দ্র গাইলে হৃদয়ের মধ্যে যিনি আছেন, তিনিও সেইরূপ চুপ করে শোনেন। আহা! মঠের ভাইদের কি গুরুভক্তি!

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসা ও রাখাল]

কালী তপস্বীর ঘরে রাখাল বসিয়া আছেন। কাছে প্রসন্ন। মাস্টারও সেই ঘরে আছেন।

রাখলা সন্তান-পরিবার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য; কেবল ভাবছেন, একাকী নর্মদাতীরে কি অন্য স্থানে চলিয়া যাই। তবু প্রসন্নকে বুঝাইতেছেন।

রাখাল (প্রসন্নের প্রতি) — কোথায় ছুটে ছুটে বেরিয়া যাস? এখানে সাধুসঙ্গ। এ ছেড়ে যেতে আছে? আর নরেনের মতো লোকের সঙ্গ। এ ছেড়ে কোথায় যাবি?

প্রসন্ন — কলকাতায় বাপ-মা রয়েছে। ভয় হয়, পাছে তাঁদের ভালবাসা আমাকে টেনে নেয়; তাই দূরে পালাতে চাই।

রাখাল — গুরুমহারাজ যেমন ভালবাসতেন, তত কি বাপ-মা ভালবাসে? আমরা তাঁর কি করেছি যে এত ভালবাসা। কেন তিনি আমাদের দেহ মন আত্মার মঙ্গলের জন্য এত ব্যস্ত ছিলেন। আমরা তাঁর কি করেছি?

মাস্টার (স্বগত) — আহা, রাখাল ঠিক বলেছেন! তাই তাঁকে বলে অহেতুক কৃপাসিন্ধু।

প্রসন্ন — তোমার কি বেরিয়া যেতে ইচ্ছা হয় না?

রাখাল — মনে খেয়াল হয় যে নর্মদাতীরে গিয়ে কিছুদিন থাকি। এক-একবার ভাবি, ওই সব জায়গায় কোন বাগানে গিয়ে থাকি, আর কিছু সাধন করি। খেয়াল হয়, তিনদিন পঞ্চতপা করি। তবে সংসারীর বাগানে যেতে আবার মন হয় না।

[ঈশ্বর কি আছেন]

দানাদের ঘরে তারক ও প্রসন্ন কথা কহিতেছেন। তারকের মা নাই। পিতা রাখালের পিতার ন্যায় দ্বিতীয় সংসার করিয়াছেন। তারকও বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। মঠই তারকের এখন বাড়ি, তারকও প্রসন্নকে বুঝাইতেছেন।

প্রসন্ন — না হল জ্ঞান, না হল প্রেম; কি নিয়ে থাকা যায়?

তারক — জ্ঞান হওয়া শক্ত বটে, কিন্তু প্রেম হল না কেমন করে?

প্রসন্ন — কাঁদতে পারলুম না, তবে প্রেম হবে কেমন করে? আর এতদিনে কি বা হল?

তারক — কেন, পরমহংস মশায়কে তো দেখেছ। আর জ্ঞানই বা হবে না কেন?

প্রসন্ন — কি জ্ঞান হবে? জ্ঞান মানে তো জানা। কি জানবে? ভগবান আছেন কি না, তারই ঠিক নাই।

তারক — হাঁ, তা বটে, জ্ঞানীর মতে ঈশ্বর নাই।

মাস্টার (স্বগত) — আহা প্রসন্নের যে অবস্থা, ঠাকুর বলতেন, যারা ভগবানকে চায়, তাদের ওওরূপ অবস্থা হয়। কখনও বোধ হয়, ভগবান আছেন কি না। তারক বুঝি এখন বৌদ্ধমত আলোচনা করছেন, তাই জ্ঞানীর মতে ঈশ্বর নাই বলছেন। ঠাকুর কিন্তু বলতেন, জ্ঞানী আর ভক্ত এক জায়গায় পৌঁছিবে।

১ কোন দেশে পদ্ম নামে রাজা ও লীলা নামে তাঁহার সহধর্মিণী ছিলেন। লীলা পতির অমরত্ব আকাঙ্ক্ষায় ভগবতী সরস্বতীর আরাধনা করিয়া, তাঁহার পতির জীবাত্মা, দেহত্যাগের পরও গৃহাকাশে অবরুদ্ধ থাকিবেন, এই বর লাভ করিয়াছিলেন। পতির মৃত্যুর পর লীলা সরস্বতীদেবীকে স্মরণ করিলে তিনি আবির্ভূতা হইয়া লীলাকে তত্ত্বোপদেশ দ্বারা জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, ইহা সুন্দররূপে ধারণা করাইয়া দিলেন। সরস্বতীদেবী বলিলেন, তোমার পদ্মনামক স্বামী — পূর্বজন্মে বশিষ্ঠ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন — তাঁহার আট দিন মাত্র দেহত্যাগ হইয়াছে — আর এক্ষণে তাঁহার জীবাত্মা এই গৃহে অবস্থিত আছেন, আবার অন্য একস্থলে বিদুরথ নামে রাজা হইয়া অনেক বর্ষ রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। এ সকলই মায়াবলে সম্ভবে। বাস্তবিক দেশকাল কিছু নহে। পরে সমাধিবলে সরস্বতীদেবীর সহিত তিনি সূক্ষ্মদেহে প্রোক্ত বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও বিদুরথ রাজার রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া আসিলেন। সরস্বতীদেবীর কৃপায় বিদুরথের পূর্বস্মৃতি উদিত হইল। পরে তিনি এক যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার জীবাত্মা পদ্মরাজার শরীরে প্রবেশ করিল।

২ বিদুরথ রাজার চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি হয় নাই। লবণ রাজার হইয়াছিল। তিনি এক ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল প্রভাবে এক মুহূর্তের মধ্যে সারা জীবন চণ্ডালত্ব অনুভব করিয়াছিলেন। অহল্যা নামে কোন রাজার মহিষী ইন্দ্র নামক কোন যুবকের আসক্তিতে পড়িয়াছিলেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৮৮৭, ৮ - ৯ই মে 1887/05/08 1887/05/09

59.5 ভাই সঙ্গে নরেন্দ্র — নরেন্দ্রের অন্তরের কথা

ধ্যানের ঘরে অর্থাৎ কালী তপস্বীর ঘরে, নরেন্দ্র ও প্রসন্ন কথা কহিতেছেন। ঘরের আর-একধারে রাখাল, হরিশ ও ছোটগোপাল আছেন। শেষাশেষি শ্রীযুক্ত বুড়োগোপাল আসিয়াছেন।

নরেন্দ্র গীতাপাঠ করিতেছেন ও প্রসন্নকে শুনাইতেছেন:

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্ররূঢ়ানি মায়য়া।।
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপস্যসি শাশ্বতম্।।
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।

নরেন্দ্র — দেখেছিস ‘যন্ত্রারূঢ়’? ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্ররূঢ়ানি মায়য়া। ঈশ্বরকে জানতে চাওয়া। তুই কীটস্য কীট, তুই তাঁকে জানতে পারবি! একবার ভাব দেখি, মানুষটা কি! এই যে অসংখ্য তারা দেখছিস, শুনেছি এক-একটি Solar System (সৌরজগৎ)। আমাদের পক্ষে একটি Solar System এতেই রক্ষা নাই। যে পৃথিবীকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করলে অতি সামান্য একটি ভাঁটার মতো বোধ হয়, সেই পৃথিবীতে মানুষটা বেড়াচ্ছে যেন একটা পোকা!

নরেন্দ্র গান গাইতেছেন:

[“তুমি পিতা আমরা অতি শিশু”]

(১) পৃথ্বীর ধূলিতে দেব মোদের জনম,
পৃথ্বীর ধূলিতে অন্ধ মোদের নয়ন।।
জন্মিয়াছি শিশু হয়ে খেলা করি ধূলি লয়ে,
মোদের অভয় দাও দুর্বল-শরণ।।
একবার ভ্রম হলে আর কি লবে না কোলে,
অমনি কি দূরে তুমি করিবে গমন?
তাহলে যে আর কভু, উঠিতে নারিব প্রভু,
ভূমিতলে চিরদিন রব অচেতন।।
আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন।
পদে পদে হয় পিতা! চরণ স্খলন।।
রুদ্রমুখ কেন তবে, দেখাও মোদের সবে,
কেন হেরি মাঝে মাঝে ভ্রূকুটি ভীষণ।।
ক্ষুদ্র আমাদের পরে করিও না রোষ;
স্নেহ বাক্যে বল পিতা কি করেছি দোষ।।
শতবার লও তুলে, শতবার পড়ি ভুলে;
কি আর করিতে পারে দুর্বল যে জন।।

“পড়ে থাক। তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাক!”

নরেন্দ্র যেন আবিষ্ট হইয়া আবার গাইতেছেন:

[উপায় — শরণাগতি]

প্রভু ম্যয় গোলাম, ম্যয় গোলাম, ম্যয় গোলাম তেরা।
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা।।
দো রোটি এক লেঙ্গোটি, তেরে পাস ম্যয় পায়া।
ভগতি ভাব আউর দে নাম তেরা গাঁবা।।
তু দেওয়ান মেহেরবান নাম তেরা বারেয়া।
দাস কবীর শরণে আয়া চরণ লাগে তারেয়া।।

“তাঁর কথা কি মনে নাই? ঈশ্বর যে চিনির পাহাড়। তুই পিঁপড়ে, এক দানায় তোর পেট ভরে যায়! তুই মনে করছিস, সব পাহাড়টা বাসায় আনবি। তিনি বলেছেন, মনে নাই, শুকদেব হদ্দ একটা ডেয়ো পিঁপড়ে? তাইতো কালীকে বলতুম, শ্যালা গজ ফিতে নিয়ে ঈশ্বরকে মাপবি?

“ঈশ্বর দয়ার সিন্ধু, তাঁর শরণাগত হয়ে থাক; তিনি কৃপা করবেন! তাঁকে প্রার্থনা কর —

‘যত্তে দক্ষিনং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ —’
অসতো মা সদগময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়।।
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময় আবিরাবির্ম এধি।।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং। তেন মাং পাহি নিত্যম্।।”

প্রসন্ন — কি সাধন করা যায়?

নরেন্দ্র — শুধু তাঁর নাম কর। ঠাকুরের গান মনে নাই?

নরেন্দ্র পরমহংসদেবের সেই গানটি গাহিতেছেন:

[উপায় — তাঁর নাম]

(১) নামেরই ভরসা কেবল শ্যামা গো তোমার।
কাজ কি আমার কোশাকুশি, দেঁতোর হাসি লোকাচার।।
নামেতে কাল-পাশ কাটে, জটে তা দিয়েছে রটে।
আমি তো সেই জটের মুটে, হয়েছি আর হব কার।।
নামেতে যা হবার হবে, মিছে কেন মরি ভেবে,
নিতান্ত করেছি শিবে, শিবেরি বচন সার।।

(২) আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন।
পদে পদে হয় পিতা চরণ স্খলন।।

[ঈশ্বর কি আছেন? ঈশ্বর কি দয়াময়?]

প্রসন্ন — তুমি বলছ ঈশ্বর আছেন। আবার তুমিই তো বলো, চার্বাক আর অন্যান্য অনেকে বলে গেছেন যে, এই জগৎ আপনি হয়েছে!

নরেন্দ্র — Chemistry পড়িসনি? আরে Combination কে করবে? যেমন জল তৈয়ার করবার জন্য Oxygen, Hydrogen আর Electricity এ-সব human-hand-এ একত্র করে।

“Intelligent force সব্বাই মানছে। জ্ঞানস্বরূপ একজন; যে এই সব ব্যাপার চালাচ্ছে।”

প্রসন্ন — দয়া আছে কেমন করে জানব?

নরেন্দ্র – ‘যত্তে দক্ষিণং মুখম্।’ বেদে বলেছে।

“John Stuart Mill-ও ওই কথাই বলেছেন। যিনি মানুষের ভিতর এই দয়া দিয়েছেন না জানি তাঁর ভিতরে কত দয়া! — Mill এই কথা বলেন। তিনি (ঠাকুর) তো বলতেন ‘বিশ্বাসই সার’। তিনি তো কাছেই রয়েছেন! বিশ্বাস করলেই হয়!” এই বলিয়া নরেন্দ্র আবার মধুর কণ্ঠে গাইতেছেন:

[উপায় — বিশ্বাস]

মোকো কাঁহা ঢুঁঢ়ো বন্দে ম্যয়তো তেরে পাশ মো।
ন হোয়ে ম্যয় ঝগ্ড়ি বিগ্ড়ি না ছুরি গঢ়াস মো।
ন হোয়ে মো খাল্ রোম্মে না হাড্ডি না মাস্ মো।।
ন দেবল মো না মস্জিদ মো না কাশী কৈলাস মো।
ন হোয়ে ম্যয় আউধ দ্বারকা মেরা ভেট বিশ্বাস মো।।
ন হোয়ে ম্যয় ক্রিয়া করম্মো, না যোগ বৈরাগ সন্ন্যাস মো।

খোঁজেগা তো আব মিলুঙ্গা, পলভরকি তল্লাস মো।।

সহর্‌সে বাহার ডেরা হামারি কুঠিয়া মেরী মৌয়াস মো।

কহত কবীর শুন ভাই সাধু, সব সন্তনকী সাথ মো।।

[বাসনা থাকলে ঈশ্বরে অবিশ্বাস হয়]

প্রসন্ন — তুমি কখনও বল, ভগবান নাই; আবার এখন ওই সব কথা বলছো। তোমার কথার ঠিক নাই, তুমি প্রায় মত বদলাও। (সকলের হাস্য)

নরেন্দ্র — এ-কথা আর কখন বদলাব না — যতক্ষণ কামনা, বাসনা, ততক্ষণ ঈশ্বরে অবিশ্বাস। একটা না একটা কামনা থাকেই। হয়তো ভিতরে ভিতরে পড়বার ইচ্ছা আছে — পাস করবে, কি পণ্ডিত হবে — এই সব কামনা।

নরেন্দ্র — ভক্তিতে গদ্‌গদ্‌ হইয়া গান গাইতে লাগিলেন। ‘তিনি শরণাগত-বৎসল, পরম পিতা মাতা।’

জয় দেব জয় দেব জয় মঙ্গলদাতা, জয় জয় মঙ্গলদাতা।

সঙ্কটভয়দুখত্রাতা, বিশ্বভুবনপাতা, জয় দেব জয় দেব।।

অচিন্ত্য অনন্ত অপার, নাই তব উপমা প্রভু, নাহি তব উপমা।

প্রভু বিশ্বেশ্বর ব্যাপক বিভু চিন্ময় পরমাত্মা, জয় দেব জয় দেব।।

জয় জগদবন্দ্য বয়াল, প্রণমি তব চরণে, প্রভু প্রণমি তব চরণে।

পরম শরণ তুমি হে, জীবনে মরণে, জয় দেব দেব।।

কি আর যাচিব আমরা, করি হে এ মিনতি, প্রভু করি হে এ মিনতি।

এ লোকে সুমতি দেও, পরলোকে সুগতি, জয় দেব জয় দেব।।

নরেন্দ্র আবার গাইলেন। ভাইদের হরিরস পিয়ালা পান করিতে বলিতেছেন। ঈশ্বর খুব কাছেই আছেন — কস্তুরী যেমন মৃগের —

পীলেরে অবধূত হো মাতবারা, প্যালা প্রেম হরিরস কা রে।
বাল অবস্থা খেল গঁবাই, তরুণ ভয়ে নারী বশ কা রে।
বৃদ্ধাভয়ো কফ বায়ুনে ঘেরা, খাট পড়া রহে নহিঁ জায় বস্‌কারে।
নাভ কমলমে হ্যায় কস্তুরী, ক্যায়সে ভরম মিটে পশুকা রে।
বিনা সদ্‌গুরু নর য়্যাসাহি ঢুঁঢ়ে, জ্যায়সা মৃগ ফিরে বনকা রে।

মাস্টার বারান্দা হইতে এই সমস্ত কথা শুনিতেছেন।

নরেন্দ্র গাত্রোত্থান করিলেন। ঘর হইতে চলিয়া আসিবার সময় বলিতেছেন, মাথা গরম হল বকে বকে! বারান্দাতে মাস্টারকে দেখিয়া বলিলেন, “মাস্টার মহাশয়, কিছু জল খান।”

মঠের একজন ভাই নরেন্দ্রকে বলিতেছেন, “তবে যে ভগবান নাই বলো!” নরেন্দ্র হাসিতে লাগিলেন।

[নরেন্দ্রের তীব্র বৈরাগ্য — নরেন্দ্রের গৃহাস্থাশ্রম নিন্দা]

পরদিন শনিবার, ৯ই মে। মাস্টার সকাল বেলা মঠের বাগানের গাছতলায় বসিয়া আছেন। মাস্টার ভাবিতেছেন, “ঠাকুর মঠের ভাইদের কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ করাইয়াছেন। আহা, এঁরা কেমন ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল! স্থানটি যেন সাক্ষাৎ

বৈকুণ্ঠ। মঠের ভাইগুলি যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ! ঠাকুর বেশিদিন চলিয়া যান নাই; তাই সেই সমস্ত ভাবই প্রায় বজায় রহিয়াছে।

“সেই অযোধ্যা! কেবল রাম নাই!

“এদের তিনি গৃহত্যাগ করালেন। কয়েকটিকে তিনি গৃহে রেখেছেন কেন? এর কি কোন উপায় নাই?”

নরেন্দ্র উপরের ঘর হইতে দেখিতেছেন, — মাস্টার একাকী গাছতলায় বসিয়া আছেন। তিনি নামিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, “কি মাস্টার মহাশয়! কি হচ্ছে?” কিছু কথা হইতে হইতে মাস্টার বলিলেন, “আহা তোমার কি সুর! একটা কিছু স্তব বল।”

নরেন্দ্র সুর করিয়া অপরাধভঞ্জন স্তব বলিতেছেন। গৃহস্থেরা ঈশ্বরকে ভুলে রয়েছে — কত অপরাধ করে — বাল্যে, প্রৌঢ়ে, বার্ধক্যে! কেন তারা কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা বা চিন্তা করে না —

বাল্যে দুঃখাতিরেকো মললুলিতবপুঃ স্তন্যপানে পিপাসা,
নো শক্তশ্চেন্দ্রিয়েভ্যো ভবগুণজনিত শত্রবো মাং তুদন্তি।
নানারোগোত্থদুঃখাদ্রুদনপরবশঃ শঙ্করং ন স্মরামি,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো।।
প্রৌঢ়েঽহম্ যৌবনস্থো বিষয়বিষধরৈঃ পঞ্চভির্মর্মসন্ধৌ,
দষ্টো নষ্টোবিবেকঃ সুতধনযুবতীস্বাদসৌখ্যে নিষণ্ণঃ।
শৈবীচিন্তাবিহীনং মম হৃদয়মহো মানগর্বাধিরূঢ়ং

ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো।।

বার্ধক্যে চেন্দ্রিয়াণাং বিগতগতিমতিশ্চাধিদৈবাদিতাপৈঃ,

পাপৈঃ রোগৈর্বিয়োগৈস্তনবসিতবপুঃ প্রৌঢ়িহীনঞ্চ দীনম্

মিথ্যামোহাভিলাষৈর্ভ্রমতি মম মনো ধূর্জটের্ধ্যানশূন্যং

ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো।।

স্নাত্বা প্রত্যূষকালে স্নপনবিধিবিধৌ নাহৃতং গাঙ্গতোয়ং

পূজার্থং বা কদাচিদ্বহুতরগহনাৎ খণ্ডবিল্বীদলানি।

নানীতা পদ্মমালা সরসি বিকসিতা গন্ধধূপৈস্ত্বদর্থং,

ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো।।

গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং

খট্বাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে।

গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্ধনি,

সোঽয়ং সর্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং সর্বদা।। ইত্যাদি

স্তব পাঠ হইয়া গেল। আবার কথাবার্তা হইতেছে।

নরেন্দ্র — নির্লিপ্ত সংসার বলুন আর যাই বলুন, কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ না করলে হবে না। স্ত্রী সঙ্গে সহবাস করতে ঘৃণা করে না? যে স্থানে কৃমি, কফ, মেদ, দুর্গন্ধ —

অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসঙ্কুলে স্বভাবদুর্গন্ধে নিরন্তকান্তরে।

কলেবরে মূত্রপুরীষভাবিতে রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ।।

“বেদান্তবাক্যে যে রমণ করে না, হরিরস মদিরা যে পান করে না তাহার বৃথাই জীবন।

ওঁকারমূলং পরমং পদান্তরং গায়ত্রীসাবিত্রীসুভাষিতান্তরং।
বেদান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্।।

“একটা গান শুনুন:

“ছাড় মোহ — ছাড়রে কুমন্ত্রণা, জান তাঁরে তবে যাবে যন্ত্রণা।।
চারিদিনের সুখের জন্য, প্রাণসখারে ভুলিলে, একি বিড়ম্বনা।।

“কৌপীন না পরলে আর উপায় নাই। সংসারত্যাগ!”

এই বলিয়া আবার সুর করিয়া কৌপীনপঞ্চকম্ বলিতেছেন:

বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো, ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।। ইত্যাদি

নরেন্দ্র আবার বলিতেছেন, মানুষ কেন সংসারে বদ্ধ হবে, কেন মায়ার বদ্ধ হবে? মানুষের স্বরূপ কি? ‘চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং’ আমিই সেই সচ্চিদানন্দ।

ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোমভূমির্ন তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।।

নরেন্দ্র আর একটি স্তব, বাসুদেবাষ্টক সুর করিয়া বলিতেছেন:

হে মধুসূদন! আমি তোমার শরণাগত; আমাকে কৃপা করে কামনিদ্রা, পাপ মোহ, স্ত্রীপুত্রের মোহজাল, বিষয়তৃষ্ণা থেকে ত্রাণ কর। আর পাদপদ্মে ভক্তি দাও।

ওমিতি জ্ঞানরূপেণ রাগাজীর্ণেন জীর্যতঃ।
কামনিদ্রাং প্রপন্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
ন গতির্বিদ্যতে নাথ ত্বমেকঃ শরণং প্রভো।
পাপপঙ্কে নিমগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
মোহিতো মোহজালেন পুত্রদার গৃহাদিষু।
তৃষ্ণয়া পীড্যমানোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
ভক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ দুঃখশোকাতুরং প্রভো।
অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
গতাগতেন শ্রান্তোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
পুনর্নাগন্তুমিচ্ছামি ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
বহবোঽপি ময়া দৃষ্টং যোনিদ্বারং পৃথক্ পৃথক্।
গর্ভবাসেমহদ্দুঃখং ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
তেন দেব প্রপন্নোঽস্মি নারায়ণঃ পরায়ণঃ।
জগৎ সংসারমোক্ষার্থং ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
বাচয়ামি যথোৎপন্নং প্রণমামি তবাগ্রতঃ।
জরামরণভীতোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
সুকৃতং ন কৃতং কিঞ্চিৎ দুষ্কৃতঞ্চ কৃতং ময়া।
সংসারে পাপপঙ্কেঽস্মিন্ ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
দেহান্তরসহস্রাণামন্যোন্যঞ্চ কৃতং ময়া।

কর্তৃত্বঞ্চ মনুষ্যাণাং ত্রাহি মাং মধুসূদন।।

বাক্যেন যৎ প্রতিজ্ঞাতং কর্মণা নোপপাদিতম্।

সোঽহং দেব দুরাচারস্ত্রাহি মাং মধুসূদন।।

যত্র যত্র হি জাতোঽস্মি স্ত্রীষু বা পুরুষেষু বা।

তত্র তত্রাচলা ভক্তিস্ত্রাহি মাং মধুসূদন।।

মাস্টার (স্বগত) — নরেন্দ্রের তীব্র বৈরাগ্য! তাই মঠের ভাইদের সকলেরই এই অবস্থা। ঠাকুরের ভক্তদের ভিতর যাঁরা সংসারে এখনও আছেন, তাঁদের দেখে এদের কেবল কামিনী-কাঞ্চনত্যাগের কথা উদ্দীপন হচ্ছে। আহা, এদের কি অবস্থা! এ-কটিকে তিনি সংসারে এখনও কেন রেখেছেন? তিনি কি কোন উপায় করবেন? তিনি কি তীব্র বৈরাগ্য দিবেন; না সংসারেই ভুলাইয়া রাখিয়া দিবেন?

আজ নরেন্দ্র ও আরও দু-একটি ভাই আহারের পর কলিকাতায় গেলেন। আবার রাত্রে নরেন্দ্র ফিরিবেন। নরেন্দ্রের বাটীর মোকদ্দমা এখনও চোকে নাই। মঠের ভাইরা নরেন্দ্রের অদর্শন সহ্য করিতে পারেন না। সকলেই ভাবিতেছেন, নরেন্দ্র কখন ফিরিবেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৮৭, ৯ই - ১০ই মে 1887/05/09 1887/05/10

59.6 নরেন্দ্র

আজ সোমবার, ৯ই মে, ১৮৮৭, জৈষ্ঠ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথি। নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা মঠে আছেন। শরৎ, বাবুরাম ও কালী শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছেন। নিরঞ্জন মাকে দেখিতে গিয়াছেন। মাস্টার আসিয়াছেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর মঠের ভাইরা একটু বিশ্রাম করিতেছেন। 'বুড়োগোপাল' গানের খাতাতে গান নকল করিতেছেন।

বৈকাল হইল। রবীন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় আসিয়া উপস্থিত। শুধু পা, কালাপেড়ে কাপড় আধখানা পরা। উন্মাদের চক্ষুর ন্যায় তাঁহার চক্ষের তারা ঘুরিতেছে। সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?" রবীন্দ্র বলিলেন, "একটু পরে সমস্ত বলছি। আমি আর বাড়ি ফিরিয়া যাইব না; আপনাদের এইখানেই থাকব। সে বিশ্বাসঘাতক! বলেন কি মহাশয়, পাঁচ বছরের অভ্যাস, মদ — তার জন্য ছেড়েছি! আট মাস হল ছেড়েছি! সে কি না বিশ্বাসঘাতক!" মঠের ভাইরা সকলে বলিলেন, "তুমি ঠাণ্ডা হও। কিসে করে এলে?"

রবীন্দ্র — আমি কলিকাতা থেকে বরাবর শুধু পায়ে হেঁটে এসেছি।

ভক্তেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আর আধখানা কাপড় কোথায় গেল?"

রবীন্দ্র বলিলেন, "সে আসবার সময় টানাটানি করলে, তাই আধখানা ছিঁড়ে গেল।"

ভক্তেরা বলিলেন, “তুমি গঙ্গাস্নান করে এসো; এসে ঠাণ্ডা হও। তার পর কথাবার্তা হবে।”

রবীন্দ্র কলিকাতার একটি অতি সম্ভ্রান্ত কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃক্রম ২০।২২ বৎসর হইবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়িতে দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিশেষ কৃপাভাজন হইয়াছিলেন। একবার তিন রাত্রি তাঁহার কাছে বাস করিয়াছিলেন। স্বভাব অতি মধুর ও কোমল। ঠাকুর খুব স্নেহ করিয়াছিলেন, কিন্তু বলিয়াছিলেন, “তোর কিন্তু দেরি হবে, এখন তোর একটু ভোগ আছে! এখন কিছু হবে না। যখন ডাকাত পড়ে, তখন ঠিক সেই সময় পুলিসে কিছু করতে পারে না। একটু থেমে গেলে তবে পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করে।” আজ রবীন্দ্র বারঙ্গনার মোহে পড়িয়াছেন। কিন্তু অন্য সকল গুণ আছে। গরিবের প্রতি দয়া, ঈশ্বরচিন্তা, এ-সমস্ত আছে। বেশ্যাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করিয়া অর্ধবস্ত্রে মঠে আসিয়াছেন। সংসারে আর ফিরিবেন না, এই সঙ্কল্প।

রবীন্দ্র গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন। পরামাণিকের ঘাটে যাইবেন। একটি ভক্ত সঙ্গে যাইতেছেন। তাঁহার বড় সাধ যে, ছেলেটির সাধুসঙ্গে চৈতন্য হয়। স্নানের পর তিনি রবীন্দ্রকে ঘাটের নিকটস্থ শ্মশানে লইয়া গেলেন। তাঁহাকে মৃতদেহ দর্শন করাইতে লাগিলেন। আর বলিলেন, “এখানে মঠের ভাইরা মাঝে মাঝে একাকী এসে রাত্রে ধ্যান করেন। এখানে আমাদের ধ্যান করা ভাল। সংসার যে অনিত্য তা বোধ হয়।” রবীন্দ্র সেই কথা শুনিয়া ধ্যানে বসিলেন। ধ্যান বেশিক্ষণ করিতে পারিলেন না। মন অস্থির রহিয়াছে।

উভয়ে মঠে ফিরিলেন। ঠাকুরঘরে উভয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ভক্তটি বলিলেন, এই ঘরে মঠের ভাইরা ধ্যান করেন। রবীন্দ্রও একটু ধ্যান করিতে বসিলেন, কিন্তু ধ্যান বেশিক্ষণ হল না।

মণি — কি, মন কি বড় চঞ্চল? তাই বুঝি উঠে পড়লে? তাই বুঝি ধ্যান ভাল হল না?

রবীন্দ্র — আর যে সংসারে ফিরব না, তা নিশ্চিন্ত! তবে মনটা চঞ্চল বটে।

মণি ও রবীন্দ্র মঠের এক নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন। মণি বুদ্ধদেবের গল্প করিতেছেন। দেবকন্যাদের একটি গান শুনে বুদ্ধদেবের প্রথম চৈতন্য হয়েছিল। আজকাল মঠে বুদ্ধচরিত ও চৈতন্যচরিতের আলোচনা সর্বদাই হয়। মণি সেই গান গাহিতেছেন:

জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই,
কোথা হতে আসি কোথা ফিরে যাই।
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।।

রাত্রে নরেন্দ্র, তারক ও হরিশ — কলিকাতা হইতে ফিরিলেন। আসিয়া বলিলেন, উঃ খুব খাওয়া হয়েছে! তাঁহাদের কলিকাতায় কোন ভক্তের বাড়িতে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।

নরেন্দ্র ও মঠের ভাইরা, মাস্টার, রবীন্দ্র ইত্যাদি এঁরাও দানাদের ঘরে বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র মঠে আসিয়া সমস্ত কথা শুনিয়াছেন।

[সন্তপ্ত জীব ও নরেন্দ্রের উপদেশ]

নরেন্দ্র গাহিতেছেন — গীতচ্ছলে যেন রবীন্দ্রকে উপদেশ দিতেছেন —

ছাড় মোহ, ছাড় ছাড় রে কুমন্ত্রণা, জান তাঁরে তবে যাবে যন্ত্রণা।

নরেন্দ্র আবার গাহিলেন — যেন রবীন্দ্রকে হিতবচন বলছেন:

পীলেরে অবধূত হো মাতোয়ারা পিয়ালা-প্রেম হরিরসকা রে।
বাল অবস্থা খেল গোঞাই, তরুণ ভয়ো নারী বশকা রে।
বৃদ্ধ ভয়ো কফ্ বায়ুনে ঘেরা, খাট পড়া রহে জা মস্কা রে।
নাভ কমলমে হ্যায় কস্তুরী, ক্যায়সে ভরম মিটে পশুকা রে।
বিনা সৎগুরু নর য়্যাসাহি ঢুঁঢ়ে, জ্যায়সা মৃগ ফিরে বনকা রে।

কিয়ৎক্ষণ পরে মঠের ভাইরা কালী তপস্বীর ঘরে বসিয়া আছেন। গিরিশের বুদ্ধচরিত ও চৈতন্যচরিত দুইখানি নূতন পুস্তক আসিয়াছে। নরেন্দ্র, শশী, রাখাল, প্রসন্ন, মাস্টার ইত্যাদি বসিয়া আছেন। নূতন মঠে আসা পর্যন্ত শশী একমনে দিনরাত ঠাকুরের পূজাদি সেবা করেন। তাঁহার সেবা দেখিয়া সকলে অবাক হইয়াছেন। ঠাকুরের অসূখের সময় তিনি রাতদিন যেরূপ তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, আজও সেরূপ অনন্যমন, একভক্তি হইয়া সেবা করিতেছেন।

মঠের একজন ভাই বুদ্ধচরিত ও চৈতন্যচরিত পড়িতেছেন। সুর করিয়া একটু ব্যঙ্গভাবে চৈতন্যচরিতামৃত পড়িতেছেন। নরেন্দ্র বইখানি কাড়িয়া লইলেন। বলিলেন, “এইরকম করে ভাল জিনিসটা মাটি করে?”

নরেন্দ্র নিজে চৈতন্যদেবের প্রেমবিতরণের কথা পড়িতেছেন।

মঠের ভাই — আমি বলি কেউ কারুকে প্রেম দিতে পারে না।

নরেন্দ্র — আমায় পরমহংস মহাশয় প্রেম দিয়েছেন।

মঠের ভাই — আচ্ছা, তুমি কি তাই পেয়েছ?

নরেন্দ্র — তুই কি বুঝবি? তুই Servant Class (ঈশ্বরের সেবকের থাক)। আমার সবাই পা টিপবে। শরতা মিত্তির আর দেসো পর্যন্ত। (সকলের হাস্য) তুই মনে করছিস বুঝি যে সব তুই বুঝিছিস। (হাস্য) লে তামাক সাজ। (সকলের হাস্য)

মঠের ভাই — সাজ-বো-না। (সকলের হাস্য)

মাস্টার (স্বগত) — ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ভাইদের অনেকের ভিতর তেজ দিয়াছেন। শুধু নরেন্দ্রের ভিতর নয়। এ তেজ না থাকলে কি কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ হয়?

[মঠের ভাইদের সাধনা]

পরদিন মঙ্গলবার, ১০ই মে। আজ মহামায়ার বার। নরেন্দ্রাদি মঠের ভাইরা আজ বিশেষরূপে মার পূজা করিতেছেন। ঠাকুরঘরের সম্মুখে ত্রিকোণ যন্ত্র প্রস্তুত হইল, হোম হইবে। পরে বলি হইবে। তন্ত্রমতে হোম ও বলির ব্যবস্থা আছে। নরেন্দ্র গীতাপাঠ করিতেছেন।

মণি গঙ্গাস্নানে গেলেন। রবীন্দ্র ছাদের উপরে একাকী বিচরণ করিতেচেন। শুনিতেছেন, নরেন্দ্র সুর করিয়া স্তব করিতেছেন।

ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং

ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।

ন চ ব্যোমভূমির্ন তেজো ন বায়ু-

শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্।

ন চ প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চবায়ু-

র্ন বা সপ্তধাতুর্ন বা পঞ্চকোষাঃ।

ন বাক্‌পাণিপাদং নচোপস্থপায়ু

চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্।।

ন মে দ্বেষরাগৌ, ন মে লোভমোহৌ,

মদোনৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ।

ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ-

শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্।

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং

ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।

অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা,

চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্‌।

এইবার রবীন্দ্র গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়াছেন; ভিজে কাপড়।

নরেন্দ্র (মণির প্রতি, একান্তে) — এই নেয়ে এসেছে, এবার সন্ন্যাস দিলে বেশ হয়। (মণি ও নরেন্দ্রের হাস্য)

প্রসন্ন রবীন্দ্রকে ভিজে কাপড় ছাড়িতে বলিয়া তাঁহাকে একখানা গেরুয়া কাপড় আনিয়া দিলেন।

নরেন্দ্র (মণির প্রতি) — এইবার ত্যাগীর কাপড় পরতে হবে।

মণি (সহাস্যে) — কি ত্যাগ?

নরেন্দ্র —— কাম-কাঞ্চনত্যাগ।

রবীন্দ্র গেরুয়া কাপড়খানি পরিয়া কালী তপস্বীর ঘরে গিয়া নির্জনে বসিলেন। বোধ হয় একটু ধ্যান করিবেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c60 ৬০ শ্রীরামকৃষ্ণ অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

60.1 শ্রীযুক্ত কেশব সেন (১৮৮১), ৺দেবেন্দ্র ঠাকুর, অচলানন্দ, শিবনাথ, হৃদয়, নরেন্দ্র, গিরিশ

“প্রাণের ভাই শ্রীম, তোমার প্রেরিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ খণ্ড, কোজাগর পূর্ণিমার দিন পেয়ে আজ দ্বিতিয়ায় শেষ করেছি। ধন্য তুমি! এত অমৃত দেশময় ছড়ালে! * * যাক, তুমি অনেকদিন হল ঠাকুরের সঙ্গে আমার কি আলাপ হয়েছিল জানতে চেয়েছিলে। তাই জানাবার একটু চেষ্টা করি। কিন্তু আমি তো আর শ্রীম’র মতো কপাল করে আসিনি যে, শ্রীচরণ দর্শনের দিন, তারিখ, মুহূর্ত আর শ্রীমুখনিঃসৃত সব কথা একেবারে ঠিক ঠিক লিখে রাখব। যতদূর মনে আছে লিখে যাই, হয়তো একদিনের কথা আর একদিনের বলে লিখে ফেলব। আর কত ভুলে গেছি।

বোধ হয় ১৮৮১ সালের শারদীয় অবকাশের সময় প্রথম দর্শন। সেদিন কেশববাবুর আসিবার কথা। আমি নৌকায় দক্ষিণেশ্বর গিয়া ঘাট থেকে উঠে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “পরমহংস কোথায়?” তিনি উত্তরদিকের

বারান্দায় তাকিয়া ঠেসান দেওয়া এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে বললেন, “এই পরমহংস।” কালাপেড়ে (Sic) ধুতিপরা আর তাকিয়া ঠেসান দেওয়া দেখে আমি ভাবলাম, ‘এ আবার কিরকম পরমহংস?’ কিন্তু দেখলাম, দুটি ঠ্যাং উঁচু করে, আবার দুইহাত দিয়ে বেষ্টন করে আধাচিৎ হয়ে তাকিয়ায় ঠেসান দেওয়া হয়েছে। মনে হল ‘এঁর কখনও বাবুদের মতো তাকিয়া ঠেসান দেওয়া অভ্যাস নাই, তবে বোধ হয় ইনিই পরমহংস হবেন।’ তাকিয়ার অতি নিকটে তাঁহার ডানপাশে একটি বাবু বসে আছেন। শুনলাম তাঁর নাম রাজেন্দ্র মিত্র, যিনি বেঙ্গল গভর্নমেন্টের এ্যাসিস্‌ট্যান্ট সেক্রেটারী হয়েছিলেন। আরও ডানদিকে কয়েকটি লোক বসে আছেন। একটু পরেই রাজেন্দ্রবাবুকে বললেন, “দেখো দিখিন্‌ কেশব আসছে কি না?” একজন একটু এগিয়ে ফিরে এসে বললেন, “না”। আবার একটু শব্দ হতে বললেন — “দেখো, আবার দেখো”। এবারও একজন দেখে এসে বললেন — “না।” অমনি পরমহংসদেব হাসতে হাসতে বললেন, ‘পাতের উপর পড়ে পাত, রাই বলে — ওই এল বুঝি প্রাণনাথ।’ হাঁ, দেখো কেশবের চিরকালই কি এই রীত! আসে, আসে, আসে না। কিছুকাল পরে সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় কেশব দলবলসহ এসে উপস্থিত।

এসে যেমন ভূমিষ্ঠ হয়ে ওঁকে প্রণাম করলেন, উনিও ঠিক তদ্রূপ করে একটু পরে মাথা তুললেন। তখন সমাধিস্থ, — বলছেন — “রাজ্যের কলকাতার লোক জুটিয়ে নিয়ে এসেছেন — আমি কি না বক্তৃতা করব। তা আমি পারব টারবনি। করতে হয় তুমি কর। আমি ও-সব পারবনি!”

ওই অবস্থায় একটু দিব্য হাসি হেসে বলছেন — “আমি তোমার খাব-দাব থাকব, আমি তোমার খাব শোব আর বাহ্যে যাব। আমি ও-সব পারবনি।”

কেশববাবু দেখছেন আর ভাবে ভরপুর হয়ে যাচ্ছেন, এক-একবার ভাবের ভরে "আঃ আঃ" করছেন।

আমি ঠাকুরের অবস্থা দেখে ভাবছি, "এ কি ঢঙ?" আর তো কখনও এমন দেখি নাই; আর যেরূপ বিশ্বাসী তাতো জানোই।

সমাধিভঙ্গের পরে কেশববাবুকে বললেন, "কেশব, একদিন তোমার ওখানে গেছলাম, শুনলাম তুমি বলছো, 'ভক্তি নদীতে ডুব দিয়ে সচ্চিদানন্দ-সাগরে গিয়ে পড়বো।' আমি তখন উপর পানে তাকাই (যেখানে কেশববাবুর স্ত্রী ও অন্যান্য স্ত্রীলোক বসেছিলেন) আর ভাবি, তাহলে এদের দশা হবে কি? তোমরা গৃহী, একেবারে সচ্চিদানন্দ-সাগরে কি করে গিয়ে পড়বে? সেই নেউলের মতো পেছনে বাঁধা ইট, কোনো কিছু হলে কুলঙ্গায় উঠে বসলো, কিন্তু থাকবে কেমন করে। ইটে টানে আর ধুপ করে নেবে পড়ে। তোমরাও একটু ধ্যান-ট্যান করতে পার কিন্তু ওই দারাসুত-ইট টেনে আবার নামিয়ে ফেলে। তোমরা ভক্তি নদীতে একবার ডুব দেবে আবার উঠবে, আবার ডুব দেবে আবার উঠবে। এমনি চলবে। তোমরা একেবারে ডুবে যাবে কি করে?"

কেশববাবু বললেন, "গৃহস্থের কি হয় না? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর?"

পরমহংসদেব "দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্র, দেবেন্দ্র" দুই-তিন বার বলে উদ্দেশে কবার প্রণাম করলেন, তারপর বললেন: — "তা জানো, একজনার বাড়ি দুর্গোৎসব হত, উদয়াস্ত পাঁঠাবলি হত। কয়েক বৎসর পরে আর বলির সে ধুমধাম নাই। একজন জিজ্ঞাসা করলে, মশাই আজকাল যে আপনার বাড়িতে

বলির ধুমধাম নাই? সে বললে, আরে! এখন যে দাঁত পড়ে গেছে। দেবেন্দ্রও এখন ধ্যানধারণা করছে, তা করবেই তো। তা কিন্তু খুব মানুষ।

“দেখো, যতদিন মায়া থাকে, ততদিন মানুষ থাকে ডাবের মতো। নারকেল যতদিন ডাব থাকে, তার লেয়াপাতি তুলতে গেলেই সঙ্গে মালার একটুকু উঠে আসবেই। আর যখন মায়া শেষ হয়ে যায় তখন হয় ঝুনো। ওই শাঁস আর মালা পৃথক হয়ে যায়, তখন শাঁসটা ভিতরে ঢপর ঢপর করে। আত্মা হয় আলাদা, আর শরীর হয় আলাদা। দেহটার সঙ্গে আর যোগ থাকে না।

“ওই যে ‘আমি’টে ওটাতেই বড় মুশকিল বাধায়। শালার ‘আমি’ কি যাবেই না? এই পোড়ো বাড়িতে অশ্বত্থ গাছ উঠেছে; খুঁড়ে ফেলে দাও আবার পরদিন দেখো, এক ফেঁকড়ি গজিয়েছে; — ওই ‘আমি’ও অমনি ধারা। পেঁয়াজের বাটি সাতবার ধোও শালার গন্ধ কি কিছুতেই যাবেনি?

কি বলতে বলতে কেশববাবুকে বললেন — “হাঁ কেশব, তোমাদের কলকাতার বাবুরা নাকি বলে ‘ঈশ্বর নাই?’ বাবু সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন, এক পা ফেলে আর-এক পা ফেলতেই ‘উঃ পাশে কি হল’ বলে অজ্ঞান। ডাক ডাক ডাক্তার ডাক! — ডাক্তার আসতে আসতে হয়ে গেছে। অ্যাঁ — এরা বলেন ঈশ্বর নাই।”

এক কি দেড় ঘণ্টা পরে কীর্তন আরম্ভ হল। তখন যা দেখলাম তা বোধ হয় জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলব না। সকলে নাচতে লাগলেন, কেশবকেও নাচতে দেখলাম, মাঝখানে ঠাকুর আর সবাই তাঁকে ঘিরে নাচছেন। নাচতে নাচতে

একেবারে স্থির — সমাধিস্থ। অনেকক্ষণ এইভাবে গেল। শুনতে শুনতে দেখতে দেখতে বুঝলাম, 'এ পরমহংস বটে।'

আর-একদিন, বোধ হয় ১৮৮৩ সনে শ্রীরামপুরের কয়েকটি যুবক সঙ্গে নিয়ে গেছলাম। সেদিন তাদের দেখে বললেন — "এরা এসেছেন কেন?"

আমি — আপনাকে দেখতে।

ঠাকুর — আমায় দেখবে কি? এরা বিল্ডিং-টিলডিং দেখুক না?

আমি — এরা তা দেখতে আসে নাই, আপনাকে দেখতে এসেছে।

ঠাকুর — তবে এরা বুঝি চকমকির পাথর। ভিতরে আগুন আছে। হাজার বছর জলে ফেলে রাখ, যেমন ঠুকবে অমনি আগুন বেরুবে। এরা বুঝি সেই জাতীয় জীব। আমাদের ঠুকলে আগুন বেরোয় কই?

আমরা এই শেষ কথা শুনে হাসলাম। সেদিন আর কি কি কথা হল ঠিক মনে নাই। তবে 'আমি'র গন্ধ যায় না আর কামিনী-কাঞ্চনত্যাগের কথাও যেন হয়েছিল।

আর-একদিন গেছি। প্রণাম করে বসেছি, বললেন: — "সেই যে কাক্ খুললে ফস্ ফস্ করে উঠে, একটু টক একটু মিষ্টি, তার একটা এনে দিতে পার?" আমি বললাম — লেমনেড? ঠাকুর বললেন — "আন না?" মনে হয় একটা এনে দিলাম। এ দিন যতদূর মনে পড়ে আর কেউ ছিল না। কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম — "আপনার কি জাতিভেদ আছে?"

ঠাকুর — কই আর আছে? কেশব সেনের বাড়ি চচ্চড়ি খেয়েছি, তবু একদিনের কথা বলছি। একটা লোক লম্বা দাড়িওয়ালা বরফ নিয়ে এসেছিল, তা কেমন খেতে ইচ্ছা হল না, আবার একটু পরে একজন — তারই কাছ থেকে বরফ নিয়ে এল — ক্যাচর-ম্যাচর করে চিবিয়ে খেয়ে ফেললাম। তা জানো জাতিভেদ আপনি খসে যায়। যেমন নারিকেলগাছ, তালগাছ বড় হয়, বালতো আপনি খসে পড়ে। জাতিভেদ তেমনি খসে যায়। টেনে ছিঁড়ো না, ওই শালাদের মতো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম — "কেশববাবু কেমন লোক?"

ঠাকুর — ওগো, সে দৈবী মানুষ।

আমি — আর ত্রৈলোক্যবাবু?

ঠাকুর — বেশ লোক, বেড়ে গায়।

আমি — শিবনাথবাবু?

ঠাকুর — * * বেশ মানুষ, তবে তর্ক করে যে!

আমি — হিন্দুতে ও ব্রাহ্মতে তফাৎ কি? বললেন — "তফাত আর কি? এইখানে রোশনচৌকি বাজে, একজন সানাইয়ের ভোঁ ধরে থাকে আর-একজন তারই ভিতর 'রাধা আমার মান করেছে' ইত্যাদি রঙ পরঙ তুলে নেয়। ব্রাহ্মেরা নিরাকার ভোঁ ধরে বসে আছে। আর হিন্দুরা রঙ পরঙ তুলে নিচ্ছে।

“জল আর বরফ — নিরাকার আর সাকার। যা জল তাই ঠাণ্ডায় বরফ হয়, জ্ঞানের গরমিতে বরফ জল হয়, ভক্তির হিমে জল বরফ হয়!

“সেই একই জিনিস, নানা লোকে নানা নাম করে। যেমন পুকুরের চারপাশে চার গাট। এ ঘাটের লোক জল নিচ্ছে; জিজ্ঞাসা কর, বলবে ‘জল’। ও ঘাটে যারা জল নিচ্ছে বলবে ‘পানি’। আর-একঘাটে ‘ওয়াটার’; আর-একঘাটে ‘অ্যাকোয়া’; জল তো একই।”

বরিশালে আচলানন্দ তীর্থাবধূতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বলাতে বললেন: — “সেই কোতরঙ্গের রামকুমার তো?” আমি বললাম “আজ্ঞা হাঁ”।

ঠাকুর — তাকে কেমন লাগল?

আমি — খুব ভাল লাগল।

ঠাকুর — আচ্ছা, সে ভাল, না, আমি ভাল?

আমি — তাঁর সঙ্গে কি আপনার তুলনা হয়? তিনি পণ্ডিত বিদ্বান লোক আর আপনি কি পণ্ডিত জ্ঞানী? উত্তর শুনে একটু অবাক্ হয়ে চুপ করে রইলেন। এক-আধ মিনিট পরে আমি বললাম: — “তা তিনি পণ্ডিত হতে পারেন, আপনি মজার লোক। আপনার কাজে মজা খুব।”

এইবার হেসে বললেন, “বেশ বলেছো, ঠিক বলেছো।”

আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, “আমার পঞ্চবটী দেখেছো?” বললাম, আজ্ঞা হাঁ। সেখানে কি কি করতেন তাও কিছু বললেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “তাঁকে পাবো কি করে?”

উত্তর — ওগো সে তো চুম্বক লোহাকে যেমন টানে, তেমনি আমাদের টানতেই আছে। লোহার গায়ে কাদা মাখা থাকলেই লাগতে পারে না। কাঁদতে কাঁদতে যেমন কাদাটুকু ধুয়ে যায় অমনি টুক করে লেগে যায়!

আমি ঠাকুরের উক্তিগুলি শুনে শুনে লিখছিলাম, বললেন: — “হ্যাঁ দেখো, সিদ্ধি সিদ্ধি করলে হবে না। সিদ্ধি আনো, সিদ্ধি ঘোঁট, সিদ্ধি খাও।” * * এরপর আমায় বললেন, “তোমরা তো সংসারে থাকবে, তা একটু গোলাপী নেশা করে থেকো। কাজকর্ম করছ অথচ নেশাটি লেগে আছে। তোমরা তো আর শুকদেবের মতো হতে পারবে না — যে খেয়ে খেয়ে ন্যাংটো-ভ্যাংটো হয়ে পড়ে থাকবে।

“সংসারে থাকবে তো একখানি আমমোক্তারনামা লিখে দাও — বকলমা দিয়ে দাও। উনি যা হয় করবেন। তুমি থাকবে বড়লোকের বাড়ির ঝির মতো। বাবুর ছেলেপুলেকে কত আদর করছে, নাওয়াচ্ছে, ধোয়াচ্ছে, খাওয়াচ্ছে যেন তারই ছেলে; কিন্তু মনে মনে জানছে, ‘এ আমার নয়’; যেমন জবাব দিলে — বস্, আর কোন সম্পর্ক নাই।

“যেমন কাঁঠাল খেতে হলে হাতে তেল মেখে নিতে হয়, তেমনি ওই তেল মেখে নিও তাহলে আর সংসারে জড়াবে না, লিপ্ত হবে না।”

এতক্ষণ মেঝেয় বসে কথা হচ্ছিল; এখন তক্তপোষের উপরে উঠে লম্বা হয়ে শুলেন। আমায় বললেন, “হাওয়া কর।” আমি হাওয়া করতে থাকলাম। চুপ করে রইলেন। একটু পরে বললেন, “বড্ড গরম গো, পাখাখানা একটু জলে ভিজিয়ে নাও।” আমি বললাম, “আবার শৌক তো আছে দেখছি।” হেসে বললেন — “কেন থাকবেনি? ক্যা-নো-থাকবেনি?” আমি বললাম, “তবে থাক্ থাক্, খুব থাক্।” সেদিন কাছে বসে যে সুখ পেয়েছি সে আর বলবার নয়।

শেষবার — যে বারের কথা তুমি তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেছ — সেইবার আমার স্কুলের হেডমাস্টারকে নিয়ে গেছলাম। তাঁর বি. এ. পাশ করার অব্যবহিত পরে। এইবার এই সেদিন তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে।

ওঁকে দেখেই বললেন — “আবার ইটি পেলে কোথায়। বেড়ে তো।

“ওগো তুমি তো উকিল। উঃ বড় বুদ্ধি! আমায় একটু বুদ্ধি দিতে পার? তোমার বাবা যে সেদিন এসেছিলেন, এখানে তিনদিন ছিলেন।”

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “তাঁকে কেমন দেখলেন?”

বললেন — “বেশ লোক, তবে মাঝে মাঝে হিজিবিজিটি ছাড়িয়ে দেবেন।”

একটু হাসলেন। আমি বললাম, “আমাদের গোটা কতক কথা শুনান।” বললেন, “হৃদয়কে চেনো?” (হৃদয় মুখোপাধ্যায়)

আমি বললাম, “আপনার ভাগনে তো? আমার সঙ্গে আলাপ নাই।”

ঠাকুর — হৃদে বলত, ‘মামা তোমার বুলিগুলি সব এক সময়ে বলে ফেলো না! ফি বার এক বুলি কেন বলবে?’ আমি বলতাম, তা তোর কি রে শালা? আমার বুলি আমি লক্ষ্যবার ওই এককথা বলব, তোর কিরে?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, “তা বটেই তো।”

কিঞ্চিৎ পরে বসে ওঁ ওঁ করতে করতে গান ধরলেন:

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।

দু-এক পদ গাইতে গাইতে ডুব্ ডুব্ বলতে বলতে ডুব্।

সমাধিভঙ্গ হল, পায়চারি করতে লাগিলেন। ধুতি যা পরা ছিল তা দুই হাত দিয়ে টানতে টানতে একেবারে কোমরের উপর তুলেছেন, এ-দিক দিয়ে খানিকটা মেঝে ঝেটিয়ে যাচ্ছে, ও-দিক দিয়ে খানিকটা অমনি পড়েছে। আমি আর আমার সঙ্গী টেপা-টেপি করছি আর চুপি চুপি বলছি, ‘ধুতিটি পরা হয়েছে ভালো!’ একটু পরেই ‘দূর শালার ধুতি’ বলে ধুতিটা ফেলে দিলেন। দিয়ে দিগম্বর হয়ে পায়চারি করতে লাগলেন। উত্তরদিক থেকে কার যেন ছাতা ও লাঠি আমাদের সম্মুখে এনে জিজ্ঞাসা করলেন — “এ ছাতা লাঠি তোমাদের?” আমি বললাম, ‘না’। অমনি বললেন, “আমি আগেই বুঝেছি, এ তোমাদের নয়। আমি ছাতা লাঠি দেখেই মানুষ বুঝতে পারি। সেই একটা লোক হাঁউ মাঁউ করে কতকগুলো গিলে গেল, এ তারই নিশ্চয়।”

কিছুকাল পরে ওই ভাবেই খাটের উত্তরপাশে পশ্চিমমুখো হয়ে বসে পড়লেন। বসেই আমায় জিজ্ঞাসা — “ওগো, আমায় কি অসভ্য মনে করছো?”

আমি বললাম, ‘না আপনি খুব সভ্য। আবার এ জিজ্ঞাসা করছেন কেন?’

ঠাকুর — আরে শিবনাথ-টিবনাথ অসভ্য মনে করে। ওরা বলে কোনরকমে একটা ধুতি-টুতি জড়িয়ে বসতে হয়। গিরিশ ঘোষকে চেনো?

আমি — কোন্ গিরিশ ঘোষ? থিয়েটার করে যে?

ঠাকুর — হাঁ।

আমি — দেখিনি কখনও, নাম জানি।

ঠাকুর — ভাল লোক।

আমি — শুনি মদ খায় নাকি?

ঠাকুর — খাক না, খাক না কদিন খাবে?

বললেন — “তুমি নরেন্দ্রকে চেনো?”

আমি — আজ্ঞা, না।

ঠাকুর — আমার বড় ইচ্ছা, তার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়, সে বি-এ পাশ দিয়েছে, বিয়ে করেনি।

আমি — যে আজ্ঞা, আলাপ করব।

ঠাকুর — আজ রাম দত্তের বাড়ি কীর্তন হবে সেইখানে দেখা হবে। সন্ধ্যার সময় সেইখানে যেও।

আমি — যে আজ্ঞা।

ঠাকুর — যাবে তো? যেও কিন্তু।

আমিই — আপনার হুকুম হল, তা মানব না? অবশ্য যাব।

ঘরে ছবি কখানা দেখালেন, পরে জিজ্ঞাসা করলেন, "বুদ্ধদেবের ছবি পাওয়া যায়?"

আমি — শুনতে পাই, পাওয়া যায়।

ঠাকুর — সেই ছবি একখানি তুমি আমায় দিও।

আমি — যে আজ্ঞা, যখন এবার আসব, নিয়ে আসব।

আর দেখা হল না! আর সেই শ্রীচরণপ্রান্তে বসতে ভাগ্যে ঘটে নাই।

সেদিন সন্ধ্যার সময় রামবাবুর বাড়ি গেলাম। নরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হল। ঠাকুর একটি কামরায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসেছেন, নরেন্দ্র তাঁর ডানপাশে আমি সম্মুখে। নরেন্দ্রকে আমার সহিত আলাপ করতে বললেন।

নরেন্দ্র বললেন, আজ আমার বড় মাথা ধরেছে। কথা কইতে ইচ্ছা হচ্ছে না। আমি বললাম, “থাক, আর একদিন আলাপ হবে।”

সেই আলাপ হয় ১৮৯৭ সনের মে কি জুন মাসে, আলমোড়ায়।

ঠাকুরের ইচ্ছা তো পূর্ণ হতেই হবে, তাই বার বছর পরে পূর্ণ হল। আহা সেই স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আলমোড়ায় কটা দিন কত আনন্দেই কাটাইয়াছিলাম। কখনও তাঁর বাড়িতে, কখনও আমার বাড়িতে, আর-একদিন নির্জনে তাঁকে নিয়ে একটি পর্বতশৃঙ্গে। আর তাঁর সঙ্গে পরে দেখা হয় নাই। ঠাকুরের ইচ্ছা পূর্ণ করতেই সে বারের দেখা।

ঠাকুরের সঙ্গেও মাত্র চার-পাঁচদিনের দেখা, কিন্তু ওই অল্প সময়ের মধ্যেই এমন হয়েছিল যে, তাঁকে (ঠাকুরকে) মনে হত যেন এক ক্লাসে পড়েছি, কেমন বেয়াদবের মতো কথা বলেছি; সম্মুখ থেকে সরে এলেই মনে হত, ‘ওরে বাপ্‌রে কার কাছে গেছলাম।’ ওই কদিনেই যা দেখেছি ও পেয়েছি তাতে জীবন মধুময় করে রেখেছে। সেই দিব্যামৃতবর্ষী হাসিটুকু, যতনে পেটরায় পুরে রেখে দিইছি। সে যে নিঃসম্বলের অফুরন্ত সম্বল গো! আর সেই হাসিচ্যুত অমৃতকণায় আমেরিকা অবধি অমৃতায়িত হচ্ছে —— এই ভেবে “হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ, হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ। আমারই যদি এই, এখন বোঝ তুমি কেমন ভাগ্যধর।”

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c61 ৬১ মাস্টার মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত স্বপ্রণিত ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে’ ‘শ্রীম’, ‘মাস্টার’, ‘মণি’, ‘মোহিনীমোহন’ বা ‘একজন ভক্ত’ ইত্যাদি ছদ্মনাম বা অসম্পূর্ণ পরিচয়ের আবরণে আপনাকে গুপ্ত রাখিতে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছেন; কারণ তাঁহার অনুপম কীর্তিসৌরভ আপনা হইতেই সর্বত্র প্রসারিত হইয়াছে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনলাভকালে তিনি মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়ের শ্যামবাজারস্থ শাখার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীতে সুপরিচিত রাখাল, বাবুরাম, সুবোধ, পূর্ণ, তেজচন্দ্র, পল্টু, ক্ষীরোদ, নারায়ণ প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে ওই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। এইজন্য তিনি ‘মাস্টার’ মহাশয় নামেই পরিচিত ছিলেন; এমনকি, ঠাকুরও তাঁহাকে কখন মাস্টার বলিয়া অভিহিত করিতেন।

‘কথামৃতে’র আদিতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে এও শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে —

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ।।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামৃত প্রচারপূর্বক মাস্টার মহাশয় সত্যসত্যই শত সহস্র ধর্মপিপাসু ব্যক্তির গৃহপার্শ্বে অমৃতের ধারা প্রবাহিত করাইয়া সর্বোত্তম ফলদানের অধিকারী হইয়াছেন। পঞ্চ খণ্ডএ বিভক্ত এই গ্রন্থখানি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষার সহজ সাবলীল গতি, ভাবের গাম্ভীর্য, স্বল্প কথায় সজীব চিত্রাঙ্কন, সর্বজনীন সহানুভূতি, অসীম উদারতা ও অবাধ অন্তর্দৃষ্টির সুনির্মল দর্পণরূপে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যমধ্যে উচ্চাসন অধিকারপূর্বক লেখককে অমর করিয়াছে। একটি জীবনের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইলেও মাস্টার মহাশয় ইহাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া স্বীয় চিত্তাকর্ষক ও প্রেরণাপূর্ণ মৌখিক উপদেশপ্রভাবে শত সহস্র দুর্বল ধর্মপথচারীর সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের উজ্জ্বল আলোক তুলিয়া ধরিয়া এক নবীন দৃষ্টিভঙ্গি ও স্পৃহা জাগাইয়াছেন। তিনি যখন কথা বলিতেন, তখন অতুলনীয় স্মৃতিশক্তির দ্বারা পরিপুষ্ট কবিত্বপূর্ণ বর্ণনার গুণে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কয়েকটি বৎসরের চিত্র শ্রোতাদের সম্মুখে সচল হইয়া উঠিত; ঠাকুরের পূত-সঙ্গলাভে ধন্য দিবসগুলির অভিজ্ঞতার আলোকে ওই চিত্রসমূহ সমুজ্জ্বল হইয়া এক অলৌকিক পরিবেশের সৃষ্টি করিত এবং সমাগত ধর্মপিপাসুদিগকে অবলীলাক্রমে সেই সজীব পুরাতন লীলাক্ষেত্রে উপস্থানপূর্বক শান্তি ও বিশ্বাসের শুর্ব পুণ্য জ্যোতিতে অবগাহন করাইত। মাস্টার মহাশয় সর্বদাই যেন দক্ষিণেশ্বর ও কামারপুকুরের স্মৃতিরাজ্যে বাস করিতেন এবং বাহিরের যে-কোন শব্দই উচ্চারিত হউক না কেন, উহা সেই রাজ্যেরই কোন ঘটনা চিত্র উদ্বোধিত করিয়া তাঁহাকে উহারই সহিত বিজড়িত অতীত জীবনের পুনরাবৃত্তিতে নিযুক্ত রাখিত। শ্রোতা আসিয়া যে-কোন বিষয়েরই প্রশ্ন করুক না কেন, অমনি উত্তরছলে তিনি জীবন্ত ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের কিয়দংশ তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেন।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন দেহত্যাগ পর্যন্ত তিনি প্রত্যহ এই স্বেচ্ছাধৃত ব্রতই উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই (১২৬১ বঙ্গাব্দের ৩১শে আষাঢ়) শুক্রবার নাগপঞ্চমী দিবসে মহেন্দ্রনাথ কলিকাতার সিমুলিয়া পল্লীস্থ শিবনারায়ণ দাস লেনের পিতৃগৃহে ভূমিষ্ঠ হন। ইহার কিছুকাল পরে তাঁহার পিতা শ্রীমধুসদন গুপ্ত ১৩/২ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের গৃহখানি ক্রয়পূর্বক তথায় চলিয়া আসেন। গৃহখানি অদ্যবধি বর্তমান এবং ওই অঞ্চলের 'ঠাকুরবাড়ি' বলিয়া পরিচিত। পিতা মধুসূদন এবং মাতা স্বর্ণময়ী উভয়েই সরলতা, মধুর ব্যবহার ও ধর্মনিষ্ঠার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের চারিটি পুত্র ও সমসংখ্যক কন্যার মধ্যে মহেন্দ্রনাথ ছিলেন তৃতীয় সন্তান। মাতার স্নেহ ও সদ্‌গুণরাশি মহেন্দ্রকে চিরজীবন মাতৃভক্ত করিয়াছিল। মাতার সহিত তাঁহার যে বহু অপূর্ব শৈশবস্মৃতি বিজড়িত ছিল, তন্মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একদিন চারি বৎসরের বালক মহেন্দ্র মাতার সহিত নৌকাযোগে মাহেশের রথদর্শনে যান। প্রত্যাবর্তনকালে সকলে দক্ষিণেশ্বরে ৺ভবতারিণীর দর্শনমানসে চাঁদনীর ঘাটে নামিয়া যখন নব-নির্মিত উদ্যান ও মন্দিরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন কালী-মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত বালক অকস্মাৎ আপনাকে জননী হইতে বিচ্যুত দেখিয়া কাঁদিতে থাকে। অমনি শ্রীমন্দির হইতে নির্গত এক সৌম্যমূর্তি ব্রাহ্মণ তাঁহার মস্তকে হস্তস্থাপনপূর্বক সান্ত্বনা প্রদান করিলে বালক সুস্থ হইয়া নির্নিমেষনয়নে তাঁহাকে দেখিতে থাকে। উত্তরকালে মাস্টার মহাশয় এই পুরুষপ্রবর সম্বন্ধে বলিতেন, "হয়তো বা ঠাকুরই হবেন; কারণ তার কিছুদিন (চার বৎসর) আগে রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ঠাকুর তখন মা-কালীর পূজকপদে

রয়েছেন।” আর একবার পাঁচ বৎসর বয়সে মাতার সহিত এক সুবৃহৎ ছাদে অবস্থানপূর্বক অসীম নীলাকাশ দর্শন করিতে করিতে তাঁহার মনে অনন্তের উদ্দীপনা জাগিয়াছিল। বৃষ্টির সময় মহেন্দ্র নিস্তব্ধ পৃথিবীবক্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া নিঝুম বারিপাতের মধ্যে অসীমের চিন্তায় মগ্ন হইতেন। কালীঘাটের ছাগবলি তাঁহাকে ব্যথিত করিত। মাতার সহিত উহা দর্শনান্তে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে উহা বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ যখন আসিল, তখন পরিণতবয়স্ক মাস্টার মহাশয়ের চিন্তাধারায় আমূল পরিবত্রন ঘটিয়াছে; সুতরাং আর কিছুই করা হয় নাই। স্নেহময়ী জননী তাঁহাকে কৈশোরেই ফেলিয়া চলিয়া যান। সেদিন মহেন্দ্র অশ্রু-বিসর্জন করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া স্বপ্নে দেখিলেন, জননী সস্নেহে বলিতেছেন, “আমি এযাবৎ তোকে লালন-পালন করেছি, পরেও তাই করব; তবে তুই দেখতে পাবি না।” জগদম্বা পরে সত্যসত্যই তাঁহার লালনের ভার লইয়াছিলেন।

মহেন্দ্রনাথের জীবনে একটা এক টানা ধর্মভাব সর্বদাই পরিস্ফুট ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তাঁহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার আশ্বিনের ঝড় মনে আছে?” তখন মহেন্দ্র উত্তর দিলেন, “আজ্ঞা হাঁ! তখন খুব কম বয়েস — নয়-দশ বৎসর বয়স — এক ঘরে একলা ঠাকুরদের ডাকছিলাম!” কোন দেবমন্দিরের পার্শ্ব দিয়া গমনাগমনকালে তিনি সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণাম করিতেন। ৺দুর্গাপূজার সময় দীর্ঘকাল ভক্তিভরে প্রতিমার সম্মুখে উপবিষ্ট থাকিতেন। যোগাদি উপলক্ষে অথবা তীর্থযাত্রাব্যপদেশে কলিকাতায় সাধুসমাগম হইলে তিনি তাঁহাদের দর্শন-স্পর্শনাদির জন্য আকুল হইতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি সানন্দে বলিতেন যে, এই সাধুসঙ্গ-স্পৃহাই তাঁহাকে

এককালে সর্বোত্তম সাধু শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আনয়নপূর্বক জীবন সার্থক করিয়াছিল। বিদ্যালয় ও কলেজের পাঠের সময় তিনি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ ইত্যাদি গ্রন্থের সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন। পাঠ্যগ্রন্থেও ধর্মভাবোদ্দীপক অংশগুলি তিনি মনে করিয়া রাখিতেন। ‘কুমারসম্ভবে’ যেখানে শিবের ধ্যানবর্ণনাচ্ছলে বলা হইয়াছে যে, গুহাভ্যন্তরে মহাদেব সমাধিমগ্ন, আর গুহাদ্বারে নন্দী বেত্রহস্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া সকল জীব ও সমস্ত প্রকৃতিকে সর্বপ্রকার চঞ্চলতা বর্জন করিতে আদেশ দিতেছেন — আর সে অলঙ্ঘ্য নির্দেশে বৃক্ষ নিষ্কম্প, ভ্রমর গুঞ্জনহীন, বিহগকুল মূক, পশুবৃন্দ নিশ্চল এবং সমগ্রকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে; অথবা ‘শকুন্তলা’য় যেখানে কণ্বমুনির আশ্রম বর্ণিত হইয়াছে; কিংবা ‘ভট্টিকাব্যে’ যেখানে রাম ও লক্ষ্মণ তাড়কাবধার্থে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞভূমিতে আগমনপূর্বক তত্রত্য বৃক্ষলতাদিকে যজ্ঞধূমে কজ্জলবর্ণে রঞ্জিত দেখিতেছেন — সেই-সব স্থল তিনি মুখস্থ করিয়া রাখিতেন। ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, “ঠাকুরের কাছে যাওয়ার আগে আমি পাগলের মতো ওই বই পড়তাম।” বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের সহিত তিনি এতই সুপরিচিত ছিলেন যে, পরে ধর্মপ্রসঙ্গে স্বীয় বক্তব্য বুঝাইবার জন্য বাইবেলের বাক্য অনর্গল উদ্ধৃত করিতে থাকিতেন। আইন-অধ্যয়নকালে তিনি মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যাদি স্মৃতি হইতে হিন্দুদের সমাজনীতির মর্মকথা শিখিয়া লইয়াছিলেন; তাই পরে বলিতেন, “ওকালতি কর আর নাই কর, আইন পড়ো; কারণ তাতে ঋষিদের আচার-ব্যবহার নিয়ম-কানুন অনেক জানতে পারবে।”

বিদ্যালয়ে বুদ্ধিমত্তার জন্য মহেন্দ্রনাথের সুনাম ছিল। তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকারপূর্বক হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এফ. এ. পরীক্ষায় তাঁহার স্থান ছিল পঞ্চম। অতঃপর ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তৃতীয় স্থান অধিকারপূর্বক প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে সসম্মানে উপাধিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি দর্শন, ইতিহাস, ইংরেজী, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি মনোযোগসহকারে আয়ত্ত করেন। ইংরেজীর অধ্যাপক টনি সাহেবের তিনি প্রিয়পাত্র ছিলেন।

কলেজের পাঠ শেষ হইবার পূর্বেই তিনি শ্রীযুক্ত ঠাকুরচরণ সেনের কন্যা এবং কেশবচন্দ্র সেনের ভগ্নীসম্পর্কীয়া শ্রীমতি নিকুঞ্জদেবীর পাণিগ্রহণ করেন (১৮৭৩)। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশান্তে তাঁহার অধ্যয়ন আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না। তিনি আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন; কিন্তু সংসারের আয়বৃদ্ধির প্রয়োজনে তাঁহাকে ওই সঙ্কল্প ত্যাগপূর্বক সওদাগরি অফিসে চাকরি লইতে হইল। পরে অধ্যাপনাকার্যে ব্রতী হইয়া তিনি বহু উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান-শিক্ষকের পদ শোভিত করেন কিংবা বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। অনেক সময় একই কালে একাধিক শিক্ষায়তনে কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি পালকিতে যাতায়াত করিতেন। ছাত্রগণ তাঁহার গাম্ভীর্য, ধর্মভাব ও সহজ অধ্যাপনাপ্রণালীতে আকৃষ্ট হওয়ায় পাঠকালে শৃঙ্খলারক্ষার জন্য তাঁহাকে বৃথা শক্তিক্ষয় করিতে হইত না। বস্তুতঃ কার্যে তিনি সুযশ অর্জন করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনের পূর্বে তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া সমাজমন্দিরে এবং ‘কমল কুটীর’ প্রভৃতি স্থানে যাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভের পর তিনি কেশবের এ-প্রকার আকর্ষণ-শক্তির

কারণনির্দেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন, “ওঃ! তাঁকে যে এত ভাল লাগত এবং দেবতা বলে মনে হত তার কারণ তিনি তখন বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করছেন এবং ঠাকুরের অমৃতময় উপদেশগুলি তাঁর নাম উল্লেখ না করে প্রচার করছেন।” শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম পরিচয় তিনি ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত ও নিজের আত্মীয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের নিকট ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে পাইয়াছিলেন। ইতোমধ্যে বিবাহের স্বল্পকাল পরেই অপ্রত্যাশিতভাবে সাংসারিক ঘাতপ্রতিঘাত আরম্ভ হওয়ায় উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য মহেন্দ্রনাথ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের একদিবস বরাহনগরে ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র কবিরাজের গৃহে আশ্রয় লইলেন। এই বাটীতে অবস্থানকালে তিনি এক সায়াহ্নে শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মজুমদারের সহিত দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে ভ্রমণ করিতে গিয়া দেখিলেন, সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তপরিবেষ্টিত হইয়া ভগবৎপ্রসঙ্গে রত আছেন। সুন্দর দেবালয়ের পবিত্র আবেষ্টন। সম্মুখে ঠাকুর যেন শুকদেবের ন্যায় ভাগবত বলিতেছেন কিংবা জগন্নাথক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ যেন রামানন্দ, স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসিয়া ভগবৎগুণকীর্তন করিতেছেন। ইহা ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়া চলে না; তথাপি মাস্টার মহাশয়ের কুতূহলী কবিসুলভ মন দেবোদ্যানের সম্পূর্ণ পরিচয়লাভের জন্য তাঁহাকে বাহিরে লইয়া চলিল। উদ্যানপর্যবেক্ষণান্তে তিনি পুনর্বার ঠাকুরের ঘরে আসিয়া বসিলেন। অচিরে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ঠাকুর অন্যমনস্ক হইতেছেন দেখিয়া মাস্টার ভাবিলেন, “ইনি ঈশ্বরচিন্তা করিবেন”, অতএব বিদায় লইলেন। গমনকালে ঠাকুর বলিয়া দিলেন, “আবার এসো।”

দ্বিতীয় দর্শন হইল সকালবেলা আটটায়। ঠাকুর পুনঃ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসান্তে অবিবাহিত জীবনের প্রশংসা করিতে করিতে জানিতে চাহিলেন, তাঁহার বিবাহ হইয়াছে কি না। মাস্টার কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ!" অমনি ঠাকুর স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "ওরে রামলাল, যাঃ বিয়ে করে ফেলেছে!" তারপর তিনি প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে, মাস্টারের একটি ছেলেও হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রে ঠাকুরের প্রতিক্রিয়া-দর্শনে মাস্টার মহাশয়ের প্রতীতি হইল যে, এযাবৎ যদিও তিনি ধর্মচর্চা ও উপাসনাদি করিয়াছেন, তথাপি আদর্শ ধার্মিকের দৃষ্টিতে তিনি জাগতিক স্তরের অধিক ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। এইরূপে তাঁহার অভিমান প্রতিপদে চূর্ণীকৃত হইতে থাকিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সম্পূর্ণ উৎসাহশূন্য না করিয়া যেন সান্ত্বনাচ্ছলেই বলিলেন, "দেখ, তোমার লক্ষণ ভাল ছিল — আমি কপাল চোখ ইত্যাদি দেখলে বুঝতে পারি।" ইহাতে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেও মাস্টার মহাশয়কে শীঘ্রই আরও কয়েকটি আঘাতে সম্পূর্ণ অবনত হইতে হইল। ক্যান্ট, হেগেল, হার্বার্ট স্পেনসার প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতবাদের সহিত সুপরিচিত মাস্টার মহাশয়ের ধারণা ছিল যে, মানবজীবনে বুদ্ধিই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু এবং যাহার বিদ্যালাভ হইয়াছে, সেই প্রকৃত জ্ঞানী। কিন্তু আজ সেরূপ শিক্ষাহীন ঠাকুরের নিকট তিনি জানিলেন, ঈশ্বরকে জানাই জ্ঞান, আর সব অজ্ঞান। অমনি আবার প্রশ্ন হইল, তিনি সাকারে বিশ্বাসী কিংবা নিরাকারে? মাস্টার বলিলেন, তাঁহার নিরাকার ভাল লাগে। ঠাকুর জানাইলেন যে, নিরাকারে বিশ্বাস থাকা উত্তম বটে, তবে সাকারও সত্য। এই বিরুদ্ধ বিশ্বাসদ্বয় কিরূপে সত্য হইতে পারে, তাহার নির্ণয়ে অসমর্থ মাস্টার মহাশয়ের অভিমান তৃতীয়বার চূর্ণ হইল। কিন্তু ইহাতেও শেষ হইল না — তিনি আবার শুনিলেন যে, মন্দিরের দেবী মৃন্ময়ী নহেন, চিন্ময়ী! মাস্টার তখনি বলিয়া উঠিলেন যে, তাহাই যদি সত্য হয় তবে

যাঁহারা প্রতিমায় উপাসনা করেন, তঁহাদিগের তো বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, বস্তুতঃ মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নহে, প্রতিমায় ঈশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া পূজা করা হয় মাত্র। অমনি শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া উঠিলেন, “কলকাতার লোকের ওই এক! কেবল লেক্চার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া! যদি বুঝাবার দরকার হয়, তিনিই বুঝাবেন। তোমার মাথাব্যাথা কেন? তোমার নিজের যাতে জ্ঞানভক্তি হয়, তার চেষ্টা কর।” মাস্টারের অভিমানের সৌধ একেবারে ভূমিসাৎ হইল। তিনি বুঝিলেন, ধর্ম অনুভূতির বস্তু — বুদ্ধি ততদূর অগ্রসর হইতে পারে না; বুদ্ধিরূপ দুর্বল যন্ত্র-সাহায্যে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে না। এবং তাদৃশ তত্ত্বলাভের জন্য তত্ত্বদর্শী সাধুদের সঙ্গ অত্যাবশ্যক — তদ্ব্যতীত অতি মার্জিত বুদ্ধিও আমাদিগকে ভগবৎসকাশে লইয়া যাইতে অসমর্থ হয়। ইহার পর তিনি সম্পূর্ণরূপে আপনাকে শ্রীরামকৃষ্ণচরণে ঢালিয়া দিয়া গৃহে ফিরিলেন।

আরও কিছুদিন বরাহনগরেই অবস্থানের সুযোগে মাস্টার মহাশয় উপর্যুপরি কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে গনমাগমন করিয়া অচিরে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ-সমাজের অঙ্গীভূত হইলেন এবং ঠাকুরের ও মাস্টারের প্রতি কার্যে ও কথায় ওই অন্তরঙ্গ সহজ ভাবেরই প্রকাশ হইতে থাকিল। এইরূপে ওই বৎসর একদিন মাস্টার মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবামাত্র ঠাকুর সকৌতুকে সমবেত বালক ভক্তদিগকে বলিলেন, “ওইরে আবার এসেছ!” বলিয়াই অহিফেনের দ্বারা বশীকৃত একটি ময়ূরের গল্প বলিলেন — ওই ময়ূরকে প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে আফিম দেওয়া হইত এবং ময়ূরেরও এমনি মৌতাত ধরিয়াছিল যে, সে প্রত্যহ ঠিক সময়ে একই স্থানে উপস্থিত হইত। মাস্টার মহাশয়ের সত্যই তখন মৌতাত ধরিয়াছে। তিনি গৃহে বসিয়া দক্ষিণেশ্বরের চিন্তা করেন; দীর্ঘ বিরহ অসহ্য বোধ

হইলে ছুটিয়া শ্রীগুরুপদে উপস্থিত হন। একবার বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রে পদব্রজে ঘর্মাক্ত-কলেবরে মহেন্দ্রনাথকে কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বরে আগত দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "এর মধ্যে (নিজের দেহ দেখাইয়া) কি একটা আছে যার টানে ইংলিশম্যানরা (ইংরেজী-শিক্ষিতেরা) পর্যন্ত ছুটে আসে।" এই টানের কারণ নির্দেশ করিয়া ঠাকুর একদিন মাস্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "তোমার এখানকার প্রতি এত টান কেন? কলিকাতায় অসংখ্য লোকের বাস, তাদের কারও প্রীতি হল না, তোমার হল কেন? এর কারণ জন্মান্তরে সংস্কার।" আর একবার বলিয়াছিলেন, "দেখ, তোমার ঘর, তুমি কে, তোমার অন্তর-বাহির, তোমার আগেকার কথা, তোমার পরে কি হবে — এ-সব তো আমি জানি!" অন্য প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, "সাদা চোখে গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ সব দেখেছিলাম — তার মধ্যে তোমায়ও যেন দেখেছিলাম।" আরও পরিষ্কার করিয়া একসময়ে কহিলেন, "তোমায় চিনেছি — তোমার 'চৈতন্য-ভাগবত' পড়া শুনে। তুমি আপনার জন, এক সত্তা — যেমন পিতা আর পুত্র।"

এরূপ সংস্কারবান উচ্চাধিকারীকে ঠাকুর উপদেশ ও সাধনা-সহায়ে ক্রমে অনুভূতির ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতর স্তরে তুলিয়া লইয়া চলিলেন। ত্রিকালজ্ঞ ঠাকুর মাস্টার মহাশয়ের অন্তরের সহিত সুপরিচিত থাকায় তাঁহাকে সদ্‌গৃহস্থ হইবারই উপদেশ দিতেন এবং তাঁহার মনে কখনও বৈরাগ্য আসিলে সংসারাশ্রমের উত্তম দিকটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নিবৃত্ত করাইতেন। একদিন তাই জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিলেন, "সব ত্যাগ করিয়ো না, মা। .... সংসারে যদি রাখ, তো এক একবার দেখা দিস — না হলে কেমন করে থাকবে? এক একবার দেখা না দিলে উৎসাহ হবে কেমন করে, মা? — তারপর, শেষে যা হয় করো।"

অপরাপর দিবসে সংসারে কিরূপে থাকিতে হয় তাহার উপদেশ দিতেন, "ছেলে হয়েছে শুনে বকেছিলাম। এখন গিয়ে বাড়িতে থাক। তাদের জানিও যেন তুমি তাদের আপনার। ভিতরে জানবে, তুমিও তাদের আপনার নও, তারাও তোমার আপনার নয়।" "আর বাপের সঙ্গে প্রীত করো। এখন উড়তে শিখে বাপকে অষ্টাঙ্গ-প্রণাম করতে পারবে না? .... মা আর জননী — যিনি জগৎরূপে আছেন সর্বব্যাপী হয়ে, তিনিই মা।" "যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন দেয়, সে অবিদ্যা স্ত্রী; ..... অমন স্ত্রী ত্যাগ করবে।" আবার একটু পরেই এইরূপ কঠোর আদেশ শ্রবণে চিন্তাকুল মাস্টারের নিকটে গিয়া তত্ত্বকথা শুনাইলেন, "কিন্তু যার ঈশ্বরে আন্তরিক ভক্তি আছে, তার সকলেই বশে আসে। ..... ভক্তি থাকলেও স্ত্রীও ক্রমে ঈশ্বরের পথে যেতে পারে। ..... সব কাজ করবে, কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে।" আর উপদেশ দিয়েছিলেন, "ঈশ্বরের নামগুণগান সর্বদা করতে হয়। আর সৎসঙ্গ — ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয়-কাজের ভিতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন।" "ঈশ্বরে ভক্তি লাভ না করে যদি সংসার করতে যাও, তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। ..... তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়। ..... ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।"

ঠাকুর মাস্টার মহাশয়কে প্রধানতঃ শুদ্ধাভক্তিরই উপদেশ দিতেন। একদিন বলিলেন, "দেখ, তুমি যা বিচার করেছ, অনেক হয়েছে — আর না। বল, আর করবে না।" মাস্টার যুক্তকরে বলিলেন, "আজ্ঞে, না।" মাস্টার স্বভাবতঃ লাজুক

ছিলেন। নৃত্যকালে ঠাকুর একদিন তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, “এই শালা, নাচ!” আর তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন সর্বদা ভগবদালাপ করিতে। একদিন মাস্টার ও নরেন্দ্র বিদ্যলয়ের ছাত্রদের নৈতিক অবনতির কথা আলোচনা করিতেছেন জানিয়া মাস্টারকে বলিলেন, “এ-সব কথাবার্তা ভাল নয় — ঈশ্বরের কথা বই অন্য কথা ভাল নয়।” এইরূপে সাধুসঙ্গ, নির্জন-বাস এবং ভগবদালাপনের সঙ্গে ব্যকুলতার প্রয়োজনও তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়।” এইসব স্থলে ব্যাকুলতার উল্লেখ দেখিয়া এবং পূর্বে বিচার-বিষয়ক নিষেধবাক্য শুনিয়া পাঠক যেন মনে করিবেন না যে, ঠাকুর মাস্টার মহাশয়কে ভাবুকতায় ডুবাইতে চাহিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমাদের মনে যে বৃথা তর্কপ্রবণতা আসে এবং ভগবৎসম্বন্ধহীন বুদ্ধিমত্তার প্রতি শ্রদ্ধা ও আগ্রহে জন্মে, মাস্টার মহাশয়কে তাহা হইতে নিরস্ত করিয়া ঈশ্বরাভিমুখ সফল বিচারে প্রবৃত্ত করাই ছিল ঠাকুরের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই তাঁহাকে বলিতে শুনি, “সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার — কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয় .... এই পর্যন্ত; ভগবানলাভ হয় না! তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না, এর নাম বিচার। বুঝেছ?”

মহেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে যান, নীরবে সব শুনেন ও দেখেন এবং সমস্ত ব্যাপার ও পরিবেশটি স্মৃতিতে মুদ্রিত করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনান্তে পূর্বাভ্যাসানুসারে দিনলিপিতে সংক্ষেপে বা বিস্তারিতভাবে লিখিয়া রাখেন। এই প্রকারেই যথাকালে ‘কথামৃতে’র সৃষ্টি হয়।

মাস্টার মহাশয় প্রথমতঃ নিরাকারেই আসক্ত ছিলেন এবং ঠাকুরও তাঁহাকে অদনুরূপ উপদেশই দিতেন। একবার মতি শীলের ঝিলে ক্রীড়ারত মৎস্যগুলিকে দেখাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, নিরাকার ব্রহ্মে ওইরূপে মন নিমগ্ন রহিয়াছে বলিয়া চিন্তা করিতে হয়। মাস্টার সেই পথেই চলিতেছিলেন; কিন্তু অবশেষে একদিন তিনি স্বীকার করিলেন, "আমি দেখছি, প্রথমে নিরাকারে মন স্থির করা সহজ নয়।" ঠাকুর অমনি উত্তর দিলেন, "দেখলে তো? তাহলে সাকার-ধ্যানই কর না কেন?" মাস্টার উহা অবনতমস্তকে স্বীকারপূর্বক তাঁহারই নির্দেশানুসারে ধ্যানভজনাদি করিতে লাগিলেন। দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতও অধিকাধিক হইতে লাগিল; অবসরমত দুই-চারিদিন তিনি সেখানে থাকিয়াও যাইতেন। এইরূপে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রায় সমগ্র ডিসেম্বর মাসটি তিনি শ্রীগুরুসকাশে যাপন করেন।

এদিকে সাধনা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে মাস্টার মহাশয়ের ধারণা পরিবর্তিত হইতেছিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে যে মাস্টার মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "এইরূপ জ্ঞান বা প্রেমভক্তি বা বিশ্বাস বা বৈরাগ্য বা উদার ভাব কখনও কোথাও দেখি নাই;" তিনিই ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে স্বীকার করিলেন, "আপনাকে ঈশ্বর স্বয়ং হাতে গড়েছেন। অন্য লোকদের কলে ফেলে তয়ের করেছেন — যেমন আইন-অনুসারে সব সৃষ্টি হচ্ছে;" আর তিনিই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে জানাইলেন, "আমার মনে হয় যীশুখ্রীষ্ট, চৈতন্য ও আপনি এক।" ঠাকুরের একটি উপদেশের আবৃত্তি করিয়া মাস্টার যখন বলিলেন যে, অবতার যেন একটি বড় ফাঁক, যাহার ভিতর দিয়া অনন্ত ঈশ্বরকে দেখা যায়, ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, বল দেখি সে ফাঁকটি কি?"

মাস্টার বলিলেন, “সে ফোকর আপনি।” অমনি ঠাকুর তাঁহার গা চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিলেন, “তুমি যে ওইটে বুঝে ফেলেছ — বেশ হয়েছে!”

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কাশীপুরে অসুস্থ, তখন মাস্টার কামারপুকুরদর্শনে গিয়াছিলেন। সঙ্গে গরুর গাড়ি থাকা সত্ত্বেও তিনি বর্ধমান হইতে অধিকাংশ পথ পদব্রজে গিয়াছিলেন। সেই পথে সে সময়ে দস্যুর উপদ্রব ছিল; তাই পথিককে সর্বদা শঙ্কিত থাকিতে হইত। তখন মাস্টারের চক্ষে নবানুরাগের অঞ্জন — দূর হইতে কামারপুকুর দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন, কামারপুকুরের পথে যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহাকেই অভিবাদন জানাইলেন; আর সর্বত্রই ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত জানিয়া পুলকিতচিত্তে সবই দর্শন-স্পর্শন করিতে লাগিলেন। রোগশয্যায় শায়িত ঠাকুর এই সমস্ত অবগত হইয়া একজন ভক্তকে বলিয়াছিলেন, “দেখ, তার কি ভালবাসা! কেউ তাকে বলেনি, ভক্তির অধিক্য আপনা থেকে এত কষ্ট করে ওইসব জায়গায় গিয়েছিল — কারণ আমি সে সব জায়গায় যাতায়াত করতাম। এর ভক্তি বিভীষণের মতো। বিভীষণ মানুষ দেখলে ভাল করে সাজিয়ে পূজো-আরতি করত, আর বলত, এই আমার প্রভু রামচন্দ্রের একটি মূর্তি।” আর কামারপুকুর হইতে প্রত্যাগত মাস্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, “কি করে গেলে ও-ডাকাতের দেশে? আমি ভাল হলে একসঙ্গে যাব।” সশরীরে একসঙ্গে যাওয়া অবশ্য হয় নাই; কিন্তু মাস্টার মহাশয়ের হৃদয়ে অবস্থানপূর্বক তিনি তাঁহাকে আরও আট-নয় বার কামারপুকুরে লইয়া গিয়াছিলেন। কামারপুকুরের প্রতি মাস্টার মহাশয় একসময়ে এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে সেখানে স্থায়িভাবে বসবাসের আকাঙ্ক্ষা শ্রীশ্রীমায়ের নিকট

নিবেদন করেন। মা কিন্তু সহাস্যে বলেন, “বাবা, ও-জায়গা ম্যালেরিয়ার ডিপো — ওখানে থাকতে পারবে না।” অবশেষে মায়ের আদেশই প্রতিপালিত হইল।

বাল্যের ন্যায় যৌবনেও মাস্টার মহাশয় প্রকৃতিক সৌন্দর্য, গাম্ভীর্য ও অসীমতার মধ্যে ভগবানের গোপন-হস্তের আভাস পাইতেন। ঠাকুরের লীলাকালে তিনি একবার কাঞ্চনজঙ্ঘা-শিখর দর্শনপূর্বক আনন্দে আপ্লুত ও ভক্তিতে পুলকিত হন। প্রত্যাবতর্তনের পর ঠাকুর তাই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “কেমন, হিমালয় দর্শন করে ঈশ্বরকে মনে পড়েছিল?”

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত মাস্টারের তর্ক বাধাইয়া দিয়া মজা দেখিতেন। স্বভাবতঃ লাজুক মাস্টারের মুখে কিন্তু তখন কথা ফুটিত না; তাই ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “পাশ করলে কি হয়, মাস্টারটার মাদীভাব, কথা কইতেই পারে না।” আর একদিন তিনি গান গাহিতে সঙ্কুচিত হওয়ায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “ও স্কুলে দাঁত বার করবে; আর এখানে গান গাইতেই যত লজ্জা।” কখনও বা বলিতেন, “এর সখীভাব।”

যাহা হউক, এই নম্রপ্রকৃতির মানুষটির সহিত পুরুষসিংহ নরেন্দ্রের প্রগাঢ় প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে কোনও বাধা হয় নাই। পিতৃবিয়োগের পর নরেন্দ্রের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে মাস্টার মহাশয় তাঁহাকে মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য যোগাড় করিয়া দেন; একবার নরেন্দ্রের বাড়ির তিন মাসের খরচ চালাইবার জন্য একশত টাকা দেন; এতদ্ব্যতীত গোপনে নরেন্দ্র-জননীর হস্তে টাকা দিয়া বলিতেন, নরেন্দ্রকে যেন জানানো না হয়, নচেৎ তিনি উহা প্রত্যবর্তন করিবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর যখন যুবক ভক্তগণ সহায়-সম্পদহীন, তখন বিরল

দুই-চারিজন গৃহস্থ ভক্তের সহিত মাস্টার মহাশয় তাঁহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং অর্থ ও সৎপরামর্শ দিয়া বরাহনগরের মঠ-সংগঠন ও সংরক্ষণ সম্ভবপর করিয়াছিলেন। ছুটির দিনে প্রায়ই ওই মঠে আসিয়া রাত্রিযাপন করিতেন। এই-সকল কথা স্মরণপূর্বক স্বামী বিবেকানন্দ পরে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, “রাখাল, ঠাকুরের দেহত্যাগের পর মনে আছে, সকলে আমাদের ত্যাগ করে দিলে — হাবাতে (গরীব ছোঁড়াগুলি) মনে করে? কেবল বলরাম, সুরেশ (সুরেন্দ্র মিত্র), মাস্টার ও চুনীবাবু — এঁরা সকলে বিপদে আমাদের বন্ধু। অতএব এঁদের ঋণ আমরা কখনও পরিশোধ করতে পারব না।”

শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনের পরে জাগতিক দৃষ্টিতে বিছিন্ন মাস্টার মহাশয় তীর্থদর্শন সাধুসঙ্গ ও তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে তিনি পুরী, কাশী, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, অযোধ্যা, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করেন এবং শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী ও রঘুনাথদাস বাবাজীর দর্শনলাভে ধন্য হন। তাঁহার সাধনার ইতিহাস বড়ই চমকপ্রদ। এক সময়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী-কুটীরে তপস্যায় রত হন, কিন্তু আর্দ্র গৃহে কঠোর জীবনযাপনের ফলে অসুস্থ ও চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়ায় স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহাকে গাড়ি করিয়া গৃহে লইয়া যান। বরাহনগরের মঠে বাসের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণেশ্বরে নহবতের ঘরেও তিনি মধ্যেমধ্যে রাত্রিযাপন করিতেন। আর এক অদ্ভুত খেয়াল ছিল তাঁহার, স্বগৃহে অবস্থানকালে তিনি গভীর রাত্রে গাত্রোত্থানপূর্বক শয্যা লইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলের বারান্দায় উপস্থিত হইতেন এবং তথায় গৃহহীনদের মধ্যে শয়নপূর্বক আপনাতেও সহায়সম্বলহীন গৃহশূন্য ব্যক্তির অবস্থা-আরোপের চেষ্টা করিতেন। পরে কেহ যদি ওই গুপ্ত সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিত,

“এত কঠোরতা করতেন কেন?” তিনি উত্তর দিতেন, “গৃহ ও পরিবারের ভাব মনে থেকে যেতে চায় না, আঠার মতো লেগে থাকে।” পর্ব উপলক্ষে তিনি গঙ্গাতীরে সমবেত সাধুদের সন্নিকটে গভীর রাত্রে যাইয়া দেখিতেন, মুক্তাকাশতলে কেমন তাঁহার প্রজ্বলিত অগ্নিপার্শ্বে ধ্যানমগ্ন বা জপরত রহিয়াছেন। কখনও হাওড়া স্টেশনে যাইয়া জগন্নাথক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত যাত্রীদের প্রসন্নবদন নিরীক্ষণ করিতেন, অথবা মহাপ্রসাদ চাহিয়া খাইতেন — উদ্দেশ্য, এইভাবে ওই মহাতীর্থে গমনের অন্ততঃ কিঞ্চিৎ ফললাভ হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণের চির সামীপ্যবোধের জন্য তিনি দিবাভাগেও অবসরকালে স্বকক্ষে প্রবেশপূর্বক পুরাতন দিনলিপি খুলিয়া শ্রীমুখনিঃসৃত কথামৃত পাঠ ও ধ্যান করিতেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ৺দুর্গাপূজার পরে তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সহিত কাশীধামে যান এবং তথায় কিয়দ্দিবস যাপনানন্তে প্রায় একবৎসর তীর্থভ্রমণাদি করেন। এই অবকাশে তিনি মাসাধিককাল কনখল সেবাশ্রম হইতে কিয়দ্দূরে একটি কুটিয়ায় থাকিয়া তপস্যা করেন। তখন স্বামী তুরীয়ানন্দ কনখল সেবাশ্রমে ছিলেন; তাঁহার সহিত ভ্রমণ ও আলোচনাদি করিয়া মাস্টার মহাশয় খুব আনন্দিত হইতেন। ইহার পরে তিনি বৃন্দাবনে যাইয়া ঝুলন দর্শন করেন এবং রাসধারীদের অভিনীত ‘কৃষ্ণ-সুদামা’র পালা দেখিয়া আহ্লাদিত হন।

প্রকাশ্যে এই-সকল সাধনা ছাড়াও অনাড়ম্বর যোগী মাস্টার মহাশয়ের তপোনিষ্ঠা বিভিন্ন প্রচ্ছন্ন ধারায় প্রবাহিত হইত। ঋষিদের ভাব আপনাতে আরোপ করিবার জন্য তিনি কখন হবিষ্যান্ন-ভোজন বা পর্ণকুটিরে বাস করিতেন; কখন বা বৃক্ষমূলে একাকী উপবিষ্ট থাকিতেন, আর বিশাল আকাশ, গগনচুম্বী পর্বত,

অপার সমুদ্র, সমুজ্জ্বল তারকামণ্ডলী, দিগন্ত-প্রসারিত প্রান্তর, সুন্দর নিবিড় বনানী, সুকোমল সুগন্ধ পুষ্প ইত্যাদি সমস্তই তাঁহার চিত্তে ঈশ্বরীয় চিন্তা সঞ্জীবিত করিয়া তাঁহাকে মুহুর্মুহুঃ ঋষিদের তপোভূমিতে লইয়া যাইত। সুযোগ পাইলেই তাঁহার অন্তর্নিহিত সাধনাভিলাষ উদ্দীপিত হইত। এইরূপে ১৯২৩ অব্দে মিহিজামে পাকা বাটী থাকা সত্ত্বেও তিনি নয় মাস পর্ণকুটিরে বাস করিয়াছিলেন এবং ১৯২৫-এর শেষে পুরীতে চারি মাস নির্জনে অবস্থানপূর্বক সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মন ছিল উচ্চসুরে বাঁধা; প্রভাতসূর্য দেখিলেই দিব্যভাব-গ্রহণে সদা উন্মুখ মাস্টার মহাশয়ের মুখে গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারিত হইত। ফলতঃ সর্বদা প্রাচীনের চিন্তাধারায় আপ্লুত মাস্টার মহাশয়ের দেহমনে প্রাচীনের একটা সুস্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছিল। তাই তিনি যখন নিবিষ্টমনে উপনিষদের কোন শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেন, তখন অনুভব হইত যেন কোন শ্বেতশ্মশ্রু, প্রশান্তললাট, সৌম্যবপু, সপ্ততিপর বৈদিক ঋষি মরধামে নামিয়া আসিয়াছেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদের গার্গীর দ্বিতীয় বারের প্রশ্নের তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেন। একবার (১৯২১ খ্রী:) ওই অংশের ব্যাখ্যাকালে তিনি আবেগে এতই অভিভুত হইয়া পড়েন যে, সামলাতে না পারিয়া শয্যাগ্রহণ করেন; অনেক্ষণ বাতাস করার পর তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসেন।

গৃহে থাকিলেও তাঁহার সাধুচিত অশেষ সদ্‌গুণরাশি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। প্রাতে স্নানান্তে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় তিনি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ধ্যানে বসিতেন। সর্বদা এই চিন্তা মনে জাগাইয়া রাখিতেন যে, সংসার অসার এবং সমস্ত বস্তুর উপরই মৃত্যুর করাল ছায়া বর্তমান, আর বলিতেন, “মৃত্যুচিন্তা থাকলে কখনও বেতালে পা পড়ে না বা কোনও জিনিসে আসক্তি থাকে না।”

সংসারের প্রয়োজনেও তিনি কাহাকেও রূঢ় কথা বলিতে পারিতেন না। অন্যায় দেখিলে বলিতেন, “যার যেরকম স্বভাব ঈশ্বর দিয়েছেন, সে তাই করছে — মানুষের আর দোষ কি?” সর্ববিষয়ে তিনি ছিলেন স্বাবলম্বী — নিকটে ভৃত্য থাকিলেও তাহার সেবাগ্রহণে পরাঙ্‌মুখ হইতেন। এমনকি, আটাত্তর বৎসর বয়সে স্নায়ুশূলে হস্ত নিদারুণ ব্যথিত হইলেও যন্ত্রণা-উপশমের জন্য স্বহস্তে পুঁটুলি গরম করিয়া সেঁক দিতেন। আবার এত সদ্‌গুণের আধার হইয়াও প্রশংসা-শ্রবণে উত্যক্তস্বরে বলিতেন, “Mutual admiration (পারস্পরিক প্রশংসা) রেখে দাও।” নিরাভিমান মাস্টার মহাশয় ‘আমি, আমার’ উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, তাই বহুবচন পরয়োগ করিতেন বা গৌণভাবে কথা কহিতেন। তাঁহার বাড়ির প্রচলিত নাম ছিল ‘ঠাকুর বাড়ি’। তিনি কখন কখন ভবানীপুরে গদাধর-আশ্রমে থাকিতেন। একবার ওইরূপ দীর্ঘকাল অবস্থানের সময়ে কার্যোপলক্ষে উত্তর কলিকাতায় স্বপ্রতিষ্টিত বিদ্যালয়ে যাইতে হইলে বলিয়া যাইতেন, “আমি এখানে খাব না — এক ভক্তের বাড়ি যাচ্ছি।” ভক্ত আর কেহ নহেন, তিনি স্বয়ং।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নানা বিদ্যালয়ে অধ্যাপনাদির পর তিনি ঝামাপুকুরে মর্টন ইন্‌স্টিটিউট ক্রয় করেন। বিদ্যালয় পরে ৫০ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়। এই বাটীর চার তলায় ঘরখানিতে তিনি থাকিতেন এবং তুলসী ও পুষ্পবৃক্ষে সজ্জিত গৃহছাদে বসিয়া সকাল-সন্ধ্যায় ধর্মালাপ করিতেন। ওই কক্ষই ছিল তাঁহার বাসস্থান বা আশ্রম; দিবসে একবারমাত্র গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে স্বগৃহে যাইয়া বৈষয়িক ব্যবস্থাদি করিতেন। ক্রমে এইটুকু সংসার-সম্পর্কও তিরোহিত হইয়া তাঁহাকে ভগবৎপ্রসঙ্গের জন্য সম্পূর্ণ মুক্তিপ্রদান করিল। ‘কথামৃত’ প্রকাশের পর দেশ-বিদেশ হইতে অগণিত ভক্ত পিপাসা মিটাইতে তাঁহার নিকট

আসিত এবং মাস্টার মহাশয়ও তাঁহাদিগকে স্বীয় ভাণ্ড উজাড় করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনাইতেন।

শেষজীবনে যাঁহারা মাস্টার মহাশয়কে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহার বাসস্থান তখন প্রাচীন ঋষিদের তপোভূমিতে পরিণত হইয়াছিল — সংসারের প্রবল তরঙ্গদ্বেলিত স্রোত নিম্নে প্রবাহিত, আর রাজপথের কোলাহলের ঊর্ধ্বে হিমালয়ের নীরবতা বিরাজিত! যখন যিনিই যান না কেন মাস্টার মহাশয়কে দেখেন শুধু জ্ঞান-ভক্তির আলোচনাতেই মগ্ন! ভক্ত ও সাধু-সঙ্গে তাঁহার অসীম আনন্দ, অবিরাম ভগবদালাপনে দীর্ঘকাল যাপন এবং ভক্তদের সহিত অধিকাধিক মিলনের আগ্রহ না দেখিয়া থাকিলে কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। সে মধুর আলাপনে লুব্ধ বহু ব্যক্তি নিত্য সেই অধ্যাত্মতীর্থে অবগাহন করিতে যাইতেন এবং উপস্থিত হইয়াই দেখিতেন, হয়তো কোন সদ্গ্রন্থপাঠ চলিতেছে এবং মাস্টার মহাশয় মধ্যে মধ্যে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশপূর্বক জটিল অংশ সরল কিংবা সরস করিতেছেন, অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে অনর্গল অমৃতধারা প্রবাহিত করিতেছেন এবং বাইবেল, পুরাণ, উপনিষদাদি হইতে বাক্য উদ্ধারপূর্বক, কিংবা যীশু, চৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির জীবনের অনুরূপ ঘটনা বিবৃত করিয়া সকলকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসাইয়া রাখিয়াছেন। কেহ অবান্তর বিষয়ের উল্লেখ করিলে তিনি কৌশলে আলোচনার ধারাকে ভগবন্মুখী করিয়া দিতেন। দক্ষিণেশ্বরে মাস্টার মহাশয়কে একদিন সংসারত্যাগের চিন্তায় মগ্ন দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছেন, "যতদিন তুমি এখানে আসনি ততদিন তুমি আত্মবিস্মৃত ছিলে। এখন তুমি নিজেকে জানতে পারবে। ভগবানের বানী যারা প্রচার করবে তাদের তিনি একটু বন্ধন দিয়ে সংসারে রাখেন, তা না হলে তাঁর কথা বলবে

কারা? সেইজন্য মা তোমাকে সংসারে রেখেছেন।” শ্রীশ্রীজগদম্বার মহিমাপ্রচারের জন্য ঠাকুর যাঁহাদিগকে ‘চারপাশ-প্রাপ্ত’ বলিয়া মনে করিতেন, মাস্টার মহাশয় ছিলেন তাঁহাদেরই অন্যতম।

শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদের প্রতি মাস্টার মহাশয়ের প্রীতির কিঞ্চিৎ পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। ইঁহাদের কাহারও কাহারও ছবি স্বগৃহে রাখিয়া তিনি সকাল-সন্ধ্যায় পূজা করিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের শেষ অসুখের সময় তিনি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিতেন এবং তাঁহার দেহত্যাগের পরও নিজের বিছানায় পড়িয়া অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলেন।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কালীকৃষ্ণ (স্বামী বিরজানন্দ) প্রভৃতি যুবকগণ যদিও রিপণ কলেজে তাঁহারই নিকট পড়িতেন, তথাপি তাঁহার ধর্মভাবের সহিত পরিচিত ছিলেন না। তাঁহারা রামবাবুর আকর্ষণে কাঁকুড়গাছিতে যাতায়াত করিতেন। ইঁহাদের সকলেরই মধ্যে ত্যাগের ভাব ছিল; অথচ রামবাবুর তদানীন্তন ধারণা ছিল অন্যরূপ। তিনি বলিতেন, “বিলে (অর্থাৎ বিবেকানন্দ) তো ঠাকুরকে মানতই না, তর্ক করত,” “ঠাকুরকেই যদি ভগবান বলে বিশ্বাস হল, তবে তাঁর কথাই তো শাস্ত্র; অপর শাস্ত্রের দরকার কি? ঠাকুরকে বকলমা দিলেই হল; আর কোন সাধন-ভজনের দরকার নেই। সংসারের মধ্যে থেকেই ঠাকুরকে ডাকলে তিনি কৃপা করবেন” ইত্যাদি। অতএব কাঁকুড়গাছিতে তাঁহারা বরাহনগর মঠ কিংবা মঠবাসী সাধুদের কোন সংবাদই পান নাই। এদিকে তাঁহাদের উৎসুক নয়ন শীঘ্রই আবিষ্কার করিল যে, তাঁহাদের গম্ভীরপ্রকৃতি ও বেশভূষায় পারিপাট্যহীন মাস্টার মহাশয় কলেজের অবসরকালে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া বাড়ির ছাদে উঠিয়া নিজের নোটবুকখানি (অর্থাৎ ‘কথামৃত’) নিবিষ্টমনে পড়েন। তাঁহার

অন্যান্য চাল-চলনও একটু অসাধারণ। অতএব তাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাঁহার প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ করিলেন এবং অতঃপর আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার গৃহেও গেলেন। মাস্টার মহাশয় মাদুর পাতিয়া তাঁহাদিগকে বসাইলেন এবং নিজেও পার্শ্বে বসিলেন — আধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে সাধারণতঃ যে কায়দাদুরস্ত ব্যবহার দেখা যায়, এখানে তাহার কিছুই ছিল না। এইরূপে যুবকদিগের হৃদয় জয় করিয়া লইয়া মাস্টার বলিলেন, "দেখ, ঠাকুর ছিলেন কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী; তাঁকে বুঝতে হলে, তাঁর প্রকৃত বাণি পেতে হলে, তাঁর যে-সকল শিষ্য কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী, তাঁদের সঙ্গ করতে হয়; গৃহস্থেরা হাজার হোক ঠাকুরের ভাব ঠিক বলতে পারে না।" এই উপদেশের ফলে এই যুবকগণ বরাহনগরে যাতায়াত আরম্ভ করেন এবং যথাকালে সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক মঠ ও মিশনের মুখ উজ্জ্বল করেন।

মাস্টার মহাশয় গৃহী হইয়াও ত্যাগের মহিমা এইরূপ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেন যে, তাঁহার অনুপ্রেরণায় অনেকে সন্ন্যাসী হইতেন। জনৈক ভক্তকে তিনি বলিয়াছিলেন, "সাধুসঙ্গ করলে শাস্ত্রের মানে বুঝা যায়।" আর একজনকে বলিয়াছিলেন, "হয় সাধুসঙ্গ, না হয় নিঃসঙ্গ! বিষয়ীদের সঙ্গ করলেই পতন।" আবার বলিতেন, "যখন সাধুসঙ্গ পাওয়া যাবে না, তখন সাধুদের ফটো বা ছবি ঘরে রেখে ধ্যান করবে।" এইসব উপদেশ দিয়া তিনি আরো বলিতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলীর মর্মকথা ছিল ত্যাগ; এমনকি, গৃহস্থদিগকে তিনি যে উপদেশ দিতেন তন্মধ্যেও ত্যাগের বীজ লুক্কায়িত থাকিত এবং বিশেষ অনুকূল ক্ষেত্রে এই জন্মেই উহা অঙ্কুরিত হইয়া পত্র-পুষ্প-ফলে সুশোভিত হইত; অপর স্থলে ভাবী জন্মে ওইরূপ পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। জনৈক ভক্তকে তিনি একদিন

বলিয়াছিলেন, “দেখ না, তিনি চন্দ্রসূর্যকে আলো ও উত্তাপ দেবার জন্য রোজ পাঠিয়ে দিচ্ছেন — আমরা দেখে অবাক্। লোকের চৈতন্য হবার জন্য তিনি সাধুদের পাঠিয়ে দিচ্ছেন। তাঁরাই শ্রেষ্ঠ মানব। সাধুরাই তাঁকে বেশি ধরতে পারেন। তাঁরা সোজা পথে উঠেছেন, তাঁরাই ভগবানকে লাভ করতে পারেন।” ভক্ত আপত্তি জানাইলেন, “এই যে সব সাধুরা আসেন, এঁরা কি সকলেই সর্বোচ্চ আদর্শ নিয়ে আসছেন?” মাস্টার মহাশয় ঈষন্মাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া উত্তর দিলেন, “এঁদের দেখলে উদ্দীপন হয়। কত বড় ত্যাগ! সব ছেড়েছুড়ে রয়েছেন! চৈতন্যদেব গাধার পিঠে গৈরিক বস্ত্র দেখে সাষ্টাঙ্গ হয়েছিলেন। সংসারীরা কলঙ্কসাগরে মগ্ন হয়েও আবার কলঙ্ক অর্জন করছে। .... সাধুরা যদি অন্যায়ও করে তবু আবার ঝেড়ে ফেলতে পারে। সৎসঙ্গে যেটুকু ভাব পাওয়া যায় সেইটুকুই লাভ।” সাধু আসিলে তিনি দীর্ঘকাল তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া সদালাপ করিতেন আর বলিতেন, “সাধু এসেছেন, ভগবানই সাধুর বেশে এসেছেন! এঁর জন্য আমার স্নানাহার বন্ধ রাখতে হবে। তা যদি না করতে পারি তবে এর চেয়ে অধিক আশ্চর্য আর কিছু হতে পারে না।” সাধুদিগকে তিনি শুধুমুখে ফিরিতে দিতেন না — কিছু না কিছু অবশ্যই খাওয়াইতেন, আর বলিতেন, “আমি ভগবানকে ভোগ নিবেদন করছি — আমি পূজা করছি ও তাই দেখছি।” বস্তুতঃ তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া এবং তাঁহার মুখে সাধুর উচ্চ আদর্শের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া সাধুরাও নিজ আদর্শ সম্বন্ধে সমধিক অবহিত হইতেন এবং জীবনে সেই আদর্শ রূপায়িত করিতে অধিকতর যত্নবান হইতেন।

যে-কোন ঘটনা বা বিষয় অবলম্বনে ভগবানের স্মরণ-মনন হয়, সেই সকলের সংস্পর্শে আসিবার জন্য তিনি নিজে যেমন ব্যাকুল হইতেন, তেমনি পরিচিত

সকলকেও তৎতৎ বিষয়ে উৎসাহ দিতেন। উৎসবাদিতে যাইয়া যখন তাঁহার নিজের পক্ষে সম্ভব হইত না, তখন অনুরক্ত ভক্তদিগকে তথায় পাঠাইয়া তাঁহাদের মুখে সবিশেষ বর্ণনা শুনিতেন। একটি ভক্তকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, “দক্ষিণেশ্বরে মধ্যে মধ্যে যাবে! কালকে দশহরা — সেখানে পুজো দেখবে। হনুমান রামচন্দ্রকে বলেছিলেন, ‘কি করে সর্বদা আপনাকে স্মরণ থাকে?’ রামচন্দ্র বললেন, ‘উৎসব দেখলে আমাকে মনে পড়বে।’ তাই পর্ব-উৎসবে যোগ দিতে হয়।” প্রসাদে তাঁহার অসীম ভক্তি ছিল — উহা ধারণ করিবার পূর্বে ভক্তিসহকারে হস্তে গ্রহণান্তে মস্তকে স্পর্শ করাইতেন। প্রসাদ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণার একটু অভিনবত্ব ছিল। তিনি বলিতেন, “গুরুজন যা দেন, তা নিতে হয়। প্রসন্ন হয়ে যা দেন, তাই হচ্ছে প্রসাদ।” আর ছিল তাঁহার দীনতা। কোনও সাধুর প্রণাম তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন না — সে সাধু বয়সে যতই ছোট হউক না কেন। একদিন জনৈক বৈষ্ণব তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মেঝেতে বসিতে যাইতেছেন, অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন, “ওটা করবেন না। ‘তৃণাদপী সুনীচেন’ — ও থাক। ঠাকুর বলতেন, ‘এই দেহের ভেতরে ভগবান আছেন, সেজন্য আসনে বসাতে হয়।’ যে কালে এত ভক্তি করছেন, তখন কথা শুনতে হয়।”

স্বয়ং ভগবৎকৃপালাভে ধন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও প্রীতিলাভে চরিতার্থ হইয়াও মাস্টার মহাশয় অপরের সেবার জন্য উন্মুখ থাকিতেন এবং আপনাকে সকলের সেবক মনে করিতেন। গুরুর আসন তিনি গ্রহণ করিতেন না, কিংবা দীক্ষা কাহাকেও দিতেন না। তাঁহার প্রভাবে আসিয়া যাঁহারা সুদীর্ঘকাল তথায় যাতায়াত করিতেন, তাঁহাদের প্রতিও তিনি উপদেষ্টার ন্যায় ব্যবহার না করিয়া কিংবা তাঁহাদিগকে নিজস্ব কিছু বলিবার

প্রয়াস না করিয়া শুধু বক্তব্য বিষয়টি ঠাকুরের ভাষায় ব্যক্ত করিতেন। শাসন তিনি করিতেন না — মুখে ছিল তাঁহার দৈব জ্যোতি, আর জিহ্বায় ছিল অবিমিশ্র আশীর্বাদ। তিনি ভক্তসঙ্গে আনন্দ পাইতেন এবং বলিতেন যে, ভক্তদের সহিত আলাপ-আলোচনা না থাকিলে তাঁহার জীবন দুর্বিষহ হইত। কিন্তু তাই বলিয়া বৃথা স্নেহ প্রকাশপূর্বক তিনি শক্তিক্ষয় বা অনুরাগীকে বিব্রত করিতেন না। সর্বাবস্থাতেই তিনি শান্ত থাকিতেন; সুখ-দুঃখ তাঁহাকে অকস্মাৎ অভিভূত করিতে পারিত না। জীবন ছিল তাঁহার সম্পূর্ণ আড়ম্বরশূন্য। অবস্থা মন্দ না হইলেও তিনি আহার-বিহার ও পোশাক-পরিচ্ছেদ অতি সাধারণভাবে চলিতেন। তাঁহার মতে ঠাকুরের উপদেশই এই ছিল যে, অনাড়াম্বর জীবনযাপন করিতে হইবে। জীবনধারণের জন্য উপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ ভোজন ও লজ্জানিবারণের জন্য সামান্য বস্ত্রপরিধানের ফলে তাঁহার অন্তর্নিহিত ভগভক্তি আরও উজ্জ্বলতর হইয়া আগন্তুকের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিত। ঠাকুর একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “মনে ত্যাগ হলেই হল; অন্তঃসন্ন্যাসই সন্ন্যাস।” মাস্টার মহাশয় সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’-প্রণয়নই তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। ওই সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, “আমার ছেলেবেলা থেকে ডায়েরী লেখার অভ্যাস ছিল। যখন যেখানে ভাল বক্তৃতা বা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ শুনতুম, তখনই বিশেষ ভাবে লিখে রাখতুম। সেই অভ্যাসের ফলে ঠাকুরের সঙ্গে যেদিন যা কথাবার্তা হত, বার তিথি নক্ষত্র তারিখ দিয়ে লিখে রাখতুম।” তিনি আরও বলিয়াছিলেন, “সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকায় আমি ইচ্ছামত তাঁর কাছে যেতে পারতুম না। তাই দক্ষিণেশ্বরে যা পেয়েছি তার উপর সংসারের চাপ পড়ে পাছে সব গুলিয়ে খায়,

এই ভয়ে আমি তাঁর কথা ও ভাবরাশি লিখে রেখে পুনর্বার যাবার আগে পর্যন্ত ওইসব পড়তুম ও মনে মনে আলোচনা করতুম। এভাবে নিজেরই মঙ্গলের জন্য প্রথমে লিখতে আরম্ভ করি, যাতে তাঁর উপদেশ আরো ভাল করে জীবনে পরিণত করতে পারি।” এইসকল দিনলিপি-অবলম্বনে ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে লিখিত ‘Gospel of Sri Ramakrishna’ (শ্রীরামকৃষ্ণের-উপদেশ) ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইলে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ সকলেই অজস্র প্রশংসা করিলেন এবং আরও উপদেশ-প্রকাশের জন্য উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ বৃহত্তর পুস্তকাকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়। এদিকে রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুরোধে মাস্টার মহাশয় কর্তৃক বঙ্গভাষায় ‘কথামৃত’-রচনা আরম্ভ হয় এবং ১৯০২ অব্দে শ্বামী ত্রিগুণাতীততনন্দ কর্তৃক উহার প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। পরে ক্রমে ১৯০৪ অব্দে দ্বিতীয় ভাগ, ১৯০৮ অব্দে তৃতীয় ভাগ এবং ১৯১০ অব্দে চতুর্থ ভাগ মুদ্রিত হিল। ১৯৩২ অব্দে তাঁহার দেহত্যাগের কয়েক মাস পরে (১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে) পঞ্চম ভাগ প্রকাশিত হয়।১ তিনি ইহার আংশিক মুদ্রণ দেখিয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর প্রতি তিনি প্রথমাবধিই অতি ভক্তিপরায়ণ ছিলেন এবং ইহারই ফলে বহুবার তাঁহাকে স্বগৃহে রাখিয়া তাঁহার সেবা করিতে পারিয়াছিলেন। অন্যভাবেও অর্থাদির দ্বারা তিনি তাঁহার সেবা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণাশ্রিত ভক্তদের সহায্যার্থে এবং তপোরত সাধুদের অভাব মিটাইবার জন্যও তিনি গুপ্তভাবে অর্থব্যয় করিতেন। ওইসমস্ত ব্যয়ের হিসাব অজ্ঞাত হইলেও মনে হয় যে, তাঁহার ন্যায় মধ্যবিত্ত ব্যক্তির পক্ষে সে দানের পরিমাণ নেহাৎ অল্প নহে।

শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভের পর পঞ্চাশ বৎসর সর্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীগুরুমহিমা ও বাণী প্রচার করিয়া তিনি ১ফলহারিণী কালিকা-পূজার পরদিবস ১৯৩২ খ্রী: ৪ঠা জুন (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, ২০শে জৈষ্ঠ) সকাল সাড়ে ছয়টার সময় শ্রীগুরুপাদপদ্মে মিলিত হন। পূর্বরাত্রি নয়টার ‘কথামৃত’ পঞ্চম ভাগের প্রুফ দেখিতে দেখিতেই হাতের স্নায়ুশূলের অসহ্য যন্ত্রণা আরম্ভ হয় এবং প্রাতঃকালে “মা, গুরুদেব, আমাকে কোলে তুলে নাও” বলিতে বলিতে তিনি চিরনিদ্রায় চক্ষু নিমীলিত করেন। শ্রীগুরুর বাণী-প্রচারে উৎসৃষ্টপ্রাণ মাস্টার মহাশয় শেষমুহূত্র পর্যন্ত ওই কার্যেরই রত থাকিয়া স্বীয় ব্রত উদ্‌যাপন করিলেন।

স্বামী গম্ভীরানন্দ

অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন,

বেলুড় মঠ, হাওড়া

১ ‘শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস’ (সমসাময়িক দৃষ্টিতে), ১৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c62 ৬২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের শব্দার্থ

অগস্ত্য যাত্রা — অগস্ত্যমুনি ভাদ্রমাসের প্রথম দিনে বিন্ধ্যপর্বত লঙ্ঘন করিয়া দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন, আর ফিরেন নাই। এই হেতু ওই দিনে যাত্রা নিষিদ্ধ। লৌকিক আচারে ইহা হইতে মাসের প্রথম দিবস যাত্রায় নিষিদ্ধ।

অঙ্কা তারে বঙ্কা তারে — অঙ্কা বঙ্কা দুইজন দুর্ধর্ষ ডাকাতের নাম। (‘হরিষে লাগি রহ রে ভাই’ গান-এর অংশবিশেষ)

অজপা — যাহা জপনীয় নহে, অর্থাৎ যাহা জপ করিতে হয় না; উচ্ছ্বাসের অন্তর্গমন ও নিঃশ্বাসের নির্গমন দ্বারা স্বভাবতঃযে মন্ত্রের জপ (অক্ষরোচ্চারণ-রূপ ক্রিয়া) হয়; স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাস দ্বারা নিষ্পাদিতবর্ণ জপ্য ‘হংস’ মন্ত্র। সুতরাং, ‘হংস’ মন্ত্র জপ করিতে হয় না, ইহা প্রাণিমাত্রেরই স্বাভাবিক বা অযত্নসিদ্ধ। এই হেতু ইহার নাম অজপা। ‘হংস’ উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসরূপ প্রাণ এবং প্রাণ আত্মরূপে দেহে অবস্থিত। প্রাণী প্রত্যহ উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাস দ্বারা ২১৬০০ বার ‘হংস’ মন্ত্র জপরূপ প্রাণায়াম করে; ইহা জীবের আয়ু। সুতরাং অজপা-জপ ফুরাইলে আয়ুঃ শেষ হয়।

অজামিল — ভাগবত পুরাণোক্ত কান্যকুব্জবাসী ব্রাহ্মণ বিশেষ। ইনি দাসীসংস্পর্শে দূষিত হইয়া দ্যূতচৌর্য প্রভৃতি অসদ্‌বৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জন করিতেন। দাসীগর্ভজাত দশ পুত্রের মধ্যে নারায়ণ কনিষ্ঠ। নারায়ণের প্রতি আজামিলের অতিশয় স্নেহ ছিল। মৃত্যুকালে দূরে ক্রীড়ারত নারায়ণকে

তক্‌গতচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়া পাপমুক্ত হইয়া ইনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন।

অনুলোম বিলোম — অনুক্রম ও বিপরীতক্রম; স্থূল থেকে সূক্ষ্মে যাওয়া এবং সূক্ষ্ম থেকে স্থূলে আসা।

অন্নকূট — বৃহদাকারে অন্ন পুঞ্জীভূত করিয়া রবাহূত অনাহূতদের ভোজন করানো।

অবধূত — বর্ণাশ্রমাচারের অতীত এবং সর্বসংস্কারমুক্ত সন্ন্যাসী। তন্ত্রমতে অবধূত চারিপ্রকার — ব্রহ্মাবধূত, শৈবাবধূত, ভক্তাবধূত, হংসাবধূত।

অম্বুজে আকাশ — বিশুদ্ধ চক্রে ধূম্রবর্ণের পদ্মমধ্যস্থিত আকাশ।

অষ্টধাতু — স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পিত্তল, কাংস্য, ত্রপু (রাং), সীসক ও লৌহ। মতান্তরে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রঙ্গ, যশদ (দস্তা), সীসক, লৌহ ও পারদ।

অষ্টপাশ — (মায়াবন্ধন) ঘৃণা, লজ্জা, মান, অপমান, মোহ, দম্ভ, দ্বেষ, পৈশুণ্য (ক্রূরতা)।

অষ্টবসু — ভব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যূষ, প্রভব। গঙ্গা ও শান্তনুর পুত্র এই অষ্ট গণদেবতা। প্রভব বশিষ্ঠমুনির শাপে ভীষ্মরূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ হন।

অষ্টসিদ্ধি — অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামবসায়িতা: যোগের এই অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য।

আউটা, আওটা — দুগ্ধাদি জ্বাল দিয়া নাড়িয়া ঘন করা।

আণ্ডিল — মহাধনশালী।

আখেরে — পরিণামে, শেষকালে।

আগম নিগম — তন্ত্র ও বেদ।

“আগতং শিববক্তেভ্যো গতঞ্চ গিরিজামুখে।
মতং শ্রীবাসুদেবস্য তস্মাদাগম উচ্যতে।” — রুদ্রযামলবচন

“নির্গতো গিরিজাবক্ত্রাৎ গতশ্চ গিরিশশ্রুতিম।
মতশ্চ বাসুদেবস্য নিগমঃ পরিকথ্যতে।” — আগমবচনদ্বৈতনির্ণয়বচন

আটপিটে, আটপিঠে — কষ্টসহিষ্ণু; সকল ভারবহনে সমর্থ; সর্বদিকে দক্ষ, চৌকস; অষ্টপৃষ্ঠযুক্ত; অষ্টতলযুক্ত।

আটাশে — গর্ভের অষ্টম মাসে জাত; দুর্বল। (আটাশে ছেলে ভীরু হয়।)

আড়া — (১) উচ্চতীর; পাড়; ডাঙ্গা। (২) বৃষ্টিজলের পরিমাণবিশেষ।

আদাড়ে — (১) জঞ্জালে বা বনজঙ্গলে উৎপন্ন, নিকৃষ্টজাতীয়। (২) বেপরোয়া।

আধপো (অন্তর) — এক ক্রোশের আটভাগের একভাগ দূরত্ব (সিকি মাইল)।

আনন্দ আসন —– তন্ত্রোক্ত সাধনবিশেষ। বীরভাবের শেষ সাধন।

আপ্তভাবে —– মিত্রভাবে; বিশ্বস্তভাবে। অন্তরঙ্গদের নিয়ে।

আবচারা —– (আঁব = আম, চারা = ছোট গাছ) আমের ছোট গাছ।

আবাঠা, আবাটা —– অঙ্গপরিষ্কারক; আমলকী, হরিদ্রা প্রভৃতি বাটা।

আঁবের কশি (কষি) — কাঁচা আমের আঁঠি। (কুশি আম = অত্যন্ত কচি আম)

আমমোক্তার —– বিষয়কর্ম নির্বাহের জন্য আইন অনুসারে নিযুক্ত প্রতিনিধি। আদালতে মকদ্দামাদির তদ্বির করিবার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি; attorney।

উদম সাঁড়ী (ষাঁড়ি) — উচ্ছৃঙ্খল মেয়ে। (উদম = উচ্ছৃঙ্খল; স্বেচ্ছাবিহারী; অনাবৃত; উলঙ্গ। ষাঁড় = বৃষ; লম্পট পুরুষ; যথেচ্ছ বিহার বা বিচরণকারী; অসংযত)

উন্মস্ত —– (ফরাসী-মস্ত্) মস্ত্ মানে মাতাল, উন্মত্ত।

উভরায় —– উচ্চরবে।

উমেদার —– চাকুরীপ্রার্থী।

উমেদারী —– কর্মপ্রাপ্তির জন্য সাধনা।

ঊনপাঁজুরে, (কথ্য) উনপাঁজুরে — যাহার পাঁজরের হাড় কম বা খাট। (গৌণার্থে) অলক্ষণীয়; (গালিতে) লক্ষ্মীছাড়া।

ঊর্জিত — বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; অধিক, অতিশয়িত।

একতারে — (এখতিয়ার-এর রূপভেদ) ক্ষমতা, অধিকার।

একোয়া — (ল্যাটিন শব্দ — Aqua) জল।

ওলম্বাকুল — কুলের আকৃতি একপ্রকার বন্য কুল। (যাহাতে শুধু আঁঠি আর খুব পাতলা খোসা, একটুও শাঁস নাই)

কন্দর্প — মদন; কামদেব।

কড়েরাঁড়ী — বালবিধবা; কন্যাবয়সে বিধবা।

কর্তাভজা — উদাসীন আউলচাঁদ কর্তৃক প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ। ঘোষপাড়ানিবাসী রামশরণ পাল ইহার প্রচারক। ইঁহাদের মতে আউলচাঁদ ঈশ্বরের অবতার; কৃষ্ণচন্দ্র, গৌরচন্দ্র ও আউলচন্দ্র — তিনে এক, একে তিন; মহাপ্রভু তিরোহিত হইয়া আউলমহাপ্রভু-রূপে আবির্ভুত হন। শ্রীকৃষ্ণই ইঁহাদের উপাস্য দেবতা। ইঁহাদের গুরুর নাম ‘মহাশয়’, শিষ্যের নাম ‘বরাতি’। এই সম্প্রদায়ের জাতিবিচার নাই। ইঁহাদের কোন ধর্মগ্রন্থ নাই। দোল ও রাসযাত্রাই ইঁহাদের প্রধান মহোৎসব। ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমাতে কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনের অদূরবর্তী ঘোষপাড়া গ্রামে ইঁহাদের মহোৎসব হয়।

কলহান্তরিতা — [কলহ (বিবাদ) দ্বারা অন্তরিতা (ব্যবধানে স্থিতা)] কীর্তনগানের পালাবিশেষ। নায়কের সহিত কলহজনিত বিচ্ছেদে নায়িকার অনুতাপ এই পালার বিষয়বস্তু।

কলমবাড়া — (Sloping) ঢালু রাস্তা।

কট্‌কেনা — নিয়মের কঠোরতা; মেয়দী; প্রতিজ্ঞা; কষ্ট, দুঃখ, দুরবস্থা।

করোয়া — জলপাত্রবিশেষ; কমণ্ডলু।

কসুর — ত্রুটি; অপূর্ণতা; বাকি।

কচে বারো — কচ (পাশার একবিন্দু) এবং এগার (পাঁচ ও ছয় বিন্দু)। মোট বারো বিন্দু।

কাকীমুখ-আচ্ছাদিনী — জীবের জ্ঞানমুখ আচ্ছাদনকারী অবিদ্যা। (ক = সুখ, অক = দুঃখ। ক + অক = কাক, সুখদুঃখযুক্ত জীব — কাকী।)

কালাপানি — ভারত মহাসাগরের কৃষ্ণবর্ণ জল; সমুদ্র।

কামারশালের নাই — কামারের নেহাই। যে লৌহখণ্ডের উপর ধাতু তাতাইয়া পেটা হয়। (anvil)

কাঁড়া — ছাঁটা, তুষহীন করা, পরিষ্কার করা।

কাঁড়ি — স্তূপ, রাশি।

কাঁদি — ফলের বড় গুচ্ছ। বৃহৎ।

কারণ — তান্ত্রিক সাধনার উপকরণরূপে ব্যবহৃত মদ্য। (কারণবারি পান করা।)

কারণ করত — মদ খেত। তান্ত্রিক সাধকগণ মদকে কারণবারি বলেন।

কাঁকাল ভাঙা (ভাঙ্গা) — কটিভঙ্গ হওয়া। নৈরাশ্যাদিতে কটি অবসন্ন বা দুর্বল হওয়া; মাজা-ভাঙা হওয়া।

কাকনিদ্রা — কাকের ন্যায় অতি সতর্ক ও পাতলা ঘুম; কপটনিদ্রা।

কুঁকড়ো — মোরগ।

কুমুরে পোকা — এই পোকা মুখে মাটি আনিয়া বাসা নির্মাণ করে এবং তাহার মধ্যে ডিম ছাড়িয়া সরিয়া যায়। কুমারের মত মাটির কাজ করে বলিয়া এই নাম।

কুপো — মাটি বা চামড়ার তৈয়ারি গলা-সরু পেট মোটা পাত্রবিশেষ।

কুইন — ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া।

কুটিলা — (১) আয়ানের ভগিনী ও রাধিকার ননদিনী। (২) ক্রূরচিত্ত, খল।

কূটস্থ — সর্ব অবস্থায় ও সর্বকালে একভাবে স্থিত, নির্বিকার; গিরিশৃঙ্গবৎ নিশ্চল।

কেঁড়েলি — অকালপক্কতা; ছেলের মুখে বৃদ্ধের ন্যায় বচন; বৃথা বাহাদুরি।

কোকিলাক্ষ — কোকিলের অক্ষিতুল্য যাহার পুষ্প লোহিত; বৃক্ষবিশেষ। (Capparis Spinosa)

কোঁয়ারি — কুমারী, কন্যা।

কোম্পানি — ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে ইংরেজ-বণিকদল ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়া ক্রমে এদেশে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন হইতে কোম্পানি বলিলে ইংরেজ রাজত্ব বুঝাইতে থাকে। পরে মহারানী ভিক্টোরিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেও কোম্পানির নাম চলিয়া আসিতেছে।

কোটা, কোঠা — অট্টালিকা; দেহ।

কোম্পানির কাগজ — (সাধারণের নিকট হইতে) ইংরেজ রাজ্যের ঋণগ্রহনার্থ স্বীকারপত্র। (Government Promissory Note)

কোম্পানির বাগান — বোটানিক্যাল গার্ডেন, শিবপুর। শহরের উদ্যান বা পার্ক।

কোদণ্ড — ধনু। এখানে কোদালি।

কোঁস্তা — তৃণনির্মিত মার্জনীবিশেষ, ঝাঁটা।

কৌচ — গদিযুক্ত বসিবার আসনবিশেষ; পালঙ্ক।

খ — আকাশ।

খয়েরের বাগানটি — বিবাহকালীন স্ত্রী-আচারের অঙ্গবিশেষ।

খড়কে কাঠি — দাঁত পরিষ্কার করিবার কাঠি।

খানসামা — ভৃত্য; সেবক।

খাজাঞ্চী — কোষাধ্যক্ষ। সদর কাছারীর তহবিলরক্ষক অর্থাৎ যে কর্মচারী মফস্বলের খাজনার চালান প্রভৃতি বুঝিয়া জমাখরচ রাখেন ও তহবিল রক্ষা করেন।

খানকী — বারনারী; বেশ্যা।

খ্যাঁট — ভোজন বা ভোজ; আহার; খোরাক।

খাদি কাঠ — ছোট টুকরা কাঠ।

খানা — খাত; লম্বা গর্ত; পরিখা।

খাঁদী-ফাঁদি — খাঁদি = নাক-থেবড়া; সৌন্দর্যহীনা। ফাঁদি = চওড়া মুখোয়ালা বা পেটোয়ালা; বৃহদাকার।

খিড়কি ফটক — বাড়ির পিছনের দরজা।

খেই — সুতার অগ্রভাগ; সূত্র, প্রসঙ্গ।

খেই ধরা — সুতার প্রান্ত বাহির করা। তাঁতে কাপড় বুনুবার সময় সুতা ছিঁড়িয়া গেলে উহার প্রান্ত বাহির করিয়া জুড়িয়া দিতে হয়।

খেউড় — অশ্রাব্য গালাগালি; অশ্লীল গ্রাম্য গান বা কবিতা। গরগর — গদ্‌গদ, বিহ্বল, অভীভূত। (গর্‌গর্‌ = ক্রোধাদির লক্ষণ-প্রকাশক। গর্গর = কলস, ঘড়া; দধিমন্থনপাত্র)

গণেশ গর্জী — নিজের দিকেই দৃষ্টি, অপরের প্রতি খেয়াল নাই। অর্থাৎ যিনি দুনিয়াকে উপেক্ষা করিয়া চলেন। কেহ কেহ বলেন, গর্জী মহারাষ্ট্রের অধিবাসীর পদবীবিশেষ; এবং গণেশ একজন ব্যক্তির নাম।

গণ্ডযোগ — (জ্যোতিষ) রাশিচক্রের একসপ্তবিংশতিতম অংশ অর্থাৎ ২৭ যোগের মধ্যে দশম যোগ। এই যোগে জন্ম হলে জাতকের মাতাপিতার মৃত্যু হয়।

গড্ডি — ‘গোরুটি’ শব্দের পরিবর্তিত রূপ।

গাড়োল, গাড়ল — মেষ, ভেড়া।

গুজরিপঞ্চম — সেকেল মেয়েদের রৌপ্যনির্মিত ঘুঙুরযুক্ত পায়ের মলবিশেষ।

গুজরাইব — দাখিল করিব।

গুটিকা সিদ্ধি — যোগলব্ধ শক্তিবিশেষ। মন্ত্রপূত গুটিকাটি (বাটিকা) অঙ্গে ধারণ করিয়া সাধক সাধারণের নয়নের দৃষ্টিবহির্ভূত বা অদৃশ্য হইতে পারেন এবং ওইরূপ অদৃশ্য হইয়া সযত্নে রক্ষিত দুর্গম স্থানেও গমনাগমন করিতে পারেন।

গুচ্ছির, গুচ্ছের — (বিরক্তিসূচক) অনেকগুলি; অবাঞ্ছিত ও প্রয়োজনাতিরিক্ত।

গেড়ে — গর্ত, ডোবা।

গোলকধান্দা, গোলকধাঁধা — যে বাড়ি বা বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিলে শতপাক খাইয়াও বাহির হইবার পথ পাওয়া যায় না, একই পথে পুনঃপুনঃ আসিতে হয়।

গোর — সমাধি, কবর।

গোড়ে মালা — মোটা করিয়া গাঁথা ফুলের মালা।

গোট — কোমরের শিকলাকৃতি অলঙ্কারবিশেষ।

গোধিকা — গোসাপ।

গোঁড়া — (১) যে প্রাচীন ধর্মের মূল আঁকড়াইয়া থাকে; প্রাচীন ধর্ম মতাবলম্বী। (২) ধম্রসম্বন্ধে যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসী। (৩) অতিরিক্ত পক্ষপাতী। (৪) ভক্ত; অতিশয় অনুরক্ত। (৫) চাটুকার; স্তাবক; খোসামোদকারী; তোষামুদে।

গৌরচন্দ্রিকা — মূল গীতের পূর্বে গৌরচন্দ্রের অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনা।

ঘুনি — মাছ্ ধরিবার ফাঁদবিশেষ।

ঘুসকী, ঘুষকী — লোকাবপাদ ভয়ে গোপনে পরপুরুষগামিনী স্ত্রী।

ঘুপটি (ঘাপটি) মেরে থাকা — (১) লুকাইয়া থাকা। (২) ওঁত পেতে থাকা।

চকোর — (জ্যোৎস্না পান করিয়া তৃপ্ত হয় বলিয়া কথিত) পক্ষিবিশেষ।

চতুর্বিংশতি তত্ত্ব — সাংখ্যদর্শন মতে চব্বিশটি মূল পদার্থ: প্রকৃতি, মহৎ (বুদ্ধি), অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ), পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্), পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক), পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় (হস্ত, পদ, মুখ, পায়ু, লিঙ্গ) ও মন।

চটকা — ঘুমের আবেশ, তন্দ্রা, আচ্ছন্নতা; অন্যমনস্কতা। (চটকা ভাঙা = বাহ্যজ্ঞান হওয়া; সতর্ক হওয়া)

চকমিলান উঠান — চতুষ্কোণ মিলিত চতুর্দিকে সম উচ্চ কক্ষমধ্যে সমচতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ।

চাঁচর (কেশ) — কুঞ্চিত, কোঁকড়া।

চাতরে হাঁড়ি ভাঙা — সর্বসমক্ষে রহস্য ভেদ করা, সর্বসমক্ষে গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া দেওয়া। (চাতর = চৌরাস্তা, চৌমাথা)

চাপরাসী — আরদালী, পেয়াদা, পিয়ন।

চানকে — কলিকাতার স্থানবিশেষ। (বারাকপুরের দক্ষিণে, গঙ্গার পূবাঁধারে)

চারধাম —— কাশী, পুরী, বৃন্দাবন ও ব্রজ। মতান্তরে রমানাথ, বৈদ্যনাথ, জগন্নাথ ও দ্বারকানাথ মথুরামণ্ডলস্থ এই চারি ধাম। (ভক্তমাল)

চাঁদনি —— মণ্ডপ অর্থাৎ ছাদযুক্ত প্রশস্ত চত্বর।

চিক —— গলার গহনাবিশেষ। বাঁশের শলা দ্বারা নির্মিত পর্দা।

চিটে গুড় —— কালো চটচটে ঘনরস গুড়।

চুটকি —— পদাঙ্গুলির ঝুমকাপরানি আংটিবিশেষ।

চুটিয়ে ফসল কাটা —— যথাশক্তি বা সাধ্যানুসারে শস্য কাটা।

চোঁয়ার ভাটি —— মদ চুইবার পাত্র।

চোরকুঠুরি (কুঠুরি, কুঠুরী) — (১) গুপ্তকক্ষ। (২) হৃদয়।

চৌদানি —— চারদানা মোতিবসানো কানবালাবিশেষ।

চৌদ্দ পোয়া —— সাড়ে তিনহাত মানবদেহ।

ছানাবড়া —— চিনির রসে পক্ক ছানার বড়া।

জটিলা —— (১) আয়ানের মাতা ও রাধিকার শাশুড়ি। (২) অনিষ্টকর কূটবুদ্ধিসম্পন্না; কলহপরায়ণা, বধূদের গঞ্জনাদাত্রী।

জাঁতি — সুপারি কাটিবার যন্ত্রবিশেষ। জেলেডিঙি — মাছ ধরিবার ছোট নৌকা।

ঝারি — লম্বা-গলা নলযুক্ত জলপাত্রবিশেষ; গাড়ু, ভৃঙ্গার। (পূর্বে সোনা, রূপা নির্মিত ঝারির প্রচুর ব্যবহার ছিল)

টোসা — বিন্দু, ফোঁটা।

ঠেক — তণ্ডুলাদির আধারবিশেষ।

ডঙ্কামারা — বিখ্যাত; প্রসিদ্ধ, বিদিত। ডঙ্কামারা নাম — সর্বত্র বিদিত নাম। ডঙ্কামারা (আলঙ্কারিক অর্থে) — সগর্বে প্রচার করা।

ডাকুর — এক প্রকার বিষাক্ত মাকড়সা।

ডোঙ্গা ঠেলা গান — ডোঙ্গা অর্থাৎ তালগাছের গুঁড়ি খুদিয়া প্রস্তুত ছোট নৌকাবিশেষ। ঠেলা গান অর্থাৎ সারিগান (মাঝি মাল্লারা সমস্বরে যে গান গায়)।

ডি. গুপ্ত — জ্বরের একটা পেটেন্ট ঔষধ।

ঢঙ কাচ — কপটবেশী, কপটচারী, ছদ্মবেশী।

ঢরঢর — ঢলঢল; ভরপুর।

ঢ্যামনা, ঢেমনা — (১) গালিবিশেষ। (২) লম্পট। (৩) নির্বিষ সাপবিশেষ; দাঁড়াশ সাপ। (৪) অকর্মণ্য। (ঢেম্‌না — যে মেয়ে, জেনেশুনে বদমায়েসী করে।)

তড়াগ — বড় ও গভীর পুকুর, দীঘি।

তন্ত্রসার — সর্বশুদ্ধ ১৯২ খানি তন্ত্র, তন্মধ্যে ৬৪ খানি বঙ্গদেশে প্রচলিত। কৃষ্ণানন্দ ওইগুলি সংগ্রহ করিয়া তন্ত্রসার প্রণয়ন করেন।

তাড় — হস্তাভরণবিশেষ, তাড়বালা।

তারাহার — স্থূল মুক্তাহার।

তুম্বা — লাউ। একপ্রকার লাউ অত্যন্ত তেতো, উহার খোল সাধুরা কমণ্ডলুর ন্যায় ব্যবহার করেন।

তেজিমন্দি — চাহিদার অনুপাতে বাজারে দরের হ্রাসবৃদ্ধি।

তেলধুতি — যে কাপড় পরিয়া স্নানের পূর্বে গায়ে তেল মাখা হয়।

থানা দেওয়া — যুদ্ধার্থ সসৈন্যে অবস্থান করা।

থিওজফি — গ্রীক দার্শনিক ‘ইয়ামব্লিখস্’ (Iamblichus) সর্বপ্রথম থিওসফি শব্দটি ব্যবহার করেন। প্রাচ্যের অতীন্দ্রিয়বাদ বা অলৌকিকবাদের দ্বারা ইহা বিশেষভাবে প্রভাবিত। এই মতানুসারে প্রকট এবং অপ্রকট সমগ্র চরাচর বিশ্বের পশ্চাতে সর্বব্যাপী শাশ্বত অসীম ও অপরিবর্তনীয় একটি মৌলতত্ত্ব রহিয়াছে। জগৎ ও মনুষ্য এই তত্ত্বে হইতে উদ্ভূত ও ইহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে থিওসফি ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবি

হিন্দুসম্প্রদায়কে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ভারতবর্ষে এই মতবাদ প্রচারে অ্যানি বেসান্তের অবদান উল্লেখযোগ্য।

থোলো, থলো — গোছা, গুচ্ছ, স্তবক।

দক্ষিণে কলাগাছ উত্তরে পুঁই, একলা কালো বিড়াল কি করব মুই — কালো বিড়াল অমঙ্গলসূচক; এবং দক্ষিণে কলাগাছ ও উত্তরে পুঁইও অমঙ্গলসূচক। সেইজন্য কালো বিড়ালকে অমঙ্গলসূচক বলিয়া অপবাদ দেওয়ার জন্য তাহার মুখ দিয়া বলানো হইতেছে যে, বাড়ির দক্ষিণে কলাগাছ ও উত্তরে পুঁই তো রয়েইছে; সুতরাং 'আমি কেন অপবাদগ্রস্ত হই?'

দরগা — (১) পীরের কবর ও তৎসংলগ্ন পবিত্র স্মৃতিমন্দির; মসজিদ। (২) দারগা-র রূপভেদ — বড়দারগা = থানার ভারপ্রাপ্ত ইন্‌স্‌পেক্‌টর। ছোট দারগা = বড় দারগার সহকারী ইন্‌স্‌পেক্‌টর।

দস্তাবিজ, দস্তাবেজ — দলিল।

দরকচা, দড়কচা, দড়কাঁচা, দড়কাঁচা — (১) আধা পাকা আধা কাঁচা, জামড়াপড়া। (২) পরিপূর্ণ সিদ্ধ না হওয়া।

দরবেশ — ভিক্ষুক; ফকির।

দশা — অবস্থা; ভাবাবেশ; সমাধি।

দশম দশা — দশম ভাব। (বৈষ্ণব শাস্ত্রে) শ্রবণ, কীর্তণ, স্মরণ, অর্চন, বন্দন, পাদসেবন, দাস্য, আত্মনিবেদন, স্বীয়ভাব: এই দশটি ভক্তিভাব।

দ্যালগিরি (দেয়ালগিরি, দিয়ালগিরি) — যে প্রদীপ প্রাচীর-গাত্রে সংলগ্ন করিয়া ঝুলাইয়া রাখা যায়।

দেউড়ি — প্রধান প্রবেশদ্বার, তোরণ, ফটক; সদর দরজা।

দোলো, দলো, দলুয়া — রস-ঝরানো গুড় হইতে প্রস্তুত লাল আভাযুক্ত চিনিবিশেষ।

ধান্যমেরু (অন্নমেরু) — অন্নের মেরুতুল্য স্তূপ; প্রচুর অন্নরাশি। রানী রাসমণির জামাতা মধুরামোহন সন ১২৭০ সালে বহুব্যয়সাধ্য অন্নমেরুব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ওই ব্রতকালে প্রভুত স্বর্ণরৌপ্যাদি ব্যতীত সহস্র মণ চাউল ও সহস্র মণ তিল ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে দান করা হইয়াছিল এবং সহচরী নাম্নী প্রসিদ্ধ গায়িকার কীর্তন, রাজনারায়ণের চণ্ডির গান ও যাত্রা প্রভৃতিতে দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটী কিছুকালের জন্য উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। (লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, দ্বাদশ অধ্যায়,)

ধূলহাঁড়ি — প্রসূতির নোংরা কাপড়-চোপড় ও ফুল একটি হাঁড়িতে করিয়া মাঠে দূরে ফেলিয়া দেওয়া হয়। যাহারা অভিচারাদি করে তাহারা হাঁড়ি লইয়া যায়।

ধোঁকার টাটি — মায়ার আবরণ; মায়ার ঘর বা রচনা।

নক্স খেলা — (১) একপ্রকার তাসের জুয়াখেলা। (২) (নকসা কেটে বাড়ি দিয়ে) এক ধরনের খেলা।

নবরত্ন — নবচুড়াযুক্ত দেবমন্দির।

নহবত, নওবত, নবত — সানাই ইত্যাদির ঐকতান বাদ্য।

নহবতখানা — যে স্থানে বসিয়া নহবত বাজান হয়।

নববিধান — কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মসম্প্রদায়ের শাখাবিশেষ।

নাচদুয়ার — সদর দ্বার; গৃহ-প্রবেশের প্রধান দ্বার।

নারিকেলের ছাঁই — নারিকেল কোরার সহিত গুড়ের মিশ্রণে প্রস্তুত পিষ্টকাদির পুর। (গ্রাম্যদেশে নারিকেল কুরিয়া গুড়ে পাক করিলে বলে, ‘ছাঁই’, চিনিতে পাক করিলে বলে ‘সন্দেশ’।)

ন্যাবা — পাণ্ডুরোগ, কমলারোগ (Jaundice)

ন্যাতাক্যাতার (নাতাকাতার) হাঁড়ি — বাজে জিনিস সঞ্চয় করিয়া রাখার হাঁড়ি।

নারদীয় ভক্তি — এ-পথে প্রথমে ভক্তি, ভক্তি পাকিলে ভাব, ভাবের চেয়ে উচ্চ মহাভাব আর প্রেম। মহাভাব আর প্রেম জীবের হয় না। যার হয়েছে তার বস্তুলাভ অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ হয়েছে।

ন্যাংটা — শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতভাবসাধনের গুরু তোতাপুরী।

নিখাদ — খাদহীন, বিশুদ্ধ।

নিকষা — রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও শূর্পনখার জননী।

নির্মলী — জলপরিষ্কারক ফল বা বীজবিশেষ।

নিধুর টপ্পা — রামনিধি গুপ্ত ('নিধুবাবু') ১১৪৮ সালে হুগলীর চাপতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'সরি মিঞার' টপ্পার অনুকরণে বাঙ্গালা টপ্পা বা প্রণয়সঙ্গীত রচনার প্রবর্তক।

নেকো আম — (১) টক আম। (২) নেকো = নাকযুক্ত। অনেক আমের আকৃতিতে একটি নাকচিহ্ন থাকে। ওই জাতীয় আমগাছের প্রত্যেকটি আমেই এই চিহ্ন থাকে। নেওটা, নেউটা, নেঅটা, ন্যাওটো — অত্যন্ত অনুরক্ত, স্নেহদ্বারা বশীভূত।

নেতিধৌতি — হঠযোগের ক্রিয়াবিশেষ। লম্বা একটি ভিজা ন্যাকড়ার ফালি আস্তে আস্তে গিলে ফেলে পুনরায় টেনে বার করার নাম নেতি এবং আকণ্ঠ জলপান করে পুনরায় বমি করে বার করার নাম ধৌতি। মলদ্বার দিয়া উদরে জলগ্রহণ ও পুনঃ নিষ্কাসনকেও ধৌতি বলে।

পঁইচে, পঁইছে, পঁইছা — মণিবন্ধে পরিধেয় স্ত্রীভূষণবিশেষ।

পঞ্জুড়ি, পঞ্জড়ি — (১) পাশাখেলার দানবিশেষ। পাশাখেলায় পাঁচের দান অর্থাৎ দুই জুড়ি ও পোয়া: ইহা অত্যন্ত ছোট দান। প্রথমে পঞ্জুড়ি পড়া — আরম্ভেই বে-পড়তা পড়া। (২) পঞ্চভূত।

পঙ্খের কাজ — ঘরের মেঝে বা দেওয়ালে চুনের প্রলেপদ্বারা কারুকার্য।

পঞ্চতত্ত্ব — [সাংখ্য মতে] ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম। [বৈষ্ণব শাস্ত্র] গুরুতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, মনতত্ত্ব, ধ্যানতত্ত্ব।

পঞ্চমকার — মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন।

পঞ্চনামী মত — স্ত্রী-পুরুষ একত্রে উপাসনাকারী ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ।

পঞ্চদশী — বেদান্ত প্রতিপাদক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

পঞ্চমকার — মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন — তান্ত্রিক সাধনার এই পাঁচটি অঙ্গ।

প'বার — পোয়া বার। (পাশায়) এক ও বার বিন্দু। ('প' = পাশার একবিন্দু)

পঞ্জা ছক্কা — (১) তাসের খেলায় ছক্কা পাঞ্জা। (২) পাশা খেলায় পাশার দানবিশেষ। (পঞ্জা = পাঁচফোটা চিহ্নিত তাস। ছক্কা = ছয় ফোঁটা চিহ্নিত তাস) পঞ্জা ছক্কায় বন্দী হওয়া — পঞ্চভূত ও ছয় রিপুর বশ হওয়া।

পইরাগ — প্রয়াগ-এর রূপভেদ।

পাঁজেব — চরণের অলঙ্কারবিশেষ; নূপুর।

পামরী — পাপিষ্ঠা।

পাঠ্‌ঠা — কুস্তির আখড়ায় যাহারা সবেমাত্র শিখিতে আসিয়াছে।

পাটোয়ার — (১) যে কর্মচারী খাজনা আদায় করে ও তাহার হিসাব রাখে। (২) অতি হিসাবী (পাটোয়ার লোক)

পাটোয়ারী — পাটোয়ারসুলভ। (পাটোয়ারী বুদ্ধি)

প্যালা (পেলা) — পালাগানে বা যাত্রায় গায়কাদির পুরস্কার্থে দেয় অর্থ। [ইহা রুমালে বাঁধিয়া গায়কের নিকটে ‘পেলা’ (প্রেরিত) হইত, সেই হেতু ইহা ‘পেলা’]

পীর — মুসলমান সাধু মহাপুরুষ।

পুরশ্চরণ — (তন্ত্রে) স্বীয় ইষ্টদেবতার মন্ত্রসিদ্ধ্যর্থ ইষ্টদেবতাপূজাপূর্বক মন্ত্রজপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক, ব্রাহ্মণভোজনরূপ পঞ্চাঙ্গসাধনা।

পোস্তা — দেওয়াল, বাঁধ প্রভৃতি মজবুত করিবার জন্য গাঁথনি বা ঠেস।

পোঁ — সানাইয়ের সকল সুরের সঙ্গেই যে এক অপরিবর্তনীয় টানা সুর বাজে।

পৌগণ্ড, পোগণ্ড — পাঁচ হইতে পনেরো বৎসর বয়স্ক, (মতান্তরে ছয় হইতে দশ বৎসর বয়স্ক)

ফরাশ, ফরাস — (১) যে ভৃত্য বিছানা পাতা, ঘর ও আসবাবপত্র ঝাড়া-মোছা করা, বাতি জ্বালা ইত্যাদি করে। (২) মেঝেয় পাতা বড় চাদর।

ফলে ফলে —— রাশি, রাশি (অনেক)

বকল্‌মা —— অন্যের উপর সব বিষয়ে সম্পূর্ণ ভার দেওয়া।

বনাত —— একপ্রকার পশমী মোটা কাপড়বিশেষ।

বাজু —— তাগাজাতীয় হাতের গহনাবিশেষ।

বাজী (বাজি) ভোর —— [বাজী = লীলা, ভোর = অবসান] লীলা শেষ; ভবলীলার অবসান

বার্ডসাই —— সিগারেট, ধূমপান।

ব্যালী —— সর্পী।

বাহাদুরী কাঠ —— শাল, সেগুন প্রভৃতি গাছের বড় গুঁড়ি।

বাছুরে গাল —— বাছুরের ন্যায় গাল।

বাঁখারি (বাখারি, ব্যাঁকারি, বাঁকারি) — বাঁশের ফালি; বাতা, চটা।

বাউটি —— বলয়জাতীয় বাহুর গহনাবিশেষ।

বাচখেলা (বাইচ) — নৌচালন-প্রতিযোগিতা (boat-race) অবতার বাচখেলার ন্যায় সীমা ও অসীমের মধ্যে ইচ্ছানুযায়ী একবার একদিক, আবার অন্যদিকে যাইতে পারেন।

বাধা —— পাদুকা।

বামাচার —— তান্ত্রিক আচার বা শক্তিপূজার প্রকারবিশেষ; তন্ত্রোক্ত পঞ্চসাধন বা পঞ্চ 'ম'কারযুক্ত সাধনাবিশেষ।

বিশালাক্ষির দ —— দ (দহ) = নদ্যাদির অতলস্পর্শ ও ঘূর্ণিময় অংশ। (আলঙ্কারিক অর্থে) কঠিন সঙ্কট। (দহে পড়া, দহে মজানো) বিশালাক্ষী = স্রোতস্বতী নদীবিশেষ।

বিল করে —— গর্ত করে।

বিড়বার —— পরীক্ষা করিবার।

বিপরীত রতাতুরা —— বিপরীত বিহার।

বেল্লো (বালদো, বাইল) — তাল, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষের সবৃন্ত পাতা।

বেশর, বেসর —— অর্ধচন্দ্রাকার নাকের গহনা।

বেহেড (বে + head) — মতিভ্রষ্ট; কাণ্ডজ্ঞানহীন; চিন্তাশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে এমন।

ভগবতী তনু —— (১) কারণ শরীর, যাহার দ্বারা ভগবদ্ আনন্দ অনুভব হয়। (২) সাধনার ফলে সাধকের অন্তরে উপলব্ধ স্বীয় শুদ্ধসত্ত্বময়ী প্রেমের দেহ। ভাঙ্গর, ভাঙ্গড় —— সিদ্ধিখোর। (ভাঙ্গরভোলা = শিব)

ভাতার — স্বামী।

ভাবরা (ভাপরা) — গরম বাষ্প; উত্তাপ; গরম সেক।

ভূচরী ও খেচরী মুদ্রা — আভিচারিক ক্রিয়াবিশেষ।

ভেক, ভেখ — সন্ন্যাসী বা বৈরাগীর বেশ।

মঙ্গলবার — অভীষ্ট সিদ্ধিমানসে হিন্দু মহিলাগণ মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডী দেবীর অর্চনা ও ব্রত উপসাবাদি করিয়া থাকেন। [ধনপতি সওদাগরের পত্নী খুল্লনা প্রথম মঙ্গলচণ্ডীদেবীর পূজার প্রবর্তন করেন।]

মলয় — দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালা; মালাবার দেশ; মালয় উপদ্বীপ; স্বর্গীয় উদ্যান, নন্দন কানন।

মলয়ের হাওয়া — মলয়পর্বত হইতে আগত স্নিগ্ধ, দখিনা বায়ু।

মনুমেন্ট — বর্তমান নাম শহীদ মিনার। কলিকাতার ময়দানে বৃটিশ সেনাপতি অক্‌টারলোনির নামে ৪৮ মিটার উচ্চ সমৃতিস্তম্ভ।

মটকা — কাঁচা ঘরের চালের শীর্ষদেশ।

মজার কুটি — আনন্দের আগার [মজা = আনন্দ; আমোদ, কৌতুক। কুটি = ভাণ্ডার; আগার]

মদনের যাগযজ্ঞ — মদন এখানে কামদেব নহেন, গানের রচয়িতার নাম।

মতুয়ার বুদ্ধি — (dogmatism) মতাদি-সম্পর্কে অন্ধবিশ্বাস।

মনোহর সাঁই (মনোহর শাহী) — মনোহর শাহের প্রবর্তিত কীত্রনের সুরবিশেষ। [রামানন্দ রায়ের বংশধর মনোহর হুগলী দশঘরা গ্রামে বাস করিতেন। ধার্মিক বলিয়া তাঁহার উপাধি ‘শাহ’ হইয়াছিল]

মানোয়ারী গোরা — যুদ্ধজাহাজের নাবিক। [মানোয়ার (man-of-war) = যুদ্ধ-জাহাজ। মানোয়ারী = যুদ্ধ-জাহাজে কর্মরত অর্থাৎ নৌযোদ্ধা। গোরা = (গৌরবর্ণ বলিয়া) ইংরেজ সৈন্য।]

মার্দব — (১) মৃদুভাব, কোমলভাব। (২) দয়া, কৃপা, অনুগ্রহ। ম্যাদ (মিয়াদ, মেয়াদ) — কারাদণ্ড, কয়েদ। [ম্যাদ খাটা — নির্দিষ্টকাল কারাদণ্ড ভোগ করা।]

মাথুর — (১) মথুরা-সম্বন্ধীয়। (২) কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরায় গেলে ব্রজবাসিগণের মনে যে বিরহতাপ জাগে তাহা অবলম্বন করিয়া রচিত গীতি-কবিতা।

মিছরীর পানা — মিছরীর শরবত।

মিছিল — মামলা, মকদ্দমা বা তৎসংক্রান্ত নথিপত্র। [মিছিল কালে — মকদ্দমার সময়ে]

মুহুরী (মুহুরি) — কেরানি।

মুক্তকেশী — (১) কালী। (২) এক রকম গাছ, তাহাতে শক্ত বেড়া হয়।

মুণ্ডি — ছোটমণ্ডা বা সন্দেশ।

মুণ্ডী — মুণ্ড; মাথা।

মুষলং কুলনাশনম্ — কুলনাশক মুষলের কাহিনী (শ্রীমদ্ভাগবত ১১ স্কন্ধ ১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ ভক্তের হৃদয়ে যদি ভক্তি থাকে, জ্ঞানরূপ পাথরে যতই ঘষা হোক না কেন সে ওই মুষলের ন্যায়, নষ্ট হয় না। ভিতরে একটু থাকে, আবার তাহা পরিস্ফুট হয়।

মুদ্দফরাস, মুদ্দাফরাশ, মুদ্দোফরাশ (মুর্দাফরাস-এর কথ্য রূপ) — শবদাহনকারী, ডোম।

মূলাধার — মূল কারণ, প্রধান আশ্রয়; (তন্ত্রে ও যোগশাস্ত্রে) দেহমধ্যেস্থ সুষুম্না নাড়ির ছয়টি চক্রের প্রথম। সুষুম্নার ‘মূল’ ও কুণ্ডলিনীশক্তির ‘আধার’ বলিয়া এই নামে অভিহিত। ইহা মেরুদণ্ডের নিম্নসীমায়, পায়ু ও লিঙ্গের মধ্যবর্তী দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থান। ইহা লোহিত ও চর্তুদল, ব, শ, ষ, স চর্তুদলের মাতৃকাবর্ণ। ইহাতে ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়ারূপ ত্রিকোণমধ্যে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ অদস্থিত। এই স্বয়ম্ভুকে সার্ধত্রিবলয়াকারে বেষ্টিত ও তাহার অমৃতনির্গমন-স্থানে মুখ লগ্ন করিয়া ভুজগরূপা কুণ্ডলিনী নিদ্রিতা আছেন। সাধক সাধনাবলে কুণ্ডলিনীকে জাগরিতা করিয়া সহস্রারে সদাশিবের সহিত সম্মিলিতা করেন। ইহা সাধনার চরম ফল।

মেলেনি মাসী — মালিনী মাসী; সাধারণ নারী।

মোলেস্কিন (মোলস্কিন) — (১) (mole-skin) গন্ধমূষিকের চর্ম (ইহার দ্বারা পোশাক তৈয়ারী হয়।) (২) mole — ছুঁচোর ন্যায় একপ্রকার ক্ষুদ্র জীব। তাহার অতি কোমল চর্মের ন্যায় একপ্রকার সুতার কাপড়।

মৌতাত —– নির্দিষ্ট সময়ে নেশা করিবার প্রবল স্পৃহা। (মৌতাত ধরা —– দেহে মাদকের কার্য আরম্ভ হওয়া। মৌতাত লাগা —– অভ্যস্ত সময়ে নেশা করিবার ক্ষুধা হওয়া।)

যাঁতি (জাঁতি, জাঁতী) — সুপারি কাটিবার যন্ত্রবিশেষ।

যোষিৎ —– স্ত্রী, নারী।

রামজীবনপুরের শীল —– (১) কেহ কেহ বলেন, কামারপুকুর সন্নিকটস্থ রামজীবনপুর গ্রামে ‘শীল’ উপাধিকারী এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার স্বভাব অর্ধেক নরম, অর্ধেক গরম।

রাঁড় —– (১) বেশ্যা; উপপত্নী। (২) বিধবা।

র‍্যাপার (রেপার) — গরম চাদর, আলোয়ান (wrapper)

রেল (রেলিং, railing) — লোহা, কাঠ প্রভৃতি সাহায্যে নির্মিত কাঠগড়া বা বেড়া।

রোশনচৌকি —– সানাই ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে ঐকতানবাদ্য।

রোউত — রোদন করা।

শশী বশীভূত — কামজয়, ব্রহ্মচর্য।

শঙ্করা — অপরিচিত ব্যক্তি।

শবসাধন — (তন্ত্রে) শ্মশানে তান্ত্রিকের শব দ্বারা কালীসাধনবিশেষ। মতান্তরে অপঘাত মৃতের মড়ার উপর উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্র জপকরণ। আবার কোনও কোনও মতে (সদ্যোমৃত পুরুষের) শবের উপরে অশ্বারোহণের ভঙ্গিতে উপবেশনপূর্বক তান্ত্রিক সাধনাবিশেষ।

শিবের মাথায় বজ্র — (১) মৃত্তিকা নির্মিত শিবলিঙ্গের মস্তকে যে গোলাকার ক্ষুদ্র মৃত্তিকাপিণ্ড স্থাপিত হয় তাহাই বজ্র। (২) শিবের ত্রিশূল।

শুভঙ্করী আঁক — শুভঙ্কর = অঙ্কশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত। আঁক = গণিতের অঙ্ক। [ইঁহার নাম ভৃগুরাম দাস, নিবাস বাঁকুড়া জেলা। সাধারণের দৈনিক সাংসারিক কার্যে প্রয়োজনীয় হিসাবের সহজ নিয়ম বাহির করিয়া ইনি ‘শুভঙ্কর’ নামে অভিহিত হন। ইঁহার কৃত অঙ্কশাস্ত্র ‘শুভঙ্করী’ এবং পয়ারে রচিত অঙ্ক কষার নিয়ম ‘শুভঙ্করী আর্য্যা’]

ষটচক্রভেদ — মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা: যোগশাস্ত্রে কথিত শরীরে সুষুম্নানাড়ীমধ্যস্থ পদ্মাকৃত এই ছয় চক্র। মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনীশক্তির এই ছয় চক্ত অতিক্রম করিয়া সহস্রারপদ্মে গমনের নাম ষট্‌চক্রভেদ।

মুলাধার — কুণ্ডলিনীশক্তির আধার। সুষুম্নার অধোমুখে সংলগ্ন, গুহ্যের অধোদেশে স্থিত, রক্তবর্ণ ও চতুর্দ্দল। চারি দলে মাতৃকাবর্ণ — ব শ ষ স।

স্বাধিষ্ঠান — লিঙ্গমূলে স্থিত, সিন্দূররাশিবৎ অরুণবর্ণ ও ষড়্দল। মাতৃকাবর্ণ — ব ভ ম য র ল।

মণিপুর — নাভিমূলে স্থিত, মেঘবৎ নীলবর্ণ ও দশদল। মাতৃকাবর্ণ — ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ।

অনাহত — হৃদয়ে স্থিত, বন্ধুক পুষ্পবৎ লোহিত ও দ্বাদশদল। মাতৃকাবর্ণ — ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ।

বিশুদ্ধ — কণ্ঠদেশে স্থিত গাঢ় ধূম্রবর্ণ ও ষোড়শদল। মাতৃকাবর্ণ — অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ।

আজ্ঞা — ভ্রূমধ্যে স্থিত। চন্দ্রসদৃশ শুভ্র ও দ্বিদল। মাতৃকাবর্ণ — হ ক্ষ

ষড়্দর্শন — সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্বমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত, ন্যায় ও বৈশেশিক — এই ছয়টি দর্শন শাস্ত্র।

ষড়ৈশ্বর্য — ভগবানের ঐশ্বর্যাদি (ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য) ছয়প্রকার মহিমা।

স্বর্ণপটপটি — আয়ুর্বেদীয় ঔষধবিশেষ।

সমুদ্রের ফেনা — সমুদ্রতীরে একপ্রকার জলজন্তুর হাড় পাওয়া যায়, তাহা দেখিতে ফেনার মত, টোটকা ঔষধে ব্যবহার হয়। [সমুদ্রফেন = white cuttle-fish bone — স্বীয় দেহ হইতে মসীবর্ণ তরলপদার্থ-নিঃসারক সামুদ্রিক প্রাণিবিশেষের দেহান্তর্গত খোলা]

স্বস্ত্যয়ন — আপৎশান্তি, পাপমোচন, অভীষ্টলাভ প্রভৃতি কামনায় পূজানুষ্ঠানবিশেষ।

সদাব্রত — নিত্যনিয়মপূর্ব্বক অন্নাদিদানরূপ ব্রত; অন্নসত্র।

সদরওয়ালা, সদরআলা — সাবজজ।

সহস্রার — শিরোমধ্যস্থ সুষুম্নানাড়ীস্থিত অধোমুখ সহস্রদল পদ্ম, পরম শিবের অধিষ্ঠান। [যোগী মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগরিত ও ষট্‌চক্রভেদপূর্ব্বক সহস্রারস্থ শিবের সহিত মিলিত করিয়া সহস্রারক্ষরিত অমৃতধারা পান ও অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ উপভোগ করেন।]

সাততলা — মনের সাতটি কেন্দ্র আছে যাহার উপর দিয়া ধাপে ধাপে মন উপরে উঠে। সাততলায় ওঠা = মহকারণে লয় হওয়া।

সাতনর — সাত পেঁচওয়ালা কণ্ঠহার।

সাচ্চা (সাঁচ্চা) জরি — বিশুদ্ধ জরি।

সাঁকো — সেতু; পুল।

সানকি —– চীনামাটির থালা, রেকাবি বা ডিশ্ (plate)

সারে মাতে —– গুড়ের শক্তভাগকে সার এবং যে অংশ গলিয়া তরল হইয়া যায় উহাকে মাত বলে; শক্তগুড় জলোগুড়। কোন কোন নাগরীতে কিছু ঝোলাগুড়ও থাকে, আবার কিছু দানাগুরও থাকে। তাকে বলে সারে মাতে থাকা।

সাত চোনার বিচার (এক চোনায় যায়) — (চোনা = চুনা / চয়ণ / নির্বাচন) সাতবার বিচার করে যা নির্ধারণ করা হয়, বিশ্বাস হলে তাহা একেবারেই হয়।

সার্জন (সার্জেন্ট) সাহেব —– [Sergeant] পুলিসের উচ্চ কর্মচারিবিশেষ।

সার্জন —– [Surgeon] অস্ত্রচিকিৎসক।

সাষ্টাঙ্গ —– (১) মস্তক, গ্রীবা, বক্ষ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর, হস্ত ও পদ —– দেহের এই অষ্ট অঙ্গের সহিত। (২) জানু, পদ, পাণি, বক্ষ, বুদ্ধি, মস্তক, বাক্য, দৃষ্টি —– এই অষ্ট অঙ্গের সহিত কৃত (সাষ্টাঙ্গ প্রণাম)

সিধা (সিধে) — পাক করিয়া খাইবার মত দত্ত চাউল, ডাল, ঘৃত, লবণ, আলু প্রভৃতি ভোজ্য।

সিদ্ধাই —– যোগলব্ধ শক্তি।

সুঁদরী — [সিন্দূরবর্ণ বলিয়া অথবা সুন্দরবনজাত বলিয়া সুন্দরী — সুঁদরী] বৃক্ষবিশেষ; ইহার শাখা-প্রশাখায় জ্বালানি কাষ্ঠ হয়।

সুবচনী — মঙ্গলদায়িনী দেবীবিশেষ; শুভচণ্ডী।

সেঁকুল — (শেয়াকুল, সেয়াকুল) — কুলজাতীয় বন্য কাঁটাগাছবিশেষ।

সেঙ্গাত (সাঙ্গাত, স্যাঙ্গাত) — সখা; সুহৃদ; মিত্র।

সেথো — সহচর, সাথী।

সোঁধোগন্ধ (সোঁদা, সোঁধা) — দগ্ধ বা শুষ্ক মৃত্তিকায় জল পড়িলে যে সৌগন্ধ (সৌরভ, সদ্‌গন্ধ, সুবাস) বাহির হয়।

হ-ছ-না, রা-ছ — (ভাবাবস্থায়) হরিশ ছুঁইতে পারে না, রাখাল পারে।

হনুমান পুরী — হিন্দুস্থানী পালোয়ানের নাম।

হাবাতে কাঠ — খুব হালকা অসার কাঠ।

হাতে খড়ি — খড়ি দিয়া লিখাইয়া শিশুর বিদ্যারম্ভ।

হাতছিনে — সূতার মত পাকান হাত; শীর্ণ, কৃশ, সরু।

হাড় পেকে — অনাহারে ও কষ্ট সহিয়া যাহার হাড় দড়ির মত পাকাইয়া হাড়সার হইয়া গিয়াছে; অতি কৃশ।

হাজাশুখা — হাজা = অতিবৃষ্টি বা জলপ্লাবনাদির ফলে শস্যের পচন। শুখা = অনাবৃষ্টি।

হাবাতে — ভাগ্যহীন ব্যক্তি।

হাঁড়ি ভাঙ্গা — গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া দেওয়া। (হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা)

হিস্যা (হিস্‌সা, হিস্যে, হিস্‌সে) — প্রাপ্য ভাগ বা অংশ; ভাগ (সম্পত্তির হিস্‌সা)।

হেদিয়ে — দৈহিক বা মানসিক কষ্টহেতু ব্যাকুলতা প্রকাশ করা। (হেদিয়ে পড়া)

হোমাপাখি — শ্রীরামকৃষ্ণ বহু বৈদিক, তান্ত্রিক ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের পণ্ডিতদের সহিত নানাবিধ প্রসঙ্গাদি করিতেন। হয়তো কোন বৈদিক পণ্ডিত তাঁহাকে এই হোমাপাখির কথা বলিয়াছিলেন। এবং সেইটিই তিনি এইখানে বলেছেন যে 'বেদে আছে হোমাপাখির কথা' ইত্যাদি।

"ব্যোম্নৈব জাতনষ্টানাং মহতাং ব্যোমপক্ষিণাম্ ।
বন্ধুনাবন্ধনিলয়ান্ শরদভ্রসমাকৃতীন্ ।। — যোগবাশিষ্ঠ, রামায়ণ নির্বাণ প্রকরণ, পূর্বার্ধ ১৫.১৯

(ব্যোমপক্ষীরা আকাশেই উৎপন্ন হয় এবং আকাশেই মরিয়া থাকে। তাহারা কদাচ ভূমিতে অবতীর্ণ হয় না। শারদ-নীরদের ন্যায় বিরিঞ্চিহংসসন্তানেরা ওই ব্যোমপক্ষীদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া বাস করিতেছে।)

মারাঠী ভাষার সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানেশ্বরী ও দাসবোধ গ্রন্থদ্বয়ে ওই জাতীয় পাখির উল্লেখ আছে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c63 ৬৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে উল্লিখিত ব্যক্তিবৃন্দের পরিচয়

অক্ষয়কুমার সেন (১৮৫৮ - ১৯২৩) 1858-1923 — বাঁকুড়া জেলার ময়নাপুর গ্রামে জন্ম। পিতা হলধর সেন। মাতা বিধুমুখী দেবী।

ঘণ কৃষ্ণবর্ণ, রুগ্ন শরীর এবং মন্দ আকৃতির জন্য স্বামী বিবেকানন্দ রহস্যচ্ছলে তাঁহাকে ‘শাঁকচুন্নী’ বলিয়া ডাকিতেন। প্রথম জীবনে অক্ষয়কুমার কলিকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে ছেলেদের পড়াইতেন বলিয়া তাঁহাকে ‘অক্ষয়

মাস্টার' বলিয়া ডাকিতেন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। তিনি তাঁহার পরবর্তী জীবনে বসুমতী পত্রিকার অফিসে চাকুরী গ্রহণ করেন। অক্ষয়কুমার ঠাকুরের গৃহী ভক্ত, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার সহ কাশীপুরে ঠাকুরের অপর ভক্ত মহিমাচরণ চক্রবর্তীর বাড়িতে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন এবং তঁহার কৃপাদৃষ্টি লাভ করেন। অতঃপর তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন এবং বহুবার ঠাকুরের পবিত্রসঙ্গ লাভ করেন। কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু হওয়ার দিনও অক্ষয়কুমার উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর সেদিন অক্ষয়কুমারকে নিজের কাছে ডাকিয়া তাঁহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া কানে 'মহামন্ত্র' দান করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের পরামর্শে, স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহে এবং সর্বোপরি শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদে ঠাকুরের লীলা সম্বলিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি' পদ্যাকারে রচনা করেন। এইটি তাঁহার জীবনের ক্ষয়কীর্তি। তাঁহার প্রণীত অপর বিখ্যাত গ্রন্থ 'শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমা'। এই দুইখানি গ্রন্থের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে তিনি বিশেষ সুপরিচিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির মুহূর্তে অক্ষয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অক্ষয়কুমারের শেষ জীবন স্বগ্রামে অতিবাহিত হয়।

অঘোড় ভাদুড়ী — শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত। তাঁহার পিতা ডা: বিহারীভাদুড়ী। কলিকাতা সিমলা অঞ্চলে ১১, মধু রায় লেনে ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। রামচন্দ্র দত্তের গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভে তিনি ধন্য হন। ঠাকুরের কণ্ঠে গান এবং ধর্মপ্রসঙ্গ শুনিয়া তিনি অভিভূত হইয়া যাইতেন। নরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল।

অচলানন্দ তীর্থাবধূত — তান্ত্রিক বীরভাবের সাধক। পূর্বনাম রামকুমার, মতান্তরে — রাজকুমার। বাড়ি হুগলী জেলার কোতরং। ঠাকুরের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ দক্ষিণেশ্বরে। মাঝে মাঝে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বাস করিতেন। কখনো কখনো সশিষ্য পঞ্চবটীতে সাধনায় বসিতেন। কারণবারি পান করিয়া স্ত্রীলোকসহ বীরভাবের সাধনা করিতেন। এই বীরভাবের সাধনা বিষয়ে ঠাকুরের সহিত তাঁহার বিতর্ক হইত। ঠাকুর তাঁহার বীরভাবের সাধনা সমর্থন করিতেন না। ঠাকুর বলিতেন — সব স্ত্রীলোক-ই তাঁহার নিকট মায়ের বিভিন্ন রূপ। অচলানন্দ বিবাহ করিয়াছিলেন — স্ত্রী পুত্র ছিল, কিন্তু তাহাদের খবর রাখিতেন না। বলিতেন — ঈশ্বর দেখিবেন। কিন্তু নাম, যশ, অর্থের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ছিল।

অতুলচন্দ্র ঘোষ — নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল। কলিকাতা বাগবাজার অঞ্চলের অধিবাসী। ঠাকুরের ভক্ত। প্রথম দর্শন বাগবাজার দীননাথ বসুর বাড়িতে। প্রথম দিকে তিনি ঠাকুরের কাছ হইতে দূরে থাকিতেন এবং পরিহাস করিয়া ঠাকুরকে রাজহংস বলিতেন। ঠাকুর সেকথা শুনিয়া সস্নেহে তাঁহার এই উক্তির সমর্থন করেন অতুল তাহাতে অভিভূত হন এবং ঠাকুরের কৃপালাভে ধন্য হন। কল্পতরু অবস্থায় ঠাকুরকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল।

অধরলাল সেন (১৮৫৫ - ৮৫) — শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় গৃহীভক্তদের অন্যতম। ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ দক্ষিণেশ্বরে, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। পিতা রামগোপাল সেন পরম বৈষ্ণব ভক্ত। তিনি ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন । পূর্বপুরুষের আদি নিবাস হুগলী জেলার সিঙ্গুর গ্রামে। অধরের জন্মস্থান — ২৯, শঙ্কর হালদার লেন, আহিরীটোলা, কলিকাতা। বাসস্থান — কলিকাতার বেনিয়াটোলা। প্রতিভাবান,

কৃতীছাত্র অধর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের fellow এবং Faculty of Arts-এর সদস্য। পাঁচখানি বাংলা কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা। প্রথম জীবনে নাস্তিক অধর, আঠাস বৎসর বয়সে প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করিয়া ঠাকুরের প্রমভক্ত হন। প্রথম সাক্ষাতেই ঠাকুর অধরকে কাছে টানিয়া নেন। একদিন ঠাকুর অধরের জিহ্বায় ইষ্টমন্ত্র লিখিয়া দেন এবং ভাবাবিষ্ট অবস্থায় অধরের বক্ষ ও মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করেন। ধীরে ধীরে অধর দিব্যানন্দে ও আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে পূর্ণ হইতে থাকেন। ঠাকুর বহুবার অধরের বাড়িতে শুভাগমন করিয়া কীর্তনানন্দে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অধরকে নারায়ণ জ্ঞান করিতেন। অধর নানাবিধ কাজের সহিত যুক্ত ছিলেন। প্রায় প্রতিদিনই কঠোর পরিশ্রমের পর দিনান্তে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া যাইতেন। অধরের বাড়িতেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। সরকারী কাজে অধরকে ঘোড়ায় চড়িতে হইত। এই ব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে একাধিকবার সাবধান করিয়াছিলেন। কিন্তু ত্রিশ বৎসর বয়সে হঠাৎ একদিন ঘোড়ার পিঠ হইতে পড়িয়া যাওয়াতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই সময়েও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাঁহাকে স্পর্শ করেন।

অন্নদা গুহ — নরেন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু। তিনি বরাহনগর নিবাসী ছিলেন। প্রথম জীবনে অন্নদা অসৎসঙ্গে কাটাইতেন। একদা নরেন্দ্রনাথের উপরেও অন্নদার প্রভাব পড়ে। অন্নদা শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভে ধন্য হন। পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ অনুসরণ করিয়া নিজের জীবনধারাকে পরিচালিত করিতে

সক্ষম হইয়াছিলেন। কেহ কেহ অন্নদাকে অহঙ্কারী মনে করিলেও ঠাকুর তাহা অস্বীকার করিয়াছিলেন।

অন্নদা বাগচী (১৮৪৯ - ১৯০৫) — ২৪ পরগণার অন্তর্গত শিখরবালি গ্রামে জন্ম। পিতা চন্দ্রকান্ত বাগচী। শৈশব হইতেই অন্নদাপ্রসাদের শিল্পচর্চার প্রতি আকর্ষণ ছিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নব প্রতিষ্ঠিত স্কুল অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস-এর এনগ্রেভিং ক্লাশে ভর্তি হন। পরে তিনি পাশ্চাত্য রীতির চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শিক্ষা করেন। কর্মজীবনে প্রবেশ করিয়াও তিনি পূর্বোক্ত স্কুলের শিক্ষকও পরে প্রধান শিক্ষকের পদলাভ করেন। পাশ্চাত্য রীতিতে প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়া ইনি প্রভূত যশোলাভ করেন। শিল্পবিষয়ক প্রথম বাংলা পত্রিকা “শিল্পপুষ্পাঞ্জলি” (১২৯২) প্রকাশনার ব্যাপারে তিনি একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। তঁাহার অন্যতম প্রধান কীর্তি ‘আর্ট স্টুডিও’, প্রতিষ্ঠা (১৮৭৮)। এই আর্ট স্টুডিও হইতে লিথোগ্রাফি পদ্ধতিতে ছাপা বহু পৌরাণিক বিষয়ক চিত্র সেকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরের বিষয়ক চিত্র সেকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। পরে শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাতের সময় তিনি তাঁহার অঙ্কিত কিছু চিত্র শ্রীরামকৃষ্ণকে উপহার দিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দের সহিত এই চিত্রগুলি দেখিয়াছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার বঙ্গীয় কলাসংসদ স্থাপিত হইলে অন্নদাপ্রসাদ তাহার সভাপতি নির্বাচিত হন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রচিত ‘The Antiquities of Orissa’ এবং ‘বুদ্ধগয়া’ নামক গ্রন্থ দুইটিতে অন্নদাপ্রসাদের অঙ্কিত ছবিগুলি বিশেষ প্রশংসা লাভ করে।

অমৃতলাল বসু (১৮৩৯ - ১৯১৩) — কেশব সেনের অনুগামী। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী গৃহী ব্রাহ্মভক্ত। জন্মস্থান কলিকাতার হাটখোলায়। স্ত্রী বিধুমুখী দেবী।

শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসিয়া অমৃতলালের জীবনধারার উন্নতি ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণের চারিত্রিক মহত্ত্ব, বৈশিষ্ট্য এবং উদারমনোভাব অমৃতকে মুগ্ধ করে। ঠাকুর অমৃতকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ১৮৮৩ সালে ঠাকুর যখন অসুস্থ কেশব সেনকে দেখিতে আসেন তখন অমৃতলাল তথায় উপস্থিত ছিলেন। কাশীপুরে থাকাকালে ঠাকুর অমৃতকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অমৃত ঠাকুরকে দেখিতে আসেন। সেই সময়ে অমৃতলালের সহিত ঠাকুরের দীর্ঘসময় ধরিয়া কথাবার্তা হয়। পরবর্তী কালে ঠাকুরের প্রতি অমৃতলালের শ্রদ্ধাভক্তির পরিচয় পাইয়া স্বামীজীও খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন।

অমৃতলাল সরকার — কলকাতায় ১৮৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ডা: মহেন্দ্রলাল সরকার শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসক এবং বিশেষ অনুরাগী। অমৃতলালও চিকিৎসক হন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত The Indian Association for Cultivation of Science-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং শেষ পর্যন্ত সেই দায়িত্ব পালন করেন। অমৃত ঠাকুরের স্নেহলাভে ধন্য হন। অমৃতলাল ঈশ্বরের অবতারে বিশ্বাসী ছিলেন না। ঠাকুর কথা প্রসঙ্গে মহেন্দ্রলালের নিকট সস্নেহে ইহা উল্লেখ করেন। তিনি অমৃতলালের সরলাতার প্রশংসা করেন। উত্তরে মহেন্দ্রলাল ঠাকুরের প্রতি অমৃতের শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের কথা বলেন এবং অমৃত যে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী সেকথাও জানান।

অলকট, কর্ণেল — প্রসিদ্ধ থিয়োসফিস্ট নেতা। কলিকাতা থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি আমেরিকার একজন শিক্ষাবিদ ছিলেন। আধুনিক শিক্ষাপ্রচারের উদ্দেশ্য তিনি একটিবিদ্যালয়ের স্থাপনের চেষ্টা করেন। পরে

কনকর্ড স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত হন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে অলকটের উল্লেখ আছে।

অশ্বিণীকুমার দত্ত (১৮৫৬ - ১৯২৩) — ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের বিখ্যাত দেশনেতা ও মনীষী। জন্ম অবিভক্ত বাংলার বরিশাল শহরে। তাঁহার প্রণীত বিখ্যাত গ্রন্থ ভক্তিযোগ, কর্মযোগ ও প্রেম। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। এরপর আরও কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়। অশ্বিনীকুমার যেদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যান, সেদিনকেশব সেনেরও সেখানে আসিবার কথা ছিল। কেশব ভক্তবৃন্দের সাথে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন অনেক ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হয় এবং ঠাকুর —— সমাধিস্থ হন। অশ্বিনীকুমার এইভাবে প্রথম দর্শনেই উপলব্ধি করেন যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, ‘প্রকৃত পরমহংস’। ঠাকুরের সহিত তাঁহার চার-পাঁচবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কিন্তু এই অল্পসময়ের মধ্যে তিনি ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠেন। এই কয়েকবারের সাক্ষাতের অনুভূতি তাঁহার জীবনকে মধুর করিয়া তোলে। অশ্বিনীকুমারের পিতাও ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল নরেন্দ্রের সহিত যেন অশ্বিনীকুমারের পরিচয় হয়। ঠাকুরের এই ইচ্ছা বারো বৎসর পর আলমোড়ায় পূর্ণ হইয়াছিল। কলিকাতাতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

আন্দি —— মথুরবাবুর জানবাজারের বাড়ির এক মহিলা। সখিভাবে সাধনকালে জানবাজারের বাড়ির মহিলাবৃন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত কিরূপ অসঙ্কোচ ব্যবহার করিতেন তাহার দৃষ্টান্তরূপে তিনি ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

আশু — শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় আগরপাড়ার অধিবাসী ছিলেন। ২২ বৎসর বয়সে ঠাকুরের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। দক্ষিণেশ্বরে গিয়া তিনি একান্তে ঠাকুরের কাছে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন। আশুতোষ বৃদ্ধ বয়সে মাস্টারমহাশয়ের কাছে যাইতেন এবং ঠাকুরের সহিত নিজ সাক্ষাতের বিষয়ে আলোচনা করিতেন। আশুতোষ ঠাকুরের ভাবাবিষ্ট অবস্থা দেখিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইতেন। তিনি ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন।

ঈশ্বর ঘোষাল — ডেপুটি। শ্রীশ্রীঠাকুর ছেলেবেলায় কামারপুকুরে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার সাজ-পোশাকে ও ব্যক্তিত্বে সাধারণ লোকে ভীত হইত। অধরের সহিত কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছিলেন।

ঈশ্বর চক্রবর্তী — হুগলী জেলার ময়াল-ইছাপুর গ্রামের রাজচন্দ্র চক্রবর্তীর পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী অতি উন্নত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। ইঁহার পুত্র শশী শ্রীরামকৃষ্ণের ১৬ জন ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে একজন। পুত্র শশী পরবর্তী কালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নামে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে পরিচিত। ঈশ্বরচন্দ্র পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রনারায়ণ সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন শ্মশানে পঞ্চমুন্ডীর আসনে বসিয়া দীর্ঘকাল দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে শক্তিরূপী দেবীর নিত্য পূজার্চনা হইত। পরবর্তী কালে বেলুড় মঠে প্রথমবার দুর্গাপূজার সময় তিনি তন্ত্রধারক ছিলেন। মঠের সহিত তাঁহার আন্তরিক যোগ ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০ - ১৮৯১) — মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্ম। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা ভগবতী দেবী। অত্যন্ত দারিদ্রের

মধ্যে তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। কিন্তু দরিদ্রতা তাঁহার বিদ্যার্জনের পক্ষে বাধাস্বরূপ হয় নাই। বাল্যকাল হইতেই তিনি অসাধারণ মেধাবী হিসাবে পরিগণিত হন। কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, বেদান্ত, সমৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য সংস্কৃত বলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের কর্মজীবন বহুধাবিস্তৃত। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে তাঁহার অবদান অবিস্মরণীয়। পিতামাতার প্রতি ভক্তি, জনগণের প্রতি অসীম দয়া, মনুষ্যত্ববোধ, অজেয় পৌরুষ, অগাধ-পাণ্ডিত্য প্রভৃতি বহুবিধ গুণাবলীর জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলার ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁহাকে আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনক আখ্যা দেওয়া হয়। সীতার বনবাস, কথামালা, বর্ণপরিচয় প্রভৃতি নানা সংস্কারমূলক কার্যে তাঁহার অবদান অনস্বীকার্য। সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন ছাড়াও শিক্ষাজগতের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি কল্পে তিনি "মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন" প্রতিষ্ঠা করেন। পরে উক্ত বিদ্যালয়কে তিনি কলেজে পরিণত করেন। ঠাকুরের ইচ্ছানুসারে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট কথামৃত প্রণেতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহায়তা বিদ্যাসাগরের সহিত ঠাকুরের যোগাযোগ ঘটে। ঠাকুর স্বয়ং বিদ্যাসাগরের বাড়ি যাইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কথামৃতে এই সাক্ষাতের বিবরণ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে বিদ্যাসাগর শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং ঠাকুরও বিদ্যাসাগরকে দয়ার সাগর হিসাবে জ্ঞান করিতেন। বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত "মেট্রোপলিটান স্কুলের" বউবাজার শাখায় শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত (পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ) কিছুকাল প্রধান শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

ঈশান কবিরাজ (ঈশানচন্দ্র মজুমদার) — শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগীভক্ত। বরাহনগরে বাড়ি। শ্রী-মর বড়দিদির বিবাহ হয় এই বাড়িতে। মাস্টারমহাশয় এই বাড়ি হইতে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন। কবিরাজ মহাশয় ঠাকুরের পূর্বপরিচিত ছিলেন। তিনি কবিরাজীমতে ঠাকুরকে চিকিৎসা করিতেন। ঠাকুরের সহিত ঈশানচন্দ্রের হৃদ্যতা থাকায় ঠাকুর বরাহনগরে তাঁহার বাড়িতেও শুভাগমন করিয়াছিলেন।

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় —— শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী ভক্ত। বর্তমান ১৯ নং কেশবচন্দ্র স্ট্রীটে তাঁহার বাড়ি ছিল। আদি নিবাস ২৪ পরগণা জেলার হরিনাভি গ্রাম। A. G. Bengal-এর সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে ঈশানচন্দ্র পরম দয়ালু, দানবীর এবং ভক্ত হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে ঈশানচন্দ্র ঠাকুরের আশ্রিতরূপে পরিগণিত হন। ঠাকুর পরম ভক্তি-পরায়ণ ঈশানচন্দ্রের বাড়িতে কয়েকবার শুভাগমন করিয়া তাঁহার সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈশানচন্দ্রের শেষ জীবন ভাটপাড়াতে সাধন-ভজনে অতিবাহিত হয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে তিনি ভাটপাড়াতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইঁহার পুত্রগণ শ্রীশচন্দ্র, সতীশচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই কৃতী ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র শ্রীমর সহপাঠী, বন্ধু ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। সতীশচন্দ্ সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী গাজিপুরে সতীশচন্দ্রের গৃহে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন।

উপেন —— (উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) (১৮৬৮ - ১৯১৯) — জন্ম কলিকতার আহিরীটোলায়। পিতা পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। উপেন্দ্রনাথ ‘সাপ্তাহিক বসুমতী’

এবং 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' এর প্রতিষ্ঠা এবং সেই সংস্থার মাধ্যমে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের গ্রন্থাবলীর সুলভ সংস্করণের প্রকাশনা। তিনি 'সাহিত্য পত্রিকা'র সহিত যুক্ত ছিলেন। রাজভাষা, পাতঞ্জল দর্শন, কালিদাসের গ্রন্থাবলী প্রভৃতি পুস্তকসমূহের সম্পাদক। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে অধর সেনের বাড়িতে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন। প্রথম জীবনে তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, তবে পরবর্তী কালে তিনি প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তিনি নানাভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীদের সেবা করিয়াছিলেন। কৃপাধন্য উপেন্দ্রনাথ জীবনের অধিকাংশ সময়ই শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর অনুরাগীদের সেবায় অতিবাহিত করেন।

উপেন ডাক্তার — কলিকাতার জনৈক চিকিৎসক। ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য তিনি ঠাকুরের কাছে আসিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। কাশীপুরে একবার ঠাকুরের অসুখ বাড়াবাড়ি হওয়ার সংবাদ শোনামাত্রই ঠাকুরের পরমভক্ত নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ সেদিন গভীর রাত্রে উপেন ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন এবং উপেন ডাক্তার সেদিন ঠাকুরের সাময়িক চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন।

উমানাথ গুপ্ত (১৫.১১.১৮৩৯ — ১.১২.১৯১৮) — চব্বিশ-পরগণার হালিশহরে জন্ম। তিনি সাংবাদিক ছিলেন। উমানাথ গুপ্ত কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী ব্রাহ্মভক্ত এবং তাঁর একজন বিশিষ্ট বন্ধুও ছিলেন। ১৮৮৩ সালের ২৮শে নভেম্বর কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ি 'কমল-কুটীর'-এ শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন। অসুস্থ কেশবচন্দ্র সেনকে দেখিবার উদ্দেশ্যে ঠাকুর একদা 'কমল-কুটীর'-এ আসেন। সেদিনও উমানাথ গুপ্ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

উলোর বামনদাস (শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায়) — নিবাস নদীয়া জেলার বীরনগর বা উলোতে। উত্তর কলিকাতার কাশীপুরে তিনি মা-কালীর এক বৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। একদা দক্ষিণেশ্বরে জনৈক বিশ্বাসদের বাড়িতে অবস্থানকালে ঠাকুর হৃদয়কে সঙ্গেলইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। সেদিন ঠাকুরের কণ্ঠে শ্যামাসংগীত শুনিয়া বামনদাস মুগ্ধ হন এবং অপ্রত্যাশিতভাবে ঠাকুরের দর্শন লাভ হওয়াতে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন।

কাপ্তেন (বিশ্বনাথ উপাধ্যায়) — শ্রীরামকৃষ্ণের নেপালী গৃহীশিষ্য। নৈতিক শাস্ত্রজ্ঞ, সুপণ্ডিত কর্মযোগী ব্রাহ্মণ। পিতা ভারতীয় সেনাবাহিনীর সুবাদার এবং নৈষ্ঠিক শৈব। ধর্মপরায়ণ, সাহসী এবং দেশপ্রেমিক বলিয়া তাঁহার পূর্বপু রুষগণের খ্যাতি ছিল। তাঁহার স্ত্রী ‘গোপাল’-এর উপাসক এবং ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন। বিশ্বনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার পূর্বেই স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। সেইহেতু তাঁহাকে দর্শন করা মাত্রই তিনি চিনিতে পারেন। কর্মজীবনে বিশ্বনাথ কলিকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নেপাল রাজ সরকারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। পরবর্তী কালে কর্মকুশলতা এবং সততার জোরে তিনি অধিকতর উচ্চপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। নেপাল সরকার তাঁহাকে ‘ক্যাপ্টেন’ উপাধিতে ভূষিত করেন। এই কারণে ঠাকুর সস্নেহে তাঁহাকে ‘কাপ্তেন’ বলিয়া উল্লেখ করিতেন এবগ তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্তিমত্তার প্রশংসা করিতেন। ঠাকুরের সহিত বেদ-বেদান্ত, ভাগবত-গীতা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার গূঢ় আলোচনা হইত। প্রায়ঃশই তিনি ঠাকুরকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা এবং নিশ্চল বিশ্বাস ছিল। কিন্তু গোঁড়ামির

জন্য তিনি কেশবচন্দ্র সেনের নিকট ঠাকুরের যাতায়াত পছন্দ করিতেন না। কর্ম এবং ধর্ম তাঁহার জীবনে সমান্তরাল ভাবে চলিয়াছিল।

কালিদাস সরকার — ইনি জনৈক ব্রাহ্মভক্ত এবং কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী ছিলেন। ইনি ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরকে দর্শন করেন।

কালী [কালীপ্রসাদ চন্দ্র] (২.১০.১৮৬৬ — ৮.৯.১৯৩৯) — কালীপ্রসাদ পরবর্তী কালে স্বামী অভেদানন্দ হিসাবে পরিচিত। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্ন্যাসীদের মধ্যে কালীপ্রসাদ অন্যতম। জন্ম উত্তর কলিকাতার নিমু গোস্বামী লেনে, মাতা নয়নতারা দেবী। পিতা রসিকলাল চন্দ্র "ওরিয়েন্টাল সেমিনারী" স্কুলের ইংরাজীর শিক্ষক ছিলেন। কালীপ্রসাদ রচিত কয়েকটি গ্রন্থ: আমার জীবনকথা, কাশ্মীর ও তিব্বতে, পুনর্জন্মবাদ, বেদান্তবাণী, ব্রহ্মবিজ্ঞান, মরণের পারে, যোগশিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম, হিন্দু ধর্মে নারীর স্থান, শ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্র রত্নাকর ইত্যাদি। কালীপ্রসাদ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ থাকাতে এন্ট্রান্স ক্লাশ অবধি পড়াশোনা করিয়া আধ্যাত্মিক প্রেরণায় লেখাপড়া ত্যাগ করেন। যৌবনের প্রারম্ভেই হিন্দু শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন এবং প্রকৃত গুরুর সন্ধান করিতে থাকেন। ১৮৮৪ সালের মাঝামাঝি এক বন্ধুর পরামর্শে তিনি দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ সকাশে যান। ইহার পর কালীপ্রসাদ বহুবার রামকৃষ্ণ সংস্পর্শে আসেন। নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী যোগচর্চা, ধ্যানধারণা প্রভৃতিতে আত্মনিয়োগ করেন এবং ঠাকুরের শেষদিন পর্যন্ত সেবা করেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর যে সকল ব্যক্তি স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং কঠোরতার সহিত ধ্যান এবং আধ্যাত্মিক পঠন-পাঠনে নিমগ্ন থাকিতেন। গুরুভ্রাতাগণের

নিকট তিনি ছিলেন ‘কালী তপস্বী’। কালীপ্রসাদ ভারতের সমস্ত তীর্থক্ষেত্র পদব্রজে পরিদর্শন করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ডের Christo-Theosophical Society-তে ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা দেন। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি আমেরিকায় ‘বেদান্ত সোসাইটি’ স্থাপন করেন এবং ১৯২১ সাল পর্যন্ত সেখানে বেদান্ত প্রচার করিতে থাকেন। এইসময় তিনি পাশ্চাত্যের বহুদেশে যান এবং বহু খ্যাতিমান লোকের সহিত মতবিনিময় করেন। প্রেততত্ত্ববিদ হিসাবেও তিনি বিদেশে খ্যাতিলাভ করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি ‘রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি’ স্থাপন করেন। এই ‘সোসাইটি’র মাধ্যমে এবং তাঁহার প্রকাশিত “বিশ্ববাণী” পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও ভাবদারাকে দিকে দিকে প্রচার করেন । ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দার্জিলিঙ-এ ‘রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম’ প্রতিষ্ঠা করেন । ১৯৩৭ সালে ঠাকুরের জন্মশতবার্শিকী উপলক্ষে কলিকাতা টাউন হলে আয়োজিত ধর্মসভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে কলিকাতার বেদান্ত আশ্রমে তাঁর দেহান্ত হয়।

কালীকিঙ্কর — ইনি একজন তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। অচলানন্দের প্রসঙ্গে (৯-৯-৮৩) শ্রীশ্রীঠাকুর ইঁহাদের সাধনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

কালীকৃষ্ণ — ভবনাথের বন্ধু। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মমহোৎসব দিবসে গান গাহিয়াছিলেন (১১-৩-৮৩)।

কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য — কথামৃত-প্রণেতা মাস্টারমশাই — মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিশেষ বন্ধু। বিদ্যাসাগর কলেজের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক। ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৮৮২-তে দক্ষিণেশ্বরে। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

তাঁহাকে শুঁড়ির দো কান দেখাইবার অছিলায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে হাজির করেন এবং ঠাকুরকে বন্ধুটির বিষয়ে উপরোক্ত ঘটনা জানান। ঠাকুর সহাস্যে কালীকৃষ্ণকে ভজনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের সুরার বিষয়ে কিছু উপদেশ দেন। কালীকৃষ্ণের সেইদিন ঠাকুরের মুখে একটি গান শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

কালীপদ ঘোষ (১৮৪৯ - ১৯০৫) — 'দানা-কালী' নামে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে পরিচিত । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীশিষ্য। উত্তর কলিকাতার শ্যামপুকুরে প্রসিদ্ধ ঘোষ কোম্পানীতে চাকুরী করিতেন। প্রথম দর্শন ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে। ন্যাট্যাচার্য গিরিশচ ন্দ্র ঘোষের সহিত তাঁহার খুব হৃদ্যতা ছিল। ভক্তগণ ইঁহাদের দুইজনকে একত্রে জগাই মাধাই বলিতেন। তিনি বহু গান লিখিয়াছিলেন যাহা "রামকৃষ্ণ সঙ্গীত" নামে প্রকাশিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে 'দানা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। ভাগ্যবান কালীপদর জিহ্বায় ঠাকুর "কালী" নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং ঠাকুর তঁহাকে বিশেষ কৃপাদান করেন। সেইদিনই অযাচিতভাবে কালীপদর শ্যামপুকুরের বাড়িতে ঠাকুর প্রথম শুভাগমন করিয়া পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসেন। কালীপদর বাড়িতে ঠাকুর আরও কয়েকবার শুভাগমন করেন এবং কাশীপুরে "কল্পতরু" হওয়ার দিনেও কালীপদর বক্ষঃস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করেন। সুগায়ক, বেহালা ও বংশীবাদক কালীপদর বাঁশী শুনিয়া একদা ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে বোম্বাইতে অবস্থানকালে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানগণ তাঁহার গৃহে অতিথি হইতেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত কালীপদ ঘোষ কলিকাতাতেই দেহত্যাগ করেন।

‘কিরণ্ময়ী’ লেখক — রাজকৃষ্ণ রায়, নরেন্দ্রনাথের বন্ধু। শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন।

কিশোরী (১৮৫৯ - ১৯৩১) — [কিশোরীমোহন গুপ্ত] শ্রীম’র ছোট ভাই, কলিকাতায় জন্ম। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত। ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ দক্ষিণেশ্বরে (১৮৮২-৮৩)। বাসস্থান ১৩, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৬। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগবশতঃ নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন এবং সুযোগ পাইলেই ঠাকুরের সেবা করিতেন। সুগায়ক এবং সুকণ্ঠের অধিকারী। ঠাকুরের সম্মুখে গান করিতেন। ঠাকুরও তাঁহার গান পছন্দ করিতেন। ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। কলিকাতাস্থ দর্জিপাড়ার ডাক্তার বিশ্বনাথ গুপ্তের কন্যা রাধারাণীকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। কিশোরী আজীবন ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি একাকী কলিকাতার বাড়িতে বাস করিতেন এবং তপস্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। সেইখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

কুইন [মহারানী ভিক্টোরিয়া] (১৮১৯ - ১৯০১) — ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা এড্‌ওয়ার্ড ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের চতুর্থ পুত্র ডিউক অব কেন্ট নামে পরিচিত এবং মাতা স্যাকস্ কোবার্গের ডিউক তনয়া মেরিয়া লুইসা। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে জুন “গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডের রানী” উপাধি লইয়া তিনি ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়া গ্রেট ব্রিটেন ক্ষমতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হয়। এই সময় ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব সম্পন্ন হয় এবং সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটে। শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্য প্রভৃত উন্নতি হওয়ায় ১৮৮০-র দশক ইতিহাস ও সাহিত্যে

‘ভিক্টোরিয়ান যুগ’ নামে অভিহিত হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণানুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে ভারতে শাসনভার ইংলণ্ডেশ্বীর হস্তে হস্তান্তরিত হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়া ‘ভারতসম্রাজ্ঞী’ উপাধিতে ভূষিত হন। কেশবচন্দ্র সেন মহারানীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সমাদর লাভ করেন —– শ্রীশ্রীঠাকুর কথামৃতে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন ।

কুক সাহেব [রেভারেণ্ড জোসেফ কোক] (১৮৩৮-১৯০১) — আমেরিকার নিউ ইংল্যাণ্ডের প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের ধর্ম প্রচারক। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকায় যে উদারপন্থী ধর্মমত প্রচলিত ছিল তিনি সেই ধর্মমতের প্রচারক। তিনি ইয়েল, হারভার্ড এবং জার্মানীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। কর্মসূত্রে অধ্যাপক ছিলেন। বাগ্মী হিসাবেও পরিচিত। ‘ওরিয়েন্ট’ নামক পুস্তক প্রণেতা। তিনি ‘ট্রিমন্ট টেম্পল’ (Tremont Temple) এবং ‘ওল্ড সাউথ মিটিং হাউস’ (Old South Meeting House) এ দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল যে বক্তৃতা দেন তা পরবর্তী কালে Monday Lectures নামে ১১ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষ ভ্রমণের সময় ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের সহিত পরিচয় ঘটে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ আমেরিকা ভ্রমণকালে যে সমস্ত ব্যক্তিদের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন জোসেফ কুক তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। একমাত্র জোসেফ কুকুই স্বামীজীর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শন লাভ করেন। কিন্তু তঁহারা পরস্পর কেহই কাহাকেও একথা বলেন নাই। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে জোসেফ কুক প্রাচ্য পরিভ্রমণে আসেন। ভারতবর্ষ ভ্রমণের সময় ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের সহিত পরিচয় হয় এবং সেই পরিচয় ক্রমশঃ হৃদ্যতায় পরিণত হয়। কেশবচন্দ্র স্টীমারে করিয়া দক্ষিণেশ্বরে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে ফেব্রুয়ারি ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসার

সময় রেভারেণ্ড কুক এবং আমেরিকার পাদ্রী মিস পিগটকে সঙ্গে লিয়া আসেন। সেদিন ঠাকুরকে স্টীমারে লিয়া গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করার সময় কুকসাহেবও উপস্থিত ছিলেন। কুকসাহেব সেখানে ঠাকুরের ধর্মবিষয়ক প্রসঙ্গের এবং তাঁহার সমাধিস্থ হওয়ার স্বর্গীয় দৃশ্যের সাক্ষী ছিলেন। খ্রীষ্টমতাবলম্বী যুবক জোসেফ কুকের কাছে এই মহাপুরুষের সমাধি দর্শন অভাবনীয় ছিল। রেভারেণ্ড কুক ইহাতে যারপরনাই অভিভূত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই অপূর্ব অনুভূতির কথা ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'দি ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকাতে লিপিবদ্ধ আছে। শিকাগো ধর্মমহাসভায় কুকসাহেবের বক্তৃতার মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে লেডি ম্যাকবেথের জঘন্য পাপ ক্ষালন একমাত্র খ্রীষ্ট ধর্মেই সম্ভব — এই কথার উত্তরস্বরূপ স্বামিজীর বিখ্যাত উক্তি: — "Ye are the children of God .... Sinners! It is a sin to call a man so."

কুঞ্জবাবু — ইনি একজন সৌখীন অভিনেতা ছিলেন। 'নববৃন্দাবন' নাটকে ঠাকুর ইঁহার পাপপুরুষের অভিনয় দেখিয়াছিলেন এবং পাপের অভিনয় করা ভাল নয় — ইহাও মন্তব্য করিয়াছিলেন।

কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ (কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ) — ইনি কুচবিহার-রাজপরিবারের সন্তান। কেশবচন্দ্র সেনের জামাতা কুমার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপের আত্মীয়। পরবর্তী কালে কেশবচন্দ্র সেনের দ্বিতিয়া কন্যা সাবিত্রী দেবীর সহিত বিবাহ হয়। ১১৮১ খ্রীষ্টাব্দে নৃপেন্দ্রনারায়ণের জাহাজে করিয়া তিনি কেশবচন্দ্র এবং তঁহার সঙ্গীদের সহিত দক্ষিণেশ্বরে যান এবং ঠাকুরের পূতসঙ্গ লাভ করেন। তাঁহার সাহেবী পোষাক শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

কুমার সিং (কুঁয়ার সিং) — শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ অনুরাগী নানকপন্থী শিখভক্ত। দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ির উত্তর পাশে সরকারী বারুদখানায় শিখসৈন্যগণের হাবিলদার ছিলেন। কুঁয়ার সিং শ্রীরামকৃষ্ণকে 'গুরু নানাক' জ্ঞানে ভক্তি করিতেন এবং প্রায়ই ঠাকুরের পূতসঙ্গ লাভ করিতে আসিতেন। ঠাকুরও তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। কুঁয়ার সিং সাধুভোজন করাইবার সময় ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিতেন, ঠাকুরও সানন্দে তাহা স্বীকার করিতেন।

কৃষ্ণকিশোর (কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য) — ইনি আড়িয়াদহ নিবাসী সদাচারনিষ্ঠ রামভক্ত সাধক ও শ্রীশ্রীঠাকুরের গৃহীভক্ত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তঁহার বাড়িতে অধ্যাত্মনারায়ণ পাঠ শুনিতে যাইতেন। তাঁহার "রামনাম ও শিবনামে" গভীর বিশ্বাস ছিল। বৃদ্ধবয়সে পুত্রশোকে কাতর হইলেও তাঁহার ভগবৎ বিশ্বাস অটুট ছিল ।

কৃষ্ণদাস পাল (১৮৩৮ - ১৮৮৪) — 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক, খ্যাতনামা বাগ্মী এবং রাজনীতিবিদ। জন্ম কলিকতার কাঁসারীপাড়ায়। পিতা ঈশ্বরচন্দ্র পাল। কৃষ্ণদাস দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়িতে ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণধন —— ইনি একজন রসিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি বলরাম-মন্দিরে ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিলে ঠাকুর ইঁহাকে রসিকতা ছাড়িয়া ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইতে উপদেশ দেন।

কৃষ্ণময়ী (কৃষ্ণময়ী বসু) — বলরাম বসুর বালিকা কন্যা । সাধনার সময়ে পাপপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুরকে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর মাকে

ডাকিতে থাকায় মা ভুবনমোহিনীরূপে দেখা দেন। তাঁহার রূপ কৃষ্ণময়ীর রূপের মতো বলিয়া ঠাকুর উল্লখ করিয়াছেন। কৃষ্ণময়ী পিতৃগৃহে বহুবার শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন হওয়াতে কৃষ্ণময়ীর ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়। ঠাকুর কৃষ্ণময়ীকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

কেদার (কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়) — ঠাকুরের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীশিষ্য। হালিশহর বাসী কেদারনাথের আদি নিবাস ঢাকায়। তিনি ঢা কাতে সরকারী অফিসে অ্যাকাউন্টেন্টের কাজ করিতেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন। কেদারনাথ প্রথমজীবনে ব্রাহ্মসমাজ, কর্তাভজা, নবসরিক প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে যোগদান করেন এবং অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাগত হন। ঢাকায় থাকাকালে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে তঁহার আলোচলা হইত। কর্মস্থল ঢাকা হইতে কলিকাতায় আসিলেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট যাইতেন। ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের সহিত কেদারনাথের নানাবিষয়ে তর্ক বাধাইয়া বেশ আনন্দ উপভোগ করিতেন।

কেশব কীর্তনীয়া —– ঈশান মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত ইঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এইদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কীর্তন শুনাইয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮ - ১৮৮৪) — কলিকাতার কলুটোলায় সেনবংশে জন্ম। পিতা প্যারীমোহন সেন। মাতা সারদাসুন্দরী দেবী। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট দীক্ষাগ্রহণ, পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজের নেতা এবং নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। কেশবচন্দ্র সেন প্রণিত গ্রন্থ —– সত্যবিশ্বাস, জীবনবেদ, সাধু-সমাগম, দৈনিক প্রার্থনা, মাঘোৎসব, ইংলণ্ডে কেশবচন্দ্র সেন,

নবসংহিতা ইত্যাদি। ‘পরমহংসের উক্তি’ নামক গ্রন্থের সংকলক। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ স্নেহধন্য। কেশব সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিখ্যাত উক্তি: একমাত্র কেশবেরই ফাতনা ডুবিয়াছে। ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জয়গোপাল সেনের বাগান বাড়িতে। এই সময় হইতে উভয়ের মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গতার সূচনা। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ‘ইণ্ডিয়ান মিরার’ পত্রিকাতে তিনি প্রথম ঠাকুরের কথা প্রকাশ করেন। ইহাই জনসাধারণের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে প্রথম প্রচার। কেশবের “কমল-কুটীর” নামক বাটীতে (বর্তমানে ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্‌টিটিউশন) ঠাকুর কয়েকবার শুভাগমন করিয়াছিলেন এবং এইখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম ফোটো তোলা হয়। অত্যধিক পরিশ্রমে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হন। তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া ঠাকুর তাঁহার বাড়িতে গিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া ঠাকুর মর্মাহত হইয়াছিলেন।

কেশব সেনের মা [শ্রীমতি সারদাসুন্দরী দেবী (সেন)] — ১৮০৯ সালে গরিফায় জন্ম। বাসস্থান কলিকাতার কলুটোলায়, ১৮৮৩ সালে সারকুলার রোডে অবস্থিত “কমল-কুটীর”-এ (বর্তমানে ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউশন) ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন। পরবর্তী কালে তিনি দক্ষিণেশ্বরে কয়েকবার ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। কেশবের মৃত্যুর শোকাতুরা সারদাসুন্দরীকে ঠাকুর নানা উপদেশ দানে এবং সঙ্গীতাদিতে সান্ত্বনা দিতেন। সারদাসুন্দরী দেবী ঠাকুরকে অতিশয় ভক্তি করিতেন এবং ঠাকুরও তাঁর ভক্তির প্রশংসা করিতেন।

কোন্নগরের গায়ক — হুগলী জেলার কোন্নগর নিবাসী জনৈক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গায়ক। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে নানাপ্রকার কালোয়াতি গান শুনাইয়া মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

ক্ষীরোদ (ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্র) — শ্রীরামকৃষ্ণের বালক ভক্ত। কথামৃত প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ছাত্র। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান স্বামী সুবোধানন্দের সহপাঠী। ক্ষীরোদ সম্পর্কে ঠাকুর খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ক্ষীরোদের প্রতি যত্ন নেওয়ার জন্য তিনি মাস্টারমশাইকে নির্দেশও দিতেন। ক্ষীরোদ বরাবরই ঠাকুরের বিশেষ অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় ঠাকুর যখন কাশীপুরে অবস্থান করেন সেই সময়ও ক্ষীরোদ ঠাকুরের কাছে নিয়মিত যাতায়াত করিতেন।

ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় (১৭৭৫ - ১৮৪৩) — ইনি শ্রীযুক্ত মাণিকরাম চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র; এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পিতা। বাসস্থান দেরে গ্রাম। ক্ষুদিরামের স্ত্রী চন্দ্রমণি দেবী। ক্ষুদিরাম অতিশয় ধর্মপরায়ণ, নির্ভীক সত্যপ্রিয় ছিলেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত অর্থকারী কোনরূপ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু সত্যনিষ্ঠা, সন্তোষ, ক্ষমা, ত্যাগ প্রভৃতি যে গুণসমূহ সদ্‌ব্রাহ্মণের স্বভাবসিদ্ধ হওয়া কর্তব্য বলিয়া কথিত আছে, তিনি ওই সকল গুণের অধিকারী ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি তাঁহাতে বিশেষ প্রকাশ ছিল এবং তিনি নিত্যকৃত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া প্রতিদিন পুষ্পচয়নপূর্বক রঘুবীরের পূজান্তে জলগ্রহণ করিতেন। নিষ্ঠা ও সদাচারের জন্য গ্রামবাসীরা তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও সম্মান করিত। কথিত আছে যে, সত্যনিষ্ঠার জন্য প্রজাপীড়ক জমিদার ক্ষুদিরামকে সর্বস্বান্ত করিয়া স্বগ্রাম হইতে বিতাড়িত করেন। সত্যরক্ষার জন্য ক্ষতি স্বীকার করিয়াও এই অত্যাচার অবিচার ক্ষুদিরাম স্বীকার করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মের পূর্বে ১২৮১ সালে, গয়াক্ষেত্রে পিতৃপুরুষদের পিণ্ডদানের পরে ক্ষুদিরাম নবদূর্বাদল শ্যাম

জ্যোতির্ময়তনু এক পুরুষকে স্বপ্নে দর্শন করেন এবং পুত্ররূপে ক্ষুদিরামের গৃহে তাঁহার জন্মগ্রহণপূর্বক তাঁহার সেবা গ্রহণ করার কথা জানিতে পারেন। ক্ষুদিরামের জীবনের বহু ঘটনায় তাঁহার গভীর ধর্মবিশ্বাস ও ভগবৎ পরিচয় পাওয়া যায়। একবার অভীষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্ররূপে তাঁহাকে দেখা দেন এবং তাঁহার সেবাগ্রহণের অভিলাষ জানান। স্বপ্নের নির্দেশ অনুযায়ী ক্ষুদিরাম 'রঘুবীর' শালগ্রামশিলা লাভ করেন এবং গৃহদেবতারূপে প্রতিষ্ঠাপূর্বক নিত্যপূজা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ ক্ষুদিরামের হৃদয়ে শান্তি, সন্তোষ ও ঈশ্বর নির্ভরতা নিরন্তর প্রবাহিত হইতে থাকে এবং তাঁহার সৌম্য শান্ত মুখদর্শনে গ্রামবাসীরা ঋষির ন্যায় তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে থাকেন। তাঁহার দেবভক্তি এত গভীর ছিল যে একবার তিনি বহুদূর পথ অতিক্রম করার পর অসময়ে নূতন বিল্বপত্র দর্শনে গন্তব্যস্থলে যাওয়া স্থগিত রাখিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বিল্বপত্র দিয়া শিবপূজা করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করেন। বালক গদাধর যখন সাতবৎসরের তখন বিজয়া দশমীর দিন ক্ষুদিরাম দেহত্যাগ করেন। পরিণত বয়সেও ঠাকুর ভক্তদের নিকট মাঝে মাঝে পিতা ক্ষুদিরামের ধর্মনিষ্ঠার কথা স্ম রণ করিতেন।

খড়দহের নিত্যানন্দবংশীয় গোস্বামী — স্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দর্শনকালে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। ঠাকুর তঁহার সহিত সস্নেহ ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইনি খুব বড় পণ্ডিত এবং ইঁহার পিতাও বড় ভক্ত ছিলেন। পিতা শ্যামসুন্দরের প্রসাদ দিয়া ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন।

খেলাৎচন্দ্র ঘোষ (রামখেলাৎ ঘোষ) — জন্ম কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটায়। বিশিষ্ট দানশীল জমিদার। দীর্ঘদিন কলিকতার অবৈতনিক বিচারক, জাস্টিস অফ দি পিস এবং সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। কলিকাতার

ধর্মতলা অঞ্চলে তাঁর নামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। খেলাৎ ঘোষের সম্বন্ধীর আমন্ত্রণে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই ঠাকুর কয়েকজন ভক্তসহ খেলাৎ ঘোষের বাড়িতে পদার্পণ করেন এবং ভগবৎ প্রসঙ্গ করেন।

গঙ্গাধর [গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায়] (৩০।৯।১৮৬৪ — ৭।২।১৯৩৭) — গঙ্গাধরের জন্ম কলিকতার আহিরীটোলায়। পিতা শ্রীমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়। গঙ্গাধর পরবর্তী-জীবনে স্বামী অখণ্ডানন্দ নামে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে সুপরিচিত। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগীশিষ্যদের অনত্যম। সম্ভবত ১৮৭৭ খ্রী: বাগবাজারে দীননাথ বসুর গৃহে তিনি প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন । সঙ্গে বাল্যবন্ধু হরিনাথ ছিলেন। এই হরিনাথ পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে স্বামী তুরীয়ানন্দ নামে রিচিত। ইহার পরে ১৮৮২ অথবা ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন। স্বামী অখণ্ডানন্দের রচিত গ্রন্থের মধ্যে ‘তিব্বতের পথে হিমালয়ে’ এবং ‘স্মৃতিকথা’ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার লেখা সজীব, সতেজ ও সাবলীল। ১৯২৫ সালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-অধ্যক্ষ এবং ১৯৩৪ সালে অধ্যক্ষ রূপে গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই পদে আসীন ছিলেন।

গঙ্গাপ্রসাদ (গঙ্গাপ্রসাদ সেন) (১২৩১-১৩০২ বঙ্গাব্দ) — ঢাকা জেলার উত্তরপাড় কোমরপুকুর গ্রামে গঙ্গাপ্রসাদ সেনের জন্ম। পিতার নাম নীলাম্বর সেন। পিতার নিকট আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ১২৪৯ বঙ্গাব্দে কলিকাতার কুমারটুলীতে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। তৎকালীন ভারতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে রামকৃষ্ণদেবও তাঁহার চিকিৎসাধীনে ছিলেন। ইনি প্রায় পঞ্চাস বৎসরের উপর আয়ুবেদিক চিকিৎসা করিয়া বাংলাদেশে কবিরাজী চিকিৎসার ধারা প্রচলন

করেন । ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি প্রথম দেখিতে আসেন। দক্ষিণেশ্বরে সাধনকালের প্রথম অবস্থায় রানীরাসমণির জামাতা মথুরবাবুর আহ্বানে ইনি ঠাকুরের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের আয়ত্তের বাহিরে ঠাকুরের অলৌকিক লক্ষণগুলি নিরাময় করিতে ব্যর্থ হইয়া ভ্রাতা দুর্গাপ্রসাদের মত অনুযায়ী এই ব্যাধিকে 'যোগজ ব্যাধি' বলিয়া অভিহিত করেন। অন্য সময়ে গঙ্গাপ্রসাদ ঠাকুরের রক্ত আমাশয় রোগের চিকিৎসা করিয়াছিলেন এবং গঙ্গাপ্রসাদের বাড়িতেও ঠাকুরের শুভাগমন হইয়াছিল। পরবর্তীকালে, ঠাকুর যখন কঠিন কণ্ঠরোগে পীড়িত হইয়া কলিকাতায় ভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে চিকিৎসার জন্য অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ভক্তদের প্রচেষ্টায় পুনরায় গঙ্গাপ্রসাদকে ঠাকুরের চিকিৎসা করিবার জন্য আনা হয়। কিন্তু গঙ্গাপ্রসাদ অন্যান্য অভিজ্ঞ কবিরাজগণের সহিত পরামর্শ করিয়া জানিতে পারেন যে, রোগটি দুরারোগ্য, সারিবার নহে।

গঙ্গামায়ী — ইনি বৃন্দাবনের নিকট বর্ষানা নামক স্থানে তপস্যা করতেন। বিশেষ উচ্চ অবস্থাসম্পন্না সাধিকা ছিলেন। সাধারণে তাঁহাকে শ্রীরাধার সঙ্গিনী ললিতা সখীর অবতার বলিয়া মনে করিতেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ইনি ঠাকুরকে শ্রীরাধার মত ভাবময়ী দেখিয়া তাঁহাকে 'দুলালী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ঠাকুর গঙ্গামায়ীর সেবাযত্নে মুগ্ধ হইয়া বৃন্দাবনে থাকিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা ঘটিয়া ওঠে নাই।

গণুর মা — [যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস] (১৬।১।১৮৫১ — ৪।৬।১৯২৪) — যোগীন্দ্র মোহিনী বিশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগীন-মা নামে পরিচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা। পিতা প্রসন্নকুমার মিত্র। ভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করেন। মেয়ের নাম গণু বলিয়া তাঁহাকে ‘গণুর মা’ বলা হইত। শ্রীসারদা দেবীর সঙ্গিনী, সেবিকা ও অসামান্যা সাধিকা যোগীন-মাকে মায়ের ‘জয়া’ বলা হইয়াছে। ইনি শ্রীশ্রীঠাকুরেরও কিছু সেবা করিয়াছিললেন। শ্রীশ্রীমায়ের পঞ্চতপা ব্রত সাধনাতেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন। যোগীন-মা উচ্চস্তরের সাধিকা ছিলেন — একাধিবার তাঁহার সমাধি হয়। যোগীন-মার অবিরাম তপশ্চর্যার বহু দৃষ্টান্ত আছে। বৃদ্ধাবয়সেও তাঁ হার জপধ্যানে প্রবল অনুরাগ ছিল। তাঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির প্রমাণ প্রদর্শনের জন্য যেন শ্রীশ্রীমা অনেক সময় তাঁহার সহিত দীক্ষার্থীদের মন্ত্রাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। দীন দুঃখীদের প্রতি তঁহার গভীর মমতা ছিল। জয়রামবাটী প্রভৃতি স্থানে মায়ের জনগণের সেবাদিতেও তিনি যথাসাধ্য অর্থব্যয় করিতেন। শ্রী শ্রীঠাকুরের নিকট তাঁহার ভগবৎ প্রসঙ্গাদি শ্রবণ করার সোভাগ্য হইয়াছিল। তাহার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী রচনাকালে তিনি স্বামী সারদানন্দজীকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। স্ত্রীভক্তদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের আলাপ ও ব্যবহারাদির ইতিহাস তাঁহার স্মৃতিশক্তিবলে অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত হইয়াছিল — প্রয়োজনস্থলে হুবুহু পুনরুজ্জীবিত হইত।

গণেশ উকিল — মথুরবাবুদের উকিল। তাঁহাদের বিষয় সংক্রান্ত কাজ উপলক্ষে আসিয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করেন।

গিরিধারি দাস — গরাণহাটার (নিমতলা স্ট্রীট) বৈষ্ণব সাধুদের আখড়ার মোহন্ত। ষড়ভুজ মহাপ্রভু দর্শন করিতে ঠাকুর এই আখড়ায় আসিয়াছিলেন।

গিরিশ [গিরিশচন্দ্র ঘোষ] (২৮.২.১৮৪৪ — ১৮.২.১৯১২) — ইনি বঙ্গসমাজে প্রধানতঃ মহাকবি, নাট্যকার ও নট বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীতে তিনি একনিষ্ঠ ভক্তি ও বিশ্বাসের মূর্তি এবং ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপার অপূর্ব নিদর্শন। কলিকাতা বাগবাজার নিবাসী গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাল্যাবস্থায় পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েন । প্রথমে পাঠশালায়, পরে গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ও হেয়ার স্কুলে পড়াশুনা করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে পাইকপাড়া স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেন। বাল্যকাল হইতে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পঠনের ফলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টি গড়িয়া ওঠে। পরবর্তী কালে নিজের অদ্যবসায় ও নিষ্ঠার গু ণে প্রখ্যাত নট, নাট্যকার ও কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং “মহাকবি” উপাধি অর্জন করেন। তিনি দেশপ্রেমিক এবং সমাজসংস্কারক ছিলেন। বাংলা নাট্য আন্দোলনের পুরোধা গিরিশচন্দ্র বাংলা নাটকের এক নূতন দিগন্ত উন্মোচন করেন। সারা জীবনে প্রায় ৮০টি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক নাটক রচনা করেন। ইহার মধ্যে উল্লখযোগ্য চৈতন্যলীলা, বিল্বমঙ্গল, প্রফুল্ল, দক্ষযজ্ঞ, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, পাণ্ডবগৌরব, জনা, সিরাজদ্দৌলা প্রভৃতি। গিরিশচন্দ্র দীননাথ বসুর গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। প্রথমে তিনি কৌতূহলবশতঃ তাঁহাকে দেখিতে যান। একজন বিপথগামী ব্যক্তি সাধুলোকের সংস্পর্শে আসিয়া কিভাবে পবিত্র হইতে পারে — গিরিশচন্দ্র তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ। ঠাকুরের অত্যধিক স্নেহ অশেষ কৃপা এবং সুমধুর প্রশ্রয় তাঁহার ক্লেদাক্ত জীবনের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরাইয়া দিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে ‘ভৈরব’ আখ্যা দিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বে তাঁহার জ্বলন্ত বিশ্বাস ছিল এবং তিনি যে জীবের মুক্তিকল্পে ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন একথা প্রচার করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন

যে, গিরিশের পাঁচসিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার রচিত 'চৈতন্যলীলা' নাটক দেখিয়া ভাবাবিষ্ট হন এবং শ্রীচৈতন্যের ভূমিকায় অভিনেত্রী বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেন। ইহা ছাড়া গিরিশের অন্য কয়েকটি নাটকও তিনি দেখেন। জীবনের অন্তিম পর্বে গিরিশ সর্বদা ঠাকুরের নাম গুণকীর্তন করিতেন। তাঁ হার ব্যক্তিত্বের চৌম্বকস্পর্শে সকলেই অভিভূত হইয়া যাইতেন। গিরিশের জীবন বুঝিতে গেলে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণকে বাদ দেওয়া চলে না, শ্রীরামকৃষ্ণের অপার করুণা বুঝিতে হইলে গিরিশের জীবনও তেমনি অপরিহার্য।

গিরীন্দ্র (গিরীন্দ্রনাথ মিত্র) — কলিকাতা সিমুলিয়াবাসী গিরীন্দ্র মিত্র শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহীভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের ভ্রাতা। ১৮৮১ সালে ইনি দক্ষিণেশ্বরে প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করেন। প্রথম দর্শনেই শ্রী রামকৃষ্ণকে শঙ্কর, বুদ্ধ এবং চৈতন্যদেবের সমকক্ষ হিসাবে অনুভব করেন। তিনি প্রথমে ব্রাহ্মধর্মে এবং নিরাকার সাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া হিন্দু ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হন। গিরীন্দ্র সুরেন্দ্রনাথের সহিত বহুবার শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসেন।

গিরীন্দ্র ঘোষ —– পাথুরিয়াঘাটায় বাড়ি। ষড়রিপু দমনের জন্য ওইগুলিকে ভগবৎমুখী করিয়া দেওয়ার কথা গিরীন্দ্র বলিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর গিরীন্দ্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

গোপাল মিত্র e — রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্রের সঙ্গে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শন করেন ১৩ই নভেম্বর ১৮৭৯। ঠাকুরের

দর্শন পাইয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। প্রতি রবিবারে গোপাল ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতেন।

গোপাল সেন — বরাহনগরবাসী ভগবৎভক্ত যুবক। ঠাকুরের সহিত প্রথম দর্শন ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যা তায়াত করিতেন এবং ঈশ্বরীয় ভাবে আবিষ্ট হইতেন। ভাবাবস্থায় ইঁহাকে ঠাকুর স্পর্শ করিয়াছিলেন। জীবনমুক্ত অবস্থায় সংসার বিষবৎ মনে হওয়ায় আত্মহত্যা করিয়া দেহত্যাগ করেন। গোপাল সেনের আত্মহত্যার সংবাদে ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর দর্শন করিবার পর যদি কেউ স্বেচ্ছায় শরীর ত্যাগ করে, তবে তাহাকে আত্মহত্যা বলে না।

গোপালের মা — [অঘোরমণি দেবী] (১৮২২ - ১৯০৬) — ২৪ পরগণা জেলার কামারহাটিতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম। পিতার নাম কাশীনাথ ঘোষাল। নয়-দশ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। অল্প বয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হইবার পর কুলগুরুর দ্বারা 'গোপাল মন্ত্রে' দীক্ষিতা হন। মুণ্ডিত মস্তকে সাধিকা অবস্থায় কামারহাটি গ্রামে দত্তদের ঠাকুর বাড়িতে বাস করিতেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দীর্ঘ ৩০ বৎসর এই সাধিকা জপতপের সাহায্যে সিদ্ধা হন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। একদিন গভীর রাত্রে জপের সময় অঘোরমণি সহসা শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পান এবং তাঁহার হাতটি ধরিবার সঙ্গে সঙ্গেই তঁহার স্থানে গোপালের ন্যায় বালক মূর্তি দর্শন করেন। ইহার পর তিনি দক্ষিণেশ্বরে বহুবার আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করেন। তিনি ঠাকুরের মধ্যে গোপালের মূর্তি দর্শন করেন । শ্রীশ্রীঠাকুরও তাঁহাকে যশোদাজ্ঞানে সম্মান করিতেন। তখন হইতেই তিনি 'গোপালের মা' নামে অভিহিত হন।

অঘোরমণি ভগিনী নিবেদিতাকে ‘নরেনের মেয়ে’ বলিয়া ডাকিতেন। অন্তিমাকালে নিবেদিতা তাঁহার অনেক সেবা করিয়াছিলেন।

গোপী দাস — খোল বাদক। শ্রীশ্রীঠাকুরের গানের সঙ্গে সংকীর্তনে খোল বাজাইয়াছিলেন।

গোবিন্দ চাটুয্যে — ঠাকুর প্রথম কলিকাতায় আসিয়া ঝামাপুকুরে ইঁহাদের বাড়িতে ছিলেন।

গোবিন্দ পাল — ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বরাহনগর নিবাসী তরুণ ভক্ত। ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ ১৮৬৪-তে, দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীশ্রী ঠাকুরের নিকট দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। ইনি ভগবৎ ভক্ত ছিলেন এবং অল্প বয়সে দেহরক্ষা করেন।

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় — ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য পরমভক্ত। ইনি চব্বিশ পরগণা জেলার বেলঘরিয়ার অধিবাসী। দেওয়ানের পদে নিযুক্ত এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। ভক্তিমান গোবিন্দ ঠাকুরের প্রতি অতীব আকর্ষণে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। ঠাকুরও তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুর তাঁহার বেলঘরিয়ার বাড়িতে শুভাগমন করেন এবং সংকীর্তনে নৃত্য করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কীর্তনের সময় ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছিলেন।

গোবিন্দ রায় — সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত গোবিন্দ রায় আরবী পারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। নানাধর্মের বহু শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি অবশেষে ইসলাম ধর্মের উদার মতবাদে আকৃষ্ট হন এবং তাহাতেই আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কোরাণ পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতার সহিত ধর্মচর্চা

করিয়া সিদ্ধি লাভের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনি একদা দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর নিকট সাধনার স্থান নির্বাচন করেন। সেই সময় ঠাকুর তাঁহার ধর্মনিষ্ঠা এবং ভগবৎপ্রেমে আকৃষ্ট হন। তাঁহার সহিত ধর্মালোচনা করিয়া তিনি মোহিত হন এবং তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ইসলাম ধর্ম সাধন করিয়া মহম্মদের দর্শন লাভ করেন ।

গোষ্ঠ — খোলবাদক। ইঁহার বাহনা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের রোমাঞ্চ হইয়াছিল। সুরেন্দ্রের বাড়িতে তিনি খোল বাজাইয়াছিলেন।

গৌরী পণ্ডিত (গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য) — বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামের বাসিন্দা। বীরাচারী তান্ত্রিক সাধক, তাঁহার কিছু সিদ্ধাই ছিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। শাস্ত্রীয় প্রমাণের ভিত্তিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের আধ্যাত্মিক অবস্থা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে মথুরবাবু দক্ষিণেশ্বরে একটি সভা আহ্বান করেন। এই সময়ে গৌরী পণ্ডিত ঠাকুরকে অবতারগণের উৎসস্থল বলিয়া ঘোষণা করেন (১৮৭০)। শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে দিন দিন তাঁহার মন পাণ্ডিত্য, লোকমান্য, সিদ্ধাই প্রভৃতি সকল বস্তুর প্রতি বীতরাগ হইয়া ঈশ্বরের শ্রীপাদপদ্ম অভিমুখী হইতে থাকে। গৌরী দিন দিন ঠাকুরের ভাবে মোহিত হইয়া তাঁহার সম্পূর্ণ অনুরাগী হইয়াছিলেন। ধীরে ধীরে ঠাকুরের দিব্যসঙ্গলাভে তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য হয়। একদা তিনি সজল নয়নে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহন করিয়া চিরতরে গৃহত্যাগ করেন। বহু অনুসন্ধানেও ইহার পর গৌরী পণ্ডিতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই।

গৌরী মা (১৮৫৭ - ১৯৩৮) — ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা স্ত্রীভক্ত। প্রকৃত নাম মৃড়ানী বা রুদ্রাণী। পিতা পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। মাতা গিরিবালা দেবী। তঁহার পিতৃগৃহ ছিল হাওড়ার শিবপুর অঞ্চলে। কিন্তু তিনি মাতুলালয় ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী জীবনে 'সন্ন্যাস' গ্রহণের পর মৃড়ানীর নাম "গৌরীপুরী" হওয়ায় ভক্তসমাজে তিনি 'গৌরী-মা' নামে পরিচিতা হন। কিন্তু ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের কাছে তিনি ছিলেন 'গৌর দাসী'। গৌরী-মার ব্যক্তিত্ব ছিল অতুলনীয়। তাঁহার একনিষ্ঠতা, সাহস এবং শক্তি সকলের শ্রদ্ধার যোগ্য বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই আত্মীয়েরা তাঁহার বিবাহের ব্যবস্থা করায় তিনি ইহাতে প্রবল আপত্তি জানান এবং বিবাহের রাত্রে বাড়ি হইতে পলায়ন করেন। অতঃপর তিনি গলায় দামোদর শিলা লইয়া পাগলিনীর ন্যায় দীর্ঘ উনিশ বৎসর নানাতীর্থস্থানে ঘুরিয়া তপস্যা করিতে থাকেন। নানা তীর্থ ভ্রমণ কালে হরিদ্বারের পথে একদল সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর সহিত মিলিত হন, এই সাধুসঙ্গেই তিনি "গৌরী-মায়ী" নামে অভিহিতা হন। ১৮৮২ সালে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ঠাকুরকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া গৌরী-মা অভিভূত হন। পরম ভাগ্যবতী গৌরী-মা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যলাভের এবং সেবার অধিকারী হন। কিছুকাল তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমা সারদাদেবীর সঙ্গেও বাস করেন। শ্রীশ্রী ঠাকুর এ দেশের মায়েদের জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া গৌরী-মাকে তাহাদের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের কথা বলেন। পরবর্তী কালে গৌরী-মা মাতাঠাকুরানীর অনুমতিক্রমে প্রথমে বারাকপুরে গঙ্গাতীরে পরে বাগবাজারে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। গৌরী-মার গান শুনিয়া ঠাকুরের সমাধি হইত। ঠাকুর তাঁহাকে মহাতপস্বিনী ভাগ্যবতী ও পুণ্যবতী বলিয়া নির্দেশ করিতেন।

অপরপক্ষে গৌরী-মাও ঠাকুরকে অবতার রূপে ও মাতাঠাকুরানীকে ভগবতীরূপে ভক্তি করিতেন।

চন্দ্র চাটুজ্যে (চন্দ্র চ্যাটার্জী) — ঠাকুরের তন্ত্রসাধনার গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণির নিকট ইনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। এইজন্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভ্রাতা রূপে পরিচিত। ভৈরবীর সহায়তায় চন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সহিত মিলিত হন। তিনি উচ্চদরের সাধক ছিলেন। কিন্তু বিশেষ সিদ্ধাইলাভের ফলে সাধনপথ হইতে ভ্রষ্ট হন। পরে ঠাকুরের পূত সান্নিধ্যে তাঁহার সিদ্ধাইশক্তি নষ্ট হয় এবং ঠাকুরের দিব্যশক্তির প্রভাবে তিনি সঠিক পথে অগ্রসর হন। চন্দ্র ঠাকুরের অনুগত ছিলেন এবং ঠাকুরও তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ঠাকুর চন্দ্রকে ঘনিষ্ঠ ঈশ্বর প্রেমী বলিয়া বর্ণনা করিতেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার দীর্ঘকাল পরে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্র অকস্মাৎ বেলুড়মঠে উপস্থিত হন এবং মাসাধিককাল সেখানে বাস করেন। তিনি নিত্য জপ-ধ্যানে নিরত থাকিতেন।

চন্দ্র হালদার — কালীঘাটের হালদার বংশীয়, মথুরবাবুদের পুরোহিত। মথুরবাবুর উপর রামকৃষ্ণের প্রভাব এবং মথুরবাবুর ঠাকুরের উপর প্রশয়পূর্ণ ব্যবহার ও পক্ষপাতিত্বের জন্য ঠাকুরের প্রতি সে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত ছিল। সে ধূর্ত ও খল প্রকৃতির ছিল। ঠাকুরের ভাবাবিষ্ট অবস্থাকে এবং সরলতাকে ধূর্ততার ভান বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে। নানা মিথ্যা কথা বলিয়া মথুরবাবুর আস্থাভঞ্জন হইবার চেষ্টা করে কিন্তু তাহাতে বিফল মনোরথ হয়। একদিন সন্ধ্যার সময় ঠাকুর যখন ভাবসমাধির ফলে অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া মথুরবাবুর জানবাজারের বাড়িতে পড়িয়া আছেন, তখন সে তাঁহাকে পদাঘাত করে এবং অত্যন্ত কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু তাহার কঠোর শাস্তি বিধানের

আশঙ্কায় ঠাকুর এই ঘটনা মধুরবাবুর কর্ণগোচর করেন নাই। পরে অন্য কোন অপরাধের ফলে চন্দ্র হালদার কর্মচ্যুত হইলে ঠাকুর মথুরবাবুর নিকট ওই ঘটনার উল্লেখ করেন।

চন্দ্রমণি (চন্দ্রমণিদেবী) (১৭৯১ - ১৮৭৬ খ্রী:) — ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভাগ্যবতী জননী। চন্দ্রমণিদেবীর জন্ম সরাটি মায়াপুর গ্রামে। তাঁহার সরলতা, দেবদ্বিজে ভক্তি এবং সর্বপরি সততা সকলকে মুগ্ধ করিত। শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী ছিলেন স্নেহ ও সরলতার মূর্তি — প্রতিবেশীগণ সম্পদে-বিপদে তাঁহার ন্যায় হৃদয়ের সহানুভূতি আর কোথাও পাইত না। দরিদ্ররা জানিত চন্দ্রাদেবীর নিকট তাহারা যখনই উপস্থিত হইবে, তখনই অন্নের সহিত অকৃত্রিম যত্ন ও ভালবাসায় তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে, ভিক্ষুক সাধুদের জন্য তাঁহার দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত ছিল এবং প্রতিবেশী বালক-বালিকাদের সমস্ত আবদার তিনি পূর্ণ করিতেন। চন্দ্রমণি জাগ্রত অবস্থায় অথবা নিদ্রিত অবস্থায় প্রায়ই নানাপ্রকার অলৌকিক ঘটনা দেখিতে পাইতেন। ইহাতে তিনি কখনও কখনও অতিশয় ভীত হইতেন আবার কখনও-বা বিস্মিত হইতেন। একবার কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে তিনি মা লক্ষ্মীকে দর্শন করিয়াছিলেন। চন্দ্রমণির ৪৫ বৎসর বয়সে গদাধরের আবির্ভাবের পূর্বেও তিনি এইরূপ অলৌকিক এক জ্যোতির দর্শন পাইয়াছিলেন। গদাধর শৈশব হইতেই দেবদ্বিজে ভক্তির ভাব তাঁহার মাতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। চন্দ্রমণি দেখিয়াছিলেন বাড়ির নিকট যুগীদের মন্দিরের মহাদেবের শ্রীঅঙ্গ হইতে দিব্যজ্যোতি নির্গত হইয়া তরঙ্গাকারে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। গদাধরের জন্মের পূর্বে তিনি প্রায় নিত্যই দেবদেবীসকলের দর্শনলাভ করিতেন এবং সকল দেবদেবীর উপরেই এইকালে

তাঁহার মাতৃস্নেহ যেন উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণ বহুবার এইকথা স্মরণ করিয়াছিলেন। শেষজীবনে প্রায় ১২ বৎসর চন্দ্রমণি দক্ষিণেশ্বরে কাটিয়াছিলেন। প্রথমে মথুরবাবুদের কুঠিবাড়িতে এবং শেষে নহবতের দ্বিতলে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হয়। মায়ের কথা মনে হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গঙ্গামায়ীর নিকট থাকেন নাই। ৮৫ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। শেষ মুহূর্তে তাঁহার দেহ গঙ্গাতীরে আনা হয় এবং ঠাকুর তাঁহার গর্ভধারিণীর চরণে অঞ্জলি প্রদান করেন।

চিনে শাঁখারি (শ্রীনিবাস শাঁখারি) — শ্রীনিবাস বা চিনু নামে অভিহিত কামারপুকুর নিবাসী ধার্মিক ব্যক্তি। চিনে শাঁখারি খুব উঁচুদরের বৈষ্ণব সাধক ছিলেন। গদাধরের শৈশবেই চিনু তাঁহার দৈবী স্বরূপ বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে স্বয়ং চৈতন্যদেব গদাধররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি তাঁহাকে ইষ্টদেবতারূপে পূজা করিতেন ও তাঁহার বাল্যলীলার সঙ্গী ছিলেন। তিনি প্রত্যহ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে ঠাকুর যখন কামারপুকুরে আসিতেন তখনও তিনি তাঁহার চিনুদাদার সহিত পূর্ববর্তী সম্পর্ক বজায় রাখিতেন। চিনু দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঠাকুরের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া গিয়াছেন।

চুনীলাল [চুনীলাল বসু] (১৮৪৯-১৯৩৬) — চুনীলাল বসু ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ত, কলিকতার বাগবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দুস্কুলের ছাত্র ছিলেনএবং কলিকাতা কর্পোরেশনে চাকুরী করিতেন। চুনীলাল সাধুদর্শনের ইচ্ছায় দক্ষিণেশ্বরে যান এবং ঠাকুরের দর্শনলাভ করিয়া ধন্য হন। পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশমত চলিয়া ইনি যোগাভ্যাসজনিত হাঁপানি রোগ হইতে

মুক্তিলাভ করেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি বাড়িতে থাকে এবং ক্রমে তিনি ঠাকুরকে অবতার বলিয়া বুঝিতে পারেন। কাশীপুরে "কল্পতরু" দিবসে তিনি ঠাকুরের বিশেষ কৃপালাভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ চুনীলালকে "নারায়ণ" বলিয়া ডাকিতেন। পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ও মঠের বিভিন্ন কাজে সাহায্যে করিতেন।

ছোট গোপাল (গোপালচন্দ্র ঘোষ) — বাসস্থান কলিকাতার সিমলা অঞ্চল। ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ দক্ষিণেশ্বরে। মাঝে মাঝে ঠাকুরের সান্নিধ্যলাভ করিয়াছেন। ইনি হঠাৎ হঠাৎ ঠাকুরের নিকট যাইতেন বলিয়া তাঁহাকে 'হুট্‌কো' গোপাল বলা হইত। ঠাকুরের গোপাল নামক কয়েকজন ভক্ত থাকায় তাঁহাকে 'ছোট গোপাল' নামে অভিহিত করা হয়। তিনি ঠাকুরের নিকট হইতে বিশেষ কৃপালাভ করেন এবং ঠাকুরকে গুরু-রূপে বরণ করেন। তিনি কাশীপুরে অসুস্থ ঠাকুরকে সেবা করিয়াছিলেন। বরাহনগর মঠে তিনি সাধুদের সেবাদি করিয়াছিলেন। পরে তিনি বিবাহ করিয়া সংসারী হন এবং একটি কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

ছোট নরেন (নরেন্দ্রনাথ মিত্র) — শ্যামপুকুর বাসিন্দা ও শ্রীম-র ছাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত, শুদ্ধাত্মা ভক্ত। স্বামী বিবেকানন্দের নাম "নরেন" হওয়ায়, ঠাকুর একই নামের এই ভক্তটিকে "ছোট নরেন" বলিতেন। ঠাকুরের প্রতি প্রবল আকর্ষণে সকল বাধা বিপদ তুচ্ছ করিয়া তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। ঠাকুরও তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন — এবং তাঁহাকে দেখিয়া প্রায়ই সমাধিস্থ হইতেন। ঠাকুরের সংস্পর্শে ছোট নরেনেরও মাঝে মাঝে ভাব সমাধি হইত। পরবর্তী কালে ইনি হাইকোর্টের এ্যটর্নী হন —

রামকৃষ্ণ মিশনের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার সাংসারিক জীবন সুখের হয় নাই।

জজ (সদরওয়ালা) — সুরেন্দ্রের মেজোভাই। সুরেন্দ্রের বাড়িতে ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। (১৯-১১-১৮৮২)

জয়গোপাল সেন —— প্রাচীন ব্রাহ্মভক্ত। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বেলঘরিয়ায় (৮ নং বি.টি. রোড) তাঁহার বাগানবাড়িতে কেশব সেনের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার কলিকাতার বাসা ছিল মাথা ঘষা গলিতে। সেখানেও শ্রীশ্রীঠাকুর পদার্পণ করিয়াছিলেন। জয়গোপাল সেন ঠাকুরের একান্ত অনুগত। জয়গোপালের বাড়িতে ঠাকুর প্রায়ই যাইতেন, ধর্মীয় বিষয়ে বিষয়ে আলোচনা করিতেন এবং ভক্তগণকে উপদেশ দিতেন। জয়গোপাল নিজেও মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। জয়গোপাল সেন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত ছিলেন এবং ঠাকুরের ব্রাহ্মভক্তদের মধ্যে জয়গোপাল সেন ছিলেন অন্যতম।

জয়নারায়ণ পণ্ডিত [তর্কালঙ্কার] (১৮০৮-১৮৭৩) — দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মুচাদিপুর গ্রামে জন্ম। পিতা শ্রীহরিশচন্দ্র বিদ্যাসাগর। চৌদ্দ বৎসর বয়সে ব্যাকরণ অমরকোষ ও কাব্যশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়া ভবানীপুরের রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার এবং জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্তের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শিক্ষাশেষে হাওড়ায় চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ১১টি। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি উদার মনোভাবাপন্ন, প্রকৃত নিরহঙ্কার এবং পরম

ভক্ত ছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। শ্রীশ্রী ঠাকুর স্বয়ং কলিকাতায় জয়নারায়ণকে দেখিতে যান। তিনি ইঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। পণ্ডিত মহাশয়ের কাশীতে দেহত্যাগ হয়।

জয় মুখুজ্জে (জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়) — বরাহনগরবাসী জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। দিব্যোন্মাদ অবস্থায় বিচরণ কালে শ্রীরামকৃষ্ণ একদা বরাহনগরে গঙ্গার ঘাটে ইঁহাকে অন্যমনস্কভাবে জপ করিতে দেখিয়া দুই চাপড় মারিয়াছিলেন।

জানকীনাথ ঘোষাল (১৮০৪ - ১৯১৩) — আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন ভক্ত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জামাতা। জানকীনাথ ২রা মে ১৮৮৩ সালে নন্দনবাগানে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। তিনি উপাসনা মন্দিরে ঠাকুরের নিকটেই বসিয়াছিলেন। ঠাকুর সেদিন কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্তা রাধিকার আকুলতার উদাহরণ দিয়াছিলেন। তাহাতে জানকীনাথ এই উন্মত্ততা অভিপ্রেত কিনা জানিতে চাহেন। ঠাকুর তখন প্রেমোন্মাদ জ্ঞানোন্মাদের মতনই ভগবৎপ্রেমেও যে উন্মাদ হওয়া যায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

জ্ঞান চৌধুরী — সিমুলিয়া নিবাসী জ্ঞান চৌধুরী ব্রাহ্মভক্ত এবং উচ্চশিক্ষিত সরকারী কর্মচারী ছিলেন। পত্নী বিয়োগের পর সাময়িকভাবে তাঁহার মনে বৈরাগ্য আসে এবং তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে আসেন। তাঁহার একটি তাচ্ছিল্যপূর্ণ উক্তিতে ক্ষুব্ধ হইয়া ঠাকুর তাঁহাকে বিদ্যার অহংকার ত্যাগ করিয়া ভক্তিপথে থাকার নির্দেশ দেন; এবং তিনি পরবর্তী কালে ঠাকুরের নির্দেশ পালন করেন। জ্ঞান চৌধুরীর বাটীতে আয়োজিত ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে

ঠাকুর শুভাগমন করিয়াছিলেন এবং জ্ঞান চৌধুরী সেদিন ঠাকুর সহ সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন।

ঠাকুরদাদা (নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) — বরাহনগরনিবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুত্র। তিনি কথকতা অভ্যাস করিতেন। সাধারণতঃ "ঠাকুরদা" বলিয়া তিনি পরিচিত। তিনি নিয়মিত সাধন-ভজন করিতেন। ২৭/২৮ বৎসর বয়সে বরাহনগর হইতে পদব্রজে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন। ২৩/৩/১৮৮৪-তে ঠাকুরের সহিত দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনি ঠাকুরের কাছে সাধন-ভজন করা সত্ত্বেও মনের অশান্তির কথা জানাইলে এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতির উপায় জানিতে চাহিলে ঠাকুর তাঁহাকে সকাল বিকাল হাততালি দিয়া "হরিনাম" করিতে বলেন। ঠাকুরদাদা সেইদিন ঠাকুরকে কতিপয় গান শুনাইয়া বিশেষভাবে প্রীত করেন। ইহা ছাড়া ঠাকুরের উপদেশামৃতশুনিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল।

ঠাকুরদাস সেন — ব্রাহ্মভক্তদের অন্যতম। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভে তিনি ধন্য হন। ঠাকুরদাস কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী ছিলেন। কেশব সেন একদা যীশুখ্রীষ্ট বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতায় খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ে কেশবের মতের পরিচয় পাইয়া ঠাকুরদাস বিস্মিত হন এবং কেশবের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যান।

তারক [তারকনাথ ঘোষাল, পরে স্বামী শিবানন্দ] (১৮৫৪ - ১৯৩৪) — তারকনাথের আদি নিবাস চব্বিশ পরগণার বারাসত গ্রামে। জন্ম রানী রাসমণির কাছারী বাড়িতে। পিতা শক্তিসাধক রামকানাই ঘোষাল রানী রাসমণির মোক্তার

নিযুক্ত হইয়া তাঁহারই কাছারী বাড়িতে বসবাস করিতেন। মাতা বামাসুন্দরী তারকেশ্বরের বরে পুত্র লাভ করেন। তারকনাথের ৯ বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়। তারকের পিতা ঘোষাল মহাশয় একদিকে যেমন প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন, অপরদিকে তেমনই মুক্ত হস্তে ব্যায় করিতেন। মাতা বামাসুন্দরী খুবই ধর্মপ্রাণা ছিলেন। এই তারকনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে স্বা মী শিবানন্দ নামে পরিচিত। শ্রীরামকৃষ্ণের ১৬ জন ত্যাগী সন্তানের মধ্যে শিবানন্দ অন্যতম। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। প্রথম দর্শনেই তারকনাথের মন-প্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে অর্পিত হইল। ইতিমধ্যে তারকনাথ ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় দর্শনে সাক্ষাৎ জননীজ্ঞানে ঠাকুরের কোলে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুরও তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। ঠাকুরের চোখে করুণা ঝরিয়া পড়িতেছে। ক্রমে ক্রমে তারকনাথ তাঁহার নিজের স্থান বুঝিয়া নিয়া দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাসও করিতে কাগিলেন। তারকনাথ দেখেন আর শেখেন। একসময়ে ঠাকুরের কথা টুকিয়া রাখিতে আরম্ভ করেন, হঠাৎ একদিন ঠাকুর বলিলেন, "তোর ওসব কিছু করতে হবে না — তোদের জীবন আলাদা।" সেদিন হইতে এই সঙ্কল্প বিদায় দিলেন। শিবানন্দ বাণী, শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা, মহাপুরুষজীর পত্রাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে স্বামী শিবানন্দের বানী সঙ্কলিত হইয়াছে।

তারক (তারক মুখার্জী) — বেলঘরিয়ার অধিবাসী। শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রিত ভক্ত। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অশেষ কৃপালাভ করিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙাচক্ষু বড় রুই, আর বেলঘোরের

তারককে মৃগেল বলা যায়।" কথাপ্রসঙ্গে একদিন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুর তাঁহার নিজের ভিতর হইতে এক উজ্জ্বল আলোক শিখা নির্গত হইয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে তারকের অনুসরণ করিতেছে এ কথা মাস্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন। তিনি তারককে কামিনী-কাঞ্চন হইতে সাবধান থাকিতে বলেন এবং তাঁহার নিকট আসিলে তাহার সাধনার বাধা শীঘ্রই দূর হইয়া যাইবে বলিয়া আশ্বাস দেন। কয়েকদিন পরে তারক আসিলে তিনি সমাধিস্থ হইয়া তাহার বক্ষে শ্রীচরণ স্থাপন করেন। ঠাকুর তাহাকে বলিয়াছিলেন, ঈশ্বর সাধনার জন্য বাপ-মার আদেশ লঙ্ঘনে কোন দোষ নাই।

তারাপদ — ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত সুপ্রসিদ্ধ গায়ক। বলরাম বসুর গৃহে গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ভক্তদের সহিত তিনি ঠাকুরের দর্শনলাভে ধন্য হন। সেই সময়ে গায়ক হিসাবে তাঁহার পরিচয় জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাঁহার গান শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তারাপদ গিরিশ ঘোষের "কেশব কুরু করুণা দীনে" গানটি শুনাইলে ঠাকুর সন্তুষ্ট হন এবং ঠাকুরের অনুরোধে তিনি আরও কতকগুলি ভজন ও কীর্তন গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন।

তুলসী [শ্রীতুলসীচরণ দত্ত] (১৮৬৩ - ১৯৩৮) — শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুরাগী বালক ভক্ত — বাগবাজার লেনে দত্ত পরিবারে জন্ম। তাঁহার বাল্যবন্ধু স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ক্যলকাটা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কিছুকাল কলেজে পড়াশুনা করেন। ১৭/১৮ বৎসর বয়সে বলরাম বসুর গৃহে শ্রীশ্রীঠাকুরকে তিনি প্রথম দর্শন করেন। তখন হইতে তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করিতেন। ঠাকুরের

তিরোধানের পর তিনি বরাহনগর মঠে যোগ দেন এবং পরবর্তী কালে স্বামী নির্মলানন্দ রূপে পরিচিত হন।

তুলসীরাম [তুলসীরাম ঘোষ] (১২৬৫ - ১৩৫২ বঙ্গাব্দ) — আঁটপুর নিবাসী তুলসীরাম শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ ভক্ত বাবুরাম মহারাজ তথা স্বামী প্রেমানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং বলরাম বসুর শ্যালক। তুলসীরাম তাঁহার ভগ্নীপতি ঠাকুরের গৃহীভক্ত বলরাম বসুর সহয়তায় ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহর ভক্তে পরিণত হইয়াছিলেন। বাবুরাম মহারাজ যখন প্রথম জীবনে সাধুর অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন তখন তুলসীরামই তাঁহাকে ঠাকুরের সন্ধান দেন।

তেজচন্দ্র [তেজচন্দ্র মিত্র] (১৮৬৩ - ১৯১২) — ঠাকুরের একজন গৃহীভক্ত। বাগবাজার বোসপাড়া অঞ্চলের বাসিন্দা, শ্রীম-র ছাত্র। বাল্যকালেই শ্রীম-র অনুপ্রেরণায় শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনলাভ করেন। শ্রীশ্রীমায়েরও কৃপাধন্য ছিলেন। তিনি নিয়মিত ধ্যান করিতেন ও মিতভাষী ছিলেন । ঠাকুর তাঁহাকে 'শুদ্ধ আধার' জ্ঞান করিতেন এবং আপনার লোক বলিয়া অতিশয় স্নেহ করিতেন।

ত্রৈলঙ্গ স্বামী (আনুমানিক ১৬০৭ - ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) — ভারতবিখ্যাত যোগী মহাপুরুষ। অন্ধ্রপ্রদেশের এক ধনী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। পূর্বনাম শিবরাম রাও। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কাশীতে অতিবাহিত করেন। লোকে তাঁহাকে শিবাবতার বলিত। তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। ১৮৬৮ সালে তীর্থভ্রমণকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেই সময় তিনি

মৌন অবস্থায় ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত ইঙ্গিতে তাঁহার ঈশ্বরবিষয়ক কথাবার্তা হয়। ঠাকুর হৃদয়কে তাঁহার 'পরমহংস' অবস্থার কথা বলিয়াছিলেন।

ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল (১৮৪০ - ১৯১৬) — ব্রাহ্মভক্ত, কেশব সেনের অনুগামী। গীতিকার ও সুগায়ক। বলা যায় কেশব সেনের সংস্পর্শে আসিয়াই ত্রৈলোক্যের নবজন্ম ঘটে। বাল্যকাল হইতেই তিনি গান গাহিতেন। কিন্তু সঙ্গীত এবং পুঁথিগত বিদ্যার বিধিবদ্ধ শিক্ষা তাঁহার কেশবচন্দ্র সেনের গৃহে বসবাসকালে হয়। কেশবচন্দ্রের সঙ্গী হিসাবে তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ ঘটে। দক্ষিণেশ্বরে বহুবার তিনি যান এবং সেখানে মধুর সুললিত কণ্ঠে ঠাকুরকে সঙ্গীত শুনাইবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। ঠাকুর তাঁহার রচিত সঙ্গীত ঠাকুরের অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং ঠাকুর স্বয়ং বিশেষ ভাবোদ্দীপক গানগুলি করিতে অনুরোধ করিতেন। তিনি কেশবচন্দ্র কর্তৃক 'চিরঞ্জীব শর্মা' উপাধি পান এবং নিজে 'প্রেমদাস' নাম গ্রহণ করেন। এই দুই ছদ্ম নামে তিনি সহস্রাধিক ভক্তিসঙ্গীত ও কীর্তন রচনা করেন। তাঁহার রচিত 'নব বৃন্দাবন' নাটকে নরেন্দ্রনাথ 'পাহাড়ী বাবার' ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ঠাকুর এই নাটক দেখিয়াছিলেন এবং ত্রৈলোক্যের প্রণীত গ্রন্থ 'ভক্তিচৈতন্য চন্দ্রিকা' পড়িতে ভক্তদের বলিয়াছিলেন। তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হইল গীতরত্নাবলী, পথের সম্বল, কেশবরচিত, ভক্তিচৈতন্য চন্দ্রিকা।

ত্রৈলোক্য বিশ্বাস — ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস ছিলেন মথুরামোহন বিশ্বাসের পুত্র এবং রাণী রাসমণির দৌহিত্র। ১৮৭১ সালে তিনি দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের সেবাইতের অধিকারী হন এবং আজীবন ওই দায়িত্ব পালন করেন। ত্রৈলোক্যনাথ

দায়িত্ব ভার নেওয়ার পর ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অধিক দিন বাস করিতে পারেন নাই। অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি অনত্র যান।

দমদমার মাস্টার (শ্রীযজ্ঞেশ্বর চন্দ্র ঘোষ) — দমদমার একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিতেন বলিয়া তিনি কথামৃতে 'দমদমার মাস্টার' বলিয়া পরিচিত। বাঁকুড়া জেলার কাটিকা গ্রামে ইঁহার বাড়ি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন। তিনি নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর যজ্ঞেশ্বর বরাহনগর মঠে প্রায়ই আসিতেন। তিনি সকলের বিশেষ প্রিয়ভাজন হন।

দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী (১৮২৪ - ৮৩) — আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা, পূর্বনাম মূলশঙ্কর। বেদ, বেদান্ত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল; সংস্কৃত ভাষায় অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। দয়ানন্দের মতে মূল হিন্দুধর্ম বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং মূর্তিপূজা বেদ-বিরোধী কার্য। তিনি ব্রাহ্মণ, খ্রীষ্টান, মুসলমান সকল ধর্মের লোকের সহিত বিচার করিতেন। কাশীতে এক শাস্ত্রীয় সম্মেলনে বিচার সভায় জয়লাভের পর তাঁহার খ্যাতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর কলিকাতার সিঁথিতে নৈনারের (সিঁথির) ঠাকুরদের প্রমোদ কাননে ভক্ত কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে যান। দয়ানন্দ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে প্রথম আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। দেহত্যাগের পূর্বে তিনি প্রায় ১০০টি আর্যসমাজ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া যান পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, রাজপুতানা ও বোম্বাই ইত্যাদি স্থানে। তিনি জাতিভেদ প্রথা মানিতেন না। স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার, নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্বদা স্বীকার করিতেন। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'সত্যার্থ প্রকাশ'।

দারোয়ান — যদু মল্লিকের বাগানের দারোয়ান। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত। শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থায় হাতপাখা লইয়া বাতাস করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া সেবা করাইতেন।

দীন মুখুজ্জে (দীননাথ মুখার্জী) — উত্তর কলিকতার বাগবাজার নিবাসী ভক্তিমার্গের গৃহীসাধক। দীননাথের ঈশ্বর ভক্তির কথা জানিতে পারিয়া ঠাকুর স্বেচ্ছায় একদা মথুরামোহন বিশ্বাসের সহিত দীননাথের গৃহে উপস্থিত হন। কিন্তু সেদিন দীননাথের গৃহে উপনয়ন উপলক্ষে সকলে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় ঠাকুর কাহাকেও আর ব্যতিব্যস্ত না করিয়া ফিরিয়া আসেন।

দীননাথ খাজাঞ্চী — দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের খাজাঞ্চী (কোষাধ্যক্ষ)। ইনি কয়েকবার ঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন।

দুকড়ি ডাক্তার — শ্যামপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে গলরোগের সময় দেখিতে আসিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে সমাধিস্থ ঠাকুরের চোখে অঙ্গুলি দিয়া তিনি ঠাকুরের সমাধি পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

দুর্গাচরণ ডাক্তার — দক্ষিণেশ্বর হইতে ঠাকুর ভক্তদের সাথে কলিকাতায় এই ডাক্তারকে দেখাইতে আসিয়াছিলেন। যদিও তিনি অতিমাত্রায় মদ্যপান করিতেন, তথাপি তাঁহার চিকিৎসার ব্যাপারে খুব হুঁশ থাকিত — ইহা শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লেখ করিয়াছেন।

দেবেন্দ্র (দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ) — শ্যামপুকুর নিবাসী দেবেন্দ্র ঠাকুরের একজন অনুরাগী ভক্ত। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করিতেন এবং ঠাকুরের নিকট নানা উপদেশ গ্রহণ করিতেন।

দেবেন্দ্র [মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর] (১৮৭১-১৯০৫) — ইনি মনীষী, পরম সাধক, আদিব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও বিখ্যাত নেতা। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার প্রচলন করেন। কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার সংস্পর্শে আসেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরচিন্তা করেন শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব মথুরবাবুর সহিত একদা মহর্ষির বাড়িতে তাঁহাকে দেখিতে যান। প্রথম পরিচয়েই ঠাকুর মহর্ষির ভিতর সাধকের লক্ষণ দেখিতে পান। অত জ্ঞানী এবং ঈশ্বরোপাসক হওয়া সত্ত্বেও মহর্ষিকে সংসারের কাজে ব্যাপৃত দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে 'কলির জনক' বলেন। ইহার পর তাঁহার অনুরোধে মহর্ষি তাঁহাকে বেদ হইতে কিছু কিছু শোনান। ঠাকুরের ধ্যানাবস্থায় দর্শনের সঙ্গে ইহার মিল ছিল। মহর্ষিও ঠাকুরের সহিত ধর্মালোচনায় প্রীত হন ও তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যোগ দিবার আমন্ত্রণ জানান। কথামৃতে ঠাকুর বহুবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কথা উল্লখ করিয়াছেন।

দেবেন্দ্র [দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার] (১৮৪৪-১৯১১) — শ্রীশ্রীঠাকুরের গৃহীভক্ত। যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার জগন্নাথপুর গ্রামে 'মজুমদার' উপাধিধারী বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রসন্ননাথ, মাতা বামাসুন্দরী দেবী । প্রথম জীবন তাঁহার দারিদ্রের মধ্যে অতিবাহিত হওয়ায় তিনি কলিকতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জমিদারী সেরেস্তায় চাকুরী গ্রহণ করেন। সাহিত্যে চর্চাও করেন। তিনি যোগাভ্যাস করিতেন, এই সময় বহু দেবদেবীর দর্শন হইত। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন। এই সময়ে

পুস্তকে ‘পরমহংস রামকৃষ্ণ’ কথা দুইটি পড়িয়া তিনি এক মহা আকর্ষণে তৎক্ষণাৎ দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের দেবদুর্লভ আচরণে মুগ্ধ হন। কিন্তু সেইদিনই তিনি আকস্মিক অসুস্থতা লিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। প্রবল জ্বরে শয্যাগত অবস্থায় তিনি শিওরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতেন। ইহার পর বলরাম বসুর গৃহে ঠাকুরকে পুনরায় দর্শন করিয়া তিনি তখন গৃহ হইতেই মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে কলিকাতায় নিজ গৃহে দেবেন্দ্রনাথ একদিন ঠাকুরকে সেবা করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ‘সন্ন্যাস’ গ্রহণের জন্য ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা জানাইলে ঠাকুর তাহাতে সম্মত হন নাই। পরবর্তী কালে “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়” প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবেনদ্রনাথ সেখানে তাঁহার স্বরচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভজন কীর্তনাদি পরিবেশনের ব্যবস্থা করেন এবং এই গানগুলিই পরে ‘দেবগীতি’ নামক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁহার বিখ্যাত “ভব সাগর তারণ কারণ” ইত্যাদি গুরুবন্দনা ও অন্যান্য ভক্তিমূলক ভজন বহুল গীত হইয়া থাকে।

দ্বারিকানাথ (দ্বারিকানাথ বিশ্বাস) — মথুরবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ ভক্ত। তিনি পিতার ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী ছিলেন। ঠাকুরও তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। একদা দক্ষীণেশ্বরে আগত এক নেপালী ব্রহ্মচারিণীর কণ্ঠে ‘গীতগোবিন্দে’র গান শুনিয়া তিনি ঠাকুরের সম্মুখেই অশ্রুমোচন করিতে থাকিলে ঠাকুর তাঁহার ভক্তির প্রশংসা করিয়াছিলেন। একবার দ্বারিকানাথ তাঁহার মোকদ্দমা সংক্রান্ত প্রয়োজনে আগত ব্যারিস্টার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে ঠাকুরের কাছে লইয়া গিয়াছিলেন। মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন।

দ্বিজ (দ্বিজ সেন) — কথামৃতকার শ্রীম-র শ্যালক। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী ভক্ত। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতে দ্বিজর বাবার প্রবল আপত্তি ছিল। এ বিষয়ে ঠাকুরের সহিত পিতা আলোচনা করিতে আসিলে ঠাকুর মিষ্ট কথায় তাঁহাকে বুঝান যে অধ্যাত্মগুণসম্পন্ন পুত্র হওয়া পিতার পুণ্যের চিহ্ন। ঠাকুর তাঁহার নিকট দ্বিজর প্রশংসা করেন এবং দ্বিজকে দক্ষিণেশ্বরে আসার জন্য বাধা দিতে নিষেধ করেন। ঠাকুরের প্রতি দ্বিজর একান্ত অনুরাগকে তিনি পূর্ব সংস্কার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। ঠাকুর মাস্টার মহাশয়ের নিকট ইঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা বলিয়াছিলেন।

দ্বিজর পিতা (ঠাকুরচরণ সেন) — মাস্টার মহাশয়ের শ্বশুর ঠাকুরচরণ সেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করিয়াছিলেন। ইনি কেশবচন্দ্র সেনের জ্ঞাতিভ্রাতা। ইঁহার কন্যা শ্রীমতি নিকুঞ্জবালা দেবীর সহিত শ্রীমর বিবাহ হয়। সওদাগরী অফিসের ম্যানেজার ছিলেন।

ধনী কামারিনী — মধুসূদন কর্মকারের কন্যা ধনীকামারিনী। উপনয়নের উপলক্ষে — ঠাকুরের ভিক্ষামাতা এবং মাতা চন্দ্রমণির ঘনিষ্ঠ সহচরী, কামারপুকুরে লাহাবাবুদের বাড়ির নিকটে এক ক্ষুদ্র কুটীরে এই বিধবা মহিলা বাস করিতেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হইবার পরমুহূর্তেই ধনীই সদ্যোজাত শিশুকে ভস্মমাখা অবস্থায় উনুনের ভিতর হইতে উঠাইয়া লইয়া এই পৃথিবীতে অবতার পুরুষের প্রথম মুখদর্শন ও প্রথম তাঁহাকে কোলে লইবার পরম সৌভাগ্য অর্জন করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ধনীকে ‘মা’ বলিয়া ডাকিতেন। উপনয়নের সময় তিনি অন্য সকলের মতের বিরুদ্ধে ধনীর নিকট হইতে সর্বাগ্রে

ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার পূর্বাভিলাষ পূরণে স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ভক্তিমতী ধাত্রীমাতা ও ভিক্ষামাতা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বাৎসল্যভাবে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং অনেক সময়ে তাঁহাকে খাওয়াইয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন।

নকুড় আচার্য — কামারপুকুর অঞ্চলের অধিবাসী। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার নৃত্যসহ গানের প্রশংসা করিতেন।

নকুড় বাবাজী — বৈষ্ণব ভক্ত, ভাল কীর্তনীয়া। কামারপুকুর গ্রামের অধিবাসী। কলকাতার ঝামাপুকুরে তাঁহার একটি দোকান ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের ঝামাপুকুরের বাসায় অবস্থানকালে মধ্যে মধ্যে নকুড়ের দোকানে গিয়া বসিতেন। দেশের লোক হিসেবে নকুড় তাঁহাকে বিশেষ আপ্যায়ন করিতেন। পানিহাটীর রাঘব পণ্ডিতের বিখ্যাত চিঁড়া মহোৎসবে তিনি প্রতিবছর যোগদান করিতেন এবং কীর্তন করিতেন। ফিরিবার পথে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সহিত তাঁহার প্রতিবার সাক্ষাৎ হইত এবং তিনি পূর্ব পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিতেন।

নগেন্দ্র (নগেন্দ্রনাথ মিত্র) — সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র। দক্ষিণেশ্বরে ও স্বগৃহে তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬২-১৯৪০) — বিহার প্রদেশের মতিহারিতে নগেন্দ্রনাথের জন্ম। পিতা মথুরনাথ আরা জেলার সাবজজ ছিলেন। বাল্যেই নগেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত ছিলেন। উভয়ে একসঙ্গে জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে অধ্যয়ন করিতেন। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক রূপে তিনি সমধিক

খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের সহিত স্টীমবোটে সোমড়া পর্যন্ত ভ্রমণকালে (১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্য লাভ করেন। ঠাকুরের কথা বলার মধুর ভঙ্গি, সাধারণ কথ্য ভাষার বাস্তব উদাহরণের সহিত গভীর ধর্মতত্ত্বের কথা বলার বৈশিষ্ট্য তিনি পরম কৌতুহলের সহিত লক্ষ্য করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান ও ভক্তিপ্রসঙ্গ আলোচনা করিবার ধারাও নগেন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে। যদিও নগেন্দ্রনাথ মাত্র একবারই ঠাকুরকে দর্শন করেন তবুও এই ঘটনাই তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করে। তিনি একটি প্রবন্ধে ঠাকুরের চেহারা হুবুহু বর্ণনা দিয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত নগেন্দ্রনাথের এই ভ্রমণের বিবরণ শুনিয়া অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তাহার কিছুকাল পরেই মহেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। প্রবুদ্ধ ভারত, উদ্বোধন, মডার্ণ রিভিউ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। মডার্ণ রিভিউতে নগেন্দ্রনাথের লেখা শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধির বর্ণনা পড়িয়া মনীষী রোমা র‍্যোঁলা মুগ্ধ হন।

নটবর (নটবর গোস্বামী) — হুগলী জিলার ফুলুই শ্যামবাজারের পার্শ্ববর্তী বেলটে গ্রামের অধিবাসী। ঠাকুরের অনুরাগী বৈষ্ণব ভক্ত। ঠাকুর নটবর গোস্বামীর গৃহে একবার গিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহার ভাগ্নে হৃদয়ের সহিত সে সময়ে সাতদিন গোস্বামীজীর গৃহে ছিলেন। গোস্বামীজী ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই ভক্তিভরে ঠাকুরে সেবা করিতেন। ফুলুইয়ে বহু বৈষ্ণবের বাস ছিল এবং তাঁহারা প্রতিদিনই সংকীর্তন করিতেন। ঠাকুরকে সংকীর্তন শুনাইবার বাসনায় গোস্বামীজী নিকটবর্তী স্থান রামজীবনপুর ও কৃষ্ণগঞ্জের বিখ্যাত কীর্তনীয়া ও মৃদঙ্গবাদককে আনয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবসমাধি দর্শনে বৈষ্ণবগণ বিশেষভাবে

আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ‘যোগমায়ার আকর্ষণ’ কাহাকে বলে — ইহা ওইখানে ঠাকুর প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

নন্দ বসু (নন্দলাল বসু) — ধনী ব্যক্তি। বাগবাজারে বাড়ি। তাঁহার গৃহে নানা দেবদেবীর সুন্দর ছবি আছে জানিতে পারিয়া ১৮৮৫ সালে বলরাম বসুর বাড়ি হইতে তথায় যান। অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই সব ছবি দেখিয়া গৃহস্বামী এবং তাঁহার ভাই পশুপতি বসুর সহিত ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেন। ঠাকুর ওই ছবিগুলির প্রশংসা করিয়া নন্দবাবুকে যথার্থ হিন্দু বলিয়া সাধুবাদ দিয়াছিলেন।

নন্দলাল সেন — কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র। কেশবচন্দ্রের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে তিনি আসেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে কয়েকবার দর্শন করেন। ১৮৮২ সালের ২৭শে অক্টোবর কেশবচন্দ্র সেন ঠাকুরকে এবং আরো অনেককে লইয়া স্টীমারে গঙ্গাভ্রমণের ব্যবস্থা করেন। নন্দলাল সেই দলে ছিলেন। তিনি সেদিন ঠাকুরের ভাবাবিষ্ট অবস্থার প্রত্যক্ষদর্শী এবং বহু আধ্যাত্মিক আলোচনার শ্রোতা হন। নন্দলাল পরবর্তী কালে কেশবচন্দ্র সেনের ও ঠাকুরের অনুগামী ভক্ত হীরানন্দের সহিত সিন্ধু প্রদেশে যান এবং সেখানে সমাজসেবী ও শিক্ষাব্রতী হিসাবে সুনাম অর্জন করেন।

নন্দিনী (নন্দিনী মল্লিক) — ব্রাহ্মভক্ত মণিলাল মল্লিকের বিধবা কন্যা। তিনি ধর্মপরায়ণা ছিলেন এবং ঠাকুরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। এক সময়ে তিনি কিছুতেই ধ্যানে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেন না। ঠাকুর এই সমস্যার কথা শুনিয়া তাঁহাকে তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় পাত্রকেই (ভ্রাতুষ্পুত্র) বালগোপাল

ভাবিয়া সেবা করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। ঠাকুরের আদিষ্ট পথ অবলম্বনে ইঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছিল।

নফর বন্দ্যোপাধ্যায় — শিওড় নিবাসী সঙ্গতি সম্পন্ন ভক্তিমান ব্যক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার শিওড় গিয়া কীর্তনানন্দে বিভোর হইয়া পড়েন। নফর সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

নবকুমার — বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গী। নবকুমার দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। এবং সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গাদি শুনেন। পরে বলরাম বসুর সহিত একই নৌকাতে কলিকাতা ফিরেন। আর একদিন ঠাকুরের নিকট ভক্ত সমাগম দেখিয়া দম্ভভরে দরজার কাছ হইতে চলিয়া যাওয়ায়, ঠাকুর তাঁহাকে অহঙ্কারের প্রতিমূর্তি বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন।

নবগোপাল ঘোষ (১৮৩২ - ১৯০৯) — হুগলী জেলার বেগমপুরে গ্রামে জন্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত। নবগোপাল বাদুড় বাগানের বাসিন্দা। প্রথমবার ঠাকুরকে দর্শনের পর বহুদিন তিনি ঠাকুরের সঙ্গে আর যোগাযোগ করেন নাই। ঠাকুরই তাঁহার বন্ধু কিশোরীর কাছে তাঁহার খবর জানিতে চাহিলে নবগোপাল তাঁহার মত একজন সাধারণ মানুসকেও ঠাকুর স্মরণে রাখিয়াছেন জানিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হন। তিনি সস্ত্রীক ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন। তাঁহার গৃহ ঠাকুরের পদধূলিতে ও নৃত্য গীতে ধন্য হইয়াছিল। নবগোপাল ঠাকুরের মধ্যে শ্রীচৈতন্য রূপ দেখিতে পান। ১৮৮৬-র ১লা জানুয়ারি ঠাকুর যখন কল্পতরু হইয়া সকলকে আশীর্বাদ করিতেছিলেন সেই সময় নবগোপালও উপস্থিত ছিলেন। সেইদিন সমাধিস্থ অবস্থায় তিনি নবগোপালকে তাঁহার নাম বারংবার

উচ্চারণ করিতে বলেন। তাহার পর হইতে নবগোপালের মুখে সবসময় “জয় রামকৃষ্ণ” ধ্বনি লাগিয়াই থাকিত। ১৮৯৮ সালে হাওড়ায় নবগোপালের নবনির্মিত গৃহে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃত স্থাপিত হয়। সেই শুভমুহূর্তে স্বামীজী “ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে। অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ।।” প্রণাম মন্ত্রটি রচনা করেন। সেইসময় বিবেকানন্দের গুরুভাইদের মধ্যেও অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নবগোপালের স্ত্রী নিস্তারিণী দেবীকে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ স্নহ করিতেন। শ্রীসারদা দেবীও বলিয়াছিলেন — “নবগোপালের পরিবার বড় শুদ্ধ।”

নবদ্বীপ গোস্বামী — ১৮৮৩ সালে পানিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের চিড়ার মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ যোগ দিতে গেলে সেখানে নবদ্বীপ গোস্বামী তাঁহার দর্শন লাভ করেন। সেখানে মণিমোহন সেনের বাড়িতে উভয়ের মধ্যে ধর্মালোচনা হয়। এই উপলক্ষে ঠাকুর গীতার সার কথা “ত্যাগী” বলিলে নবদ্বীপ গোস্বামী তাহা প্রমাণ সহ সমর্থন করেন।

নবাই চৈতন্য — প্রকৃত নাম নবগোপাল মিত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত মনোমোহন মিত্রের জ্যেষ্ঠতাত। তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই আসিতেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামৃত শ্রবণপূর্বক উচ্চ সংকীর্তনাদি করিতেন। পানিহাটীর উৎসবে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ কৃপালাভ করিয়া ধন্য হন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন ও কৃপালাভ করিবার পরে সংসারের ভার পুত্রের উপর দিয়া কোন্নগরে গঙ্গাতীরে পর্ণকুটিরে দিবারাত্র জপধ্যান ও কীর্তনাদি করিতেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

নবীন নিয়োগী (নবীনচন্দ্র নিয়োগী) — দক্ষিণেশ্বর নিবাসী ভক্ত নবীন নিয়োগী প্রায়ই ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিতেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর নবীন নিয়োগীর গৃহে আয়োজিত নীলকণ্ঠ মুখার্জীর যাত্রা উপলক্ষে ঠাকুরের পদার্পণ হয়। সেদিন ঠাকুর নবীনচন্দ্র ও তাঁহার পুত্রের ভক্তির প্রশংসা করেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন তাঁহার যোগ ও ভোগ দুইই আছে। দুর্গাপূজার সময় নবীন ও তাঁহার পুত্র মা-দুর্গাকে ব্যজন করিতেন। সাধনকালে দক্ষিণেশ্বরে ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে ঠাকুর মণ্ডল ঘাটে থাকিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। ভৈরবীর সেখানে অবস্থানকালে নবীন নিয়োগীর ভক্তিমতী স্ত্রী তাঁহার সেবা ও যত্নের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

নবীন সেন —— কেশবচন্দ্র সেনের জেষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহার কলুটোলার বাড়িতে কেশবের মাতাঠাকুরানীর নিমন্ত্রণে ঠাকুর শুভাগমন করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মভক্তদের হিত কীর্তন করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্র [নরেন্দ্রনাথ দত্ত] (১৮৬৩ - ১৯০২) — ইনি পরবর্তী জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘে বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত প্রখ্যাত অ্যাটর্নী ছিলেন। তিনি খুব উদার মনোভাবাপন্ন এবং প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। মাতা ভুবনেশ্বরী অতিশয় ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন। রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণাদি গ্রন্থপাঠে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। বীরেশ্বর শিবের কৃপায় তিনি পুত্র নরেন্দ্রনাথকে পাইয়াছিলেন। পুত্রের উপর মায়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নরেন্দ্রনাথ অতিশয় মেধাবী এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন। বালক নরেনের বুদ্ধিমত্তায় সকলেই মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতেন। সমবয়স্ক ছাত্রদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ ছিলেন ধ্যানপ্রবণ, প্রত্যুৎপন্নমতি

এবং অসমসাহসিক ও হৃদয়বান নেতা। একাধারে অনেক গুণের অধিকারী। বাল্যকাল হইতে সত্যনিষ্ঠা এবং দেবদেবীর প্রতি অনুরাগ নরেন্দ্রনাথের মধ্যে বিশেষ লক্ষিত হয়। কলেজের পাঠকালেই ঈশ্বরান্বেষী যুবক নরেন্দ্রনাথ একজন প্রকৃত ঈশ্বরদ্রষ্টাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন। মন সময়ে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তিনি বহু মনীসীর সান্নিধ্য লাভেও তৃপ্ত হন নাই। অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সেই আকাঙ্খিত ঈশ্বরদ্রষ্টার সাক্ষাৎলাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ওই সাক্ষাৎকালে নরেন্দ্রনাথকে জানিতে পারেন যে এই সেই চিহ্নিত ঋষি যিনি লোকহিতার্থে পৃথিবীতে আসিয়াছেন। নরেন্দ্র সেই দিনেই তাঁহার এতদিনের প্রশ্নের উত্তর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে মহূর্তমধ্যে পাইয়া যান। শ্রীরামকৃষ্ণের দৃঢ়কণ্ঠের উত্তর —— তিনি ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছেন; ভগবানকে তিনি নিজেই শুধু দেখেন নাই, অপরকেও দেখাইতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনার সকল শক্তি নরেন্দ্রনাথকে অর্পণ করিয়া মহাসমাধি লাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পরে শ্রীরামকৃষ্ণের যুবক ভক্তদের একত্র করিয়া বরাহনগর মঠে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক প্রথমে বিবিদিষানন্দ পরে সচ্চিদানন্দ ও শেষে বিবেকানন্দ নামে তিনি পরিচিত হন। তারপর পরিব্রাজক রূপে ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া দেশের বাস্তবরূপের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় হিয়াছিল। অবশেষে মাদ্রাজের যুবক ভক্তদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো শহরে আয়োজিত বিশ্বধর্ম মহাসভায় যোগদান করিতে রওনা হন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে। অনেক অসুবিধার মধ্যে অগ্রসর হইয়া শেষ পর্যন্ত তিনি উক্ত সম্মেলনে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিয়া হিন্দুধর্মের মহিমা ঘোষণা করেন। উক্ত সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়া জগৎসভায় ভারতের প্রতিষ্ঠাপূর্বক বিপুল সাফল্য লাভ করেন। আমেরিকার নানা স্থানে

ঘুরিয়া ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি, দর্শন ও বেদান্তের প্রচার করা এই সময়ে তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। ইউরোপেও তিনি বেদান্ত প্রচার করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ফিরিলে কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্যন্ত সর্বত্র অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা লাভ করেন। নানাস্থানে বক্তৃতার পরে ভাবী রামকৃষ্ণ মিশন গঠনের কাজে উদ্যোগী হন এবং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন।

নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। তিনি স্ত্রী-পুত্র সহ শ্যামপুকুরে বাস করিতেন। এবং মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরের সঙ্গলাভে নিজেকে ধন্য মনে করিতেন।

নরোত্তম — কীর্তনীয়া। ঠাকুরের ভক্তেরা নিজেদের গৃহে উৎসবের ব্যবস্থা করিলেই কীর্তনগানের জন্য নরোত্তমকে আমন্ত্রণ করিতেন। ঠাকুর এই কীর্তনীয়াকে খুব স্নেহ করিতেন।

নারায়ণ — কলিকাতার সঙ্গতিপন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। সরল ও পবিত্র স্বভাবের জন্য ঠাকুর তাঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন। নারায়ণ কথামৃত প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ছাত্র। বাড়ির লোকের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও দৈহিক নির্যাতন সহ্য করিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। তাঁহার প্রতি এই শারীরিক অত্যাচারের জন্য ঠাকুর ব্যাথা বোধ করিতেন। অল্প বয়সেই নারায়ণ দেহত্যাগ করেন।

নারায়ণ শাস্ত্রী — রাজস্থানের অধিবাসী। দার্শনিক, পণ্ডিত এবং ঠাকুরের ভক্ত। সাধনকালে তিনিঠাকুরের দিব্যোন্মত্ত অবস্থা দেখিয়াছিলেন। পরে নবদ্বীপ হইতে

নবন্যন্যায়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ফিরিবার পথে ঠাকুরের ভাবময় মূর্তি ও সমাধি দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি ঠাকুরের মধ্যে শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিষয় সমূহ উপলব্ধ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ঠাকুরের ভাবে আকৃষ্ট হইয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া যান। পরে ঠাকুরের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং বশিষ্ঠাশ্রমে তপস্যা করিতে চলিয়া যান। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কেশবের সহিত ঠাকুরের মিলনের আগে তিনি ঠাকুরের নির্দেশে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেন এবং ঠাকুরকে জানান যে কেশব জপে সিদ্ধ। দক্ষিণেশ্বরে মাইকেল মধুসূদনের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাতের সময় শাস্ত্রীজী সেখানে উপস্থিত থাকিয়া মাইকেলের সঙ্গে সংস্কৃতে কথা বলেন।

নিতাই মল্লিক — ডাক্তার নিতাই মল্লিক দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশও তিনি শুনিয়াছিলেন।

নিত্যগোপাল [নিত্যগোপাল বসু — জ্ঞানানন্দ অবধূত] (১৮৫৫ - ১৯১১) — শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য ভক্ত। রামচন্দ্র এবং মনোমোহন মিত্রের মাসতুতো ভাই। তুলসীচরণ দত্ত (পরে স্বামী নির্মলানন্দ) নিত্যগোপালের ভাগিনেয়। কলিকাতা আহিরীটোলায় বিখ্যাত বসু বংশের সন্তান। পিতা জনমেজয়, মাতা গৌরী দেবী। নিত্যগোপাল কখনো একা কখনো রামচন্দ্রের সহিত ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিতেন। তিনি সর্বদা ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার আধ্যাত্মিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ঠাকুর তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সম্পর্কে 'পরমহংস অবস্থা' বলিতেন। ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেন যে তাঁহার আধ্যাত্মিক অনুভূতিলাভ বিশেষ সাধন-ভজনাদির উদ্যোগ ব্যতীতই হয়। নিত্যগোপালের পৃথক ভাবে জন্য ঠাকুর তাঁহার অন্যান্য

ভক্তদের তাঁহার সঙ্গে মিশিতে নিষেধ করিতেন। বলিতেন, "ওর ভাব আলাদা, ও এখানকার লোক নয়।" ঠাকুরের তিরোধানের পর ঠাকুরের অস্থিভস্ম কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে রাখা হয় এবং নিত্যগোপাল তখন পাঁচ-ছয় মাস কাল ঠাকুরের নিত্যপূজা করিতেন। নিত্যগোপাল সেইসময়ে দিনের অধিকাংশ সময় ধ্যান করিয়া কাটাইতেন। তিনি 'জ্ঞানানন্দ অবধূত' নাম গ্রহণ করেন। ১১৩ নং রাসবিহারী এভেনিউতে 'মহানির্বাণ মঠ' স্থাপন করেন। পানিহাটিতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অন্য মঠের নাম কৈবল্য মঠ। তাঁহার রচিত প্রায় ২৫ খানা গ্রন্থের মধ্যে কিছু কিছু ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে।

নিরঞ্জন [নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ — স্বামী নিরঞ্জনানন্দ] (১৮৬২ - ১৯০৪) — নিরঞ্জনের জন্ম ২৪ পরগণার রাজারহাট বিষ্ণুপুরে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ নামে সুপরিচিত। শ্রীরামকৃষ্ণের ১৬ জন ত্যাগী সন্তানের মধ্যে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ অন্যতম ও ছয় জন ঈশ্বরকোটির অন্যতম। নিরঞ্জনের বাল্যকাল মাতুলালয়ে কাটে। তাঁহার অতি সুন্দর চেহারা ব্যায়ামাদির ফলে সুদীর্ঘ, সবল ও সুঠাম ছিল। তাঁহার প্রকৃতি ও অনুরূপ নির্ভীক ও বীরভাবাপন্ন ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিবার পূর্বে তিনি এক প্রেততত্ত্বান্বেষী দলের সহিত যুক্ত ছিলেন। এই প্রেততত্ত্বানুসন্ধিৎসু জনকয়েক বন্ধুর সহিত নিরঞ্জন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসেন। প্রথম দর্শনে নিরঞ্জন দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তপরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। সন্ধ্যায় সকলে উঠিয়া গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনের এমন অনতরঙ্গভাবে খবর নেন, যেন কতকালের পরিচিত। সেই সময়ই তিনি নিরঞ্জনকে জানাইয়া দেন যে, মানুষ ভূত ভূত করিতে থাকিলে ভূত হইয়া যায়, আর ভগবান ভগবান করিলে মানুষই ভগবান হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে নিরঞ্জন

স্থির করিলেন যে, ভগবান ভগবান করাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রথম দিন হইতেই নিরঞ্জনের সরলতা শ্রীরামকৃষ্ণের মন জয় করে। নিরঞ্জনের সরলতা ও বৈরাগ্যের জন্য ঠাকুর তাঁহার প্রতি কতখানি স্নেহপরায়ণ ছিলেন তাহার উদাহরণ কথামৃতের বহু জায়গায় দেখা যায়। বলরামভবনে একদিন বলিয়াছিলেন, "দেখ না নিরঞ্জন কিছুতেই লিপ্ত নয়।" এছাড়া আরও অনেক গুহ্য কথা বলিয়াছিলেন নিরঞ্জন সম্পর্কে। দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুর নিরঞ্জনকে আলিঙ্গন করিয়া আকুলস্বরে ভগবান লাভের জন্য ব্যগ্র হইতে বলিয়াছিলেন। নিরঞ্জন এই ভালবাসায় অভিভূত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর ত্যাগী সন্তানদের এমন প্রাণঢালা ভালবাসা ছিল, যার উদাহরণ নিরঞ্জনের ভাষায়, "আগে ভালবাসা ছিল বটে কিন্তু এখন ছেড়ে থাকতে পারবার যো নাই।" কর্তব্যানুরোধে ও বৈরাগ্যের আবেগে নিরঞ্জনকে আপাতদৃষ্টিতে কঠোর মনে হইলেও তাঁহার চরিত্রে কোমলতার অভাব ছিল না। এককথায় প্রয়োজন বোধে তিনি যেমন বজ্রাদপি কঠোর হইতেন, তেমনি আবার কুসুমাদপি মৃদুও হইতে পারিতেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তিনি স্বামী নিরঞ্জনানন্দ নামে অভিহিত হন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দের তপস্যার দিকেই বেশি ঝোঁক ছিল। তবে গুরুভাইদের কাহাকেও অসুস্থ দেখিলে তিনি সেখানে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। তাঁহার শেষ সময় হরিদ্বারে অতিবাহিত হয়।

নিরঞ্জনের ভাই — স্বামী নিরঞ্জনানন্দের পূর্বাশ্রমের ভাই। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কালীপূজার দিনে দক্ষিণেশ্বরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে ধ্যান করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সেই ধ্যানের প্রশংসা করেন।

নীলকণ্ঠ [নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়] (১৮৪১ - ১৯১১) — ইনি বর্ধমানের ধরণী গ্রাম নিবাসী বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা দলে প্রথম ছিলেন। সুগায়ক নীলকণ্ঠ কৃষ্ণযাত্রায় দূতীর ভূমিকায় অভিনয় করিতেন। তিনি সংস্কৃত ভাল জানিতেন। গোবিন্দ অধিকারীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার যাত্রা দলের মালিক হন। কবিত্ব শক্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার রচিত 'কৃষ্ণযাত্রা' বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং বাঁকুড়ায় খুব খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। 'কালীয় দমন' (কৃষ্ণলীলা) নীলকণ্ঠের রচিত শ্রেষ্ঠ পালা। তিনি নিজে ওই যাত্রায় রাধার সখীরূপে অত্যন্ত সুন্দর অভিনয় ও গান করিতেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতদের নিকট হইতে 'গীতরত্ন' উপাধি লাভ করেন। নীলকণ্ঠ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শুনাইয়া মুগ্ধ করেন। ঠাকুরও তাঁহাকে গান শুনাইয়া ধন্য করিয়াছিলেন। নীলকণ্ঠের যাত্রা অনুষ্ঠান দেখিতে আগ্রহী শ্রীরামকৃষ্ণ হাটখোলার বারোয়ারী তলায় গিয়াছিলেন। পরে আর একবার ঠাকুর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে নবীন নিয়োগীর গৃহে আমন্ত্রিত হইয়া নীলকণ্ঠের যাত্রা শুনেন। সেদিনও তিনি সমাধিস্থ হন। নীলকণ্ঠ ঠাকুরকে প্রশ্ন করেন যে, তাঁহার মতো সংসারী জীবের গতি কি। ঠাকুর তাঁহাকে বলেন যে, তিনি (নীলকণ্ঠ) ভগবান দ্বারা পরিচালিত হইয়াই তাঁহার নামগান, ভক্তিরসের ধারা সাধারণ মানুষের মনে পৌঁছাইয়া দিতেছেন। তাহার পর তিনি নীলকণ্ঠকে মায়ের গান করিতে অনুরোধ করিলেন। মধুর কণ্ঠে গান শুনিয়া তিনি ভাববিভোর হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন। এইভাবে নীলকণ্ঠ তাঁহার গানের যথার্থ পুরস্কার পাইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, দুর্লভ রত্ন নীলকণ্ঠের নিজের কাছেই আছে।

নীলমণিবাবু — অধ্যাপক। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সহিত শ্যামপুকুরে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন এবং তাঁহার কথামৃত পান করেন।

নীলমাধব সেন (গাজীপুরের ব্রাহ্মভক্ত) — তিনি গাজীপুর হইতে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন এবং তাঁহার ব্রাহ্মভক্তদের সহিত ঠাকুর যখন গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় নীলমাধব সেনও উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি বাহ্যজগতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন নীলমাধব ও অপর একজন ভক্ত ঠাকুরের ছবি ঘরে রাখেন। তাহাদের কথা শুনিয়া ঠাকুর স্মিত হাসেন এবং নিজের দেহের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করিয়া বলেন যে শরীরটা কেবলমাত্র খোল।

ন্যাংটা (তোতাপুরী) — শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্বৈত বেদান্ত সাধনার গুরু। পাঞ্জাবের লুধিয়ানা মঠের পুরীনামা দশনামা সম্প্রদায়ভুক্ত অদ্বৈতবাদী নাগা সন্ন্যাসী। দীর্ঘ ৪০ বৎসর সাধনার পর নির্বিকল্প সমাধিলাভ করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে পুরী ও গঙ্গাসাগর তীর্থ করিয়া ফিরিবার পথে তিনি ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে আসেন। এখানে ঠাকুরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। তোতাপুরী বাল্যকাল হইতেই সন্ন্যাসীদের মঠে ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা দিগম্বর থাকিতেন বলিয়া (ন্যাংটা) নাগা বা নাংগা সাধু সম্প্রদায় বলা হইত। তোতা অল্প বয়সেই গুরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বিশেষ যত্ন সহকারে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। অল্প সময়ের মধ্যে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বহুদিন নর্মদাতীরে কৃচ্ছ্রসাধন করেন এবং অবশেষে নির্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হন। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র তোতাপুরী তঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারেন। তিনি ঠাকুরকে বেদান্ত শিক্ষা দিতে পারেন কিনা প্রশ্ন করিলে ঠাকুর বলেন যে

সবই মায়ের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। অবশেষে ঠাকুর মায়ের আদেশানুসারে তোতাপুরীর কাছে বেদান্ত সাধনা করেন। সন্ন্যাসদীক্ষান্তে তিনদিনের মধ্যেই ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধি লাভ হইয়াছিল। তোতাপুরী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, ঠাকুরের মন সম্পূর্ণভাবে বাহ্যজগৎ হইতে প্রত্যাহৃত। তাঁহার নির্বিকল্প সমাধি অবস্থা দেখিয়া তোতাপুরী বিস্মিত হইয়াছিলেন। দীর্ঘ ৪০ বৎসরের কঠিন সাধনার পর যাহা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ মাত্র অল্প সময়েই লাভ করিয়াছিলেন। তিনদিনের পরিবর্তে ১১ মাস অতিবাহিত করার পর, তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিয়া যান। যাইবার পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যবশতঃ তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন যে ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন, একই সত্তা।

পওহারীবাবা [হরভজন দাস] (১৮৪০ - ১৮৯৮) — উত্তর প্রদেশের জৌনপুরের নিকটবর্তী প্রেমপুরে (গুজি) মতান্তরে বারাণসী জেলার গুজি নামক স্থানের নিকটবর্তী এক গ্রামে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম। পিতা অযোধ্যা তেওয়ারী। শৈশবে বসন্তরোগে তাঁহার একচক্ষু নষ্ট হয়। কাকা লক্ষ্মীনারায়ণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী এবং অল্প বয়সেই সন্ন্যাস জীবন যাপনের জন্য গৃহত্যাগী। বহু বৎসর পরে গাজীপুরের তিন মাইল দক্ষিণে গঙ্গাতীরে কুর্থ নামক গ্রামের আশ্রমে লক্ষ্মীনারায়ণের অবস্থান কালে হরভজন তাঁহার নিকট আসিলে তিনি তাঁহার উপনয়নের পর শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করান। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মীনারায়ণের দেহত্যাগের পর আশ্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বাবাজী পুরী রামেশ্বর, দ্বারকা ও বদ্রীনাথ তীর্থাদি দর্শন করেন। এ সময়ে গির্নার পর্বতে এক যোগীর কাছে উপদেশ লাভ করেন এবং হিমালয়ের এক যোগীর নিকট এক উদ্ভিদের সন্ধান পান যাহা খাইয়া অন্য খাদ্য ব্যতীতই বহুদিন বাঁচিয়া থাকা যায়। আশ্র মে ফিরিয়া

সাধুর জীবনযাপন কালে শুধুমাত্র লঙ্কা ও দুধ আহার্য গ্রহণ করিতেন। পরে শুধু বিল্বপত্রের রস পান করিতেন। সেজন্য লোকে পওহারীবাবা বলিত। পুরী যাত্রার পথে মুর্শিদাবাদে বাংলা ভাষা শিখিয়া চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করেন। তামিল তেলেগু ভাষা শিখিয়া দক্ষিণ ভারতীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি পাঠ করেন। শ্রীসম্প্রদায়ের এক বৈষ্ণব সাধুর নিকট তিনি দীক্ষিত হইয়াছিলেন। গাজীপুরের নিকটে এক যোগীর কাছে তিনি যোগশিক্ষা করেন। আশ্রমের এক মৃত্তিকা গহ্বরে তিনি যোগাভ্যাস করেন। জনতাকে প্রতি একাদশীতে দর্শন দান করিতেন। পরে বৎসরে একদিন মাত্র দর্শন দানের জন্য বাহিরে আসিতেন। দীর্ঘকাল গুহায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার গুহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি ফটো ছিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী তাঁহার সহিত আলাপাদি করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কথামৃতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে ত্রৈলোক্যের কথোপকথনে পওহারীবাবার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। বাবাজীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে স্বামীজী তাঁহার উচ্চাবস্থার কথা একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন।

পণ্ডিতজী — বড়বাজারের ভক্ত মারোয়াড়ীর গৃহে (১২ নং মল্লিক স্ট্রীটে) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভাগমন কালে পণ্ডিতজী তাঁহার সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেন। তাঁহার পুত্রও ওইদিন ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতেন।

পদ্মলোচন (পণ্ডিত পদ্মলোচন তর্কালঙ্কার) — বেদান্তবাদী, ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম অনুরাগী। তিনি বর্ধমান মহারাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। পদ্মলোচনের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ও ঈশ্বরভক্তির কথা শুনিয়া ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেই সময়ে পদ্মলোচন ভগ্ন

স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য আড়িয়াদেহের একটি বাগানবাড়িতে ছিলেন। মিলনে উভয়েই আনন্দিত হন। ঠাকুরের মুখে তাঁহার উপলব্ধি সমূহ ও মায়ের গান শুনিয়া তিনি অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছিলেন। পণ্ডিতের সিদ্ধাই-এর বিষয় ঠাকুর জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে সাক্ষাৎ ইষ্টজ্ঞানে স্তবস্তুতি করিয়াছিলেন। কাশীতে তিনি দেহরক্ষা করেন।

পল্টু (প্রমথনাথ কর) — কম্বুলিয়াটোলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রায় বাহাদুর হেমচন্দ্র করের পুত্র। এ্যটর্নী হিসাবে বিখ্যাত। মাস্টার মহাশয়ের ছাত্র হিসাবে খুব শৈশবেই ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন ও তাঁহার ভক্ত হন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন "তোরও হবে। তবে একটু দেরিতে হবে।" পরবর্তী জীবনে তিনি বহু পরহিতব্রতী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং দরিদ্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন ।

পশুপতি (পশুপতি বসু) — নন্দলাল বসুর ভাই। বাসস্থান — বাগবাজার, কলিকাতা। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দ বসুর বাড়িতে রক্ষিত দেবদেবীর সুন্দর ছবিগুলি দর্শনের জন্য শুভাগমন করিয়া সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেন। পশুপতি তাঁহাকে দেবদেবীর ছবিগুলি দর্শন করাইয়া সুখী হন। ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও পশুপতির অহংকারশূন্য মনোভাবের জন্য ঠাকুর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন ও কিছুক্ষণ নন্দবাবু প্রভৃতির সহিত ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেন।

পাগলী — কথামৃতে এক পাগলিনীর উল্লেখ আছে। সে দক্ষিণেশ্বরে ও কাশীপুরে ঠাকুরের নিকট মধ্যে মধ্যে আসিত। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই

সুগায়িকা পাগলীকে শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে আনয়ন করেন। কিন্তু ঠাকুরের প্রতি তাহার অন্যভাবে কথা প্রকাশ করায় ঠাকুর বিরক্ত হন। যখন তখন আসিয়া সে ঠাকুরের নিকট গান করিত।

পান্না কীর্তনী (পান্নাময়ী) — বিখ্যাত মহিলা কীর্তনীয়া। পদাবলী কীর্তনে সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে দক্ষিণেশ্বরে কীর্তন উপলক্ষে ঠাকুরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ঠাকুর তাঁহার ভক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে পান্নার সুকণ্ঠের প্রশংসা করেন এবং তাঁহার ভক্তির কথা উল্লেখ করেন।

পাঁড়ে জমাদার (খোট্টা বুড়ো) — শ্রীশ্রীঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে ভক্তদের নিকট কামিনী-কাঞ্চন প্রসঙ্গে তাহার তরুণী স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণে তাহাকে উদ্বিগ্ন থাকিতে হইত — উল্লেখ করিয়াছিলেন।

পিগট (মিস্) — আমেরিকান পাদ্রী। যোশেফ কুকের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের স্টীমারে (২৩-২-১৮৮২) শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। সেদিন ঠাকুরের গান এবং আধ্যাত্মিক আলোচনা শুনিয়া এবং ঠাকুরের ভাবসমাধির অবস্থা দেখিয়া যোশেফ কুক এবং মিস্ পিগট অভিভূত হইয়াছিলেন।

পূর্ণ [শ্রী পূর্ণচন্দ্র ঘোষ] (১৮৭১ - ১৯১৩) — কলিকাতার সিমুলিয়ায় জন্ম। ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে। গৃহীভক্তদের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকেই ঈশ্বরকোটি বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। ছাত্রাবস্থায় অতি শৈশবেই মাস্টার মহাশয়ের পরামর্শে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন। পিতা রায় বাহাদুর দীননাথ ঘোষ — উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। ঠাকুর পূর্ণকে

বলিয়াছিলেন যে যখনই তাহার সুবিধা হইবে তখনই যেন সে ঠাকুরের নিকট আসে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন পূর্ণচন্দ্রের ‘বিষ্ণুর অংশে জন্ম’ এবং তাঁহার আগমনে ওই শ্রেণীর ভক্তদের আগমন পূর্ণ হইল। বাহিরে সরকারীকাজে নিযুক্ত থাকিলেও অন্তরে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবে ও চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। স্বামীজীর প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। স্বামীজীর মহিলাভক্ত মাদাম কালভে কলিকাতায় যখন আসেন, সে সময় তিনি তাঁহাকে বিবেকানন্দ সোসাইটির সম্পাদক হিসাবে উক্ত সোসাইটির পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করেন। মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

প্রতাপ ডাক্তার (১৮৫১ - ১৯১২) — বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। নদীয়া জেলার চাপড়া গ্রামে জন্ম। কলিকাতায় চিকিৎসা-বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামপুকুরে ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনি শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন। এই সময়ে ঠাকুরের পূত সঙ্গ লাভ করিয়া এবং তাঁহার অদ্ভুত ভাবাবস্থা দর্শনে বিজ্ঞান জগতের প্রতাপচন্দ্র মোহিত হন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগোতে World's Columbian Exposition-এ আমন্ত্রিত হন।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (১৮৪০ - ১৯০৫) — বাসস্থান কলিকাতা। পিতা গিরীশচন্দ্র মজুমদার। প্রতাপচন্দ্র বিখ্যাত ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। জন্ম হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামে মাতুলালয়ে। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য ভারত ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। কেশবচন্দ্র সেনের দেহত্যাগের পর নববিধান ব্রাহ্মসমাজের নেতা হন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তিনি বহুবার গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার

বিখ্যাত প্রবন্ধ Hindu Saint জনপ্রিয়তা লাভ করে। Oriental Christ, Paramhamsa Ramakrishna প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচনা। ১৮৯৩ সালে প্রতাপচন্দ্র শিকাগো ধর্মসভায় উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া ভাষণ দিয়াছিলেন এবং সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের সাথে সাক্ষাৎ হয়। কলিকাতায় ৬৫ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

প্রতাপ সিং — একজন ডেপুটি। ঠাকুর কামারপুকুরে তাঁহার দানধ্যান ও ঈশ্বরে ভক্তি ইত্যাদি অনেক গুণের কথা শুনিয়াছিলেন। ইনি ঠাকুরকে লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন।

প্রতাপচন্দ্র হাজরা — হুগলী জেলার মড়াগেড়ে নামক গ্রামে বাড়ি। কামারপুকুরের কয়েক মাইল পশ্চিমে এই গ্রাম। শিহড় গ্রামে হৃদয়ের বাড়িতে প্রথম তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পান। কয়েক বৎসর পরে বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও বৃদ্ধা মাতাকে রাখিয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে আসেন। কিন্তু তাঁহার কিছু ঋণ ছিল। দক্ষিণেশ্বরে তিনি ‘হাজরামশাই’ নামে পরিচিত ছিলেন। হাজরার নিরাকারবাদের সমর্থন পাইয়া নরেন্দ্রনাথও প্রথমে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। হাজরাকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর বলিতেন — ‘জটিলে কুটিলে’ থাকলে লীলা পোষ্টাই হয়। নরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় হাজরা ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জীবনের শেষ ভাগে তিনি স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন। অন্তিম সময়ে ঠাকুরের দর্শন পান। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ৬২।৬৩ বৎসর বয়সে স্বগ্রামে হাজরা লোকান্তরিত হন।

প্রতাপের ভাই — শ্রীম-র দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতীয় দর্শন দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার কথা উল্লেখ করেন। বেকার অবস্থায় স্ত্রী-পুত্রকে শ্বশুরবাড়িতে রাখিয়া দক্ষিণেশ্বরে

থাকিতে চাহিয়াছিলেন। সেজন্য ঠাকুর তাহাকে গৃহস্থের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন। ইনি কোন্ প্রতাপের ভাই তাহা জানা যায় না।

প্রসন্ন (প্রসন্নকুমার সেন) — ব্রাহ্মভক্ত। জন্ম — ২৪ পরগণা — গরিফা। কেশব সেনের অনুগামী শিষ্য। ঠাকুরের শুভদর্শন লাভে তিনি আশীর্বাদ ধন্য হইয়াছিলেন। কমলকুটীরে কেশব সেনের অসুস্থ অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে দেখিতে গেলে তিনি ঠাকুরকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছিলেন।

প্রসন্ন [সারদাপ্রসন্ন মিত্র — স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ] (১৮৬৫ - ১৯১৫) — চব্বিশ পরগণা জেলার নাওরা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম। পিতা শিবকৃষ্ণ মিত্র। মাতামহ পাইকহাটীর নীলকমল সরকার একজন জমিদার। সারদাপ্রসন্ন ছিলেন কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ছাত্র। মেধাবী হইয়াও প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য বিশেষ দুঃখ পান। মাস্টার মহাশয় এইজন্য বিষাদগ্রস্ত ছাত্রকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে লইতেন। অভিভাবকগণ তাঁহার বিবাহের চেষ্টা করিলে তিনি গৃহ হইতে পলাইয়া যান। প্রথমে কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যান। পরে পুরীধামে পথে রওনা হন। কিন্তু ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। মেট্রোপলিটন কলেজ হইতে এফ্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বরাহনগরে মঠে যোগ দেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তাঁহার নাম হয় স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। দুঃসাহসিকতার প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকায় তীর্থ ভ্রমণের সময় অনেক বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর প্রতি তাঁহার অপরিসীম ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তীর্থ হইতে ফিরিয়া নানা জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। দুর্ভিক্ষে

সেবাকার্য, উদ্বোধন পত্রিকার প্রকাশনা এবং ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বেদান্ত প্রচারে বিদেশযাত্রা তাঁহার কর্মময় জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমেরিকার সানফ্রান্সিস্‌কো, ক্যালিফোর্নিয়া প্রভৃতি শহরে বেদান্ত প্রচারের কাজে তাঁহার শেষ জীবন কাটে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে সানফ্রান্সিস্‌কো শহরে হিন্দুমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। পাশ্চাত্যে এইটি প্রথম হিন্দুমন্দির। ক্যালিফোর্নিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে 'শান্তি আশ্রম' নামে একটি শাখাকেন্দ্র শুরু করিয়াছিলেন। Voice of Freedom নামে একটি মাসিক পত্র এবং লস এঞ্জেলস নগরে বেদান্ত সমিতি স্থাপন তাঁহার বিশেষ উদ্যোগের পরিচায়ক। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তিনি দেহত্যাগ করেন।

প্রাণকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়) — হুগলি জেলার জনাইয়ের মুখোপাধ্যায় বংশীয় শ্রীরামকৃষ্ণে ভক্ত। স্থূলকায় ছিলেন বলিয়া 'মোটা বামুন' নামে ঠাকুর তাঁহাকে উল্লেখ করিতেন। কলিকাতায় শ্যামপুকুর অঞ্চলে রামধন মিত্র লেনে থাকিতেন। সওদাগরী অফিসে চাকুরী করিতেন। ঠাকুরকে নিজের বাড়িতে লইয়া গিয়া সেবা করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন এবং বেদান্তচর্চায় আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

প্রিয় [প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়] — শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী ভক্ত, ইঞ্জিনীয়ার, বাগবাজারের রাজবল্লভ পাড়ার বাসিন্দা। তিনি মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। উভয়েই থিয়োসফিস্ট হইলেও ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করিতেন।

প্রিয় (প্রিয়নাথ সিংহ) — নরেন্দ্রনাথের প্রতিবেশী বন্ধু — ব্রাহ্মভক্ত। দক্ষিণেশ্বরে ও সিমুলিয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে তিনি দর্শনাদি করিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি

খ্যাতনামা শিল্পী হন। 'গুরুদাস বর্মণ' এই ছদ্মনামে তিনি 'শ্রীরামকৃষ্ণচরিত' রচনা করেন। বাল্য-বয়সেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন। স্বামীজীর সম্বন্ধে তাঁহার রচনায় স্বামীজী সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য জানা যায়। 'স্বামীজীর কথা' পুস্তকে এই স্মৃতিকথা প্রকাশিত হইয়াছে।

ঠাকুর যে নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ দ্বারা অদ্বৈতানুভূতি দান করেন তাহার একটি সুন্দর রঙিনচিত্র তিনি অঙ্কন করিয়াছিলেন।

প্রেমচাঁদ বড়াল — বহুবাজার নিবাসী সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম। ব্রাহ্মভক্ত মণি মল্লিকের সিঁদুরিয়াপটীর বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার পরিবারস্থ লালচাঁদ বড়াল ও রাইচাঁদ বড়াল প্রখ্যাত সঙ্গীত সাধক।

ফকির — প্রকৃত নাম যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য। বলরাম বসুর পুরোহিত বংশের সন্তান এবং কিছুকাল বলরামবাবুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসুর গৃহশিক্ষকরূপেও নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত শুরু করেন এবং ক্রমে তাঁহার ভক্ত হন। ঠাকুর ফকিরের মুখে দেবদেবীর স্তব শুনিতে ভালোবাসিতেন।

বঙ্কিম — মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের পরিচিত। বাগবাজার স্কুলের ছাত্র। শ্যামপুকুর বাটীতে তাহার খোঁজ লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর মাস্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন — সে যদি না আসতে পারে, তাহাকে মাস্টার মহাশয় যেন ভগবৎকথা বলেন। তাহা হইলেই তাহার চৈতন্য হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮ - ১৮৯৪) — সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক। পেশায় ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট। “বন্দেমাতরম্” সংগীতের স্রষ্টা। বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্কিমচন্দ্র ২৪ পরগণা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর শোভাবাজারের অধরলাল সেনের বাড়িতে দর্শন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন ঠাকুরকে ধর্ম সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং যথাযথ উত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা ‘দেবী চৌধুরাণী’ গ্রন্থের পাঠ শুনিয়াছিলেন এবং গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মযোগ বঙ্কিমবাবু উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করায় খুশি হইয়াছিলেন। কথামৃতে ঠাকুরের সঙ্গে কথোপকথনটি বঙ্কিমবাবুকে গভীরভাবে চিন্তাশীল করিয়াছিল। পরবর্তী কালে মাস্টার মহাশয় ও গিরিশবাবু ঠাকুরের নির্দেশে বক্ষকিমবাবুর সানকীভাঙ্গার বাসায় গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন।

বলরাম [বলরাম বসু] (১৮৪২ - ১৮৯০) — বলরামবসু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান গৃহীভক্তদের মধ্যে অন্যতম। তিনি রসদদারদের মধ্যে একজন। কলিকাতার বাগবাজারে জন্ম। পিতা রাধামোহন। পিতামহ গুরুপ্রসাদের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর বিগ্রহের নামানুসারে ওই অঞ্চলের নাম হয় শ্যামবাজার। ওই অঞ্চলের কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রীট আজও বলরামের প্রপিতামহের গৌরবময় স্মৃতির সাক্ষ্য বহন করিতেছে। হুগলী জেলার আঁটপুর-তড়া গ্রামে পূর্বপুরুষদর আদি নিবাস। উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় জমিদারি ও কোঠার মৌজায় কাছারি বাড়ির পত্তন হয় পিতামহের সময়। পিতার তিন পুত্রের মধ্যে বলরাম দ্বিতীয়।

শৈশব হইতেই বলরাম ধর্মভাবাপন্ন। এই বৈষ্ণব পরিবারের সকলেই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। শ্রীধাম বৃন্দাবনেও শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর বিগ্রহ স্থাপন করেন পিতামহ গুরুপ্রসাদ। বর্তমানে উহা 'কালাবাবুর কুঞ্জ' নামে পরিচিত। বলরাম ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণের বলরামকে চিনিয়া লইতে দেরি হয় নাই। একমাত্র বলরামের বাড়িতেই শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বাধিকবার আগমন ঘটে। বলরামের অন্ন "শুদ্ধ অন্ন" — একথাও ঠাকুরের মুখে শোনা যায়। তিনি বলরামকে শ্রীচৈতন্যের কীর্তনের দলে দেখিয়াছিলেন। বলরামের সহধর্মিণী কৃষ্ণভাবিনীকে শ্রীমতীর (রাধারানীর) অষ্ট সখীর প্রধানা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। একবার শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী অসুস্থা হইলে তাঁহাকে দেখিবার জন্য ঠাকুর শ্রীমা শ্রীসারদা দেবীকে দক্ষিণেশ্বর হইতে বলরাম বসুর গৃহে পাঠান। প্রতিবৎসর রথের সময় ঠাকুরকে বাসভবনে লইয়া আসিতেন বলরাম। এখানে ঠাকুর রথের সম্মুখে কীর্তন নৃত্যাদি করিতেন ও রথ টানিতেন। ঠাকুর বলিতেন বলরামের পরিবার সব একসুরে বাঁধা। বলরাম শুধু নিজ পরিবার নয়, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবও যাহাতে ঠাকুরের কৃপালাভে ধন্য হইতে পারে সেজন্য তাঁহাদিগকে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির দিন পর্যন্ত তিনি ঠাকুরের প্রয়োজনীয় নিত্য আহার্যের দ্রব্যসমূহ যোগাইতেন। ঠাকুরের অদর্শনের পরেও শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদের কাছে বলরামের ভবন একটি আশ্রয়স্থল ছিল। এই ভবন বর্তমানে "বলরাম-মন্দির" নামে পরিচিত। এইখানেই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীশ্রীমাও এই বাড়িতে মধ্যে মধ্যে আসিয়া বাস করিতেন। বলরামবাবুর পুরীর আবাস এবং বৃন্দাবনের কালাবাবুর কুঞ্জ ছিল ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের সাধন ভজনের উপযোগী স্থান। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার ইতিহাসে অন্য কোনও ভক্ত পরিবারের এরূপ সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায় না।

মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদের উপস্থিতিতে বলরাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯১৯ সালে কৃষ্ণভাবিনী দেবীর ৺কাশীপ্রাপ্তি হয়।

বলরামের পিতা (রাধামোহন বসু) — ইনি অতি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। অধিকাংশ সময় কালাবাবুর কুঞ্জে একাকী বাস করিতেন। শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরের সেবার তত্ত্বাবধান এবং অবসর সময়ে ভক্তিগ্রন্থ পাঠ এবং বৈষ্ণবসেবায় সময় অতিবাহিত করিতেন। কোঠারে থাকাকালেও এইরূপ জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় শান্তির অধিকারী হইয়া বলরাম তাঁহার ধর্মপ্রাণ পিতাকে ঠাকুরের সান্নিধ্যে লইয়া আসিয়াছিলেন। অতঃপর রাধামোহন বসু বহুবার শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভে জীবন ধন্য করেন ও ভগবৎ দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা এবং ধর্মজীবনে উদার দৃষ্টিভঙ্গীলাভের প্রেরণালাভ করেন।

বাবুরাম [বাবুরাম ঘোষ — স্বামী প্রেমানন্দ] (১৮৬১ - ১৯১৮) — হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম। পিতা আঁটপুর নিবাসী তারাপদ ঘোষ, মাতা মাতঙ্গিনী দেবী। বাবুরাম পরবর্তী জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে স্বামী প্রেমানন্দ নামে পরিচিত। শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত ছয়জন ঈশ্বরকোটির মধ্যে তিনি একজন। কলকাতায় পড়াশুনা করিবার সময় সহপাঠী রাখালচন্দ্র ঘোষের (পরবর্তী কালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ) সহিত দক্ষিণেশ্বরে গিয়া প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেইদিনই বাবুরামকে আপনজন বলিয়া গ্রহণ করেন। তিনি বাবুরামকে দরদী, 'বাবুরামের হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ' — বলিতেন। ভক্তপ্রবর বলরাম বসুর স্ত্রী কৃষ্ণভাবিনী দেবী, বাবুরামের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। পরম ভক্তিমতী মাতা মাতঙ্গিনী দেবীর নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার এই পুত্রকে তাঁহাকে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন। কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ সৌভাগ্যজ্ঞানে পুত্রকে

ঠাকুরের চরণে সমর্পণ করেন। দক্ষিণেশ্বরে, শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে বাবুরাম নানাভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচারের জন্য তিনি তিনবার পূর্ববঙ্গে গমন করেন। প্রতিবারেই সেখানে বহুভক্তের মধ্যে প্রভূত উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত দেওভোগ গ্রামে নাগমহাশয়ের বাড়িতে গিয়া ভাবাবেগে নাগ প্রাঙ্গণে গড়াগড়ি দেন। স্বামী প্রেমানন্দ ছিলেন মঠের স্বাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণের জননীর মতো। নানাদেশ হইতে আগত সকলকে তিনি বেলুড়মঠের তখনকার নানা অসুবিধার মধ্যেও মিষ্ট আলাপাদি ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে সেবা করিতেন। তাঁহার চেষ্টায় বেলুড়মঠে শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের জন্য একটি চতুষ্পাঠী (টোল) স্থাপিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি স্বামী প্রেমানন্দের অসীম ভক্তি ছিল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই, মঙ্গলবার, বিকাল ৪টা ১৫ মিনিটে বলরাম-মন্দিরে তিনি দেহত্যাগ করেন।

বিজয় [বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী] (১৮৪১ - ১৮৯৯) — শান্তিপুরের বিখ্যাত অদ্বৈত বংশে জন্ম। পিতা আনন্দচন্দ্র গোস্বামী। বাল্যবয়স হইতেই ঈশ্বর অনুরাগ লক্ষিত হয়। বেদান্ত অধ্যয়নের জন্য সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্মধর্মে আকৃষ্ট হইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। পরে কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে আসেন এবং পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের কোন কোন আচরণ তিনি সমর্থন করেন নাই। যদিও তিনি নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগী ছিলেন তথাপি গয়াতে এক যোগীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ এবং যৌগিক সাধন প্রক্রিয়াদি অভ্যাস করিতে থাকেন। মতপার্থক্যের জন্য ১৮৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মসংঘ ত্যাগ করেন এবং সনাতন

হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন। ঢাকাতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি আশ্রম আজও বিদ্যমান। পরবর্তী কালে তিনি বহু ব্যক্তিকে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। অন্যান্য ব্রাহ্ম নেতাদের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে আকৃষ্ট হইয়া তিনি বহুবার দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বিজয়কৃষ্ণের মতে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই তিনি ষোলআনা ভগবদভাবের প্রকাশ দেখিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অহেতুকী ভালবাসার প্রভাবে তাঁহার ধর্মজীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। শেষজীবনে তিনি পুরীধামে সাধন-ভজনে নিযুক্ত থাকিয়া এক শিষ্যমণ্ডলী গঠন করেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এখানেই দেহত্যাগ করেন।

বিজয়ের শাশুড়ী — শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী মহিলা ভক্ত। রামচন্দ্র ভাদুড়ীর ভক্তিমতী সহধর্মিণী। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ও ব্রাহ্ম উৎসবস্থলে ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতেন। ঠাকুরের পূতসঙ্গ লাভে এবং তাঁহার নানাবিধ উপদেশ শ্রবণে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। আজীবন তিনি ঠাকুরের বিশেষ অনুরাগী ভক্ত ছিলেন।

‘বিদ্যা’ অভিনেতা — প্রকৃত নাম ভোলানাথ বসু। প্রখ্যাত যাত্রাশিল্পী। “বিদ্যাসুন্দর” নাটকে বিদ্যার ভূমিকায় অভিনয় করিয়া তিনি “বিদ্যা অভিনেতা” রূপে খ্যাতি লাভ করেন। ঠাকুর একদা দক্ষিণেশ্বরে “বিদ্যাসুন্দর” যাত্রায় বিদ্যার ভূমিকায় তাঁহার অভিনয় দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ঈশ্বরলাভের জন্য সাধনা করিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন।

বিনোদ (বিনোদবিহারী সোম) — মহেন্দ্রনাথ গুপ্তর ছাত্র। বন্ধুদের কাছে তিনি 'পদ্মবিনোদ' নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করেন। পরবর্তী কালে গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে অভিনয় করিতেন ও সঙ্গদোষে মদ্যপায়ী হন। একদিন থিয়েটার হইতে ফেরার পথে রাত্রিতে মায়ের বাড়ীর সম্মুখে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের উদ্দেশ্যে একটি গান করিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করেন। এর কিছুকাল পরেই তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া হাসপাতালে ভর্তি হন এবং দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি শ্রীম কথিত রামকৃষ্ণকথামৃত হইতে পাঠ শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা পালিত হয় এবং তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নাম করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিনোদিনী (১৮৬৩ - ১৯৪২) — কলিকাতার বিখ্যাত মঞ্চাভিনেত্রী। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন বিনোদিনীর নাট্যগুরু। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার দলের সঙ্গে ভারত ভ্রমণ করেন। ১৮৭৭ সালে গিরিশচন্দ্রের অনুরোধে ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগ দেন। গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় এবং স্বীয় প্রতিভায় বিনোদিনী শ্রেষ্ঠ মঞ্চাভিনেত্রী রূপে খ্যাত হন। তাঁহার নিঃস্বার্থ কর্মের ফলেই স্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। সহকর্মীদের অবিচারে এবং নানা কারণে তিনি ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে অভিনয় জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'বাসনা' (কাব্যগ্রন্থ), কনক ও নলিনী (কাহিনী-কাব্য), 'আমার অভিনেত্রী জীবন' উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর বিনোদিনী ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন। ওইদিন গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' নাটকে চৈতন্যদেবের ভূমিকায় বিনোদিনীর অসামান্য অভিনয় দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ অভিভূত হন এবং বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেন। পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণ বিনোদিনী অভিনীত

প্রহ্লাদচরিত, দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুবচরিত, বৃষকেতু ইত্যাদি নাটকগুলি দেখেন এবং বিনোদিনীর অভিনয়ের প্রশংসা করেন। ঠাকুরের অসুস্থতার কথা শুনিয়া ব্যাকুলচিত্তে বিনোদিনী কালীপদ ঘোষের সহায়তায় এক ইওরোপীয় পুরুষের ছদ্মবেশে শ্যামপুকুর বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও বিশেষ প্রীত হন এবং আশীর্বাদ করেন।

বিপিন সরকার — হুগলী জেলার কোন্নগর নিবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শন করেন। সেদিন ঠাকুর তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

বিশ্বম্ভরের বালিকা কন্যা — শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্যা ৬।৭ বছরের বালিকা। একদা বলরাম-মন্দিরে রথজাত্রা উপলক্ষে এই বালিকা ঠাকুরের পাদস্পর্শ করিয়া নমস্কার করিলে ঠাকুরও তাঁহাকে মাথা অবনত করিয়া প্রতিনমস্কার জানান। অতঃপর ঠাকুর স্নেহবশে এই বালিকাকে ‘কেলুয়ার গান’ শুনাইয়া আনন্দ দান করেন।

বিশ্বাসবাবু (অম্বিকাচরণ বিশ্বাস) — খড়দহের মর্যাদাসম্পন্ন ধনী জমিদারের দত্তক সন্তান। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর সঙ্গিনী ‘যোগীন-মা’র স্বামী বলরাম বসুর আত্মীয়। নিজ কর্মদোষে নিঃস্ব এবং মর্যাদাহীন হইয়াছিলেন। অম্বিকাচরণ বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

বিষ্ণু — আড়িয়াদহ নিবাসী তরুণ ভক্ত এবং স্কুলের ছাত্র। ঠাকুরের পূতসঙ্গ লাভের জন্য প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। সংসার-বিতৃষ্ণ বিষ্ণু পশ্চিমাঞ্চলে

আত্মীয়ের নিকট অবস্থানকালে নির্জনে ধ্যান করিতেন; এবং নানাবিধ ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করিতেন। এই উদাসী বালক-ভক্তটি গলায় ক্ষুর দিয়া আত্মহত্যা করায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন, বোধ হয় — শেষ জন্ম, পূর্বজন্মে অনেক কাজ করা ছিল। একটু বাকি ছিল, সেইটুকু বুঝি এবার হয়ে গেল।

বিহারী (বিহারী মুখোপাধ্যায়) — শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। বীরভূমের অধিবাসী, চাকরীর খোঁজে কলিকাতার আসেন। ভাগ্যক্রমে দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার আশ্রয় লাভ করেন। পরবর্তী কালে তিনি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে যান এবং তাঁহার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন। শ্যামপুকুর বাটীতে বিহারী কালীপূজা দিবসে স্তব ও গান করিয়াছিলেন।

বিহারীলাল ভাদুড়ী — ভাদুড়ী ডাক্তার — ভাদুড়ী ডাক্তার — প্রবীন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক । বাড়ি কর্নয়া লিস স্ট্রীটে। শ্যামপুকুর বাটীতে ঠাকুরের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। এইসময়েই তিনি ঠাকুরের কথামৃত পান ও ভাবসমাধি দর্শনের সোভাগ্য লাভ করেন। ডাক্তার ভাদুড়ীর জামাতা ডা: প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুর বাটীতে আসিয়াছিলেন।

বেচারাম (আচার্য বেচারাম চট্টোপাধ্যায়) — আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য। জন্ম কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চল বেহালাতে। সংস্কৃত পণ্ডিত। হাওড়ায় একটি স্কুলের শিক্ষক পরবর্তী কালে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল বেণীমাধব পালের সিঁথির বাগানবাড়িতে ব্রাহ্মোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন ও তাঁহার ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণে আনন্দিত হন।

বেণীমাধব পাল — ব্রাহ্মসমাজভুক্ত, ব্যবসায়ী। কলিকতার উপকণ্ঠে সিঁথিতে তাঁহার উদ্যানবাটিতে শরৎকালে এবং বসন্তকালে ব্রাহ্মসমাজের উৎসব হইত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একাধিকবার এই উৎসবে আসিয়া ব্রাহ্মভক্তদের আনন্দ দান করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে তিনি মধ্যে মধ্যে গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গাদি শুনিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার উৎসবে ও ভক্তসেবায় অর্থের সদ্ব্যবহার দেখিয়া প্রশংসা করিতেন।

বেনোয়ারী কীর্তনীয়া — শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত জনৈক কীর্তনীয়া। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রথযাত্রার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত বলরাম বসু তাঁর বাড়িতে বেনোয়ারীর কীর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঠাকুর সেই আসরে উপস্থিত ছিলেন।

বৈকুণ্ঠ সান্যাল (১৮৫৭-১৯৩৭) — ঠাকুরের গৃহীভক্ত। “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত” নামক তথ্যবহুল গ্রন্থের প্রণেতা। নদীয়া জেলার বেলপুকুর গ্রামে জন্ম। পিতা দীননাথ সান্যাল। অনি অল্প বয়সেই শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন। ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হইবার পর হইতেই ইষ্ট দর্শন লাভের বাসনা হয়। অতঃপর কল্পতরু দিবসে ঠাকুরের কৃপায় তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হয়। আজীবন তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আদর্শের ঘনিষ্ঠ ও উৎসাহী অনুগামী ছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সহযোগীও ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের তিনি নানাভাবে সহায়তা করিতেন। রামকৃষ্ণ মিশনের হিসাব নিরীক্ষক রূপে বহুদিন কাজ করেন। স্বামী কৃপানন্দ নামে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি কিছুকাল উত্তরাখণ্ডে পরিব্রাজক রূপে ভ্রমণ ও তপস্যাদি করিয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠ সেন — কলিকাতার মাতাঘষা পল্লীর অধিবাসী। ব্রাহ্মভক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী জয়গোপাল সেনের ভ্রাতা। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন। গৃহস্থাশ্রম প্রসঙ্গে ঠাকুর তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে অতি সুন্দর উপদেশাদি দিয়াছিলেন।

বৈদ্যনাথ — হাইকোর্টের উকিল। ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্রের আত্মীয়। ভক্ত সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন এবং তাঁহার সঙ্গে বহুক্ষণ ভগবৎ বিষয়ক আলোচনা করেন। বৈদ্যনাথের সঙ্গে আলোচনায় ঠাকুর প্রীত হইয়াছিলেন।

বৈষ্ণবচরণ — প্রখ্যাত কীর্তনীয়া। বলরাম বসু, অধরলাল সেন প্রভৃতি অনুরাগীদের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ কয়েকবার বৈষ্ণবচরণের কণ্ঠে কীর্তনগান শোনেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে অধর সেন প্রতিদিন তাঁহার নিকট কীর্তন শুনিতেন। বৈষ্ণবচরণের মুখে ঠাকুর এই বিশেষ গানটি শুনিতে ভালবাসিতেন — "দুর্গানাম জপ সদা রসনা আমার, দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনে কে রে নিস্তার ।" বৈষ্ণবচরণের গানে ঠাকুরের ভাবসমাধি হইত এবং ভাবাবিষ্ট অবস্থায় তিনি নৃত্যও করিতেন। বৈষ্ণবচরণ শ্রীরামকৃষ্ণকে বিশেষ ভক্তি করিতেন।

বৈষ্ণবচরণ গোস্বামী — উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগিশের পুত্র। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধক। কলিকাতার পণ্ডিত সমাজে তাঁর খ্যাতি সুবিদিত। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পানিহাটীর চিঁড়া মহোৎসবে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন। তখন হইতেই ঠাকুর সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন এবং পরবর্তী কালে সর্বসমক্ষে তিনি

ঠাকুরকে ঈশ্বরের অবতাররূপে ঘোষণা করেন। একবার ঠাকুর ভাবসমাহিত অবস্থায় বৈষ্ণবচরণের স্কন্ধে আরোহণ করেন। বৈষ্ণবচরণ ইহাতে উৎফুল্ল হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের বন্দনা করিতে থাকেন। বৈষ্ণবচরণ প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। একবার তিনি ঠাকুরকে কাছিবাগানের তাঁহার কর্তাভজা সমাজে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার নিমন্ত্রণেই ঠাকুর কলুটোলার হরিসভাতে গিয়া কীর্তনে যোগ দেন এবং ভাবোন্মত্ত অবস্থায় নৃত্য করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গের আসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন।

বৃন্দে — পরিচারিকা — প্রকৃত নাম বৃন্দা দাসী। শ্রীরামকৃষ্ণ 'বৃন্দে' বলিয়া ডাকিতেন। তিনি ১৮৭৭ হইতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ আট বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীসারদাদেবীর সেবা করিয়াছিলেন।

ভগবতী দাসী — ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগতা রানী রাসমণির বাড়ীর পুরাতন দাসী। কাশী বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থদর্শন এবং সাধু-বৈষ্ণবসেবা প্রভৃতি নানা সৎকাজ করিয়াছিল। প্রায়ই সে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিত। প্রথম জীবনে তাহার স্বভাব ভাল ছিল না — কিন্তু পরবর্তী জীবনে তাহার পরিবর্তন হয়।

ভগবান দাস — ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত জনৈক ব্রাহ্মভক্ত। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে তাঁহার যাতায়াত ছিল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনের কথা কথামৃতে উল্লিখিত আছে। ওই দিন ঠাকুর তাঁহাকে আধুনিক ধর্ম ও সনাতন ধর্ম যথাক্রমে স্বল্পকাল ও অনন্তকাল স্থায়ীত্বের কথা বলিয়াছিলেন।

ভগবান দাস বাবাজী —— বর্ধমান জেলার কালনার প্রবীন ও সিদ্ধ বৈষ্ণব। তাঁহার তাগ, শান্ত স্বভাব এবং ভগবৎ প্রেমের কথা সুবিদিত। তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি ও অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। একই অবস্থায় দিনরাত বসিয়া জপ করার ফলে তাঁহার পদদ্বয় পক্ষাঘাতে অবশ হইয়া গিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার কলুটোলা হরিসভায় শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ শুনিতে শুনিতে ভাবাবস্থায় শ্রীচৈতন্যের আসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। ইহা লোক পরম্পরায় জানিয়া ভগবান দাস বাবাজী তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হন। পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তাঁহার আশ্রমে সর্বাঙ্গ-বস্ত্রাবৃত হইয়া আগমন করেন, তখন ভগবান দাস অনুভব করেন যে, কোন মহাপুরুষ তাঁহার আশ্রমে আগমন করিয়াছেন। বাবাজীকে সর্বদা জপের মালা ঘুরাইতে দেখিয়া ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় তাঁহাকে প্রশ্ন করেন যে সিদ্ধ অবস্থার পরেও তিনি কেন সর্বদা মালা জপ করেন। তখন তিনি জবাব বেন যে, লোকশিক্ষার জন্য তিনি তা করেন। ঠাকুর ভাবস্থ অবস্থায় তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার অহংকার চূর্ণ করেন। শেষ পর্যন্ত বাবাজী শ্রীরামকৃষ্ণের মহত্ত্ব বুঝিতে পারেন এবং স্বীকার করেন যে, তিনিই (ঠাকুরই) কলুটোলা হরিসভার শ্রীচৈতন্য আসনে আরূঢ় হওয়ার উপযুক্ত অধিকারী।

ভগবান রুদ্র —— ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, কলিকাতার এম ডি পাশ চিকিৎসক। তিনি বিপত্নীক ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ২রা সেপ্টেম্বর চিকিৎসা উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত তাঁহার যোগাযোগ হয়। চিকিৎসাকালীন ঠাকুরের অবস্থা দেখিবার উদ্দেশ্যে, ঠাকুরের হাতের উপর একটি রৌপ্য মুদ্রা রাখিয়া তাঁহার সামনে পরীক্ষা করা হয়। হাতে টাকা রাখিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুরের হাতটি বাঁকিয়া গিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। টাকাটি স্থানান্তরিত করিবার

পর ঠাকুরের তিনবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে এবং হাতটিও স্বাভাবিক হয়। এই ঘটনায় বিজ্ঞানজগতের মানুষ ডাক্তার অতীব বিস্মিত হন এবং ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন।

ভগী তেলি — কামারপুকুর অঞ্চলের শূদ্রজাতীয়া কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধিকা ভগবতী দাসী। দুষ্টলোকের চক্রান্তে তিনি সাধনপথ হইতে বিচ্যুতা হইয়াছিলেন।

ভবনাথ [ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়] (১৮৬৩ - ১৮৯৬) — ঠাকুরের গৃহীভক্ত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বরাহনগরে বর্তমান অতুলকৃষ্ণ ব্যানার্জী লেনে জন্ম। পিতা রামদাস ও মাতা ইচ্ছাময়ী দেবী। পিতামাতার একমাত্র সন্তান ভবনাথ যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই নানা জনহিতকর কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত নরেন্দ্রনাথের সহিত বন্ধুত্ব, শিক্ষকতা করা এবং সর্বোপরি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যলাভ তাঁহার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা। নরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার অন্তরিকতা দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাদিগকে 'হরিহরাত্মা' বলিতেন। ইহা ব্যতীত ঠাকুর কখনও নরেনকে 'পুরুষ' ও ভবনাথকে 'প্রকৃতি' বলিতেন। তিনি উভয়কেই 'নিত্যসিদ্ধ' ও 'অরূপের ঘর' বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পর বরাহনগরে মঠের জন্য মুন্সীদের ভূতুড়ে বাড়ি মাসিক ১০ টাকা ভাড়ায় ভবনাথ যোগাড় করিয়া দেন। তিনি সুগায়ক ছিলেন, বহুবার ঠাকুরকে গান শুনাইয়াছিলেন। 'নীতিকুসুম' ও 'আদর্শনারী' তাঁহার রচিত দুইখানি গ্রন্থ। তাঁহারই আহ্বানে বরাহনগরের অবিনাশ দাঁ দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তাঁহার ক্যামেরায় ৺বিষ্ণু মন্দিরের দালানে সমাধিস্থ অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বহুল প্রচারিত ছবি তোলেন। তিনি ঠাকুরকে ধ্রুবর একটি ফটো উপহার দিয়াছিলেন যেটি

বর্তমানে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ঠাকুরের ঘরের শোভাবর্ধন করিতেছে। বরাহনগরমঠ প্রতিষ্ঠার সময় আর্থিক সাহায্য না করিলেও অন্য দিক দিয়া তিনি অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। ঠাকুরের তিরোধানের পর তিনি বি. এ. পাশ করেন। পরে বিদ্যালয় পরিদর্শনের চাকুরী লইয়া কলিকতার বাহিরে চলিয়া যান, ফলে বরাহনগর মঠের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ক্ষীণ হইতে থাকে। তিনি ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীপুরে বিহারী ডাক্তার রোডে বসবাস করিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহার একমাত্র কন্যা প্রতিভার জন্ম হয়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কালাজ্বরে আক্রান্ত হইয়া তিনি রামকৃষ্ণ দাস লেনের ভাড়াবাড়িতে দেহত্যাগ করেন।

ভাস্করানন্দ স্বামী (১৮৩৩ - ১৮৯৯) — কাশীর সিদ্ধ সন্ন্যাসী, প্রকৃত নাম মতিরাম। মণিলাল মল্লিক শ্রীশ্রীঠাকুরকে তাঁহার কথা বলিয়াছিলেন। কানপুর জেলার মিথিলাপুর গ্রামে জন্ম। ব্যাকরণ ও বেদান্তাদি শিক্ষার পর ২৭ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কাশীতে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। সেখানে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে দর্শন করিয়া এই নির্বিকার পুরুষ সম্বন্ধে স্বীয় উচ্চ ধারণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বামীজীও পরিব্রাজক অবস্থায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দও এই ত্যাগী ও নিরহঙ্কার পুরুষের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছিলেন।

ভূধর চট্টোপাধ্যায় — কলিকাতার পটলডাঙা নিবাসী শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত। প্রখ্যাত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির শিষ্য ছিলেন। তাঁহার কলিকাতার বাড়িতে শশধর কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন এবং সেই উপলক্ষেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ভূধরের যোগাযোগ হয়। ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের প্রণীত ‘সাধুদর্শন’ নামক পুস্তকে (১ম ভাগ, কলিকাতা, ১৯২৪ সাল) রামকৃষ্ণ

পরমহংস নামে একটি নিবন্ধ আছে। তাঁহার শেষজীবন কাশীতে অতিবাহিত হয়।

ভুবনমোহিনী ধাত্রী — ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগতা, কলিকাতার জনৈকা ধাত্রী এবং মহিলা ভক্ত। ইনি মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন।

ভুবনেশ্বরীদেবী (ভুবনেশ্বরী দত্ত — নরেন্দ্রনাথের মাতা) — অতীব ধর্মপরায়ণা, দয়ালু পরোপকারী মহিলা। তিনি স্বল্প-শিক্ষিতা কিন্তু অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। নন্দলাল বসুর একমাত্র কন্যা এবং মাত্র ১১ বছর বয়সে বিশ্বনাথ দত্তের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অত্যন্ত দক্ষতা ও নিপুণতার সহিত সংসারে বিশাল দায়িত্ব পরিচালনা করিতেন। প্রতিদিন রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করিতেন যাহার অধিকাংশই তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ইহা ছাড়া দরিদ্র সেবা, বহু কর্তব্যকর্মের মধ্যেও শান্ত সমাহিত চিত্তে ভগবানের সাধনা করা ছিল তাঁহার কাজ। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবার খুব দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে কিন্তু তিনি কখনো ভাঙিয়া পড়েন নাই। অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে তিনি পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেন। নরেন্দ্রনাথের অন্তরের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে তঁহার মাতা ভুবনেশ্বরী জাগাইয়া তোলেন। রামায়ণ মহাভারত পাঠের দ্বারা ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য গৌরবকে নরেনের চোখের সামনে তুলিয়া ধরেন। মানুষের প্রতি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভালবাসা, যা নরেনকে বিশ্ববাসীর কাছে প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল তাহার শিক্ষাও তিনি মাতা ভুবনেশ্বরীদেবীর নিকট হইতে পান। তাঁহার জীবনে মাতার প্রভাব পরবর্তী কালে তিনি বহুবার স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। নরেন্দ্রনাথ কাশীপুরে ঠাকুরের অসুখের

সময় ঠাকুরের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। পুত্রের অনুপস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হইয়া মাতা ছয় বৎসরের বালক পুত্র ভূপেনন্দ্রনাথকে লইয়া তাঁহার সন্ধানে কাশীপুরে আসেন। ভুবনেশ্বরী কাঁকুড়গাছি বাগানবাড়িতে ঠাকুরের পূতাস্থির সমাধিস্থ দিবসে উপস্থিত ছিলেন ও পরবর্তী কালে এই দিবসের অনুষ্ঠানে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন।

ভূপতি — কলিকাতার রাজবল্লভ পাড়ায় জন্ম। বলরাম-মন্দিরে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন এবং পরে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। ঠাকুর একদিন ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিলে তাঁহার উচ্চ অনুভূতি হয়। পরবর্তী কালে তাঁহার শিষ্যগণ বারাসতের হৃদয়পুরের কোঁড়া অঞ্চলে 'ঋষভ আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন।

ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায় — আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন নেতা। নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করেন।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী — যশোহর জেলার বিদুষী ব্রাহ্মণ কন্যা — প্রকৃত নাম যোগেশ্বরী। ইনি শ্রীশ্রীঠাকুরের তন্ত্রসাধনার গুরু। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আনুমানিক ৪০ বৎসর বয়সে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে ইনি চৌষট্টি প্রকার তন্ত্রসাধনা করান এবং ঠাকুরকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ঠাকুরের সহিত কামারপুকুরে গিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাও যোগেশ্বরীকে শ্বশ্রূমাতার মতোই সেবা করিতেন। কামারপুকুর হইতে তিনি কাশী গমন করেন এবং শেষ জীবন কাশী ও বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন।

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় —— দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির মুহুরী এবং পরে খাজাঞ্চী হইয়াছিলেন। ইনি ঠাকুরকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন এবং তাঁহাকে মাঝে মাঝে মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাইতেন।

মথুরনাথ বিশ্বাস (মথুরামোহন বিশ্বাস —— সেজোবাবু) — মথুরামোহন রানী রাসমণির তৃতীয়া কন্যা করুণাময়ীর স্বামী। তিনি রানীর সেজো জামাতা বলিয়া 'সেজোবাবু' নামে পরিচিত ছিলেন। করুণাময়ীর মৃত্যুর পর রানীর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জগদম্বার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের পরমভক্ত, শিষ্য, সেবক ও রসদদার ছিলেন । দীর্ঘ ১৮ বৎসর তিনি ঠাকুরের অসাধারণ সেবা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের উপর ছিল তাঁহার অচল বিশ্বাস ও অগাধ বিশ্বাস ও অগাধ ভক্তি। মথুরামোহনই ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরের মা-কালীর পূজক পদে নির্বচন করিয়াছিলেন। তিনি নানারকম যুক্তি, পরীক্ষা দ্বারা ঠাকুরের অবতারত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন, অবশেষে ঠাকুরের ন্যায় প্রকৃত কাম-কাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসীর পায়ে আত্মনিবেদন করেন। একদা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে একসঙ্গে শিব ও কালীমূর্তি দর্শন করেন। তিনি ঠাকুরকে জীবন সর্বস্ব রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ও সকল বিষয়েই তাঁহার উপর নির্ভর করিতেন। ঠাকুরের পক্ষে দক্ষিণেশ্বরে —— সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সর্বরকমের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার ক্ষেত্রে মথুরের ঐকান্তিক সেবা অপরিহার্য ছিল। ঠাকুরকে তিনি নানা তীর্থদর্শন করাইয়াছিলেন। ঠাকুরের সাধনকালে সাধনার যাবতীয় সেবার ভার তিনি গ্রহণ করায় ঠাকুর তাঁহাকে ‘‘জগদম্বার লীলায় প্রধান রসদদার বলিয়া জানিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মথুরবাবুর অলৌকিক সম্বন্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ লীলার এক বিশেষ অধ্যায়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

মধুসূদন ডাক্তার — ঠাকুরের হাত ভাঙার সময় ইনি চিকিৎসা করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে নবীন নিয়োগীর বাড়িতে যাত্রাগান শুনিতে গিয়া ঠাকুর ইঁহার চোখে অশ্রুর ধারা দেখিয়াছিলেন। তাঁহার অধিক বয়সে শক্তিসামর্থ্যের কথা শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লেখ করিয়াছিলেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪ - ১৮৭৩) — বাংলা নবজাগরণের এক নবীন প্রতিভা। খ্রীষ্টান ধর্মে আকৃষ্ট হইয়া হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যান ও ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আইনবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া ভারতে আসেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। প্রচুর অর্থ উপার্জন করিলেও ব্যয়াধিক্যের ফলে তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন ও কলিকাতা ত্যাগ করিয়া উত্তরপাড়ায় চলিয়া যান। ১৮৫৯ - ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ ছিল মধুসূদনের জীবনের সর্বোত্তম কয়েকটি বছর। এই সময় তাঁহার তিনটি নাটক দুইটি ব্যঙ্গ নাটক ও চারটি কাব্য প্রকাথিত হয়। তাঁহার ‘মেঘনাদ বধ’ কাব্য বাংলা কাব্যে নবজাগরণের সূচনা করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের অত্যুত্তম রচনাসমূহ পাঠে তাঁহার উৎসাহ ছিল। তিনি সমাজের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া আধুনিক চিন্তাধারা আনিতে চাহিয়াছিলেন। মধুসূদন দত্ত দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের বাগান সংক্রান্ত একটি মামলা পরিচালনা করিতেছিলেন। সেই সময় মধুরামোহনবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বারিকানাথের সহিত সেই ব্যাপারে আলোচনা করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। তখন দ্বারিকাবাবু তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছানুসারে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করান। দুর্ভাগ্য বশতঃ ঠাকুর তাঁহার সহিত কোনরূপ বাক্যালাপ করিতে পারেন নাই। তবে তিনি মাইকেলকে দুইখানি রামপ্রসাদী গান গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন।

মণি মল্লিক (মণিমোহন মল্লিক — মণিলাল মল্লিক) — সিঁদুরিয়াপটী নিবাসী ব্রাহ্মভক্ত। ষাট-পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ মণিমোহন মল্লিক ছিলেন ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত। তিনি খুব হিসাবী মানুষ ছিলেন। পরবর্তী কালে পঁচিশ হাজার টাকা দরিদ্র বালকদের ভরণপোষণার্থে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি যুবক পুত্র মারা গেলে তিনি শোকার্ত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং ঠাকুরের কথামৃত ও ভজন গান শুনিয়া তাঁহার শোকের লাঘব হয়। তখন তিনি বলেন, তিনি জানিতেন যে ঠাকুর ছাড়া তাঁহার শোকের আগুন আর কেহ নির্বাপিত করিতে পারিতেন না। ব্রাহ্ম সমাজের বাৎসরিক উৎসবে মণিমল্লিক ঠাকুরকে তাঁহার গৃহে আমন্ত্রণ করেন। ঠাকুর তাঁহার গৃহে প্রায়শঃ যাইতেন, ভাবে নৃত্যগীতাদি করিতেন এবং কখনো সমাধিস্থ হইতেন। ঠাকুর তাঁহাকে আপনার লোক বলিয়া মনে করিতেন।

মণী সেন (মণিমোহন সেন) — পাণিহাটির মণিমোহন সেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। তিনি কখনো একা, কখনো সঙ্গীর সহিত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট আসিতেন। মথুরবাবুর মৃত্যুর পর তিনি স্ব-ইচ্ছায় ঠাকুরের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইবার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু সম্ভবতঃ দেশিদিন তিনি এই দায়িত্ব বহন করেন নাই। মণিমোহন পাণিহাটির ৺রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের সেবায়েত ছিলেন। পাণিহাটির বিখ্যাত চিঁড়া মহোৎসবে মণিমোহনের দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়া ঠাকুর ভক্তদিগের সহিত গিয়াছিলেন। প্রথমে মণি সেনের গৃহে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া মন্দিরে যান। অতঃপর ভাবাবেশে গলার ব্যাথা ভুলিয়া মণি সেনের গুরু নবদ্বীপ গোস্বামীর সহিত কীর্তনানন্দে মত্ত হইয়া সমাধিস্থ হইতে থাকেন। তখন তাঁহাকে লোকে সাক্ষাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ মনে করিয়া তাঁহার চারিদিকে সকলে আনন্দে কীর্তন ও নৃত্য করিতেছিল। পরে মণি সেনের গৃহে জলপান করিয়া তাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে

রওনা হন। মণি সেন সকলকে দক্ষিণা দিলেও ঠাকুর কিছুতেই দক্ষিণা গ্রহণ করেন নাই।

মণীন্দ্র গুপ্ত [মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত] (১৮৭১ - ১৯৩৯ — মণীন্দ্র (খোকা) একাদশ বৎসর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্রকিশোর ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহিত আসিয়াছিলেন। ঠাকুরের স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে তিনি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। সেই সময়ে তিনি তাঁহার পিতার কর্মস্থল ভাগলপুরে থাকিতেন। তারপর কলিকাতায় যখন ফিরিয়া আসিলেন ঠাকুর তখন শ্যামপুকুরে অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সারদাপ্রসন্নর সহিত ১৫ বৎসর বয়সে তিনি ঠাকুরকে দেখিতে যান। ঠাকুর তাঁহাকে চিনিতে পারেন এবং আবার আসিতে বলেন। পরদিন গেলে ঠাকুর তাঁহাকে স্নেহভরে ক্রোড়ে লইয়া সমাধিস্থ হন। ইহার পর তিনি সেখানে নিত্য যাইতে থাকেন এবং ঠাকুরকে গুরুরূপে বরণ করেন। কাশীপুরে অসুস্থ ঠাকুরকে তিনি পাখার হাওয়া করলতেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের দোলযাত্রার দিনে ঠাকুর তাঁহাকে হোলিখেলার জন্য যাইতে নির্দেশ দিলেও তিনি ঠাকুরকে একা রাখিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। ঠাকুর অশ্রু ভারাক্রান্ত নয়নে তাঁহাকে তাঁহার সেই 'রামলালা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে বিবাহ করলেও শ্রীরামকৃষ্ণদের শিষ্যদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল অবিচল।

মণি সেনের সঙ্গী ডাক্তার — শ্রীরামকৃষ্ণের যখন হাত ভাঙিয়া গিয়াছিল তখন ডা: প্রতাপ মজুমদার চিকিৎসা করিয়া ঔষধ লিখিয়া দিয়াছিলেন। পাণিহাটির

মণি সেন এই ডাক্তারকে লইয়া আসিয়াছিলেন। ইনি প্রতাপ মজুমদারের ব্যবস্থা অনুমোদন করেন নাই। ইহার বুদ্ধি সম্বন্ধে ঠাকুর বিরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন।

মনোমোহন মিত্র (১৮৫১ - ১৯০৩) — শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত। কোন্নগরের মিত্র পরিবারের সন্তান —— রামচন্দ্র দত্তের মাসতুতো ভাই। রাখাল তাঁহার ভগ্নীপতি ছিলেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত দক্ষিণেশ্বরে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম সমাজে তাঁহার যাতায়াত ছিল। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ এবং তাঁহার প্রতি ঠাকুরের কৃপা মনোমোহন মিত্রের জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। শ্রীরামকৃষ্ণকে সর্বান্তঃকরেণে গুরুরূপে গ্রহণের ফলে মনোমোহনের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। তিনি ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার গৃহে শুভাগমন করিয়াছিলেন। বরাহনগর মঠে সন্ন্যাসীদের অসুস্থ অবস্থায় মনোমোহন তাঁহাদের দেখাশুনা করিতেন। তত্ত্বমঞ্জরীতে ঠাকুরের সম্বন্ধে তিনি বহু প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৯৩ - ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বহু ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ে আলোচনার জন্য তাঁহার গৃহে আসিতেন।

মনোহর সাঁই (গোস্বামী) — প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া। দক্ষিণেশ্বরে ও অধরের বাড়িতে কয়েকবার ঠাকুরকে কীর্তন শুনাইয়া ছিলেন। ঠাকুর তাঁহার কীর্তন খুব পছন্দ করিতেন —— মনোহরও ঠাকুরের অনুরাগীভক্ত ছিলেন।

মহলানবীশ (ডাক্তার) — সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য। সমাজ মন্দিরের নিকট তাঁহার চিকিৎসা গৃহ ছিল। একবার ঠাকুর ব্রাহ্মভক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বাড়িতে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু শাস্ত্রী

মহাশয় তখন বাড়িতে না থাকায় ডা: মহলানবীশ ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া সমাজ মন্দিরে লইয়া যান ও শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ঈশ্বর-প্রসঙ্গ শ্রবণ করেন।

মহিমাচরণ চক্রবর্তী — কাশীপুরনিবাসী মহিমাচরণ বেদান্ত চর্চা করিতেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। ধর্মীয় চিন্তায়, শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে তিনি সময় কাটাইতেন। সংস্কৃত, ইংরাজীতে বহুগ্রন্থ পড়িয়া তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক গুণ ছিল। কিন্তু তিনি যে বিদ্বান বুদ্ধিমান, ধার্মিক উদার এবং বহুগুণের-সমাবেশ তাঁহার মধ্যে আছে — ইহা সকলের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিবার জন্য যে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেন, ইহা তাঁহাকে অনেকের কাছে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিত। নরেন্দ্রনাথ ও গিরিশ তাঁহার সহিত তর্ক করিতেন। একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়িতে অন্নপূর্ণা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। একটি বিরাট গ্রন্থাগারও তাঁহার ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে ভক্তিমার্গের কথাপ্রসঙ্গে বহুবার নারদ পঞ্চরাত্রের শ্লোক আবৃত্তি করাইয়াছিলেন।

মহেন্দ্র কবিরাজ — মহেন্দ্রনাথ পাল — সিঁথি নিবাসী কবিরাজ। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। ঠাকুর তাঁহাকে ‘সিঁথির মহিন্দোর পাল’ বলিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম চিকিৎসক।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৫৪ - ১৯৩২) — ইনি ‘শ্রীম’ বা মাস্টার মহাশয় নামে অধিক খ্যাত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিছাত্র ছিলেন, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিয়শনের ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার পূর্বে তিনি কেশবচন্দ্র সেনের অনুরাগী

ছিলেন। তখনকার দিনের অন্যান্য সকল ইংরেজী শিক্ষিত যুবকের মতো তিনিও পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানে অনুরক্ত ছিলেন। কেশবচন্দ্রের আকর্ষণে তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সভাতেই তিনি পরমহংসদেবের নাম শুনিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট আত্মীয় নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের অনুপ্রেরণায় তিনি তাঁহার অপর এক আত্মীয় সিদ্ধেশ্বর মজুমদারের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মহেন্দ্রনাথ প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করেন। প্রথম দর্শনই তাঁহার হৃদয়-মনকে এতদূর অভিভূত করে যে তিনি চিরজীবনের জন্য ঠাকুরের ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া যান। তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানের গর্ব ঠাকুরের প্রভাবে ভগবন্মুখী হইয়া যায়। তিনি বুঝিতে পারেন যে ঈশ্বরকে জানাই আসল জ্ঞান। ঠাকুর প্রথম দর্শনেই মহেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সম্ভাবনার কথা জানিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিরন্তর উপদেশ অবিরাম শিক্ষা তাঁহাকে ভাগবত জীবনযাপনের শিক্ষা দিতে লাগিল। ঠাকুরের বাণী প্রচার করাই তাঁহার ভবিষ্যত জীবনের কাজ সেজন্য তাঁহাকে ঠাকুর গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। সংসারে থাকিয়াও গৃহী-সন্ন্যাসীর জীবনযাপন, ঈশ্বরের প্রতি অসীম ভক্তি, সাধু সন্ন্যাসীদের সেবা তাঁহার শেষ জীবন অবধি তিনি করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ধ্যানে, মননে, তাঁহার সমগ্র চিন্তাকে তন্ময় করিয়া রাখিতেন সর্বদা। তাঁহার বহু ছাত্রকে তিনি ঠাকুরের কাছে লইয়া আসিয়াছেন যাঁহাদের মধ্যে অনেকে পরবর্তী জীবনে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ছায়ার মতো তিনি ঘুরিতেন এবং তাঁহার আচরণ পূর্বকথা, বাণী সব লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন যাহা তিনি ইংরেজী ছোট পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশ করেন। ৫০ নং আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে ৪র্থ তলের এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রায় ২০ বৎসর বাস ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের পরিবেশনাই মাস্টার মহাশয়ের জীবনের শ্রেষ্ঠ দান। তিনি

কথামৃত ইংরেজীতে 'গসপেল অফ শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে প্রকাশ করেন যাহা পাঠ করিয়া বহু দেশী-বিদেশী মানুষ প্রভাবিত হইয়াছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও বাণী, দেশ-দেশান্তরের মানুষকে শান্তিলাভের পথে চলিবার প্রেরণা দান করিতেছে।

মহেন্দ্র গোস্বামী —— বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত, শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। রামচন্দ্র দত্ত ও সুরেন্দ্রের প্রতিবেশী। ধর্মবিষয়ে গোঁড়ামী না থাকায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব এবং উপদেশ লাভে আগ্রহী ছিলেন। রামচন্দ্র দত্তের গৃহে শুভাগমন করিলে ঠাকুরের সহিত ইনি দেখা করিতেন —— দক্ষিণেশ্বরেও কিছুকাল ঠাকুরের নিকট ছিলেন ও উদার ভাবাপন্ন বৈষ্ণব হইয়াছিলেন।

মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায় —— শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। বাগবাজার রাজবল্লভ পাড়ার বাসিন্দা। তাঁহার একটি ময়দার কল ছিল আরও অন্যান্য ব্যবসা ছিল, ২৪ পরগণার কেদেটি গ্রামে এবং বাগবাজারে তাঁহার বাড়ি ছিল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর স্টার থিয়েটারে যাইবার পূর্বে এবং পরে শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টার মহাশয়ের সহিত মহেন্দ্রের হাতিবাগানস্থিত ময়দা কলের বাড়িতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ঠাকুর সেখানে ভাবস্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নাম করিয়াছিলেন। মহেন্দ্র নানাবিধ মিষ্টান্ন দ্বারা তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন এবং ঠাকুর তাঁহার ভক্তি ও সেবায় খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে মহেন্দ্র মঠের প্রয়োজনীয় ময়দা ও বস্ত্র প্রভৃতি প্রায়ই সরবারাহ করিতেন।

মহেন্দ্রলাল সরকার (ডাক্তার) (১৮৩৩ - ১৯০৪) — হাওড়া জেলার পাইকপাড়া গ্রামে জন্ম। বাল্যে পিতৃবিয়োগের পর মাতার সহিত মাতুলালয়ে থাকিয়া হেয়ার স্কুল, হিন্দু কলেজে শিক্ষা। বৃত্তি লাভ করয়া মেডিকেল কলেজ হইতে

এল.এম.এস পরে এম.ডি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। এলোপ্যাথি ত্যাগ করিয়া হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিতেন। শিক্ষা ও চিকিৎসাক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন সম্মানসূচক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় (২১০ নং বহুবাজার স্ট্রীটে) ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা (বর্তমানে যাদবপুর নূতন ভবনে স্থানান্তরিত) স্থাপন করেন। মথুরবাবুদের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন — সেইসূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে শ্যামপুকুরে ডাকা হয়। ঠাকুরের সহিত ঈশ্বরীয় কথাপ্রসঙ্গে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন চিকিৎসাসূত্রে তিনি প্রায় প্রতিদিন ঠাকুরের নিকট আসিতেন এবং প্রাণ ভরিয়া ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তগণের সঙ্গ করিয়া যাইতেন। প্রথম দিনের পর তিনি প্রাপ্য দর্শনীও নিতেন না। ক্রমে ঠাকুরের সহিত তাঁহার হৃদ্যতা জন্মে এবং মানসিক শান্তি লাভ করেন। তিনি একদা জনৈক ডাক্তার বন্ধুর সহিত একত্রে সমাধি অবস্থায় ঠাকুরের শরীর পরীক্ষা করিয়া তাঁহাতে নিস্পন্দভাব লক্ষ্য করিয়া যারপরনাই বিস্মিত হন। মহেন্দ্র বলেন, As a man I have the greatest regard for him. ঠাকুরের চিকিৎসা করিতে আসিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হন।

মানময়ী — শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্তের শিশুকন্যা। শ্রীশ্রীঠাকুর পুত্রশোকগ্রস্তা শ্রীম'র সহধর্মিণীকে এই শিশুকন্যাসহ কাশীপুরে আসিয়া শ্রীশ্রীমায়ের নিকট থাকিতে বলেন। শ্রীশ্রীমা কন্যাটিকে স্নেহভরে 'মানময়ী' বলিয়া ডাকিতেন।

মারোয়াড়ী ভক্ত — কলিকাতার বড়বাজারের ১২ নং মল্লিক স্ট্রীট নিবাসী জনৈক মারোয়াড়ী ভক্ত। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে তিনি প্রায়ই যাইতেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর, সোমবার 'অন্নকূট' উপলক্ষে ঠাকুর

তাঁহার মল্লিকবাজারের বাড়িতে আমন্ত্রিত হইয়া যান। মারোয়াড়ী ভক্তগণ ঠাকুরের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধাভক্তি জ্ঞাপন করেন। ঠাকুর সেখানে তাঁহাদের সহিত সহজবোধ্য হিন্দীতে ভগবৎ প্রসঙ্গ করেন এবং শ্রীশ্রীময়ূর মুকুটধারী বিগ্রহের পূজা দর্শন করিয়া তিনি ভাবসমাধিস্থ হন ও শ্রীবিগ্রহকে চামর ব্যজন করেন। তিনি এই ভাগ্যবান ভক্তের বাড়িতে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

মাস্টারের পরিবার (নিকুঞ্জ দেবী) — শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহধর্মিণী। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীমার স্নেহধন্যা মহিলাভক্ত। নিকুঞ্জ দেবী পুত্র শোকে অত্যধিক কাতর হইয়া মানসিক ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিলে মহেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ঠাকুরের নিকট লইয়া আসেন এবং পরে কাশীপুরে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে বাস করিয়া তাঁহার মানসিক পরিবর্তন ঘটে। তিনি শ্রীশ্রীমার সহিত বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় তাঁহার জীবন সার্থক হইয়াছিল।

মিশ্র সাহেব (প্রভুদয়াল মিশ্র) — উত্তর পশ্চিম ভারতের অধিবাসী। এক ভ্রাতার বিবাহের দিনে সেই ভ্রাতা এবং আর এক ভ্রাতার আকস্মিক মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। ব্রাহ্মণ হইলেও তিনি খ্রীষ্টের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া খ্রীষ্টান হন। কিন্তু তাঁহার সাহেবী পোষাকের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিত গৈরিক বস্ত্র। তিনি কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যদর্শন পূর্বেই পাইয়াছিলেন। ৩৫ বৎসর বয়সে ঠাকুরের সন্ধান পাইয়া তিনি শ্যামপুকুরের ভাড়া বাড়িতে ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন। ভাবস্থ ঠাকুরের মধ্যে তিনি যীশুর প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হন।

মোহিত সেন (মোহিতচন্দ্র সেন) — জয়কৃষ্ণ সেনের পুত্র। তিনি হেয়ার স্কুল, মেট্রোপলিটন কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশুনা করিয়াছেন । তিনি কেশব সেনের নব ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। মোহিত ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। তাঁহার ধর্মবিষয়ে গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি এম.এ. পরীক্ষায় দর্শনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং নানা কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচারে সম্পূর্ণ রূপে আত্মনিয়োগ করেন। সিস্টার নিবেদিতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি তাঁহার জ্ঞানের প্রশংসা করেন।

যোগীন্দ্র [যোগীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী — স্বামী যোগানন্দ] (১৮৬১ - ১৮৯৯) — দক্ষিণেশ্বরের প্রসিদ্ধ সাবর্ণ চৌধুরীর বংশে জন্ম। পিতা নবীনচন্দ্র নিষ্ঠবান ব্রাহ্মণ। দক্ষিণেশ্বরে বাস করিয়াও শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। যোগীনদ্রনাথও প্রথম দর্শনে তাঁহাকে কালীবাড়ির বাগানের মালী মনে করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু প্রথম দিনেই যোগীন্দ্রকে 'ঈশ্বরকোটী' বলিয়া চিনিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে একদা নিরঞ্জনানন্দ বলিয়াছিলেন — "যোগীন আমাদের মাথার মণি।" কেশবচন্দ্রের প্রবন্ধাদি পড়িয়া যোগীন শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনে উৎসুক হইয়াছিলেন। প্রথম পরিচয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন "মহদ্বংশে জন্ম — তোমার লক্ষণ বেশ সব আছে। বেশ আধার — খুব (ভগবদ্ভক্তি) হবে।" তদবধি যোগীন ঘন ঘন ঠাকুরের সঙ্গগুণে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। পরে চাকুরির চেষ্টায় থাকাকালীন নিতান্ত অনিচ্ছায় বিশেষতঃ মাতার বিশেষ পীড়াপীড়িতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এইজন্য অপরাধীর মতো ঠাকুরের কাছে গেলে তাঁহাকে অভয় দিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, এখানকার কৃপা থাকিলে

লাখটা বিবাহ করিলেও ক্ষতি নাই। সাংসারিক দৃষ্টিতে অনভিজ্ঞ যোগীন্দ্রনাথকে ঠাকুর নানারকম শিক্ষার দ্বারা উপযুক্ত করিয়া তোলেন। তাই তাঁহাকে একসময়ে বলিয়াছিলেন — ভক্ত হবি, তা বলে বোকা হবি কেন? কাশীপুরে তিনি প্রাণপণে ঠাকুরের পরিচর্যা করেন। ঠাকুরের নির্দেশে শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে মন্ত্রদীক্ষা দেন। এরপরে প্রায় সবসময়ে শ্রীমায়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সেবায় বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। মধ্যে কয়েকবার তীর্থভ্রমণে যান। অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রের ফলে ক্রমাগত পেটের অসুখে ভুগিয়া ভুগিয়া মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। বেলুড় মঠের জমি ক্রয়ের ব্যাপারে তাঁহার অবদান উল্লেখযোগ্য।

যোগীন্দ্র বসু (১৮৫৪ - ১৯০৫) — বর্ধমান জেলার ইলসবা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মাধবচন্দ্র। ‘বঙ্গবাসী’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় অধর সেনের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার প্রথাম সাক্ষাৎ হয়। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগবশত তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বর যাইতেন এবং ঠাকুরও তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ — কালাচাঁদ, কৌতুককণা, নেড়া হরিদাস ইত্যাদি।

যোগীন্দ্র সেন — কৃষ্ণনগরের অধিবাসী, কলিকতায় সরকারী চাকুরী করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সরল ও অমায়িক গৃহীভক্ত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহীভক্ত শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর বাড়িতে ঠাকুরের শুভাগমনের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। বৈকুণ্ঠ সান্যাল রচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত গ্রন্থে যোগীন্দ্রকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপার কথা উল্লিখিত আছে। ১৩২০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

যজ্ঞনাথ মিত্র — ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী ব্রাহ্মভক্ত এবং কলিকাতার নন্দন বাগানের ব্রাহ্মনেতা কাশীশ্বর মিত্রের পুত্র। নিজেদের বাড়ি ছাড়াও তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসেন। পিতার মৃত্যুর পরেও যজ্ঞনাথ তাঁহাদের বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন।

যতীন দেব — কলিকাতার শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রপৌত্র যতীন শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য ভক্ত। তিনি ঠাকুরের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে খুব যাতায়াত ছিল।

যতীন্দ্র [যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর] (১৮৩১ - ১৯০৮) — কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত জমিবার, দানবীর ও 'মহারাজা' উপাধিপ্রাপ্ত বিদ্যোৎসাহী পুরুষ। তিনি "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে"র সম্পাদক, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন। হিন্দুধর্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। যদুলাল মল্লিকের বাগানবাড়িতে ঠাকুরের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। 'কর্তব্য কি?' ঠাকুরের জিজ্ঞাসার উত্তরে যতীন্দ্র সংসারীদের মুক্তির বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়া যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শনের কথা উল্লখ করিয়াছিলেন। তাহাতে ঠাকুর বিরক্ত হইয়া তাহার সমুচিত উত্তর দিয়াছিলেন। পরে ভক্ত কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের সহিত ঠাকুর সৌরেন্দ্রমোহনের বাড়িতে গিয়া যতীন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন খবর পাইয়া অসুস্থতার সংবাদ পাঠাইয়া ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেন নাই।

যদুলাল মল্লিক (১৮৪৪ - ১৮৯৪) — কলিকতার পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী মতিলাল মল্লিকের দত্তক পুত্র; ধনী, বাগ্মী ও ভগবদ্‌ভক্ত। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কৃতিত্বের সহিত

এন্ট্রান্স পাশ করিয়া বি.এ. পর্যন্ত পড়েন। কিছুদিন আইন পড়িয়াছিলেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসোয়েশনের সদস্য হিসাবে অনারারি ম্যজিস্ট্রেটরূপে এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার প্রভৃতি পদে থাকাকালীন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত সরকারী কর্মচারীদের কঠোর সমালোচনার জন্য কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান স্যর হেনরি হ্যারিসন তাঁহাকে 'দি ফাইটিং কক্' নাম দিয়াছিলেন। দানশীল এবং শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট উদার ছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে জুলাই শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে যদুবাবুর পাথুরিয়াঘাটার বাড়িতে গিয়া নিত্যসেবিতা ⁄সিংহবাহিনীকে দর্শন করিয়া সমাধিস্থ হন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির দক্ষিণে গঙ্গাতীরে যদুবাবুর ত্রিতল বাড়ির কিয়দংশ পশ্চিমবঙ্গ সরকার শ্রীরামকৃষ্ণ মহামণ্ডলকে বিক্রয় করেন। বর্তমানে মহামণ্ডল পরিচালিত আন্তর্জাতিক অতিথিভবন এবং ঠাকুরের মর্মরমূর্তি সমন্বিত মন্দির সেই স্থলে অবস্থিত। ওই উদ্যানবাটিতে একটি ঘরের দেয়ালে মাতা মেরীর কোলে বালক যীশুর চিত্র দর্শন করিয়া তিনি খ্রীষ্টীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হন এবং ক্রমাগত তিনদিন ওই ভাবে আবিষ্ট থাকিয়া পঞ্চবটীতে যীশুর দিব্যদর্শন লাভ করেন। এই বৈঠকখানা ঘরেই ঠাকুর একদা ভাবাবস্থায় নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিলে নরেন্দ্রের বাহ্য সংজ্ঞা লোপ পায় এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের জিজ্ঞাসার উত্তরে নরেন্দ্রনাথ তাঁহার এই পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ও এই বিষয়ে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ লীলা সহায়ক বলিয়া সমূহ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বহুবার যদুবাবুর এই বৈঠকখানায় ও তাঁহার পাথুরিয়াঘাটার বাড়িতে গিয়া তাঁহাদের পরিবারকে ধন্য করিয়াছিলেন।

রজনীনাথ রায় (১৮৪৯ - ১৯০২) — উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। জন্ম-অধুনা বাংলাদেশে অবস্থিত ঢাকাতে। হিন্দু, তবে পরবর্তী কালে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন এবং "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের" খ্যাতনামা ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত লাভ করেন। বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে তাঁহার ভূমিকা অন্যতম। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরের অন্যতম ভক্ত মণিলাল মল্লিকের কলিকতার সিঁদুরিয়াপটির বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে ঠাকুরের শুভাগমন হইয়াছিল। রজনীনাথ রায় সেই উৎসবস্থলে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন এবং তাঁহার ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গাদি শ্রবণ করেন।

রতন — শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী ভক্ত। ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত যদুলাল মল্লিকের দক্ষিণেশ্বরের বাগানবাড়িতে তত্ত্বাবধায়ক — এই সূত্রেই তিনি ঠাকুরের পূতসঙ্গলাভের সুযোগ পান। ভক্ত যদুলালের বাড়িতে যাত্রা-গান প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঠাকুরকে আমন্ত্রণের জন্য রতন দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। ঠাকুর রতনকে খুবই স্নেহ করিতেন।

রতির মা — শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগতা কর্তাভজা সম্প্রদায়ের গোঁড়া বৈষ্ণবী। বৈষ্ণবচরণ দাসের শিষ্যা। পাইকপাড়ার রাজা লালাবাবুর স্ত্রী কাত্যায়নী দেবীর ঘনিষ্ঠ সহচরী, অতি শুদ্ধাচারে জীবনযাপন করিতেন। মাঝে মাঝেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিতেন। ঠাকুর মা ভবতারিণীকে একবার 'রতির মার বেশে' ভাবচক্ষে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গোঁড়ামি ছিল। সেজন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে মা কালীর প্রসাদ গ্রহণ করিতে দেখিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত বন্ধ করেন।

রবীন্দ্র —— কলিকাতা নিবাসী বৈষ্ণববংশজাত ভক্তিমান যুবক। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্য। দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে ঠাকুর তাঁহার জিহ্বায় কিছু লিখিয়া দিয়াছিলেন। একবার বৃষকেতু নাটক দেখিয়া ফিরিবার সময় তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনিয়া তিনদিন নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন। ঈশ্বরের প্রসঙ্গে তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হইত। পরে বরাহনগর মঠেও তাঁহার যাতায়াত ছিল। কিন্তু সেইসময় তিনি অসৎ সঙ্গে মনের ভারসাম্য কিছুটা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ - ১৯৪১) — বিশ্ববিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। জন্মকলিকতারা জোড়াসাঁকো অঞ্চলে। ধনীর সন্তান। সেইসময়কালে প্রগতিশীল পরিবার বলিতে এই ঠাকুর পরিবারকে বুঝাইত। অসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই অন্য সকলের অপেক্ষা একটু আলাদা ধরণের ছিলেন। একাধারে গায়ক, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ছিলেন। স্কুল-কলেজের তথাকথিত ডিগ্রী তাঁহার না থাকিলেও রবীন্দ্রনাথের মতো পণ্ডিত ব্যক্তি বিরল। জালিয়ানোয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। ১৯১৩ সালে ভারতবাসী হিসাবে প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে কখনও শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে আসেন নাই। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন তিনি পান। নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন সেখানে রবীন্দ্রনাথ সহ ঠাকুর বাড়ির অনেকেই উপস্থিত থাকিয়া গান করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবর্ষ পূর্তিতে কলিকাতায় যে বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলন আহূত হয় তাহার পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে খুব সুন্দর মন্তব্য করেন। এই উপলক্ষে The Cultural Heritage of India নামে যে স্মারক গ্রন্থ বাহির হয় তাহার ভূমিকাতে The Spirit of India নামে এক বাণী দেন।

রসিক মেথর — দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির ঝাড়ুদার। শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাগত পরমভক্ত। রসিক শ্রীরামকৃষ্ণকে "বাবা" বলিয়া সম্বোধন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব রসিককে স্নেহভরে "রসকে" বলিয়া ডাকিতেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার দুই বৎসরের মধ্যেই রসিকের জীবনাবসান ঘটে। জীবনাবসানের অন্তিম মুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করেন এবং "এই যে বাবা এসেছ, বাবা এসেছ" বলিয়া সজ্ঞানে "রামকৃষ্ণ" নাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। ঠাকুরের পরমভক্ত রসিক মেথর রামকৃষ্ণভক্ত-মণ্ডলীতে বিশেষ স্থানাধিকারী হিসাবে গণ্য।

রাখাল [রাখালচন্দ্র ঘোষ — স্বামী ব্রহ্মানন্দ] (১৮৬৩ - ১৯২২) — রাখালচন্দ্র ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জানুয়ারি বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত শিকরা-কুলীন গ্রামে এক অতি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আনন্দমোহন ঘোষ। তিনি সঙ্গতিপন্ন জমিদার ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে রাখালচন্দ্রের মাতা কৈলাসকামিনীর দেহত্যাগ হইলে তিনি বিমাতা হেমাঙ্গিনীর স্নেহময় ক্রোড়ে মানুষ হইতে থাকেন। উপযুক্ত বয়সে বিদ্যাভ্যাসের জন্য বাটীর নিকটে একটি বিদ্যালয়ে স্থাপনপূর্বক আনন্দমোহন উহাতে রাখলচন্দ্রকে ভর্তি করিয়া দিলে তথায় বালকের সৌম্য সুন্দর আকৃতি ও মাধুর্যময় কোমল প্রকৃতির ছাত্র ও শিক্ষককে আকৃষ্ট করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়েও রাখালের বিশেষ উৎসাহ ছিল। ক্রীড়াদিতে যেমন তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না, কুস্তিতেও তেমনি কেহ তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারিত না। বাল্যকাললেই গ্রামের উপকণ্ঠে

৺কালীমন্দিরের নিকটে বোধনতলায় স্বনির্মিত শ্যামামূর্তির পূজাদিতে মগ্ন থাকিতেন। আবার তাঁহাদের বাটীতে প্রতিবৎসর শারদীয়া পূজার সময়ে পূজামণ্ডপে পুরোহিতের পশ্চাতে বসিয়া পূজা দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন এবং সন্ধ্যাকালে অনিমেষনয়নে মায়ের আরাত্রিক দর্শন করিতে করিতে নিজেকে কোন্ অজ্ঞাত রাজ্যে হারাইয়া ফেলিতেন। সংগীতে তাঁহার অসাধারণ প্রীতি ছিল — সঙ্গীদের লইয়া শ্যামাসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে এত তন্ময় হইতেন যে দেশ-কালের জ্ঞান লোপ পাইত। বৈষ্ণব ভিখারির মুখে বৃন্দাবনের মুরলীধর রাখালরাজের গান শুনিয়া অত্মহারা হইতেন। ১২ বৎসর বয়সে কলিকাতায় বিমাতার পিতৃগৃহে থাকিয়া নিকটস্থ "ট্রেনিং একাডেমিতে" পড়াশুনা করিতে থাকেন। এইখানেই নরেন্দ্রনাথের (পরে স্বামী বিবেকানন্দ) সহিত তাঁহার পরিচয় হয় ও উভয়ের মধ্যে গভীর সখ্যের উদয় হয়। নরেন্দ্রের প্রেরণাতেই তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন এবং নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন বলিয়া সমাজের অঙ্গীকার পত্রে সাক্ষর দেন।

রাখালচন্দ্রের পিতা পুত্রের ধর্মভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্য কোন্নগর নিবাসী ভুবনমোহন মিত্রের কন্যা এবং মনোমোহন মিত্রের ভগিনী একাদশ বর্ষীয়া বিশ্বেশ্বরীর সহিত ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহ দেন। ঠাকুরের নিকট আসিবার পূর্বে ঠাকুর ভাব-নেত্রে তাঁহার মানসপুত্রের দর্শন পান। তাই মনোমোহনবাবু রাখলকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া গেলে ঠাকুর তাঁহার মানসপুত্রকে পাইয়া তাহাকে সন্তানের ন্যায় গ্রহণ করেন। তাঁহারই কৃপায় রাখাল পিতার বাধা এবং স্ত্রীর মায়ামমতা সহজেই কাটাইয়া উঠিয়া ধর্মপথে অগ্রসর হন। নরেন্দ্রনাথ কাশীপুরে ঠাকুরের মুখে রাখালের "রাজবুদ্ধির" প্রশংসা শুনিয়া তাঁহাকে

“রাজা” বলিয়া সম্বোধন করিতে সকলকে বলেন। এবং সেইহেতু পরবর্তী কালে তাঁহার রাজামহারাজ নামের প্রচলন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বরাহনগর মঠে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ নাম ধারণ করেন এবং উত্তর পশ্চিম ভারতের তীর্থাদি ভ্রমণ করেন। ১/৫/১৮৯৭ তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা হইলে মিশনের কলিকাতা শাখার সভাপতি হন। কিছুকাল পরেই স্বামীজী তাঁহাকে সঙ্ঘের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ পূর্বক মঠ ও মিশনের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি ভারতের প্রায় সর্বত্র গমন করিয়া বহু নূতন শাখা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাঙ্গালোর আশ্রমের নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদঘাটন, মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের মিশন ছাত্রাবাসের ও ত্রিবান্দ্রাম আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করেন। ভুবনেশ্বরে রামকৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠাতাও তিনিই। বাঙ্গালোরে “শুদ্ধ ব্রহ্ম পরাৎপর রাম” সংকীর্তনটি শুনিয়া সপ্তকাণ্ডাত্মক এই নাম-রামায়ণ সংকলন করিয়া মঠের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রচলন করেন ইহা সর্বসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হইত। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল সোমবার রাত্রি পৌনে নয়টায় বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র রাখাল মহাসমাধিতে মগ্ন হন।

রাখাল ডাক্তার [রাখালদাস ঘোষ] (১৮৫১ - ১৯০২) — শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত, কলিকতার কলেজ স্ট্রীট নিবাসী খ্যাতনামা চিকিৎসক। জন্ম কলিকতার নিকট বালীতে। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। হিল্টন কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিতা। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে আগস্ট চিকিৎসা উপলক্ষেই ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ হয়। দোহারা চেহারার রাখাল ডাক্তারের হাতের আঙ্গুলগুলি মোটা ছিল। সেইজন্য যখন ঠাকুরের গলার ভিতর হাত দিয়া রাখাল ডাক্তার পরীক্ষা করিতেন তখন ঠাকুর খুবই সন্ত্রস্ত হইতেন। রাখাল ডাক্তার প্রায়ই

ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। ঠাকুর তাঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন এবং তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিলে আপ্যায়ন করিতেন।

রাখাল হালদার — শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য ডাক্তার। নিবাস কলিকাতার বহুবাজারে। ঠাকুরের অন্যতম চিকিৎসক। রাখাল হালদার মাঝে মাঝেই কাশীপুরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করিতেন। ঠাকুর নানাবিধ উপদেশ দানে তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন।

রাখালের বাপ (আনন্দমোহন ঘোষ) — রাখালচন্দ্র ঘোষের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) পিতা সঙ্গতিসম্পন্ন জমিদার। পাঁচ বৎসর বয়সে রাখালের মাতা কৈলাসকামিনীর দেহত্যাগ হয়। অতঃপর রাখালের পিতা দ্বিতীয়বার হেমাঙ্গিনী দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

রাখালের বাপের শ্বশুর (শ্যামলাল সেন) — ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তান স্বামী ব্রহ্মানন্দের মাতামহ সম্পর্কীয়। রাখালচন্দ্রের পিতা আনন্দমোহন ঘোষ, রাখালের মাতার মৃত্যুর পর ইঁহার কন্যা কে বিবাহ করেন। তিনি সাধক ছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনিয়া তিনি জামাতা আনন্দমোহনের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে যান। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও ঈশ্বর লাভের উপায় সম্পর্কে ঠাকুর তাঁহাদের উপদেশ দান করেন।

রাজনারায়ণ — শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে চণ্ডীর গান শুনাইয়া তুষ্ট করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্রসহ তিনি গান করিতেন।

রাজমোহন — শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত পুরাতন ব্রাহ্মভক্ত। নিবাস কলিকাতার সিমুলিয়া পল্লী। ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা উপলক্ষে নরেন্দ্রনাথ (পরে স্বামী বিবেকানন্দ) প্রভৃতি তরুণেরা প্রায়ই তাঁহার বাড়িতে যাইতেন। ইহা শুনিয়া ঠাকুর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর সন্ধ্যার পর রাজমোহনের বাড়িতে শুভাগমন করেন এবং ভক্তগণের উপাসনাদি দেখেন ও নরেন্দ্রনাথের গান শুনিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে রাজমোহন ঠাকুরকে জলযোগে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্র ডাক্তার [রাজেন্দ্রলাল দত্ত] (১৮১৮ - ১৮৮৯) — শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। ঠাকুরের চিকিৎসকদের অন্যতম। কলিকাতার বহুবাজারনিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী অক্রূর দত্তের বংশধর। বিখ্যাত হোমোওপ্যাথিক চিকিৎসক। স্বনামধন্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার অনুপ্রেরণায় হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করেন। রাজেন্দ্রলাল প্রথমে এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করেন। পরে হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। চিকিৎসা উপলক্ষে ঠাকুরের সেবার অধিকার পাইয়া তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেন। তিনি মখমলের যে কোমল জুতাজোড়া আনিয়া স্বয়ং ঠাকুরকে পরাইয়া দিয়াছিলেন আজও তাহা বেলুড় মঠে পূজিত হয়।

রাজেন্দ্রনাথ মিত্র — ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ইংরেজ সরকারের প্রথম ভারতীয় অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী, ভাইসরয়ের আইন মন্ত্রী। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের গৃহীভক্তদ্বয় রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্রের মেসোমশাই ছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন তাঁহার বন্ধু। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে মনোমোহনের বাটীতে রামকৃষ্ণদেব শুভাগমন করেন। কেশবচন্দ্র সেন ও রাজেন্দ্র মিত্র সেইস্থলে উপস্থিত ছিলেন। কেশবের অনুরোধে রাজেন্দ্র তাঁহার গৃহে ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮১

খ্রী: একটি উৎসবের আয়োজন করেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমন্ত্রিত হন। পথে সুরেন্দ্র ঠাকুরকে রাধাবাজারের স্টুডিওতে লইয়া গিয়া ফটো তোলান। রাজেন্দ্র মিত্রের গৃহে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গের পর ঠাকুর কীর্তন ও নৃত্য করিতে করিতে সমাধিস্থ হন।

রাধিকা (প্রসাদ) গোস্বামী (১৮৬৩ — ১৯২৪) — বৈষ্ণব ভক্ত। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন ও প্রণাম করেন। তিনি অদ্বৈত প্রভুর বংশধর জানিয়া ঠাকুরও ভক্তিভরে তাঁহাকে হাতজোড় করিয়া নমস্কার করেন। উত্তরকালে ইনি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ হইয়াছিলেন।

রানী রাসমণি (১৭৯৩ - ১৮৬১) — দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মতে রানী জগন্মাতার অষ্টনায়িকার অন্যতমা। পুণ্যশ্লোকা, পরোপকারিণী, দানশীলা, তেজস্বিনী মহিলা। জন্ম চব্বিশ পরগণা জেলার হালিশহরের কাছে “কোনা” গ্রামে। পিতা হরেকৃষ্ণ দাস। মাতা রামপ্রিয়া দেবী। মাতৃদত্ত নাম রানী, পরবর্তী কালে রানী রাসমণি হিসাবে পরিচিতা। ১১ বৎসর বয়সে কলিকাতার জানবাজারের জমিবার রাজচন্দ্র দাসের সহিত বিবাহ হয়। এই সময় হইতেই ভগবদভক্তির সহিত দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, তেজস্বিতা এবং হৃদয়বত্তা তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে লক্ষিত হয়। মৎস্যজীবিদের জন্য গঙ্গার জলকর রহিত করা তাঁহার অন্যতম কীর্তি। তবে তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি দক্ষিণেশ্বরে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মন্দিরাদি নির্মাণ করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে স্নানযাত্রার দিন শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিধানে এবং পৌরোহিত্যে মন্দিরের এবং ৺ভবতারিণীমাতার বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাকার্য মহাসমোরহে সম্পন্ন হয়। অন্য কেহ রাজি না হওয়ায় রামকুমারই দেবীর নিত্য পূজা করিতে থাকেন। ইহার

কিছুকাল পরে ঠাকুর এই পূজার ভার গ্রহণ করেন। তখন হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর দক্ষিণেশ্বরে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। রানী রাসমণি আজীবন ঠাকুরের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্রী ছিলেন এবং ঠাকুরের সব কাজে রানীর সম্মতি থাকার দরুণ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পক্ষে নির্বিঘ্নে সকলপ্রকার সাধন-ভজন করা সম্ভবপর হয়।

রাম কবিরাজ — নাটাগড়ে বাড়ি ইনি ঠাকুরের পেটের অসুখের সময় দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাকে দেখিতে আসেন। ঠাকুরের এই অসুখের ফলে অতি দুর্বল শরীরেও ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতে দেখিয়া তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার চিকিৎসায় ঠাকুরের উক্ত রোগের উপশম হয়।

রামকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮০৫ - ১৮৫৭) — শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। রামকৃষ্ণদেবের জীবনে তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পিতার ঈশ্বরানুরাগ এবং বৈষয়িক জ্ঞান, উভয়ই তাঁহার চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। তিনি সংস্কৃত কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান, বাক্ সিদ্ধ, সৎ প্রকৃতির পুরুষ ছিলেন। পিতৃবিয়োগের পর সংসারের আর্থিক দুরবস্থা দূর করিবার জন্য তিনি কলিকাতার ঝামাপুকুর অঞ্চলে একটি টোল খুলিয়া ছাত্র পড়াইতে আরম্ভ করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরকে (শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বনাম) কলিকাতায় লইয়া আসেন। রামকুমার ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রানী রাসমণি স্থাপিত দক্ষিণেশ্বর ৺কালীমন্দিরের স্থায়ী নিত্য পূজকের পদ গ্রহণ করেন। ইহার এক বৎসর পরে শারীরিক অপটুতাবশতঃ তিনি গদাধরকে ৺কালীপূজার ভার অর্পণ করেন ও নিজে ৺রাধাকান্তের পূজার ভার নেন। রামকুমার স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুরকে পূজাবিধি ও চণ্ডীপাঠ সেখান। এইভাবেই

তাঁহার প্রচেষ্টা ও শিক্ষায় গদাধর দক্ষিণেশ্বরে স্থায়ী পূজকের পদে নিযুক্ত হন। তিনি কলিকাতার উত্তরস্থ মূলাজোড় নামক স্থানে কার্যোপলক্ষে গমন করিয়া সান্নিপাতিক জ্বরে দেহত্যাগ করেন।

রামচন্দ্র দত্ত (১৮৫১ - ১৮৯৯) — শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত। কলিকাতার নিকটবর্তী নারিকেলডাঙ্গায় ৩০/১০/১৮৫১ তারিখে বৈষ্ণব কুলে জন্ম। পিতা নৃসিংহপ্রসাদ, মাতা তুলসীমণি, স্ত্রী কৃষ্ণপ্রেয়সী। প্রথম জীবনে বিজ্ঞানচর্চার ফলে তিনি নাস্তিক ও যুক্তিবাদী হইয়া পড়েন। আকস্মিকভাবে একটি কন্যা সন্তানের মৃত্যুতে তাঁহার তত্ত্বান্বেষণের সূচনা হয়। তাঁহার মাসতুতো ভাই মনোমোহন মিত্রের সহিত তিনি ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভ করেন। দর্শনমাত্র তাঁহার হৃদয় শান্ত হয়। তিনি ঠাকুরের নিকট যাতায়াত শুরু করেন এবং তিনিই যে তাঁহার আরাধ্য দেবতা তাহা অনুভব করিতে থাকেন। ১৮৮০ এবং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুর তাঁহার গৃহে শুভাগমন করেন। ফলে রামচন্দ্রের মন আমূল পরিবর্তিত হইয়া যায়। তিনি ও মনোমোহনবাবু একযোগে ঠাকুরকে অবতার বলিয়া প্রচার করিতে থাকেন এবং এ সম্বন্ধে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। রামচন্দ্র ঠাকুরের জীবিতাবস্থাতেই তাঁহার উপদেশ ও জীবনী অবলম্বনে "তত্ত্বাসার" ও"তত্ত্বপ্রকাশিকা" বা "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ" নামক পুস্তক এবং "তত্ত্বমঞ্জরী" নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করেন। কাঁকুড়গাছিতে ঠাকুরের অনুমতিক্রমে একটি বাগানবাড়ি ক্রয় করিয়া বিখ্যাত "যোগদ্যানের" প্রতিষ্ঠান করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুর এখানে শুভ পদার্পণ করেন। পরবর্তী কালে ঠাকুরের দেহরক্ষার পর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া ওই স্থানটিকে মহাতীর্থে পরিণত করেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই

জানুয়ারি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আজীবন মহাভক্ত শ্রীরামচন্দ্র "যোগোদ্যানে" দেহত্যাগ করেন।

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় — নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। পিতার নাম কার্তিকরাম। শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর পিতৃদেব। নিবাস বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটি গ্রামে। স্ত্রী শিহড় গ্রামের হরিপ্রসাদ মজুমদারের কন্যা শ্যামাসুন্দরীদেবী। সারদাদেবী তাঁহাদের প্রথম সন্তান। শ্রীশ্রীমা নিজে তাঁহার পিতার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন — তিনি পরম রাম ভক্ত, নৈষ্ঠিক ও পরোপকারী ছিলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে রামচন্দ্র কন্যা সারদাকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে জামাতার (শ্রীরামকৃষ্ণের) নিকট উপস্থিত হন এবং সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন। ১২৮০ বঙ্গাব্দের ১৮ই চৈত্র রামনবমী তিথিতে জয়রামবাটিতেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

রাম চাটুজ্যে — কথামৃতে তাঁহাকেও কখনও রাম চক্রবর্তী বলিয়া উল্লেখ করা আছে। দক্ষিণেশ্বরেই থাকিতেন। ঠাকুরের ভক্ত। ঠাকুর তাঁহার তত্ত্বাবধানের প্রশংসা করিতেন, কারণ ঠাকুরের ভক্তদের আহারাদি সম্পর্কে তিনি সর্বদা যত্নবান ছিলেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ৺রাধা-গোবিন্দ মন্দিরের পূজারী ছিলেন। দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করিয়া অসুস্থ অবস্থায় ঠাকুর কাশীপুরে থাকাকালীন রাম চাটুজ্যে নিয়মিত তাঁহার খোঁজখবর লইতেন।

রামতারণ — গিরিশচন্দ্র ঘোষের থিয়েটারের অভিনেতা ও সুগায়ক। শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে অসুস্থ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শুনাইবার জন্য গিরিশবাবু রামতারণকে লইয়া আসেন। তাঁহার ভক্তিমূলক গান শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হন।

রামদয়াল চক্রবর্তী — শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। নিবাস আঁটপুর। বলরাম বসুর পুরোহিত বংশের সন্তান। হোরমিলার ষ্টীমার কোম্পানির ঠিকাদার ছিলেন। কেশব সেনের ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরের কথা শুনিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে থাকেন। বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ), মাস্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সঙ্গে রামদয়াল বহুদিন দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাসও করিয়াছেন। ঠাকুর স্নেহভরে রামদয়ালকে নানা উপদেশ দিতেন। রামদয়ালের আহ্বানেই ভক্ত বলরাম বসু কটক হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসেন। কলিকাতায় আসিবার পরের দিনই রামদয়াল বলরাম বসুকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামদয়াল আজীবন রামকৃষ্ণ মিশনের অনুরাগী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের চিঠিতে তাঁহার নাম বহুবার উল্লিখিত আছে।

রামনারায়ণ — ডাক্তার, গোঁড়া হিন্দু। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে ডাক্তার সরকারের নিকট শ্যামপুকুর বাটীতে উল্লেখ করিয়াছিলেন।

রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য — শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত রামপ্রসন্ন দক্ষিণেশ্বরের পার্শ্ববর্তী আড়িয়াদহের অধিবাসী। ভক্তবর কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্যের পুত্র। ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার পর রামপ্রসন্ন মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে বসিয়া প্রাণায়াম করিতেন। একবার রামপ্রসন্ন তাঁহার বৃদ্ধা মায়ের সেবা না করিয়া হঠযোগী সাধুর সেবা করার জন্য ঠাকুর বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রামলাল — ঠাকুরের মধ্যম অগ্রজ রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ঠাকুর তাঁহাকে স্নেহভরে "রামনেলো" বলিয়া ডাকিতেন। এবং বেলুড় মঠের সকলের নিকট তিনি "রামলাল দাদা" নামে পরিচিত ছিলেন। রামেশ্বর দেহত্যাগের পর তিনি দক্ষিণেশ্বরে ৺ভবতারিণীর পূজকের পদে নিযুক্ত হন এবং আজীবন সেই দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সুগায়ক ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে অনেকবার গান শুনাইয়াছেন। ঠাকুর কাশীপুরে কল্পতরু দিবসে রামলালকেও কৃপা করেন।

রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় — (১৮২৬ - ১৮৭৩) — ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যম অগ্রজ ভ্রাতা। সাংসারিক বিষয়ে তিনি চিরকাল উদাসীন ছিলেন। তিনি চারিবৎসরকাল দক্ষিণেশ্বরে মা ৺কালীর পূজারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। কামারপুকুরে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র রামলাল, শিবরাম ও কন্যা লক্ষ্মীমণি।

লক্ষ্মী-দিদি (১৮৬৪ - ১৯২৬) — ঠাকুরের কৃপাধন্য মহাসাধিকা লক্ষ্মীমণি দেবী ঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরের কন্যা এবং রামলাল ও শিবরামের ভগিনী। ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলীর নিকট তিনি লক্ষ্মী-দিদি নামে পরিচিতা ছিলেন। এগার বৎসর বয়সে বিবাহের অল্প কয়েকদিন পরেই তাঁহার স্বামী চিরদিনের মতো নিরুদ্দেশ হন। ১২ বৎসর অপেক্ষা করিবার পর তিনি শ্বশুর বাড়িতে স্বামীর শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া পিতৃগৃহেই বাস করিতে থাকেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গিনী হিসাবে তিনি নহবত ঘরে শ্রীশ্রীমায়ের সহিত সর্বক্ষণ থাকিতেন বলিয়া ঠাকুর তাঁহাদের উভয়কে 'শুক-সারী' বলিয়া ডাকিতেন। পূর্বে উত্তরদেশীয় এক সন্ন্যাসীর নিকট শক্তি মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেও ঠাকুর তাঁহার জিহ্বায় 'রাধাকৃষ্ণ' নাম ও বীজ লিখিয়া পুনরায় তাঁহাকে দীক্ষিত করেন। লক্ষ্মী-দিদি

শ্রীশ্রীঠাকুরকে গুরু, ইষ্ট ও অবতাররূপে জ্ঞান করিতেন অপরপক্ষে ঠাকুরও তাঁহাকে মা-শীতলার অংশরূপে জানিতে পারিয়া কাশীপুরে থাকাকালীন মা-শীতলারূপে পূজা করিয়াছিলেন। দেব-দেবী সাজিয়া, নাচিয়া গাহিয়া তিনি সকলের আনন্দ বিধান করিতে অতিশয় পারদর্শী ছিলেন। এইরূপ এক আসরে ভগিনী নিবেদিতা স্বয়ং সিংহ সাজিয়া তাঁহাকে ‘জগদ্ধাত্রীরূপে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মী-দিদি মন্ত্রদীক্ষা দিয়া অনেককে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভক্তরাই তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে একটি দ্বিতল গৃহ নির্মাণ করিয়া দিলে সেখানেই তিনি দীর্ঘ ১০ বৎসর কাটাইয়াছিলেন। পুরীধামের প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ লক্ষ্য করিয়া ভক্তেরাও সেখানেও তাঁহার জন্য ‘লক্ষ্মীনিকেতন’ নামে একটি পাকা বাড়ি নির্মাণ করিয়া দেন। এই বাড়িতেই ২৪।২।১৯২৬ তারিখে তাঁহার তিরোভাব ঘটে।

লক্ষ্মীনারায়ণ মারোয়াড়ী — শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুরাগী ভক্ত, বিত্তশালী ব্যক্তি। কলিকাতায় থাকিতেন। মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে আসিতেন। ইনি ঠাকুরকে দশ হাজার টাকা লিখিয়া দিতে চাহিলে ঠাকুর অত্যন্ত বিচলিত হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করেন।

লাটু (রাখতুরাম — স্বামী অদ্ভুতানন্দ) — বিহারের ছাপরা জেলার কোন এক গ্রামে জনৈক মেষ-পালকের গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম-সাল, তারিখ বা তিথি — সবকিছু অজ্ঞাত। জীবিকা অর্জনের জন্য তিনি কলিকাতায় আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত রামচন্দ্রের গৃহে তিনি কাজ করিতেন। তাঁহার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে সস্নেহে ‘লাল্টু’ নামে ডাকিতেন। রামচন্দ্রের সঙ্গে আসিয়া লাল্টু প্রথম দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। ঠাকুর

লালটুকে স্পর্শ করিলে তাঁহার জীবনের গতি অন্যদিকে প্রবাহিত হয়। লালটুর মন অন্য সব ভুলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের দিক ধাবিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্রও লালটুকে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইতেন। অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ রামচন্দ্রের কাছ হইতে তাঁহাকে সেবকরূপে চাহিয়া লন। শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহময় মুখে লাটু বা নেটোতে পরিণত হইয়াছিল। ঠাকুরের শিক্ষা অনুযায়ী ধীরে ধীরে লাটুর আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হইতে থাকে। ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ঠাকুরের কাছে আসেন। সেইসময় হইতে ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের দিন অবধি দীর্ঘকাল ঠাকুরের সেবা ও সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য লাটুর হইয়াছিল। শ্রীশ্রীসারদা দেবীর কাজে সহায়তা করিবার সুযোগও লাটুর জীবনে আসে। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে লাটু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। স্বামী অদ্ভুতানন্দ নামে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে পরিচিত। নিজেকে কঠোর জপধ্যানে নিয়োজিত রাখিয়া এবং ভারতের বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি শেষ জীবন কাশীতে অতিবাহিত করেন। অবশেষে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল কাশীতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

শম্ভুচরণ মল্লিক — ঠাকুরের দ্বিতীয় রসদদার। কলিকাতার সিঁদূরিয়াপটির কমলনাথ স্ট্রীটের পৈতৃক বাড়িতে সুবর্ণবণিক কুলে জন্ম। সনাতন মল্লিকের একমাত্র পুত্র। সওদাগরী অফিসে মুৎসুদ্দির কাজ করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ির অনতিদূরে তাঁহার উদ্যানবাটিতে যাতায়াত এবং অবস্থান উপলক্ষেই ঠাকুরের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। ঠাকুর শম্ভুবাবুর নিকট বাইবেল শ্রবণ করিয়া খ্রীষ্টের জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে অবগত হন। প্রথমদিকে শম্ভুচরণ ব্রাহ্মধর্মে আকৃষ্ট হইলেও ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিবার পর মহামূল্য অধ্যাত্মসম্পদের অধিকারী হন। ঠাকুরকে ‘গুরুজী’ বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

শম্ভুচরণ ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই শ্রীশ্রীমাকে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে পূজা করিতেন। নহবতে শ্রীমায়ের থাকিবার অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া তিনি মন্দিরের নিকটেই একটি কুটির নির্মাণ করিয়া দেন। মথুরবাবুর দেহান্ত হইবার কিছুদিন হইতেই ঠাকুরের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তিনিই সরবরাহ করিতেন। চার বৎসর একনিষ্ঠ সেবা করিবার পর তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলে ঠাকুর শম্ভুচরণকে দেখিতে যান। ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই শম্ভুচরণের দেহান্ত ঘটে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে।

শরৎচন্দ্র — বরাহনগর নিবাসী সদাচারনিষ্ঠ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ যুবক। বরাহনগর মঠে প্রায়ই আসিতেন। কিছুকাল বৈরাগ্যবশতঃ তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

শরৎ [শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী — স্বামী সারদানন্দ] (১৮৬৫ - ১৯২৭) — শরৎচন্দ্রের জন্ম কলিকাতার আমহার্স্ট স্ট্রীটে। পিতা গিরিশচন্দ্র এবং মাতা নীলমণি দেবী। পিতা ধনী ব্যক্তি ছিলেন। শরৎচন্দ্র মেধাবী ছাত্র হিসাবে হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ-এ ভর্তি হন। ছাত্র জীবনে কেশবচন্দ্রের প্রভাবে ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য হইয়াছিলেন। কিন্তু খুড়তুত ভাই শশিভূষণ (পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে দক্ষিণেশ্বরে যান। শ্রীরামকৃষ্ণের তীব্র বৈরাগ্যের উপদেশ শরতের জীবনে এক অভিনব আলোকসম্পাত করে। শ্রীরামকৃষ্ণের সপ্রেম ব্যবহার আরও দৃঢ়তর রূপে দক্ষিণেশ্বরের দিকে টানিতে লাগিল। কোন কোন দিন দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়াও যাইতেন। গভীর রাত্রে ঠাকুর তাঁহাকে তুলিয়া দিয়া পঞ্চবটী, বেলতলা, অথবা ৺ভবতারিণীর নাট মন্দিরে ধ্যান করিতে পাঠাইতেন। পিতামাতার আশীর্বাদ লইয়াই তিনি গৃহত্যাগ করেন। বহুদিন তীর্থে তীর্থে পর্যটন ও তপস্যা করেন। স্বামীজীর আহ্বানে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় গিয়া সাফল্যের সহিত প্রচার

কার্য চালাইয়া যান। এরপরে কলিকাতায় ফিরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাদারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। অবশিষ্ট জীবন এই পদেই অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ আমেরিকায় গমন করিলে উদ্বোধন পত্রিকার সমস্ত দায়িত্ব বহন করেন। নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনায় তাঁহার প্রচেষ্টা স্মরণীয়।

বাগবাজার উদ্বোধন অফিসে শ্রীশ্রীমায়ের জন্য বাড়ি নির্মাণ তাঁহার আরেক স্মরণীয় কাজ। স্বামী যোগানন্দের দেহত্যাগের পর হইতে স্বামী সারদানন্দই শ্রীশ্রীমায়ের প্রধান সেবকরূপে পরিগণিত হন। শ্রীশ্রীমা বলিতেন, ‘শরৎ আমার ভারী।’

‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ’ মহাগ্রন্থ রচনা, জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থানে মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা (১৯২৩ খ্রীঃ), ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহাসম্মেলনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি তাঁহার স্মরণীয় কীর্তি। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২শে আগস্ট তিনি দেহত্যাগ করেন।

শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৫০ - ১৯২৮) — ফরিদপুর জেলার মুখডোবা গ্রামে যজুর্বেদী কাশ্যপ বংশে জন্ম। পিতা হলধর বিদ্যামণি, মাতা সুরেশ্বরী দেবী। পিতার নিকট তিনি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। হিন্দুধর্মপ্রচারে আগ্রহী হইয়া বঙ্গদেশের নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান। কাশিমবাজারের রাজার সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে রামকৃষ্ণদেব তাঁহার বিষয়ে জ্ঞাত হইয়া ভক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায়ের ঠনঠনিয়ার বাড়ি হইতে গাড়ি করিয়া তাঁহাকে দেখিতে যান। ঠাকুরের কথা ও উপদেশে মুগ্ধ হইয়া পণ্ডিত এক সপ্তাহের মধ্যেই

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে আসেন। ওই বৎসরের উল্টোরথের দিন বলরাম-মন্দিরে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করেন। পরে আরো কয়েকবার তিনি ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন। শেষ বয়সে তিনি বহরমপুর জুবিলীটোলের অধ্যক্ষ হন। মুর্শিদাবাদের খাগড়ায় স্থায়ী বাড়ি নির্মাণ করিয়া শেষ জীবন সেখানে অতিবাহিত করেন।

শশী [শশীভূষণ চক্তবর্তী — স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ] (১৮৬৩ - ১৯১১) — হুগলী জেলার ময়াল-ইছাপুর গ্রামে জন্ম। পিতা ঈশ্বরচন্দ্র তান্ত্রিক সাধক এবং পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রনারায়ণ সিংহের সভাপণ্ডিত। বাল্যকাল হইতেই শশিভূষণ ধর্মভাবাপন্ন এবং মেধাবী। মাতা অতিশয় উদার হৃদয়া ও সরলা ছিলেন। তিনি এলবার্ট কলেজ হইতে এফ. এ. পাশ করেন এবং মেট্রোপলিটন কলেজে বি. এ. পড়েন। সংস্কৃতে ও অঙ্কে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ছাত্রজীবনে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া কেশব সেনের কাছে যাতায়াত করিতেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনিয়া জ্যাঠতুত ভাই শরতের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। প্রথম দিনেই ঠাকুর শশীর মন জয় করিয়া নিলেন। এরপরে ঘন ঘন যাতায়াতের ফলে শশী ক্রমে নরেন্দ্রাদি যুবক ভক্তদের সহিত পরিচিত এবং প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হন। ঠাকুর একদিন শশীকে জানাইয়া দেন যে তিনি অর্থাৎ ঠাকুরই তাঁহার অভীষ্ট বস্তু। ইহার পরে হইতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ হইয়া ওঠেন। শরৎ আর শশীকে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাণ ঢালিয়া ঠাকুরের সেবা করেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নামে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে পরিচিত হন। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে ইনি অন্যতম। স্বামীজীর নির্দেশে তিনি মাদ্রাজে গিয়া সেখানেও ঠাকুরের

পূজা আরম্ভ করেন। কবি নবীনচন্দ্র এবং ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রেঙ্গুনে তাঁহার দেখা হয়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অক্লান্ত চেষ্টায় মাদ্রাজে ও বাঙ্গালোরে স্থায়ী মঠ গড়িয়া ওঠে। শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী দাক্ষিণাত্যে তীর্থভ্রমণে আসিলে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সর্বতোভাবে তঁহার দর্শনাদির সুব্যবস্থা করেন। ১০৮টি সোনার বেলপাতায় শ্রীশ্রীমা রামেশ্বরে ’শিবের পূজা করিয়াছিলেন। এইসবই শশী মহারাজের ব্যবস্থায় হয়। তাঁহার লেখা অনেক গ্রন্থ আছে। কলিকতার উদ্বোধনের বাড়িতে তিনি দেহ্যতাগ করেন।

শালগ্রামের ভাই — তার ছেলে বংশলোচনের কারবার ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে সে বিরাশি রকমের আসন জানিত ও যোগসমাধির কথা বলিত। হঠযোগীদের দেহের উপর অত্যধিক আসক্তির ফলে তাহাদের মন ঈশ্বরের দিকে অধিকসময় থাকে না। টাকার লোভে সে দেওয়ান মদন ভট্টের কয়েক হাজার টাকার একটি নোট গিলিয়া ফেলে। কিন্তু পরে উহা আদায় হয়, এবং তাহার তিন বৎসর জেল হয়।

শিবচন্দ্র — ঠনঠনের বাসিন্দা। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ভগবৎপ্রসঙ্গ শুনিয়াছিলেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭ - ১৯১৯) — শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অনুরাগী, ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট নেতা, সুলেখক এবং শিক্ষাব্রতী। চব্বিশ পরগণার চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম। ব্রাহ্ম নেতা আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের সহযোগী। পরবর্তী কালে কেশবচন্দ্রের সহিত মতবিরোধের ফলে, তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজ হইতে ক্রমে এফ.এ. (১৮৬৮),

বি.এ. (১৮৭১) এবং এম. এ. পাস করিয়া ‘শাস্ত্রী’ উপাধি পান। ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে কার্য করিবার সময় শিবনাথ ‘ইণ্ডিয়ন মিরর’ পত্রিকাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসঙ্গে পাঠ করেন। আচার্য কেশব সেনের মাধ্যমেই শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে। শিবনাথ রচিত বহু গ্রন্থ তাঁহার সাহিত্য ও ধর্ম-চর্চারসাক্ষ্য বহন করে। ইহাদের মধ্যে ‘আত্মচরিত’ (১৯১৮), “রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ”, History of the Brahmo Samaj (1911-12), Men I have seen (1919) উল্লেখযোগ্য। তাঁহার শেষোক্ত গ্রন্থের অন্তর্গত ‘রামকৃষ্ণ পরমহংস’ নিবন্ধ হইতে জানা যায় তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট বহুবার যাতায়াত করেন এবং তাঁহার অহেতুকী স্নেহ ধারায় নিজেকে সিঞ্চিত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনের বহু আধ্যাত্মিক আদর্শকে রসপুষ্ট করিয়াছিল। ঈশ্বরলাভের জন্য ঠাকুরের ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং কঠোর জীবনযাপন শিবনাথকে বিস্ময়াভিভূত করিয়াছিল। শিবনাথের সরলতা ও নিষ্ঠার জন্য ঠাকুর তাঁহাকে পরম স্নেহ করিতেন। ঠাকুর মাঝে মাঝে শিবনাথকে দেখিবার জন্য উতলা হইতেন এবং তাঁহার সহিত ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে আনন্দ পাইতেন। ঠাকুরের অন্তিম অসুখের সময় শিবনাথ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে শেষবারের জন্য দেখিতে যান। কেবলমাত্র সাহিত্যিক হিসাবেই নয়, সত্যনিষ্ঠা, সরল বিশ্বাস এবং ঐকান্তিকতার জন্য শিবনাথ শাস্ত্রীর নাম আজও সমাজে আদৃত।

শিবরাম চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৬ - ১৯৩৩) — ঠাকুরের মধ্যমভ্রাতা রামেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র। জন্ম কামারপুকুরে। শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ কৃপাধন্য। শিবরামকে ‘ভিক্ষাপুত্র’ বলিতেন। ভক্তমহলে তিনি ‘শিবুদা’ বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

তাঁহার বিশেষ পীড়াপীড়িতে শ্রীমা নিজেকে ’কালী বলিয়া স্বীকার করেন। কথামৃতে শ্রীশ্রীঠাকুর শিবরামকে বালকোচিত সারল্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীনাথ ডাক্তার — শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, বেদান্তবাদী চিকিৎসক। নিবাস কলিকাতা। ঠাকুরের অন্তিম অসুখের সময় তিনি চিকিৎসক হিসাবে ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান। বেদান্তমতে “সব স্বপ্নবৎ” — একথা সংসারী লোকের পক্ষে ভাল নয় বলিয়া ঠাকুর তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

শ্রীনাথ মিত্র — ইনি আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত কাশীশ্বর মিত্রের পুত্র। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসেন। পর বৎসর তাঁহার বাড়িতে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মমহোৎসবে ঠাকুর নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন এবং ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গান্তে দয়াসিন্ধু ঠাকুর অসুবিধার মধ্যেও আহার করিয়া দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়াছিলেন।

শ্রীরাম মল্লিক — কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্যসঙ্গী; সিওড়ে তাঁহাদের বাড়ি ছিল। বাল্যকালে উভয়ের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে শ্রীরাম ঘোরতর বিষয়ী হইয়া পড়েন। চানকে তাঁহার দোকান ছিল।

শ্রীশ মুখোপাধ্যায় — শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত ঠনঠনে নিবাসী ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহপাঠী। বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন ছিলেন। প্রথমে আলিপুরে ওকালতি করিতেন এবং পরে ডিস্ট্রিক্ট জজ হইয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে আগমনকালে ঠাকুরের সহিত তাঁহার ধর্মালোচনা হয়। ঠাকুর তাঁহার শান্তস্বভাব দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমা [শ্রীশ্রীসারদা দেবী] (১৮৫৩ - ১৯২০) — পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সারদাদেবীর জন্ম হয়। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাসুন্দরী দেবীর প্রথম সন্তান। শিশুকাল হইতেই তাঁহার জীবনে সেবা, পরোপকার, দয়া, ক্ষমা, সত্য প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি বিকশিত হয়। ছয় বৎসরের সারদার বিবাহ হয় ২৪ বৎসরের যুবক শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। বিবাহের পর কখনও জয়রামবাটীতে কখনও কামারপুকুরে কাটাইতেন। দক্ষিণেশ্বরে সাধনমগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণের উন্মত্ততা সম্পর্কে নানাবিধ গুজব শুনিয়া তিনি একবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়া দেখিয়া আসিবার সংকল্প গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পর পিতার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুন ফলহারিণী কালীপূজার দিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকর্তৃক ষোড়শীরূপে পূজিতা হন। পরে জয়রামবাটী প্রত্যাবর্তন করেন। অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বানে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও তাঁহার সেবার ভার গ্রহণ করেন। অপরদিকে সারদাদেবীর জীবনে শুরু হয় শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আদর্শ জীবন যাপনের শিক্ষা — পবিত্র সুন্দর চরিত্র কিভাবে গঠন করিতে হয়, দৈনন্দিন গৃহস্থালির কাজ কিভাবে সুসম্পন্ন করিতে হয়, সমস্ত কর্তব্য সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে ঈশ্বর-আরাধনায় নিমগ্ন থাকা যায় ইত্যাদি। অসুস্থাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ বাটী ও কাশীপুর উদ্যানবাটীতে থাকাকালীন সারদাদেবী তাঁহার সেবাতেই নিযুক্তা ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্তে কিছুকাল তীর্থদর্শনাদি ও তপস্যায় অতিবাহিত করেন। তারপর বিভিন্ন সময়ে তিনি কামারপুকুর, জয়রামবাটী, কলিকাতা, ঘুষুড়ী, বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি প্রভৃতি স্থানে বাস করেন। শেষ কয় বৎসর তিনি কলিকতার বাগবাজারে ১নং উদ্বোধন লেনের বাড়িতে (মায়ের বাড়ি) অতিবাহিত করেন এবং এই বাড়িতেই ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে

জুলাই তাঁহার মহাসমাধি হয়। সঙ্ঘমাতারূপে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেন। তাঁহার জীবন ছিল অনাড়ম্বর ও বাহুল্যবর্জিত। কিন্তু শ্রীমা জগতের সামনে একটি মহৎ জীবন - দর্শনকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ভগিনী নিবেদিতার মতে, ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীসারদাদেবীই শ্রীরামকৃষ্ণের চরম কথা।

শৈলজাচরণ মুখুজ্জে — কলকাতার বেচু চ্যাটার্জ্জী স্ট্রিটের ৺শ্যামসুন্দর বিগ্রহের সেবক। এই মন্দির প্রাঙ্গণেই ঠাকুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার ঝামাপুকুরে প্রথম টোল খুলিয়াছিলেন। শৈলজাচরণ মিত্রের গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন।

শোকাতুরা ব্রাহ্মণী (১৮৬৪ - ১৯২৪) — শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে 'গোলাপ-মা' বলিয়া পরচিতা। প্রকৃত নাম অন্নপূর্ণা দেবী নামান্তরে গোলাপসুন্দরী দেবী। কথামৃতে 'শোকাতুরা ব্রাহ্মণী' বলিয়া উল্লিখিত। উত্তর কলিকাতার বাগবাজারে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। তাঁহার একমাত্র কন্যা শ্রীমতী চণ্ডীর সহিত ঠাকুর পরিবারের সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বিবাহ হয়। অকালে স্বামী, পুত্র এবং বিবাহিতা কন্যা "চন্ডী"র মৃত্যুতে তাঁহার জীবনে নিদারুণ শোক নামিয়া আসে। সেইসময় যোগীন-মা এই শোকাতুরা মহিলাকে ঠাকুরের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিলে ঠাকুরের দিব্য সান্নিধ্যে তাঁহার শোকতাপ দূরীভূত হয়। পরবর্তী কালে ঠাকুরের করুণায় গোলাপ-মা দক্ষিণেশ্বরে নহবত-ঘরে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর সঙ্গে বাস করিবার সুযোগ পান এবং সেখানে মধ্যে মধ্যে থাকিয়া সেবা করার সুযোগ পাইয়া কৃতার্থ হন। পরবর্তী সময়ে শ্যামপুকুরে এবং কাশীপুরেও তিনি অসুস্থ ঠাকুরের যথাসাধ্য সেবা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের তিরোভাবের পর ভাগ্যবতী

গোলাপ-মা শ্রীশ্রীমায়ের সেবার ভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সঙ্গে বহু তীর্থ দর্শন করেন। শেষজীবনে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে বাগবাজারে উদ্বোধন মঠে বাস করিতেন। শ্রীশ্রীমায়ের তিরোভাবের পর তিনি ভক্তদের সেবা ও পরিচর্যার ভার গ্রহণ করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর তিনি দেহত্যাগ করেন।

শ্যাম ডাক্তার — ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন ও তাঁহার নিকট ভগবৎ কথা শুনিয়াছিলেন।

শ্যাম দাস — প্রখ্যাত কীর্তনিয়া। ঠাকুরের গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্ত তাঁহার নিকট কীর্তন শিখিতেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্যাম দাসের "মাথুর" কীর্তন শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন।

শ্যাম বসু — শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স্ক ভক্ত। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শ্যামপুকুর বাটীতে ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন। ঈশ্বর চিন্তার প্রতি তাঁহার মন ব্যাকুল হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন এবং তাঁহাকে সাধন সম্বন্ধে নানাবিধ নির্দেশ দান করেন।

শ্যামাপদ ভট্টাচার্য (পণ্ডিত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য ন্যায়বাগীশ) — শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত। নিবাস হুগলী জেলার আঁটপুর। এই নিরহঙ্কার পণ্ডিতকে ঠাকুর বিশেষ স্নেহ করিতেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে আগস্ট দক্ষিণেশ্বরে শ্যামাপদর মুখে শ্রীমদ্‌ভাগবতের আবৃত্তি শুনিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হন এবং সমাধিস্থ অবস্থায় শ্যামাপদর ক্রোড়ে ও বক্ষে শ্রীচরণ স্থাপন করিয়া বিশেষ কৃপা করেন।

শ্যামাসুন্দরী দেবী (শ্যামাসুন্দরী মিত্র) — শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা মহিলা ভক্ত। ঠাকুরের গৃহীভক্ত মনোমোহন মিত্রের জননী। তাঁহার চারি কন্যা ও তিনি জামাতা শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহর তৃতীয় জামাতা রাখালচন্দ্র (পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ)। পতিবিয়োগের পর শ্যামাসুন্দরী ঠাকুরের আমন্ত্রণে একবার পুত্র-কন্যাসহ দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং ঠাকুরের নির্দেশমত এক জায়গাতেই প্রসাদ গ্রহণের জন্য বসেন। নিজের ভোজন পাত্র হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ বিধবা শ্যামাসুন্দরীকে মাছের মুড়ো দিলে শ্যামাসুন্দরী প্রসাদজ্ঞানে বিনা দ্বিধায় তাহা গ্রহণ করেন। রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে মহোৎসবের সময় নাম-কীর্তন শুনিতে শুনিতে ভাগ্যবতী শ্যামাসুন্দরী ইহলোক ত্যাগ করেন।

শ্যামাসুন্দরী দেবী — শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মাতৃদেবী। জন্মস্থান — বাঁকুড়া জেলার সিহড় গ্রাম। পিতা হরিপ্রসাদ মজুমদার। জয়রামবাটীর কার্তিকরাম মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রের সহিত বিবাহ হয়। সারদাদেবী ইঁহাদেরই প্রথম সন্তান। শ্রীরামকৃষ্ণজননী চন্দ্রমণি দেবীর জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের আর্বিভাবের পূর্বে যেমন অলৌকিক দর্শনাদি হইয়াছিল, শ্রীশ্রীসারদাদেবীর আবির্ভাবের পূর্বেও তেমন অলৌকিক দর্শনাদি শ্যামাসুন্দরীদেবীর জীবনেও ঘটিয়াছিল। দেব-দ্বিজে ভক্তি-পরায়ণা, অমায়িক, অতিথিবৎসলা শ্যামাসুন্দরী দেবী সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন — “আহা, আমার মা ছিলেন যেন লক্ষ্মী। সমস্ত বছর সব জিনিস পত্রটি গুছিয়ে-টুছিয়ে ঠিকঠাক করে রাখতেন ।”

সদরওয়ালা — সাবজজ। ব্রাহ্মভক্ত। সিঁথির ব্রাহ্মসমাজে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত তাঁহার কথোপকথন হয়। (১৯-১০-৮৪)

সরী পাথর — সরস্বতী পাথর। সিহড় নিবাসিনী মহিলা। তিনি "ঘোষপাড়ার মতে"র সাধিকা ছিলেন। 'পাথর' তাঁহার পদবী। সরীর সাধনার কথা শুনিয়া ঠাকুর হৃদয়ের সহিত স্বেচ্ছায় তাঁহার বাড়িতে খাইয়া সেখানকার পরিবেশ দেখিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সরীও ঠাকুরকে পরম আন্তরিকতার সহিত আপ্যায়ন করিয়াছিলেন।

সহচরী — শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে আগতা, প্রবীণা ও প্রসিদ্ধা মহিলা কীর্তনিয়া দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবদিবসে (২৫-৫-১৮৮৪) তিনি কীর্তন পরিবেশন করিয়াছিলেন। এবং ইহা শুনিয়া ঠাকুরের ভাব সমাধি হইয়াছিল। ঠাকুর তাঁহাকে নমস্কার করিয়াছিলেন। ওইদিন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, তাঁহার গান, নৃত্য ও সমাধিস্থ অবস্থা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

সাতকড়ি — নরেন্দ্রনাথের সমবয়স্ক বরাহনগরবাসী যুবক ভক্ত। বরাহনগর মঠে যাইতেন এবং মঠবাসীদের সেবা করিতেন। তাঁহার গাড়িতে নরেন্দ্রনাথ কখন কখন কলিকাতা হইতে মঠে আসিতেন।

সাধু নাগ মহাশয় [দুর্গাচরণ নাগ] (১৮৪৬-১৮৯৯) — শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ গৃহী ভক্ত। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবসায়ে খ্যাতি সম্পন্ন। ঢাকার দেওভোগ গ্রামে জন্ম। ভক্ত সুরেশচন্দ্র দত্তের সহিত দক্ষিণেশ্বরে যান। (১৮৮২/৮৩ খ্রীষ্টাব্দে)। কাশীপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের রোগ নিজ দেহে আকর্ষণ করিয়া লইতে চেষ্টা করিলে ঠাকুর তাঁহাকে নিরস্ত করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে 'জ্বলন্ত আগুন' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাকে নাগমহাশয় সাক্ষাৎ ভগবতী জ্ঞান করিতেন। এই

জ্ঞানানুভূতির তীব্রতায় আত্মহারা হইয়া পড়িতেন বলিয়া মায়ের নিকট যাইতে তাঁহার অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হইত। তিনি বলিতেন বাপের চেয়ে মা দয়াল। শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীও তাঁহার অসীম ভক্তি ও মহাপুরুষোচিত গুণাবলীর অশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর নাগ মহাশয় মহাসমাধিতে লীন হইলেন।

সামাধ্যায়ী — ব্রহ্মব্রত সমাধ্যায়ী — এক তার্কিক পণ্ডিত। উত্তরপাড়ার নিকট ভদ্রকালীতে — এক কীর্তনের আসরে ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ইহা ব্যতীত কমলকুটীরেও শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পণ্ডিতের ঈশ্বর উপলব্ধি হয় নাই বলিয়া তাঁহার বক্তব্যে ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন।

সারদাচরণ — অধরের বন্ধু। পুত্র শোকগ্রস্ত হইয়া তিনি ঠাকুরের নিকট অধরের সহিত দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহার শোকের কথা শুনিয়া একটি গান গাহিয়া ও উপদেশ দিয়া তাঁহাকে সংসারের অনিত্যতার কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। তিনি স্কুলের ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টর ছিলেন।

সিঁথির গোপাল [গোপাল চন্দ্র ঘোষ — স্বামী অদ্বৈতানন্দ] (১৮২৮ - ১৯০৯) — চব্বিশ পরগণা জেলার জগদ্দলের রাজপুর গ্রামে জন্ম। পিতা গোবর্ধন ঘোষ। শ্রীরামকৃষ্ণের অপেক্ষাও তিনি বয়সে বড় ছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বুড়ো গোপাল অথবা মুরুব্বি আখ্যা দিয়াছিলেন। ভক্তমহলে তাঁহার নাম গোপালদা। সন্ন্যাসের পরে স্বামী অদ্বৈতানন্দ নামে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে পরিচিত। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে স্বামী অদ্বৈতানন্দ অন্যতম। উত্তর

কলিকাতার সিঁথি নিবাসী ব্রাহ্মভক্ত ও ব্যবসায়ী বেণীমাধব পালের কলকাতার চীনাবাজারে একটি দোকানে গোপালচন্দ্র চাকুরী করিতেন। সেই সূত্রেই সিঁথিতে বাস করিতেন। বেণীমাধবের সিঁথির বাড়িতেই ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে গোপালচন্দ্র ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন। স্ত্রী বিয়োগের ব্যথায় তখন তিনি কাতর হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিয়া তাঁহার ভালবাসায় গোপাল বাঁধা পড়েন। অবিরত ভাগবতী কথা ও বৈরাগ্যের অনুপ্রেরণা পাইয়া গোপাল বুঝিলেন যে, সংসার মায়ামরীচিকা এবং একমাত্র বৈরাগ্যই শোকসন্তপ্ত জীবনের মহৌষধ। এইভাবে গোপাল সম্পূর্ণরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাগত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণের পরে তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হইতে থাকে। অক্লান্তভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করিয়া তিনি ধন্য হন। শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীও গোপালদার কাছে নিঃসন্দেহে কথাবার্তা বলিতেন। তিনি ডাক্তারের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য বিশেষ পথ্য প্রস্তুতের প্রণালী শিখিয়া যথা সময়ে উহা শ্রীশ্রীমাকে শিখাইয়া দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাতে নিজ জীবন চরিতার্থ করিলেও তাঁহার বৈরাগ্যপূর্ণ মন তপস্যার জন্য ব্যাকুল হইত। কাশীপুরে থাকাকালে একবার তীর্থদর্শনে গিয়াছিলেন। অতঃপর কলিকাতায় সমবেত গঙ্গাসাগর-যাত্রী সাধুদের গেরুয়া বস্ত্র, রুদ্রাক্ষের মালা ও চন্দন দিতে চাহিলে ঠাকুর নির্দেশ দিলেন উহা তাঁহার ত্যাগী ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে। ঠাকুরের নির্দেশে দ্বাদশখানি গেরুয়া বস্ত্র ও সমসংখ্যক রুদ্রাক্ষের মালা তিনি ঠাকুরকে অর্পণ করিলে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে উহা নরেন্দ্র, রাখাল, যোগীন্দ্র, বাবুরাম, নিরঞ্জন, তারক, শরৎ, শশী, গোপাল, কালী ও লাটুকে দান করেন। আরেকখানি গেরুয়া বস্ত্র গিরিশের জন্য রাখিয়া দিয়াছিলেন। পরে গিরিশচন্দ্র

তাহা গ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে এবং গোপালচন্দ্রের জীবনে ইহা স্মরণীয় ঘটনা। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮শে ডিসেম্বর তিনি স্বধামে গমন করেন।

সিঁথির ব্রাহ্মণ — পণ্ডিত ব্যক্তি। কাশীতে বেদান্ত পাঠ করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করেন। তাঁহার সহিত দয়ানন্দ ও কর্ণেল অলকটের বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। ঠাকুর তাঁহাকে সাধুসঙ্গ করার, অনাসক্ত হইয়া দাস ভাবে সংসারে থাকিবার উপদেশ দিয়াছিলেন।

সিধু (সিদ্ধেশ্বর মজুমদার) —উত্তর বরাহনগরের বাসিন্দা। মাস্টার মহাশয় তাঁহার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম গিয়াছিলেন।

সিস্টার নিবেদিতা — [ভগিনী নিবেদিতা] (১৮৬৭ - ১৯১১) — পূর্বনাম মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। স্বামিজীর বিদেশী শিষ্যা। শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন না করিলেও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ কৃপা ও স্নেহ লাভ করেন। এদেশে স্ত্রী-শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের সহিত জড়িত ছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ The Master as I saw him, Cradle Tales of Hinduism ইত্যাদি। মার্গারেট যখন প্রচলিত ধর্ম ও গতানুগতিক জীবন সম্পর্কে সংশয়ে দোদুল্যমান, সে সময়ে ইংলণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজীর প্রভাবে তাঁহার জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বামীজীর আহ্বানে ভারতে আসেন। ওই খ্রীষ্টাব্দেরই ২৫শে মার্চ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করিয়া ‘নিবেদিতা’ নামে অভিহিত করেন। নিবেদিতা বিবেকানন্দের কথামত ভারতবাসীর সেবায় নিজ জীবন উৎসর্গ করেন। এই সময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীগুরু ও সতীশ

মুখোপাধ্যায়ের 'ডন সোসাইটির' সংস্পর্শে আসেন। অত্যন্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। ভারতের মঙ্গলে নিবেদিত প্রাণ এই বিদেশিনী রোগমুক্তির জন্য দার্জিলিং-এ আচার্য জগদীশচন্দ্র ও লেডী অবলা বসুর আতিথ্য গ্রহণ করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিং শহরেই তাঁহার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

সুবোধ [সুবোধচন্দ্র ঘোষ — স্বামী সুবোধানন্দ] (১৮৬৭ - ১৯৩২) — কলিকাতার ঠনঠনিয়া সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার সেবক শ্রীশঙ্কর ঘোষের পৌত্র। পিতা কৃষ্ণদাস ঘোষ এবং মাতা নয়নতারা দেবী। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া সুবোধচন্দ্র প্রথমে "অ্যালবার্ট কলেজিয়েট স্কুল" এবং পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। ছাত্রাবস্থাতেই সুবোধচন্দ্র প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যান। এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নেহ-সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার মন বৈরাগ্যপূর্ণ হইয়া উঠে এবং তিনি লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করেন। তাঁহার বালক সুলভ স্বভাবের জন্য তিনি গুরু ভ্রাতাগণের নিকট 'খোকা মহারাজ' নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। মঠে যোগদানের পর তিনি নানা তীর্থ ভ্রমণ ও তপস্যাদি করিয়াছিলেন। বেলুড়ে মঠ স্থাপিত হইলে সেখানে স্থায়ী ভাবে অবস্থানের সময়ও তিনি কয়েকবার তীর্থ ভ্রমণে যান। স্বামীজী কর্তৃক বেলুড়মঠের জন্য নিযুক্ত ১১ জন ট্রাস্টীর মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। তাঁহার অনাড়ম্বর জীবন, বালকসুলভ সরলতা, গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও হৃদয়বত্তা সকলকে মুগ্ধ করত। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর শুক্রবার বিকাল ৩টা ৫ মিনিটে স্বামী সুবোধানন্দ বেলুড় মঠে প্রফুল্লচিত্তে সহাস্যবদনে মহাসমাধিতে লীন হন।

সুরেন্দ্র — [সুরেন্দ্রনাথ মিত্র] (১৮৫০ - ১৮৯০) — ঠাকুরের গৃহীভক্ত, অনত্যম রসদদার। স্পষ্টবক্তা, প্রথম জীবনে নাস্তিক এবং ডষ্ট কোম্পানীর মুৎসুদ্দী ছিলেন। আনিমানিক ত্রিশ বৎসর বয়সে বন্ধু রামচন্দ্র দত্ত এবং মনোমোহন মিত্রের আগ্রহে অত্যন্ত অবিশ্বাসী মনে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে যান। কিন্তু ঠাকুরের অমৃত বাণী শুনিয়া সমস্ত ভুলিয়া অভিভূত হন। এই সময়ে তিনি সর্বদাই শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণ মনন করিতে থাকেন। তিনি বহুবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সান্নিধ্যলাভের জন্য যাইতে থাকেন, অপর পক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরও অনেকবার সিমুলিয়ায় তাঁহার এই ভক্তটির বাড়িতে শুভাগমন করিয়া কৃপা করিয়াছিলেন। এই মহামিলনের ফলে সুরেন্দ্রের অশান্তজীবন শান্ত হয় এবং তিনি ঠাকুরকে ‘গুরু রূপে’ বরণ করেন। সুরেন্দ্রের বাড়িতে ৺অন্নপূর্ণা, ৺জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি পূজা হইত। তাঁহার গৃহেই ঠাকুর প্রথম নরেন্দ্রের (বিবেকানন্দ) গান শুনিয়াছিলেন। উৎসবাদিতে প্রচুর ব্যয় হইলেও সুরেন্দ্র তাহা অতিশয় আনন্দের সহিত বহন করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কাশীপুরে অবস্থান কালে তিনি অধিকাংশ খরচ বহন করিতেন। ঠাকুর তাঁহাকে ‘রসদদার’ বলিয়া উল্লেখ করিতেন। ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে নিজ ব্যয়ে ও উদ্যোগে সুরেন্দ্রনাথই প্রথম “শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব” প্রবর্তন করেন এবং পরবর্তী কালেও এই উৎসবের অধিকাংশ খরচ তিনি বহন করিতেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পরও সুরেন্দ্রনাথ ত্যাগী সন্তানদের সেবার জন্য অনেক টাকা দিয়াছিলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে ঠাকুরের পরমভক্ত সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন।

সুরেন্দ্রের মেজো ভাই — আদালতের জজ স্বগৃহে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করেন এবং তাঁহার সহিত ঈশ্বরের বিষয়ে নানাবিধ আলোচনা করেন।

সেজোগিন্নী (জগদম্বা দাসী) — রানী রাসমণির কনিষ্ঠা কন্যা এবং রানীর সেজ জামাই মথুরামোহন বিশ্বাসের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। অতিশয় ধর্মপ্রাণা ভক্তিমতী মহিলা। স্বামীর সহযোগিতায় তিনি নানাভাবে ঠাকুরের সেবা করিয়া গিয়াছেন। মথুরামোহনের মত ঠাকুরকেও তিনি 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, ঠাকুরের যখন যাহা প্রয়োজন সব সময়ই সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতেন। এমনকি ঠাকুর কামারপুকুরে থাকাকালীন যাহাতে কোন রকম অসুবিধে না হয়, সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখিতেন। ঠাকুরও এই মহিলা ভক্তটিকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার সরলতার প্রশংসা করিতেন।

সৌরীন্দ্র ঠাকুর —– পাথুরিয়া ঘাটার ঠাকুর বংশের হরকুমার ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র, রাজা এবং স্যার উপাধি প্রাপ্ত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইঁহার গৃহে শুভাগমন করিয়াছিলেন। গোলাপ-মার একমাত্র কন্যা চণ্ডীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অকালেই তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়।

হঠযোগী —– শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে জনৈক হঠযোগী। কিছুদিনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং পঞ্চবটীতলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে ঠাকুরের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। একদা ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান যোগীন কৌতূহলের বশে হঠযোগীর ক্রিয়া দেখিতে উপস্থিত হইলে ঠাকুর যোগীনকে ওই সব ক্রিয়া দেখিতে বা শিখিতে নিষেধ করেন। ঠাকুরের অন্যতম ভক্ত কৃষ্ণ কিশোরের পুত্র রামপ্রসন্ন এবং আরও কয়েকজন ওই হঠযোগীকে খুব ভক্তি করিতেন। হঠযোগীর আর্থিক অভাব নিবারণের জন্য রামপ্রসন্ন ভক্তদের বলিয়া হঠযোগীর জন্য টাকার ব্যবস্থা করিতে ঠাকুরকে অনুরোধ করেন। ইহার পর

রাখাল এবং হঠযোগী নিজেও একই কথা জানাইলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার কয়েকজন ভক্তকে হঠযোগীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

হনুমান সিং (দারোয়ান) — শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অগাধ বিশ্বাসী দক্ষিণেশ্বরের মন্দির রক্ষা কার্যে নিযুক্ত মহাবীর মন্ত্রের উপাসক ও ভক্ত। পাঞ্জাবী মুসলমান পালোয়ানের সহিত মল্লযুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতার পূর্বে তিনি ইষ্টমন্ত্র জপ এবং দিনান্তে একবার আহার করিয়া কাটাইতেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগের দিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল সম্বন্ধে ঠাকুর হনুমান সিংকে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন, ঠাকুরের কৃপা থাকিলে নিশ্চয়ই তাঁহার জয় হইবে। বলাবাহুল্য তিনি মল্লযুদ্ধে জয়ী হইয়া নিজের দারোয়ানের পদে পূর্বের ন্যায় বহাল ছিলেন।

হরমোহন মিত্র — শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত গৃহীভক্ত। নরেন্দ্রনাথের সহপাঠী ও বন্ধু। কলিকাতার দর্জি পাড়ায় নয়ন চাঁদ মিত্র স্ট্রীটে বাস করিতেন। হরমোহনের মাতা কয়েকবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করেন। মাতার উৎসাহেই পুত্র হরমোহন দক্ষিণেশ্বরে বহুবার যান এবং বিশেষ কৃপা লাভে ধন্য হন। একদা ঠাকুর তাঁহাকে স্পর্শ করায় তাঁহার ভিতরে দিব্য অনুভূতির সৃষ্টি হয়। ঠাকুরের কল্পতরু হওয়ার দিন তিনি কাশীপুরে উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর এবং স্বামীজীর ভাবধারা প্রচারের জন্য নিজ ব্যয়ে ছাপানো পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করেন। ঘরে ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি ও ভাবধারা প্রচারে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ম্যাক্সমূলার প্রণীত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী তিনিই সর্বপ্রথম এদেশে প্রচার করেন।

হরলাল — ব্রাহ্ম ভক্ত, হিন্দু স্কুলের শিক্ষক। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অনুগামী। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ আকর্ষণে হরলাল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট যাইতেন। ঠাকুরও তাঁহার সহিত ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর হইতে কেশবচন্দ্র সেনের সহিত স্টীমারে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণের সময়ে হরলালও উপস্থিত ছিলেন।

হরি — বাগবাজার নিবাসী ব্রাহ্মণ বংশীয় সন্তান। শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহ ধন্য যুবক ভক্ত। ঠাকুরের ভক্ত মুখুজ্যে ভ্রাতৃদ্বয়, মহেন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের আত্মীয়। ‘মুখুজ্যেদের হরি’ নামে কথামৃতে পরিচিত। হরি কখনো একাকী, কখনো মুখুজ্যেদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে যাইতেন। ঠাকুরকে গুরুরূপে বরণ করেন। ঠাকুরের এত স্নেহপাত্র ছিলেন যে তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে যাইতে কিছুদিন বিলম্ব হইলে ঠাকুর তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেন। একদা হরি ঠাকুরের নিকট দীক্ষালাভের প্রার্থনা করায় ঠাকুর অসম্মত হন; তবে প্রার্থনা করেন যে যাহারা আন্তরিক টানে তাঁহার নিকট আসিবেন তাহারা যেন সবাই সিদ্ধ হয়। ভাগ্যবান হরির হাত নিজের হাতের উপর রাখিয়া পরীক্ষাপূর্বক ঠাকুর তাঁহার ভাল লক্ষণের কথা জানান এবং তাঁহার ভক্তির প্রশংসা করেন।

হরি [হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় — স্বামী তুরীয়ানন্দ] (১৮৬৩ - ১৯২২) — কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চলে জন্ম। পিতা চন্দ্রনাথ, মাতা প্রসন্নময়ী। শৈশবেই মাতৃহারা এবং ১২ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। এই হরিনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে স্বামী তুরীয়ানন্দ নামে পরিচিত। গঙ্গাধর (স্বামী অখণ্ডানন্দ) তাঁহার বাল্যবন্ধু। বাল্যকাল হইতেই হরিনাথ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী এবং তত্ত্বান্বেষী। ১৩।১৪ বৎসর বয়সে বাগবাজারে দীননাথ বসুর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। ইহার

দুই বৎসর পর হইতেই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করেন। তাঁহার সঙ্গগুণে সমস্ত সংশয় ও দ্বন্দ্বের অবসান হয়। শ্রীরামকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হয়। হরিনাথ বেদান্ত বিচারে আনন্দ লাভ করিতেন। এইসময়ে নরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে বরাহনগর মঠে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১২ বৎসর ধরিয়া নানা তীর্থে ঘুরিয়া তপস্যা করেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজীর সঙ্গে আমেরিকাতে গিয়া বেদান্ত প্রচার করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন। শেষজীবনে তিনি কাশীধামে ছিলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই, শুক্রবার তিনি মায়ার জগৎ হইতে বিদায় লইলেন।

হরিপদ —— শ্রীরামকৃষ্ণের বালক ভক্ত। মাস্টার মহাশয় কর্তৃক ঠাকুরের নিকট আনীত। দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মাঝে যাইতেন। ঘোষপাড়া মতে সাধন-ভজন করিতেন। কথকতা জানিতেন এবং খুব ধ্যান করিতেন।

হরিপ্রসন্ন —— [হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় —— স্বামী বিজ্ঞানানন্দ] (১৮৬৮ - ১৯৩৮) — শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত, অবিবাহিত, ত্যাগী শিষ্য এবং অন্তরঙ্গ পার্ষদ হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় স্বামী বিজ্ঞানানন্দ নামে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে পরিচিত। উত্তরপ্রদেশের এটোয়ায় বৈকুণ্ঠ চতুর্দশী তিথিতে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃগৃহ ছিল চব্বিশ পরগণার বেলঘরিয়ায়। পিতা তারকনাথ ও মাতা নকুলেশ্বরী দেবী। শৈশবে কাশীতে এবং পরে কলিকতায় বিদ্যাভ্যাস করেন। পরে পুণায় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হইয়া পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি গাজীপুরে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ারের সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হন এবং মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের সময় তিনি বাঁকীপুরে

ছিলেন। পরে সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিয়া আলমবাজার মঠে যোগদান করেন। এই সময় তিনি "স্বামী বিজ্ঞানানন্দ" এবং গুরুভ্রাতাগণের নিকট "বিজ্ঞান মহারাজ" বা "হরিপ্রসন্ন মহারাজ" নামে পরিচিত ছিলেন। স্বামীজীর আদেশে তিনি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগে (এলাহাবাদ) যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে মুঠিগঞ্জে একটি স্থায়ী মঠ স্থাপন হয়।

স্বামী অখণ্ডানন্দের দেহরক্ষার পর তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্থ অধ্যক্ষ হন। ঠাকুরের দীক্ষিত ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে তিনিই শেষ অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি পৌস সংক্রান্তির দিন তিনি স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী বেলুড়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া "আত্মারামের কৌটা" বেদীতে স্থাপনপূর্বক মন্দিরের উদ্বোধন করেন। ইহাই তাঁহার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা। তাঁহার শেষজীবন এলাহাবাদে কাটে। তীব্র বৈরাগ্যপূর্ণ জীবনযাপনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ হরিপ্রসন্নকে খুব স্নেহ করিতেন এবং আদর করিয়া 'পেসন' বলিয়া ডাকিতেন। অন্যান্য গুরু ভাইদেরও গভীর স্নেহ ভালবাসা তিনি পাইয়াছিলেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল সোমবার এলাহাবাদেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

হরিবল্লভ বসু — ঠাকুরের গৃহীভক্ত বলরাম বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কটকের উকিল এবং রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত। পিতা বিন্দু মাধব। কলিকাতায় রামকান্ত বসু স্ট্রীটের যে ৫৭ নং বাড়িতে বলরামবাবু সপরিবারে করিতেন এবং কথামৃতে যাহাকে 'বলরাম-মন্দির' বলা হইয়াছে — তিনিই উহার মালিক ছিলেন। বলরাম শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত করেন বিশেষতঃ পরিবারস্থ মহিলাদের সেখানে লইয়া যান শুনিয়া হরিবল্লভবাবু বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্যামপুকুর

বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহার মনোভাবের আমূল পরিবর্তন হয় এবং তিনি ঠাকুরের ভক্ত হন। 'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি কথা' হইতে জানা যায়, একদিন ঠাকুর বলরাম-মন্দিরে শুভাগমন করিলে পর গিরিশচন্দ্রের ব্যবস্থামত হরিবল্লভবাবু আসিয়া ঠাকুরের নিকট বসেন এবং উভয়েই উভয়কে দেখিয়া কাঁদিতে থাকেন, কোন কথা হয় নাই।

হরিবাবু (হরি চৌধুরী) — মাস্টার মহাশয়ের প্রতিবেশী ও বন্ধু। মাস্টার মহাশয়ের সহিত দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে যান (২০।৮।১৮৮৩)। শ্রীশ্রীঠাকুর ইঁহাকে 'কুমড়োকাটা বঠ্‌ঠাকুর' না হইয়া ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রাখিয়া সংসারের কাজ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

হরিশ (হরিশ কুণ্ডু) — কলিকাতার উপকণ্ঠে গড় পারে বাড়ি। ব্যায়াম শিক্ষকের কার্য করিতেন। মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট আসিতেন। সরল শান্ত স্বভাবের জন্য তিনি ঠাকুরের স্নেহভাজন হন। পরবর্তী কালে তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে।

হলধারী (রামতারক চট্টোপাধ্যায়) — শ্রীরামকৃষ্ণদেবের খুল্লতাত ভ্রাতা। ঠাকুর তাঁহাকে হলধারী বলিতেন। দক্ষিণেশ্বরে প্রথমে কালীঘরে ও পরে বিষ্ণুঘরের পূজারী হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধকজীবনের বহু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

হলধারীর বাবা — শ্রীকানাইরাম চট্টোপাধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের খুল্লতাত। নিষ্ঠাবান, সরল বিশ্বাসী ভগবদ্ ভক্ত ছিলেন।

হাজরা — প্রতাপ হাজরা দ্রষ্টব্য।

হীরানন্দ — সিন্ধুপ্রদেশের এক শিক্ষিত ব্যক্তি। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি.এ.পাশ করেন। নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের অনুগামী ব্রাহ্ম ভক্ত। সিন্ধু প্রদেশের 'সিন্ধু টাইমস' এবং 'সিন্ধু সুধার' পত্রিকা দুইটির সম্পাদক ছিলেন। ঠাকুরের নিকট তিনি কয়েকবার আসিয়াছিলেন। আচার্য কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ, মাস্টার মহাশয় প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট ভক্তদের সহিত তাঁহার অত্যন্ত হৃদ্যতা ছিল। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে অসুস্থ অবস্থায় থাকার সময় ঠাকুর হীরানন্দকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হন এবং সেই সংবাদে হীরানন্দ সুদূর সিন্ধু প্রদেশ হইতে কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় আসেন। ঠাকুর হীরানন্দকে কাছে পাইয়া আনন্দিত হন। ঠাকুরের দেহ রক্ষার পরেও হীরানন্দ কলিকতায় আসিলে বরাহনগর মঠে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিতেন।

হৃদয় (হৃদু, হৃদে — হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়) — ঠাকুরের পিসতুত বোন হেমাঙ্গিনী দেবীর তৃতীয় পুত্র। পিতা কৃষ্ণচন্দ্র। শিহড় গ্রামে বাড়ি। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলায় হৃদয়ের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ঠাকুরের সহচর হিসাবে তাঁহার সেবা ও দেখাশোনা করেন। দক্ষিণেশ্বরে তিনি প্রথমে মা-কালীর বেশ-কারী ও পরে রাধাগোবিন্দজী ও ভবতারিণীর পূজক রূপে নিযুক্ত হন। প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ের আন্তরিক সেবা ভিন্ন সাধনকালে ঠাকুরের শরীর রক্ষা কঠিন হইত। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কর্তৃপক্ষীয়দের বিরাগভাজন হওয়ায় কর্মচ্যুত হন। দীর্ঘকাল ঠাকুরের পূত সঙ্গ লাভ করা সত্ত্বেও সংসারের প্রতি হৃদয়ের বিশেষ আসক্তি থাকায় তিনি মাঝে মাঝে

ঠাকুরকে ভুল বুঝিতেন ও তাঁহার প্রতি বিরূপ আচরণ করিতেন। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর প্রতিও তাঁহার আচরণ কোন কোন সময় ভাল ছিল না। মাঝে মাঝে ঠাকুরের অনুকরণে নিজেকে আধ্যাত্মিক জগতে প্রতিষ্ঠা করার নিষ্ফল চেষ্টাও করিতেন। ক্রমে তিনি ঠাকুরের প্রতি দুর্ব্যবহার শুরু করিলে ঠাকুর একসময় গঙ্গায় দেহত্যাগের জন্য গিয়াছিলেন। দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। পরম ভাগ্যবান হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা লাভে ধন্য হইয়াছিলেন। হৃদয়ের প্রতি কৃপাপরবশ ঠাকুর, হৃদয়ের শিহড় গ্রামের বাড়িতেও কয়েকবার শুভাগমন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পরবর্তী কালে হৃদয় কাপড় গামছা বিক্রয় করিলেও দীর্ঘকালের সঙ্গী শ্রীরামকৃষ্ণকে কখনও বিস্মৃত হন নাই। ঠাকুরের অনুরাগী ভক্তদের সহিত মিলিত হইয়া তিনি ঠাকুরের স্মৃতিকথায় মগ্ন হইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাবিষয়ক অনেক কথা তাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় জন্মভূমি শিহড় গ্রামে ঠাকুরের এই অন্তরঙ্গ সেবক দেহত্যাগ করেন।

হৃদয়ের মা (শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী) — ঠাকুরের পিসতুতো ভগিনী। শ্রীশ্রীঠাকুরের মহিমা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ ফুল-চন্দন দিয়া পূজা করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ অবস্থায় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ‘তোর কাশীতেই মৃত্যু হবে’। ঠাকুরের কৃপালাভে তিনি কৃতার্থ হন।

হেম (রায় বাহাদুর হেমচন্দ্র কর) — ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত পল্টুর পিতা।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ

----

c64 ৬৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে উল্লিখিত স্থানসমূহের পরিচয়

কামাপুকুর ও পার্শ্ববর্তী লীলাস্থল

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মস্থান ও তাঁহার বাল্য ও কৈশোরের লীলাভূমি কামারপুকুর বর্তমান যুগের অন্যতম মহান তীর্থ। ইহা হুগলী, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর এই তিন জেলার সংযোগস্থলে অবস্থিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের পৈত্রিক বাসভবন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে উক্ত বাসভবন সহ ৪৫ বিঘা জমি রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক সংগৃহীত হইলে এপ্রিল মাসে সেখানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের এক যুক্ত শাখাকেন্দ্র খোলা হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যবহৃত খড়ের চালবিশিষ্ট মাটির নির্মিত বাসগৃহ, দোতলা গৃহ ও বৈঠকখানা সংরক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্য ও কৈশোরের কামারপুকুর ও পার্শ্ববর্তী লীলাস্থলগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ:—

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান — ঢেঁকিশালায় একটি উনুনের পাশে। এই জন্মস্থানের উপরেই বর্তমান মন্দির নির্মিত। এই মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্বেত প্রস্তরমূর্তি যে প্রস্তরময় বেদীর উপর স্থাপিত ওই বেদীর সম্মুখ ভাগে ঢেঁকি ও উনুনের প্রতিরূপ খোদিত আছে।

কুলদেবতার মন্দির — শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহাঙ্গনে তাঁহার জন্মস্থানের পশ্চিমে কুলদেবতা ৺রঘুবীরের মন্দির। মন্দিরে ৺রামেশ্বর শিবলিঙ্গ, ৺রঘুবীর শিলা ও ৺শীতলার ঘট আছে। ইঁহাদের নিত্যপূজা হয়। পূর্বে মন্দিরটি মৃত্তিকা নির্মিত ছিল। পরে ইষ্টক নির্মিত হইয়াছে। বর্তমানে এই মন্দিরে ৺নারায়ণ শিলা ও লক্ষ্মীর ঘটও আছে।

পৈতৃক গৃহ: — শ্রীশ্রীঠাকুরের শয়ন ঘর — ৺রঘুবীরের মন্দিরের উত্তের মৃত্তিকা নির্মিত গৃহ ও বারান্দা। এই গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণ শয়ন করিতেন। ইহা এখনও তাঁহার শয়নকক্ষ রূপে ব্যবহৃত হয়। খড়ের চাল, মাটির দেওয়াল ও পরিষ্কার নিকানো মেঝে পূর্বের ন্যায় একই আছে। এই গৃহের সংলগ্ন পূর্বদিকে দ্বিতল মৃত্তিকা নির্মিত গৃহ ও বারান্দা। এই গৃহে বাড়ির অন্যান্য সকলে শয়ন করিতেন।

বাড়ির বাহিরে প্রবেশপথের উপরে একখানি মৃত্তিকার দেওয়াল সহ চালাঘর আছে। এখানে শ্রীশ্রীঠাকুর বাহিরের লোকজনের সহিত কথাবার্তা বলিতেন। সেইজন্য ইহাকে বৈঠকখানা বলা হয়। ইহার পূর্বদিকে দেওয়ালের পার্শ্বে

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বহস্তরোপিত আম্রবৃক্ষ আছে। বাড়ির পূর্বদিকে একটি পুষ্করিণী আছে। বর্তমানে ইহা ভরাট করাতে ক্ষুদ্রাকৃতি হইয়াছে। ইহার নাম খাঁ পুকুর।

বাড়ির দক্ষিণ দিকে এখন যে স্থানে নাটমন্দির আছে সেখানে ক্ষুদিরামের বন্ধু সুখলাল গোস্বামীর বাড়ি ছিল। ক্ষুদিরাম স্বগ্রাম দেরে হইতে ওই গ্রামের জমিদারের চক্রান্তে সর্বস্ব বঞ্চিত হইয়া বন্ধু সুখলালের আমন্ত্রণে কামারপুকুরে আসিয়া বসবাস করেন। সুখলাল নিজ বসতবাটীর উত্তরে জমি দান করিয়া গৃহাদি নির্মাণে ক্ষুদিরামকে সহায়তা করিয়াছিলেন।

যুগীদের শিব মন্দির — শ্রীরামকৃষ্ণের বাড়ির উত্তরে যুগীদের শিব মন্দির। এই মন্দিরের মহাদেবের লিঙ্গমূর্তি হইতে দিব্যজ্যোতি নির্গত হইয়া বায়ুর ন্যায় তরঙ্গাকারে মন্দিরের সম্মুখে দণ্ডায়মান চন্দ্রাদেবীর দেহে প্রবেশ করে এবং উহা হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম। এই মন্দিরে উত্তর-পূর্ব কোণে মধু যুগীর বাড়ি ছিল।

হালদারপুকুর — এই পুকুরে গদাধর (ঠাকুরের বাল্য নাম) ও বাড়ির অন্যান্য সকলে স্নান করিতেন। পরবর্তী কালে শ্রীশ্রীঠাকুর ইহার কথা কথামৃতে বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন।

লক্ষ্মীজলা — হালদারপুকুরে পশ্চিমে লক্ষ্মীজলা নামে এক বিঘা দশ ছটাক পরিমাণের ধানের খেত। ইহাতে প্রচুর ধান হইত। এই ধানের চাউলে ৺রঘুবীর ও অন্যান্য দেবতাদের ভোগ হইত।

ভূতির খালের শ্মশান ও গোচারনের মাঠ — পিতা ক্ষুদিরাম দেহত্যাগ হইলে গদাধর শোকাচ্ছন্ন হইয়া এই শ্মশানে বহু সময় কাটাইতেন। এই গোচারণের মাঠে গদাধর কোন কোন সময় কোঁচড়ে মুড়ি লইয়া খাইতে খাইতে বেড়াইতেন। সেই সময় একদিন আকাশে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের কোলে এক ঝাঁক সাদা বলাকা দর্শনে মুগ্ধ হন এবং এই অপূর্ব সৌন্দর্যের দর্শনে তন্ময় হইয়া ভাবসমাধিস্থ হন। ইহাই তাঁহার প্রথম ভাব সমাধি।

লাহাবাবুদের সদাব্রত ও দেবালয় — বর্তমান শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের দক্ষিণদিকে এই সদাব্রত ছিল। সাধুরা সেখানে আসিলে চাউল, ডাল ইতাদি পাইতেন। গদাধর বাল্যকাল হইতেই সাধুদর্শনের জন্য সেখানে যাইতেন। বর্তমান মঠের পূর্বদিকে লাহাবাবুদের বাড়ি ও দেবালয়, বিষ্ণুমন্দির ও দুর্গাদালান ছিল। গদাধের বাল্যেই মন্দিরে পূজা ও দুর্গামণ্ডপে প্রতিমা নির্মাণ হইতে পূজাসাঙ্গ পর্যন্ত বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেন। লাহাবাবুদের বাড়িতেও প্রায়ই যাইতেন।

লাহাবাবুদের পাঠশালা — দুর্গামণ্ডপের সম্মুখে আটচালায় এই পাঠশালা বসিত। ক্ষুদিরাম গদাধরের পাঁচ বৎসর বয়সে এক শুভদিনে হাতে খড়ি দিয়া এই পাঠশালায় ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন। বর্ণপরিচয়, পরে হস্তলিখন ও সংখ্যা গণনা অভ্যাস শুরু হয়। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর হইয়াছিল। ‘সুবাহুর পালা’ নামক তাঁহার স্বহস্তলিখিত পুঁথিতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পুঁথিপাঠ তিনি ভালভাবেই করিতে পারিতেন।

চিনু শাঁখারির বাড়ি — কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহ হইতে কিছু পূর্বদিকে ইহা অবস্থিত ছিল। বর্তমানে কেবল বাস্তুভিটা ভিন্ন বসতবাটীর অন্য কোন চিহ্ন নাই। সম্প্রতি এই স্থানটি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

পাইনদের বাড়ি — বর্তমান মঠের দক্ষিণ দিকে পাইনদের বাড়ি। ইহাদের মধ্যে সীতানাথ পাইনের বাড়িতে গদাধর প্রায়ই যাইতেন।

ধনী কামারিনীর বাড়ি — লাহাবাবুদের দুর্গামণ্ডপের পূর্বদিকে ধরিয়া দক্ষিণ দিকে কিছু দূরে রাস্তার মোড়ের মাথায় ধনী কামারিনীর ভিটা। বর্তমানে এই ভিটায় একটি ছোট মন্দির আছে।

বুধুই মোড়লের শ্মশান — কামারপুকুর গ্রামের পূর্বপ্রান্তে ইহা অবস্থিত। সম্মুখে একটি ছোট পুষ্করিণী। চারিদিকে বট ও অন্যান্য বৃক্ষ আছে। এইখানে গদাধর পিতার দেহাবসানের পর শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় একাকী বসিয়া থাকিতেন।

মুকুন্দপুরের বুড়ো শিব — এই মন্দিরে নিত্য পূজা ছাড়া বিশেষ বিশেষ দিনে যাত্রাগান প্রভৃতি হইত।

লাহাবাবুদের পান্থ নিবাস — শ্রীপুরের হাটতলা হইয়া যে পথ দক্ষিণে গিয়া অহল্যা বাঈ রোডের সঙ্গে মিশিয়াছে সেই চৌমাথার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে ইহা অবস্থিত ছিল। ওই পান্থনিবাসের কিছু পূর্বে বর্ধমান যাইবার পথের নিকটে নূতন চটি। গদাধর এই সব স্থানে সাধুদর্শন করিয়া তাঁহাদের সহিত মেলামেশার জন্য যাইতেন ও তাঁহাদের যথাসাধ্য সেবা করিতেন। এইসব স্থান ব্যতীত গদাধর

বাল্যকালে বিভিন্ন গ্রামের মুক্ত পরিবেশে স্বাধীনভাবে বহুগৃহে ও বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন।

মানিক রাজার আম বাগান — ইহার ভুরসেবো (বর্তমান হরিসভা) গ্রামস্থ বাড়িতে গদাধর বাল্যে অনেকবার গিয়াছেন ও তাঁহাদের স্নেহ যত্ন বিশেষভাবে লাভ করিয়াছিলেন।

আনুড় গ্রাম — আনুড় গ্রামে ৺বিশালাক্ষীর মন্দির অবস্থিত। একবার দেবী দর্শনে গদাধর কামারপুকুরের মহিলা ভক্তদের সঙ্গে গমনকালে ভাবসমাধিস্থ হইয়া পড়েন। মহিলারা কাতরভাবে মায়ের নাম করিতে থাকায় তিনি স্বাভাবিক হন ও সকলে মিলিয়া ৺বিশালাক্ষীর দর্শন ও পূজাদি করিয়া ফিরিয়া আসেন।

গৌরহাটী গ্রাম — এই গ্রামে কামারপুকুর হইতে আরামবাগ হইয়া ৬।৭ মাইল পূর্ব-দক্ষণে যাইতে হয়। গদাধরের কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী সর্বমঙ্গলার সহিত এই গ্রামের শ্রীরামসদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছিল। রামসদয়ের ভগিনী শ্রীমতী শাকম্ভরীর সহিত ঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীরামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। গদাধর একবার গৌরহাটী গ্রামে গিয়া দেখেন তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী প্রসন্নমুখে নিজের স্বামীর সেবা করিতেছেন। দৃশ্যটি তাঁহার হৃদয়গ্রাহী হওয়ায় বাড়িতে ফিরিয়া স্বামী সেবানিরতা নিজের ভগিনীর একখানি ছবি আঁকিয়াছিলেন। উহাতে সর্বমঙ্গলার ও তাঁহার স্বামীর চেহারার সৌসাদৃশ্য দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছিলেন। গৌরহাটী গ্রামে সম্প্রতি একটি শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির ও আশ্রম স্থানীয় ভক্তদের আগ্রহে শুরু হইয়াছে।

সরাটি মায়াপুর — আরামবাগ হইতে চয় মাইল পূর্বে এই গ্রাম। গদাধরের মাতুলালয়।

বালি দেওয়ানগঞ্জ — শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা একবার হৃদয়ের সঙ্গে দেশে আসিবার পথে এই গ্রামে এক ভক্ত মোদকের নবনির্মিত গৃহে ত্রিরাত্র বাস করিয়াছিলেন। তখন বর্ষাকাল বলিয়া মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় হৃদয়ের অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্ত মোদকের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য তিন দিন-রাত্রি তাঁহার গৃহে অবস্থানপূর্বক স্থানীয় নরনারীদের নিকট ভগবৎপ্রসঙ্গাদি করিয়া আনন্দ দান করিয়াছিলেন।

বেলটে গ্রাম — এই গ্রাম কামারপুকুরের ৫।৬ মাইল পশ্চিম দক্ষিণে অবস্থিত। এই গ্রামের শ্রীনটবর গোস্বামীর সহিত শিহড়ে হৃদয়রামের বাড়িতে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের আলাপ পরিচয় হয়। একবার গোস্বামীজী তাঁহাকে নিজ বাটীতে লইয়া যান। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই ভক্তিভরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করেন।

ফুলুই-শ্যামবাজার — শ্রীশ্রীঠাকুর একবার বেলটের পার্শ্ববর্তী ফুলুই-শ্যামবাজারে কীর্তন দেখিয়াছিলেন। নটবর গোস্বামীজীর ব্যবস্থায় সাতদিন ধরিয়া এই কীর্তন অহোরাত্র হয়।

কয়াপাট-বদনগঞ্জ গ্রাম — ফুলুই-শ্যামবাজারের নিকটবর্তী সম্মিলিত গ্রাম দুইটির নাম কয়াপাট-বদনগঞ্জ গ্রাম। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার প্লীহা দাগানো চিকিৎসা করাইতে এই গ্রামে আসিয়াছিলেন। এখানে কীর্তনানন্দে একবার যোগদানও করিয়াছিলেন ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে।

কোতলপুর গ্রাম —— কথামৃতের ২।৪।১৮৮২ তারিখের পাদটীকায় আছে শিহোড় শ্যামবাজারে কীর্তনানন্দের পর ফিরিবার সময় এই গ্রামে ভদ্রদের বাড়িতে ৺দুর্গাসপ্তমী পূজার আরতি দর্শন করিয়াছিলেন। এই গ্রাম জয়রামবাটী হইতে ৬।৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

গোঘাট —— কামারপুকুর গ্রামের দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রায় ৪ মাইল দূরে আরামবাগ যাইবার পথে ইহা অবস্থিত। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার ৺রঘুবীরের নামে জমি ক্রয় করাইয়া রেজিস্ট্রি করাইতে এখানকার রেজিস্ট্রি অফিসে আসিয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বর ও নিকটবর্তী স্থান

দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ি —— এই মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য রানী রাসমণি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর সাড়ে চুয়ান্ন বিঘা জমি ও কুঠিবাড়িটি বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশত টাকায় ক্রয় করেন। এই বিস্তৃত ভূখণ্ড ও কুঠিবাড়িটি প্রথমে ইংরেজ এটর্নি জেমস হেসটি সাহেবের ছিল। কিছু অংশে মুসলমানদের কবরডাঙ্গা, গাজীসাহেবের পীঠের স্থান, পুষ্করিণী ও আম বাগান ছিল। এইস্থানের কিছু অংশ কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি থাকায় শাস্ত্রানুসারে শক্তিমন্দির প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত স্থানরূপে নির্ণীত হয় এবং পরবর্তী কালে শিব শক্তি ও বিষ্ণু মন্দির নির্মিত হইয়া সর্বধর্মের মিলনক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। গঙ্গার ধারে পোস্তা প্রভৃতিসহ মন্দির নির্মাণের কাজ ‘ম্যাকিন্‌টস্ আণ্ড বারন্’ কোম্পনি দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল। সমস্ত নির্মাণ কাজ শেষ হইতে নয় বৎসর সময় লাগে এবং খরচ হয় তখনকার দিনে নয় লক্ষ টাকা। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে, স্নানযাত্রার দিন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমথামৃতে দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ির বর্ণনা প্রসঙ্গে সমস্ত ক্ষেত্রটির শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত অনেক তথ্য দিয়াছেন। এখানে সংক্ষেপে ওই স্থানগুলির উল্লেখ করা হইতেছে:—

[গাজীতলা]

বর্তমানে এক বিরাট অশ্বত্থ গাছসহ স্থানটি বাঁধানো আছে এবং ছোট ফলকে পরমহংসদেবের সাধনস্থল বলিয়া লিখিত আছে।

[কুঠিবাড়ি]

রানী রাসমণি, মথুরবাবু ও পরে তাঁহাদের উত্তরাধিকারীগণ দক্ষিণেশ্বে আসিলে এখানে বাস করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এই কুঠিবাড়ির পশ্চিমের ঘরে দীর্ঘ ১৬ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। পরে ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের দেহত্যাগের পর মন্দির প্রাঙ্গণের উত্তর-পশ্চিম দিকের ঘরটিতে শেষ ১৪ বৎসর বাস করেন। এই কুঠিবাড়ির ছাদ হইতেই তিনি ভক্তদের আহ্বান করিয়াছিলেন।

[শিবমন্দির]

দ্বাদশ শিবমন্দিরের শিবলিঙ্গগুলির নাম — চাঁদনীর উত্তরদিকের মন্দিরসমূহের যথাক্রমে — যোগেশ্বর, যত্নেশ্বর, জটিলেশ্বর, নকুলেশ্বর, নাকেশ্বর ও নির্জরেশ্বর, আর চাঁদনীর দক্ষিণদিকের মন্দিরগুলির শিবলিঙ্গের নাম যথাক্রমে যজ্ঞেশ্বর, জলেশ্বর, জগদীশ্বর, নাগেশ্বর, নন্দীশ্বর ও নরেশ্বর। সোপকরণ নৈবেদ্যসহ প্রতি শিবকে নিত্যপূজা করা হয়। এতদ্ব্যতীত শিবরাত্রি, নীলপূজা ও চড়কের দিনে

এবং স্নানযাত্রায় (দেবালয় প্রতিষ্ঠা দিবসে) বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে। এই সব মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্রপাঠাদি করিতেন।

[চাঁদনী]

দুইসারি শিবমন্দিরের মধ্যস্থলে চাঁদনী। এখানে সাধু, অতিথি, ও স্নানার্থীরা বিশ্রামাদি করেন। এখানেই শ্রীমৎ তোতাপুরী প্রথমে আসিয়াছিলেন।

[বিষ্ণুমন্দির]

শ্রীরামকৃষ্ণ এই মন্দিরে কিছুকাল পূজা করেন। এখানে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহদ্বয়ের নাম শ্রীশ্রীজগমোহিনী রাধা ও শ্রীশ্রীজগোহন কৃষ্ণ। নিত্য পূজা ও নিরামিষ ভোগ নিবেদন করা হয়। বিশেষ পূজার ব্যবস্থা স্নানযাত্রা, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, রাস প্রভৃতি বিশেষ দিনে আছে। এই মন্দিরের পার্শ্ববর্তী কক্ষে যে শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিটি দেখা যায় উহারই ভগ্নপদ শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক জোড়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে এই মূর্তির জোড়া দেওয়া অংশটি অঙ্গরাগের সময় পুনরায় ভগ্ন হওয়ায় নূতন মূর্তি শ্রীশ্রীরাধাবিগ্রহের নিকট স্থাপিত হইয়াছে, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে।

[কালীমন্দির]

এই মন্দিরটির নবচূড়াবিশিষ্ট তিনটি স্তরে আছে। মন্দির শীর্ষের নিচু অংশে ৪টি চূড়া, তাহার উপরের স্তরে ৪টি ও সর্বোচ্চস্থানে মূল চূড়া — মোট নয়টি। চূড়া ও মন্দির গাত্রের শিল্পকাজসমূহ স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। মন্দিরের দেবীর নাম শ্রীশ্রীজগদীশ্বরী কালী, কিন্তু তিনি ভবতারিণী নামেই সমধিক পরিচিতা।

এখানে নিত্য পূজা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ এই মন্দিরে প্রায় তিন বৎসর পূজা করেন। পরে দিব্যোন্মত্তায় বৈধীপূজা করা সম্ভব ছিল না। তবে নিত্যই মায়ের মন্দিরে গিয়া প্রণামাদি করিতেন। সাধনকালে ব্যাকুলভাবে মায়ের নিকট প্রার্থনা, ও দিব্যভাবে মাকে খাওয়ানো শোয়ানো প্রভৃতি বিভিন্নভাবে সেবা করিতেন।

[নাটমন্দির]

কালীমন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্বে মন্দিরের দক্ষিণদিকে অবস্থিত ইহার উপরে উত্তরমুখী মহাদেব, নন্দী ও ভৃঙ্গীকে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রণাম করিতেন। এই নাটমন্দিরে ধর্মীয় সভায় ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীশ্রীঠাকুরকে সর্বজনসমক্ষে অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন। নাটমন্দিরের দক্ষিণে বলিদানের স্থান।

[শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর]

মন্দির প্রাঙ্গনের উত্তর-পশ্চিমদিকের কক্ষটিতে শ্রীশ্রীঠাকুর দীর্ঘ ১৪ বৎসর কাল বাস করিয়াছেন। এই কালে কত সাধু, পণ্ডিত, ভক্ত, তাঁহার অন্তরঙ্গ গৃহী ও ত্যাগী ভক্তবৃন্দের সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গ, তাঁহার সাধনকালের কথা, কীর্তন, ভজন, ভাব, সমাধি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই ঘরের পশ্চিমদিকের অর্ধচন্দ্রাকৃতি বারান্দায় দাঁড়াইয়া গঙ্গাদর্শন করিতেন। এই ঘরে বর্তমানে শ্রীশ্রীঠাকুরের তক্তাপোশ, চৌকীর উপর তাঁহার ফটো সযত্নে রক্ষিত হইয়া নিত্য পূজাদি হয়।

[নহবতখানা]

মন্দির প্রাঙ্গণের বাহিরে উত্তর ও দক্ষিণে অবস্থিত দুইটি নহবতখানা হইতে পূর্বে দিনে ছয়বার নহবত বাজানো হত। এখন আর হয় না। উত্তর দিকের নহবতখানার ঘরে ঠাকুরের মাতা চন্দ্রামণিদেবী বাস করিতেন। নিচের ঘরে শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে দীর্ঘদিন বাস করিয়াছিলেন। এখন এই ঘরে শ্রীশ্রীমায়ের ফটোতে নিত্য পূজা হয়।

[পঞ্চবটী]

বট, অশ্বত্থ, নিম, আমলকি ও বেলগাছ রোপণ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর এই পঞ্চবটী তলায় অনেক কাল সাধন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের রজঃ আনিয়া এখানে ছড়াইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, ‘এই স্থান এখন হইতে মহাতীর্থে পরিণত হইল।’ পঞ্চবটীর সাধন কুটিরে তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক বেদান্তসাধনা করিয়া নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়াছিলেন। এই সাধন কুটিরটি এখন একটি পাকা কুটিরে পরিণত হইয়াছে।

[বেলতলা]

এখানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন (নর, সর্প, সারমেয়, বৃষ ও শৃগাল এই পঞ্চপ্রাণীর মুণ্ড) ব্রাহ্মণী স্থাপন করেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে ৬৪ প্রকার তন্ত্রের সাধন করান। এই সাধনবেদী পরে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। এখন স্থানটিতে সিমেন্টের বেদী করিয়া ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে। এই সব ক্ষেত্র ব্যতীত দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ির বর্ণনাতে হাঁসপুকুর, গাজীপুকুর, বকুলতলা, ভাণ্ডার, কর্মচারীদের থাকিবার স্থান প্রভৃতির বিবরণও মাস্টারমহাশয় দিয়াছেন।

মোল্লাপাড়ার মসজিদ —— দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্তী এই মসজিদে ইসলামধর্ম সাধনকালে শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে নমাজ পড়িতে আসিয়াছিলেন।

কুয়ার সিং-এর আস্তানা —— দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের বাগানের পাশে শিখ পল্টনদের নিবাস ছিল। ভক্তিমান কুয়ার সিং কালীবাড়ির উত্তরদিকে অবস্থিত সরকারী বারুদখানার পাহারাদার শিখ সৈন্যদলের হাবিলদার থাকার সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার অনুরাগী হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে সাধুদের ভোজন করাইবার সময় নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার আস্তানায় লইয়া যান।

রসিক মেথরের বাড়ি —— দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ির নিকট মেথর পল্লীতে রসিকের বাস ছিল। সে দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিত। রসিকের ভক্তিতে ঠাকুর তাহাকে স্নেহ করিতেন। সাধনকালে ঠাকুর গোপনে রাত্রিতে রসিকের বাড়িতে গিয়া নর্দমা প্রভৃতি স্থান ধুইয়া নিজের মস্তকের কেশ দ্বারা সাফ করিতেন এবং মায়ের নিকট প্রার্থনা করিতেন তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের অভিমান নাশ করিবার জন্য। ধ্যানকালে একদিন তাঁহার মন রসিকের বাড়িতে চলিয়া গিয়াছিল। তখন তিনি মনকে ওইখানেই থাকার কথা বলিয়াছিলেন।

যদু মল্লিকের বাগানবাড়ি —— দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণদিকে অবস্থিত। ভক্ত যদু মল্লিকের আন্তরিক আহ্বানে ঠাকুর এখানে তাঁহার সঙ্গে কখন কখনও মিলিত হইতেন। এইখানে ম্যাডোনা ক্রোড়ে শিশু যীশুর ছবি দেখিয়া ঠাকুর তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন।

শম্ভু মল্লিকের বাগানবাড়ি — দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ির পাশেই শম্ভু মল্লিকের এই বাগানবাড়ি থাকায় ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হইয়াছিল। ঠাকুর মধ্যে মধ্যে তাঁহার বাগানে যাইতেন। এখানে তাঁহার নিকট হইতে বাইবেল ও যীশুর পবিত্র জীবনকথা শুনিয়া ঠাকুর খ্রীষ্টধর্ম সাধনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। এ স্থানের এখন কোন চিহ্ন নাই।

শম্ভু নির্মিত শ্রীশ্রীমায়ের চালাঘর — কালীবাড়ির নহবতের সঙ্কীর্ণ ঘরে শ্রীশ্রীমায়ের বসবাসের কষ্ট দেখিয়া ভক্ত শম্ভুচরণ মন্দিরের বাগানের পাশেই একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়া ঠাকুরের অন্য ভক্ত কাপ্তেনের সহায়তায় সেখানে মায়ের বসবাসের জন্য একটি ঘর নির্মাণ করিয়া দানপত্র করিয়া দিয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্র রায়চৌধুরীর বাড়ি — দক্ষিণেশ্বর গ্রামে সুবিখ্যাত সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়ি। যোগীন্দ্রের (স্বামী যোগানন্দের) পিতার এই বাড়িতে ঠাকুর কথকতা, শাস্ত্রকথা প্রভৃতি শুনিতে যাইতেন।

নবীন নিয়োগীর বাড়ি — দক্ষিণেশ্বরের বাচস্পতি পাড়া রোডে ঠাকুর তাঁহাদের বাড়িতে দুর্গোৎসবাদিতে নিমন্ত্রিত হইয়া শুভাগমন করিতেন। নীলকণ্ঠের যাত্রাগান শুনিতেও গিয়াছিলেন।

নবকুমার চাটুজ্যের বাড়ি — দক্ষিণেশ্বর নিবাসী এই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের গৃহে কোন কোন সময় ঠাকুর স্বেচ্ছায় গিয়া খুব তৃপ্তির সহিত আহার করিতেন।

বিশ্বাসদের বাড়ি — দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাদের বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুর উলোর বামনদাসের ভক্তির কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত ঈশ্বরীয় আলাপ করিতে গিয়েছিলেন।

কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্যের বাড়ি — দক্ষিণেশ্বরের পার্শ্ববর্তী আড়িয়াদহে এই ভাগ্যবান পরমভক্তের বাড়িতে ঠাকুর বহুবার শুভাগমন করিয়াছিলেন। অধ্যাত্ম রামায়ণ পাঠ শুনিয়া ও ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করিয়া অনেক সময় ঠাকুর তাঁহার গৃহে আহার করিতেন।

পণ্ডিত পদ্মলোচনের বাসা বাড়ি — আড়িয়াদহে মতান্তরে কামারহাটীতে গঙ্গাতীরে একটি বাগান বাড়িতে পণ্ডিতজী যখন শারীরিক অসুস্থতার জন্য অবস্থান করিতেছিলেন তখন ঠাকুর নিজেই তাঁহার সহিত দেখা করেন ও ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ কারিয়া তাঁহাকে আনন্দ দান করেন ও নিজেও আনন্দিত হন।

দেবমণ্ডল ঘাট — গঙ্গাতীরে এই ঘাটের চাঁদনিতে ভৈরবী ব্রাহ্মণী বাস করিতেন। এইখান হইতে প্রত্যহ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিতেন। দক্ষিণেশ্বরে নিবাসী ভক্ত নবীন নিয়োগীর সহধর্মিণী তাঁহাকে প্রয়োজনীয় আহার্য দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেন। এখানে ব্রাহ্মণীর অন্য দুই শিষ্য চন্দ্র ও গিরিজার সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের দেখা হয়।

গদাধরের পাটবাড়ি — ঠাকুর শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত এখানে দর্শনাদির জন্য গিয়াছিলেন।

কোন্নগর — এই গ্রামের জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরাদি দর্শন ও শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ও কীর্তনাদি শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের আগ্রহে শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকবার এখানে শুভাগমন করিয়াছিলেন। এই স্থানের পণ্ডিত দীনবন্ধু ন্যয়রত্ন, শ্রীযুক্ত নবাই চৈতন্য এবং তঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মনোমোহন মিত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ অনুরাগী ও পরমভক্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীরামপুর-মাহেশ — এই স্থানের জগন্নাথদেবের মন্দির বিখ্যাত। স্নানযাত্রা ও রথযাত্রায় খুব ভিড় হয়। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তসঙ্গে দেবদর্শনে বিশেষত রথযাত্রায় অনেকবার এখানে আসিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিতে উল্লেখ আছে একবার মনোমোহন মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের ভ্রাতা গিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর সেবক লাটুসহ এখানে আসিয়া দেবদর্শন করেন।

বল্লভপুর — শ্রীশ্রীঠাকুর মাহেশের নিকটবর্তী বল্লভপুরে শ্রীশ্রীবল্লভজীর দর্শনে আসিতেন। মনোমোহন মিত্র, গিরীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই মন্দির দর্শনের কথা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিতে উল্লিখিত আছে।

ভদ্রকালী — দক্ষিণেশ্বরের অপরপারে ভদ্রকালী গ্রাম অবস্থিত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিতে আছে পাঁচালী গায়ক শিবু আচার্যের গান শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর মুগ্ধ হইলে শিবু তাঁহার ভক্তিমান শ্বশুরের বাড়ি ভদ্রকালী গ্রামে শ্রীশ্রীঠাকুরকে একবার শুভাগমন করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। তদনুসারে অনেক ভক্ত সঙ্গে একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর এই গ্রামে শুভাগমন করিয়া সকলকে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ও কীর্তনাদি দ্বারা আনন্দদান করেন এবং এই ভক্তিমান ব্রাহ্মণের গৃহে ভক্তগণসঙ্গে আহারাদি করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এখানে সামাধ্যায়ী নামক এক পণ্ডিতের সহিত মহিম

চক্রবর্তীর বিচারকালে পণ্ডিত যখন কোন কথা স্বীকার করিতেছিলেন না, তখন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া তাঁহার নাস্তিক ভাব দূর করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন।

বালী — কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে হরিসভায় — শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ভগবৎ লীলাবিষয়ক কীর্তন বা যাত্রা শ্রবণের জন্য হরিসভা প্রভৃতি অনেক স্থলে গিয়াছিলেন। বালীতে ভক্ত কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে হরিসভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্তনে যোগ দিয়াছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিতে উল্লিখিত আছে।

বেলুড় — নেপালের কাঠের গুদাম — শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতকার শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলিতেন শ্রীশ্রীঠাকুর কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের অনুরোধে নেপালের কাঠের টালে (গুদাম), একবার আসিয়াছিলেন। তখন কাপ্তেনের এই কাঠের গুদাম ও গদী বর্তমান বেলুড় মঠের জমির উপর অবস্থিত পুরাতন মঠবাড়ি বলিয়া পরিচিত বাড়িটির সংলগ্ন উত্তরের একতলা অংশে ছিল। ইহা শ্রীমদর্শন ১৫শে খণ্ডে উল্লিখিত আছে। মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীবৃন্দও মাস্টারমহাশয়ের কাছে একথা শুনিয়াছিলেন। মাস্টারমহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরের নিজমুখে একথা শুনিয়াছিলেন।

আলমবাজার — রাম চাটুজ্যের বাড়ি — দিব্যোন্মাদ অবস্থায় ঠাকুর কখন কখনও এই বাড়িতে আসিয়া আহার করিতেন। বিষ্ণুমন্দিরের পূজারী রাম চাটুজ্যে অন্য ব্যক্তি। তিনি দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতেন।

নটবার পাঁজার বাড়ি — দক্ষিণেশ্বরের পার্শ্বে আলমবাজারে তাঁহার বাড়িতে ঠাকুর গিয়াছিলেন। (শ্রীমদর্শন — ১৫শ খণ্ড)

কবিরাজ ঈশানচন্দ্র মজুমদারের বাড়ি — মাস্টারমহাশয়ের ভগ্নীপতি ঈশানচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার বরাহনগরের বাড়িতে ঠাকুর শুভাগমন করিয়াছিলেন (শ্রীমদর্শন)

কথক ঠাকুরদাদার বাড়ি — বরাহনগর কুঠিঘাট রোড নিবাসী পরম ভক্ত নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কথকতায় দক্ষ ছিলেন বলিয়া জনগণের নিকট কথকঠাকুর বা ঠাকুরদাদা নামে পরিচিত ছিলেন। কথামৃতেও তিনি ঠাকুরদাদা নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। ঠাকুর এই বাড়িতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। (শ্রীমদর্শন — ১৫শে খণ্ড)

মণি মল্লিকের বাগানবাড়ি — বরাহনগরের এই বাগানবাড়িতে ঠাকুর আহার করিয়াছিলেন। এখানে মধ্যে মধ্যে আসিতেন।

জয় মিত্রের কালীবাড়ি — গঙ্গার ধারে বরাহনগরে ভক্তপ্রবর জয় মিত্রের কৃপাময়ী কালীমন্দিরে ঠাকুর শুভাগমন করিয়াছিলেন বলিয়া কোন কোন গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

ভাগবত আচার্যের পাটবাড়ি, বরাহনগর — বৈষ্ণবদের বিখ্যাত এই পাটবাড়িতে ঠাকুরের শুভাগমন হইয়াছিল। শ্রীম-দর্শন গ্রন্থের পঞ্চদশ ভাগে ইহার উল্লেখ আছে। যেহেতু ঠাকুর বরাহনগর অঞ্চলের অধিকাংশ দেবালয়েই যাতায়াত করিয়াছিলেন সেজন্য এই পবিত্র আশ্রমে তাঁহার আগমন স্বাভাবিক। শ্রীরঘুনাথ

উপাধ্যায় একবার এই স্থানে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকে তাঁহার ভজন কুটিরে ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার পাঠে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ‘ভাগবতাচার্য’ উপাধি দিয়াছিলেন।

ভাগবত পণ্ডিতের বাড়ি — ভাগবত পাঠ শুনিবার আগ্রহে ঠাকুর প্রথম জীবনে দক্ষিণেশ্বর হইতে বরাহনগরে এক ভাগবত পণ্ডিতের বাড়িতে নিত্য সন্ধ্যার সময় আসিতেন। ইহার উল্লেখ ‘বরাহনগর-আলমবাজার মঠ’ পুস্তকে আছে।

সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির — বরাহনগর বাজারের নিকট সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শুভাগমন করিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত পুস্তকে ইহার উল্লেখ আছে।

প্রামাণিকদের ব্রহ্মময়ী কালীমন্দির — বরাহনগরের প্রামাণিক ঘাট রোডের উপর দে-প্রামাণিক বংশীয়দের প্রাচীন কালীমন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন। ভবতারিণী মূর্তির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে; সেইজন্য এই মূর্তি ‘মাসিমা’ বলিয়া পরিচিত। পূর্বোক্ত পুস্তকে উল্লিখিত।

বরাহনগরে (প্রকৃতপক্ষে কাশীপুরে) কুঠিঘাটের দশমহাবিদ্যার মন্দির — শ্রীশ্রীঠাকুর মথুরবাবুর সহিত এই দেবালয় দর্শন করিতে আসিয়া ৺দেবীর ভোগের জন্য মাসিক বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্তী কালেও তিনি মধ্যে মধ্যে এখানে দর্শন করিতে আসিতেন।

ফাগুর দোকান — বরাহনগর বাজারে রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে ফাগুর প্রসিদ্ধ খাবারের দোকান ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর ফাগুর দোকানের কচুরি ভালবাসিতেন।

বর্তমানে সেখানে কয়েকটি মনোহারী দোকান ও একটি খাবারের দোকান (মুখরুচি) হইয়াছে।

বেলঘরিয়া —— জয়গোপাল সেনের বাগান বাড়ি (তপোবন) — শ্রীশ্রীঠাকুর হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া বেলঘরিয়ায় এই বাগান বাড়িতে (৮ নং বি. টি. রোড) আগমন করিয়া কেশবের সহিত প্রথম দেখা করেন এবং তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া প্রীত হল। এই সময় হইতে উভয়ের মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গতার সূচনা (১৫-৩-১৮৭৫)। আবার ১৪-৫-১৮৭৫ তারিখে ঠাকুর বেলঘরিয়ায় আসিয়া কেশবের সহিত ধর্মালোচনা করেন। এই সময়ে ধর্মতত্ত্ব নামে মাসিক পত্রিকায় ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বাহির হয়। ১৫-৯-১৮৭৯ তারিখে ব্রাহ্মসমাজের ভাদ্রোৎসবের সময় কেশবের নিমন্ত্রণে ঠাকুর আর একবার বেলঘরিয়ায় এই তপোবনে যান।

দেওয়ান গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি —— শ্রীশ্রীঠাকুর ১৮-২-১৮৮৩ তারিখে তাঁহার বেলঘরিয়ার বাড়িতে আসিয়াছিলেন। সেই দিন নামসংকীর্তন, ভজন, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ইত্যাদি ভক্তদের সঙ্গে করিয়াছিলেন। এইদিন হরিপ্রসন্ন (পরবর্তী কালে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) তাঁহাকে ভাবসমাধিস্থ অবস্থায় দর্শন করিয়াছিলেন।

কামারহাটী —— গোপালের মার বাড়ি —— গোবিন্দ দত্তের রাধাকৃষ্ণ মন্দির —— পটলডাঙ্গার গোবিন্দচন্দ্র দত্তের এই ঠাকুর বাড়ি, কামারহাটীতে গোপালের মা বাস করিতেন। তিনি এখানে নিয়মিত ধ্যান, জপ, গঙ্গাস্নানাদি এবং ইষ্ট দেবতা গোপালের সেবা করিতেন। ৬২ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাতের পর তাঁহার ইষ্ট দর্শন ও ভাবে দিব্যদর্শনাদি হইয়াছিল। ঠাকুর রাখালচন্দ্রের (স্বামী

ব্রহ্মানন্দের) সহিত একবার কামারহাটীতে গিয়া গোপালের মার সেবা গ্রহণ করেন। ইহার পূর্বেও দত্ত গৃহিণীর নিমন্ত্রণে ঠাকুর এই ঠাকুরবাড়িতে আসিয়াছিলেন।

পানিহাটী — দক্ষিণেশ্বরের উত্তরে গঙ্গাতীরে পানিহাটী। নিত্যানন্দ প্রভুর নির্দেশে বৈষ্ণব রঘুনাথ দাস এখানে জৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে (মহাপ্রভুর উপদেশ অমান্য করার অপরাধের দণ্ড স্বরূপ) এই চিঁড়ার উৎসবের সূচনা। সেইজন্য ইহাকে দণ্ড মহোৎসব বলা হয়। রঘুনাথ দাসের পর পানিহাটী নিবাসী রাঘব পণ্ডিত এই উৎসব করিতেন বলিয়া ইহাকে রাঘব পণ্ডিতের চিঁড়ার মহোৎসবও বলা হইয়া থাকে। পরবর্তী কালে পানিহাটীর সেন পরিবার এই উৎসব করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকবার এই উৎসবে যোগদান করেন।

মণিমোহন সেনের বাড়ি ও ঠাকুরবাড়ি — পানিহাটীর উৎসবে যোগদান কালে তাঁহার বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুর শুভাগমন করিতেন ও তাঁহাদের ঠাকুরবাড়ি দর্শন করিতেন।

রাঘব পণ্ডিতের বাটী — পানিহাটী-মহোৎসবে যোগদান কালে কীর্তন দলের সহিত ভাবে নৃত্য ও গান করিতে করিতে ঠাকুর এখানে আসিতেন।

মতিশীলের ঠাকুরবাড়ি ও ঝিল — ১৮-৬-১৮৮৩ তারিখে ঠাকুর সদলবলে পানিহাটীর মহোৎসবে হইতে ফিরিবার পথে সন্ধ্যার সময় এই ঠাকুরবাড়ি ও ঝিল দর্শন করেন।

খড়দহ — শ্যামসুন্দর মন্দির — উত্তর-চব্বিশ পরগণা জেলার খরদহ রেলস্টেশন হইতে দুই মাইল পশ্চিমে গঙ্গার পূর্বকূলে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরের মন্দির। ঠাকুর একবার দক্ষিণেশ্বর হইতে প্রভু নিত্যানন্দ বংশীয় গোস্বামীর সহিত আগমন করিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও প্রসাদী ভোগ গ্রহণ করিতেন।

ব্যারাকপুর — চানকে অন্নপূর্ণা মন্দির — ব্যারাকপুরের দক্ষিণে গঙ্গাতীরবর্তী চানকে এই মন্দির ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল মথুরবাবুর ভক্তিমতী স্ত্রী শ্রীমতী জগদম্বা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরমধ্যে ৺অন্নপূর্ণাবিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠা কার্যের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর সেখানে গিয়াছিলেন।

তীর্থাদি ও অন্যান্য স্থান

আঁটপুর — এই গ্রামের জমিদার শ্রীরামপ্রসাদ মিত্র কলিকাতায় ঝামাপুকুরে একটি ভাড়াবাড়িতে থাকিতেন। সেই সময় (১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ) শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার অগ্রজ রামকুকারের টোলে থাকিতেন ও মিত্রমহাশয়ের বাসাতে প্রায়ই যাইতেন। মিত্রমহাশয়ের পুত্রদ্বয় শ্রীকালীচরণ (কালু) ও শ্রীউমাচরণ (ভুলু)-র সহিত তাঁহর বিশেষ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। সেই সূত্রেই ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে খুব সম্ভবত দুর্গাপূজায় নিমন্ত্রিত হইয়া গদাধর আঁটপুরে গিয়াছিলেন। এই গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রামের নাম তড়া। সেইজন্য তখন ইহাকে তড়া-আঁটপুর বলা হইত। বাবুরাম (পরবর্তীকালে স্বামী প্রেমানন্দ) যখন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করেন, তখন তাঁহার বাড়ি তড়া-আঁটপুরে জানিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, ‘তবে তো তোমাদের দেশেও একবার গেছি।’

জয়রামবাটী — শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মস্থান। বিষ্ণুপুর রেলওয়ে স্টেশন হইতে সাতাশ মাইল দূরে আমোদর নদের পার্শ্বে এই গ্রাম অবস্থিত। কলিকাতা হইতে সোজাপথে তারকেশ্বর হইয়া তেষট্টি মাইল। এখানে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর, অগ্রাহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মাতা শ্যামা সুন্দরী দেবীর গৃহে শ্রীশ্রীমা আবির্ভূতা হন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসের প্রথমার্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত তাঁহার শুভ বিবাহ হয়। বিবাহের পরও ঠাকুর কয়েকবার এখানে আসিয়াছিলেন। বর্তমানে মায়ের জন্মস্থানের উপর এপটি প্রশস্ত মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিত্যপূজা ও উৎসবাদিতে বিশেষ পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

ভানু পিসীর বাড়ি — জয়রামবাটীতে পিত্রালয়ে বৈধব্য অবস্থায় বাস কালে ভানু পিসী শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিজ ইষ্টরূপে দর্শন করেন। ঠাকুর একদিন তাঁহার বাড়িতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ভানু পিসীর প্রকৃত নাম মান গরবিনী। শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে পিসী সম্বোধন করিতেন বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার নাম দিয়াছিলেন ভানু পিসী।

সিংহবাহিনীর মন্দির — জয়রামবাটীতে এই প্রাচীন মন্দিরে শ্রীশ্রীমা তাঁহার কঠিন আমাশয় রোগের উপশমের জন্য ‘হত্যা’ দিয়াছিলেন এবং ’সিংহবাহিনীর ঔষধে আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন। সেই অবধি এই দেবীর মাহাত্ম্য আরও প্রচার লাভ করে।

শিহড় — শ্রীশ্রীঠাকুরের পিসতুত ভগিনী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র হৃদয়রামের বাড়ি। শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে কয়েকবার আসিয়াছিলেন। ইহা কামরপুকুর গ্রামের

প্রায় পাঁচ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। একবার পালকিতে কামারপুকুর হইতে শিহড় গ্রামে যাওয়ার সময় ঠাকুর দেখিয়াছিলেন তাঁহার দেহ হইতে দুইটি কিশোর বয়স্ক সুন্দর বালক বাহির হইয়া মাঠের মধ্যে বনপুষ্পাদি অন্বেষণ, কখনও বা পালকির নিকটে আসিয়া হাস্য পরিহাস, কথোপকথনাদি করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত এইরূপ আনন্দ করিয়া তাহারা পুনরায় তাঁহার দেহে প্রবেশ করিল। ভৈরবী ব্রাহ্মণী এই দর্শনের কথা পরবর্তী কালে ঠাকুরের নিকট শুনিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'এইবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব — শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীচৈতন্য এইবার একসঙ্গে একাধারে আসিয়া তোমার ভিতরে রহিয়াছেন।'

বিষ্ণুপুর — ৺মৃন্ময়ী মন্দির — ঠাকুর একবার কামারপুকুর হইতে শিহড়ে হৃদয়ের গৃহে অবস্থানকালে একটি মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে বিষ্ণুপুর আদালতে গিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মামলা আপসে মিটিয়া যাওয়ায় সাক্ষ্য দিতে হয় নাই। সেই সময় ঠাকুর বিষ্ণুপুর শহরের লালবাঁধ ইত্যাদি দীঘি, অনেক দেব-মন্দির ইত্যাদি দেখিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজাদের প্রতিষ্ঠিত ৺মৃন্ময়ী দেবী অত্যন্ত জাগ্রতা ছিলেন। ওই সময়ে ভাবাবেশে ঠাকুরের যে দেবী মূর্তির দর্শন হইয়াছিল তাহা বহুপূর্বেই ভগ্ন হওয়ার পরে নূতন মূর্তি মন্দিরে স্থাপিত হইয়াছিল। ভাবে দৃষ্ট দেবী মূর্তির মুখখানি এই নূতন মূর্তির মুখের ন্যায় ছিল না। পুরাতন মূর্তির মুখটি এক ব্রাহ্মণের গৃহে সযত্নে রক্ষিত ছিল। পরে অন্যমূর্তি গড়াইয়া এই মুখটি উহাতে সংযোজিত করিয়া লালবাঁধের পার্শ্বে অন্য মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং ইহার নিত্যপূজাদি হইতে থাকে।

বর্ধমান — কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বর যাতায়াতের পথে ঠাকুর কখনও কখনও বর্ধমান হইয়া গমনাগমন করিতেন।

কালনা — ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রম — মথুরবাবুর সহিত শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে শুভাগমন করিয়াছিলেন। এখানে ভগবানদাস বাবাজীর সহিত তাঁহার মিলনের ফলে বাবাজী তাঁহাকে যথার্থ মহাপুরুষ বলিয়া বুইতে পারিয়াছিলেন।

নদীয়া — নবদ্বীপ ধাম — শ্রীশ্রীঠাকুর মথুরবাবুর সহিত নবদ্বীপ ধাম দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর দেবভাবের প্রকাশ নবদ্বীপে বহু গোঁসাইর বাড়িতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কিছুই অনুভব না হওয়ায় দুঃখিত হন। ফিরিবার কালে নৌকাতে উঠিবার সময় এক অদ্ভুত দিব্যদর্শন হয়। দিব্যদর্শনটি এইরূপ — দুইটি সুন্দর কিশোর তপ্তকাঞ্চনের মতো রঙ, মাথায় একটি করিয়া জ্যোতিমণ্ডল, হাত তুলিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার দিকে আকাশ পথ দিয়া ছুটিয়া আসিতেছিল। ঠাকুর চিৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, ‘ওই এলোরে, ওই এলোরে!’ তাঁহারা নিকটে আসিয়া ঠাকুরের দেহে প্রবেশ করায় ঠাকুর বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলাস্থান পুরাতন নবদ্বীপ গঙ্গাগর্ভে লীন হইয়াছে।

কলাইঘাট — রানাঘাটের নিকট এই স্থানে মথুরবাবুর জমিদারি মহল দেখিতে গিয়া কলাইঘাটবাসী স্ত্রী-পুরুষগণের দুর্দশা ও অভাব দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর দুঃখে কাতর হন এবং মথুরবাবুর দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে এক-মাথা তেল, এক-একখানি নূতন কাপড় ও পেট ভরিয়া একদিনের ভোজন দান করাইয়াছিলেন।

সোনাবেড়ে — সাতক্ষীরার নিকট সোনাবেড়ে গ্রামে মথুরবাবুর পৈত্রিক ভিটা ছিল। ইহার সন্নিহিত গ্রামগুলিও তাঁহার জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া মথুরবাবু ওইস্থানে গমন করিয়াছিলেন।

তালমাগরো — সোনাবেড়ের অনতিদূরে এই গ্রামে মথুরবাবুর গুরুগৃহ ছিল। গুরুবংশীয়দিগের আমন্ত্রণে মথুরবাবু তথায় গিয়াছিলেন। এই সময়ে ঠাকুর ও হৃদয়কে হস্তীপৃষ্ঠে বসাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং সেখানে কয়েকসপ্তাহ কাটাইয়াছিলেন।

দেওঘর — ৺বৈদ্যনাথ ধাম — শ্রীশ্রীঠাকুর দুইবার এখানে আসিয়াছিলেন ৺কাশীধাম গমনের পথে। প্রথমবার ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। সে সময়কার বিবরণ কিছু জানা যায় না। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারির শেষদিকে মথুরবাবু তাঁহাকে লইয়া এখানে আসিয়াছিলেন। সে সময় হৃদয় তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। ৺বৈদ্যনাথ মহাদেবের পূজা ও দর্শনাদি করিয়া কয়েকদিন এই তীর্থে অবস্থান করিয়াছিলেন। সে সময় একদিন একটি পল্লীর দরিদ্র লোকদের দুঃখ দুর্দশা দর্শনে ঠাকুর অত্যন্ত বিচলিত হইয়া মথুরবাবুকে বলিলেন, ‘তুমি তো মার দেওয়ান, এদের এক-মাথা করে তেল আর একখানা করে কাপড় দাও, আর পেট ভরে একদিন খাইয়ে দাও।’ মথুর উত্তরে বলিয়াছিলেন, ‘বাবা তীর্থে অনেক খরচ হবে, এও দেখছি অনেক লোক; এদের খাওয়াতে হলে অনেক টাকা লাগবে — এ অবস্থায় কি বলেন?’ ‘দূর শালা তোর কাশী তাহলে আমি যাব না, আমি এদের কাছেই থাকব; এদের কেউ নেই এদের ছেড়ে যাব না।’ — এই বলিয়া ঠাকুর কাঁদিতে কাঁদিতে লোকগুলির মধ্যে গিয়া বসিয়া পড়িলেন। মথুরবাবু তখন কলিকাতায়

লোক পাঠাইয়া অনেক কাপড় আনাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছানুযায়ী লোকগুলির সেবা করিয়াছিলেন।

৺কাশীধাম — শ্রীশ্রীঠাকুর দুইবার এই তীর্থে আগমন করিয়াছিলেন কথামৃতে উল্লিখিত আছে। একবার ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। সঙ্গে তাঁহার মা, শ্রীরাম চাটুজ্যে ও মথুরবাবুর কয়েকজন পুত্র। সে সময় কাশী পর্যন্ত রেলপথে যাতায়াত সবে শুরু হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের তখন সাধনাবস্থার ৫/৬ বৎসরের মধ্যে। সে সময় তিনি প্রায়ই সমাধিস্থ অথবা ভাবে মাতোয়ারা হইয়া থাকিতেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার ৺কাশী দর্শনকালে সঙ্গে মথুরবাবু ও তাঁহার স্ত্রী জগদম্বা দাসী ছিলেন। হৃদয়ও সঙ্গে ছিলেন। এ সময়ে মথুরবাবু তাঁহার সঙ্গে শতাধিক ব্যক্তিকে লইয়া আসিয়াছিলেন। কেদার ঘাটের নিকট দুইটা ভাড়া বাড়িতে তাঁহারা ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবচক্ষে ৺কাশীধামকে স্বর্ণময়রূপে দেখেন।

ঠাকুর ৺কাশীতে ত্রৈলঙ্গস্বামীর দর্শন লাভ করেন। নিজের হাতে ঠাকুর একদিন তাঁহাকে পায়েস খাওয়াইয়াছিলেন। ৺কাশীতে একদিন নানকপন্থী সাধুদের মঠে নিমন্ত্রিত হইয়া ঠাকুর গিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে মুখ করিয়া অল্পবয়স্ক এক সাধু গীতা পাঠ করিয়াছিলেন। সেই সাধু ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন 'কলিযুগে নারদীয় ভক্তি।' ৺কাশীতে একদিন ভৈরব-ভৈরবীদের চক্রে আহূত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর গিয়াছিলেন। ৺কাশীর মদনপুরা পল্লীতে শ্রীশ্রীঠাকুর বীণাবাদক মহেশচন্দ্র সরকারের বাড়িতে তাঁহার বীণা বাদন শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। চৌষট্টি যোগিনী ঘাটের নিকট যোগেশ্বরী ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে (শ্রীশ্রীঠাকুরের তন্ত্র সাধনার গুরু) দেখিয়া ঠাকুর তাঁহার মনোবেদনা দূর করিয়া ৺বৃন্দাবনে লইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আজ্ঞায় মথুরবাবু এখানে একদিন কল্পতরু হইয়া

নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য বস্ত্র, কম্বল, পাদুকা প্রভৃতি যে যাহা চাহিয়াছিল, দান করিয়াছিলেন। মথুরবাবুর অনুরোধে ঠাকুর একটি কমণ্ডলু চাহিয়া লইয়াছিলেন।

প্রয়াগ ও ত্রিবেণী — শ্রীশ্রীঠাকুর ১৮৬৩ খ্রী: ও ১৮৬৮ খ্রী: দুইবার প্রয়াগে তীর্থদর্শনে আসিয়াছিলেন। মথুরবাবুর সহিত ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ৺কাশী ধাম হইতে প্রয়াগে আসিয়া গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে স্নান ও ত্রি-রাত্রি বাস করিয়াছিলেন।

৺শ্রীবৃন্দাবন ও মথুরাধাম — ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগ হইতে কাশীতে ফিরিয়া এক পক্ষকাল পরে শ্রীশ্রীঠাকুর মথুরবাবুর সঙ্গে ৺বৃন্দাবন ও মথুরাধামে আগমন করিয়াছিলেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণীকেও তিনি কাশী হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণী ৺বৃন্দাবন ধামে শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়া এখানেই দেহত্যাগ করেন। বিভিন্ন সময়ে কথামৃতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার মথুরা ও বৃন্দাবনের পথে মথুরায় নামিয়া তাঁহারা লীলাস্থানসমূহ দর্শন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ধ্রুব ঘাটে বসুদেবের কোলে শিশু কৃষ্ণের যমুনা পার হওয়া ভাবচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। এখানে স্বপ্নে রাখালকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে আসিয়া তিনি শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরের নিকট বাড়িতে — চৈতন্য ফৌজদার কুঞ্জে ছিলেন। বৃন্দাবনে ফিরতি গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ গোপালবালকদের সহিত ধেনু লইয়া যমুনা পার হইতেছেন — ভাবচক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন করিয়া বিহ্বল হইতেন। ৺গোবিন্দজীর মন্দির দর্শন করিবার পর পুনরায় গোবিন্দজীকে দেখিতে চাহেন নাই। ৺বঙ্কুবিহারীকে দেখিয়া ভাব হইয়াছিল। গোবর্ধন গিরি দেখামাত্রই ছুটিয়া উহার উপর উঠিয়া বিহ্বল ও বাহ্যশূন্য হন। পাণ্ডারা ধীরে ধীরে নামাইয়া আনিয়াছিল। পালকি করিয়া ৺শ্যামকুণ্ড ও ৺রাধাকুণ্ড দর্শনে হৃদয়ের সঙ্গে গিয়াছিলেন। পালকিতে ভাবাবেগে বিহ্বল হইয়া অনেক সময় পালকি হইতে

লাফাইয়া পড়িতে চাহেন। হৃদয় বেহারাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন ও তাহাদের খুব সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। এইসব লীলাস্থলের পথে কৃষ্ণের বিরহে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখের জলে কাপড় ভিজিয়া যাইত। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন, ‘সেইসব আছে, কৃষ্ণরে তুই কোথায়।’

নিধুবনে গঙ্গামাতার দর্শনলাভ করেন। গঙ্গামাতাজী শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে শ্রীরাধার প্রকাশ দেখিয়া তাঁহাকে ‘দুলালী’ বলিয়া সম্বোধন করিতেন ও তাঁহাকে নানাভাবে সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি আকর্ষণে শ্রীশ্রীঠাকুর বৃন্দাবন ছাড়িয়া আর কোথাও যাইবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু মথুরবাবু ও হৃদয়ের অনুরোধে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা চন্দ্রাদেবীর শোক-তাপের কথা মনে পড়ায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে এক পক্ষকাল অবস্থানের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর অধিকাংশ সময় ভাবাবেগে বিহ্বল হইয়া থাকিতেন বলিয়া পদব্রজে দর্শনাদি করিতে পারিতেন না। পালকিতেই তাঁহাকে যাইতে হইত। এমনকি যমুনাতেও স্নানের সময়ও পালকিতে বসিয়া স্নান করিতেন।

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী স্থান

নাথের বাগান — এই স্থান কলিকাতার শোভাবাজার অঞ্চলে অবস্থিত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের সহিত ১৭ বৎসর বয়সে গদাধর এখানে কিছুদিন ছিলেন।

ঝামাপুকুর — গোবিন্দ চাটুজ্যের বাড়ি — গোবিন্দ চাটুজ্যের বাড়ি — বাড়ির ঠিকানা ৬১ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকতা-৯। এই বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুর (তখন গদাধর) কিছুদিন বাস করিয়া দেবদেবীর পূজা করিতেন। বর্তমানে ঝামাপুকুরে যে

রাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে, তখন এই মন্দিরের রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ গোবিন্দ চাটুজ্যের বাড়িতে পূজা পাইতেন। বাড়িটি একতলা এবং খুবই পুরাতন।

দিগম্বর মিত্রের বাড়ি — ঝামাপুকুরে অবস্থান কালে গদাধর এই বাড়িতে ৺নারায়ণ পূজা করিতেন। সেজন্য নিত্যই তাঁহাকে এখানে আসিতে হইত। দিগম্বর মিত্রের এই বিরাট প্রাসাদের অধিকাংশই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। দিগম্বর মিত্রের এই বাড়িটি 'ঝামাপুকুর রাজবাড়ি' নামে খ্যাত। ঠিকানা: ১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলি-৯।

ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি — ঝামাপুকুরে বাসকালে গদাধর এই মন্দিরের মা সিদ্ধেশ্বরী কালী দর্শনে আসিতেন এবং দেবীকে গান শুনাইতেন। পরবর্তী কালেও এই মন্দিরে অনেকবার আসিয়া দেবীদর্শন ও পূজাদি দিয়াছিলেন। এই মন্দির ১১১০ বঙ্গাব্দে মহাত্মা শঙ্কর ঘোষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই ভক্ত শঙ্কর ঘোষই দেবীর মাটির মূর্তির বদলে প্রস্তর মূর্তি স্থাপন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ স্বামী সুবোধানন্দজী এই শঙ্কর ঘোষের প্রপৌত্র। শঙ্কর ঘোষের বংশধরগণই এখন এই কালীমাতার সেবাইত। ঠিকানা: ২২০।২ বিধান সরণি, কলিকাতা - ৬।

ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠী — ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ঝামাপুকুরে ছাত্রদের পড়াইবার জন্য রামকুমার (ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) এই টোল বা চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। সাংসারিক অভাব অনটনের জন্য তাঁহাকে কলিকতায় আসিয়া এই কাজ করিতে হইয়াছিল। বর্তমানে এই টোলের কোন অস্তিত্ব নাই। সেই ভিটাতেই রাধাকৃষ্ণের মন্দির স্থাপিত হইয়া নিত্যপূজা হয়। ঠিকানা — ৬১ নং বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৯।

ঠাকুরের দাদার বাসা — এই বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে একই সারিতে একটু পূর্বে ৩/৪ টি বাড়ির পরে ঠাকুর দাদার সহিত একই বাসাতে থাকিতেন। খোলার বাড়ি ছিল। লাহাদের বাড়ির বিপরীত দিকে রাস্তার উত্তরে উহা অবস্থিত ছিল। এখন সে সব বাড়ি ভাঙ্গিয়া বড় পাকা বাড়ি হইয়াছে।

নকুর বাবাজীর দোকান — গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের এই দোকানে ঠাকুর ঝামাপুকুরে অবস্থানকালে অনেক সময়ে গিয়া বসিতেন। বৈষ্ণব নকুড় বাবাজী কামারপুকুর অঞ্চলের লোক ছিলেন।

স্বামী সুবোধানন্দের বাড়ি — ঝামাপুকুরে অবস্থানকালে সুবোধের (পরবর্তী কালে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ স্বামী সুবোধানন্দ) ঠনঠনিয়ার বাড়িতে কয়েকবার গিয়াছিলেন। তখন সুবোধের জন্ম হয় নাই। পরবর্তী কালে সুবোধ ছাত্রাবস্থায় প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের দর্শনের জন্য গেলে তিনি বলিয়াছিলেন, ‘যখন ঝামাপুকুরে ছিলুম তোদের সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, তোদের বাড়িতে কতবার গেছি। তুই তখন জন্মাসনি।’ প্রথমে এই বাড়ির নম্বর ছিল ২৩ নং শঙ্কর ঘোষ লেন। এখন নম্বর হইয়াছে ৮১ নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯। এই বাড়িটি দোতলা ও অতি প্রাচীন। এই বাড়িতেই স্বামী সুবোধানন্দের জন্ম হইয়াছিল। এখানেই শ্রীশ্রীঠাকুর আসিতেন।

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি — ১৯ নং কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, শ্রীশ্রীঠাকুরের এই বাড়িতে দুইবার শুভাগমন করিয়াছিলেন। ঈশানবাবুর বাড়িতে তাঁহার দ্বিতীয়

পুত্র শ্রীশচন্দ্রের সহিত ঠাকুরের আলাপ হইয়াছিল ২৫-৬-১৮৮৪ তারিখে। এখান হইতে ঠনঠনিয়ার শশধর পণ্ডিতকে দেখিতে যান।

রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ি — গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের মোড়ে ১৪ নং বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৯, ঠনঠনে, বেচু চ্যাটার্জীর স্ট্রীটে তাঁহার বাড়ি। ১০-১২-১৮৮১ তারিখে ঠাকুর এখানে শুভাগমন করিয়া ভাবে নৃত্যভজন ও ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনও ওইদিন উপস্থিত ছিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বাড়ি — ২৭ নং ঝামাপুকুর লেনের ভাড়াটিয়া বাড়িতে (মেছুয়া বাজার যাইতে বামদিকে) বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী থাকিতেন। তাঁহার অসুখের সময় ঠাকুর তাঁহাকে দেখিতে এই বাড়িতে আসিয়াছিলেন।

নববিধান ব্রাহ্মসমাজ, মেছুয়াবাজার — ৯৫ নং কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকতা-৯। এখানে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায়ই আসিতেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ নেতা আচার্য কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার অনুগামীদের মধ্যে মত বিরোধের ফলে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে পৃথক ভাবে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পরবর্তী নামই নববিধান ব্রাহ্মসমাজ। সমাজমন্দিরটি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

কেশব সেনের বাড়ি — 'লিলি কটেজ' (কমল কুটির) — মেছুয়াবাজার ও সারকুলার রোডের মোড়ে ইহা অবস্থিত। এখানে ঠাকুর কয়েকবার আসিয়াছিলেন। এই বাড়ির উপরের ঠাকুর ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে কেশব সমাদরে বসাইতেন। এইখানেই শ্রীশ্রীঠাকুরের দণ্ডায়মান অবস্থায় সমাধিস্থ ফটো তোলা হয়। বর্তমান ঠিকানা ৭৮/বি, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, রাজাবাজার, কলি-৯।

ড: বিহারীলাল ভাদুড়ীর বাড়ি —— তাঁহার বাড়ি ছিল কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে। ঠাকুর সিমলায় মনোমোহন মিত্র ও রাম দত্তের বাড়িতে আসিলে এই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক তাঁহাকে একবার নিজ বাড়িতে কিছুক্ষণের জন্য লইয়া গিয়াছিলেন।

জ্ঞান চৌধুরীর বাড়ি —— সিমুলিয়ায় তাঁহার বাড়িতে আয়োজিত ব্রাহ্ম সমাজের মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর শুভাগমন করিয়া কেশবাদি ব্রাহ্ম ভক্তগণের সঙ্গে ১-১-১৮৮২ তারিখে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, নৃত্য গীত ইত্যাদি করিয়াছিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ —— পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, আচার্য বিজয়কৃষ্ণ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্রাহ্ম নেতাদের প্রতিষ্ঠিত ঠনঠনে অঞ্চলে (২১১ বিধান সরণী) অবস্থিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে কয়েকবার শুভাগমন করিয়াছিলেন। নববিধান তথা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি এবং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে সমাজমন্দিরের প্রতিষ্ঠা।

বাদুড়বাগানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাড়ি —— বর্তমানে ৩৬ নং বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে মাস্টারমহাশয়ের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। বর্তমানে সেই বাড়ির পূর্বাবস্থা নাই।

বাদুড়বাগানে নবগোপাল ঘোষের বাড়ি —— শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার বাদুড় বাগনের বাড়িতে একদিন মহোৎসব উপলক্ষে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের চণ্ডীমণ্ডপে ভাগবত পাঠ পদাবলী কীর্তন শ্রবণ করিয়া কীর্তন মধ্যে

ত্রিভঙ্গমুরলীধারী হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। নবগোপালবাবু ঠাকুরের সেইদিন ভুবনমোহন রূপ দর্শন করিয়াছিলেন।

আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে লং সাহেবের গির্জা — হোলি ট্রিনিটি চার্চ (বর্তমান ঠিকানা ৩৩/বি, রামমোহন সরণি।) মধ্যে কলিকাতার বৈঠকখানা অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্মের প্রোটেষ্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের বিরাট গির্জা। ভক্ত মথুরবাবুর সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে শুভাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর খ্রীষ্টের ভাবে তিনদিন দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানের সময় পঞ্চবটী তলায় যীশু খ্রীষ্টের দর্শন লাভ করেন। তাঁহার শরীরে যীশুর প্রবেশ পূর্বক লীন হওয়া প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি সমাধিস্থ হন। এই সময় ৺জগদম্বার নিকট খ্রীষ্টান ভক্তদের উপাসনা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা জানান এবং তাঁহাদের উপাসনা দেখিতে ওই চার্চে শুভাগমন করেন। (শ্রীমদর্শন ১১/৫ দ্রষ্টব্য)

কাছি বাগান (মানিকতলা) — শ্যামবাজারের নিকটবর্তী কাছি বাগান নামক স্থানে বৈষ্ণবদের 'নবরসিক' সম্প্রদায়ের আখড়ায় বৈষ্ণবচরণ গোস্বামী ঠাকুরকে একবার লইয়া গিয়াছিলেন। এখানকার সাধিকারা ঠাকুরকে ইন্দ্রিয় জয়ী কিনা পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অটুট সহজ বলিয়া সম্মান দেখাইয়াছিলেন।

কাঁকুড়গাছি — সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের উদ্যানবাটী — শ্রীশ্রীঠাকুর ১৬-১২-১৮৮৩ তারিখে রামবাবুর উদ্যানবাটী হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন। বর্তমানে এইস্থানে সাধারণের বসতি স্থাপন হইয়াছে। ১৫-৬-১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এই বাগানে মহোৎসবে

ভক্তগণসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর সংকীর্তন শ্রবণ করিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন। ইহার বিস্তৃত বর্ণনা কথামৃতে আছে।

রামচন্দ্র দত্তের উদ্যানবাটী (যোগোদ্যান মঠ) — রামচন্দ্র দত্তের প্রতিষ্ঠিত এই সাধন ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূত দেহাস্থি ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মাষ্টমী দিবসে সংরক্ষিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে ২৬-১২-১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আসিয়াছিলেন। গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া সর্বপ্রথম ঠাকুর তুলসী কানন দর্শন করেন এবং জায়গাটি ঈশ্বর চিন্তার পক্ষে প্রকৃষ্ট স্থান বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। এখানে রামবাবুর প্রদত্ত ফল ও মিষ্টান্ন ঠাকুর ভক্তগণসহ গ্রহণ করেন। বর্তমানে ইহা বেলুড় মঠের একটি শাখা কেন্দ্র — ঠিকানা শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠ, ৭ নং যোগোদ্যান লেন, কাঁকুড়গাছি, কলি-৫৪।

রাজাবাজার — শিবনাথ শাস্ত্রীর বাড়ি — ১৬-৯-১৮৮৪ তারিখে শিবনাথের বাড়িতে গমন করিয়া তাঁহার দেখা না পাওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে অপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মভক্তগণের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেইদিন শিবনাথের সঙ্গে দেখা হয় নাই।

পটলডাঙ্গা — ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি — ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি — কলেজ স্ট্রীটে, পণ্ডিত শশধর এই বাড়িতে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ঈশান মুখোপাধ্যায়ের ঠনঠনিয়ার বাড়ি হইতে পণ্ডিতকে দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন।

মেছুয়াবাজার — লছমী বাঈ-এর বাড়ি — রানী রাসমণি ও মথুরবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধনকালে তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য লছমী বাঈ প্রমুখ

সুন্দরী বারনারীকুলের সাহায্যে ঠাকুরকে প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে এবং পরে কলিকতারা মেছুয়াবাজার পল্লীর এক গৃহে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এইসব নারীদের মধ্যে জগন্মাতাকে দেখিয়া 'মা' 'মা' বলিয়া বাহ্যচেতনা হারাইয়াছিলেন। ইহাতে এই সব নারীর মধ্যে বাৎসল্য ভাবের সঞ্চার হয় এবং তাহারা ঠাকুরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তাঁহাকে প্রণাম পূর্বক চলিয়া গিয়াছিল।

গেঁড়াতলার মসজিদ — ঠিকানা ১৮২ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলি-৭, মধ্য কলিকতার এই মসজিদে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি আকস্মিক ঘটনায় একদিন শুভাগমন হইয়াছিল। ভক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। একদিন সন্ধ্যার সময়ে এই মসজিদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একজন মুসলমান ফকির প্রেমের সহিত ব্যাকুলভাবে ডাকিতেছিলেন, 'প্যারে, আ যাও, আ যাও।' এই সময়ে তিনি দেখেন ঠাকুর একটি ভাড়াটিয়া গাড়ি হইতে নামিয়াই দৌড়াইয়া ফকিরকে আলিঙ্গন করেন। দুই জনেই বেশ কিছুক্ষণ আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়াছিলেন। গাড়িটিতে ঠাকুর ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল সহ কালীঘাট হইতে মা-কালীকে দর্শন করিয়া ফিরিতেছিলেন। এই মসজিদটি শতাধিক বছরের প্রাচীন এবং এলাকাটির বর্তমান নাম কলাবাগান। ইহা অবাঙ্গালী মুসলমান ভক্তগণ কর্তৃক পরিচালিত।

সিমুলিয়া — নরেন্দ্রনাথের বাড়ি — শ্রীশ্রীঠাকুর ৩ নং গৌরমোহন মুখার্জ্জী স্ট্রীটের নরেন্দ্রনাথের এই পৈতৃক বাড়িতে তাঁহাকে মাঝে মাঝে দেখিতে ও খোঁজখবর লইতে আসিতেন। মহেন্দ্রনাথ দত্তের রচনা হইতে জানা যায় ঠাকুর কখনও এই গৃহে প্রবেশ করেন নাই। কিন্তু লাটু মহারাজ ও মাস্টারমহাশয়ের মতে ঠাকুর নরেন্দ্রের বাড়ি আসিয়াছিলেন — লাটু মহারাজ সঙ্গে ছিলেন।

নরেন্দ্রের মাতামহীর বাড়ি — নরেন্দ্রের পৈতৃক বাটীর নিকটে ৭ নং রামতনু বসু লেনে তাঁহার মাতামহীর বাটীতে ঠাকুর বহুবার শুভগমন করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ এই বাড়িতে দোতলায় নির্জন একটি ছোট ঘরে লেখাপড়া ও গান বাজনার উদ্দেশ্যে থাকিতেন।

রাজমোহনের বাড়ি — ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর সন্ধ্যার কিছু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর সিমুলিয়ায় রাজমোহনের বাড়িতে নরেন্দ্র প্রভৃতি যুবকদের ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা দেখিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যুবকদের উপাসনা দেখিয়া রাজমোহনের বাড়িতে জলযোগ করেন।

রামচন্দ্র দত্তের বাড়ি — সিমুলিয়ার ১১, মধু রায় লেনের এই বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বৈশাখী পূর্ণিমায় রামবাবু প্রথম লইয়া আসেন। তখন হইতে প্রতিবৎসর এইদিনে ভক্তদের লইয়া উৎসব করিতেন। এতদ্ব্যতীত বহুবার শ্রীশ্রীঠাকুর এই বাড়িতে আসিয়া ভক্তসঙ্গে কীর্তন, ভাগবত পাঠ শ্রবণ ও ভক্তিমূলক গান শ্রবণ করিয়া ভাবস্থ হইয়াছেন। ভগবৎ প্রসঙ্গে ভক্তদের উদ্দীপিত করিয়াছেন ও ভক্তসঙ্গে আনন্দে আহারাদি করিয়াছেন। বর্তমানে এ বাড়ির চিহ্ন নাই। অক্সফোর্ড মিশনের পিছনে এ বাড়ি ভাঙ্গিয়া রাস্তা হইয়াছে।

সুরেন্দ্র মিত্রের বাড়ি — সিমুলিয়াতে নরেন্দ্রনাথের বাড়ির কাছেই, গৌরমোহন মুখার্জী লেনের সংসগ্নে (অক্সফোর্ড মিশনের পিছনে) সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুর আগমন করিয়াছিলেন। এ বাড়িটিও ভাঙ্গা হইয়াছে।

মনোমোহন মিত্রের বাড়ি — ২৩ নং সিমুলিয়া স্ট্রীটের এই বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুর শুভাগমন করিয়াছিলেন। ৩-১২-১৮৮১ তারিখে এই বাড়িতে কেশব সেন ও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে ভগবৎ প্রসঙ্গ ও কীর্তনানন্দের পরে আহারাদি করিয়াছিলেন — কথামৃতের পরিশিষ্টে ইহার বিবরণ আছে। কলিকাতায় আসিলে এখানে শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া অন্যত্র যাইতেন। বর্তমানে বাড়িটির হস্তান্তর হইয়াছে।

মহেন্দ্র গোস্বামীর বাড়ি — (বর্তমানে ৪০/৪১ নং মহেন্দ্র গোস্বামী লেন): শ্রীম দর্শন — ১৫শ খণ্ডে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই বাড়িতে শুভাগমনের কথা উল্লিখিত আছে। এই বাড়িতে পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন গৌর-নিতাই বিগ্রহের পালাক্রমে সেবা আছে। মহেন্দ্র গোস্বামী নিত্যানন্দের বংশধর। খড়দহে তাঁহাদের প্রাচীন বাড়ি। শ্রীশ্রীঠাকুর গোর-নিতাই বিগ্রহ দর্শনে আসিয়াছিলেন।

হাতিবাগান — মহেন্দ্র মুখুজ্জের ময়দার কল — স্টার থিয়েটারে চৈতান্যলীলা দর্শনের জন্যে মহেন্দ্র মুখুজ্জের ময়দার কলে শ্রীশ্রীঠাকুর ২১-৯-১৮৮৪ তারিখে আসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছিলেন। থিয়েটারে অভিনয় দর্শনের পর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার পথে এখানে মহেন্দ্রবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরকে সযত্নে খাওয়াইয়াছিলেন।

শ্যামপুকুর — কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের বাড়ি — ২৫, শ্যামপুকুর স্ট্রীটে তাঁহার বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে অনেকবার লইয়া গিয়া সেবা করিয়াছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের নিকট ভগবৎ প্রসঙ্গ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর

তাঁহাদের বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন। ভক্তদের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাদের সেবার প্রশংসা করিয়াছেন।

কালীপদ ঘোষের বাড়ি — ২০, শ্যামপুকুর স্ট্রীট। এই বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুর শুভাগমন করিয়াছিলেন পুঁথিতে উল্লিখিত আছে। দক্ষিণেশ্বরে একদিন কালীপদ উপস্থিত হইলে, শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকতায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখনই নৌকায় করিয়া ঠাকুর লাটুর সঙ্গে রওনা হন। পথে গঙ্গাবক্ষে কালীপদর জিহ্বায় মন্ত্র লিখিয়া দিয়া তাঁহাকে কৃপা করেন এবং তাঁহার বাড়িতে শুভাগমন করেন। ৺শ্যামা পূজা দিবসে প্রতি বৎসর এই বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মরণোৎসব হয়।

শ্যামপুকুর বাটী — গোকুল ভট্টাচার্যের বৈঠকখানা, ৫৫ নং শ্যামপুকুর স্ট্রীট। গলার অসুখের চিকিৎসার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এই বাড়িতে ২-১০-১৮৮৫ তাং হইতে ১০-১২-১৮৮৫ পর্যন্ত ৭০ দিন ছিলেন। এই সময়কার বারদিনের বিবরণ কথামৃতে উল্লিখিত আছে। এই বাড়ি কালীপদ ঘোষের প্রচেষ্টায় ভাড়া লওয়া হইয়াছিল।

প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি — ৪০ রামধন মিত্র লেন, কলিকাতা-৪, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তসঙ্গে এই বাড়িতে আসিয়া মধ্যাহ্নে সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে ভগবৎপ্রসঙ্গ করেন।

শ্যামপুকুরে বিদ্যাসাগরের স্কুল — এই মেট্রোপলিটন স্কুল শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ের অনতিদূরে অবস্থিত। গড়ের মাঠে সার্কাস দেখিতে যাওয়ার পথে

শ্রীশ্রীঠাকুর মাস্টারমহাশয়কে এই স্কুল হইতে গাড়িতে তুলিয়া লইয়াছিলেন (১৫-১১-১৮৮২)

গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ি — এই বাড়ির পুরানো নম্বর ছিল, ২৩ নং বোস পাড়া লেন। বর্তমানে ইহার প্রায় সবটাই ভাঙ্গিয়া নূতন রাস্তা 'গিরিশ এভিনিউ' তৈয়ারী হইয়াছে। বাড়িটির চারিদিকেই রাস্তা। মাঝখানে দ্বীপের মতো সামান্য একটু অংশের সংস্কার করিয়া গিরিশ মেমোরিয়াল নামে একটি পাঠাগার দোতলায় স্থাপন করা হইয়াছে। প্রাচীর দিয়া ঘেরা জায়গাটিতে গিরিশচন্দ্রের দণ্ডায়মান পূর্ণবয়ব মূর্তি দক্ষিণাস্য অবস্থায় স্থাপিত। বর্তমান ঠিকানা: "গিরিশ সমৃতিমন্দির", গিরিশ অ্যাভিনিউ, বাগবাজার, কলি-৩। শ্রীশ্রীঠাকুর এই বাড়িতে কয়েকবার শুভাগমন করিয়াছিলেন।

বলরাম বসুর বাড়ি — 'বলরাম মন্দির' নামে বর্তমানে খ্যাত। শ্রীশ্রীঠাকুর শতাধিকবার এই বাড়িতে শুভাগমন করিয়া মধ্যে মধ্যে রাত্রি বাস করিয়াছেন। ভক্তসঙ্গে মিলন, বলরামের শুদ্ধ অন্ন গ্রহণ, রথযাত্রা উৎসবে সংকীর্তন, বিভিন্ন সময়ে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, ভাবাবেশে ভক্তদের প্রতি কৃপা, সমাধি, প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুরের বহুলীলা এই বাড়িতেই প্রকটিত হইয়াছিল। ঠাকুর এই বাড়িকে তাঁর 'কেল্লা' বলিতেন। বর্তমানে এই বাড়িটির বর্হিভাগ রামকৃষ্ণ মঠের সাধুদের দ্বারা গঠিত পৃথক ট্রাস্টীগণের পরিচালনাধীন। ঠিকানা — ৭ নং গিরিশ অ্যাভিনিউ, কলি-৩।

চুনিলাল বসুর বাড়ি — ৫৮বি, রামকান্ত বোস স্ট্রীট। এই বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুর আসিয়াছিলেন — ভক্তমালিকা ২য় খণ্ডে উল্লিখিত আছে।

নন্দলাল বসুর বাড়ি — বর্তমান ঠিকানা — ৯ নং পশুপতি বসু লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩। এই বাড়িতে অনেক দেব-দেবীর ছবি আছে শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ২৮-৭-১৮৮৫ তারিখে এখানে আসেন ও ছবিগুলি দেখিয়া প্রশংসা করেন।

দীননাথ বসুর বাড়ি — বর্তমান ঠিকানা ৪৭/এ, বোস পাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩। স্বামী অখণ্ডানন্দজীর 'স্মৃতি কথা' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে শ্রীশ্রীঠাকুর এই বাড়িতে কেশবচন্দ্র সেন ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তদের সঙ্গে শুভাগমন করিয়াছিলেন। সে সময় হৃদয়, শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবক ও সঙ্গী, তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। এই গৃহে কিশোর গঙ্গাধর ও হরিনাথ তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন।

কালীনাথ বসুর বাড়ি — দীননাথ বসুর কনিষ্ঠ সহোদর কালীনাথের ১৩/১, বোস পাড়া লেনের বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুর কেশববাবু ও অন্যান্যদের সঙ্গে একইদিনে আসিয়াছিলেন। বর্তমানে বাড়িটি হস্তান্তরিত হইয়া নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। ঠিকানা — ৬/এ, নবীন সরকার লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩।

যোগীন মা-র বাড়ি — ২৮-৭-১৮৮৫ তারিখে গোলাপ মা-র বাড়ি হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তসঙ্গে এই বাড়িতে শুভাগমন করেন। বাড়িটি আগে এক তলা ছিল, এখন তিনতলা হইয়াছে। ঠিকানা — ৫৯বি, বাগবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৩।

দীনানাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি — বাগবাজার পুলের কাছে এই বাড়িতে দীননাথের ভক্তির কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর মথুরবাবুর সঙ্গে গাড়ি করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে এই বাড়ির কোন সন্ধান জানা যায় না।

গঙ্গাতীরে নূতন বাড়ি — বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখার্জী স্ট্রীটের এই একতলা ভাড়া বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চিকিৎসার জন্য দক্ষিণেশ্বর হইতে ভক্তগণ তাঁহাকে লইয়া আসেন। কিন্তু প্রশস্ত উদ্যানের মুক্ত বায়ুতে থাকিতে অভ্যস্ত ঠাকুর ওই স্বল্প পরিসর বাটীতে প্রবেশ করিয়াই ওই স্থানে বাস করিতে পারিবেন না বলিয়া তৎক্ষণাৎ পদব্রজে বলরাম বসুর ভবনে চলিয়া যান।

৺সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, বাগবাজার — শ্রীশ্রীঠাকুর এই মন্দিরে আসিয়াছিলেন। — শ্রীম-দর্শন ১৫শ খণ্ডে উল্লিখিত আছে।

৺মদনমোহন মন্দির, বাগবাজার — এই মন্দির দর্শনে শ্রীশ্রীঠাকুর আগমনের কথা শ্রীম-দর্শনে (১৫শ খণ্ডে) উল্লিখিত আছে।

কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের বাড়ি — ৯/১ কুমারটুলি স্ট্রীট, কলিকাতা-৫, বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের এই বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ চিকিৎসার জন্য আসিয়াছিলেন।

অধরলাল সেনের বাড়ি — বর্তমান ঠিকানা — ৯৭বি, বেনিয়াটোলা স্ট্রীট; শোভাবাজার, কলিকতা-৫। শ্রীশ্রীঠাকুর এই বাড়িতে ভক্তসঙ্গে অন্তত ৯ বার শুভাগমন করিয়াছিলেন (কথামৃতের বিবরণ অনুযায়ী)। এই বাড়িতে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও ভগবৎ প্রসঙ্গ হইয়াছিল। ভক্তসঙ্গে

কীর্তন, ভগবৎ প্রসঙ্গ, সমাধিস্থ হওয়া ও আহার করার কথা কথামৃতে উল্লিখিত আছে।

নন্দনবাগান, কাশীশ্বর মিত্রের বাড়ি — গ্রে স্ট্রীটে ২-৫-১৮৮৩ তারিখে আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত কাশীশ্বর মিত্রের এই বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে শ্রীশ্রীঠাকুর শুভাগমন করিয়াছিলেন। এই উৎসবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ঠাকুর বংশের ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন।

ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি — কলিকতার নতুন বাজারের নিকট তাঁহার বাড়ি ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের গলরোগের প্রথম অবস্থায় এই ডাক্তারের বাড়িতে গোলাপ-মা, লাটু ও কালী দক্ষিণেশ্বর হইতে নৌকাযোগে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখাইতে লইয়া আসিয়াছিলেন — পুঁথিতে উহার উল্লেখ আছে।

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাসা বাড়ি — নিমু গোস্বামী লেনের এই বাড়িতে ৬-৪-১৮৮৫ তারিখে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তসঙ্গে শুভাগমন পূর্বক কীর্তনানন্দে সমাধিস্থ হন। পরে ভগবৎপ্রসঙ্গ করিয়া জলযোগ করেন। চৈত্রমাসের অসতন্ত গরমে কুলপি খাইয়া আনন্দ করিয়াছিলেন।

কোম্পানী বাগান — বর্তমানে রবীন্দ্রকানন — পুঁথিতে ‘বিডন-বাগান’ নামে উল্লিখিত। ডা: দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গলরোগের প্রথম অবস্থায় দেখানোর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর, গোলাপ-মা, লাটু ও কালীর সহিত এই বাগানে দর্শনে আসিয়াছিলেন। নানাপ্রকারের বৃক্ষলতা, সিমেন্টে তিলক চিত্র আঁকা, তিলকের

মালা ইত্যাদি দেখিতে দেখিতে বেলা ১।।টার সময় তাঁহারা নৌকাযোগে প্রত্যাবর্তন করেন।

স্টার থিয়েটার — ৬৮ নং বিডন স্ট্রীট। কথামৃতে আছে ২১-৯-১৮৮৪ তারিখে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তসঙ্গে এখানে 'চৈতন্যলীলা' দর্শন, ১৮-১২-১৮৮৪ তারিখে প্রহ্লাদ চরিত্র এবং ২৫-২-১৮৮৫ তারিখে বৃষকেতু অভিনয় দর্শনে শুভাগমন করিয়াছিলেন। বিডন স্ট্রীটের এই রঙ্গমঞ্চ পরে এমারেল্ড থিয়েটার ও ক্লাসিক থিয়েটারের আভিনয় হইত। পরে কোহিনূর ও মনোমোহন থিয়েটার এখানে হয়।

গরানহাটা — বর্তমান নিমতলা স্ট্রীট — বৈষ্ণব সাধুদের আখড়ায় ষড়ভুজ মহাপ্রভুর দর্শন করিতে শ্রীশ্রীঠাকুর ১৬-১১-১৮৮২ তারিখে বৈকালে এখানে আসিয়াছিলেন।

হাটখোলা — বারোয়ারী মেলায় একদিন সকালে নীলকণ্ঠের ভক্তিমাখা কৃষ্ণলীলা গীত শুনিতে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তগণ সঙ্গে গিয়াছিলেন — পুঁথিতে ইহার উল্লেখ আছে।

পাথুরিয়াঘাটায় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ি — কাপ্তেনের সঙ্গে এই বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুর আসিয়াছিলেন। পূর্বে একবার যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে যদুলাল মল্লিকের দক্ষিণেশ্বরের বাগানে দেখা ও তাঁহার সঙ্গে 'ঈশ্বর চিন্তা করাই কর্তব্য' বিষয়ে কতাবার্তা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের আগমন দিবসে যতীন্দ্রমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৌরীন্দ্রমোহনের সহিত কথাবার্তা তাঁহার বাড়িতেই হয়। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন

‘গলার বেদনার কথা’ জানাইয়া দেখা করেন নাই। ১৫-১০-১৮৮২ তারিখে কথামৃতে ইহার উল্লেখ আছে।

যদুলাল মল্লিকের বাড়ি — ৬৭ পাথুরিয়া ঘাটা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। এই বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুর মল্লিকদের কুলদেবী ৺সিংহবাহিনী দর্শন করিতে আসিতেন।

খেলাৎ ঘোষের বাড়ি — ঠিকানা ৪৭, পাথুরিয়া ঘাটা স্ট্রীট, কলিকতা-৬। ২১-৭-১৮৮৩ তারিখে শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রি ১০টার সময় এই বাড়িতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। খেলাৎ ঘোষের সম্বন্ধী এক প্রবীণ বৈষ্ণব ভক্তের আগ্রহে শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে আগমন করেন। কথামৃতে ইহার উল্লেখ আছে। এই বৈষ্ণব ভক্তের নাম জানা গিয়াছে শ্রীনিত্যানন্দ সিংহ; তাঁহার বাড়ির ঠিকানা নিত্যানন্দ ধাম, ৩৮/৮, বোস পাড়া লেন, বাগবাজার।

জয়গোপাল সেনের বাড়ি — মাথাঘষা গলি — বর্তমানে রতন সরকার স্কোয়ার, বড় বাজার, ২৮-১১-১৮৮৩ তারিখে সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর এই বাড়িতে ভক্তসঙ্গে শুভাগমন, ভগবৎ প্রসঙ্গ ও ভজন করিয়া গৃহস্থ ভক্তদের উৎসাহ দিয়াছিলেন — কথামৃতে ইহার উল্লেখ আছে। ইঁহার বেলঘরিয়ার উদ্যান বাটিতে (৮নং বি টি রোড) ঠাকুর উপস্থিত হইয়া কেশবচন্দ্র সেনের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিয়াছিলেন।

জোড়াসাঁকো — মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি — বর্তমান ঠিকানা ৬/৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৭। মথুরবাবুর সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর এই বাড়িতে মহর্ষির সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। ঠিক কোন ঘরে সাক্ষাৎ হইয়াছিল

তাহা এখন জানা যায় না। ২৬-১০-১৮৮৪ তারিখে কথামৃতে এই প্রসঙ্গ আছে। বর্তমানে এই বাড়িটি ও অন্যান্য বাড়িগুলি রবীন্দ্র সোসাইটি ও রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম কেন্দ্র।

আদি ব্রাহ্মসমাজ — বর্তমান ঠিকানা — ৫৫/১ রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা-৭। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মথুরবাবুর সহিত শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে আসিয়া কেশব সেনকে বেদীর উপর ধ্যানস্থ অবস্থায় দেখিয়াছিলেন।

জোড়াসাঁকো হরিসভা — শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে কীর্তন শুনিতে আসিয়াছিলেন। ১৮-১২—১৮৮৩ তারিখে তিনি স্বমুখে তাঁহার সমাধিস্থ অবস্থায় দেহত্যাগের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন।

কাঁসারিপাড়া হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা — ডব্লিউ সি বনার্জী স্ট্রীট — ১৩-৫-১৮৮৩ তারিখে শ্রীশ্রীঠাকুর এই সভার বার্ষিক উৎসবে মনোহর সাঁই-এর 'মান' পালা-গান শুনিতে শুভাগমন করিয়াছিলেন।

বড়বাজার — মারোয়াড়ী ভক্তের বাড়ি — ১২ নং মল্লিক স্ট্রীট। ২০-১০-১৮৮৪ তারিখে দেওয়ালির উৎসবের সময় মারোয়াড়ী ভক্তদের অন্নকূট উৎসবে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তসঙ্গে এখানে আসিয়াছিলেন। ওইদিন ময়ূরমুকুটধারী-বিগ্রহ দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মণিলাল মল্লিকের বাড়ি — বর্তমান ঠিকানা ৮২ নং এবং ১২০ নং রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা-৭। সিঁদুরিয়া পটীর ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক মহোৎসবে শ্রীশ্রীঠাকুর ২৬-১১-১৮৮২ এবং ২৬-১১-১৮৮৩ তারিখে এখানে শুভাগমন

করিয়া ব্রাহ্মভক্তদের সহিত ভগবৎ প্রসঙ্গ ও আহারাদি করিয়াছিলেন। বর্তমানে এই বাড়িটি জৈন মন্দির। বাড়িটির সম্মুখের অংশ দোতলায় যেখানে শ্রীশ্রীঠাকুর আসিয়া ছিলেন সংস্কার করার পর — এখনও আছে।

কলুটোলা: কেশব সেনের ভ্রাতা নবীন সেনের বাড়ি — এই বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুর অন্তত দুইবার আসিয়াছিলেন — কথামৃতে উল্লিখিত আছে। ১৮৭৫ - ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন একদিন হৃদয়ের সঙ্গে আসিয়াছিলেন একথা ২৮-৫-১৮৮৪ তারিখের বিবরণে কথামৃতে আছে। এতদ্ব্যতীত ৪-১০-১৮৮৪ তারিখে কোজাগরী পূর্ণিমার দিন কেশবের মাতাঠাকুরানীর নিমন্ত্রণে ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দ করিয়া আহার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে এই বাড়িটি হস্তান্তরিত হইয়াছে। অতি জীর্ণ অবস্থায় একতলায় একটি ঘর মাত্র আছে। বর্তমান ঠিকানা ১২২সি, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৭৩।

কলুটোলার হরিসভা — শ্রীশ্রীঠাকুর এই হরিসভায় নিমন্ত্রিত হইয়া হৃদয়ের সঙ্গে ভাগবত পাঠ শুনিতে আসিয়াছিলেন। পাঠ শুনিতে শুনিতে ভাবে আত্মহারা হইয়া শ্রীচৈতন্যের আসনে সমাধিস্থ অবস্থায় দণ্ডায়মান হন। বর্তমান ঠিকানা — কলুটোলা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, ৩২-এ ফিয়ারস্ লেন, কলিকাতা-৭৩।

রাধাবাজার বেঙ্গল ফটোগ্রাফের স্টুডিও — শ্রীশ্রীঠাকুরকে সুরেন্দ্রনাথ মিত্র এখানে ফটো তোলা কিরূপে হয় দেখাইবার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের দণ্ডায়মান ও সমাধিস্থ অবস্থায় ফটো তোলেন।

তেলিপাড়া — ছোট নরেনের বাড়ি — ঠিকানা ৩৩/এ, তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা-৪। শ্রীশ্রীঠাকুর এই বাড়িতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ১৩-৬-১৮৮৫ তারিখে কথামৃতে ইহার উল্লেখ আছে।

শাঁখারি টোলা — ডা: মহেন্দ্রলাল সরকারের বাড়ি — ঠিকানা — ১৫ নং, মহেন্দ্র সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। শ্রীশ্রীঠাকুরের চিকিৎসার জন্য শাঁখারি টোলার ডা: সরকারের এই বাড়িতে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। রামচন্দ্র দত্তের 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত' গ্রন্থে (২১শ পরিচ্ছেদ) ইহার উল্লেখ আছে।

সিঁদুরিয়া পটী কাশীনাথ মল্লিকের ঠাকুর বাড়ি — বর্তমান ঠিকানা — ১৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৭। কাশীনাথ মল্লিকের এই ঠাকুর বাড়িতে পালাক্রমে পূজিতা ৺সিংহবাহিনী দেবীকে দর্শন করিতে শ্রীশ্রীঠাকুর একবার আসিয়াছিলেন। চাষা-ধোপা পাড়ার মল্লিকদের আর এক শরিকের বাড়িতেও শ্রীশ্রীঠাকুর এই দেবী দর্শনে গিয়াছিলেন — কথামৃতে ইহা উল্লিখিত আছে।

জানবাজার রানী রাসমণির বাড়ি — বর্তমান ঠিকানা — ১৩ নং, রানী রাসমণি রোড, কলিকাতা-৮৭, জানবাজারে রানীর বাড়িতে আসিলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই দোতলা বাড়িটিতে বাস করিতেন। তাঁহার ব্যবহৃত খাটটি এখনও আছে। মথুরবাবুর প্রবলভক্তি বিশ্বাসের ফলে শ্রীশ্রীঠাকুরকে অধিক সময় নিকটে পাইবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর হইতে লইয়া আসিয়া দীর্ঘকাল সেবা করিতেন। একত্রে আহার, বিহার, এমনকি একই কক্ষে শয়ন পর্যন্ত

করিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সখীভাব সাধন কালে এখানে অনুষ্ঠিত অনেক ঘটনার বিবরণ 'লীলাপ্রসঙ্গে' আছে।

ময়দান অঞ্চল — গড়ের মাঠ — শ্রীশ্রীঠাকুর দুইবার এখানে আসার কথা কথামৃতে উল্লেখ আছে। ২১-৯-১৮৮৪ তারিখের বিবরণে আছে একবার বেলুন উড়ানো দেখিতে আসিয়া একটি সাহেবের ছেলেকে ত্রিভঙ্গ হইয়া গাছে হেলান দেওয়া অবস্থায় দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন হওয়ায় তিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার ১৫-১১-১৮৮২ তারিখে উইলসন সার্কাস দেখিতে আসিয়াছিলেন।

লাটসাহেবের বাড়ি — বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের বাসভবন। ময়দাবের উত্তরে ছয় একর বিস্তৃত জায়গাতে ইহা অবস্থিত। কলিকাতায় শ্রীশ্রীঠাকুর আসিলে হৃদয় তাঁহাকে বড় বড় থামওয়ালা এই বাড়ি দেখান। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'মা দেখিয়ে দিলেন, কতকগুলি মাটির ইট উঁচু করে সাজানো।' ৯-৩-১৮৮৪ তারিখে কথামৃতে ইহার উল্লেখ আছে।

ফোর্ট উইলিয়াম — রাজা তৃতীয় উইলিয়মের নামে কলিকাতার এই কেল্লা গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত। ইহা অসম অষ্টভুজাকৃতির। আয়তন ৫ বর্গ কিলোমিটার। ইহার অস্ত্রাগার বিশেষ দ্রষ্টব্য। মথুরবাবুর সহিত শ্রীশ্রীঠাকুর এই কেল্লা দেখিয়াছিলেন। কথামৃতে ২৫-৫-১৮৮৪ তারিখে ইহার উল্লেখ আছে। সংসারীর পক্ষে ঈশ্বরের সাধন গৃহে থাকিয়াই সুবিধাজনক। এই প্রসঙ্গে গৃহকে কেল্লার সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, যেমন কেল্লা হইতে যুদ্ধ করিলে কেল্লার অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। পুঁথিতে আছে মথুরবাবুর সঙ্গে ফিটন গাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে আসিতে দর্শন করিয়া শিখ সৈন্যরা ইংরেজ সেনাধ্যক্ষের অধীনে

কেল্লাভিমুখে গমন কালে পথে অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়া ইউনিফর্ম পরা অবস্থাতেই ‘জয় গুরু’ বলিয়া তাঁহাকে ভুলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিয়াছিল। সেনাধ্যক্ষ তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাহাদের এরূপ কাজের জন্য প্রশ্ন করিলে, তাহারা উত্তর দিয়াছিল ইহাই শিখদের গুরুদর্শনে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর চিরাচরিত রীতি। ‘কেল্লা’ শব্দটির ব্যবহার শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকক্ষেত্রে করিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িকে ‘মা কালীর কেল্লা’ ও বলরাম ভবনকে তাঁহার দ্বিতীয় কেল্লা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি ও যাদুঘর — তখনকার বেঙ্গল সুপ্রীম কোর্টের এক বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোনস্ ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি ভারতে ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য এই সোসাইটি স্থাপন করেন। এখানে এশিয়ার অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি এবং প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও প্রাণিতত্ত্বের নিদর্শন সংগৃহীত হয় তাঁহারই প্রচেষ্টায়। প্রথমত এগুলিকে ওল্ড সুপ্রীম কোর্টে ও বিভিন্ন স্থানে ভাড়া বাড়িতে রাখা হয়, পরে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে পার্ক স্ট্রীটে সোসাইটির নবনির্মিত ভবনে স্থায়ী ভাবে রাখা হয়। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভারতীয়গণকে সোসাইটির সভ্যপদ দেওয়া হয়। বিভিন্ন সময়ে সংস্থাটির নাম পরিবর্তিত হইয়া অবশেষে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে ইহার নাম হয় ‘এশিয়াটিক সোসাইটি।’ এই সোসাইটির প্রচেষ্টাতেই কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছিল। সোসাইটির মিউজিয়মের জিনিসগুলি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম বা ভারতীয় সোসাইটিতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই সিসাইটির নূতন বাড়িটির উদ্বোধন হয় এবং

বর্তমানে এই সোসাইটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে ঘোষিত। শ্রীরামকৃষ্ণ এই সোসাইটির মিউজিয়ম (যাদুঘর) দেখিতে আসিয়াছিলেন। কথামৃতে ইহার উল্লেখ আছে — ২-৩-১৮৮৪, ৯-৩-১৮৮৪ ও ২৩-১০-১৮৮৫ তারিখগুলির বিবরণে। হৃদয়ের পরামর্শে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার শারীরিক ব্যাধির আরামের জন্য মাকে বলিতে লজ্জিত হন। বলিয়াছিলেন সোসাইটিতে দেখা মানুষের কঙ্কাল যেমন তার দিয়া শক্ত করিয়া জুড়িয়া রাখা আছে, সেইরূপ তাঁহার শরীরটা শক্ত করিয়া দিলে তিনি মায়ের নামগুণকীর্তন করিতে পারিবেন।

মিউজিয়ামে দেখিয়াছিলেন জানোয়ার পাথর (fossil) হইয়া গিয়াছে। ইহাতে সাধু সঙ্গে উপমা দিয়া বলিয়াছিলেন, সাধুসঙ্গের ফলে মানুষও সাধু হিয়া যায়। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমনের স্মৃতি রক্ষার জন্য সোসাইটির নূতন বাড়ির চারতলার হল ঘরে তাঁহার একটি সুন্দর প্রতিকৃতি স্থাপিত হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া সোসাইটি তাঁহার একটি প্রতিকৃতি স্থাপন ও বিবেকানন্দ অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি ও অদ্যাপক নিয়োগ করিয়াছেন। বর্তমান ঠিকানা ১ নং পার্ক স্ট্রীট কলিকাতা-১৬। প্রধান ফটকের ডানদিকের পিলারে শ্বেতপাথরের ফলকে ছোট অক্ষরে লেখা আছে (The Asiatic Society)

জগন্নাথ ঘাট ও কয়লাঘাট — শ্রীশ্রীঠাকুর জগন্নাথ ঘাটে নামিয়াছিলেন। শ্রীম দর্শনে (১৫শ খণ্ডে) উল্লিখিত আছে। ২৭-১০-১৮৮২ তারিখে শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বর হইতে কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্মভক্তদের সহিত স্টীমারে আসিয়া গঙ্গাবক্ষে ভগবৎ প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। সেদিন কয়লাঘাটে নামিয়াছিলেন — কথামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে।

আলিপুর চিড়িয়াখানা — শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতি কথায় আছে একবার তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে চিড়িয়াখানার সিংহ দেখাইবার জন্য অনুরোধ করেন। "সিংহ জগজ্জননী দেবী দুর্গার বাহন" বলিতে বলিতে তাঁহার মধ্যে এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি জাগ্রত হইল। সেদিন শাস্ত্রীমহাশয়ের জরুরী কাজ থাকায় নিজে যাইতে পারেন নাই। সুকিয়া স্ট্রীট পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরকে গাড়িতে লইয়া আসিয়া নরেন্দ্রনাথের দায়িত্বে তাঁহাকে চিড়িয়াখানায় পাঠান। কথামৃতে ২৪-২-১৮৮৪ তারিখের বিবরণে আছে — 'চিড়িয়াখানা দেখাতে লয়ে গিছলো। সিংহ দর্শন করেই আমি সমাধিস্থ হয়ে গেলাম। ঈশ্বরীয় বাহনকে দেখে ঈশ্বরীয় উদ্দীপন হলো। — তখন আর অন্য জানোয়ার কে দেখে। সিংহ দেখেই ফিরে এলাম।' প্রায় চল্লিশ একর পরিমিত স্থানে এই চিড়িয়াখানাতে অনেক প্রকারের বন্য প্রাণীর সংগ্রহ আছে।

কালীঘাট মা কালীর মন্দির — এই মন্দির প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্বে নির্মিত। পৌরাণিক কাহিনীতে দেবী সতীর একটি অঙ্গুলি এখানে পড়িয়াছিল। ইহা হিন্দুদের একটি মহাতীর্থ। শ্রীশ্রীঠাকুর এই মহাতীর্থে কয়েকবার মায়ের দর্শনে আসিয়াছিলেন। ২৯-১২-১৮৮৩ তারিখে এখানে আসার কথা কথামৃতে উল্লিখিত আছে। লীলাপ্রসঙ্গে — গুরুভাব উত্তরার্ধ ৩য় অধ্যায়ে আছে কালীঘাট তীর্থে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। সে সময় সঙ্গী ভক্তদের মধ্যে একজনকে বলিয়াছিলেন 'দেবস্থান তীর্থস্থান দর্শনাদি করে এসে সেই সব ভাব নিয়ে থাকতে হয়। জাবর কাটতে হয়, তা নইলে ওসব ঈশ্বরীয় ভাব প্রাণে দাঁড়াবে কেন?'

কম্বুলিয়াটোলা — মাস্টারমহাশয়ের ভাড়া বাড়ি — লীলাপ্রসঙ্গে গুরুভাব পূর্বার্ধ (ঝামাপুকুরে) ১ম অধ্যায়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের এখানে আসার কথা আছে। সেদিন কয়েকজন মহিলা ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার দর্শনে গিয়াছিলেন। সেখানে দর্শন না পাইয়া এই বাড়িতে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনলাভপূর্বক তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিয়া ধন্যা হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এই বাড়িতে জলযোগ ও আহারাদি করিয়া সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া যান।

বেণীমাধব পালের উদ্যানবাটী, সিঁথি — শ্রীশ্রীঠাকুরের এখানে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে তিনবার শুভাগমনের কথা কথামৃতে উল্লেখ আছে (২৮-১০-১৮৮২, ২২-৪-১৮৮৩ ও ১৯-১০-১৮৮৪)। এইসব দিনের উৎসবে বহু ব্রাহ্মভক্তের সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গ ও কীর্তনাদি করিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। বর্তমানে এই উদ্যানবাটীটির সমাজগৃহ, সরোবর, উদ্যানসমেত ১৮ বিঘা জমি হস্তান্তরিত হইয়া বিভিন্ন প্লটে অনেক নতুন বাড়ি নির্মিত হইয়াছে। স্থানীয় ভক্তদের প্রচেষ্টায় সমাজ প্রাঙ্গণের একটি অংশে দেড় কাঠা জমিতে একটি বেদী নির্মিত হইয়াছে।

ঠাকুরদের নৈনালের প্রমোদ কানন, সিঁথি — বর্তমানে এখানে Indian Statistical Institute অবস্থিত। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এখানে ডিসেম্বর ১৮৭২ হইতে মার্চ ১৮৭৩ খ্রী: পর্যন্ত ছিলেন। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের সঙ্গে সেখানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

কালী ডাক্তারের বাড়ি — শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ের নিকট এই বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুর শুভাগমন করিয়াছিলেন। (শ্রীম-দর্শন ১৫শ খণ্ড)

সর্বমঙ্গলা মন্দির, কাশীপুর — ইহার নাম ‘চিত্তেশ্বরী সর্বমঙ্গলা মন্দির।’ কিন্তু ‘সর্বমঙ্গলার মন্দির’ নামে অধিক পরিচিত। শ্রীশ্রীঠাকুর এই মন্দিরে কয়েকবার আসিয়াছিলেন। বর্তমান ঠিকানা: ১৫/১, খগেন চ্যাটার্জী রোড, কলিকাতা - ৭০০০০২।

মহিমাচরণ চক্রবর্তীর বাড়ি — কাশীপুর রোডের উপর দিয়া যেখানে Gun and Shell Factory-র রেললাইন গিয়াছে তাহার পূর্বসীমায় বসাক বাগানে মহিম চক্রবর্তির উদ্যানবাটী ছিল। এই বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুর শুভাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি প্রণেতা অক্ষয় কুমার সেন এই বাড়িতেই শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। এই বাড়ির এখন কোন চিহ্নই নাই।

কাশীপুর উদ্যানবাটী — শ্যামপুকুর বাটী হইতে ডাক্তারের পরমর্শে উন্মুক্ত পরিবেশে রাখিবার জন্য ভক্তগণ শ্রীশ্রীঠাকুরকে গোপালচন্দ্র ঘোষের এই উদ্যান বাটীতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর আনয়ন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এখানেই ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী আত্মপ্রকাশে ভক্তদের অভয়প্রদান করেন। ওই ঘটনার স্মরণে আজও প্রতি বৎসর ১লা জানুয়ারি ‘কল্পতরু’ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই বাগানবাটীতে শ্রীশ্রীঠাকুর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট লীলাসংবরণ করেন। পরে এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। বর্তমান ঠিকানা — ৯০ কাশীপুর রোড, কলিকাতা - ৭০০০০২।

কাশীপুর মহাশ্মশান — শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূতদেহ এই শ্মশানঘাটে ১৬-৮-১৮৮৬ তারিখে ভক্তবৃন্দ লইয়া গিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। ওই

স্থানটিতে একটি স্মারক মন্দির নির্মিত হইয়াছে। ইহার বর্তমান নাম — শ্রীরামকৃষ্ণ মহাশ্মশান।

THE END

SRI RAMAKRISHNARPANAMASTHU